সূচীপত্র

৩০শ বর্ষ] ১৩৫৮ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত [২য় খণ্ড

মাসিক বসুমতীর মূল্য

॥ যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায় ॥

ভারতে (ভারতীয় মুদ্রায়) বার্ষিক সডাক ... ১২৲

ষাণ্মাসিক সডাক ৬৲ : প্রতি সংখ্যা ... ... ১৲

” ” রেজিঃ ডাকে ... ১৷৵

পাকিস্তানে (পাক মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক রেজিঃ খরচ সহ ১৫৲

ষাণ্মাসিক ” ” ৭৷৷০ : প্রতি সংখ্যা সডাক (ভারতীয় ও পাক মুদ্রায়) ১৷৵

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিঃ ডাকে ৩০৲ : ষাণ্মাসিক রেজিঃ ডাকে ১৫৲

ভারতের বাহিরে প্রতি সংখ্যা সডাক (ভারতীয় মুদ্রায়) ২৷৷০

॥ টাকা পাঠাবার সময় গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করতে যেন ভুলবেন না ॥

কেশচর্চা।

৩০শ বর্ষ
কার্ত্তিক ১৩৫৮
দ্বিতীয় খণ্ড
১ম সংখ্যা

মাসিক বসুমতী

কথামৃত

মথুরানাথ। বাবা, তোমায় অনুগ্রহ ক'রে শ্যামাপূজার ভার নিতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানি না, শাস্ত্রমত পূজা কেমন ক'রে করবো?

মথুরানাথ। বাবা তোমার যে ভক্তি, সেই ভক্তিতেই মাকে বেঁধে ফেলবে। তোমার পূজায় মন্ত্র-তন্ত্রের দরকার নেই। তুমি ভক্তিভাবে যা ব'লে পূজা করবে, মা তাই সন্তুষ্ট হয়ে গ্রহণ করবেন।

মকৃষ্ণ। মা, তুই আমায় দেখা দে মা; তুই শুনচিস নি মা? তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমায় দেখা দিবি নি মা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর এক দিন গেল মা, তবু তুই দেখা দিলি নি মা!

শ্রীরামকৃষ্ণ। মা, আমায় দেখা দে মা; আমি মান চাই নি, ঐশ্বর্য্য চাই নি, আমি কিছুই চাই নি, মা!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এখানে আমি অনাবশ্যক বিনয়প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না। কিন্তু গোড়াতে এ কথা বলিতেই হইবে, আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে, আমার তাহা নাই। না থাকিলেও ক্ষতি নাই, কারণ আমার জীবনের বিস্তারিত বর্ণনায় কাহারো কোন লাভ দেখি না।

সেইজন্য এস্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব। ইহাতে যে অহমিকা প্রকাশ পাইবে, সেজন্য আমি পাঠকদের কাছে বিশেষ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আমার সুদীর্ঘকালের কবিতালেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি, কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ডকবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই—সেই তাৎপর্য্যটি কি, তাহাও আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি;—তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল পরে একদিন লিখিয়াছিলাম :—

এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ি !
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কৈ ?
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা ল'য়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই
তুমি যা' বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে !

বিশ্ববিধির একটা নিয়ম এই দেখিতেছি যে, যেটা আসন্ন, যেটা উপস্থিত, তাহাকে সে খর্ব্ব করিতে দেয় না। তাহাকে এ কথা জানিতে দেয় না যে, সে একটা সোপানপরম্পরার অঙ্গ। তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, সে আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত। ফুল যখন ফুটিয়া উঠে, তখন মনে হয়, ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য—এম্‌নি তাহার সৌন্দর্য্য—এম্‌নি তাহার সুগন্ধ যে, মনে হয়, যেন সে বনলক্ষ্মীর সাধনার চরমধন—কিন্তু সে যে ফল ফলাইবার উপলক্ষ্যমাত্র, সে কথা গোপনে থাকে—বর্ত্তমানের গৌরবেই সে প্রফুল্ল, ভবিষ্যৎ তাহাকে অভিভূত করিয়া দেয় না। আবার ফলকে দেখিলে মনে হয়, সে-ই যেন সফলতার চূড়ান্ত। কিন্তু ভাবী তরুর জন্য সে যে বীজকে গর্ভের মধ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, এ কথা অন্তরালেই থাকিয়া যায়। এম্‌নি করিয়া প্রকৃত ফুলের মধ্যে ফুলের চরমতা, ফলের মধ্যে ফলের চরমতা রক্ষা করিয়াও তাহাদের অতীত একটি পরিণামকে অলক্ষ্যে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

কাব্যরচনা সম্বন্ধেও সেই বিশ্ববিধানই দেখিতে পাই—অন্তত আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। যখন যেটা লিখিতেছিলাম, তখন সেইটাকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এইজন্য সেইটুকু সমাধা করার কাজেই অনেক যত্ন ও অনেক আনন্দ আকর্ষণ করিয়াছে। আমিই যে তাহা লিখিতেছি এবং একটা কোন বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে সকল লেখা উপলক্ষ্যমাত্র;—তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য্য

["বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থটি পরিচিত। উনবিং[illegible] তাব্দীর বাঙালী সাহিত্যিকদের আত্ম-পরিচয় আছে গ্রন্থটি[illegible]ত। গ্রন্থটির সম্পাদক ছিলেন ৺হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। কয়েকটি জীবনী সম্পাদক স্বয়ং লিখেছেন। কয়েকটি তৎকালীন কয়েক জন লেখক কর্ত্তৃক লিখিত। কবিগ[illegible] [illegible]ন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত এই লেখাটি অনুরোধে লেখা। সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থের জন্ম লিখতে অনুরোধ করায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। বিখ্যাত 'জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ আত্ম-স্মৃতি লিখেছেন, কিন্তু এই লেখাটিতে যেন কিছু-কিছু অন্য কথা আছে। কবি রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে অঙ্কিত করেছেন। গত সংখ্যায় বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী শ্রীসজনীকান্ত দাস-লিখিত আত্ম-স্মৃতি যথাসময়ে না পাওয়ায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'আত্ম-স্মৃতি' মুদ্রিত হ'ল। লেখাটির জন্য 'বিশ্বভারতী'র সৌজন্য স্বীকার করছি।—স]

প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান। ফুৎকার বাঁশীর এক-একটা ছিদ্রের মধ্যে দিয়া এক একটা সুর জাগাইয়া তুলিতেছে এবং নিজের কর্ত্তৃত্ব উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু কে সেই বিচিত্র সুরগুলিকে রাগিণীতে বাঁধিয়া তুলিতেছে? ফুঁ সুর জাগাইতেছে বটে, কিন্তু ফুঁ ত বাঁশী বাজাইতেছে না? সেই বাঁশী যে বাজাইতেছে, তাহার কাছে সমস্ত রাগরাগিণী বর্ত্তমান আছে, তাহার অগোচরে কিছুই নাই।

বলিতেছিলাম বসি একাধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত;
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে,
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নবকৌশলে
গড়িলে মনের মত।

এই শ্লোকটার মানে বোধ করি এই যে, যেটা লিখিতে যাইতেছিলাম সেটা শাদা কথা, সেটা বেশী কিছু নহে—কিন্তু সেই সোজা কথা,—সেই আমার নিজের কথার মধ্যে এমন একটা সুর আসিয়া পড়ে, যাহাতে তাহা বড় হইয়া উঠে, ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বের হইয়া ওঠে। সেই যে সুরটা সেটা ত আমার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না? আমার পটে একটা ছবি দাগিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যে একটা রং ফলিয়া উঠিল, সেই রং ও সে রঙের তুলি ত আমার হাতে ছিল না।

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণী ভরে;
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি যখন আমার একটা ক্ষুদ্র কথা বলিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম, তখন কে একজন উৎসাহ দিয়া কহিলেন—"বল বল, তোমার কথাটাই বল! ঐ কথাটার জন্যই সকলে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে?" এই বলিয়া তিনি শ্রোতৃবর্গের দিকে চাহিয়া চোখ টিপিলেন; স্নিগ্ধ কৌতুকের সঙ্গে একটুখানি হাসিলেন—এবং আমার কথার ভিতর দিয়া কি-সব নিজের কথা বলিয়া লইলেন:

কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে, কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বারবার,
দেখে' তুমি হাস বুঝি!
কে গো তুমি কোথা রয়েছ গোপনে
আমি মরিতেছি খুঁজি!

শুধু কি কবিতালেখার একজন কর্ত্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত যোগ-বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্য্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কি না জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধা-বিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া-জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তিনি বারেবারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন—তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা বিপুলের সহিত বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন। সে যখন একদিন হাট করিতে বাহির হইয়াছিল, তখন বিশ্বমানবের মধ্যে সে আপনার সফলতা চায় নাই—সে আপনার ঘরের সুখ, ঘরের সম্পদের জন্যই কড়ি সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু সেই মেঠো পথ, সেই ঘোরো সুখ-দুঃখের দিক্ হইতে কে তাহাকে জোর করিয়া পাহাড়-পর্ব্বত-অধিত্যকা-উপত্যকার দুর্গমতার মধ্য দিয়া টানিয়া-লইয়া যাইতেছে।

এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ি!
যেদিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই?
গ্রামের যে পথ যায় গৃহপানে,
চাষিগণ ফিরে দিবা-অবসানে,
গোঠে যায় গোরু, বধূ জল আনে
শতবার যাতায়াতে,
একদা প্রথম প্রভাতবেলায়,
সে পথে বাহির হইনু হেলায়
মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে;—
পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক্,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্ত হৃদয়, ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে;
কখনো উদার গিরির শিখরে
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের 'পরে
চলেছি পাগলবেশে!

এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি "জীবন-দেবতা" নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহ-জীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া, বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্যস্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—

আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্ত্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন ;—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎস্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন অনুভব করিতে পারি—সেইজন্য এত-বড়-রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।

আজ মনে হয় সকলেরই মাঝে
তোমারেই ভালবেসেছি ;
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে,
শুধু তুমি-আমি এসেছি।
চেয়ে চারিদিক্‌পানে
কি যে জেগে ওঠে প্রাণে !
তোমার-আমার অসীম মিলন
যেন গো সকলখানে !
কতদিন এই আকাশে যাপিনু
সে কথা অনেক ভুলেছি,
তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে
সে আলোকে দোঁহে দুলেছি।
তৃণ-রোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব-আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি' উঠে পুলকে ?
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী,—
মূক মেদিনীর মর্ম্মের মাঝে
জাগিছে ভাবখানি।
এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি ?

* * * *

লক্ষ-বরষ আগে যে প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে,
তাহার অরুণ-কিরণ-কণিকা
গাঁথ-নি কি মোর জীবনে ?
সে প্রভাতে কোন্‌খানে
জেগেছিনু কেবা জানে ?
কি মুরতিমাঝে ফুটালে আমারে
সেদিন লুকায়ে প্রাণে ?
হে চির-পুরাণো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া !
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া !

তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোন অধিকার নাই। দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের কোনো তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব। আমি কেবল অনুভবের দিক্ দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ, সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধি-মন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে। এ লীলা ত আমি কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা ? আমার চোখে যে আলো ভাল লাগিতেছে, প্রভাত-সন্ধ্যার যে মেঘের ছটা ভাল লাগিতেছে, তৃণতরুলতার যে শ্যামলতা ভাল লাগিতেছে, প্রিয়জনের যে মুখচ্ছবি ভাল লাগিতেছে—সমস্তই সেই প্রেমলীলার উদ্বেল তরঙ্গমালা। তাহাতেই জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের, সমস্ত আলো-অন্ধকারে ছায়া খেলিতেছে।

আমার মধ্যে এই যাহা গড়িয়া উঠিতেছে এবং যিনি গড়িতেছেন, এই উভয়ের মধ্যে যে একটি আনন্দের সম্বন্ধ, যে একটি নিত্য প্রেমের বন্ধন আছে, তাহা জীবনের সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিলে সুখদুঃখের মধ্যে একটি শান্তি আসে। যখন বুঝিতে পারি, আমার প্রত্যেক আনন্দের উচ্ছ্বাস তিনি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন,—আমার প্রত্যেক দুঃখবেদনা তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন জানি যে, কিছুই ব্যর্থ হয় নাই,—সমস্তই একটা জগদ্ব্যাপী সম্পূর্ণতার দিকে ধন্য হইয়া উঠিতেছে।

এইখানে আমার একটি পুরাতন চিঠি হইতে একটা জায়গা উদ্ধৃত করিয়া দিই।—

"ঠিক যাকে সাধারণে ধর্ম্ম বলে, সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ কর্‌তে পেরেছি, তা বল্‌তে পারি নে। কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হ'য়ে উঠচে, তা অনেক সময় অনুভব কর্‌তে পারি। বিশেষ কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট মত নয়,—একটা নিগূঢ় চেতনা—একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন কর্‌তে পার্‌ব,—আমার সুখ, দুঃখ, ভিতর, বাহির, বিশ্বাস, আবরণ, সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পার্‌ব। শাস্ত্রে যা লেখে, তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারি নে—কিন্তু সে সমস্ত সত্য অনেক-সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নাই বল্লেই হয়। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিষটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে' তুলতে পারব, সেই আমার চরমসত্য। জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অনুভব করি, তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারি নে—প্রত্যেক কথাটা বানান করে' পড়তে হ'লে যেমন সমস্ত পদটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বুঝা যায় না, কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায়, তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত

বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি; বুঝতে পারি, যেমন গ্রহনক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে' তৈরী হয়ে উঠবে, আমার ভিতরেও তেম্‌নি অনাদিকাল ধরে' একটা সৃজন চল্‌চে; আমার সুখদুঃখবাসনাবেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ করচে। এই থেকে কি হয়ে উঠবে জানি নে, কারণ, আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানি নে। কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে' দেখি, তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই—আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চল্‌চি, এইটেকে একটা কি বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি, আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণুপরমাণুও থাকতে পারে না, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়—সেইজন্যই এই জ্যোতির্ম্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে' পরিব্যাপ্ত করে' নেয়। নইলে সে কি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ করতে পারত? নইলে তাকে আমি সুন্দর বলে' অনুভব করতেম? * * * আমার সঙ্গে অনন্ত জগৎপ্রাণের যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্চে বর্ণগন্ধগীত। চতুর্দ্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য-অলক্ষ্য-ভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করচে—কথা-বার্ত্তা দিন রাত্রিই চলচে।"

এই পত্রে আমার অন্তর্নিহিত যে সৃজনশক্তির কথা লিখিয়াছি—যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে, সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান, তাৎপর্য্যদান করিতেছে, আমার রূপরূপান্তর—জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই "জীবনদেবতা" নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম:—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম?
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিতদ্রাক্ষাসম!
কত যে বরণ, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন
বাসর-শয়ন তব,
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মূরতি নিত্য নব!

আশ্চর্য্য এই যে, আমি হইয়া উঠিতেছি, আমি প্রকাশ পাইতেছি! আমার মধ্যে কি অনন্ত মাধুর্য্য আছে,—যেজন্য আমি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য সূর্য্যচন্দ্রগ্রহতারকার সমস্ত শক্তিদ্বারা লালিত হইয়া, এই আলোকের মধ্যে, আকাশের মধ্যে চোখ মেলিয়া দাঁড়াইয়াছি—আমাকে কেহ ত্যাগ করিতেছে না। মনে কেবল এই প্রশ্ন উঠে, আমি আমার এই আশ্চর্য্য অস্তিত্বের অধিকার কেমন করিয়া রক্ষা করিতেছি—আমার উপরে যে প্রেম, যে আনন্দ অশ্রান্ত রহিয়াছে,—যাহা না থাকিলে আমার থাকিবার কোন শক্তিই থাকিত না, আমি তাহাকে কি কিছুই দিতেছি না?

আপনি বরিয়া লইয়াছ মোরে
না জানি কিসের আশে!
লেগেছে কি ভাল হে জীবননাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত,
আমার নর্ম্ম, আমার কর্ম্ম
তোমার বিজনবাসে?
বরষা শরতে বসন্তে শীতে
ধ্বনিয়াছ হিয়া যত সঙ্গীতে
শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া
আপন সিংহাসনে?
মানসকুসুম তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে,
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ
মম যৌবন-বনে?
কি দেখিছ বঁধু মরম মাঝারে
রাখিয়া নয়ন দুটি?
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটি?
পূজাহীন দিন সেবাহীন রাত
কত বারবার ফিরে গেছে নাথ
অর্ঘ্যকুসুম ঝরে পড়ে গেছে
বিজনবিপিনে ফুটি!
যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বারবার
কবি, তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি?
তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া
এনেছি অশ্রুবারি!

যদি এমন হয় যে, আমার বর্ত্তমান জীবনের মধ্যে এই জীবনদেবতার বসিবার সম্ভাবনা যতদূর ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়া থাকে, যে আগুন তিনি জ্বালাইয়া রাখিতে চান আমার বর্ত্তমান জীবনের ইন্ধন যদি ছাই হইয়া গিয়া আর তাহা রক্ষা করিতে না পারে, তবে এ আগুন তিনি কি নিবিতে

দিবেন? এ অনাবশ্যক ছাই ফেলিয়া দিতে কতক্ষণ? কিন্তু তাই বলিয়া এই জ্যোতিঃশিখা মরিবে কেন? দেখা ত গিয়াছে, ইহা অবহেলার সামগ্রী নহে। অন্তরে অন্তরে ত বুঝা গিয়াছে, ইহার উপরে অনিমেষ আনন্দের দৃষ্টির অবসান নাই।

এখন কি শেষ হয়েছে, প্রাণেশ,
যা-কিছু আছিল মোর?
যত শোভা, যত গান, যত প্রাণ
জাগরণ, ঘুমঘোর?
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরাবিহীন মম চুম্বন
জীবনকুঞ্জে অভিসারনিশা
আজি কি হয়েছে ভোর?
ভেঙ্গে দাও সবে আজিকার সভা,
আন নবরূপ, আন নবশোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার
চিরপুরাতন মোরে?
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে!

নিজের জীবনের মধ্যে এই যে আবির্ভাবকে অনুভব করা গেছে—যে আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কালমহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই জীবনদেবতার কথা বলিলাম।

এই জীবনযাত্রার অবকাশকালে মাঝে মাঝে শুভমুহূর্ত্তে বিশ্বের দিকে যখন অনিমেষদৃষ্টি মেলিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি, তখন আর-এক অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মকতা আমাকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কতদিন নৌকায় বসিয়া সূর্য্যকরোদ্দীপ্ত জলে-স্থলে-আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি; তখন মাটিকে আর মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই, তখন জলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দ গানে বহিয়া গেছে;—তখনি এ কথা বলিতে পারিয়াছি:—

হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুলফল,
জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।

তখনি এ কথা বলিয়াছি:—

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তান তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চলতলে! ওগো মা মৃণ্ময়ি—
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত?

এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই:—

তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিলায়ে ল'য়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্তচরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে-ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র-ফুল-ফল-গন্ধরেণু!

আমার স্বাতন্ত্র্যগর্ব্ব নাই—বিশ্বের সহিত আমি আমার কোনো বিচ্ছেদ স্বীকার করি না।

মানব-আত্মার দম্ভ আর নাহি মোর
চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম-মাতৃমুখ-পানে,
ভালবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর!

আশা করি, পাঠকেরা ইহা হইতে এ কথা বুঝিবেন, আমি আত্মাকে, বিশ্বপ্রকৃতিকে, বিশ্বেশ্বরকে স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র কোঠায় খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই।

আমি, কি আত্মার মধ্যে, কি বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়ের অন্ত দেখি না। আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া কোনো জিনিসকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই অনন্তের যে প্রকাশ, তাহাই আমার কাছে অসীমবিস্ময়াবহ। আমি এই জল-স্থল, তরু-লতা, পশু-পক্ষী, চন্দ্র-সূর্য্য, দিন-রাত্রির মাঝখান দিয়া চোখ মেলিয়া চলিয়াছি, ইহা আশ্চর্য্য! এই জগৎ, আমার অণুতে পরমাণুতে, তাহার প্রত্যেক ধূলিকণায় আশ্চর্য্য! আমাদের পিতামহগণ যে, অগ্নি-বায়ু, সূর্য্য-চন্দ্র, মেঘ-বিদ্যুৎকে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা যে, সমস্তজীবন এই অচিন্ত্যনীয় বিশ্বমহিমার মধ্য দিয়া সজীব ভক্তি ও বিস্ময় লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, বিশ্বের সমস্ত স্পর্শই তাঁহাদের অন্তরবীণায় নব নব স্তব-সঙ্গীত ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছিল—ইহা আমার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে। সূর্য্যকে যাহারা অগ্নিপিণ্ড বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, তাহারা যেন জানে যে, অগ্নি কাহাকে বলে! পৃথিবীকে যাহারা "জলরেখা-বলয়িত" মাটির গোলা বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহারা যেন মনে করে যে, জলকে জল বলিলেই সমস্ত জল বোঝা গেল এবং মাটিকে মাটি বলিলেই সে মাটি হইয়া যায়।

প্রকৃতিসম্বন্ধে আমার পুরাতন তিনটি পত্র হইতে তিন জায়গা তুলিয়া দিব।

"এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে—এর সমস্তটা গ্রহণ করিতে পারচি নে! এই সমস্ত রং, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ

সমারোহ, এই দ্যুলোক-ভূলোকের মাঝখানের সমস্ত শূন্য-পরিপূর্ণ করা শান্তি এবং সৌন্দর্য্য—এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চল্‌চে! কত বড় উৎসবের ক্ষেত্রটা! এতবড় আশ্চর্য্য কাণ্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হ'য়ে যাচ্চে, আর আমাদের ভিতরে ভাল করে' তার সাড়াই পাওয়া যায় না! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি। লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে' অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে' একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়, আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না! মনটা যেন আরও শতলক্ষ যোজন দূরে! রঙীন্ সকাল ও রঙীন্ সন্ধ্যাগুলি দিগ্বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার হতে এক-একটি মাণিকের মত সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্চে, আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না! * * * যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি, এখানকার মানুষগুলি সব অদ্‌ভুত জীব! এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথ্‌চে—পাছে দুটো চোখে কিছু দেখতে পায়, এইজন্যে পর্দ্দা টাঙ্গিয়ে দিচ্চে—বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারি অদ্‌ভুত! এরা যে ফুলের গাছে এক-একটি ঘ্যারাটোপ পরিয়ে রাখে নি, চাঁদের নীচে চাঁদোয়া খাটায় নি, সেই আশ্চর্য্য! এই স্বেচ্ছা-অন্ধগুলো বদ্ধ পাল্‌কীর মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কি দেখে চলে যাচ্চে!"

"একসময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হ'য়ে ছিলেম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠ্‌ত, শরতের আলো পড়্‌ত, সূর্য্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাক্‌ত, আমি কত দূরদূরান্তর, দেশদেশান্তরের জলস্থল ব্যাপ্ত করে' উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাক্‌তেম, তখন শরৎসূর্য্যালোকে আমার বৃহৎ সর্ব্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, যে একটি জীবনীশক্তি, অত্যন্ত অব্যক্ত অর্দ্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাক্‌ত—তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত, অঙ্কুরিত মুকুলিত, পুলকিত সূর্য্যসনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক-ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্চে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠচে, এবং নারকেলগাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে' কাঁপছে।"

"এই পৃথিবীটি আমার অনেকদিনকার এবং অনেকজন্মকার ভালবাসার লোকের মত আমার কাছে চিরকাল নতুন * * আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্ব্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা করচেন,—তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হ'য়ে, পল্লবিত হয়ে উঠেছিলেম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিন-রাত্রি দুল্‌চে এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত ক'রে ফেল্‌চে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক পান করছিলেম—নবশিশুর মত একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলেম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার মস্তক শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলেম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত। যখন ঘনঘটা করে' বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যামচ্ছটায় আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মত স্পর্শ করত। তার পরেও নবনব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল পরে' ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন—আমি তাঁর পায়ের কাছে, কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়্‌চি। অনেক ছেলের মা যেমন অর্দ্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না, তেম্‌নি আমার পৃথিবী এই দুপুরবেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবচেন,—আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করচেন না, আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকেই যাচ্চি।"

প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন, তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে: তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া-টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণপাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে। কেহ বা দ্রুত চলিতেছে বলিয়া সে আপন গতিসম্বন্ধে সচেতন,—কেহ বা মন্দগমনে চলিতেছে বলিয়া মনে করিতেছে, বুঝি-বা সে একজায়গায় বাঁধাই পড়িয়া আছে। কিন্তু সকলকেই চলিতে হইতেছে—সকলই এই জগৎ-সংসারের নিরন্তর টানে প্রতিদিনই ন্যূনাধিকপরিমাণে আপনার দিক্ হইতে ব্রহ্মের দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে। আমরা যেমনই মনে করি, আমাদের ভাই, আমাদের প্রিয়, আমাদের পুত্র আমাদিগকে একটি জায়গায় বাঁধিয়া রাখে নাই; যে জিনিষটাকে সন্ধান করিতেছি, দীপালোক কেবলমাত্র সেই জিনিষটাকে প্রকাশ করে, তাহা নহে, সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে;—প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়। জগতের সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া, ভগবান্‌ই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর-কাহারো টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই ত আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তি রসের আস্বাদন!

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয় !
অসংখ্যবন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ ! এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণ গন্ধময় ! প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমারি মন্দিরমাঝে ! ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার !
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে !
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া !

আমি বালকবয়সে প্রকৃতির "প্রতিশোধ" লিখিয়াছিলাম,—তখন আমি নিজে ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলাম কি না জানি না,—কিন্তু তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জাহাজে অনন্তকোটি লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে !

"হে বিশ্ব, হে মহাতরি, চলেছ কোথায় ?
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে !
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে !
কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া—
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে !
যে পথে তপনশশী আলো ধরে' আছে
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,
আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত-আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে !

* * * *

পাখী যবে উড়ে যায় আকাশের পানে
মনে করে এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া ;
যত ওড়ে—যত ওড়ে, যত ঊর্দ্ধে যায়,
কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ছাড়িতে—
অবশেষে শ্রান্তদেহে নীড়ে ফিরে আসে !"

পরিণত বয়সে যখন "মালিনী" নাট্য লিখিয়াছিলাম, তখনো এইরূপ দূর হইতে নিকটে, অনির্দ্দিষ্ট হইতে নির্দ্দিষ্টে, কল্পনা হইতে প্রত্যক্ষের মধ্যে মর্ম্মকে উপলব্ধি করিবার কথা বলিয়াছি :—

বুঝিলাম ধর্ম্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুন ;—দাতারূপে
করে দান, দীনরূপে করে তা গ্রহণ,—
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্ব্বাদ ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ-অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে
করে সর্ব সমর্পণ ! ধর্ম্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল,—নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে,—সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দবেদনে !

নিজের সম্বন্ধে আমার যেটুকু বক্তব্য ছিল, তাহা শেষ হইয়া আসিল, এইবার শেষ কথাটা বলিয়া উপসংহার করিব।—

মর্ত্ত্যবাসীদের তুমি যা দিয়েছ, প্রভু,
মর্ত্ত্যের সকল আশা মিটাইয়া তবু
রিক্ত তাহা নাহি হয়। তার সর্ব্বশেষ
আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ।
নদী ধায় নিত্যকাজে ; সর্ব্বকর্ম্ম সারি'
অন্তহীন ধারা তার চরণে তোমারি
নিত্য-জলাঞ্জলিরূপে ঝরে অনিবার।
কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণ না হয়,—
তোমারি পূজায় তার শেষ পরিচয়।
সংসারে বঞ্চিত করি, তব পূজা নহে,—
কবি আপনার গানে যত কথা কহে
নানা জনে লয় তার নানা অর্থ টানি',
তোমাপানে ধায় তার শেষ অর্থখানি !

আমার কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে মূলকথাটা কতক কবিতা উদ্ধৃত করিয়া, কতক ব্যাখ্যাদ্বারা বোঝাইবার চেষ্টা করা গেল। বোঝাইতে পারিলাম কি না, জানি না—কারণ, বোঝানো-কাজটা সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতে নাই—যিনি বুঝিবেন, তাহার উপরেও অনেকটা নির্ভর করিবে। আশঙ্কা আছে, অনেক পাঠক বলিবেন,—কাব্যও "হেঁয়ালি" রহিয়া গেল, জীবনটাও তথৈব চ। বিশ্বশক্তি যদি আমার কল্পনায়, আমার জীবনে, এমন বাণীরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকেন, যাহা অন্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ, তবে আমার কাব্য, আমার জীবন পৃথিবীর কাহারো কোনো কাজে লাগিবে না—সে আমারি ক্ষতি, আমারি ব্যর্থতা। সেজন্য আমাকে গালি দিয়া কোনো লাভ নাই—আমার পক্ষে তাহার সংশোধন অসম্ভব—আমার অন্য কোনো গতি ছিল না।

বিশ্বজগৎ যখন মানবের হৃদয়ের মধ্য দিয়া, জীবনের মধ্য দিয়া মানবভাষায় ব্যক্ত হইয়া উঠে, তখন তাহা কেবলমাত্র প্রতিধ্বনি-প্রতিচ্ছায়ার মত দেখা দিলে বিশেষ কিছু লাভ নাই। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা জগতের যে পরিচয় পাইতেছি, তাহা জগৎপরিচয়ের কেবল সামান্য একাংশমাত্র ;—সেই পরিচয়কে আমরা ভাবুকদিগের, কবিদিগের, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের চিত্তের ভিতর দিয়া কালে-কালে, নবতর-রূপে, গভীরতররূপে সম্পূর্ণ করিয়া লইতেছি। কোন্

গীতিকাব্য-রচয়িতার কোন্ কবিতা ভাল, কোন্টি মাঝারি, তাহাই খণ্ড-খণ্ড করিয়া দেখানো সমালোচকের কাজ নহে। তাঁহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব কোন্ বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তাহাই বুঝিবার যোগ্য। কবিকে উপলক্ষ্য করিয়া বীণাপাণি বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশশক্তি, আপনাকে কোন্ আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই দেখিবার বিষয়।

জগতের মধ্যে যাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে—সেই অনির্ব্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে ;—জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ. তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া তাকাইয়াছে, সেই অপরূপ যদি কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে ; যাহা চোখের সম্মুখে মূর্ত্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, যাহা অশরীর-ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে, তাহাই যদি কবির কাব্যে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতালাভ করিয়া থাকে ;—তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সকল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।

বাহির হতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে !
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে !

* * *

যে আমি স্বপনমূরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, এসেছ কাহারে ধরিতে ?
মানুষ-আকারে বদ্ধ যেজন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতি নিন্দার জ্বরে,
কবিরে খুঁজিছ তাহারি জীবনচরিতে ?

গল্প হলেও সত্যি

ডগলাশ ম্যাকআর্থার তখন টোকিওতে। শ্রীমতী ম্যাকআর্থারও ছিলেন সঙ্গে। তিনি হলেন বেশ রূপবতী। শ্রীমতী বেড়াতে গেছেন কোন বান্ধবীর গৃহে। আলাপচারী শেষ ক'রে পথে বেরিয়েই দেখলেন কিছু দূরে এক জনতা। শ্রীমতী ঐ ভীড়ের মধ্যে মিশে গিয়েও বুঝে উঠলেন না, জনতা কেন অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, ভীড়ের মধ্যে মিঃ ম্যাকআর্থারের এক জন দেহরক্ষীকে। শ্রীমতী শুধোলেন,—এত ভীড় কেন ?

দেহরক্ষী বললে,—জনতা শ্রীমতী ম্যাকআর্থারকে দেখতে চায়।

বিস্ময় এবং স্ফূর্ত্তিতে উপচে পড়লেন শ্রীমতী। মুখে ফুটে উঠল কৌতূহলের হাসি। বললেন—ওদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। বলতে বলতে তৎক্ষণাৎ তিনি বান্ধবীর গৃহে গিয়ে টেলিফোন করলেন মিঃ ম্যাকআর্থারকে। বললেন,—গাড়ীটা চট ক'রে পাঠাও।

মুহূর্ত্তের মধ্যে গাড়ী পৌঁছল। গাড়ীতে চেপে শ্রীমতী ঐ ভীড়ের কাছে উপস্থিত হলেন। কয়েক জন চিনলে যে, শ্রীমতী ম্যাক-আর্থার গাড়ী থেকে নামছেন। ভীড়ের মধ্যে থেকে কেউ কেউ সেলাম করলে শ্রীমতীকে।

শ্রীমতীও তখন মুখে হাসি ফুটিয়ে সেলাম করতে লাগলেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ছাপ্পান্ন

কেশবের ডাকে ইয়ং-বেঙ্গলে সাড়া পড়ে গেল। পল্লব-প্রফুল্ল বসন্তের শিহরণ জাগল অরণ্যে।

কিন্তু যার ডাকে এই অবস্থা, তার নিজের অবস্থা কি!

জয়গোপাল সেনের বাগানে রামকৃষ্ণ লালপেড়ে কাপড় পরে গিয়েছিল। কেশব বললে, 'আজ বড় যে রঙ। লালপাড়ের বাহার!'

রামকৃষ্ণ বললে, 'কেশবের মন ভোলাতে হবে, তাই বাহার দিয়ে এসেছি।'

রঙ লাগল কেশবের মনে। রসে ডুবে ভাসতে লাগল ভাবের জোয়ারে। হয়ে দাঁড়াল সে রামকৃষ্ণের মনের মানুষ।

"মনের মানুষ হয় যে জনা
ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা।
সে দু এক জনা।
ভাবে ভাসে রসে ডোবে
ও তার উজান পথে আনাগোনা।"

কিন্তু গোড়ার দিকে রাজসিকতার ভাবটা একটু সজাগ ছিল কেশবের। কেশবের কলুটোলার বাড়িতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ, সঙ্গে হৃদয়। টেবিলের কাছে চেয়ারে বসে কি-সব লিখছে কেশব। যে ঘরে বসে লিখছে সেই ঘরে এনেই বসাল রামকৃষ্ণকে। কিন্তু কেশবের চেয়ার ছেড়ে ওঠবার নাম নেই। একমনে লিখেই চলেছে। অনেক পরে লেখা শেষ করে চেয়ার ছেড়ে নেমে বসল। নেমে বসল বটে, কিন্তু রামকৃষ্ণকে একটা নমস্কার পর্য্যন্ত করলে না।

নমস্কার না করাটাই বুঝি সে যুগের জ্ঞানী-গুণীদের শালীনতা।

কিন্তু কেশব যখন এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, রামকৃষ্ণ তাকে আনত হয়ে প্রণাম করলে। একবার নয়, যতবার এসেছে ততবার। যখন যে দলবল নিয়ে এসেছে, সবাইকে। তখন তারা আর করে কি। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে শিখলে।

কঠিনকে নম্র করে দিলে রামকৃষ্ণ। অভিজাতকে নিরভিমান।

রামকৃষ্ণের সমস্ত সাধনাই এই সহজের সাধনা। নিকটের সাধনা। নিকটে পাবার সহজ সাধনা।

বললে, 'যাঁকে তোমরা ব্রহ্ম বলো তাঁকেই আমি মা বলি। মা বড় মধুর নাম।'

আমি ঈশ্বর বুঝি না। আমি আমার মাকে বুঝি, মাকে ডাকি। আর কে আছে না আছে কে জানে, আমি আছি আর আমার মা আছে। ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের আমি তত্ত্ব করি আমার সাধ্য কি, আমার মা আছে এই আমার পরম ঐশ্বর্য।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে বেদীতে বসে উপাসনা করছে। কিন্তু ঈশ্বরকে ডাকছে 'মা' 'মা' বলে।

'তুমি তাঁকে 'মা' 'মা' বলে প্রার্থনা করছিলে। এ খুব ভালো। এ খুব ভালো।' বিজয়কৃষ্ণকে বললে রামকৃষ্ণ। 'কথায় বলে বাপের চেয়ে মায়ের টান বেশি। মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর চলে না। ত্রৈলোক্যের মায়ের জমিদারি থেকে গাড়ি-গাড়ি ধন আসছিল, সঙ্গে কত লাল-পাগড়িওয়ালা লাঠি হাতে দারোয়ান। ত্রৈলোক্য রাস্তায় লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, জোর করে সব ধন কেড়ে নিলে। মায়ের ধনের উপর খুব জোর চলে। বলে নাকি ছেলের নামে মার তেমন নালিশ চলে না।'

"জানাইব কেমন ছেলে
মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে,
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ
গুজরাইব মিছিলকালে।

মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা,
ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায়
শান্ত করে লবে কোলে॥"

মা কতক্ষণ মামলা চালাবে? কতক্ষণ মুখ ভার করে থাকবে? কখন নিজেই এক সময় বাহু মেলে টেনে নেবে কোলের মধ্যে।

আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে আমরা পিতা বলে কল্পনা করেছি। পিতা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, লালনকর্তা, রক্ষণকর্তা। পিতার মধ্যে যে ভাবটি প্রকাশিত তা প্রতাপের ভাব, প্রভুত্বের ভাব। তিনি শুধু আমাদের পালন করেন না, চালনা করেন, পোষণ করেন না শাসন করেন। তিনি জগৎসংসারের সর্বময় বিধাতা। একচ্ছত্র একাধিপতি।

উপনিষদে বলেছে, পিতা নোঽসি। তুমি আমাদের পিতা হয়ে আছ। বলেছে, পিতা নো বোধি। তুমি যে আমাদের পিতা এই বোধের আলোকে আমাদের দু-চোখ উদ্ভাসিত হোক। এই জানা আর অনুভব করার মধ্যে পিতার সর্বসাম্রাজ্যময় বিরাটত্বকেই কল্পনা করা হয়েছে। যখনই বলেছে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, তখন আমরা যাঁর পুত্র সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষকে দিব্যধামবাসী একনায়ক সম্রাট বলেই মেনে নিয়েছি। সমস্ত অন্ধকারের পরপারে সেই পিতা ভাস্বর ভাস্কর।

এ ভাবটির মধ্যে যতই মহিমা থাক, কিছুটা যেন ভয় আছে। সম্ভ্রম তো আছেই, হয়তো বা রয়েছে একটু নিষ্ঠুরতা। পিতা আমাদের যতই প্রিয় হোন, তাঁর সঙ্গে কোথায় যেন রয়েছে একটু ব্যবধান। কোথায় যেন একটু আড়াল বাঁচিয়ে চলছি। যেন তাঁর চোখে চোখ রেখে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি না, একটু পাশ কাটিয়ে পালিয়ে বেড়াই। যদি বা কখনো কাছে আসি সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব বজায় রাখি। কখনো যদি অপরাধ করি, তবে তো আর কথাই নেই; ভয় পাই, শাসনে যেন উদ্যতবজ্র হয়ে আছেন।

কিন্তু মা—মা আমাদের কাঙালিনী। আমরা কাঙাল বলে মা-ও কাঙালিনী সেজেছেন। মার সঙ্গে আমাদের তন্তুমাত্র ব্যবধান নেই, নেই লেশমাত্র অন্তরাল। আমরা মার অঙ্গের অঙ্গ বলে তাঁর সঙ্গে আমাদের অন্তহীন অন্তরঙ্গতা। যতই অকিঞ্চন হই, আমরা মার অঞ্চলের নিধি। যতই ধুলো-মাটি মাখি, মার অঞ্চলে আমাদের জন্যে অবারিত মার্জনা।

যদি অপরাধ করি, মা-ও নিজেকে অপরাধী মনে করেন। সন্তানের দুঃখে তাঁর দুঃখ।

কোনো কুণ্ঠা নেই, লজ্জা নেই, শুধু ক্ষমা শুধু স্নেহ। শুধু পুষ্টি দেন না তুষ্টি দেন, শুধু পিপাসা মেটান না, নিয়ে আসেন পরিতৃপ্তির আস্বাদ। মা আমাদের মূর্তিমতী সরলতা, মা আমাদের অভয়ময়ী। পুত্র যত বৃদ্ধই হোক, মার কাছে সে শিশু, অর্বাচীন অপোগণ্ড শিশু। আর মা যত বৃদ্ধই হোক, ছেলের কাছে সে সনাতনী মা। পিতার জন্যে আমাদের শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম, আনুগত্য, কিন্তু মার জন্যে আমাদের ভালোবাসা, অবিরল অফুরন্ত ভালোবাসা। পিতার থেকে আমরা দূরে-দূরে থাকি, কিন্তু মা আমাদের একেবারে কোলের মধ্যে টেনে নেন। আর্ত হই বঞ্চিত হই পীড়িত হই পাপলিপ্ত হই, অকূলে মার কোল আছেই। পিতা আমাদের রাজচক্রবর্তী, মা আমাদের বিশ্বকল্যাণী।

দুর্গাচরণ নাগ ঠাকুরের নিদারুণ ভক্ত। অসুখের সময় আমলকী খাবার ইচ্ছে হয়েছিল ঠাকুরের। এমন সময় আমলকী কি কোথাও পাওয়া যায়? জিগগেস করলেন ঠাকুর। তখন শ্রাবণ মাস, আমলকীর পক্ষে অকাল। কিন্তু ঠাকুরের যখন ইচ্ছে হয়েছে, নিশ্চয়ই কোথাও পাওয়া যাবে আমলকী। দুর্গাচরণ বেরিয়ে পড়ল আমলকী খুঁজতে। বনে-বাগানে ঘুরে-ঘুরে তিন দিন পরে ঠিক আমলকী নিয়ে এল।

সেই দুর্গাচরণকে শ্রীশ্রীমা একখানি কাপড় দিয়েছেন। সেই কাপড় না পরে মাথায় বেঁধে রাখে দুর্গাচরণ। আর আনন্দে ধ্বনি করে: 'বাপের চেয়ে মা দয়াল! বাপের চেয়ে মা দয়াল!'

শ্রীশ্রীমার তখন অসুখ। খুব যন্ত্রণা পাচ্ছেন। এক ভক্ত বললে, 'মা, আপনি এত কষ্ট পাচ্ছেন. কষ্টটা আমায় দিন না!'

মা চমকে উঠলেন। 'বল কি! ছেলে! মা কখনো ছেলেকে দিতে পারে? ছেলের কষ্ট হলে যে মার আরো বেশি কষ্ট।'

বিভূতি বলে একটি ছেলে আসত শ্রীমার কাছে। এলেই পেট ভরে খেয়ে যেত। এক দিন তার খাওয়া দেখে তার মা বললে, 'বিভূতি তো এখানে বেশ খায়! বাড়িতে মাত্র এত ক'টি খায়!'

অমনি শ্রীমা বললেন, 'আমার ছেলেকে তুমি খুঁড়ো না। আমি ভিখারীর রমণী, আমার ছেলেদিকে আমি যা খেতে দি, ছেলেরা আমার তাই আদর করে খায়।'

চন্দ্র দত্ত উদ্বোধন-অফিসের কর্মচার। এক দিন শ্রীমাকে বললে, 'মা, আপনাকে কত দূর দেশ থেকে কত লোক দর্শন করতে আসে। আপনি তো ঘরের ঠাকুরমার মত পান সাজেন, শুপুরি কাটেন, কখনো বা ঘর ঝাঁট দেন। আপনাকে দেখে আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না।'

মা বললেন, 'চন্দ্র, তুমি বেশ আছ। আমাকে তোমার বোঝবার দরকার নেই।'

স্বভাবে সহজ, করুণায় কোমল, স্নেহে সীমাহীন — এই আমাদের মাতৃপ্রতিমা। মাকে আমাদের বোঝবার দরকার নেই, ডাকবার দরকার। ডাক শুনে মা যখন ছুটে এসে কোলে তুলে নেবেন তখন সেই স্পর্শেই বুঝতে পারব, মা এসেছে রে, মা এসেছে।

যিনি অবাঙমানসগোচর, অগম্য অপার, সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের ওপারে যাঁর বাসা, তাঁকে নিকটতম, নিবিড়তম করে পাবার সাধনায় রামকৃষ্ণ নতুন মন্ত্র আবিষ্কার করলে। ওঁ-এর মত এ মন্ত্রও একাক্ষর মন্ত্র। এ মন্ত্রের কথা হচ্ছে—'মা'। এ মন্ত্রের আকর্ষণে যা অত্যন্ত দূর তা নিমেষে কাছে চলে এল, যা অত্যন্ত দুরূহ তা হয়ে দাঁড়াল জলের মত সোজা। যা ছিল পর্বতশৃঙ্গে তাই বিগলিতধারে নেমে এল নির্ঝরিণী হয়ে। যা ঐশ্বর্যশালিনী শক্তি, তাই দেখা দিল দয়া-রূপে, ক্ষমারূপে, অমিয়ময়ী প্রশান্তিরূপে।

একেই বলে এক চালে মাৎ। এক বাণে জগজ্জয়। এক অক্ষরে পরা সিদ্ধি।

রামকৃষ্ণের সবই সহজ। তত্ত্ব সহজ, পদ্ধতিও সহজ। মানুষটি যেমন সহজ, মন্ত্রটিও তেমনি। একেই বলে তরঙ্গহীন স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপসমুদ্র। কিংবা, সহজ করে বললে, সহজানন্দ।

বিজয়কৃষ্ণকে বলে রামকৃষ্ণ, 'কারণের বোতল এক জন এনেছিল, আমি ছুঁতে গিয়ে আর পারলুম না।'

বিজয় বললে, 'আহা!'

'সহজানন্দ হলে অমনি নেশা হয়ে যায়। মদ খেতে হয় না। মার চরণামৃত দেখেই আমার নেশা হয়ে যায়। ঠিক যেমন পাঁচ বোতল মদ খেলে হয়।'

কেশবকেও তেমনি সহজ করে দিল রামকৃষ্ণ। কেশব 'মা' ধরল। ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল 'মা' বলে। ঈশ্বরকে 'মা' বলে ডাকে আর কেশবের দুই নয়নে ধারা নামে।

সাতান্ন

এ মাতৃসাধনার গোড়াপত্তন কমলাকান্তে। তার পর তাতে সৌধ তুলল রামপ্রসাদ।

গরানহাটায় দুর্গাচরণ মিত্তিরের বাড়িতে রামপ্রসাদ মুহুরির কাজ করে আর হিসেবের খাতায় দুর্গানাম কালীনাম লেখে। সমস্ত হিসেব বেহিসেব হয়ে যায়। পদে-পদে ত্রুটির কাঁটা খোঁচা মারে।

নালিশ গেল মনিবের কাছে। মনিব খাতা তলব করলেন। দেখলেন আষ্টেপৃষ্ঠে অঙ্কের আঁচড় নেই, কেবল দুর্গানাম কালীনাম। কেবল মাতৃসঙ্গীত।

কি না-জানি আছে এই গানে! মনিব পড়তে লাগলেন। লোকটার আস্পর্ধা বটে। সামান্য মুহুরি হয়ে তবিলদারি চাইছে!

"আমায় দাও মা তবিলদারি,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।
আমি বিনা মাহিনার চাকর,
কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী॥"

মনিব ছুটি দিয়ে দিলেন রামপ্রসাদকে, বললেন, 'তুমি বাড়ি যাও। এখানে যেমনি ত্রিশ টাকা মাইনে পেতে তেমনি পাবে তুমি বাড়ি বসে। তুমি মার নামের গান গাও।'

ছাড়া পেয়ে গেল রামপ্রসাদ। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ডেকে পাঠালেন, রাজসভায় চাকরি দেবেন। আবার চাকরি! চরণ-ধূলার জন্যে এই তো দিব্যি চাকর আছি বিনি-মাইনেয়। হোলই বা রাজসভা, মার শোভার কাছে আবার রাজসভা কি! মহারাজের অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান করলে। এবার না কোপে পড়ে মহারাজার। মহারাজার কি মতি হল, রামপ্রসাদের বৈরাগ্য দেখে একশো বিঘে নিষ্কর জমি দান করে বসলেন।

"মন তুই কাঙালী কিসে।" রামপ্রসাদ গান ধরল: "অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে-দেশে। ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিস রে তুই বসে-বসে।"

মাকে নিয়ে সাধনায় বসল রামপ্রসাদ। কারু

সাধনা জ্ঞানে, রামপ্রসাদের গানে। আর-সব সাধকেরা জ্ঞানানন্দ, রামপ্রসাদ গানানন্দ।

মাকে নিয়ে তার নানান খেলা, নানান লুকোচুরি। কত নালিশ-আপত্তি, কত অভিমান-অভিযোগ! কখনো ঝগড়া, কখনো মামলা-মোকদ্দমা, কখনো বা রফা-নিষ্পত্তি। কখনো রাগ, কখনো কান্না, কখনো অহঙ্কার, কখনো স্রেফ গায়ের জোর। সাধ্য নেই মা আর বসে থাকেন লুকিয়ে। কালী বটে, কিন্তু কালা তো নন। ডাকের মত ডাক হলে শুনতে পান ঠিকঠাক। কান্না শুনে না আসেন, আসবেন ধমক খেয়ে। ভালো-মানুষের মত না আসেন আসবে ভয়ে-ভয়ে।

"এবার কালী তোমায় খাব।
গণ্ড যোগে জনমিলে,
সে হয় যে মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই
দুটার একটা করে যাব।
হাতে কালী মুখে কালী
সর্বাঙ্গে কালী মাখিব,
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে
সেই কালী তার মুখে দিব॥"

মাকে লজ্জা দিতেও ছাড়ছে না রামপ্রসাদ। বিদ্রূপ করছে। অনুযোগ করছে।

"কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা
আর আমার এমনি দশা
শাকে অন্ন মেলে কই॥
কারো দিলে ধন-জন মা,
হস্তী অশ্ব রথচয়।
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর
আমি কি তোর কেহ নই॥"

কিংবা—

"বড়াই করো কিসে গো মা
বড়াই করো কিসে।
আপনি ক্ষ্যাপা পতি ক্ষ্যাপা
থাকো ক্ষ্যাপা সহবাসে।
তোমার আদি মূল সকলি জানি
দাতা তুমি কোন পুরুষে॥
মাগী-মিন্সে ঝগড়া করে
রইতে নার আপন বাসে।
মা গো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে
ফেরে কেন দেশে দেশে॥"

আবার বলছে—

"মা হওয়া কি মুখের কথা।
কেবল প্রসব করে হয় না মাতা।
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥
দশ মাস দশ দিন যাতনা পেয়েছেন মাতা
এখন ক্ষুধার বেলায় শুধালে না
এল পুত্র গেল কোথা॥"

শেষকালে অভিমানে ভেঙে পড়ছে রামপ্রসাদ—

"ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখো এলোকেশী।
দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মাগি খাব
মা মলে কি তার সন্তান বাঁচে না।"

বাস্তুর পাশে ডোবা, ডোবার পাশে বাগান। সেই বাগানে রামপ্রসাদকে দেখা দিলেন অন্নদা। দেখা না দিয়ে আর উপায় কি। এত ভাবে ডাকলে কি করে আর সরে থাকা যায়? শেষকালে কন্যা হয়ে ঘরের বেড়া বাঁধতে বসলেন।

এই মাতৃসাধনা চরম হল রামকৃষ্ণে।

'মা, তুই কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছিস, রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় কেন দেখা দিবি নে?'

এ আকুলতা শুধু মাকে লক্ষ্য করেই জানানো যায়। এ দাবি এ আবদার মা ছাড়া আর কে পূরণ করবে?

দেখা দিবি নে? এই গলায় তবে ছুরি দেব।

কোন মা ঘুমিয়ে থাকবে?

আবার বলছে, 'মা, আমি নরেন্দ্র ভবনাথ রাখাল কিছুই চাই না। কেবল তোমায় চাই। আমি মানুষ নিয়ে কি করব?'

'মা, পূজা উঠিয়েছ, সব বাসনা যেন যায় না। মা, পরমহংস তো বালক,—বালকের মা চাই না? তাই তো তুমি মা, আর আমি তোমার ছেলে। মার ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন করে থাকে?'

সাধ্য কি, এমন ছেলেকে মা কোলে না নেয়!

রাত্রে একলা রাস্তায় কেঁদে-কেঁদে বেড়ায় রামকৃষ্ণ। আর বলে, 'মা, বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও।'

বিচার-বিতর্ক ভেসে গেল। রইল শুধু ভক্তি আর ভালোবাসা। মাকে ভালোবাসতে পারলে আর

ভাবনা নেই। আর, ভালোই যদি বাসবি, মার মতন আর কে আছে ভালোবাসবার?

কার্তিক-গণেশকে বললেন ভগবতী, যে আগে ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে তাকে গলার এই রত্নহার দেব। কার্তিক তখুনি ময়ূরে চড়ে বেরিয়ে পড়ল। গণেশ শুধু মাকে একবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলে। মার মধ্যেই তো ব্রহ্মাণ্ড। প্রসন্ন হয়ে গণেশকেই হার দিলেন ভগবতী। অনেক পরে ঘুরে এসে কার্তিকের তো চক্ষুস্থির। দাদা দিব্যি হার পরে বসে আছেন।

'মা, আমি বলবো তবে তুমি করবে—এ কথাই নয়। আচ্ছা মা, যদি না-বলতাম, 'আমি খাবো,' তা হলে কি যেমন খিদে তেমন খিদে থাকত না? তোমাকে বললেই তুমি শুনবে, আর ভিতরটা শুধু ব্যাকুল হলে তুমি শুনবে না—এ কখনো হতে পারে? তুমি যা আছ তাই আছ—তবে বলি কেন, প্রার্থনা করি কেন? ও! যেমন করাও তেমনি করি।'

এই সরলতা এই ব্যাকুলতা এই আন্তরিকতার কাছে মা কি ধরা না দিয়ে পারেন?

মা-তে ওতপ্রোত হয়ে আছে রামকৃষ্ণ। মা ছাড়া আর কিছু নেই জীবজগতে। মা-ই আমাদের একমাত্র মাধুরী। যিনি মানসী তিনিই আবার মানুষী।

তাই যতক্ষণ গর্ভধারিণী মা আছেন ততদিন তাঁতেই জগজ্জননী আরোপ করতে হবে।

'আমি মাকে ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করতাম।' বললে রামকৃষ্ণ, 'সেই জগতের মা-ই মা হয়ে এসেছেন?'

কিন্তু যখন মা থাকবে না, কিংবা পূজা থাকবে না, তখন? তখন অন্য কথা। তখন মার মনোমূর্ত্তি। তখন বিশ্বব্যাপিনী জগন্মাতা।

'মা, পূজা গেল, জমা গেল, দেখো মা যেন জড় কোরো না। সেব্য-সেবকভাবে রেখো। মা, যেন কথা কইতে পারি, যেন তোমার নাম করতে পারি—আর তোমার নামগুণ কীর্তন করব, গান করব মা। আর শরীরে একটু বল দাও, যেন আপনি একটু চলতে পারি। যেখানে তোমার কথা হচ্ছে, যেখানে তোমার ভক্তরা আছে, সেই সব জায়গায় যেতে পারি।'

শুধু গান নয়, নৃত্য করছে রামকৃষ্ণ। আমাদের নিত্যানন্দ ঠাকুর এখন নৃত্যানন্দ।

মাকে কখনো আদর করছে, শাসন করছে কখনো। কখনো বিলাপ করছে, কখনো বা মুখ ভার করে থাকছে। কখনো মিনতি করছে কখনো বা জোর ফলাচ্ছে। কখনো বা রঙ্গরসের তরঙ্গ তুলছে।

"কে মা এলি গো গিরে দাদার বেটি।
দোনো ছোকরা বি সাৎ
দোনো ছুকরি বি সাৎ
আর এক বেটা জুলপি-কাটা।
বাঘটা কামড়ে নেছে টুঁটি॥
একবার নেমে দাঁড়া শ্যামা
ভাঙল বুড়োর পাঁজর-কটি।
শিব মলে অনাথ হবে
কার্তিক গণেশ ছেলে ছুটি॥"*

গালে হাত দিয়ে অবাকের ভাব করে নাচছে রামকৃষ্ণ।

"আই মা কি লাজের কথা
মিনসের উপরে মাগী।
বেটির পদতলে পড়ে ভোলা
অপরূপ এক যোগী॥
নয়নে না দেখ চেয়ে
শিব আছেন শব হয়ে
আবার কে দেখেছে এমন মেয়ে
কুল-লজ্জা-ভয়-ত্যাগী॥"*

আবার অন্য রকম তাল ধরছে:

"কোন হিসেবে হরহৃদে
দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিব বাড়ায়েছ
যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥
বল মা তোরে শুধাই তারা
এমনি কি তোর কাজের ধারা—
তোর মা কি তোর বাপের বুকে
দাঁড়িয়েছিল অমনি করে?"

'রসো বৈ সঃ যে তিনি। নানা ভাবে তাঁর রস আস্বাদ করতে হবে, তবে তো হবে।' বললেন রামকৃষ্ণ। 'নইলে কেশবদের মত খালি দয়াময়, প্রভু বললে কি রস হয়?'

রামকৃষ্ণে যেমন সর্বধর্মসমন্বয় তেমনি সর্বরসসমাশ্রয়।

---

* শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল-প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত। পৃষ্ঠা ২৫০-২

মা-ও রামকৃষ্ণকে দেখা দিলেন নানান ভাবে। নানান রস-বেশে।

এক দিন মুসলমানের মেয়ে হয়ে চলে এলেন। ছ-সাত বছরের মেয়ে। মাথায় তিলক কিন্তু দিগম্বরী। রামকৃষ্ণের সঙ্গে বেড়'তে লাগল আর ফিচকেমি করতে লাগল। একবার চোখ নাচাল, অমনি নীল আকাশে গ্রহ-তারা সব দুলে উঠল একসঙ্গে।

কালো পেড়ে কাপড় পরনে শ্রীগৌরাঙ্গ হয়ে এক দিন দেখা দিলেন হৃদয়ের বাড়িতে।

তার পর, হলধারী যখন যন্ত্রণা দিচ্ছে আর বলছে রূপ-টুপ কিছু নেই, তখন এক দিন মার কাছে গিয়ে নালিশ করলে রামকৃষ্ণ। মা রতির মার বেশে দেখা দিলেন। বললেন, তুই ভাবেই থাক।

'এক-একবার ও-কথা ভুলে যাই বলে কষ্ট হয় ভাবে না থেকে দাঁত ভেঙে গেল। তাই দৈববাণী যতক্ষণ না শুনছি বা প্রত্যক্ষ যতক্ষণ না হচ্ছে ভাবেই ডুবে থাকব, থাকব ভক্তি নিয়ে।'

সেই সহজ কথাই কেশবকে শেখাতে বসল।

'দুধ কেমন? না, ধোবো-ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। যিনি নিত্য তিনিই ব্রহ্ম, যিনি লীলা তিনি কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী।'

কালীতত্ত্ব জানবার জন্যে ধরে বসল কেশব। কালী অত কাল কেন?

'কালী কি কালো? দূরে, তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয়।' বললে রামকৃষ্ণ। 'আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে গিয়ে দেখ, কোনো রঙ নেই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ, কোনো রঙ নেই।'

ভাবে বিহ্বল হয়ে গান ধরল রামকৃষ্ণ।

'মা কি আমার কালো রে? কালরূপ দিগম্বরী, হৃৎপদ্ম করে আলো রে।'

মার একান্ত কাছটিতে সরে এসেছে রামকৃষ্ণ। কাছে এসে আলোয় আলোময় দেখছে। সরে আসতে-আসতে নিজেই মা-তে মিশে মা হয়ে গিয়েছে।

'শ্যামা পুরুষ না প্রকৃতি? এক জন ভক্ত পুজো করছিল। এক জন দর্শন করতে এসে দেখে মূর্তির গলায় পৈতে। তুমি মার গলায় পৈতে পরিয়েছ? দর্শক আপত্তি করলে। ভক্ত বললে, ভাই, তুমিই চিনেছ। আমি এখনো চিনতে পারিনি, তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি। তাই পৈতে পরিয়েছি।'

তাকেই তো বলে যোগমায়া, অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয় তাই শিব শব হয়ে আছেন। আর, পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছে, হনন-পালন করছে। এক ছাড়া আর নেই। যা পুরুষ তাই প্রকৃতি। যা বিদ্যুৎ তাই বৈদ্যুত শক্তি। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিরও মানে ঐ। ঐ যোগের জন্যেই তো বঙ্কিম ভাব।

মনোমোহন মিত্তিরের বোনকে বিয়ে করেছে রাখাল। রাখালের বয়েস তখন আঠারো। বিয়ের পর ভগ্নীপতিকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে মনোমোহন।

এ কে? রাখালকে দেখে রামকৃষ্ণ তো অবাক।

ভাবমুখে থেকে মাকে এক দিন বলেছিল রামকৃষ্ণ, 'মা গো, বিষয়ী-সংসারী লোকের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে জিভ জ্বলে গেল।'

মা বললেন, 'ভয় নেই। শুদ্ধ সত্ত্ব ত্যাগী ভক্তেরা আসছে একে-একে।'

'এক জনকে সঙ্গী করে দাও আমার মত। আমার তো সন্তান হবে না, কিন্তু মা, ইচ্ছা করে, একটি শুদ্ধ-ভক্ত ছেলে আমার সঙ্গে থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও।'

এর কিছু দিন পরে ভাবচক্ষে রামকৃষ্ণ দেখতে পেল, বটতলায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। কেন, ও ওখানে কেন? এ কি কাণ্ড?

হৃদয়কে বললে সেই দর্শনের কথা। হৃদয় আনন্দ করে উঠল। বললে, 'মামা, নিশ্চয়ই তোমার ছেলে হবে। তাই দেখেছ।'

'সে কি রে?' চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। 'সে কি রে? আমার যে মাতৃযোনি। আমার ছেলে হবে কেমন করে?'

রামকৃষ্ণ এক দিন বসে আছে নিরালায়, হঠাৎ মা এসে তার কোলের মধ্যে একটি ছেলে ফেলে দিয়ে গেলেন। বললেন, 'ছেলে চেয়েছিলে না? এই তোমার ছেলে।'

সে কি? আমার আবার ছেলে কি?

মা বুঝিয়ে দিলেন, শরীরের পুত্র নয়, মানস পুত্র।

রাখালের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল রামকৃষ্ণ। এ যে সেই ছেলে।

'তোমার নামটি কি?' তৃষিত কর্ণে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ।

'শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ।'

সমস্ত হৃদয় দুলে উঠল। সমস্ত সৃষ্টি ভরে গেল বাঁশির সুরে। নীল যমুনার জলে।

'সেই নাম! রাখাল, ব্রজের রাখাল!' ভাবে ডুবে গেল রামকৃষ্ণ। আর কোনো কথা নেই। আর শুধু একটি মাত্র স্নেহস্বর: 'এখানে আবার এক দিন এস। আবার এক দিন।'

আর রাখাল কী দেখল? এ কে? দিব্যদীপ্তি অঙ্গে নিয়ে এ কে বসে আছে তার চোখের সামনে?

রাখাল দেখল মা বসে আছে। মা, তার মা। জীবজগতের মা।

তার পর আরো কদিন পর কলেজের ছুটির শেষে এক দিন একা-একা চলে এসেছে রাখাল।

'তোর এখানে আসতে এত দেরি হল কেন?' আকুল হয়ে ডাকলে রামকৃষ্ণ: 'আয় আয়, তুই আমার রাখাল, তুই আমার গোপাল, তুই আমার কৃষ্ণ।'

রাখালের মনে হল সে যেন তিন-চার বছরের ছেলে। আর তার সামনে বিশ্রামশান্ত কোল পেতে তার মা বসে আছেন। মা কালী, মহাকালী। শ্যামশ্রীতে স্নেহশ্রী।

রামকৃষ্ণের কোলের মধ্যে গিয়ে বসে পড়ল রাখাল। রামকৃষ্ণ সস্নেহে হাত বুলুতে লাগল সর্বাঙ্গে। আর রাখাল নিঃসঙ্কোচে রামকৃষ্ণের স্তনপান করতে লাগল।

রামকৃষ্ণই মা। রামকৃষ্ণই মাতৃসাধনার চরম।

তাই তো মা বলে ডাকি। মা বলে যখন ডাকি তখন তোমাকেই ডাকি। আমরা কি কালী চিনি না দুর্গা চিনি? আমরা শুধু তোমাকে চিনি। আমরা মা বলে ডাকলে আর কেউ সাড়া না দিক, তুমি দেবে। তোমার ডাক, তুমিই তো ভালো চেন। তুমিই তো সংসারের কানে দিয়ে গেছ এই ডাক। এই সংক্ষিপ্ত একাক্ষর মন্ত্র। তাই তোমার সাধ্য কি, তুমি থাকো নিশ্চল হয়ে।

তার পর এক দিন নিজের ডাকে যদি নিজে সাড়া দাও, প্রভু, তবে আর আমাদের কালীই বা কি, ব্রহ্মই বা কি।

[ক্রমশঃ।

পদোন্নতি চাই

চাকরীতে পদোন্নতি যাতে হয় সে জন্য কর্মচারীদের কত কি করতে হয়? ভেট পাঠানো, উমেদারী, কর্তাদের তোষামোদ করলেই কি পদোন্নতি হয়? অনেক সময়ে ফল হয় বিপরীত। উপরিওলা আবেদন নামঞ্জুর ক'রে দেন। কিন্তু পদোন্নতি না হ'লে চলে না, মাইনে বর্দ্ধিত হয় না। পদোন্নতি চাই। নীচে কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক এবং সুষ্ঠু উপায় লিখিত হচ্ছে, যেগুলি ইউরোপের বিখ্যাত বিশিষ্টদের লেখা এবং যেগুলি যথাযথ পালিত হওয়ায় যথেষ্ট ফল পাওয়া গেছে।

(ক) যে কোন কর্ম্মী অন্যান্য কর্ম্মীদের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না।

(খ) যে কোন কর্ম্মী উপরিওলাকে কিংবা অন্যান্য কর্ম্মীদের অযথা প্রশ্ন করবে না।

(গ) যে কোন কর্ম্মী অন্যান্য কর্ম্মীদের উপরিওলাদের কটুকথা কিংবা তর্জ্জন-গর্জ্জন থেকে রক্ষা করবে।

(ঘ) যে কোন কর্ম্মী অন্যান্য কর্ম্মীদের কাজে-কর্ম্মে যথাসাধ্য সাহায্য করবে, যাতে কাজে বিঘ্ন না হয়।

(ঙ) অন্যান্য কর্ম্মীদের বিশ্বাস অর্জ্জন করতে যে কোন কর্ম্মী অন্যান্য কর্ম্মীদের মতামত গ্রহণ করবে।

(চ) যে কোন কর্ম্মী অন্যান্য কর্ম্মীদের হুকুম না ক'রে কর্ম্মীদের সঙ্গে বিনম্র-কণ্ঠে কথা বলবে।

(ছ) অন্যান্য কর্ম্মী যখন অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলবে, তখন যে কোন কর্ম্মী কথায় ব্যাঘাত করবে না।

(জ) অন্যান্য কর্ম্মীদের কাজ দেখে যে কোন কর্ম্মী সত্যিই মন থেকে তারিফ করবে।

(ঝ) যে কোন কর্ম্মীকে অন্যান্য কর্ম্মীদের পছন্দ-অপছন্দ জানতে হবে, জানতে হবে কর্ম্মীদের খেয়াল-খুশী, সুখ-দুঃখ।

(ঞ) যে কোন কর্ম্মী নিশ্চয় না হয়ে কখনও কোন কথা বলবে না। শপথ করবে না।

আকাশ-পাতাল

অ, আ, ই

কখনও হয়তো দেখা যায় এমন কিছু, হাজারো ঝড়ের তুফানে যা মুছে যায় না মন থেকে। শাশ্বতী ক্ষণ-স্মৃতি। জ্বল-জ্বল করে যেন স্মৃতিপটে। মনটাকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে গেছে ঐ পূর্ণশশী। শুধু হ'য়েছে দৃষ্টি-বিনিময়, দেখেছে কয়েক মুহূর্ত্ত। বেশীক্ষণ দেখতে লজ্জা পেয়ে চ'লে গেছে দৃষ্টির বাইরে। কেন কে জানে, পূর্ণশশীই কি এক শঙ্কায় যেন কাতর হয়ে থাকে। মুখে কথা ফোটে না, শুধু চেয়ে থাকে শূন্যদৃষ্টি মেলে। পূর্ণশশী, শশীবৌ, বৌ,—কত নাম হয়েছে এখন—কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে আকৃতিতে। দেখলে কি মনে হয় যে সেই পূর্ণশশী। মনে হয় না। অবোধ্য রূপ, ধরা যায় না কত যে বয়স—যেন বয়সকে ফাঁকি দিয়ে হয়ে আছে অটুটযৌবনা। চোখে ধূলো-দেওয়া রূপচ্ছটায় এখনও পরিপূর্ণ পূর্ণশশী আসে হঠাৎ। থাকে কিছুক্ষণ। চলে যায় হাওয়ায়-ওড়া মেঘের মতই। সাজ-সজ্জার চমক এখন নেই, শুধু আছে হরেক রকম রঙীন শাড়ীর সখ। আর শুধু গয়না। অঙ্গে যেন মিশে যায় গয়নাগুলো। চুড়ি, কাঁকন, তাবিজ। কানে চুনীর টব। রাঙা ঠোঁটের দু'ধারে লাল চুনীর রক্তিম চাকচিক্য। মাথায় থাকে গুণ্ঠন, নয় তো দেখা যেতো চালচিত্র খোঁপায় এখনও আছে বাগান। ফুল-কাটার-বাগান। পূর্ণশশীর দাঁতে মিসি, হাতের তালুতে মেতি। স্নিগ্ধ-শান্ত হাসিতে ভরে থাকে মুখটা। তবুও কোথায় যেন ব্যথার ক্ষীণ রেশ পাওয়া যায়। হাসিতে না কথায়, চাউনি না ভাবভঙ্গীতে ঠিক বোঝা যায় না। পূর্ণশশীর ম্লান দৃষ্টিতে কেন যেন হতাশ-ছায়া।

ঘুমের ঘোরেও মনে পড়ছিল ঐ পূর্ণশশীকে।

কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল পূর্ণশশীর যখন বিয়ে হয়নি, তখনকার কথা। কত দিন আগের কথা! যোগ্য ঘরে বিয়ে হয়েছে, পেয়েছে যোগ্য পাত্র। পূর্ণশশীর স্বামী প্রত্নতত্ত্বের গবেষক, অধ্যাপনাবৃত্তিতে কালাতিপাত করেন। বৈদেশিক সাময়িক-পত্রে গবেষণামূলক লেখা মুদ্রিত ক'রে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করেন! তক্ষশিলা, মহেঞ্জোদড়োর পাতালিক ভগ্নস্তূপ পরীক্ষা ক'রে ঐতিহাসিক সময়-নির্ণয় করেন। মৃন্ময় ভূতত্ত্বে মোহগ্রস্ত তিনি,—পলি, খাড়ি ও শিলাময় ভূগর্ভে বিগত কৃষ্টির পরিচয় উদ্ধার করেন। কঙ্কাল-করোটি দেখে বলে দেন আর্য্য না অনার্য্য, মঙ্গোলীয় না ককেশীয়। মৃত মানুষ ও পশুর অস্থি, কণ্ঠমণি, নেত্রগোলক, পর্শুকা, কোটর, মেরুদণ্ড, ও জঙ্ঘাস্থি পরীক্ষা করতে-করতেই তিনি বিভোর হয়ে থাকেন। 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফি' ম্যাগাজিন থেকে আমন্ত্রণ-পত্র আসে, লেখা দেওয়ার তাগিদ-পত্র। পূর্ণশশী পরিহাসচ্ছলে তাঁকে ডাকে এক নামে। বলে,—তুমি মহেঞ্জোদড়ো।

আসল নাম কাশীকিঙ্কর। কাশীকিঙ্কর নামটা শুনলে কত সায়েব-সুবো পর্য্যন্ত শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। দেশ-বিদেশের উদ্যোগী খনন-কার্য্যের দল থেকে সাহায্যকারী হিসাবে আহ্বানেও সাড়া দিতে হয় কাশীকিঙ্করকে। মেক্সিকো, চিকাগো, ভ্যাটিকান থেকেও ডাক পড়েছিল। সম্মানযোগ্য পাথেয় দেওয়ায় পর্য্যন্ত সম্মত হয়েছিল আহ্বানকারীরা। কাশীকিঙ্কর সময়াভাবের জন্য অক্ষমতা জানিয়েছিলেন। পূর্ণশশী স্বামিগর্ব্বে গর্ব্ব বোধ করে। কিন্তু তবুও কেন কে জানে, পূর্ণশশীর দৃষ্টিতে মালিন্য। দুই পুত্র-কন্যার জননী পূর্ণশশী, তবুও তো এখনও অক্ষয়যৌবনা। তবে কেন যে শশীবৌ হেসেও হাসে না কে জানে!

কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল এখনই না হয় শশীবৌদির গায়ে গয়না উঠেছে রাশি-রাশি। মাথায় চড়েছে ঘোমটার ঢাকা। কিন্তু যখন সিঁথিতে সিঁদুর ছিল না, যখন ছিল না বধূবেশরূপ, তখনকার কথা। মধ্যে ঐ শশীবৌদিদি যেন ডুমুরের ফুল হয়েছিল, কত—কত দিন দেখা নেই। কুমুদিনীর ডাক পড়তে করছে আসা-যাওয়া। আসছে ইদানীং কখনও কখনও। নয় তো কত দিন দেখা নেই শশীবৌদিদির, বোধ করি যত দিন বিয়ে হয়েছিল তত দিন।

—দিদি বেশ লোক। খুব ভাল লাগে আমার। যেমন রূপ তেমন কথাবার্ত্তা। দিদি তোমাদের কে হয়? হঠাৎ কথাগুলো জিজ্ঞেস করলে রাজেশ্বরী। বললে,—তোমাদের আত্মীয়?

ঘরটা তখন অন্ধকার। নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে লণ্ঠনের আলো। শুয়ে পড়েছিল দু'জনে। কাছে এগিয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। বলে,—না, আত্মীয় কে বললে? শশীবৌদি, শশীবৌদি আমাদের পাড়ার মেয়ে। পাড়াতেই বিয়ে হয়েছে শশীবৌদির।

মুক্ত বাতায়ন। দেখা যায় দিগন্তবিস্তৃত শান্ত আকাশ। নিবিড় মেঘ ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র। মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে নক্ষত্র,—হীরকচূর্ণ যেন। ঘনকালো আকাশে চোখ তুলে শুয়েছিল রাজেশ্বরী। ঘুমের আবেশে স্তিমিত চোখ, পূর্ণশশীর কথা তবুও শুনতে ভাল লাগে। রাজেশ্বরী বললে,—তুমি কত দিন দেখছো দিদিকে?

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে কৃষ্ণকিশোর। যেন ভাবতে থাকে পূর্ণশশীর পূর্ব্বকথা। বলে,—কত দিন মনে নেই। জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত দেখছি। আগে আগে খুব আসতো, বিয়ে হ'তে বেশ কিছু দিন দেখা পাওয়া যেতো না।

পূর্ণশশীর কথা বলতে গিয়ে কত কথা যেন অব্যক্ত থেকে যায়। পূর্ণশশীর পূর্ব্ব-পরিচয় বলা হয় না। বোধ হয় বলা যায় না। ছায়া-ছায়া মনে পড়ে, কত দিন আগের কথা। তখন কেবল শৈশব উত্তীর্ণ হয়েছে। কৃষ্ণকিশোর ছিল পূর্ণশশীর দূত। অজ্ঞ বাহক বললেই হয়।

খুল্লতাত কৃষ্ণকান্ত তখন জীবিত। তরুণ যুবক। গৃহলগ্ন আঙিনায় ছায়ামণ্ডপে ব'সে দু'বেলা অধ্যয়ন করতেন। শুভ্রশান্ত মূর্ত্তি দিব্যাকৃতি ব্রাহ্মণ কৃষ্ণকান্ত একাগ্রচিত্তে শাস্ত্রপাঠ করতেন। বেদ, স্মৃতি ও সঙ্গীতশাস্ত্র। পূর্ণশশী তখন চপলা কুমারী। ব্রত পালন করতে হ'ত পূর্ণশশীকে। মেয়েলী ব্রত। পূর্ণশশী বাগানে ফুল তুলতে আসতো। প্রজাপতির মত নেচে-নেচে ফুল তুলে সাজি পূর্ণ করতো। কচি-কচি বিল্ব, তুলসী ও দূর্ব্বা চয়ন করতো। প্রতিবেশী মেয়ে, ব্রতে পুষ্পার্ঘ্য দেবে, আপত্তি করতো না কেউ। পুষ্পগন্ধবাহী ঠাণ্ডা হাওয়া বইতো। মধুলোলুপ অলিদল ওড়াওড়ি করতো গন্ধে মাতাল হয়ে ফুলে-কুঁড়িতে।

রূপকথার রূপকুমারী—কোথা থেকে এলো। প্রথম দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত। পূর্ণশশী তখন একটা গাছের প্রায় শিখর ধ'রে নামিয়েছে। অজস্র ভুঁইপদ্ম ফুটেছিল গাছটিতে। কৃষ্ণকান্তের বিস্ময়পূর্ণ উদ্যত দৃষ্টির সমুখে অধিকক্ষণ চোখ তুলে চাইতে সাহসী হয়নি পূর্ণশশী। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত দেখেছিলেন, লক্ষ্য ক'রে দেখেছিলেন মেয়েটিকে। দেখেছিলেন সৌম্য রূপপ্রভা, প্রথম সূর্য্যালোকের মত রূপচ্ছটা। আয়ত আঁখিযুগলে আবেগমাখা দৃষ্টি। খোপায় ঝুলছে মাধবীর স্তবক। বিলুণ্ঠিত শাড়ীর আঁচল চুমা খাচ্ছে ঘাসফুলকে।

কুমারী হ'লে হবে কি, পূর্ণশশীও কয়েক পলকে দেখেছিল কৃষ্ণকান্তকে। শুভ্র লোমশ বক্ষে উপবীত; রুদ্রাক্ষের মালা। ললাটে চন্দন-তিলক। বাহুতে মঙ্গল-কবচ। ছায়ামণ্ডপে ব'সে তখন শাস্ত্রাধ্যয়ন করছিলেন কৃষ্ণকান্ত। পূর্ণশশীকে সহসা দেখতে পেয়ে স্তিমিত দৃষ্টিতে দেখেছিলেন কিয়ৎক্ষণ। পূর্ণশশী দেখেছিল, চোখ দু'টি যেন শিবনেত্র। বৃক্ষলতা সাক্ষী ছিল দু'জনের দেখাদেখির, সাক্ষী ছিল অনন্ত আকাশ। প্রভাত-সূর্য্য।

—তুমি কে? মনে মনে ব'লেছিলেন কৃষ্ণকান্ত।

হয়তো পূর্ণশশীও অস্ফুট কণ্ঠে ব'লেছিল,—কে তুমি?

যত বাধা হ'য়েছিল যেন দিবালোকে। লজ্জা দিয়েছিল আলো। লজ্জাহীনের মত। কতকগুলো শালিক হঠাৎ ডাকতেই সসম্ভ্রমে অদৃশ্য হয়েছিল পূর্ণশশী। কুমারী-মনকে প্রথম বিষাক্ত ক'রে।

পাঠে বিঘ্ন হয়েছিল কৃষ্ণকান্তর। যাকে দেখলেন, যা দেখলেন, সত্য না মিথ্যা ভাবছিলেন তিনি। স্বর্গ থেকে আবির্ভাব হ'ল, না মর্ত্ত্যলোকের—আকুল হয়ে ভাবছিলেন। আবিষ্টচিত্তে। কৃষ্ণকান্তর ব্যগ্র দৃষ্টি অনুসৃত হয় গাছের ফাঁকে-ফাঁকে। কোথায় কে, শুধু পুষ্পশোভা। শুধু শেফালী, মাধবী, মালতী। শুধু কামিনী, অতসী, দোপাটী। শুধু সূর্য্যমুখী।

মনসিজের ফুলধনুতে তখন বিদ্ধ হয়েছে দেহ-মন। পূর্ণশশীও জর্জ্জরিত হয়ে দ্রুতপদে চলেছে গৃহপথে। সাজি থেকে পড়ে যাচ্ছে কত ফুল, দৃষ্টি নেই। বক্ষমাঝে জেগেছে তখন অপূর্ব্ব কান্তিময়ের মুখচ্ছবি, কল্পনাতেও যাকে কখনও দেখেনি পূর্ণশশী।

কথা বলতে বলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে রাজেশ্বরী। ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ভেবে-ভেবে যেন ক্লান্ত রাজেশ্বরী, নেশাসক্ত স্বামী হওয়ার ভাবনায়। খুব দূরে, কোথায় শৃগাল ডাকছে আকাশ কাঁপিয়ে। পাল্লা দিয়ে ডাকছে। ডাক শুনে অন্যান্য দলও হয়তো ডাকতে থাকে। প্রতিধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে নিশীথ-নগরী। ঘুমের ঘোরে যেন চমকে ওঠে রাজেশ্বরী। ভয় পেলে শিশু যেমন চমকায়।

ছায়া-ছায়া মনে পড়েছিল। ছবির মত দেখতে পায় কৃষ্ণকিশোর কত দিন আগের মুছে-যাওয়া ছবি। মাঝে-মিশেলে দেখা হ'লে বলতো পূর্ণশশী। বলতো,—যাও তো ডেকে দাও তো। কাকাকে বল' তো আমি ডাকছি।

দিনে দিনে পূর্ণশশী তখন বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে। লজ্জা নেমেছে দেহবল্লরীতে; দৃষ্টিতে বিনম্র সঙ্কোচ; চলাফেরায় সলজ্জ ভঙ্গিমা। প্রতিবেশী, কাজে-অকাজে মেয়েমহলে আসা-যাওয়া ছিল। সুযোগ ছিল দেখা হওয়ার। প্রথম দেখে কৌতূহলী মন যেন অদম্য হয়ে উঠেছিল। কৃষ্ণকান্ত শুধিয়েছিলেন কুমুদিনীকে। ফাঁক পেয়ে নির্জ্জনে জিজ্ঞেস করেছিলেন কৃষ্ণকান্ত,—বৌঠান, মেয়েটিকে দেখলাম কিন্তু ঠিক চিনতে—

মুনি-ঋষির মুখে যেন অসৎ কথা শুনেছিলেন কুমুদিনী। বিস্ময় এবং কৌতুকে তিনিও উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

—মেয়ে, তুমি দেখলে মেয়ে! বলতে বলতে বেশ হেসেছিলেন কুমুদিনী।—কা'কে দেখলে বল' তো? কোথায় দেখলে?

ক্রোধে এবং লজ্জায় কৃষ্ণকান্ত বেশী কিছু শুনতে না চেয়ে চলে যাচ্ছিলেন। কুমুদিনী বলেছিলেন,—চ'লে যাচ্ছো, কে চিনিয়ে দেবে!

কৃষ্ণকান্ত ক্ষণেক দাঁড়িয়ে বলেন,—বল' না ছাই। বলছ কৈ?

কুমুদিনী টের পেয়েছিলেন মনে-মনে। বললেন, হেসে হেসেই বললেন,—আহা, মেয়েটি যদি কুলীন না হ'তো!

কুলীন!

চড়াৎ ক'রে ওঠে যেন বুকের ভেতরটা। অধিক কথা যেন শুনতে মন হয় না কৃষ্ণকান্তর। কুলীন! কুলীনকুলসর্ব্বস্বা।

কুমুদিনী বললেন,—পাড়াতেই থাকে। অধর চাটুজ্জের মেয়ে। মেয়েটি যেন রূপে-গুণে—

গম্ভীর প্রকৃতি ছিল কৃষ্ণকান্তর। শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। দ্বিরুক্তি না ক'রে কি কাজের অজুহাত দেখিয়ে চলে গেলেন অন্যত্র। কৃষ্ণকান্ত চলে গেলেও কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলেন কতক্ষণ। কি ভাবলেন কে জানে। মুখে ফুটে উঠলো খুশীর হাসি। 'কুলীন' কথাটা বলতেই ঠাকুরপো কেন যে হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে উঠলো, দেখতে পেয়েছিলেন কুমুদিনী। তবুও হেসেছিলেন মৃদু হাসি ঋষির ভাব-পরিবর্ত্তনে।

আবছা আবছা মনে পড়ে।

দু'জনে হাসতেন দু'জনকে দেখে। কৃষ্ণকিশোরের মনে পড়ে প্রায় শৈশবের কয়েকটা দৃশ্য। ঐ পূর্ণশশী দাঁড়াতো দেওয়াল ঘেঁষে, দেওয়ালের সঙ্গে মিশে। দেহটা যেন সর্পিল গতিতে লতিয়ে উঠতো থেকে থেকে। ফর্সা ধবধবে বাহু দু'টো তোলা থাকতো মাথায়। বারে বারে খুলে-যাওয়া চুলের খোঁপা জড়াতো পূর্ণশশী। দাঁড়াতো এমন জায়গায়, যেখানে চট ক'রে অন্য কেউ আসতো না।

পূর্ণশশী হাসতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তুষ্টহাসি। মুখ টিপে টিপে হাসতো। হাসতেন কৃষ্ণকান্ত। হাসির উত্তরে হাসতেন? লুকানো হাসি দেখে কিছু বুঝতো না, কৃষ্ণকিশোর তখন শিশু।

কিছুটা অনুমানে বুঝেছিলেন কুমুদিনী। পূর্ণশশীর আসা-যাওয়াটা কেমন চোখে লাগতো যেন। মুখ ফুটে কিছু বলতেন না তিনি। কৃষ্ণকান্তর সদাগম্ভীর মুখে যদি হাসি দেখতে পাওয়া যায়, ঠাকুরপো যদি বীতস্পৃহ না হয়ে হাসি-মুখে থাকে—কুমুদিনী দেখে-শুনেও তাই মুখ ফুটে বলতেন না কিছু। পূর্ণশশীকে সময়ে-অসময়ে ডেকে পাঠাতেন, বড়ি দেওয়ার ছলে, পাঁচালী শুনতে। পূর্ণশশীর চুল বেঁধে দেওয়ার নামে।

কুমুদিনী চুল বেঁধে দিতে দিতে বলতেন,—শশী, তোরা যদি কুলীন না হয়ে হতিস্ আমাদের ঘরের!

কথাটা পূর্ণশশীর মনেও কত বার উদিত হয়েছে। মনে হ'তে ধিক্কার দিয়েছে নিজেকে, ধিক্কার দিয়েছে কৌলীন্য-প্রথাকে। মনে উদয় হ'তে বুকটা যেন ফেটে গেছে, তবুও মুখটা ফোটেনি। ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয়নি কাকেও। পূর্ণশশীর আশাহত ষোড়শী-মনে ঝড় ব'য়ে গেছে, কেউ জানেনি।

—অক্ষর-পরিচয় আছে?

কথা বলার সুযোগ পেয়ে শুধিয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত। স্বভাবগম্ভীর কণ্ঠেই জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন।

পূর্ণশশী প্রথমটায় উত্তর দেয়নি। বোধ করি অপমান বোধ ক'রেছিল। মৌন থাকলে পাছে সম্মতি প্রকাশ পায়। পূর্ণশশী বলেছিল,—মৈত্রেয়ী, অনসূয়া, চিত্রলেখা, লীলাবতী না হ'লেও পড়তে আমি জানি।

নামগুলো শুনে হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত। বলেছিলেন,—পাঠশিক্ষা, লেখাপড়ায় কত জ্ঞান হয়। স্বাধীন দেশে স্ত্রীজাতি শিক্ষা পেয়ে কত উন্নত হয়েছে। তুমি লেখাপড়া কর'। পুরুষাপেক্ষা বুদ্ধিতে স্ত্রীজাতি চতুর্গুণা।

কথাগুলি শুনে খটকা লেগেছিল পূর্ণশশীর।

অবোধ্য না ঠেকলেও আশাতীত মনে হয়েছিল যেন। ভেবেছিল, শুনবে শুধু মিষ্টি কথা, পূর্ব্বরাগের ভাবাবেগ। দিনে দিনে পূর্ণশশী বুঝেছিল, কৃষ্ণকান্ত কেমন যেন বদলে যাচ্ছেন। কথায় তেমন যেন নৈকট্যের আহ্বান নেই। কথা বলতে হয় তাই যেন কথা বলেন। কৃষ্ণকান্তর মুখে হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে।

কেন, কেন, কেন? আশাহত ষোড়শী-মন পূর্ণশশীর। বিদগ্ধ মনে ঘরে ফিরে যেতো। কখনও বিবস্ত্রা হ'লে গোপনে নিজেকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতো। ব্যর্থশ্বাস।

কৃষ্ণকান্তর মন যে তখন সভা-সমিতিতে ছুটে বেড়াচ্ছে। কোথায় লেকচার দিচ্ছেন সখারাম গণেশদেউস্কর, রবিবাবু কোথায় কবিতা পাঠ করছেন, সুরেন বাঁড়ুজ্যে কোথায় বক্তৃতা দেবেন, অশ্বিনীকুমার দত্ত কেন ফেরারী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কোথায় ব্রাহ্মণ-সভা বসেছে; কৃষ্ণকান্ত শ্রোতা হয়েছেন সেখানে। নয় তো উদ্যোক্তা।

স্বদেশী যুগ। স্বদেশী মেলা দেখে দেশবাসী জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

এক হাতে গীতা, এক হাতে বোমা! আধ্যাত্মিক দেশ-প্রেমে জেগেছে তখন মানুষ। দিকে দিকে ছড়িয়েছে মুক্তির মন্ত্র। ধর্ম্মপথে মুক্ত করতে হবে দেশকে, শৃঙ্খল ছিঁড়তে হবে। দাসত্ব-মোচনের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত সমুপস্থিত!

কৃষ্ণকান্তকে কেউ ডাকেনি। তিনিই জড়িয়ে পড়েছিলেন। গৃহে অধিকক্ষণ থাকতেন না। কোথায় যেতেন কেউ জানতো না। যেতেন সভা-সমিতিতে, যেতেন গুপ্ত আড্ডায়। কৃষ্ণকান্তর আকৃতি তখন অন্য, সাধকের সাজ-সজ্জা। গৈরিক বস্ত্র, গৈরিক উত্তরীয়। মাথার চুল চূড়া করে বাঁধা। শ্মশ্রূপূর্ণ মুখ। ললাটে তিলক। কণ্ঠে স্ফটিকের মালা, শূন্য পদ। অশ্বপৃষ্ঠে যেতেন যেখানে খুশী। ওয়েলার ছিল একটা কৃষ্ণকান্তর। কৃষ্ণকান্ত ব্যতীত অন্যকে চিনতো না। পথ কাঁপিয়ে ছুটতো তীব্রগতিতে।

পূর্ণশশীর ডাক কানে পৌঁছতো না হয়তো। পূর্ণশশী সাগ্রহে অপেক্ষা ক'রে থাকতো ঘরের জানলায়। দেখতো অশ্বপৃষ্ঠে কৃষ্ণকান্ত বেরিয়েছেন। ওয়েলারের পদশব্দে পথ ছেড়ে দিচ্ছে পথিক-জন। পূর্ণশশীর চোখ থেকে জল পড়তো টুপ-টুপ। দুঃসহ ব্যথায় গুমরে উঠতো মনটা।

দেখা হ'লে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি-চুপি বলতো পূর্ণশশী—কাকা কোথায়? লক্ষ্মী ছেলে বল তো।

কৃষ্ণকিশোর বলতো,—কি জানি কোথায়। ক'দিন দেখছি না কাকাকে।

পূর্ণশশীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফুটে উঠতো করুণ ছায়া। হতাশ-চোখে চেয়ে থাকতো কতক্ষণ ধ'রে।

—ঘুমোলে? চুপিসাড়ে জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণকিশোর।

সাড়া পাওয়া যায় না। রাজেশ্বরী ঘুমিয়ে যেন কাদা হয়ে গেছে। বাহুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে প'ড়েছে কখন।

অন্ধকারে একটা মুখ। না, ভুল দেখেছে কৃষ্ণকিশোর। শুধু একটা মুখ! যে দিকে চোখ ফেরায় দেখা যায় মুখটা। প্রস্ফুটিত শ্বেত পদ্ম যেন একটা। মুক্তার কর্ণভূষা কানে, বাঁকা সিঁথিতে মুক্তার সিঁথি, চিবুকের তলায় দুলছে মুক্তামালা। গলায় দপদপ করছে একটা ধুকধুকি। বৈদূর্য্য একটা।

অধরোষ্ঠে মিষ্টি হাসি লেগে আছে। নয়নে দিশা নেই, শুধু চেয়ে আছে আঁখি মেলে। ঘন চুলের রাশি ঢাকা পড়েছে ওড়নায়। ঘন লাল রঙের মশলিনে।

গহরজান? তুমি কোথা থেকে?

মনশ্চক্ষে দেখছিল কৃষ্ণকিশোর। মনে মনে বলছিল, টায়রা দেব তোমাকে। টায়রা নিয়ে যাবো। জড়োয়া-টায়রা। যাও, ঘুমিয়ে পড়'।

—কবে আসবে কাকা? আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কখনও হয়তো চুপি-চুপি বলতো পূর্ণশশী।

—জানি না। শুনছি শীঘ্রি আসবে। বলতো কৃষ্ণকিশোর।

—কোথায় গেছেন? পূর্ণশশীর কথায় কঠিন ব্যগ্রতা।

—কেউ জানে না। ব'লে যায় না, কোথায় যায়। শুনছি হুগলীতে গেছে। উত্তরপাড়ায়। লোকমুখে যা শুনতো বলতো কৃষ্ণকিশোর।

উত্তরপাড়া। উত্তরপাড়ার দামাল ছেলে মিছরীবাবু তখন লিপ্ত হয়েছেন দেশহিতকর কাজে।

মিছরীবাবুকে পিতা প্যারীমোহন পর্য্যন্ত বাগ মানাতে অক্ষম হয়ে প'ড়েছেন। ছেলে জনগণের হিতার্থে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন—পিস্তল দাগতে শিখেছেন।

কৃষ্ণচরণ ভাইকে যেমন চিনতেন তেমন অন্য কেউ চিনত না। কৃষ্ণকান্তর মতিগতি লক্ষ্য ক'রে বললেন,—পিতৃপুরুষের কষ্টার্জ্জিত বিষয়টা বিকিয়ে দেওয়া যায় না। পুলিশ খোঁজ ক'রে গেছে তোমার। সন্ন্যাসী সেজে হিংসাত্মক কাজে লেগেছ?

অগ্রজ। পিতৃতুল্য অগ্রজ।

কৃষ্ণকান্ত উত্তর দেওয়ায় সাহসী হবেন? বিনম্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। বাক্যস্ফূর্ত্তি হত না কৃষ্ণকান্তর।

পূর্ণশশী কৃষ্ণকান্তকে দেখতে পায়। পুকুর-যাওয়ার পথে। ফাঁক পেয়ে বলেছিল,—সন্ন্যাসী হয়েছো তুমি?

কৃষ্ণকান্ত স্মিত হাস্যে উড়িয়ে দিয়েছিলেন কথাটা।—ভাল আছো তুমি? অনেক দূর থেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কৃষ্ণকান্ত।

চোখে জল টলমলিয়ে উঠেছিল। বল্লালী বালাইয়ে তখনও বিয়ে না হ'লে কি হবে, বেশ ডাগর হয়ে উঠেছিল পূর্ণশশী। শাড়ীতে দেখিয়েছিল যেন কত বিজ্ঞ। পরিপূর্ণ বিকাশে তখন পূর্ণশশীর দেহটা ঢল-ঢল। তাও লজ্জার মাথা খেয়ে দাঁড়িয়েছিল পুকুর-যাওয়ার পথে। কুশল জিজ্ঞাসায় বলেছিল,—খুব ভাল আছি।

কৃষ্ণকান্ত বলেছিলেন,—মনে হয় তুমি গার্গী, তুমি মৈত্রেয়ী, তুমি খনা হয়েছো। মনে হয়—

কথা শেষ হয় না। ধমকে ওঠে পূর্ণশশী। বলে,—থাক্, বৃথা কথা থাক্। শুনলাম তুমি দেশসেবায় লেগেছো!

—তোমাকে দেখা যায় না কত দিন। কৃষ্ণকান্ত কথাটা চেপে গিয়ে বললেন,—কত দিন হয়ে গেছে, দেখা যায় না।

—থাক, দেখা হয়ে কাজ নেই। কাতর কণ্ঠে বলে পূর্ণশশী। বলে,—দোহাই, তুমি, তুমি তেমন হও না। তুমি যে কেমন হয়ে যাচ্ছো দিন-দিন!

কথা বলতে বলতে কিছুটা কাছে এগিয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত। পূর্ণশশী দেখলে, কৃষ্ণকান্তর দৃষ্টিতে যেন স্পৃহা নেই, মুখাবয়বে কেমন যেন স্তব্ধ-কঠোর গাম্ভীর্য্য। কৃষ্ণকান্ত পুকুর-ঘাটে চলেছিলেন। বললেন,—কত ভাল দেখতে হয়েছো তুমি? কোথায় যাচ্ছো, বৌঠান ডেকেছে বুঝি? যাও, কোথায় কে দেখবে।

কথা বলতে বলতে পূর্ণশশীকে ছেড়ে ঘাটের দিকে চললেন কৃষ্ণকান্ত। কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়েছিল পূর্ণশশী। দেখেছিল গমনোদ্যত মানুষটাকে। দেখেছিল সাশ্রুলোচনে।

ঠাকুরপোকে গৃহে ফিরতে দেখে মিথ্যা অছিলায় কুমুদিনী ডাকিয়েছিলেন পূর্ণশশীকে। যেমন ছিল তেমনি বেশে এসেছিল পূর্ণশশী। ম্লান বেশে।

কৃষ্ণকান্ত তখন যেন ঘুম থেকে জেগেছেন।

ঘুমে অচেতন ছিলেন। ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে হবে, কথাটা কানে মন্ত্র পড়েছে কে কৃষ্ণকান্তর। বিদেশীদের কবল থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে ভারতবর্ষকে। শাস্ত্রাধ্যয়ন ও সঙ্গীতচর্চ্চাতে কালাতিপাত করতে করতে দীক্ষা গ্রহণ করলেন কি এক লুকানো মন্ত্রে—যে-মন্ত্র তখন বাঙলা থেকে ছড়িয়েছে সমগ্র ভারতে। ভারত থেকে এশিয়ায়।

ঘুমের ঘোরেও যেন মন থেকে মুছে যায় না ঐ পূর্ণশশী। কৃষ্ণকিশোর ভাবে পূর্ব্বকথা। পূর্ণশশীর সঙ্গে সঙ্গে খুল্লতাতকেও মনে পড়ে। কৃষ্ণকান্তর সাধক রূপ।

কৃষ্ণকান্ত যে তখন ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছেন কাদের সঙ্গে কেউ জানতো না। রীতিমত যাওয়া-আসা। মন্ত্র পড়ছেন, দিন নেই, রাত্রি নেই, মন্ত্র পড়ছেন। অস্পষ্ট মনে পড়ে, মা কুমুদিনী অন্দরে ঘরে গিয়ে লুকোতেন। মূর্ত্তি হয়ে উঠতো যেন পাষাণ। ভয়ে শিঁটিয়ে থাকতেন।

বৈঠকখানা-ঘরে পুলিশ আসতো। লাল-পাগড়ী। সাদা মুখের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। কৃষ্ণচরণকে জেরা করতো। শাসাতো। ভয় দেখাতো জমিদারী উচ্ছেদের। ভয় দেখাতো কালাপানির। ভাইকে সামলাও।

পূর্ণশশী দূরের কথা, কৃষ্ণচরণ পর্য্যন্ত ডেকেছিলেন। কানে উঠলো না কথা। পিতৃতুল্য অগ্রজ ভাইকে সামলাতে হিমসিম খেয়েছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ঘোড়া থেকে প'ড়ে মৃত্যু যদি না হ'ত, কি হ'ত বলা যায় না।

কৃষ্ণকান্তকে পড়িয়েছিলেন যে-গুরু, তিনিই ছদ্মবেশে ছিলেন। পরিচয় জানতেন না কৃষ্ণকান্ত। গুরু দেখিয়ে দিলেন পথ। বুঝিয়ে দিলেন মত। পথ ও মত মেনে নিয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত। মন থেকেই মেনেছিলেন।

হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করতেন। ত্রিসন্ধ্যা জপ করতেন। গীতা পাঠ করতেন সময়ে-অসময়ে। খুশী থাকলে, মেজাজ ভাল থাকলে, মৃদঙ্গ বাজাতেন। বেহালা বাজাতেন। পিয়ানো বাজাতেন!

রক্তের বদলে রক্ত।

মানুষের বদলে মানুষ চাই। বাঙলা দেশে শ্যামার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে যুবক-দল। পরিত্যক্ত জনহীন বাগানে লুকিয়ে পূজা চ'ড়েছে শ্যামার পায়ে। রক্তজবা। আঁধারে ধুনি জ্বলছে ধিকি-ধিকি। শ্যামার পায়ে পূজারীদের সঙ্গে হিংস্র শৃগাল! লাঠি খেলা, অসি খেলা শেষ ক'রে পূজায় ব'সেছে ঘনান্ধকারে, মন্ত্র আওড়াচ্ছে। রক্তের বদলে রক্ত। মানুষের বদলে মানুষ চাই।

—ঠাকুরপো! তুমি যেও না।

—কোথায় বৌঠান?

—ঐ যে বললে পিস্তল দাগতে যাচ্ছো! যেও না তুমি। পুলিশ আসবে। উনি কত উচাটন হবেন।

—বৌঠান, তুমি বলবে, বুঝিয়ে বলবে দাদাকে। কিছু ভয় নেই। পিস্তল দাগবো না আমি, শুধু শিখবো। বৌঠান আশীর্ব্বাদ কর, পদধূলি দাও।

কুমুদিনী সাশ্রুলোচনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। মাথায় বৌঠানের পদধূলি মেখে কৃষ্ণকান্ত ওয়েলার ছোটাতেন তীব্র-বেগে। ওয়েলার তো ছুটতো।

ধুলোও উড়তো খুরের। কৃষ্ণকান্ত ভাবতেন, কত কথা ভাবতেন অশ্বপৃষ্ঠে ব'সে ব'সে। ওয়েলারের কি তীব্রগতি! হয়তো ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ কল্পনায় দেখা দেয় কৃষ্ণকান্তর। ইংরাজী ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ, ২৪শে আগষ্ট। যে'দিন ইংরাজ কলকাতা অধিকার করলে। কৃষ্ণকান্ত যেন কল্পনায় দেখেন।

চব্বিশে আগষ্টের দিন বর্ষা-ভারাক্রান্ত। শস্য-শ্যামল বাঙলায় বর্ষা-মেঘের পবিত্র ধারা নেমেছে। ভাদ্রের প্রথমে তখনও বর্ষা শেষ হ'ল না? ভাদ্রের জলভরা মেঘ তখনও আকাশে। কখনও বৃষ্টি হয়, কখনও শুধু বা আকাশ সহসা ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়। কখনও বা মেঘ-ভাঙ্গা সূর্য্যকিরণ দিগ্বিদিক প্লাবিত ক'রে তোলে।

সলিল-সম্পদময়ী ভাগীরথী কূলে কূলে ভ'রে উঠেছে! দুকূল-প্লাবী প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে ভাগীরথীর উভয় কূলেই ধ্বস নেমেছে। যেদিনের কথা সেদিন আকাশ প্রথমটা মেঘাবৃত ছিল। কিছু বারিপাতে মেঘ উড়ে গিয়ে আকাশ সম্পূর্ণরূপে মেঘমুক্ত হয়। অস্তগামী সূর্য্যের সিঁদুর-আলো দেখা যায়।

সূর্য্য যখন প্রায় ডুব্-ডুব, তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পতাকাবাহী কয়েকটি বাণিজ্য-জাহাজ, ভাগীরথীর প্রচণ্ড শক্তিশালী উর্ম্মিমালার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে পাল উড়িয়ে সুতালুটির দিকে এগিয়ে আসে। সংখ্যায় হয়তো ছয়।

জাহাজগুলির সঙ্গে কয়েকটি দেশী ছিপ, জালি-বোট এবং ভাউলিয়া। সেগুলিও ভাগীরথীবক্ষে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে জাহাজগুলির পিছনেই ছিল।

জাহাজগুলি যখন সাঁখরাইলের কাছাকাছি, তখন সূর্য্য অস্ত গেছেন। বিরলান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে ভাগীরথী-তীর। বৃক্ষাদিপূর্ণ, জঙ্গলময় জনশূন্য কূলে তখন জমাট অন্ধকার।

তখন মোগল আমলের মধ্যযুগ। তখন শুধু কলকাতা ছিল না, ছিল সুতালুটী, গোবিন্দপুর, ও কলিকাতা নামে পাশাপাশি তিনটি গণ্ডগ্রাম। ভাগীরথীও ছিলেন অতি বেগশালিনী এবং বিস্তৃতকায়া।

অগম্য জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম তিনটি। গ্রামগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত ক'রে মধ্যে একটি খাত ছিল।

সূর্য্যালোক ব্যতীত কেউ পথে বেরোয় না। দস্যু-তস্করের ভয়, হিংস্র জানোয়ারের ভয়!

সুতালুটীতে ভাগীরথীর উপকূলে একটি হাট ছিল।

শেঠ ও বসুকেরা তখন সুতালুটীর বিশিষ্ট অধিবাসী। সুতালুটীর হাটে সূক্ষ্ম-কাটুনি সুতা ও বস্ত্র বিক্রয় হ'ত। চরকা ও কাটনায়-কাটা সুতা।

সাঁঝের বিরল অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে, ধীর-মন্থরগতিতে জাহাজগুলি সাঁখরাইল ছাড়িয়ে, খিদিরপুরের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে সুতালুটী গ্রামে পৌছলে নাবিকগণ যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রচণ্ড তরঙ্গের ওপর জালি-বোট নামিয়ে জাহাজগুলি নঙ্গর করলে। ভাগীরথীতে তখন বয়া কোথায়? বাণিজ্য-জাহাজগুলিকে বৃক্ষমূলে বেঁধে নঙ্গর করা হ'ল।

বজরার মধ্যে থেকে এক জন ইংরাজ জালি-বোটের সাহায্যে তীরে উপস্থিত হলেন। নদীতীর ধ'রে সুতালুটীতে যাবেন তিনি।

কৃষ্ণকান্তর কল্পনানেত্রে তখন ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ।

পূর্ণশশীর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে খেয়াল নেই। কুলীন-কন্যা। কিছু অধিক বয়সে বিয়ে হয়েছিল পূর্ণশশীর। পাত্র কাশীকিঙ্কর, কৃষ্ণচরণের কাছে যিনি কিছু দিন ভারতেতিহাস পাঠ করেছিলেন। হাণ্টার, উর্ম্মি প্রভৃতির লিখিত ভারতেতিহাস। কৃষ্ণচরণ সে জন্য তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। কাশীকিঙ্কর এখন খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক।

বিয়ে হওয়ার কিছু দিন পূর্ব্বে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল পূর্ণশশী।

লজ্জার মাথা খেয়ে সোজা চলে গিয়েছিল কৃষ্ণকান্তর শয়ন-ঘরে। কৃষ্ণকান্ত তখন বিশ্রাম-মগ্ন। পূর্ণশশী ঘরে যায় বিনা দ্বিধায়। বলে,—শুনছো, আমার বিয়ে হচ্ছে।

পূর্ণশশীর সাহস দেখে বিস্মিত হয়ে উঠেছিলেন কৃষ্ণকান্ত। বলেছিলেন—আমি জেনেছি, কাশীকিঙ্কর তোমাকে বিবাহ করছে।

দ্বিতীয় কথা কেউ বলে না। গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের বেলা বয়ে যায়। দৃষ্টি-বিনিময় হয় শুধু। পূর্ণশশী মর্ম্মরমূর্ত্তির মত দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা পড়তে পূর্ণশশী শেষ-কথা বলে,—তুমি ?

—আমি বেশ আছি। হৃদয়ে আছেন আমার এক দেবী। তাঁকে পূজা করছি। বলতে বলতে হেসেছিলেন কৃষ্ণকান্ত।

—পরিহাস থাক, জন্মের মত বিদায় চাইছি। ওঠ, একটা প্রণাম করি। পূর্ণশশী বলতে বলতে গমনোদ্যত হয়।

কৃষ্ণকান্ত বলেন,—তুমি প্রণাম করবে? দেবীর মত যাকে আমি—

সত্যিই পূর্ণশশী ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল আঁচলে মুছেছিল ঘর থেকে বেরিয়ে।

কৃষ্ণকান্তর চোখে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ।

ওয়েলারের পিঠে চেপে শহরময় ঘোরাফেরা করছেন। যাচ্ছেন হেথায়-সেথায়। যখন-তখন। যাচ্ছেন বাগানে, শ্যামা পূজা করছেন। লাঠি ও অসিখেলা শিক্ষা হয়ে গেছে। কৃষ্ণকান্তর গহন-মনে দেখা দেয় ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ। যে-ইংরাজকে টেররিজিমে উৎখাত করতে হবে, সেই ইংরাজ প্রথম যেদিন কলিকাতা অধিকার করে সেই ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্টের কথা।

ভাগীরথীর তীর থেকে সুতালুটীর বাজারে পৌছে সায়েবটি তো শিউরে উঠলো। নদীতীরে বাণিজ্য-কার্য্যের জন্য কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের যে ক'টি চালা-ঘর ছিল, মনে হ'ল বুঝি উড়ে গেছে ঝড়ে। চালের খড় নেই, দেওয়াল ভেঙ্গে গেছে, বাঁশ-বাঁখারির চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। কেবল ভিত্তির মাটি। বর্ষায় ধুয়ে গেছে। শুধু অস্তিত্ব আছে।

সায়েবের পিছু-পিছু কেউ কেউ ছিলেন। সকলেই চমকে শিউরে উঠলেন। লণ্ঠন ছিল সঙ্গে, অন্ধকারময় শ্মশানের মত নির্জ্জন নদীতীর ভয়াবহ হয়ে আছে যে!

অগ্রগামী সায়েবটির বেশভূষা অন্যান্য অপেক্ষা সুদৃশ্য। তিনি কিয়ৎক্ষণ নক্ষত্রালোকপূর্ণ মেঘমণ্ডিত আকাশে দৃষ্টিপাত করে কি যেন ভাবলেন। বললেন,—"বন্ধুগণ, আমরা সুতালুটীতে যে আশ্রয়টুকু রাখিয়া গিয়াছিলাম তাহার দুরবস্থা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিলে। বর্ষার রাত্রি, জঙ্গলের মধ্যে তাঁবুতে রাত্রি যাপন করা কষ্টকর। চল, আমরা আজিকে রাত্রিটুকু জাহাজে কাটাই। প্রাতে মাল-মসলা জোগাড় করিয়া আশ্রয় তৈয়ারী করিব।"

অন্যান্য লোকজন সায়েবের মত সমর্থন করলে।

ইংরাজ সায়েবটি কেউ নয়, জব চার্ণক! যিনি না কি কলকাতাকে আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কলকাতাকে।

লণ্ঠনের আলোয় দেখতে পাওয়া গেল, দূরে কয়েকটা হিংস্র জানোয়ার। নেকড়ে, হাঁড়োল, নেউল। পালাচ্ছে লণ্ঠনের আলো দেখে। কোথাও দু'টো ভাম, কোথাও শৃগাল।

দুর্ভেদ্য অন্ধকার। ভাগীরথীর কুলু-কুলু স্রোতশব্দ পাওয়া যায়! বিস্তৃত-কায়া ভাগীরথীর তীরে গহন অন্ধকার। বর্ষাজলসিক্ত মাটি। কর্দ্দমপূর্ণ। বৃক্ষশাখায় দেখা যায় কতগুলো বাদুড় ঝুলছে। অদ্ভুতাকৃতি প্যাঁচা।

চার্ণক জালি-বোটে উঠলেন। জাহাজে যাবেন। অন্ধকার দেখে চার্ণক পর্য্যন্ত শিউরে উঠেছে। কি দুর্ভেদ্য অন্ধকার!

ওয়েলারের পিঠে কৃষ্ণকান্তর মুখে ফুটে ওঠে স্মিতহাস্য। সত্যিই তখন অন্ধকার। শুধু কলকাতায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে তখন কি দুর্ভেদ্য অজ্ঞানান্ধকার! [ক্রমশঃ।

থিওডর রুজভেল্টের কথাপ্রীতি

থিওডর রুজভেল্টের বদ অভ্যাস ছিল যে, চিঠি টাইপ হয়ে গেলেও, চিঠিকে শোধন করতে হবে। যে-চিঠিই হোক, চিঠিতে কিছু না কিছু কথা জুড়ে দিলেন। কেণ্ডাল ছিলেন রুজভেল্টের সেক্রেটারী। চিঠিতে যাতে রুজভেল্টকে দাগতে না হয়, সে জন্য কেণ্ডাল খুব দৃষ্টি দিতেন।

একটা চিঠিতে রুজভেল্ট দাগালেন। কেণ্ডালকে চিঠিটা ফের টাইপ করতে হ'ল। রুজভেল্ট একটি কথা জুড়েছিলেন, তবুও।

কেণ্ডাল চিঠিটা টাইপ করতে অস্বীকার করলে। কিন্তু রুজভেল্ট বেশ ধৈর্য্য ধ'রে বললেন,—আমি প্রত্যেক চিঠিতে নিজে কথা জুড়তে চাই কেন জানো? যা থেকে দেখতে পাই বন্ধুত্ব দৃঢ় হচ্ছে।

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

পীলা—প্লীহা, পীত, হরিদ্রাবর্ণ।
পুঁছন—মার্জ্জন, ঘর্ষণ।
পুঁজ—ক্লেদ, ক্ষতজ, বিকৃত রক্ত।
পুঙ্গব—শ্রেষ্ঠ, উত্তম, বৃষ, ষাঁড়।
পুঞ্জ—সমূহ, শ্রেণী, স্তূপ।
পুণ্য—ধর্ম্ম, সুকৃতি, সৎকর্ম্ম, সাধুতা।
পুণ্যাহ—পবিত্র দিবস, কর গ্রহণের দিন।
পুত্তল—পুত্তলী, পুতুলা।
পুথী—পুস্তক, গ্রন্থ, বহি, বই।
পুনশ্চ—পুনরায়, পুনর্বার, পুঃ।
পুমান—পুরুষ, নর, মনুষ্য।
পুরী—নগরী, বাটী, গৃহ।
পুরু—স্থূল, অসূক্ষ্ম।
পুরোহিত—পুরোধা, যাজক, পূজারী।
পুলক—রোমাঞ্চ, হর্ষ, রোমোদ্গম।
পুষ্ট—প্রতিপালিত, পোষিত, স্থূল।
পুষ্পিতা—পুষ্পবতী, ঋতুমতী, রজস্বলা।
পূত—পবিত্র, শুদ্ধ, পরিষ্কৃত, শুচি।
পূপ—পিষ্টক, পিঠা।
পূর্ত্তি—তৃপ্তি, সমাপ্তি, ভর্ত্তি।
পূর্ব্ব—প্রথম, আদি, প্রাচী দিক, অগ্রস্থিত।
পূর্ব্বক—দ্বারা, অগ্রগামী।
পূর্ব্বেদ্যু—পূর্ব্ব দিনে, গতকল্য, পূর্ব্ব দিন।
পৃচ্ছা—জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন।
পৃথুক—চিপিটক, চিড়া।
পৃষ্ঠ—পিঠ, শরীরের পশ্চাৎ ভাগ।
পেঁচ—ঘুর, ব্যাঘাত, গোল, ঝঞ্ঝাট।
পেঁচান—প্যাক দেওন, শঠতা, ছলন।
পেচক—পেচা, উলূক।
পেট—উদর, জঠর, গর্ভ।
পেটী—ঝাঁপী, পেটক, পেটরা, ডালা।
পেলব—কোমল, মৃদু, লঘু।
পেশা—ব্যবসায়, বৃত্তি, কর্ম্ম, কাজ।
পেশী—পেশি, মাংসপিণ্ড, কোষ।
পেষণ—দলন, মর্দ্দন, চূর্ণন, ঘর্ষণ, বাটা।
পেষণী—জাঁতা, নোড়া, শিলাপুত্র।
পৈতা—উপবীত, যজ্ঞসূত্র।
পোকা—কীট, কৃমি।
পোড়া—দগ্ধ, ভাজা, জ্বলন্ত।
পোয়াল—পলাল, বিচালী, খড়।
পোষ্যপুত্র—পালকপুত্র, দত্তকপুত্র।
পৌত্তলিক—সাকারসেবী, প্রতিমাপূজক।
পৌষ্টিক—ধাতুপোষক, পুষ্টিকর।
প্রকট—প্রকটিত, স্পষ্ট, ব্যক্ত।
প্রকাণ্ড—উচ্চ, বৃহৎ, ঊর্দ্ধ, স্থূল।
প্রকার—রূপ, বিধ, মত, সাদৃশ্য।
প্রকাল—বহুকাল, প্রসিদ্ধ সময়, শক।
প্রকাশ—প্রচার, উদয়, উজ্জ্বল।
প্রকাশিত—প্রচারিত, প্রদর্শিত, ব্যক্তীভূত।
প্রকৃত—যথার্থ, ন্যায্য, বাস্তবিক, সত্য।
প্রকৃতার্থ—উপযুক্ত, উচিত।
প্রকৃতি—স্বভাব, চরিত্র, ধাতু।
প্রকৃষ্ট—উত্তম, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ।
প্রক্রিয়া—দৈবচেষ্টা, স্বস্ত্যয়ন।
প্রক্ষালন—কাচন, ধোওন।
প্রখর—তীক্ষ্ণ, তীব্র, তেজস্বী, উগ্র, কটু।
প্রখ্যাত—বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, খ্যাত।
প্রগলভ—দাম্ভিক, নির্লজ্জ।
প্রগলভা—ব্যাপিকা, লম্পটা, দুর্মুখা।
প্রগাঢ়—দৃঢ়, শক্ত, কঠিন, গভীর, ধীর।
প্রগ্রীব—গৃহের জাল, ঝরকা, গরাদিয়া।
প্রচণ্ড—দাম্ভিক, ভয়ানক, কুসাহসী, উগ্র।
প্রচার—প্রকাশ, ঘোষণা, বিজ্ঞাপন।
প্রচুর—ভূরি, অনেক, বিস্তর, যথেষ্ট।
প্রচ্ছন্ন—আচ্ছাদিত, আচ্ছন্ন, গুপ্ত।
প্রজাপতি—ব্রহ্মা, রাজা, পদ্মাবতী।
প্রজ্ঞ—বিজ্ঞ, পণ্ডিত, জ্ঞানী।
প্রজ্ঞা—বুদ্ধি, ধী, মতি, মেধা।
প্রণত—পাদ-পতিত, নম্র, বিনয়ী।
প্রণতি—প্রণাম, নমস্কার, প্রণিপাত।
প্রণয়—প্রীতি, সৌহৃদ্য, প্রেম।
প্রণামী—নমস্কারী, উপঢৌকন।
প্রণিধান—মনোযোগ, ধ্যান।
প্রতি—এক এক, প্রত্যেক, সমস্ত।
প্রতিকূল—বিমুখ, বিরুদ্ধ, বিপক্ষ।
প্রতিক্ষণ—সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বদা।
প্রতিচ্ছায়া—প্রতিবিম্ব, প্রতিমা, মূর্ত্তি, প্রতিমূর্ত্তি।
প্রতিজ্ঞা—নিয়ম, স্বীকার, অঙ্গীকার, শপথ।
প্রতিধ্বনি—প্রতিশব্দ, শব্দজনিত শব্দ।
প্রতিনিধি—পরিবর্ত্তী, অনুকল্প।

প্রতিপক্ষ—শত্রু, বৈরী, বিপক্ষ।
প্রতিপত্তি—প্রাপ্তি, লাভ, সম্ভ্রম, মর্য্যাদা।
প্রতিপাদ্য—জ্ঞাতব্য, শব্দার্থ, বাচ্য।
প্রতিপালক—রক্ষক, পোষ্টা, ভরণকর্ত্তা।
প্রতিফল—উপযুক্ত শাস্তি, পরিশোধ।
প্রতিবাদ—উত্তর, বিরোধ, আপত্তি।
প্রতিভা—বুদ্ধি, জ্ঞান, দীপ্তি, তেজ, প্রভাব।
প্রতিভূ—লগ্নক, জামীনদার।
প্রতিযত্ন—উদ্যোগ, চেষ্টা, বাঞ্ছা।
প্রতিযোগ—সহকারী, সাথী, অনুরূপ।
প্রতিরূপক—সদৃশ, তুল্য, পরিবর্ত্ত।
প্রতিরোধ—বাধা, নিষেধ।
প্রতিলিপি—উত্তর-পত্র, অনুরূপ লেখা।
প্রতিলোম—ব্যতিক্রান্ত, বিপরীত, উল্টা।
প্রতিশ্রুত—স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত।
প্রতিষ্ঠা—সুখ্যাতি, প্রশংসা, কীর্ত্তি।
প্রতিসূর্য্য—কৃকলাস, কাঁকলাস।
প্রতীক—অবয়ব, অঙ্গ, আকৃতি।
প্রতীকার—প্রতিফল, উপশম, উপায়।
প্রতীক্ষণ—অবলোকন, দর্শন, অপেক্ষণ।
প্রতীক্ষা—অপেক্ষা, প্রত্যাশা।
প্রতীচী—পশ্চিম দিক, সূর্য্যাস্ত দিক।
প্রতুল—সম্পত্তি, বাহুল্য, বৃদ্ধি।
প্রত্যক্ষ—সাক্ষাৎ, ব্যক্ত।
প্রত্যঙ্গ—প্রত্যেক অঙ্গ, অন্তিমাবয়ব।
প্রত্যবায়—দোষ, পাপ, বিয়োগ।
প্রত্যয়—বিশ্বাস, প্রতীতি, শ্রদ্ধা।
প্রত্যহ—প্রতিদিন, প্রত্যেক দিবস।
প্রত্যূষ—প্রভাত সময়, প্রাতঃকাল।
প্রথম—আদি, আদ্য, পূর্ব্ব।
প্রথমতঃ—প্রথমে, আগে, পূর্ব্বে।
প্রদীপ—দীপ, বর্ত্তি।
প্রদীপ্ত—উজ্জ্বল, শোভিত, দীপ্তিবিশিষ্ট।
প্রদৃপ্ত—অহঙ্কৃত, গর্ব্বিত, দর্পিত, দাম্ভিক।
প্রপা—জলচ্ছত্র।
প্রফুল্ল—বিকশিত, প্রস্ফুটিত, আহ্লাদিত।
প্রবক্তা—বাক্‌পটু, কথক, বক্তা।
প্রবর্ত্তক—প্রয়োজক, চেতনাকারী।
প্রবাসী—বৈদেশিক, পর্য্যটক, বিদেশী।
প্রবাহ—স্রোত, ঘটনাক্রম।
প্রবুদ্ধ—জাগ্রত, চিহ্নিত, নিদ্রোত্থিত।
প্রবৃত্তি—ইচ্ছা, স্পৃহা, অভিরুচি।
প্রবোধ—সান্ত্বনা, বুদ্ধি, চৈতন্য।
প্রব্রজ্যা—সন্ন্যাসাশ্রম, ঔদাস্য।
প্রভাকর—দীপ্যমান, ভানু, রবি, সূর্য্য।
প্রভু—স্বামী, কর্ত্তা, অধিপতি।
প্রভূত—ভূরি, বহু, অনেক, যথেষ্ট।
প্রমদ—হর্ষ, আনন্দ, উল্লাস, প্রীতি, প্রমোদ।
প্রযত—পবিত্র, পূত।
প্রযত্ন—অধ্যবসায়, পরিশ্রম, চেষ্টা।
প্রয়োজন—হেতু, নিমিত্ত, আবশ্যক।
প্রলয়—কল্পান্ত, যুগান্ত, সৃষ্টিনাশ।
প্রশংসা—শ্লাঘা, গুণানুবাদ, স্তব।
প্রশ্ন—জিজ্ঞাসা, পৃচ্ছা, পূর্ব্বপক্ষ।
প্রষ্টা—জিজ্ঞাসক, পৃচ্ছক, প্রশ্নকারী।
প্রসহ্য—হঠাৎ, অকস্মাৎ, বলপূর্ব্বক।
প্রসাদ—ভুক্তবিশেষ, পুরস্কার।
প্রসাদিত—অনুগৃহীত, কৃপাপাত্র।
প্রস্তাব—প্রসঙ্গ, কথানুষ্ঠান, বৃত্তান্ত।
প্রাক্তন—অদৃষ্ট, কপাল, ভাগ্য।
প্রাখর্য্য—তীক্ষ্ণতা, ব্যগ্রতা।
প্রাঙ্গণ—আঙ্গিনা, উঠান।
প্রাচীন—পুরাতন, পূর্ব্বকালীন, বৃদ্ধ।
প্রাচুর্য্য—আধিক্য, বাহুল্য, যথেষ্টতা।
প্রাজ্ঞ—পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ।
প্রাণ—বায়ু, শ্বাস, অসু।
প্রাথমিক—আদিম, অগ্রগণ্য, অগ্রিম।
প্রাপ্ত—লব্ধ, উপার্জ্জিত, আগত।
প্রাবৃট—বর্ষাকাল, বৃষ্টিকাল।
প্রারম্ভ—উপক্রম, অনুষ্ঠান, আরম্ভ।
প্রার্থনা—যাচ্ঞা; প্রাপ্তীচ্ছা প্রকাশ।
প্রাসাদ—অট্টালিকা, কোটা, ইষ্টকগৃহ।
প্রিয়—প্রেমপাত্র, তৃপ্ত, তুষ্ট।

[ক্রমশঃ

-আগামী সংখ্যায়-

কবি-তীর্থে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

যাযাবর

আখ্যান

অভিনয়-মঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগারে যাতায়াতের সঙ্কীর্ণ গলিপথটায় নিখিলের সঙ্গে একটি প্রৌঢ়া মহিলার প্রায় মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। চেনা-জানার দলে সবাই তাঁকে বলে, মান্নামাসি। শ্বশ্রূকুলে পোষাকী ও পিতৃকুলে আটপৌরে নাম কিছু একটা তাঁর অবশ্যই ছিল এবং আছে। কিন্তু সে বোধ হয় একমাত্র তিনি ছাড়া আজ আর কেউ সহসা মনেও আনতে পারে না। ঘরে-বাইরে সর্ব্বত্র বর্ত্তমানে তাঁর এক ও অনন্য পরিচিতি—মান্নামাসি।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন, সংসারে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর লোককে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতে হয়। যথা,—গরীব আত্মীয়, বীমার দালাল ও সার্ব্বজনীন পূজার সেক্রেটারী। মান্নামাসি এর কোনটিই নন। তবুও নিখিল তাঁকে দেখলেই শঙ্কিত হন। চাণক্য-শ্লোক নিখিলের ভালো পড়া নেই। কিন্তু মনে হয়, মান্নামাসিকে তিনি শৃঙ্গীনামের পর্য্যায়েই গণ্য করেন এবং শুধু শত নয়, প্রায় সহস্র হস্তেন দূরে রাখতে চেষ্টা করেন।

এত কাছাকাছিতে না দেখার ভাণ করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অকস্মাৎ পিছন ফিরে প্রস্থানোদ্যোগ ততোধিক দৃষ্টিকটু। নিরুপায় নিখিল হতাশচিত্তে মান্নামাসিকে নমস্কার জানিয়ে নিয়ম রক্ষার্থে বললেন, "এই যে, মিসেস্ পাকড়াশী, কোথায় যাচ্ছেন?"

প্রতিনমস্কারে মুখে-চোখে সৌজন্যের বন্যা বইয়ে দিয়ে মান্নামাসি বললেন, "যাচ্ছিলেম আপনারি সন্ধানে। গৌরী সেই কখন থেকে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

গৌরী মান্নামাসির মেয়ে। বিবাহযোগ্যা।

নিখিল জিজ্ঞাসা করলেন, "তাই নাকি? কেন বলুন তো?"

"তা তো বলেনি কিছু। তবে মনে হচ্ছে, চা খাওয়ার জন্যে।"

"সে জন্যে আমাকে কেন?"

"তা জানেন না বুঝি? তা হলে খুলেই বলছি, মিষ্টার রয়। অনেক বেলায় এখানকার রিহার্সেল থেকে বাড়ি ফিরে গেল। আমি বললেম, চান করে খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে, নইলে রাত্তিরে ক্লান্ত লাগবে, গানের গলা খুলবে না। ওমা, খানিক বাদে দেখি, মেয়ে রান্নাঘরে বসে শিঙ্গাড়া ভাজছে। কেন? না, মিষ্টার রয়ের জন্য ফ্লাস্কে চা আর টিফিন বাস্কেটে খাবার নিয়ে যেতে হবে। থিয়েটারের বাড়িতে যা হৈ-হট্টোগোলের ব্যাপার। সেখানে সময় মতো চা জুটবে কি না কে জানে?"

মান্নামাসিকে নিখিল এতদিনে অনেকটাই জেনেছেন। তাঁর এ ধরণের হৃদয়গ্রাহী রচনাশক্তির সঙ্গেও নিখিলের পরিচয় এই প্রথম নয়। তাই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না করে শুধু সাধারণ ভদ্রতার ভঙ্গিতে বললেন, "মিসেস্ পাকড়াশী……"

বাধা দিয়ে অত্যন্ত আত্মীয়তার সুরে মান্নামাসি বললেন, "না, না, ঐ 'মিসেস্ পাকড়াশীটা' আপনাকে ছাড়তে হবে, মিষ্টার রয়। ঐ দেখ, আমিই বা বলছি কাকে? তুমি তো নিজের পেটের ছেলের মতো, তোমাকে 'আপনি' বলা কি আমারই ভালো দেখায়? মোটেই না। তা দেখ, নিখিল, তোমাদের ঐ সাহেবী কায়দায় মিষ্টারগুলি, মিসেস্ আপিসে, ক্লাবেই বলো। আপনা-আপনির মধ্যে ও সব কেন? এই তো সেদিন গৌরীও বলছিল, 'মা, মিষ্টার রয় যে আমাকে সর্ব্বক্ষণ মিস্ পাকড়াশী বলেন, আমার বড় সঙ্কোচ লাগে। মনে হয় যেন ট্রেণের দু'জন প্যাসেঞ্জার, গাড়ির কামরায় আলাপ। যে যার ষ্টেশানে নেমে গেলেই শেষ।' না, বাপু, তুমি এখন থেকে আমাকে মান্না-মাসিই বলো।"

"তা না হয় বলব। কিন্তু আমি বলছিলেম, মিস্ পাকড়াশী যে আমার জন্যে এতখানি কষ্ট করেছেন, সে জন্যে তাঁকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবেন। কিন্তু আমার চা-এর দরকার নেই।" বলে নিখিল প্রস্থানোদ্যম করলেন।

মান্নামাসি ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, "সে তা'হলে তোমাকে নিজে এসে বলতে হবে, নিখিল। আমার বলায় হবে না।"

মরু-যুদ্ধে জার্ম্মাণ সেনাপতির মতো প্রতিপক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল অংশে আঘাত হানলেন মান্নামাসি,

কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট গাম্ভীর্য্য আরোপ করে বলতে লাগলেন, "তুমি তো জানো না, নিখিল, ঠিক সময়ে চা-এর পেয়ালাটি হাতে না পেলে গৌরী একেবারে নেতিয়ে পড়ে। মেয়ের আমার ঐ রোগ। নিজেই স্বীকার করে। বলে, 'দু'দিন ভাত না খেয়ে থাকতে বলো, রাজী আছি। কিন্তু চা না পেলে বাঁচবো না।' সেই গৌরী কিনা এই সন্ধ্যে অবধি চা না খেয়ে আছে।"

মান্নামাসি নিখিলের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু নিখিলের জন্য আপন কন্যার এই কৃচ্ছ্রসাধনের সকরুণ কাহিনী উপস্থিত শ্রোতার মনে অনুতাপের দাবানল সৃষ্টি করেছে এমন কোন চিহ্ন সেখানে দেখা গেল না। তিনি পূর্ব্ববৎ ভদ্রতায় শুধু বললেন, "আমি দুঃখিত।"

জেনারেল রোমেল রণকৌশল পরিবর্ত্তন করলেন। শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, "আমি সেই কখন থেকে বলছি, গৌরী, তুই চা-টা খেয়ে নে। মিষ্টার রয়ের জন্য মিছে বসে থেকে মাথা ধরাসনে। তিনি হয়তো অন্য কোথাও চা খাচ্ছেন। তা মেয়ে কী শোনে? বলে 'না, মা, অমন কথাটি বলো না। মিষ্টার রয়ের নাম করে এনেছি, তিনি না খেলে বরং বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে সব নর্দ্দমায় ফেলে দেবো। নিজে স্পর্শও করব না'।"

বৃথা। খোঁচাটা নিখিল যে শুধু অম্লান বদনে পরিপাক করলেন তাই নয়, অধিকন্তু অকপট স্বীকৃতি দ্বারা কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকুকে আরও সুস্পষ্ট করে তুললেন। বললেন, "আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন মান্নামাসি। সাড়ে তিনটা বাজতে বাজতেই মিসেস্ সেন আমাকে চা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। চা আর নয়। এখন এক পেয়ালা কফি চাই। সে-ও মিসেস্ সেন তৈরী করেছেন, বলে গেছেন। এখন তাঁর ওখানেই যাচ্ছি। আচ্ছা, চলি। নমস্কার।"

ক্রোধে মান্নামাসির দুই কর্ণ তপ্ত, ললাট কুঞ্চিত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ত্বরান্বিত হয়ে উঠল। ক্ষোভে ও অপমানের জ্বালায় তিনি প্রথমে উত্তেজিত ও পরে ম্রিয়মান হয়ে গেলেন।

ছিঃ, ছিঃ, কী লজ্জা! এমন প্রকাশ্য অবজ্ঞা ও সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের কলঙ্ক তিনি আর কত কাল বহন করবেন? শুধু তো নিখিলই নয়। ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকটি সম্ভবপর পাত্রের কাছেও তো তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। মান্নামাসি আর যাই হোন, একেবারে নির্ব্বোধ নন। যোগ্য জামাতা সংগ্রহের ব্যগ্রতায় মেয়ের নাম করে তিনি যে সকল কাহিনী রচনা করেন, শ্রোতাদের কাছে সেগুলি যে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না সে কথা তিনি নিজেও মনে মনে বোঝেন। কিন্তু উপায়ান্তর ভেবে পান না। তিনি ভুলে যান যে, এযুগে যারা নিজেই নিজের পত্নী নির্ব্বাচন করে তারা রূপকথার রাজপুত্রের মতো ভাটের মুখে গুণপনা শুনে রাজকন্যার গলায় মালা দেবে এমন সম্ভাবনা নেই। জানেন না যে, কোর্টশিপের হাটই হচ্ছে একমাত্র বাজার যেখানে মিডলম্যান নেই। সে স্বয়ং কন্যার মা হলেও নয়!

কিন্তু এই ছেলেগুলিই বা কী? চোখ কান বলে কি কিছু নেই এদের? মান্নামাসি ভাবেন। এত পড়াশুনা করেও এক একটা যেন আস্ত হস্তীমূর্খ। কাণ্ডজ্ঞান বিন্দুমাত্রও নেই। এই যে নিখিল,—মস্ত এঞ্জিনীয়র, বিলাতী ডিগ্রী, বড় চাকরী। অথচ একটা অপদার্থ ফ্লার্ট মেয়েমানুষ নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। তার হুঁশ আছে একটু? হুঃ, মিসেস্ সেনের কাছে কফি খেতে যাচ্ছেন! বলতে লজ্জা হলো না একটু? পুরুষ জাতটা এমনি নির্লজ্জ বেহায়াই বটে! তাদের সংস্রব পুরোপুরি বর্জ্জন করাই বিধেয়।

কিন্তু তার কি উপায় আছে? পুরুষকে বাদ দিলে আর যাই হোক, মেয়ের বর জোটে না। ভাবনা তো ঐখানে এবং সব চেয়ে দুর্ভাগ্য এই যে, সে ভাবনাটা একা মান্নামাসিরই। আর কারো নয়। দুর্ভাবনাভারে বহু বিনিদ্র রজনীতে কন্যার নিশ্চিন্ত নিদ্রালস দেহের পানে তাকিয়ে তিনি সখেদে বাংলা প্রচলিত প্রবাদ বিশেষ স্মরণ করেছেন। হায়, হতভাগা মেয়েটার যদি একটু নিজের হিতাহিত বোধ থাকতো! এই তো দত্তদের ডলি, নিজেই নিজের বিয়ে ঠিক করল। প্রীতি রায়। বেথুনে গৌরীর দু'ক্লাশ নীচে পড়তো; দেখতেও এমন কিছু আহা-মরি নয়। অথচ কেমন খাসা বরটি বাগাল! আর গৌরী? কচি খুকীটি তো নয়—লোকের কাছে যতই কেন কমিয়ে বলে থাকেন, তিনি নিজে তো জানেন মেয়ের বয়স কত—একটু যদি তার নিজের উদ্যোগ থাকতো! না

দেখাবে সে কোন আগ্রহ, না করবে তেমন খাতির আপ্যায়ন; ছেলেরা কাছে ঘেঁষবে কী ভরসায়? তারা সন্ধ্যে বেলায় সিনেমা দেখতে বললে মেয়ে বলে, মাথা ধরে। ক্যাবারেতে নিয়ে যেতে চাইলে মেয়ে জবাব দেয়, ভালো লাগে না। তিনি নিজে চেষ্টা করে যে দু'একটি প্রার্থনীয় পাত্রকে ভিড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁরা দু'চার দিন পরেই হতাশ হয়ে সরে পড়েছে। বোকা, নিরেট বোকা। হবে না কেন? যেমন বাপ তার তেমনি মেয়ে। ঠিক বাপের ধারা পেয়েছে। রাগে ও বিরক্তিতে মান্নামাসির সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুনের জ্বালা ধরল।

কথাটা যেহোক মিথ্যা নয়। বাপের সঙ্গে গৌরীর মিল আছে অনেকখানি। সেটা মান্নামাসির পক্ষে রুচিকর নয়। বাপ পরলোকে। বেঁচে থাকতে তাঁকে নিয়ে মান্নামাসির মনস্তাপের অবধি ছিল না। মৃত্যুর পরেও তাঁর স্মৃতি মনে সুখোদ্রেক করে না। বিবাহিত জীবনের নিদারুণ ব্যর্থতার জন্য মান্নামাসি তাঁর স্বামীকে কোনকাল ক্ষমা করেন নি, কোনকাল ক্ষমা করবেনও না।

রূপার জোরে কুরূপা মেয়ে পার করার চির প্রচলিত পন্থায় মান্নামাসিও নিশ্চয়ই ধনবান পতি লাভ করতে পারতেন। কিন্তু তা হয়নি।

এ জগতে নিঃসম্বল দরিদ্রের আছে মহত্ব, অমিতব্যয়ী ধনীর আছে ঔদার্য্য। ব্যয়কুণ্ঠ বিত্তবানের নেই কোনটাই। সংসারে কৃপণ বড়লোকেরাই সব চেয়ে ভয়াবহ। মান্নামাসির বাবার কাছেও মেয়ের মায়ার চাইতে টাকার মায়া ছিল বেশী। অনেক দিন অপেক্ষার পর কন্যার যৌবন যখন উত্তীর্ণপ্রায়, খুঁজে পেতে তিনি সব চেয়ে সস্তায় যে পাত্র সংগ্রহ করলেন তাঁর না ছিল কাঞ্চন, না ছিল কৌলীন্য।

সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা ছাত্রজীবনে কৃতিত্বে সকলের শীর্ষস্থানে থেকে কর্ম্মজীবনে বিফলতায় গভীর তলদেশে গড়িয়ে পড়ে। জীবনের আকাশে তারা ক্ষণস্থায়ী সন্ধ্যাতারার মতো। রজনীর প্রথম প্রহরে সর্ব্বাধিক ঔজ্জ্বল্যে দেখা দিয়ে মধ্য প্রহরে নিষ্প্রভতার অগণিত তারকারণ্যে অলক্ষ্যে হারিয়ে যায়। মান্নামাসির স্বামী গৌরমোহন সেই জাতের।

ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় গৌরমোহন কখনও দ্বিতীয় হননি। ভবিষ্যতে তিনি জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, দ্বিতীয় আশু মুখুজ্যে, ব্রজেন শীল এমনই অসাধারণ কিছু একটা হবেন—এ সম্বন্ধে ছাত্রাবস্থায় তাঁর বন্ধুবান্ধব, মাষ্টার, প্রফেসর সবাই একমত ছিল। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল, শুভানুধ্যায়ীদের সকল ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি হলেন হাইকোর্টের—জজ নয়, একজন সাধারণ উকীল।

আসল কথা, গৌরমোহনের পাণ্ডিত্য যতখানি, সাংসারিক বুদ্ধি ততখানি নয়। তিনি অতি মাত্রায় লাজুক ও মুখচোরা গোছের লোক। কলেজের পরীক্ষার খাতায় কঠিন আইনের প্রশ্নের গবেষণাপূর্ণ জবাব লিখে যে পরীক্ষকদের চমৎকৃত করেছে, সামান্য একটা জামিনের আর্জ্জি পেশ করতে সে যে কথা খুঁজে পায় না অথবা অসংলগ্ন উক্তি করে, তার দৃষ্টান্ত তিনি। হায়, ওকালতিতে তিনি রাসবিহারী ঘোষ হবেন বলে যারা শেষ আশা রেখেছিল, গৌরমোহন তাদেরও নিরাশ করলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন আঘাত পেলেন মান্নামাসি। ভবিষ্যতে বিপুল সাফল্যের দ্বারা স্বামী সকলের ঈর্ষা উৎপাদন করবেন, এই কল্পনা নিয়ে বিয়ের সময় মান্নামাসি তার শ্বশুরালয়ের ধনহীনতাকে খুব হৃষ্টচিত্তে না হলেও যা হোক এক রকম মেনে নিয়েছিলেন। সে সফলতার কোনো আশু লক্ষণ তো দৃষ্টিগোচর নয়। তবুও নিজের উদগ্র উচ্চাভিলাষের জোরে তিনি নিজেকে দমতে দিলেন না। স্বামীকেও না। বললেন, "দেশী উকীলদের কেউ পোঁছে না। বিলেতে গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে এস। পসার জমতে দেরী হবে না।"

গৌরমোহন ততদিনে নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েছেন। বুঝেছেন, বাক্‌পটু না হলে আইন ব্যবসায় চলে না। উকীল থাকতে যার হাতে মামলা আসে না, ব্যারিষ্টার হলেই তার দরজায় মক্কেলের কিউ জমে যাবে এমন সম্ভাবনা কোথায়? স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলেন, "তার চাইতে বরং, বাগেরহাট কলেজে একজন ফিলজফীর লেকচারারের কাজ খালি আছে—কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে......"

দুই চক্ষে অজস্র অবজ্ঞা বর্ষণ করে মান্নামাসি বললেন, "ছ্যাঃ, শেষকালে বিদ্যাদানে গুরু মশায়? সেও আবার কলকাতায় নয়, অজ পাড়াগাঁয়ে। তা, তোমার আর এর চাইতে কত বেশী উচ্চাকাংখা

হবে? ও সব কল্পনা ছাড়। যা বলছি শোন। ব্যারিষ্টারীর চেষ্টা দেখ।"

অসহায় গৌরমোহন অবশেষে খরচের প্রশ্ন তুললেন। জানেন একমাত্র অর্থঘটিত যুক্তিই স্ত্রীর কাছে অকাট্য। তিনি শ্বশুরেরই তো মেয়ে!

ফল হলো না। মান্নামাসি গৌরমোহনের আপত্তি সত্ত্বেও বসত বাড়িটা বাঁধা রেখে হাজার কয়েক টাকা যোগাড় করলেন। কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে শাশুড়ীও কিছু টাকা ধার বলে দিলেন। বলা বাহুল্য, নিজের স্বামীকে লুকিয়ে।

বিলাতে গৌরমোহন যথারীতি লীঙ্কনস্ ইন থেকে পরীক্ষায় সব কটি পেপারে প্রথম হলেন, প্রাচীন ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের বিবর্ত্তন সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ থিসিস লিখে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট পেলেন এবং অতঃপর দেশে ফিরে এসে ব্রীফহীন ব্যারিষ্টারদের সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীর শোভা বর্দ্ধন করতে লাগলেন।

দুঃখে ও হতাশায় মান্নামাসির অসন্তোষের আর সীমা রইল না। পরিচিত বন্ধু বান্ধবীদের সুখ ও ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করে নিজগৃহের অসচ্ছলতা তাঁর কাছে ক্রমশঃ অধিকতর অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগল। দাশ সাহেবের কেমন ঝকঝকে দামী জ্যাগুয়ার। গৌরমোহনের একটা পুরানো ছোট অষ্টিনও হয় না কেন? রিচি রোডের সুহাসিনীর যেমন রেডিওগ্রাম ও রিফ্রিজারেটার, টেলীফোন, বাবুর্চ্চী, বেয়ারা,—মান্নামাসির তেমন কিছুই নেই। এর চেয়ে ঘোরতর অবিচার ভগবানের রাজ্যে আর কী হতে পারে? অথচ গুণে, বুদ্ধিতে মান্নামাসির চাইতে তার যোগ্যতা এমন কীই বা বেশী। শুধুমাত্র গৌরমোহনের হাতে পড়েই তাঁর এ দুরবস্থা, একথা মনে করে স্বামীর প্রতি মান্নামাসির অশ্রদ্ধা দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে লাগল।

তাঁর বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের পশ্চাতে মান্নামাসি শুধু গৌরমোহনের অক্ষমতাই নয়, দুরভিসন্ধিও আবিষ্কার করলেন। গৌরমোহন যে নিজের ভবিষ্যৎ অসাফল্যের কথা আগের ভাগে জেনে শুনেই মান্নামাসিকে বিয়ে করে ঠকিয়েছেন, সে সন্দেহ ক্রমশঃই তাঁর মনে দৃঢ়মূল হলো। গৌরমোহনের সঙ্গে বিয়ে না হলে তিনি যে অপর কোন ধনশালীর ঘরে গৃহিণী হতেন, সে বিষয়ে তার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। কেন, ঝামাপুকুরের মৈত্রদের বাড়িতে বিয়ের কথা হয়নি তাঁর? সান্নাল এটর্নীর বড় ছেলে দেখতে আসেনি তাঁকে? সেখানে বিয়ে হলে যে আজ তিনি সোনার ইট গেঁথে গলায় পরতে পারতেন। সে খবর রাখে কেউ?

না। অন্ততঃ গৌরমোহন রাখেন না। আর রাখলেই বা কী? এ সকল উক্তির প্রত্যুক্তি অবশ্যই আছে। সোনার ইট গেঁথে সত্যি গলায় পরা যায় কিনা এবং পরা গেলেও সাধারণ বিছে হারের চেয়ে তাতে বেশী সুন্দরী দেখায় কিনা, সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। তবে ইতিমধ্যে এটুকু বোঝার মতো কাণ্ডজ্ঞান গৌরমোহনের হয়েছে যে, স্ত্রীর সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ অপেক্ষা নিরুত্তর থাকাটাই অধিকতর নিরাপদ।

কিন্তু মৌনব্রতই যে সংসারে নিশ্চিত পরিত্রাণের পথ নয়, সে কথাও গৌরমোহন ক্ষণে ক্ষণে উপলব্ধি করেন। হয়তো তিনি পড়ার ঘরে একাগ্র চিত্তে নতুন কোন পুস্তকে মনোনিবেশ করেছেন এমন সময় অকস্মাৎ সেখানে মান্নামাসির আবির্ভাব ঘটল। অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললেন,

"গৌরীর স্কুলের বাস বন্ধ করে দাও।"

গৌরমোহন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে সে স্কুলে যাবে কেমন করে?"

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনলেন,—"পায়ে হেঁটে।"

গৌরমোহন বুঝলেন, এটা রাগের কথা। অত্যন্ত নম্রকণ্ঠে বললেন, "বাসের ত ভাড়া মাত্র দশ টাকা। সে কটা টাকা বাঁচিয়ে আর……"

"বটে? দশটা টাকা তোমার গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়? মাসের শেষে ক' হাজার টাকা এনে হাতে দাও শুনি? কী করে সংসার চলে খবর রাখো তার?" ক্রোধে একেবারে ফেটে পড়লেন মান্নামাসি।

আবার একদিন হয়তো এসে বললেন, "গৌরীর স্কুলে যাওয়ার শাড়ি নেই। যাও, বাজার থেকে কয়েকটা জামা কাপড় নিয়ে এস দিকিন।" বলে সিল্ক, জর্জ্জেট ও বিষ্ণুপুরী ইত্যাদির এমন এক ফর্দ্দ দিলেন যা স্কুলে যাওয়ার তো কথাই নেই, ফুলশয্যার তত্ত্বের পক্ষেও বেশী মনে হতে পারে।

গৌরমোহন সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এত কিসের জন্য?"

"এটুকুতেই তোমার চোখ কপালে উঠলো?

আমার বাপের বাড়িতে ছেলেবেলায় কখনও যে এক জামা পরে দুদিন স্কুলে যাইনি, তা জানো? বেশ তো, মেয়েকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দাও; কাপড়, জামা কিছুই কিনতে হবে না।" বলে মান্নামাসি সবেগে প্রস্থান করলেন।

কন্যাকে কেন্দ্র করে এই কলহের পিছনে একটু বিশেষ কারণ আছে। মান্নামাসি জানেন, মেয়ের প্রতি গৌরমোহনের স্নেহ সাধারণের চাইতে অনেকটা বেশী। চতুর শাশুড়ীরা যেমন ঝিকে বকে বউকে শেখান, তেমনি তিনিও গৌরীকে উপলক্ষ্য করে তার বাপকে জব্দ করে থাকেন। এমন কি, গৌরমোহন স্ত্রীর সাক্ষাতে কন্যাকে যথেষ্ট আদর করতেও কুণ্ঠা বোধ করেন। মান্নামাসি দেখতে পেলেই মন্তব্য করেন, "থাক, থাক, হয়েছে তো ভারি একটা মেয়ে। বিয়ে দিতে জিভ বেরিয়ে যাবে। হতো যদি ছেলে, তবুও না হয় বুঝতুম।"

তিনি যে পুত্রসন্তান প্রসব না করে কন্যা জন্ম দিয়েছেন তার সমুদয় অপরাধও একমাত্র গৌরমোহনেরই, এ সম্পর্কে মান্নামাসির মনে কিছুমাত্র সংশয় নেই।

মাঝে মাঝে স্বামীর চরিত্রে উদ্যোগের অভাব তিনি আপন কৌশল ও আয়োজনের দ্বারা পরিপূরণের চেষ্টা করেন। যে সব এটর্নী ইচ্ছা করলেই গৌর-মোহনকে ব্রীফ দিতে পারে, বেছে বেছে তাঁদের ডিনার খাওয়ান। সিনীয়র ব্যারিষ্টারদের বাড়ি বয়ে এসে কারো সঙ্গে সম্পর্ক পাতান, কাকাবাবু। কারো স্ত্রীকে ডাকেন দিদি, কারো বা নাতনীর জন্মদিনে 'বিধবা-কল্যাণ সমিতি' থেকে উলের জাম্পার কিনে এনে নিজের হাতে বোনা বলে চালিয়ে দেন প্রেজেণ্ট। কিন্তু পৈত্রিক কৃপণ স্বভাব কাটিয়ে উঠতে না পারার ফলে নিমন্ত্রিতেরা বাড়ী ফিরে খাদ্যের পরিমাণ নিয়ে নিজেদের মধ্যে করেন কৌতুক। উপহারের স্বল্পমূল্যতা নিয়ে গিন্নীরা আড়ালে করেন নিন্দা। গৌরমোহনের চেম্বার মক্কেল অভাবে শূন্য থাকে পূর্ব্ববৎ।

অবশেষে আর্থিক গৌরবের অভাব রাজনৈতিক খ্যাতিদ্বারা পূরণের মানস করলেন মান্নামাসি। স্বামীকে বললেন, কর্পোরেশনের ইলেকশানে দাঁড়াতে। মেয়রের না হোক, অন্ততঃ কাউন্সিলরের স্ত্রী হলেই বা কম কী?

গৌরমোহন প্রমাদ গণনা করে বললেন, "সর্ব্বনাশ! আমাকে লোকে ভোট দেবে কেন?"

স্ত্রী বললেন, "কেন দেবে না? ঐ রামদুলাল বটব্যালের চাইতে তুমি কোন্ অংশে খাটো? সে তো আকাট মূর্খ, পাঁড় মাতাল। চোরাই মালের ব্যবসা করে। সে যদি ইলেকশানে দাঁড়াতে পারে, তুমি পারবে না কেন?"

"তার কত টাকা আছে জানো?"

"থাকুক টাকা, তুমি তো ভোটদাতাদের ঘরে মেয়ের সম্বন্ধ করতে যাচ্ছ না যে তারা তোমার টাকার খোঁজ নেবে। তারা ভোট দেবে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী দেখে।"

যুক্তি নির্ভুল। কিন্তু যুক্তি দিয়ে যদি ইলেকশান জেতা যেতো তবে আর ভাবনা ছিল কী? বাস্তবিক, একমাত্র কলেজে পরীক্ষায় পাশ করা ছাড়া লজিক যে সংসারে আর কোন কাজে লাগে এমন প্রমাণ নেই।

গৌরমোহন আপত্তি করলেন, "ইলেকশানে কত লোকজন চাই, তা জানো? লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ক্যানভাস করা, মিটিং করা, এসব করবে কে?"

"সে সব আমি ঠিক করে রেখেছি। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তারা সবাই বলেছে, তোমার মতো বিদ্বানপ্রার্থী দাঁড়ালে ইলেকশান জেতা কিছুই নয়। তারা সবাই তোমার ভলাণ্টিয়ার হবে, হ্যাণ্ডবিল বিলোবে, পোষ্টার আঁটবে। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।"

গৌরমোহন বুঝলেন, স্ত্রী ইতিমধ্যেই অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন।

সাধারণতঃ কোন ব্যাপারেই তিনি স্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণে সাহস করেন না। কিন্তু এবারে তাঁকে সহজে রাজী করা গেল না। তিনি কেবলই বলেন, "আমি জেলেও যাইনি, কোন দলেও নেই। আমাকে চেনে কে? জানে কে? ভোট দেবে কে?"

মান্নামাসি সহজে নিরস্ত হওয়ার পাত্রী নন। তিনি গৌরমোহনকে ভীতু, বুদ্ধিহীন, নিষ্কর্ম্মা ইত্যাদি আরও যে সকল বাছা বাছা শব্দে তিরস্কার করলেন তার অধিকাংশই মুদ্রণের যোগ্য নয়। অহর্নিশি এরূপ নিষ্ঠুর তাড়নার ফলে দিন চার পাঁচ পরে অবশেষে বিধ্বস্ত গৌরমোহন আত্মসমর্পণ করলেন। নমিনেশান পেপার দস্তখত করে ভোটযুদ্ধে নামলেন।

গৌরমোহনের বিদ্যার খ্যাতি তখনও কিছু সংখ্যক লোকের মনে ছিল। গোড়াতে অনেকেই তাঁর প্রতি অনুকূল মনোভাবও দেখালেন। কিন্তু ভোটের দিন এগিয়ে আসতেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর তৎপরতাও বৃদ্ধি পেল। সে রাতারাতি খদ্দর পরে ইংরেজকে কষে এলোপাতাড়ি গাল দিতে সুরু করল। পাড়ার ইউথ ক্লাবে লিখে দিল এক হাজার টাকার চেক, কনসার্ট পার্টিকে খাওয়ালো ভোজ এবং মহিলা সমিতিতে দান করল দু'ডজন চরকা ও তিনখানা কলের তাঁত। অবিলম্বে গৌরমোহনের সমর্থকদের সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগল। ছেলেদের মধ্যে যারা কয়েকদিন আগে মাত্র গৌরমোহনের হয়ে কাজ করেছে, তারাই এখন লালকালীতে ছাপা পোষ্টার কাঁধে নিয়ে প্রবীণ দেশসেবী ও পরদুঃখকাতর রামদুলাল বটব্যালকে ভোট দিয়ে জাতির মর্য্যাদা এবং করদাতাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার অনুরোধ জানাতে লাগল। টিনের চোঙ্গা মুখে কালও যারা 'ভোট ফর্ গৌরমোহন' বলে চেঁচিয়েছে আজ তারা 'রামদুলালকী জয়' চীৎকারে পল্লী কাঁপিয়ে তুলল।

পত্নীর তাগাদায় গৌরমোহন নিজে পাড়ায় যে সকল ভদ্রমহোদয়গণের সঙ্গে দেখা করে ভোট প্রার্থনা করলেন, তাঁরাও প্রসন্ন হলেন না। এ কী রকম ভোটপ্রার্থী? এ তো প্রায় কথাই বলে না। না, লোকটা যথেষ্ট বিনয়ী নয়। রামদুলাল মদ খায় বটে, কিন্তু অমন অমায়িক লোক আর হয় না। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সর্ব্বনাশের যেটুকু বাকী ছিল তাও মান্নামাসির অতিকৃপণতায় পূর্ণ হলো। তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের জলযোগের আয়োজনে যথেষ্ট হাতটানের পরিচয় দিলেন। রামদুলালের লোকেরা যখন দু'বেলা লুচি তরকারী ও দরবেশ খাচ্ছে, তখন দু'খানা থিন এরারুট বিস্কুট ও এক পেয়ালা চা খাইয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে রাখতে চাইলে চলবে কেন? তা ছাড়া, ভোট ক্যানভাসের জন্য দিন-চুক্তিতে যে তিনখানা ট্যাক্সি ভাড়া করা হয়েছে, তাদের গতিবিধি সম্পর্কে তিনি এমন কড়া হিসাব নিতে সুরু করলেন যে, সেগুলি চেপে বন্ধুবান্ধবসহ স্বেচ্ছাসেবকেরা যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল, চিড়িয়াখানা ও পরেশনাথের মন্দির বেড়িয়ে আসবে তার আর জো রইল না। আশ্চর্য্য নয় যে, অতঃপর বিরক্ত চিত্তে ভলান্টিয়ারেরা প্রায় সবাই সরে পড়ল। ভোটের দিন গৌরমোহনের ক্যাম্পে সরবৎ ও পান সিগারেট খেয়ে ভোটদাতারা রামদুলালকে ভোট দিয়ে এল। গৌরমোহনের জমানতের টাকাটা পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত হল।

অতঃপর মান্নামাসির আর দয়া মায়া রইল না। উঠতে বসতে তিনি স্বামীকে গঞ্জনা দিতে লাগলেন। গৌরমোহন কোন বিষয়ে কিছু বলতে গেলেই তিনি তাঁকে থামিয়ে দেন,—"ঢের হয়েছে, তোমার আর ফোঁড়ন কাটতে হবে না। তোমার যা যোগ্যতা সে তো দেখাই গেছে।"

মান্নামাসির আগ্রহাতিশয্যে একান্ত অনিচ্ছায়ই যে তিনি নির্ব্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন সে কথা মান্নামাসিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সাহস গৌরমোহনের ছিল না। তিনি বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলেন যে, নির্ব্বাচনে পরাজয়ের সমুদয় দোষ একমাত্র তাঁরই।

ইলেকশানের ধকলে গৌরমোহনের শরীর ভেঙ্গে পড়ল। গৌরী এসে বলল, "মা, বাবা মাথার যন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাচ্ছেন, একজন ডাক্তার ডাকলে হয় না?"

"ইলেকশানের ব্যয়ের প্রচণ্ড দমকা হাওয়ায় সংসারের ছিদ্রযুক্ত জীর্ণ আর্থিক তরণীটা তখন প্রায় কাৎ হয়ে পড়েছে। মান্নামাসির মেজাজও গোড়া থেকেই বিগড়ে ছিল। শ্লেষ করে বললেন, "হ্যাঁ, ডাকতে হবে বৈ কি! একি আর আমাদের মতো মুখ্যু লোকের মাথা যে একটা এ্যাস্পিরিণের বড়ি গিলে শুয়ে থাকবো? এ হলো পি-আর-এস., পি-এইচ-ডির মাথা! সে মাথাধরা কি ডাক্তার না ডাকলে সারে? যাও, বিধান রায় কিম্বা নলিনী সেনকে কল্ দাওগে।"

ডাক্তার অবশ্য দু'দিন পরে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তখন না ডাকলেও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। ডাক্তার দেখে যাওয়ার ঘণ্টা পাঁচেক পরেই ম্যানিন-জাইটিসে জীবনে ব্যর্থকাম, অক্ষম ও অযোগ্য স্বামী গৌরমোহনের জীবনান্ত ঘটল।

ভাগ্যের এমনই পরিহাস। তাঁর মৃত্যুর পরদিন সকালে ক্যালকাটা গেজেটে দেখা গেল, গৌরমোহনকে গভর্ণমেণ্ট এক ট্রাইবুন্যালের জজ নিযুক্ত করেছেন। মান্নামাসির হৃদয়ে অনুতাপের বদলে ক্ষোভ দেখা দিল। মরার ব্যাপারেও গৌরমোহন কিছুমাত্র

বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারলেন না। লোকটা এমন অপদার্থই বটে।

অতীত স্মৃতি সিনেমার ছবির মতো মান্নামাসির মনের পর্দ্দায় দেখা দিয়ে পুরাতন বেদনাকে আর একবার নাড়া দিয়ে গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি প্রেক্ষাগারের দিকে ফিরে চললেন। যেতে যেতে ভাবলেন,—না, জীবনের কোনো সাধ, কোনো আকাংখাই পূর্ণ হয়নি। এখন মেয়েটাকে একটি কৃতী পাত্রের হাতে দিতে পারলে হয়তো অতীতে স্বামীগৌরবের অভাব ভবিষ্যতে জামাতাগর্ব্বের দ্বারা কিছুটা পূরণ হতে পারে। কিন্তু তারই বা সম্ভাবনা কোথায় ?

"মান্নামাসি যে, কেমন আছেন ?"

মান্নামাসি মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে সত্যসিন্ধু। বললেন, "ভালো আছি বাবা, তুমি কেমন ? অনেকদিন দেখিনি যে ?"

সত্যসিন্ধু সে কথার জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কৈ, মুখ দেখে তো খুব ভালো মনে হচ্ছে না। অসুখ-বিসুখ করেনি তো ?"

মান্নামাসি উত্তর করলেন, "না অসুখ নয়, তবে মনটা তেমন ভালো নেই।"

"বুঝেছি, মেয়ের বিয়ে তো ? তার জন্যে অত ভাবনা কেন ?"

ম্লান হেসে মান্নামাসি উত্তর দিলেন, "মেয়ের মা তো হওনি।"

সত্যসিন্ধু মৃদু হেসে বললেন, "না, সেটা ইচ্ছে থাকলেও আর হওয়া সম্ভব নয়।" তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, "মান্নামাসি, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা বলি। সংসারে সব কাজেই ধৈর্য্যের প্রয়োজন আছে। ডিমকে ভেঙ্গে ফেললেই তো তা থেকে তাড়াতাড়ি বাচ্চা বেরোয় না। তাতে অনেকদিন ধরে তা দিতে হয়।"

একটু চিন্তা করে মান্নামাসি বললেন, "হয়তো তোমার কথাই ঠিক। সংসারে যখন যা হওয়ার ঠিক তখনই তা হবে, তার আগে নয়। আমি উতলা হয়ে কী করব ?" একটু হেসে যোগ করলেন, "ঐ যে তোমাদের ইংরেজী প্রবাদ আছে, তাই মনে হয়.—মান্নামাসি প্রপোজেস্···

"মলী সেন ডিসপোজেস্। এই তো ? আপনি চমকে উঠবেন না। হ্যাঁ, সমস্তটা না জানলেও আমি অনেকটাই অনুমান করতে পারি। আমার কথা শুনুন, মিসেস্ সেনকে আমি আপনার চেয়ে অনেক বেশী জানি। আপনি অনর্থক ভয় পাবেন না। এমন অনেক লোককে দেখছি যারা নিজেরা মাছ খায় না কিন্তু ছিপ ফেলে মাছ ধরতে ভালোবাসে। তারা আমিষাশীদের পক্ষে ভয়ের পাত্র নয়, করুণার পাত্র।"

মান্নামাসি কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এমন সময় যাঁর সম্পর্কে আলোচনা সে ব্যক্তিটিই সশরীরে হাজির হলেন সেখানে। স্বয়ং মলী সেন। বললেন, "মান্নামাসি, তুমি যদি ড্রেসিং-রুমে বসে ছোট ছোট মেয়েগুলির চুলটা একটু বেঁধে দাও তো বড় উপকার হয়।"

সম্মত হয়ে মান্নামাসি প্রস্থান করতেই মলী সেন সত্যসিন্ধুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী, বড় যে পালিয়ে বেড়াচ্ছ ?"

সত্য জবাব দিলেন, "শুনেছি ছায়াকে তার পিছনে ছুটে ধরা যায় না, বরং পিছন ফিরে উল্টো দিকে চলতে থাকলেই নাকি সে পিছু নেয়।"

মলী সেন বললেন, "হেঁয়ালী রাখ। বল, এতদিন কোথায় ছিলে ?"

"কোথায় আবার, এখানেই।"

"মিছে কথা, তবে দেখিনি কেন ?"

"দেখা তো শুধু দেখার বস্তুর উপর নির্ভর করে না। আকাশে তারা তো সারাক্ষণই থাকে। দিনের আলো না নিভলে কি তা চোখে দেখা যায় ?"

"বেশ তো, আমার চোখ না হয় সূর্য্যকিরণে ঝলসে আছে, তুমি একদিনও আসনি কেন ?"

"আমি টাইম-লিমিট মানি। রিটায়ারমেণ্টের পরেও যে রি-এমপ্লয়মেণ্ট চায় সে অশ্রদ্ধেয়, শুধু গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে নয়, জীবনের কারবারেও।"

মলী সেন খানিক চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা সিন্ধু, আমরা কি পরস্পরের বন্ধু হয়ে থাকতে পারিনে ?"

"না। স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুত্বে আমি বিশ্বাস করিনে। সেটা হয় বাড়তে বাড়তে অনুরাগের কোঠায় পৌঁছয়, নয় তো কমতে কমতে পরিচয়ের পর্য্যায়ে নামে। অনাত্মীয় নরনারীর মধ্যে মাত্র দুটি সম্পর্ক সম্ভব। হয় ভদ্রতার, নয় তো প্রেমের।"

মলী সেন বললেন, "আমি যা নই তা ভেবে তুমি একদিন আনন্দ পেয়েছিলে। তাতে আমার হাত

ছিল না। তারপর হঠাৎ একদিন যদি তোমার জ্ঞান হয়ে থাকে যে, তুমি যা ভেবেছ আমি তা নই, সে কি আমার অপরাধ ?"

সত্য বললেন, "কিছুমাত্র নয়। আমি তো তোমাকে কখনও দোষী করিনি। নোট ডবল করার কাহিনী জানো তো? একদল লোক আছে যারা একশো টাকার নোট দুশো টাকা হবে আশা করে যখন দেখে নোট নিয়ে লোকটা উধাও, তখন তাকে গাল দিয়ে বলে, জোচ্চোর। তাদের একবারও মনে হয় না যে, নোট ডবল করা সম্ভব একথা যে বিশ্বাস করে মূর্খতাটা তাদেরই। আমি জানি, ধিক্কারের পাত্র যদি কেউ থাকে, তবে সে তারা নিজে।"

মলী সেন আহত হলেন। কিন্তু প্রতিঘাত না করে বললেন, "আমার হাত থেকে তুমি গভীর দুঃখ পেয়েছ তা জানি, সিন্ধু।"

সত্য বললেন, "দেখ মলী, ভগবান সব জিনিষেরই একটা শেষ দিয়েছেন। তাঁর নিয়মে মানুষের জীবনকালেরও একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। দুঃখ যত গভীরই হোক দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই একদিন তারও সমাপ্তি ঘটে। তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করতে নেই।"

"আমি যে তোমার জন্যে সত্যি সত্যিই ভাবি, সে কথা হয়তো আজ আর তুমি বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমিও যে ব্যথা পাই, আর যাই হোক, আমারও যে হৃদয় আছে, একথা কি তোমার একবার মনে হয় না?"

সত্য করজোড়ে বললেন, "দোহাই তোমার। এসব গভীর কথা আমাকে শুনিও না। আমি ডাক্তার মানুষ। ষ্টেথিস্কোপ দিয়ে লোকের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে অভ্যস্ত। হৃদয়ের খবর রাখিনে। গ্রে'স এনাটমিতে তার উল্লেখ নেই।"

মলী সেন কিছুক্ষণ নীরব থেকে বেদনাভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, "একদিন ভাবতেম, আমরা দুজনে দুজনকে এত গভীরভাবে জানি যে মুখ ফুটে না বললেও একজনের কথা আর একজন বুঝতে পারে। সে ভুল ভেঙ্গেছে। তাই ঠিক করেছিলেম, তোমাকে সবটাই স্পষ্ট ভাষায় জানাবো। এখন দেখছি, বৃথা। যে বুঝবে না বলেই পণ করে বসেছে, তাকে বোঝাবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। বুঝেছি, আমাকে তুমি কোনো দিন ক্ষমা করতে পারবে না।"

সত্য ব্যস্ত হয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, "ক্ষমার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমাকেও তুমি ভুল বুঝো না। গোলাপ তুলতে গেলে ফুলও জোটে, কাঁটাও ফোটে। কিন্তু ফুলের সৌরভ ভুলে গিয়ে যারা শুধু কাঁটার আঘাতটাই চিরকাল মনে জীইয়ে রাখে আমি তাদের দলে নেই। কথাগুলি বোধ হয় অনেকটা কবিত্বের মতো শোনাচ্ছে। তা শোনাক। কিন্তু এর একবিন্দুও মিথ্যে নয়। পরের দোষ মনে করে রাখায় সুখ নেই, একথা আমি পুঁথি থেকে নয়,—নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জেনেছি। অতীতের যে দিনগুলি সরস, যে কথাগুলি মধুর এবং যে মুহূর্ত্তগুলি সুধায় পরিপূর্ণ, আমি সেগুলিই মনে রাখব; ব্যর্থতার, পরিতাপের, বা তিক্ততারগুলি নয়। যথার্থ বলছি, একাউণ্টেন্সী আমার পেশা নয়। জীবনের ট্রায়েল ব্যালেন্স কষা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। না, মিসেস্ মলী সেন, কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী।"

[ক্রমশঃ।

রামমোহন রায় কি তান্ত্রিক ছিলেন ?

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হ'লে হিন্দুরা তাঁকে বেদান্তানুগামী ব্রহ্মজ্ঞানী, খৃশ্চানেরা খৃষ্টান, মুসলমানেরা মুসলমান এবং তন্ত্রমতাবলম্বীরা তান্ত্রিক প্রচার করতে থাকেন। চুঁচুড়ার অন্তর্গত ক্যাকশিয়ালীতে মদন কামার নামে একটি সুনিপুণ শিল্পকর ঘোর তান্ত্রিক ছিল। রামমোহনের প্রতিমূর্ত্তি ছিল তান্ত্রিকটির গৃহে। মদন প্রত্যহ প্রাতে রুদ্রাক্ষের মালা হস্তে রাজার প্রতিমূর্ত্তিকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতো। মদনের প্রতিবেশী মদনকে প্রণামের কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলে, "রাজা রামমোহন রায় সিদ্ধপুরুষ ছিলেন"।

শোনা যায়, শৈশবে রামমোহন কাশীবাসী মাতামহ ৺শ্যাম ভট্টাচার্য্যের কাছে কিছু দিন ছিলেন। রামমোহনের মা-ও ছিলেন। মাতামহ শ্যাম ভট্টাচার্য্য ছিলেন ঘোর তান্ত্রিক। তিনি তন্ত্রোক্ত প্রথানুযায়ী মন্ত্রপূত সুরা শিশু রামমোহনকে পান করিয়েছিলেন। উপস্থিত সকলে বিরক্ত হওয়ায় শ্যাম ভট্টাচার্য্য বলেন,—"তোমরা রাগ করিও না। আমি শিশুকে যাহা পান করাইলাম, তাহার গুণে শিশু সিদ্ধপুরুষ হইবে।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা পশ্চিমাঞ্চলে ভজ্জির রাণার গুরু সুখানন্দ স্বামীর সঙ্গে রামমোহনের বিষয়ে আলাপ করেন। মন্ত্রী ছিলেন ঘোর তান্ত্রিক। কি কারণে মন্ত্রী মহর্ষিকে ব'লেছিলেন,—"রামমোহন রায় অবধূত থা।" বস্তুতঃ রামমোহনের ধর্ম্মমত বিষয়ে নিশ্চিত বলা যায় যে, রামমোহন একেশ্বরবাদী ছিলেন।

হাওড়া ষ্টেশন

(প্রথম পুরস্কার)

—শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(উত্তরপাড়া)

——প্রতিযোগিতা——

বিষয়

বিখ্যাত সাহিত্যিক

প্রথম পুরস্কার ১৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৲

তৃতীয় পুরস্কার ৫৲

ছবি পাঠাবার শেষ দিন ২২শে অগ্রহায়ণ

দুর্গাপূজা

—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলি·৩)

গঠনের প্রাথমিক অবস্থা

হাওড়া

(দ্বিতীয় পুরস্কার)

—জলধিরতন বন্দ্যোপাধ্যায় (কাশীধাম)
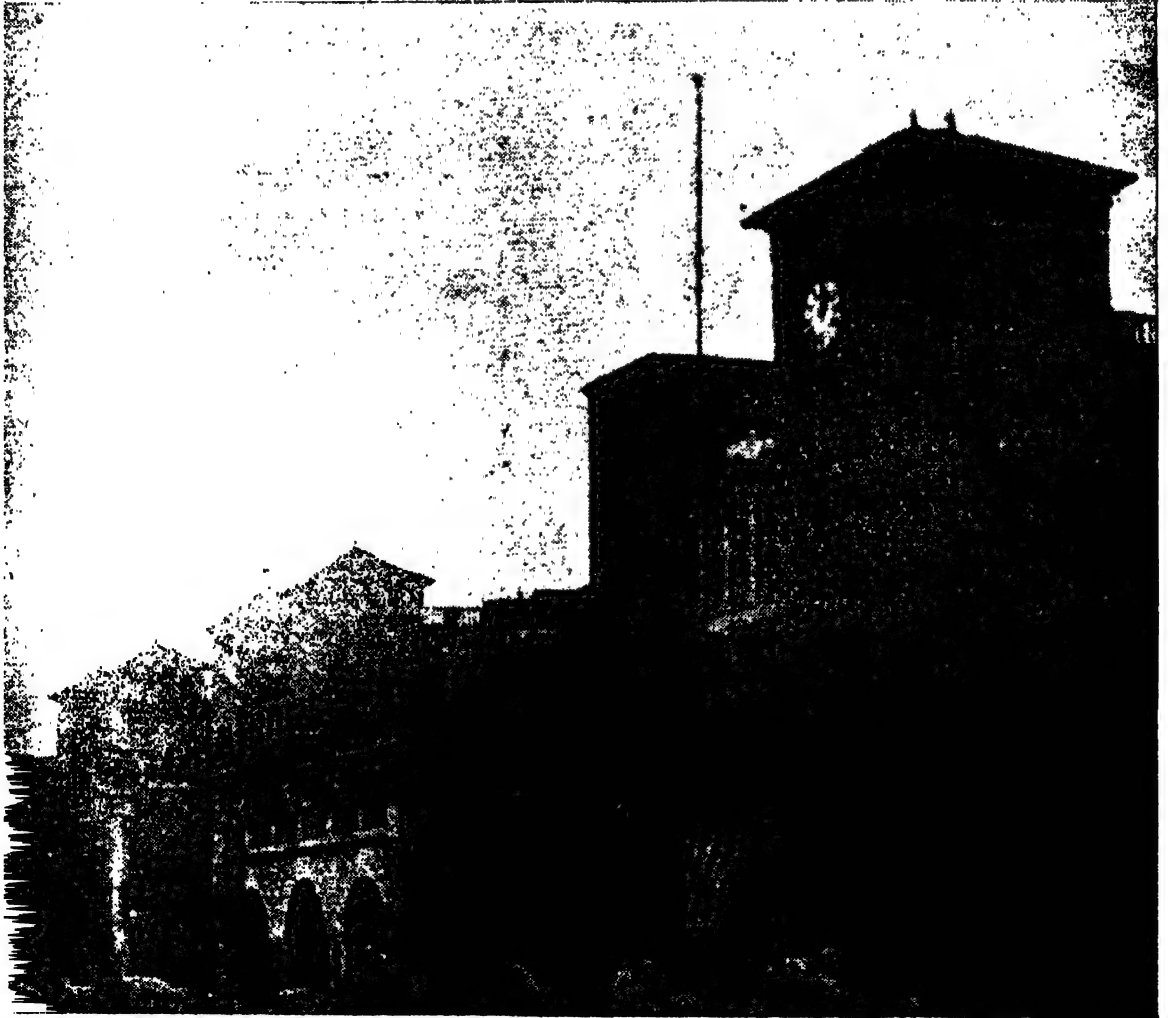
সাজ বিক্রী হচ্ছে

গঠন হচ্ছে

শিবাদহ

—মনীষিকুমার ভট্টাচার্য্য (কলি-৪

(তৃতীয় পুরস্কার)

বিক্রী হয়ে গেছে

লাল কেল্লা —শ্রীসুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলি-৪)

—প্রচ্ছদপট—

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট হাউসে গৃহীত
মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ কেসি

বিসর্জ্জন হচ্ছে

ঘুম —রঞ্জিত রায়চৌধুরী (কলি-১১)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিধিপত্র

[ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে মাদ্রাজের কুঠীর অধ্যক্ষ বা প্রেসিডেণ্টই ঐ সময়ের ভারতবর্ষীয় ইংরাজদের লোকাকর্তা বা ফ্যাক্টরীর শ্রেষ্ঠতম কর্মচারী ছিলেন। যাহাতে কর্মচারিগণ সচ্চরিত্র হন ও নীতি পালনে অমনযোগিতা না করেন, তজ্জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটিই তাঁহারা করেন নাই। তখন পাদরী ছিল না, গির্জ্জা ছিল না, উপাসনা করিবার কোন কেন্দ্র ছিল না। কিন্তু ক্রমে বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ১৬৭১ খৃঃ অব্দে মাদ্রাজের গভর্ণর বাংলায় আসিয়া পাদরীদিগের সহিত পরামর্শ মতে কতকগুলি নীতিগর্ভ নিয়ম প্রচলন করেন। নিয়মগুলি দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন, কোম্পানী বাহাদুরের কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাদের সহযোগীদিগের নৈতিক উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বের নৈতিক নিয়মগুলি কত কৌতূহলজনক। নিয়মগুলি আনুপূর্ব্বিক উদ্ধৃত হইতেছে।]

১। যাহাতে ঈশ্বরের নাম গৌরবান্বিত হয়, যাহাতে সকল কর্ম্মে তাঁহার মঙ্গলাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়, এই উদ্দেশ্যে কোম্পানীর কর্মচারিগণ ভজনাগারে নিত্য প্রার্থনা করিবেন।

২। মিথ্যা বলা, শপথ করা, শাপ দেওয়া, মাতলামি প্রভৃতি দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্র দিন অপবিত্র করিবে না।

৩। রাত্রে, কেহই ফ্যাক্টরী অথবা তাহাদের শহরের আবাস-বাটী ছাড়িয়া, অন্যত্র রাত্রি যাপন করিতে পারিবে না।

৪। সকলেই পাদরীদিগের উপদেশে মনোযোগ দিবে। যিনি নিয়ম পালন করিবেন না, প্রার্থনার সময়ে ভজনাগারে উপস্থিত না হইবেন, তাঁহাকে অপরাধীরূপে বিচারার্থে যাইতে হইবে।

৫। যদি কেহ রাত্রি নয়টা অতিক্রান্ত হইলে বাহিরে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দশ টাকা জরিমানা দিতে হইবে।

৬। যদি কেহ অযথা শপথ করেন তাহা হইলে প্রত্যেক শপথের জন্য তাহার নিকট হইতে বারো পেনি জরিমানা আদায় করা হইবে।

৭। মাতলামির প্রত্যেক অপরাধের জন্য, অপরাধীকে পাঁচ শিলিং করিয়া জরিমানা দিতে হইবে।

৮। লর্ডস দিনে, প্রার্থনাক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকিলে এক শিলিং জরিমানা দিতে হইবে।

৯। যদি জরিমানার টাকা আদায় না হয়, তাহা হইলে অপরাধী ব্যক্তির সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা তাহা আদায় করা হইবে।

১০। প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানদিগকে দুই বেলার ভজনা সময়ে নিয়মিতরূপে গির্জ্জায় উপস্থিত থাকিতে হইবে। অনুপস্থিতির যথাযথ কারণ না দেখাইতে পারিলে, অপরাধীকে প্রত্যেক

১১। আদেশসমূহ ফ্যাক্টরীর কর্মচারিগণকে বৎসরে দুই বার পড়িয়া শুনান হইবে।

১২। এক জন ফ্যাক্টার জরিমানা আদায়ের কার্য্যালয় রাখিবেন। অপরাধী ফ্যাক্টার ও কর্মচারিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত টাকা হুগলীস্থিত অধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। অধ্যক্ষ টাকা মাদ্রাজে পাঠাইবেন। উক্ত অর্থ দরিদ্রদিগকে বিতরিত হইবে।

[উক্ত নিয়মগুলি যথাযথ পালিত না হইলে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার রীতি ছিল। শাস্তি যে কত কঠোর ছিল ইহা হইতে বুঝা যায় :—

If any by these penalties will not be reclaimed from the vices or any shall be found guilty of adultery, fornication, uncleanliness or any such crimes, or shall disturb the peace of the Factory by quarrelling or fighting and will not be reclaimed, then they shall be sent to Fort St. George, there to recieve condign punishment.—(Wilson's Early Annals. page. 69)]

লোকনাথ ঘোষ লিখিত "The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, &c." এবং "The Native Aristocracy and Gentry of India" গ্রন্থের ভূমিকা-পত্র।

[ইতিহাস লিখতে যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় বিখ্যাত বাঙালী পণ্ডিত স্বর্গত লোকনাথ ঘোষ মহাশয়ের "The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars" গ্রন্থটি পাঠ করলেই বোঝা যায়। লোকনাথ ঘোষ ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের শিক্ষিত বাঙালী—যিনি বেঙ্গল মিউজিক স্কুল ও ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাবের সঙ্গে জড়িত থেকে "The Music and Musical Notation of Various Countries," গ্রন্থের মত দুর্মূল্য গ্রন্থ লিখে গেছেন। বাঙলা তথা ভারতবর্ষের বিখ্যাত ব্যক্তি এবং বংশগুলির ইতিহাস আছে প্রথমোক্ত গ্রন্থটিতে। মূল ইংরেজীতে লেখা। তখনকার বাঙালী যে কত ভাল ইংরেজী লিখেছেন, লোকনাথ ঘোষের লেখা পাঠে তাহা জানা যায়। পরিশ্রমসাপেক্ষ ইতিহাস লেখায় সাহায্য করেছিলেন কত বিখ্যাত গুণী, সুধী ও সজ্জন। নামের তালিকাতে পাওয়া যাবে সাহায্যকারীদের নাম। লোকনাথ ঘোষের লেখা ভূমিকায় তখনকার দিনকে দেখতে পাওয়া যায়। ভূমিকা-পত্রটি

আমার "The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars." পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড The Native Aristocracy and Gentry of India." ই নাম দিয়া জনসাধারণ ও আমার দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত রিতেছি। আমার পুস্তকের প্রথম খণ্ডকে আমার পৃষ্ঠপোষকগণ সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং বিশিষ্ট সাময়িক পত্রের সম্পাদকবৃন্দ অকুণ্ঠচিত্তে ইহার যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, জন্য আমি এই সুযোগে তাঁহাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন রিতেছি। আমি নিশ্চিতরূপেই আশা করি যে, আমার পুস্তকের তীয় খণ্ডও অনুরূপ ভাবে সমাদৃত হইবে। এই আশা প্রকাশের ঙ্গে সঙ্গে আমি মুখবন্ধস্বরূপ কয়েকটি কৈফিয়ৎ দিয়া পুস্তকখানি নসাধারণের নিকট পেশ করিতেছি।

পুস্তক প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার কারণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৮৭৫ সালে এই পুস্তক লিখিবার প্রথম প্রচেষ্টার সময় মাকে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথম ণ্ডটির অধিকাংশই বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ বলিয়া উহা সম্পূর্ণ বিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডটির বেলায় তাহা হয় নাই। এই খণ্ডের প্রায় সবটাই বহু কষ্টে সংগৃহীত থ্যসমূহ হইতে লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে। প্রায় সমস্ত দেশীয় পণ্ডিতবৃন্দ, শ্রেষ্ঠ পরিবারসমূহের প্রধানগণ এবং দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিবৃন্দের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ ও পত্রালাপ করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৮৭৬ সালের নভেম্বর মাস হইতে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' নিয়মিত ভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। বিজ্ঞাপন দিয়া অবশ্য বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। বিজ্ঞাপন দিয়া যাহা পাওয়া গেল, তাহা সরাসরি পত্র লিখিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম। 'হিন্দু পেট্রিয়টে' বিজ্ঞাপন দিবার দু'-এক মাস পরে অর্থাৎ ১৮৭৭ সালের প্রথমে রাজা-রাজড়াদের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। ঐ সময় বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের মিঃ ডবলিউ, এইচ, ডি'ওলি "ইণ্ডিয়ান পীয়ারেজ" নামে একখানি পুস্তক লিখিতে মনস্থ করিয়া প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন এবং একখানি "প্রসপেক্টাস" প্রচার করেন। ফলে বাঙ্গলার প্রধানগণ তাঁহাকেই তথ্য সরবরাহ করিতে থাকেন এবং আমি বাদ পড়িয়া যাই। তাঁহারা স্বভাবতঃই মিঃ ডি'ওলির উপর অধিক আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন, আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তিকে তত পছন্দ হয় নাই। মিঃ ডি'ওলি যদি তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতেন, তাহা হইলে আমার পুস্তকের বর্ত্তমান খণ্ড আলোকের মুখ দেখিত না। কিন্তু মিঃ ডি'ওলি জনসাধারণকে নিরাশ করিয়া ১৮৭৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 'ষ্টেটসম্যান' মারফৎ ঘোষণা করিলেন যে, তিনি "ইণ্ডিয়ান পীয়ারেজ" লিখিবার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই সময় আমার পুস্তকের প্রথম খণ্ড "দি নেটিভ ষ্টেটস" প্রেসে ছাপান হইয়াছিল এবং ইহা ১৮৭৯ সালের ১লা জুন তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে ভাল অভিমত প্রকাশিত হওয়ায় আমি পুনরায় তৎকালীন খ্যাতিমান ভদ্র ব্যক্তিদের নিকট তথ্যের জন্য আবেদন করি। চিঠিপত্র লিখিয়া অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়, কিন্তু তবুও কতিপয় বিশিষ্ট পরিবার ব্যক্তিগত কারণে অথবা ঔদাসীন্য বশত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে বিরত থাকেন এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে তথ্যগুলি বিভিন্ন বন্ধুর সহায়তায় এবং ইংরাজী, বাঙ্গলা, উড়িয়া ও অন্যান্য ভাষার পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, জমিদার প্রভৃতির নাম এবং স্থান বা জেলাগুলি নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী সাজান হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানের সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—"প্রধান পরিবার সমূহ, সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ" এবং "অন্যান্য পরিবার, সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ বা ছোটখাট জমিদারগণ।" কয়েকটি ক্ষয়প্রাপ্ত পরিবারের ইতিহাসও এই খণ্ডে স্থান পাইয়াছে এবং বর্ত্তমানে দরিদ্রদশাপ্রাপ্ত হইলেও অতীতের মর্য্যাদা অনুযায়ী তাঁহাদের নাম সন্নিবেশ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিষ্ণুপুর রাজ-পরিবার (বাঁকুড়া, ২য় পৃষ্ঠা) এর পূর্ব্বের ঐশ্বর্য্য নষ্ট হইলেও প্রধান প্রধান পরিবারের মধ্যে এই রাজ-পরিবারের স্থান দেওয়া হইয়াছে। পাঠকগণ প্রত্যেক পরিবারের ইতিহাস পাঠ করিয়া তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা সহজেই অবগত হইতে পারিবেন।

কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য স্থানের ক্ষয়প্রাপ্ত পরিবার-সমূহের বিবরণ বর্ত্তমান খণ্ডের বিভিন্ন অংশে "অন্যান্য পরিবার" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ভারতে এইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা বহু, কিন্তু আমি মাত্র কয়েকটি পরিবারের সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। পুত্রদের মধ্যে অথবা আইন-সম্মত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি সমান ভাবে ভাগ করিয়া দিবার প্রথাই এই সব পরিবারের পতনের প্রধান কারণ। ভারতের প্রাচীন পরিবারসমূহের পতনের আর একটি কারণ—বেপরোয়া দান-ধ্যান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান। ভারতে এমন অল্প গ্রামই আছে, যেখানে এই ভাবে মন্দির বা মসজেদ, পুষ্করিণী বা পথ অথবা সদাব্রত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

বড় বড় পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম পৃথক্ ভাবে দেওয়া হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বর্গীয় মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর অথবা স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ইতিহাস শোভাবাজার রাজ-পরিবারের ইতিহাসের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। এই ভাবে মহারাণী স্বর্ণময়ী, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের ইতিহাস জানিতে হইলে কাশিমবাজার রাজ-পরিবার (মুর্শিদাবাদ) এবং কলিকাতার ঠাকুর ও ও মল্লিক-পরিবারের ইতিহাস দেখিতে হইবে। ভারতের অন্যান্য বিখ্যাত পরিবারের বিবরণ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। আমার পুস্তকের প্রথম খণ্ডেও এই নীতি অনুসৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইন্দোরের হোলকারের সম্বন্ধে জানিতে হইলে ইন্দোর রাজ্যের ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে।

কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত সামর্থ্য দ্বারা যাঁহারা ভারতীয় সমাজের শীর্ষে আরোহণ করিয়াছেন, যেমন—হায়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী নবাব সার সালার জং বাহাদুর, বরোদার প্রধান মন্ত্রী রাজা সার টি, মাধব রাও প্রভৃতি ব্যক্তিদের বিবরণ স্থান বা জেলা হিসাবে পৃথক্ ভাবে দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে বহু মৃত ব্যক্তির জীবনীও দেওয়া হইয়াছে, যেমন—স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়, স্বর্গীয় বাবু

রামদুলাল দে, স্বর্গীয় বাবু মতিলাল শীল, স্বর্গীয় বাবু রামগোপাল ঘোষ, স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র, স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি ব্যক্তিদের বিবরণ এই পুস্তকের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

এই খণ্ডে কেবল হিন্দুদেরই নয়, পরন্তু মুসলমান এবং পার্শীদের ইতিহাসও দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তকখানি সঙ্কলন করিতে আমার প্রায় সাত বৎসর অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। আমার পুস্তকের প্রথম খণ্ডের সমালোচনা করার সময় 'ইংলিশম্যানে'র সুযোগ্য সম্পাদক এই ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, দ্বিতীয় খণ্ড লিখিতে অনেক কষ্ট করিতে হইবে, কারণ এ বিষয়ে পূর্ব্বে কেহ কিছু লিখিয়া যায় নাই।

আমি যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার সাহায্যে গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছি। তবে আমার মনে হয়, হয়ত অনেক কথা বাদ পড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি সমাদৃত হইলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই ত্রুটি দূর করিবার ইচ্ছা রহিল।

যাঁহারা আমাকে অধিক তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, তাঁহাদের পরিবারের বিবরণ সম্পূর্ণরূপে দেওয়া হইয়াছে—কোনও ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করা হয় নাই বা কম করিয়া লেখা হয় নাই। যাহাতে জনসাধারণের আগ্রহ সৃষ্টি হইবে না, এরূপ বিষয়গুলি বাদ দিয়াছি। এই কাজে যে সব ত্রুটি অনিবার্য্য, সে সবের জন্য জনসাধারণ আমাকে ক্ষমা করিয়া বাধিত করিবেন। তাঁহারা যদি কোন প্রকার প্রস্তাব করেন, ভবিষ্যৎ সংস্করণে তদনুযায়ী কাজ করিবার বাসনা রহিল। আমার চেষ্টা যদি সফল হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় সংস্করণে কতিপয় নির্ব্বাচিত রাজা-রাজড়ার এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহের ছবি প্রকাশ করিবার আশা করি। নানা কারণে দ্বিতীয় খণ্ডের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবে ইহাতে দেশীয় নৃপতিবৃন্দ সম্বন্ধে অনেক চিত্তাকর্ষক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে যে সব রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি খেতাব পাইয়াছেন, তাঁহাদের নামের একটি নির্ঘণ্ট দ্বিতীয় খণ্ডের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে।

যাঁহারা আমাকে বহু মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন, নিম্নে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া আমি তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি :—

হায়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী নবাব সার সালার জং বাহাদুর, বরোদার প্রধান মন্ত্রী রাজা সার টি, মাধব রাও, গিধৌরের মহারাজা সার জয়মঙ্গল সিং বাহাদুর, ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজ আনন্দ-গজপতিরাজ, কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী, দ্বারভাঙ্গার মহারাজ লছমেশ্বর সিং বাহাদুর, হাতোয়ার মহারাজা কৃষ্ণ প্রতাপশাহী বাহাদুর, কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, বেঙ্কটগিরির পাঁচ হাজারী মনসবদার রাজা ভেলুগতি কুমার য়াচামা নাইডু গারো বাহাদুর, শোভাবাজারের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর, পাথুরিয়াঘাটার রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, চোরবাগানের রাজা রাজেন্দ্রমোহন মল্লিক বাহাদুর, বারাণসীর রাজা শিবপ্রসাদ, মাদ্রাজের রাজা গোদে নারায়ণ গজপতি রাও, ময়মনসিং মুক্তাগাছার রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, বাল্লেশ্বরের রাজা শ্যামানন্দ দে বাহাদুর, দিনাজপুরের মহারাণী শ্যামমোহিনী, টিকারীর মহারাণী রাজরূপ কুমার, ঢাকার নবাব খাজা আবদুল গনি, ঢাকার নবাব আশানুল্লা খান, কলিকাতার আমীর আলী খান বাহাদুর, সুরাটের সৈয়দ হোসেন অল-ইদ্রুস, জুনাগড়ের খান বাহাদুর জমাদার সালে হিন্দী, গঞ্জাম মান্দাসার সর্দ্দার জগন্নাথ রাজামণি রাজা দেও, লুধিয়ানার ভাদৌরের সর্দ্দার আতর সিং, দিল্লীর পণ্ডিত স্বরূপনারায়ণ, বারাণসীর পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী, কলিকাতার পারসীক কন্সাল মানেকজী রুস্তমজী, বোম্বাইএর দোসাভাই ফ্রামজী কারা কা, মৈসুরের বি, কৃষ্ণ আয়েঙ্গার, বোম্বাইএর মোরারজী গোকুলদাস, বোম্বাইএর শেঠ ফ্রামজী নুস এরোয়ানজী প্যাটেল, মাদ্রাজের মিস হুমায়ুন জা বাহাদুর, মাদ্রাজের মথুস্বামী আয়ার, বিষ্ণুপুরের (দমদম) রমেশচন্দ্র মিত্র, কাশিমবাজারের রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুর, কটকের রায় বৈদ্যনাথ পণ্ডিত বাহাদুর, নাটোর রাজ-পরিবারের কুমার যোগেন্দ্রনাথ রায়, পাথুরিয়াঘাটার বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, বড়বাজারের বাবু দামোদর দাস বর্ম্মণ ও প্রসাদদাস মল্লিক ; শ্রীহট্টের বাবু নবকৃষ্ণ রায় দস্তিদার, চকদীঘির বাবু যোগেন্দ্রনাথ সিং রায়, ইন্দোরের রাও সাহেব বিনায়ক রাও, বারাণসীর বাবু গুরুদাস মিত্র এবং আরও অনেকে।

উপসংহারে আমি জানাই যে, যাঁহারা তাঁহাদের পরিবারের মাননীয় ব্যক্তিদের মৃত্যুসংবাদ জানাইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য আমি শোক প্রকাশ করিতেছি এবং এই তথ্য দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য রাখিয়া দিতেছি।

লোকনাথ ঘোষ।

গল্প হলেও সত্যি

কবি রবার্ট ব্রাউনিং তখন শিশু। পিতাকে পড়তে দেখে ব্রাউনিং জিজ্ঞেস করলে,—কি পড়ছো ?

পিতা পড়ছিলেন হোমারের কাব্য। বললেন,—পড়ছি 'ট্রয় অধিকার'।

উত্তর শুনে ব্রাউনিং বললে,—ট্রয় কাকে বলে ?

অন্য পিতা হ'লে সহজ কথায় ব'লে দিতেন,—এশিয়াতে ট্রয় নামে একটি শহর আছে। এখন যাও খেলা কর গে যাও।

কিন্তু ব্রাউনিং-পিতা ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনি টেবিল এবং চেয়ারের সাহায্যে একটি শহর তৈরী ক'রে ফেললেন। সব চেয়ে উঁচু জায়গায় একটি বিশেষ আকারের চেয়ারে ব্রাউনিংকে বসিয়ে দিয়ে ফেললেন। বললেন,—ট্রয় শহর তৈরী হ'ল। তুমি হ'লে সম্রাট প্রায়াম। ঐখানে বসে আছে ট্রয়ের হেলেন। কথার শেষে দেখিয়ে দিলেন একটি বিড়ালকে। বললেন,—ঘরের বাইরে ঐ যে মাঠে কুকুরগুলো ডাকাডাকি করছে, চেষ্টা করছে ভেতরে আসতে, হেলেনকে ধরতে, দেখতে পাচ্ছো ? কুকুরগুলো হচ্ছে রাজা এ্যাগামেমনন এবং মেনিলশ। যুদ্ধ করে ট্রয় অধিকার এবং হেলেনকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করছে।

গল্পটা যে ভাবে বললেন, ব্রাউনিং শিশু হলে কি হবে বেশ মুগ্ধ হয়ে পড়লো। কিছু দিন বাদে পিতা ব্রাউনিংকে হোমারের ইলিয়াড গ্রন্থটির একটি অনুবাদ পড়তে দিলেন, যাতে ব্রাউনিং গ্রীক ভাষা শিখতে উৎসাহী হয়। ব্রাউনিং গ্রীক ভাষা শিখেছিলেন এবং কবিতা পড়তে শিখেছিলেন শৈশবেই।

অকল্যাণ্ডীয় শিক্ষাপদ্ধতি

১৮৩৬ – ৪২

শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত

ইতিহাসে লর্ড অকল্যাণ্ডের নাম কুখ্যাতির সঙ্গে উল্লিখিত আছে। তার কারণ অকল্যাণ্ডের দুর্ভাগ্য যে, তাঁরই সময়ে ইংল্যাণ্ডের সম্মান ধূলিমলিন হয়েছিল, ভারতবর্ষে সর্বাধিক সামরিক বিপর্যয় ঘটেছিল এবং হীনতা স্পর্শ করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ললাটে। কিন্তু এ কথা সত্য যে, যত পাপ তিনি করেছিলেন তার চেয়ে বেশী পাপী বলে তাকে অসম্মান করা হয়েছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের পামারষ্টোন পরিচালিত রুশ-বিরোধী কূটনীতির হাতের ক্রীড়নক হয়েছিলেন অকল্যাণ্ড এ কথা ভোলা উচিত নয়। আর সেই কারণেই আভ্যন্তরীণ শাসনে অকল্যাণ্ডের সমস্ত কৃতিত্বই সামরিক বিপর্যয়ের কাছে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এমন কি, তাঁর সমসাময়িক এবং সহকর্মী প্রিন্সেপ তাঁকে কুশলী শাসক বলে গণ্য করতে পারেননি। কিন্তু ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিস্তারের প্রচেষ্টায় অকল্যাণ্ড যে শিক্ষা-পলিসি গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন, তার দ্বারা তাঁকে বেণ্টিঙ্ক, ডালহাউসি ও কার্জনের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত করা যায়। ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ তারিখে বেণ্টিঙ্ক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, ভারতবর্ষে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে সরকারী সাহায্য ও প্রেরণা দেওয়া হবে। এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে সাহেবী মহল সমস্ত ভারসাম্য হারিয়ে প্রস্তাবের মর্মার্থকে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করা সুরু করলে। এর ফলে দেশময় অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠল এবং যাঁদের ভারতবন্ধু বলে নাম ছিল না তেমন ইংরেজরাও এর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। ২৪শে নভেম্বর ১৮৩৯ সালে অকল্যাণ্ড সমস্ত ব্যাপারটি নূতন করে পর্যালোচনা করেন এবং সকল দলের সন্তোষজনক এক সমাধানের চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষা প্রসার, গণশিক্ষার বিস্তার, চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষা এবং ঐ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অকল্যাণ্ডের নিজস্ব মতবাদ কি ছিল, সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই। এটুকুও আমরা প্রতিপন্ন করতে চাই যে, দেশের শাসনকর্তা হিসাবে শিক্ষা-ব্যাপারে উৎসাহ ছিল না তাঁর মামুলি। ছিল তার অতিরিক্ত কিছু।

১৮৩৫ সালে বেণ্টিঙ্কের প্রস্তাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি পক্ষপাতিত্বে সরকারের পলিসি বর্ণিত হয়। প্রস্তাবের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। "ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মহৎ উদ্দেশ্য নেটিভদের মধ্যে য়ুরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসার। এ জন্য শিক্ষা বাবদ সরকারী বাজেট সামগ্রিক ভাবে কেবল ইংরাজী শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হবে।" গোঁড়া ইংরেজরা 'কেবল' কথাটির উপর ঝাঁপ দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ নেন এবং এতাবৎ যে টাকা দেশী শিক্ষায় ব্যয়িত হোত তা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। সর্বপ্রকার ষ্টাইপেণ্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবং বাংলা ক্লাসগুলি উঠিয়ে দেওয়া হয়। দেশের লোক সরকারী পলিসি সম্বন্ধে স্বভাবতই সন্দিহান হয়ে ওঠে। এদেশে আসার সঙ্গেই রুশ-আফগান রাজনীতির গোলকধাঁধায় দিশাহারা হলেও, অকল্যাণ্ড এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি সম্বন্ধে চিন্তা করার সুযোগ নষ্ট করেননি। শতাধিক বর্ষ পার হয়েছে বটে, কিন্তু অদ্যাবধি অকল্যাণ্ডের প্রস্তাব জাগ্রত সমস্যা হয়ে আছে আমাদের জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে। তাঁর প্রস্তাবে অকল্যাণ্ড রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন, বিশেষ কোন দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেননি। তাঁর মতামতের দীর্ঘ বিবৃতি দেওয়া সম্ভব না হলেও, তার থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি উদ্ধার করে দেওয়া হচ্ছে, যা পাঠ করলেই তাঁর শিক্ষা-পলিসি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে পারে।

স্বদেশী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরকারী সাহায্য সম্বন্ধে বেণ্টিঙ্কের নীতি অকল্যাণ্ড নিজস্ব ধারায় গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। তিনি প্রথমেই মত দেন যে, শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারী সাহায্যের স্বল্পতার দরুণই শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে দেশে এমন গুরুতর বাদ-বিসংবাদ ঘনিয়ে ওঠার সুযোগ হয়েছে। স্বদেশী শিক্ষার জন্য যে টাকা এতাবৎ দেওয়া হয়ে এসেছে, তা চলতে থাকলে এবং য়ুরোপীয় শিক্ষার জন্য অন্য ভাবে সাহায্য দেওয়া হলে, সরকারী শিক্ষা-পলিসি দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের সমর্থন লাভ করত। দেশের শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহী সকল পার্টিই সরকারের পলিসির ফলে আপন আপন দলীয় স্বার্থকে খুশী করার জন্য পরস্পরের সঙ্গে বিরোধ করেছে, কিন্তু নূতন বাজেটে সরকারী প্রস্তাবের জন্য টাকা দেওয়া হলে, সকলেই নির্বিরোধে এই পরীক্ষামূলক শিক্ষা প্রবর্তনে সায় দিতে পারতেন। স্পষ্ট ভাষায় অকল্যাণ্ড সরকারী সাহায্য সম্বন্ধে তাঁর মত প্রকাশ করেন। এর ফলে ১৮৩৫ সাল অবধি ওরিয়েণ্টাল কলেজগুলি যে সরকারী সাহায্য লাভ করত, তারা আবার তা ফিরে পায়। কিন্তু সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারের জন্য তিনি অতিরিক্ত টাকা মঞ্জুর করতেও কার্পণ্য করেননি। এই অতিরিক্ত মঞ্জুরী পঁচিশ হাজার টাকার অধিক হয়নি এবং তিনি জানান যে, এই তিক্ত বিবাদ দূর করার জন্য এই সামান্য টাকা মাননীয় কোর্ট নিশ্চয়ই মঞ্জুর করবেন।

১৮৩৬ সালে সরকারী বাজেটে শিক্ষা বাবদ ব্যয়ের হিসাব ছিল চার লক্ষ টাকা। ১৮৪০ সালে অকল্যাণ্ড অতিরিক্ত দেড় লক্ষ টাকা যোগ দেন সেই খাতে। এই টাকা মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের জন্যই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, শিক্ষা বিস্তারের জন্য অকল্যাণ্ড কোন দিন অর্থ নৈতিক কার্পণ্য করেননি। এইখানেই তাঁর সফলতার সূত্র নিহিত। মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ে তিনি একটা বিবাদ-বিসংবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটান।

বস্তুত পক্ষে, পাশ্চাত্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হলেও তিনি দেশী শিক্ষা-পদ্ধতিকে যথাসম্ভব সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর এই মতবাদে গভর্ণমেন্টের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টায় কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। তথাপি গোঁড়া ইংরেজরা তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেনি এবং রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফের মত লোকও স্বদেশী শিক্ষার সঙ্গে তাঁদের শিক্ষা-পদ্ধতির এই সমন্বয়ের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যে স্বদেশী শিক্ষা মিথ্যা ঘটনাপঞ্জী ও ইতিহাস, ঝুটা আইন, আজব বিজ্ঞান, অসার ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শন, এমন কি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন নীতি ও ধর্ম শিক্ষা দেয়, তার প্রতি অকল্যাণ্ডের এই সম্প্রীতিকে তিনি সহ্য করতে পারেননি। এ সম্বন্ধে 'ক্যালকাটা ক্রীশ্চান অবজারভার' পত্রিকায় তিনি অকল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি লেখেন কয়েকখানি। এই পত্রাবলী পরে তিনি পুস্তাকাকারে প্রকাশ করেন ভূমিকা ও নোট সম্বলিত করে। এই পত্রাবলীতে ডাফ অনেক ব্যক্তিগত কটূক্তি বর্ষণ করেছেন

অকল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এবং হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সম্বন্ধে অপ্রিয় অহেতুক মন্তব্য করেছেন। বস্তুত পক্ষে, ডাফের সমগ্র কটূক্তি ধর্ম সম্বন্ধে ; শিক্ষা সম্বন্ধে নয়, কারণ মিশনারী হিসাবে তিনি ধর্ম ও শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখতে পারতেন না। যে দু'টি মূল বক্তব্য ছিল তাঁর তা হোল, প্রাচ্যদেশীয়তা ও ঝুটা ধার্মিকতায় মনোনিবেশ এবং য়ুরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষায় ধর্মের যোগহীনতা। ডাফ ও অকল্যাণ্ডের মতবাদ এত বিপরীতধর্মী যে তা নিয়ে কোন মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন। বিভিন্ন ধর্মমত সম্বন্ধে অকল্যাণ্ডের নিজস্ব মতবাদ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।

শিক্ষায় কৃত্রিম উৎসাহ প্রদানকে রোধ করার জন্য বেণ্টিঙ্ক সমস্ত কলেজী শিক্ষায় ষ্টাইপেণ্ড বন্ধ করে দেন। যে দেশে পণ্ডিতগণ দরিদ্র এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চিরকালই সাহায্য-পুষ্ট হয়ে এসেছে, সে দেশে বেণ্টিঙ্কের নীতি অনিবার্য বিনাশের সূচনা করল সন্দেহ নেই। উত্তর-ভারতের মুসলমানরা বিশেষ ভাবে বিপন্ন হল এই কারণে। ১৮৩৭-৩৮ সালে উত্তর-ভারত সফর কালে অকল্যাণ্ড এই গুরুতর বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন এবং ১৮৩৮ সালের ৭ই মার্চ তিনি দিল্লী কলেজগুলি সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। পূর্বেকার নির্বিচার সাহায্য দানের পরিবর্তে বিশেষ নির্বাচিত ক্ষেত্রে স্বল্পকালের জন্য আর্থিক সাহায্য দানের কথা সেই সময় তিনি উল্লেখ করেন। ১৮৩৯ সালের ২৪শে নভেম্বর তারিখের প্রস্তাবে আমরা তাঁর সেই চিন্তার কার্যকরী রূপ দেখলাম। সেই প্রস্তাবে তিনি পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন কমিটিকে নির্দেশ দেন, যথাশীঘ্র সকল উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এক রিপোর্ট পেশ করতে, স্বদেশী ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ প্রতিষ্ঠানই সমান সমান হারে। এই সকল স্কলারশিপ হবে চার বৎসরের জন্য এবং স্কলারশিপ-প্রাপ্ত ছাত্রেরা যদি বাৎসরিক পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল না প্রদর্শন করতে পারে তবে তাদের স্কলারশিপ বন্ধ করে দেওয়া হবে, এ কথাও তিনি নির্দেশ দিয়ে দেন। এই সম্বন্ধে কমিটিও যথাশীঘ্র তার রিপোর্ট পেশ করে, তাকে কার্যে পরিণত করে। এই জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। কমিটির বাৎসরিক বিবরণীতে এই সকল প্রশ্নপত্র ও উত্তরগুলি প্রকাশিত হোত। অকল্যাণ্ডের এই নূতন ব্যবস্থায় এদেশীয় শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োজন মেটার সঙ্গে সঙ্গে এইটুকু লাভ হোল যে, এখন আর অযোগ্য লোক সাহায্য ও সুযোগ পেল না। এই পরিকল্পনায় সরকারের খরচ পড়ল বাহান্ন হাজার টাকা এবং শিক্ষা-পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য সরকার সানন্দে এ খরচ বহন করতে লাগলেন। দেশের সকল এলাকায় এই পরিকল্পনা বিস্তৃত হল।

আফগান যুদ্ধের সমস্ত দোষ অকল্যাণ্ডের উপর অর্পিত হলেও, কে'র মত ঐতিহাসিকও তার "হিষ্ট্রি অব ওয়ার" নামক গ্রন্থে অকল্যাণ্ডের শিক্ষা-পরিকল্পনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এত দিন বিদেশী সওদাগরী অফিসে বা কোম্পানীর চাকুরীতে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য যে ভাবে পুঁথিগত বিদ্যা গলাধঃকরণ করা হোত, তার পরিবর্তে সত্যকার জ্ঞান লাভের এক সাধনাকে জাগ্রত করল এই সরকারী প্রেরণা।

দেশীয় শিক্ষা-পদ্ধতির বিষয়েও বিস্তর আলোচনা করেছিলেন অকল্যাণ্ড। অন্য অনেক সমস্যাও তিনি আলোচনা করেছিলেন। জিলা স্কুলগুলিকে কলেজগুলির জন্য ছাত্র গঠন করার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। কলেজে নর্মাল ট্রেণিং কোর্সের জন্য তিনি নির্দেশ দেন এবং সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য উন্নততর পরিদর্শন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তাঁর এই সকল প্রস্তাবকে ডাফ এক জন অপরিণতবুদ্ধি শিক্ষাব্রতীর পরিকল্পনা বলে মত দেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির গুরুতর সঙ্কটের সময়ে এক দল দেশী শিক্ষাব্রতী পুরোভাগে এসে দাঁড়ান। তাঁরা দেশীয় শিক্ষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন। বেণ্টিঙ্কের শাসন কালেই গ্রামীণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে এক অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয় এবং স্বদেশী শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ এক জন য়ুরোপীয়কে তার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সেই দায়িত্বশীল য়ুরোপীয় অ্যাডাম এ দেশে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনিও গ্রামীণ স্কুলে সরকারী সাহায্য এবং মাতৃভাষার প্রয়োগ বিষয়ে তাঁর মত প্রকাশ করেন। অ্যাডামের পরিকল্পনায় দেশে ব্যাপক শিক্ষা-বিস্তার সম্ভবপর হত। কিন্তু অকল্যাণ্ড তাঁর মত গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। এই ধরণের গণশিক্ষা প্রচারের উপযোগী অর্থ সরকারের হাতে নেই বলেই অকল্যাণ্ডের নিজস্ব ধারণা ছিল। দেশী স্কুলপাঠ্য পুস্তকের অভাব তাঁর মনে গুরুতর অসুবিধা বলেই ধারণা হয়েছিল এবং বিশেষ করে বাংলা দেশে নানা বিষয়ে পাঠ্য পুস্তক রচিত হওয়া অবধি ইংরাজী ও মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রচারই অকল্যাণ্ড যুক্তিযুক্ত বলে মনে করলেন। অবশ্য বঙ্গেতে স্বদেশী শিক্ষা প্রচারকে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রবর্তিত করতে তাঁর আপত্তি ছিল না। বাংলা দেশে উচ্চশিক্ষা বিষয়ে মনোযোগ দেওয়াই তিনি স্থির করলেন।

নির্বাচনী পদ্ধতিতে বিশ্বাস করতেন বলেই অকল্যাণ্ড স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করলেন। এই পদ্ধতিতে যাঁরা আস্থাবান ছিলেন, তাঁদের ধারণা, দেশব্যাপী গণশিক্ষা প্রবর্তনের উপযুক্ত আর্থিক সচ্ছলতা যখন কমিটির নেই তখন উচ্চশিক্ষা লাভ করার আর্থিক সঙ্গতি যাদের আছে, সেই সকল ছাত্রকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় যথোচিত শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়াই সরকারের দায়িত্ব। তাঁদের ধারণা ছিল যে, শিক্ষিত শ্রেণীর এই জ্ঞানালোক ধীরে ধীরে অশিক্ষিত জনসমাজের মধ্যেও আলোক বিতরণ করতে পারবে। তাঁরা জানতেন না যে, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন সে থিয়োরী কার্যকরী হতে পারে না, বিশেষ করে যে দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায় চাকুরীতে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করে, জাতি গঠনের দিকে দৃক্‌পাত করার সময় ও সুযোগ পায় না।

বাছাই থিয়োরীর পক্ষপাতিত্ব করলেও এ কথা বলা সঙ্গত নয় যে, অকল্যাণ্ড দেশীয় শিক্ষার দাবীর বিরোধী ছিলেন। স্কলারশিপ পরীক্ষার পাঠ্যতালিকায় মাতৃভাষার স্থান ছিল। ১৮৪০ সালে ইংরাজী ক্লাসিক্‌স্ থেকে বাংলা অনুবাদে পারদর্শিতার পুরস্কার-স্বরূপ তিনি হিন্দু কলেজ ও হুগলী কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম দু'টি স্থান অধিকারী ছাত্রকে একটি সোনার ও একটি রূপার ঘড়ি দিয়েছিলেন। এই জন্য বেকনের Essay on Truth প্রবন্ধ পরীক্ষায় দেওয়া হয়েছিল। অকল্যাণ্ডের শাসন কালেই কলিকাতা মেডিকেল কলেজে হিন্দুস্থানী ভাষার মাধ্যমে জুনিয়র কোর্স খোলা হয়।

স্বদেশী শিক্ষায় এই সরকারী সাহায্য দানের প্রশ্নে য়ুরোপীয় শিক্ষায় অকল্যাণ্ডের ধারণা সম্বন্ধে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক।

অকল্যাণ্ডকে 'দুর্মনা' বলে কটূক্তি করেছিলেন ডাফ এই জন্য। তিনি বলেছিলেন যে, অকল্যাণ্ড মৃতের সঙ্গে জীবিতের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছেন, এক দল জরাগ্রস্ত ভ্রান্তের সঙ্গে সত্যের ধ্বজাবাহকদের তিনি শিক্ষারাজ্য সমান ভাবে বণ্টন করার অপপ্রয়াস করেছেন। অকল্যাণ্ডের নীতিতে এই অপরাধের কোন হদিশই পাওয়া যায় না। 'এদেশীয় শিক্ষা-পদ্ধতির মূল ভ্রান্তি' এবং 'য়ুরোপীয় শিক্ষা-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতা' সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল, এদেশীয় ছাত্রের মধ্যে যথাসম্ভব অধিক সংখ্যককে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে য়ুরোপীয় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলা। তার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয় করা। স্বদেশী শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় তাঁর য়ুরোপীয় শিক্ষা-পরিকল্পনার অন্তরায় ছিল না। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর প্রীতির নিদর্শন পাওয়া যায় ব্যারাকপুরে নিজের খরচায় এক ইংরাজী স্কুল পরিচালিত করার দৃষ্টান্তে।

সকল জাতির জন্য উন্মুক্ত এই স্কুলটি ১৮৩৭ সালের ৬ই মার্চ উদ্‌ঘাটিত করেন তিনি। স্কুলের সমস্ত ব্যয় বহন করতেন তিনি। স্কুল-বাড়ীর খরচা পড়েছিল সাড়ে তিন হাজার। ছাত্রদের কেবল যে বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া হোত তা নয়, তাদের পুস্তকাদিও দিতেন তিনি। দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষা দেবার জন্যই তিনি এই বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। যে সকল উঁচু ক্লাসের ছাত্রেরা নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াত, তাদের কিছু কিছু অর্থ-সাহায্যও করতেন তিনি। ছাত্রদের মধ্যে যারা মেধাবী তাদের হিন্দু কলেজে বা কলিকাতার মেডিকেল কলেজে ভর্তি করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। তাঁর স্কুলের সর্বোত্তম ছাত্র ভোলানাথ বসু কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে লণ্ডনে এম, ডি, ডিগ্রী লাভ করেন।

১৮৩৫ সালে বেণ্টিঙ্কের শাসন কালে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও অকল্যাণ্ডের শাসন কালই কলেজের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। রোগী দেখার ব্যবস্থা ভাল না থাকায়, ছাত্রদের যেতে হোত জেনারেল হাসপাতাল, নেটিভ হাসপাতাল, কোম্পানীর ডিসপেনসারী ও চক্ষু রোগের হাসপাতালে। এই সব হাসপাতাল কলেজ থেকে বহু দূরে অবস্থিত হওয়ার দরুণ ছাত্ররা এই বিষয়ে তত মনোযোগ দিত না। তা ভিন্ন জেনারেল হাসপাতালের রোগী সব য়ুরোপীয়। তাদের রোগের প্রকৃতি এদেশীয় নয়। এই সব অসুবিধা দূরীকরণের জন্য অকল্যাণ্ডের অবস্থানের তৃতীয় বর্ষে কলেজের সীমানার মধ্যেই ১৮৩৮ সালের এপ্রিল মাসে এক হাসপাতালের দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হয়।

প্রতিষ্ঠা সময় থেকেই মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষামান ছিল উন্নততর। সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক দল ডাক্তার রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে কলেজে এক জুনিয়র কোর্সের প্রবর্তনার জন্য কলেজ কাউন্সিল ও পাবলিক ইনষ্ট্রাকশনের মধ্যে পত্র-বিনিময় হতে থাকে। এই পরিকল্পনার মূল বিষয় ছিল হিন্দুস্থানী ভাষার মাধ্যমে জুনিয়র কোর্সের শিক্ষাদান। ১৮৩৯ সালে পঞ্চাশ জন ষ্টাইপেণ্ডধারী ছাত্র নিয়ে এই কোর্স আরম্ভ হয়। ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুসলমান।

স্কলারশিপের পরিবর্তে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার নিয়ম মেডিকেল কলেজে বহু দিন চালু ছিল। দীর্ঘ পাঠ্যাবস্থা ও হিন্দুদের সংস্কার-বিরোধী চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নে উৎসাহ দানের জন্যই এই নিয়ম বলবৎ করেছিলেন অকল্যাণ্ড। বহু কাল অবধি এই নিয়মই প্রচলিত ছিল মেডিক্যাল কলেজে ভারতীয় ছাত্রদের মনের কুসংস্কার দূর করার জন্য।

১৮৩৮ সালেই পুনরায় পত্র-বিনিময় হয় সরকারের সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজের মেধাবী ছাত্রদের ইংল্যাণ্ডে পাঠানো সম্বন্ধে। ব্যয়ের কথা চিন্তা করে গভর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে বাধ্য হন বটে, কিন্তু অকল্যাণ্ডের ব্যক্তিগত উৎসাহ হ্রাস পায়নি। ১৮৪৫ সালে অর্থাৎ ভারত ত্যাগের তিন বৎসর পরে অকল্যাণ্ড যখন ইংল্যাণ্ডের ফার্ষ্ট লর্ড অব দি এডমিরালটি, তখন চারটি ভারতীয় ছাত্র ইংল্যাণ্ডে যায়। অকল্যাণ্ড তাদের সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন সে সময়। তাদের মধ্যে তিন জন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তন্মধ্যে ভোলানাথ বসু অন্যতম। ব্যারাকপুরের প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে ভোলানাথের বিষয়ে বেশী উৎসাহী ছিলেন তিনি। বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তন কালে ভোলানাথ এই পত্রখানি পান।

জানুয়ারী ১৩, ১৮৪৮

প্রিয় ভোলানাথ,

ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করিবার পূর্বেই আমি তোমাকে জানাইতে চাহি যে, তোমার মঙ্গল আমার পরম কাম্য। যে নিষ্ঠার সহিত তুমি অধ্যয়ন করিয়াছ তাহাতে আমি ও তোমার অন্যান্য হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তোমার সাফল্যে আমরা সকলেই আনন্দিত হইয়াছি।

আমার নিকট হইতে একটি স্মারক-চিহ্ন তুমি লইয়া যাও ইহা আমার অভিলাষ। এতৎসহ যে ড্রাফট পাইবে তাহা দিয়া তোমার রুচিমত কিছু ক্রয় করিয়া লইও। ইতি

পরম শুভানুধ্যায়ী
অকল্যাণ্ড।

ক্যামেরণ প্রভৃতি প্রতিপত্তিশালী ইংরেজের সহিত অকল্যাণ্ডও চেষ্টা করেন যাতে ভোলানাথ বিলাত হইতে চাকরী লইয়া দেশে ফিরিতে পারে। কিন্তু কোর্ট অফ ডিরেকটারসের আপত্তিতে অকল্যাণ্ডের চেষ্টা সফল হয়নি।

অকল্যাণ্ড ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রগতির ক্ষেত্রে যে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন তা সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে। তাঁর শিক্ষা-পলিসি ছিল বহু দূরপ্রসারী ও ব্যাপক। ধীর বিবর্তনের দ্বারা শিক্ষা বিস্তার ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল স্বচ্ছ। ইংরেজী কলেজগুলির পাঠ্য-তালিকায় বাইবেলকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টাকে তিনি প্রতিরোধ করে ডাফ প্রভৃতি মিশনারীদের গভীর বিরক্তির সঞ্চার করেছিলেন। যে দেশে অনেক ধর্মমত প্রচারিত, সেই দেশে ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন পরিচালনার কর্তৃত্ব নিয়ে তিনি ধর্মকে সমস্যার বাইরে রেখেছিলেন। ১৮৪০ সালের এপ্রিল মাসে তিনি ভারতীয় ধর্মমত ও কোম্পানীর গভর্ণমেণ্টের মধ্যে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। তখন থেকে আর কোন কোম্পানীর চাকুরে সাধারণ অনুষ্ঠান-উৎসবে যোগ দিতে পারবেন না কোম্পানীর চাকুরে হিসাবে, এ হুকুম তিনি জারি করে দেন। মন্দিরের আয় তিনি পুরোহিত ও মোহান্তদের হাতে সমর্পণ করেন। অকল্যাণ্ডের শিক্ষা-পলিসি ঊনবিংশ শতাব্দীর এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

২

শ্রীপবিত্রমোহন প্রধান (উড়িষ্যার প্রচার ও শ্রমবিভাগ মন্ত্রী)

তালচেরের প্রজা আন্দোলন

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমরা তালচের রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন গোপনে চালিয়ে যেতাম। আমি রাজার স্কুলের হোষ্টেলে থাকতাম। শনিবার ছুটি হলে মফঃস্বলে যেতাম। গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোকেদের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতাম। ভারতের স্বাধীনতার জন্যে কংগ্রেসের আন্দোলন তাদের বোঝাতাম। বড় বড় গ্রামে গুপ্ত কেন্দ্র স্থাপন করা হল। এই সব কেন্দ্রে আমাদের কর্মীরা রাজার অত্যাচার প্রতিরোধ করবার জন্যে লোকদের দলবদ্ধ হতে শিক্ষা দিত। পার্শ্ববর্তী ষ্টেটগুলি, পাললহড়া, বামরা ও ঢেনকানালেও প্রজা-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। ঢেনকানাল রাজ্যে প্রজাদের উপর সব চেয়ে বেশী অত্যাচার করা হত। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব, শ্রীবলবন্ত রায় মেহটা ও শ্রীশারঙ্গধর দাসকে নিয়ে উড়িষ্যা গড়জাত শাসন তদন্ত কমিটি গঠিত হল। এই কমিটির কাজ ছিল, গড়জাত রাজা-মহারাজাদের অবিচার-অত্যাচার সম্বন্ধে evidence সংগ্রহ করা। আমি তালচের রাজার দমন ও শোষণ নীতি সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ-সম্বলিত কাগজ-পত্র পাঠালাম। রাজার কু-শাসন বাইরে প্রকাশ পেল। অথচ আমি যে পাঠিয়েছিলাম—রাজা তখন জানতে পারেননি। কিন্তু কর্মীদের গুপ্ত সংগঠন ও আন্দোলন বেশী দিন গোপন রাখা সম্ভব হল না। কথাটা রাজার কানে গেল। রাজা আমাদের উপর কড়া নজর রাখলেন। কিন্তু কোনো প্রমাণ পেলেন না। প্রমাণ না পেলেও আমাকে ডেকে পাঠিয়ে খুব ধমক দিলেন। তিনি জানালেন যে, রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্য চালালে আমার জীবন নিরাপদ নয়। তাঁর হুমকি কাজে পরিণত করতে তিনি চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু হোষ্টেলের ছেলেরা আমার দেহরক্ষী হল। ১৯৩৮ সালের জুন মাসে গড়জাত আন্দোলন কয়েকটা রাজ্যে প্রবল হয়ে দাঁড়াল। নীলগিরি রাজ্যে কৈলাস বাবু (ইনি পরে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলার হয়েছিলেন) আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করলেন। তালচের, ঢেনকানালের প্রজারাও আর চুপ করে থাকল না। আমরা স্থির করলাম, প্রকাশ্যে আন্দোলন চালাব। আমরা জানতাম, রাজা সুযোগ পেলেই আমাদের গ্রেপ্তার করে আন্দোলনের মূলোচ্ছেদ করবেন। হাজতে না পচে রাজ্যসীমার বাইরে উড়িষ্যার অঙ্গুল জেলায় গিয়ে সেখান থেকে আন্দোলন চালান হবে স্থির হল। আমার সহকর্মীরা সহজেই রাজার চক্ষে ধূলো দিয়ে অঙ্গুলে পালালেন। আমি নজরবন্দী অবস্থায় ছিলাম। তা সত্ত্বেও কয়েক জন অনুগত ছাত্রের সাহায্যে ছদ্মবেশে রাতের ট্রেণে তালচের ছেড়ে অঙ্গুল গেলাম। আমরা অঙ্গুলে আমাদের শিবির স্থাপন করে প্রকাশ্যে রাজার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করলাম। তালচের রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রজারা আমাদের শিবিরে যাতায়াত করতে লাগল। ১৯৩৮এর সেপ্টেম্বর মাসে অঙ্গুল জেলার কোশলা গ্রামে তালচের প্রজামণ্ডল আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠন করা হল। আমি সভাপতি নির্বাচিত হলাম। সেই মাসে সেই গ্রামেই তালচের অধিবাসীদের বিরাট সভা হল। আমরা প্রজামণ্ডলের উদ্দেশ্য আর দাবী সমবেত জনতাকে বুঝিয়ে দিলাম। আমাদের দাবী ছিল—নাগরিক ও সামাজিক সর্বপ্রকার স্বাধীনতা, রসদ মাগন বেঠি ভেটি বন্ধ করা, প্রজাস্বত্ব আইন করা, ব্যবসায়ে একচেটে অধিকার না দেওয়া, ফরেষ্ট আইন সংশোধন করা, তেলি ধোবা নাপিতদের কাছ থেকে professional tax আদায় বন্ধ করা ইত্যাদি।

প্রজামণ্ডলের দাবীপত্র দেখে রাজা ভয় পেলেন। সে পর্য্যন্ত তাঁর ধারণা ছিল প্রজামণ্ডলে মাত্র কয়েক জন শিক্ষিত লোক যোগ দিয়েছে। যাদের উপর তিনি অবাধে অত্যাচার চালিয়ে এসেছেন—সেই অশিক্ষিত দরিদ্র প্রজাদের সঙ্গে মণ্ডলের কোন সংশ্রব নেই। তিনি কয়েক জন তাঁবেদার প্রজাদের নিয়ে আরেকটি প্রজামণ্ডল গঠন করলেন। এক সভা আহ্বান করে লোকদের সরকারী প্রজামণ্ডলে যোগ দিতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সেই সভাতেই প্রজারা তাঁর হুকুম মেনে নিতে অস্বীকার করল। রাজা দেখলেন তাঁবেদার প্রজামণ্ডল টিঁকবে না। কূটনীতি বিফল হওয়ায় তিনি গুণ্ডানীতি অবলম্বন করলেন। অঙ্গুল প্রজামণ্ডল বে-আইন ঘোষণা করলেন। রাজ্যে ১৪৪ ধারা জারী করলেন। লাঠি, জেল, জরিমানা—তাঁর এই তিন অস্ত্র নির্বিচারে প্রয়োগ করতে লাগলেন। কিন্তু প্রজারা তখন মেতে উঠেছে। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত সভা স্থাপন করা হল। রাজার অফিস্-আদালত বয়কট করা হল। রাজশক্তি পঙ্গু হয়ে গেল।

গুণ্ডা-নীতি বিফল হওয়াতে রাজা যুদ্ধ-নীতি ধরলেন। তিনি সামরিক আইন জারী করলেন। ব্রিটিশ ভারত থেকে গোরা সৈন্য ভাড়া করে আনলেন। সৈন্যরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রজাদের ধমকাতে লাগল। নির্বিচারে প্রজাদের মার-ধর করতে লাগল। সামান্য সন্দেহে তাদের ধরে এনে হাজতে রাখা হল। প্রজারা কিন্তু ভয় পেল না। শেষে সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো। তাদের গুলীতে পাঁচ জন আহত হল এবং হরিজন-কর্মী বিকা নায়ক মারা গেল। কিন্তু সৈন্যরা পিছু হঠে যেতে বাধ্য হল। বেগতিক দেখে রাজা আরও সৈন্য আনালেন। প্রজারাও এবার সত্যাগ্রহ আরম্ভ করল। ক্ষুদ্র তালচের রাজ্যের চৌদ্দশ' কর্মী স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে নিল। রাজা ক্ষেপে উঠলেন। বিরোধী প্রজাদের বাড়ী পুড়িয়ে দিলেন। তাদের সম্পত্তি কেড়ে নিলেন। রাজ্যের মধ্যে মানসম্ভ্রম দূরে থাক্—প্রাণ নিয়ে বাস করা দায় হল। রাজা আমার ও চল্লিশ জন কর্মীর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারী করলেন। ইংরেজ সরকারের অনুমোদন ও সাহায্য পেয়ে রাজা অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব ও অঙ্গুলের শ্রীগিরিজাভূষণ দত্ত এম, এল, এ আমাদের উপদেষ্টা ছিলেন। ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যে অঙ্গুলে এক বৈঠক আহ্বান করা হল। স্থির হল যে, শ্রীমহতাব তালচের রাজার কু-শাসনের কথা মহাত্মা গান্ধীকে জানাবেন। গান্ধীজী সব কথা শুনে শ্রীমহতাবকে পরামর্শ দিলেন—তালচেরের প্রজারা রাজ্য ছেড়ে চলে যাক্। তা হলে ইংরেজ সরকারের কলঙ্ক চারি দিকে রাষ্ট্র হয়ে যাবে ও বাধ্য হয়ে রাজনৈতিক বিভাগ রাজার কু-শাসনে হস্তক্ষেপ করবেন। ১৯৩৮এর ডিসেম্বর মাসে রাজার অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠল। প্রজারা গান্ধীজীর নির্দেশক্রমে দলে

দলে রাজ্য ছেড়ে অঙ্গুলে চলে গেল। এই রাজ্য পরিত্যাগের কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে যথাযোগ্য স্থান পায়নি। প্রায় ত্রিশ হাজার লোক অর্থাৎ তালচের রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশের চেয়েও বেশী অধিবাসী নিজেদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ফেলে রেখে অজানা পথে পা দিল। অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তারা হাসিমুখে অসীম দুঃখ-দারিদ্র্য বরণ করে নিল। অঙ্গুলে এসে তারা পাঁচটা শিবির স্থাপন করল। শিবিরগুলির কাজ খুব শৃঙ্খলার সঙ্গে চলত। ত্রিশ হাজার লোক নিজেদের ভিটে-মাটী ছেড়ে নতুন জায়গায় গিয়ে কি রকম যৌথ ভিত্তিতে জীবন ধারণ করতে পারে—এই শিবিরগুলি তার দৃষ্টান্ত দেখাল। রাজ্য পরিত্যাগ গান্ধীজীর নির্দ্দেশক্রমে হয়েছিল বলে তিনি এই movementএর সাফল্যের জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটির কর্মীরা, নিখিল ভারত চরখা-সঙ্ঘের পক্ষ থেকে শ্রীগোপবন্ধু চৌধুরী ও রমা দেবী অঙ্গুলে এসে দুর্গতদের সাহায্য করতে লাগলেন। উড়িষ্যার মন্ত্রিমণ্ডল 'হিজরাত' (পলাতক) শিবিরে ডাক্তারখানা খুললেন ও পুলিশের বন্দোবস্ত করলেন। খবর কাগজের (এমন কি ষ্টেটসম্যানের) প্রতিনিধিরা শিবিরগুলি দেখে গিয়ে রাজার দুর্নীতির কথা তাঁদের কাগজে ছাপালেন।

উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ দাস, অধ্যাপক রঙ্গ, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ, পার্লামেন্টের সদস্য মিস্ আগাথা হারিসন্ অঙ্গুল শিবিরে এসে হিজরাত্ বা পলাতকদের আশা-আশ্বাস দিয়ে গেলেন। গান্ধীজী নিজে না আসতে পেরে শ্রীমহতাবকে তাঁর পক্ষ থেকে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাবার ভার দিয়েছিলেন। রাজা ও ইংরেজ সরকার প্রথমে ভেবেছিলেন যে, প্রজারা বাড়ী-ঘর ভূসম্পত্তির মায়া কাটাতে না পেরে, দারুণ শীতে তালপাতার কুঁড়ে ঘরে থাকতে না পেরে আবার ফিরে যাবে। না খেতে পেয়ে, রোগে ভুগে তারা কত দিনই বা বাড়ী ঘর ছেড়ে থাকতে পারবে? কিন্তু প্রজাদের প্রতিজ্ঞা—তাদের দাবী পূর্ণ না হলে তারা রাজ্যে ফিরবে না। মরতে হয় ত সেইখানেই মরবে। পলাতক-আন্দোলন ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যে চেষ্টাও করা হয়েছিল। রাজা গুণ্ডা লাগিয়ে রাতে কয়েকটি কুঁড়ে ঘর পুড়িয়ে দিলেন। কিন্তু অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে প্রজারা বিচলিত হলো না। ক্রমে আরও অনেক অনুষ্ঠান সাহায্য করতে এলো। মহাত্মা গান্ধী পলাতকদের পক্ষ সমর্থন করবার জন্যে উড়িষ্যা মন্ত্রিমণ্ডলের উপর চাপ দিলেন। বৈদেশিক খবর কাগজগুলিতে ইংরেজ সরকার ও তালচের রাজার আচরণের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হল। মিস্ আগাথা হারিসন্ তালচের প্রজা-আন্দোলন প্রসঙ্গ পার্লামেন্টে উত্থাপন করলেন। ইংরেজ সরকার এবার হার মানলেন। সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্ট মেজর হেনেসি ও সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের মেজর গ্রেগরি অঙ্গুলে ক্যাম্প করে রইলেন ও কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। আমি ও আমার সহকর্মীরা ফেরার অবস্থায় ছিলাম। তাই তালচের প্রজাদের পক্ষ হতে শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব মেজর হেনেসির সঙ্গে আপোষের সর্ত্ত নিয়ে আলোচনা করলেন। ১৯৩৯এর মার্চ মাসে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল। তাতে প্রজাদের মূল দাবীগুলি স্বীকৃত হল। কিন্তু রাজা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন না। প্রজাদের তিনি এত দিন মানুষ বলে গণ্য করেননি। কাজেই তাদের দাবী মেনে নিয়ে নিজের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করতে তিনি চাইলেন না। তাছাড়া তিনি ভাবলেন, পলাতকেরা চাসবাস করতে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। পলিটিক্যাল এজেন্ট মরলে সাহেবকে হাত করে তিনি হেনেসি-মহতাব চুক্তি অগ্রাহ্য করলেন।

পলাতকদের মাথার উপর দিয়ে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম গেল। বর্ষা এসে গেল। তারা কিন্তু ভবিষ্যতের আশা-ভরসা ছেড়ে দিয়ে শিবিরেই থাকল। পাতার কুঁড়ে ঘর বাসের অযোগ্য হয়ে উঠল। পলাতকদের দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকল না। তবু তারা ফিরল না। রাজা কিছু concession দিয়ে এক ঘোষণাও করলেন। পলাতকেরা ফিরে গেলে তাদের আরও সুবিধা দেবেন—এ প্রলোভন দেখালেন। কিন্তু কেউ তাঁর ফাঁকা আশ্বাস-বাণীতে ভুলল না। রাজা দেখলেন, পলাতকেরা ফিরে না গেলে সে বছর আর কৃষিকার্য্য হবে না। রাজ্যে প্রজা না থাকলে তাঁকে রাজস্ব দেবে কে? তাছাড়া কংগ্রেস নেতারা হেনেসী-মহতাব চুক্তি অগ্রাহ্য হওয়ায় ইংরেজ সরকারের তীব্র নিন্দা করলেন। রাজনৈতিক বিভাগ উড়িষ্যার কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যস্থতায় আবার আপোষের কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। ১৯৩৯এর ২৩শে জুন রাজা ও পলিটিক্যাল এজেন্ট এক ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণা অনুসারে বেঠি, বেগার, ধর্ম্ম-আদালত উঠে গেল। প্রজাদের অর্থ নৈতিক ও অধিকাংশ রাজনৈতিক দাবী পূর্ণ হল। মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশ অনুসারে পলাতক প্রজারা রাজ্যে ফিরে যাবে বলে স্থির করল। বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে তারা নিজেদের ভিটায় ফিরে গেল। কিন্তু আমরা ফিরতে পারলাম না। কারণ আমাদের নামে ওয়ারেন্ট জারী করা হয়েছিল। প্রজারা আমাদের নামে ওয়ারেন্ট রদ্ করবার জন্যে দাবী করল এবং রাজা এ দাবী অগ্রাহ্য করলে আবার আন্দোলন আরম্ভ করবে জানিয়ে দিল। রাজা তবু ইতস্ততঃ করছিলেন। কিন্তু রেসিডেন্ট তাঁকে এ দাবী অবিলম্বে পূরণ করতে নির্দ্দেশ দিলেন। ১৯৩৯এর আগষ্ট মাসে আমি আবার তালচেরে ফিরলাম। এই সময় রাজার শাসন প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল। রাজার মুখাপেক্ষী না হয়ে রাজ্যের উন্নয়ন-ভার প্রজারা নিয়েছিল। প্রতি গ্রামে পঞ্চায়েত সভা ও পরগণায় পরগণা-পঞ্চায়েত সভা বসান হল। লোকেরা রাজার আদালত ছেড়ে এই সব সভায় বিচারের জন্যে আসত। পঞ্চায়েতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে যেতে কেউ সাহস করত না। রাজা ও পলিটিক্যাল এজেন্ট প্রজামণ্ডলকে দমন করবার জন্যে সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন, এবং শীঘ্রই তাঁরা সেই সুযোগ পেলেন। ১৯৩৯র সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলো। ১৯৪০এ বর্ষার অভাবে অনেক গ্রামে ফসল নষ্ট হল। প্রজামণ্ডল অভিযোগ করল যে, রাজ-কর্ম্মচারীরা উদাসীন না থাকলে কিছু ফসল পাওয়া যেত। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে এক তদন্ত কমিটি গঠন করা হল। এই সময়ে পলিটিক্যাল এজেন্ট তালচেরে উপস্থিত ছিলেন। তদন্ত বিষয় নিয়ে প্রজামণ্ডলের কর্মীদের সঙ্গে তাঁর মনান্তর হলো। রাজা পলিটিক্যাল এজেন্টকে বশ করলেন। তখন যুদ্ধে যোগ দেওয়া নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ আরম্ভ হয়েছে। রাজনৈতিক বিভাগের সমর্থন পেয়ে রাজা ভারত রক্ষা আইন তালচের রাজ্যে জারী করলেন। এই বছরের নভেম্বর মাসে

প্রজামণ্ডলের কর্মীরা গ্রেপ্তার হলেন। আমি তখন অঙ্গুলে ছিলাম। এক্সট্রাডিসন্ ওয়ারেন্টের বলে আমাকে সেখান থেকে গ্রেপ্তার করে আনা হল। রাজা ভেবেছিলেন, আমাদের ধরে নিয়ে জেলে ভর্তি করলেই আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি দেখলেন, তাঁর ধারণা ভুল। নতুন কর্মীদের নিয়ে প্রজামণ্ডল গঠিত হল। রাজা মিথ্যা মকদ্দমায় বা বিনাবিচারে কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে লাগলেন। জেলের ভিতর কর্মীদের উপর নির্য্যাতন করা হল। বন্দীরা আদালতে আর জেলের মধ্যে রাজার আচরণের ঘোর প্রতিবাদ করতে লাগল। রাজা শেষটা nervous হয়ে পড়লেন। তিনি জেল পরিদর্শনের ছুতায় আমার সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব করলেন যে, আন্দোলন বন্ধ হলে তিনি প্রজামণ্ডলের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্য শাসন করবেন। ১৯৪২এর ২১শে জানুয়ারী আমি মুক্তি পেলাম। কিন্তু তালচের সহরের মধ্যে নজরবন্দী অবস্থায় থাকলাম। লোকদের মধ্যে উৎসাহ, উন্মাদনা ফিরে এল। তাদের ধারণা হল, রাজ্যে এবার লোকপ্রিয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। রাজার যথেচ্ছাচার শাসনের অবসান হবে। রাজার ভয় হল, প্রজারা আমার নেতৃত্বে সমান্তরাল শাসন প্রবর্তন করবে। তাই প্রায় দুই মাস পরে ২৬শে মার্চ এক মিথ্যা মকদ্দমায় আমাকে জড়িয়ে আবার বন্দী করলেন। রাজা বলে বেড়াতে লাগলেন যে, তিনি আর আমাকে জীবিত অবস্থায় জেল থেকে বেরুতে দেবেন না।

জেলের মধ্যে প্রথম কয়েক মাস নৈরাশ্যে কেটেছিল। দেশব্যাপী রাজনৈতিক অবসাদ দেখে আমি ক্ষুন্ন হয়েছিলাম। একমাত্র সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান আমার মনে আশার আলো দেখিয়েছিল। সুভাষ বুঝতে পেরেছিলেন, ইংরাজ সরকারের দুর্বল অবস্থায় তাকে আঘাত করতে পারলে তবে সে পরাজয় স্বীকার করবে। সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করবার জন্যে যে আন্দোলন তিনি ভারতের বাইরে আরম্ভ করলেন—মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত নেহরু ভারতের মধ্যে সেই আন্দোলনের সূচনা দিলেন। গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতারা বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে ইংরাজ সরকারকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে অনুরোধ করলেন। তাঁরা এ কথাও জানালেন, এবারের স্বাধীনতা আন্দোলন অতি তীব্র হবে এবং এই হবে শেষ আন্দোলন।

জেলের মধ্যে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আসন্ন আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতাম। আমার প্রস্তাব ছিল, তালচের ও ঢেন্‌কানালের প্রজারা সমবেত হয়ে এবং দরকার হলে খণ্ডযুদ্ধ করে রাজশক্তি চূর্ণ করবে। আমার কয়েক জন সহকর্মী বোঝালেন, আমার plan কার্য্যে পরিণত করা যাবে না। কারণ জেলের বাইরে যে সব কর্মী আছেন, তাঁদের এ রকম সক্রিয় আন্দোলন চালাবার ক্ষমতা নেই। আর আমাদের মুক্তি পাবার কোনো আশাও নেই। শুনে মনটা বড় খারাপ হল। যখন ব্রিটিশ-ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হবে, তখন তালচের অধিবাসীরা—যারা স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে mass movementএর আদর্শ দেখিয়েছিল—তারা নিশ্চেষ্ট থাকবে? তারা হয়ত আমার অপেক্ষায় বসে থাকবে। কিন্তু আমি যে বন্দী! কারাগারের উঁচু প্রাচীর যে তাদের ও আমার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। বন্দীদের উপর কড়া নজর ছিল। একটু সন্দেহ হলেই হাতে-পায়ে লোহার বেড়ী দেওয়া হত। তবু তখন চেষ্টা করলে পালাতে পারতাম। কারণ, কয়েক জন ওয়ার্ডার আমাদের অনুগত ছিল। ভারতের শেষ স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়া তখনও সম্ভবপর ছিল। ১৯৪২এর ৮ই আগষ্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ঐতিহাসিক অধিবেশনে "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গৃহীত হল। গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। সারা ভারতে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠল। তালচের দরবারের আশঙ্কা হলো প্রজারা হয়ত জেল ভেঙ্গে তাদের নেতাদের উদ্ধার করবে। জেলে অফিসারের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হলো। প্রহরীর সংখ্যাও ৩।৪ গুণ বাড়ান হলো। আমাদের cellএর কাছে সশস্ত্র গুর্খা পুলিশ মোতায়েন করা হলো। সময় থাকতে পালিয়ে না যাওয়ায় মনে তীব্র অনুতাপ হলো। কিন্তু গড়জাতগুলোর নিষ্ক্রিয়তা দেখে পালিয়ে যাবার বাসনা তীব্রতর হলো। মনে মনে বলতাম :—

"জাগিল ভারত ওরে গড়জাত চঞ্চল ওঠ্, জেগে
মুক্তি-যুদ্ধে যোগ দে রে সবে কারার প্রাচীর ভেঙ্গে"

স্থির করলাম—বাধা যতই প্রবল হোক্ না কেন, আমি পালাবই। আমি স্বাধীনতা-যুদ্ধে গড়জাতবাসীদের নিষ্ক্রিয় ব'লে অপবাদ পেতে দেবো না।

ছায়াছবিতে চিত্রশিল্প

হলিউডের একটি ফিল্ম-ব্যবসায়ী বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এবং বিখ্যাত চিত্রের ছবি তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন। ছবি গৃহীত হয়েছে চিত্রশিল্পীদের জন্মভূমিতে। এখন ঐ ছবি যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সর্ব্বত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবি দেখানোর উদ্দেশ্য হল আমেরিকাবাসীদের শিল্প-চেতনা জাগ্রত করা। যুক্তরাষ্ট্রে ৫০০০০০০০ আমেরিকাবাসী প্রতি বছরে আর্ট মিউজিয়াম দেখতে যায়। ইউরোপে গৃহীত মাইকেল এঞ্জেলোর জীবন এবং শিল্প সম্বন্ধীয় 'দি টাইটান' চিত্রটি উপর্য্যুপরি দেখতে দেখতে যুক্তরাষ্ট্র শিল্পীদের বিষয়ে ছবি তুলতে উদ্যোগী হয়েছে; 'দি টাইটান' ছবিটি আমেরিকান এ্যাকাডেমী অফ মোশান পিকচার, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠতম ডকুমেণ্টারী ছবি হিসাবে ধার্য্য ক'রেছে। যদিও ছবিটি আমেরিকার বাইরে গৃহীত হয়েছে।

টোয়েন্টিথ সেঞ্চুরী-ফক্স ওয়ার্ল্ড-ওয়াইড ছবি গ্রহণের কাজ করছে। ছবি তোলা হচ্ছে ইটালী, মাদ্রিদ, স্পেন, লণ্ডন, ইংলণ্ড, প্যারিস, ফ্রান্স, এবং নেদারল্যাণ্ডে। প্রত্যেক শিল্পীর জন্য দু' রীল ফিল্ম খরচ হবে। ফিল্মগুলির বিষয় হচ্ছে—ইটালীর শিল্পী বটিচেলী, স্পেনের এল গ্রেকো, ইংলণ্ডের হোগার্থ, ফরাসী শিল্পী এডগার ডেগাশ, পীয়েরী রেঁনোয়া, প্রভৃতি। ছবিতে শিল্পীদের শিল্প এবং জন্ম ও কর্ম্মভূমি দেখানো হচ্ছে। ছবিতে প্রাডো, উফিজি, এবং লুভর মিউজিয়াম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

আমেরিকার প্রতি পার্ল বাক

হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের নেতৃবৃন্দের মুখেই এই কথাটা আজকাল বড় বেশী শোনা যাচ্ছে—কম্যুনিজম প্রতিরোধের একমাত্র দাওয়াই দেশের সর্ব্বসাধারণের ভাত-কাপড়ের বন্দোবস্ত। দেশের লোক যদি খেতে প'রতে পায়, তাহ'লে তারা আর কম্যুনিজম চাইবে না। তাদের কথা হ'চ্ছে, কম্যুনিজম এক রকম সাম্রাজ্যবাদ, এর ধ্বংস না করতে পারলে পৃথিবীতে শান্তি বিপন্ন হবে। তাই প্রবল শক্তিশালী দেশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পৃথিবীর ছোট-বড় সমস্ত দেশ (রুশিয়া, চীন ও পূর্ব্ব-ইউরোপ বাদে) কম্যুনিজমের উৎখাতের জন্য কোমর বেঁধেছে। এশিয়ার দুর্গত অধিবাসীদের জন্য প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের চোখে ঘুম নেই। তাদের স্বাধীনতা কি ক'রে বজায় থাকবে, সেই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি নানা রকম দুঃস্বপ্ন দেখতে আরম্ভ ক'রেছেন।

কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্যরূপ। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মতই আমেরিকা এশিয়ায় প্রাধান্য বিস্তার ক'রতে চেয়েছে। এর মূলে ছিল এশিয়াকে শোষণ। শান্তি ও স্বাধীনতার মুখোস প'রে নির্ম্মম ভাবে নিপীড়িত এশিয়াবাসীদের শোষণ করাই হচ্ছে মার্কিণ ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের একমাত্র লক্ষ্য। তাদের লক্ষ্য ভাত-কাপড় কেড়ে নেওয়া—দেওয়া নয়। তারা কি ভাবে চীনের সর্ব্বনাশ করতে চেষ্টা ক'রেছিল, সে কথা আজ আর কারো অবিদিত নেই এবং এই ব্যাপারে মিশনারীদের হাতও বড় কম ছিল না। চীন দেশে মিশনারী প্রেরণের মূলে কোন্ শক্তি ও উদ্দেশ্য কাজ ক'রেছিল, তা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়। এখনো পর্য্যন্ত ক্যাংসায় চিয়াংকে খাড়া ক'রে তারা চীনের সর্ব্বনাশের চেষ্টা ক'রছে। কোন প্রকার কু-উদ্দেশ্য না থাকলেও কেবল মাত্র কয়েকটি মিশন পাঠিয়ে এশিয়াবাসীকে ধাপ্পা দেওয়া কি আর সম্ভব হবে? শোষণের মতলব ত্যাগ না ক'রে কেবল ত্রাণ-কার্য্য দ্বারা কি লোকের মন জয় করা সম্ভব? সাম্রাজ্যবাদী নীতি ত্যাগ না ক'রলে এশিয়াবাসীর সমর্থন লাভ করা সম্ভব নয়।

নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তা বিখ্যাত মার্কিণ লেখিকা পার্ল বাক আমেরিকার প্রতি এশিয়াবাসীদের ঘৃণার কারণ বিশ্লেষণ করে কি ক'রে এশিয়াবাসীর মন জয় করা যায়, সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। সেই উপদেশ কত দূর সঙ্গত, জনসাধারণই তার বিচার ক'রবেন। পার্ল বাক এক মিশনারীর কন্যা এবং চল্লিশ বছরের অধিক কাল এশিয়ায় কাটিয়েছেন। কাজেই এশিয়ার অধিবাসীদের সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা কম নয়। তিনি লিখছেন:—

"এশিয়ার অধিবাসীরা এক সময় আমাদের বন্ধু ছিল। কিন্তু এখন তারা আমাদের ঘৃণা করে। এশিয়ার সব জায়গা থেকেই আমাদের প্রতি তারা রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করে। আমরা কেউ কেউ চীৎকার ক'রে ব'লতে পারি—'দেখ আমরা তাদের জন্য কি করেছি। যুগ-যুগ ধ'রে আমরা চীনে মিশনারী পাঠাচ্ছি। আমরা এখনো সেখানে সর্ব্বত্র সাহায্য দান ক'রছি।' কিন্তু রাগ ও ক্ষোভ দেখিয়ে লাভ নেই। এ কথাও আমরা বলতে পারি না যে, আমাদের তোমরা চাও আর নাই চাও, তাতে আমাদের ব'য়ে গেল।' এশিয়া পৃথিবীর একটা বড় অংশ এবং এশিয়ার অধিবাসীদের সংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের সম্বন্ধে এশিয়ার অধিবাসীদের মনোভাবের গুরুত্ব খুব বেশী। সে জন্য কেন তারা আমাদের ঘৃণা করে, তা দেখা দরকার।

"আমার মতে এশিয়ার অধিবাসীরা মনে করে, আমরা তাদের প্রতারিত ক'রেছি। তারা মনে করে, আমরা তাদের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন ক'রেছি। আমাদের সম্বন্ধে তারা যে উচ্চ ধারণা পোষণ ক'রতো, আমরা তা নষ্ট ক'রেছি। এইগুলি হ'ল তাদের ঘৃণার কারণ।

"তারা আমাদের বিশ্বাস ক'রতো, প্রশংসা ক'রতো। আমরা তাদের কাছে ভাল লোক ছিলাম—তার কারণ আমাদের কাজ নয়, আমাদের তৎকালীন মর্য্যাদা বা অবস্থা। আমরা এক সময় বৃটেনের প্রজা ছিলাম, আমেরিকা ছিল বৃটেনের উপনিবেশ। ভারত, মালয়, ব্রহ্ম এবং চীনের অনেকগুলি বড় বড় খণ্ড বৃটেনের অধিকারে ছিল। চীনের নদীগুলিতে বৃটিশ জাহাজের অবাধ আধিপত্য ছিল, আফিং বিক্রয়ে চীনকে বাধ্য করার জন্য তারা যুদ্ধ পর্য্যন্ত ক'রতে কুণ্ঠিত হয়নি।

"আমেরিকানরা এ সব কাজ কখনো করেনি। আমাদের কোনো বন্দর ছিল না, আমরা কোনো শুল্ক নিইনি, চীনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও আমরা করিনি। বরং অন্যান্য শক্তি যাতে চীনকে ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রতে না পারে, তার ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম। দুর্ভিক্ষের সময় যখন কোনো দেশ সাহায্য করেনি, তখন আমেরিকানরা খাদ্য দিয়ে চীনকে সাহায্য ক'রেছিল এবং আমেরিকান মিশনারীরা দয়ালু ও ভাল লোক ছিলেন। তাছাড়া আমেরিকা ছিল প্রজাতন্ত্র—সেখানে দেশের অধিবাসীরাই নিজেদের গভর্ণর নির্ব্বাচন করে এবং সকলেই প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস করে। এশিয়ার অধিবাসীরা ভাবত—এই যদি হয়, তবে তারা আমেরিকাকে অনুকরণ করবে।

"কিন্তু সেদিন আর নেই। আমাদের যে এখন ঘৃণা করা হয়, তার কারণ এই নয় যে, আমরা ঘৃণ্য প্রকৃতির। আমেরিকানদের প্রকৃতি ইউরোপীয়দের প্রকৃতির চেয়ে অনেক ভাল এবং এ জন্য তারা এশিয়াবাসীদের অধিকতর প্রিয় হবার যোগ্য। আমাদের উদারতা ও মৈত্রী স্থাপনের যোগ্যতা এশিয়াবাসীরা উপলব্ধি ও পছন্দ করে। তবে এ কথা সত্য যে, এশিয়াবাসীদের মান অনুযায়ী আমেরিকানরা একটু vulgar. সৈন্যবাহিনীতে যে সব আমেরিকান আছে, তাদের আচরণও এশিয়াবাসীদের ভাল লাগে না। এশিয়াবাসীদের মধ্যে অনেক দুর্নীতি আছে এ কথা সত্য, কিন্তু আমেরিকানদের কাছ থেকে তারা এ সব আশা করে না। তারা আমাদের সম্বন্ধে অনেক উচ্চ ধারণা পোষণ করে। ভারতের জন্য খাদ্য বরাদ্দ নিয়ে যে ভাবে দর-কষাকষি করা হয়েছে, তাতে এশিয়াবাসীরা খুব সন্তুষ্ট হয়নি।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, আমেরিকা ভারতকে যে খাদ্য দেবার ব্যবস্থা ক'রেছে, তা দান নয়, ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে এবং ভারতকে তার সুদ গুণতে হবে বছরে প্রায় চব্বিশ লক্ষ টাকার মত। আমেরিকার এই খাদ্য বিক্রয়কে এ দেশে এত বড় করে দেখান হচ্ছে যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে আমেরিকা না জানি ভারতকে কি দেওয়াই দিল! এই ঋণদানকে কি পার্ল বাক নিছক শুভেচ্ছা-প্রণোদিত বলে মনে করেন? আমেরিকার যদি এতই দরদ থাকতো, তা হলে সুদটা সে ত না নিলেই পারতো। ইউরোপে রক্ষাব্যূহ দৃঢ় করবার জন্য যার কোটি কোটি ডলার ব্যয় করতে কুণ্ঠা বোধ হয় না, ভারতকে বিনা সুদে ঋণ দিতে তার বাধে—এই কি এশিয়াবাসীর প্রতি আমেরিকার দরদের নমুনা?

পার্ল বাক লিখেছেন, "আমেরিকার প্রতি এশিয়াবাসীদের বিরূপ হবার কারণ এই যে, তারা মনে করে, স্বাধীনতার আদর্শ সম্বন্ধে আমরা তাদের প্রতারণা করেছি। তারা মনে ক'রেছিল আমেরিকার মত উন্নতি ক'রতে হ'লে আরো স্বাধীন হওয়া দরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'লে তারা মনে ক'রেছিল, আমেরিকা এইবার উপনিবেশের স্বাধীনতা লাভে সাহায্য ক'রবে। কিন্তু সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে যা হ'ল, তাতে এশিয়াবাসীদের আশা চূর্ণ হ'য়ে গেল। এই সম্মেলনে যা ঘটেছিল, 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রে এক প্রবন্ধে তা প্রকাশিত হয় এবং এই প্রবন্ধের শিরোনামা দেওয়া হয়, 'মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঔপনিবেশিক স্বাধীনতার বিরোধিতা ক'রবে।'

"এর পর এশিয়াবাসীদের মনের অবস্থা কি হয়, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। এবং এই সম্মেলনের পর পরিষ্কার দেখা গেল যে, আমেরিকা বিশ্বব্যাপী খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় সর্বান্তঃকরণে যোগ দেবে না, তারা খাদ্যকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার ক'রবে এবং ক'রেছেও তাই। আমরা তাদের কথাই শুনেছি, যারা আপন দেশবাসীর কাছে অবাঞ্ছিত এবং যারা আমাদের কথা মত কাজ ক'রতে চেয়েছে।"

পার্ল বাকের এই মন্তব্যটি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমেরিকা নিজের স্বার্থরক্ষার জন্যই পৃথিবীর শান্তিরক্ষার নামে তার ধনবল ও জনবল প্রয়োগ ক'রছে আর ডলারের ছিনিমিনি খেলায় মেতে উঠেছে। পার্ল বাকের ধারণা, আমেরিকার এই নীতিই এশিয়াবাসীর সমর্থন হারানোর কারণ। তাঁর আশঙ্কা, এই মার্কিণ নীতির ফলে এশিয়ায় কম্যুনিজমের প্রসার হবে, কাজেই এই নীতি পরিবর্তন করার কথা তিনি বলেছেন। পার্ল বাকের কম্যুনিজম সম্বন্ধে এই আতঙ্কের কারণ কি? তিনি স্বীকার করেন, পৃথিবীতে যে পরিমাণ খাদ্য আছে, তাতে কারও ক্ষুধার্ত্ত থাকা উচিত নয় এবং পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদন আরও বহু গুণ বর্দ্ধিত করা সম্ভব। তিনি বলেন যে, আমেরিকানরা যদি তাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে, সকল দেশের অধিবাসীকে খুশী করবার চেষ্টা করে, তা'হলে কম্যুনিজমের পরাভব ঘটবে। কথাটা খুবই সত্য। লোকে খেতে-প'রতে পেলে কম্যুনিজম আসবে না। কিন্তু লেখিকা এই সহজ সত্যটুকু বুঝতে চাইছেন না যে, ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সব দেশের সব লোকের সুখে খেতে-প'রতে পাওয়া সম্ভব নয়।

ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় আজ যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে আমেরিকা তার ঘাঁটা আগলাবার চেষ্টা করেছে। সুতরাং আমেরিকার পক্ষে পার্ল বাকের প্রস্তাব অনুযায়ী নীতি পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নয়। তার নীতি পরিবর্ত্তন করতে হ'লে তাকে কম্যুনিজমের পথেই গা ভাসাতে হবে, কোন মধ্য পন্থা নেই। মধ্য পন্থা একেবারে নেই এ কথা বলা যায় না, সেটা হ'ল সমাজতন্ত্র, কিন্তু তা কম্যুনিজমেরই অঙ্গ, তার প্রবেশ-দ্বার। বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর বর্ত্তমান উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না। তাই যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা সেই তাল সামলাবার চেষ্টা হ'চ্ছে।

পার্ল বাক ঠিকই বলেছেন, এশিয়ার অধিবাসীরা মনে করে, ইউরোপের শ্বেতাঙ্গদের মতই আমেরিকানরা সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রতে চাইছে। তিনি এর প্রতিকারের জন্য কোরিয়ায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের মুরুব্বীয়ানায় একটি নিরপেক্ষ সরকার গঠন ক'রে সেখানে পুরো দমে পুনর্গঠনের ও খাদ্য সরবরাহের কাজ করার প্রস্তাব করেছেন।

কিন্তু তিনি কি জানেন না যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ বর্ত্তমানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার হ'য়ে প'ড়েছে? তিনি কি জানেন না যে, কোরিয়ায় যুদ্ধ ঘোষণা রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিনানুমতিতে ক'রে পরে ভোটের জোরে তা পাশ করিয়ে নেওয়া হয়? প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বর্ত্তমানে আমেরিকার ক্রীড়নকে পরিণত হ'য়েছে। এমতাবস্থায় পার্ল বাকের প্রস্তাব অনুযায়ী কোরিয়ায় নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা কিরূপে সম্ভব? যারা দক্ষিণ-কোরিয়ার গণভোট অগ্রাহ্য ক'রে সামরিক শক্তির দাপটে নিজেদের তাঁবেদার সরকার গঠন ক'রেছে, তাদের দ্বারা নিরপেক্ষ সরকার গঠনের প্রস্তাব হাস্যকর ব্যাপার!

পার্ল বাকের উদ্দেশ্য সাধু তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি যে ভাবে তালি দিয়ে সমস্যার সমাধান ক'রতে চেয়েছেন, তাতে এশিয়ার লোক আর ভুলবে না। আমেরিকা যদি এশিয়াবাসীর ঘৃণা থেকে মুক্ত হ'তে চায়, তবে তাকে এশিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ভবিষ্যৎ সেই সব দেশের অধিবাসীদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে এবং কোন প্রকারে তাদের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চ'লবে না। জাপান, কোরিয়া, ফর্মোসা, ফিলিপাইন, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা থেকে সমস্ত মার্কিণ স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী অপসারিত ক'রতে হবে। আমেরিকা কি তা পারবে? পার্ল বাক কিন্তু এ সব প্রস্তাব করেননি এবং কেন যে করেননি, তা তিনিই জানেন।

"সামাজিক সভ্যতার আদি দুই প্রকার, কোন কোন সমাজ স্বতঃ সভ্য হয়, কোন কোন সমাজ অন্য সমাজ হইতে শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতা লাভ বহুকালসাপেক্ষ, দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয়।"—বঙ্কিমচন্দ্র

যাদু ও শিল্পকলা

অবন্তী সান্যাল

পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করেন যে, আদিযুগে যূথবদ্ধ হয়ে গাছের ডালে-ডালে দিন কাটিয়েছে মানুষ। তার ফলেই বিচিত্র কর্মশক্তি লাভ করেছে তার হাত। পরে যে কারণেই হ'ক না কেন, যেদিন গাছ ছেড়ে দু'পায়ে ভর দিয়ে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াতে শিখেছে, সেদিন থেকেই সুরু হয়েছে তার অগ্রগতি। মানুষ জীব-জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে দু'টো জিনিষ আয়ত্ত ক'রে—একটা হচ্ছে অস্ত্র (tool), অপরটির তার বাক্-ক্ষমতা। মানুষের সমগোত্রীয় জীবেরা হাতের ব্যবহারে যতই চমৎকৃত করতে পারুক না কেন, হাত দিয়ে অস্ত্র তৈরী করবার ক্ষমতা তাদের কারুর নেই। একমাত্র মানুষই অস্ত্র তৈরী করে ব্যবহার করতে পারে। আর বাক্-ক্ষমতার বেলাতে দেখা যায় যে, জীবের বাক্‌যন্ত্র অসম্পূর্ণ ও সব রকম মনোভাব প্রকাশে সে অসমর্থ। একমাত্র মানুষই তার মনের ভাব বিশদ ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম।

জীব-জগৎ থেকে অস্ত্রধারী মানুষ যেদিন পৃথক্ হয়েছে, সেদিন সব চেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটেছে প্রকৃতির সংগে তার সম্পর্কের। মানুষ ছাড়া আর সবাই প্রকৃতির অদৃশ্য শৃংখলে বন্দী। প্রকৃতির উপর নির্ভর না ক'রে মানুষ অস্ত্র হাতে বেরিয়েছে তাকে জয় করতে। প্রকৃতির দানে সন্তুষ্ট না হয়ে সে মাটি খুঁড়েছে, ফসল বুনেছে; বন্য জন্তুকে পোষ মানিয়ে কাজে লাগিয়েছে, দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করতে শিখেছে। অস্ত্রকে সে কাজে লাগিয়েছে প্রকৃতি-জয়ের উদ্দেশ্যে। আর এমনি ক'রে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছে প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন সম্পর্কে—যেমন, বৃষ্টি হলে ফসল ফলে, অনাবৃষ্টিতে ফসল মরে। আর সেই সংগে বুঝতে শিখেছে এই সত্যটি যে, প্রকৃতির নিয়ম-কানুনের সংগে তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন যোগ নেই; প্রকৃতি স্বাধীন, সম্পূর্ণ ভাবে মানুষের বাসনার ঊর্ধে। প্রকৃতির ঘটনাবলী লক্ষ্য করে একটু একটু ক'রে মানুষ বুঝতে শিখেছে কার্য্য-কারণের রহস্য। আর তাই কারণ জেনে কার্য ঘটানোও তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে।

মানুষ চেয়েছে প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনগুলো আয়ত্ত ক'রে নিজের কাজে লাগাতে। কিন্তু যে যে ক্ষেত্রে সে প্রকৃতির রহস্য বুঝে উঠতে পারেনি, সেই সেই ক্ষেত্রে নিজের প্রয়োজনের ইচ্ছামত প্রকৃতিকে কল্পনায় আয়ত্তে আনতে চেয়েছে। আজকের দিনে আশ্চর্য মনে হলেও আদিম মানুষের কাছে তার এই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ব্যাপারটা খুবই বড় কথা ছিল। প্রকৃতির বাধাকে জয় ক'রে নিজেকে টিকিয়ে রাখার প্রেরণাই আত্মপ্রকাশ করেছিল এর মধ্য দিয়ে। এই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের চেষ্টা থেকেই যাদুর (magic) উৎপত্তি।

বাস্তবের যেখানে অভাব, মায়ার (illusion) সাহায্যে সেখানে সেই অভাব পূরণের চেষ্টাকে সোজা কথায় যাদু বলা যেতে পারে। যাদু হচ্ছে অভিপ্রেত বাস্তবের মানস-প্রক্ষেপ। বাস্তব পরিবেশের উপর আরোপিত পরিবর্তনের ইচ্ছাই যাদুর মধ্যে প্রতিফলিত। প্রকৃতির অপ্রতিহত বাধার সামনে দাঁড়িয়ে অ-সভ্য (savage) দরিদ্র মানুষের পরিবেশ পরিবর্তনের এই ইচ্ছাই ছিল তার জীবন-ধারণের সব চেয়ে বড় অস্ত্র। এই ইচ্ছাশক্তির বস্তুগত (objective) ও আত্মগত (subjective) সামগ্রিক প্রকাশ যাদুর মধ্যে। অ-সভ্য মানুষের কাছে তাই প্রকৃতিকে আয়ত্ত করার উপায় হচ্ছে যাদু; যাদুর সাহায্যে নিজের ইচ্ছামত প্রকৃতিকে পরিবর্তন ক'রে অভিপ্রেত সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করাই তার মনোগত কামনা।

যাদুর অন্তর্নিহিত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের বাস্তব রূপটি কি? অ-সভ্য মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় কামনা, শিকার প্রাপ্তির ইচ্ছার কথাই ধরা যাক। সে চায় অনিশ্চিত শিকারকে আয়ত্তে আনতে। কিন্তু বাস্তব শিকারের সংগে অ-সভ্য মানুষের শিকারকে আয়ত্ত করার মনোগত ইচ্ছার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। এ ক্ষেত্রে তার শিকার আয়ত্ত করার দুর্দমনীয় ইচ্ছা রূপ পায় নানা ভাবে। প্রথমত, শিকার সম্পর্কিত মনোগত ইচ্ছার শব্দগত প্রকাশে; দ্বিতীয়ত, অভিপ্রেত অথচ অনুপস্থিত শিকার ও তাকে আয়ত্ত করার বাস্তব প্রক্রিয়ার অনুকৃতিতে। প্রথমটি, যাদুর মন্ত্র (spell)—সুসংবদ্ধ শব্দাকারে গ্রথিত অভিপ্রেত বস্তু সম্পর্কিত বক্তব্য; দ্বিতীয়টি, অনুষ্ঠান (rite)—মন্ত্রের বক্তব্যকে অনুকৃতির মাধ্যমে রূপায়িত করার চেষ্টা। যাদু-ক্রিয়ায় মন্ত্র ও অনুষ্ঠান অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত।

অ-সভ্য মানুষ যদি বৃষ্টি চায়, তা হ'লে মন্ত্রোচ্চারণ করবে বৃষ্টির দেবতার উদ্দেশ্যে,—সে মন্ত্রে থাকবে বৃষ্টির দেবতার মহিমা, তার বাস্তব বর্ণনা; আর তারই সংগে অনুকৃতির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলবে মেঘের গর্জন, জলের বর্ষণ। এরই নাম যাদু-অনুষ্ঠান। অভিপ্রেত বাস্তবকে আয়ত্ত করার প্রেরণা থেকেই এর সৃষ্টি। আর কায়িক ও বাচিক ভঙ্গী ও অনুকৃতি যাদু-অনুষ্ঠানের সংগে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত; কারণ মায়া (illusion) সৃষ্টির জন্য এগুলি অপরিহার্য। এই যাদু-অনুষ্ঠানেরই প্রকারভেদ—অনুকার নৃত্য (Mimetic dance)।

অ-সভ্য মানুষেরা শিকারের আগে নৃত্য করে; এই নৃত্যে ধারাবাহিক ভাবে শিকারের যাবতীয় দৃশ্যগুলি অনুকৃতির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়; কখনো বা শিকারের বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ ক'রে তুলবার জন্য ব্যবহার করা হয় অভিপ্রেত জন্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (হয়ত হরিণের শিং, তার চামড়া, বাইসনের মাথা; পরে এ থেকেই মুখোসের সৃষ্টি হয়েছে); কারণ, শিকার ধরতে গিয়ে যে যে বাধা তার সামনে এসে উপস্থিত হয়, তাদের সবাইকে সে জয় করতে চায়। বাস্তবের অভাব সে পূরণ করতে চায়, কিন্তু এই অভাব পূরণের একমাত্র উপায় মায়া-সৃষ্টি। কিন্তু এই মায়াময় যাদু-নৃত্যের ফলে লাভ কি হয় তার? লাভ হয় এইটুকু যে, নৃত্যের মধ্য দিয়ে অভিপ্রেত বাস্তব-প্রাপ্তির যে ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে, তারই অনুপ্রেরণা তার মনকে আশাবাদী ক'রে তোলে, জয়ের ইচ্ছাকে দৃঢ় করে। আর তারই ফলে সত্যি সত্যিই তাকে সেই মুহূর্তের জন্য আরও উপযুক্ত পাকা শিকারী ক'রে তোলে।

যাঁরা পল রোবসন অভিনীত এডগার ওয়ালেসের 'স্যাণ্ডার্স অব দি রিভার'এর চিত্ররূপটি দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ভুলবেন না 'উটপাখীর-পালক'-গোষ্ঠীর সিংহ-নৃত্যটি। শত্রুর বিরুদ্ধে নির্মম আক্রমণ চালাবার পূর্বে অনুষ্ঠিত এই নৃত্যটির মধ্যে ধীরে ধীরে, সুর ও অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে যে প্রচণ্ড আবেদন চূড়ান্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা যেন দর্শককেও অভিভূত ক'রে তোলে; নৃত্যকারী যোদ্ধাদের মনের অবস্থা যে কি, তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই

সিংহ-নৃত্যটি যাদু-অনুষ্ঠান। স্যাণ্ডি মৃত ; কিন্তু তৎসম্পর্কিত ভয়ের স্মৃতি অ-সভ্যদের মধ্যে জীবন্ত। স্যাণ্ডির পরবর্তী রাজকর্মচারী মরবার মুহূর্তেও ব'লে গেছে যে, স্যাণ্ডি আবার ফিরে আসবে ; আর স্যাণ্ডির আইন নিষ্করুণ। এই ভয়কে জয় করে, শক্রর ধ্বংস সাধনের জন্য মনকে প্রস্তুত করাই এই নৃত্যের উদ্দেশ্য। ঠিক এই কারণেই অ-সভ্য মানুষ যাদু-ক্রিয়া সম্পন্ন না ক'রে কোন কাজে হাত দিতে পারে না। কারণ বাস্তবের বাধা-বিপত্তির মুখোমুখী দাঁড়াবার উপযুক্ত মানসিক শক্তি তখন তার থাকে না। যাদু অ-সভ্য মানুষের কাছে প্রকৃতি জয়ের অন্যতম অস্ত্র।

যাদুর উদ্দেশ্য মায়ার জগতে অভিপ্রেত বাস্তবকে লাভ করা। যাদুর ক্রিয়া মনোজগতে। মায়ার সাহায্যে অভিপ্রেত বাস্তবের অভাব পূরণ ক'রে নেওয়াটাই যাদুর মূলগত কথা। কায়িক ও বাচিক অনুকৃতি ছাড়া সম্পূর্ণ অন্য ধরণের যাদু-অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যেতে পারে এ প্রসঙ্গে। হুইকোল ইণ্ডিয়ানদের একটি যাদু-অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন কুমারী জেন হ্যারিসন তাঁর বিখ্যাত 'এনসেণ্ট আর্ট এ্যাণ্ড রাইচুয়াল' গ্রন্থে। সেটি এই রকম : অনাবৃষ্টির আশংকা হলে হুইকোল ইণ্ডিয়ানরা মাটির চ্যাপ্টা থালার এক পিঠে লাল, নীল, হলদে রং দিয়ে রশ্মি-সংবলিত সূর্য-দেবতার মুখ আঁকে ; থালার অপর পিঠে সূর্যের গতিপথ আঁকা থাকে। একটি ক্রুশের মত মূর্তি দিয়ে সূর্য্যের যাত্রাপথ এবং কেন্দ্রমধ্যস্থ একটি বৃত্ত দিয়ে মধ্যাহ্ন বোঝানো হয়। থালার চার পাশে থাকে মৌচাকের মত অনেকগুলো ঢিবি আঁকা। ঐ ঢিবিগুলো পাহাড়ের প্রতিকৃতি। পাহাড়ের চার পাশে লাল ও হলদে রং-এর ছোট ছোট বিন্দু শস্যক্ষেত্র ও পাহাড়ের উপরের ক্রুশগুলো অর্থ ও ঐশ্বর্যের প্রতীক। কোন কোন থালায় আবার পাখী, বিচ্ছু, এমন কি বৃষ্টির ধারাও আঁকা থাকে। এই থালাগুলো তারা বৃষ্টিদেবতার বেদীর উপর রেখে আসে। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি? এর উদ্দেশ্য, হুইকোল ইণ্ডিয়ানদের কামনা নিবেদন: "সূর্যদেব তাঁর আলোকরশ্মি নিয়ে পূর্ব দিকে উদয় হন, তাতেই তাদের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি ; তাঁর রশ্মিজাত তাপ ও আলোয় শস্য জন্মায়, কিন্তু তিনি যেন দয়া ক'রে পাহাড়ের মাথায় যে মেঘ জড়ো হচ্ছে, তাকে বাধা না দেন।" এখানে কায়িক ও বাচিক কোন অনুকৃতি নেই। বস্তু এখানে রূপ পেয়েছে রেখার মাধ্যমে। এতে লাভ কি হয়? বাস্তব লাভ নিশ্চয়ই নয়। এখানে লাভ কেবল মানসিক। তাদের মন তৃপ্ত হয় এই ভেবে যে, বৃষ্টির দেবতাকে তুষ্ট করা হয়েছে, তিনি সদয় হবেন। বৃষ্টির দেবতার দয়াই তাদের অভিপ্রেত বাস্তব। সেই অভিপ্রেত বাস্তব রেখার মাধ্যমে অনুকৃত হয়েছে। এই অনুষ্ঠান তাদের আশংকা দূর ক'রে মনকে তৃপ্ত ও স্থিতাবস্থ করে। অবশ্যই এর আবেদন মায়াময়।

যাদু-অনুষ্ঠান অ-সভ্য মানুষের জীবনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা অনুমান করা আজ মোটেই কঠিন হয়। অ-সভ্য সমাজের স্তরে এখনও যে মানব-গোষ্ঠীরা পড়ে আছে, তাদের জীবনযাত্রার ক্ষেত্র থেকে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা যাদু-সম্পর্কিত বহু বিচিত্র এবং কৌতুহলজনক উপাদান সংগ্রহ করছেন। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে, আফ্রিকার অরণ্য অঞ্চলের অ-সভ্য মানুষের সমাজে এই যাদু-ক্রিয়ার প্রাচীন রূপ আজো চোখে পড়ে। অ-সভ্য সমাজ কেন, আমাদের সভ্য সমাজেও এই যাদু নানা চেহারায় এখনও বেঁচে আছে। রাজনৈতিক শক্রর কুশমূর্তি দাহ করার ঘটনা রাজনৈতিক জগতে প্রায়ই ঘটে থাকে। কুশমূর্তি দাহ করার মধ্যে স্পষ্টতই প্রকাশ পায় অনুকৃতির মাধ্যমে শক্রর অভিপ্রেত ধ্বংস কামনা। এটি নির্ভেজাল যাদু। আজও 'আশ্চর্য ইচ্ছা-শক্তি অঙ্গুরী', 'বশীকরণ মাদুলি' প্রভৃতির বিজ্ঞাপন রোটারি প্রেসে ছাপা কাগজের পাতায় দেখে থাকি। একমাত্র মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদিকেই যাদুক্রিয়া জেনে আমরা যাদু সম্পর্কে সম্পূর্ণ সংকীর্ণ ধারণা করে বসি। কিন্তু মানুষের কাছে যাদু এক দিন অপরিহার্য বস্তু ছিল ; সমাজের বিবর্তনের সংগে যাদুরও বিবর্তন ঘটেছে, যার অসংখ্য চিহ্ন প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে আজও আমরা বহন ক'রে চলি। আদিম মানুষের কাছে যাদু ছিল তার ধর্ম, তার মতাদর্শ (ideology) ; এই যাদুর মধ্যেই আদিম মানুষের কৃষ্টি।

এই যাদু থেকেই বিজ্ঞান ও শিল্পকলার জন্ম। মানুষের প্রকৃতি-জয়ের প্রচেষ্টার বস্তুগত দিক (objective) বিজ্ঞান, আর কাব্য-কলা তার আত্মগত (subjective) দিক। বস্তুগত দিক যত উন্নত হয়েছে, ততই তার আত্মগত দিকের সঙ্গে ব্যবধান গভীর হয়ে উঠেছে। যাদুর আত্মগত দিকের প্রকাশও অতি বিচিত্র। যাদু-অনুষ্ঠানের অংগভংগী, কণ্ঠস্বরের ভংগী এবং বিভিন্ন অনুকার শব্দ থেকে জন্মলাভ করেছে নৃত্য, সংগীত ও যন্ত্র-সংগীত। আর যাদুক্রিয়ায় অভিপ্রেত বস্তুর রেখার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ প্রদর্শনের প্রকাশভংগী রূপ পেয়েছে চিত্রকলায়।

গল্প হলেও সত্যি

ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরী তখন বেশ বৃদ্ধ হয়েছেন। চুলে পাক ধরেছে। হঠাৎ ঠিক করলেন যে, নেপ্‌লস্ দেশীয় একটি যুবতী রাজকুমারীকে বিবাহ করবেন। সপ্তম হেনরী তিন জন দূত পাঠিয়ে দিলেন, রাজকুমারীর দেহ পরীক্ষা করতে। গাত্রচর্ম্ম, চক্ষু, ভ্রূযুগল, দাঁত, অধর এবং চুলের রঙ কেমন জানতে হবে। দূত তিন জন রাজকুমারী সমীপে উপস্থিত হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে নাসিকা, কপোল, কপাল, বাহু, আঙুল, গ্রীবা, বক্ষদেশ প্রভৃতি। রাজকুমারীকে কথা বলতে বলা হ'ল, শ্বাস-প্রশ্বাসে সুগন্ধ না দুর্গন্ধ আছে যাতে জানা যায়। খোঁজ নেওয়া হ'ল, শৈশবে রাজকুমারী কখনও পীড়িত হয়েছিলেন কি না। রাজকুমারী মদ্যপায়ী কি না। সপ্তম হেনরী ব'লে দিয়েছিলেন, দূতদের পরীক্ষা শেষ হ'লে শিল্পী যাবে রাজকুমারীকে আঁকতে। পরীক্ষা শেষ হ'লে ফলাফল জেনে সপ্তম হেনরী তো খুব খুশী। কিন্তু একটি বিষয় জেনে সপ্তম হেনরী খুশী হলেন না, রাজকুমারী বিয়ের সোজাসুজি না বলেছেন।

["এই চিঠি ও চিঠির লেখক সম্পূর্ণ কল্পনাজাত। আমাদের বর্ত্তমান সমাজ সৃষ্টি হয়েছে যে-অবস্থার চাপে তার নিরিখে দেখা যায়, এই চিঠিগুলোর লেখকের শুধু যে অস্তিত্বই সম্ভব তা নয়, অস্তিত্ব থাকবেই।"—গ্রন্থটির ভূমিকায় ডষ্টয়েভ্‌স্কি বলেছেন ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর একটি বিশেষ চরিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছেন। এই চিঠিগুলিতে ঐ ব্যক্তি কিছু কিছু আত্মস্মৃতি এবং তার ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠার কারণগুলো বিবৃত করেছে। লেখাটিতে যেমন রোমাঞ্চ আছে তেমনি আছে প্রচুর আকর্ষণীয় বিষয়—যেগুলি পড়তে পড়তে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। রুশীয় লেখক ডষ্টয়েভ্‌স্কির পরিচয় অজানা নয়। "ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট" গ্রন্থ তাঁকে সমগ্র পৃথিবীতে বিখ্যাত করেছে।—অনুবাদক]

থিওডর ডষ্টয়েভ্‌স্কি

প্রথম অধ্যায়

১

অসুস্থ আমি। অত্যন্ত খিটখিটে আর বদমেজাজী হয়ে গেছি। মনে হচ্ছে, লিভারে কিছু গোলমাল ঘটেছে, কেন না, আমি মাথাধরার কথা আর ভাবতেই পারিনে। কিন্তু কিসের বিরুদ্ধে আমার নালিশ সেটাও ত' জানিনে। যদিও ওষুধ-পথ্য আর ডাক্তার-বদ্যির প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, তবু কিন্তু আমি ওষুধ গিলতে পারিনি কখনও, পারিও না। তাছাড়া আমি ভীষণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সম্ভবত এই জন্যেই ডাক্তারী বিদ্যের প্রতি অতোখানি শ্রদ্ধা পোষণ করি! বেশ ভালোই লেখাপড়া জানি আমি, সেই দিক থেকে এই সমস্ত কল্পনার ঊর্দ্ধে ওঠা উচিত ছিলো; কিন্তু এগুলোয় আমি একেবারে টইটম্বুর। অবশ্য এই সব বদ্‌খেয়াল থেকে মুক্ত হওয়ার সদিচ্ছাও আমার নেই। বুঝতে পারছেন না মনে হচ্ছে? না, ভেবে দেখিনি, কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারি, কে আমায় বিরক্ত করে তা আপনাকে ঠিক-ঠিক বলতে গেলে সব যদিও গুলিয়ে ফেলবো। শুধু এইটুকু বুঝি যে, ডাক্তারদের চিকিৎসা গ্রহণ করতে আমি নারাজ, এ কথা বলে তাঁদের চটাতে চাইনে। আরও বুঝি, অন্য কারো চেয়ে বেশ বুঝি যে, আমার শত্রু আমি নিজে, আমি অন্য কারোর শত্রুর বদলে আমিই আমার ভীষণ শত্রু। যা হোক, যদি আমি ব্যাধিমুক্ত না হই, তাহলে সেটা আমার পক্ষে, আমার অসৎ চিত্তক্ষোভের পক্ষে মারাত্মক। যদি আমার লিভার বিকল হয়, সেটা লিভারের পক্ষে ক্ষতিকরই।

এই ভাবে আমি অনেক দিন বেঁচে আছি, প্রায় পুরো কুড়িটি বছর ধরে। বয়েস আমার চল্লিশ, এবং যৌবন কালে আমি ছিলাম সরকারী বেসামরিক বিভাগের চাকুরে। এখন আর নই। আমি খুব ভালো কর্মচারী ছিলাম না কিন্তু। আমি প্রত্যেককে খোঁচাতাম, আর খুঁচিয়ে বেশ আরাম পেতাম। তাই বলে আমি কখনও ঘুষ নিইনি, নিতাম যদি তাহলে অত্যন্ত সহজে আমি বেশ গুছিয়ে নিতে পারতাম নিজের কাজ। আপনার কাছে মনে হবে এ এক চিত্তদৌর্বল্যের লক্ষণ; কিন্তু আমি এ ঘুচাতে পারিনি। এই বিশ্বাসে আমি এ লিখেছি যে, লেখা হলে এতে বুদ্ধিমত্তার ছাপ থাকবে, কিন্তু যখন দেখছি যে, আমি একটা বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করে গেছি, তখন সামান্য যুক্তি দিয়ে একটা প্রতিষ্ঠিত সার বচনকে উলটে দেবো না—এই ক্ষণেও না।

লোকে যখনই আমার অফিসে এসে কোনও খবর বা যে কোনো বিষয় জানতে চেয়েছে, আমি দাঁত বার করে ভ্রূকুটি করেছি তাদেরকে এবং তাদের সম্ভ্রমে আঘাত করে বেশ পুলকিত হয়ে উঠেছি। খুব কম ক্ষেত্রেই আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছে। অধিকাংশ মানুষই ভীরু জীব, আর আমরা জানি সবাই প্রায় দয়া-অনুগ্রহপ্রার্থী। এই বোকা-হাঁদা লোকগুলোর বিশেষ এক জনকে আমি সহ্য করতে পারতাম না, সে এক জন অফিসার; সে আমাকে আদপেই মানতো না এবং অনাবশ্যক বকবক গজগজ করতো। দেড় বছরের ওপর চললো এই সংগ্রাম, শেষে জিতে গেলাম অবশ্য আমিই, আমিই তার লম্ফঝম্ফ বন্ধ করে দিলাম। এ সব ঘটেছিলো আমার যৌবন প্রারম্ভে।

আপনি জানতে চান, কোথায় আমার এই বদমেজাজের মূল নিহিত? এর মূলে ছিলো এই যে (অবশ্য ঐখানটাতেই অদ্ভুত

বিরক্তির কারণ), আমার প্রচণ্ডতম ক্রোধের সময়েও, আমি লজ্জার সংগে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি যে, আমি মোটেই বদমেজাজী লোক নই শুধু ত' বটেই, বরং বিরক্ত হওয়ার কারণ তেমন কখনও ঘটেনি ; আমি চড়ুই পাখীগুলোকে তাড়াবার জন্যে চীৎকার করতে থাকি, আর তা করে আমোদ পাই। মুখে তখন গর্‌গর্‌ করতে থাকলেও, আমার তখন দরকার হয় খেলা করার জন্যে একটা পুতুল কিংবা মিষ্টি এক পেয়ালা চা, তার পরেই সংগে সংগে আমি ডুবে যাই নিস্তব্ধতার মধ্যে। হাঁ, তখন মুহূর্তের জন্যে চুপ্‌ করে গেলেও পরে আমি নিজেকেই ভ্রূকুটি করেছি, এবং বহু মাস ধরে ভুগেছি নিদ্রাহীনতার ব্যাধিতে। এই ছিলো আমার অনিবার্য গতিপথ।

বেশ কিছু কাল ধরে এই ভাবে আমি আমার নিজের ব্যক্তিসত্তাকে ভরিয়ে তুলেছি নিজেকে বদ্‌রাগী লোক বলে ভেবে। একেবারে খাঁটি বিদ্বেষ-বৈরিতাই আমার নিজের বিরুদ্ধে এতো বড়ো মিথ্যে কথা বলিয়েছে। বস্তুত, সত্যি বলতে কি, আমি শুধু অভিনয় করে গেছি আমার অফিসে আগন্তুকদের সংগে আর সেই অফিসারটির সংগে ; কারণ সব সময় আমার পক্ষে রাগ দেখানো সম্ভব ছিলো না। প্রত্যেক দিন আমি আমার নিজের ভেতরকার সব চেয়ে বিপরীত গুণাগুণগুলির মূল সূত্র আবিষ্কার করতাম ; আমি অনুভব করতাম, তারা আমার মধ্যে কিল্‌বিল্‌ করছে এবং আমি জানি আমার জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সেগুলো কিল্‌বিল্‌ করতে থাকবে। আবার, যদিও সেগুলো বার বার চেষ্টা করেছে বাইরে বেরিয়ে আসার, আমি কখনই তা ঘট্‌তে দিইনি। কঠোর হস্তে আমি তাদের নিবৃত্ত করেছি, কখনও কখনও তাদের উৎপাতে আমি লজ্জাজনক ভাবে অত্যাচারিত বোধ করেছি, কখনও কখনও সেগুলো আমায় ছুঁড়ে দিয়েছে অবসাদের প্রবল আক্ষেপে—উঃ, কী পরিমাণ অবসাদের মধ্যে সে!···মহাশয়, এ সবের দ্বারা আপনার কি ধারণা হচ্ছে না, আমি অনুতাপ করছি এক রকম, আমি যেনো আপনার কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করছি? আমার নিশ্চিত ধারণা, আপনার ভাবনা তাই? বেশ, আমি বলে রাখছি শুধু, আমি আপনার মতামতের একটুও পরোয়া করিনে।

না, আমি সত্যিই বদ্‌রাগী লোক নই। বরং সত্যটা হলো এই যে, আমি কোনো কিছুতেই সাফল্য লাভ করতে পারিনি তা সে হোক্‌ দয়ার্দ্র-হৃদয় বা নিষ্ঠুর, শয়তান বা সাধু, বীর বা কীটাণুকীট। আমার আস্তানায় এসে আমি শুধু নিজেকে নিয়ে মাথাব্যথা করি অন্তর্দাহী অর্থহীন চিন্তায় যে, যতোই হোক্‌, যার মধ্যে ভালো গুণ আছে সে কিছুই হতে পারে না। কেবল হাঁদারাই কিছু একটা হয়। হাঁ (আমি মনে মনে বলি), ঊনবিংশ শতাব্দীর লোকে সব কিছু ছাড়িয়ে নৈতিক ভাবে ঠিক করে ফেলেছে কোনো বিশেষ কিছু না হওয়ার ; কারণ, চরিত্রওয়ালা লোক, কাজের লোক হলো সেই-ই, যার গণ্ডী ভালো ভাবেই সীমাবদ্ধ। এই রকমের একটা প্রত্যয়গত চল্লিশটা বছর আমার ওপর চেপে ছিলো। আমার জীবনের সীমা এই চল্লিশটা বছর,—আর চল্লিশটা বছর, একটা জীবন-কাল—এই হলো বৃদ্ধ বয়সের একবারে প্রত্যন্ত সীমা। এর চেয়ে বেশি বাঁচতে চাওয়া অভদ্র, নীচ ও নীতিভ্রষ্ট বলে মনে হয়। কে এর চেয়ে বেশি কাল বেঁচে থাকতে চায়? উত্তর দিক আমায়—সত্যি করে আর বুকে হাত দিয়ে। আমিই বলছি, কে এর চেয়ে বেশি কাল বেঁচে থাক্‌তে চায়। বোকা আর বদমায়েসরাই চায়। এই কথা আমি সমস্ত পৃথিবীর বৃদ্ধদের কাছে বলবো,—বলবো সম্মানিত বৃদ্ধদের কাছে, পাকা-মাথা বৃদ্ধদের কাছে আর খ্যাতিমান বৃদ্ধদের কাছে। সমস্ত পৃথিবীর কাছেই বলছি আমি এ কথা। আর এ কথা আমার বলার অধিকার আছে, কারণ আমি নিজেই ত' সত্তর বা আশী বছর পর্যন্ত বাঁচতে চলেছি! সবুর করুন এক মিনিট। একটু দম্‌ ফেলতে দিন আমায়······।

সম্ভবত আপনি ভাবছেন, আপনাকে নিয়ে মজা করছি? তা ভাবলে আপনি ভুল ভাবছেন। আপনি যা ভাবছেন বা ভাবতে পারেন এমন মজাদার লোক আমি নই। সেই সংগে যদি আমার বোকামিপণায় চটে গিয়ে (এবং আমার সন্দেহ হয় আপনি চটেছেন) আমাকে জিগ্‌গেস্‌ করেন, সত্যিই আমি কী ধরণের লোক, তাহলে উত্তর দেবো, আমি এক জন কলেজে পাশকরা গ্রাজুয়েট, যে কি-না জীবিকার জন্যে (এবং জীবিকার জন্যেই কেবল) একটা কালে রাষ্ট্রের অধীনে চাকরী করেছিলো, এবং যে দূর-সম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের মৃত্যুর পরে তাঁর রেখে যাওয়া ছ'হাজার রুব্‌ল্‌ পেয়ে গত বছরে চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করে এই ডেরায় বাসা বেঁধেছে। এর আগেও আমি এখানে থাকতাম, কিন্তু এখন এখানে চিরস্থায়ী আস্তানা গেড়েছি। সহরের প্রান্তে অবস্থিত এই ঘরখানা জঘন্য রকমের আর জীর্ণ অবস্থার। ঝি রেখেছি এক জন বৃদ্ধা গ্রাম্য স্ত্রীলোককে, কালা বলে স্বভাবটা রুক্ষ তার, তার চেহারা স্বর্গীয় রকমের। লোকে বলে, সেণ্টপীটার্সবার্গের জলবায়ু আমার ক্ষতি করছে এবং আমার এতো স্বল্প আয় নিয়ে রাজধানীতে বাস করা অমিতব্যয়িতা ছাড়া আর কিছু নয়। সে আমি বেশ জানি। হাঁ, আমি জানি, জানি পৃথিবীর সব চেয়ে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা ও মাথাওয়ালাদের থেকে। তাই আমি সেণ্টপীটার্সবার্গ সহরে আছি এবং এ জায়গা ত্যাগ করার কোনো অভিসন্ধিই নেই। না, আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকতে চাই···। ওঃ, আমার এখানে থাকা বা চলে যাওয়ায় অনেক কিছুই যেনো যাচ্ছে-আসছে।

আচ্ছা, কোন্‌ বিষয়ে সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকরা অত্যন্ত তৎপরতার সংগে কথা বলেন? উত্তর,—নিজেদের সম্বন্ধে। সুতরাং আমিও আমার নিজের বিষয়ে বল্‌বো।

২

মহাশয়, আমি আপনাকে শোনাতে চাই (কিছু আসে-যায় না, আপনি শোনেন আর না-ই শোনেন) কেন আমি হতে পারিনি একটা কীট। অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সংগে আমি ঘোষণা করছি আপনার কাছে, আমি একটি কীট হওয়ার ইচ্ছা বহু বার করেছি, কিন্তু আমার ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারিনি। ভদ্র মহোদয়, আমি শপথ করে বলছি আপনাকে, অত্যধিক পরিমাণ বোধশক্তি থাকাটা সত্যি একটা ব্যাধি—নিখাদ, দুঃখজনক ব্যাধি। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের বোধশক্তিই যথেষ্ট, বা আমাদের দুর্ভাগা ঊনবিংশ শতাব্দীর সাধারণ শিক্ষিত লোকের কপালে যে পরিমাণ বোধশক্তি জুটেছে তার অর্ধেক বা সিকি পরিমাণ হলেও চলবে, যদি এরই সংগে সেণ্টপীটার্সবার্গে বাস করার মতো

অতিরিক্ত একটা দুর্ভাগ্য ঘটে (আমাদের এই গোলার্দ্ধে সেণ্ট-পীটার্স বার্গ অত্যন্ত অবাস্তব ও ভ্রান্তপথবর্তী সহর ; আমাদের এই গোলার্দ্ধের সহরগুলো মনস্তত্ত্বের দিক থেকে হয় "জটিল" (নয়ত "না-জটিল")। আর যাই হোক, তথাকথিত স্বাধীন আর কাজের লোকদের সাধারণত যে পরিমাণ চৈতন্য আছে তাই-ই যথেষ্ট ! এখন আমি বাজী রাখতে পারি যে, আপনি মনে করছেন আমি ধৃষ্টতার সংগে লিখে চলেছি আর লিখে চলেছি কাজের লোকদের নিয়ে মস্করা করতে ; আপনি মনে করছেন, এটা অত্যন্ত কুরুচির পরিচয় যে আমিও আমার সেই অফিসারটির মতো কথার ফুলঝুরি ফোটাচ্ছি। কিন্তু, মহাশয়, সত্যি কথা বলবো ? সে লোক নিজের দুর্বলতাগুলোকে নিয়ে কী করে বড়াই করতে পারে যদি সে সেই দুর্বলতাগুলোকে দিয়ে আরেক জনের সংগে মজা আর মস্করা করে ?

তবে কেনো আমি করবো না ? সব লোকেই ত করে। প্রত্যেকটি লোকই তার নিজের দুর্বলতাগুলোর জন্যে গর্ববোধ করে, এবং সম্ভবত আমি আমার সহযাত্রীদের চেয়ে এ বিষয়ে বেশিই করি। ঝগড়ার দরকার নেই এ নিয়ে। হতে পারে আমি একটা বেয়াড়া কথা বলে ফেলেছি। তবে আমি বিশ্বাস করি বোধশক্তির আধিক্য শুধু নয়, যে কোনো রকমের বোধশক্তি থাকাটাই একটা ব্যাধিবিশেষ। এ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই কোথাও। আচ্ছা, কিছুক্ষণের জন্যে এই বক্তব্যটা মুলতুবী থাক্। এইটা ধরুন : যখন আমি 'মহৎ ও সুন্দর' (এককালে আমাদের এই দু'টি শব্দের প্রচুর প্রচলন ছিলো) জিনিষের সূক্ষ্মতা উপলব্ধি করার মতো নিজেকে উপযুক্ত বিবেচনা করেছি ঠিক সেই সময়ে, হাঁ ঠিক সেই সময়ে সর্বদা এবং একটা দৃঢ়প্রত্যয়ে আমি অনিবার্য ভাবে তা অস্বাভাবিক মনে করেছি শুধু নয়, আমি করতে পারিনি সে সব কাজ যে সব কাজ—এক কথায় যে সব কাজ অন্য লোকেরা করে,—সে সব কাজ করেছি যখন আমার পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি সে সব করতে দিতে চায়নি ; এটা কি এবং কী করে ঘটে ? কোন্‌টা ভালো, এবং কোন্‌টার দ্বারা "মহৎ ও সুন্দর" সৃষ্টি হয়, এটা যতো আমি অনুধাবন করেছি ততোই আমি ধাঁধায় পড়ে গেছি এবং ততোই আমি সেই সব শক্ত-কঠিন ব্যাপারে নিজেকে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছি। কিন্তু সব চেয়ে কৌতূহলজনক ব্যাপার হলো এই যে, আমি যে মেজাজের ব্যাখ্যা আগে করলাম তা কিন্তু আমার কাছে নেহাৎ আকস্মিক নয়, এ আমার সনাতন, সাধারণ মনোভাব, এবং সেই কারণে এটা আমার দুর্বলতাও নয়, পাপও নয়। পরিণামে আমি ক্রমশ আমার এই ব্যর্থতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার বাসনাটাও হারিয়ে ফেলেছি। বস্তুত, ব্যাপার এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, আমি এক রকম বিশ্বাসই করি (এক রকম এ-ও বলতে পারি, আমি সম্পূর্ণ ই বিশ্বাস করি) যে, এটা আমার সাধারণ অবস্থা। প্রথম প্রথম যা হোক অর্থাৎ এই ব্যাপার ঘটার আদিকাণ্ডে—আমার এই দুর্বলতার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আমি অনেক ভুগেছি, কারণ, আমি নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারিনি যে, অন্য লোকের সমপর্যায়ে আমি পড়িনে। তবু এই সত্যটাকে আমি বুকের মধ্যে এঁটে-সেঁটে গোপন-রহস্য করে রেখেছিলাম ; কারণ তখন আমি এতে লজ্জা পেতাম, এখনও লজ্জা পাই। হাঁ এখনও লজ্জা পাই এই জন্যে যে, সেণ্ট-পীটার্স বার্গে নোংরামিপূর্ণ নৈশ আমোদ-প্রমোদের কাহিনীকে আজ স্মরণ করতে হয় যে সব ব্যাপারে আমি একটা রহস্যময়, অস্বাভাবিক, নীচ আনন্দ অনুভব করতাম, এবং আমি যে খারাপ কাজ করেছিলাম তা আবার মনে করতে হয়, কিন্তু যা একবার ঘটে গেছে তাকে ত আর ফেরানো যাবে না। ভেতরে ভেতরে গোপনে আমি এই আমোদ-প্রমোদের চিন্তা করে ঠোঁট চেটেছি এবং রোমন্থন করেছি স্মৃতির ততোক্ষণ পর্যন্ত, যতোক্ষণ না সেই স্মৃতির তিক্ততা সরে গিয়ে একটা নীচ, ঘৃণ্য মিষ্টতা পাই, যতোক্ষণ না সত্যিকারের নিশ্চিত একটা আনন্দের উত্তেজনা বোধ করি। হাঁ, আমি আনন্দের কথা বলছি, আনন্দই বলছি। জোর দিয়েই বলছি। অনেক বার মনে মনে বলেছি নিজেকে, আমি জানতে চাই এমন আনন্দ অন্যান্য লোকের কপালে ঘটেছে কি না। যা হোক, প্রথমত আপনাকে বলি কোথায় সে আনন্দ নিহিত। এটা আমার অধঃপতনের স্বচ্ছ চেতনাতেই ছিলো,—এই রকম একটা অনুভূতিতে যে, আমি শেষ প্রাচীরে এসে গেছি, এবং সমস্তটা বিষয়ই নীচ, অন্য কোনো রকমই হতে পারে না ; এবং এর থেকে পালানোর কথা ভাবতে হবে না, আর, আমার পক্ষে এর বিপরীত ধরণের মানুষ হওয়া সম্ভব নয়, এবং যদিও এখনো আমার মধ্যে বিপরীত ভাবে গড়ে ওঠার মতো যথেষ্ট বিশ্বাস ও শক্তি আছে তবু আমি তা হতে চাইনে, কারণ আমি তাতে বিশেষ কিছু করতে পারবো না, ওই রকম একটা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া কোনো কাজে না-ও আসতে পারে। এই ব্যাপারের প্রধান কারণ হলো এই যে, এক জন অনুভব করেছে এই প্রক্রিয়াটি সূক্ষ্ম বোধশক্তির সাধারণ মৌল সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এই প্রক্রিয়াটির সংগে যে জড়ত্ব -জড়িয়ে আছে তা ঐ সব সূত্র নিয়ম-কানুনের কার্য-কারণের ফলে উৎপন্ন ; সুতরাং কেউই এর পরিবর্তন করতে পারবে না, কেউই এর গায়ে পরিবর্তনের ছাপ রাখতে আঙুল তুলতে পারবে না। অতএব এই সিদ্ধান্ত করা যায়, বোধশক্তির আধিক্য কোনো শয়তানকে তার নিজের সংগে শয়তানীর যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়, যদি অবশ্য সে বুঝতেই পারে সে একটি শয়তান।··· অনেক হলো এ বিষয়ে। আমি যা বললাম তা সব বুঝতে পেরেছেন ? ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারেন আমার সে আনন্দে কী কী ছিল ? না ; আচ্ছা আমি নিজেই তবে তা বুঝিয়ে দেবো। লেখার জন্যে লেখনী যখন ধারণ করেছি তখন এই জিনিসটাকে নিয়ে শেষ অবধি যাবো।

আমি অত্যন্ত আত্মসচেতন। আবার আমি যেমন রাগ করি, বিরক্ত হই, এমন কোনো কুঁজো কিংবা বামনও হয় না। এমন এমন মুহূর্তের ভেতর দিয়ে চলেছি আমি, যখন মুখে একটা ঘুসী খেলে খুশী হয়েই উঠতাম। হাঁ, আমি খুবই গুরুত্ব দিয়েই বলছি যে, আমি সব চেয়ে বড়ো সম্ভাব্য সুখ ঘুসীর থেকে পেতে চাই—যে সুখ থেকে মরিয়া হয়ে ওঠা অনুভব করা যায় (কারণ; মরিয়া হয়ে ওঠার মধ্যেই মানুষ খুঁজে পায় তার গৌরবময় মুহূর্ত, বিশেষ যখন লোকে বুঝতে পারে যে তার অধিকৃত অবস্থান থেকে ফিরে যাওয়া চলে না)। হাঁ, একটা ঘুসী, একটা ঘুসীই শুধু মুছে ফেলে দিতে পারে স্নেহরসসিক্ত বোধশক্তি, যাতে মানুষ ভরে আছে। যদিও আমি অন্য লোকের সাক্ষাতে ক্রোধাদি

প্রকাশের ব্যাপারের বিরুদ্ধে তবু আমার ভাগ্যে এমনই ঘটেছে যে, আমিই হলাম বাদীপক্ষ। এবং (আরও লজ্জাপ্রদ ব্যাপার) বিধিকানুন লঙ্ঘন না করেও আমি হতভম্ব হয়ে গেছি, আমি যেনো দোষী সাব্যস্ত হয়েছি প্রকৃতির নিয়মগুলোর ঠিক মতো কার্যকারিতায়ই। প্রথমত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি এই জন্যে যে, আমি যারই সংস্পর্শে এসেছি তারই চেয়ে নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান বলে ধরে নিয়েছি। এটা আমার সব সময়েই ঘটেছে। কখনো-সখনো যদিও—বিশ্বাস করবেন কি?—এর জন্যে আমি দুঃখ বোধ করেছি। আর যাই হোক, সারা জীবন ধরে আমি লোককে দেখতে ভালোবেসেছি অবজ্ঞার চোখে, খুঁটিয়ে দেখার চেয়ে, এ আমি জানি। এবং দ্বিতীয়ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি এই জন্যে যে, যদি আমার মধ্যে আত্মার মহত্ত্ব থেকে থাকে, তা আমার চেতনা-বোধে অনর্থক থাকাটার জন্যে দুঃখ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে সমর্থ হয়নি। সেই মহত্ত্ব নিয়ে আমি কিছুই করতে পারিনি, তার কারণ হলো, প্রকৃতির নিয়ম-কানুন মেনেও যদি কোন ব্যক্তি আমায় আঘাত করে তাহলে প্রকৃতির নিয়মতন্ত্রকে ক্ষমা করারও যুক্তি নেই, অস্বীকার করারও না, যেহেতু ঐ সব নিয়মের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও অপমানটা অপমানই থেকে যায়। অতএব, যদি আমি সমস্ত মহত্ত্ব থেকে নিজেকে বিচ্যুত করতে পারতাম, এবং যে যে আমার বিরক্ত অপমানিত করতো তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতাম, তাহলেও আমি সত্যিকারের প্রতিশোধ নিজেকে দিয়ে তাদের ওপর নেওয়াতে পারতাম না; তার কারণটা হলো, কাজে পরিণত করার যথেষ্ট শক্তি থাকলেও আমি শেষ পর্যন্ত সমর্থ হতাম না মন স্থির করতে কোনো একটা নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি মেনে চলায়। কেন আমি মন স্থির করতে এই রকম অসমর্থ হবো? এ বিষয়ে আমার দু'টো-একটা কথা বলার আছে।

[ক্রমশঃ

অনুবাদক—আনন্দ দে

কোলাপসিবিল গ্যারেজ

ফ্রেম মুড়ে রাখতে হয়
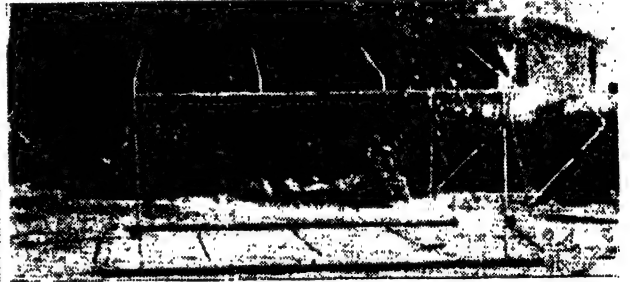
ফ্রেম খাটানো হয়েছে
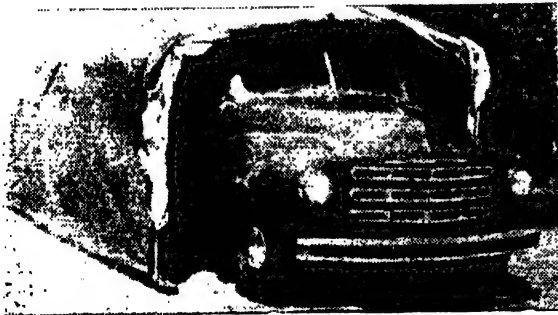
গ্যারেজে গাড়ী ঢুকেছে
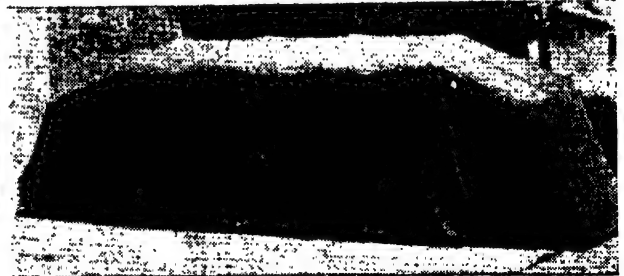
সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েছে গ্যারেজে

কোলাপসিবিল গেট কথাটা শোনা যায়, কোলাপসিবিল গ্যারেজ কেউ শুনেছেন? চট অথবা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা দিতে হয়। ঘর তৈরী হবে এ্যালমিনিয়াম থেকে তৈরী ফ্রেমে। জল, বৃষ্টি কিম্বা রৌদ্র থেকে গাড়ী বাঁচবে, অথচ যেখানে খুশী খাড়া ক'রে দেওয়া যাবে গ্যারেজ। দেশ-বিদেশে খাদ্যাভাব যত প্রকট, বসবাস সমস্যাটা ততোধিক। কোলাপসিবিল গ্যারেজ তৈরী ক'রে বিদেশে গাড়ীগুলোকে বাঁচানো হচ্ছে।

জাত-ব্যবসায় বাঙালী

শ্রীমনকুমার সেন

যুগে-যুগে বাংলার শিল্প-খ্যাতি সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সামান্য মূলধনে এবং সামান্যতম যন্ত্রপাতিতে বাংলার দূর-দূরান্তের পল্লীবাসী শিল্পী ও কারিগরের সেই শিল্প-নৈপুণ্য আজ বহুলাংশে শুধু ইতিহাসের বিষয় হইয়া আছে ; কেন না, সেই ধারা বিদেশী শাসকের চক্রান্তে বৈদেশিক বাণিজ্যের ধাক্কায় আজ প্রায় বিলুপ্ত। তথাপি আজও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কত রকমারি বৃহৎ, মাঝারি ও ছোট শিল্প-ব্যবসায়ের সম্ভাবনা যে আত্মপ্রকাশের আগ্রহে উন্মুখ হইয়া আছে, তাহা বহু জনেরই অজ্ঞাত নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-ব্যবসায় সমূহকে একটি নূতন পরিকল্পনানুযায়ী নূতন প্রতিষ্ঠা দিবার প্রয়াস পাইতেছেন। সাধারণ পরিচয় :—

চব্বিশ পরগণা

বঙ্গ-বিভুক্তির ফলে কতকগুলি সমৃদ্ধ অঞ্চল পূর্ব-পাকিস্থানের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে সত্য, তথাপি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতেও রকমারি শিল্প-ব্যবসায় চালু আছে, এবং অন্ততঃ ইহাদের কতকগুলি অতীতের বিস্মৃত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করিবার সামর্থ্য রাখে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। শিক্ষিত সমাজের ঔদাসীন্য আর সরকারী দৃষ্টির কার্পণ্য এই দুইয়ে মিলিয়া ইহাদিগকে শীর্ণ-শুষ্ক করিয়া না রাখিলে আজ পশ্চিমবঙ্গের (বা বঙ্গের) অর্থ-নৈতিক চেহারা আমরা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ দেখিতাম, সন্দেহ নাই।

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে চব্বিশ পরগণা অগ্রগামী। কাপড়, পাট, রাসায়নিক ঔষধপত্র, লৌহ-ঢালাই, ইঞ্জিনীয়ারিং, হোসিয়ারী, বেকারী, রবার দ্রব্য, কাগজ, কাঁচ, গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরী, রং-বার্ণিশ, লাক্ষা-প্রমুখ বিভিন্ন শ্রেণীর অন্যূন ছয় শতাধিক কারখানা এই জেলাটিকে মুখর করিয়া রাখিয়াছে। বাদুরিয়া ও বারাসতে তাঁতের কাপড় ; বারাসত ও একবালপুরে গামছা, ছিটের কাপড়, মশারী ও লেপের কাপড় ; ব্যারাকপুর ও দমদমে পাটের দড়ি, চামড়ার ব্যাগ, সুটকেশ প্রভৃতি আজও প্রসিদ্ধ। নাতাগোড়ের একদা-বিখ্যাত পিতলের তালার ব্যবসায় আজ একরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত ; সেনুলি ইউনিয়ন ও নিমতার অবস্থাও অনুরূপ শোচনীয়। তালা-কুলুপ তৈরীর ব্যবসায় আমতা, খামারপাড়া, বরাহনগর, দত্তপুকুর ও ডেলসায় ; কাঁসার বাসন তৈরীর ব্যবসায় ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় ; কাঠের খেলনা, বেতের ঝুড়ি, বাক্স তৈরীর ব্যবসায় বালী, নারায়ণপুর, কামারপাড়া ও বরাহনগরে ; পাট ও শনের দড়ির ব্যবসায় তিলজলা, মোল্লাহাট, সাহাপুর, দুর্গাপুরে, গোপালপুর ও ট্যাংরায় আজিও বহু দুর্য্যোগের মুখে অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। চব্বিশ পরগণার মধ্যে কলিকাতা সর্ববৃহৎ মহকুমা,—পরে একটি পৃথক্ প্রবন্ধে এই অঞ্চলের শিল্প-ব্যবসায় সম্পর্কে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

জলপাইগুড়ী

তাঁতবস্ত্র বয়ন এখনকার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কুটীরশিল্প। জেলার প্রায় সর্বত্রই উহা চালু আছে,—তন্মধ্যে পাহাড়পুর, কৃষ্ণনগর, মীরঘর, বল্লারপাড়া, বালিয়া প্রভৃতি তাঁতকেন্দ্র সমধিক প্রসিদ্ধ। মোটা সিল্ক ও পাটের কাপড় তৈরীও বহু অঞ্চলেই পুরোদস্তুর চালু রহিয়াছে।

দার্জ্জিলিংএর শীতবস্ত্র সর্বজনপ্রিয়। মোটা আলোয়ান, কম্ফর্টার, মোজা, শতরঞ্চি, শাড়ী প্রভৃতি মাঝারী শিল্প-ব্যবসায়ের

দার্জ্জিলিং

আকারে সহস্র সহস্র পরিবারের জীবিকা নির্বাহের উপায় হইয়া আছে। কুটীরশিল্পের মধ্যে কুঁকড়া, বেতের ঝুড়ি, কাঠের পাত্র, কম্বল প্রভৃতির খ্যাতি আছে।

দিনাজপুর

চটের আসন, পাটি প্রভৃতি বুননের জন্য কয়েকটি তাঁতশালা দিনাজপুরে প্রকৃতই দর্শনীয় বস্তু। কুটীরশিল্পরূপে এণ্ডির কাপড় তৈয়ার হয় বড়শালুপাড়া, রুহিয়া, গলাগলি প্রভৃতি স্থানে। দেবীর-বাজার, জৌনিয়া, সাবজপুর, ছিরিরবন্দর, কেশববাড়ী, রাণীরবন্দর, চূড়ামন প্রভৃতি খ্যাতিসম্পন্ন তাঁতকেন্দ্র। ইতাহারে মশারী তৈয়ারীর ব্যবসায় ; বীরগঞ্জ ও পীরগঞ্জ গুড় তৈয়ারীর ব্যবসায় এবং অন্যান্য স্থানে চামড়া পাকাই, গরুর গাড়ীর চাকা তৈয়ারী, চাকার অন্যান্য সরঞ্জাম ও লোহার বাসনপত্র এবং লাঙ্গল তৈয়ারীর ব্যবসায়ে লক্ষাধিক লোক সাক্ষাৎ-সম্পর্কে জড়িত।

নদীয়া

তাঁতের কাপড়, বেলোয়ারী, তামা, পিতলের বাসন-কোসন, মাটির খেলনা ও তৈজসপত্র, গুড় প্রভৃতি এখানকার প্রসিদ্ধ শিল্প ও ব্যবসায়। চাদর ও তামার বাসনপত্রের জন্যও কয়েকটি অঞ্চলের খ্যাতি আছে। রাণাঘাট, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর মৃৎশিল্পের সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্র। নদীয়ার ভাস্কর্য ও মৃৎশিল্প আজ বিশ্বের সমাদরপ্রাপ্ত। মাঝদিয়া, মহেশগঞ্জ, শিকারপুর, গোয়ারী, মেহেরপুর, স্বরূপগঞ্জ ও কৃষ্ণনগরের কম্বল তৈরী এবং কালীগঞ্জ, দেবগ্রাম ও পলাশীপাড়ার টুপি ও বালীয়াডাঙ্গায় শাঁখের করাতীর কাজ সুপরিচিত। কয়েক স্থানের হোসিয়ারী দ্রব্যও উল্লেখযোগ্য।

বর্দ্ধমান

বর্দ্ধমানের বনপাস, দাঁইহাট, পূর্ব্বস্থলী, কালনা ও মাটীয়ারী অঞ্চলে কাঁসা ও পিতলের বড় বড় পাত্র এবং রন্ধনের বাসন-কোসনাদি ; কাঞ্চননগরে ছুরি-কাঁচি ; ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহে মাটির খেলনা ও বাসনপত্র, বনপাসে সোনা, রূপা ও গিল্টির গহনা এবং তামা-পিতলের জিনিষাদি প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে। বংশ নামক স্থানের হরিতকীর নির্য্যাস তৈরীর ব্যবসায় বাংলায় এই শ্রেণীর একমাত্র ব্যবসায়। রাণীগঞ্জ ও কালনায় বস্ত্রবয়নও অনুল্লেখ্য নয়।

বাঁকুড়া

বাঁকুড়ায় কুটীরশিল্পের মধ্যে তসর ও সিল্কের কাপড়, কাঁসার বাসনপত্র ও বিচিত্র কারুকার্য্যযুক্ত শাড়ী, শাঁখার বালা, লৌহনির্ম্মিত হাতিয়ার, ছুরি-কাঁচি প্রভৃতি সুপ্রাচীন। বিষ্ণুপুরের তাঁতবস্ত্র, কাঁসার বাসন, শাঁখের অলঙ্কার বিশেষ সমাদৃত। অপর দুইটি সমৃদ্ধ অঞ্চল—সোনামুখী ও পাত্রসায়ের তাঁতশিল্পের কাপড় বয়ন, এবং কাঁসা-পিতলের জিনিষের জন্য একদা প্রসিদ্ধ ছিল, আজ

ধ্বংসোন্মুখ। সোনামুখীর বিরাট লাক্ষার ব্যবসায়ও আজ শুধু অতীত ইতিহাসের বস্তু।

বীরভূম

বীরভূমের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কুটীরশিল্প হইতেছে পিতল ও কাঁসার দ্রব্য (প্রধানতঃ দুবরাজপুরে ও নলহাটিতে), ছুরি-কাঁচি তৈয়ারী ও সিল্ক-বস্ত্র বয়ন। বিষ্ণুপুর, মারগ্রাম পালসা, বালীয়া, পাঁচগ্রাম প্রভৃতি স্থান তাঁত-সিল্কের জন্য সুপরিচিত। কাম্বালীপুর কারিধ্যার তসর বাংলার একটি বিশিষ্ট কুটীরশিল্পরূপে সম্বর্দ্ধিত, এখানকার শাঁখের অলঙ্কারও প্রসিদ্ধ। বিশ্বভারতীর অন্তর্ভুক্ত কবিগুরুর শ্রীনিকেতন সূক্ষ্ম ও মনোরম শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করিতেছে। শুধু শিল্প-রাঙা নয়, এতদঞ্চলে কুটীরশিল্প সংগঠনে শ্রীনিকেতনের ভূমিকা যে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তাহাও আজ আর অজ্ঞাত নয়।

মালদহ

সূতা-পাকাই মালদহের একটি প্রধান ব্যবসায়,—ইহা কুটীরশিল্প ও বৃহৎ শিল্প উভয় আকারেই পরিচালিত হইয়া থাকে। মেহনণ্যা, শিশুনগর, জোট, গণেসপুর, নরোত্তমপুর প্রভৃতি স্থানের মটকা এবং শিবগঞ্জ থানার আসল সিল্কও উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়। ইংলিশবাজার, কাঁসারীপাড়া, শঙ্করবাটী প্রভৃতি বিখ্যাত কাঁসা ও পিতল বস্তু তৈরীর স্থান। কুটীরশিল্পিগণের কোন সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অভাব হেতু এবং তাহাদের অর্থনৈতিক অধোগতি বশতঃ প্রধানতঃ মহাজনদের প্রতাপের মধ্যেই কুটীরশিল্প ও ব্যবসায়িগণ কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিতেছে।

মেদিনীপুর

ঘাটালের সূত্রধরদের কারিগরী কাজ সুবিখ্যাত। চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, ও ঘাটালে যে সঙ্ঘবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত কাঁসা ও পিতল-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই শ্লাঘার বিষয়। সবঙ্গ ও পাঁশকুড়া থানার বহু লোক স্থানীয় একপ্রকার ঘাস হইতে প্রশংসনীয় কৌশলে মাদুর প্রস্তুত করে। পশ্চিমবঙ্গের অপরাপর অঞ্চলে এই শিল্পটির প্রসার সম্ভাবনাপূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। ঘাটালের মৃৎশিল্পও সুপরিচিত।

মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র জিয়াগঞ্জে বালাপোষ ও লোহার ট্রাঙ্ক তৈরী একটি সমধিক উল্লেখযোগ্য শিল্পরূপে দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছে। খাগড়া, বহরমপুর, কান্দী ও জঙ্গীপুরের কাঁসা ও পিতলের বাসন তো ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। সিল্ক পাকাই ও বুননের জন্য ইসলামপুর ও বোলটুলী গোরাবাজার; মৃৎশিল্পের জন্য কাঁঠালিয়া, এবং জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শিল্পদ্রব্য হাতীর দাঁতের অপরূপ দ্রব্য-সামগ্রীর জন্য মুর্শিদাবাদ (সদর), খাগড়া ও মাথরার নাম সর্বজনবিদিত। বহরমপুরের সিল্ক দেশ-দেশান্তরে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে।

হাওড়া

আন্দুল ও উলুবেড়িয়া হাওড়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প তাঁতবস্ত্রের কেন্দ্রভূমি। বৈনান এবং আমতায় হাতে তৈরী কাগজও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। আরও অসংখ্য সূক্ষ্ম ও মনোমুগ্ধকর শিল্পকার্য গ্রামাঞ্চলের সাধারণ কারিগরের মৌলিক শক্তির পরিচয় বহন করিতেছে; হাটে-বাজারে এই সমস্ত শিল্পদ্রব্য প্রভৃত আমদানী হইয়া থাকে।

হুগলী

হুগলীর তাঁত ও তসর সুবিখ্যাত। হরিপাল, রাজাবলহাট, বেগমপুর, শ্রীরামপুর, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি বিখ্যাত কেন্দ্রে তাঁতশিল্প জনগণের মধ্যে প্রচলিত জীবিকানির্বাহের উপযোগী প্রধান শিল্প। সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য নিপুণ শিল্পীর তৈরী ধুতি-শাড়ীর জন্য ফরাসডাঙ্গার খ্যাতি বহুদূরবিস্তৃত। বালী, মহেশ, শ্রীরামপুর, বাঁশবেড়িয়া ও কামারপাড়ায় তৈরী 'পাগড়ী ও শিরস্ত্রাণ' অতি উত্তম দর্শনীয় শিল্প-সামগ্রী। চন্দননগরের কাষ্ঠ-আসবাবের ব্যবসায়ও এই প্রকারই উল্লেখযোগ্য।

সাধারণ ভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য শিল্প-ব্যবসায়ের সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দেওয়া হইল। প্রায় প্রত্যেকটি শিল্পই চরম দুরবস্থা ও ক্ষয়িষ্ণুতার মধ্যে টিকিয়া আছে। যুগ-যুগব্যাপী যে সকল সমস্যা শিল্প ও শিল্পীকুলকে মুমূর্ষু অবস্থায় ঠেলিয়া দিয়াছে, তন্মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) সমবায়িক কর্মনীতির অভাব
(২) কাঁচা মালের সমস্যা
(৩) মহাজনদের শোষণমূলক দাদন নীতি
(৪) ক্রয়-বিক্রয়ের অবৈজ্ঞানিক ও ক্ষতিকর ব্যবস্থা
(৫) মান্ধাতা আমলের কলা-কৌশল।

তাঁতশিল্প ও রেশমশিল্পের ন্যায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শিল্পগুলিকে ব্যাপক ও সুষ্ঠু সংগঠনের মধ্য দিয়া বাঁচাইয়া না রাখিতে পারিলে আমাদের অর্থনৈতিক দুর্গতির শেষ থাকিবে না। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গের কৃষির সমস্যাটি যেমন দুরূহ, কুটীরশিল্প ও গ্রামশিল্পের সমস্যা তদ্রূপ নহে। শিল্পোন্নয়নের পূর্ণ সুযোগ পশ্চিমবঙ্গে রহিয়াছে। তাঁতশিল্পের উন্নয়নের অনুকূলে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় :

(১) জনসাধারণের মধ্যে বস্ত্রাভাব হেতু তাঁতের সমাদর বৃদ্ধি পাইতেছে; সৌখিন ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁতের প্রচলন বরাবরই ছিল।

(২) মিলের উপর নির্ভর না করিয়া স্থানীয় বস্ত্রের চাহিদা তাঁতের সাহায্যে যত মিটানো যায় ততই ভাল এবং লাভজনক। তজ্জন্য প্রয়োজন প্রস্তুত-পদ্ধতির উন্নতি, বস্ত্রের মূল্য হ্রাস।

(৩) গ্রামবাসীর এবং বিশেষরূপে কৃষককুলের দারিদ্র্য ভয়াবহ, এমতাবস্থায় পুরুষ-স্ত্রী ছেলে-মেয়ে মিলিয়া অবসর সময়েও তাঁতে কাজ করার বিশেষ অবকাশ আছে।

(৪) সহস্র সহস্র বাঙ্গালী পরিবার আছে, যাহাদের জাত-ব্যবসায় হইতেছে তাঁত। ইহাদের অবস্থার পাকে ফেলিয়া অন্য ধরণের কাজ করিতে বা বেকার বসিয়া থাকিতে বাধ্য করার অর্থ জাতীয় শিল্প-সৌকর্যের অবলুপ্তি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধঃপতন।

(৫) খাদ্য সম্পর্কে পশ্চিম-বাংলার পরনির্ভরতা কঠিন সমস্যায়

বিষয় হইয়া আছে। তদুপরি বস্ত্র সম্পর্কেও আমরা যদি কেবলই আমদানীর উপর নির্ভর করিতে থাকি, তাহা সর্বদিকেই অকল্যাণকর।

রেশমশিল্পে আবালবৃদ্ধবনিতাকে কর্মে নিযুক্ত রাখার অবকাশ আরও অধিক। বস্তুতঃ স্ত্রীলোক ও শিশুদের সহায়তা-প্রাপ্ত রেশম পোকা পালন বা গুটি উৎপাদনের দ্বারা সারা বৎসর জীবিকা নির্বাহে নিযুক্ত সহস্র সহস্র পরিবার রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ বিভিন্ন শিল্প-ব্যবসায়ে মোট কত লোকের কর্ম্মসংস্থান হইতেছে এবং বার্ষিক উৎপন্নের মূল্য কত, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :

	শিল্পের নাম	নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা	বার্ষিক উৎপাদনের মূল্য
(১)	বয়নশিল্প	৪,৬৭,২০০	১৬,০০,৬৯,০০০ টাকা
(২)	চর্মশিল্প	২৯,০০০	৭,৭২,০০০০০ টাকা
(৩)	পিত্তল শিল্প	২০,০০০	৮,৬৪,০০,০০০ টাকা
(৪)	লৌহ ও ইস্পাতে তৈরী কুটীরশিল্প (ট্রাঙ্ক, সুটকেস, কৃষির যন্ত্রপাতি প্রভৃতি)	১৮১০০	৩৮৩০০০০০ টাকা
(৫)	মৃৎশিল্প (ও কাচ)	১৯,০০০	৯২,০০,০০০ টাকা
(৬)	তৈল ও সাবানশিল্প	৫,০০০	১,২৬,০০,০০০ টাকা
(৭)	কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্যসামগ্রী	১১,০০০	৬৪,৮০,০০০ টাকা
(৮)	তন্তুজাত শিল্প (ঘাস, নারিকেলের ছোবড়ায় তৈয়ারী জিনিষ, মাদুর প্রভৃতি)	১০,০০০	৪৩,০০,০০০ টাকা
(৯)	তালা ও চাবিশিল্প	২,০০০	২৮,৮০,০০০ টাকা
(১০)	বিবিধ (ইহার মধ্যে একমাত্র বিড়িশিল্পেই ৩৫ হাজার এবং লবণশিল্পে ১৫ হাজার)	৫৭,৫৫০	৪,১১,২৯,০০০ টাকা

এইরূপে মোট নিযুক্ত নর-নারীর সংখ্যা দাঁড়াইতেছে ৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮ শত ৫০ জন, এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদির বার্ষিক মূল্য ৪৪ কোটি ৫৩ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার উক্তরূপ শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নয়নমূলক কতকগুলি পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিকল্পনাধীনে আপাততঃ রেশমশিল্প, বয়নশিল্প (হস্তচালিত তাঁতে), হাতে তৈরী কাগজশিল্প, তাল-গুড়, খাদি, বোতাম (ঝিনুকের), মৌমাছি পালন, ঘানি, লাক্ষা, মাদুর প্রভৃতি প্রায় এক ডজনের অধিক শিল্পকে আনা হইয়াছে। আলোচ্য পরিকল্পনার কয়েকটির মোটামুটি আভাস দেওয়া এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :

(১) হস্তচালিত তাঁতে :—

পরিকল্পনার লক্ষ্য

(১) সুলভে কাঁচা মাল সরবরাহ করা ;

(২) তন্তুবায়দের সমবায় সমিতিতে সংগঠিত করা ;

(৩) কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয়-কেন্দ্র স্থাপন করা ;

পরিকল্পনার লক্ষ্য

(৪) রং ও ছাপাই সম্পর্কে একটি কেন্দ্রীয় কারখানার প্রবর্তন করা ;

সঙ্গে সঙ্গে তন্তুবায়গণকে (ক) উন্নত ধরণের তাঁত ও অন্যান্য আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি দেওয়া, (খ) উন্নততর প্রণালীর সাহায্যে উৎপাদন বর্দ্ধিত করা, (গ) এবং এই প্রকারে অহেতুক ক্ষয়-ক্ষতি বন্ধ করিয়া উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করা, এবং (ঘ) দৈহিক ক্লেশ হ্রাস করার উদ্দেশ্যও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

(২) ঝিনুকের বোতামশিল্প : (ক) সম্ভাবিত ঝিনুক উৎপাদনের স্থানগুলি নির্বাচন করা ;

(খ) পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়-প্রার্থিগণকে এই শিল্পে শিক্ষাদানের নিমিত্ত একটি কারখানা স্থাপন করা ;

(৩) গুটিপোকা পালন : (ক) স্থানীয় গুটিপোকা বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করা ;

(খ) অবিক্রীত গুটিপোকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ;

(গ) এই বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করা ;

(ঘ) বিভিন্ন শ্রেণীর পোকার ন্যায়-সঙ্গত দর নির্দ্ধারণ করা ;

(৪) ঘানি শিল্প : (ক) উন্নত ধরণের ঘানির সাহায্যে প্রকৃষ্টতর উপায়ে তৈলবীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের পদ্ধতি প্রচারের জন্য একটি প্রচার ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা।

(৫) মাদুর শিল্প : (ক) মেদিনীপুরের মাদুরশিল্পিগণকে সমবায় সমিতিতে সংগঠিত করা ;

(গ) মাদুরের কাঁচা মালের উৎপাদন-বৃদ্ধির পন্থা নির্দ্ধারণ করা ;

(গ) উন্নততর প্রণালীর সাহায্যে উৎপাদনের হার ও উৎপন্নের মান বর্দ্ধিত করা ;

(ঘ) ভারতের বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন মাদুরাদির বাজারীকরণের সুব্যবস্থা করা, বিদেশেও যাহাতে ইহাদের চাহিদা বর্দ্ধিত হয়, তদনুযায়ী ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সরকারী পরিকল্পনায় রোগ-নির্ণয় এবং ঔষধ নির্বাচন ঠিকই হইয়াছে, এক্ষণে প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী কার্যকরী ব্যবস্থা যত দ্রুত গৃহীত হয়, ততই মঙ্গল।

বণিকের মানদণ্ড

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক উর্ম্মি বলেন, "ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা বাঙলা দেশের বাণিজ্য বিস্তীর্ণ ছিল। তখন বাঙলা হইতে সমুদয় পটবস্ত্র ও কার্পাস দিল্লীতে যাইত। তখন বাঙলায় ইউরোপীয়দিগের ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল। এই বাণিজ্যক্ষেত্রে ইংরেজ জাতি অস্ত্র-বিনিময়ে পণ্যরূপে বাঙলাকে ক্রয় করিয়াছিলেন।"

জেন অস্টিনের

আটত্রিশ

বিদায়ের দিন। শনিবার সকালে এলিজাবেথ এসে দেখলে খাওয়ার টেবিলে কলিন্স একলা বসে আছে। এলিজাবেথকে একলা পেয়ে কলিন্স সবিনয়ে নিবেদন করলে—'জানি না, গৃহিণী ইতি-মধ্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে কি না। কিন্তু এ কথা জানবে যে তোমাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে খুব খুশীই হয়েছি আমরা। আমাদের এই পর্ণকুটীরে কাউকে আহ্বান করে আনার মত লোভনীয় কিছু নেই। আমাদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, আমাদের স্বল্প-পরিসর ঘর-দুয়ার, ততোধিক স্বল্প গৃহস্থালী বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সীমাবদ্ধ সংযোগ—এ সব কিছুই তোমার মত তরুণীর চোখে হান্সফোর্ডকে বিরস করে তুলবে। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমাদের প্রতি তোমার ভালবাসায় কৃতজ্ঞ আমরা—আমরা আমাদের সাধ্য মত তোমায় সুখী করতে কোন কৃপণতা করিনি কোন দিকে।'

এলিজাবেথও ধন্যবাদ জানালে। সত্যি, সুখেই কেটেছে তার দিনগুলি। দু'টি সপ্তাহ ভরাট আনন্দ। প্রিয় বান্ধবী শার্লটির সাথে একসঙ্গে থাকার আনন্দ। যে স্নেহসিক্ত মনোযোগ পেয়েছে সে সবার কাছ থেকে, তার জন্য বাধিত সে।

শুনে খুশীই হোল কলিন্স। আরো একটু গাম্ভীর্যে, স্মিত হাস্যে বলল—'নিরানন্দে যে দিন কাটেনি শুনে খুবই আনন্দ পেলাম। আমরা আমাদের যথাসাধ্য করেছি। সৌভাগ্য বশতঃ সুযোগ থাকায় একটি উন্নততর সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি তোমায়। এ নিয়ে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি যে, হান্সফোর্ডের দিনগুলি একেবারে ক্লান্তিকর ভাবে ঘাড়ে চেপে বসেনি। লেডী ক্যাথারিনের পরিবারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভগবানের আশীর্বাদ। খুব কম লোকই এমন সৌভাগ্যের আশীর্বাদ নিয়ে গর্ব করতে পারে। তুমি তো নিজের চোখেই দেখে গেলে সে-বাড়ীতে আমাদের স্থান কোথায়। দেখেছ তো, হামেশাই আমাদের সেখানে ব্যস্ত থাকতে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, এ জায়গার সকল প্রকার অসুবিধার মধ্যেও আমরা কৃপার পাত্র হয়ে এখানে থাকি না!'

মনের আবেগ প্রকাশের পক্ষে কলিন্সের ভাষা অপ্রতুল হয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে সে ঘরে পায়চারী করতে লাগল। এলিজাবেথ বসে বসে সৌজন্য আর সত্যকে আরো কয়েকটি কথার গ্রন্থিতে বদ্ধ করার চেষ্টা করতে লাগল।

—'তুমি আমাদের সম্বন্ধে একটা অনুকূল সংবাদ হার্টফোর্ড-শায়ারে বহন করে নিয়ে যেতে পারবে। আর তুমিই যে পারবে সে বিশ্বাস আমার আছে। লেডী ক্যাথারিন যে প্রত্যহ মিসেস্ কলিন্সের খোঁজ-খবর নেন সে তো নিজের চোখেই দেখে গেলে। তোমার বান্ধবী যে অপাত্রে—কিন্তু এ বিষয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়। আন্তরিক কামনা করি, তোমারও একটি ভালো বিয়ে হোক। এ বিষয়ে শার্লটিও আমার মত পোষণ করে। আমাদের চরিত্র ও চিন্তাধারায় এক অদ্ভুত মিল আছে। আমাদের ভাগ্য যেন পরস্পরের জন্য গাঁটছড়া বাঁধাই ছিল।'

এলিজাবেথ বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে যে, এদের মিলন সুখেরই হয়েছে। অকপটেই সে বলতে পারে এ কথা যে, তাদের সুখ-সৌভাগ্যে খুশীই হয়েছে সে। হতভাগিনী শার্লটি! এ রকম সামাজিক আবেষ্টনীতে তাকে ফেলে যেতে কষ্ট হয়। কিন্তু খোলা মন নিয়েই সে বেছে নিয়েছে এ অবস্থা। অতিথিরা চলে যাওয়ায় দুঃখিত হলেও সে তাদের কৃপাপ্রার্থী নয়। তার ঘর-দুয়ার, তার ঘর-কন্না, যাজক-পল্লী, গৃহপালিত জীব-জন্তু—এ সব এখনো বিস্বাদ হয়ে ওঠেনি তার কাছে।

অবশেষে বিদায়ের লগ্নে দুয়ারে প্রস্তুত হোল গাড়ী। বাক্স-প্যাঁটরা তোলা হোল। বিদায়ের পালাও একে একে সাঙ্গ হোল। বাগানের পথটুকু হেঁটে যেতে যেতে তাদের বাড়ীর সকলকে প্রীতি জানাল কলিন্স। লংবোর্ণে যে আদর-যত্ন পেয়েছে তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ—অচেনা হলেও গার্ডিনার-দম্পতীকেও নমস্কার জানাল সে। এলিজাবেথকে হাত ধরে তুলে দিল গাড়ীতে কলিন্স, পিছন পিছন মেরিয়াও উঠল গাড়ীতে। গাড়ীর দরজা বন্ধ করতে যাবে এমন সময় কলিন্স তাকে স্মরণ করিয়ে দিল—'ও-বাড়ীর জন্য কোন বার্ত্তা রেখে যাবে না?'

—'অবশ্য তাঁদের ভালবাসা ও সহৃদয়তার জন্য সশ্রদ্ধ নমস্কার তো জানাবেই'—নিজেই বললে কলিন্স।

এলিজাবেথ নীরবেই সে কথায় সায় দিলে। গাড়ী ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর মেরিয়া বলল—'মনে হচ্ছে যেন মাত্র এক দিন কি দু'দিন আগে এসেছি এখানে। কিন্তু তার মধ্যেই কত কিছু ঘটে গেল।'

—'অনেক কিছুই'—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রতিধ্বনি করল সঙ্গী।

—'দু'দিন চা খাওয়া ছাড়া দশ দিন ডীনার খেয়েছি রোজিংসে। বাড়ী গিয়ে গল্প করার কত কিছু যে জমা হয়ে আছে।'

—'আর আমার কত কিছু লুকোতে হবে'—মনে মনে বললে এলিজাবেথ। তার পর নীরবে বসে রইল দু'জনে। চার ঘণ্টার

মধ্যেই মামার বাড়ী এসে পৌঁছল তারা—সেখানেও কাটল কয়েকটা দিন।

জেনকে দেখে খুশী হোল এলিজাবেথ। দিদিকে দেখাচ্ছে ভালই। এবার তারা একসঙ্গে একই বাড়ী ফিরবে। বাড়ী পৌঁছান পর্যন্ত ডার্সি'র কথা গোপন রাখতে বিশেষ বেগ পেতে হোল এলিজাবেথকে। সে জানে তার ভাণ্ডারে এমন গোপন কথা জমা আছে, যা প্রকাশ করলে বিস্মিত হবে জেন। সে সব কথা বলে ফেলার লোভ এতই দুর্নিবার যে, কি বলবে ভেবে কুল-কিনারা ঠিক করতে পারলে না এলিজাবেথ। ভয় হয়, একবার যদি এ নিয়ে আলোচনা সুরু করে বিংলের কথা উঠবেই—যা শুধু দিদির মনে আঘাত দেবে। আর কিছু নয়।

উনচল্লিশ

মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনটি তরুণী যথাসময়ে হার্টফোর্ডশায়ারের পথে পান্থনিবাসে এসে পৌঁছল। দেখতে পেলে কিটি ও লিডিয়া পূর্বাহ্নেই হোটেলের খাওয়ার ঘরের জানলায় সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল তাদের জন্যে। উল্লসিত অভ্যর্থনা জানিয়ে বোনেদের খাবার টেবিলে নিয়ে গেল তারা। কথায় কথায় লিডিয়া জানাল, গ্রীষ্মে অফিসাররা কেউ-ই থাকছে না মেরীটনে।

'তাই না কি?'—এলিজাবেথ পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

—'তারা ব্রাইটনের কাছে ক্যাম্প ফেলবে। বাবা যদি আমাদের গ্রীষ্মে সেখানে নিয়ে যান ভারী মজার হয়। এর চেয়ে লোভনীয় পরিকল্পনা হতে পারে না আর এতে এক পয়সা খরচাও হবে না। মাও যেতে রাজী আছেন। একবার ভাব তো—এখানে থাকলে গ্রীষ্মটা কি বিশ্রী কাটবে?'

এলিজাবেথ মনে মনে বলল—'খুব চমৎকার পরিকল্পনা বই কি! হায় ভগবান! এমনিতেই ছোট্ট এক রেজিমেন্টের পাল্লায় আর মাস মাস বল-নাচে প্রাণ ওষ্ঠাগত, তার উপর আবার ব্রাইটন আর ক্যাম্প-ভর্তি সেনাদল!'

—'একটা খবর আছে'—বললে লিডিয়া—'কি বল্ দেখি? চমৎকার একটি খবর এবং খবরটি এমন এক জনের সম্বন্ধে যাকে আমরা সবাই ভালবাসি।' জেন আর এলিজাবেথ দৃষ্টি-বিনিময় করল। বয়কে সরে যেতে বলা হোল। লিডিয়া বললে হাসতে হাসতে।

—'খবরটি উইকহ্যাম সম্বন্ধে। মেরী কিংকে বিয়ে করার বিপদ থেকে মুক্ত উইকহ্যাম। মেরী কিং চলে গেছে কাকার কাছে। উইকহ্যাম এখন নিরাপদ।'

—'মেরী কিংও বাঁচল।'—বললে এলিজাবেথ।

—'তার পক্ষে চলে যাওয়া অত্যন্ত নির্বোধের কাজ হয়েছে।'

—'দু'জনের কারুরই পরস্পরের প্রতি নিবিড় টান নেই বলেই আমার বিশ্বাস।' মন্তব্য করে জেন।

—'উইকহ্যামের তো নেই। তাকে সে খড়-কুটোর মত মনে করে। অমন কুৎসিত মেয়েকে কেউ পছন্দ করে!'

এলিজাবেথ অবাক হয় বোনের এই অভদ্র ভাষণে।

খাওয়া শেষ হলে গাড়ী ডাকতে পাঠান হোল। আগের বাক্স-প্যাঁটরা, কিটি ও লিডিয়ার কেনা জিনিষ-পত্তর সব গাড়ীতে তুলে তারা কোন মতে ঠাসাঠাসি করে বসল।

—'কি সুন্দর ভাবে গাদাগাদি করে বসেছি আমরা'—মন্তব্য করল লিডিয়া—'যাক, এবার আরাম করে ঘন হয়ে বসা যাক। হাসি আর গল্প করতে করতে বাড়ী। সবার আগে, চলে যাওয়ার পর কী কী ঘটেছে তোদের জীবনে, শোনা যাক্। কোন চমৎকার লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে? আমি ভেবেছিলাম, তোমাদের দু'জনের এক জন অন্ততঃ বর জুটিয়ে নিয়ে ফিরবে। বড়দি তো বুড়ী হতে চললি। তোর বয়স তো প্রায় তেইশ হবে। তেইশের আগে আমার বিয়ে না হলে আমি তো মরমে মরে যাব। ফিলিপ মেসো তাই তো চান তোমাদের শীগগির বর জুটুক। তিনি বলেন, লিজির কলিন্সকেই বরণ করে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার মতে তাতে একটুও মজা হোত না। হায় ভগবান! তোমাদের আগে আমার বিয়ে হোত যদি! তা'হলে আমি তোদের সব্বাইকে বল-নাচে নিয়ে যেতাম। ওঃ, কর্ণেল ফর্ষ্টারের বাড়ীতে সেদিন কী মজাটাই না হয়েছে। আমার আর কিটির সেদিনটা সেখানে কাটানোর কথা ছিল—মিসেস্ ফর্ষ্টার বিকেলে একটু নাচেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু হ্যারিয়েট অসুস্থ হয়ে পড়ায় পেন একাই আসতে বাধ্য হয়েছিল। ভাব তো তখন আমরা কি করলুম? আমরা চেম্বারলেনকে মেয়েদের মত সাজালাম—কেউ জানত না। একমাত্র কর্ণেল আর মিসেস্ ফর্ষ্টার জানতেন। আর জানত মাসি, কেন না তার গাউনটা ধার করতে হয়েছিল। কি সুন্দর মানিয়েছিল চেম্বারলেনকে। তোমরা ধারণাই করতে পারবে না। ডেনী, উইকহ্যাম, আরো দু-তিন জন যখন এল, তারা তো তাকে চিনতেই পারলে না। আমি এত হেসেছিলাম। মিসেস্ ফর্ষ্টারও খুব হেসেছিলেন। হাসতে হাসতে আমার তো দম আটকে যাবার মত অবস্থা! এতে পুরুষগুলোর সন্দেহ হোল এবং তখন আসল রহস্য ফাঁস হয়ে গেল।'

এই ভাবে পার্টির ও হাসি-তামাসার নানা বর্ণনা দ্বারা সে সারা পথটা সঙ্গীদের জমিয়ে রাখল। কিটি মাঝে মাঝে ফোড়ন কাটছিল—ছিন্ন সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছিল। এলিজাবেথ এদের কথায় যত কম পারছিল কান দিচ্ছিল, কিন্তু উইকহ্যাম সম্বন্ধে একটি কথাও তার কান এড়াচ্ছিল না।

এমনি হাসি-গল্পে তারা বাড়ী পৌঁছে গেল। জেন তেমনটিই আছে দেখে মা হর্ষ প্রকাশ করলেন। আহারের সময় বাবা একাধিক বার নিজের অজ্ঞাতসারেই বললেন এলিজাবেথকে—'তোমরা ফিরে আসাতে আমি খুব খুশী হয়েছি।'

ডাইনিং-রুমের পার্টিটি বেশ বিপুল কলেবর হয়েছিল—লুকাস-পরিবারের সকলেই উপস্থিত ছিলেন মেরিয়াকে দেখতে আর তার কথা শুনতে। নানা বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা হোল। মিসেস্ বেনেট জেনের নিকট হতে আধুনিক ফ্যাশানের সংবাদ জেনে নিয়ে পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন লুকাস-গিন্নীর ছোট মেয়েদের কাছে। আর লিডিয়া সকলের উঁচু পর্দায় সকালের নানা মজা সম্বন্ধে সবিস্তারে বর্ণনা করে যেতে লাগল—বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়, যে ইচ্ছা শুনতে পারে।

বিকেলে লিডিয়া সকলকে নিয়ে মেরীটনে যাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠল। সেখানকার হাল-চাল চলছে কেমন, সরেজমিনে তদন্ত করে আসবে। এলিজাবেথ প্রতিবাদ করল। শুধু জেনেরই খারাপ

লাগবে তা নয়, নিজেরও অন্য কারণ আছে। উইকহ্যামের সঙ্গে দেখা করতে ভয় পায় এলিজাবেথ এবং যত দূর সম্ভব তাকে পরিহার করতে চায় সে।

রেজিমেণ্ট এখান থেকে পাততাড়ি গুটোচ্ছে শুনে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। একপক্ষকালের মধ্যেই তারা চলে যাবে এখান থেকে। তারা চলে গেলে আর উইকহ্যামকে নিয়ে বিব্রত হতে হবে না। বাড়ীতে কয়েক ঘণ্টা কাটাতে না কাটাতেই ব্রাইটনে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে জোর আলোচনা সুরু হোল। এটা সে লক্ষ্য করল যে, বাবার একটুও ইচ্ছা নেই যাবার, কিন্তু তাঁর উত্তর এমন অস্পষ্ট আর দ্ব্যর্থবোধক যে, মা'র স্বভাব একটুতেই নিরাশ হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যে বাবার মত হবে সে-আশা তিনি ত্যাগ করলেন না।

চল্লিশ

ঐ ক'দিনে যে সব ঘটনা ঘটেছে সে সব জেনকে বলে মন হাল্কা করার লোভ কিছুতেই দমন করতে পারলে না এলিজাবেথ। শেষ অবধি দিদির ব্যাপারটুকু বাদ দিয়েই সে ডার্সির সঙ্গে আলাপের সব কথা বলল বোনকে।

ডার্সি যে ভাবে প্রস্তাব করেছিল তা শুনে দুঃখিত হোল জেন। বেশী দুঃখ পেল ভেবে যে, এলিজাবেথের প্রত্যাখ্যানে ডার্সি কী গভীর মর্মবেদনা পেয়েছে।

—'হয়ত অতখানি নিশ্চিন্ত হওয়া ঠিক হয়নি'—বললে জেন—'কিন্তু কতখানি নিরাশ হতে হোল ভেবে দেখ তুই।'

—'তা সত্যি'—বললে এলিজাবেথ—'কিন্তু আরো অনেক কারণেই তার অনুরাগ অচিরাৎ দূর হবে। তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তুই নিশ্চয়ই দুষবি না আমাকে?'

—'তোকে? না—না।'

—'কিন্তু উইকহ্যামের অত সুখ্যাতি করার জন্য নিন্দা করবে না ত আমায়?'

—'তাতে কি অন্যায় হয়েছে?'

—'আগে শোনো সবটা।'

এলিজাবেথ তখন ডার্সির চিঠির কথা উল্লেখ করল সব। পুনরাবৃত্তি করলে উইকহ্যাম সম্বন্ধে যা-যা লেখা ছিল চিঠিতে। তখন জেনের যা অবস্থা হোল! মানুষের মধ্যে যে কত দূর নষ্টামি থাকতে পারে তাই সে ভাবতে লাগল অবাক হয়ে। ডার্সির কথাতেও পুরো আশ্বস্ত হতে পারলে না সে। ভাবলে কোথাও হয়ত একটু ভুল ঘটেছে। দু'জনের কাউকে সে দোষী করতে চায় না।

—'তা হয় না দিদি। দু'জনকেই ভাল বলতে পার না। এক জনকে বেছে নিতেই হবে। আমি ডার্সির কথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। তুমি যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে পার।'

অনেক পরে জেনের মুখে হাসির রেখা দেখা দিল।

—'কখন যে আমি সব চেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছি জানি না। উইকহ্যাম যে এত মন্দ এ ধারণার অতীত। আর হতভাগ্য ডার্সির ভোগান্তির কথা একবার ভেবে দেখ। এই রকম হতাশা। এর সঙ্গে আবার তোমার কু-ধারণা। তুই যদি একটু একটু ভাবিস তোরও দুঃখ হবে।'

—'তোমার দেখে, আমার অনুকম্পা ও পরিতাপ উবে গেছে তুমি তার উপর ন্যায়বিচার করবে নিশ্চয়ই, সুতরাং আমি তার সম্বন্ধে উদাসীন, নির্লিপ্ত হতে পারি অনায়াসে। তোমার আতিশয্য আমায় কৃপণ করে তুলেছে। তুমি যদি আরো বেশী মমতা দেখাও তা'হলে আমার মনে আর কোন ভার থাকবে না।'

—'উইকহ্যামের কথা ভাবছি। এত ভালমানুষি তার মুখে। আচার-আচরণ এত সাদাসিদে নম্র।'

—'ওদের শিক্ষা-দীক্ষায় নিশ্চয়ই কোথাও বড় রকম গলদ ঘটেছে। এক জন সততার প্রতিমূর্তি আর এক জন সততার মুখোস মাত্র।'

—'আমার চোখে কিন্তু কোন দিনই ডার্সির শালীনতার অভাব কটু হয়ে ওঠেনি তোমার মত।'

—'তুই যখন প্রথম চিঠিখানা পড়লি এই রকম ভাবতে পেরেছিলি তখন? পারিসনি নিশ্চয়।' বললে জেন।

—'তা পারিনি ঠিক। কেমন যেন অস্বস্তি। অসুখীই বলতে পার। মনের কথা বলব এমন কেউ নেই। এমন কেউ ছিল না যে সান্ত্বনা দেয়। তখন কেবল কামনা করতাম—তুই যদি কাছে থাকতিস্।'

—'দুর্ভাগ্য যে, উইকহ্যাম সম্বন্ধে তুমি অত কটু কথা বলেছ ডার্সিকে। উচিত হয়নি এখন তা বুঝতে পারছ।'

—'নিশ্চয়। আমি এত দিন যে ভুল ধারণা পোষণ করতাম তার স্বাভাবিক পরিণতিই ঐ কটূক্তি। একটি বিষয়ে তোর উপদেশ আমি চাই। আমাদের পরিচিত সকলকে উইকহ্যামের সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া উচিত হবে কি না।'

জেন চুপ করে রইল খানিকক্ষণ, তার পর বলল—'আমার মতে এই ভাবে সমাজে তার মুখোস খুলে দেওয়া উচিত হবে না। তোর মত কি?'

—'আমারও তাই মনে হয়। ডার্সি এ সব কথা সাধারণ্যে প্রকাশের অনুমতি দেয়নি আমাকে। বরং তার বোন সম্বন্ধে যা-যা বলেছে দু'কান না করি এই তার ইচ্ছে। এখন তার সম্বন্ধে লোকের ভুল ধারণা ভাঙতে গেলে লোকে আমায় বিশ্বাস করবে কেন? ডার্সি সম্বন্ধে লোকের মন এতই বিরূপ যে, তার সম্বন্ধে ভাল ধারণা সৃষ্টি করতে মেরীটনের অর্ধেক লোককে গঙ্গাযাত্রা করাতে হবে। আমার সে ক্ষমতা নেই। উইকহ্যাম শীগগির চলে যাচ্ছে এখান থেকে। কাজেই সে লোকটা কেমন তা নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাতে যাবে না। এক সময় তার মুখোস খুলে যাবেই—তখন সবার এ কথাটা আগে না জানার বোকামি দেখে আমরা বরং হাসব। এখন মুখ বন্ধ রাখাই শ্রেয়।'

—'ঠিক বলেছিস। তার ক্রটি-বিচ্যুতির কথা সাধারণ্যে প্রকাশ করলে তার চিরকালের মত সর্বনাশ করা হবে। হয়ত কৃতকর্মের জন্য এখন সে অনুতপ্ত—হয়ত সে নিজেকে শোধরাবার চেষ্টা করছে। আমাদের তাকে মরীয়া করে তোলা উচিত হবে না।'

এলিজাবেথের মানসিক উত্তেজনা প্রকাশিত হোল এই ভাবে। দু'টো গোপন কথার বোঝা সে নামিয়ে ফেলতে পারলে, যা একপক্ষকাল যাবৎ চেপে ছিল তার উপর। এ সম্বন্ধে আবার যখন সে কিছু বলতে চাইবে, জেনকে সে আগ্রহশীল শ্রোতা হিসেবেই পাবে সব

সময়। কিন্তু এখনও মনের অন্তরালে আরো অনেক কিছু লুকানো আছে যা প্রকাশ করতে তার বিচার-বুদ্ধি তর্জনী তুলে আছে। ডার্সির চিঠির আর অর্ধেকটা সে বলতে সাহস করল না জেনকে—ডার্সির বন্ধু যে জেন সম্বন্ধে কত উঁচু ধারণা পোষণ করে সে কথাও জানাল না তাকে। দু' পক্ষের মধ্যে যথার্থ বোঝাবুঝির পালা সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত এ রহস্যের জাল ছিন্ন করতে পারবে না সে।

এলিজাবেথ এত দিনে অনেকটা শান্ত হয়ে বসতে পেরেছে বাড়ীতে। এবার দিদিকে পর্যবেক্ষণের পর্যাপ্ত অবসর পেল সে। জেনের মনে সুখ নেই। বিংলের প্রতি এখনও তার মধুর অনুরাগ রয়েছে। এই তার প্রথম অনুরাগ, তার বয়স, তার মনের কাঠামো সব কিছু মিলে সেই প্রথম প্রেমকে একটা গভীর মুগ্ধতা দিয়েছে। গভীর নিষ্ঠায় আজো পূজা করে মনের দেবালয়ে—সকলের চেয়ে উঁচুতে বসিয়ে রেখেছে ভালবাসার মানুষকে।

এক দিন মা এলিজাবেথকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আচ্ছা, বল তো জেনের ব্যাপারটা কি? আমি তো এ সম্বন্ধে আর কাউকে কিছু বলব না স্থির করে ফেলেছি। আমার বোনকেও সে কথা বলেছি সেদিন। লণ্ডনে জেনের সঙ্গেও বিংলের দেখা হয়েছে শুনিনি। ছেলেটি আদৌ ভাল নয়—ওকে পাবার আর বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। গরম কালেও যে সে নেদারফিল্ডে ফিরে আসবে সে রকম কানাঘুষাও তো শুনতে পাই না। যারা জানে তাদের সবাইকেই জিজ্ঞেসা করেছি।'

—'আমারও বিশ্বাস, নেদারফিল্ডের বাস সে চিরকালের মত উঠিয়ে দিয়েছে।'

—'তার মন যা চায় করুক। এখানে আসুক কেউ চায় না। তবে এ কথা আমি বলব, আমার মেয়ের প্রতি সে খারাপ ব্যবহার করেছে। আমি যদি জেন হতাম কখনই সহ্য করতাম না। আমার ধারণা, জেন মনের দুঃখে মারা যাবে—তখন সে কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত হবে।'

কিন্তু এলিজাবেথ এ রকম সম্ভাব্য পরিণতিতে সান্ত্বনা পেল না। তাই চুপ করে রইল—কোন উত্তর করল না।

একটু থেমে মা আবার বললেন—'কলিন্সরা বেশ সুখে আছে না রে? আহা, তাই যেন হয়। কেমন ঘর-কন্না করছে ওরা। শার্লটি ভারী গুছোনো মেয়ে। ওর মা'র মত অর্ধেক চালাকও যদি হয় তো খুব জমাতে পারবে। ওদের ঘর-কন্নায় বিলাসিতার স্থান নেই।'

—'তা নেই'—

—'ভাল গিন্নীপনার উপর সবই নির্ভর করে। ওরা বাজে খরচা করবে না। কোন দিন ওদের কষ্ট হবে না। খুব সুখে থাকতে পারবে। তোমাদের বাবা দেহ রাখলে এ সম্পত্তি যে ওদেরই হবে সে কথা নিয়েও নিশ্চয় খুব আলোচনা করে। এটাকে ওরা নিজেদের সম্পত্তি বলেই মনে করে, তা সে যবেই হাতে আসুক না কেন।'

—'এ সব কথা আমার সামনে বলবে কি করে।'

—'তা বলবে না অবিশ্যি। তবে নিজেদের মধ্যে যে আলোচনা করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। যে সম্পত্তি তাদের নয় তা নিয়ে ওরা যদি সুখী হয়, হোক। এ রকম ভাবে কোন সম্পত্তি হস্তগত করতে হলে আমি তো লজ্জায় মরে যেতাম।'

একচল্লিশ

এক সপ্তাহ দেখতে দেখতে কেটে গেল এখানে। মেরীটনের সৈন্য-শিবিরের দিনও যত শেষ হয়ে এল, মেয়েদের মুখও মলিন হয়ে উঠল। একমাত্র বেনেট-গিন্নীর বড় মেয়ে দু'টি যা দু'টো কিছু দাঁতে কাটতে, ঘুমোতে পারছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তাদের ব্যাঘাত ঘটছে না কোথাও। কিটি-লিডিয়ার কিন্তু দুঃখের সীমা নেই। তারা ভাবতেই পারে না, বাড়ীর অন্য সবাই এত নিষ্ঠুর হতে পারে কি করে!

—'হায় ভগবান! আমাদের কি হবে? আমরা থাকব কি নিয়ে?' প্রায়ই দুঃখের তীব্রতায় আক্ষেপ করে ওঠে তারা—'লিজি, তুই ঐ রকম হাসতে পারছিস?'

স্নেহময়ী মা একমাত্র তাদের দুঃখে সমব্যথী—পঁচিশ বছর আগে তাঁকেও এক দিন এমনি ধারা দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল—মনে পড়ে যায় সব কথা। তিনি গল্প করেন—'আমার মনে আছে, কর্ণেল মিলারের রেজিমেণ্ট চলে গেলে আমি দু'দিন ধরে কেঁদেছিলাম। মনে হয়েছিল বুক বুঝি ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যাবে।'

—'আমাদেরও তাই হবে'—লিডিয়া বলে।

—'ব্রাইটনে যেতে পারলে ভাল হোত'—মন্তব্য করেন মা।

—'ঠিক বলেছ মা। কিন্তু বাবা যে রাজী নন।'

—'সমুদ্র স্নানে শরীর সারত।'

—'ফিলিপ মেসো বলেছেন আমারও খুব উপকার হবে।' যোগ করল কিটি।

লংবোর্ণ-গৃহে এমনি ধারা বিলাপের সুর দিবা-রাত্রি গুঞ্জরিত হতে লাগল। এলিজাবেথকেও ওরা দলে টানতে চেষ্টা করে। কিন্তু আনন্দবোধ তার লজ্জায় পরিম্লান হয়ে যায়। ডার্সির আপত্তির সারবত্তা নতুন করে উপলব্ধি করে সে। বন্ধুর ব্যাপারে মাথা গলানোর জন্য এমন ভাবে ক্ষমাবোধ আর কখনো করেনি সে। কিন্তু লিডিয়ার দুঃখের মেঘ শীগগিরই কেটে গেল। কর্ণেল ফর্ষ্টারের স্ত্রীর কাছ থেকে একখানি আমন্ত্রণ-লিপি পেল সে ব্রাইটনে আসার। প্রিয় বান্ধবীটির কিছু দিন হোল বিয়ে হয়েছে মাত্র। হাসি-ঠাট্টা আর আমোদপ্রিয়তা দু'জনকে আকৃষ্ট করেছে পরস্পরের প্রতি এবং তিন মাসের মেলা-মেশায় খুবই ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিল তারা।

এক দিকে লিডিয়ার উল্লাস, মিসেস্ ফর্ষ্টারের প্রশংসা ও মিসেস্ বেনেটের আনন্দ। আর এক দিকে কিটির আশাভঙ্গজনিত বেদনা।

—'আমি তো ভাবতেই পারি না, মিসেস্ ফর্ষ্টার লিডিয়ার মত আমায় কেন নেমন্তন্ন করলে না।' বললে সে—'যদিও আমি তার প্রিয় সই নই। নেমন্তন্ন পাওয়ার আমারও তো অধিকার আছে—তার চেয়ে আমি দু'বছরের বড়।'

এলিজাবেথ কিন্তু তা ভাবছিল না। তার মতে লিডিয়ার পক্ষে এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করা অত্যন্ত ঘৃণার্হ হবে। তাকে যেতে নিষেধ করার কথা বাবাকে গোপনে গোপনে না বলে পারলে না সে। লিডিয়ার অসঙ্গত চাল-চলন সম্বন্ধেও সে অভিযোগ করল—'মিসেস্

ফর্ষ্টারের মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব দ্বারা কোনই উপকার হবে না তার, বরং ব্রাইটনে এই রকম সাহচর্যে সে আরো বেশী গোল্লায় যাবে—বাড়ীর চেয়ে সেখানে প্রলোভনের মাত্রা আরো বেশী।'

বাবা খুব মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনে বললেন—'লিডিয়া যতক্ষণ না নিজেকে লোক-সমাজে জাহির করতে পারছে, ততক্ষণ কিছুতেই শান্ত হবে না সে। আর নিখরচায় এমন সুবিধা আর কিছুতেই তো সম্ভব নয়।'

—'কিন্তু লিডিয়ার অসতর্ক আচরণে যে নিন্দা উঠবে এবং উঠেছেও, তা যদি তুমি খবর রাখতে বাবা, নিশ্চয়ই তুমি অন্য রকম বলতে।'

—'নিন্দা উঠেছে?' এলিজাবেথের কথার প্রতিধ্বনি করলেন মিঃ বেনেট—'তোমাদের রাজ্যে সে বুঝি ভাঙ্গন ধরিয়েছে? মুশড়ে পড়ো না মা। লিডিয়ার আচরণে যে সব যুবকদের মন ভেঙ্গেছে তাদের একটা তালিকা আমায় দিও তো।'

—'তুমি ভুল বলছ বাবা! তুমি যদি এখন তার এই উচ্ছৃঙ্খলতাকে সংযত করতে চেষ্টা না কর এবং অফিসারদের পিছু-ধাওয়া মনোবৃত্তিই যে তার জীবনের উদ্দেশ্য নয় যদি এ না বোঝাও, পরে সে সমস্ত শাসনের বাইরে চলে যাবে একেবারে। এইটাই তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। সংসারের মুখে চুণকালি দেবে—। কিটিরও সে ভয় আছে। সে লিডিয়ার অনুগামী। উদ্ধত, বুদ্ধিহীন, অলস এবং কোন প্রকার শাসনের ধার ধারে না। এ রকম হলে যেখানেই যাবে, পরিচিত মহলে সর্বত্র তারা নিন্দিত, অবজ্ঞাত হবে এবং তার বোনেদেরও অপমানের শেষ থাকবে না।'

মিঃ বেনেট মেয়ের গভীরতা লক্ষ্য করে পরম স্নেহভরে তার হাত দু'টি নিজের হাতে নিয়ে বললেন—'এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না মা। তুমি আর জেন যেখানেই যাবে সবাই তোমাদের সম্মান করবে,—মর্যাদা দেবে। তোমাদের এই তিনটি নির্বোধ বোনের জন্য একটুও অসুবিধায় পড়তে হবে না। লিডিয়া ব্রাইটনে যেতে না পারলে লংবোর্ণে একটুও শান্তি থাকবে না। কর্ণেল ফর্ষ্টার বুদ্ধিমান লোক—সত্যিকারের বিপদ থেকে নিশ্চয়ই তিনি তাকে আগলে রাখবেন। আর সৌভাগ্য বশতঃ ওর অর্থের পুঁজি এত কম যে, কারুর শিকারে পরিণত হবে না ও। বরং সেখানে গিয়ে নিজের হীনতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আসুক। যাই হোক, সে এমন কিছু খারাপ হতে পারবে না, যাতে না আমরা তাকে আজীবন তালা-চাবী বন্ধ করে রাখতে বাধ্য হব।'

এই উত্তরের পর এলিজাবেথকে বাধ্য হয়েই চুপ করে যেতে হয়, কিন্তু তার মতের একটুও পরিবর্ত্তন হয় না। নিরাশ ও দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে সে বিদায় নিল। একই বিষয় টানাপোড়েন করে বিরক্ত করে তোলা স্বভাব নয় এলিজাবেথের। নিজের কর্ত্তব্য সে করেছে এই তার শান্তি।

মা বা লিডিয়া বাপের সঙ্গে তার আলোচনার কথা লেশ মাত্র জানতে পারত যদি, তা'হলে তাদের ক্রোধ সংযুক্ত বকবকানির দাপটেও সম্পূর্ণ প্রকাশ হোত কি না সন্দেহ। লিডিয়ার কল্পনায় ব্রাইটনে যেতে পারার অর্থই হোল হাতে স্বর্গ পাওয়া। কল্পনার নেত্রে সে দেখতে পাচ্ছে, সেই স্নান-তীর্থের উজ্জ্বলন্ত প্রতিটি রাস্তা-ঘাট অফিসারে গম্‌গম্ করছে। এখন না জানা থাকলেও অন্ততঃ দশ-বার জনের মধ্যমণি হবে সে। ক্যাম্প-জীবনের সকল প্রকার আনন্দ-উৎসব উচ্ছলিত সেখানে—তাঁবু পড়েছে সারি সারি—তরুণ অফিসাররা ঝকঝকে পোষাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—সে নিজেও একটি তাঁবুর ছায়ায় বসে—একসঙ্গে ছয়-ছয় জন অফিসারের সঙ্গে রঙ্গরসে মত্ত।

যদি সে জানতে পারত তার দিদি তাকে এই সব সুখ-স্বপ্ন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, তা'হলে কী ভীষণ উত্তেজনার ব্যাপার হোত? একমাত্র মা-ই তাদের সমদরদী—তিনিই একমাত্র তাদের মনের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন।

কিন্তু যবনিকার অন্তরালে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং যাওয়ার আগের দিন পর্যন্ত উল্লাসের স্রোত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে লাগল।

উইকহ্যামের সঙ্গে এলিজাবেথের এই শেষ দেখা। বাড়ী ফিরে আসার পর অনেক দিন সাক্ষাৎ হয়েছে তার সঙ্গে—এত দিনে উত্তেজনাও প্রশমিত হয়ে এসেছে অনেকটা। যে মার্জিত আচরণ প্রথম প্রথম তার মন প্রসন্নতায় ভরে দিত, এখন যেন তাতে কৃত্রিমতার খোলস দেখতে পেল সে। তার প্রতি আচরণে নতুন করে বিতৃষ্ণার ভাব উদিত হোল—তার অলস নির্বোধ প্রেম-পূজার পাত্রী হওয়ায় আর যেন আনন্দ লাগে না মনে।

মেরীটনে অবস্থানের শেষ দিন উইকহ্যাম ও অন্যান্য অফিসারদের লংবোর্ণে নিমন্ত্রণ ছিল। খুশী মেজাজেই এলিজাবেথ তার কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইল। হান্সফোর্ডে সময় কেমন কেটেছে জানতে চাওয়ায় এলিজাবেথ জানাল, ডার্সি ও ফিজ উইলিয়ম তিন সপ্তাহ রোজিংসে কাটিয়ে গেছে। ফিজ উইলিয়মের সঙ্গে তার পরিচয় আছে কি না জানতে চাইল এলিজাবেথ।

উইকহ্যাম বিস্মিত, অসন্তুষ্ট ও ভীত দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। তার পর এক মুহূর্ত ভেবে, মুখে হাসি টেনে বলল—আগে প্রায়ই দেখা হোত বটে। অতি ভদ্রলোক সে। এলিজাবেথের কেমন লেগেছে তাকে? উত্তরটা যে ফিজ উইলিয়মের অনুকূলে হোল সন্দেহ নেই। একটা ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়ে উইকহ্যাম বললে—'কত দিন সে রোজিংসে ছিল?'

—'প্রায় তিন সপ্তাহ'—

—'রোজই দেখা হোত তার সঙ্গে?'

—'প্রায় রোজ'—

—'ডার্সির তুলনায় তার আচরণ সম্পূর্ণ আলাদা?'

—'হ্যাঁ, সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু ডার্সিরও ব্যবহার বেশী ঘনিষ্ঠতায় পাল্টে যায়।'

—তাই না কি।'—উইকহ্যামের মুখে এমন একটা ভাব হোল যা এড়াল না এলিজাবেথের দৃষ্টি।

—'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?' কিন্তু কি ভেবে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আর একটু মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল উইকহ্যাম—'তার কথাবার্তা মার্জিত হয়েছে, না সাধারণ আচরণে সৌজন্যবোধ বেড়েছে? আমার তো মনে হয় না, মূলগত তার কোন উন্নতি হয়েছে?' শেষের কথাটা সে অপেক্ষাকৃত নীচু ও গম্ভীর গলায় বলল।

—'না, মানুষটার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে'—বললে এলিজাবেথ।

এলিজাবেথের কথায় আনন্দিত হবে, না তাকে অবিশ্বাস করবে ভেবে যেন ঠিক করতে পারছে না উইকহাম। এলিজাবেথের মুখের দিকে শংকিত উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে সে তার কথা শুনতে লাগল।

এলিজাবেথ বলতে থাকে—'তার উন্নতি ঘটেছে বলায় তার মন বা আচরণের উৎকর্ষতা ঘটেছে এ বোঝাতে চাইনি আমি—আমি বোঝাতে চেয়েছি, ঘনিষ্ঠতায় তাকে আরো গভীর ভাবে বোঝবার অবকাশ ঘটেছে।'

উইকহামের ভয় আরো পুঞ্জীভূত হোল—চোখ-মুখ উত্তেজনায় হয়ে উঠল উদ্‌গ্রীব। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে, যেন নিজের সমস্ত বিভ্রান্তি ঝেড়ে ফেলে মধুকণ্ঠে প্রশ্ন করল সে—'ডার্সির প্রতি আমার মনোভাব তুমি জান। সে যদি ভাল করারও ভাণ করে তা'হলে আমার কত আনন্দ হবে তুমি বুঝতে পারছ। তার এ গর্ব-বোধে নিজের না হোক অন্যের যথেষ্ট উপকার হবে। এ গর্ব-বোধ তাকে অন্যায় আচরণ থেকে রক্ষা করবে—যে অন্যায় আচরণ আমার প্রতি সে করেছে। যে সতর্ক আচরণের কথা তুমি বলছ, আমার ভয় হয়, লেডী ক্যাথারিনের গৃহে আসার জন্যে সে সেটুকু করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ তার মতামত ও বিচার-বিবেচনাকে সে ভয় করে; আমরা যখন একসঙ্গে ছিলাম তখনও এই ভয় কাজ করত। তাড়াতাড়ি মিস্ দ্য বুর্গের সঙ্গে বিয়েটা পাকাপাকি করতেও উদ্‌গ্রীব সে।'

এ কথা শুনে এলিজাবেথ হাসি দমন না করে পারলে না, কিন্তু সে মাথাটাকে সামান্য কাৎ করে এর উত্তর দিল। সে বুঝতে পারলে উইকহাম তার পুরানো ক্ষতের বিষয়ে আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত করতে চায়, কিন্তু সে আলোচনায় কোন অভিরুচি নেই তার। বিকেলের বাকি অংশটা উইকহাম প্রফুল্লতার ভাণ করে কাটাল, কিন্তু এলিজাবেথের প্রতি আর বিশেষ মনোযোগ দিতে চেষ্টা করল না। স্বাভাবিক সৌজন্যের সহিত তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল—সম্ভবতঃ আর জীবনে যাতে দেখা না হয় এমনি একটা ইচ্ছা নিয়ে।

পার্টির শেষে লিডিয়া মিসেস্ ফর্ষ্টারের সঙ্গে মেরীটনে গেল, সেখান থেকে পরদিন সকালে যাত্রা করবে ব্রাইটনের উদ্দেশ্যে। গৃহ থেকে তার বিদায় নেওয়ার মধ্যে দুঃখের চেয়ে হৈ-চৈএর মাত্রাটাই হোল বেশী। একমাত্র কিটি চোখের জল ফেলল। কিন্তু তার চোখের জল ক্ষোভের, ঈর্ষার। মা মেয়ের সুখ কামনা করলেন অকুণ্ঠিত উচ্ছ্বাসে—এলিজাবেথ ও জেনের বিদায়-ভাষণ উচ্চারিত গেল কিন্তু শোনা গেল না।

বিয়াল্লিশ

আপন পারিবারিক জীবন থেকে যদি আদর্শ অনুসন্ধান করত এলিজাবেথ, তবে বিবাহিত সুখের কোন মনোরম ছবি তার মনশ্চক্ষে জাগত না। তরুণ বয়সে একটি কুমারীর তরুণিমা ও যৌবনের মোহে মুগ্ধ হয়ে বাবা তার মাকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু মায়ের পিছিয়ে-থাকা মন এবং দুর্বলচিত্ততা বিবাহোত্তর জীবনের সুরুতেই ধরা পড়ায় তাঁদের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন দৃঢ় হতে পারেনি। বাবার মন থেকে শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও বিশ্বাসের সবটুকু দূরে সরে গেল আর গেল বিবাহিত জীবনের সুখ-শান্তির প্রত্যাশা। কিন্তু যে সব পুরুষ নিজেদের দূরদৃষ্টির অভাবের দরুণ জীবনের সুখের আশার মূলে কুঠারাঘাত ক'রে পরে অন্য ভাবে সেই সকল সুখ উপভোগ করার উপায় দেখেন, এলিজাবেথের বাবা সে শ্রেণীর মানুষ ছিলেন না। পল্লী ও গ্রন্থ ছিল তার প্রিয়। সেখান থেকেই তিনি জীবনের আনন্দ খুঁজে পেতেন। স্ত্রীর কাছ থেকে তার পাওনা ছিল না কিছুই। তার জন্য তিনি দুঃখও করতেন না। প্রকৃত দার্শনিক মানুষের মত সহজে সব কিছু মেনে নিয়েছিলেন।

বাবার এই নিস্পৃহতা এলিজাবেথের চোখে পড়ত। বুক তার বেদনায় টনটন করে উঠত। বাবা বিবাহিত জীবনের কোন সৌজন্য পালন করেন না, এমন কি নিজের মেয়েদের কাছে তাদের মাকে ছোট করে তোলেন, এই বেদনাপূর্ণ ত্রুটির জন্য বাবার বিরুদ্ধে তার অনেকখানি ক্ষোভ জমা থাকলেও, বাবার স্নেহময় ব্যবহারের জন্য এলিজাবেথ তাঁর দোষ-ত্রুটি না ভুলে থাকতে পারে না। তবু আজকের মত এমন করে আর কোন দিন তার মনকে এই চিন্তা ভারাক্রান্ত করেনি যে, অসুখী বিবাহের পরিণাম কি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে!

উইকহামের বিদায়ে মনের ভিতর যে তৃপ্তিটুকু জমে উঠেছিল সেইটুকু ভিন্ন সেনা-শিবির গুটিয়ে নেওয়ার কারণে আর কোন আনন্দ রইল না। বরং আগেকার মত পার্টিতে আর জৌলুস রইল না। বাড়ীর ভিতর মা ও দিদির চারি পাশে জমাট হয়ে ওঠা নৈরাশ্য ও একঘেয়েমিতে যেন পারিবারিক আবহাওয়াই বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

চলে যাওয়ার সময় লিডিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সে প্রায়ই চিঠি লিখবে বাড়ীতে সেখানকার খুঁটিনাটি খবর দিয়ে। কিন্তু আজকাল তার চিঠি আসে কদাচিৎ। যাও আসে তা সংক্ষিপ্ত। মায়ের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে থাকে, এইমাত্র সে লাইব্রেরী থেকে ফিরেছে অমুক অমুক অফিসারের সঙ্গে আলাপ করে। খবর দেয় যে, এখানকার অলঙ্কার সব দেখে তার চোখ আর ফিরতে চায় না। নতুন একটি গাউন করিয়েছে সে। বড়ো তাড়াতাড়ি। মিসেস্ ফর্ষ্টার তাকে ডাকছে, ক্যাম্পে যাবার বেলা হয়ে যাচ্ছে। পরে এক সময় সে মাকে গাউনের বর্ণনা লিখে পাঠাবে নিশ্চয়ই। অন্য বোনেদের কাছে লেখা চিঠিতে খবর থাকে আরো কম! কিটিকে যা সে লেখে তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভবপর হয় না মায়ের পক্ষে।

দিনে দিনে সপ্তাহ গড়িয়ে যায়। লিডিয়া চলে যাবার তিন সপ্তাহ পর থেকে লংবোর্নে আবার হাসি, আনন্দ ও জীবনের স্রোত ফিরে আসতে সুরু করে। যে সব পরিবার শীতে সহরে গিয়েছিল, তারা আবার নূতন গ্রীষ্মের আতপে ফিরে এসে পল্লীকে কলরব-মুখর করে তোলে। মিসেস্ বেনেটের নিরিবিলি জীবনের অবসান ঘটে। কিটি নূতন করে আবার হাসে।

এ বৎসর মামীর সঙ্গে লেকে গিয়ে কাটিয়ে আসার কথা ছিল এলিজাবেথের। কিন্তু তাদের বিশেষ কাজ পড়ে যাওয়ায় অত দূর অবধি যাওয়া সম্ভব হবে না বলে মামী জানিয়ে দিলেন আর সেই সঙ্গে জানালেন যে, এবারকার মত তাঁরা ডার্বিশায়ার অবধিই যাবেন।

এলিজাবেথের মনোভঙ্গের কারণ ঘটল গোড়াতেই। লেকের নৈসর্গিক সৌন্দর্য তার মনকে রোমাঞ্চিত করে রেখেছিল কল্পনায়, তার পরিবর্তে ডার্বিশায়ারে তার জন্য কি নাটকীয় সংঘাত অপেক্ষা করে আছে, সে কথা ভাবতে তার মন নৈরাশ্যে ভেঙে পড়তে লাগল। কিন্তু ভেঙে পড়বার মত মেয়ে এলিজাবেথ নয়। সব কিছুর মধ্যেই খুসীর খোরাক সংগ্রহ করে নেবার এক দুর্লভ শক্তি ছিল তার প্রকৃতিতে। সেই শক্তিই বিজয়িনী হল।

মামী এলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাকেও তুলে নিতে। মাত্র এক রাত্রি আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁরা পরদিন সকালেই লংবোর্ণ ত্যাগ করে গেলেন। এই স্নেহশীল পরিবারটির এক জন হয়ে যাওয়ার মত আনন্দ আর কি! এলিজাবেথ ভাবলে, যে সঙ্গ-সুখ মানুষকে দুঃখ-অসুবিধা ভুলিয়ে দেয় সেই রকম এক স্নেহ-পরায়ণ সান্নিধ্য সে পাবে এবারকার ভ্রমণে। যদি সেখানে তার জন্য কোন দুঃখ প্রতীক্ষা করেও থাকে, মামীমা'র স্নেহচ্ছায়ায় সে দুঃখের তীব্রতা হ্রাস পাবে নিশ্চয়ই।

এইখানেই ডার্সির জমিদারী। পেম্বার্লির এক বাসায় তারা থাকবে কয়েক দিন। এই এক চিন্তা এলিজাবেথের মনকে সংশয়ে কণ্টকিত করে লাগল, যদি দেখা হয় তার সঙ্গে। কি বিশ্রী মনে হবে। চিন্তা মাত্রেই সর্বশরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল এলিজাবেথের। একবার ভাবলে মামীমাকে স্পষ্টই সে বলবে এ-সম্বন্ধে। কিন্তু শেষ অবধি মুখ খুললে না এলিজাবেথ। শেষ অস্ত্র হিসাবে সেটিকে সংবরণ করে রাখলে নিজের গোপন মনে। সুতরাং পেম্বার্লিতে ডার্সির বাসায় একবার নেমে যাওয়াই ঠিক হোল।

রাত্রে দাসীর কাছে কথায়-কথায় কথাটি পাড়লে এলিজাবেথ। কিন্তু যখন শুনলে যে, পেম্বার্লি-প্রাসাদের মনিব বাড়ীতে অবর্ত্তমান, তখন তার মন এক গভীর লজ্জাস্কর পরিণতির আশঙ্কা থেকে মুক্ত হোল।

পেম্বার্লিতে যাবার আর অন্তরায় রইল না।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীশিশির সেনগুপ্ত ও শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

লণ্ডনের প্রথম কমনওয়েলথ লর্ড মেয়র স্যার লেসলী বইশ

সা হি ত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী—চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬৫ বঙ্গ। মৃত্যু—১৮১৪ খৃঃ। পিতা—উমাচরণ লাহিড়ী। গ্রন্থ—হোমিও মতে গৃহচিকিৎসা, ওলাউঠা-চিকিৎসা, নরশরীর-তত্ত্ব, জ্বর-চিকিৎসা, চিকিৎসা-তত্ত্ব, ভৈষজ্যতত্ত্ব, সদৃশ চিকিৎসা, হোমিও-প্যাথীর বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন। সম্পাদক—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (১২৯২), Indian Medical Record.

জগদীশচন্দ্র বসু,—বিজ্ঞানাচার্য। জন্ম—১৮৫৮ খৃঃ ঢাকা-বিক্রমপুরে রাড়ীখাল নামক স্থানে। মৃত্যু—১৯৩৭ খৃঃ। পিতা—ভগবানচন্দ্র বসু। শিক্ষা—বি, এ (কেম্‌ব্রিজ, ১৮৮৪), বি-এস্ সি (লণ্ডন), সি, আই, ই (১৯০২), সি, এস আই (১৯১১), LL. D., D. Sc. (১৯১৪), স্যর (১৯১৬), আই, ই, এস (১৮৮৪-১৯১৫)। অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ, বসুবিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা (১৯১৭), অদৃশ্য আলোক আবিষ্কার, Crescograph যন্ত্র আবিষ্কার (১৯১১), Wireless Telegraphy Sound (১৮৯৪)। গ্রন্থ—Response in the Living and Non-living, Plant Response, অব্যক্ত (১৩২৮)।

জগদীশচন্দ্র বসু—সাংবাদিক ও প্রকাশক। জন্ম—১৮৯৭ খৃঃ ৭ই ফেব্রুয়ারী কাঁথি, মেদিনীপুর। পিতা—জ্ঞানদাচরণ বসু (রায় সাহেব) শিক্ষা—বি. এ (১৯২২)। সহ-সম্পাদক—Planters Journal and Agriculturist (১৯২১)।

জগদীশ্বর গুপ্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৫২ বঙ্গ ভাদ্র, নদীয়া জেলায় মেহেরপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৮৯২ খৃঃ, জুলাই। পিতা—গোপীকৃষ্ণ গুপ্ত। শিক্ষা—বি, এ, বি এল। ওকালতী, (দিনাজপুর), মুন্সেফ। গ্রন্থ—চৈতন্য-চরিতামৃত (সটীক), লীলা-স্তবক, চৈতন্য লীলামৃত, রামমোহন রায় চরিত, মেঘদূত (বঙ্গানুবাদ)।

জগবন্ধু ভদ্র—শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক। জন্ম—১২৪৮ বঙ্গ ১৫ই চৈত্র ঢাকা জেলার পানকুণ্ডা গ্রামে। মৃত্যু—১৩১০ বঙ্গাব্দ ফরিদপুরে। পিতা—রামকৃষ্ণ ভদ্র। শিক্ষা—১৮৬২ খৃঃ প্রবেশিকা। এল, এ (১৮৬২ খৃঃ)। শিক্ষকতা—কুমিল্লা, যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর। গ্রন্থ—ছুছুন্দরী-বধ কাব্য (১২৭৫ বঙ্গ), তপতী উদ্বাহ কাব্য (১৮৬৩), ভারতের হীনাবস্থা (১৮৬৬), বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী, গৌরপদতরঙ্গিণী (১৩১০); বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত—বিলাপতরঙ্গিণী কাব্য, বিজয়সিংহ (নাটক), দুর্ভাগিনী, বামা, বঙ্গেশ-রহস্য, দেবল-দেবী (নাটক, ১২৭৭ বঙ্গ)।

জগবন্ধু ভট্টাচার্য—সাহিত্যিক। সম্পাদক—বণিক (১৩৩৩—১৩৩৯)।

জগদ্দেব—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—স্বপ্নচিন্তামণি (আনু ১৬৩০ খৃঃ)।

জগদ্ধর ঠাকুর—টীকাকার। জন্ম—মিথিলায় ১৭ শতাব্দীতে। পিতা—রত্নধর। মাতা—দময়ন্তী। মিথিলারাজের বিচারক। গ্রন্থ—তত্ত্বদীপনী, বাসবদত্তের টীকা, রসদীপিকা (মেঘ-দূতের টীকা), গীতাপ্রদীপ (টীকা), দুর্গাটীকা, মালতীমাধব (টীকা)।

জগদ্রাম—গ্রন্থকার। জন্ম—বাঁকুড়া জেলার শিখরভুমির অন্তর্গত মহিষাড়া পরগনার বুলুই গ্রামে। পিতা—রঘুনাথ রায়। মাতা—শোভাবতী। গ্রন্থ—রামায়ণ (১৭১০ খৃঃ), দুর্গাপঞ্চরাত্র (১৭৭০), আত্মবোধ।

জগন্নাথ—তৈলঙ্গব্রাহ্মণ পণ্ডিত। রাজপুতনার জয়পুরের মহারাজ জয়সিংহের প্রধান জ্যোতিষী। গ্রন্থ—সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ (আরবী ভাষায় 'মিস্তাজী' গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ), রেখাগণিত (Euclid-এর অনুবাদ, ১২৭২)।

জগন্নাথ—গ্রন্থকার ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। গ্রন্থ—দুর্গাপুরাণ, নিগমগ্রন্থ।

জগন্নাথ—বঙ্গীয় কবি। ইনি মনসাদেবীর ভাসান রচকদিগের অন্যতম। গ্রন্থ—মনসার ভাসান।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১১০১ বঙ্গ আশ্বিন (১৬৯৪ খৃঃ) হুগলী ত্রিবেণী। মৃত্যু—১২০৩ বঙ্গ ৪ঠা কার্ত্তিক (১৮০৬ খৃঃ)। পিতা—রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। ইহার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল এবং ইনি বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। গ্রন্থ—অষ্টাদশ বিবাদের বিচারগ্রন্থ (দায়গ্রন্থ), বিবাদভঙ্গার্ণ নব্য ন্যায় (দুষ্প্রাপ্য), রামচরিত (নাটক)।

জগন্নাথ দাস—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। জন্ম—নীলাচলের কপিলেশ্বরপুরে। পিতা—ভগবান পাণ্ডা। মাতা—পদ্মাবতী। গ্রন্থ—প্রেমসাধন, ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল, দূতীবোধ।

জগন্নাথ দাস—পদকর্তা। জন্ম—উৎকল প্রদেশ। গ্রন্থ—রসোজ্জ্বল।

জগন্নাথ দাস—কবিওয়ালা। ইনি যজ্ঞেশ্বর ধোপা নামে পরিচিত। জন্ম—১৯শ শতাব্দী ঘাঁটাল, মেদিনীপুর। ইঁহার রচিত বিবিধ কবিগানের মধ্যে 'জাড়া গোলক বৃন্দাবন' ও প্রতিপক্ষ হরিবোল দাসের 'কি বলে বললি জগা জাড়া গোলক বৃন্দাবন' গান দুইটি বাংলার সুপ্রসিদ্ধ কবি-সঙ্গীত।

জগন্নাথ দ্বিজ—বঙ্গীয় কবি। জন্ম—দিনাজপুর। গ্রন্থ—দিনাজপুরের কবিতা, সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ—আলঙ্কারিক পণ্ডিত। গ্রন্থ—রস-গঙ্গাধর (অলঙ্কার), পীযূষলহরী (স্তোত্র), ভামিনীবিলাস (কাব্য), চিত্রমীমাংসাখণ্ডন, মনোরমাকুচমর্দন।

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক—সঙ্গীত-রচয়িতা। জন্ম—হাওড়া জেলার অন্তর্গত আন্দুল গ্রামে ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জমীদার-বংশে। গ্রন্থ—শব্দকল্পতরঙ্গিণী (অমরকোষের বঙ্গানুবাদ—১৮৩১ খৃঃ), শব্দকল্পলতিকা (১৮৩৮)।

জগন্নাথ শর্মা—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অভিধান (১৮৩৮ খৃঃ)।

জগন্নাথ সিংহ শর্মা—কবি। জন্ম—ময়মনসিং জেলার অন্তর্গত সুসঙ্গের রাজবংশে। পিতা—রাজা রাজসিংহ (১১৫৬—১২২৮ বঙ্গ)। কাব্যগ্রন্থ—জগদ্ধাত্রী গীতাবলী।

জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। গ্রন্থ—অভিধান (১৮৪০ খৃঃ)। সম্পাদক—সংবাদ অরুণোদয় (দৈনিক, ১৮৩০)।

জগন্মোহন—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। গ্রন্থ—জ্যোতিঃ সারসাগর।

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার—সংবাদপত্রসেবী। নিবাস—কলিকাতার উপকণ্ঠে বঁড়িশা গ্রামে। পাঠাগার অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ। সম্পাদক—পবিদর্শক (দৈনিক, ১৮৬১), বিজ্ঞান-কৌমুদী (মাসিক, ১৮৬০ খৃঃ), সত্যান্বেষণ (মাসিক, ১৮৬৫); গ্রন্থ—বেণীসংহার (সংস্কৃত, টীকা—১১২৪ শক), কল্কিপুরাণের অনুবাদ (১২৭৭ বঙ্গ)।

জগমোহন—বঙ্গীয় কবি। গ্রন্থ—লক্ষ্মীমঙ্গল।

জগমোহন তর্কালঙ্কার—অনুবাদক। অনূদিত-গ্রন্থ—মহাভারত (১৮৬৭ খৃঃ)।

জগমোহন মিত্র—পালা-রচয়িতা। নিবাস—বঁড়িশার অন্তর্গত গোপালপুর। পিতা—রামচন্দ্র মিত্র। পালাগ্রন্থ—মনসামঙ্গল।

জনমেজয় মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অষ্টাদশমহাপুরাণীয় অনুক্রমণিকা (১৭৭৭ শক)।

জনমেজয় ঘটক—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জ্ঞানতত্ত্বদর্শন।

জনমেজয় মুখোপাধ্যায়—গীতকার। গ্রন্থ—সঙ্গীত-রসার্ণব।

জনার্দন—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। গ্রন্থ—বিবাহপটল (জ্যোতিষ)।

জনার্দন দ্বিজ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চণ্ডীর ব্রতকথা।

জনাব আলি—গ্রন্থকার। ১৩শ শতাব্দী হুগলী জেলার বসা গ্রামে। গ্রন্থ—নকসে সোলেমানি, ফজিলাতে বার চাঁদ।

জমিরুদ্দিন সেখ—কবি। গ্রন্থ—শোকামন (১৩১৬), আসল বাঙ্গালা গজল।

জলধর চট্টোপাধ্যায়—নাট্যকার। গ্রন্থ—অহিংসা, সত্যের সন্ধান, প্রাণের দাবী, ত্রিমূর্তি, রাঙ্গারাখী, অসবর্ণা, আঁধারে আলো, পরের বৌ (১৩৩৮)।

জলধর সেন—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬৬ বঙ্গ ১লা চৈত্র নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে। মৃত্যু—২৬ চৈত্র, ১৩৪৫ কলিকাতা বাগবাজারে। পিতা—হলধর সেন। শিক্ষা—বঙ্গবিদ্যালয়ে (কুমারখালি), মাইনার পরীক্ষা (গোয়ালন্দ স্কুল—১৮৭১), এন্ট্রান্স পরীক্ষা (১৮৭৮), জেনারেল এ্যাসেম্বিজ (১৮৭৯)। ১২৯৭ সালে হিমালয় যাত্রা ও দুই বৎসর পরে প্রত্যাবর্তন। কর্ম—শিক্ষকতা, গোয়ালন্দে, দেরাডুনে, মহিষাদল রাজ বিদ্যালয়ে, বঙ্গবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে, সহকারী সম্পাদক, বসুমতী (১৩০৬), সন্তোষের গৃহ-শিক্ষক। অতঃপর সাহিত্য-সেবায় ব্রতী হন। রায় বাহাদুর উপাধি (১৯২২)। গ্রন্থ—(ভ্রমণ) হিমালয়, (১৩০৭), পথিক (১৩০৮), পুরাতন পঞ্জিকা (১৩১৬), দক্ষিণাপথ (১৩৩৩), মধ্যভারত (১৩৩৬), হিমাদ্রী (১৩১৮), প্রবাস-চিত্র (১৩০৬), হিমাচল বক্ষে (১৩১১)। (গল্প ও উপন্যাস)—পরশপাথর (১৩৩১), ভবিতব্য (১৩৩১), দুঃখিনী (১৯০৯), অভাগী ১ম (১৩২২), ২য় (১৩২৯), ৩য় (১৩৩৯), বড়বাড়ী (১৩২৩), হরিশভাণ্ডারী (১৩২৬), ষোলআনি (১৩২৭), ঈশানী (১৯১৯), দানপত্র (১৩২৯), ছোট কাকী (১৯০৪), পরাণমণ্ডল (১৩২১), এক পেয়ালা চা (১৩২৫), মায়ের নাম (১৩২৪), কাঙ্গালের ঠাকুর (১৩২৮), মুসাফির মঞ্জিল (১৩৩০), সেকালের কথা (১৩৩৭), রামচন্দ্র (১৩৩৭), উৎস (১৩৩৯) শিব-সীমন্তিনি (১৩৩১), বড় মানুষ (১৩৩৬), মায়ের পূজা (১৩৩৪,), চাহার দরবেশ (১৩০৬), নৈবেদ্য (১৩০৭), নূতন গিন্নী (১৩১০), বিশুদাদা (১৯১১), আমার বর (১৩১৯), করিম শেখ (১৩২৯), আলান কোয়াটায়মেন (১৯১০), আশীর্বাদ (১৩২৩), দশ দিন (১৩২৩), পাগল (১৩২৭), কাঙ্গালের ঠাকুর (১৩২৭), চোখের জল (১৩২৭), সোনার বালা (১৩২৮), তিন পুরুষ (১৩৩৪), কাঙ্গাল হরিনাথ(জী) ১ম (১৩২০), ২য় (১৩১১)। শিশুপাঠ্য —সীতা দেবী (১৩১৮), কিশোর (১৩২১), আইসক্রীম সন্দেশ, বাঙ্গালা দ্বিতীয় পাঠ, প্রথম শিক্ষা, শিশুবোধ, নবীন ইতিহাস, বঙ্গগৌরব। সম্পাদিত গ্রন্থ—হরিনাথ গ্রন্থাবলী ১ম (১৩০৮), জাতীয় উচ্ছ্বাস (১৯০৫), প্রমথনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী, ১ম—৩য় (১৩২২-২৩)। সম্পাদক—গ্রামবার্ত্তা (১২৮১-৯২), বসুমতী (সাপ্তাহিক ১৩০৬), হিতবাদী (১৯০৭), ভারতবর্ষ (১৩২০ —১৩৪৫)। সুলভ সমাচার (১৯১১)।

জয়কালী বসু—সাহিত্যিক। সম্পাদক—মহাজন দর্পন (সংবাদপত্র—১৮৪১ খৃঃ)।

জয়কৃষ্ণ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—তত্ত্বসার বা সারপ্রদীপ।

জয়কৃষ্ণ দাস—গ্রন্থকার। প্রকৃত নাম—কেবলরাম। জন্ম—হুগলী জেলার আরামবাগ পরগনায়। পিতা—রামমোহন দাস। গ্রন্থ—শ্রীচৈতন্য-পারিষদ জন্মস্থান নিরূপণ, রসকল্পলতা।

জয়গোপাল গোস্বামী—পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৩৬ বঙ্গ শান্তিপুরে। মৃত্যু—১৩২৩ বঙ্গ। পিতা—রমানাথ গোস্বামী। গ্রন্থ—সাহিত্য-মুক্তাবলী, সীতাহরণ, বাসবদত্তা (অনুবাদ), শৈবলিনী, রত্নযুগল (উপ), চারুকথা, গোবিন্দ দাসের করচা, গণিত বিজ্ঞান, চারুগাথা (১৮৭১)।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার—পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৭৭৫ খৃঃ যশোহর জেলার বরজপুরে। মৃত্যু—১৮৪৪ খৃঃ। পিতা—কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। শিক্ষা—কাশীধামে। কর্ম—কেরী সাহেবের অধীনে শ্রীরামপুরে (১৮০৫), অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ (১৮১৩), সুপ্রীম কোর্টের জজ পণ্ডিত। গ্রন্থ—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত (সংশোধিত), হরিভক্তিবিলাস (বঙ্গানুবাদ), পারসী অভিধান (সংকলন); সম্পাদক—সমাচারদর্পণ।

জয়গোবিন্দ দাস—কবি। জন্ম—(আনু) ১৮০৮ খৃঃ বর্ধমান জেলায় বেণাপুর গ্রামে। মৃত্যু—১২৭৪ বঙ্গাব্দে। পিতা—গোকুলচন্দ্র বসু চৌধুরী। গ্রন্থ—শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত (পদ্যানুবাদ—১২৪১ বঙ্গাব্দ)।

জয়গোবিন্দ দেব—কবি ও সম্পাদক। জন্ম—১৮৫০ খৃঃ মেদিনীপুরের মেল্লাপুর থানার অন্তর্গত মালঞ্চ গ্রামে। মৃত্যু—১৯০০ খৃঃ। গ্রন্থ—ব্রহ্মযামলের অনুবাদ।

জয়গোবিন্দ সোম—সাহিত্যিক। জন্ম—শ্রীহট্টের আথানিয়া গ্রামে। মৃত্যু—১৯০০ খৃঃ। এম, এ, বি, এল (১৮৬৪ খৃঃ)। সম্পাদক—আর্যদর্শন (মাসিক)।

জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ—গ্রন্থকার। সংকলিত গ্রন্থ—মহাভারতের বৃহৎ সূচী (১৩১৯)।

জয়তীর্থ—টীকাকার। গ্রন্থ—গীতাভাষ্য, প্রমেয়দীপিকা (টীকা), ন্যায়দীপিকা (টীকা)।

জয়দেব গোস্বামী—বঙ্গীয় কবি। জন্ম—১২শ শতাব্দীতে বীরভূমের অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব গ্রামে। পিতা—ভোজদেব। মাতা—রমা দেবী। গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ দেবের রাজকবি। কাব্যগ্রন্থ—গীতগোবিন্দ।

জয়দেব—গ্রন্থকার। জন্ম—১২-১৩ শতাব্দী বিদর্ভ দেশ। নামান্তর—পীযুষবর্ষ। পিতা—মহাদেব মিত্র। মাতা—সুমিত্রা। গ্রন্থ—চন্দ্রালোক, প্রসন্নরাঘব (নাটক)।

জয়দেব—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। গ্রন্থ—প্রশ্নবিধি।

জয়দেব—কবি। নিবাস—চট্টগ্রাম। গ্রন্থ—কালিকাপুরাণ (কাব্য)।

জয়দেব দাস—গ্রন্থকার। কাব্যগ্রন্থ—পদ্মলোচনবধ।

জয় নন্দী—আয়ুর্বেদাচার্য। গ্রন্থ—চরকসংহিতার টীকা।

জয়নাথ ঘোষ, মুন্সী—ঐতিহাসিক। গ্রন্থ—রাজোপাখ্যান (কুচবিহারের ইতিহাস)।

জয়নারায়ণ ঘোষাল, মহারাজ—গ্রন্থকার। জন্ম—১১৫১ বঙ্গাব্দ ৩রা আশ্বিন গোবিন্দপুরে (বর্ত্তমান Fort William দুর্গ অধিকৃত স্থানে)। মৃত্যু—১২২৮ বঙ্গ ২৫এ কার্ত্তিক কাশীধামে। পিতা—কন্দর্প ঘোষাল (?)। কলিকাতার উপকণ্ঠে খিদিরপুরে ভূকৈলাস রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মহারাজা উপাধিলাভ (১১৮১ বঙ্গ), তিন হাজার মনসবদার। গ্রন্থ—কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ (১৩১৪), করুণানিধানবিলাস (বাংলা, ১২২০-১২২১), জয়নারায়ণ-কল্পদ্রুম (সংস্কৃত), নবদ্বীপ-পরিক্রমা (সংস্কৃত), শঙ্করী সঙ্গীত (সংস্কৃত), ব্রাহ্মণার্চন চন্দ্রিকা (সংস্কৃত)।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—পণ্ডিত। জন্ম—১৮০৪ খৃঃ ২৪-পরগনা মুচাদি গ্রামে। মৃত্যু—১৮৭০ খৃঃ। পিতা—হরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। কর্ম—অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ। গ্রন্থ—সর্বদর্শনসংগ্রহ (বঙ্গানুবাদ), বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্য, পদার্থতত্ত্বসার।

জয়নারায়ণ দ্বিজ, (মুখোপাধ্যায়)—কবি। গ্রন্থ—দ্বারকা-বিলাস, রাধাবিলাস, রাধাকৃষ্ণবিলাস (১৮৬৮)।

জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—উপষ্টম্ভ (খৃষ্টধর্ম বৌদ্ধধর্মের রূপান্তরতা প্রতিপাদন, ১৮৮৪)।

জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—আর্যপ্রবর (মাসিক, ১৯২৯ সংবত)।

জয়নারায়ণ ভট্টাচার্য—ঐতিহাসিক। গ্রন্থ—পঞ্জাবেতিহাস (১৮৫৪ খৃঃ)।

জয়নারায়ণ রায়—কবি। জন্ম—বিক্রমপুরে ১৮শ শতাব্দী। পিতা—রামপ্রসাদ রায়। গ্রন্থ—চণ্ডীকাব্য।

জয়নারায়ণ লালা—কবি। গ্রন্থ—হরিলীলা (১৭৭২ খৃঃ), চণ্ডীমঙ্গলকাব্য।

জয়নারায়ণ সেন—কবি। গ্রন্থ—চণ্ডীকাব্য।

জয়নোল আবেদীন লোদী—সাহিত্যিক। সম্পাদক—বাহাদুর (১৩৩০-৩১)।

জয়ন্তীচন্দ্র সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বত্রিশ সিংহাসন (১৮৬১)।

জয়পাল দীক্ষিত—পণ্ডিত। গ্রন্থ—মধুকোষ।

জয়পাল সিং—সাহিত্যিক। জন্ম—১৯০৩ খৃঃ ৩রা জানুয়ারি, রাঁচী। শিক্ষা—রাঁচী, অক্সফোর্ড, আই, সি, এস। সম্পাদক—আদিবাসী সজ্ঘ।

জয়রত্ন—জ্যোতির্বিদ্। নিবাস—কাশ্মীর। গ্রন্থ—জ্ঞানরত্নাবলী।

জয়রাম—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—খেচরকৌমুদী, গ্রহখেচর।

জয়রাম—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—রমালামৃত (১৭৪৫ খৃঃ)।

জয়রাম—আয়ুর্বেদবিদ্। গ্রন্থ—চিকিৎসার রত্নসংগ্রহ।

জয়রাম—পণ্ডিত। গ্রন্থ—গীতাসারার্থ সংগ্রহ।

জয়রাম—বঙ্গীয় কবি। গ্রন্থ—গঙ্গামঙ্গল।

জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১৮শ শতাব্দী নবদ্বীপে। গ্রন্থ—ন্যায়সিদ্ধান্তমালা (১৭১৩), তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতিগূঢ়ার্থবিদ্যোতন, শব্দার্থমালা, গুণদীধিতিবৃত্তি, গুণদীধিতি-বিবৃতি, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা, পদার্থমণিমালা, কাব্যপ্রকাশতিলক।

জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—আর্যপ্রবর (১৮৭৪)।

জয়রাম ভট্ট—জ্যোতিষী। গ্রন্থ—জাতককামধেনু (১৬৫০ খৃঃ)।

জয়লক্ষ্মণ—জ্যোতিষী। গ্রন্থ—সিদ্ধান্তশিরোমণি টীকা।

জয়শঙ্কর—আয়ুর্বেদবিদ্। গ্রন্থ—আয়ুর্বেদ-শব্দার্থ, দীপক বা ঔষধনামাবলী।

জয়সিংহ—জৈন গ্রন্থকার। ১৩শ শতাব্দী। গ্রন্থ—হম্মীরমদ-মর্দন (নাটক)।

জয়সিংহ সুরী—জৈন নৈয়ায়িক। ১৪শ শতাব্দী। গ্রন্থ—কুমারপাল চরিত (১৩৬৫ খৃঃ)।

জয়সেন—বঙ্গীয় কুলপঞ্জিকাকার। গ্রন্থ—বৈদ্যকুলচন্দ্রিকা।

জয়াদিত্য—বৈয়াকরণিক। ৭ম শতাব্দী। গ্রন্থ—কাশিকাবৃত্তি।

জয়ানন্দ—জ্যোতিষী। পিতা—মেধাকর। গ্রন্থ—জন্মপদ্ধতি।

জয়ানন্দ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মুহূর্ত্তপ্রদীপ (১৫২৫ সংবত)।

জয়ানন্দ মিশ্র—কবি। জন্ম—১৫১৩ খৃঃ বর্ধমান জেলার আমাইপুরা (অম্বিকা) গ্রামে। পিতা—সুবুদ্ধি মিশ্র। মাতা—রোদনী গ্রন্থ—চৈতন্যমঙ্গল (১৫৫৮- ১৫৭০ খৃঃ), ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র।

জসীম উদ্দিন—কবি। জন্ম—১৯০৩ খৃঃ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত তাম্বুল খানার গোবিন্দপুর গ্রামে। এম. এ.। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী গবেষক। অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রচার-বিভাগে কর্ম করিতেছেন। কাব্যগ্রন্থ—নক্সী কাঁথার মাঠ, রাখালী, বালুচর, সোজনবাদিয়ার ঘাট। ধানক্ষেত, রঙিলা নায়ের মাঝি।

জহরলাল নেহরু—রাজনীতিবিদ্। জন্ম—১৪ই নভেম্বর, ১৮৮৯, এলাহাবাদ। পিতা—মতিলাল নেহরু। ইঁহারা কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। শিক্ষা—Harrow Public School, Cambridge University (Tripos), LL.D. (পাটনা বিশ্বঃ ১৯৪৬, দিল্লী বিশ্বঃ ১৯৪৮), বার-এট্-ল। প্রজা-আন্দোলনে যোগদান (১৮১৯), কারাবাস (১৯২১, ১৯২২), কংগ্রেস সভাপতি (১৯২৯-৩০, ১৯৩৬-৩৭১), কারাবাস (১৯৩১—১৯৩৪, ১৯৪০, ১৯৪৫), ইনি সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা, রুসিয়া ভ্রমণ করেন। ভারত স্বাধীনতা লাভের পর ইনি ভারতের প্রধান মন্ত্রী (১৯৪৭)। গ্রন্থ—Glimpses of World History, ২ খণ্ড (এলাহাবাদ,

১৯৩৪), Autobiography (এলাহাবাদ), Discovery of India, Letters from father to his daughter.

জহিরুদ্দিন আহম্মদ—সাহিত্যসেবী। সম্পাদক—ভিষক্‌-দর্পণ (১৮৯৪—৯৬ খৃঃ)।

জানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—সাংবাদিক। সম্পাদক—হালিশহর পত্রিকা (মাসিক, ১২৭৮)।

জানকীনাথ ভট্টাচার্য—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ১৬শ শতাব্দী নবদ্বীপের নন্দীপাড়ায়। গ্রন্থ—ন্যায়সিদ্ধান্ত মঞ্জরী।

জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—বাসনা (১৩০১-২)।

জানকীবল্লভ বিশ্বাস—সাহিত্যিক। সম্পাদক—পরিচারিকা (১৩৩২)।

জানাল বা জালাল সেখ—কবি। গ্রন্থ—সখীর বার মাস।

জাফর আলি, মোহম্মদ—সাহিত্যিক। সম্পাদক—সবুজ পল্লী (১৩৩৩—৩৫)।

জাবাল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—তন্দ্ররাম (চিকিৎসাগ্রন্থ)।

জাবেদ আলি খোন্দকার—বঙ্গীয় কবি। গ্রন্থ—মধুমালার কেচ্ছা।

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—বীরভূমি (১৩১৭-২০)।

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। ইনি 'শর্মা ব্যানার্জী কো'র মালিক। সম্পাদক—নবযুগ (সাপ্তাহিক—১৩৩১-৩৬)।

জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—সাহিত্যিক। সম্পাদক—প্রভা (১৩০০)

জিন—বৌদ্ধ দার্শনিক। গ্রন্থ—প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কার টীকা।

জিনদত্ত সূরি—জৈন নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ১৩শ শতাব্দী। গ্রন্থ—বিকেকবিলাস।

জিনপদ্ম—জৈন গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বড়্‌ভাষা বিভূষিত শান্তিনাথ স্তবন।

জিনপ্রভসূরি—জৈন আচার্য। ১৩শ শতাব্দী। গ্রন্থ—রাজপ্রসাদ, চতুর্বিংশতি জিনস্তোত্র, ভয়হর স্তোত্রের টীকা।

জিনভদ্র গণিক্ষমাশ্রমণ—জৈন দার্শনিক। জন্ম—৪৮৪ খৃঃ। প্রধান ধর্মাচার্য (৫২৮—৫৮৮ খৃঃ)। গ্রন্থ—বিশেষ-আবশ্যক-ভাষ্য।

জিনেন্দ্র বোধি—বৌদ্ধ স্থবির ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত। গ্রন্থ—বিশালমলবতীনামপ্রমাণসমুচ্চয় টীকা।

জীব গোস্বামী—বৈষ্ণব ভক্ত ও গ্রন্থকার। জন্ম—বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ নামক স্থানে। মৃত্যু—১৬১৮ খৃঃ। পিতা—বল্লভ গোস্বামী। ইঁহারা কর্ণাটের অধিপতি বিপ্ররাজের বংশোদ্ভব। ইনি বৃন্দাবনে প্রায় ৬৫ সংসর বাস করেন। গ্রন্থ—ষটসন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভ, হরিণামামৃত-ব্যাকরণ, গোপালবিরুদাবলী, কৃষ্ণার্চনদীপিকা, মাধব-মহোৎসব, সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ, সূত্রমালিকা, চম্পু, লঘুতোষিণী।

জীবনকৃষ্ণ মাইতি—সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৮০ খৃঃ মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার অন্তর্গত বেলবনী গ্রামে। মৃত্যু ১৯৩৬ খৃঃ ১০ই আগষ্ট। পিতা—প্রাণকৃষ্ণ মাইতি। শিক্ষা—বি, এ, বি-টি। শিক্ষক, কাঁথি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় (১৯০৭—১৯৩৬ খৃঃ)। সম্পাদক—হিজলী হিতৈষী পত্রিকা (সাপ্তাহিক)।

জীবন চক্রবর্তী—কবি। পিতা—নারায়ণ চক্রবর্তী। পদ্যগ্রন্থ—কৃষ্ণমঙ্গল, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড।

জীবননাথ—জ্যোতির্বিদ্‌। গ্রন্থ—বস্তুরত্নাবলী।

জীবননাথ শর্মা—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বীজগণিত (১৮৪৮ খৃঃ), ভাবপ্রকাশ (জ্যোতিষ)।

জীবন মৈত্র—কবি। জন্ম—বগুড়া জেলার লাহিড়ীপাড়া গ্রামে। পিতা—অনন্তরাম মৈত্র। মাতা—স্বর্ণমালা। গ্রন্থ—বিষহরি পদ্মপুরাণ বা মনসার ভাসান (১১৫১ বঙ্গ)।

জীবাগর্জর—জ্যোতির্বিদ্‌। পিতা—নরহরি। গ্রন্থ—প্রশ্নসার।

জীবানন্দ বিদ্যাসাগর—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। পিতা—তারানাথ তর্কবাচস্পতি। ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। সম্পাদিত গ্রন্থ—আরণ্যসংহিতা, সামবেদ-সংহিতা, দৈবত ব্রাহ্মণ (১৮৮২), ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ (১৮৮২), গোপথব্রাহ্মণ (১৮৯১), বৃহদারণ্যকোপনিষদ (১৮৭৫), ছন্দঃসূত্রম্‌ (১৮৯২), নিরুক্তম্‌ (১৮৯১), ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়ঃ (১৮৯৭), রুদ্রাযামলতন্ত্রম্‌ (১৮৯২), শ্যামারহস্যম (১৮৯৬), বৈশেষিকদর্শনম্‌ (১৮৮৬), সাংখ্যাসার (১৯০৯), মীমাংসা-দর্শনম্‌ ২য় খণ্ড (১৮৮৩), মীমাংসান্যায়প্রকাশঃ (১৮৯৮), মীমাংসা-পরিভাষা বেদান্তদর্শনম্‌ (১৮৭৫), ভামতী (১৮৯১), পঞ্চদশী (১৮৮২), বেদান্তসারঃ (১৮৭৫), বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী (১৮৯৭), পূর্ণপ্রজ্ঞাদর্শনম্‌ (১৮৮৩), উত্তরখণ্ডম্‌ অষ্টমাবধি, কাদম্বরী (১৯০০), বাসবদত্তা (১৯০৩), চণ্ডকৌশীকম্‌ (১৮৮৪), চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ম্‌ (১৮৮৫), নাগানন্দম্‌ (১৯০৪), বেণীসংহারম্‌ (১৮৯৩), মহাবীর-চরিতম্‌ (১৯০১), উনাদিসূত্রবিত্তিঃ (১৮৭৩), সিদ্ধান্তকৌমুদী (১৮৮৪), সারস্বতঃ ব্যাকরণম্‌ (১৯০১), সাহিত্য-দর্পণম্‌ (১৯০৫), গোলাধ্যায়ঃ (১৮৯১), বৃহৎ সংহিতা (১৮৮০), নীতিসারঃ (১৮৭৫), শুক্রনীতিসারঃ (১৮৯০), মেদিনীকোষ (১৮৯৭), সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ (১৮৯৭), শ্রুতবোধ কাব্যপ্রকাশঃ (১৮৯৭)।

জীমূতবাহন—গ্রন্থকার। জন্ম—১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশে। গ্রন্থ—দায়ভাগ (ব্যবহার-শাস্ত্রগ্রন্থ), ধর্মরত্ন (স্মৃতিগ্রন্থ)।

জুমুর নন্দী—বৈয়াকরণিক। জন্ম—১৫শ শতাব্দী মুর্শিদাবাদে। গ্রন্থ—রসবতী (সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকা)।

জেতারি, আচার্য—বৌদ্ধ দার্শনিক। জন্ম—১০ম শতাব্দীতে বরেন্দ্রভূমিতে। বিক্রমশীলার অধ্যক্ষ। গ্রন্থ—হেতুতত্ত্ব উপদেশ, ধর্মাধর্ম বিনিশ্চয়, বালাবতারতর্ক।

জৈন মহাবীর—জ্যোতির্বিদ্‌। গ্রন্থ—গণিতসার সংগ্রহ (৮৫৩খৃ)।

জৈমিনী—দার্শনিক পণ্ডিত। কর্মমীমাংসা বা পূর্বমীমাংসা, সঙ্কর্ষণকাণ্ড।

জ্ঞানচন্দ্র—জৈন নৈয়ায়িক। জন্ম—১৪শ শতাব্দী। গ্রন্থ—রত্নাকরাবতারিকা টিপ্পন।

জ্যোতি বাচস্পতি—জ্যোতির্বিদ্‌ পণ্ডিত ও নাট্যকার। গ্রন্থ—ফলিতজ্যোতিষের মূলসূত্র, সরল জ্যোতিষ, কোষ্ঠি দেখা, হাত দেখা, লগ্নফল, মাসফল, পরাশরীয় সুশ্লোক-শতকম্‌, হাতের রেখা নিবেদিতা (নাটক), সমাজ (নাটক)।

জ্ঞানদাচরণ দাস—সাহিত্যিক। সম্পাদক—আজকাল (সাপ্তাহিক—১৩৩৮)।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী—মহিলা সাহিত্যিক। স্বামী—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদিকা—বালক (১২৯২ বঙ্গ)।

জ্ঞানদাস—পদকর্তা। জন্ম—১৫৩০ খৃঃ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকট কাঁদরা গ্রামে। ইনি নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত। ইনি নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত। গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস প্রভৃতির সমসাময়িক কবি। ইহার রচিত ১১৪টি পদ পাওয়া গিয়াছে।

জ্ঞানদাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শিবরহস্য।

জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সুধা-না-গরল (১৮৭০)।

জ্ঞানপূর্ণ—দার্শনিক। ১৩শ শতাব্দী। গ্রন্থ—লঘুদীপিকা (টীকা)।

জ্ঞানরাজ—জ্যোতির্বিদ্। পিতা—নাগনাথ। গ্রন্থ—জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত (১৫০৩ খৃঃ)।

জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দননগর। পিতা—বীরেশ্বর চক্রবর্তী। এম, এ, পি, আর, এস, কাব্যানন্দ উপাধিলাভ। গ্রন্থ—আত্তিকম্, উচ্ছ্বাস, লক্ষ্মীবাণী (নাটক), পিতাজী (নাটক), Solutions of Differential Equations, Agricultural Insurance, Theory of Thunderstorm, The Language Problems of India.

জ্ঞানশ্রী মিত্র—বৌদ্ধ গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কার্যকারণ ভাবসিদ্ধি।

জ্ঞানাঞ্জন পাল—সাহিত্যিক। পিতা—বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল। সম্পাদক—সংহতি (মাসিক)।

জ্ঞানানন্দ চৌধুরী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পূজনীয় গুরুদাস, উচ্ছ্বাস পঞ্চক, পঞ্চকণা, শ্রীকৃষ্ণচিন্তা।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—কবি। গ্রন্থ—তৃণপুঞ্জ (১২৮১), বীণা ও বাঁশরী (১২৯৮)।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—সতীর মুক্তি, পতিতার দান, সতীর শক্তি।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—সাহিত্যিক। সম্পাদক—প্রজাপতি (১৩১১-১৩৩১), মজলিস (সাপ্তাহিক—১৩৩১-৩৩)।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—সাহিত্যিক। গ্রন্থ—ভালবাসার নেশা, দাম্পত্য-রহস্য, রমণী রহস্য। সম্পাদক—বাসন্তী (বিজয়চন্দ্র মজুমদার সহ—১৩২১-৩২)।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস—সাহিত্যিক। এম. এ. বি. এল। সম্পাদক—সময় (সাপ্তাহিক, ১২৮১)।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—(গীতাভিনয়) সন্ধ্যা, শ্রীদুর্গা, ধুন্ধুমার, জয়শ্রী, বল্লালসেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—অর্চনা (মাসিক, ১৩১০—১৮)।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—আলোচনা (১৩৩০-১৩৩১)।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—নবপ্রভা (হীরেন্দ্রনাথ রায় সহ—১৯০১)।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জপজী, সুখমনী, অজপাসাধন।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মেঘনাদবধকাব্য (সটীক, ১৯১০), চরিত্রগঠন, ঋদ্ধি, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, ১ম, ২য়, ৩য়, বঙ্গভাষার অভিধান।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আত্মার অভৌতিকত্ব ও অমরত্ব সপ্রমাণ (১৮৭৩)।

জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়—সাহিত্যিক। জন্ম—কৃষ্ণনগর। পিতা—দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়। শিক্ষা—এম, এ, বি, এল। কৃষ্ণনগরের দেওয়ান। সম্পাদক—পতাকা (সাপ্তাহিক ১২৯১), নবপ্রভা (পত্রিকা), বঙ্গবাসী (সাপ্তাহিক, ১২৮৮)।

জ্ঞানেশ্বর নাথ—মরাঠী ভাষ্যকার। ১৩শ শতাব্দী। গ্রন্থ—জ্ঞানেশ্বরী (গীতার ভাষ্য)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ও নাট্যকার। জন্ম—১২৫৫ বঙ্গ ২২এ বৈশাখ। মৃত্যু—১৩৩১ বঙ্গ ২০এ ফাল্গুন। পিতা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষা—প্রবেশিকা (ক্যালকাটা কলেজ)। গ্রন্থ—(প্রহসন ও নাটক)—অদ্ভুত নাট্য, মিলিতোনা, সরোজিনী, অলীকবাবু, বসন্তলীলা, হিতে বিপরীত, ধ্যানভঙ্গ, অশ্রুমতী, অবতার, কিঞ্চিৎ জলযোগ, পুরুবিক্রম, মানভঙ্গ, পুনর্বসন্ত; অনুবাদ গ্রন্থ—অভিজ্ঞান শকুন্তলা, উত্তর চরিত, মুদ্রারাক্ষস (১৯০১), রত্নমালা, মালতীমাধব, প্রবোধচন্দ্রিকা, বেণীসংহার, মহাবীর-চরিত, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী, চণ্ডকৌশিক, মৃচ্ছকটিক (১৯০১), নাগানন্দ, বিদ্ধশালভঞ্জিকা, ধনঞ্জয়বিজয়, কর্পূরমঞ্জরী। সম্পাদক—বীণাবাদিনী (১৩০৪-৫)।

জ্যোতিপ্রসাদ বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ, বিপ্লবী কানাইলাল, মহাবিপ্লবী রাসবিহারী, জার্মাণীতে নেতাজী (সম্পাদিত), গল্প লেখার গল্প (সম্পাদিত)।

জ্যোতির্ময় ঘোষ—শিক্ষাবিদ্। ছদ্মনাম—ভাস্কর। এম. এ. পি. এইচ. ডি। গ্রন্থ—লেখা, শুভশ্রী, মজ্‌লিস্। কথিকা।

জ্যোতি বাচস্পতি—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। সম্পাদক—বিধিলিপি (১৩৩০—৩২)।

জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাংবাদিক। সম্পাদক—বেঙ্গল মিস্‌লানি (চুঁচুড়া, দ্বিভাষিক মাসিক পত্র, ১৮৮১)।

জ্যোতীশ্বর ঠাকুর—পণ্ডিত। জন্ম—১২২৭ বঙ্গাব্দ (আনু)। পিতা—বীরেশ্বর ঠাকুর। উপাধি—কবিশেখরাচার্য। মিথিলারাজ নরসিংহের সভাপণ্ডিত। গ্রন্থ—ধূর্তসমাগম (প্রহসন), পঞ্চসায়ক (কামশাস্ত্র), বঙ্গশেখর (কামশাস্ত্র), বর্ণরত্নাকর (মৈথিলি ভাষায়)।

টড (Col. James Tod)—রাজকর্মচারী ও ঐতিহাসিক। জন্ম—১৭৮২ খৃঃ ২০ মার্চ। মৃত্যু—১৮৩৫ খৃঃ ১৭ নভেম্বর। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে চাকুরী লইয়া ভারতে আগমন (১৭৯৯), রাজপুতনার রেসিডেন্টরূপে উদয়পুর, গোয়ালিয়র (১৮১২—১৭), রাজপুতনার পলিটিক্যাল এজেন্ট (১৮১৮—২৩), গ্রন্থাধ্যক্ষ, রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি, লণ্ডন। গ্রন্থ—Annals and Antiquities of Rajsthan বা The Central and Western Rajputs of India (১৮২৯—৩২), Travels in Western India (১৮৩৯)।

টাউনসেণ্ড, এম—সাংবাদিক। গভর্ণমেণ্টের সহ-অনুবাদক। ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন (১৮৬০)। সহ-সম্পাদক ও পরে সম্পাদক—ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া (শ্রীরামপুর, ১৮৪৮), সম্পাদক—সত্যপ্রদীপ (সংবাদপত্র, শ্রীরামপুর, ১৮৫০ খৃঃ (১২৫৭ বঙ্গ)। Spectator (১৮৬১—১৮৯৪)। গ্রন্থ—Asia & Europe.

টমসন, পাদরী—খৃষ্টীয়ান পাদরী। সম্পাদক—উপদেশক (১২৫৭ বঙ্গ)।

টোডরমল—অর্থনীতিবিদ্ মন্ত্রী। জন্ম—১৫২৩ খৃঃ। মৃত্যু—১৫৮৯ খৃঃ নভেম্বর। পিতা—ভগবতী দাস। সম্রাট্ অকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম সভ্য এবং প্রসিদ্ধ মন্ত্রী। গ্রন্থ—টোডড়ানন্দ (সংস্কৃত ভাষায় ধর্মশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র)।

ঠাকুরদাস দত্ত—পাঁচালীকার। জন্ম—(আনু) ১২০৭ বঙ্গাব্দ হাওড়ার নিকটবর্ত্তী উত্তর ব্যাটরা। মৃত্যু—১২৮৩ বঙ্গাব্দ ২১শে বৈশাখ (১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ)। পিতা—রামমোহন দত্ত। কিছুকাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকুরী। পরে পাঁচালীর দল গঠন। ইঁহার একই পালা বিভিন্ন ভাবে রচনা করিবার ক্ষমতা ছিল। পালাগ্রন্থ—বিদ্যাসুন্দর (৪খানি পালা), লক্ষণ-বর্জ্জন (নাটক), হরিশ্চন্দ্র, শ্রীবংসচিন্তা, নলদময়ন্তী, কলঙ্কভঞ্জন, শ্রীমন্তের শ্মশান, রাবণবধ, অক্রূর আগমন, দুর্গামঙ্গল, লবকুশের পালা, রামচন্দ্রের দেশাগমন, ধ্রুবচরিত্র, শিবের বিবাহ, পারিজাত হরণ, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, দান, মাথুর, মান।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার কপোতাক্ষ নদীর সাগরদাঁড়ির অপর পারে সারসা গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৫ বঙ্গাব্দ ১১ই কার্ত্তিক। পিতা—নবকুমার মুখোপাধ্যায়। কর্ম—স্কুলে শিক্ষকতা, দ্বারভাঙ্গা কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের কার্য (১৮৭৬), দ্বারকানাথ ঠাকুর এষ্টেটে কর্ম ইত্যাদি। সহ-সম্পাদক—বঙ্গবাসী। সম্পাদক—পাক্ষিক সমালোচনা, বঙ্গনিবাসী। গ্রন্থ—মালঞ্চ, সাহিত্য-মঙ্গল, সাতনরী, উদ্ভটকাব্য, শারদীয়া সাহিত্য, বিজনবালা।

[ক্রমশঃ।

বিজ্ঞাপন-সাহিত্য

"বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বিশেষ ক'রে জানা, কিন্তু কোন-কিছু বিশেষ ক'রে জেনে কোন ফল নেই, যদি না সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে বিশেষ ক'রে জানানো যায়। এই উদ্দেশ্য সাধিত করে বিজ্ঞাপন, কেননা শব্দের অর্থই হচ্ছে বিশেষ করে জানানো। আমার এ যুক্তি যদি অকাট্য হয়, তা হ'লে মানতেই হবে যে, এ যুগের উপযুক্ত সাহিত্য হচ্ছে বিজ্ঞাপন-সাহিত্য।"

—প্রমথ চৌধুরী।

ওথেলো

উইলিয়াম সেক্সপীয়র

রূপের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ওথেলো দেউলিয়া—মূর-জাতির এই পুরুষটির দৈত্যের মত চেহারায় রূপের লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। বিরাট কালো চেহারা সকলের মনে ভীতির উদ্রেকই করবে। তবুও সে সুন্দর শ্বেতকায় জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, তাকে সকলেই উচ্চপদে বসিয়ে খাতির করত তার গুণের জন্যেই—তার বীরত্বের কথা ছিল সর্বজনবিদিত। এত বড় বীরের মধ্যে সরলতার প্রাচুর্য্য দেখলে বিস্মিত হতে হয়। তার সঙ্গে যে-ই ভাল ব্যবহার করে তাকেই সৎ বলে ধরে নেয়। রাজদপ্তরের সদস্য ব্রাবানসিয়ো ওথেলোর বীরত্বের কথা শুনে তাকে খুব খাতির করতেন, শ্রদ্ধা করতেন, সে জন্য ওথেলোর যাতায়াত ছিল তাঁর গৃহে। তার বীরত্বের কথা, যুদ্ধের কঠোর দুঃখের কথা ব্রাবানসিয়ো আর তাঁর কন্যা ডেস্‌ডিমোনা মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। ওথেলো যে সমস্ত বিপদের ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে দিয়ে তার জীবন কাটিয়েছিল সে কাহিনী শুনলে যে-কোন লোকই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। ডেসডিমোনা সরলা, অন্যের দুঃখে অল্পেই কাতর হয়। সেও ওথেলোর প্রতি আকৃষ্ট হল। ওথেলোর মুখে তার দুঃখ-দুর্দ্দশাময় দুঃসাহসিক জীবনের কথা শুনতে শুনতে ডেস্‌ডিমোনা ভুলে যেত নিজেকে—ভুলে যেত পরিবেশকে—মনে থাকত না যে, যার কথা সে মন দিয়ে শুনে চলেছে সে এক জন কৃষ্ণকায় মুর। মাঝে মাঝে তার মনে হোত—"আহা, যদি আমি সে সময়ে ওর কাছে কাছে থেকে ওর কষ্ট খানিকটা লাঘব করতে পারতাম।" কিছু দিনের মধ্যেই ডেসডিমোনা নিজের অজ্ঞাতেই নিজেকে তুলে দিয়েছিল ওথেলোর হাতে। কিন্তু ব্রাবানসিয়ো রাজপুরুষ। হতে পারে ওথেলো এক জন বিখ্যাত বীর, কিন্তু তার মত এক জন মূরের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার রীতি ইতালীয় সমাজে ছিল না, বিশেষতঃ তাঁর মত রাজপুরুষের পক্ষে। তাই ডেসডিমোনা ও ওথেলোর মিলন হল সকলের অগোচরে অন্য স্থানে।

জগতে মহৎ লোকেরও শত্রুর অভাব হয় না। ওথেলোর শত্রুদের মধ্যে প্রথমেই যার নাম করতে হয় সে হচ্ছে ইয়াগো। মুখে মিষ্ট ভাষা, অন্তরে গরলের মতই ইয়াগোর চরিত্র জটিল। এক জন মূর সেনাপতির পদ দখল করল আর তার চেয়ে অধিক দিন সৈন্যদলে থেকেও ইয়াগো বঞ্চিত হল, এ কথাটা যতই ভাবে ততই হিংসার জ্বালা তাকে জ্বালিয়ে তোলে। ওথেলো তার সহকারী হিসাবে নিয়েছিল মাইকেল কেশিও নামে এক জন যুবককে। শুনে ইয়াগো খুব রেগে গেল। নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে ইয়াগো যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল, যে জন্য ইয়াগো ভাবত কেশিওর যোগ্যতা তার কাছে তুচ্ছ। সে শুধু সুপারিশের জোরেই সহকারীর পদ পেয়েছে। কোন উপায়ে ওথেলোকে ধ্বংস করা যায় এই হল তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান।

আর এক জন ছিল রোডারিগো। বিপুল ধনী হয়ে সে ডেসডিমোনার পাণিপ্রার্থী হয়েছিল। কিন্তু যখন দেখল তার আশা বৃথা, তখনই ওথেলোকে হিংসা করতে আরম্ভ করল—আর তাকে ইন্ধন জোগাচ্ছিল ইয়াগো—বলেছিল, সে যদি টাকা খরচ করতে পারে তা'হলে ডেসডিমোনাকে ঠিক পাইয়ে দেবে। রোডারিগোও তাকে বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল—আর টাকা ঢালতে লাগল জলের মত।

২

তখন যুদ্ধ চলছে তুরস্ক আর স্পেনের মধ্যে সাইপ্রাস দ্বীপ নিয়ে। ভিনিশের ডিউক এমনি সংকটাবস্থায় ওথেলোকেই উপযুক্ত মনে করলেন—তাকে দিলেন সাইপ্রাসের শাসনকর্ত্তার পদ। ওদিকে কর্ত্তব্যের আহ্বান—ঠিক এমনি সময়ে ইয়াগো খেলল একটা চাল। ব্রাবানসিয়ো যখন ওথেলো ও ডেসডিমোনার ব্যাপার নিয়ে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন সেই সময় ইয়াগো তাঁর ক্রোধের আগুনে ঘৃতাহুতি দিল। ওথেলো লম্পট, সে যাদু জানে—ডেসডিমোনাকে সে যাদু করে সরিয়ে নিয়ে গেছে প্রভৃতি অনেক কথাই সে ব্রাবানসিয়োর কানে ঢুকিয়ে দিল। ব্রাবানসিয়ো রাগে অন্ধ হয়ে নালিশ করলেন রাজ-দরবারে—ইয়াগোর উক্তিই তাঁর অভিযোগ—অভিযোগ ওথেলোর বিরুদ্ধে। মন্ত্রণা-সভায় সামন্তরাজেরা ডাক দিলেন ওথেলোকে।

অবশেষে ওথেলোর মান বাঁচাল পতিপরায়ণা ডেসডিমোনা। সে বলল যে, সে তাকে ভালবাসত বলেই স্বেচ্ছায় ওথেলোর স্ত্রী হয়েছে। ইয়াগোর জাল তেমন শক্ত হয়ে ওথেলোকে এ ক্ষেত্রে ধরাশায়ী করতে পারল না। রাজসভায় ওথেলোর যখন ডাক পড়লো তখন রোডারিগোর মনে আশা হলো এইবার বুঝি তার ইচ্ছা পূরণ হয়। কিন্তু ওথেলোর মুক্তিতে সে হতাশ হয়ে পড়ল।

ওথেলো যাবে সাইপ্রাসে। সংগে যাচ্ছে স্ত্রী ডেসডিমোনা। ওথেলো ইয়াগোকে ভার দিল ডেস্‌ডিমোনাকে নিয়ে যাবার, কারণ ওথেলো ইয়াগোকে বিশ্বাস করতেন—আর ব্রাবানসিয়োর অভিযোগ যে ইয়াগোর চক্রান্তে আর পরামর্শে, এটা সে কেন, কেউই বুঝতে বা জানতে পারেনি—ইয়াগোও তাই নিশ্চিন্তে বুক ফুলিয়ে বেড়াত। ইয়াগোর স্ত্রী এমিলিয়াও সঙ্গে যাবে ডেসডিমোনার সহচরী হয়ে। এমনি সময় পথে রোডারিগো ও ইয়াগোর দেখা। রোডারিগো বিষণ্ণ মুখে বলল, "কি বন্ধু, খবর কি ? ওরা চলল ত সব। আমার মিছিমিছি কতকগুলো টাকা নষ্ট করলে তুমি।"

ইয়াগো তার পিঠ চাপড়িয়ে বলল, "আরে ঘাবড়াও কেন, তুমি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও গে—যা করবার আমিই করব। তুমি শুধু দরকারের সময় টাকা ঢেলে যাবে। তোমায় ত বলেছি, ওই কালো মুরটাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি—দু'জনে একজোট হয়ে বেটার সর্ব্বনাশ করব।"

ইয়াগো সাইপ্রাসকেই তার ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্র বলে ঠিক করে নিল।

সে জানতো—ওথেলো ও কেশিওর মধ্যে সে যদি কোন রকমে বিদ্বেষ ও হিংসার বিষ ঢুকিয়ে দিতে পারে, তা'হলে সেই বিষের জ্বালাই হবে তার অভীষ্টসিদ্ধির উপায়। তাই সাইপ্রাসে যাবার সময় রোডারিগোকে সঙ্গে নিল। রওনা হল সকলেই সাইপ্রাসের পথে।

৩

সাইপ্রাসের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা মনটানো। তখনও ওথেলো বা তার দলবল এসে পৌঁছায়নি, খবর পাওয়া গেছে তুরস্কের সৈন্য-ভর্ত্তি জাহাজ এগিয়ে আসছে। কিন্তু গতকাল প্রচণ্ড ঝড় হয়ে গেছে—জাহাজের কোন চিহ্নই আশপাশে দেখা যাচ্ছিল না। যত দূর চোখ যায় শুধু ফেনিল জলরাশি—এই সবই দেখছিলেন মনটানো ও আর দু'জন ভদ্রলোক। এমন সময় এক জন ভদ্রলোককে আসতে দেখা গেল।

"এই যে মনটানো, তুরস্কের জাহাজ ধ্বংস হয়ে গেছে গত ঝড়ে। সুখবর, ভায়া! ভেনিস্ থেকে একটা জাহাজ আসছিল, সে দেখে এসেছে তুর্কীদের ভাল জাহাজগুলিই ঝড়ে ভেঙে গেছে।"

মনটানো আনন্দিত হয়ে বললেন, "অ্যাঁ, খবর ঠিক ত?"

সেই ভদ্রলোকটি বললেন, "নিশ্চয়ই, সহকারী সেনাপতি এই জাহাজে এসেছেন। কিন্তু মুস্কিল, সেনাপতি ওথেলোর জাহাজ এখনও পৌঁছায়নি। তিনিই এই দ্বীপের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েছেন।"

মনটানো বললেন, "অতি সুখের সংবাদ! ওথেলো যোগ্য লোক। চল দেখি গে, সেনাপতির জাহাজ আসছে কি না?"

শত্রু-জাহাজ ধ্বংসের মত সুখ-সংবাদের মধ্যে ওথেলো শুভ-বার্ত্তার মতো এসে উপস্থিত হলেন নির্ব্বিঘ্নে। তুরস্কের ক্ষতির কথা শুনে আনন্দিত হয়ে ঘোষণা করে দিলেন, "এই আনন্দ-সংবাদে নগরবাসী প্রজা সকলে নৃত্য-গীত, আনন্দ ও আতসবাজী প্রভৃতির আয়োজন করিয়া নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে আমোদ-আহ্লাদ করুক।"

কিন্তু পাছে সকলে পানোন্মত্ত হয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে এই ভয়ে ওথেলো সমস্ত তদারকের ভার দিলেন সহকারী সেনাপতি কেশিয়োকে আর তার সহকারী হিসাবে পতাকাধারী ইয়াগোকে। ইয়াগোও এই সুযোগে তার ষড়যন্ত্র-জালের প্রথম ক্ষেপের জন্যে প্রস্তুত হল।

কেশিয়োকে আবশ্যকীয় উপদেশ ও আদেশ দিয়ে সেনাপতি ওথেলো চলে গেলেন। ইয়াগো এল সংগে সংগে। তাকে দেখে কেশিয়ো বলল, "চল ভাই আমরা এবার পাহারায় যাই।"

ইয়াগো বলল, "আরে দূর! এখনি কি? রাত দশটা বাজেনি এখনও। তার চেয়ে চল সেনাপতির কল্যাণে কিঞ্চিৎ মধুপান করি গে।"

"না ভাই, মদ আমার সয় না।"

"আরে একটুখানি। দু'জন যুবক আছে—তাদের ফিরিয়ে দেবে? তাদের উৎসাহ দিতে শুধু এক পাত্তর।"

ইয়াগোর জবরদস্তিতে কেশিয়ো মত্তপদের দলে গিয়ে হাজির হল। ইয়াগো এই-ই চায়—কেশিয়ো মদ খেয়ে মাতাল হোক, আর তার জালে এসে পড়ুক। নেশা যতই মনকে ছেয়ে ফেলে ততই নেশার জিনিষের ওপর ঝোঁক বেড়ে যায়। মনটানো আর কেশিয়োও তাই এক পাত্রের জায়গায় অনেক পাত্রই গলাধঃকরণ করল ইয়াগোর পীড়াপীড়িতে।

কেশিও অল্পেই মাতাল হয়ে পড়ে—আজ আবার বেশী হয়েছে মদের মাত্রা—মত্ততার সুরে বলতে লাগল, "দেখুন, আমি কিন্তু মাতাল হইনি, পতাকাধারী বন্ধু তুমি চল—কিন্তু আমার আগে নয়। ভগবান ক্ষমা করুন। কাজে চলুন, দেখুন মশাইরা, আমি কিন্তু মাতাল হইনি—তার প্রমাণ চান—এই দেখুন—এই আমার পতাকাধারী, এই আমার ডান হাত—এই আমার বাঁ হাত। আরও দেখুন, আমি দাঁড়াতে পারছি—কথা কইছি বেশ। তা'হলেই আমি মাতাল নই।"

সকলেই "সাবাস, সাবাস্" করে চেঁচিয়ে উঠল। কেশিও চলে গেল টলতে টলতে।

মনটানো বললেন ইয়াগোকে—"চলুন, আমরাও যাই পাহারার বন্দোবস্ত করতে।"

ইয়াগো বলল—"এই যে লোকটি চলে গেল, জগৎজয়ী বীরের পাশে দাঁড়িয়ে সৈন্যচালনা করবার ক্ষমতা রাখে এ। কিন্তু ঐ যে এক দোষ। আমার ভয় হয় কখন কি করে ফেলে মদের ঝোঁকে।"

মনটানো আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "সর্ব্বদাই কি এই অবস্থা হয় না কি?"

ইয়াগো—"মদ না খেলে ওর ঘুমই আসে না।"

মনটানো বললেন, "তা'হলে ত সেনাপতিকে বলা দরকার। তিনি নিজে সজ্জন বলে ওর দোষটা দেখতে পাননি—গুণেই মুগ্ধ।"

এমন সময় রোডারিগো এসে হাজির।

ইয়াগো তাকে জনান্তিকে বলল, "তুমি এখানে কেন? কেশিয়োর পেছনে পেছনে যাও।"

রোডারিগো আবার বেরিয়ে গেল যে পথে এসেছিল সেই পথে।

ইয়াগো ও মনটানো বসে গল্প করছে। এমন সময় রোডারিগো "খুন করলে, রক্ষা কর" বলতে বলতে ছুটে এল। তার পেছনে তাড়া করে এল কেশিও। কেশিও হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "পাজী, বদমায়েস্!"

মনটানো জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে?"

কেশিও রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে, "এত বড় আস্পর্দ্ধা বেটার, আমার কাছে আসে গুরুগিরি ফলাতে! বেটাকে হাড় এক দিকে মাস এক দিকে করব থুড়ে থুড়ে।"

রোডারিগো বললে, "মারবে না কি?"

"আবার কথা কইছিস্ নচ্ছার!" কেশিও তাকে আঘাত করল তরবারি দিয়ে।

মনটানো বাধা দিতে গেলেন—"আহা, করেন কি? করেন কি?"

কেশিও তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রাগে—তার ওপর আছে মদের নেশা। ইয়াগোই ষড়যন্ত্র করে রোডারিগোকে পাঠিয়েছিল কেশিওকে রাগিয়ে দিয়ে একটা হট্টগোল বাধাবার জন্যে।

কেশিও বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও মনটানো, না হলে তোমারও মুণ্ডপাত করব।"

মনটানো বিদ্রূপ করে বললেন, "আরে থামুন মশাই, আপনার মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গেছে, বড্ড নেশা হয়েছে আপনার।"

কেশিও আরও রেগে গেল—"কি, আমার নেশা।"

তার পরই আরম্ভ হল এই দুই পানোন্মত্তের মধ্যে অসিযুদ্ধ, কেশিও আঘাত করল মনটানোকে—মনটানোও প্রতিদান দিল এর।

ওদিকে ইয়াগো তখন পাগলা-ঘণ্টা বাজিয়ে লোকের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করে দিল। লোকেরা মনে করল চারি দিকে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। ওথেলো ছুটে এলেন ব্যাপার শুনে। দেখলেন—তাঁর সহকারী কেশিও সুরায় মাতাল।

ওথেলো জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার এ সব?"

মনটানো নিজের সর্ব্বাঙ্গ দেখালেন, সমস্ত গা বেয়ে তাঁর রক্ত ঝরছে। সঙ্গে সঙ্গেই মূর্চ্ছা গেলেন তিনি।

ওথেলো বললেন, "তোমাদের এ কি বিসদৃশ ব্যবহার! এই তুচ্ছ দ্বন্দ্ব ত্যাগ কর। অভদ্র—নীচের মত আবার যে অস্ত্র চালাতে এগোবে তার মৃত্যু জেনো।"

এমন সময় ইয়াগোর ব্যবস্থা মত বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠল। সেই ঘণ্টা-ধ্বনি শুনে ওথেলো বললেন, "দেখ দিকি, এখনি সমস্ত প্রজা ঘুম থেকে উঠে পড়বে। ইয়াগো তুমি ভদ্র, তুমি বল কি ক'রে এ অনর্থপাত হল।"

ইয়াগো বললে, "কি ক'রে জানব প্রভু, খানিক আগে এরা দু'জনে ভাবে গলাগলি হয়ে আনন্দ করছিল। হঠাৎ কি হয়ে গেল—তার পরই এই রক্তপাত।"

ওথেলো কেশিয়োকে ভর্ৎসনা ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "ছিঃ কেশিয়ো, কি ক'রে তুমি এত দূর আত্মবিস্মৃত হলে?"

কেশিও মাথা নীচু ক'রে বলল, "ক্ষমা করুন প্রভু, আমি কোন কথা বলতে পারছি না এখন।"

ওথেলো তার পর মনটানোকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মনটানো—তুমি ত এমন বেহিসেবী ছিলে না কোন দিন? তুমি বল ত, কি হয়েছে?"

এতক্ষণে মনটানো ভাল হয়ে উঠেছেন খানিকটা। তিনি বললেন, "সেনাপতি, আমার গুরুতর আঘাত লেগেছে, রক্তপাতে দুর্ব্বল, আমি কোন কথাই বলতে পারব না, তবে আমি ন্যায়তঃ কোন অন্যায় করি'ন—আপনি কর্ম্মচারী ইয়াগোর কাছে সব শুনুন।"

তাদের উত্তর দেবার এই ভঙ্গী দেখে ওথেলো রাগান্বিত হয়ে বললেন, "তোমরা আমায় ক্ষেপিয়ে তুলবে দেখছি। কিন্তু আমি ক্ষেপলে কারও রক্ষা রাখব না বলে দিচ্ছি ইয়াগো। আমার আদেশ, তুমি সব বল—কি হয়েছে।"

মনটানো বললেন, "কিন্তু ইয়াগো, তুমি যদি কারও পক্ষ নিয়ে কথা বল, তাহলে জানব তুমি কাপুরুষ।"

ইয়াগো তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, "অমন কথা বলবেন না মশাই আমাকে, কেশিয়ো আমার বন্ধু, এমন কথা আমার মুখ দিয়ে বের হবে না যা আমার বন্ধুর সম্মানে আঘাত করে।"

এটা তার জাল বিস্তারের আর এক অধ্যায়। সে এমন ভাবে ঘটনাটির বিবরণ দিল কেশিও তার কথায় রাগ করতে পারল না—অথচ ওথেলোও বুঝলেন কেশিওর মত্ততার জন্যই এই অনর্থের সৃষ্টি।

সে বলল, "হুজুর, আমি আর মনটানো একসঙ্গে বসেছিলাম, এমন সময় "খুন খুন" "বাঁচাও বাঁচাও" বলতে বলতে যে লোকটি ছুটে এল, তার পেছনে তাড়া ক'রে এলেন মাইকেল কেশিও। মনটানো কেশিওকে অনুনয়-বিনয় করলেন নিবৃত্ত হবার জন্যে, সেই লোকটি "খুন খুন" বলতে বলতে ছুটে পালাল, আমি তার পেছু পেছু ছুটলাম পাছে তার চীৎকারে সহরে সকলে ভয় পায়। সে কিন্তু পালিয়ে গেল, তাকে ধরতে পারলাম না, তার পর সহকারী সেনাপতির চীৎকার আর অস্ত্রচালনার শব্দ শুনলাম—তার পরই দেখি যুদ্ধ চলছে। আপনি এর পর সবই জানেন।" এখানে বলে রাখা ভাল—ওথেলো, মনটানো বা কেশিও কেউই রোডারিগোকে চেনে না। ইয়াগো আরও বলল, "মাইকেল কেশিওকে যত দূর জানি তিনি এমন লোক নন। আমার মনে হয়, যে পালিয়েছে সে নিশ্চয় কেশিওকে ভীষণ অপমান করেছিল, তাই রাগ সামলাতে পারেননি।"

তার এই সরলতা ভাবে ওথেলো প্রীত হলেন, বললেন, "ইয়াগো, তুমি সৎ—তুমি কেশিয়োকে ভালবাস বলেই এমন কথা বলছ। কেশিও, তুমি আমার স্নেহের পাত্র, আমি তোমায় যথেষ্ট ভালবাসতাম কিন্তু আজ থেকে আমি তোমাকে পদচ্যুত করলাম।"

এই কথা বলে ওথেলো চলে গেলেন। কেশিও বিষণ্ণ বদনে দাঁড়িয়ে রইল। ইয়াগো ছাড়া আর সকলেই চলে গেল। ইয়াগো যেন তাকে আহত দেখে খুব দুঃখিত, এমনি সমবেদনার সুরে বলল: "আহা—তোমার বড় লেগেছে, না?"

কেশিয়ো বিষণ্ণ স্বরে বলল, "হাঁ ভাই, এ যা লেগেছে তা আর কোন দিন সারবে না—এ আঘাত আমার মর্ম্মে গিয়ে পৌঁচেছে। আমার খ্যাতি গেল—সম্ভ্রম নষ্ট করল—মান যার রইল না তার কি রইল পৃথিবীতে বলতে পার?"

ইয়াগো তার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করবার পথ খুঁজে পেল—সান্ত্বনার সুরে বলল, "আরে তাতে কি? সেনাপতি ত তাঁর স্ত্রীর হাতে, তুমি ডেসডিমোনাকে গিয়ে ধর। তাহলেই তোমার পদ ফের ফিরে পাবে।" তার অভিসন্ধি বুঝতে না পেরে কেশিও তাকে বিশ্বাস করল, ধন্যবাদ দিল এই যুক্তিদানের জন্যে।

৪

সাইপ্রাস দুর্গের সম্মুখে দেখা হল আবার কেশিয়ো ও ইয়াগোর। তার আগে কেশিয়ো এক জন মোসাহেবকে দিয়ে ডেসডিমোনার সহচরী, ইয়াগোর স্ত্রী এমিলিয়াকে ডাকতে পাঠিয়েছিল। ডেসডিমোনা তার কর্ত্রী আর নিজেও একটা অপরাধ করে ফেলেছে—সেই জন্যে তার একা যেতে লজ্জা হচ্ছিল। এমিলিয়া যদি তার হয়ে কর্ত্রীর কাছে সুপারিশ করে, কর্ত্রীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেয় তাহলে তার অনুরোধ করার সুবিধা হয়।

"এই যে ইয়াগো," বলল কেশিয়ো, "তোমার মত না নিয়ে ভাই একটা কাজ করেছি। তোমার স্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়েছি, আমার হয়ে কর্ত্রীর কাছে একটু সুপারিশ করবার জন্যে।"

ইয়াগো তাকে বাধা দিয়ে বললে, "আরে তাতে কি? আমি এখনি গিয়ে তাকে ডেকে দিচ্ছি। সেনাপতিকে কৌশলে সরিয়ে নিয়ে যাব এখন—তুমি ততক্ষণ কর্ত্রীর কাছে গুছিয়ে বলতে পারবে।"

মনে মনে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল কেশিয়ো—'সত্যি ইয়াগোর মত ভদ্রলোক আর হয় না।' ইয়াগো ডাকতে গেল এমিলিয়াকে।

এমিলিয়ার সুপারিশে কেশিয়ো ডেসডিমোনার কাছে তার প্রার্থনা পেশ করল,—"আমি আপনাদের দাস—চিরদিনের দাস। দয়া করে সাহায্য করুন।"

ডেস্‌ডিমোনা বললে, "নিশ্চয়ই, তুমি যেমন প্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলে তেমনি হবে আবার—তবে আমি নিশ্চিন্ত হব। তুমি যে কতটা সেনাপতিকে শ্রদ্ধা কর তাও জানি। তুমি ভেব না, সে জন্যে আমি দায়ী; তবে দু'দিন যদি দেরী হয়—তার তো কোন চারা নেই।"

কেশিয়ো বললে, "আজ্ঞে তা ঠিক। তবে দেরী হয়ে গেলে আমি হয়ত অন্য কোথাও চলে যাব—আর আমার পদে অন্য কেউ এসে বসবে আর সেনাপতি আমার এত ভক্তি, বিশ্বাস সব ভুলে যাবেন।"

ডেসডিমোনা—"না, না, সেও কি হয়। আমি আমার বান্ধবীর সাক্ষাতে তোমায় প্রতিশ্রুতি দিলাম। তুমি আনন্দ কর গে—তোমার জন্যে আমি ওঁর কাছে ওকালতি করব।"

এমন সময় দূরে দেখা গেল—কাগজের একটা তাড়া নিয়ে সেনাপতি ওথেলো আসছেন, সঙ্গে আছে ইয়াগো।

কেশিয়ো বললে, "তবে আমি যাই দেবি! যা করেছি আমি, তাতে প্রভুর সামনে মুখ তুলে কথা বলতে পারব না। কি বলতে কি বলব।"

কেশিয়োর গমন-পথের দিকে ওথেলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যেই যেন ইয়াগো বলে উঠল, "এ কি, এ ত ভাল নয়!"

ওথেলো বললেন, "কি?"

ইয়াগো যেন হঠাৎ ভুল করে ফেলেছে, বললে, "না—না—মানে ও কিছু নয়—আমি—"

ওথেলো বললেন, "কে চলে গেল, কেশিও না?"

ইতস্ততঃ করে ইয়াগো বললে, "না, না, কেশিও হবেন কেন? আপনাকে দেখে তিনি অমন চোরের মত পালাবেন কেন?"

"না, আমি ঠিকই দেখেছি"—জোর গলায় বললেন ওথেলো। ডেস্‌ডিমোনা তাঁকে দেখে বললেন, "জানো প্রভু, এই মাত্র এক জন ভিক্ষুক এসেছিল—তোমার অপ্রিয় হয়ে যে মনস্তাপে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।"

ওথেলো—কে, কার কথা বলছ?"

ডেসডিমোনা—"কেন? তোমার সহকারী। আহা বেচারী; বড় অনুতপ্ত, তুমি তাকে ক্ষমা কর—তাকে একবার ডেকে পাঠাও।"

ওথেলো—"সে হবে এখন।"

ডেসডিমোনা—"না, অমন করে ফাঁকি দিলে চলবে না, বল কখন ডাকবে? আজ সন্ধ্যার পর? খাবার সময়।"

ওথেলো—"আজ থাক—আজ আর নয়।"

ডেসডিমোনা কিন্তু ছাড়লেন না, পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন: "আজ নয় যদি ত কাল খাবার সময়, তা নয় যদি তবে সন্ধ্যার সময়।"

ওথেলোর মনে ইয়াগো হিংসার যে বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল—কেশিওর সন্দেহজনক প্রস্থানের সময় সেই বীজই অঙ্কুরিত হল। অঙ্কুরকে গাছে পরিণত করার জন্যে ইয়াগো মন্ত্র দিতে লাগল। ডেসডিমোনা যে কেশিওর অনুরাগিণী, এই কথাই সপ্রমাণ করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল যেন—ওথেলো রাগ প্রিত হ'য়ে তার কথা মিথ্যা হলে তাকে হত্যা করার ভয় দেখালেন। ইয়াগো বলে উঠল, "হা ভগবান, কেন যে আমি সত্যি কথা বলতে গেলাম!"

ওথেলো বললেন, "তুমি কি বলতে চাও?"

ইয়াগো বলল, "আমি কি আর বলব? আচ্ছা প্রভু, যখন কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনার প্রতি মুগ্ধ হয়েছিলেন, তখন বাবার সঙ্গে তাঁর ব্যবহার দেখেননি? তাঁর বাবার সামনে আপনাকে দেখে এমন ব্যবহার করতেন যেন আপনাকে তিনি ভয় করেন?"

ওথেলো সায় দিয়ে বললেন, "হুঁ, তা ত বটে।"

উৎসাহিত হয়ে ইয়াগো বলল, "তাহলেই দেখুন প্রভু, বাবার সঙ্গে যিনি প্রতারণা করতে পারেন, তিনি যে স্বামীকেও প্রতারিত করবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর আমি তো আমার দেশের মেয়েদের ভালই জানি। ওদেশের মেয়েরা ধর্ম্মের দায়ে খালাস না হোক, স্বামীর চোখে ধূলো দিতে পারলেই হোল। পাপ ক'রে সে পাপ যদি চাপা পড়ে তবে তাকে পাপ বলেই মনে করে না।"

এমনি ভাবে ইয়াগো ওথেলোর কানে নিয়তই বিষমন্ত্র ঢালতে লাগল। বিষ আর সন্দেহের জ্বালায় ওথেলো ছটফট করতে লাগলেন। কেশিও সুন্দর স্বাস্থ্যবান, ডেস্‌ডিমোনার উপযুক্ত, এই কথা ইয়াগো যতই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় ততই তিনি জ্বলতে থাকেন। ডেসডিমোনার ব্যবহারে ও তাঁকে ভালরূপে লক্ষ্য ক'রে মাঝে মাঝে আশ্বস্ত হতেন বটে, কিন্তু ইয়াগোর মত ইন্ধনকারী যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে কি ক'রে হিংসার জ্বালা নিবতে পারে?

ওথেলোর মনের অবস্থা যখন এই রকম, তখন ইয়াগো আরও এক চাল চালল। এক সময় ওথেলো ডেসডিমোনাকে একটা রুমাল উপহার দেন, সেই রুমালটি ইয়াগো সংগ্রহ করল তার স্ত্রীর মারফৎ। তার পর সেই রুমালটিকে কেশিওর ঘরে এমন জায়গায় রেখে এল যাতে কেশিও চট্ করে সেটা লক্ষ্য করে। তার পর ইয়াগো ওথেলোকে জানাল যে, সেই রুমালটিকে সে কেশিওর কাছে দেখেছে। ওথেলোর প্রথম বিশ্বাস হয় নাই, দূর থেকে তাঁকে দেখিয়ে দিল ইয়াগো যে রুমালটি রয়েছে কেশিওর হাতে।

ওথেলো ডেসডিমোনাকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন রুমালটি তাঁর কাছে নাই। ভুল সন্দেহ তাঁকে ক্রোধে জ্বালাতে লাগল। ইয়াগো এতেই ক্ষান্ত হয়নি, কেশিও যখন তার এক বান্ধবীর সম্বন্ধে ইয়াগোর সঙ্গে কথা বলছিল তখন সেই-ই কৌশল করে আড়াল থেকে ওথেলোকে তাদের এ আলাপ শুনিয়ে দিল। হিংসার জ্বালায় ওথেলো তখন এতই মুহ্যমান্ যে, তিনি বুঝতেই পারলেন না, যে-মেয়েটির কথা শুনলেন তার স্বর তাঁর স্ত্রীর নয়। তার জালে ওথেলোকে আবদ্ধ হতে দেখে ইয়াগো তার শেষ চাল চালল, বলল, "দুষ্টের দমনে কোন পাপ নেই, আপনি রাত্রে যখন ডেস-ডিমোনা ঘুমোবে তখন তাকে গলা টিপে মেরে ফেলুন। আমি কেশিওর ভার নিচ্ছি।"

ওথেলোকে উত্তেজিত করেই ইয়াগো রোডারিগোর সঙ্গে পরামর্শ করল, কি রকমে কেশিওকে হত্যা করা যায়। রাত্রি

গভীর। সেই গহন অন্ধকারে ইয়াগো আর রোডারিগোর কথাবার্ত্তা হচ্ছে। ইয়াগো বলল, "তুমি এইখানে লুকোও, এখনি কেশিও এই দিকে আসবে। তলোয়ার খুলে তৈরী হও। এমনি মোক্ষম কোপ ঝাড়বে যেন বাছাধন এক ঘায়েই কাবার হয়। যাও যাও, লুকোও, ভয় নেই—আমি কাছেই আছি।"

রোডারিগো এক দিকে, ইয়াগো অন্য দিকে লুকিয়ে পড়ল। কেশিওর পায়ের শব্দ শোনা গেল। পেছন থেকে রোডারিগো তাকে আঘাত করল, কিন্তু কেশিও বর্ম্মাবৃত হয়েছিল, ঠিক আঘাত লাগল না। কেশিও তখন ফিরে আঘাত করল রোডারিগোকে। রোডারিগোর চীৎকার শুনে ইয়াগো অন্ধকারে কেশিওর পায়ে আঘাত করে ছুটে পালাল।

ঠিক সেই সময় ওথেলো সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, কেশিওর কাতরানি শুনে মনে মনে বললেন, "ইয়াগো সত্যবাদী, কেশিও মরেছে। ওদিকে ওই কুলটাই বা কেন বেঁচে থাকে?"

এই বলে তিনি বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলেন।

কেশিও গুরুতর আহত হল বটে কিন্তু মরল না। পাছে সব জানাজানি হয়, এই ভয়ে ইয়াগো আহত রোডারিগোকে খুন করল।

ততক্ষণে ওথেলোর কাজ শেষ হয়েছে। ডেসডিমোনা মৃত্যুপথযাত্রী। ওথেলোই তাকে বাকরোধ করে হত্যা করেছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে ডেসডিমোনা একবার কথা বলেছিলেন—এমিলিয়াকে বলে গেলেন, "আমি আত্মহত্যা করেছি।" কিন্তু ওথেলো স্বীকার করলেন, তিনিই হত্যা করেছেন। এমিলিয়ার চীৎকারে সকলে এসে হাজির। ইয়াগোর দুষ্কৃতি ফাঁস হয়ে গেল—এমিলিয়াই বলে দিল ইয়াগো প্রতারক। ইয়াগোকে বন্দী করা হোল। ওথেলো যখন জানতে পারলেন যে, ডেসডিমোনা নিরপরাধ, তখন শোকে তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। মনের দুঃখে তিনি আত্মহত্যা করলেন।

রাজপুরুষগণের পরামর্শে কেশিও সাইপ্রাস দ্বীপের শাসনকর্ত্তা হল।

হিংসা ও সন্দেহের জ্বালায় দু'জন মহৎ মানব-মানবীর সুখের সংসারের শেষ হল।

অনুবাদক—শ্রীতরুণকুমার দত্ত।

অ্যালফ্রেড ড্রেফাস

শ্রীযামিনীমোহন কর

বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা। ফরাসী আর্ম্মির জেনারেল ষ্টাফের উদীয়মান যুবক অফিসার অ্যালফ্রেড ড্রেফাস। স্ত্রী ও দু'টি ছেলে। হঠাৎ কালো মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেললে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ। যুবক হুকুম পায় সোমবার সকালেই ওয়ার ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে দেখা করতে। বিস্মিত হবার কিছুই নেই। ষ্টাফের লোকেদের হঠাৎ দেখা-সাক্ষাৎ করতেই হয়। রবিবার রাত্রে ড্রেফাসরা নিমন্ত্রণ খেলেন শ্বশুর বাড়ীতে। সোমবার সকালে ধড়া-চূড়া পরে ড্রেফাস বেরিয়ে পড়লেন ওয়ার ডিপার্টমেণ্টের উদ্দেশে। তিন বছরের ছোট্ট ছেলে বাপকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিলে। ভবিষ্যতে যখন পিতা-পুত্রে আবার দেখা হ'ল, তখন বাপ অকালবৃদ্ধ স্বাস্থ্যহীন আর ছেলে ন'বছরের। মধ্যে ছ'বছরের কথা—ভাবতেও ভয় লাগে। অফিসে পৌঁছতেই তাঁকে সোজা জেনারেল ষ্টাফের বড়কর্ত্তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কর্ত্তা ঘরে ছিলেন না। এক জন অফিসার তাঁর হাতে একটা কাগজ দিয়ে বললেন,—"কর্ত্তা এখনই এসে পড়বেন। আমার আঙুলে ভীষণ ব্যথা হয়েছে। আপনি ততক্ষণ আমার হয়ে একটা চিঠি লিখে দেবেন?" ঘরে আরও তিন জন লোক ছিলেন, অফিসার কিন্তু সাধারণ পোষাকে। বাহিরে বরফ পড়ছে।

ড্রেফাস কলম তুলে নিলেন। অফিসার বলে যেতে লাগলেন আর তিনি লিখতে থাকলেন। হঠাৎ অফিসারটি চেঁচিয়ে উঠলেন,—"আপনার হাত কাঁপছে কেন?" ড্রেফাস উত্তর দিলেন,—"বরফের মধ্যে দিয়ে এসেছি, আঙুলগুলো জমে আছে।" আবার অফিসার চিঠির কথা বলে যেতে থাকলেন। ড্রেফাস লিখতে থাকলেন। পুনরায় অফিসারটি চেঁচিয়ে উঠলেন,—"সাবধান! এটা গুরুতর ব্যাপার।" ড্রেফাস এ কথার কোন অর্থই বুঝতে পারলেন না, আরও ধরে ধরে লিখতে থাকলেন। চিঠি শেষ হতেই সেই অফিসারটি বলে উঠলেন,—"আইনানুসারে আমি আপনাকে বন্দী করলাম। আপনার অপরাধ দেশদ্রোহিতা।" সঙ্গে সঙ্গে অন্য তিন লোক ড্রেফাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। খানাতল্লাসীর পর তাঁকে সৈন্যদের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হ'ল। একটা অন্ধকার সেলে একলা থাকার ব্যবস্থা। সাধারণ কয়েদীদের খাদ্য। সবই যেন চকিতে ঘটে গেল। ড্রেফাস বেচারা কোন কারণ পর্য্যন্ত জানতে পারলেন না, কেন তাঁর প্রতি এই দুর্ব্যবহার।

দিন পনেরো পরে তাঁকে একটা চিঠি দেখান হ'ল। তাতে যা লেখা ছিল তাতে প্রমাণিত হয় যে, লেখক ফরাসী দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে জার্ম্মাণীর সঙ্গে গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল, এই চিঠি তাঁর লেখা কি না? তিনি দৃঢ় ভাবে উত্তর দিলেন,—"নিশ্চয়ই না।" সেই প্রথম তিনি জানলেন তাঁর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ।

সাধারণ কয়েদীর খাদ্য খেয়ে তাঁর একা নির্জ্জন অন্ধকার কারাগৃহে বাস চলতে থাকল। ডিসেম্বর মাসের ১৯শে সামরিক আদালতে তাঁর বিচারের দিন স্থির করা হ'ল। এই প্রথম তাঁকে বাড়ীতে চিঠি লেখবার অনুমতি দেওয়া হ'ল—বিচারের দিন-দুই পূর্ব্বে। নির্দ্দিষ্ট দিনে বিচার আরম্ভ হ'ল। অত্যন্ত গোপনে। কয়েক দিন পরে রায় বেরোল। দোষী। দেশ-প্রেমিকের পক্ষে সব চেয়ে গ্লানিকর অপরাধ দেশদ্রোহিতা।

জানুয়ারী মাসে তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পেলেন। ঘরের মধ্যে জালের প্রাচীর—এক পাশে স্বামী, অন্য পাশে স্ত্রী। কয়েক দিন পরে ড্রেফাসকে পদচ্যুত করা হ'ল। তার পর সাধারণ অপরাধী সৈনিকের মত, এক দল সৈন্য দিয়ে ঘিরে, মার্চ্চ করিয়ে মিলিটারী ব্যারাকের সামনের মাঠে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে এক জেনারেল দণ্ডাজ্ঞা পাঠ করলেন, সৈন্যবাহিনীর সামনে। ড্রেফাস আর সহ্য করতে পারলেন না। তাঁরই অধীনে ছিল এই সৈন্যদল। তাদের সামনেই তাঁর এই অপমান! চেঁচিয়ে উঠলেন,—"সৈন্যগণ, তোমাদের চোখের সামনে

এক জন নিরপরাধ ব্যক্তি পদচ্যুত, লাঞ্ছিত। জয়, ফ্রাঁসের জয়, সৈন্যবাহিনীর জয়।"

সৈন্যদল নিশ্চল। এক জন অফিসার এসে ড্রেফাসের পদ-মর্য্যাদার চিহ্নসমূহ খুলে নিলেন। জামার বোতাম, প্যান্টের ষ্ট্রাইপ ছিঁড়ে দিলেন। মাথার টুপি খুলে নিলেন। কাপ্তেনের তরোয়াল হাঁটুর ওপর রেখে দু'টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলে দিলেন। তার পর হাতে হাতকড়া পরিয়ে সমস্ত মাঠটায় মার্চ্চ করিয়ে তাঁকে মিলিটারী কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। সৈনিকরা চীৎকার করতে, টিটকারী দিতে থাকল। তাঁর তখন মনে হ'ল, এর চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল। নির্জ্জন অন্ধকার শেলে এক দিন রাত্রে তাঁকে হঠাৎ ঘুম থেকে ঠেলে তুলে কাপড়-জামা পরে নিতে বলা হ'ল। তার পর তাঁকে টেনে ঘর থেকে বার করে দিল। মেঝেয় চশমাটা পড়ে গিছল, সেটা পর্য্যন্ত তুলে নিতে সময় দিল না। ট্রাকে ক'রে তখনই তাঁকে ষ্টেশনে নিয়ে গিয়ে কয়েদীদের ট্রেণের একটা কামরায় চড়িয়ে দিলে। জন্তুদের মত। বাইরে থেকে কামরায় তালা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। ট্রেণ চলে গেল। পরদিন দুপুরে ট্রেণ থেকে নামিয়ে তাঁকে লা রশেলে নিয়ে যাওয়া হ'ল জেলখানায়। ক্ষুধায়, শীতে তখন তাঁর প্রায় মরণাপন্ন অবস্থা। পথে দর্শকরা তাঁর গায়ে থুতু দিল, দু'-চার ঘা মারও মুখে-পিঠে পড়ল। রক্ষীরা কোন বাধা দিল না। তার পর জেল থেকে ষ্টীমারে। একটা খাঁচার মধ্যে সিংহ বন্দী। দর্শকরা কেউ খোঁচা দিচ্ছে। কেউ থুতু ফেলছে। ১৮৯৫ সালের ১৫ই মার্চ্চ, ষ্টীমার থেকে নামিয়ে আবার কারাগারে আর ১৩ই এপ্রিল ডেভিল্স আইল্যাণ্ডে (শয়তানের দ্বীপ) নির্ব্বাসন, যেখানে আগে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তদের সরিয়ে রাখা হ'ত। এক নির্জ্জন কুটীরে বাস। জানলায় লোহার গরাদ, দরজা লোহার তৈরী। দু'ঘণ্টা অন্তর প্রহরী বদল। দিনে রাতে। তাঁর কারও সঙ্গে কথা বলা পর্য্যন্ত বারণ। খাদ্য যা, তা কুকুরেও খায় না। এই ভাবে চলল ১৮৯৯ সাল পর্য্যন্ত।

এদিকে তাঁর স্ত্রী ও ভাই তাঁর মুক্তির জন্য আন্দোলন করতে লাগলেন। কয়েক জন দয়ালু ও ধনী লোকে তাঁদের ডাকে সাড়া দিল। শীঘ্রই ড্রেফাসের ব্যাপারটা জগৎময় ছড়িয়ে পড়ল। লোকের মুখে, খবরের কাগজে সর্ব্বত্র শয়তান দ্বীপের কথা। ফ্রাঁসের জনসাধারণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দাঁড়াল। এক দল ড্রেফাসের নির্দ্দোষিতায় বিশ্বাসী, অপর দল তাঁর বিরুদ্ধে। সেই সময় বিখ্যাত ফরাসী লেখক এমাইল জোলা ভেতরকার ষড়যন্ত্রের সব খবর পেলেন। তিনি এক বই লিখলেন—"আই অ্যাকিউজ"। আমি দোষারোপ করছি। সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। সরকারের টনক নড়ল। পুনর্ব্বিচারের আদেশ দেওয়া হ'ল। প্রকৃত অপরাধী পাওয়া গেল, মৃতাবস্থায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে সকল দোষ স্বীকার করে চিঠি লিখে গেছে। বিচার শেষে ড্রেফাস মুক্তি পেলেন, নিজের সংসারে ফিরে এলেন। কিন্তু সে ড্রেফাস গিছলেন, তিনি নয়। আনন্দময় যুবকের পরিবর্ত্তে ফিরে এলেন এক অকালবৃদ্ধ, মেরুদণ্ড ভাঙ্গা। ১৯১৪ সালের যুদ্ধে তিনি প্রচুর সুখ্যাতি লাভ করেন, লেঃ কর্ণেল পদে উন্নীত হন, লিজিওঁ-অনার ডেকোরেশন লাভ করেন, কিন্তু পূর্ব্বের হাসি আর মুখে দেখা গেল না।

আইনষ্টাইন

সুখেন্দু দত্ত

আইনষ্টাইনের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কার করে আইনষ্টাইন পৃথিবীর রূপ ও ধারণার একটা আমূল পরিবর্ত্তন এনে দেন। বিশ্ব-জগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের এত দিনকার ধাপে-ধাপে গড়ে ওঠা ধারণার মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানে তাঁর এই আপেক্ষিক তত্ত্ব। এই আবিষ্কারের ফলে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে আইনষ্টাইন খ্যাতনামা হয়ে ওঠেন। তিনিই এ যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। দক্ষিণ-পূর্ব্ব জার্ম্মাণীতে একটা ছোট্ট শহর আছে—উল্‌ম। ইলার নদী এসে মিশেছে এখানে ড্যানিউবের সাথে। ফলে একটা বন্দরও গড়ে উঠেছে সেখানে। এই উল্‌ম্ সহরেই একটা ছোটখাট ইলেকট্রিক কারখানার মালিকের ঘরে আজকের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের জন্ম হয় ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ্চ। তাঁর বাবার নাম ছিল হারমান আইনষ্টাইন আর মায়ের নাম পলিন। ধর্ম্মে এঁরা ছিলেন ইহুদী। আইনষ্টাইনের বেশ মোটাসোটা গড়ন। হলে কি হবে, ছেলেটা কিন্তু কেমন যেন একটু বোকাটে ধরণের হল। কথাও বলে যেন কেমন করে! চিন্তিত হয়ে হারমান আইষ্টাইন ছেলেকে ডাক্তারও দেখালেন।

আইনষ্টাইনের বছর চার-পাঁচেক বয়স হতেই কেউ কেউ কিন্তু বলতে থাকেন যে, বোকাটে ধরণের হলে কি হবে, ছেলেটির অঙ্কে বড় মাথা। আইনষ্টাইনের খুড়ো জ্যাক তাঁকে বড্ড ভালবাসতেন। তিনিই ভাইপোকে পড়াবার ভার নিলেন। ছেলে-বেলায় খেলাধূলায় আইষ্টাইনের মন দেখা যেত না একটুও। কোন ছেলে তাঁর সাথী নেই! কেবল একা থাকতে ভালবাসেন, একা একা ঘোরেন আর কত কি ভাবেন। পাঁচ বছর বয়সেই আইনষ্টাইনের আশ্চর্য্য ঝোঁক দেখা গেল অঙ্কশাস্ত্রের দিকে, বিশেষ করে বীজগণিত তো তাঁর বড্ড ভাল লাগে। হারমান আইনষ্টাইন এক দিন ছেলেকে একটা কম্পাস এনে দিলেন খেলা করার জন্য, কারণ তিনি জানতেন যে, ছেলে তাঁর এই ধরণের জিনিসই বেশী ভালবাসে। কম্পাসটা নিয়ে ছোট আইনষ্টাইন গম্ভীর মুখে ভুরু কুঁচকে ভেতরটা দেখতে লাগলেন। কাঁটাটা এই ভাবে একমুখো হয়ে থাকে কেন? কত কি ভাবলেন তিনি আপন মনে, কত কি প্রশ্ন করলেন বাবাকে। ছ'বছর বয়সে আইনষ্টাইনকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দেওয়া হল। এখানে তিনি তিন বছর পড়াশুনা করলেন। তার পর তিনি এলেন মাইনর স্কুলে।

আইনষ্টাইনের খুড়ো জ্যাক তো মহা উৎসাহে ভাইপোকে বীজগণিত পড়াচ্ছিলেন। কিন্তু শীগগিরই খুড়ো মশাই বড় বিপদে পড়ে গেলেন। দেখা গেল, ভাইপোকে পড়ান তাঁর বিদ্যায় আর কুলোচ্ছে না। আইনষ্টাইনের বয়স তখন বছর দশেক মাত্র! স্কুলের ছাত্র তিনি, কলেজের ছেলেদের মত অঙ্ক কসতে আরম্ভ করলে খুড়ো মশাই যান কোথায়? স্কুলে প্রায় সব মাষ্টাররাই বলতেন যে, ছেলেটি একটু বোকাটে গোছের, সহজে কিছু আর মগজে ঢুকতে চায় না। অঙ্কের মাষ্টার কিন্তু বলতেন যে, অঙ্কে না কি ওর আশ্চর্য্য মাথা—একেবারে কলেজের ছেলেদের মত! সেই দশ বছর বয়সেই আইনষ্টাইন আবিষ্কার করলেন একটা

ত্রিকোণের দুই ভুজের ঠিক সম্বন্ধটা কি, বিনা সাহায্যেই পিথাগোরীয় উপপাদ্য প্রমাণ করলেন; তার পর বীজগণিতের আরও কড়া কড়া বিষয় নিয়ে অঙ্ক কষতে লাগলেন। স্কুলে আইনষ্টাইন ছিলেন একটু মুখচোরা গোছের। তাঁর না ছিল কোন সাথী, না ছিল কোন বন্ধু। মন ও রুচির দিক থেকে কারও সংগেই মিলতো না তাঁর। তার ওপর ইহুদী বলে স্কুলের বেশীর ভাগ ছেলেই তাঁকে বিদ্বেষের চোখে দেখত। এই জিনিষটাই তাঁর মনে বিষম আঘাত দিত। তিনি ভেবে পেতেন না, শুধু ইহুদী বলেই ওরা তাঁকে এমন ঘৃণা করে কেন? আইনষ্টাইন-পরিবারের আর্থিক অবস্থা হঠাৎ অবনতির দিকে যেতে থাকে। তাঁরা তখন ছিলেন ম্যুনিকে। কোন নির্দ্দিষ্ট মাটির প্রতি টান তাঁদের ছিল না। ভাগ্যান্বেষণে হারমান আইনষ্টাইন এর পর সপরিবারে চলে এলেন ইটালীর মিলানে। কিন্তু পড়াশুনার জন্য আইনষ্টাইনকে ম্যুনিকেই থেকে যেতে হল। তাঁর বয়স তখন পনের বছর। জীবনে তিনি এই প্রথম একা রইলেন। মাস ছয়েক কেটে যাবার পর আইনষ্টাইন এই ভাবে একা একা আর থাকতে না পেরে একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত মিলানে চলে এলেন তিনি।

মিলানে এসে আইনষ্টাইনের পড়াশুনা কিন্তু মোটেই হচ্ছিল না। কিছু দিন বাদে তিনি সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে পলিটেকনিক একাডেমিতে গিয়ে ভর্ত্তি হন। এখানে তিনি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন অঙ্কশাস্ত্র আর পদার্থবিদ্যায়। চার বছর তিনি এই এ্যাকাডেমিতে ছিলেন। আর এই সময়ই তাঁর মনে প্রথম আপেক্ষিক তত্ত্বের বীজ বপন হয়।

জুরিখ এ্যাকাডেমিতে পড়বার সময় আইনষ্টাইন শুধু যে পদার্থ-বিজ্ঞান আর অঙ্কশাস্ত্র নিয়েই মেতে রইলেন তা নয়। অন্যান্য বিষয়ের ওপরও এই সময় তাঁর ঝোঁক দেখা যায়। খুবই উৎসাহের সংগে তিনি দর্শন ও প্রকৃতিবিজ্ঞান পড়তে থাকেন। ডারউইন, বার্কলে—এঁদের লেখা তিনি পড়েন প্রচুর। একুশ বছর বয়সে পলিটেকনিক এ্যাকাডেমি থেকে তিনি গ্রাজুয়েট হন। এ্যাকাডেমিতে পড়বার সময়েই আইনষ্টাইন দেখেছিলেন যে, সেখানে লেবরেটরিতে যে-সব যন্ত্রপাতি আছে তা তাঁর প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এখানে যা পড়ান হয় তা থেকেও অনেক দূর এগিয়ে গেছেন তিনি। আরও উচ্চতর পদার্থ-বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের আবহাওয়া তাঁর চাই। কিন্তু দারিদ্রের জন্য এই সুযোগ তিনি আর লাভ করতে পারেন না। অর্থাভাবের জন্য এর পর তাঁকে চাকরির চেষ্টা সুরু করতে হয়।

বছর পাঁচেক আইনষ্টাইনের দারিদ্রের মধ্যেই কাটতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে কয়েকটা ছোট ছোট স্কুলে মাষ্টারী করেন তিনি। তার পর শেষ পর্য্যন্ত এক পেটেণ্ট অফিসে অল্প মাইনেয় পরীক্ষকের চাকরী পেলেন। কিন্তু দারিদ্রের মধ্যে দিন যাপন করেও আইনষ্টাইন ভোলেননি তাঁর উদ্দেশ্য। যেটুকু সময় তিনি পেতেন সেটুকু লাগাতেন গবেষণার কাজে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাস। ছাব্বিশ বছরের এক যুবক এক দিন এক কাগজের অফিসে গিয়ে সম্পাদকের হাতে একটা লেখা দিয়ে বললে, 'দেখুন, আপনার কাগজে ছাপবার মত হয়ত লেখাটা অনুগ্রহ করে ছাপবেন।' সম্পাদক লেখাটার কিছু না বুঝলেও লেখাটি ছাপা হল। ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখাটি বৈজ্ঞানিক-জগতে যেন তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করল।

এই বিদ্রোহ-মূলক থিয়োরীর স্রষ্টা কিন্তু তখনও দিন কাটাচ্ছেন এক পেটেণ্ট অফিসে যাতায়াত করে! তিনি আইনষ্টাইন। লেখাটিতে তিনি আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন।

গল্প হলেও সত্যি

শৈলেন ভট্টাচার্য্য

সিঙ্গাপুর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানের সহিত যুদ্ধ ঘোষণার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বৃটিশ দু'টি জিনিষ হারালো যা কখনও ফিরে পাবে না—তার মধ্যে একটি দূর-প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ ঘাঁটি সিঙ্গাপুর আর অপরটি প্রিন্স অফ ওয়েলস্ জাহাজ। বৃটিশ সরকারের এ ক্ষতি অপূরণীয়। সিঙ্গাপুরের পতনের পর তার শাসন-ভার গিয়ে পড়ল জাপান সরকারের হাতে। জাপান সরকারের মিত্রপক্ষ আজাদ হিন্দ সরকার যুদ্ধকালে সিঙ্গাপুরকে শক্তিশালী ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করবার ক্ষমতা পেল।

আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের পর নেতাজী সর্ব্বপ্রথম সিঙ্গাপুরে পদার্পণ করলেন। আজাদ হিন্দ সরকারের সর্ব্বময় কর্ত্তাকে যথোপযুক্ত অভিনন্দন জানাবার জন্য সারা সিঙ্গাপুর শহরে সাড়া পড়ে গেছে। সকাল হতেই বালক-বালিকারা নূতন নূতন পোষাক পরে শহরের এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে, সৈন্যরা ধীর পদক্ষেপে মার্চ্চ করতে করতে নগর প্রদক্ষিণ করছে। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য!

বিকালে অভিনন্দন-সভায় তিল ধারণের স্থান নেই, সারা সিঙ্গাপুর শহর ও শহরতলী হতে লক্ষ লক্ষ লোক এসেছে নেতাজীর বক্তৃতা শুনতে। রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনল তারা নেতাজীর বক্তৃতা।

সভার শেষে নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতিদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে ভীড় ঠেলে চলেছেন শিবির অভিমুখে। সহসা তাঁর নজরে পড়ল এক বৃদ্ধা অতিকষ্টে ভীড় ঠেলে আসছে তাঁরই দিকে। নেতাজীর দেহরক্ষীরা তাকে বাধা দিল। বৃদ্ধা হতাশ ভাবে মিনতির সুরে বলতে লাগলো—'দোহাই বাবা তোমাদের, আমায় বাধা দিও না, দেবতাকে আজ আমায় একটু দেখতে দাও। এ দিন আর হয়তো আমার জীবনে আসবে না।' নেতাজী নিজেই এগিয়ে গেলেন বৃদ্ধার কাছে। নেতাজীর মুখে দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে লুটিয়ে পড়ল তাঁর পায়ে। নেতাজী তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বৃদ্ধাকে তুলে ধরে নিজেই তার পদধূলি নিয়ে বললেন—'মা, আমায় আশীর্ব্বাদ করো।' অবাক হয়ে যায় বৃদ্ধা আর নেতাজীর সহচরবৃন্দ। আনন্দের আতিশয্যে বৃদ্ধা নেতাজীকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বললে—'ঈশ্বর তোমাকে শতবর্ষ পরমায়ু দান করুন।' আর সে কিছু বলতে পারল না।

শিবিরে ফেরার পর সেনানীরা নেতাজীকে জিজ্ঞাসা করে এক জন সাধারণ স্ত্রীলোকের প্রতি নেতাজীর এইরূপ আচরণের কারণ। নেতাজীর চোখ ছলছল করে ওঠে, ধরা গলায় বলেন—'ওদের দেখলেই আমার কোলকাতায় ফেলে আসা মাকে মনে পড়ে।'

সেনানীরা চুপ করে যায়, মনে মনে ভাবতে থাকে—এ মানুষ না দেবতা?

দীপালী

শ্রীকামিনীকুমার রায়

দুর্গাপূজার পর আশ্বিনী অমাবস্যা একটি সর্ব্বভারতীয় উৎসবের দিন। এই দিনে ভারতের সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেই বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান আচরিত হইতে দেখা যায়। রাত্রিতে দীপদান—গৃহে, মন্দিরে, দেবতা-স্থানে, বৃক্ষমূলে, নদীকূলে, পথে-প্রান্তরে, আকাশে দীপদান এই উৎসবের একটি সার্ব্বজনীন প্রধান কৃত্য। বাঙ্গালী, বিহারী, আসামী, ওড়িয়া, মাদ্রাজী, মাড়োয়ারী সকলেই পরম নিষ্ঠার সহিত ইহা পালন করিয়া থাকে। এই সর্ব্বজনাচরিত অনুষ্ঠান দীপদান হইতেই আশ্বিনের অমাবস্যা 'দীপান্বিতা অমাবস্যা' এবং এই অমাবস্যায় ভারতব্যাপী যে উৎসব হয়, তাহার নাম দীপালী বা দেওয়ালী।

কালীপূজা

দেওয়ালী সর্ব্বভারতীয় উৎসব হইলেও এই উৎসবে সর্ব্বত্র একই কার্য্যসূচী অনুসৃত হয় না। বাঙ্গালীর দেওয়ালী প্রধানতঃ কালীপূজা-কেন্দ্রিক। মাতৃভাবের উপাসনায় এবং উদ্দীপনায় বাঙ্গালীর মতি-গতি যেমনটি খেলিয়াছে অন্য কোন জাতির তেমনটি খেলে নাই বা অন্য কোন ভাবে বাঙ্গালী ততখানি তন্ময় হয় নাই। 'মা' কথায় সে আত্মভোলা; মাতৃমূর্ত্তি অপেক্ষা মহিমময়ী, নির্ম্মল ও উজ্জ্বল আর কিছু সে জানে না। বাঙ্গালীর ধর্ম্মে-কর্ম্মে, তাহার সাহিত্যে-সমাজে মাতৃপূজার অক্ষুন্ন রাজত্ব। উপনিষদের ঋষিরা জগৎ ব্রহ্মময় দেখিয়াছিলেন, বাঙ্গালী দেখিয়াছে মাতৃময়। "একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মকে জ্ঞাতসারেই বহু ভাবে দর্শন ও আরাধনা সমগ্র হিন্দু জাতির বিশেষত্ব।" বাঙ্গালীও তাহার মাতৃরূপা ব্রহ্মকে বহু রূপে রূপায়িত দেখিয়াছে এবং সেই সকল রূপের উপাসনা করিয়াছে। মা কালী সেই বহু রূপের এক রূপ। বলিতে কি, বাঙ্গালীর মাতৃদেবতার মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রধান! ইনি একাধারে সুন্দর ও ভৈরব; যেমন ইঁহার এক হাতে খড়্গ আর এক হাতে অসুর-মুণ্ড, তেমনি আবার এক হাতে বর, অপর হাতে অভয়; ইনি ভীষণং ভীষণাং, আবার আশ্রিত সন্তানের প্রেমময়ী জননী; ইনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্রী, ইনিই জগদীশ্বরী। অতীব দুর্জ্ঞেয় এই কালীতত্ত্ব! জানি না কোন্ সাধকের ধ্যানলব্ধ অথবা কল্পনা-প্রসূত এই কালীমূর্ত্তি! কিন্তু বাঙ্গালীই ইঁহার প্রধান ভক্ত এবং বলিতে কি বর্ত্তমান বাংলা ইঁহারই অধিকারভুক্ত! ঋষি বঙ্কিম এক দিন এই কালী-প্রতিমার মধ্যে হৃতসর্ব্বস্বা বঙ্গজননীর মূর্ত্তিটিই যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আনন্দমঠে ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কালীমূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ, মা যা হইয়াছেন।...কালী—অন্ধকার-সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্বা, এইজন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!" কিন্তু তিনি আশা পরিত্যাগ করেন নাই, সন্তান যেদিন মাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারিবে দেশ আবার সেদিন ধন-ধান্যে, ষড়ৈশ্বর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, সর্ব্বানন্দ (ত্রিপুরা) এই নগ্নিকার পদতলে বসিয়াই অনন্তরূপিণী জগদীশ্বরীকে মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, মহাশক্তি মহাকালীর পূজায় এক দিন তাহার সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হইয়া সংসারে-সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা হইবে।

বলিতে কি, সমস্ত বাংলা দেশটাই যেন কালীক্ষেত্র! যেদিকে চাই কেবলই কালীমন্দির, কালীপূজা। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতার বুকে ৫১ পীঠের শ্রেষ্ঠ পীঠ কালীঘাট। লক্ষপতি হইতে পথের ভিখারী পর্য্যন্ত কে না সেখানে দিনান্তে, মাসান্তে কিংবা বৎসরান্তে একবার দেবীর কৃপালাভের জন্য ছুটিয়া যায়? ঠন্ঠনিয়া কালীবাড়ীও কলিকাতার কেন্দ্রস্থলেই অবস্থিত। কলিকাতা হইতে গঙ্গার তীর ধরিয়া উত্তর দিকে চলিলে মাত্র কয়েক ক্রোশের মধ্যে আরও কত মাতৃমন্দিরই না চোখে পড়ে! ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বরে ৺ভবতারিণীর মন্দির, মূলাযোড়ে কলিকাতার ঠাকুর-বংশের গোপীমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ৺ব্রহ্মময়ী কালীমন্দির, সেওড়াফুলিতে তথাকার রাজাদের দ্বারা স্থাপিত ৺নিস্তারিণীর মন্দির, বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহদেব প্রতিষ্ঠিত ত্রয়োদশ-চূড় ৺হংসেশ্বরী মন্দির—এইরূপ কত নাম করা যায়। গঙ্গার তীর ছাড়িয়া অন্যত্র দৃষ্টিপাত করি, সেখানেও প্রতি সমৃদ্ধ জনপদ ও নগর-বন্দরের জাগ্রত দেবতা—অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালী,—'সিদ্ধেশ্বরী', 'আনন্দময়ী', 'ঢাকেশ্বরী', 'দয়াময়ী' প্রভৃতি নানা নামে অভিহিতা এবং পূজিতা। যখনই যিনি অর্থ-বিত্ত, সম্মান-প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াছেন, পুণ্য অর্জ্জন করিতে চাহিয়াছেন, তখনই তাঁহার মনে জাগিয়াছে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা। তাই দিনে দিনে বাংলার মাটীতে মায়ের মন্দির বাড়িয়াই গিয়াছে। পল্লীবাংলায় কালীপূজা না করিয়া কিংবা কালীমন্দিরে ভোগ না দিয়া বিবাহাদি কোন শুভকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না। শুধু তাহাই নহে,—দুর্ভিক্ষে-মহামারীতে, অশান্তি-উপদ্রবে দুঃস্থ বাঙ্গালীর রক্ষাকর্ত্রী মা রক্ষাকালী। বিশেষ বিশেষ দিনে, শনি-মঙ্গলবারে, অমাবস্যায় মহা ঘটা করিয়া ইঁহার পূজা করা হয়। বাঙ্গালী-চিত্তের উপর শাক্ত প্রভাব অপরিসীম। এমন কি, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলাভূমি এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাধনপীঠ নবদ্বীপেও শক্তিদেবীদের তথা মহাদেবী কালীর পূর্ণ আধিপত্য। তাই দেখি, বৈষ্ণবদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্ব্ব 'রাসযাত্রা'র দিনে সেখানে চলে মহাড়ম্বরে কালীপূজা। কি বিশাল সুন্দর সে-সকল কালীমূর্ত্তি! ব্যাদরাপাড়ার 'শবশিবা' মূর্ত্তি ও চারিচারা বাজারের 'ভদ্রকালী' মূর্ত্তি বিশ হাত পর্য্যন্ত উঁচু হয়। নবদ্বীপে এই দিনে প্রায় তিন শত কালী ও অন্যান্য শক্তিদেবীর পূজা হইয়া থাকে।

আশ্বিনী অমাবস্যার গভীর নিশীথে শ্যামা মায়ের পূজা—শাক্তধর্ম্মী বাঙ্গালীর দেওয়ালী উৎসবের ইহাই বড় কথা। ছোট কথাও অনেক আছে। দেওয়ালী একটি অনুষ্ঠান-বহুল উৎসব।

লক্ষ্মীপূজা

কালীপূজার রাত্রিতে—সন্ধ্যায় বাংলা দেশের বহু স্থানে,—বিশেষতঃ ভাগীরথী অঞ্চলে এবং যশোহর ও খুলনা জেলায় গৃহিণীরা লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীর পূজা করিয়া থাকেন। গোবর দিয়া অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি এবং পিটুলি দিয়া লক্ষ্মী, কুবের ও নারায়ণের মূর্ত্তি গড়া হয়। অলক্ষ্মীর মূর্ত্তিটি কলার খোল বা পেটোতে রাখিয়া প্রথমে তাঁহার পূজা ও ধ্যান করা হয়। অলক্ষ্মী কৃষ্ণবর্ণা, ক্রোধী, এলোকেশী; তাঁহার এক হাতে কুলা, অন্য হাতে সম্মার্জ্জনী, তিনি গর্দ্দভারূঢ়া,—প্রায় শীতলাদেবীরই অনুরূপ। পূজান্তে ছেলেমেয়েরা কুলা পিটাইতে

পিটাইতে অলক্ষ্মীর মূর্ত্তিটি ঘরের বাহিরে লইয়া যায় এবং চৌমাথায় ফেলিয়া দিয়া বলে, 'লক্ষ্মী ঘরে আয়, অলক্ষ্মী দূরে যা।' এইরূপে 'অলক্ষ্মী-বিদায়'-এর পর যথারীতি লক্ষ্মীপূজা করা হয়। লক্ষ্মী-মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে কুবের, কুবেরের ধনভাণ্ডার ও নারায়ণের মূর্ত্তিগুলি বসানো হয়। পিটুলির মূর্ত্তি ছাড়াও কিংবা পিটুলির মূর্ত্তি না দিয়া অনেকে মাটির প্রতিমা আনেন। পূজা-স্থানে একটি ঘৃত-প্রদীপ ও বহু তৈল প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়। ঘৃত-প্রদীপটি সারা রাত্রি রক্ষা করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই দিন অন্যান্য স্থানে 'দীপদানের' কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বাংলার কোন কোন অঞ্চলে সন্ধ্যায় আর একটি কৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। পাটশোলা জ্বালাইয়া ঘরে ঘরে, ঘরের আনাচে-কানাচে যাওয়া হয় এবং বলা হয়,—'জোঁক পোকৃ কি কর, ঘর তনে (হইতে) নিকাল (বাহির হও)।'

বাজী পোড়ানো—বিচিত্র রকমের বাজী পোড়ানো, পট্‌কা ফাটানো বাঙ্গালীর দেওয়ালী উৎসবের আর একটি প্রধান অঙ্গ। প্রতি বৎসর কত সহস্র টাকা যে এই উপলক্ষে তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়, পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা সহজ নয়। এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী অনেক সময় এমন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে যে, তাহাতে পথচারীর এবং পাড়া-প্রতিবেশীর অশেষ ক্ষতি সাধিত হয় এবং গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া নানা বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করিতে হয়।

দীপান্বিতা অমাবস্যায় নিষ্ঠাবান হিন্দুদের অনেকেই পরলোকগত পিতৃপুরুষদের তৃপ্ত্যর্থে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন এবং সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে দীপ ও উল্কাদান করেন। তাঁহাদের মতে দীপদানের মূল উদ্দেশ্য পিতৃপুরুষগণকে যমলোক হইতে দেবলোকে যাইবার পথে সহায়তা করা।

হিন্দুস্থানীদের দেওয়ালী

উত্তর ও পশ্চিম-ভারতের দেওয়ালী উৎসব প্রধানতঃ লক্ষ্মীপূজা। বাঙ্গালীরা যে উদ্দেশ্যে এই পূজা করে, হিন্দুস্থানীরাও সেই উদ্দেশ্যেই করিয়া থাকে। কিন্তু আচার-পদ্ধতিতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলা দেশে লক্ষ্মীপূজা করেন গৃহকর্ত্রীরা, উত্তর-ভারতে করেন গৃহকর্ত্তা-গৃহকর্ত্রী উভয়েই। অমাবস্যার সন্ধ্যায় তাঁহারা স্নান করিয়া শুদ্ধ বসনে শুদ্ধ মনে একটি আসনে লক্ষ্মীর মূর্ত্তি এবং উহার দুই পার্শ্বে কুবের, গণেশ, শিব, পার্ব্বতী, রাম, সীতা প্রভৃতির মূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং ধূপ-দীপ জ্বালাইয়া দিয়া ষোড়শোপচারে লক্ষ্মী ও অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা করেন। লক্ষ্মীর নিকট প্রার্থনা করেন অটুট স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ আয়ু, কুবেরের নিকট করেন ধনৈশ্বর্য্য। শুধু ভোগ-নৈবেদ্যই নহে, পূজা-স্থানে কিঞ্চিৎ ধনরত্ন, খাতাপত্র, দোয়াত-কলম, একটা পাত্রে করিয়া ধান গম, তৌলদণ্ড ইত্যাদিও সাজাইয়া দেওয়া হয়। অনেকে সিন্ধুকের গায়, দেওয়ালে, কপাটে সিন্দুর দ্বারা স্বস্তিক-চিহ্ন আঁকেন, এবং মনে মনে উহাকে পূজা করেন। সন্ধ্যা হইতেই ঘরে একটি ঘৃত-প্রদীপ জ্বালিয়া রাখা হয়। এই প্রদীপ লক্ষ্মীর প্রতীক, সিন্দুরের কৌটা দিয়া যথারীতি উহাকেও পূজা করা হয়। লোকমত এই যে, দেওয়ালীর রাত্রিতে সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যাহার গৃহে দীপ জ্বলে, লক্ষ্মী তাহার গৃহে স্থায়ী হন এবং সেই গৃহস্বামী কখনো দারিদ্র্য-কষ্ট ভোগ করেন না। প্রদীপের তৈল শরীরে মালিশ করিলে স্বাস্থ্য এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়, এইরূপও শুনা যায়। দীপদানের ব্যাপারে মাড়োয়ারী, বিহারী, বোম্বাইবাসী প্রভৃতিরা যথেষ্ট উৎসাহ দেখান এবং ব্যয় করেন। তাঁহাদের মতে দীপদান মহাপুণ্যময় অনুষ্ঠান। এই কৃত্যের ভিতর দিয়া দাতা অতুল সম্পদ ও সম্পত্তির অধিকারী হন এবং অন্তে মোক্ষধাম লাভ করেন। দ্যূতক্রীড়া বা জুয়া খেলা হিন্দুস্থানীদের দেওয়ালীর আর একটি অঙ্গ। লোকবিশ্বাস এই যে, রাত্রিতে লক্ষ্মী ঘরে ঘরে উঁকি দিয়া যান—কে জাগে, কে ঘুমায়। নিদ্রিত ব্যক্তির গৃহ হইতে তিনি নিঃশব্দে চলিয়া যান এবং যে জাগিয়া আছে তাহার গৃহে গিয়া অবস্থান করেন। তাই গৃহীরা দেওয়ালীর সারা রাত্রি জাগিয়া থাকিতে চেষ্টা করে এবং অনেকে দ্যূতক্রীড়ার ভিতর দিয়া এই চেষ্টায় সফল হইতে চায়। বাঙ্গালীদের মধ্যেও প্রায় একইরূপ বিশ্বাস প্রবল দেখা যায়। লক্ষ্মীর ব্রতকথায় আছে, অমাবস্যার রাত্রিতে প্রদীপের আলো দেখিয়া লক্ষ্মী আসিয়া ঘরে উঠেন। অন্ধকারে পাছে তিনি ফিরিয়া যান তাই গৃহিণী আলো জ্বালিয়া সারা রাত্রি দরজার কাছে বসিয়া থাকেন।

ব্যবসায়ীদের অনেকে এই লক্ষ্মীপূজার পরদিন হইতে তাঁহাদের বৎসর ধরেন এবং নূতন খাতা করেন। বাঙ্গালীরা দুর্গাপূজার সময়ে যেমন নূতন বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়, বিজয়ার দিনে আত্মীয়-বান্ধব-পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে মিষ্টিমুখ করায়, সাদর সম্ভাষণ জানায়, অবাঙ্গালীরা দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজার দিনে সেইরূপ করিয়া থাকে; তখন তাহাদের ঘর-দুয়ার, উঠান-আঙ্গিনা, আসবাবপত্র, তৈজস বিশেষ ভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়।

গো-অর্চ্চনা

গো-অর্চ্চনা এবং গোরুর সেবা-যত্ন উত্তর-ভারতীয় দেওয়ালীর আর একটি প্রধান অঙ্গ। পল্লীবাসীরা সেদিন হালচাষ বন্ধ রাখে এবং গো-মহিষাদিকে সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রমের কাজ হইতে মুক্তি দেয়। সকাল হইতেই সকলে তাহাদের গোরু-বাছুর লইয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী কোনও বৃহৎ জলাশয়ের দিকে অগ্রসর হয় এবং সেগুলিকে জলে নামাইয়া ডলিয়া-মলিয়া স্নান করায়। স্নানের শেষে শোভাযাত্রা করিয়া বাড়ী ফিরে এবং একে একে প্রত্যেক গোরুর শিঙ্গায় তেল-ঘি মাখাইয়া দেয়; আবীর কিংবা অন্য রং গুলিয়া সর্ব্বাঙ্গে ছাপ দেয় এবং উত্তম ঘাস ও খড়-ভূষি-খৈল-খাবার দিয়া প্রণাম করে। বাংলা দেশেও এইরূপ গো-অর্চ্চনার রীতি আছে, কিন্তু তাহা অন্য দিনে—চৈত্র-সংক্রান্তিতে সম্পন্ন হয়।

দক্ষিণ-ভারতের দেওয়ালী

দক্ষিণ-ভারতের দেওয়ালী ত্রয়োদশী হইতে আরম্ভ হয় এবং অমাবস্যা পর্য্যন্ত তিন দিন ধরিয়া তাহারা দীপদান করে। পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনকে মিষ্ট বিতরণ করা হয়; বালক-বালিকারা নূতন কাপড় পরে, বাজী পোড়ায়; ব্যবসায়ীরা ধনরত্ন ও খাতাপত্রের পূজা করে; সকলে শুদ্ধ মনে শুদ্ধ বসনে এই কয় দিন অতিবাহিত করে। প্রথম দিনের উৎসবকে 'ধন-ত্রয়োদশী' বলা হয়; সেদিন ধনরত্ন ও গৃহের যাবতীয় দ্রব্যাদি

পূজা এবং উহাদের বৃদ্ধি কামনা করা হয়। ইহা লক্ষ্মীপূজারই প্রকার-ভেদ। দ্বিতীয় দিনের উৎসবকে 'নরক চতুর্দ্দশী' বলা হয়। এই দিন মাদ্রাজীরা সাজ-সজ্জায় এবং প্রসাধনে বিশেষ মনোযোগী হয়। অমাবস্যায়ও অনুরূপ অনুষ্ঠানই চলে। তবে সেদিন বিশেষ ভাবে বহ্নিপূজাও করা হয়।

দীপদান

দেখিতেছি, দেওয়ালী উৎসরের কতকগুলি কৃত্য ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রায় একই ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। 'দীপদান' তন্মধ্যে একটি। অনেকে বলেন, চৌদ্দ বৎসর বনবাসের পর রাম রাবণকে বধ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে এই দিনটিতে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয় এবং এই উপলক্ষে জনচিত্তে যে-আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, দেওয়ালীর আলোক-সজ্জা তাহারই স্মৃতি বহন করে। আবার কাহারও মতে এই দিনটি রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যাভিষেকের দিন; তাহারই স্মৃতি-পূজা হয় প্রতি বৎসর এই দীপদানের ভিতর দিয়া। দাক্ষিণাত্যে আরও একটি লোকমত প্রবল দেখা যায়। সেখানে দীপান্বিতা অমাবস্যার পূর্ব্ব দিনকে 'নরক চতুর্দ্দশী' বলা হয়। কথিত আছে, ঐ দিন বিষ্ণু নরকাসুরকে বধ করিয়া বিজয়ী-বেশে রাজধানীতে (?) প্রত্যাবর্ত্তন করেন; তাঁহারই সম্বর্দ্ধনার জন্য যে আলোক-সজ্জার ও বাজী-বারুদ পোড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, দেওয়ালী উৎসবের ভিতর তাহারই ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। রাজনৈতিক কারণ ছাড়া আমাদের শাস্ত্রকাররা দীপ ও উল্কাদানের ধর্ম্মীয় কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতীয় হিন্দুরা বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পর তাহাদের পিতৃপুরুষগণ দেবলোকে যান, দেবলোক আলোকময়। কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে না; অনেককে কর্ম্মফলের দরুণ অন্ধকারময় যমলোকে অবস্থান করিতে হয়। মহালয়া ও দীপান্বিতা অমাবস্যায় দীপ ও উল্কাদান করিলে, সেই আলোতে পথ দেখিয়া তাঁহারা যমলোক হইতে ঊর্দ্ধলোকে—দেবলোকে চলিয়া যান। এই দীপদান ও উল্কাদানের হৃদয়গ্রাহী শাস্ত্রীয় মন্ত্রও আছে। রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মীয় কারণ ছাড়াও আমাদের মনে আর একটা কারণ জাগে। বাংলা দেশে তথা ভারতে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে, বিশেষতঃ দুর্গাপূজার পর এক শ্রেণীর সবুজ পোকার এত উপদ্রব হয় যে, স্থির ভাবে বসিয়া কোনও কাজ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়; উহারা চোখে, মুখে, সর্ব্বাঙ্গে, খাদ্য-দ্রব্যে, এখানে-ওখানে অবিরত আসিয়া পড়িতে থাকে। ভগবান আমাদিগকে যেমন উপদ্রব দিয়াছেন, উহা হইতে আত্মরক্ষার উপায়ও করিয়া দিয়াছেন। ঐ পোকাগুলির এমনি প্রকৃতি যে, আগুন দেখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না, ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মাহুতি দিবেই। আজকাল ভারতে মধ্যে মধ্যে পঙ্গপাল বিনাশের অভিযান চলে। কে জানে এক কালে এই পোকা-বধের সর্ব্বভারতীয় অভিযান চলিয়াছিল কি না। স্পষ্টই দেখিতে পাই, দীপান্বিতার কয়েক দিনের মধ্যেই ঐ সকল পোকার উপদ্রব একেবারে কমিয়া যায়। প্রশ্ন উঠিতে পারে, পোকা মারিবার উদ্দেশ্যেই যদি দীপদানের বিধান, তবে বিশেষ দিনে কেন, আর দীপই বা কেন? এমনি আগুন জ্বালাইলেও তো কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে! হাঁ, পারে বটে এবং সে ভাবে যে আলো জ্বালানো না হইয়াছে বা এখনো না হয়, তাহা নহে। কিন্তু ভারতীয়দের প্রকৃতি এমনই ধাতুতে গড়া যে, ধর্ম্মীয় কোন নির্দ্দেশ না থাকিলে তাহারা কোনও কাজ করিতে চায় না; আর কোনও বিরাট ব্যাপার সম্মিলিত ভাবে করিতে না পারিলে অভীষ্ট ফলও লাভ হয় না। ধর্ম্ম-বিশ্বাস মানুষকে সদসৎ যে কোনও কার্য্যে অতি সহজেই প্রণোদিত করিতে পারে এবং সমস্ত বিচ্ছিন্ন শক্তিকে মুহূর্ত্তে এক করিয়া দিবার সে ক্ষমতা রাখে। আমাদের শাস্ত্রকাররা মানব-প্রকৃতির এই গোপন খবর রাখিতেন। তাই অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহারা সহজ কথা সহজ ভাবে না বলিয়া ধর্ম্ম-কথার আবরণে বলিয়াছেন এবং কৌশলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি:—যদি তাঁহারা বলিতেন—'মাঘ মাসে মূলার স্বাদ থাকে না. বিশেষতঃ তখন উহাতে একরূপ পোকা জন্মে, অতএব মাঘ মাসে মূলা খাইও না', তবে কেহ তাঁহাদের সে-কথা শুনিত, কেহ শুনিত না—অনেকেই উপেক্ষা করিত। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাঁহারা বলিয়াছেন, 'মাঘ মাসে মূলা-ভক্ষণ, গোমাংস ভক্ষণের সমান', সেই মুহূর্ত্তে বাঙ্গালী হিন্দুরা শিহরিয়া উঠিল। তাই তো মাঘ মাসে মূলা খাইয়া কি ধর্ম্মনাশ করিব! এই ভয়েই নিষ্ঠাবান হিন্দুরা মাঘ মাসে মূলা খান না। কিন্তু ঐ বিধানের মূলে শাস্ত্রকারদের কি উদ্দেশ্য ছিল?—পূর্ব্বাহ্নেই কুখাদ্য-গ্রহণজনিত রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা। দীপদান-ব্যাপারেও যদি তাঁহারা বলিতেন, 'হে ভারতবাসী, তোমরা প্রতি সন্ধ্যায় দীপদান করিবে ও অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে, তাহা হইলে পোকার উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবে,'—তাঁহাদের কথা কেহ শুনিত, কেহ শুনিত না। কিন্তু তাঁহারা যে ভাবে এই দীপদানের নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন, আসমুদ্রহিমাচল-ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুরা তাহা মাথা পাতিয়া লইয়াছে। পিতৃপুরুষকে কে অন্ধকারময় যমলোকে ফেলিয়া রাখিতে চায়? তাঁহাদের প্রতি কাহার না শ্রদ্ধা আছে? সামান্য কয়েকটি দীপদানে যদি তাঁহাদের দেবলোক-প্রাপ্তি ঘটাইতে পারি, আপত্তি কি? তবে জানি না, শাস্ত্রকারদের ঠিক উদ্দেশ্য কি ছিল? মনে যাহা আসিল, তাহাই বলিলাম। পূর্ব্বোক্ত কোনও রাজনৈতিক কারণও হইতে পারে। বাজী পোড়ান, পট্‌কা ফাটান—এইগুলির উদ্দেশ্যও আর যাহাই থাকুক, বর্ষার অবসানে স্যাঁতস্যাতে আর্দ্র পথ-ঘাট-মাঠ, আনাচ-কানাচ হইতে যে দুর্গন্ধ বাষ্প উত্থিত হইতে থাকে, নানা রোগের বীজাণু সৃষ্টি হয় বা হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, ব্যাপক ভাবে বাজী পোড়ানোর ফলে তাহা কতকটা বিনষ্ট হয় বৈ কি। আমাদের যাহা কিছু আচার-বিচার সকলই কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া একটু চিন্তা করিলে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব মিলিতে পারে।

শ্রীআনন্দময়ী মা

নির্ম্মলেন্দু ভট্টাচার্য্য

"তোমরা শুদ্ধ ও পবিত্র ভাবে থাকলেই আমি সুস্থ থাকব, তোমাদের শুদ্ধ ভাবই আমার পুষ্টিসাধন করবে। বাইরের খাওয়ায় কিছু হবে না।"—এ কথা অনেক সময়েই যাঁকে বলতে শোনা যায়, সেই মহীয়সী মহিলা পূব-বাংলার ত্রিপুরা জেলার খেওড়া গ্রামে ইংরাজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তারিখে রাত প্রায় তিনটের সময় জন্মেছিলেন। নাম শ্রীমতী নির্ম্মলাসুন্দরী দেবী। যে নামে ইনি সকলের কাছে পরিচিতা সেই "শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা" নাম প্রথমে রাখেন ঢাকার ৺শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়, আই, এস্, ও, পার্সনাল এসিষ্ট্যাণ্ট টু দি ডাইরেকটর অব এগ্রিকালচার, বাংলা। বাপের নাম শ্রীবিপিনবিহারী ভট্টাচার্য, মায়ের নাম শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী দেবী।

অন্যান্য মহাপুরুষদের বেলায়ও যেমন, এঁর জন্ম সম্বন্ধেও তেমনই শুনতে পাওয়া যায়। গর্ভে আসবার আগে মা মোক্ষদাসুন্দরী স্বপ্নে প্রায়ই অনেক দেব-দেবী দেখতে পেতেন। বিপিনবিহারীর মা কসবার কালীবাড়ীতে গিয়ে ছেলের একটি ছেলে হোক্ প্রার্থনা করতে গিয়ে না কি মেয়ে হোক করে ফেলেছিলেন। তারই কিছু দিন পর এঁর জন্ম।

ছোটবেলায় নির্ম্মলাসুন্দরী ঠিক আর পাঁচ জনের মত ছিলেন না, কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক থাকতেন। তাই সবাই তাঁকে ট্যালা, সোজা এই সব বলত। হয়ত ভাত খাচ্ছেন, খেতে খেতে. বেহুঁস। মা ধাক্কা মারতেন, বকতেন। কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হয়নি। সেই সময়ের সম্বন্ধে পরে তিনি বলেছেন, "আমি দেখতাম কত দেব-দেবীর মূর্ত্তি আসছে-যাচ্ছে।"

ঢাকা বিক্রমপুরের শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে এক দিন যথানিয়মে শাঁখ বেজে উলুধ্বনি করে তাঁর শুভবিবাহ হয়ে গেল। তখন তাঁর বয়স বার বছর দশ মাস মাত্র! রমণীমোহন বিয়ের পর দু'-একখানা বাংলা বই স্ত্রীকে পড়বার জন্যে এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু সংযুক্ত অক্ষর, লাইন, ছন্দ, কাজেই বই পড়া তাঁর আর হ'য়ে শিখেছিলেন। তার পর আর কিছু হয়নি। তাঁর সম্বন্ধে যে দু একখানা বই ছাপা হয়েছে, তাতে পরবর্ত্তী জীবনে অনুরোধে পড়ে তাঁর নিজের হাতের লেখা কিছু কিছু চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে। সেই চিঠিপত্রে অজস্র বানান ভুল থেকে তাঁর লেখাপড়া সম্বন্ধে এই ধারণাই করা যায়।

বিয়ের সময় রমণীমোহন পুলিশে কাজ করতেন। প্রায় ছ' মাস পরে তাঁর চাকরি যায় এবং কয়েক বছর বেকার হয়ে থাকতে বাধ্য হন। রমণীমোহনের ভাই রেবতীমোহন ছিলেন রেলওয়ে ষ্টেশন-মাষ্টার। তাঁরই কাছে বিয়ের পর থেকে বছর চারেক নির্মলাসুন্দরীর কাটে। ভাসুর মারা যাওয়ার পর আটপাড়া, বিদ্যাকুট, শুষ্টগ্রাম, বাজিতপুর প্রভৃতি জায়গায় বিভিন্ন সময়ে ছিলেন। ২১ বছর বয়স থেকে ঢাকায় বাস করতে লাগলেন এবং এখানে কয়েক বছর একাদিক্রমে ছিলেন। সেই সময়ে এই মেয়েটিকে কারো সঙ্গে কথা বলতে দেখা যেত না। মাথায় ছিল এক মস্ত ঘোমটা। পরে স্বামীর আদেশে ও অনুরোধে আস্তে আস্তে সকলের সঙ্গেই কথা বলতে আরম্ভ করেন। ইনি কেবলই ভারতবর্ষময় ঘুরে ঘুরেই বেড়ান, কোথাও স্থির হয়ে বেশী দিন থাকেন না। বর্ত্তমানে বয়স ৫৬ বৎসর।

ছেলেবেলায় বাবা একবার বলেছিলেন, হরিনাম করা ভাল। নির্মলাসুন্দরী তাই আরম্ভ করে দিলেন। ক্রমে ভগবানের নামে তন্ময়তা বেড়ে চলল। ভাসুরের কাছে থাকার সময় রান্না করতে করতে তন্ময়তায় আবিষ্ট হয়ে পড়তেন। এদিকে রান্নার তরি-তরকারি পুড়ে যেত, বড় জা এসে নানা কথা বলতেন। লোকে মনে করত বউ বড় ঘুমোয়। ইনি কোন প্রতিবাদ করতেন না। মহা অপ্রস্তুত হয়ে আবার সব ঠিক করে রান্না করতে বসতেন। অত্যন্ত শান্ত ও ধীর স্বভাবের ছিলেন বলে সকলেই তাঁকে একটু স্নেহ না করে থাকতে পারত না। ১৭ কি ১৮ বছর বয়সে অষ্টগ্রামে থাকার সময় সেখানকার এক ভদ্রলোক শ্রীগগন রায়ের বাড়ী কীর্ত্তন হয়েছিল। শোনা যায়, ভাবের লক্ষণ প্রথম সেই সময়েই দেখা দিয়েছিল। এর পর প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯২১ সাল হতেই এই স্ত্রীলোকটির জীবনের অদ্ভুতত্ব লোকের কাছে ধরা পড়তে আরম্ভ হল। এই সময়ে ইনি বাজিতপুরে ছিলেন।

এই মহিলার জীবনে দেখা যায়, সংসারকে কখনো নিজে ইচ্ছে করে ছেড়ে দেননি, সংসারই বরং যখন ছাড়বার এঁকে ছেড়ে দিয়েছে। আর কোনো কর্ত্তব্যে অবহেলা করে আরাম-বিরাম, এমন কি ভগবৎ সাধনা করতেও কেউ কখনো তাঁকে দেখেনি। পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত সংসারের লোক। ঝি-চাকর থাকার রেওয়াজও ছিল না, থাকার মত অবস্থাও নয়। স্বামীর সকল রকম পরিচর্য্যা থেকে রান্নাবান্না, বাসন মাজা, মশলাদি বাটা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া প্রভৃতি সমস্ত কাজ নিজের হাতে তন্ন-তন্ন করে করতেন। কিন্তু হলুদ, মশলা প্রভৃতি শিলনোড়ায় বাটবার সময় তার তালে-তালে ছন্দে-ছন্দে হরিনাম মনে মনে হত, এ কথা তাঁর কাছ থেকে শোনা গেছে। সংসারের সমস্ত কাজ সেরে নিজের ঘরটিতে নাম-জপে বসতেন। বাড়া ভাত পড়ে থাকত। রাতের পর রাত শেষ হয়ে যেত। শরীরে কোনও ক্লান্তি বা বিষণ্ণতা আসত না। এই সময় তাঁর শরীর দিয়ে নানা ধরণের আসন, মুদ্রা, পূজা প্রভৃতি আপনা থেকে হয়ে যেত। তিনি বলেছেন, "এই সময়ে কখনো, কখনো আমার শরীর

জ্যোতির্ময় হয়ে পড়ত। সেই জ্যোতিঃ যেন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে এমন মনে হত।" যেখানে থাকতেন সেখানটা গরম হয়ে উঠত। স্বামী রমণীমোহন চৌকার ওপর মশারীর ভেতর থেকে আশ্চর্য্য হয়ে এই সব দেখতেন, দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়তেন।

কেউ কেউ লুকিয়ে এই সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখে ফেলেছিল। তবে ব্যাপারটা যে কি তা কেউ ধরতে পারত না। সাধারণ মানুষ কি করেই বা বুঝবে! কেউ মনে করত এ সব ভুতুড়ে, কেউ মনে করত রোগ। যে যার বুদ্ধিমত ওঝা বা চিকিৎসক দেখাতে বলত। দু'-এক জন ওঝা এসেওছিল। কিন্তু কেউ-ই কিছু সুবিধে করে উঠতে পারেনি। কাজেই 'ভৌতিক ব্যাপার' বা 'অদ্ভুত রোগ' প্রবলগতিতে বেড়েই চলল। ইনি বলেছেন, "এই অবস্থা আরম্ভ হলে আমাকে ভূতে পেয়েছে ভেবে সকলে আসা বন্ধ করল। ভালই হল। আমিও একান্ত পেয়ে আপন-মনে বসে থাকতাম।"

সাধন-জীবনে এই লোকটিকে কখনও আসনে বা কিছুতে বসতে দেখা যেত না। মাটিই তিনি বেশী পছন্দ করতেন। মাটিতেই বসে থাকতেন, মাটিতেই শুয়ে পড়তেন। কখনো কখনো দেখা গেছে, পিঁপড়েয় তাঁর মুখ-হাত ভরে গিয়েছে, ইনি এক কোণে পাথরের মত মাটিতে পড়ে আছেন। সেমিজ কখনও গায়ে দিতেন না। কাপড় পরা এমন চমৎকার ছিল যে, হাত দেখা যেত না।

সাধনায় সময় তাঁর এই যে আসন, মুদ্রাদি হত, তিনি বার-বার বলেছেন, ইচ্ছে করে বা চেষ্টা করে কিছুই করতে পারতেন না। শরীর বেঁকে বেঁকে আপনা থেকে এ সব হয়ে যেত, এমন অদ্ভুত। এই মানুষটিই আবার যখন সাধারণ লোকের মত তাদের সুখ-দুঃখ ও সমস্যা সম্বন্ধে কথা বলেন, পরামর্শ দেন এবং হাসেন, তখন কেউই বুঝতে পারে না যে, তাদের কল্পনারও অতীত সব ঘটনা ও আচরণ এঁর জীবনে অতি সহজেই হয়ে গেছে, যার জন্তে ইনি নিজে থেকে কোন চেষ্টা করেননি।

প্রথম দিকে স্বামী রমণীমোহন ভাবতেন তাঁর স্ত্রীর বয়স কম, আরো একটু বয়স বেশী হলে সব ভাব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু বয়স হলেও গৃহিণীর ভাবের কোন পরিবর্তনই তিনি দেখতে পেলেন না। নির্মলাসুন্দরীর মধ্যে কাম-ক্রোধাদির কোন প্রকাশ না দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলতেন, "এ কি অদ্ভুত, এ রকম শোনাই যায় না!" ইনি তখনই উত্তর দিতেন, "হয়ত দরকার নেই।" স্বামীর মধ্যে কামভাব এতটুকু জাগা মাত্র তাঁর শরীরটা এমন হয়ে যেত যে, স্বামী রীতিমত ঘাবড়ে যেতেন এবং তাঁকে সুস্থ করার জন্য ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। পরস্পরের যৌন-জীবন সম্বন্ধে এই মহিলা সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন, "অঙ্গস্পর্শ করার দরকার হত না। বিছানায় শুয়ে আছি, ভোলানাথের (রমণীমোহনকে পরে সকলে 'ভোলানাথ' বলেই ডাকত) কোনরূপ ভাবের পরিবর্তন মাত্রই এই শরীরটায় অস্বাভাবিক অবস্থা হত।" কাম, ক্রোধ, লোভের লেশ মাত্র তাঁর মধ্যে কেউ কখনো দেখতে পায়নি। বাপের কাছে মেয়ে যেমন থাকে, স্বামীর কাছে ঠিক তেমন ভাবেই থাকতেন। যৌন-জীবনে এত বিরাগ দেখে সমান-বয়সী মেয়েরা নানা বিদ্রূপ করতেন। কিন্তু তাই বলে তাঁকে কেউ কোন দিন কিছু বলতে বা বোঝাতে দেখেনি ; আপন-মনে চুপচাপই থাকতেন। ছেলেপুলে হল না ভেবে স্বামী অনেক সময় আবার বিয়ের কথা ভাবতেন, কিন্তু স্ত্রী এমন ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর সেবা-যত্ন করতেন যে, এ চিন্তা তাঁর মন থেকে শীঘ্রই মুছে গেল। এই পরিপূর্ণ সংযম পালন তিনি চেষ্টা করে অথবা করা উচিত মনে করে যে করতেন তা মোটেই না। তিনি বলেন, "এটা ভোগ বা ওটা ত্যাগ করব, এ ভাব কিন্তু নয়। এ পথ দিয়ে শরীরটা চলেছে, বোধ হয় তাই তোমাদের দরকার, তাই শরীরের গতি এরূপ হয়ে গিয়েছে। যদি বল, কেন সব ভোগ শরীর দিয়ে হল না, এই কেনর কোন অর্থ নেই।"

নিন্দুকের কোন দিনই অভাব হয় না। এই মেয়েটির সম্বন্ধে কেউ কেউ তেমনই নিন্দে করতে ছাড়েনি। তার উত্তরে রমণীমোহন নির্ভীক ভাবে ও নিঃসঙ্কোচে একবার লিখেছিলেন, "তাঁকে (অর্থাৎ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে) ১২ বছর ১০ মাস বয়সে বিয়ে করেছি। আজ পর্য্যন্ত তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা কখনও দেখিনি, তাই আমি নিঃসন্দেহে তাঁকে জগতের সকলের কাছে ছেড়ে দিয়েছি।"

রমণীমোহন পরশপাথরের ছোঁয়া লেগে সোনা হয়ে উঠলেন। জপ, ধ্যান, তপস্যা ঐকান্তিক ভাবে চলতে আরম্ভ হল। শেষ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে 'মা' বলে ডেকেছিলেন। ১৯৩৮ সালে দেরাদূনে আনন্দময়ী আশ্রমে তাঁর দেহত্যাগ হয়েছে।

আশ্রম স্থাপিত হওয়ার সময়ে তিনি বলতেন, "আশ্রমের তো আমার কোনই দরকার নেই, গাছতলাই আমার আশ্রম। তবে তোমাদের দরকার যদি হয় করতে পারো।" কোন লোক যদি জিজ্ঞাসা করে, "মা, আপনার আশ্রম কোথায়?" অমনিই উত্তর আসত, "তোমার বাড়ীই আমার আশ্রম।" অবশ্য পরবর্তী কালে ভক্তগণ বিভিন্ন জায়গায় আশ্রম করেছেন।

কাউকে কোন দিন দীক্ষা তিনি দেননি। কেউ দীক্ষা নিতে চাইলে বলেন, "এই শরীর ত কাউকে দীক্ষা দেয় না।" তবে তিনি উপযুক্ত গুরুর সন্ধান দিয়ে তাকে সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হন না। যদিও তাঁকে অশ্রান্ত ভাবে দিন-রাত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা ছুটে বেড়াতে দেখা যায় এবং সর্বত্রই তাঁকে কেন্দ্র করে লোকের ভগবদ্‌ভাব পুষ্ট হতে থাকে ও মানুষ শান্তি পায়, কোন একটা বিশেষ ভাব বা 'মিশন' প্রচার করতে তাঁকে দেখা যায় না। লোককে যথার্থ ধর্মজ্ঞান দেওয়ার সংস্কারও তাঁর আছে বলে মনে হয় না। অথচ সদ্ভাবের সকল পথকেই ইনি পুরোপুরি সমর্থন করেন এবং যে-কোন মতের লোকই হোক না কেন এঁর কাছে এসে কোন অসুবিধে বোধ করেননি, বরং নিজ ভাবের পুষ্টিলাভ করেছেন। ইনিও বলেন, "এ শরীরের ত সাধন-ভজন করে উন্নত হওয়ার বা এই ভাবের কোন কথা নেই, তাই তোদের আবশ্যক অনুযায়ী যখন যা হবার হয়ে যাচ্ছে এবং হবে।" আবার "আমার নিজের করবার বা বলবার প্রয়োজন নেই, আগেও ছিল না বা পরেও হবে না। যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে, পাচ্ছে বা পাবে, সবই তোমাদের জন্যে। এ শরীরের নিজস্ব বলে যদি কিছু বলতে চাও, তবে জগৎময় সবই নিজস্ব।"

একবার তিনি রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। যারা তাঁর কাছে আসত বা থাকত তাদের ধারণা, তিনি একটু ইচ্ছে করলেই রোগটা সারিয়ে ফেলতে পারেন। অথচ কেন যে সারিয়ে ফেলছেন না এই জন্যে তাদের আক্ষেপের অন্ত থাকত না। এ সম্পর্কে প্রশ্ন

করলে উত্তর পাওয়া যেত, "তোমরা এলে তাড়িয়ে দিই না, রোগগুলো এসে শরীরে খেলা করছে, তাই বা তাড়াব কেন? যত দিন খেলা করবার খেলা ক'রে আবার নিজেরাই চলে যাবে।" অতি কঠিন রুগ্নাবস্থায়ও তাঁর স্বাভাবিক মধুর হাসি, অটুট ধৈর্য্য ও লোকের কল্যাণে সাহায্য দান থেকে কেউ তাঁকে একটুও বিচলিত দেখেনি।

এটোয়াতে যমুনার ধারে বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন, যমুনার ধারে একটা ক্ষেতের পাশে নিমগাছের তলায় এক কুঁড়ে ঘরে এক বাগ্‌দি-পরিবার থাকে। অমনি তাদের কাছে গিয়ে হাজির। তারা পেঁপে গাছের পাতা পেতে বসতে দিল। ইনিও তাদের মেয়ে সেজে 'মা' 'বাবা' বলে ডাকতে লাগলেন। তারাও খুব যত্ন করতে আরম্ভ করল। উঠে আসার সময় একটা কাঁচা পেঁপে দিল, কিছুতেই দাম নিল না। এই স্নেহময়ী মহিলা মধ্যে মধ্যে ওখানে গিয়ে বসে থাকতেন। অনেক বিশিষ্ট লোক এঁকে দেখতে যেতেন; পাল্লায় পড়ে তাঁরাও ওখানে গিয়ে পেঁপের পাতার ওপরই বসে পড়তেন।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর যারা অত্যন্ত বিরুদ্ধবাদী তারাও যা স্বীকার না করে পারেনি তা হল তাঁর আকর্ষণ-শক্তি। তাঁর আশ্চর্য্যজনক স্নিগ্ধ ও বিমল আকর্ষণে যেখানেই যান, ধনি-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক এসে হাজির হয়; শুধু তাই নয়, ঢাকায় কীর্ত্তনের সময় ছাগল, কুকুর প্রভৃতি তাঁর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখা গেছে। তাঁর এই আকর্ষণ-শক্তি, সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অপরিমেয় বুদ্ধির সঙ্গে অসীম স্নেহ ও শিশুর সরলতা মিশে লোকের কাছে এক বিস্ময়ের বিষয় হয়ে পড়ে।

এই মানুষটিকে কেউ কেউ বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। বহু জন্ম ধরে সাধনা করতে করতে ইনি এ জন্মে সিদ্ধা হয়েই জন্মেছেন, এই ধারণা নিয়ে কেউ কেউ তাঁর কাছে যেতেন। তাঁদের তিনি বলেছেন, "সাধনার একটি স্তরে গেলে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি পাওয়া যায়। এ শরীরের তো ঐ জাতীয় কিছু পাওয়ার নয়।"

স্বামী দয়ানন্দ একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মা, তুমি কি? কেউ বলে তুমি অবতার, কেউ বলে তুমি আবেশ, কেউ বলে তুমি সাধক বা সিদ্ধ জীব। আমি সত্যি সত্যি জানতে ইচ্ছে করি তুমি কি?" ইনি সহজ সরলতায় বলেছিলেন, "···তুমি কি মনে কর বাবাজী? তুমি যা মনে কর, আমি তাই-ই।"

কয়েক বছর আগে কলকাতার উপকণ্ঠে আগড়পাড়ায় এঁর দর্শনলাভের সৌভাগ্য একবার হয়েছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনার কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে?" তিনি হেসে বলেছিলেন, "তুই যা মনে করিস তাই।" আমি তর্ক করেছিলাম, "আমি যদি মনে করি হয়নি, আর এক জন মনে করে হয়েছে, তা'হলে কোন্‌টা সত্যি? একই সঙ্গে ত দু'টো হতে পারে না।" এই কথা শুনে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী হাসতে লাগলেন। সেই সময় আর একটি প্রশ্নও করেছিলাম, "আপনার কি সাধারণ মানুষের মত ঘুম আসে? শুনি আপনি না কি ঘুমোন না?" উত্তর হল, "শরীরটা পড়ে থাকে মাত্র, ঘুম নেই।"

আধ্যাত্মিক জীবন-সম্পর্কিত না হলে কোন সমস্যার সমাধান ইনি মোটেই দিতে চান না, দিলেও এমন অস্পষ্ট ভাবে যে তা কেউ বুঝতে পারে না এবং তা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেই দিয়ে থাকেন। একবার উত্তর-কলকাতায় দর্জিপাড়ায় ভক্তগণের জন্য যখন এসেছিলেন, এক জন প্রশ্ন করেছিল, কমিউনিজম ভাল কি না? জবাব দিয়েছিলেন, "যেটা সত্যিকারের ধর্ম্ম তা থেকে বঞ্চিত হলে ত টিঁকবে না বাবা!" বর্দ্ধমান জেলার ট্যাঙ্ক ইম্‌প্রুভমেন্ট অফিসার শ্রীভবানীচরণ সেন আর একবার উত্তর-কলকাতায় এঁকে দর্শন করতে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর যে অত্যাচার চলছে, মন্দির ধ্বংস হচ্ছে, হিন্দুধর্ম্ম কি আপনি থাকতে লোপ পেয়ে যাবে?" ইনি শান্ত ভাবে হাসতে লাগলেন। বললেন, "যা যথার্থ ধর্ম তাকে কি কেউ নষ্ট করতে পারে বাবা? দু'টো মন্দির ভাঙলে বা মানুষ মারলে কি সেখানে আঘাত লাগে?"

হৃষীকেশের স্বামী পূর্ণানন্দ একবার প্রশ্ন করে পাঠিয়েছিলেন, আনন্দময়ী মায়ের স্বপ্নদর্শন হয় কি না এবং হলে কি স্বপ্ন দেখেন? ইনি জবাব দিয়েছিলেন, "স্বপ্ন যদি বল তবে ত তোমার সঙ্গে যে কথা বলছি এ-ও স্বপ্ন। আর তা না হলে যারা বাস্তবিক জ্ঞানী তাদের ত নিদ্রা নেই। সে চিরজাগ্রত।"

পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর স্ত্রী কমলা নেহরু মায়ের বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং মাঝে মাঝে এসে সঙ্গ করে যেতেন।

১৩৩৮ সালের শেষের দিকে কলকাতার কাছে দক্ষিণেশ্বর বাগানে দুপুর বেলা এই মানুষটির সঙ্গে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু দেখা করে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলেছিলেন। সেই সময়কার কথোপকথন নীচে দেওয়া হল।

এক ভদ্রলোক—মা, দেশের কাজে কি ভগবানকে পাওয়া যায়?

আনন্দময়ী মা—বাস্তবিক সেবার ভাব জাগলে সেই পথ দিয়েও ভগবানকে পাওয়া যায়। (ফিরে সুভাষচন্দ্রের দিকে) আচ্ছা, বাবা, তুমি এই যে দেশের কাজ করছ, কেন করছ?

সুভাষচন্দ্র (ধীর ভাবে)—আনন্দ পাই।

আনন্দময়ী মা—আচ্ছা, এই যে আনন্দ, এটা নিত্য আনন্দ না খণ্ড আনন্দ?

সুভাষচন্দ্র—তা ত বলতে পারি না।

আনন্দময়ী মা (হেসে)—এই কাজের সঙ্গে সেই কাজটিও একটু কোরো, বাবা। যদিও তোমরা বলতে পার, "এই কাজ ত নিজের জন্য করছি না, সকলের উপকারের জন্য করছি। কিন্তু আমি বলব,—তোমরা যা বলাচ্ছ তাই বলছি, আমি ত লেখাপড়া কিছু জানি না। তবে বলা হয় যে, সবই নিজের জন্য। সকলেই সেই এক অখণ্ড আনন্দই চাইছে। কেন চায়? না, সেই রসটা আমাদের জানা আছে বলেই ত আমরা আবার চাইছি। তবে তোমরা বলতে পার যে, 'এই সব করে কি হবে?' কিন্তু বলা হয় যে, বাস্তবিক যদি এই দিকের কাজ করা যায়, নিজেকে নিজে জানতে পারে, তবে তার দ্বারা জগতেরও অনেক উপকার স্বভাবতঃই হয়ে যায়। যেমন এম্‌. এ, বি, এ, পাশ করে প্রফেসাররা কত মূর্খকে বিদ্বান্‌ করে দিচ্ছে। (হেসে) বাবা, তুমি ত কত জায়গায় বক্তৃতা দেও, এখানে কিছু বল না বাবা, আমরা শুনি।

সুভাষচন্দ্র—আমি কি এখানে শোনাতে এসেছি? আমি এসেছি শুনতে।

আনন্দময়ী মা (হেসে)—তবে এই মেয়েটা যা বলবে একটু শুনবে বাবা?

সুভাষচন্দ্র—চেষ্টা করব।

আনন্দময়ী মা—শুধু বাইরের দিকে লক্ষ্য রেখো না বাবা, একটু ভেতরের দিকেও লক্ষ্য কোরো; তোমার ত শক্তি আছে।

ডা: মহেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, পি, এইচ, ডি একটি প্রবন্ধে এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন, "Like the great compassionate Buddha, Anandamayi expresses Herself as carrying out Her existence for the redemption of humanity.' আবার লিখেছেন, "Anandamayi always appeals to me as excelling is esoteric wisdom and an unfetterd love."

বালানন্দ ব্রহ্মচারী একবার এঁর এক জন ভক্তকে বলেছিলেন, "যে সঙ্গ ধরেছ ছেড়ো না। মা ত সাধিকা নন; ইনি নিত্যসিদ্ধা, কোন কর্মের উপলক্ষে জন্মগ্রহণ করেন। আবার সেই কর্ম শেষ হলেই চলে যান। এঁদের কোন প্রকার সাধন-ভজন করতে হয় না।"

মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে একবার যখন ইনি দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন একটি ভারি মজার কাণ্ড হয়েছিল। গান্ধীজী খুব খুশী হয়ে বললেন, "বেটি, এক দিন থেকে যা।" ইনি—"বাবা, সে রকম খেয়াল হচ্ছে না যে।" গান্ধীজী—"আমার কথায় কত লোক প্রাণ দিতে পারে, আর তুই একটা দিন থাকতে পারবি না?" আনন্দময়ী মা গান্ধীজীর কথা রক্ষা করতে পারেননি।

মেয়েদের বুদ্ধি নেই

জয়া দেবী

মেয়েরা যে পুরুষের তুলনায় বোকা এ কথাটা মেয়েরা তো বিশ্বাস করতে চাইবেনই না, অনেক পুরুষেরও বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে। হওয়াই স্বাভাবিক। পৃথিবীতে নারী এবং পুরুষ সৃষ্টি হয়েছে একই সঙ্গে এবং তারা উভয়েই মানুষ। তা সত্ত্বেও বুদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এত বড় ব্যবধান গড়ে উঠেছে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তাছাড়া একটি পুরুষ একটি নারীর সম্বন্ধে খুব উদার। সেই মেয়েকে বোকা প্রতিপন্ন করতে তার অন্তরের বাধা আছে। যাকে সে ভালবাসে, তাকে নিজের চেয়েও বেশী মর্যাদা দিতে কোন দ্বিধা তার নেই। পুরুষরা জীবনের যে সব ক্ষেত্রে মেয়েদের নিয়ে কাজ-কারবার করে, সে সব ক্ষেত্রে বুদ্ধিকে সে বাক্সবন্দী করে রেখে দেয়। সেখানে তাদের সম্পর্কের বিনিময় হয় হৃদয়ের মাধ্যমে। একটি পুরুষের চোখে একটি নারী হচ্ছে "অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।" রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে যা বলেছেন, এখানে তার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহে তুমি নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।"

বুঝুন একবার একটি নারীর প্রতি একটি পুরুষের ভালবাসাটা কি প্রচণ্ড। যাকে সে এত ভালবাসে তার বুদ্ধি থাকুক আর নাই থাকুক, কি এসে-যায় তাতে?

কিন্তু তবুও এ কথা ঠিকই যে, নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তিতেই শুধু নারীর বিচার হতে পারে না। প্রকৃতি এবং সমাজে তার একটা পৃথক্ সত্তা যখন রয়েছে তখন তার বিচারটাও হবে পৃথক্ এবং তুলনামূলক ভাবে। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে, "যার বুদ্ধি আছে, তার বল আছে, নির্বোধের কোন বল নেই।" সত্যি, মানুষের বল হচ্ছে তার বুদ্ধির বল, গায়ের জোর নয়। মুষ্টিমেয় ইংরাজ দু'শো বছর ধরে ৩৫ কোটি ভারতবাসীকে মই-ডলা করে শাসন করে গেল স্রেফ বুদ্ধির মার-প্যাঁচে। প্রচণ্ড বিক্রমশালী সম্রাট বিশ্বামিত্র মহাপণ্ডিত বশিষ্ঠের কাছে বুদ্ধির দৌড়ে পরাজিত হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "ধিক বলং ক্ষত্রিয় বলং ব্রহ্মতেজো (এখানে ব্রহ্মতেজের অর্থ বুদ্ধি বলে বঙ্কিম বাবু অভিমত প্রকাশ করেছেন) বলং বলম্।" মানুষের কাছে বুদ্ধিই বল আর আমাদের শাস্ত্রে বলছে নারী অবলা। নারী যদি অবলা হয় তা'হলে স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছোতে হয় যে, সে বুদ্ধিহীনা। বুদ্ধি থাকলে তাকে কিছুতেই অবলা বলে উল্লেখ করা হত না। কোন কোন ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, মেয়েদের না কি আত্মা নেই; আর আমাদের শাস্ত্রে বলেছে নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অর্থাৎ বলহীনেরা আত্মার অধিকারী নয়। আত্মার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা না মেনে যদি কেউ আত্মাকে মনের সারবস্তু বলে গ্রহণ করেন, তাহলে স্পষ্টই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে 'অবলা' নারী ঐ দু'টি বস্তুর অধিকারী নয়। আর বুদ্ধি যখন মনের ধর্ম এবং কর্ম তখন মেয়েদের বুদ্ধিও নেই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নারী' প্রবন্ধে লিখেছেন, "পুরুষের রচিত সভ্যতায়·· মেয়েদের হৃদয়-মাধুর্য ও সেবা-নৈপুণ্যকে পুরুষ সুদীর্ঘ কাল আপন ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে কড়া পাহারার বেড়া দিয়ে রেখেছে।···তার বুদ্ধি, তার সংস্কার, তার আচরণ নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার দ্বারা বহু যুগ থেকে প্রভাবিত। তার শিক্ষা, তার বিশ্বাস বাহিরের বৃহৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যতা লাভ করবার সম্পূর্ণ সুযোগ পায়নি।···আবিলবুদ্ধি মূঢ়মতি পুরুষ দেশে যে কম আছে তা নয়, তারা শিশুকাল থেকে মেয়ের হাতে গড়া এবং তারাই মেয়েদের প্রতি সব চেয়েও অত্যাচারী। দেশে এই কেসব আবিলমনের কেন্দ্রগুলি দেখতে দেখতে চারি দিকে গড়ে উঠছে, মেয়েদের অন্ধ বিচারবুদ্ধির উপরেই তাদের প্রধান নির্ভর। চিত্তের বন্দিশালা এমনি করে দেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে এবং প্রতিদিন তার ভিত্তি হয়ে উঠছে সুদৃঢ়···" (কালান্তর ৩৫৬ পৃঃ)। নারী-সমাজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মমতা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ নারীর বর্তমান সামাজিক অবস্থায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই উক্তির মধ্য দিয়ে অনেক সত্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রথমতঃ, তিনি বর্তমান সভ্যতাকে পুরুষ রচিত (এবং শাসিতও) বলে সমাজে পুরুষের প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন। এই প্রাধান্যের হেতু বিশ্লেষণ করে ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলে আমরা যে তথ্য পাই, তা বিশেষ মূল্যবান। সৃষ্টির আদিকালে নারী-পুরুষ কেউ কারও চেয়েও ছোট অথবা বড় বলে বিবেচিত হত না। তারা দুই পক্ষই ছিল সকল বিষয়ে সমান। তার চেয়েও মজার কথা হচ্ছে এই যে, সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে জীবনযাত্রা সুরু করার প্রারম্ভে নারীই ছিল সমাজের কর্ত্রী এবং প্রকৃত পক্ষে পুরুষ ছিল নারীর অধীন (আধুনিক

অৰ্দ্ধেক রূপসী...

রূপচর্চ্চার রীতি-নীতি বদলায় যুগে যুগে···নূতন এসে করে পুরাতনের স্থান অধিকার। কিন্তু নারী—চিরন্তনী নারী—সে তার কেশসম্পদের নিরাপত্তা-রক্ষায় নিজের মধ্যে জেগে রয়েছে চিরদিন···কেশই যে তার অর্দ্ধেক রূপ। সে-রূপ সাধনায় এ-যুগের সর্ব্বগুণান্বিত আঙ্গিক **জবাকুসুম**।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা
CKJ-81/CPS

কালের ঠিক উল্টো)। সেই যুগটাকে বলা হয় আদিম সাম্যবাদী যুগ এবং সেই সমাজটাকে বলা হয় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ (Matriarchial Period)। বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশ তত্ত্ব অনুসারে মানুষ হচ্ছে বানরের বংশধর। বানর এবং বনমানুষের যুথস্বামী সর্বদাই হত পুরুষ কিন্তু আদিম মানুষের যুথকর্ত্রী ছিল স্ত্রী। আজকালকার দিনে কথাটা খুব আশ্চর্য্যজনক ঠেকতে পারে কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ নেই। প্রাচীন এবং আধুনিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে এ যাবৎ অনেক গবেষণা হয়েছে। নৃতত্ত্ববিদেরা মাতৃতন্ত্রের কারণ নির্ণয় করে বলেছেন, মানুষের সমাজে ব্যক্তির বল তত প্রাধান্য পায় না। মানুষ বহু আগেই সংঘশক্তির মর্যাদা বুঝতে পেরেছিল। তাই আদিম অবস্থায় তাদের কোন শক্তিশালী যুথপতির প্রয়োজন হয়নি (বানর সমাজে অপরের সঙ্গে লড়াই করে যুথকে রক্ষা করার জন্য তার প্রয়োজন ছিল) তার পরিবর্তে মানুষ পরিবারের সৃষ্টি করেছে এবং সেই পরিবারের অধ্যক্ষা হয়েছেন স্ত্রীলোক অর্থাৎ পত্নী এবং মাতা। আদিম সমাজে নিশ্চিত বিবাহ বা পতি-পত্নী সম্পর্কের অস্তিত্ব ছিল না। মাতৃ-পরিবারে যে কোন পুরুষের সংসর্গেই তখন নারী গর্ভিণী হতেন। এঙ্গেলস্ এই যুগের স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ককে যুথবিবাহ (Group marriage) বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ বিবাহ তখন ব্যক্তিগত ভাবে হত না এবং বিবাহে ব্যক্তির স্থানে যুথেরই প্রাধান্য থাকত। যৌন-সম্পর্কের দিক দিয়ে মাতৃকর্তৃক পরিবার মাত্র দুই ভাগে বিভক্ত ; অর্থাৎ শুধু স্ত্রী এবং পুরুষ। এর এক বর্গের সঙ্গে অপর বর্গের যৌথ পতি-পত্নী সম্বন্ধ স্থাপিত হত। পরিবারের সমস্ত স্ত্রীলোক এই হিসাবে সমস্ত পুরুষের পত্নী এবং সমস্ত পুরুষ সমস্ত নারীর পতি। মাতৃকর্তৃক সমাজের প্রত্যেক লোক পরিবারের কর্ত্রী অর্থাৎ মাতার পরিচয় জানত। যুথ-বিবাহের সন্তান বলে তাদের পক্ষে পিতৃ-নিরূপণ করা সম্ভব ছিল না। তাই পিতা বা পুরুষের সঙ্গে পরিবারের ব্যক্তিদের মাতার মত ঘনিষ্ঠতা হত না।

আদিম সমাজে নারীর এই যে প্রাধান্য, সেটা সে হারিয়েছে বুদ্ধির দৌড়ে পুরুষের কাছে পরাজিত হয়ে। পুরুষ চেতন অথবা অবচেতন ভাবেই হোক বুঝেছিল যে, জীবিকা-নির্বাহের পদ্ধতি ও সমাজের উৎপাদন-পুনরুৎপাদনের গতি-প্রকৃতির উপরই নির্ভর করছে ইতিহাসের ভাঙ্গা-গড়া। মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণ এ সম্পর্ক বলেছেন, "নারী-কর্তৃত্বের সমাজেও ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন আসিল। জীবিকা অর্জনের ব্যাপারে প্রাধান্য স্থাপন করিয়া পুরুষ নারীর কর্তৃত্ব কাড়িয়া লইল। পুরুষের ব্যক্তিক বিশেষত্বগুলিও এই বিষয়ে তাহার সহায়ক হইয়াছিল সন্দেহ নাই। আদিম যুগের শিকার বা ফল সঞ্চয়ের কাজে নারী পুরুষের পশ্চাতে ছিল না। তখন ঘরে ও বাহিরে কিংবা চুল্লীতে ও হালে নারী-পুরুষের কোন কর্মবিভেদ হয় নাই।" (মানব সমাজ, ৩৬ পৃষ্ঠা) পুরুষ যখনই ইতিহাসের ধারা অনুধাবন করল তখনই সে জীবিকা নির্বাহের অর্থনৈতিক ঘাঁটিগুলো দখল করে ফেলল এবং এই ভাবে ধীরে ধীরে সে নারীকে কর্তৃত্বচ্যুত করে নিজের ভোগ-লালসার কারাগারে দাসী হিসাবে বন্দী করে ফেলল। তখন থেকে সে হল পুরুষের সেবিকা, তার সন্তানের জননী এবং তার গৃহ এবং সংসারের পরিচারিকা। সমাজে নারীর কর্তৃত্বচ্যুতির পর পুরুষের কর্তৃত্ব স্থাপনকে এঙ্গেলস্ ইতিহাসে নারীর চরম পরাজয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এই পরাজয়ের একমাত্র কারণ যে নারীর বুদ্ধিহীনতা, সেটুকু বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। কাজেই আজ পুরুষ-রচিত এবং শাসিত সমাজে নারীর উপর যে উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা হয়, তার জন্য আদিম নারীর নির্বুদ্ধিতাই দায়ী। মেয়েরা আজও সেই আদিম নারীর নির্বুদ্ধিতার জের টেনে চলেছেন। পুরুষের জীবনে নারী একান্ত ভাবে অপরিহার্য হলেও সেই প্রয়োজনীয়তাকে নিজের বন্ধনমুক্তির কাজে প্রয়োগ করার মত বুদ্ধি তার নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পুরুষ-রচিত সভ্যতা' কিন্তু সভ্যতা রচনার প্রথম সুযোগ মেয়েরাই লাভ করেছিল। প্রকৃতি তাদের সামনে যে সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল সভ্যতার সূচনায়, নারী বুদ্ধির দোষে তার সদ্ব্যবহার করতে অক্ষম হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই পুরুষের দোষ নয়।

আগেই বলা হয়েছে, বুদ্ধি হচ্ছে মনের ধর্ম। যাঁরা আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসী, তাঁরা মনকে জড়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কহীন আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ বলে মনে করেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক জড়বাদ অনুসারে জড়বস্তুই হচ্ছে একমাত্র সত্য, মন হচ্ছে তার প্রতিবিম্ব মাত্র। এ সম্বন্ধে এঙ্গেলস্ বলেছেন, "আমাদের চেতনা এবং চিন্তাশক্তি যত সূক্ষ্মই মনে হোক না কেন, বাস্তব দেহাঙ্গ মস্তিষ্ক থেকেই তার উৎপত্তি। জড়বস্তুর শ্রেষ্ঠতম অবদান হচ্ছে মন। যে বস্তু চিন্তা করে, তার থেকে চিন্তাকে পৃথক্ করা অসম্ভব।" ষ্টালিন বলেছেন, "জড়বস্তুর অবদান চিন্তাশক্তি ক্রমবিকাশের ধাপে ধাপে চরম এবং পরম উন্নতির স্তরে উঠে জন্ম দিয়েছে মস্তিষ্কের এবং চিন্তাশক্তির আধার হচ্ছে মস্তিষ্ক।"

ক্রমবিকাশ-তত্ত্ববিদরা বলেন, মানুষের সর্ববিধ ক্রমবিকাশের মূলে আছে তার শ্রম। জীবের বাঁচবার চেষ্টাই তাকে শ্রমের আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। চার পায়ে হাঁটা বানর যখন থেকে অবস্থার বিপর্যয়ে পড়ে দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে সুরু করল, তখন তার হাত দু'টি পেল মুক্তি। তখন সে হাতকে অন্যান্য কাজে নিয়োগ করবার অবকাশ পেল। হাতের নিত্য-নূতন ব্যবহারে নতুন পেশী এবং শিরা গঠিত হল। ক্রমে তার প্রভাব পড়ল হাড়ের উপর। সেই প্রভাব আবার আনুবংশিক হয়ে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। বংশলব্ধ প্রভাব পরে হাতের আরও নতুন নতুন ব্যবহার আয়ত্ত করেছে। এই ভাবে মানুষের হাত আজ হাজার কাজের উপযোগী হয়েছে : অজন্তার চিত্রকলায়, গুপ্ত-যুগের মূর্ত্তিশিল্পে, কিংবা তানসেন বা বৈজু বাবরের সপ্তত‌ন্ত্রী স্বরে মানুষের কুশলী হাত সার্থক হয়েছে। কিন্তু হাত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন কোন পদার্থ নয়, শরীরেরই একটা অঙ্গ মাত্র। সমগ্র শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে শুধু হাতের বিকাশে বিশেষ কোন লাভ হত না। শরীরের এক অংশ অপর অংশকে প্রভাবিত করে। হাতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌ক্ষমতা এবং শব্দধ্বনি বিকাশ লাভ করে। এই দু'টি বিকাশ আবার মস্তিষ্ক বিকাশের সহায়ক হয়। মস্তিষ্কের সঙ্গে হাতের সম্বন্ধ খুব নিকট। এক অংশের বিকাশের সঙ্গে অপর অংশের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। বিকাশতত্ত্বের এই অবিচ্ছেদ্যতা ধরতে পারলেই মানুষের ইন্দ্রিয়ের বিকাশ খুব সহজেই ধরা যায়। মস্তিষ্কের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই চেতনা, কল্পনা,

নিশ্চয় শক্তি এবং মস্তিষ্ক-সঞ্জাত অন্যান্য গুণও ক্রমশঃ বেড়ে যেতে থাকে। বুদ্ধিটা যখন মস্তিষ্কজাত এবং মস্তিষ্কের বিকাশ যখন শ্রমের উপর নির্ভরশীল, তখন স্বভাবতই বলা যেতে পারে যে পরিশ্রমী মানুষই উন্নততর বুদ্ধির অধিকারী হয়েছে। অর্থাৎ বুদ্ধিকে আয়ত্ত করতে হলে শ্রমশীল হতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নারী' প্রবন্ধে বলেছেন : "মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী···প্রকৃতির সমস্ত সৃষ্টি-প্রক্রিয়া গভীর গোপন, তার স্বতঃ-প্রবর্তনা দ্বিধাবিহীন সেই আদি প্রাণের সহজ প্রবর্তনা নারীর স্বভাবের মধ্যে। সেই জন্য নারীর স্বভাবকে মানুষ রহস্যময় আখ্যা দিয়েছে। তাই অনেক সময়ে অকস্মাৎ নারীর জীবনে যে সংবেগের উচ্ছ্বাস দেখতে পাওয়া যায় তা তর্কের অতীত—তা প্রয়োজন অনুসারে বিধিপূর্বক খনন করা জলাশয়ের মতো নয়, তা উৎসের মতো, যার কারণ আপন অহেতুক রহস্যে নিহিত।···প্রেমের রহস্য, স্নেহের রহস্য অতি প্রাচীন এবং দুর্গম। সে আপন সার্থকতার জন্যে তর্কের অপেক্ষা রাখে না। যেখানে তার সমস্যা, সেখানে তার সমাধান। তাই গৃহে নারী যেমনি প্রবেশ করেছে, কোথা থেকে অবতীর্ণ হল গৃহিণী, শিশু যখনই কোলে এল মা তখনই প্রস্তুত। জীবরাজ্যে পরিণত বুদ্ধি এসেছে অনেক পরে। সে আপন জায়গা খুঁজে পায় সন্ধান করে, যুদ্ধ করে। দ্বিধা মিটিয়ে চলতে তার সময় যায়। এই দ্বিধার সঙ্গে কঠিন দ্বন্দ্বেই সে সবলতা সফলতা লাভ করে। এই দ্বিধা-তরঙ্গের ওঠা-পড়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়, সাংঘাতিক ভ্রম জমে উঠে বার বার মানুষের ইতিহাসকে দেয় বিপর্যস্ত ক'রে। পুরুষের সৃষ্টি বিনাশের মধ্যে তলিয়ে যায়, নূতন করে বাঁধতে হয় তার কীর্তির ভূমিকা। পালটিয়ে-পালটিয়ে পরীক্ষায় পুরুষের কর্ম কেবলই দেহ পরিবর্তন করে। অভিজ্ঞতার এই নিত্য পরিক্রমণে যদি তাকে অগ্রসর করে তবে সে বেঁচে যায়, যদি ত্রুটি সংশোধনের অবকাশ না পায় তবে জীবন-বাহনের ফাটল বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে তাকে টানে বিলুপ্তির কবলের মধ্যে। পুরুষের রচিত সভ্যতায় আদিকাল থেকে এই ভাঙ্গা-গড়া চলেছে। ইতিমধ্যে নারীর মধ্যে প্রেয়সী নারীর মধ্যে জননী প্রকৃতির দৌত্যে স্থির প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপন কাজ করে চলেছে"—(কালান্তর—৩৫৪ পৃঃ)।

পরম শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ক্ষুদ্র বর্ণনায় নারী-পুরুষের চলতি কর্মবিভাগের যে বাস্তব ছবি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, তার ভিতর দিয়েই আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরুষ হচ্ছে উদ্যমশীল, পরিশ্রমী এবং এডভেঞ্চারপিয়াসী। বাইরের জগতের ভাঙ্গা-গড়া নিয়ে তার দুঃসাহসী কারবার, কিন্তু নারী নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে গৃহের সীমানার মধ্যে। তিনি বলেছেন, "পুরুষ বারে বারে নিজের জগতে আগন্তুক। আজ পর্যন্ত কত বার গড়ে তুলেছে আপন বিধি-বিধান। বিধাতা তাকে তার জীবনের পথ বাঁধিয়ে দেননি; কত দেশে কত কালে তাকে আপন পথ বাঁধিয়ে নিতে হল। এক কালের পথ বিপথ হয়ে উঠল আর এক কালে, উলটিয়ে গেল তার ইতিহাস। করল সে অন্তর্ধান।···নব নব সভ্যতার ওলট-পালটের ভিতর দিয়ে নারীর জীবনের মূল ধারা চলেছে এক প্রশস্ত পথে। প্রকৃতি তাকে যে হৃদয়-সম্পদ দিয়েছেন, নিত্য কৌতূহলপ্রবণ বুদ্ধির হাতে তাকে নূতন নূতন অধ্যবসায়ে পথ্য করতে দেওয়া হয়নি। নারী পুরাতনী।" আর পুরুষ সম্বন্ধে লিখেছেন, "কঠিন পরিশ্রমে নানা কাজের শিক্ষা তার করা চাই···" যে পরিশ্রমী, বুদ্ধি তার হাতে বাঁধা পড়ে। পুরুষ পরিশ্রমী, কাজেই বুদ্ধিটা তারই একচেটে, মেয়েরা গৃহধর্মের গতানুগতিক কাজেই সারা জীবন নিজেদের লিপ্ত রাখেন, কাজেই বুদ্ধিটা তাঁরা আয়ত্ত করবেন কেমন করে? মেয়েরা যে পুরুষের চেয়েও অনেক বোকা তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে বলে ধরা যেতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, সোভিয়েট রুশিয়া চীন এবং পূর্ব-ইউরোপের নয়া গণতন্ত্রের রাষ্ট্রগুলো ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশেই মেয়েরা পুরুষের বুদ্ধিতেই ওঠ-বস করেন। পুরুষের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করাই তাঁদের একমাত্র ধর্ম। মেয়েদের লাল ঠোঁট দেখতে পুরুষের ভাল লাগে তাই পুরুষ বাজারে ছাড়ল লিপষ্টিক। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা তাই কিনে ঠোঁটে মেখে সঙ্ সাজলেন মেয়েদের সাজগোজ ক্রিয়া-কলাপ সব কিছুই পুরুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি-প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। মেয়েদের কোন নিজস্ব রুচি বা রসোপলব্ধি নেই। তাই যদি থাকত তা'হলে উন্নাসিক সমাজের মেয়েরা তাঁদের অতি আধুনিক সাজ-পোষাকে দেহের অংশবিশেষকে উন্মুক্ত করে বিকৃতরুচি পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য এত ব্যাকুল হতেন না। পুরুষ নারীকে গৃহে বন্দী করার অজুহাত খাড়া করে বলল, "মেয়েদের মন অন্তর্মুখী আর পুরুষের মন বহির্মুখী।" কথাটা শুনেই মেয়েরা আনন্দে নাচতে নাচতে নিজের গৃহে গিয়ে কুলুপ লাগিয়ে দিলেন যাতে বাহি'রের আলো এসে সেখানে প্রবেশ না করতে পারে। পুরুষের এই উক্তির পেছনে কোন ষড়যন্ত্র আছে কি না এক বার বিবেচনা করেও দেখলেন না। এ যুগের নারী আসলে পুরুষেরই সৃষ্টি। মেয়েরা যা হলে, যেভাবে থাকলে পুরুষের সুবিধা হয়, সেই ভাবেই মেয়েরা গড়ে উঠছেন। তাঁদের কোন নিজস্ব সত্তা নেই। পুরুষের পরিচয়েই তাঁদের পরিচয়, পুরুষের ভাল-মন্দই তাঁদের ভাল-মন্দ। তাঁরা পুরুষের ছায়া মাত্র—অনেকটা গৃহপালিত জীবের মত পোষমানা। এই হচ্ছে আজ আমাদের নারী জাতির অবস্থা।

মেয়েদের বিয়ে কত বছরে হওয়া উচিত?

কল্যাণী বসু

শৈশব থেকেই নারী-জাতির অন্তরে ঘর বাঁধবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল ভাবে পরিলক্ষিত হয়। পুতুল নিয়ে খেলা ও তাদের বিয়ে দেওয়া, পুতুলের বিছানা-কাপড় পরিপাটি কোরে রাখা, ছোট ছোট হাঁড়ি-কড়া নিয়ে রান্না-বান্না করা ইত্যাদি কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের মনের ভাব পরিস্ফুট হ'তে দেখা যায়। বারো বছর থেকে আরম্ভ কোরে ষোলো বছর পর্য্যন্ত তাদের কুমারী-জীবনের জলতরঙ্গ উচ্ছল ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। এই বয়সে তাদের সৌন্দর্য্যও প্রস্ফুটিত ফুলের ন্যায় বৃদ্ধি পায়।

এখন মেয়েদের বিয়ে কত বছরে হওয়া উচিত এই বিষয়ে দু'-একটি কথা বলবো। বর্তমান যুগকে নারী-প্রগতির যুগ বলা চলে বটে, কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের দেশে খুব কম সংখ্যক মেয়েকেই নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। শতকরা নিরানব্বই জন মেয়েকেই জননী, ভগিনী ও জায়ারূপে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকতে দেখা যায়। সুতরাং অধিকাংশ মেয়েদের যখন

বিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই, তখন এই বিয়ে আমার মতে ষোলো বছরে হওয়া উচিত। শিক্ষার দিক দিয়ে আমাদের ঘরে যা যথেষ্ট বলে মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সিঁড়ি পেরোবার সৌভাগ্যও ঐ বয়সে অনেক মেয়ের ঘটে থাকে। তাছাড়া, ষোলো বছরের পর থেকে মেয়েদের শ্রী নষ্ট হতে থাকে। মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই যেন তাদের মধ্যে বার্দ্ধক্য ভাব এসে যায়। প্রবাদে আছে; "কুড়ি বছরেই মেয়েরা বুড়ী!"

সুতরাং যে দেশে শিক্ষা অপেক্ষা রূপ ও রূপিয়ার কদর বেশী, সেই দেশে যে মেয়ের বাপের অর্থসঙ্গতি নেই বা মেয়ের রূপও নেই, সেই মেয়ের বাপই মনুষ্য-সমাজে "অপদার্থ" বলে পরিগণিত হয়, এবং মেয়েও মনে মনে ভাবে আমি "আশীর্ব্বাদ না অভিশাপ?" এ স্থলে মেয়েদের বিয়ের বয়স বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। আবার অনেক স্থলে দেখা গেছে, রূপের জোরেই অনেক মেয়ের কেবল মাত্র শালগ্রামশিলা সাক্ষ্য কোরে বিয়ে হয়ে গেছে।

আগেকার দিনে খুব অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হতো। খাওয়া-পরার অভাব না থাকায় পাঠ্যাবস্থাতেই ছেলেদের বিয়ে দেওয়া হতো। ফলে এই বিয়ে জিনিষটা যে কি তা উপলব্ধি করবার শক্তি তাদের থাকতো না এবং বালবিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতো। বালবিধবার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রহানিরও আশঙ্কা ছিল এবং নানান্ দিক্ দিয়ে নানান্ অসুবিধায় তাদের পড়তে হতো। শুধু তাই নয়, আবার অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে ষোলো বছরে মেয়েদের ভাল-মন্দ জ্ঞান সম্পূর্ণ আসে। সকল কিছু উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তাদের জন্মায়। স্ত্রী যখন স্বামীর শুধু "শয্যাসঙ্গিনী" নয় অর্দ্ধাঙ্গিনী, সুখ-দুঃখের ভাগিনী তখন তার নিজের বিচার-বুদ্ধি জন্মাবার আগে বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আবার বেশী বয়সে বিয়ে দেওয়াও ঠিক নয়। এতে মেয়েদের যে শুধু সৌন্দর্য্যই নষ্ট হয় তা নয়। মেয়েদের বয়স বৃদ্ধি হলে তার উপযোগী (বয়স্ক) পাত্র দরকার। সুতরাং অধিক বয়সে বিয়ে করার অর্থ বৃদ্ধ বয়সে নাবালকের সৃষ্টি করা। এবং এতে আরও ক্ষতির সম্ভাবনা।

বর্ত্তমান অন্নসমস্যা ও অর্থসঙ্কটের দিনে ছেলেরা উপার্জ্জনশীল না হলে তাদের বিয়ে দেওয়া হয় না। এই কারণ বশতও মেয়েদের বিয়ের বয়স যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এখন সকল দিক বিবেচনা কোরে আমার মনে হয়, মেয়েদের বিয়ে ষোলো বছরে দেওয়াই ভাল।

আমাদের এই হতভাগ্য বাংলা দেশে অধিকাংশ পিতা-মাতাই মেয়েদের উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া তাদের প্রধান কর্ত্তব্য বলে মনে করেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন:—

কন্যা ঘরের আবর্জ্জনা পয়সা দিয়ে ফেলতে হয়,
পালনীয়া, শিক্ষণীয়া, রক্ষণীয়া মোটেই নয়।

আজ এই প্রসঙ্গে আমিও সেই কথার পুনরুল্লেখ কোরছি।

মাদাম রলাঁ্যা

কেয়া দেবী

"O Liberty, what crimes are committed
in thy name."

ফ্রাঁসের দেশপ্রেমিকা মাদাম রলাঁ্যা। বধ্য-মঞ্চে পৌঁছে জগদ্বিখ্যাত এই বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল সম্রাট ও ধনীর অত্যাচারে জর্জ্জরিত জনগণকে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পথ নির্দ্দেশ করা। আর সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডী এই যে, তাঁকে গিলোটিনে হত্যা করেছিল তারাই, যারা নিজেদের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষক দল বলে সব চেয়ে বেশী চীৎকার করেছিল। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিস ম'শিয়ে ফ্লিপঁ নামক এক শিল্পীর এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। নাম মাঁল। থাকতেন কে-দ্য-লুগেৎ নামে এক রাস্তায়, ছোট্ট পুরানো বাড়ীতে। খুব অল্প বয়সে মাঁল পড়তে শেখেন। পিতার ষ্টুডিওর পাশে একটা ছোট ঘর, সেইটাই ছিল মাঁল'র নিজস্ব। সেইখানে বসে তিনি পুরানো দিনের বীরেদের কাহিনী পড়তেন, আর অদম্য উৎসাহে তাঁর প্রাণ নেচে উঠত। তাঁদের দুঃখে তিনি ঝরঝর করে কাঁদতেন। ফলে তিনি কল্পনাবিলাসী ও আদর্শবাদী হয়ে উঠেছিলেন। মাঝে মাঝে মা'র সঙ্গে তিনি জাঁর্দা-দ্য-প্লাঁৎ (বোটানিক্যাল গার্ডেন) অথবা লুক্সেমবুর্গে বেড়াতে যেতেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতিও তাঁর খুব টান ছিল। যা কিছু সুন্দর—চিত্র বা চরিত্র—তাই তাঁকে মুগ্ধ করত।

বেহালা তিনি মন্দ বাজাতেন না, তবে এনগ্রেভিং-এর কাজে তাঁর হাত বেশ পাকা ছিল। অল্প-বিস্তর নামও করেছিলেন। কিন্তু বেশী দিন এই দিকে নজর দিতে পারেননি। তাঁর সমস্ত মন পড়েছিল পড়াশুনার দিকে। জ্ঞান—আরও জ্ঞান। পৃথিবীর সব কিছুর সম্বন্ধেই। এই ভাবে তিনি নিজের অজান্তেই জোগাড় করেছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়।

এগারো বছর বয়সে তাঁকে শিক্ষালাভের জন্য কনভেণ্টে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। সেখানে হেনরিয়েৎ ও সোফি কানে নামক দুইটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। ছুটিতে ছাড়াছাড়ি হলে তিন জনে পরস্পরকে তাড়া তাড়া চিঠি লিখতেন। তাঁর ঠাকুমা এক দিন হেসে বলেছিলেন,—"এত যে ভাব, বিয়ে হলে তোরা সবাই পরস্পরকে ভুলে যাবি।" মাঁল উত্তর দিয়েছিলেন,—"কখনও নয়। তুমি দেখে নিও।" তাঁর এই উক্তি পরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

রুসোর লেখা পড়ে তাঁর লেখককে দেখবার প্রবল ইচ্ছা হয়। এক দিন তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর এক বন্ধুর রুসোর বাড়ীতে কি একটা কাজে যাবার দরকার। বন্ধুকে বলে-কয়ে তিনি নিজেই গেলেন রুসোর বাড়ী সেই কাজটা সারতে। সিঁড়িতে ওঠবার সময় সে কি ভয় আর ভক্তি, যেন কোন মন্দিরের সিঁড়িতে উঠছেন। উত্তেজনায় পা দু'টো ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে, গলা শুকিয়ে গেছে। অনেক কষ্টে দরজা খট্খট্ করলেন। দরজার ওদিকে পদধ্বনি শোনা গেল। অসীম আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, এই বুঝি দরজা খুলে রুসো স্বয়ং আবির্ভূত হবেন। দরজা খুলল, দেখা দিল লেখকের পরিবর্ত্তে একটা কুৎসিত-দর্শনা ঝি। কর্কশ কণ্ঠে 'দেখা হবে না' বলে মুখের ওপর দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে দিলে। তাঁর সকল আশা ভঙ্গ হল। বোধ হয় ভালই হল—রুসো সম্বন্ধে তাঁর স্বপ্নটা ভাঙ্গল না। রুসোর মধ্যে ছিল অসামান্য প্রতিভার সঙ্গে অত্যন্ত নোংরা চরিত্রের মিশ্রণ। লাম্পট্যের জন্য লেখক নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর এ দিকটা দেখলে মাঁল'র মনে খুবই আঘাত লাগত।

কনভেণ্ট থেকে পাশ করবার অল্প দিন পরেই তাঁর মা

রূপ রচনার রুচিরাগ
রূপের কলিকে সৌন্দর্য্যকুসুমে বিকশিত করে তোলাই এই প্রসাধনীর সাধনা। রূপ সাধকসাধিকাদের নিকট তাই চিরকাম্য এই সৌন্দর্য্যের সুরম্য সম্ভার।
মার্গো সোপ
নিম টুথ পেষ্ট
ভৃঙ্গল সুবাসিত মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল
লাবণি স্নো ও ক্রীম
কান্তা মনোমদ গন্ধসার
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা ২৯

মারা যান। এদিকে তাঁদের বিলক্ষণ অর্থকষ্টেও পড়তে হয়। সব দিক দিয়ে বিপদে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। সেই সময়ে তিনি প্রেমে পড়েন তাঁর চেয়ে কুড়ি বছর বড় ম'শিয়ে রলাঁ্যা নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে। ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি কুমারী মার্ন ফ্লিপঁ থেকে মাদাম রলাঁ্যা হন। তাঁর স্বামী তখন কারখানা সমূহের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। স্বামীর সঙ্গে তিনি লিয়ঁজ জেলায় বহু দিন বাস করেন। তাঁর গৃহে বহু বিদ্বান-বুদ্ধিমানদের সমাগম হত। অনেক রকম তর্ক-আলোচনায় সকাল-সন্ধ্যা কাটত। স্বামী ও একমাত্র কন্যাকে নিয়ে বেশ সুখেই তার দিন চলে যাচ্ছিল। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি তাঁর বরাতে ছিল না।

সেই সময় ফ্রাঁসের রাজনৈতিক অবনতি ঘটে। দেশটা ধনীদের ও জমিদারদের স্বৈরাচারে জর্জ্জরিত। আইন-কানুন তাঁদের ইচ্ছার মুখাপেক্ষী। খাদ্যাভাবে জনসাধারণ মরছে আর ধনী সম্প্রদায় দু'হাতে পয়সা ওড়াচ্ছেন। সামান্যতম প্রতিবাদ করলেই কারাদণ্ড—বিনা বিচারে। রলাঁ্যা ও তাঁর কয়েক জন বন্ধু দারিদ্রের দুঃখে কাতর হয়ে দুর্নীতিপরায়ণ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন শুরু করে দিলেন। পার্টির নাম হল গিরঁদী পার্টি আর তার উৎসাহের, শক্তির উৎস হলেন মাদাম রলাঁ্যা। 'জনগণের স্বাধীনতা' হল পার্টির মূলমন্ত্র। ১৭৮৯ সালে বিপ্লব আরম্ভ হল আর ১৭৯২ সালে গিরঁন্দী পার্টি দেশের শাসন-ক্ষমতা হাতে পেল। এই হ'ল ফরাসী বিপ্লবের গোড়া—স্বাধীনতার সংগ্রাম, আদর্শবাদীর স্বর্গরাজ্য।

দলে ভাঙ্গন ধরল ফ্রাঁসের রাজার মৃত্যুদণ্ড নিয়ে। রলাঁ্যার দল ভোট দিতে রাজী হল না। নরমপন্থীদের দল থেকে বার করে দেওয়া হল। চরমপন্থীরা ক্ষমতা অধিকার করে বসল। যে বিপ্লব রলাঁ্যার দল আরম্ভ করেছিলেন, তারই চাকার তলায় তাঁরা পিষে গেলেন। বিনা ব্রেকে প্রচণ্ড বেগে চাকা ঘুরতে লাগল। সেপ্টেম্বর মাসে নিষ্ঠুর ভাবে শত শত ব্যক্তিকে হত্যা করা হল। ১৭৯৩ সালে রাজা গিলোটিনে প্রাণ দিলেন আর সেই সঙ্গে মধ্যপন্থী গিরঁদ্যার দলের বহু সভ্যের শিরশ্ছেদ করা হল। 'স্বাধীনতার রাজ্য' অন্তর্হিত হয়ে 'ভীতির রাজ্য' এসে পড়ল। বিপ্লবী দলের বিষমপন্থী জাকোব্যাঁ দল তখন সর্ব্বেসর্ব্বা।

যখন গিরঁদ্যা দলের হাতে ক্ষমতা ছিল তখন মঃ রলাঁ্যা আভ্যন্তরিক মন্ত্রী ছিলেন। মাদাম সর্ব্বদা তাঁকে সাহায্য করতেন—অনেকটা সেক্রেটারীর মত। যদি তখনকার দিনে রমণীরা সক্রিয় ভাবে শাসন-কার্য্যে যোগ দিতে পারতেন, তবে হয়ত ফ্রাঁসের ইতিহাস অন্যরূপ হত।

তখন রলাঁ্যা পরিবার যে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করতেন তা পূর্ব্বে ছিল মাদাম দ্য-স্তালের পিতা মন্ত্রী নেকারের গৃহ। কিন্তু এই জাঁকজমকপূর্ণ আবহাওয়ায় মাদাম রলাঁর কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি। সেই আগেকার দিনের সরল আদর্শবাদী মন। দলের সকলকে তিনি সাহস দিয়েছেন চিরকাল—উত্থানের সময়ও, পতনের সময়ও। প্রাণ যায় যাক, কিন্তু মান না যায়, আদর্শ না টুটে। বহু বার তাঁকে বিপদে পড়তে হয়েছে, কনভেনশনে গিয়ে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তিনি মাথা নীচু করেননি। তিনি বলতেন যে, বরাতে যা আছে তা হবেই। হাসিমুখেই তা বরণ করে নেওয়া উচিত। বিপদকে ভয় করলেই জো পেয়ে যাবে। কিন্তু ভীত তিনি হয়েছিলেন—নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য। বিপ্লব যখন এমন একটা বিশৃঙ্খল রূপ নিল যে, তার প্রচণ্ড গতি আয়ত্তে রাখা মুস্কিল, তখন তিনি ভীত হলেন এই দেখে যে, গিরঁন্দী দলে তেমন জবর লোক নেই যে, রাশ টেনে রাখতে পারে আর জাকোব্যাঁ দলে এমন লোক নেই যার হাতে বিশ্বাস করে বল্‌গা দেওয়া যেতে পারে। তাঁর ভয় যে অমূলক নয়, তা শীঘ্রই প্রমাণ হয়ে গেল। জাকোব্যাঁ দল গিরঁন্দীদের ক্ষমতাচ্যুত করল। মারা, দাঁতঁ, রোবেস্পিয়ে ইত্যাদি মিলে "ভীতির রাজ্য" স্থাপন করলে। নরমপন্থীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল—বিশ্বাসঘাতক, দেশের শত্রু ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে। মঃ রলাঁ্যা স্ত্রীর পরামর্শে লুকিয়ে দেশ ছেড়ে পালালেন। মাদাম বন্দী হলেন, মুক্তি পেলেন, আবার ঘণ্টা খানেক পরে তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত নীচু শ্রেণীর কারাগারে আটক রাখা হল। চারি দিকে নোংরা বন্দিনী দল। অশ্লীল কথা-বার্ত্তা, কলঙ্কময় চরিত্র। তার মধ্যে মাদাম রলাঁ হাঁপিয়ে উঠলেন। মনে হল যেন জীবন্ত অবস্থায় নরকবাস করছেন। কিন্তু তবু তিনি আদর্শচ্যুত হলেন না। পার্টির কোন সভ্যের খবর দিলেন না।

কারাগারে বসে তিনি মেয়েকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে কোন খেদোক্তি নেই। শুধু শিক্ষা আর সাহসের কথা। লিখেছিলেন—তোমার মাকে মনে রেখ। প্রপীড়িত অত্যাচারিতদের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করবে। সর্ব্বদা কাজে লিপ্ত থাকবে। শত বিপদেও কর্ত্তব্যচ্যুত হবে না।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতা, কারারুদ্ধা মাদামকে দেখতে এলেন তাঁর বালিকা বয়সের বান্ধবী হেনরিয়েৎ কানে। মাদামের ঠ'কুমা'র কথা ভুল—বান্ধবীরা পরস্পরকে ভোলেনি। হেনরিয়েৎ মার্নকে বললেন—"পালাও, আমার কাপড়-জামা পরে চলে যাও। কেউ চিনতে পারবে না।" মার্ন প্রশ্ন করলেন,—"আর তুমি?" হেনরিয়েৎ চুপ করে রইলেন। মার্নই উত্তর দিলেন,—"তা হয় না বোন। তা'হলে তোমাকে ওরা হত্যা করবেই। আর মৃত্যু-ভয়ে কর্ত্তব্যচ্যুত হওয়া ঠিক নয়।" চোখে রুমাল দিয়ে হেনরিয়েৎ বিদায় নিলেন।

১৭৯৩ সালের ৮ই নভেম্বরে মাদামকে জেল থেকে গিলোটিনে নিয়ে যাওয়া হল। সঙ্গী জেলারের চোখে জল। মাদামের উদার ব্যবহার আর অদ্ভুত সাহস তাকে মুগ্ধ করেছে। মাদাম নিজেই তাকে সাহস ও সান্ত্বনা দিলেন। বধ্যমঞ্চের সিঁড়ির উপর যখন উঠে দাঁড়ালেন—সে কি মহিমময়ী মূর্ত্তি! এলো চুল, শুভ্রবেশ, চোখে বীরত্বপূর্ণ আগুন! একটা কাগজ চাইলেন, তাঁর সেই সময়কার মনোভাব লিখে রাখবার জন্য। কিন্তু কাগজ তিনি পেলেন না! মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের চিন্তাধারা অজ্ঞাতই রয়ে গেল। গিলোটিনের খড়্গের নীচে মাথা নোয়াবার আগে তিনি শেষ বারের মত মাথা তুলে চাইলেন, সেইখানে স্থাপিত স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তির পানে। বলে উঠলেন,—'Oh Liberty, what crimes are committed in thy name' (হা স্বাধীনতা, তোমার নামে কত অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়)।

তার পর, সব শেষ।

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

সাঁওতাল বিদ্রোহের এক বৎসরের মধ্যেই ১৮৫৭ সালে বাংলা দেশে ইংরাজ-শাসনের উচ্ছেদকামী বিদ্রোহী সিপাহীদের কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হয় "হিন্দুস্থান ছোড় দো"। এই সিপাহী অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করিয়া বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ তাহাকে কেবল মাত্র "সিপাহী বিদ্রোহ" বলিয়া ঘোষণা করিলেও প্রকৃত পক্ষে এই বিদ্রোহকেই ভারতের প্রথম মুক্তি-সংগ্রাম বলা চলে।

১৭৫৭ সালে লর্ড ক্লাইভ মীরজাফরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করার পর হইতেই পরবর্ত্তী এক শত বৎসর ইংরাজ-শাসনের আমলে শ্বেতাঙ্গ শাসকবর্গের ছুনির্ব্বার সাম্রাজ্য-লিপ্সা ও অর্থগৃধ্নুতার যে ভয়াবহ নগ্নরূপ ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেই উৎকট অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক অভ্যুত্থান দেখা দিয়াছিল।

এই মুক্তি-সংগ্রামে সেদিন ভারতবাসী পরাজিত হইয়াছিল। কাজেই সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করার মতন কোন নেতাই জীবিত ছিলেন না। সমসাময়িক ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ সিপাহী অভ্যুত্থানের অন্তর্নিহিত সত্যকে বিকৃত ভাবে দেখাইয়া আসল রূপটি চাপা দিয়াছেন। চর্ব্বি-মাখান টোটার জন্য ভারতব্যাপী এত বড় একটা বিপ্লব হইয়া গেল, ইহা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অযৌক্তিক। কারণ হিসাবে ঐতিহাসিকগণ সিপাহীদের ভাতা বন্ধ, বেতনের স্বল্পতা, ছুটির অভাব, সমুদ্র পার হইয়া সমুদ্র-যাত্রার নির্দ্দেশ, সেনাবাহিনীতে উচ্চ জাতির লোক নিয়োগ এবং সেনা সংগঠনের অন্যান্য দোষ-ত্রুটির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। চর্ব্বি-মাখান টোটা ব্যবহার ও এই সকল আনুসঙ্গিক কারণের ফলে সিপাহীদের মধ্যে সাময়িক কিছুটা অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত কারণের ফলে এত বড় ব্যাপক ও বিরাট ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান সম্ভবপর কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়া অনুধাবন করিলে ইহা স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে, শতবর্ষব্যাপী ইংরাজ বণিকের নিপীড়ন ও অনাচারের ফলে ভারতবাসীর মনে যে বিদ্বেষ ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, এই অভ্যুত্থান তাহারই স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি এবং ভারতবাসীর মনে দেশাত্মবোধের উন্মেষই সিপাহী অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ। ইহার পশ্চাতে ছিল এক শত বৎসরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা সমূহের ঐতিহাসিক পটভূমিকা।

এক শত বৎসর বিদেশীদের পদানত থাকিবার পর হিন্দু-মুসলমান মর্ম্মে-মর্ম্মে পর-শাসনের জ্বালা অনুভব করিয়াছিল, সেই জন্য পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতবাসী সেদিন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজ বণিকগণ দেশবাসীর অন্তরে ভেদ-বুদ্ধি জাগাইয়া তোলার জন্য তখন সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই তখন বিচক্ষণ জননায়ক থাকায় সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বুঝিয়াছিল যে, ইংরাজ বিদেশী, ইংরাজ রাজ্য-অপহারক, ইংরাজ শাসনের নামে সমগ্র দেশকে ও জাতিকে শোষণ করিতেছে, ইংরাজ দেশের শত্রু।

লর্ড ডালহৌসী সমগ্র ভারতবর্ষে একছত্র ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনে ব্রতী হইয়া যে সকল রাজন্যকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন, যে সকল জমিদারকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অবমাননা করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। অযোধ্যার নবাবকে রাজ্যচ্যুত করা ও ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই ও তাঁহার দত্তকের রাজ্য অপহরণ সমগ্র অযোধ্যা প্রদেশ ও ঝাঁসী রাজ্যে ব্রিটিশ-বিরোধিতার অনল-শিখা প্রজ্বলিত করিল। সিপাহীদের খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করার জন্য ব্রিটিশ অফিসারদের অসাধু প্রচেষ্টা সিপাহীদিগকে দিন দিন ব্রিটিশের প্রতি বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিল। ব্রিটিশ অফিসারদের দুর্ব্যবহারে সিপাহীদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ এক দিন ভারতব্যাপী প্রচণ্ড দাবদাহে পরিণত হইল। দেশবাসীর অনুকূলতা সে অগ্নি-শিখায় ঘৃতাহুতি দিল। সমগ্র ভারতব্যাপী দেখা দিল রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য দেখা দিল প্রথম গণ-সংগ্রাম।

১৮৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশী যুদ্ধের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র সিপাহীরা একই দিনে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে স্থির করিয়াছিল, সংগ্রাম ঘোষণার সংবাদ বিদ্রোহীদের পরস্পরের মধ্যে প্রচারের জন্য এক ক্যাম্প হইতে আর এক ক্যাম্পে রক্তপদ্ম চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। সেই সময় ইউরোপেও রাশিয়ার সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধ চলিতেছিল। এই কারণে ভারতে বেশী ইংরাজ সৈন্য রাখা সম্ভবপর ছিল না। তখন ভারতে ইংরাজ সৈন্য ছিল ৪০ হাজার। আর ভারতীয় সেনা ছিল ২ লক্ষ ১৫ হাজার। কাজেই ভারতীয়রা ভাবিয়াছিল যে, একসঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ করিতে পারিলে তাহাদের জয় সুনিশ্চিত।

পলাশীর পরাজয়ের এক শত বৎসর পূর্ণ হওয়ার তারিখ ছিল ১৮৫৭ সালের ২২শে জুন। অভ্যুত্থানের সময়টাও ছিল বেশ অনুকূল। ভারতে যে সকল ইংরাজ সৈন্য আসে, জুন মাসের গ্রীষ্মের উত্তাপ তাহাদের বিশেষ কাবু করিয়া ফেলে। তাহা ছাড়া এই সময় রবি শস্য উঠিবে বলিয়া সরকারী কোষাগারও বেশ পূর্ণ থাকিবে। বিদ্রোহীরা যখন দিল্লীর বাদশাহের কাছে গেল, তখন বাদশাহ বলিয়াছিলেন, "দিল্লীর বাদশাহের আর সেদিন নাই, বাদশাহী তোষাখানা আজ শূন্য, তোমাদের ভরণ-পোষণ যোগাইব কোথা হইতে?" বিদ্রোহীরা মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিয়াছিল, "আমাদের শোষণ করিয়া বৃটিশ বণিক যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাদের ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া সেই অর্থ আপনাকে আনিয়া দিব।"

অভ্যুত্থান-পরিকল্পনায় বিশেষ কোন জটিলতা ছিল না। সিপাহীরা এক দিনে বিদ্রোহ করিয়া সমস্ত ইউরোপীয় সেনানীদের

হত্যা করিবে, কারাগৃহের দ্বার ভাঙ্গিয়া বন্দীদের মুক্ত করিয়া দিবে, সরকারী কোষাকার দখল করিবে, টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া ও রেল-লাইন উড়াইয়া যোগাযোগ-ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া দিবে, তোষাখানা ও দুর্গ অধিকার করিবে। ইহার পর গণ-অভ্যুত্থানের জন্য জনসাধারণকে আহ্বান করা হইবে।

গেরিলা প্রণালীতে যুদ্ধ চালান হইবে বলিয়া স্থির হয়। এ সম্পর্কে বেরেলীর খাঁ বাহাদুর খাঁর নিম্নলিখিত ইস্তাহারটি উল্লেখযোগ্য :—

"বিধর্মীদের নিয়মিত সৈন্যের মুখামুখী হইতে চেষ্টা করিও না। তাহারা তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর সুশৃঙ্খল ও তাহাদের বন্দোবস্ত পাকা। তাহা ছাড়া তাহাদের বড় বড় কামান আছে। বরং তাহাদের সেনা-পরিচালনা পর্য্যবেক্ষণ কর; নদীর ঘাট সমূহ চৌকী দাও, তাহাদের চিঠি-পত্র হস্তগত কর, খাদ্যাদি সরবরাহ বন্ধ কর। তাহাদের চিঠির থলিয়া কাট এবং সর্ব্বক্ষণ তাহাদের শিবির সমূহের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান কর। তাহাদের বিশ্রাম করিতে দিও না।"

সংগ্রাম ঘোষণার বেশ কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রাম প্রস্তুতি সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে গোপন চিঠি-পত্র আদান-প্রদান চলিতে থাকে। এইরূপ একটি পত্রে লেখা হয়, "সিপাহীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইলে শ্বেতাঙ্গরা সমুদ্রে শিশিরবিন্দুবৎ হইয়া পড়িবে। বিদ্রোহ ঘটিলে আমাদের সাফল্য সুনিশ্চিত। কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান বিনা বাধায় দখল হইবে।"

এই অভ্যুত্থানে ভারতবর্ষের পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহেরও সমর্থন লাভের চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নায়ক ও কূটনৈতিক পরামর্শদাতা আজিমউল্লা খানকে সেই সময় নানা সাহেব ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে থাকিয়া বৃটিশ সৈন্যের সামর্থ্য নির্দ্ধারণ করেন, এমন কি ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া ইংরাজদের রণকৌশল আয়ত্ত ও ক্ষমতা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেন। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আজিমউল্লা ইংরাজদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সংগ্রামে তুরস্ক ও আফগান দেশ যাহাতে ভারতীয়দের সমর্থন করে, তজ্জন্য চেষ্টা করেন।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য ভারতীয়রা বহু দিন হইতেই উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছিল এবং সংগ্রামের একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনাও প্রস্তুত হইয়াছিল। এই অভ্যুত্থান যে কতখানি ব্যাপক হইয়াছিল, তাহা বিদ্রোহের পরিসর ও বিদ্রোহ দমনের ইতিহাস হইতেই প্রতিপন্ন হইবে। এক লক্ষ বর্গ-মাইলেরও অধিক ভূখণ্ড এই সময় বিদ্রোহীরা দখল করে এবং চার কোটি ভারতীয় কিছু দিনের জন্য বৈদেশিক শাসন-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত থাকিতে সমর্থ হয়। এই বিদ্রোহ প্রায় আড়াই বৎসর যাবৎ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত জ্বলিতে থাকে এবং দুই লক্ষ ভারতীয় মৃত্যুবরণ করে। বিদ্রোহ দমন করিতে খরচ লাগিয়াছিল চার কোটি চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড। সিপাহীদের বিদ্রোহই ছিল আসলে অভ্যুত্থানের প্রধান ভিত্তি। সৈন্যরা যেখানে অনুগত ছিল সেখানে সামন্ত নৃপতি বা জনগণের অভ্যুত্থান বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। মাদ্রাজ বাহিনী সমগ্র ভাবে এবং হিন্দুস্থানী সৈন্য বাদে বোম্বাই বাহিনী অনুগত ছিল। 'বেঙ্গল আর্ম্মি'ই বিদ্রোহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাড়া দেয় এবং ঘাঁটির পর ঘাঁটিতে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইতে থাকে। এই বাহিনীতে মাত্র ১১টি পদাতিক ব্যাটালিয়ান বৃটিশের অনুগত ছিল।

বিদ্রোহ যে কতখানি ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার আর একটি প্রমাণ পাওয়া যাইবে সামরিক আইন জারীর বহর হইতে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে দিল্লী, মীরাট, রোহিলখণ্ড, আগ্রা, কাশী ও এলাহাবাদ বিভাগে, বাঙ্গলা, পাটনা ও ছোটনাগপুর বিভাগে, মধ্য-ভারতে, নিমুচ ও আজমীড়ে সামরিক আইন জারী করা হইয়াছিল। পাঞ্জাব ও অযোধ্যায় কাগজে-কলমে সামরিক আইন জারী না হইলেও কার্য্যতঃ কর্ত্তৃপক্ষ সেইরূপ ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ সালের জুন পর্য্যন্ত অযোধ্যায় অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্রোহীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ২৫ হাজার, দিল্লীতে ৩০ হাজার, মধ্য-ভারতে ৫০ হাজার। দিল্লী, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, ও বুন্দেলখণ্ড বিদেশী শাসকদের কর্ত্তৃত্ব মুছিয়া ফেলিল, ভারতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে (বর্ত্তমান উত্তর প্রদেশ), মধ্য-ভারত, মধ্য-ভারতীয় দেশীয় রাজ্য সমূহ এবং পশ্চিম-বিহারে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতে লাগিল। হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, ১৮৫৭ সালে কোষাগার বেদখল, খাজনা অনাদায় এবং সরকারী সম্পত্তি ধ্বংসের জন্য গভর্ণমেণ্টের ক্ষতি হইয়াছিল দেড় কোটি পাউণ্ড। বিদ্রোহ দমনের জন্য গভর্ণমেণ্টের ঋণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল চার কোটি ষাট লক্ষ টাকা। সিপাহী বিদ্রোহ প্রথম আরম্ভ হয় বাংলা দেশে—ব্যারাকপুরে। ১৮২৪ সালে ব্যারাকপুরে এক দল সিপাহী ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে যাইতে অস্বীকার করে। তাহাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় অথচ ভারতীয় সৈন্যদের ভারতের বাহিরে লইয়া যাওয়া হইবে না বলিয়া তাহাদের নিয়োগের সময় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। ঐ ঘটনার পর হইতেই 'বেঙ্গল আর্ম্মি'তে অসন্তোষ দিন দিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল।

বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৮৫৭ সালে ব্যারাকপুরে চারি দল ভারতীয় পদাতিক সৈন্য ছিল। এই চারি দলের মধ্যে ২য় ও ৩৪ সংখ্যক রেজিমেণ্ট কান্দাহার এবং কাবুল যুদ্ধে ইংরাজের বিশেষ সহায়তা করে। অবশিষ্ট ৪৩ সংখ্যক ও সপ্তদশ রেজিমেণ্টের মধ্যে প্রথমোক্ত দল এক সময়ে অবাধ্যতা প্রদর্শনের জন্য সৈন্যশ্রেণী হইতে দূরীভূত হইয়াছিল এবং নূতন আর এক দল তাহাদের স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল। সৈনিক-নিবাসের কর্ত্তৃত্ব চার্ল্‌স্ গ্রাণ্টের উপর ছিল। জন হিয়ারসে সমস্ত সৈনিক বিভাগের সেনাপতি ছিলেন।

সেনাপতি হিয়ারসে ২৮শে জানুয়ারী অ্যাডজুটাণ্ট জেনারেলের কার্য্যালয়ে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ব্যারাকপুরের সিপাহীরা ক্রমেই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, ক্রমেই তাহাদের হৃদয়ে বিদ্বেষ-বুদ্ধির আবির্ভাব দেখা যাইতেছে। কতিপয় চক্রান্তকারী—সম্ভবতঃ বালিপাড়ার ব্রাহ্মণ—এইরূপ গুজব তুলিয়া দিয়াছে যে, সিপাহীদিগকে বলপূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইবে।

শীঘ্রই বিদ্রোহের অগ্নি-শিখা প্রজ্বলিত হইল, ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে ব্যারাকপুরের ষ্টেশন পুড়িয়া গেল। এই অগ্নিকাণ্ড শীঘ্রই থামিল না। দেখা গেল, প্রতি রাত্রেই ইংরাজ অফিসারদের খড়ের চালে প্রজ্বলিত আগুনযুক্ত তীর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। উক্ত সময়ে বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী রাণীগঞ্জে দ্বিতীয়

রেজিমেণ্টের এক শাখা অবস্থান করিতেছিল। সেখানেও ঠিক একই উপায়ে ঘরে ঘরে আগুন দেওয়া হইতে লাগিল।

ইহার পর রাত্রিকালে সিপাহীদের মধ্যে সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। প্রতি রাত্রিতেই উত্তেজিত সিপাহী দল সভায় ব্রিটিশের অন্যায় ও অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করিতে থাকে। সিপাহীরা কেবল সভা করিয়াই নিরস্ত হইল না। তাহাদের অনেক চিঠি কলিকাতা ও ব্যারাকপুর হইতে বিভিন্ন সৈনিকাবাসে যাইতে লাগিল।

ঠিক এই সময়ে ব্যারাকপুর হইতে এক শত মাইল দূরে বহরমপুর সৈনিক-নিবাসে ১৯ সংখ্যক দেশীয় সিপাহীর এক দল পদাতিক, এক দল অশ্বারোহী এবং কতিপয় কামান-রক্ষী অবস্থান করিতেছিল। ব্যারাকপুরের উত্তেজিত সিপাহীদিগকে ইংরাজ সেনাপতির আদেশে সেই সময় বিভিন্ন স্থানে বিভক্ত করিয়া পাঠান হইতে থাকে। ইহাদের সকলেরই বহরমপুর পর্য্যন্ত যাইবার কথা থাকে। বহরমপুরের সিপাহীরা ইহাদের কার্য্যভার গ্রহণ করিলে উক্ত সৈনিকগণ পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি পায়।

৩৪ সংখ্যক সিপাহী দল বারাকপুর হইতে বহরমপুরে পৌছিবার পর ১৯ সংখ্যক সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ সংক্রামিত হয়। যেদিন বারাকপুরের সিপাহী দল পৌছিল, তাহার পর দিবস ১৯ সংখ্যক সৈনিক দলের মধ্যে আদেশ প্রচারিত হয় যে, তাহাদিগকে আগামী কাল প্রাতে কাওয়াজ করিতে হইবে। আদেশ প্রচারের দিন প্রাতঃকালে সৈনিকদের অসন্তোষের কোন বাহ্যিক চিহ্ন দেখা যায় নাই। কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কর্ণেল মিচেলের সহকারী সিপাহীদিগের মধ্যে অসন্তোষের চিহ্ন দেখিতে পাইয়া সেনাপতিকে সমস্ত বিবরণ জানাইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কাওয়াজের সময় সিপাহীগণ বন্দুকের ক্যাপ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। সেনাপতি মিচেল এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধে আত্মহারা হইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "টোটা এক বৎসর হইল প্রস্তুত হইয়াছে, অফিসারদের কোন আশঙ্কার কোনও কারণ নাই, যদি একথার পরেও কেহ ইহা ব্যবহারে অসম্মত হয়, তাহা হইলে সমস্ত রেজিমেণ্ট ব্রহ্মদেশ কিংবা চীন দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। সেখানে মৃত্যু ভিন্ন ইহাদের অদৃষ্টে আর কিছুই ঘটিবে না। যাহারা গভর্ণমেণ্টের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"

সেনাপতি মিচেলের কথায় সিপাহীদের অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি ভয় দেখাইয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন। এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি অশ্বারোহী ও কামান-রক্ষকদিগকেও পরদিবস প্রাতঃকালে কাওয়াজের সময় উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ প্রচার করেন।

এই আদেশ প্রচার করিয়া সেনাপতি মিচেল রাত্রি দশটার সময় শয়ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না। এই সময় সৈনিক-নিবাসের দিকে জয়ঢাকের শব্দ ও বহু সংখ্যক লোকের কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যে চীৎকার ও কোলাহল উত্থিত হইল তাহাতে সেনাপতি মিচেল বুঝিতে পারিলেন, সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া বিপদ বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে। অফিসাররা কর্ণেল মিচেলের নিকট হইতে চলিয়া গেলে সিপাহীদের উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইল। ইহার পর যখন তাহারা শুনিতে পাইল, অশ্বারোহী ও কামান-রক্ষকদিগকে সজ্জিত হইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহারা সকলেই প্রাতঃকালের কাওয়াজের সময় উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদের গভীর আশঙ্কা গভীরতর হইল। সিপাহী দল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

ক্ষিপ্ত সিপাহী দল কেহ কেহ বন্দুক ভরিতে উদ্যত হইল, কেহ কেহ "ছোড়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ কেহ অস্ত্রাগার অধিকার করিতে চলিল। গভীর নিশীথে বহরমপুরের সৈনিক-নিবাসে এই ভাবে বিপ্লবের ধূমায়মান বহ্নির ক্ষীণ শিখা দেখা গেল।

সেনাপতি মিচেল এই কোলাহল শুনিয়াই শয্যা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া সৈনিক-নিবাসের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি কালমাত্র বিলম্ব না করিয়া অশ্বারোহীদিগকে শীঘ্র সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন; কামান-রক্ষকদিগকেও আপনাদের কামানগুলি যথোপযুক্ত স্থলে লইয়া যাইতে কহিলেন। সেনাপতির আদেশ প্রতিপালিত হইল। অশ্বারোহী সৈনিক দল সজ্জিত হইয়া অশ্বে আরোহণ করিল। অন্ধকারময় নিশীথে মশালের আলোকে কামান-রক্ষকেরা আপনাদের কামান সকল সিপাহীদিগের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। সিপাহীরা দূরে কামানের ঢাকার শব্দ শুনিতে পাইতেছিল, প্রজ্বলিত মশালের আলোকে সুসজ্জিত অশ্বারোহীদিগকে তাহাদের অভিমুখে আসিতে দেখিল। এ দৃশ্য দেখিয়া সকলে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেনাপতি মিচেল এই সময় ইউরোপীয় অফিসারদের শয্যা হইতে উঠাইয়া কামান সঙ্গে করিয়া কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। সিপাহীদিগের হাতে বন্দুক ছিল, কিন্তু তাহাদের কেহ সামরিক পরিচ্ছদ গ্রহণ করে নাই। সেনাপতির আদেশে কামান ভরা হইল এবং অশ্বারোহীরা কামানের নিকটে সন্নিবেশিত হইল। মিচেল অতঃপর দেশীয় অফিসারদের একত্র হইবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। আদেশ অনুসারে কার্য্য হইল। সেনাপতি মিচেল ক্রুদ্ধ ভাবে সিপাহীদের সম্বোধন করিয়া যাহা বলিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ না থাকিলেও দেশীয় সৈনিকগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সমস্ত অবাধ্য সিপাহীকে কামানের তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। তিনি ইহার জন্য আত্মবিসর্জ্জনেও প্রস্তুত আছেন। সিপাহীগণ সমূহ বিপদের সম্মুখে সম্পূর্ণ অটল রহিল। অবশেষে দেশীয় অফিসারদের উপদেশ অনুযায়ী মিচেল অশ্বারোহী ও কামান-রক্ষকদের আপন আপন স্থানে যাইতে ও পরদিবস প্রাতে কাওয়াজ বন্ধ রাখার নির্দ্দেশ দিলেন। সিপাহী দল ইহার পর ধীরে ধীরে নিজের আবাসস্থলে ফিরিয়া গেল।*

[ক্রমশঃ।

---

* Sepoy War—Kaye, Letters, Despatches and other State papers preserved by the Military Department of the Government of India—George Forest. সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস।

এ্যাটম

শ্রীযামিনীমোহন কর

এ্যাটমের বিভিন্ন অংশ

এইখানে ক্যাথোড রশ্মির কথা আরেক বার বলা প্রয়োজন। ১৮৯৭ সালে টমসন দেখালেন যে, মোক্ষণনলে ক্যাথোড অর্থাৎ ঋণাত্মক দ্বার থেকে যে রশ্মি বার হয়, তা প্রকৃতপক্ষে ঋণাত্মক আধান যুক্ত কণাসমূহের প্রবাহ। এই সম্বন্ধে অনেক মতবিরোধ হয়। তাঁর যুক্তি সমর্থনের জন্য তিনি এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা অনেক রকম পরীক্ষা করেন।

যদি কণাসমূহের প্রবাহ একটি সরলরেখা ক্রমে হয়, এবং লম্ব ভাবে তাদের ওপর চৌম্বক ক্ষেত্র আরোপিত হয়, তবে কণাসমূহের গতিপথ বেঁকে বৃত্তাকার হয়ে যাবে। যদি প্রতি কণার আধানের পরিমাণ e এবং বেগ v হয়, এবং চৌম্বক-ক্ষেত্রের বল H হয়, তবে একটি কণার উপর চৌম্বক বলের পরিমাণ Hev হবে। যদি কণার ভর m হয় এবং উহার বৃত্তাকার গতিপথের ব্যাসার্দ্ধ r হয়, তবে একটি কণার কেন্দ্রাতিগ বল mv^2/r হবে। যেহেতু উহারা পরস্পরকে প্রশমিত করে, সুতরাং

$$Hev = \frac{mv^2}{r}$$

অর্থাৎ $$\frac{e}{m} = \frac{v}{Hr}$$

পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে, কণার আধান e ও ভর mএর অনুপাত $\frac{e}{m}$ যে কোন গ্যাস, তরল বা কঠিন মাধ্যমে প্রায় এক থাকে। ইহাকে আপেক্ষিক আধান বলা হয়। এরং মান গ্রাম পিছু 10^{17} স্থিতীয় তড়িৎ একক।

যদি এই সঙ্গে আরও এক তড়িৎ ক্ষেত্র আরোপ করা হয়, যাতে করে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব বিনষ্ট হয় এবং যদি এই তড়িৎ ক্ষেত্রের বল E হয়, তবে

$$He\,v = Ee$$

অর্থাৎ $$v = \frac{E}{H}$$

vএর মান সেকেণ্ডে 3×10^9 সেণ্টিমিটার, আলোর বেগের প্রায় দশমাংশ। সুতরাং $\frac{e}{m}$ বার করা যায়।

দেখা গেল যে, এই ভাবে নির্দ্ধারিত $\frac{e}{m}$এর মান দ্রাবকের হাইড্রোজেন আয়নের সহস্র গুণ। যদি আধান e উভয় ক্ষেত্রে সমান হয়, তবে ক্যাথোড রশ্মিকণা হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা সহস্র গুণ হাল্কা; আর যদি ভর m উভয় ক্ষেত্রে সমান হয়, তবে কণার আধান হাইড্রোজেন পরমাণুর আধানের সহস্র গুণ। এই নিয়ে একটা মতদ্বৈততা ঘটল।

১৮৯৯ সালে টমসন $\frac{e}{m}$এর প্রকৃত অর্থ নিরূপণের জন্য সোজাসুজি কণার আধান এবং আধান ও ভরের অনুপাত নির্ণয়ের চেষ্টা করলেন। কিন্তু ক্যাথোড রশ্মিকণা দিয়ে তা করা সম্ভব হল না। যদি বেগুনাতীত (আল্ট্রা-ভায়োলেট) রশ্মি কয়েকটি ধাতুর, বিশেষ করে দস্তার ওপর ফেলা হয়, তবে দস্তা থেকে ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত কণাসমূহ বিচ্ছুরিত হয়। এই ব্যাপারকে ফোটো-ইলেকট্রিক প্রভাব বলে। টমসন এই সকল কণার আপেক্ষিক আধান নির্ণয় করলেন। বিভিন্ন উপায়ে একই ফল পাওয়া গেল, $\frac{e}{m}$ প্রতিবার একই হল। দ্রাবকের বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেল যে, হাইড্রোজেন পরমাণুর যে পরিমাণ ঋণাত্মক আধান, এই কণাগুলির সেই পরিমাণ ধনাত্মক আধান। তাহলেই প্রমাণিত হল যে, ক্যাথোড রশ্মিকণা হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা সহস্র গুণ হাল্কা। টমসন বললেন যে, এই কণাগুলিই হল সব চেয়ে হাল্কা যার স্বাধীন অস্তিত্ব সম্ভব। পূর্বে ষ্টোনী নিম্নতম ইলেকট্রোনিক আধানকে ইলেকট্রোন বলেছিলেন, পরে এই কণাসমূহের নাম ইলেকট্রোন হয়ে গেল। এখনও তাই চলে আসছে। ইলেকট্রোনের আধুনিকতম সংজ্ঞা হল, এমন কণা যার স্বাধীন অস্তিত্ব আছে, $4{\cdot}802 \times 10^{-10}$ স্থিতীয় তড়িৎ একক ঋণাত্মক আধান যুক্ত এবং যার ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রায় দ্বি-সহস্রতম অংশ। যে কোন পরমাণুর এই হল মূলতম অংশ।

সাধারণতঃ পদার্থ তড়িৎ-নিরপেক্ষ অর্থাৎ তার কোনরূপ আধান নেই। কিন্তু প্রত্যেক পদার্থে ঋণাত্মক আধান যুক্ত ইলেকট্রোন রয়েছে, সুতরাং তাকে প্রশমিত করবার জন্য পদার্থের মধ্যে নিশ্চয়ই ধনাত্মক আধান আছে। এ সম্বন্ধে পরে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হবে। এইখানে উল্লেখ করা যায় যে, ধনাত্মক আধান পরমাণুর একটা অখণ্ড অংশ, কিন্তু ইলেকট্রোনগুলি এক পরমাণু থেকে অন্য পরমাণুতে চলে যেতে পারে। কোন পদার্থে, তড়িৎ-নিরপেক্ষ অবস্থার অধিক ইলেকট্রোন থাকলে তা ঋণাত্মক,আর কম থাকলে তা ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত হয়। তেমনই ধনাত্মক আয়ন বলতে বুঝায় এমন এক পরমাণু বা পরমাণুর গ্রুপ, যার এক বা একাধিক ইলেকট্রোন কমে গেছে, আর ঋণাত্মক আয়ন বলতে বুঝায় এমন এক পরমাণু বা পরমাণুর গ্রুপ, যার এক বা একাধিক ইলেকট্রোন বেড়ে গেছে।

তড়িৎ-প্রবাহে সর্ব্বদা ইলেকট্রোনসমূহ এক মেরু থেকে অন্য মেরুতে প্রবাহিত হয়। যেহেতু ইলেকট্রোন ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত, সুতরাং এই প্রবাহের অভিমুখ প্রথাজনিত ধনাত্মক তড়িৎ-প্রবাহের

অভিমুখের বিপরীত। এই হাঙ্গামার কারণ হল ফ্র্যাঙ্কলিনের খামখেয়ালী ভাবে আধানযুক্ত কাচকে ধনাত্মক নাম দেওয়া। প্রকৃত পক্ষে তার নাম হওয়া উচিত ছিল ঋণাত্মক। তাহলে ইলেকট্রোনের আধান ধনাত্মক হত, ঋণাত্মক হত না। ফলে ইলেকট্রোনের প্রবাহের অভিমুখ এবং ধনাত্মক তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখ একই হত। কিন্তু এখন আর তা হয় না। গতস্য শোচনা নাস্তি।

যেহেতু এখন প্রকৃত আধান e এবং আপেক্ষিক আধান e/m দুইই জানা আছে, সুতরাং একটি ইলেকট্রোনের m অর্থাৎ ভর নির্ণয় করা যায়। $e = 4{\cdot}802 \times 10^{-10}$ স্থিতীয় তড়িৎ একক, এবং $\frac{e}{m} = 5{\cdot}273 \times 10^{17}$ প্রতি গ্রাম-পিছু স্থিতীয় তড়িৎ-একক। ভাগ করলেই একটি ইলেকট্রোনের ভর পাওয়া যাবে; ভর $m = 9{\cdot}106 \times 10^{-28}$ গ্রাম। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর $= 1{\cdot}673 \times 10^{-24}$ গ্রাম। অর্থাৎ 1838 ইলেকট্রোনের মিলিত ভর একটা মাত্র হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের সমান। এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইলেকট্রোনের আপাত ভর তার দ্রুতির ওপর নির্ভর করে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে। ইলেকট্রোনের যে ভরের কথা এখানে বলা হয়েছে, তা স্থির অথবা অত্যন্ত অল্প দ্রুতি-সম্পন্ন ইলেকট্রোনের। অল্প দ্রুতি মানে সত্যই অল্প নয়। আলোর বেগের দশমাংশ। আলোর বেগ সেকেণ্ডে 3×10^{10} সেঃ মিটার, সুতরাং ইলেকট্রোনের দ্রুতি সেকেণ্ডে 3×10^{9} সেঃ মিটার অর্থাৎ সেকেণ্ডে 18600 মাইল। প্রকৃত পক্ষে এ দ্রুতি প্রচণ্ড, তবে আলোর বেগের তুলনায় কম বলা চলতে পারে। ইলেকট্রোনের এই ভরের নাম দেওয়া হয়েছে 'স্থিরভর'।

ইলেকট্রোন আবিষ্কৃত হবার পর এবং তার ভর অত্যন্ত কম দেখে অনেক বৈজ্ঞানিক চিন্তা করতে লাগলেন যে, এই ভর সম্পূর্ণরূপে তড়িৎ-আধানজনিত হতে পারে। কোন পদার্থের ভর আছে বলা হয়, যখন তাকে নাড়তে শক্তির প্রয়োজন হয়। প্রকৃত পক্ষে জড় ও শক্তির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। শক্তি ছাড়া জড় নেই, জড় ছাড়া শক্তি প্রকাশিত হয় না। গতিশীল তড়িৎ-আধানের কাছে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় এবং সে জন্য শক্তির প্রয়োজন। তাহলে আধানের সঙ্গে ভরের (অথবা ঐ জাতীয় এমন কিছু, যাকে ভর থেকে প্রভেদ করা যায় না) নিশ্চয়ই কোন সম্পর্ক আছে। এই ধরণের ভরকে তড়িৎ-চুম্বকীয় ভর বলা হয়। যেহেতু ইলেকট্রোনের ঋণাত্মক আধান আছে, এবং গতিশীল অবস্থায় চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, সুতরাং তার তড়িৎ-চুম্বকীয় ভর আছে। যদি এ কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়, তবে তার আয়তন বা ব্যাসার্দ্ধও নির্ণয় করা যায়।

যদি একটা ইলেকট্রোনের তড়িৎ-চুম্বকীয় ভর m আয়তন গোলকরূপী ধরে ব্যাসার্দ্ধ r এবং আধান e তড়িৎ-চুম্বকীয় একক হয়, তবে টমসন নির্দ্ধারণ করেন যে, $r = \frac{2e^2}{3m}$. কিন্তু এই সমীকরণ অল্প দ্রুতিসম্পন্ন আধান-যুক্ত কণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ইলেকট্রোনের স্থিরভর নিতে হবে। তাহলে $e = 4{\cdot}80 \times 10^{-10}/3 \times 10^{10}$ তড়িৎ-চুম্বকীয় একক এবং $m = 9{\cdot}1 \times 10^{-28}$ গ্রাম ধরলে $r = 2 \times 10^{-13}$ সেণ্টিমিটার। টমসনের সমীকরণ একটা কণার জন্য সত্য বটে, কিন্তু ইলেকট্রোনের মত ক্ষুদ্র কিছুর জন্য সত্য কি না, তা পরখ করে দেখা হয়নি। সুতরাং ব্যাসার্দ্ধের এই মান নির্ভুল বলা চলে না। তার ওপর দু'টো কথা বিনা প্রমাণে ধরে নেওয়া হয়েছে। প্রথম এই যে, আধান গোলকরূপী ইলেকট্রোনের পৃষ্ঠে সমভাবে ছড়িয়ে আছে; দ্বিতীয় এই যে, স্থিরভর সম্পূর্ণরূপে তড়িৎ-চুম্বকীয় ধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ ইলেকট্রোনের আপাত ভর তড়িত-আধানজনিত। যদি কোন রকমে জানা যায় যে, ভরের কোন অংশ অন্য কারণেও হতে পারে, তবে ব্যাসার্দ্ধের মান আরও কমে যাবে। তবে ব্যাসার্দ্ধ 10^{-13} সেণ্টিমিটারের কাছাকাছি থাকবেই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রোন আবিষ্কৃত হবার পর যে ধনাত্মক আধানযুক্ত কণার খোঁজ পড়বে, এটা খুবই স্বাভাবিক। ১৮৮৬ সালে জার্ম্মাণীর গোল্ডষ্টাইন মোক্ষণ-নলে ছিদ্রযুক্ত ধাতব ক্যাথোড নিয়ে তড়িৎ মোক্ষণ করে দেখলেন যে, অ্যানোডের বিপরীত ক্যাথোডের পশ্চাৎ দিকে এক প্রকার সরলরেখাক্রম রশ্মি দেখা যায়। তিনি এর নাম দিলেন 'ক্যানালষ্ট্রাহলেন' অর্থাৎ ক্যানাল-রশ্মি। ১৮৯৫ সালে পের‍্যাঁ, ফ্যারাডের চোঙে রশ্মি ফেলে দেখালেন যে, এদের মধ্যে ধনাত্মক আধান রয়েছে। ১৯০৭ সালে টমসন বললেন, যেহেতু এই রশ্মিগুলি উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবে যায়, সুতরাং এদের কণা ধনাত্মক আধানে আহিত হয়। অতএব এর নাম হওয়া উচিত ধনাত্মক রশ্মি। এই নামই এখন সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ থেকে এই রশ্মি সম্পর্কে ওয়েন পরীক্ষা চালাতে থাকেন। ধনাত্মক রশ্মির কণার আধান ও ভরের অনুপাত (e/m) নির্ণয় করে দেখলেন যে, এর মান ইলেকট্রোনের তুলনায় অনেক কম, এমন কি অনেক সময় দ্রাবকের হাইড্রোজেন আয়নের তুলনায়ও কম। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ধনাত্মক কণা খুব কম কিন্তু অখণ্ড সংখ্যক আধানযুক্ত। তাহলে দাঁড়ায় এই যে, তার ভর ইলেকট্রোনের ভরের চেয়ে অনেক বেশী। প্রকৃত পক্ষে ধনাত্মক কণা, তড়িৎ আধানযুক্ত পরমাণু বা অণু। তিনি মোক্ষণ-নলে বাতাস পূরে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, নির্গত ধনাত্মক কণাগুলির ভর অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন অণুর সমান। পরে প্রমাণিত হল যে, মোক্ষণ-নলে যে যে গ্যাস থাকে, ধনাত্মক রশ্মির কণার ভর সেই সেই গ্যাসের অণু বা পরমাণুর ভরের সমান।

চিহ্নের পার্থক্য ছাড়াও, ক্যাথোড রশ্মি ও ধনাত্মক রশ্মির মধ্যে অন্ততঃ দু'টো বিশেষ প্রভেদ আছে। প্রথম এই যে, ধনাত্মক রশ্মির কণাগুলি প্রকৃত পক্ষে অণু বা পরমাণু এবং তাদের ভর ইলেকট্রনের তুলনায় অনেক বেশী, কিন্তু ক্যাথোড রশ্মির কণাগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়েও হাল্কা। দ্বিতীয় এই যে, ক্যাথোড রশ্মির কণাগুলির সঙ্গে মোক্ষণ-নলের গ্যাসের বা ক্যাথোডের পদার্থের কোন সংস্রব নেই, কিন্তু ধনাত্মক রশ্মির কণাগুলি মোক্ষণ-নলের গ্যাসের তড়িৎ-আধান আহিত পরমাণু বা অণু। শত চেষ্টা করেও মোক্ষণ-নলে ইলেকট্রোনের অনুরূপ ধনাত্মক আধানযুক্ত কণার সন্ধান মিলল না। ১৯১৪ সালে রাদারফোর্ড, তাঁর পরীক্ষার ফলস্বরূপ জানালেন যে, সব চেয়ে হাল্কা যে এক রকম কণা পাওয়া যায়—যাকে এত দিন ধরে খোঁজা হচ্ছে—বোধ হয় এই সেই ধনাত্মক ইলেকট্রোন। এর ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের সমান এবং এর এক একক ধনাত্মক আধান আছে

অর্থাৎ পরিমাণে একটা ইলেকট্রোনের আধানের সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্নযুক্ত। সুতরাং এই কণা এক একক ধনাত্মক আধানযুক্ত হাইড্রোজেন আয়ন (H^+)। বোধ হয় মোক্ষণ-নলে ধাক্কাধাক্কির ফলে একটা হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে একটা ইলেকট্রোন বেরিয়ে গেছে, ফলে সেই পরিমাণ ধনাত্মক চার্জ্জ থেকে গেছে। এর নাম দেওয়া হল প্রোটোন। যেহেতু একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর একটা ইলেকট্রোনের ভরের 1838 গুণ, এবং পরমাণু থেকে একটা ইলেকট্রোন বেরিয়ে গেলেই প্রোটোন হয়ে যায়, সুতরাং একটা প্রোটোনের ভর একটা ইলেকট্রোনের ভরের 1837 গুণ।

১৯৩০ সালে ইংরেজ গণিতজ্ঞ ডিরাক বললেন যে, যদিও পরীক্ষামূলক ভাবে ধনাত্মক ইলেকট্রোন অর্থাৎ ইলেকট্রোন জাতীয় কিন্তু ধনাত্মক আধানযুক্ত কোন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, তবু এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এর প্রমাণ যা দিলেন তা জটিল গণিতে ভরা। ভাসা-ভাসা ভাবে বলা যায় যে, সাধারণ ঋণাত্মক আধানে আহিত ইলেকট্রোন ছ'রকম শক্তির অবস্থায় নিশ্চয়ই থাকতে পারে—ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক। শক্তির চিহ্নগুলির সঙ্গে চার্জ্জের চিহ্নের কোন সংস্রব নেই। এই চিহ্নগুলি আপেক্ষিক এবং শক্তির স্থির বা কোন নির্দ্দিষ্ট অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। যদি কোন একটা সম্ভাব্য ঋণাত্মক শক্তির অবস্থায়, সেখানে একটা ইলেকট্রোন না থাকে, তবে সেই স্থানে ফাঁক থেকে যাবে—এর নাম দেওয়া হয়েছে ডিরাক-ছিদ্র, সাধারণ ত্রিমাত্রিক ভাবের ছিদ্র নয় এবং এই ফাঁক ধনাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রোনের মত ব্যবহার করবে ও ধনাত্মক শক্তিসম্পন্ন হবে।

প্রথমে ডিরাকও এই ফাঁক বা ছিদ্রকে প্রোটোন মনে করেছিলেন, কারণ পরীক্ষামূলক ভাবে ধনাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রোনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি, কিন্তু পরে দেখা গেল, তা সম্ভব নয়। কারণ প্রথমতঃ, প্রোটোনের ভর ইলেকট্রোনের ভরের 1837 গুণ, কিন্তু হিসেব মত ছিদ্রের ভর ইলেকট্রোনের সমান হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, ডিরাকের কল্পিত ধনাত্মক ইলেকট্রোন প্রকৃত পক্ষে একটি ছিদ্র, সুতরাং যে কোন ঋণাত্মক ইলেকট্রোন সেই স্থান দখল করতে পারে। তার অর্থ হল এই যে, ধনাত্মক ইলেকট্রোন অত্যন্ত স্বল্পায়ু, কারণ এতগুলি ইলেকট্রোনের যে কেউ এসে শূন্য স্থান দখল করলেই ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধান পরস্পরকে বিনষ্ট করে দেবে, ফলে উভয়ই লোপ পেয়ে থেকে যাবে কেবল শক্তি। কিন্তু প্রোটোন তো স্বল্পায়ু নয়, অতএব ডিরাক-ছিদ্র প্রোটোন হতে পারে না। তাহলে নিশ্চয়ই ধনাত্মক ইলেকট্রোন আছে, আরও পরীক্ষা প্রয়োজন।

পরীক্ষা চলতে থাকল। শেষে ১৯৩২ সালে ক্যালিফর্ণিয়ার অ্যাণ্ডারসন দুর্ল্লভ ধনাত্মক ইলেকট্রোন আবিষ্কার করলেন। সে জন্য পৃথিবীর বাইরে থেকে মহাজাগতিক (cosmic) রশ্মির সাহায্য নিতে হল। এই রশ্মির কথা পরে আলোচনা করা হবে। অ্যাণ্ডারসন ও মিলিকান, দু'জনে মিলে একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন, যাকে মেঘের কামরা (cloud chamber) বলা হয়। সেই কামরাটিকে খুব শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখা হল। কামরার মধ্যে তড়িৎ-আধানযুক্ত কণা সমূহের গতিপথের ছবি তোলা হল। সেই পথের প্রাখর্য্য দেখে কণার ভর, এবং কোন্ দিকে বেঁকেছে দেখে কণার আধান, ধনাত্মক বা ঋণাত্মক, নির্ণয় করা সম্ভব হল। পরীক্ষার সময় অত্যন্ত শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মির কণা সমূহের শক্তি কিছু পরিমাণ হ্রাস করার জন্য কামরায় আড়াআড়ি ভাবে একটা ছয় মিলিমিটার মোটা সীসার প্লেট এঁটে দেওয়া হয়েছিল। ছবিতে দেখা গেল যে, গতিপথের বক্রতা প্লেটের ওপরের তুলনায় নীচেয় কম, সুতরাং প্লেটের নীচের দিকে কণার শক্তি বেশী। অতএব কণা নিশ্চয়ই ওপর দিকে যাচ্ছিল। চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ, কণার গতির অভিমুখ জানা আছে, সুতরাং গতিপথের বক্রতা বাম দিকে হওয়াতে বোঝা গেল যে, নিশ্চয়ই কণা ধনাত্মক আধান আহিত। এই কণার গতিপথ প্রোটোনের গতিপথের মত অতটা ঘন নয়, যদিও দৈর্ঘ্যে বেশী। অ্যাণ্ডারসন বললেন—"ধনাত্মক আধানযুক্ত কণাগুলির ছবির অর্থ সম্ভব, যদি সেগুলির ভর ঋণাত্মক আধানযুক্ত সাধারণ ইলেকট্রোনের ভরের সমান হয়। সুতরাং ধনাত্মক ইলেকট্রোনের অস্তিত্ব পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণিত হল।" তিনি এই কণাগুলির নাম ধনাত্মক ইলেকট্রোনের পরিবর্ত্তে পজিট্রোন রাখলেন এবং সেই নামই চলে গেল। তিনি ঋণাত্মক ইলেকট্রোনেরও নাম মিলিয়ে নেগাট্রোন রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা চলল না। ইলেকট্রোন নামই বহাল রইল। পজিট্রোনের এবং ইলেকট্রোনের আপেক্ষিক আধানের (e/m) প্রভেদ শতকরা দুই ভাগের অধিক নয়।

যেহেতু দুর্ল্লভ পজিট্রোন বহু বছর ধরে চেষ্টা করেও ধরা দিতে চায়নি, তাতে মনে হয় যে, এরা ইলেকট্রোনের মত জড়ের সাধারণ ও সার্ব্বজনীন অংশ নয়। এর আয়ু যে অত্যন্ত কম, তা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। যমরূপী ইলেকট্রোন, পজিট্রোনকে দেখলেই গ্রাস করবে এবং উভয়ই ধ্বংস হয়ে কেবল মাত্র শক্তি থেকে যাবে। একটা পজিট্রোনের গড় পরমায়ু এক সেকেণ্ডের দশ কোটিতম অংশ। এই জন্য কিছুতে একে আবিষ্কার করা যাচ্ছিল না।

[ক্রমশঃ।

-আগামী সংখ্যায়-

ধর্ম্ম-সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ

ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস (শান্তিনিকেতন)

কবীরদাস যে সব ধর্মসম্প্রদায় তথা সাধু-সন্ত এবং অন্যান্য ব্যক্তির নিকট সংস্রবে এসেছিলেন, তাঁর রচনায় তাঁদের উল্লেখ পাওয়া যায় নানা ভাবে। হিন্দু-মুসলমান ছাড়াও নাথ, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। সাধু, সন্ত, যোগী, গোরখ (গোরক্ষনাথ), পাঁড়ে, অবধূত, পণ্ডিত, মোল্লা, কাজি এঁদের সম্বোধন করে তিনি পদ রচনা করেছেন, এঁদের উল্লেখ করেছেন বহু পদে।

ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেন, এই ধরণের এক এক সম্বোধনের এক এক বিশেষ প্রয়োজন বা অর্থ আছে। কবীরদাস যে পদে নিজেকে অথবা সন্ত বা সাধুকে সম্বোধন করেছেন, সেই পদে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মত যারা মানত তাদের তিনি সন্ত বা সাধু বলতেন। আর যে পদ তিনি পাঁড়ে, অবধূ, 'জোগিয়া', মোল্লা বা এমনি কাউকে সম্বোধন করে রচনা করেছেন, তাতেই উক্ত ব্যক্তির ভাষায় তারই যুক্তির অনুসরণ ক'রে তার মত খণ্ডন করেছেন। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কবীরদাস এই সব লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন।

কবীরদাস যে জোলা-পরিবারে জন্মেছিলেন বা মানুষ হয়েছিলেন তারা মুসলমান হওয়ার আগে ছিল নাথপন্থী। নাথ-ধর্মের প্রধান সাধনা যোগ। এই জন্য, আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে অনেক জায়গায় নাথপন্থীদের যোগী বা যুগী বলা হয়। যোগ অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতে প্রচলিত ছিল। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে "আর্য্যদের ভারতে আসবার পূর্বে প্রাচীন অনার্য্য ভারতীয়দের মধ্যে যোগ প্রচলিত ছিল। মহেন-জো-দারো ও হারাপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে তা প্রমাণ হয়েছে।" ভারতের সব ক'টি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে, এমন কি বহিরাগত সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যেও যোগমত প্রচলিত হয় এবং সম্ভবতঃ মূল এক হওয়ায় সম্প্রদায়ভেদেও এই মতের ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।

যোগের আছে বিভিন্ন প্রকারভেদ। তবে সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে যোগটি সাধারণ ভাবে প্রচলিত, তা হঠযোগ। এই হঠযোগই নাথপন্থীদের প্রধান সাধনা। হঠযোগকে সাধারণতঃ রাজযোগেরই অঙ্গ বলে গণ্য করা হয়। অবশ্যি, গোঁড়া হঠযোগীরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে হঠযোগ স্বতন্ত্র। মনে হয়, গোড়ায় হঠযোগের উদ্দেশ্য ছিল কায়াসাধন অর্থাৎ শরীর ও মনের বিশুদ্ধি। পরে নাথপন্থীরা কায়াসাধনের দ্বারাই মুক্তি হয় মনে করতে লাগলেন। নাথপন্থীদের মতে মীননাথের শিষ্য গোরখনাথ হঠযোগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। শাস্ত্রগ্রন্থে সাধারণতঃ প্রাণ-নিরোধ-প্রধান সাধনাকে হঠযোগ বলা হয়। বাচস্পতি অভিধান মতে হঠযোগ হ'ল প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াভ্যাসজাত পরমাত্ম-সাক্ষাৎকাররূপ চিত্তবৃত্তিনিরোধ। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম ইত্যাদির দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হ'লে সমাধি হয়। এইটি যোগের চরমাবস্থা। এই অবস্থায়ই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটে। হঠযোগীরা অবশ্য হঠযোগের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন অন্য রকম। নাথপন্থীদের গ্রন্থ সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতি বলেন—

হকারঃ কথিতঃ সূর্য্যষ্ঠকারচন্দ্র উচ্যতে।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যোগাৎ হঠযোগ নিগদ্যতে।

সূর্য্যকে হ বলা হয়, চন্দ্রকে ঠ বলা হয়। সূর্য্য আর চন্দ্রের যোগকেই হঠযোগ বলা হয়। এর দু'রকম ব্যাখ্যা আছে। এক— সূর্য্য অর্থ প্রাণবায়ু আর চন্দ্র অপানবায়ু। এই দুয়ের যোগ অর্থাৎ প্রাণায়ামের দ্বারা বায়ু নিরোধের নামই হঠযোগ। দুই— সূর্য্য অর্থ ইড়া নাড়ী আর চন্দ্র পিঙ্গলা। এই উভয়কে রুদ্ধ করে সুষুম্না নাড়ী দিয়ে প্রাণবায়ুকে সঞ্চারিত করার নাম হঠযোগ।

যোগসাধনা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। সাধনায় খানিকটা অগ্রসর হ'লেই যোগীর অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতালাভ হয়।

হঠযোগ সাধনা গুরুগম্য। এই জন্য হঠযোগীদের কাছে গুরুর স্থান সর্ব্বোচ্চ। তাই নাথপন্থীদের কাছেও গুরুর চেয়ে কেউ নেই। যোগের আছে পরিভাষা। যাঁরাই যোগ সম্বন্ধে কিছু বলেছেন, তাঁরাই সাধারণতঃ পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে এই পরিভাষা সকল সম্প্রদায়েই প্রায় একরূপ। কাজেই এই পরিভাষার সঙ্গে একবার পরিচয় হয়ে গেলে যে-কোনো সম্প্রদায়ের যোগের কথা মোটামুটি বুঝার পক্ষে আর কোনো অসুবিধা থাকে না। মুসলমান হয়ে যাবার পরও বেশ কিছু কাল জোলাদের মধ্যে নাথধর্মের প্রভাব পূরো মাত্রায় ছিল এবং জোলাদের যখন ঐ রকম অবস্থা তখনই কবীরদাসের আবির্ভাব হয়, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। কাজেই দেখা যায়, কবীরদাস যোগমতের পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং অবশ্যি এই মতের উপাসক ছিলেন না। তবে পরিবেশের প্রভাব যে তাঁর উপর যথেষ্টই পড়েছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর ভাষা, তাঁর যুক্তি, তাঁর তর্কশৈলী এই সবের উপর যোগমতের প্রভাব স্পষ্ট। জোলাদের কথা বলার সময় পরোক্ষ ভাবে যোগীদের কথা খানিকটা বলা হয়েছে। এখানে আমরা এঁদের কথা আর একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করতে চাই। তার কারণ, কবীরদাসের উপর যে সব সাধু-সন্তের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল, তাঁদের প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, এক—যোগী, দুই—ভক্ত। কবীরদাস মানুষ হয়েছিলেন যোগমতের পরিবেশের মধ্যে আর স্বয়ং ছিলেন ভক্ত। কাজেই তাঁকে জানতে হ'লে আগে এঁদের পরিচয় লওয়া দরকার।

"যোগীর প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর আত্মবিশ্বাস। তাঁর একান্ত নির্ভর নিজের উপর, নিজের উপরই তাঁর যত ভরসা। তিনি কঠোর জ্ঞানমার্গী, যুক্তি-তর্কের ক্ষুরধার পথে তিনি চলেন। পিণ্ডকেই মনে করেন ব্রহ্মাণ্ড। দৃঢ় নিঃশঙ্কতা এবং এক বেপরোয়া ভাব যোগীর মধ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। কেন না, যোগের প্রথম কথাই হ'ল 'নির্মমতা' আর 'অমায়িকতা'। প্রেম যোগীর কাছে দুর্বলতা-মাত্র। নিজের জ্ঞানের এবং সাধনার গর্ব তাঁর খুবই। জাতিভেদ তিনি মানেন না। তাঁর কাছে মানুষই সকলের বড়। কিন্তু যে সব মানুষ যোগপন্থী নয়, তাদের চেয়ে যোগপন্থীদের তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করেন।

যোগের প্রথম সোপান ইন্দ্রিয়-সংযম, নিরাসক্তি ও কামনাহীনতা, সুখে-দুঃখে সমভাব ও রাগ-ভয়-ক্রোধহীনতা ও নির্ভীকতা। যোগের পথ কঠিন সাধনার পথ। এই পথে ভাবালুতা অচল,

চোখের জল ভীরুতার পরিচায়ক। যোগমতে মুক্তি দুর্লভ, কঠোর সাধনার ধন। যোগের পথ প্রধানতঃ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের পথ। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এ পথে চলা সম্ভবপর নয়। কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে যোগীদের খুব প্রভাব ছিল। তারা যোগীদের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তাঁদের ভয় করত, শ্রদ্ধা-ভক্তি করত, তাঁদের মতের মাহাত্ম্য স্বীকার করত; কিন্তু তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলতে পারত না। যোগীরা যখন বলতেন, যোগসাধনা ছাড়া মুক্তির আর কোনো উপায় নেই, তখন সে কথাকে তারা ধ্রুবসত্য বলে মনে করত আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মন ভয়ে-নিরাশায় অভিভূত হয়ে পড়ত। যোগসাধনা যখন তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তখন তারা মুক্তির আর কোনো উপায় দেখতে পেত না। যোগ সাধারণের অন্তরে একটা শুষ্কতা, একটা নিরাশার ভাব এনে দিল। এই অবস্থায় অফুরন্ত আশার বাণী নিয়ে এলেন ভক্ত। বললেন, ভয় নেই—কোনো ভয় নেই। মুক্তি তো তোমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে। তার জন্য কোনো রকম কৃচ্ছতা সাধনেরও দরকার নেই। শুধু মনে-প্রাণে ভগবানের নাম কর। ব্যস্, তা হ'লেই মুক্তি। কৃষ্ণের চেয়ে কৃষ্ণনাম বড়, রামের চেয়ে বড় রামনাম। নামই সাধন, নামেই সিদ্ধি। কলিযুগ সকল যুগের সেরা। এ যুগে মুক্তি হয়েছে এত সহজ। 'ভক্ত গৃহস্থকে করে তুললেন পুরো আশাবাদী। ভক্তিধর্ম প্রেমের ধর্ম। তাই ভক্তির প্রভাবে সাধারণের জীবন হয়ে উঠল সরস, আশায় আনন্দে ভরপুর। ভক্ত চলেন যোগীর উল্টো পথে। ভক্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর ভগবদ্-বিশ্বাস, ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরতা। ভগবানের পায়ে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেন। তাঁর আশা-ভরসা, বল-বুদ্ধি সবই ভগবান। ভক্তের পথ প্রেমের পথ। যুক্তি-তর্কের তিনি ধার ধারেন না। নিজের বলতে কিছুই তাঁর নেই, সবই ভগবানের। কাজেই তাঁর কোনো অহংকারও নেই—জ্ঞানের নয়, কর্মের নয়, কিছুরই নয়। বরং তিনি নিজেকে অতিশয় অজ্ঞান মনে করেন আর বিশ্বাস করেন তাঁর দুর্বলতার জন্যই ভগবান তাঁকে কৃপা করবেন। ইন্দ্রিয় নিগ্রহের জন্য তিনি মাথা ঘামান না; এ ক্ষেত্রেও তাঁর কোনো অহংবোধ নেই। তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিও ভগবৎসেবাতেই নিযুক্ত। কাজেই তাদের নিগ্রহ নিষ্প্রয়োজন।

ভক্ত বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ সবই মানেন অথচ শ্রেষ্ঠ বর্ণে জন্মালেও নিজেকে তৃণের চেয়েও নীচ মনে করেন। এই বিনয় ভক্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভক্ত নিজেকে অতি দীন-হীন পাপী মনে করেন আর তার জন্য কেঁদে-কেঁদে ভগবানকে ডাকেন। বিশ্বাস করেন, চোখের জলে তাঁর সব মলিনতা ধুয়ে যাবে আর অন্তর্যামী ভগবান তাঁর এই অনুতাপের কথা জেনে তাঁকে কৃপা করবেন, দেবেন মুক্তি। ভক্তের কাছে জগৎ ভগবানের লীলা-স্থল। তাঁর সাধনা ভাববিভোর প্রেমের সাধনা। জনসাধারণের তথা কবীরদাসের উপর উপরে-লিখিত যোগী ও ভক্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব পড়ে। কবীরদাস ভক্ত ছিলেন। কিন্তু সাধারণ ভক্তের মত ভাববিহ্বল মানুষ তিনি ছিলেন না। সংসারী জীবের দুঃখ-দুর্গতি দেখলেই তাঁর চোখে জল আসত না। তিনি বরং তাদের কড়া কড়া কথা বলে ধমকে দিতেন। কবীরদাসের চরিত্রের এই কঠোর দিকটা গড়ে ওঠে যোগীদের প্রভাবে। তিনি হয়ে উঠেন 'অক্খড়'*। যেখানে কোনো রকম অলসতা, আরামপ্রিয়তা, কোনো রকম দুর্বলতা দেখেছেন, সেখানেই তিনি খড়্গহস্ত হয়েছেন, তাঁর বাণী হয়েছে ক্ষুরধার।

সাধারণ ভক্তের মত কবীরদাস মুক্তিকে সহজলভ্য মনে করতেন না। তাঁর মতে মুক্তি-সাধনা অত্যন্ত কঠিন। এতে অলসতা, আরাম বা দয়ার কোনো স্থান নাই। 'সুরত' আর 'নিরত'এর শুষ্ক কঠোর উপদেশ তিনি দিয়েছেন মুক্তির জন্য। এখানেও কবীরদাসের উপর যোগীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

তবে কবীরদাসের উপর যোগীদের প্রভাব যথেষ্ট পড়লেও তিনি যোগমার্গের অনুসরণ করেননি বা যোগীদের দুর্বলতা সম্বন্ধেও অজ্ঞ ছিলেন না। যোগমার্গ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অতি গভীর। তিনি এর খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই যোগীদের কোনো-কিছুই তাঁর কাছে লুকোনো ছিল না। ভক্তদের দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতাকে তিনি যেমন আঘাত করেছেন, তেমনি আঘাত হেনেছেন যোগীদের দোষত্রুটি-দুর্বলতার উপর। যোগীকে তিনি সুতীব্র ব্যঙ্গের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করেছেন, তাঁরই অস্ত্রে তাঁকে ঘায়েল করেছেন। কানে কুণ্ডল, হাতে নারকেল-মালা, গলায় ঝুলান ছোট শিঙা আর পরনে গেরুয়া কাপড় যোগীর এই সব বাইরের বেশভূষা থাকলেই সত্যিকারের যোগী হওয়া যায় না। অনেক ভণ্ড যোগী বাইরের বেশভূষা ধারণ করত কিন্তু অন্তরে একেবারেই যোগী ছিল না। কবীরদাস এদের খুব কশাঘাত করেছেন। তিনি মনে করতেন সত্যিকারের যোগী যে, সে বাইরের বেশভূষার ধার ধারে না, যোগীর চিহ্ন মুদ্রা, নাদ, বিভূতি সে মনেই ধারণ করে, মনেই করে আসন, করে জপ-তপ, তার সাধনা মনের জিনিস। যোগীদের ভারী অহংকার। তাঁরা যোগপন্থী ছাড়া অন্যদের নিতান্ত কৃপায় পাত্র মনে করেন। কবীরদাস তাঁদের এই অহংকার চূর্ণ করেছেন তাঁদেরই যুক্তি দিয়ে তাঁদের কাবু করে। যোগীদের সাধনার চরম লক্ষ্য উন্মনী সমাধি; সেখানে অক্ষর-পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। খুব ভাল কথা। কিন্তু সমাধি যখন ভঙ্গ হয় তখন কি? তখন ত আবার সেই ভব-বন্ধন। এর উত্তর যোগীরা কি দেবেন?

কবীরদাসের পদে বার বার এসেছে 'অবধূর' কথা। ভারতীয় কয়েকটি উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে অবধূত বলতে বুঝায় সিদ্ধ তপস্বীকে। বর্ণাশ্রম অতিক্রম করে যে পুরুষ আত্মাতেই অবস্থান করেন, সেই অতিবর্ণাশ্রমী যোগীকে বলে অবধূত। তান্ত্রিকদের মতে অবধূত চার রকমের—শৈবাবধূত, ব্রহ্মাবধূত, হংসাবধূত, ভক্তাবধূত। ভক্তাবধূত আবার দু'রকমের—পূর্ণ ভক্তাবধূত, এঁকে বলে পরমহংস আর অপূর্ণ ভক্তাবধূত, এঁকে বলে পরিব্রাজক।

---

* 'অক্খড়' কথাটা হিন্দী। কথাটির বাঙ্গলা প্রতিশব্দ নেই। হিন্দীতে অক্খড় বলতে বুঝায় সেই মানুষকে যে তার নিজের সুচিন্তিত মত সম্বন্ধে অত্যন্ত দৃঢ়, কিছুতেই তার থেকে একটুও বিচলিত হয় না। যে অত্যন্ত স্পষ্টবাদী ও বেপরোয়া, যে কারুর কোনো তোয়াক্কা রাখে না, যা সত্য বলে মনে করে স্পষ্ট ভাষায় তা বলে দেয়, আর কোথাও কোনো মিথ্যাচার দেখলে কঠিন ভাবে করে আঘাত।

সংসারাসক্তিশূন্ত বর্ণাশ্রমচিহ্নহীন গৃহস্থকেও অবধূত বলে। কবীরদাসের 'অবধূ' কিন্তু এঁদের কেউ নয়। তাঁর অবধূ গোরখপন্থী সিদ্ধ যোগী ; কোনো কোনো স্থলে তিনি পরিষ্কার গোরখনাথকেই অবধূ বলেছেন। অবধূ সিদ্ধযোগী। সাধারণ যোগী থেকে তিনি স্বতন্ত্র। কবীরদাসও তাই মনে করতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই অবধূ আর যোগী আলাদা বলে উল্লেখ করেছেন। কবীরদাসের অবধূ আদর্শ যোগী। তাঁর একটি পদে এঁর যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে এই কথাই মনে হয়। তিনি বলেছেন, অবধূ যোগী-জগৎ থেকে আলাদা। ইনি যোগীর চিহ্ন মুদ্রা, সুরতি, নিরতি আর শৃঙ্গ ধারণ করেন, নাদের দ্বারা ধারাকে খণ্ডন করেন না, গগনমণ্ডলে এঁর বাস, দুনিয়ার দিকে ইনি তাকানও না। চৈতন্যের চৌকীর উপর ইনি বসে আছেন। আকাশে উঠেও ইনি আসন ছাড়েন না, আর পান করতে থাকেন মধুর মহারস। যদিও প্রকটরূপে ইনি কাঁথা জড়িয়ে থাকেন তবু নিজের হৃদয়ের দর্পণে সব কিছু দেখতে থাকেন, নিশ্চল নাকে একুশ হাজার ছ'শ তাগাতে গিঁঠ দেন। ইনি ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দেন নিজ কায়া, আর জেগে থাকেন ত্রিকুটী-সঙ্গমে। কবীর বলছেন, এই যোগেশ্বর সহজ এবং শূন্যের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। এ রকম আদর্শ যোগীকেই কবীরদাস গুরু করতেও প্রস্তুত। তিনি বলেছেন—ভাই অবধূ, যে যোগী আমার এই কথাটার একটা মীমাংসা করে দিতে পারবেন তিনি আমার গুরু :—এক গাছ দাঁড়িয়ে আছে ; কিন্তু তার শিকড় নেই ; তাতে ফুল ছাড়াই ফল হয়েছে ; তার ডাল-পালা-পাতা কিছুই নেই, তবু সে আট দিকের আকাশ ঢেকে রেখেছে। এই গাছের উপর আছে এক পাখী, তার পা নেই তবু নাচছে, হাত নেই তবু তাল দিচ্ছে, জিহ্বা নেই তবু গান করছে। এই গায়কের কোন রূপ-রেখা নেই। তবে সদ্‌গুরু হ'লে একে দেখিয়ে দিতে পারেন। এই পাখী খুঁজছে মাছের পথ। কবীর বিচার করে বলছে পুরুষোত্তম ভগবান অপরংপার। বলিহারি যাই তাঁর এই মূর্ত্তির ! এর থেকে বোঝা যায়, সত্যিকারের সিদ্ধ যোগী যাঁরা তাঁদেরই প্রভাব পড়েছিল কবীরদাসের উপর। যোগমার্গের যা উত্তম, তাই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কবীরদাসের সময় যোগী ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধু-সন্তও অনেক ছিলেন। কাশীতে তাঁদের সবারই আস্তানা ছিল। কবীরদাস তাঁদের সবাইকেই অল্প-বিস্তর জানতেন। তিনি স্বয়ং একটি পদে বলেছেন—সেই সময়ে মুনি, পীর, দিগম্বর, যোগী, জংগম, ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী এরা ছিল কিন্তু সবাই ঘুরে মরছিল মায়াচক্রে পড়ে। কবীরদাসের সময় দেশে নানা রকমের ধর্মসাধনা প্রচলিত ছিল, কেউ বেদ পাঠ করত, কেউ উদাসী হয়ে ঘুরে বেড়াত, কেউ থাকত নগ্ন হয়ে, কেউ দীন-হীন হয়ে ফিরত, কেউ দান-ধ্যান করত, কেউ সুরাপান করত, কেউ মন্ত্র-তন্ত্র ওষুধ-বিষুধের কেরামতি দেখাত, কেউ তীর্থ-ব্রত করত, কেউ ধূমপান করে করে (গাঁজা টেনে টেনে) শরীর কালি করত, কিন্তু কেউ-ই রামনামে লীন হয়ে থাকত না।

কবীরদাসের সময়ে সত্যিকারের সাধু-সন্ত যেমন অনেক ছিলেন তেমনি ভণ্ড সাধুর সংখ্যাও কম ছিল না। এই সব ভণ্ডেরা বাইরে ছিল ধর্মের ধ্বজাধারী বড় বড় মহান্ত কিন্তু আসলে ছিল অত্যন্ত হীন চরিত্রের মানুষ। কবীরদাস একটি পদে এদের লক্ষ্য করে বলেছেন—এমন যোগ ত দেখিনি রে, ভাই, মহাদেবের নামে চালাচ্ছে সম্প্রদায়, নিজেদের বড় বড় মহান্ত বলে জাহির করছে, হাট-বাজারে সমাধিস্থ হচ্ছে আর সুযোগ পেলেই কামান-বন্দুক নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে। কবে কোন্ সাধু এমনি আক্রমণ করেছেন শুনি? দত্তাত্রেয় কবে ভেঙেছিলেন শত্রুর দুর্গ? শুকদেব কবে দেগেছিলেন কামান? নারদ কবে চালিয়েছিলেন বন্দুক? ব্যাসদেব কবে বাজিয়েছিলেন রণভেরী? এই সব মন্দমতিরা লড়াই করে মরে। আজব সাধু এই সব মহান্ত। এদের লোভের অন্ত নেই। এদের সোনাদানার বাহার গৃহস্থের বেশভূষাকে লজ্জা দেয়। এদের হাতী-ঘোড়া-ঠাট কত! কোটিপতির মত এদের চাল।

তখন জনসাধারণের মধ্যে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা হিন্দুধর্মের সব চেয়ে বেশী প্রভাব ছিল। বিশেষ করে কাশীর জনসাধারণ প্রায় সবাই ছিল হিন্দু। ছেলেবেলা থেকেই কবীরদাস এদের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। কাজেই হিন্দুধর্মের পূজা-আর্চা, আচার-অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। সাধারণের মধ্যে ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানটাই ছিল। তারা ধর্মের মূল তত্ত্ব বা মর্ম জানত না, অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিহীন আচার ও প্রথার অন্ধ অনুসরণ করে চলত। অনুমান হয়, কবীরদাসেরও হিন্দুধর্মের এই দিকটায় সঙ্গেই পরিচয় ছিল। তার বাহ্যাচারের পিছনের তত্ত্বের দিকটা তিনিও জানতেন মনে হয় না। তাই, হিন্দুধর্মকে তিনি আচার-সর্বস্ব একটা অর্থহীন আড়ম্বর মাত্র মনে করতেন। সেই ভাবেই তিনি তাঁর পদে এই ধর্মের উল্লেখ করেছেন। হিন্দুধর্মের তত্ত্বের দিকটা জানতেন না বলে কবীরদাসের এর প্রতি কোনো শ্রদ্ধাও ছিল মনে হয় না। সেই জন্য তাঁর পদে কোথাও হিন্দুধর্মের দিকটা জানবার ইচ্ছারও কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। কবীরদাসের পরিচিত হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি পণ্ডিত আর পাঁড়ে। অনেক পদ তিনি পণ্ডিত বা পাঁড়েকে সম্বোধন করে রচনা করেছেন। হিন্দুধর্মের বিবিধ বিষয় নিয়ে তাদের প্রশ্ন করেছেন। পূজা-আর্চা, তীর্থ-ব্রত, জাতিভেদ, জন্মান্তর, স্বর্গ-নরক, চতুর্বর্গ ফল ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করেছেন এবং এই সম্বন্ধে প্রচলিত মত ও বিশ্বাস খণ্ডন করেছেন। এই সব প্রশ্নের ভঙ্গীতেই বোঝা যায় এই সব বিষয়ের কোনো সদুত্তর যে থাকতে পারে, তা তিনি বিশ্বাসই করতেন না। কবীরদাসের পদোক্ত পণ্ডিত নামেই পণ্ডিত ; তার মধ্যে পাণ্ডিত্যের কোনো পরিচয়ই পাওয়া যায় না। কবীরদাস তাকে নেহাত বোকা ও ভণ্ড গোঁয়ার মনে করতেন। কবীরদাসের ধারণা ছিল, সত্যিকারের ধর্ম কি তা সে জানে না ; তাঁর তত্ত্বজ্ঞান নেই, আত্মজ্ঞান নেই, এমন কি ন্যায়-অন্যায়-বিচার-বোধও নেই। কবীরদাসের পাঁড়েও তথৈব চ। সেও একটি নিরেট বোকা এবং ধর্মের নামে ঘোর অধর্মাচারী। তিনি একটি পদে ত পাঁড়েকে সোজাসুজি নিপুণ কসাই বলে গাল দিয়েছেন।

কবীরদাসকে এর জন্যে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি হিন্দু সমাজের বাইরে মানুষ হয়েছিলেন বা জন্মেছিলেন। কাজেই দূরের থেকে হিন্দুধর্মের বাইরের দিকটাই তাঁর চোখে পড়েছিল। তিনি তার বাহ্যানুষ্ঠানটাই লক্ষ্য করেছিলেন। হিন্দু জনসাধারণও ধর্মের এই বাহ্যানুষ্ঠানগুলোকেই ধর্ম বলে মনে করত, তার বেশী

কিছু তারাও জানত মনে হয় না। কবীরদাস এদের দেখেই হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ধারণা করেছিলেন। হিন্দুধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানের পিছনের তত্ত্ব যে সব পণ্ডিত ব্যক্তিদের জানা ছিল, কবীরদাসের মত একটি নিরক্ষর জোলার ছেলের পক্ষে তাঁদের কাছ থেকে এ সব তত্ত্ব জানা সম্ভবপর ছিল না। আর তা ছাড়া, তাঁর সে রকম ইচ্ছাই বোধ হয় হয়নি। কেন না, এই সব বাহ্যাচারের পিছনে যে কোনো তত্ত্ব থাকতে পারে, তা তিনি মনেও করেননি। তার কারণ, তিনি যে যোগমতের আওতায় মানুষ হয়েছিলেন, সেই মত অনুসারে হিন্দুধর্মের বাহ্যাচারগুলো অত্যন্ত অসার বাজে জিনিষ। নাথপন্থী যোগীরা হিন্দুধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানগুলোকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করেছেন এবং নানা যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করেছেন। শুধু নাথপন্থী কেন, বেদবাহ্য সব ধর্মেই হিন্দুধর্মের এই বাইরের দিকটাকে আঘাত ক'রে এর অসারতা প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে।

প্রশ্ন হ'তে পারে, কবীরদাস ত অনেক খাঁটি হিন্দু সাধু-সন্তের সঙ্গও করেছিলেন, দীক্ষা নিয়েছিলেন হিন্দু গুরুর কাছ থেকে; কাজেই হিন্দুধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানগুলির পিছনে কোনো তত্ত্ব আছে কি না তা ত তিনি তাঁদের কাছ থেকে অনায়াসে জানতে পারতেন। জানেননি কেন? আমরা আগেই বলেছি, এই সব বাহ্যাচারের পিছনে যে কোনো আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে তা তাঁর মনেই হয়নি। সেই জন্য তিনি ওদিকে কোনো চেষ্টাই করেননি। আর তা ছাড়া আমাদের মনে হয়, সাধু-সন্তদের কাছ থেকে ঈশ্বরের কথা, প্রেমভক্তির কথা, পরমার্থ জ্ঞানের কথা এই সবই তিনি শুনতে চাইতেন, আচার-অনুষ্ঠানের তত্ত্ব শুনবার কথা তার মনেই হ'ত না। যে মানুষ ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল, সে ঈশ্বরের কথাই শুনতে চায়, অন্য কিছুর দিকে তার মন যায় না। নিছক বাহ্যানুষ্ঠানই যখন ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় তখন সত্যিকারের ধর্ম লোপ পায়। বাহ্যানুষ্ঠানকেই ধর্ম মনে করা মোহ। মোহ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত কল্যাণ নেই। তাই কঠিন আঘাত হেনে এই মোহ দূর করতে হয়। পরমার্থবিদ্ সিদ্ধ সাধু-সন্তেরা চিরকাল এ কাজ করেছেন। ধর্মের বেশে মোহ এসে যখন মানুষকে আচ্ছন্ন করেছে, তখনই কঠিন আঘাত হেনে তাঁরা সে-মোহ ভেঙ্গেছেন। আচারের মরু-বালিতে যখন মানুষের প্রেম-ভক্তির ধারা লুপ্ত হ'তে চলেছে, তখনই তাঁরা সহজ পথ কেটে তাকে নূতন খাতে বহিয়ে দিয়েছেন। কবীরদাসও তাই করেছিলেন। নিপুণ কসাই পাঁড়েকে আর বোকা পণ্ডিতকে তিনি যে কশাঘাত করেছিলেন তার প্রয়োজন ছিল। জীর্ণ বাহ্যাচারের শৈবালদামে হিন্দুধর্মের সত্যিকারের জ্ঞান ও ভক্তির স্রোত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আঘাত হেনে তাকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন কবীরদাস। প্রেম-ভক্তির বিমল স্রোতে এই সব মিথ্যা আবর্জনা তিনি ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন!

শুধু হিন্দুধর্মের বেলাই যে কবীরদাস এ রকম করেছিলেন তা নয়, যে কোনো ধর্মের বাহ্যাচার-সর্বস্বতাকে তিনি আঘাত করেছেন। পণ্ডিত ও পাঁড়ের মত কাজী ও মোল্লার উপরও তিনি এক হাত নিয়েছেন। ওদেরও তিনি নিতান্ত মূর্খ এবং অপদার্থ মনে করতেন। মুসলমানধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানকেও তিনি ছেড়ে কথা কননি। সুন্নত, কোরবানি, আজান—এ সবের তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। মনে হয়, মুসলমানধর্মেরও গভীর তত্ত্বের দিকটা কবীরদাসের জানা ছিল না। যে জোলা-পরিবারে তিনি মানুষ হয়েছিলেন, অনুমান হয়, তারাও ধর্মের বাহ্যাচারের দিকটাই জানত। আর পরম্পরাক্রমে আগত ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানের যে বিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে কবীরদাস মানুষ হয়েছিলেন, তারই জন্য হিন্দুধর্মের ন্যায় মুসলমান-ধর্মেরও বাহ্যানুষ্ঠানের পিছনে যে কোনো তত্ত্ব থাকতে পারে, তা বোধ হয় তাঁর মনেই পড়েনি। কবীরদাস যে পরম সত্য লাভ করেছিলেন, ধর্মের যে সার মর্ম জেনেছিলেন তা কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না; কোনো বাহ্যানুষ্ঠানের অপেক্ষা তা রাখত না। কবীরদাস যে সাম্প্রদায়িকতা, বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার প্রভৃতির তীব্র নিন্দা করতেন, তার কারণ এ সব হয়ে উঠেছিল সেই পরম সত্যের বিরোধী, সেই সত্য অনন্যা ভক্তি। কবীরদাসের কাছে ভক্তির চেয়ে আর কিছুই ছিল না। তাঁর কাছে ধর্মের সার কথা ছিল ভক্তি। তিনি এই ভক্তির দৃষ্টিতে সব-কিছু বিচার করতেন। যা-কিছু এই ভক্তির বিরোধী বা ভক্তকে আচ্ছন্ন করে রাখে, কবীরদাস তাকেই আঘাত করেছেন, সহজ যুক্তি দিয়ে তাকে অসার প্রতিপন্ন করেছেন। নতুবা শুধু সংস্কার বা বাহ্যাচার বলেই কোন-কিছুর তিনি খণ্ডন করেননি। তাঁর ধারণা ছিল, যেখানে সত্যিকারের ভক্তি দেখা দেয় সেখানে অর্থহীন সংস্কার, বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি থাকতে পারে না। ভক্তের কাছে এ সবের কোনো মূল্যই নেই। কবীরদাসের কাছে ভক্তের বড় আদর ছিল। সদ্গুরুর কৃপায় যথার্থ ভক্তি তিনি লাভ করেছিলেন। তাই যথার্থ ভক্তকেও তিনি খুঁজে বের করতে পারতেন। এ সম্বন্ধে কেউ তাঁকে ধোঁকা দিতে পারত না। ধর্ম সম্বন্ধীয় নানা কূট তর্ক, জ্ঞানের বড়াই, নানা রকমের বেশভূষা, ভেক, ভক্তির ভাণ কিছুতেই তাঁকে ভুলাতে পারত না, তিনি স্বয়ং খাঁটি ভক্ত ছিলেন ব'লে কোনো রকম মেকি তাঁর কাছে চলত না। গুরুকৃপায় যথার্থ ভক্তের তিনি সঙ্গলাভ করেছিলেন, দেখেছিলেন তাঁদের মাহাত্ম্য। তিনি দেখেছিলেন সত্যিকারের ভক্ত যিনি তাঁর মধ্যে কোনো ভেদবুদ্ধি নেই, কোনো সঙ্কীর্ণ মনোভাব নেই। যে যে-ভাবেই ভগবানকে ডাকুক না কেন, ভক্তি থাকলে ভগবান তাতেই সাড়া দেবেন। সব নামই ভগবানের নাম; সব পথই তাঁর কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। তাই দেখি, ভক্ত কবীরদাস সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার তিনি ঊর্দ্ধে। রাম-রহিম, কৃষ্ণ-করীমের মধ্যে তিনি কোনো ভেদ স্বীকার করেন না। ভক্তের কাছে ভগবান একই। যে যে-নামে ডাকুক না কেন, তাতে কিছু এসে-যায় না।

কবীরদাসের এক দিকে যেমন সত্যিকারের সাধু-সঙ্গ বলে অনেকের সঙ্গে পরিচয় ছিল, তেমনি অসংখ্য ভক্তের সংস্পর্শেও তাঁকে আসতে হয়েছিল। এদের কেউ বা উদাসী সাধু কেউ বা গৃহী। বাইরের দিক দিয়ে ধর্মের ভড়ং এদের ষোল আনাই ছিল। বেশভূষা, ভেক, জটা, বিভূতি, ফোঁটা-তিলক, পূজা-আর্চা, রোজা-নামাজ কিছুরই অভাব ছিল না এদের। চিরকাল যেমন হয়, খাঁটির চেয়ে মেকির সংখ্যা বেশী। কবীরদাসের সময়েও তাই ছিল। এই সব মেকিকে সুযোগ পেলেই তিনি নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন। ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে তাঁর বাণী সব চেয়ে ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে।

[ক্রমশঃ।

ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষ মোঙ্গলয়েড লক্ষণবিশিষ্ট জাতি সমূহের অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত। এই অঞ্চল আসাম ও চট্টগ্রাম হইতে প্রসারিত হইয়া উত্তরে সাইবেরিয়া ও দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের জাতিগুলির মধ্যে এই লক্ষণ অল্লাধিক পরিমাণে বর্তমান। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিগুলিকে মোঙ্গলয়েড লক্ষণবিশিষ্ট বলিবার অর্থ এই নহে যে, ইহারা মোঙ্গল-গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত। ভারতবর্ষ, পামীর, আফগানিস্থান, পারস্য, আর্মেনিয়া, কুর্দিস্থান প্রভৃতি ও আরব জাতিগুলির অধ্যুষিত অঞ্চল বাদ দিলে এশিয়ার অবশিষ্ট বিরাট অংশের অতি বৃহৎ মনুষ্য-গোষ্ঠীর মধ্যে অল্লাধিক পরিমাণে নাসিকা, চক্ষু ও চিবুকের গঠনের একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—যাহাকে সাধারণ ভাবে মোঙ্গলয়েড লক্ষণ বলা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন গোষ্ঠীর আদিবাসী ও আগন্তুক বিভিন্ন জাতির সহিত সংমিশ্রণের ফলে এই লক্ষণ কোথাও হয়ত ফিকে হইয়াছে, কিন্তু একেবারে মুছিয়া যায় নাই।

ব্রহ্ম

প্রথমে ব্রহ্মদেশের কথা বলা হইতেছে। দেশের ব্রহ্ম নাম ভারতবর্ষের প্রদত্ত। দেশের বর্মী নাম মিয়ানামা (উচ্চারণ বামা)। শান জাতি ব্রহ্মকে মন জাতির দেশ বলে। বর্মীজদিগের মণিপুরী নাম মারান।

কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ব্রহ্মের অধিবাসীদিগকে "দক্ষিণ মোঙ্গলয়েড" (Southern Mongoloid, Pareoean) গোষ্ঠীভুক্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের জাতি-সংমিশ্রণের পরিচয় দিবার কার্যে যে সকল বিদেশী পণ্ডিত প্রথম দিকে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এক অভিনব পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। জাতিলক্ষণ সমূহের ভিত্তির পরিবর্তে ভাষার ভিত্তিতে তাঁহারা এ দেশের অধিবাসিগণকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের মধ্যে জাতি-সংমিশ্রণ নির্ণয়ের ব্যাপারে যে অস্পষ্টতা ও ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়, তাহার জের এখনও চলিতেছে। ভারতবর্ষে যেরূপ করা হইয়াছে ব্রহ্মদেশে সেইরূপ ভাষার ভিত্তিতে অধিবাসীদিগের নৃতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। ফলে সঠিক জাতি-সংমিশ্রণ নির্ণয়ের ব্যাপারে এখানেও অস্পষ্টতা দেখা দিয়াছে। সে যাহা হউক, ব্রহ্মের অধিবাসীদিগকে মনা ক্মের, শান বা তাই, ইন্দো-চাইনীজ ও তিব্বতী-বর্মী ইত্যাদি গোষ্ঠীভুক্ত বলা হইয়াছে। এই কয়েকটি গোষ্ঠীভুক্ত জাতির অল্লাধিক অংশ ব্রহ্মের সীমানা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের (আসাম) মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইন্দো-চাইনীজ গোষ্ঠীভুক্ত কোন কোন উপজাতি ব্রহ্ম ও মালয়ের মধ্য দিয়া ইন্দোনেশিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। আসামে এই গোষ্ঠীর যে সকল উপজাতি প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে মিরি, বোদো, নাগা প্রভৃতির নাম করা যায়। এই গোষ্ঠীর একটি শাখাকে লুশাই পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণে ও পশ্চিমে, আরাকানে ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায়।

ব্রহ্মের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত উপজাতিদিগের বিস্তারিত পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই এবং তাহার স্থানও এখানে নাই। ব্রহ্মের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণ যাহা বলিতে চাহেন তাহা মোটামুটি বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হয় না। ব্রহ্মে জনপ্রবাহের চাপ আসিয়াছে থাইল্যাণ্ড হইতে, দক্ষিণ-পশ্চিম চীন হইতে ও তিব্বতের সংলগ্ন অঞ্চল হইতে। পণ্ডিতগণের মতে মালয় ও ইন্দোনেশিয়া হইতে অল্লাধিক অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে আরাকান ইয়োমা অঞ্চলে। ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ব্রহ্ম হইতে এই মিশ্র জনপ্রবাহের চাপ ভারতবর্ষের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিয়াছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, কিন্তু স্থলপথে সংযোগ থাকিলেও ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মাভিমুখী পাল্টা জনপ্রবাহের চাপের কথা বলা হয় নাই। অথচ এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই যে, ইন্দো-চীন বা ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে আদান-প্রদান ঘটিবার পূর্বে নিকটতম প্রতিবেশী ব্রহ্মের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। তিব্বতের প্রাচীন কিম্বদন্তী মতে কোশলের এক রাজপুত্র তিব্বতের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রহ্মের প্রাচীন কিম্বদন্তী মতে কাশীর এক রাজপুত্র ব্রহ্মের প্রথম রাজা। নিম্ন-ব্রহ্মে (প্রোম) ও আরাকানে ভারতীয় রাজবংশ বহু কাল ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং একটি অনুমান করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মে গিয়া যাঁহারা ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টি প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহারা স্থানীয় অধিবাসিগণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মে আগত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মন ক্মের বা মন-আনাম গোষ্ঠী প্রথমে আসিয়াছিল, পণ্ডিতগণ এই কথা বলেন। শান রাজ্যগুলির পালৌং, রিয়েং, ওয়া প্রভৃতি উপজাতি এবং পেগু অঞ্চলের মন বা তলৈং উপজাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত। পেগুর এই মন জাতি একদা সমগ্র ব্রহ্মে আপনাদিগের শাসন (পাগান সাম্রাজ্য) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। বর্মীজ জাতির সহিত বহু দিন সংগ্রামের পরে অবশেষে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মন জাতির আধিপত্য নষ্ট হইয়াছিল। এই মন বা মন ক্মের জাতি ও তাহাদিগের ভাষা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ অনেক কথা বলিয়াছেন, এখানে সে সকলের উল্লেখ করিবার স্থান নাই। আসামের খাশীদিগের ভাষার সহিত মন ক্মের ভাষার সম্পর্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ কেহ মুণ্ডা ভাষাগোষ্ঠীর, অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিবাসীদিগের এক বৃহৎ অংশের ভাষার সঙ্গে মন ক্মের ভাষার সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়াছেন।

নিম্ন-ব্রহ্মের এই মন ক্মের বা তলৈং বা পেগুজাতির সম্বন্ধে একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। মন জাতির তলৈং নাম দিয়াছিলেন পরবর্তী কালের বর্মীজ জাতির বিজেতারা। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন, এই তলৈং নাম তেলিঙ্গ বা তেলেগু নামের রূপান্তর এবং মন জাতির মধ্যে দক্ষিণ-ভারতের তেলেগু বা অন্ধ্র জাতির ঔপনিবেশিকগণের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল বলিয়া জাতির তলৈং নাম দেওয়া হইয়াছিল।

ইহার পরের গোষ্ঠীর শ্যাম-চাইনীজ, শান বা তাই গোষ্ঠী নাম দেওয়া হইয়াছে। স্যালউইন ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের পূর্বাংশে এবং ব্রহ্মের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এই গোষ্ঠীভুক্ত উপজাতি-গুলি বাস করে। শান জাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত। দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের (সেচুয়ান) পার্বত্য অঞ্চল হইতে অনুমান খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে শান-তাই জাতির প্রবাহ দক্ষিণ অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। উত্তর-পূর্ব ব্রহ্মের শান জাতি, শ্যামের থাই জাতি, নিম্ন ব্রহ্মের পূর্ব দিকের লাও অঞ্চলের লাও জাতি, কেন্টংয়ের কুম (HKum) ও লু জাতি, টং-কিংয়ের মং জাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত। আসাম-বিজেতা আহোম জাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত। ব্রহ্মের কারেন জাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত।

মধ্য-ইরাবতী অঞ্চলের বর্মীজ, আবাকানী, লিসও, পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলের চিন জাতি, উত্তর অঞ্চলের কাচিন প্রভৃতি উপজাতি তিব্বতি-বর্মী গোষ্ঠীভুক্ত। বর্মীজরা সমস্ত দেশের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে একটি উপজাতি মাত্র। রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের ফলে সমগ্র দেশের নাম তাহাদের নামানুসারে হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক আমলে এই উপজাতি সেচুয়ান অঞ্চল হইতে ব্রহ্মের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিয়াছিল।

থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীন

থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীনের অধিবাসীদিগকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,—যাহাদিগের মধ্যে সাউদার্ণ মোঙ্গলয়েড লক্ষণ দেখা যায় না ও যাহাদিগের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায়।

মেকং নদী হইতে আনামের উপকূল পর্যন্ত এবং য়ুনান হইতে কোচীন-চীনের বারিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে যে সকল উপজাতির বাস, তাহারা (মায়া, পিউমং, খা, নং প্রভৃতি) মোঙ্গলয়েড লক্ষণ-বর্জিত। চীনের সেচুয়ান ও য়ুনানের লোলো, মন-সে (Man-tse), মো-সো প্রভৃতি উপজাতিও এই লক্ষণ-বর্জিত।

থাইল্যাণ্ডের বর্তমান অধিবাসীরা কতকটা মিশ্রজাতি, কিন্তু শান-থাই সংমিশ্রণ প্রবল। দেশের শ্যাম নাম প্রাচীন শ্যায়ামী "সিয়েম" (চীনা, সিয়েন-লো) হইতে আসিয়াছে। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল হইতে থাই জাতির দক্ষিণ অঞ্চলে অবতরণের পূর্বে ইন্দোচীন উপদ্বীপের সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল কাম্বোডিয়া বা কাম্বোজের হিন্দু-রাজবংশের অধীন ছিল। পার্বত্য অঞ্চল হইতে আগত "বর্বর" শান-থাই জাতির আক্রমণের ফলে কাম্বোডিয়ার হিন্দু সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায় খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই হিন্দু সাম্রাজ্য ৪০০ বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম চালাইয়াছিল। বর্তমান থাই জাতির মধ্যে পণ্ডিতগণের মতে কম্বোডিয়ার প্রাচীন ক্মের, কুই, "হিন্দু" এবং মালয় জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। কাম্বোডিয়ার প্রাচীন ক্মের জাতি ব্রহ্মের প্রাচীনতম অধিবাসী মন ক্মের জাতির সম্পর্কিত। কুই জাতির বাস দক্ষিণ-পূর্ব থাইল্যাণ্ড ও উত্তর-পূর্ব কম্বোডিয়ায় মালয় সংমিশ্রণ আসিয়াছে থাইল্যাণ্ডের অধীন মালয় উপদ্বীপের উত্তরাংশের মালয়ী অধিবাসী হইতে। থাইদিগের মধ্যে যে "হিন্দু" সংমিশ্রণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কম্বোজের ও আনামী উপকূলের চম্পা রাজ্যের হিন্দু ঔপনিবেশিকদিগের কথা মনে রাখিয়া বলা হইয়াছে। এখানে "হিন্দু" কথার অর্থ ভারতবর্ষীয়। সিংকিয়াংয়ের সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি ও মোঙ্গল, তুর্ক প্রভৃতি গোষ্ঠীর অধিকৃত অঞ্চল অতিক্রম করিয়া মহাচীনে প্রবেশ করিবার দ্বারপ্রান্তে টেন-হুয়াংয়ের বৌদ্ধ মন্দিরে ভারতীয় মুখাকৃতিবিশিষ্ট চৈনিক ভিক্ষুকে দেখিয়া স্যর অরেল ষ্টাইন বিস্মিত হইয়াছিলেন। থাইল্যাণ্ডে হঠাৎ-দৃষ্ট দুই-একটি ভারতীয় মুখাকৃতি হয়ত অনুসন্ধিৎসু বিদেশী পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আরও অনুসন্ধান করিয়া তিনি হয়ত জানিতে পারেন, থাইল্যাণ্ডের রাজগোষ্ঠী ও অভিজাত গোষ্ঠীয়দিগের নাম, ধর্মীয় ও সামাজিক বহু আচার-অনুষ্ঠান, দেবার্চনার মন্ত্র ও ভাষা ভারতবর্ষের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগের স্মৃতি বহন করিতেছে। থাইল্যাণ্ডে এই ভারতীয় প্রভাব আসিয়াছে প্রধানতঃ কাম্বোডিয়া হইতে।

ইন্দোচীনের লাওস (লুয়াং প্রবাং), আনাম, কাম্বোডিয়া, টংকিং ও কোচীন-চীন এই কয়েকটি রাজ্য বা অঞ্চলের মধ্যে টংসিং, আনামের উপকূল অঞ্চল ও কোচীন-চীনে আনামী জাতির বাস। আনামীদিগের মধ্যে চীন ও তিব্বতী গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ প্রবল। দক্ষিণ-আনাম, কোচীন-চীনের বারিয়া ও কাম্বোডিয়ায় চিয়াম জাতিকে দেখিতে পাওয়া যায়; ডাঃ হেডনের মতে ইহাদিগের নাসিকা প্রায় তীক্ষ্ণ, চোখের পাতার উপরে চামড়ায় ভাঁজ নাই, চুল কুঞ্চিত বা ঢেউ খেলানো ও গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই চিয়াম জাতি চম্পার হিন্দু ঔপনিবেশিকগণের বংশধর। বর্তমানে ফরাসী সরকারের অবহেলায় ও আনামীদিগের অত্যাচারের ফলে ইহারা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে ও ইহাদিগের সংখ্যাও যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। চিয়াম ছাড়া এই অঞ্চলে মালয়-গোষ্ঠীর জাতিকেও দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ক্মের জাতি কাম্বোজে প্রবেশ করিবার আগে হইতে চিয়াম জাতি সেখানে বাস করিত, অর্থাৎ তাহারা কাম্বোজের আদিবাসী। কাম্বোজের অধিবাসিগণের মধ্যে ক্মের ও মালয় ছাড়া কুই ও "হিন্দু" প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে। মোঙ্গলয়েড লক্ষণ-বর্জিত মানুষ এ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

লাওস বা লুয়াং প্রবাংয়ের অধিবাসীরা শান-থাই গোষ্ঠীভুক্ত। প্রাচীন কালে এই শান-থাই জাতির সম্প্রসারণের গতি ও বহু বিস্তৃত ক্ষেত্র (ইন্দোচীন হইতে আসাম) দৃষ্টে এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"The Thai race came very near being the dominant power in the Further East." (থাই জাতি ইন্দোচীন হইতে ব্রহ্ম পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল)।

মালয়

মালয় উপদ্বীপের উত্তরাংশের অধিবাসিগণের মধ্যে থাই বা শ্যায়ামী সংমিশ্রণ প্রবল। মধ্য-মালয়ের অরণ্যময় অঞ্চলে মালয়ের আদিবাসী নেগ্রিটো গোষ্ঠীভুক্ত সেমাংদিগের বাস। নেগ্রিটো গোষ্ঠীর সেমাং ছাড়া ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত শকাই ও জাকুনদিগকেও এই অঞ্চলে দেখা যায়। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানিগণের মতে শকাইদিগের সঙ্গে ভারতবর্ষের আদিবাসীদিগের সাদৃশ্য বর্তমান। তাঁহারা উভয়কে প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড

গোষ্ঠীভুক্ত বলেন। এই গোষ্ঠীর প্রি-ড্রাবিডিয়ান, পালী-মেডিটারেনীয়ান (Pre-Dravidian, Palae-Mediterranean) প্রভৃতি নামকরণ করা হইয়াছে। যাহাদিগকে প্রকৃত মালয়-গোষ্ঠীভুক্ত (Orang Malayn) বলা হয়, তাহাদিগের উৎপত্তি সুমাত্রার মেনাং কাবু অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র উপজাতি হইতে। অনুমান করা হয়, দক্ষিণী মোঙ্গলয়েড ও আদিবাসীর সংমিশ্রণে এবং অন্য কোন মোঙ্গলয়েড লক্ষণ-বর্জ্জিত গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে মালয়-গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছিল। এই শেষোক্ত গোষ্ঠীটি যে ভারতবর্ষীয়—কেহ কেহ এ কথা বলিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই উপজাতি শক্তিশালী হইয়া উঠে ও চা'রি দিকে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। ইহারা সামান্য পরিমাণে মোঙ্গলয়েড লক্ষণাক্রান্ত, গাত্রবর্ণ বাদামী বা উজ্জ্বল শ্যাম। মালয়ের প্রসিদ্ধ সিঙ্গাপুর বন্দর মেনাং কাবুর মালয়ী ঔপনিবেশিকগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইন্দোনেশিয়া

সুমাত্রা, বোর্ণিও, টিমোর, সেলিবিস প্রভৃতি অঞ্চলে নেগ্রিটো, মেলানিশিয়ান ও পলিনেশিয়ান বা অন্য গোষ্ঠীভুক্ত যে সকল উপজাতি বাস করে, তাহাদিগকে বাদ দিলে দেখা যায় যে, ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসিগণের মধ্যে কয়েকটি গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের কথা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসিগণের মধ্যে জাতি-সংমিশ্রণের প্রথম স্তর নেসিয়ট (Nesiot) গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী লম্বা মুণ্ড, সামান্য পরিমাণে মোঙ্গলয়েড লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু ডাঃ হেডনের মতে, "It is difficult to isolate this type as it has almost everywhere been mixed with a brachycephalic Xanthodermic stock." অর্থাৎ যেখানে এই গোষ্ঠীর উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায় সেখানেই দেখা যায় যে, একটি গোল মুণ্ড পীত গোষ্ঠীর সঙ্গে ইহার গভীর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই brachycephalic xanthodermic stock বা গোল মুণ্ড পীত গোষ্ঠীকেই সাউদার্ণ বা দক্ষিণী মোঙ্গলয়েড নাম দেওয়া হইয়াছে। এই গোষ্ঠীকে Oceanic Mongolo বা প্রোটো-মালয় নাম দিয়াছেন কেহ কেহ। সুমাত্রার এবং মালয় খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে ইন্দোনেশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। এই মালয়-গোষ্ঠী ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসিগণের মধ্যে জাতি-সংমিশ্রণের একটি প্রধান স্তর। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে চীন জাতি ইন্দোনেশিয়ায় অনুপ্রবেশ করিতে আরম্ভ করে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষ হইতে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ সুমাত্রা ও জাভায় আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজনৈতিক প্রভাব ও ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন।

দলে দলে ভারতবর্ষ হইতে ঔপনিবেশিকগণ পূর্ব-সমুদ্রে যে "দ্বীপময় ভারত" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেখানে যে সকল পরাক্রান্ত রাজ্য ও সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টি প্রচারের যে সকল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাদের খ্যাতি সমগ্র প্রাচ্য-জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় পনের শত বৎসর পরে ভারতীয় কীর্তির এই বিস্ময়কর সৌধ জরাজীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল

১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। যবদ্বীপের একদা পরাক্রান্ত মাজাপাহিত (Madjapahit) সাম্রাজ্যের পতন দ্বীপময় ভারতে ভারতীয়গণের রাজনৈতিক প্রভাবের অবসান ঘোষণা করিল।

ভারতীয়গণের রাজনৈতিক প্রভাব অবসানের উপলক্ষ ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের অভিযান। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই অভিযান আরম্ভ হয়। মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব হইতে আরব ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় উপলক্ষে এই অঞ্চলে যাতায়াত করিত, পরবর্তী কালে এই ব্যবসায়ীরা ধর্মপ্রচারকরূপে দেখা দিল। পণ্ডিতগণের মতে ইসলাম ধর্ম প্রচারের ফলে ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীদিগের মধ্যে নূতন কোন জাতি-সংমিশ্রণ ঘটে নাই। এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয়গণের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় সংগঠন ভাঙ্গিয়া পড়িবার আগে ভারতবর্ষে ইসলামধর্মী তুর্ক-আফগানদিগের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ ভারতবর্ষের কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী ?

ব্রহ্ম, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় কৃষ্টির সম্প্রসারণ ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের বিবরণ পরে দেওয়া হইবে, বর্তমান নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে একটি প্রশ্নের উল্লেখ করা আবশ্যক।

ইন্দোচীনের কাম্বোজ ও চম্পায় এবং ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় (পালেমবাং) ও যবদ্বীপে যাঁহারা পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, যাঁহারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, যাঁহারা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া দূরবর্তী দেশে ভারতীয় প্রতিভার বর্তিকা সহস্রাধিক বৎসর পর্যন্ত জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী? মাতৃভূমিকে স্মরণ করিয়া আপনাদিগের উপনিবেশগুলিকে যাঁহারা কাম্বোজ, তক্ষশিলা, গান্ধার, অযোধ্যা, হস্তিনা নগর, মাথুরা, শ্রীবিজয় প্রভৃতির নাম দিয়াছিলেন তাঁহারা বাস্তবিক ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের লোক? এই প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ নানা প্রকার থিওরীর অবতারণা করিয়াছেন। এই সকল থিওরীর আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই, সংক্ষেপে দুই-চারিটি কথা বলা হইতেছে।

যবদ্বীপের প্রাচীন কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে গুজরাত ও সিন্ধু দেশের নৌবাহিনীসমূহ ঔপনিবেশিকগণকে বহন করিয়া যবদ্বীপ ও কাম্বোজে লইয়া গিয়াছিল। মালবের শক ক্ষত্রপদিগের প্রেরণা ও উদ্যোগের কথাও এই প্রসঙ্গে উঠিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, যবদ্বীপের হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ যে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসী, গাঙ্গেয় উপত্যকার লোক নহেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সুমাত্রার হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ ভারতবর্ষের পূর্ব-উপকূল অঞ্চলের লোক, এইরূপ মত অনেকেই প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, বাংলা, ওড়িষ্যা ও মাদ্রাজের পূর্ব-উপকূলের অধিবাসীরা শুধু সুমাত্রা নহে, যবদ্বীপ ও কাম্বোজেও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ক্রফোর্ডের মতে যবদ্বীপের হিন্দু ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে বহুসংখ্যক কলিঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। কেহ বলিয়াছেন, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যে হিন্দু ঔপনিবেশিক দল কাম্বোডিয়ায় যাত্রা করেন, তাঁহারা বাংলার তমলুক বন্দর হইতে যাত্রা করেন। খৃষ্টীয় ৫ম হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে সিন্ধু দেশ ও গুজরাতের উপকূল হইতে এবং ওড়িষ্যা ও মসুলিপত্তন হইতে বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দল যাত্রা করেন। নানা প্রকার প্রমাণের উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই সকল হিন্দু ঔপনিবেশিক দলের মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার ও কাবুল উপত্যকার অধিবাসী ছিলেন। এক দল পণ্ডিতের মতে ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে, বিশেষতঃ কাম্বোডিয়ার হিন্দু ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে, বহুসংখ্যক শক, শ্বেত হূন ও ফিদারাইট (য়িয়ুচী) ছিল। [ক্রমশঃ।

অস্ত্রবাহী জীপ
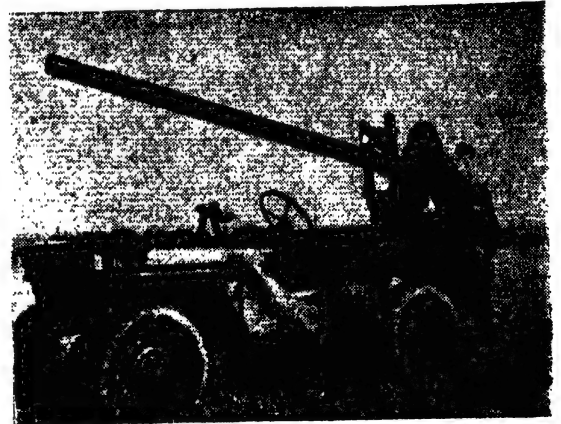
জীপ গাড়ী দেখেছেন? নিশ্চয়ই দেখেছেন, চড়েওছেন হয়তো। জীপ গাড়ীকে কি ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ছবিতে দেখুন। যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই হচ্ছে। জীপ গাড়ীতে অস্ত্র সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। ট্যাঙ্ক যায় ধীরে ধীরে, কিন্তু জীপ গাড়ী দৌড়বে অতি দ্রুতগতিতে। জীপ যাবে যত্র-তত্র, খাল-বিল-নদী-নালায়। যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রবাহী গাড়ী জীপ হয়ে দাঁড়িয়েছে অপরিহার্য্য।

৺মনোমোহন ঘোষ

[মামলাটি যেন সত্যিকার উপন্যাস। পল্লী-বাংলার মামলাটি পড়তে পড়তে মনে হয় বুঝি বা গল্প পড়ছি। কিন্তু একটি কচি মেয়ের মৃত্যুতে দুঃখে ও শোকে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে মন। তবুও সত্যি ঘটনা এবং বাঙলা দেশেই 'নেকজান' মরেছে অপঘাতে। সামান্য চৌকীদার মুলুকচাঁদ। তাকে ঘিরে ৭০ বছর পূর্ব্বে যে মিথ্যা খুনী মামলার ফাঁদ পাতা হয়েছিল, তাই থেকে ভারতে ইংরেজ আমলের প্রথম যুগের কু-শাসনের একটা দিক প্রকট হয়ে উঠেছিল। সেকালের প্রসিদ্ধ কৌঁসুলী মনোমোহন ঘোষ গ্রন্থাকারে প্রকাশ ক'রেছিলেন মামলাটি মূল ইংরাজীতে। মামলা সম্বন্ধে, সুপ্রসিদ্ধ W. A. Hunter, L L. D., M. P. মন্তব্য করেছিলেন— ৯ বছরের কন্যাকে খুন করবার অভিযোগে জুরীরা একবাক্যে দোষী সাব্যস্ত করেছিল মুলুকচাঁদকে। ৭ বছরের এক ছোট্ট মেয়েই মামলার মুখ্য সাক্ষী। সে না কি খুন করতে চোখে দেখেছিল। "কমপিটিশন ওয়ালা" দায়রা জজ মিঃ পি ডি ডিকেন্স্ আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু ভারতে হাইকোর্টের অনুমোদন না পেলে দায়রা জজ মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন না। যাঁরা ডিকেন্সের বিচার শুনেছিলেন, তাঁদের ধারণা হয়েছিল বিচার ন্যায়সঙ্গত হয়নি। তাঁরা চাঁদা তুলে হাইকোর্টে কৌঁসুলি নিযুক্ত করেছিলেন। সুদীর্ঘ সওয়ালের পর মিঃ এম ঘোষ বিচারপতি দু'জনকে নিঃসংশয় করে পুনরায় বিচারের আদেশ করিয়ে নিয়েছিলেন। পুনর্বিচারে আসামী খালাস পেয়েছিল। প্রায় প্রমাণিত হয়েছিল, খুন হয়নি। কি ভাবে যে মেয়েটা মরল, তা প্রকাশ পেয়েছিল দ্বিতীয় বার বিচার শেষ হবার পর। এই মামলায় বাংলার মফঃস্বল আদালতের বিচার-পদ্ধতির যে পরিচয় পাওয়া গেছে, তা বেদনাদায়ক। দুর্নীতিপরায়ণ পুলিস মিথ্যা মামলা সাজাবার জন্য একটা শিশুকে পর্য্যন্ত হলফ করিয়ে পিতাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবার জন্য শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছে। মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে আর লোকেও আপত্তি করেনি। মামলার পুনর্বিচারে ময়না তদন্তকারী দেশী ডাক্তার ও আর তাঁর ইউরোপীয় উপরিওয়ালাকে জেরা করে জানা গিয়েছিল যে, মেয়েটির অঙ্গের ক্ষত মৃত্যুর পর করা হয়েছিল। কিন্তু মজার কথা এই যে, আদালতে চিকিৎসকদের সাক্ষ্য যে অবশ্য দিতে হয়, তদানীন্তন ভারতবর্ষে ঐ নিয়ম ছিল না। —অনুবাদক]

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম বিচারের নথিপত্র

নদীয়া দায়রা আদালত—১৬ই মে, ১৮৮২

(জজ—পি ডি ডিকেন্স্)

মহারাণী বনাম মুলুকচাঁদ চৌকিদার

বাংলা দেশের নদীয়া জেলায় বনগাঁর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এই মামলা দায়রা সোপর্দ্দ করিলে দায়রা আদালতে বিচার হয়।

ভিযোগ—১৮৮২, ২৭শে মার্চ্চ রাত্রিতে আসামী তাহার ৯ বৎসরের শু-কন্যা নেকজানকে হত্যা করে। উদ্দেশ্য—কদম আলি ফকীরকে থ্যা খুনী মামলায় জড়িত করা। জুরীরা আসামীকে অপরাধী ব্যস্ত করিলে জজ একমত হইয়া হাইকোর্টের সম্মতি সাপেক্ষে হাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। বিচারকালে জজ যে সকল

সাত বছরের মেয়ে গোলকমণির সাক্ষ্য

[জুরীদের ফোরম্যান প্রথম প্রশ্ন করিলে, মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতীর মত উত্তর দেয়। সে এ কথাও বলে, "মিথ্যে বলিলে পাপ হয়, সত্য বলা ভাল।"]

হাঁ, আমার দিদির কথা বেশ মনে আছে। নাম ছিল তার নেকজান। মরে গেছে। আমাদের দাওয়ার উপরেই মরেছে। রাতে। বাবা ?……হাঁ হাঁ, বাবাই তাকে খুন ক'রেছে।

ঐ ত বাবা (আসামীকে দেখিয়ে)। হাঁ, দেখেছি—নিজের চোখেই দেখেছি, বাবাই খুন করেছে। প্রথমে তার গলায় দিল পা, তার পর ? হাঁ, একটা শড়কি—শড়কিই ত, তাই বসিয়ে দিল এইখানটায় (পেটের নীচের দিক দেখিয়ে দিল)। দিদি কিন্তু কাঁদেনি। আমি জেগেই ছিলাম। কি যেন আমার গায়ে লাগল।

কেন ?" বাবা কিছু বললে না। ভয় হল। তখন ফরসা হয়েছে। এর পর বাবা আমায় বললে—'দারোগা এলে কিছু বলিস্ নে। মা ফিরে এলে তাকেও কিছু বলবি না।' আগের দিন সন্ধ্যায় মা গেছল, গোগায়। সে রাতে দিদি নেকজানই খেতে দিয়েছিল আমায়। পরদিন সকালে খেতে দিয়েছিল ধীরু নানি। সকাল বেলা ধীরুকে বললাম, মাকে বললাম, আর হারু নানিকে। খুব সকালে হারু নানি এসেছিল, তাকেই প্রথম বলি। তার পর এসেছিল ধীরু নানি, তাকেও বলি। মা যখন এল, তাকেও বলি।

বাবা দিদিকে যখন মারলে, তার পর আর ঘুমুইনি। এর পর বাবা চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল। আমিও কাঁদতে লাগলাম। দিদিকে মেরে ফেলে বাবা বেরিয়ে গেল, এল কিছুক্ষণ পরে। আমি যেখানে ছিলাম, সেখানেই থাকলাম। বাইরে গিয়ে পিসিকে ডাকব, সে কথা মনেই হয়নি।

এই সেই শড়কি—আমাদেরই শড়কি।

দিদিকে মেরে ফেলবার আগে যে বিছানায় দিদি শুয়েছিল, আমিও সেই বিছানায় শুয়েছিলাম, বাবাও শুয়েছিল সেই বিছানাতেই। হারুকে যখন প্রথম বলি, তখন বাড়ীতে আর কেউ ত ছিল না—আমিই ছিলাম। পরদিন বাবা আমায় মাঠে পাঠায়। দারোগাকে দিদির মরা পাঠিয়ে দিতে আমি দেখিনি। মরা নিয়ে যেতে আমি দেখিনি। খাওয়া-দাওয়ার পর ভোর বেলা আমায় মাঠে পাঠিয়ে দিয়েছিল বাবা।

বাবা দিদির চাইতে আমাকেই বেশী ভালবাসত। দিদিকেও মন্দ বাসত না।

ডাকলাম—দিদি কথা কইল না, দিদি সাড়া দিল না। টানলাম—দিদি নড়ল না। তখন বুঝলাম মরে গেছে।

জুরীদের প্রশ্নের উত্তরে—সকালে ফিরে এসেই বাবা কেঁদে উঠল।

আসামীর প্রশ্নের উত্তরে—কেউ ত আমায় শেখায়নি। সত্যি কথাই ত বলেছি।

[জজের মন্তব্য—এই ছোট্ট মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতীর মত সাক্ষ্য দিল। যে ভাবে সাক্ষ্য দিল তাহাতে আমার এ ধারণাই হইল যে, যে দৃশ্য সে বর্ণনা করিয়াছে তাহা সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, শেগান গল্প সে আবৃত্তি করিয়াছে বলিয়া মনে হইল না।]

স্বাঃ—পি, ডিকেন্‌স।

সাক্ষী নং দুই

অধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জবানবন্দী। বয়স প্রায় ৩৫। ১৮৮২, ১৬ই মে নদীয়ার দায়রা জজ পি, ডিকেন্‌স, এস্কোয়ার, আমার এজলাসে ১৮৭৩ সালের ১০ আইন অনুসারে সত্য পাঠ করে বলে—

আমার নাম অধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। পিতার নাম রামকুমার চক্রবর্ত্তী। জাতি ব্রাহ্মণ। বর্ত্তমান সাকিন মৌজা বনগাঁ। এখানে আমি বনগাঁ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত সিভিল হাসপাতালের এসিষ্টেণ্ট।

২১শে মার্চ্চ বুধবার অপরাহ্ণ ৪টায় কনেষ্টবল দ্বারিকার সনাক্ত মত মেকজান নামে এক বালিকার লাস আমি পরীক্ষা করেছিলাম।

লাসের মাথার চাঁদিতে পচন ধরেছিল, শরীরে পচন ধরেনি।

ময়না তদন্ত করে, রিপোর্ট দিয়েছি। এই সে রিপোর্ট [একজিবিট 'এ' মার্কা দিয়ে দাখিল করে পাঠ করা হল]

মুখ বন্ধ, জিভ বেরিয়ে এসেছে। তার মানে—জিভ বেরিয়েছিল তার উপর দাঁত চেপে বসেছিল। দমবন্ধে মৃত্যু সন্দেহ হয়নি, কাজেই কণ্ঠের চামড়ার নীচে চাপের দাগ ছিল কি না, তা পরীক্ষা করে দেখিনি।

উরুতে যে আঘাত ছিল তা মৃত্যু হবার পক্ষে যথেষ্ট। কাটার দুই দিক বন্ধ ছিল না—হাঁ করা ক্ষত। লাসের দিকে চাইলে যে কেউ ক্ষত দেখতে পেত। এই শড়কিখানি আমি দেখছি। যে ক্ষতের কথা বলেছি তা এ দিয়ে হতে পারে। শিশু খুব স্বাস্থ্যবতী ছিল না। তার যকৃত ছিল বড়।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে—কোমর পর্য্যন্ত শাড়ী ছিল। শাড়ীতে রক্ত ছিল না। ভিতরে ভিতরে রক্তক্ষরণ হয়েছে তার কোন চিহ্ন ছিল না। সাপে কামড়াবার চিহ্নও ছিল না।

স্বাঃ—পি, ডিকেন্‌স।

ময়না তদন্তের রিপোর্ট একজিবিট 'এ'

লাস পৌছে—১৮৮২, ২১ মার্চ্চ প্রাতে ১০টা

পরীক্ষা হয়— " " অপরাহ্ণ সাড়ে ৪টা

পুলিসের দেওয়া তথ্য—সর্প দংশনে মৃত্যু। মৃতের পিতা মৃত্যুর কারণ কিছু বলতে পারে না। এপিগ্যাষ্ট্রীক স্থানে এক আঙুল পরিমাণ তিন কোণ একটা কাটা ক্ষত।

দেহের অবস্থা—শীর্ণ।

ক্ষতের " —এপিগ্যাষ্ট্রীক স্থানের এক ইঞ্চ দীর্ঘ ও সিকি ইঞ্চ চওড়া ও প্রায় আধ ইঞ্চ গভীর কাটা ক্ষতের মত আঘাত। এই ক্ষত যকৃতের বাম অংশে সিকি ইঞ্চ গভীর ভাবে প্রবেশ করেছে। বাঁ গালে প্রায় ২ ইঞ্চ দীর্ঘ ও সিকি ইঞ্চ চওড়া এক আঁচড়ের দাগ।

ছড়া দাগ—নেই।

গলায় দড়ীর দাগ—নেই।

চাঁদি প্রায় পচে গেছে। খুলি ও ভাটিত্রে অবিকৃত।

মুখ বন্ধ। জিভ ফোলা, বড়, বেরিয়ে এসেছে। চক্ষু লাল। নাক দিয়ে ফেনার মত রক্ত বেরিয়েছে। আমার ধারণা, পেটের গভীর ক্ষতের ফলেই মৃত্যু হয়েছে।

স্বাঃ—এ, সি, চক্রবর্ত্তী,
সিভিল হাসপাতালের এসিষ্টাণ্ট,
বনগাঁ।

মৃত্যুর কারণ সম্ভবতঃ পেটের ক্ষত।

স্বাঃ—জে, ব্রাণ্ডার,
সিভিল সার্জ্জন।

সাক্ষী নং তিন

রামদাস সরকারের জবানবন্দী। বয়স প্রায় ৩০। সত্য পাঠ করে বলে—

আমার পিতার নাম জয়চাঁদ সরকার। কায়স্থ। সাকিন মৌজা সরসা। এখানে আমি পুলিসের হেড কনেষ্টবল।

আমি সরসা থানার ভারপ্রাপ্ত। গত ২৭ মার্চ্চ আমি চার্জ্জে ছিলাম। ২৮ মার্চ্চ, মঙ্গলবার, বিকাল প্রায় সাড়ে তিনটায় এই হত্যার খবর পাই।

আসামী সংবাদ দেয়। (আসামী এই মর্ম্মে সংবাদ দেয় যে,

সেদিন ভোর ৪টায় মাঠ থেকে ঘরে ফিরে সে দেখতে পায়, শিশু শয্যায় মরে আছে। কি করে মরল, তা সে বলতে পারে না) সে কোন লিখিত এতালা সঙ্গে আনেনি।

তার এজাহার আমি ঠিক ঠিক লিখে নেই! এ সেই এজাহার নয়।

(জজের মন্তব্য—প্রথম এজাহার মামলার নথিতে নাই। এজাহারে কি ছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ আমি মানতে পারি না)

আসামী এজাহার দিয়ে বাড়ী চলে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। ২১ মার্চ্চ প্রাতে সাড়ে ৭টায় গ্রামে পৌছি। এক শিশুর লাস দেখতে পাই আসামী মুলুকচাঁদের ঘরের দাওয়ায়। চিৎ হয়ে শুয়েছিল। পা দু'টো ভাঁজ করা বা উপরে টেনে উঠান ছিল না—টান হয়েছিল। হাত দু'টিও সোজা দু'পাশে পড়েছিল। মাদুরে কোন রক্তের দাগ দেখিনি!

এমন কোন চিহ্ন দেখলাম না, যাতে বুঝা যায় যে বারান্দা সদ্য লেপা হয়েছে।

ক্ষত দেখেছি। ক্ষতের মুখ বন্ধ ছিল না। আসামী সেখানেই ছিল, পঞ্চায়েৎ সেখানে ছিল, আসামীর স্ত্রী সেখানে ছিল। গোলক ছোকরীকে (বালিকা) দেখিনি। আসামী বলেছিল, কি করে মেয়ে মারা গেল বলতে পারি না। আসামীর স্ত্রী আমার কাছে কোন কথা বলেনি। এই ম্যাপ আমি তৈরী করি। ঠিক মাপ-জোখ করে আঁকা না হলেও মোটামুটি ম্যাপটি ঠিকই। সারা দিন (২৯শে) আমি গোলকমণিকে দেখতে পাইনি।

পরদিন থানায় ছিলাম। ২১শে তারিখ আমি তদন্তের কোন চেষ্টা করিনি। মাত্র আসামীর এজাহার লিখে নিয়েছিলাম। তার স্ত্রীর জবানবন্দী লিখে নেইনি। খুন সম্বন্ধে কোন কথাই সে আমায় বলেনি। ৩১শে মার্চ্চ তদন্তকারী ইনস্পেক্টরের সঙ্গে ফিরে এসে আমি ম্যাপ তৈরী করি।

জুরীদের প্রশ্নের উত্তরে—গ্রাম থেকে থানা ১ মাইল। ২১শে মার্চ্চ দ্বারিকের হেফাজতে লাস চালান দেই। প্রথম দিন যখন সেখানে যাই, শড়কি বা এই বগি (তরোয়াল) দেখিনি। সেদিন কোন হাতিয়ার সম্বন্ধে তদন্ত করিনি। এই ব্যাপার সম্বন্ধে আর কোন রিপোর্ট না করে আমি কেন গ্রাম থেকে চলে আসি, তা বলতে পারি না। ঐ দিন আমি এক লিখিত রিপোর্ট করি। রিপোর্টটি এই [একজিবিট 'গ']।

সরেজমিনের এই রিপোর্ট ক'রে অপরাধ সম্বন্ধে কোন তদন্ত না ক'রে আমি ফিরে আসি। ৩১শে তারিখ ইনস্পেক্টারের সঙ্গে গিয়ে আমি প্রথম তদন্ত আরম্ভ করি।

স্বাঃ—পি, ডিকেন্স্।

সাক্ষী নং চার

বরাতির জবানবন্দী। বয়স প্রায় ২৫। সত্য পাঠ করে বলে—

আমার বাবার নাম খোদা বক্স। জাতি মুসলমান। সাকিন মৌজা তুলাৎ। সেখানে সোয়ামীর কাছে থাকি। আসামী আমার সোয়ামী। আমার এক মেয়ে ছিল। নাম নেকজান। সে মরে গেছে। বয়স ছিল প্রায় আট। গোলকের চাইতে বড়। আড়াই বছরের এক ছেলেও আছে। যে রাতে নেকজান মরে, আমি বাড়ী ছিলাম না। গোগায় গেছলাম। সন্ধ্যায় সোয়ামী গোগায় পাঠিয়েছিল। দুপুর বেলা যেতে বলেছিল। সন্ধ্যায় সূর্য্য পাটে বসবার প্রায় এক দণ্ড (২৪ মিনিট) আগে রওনা হয়েছিলাম। ফকীর তার নামে যে মামলা করেছে তার খরচার জন্যে তার ভাই গোপালের কাছ থেকে টাকা আনতে আমায় বলেছিল। টাকা পাইনি। পরদিন প্রাতে প্রায় চার দণ্ড বেলায়, গরু যখন মাঠে নিয়ে যায়, সে সময় ফিরে আসি। কান্নার শব্দ কানে যায়। আমার মেয়ে গোলক কাঁদছিল। আমার স্বামীও কাঁদছিল। বারান্দার উপর পড়েছিল নেকজান। পেটের ঠিক উপরে একটা গর্ত্ত দেখতে পেলাম। সেখান দিয়ে রক্ত পড়ছিল না। শুকনো। আসামীকে জিজ্ঞেস করলাম—'কি করে হল?' বললে—"পেঁয়াজ ক্ষেত দেখতে গেছলাম, কি করে হল বলতে পারি না।" বললাম—"কারু সঙ্গে ত আমার ঝগড়াঝাটি নেই, কে এ কাজ করল? তুমিই করেছ, আর কেউ না।" এ কথা আমি ঠিকই বলেছি—"এই জন্যেই কি আমায় গোগায় পাঠিয়েছিলে?" সে বললে—"কি করে এখন বাঁচা যায় তাই ভাব।" ছোট মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম। সে বললে, তার বাবা মেয়ের গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলেছে, তার পর শড়কি বসিয়ে দিয়েছে।

মেয়ের কথায় বিশ্বাস হল। সোয়ামীকে বললাম—"এ হাতে তোমায় আর ভাত দেব না।" উত্তরে সে বলল—"তোমার হাতে ভাত আমার আর খেতে হবে না।" এর পর তাকে আর ভাত রেঁধে দেইনি। তখন শড়কিখানা লক্ষ্য করিনি। [শড়কি দেখান হলে] এ আমার সোয়ামীর। তার মাত্র একখানিই শড়কি। এই বগিও তার। এগুলো দাওয়ার চালে রাখা হত। দারোগা এসেছিল পরের দিন। দারোগাকে আমি দেখিনি। সে আমায় কোন কথা জিজ্ঞেস করেনি। সে যখন বাড়ী আসে, এক দাওয়ার লাস ছিল, আমি ছিলাম অন্য দাওয়ায়। দারোগার কাছে আমার ডাক হয়নি। সেদিন দারোগা আমায় কোন কথা জিজ্ঞেস করেনি। অন্য দারোগা দুই দিন পরে আমায় প্রথম জিজ্ঞাসাবাদ করে। আদালতে যা বললাম, তাকে তাই বলেছিলাম।

প্রথম দিনে কেন আমি দারোগাকে সোয়ামীর বিরুদ্ধে কিছু বলিনি তা বলতে পারব না। ভয়ে নয়। আমার ছেলেপিলে আছে। খুন আমি নিজের চোখে দেখিনি। আমায় এ সম্বন্ধে কেউ জিজ্ঞাসাও করেনি।

ছোট দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমি গোগায় গেছলাম, ছোটটা কোলের। বড়টা কাঁদতে লাগল। একা ফেলে রেখে যেতে ত পারি নে।

সোয়ামীর নামে একটা মামলা চলছিল। ফকীর মামলা এনেছিল। সে বাদী। মামলা তার বৌকে নিয়ে।

জুরীর প্রশ্নের উত্তরে—এর আগে সোয়ামীর সঙ্গে আমার সদ্ভাব ছিল, সে আমায় যত্ন-আত্তি করত।

[জজের মন্তব্য—স্বচ্ছন্দে জবানবন্দী দিল। স্বামীর বিরুদ্ধে কোন কিছু প্রমাণ করিবার ইচ্ছা বা তাহার প্রতি শত্রুতাচরণের কোন মনোভাব প্রকাশ পাইল না]

১৬ই মে, ১৮৮২　　স্বাঃ—পি, ডিকেন্স্।

সাক্ষী নং পাঁচ

হারুর জবানবন্দী। বয়স ৪০ বৎসর—ছেলের কাছে থাকি। স্বামী এই সেদিন মারা গেছে। এক সকালের কথা মনে আছে, এক মঙ্গলবারের সকাল। প্রায় দুই মাস হল। নেকজানের মরার কথা শুনেছিলাম। আসামীর বাড়ী থেকে আমার বাড়ী প্রায় ২।৩ রশি (৮০ বা ১২০ গজ) দূরে। ঐ ত মুলুকচাঁদ, নেকজানের বাবা। সেদিন প্রাতে তার বাড়ী গিয়ে দেখি সে কাঁদছে, আর তার ছোট মেয়ে গোলকও কাঁদছে। তখন বেশ আলো ফুটেছে, কিন্তু সূর্য্য তখনও ওঠেনি। কান্নার চীৎকার শুনিনি, মাত্র ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। মুলুকচাঁদ দাওয়ায় বসে, আর বসে তার ছোট মেয়ে। আর দাওয়ায় পড়ে নেকজান। দাওয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে নেকজানকে দেখলাম। ধাপ দিয়ে উপরে উঠিনি।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে—নেকজান চিৎ হয়ে পড়েছিল। হাত-পা গুটান ছিল না, টান করা ছিল। গোলককে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে রে! সে বলল—'বাবা ওর গলায় পা দিয়ে শড়কি মেরেছে।' আমার কচি কান্না জুড়ে দিতেই চলে যেতে হল। কচিকে বাড়ী রেখে এসেছিলাম। মুলুকচাঁদকে কোন কথা জিজ্ঞেস করিনি। দেখেছিলাম, মরা মেয়েটার পেটের উপর ক্ষত। রক্ত দেখিনি। গোলক যখন এ কথা আমায় বলল, তার বাবা উঠে দাঁড়িয়ে তাকে ধমক দিয়ে বলল—"যদি এ কথা বলিস, তোরও গলায় পা দিব।" তার পর চলে এলাম। পরদিন দারোগা এল দেখেছি। সেদিন তাকে কিছু বলিনি, বলেছি দু'দিন বাদে।

[জজের মন্তব্য—প্রমাণ বিধির ১৫৭ ধারা অনুসারে এই জবানবন্দী গ্রাহ্য করিলাম]

সাক্ষী নং ছয়

ধীরুর জবানবন্দী। বয়স প্রায় চল্লিশ। ১৬ই মে তারিখে সত্য পাঠ করে বলে—

বাবার নাম খোদাবক্স। জাতি মুসলমান। সাকিম মৌজা ভুলাৎ। সেখানে স্বামীর কাছেই থাকি।

নেকজানকে জানতাম। আসামী মুলুকচাঁদ তার বাবা। আমার বাড়ী তার বাড়ী থেকে এক রশি (৪০ গজ)। তার মরার কথা মনে আছে। দু'মাস আগের কথা। ভোর বেলা শুনি মুলুকচাঁদ কাঁদছে। সেখানে যাই। মরা মেয়ের কাছে গোলক বসে। দাওয়ায় নেকজানের লাস পড়ে। খুব নজর দিয়ে দেখিনি। ছোট্ট মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করতেই তখন সে কিছু বললে না। মুলুকচাঁদও তখন কিছু বললে না। বাড়ী ফিরে এলাম। একটু পরে ছোট মেয়েটিকে ডেকে বললাম, খাবি আয়। সূর্য্যি উঠবার এক প্রহর পরে (বেলা ৯টা) মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম—দিদির কাছে শুয়েছিলি? কি করে মরল? সে বললে, 'বাবা তার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলেছে।' তখন সে শড়কির কথা বলেনি। ওর বাবার উপর সন্দেহ হল। মেয়ের মা তখন ঘরে ছিল না। নাইবার বেলা সে এল। সেদিন কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করিনি। সেদিন আর ও-বাড়ীর কাছেও যাইনি। আর কিছু জানি নে।

জুরীর প্রশ্নের উত্তরে—ওর বাবা কেন এ কাজ করল বলতে পারি না। এর আগে ত সে মেয়েকে আদর-যত্নই করত।

স্বাঃ—পি, ডিকেন্‌স।

সাক্ষী নং সাত

উমাচরণ সরকারের জবানবন্দী। বয়স প্রায় ৪৫ বছর। ১৮৮২, ১৬ই মে নদীয়ার দায়রা জজ পি, ডিকেন্‌স্, আমার এজলাসে ১৮৭৩এর দশ আইন অনুসারে সত্য পাঠ ও হলফ গ্রহণ করিয়া বলে—

আমার নাম উমাচরণ সরকার। পিতার নাম বংশীধর সরকার। জাতি কপালি। সাকিন মৌজা ভুলাৎ। আমি পঞ্চায়েৎ ও চাষী।

আসামীকে জানি। আমার গ্রামের সে চৌকিদার। তার মেয়ে নেকজানকে চিনি। গত ১৬ চৈত্র (২৮ মার্চ্চ) উমেশ গাজীর কাছে কিছু খবর পেয়ে আমি আসামীর বাড়ী যাই। সে ঘরে ছিল। সূর্য্য উঠতে ৪ দণ্ড বাকী থাকতে থাকতে (বেলা ৭টা) ওর ঘরে যাই। দেখি বারান্দায় নেকজানের লাস, কাপড় দিয়ে ঢাকা। কাপড়ে বা চ্যাটাইয়ে রক্ত দেখিনি। দাওয়ায় উঠিনি। বাইরে থেকে দেখেছি। পেটের উপর বুকে জখম দেখে মুলুকচাঁদকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, কে জখম করেছে বলতে পারে না। বারান্দা থেকে ৫।৭ হাত (৩।৪ গজ) তফাৎ রাস্তার উপর এই শড়কিখানি পড়েছিল। বারান্দা থেকে ৪ বিঘা (১৬০ গজ) তফাৎ এক কামারশালের কাছে এই বগিখানি পড়ে থাকতে দেখেছি। জিজ্ঞেস করলাম, শড়কী আর বগি পড়ে কেন? সে বললে—জানি না। সে বলল, দুই-ই তার। বললাম—ওগুলো যেখানে যেমন আছে থাক, থানায় যাও, গিয়ে পুলিসে খবর দিয়ে এস। কোন লিখিত এতালা তাকে দেইনি। বলেছিলাম লিখে দেবে, কিন্তু এতালা আমার কাছ থেকে না নিয়েই গেছল। যখন ওদের বাড়ী যাই তখন গোলক বা তার মাকে দেখিনি। তখন কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। হাতিয়ারগুলো পড়ে থাকতে দেখে আসামীর উপর কতকটা সন্দেহ হয়েছিল। সে বলেছিল, নিশ্চয় মেয়েকে সাপে কামড়ে মেরেছে।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে—আমি ক্ষত দেখবার পর এ কথা বলেছি।

স্বাঃ—পি, ডিকেন্‌স!

পুনঃ জবানবন্দীতে বলে—ফকীর নামে যে লোকটা আসামীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা এনেছে, সে একই গ্রামে বাস করে।

স্বাঃ—পি, ডিকেন্‌স,
দায়রা জজ।

[ক্রমশঃ

অনুবাদক—তারানাথ রায়।

ইহলীলা

সুনীল ঘোষ

বিয়ের পর এক বছরের মধ্যে তিন বার অসুখে পড়ল যূথিকা। বেশ জটিল অসুখ। প্রথমে কয়েক দিন ধরে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। তার পর হঠাৎ এক দিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে। জ্ঞান ফিরে আসতে বেশ সময় লাগে। পরের ক'দিন কাটে অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায়। শেষে দেখা দেয় প্রচণ্ড দৈহিক দুর্বলতা। বিছানা ছেড়ে স্বাভাবিক কাজ-কর্মে লাগতে প্রায় মাস খানেক কেটে যায়।

শেষের বার ডাক্তার বললেন—লো ব্লাডপ্রেসার। মনটাকে সব সময় হাসি-খুশী, ভারমুক্ত রাখার প্রয়োজন।

ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে রুগ্ন স্ত্রীর শিয়রে বসে তার গুচ্ছ-গুচ্ছ রুক্ষ কোকড়ানো ঘন চুলে আঙুল দিয়ে বিলি কাটে বিনয়। যূথিকা চোখ বুজে অসাড় হয়ে পড়ে আছে। গায়ের কাপড়টা কখন সরে গেছে খেয়ালই নেই। কালো ব্লাউসের উপর সুতোয় বোনা শাদা পদ্মফুলটা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ওঠা-নামা করছে। চোখে-মুখে বেদনার বিষণ্ণতা। অসহায় বাঁ হাতখানা বিছানার বাইরে এসে পড়ে আছে স্থির হয়ে। রক্তহীন ফ্যাকাশে আঙুল-গুলো অচঞ্চল। আঙটির লাল পাথরটা ঘরের ম্লান আলোয় জ্বল-জ্বল্ করছে। তারই দেওয়া আঙটি—প্রথম প্রেমের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। আঙটির পেছনের পাঁচ বছরের ইতিহাসটা হঠাৎ বড়ো বেদনার মতো বেজে ওঠে বিনয়ের প্রাণে।

চোখে জল এসে পড়বার আগেই যূথিকার আঙটিশুদ্ধ হাতটা নিজের মুঠির মধ্যে ভরে ফেলে বিনয়। যূথিকার ভারী দু'টি চোখের পাতায় চাঞ্চল্য নামে।

—"কি বলল ডাক্তার?"—যূথিকার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মত শোনায়।

একটু ইতস্তত করে বিনয় বলে, "দিন-রাত মন খারাপ করে করে অসুখ ধরেছে। ভাবনা-চিন্তা একদম ছেড়ে দিতে বলেছে।"

যূথিকার পাণ্ডুর অধরোষ্ঠে একটা ক্লিষ্ট হাসি উঁকি মারে। নিজেকে পরিহাস করার হাসি। বুঝতে একটুও বেগ পেতে হয় না বিনয়কে। এ সংসারে তাদের অবস্থান অনেকটা অবাঞ্ছিত অতিথির মত। ছেলে-ভোলানো-মেয়ে ছেলের অভিভাবকদের ভোলাতে পারেনি। এ বাড়ীতে তার সম্বন্ধে কারও উৎসাহও নেই, আগ্রহও নেই। ছেলে যাকে প্রেমে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করে এনেছে নিজের ইচ্ছায়, তার সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করার কারণ খুঁজে পান না বাড়ীর লোকেরা। যূথিকা বিনয়ের বউ এই পর্যন্ত, পরিবারের বধূ হয়ে উঠতে পারেনি। অবশ্য বিনয় বোঝে ওটা আসল কারণ নয়। বিয়েতে বাড়ীর লোকের অনিচ্ছা থাকলেও অসম্মতি ছিল না। প্রেমটা বিয়ের পরে না হয়ে আগে হয়েছে বলে তো আর কোন সামাজিক আচার-বিচার ওলট-পালট হয়ে যায়নি, শুধু দেনা-পাওনার ব্যাপারটায় ব্যবসাদারী জমতে পায়নি। সেটা বাড়ীর লোকের এত বেশী নিস্পৃহ এবং শীতল হবার কারণ হতে পারে না। আসল কারণ বিনয়ের অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা। সংসার তার কাছ থেকে যতটুকু অর্থনৈতিক সাহায্য আশা করে, ততটুকু করবার সাধ্য তার নেই। এই মুখ্য কারণটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে কুৎসিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করে নানা অজুহাতে। তাই মুহূর্তে-মুহূর্তে এত অসন্তোষ আর অর্থপূর্ণ নীরবতা। এ ব্যাপারে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দায়ী করতে পারে না বিনয়। নিজের অক্ষমতার বোঝা কার ঘাড়েই বা চাপাবে? এমন পরিবেশে যূথিকার পক্ষে মনটাকে ভারমুক্ত রাখা সম্ভব নয়। সেটুকু বোঝবার ক্ষমতা বিনয়েরও আছে।

যূথিকার বাবা মোটামুটি অবস্থাপন্ন লোক। বিনয়ের মত একটা ভবিষ্যৎহীন কেরাণীকে বিয়ে করে মেয়ের কেরিয়ারটা নষ্ট হোক—এ তিনি কোন কালেই চাননি কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়েরা যখন অবুঝ হয়ে ওঠে, তখন তাদের বাপেরা অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর কি করতে পারেন?

বাবার কাছে যেতে চায় না যূথিকা। সে হবে ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনোনে পড়ার মতো। অবজ্ঞা-অবহেলা গা-সওয়া হয়ে এসেছে, কৃপা আর অনুগ্রহ সহ্য হবে না।

স্বামীর মুঠির মধ্যে যূথিকার বাঁ হাতটা গরম হয়ে ওঠে। চোখ মেলে চাইতেই চোখাচোখি হয়ে যায়। এতক্ষণ ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল বিনয়। বিষাদের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। ছলছলিয়ে উঠেছে দু'টি চোখ। এখনই কেঁদে ফেলতে পারে।

মুখে একটা সান্ত্বনার হাসি টেনে আনবার চেষ্টা করে যূথিকা।

—"বার বার খালি অসুখ অসুখ আর অসুখ। সত্যি ভারি লজ্জা করে আমার। শুধু অশান্তিই বাড়াচ্ছি।"

এক ফোঁটা অশ্রু যূথিকার ঠোঁটের কোণাটাকে উষ্ণ করে তোলে। পুরুষের চোখের জলও লোনা।

—"লজ্জা তোমার নয় যূথিকা, লজ্জা আমার। আমাকে বিয়ে করে তোমার জীবনটাই নষ্ট হল···"

কাঁদলে ওর গলাটা মেয়েলী-মেয়েলী শোনায়। যূথিকার ঝিমিয়ে-পড়া শিরাগুলো আরও অবশ হয়ে আসতে থাকে। আবার যেন অজ্ঞান হয়ে পড়বে ও। কথা বলবার শক্তি নেই। মাথাটা বালিস থেকে সরিয়ে স্বামীর কোলের উপর রাখে সে।

সহজ হয়ে ওঠে বিনয়।

—"এবার অসুখ সারলে···

—"কি করবে?"—যূথিকা হাসিমুখে উৎসুক নয়নে তাকায় স্বামীর মুখের দিকে। ওর চোখে-মুখে কৌতুকের রঙিন আভা ফুটে ওঠে।

—"চলে যাব যেদিকে দু'চোখ চায়।" তার কথা বলার বে-পরোয়া ভঙ্গির মধ্যে নির্মম হতাশা প্রকাশ পায়।

যূথিকার হাসি পায়। রাত্রে গায়ে হাত দিয়ে না শুলে যে মানুষের গা ছমছম করে, তার নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্কল্প হাস্যকর মনে হয় তার কাছে। হাসতে গিয়ে নিজের চোখেই জল ভরে ওঠে।

—"এবার আমি আলাদা বাসা করে থাকব। আধপেটা খেয়ে থাকতে হয় সেও ভাল। মরতে হয় শান্তিতেই মরব। এ অশান্তি আর ভাল লাগে না।"

এ কথা অনেক বার মনে হয়েছে যূথিকার। মুখ ফুটে বলতে পারেনি। যে রকম নার্ভাস বিনয়। পৃথক্ হয়ে সংসার পাতবার সাহসই পাবে না হয়ত। কি রকম যেন নাবালক নাবালক ভাব। উল্টে হয়ত তাকেই স্বার্থপর মেয়ে ভেবে বসে থাকবে। শেষে আবার সংসার ভাঙবার দায়টাও তার ঘাড়েই এসে চাপাবে। আজ অত্যন্ত

অপ্রত্যাশিত ভাবে তার মুখেই প্রস্তাবটা শুনে বুকটা যুথিকার চঞ্চল হয়ে উঠে। নিজেকে সামলাতে পারে না।

—"তাই করো গো, তাই করো। অসুখটা সেরে গেলে আমিও চাকরী করব। দু'জনে মিলে দু'জনের সংসার বেশ চালাতে পারব। তোমার কোন ভাবনা নেই গো। এ বাড়ীর আবহাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার।"

মাস দেড়েক বাদে সত্যিই তারা নতুন বাসায় উঠে যায়। বাড়ীর লোকের কাছে এ যেন একেবারে জানা কথা ছিল। যে মেয়ে বিয়ের আগে পুরুষের মন ভুলিয়ে বশ করে, সে তো ভাঙার প্রতীক। কাজেই ওদের পৃথক্ হওয়াটাও একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এ নিয়ে মুখর বা চঞ্চল হবার কিছু নেই। যা ঘটবার তাই ঘটেছে।

বিনয়ের বাবা সুরেশ বাবু রাসভারী গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। বলেন, "এ তো আমি আগেই জানতাম খোকা। নিজে সখ করে বিয়ে করেছিলে, তখনও আপত্তি করিনি, এখনও করব না। আপত্তি করলেই বা শোনে কে? ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে গেলে তাদের কাছে বাপের কথার কোন মূল্য আছে?"

নতুন বাসা অর্থাৎ প্রকাণ্ড বাড়ীটার দোতলার একখানা ঘর। দু'টো সুটকেস আর ট্রাঙ্কটা রাখতেই ঘরের বড় অংশটা ভরে গেল। এর পর তক্তাপোষ বসালে চলা-ফেরা করাই দুষ্কর হবে। যুথিকা বলে, "থাক, আর তক্তাপোষ এনে কাজ নেই। মাটিতে বিছানা পেতেই শোয়া যাবে।"

রান্না-ঘর নেই। বারান্দার কোণায় তোলা উনুনে রান্না সেরে নিতে হবে।

বাড়ীর প্রত্যেকটি কামরায়ই একটি করে পরিবার থাকে। ভোর থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কান্নাকাটি হাসাহাসি হৈ-হল্লোড় লেগেই আছে। এমনি হেটুরে আবহাওয়ায় বাস করেনি কখনও যুথিকা, তবু পৃথক্ বাসা করে নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর সমস্ত ব্যাপারটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর লাগে। বিনয়কে রেশনের চাল ঘাড়ে করে ঘামতে ঘামতে বাড়ী ঢুকতে দেখলে একটা সকরুণ তৃপ্তিতে সমস্ত শিরাগুলো শিথিল হয়ে আসতে থাকে। ইচ্ছে করে ওর গলা জড়িয়ে ঘাম-ঝরা কপালের উপর একটা চুমু খায়—ঘাড়ে গাল রেখে চোখ বুজে নিবিড় ভাবে অনুভব করে ওর দেহ-স্পন্দন। এই তো ভালবাসা। প্রিয়তমের সঙ্গে নিজের অস্তিত্বকে মিশিয়ে দিয়ে একটা কিছু গড়ে তোলা দ্বৈতভাবে। মহাসৃষ্টির পথে নবীন যাত্রী তারা। এক দিন তার দেহের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে একটি নূতন প্রাণ। তারই শরীরের অণু-পরমাণু দিয়ে গড়া একটি জীবন্ত মানুষ জন্ম নেবে এই পৃথিবীতে—একেবারে তার নিজস্ব সৃষ্টি। সম্ভাবনার প্রচণ্ড আবেগে থর-থর করে কাঁপতে থাকে যুথিকা। একটা অনাস্বাদিত মধুর চেতনার আবেশে উদাস হয়ে পড়ে। সে কি অন্তঃস্বত্বা?

কাজের অন্ত নেই তার। সকালে ঘর মোছা থেকে সুরু করে রাত্রে শোবার আগে বিছানা পাতা পর্যন্ত কত অসংখ্য কাজ। ঝি-চাকর রাখবার সামর্থ তাদের নেই। বিনয় জানে যুথিকা এ সব কাজে কোন দিনই অভ্যস্ত ছিল না, তবুও কি নিখুঁত পরিচ্ছন্নতায় সংসারের খুঁটিনাটি কাজ করে ও। নরম দু'টি শুভ্র হাত দিয়ে বাসনের উপর ও যখন ছাই ঘসে, তখন বিনয়ের মনটা ব্যথায় টন্‌টন্ করে ওঠে। কলেজে পড়বার সময় খুব সৌখীন মেয়ে ছিল যুথিকা। ওর সাজ-গোজ, চাল-চলন, আলাপ-ব্যবহারের ষ্টাইল ছিল অন্য মেয়েদের অনুকরণীয়। কত বৈচিত্র্য ছিল ওর কুমারী-জীবনে—কত স্তাবক, প্রেমিক, উৎসব, আনন্দ! কিছুই অজানা নয় বিনয়ের কাছে। নিজেকে তার সব সময় অপরাধী মনে হয়।

মাসের শেষ সপ্তাহে টাকার টানাটানি পড়ে। যুথিকাকে না জানিয়ে ধার করে চালায় বিনয় কিন্তু যুথিকা বোকা নয়। বুঝতে বাকী থাকে না তার কিছুই। বলে, "কি দরকার ছিল ধার-দেনার? আমার হারটা বেচে দিলেই হত। হারের প্যাটার্ণটা বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে। তাছাড়া জীবনের দাবী সর্বাগ্রে, সাজ-সজ্জার নয়।"

এক দিন বিকেলে বাড়ী ফিরে বিনয় দেখে যুথিকা বিছানায় পড়ে আছে অসাড় হয়ে। পাশের ঘরের মহিলারা তাকে ঘিরে রয়েছেন।

কি ব্যাপার?

"গা ধুতে গিয়ে কলতলায় পড়ে গিয়েছিল। সেই থেকে অজ্ঞান হয়ে আছে। ডাক্তার ডেকে আনুন।"—এক জন মহিলা সংক্ষেপে জানান ঘটনাটা।

"গা ধুতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল? কতক্ষণ আগে?"

"তা প্রায় ঘণ্টাখানেক হবে।"

ডাক্তার বললেন, "আবার সেই ব্লাডপ্রেসারের ষ্ট্রোক। খুব সাবধান মশাই। আপনার স্ত্রী তো আবার দেখছি প্রেগনাণ্ট।"

রাত্রে ঘুমন্ত স্ত্রীর পাশে শুয়ে ঘুম আসতে চায় না বিনয়ের। একটা ভয়ানক রকমের অক্ষমতা চেপে বসেছে তাকে। মাথার শিরাগুলো দপ্‌দপ্ করতে থাকে। তারা যেন কারও হাতের পুতুল। কোন অদৃশ্য শক্তির নির্দেশে কোন সুনির্দিষ্ট মৃত্যুর পথে যাত্রা। জীবন আর ভালবাসা যেন পৃথক্ দু'টি সত্তা। জীবন চলে নিজের নিয়ম-কানুনে—নির্মম তার বিধান। শুধু ভালবাসার পুঁজি নিয়ে জীবনের হাটে কোন কারবার, কেনা-বেচা চলে না। আরও কিছু দরকার আরও কিছু চাই। নিছক ভালবাসা দিয়ে জীবনে কাউকে সুখী করা যায় না। মনে হয়, মস্ত ভুল করেছে সে যুথিকাকে বিয়ে করে। সুন্দর একটা ফুলের কুঁড়িকে গাছ থেকে ছিঁড়ে এনে কোটের শোভা-বর্দ্ধনের পর অকালে নষ্ট করে ফেলার মত অপরাধময় ভুল। ভালবাসার নিয়ম-কানুন বড়ো অযৌক্তিক, বে-হিসাবী, বড়ো মারাত্মক। বেদনায় ভারী হয়ে ওঠে বিনয়ের বুকটা।

যুথিকার একটা হাত তার বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে পড়ে আছে নিশ্চল হয়ে। পাশ ফেরার সময় সেটাকে আলগোছে সরিয়ে দিতে গিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে ফেলে যুথিকার।

"কি গো ডাকছ আমায়?"—ছোট্ট খুকুর মত আদুরে গলা যুথিকার। ঘুমের স্পর্শে ঈষৎ ভাবালু, স্বপ্নাবেশময়।

"কই, না তো।"

"তোমার বুঝি ঘুম আসছে না ?"—যুথিকা আরও নিবিড় ভাবে কাছে সরে আসে। দুই হাতে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ ঘষতে থাকে।

"কি যুথিকা, অস্বস্তি লাগছে বুঝি ?"

"একটুও না। খু-উ-ব ভাল লাগছে।"

যুথিকার মাথার চুলে মুখ গুঁজে দেহের প্রতি বিন্দু দিয়ে তার নরম বেপথু দেহের উষ্ণতা অনুভব করে বিনয়।

"তুমি রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি···এ তো হবেই।"

কি হবে ভেবে পায় না বিনয়—"কি হবেই, যুথিকা ?"

যুথিকা ইতস্তত করে জবাব দেয়, "ওই যা ভেবে মন খারাপ হয়েছে তোমার···ডাক্তার যা বলেছে···"

এবার বুঝতে পারে বিনয়। হাসি পায়। তার সম্বন্ধে যুথিকার অনেক ধারণাই অদ্ভুত।

"তুমি একদম ছেলেমানুষ। আমি ওসব ভাবিইনি।" নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধা যুথিকার পিঠে একটু চাপ দিয়ে আদর করে বিনয়। চুলের মধ্যে চুমু দেয় একটা।

"আমি কিন্তু সন্ধ্যা থেকেই ভাবছি। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

"কি ভাবছিলে ?"

"ভাবছিলাম ?"—লজ্জায় সরস হয়ে ওঠে ওর কণ্ঠস্বর, "ভাবছিলাম কি রকম হবে বাচ্চুটা···ওকে খুব ভাল করে মানুষ করতে হবে, বুঝলে ? দুঃখ-কষ্ট যা-কিছু সব যাক আমাদের উপর দিয়ে। ওরা যেন সুখী হতে পারে—আমাদের ছেলে-মেয়েরা···"

কল্পনায় বাহাদুরী আছে যুথিকার। নতুন সম্ভাবনায় ভরে আছে ওর মন। মেয়েরা অদ্ভুত আশাবাদী। বিনয়ের মনটাও অনেক হাল্কা হয়ে যায়।

"তুমি অমন মন খারাপ করে থেকো না। শরীরটা একটু সারলেই চাকরী নিয়ে নেব। তত দিন আমার গহনাগুলো আছে। বাচ্চুর জন্য একটুও ভাবতে হবে না তোমায়। ওকে আমিই মানুষ করব। তুমি শুধু একটু হাসি-খুশী হও, সহজ হও। তা'হলে দেখবে সব ঠিক আছে।"—যুথিকা শেষের কথাগুলো দু'বার করে উচ্চারণ করে।

পরদিন ঘুম ভাঙতেই বিনয়ের চোখে পড়ে যুথিকা ঘর মুছছে ভিজে নেকড়া দিয়ে। কাল বিকেলে যে মানুষটার শারীরিক দুর্বলতায় মৃত্যুর আভাস পেয়েছিল, সকালেই তার এই অনাবশ্যক কর্তব্যপরায়ণতা ভাল লাগে না বিনয়ের। এ যেন একটু বাড়াবাড়ি। কি ক্ষতি হয় এক দিন ঘর না মুছলে ?

"ঘরটা না মুছলেই কি হত না আজ ?"—রাগটা কিছুতেই চেপে রাখতে পারে না। বিরক্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে বিনয়।

"মুছলেই বা ক্ষতিটা হচ্ছে কিসে ?"

"অসুখটাকে ডেকে আনা হচ্ছে, আর হবে কি।"

"ভয় নেই গো, তাড়াতাড়ি মরব না। আর মরি যদি সে তো

তোমার বরাত জোর।"—একটু রাগত ভাবেই জবাব দেয় যুথিকা। স্বামীর এই আপত্তি তার পছন্দ হয় না। একটি মাত্র চিন্তায় লোকটার মাথা দিন-রাত যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বিনয় পাথরের মত স্তব্ধ নিস্প্রাণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

"এত বড় সাংঘাতিক কথাটা বললে আমায় সকাল বেলায়!" —তার চোখের কোন বেয়ে টস-টস করে জল গড়িয়ে পড়ে। এতটা ভাবতে পারেনি যুথিকা। ভাবপ্রবণ হবারও একটা সীমা থাকা উচিত।

"ছি ছি, সামান্য একটা রসিকতাকে অত সিরিয়াসলি নিলে? তুমি দেখছি একেবারেই গেছ।"

ন্যাতাটা বালতির মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে স্বামীর সামনে এসে তার দুটো হাত তুলে নেয় নিজের হাতে।

"রেখে দিলাম বাবা। আজ আর মুছবো না ঘর। এবার খুশী তো?"

কিন্তু খুশী হওয়া বড় কঠিন। মাঝে মাঝে বিনয়ের মনে হয়, জীবনে আর কোন দিনই সে খুশী হতে পারবে না। তার সমস্ত খুশীর উৎস শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে। এই গতানুগতিক বাঁধা-ধরা পথে জীবনকে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার মধ্যে কোন মাহাত্ম্য নেই, সম্ভাবনা নেই, সার্থকতা নেই। বড় আশা, বড় চাওয়া কিছুই তো তার ছিল না কখনও, শুধু সুস্থ-সুন্দর-স্বচ্ছল জীবনযাত্রা ছিল তার একমাত্র কামনা। সে পথে কত বাধা! সারা দিন-রাত হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও অসুস্থ স্ত্রীকে ওষুধ-পথ্য কিনে খাওয়াবার সামর্থ্যের অভাব। এর পর ছেলে-মেয়েদের মানুষ করবে কি করে?

এ বাড়ীর প্রত্যেকটি পরিবারেই এই একই অবস্থা। সকলের বর্তমানই দুর্বিসহ, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত অন্ধকারাচ্ছন্ন। সারা দিন তারা কিছু নিরবচ্ছিন্ন আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হয়ে কাল কাটায় না। মাঝে মাঝে কোন মেয়ে গভীর রাত্রে এস্রাজ বাজিয়ে মুক্তকণ্ঠে গান গায়। সুরে সুরে গভীর রহস্যময় মোহ জাগিয়ে তোলে পরিবেশে। করুণ বিষাদময় অবসন্নতা রাত্রির নিবিড়তাকে বিমুগ্ধ করে দেয়। বিনয়ের মনে পড়ে, সকালে সংসারের তুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে এই মেয়েটিই স্বামীর সঙ্গে তুমুল কলহ করে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে ঠুকতে রক্তপাত করেছিল নিজের। প্রত্যুষের স্নিগ্ধ মুহূর্তে কোন বেদনাবিধুর তরুণীর জীবন ধন্য করে কোন নব জাতক তার আবির্ভাব ঘোষণা করে কর্কশ চিৎকারে। হাসে খেলে গান গায়। সঙ্কুচিত জীবনের যতটুকু সম্ভব উপভোগ করে। কিন্তু সব কিছুই যেন একটা প্রচণ্ড সর্বগ্রাসী ব্যর্থতার সুরে বাঁধা বলে মনে হয় বিনয়ের কাছে। নিজের মনে ভরসা পাবার কোথাও যেন কিছু নেই। জীবনের সবটুকু সকলেই জানে কি?

তবুও আশ্চর্য, যে ভাবেই চলুক, সংসারটা বেশ সহজ ভাবেই চলে যায় তিনটে মাস। তিন মাসে একটাও সিনেমা দেখেনি তারা, একখানাও কাপড় কেনেনি। কিন্তু ধার-দেনাও হয়নি বেশী কিছু এবং যুথিকার গহনাগুলো সব যথারীতি আছে।

যুথিকা বলে, "এর পর আমি যখন চাকরী করব, তখন তিনখানা ঘরওয়ালা একটা ফ্লাটে উঠে যাব। আমার টাকায় কেবল ঘরভাড়া আর খোকনের খরচ আর তোমার টাকায় সংসার। বুঝলে?"

রোমাঞ্চকর পরিকল্পনা। যুথিকা একেবারে ধরেই বসে আছে, ও একটি খোকনের জন্মদাত্রী হবে, খুকুর মা হবে না। বউকে গাল টিপে আদর করবার লোভ হয় বিনয়ের, কিন্তু এ বাড়ীতে দিনের বেলায় দাম্পত্য কলহ চলে, দাম্পত্য প্রেম প্রকাশের সুযোগ নেই। চারি পাশে সর্বদাই ছেলে-বুড়ো কিল্‌বিল্ করছে। যুথিকার মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হয়, আসন্ন মাতৃত্ব যুথিকার সারা দেহে কেমন একটা কৈশোরের আবেশ বুলিয়ে দিয়েছে। বয়সটা যেন ওর অনেক কমে গেছে। গাল দু'টো টসটসে লাল আভায় সমুজ্জ্বল। সব সময় কেমন মন্থরা, আবেশমুগ্ধা—কোন্ সুদূরের অস্পষ্ট আহ্বানে উদ্বেলিত-অন্তরা। কিশোরীর প্রথম প্রেমের কাকলীর মত আঁকা-বাঁকা ভাষায় এলোমেলো কথা বলে রাত্রে শুয়ে শুয়ে, ক্ষণে ক্ষণে ফেটে পড়তে চায় অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসে।

তবে মন ওর কেমন ভয়-কাতুরে হয়ে উঠেছে। কেমন যেন ছমছমে ভাব। ঘুমের ঘোরে ধড়মড়িয়ে জড়িয়ে ধরে বিনয়কে। ঘুম ভেঙ্গে গেলে ভয়ার্ত গলায় কাঁদো-কাঁদো সুরে বলে, "ভারী ভয় করে আমার, জানো।"

গভীর মমতায় ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বিনয় একটু ঠাট্টার সুরে বলে, "কিসের ভয়? ভূতের?"

"কি জানি কিসের? ছেলে হওয়া খুব কষ্ট। কত মেয়ে মারা যায়…!"

খবরটা নতুন নয় বিনয়ের কাছে। মনটা তার আরও দমে যায়। সান্ত্বনা দেবার ভাষাটা পর্যন্ত ভুলে যায় সে। কতক্ষণ কাটে মৌন স্তব্ধতায়।

"চুপ করে আছ যে? কি ভাবছ?"—যুথিকা স্বামীর মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়। বিনয় আবার ফিরে পায় সম্বিৎ।

"ও-সব ভেবে মন খারাপ কোরো না লক্ষ্মীটি।"

"নাঃ ভাবিনি, এমনই বলছি। তবে তুমি যদি দিন-রাত খালি মুখ গোমড়া করে থাক, তা'হলে আমিও ওসব ভাবব।…আমিও মরে যাব এক দিন দেখো।"

—"না না, দোহাই তোমার। ও-রকম বীভৎস শাস্তি দিও না আমায়।" বিনয় হাসে।

এ বাড়ীতে ভাল করে স্নান করতে হলে খুব ভোরে উঠে সকলের আগে কল-ঘরে ঢুকতে হয়। ন'টার পর চৌবাচ্চায় এক বিন্দুও জল অবশিষ্ট থাকে না। যুথিকা তাই ঘুম থেকে ওঠে সূর্য ওঠবার আগেই। স্নানের বিলাসটা ও কিছুতেই ত্যাগ করতে রাজি নয়। স্নান সেরে উনুন জ্বালিয়ে চা তৈরী করতে করতে ঘুম ভাঙে বিনয়ের। যুথিকা যে কখন শয্যা ত্যাগ করে তা টেরও পায় না বিনয়। ও তখন অঘোরে ঘুমোয়। রোজ সকালে চোখ মেলে চাইতেই সব চেয়েও আগে নজরে পড়ে সদ্যস্নাতা সুস্মিতা যুথিকাকে। তিন মাসে এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। ভারী সুন্দর স্নিগ্ধ মুহূর্ত।

এক দিন হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে যায় প্রচণ্ড আর্তনাদের শব্দে। বুকটা ছ্যাঁত করে উঠে। পাশে যুথিকা নেই। খোলা দরজার

ফাঁক দিয়ে প্রত্যূষের সোনালী আলো এসে ঢুকেছে ঘরে। এক-টানা গোঁঙানীর শব্দে পরিচিত সুর। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়েই দেখতে পায় দরজার পাশেই মুখ থুবড়ে পড়ে গোঁঙাচ্ছে যূথিকা। পাশের ঘরের দুই-এক জনও বেরিয়ে আসেন। বিনয় দুই হাতে স্ত্রীর দেহটা তুলতে যাবে, এমন সময় সকলে মিলে চেঁচিয়ে উঠেন একসঙ্গে।

হকচকিয়ে সামনে তাকিয়ে বিনয় দেখে কোণের ঘরের এস্রাজ-বাজানো সেই তরুণী বধূটি বারান্দার কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলছে। ঠিকরে-বেরোনো দু'টি চোখ আর জিভটা বিকট বীভৎস করে তুলেছে ওর মুখটাকে। বিলম্বিত দেহটি মৃদু বাতাসে দোদুল্যমান। বিনয়ের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত শিউরে ওঠে। এ দৃশ্য সহ্য করার মত শক্ত নার্ভ কোথায় পাবে যূথিকা?

যূথিকার অচৈতন্য দেহটিকে তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয় বিনয়। কোন সাড়া শব্দ নেই আর। একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে সে।

কয়েক মুহূর্তেই সমস্ত বাড়ীময় সোরগোল পড়ে যায়। আশে-পাশের সবাই আসে ভীড় করে দেখতে।

ঘরের মধ্যে আতঙ্কে নীল-হয়ে-যাওয়া অজ্ঞান স্ত্রীর পাশে বসে ঘামতে থাকে বিনয়। ডাক্তার ডাকতে হবে কিন্তু স্ত্রীর কাছে বসবার মত একটা লোকও পাওয়া যাবে বলে তার মনে হয় না।

শুধু ডাক্তার নয়, বিকেল পর্যন্ত বিনয় আর যূথিকার আত্মীয়-স্বজনে ছোট্ট ঘরখানা ভরে যায়, কিন্তু ওর চোখের পাতা দু'টো আর খোলে না। ব্লাডপ্রেসারে ভোগা সন্তানসম্ভবা মেয়ের পক্ষে ধূসর আলোয় বারান্দার কোণায় মানুষের দেহ বাতাসে দুলতে দেখার ধাক্কা সামলানো সম্ভব নয়। অন্তত যূথিকা পারেনি।

শ্মশানঘাট থেকে মৌন ছেলের হাত ধরে নিজের বাড়ীতে নিয়ে-যান সুরেশ বাবু।

"বিনুকে আজ আমার ঘরে বিছানা করে দাও। আমরা এক সঙ্গে শোব।" স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলেন।

বিনয় চুপ করে বসে থাকে বাবার সামনে। তার শূন্য উদাস দৃষ্টি সারা ঘরময় ঘূরপাক খেতে থাকে।

"আজ একটু গীতা পড়ে শোনাই তোকে।"

বিনয় কথা বলে না। বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে। সুরেশ বাবু গীতার পাতা উল্টে শ্লোক উচ্চারণ করতে থাকেন। মাঝে মাঝে ছেলের দিকে আড়-চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেন, কোন ভাবান্তর দেখা যায় কি না। মনে হয় না একটা কথাও ঢুকছে ওর কানে। শেষে ওর হাত ধরে বলেন, "শুবি আয় বাবা। ভেবে ভেবে আর কি করবি? শোক-তাপ, দুঃখ-বেদনা এ তো মানুষের নিত্যসঙ্গী।" কোন আপত্তি না করে প্রকাণ্ড বিছানার এক পাশে চুপটি করে শুয়ে পড়ে বিনয়।

"মানুষ মারা গেলে কোথায় যায় বলতে পার বাবা?"—কয়েক ঘণ্টা বাদে হঠাৎ মুখ খুলেছে বিনয়। সুরেশ বাবু চঞ্চল হয়ে ওঠেন। এমন একটা মুখরোচক প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দিতে পারতেন সুরেশ বাবু। সেই অনাদি অনন্ত পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মার অবলুপ্তি মৃত্যুর পথে। মানুষের পরম মুক্তি সেই মৃত্যুর অবিনশ্বরতায়। আরও অনেক অনেক অনেক ব্যাখ্যা করে পরলোকের মহিমা বোঝাতে পারতেন তিনি। কিন্তু এ তো ছেলের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নয়—প্রলাপোক্তি। মরে গেলে মানুষ কোথায় যায় তা যেন নিজেই তিনি গুলিয়ে ফেলেন। ফট করে একটা জবাব দিতে পারেন না।

পরদিন প্রত্যূষে স্ত্রীর চীৎকারে যখন তাঁর ঘুম ভাঙ্গে, তখন বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। বাইরে বারান্দার ডান দিকে তাকাতেই দেখেন বিনয়ের দেহটা ঝুলছে কড়িকাঠে—দুলছে বাতাসে, যূথিকার মত মুখ থুবড়ে অজ্ঞান হয়ে যান না তিনি। ছুটে গিয়ে ছেলের পা দু'টো তুলে ধরেন উঁচু করে। কিন্তু তখন বিনয়ের দেহটা হিম হয়ে গেছে।

দি ক্লোক

এন, ভি, গোগোল

কোন একটি বিভাগ। বিভাগটির নাম উল্লেখ না করাই ভাল। সেনাবাহিনীই হোক আর আদালতই হোক—কোন সরকারী দপ্তরখানাকে চটানো বিপজ্জনক। আজকাল প্রত্যেক লোক তার অস্তিত্বের দ্বারাই সমাজকে চটাচ্ছে। শোনা যায়, পুলিশের কোন বড়কর্তা (কোন্ শহরের মনে পড়ছে না) এক অভিযোগ উত্থাপন করে নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, রাষ্ট্রের আইন-কানুনের অমর্যাদা এবং এর পবিত্র নাম নিয়ে ছেলেখেলা চলছে। তাঁর এই বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ তিনি একটি প্রকাণ্ড উপন্যাস পাঠিয়ে দেন। সেই উপন্যাসে প্রতি আট-দশ পৃষ্ঠা অন্তর অন্তর এক জন পুলিশ-কর্তার আবির্ভাব ঘটেছে এবং তার চরিত্র বার বার যে-ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, সেটা আর যাই হোক, স্থিরবুদ্ধি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষের নয়। অতএব সকল রকমের সম্ভাব্য অপ্রীতিকর অবস্থা এড়াবার জন্য বিভাগটিকে "কোন একটি বিভাগ" বলে উল্লেখ করব। এবার আমরা সুরু করতে পারি। কোন এক বিভাগে কাজ করত এক কেরাণী। কোন রকমের কোন বৈশিষ্ট্যই তার ছিল না। বেঁটে-খাটো গড়ন, কটা চুল, ক্ষীণ দৃষ্টি, মাথায় একফালি টাক, কুঞ্চিত গাল। চেহারাটা অনেকটা অর্শ রোগীর মত। দোষটা কার? সেন্টপিটার্সবার্গের জলবায়ুর নিশ্চয়ই। তার পদ সম্বন্ধে (সব চেয়েও আগে পদের কথা বলা বিশেষ জরুরী) বলা যায় যে, কাউন্সিলর নামে যে পদটি সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত, সে বরাবর সেই পদেই বহাল আছে। প্রতিশোধ গ্রহণে অক্ষম ব্যক্তিদের উপর আক্রমণ চালাবার প্রশংসনীয় অভ্যাস যে সব লেখকদের আছে, তাদের কাছে এই পদটি হচ্ছে ঠাট্টা-তামাসার বস্তু।

কেরাণীটির পদবী ব্যাসম্যাচকিন (রুশ ভাষায় ব্যাসমাকের অর্থ জুতো)। কাজেই জুতো শব্দ থেকেই যে ওর পদবীর উৎপত্তি তাতে কোন সন্দেহই নেই; কিন্তু কবে কোথায় এবং কেমন করে যে

উৎপত্তি হোল, তা কেউ জানে না। তার বাপ-ঠাকুর্দা এবং ভগিনী-পতি—অর্থাৎ কি-না ব্যাসম্যাচকিনদের সঙ্গে যাদেরই আত্মীয়তা ছিল, তারা সকলেই বুট জুতো পরতো এবং বছরে তিন বার তার সোল বদলাতো। তার বংশানুগ নাম ছিল আকাকি আকাকিয়েভিচ। পাঠকরা ভাবতে পারেন, নামটা অস্বাভাবিক এবং কৃত্রিম, কিন্তু আপনারা সুনিশ্চিত ভাবে জেনে রাখুন, নামটা খুঁজে-পেতে বার করতে হয়নি, অতি স্বাভাবিক ভাবেই এসে গেছে। বস্তুত: বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এ ছাড়া অন্য কোন নাম তাকে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

যদি আমার স্মৃতিভ্রংশ না হয়ে থাকে তা'হলে বলতে পারি, আকাকিয়েভিচ ২৩শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেছিল। তার মৃতা মা ছিলেন জনৈক সরকারী কর্মচারীর পত্নী। ভারী সৎ মহিলা। যথাসময়ে তিনি তাঁর পুত্রের নামকরণের আয়োজন করেন। দরজার মুখোমুখি বিছানার উপর শুয়েছিলেন তিনি। ডান দিকে ধর্ম-বাপ আইভ্যান আইভ্যানোভিচ ইগোবস্কিন—ভারী চমৎকার মানুষ, সিনেটের হেড ক্লার্ক এবং ধর্ম-মা এরিনা সেমিওনোভা বেলোব্রুকোভা। শেষোক্ত ভদ্রমহিলা এক কোয়ার্টার-মাষ্টারের পত্নী এবং অশেষ গুণসম্পন্না। শহীদদের নাম অনুসারে মোকিয়া, সোসিয়া এবং হসডাজাটা—এই তিনটি নামের মধ্যে যে কোন একটি নাম বেছে নিতে বলা হয় শিশুর মাকে।

শিশুর মা ভাবলেন, "কি ভয়ঙ্কর নাম রে বাবা!"

তাঁকে খুশী করবার জন্য পঞ্জিকা খুলে আরও তিনটে নাম বার করা হলো—ট্রিফলি, ডুলা এবং ভ্যারাসি।

"নামগুলো কি ভীষণ! যেন কোন মতলব নিয়েই এসে হাজির হয়েছে!" শিশুর মা চেঁচিয়ে উঠলেন, "ও-রকম নাম জন্মে কখনও শুনিনি। ভেরাদত অথবা ভ্যারুই যথেষ্ট খারাপ, তার উপর আবার ট্রিফলি আর ভ্যারাসি!"

আবার একটা পৃষ্ঠা ওল্টানো হলো পঞ্জিকার। সেই পৃষ্ঠায় পাওয়া গেল দু'টি নাম—প্যাভসিক্যাহি আর ভ্যাটিসি।

"অদৃষ্ট যেন ওই দিকেই ঠেলে নিয়ে চলেছে," বললেন শিশুর মা, "ও সব নামের চেয়েও ওর বাপের নামই রাখা হোক—আকাকি। বাপের পক্ষে যা ভালো, ছেলের পক্ষেও তাই ভাল।'

সুতরাং তার নাম হলো আকাকি আকাকিয়েভিচ। নামকরণের সময় শিশু কেঁদে মুখ বিকৃতি করেছিল। সে-যে এক দিন কাউন্সিলর হবে, সম্ভবত তারই আভাস পেয়েছিল মনে-মনে। এই হচ্ছে ঘটনা। পাঠকরা যাতে বুঝতে পারেন যে, শিশুর অপর কোন নাম দেওয়া সম্ভব ছিল না, সেই জন্যই এই ঘটনার উল্লেখ করলাম।

কখন এবং কি ভাবে সে যে সরকারী দপ্তরখানায় ঢুকেছিল এবং এবং কে যে তাকে নিযুক্ত করেছিল, তা কারও স্মরণে নেই। বিভাগের বড়কর্তা ছোটকর্তাদের যতই অদল-বদল হোক না কেন, তাকে সব সময় একই জায়গায় একই পদে, একই কাজে এবং একই লেখার ভঙ্গিতে আবদ্ধ থাকতে দেখা যেত। সুতরাং লোকে ভাবতো, সে তার সাজ-পোষাক, টাক এবং অন্যান্য সব কিছু নিয়ে একেবারে এই ভাবে তৈরী হয়েই পৃথিবীতে জন্মেছে। সে যখন হলে ঢুকতো, তখন আর্দালীরা আসন ছেড়ে তো উঠতোই না, এমন কি একটা সাধারণ মশা-মাছি বলেও গ্রাহ্য করত না। অফিসের উপরওয়ালারা তার সঙ্গে কড়া মেজাজে কথা বলত। কোন হেড ক্লার্কের সহকারী হয়ত বা তার নাকের ডগায় এক তাড়া কাগজপত্র ফেলে দিত। এমন কি বড় বড় অফিস-আদালতে "দয়া করে এগুলো নকল করবেন কি?" "এই নিন একটা ভাল কাজ" প্রভৃতি যে সব শিষ্টাচারের ভাষা ব্যবহৃত হয়, সেগুলো পর্যন্ত কেউ তার সঙ্গে ব্যবহার করত না। সে কিন্তু কাগজগুলো তুলে নিতো। চোখ তুলে তাকাতো না আগন্তুকের দিকে অথবা তার অধিকার সম্বন্ধেও কোন প্রশ্ন তুলতো না। কাগজগুলো তৎক্ষণাৎ নকল করতে আরম্ভ করত। তরুণ কেরাণীকুল তাকে নিয়ে হাসাহাসি করত এবং তার উপর নিজেদের রস-রসিকতার ধার পরীক্ষা করে নিত, অবশ্য অফিসের গণ্ডীতে যতটা রস-রসিকতা সম্ভব ততটুকুই। তারা ওর সম্বন্ধে নানা রকম গল্প বানিয়ে ওর সামনে বার বার করে সেগুলো বলত। একবার তারা গল্প ছাড়ল—ওর ৭০ বছর বয়স্কা বাড়িউলী ওকে ঠেঙ্গায়! এমনি ধরণের সব গল্প। বাড়িউলী বুড়িকে জড়িয়ে ওকে নিয়ে নির্মম ভাবে ঠাট্টা-তামাসা করত তারা। বলত, বিয়ে-সাদী হচ্ছে কবে? তার পর কাগজের টুকরো ছুঁড়ে মারত তার মাথায়, যেন ধান-দূর্বা পড়ছে ওর মাথায়।

কিন্তু আকাকিয়েভিচ ওসব কথার কোন জবাব দিত না। ওসব গাল-গল্পের সঙ্গে যেন কোন সম্পর্কই নেই তার। এতে তার কাজেরও ক্ষতি হত না। যতক্ষণই ঠাট্টা-তামাসা চলুক না কেন, লেখায় কখনও তার ভুল হত না। নিতান্তই যখন কেউ ঠাট্টা-তামাসার সক্রিয় প্রয়োগ করে কনুইয়ে খোঁচা মারত, তখন ভাঙ্গত তার ধৈর্যের বাঁধ। ক্ষেপে উঠত সে। বলত, "চলে যান এখান থেকে, একা থাকতে দিন আমায়। বিরক্ত করেন কেন?" কথার ভাষা এবং স্বরের অদ্ভুত বিশেষত্বে করুণার উদ্রেক করত। অন্যান্যদের দেখাদেখি নতুন চাকরী পাওয়া এক ছোকরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা সুরু করে। কিন্তু হঠাৎ এক দিন সে চমকে যায় এবং নিজেকে সংযত করে ফেলে। সেদিন থেকে তার মধ্যে এক পরিবর্ত্তন দেখা দেয় এবং সে আকাকিকে নতুন চোখে দেখতে আরম্ভ করে! কোন অলৌকিক শক্তি তাকে তার সহকর্মীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এই সহকর্মীদের সে বিশেষ সম্ভ্রান্ত বলেই আগে ধারণা করেছিল। অনেক অনেক দিন বাদে চরম আনন্দের মুহূর্তে তার মনে পড়ত, সেই টাকপড়া কেরাণীটিকে আর মনে পড়ত তার মর্ম্মস্পর্শী কথা—"চলে যান এখান থেকে, একা থাকতে দিন আমায়। বিরক্ত করেন কেন?" এই কথার মধ্য থেকেই যেন তার কানে বেজে উঠত আর একটি সুর,—"আমি কি আপনাদের ভাই নই?" দুর্ভাগা যুবক দুই হাতে মুখ ঢেকে সেই যুগের কথা ভেবে কেঁপে উঠত। তার যুগে মানুষ কত অমানুষিক এবং তথাকথিত মার্জিত এবং সম্ভ্রান্তদের মধ্যে কত অনর্থক নৃশংসতা! হায় ভগবান! জগৎ যাকে সৎ এবং সম্মানীয় বলে মনে করে, তারও এই দশা!

আকাকির মত কাজে ডুবে থাকতো না কেউ। সে যে উৎসাহ সহকারে কাজ করত, সে কথা বললে অতি অল্পই বলা হয়। কাজে ছিল তার রীতিমত অনুরাগ। কাগজ নকলের কাজে যেন

এক নতুন জগতের দ্বার উন্মোচন হত তার সামনে, তার নিজস্ব জগৎ—মধুর এবং বৈচিত্র্যময়। কাছে বসলেই তার চোখে-মুখে আনন্দ ঝলকে উঠতো। আর তার প্রিয় চিঠিগুলি পেলে মুখে হাসি ফুটে উঠতো, চোখ মিটমিট করত এবং ঠোঁট নড়ত। যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারত, কি ধরণের চিঠির জবাব লিখছে সে। উৎসাহের অনুপাতে পদোন্নতি হলে সে এত দিনে ষ্টেট কাউন্সিলর হয়ে যেত; কিন্তু তার সম্বন্ধে তার সহকর্মী কেরাণীরা বলত, কাজের সঙ্গে আঠার মত সে জুড়ে আছে, তার একমাত্র পুরস্কার সে যা পেয়েছে তা হচ্ছে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি। তার দিকে যে কারও নজর নেই, এ কথা বলা অবশ্য অন্যায়। একবার এক জন ডিরেক্টার—এক জন যোগ্য মানুষ—তার সুদীর্ঘ চাকরীর জন্য তাকে পুরস্কৃত করতে চেয়ে ঠিক করেছিলেন, ওকে নকল করার কাজ না দিয়ে অন্য জরুরী গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হবে। সেই হিসাবে প্রথম কাজ সে পায় একটি তৈরী দলিল সংশোধনের। দলিলের টাইটেল পৃষ্ঠা ও ক্রিয়াপদের অদল-বদল করাই ছিল একমাত্র কাজ। কিন্তু এতে আকাকির এত কষ্ট হল যে, সে ঘেমে নেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল—"দয়া করে এর বদলে আমাকে কিছু নকল করার কাজ দিন।" সেদিন থেকে সে নকলের কাজেই বহাল আছে।

তার কাছে নকল করা ছাড়া আর সবই মায়া। পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে কোন দিনই তার কোন খেয়াল ছিল না, এবং তার ইউনিফর্মের রঙ আর সবুজ ছিল না, মরচে-পড়া শুষ্ক এবং মলিন বর্ণ ধারণ করেছিল। গলাবন্ধটা ছিল সরু আর ছোট। ঘাড়টা তার লম্বা না হলেও বেখাপ্পা রকমের লম্বা দেখাতো। বিদেশী ফেরিওয়ালারা মাথায় ট্রে চাপিয়ে প্লাষ্টারের তৈরী যে সমস্ত বিড়ালছানা বেচে বেড়ায়, ঠিক তাদের ঘাড়ের মত। আর তার কোটে সব সময়ই খড়-কুটো অথবা সুতো জাতীয় একটা না একটা কিছু লেগে থাকতই। বাড়ীর লোকেরা যখন রাস্তায় জঞ্জাল ফেলে, ঠিক সেই সময় জানলার ধার দিয়ে চলার দিকে একটা অদ্ভুত ঝোঁক ছিল তার। ফলে রোজই তার টুপির উপর তরমুজ অথবা কুমড়োর টুকরো লেপটে থাকতো। প্রতিদিন রাস্তায় কি ঘটে না ঘটে সেদিকে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তার সহকর্মী কেরাণীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু শিথিল কোন কাঁচুলি, উল্টো দিকে বিলম্বিত ট্রাউজার আবিষ্কার করতে একটুও ভুল করত না। এ সব ঘটনা তাদের ঠোঁটে একটা চিরপরিচিত হাসি ফুটিয়ে তুলতো। আকাকিয়েভিচ যদি আদৌ কোন কিছুর দিকে চাইত, তা'হলে সুবিন্যস্ত লিখিত দলিলপত্র ছাড়া আর কিছুই তার নজরে পড়ত না। শুধু যখন কোন ঘোড়া তার কাঁধে গুঁতো মারতো এবং তার মুখের কাছে ভীষণ রকমের ঘড়ঘড়ে আওয়াজ করে শ্বাস-প্রশ্বাস নিত, তখনই সে বুঝত সে রাস্তার মাঝখানে রয়েছে, দলিল-পত্রের মধ্যে নয়। বাড়ী পৌঁছে টেবলের সামনে বসে সে খেত মাংস, পেঁয়াজ আর ঝোল। খাবার-দাবারের স্বাদ কেমন, সে প্রশ্ন জাগত না তার মনে। খাওয়ার সময় মশা-মাছি অথবা যাই পাঠান না কেন ঈশ্বর—সবই সে গিলে ফেলত। পেট ভরলে টেবল ছেড়ে উঠে দোয়াত নিয়ে আবার নকল করতে বসত বাড়ীতে আনা কাগজপত্র। অফিসের কোন কিছু নকল করার না থাকলে, নিজের জন্যই সে নকল করতে বসত, বিশেষ করে দলিলটি যদি উল্লেখযোগ্য হত। দলিলের বিষয়বস্তু মূল্যবান হোক বা না হোক, সেটা যদি কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির উদ্দেশে লেখা হয়ে থাকে, তাহলেই সেটা তার কাছে উল্লেখযোগ্য দলিল বলে বিবেচিত হত।

সেণ্টপিটার্স বার্গের ধূসর আকাশ ফিকে হয়ে গেলে সরকারী কর্মচারীরা নিজের নিজের সাধ্য এবং সাধ অনুযায়ী ভাল ভাল খাবার-দাবার খেত। কলম পেশা এবং অন্যান্য কাজের ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি নিয়ে সকলে বিশ্রাম করত। প্রত্যেক উৎসাহী ব্যক্তি সেই অবকাশকে অবাধে উপভোগ করার নেশায় মত্ত হত, এ্যাডভেঞ্চার-পিয়াসীরা ছুটতো থিয়েটারে, কেউ কেউ রাস্তায় টুপির দোকান দেখে বেড়াতো, কেউ বা সান্ধ্য মজলিসে গিয়ে ছোট-খাটো কেরাণী-মহলের হৃদয়াকাশের তারকা কোন সুন্দরীর সঙ্গে প্রেমালাপ করত। কেউ কেউ আবার সহযোগী কেরাণীদের বাসায় গিয়ে কাটিয়ে আসত সন্ধ্যাটা। সেই সব বাসা হয়ত দোতলা অথবা তিন তলার ছোট-ছোট দু'টো কামরা নিয়ে। হয়ত একটা রান্না-ঘর আছে আর আছে চলা-ফেরা করার একফালি রাস্তা। বাসার সাজ-সরঞ্জামে আধুনিক রুচির কৃত্রিম বাহ্যাভাব লক্ষ্যণীয়। বাতি অথবা ঐ জাতীয় জিনিষপত্রে তার প্রমাণ মেলে। ওসব করতে পরিবারের খাওয়া-দাওয়া এবং বেড়ানো-চেড়ানো কমাতে হয়েছে। সরকারী দপ্তরের কেরাণীরা সকলেই যখন তাদের বন্ধুদের খুপরি বাসায় তাসের আড্ডায় জমে গিয়ে চা বিস্কুট পাইপ ওড়াতো এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে রুশবাসীর অতিপ্রিয় উন্নাসিক সমাজের গাল গল্পে মেতে উঠে সেই অতি পুরাতন কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে বলত "অমুক সেনাপতি শুনেছিল ফ্যালকানেট মনুমেণ্টের ঘোড়ার লেজ কাটা গেছে", যখন সকলেই প্রাণপণে আনন্দে ডুবে থাকার চেষ্টা করত, তখনও আকাকিয়েভিচ কিছুতেই মনকে অন্য পথে যেতে দিত না। কেউ তাকে কখনও সান্ধ্য মজলিসে দেখেছে বলে স্মরণ হয় না। প্রাণভরে লিখে সে বিছানায় শুয়ে পড়ত এবং আগামী কালের প্রত্যাশায় তার মুখে হাসি ফুটে উঠত। আগামী কাল তাকে কি নকল করতে দেওয়া হবে? সামান্য বেতনভুক এই মানুষটির জীবন এই ভাবেই কাটত। এতেই সে আত্মতুষ্ট হয়ে থাকত। জীবনের যে সমস্ত অপরিহার্য্য দুর্ভাগ্য জীবন-পথের উপর ছড়িয়ে থাকে এবং সাধারণ কাউন্সিলার তো দূরের কথা, প্রিভি কাউন্সিলার এবং অপরের সঙ্গে পরামর্শ-বিনিময়ে বিমুখ ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত যার হাত থেকে রেহাই পান না, তেমনি এক দুর্ভাগ্য এসে উপস্থিত না হলে হয়ত বুড়ো বয়স পর্য্যন্তই তার এমনি কাটতো।

সেণ্টপিটার্স বার্গে যাদের বেতন চারশো রুবলের বেশী নয়, উত্তুরে তুষারপাত তাদের মস্ত শত্রু। অবশ্য কেউ কেউ দৃঢ় ভাবে বোঝাতে চায় ওটা না কি স্বাস্থ্যকর। সকাল ন'টায় যখন সরকারী অফিসের কেরাণীরা অফিসে ছোটে এবং তাদের ভীড়ে রাস্তা পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন তুষারপাত এত তীব্র এবং যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে যে, বেচারীরা ভেবে পায় না নাকটা নিয়ে কি করবে। বড় বড় অফিসারের কপাল পর্য্যন্ত টাটিয়ে ওঠে, চোখে জল নামে। তখন হতভাগ্য কেরাণীকুল একেবারেই অসহায়। পাতলা ঢিলেঢালা জামায় আবৃত তাদের মুক্তির একমাত্র উপায়ই হচ্ছে তখন যত তাড়া[illegible]ড় সম্ভব পাঁচ-ছ'টা রাস্তা অতিক্রম করে আর্দালির ঘরে [illegible] পা-টাকে গরম করা

এবং এই ভাবে পথে অপচয় করা শক্তি-সামর্থের পুনরুদ্ধার করা। আকাকিয়েভিচ লক্ষ্য করল, কিছু দিন যাবৎ তুষারপাতে তার পিঠ ও কাঁধ দু'টোয় অস্বাভাবিক ব্যথার সৃষ্টি হয়েছে। প্রাণপণে ছুটোছুটি করে অফিসে যাওয়া সত্ত্বেও ঘটনাটা ঘটেছে। শেষে তার মনে হলো, হয়ত তার জামায় কোন ত্রুটি হয়েছে। বাড়ীতে ভাল করে পরীক্ষা করে সে বার করল দু'-তিনটে জায়গায়—বিশেষ করে পিঠ ও কাঁধের কাছে—একেবারে ফালি-ফালি হয়ে গেছে এবং কাপড় থেকে সুতো খসে গেছে। এখানে পাঠকদের বলে রাখা দরকার যে, আকাকিয়েভিচের জামাটাও তার সহযোগীদের হাসি-ঠাট্টার বিষয় ছিল। এটাকে গুরু-গম্ভীর ভাষায় 'ক্লোক' না বলে ড্রেসিং গাউন বলে উল্লেখ করা হত। আর বাস্তবিক ক্লোকটার ছাঁটকাটও ছিল অদ্ভুত। বছরের পর বছর ওর কলারটা ছোট হয়ে আসছিল, কারণ কলার কেটে অন্য অংশে তালি দেওয়া হত। তালিগুলো আবার দর্জির সূচীবিদ্যার পরাকাষ্ঠার প্রমাণ দিত না—এলোমেলো লেপটানো এবং দেখতেও বিকট ছিল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আকাকিয়েভিচ ঠিক করল, জামাটা দর্জি পেট্রোভিচের কাছে নিয়ে যাবে। একটা বাড়ীর চার তলার পেছনের সিঁড়ির পাশে থাকতো সে। তার একটি মাত্র চক্ষু এবং বসন্তের দাগওয়ালা মুখ সত্ত্বেও সরকারী দপ্তরের কেরাণীদের ও অন্যান্য লোকের জামা-কাপড় সেলাই-রিপু করে বেশ লাভজনক ব্যবসাই চালাচ্ছিল সে, অবশ্য যখন সে প্রকৃতিস্থ থাকতো এবং নতুন কোন ব্যবসা নিয়ে মাথা না ঘামাতো। পেট্রোভিচের নামটা আমরা উল্লেখ করতাম না, কিন্তু যখন করা হয়েই গেছে এবং নিয়ম আছে, গল্পে কারও নাম উল্লেখ করলে তার সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত, তাই তার কথাটা পাড়লাম। বহু দিন আগে সে শুধু গ্রেগরী নামেই পরিচিত ছিল। তখন সে ছিল এক জমিদারের ক্রীতদাস। মুক্তির পর সে নিজেকে পেট্রোভিচ বলে পরিচয় দিতে লাগল এবং সেই সঙ্গে ছুটি-ছাটা, উৎসব-আনন্দের দিনে প্রচুর নেশা-ভাঙ করতে লাগল। প্রথম প্রথম সে শুধু বড় বড় উৎসবেই মদ খেত, কিন্তু পরে গীর্জার পঞ্জিকায় যে যে দিনগুলোয় ক্রসচিহ্ন আঁকা, সেই সেই দিনেই চলতে লাগল তার নেশা-ভাঙ। এ বিষয়ে সে পূর্বপুরুষদের অভ্যাস বজায় রাখল। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করার সময় তাকে সে স্থূল বিষয়বুদ্ধিসম্পন্না জার্মান স্ত্রীলোক বলে ডাকত। তার স্ত্রীর কথাটা যখন উঠলই তখন তার সম্বন্ধেও দুই-একটা কথা বলার দরকার। দুর্ভাগ্য বশত তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। শুধু এইটুকুই জানা যায় যে, পেট্রোভিচের একটি পত্নী ছিল এবং সে মাথায় রুমাল বাঁধতো না, টুপিই পড়ত। রূপ নিয়ে বড়াই করার কিছুই তার ছিল না, কারণ একমাত্র সৈন্যরাই ওকে রাস্তায় দেখতে পেলে টুপির নীচু দিয়ে উঁকি মারতো আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ বিকৃতি করে মুখ দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ বার করতো।

চোখ জ্বালা-করা স্পিরিট-মিশ্রিত জল দিয়ে সদ্য-ধোয়া পেট্রোভিচের ঘর অভিমুখী সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে আকাকিয়েভিচ ভাবছিল, পেট্রোভিচ কাজটার জন্য কত চাইবে। মনে মনে সে ভেবে রেখেছিল দু'রুবলের বেশী কিছুতেই দেবে না। পেট্রোভিচের ঘরের দরজা খোলাই ছিল, কারণ তার স্ত্রী তখন মাছ রান্না করছিল আর রান্না-ঘরটা তার গন্ধে এমন ভরপুর ছিল যে, আরশোলাগুলো পর্যন্ত অদৃশ্য হয়েছিল। ওর স্ত্রীর অলক্ষ্যে আকাকিয়েভিচ রান্না-ঘরের মধ্য দিয়ে গিয়ে ঢুকল আর একটা ঘরে। সেখানে পেট্রোভিচ একটা সাদামাটা টেবলের উপর বসেছিল। আকাকিয়েভিচের প্রথমেই নজরে পড়ল কুৎসিত নখযুক্ত পরিচিত একটা বুড়ো আঙুলের দিকে—কাছিমের পিঠের মত পুরু আর শক্ত। পেট্রোভিচের ঘাড়ে ঝুলছে রেশম আর সুতোর ফেটি আর হাটুর উপর কতকগুলো কোরা কাপড়। কয়েক মিনিট ধরে সে সূচে সুতো পরাবার চেষ্টা করছিল। শেষে অন্ধকার আর সুতোর উপর রাগ করে বিড়বিড়িয়ে বলে উঠল—দুত্তোর, কিছুতেই ঢুকবে না শালা। পেট্রোভিচের মেজাজ যখন বিগড়েছে, ঠিক সেই সময় ঘটনা-স্থলে হাজির হওয়ায় আকাকিয়েভিচ মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল। পেট্রোভিচের মেজাজ যখন শান্ত থাকে, তখনই সে তার সঙ্গে দর-দস্তর ঠিক করতে চায়। সেই সময় সে সহজেই দর নামায় এবং খদ্দেরদের মাথা নুইয়ে ধন্যবাদও জানায়। এ কথা অবশ্য সত্যি যে, সেই সময় তার স্ত্রীও ঘটনা-স্থলে এসে হাজির হয় এবং দুঃখ করতে থাকে যে, মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে বলেই তার স্বামী অল্প দাম চেয়েছে। তার অর্থ, আরও বিশ কোপেক। তার পরই ব্যাপারটি চুকে যায়। এদিন মনে হলো, পেট্রোভিচ সুস্থ শান্ত অবস্থায় আছে, ফলে মৌন এবং লোলুপ। আকাকিয়েভিচ ফিরেই যেত কিন্তু বড্ড বিলম্ব হয়ে গেছে। পেট্রোভিচ এক চোখে তার দিকে তাকাতে আকাকিয়েভিচ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল—নমস্কার!

'নমস্কার'—উত্তর দিল পেট্রোভিচ। ওর হাতের দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল, শিকারটা কি রকম।

"তোমার কাছে এলাম পেট্রোভিচ, কারণ"……

লক্ষ্য করবেন আকাকিয়েভিচ অব্যয় পদ এবং ক্রিয়ার বিশেষণ-বহুল এমন এক ভাষায় কথা বলে, যার কোন অর্থই হয় না। বিষয়টা জটিল হলে সে কখনও কথা শেষ করত না এবং প্রায়ই 'সত্যি', 'তবে' জাতীয় শব্দ দিয়ে কথা সুরু করে আর কোন কথা জোগান দিতে পারত না। তবে সে মনে করত নিজের বক্তব্য ভাল ভাবেই বুঝিয়েছে সে।

"দেখি ওটা কি।"—বলল পেট্রোভিচ। এক চোখ দিয়ে সে জামার কলার থেকে হাতা পর্যন্ত এবং ঝুল থেকে বোতামের ঘর পর্যন্ত পরীক্ষা করতে লাগল, যদিও ওটা তারই তৈরী এবং ওর প্রত্যেকটি সেলাই তার পরিচিত। কিন্তু এ হচ্ছে দর্জিদের নিয়ম। খদ্দেররা কাজ আনলে প্রথমেই ওরা এমনি করে দেখে।

"আমি এসেছিলাম পেট্রোভিচ…জামাটা…কাপড়টা…দেখ এটার সব জায়গাই বেশ ভাল আছে…একটু ধুলো পড়েছে শুধু। একটু পুরোনো দেখায়…এটা খুব ভালই আছে, খালি এখানে-ওখানে, তুমি দেখতে পাচ্ছ…পিঠ এবং কাঁধটা একটু ছিঁড়ে গেছে, এবং এধারের কাঁধে একটু…দেখছো? কিন্তু খুব বেশী কিছু করতে হবে না এর…"

পেট্রোভিচ টেবলের উপর ওটাকে রেখে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করল। একটু একটু করে মাথা নড়তে লাগল তার। তার পর জানলার ধারে গিয়ে এক জন জেনারেলের ছবিওয়ালা 'মুখুটি' লাগানো নস্যির ডিবেটা তুলে নিল। ওটা যে কোন জেনারেলের ছবি তা কেউই বলতে পারে না, কারণ তার মুখের

রঙ উঠে গেছে এবং সেখানে একটা কাগজ মেরে দেওয়া হয়েছে। পেট্রোভিচ এক টিপ নস্যি নিয়ে জামাটা আলোর নীচে তুলে ধরে আর একবার মাথা নাড়ল। তার পর সেলাইটা পরীক্ষা করে আবার দোলালো মাথাটা। ফের আর এক টিপ নস্যি নিয়ে জেনারেলের ছবি এবং কাগজ-আঁটা মুখটা সশব্দে বন্ধ করতে করতে বলল, "এটা মেরামত করা চলবে না, কাপড়টা একেবারে পচে গেছে।"

এ কথায় আকাকিয়েভিচের মন হতাশায় ডুবে গেল।—"কিন্তু কেন চলবে না পেট্রোভিচ?"—ওকালতির ভঙ্গিতে শিশুর ভাষায় প্রশ্ন করল সে।—"কাঁধটার উপর একটু ছিঁড়ে গেছে শুধু। আমার মনে হয়, দুই-এক টুকরো কাপড় দিলেই···"

"টুকরো কাপড় অনেক আছে আমার"—বলল পেট্রোভিচ, "টুকরোর কোন অভাব পড়েনি, কিন্তু কাপড়টা এত পচে গেছে যে, জোড়া দিলে থাকবে না। একটা ছুঁচ স্পর্শ করলেই ওটা খসে পড়বে।"

"কিন্তু তুমি তো টুকরোগুলোয় তালি লাগাতে পার।"

"এতে এমন কোন পদার্থ নেই যে তালি টিকে থাকবে। কাপড়টা একেবারে ঝুরঝুরে হয়ে গেছে—জোরে বাতাস বইলেই ওগুলো উড়িয়ে নিয়ে যাবে।"

"তা'হলে তুমি এটাকে শক্ত করে দাও। নিশ্চয়ই এটা···"

"অসম্ভব",—পেট্রোভিচ দৃঢ় স্বরে বলে উঠল, "জামাটা এত খারাপ যে, মেরামতের অযোগ্য। শীতের সময় আপনি ওটাকে কেটে পায়ের আচ্ছাদনী তৈরী করতে পারেন। মোজা একটুও গরম হয় না। জার্মানরা আমাদের ট্যাঁক থেকে আরও কড়ি গলিয়ে নেবার ফিকিরে ওটা আবিষ্কার করেছে (পেট্রোভিচ সুযোগ পেলেই জার্মানদের খিস্তি করে)। আর জামার কথা বললে বলতে হয় একটা নতুন জামাই আপনাকে বানাতে হবে।"

'নতুন' শব্দটা শুনেই আকাকিয়েভিচের চোখের সামনে ধোঁয়ার পর্দা নামল আর মনে হলো, ঘরের মধ্যে সব-কিছুই যেন সাঁতার কাটছে। একমাত্র জেনারেলের ছবি আর কাগজ-আঁটা নস্যির কৌটো ছাড়া আর কিছুই পরিষ্কার ভাবে তার নজরে পড়ল না।

"নতুন!" সে যেন স্বপ্নের ঘোরে প্রশ্ন করে, "কিন্তু টাকা-পয়সা আমার একদম নেই।"

"হ্যাঁ, আমার মনে হয় নতুনই তৈরী করতে হবে"—নিস্পৃহ প্রশান্তির সঙ্গে একই কথার পুনরাবৃত্তি করল পেট্রোভিচ।

"তাই যদি বানাতে হয়···তা'হলে কত···"

"দামের কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ।"

"দেড়শো রুবল বললে কম বলা হয়"—ঠোঁট কামড়ে বেশ অর্থপূর্ণ ভাবে জবাব দিল পেট্রোভিচ। এমনি প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে চেয়েছিল সে। খদ্দেরকে বিহ্বল করে দিয়ে পরে ওর দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চেয়ে দেখবে, তার কথার ফল কি ফলেছে।

"একটা জামার জন্য দেড়শো রুবল!" আকাকিয়েভিচ চীৎকার করে উঠল। জীবনে এই প্রথম চীৎকার করল সে। মিষ্টভাষী বলে তার খ্যাতি ছিল।

"হ্যাঁ"—পেট্রোভিচ উত্তর দিল, "আর ওতেও এমন কিছু ভাল জিনিস হবে না। রেশমের কাজ-করা মার্টেন কলার আর হুড হলে দু'শো রুবল লাগত আপনার।"

পেট্রোভিচের কথা কানে না তুলে সে বলল, "দোহাই পেট্রোভিচ, জামাটা যাতে আরও কিছু দিন চলে, সেই ভাবে মেরামত করে দাও ওটা।"

"তাতে একটুও লাভ নেই, শুধু টাকা আর পরিশ্রম নষ্ট",—পেট্রোভিচ বলল।

আকাকিয়েভিচ একেবারে মুসড়ে পড়ে বেরিয়ে গেল। সে যাবার পর পেট্রোভিচ নিজের ঠোঁট দু'টোকে কঠিন ভাবে চেপে ধরে আরও কিছু কাল দাঁড়িয়ে রইল। সে যে নিজের এবং ব্যবসায়ের মর্যাদাহানি করেনি, তাতে সে খুশী হয়ে ওঠে।

আকাকিয়েভিচ স্বপ্নাচ্ছন্নের মত রাস্তায় চলতে থাকল। মনে মনে বলল, "চমৎকার ব্যবসা নিশ্চয়ই। সত্যি আমি ভাবতে পারিনি যে এটা···ও তা'হলে ঘটনাটা এই ঘটল। ভাবতেই পারিনি শেষটা এমনি দাঁড়াবে···কেই বা পারে?···কি ভীষণ ব্যাপার···!" ভাবতে ভাবতে সে বাড়ীর দিকে না গিয়ে উল্টো দিকে হাঁটতে লাগল। কিছু দূর যেতে না যেতেই একটা নোংরা চিমনী-মোছা ঝাঁটা তার গায়ে পড়ে কাঁধটায় একটা কালো দাগ ফেলল। আরও একটু দূরে একটা আধ-তৈরী বাড়ী থেকে খানিকটা চূণ এসে পড়ল ওর গায়ে। কিন্তু তাতেও ওর হুঁশ নেই। বেয়নেট পাশে রেখে একটা পুলিশ কৌটো থেকে তামাক নিয়ে তার হাতে রাখছিল। তার সঙ্গে ধাক্কা লাগল আকাকিয়েভিচের। ধাক্কা খেয়ে পুলিশটা ধমকে উঠল, "ভূতটা যাচ্ছে কোথায়? ফুটপাথ দিয়ে হাঁটো না কেন?" ধমক খেয়ে হুঁশ এল তার। চারি দিকে তাকিয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো। তখনই সব কিছু তার মনে পড়ল এবং নিজের অবস্থাটা বুঝতে পারল ঠিকমত ভাবে। নিজের সঙ্গে নিজে বাক্যালাপ সুরু করল সে—ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাক্যে নয়, বুদ্ধিমান বন্ধুর কাছে ব্যক্তিগত ভাবে উপদেশ প্রার্থনা করার সময় যেমন পরিষ্কার যুক্তির সঙ্গে কথা বলতে হয়, ঠিক তেমনি ভাবে। "নাঃ, আজ পেট্রোভিচের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। সে এখন···সে তার স্ত্রীর কাছে মার খেয়েছে নিশ্চয়ই। রবিবার সকালেই বরং ওর কাছে যাওয়া যাবে। সে সময় মদ খেতে তার টাকার দরকার স্ত্রী তাকে মদ খাবার পয়সা দেবে না। শুধু কুড়িটা কোপেক তার হাতে গুঁজে দিলেই সে নরম হয়ে যাবে এবং তার পর জামাটা···" এই ভাবে আকাকিয়েভিচ নিজে নিজেই বিচার-বিশ্লেষণ করে সাহস সঞ্চয় করবার চেষ্টা করল। আর ঠিক রবিবারে পেট্রোভিচের স্ত্রীকে যেই সে বাড়ী থেকে বেরুতে দেখল, আর অমনি সোজা হাজির হলো গিয়ে দর্জির কাছে। বলে রাখা ভাল, শনিবার রাতে মদ খেয়ে পেট্রোভিচ তখনও তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল। এক চোখ ঘুরিয়ে মাথা নত করল সে, কিন্তু যখনই সে তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারল, তখনই শয়তানে পাওয়া মানুষের মত বলে উঠল, "পারব না আমি। তোমাকে নতুন একটা বানাতেই হবে।"

আকাকিয়েভিচ তার হাতে কুড়িটা কোপেক গুঁজে দিল।

পেট্রোভিচ বলল, "ধন্যবাদ মশাই। আমি আপনার স্বাস্থ্য কামনায় এক গ্লাস পান করব। আর জামার জন্য ব্যস্ত হবেন না আপনি। এটা আর কোন কাজেই লাগবে না। আপনার জন্য নতুন দেখে একটা তৈরী করে দেব নিশ্চয়ই।"

আকাকিয়েভিচ ফের সেই মেরামতের কথা বলল, কিন্তু পেট্রোভিচ সে কথা কানেই তুললো না।

"আপনাকে একটা নতুন জামা তৈরী করে দেব।"—সে বলল, "আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। যত দূর সম্ভব ভাল করে বানাতে চেষ্টা করব। আমি নতুন ফ্যাসান তৈরী করতে পারি—কলারে রূপালি কাজ করা।"

আকাকিয়েভিচ নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল, কারণ সে বুঝতে পারল, নতুন একটা জামা তৈরী করতে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু কি করে সে বানাবে? টাকা পাবে কোথায়? সামনের ছুটিতে বোনাসটা পাবে অবশ্য, কিন্তু সেই টাকাও তো ভাগ করে খরচ করার প্ল্যান ছকা হয়ে গেছে। নতুন ট্রাউজার চাই তার। মুচিকে জুতো মেরামতের টাকা দিতে হবে। এক কথায় বলা চলে, টাকা ক'টা সবই খরচ হয়ে যাবে; আর বড়কর্তা যদি দয়া ক'রে চল্লিশ রুবলের জায়গায় পঁয়তাল্লিশ অথবা পঞ্চাশ রুবল দেন, তা'হলেও এত কম টাকা হাতে থাকবে যে, জামা তৈরীর ব্যাপারে সেটা হবে সমুদ্রে বারিবিন্দুর মত। যদিও সে জানে যে পেট্রোভিচ মাঝে মাঝে এমন দাম চেয়ে বসে যে, তার স্ত্রীও অবাক হয়ে চিৎকার করে বলতে বাধ্য হয়, 'তুমি কি উন্মাদ, নির্বোধ? কোন দিন বিনা পয়সায় কাজ করছ আর কোন দিন এমন দাম চাইছ যা তোমার দামের চেয়েও বেশী।"

আশী রুবলে পেট্রোভিচ ওটা বানাবে কিন্তু আশী রুবলই বা কোথায় পাওয়া যাবে? অর্দ্ধেকটা হয়ত জোগাড় করতে পারে সে—হয়ত তার চেয়েও একটু বেশীই পারে—কিন্তু আর অর্দ্ধেকটা আসবে কোথা থেকে? পাঠকের প্রথমে জানা দরকার, প্রথম অর্দ্ধেকটা কোথা থেকে আসবে। প্রতি রুবল ব্যয়ের জন্য আকাকিয়েভিচের দু' কোপেক জমানো অভ্যাস। সেটা সে একটা বড় বাক্সের মধ্যে রাখে—ছ'মাস অন্তর ভাঙ্গিয়ে রূপোর টাকায় পরিণত করে। এই ভাবে বহু বছর ধরে সে চল্লিশ রুবল জমাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু অবশিষ্ট টাকাটা যোগাড় করবে কোত্থেকে? এই সময় বিভ্রান্ত হয়ে সে ঠিক করল যে, এক বছরের জন্য সে তার সাধারণ ব্যয় হ্রাস করবে। সন্ধ্যার চা'টা সে বন্ধ করতে পারে আর মোমবাতি না হলেও তার চলে। সন্ধ্যায় কাজ-কর্ম থাকলে সে বাড়ীউলীর ঘরে যেতে পারে। রাস্তার খোয়ার উপর দিয়ে সে খুব আস্তে আস্তে হাঁটবে—আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে চলবে সে, যাতে জুতোর চামড়া না ক্ষয় হয়। কাপড়-জামা দেরী করে কাচাবে এবং যত দিন সম্ভব সেগুলো পরিষ্কার রাখবার জন্য সন্ধ্যার সময়ই সে তার কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে পুরোনো সুতির ড্রেসিং গাউনটা পরবে।

সত্যি কথা বলতে কি, এই দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে তাল রাখতে তার বেশ কষ্ট হতে লাগল প্রথমটায়, কিন্তু আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেল। ক্ষুধা-ভরা সন্ধ্যাগুলোর কাছে নতি স্বীকার করে নিত সে—সান্ত্বনা-স্বরূপ ভবিষ্যৎ ক্লোক (জামা)-টার চিন্তায় কিছু আধ্যাত্মিক সুখ পেত। সেই ক'টা দিন ওর মনে হত, যেন জীবনটা ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠেছে—যেন তার বিয়ে হয়েছে—যেন সারা জীবন একই পথ

মাড়িয়ে-চলা কোন প্রিয়বন্ধু সব সময় রয়েছে তার পাশে-পাশে। এ বন্ধু আর কেউ নয়—এ তার সেই মজবুত লাইনিং আর মোটা প্যাড জড়ান ক্লোকটি। আগের চেয়েও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে সে, আরও স্থির সঙ্কল্প দেখা দেয় তার মনে—আদর্শ-প্রণোদিত মানুষের মত। তার মুখ এবং চাল-চলন থেকে সন্দেহ এবং সংশয়তার ছাপ মুছে গেল। মাঝে মাঝে তার চোখে আগুন জ্বলে উঠত, মস্তিষ্কে ভেসে বেড়াত দুঃসাহসী এবং বেপরোয়া সব চিন্তা। সে কি মার্টেন কলার লাগানো জামার অধিকারীদের সমপর্য্যায়ে হয়ে উঠতে পারে না? এই চিন্তায় বিমনা হয়ে সে একবার প্রায় তার লেখা ভুল করে ফেলেছিল। কিন্তু 'এ রাম' উচ্চারণ করে নিজেকে সামলে নেয় এবং দুই হাতে ক্রস-চিহ্ন আঁকে। মাসে অন্তত একবার সে পেট্রোভিচের সঙ্গে দেখা করতো তার নতুন ক্লোকটার সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য। প্রশ্ন করত, কোথায় সে কাপড় কিনবে, কি রকম রং হবে, কত দাম তাকে দিতে হবে ইত্যাদি। প্রতিদিন সে এই ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরত যে, এক দিন সে সত্যিই কাপড় কিনে ক্লোক বানাতে দেবে। অপ্রত্যাশিত দ্রুতগতিতে কেটে যেতে লাগল সময়। স্বপ্নাতীত ভাবে আকাকিয়েভিচ অফিসের কর্ত্তার কাছ থেকে চল্লিশ রুবলের বদলে পেয়ে গেল ৬০ রুবল। লোকটা কি জানতো যে তার একটা নতুন ক্লোক দরকার, অথবা এটা শুধু ঘটনাচক্রের মিল? যাই হোক, আকাকিয়েভিচের নিজের কাছে আরও কুড়ি রুবল জমে ছিল। এ ঘটনায় ব্যাপারটা আরও ত্বরান্বিত হলো। আরও দু'-তিন মাস যদি সে আধ-পেটা খেয়ে থাকে তা'হলে তার আশী রুবল জমবে। স্বভাবত শান্ত হৃদয়টি তার দ্রুত তালে চলতে আরম্ভ করল এবং পরদিনই সে গেল পেট্রোভিচের কাছে। ছ'মাস আগে স্থির করা এবং প্রতি মাসে দর-দস্তর করা কিছু ভাল কাপড় তারা কিনে ফেলল। পেট্রোভিচ নিজেই বলল, এর চেয়ে ভাল কাপড় আর পাওয়া যাবে না। লাইনিং-এর জন্য তারা ভাল মজবুত সাটিন কিনল, কারণ পেট্রোভিচ বলল যে, সাটিন রেশমের চেয়েও সুন্দর মজবুত এবং চকচকে। দাম বেশী বলে বলে মার্টেনের (একজাতীয় বেজী) চামড়ার প্রশ্নই উঠল না। তার বদলে পছন্দ করা হলো বেরালের চামড়া—দোকানের সব চেয়েও ভালোটা। সেটাকে দূর থেকে দেখলে অনেকটা মার্টেনের চামড়ার মতই দেখায়। ক্লোকটা বানাতে পেট্রোভিচের দু' সপ্তাহ লাগল; পেট্রোভিচ নিজের প্যাটার্ণ অনুযায়ী আগাগোড়া ওটাকে যে ভাবে সেলাই করল, তাতে ওর চেয়েও কম সময়ে তৈরী হতে পারে না। মজুরী চাইল সে বিশ রুবল।

পেট্রোভিচ যেদিন শেষ পর্য্যন্ত এনে হাজির করল জামাটা, সেদিন স্মরণ করা শক্ত, তবে আকাকিয়েভিচের জীবনে দিনটা সব চেয়েও আনন্দময়। সকালে আকাকিয়েভিচের অফিসে বেরুবার ঘণ্টা খানেক আগে জামাটা নিয়ে এসেছিল পেট্রোভিচ। এর চেয়েও উপযুক্ত মুহূর্ত্তে আসতে পারত না জামাটা, কারণ সেই দিনই তুষারপাত য় এবং আবহাওয়া যে আরও শীতল হবে, তার লক্ষণই খা যায়। ভাল দর্জির মত পেট্রোভিচ নিজেই নিয়ে এল মাটা। আকাকিয়েভিচ তাকে কখনও এমন গুরুগম্ভীর খনি। রিপুকার থেকে সে যে নতুন পোষাক বানানোর দর্জিতে ত হয়েছে, এই কর্ম-মর্য্যাদা সম্পর্কে সেদিন সে যেন সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। সদ্য-ধোয়া ঝাড়নে জড়ানো ছিল ক্লোকটা। ঝাড়নের ভিতর থেকে ক্লোকটা বার করে সে নিজের ব্যবহারের জন্য ঝাড়নটা পকেটে পুরল। ক্লোকটা তুলে ধরে গর্ব্বিত দৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকালো সে। তার পর দুই হাত দিয়ে ওটাকে দক্ষতার সঙ্গে ধরে আকাকিয়েভিচের কাঁধের উপর চাপিয়ে দিল। পেছনের দিকে পালিস করে দিল ঘসে-ঘসে। শেষে নিপুণ ভাবে পরিয়ে দিল আকাকিয়েভিচের গায়। আকাকিয়েভিচ নিজের বয়সের কথা ভেবে হাতায় হাত ঢুকিয়ে পরবার চেষ্টা করল। পেট্রোভিচ তাকে সাহায্য করল। নিজের হাতের কাজের প্রশংসা করে পেট্রোভিচ বলতে ছাড়ল না যে, দামটা সে কমই নিয়েছে, কারণ আকাকিয়েভিচকে সে অনেক দিন থেকে জানে আর তা ছাড়া সে বাজে রাস্তায় সাইন-বোর্ডহীন অবস্থায় থাকে বলে লোকে তার কদর করে না। নেভস্কী প্রসপেক্টের দর্জি হলে কাজটার জন্য পঁচাশী রুবল নিত। এ নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে আকাকিয়েভিচের ছিল না। তাছাড়া পেট্রোভিচ যে সব বড় বড় টাকার অঙ্কের কথা বলতে ভালবাসে, তা আবার ওকে আতঙ্কগ্রস্ত করে। সে ওকে টাকা দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে নতুন জামা পরে অফিসে রওনা হলো। পেট্রোভিচ গেল তার পেছন পেছন। ক্লোকটার প্রশংসা করবার জন্য রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে পড়ল সে, তার পর সঙ্কীর্ণ একটা গলি দিয়ে ছুটে রাস্তার অপর পারে গেল ক্লোকটাকে সামনাসামনি পূরো চোখে দেখবার জন্য।

—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত।

—আসুন আপনারা দলে দলে, একতা চাই, কংগ্রেস একে ফুটো জীর্ণ তরী, আসুন সকলে একসঙ্গে আমরা বিপদ-সমুদ্র পার হয়ে চলে যাব!!!
—(জনৈক শ্রোতা)—কোথা, জলের তলায়?

ইতিমধ্যে আকাকিয়েভিচ খুশী-মনে রাস্তা বেয়ে চলতে সুরু করেছে। প্রতি মুহূর্তেই সে অনুভব করছিল যে, তার কাঁধে রয়েছে ক্লোকটা। মাঝে মাঝে হাসছিল আত্মতুষ্টিতে। ছু'টি সুবিধা এসেছে জামাটার সঙ্গে—প্রথমত, ওটা গরম : দ্বিতীয়ত, ওটা পরে গভীর তৃপ্তি পাচ্ছে সে। রাস্তার কোন দিকে না তাকিয়েই অফিসে গিয়ে পৌছালো এবং ক্লোকটা খুলে পরীক্ষা করে আর্দালীর হাতে দিয়ে দিল। বলে দিল, যেন বিশেষ যত্ন করে রাখা হয় ওটাকে। স্বভাবতই অফিসের সব লোকরা আকাকিয়েভিচের নতুন ক্লোকের কথা এবং পুরোনো ড্রেসিং গার্ডনের অন্তর্ধানের কাহিনী শুনল এবং প্রত্যেকেই ছুটে এলো ওটা দেখতে। সকলেই প্রশংসা করল এবং আকাকিয়েভিচকে অভিনন্দন জানালো। প্রথমটায় আকাকিয়েভিচ একটু হাসল, পরে বিপন্ন বোধ করল। যখন সকলে জিদ ধরল যে, এই উপলক্ষে তাকে একটা পার্টি দিতে হবে, তখন তার মাথাটি একেবারেই ঘুরে গেল। সে বুঝতে পারল না কি বলবে, কি করে জানাবে নিজের অক্ষমতা। মুখটা তার লাল হয়ে উঠল। সে এই বলে বোঝাতে চাইল যে ওটা আদৌ নতুন ক্লোক নয়, কিছু দিন আগের। তখন ওদের মধ্যে বড়কর্তার এক জন সহকারী—নিজে যে ফোতো বাবু নয়—সেটা প্রমাণ করার জন্য বলল, "আচ্ছা বেশ, দেখুন, আজ রাতে আমি আর আকাকিয়েভিচ একটা পার্টি দেব। আমার বাড়ীতে চা খেতে আসবেন আপনারা সবাই, আজ আমার বাড়ীতে একটি পর্বও আছে।"

অন্যান্য কেরাণীরা তৎক্ষণাৎ তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রহণ করল তার নিমন্ত্রণ। আকাকিয়েভিচ প্রত্যাখ্যান করতে উদ্যত হলো কিন্তু ওরা বলল, সেটা হবে অসভ্যতা, রূঢ়তা ইত্যাদি। সুতরাং নিরুপায় হয়ে সেও গ্রহণ করল নিমন্ত্রণ। সে যে সন্ধ্যায় আবার পরবে তার ক্লোকটা তাই ভেবে আরাম বোধ করল। দিনটা স্মরণীয় আকাকিয়েভিচের কাছে। খুশী-মনে বাড়ী ফিরে জামাটা খুলে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখল। আর একবার পরীক্ষা করে দেখল ওর কাপড় আর সেলাই-ফোড়াই। পুরোনো ক্লোকটার সঙ্গে ওটাকে মিলিয়ে দেখে না হেসে থাকতে পারল না—পার্থক্যটা এতই বেশী। খাবার সময়ও সে মাঝে মাঝে ড্রেসিং গাউনের অবস্থাটা মনে করে হাসল। খাওয়া শেষ হলে সে কাগজপত্র নকল করতে না বসে সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় বিছানায় শুয়ে রইল। নির্দিষ্ট সময়ে ক্লোকটা পরে সে নেমে এল রাস্তায়। প্রথমটায় সে কতকগুলো অন্ধকার নির্জন রাস্তা ধরে চলল, কিন্তু সেই কেরাণী ভদ্রলোকের বাড়ীর কাছে আসতেই রাস্তাগুলো উজ্জ্বল আর সজীব হয়ে উঠল। অনেক লোক রাস্তায় চলা-ফেরা করছে। তাদের মধ্যে সুন্দর হাল-ফ্যাসানের পোষাক-পরা মেয়ে এবং পুরুষরা রয়েছে। আশে-পাশে কোন ওছা লোক নেই। লাল মখমলের টুপি-পরা স্মার্ট ড্রাইভার ভালুকের কম্বলে গা ঢেকে রং-করা স্লেজ নিয়ে উড়ে চলেছে বরফের উপর দিয়ে। কড়্-কড়্ শব্দ হচ্ছে চাকায়—গাড়ীর বসবার আসনগুলি সুন্দর। আকাকিয়েভিচ অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে রইল এ সবের দিকে। অনেক বছর ধরে সে রাতে বাড়ীর বার হয়নি। একটি আলোক-সজ্জিত দোকানের শো-কেসের সামনে দাঁড়ালো সে। শো-কেসে একটা ছবি ছিল। এক সুন্দরী তার জুতো ছুঁড়ে দিতে কাছে দাঁড়িয়ে আছে গালপাট্টা দাড়ী আর অধরের নীচে এক গুচ্ছ চুলওয়ালা একটি পুরুষ। আকাকিয়েভিচ একটু হেসে মাথা নাড়ল। হাসল কেন সে? অদ্ভুত অস্বাভাবিক কিছু দেখেছিল কি সে—হৃদয়ের গভীরে মানুষ যা বয়ে বেড়ায় তারই আভাস পেয়েছিল কি সে? কিম্বা হয়ত সরকারী দপ্তরখানার অধিকাংশ কেরাণীর মত সে বলেছিল, "ফরাসীদের কাছে আর কি আশা করতে পার তুমি? তারা না করতে পারে এমন কাজই নেই।" কিন্তু সে সম্ভবত কিছুই ভাবেনি। অপর মানুষের আত্মার গভীরে প্রবেশ করা যায় না তো।

অবশেষে সে কেরাণী ভদ্রলোকের বাড়ী পৌছোলো। ফ্লাটটা তেতলায়। সিঁড়ির উপর একটা আলো ছিল। ঘরে ঢুকেই সারি সারি চটির সম্মুখীন হলো আকাকিয়েভিচ। তার মধ্যে ঘরের মাঝখানে টগবগ করে ফুটছিল সামোভার (এক প্রকার পানীয়)। পাশের ঘর থেকে মিলিত কণ্ঠের চিৎকার উঠছিল। দরজা খোলার সাথে সাথে সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। এক জন ভৃত্য একটি ট্রে-ভর্তি খালি গেলাস নিয়ে বাইরে বেরোলো। নিমন্ত্রিতের দল তা'হলে সত্যিই এসেছে এবং প্রথম কাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে। জামাটা ঝুলিয়ে রেখে ঘরে ঢুকল আকাকিয়েভিচ। লোক-জন, পাইপ, মোমবাতি, তাসের টেবল ঝলসে উঠল তার চোখে। চারি পাশের চীৎকার আর চেয়ার ঠেলাঠেলির শব্দে কানে লাগল তালা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঘরের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে কিন্তু দলের নজর পড়ে গেল। সবাই তাকে চেঁচিয়ে সম্বর্দ্ধনা জানালো। সকলে মিলে আবার হলে ঢুকল তার ক্লোকটা দেখতে। তাসের টেবলের আকর্ষণ বেশী হওয়ায় সবাই ভুলে গেল ওর এবং ওর ক্লোকের কথা। এই গোলমাল, ভীড়, কথাবার্ত্তা সবই অপূর্ব মনে হয় ওর কাছে। নিজের হাত-পা এবং নিজেকে নিয়ে কি যে সে করবে, ভেবে পায় না। তাসের টেবলে বসে তাস এবং খেলোয়াড়দের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে অবিলম্বেই হাই তুললে লাগল। সে অবসাদ বোধ করতে লাগল, কারণ অন্য দিন অনেক আগেই সে শুয়ে পড়ে। গৃহকর্তার কাছে বিদায় নিতে চেয়েছিল কিন্তু অন্যরা ছাড়ল না। তারা বলল, নূতন ক্লোকের উদ্দেশে শ্যাম্পেন না খেয়ে ছাড়বে না। ঘণ্টাখানেক বাদে খাবার দেওয়া হলো—ঠাণ্ডা ভেড়ার মাংস, প্যাটিস, মাংসের পুর-দেওয়া বড়া আর শ্যাম্পেন। আকাকিয়েভিচ ছু' গ্লাস টানতে বাধ্য হলো। তার'পরই ঘরের সব-কিছুই আরও বেশী রঙদার হয়ে উঠল। তবুও সে ভোলেনি যে, রাত বারোটা বেজে গেছে এবং অনেক আগেই তার বাড়ী ফেরা উচিত ছিল। গৃহস্বামী তাকে আটকে রাখতে পারে এই আশঙ্কায় নিঃশব্দে সরে পড়ে ক্লোকটার খোঁজ করতে গেল। দুর্ভাগ্যক্রমে সে দেখল ক্লোকটা মাটিতে পড়ে আছে। সেটাকে ঝেড়ে ধুলো-বালি-মুছে করে গায়ে চাপিয়ে দিল এবং সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রাস্তায় বাইরে তখনও আলো ছিল। ছোট-খাট ছু'-একটা দোকান তখন খোলা ছিল। সেখানে যত সব ছোটলোকের আড্ডা। ব দোকানের ভিতরে আলো দেখা যাচ্ছিল। সেখানে চাকর-চাকরাণী নিশ্চয়ই তাদের কর্তা-গিন্নীদের নিয়ে গাল-গল্প করছিল এরা কোথায় থাকে না থাকে কর্তা-গিন্নী সে-সব খবর রা

বড় বড় পা ফেলে চলতে যাবে, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক হঠাৎ কোথেকে এসে ওকে ধাক্কা মেরে বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে গেল। স্ত্রীলোকটির প্রতিটি অঙ্গ সজীব বলে মনে হলো। আকাকিয়েভিচ থেমে গেল, তার পর আস্তে আস্তে পথ হাঁটতে লাগল। এত তাড়াতাড়ি সে যে কি করে পথ হাঁটছিল, সে কথা ভেবে সে নিজেই অবাক হয়ে যায়। শীগ্‌গিরই সে পৌঁছে গেল নির্জ্জন রাস্তায়,—দিনের বেলায়ও যেগুলো থাকে জনশূন্য। রাস্তাগুলোকে আরও নির্জ্জন এবং অন্ধকার বলে মনে হলো। রাস্তার বহু দূর-দূর অন্তর একটা করে আলো। তেল নিশ্চয় পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। কাঠের বাড়ি আর বেড়া নজরে পড়ে কিন্তু জনপ্রাণী দেখতে পাওয়া যায় না। মাটির উপর বরফ চিকচিক করে অন্ধকার নিস্তব্ধ ছোট ছোট বাড়ীগুলোকে উজ্জ্বল করে আছে। একটা বড় পার্কের সামনে এসে উপস্থিত হলো সে। পার্কের ওধারের বাড়ীগুলো ঝাপসা দেখা যাচ্ছিল। জায়গাটা ভীষণ নির্জ্জন আর জনমানবহীন। দূরে পাহারাওয়ালার ঘরে জ্বল্‌জ্বল্ করছিল একটা আলো, অনেক—অনেক দূরে যেন ওটা পৃথিবীর আর এক প্রান্তে অবস্থিত। আকাকিয়েভিচের সাহস কমে এল। শঙ্কিত চিত্তে মনের মধ্যে বিপদের আভাস নিয়ে পার্কটা পাড়ি দিতে আরম্ভ করল সে। দৃষ্টি আশে-পাশে ঘুরতে লাগল। সে যেন মহাসমুদ্রের মধ্যে পড়েছে। "নাঃ, চোখ বুজে থাকাই ভাল"—ভাবল সে এবং চোখ বুজেই হাঁটতে লাগল। পার্কের অপর পারে এসেছে কি-না দেখবার জন্য যখন সে চোখ খুলল, তখন দেখতে পেল, সে এক দল দাড়িওয়ালার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সে স্পষ্ট দেখতে পেল না। তার চোখের সামনে কুয়াসা ঘনিয়ে উঠল এবং বুকটা ধক্‌ধক্ করে উঠল।

"ক্লোকটা আমার"—ঘোষিত হলো বজ্রকণ্ঠে এবং আকাকিয়েভিচের কলার চেপে ধরা হলো। আকাকিয়েভিচ সাহায্যের আশায় চীৎকার করবার উদ্দেশ্যে মুখ খুলতে যাবে, অমনি একটা ঘুষি এসে পড়ল সেখানে। এক জন হুমকি দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "এত সাহস তোমার!"

আকাকিয়েভিচ বুঝল ক্লোকটা তার গা থেকে খুলে নেওয়া হচ্ছে। তার পর একটা লাথি খেয়ে পেছনে বরফের মধ্যে ছিটকে পড়ল সে···তার পর সব ঠাণ্ডা! কয়েক মিনিট বাদে যখন তার জ্ঞান ফিরে এল তখন সে উঠে দাঁড়িয়ে চারি দিকে তাকিয়ে দেখল। কাউকেই দেখা গেল না। তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এবং ক্লোকটা উধাও হয়েছে বুঝতে পেরে সে সাহায্যের জন্য চেঁচাতে লাগল, কিন্তু তার গলার স্বর এতই ক্ষীণ যে পার্কের অপর পারে পৌঁছোচ্ছিল না। বেপরোয়া হয়ে পাগলের মত চেঁচাতে চেঁচাতে সে পার্কের ভিতর দিয়ে পাহারাওয়ালার ঘরের দিকে ছুটতে লাগল। সেখানে এক জন পুলিশ বন্দুকে ভর দিয়ে বসে ভাবছিল, কোন্ হতভাগাটা তার দিকে ছুটে আসছে। আকাকিয়েভিচ ওর দিকে ছুটে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ওকে গাল দিতে লাগল যে, ডিউটি না দিয়ে ও নিজের ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। পাহারাওয়ালা বলল যে, সে দেখেছে পার্কের মাঝখানে দু'জন লোক ওকে থামিয়েছে কিন্তু সে ভেবেছিল ওরা ওর বন্ধু। তাই ওদিকে আর নজরই দেয়নি। সে বলল, ওকে গাল না দিয়ে আকাকিয়েভিচ যেন কাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে যায়। তিনি ক্লোকটা খুঁজে বার করতে সাহায্য করতে পারেন।

অতি দুরবস্থার মধ্যে আকাকিয়েভিচ বাড়ী পৌঁছোলো। তার যে চুলটুকু কপাল এবং ঘাড়ের কাছে ছিল, সেটুকুও উস্কোখুস্কো হয়ে গিয়েছিল। আর পোষাক-পরিচ্ছেদে জড়িয়েছিল বরফ। দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিতেই বাড়ীউলী বিছানা ছেড়ে উঠে তাড়াহুড়োয় এক পাটি চটি জুতো ফেলেই শ্লীলতার সঙ্গে বুকের উপর রাত্রিবাসটা চেপে ধরে দরজা খুলে দিল। আকাকিয়েভিচকে দেখে আতঙ্কে এক পা পিছিয়ে গেল। ঘটনাটা সব শুনে সে হাত ছুঁড়ে আকাকিয়েভিচকে পরামর্শ দিল তার এক পরিচিত ইন্‌স্‌পেক্টরের কাছে যেতে, কারণ পাহারাওয়ালাটা সম্ভবত কিছুই করবে না। তার আগেকার রাঁধুনী এ্যানা এখন এই ইন্‌স্‌পেক্টরের পরিবারে নার্সের কাজ করে। বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় সে ওঁকে প্রায়ই দেখে—প্রতি রবিবার গীর্জাতেও ওঁর সঙ্গে দেখা হয়। প্রার্থনার সময় তিনি সকলের উপর সদয় দৃষ্টি বুলিয়ে থাকেন এবং তিনি নিশ্চয় এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বাড়ীউলীর কাছে সমস্যা সমাধানের পথ পেয়ে আকাকিয়েভিচ বিমর্ষ ভাবে নিজের ঘরে চলে গেল। যারা পরের দুঃখে দুঃখী তারাই শুধু বুঝতে পারবে, রাতটা ওর কি ভাবে কেটেছিল। পরদিন ভোরে উঠেই সে রওনা হলো ইন্‌স্‌পেক্টরের বাড়ীর দিকে। গিয়ে শুনল তিনি তখনও শুয়ে। এগারোটার সময় আবার তাঁর বাড়ী গিয়ে শুনল, তিনি বাড়ী নেই। মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় আবার গেল সে, কিন্তু কেন সে এসেছে সে কথা না শুনে কেরাণীরা তাকে ঢুকতে দিতে রাজি হলো না। শেষে তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙল। আকাকিয়েভিচ জীবনে এই প্রথম আত্মবিশ্বাসে ভর করে দৃঢ় ভাবে বলল যে, সে নিজেই ইন্‌স্‌পেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে চায়। কোন সরকারী কাজে একটি সরকারী বিভাগ থেকে এসেছে সে এবং তাকে ঢুকতে নিষেধ করা চলবে না। যে তাকে বাধা দেবে তাকে তার ফল ভোগ করতে হবে। আরও এই ধরণের কথা বলল সে। এ কথার পর কেরাণীদের আর কিছু বলবার রইল না। তাদের মধ্যে এক জন গেল ইন্‌স্‌পেক্টরের কাছে। ইন্‌স্‌পেক্টর সন্দিগ্ধ ভাবে শুনলেন ক্লোক চুরির কাহিনী। ঘটনার আসল বিষয়টার দিকে লক্ষ্য না দিয়ে তিনি আকাকিয়েভিচকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন, কেন সে দেরীতে বাড়ী ফিরছিল? সে কি অস্থানে-কুস্থানে গিয়েছিল? আকাকিয়েভিচ এমন বিব্রত বোধ করল যে, ক্লোকের কথাটা বলেছে কি না, সে সম্বন্ধে সচেতন না হয়েই বিদায় নিল। জীবনে এই প্রথম সে অফিস কামাই করল। পরদিন পুরোনো ক্লোকটা পরে শাদা ভূতের মত বেশে অফিসে গেল সে। পুরোনো ক্লোকটা আগের চেয়েও অনেক বিশ্রী দেখাচ্ছিল।

ক্লোক চুরির ব্যাপারটা তার সহকর্মী বন্ধুদের সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করল। তবে এ ব্যাপারেও রসিকতা করার মত দুই-এক জন লোকের অভাব ঘটল না। ঠিক হলো, নতুন একটা ক্লোকের জন্য চাঁদা তোলা হবে। কিন্তু চাঁদা উঠল সামান্যই, কারণ কেরাণীদের সকলেরই পকেট-টান। অফিসের কর্তার প্রতিকৃতি টাঙানো হবে সে জন্য চাঁদা চাই, কর্তার এক বন্ধু বই লিখেছে সে জন্য চাঁদা চাই এবং এই রকম আরও অনেক চাঁদাই কেরাণীদের দিতে হয়। এক জন দয়াপরবশ হয়ে আকাকিয়েভিচকে ভাল একটা যেতে একেবারে নিষেধ করে দিল, কারণ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যদি এই বিভাগকে খুশী করবার জন্য ক্লোকটা খুঁজে বারও করে, তা'হলেও ক্লোকটার মালিকানার অকাট্য প্রমাণ না দিতে পারলে সেটা ফেরৎ পাবে না আকাকিয়েভিচ। তার বদলে সে ওকে কোন এক জন "বিখ্যাত লোকের" কাছে আবেদন জানাতে বলল—যিনি ঠিক মত জায়গায় লিখবেন অথবা দেখা করে ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি ফয়সালা করবেন। অন্য কোন উপায় না দেখে আকাকিয়েভিচ তাঁর কাছে যাবে বলে স্থির করল। তিনি কে এবং তাঁর পদ-মর্যাদা কেমন—আজ পর্যন্ত এটা রহস্যাবৃত হয়ে আছে। তবে তিনি যে অতি সম্প্রতি 'বিখ্যাত' হয়েছেন এবং আগে খুব নগণ্যই ছিলেন, সে কথা বলে রাখা ভাল। যাই হোক, অন্যান্য 'বিখ্যাত' লোকদের তুলনায় এখনও তাঁর প্রতিষ্ঠা কম। এই 'বিখ্যাত' ব্যক্তিটি নানা ভাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা বাড়াবার চেষ্টা করছেন। অফিসে এলে তাঁর নিম্নপদস্থদের সিঁড়ির উপরই তাঁকে সেলাম ঠুকতে হয়। সরাসরি তাঁর কাছে কোন রিপোর্ট দাখিল করার হুকুম নেই। তাঁর কাছে রিপোর্ট পৌঁছোবার আগে কঠিন নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। কলেজিয়েট রেজিষ্ট্রারকে ডিষ্ট্রিক্ট সেক্রেটারীর কাছে রিপোর্ট করতে হয়, ডিষ্ট্রিক্ট সেক্রেটারীকে টাইটুলার সেক্রেটারীর কাছে—ঠিক এই ভাবে অনেক পথ ঘুরে সেটা পৌঁছোয় সেই "বিখ্যাত ব্যক্তি"র কাছে। এই ভাবে আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি রুশিয়ায় আজকাল অনুকরণের ছোঁয়াচ লেগেছে। প্রত্যেক নিম্নপদস্থ ব্যক্তি তার ওপরওয়ালার অনুকরণ করে এবং তাঁর কার্য্যাবলী অনুসরণ করে।

শোনা যায়, এক জন টাইটুলার কাউন্সিলর পদোন্নতির ফলে একটি ছোট বিভাগের কর্তা হন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর ঘরের একটা অংশ নিজের জন্য পার্টিশান করে নিয়ে "দর্শকদের কক্ষ" নাম দেন। দু'জন দারোয়ান উর্দি পরে দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকত এবং কেউ ওঁর ঘরে ঢুকতে চাইলে—ঘরটা অবশ্য এতটুকু যে একখানা সাধারণ লিখবার ডেস্কও আঁটে কি না সন্দেহ—তারা তাকে সেখানে ঢোকাতো। সেই বিখ্যাত ব্যক্তির আইন-কানুনও এমনি আড়ম্বরপূর্ণ —যদিও বলা চলে খানিকটা জটিল। মোটের উপর কঠোরতাই হচ্ছে তার মূল কথা।

"কঠোরতা, কঠোরতা, কঠোরতা"—কোন লোককে কিছু বলার আগে তার মুখের দিকে গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে তিনি প্রথমেই এই কথা বলতেন, যদিও কঠোরতা এবং কড়াকড়ির প্রয়োজন ছিল খুবই কম। তাঁর অফিসের জন-দশেক কেরাণী অহর্নিশি তটস্থ হয়ে থাকত এবং দূর থেকে তাঁর কথা শোনা গেলেই কাজ ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো। যতক্ষণ না তিনি ঘরের মাঝখান দিয়ে চলে যেতেন, ততক্ষণ বসত না তারা। অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর প্রতিদিনের কথাবার্তায় একটা রুক্ষ কঠিন ভাব বিরাজ করত এবং সাধারণত তিনটে কথাই তিনি প্রয়োগ করতেন—সাহস করছ কেমন করে? জান, কার সাথে কথা বলছ? বুঝছো, তোমার সামনে কে? অন্তরে তিনি সদাশয় ছিলেন। বন্ধু-বান্ধবের উপকার করতে সব সময়ই প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু জেনারেলের পদ তার মাথা খারাপ করে দিয়েছিল সমস্তরের লোকের কাছে তিনি বেশ অমায়িক এবং বুদ্ধিমান, কি

তাঁর আচরণও অসঙ্গত হয়ে উঠত। তাঁর অবস্থা করুণা উদ্রেক করে। কোন রকম মজার কথাবার্তা অথবা আড্ডায় যোগ দেওয়ার প্রবল ইচ্ছে মাঝে মাঝে জেগে উঠত তাঁর মনে, কিন্তু মর্যাদা-হানির আশঙ্কায় তিনি অটল ও সংযত হয়ে থাকতেন। ফলে সব সময়ই তাঁকে নীরব হয়ে থাকতে হত। মাঝে মাঝে দু'-একটা কথা উচ্চারণ করতেন মাত্র। এই ভাবে তিনি লোকের কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিলেন।

এই রকম এক জন বিখ্যাত ব্যক্তির কাছে আমাদের আকাকিয়েভিচ এক অশুভ এবং অসুবিধাজনক মুহূর্তে এসে হাজির হলো। বিখ্যাত ব্যক্তিটি তখন তাঁর প্রাইভেট রুমে এক জন পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলেন। বহুকাল না-দেখা বন্ধুটি তখন সবে মাত্র গ্রাম থেকে এসেছেন, এমন সময় আকাকিয়েভিচের আগমনের কথা ঘোষণা করা হলো।

—"কে সে?"—সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

—"সরকারী দপ্তরখানার এক জন কেরাণী।"—উত্তর এলো।

—"আচ্ছা, তাকে অপেক্ষা করতে বল। এ রকম সময় আমি কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করি না।"

বলে রাখা ভাল, বিখ্যাত ব্যক্তি মিথ্যে কথা বললেন। এই সময়েই তিনি লোক-জনের সঙ্গে দেখা করেন। বন্ধুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও শেষ হয়েছিল অনেক আগেই। এখন বন্ধুকে বোঝাতে চাইছেন যে, পাশের ঘরে এক জনকে বসিয়ে রাখবার ক্ষমতা তাঁর আছে। অবশেষে আরও অনেক কথাবার্তার পর আরামদায়ক আর্ম-চেয়ারে বসে চুরুটটা শেষ করে তিনি তাঁর সেক্রেটারীকে বললেন, "এক জন কেরাণী অপেক্ষা করছে বলে মনে হয়। তাকে আসতে বল।"

পুরোনো পোষাক-পরা নিরীহ আকাকিয়েভিচকে দেখে ওর দিকে একেবারে ঘুরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি কাজ আপনার?" রুক্ষ কঠোর তাঁর গলার স্বর। ওটা তিনি জেনারেলের পদে উন্নীত হয়ে কাজে যোগ দেবার এক সপ্তাহ আগে প্রাইভেট-রুমে একটা আয়নার সামনে অভ্যাস করেছিলেন। ভীরু আকাকিয়েভিচ আরও ঘাবড়ে গেল। সে বলল যে, তার একটা নতুন ক্লোক রাহাজানি হয়ে গেছে। সে এই আশা নিয়ে এসেছে যে জেনারেল তার জন্য কিছু করবেন—পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অথবা অন্য কারও কাছে লিখে প্রয়োজনানুসারে চেষ্টা করে তার ক্লোকটা উদ্ধার করে দেবেন। জেনারেল কোন কারণে তার আচরণকে মর্যাদাহানিকর বলে মনে করলেন। তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাবে বলতে আরম্ভ করলেন, "মশায়, এ ব্যাপারে সাধারণ রীতিও কি জানেন না? আমার কাছে সোজা এসেছেন কেন? এই বিভাগে আপনার একটা দরখাস্ত করা উচিত ছিল। সেই দরখাস্ত প্রথমে হেড ক্লার্কের কাছে, তার পর এই বিভাগের বড় সাহেবের কাছে, তার পর আমার সেক্রেটারীর কাছে এবং শেষে আমার কাছে আসবে।"

"কিন্তু, মহানুভব"—যেটুকু সাহস অবশিষ্ট ছিল, তাই সঞ্চয় করে আকাকিয়েভিচ বলল, "আমি স্বেচ্ছায় আপনার কাছে সোজা এসেছি—কারণ, সেক্রেটারীরা··· এ রকম অপদার্থ লোক···"

"কি—কি—কি?" তিনি জানতে চাইলেন, "এই মনোভাব নিয়ে এসেছেন? এ রকম ধারণা কোত্থেকে পেলেন? এই চোখেই কি আপনারা—যুবকেরা বয়োজ্যেষ্ঠদের এবং ভাল লোকদের দেখেন?"

তিনি লক্ষ্য করেছিলেন কি না সন্দেহ, আকাকিয়েভিচের বয়স পঞ্চাশের ওপর এবং আশী বছরের লোকের তুলনায় ওকে যুবক বলা যেতে পারে।

"জানেন, কার সাথে কথা বলছেন? আপনার সামনে দাঁড়িয়ে কে জানেন? জানেন কি, জিজ্ঞাসা করি আমি?"

এই সময় তিনি রাগে পা ছুঁড়তে লাগলেন এবং এমন সপ্তমে চড়ল তাঁর গলার স্বর যে, আকাকিয়েভিচের চেয়েও একটু কম সাহসী লোক হলেও ভয়ে কাঁপতো। আকাকিয়েভিচ কিন্তু একেবারেই হতভম্ব হয়ে পড়ে। তার শরীর সামনে-পেছনে দুলতে থাকে। এক জন আর্দালি ধরে না ফেললে সে মেঝের উপরই পড়ে যেত। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। বিখ্যাত ব্যক্তি তার কাজের ফল দেখে এই চিন্তায় উন্মত্ত হয়ে তার বন্ধুর দিকে তাকালেন যে, তাঁর চরম প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গিয়ে তার একটা কথায় একটা লোক অজ্ঞান হয়ে গেছে। বন্ধু এ দৃশ্য কেমন উপভোগ করল, তাই দেখতে চাইলেন তিনি। তাঁর বন্ধুও যে তাঁকে প্রায় ভয় করছেন—এ কথা ভেবে তিনি কম সন্তুষ্ট হলেন না।

আকাকিয়েভিচ মনে করতে পারে না, সিঁড়ি বেয়ে কেমন করে নামল সে। তার হাতে-পায়ে সাড় ছিল না। কোন জেনারেলের কাছ থেকে জীবনে সে এ ভাবে তিরস্কৃত হয়নি। সে হু-হু করা

—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত।

—ডাক্তার বলে টাইট জামা পরলে রক্ত চলাচলে বাধা পায়।
—আমার কিন্তু টাইট পরলে চলাচলের সুবিধা হয়।

বাতাসের মাঝ দিয়ে ধাঁ করে তার পথে এগোবার চেষ্টা করল। সেন্টপিটার্সবার্গের পথে বাতাস বয় চার দিক থেকে। সমস্ত রাস্তা এবং গলি-ঘুপচি দিয়ে ছুটে আসে বাতাস। ভীষণ ঠাণ্ডা লাগল আকাকিয়েভিচের। গলা ফুলে জ্বলতে আরম্ভ করল এবং বাড়ী পৌঁছে গলা দিয়ে রা'টি বেরুলো না। সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল সে। তিরস্কার কখনও কখনও এমনি ভয়ঙ্কর ফল ফলিয়ে দেয়। পরদিন ভীষণ জ্বর হলো তার। সেন্টপিটার্সবার্গের আবহাওয়ার কল্যাণে রোগটা অপ্রত্যাশিত ভাবে বেড়ে চলল। ডাক্তার এসে নাড়ী দেখবার পর করবার রইল না কিছুই। তিনি বললেন সেক দিতে। উদ্দেশ্য এই যে, কেউ না বলে রোগী বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। ও-সব সত্ত্বেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তার বললেন অবস্থা নিরাশাজনক এবং বাড়ীউলীর দিকে ফিরে বললেন, "আপনি বরং যত শীঘ্র সম্ভব একটা পাইন কাঠের কফিন আনতে দিন, ওকের কফিন ওর অবস্থায় কুলোবে না।"

এই সব ভয়ঙ্কর কথা আকাকিয়েভিচের কানে ঢুকেছিল কি? শুনলে তার মনের অবস্থা কি হত? তার হতভাগ্য জীবনের জন্য অনুতাপ করত কি সে? কেউ বলতে পারে না, কারণ আকাকিয়েভিচ তখন ভুল বকছিল। তার চোখের সামনে ক্রমেই ভয়ঙ্কর মূর্তিতে ফুটে উঠছিল প্রেতছায়া। কখনও সে দেখছিল পেট্রোভিচকে—তার কাছে সে অর্ডার দিচ্ছিল একটা ক্লোকের··· ক্লোকের মধ্যে চোরের জন্য অদ্ভুত কয়েকটা ফাঁদ থাকবে। চোরগুলো যেন বিছানার নীচেই রয়েছে। আকাকিয়েভিচ চীৎকার করে বাড়ীউলীকে বলছিল, বিছানার চাদরের তলা থেকে একটা চোরকে টেনে বার করতে। কখনও সে জিজ্ঞাসা করছিল, নতুন ক্লোকটা থাকতে পুরোনো ক্লোকটা ঝুলছে কেন ওখানে। কখনও সে ভাবছিল, সেই জেনারেলের সামনে দাঁড়িয়ে সে তার গালাগালি শুনছে। বিড়-বিড় করে সে বলছিল, "আমি দুঃখিত ধর্মাবতার!" পরে এমন সব শপথ সে করছিল যার ফলে বাড়ীউলী বুড়ী ক্রস-চিহ্ন আঁকতে বাধ্য হচ্ছিল। সে কোন দিন আকাকিয়েভিচকে ও-রকম ভাষা প্রয়োগ করতে শোনেনি—বিশেষ করে 'মহানুভব' ইত্যাদি কথা। আর যে-সব কথা সে বলেছিল তার কোন অর্থই হয় না। শুধু এইটুকুই বোঝা গিয়েছিল যে ক্লোককে কেন্দ্র করেই চলেছে তার প্রলাপ। কিছুক্ষণ বাদেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলে আকাকিয়েভিচ। তার ঘর-দোর জিনিষপত্রের কোন বিলি-ব্যবস্থা করে যায়নি। কারণ, প্রথমত তার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না আর দ্বিতীয়ত, রেখে যাবার মত জিনিষ তার ছিল সামান্যই। এক বাণ্ডিল কলম, এক দিস্তে সরকারী কাগজ, তিন জোড়া মোজা, ট্রাউজারের দু'-তিনটে বোতাম আর সেই পরিচিত ড্রেসিং গ্রাউন। ভগবান জানেন, সে সবের উত্তরাধিকারী হয়েছিল কে। স্বীকার করব, গল্পটা যাঁর কাছে শুনেছিলাম, ও-প্রশ্নে তাঁর কোন কৌতূহল ছিল না। আকাকিয়েভিচকে কবর দেওয়া হলো। সেন্টপিটার্সবার্গ আকাকিয়েভিচ-শূন্য হয়ে পড়ল, যেন কোন কালেই তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। এই ভাবে একটি জীব অনাদৃত অবস্থায় বিদায় নিয়ে গেল। এক জন প্রকৃতি-তত্ত্বজ্ঞের কৌতূহলও জাগিয়ে তুলতে পারেনি সে—সাধারণ একটি মাছির ব্যবচ্ছেদেও ওরা এর চেয়েও বেশী কৌতূহল অনুভব করে থাকে। এমন একটি জীব সে যে, তার সহকর্মীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের কাছে নতি স্বীকার করেছিল এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাই তার ঘটেনি। শুধু সামান্য একটু সময়ের জন্য একটা ক্লোকের সম্বন্ধে তার জীবনটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এবং ক্লোকটা তার জীবনে এমন একটা বিরাট বিপর্যয় এনে দিল যে তাতে মনে হলো, সে যেন পৃথিবীর বিরাট ব্যক্তিদেরই এক জন।

চারি দিন বাদে অফিস থেকে এক জন পিয়ন এসে হাজির। বলল, কর্তা তাকে বার বার করে কাজে যোগ দিতে বলেছেন, কিন্তু পিয়ন ফিরে গেল একাই। গিয়ে বলল, "তিনি আর কোন দিনই আসবেন না।"

"কেন?"

সহজ ভাবে সে উত্তর দিল, "কারণ তিনি মারা গেছেন, চার দিন আগে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে।

এই ভাবে আকাকিয়েভিচের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছোলো অফিসে। পরদিন তার জায়গায় বসল এক জন নতুন কেরাণী। লোকটা আকাকিয়েভিচের চেয়েও লম্বা। ওর লেখা তার মত সোজা এবং নির্দোষ নয়, হেলান এবং বাঁকা-চোরা।

কে বিশ্বাস করবে যে, এই আকাকিয়েভিচের শেষ নয় এবং তার ছায়াময় বর্ণহীন জীবনের ক্ষতিপূরণ করবার জন্য সে মৃত্যুর পর কয়েক দিনের জন্য খ্যাতি অর্জন করবে? কিন্তু সত্যি তাই ঘটেছিল এবং আমাদের এই সামান্য গল্পটা তাতে অপ্রত্যাশিত ভাবে অদ্ভুত একটা পরিণতি লাভ করে। সারা সেন্টপিটার্সবার্গময় গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, কালিঙ্কিন ব্রিজ এবং তার আশে-পাশের অঞ্চলে সরকারী অফিসের কেরাণীর বেশে একটা ভূত একটা অপহৃত ক্লোকের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এই অছিলায় সে যে কোন পথিকের কাঁধ থেকে তার ক্লোক খুলে নেয়—তা সে যত বড় পদমর্য্যাদাসম্পন্ন লোকই হোক না কেন। এক জন কেরাণী স্বয়ং সেই ভূতটাকে দেখে আকাকিয়েভিচ বলে চিনতে পেরেছে। সে এত ভয় পেয়েছিল যে তাড়াতাড়ি ছুটে পালিয়ে আসতে গিয়ে ভালো করে দেখতে পায়নি। দূর থেকে শুধু দেখেছে ভূতটা ভয়ঙ্কর ভাবে তার দিকে তর্জনী নাড়ছিল। চারি দিক্‌ থেকে অসংখ্য অভিযোগ আসতে লাগল। শুধু টাইটুলার কাউন্সিলরদের কাছে থেকে নয়, ভূতের জন্য যাদের কাঁধ খালি হয়ে গিয়েছিল, তারা সবাই অভিযোগ করছিল। পুলিশ সাব্যস্ত করল, যে ভাবেই হোক মৃত অথবা জীবিত অবস্থায় তাকে ধরবে। ঠিক করল, এমন ভাবে শাস্তি দেবে তাকে যাতে অপরের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। তারা প্রায় কৃতকার্য্য হয়েছিল। কিরুসকিন ষ্ট্রীটে এক কনেষ্টবল অপরাধে লিপ্ত অবস্থায় ভূতটার কলার চেপে ধরল। ভূতটা তখন এক বৃদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞের কাঁধ থেকে ক্লোক খুলে নিচ্ছিল। কনেষ্টবলের চীৎকারে আরও দু'জন কনেষ্টবল এসে পড়ল। বন্দী ভূতটাকে তাদের জিম্মায় রেখে সে তার ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া নাকটাকে চাঙ্গা করে তুলবার জন্য বুটের ভিতর থেকে নস্যির কৌটো বের করে এক টিপ নস্যি নিতে গেল। কিন্তু নস্যিটা এতই কড়া যে, ভূতের কাছেও অসহ্য হয়ে উঠল। কনেষ্টবল সবে মাত্র তার ডান নাকটা বন্ধ করেছে, অমনি ভূতটা এতো জোরে হেঁচে উঠল যে, তিন জন কনেষ্টবলের চোখেই নস্যি ঢুকে গেল। হাত তুলে চোখ রগড়াতে

রগড়াতে ভুতটা এমন ভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল যে, তাদের সন্দেহ হলো আদৌ তারা কিছু ধরেছিল কি না। সেই রাত থেকে ভুতের ভয়ে সমস্ত পুলিশ এমন শঙ্কিত হয়ে উঠল যে কোন অপরাধীকে দেখলে দূর থেকেই বলত, "শাস্ত ভাবে চলে যাও"। তার পর সেই ভুতটা কালিঙ্কিন ব্রিজ ছাড়িয়ে আরও দূরে চলে গিয়ে ভীতু লোকদের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করতে লাগল।

কিন্তু যার জন্য এই সম্পূর্ণ সত্য গল্পটা একটা আজগুবী রঙ পেল, সেই বিখ্যাত ব্যক্তির কথা আমাদের ভুললে চলবে না। ন্যায়বোধে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, এই হতভাগ্য নিষ্পিষ্ট লোকটি চলে যাবার পর সেই বিখ্যাত ব্যক্তি একটু করুণা বোধ করেছিলেন। এটা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। অন্তরে করুণার ভাব গ্রহণ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল, কিন্তু তাঁর পদমর্যাদা তার প্রকাশে বাধা দিত। বন্ধু চলে গেলে হতভাগ্য আকাকিয়েভিচের কথা মনে হলো তাঁর এবং তার পর থেকে প্রতিদিনই তার চোখের সামনে ভেসে উঠত সেই দুর্ভাগ্যের কথা, তিরস্কারের সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা। তার চিন্তায় তিনি এতই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন যে, এক জন কেরাণীকে ওর পরিচয় সংগ্রহ করতে এবং তাকে সাহায্য করার জন্য কিছু করা যায় কি না জানতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি হতভম্ব হয়ে যান এবং সারা দিন ধরে গভীর অনুশোচনা বোধ করেন। একটু অন্যমনস্ক হবার জন্য এবং ঐ অপ্রীতিকর চিন্তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তিনি সেদিন সন্ধ্যায় এক বন্ধুর বাড়ী গেলেন।

জেনারেল দেখতে পেলেন বন্ধুর বাড়ীতে বেশ প্রীতিকর আড্ডা জমেছে। তাঁর নিজের স্তরের লোকই ওরা, তাই আনন্দে যোগ দিতে তাঁর বাধা ছিল না। অবস্থাটা অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল তাঁর মনে। কথাবার্তায় তিনি সম্পূর্ণ অমায়িক এবং প্রীতিকর হয়ে উঠলেন এবং বলতে কি, সন্ধ্যাটা তাঁর কাটল বেশ আনন্দেই।

পারিবারিক স্নেহ-ভালবাসায় সুখী হলেও সহরের আর এক প্রান্তে এক জন বান্ধবী থাকা তিনি অন্যায় বলে মনে করতেন না। সেই বান্ধবী তাঁর স্ত্রীর চেয়ে ছোটও নন, সুশ্রীও নন, কিন্তু এমনি ধরণের অসামঞ্জস্য পৃথিবীতে থাকবেই কিছু কিছু। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে না কেউ। আমাদের বিখ্যাত ব্যক্তিটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে শ্লেজে চেপে কোচম্যানকে আইভ্যানোভনার বাড়ীর দিকে যেতে বললেন। দামী গরম ক্লোক দিয়ে গা ঢেকে নিলেন তিনি এবং আরামদায়ক ভঙ্গিতে এলিয়ে দিলেন নিজেকে। পূর্ণ আনন্দে অতিবাহিত সুন্দর সন্ধ্যাটার কথা মনে পড়ল তাঁর, ছোট্ট সেই চক্রটিকে আমোদিত করা হাসি-ঠাট্টার কথা মনে পড়ল। সেই সব ঠাট্টা-তামাসার দুই-একটা মনে মনে আওড়ালেন তিনি এবং বুঝতে পারলেন আগের মতই ভাল লাগছে। স্নিগ্ধ-মধুর আনন্দে হাসলেন তিনি।

কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস মাঝে মাঝে তাঁকে উদ্ব্যস্ত করে তুলছিল —মনে হচ্ছিল, বাতাসের ফলা যেন তাঁর মুখ কেটে কেটে বসছে। কখনও বাতাস উড়িয়ে আনছে মুঠো মুঠো তুষার; কখনও তাঁর ক্লোকটাকে পালের মত উড়িয়ে দিচ্ছে অথবা ওটাকে ঝাপট মেরে এনে ফেলছে ওঁর মাথার উপর। ঠিক এমনি সময় মনে হলো, কে যেন তাঁর কলার ধরে প্রচণ্ড ভাবে টানছে। ফিরেই তিনি দেখলেন, লোমওয়ালা পুরোনো ক্লোক-পরা একটা অল্পবয়সী লোক। আতঙ্কের মধ্যে ওকে আকাকিয়েভিচ বলে চিনতে পারলেন তিনি। তাঁর মুখ বরফের মত সাদা হয়ে গেল। যখন তিনি দেখলেন সে মুখ খুলছে, তখন তাঁর আতঙ্ক চরমে পৌঁছোলো। তিনি তার পৈশাচিক নিশ্বাস অনুভব করলেন এবং শুনলেন, সে বলছে—"হাঃ হাঃ, অবশেষে তোকে পেয়েছি! শেষ পর্যন্ত ধরেছি তোর কলার! তোর ক্লোকটাই চাই আমি, আমার ক্লোক উদ্ধার করবার জন্য তুই সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিলি, উপরন্তু গাল দিয়েছিলি। এখন দে তুই তোর ক্লোকটা।" হতভাগ্য বিখ্যাত ব্যক্তিটি আতঙ্কে তো প্রায় মরবার যোগাড়। অফিসে তিনি ক্ষমতাশালী পুরুষ—সাধারণ অধস্তন কর্মচারীদের তুলনায় শক্তিমান। তাঁর পুরুষোচিত আকারের দিকে তাকিয়ে যে কেউ বলত, "কি সুন্দর বলিষ্ঠ লোকটা!" কিন্তু এখন অন্যান্য অনেক মুখসর্বস্ব সাহসী লোকের মত এমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন তিনি যে, হার্টে অসুখ ধরবে বলে ভয় হলো। কাঁধ থেকে ক্লোকটা ফেলে দিয়ে বিকট স্বরে তিনি কোচম্যানকে বললেন, "বাড়ীর দিকে গাড়ী হাঁকাও, যত শীঘ্র সম্ভব।"

কোচম্যান সেই কণ্ঠস্বর (যে কণ্ঠস্বর সাধারণ সময়েই আতঙ্কজনক) শুনে তার কোটের কলারের মধ্যে মাথা টেনে নিয়ে চাবুক ঘুরিয়ে বায়ুগতিতে ছুটে চলল। পাঁচ-ছ' মিনিটের মধ্যেই নিজের বাড়ীর দরজায় পৌঁছে গেলেন তিনি। বিবর্ণ ব্যাকুল অবস্থায় টলতে টলতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন এবং আইভ্যানোভনার বাড়ীর বদলে নিজের বাড়ীতে ভীষণ কষ্টে রাত কাটালেন। পরদিন সকালে চা খাবার সময় তাঁর মেয়ে বলল, "তুমি যে ফ্যাকাসে হয়ে গেছ বাবা!" কিন্তু বাপ নীরব সেই ঘটনা সম্বন্ধে। তিনি কোথায় গিয়েছিলেন কিম্বা কোথায় যাবার ইচ্ছে ছিল, সে সম্বন্ধে যেন কথাই বললেন না। ঘটনাটা তাঁর মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল। "তুমি কি করে সাহস কর? তোমার সামনে দাঁড়িয়ে কে বুঝতে পারছ?"—ইত্যাদি কথাগুলো আজকাল তার অধস্তন কর্মচারীরা খুব কমই শোনে।

কিন্তু সব চেয়েও অদ্ভুত ঘটনা হচ্ছে এই যে, সেই রাত থেকে ভুতও অদৃশ্য হলো। জেনারেলের ক্লোকটা ঠিক ঠিক লেগেছিল তার গায়। যাই হোক, আর কখনও সে কারও কাঁধ থেকে কোট ছিনিয়ে নেয়নি। তবু কতকগুলো ব্যস্তবাগীশের আর ভয় যায় না! তারা বার বার বলতো, ভুতটা এখনও সহরের দূরপ্রান্তে কখনও কখনও হানা দেয়। এক জন পুলিশ বলে যে, সে নিজের চোখে দেখেছে, এক বাড়ী থেকে একটি ভুত বেরিয়ে আসছে। গায়ের জোরে পেরে উঠবে না এই ভয়ে তাকে সে ধরেনি। ভুতটাকে থামাতে না পেরে সে তাকে অনুসরণ করে, তাতে ভুতটা ফিরে দাঁড়িয়ে জানতে চায় ওর কি প্রয়োজন এবং ওর দিকে ভীষণ এক ঘুষি তুলে ধরে। জীবিত লোকদের মধ্যে এত বড় হাত কখনও দেখা যায় না। হতভাগ্য পুলিশটা পিছনে ফিরে প্রাণপণে সরে পড়ে। এই ভুতটা কিন্তু আগের চেয়েও লম্বা, একটা গোঁফ আছে তার। এই ঘটনার পর ভুতটা অবুকভ ব্রিজের দিকে দ্রুত হেঁটে গিয়ে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

অনুবাদক—শ্রীবিভূতিচরণ ঘোষ।

তখন আমি জেলে

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

গা পালায় ঢাকা ছোট্ট গ্রামের শুকনো পাতায় আকীর্ণ মেঠো পথে পা ফেলে যখন যাত্রা সুরু করেছিলাম, পথের নেশায় তখন পেয়ে বসেছিল। পশ্চাতে রেখে এলাম শৈশব ও কৈশোরের লীলাভূমি আমার গ্রামখানি, রেখে এলাম ফেলে আত্মীয়জনের স্নেহ ও মমতা, পড়শীদের প্রীতি ও সহযোগিতা, সকল বন্ধন অস্বীকার করে বন্ধুর পথে এগিয়ে চললাম বেদুঈনের মতো বুকে নিয়ে অদম্য সাহস ও অন্তরে নিয়ে অটল বিশ্বাস। গ্রামের গণ্ডী এক লম্ফে পেরিয়ে এসে পড়লাম শহরে, শহরের ঝকঝকে রাজপথে নিজেকে মনে হলো আমি হারকিউলিস কিংবা জুলিয়াস সীজার। তার পর দুর্নিবার বেগে ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করে যখন শহরতলীতে এসে পৌছলাম, তখন একেবারে অকস্মাৎ—অপ্রত্যাশিত ভাবে পথের ধারে একটি শিউলী গাছের চারা দেখে মনে পড়ে গেল আবার আমার সেই ফেলে-আসা গ্রামের কথা, আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ-পূব কোণের সেই শিউলী গাছের কথা, যার তলায় সৃষ্টি হয়েছে শৈশবের কত উপাখ্যান, কৈশোরের কত আখ্যায়িকা!

আমার পুরোনো আখ্যায়িকার যবনিকা উত্তোলিত হলে দেখতে পাওয়া গেল, কলকাতায় আমি গা-ঢাকা দিয়ে বাস করছি পুলিশের নাগপাশ এড়াবার জন্য। আই-বি'র ছদ্মবেশী গুপ্তচর আমাদের কালিঘাটের বাড়ীতে সময়ে ও অসময়ে বহু বার বহু ওজর দেখিয়ে আসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য। কিন্তু বৌদিরা বা বাড়ীর অন্যান্য সবাই প্রতিবারই তাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে জবাব দিয়ে দেন: দ্বিজেন? তা থাকে তো এখানেই। নিজেদের বাড়ী ছেড়ে থাকবে কি মেসে? কিন্তু কি কাজে জানি নে, এই একটু আগে বেরিয়ে গেছে। কি আপনার নাম বলুন না, আর কি দরকার? এলে বলবো'খন।

আগন্তুকদের মধ্যে যিনি তত দড় নন, তিনি হয়তো আমতা-আমতা করে সরে পড়েন। আর যিনি পাকা, তিনি ফস্ করে জবাব দেন: বলবেন রবী হালদার এসেছিল। কাল সকালে আমি আবার আসবো। ওঁকে থাকতে বলবেন। ভারী দরকার ওঁকে, অথচ—

বলতে বলতে মুখখানা চিন্তার মেঘে একেবারে কালো করে এক-পা-দু'পা করে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেন। আশ্চর্য্য! 'কাল সকালে' আর রবী হালদারকে দেখা যায় না। আসেন অপর ব্যক্তি।

দ্বিজেন বাবু বাড়ী আছেন কি?

হয়তো বেরিয়ে আসেন এবার স্বয়ং মেজদা। মেজদা সরকারী চাকুরে। তিনি যে শুধু দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দেন আমায় নেহাৎ রক্তের সম্পর্ক আছে বলে এবং না দিলে অনাহারেই যে আমায় থাকতে হবে, এই কথা একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে দিয়ে তবে তাঁর চাকরি বজায় রাখতে পেরেছেন।

জিজ্ঞেস করেন: কোথা থেকে আসছেন?

আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে আগন্তুক অকস্মাৎ আমার প্রতি বন্ধুত্বে একেবারে গলে পড়েন: বুঝলেন না, দ্বিজেন আমার সেই ছোটবেলাকার বন্ধু। আরে মশাই, চারি দিকে যেমন ধর-পাকড় চলছে, পুলিশের টিকটিকি যেমন ঘুরছে চারি দিকে, তাতে করে ওকে আসাই ভাল।—বলতে বলতে আরো একটু কাছে এগিয়ে এসে তিনি চারি দিকটা একবার দেখে নিয়ে কণ্ঠস্বর আরো একটু খাটো করে নিয়ে বলেন: আপনার এই সামনের বাড়ীটাকেই বিশ্বাস নেই। কুণ্ডুদের ঐ সেজ ছেলেটাকে কাল দেখছিলাম থানায় ঢুকতে। ওর কি দরকার বলুন তো? আমাদের এ সব বাছাধনদের চিনতে আর দেরী হয় না। বুঝলেন? তা দিনের বেলায় দ্বিজেন আসে না তো?

মেজদা আলীপুর দায়রা জজের আদালতের বিশ বছরের চাকুরে। সেই দায়রা জজ ছিলেন এককালে গার্লিক, এ, এন, সেন প্রভৃতি। ঝানু লোক। আগন্তুকের বক্তৃতায় তাঁর বিন্দুমাত্রও ভাবান্তর ঘটে না। তিনি পুরাতন জবাবেরই পুনরাবৃত্তি করেন: থাকে তো এখানেই। এই তো এতক্ষণ বাড়ীতেই তো ছিল। আপনি আসবার একটু আগেই কোথায় বেরিয়ে গেল। একটু বসবেন কি?—তা দেখুন, ইংরেজের আমরা নুণ খাই, বিশ বছর ধরে সরকারী চাকরি করছি। ও যে কি করে, কোথায় যায়, এ সব খবর আমি কোন দিনই রাখি নে, রাখবার প্রবৃত্তিও আমার নেই।

অর্থাৎ চাকরি বজায় রাখবার জন্য যে চুক্তিপত্রে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁকে স্বাক্ষর দিতে হয়েছে, আমার বন্ধুটির কাছে বেশ উৎসাহের সঙ্গে তাতেই লিখিত কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করেন। শুধু তাই নয়। রাজভক্তির আতিশয্যে অকস্মাৎ মেজদা যেন ফেটে পড়েন: আরে মশাই, এই সব হুজুগেরা কি করতে পারবে বলুন তো? স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার কর, ব্যস্, তাহলেই কাজ হবে। তা না করে দু'টো বোমা আর রিভলভার দিয়েই যদি দেশ স্বাধীন করা যেত ইংরেজদের সাগরপারে তাড়িয়ে দিয়ে, তাহলে তো আর ভাবনা ছিল না।—কি বলেন, অ্যাঁ?

বলে মেজদা খুব বিজ্ঞের মতো হেসে ওঠেন। আমার বন্ধুর কানে তা বিদ্রূপের মত গিয়ে আঘাত হানে।

হাল ছেড়ে দেবার মতো মুখ করে বন্ধু বলেন: বুঝলেন না, অনেক দিনের বন্ধু তো, তাই সাবধান করে গেলাম। ও যদি এখনো এই বাড়ীতে থেকে বা যাওয়া-আসা করে সাধ ক'রে হাতকড়ি পরতে চায়, তাহলে আমি আর কি করে ঠেকাই বলুন?

তা তো বটেই, তা তো বটেই—বলে মেজদা সদর দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে ফিরে আসতেই মেজ বৌদি জিজ্ঞেস করেন: কে এসেছিল গো?

মেজদা তৎক্ষণাৎ জবাব দেন: আর একটা টিকটিকি!

এমনি দিবা-রাত্র আসতেন আমার পরম সুহৃদেরা, আমার শুভানুধ্যায়ীরা আমার সংবাদ সংগ্রহ করে আমায় আপ্যায়িত করবার জন্য।

সেটা ১১৩১ সাল। কিন্তু উনিশশো একত্রিশ সালের বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিকা সৃষ্টি হয়েছিল ১৯২৮ সালে। তার একটুখানি আভাস এখানে দেওয়া প্রয়োজন।

কংগ্রেসী আন্দোলনের মতই বিপ্লবী আন্দোলনেরও সূত্রপাত, পরিণতি ও সাময়িক ভাবে মন্থর হয়ে আসার ইতিহাস আছে। আইন অমান্য আন্দোলনের মতই বিপ্লবী আন্দোলন এক-একটি

এমনি একটি লাল অধ্যায়ের গোড়াপত্তন হয় সাইমন কমিশন এদেশে আসবার সময় থেকে। যেদিন বোম্বাই বন্দরে তাঁরা জাহাজ থেকে মাটিতে পদক্ষেপ করলেন, সেদিন থেকেই সমগ্র ভারতে কমিশন বয়কট আন্দোলন এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, দিশেহারা ইংরেজ সরকারের আদেশে লাহোরে স্কট সাহেব নির্দ্দয় ভাবে লাঠীর আঘাত চালান ভারতের অন্যতম নেতা লালা লাজপৎ রায়ের দেহে। এরই ফলে আহত নেতা হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মতিলাল নেহরু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনেই ভারত তখনকার মতো শান্ত হবে বলে রিপোর্ট প্রকাশ করলেন। সুভাষ ও স্বরাজ্য দলের অপরাপর নেতারা জেল থেকে মুক্তি পেলেন। বেরিয়ে এলেন চট্টগ্রামের সূর্য্য সেনও। কমিশন বয়কট আন্দোলনে যোগদানকারীদের ওপর তখন চলছে নির্দ্দয় অত্যাচার। লাহোরে লালা লাজপৎ রায়ের ওপর যে লাঠী চালনা করা হয়েছে, বাংলার বিপ্লবী নেতারা তার আঘাত নিজেদের দেহে অনুভব করলেন। সুভাষের নেতৃত্বে সমস্ত বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ আর সেই সঙ্গে সৃষ্টি হলো বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স। ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের পরই এই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স নেতা সুভাষের নির্দ্দেশ অনুসারে বাংলার শহরে-শহরে, গ্রামে-গ্রামে কুচকাওয়াজ করতে সুরু করে দিল। ঘুমিয়ে-পড়া ঝিমিয়ে-পড়া প্রাণে আশার দেওয়ালি জ্বালিয়ে অনাগত সুদিনের জন্য যারা অধীর আগ্রহে দিন গুণতে থাকে, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স তাদের শুভেচ্ছা ও অকপটতা স্বীকার করে নিয়ে দেশের যুবশক্তির রক্তে সামরিক অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলবার ব্রত গ্রহণ করে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের মুখপাত্ররূপে সুভাষ ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে প্যারালেল গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। বাংলা ও পাঞ্জাবের বিপ্লবী দলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল পূর্ব্বেই। দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের মঞ্চ ও জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়েই ভারতীয় বিপ্লবীরা দেশে বিপ্লব আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হলেন। পাঞ্জাবে প্রতিষ্ঠিত হলো হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক্যান পার্টি আর নওজোয়ান ভারত সভা। সর্দ্দার ভগৎ সিং, চন্দ্রসিং আজাদ ও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মেজর যতীন দাসের নেতৃত্বে এঁরা শুধু পাঞ্জাবে কেন, সমগ্র ভারতেই সফর করে বেড়াতে লাগলেন। ইংরেজ সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাবার জন্য সর্দ্দার ভগৎ সিং দিল্লীর পরিষদ-কক্ষে বোমা নিক্ষেপ করে ধরা দিলেন এবং ভীতিহীন বিবৃতিতে যা বললেন, তার মর্ম্মার্থ এই : যে বিপ্লবের ঝড় আসন্ন হয়ে উঠেছে, জনগণের আপাত-নীরবতা যে সেই তুফানেরই উপক্রমণিকা, শেষ বারের মতো বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে আমরা সে সম্বন্ধে সতর্ক করে দিচ্ছি মাত্র।

লালা লাজপতের ওপর যে লাঠী চালিয়েছিল, সেই স্কট সাহেবকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে নিহত হলেন সণ্ডার্স সাহেব। লাহোরে সুরু হলো বিখ্যাত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা এবং তার অন্যতম নেতারূপে বাংলা থেকে গ্রেপ্তার হলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মেজর যতীন দাস। লাহোর বোরষ্টাল জেলে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো। মামলার প্রথম দিনের শুনানী কালেই সুরু হলো কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া, অবশেষে চ্যালেঞ্জ। যতীন দাস আমরণ অনশন সুরু করলেন এবং ৬২ দিন পর ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর ১২টা ৫৫ মিনিটে মহাপ্রস্থান করলেন। মেজর যতীন দাসের শবদেহ সুদূর লাহোর থেকে ট্রেনযোগে কলকাতায় আনবার অনুমতি দিয়ে ইংরাজ যে কী মহাভ্রম করেছিল সেদিন, তা বর্ণনার অতীত! এক কথায় সমগ্র ভারতের মাটিতে-মাটিতে যেন সেই অমর শহীদ লোকান্তরিত দেহ নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন। সতীর দেহ স্কন্ধে নিয়ে পাগলা ভোলা যখন সমগ্র ভারতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে সেই দেহের যে-কোনো অংশ যেখানে পড়েছিল, সেখানেই সৃষ্টি হয়েছিল এক-একটি তীর্থ। ঠিক তেমনি লাহোর থেকে কলকাতা আসার পথে যেন একটি অদৃশ্য যোগসূত্র টেনে দিয়ে গেল সেদিনকার তুফান মেল।

কলকাতায় যতীন দাসের শব নিয়ে যে শোকযাত্রা বেরিয়েছিল, ইংরেজ জাতি কোনো দিন তা ভুলতে পারে না। পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলার অন্তরঙ্গতাই যে সেদিন দৃঢ়তর হয়ে উঠলো, তাই নয়, সমগ্র ভারতের বিপ্লবী দলই সেদিন পেল নতুন উদ্দীপনা, নতুন অনুপ্রেরণা। তাই বাংলার শহরে-শহরে, পল্লীতে-পল্লীতে সেদিন ছড়িয়ে পড়লো বৈপ্লবিক ইস্তাহার : রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্ব্বনাশের নেশা।

সত্যই সর্ব্বনাশ, তিলে তিলে আত্মাহুতি, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত, রঙীন সম্ভাবনাময় জীবনের ওপর টেনে-আনা কালো যবনিকা!

বিপ্লবীরা আর আত্মগোপন করে থাকতে চাইলো না। কংগ্রেসী আন্দোলনের পাশাপাশি সুরু হলো বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের একটি রেজিমেণ্ট অস্ত্র আইন ও ১৪৪ ধারা অমান্য করে কলকাতা থেকে সুভাষের পৈতৃক গ্রাম কোদালিয়ায় রুট মার্চ্চ করে গেল।

১৯৩০ সাল পড়তে-পড়তেই ৬ই এপ্রিল গান্ধীজী সুরু করলেন ঐতিহাসিক ডাণ্ডি অভিযান। তার পর ১৮ই এপ্রিল হলো চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান। সুভাষ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তখন ছিলেন আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে এক দিন কারাসমূহের ইন্সপেক্টার-জেনারেল কর্ণেল সিম্পসন ও জেল-সুপার সোম দত্তের নেতৃত্বে এক দল পুলিশ সুভাষ, সেনগুপ্ত, বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের মেজর সত্য গুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ওপর লাঠি-চালনা করে। বাইরে সমগ্র ভারতে তখন চলছে তীব্র ভাবে আইন অমান্য আন্দোলন। এই আন্দোলনে অংশ-গ্রহণকারীদের ওপর যে অথবা যারাই অত্যাচার করছিল, বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের Suicide Sqad বেছে-বেছে তাকে বা তাদেরকে এক-এক করে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে দেবার ব্রত গ্রহণ করে। কলকাতায় টেগার্ট ও গর্ডন সাহেবের নেতৃত্বে পুলিশ নির্ব্বিবাদে অত্যাচার চালাচ্ছিল প্রকাশ্য জনসভায় মহিলাদের ওপরেও। আইন অমান্য আন্দোলনের কেন্দ্র-স্থল ঢাকা শহরে যেমন চলছিল পুলিশ-সুপার হডসনের তাণ্ডব, তেমনি মেদিনীপুরে চলছিল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ণেল পেডির অমানুষিক অত্যাচার আর সমগ্র বাংলার পুলিশী নৃশংসতার পশ্চাতে ছিল পুলিশের ইন্সপেক্টার-জেনারেল লোম্যানের অদৃশ্য সমর্থন ও সহযোগিতা!

অকস্মাৎ ২৫শে আগষ্ট ডালহৌসী স্কোয়ারে টেগার্ট সাহেবের মোটর গাড়ীর ওপর দু'টি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ২৬শে আগষ্ট জোড়াবাগান আদালত-গৃহে ও ২৭শে ইডেন গার্ডেন পুলিশ-ফাঁড়ির ওপর বোমা পড়ে। ২৯শে আগষ্ট লোম্যান হডসনের সঙ্গে যখন ঢাকা মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল পরিদর্শন করছিলেন, তখন বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের মেজর বিনয়কৃষ্ণ বসু তাঁদের দু'জনকেই গুলীর আঘাতে ভূপাতিত করেন। লোম্যান মারা যান, হডসন বেঁচে থাকেন অর্দ্ধমৃতবৎ। তার পরও চলতে থাকে নানা স্থানে রাজনৈতিক ডাকাতি ও নরহত্যা। অবশেষে ৮ই ডিসেম্বর কলকাতা শহরে সরকারী দপ্তর রাইটার্স বিল্ডিং-এ হানা দেন বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের তিনটি অফিসার—মেজর বিনয় বসু, ক্যাপ্টেন দীনেশ গুপ্ত ও লেফটেন্যাণ্ট বাদল গুপ্ত। প্রকাশ্য দিবালোকে ডালহৌসী স্কোয়ারের মতো জনবহুল স্থানে রাইটার্স বিল্ডিং-এর দোতলায় "অলিন্দ যুদ্ধে" প্রাণ হারান কারাসমূহের ইনসপেক্টার-জেনারেল কর্ণেল সিম্পসন। ২৩শে ডিসেম্বর লাহোরে ইউনিভারসিটি হল-এ পাঞ্জাবের গভর্ণর মণ্টগোমারির ওপর উপর্য্যুপরি ছ'বার গুলী নিক্ষেপ করেন হরিকিষেণ।

এই প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে এল ১৯৩১ সাল। এর সুরুটা বেশ মন্থর, খানিকটা স্বস্তিজনকও বলা যেতে পারে। ৫ই মার্চ্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হলো। আইন অমান্য আন্দোলন হলো প্রত্যাহৃত, গভর্ণমেণ্টও এই আন্দোলনের বন্দিগণকে মুক্তি দিতে লাগলেন। বাংলার গভর্ণর তখন স্যার ষ্ট্যানলী জ্যাকসন। অহিংস কংগ্রেসী আন্দোলনের বন্দিগণ মুক্তি পেলেও বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের ভাগ্যে আদৌ কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। কিন্তু এক দিকে সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য এবং অপর দিকে বৈপ্লবিক আঘাতের চাপে জর্জ্জর হয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তখন এতখানি মুষড়ে পড়েছিলেন যে, তাঁরা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মারফৎ বক্সা বন্দীশিবিরে আবদ্ধ রাজবন্দী নেতাদের কাছে আপোষ-আলোচনার প্রস্তাব পাঠাতেও দ্বিধাবোধ করলেন না। রাজবন্দীরা দাবী জানালেন দু'টি: এক, চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের নায়ক ফেরারী সূর্য্য সেনের ওপর থেকে সর্ব্বপ্রকার অভিযোগ প্রত্যাহার এবং দুই, আপোষ-আলোচনার সময়ে পুলিশের অনুপস্থিতি। গভর্ণমেণ্ট এই দু'টি সর্ত্ত মেনে না নেওয়ায় আপোষ-আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

গান্ধীজীর সর্ব্ব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ২৩শে মার্চ্চ সর্দ্দার ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসী হয়ে গেল। দেশময় সুরু হলো বিক্ষোভ প্রদর্শন, তেমনি আবার সুরু হলো সরকারী অত্যাচার। কিন্তু সেই অত্যাচারের মধ্যেই ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ণেল পেডি বিপ্লবীর গুলীর আঘাতে নিহত হন। ৭ই জুলাই মেজর দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী হয়ে যায়। তার পরই হয় রামকৃষ্ণের ফাঁসী। যে স্পেশাল ট্রাইবিউন্যাল দীনেশ গুপ্তকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে, আলীপুরের দায়রা জজ গার্লিক ছিলেন তার সভাপতি। ২৭শে জুলাই এজলাসে যখন তিনি কার্য্যরত, সেই সময় কানাই ভট্টাচার্য্য নিঃশব্দে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে রিভলভারের গুলীতে তাঁকে হত্যা করেন।

পুলিশ এবার মরিয়া হয়ে উঠলো। হাতের কাছে যাকে পেতে লাগলো, তাকেই গ্রেপ্তার করতে লাগলো। বাংলা দেশে, বিশেষ করে পূর্ব্ববঙ্গে এমন পরিবার খুঁজে বার করা কঠিন হয়ে উঠলো যা থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে গভর্ণমেণ্ট তাঁর অতিথি করে নেননি। ব্যায়ামাগারে, লাইব্রেরীতে, ক্লাব-গৃহে, কুস্তির আখড়ায়, আড্ডা-ঘরে সর্ব্বত্র পুলিশ হানা দিয়ে ফিরতে লাগলো। ছাত্রদের মধ্যে যে বক্তৃতা দিতে পারে, যুবকদের মধ্যে যার স্বাস্থ্য ভালো, পাড়ায় যে নেতৃস্থানীয়, তার আর কারার বাইরে থাকবার উপায় নেই! সরকারী চাকুরের ছেলেই হয়তো গ্রেপ্তার হয়ে গেল মহামান্য সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অভিযোগে। তাঁদের চাকরি নিয়ে যখন টানা-হেঁচড়া পড়ে গেল, তখন অনেকেই আমার মেজদা'র মতোই একটি বণ্ডে স্বাক্ষর করে রাজভক্তির নতুন করে পরিচয় দিয়ে রক্ষা পেয়ে গেলেন। বহু যুবকের নামে 'হুলিয়া' বেরুলো, অনেকের নামে মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। পথে-ঘাটে, রেস্তোরাঁয়, ট্রামে-বাসে ও ট্রেণে অসংখ্য টিকটিকি বা স্পাই কিলবিল করতে লাগলো। বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার বন্ধনও বুঝি অবিশ্বাস ও আশঙ্কার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

সর্ব্বত্র আতঙ্ক ও নিরাশার থমথমে আবহাওয়া! কখন্ কার ঘাড়ে অকস্মাৎ সরকারী হুকুম এসে ভূতের মতো চেপে বসবে, কে জানে!

দেশের এমনি নিদারুণ সময়ে রাজনীতির সঙ্গে যার সামান্যতম সংস্পর্শ আছে, সে কি আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? 'হুলিয়া' না বেরুলেও সরকারের একখানা আমন্ত্রণ-লিপি যে আমারও নামে লিখিত হয়ে পিওন-বুকে বসে আমারই প্রতীক্ষা করছে, সেটুকু বোঝবার ক্ষমতা আমার হয়েছিল। তাই পারিবারিক খাতায় আমার নাম থাকলেও লগ্‌-বুকে কখনো আমার স্বাক্ষর পড়তো না।

থাকতাম সহরতলীর এক বন্ধুর বাসায়। ইটের দেয়ালের ওপর টিনের চাল-দেওয়া খান-চারেক কামরার ছোট একখানা গোটা বাড়ী। বন্ধু ভূপাল পড়েন যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে, তাঁর দাদা গোপাল কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষক, ছোট ভাই মনু তখনো স্কুলে পড়ে। বিধবা মা। আর থাকেন এক জন সহ-ভাড়াটিয়া। বিধবা মা ও ছেলে। দিব্যেন্দু সেই সকাল আটটায় কোন্ কারখানায় গিয়ে মোটরের নীচে শুয়ে-শুয়ে যখন একবার একটি বল্টু আঁটেন ও আর-একবার একটি স্ক্রু ঢিলে করেন, তখন জানতেও পারেন না, কখন্ সকালের উজ্জ্বল রোদ বিকেলের স্নিগ্ধতায় ম্লান হয়ে এসেছে। তার পর সম্মুখের কেমিক্যালের কারখানায় ঢং-ঢং করে ছ'টা বাজবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চৈতন্য ফিরে আসে। কালিমাখা দেহ নিয়ে ফিরে আসেন দিব্যেন্দু। মা কিন্তু তাঁর ছেলের সম্বন্ধে যেমন আশাশীলা, তেমনি অর্থের যে তাঁর আদৌ প্রয়োজন নেই, একটি অঙ্গুলি হেলনেই যে তিনি তাঁর হাজরা রোডের স্বামীর গৃহ থেকে ছোট জা-দের ও তাদের ভেড়া স্বামীদের বহিস্কৃত করে দিয়ে দিব্যেন্দুকে নিয়ে দিব্য সেখানে চলে যেতে পারেন, এ কথা দিনের মধ্যে প্রায় একশো বার উচ্চারণ করে থাকেন।

অত্যন্ত কটুভাষিণী হলেও ইনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন আমায়। বন্ধুদের বাড়ীতে খেলেও প্রায়ই ইনি এটা-ওটা-সেটা রান্না করে আমায় একটুখানি পাঠিয়ে দিতেন রন্ধনে তাঁর কৃতিত্বের নমুনা-স্বরূপ। খাদ্যের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর নিজের প্রশস্তি এতখানি গলাধঃকরণ করতে হতো যে, তার পর রন্ধনের শতমুখে সুখ্যাতি না করে আর পথ থাকতো না।

বাড়ীখানার চতুর্দ্দিকে খোলা মাঠ, আম-কাঁটাল ও নারিকেল গাছে ছাওয়া। একটু দূরে একটা ছোট পুকুর, তার তীরে গোটা কয়েক বাতাবী নেবু ও পেয়ারা গাছ। বড় রাস্তা কয়েক শত গজ দূরে।

চাকর বা ঠিকে ঝি আমরা রাখিনি। কারণ ওদের মধ্যেই যে পুলিশের গুপ্তচরের সংখ্যা বেশী! খাওয়া শেষ হলে এঁটো-কাটা সাফ করে নিজেরাই পুকুরে যেতাম থালা-বাটি নিয়ে।

দিনের বেলা বেরুনো নিষিদ্ধ ছিল। রাত্রে, তাও আবার ট্রামে বা বাসে নয়, সাইকেলে। সাইকেলে চড়লে কেউ আমায় অনুসরণ করছে কি না, তা সহজে ধরা যায়। মনে করুন, সে যুগের খোলা ময়দান রাসবিহারী এ্যাভিনিউ দিয়ে বেগে সাইকেল চালিয়ে চলেছেন বালিগঞ্জ ষ্টেশনের দিকে। অকস্মাৎ দেখলেন একখানা সাইকেল বা মোটর আপনার পেছন-পেছন ছুটে আসছে। কে এ? কি এর মতলব? পুলিশের স্পাই? অনুসরণ করছে আমায়? কুছ-পরোয়া নেই। অকস্মাৎ ব্রেক কষে নেমে পড়ুন। হয় সাইকেলখানা রাস্তার ধারে শুইয়ে রেখে মূত্রত্যাগের ভান করে বসে পড়ুন, কিংবা ওখানা ফস্ করে ঘুরিয়ে নিয়ে ঠিক উল্টো দিকে যাত্রা করুন। অত শীগ্‌গির মোটর উল্টো দিকে ঘুরিয়ে নেয়া যায় না আর সাইকেল ঘোরাতে পারলেও জানা গেল কোন্‌খানা ফেউএর মতো আপনার পেছনে লেগেছে।

কালীঘাটে আমাদের বাসায় আমি মাঝে-মাঝে এসে সংবাদ নিয়ে যেতাম সত্যি, কিন্তু কখন্ আসবো, যেমন কেউ জানতো না, তেমনি জানতেও চাইতো না থাকবো কতক্ষণ!

এমনি ভাবে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলাম ভালোই, কাজও চলছিল মন্দ নয়। এমন সময় এক দিন বাল্যবন্ধু শ্রীপদের পত্র এল গোয়ালন্দ থেকে। গোয়ালন্দ ষ্টীমার কোম্পানীতে সে কয়েক বছর ধরে চাকরি করে, থাকে একা একখানা ফ্লাটে। বেচারা হয়ে পড়েছে দারুণ অসুস্থ। প্রথমতঃ রেলের হাসপাতালে আশ্রয় নিয়ে রোগ সারাবার চেষ্টা করেছে। না পেরে নিয়েছে এক মাসের ছুটি আর আমায় লিখেছে তাকে দেশের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবার অনুরোধ জানিয়ে। আমারই গ্রামে আমারই পাড়ায় তার বাড়ী।

ছোটবেলাকার বন্ধু, তার পর পীড়িত আর আমায় খুঁজে বার করবার ব্যাপারে পুলিশের উৎসাহও মনে হলো কতকটা কমে এসেছে। তাই যাওয়াই স্থির করা হলো।

রওনা হলাম শিয়ালদহ থেকে চট্টগ্রাম মেলে। পরনে খাঁটি সাহেবের পোষাক, কাঁধের ওপর খাঁটি মিলিটারী ওভারকোট আর হাতে বিরাটকায় খাঁটি গ্লাডষ্টোন ব্যাগ। ফেল্ট ক্যাপে কপাল ঢাকা। টিকিট আগেই কেনা ছিল, তাই ট্রেণ ছাড়বার ঠিক পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে এই খাঁটি সাহেবটি ট্যাক্সিযোগে ষ্টেশনে এসে সোজা গিয়ে আরোহণ করলেন রিজার্ভ-করা সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় এবং জানালার কাচগুলো তুলে দিয়ে একখানা বিলিতি সিনেমা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে লাগলেন।

ভোর সাড়ে ছ'টায় ছেড়ে চট্টগ্রাম মেল বেলা বারোটায় এসে পৌঁছলো গোয়ালন্দ ঘাটে। এবারে সেকেণ্ড ক্লাশ থেকে নেমে এলেন গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি পরনে, গ্রিসিয়ান শ্লিপার পায়ে এক জন দর্জ্জিপাড়ার কাপ্তান দু' আঙুলের মাঝে আলগোছে চেপে ধরে একটি সিগারেট।

পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়া ছিল, তাই দেখা গেল শ্রীপদের প্রেরিত লোক অপেক্ষা করছে। সাবধানে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় কাপ্তান অস্ফুট স্বরে বলে গেলেন: আমি ষ্টীমারে ইণ্টার ক্লাশে যাচ্ছি।

সোজা গিয়ে হন-হন করে ষ্টীমারে উঠলে পাছে টিকটিকিদের সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাই কাপ্তান পথের মাঝখানে অকস্মাৎ থেমে গিয়ে কমলার দর-দস্তর করতে লাগলেন। দরে বনলো না, তাই পাশের দোকান থেকে আর এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে ষ্টীমারের দিকে চললেন।

সন্ধ্যার একটু আগে যখন ষ্টীমার কাদিরপুর ষ্টেশনে এসে থামলো, শ্রীপদ তখন বলে উঠলো: যাক্, এবার নিরাপদে তোকে আনতে পারা গেল। আর যা ছদ্মবেশ নিয়েছিস, তাতে পুলিশের বাবারও সাধ্যি নেই যে, তোকে চিনতে পারে।

কাদিরপুর বিক্রমপুরেরই মধ্যে একটি ষ্টীমার-ষ্টেশন। ভাগ্যকুল এর কাছেই। সেটা অগ্রহায়ণ মাস। বর্ষার জল প্রায় শুকিয়ে এসেছে। বর্ষাকালে বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র জল থৈ-থৈ করে।

পাহাড়ের গা বেয়ে পদ্মা নদীতে যে ঢল নামে, তার ফলে নদী এতখানি স্ফীতকায় হয়ে ওঠে যে, কূল ছাপিয়ে সেই জলরাশি এসে প্রবেশ করে গ্রামে আর খাল-বিল-পুকুর সব ডুবিয়ে দিয়ে, পথ-ঘাট ডুবিয়ে দিয়ে কোথাও-কোথাও প্রায় দশ হাত গভীরতা সৃষ্টি করে। জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধান ও পাট গাছগুলিও দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে উঠে জলের ওপর গলা বাড়িয়ে থাকে। তখন হাট-বাজারে যেতে হয় নৌকোয়, স্কুলে যেতে হয় নৌকোয়, নৌকোর সাহায্য ব্যতীত এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাতায়াতও বন্ধ হয়ে যায়। কখনো-কখনো এই জলরাশি সীমাহীন ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে হাট-বাজার ডুবিয়ে দেয়, গৃহস্থের আঙিনায় প্রবেশ করে। তখন এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে হয় বাঁশের তৈরী সাঁকোর ওপর দিয়ে। আশ্বিনের শেষাশেষি এই জলরাশিতে ভাটার টান পড়ে। কার্ত্তিকে পথ-ঘাট আসে শুকিয়ে আর অগ্রহায়ণে জল নেমে এসে আশ্রয় নেয় শুধু খালে, বিলে, ডোবায় ও পুষ্করিণীতে। যাতায়াতে তখন অসুবিধা ও কষ্টের সীমা নেই। কোথাও হাঁটুপ্রমাণ কর্দ্দম একটা বিচ্ছিরি অবস্থার সৃষ্টি করেছে, আবার তার পরই হয়তো শুকনো খাঁ-খাঁ করছে মাইলের পর মাইল পথ। কোথাও নৌকো পাল তুলে চলে খাল বা বিল দিয়ে, আবার কোথাও এসে একেবারে ডাঙ্গায় ঠেকে যায়।

সংবাদ নিয়ে জানা গেল, নৌকাযোগে আমরা ঘোলঘর পর্য্যন্ত যেতে পারবো। সেখান থেকে আমাদের গ্রাম মাত্র দেড় মাইল। ঘোলঘর পৌঁছুতে আমাদের বেশ রাত হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই, কারণ গ্রামের পথ-ঘাট আমাদের মুখস্থ আর আমি তো রাত্রেই চাই গ্রামে পৌঁছুতে সবার অলক্ষ্যে, সবার অজ্ঞাতে। শ্রীপদকে রেখে পরদিনই আবার এমনি গভীর রাত্রে গ্রাম ত্যাগ করে ফিরে আসবো কলকাতায়—এই ছিল আমার কর্ম্মসূচী।

দু'ধারে উঁচু পাড়, তার মাঝখানে ক্ষীণকায় খাল। অন্ধকার রাতে আমাদের নৌকো এগিয়ে চলেছে। ছইয়ের মধ্যে বিছানো বিছানায় শ্রীপদ সটান শুয়ে আছে আর আমি কেরোসিন ল্যাম্পের স্তিমিত আলোয় একখানা বই পড়ছি নিবিষ্ট মনে। পায়ের কাছে গ্লাডষ্টোন ব্যাগটাও নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

বাইরে নিবিড় অন্ধকার। মাঝে-মাঝে দু'-একটা ঝিঁঝি পোকার বিকট একঘেয়ে শব্দ শোনা যাচ্ছে আর গাছের ডালে-ডালে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য জোনাকির চুমকি। ভিজে মাটির কেমন একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

শ্রীপদ যেন অনেকক্ষণ মনে মনে মহলা দিয়ে গম্ভীর গলায় ডাকলো : দ্বিজেন!

আমি তৎক্ষণাৎ তাকে সংশোধন করে দিলাম : দ্বিজেন নয়, বরেন তপেন রাম শ্যাম যদু, হরি—যা-খুশী তাই বল, শুধু দ্বিজেন নয়।

সে ম্লান হাসি হাসবার চেষ্টা করলো : হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ছাখ,, এমনি ভাবে আর কত কাল পালিয়ে-পালিয়ে থাকবি?

বললাম : যত দিন না ধরা পড়ি।

বন্ধুর কোমল হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো : তা জানি। কিন্তু জ্যেঠাইমা আর জ্যেঠা মশায়ের কথা ভেবে ছাখ,। পূজোর সময় যখন এসেছিলাম, জ্যেঠা মশায় আমায় কত বললেন, কত দুঃখ জানালেন আর জ্যেঠাইমা তো কেঁদেই আকুল! তাঁদের বড় আশা ছিল তুই বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে আসবি—

বাধা দিতে হলো : মানুষের মনে কত আশাই না বুদ্বুদের মতো ফুটে ওঠে শ্রীপদ, ক'টা তা পূরণ হয়?

শ্রীপদ দমবার পাত্র নয় : বেশ, তাই যদি বল, তাহলে যে আশা নিয়ে তোমরা এই পথে পা বাড়িয়েছ, সে আশাও তো পূরণ না-ও হতে পারে। তোমাদের পথ যে নির্ভুল, এই পথে এগিয়ে গেলেই যে অভীষ্ট লাভ হবেই, এর গ্যারাণ্টি তোমরা দিতে পারো কি?—শ্রীপদ এবার লজিকের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে যেন হাইকোর্টের সওয়াল সুরু করে : যার গ্যারাণ্টি তোমরা দিতে পারো না, নিশ্চয়ই সে সম্বন্ধে তোমরাই নিশ্চিত নও। আর নিশ্চিতই যদি না হও, তাহলে আমি প্রশ্ন করতে পারি কি, এমনি ভাবে অনিশ্চয় ও আলেয়ার পেছনে দেশের যুবকদের টেনে নেবার অধিকার তোমরা কোথেকে পেলে? নিজের সম্ভাবনাময় জীবন যেমনি নষ্ট করছো, তেমনি নষ্ট করছো আরো দশ জনের। এর জন্য তোমায় কি আমি অভিযুক্ত করতে পারি না?

চুপ করে গেলাম। জবাব দেবার কিছু নেই বলে নয়, জবাব দোব না বলে। জানি শ্রীপদ আমায় কতখানি ভালোবাসে, আমার মত ও পথের সঙ্গে তার এতটুকুও না মিললেও দূরে থেকেই সে তার ভগবানের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা জানায় আমার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের। যে সর্ব্বনাশা পথে আমরা বিচরণ করি, তার কাছে ঘেঁসতেও সে ভয় পায় জানি এবং তার আতঙ্কের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমার কাছে প্রকাশ করতেও তার বাধে না সত্য, কিন্তু তার আদালতী লজিকের অন্তরালে স্ফটিক-স্বচ্ছ হৃদয়ের যে নিরবকুণ্ঠ দরদ উৎসারিত হচ্ছিল, আর একবার নতুন করে তা অনুভব করলাম!

আমি নীরব থাকলেও আমার বন্ধু নীরব থাকবার পাত্র নয়, বিশেষ করে যখন সে অনুভব করে যে যুক্তি-বাণে সে আমায় প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছে। সে জানে যে, পরাজয় আমি মেনে নিতে রাজী আছি শুধু যুক্তির কাছে; ভ্রূকুটি, হুমকি বা অশ্রুজলের কাছে নয়। কিন্তু শ্রীপদ আর কিছু বলতে পারলো না। অকস্মাৎ বছিরুদ্দী মাঝি লগি হাতে বসে পড়ে ফিস্-ফিস্ করে বললো : দূরে দারোগার নৌকার মতো একখানা নৌকা দেখা যাচ্ছে।—বলেই সে আপন-মনে আবার লগি মারতে লাগলো আর মুখে ধরলো একটি সরস জারি গানে সরসতম কলি :

তোমার লইগা মরলাম
কাঁইদা বঁধু রে
ডাইকা ডাইকা পলাইয়া
যাও শুধু রে—

ল্যাম্প ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেওয়া হলো। ছইয়ের এক দিক একখানা চাদর টাঙ্গিয়ে দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হলো। শ্রীপ[illegible] আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে বোধ হয় দুর্গানাম জপ কর[illegible] লাগলো। গ্লাডষ্টোন ব্যাগটা টেনে ভেতরে নিয়ে একখানা চা[illegible] অকস্মাৎ মাথায় ঘোমটার মত দিয়ে বেড়ার দিকে মুখ করে ব[illegible] আমি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে চাপা-কান্না সুরু করে দিলাম।

বছিরুদ্দী আমার পুরোনো মাঝি ও সাকরেদ। এই কৌশ[illegible] বহু বার পুলিশের চক্ষে আমরা ধূলি নিক্ষেপ করেছি। ওর নৌকো

ব্যতীত বিক্রমপুরে বর্ষাকালে আমি এক পাও যেতাম না কোথাও। পুলিশের নৌকোখানি যেই কাছে এসে পড়ে, অমনি বছিরুদ্দী অগ্রণী হয়ে দারোগাকে সভক্তি সেলাম নিবেদন করে বলে: কাঁদবো আর কে? আপনার বৌমা কর্ত্তা। বাপের বাড়ী থিকা আসোনের সময় পেরতেক বারই এমন কইরা কোঁপাইব। বুড়া হইয়া গেল, তবু বাপের বাড়ীর টান গেল না—অ্যাঁ?

দারোগারা সাধারণতঃ এই রসিকতায় বেশ কৌতুক অনুভব করে।

কিন্তু এবার রক্ষা পাওয়া গেল। পাশ দিয়ে প্রায় গা ঘেঁসে যে নৌকাখানা বিপরীত দিকে চলে গেল, সেখানা দারোগার নৌকো নয়। গানের সুর থামিয়ে বছিরুদ্দী হি-হি করে হেসে উঠলো। বন্ধু শ্রীপদ তখন কম্বলের নীচে ঘেমে উঠেছে। আমার মাথার বালিশ দু'টো আমি কোল থেকে নামিয়ে পাশে রেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আবার কেরোসিন ল্যাম্পটি জ্বেলে দিলাম।

নৌকো থেকে নেমে অসুস্থ বন্ধুকে নিয়ে যখন দেড় মাইল পথ পায়ে হেঁটে বাড়ীতে এসে পৌছলাম, তখন রাত বারোটা বেজে গেছে।

কিন্তু পরদিন রওনা হবার পথে দেখা দিল একটা প্রকাণ্ড অন্তরায়।

দূর-সম্পর্কীয় বিলাস কাকার মেয়ে রেণুর সেদিন বিয়ে। আনন্দোৎসব বা কোনো প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় দু' বছর পূর্ব্বেই চুকে গেছে। তাই গ্রামের বা পাড়ার কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানেই আমাকে পাওয়া যেত না। আত্মীয়জনের বিবাহেও নয়। পুলিশ যেমন করে খুঁজছে আমায়, এমনি অবস্থায় তো একটি ঘণ্টা দেরী করাও বিপজ্জনক।—আমার এই যুক্তি দিয়ে সবাইকে শান্ত করে দিলেও কিছুতেই পারলাম না জেদ বজায় রাখতে, যখন স্বয়ং রেণু এসে আমার হাত ধরে ফেললো এবং বললো: দাদা, আমায় তুমি কত ভালোবাসো, তা তোমার চাইতে আমিই বেশী জানি। সবাইকে ফিরিয়ে দিতে পারলেও আমায় পারবে না। তোমায় থাকতে হবে। রাত ১টার মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। তার পর রওনা হয়ো—আমি আপত্তি করবো না।

সত্যিই রেণু আমার প্রিয় বোনটি। বড়ো-ছোটোর সম্বন্ধ নয়, আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল কি করে জানি না একটা মধুর বন্ধুত্বের বন্ধন। বয়সে ও শিক্ষায় দু'জনে সমপর্য্যায়ের নই বলেই বোধ হয় আমাদের মধ্যে নীরস ফর্ম্মালিটির অস্তিত্ব ছিল না। দু'জনের মধ্যে একটা পরিচ্ছন্ন ভাবাবেগপূর্ণ ভালোবাসার জালই কেমন করে বোনা হয়ে গিয়েছিল। কে বুনেছিল জানি না, আমি, না ও—না দু'জনেই, না তৃতীয় অশরীরী কোনো কারিগর!

রাজী হতে হলো এবং আগুনের মত সেই খুশীর সন্দেশ মুখে-মুখে প্রচারিত হয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানেই যেন অধিকতর উদ্দীপনা ও উৎসাহ দেখা দিল এবং আমাকেই জড়িয়ে পড়তে হলো তার সঙ্গে। রান্না কে করবে, কি-কি রান্না হবে, কোথায় বরযাত্রীরা এসে বসবেন, কি ভাবে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো হবে, কত জন বরযাত্রী আসবেন, তাঁরা সবাই মাংসাশী কি না, তার পর বরপক্ষের দাবী মত সব জিনিষপত্র কেনা হয়েছে কি না, কোথায় বিবাহ-সভার আয়োজন হবে, কে সম্প্রদান করবেন, পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে কি না, আলো কোথায়, বাইরের ঠাণ্ডা ঠেকিয়ে রাখবার মত পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সামিয়ানা এসেছে কি না—এমনি হাজারো ব্যাপারে মাথা গলিয়ে ও বিলি-ব্যবস্থা করে যখন পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম স্নানের জন্য, তখন পড়ন্ত রোদের আভা বট গাছের মাথায় চিকচিক করছে।

উপবাসী রেণু এসে আমায় চোখ রাঙিয়ে গেল: আর যদি একটি মিনিটও দেরী কর, তাহলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি দাদা।

খাওয়া শেষ হলো বেলা চারটেতে। রেণুর শুকনো মুখখানা দেখে জিজ্ঞেস করলাম: তুই কি নিষ্ঠাবতীর মতো বিয়ে করছিস না কি রে?

কেন?

না খেয়ে মুখখানা গেছে শুকিয়ে, এ তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।

ইস্, জানো কি না তাই। এমনি উপোস তোমাকেও এক দিন করতে হবে জেনো।

হা-হা করে হেসে উঠলাম: সে এক দিন আমার জীবনে আর আসবে না রে।

এখনই এত বিরাগ? কত আর বয়েস হয়েছে, একুশ? না হয় হলেই আমার চাইতে তিন বছরের বড়, তবুও তোমার চাইতে অনেক বেশী বুঝি, জানো?

বল, কি-কি বুঝতে পেরেছ?

মুচকি হেসে রেণু বলতে লাগলো: জানি এক জনকে ভালবাসতে তুমি। মনে-মনে তাকেই বিয়ে করবার পূরোপূরি ইচ্ছে ছিল, শুধু একবার সাধিলেই—কিন্তু হায়, কেউ আর সাধলো না। তাই না দাদা?

দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা।—বলে উঠে ওর বেণী ধরতে যাবো, এমন সময় ওর দাদা গণেশ এসে বললো: দাদা, কারিগর-বাড়ী থেকে যে ডে-লাইটটা আনা হয়েছে, তেল ভরতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে সেটা থেকে তেল চুঁইয়ে পড়ে। এখন কি করা যায়?

বাধা পড়লো। গণেশকে সঙ্গে করে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসেই গুরুদাসের সঙ্গে দেখা; দাদা, বরযাত্রীদের ঘরে আরো একখানা সতরঞ্চি না হলে সবটা ঢাকছে না।

চল যাচ্ছি।—বলে এদেরকে নিয়ে পশ্চিম-বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। রেণুদের বাড়ী থেকে পশ্চিম-বাড়ীর দূরত্ব বেশী না হলেও রাস্তায় একটা বাঁক ঘুরে যেতে হয়। অত্যন্ত উৎকণ্ঠা নিয়ে সেই বাঁকটি পেরিয়ে যেই দু' পা এগিয়েছি, অমনি দেখি সম্মুখে এক জন একান্ত অপরিচিত ভদ্রলোক, সঙ্গে পাড়ার কতকগুলো ছোট ছেলে।

ওদের মধ্যেই এক জন বলে উঠলো: এই তো উনি, ওঁরই নাম দ্বিজেন গাঙ্গুলী।

আগন্তুক যেন বেশ ঘাবড়ে গেলেন। দু'-একবার কেসে গলাটা বৃথাই ঝাড়বার চেষ্টা করে, পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বৃথাই বার করে আবার তা পকেটে ভরে, অনেক দ্বিধা ও সঙ্কোচের বাধা অতিক্রম করবার চেষ্টা করে প্রশ্ন করলেন: আপনার নাম দ্বিজেন বাবু?

হ্যাঁ। কেন বলুন তো? কোথা থেকে আসছেন আপনি?

আবার সেই জড়তা : দেখুন, আমি, মানে আপনার কাছেই এসেছি। আপনি অবশ্য আমায় চেনেন না—কি করে চিনবেন বলুন। তা আমি আসছি শ্রীনগর থেকে।—চলুন, আপনার বাড়ীতে যাই, সেখানেই বরং—

ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেও কাঠখোট্টা স্বরে প্রশ্ন করলাম : আপনার প্রয়োজন কি বলুন না?

না—তা প্রয়োজন বিশেষ কিছুই নয়। তা দেখুন, আমাদের কি দোষ বলুন! আমরা হুকুমের চাকর বই তো নয়। মানে—

চারি দিকে যেমন লোক জমে গেছে, তেমনি একেবারে থমথমে ভাব! সবার কপালেই কুঞ্চন-রেখা, চোখে নিদারুণ বিরক্তি! একই প্রশ্ন তখন সবার মনে-মনে অলস্ত লৌহ-শলাকা চালিয়ে ফিরছে : তবে কি—

এই 'তবে কি'র জবাব তিনি অনেকক্ষণ আমতা-আমতা করে যা জানালেন, তার মর্ম্মার্থ এই : আমাকে গ্রেপ্তার করা হলো। কাল ঢাকা থেকে পুলিশ-সুপার এসেছিলেন থানা পরিদর্শনে। তিনি বলে গেছেন যে আমি যে চট্টগ্রাম মেলে রওনা হয়েছি, সে সংবাদ তিনি পেয়েছেন। সুতরাং এই মুহূর্ত্তে আমাকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হোক্।

পুলিশ-সুপারের এই হুকুম তামিল করতেই এসেছেন রাজেন বাবু—থানার দ্বিতীয় অফিসার।

স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল যে, গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ শিয়ালদহে অপেক্ষমান স্পাই-পুঙ্গবদের শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে পারেনি। যদিও বা সংশয় ছিল, তাও একটি প্রশ্নেই রাজেন বাবু দূর করে দিলেন : বাড়ী যাবেন না? চলুন। অবশ্য আপনার জামা-কাপড় বদলে নেবার জন্য, আমার বিশেষ কিছুই প্রয়োজন নেই। সার্চ্চ করবার আদেশ যখন দেয়নি—শুধু আপনার না কি একটা গ্লাডষ্টোন ব্যাগ—সেটাই শুধু একবার, মানে—

দেখতে হবে। তা চলুন না। ঐ তো আমার বাড়ী।

ইতিমধ্যে দু'জন হিন্দুস্থানী পুলিশকে দেখলাম এসে হাজির। দেখলাম তারা মালকোছা এঁটে ধুতি পরে তার ওপরই ছোট সাইজের খাকি প্যাণ্ট চাপিয়ে দিয়েছে, সমুখের বোতামগুলো তখনো এঁটে দেয়নি। আর দু'হাতে লাল পাগড়ীর সুদীর্ঘ কাপড়টা মাথায় পাগড়ী নয়, ফাট্‌কার-মতো করে কোন রকমে জড়িয়ে নিচ্ছে।

আসামী ধরবার বেলায় বিশেষ করে স্বদেশী আসামীর ক্ষেত্রে কী সব কৌশল অবলম্বন করলে কাজটা সহজ ও ক্ষিপ্র হয়ে আসে, সে সব মূল্যবান শিক্ষা এদের সমাপ্ত হয়েছে। তাই আমাদের পাড়ায় প্রবেশ করবার পূর্ব্বে রাজেন বাবুর মতই নিজেদের পোষাক এরা লুকিয়ে রেখেছিল স্কন্ধে লম্বমান ঝোলার মধ্যে। পাছে লাল পাগড়ীর শুভাগমন কেউ দেখতে পেয়ে সংবাদটি সোজা আমায় পৌঁছে দেয়, পাছে আসামী তাদের মূঢ়তার সুযোগ নিয়ে ভাগ্‌ যায়, তাই তারা সরকারী তক্‌মা ছেড়ে এসেছিল সিভিল পোষাকে। এখন, দূর থেকে যখন বুঝতে পেরেছে যে, কাজ হাসিল হয়েছে, তখন পোষাক পরে জবরদস্ত হয়ে তারা এসে হাজির।

কিন্তু, আমার আসবার খোশ-খবর কালকে যেমন উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল, তেমনি আমার মহাপ্রস্থানের দুঃসংবাদটি সমস্ত আয়োজনটাই যেন ম্লান করে দিল!

ডে-লাইটের তলাটা ফুটো হয়েছে, না একেবারেই ভেঙে গেছে, গণেশ তা ভালো করে মনেই করতে পারলো না আর গুরুদাস যে কেন আমায় ডাকতে এসেছিল, সে কথা ভুলেই গেছে। রাজেন বাবু আমার গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগটির পরীক্ষা-কার্য্য শেষ করে বিলাস কাকার বৈঠকখানাতে এসে বসতেই চারি দিক থেকে তাঁকে ছেলে-বুড়ো ও মেয়েরা-মহিলারা একেবারে ছেঁকে ধরলেন।

বিলাস কাকা পাড়ার অন্যান্য কাকাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ, বয়সে নয়, অভিজ্ঞতায় ও বুদ্ধিতে। তিনি বললেন : দেখুন, আজ আমার মেয়ে রেণুর বিয়ে। গ্রামের দূরের কথা, পাড়ার কোনো শুভ কাজে, এমন কি আত্মীয়জনের কাজেও দ্বিজেনকে পাওয়া যায় না। কারণ ও যে কবে ও কখন্ এখানে আসবে আর বিনা নোটিশে কখনই বা ফস্ করে কোথায় চলে যাবে, তা দেবা ন জানন্তি। আজ বোধ হয় রেণুরই ভাগ্যগুণে ও অকস্মাৎ এসে হাজির। চলেই যাচ্ছিল, রেণুই হাতে-পায়ে ধরে ওকে নিরস্ত করেছে। এমনি শুভদিনের আনন্দে আপনি এসে এমনি বাধা সৃষ্টি করে বসলেন?

মর্ম্মভেদী সংবাদটি ছেড়ে দেবার পর এক ঘণ্টা অতিক্রম হয়েছে। সুতরাং রাজেন বাবু হারানো সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন। ধীরে শান্ত স্বরে তিনি যুক্তি দিয়ে নিজের অসহায় অবস্থার কথা বর্ণনা করলেন : দেখুন, বিশ্বাস করুন, এমনি দিনে আসছি জানতে পারলে অন্ততঃ আমি এই নির্ম্মম কাজের ভার নিতাম না। আমিও আপনাদেরই মত সামাজিক লোক, আমারও বাড়ীতে এমনি বিবাহাদি হয়ে থাকে। কিন্তু জানেন তো পরের চাকরি করি আর সে চাকরিই হচ্ছে অত্যন্ত নিরানন্দদায়ক। তাই আপনাদের বাধা সৃষ্টি করতে এসে আমিও কম দুঃখ পাচ্ছি না। কিন্তু আমার অসহায় অবস্থার কথাটা আপনারা একবার বিবেচনা করে দেখুন।—

বলে তিনি করুণ দৃষ্টি একবার সভার চতুর্দ্দিকে বুলিয়ে নিলেন। কালু কাকা তাঁর কালো দাড়িতে হাত বুলাচ্ছেন, অশ্বিনী কাকা ধোঁয়া না বেরুলেও ভুড়ুক্-ভুড়ুক্ করে হুঁকো টেনে চলেছেন, বৃদ্ধ ও বধির অখিল কাকা কিছু শুনতে না পেলেও সবই বুঝতে পেরে একবার এর মুখের দিকে, আর একবার ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখছেন, দেবেন কাকা এ সব ব্যাপারে চিরকালই অগ্রণী, তাই বিলাস কাকার ব্রীফ নিয়ে যেন তাঁর পাশে অপেক্ষা করছেন সওয়ালের পয়েণ্টগুলো ঠিক-ঠিক ধরিয়ে দেবার জন্য। অতুল কাকা পূজো-অর্চ্চনা নিয়েই থাকেন; তাই অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে এক পার্শ্বে বসে সবই শ্রীভগবানের হাতে তুলে দিয়ে স্বস্তিলাভের চেষ্টা করছেন।

কাকাদের ফাঁকে-ফাঁকে এসে বসেছে তাঁদের ছেলেরা, যুবকের দল, প্রয়োজন হলে জামার আস্তিন গুটিয়ে নিতে প্রস্তুত হয়ে। জানালার ঝাঁপগুলো ঠেলে দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন কাকীমা, পিসিমা, মাসীমার দল ও তাঁদের মেয়েরা। সমুখের প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয়েছে কারিগর-বাড়ীর রমজান, ইলিয়াস, রেজা আলী, সিরাজ প্রভৃতি। বহিরদ্দী ব্যাটাও কোথা থেকে সংবাদ পেয়ে এসেছে এবং পুলিশকে সর্ব্বদাই ডোণ্ট কেয়ার ভাব দেখাবার জন্য বেশ কেয়ারক্রি ভাবে এর-ওর সঙ্গে হাসি-তামাসা করে বেড়াচ্ছে।

আমার বাবাও এসেছেন এবং ঘটনার পরিণতি দেখাই যে শুধু তাঁর উদ্দেশ্য, তা প্রমাণ করবার জন্য একটি চেয়ারে বসে হাঁটুর

ওপর হাঁটু তুলে দিয়েছেন আর হাতে ধরে রেখেছেন সহস্তে নির্ম্মিত নিম গাছের ডালের একটি যষ্টি। তাঁর বিশ্বাস, নিমের ডাল হাতে থাকলে মানুষের কোনো অমঙ্গলই আসতে পারে না। অদ্ভুত ভাবে নীরব তিনি, এই সব আলাপ-আলোচনার সঙ্গে তাঁর যেন কোনো সম্বন্ধ নেই। পুত্রকে তিনি চেনেন, খুব ভালো ভাবেই জানেন; তাই রেণুর বিবাহে আমায় হারিয়ে সবাই অজস্র দুঃখ পেলেও আমার মনে যে তার প্রতিধ্বনি মিলবে না, সে সংবাদ তিনি রাখেন।

আসেনি বন্ধু শ্রীপদ আর আসেননি আমার মা। শ্রীপদ অসুস্থ, জ্বরের প্রকোপটা বেশ বেড়ে গেছে। আর মা এই বিদায়-দৃশ্য সইতে পারবেন না বলে আর এদিকে আসেননি।

তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে। আর দু'টো ঘণ্টা পরই বিয়ের লগ্ন। আসন্ন সেই উৎসবের প্রাক্কালে যেন একটি শোকসভা বসেছে!

কালু কাকা বললেন: কিন্তু রাজেন বাবু, ধরুন আমরা যদি সবাই মিলে আপনাকে লিখে দিই যে, কাল সকাল নয়টার মধ্যে আমরা দ্বিজেনকে থানায় পৌঁছে দোব, তাহলেও কি পারেন না ওকে আজ রেখে যেতে?

বিলাস কাকা অকস্মাৎ যেন একটা পথ খুঁজে পেলেন: মনে করুন না, ওর সঙ্গে আপনার আজ দেখাই হয়নি, ওকে বাড়ী পাননি কিংবা আপনাদের আসবার সংবাদ পেয়ে পূর্ব্বাহ্ণেই ও সরে পড়েছে, তাহলে? অবশ্য, আমি বলছি না ওকে একেবারেই পাননি বলে রিপোর্ট দিয়ে নিজের চাকরি খারাপ করুন। কাল সকালে আপনিই আবার আসুন না সদলবলে। আমরা কথা দিচ্ছি, ও বাড়ীতে থাকবে এবং থানায় যাবে আপনাদের সঙ্গে।

এ যে কত বড় ঝুঁকি সেটা মনে-মনে উপলব্ধি করে রাজেন বাবু আর একবার কেসে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন: দেখুন, আবারো বলি, আপনাদের দুঃখে আমি দুঃখ অনুভব করছি। কিন্তু দ্বিজেন বাবুকে পেয়েও পাইনি বলে কি ভাবে ডায়েরী লিখবো বুঝতে পারছি না। আর এই খবরটি ঘৃণাক্ষরেও ওপরে গিয়ে পড়লে শুধু যে চাকরি যাবে তাই নয়, জেলও হয়ে যাবে। তার পর কালকে ওঁকে পাঠিয়ে দেবার কথা। কোন্ আইনে আমি এমনি অদ্ভুত জামিন দিতে পারি বলুন? বিশেষ করে উনি তো আর আমাদের প্রিজনার নন। আই-বির হুকুমে আমরা ওঁকে নিতে এসেছি। আই-বি চীজটি যে কী বস্তু, তা তো আপনাদের অজানা নেই। ওরা ছেলেকে পর্য্যন্ত ধরিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। এমনি অবস্থায়—মানে,—

মানে প্রাঞ্জল হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আমায় যেতে হবে। সে আমি জানি দু'ঘণ্টা পূর্ব্বেই যখনই শ্রীমান রাজেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে গেছে, তখনই।

তথাপি, আত্মীয়েরা, পড়শীরা ও গ্রামের লোকেরা বহু যুক্তির অবতারণা করলেন, বহু অনুরোধ জানালেন, যুবকেরা অজস্র বিতর্কের সৃষ্টি করলো এবং সমবেত মহিলা ও দর্শকেরা নীরবে জানালো তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন। কিন্তু Settled fact কার্জ্জন সাহেবের বেলায় unsettled হলেও শ্রীনগর থানার দ্বিতীয় অফিসার রাজেন বাবুর বেলায় তা হতে পারলো না। বিনয়ের ও সমবেদনার পরাকাষ্ঠা দেখালেও আসামীকে হাতছাড়া করবার প্রস্তাব তাঁর অন্তর স্পর্শ করলো না।

তার পরের ঘণ্টা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সভা ছত্রভঙ্গ হয়ে জনসমাবেশে পরিণত হলো। কারু মুখে কথা নেই। সন্ধ্যার অন্ধকারে মনে হতে লাগলো যেন অজস্র প্রেতাত্মা কালো ছায়া ফেলে-ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আকাশেও এক ফালি কৃষ্ণাষ্টমীর চাঁদ। সে স্তিমিত দ্যুতিতে অন্ধকার আদৌ দূর হয়নি। তারাগুলোও তৈলহীন প্রদীপের মত মিট্‌মিট্‌ করছে। ডে-লাইটের একটিও জ্বালা হয়নি তখনো। বরযাত্রীদের ঘর তখনো অন্ধকার।

রাজেন বাবুর পাশাপাশি আমি এগিয়ে চললাম। পশ্চিম-বাড়ীর বাঁকটার পাশে আসতেই কে যেন হাতে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে গেল। খুলে দেখবার অবকাশ হলো না।

বরযাত্রীদের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় গুরুদাসকে খানিকটে উপদেশ দিলাম কি ভাবে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে।

ধোপা-বাড়ী এসে পড়লো। এর পরই সদর রাস্তা। পশ্চাতে চেয়ে দেখলাম দীর্ঘ নীরব শোকযাত্রা। কাকারা সবাই আছেন, কাকীমারাও আছেন, পাড়ার ছেলে-মেয়েরা আছে, কারিগর-বাড়ীর মুসলমানেরাও আছে, সবাই আছে। সবার উদ্দেশ্যেই যুক্তকরে প্রণাম জানিয়ে যখন সদর রাস্তায় পড়লাম, তখন অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল বাবাকে তো যেন দেখতে পেলাম না এঁদের মধ্যে, আর মাকে?

একটু পরই দেখা গেল বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে বাংলার হাজারো রাজবন্দীদের এক জন আর তাকে ঘিরে সাবধানে চলেছে বৃটিশ সরকারেরই এক জন এজেন্ট ও তার দু'জন সহচর।

কারু মুখে রা নেই। [ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

যাত্রাপথে চলচ্চিত্র

দুই

কলকাতার দিকে দিকে চিত্রনাট্য ভবন—বেশীর ভাগ বাড়ীর মালিক ম্যাডানরাই। তত দিনে ইংরেজরাও বুঝে নিয়েছিল, এ দেশেও ছবির প্রদর্শনীতে মুনাফা পাওয়া যায় যথেষ্ট। তারাও নিজস্ব চিত্রগৃহ খুলতে বিলম্ব করেনি। তখন প্রেক্ষাগারের উচ্চমূল্যের আসনগুলিতে দলে ভারি ছিল ইংরেজরাই। ভারত স্বাধীনতা অর্জ্জন করবার পর অধিকাংশ লালমুখো জীব বিলাতী কুয়াশার ভিতরে গিয়ে আত্মগোপন করেছে এবং সেই গড্ডলিকা প্রবাহ অবলম্বন করেছে খাঁটি জনবুলের দ্বারা অবজ্ঞাত বহু ট্যাঁসও (কারণ নিজেদের চামড়া ধলা না হ'লেও তাদের বিশ্বাস, তারা হচ্ছে ভারতীয় কালা আদমিদের চেয়ে উচ্চশ্রেণীর অভিজাত)।

প্রসঙ্গক্রমে আসল শ্বেতাঙ্গরা ফিরিঙ্গীদের কি-রকম অবজ্ঞা করে তার একটা দৃষ্টান্ত দি। গ্রেহাম কোম্পানির স্যার গ্রেহাম যখন বিলাতে চ'লে যান, তখন নিজের আপিসের কেরাণীদের একটি বিদায়-ভোজ দেন। দুই দিনের নিমন্ত্রণ। একটি দিন নির্দ্ধারিত ছিল ইংরেজদের সঙ্গে বাঙালীদের জন্যে। আর এক দিন নিমন্ত্রণ করা হয় কেবল ফিরিঙ্গীদের।

জনৈক বড়বাবু কৌতূহলী হয়ে এক জন পদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেন, "সাহেব, ফিরিঙ্গীদের জন্যে আলাদা দিন কেন?"

সাহেব সাফ জবাব দেন, "ওরা দোআঁশলা ব'লে। তোমাদের যে সামাজিক সম্মান দিতে পারি, ওদের তা দিতে পারি না।"

আঠারো শতকের আর একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। নবাব সিরাজদ্দৌলার কাছে থেকে তাড়া খেয়ে ইংরেজরা যখন পগার পার হয়ে ফোর্ট উইলিয়মে প্রবেশ ক'রে দুর্গদ্বার বন্ধ করেছিল, তখন সহরের ফিরিঙ্গীদের ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। ফিরিঙ্গীরা তখন দরজায় মাথা কুটতে কুটতে এমন হৃদয়-বিদারক উচ্চ ক্রন্দন জুড়ে দিয়েছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের কেল্লার ভিতরে স্থান দিতে বাধ্য হয়।

ধান ভানতে শিবের গান গাইলুম বটে, কিন্তু ফিরিঙ্গীদের নাম করতেই গল্প দু'টি মনে প'ড়ে গেল ব'লে না ব'লেও থাকতে পারলুম না।

অতঃপর যা বলছিলুম। তখন ইংরেজদের দেখাদেখি অধিকাংশ ফিরিঙ্গীরাও উচ্চতর শ্রেণীর আসনগুলির দখলিকার হয়ে নিজেদের কল্পিত আভিজাত্য বজায় রাখতে চাইত। ইংরেজরা আজও দলে হালকা হয়েও পূর্ব্ব-অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। ট্যাঁসের দলও তেলের মত গঙ্গাজলে মিশতে নারাজ। নিজেরা তেলেভাজা হয়েও তারা খেতে চায় বিলাতী টিনের মাখম। সাবেক চাল বজায় রাখবার চেষ্টা করে। কিন্তু উচ্চাসনে ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীদের আধিপত্য যত ক'মে এসেছে, ততই বেড়ে উঠেছে ধনপতি ইঙ্গবঙ্গদের সংখ্যা। নিম্নতর শ্রেণীর আসনগুলিতে মধ্যবিত্ত পরিবারের এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দর্শকের সংখ্যাধিক্য হয়েছে যথেষ্ট। এই চাহিদা বৃদ্ধির ফলেই দেশী ছবির জন্ম।

আগে ছবিঘরের মালিকদের পকেট বেশী ভারি করত ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী (স্বদেশেও যারা বিদেশী) দর্শকদেরই মনিব্যাগ। তাই তাদের জন্যে কালাপানির ওপার থেকে আমদানি করা হ'ত বিলাতী, ফরাসী ও ইয়াঙ্কি তসবির। ফরাসী ও ইংরেজরা পাঠাত অনেক সেরা সেরা চিত্রনাটক—'ক্লাসিক'রূপে বিশ্ববিখ্যাত নাটক, উপন্যাস ও কাব্য প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে রচিত হ'ত তাদের আখ্যান। ছবি তখন বোবা ছিল বটে, কিন্তু ভিক্টর হিউগোর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসের নায়ক জিন-ভ্যান-জিন সে সময়েও আসর কতখানি জমিয়ে তুলেছিল, তা আজও আমার স্মরণ আছে। অনেক কষ্ট ক'রে সর্ব্বোচ মূল্যের একখানি প্রবেশপত্র সংগ্রহ ক'রে ছবিখানি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম। চার্লস ডিকেন্সের "এ টেল অফ টু সিটিস," ছোট ডুমার "এ লেডি অফ দি ক্যামেলিয়া" ও লর্ড লিটনের "দি লাষ্ট ডেস্ অফ পম্পি" প্রভৃতি বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে তোলা ছবিগুলিও বাজার মাৎ ক'রে দিয়েছিল।

সার বার্ণাড, স্যর ফোর্বস্ রবার্টসন ও স্যার হার্বার্ট ট্রি প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় মঞ্চশিল্পীদেরও সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় ঐ নির্ব্বাক্ চিত্রের ভিতর দিয়েই। এখানে এটাও উল্লেখ করা উচিত, তখনও সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে নবযুগের সূচনা হয়নি বটে, কিন্তু পরে যে সব নট আমাদের নাট্যজগতে যুগান্তর এনেছিলেন, সে সময়ে তাঁরাও প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে সৌখীন অভিনয় করছেন এবং এ সব ছবি দেখেছেন। কাজেই চিত্রাভিনয়ের প্রভাব থেকে তাঁদের নাট্যসাধনাও মুক্ত হ'তে পারেনি। সেই জন্যেই এখানকার জনসাধারণ নবযুগের মঞ্চাভিনয়কে বায়োস্কোপ-ঘেঁষা ব'লে মনে করত। অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক ব'লে মনে হয় না। তবে এ জন্যে আমাদের লাভ ছাড়া লোকসান হয়নি। গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, দানী বাবু, তারক পালিত এবং আরো দুই-চার জনের কথা ছেড়ে দিলে বলতে পারি, সেকালকার অধিকাংশ অভিনেতাই প্রধানত নির্ভর করতেন কণ্ঠস্বরের উপরেই—এমন কি সুবিখ্যাত অমৃতলাল মিত্র পর্য্যন্ত। অনেকে আবার ছিলেন সবাক্ কাঠের পুতুলের মত। প্রিয়নাথ ঘোষ এক জন নামজাদা অভিনেতা ছিলেন, তাঁকে দেওয়া হত বড় বড় ভূমিকা—যেমন সাজাহান এবং ("সাজাহানে")' চন্দ্রগুপ্ত (চন্দ্রগুপ্তে") প্রভৃতি। ভদ্রলোকের একমাত্র গুণ, তাঁর ছিল তৈরি গলা। কিন্তু তাঁর মুখ প্রায় ভাবহীন ছিল বললেও চলে। অভিনয় করতে করতে দুই দিকে বিস্তৃত বাহু স্কন্ধের সমান্তরালে তুলে ধ'রে আবার তিনি নামিয়ে ফেলতেন, এই ছিল তাঁর প্রধান ভঙ্গি। ভাবভঙ্গিবৈচিত্র্য না থাকার দরুণ তাঁর দ্বারা গৃহীত চন্দ্রগুপ্ত ও সাজাহান প্রভৃতি ভূমিকা উপভোগ্য হত না আদৌ ও দু'টি ভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয় দেখা গিয়েছে নবযুগেই।

ছবির দর্শকরা তখন রঙ্গালয়ে গিয়ে দানী বাবুর মৌখিক ভাবাভিব্যক্তি দেখে মতপ্রকাশ করতেন, বাংলা দেশে সব চেয়ে বেশী চিত্রাভিনয়ের যোগ্যতা আছে তাঁরই। মনোমোহন থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ চলচ্চিত্রের ক্রমবর্দ্ধমান লোকপ্রিয়তা দেখে ফন্দি খাটিয়ে মঞ্চনাটকের কোন কোন দৃশ্য দেখাতে সুরু করলেন নির্ব্বাক্

চলচ্চিত্রের সাহায্যে। একসঙ্গে চিত্রাভিনয় তথা মঞ্চাভিনয় দেখবার লোভে প্রেক্ষাগারে ভেঙে পড়ল কাতারে কাতারে দর্শক। কৌতূহলী হয়ে গিয়েছিলুম আমিও। মুখর আর্টের সঙ্গে নির্ব্বাক্ আর্ট বেশ খাপ খেলে না বটে, কিন্তু ছবিতে দানী বাবুর মৌখিক ভাবের অভিব্যক্তি সুন্দর হয়েছিল সত্য সত্যই।

সেকালকার অভিনেতারা চলচ্চিত্রের আওতায় আসেননি। কিন্তু এ দেশের নাট্যজগতে নবযুগের পুরোধা যাঁরা, মানুষ হয়েছেন তাঁরা বৈদেশিক নির্ব্বাক্ চলচ্চিত্র দেখতে দেখতেই। চিত্রনাট্যের কুশীলবদের মৌখিক ভাবাভিব্যক্তি দেখে তাঁরা যে অভিনয় অভ্যাস করতেন, হয়তো এটা না হ'তেও পারে। তবে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তাঁরা যে অল্প-বিস্তর পরিমাণে চিত্রাভিনয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'য়েছিলেন, এটা অনুমান করলে অসঙ্গত হবে না, কারণ তাই-ই হচ্ছে স্বাভাবিক। এবং আগেই বলেছি, তাতে ক'রে হয়নি অপকার, হয়েছে উপকার। কারণ, নবযুগের অভিনেতাদের মুখ হয়নি মুখোসের মত স্থিরভাবযুক্ত এবং ভঙ্গি হয়নি বৈচিত্র্যহীন। তাঁদের বিভিন্ন ভাবদ্যোতক মুখের উপরে দেখা যেত দ্রুত পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন, এবং সাবলীল অঙ্গভঙ্গের দ্বারা তাঁরা মৌখিক সংলাপকে করতেন অলঙ্কৃত। নির্ব্বাক্ যুগে নাট্যরসবিকাশের জন্যে চিত্রনটদের প্রধান আলম্বন ছিল ভাবভঙ্গিই। আমাদের নবযুগের মঞ্চনটরা কণ্ঠস্বরকে অবহেলা না ক'রে ছবির ভাবাভিব্যক্তির পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে সংলাপকে ক'রে তুলেছিলেন অধিকতর উপভোগ্য। হয়তো সেই জন্যেই আমাদের নাট্যজগতে গিরিশোত্তর যুগের অধঃপতিত পুরাতন অভিনেতারা নূতন দলের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় একেবারেই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারেননি। এ অনুমান যদি সত্য হয়, তবে পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রের কাছে বাংলার আধুনিক সাধারণ রঙ্গালয় অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করতে পারে। তাতে লজ্জারও কারণ নেই। আসলে বাংলা রঙ্গালয় ও নাটক তো আজ পর্য্যন্ত করছে প্রতীচ্যেরই অনুসরণ। ঋণের মাত্রা না হয় আরো কিছু বাড়বে!

ফরাসী ও ইংরেজী ছবির কথা উল্লেখ করেছি। এইবারে তখনকার মার্কিণ ছবির কথা কিছু বলি।

ভারতের বাজারে তখন ছিল মার্কিণ হাসির ছবির খুব প্রভাবপ্রতিপত্তি। ক্রমে তাদের পসার এত বেড়ে ওঠে যে, আগে যারা ছিল অগ্রগণ্য সেই ফরাসী হাসির ছবিগুলি একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। লোকসাধারণ উচ্চশ্রেণীর হাস্যরসকে উচিত মত আমল দিতে কোন দিনই রাজি হয়নি। এই জন্যেই তারা "চিরকুমার সভা"র হাস্যরসের চেয়ে বেশী পছন্দ করে "আবুহোসেন" ও "আলিবাবা"র ইয়ার্কির বচনগুলি। অধিকাংশ মার্কিণ হাসির ছবির প্রধান কারবার ছিল "লো-কমিক" বা নীচু দরের হাসি নিয়ে। কাজেই সাধারণ—বিশেষ ক'রে অশিক্ষিত ও কুশিক্ষিত—দর্শকরা সেই দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়ে। য়ুরোপে সব চেয়ে শিল্পরসবেত্তা জাতি ব'লে ফরাসীদের অসামান্য খ্যাতি আছে। ব্যবসার খাতিরেও তারা চাইলে না নীচের দিকে নামতে।

আসরে জাঁকিয়ে বসল মার্কিণ হাসির ছবি। ও-সব চিত্রনাট্যের বাঁধুনি ছিল যথেষ্ট আলগা। আখ্যানবস্তু হ'ত উদ্ভট, নটীর অঙ্গভঙ্গি ও চলা-ফেরাও হ'ত উদ্ভট এবং লোক হাসাবার কৌশলও হ'ত উদ্ভট। পা পিছলে হঠাৎ কেউ দড়াম ক'রে আছাড় খেলে দুনিয়ার সব দেশেরই সাধারণ লোক হো-হো ক'রে না হেসে থাকতে পারে না, অথচ সবাই জানে, এ ভাবে ভূতলশায়ী হওয়ার মধ্যে হাসির খোরাক নেই কিছু মাত্র, বরং বেদনা বোধ করবার কারণ আছে পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই। তবু প্রথমটা লোকে দুঃখিত না হয়ে হেসেই ফেলে নিষ্ঠুর ও ইতরের মত। দর্শক হাসাবার এই সস্তা প্যাঁচটি মার্কিণের হাস্যাভিনেতারা যত্র-তত্র ব্যবহার করতে ছাড়ত না। এক রাশ কাচের বা চীনেমাটির সানকি হাত থেকে মাটিতে প'ড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেলে লোকে হাসে কেন জানি না। মার্কিণ ছবিতে এ ব্যাপারটাও দেখা যেত হামেসাই। মার্কিণ হাসির ছবিতে কত হাজার (বা লক্ষ) টাকার কাচের বাসন ও গৃহস্থালীর অন্যান্য আসবাব মানুষকে জোর ক'রে হাসাবার জন্যে ভেঙে তছনছ করা হয়েছে, বোধ করি তার হিসাব কেউ রাখেনি। হাস্যোদ্রেক করবার জন্যে এমনি আরো হরেক রকম সুপরিচিত কৌশল দেখা যেত মার্কিণ ছবিগুলিতে। এ-দেশে এ-সবকে বলে, কাতুকুতু দিয়ে লোক হাসানো।

এই শ্রেণীর হাসির রাজা ব'লে অগ্রগণ্য ছিলেন চার্লি চ্যাপলিন এবং তাঁর পরেই আসন পেতেন হ্যারল্ড লয়েড। লোকে হাসির রাণী ব'লে দেখত মেরি পিকফোর্ডকে। চ্যাপলিন ব্যবহার করতেন সৃষ্টিছাড়া উপকরণ, তাঁর টুপী, ইজের, জুতো ও ছড়ী দেখলেই হাসবার জন্যে উদ্যত হয়ে থাকত দর্শকদের ওষ্ঠাধর। হ্যারল্ড লয়েড ও-রকম বেমক্কা জিনিষ ব্যবহার করতেন না, তিনি চোখে পরতেন মোটা ফ্রেমওয়ালা চশমা। তা দেখতে সবাই এতটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, বিনি-চশমায় কেউ হ্যারল্ড লয়েডের মুখ কল্পনাই করতে পারত না। মেরি পিকফোর্ডও অদ্ভুত মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি দেখাতে এবং আশ্চর্য্য ভাবে নিজের গতর চূর্ণ না ক'রে দুমদাম আছাড় খেতে পারতেন। কিন্তু দর্শকদের সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করত তাঁর পরমসুন্দর মুখশ্রী এবং সুঠাম তনুলতা। চিত্রামোদীদের কাছে তাঁর পদবী হয়েছিল "বিশ্বপ্রেয়সী"।

কিন্তু একটা বিষয়ে সন্দেহ নেই। লোকপ্রিয় হবার জন্যে পূর্ব্বোক্ত তিন জন সস্তা হাসির রস নিবেদন করেছেন বটে, কিন্তু আসলে তাঁরা হচ্ছেন উচ্চশ্রেণীর শিল্পী। চ্যাপলিনের হাসির ছবির মধ্যে হাসির তলায় থাকে ফল্গুর মত যে সব সূক্ষ্ম ও করুণ ভাব এবং চিন্তাশীলতা, গোড়ার দিকে তার পরিচয় পাওয়া যায়নি। হ্যারল্ড লয়েড ও মেরি পিকফোর্ড আজ আসরে নামেন না বটে, চ্যাপলিন কিন্তু "still going strong"! আজ আর তিনি কুচো-কুচো হাল্কা ছবির বেসাতি করেন না, উচ্চতর ও সুচিন্তিত বিষয়বস্তু নিয়ে প্রস্তুত করেন গুরুতম ছবি, তাদের মধ্যে সস্তায় কিস্তিমাৎ করবার কোন প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করা যায় না। চার্লস চ্যাপলিন নিজেকে এক জন রীতিমত ভাবুক, সৃষ্টিক্ষম ও অতুলনীয় শিল্পী ব'লে প্রমাণিত করতে পেরেছেন।

মার্কিণ মুল্লুক এ দেশে আর এক শ্রেণীর ছবি রপ্তানি করত। তা হচ্ছে দুঃসাহসিক কার্য্যকলাপে পরিপূর্ণ, চিত্তোত্তেজক ধারাবাহিক চিত্র। হপ্তায় হপ্তায় দফায় দফায় দেখানো হ'ত সে সব সুদীর্ঘ ছবি। প্রতি কিস্তির শেষের দিকে এমন জায়গায় ছবি দেখানো বন্ধ করা হ'ত, যাতে ক'রে দর্শকরা পরের কিস্তির জন্যে অপেক্ষা করতে বাধ্য হয় অধীর আগ্রহে। সে সব ছবিতে কেবল হানাহানি,

মারামারি, বন্দুকের লড়াই, স্ত্রীহরণ, গুণ্ডামি ও ডাকাতি প্রভৃতিই থাকত না, দেখা যেত এমন সব রোমাঞ্চকর, অবিশ্বাস্য, আজগুবি ও অতিপ্রাকৃত ব্যাপার, বাস্তব জীবনে বা কল্পনাতেও সম্ভবপর ব'লে মনে হবে না। ক্যামেরার কেরামতিতে অচল পাহাড়ও হয় সচল, মরুভূমিতেও প্রবাহিত হয় নদ-নদী, মানুষের গতিবিধিও হয় জলে-স্থলে-শূন্যে। সুতরাং ছবিতে ভিতরেও যে আমরা দেখাত পাব ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব, কবন্ধ, অদৃশ্য মানুষ, এবং ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সৃষ্ট দোতলা-তেতলার সমান উঁচু অতিকায় বীভৎস মূর্ত্তি, তা আর এমন আশ্চর্য্য কথা কি? এ সব ছবির ছিল প্রভূত চাহিদা, কারণ মানুষ কল্পনায় যার নাগাল ধরতে পারে না, চোখের সামনে তাকে আকার ধারণ করতে দেখলে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে অত্যন্ত।

মাঝে মাঝে সারা দিবসব্যাপী বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ক'রে একটানা দেখানো হ'ত গোটা ছবিখানা। ফলে ছবিঘরে আর তিলধারণের ঠাঁই থাকত না। নির্ব্বোধের মত আমি একবার ঐ রকম বিশেষ প্রদর্শনীতে হাজিরা দিয়েছিলুম। আজও মনে আছে, দুপুরে ছবিঘরে ঢুকে সন্ধ্যার কিছু আগে যখন বাইরে বেরিয়ে এলুম, তখন চোখে দেখেছিলুম অন্ধকার এবং মস্তকের মধ্যে অনুভব করেছিলুম ঘূর্ণাবর্ত্ত! সুখের বিষয়, এ শ্রেণীর প্রদর্শনী আর হয় না। এবং ধারাবাহিক ছবির চাহিদাও বোধ হয় এ দেশে ক'মে গিয়েছে—যদিও ইয়াঙ্কি মুলুকে এখনো ঐ রকম ছবি প্রস্তুত হয়।

আগেকার পাশ্চাত্য নির্ব্বাক্ ছবির কথা মোটামুটি বলা হ'ল। আসছে বারে বলব বাংলা ছবির গোড়ার দিককার কথা।

[ক্রমশঃ

—সাহিত্য-পরিচয়—

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

সে কাল আর এ কাল—রাজনারায়ণ বসু। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ২৪৩।১ নং আপার সারকুলার রোড। কলিকাতা—৬। মূল্য এক টাকা।

নারীর মূল্য—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য দুই টাকা।

পঞ্চশর—প্রেমেন্দ্র মিত্র। সিগনেট প্রেস। ১০।২ নং এলগিন রোড, কলিকাতা—২০। মূল্য দুই টাকা চার আনা।

কাদামাটির দুর্গ—প্রবোধকুমার সান্যাল। ক্যালকাটা বুক-ক্লাব লিঃ। ৮৯ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

পুষ্পমেঘ—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর। বেলেভিউ পাবলিশার্স। পি ১৩ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নর্থ। কলিকাতা—৫। মূল্য পাঁচ টাকা।

THE ART OF SUBHO TAGORE—Thackers Spink (1933) Limited. Calcutta. Price Rupees Ten only.

জৈনধর্ম্ম—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন। বিশ্বভারতী, ৬।৩ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭। মূল্য আট আনা।

ওড়িয়া সাহিত্য—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন। বিশ্বভারতী, ৬।৩ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭। মূল্য আট আনা।

রাজগৃহ ও নালন্দা—ডাঃ অমূল্যচরণ সেন এম. এ., ডি. ফিল্ (হামবুর্গ)। ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি। ২১ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

একটি সঙ্গীতের জন্মকাহিনী—অমরেন্দ্র ঘোষ। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য আড়াই টাকা।

অভিসির গল্প—নবকৃষ্ণ ঘোষ। গ্রন্থ-ভাণ্ডার, ৭২।১এ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য দেড় টাকা।

ভ্রমণে দর্শন—"সেবক"। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ নং ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

পূর্ণচ্ছেদ—লিলি দেবী। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য দুই টাকা।

অন্তরালে—শ্রীকানাইলাল ঘোষ। দি প্রকাশনী। ১১।এ নং তারক পরামাণিক রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য দুই টাকা।

শিল্পধারা—প্রভাতকুমার দত্ত। ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ, ৮৯ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য দুই টাকা।

মান্দালয়ের কথা—শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়। বৈকুণ্ঠ বুক হাউস। ১৮৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

মিঃ চার্চ্চিলের জয়—

গত ২৫শে অক্টোবর (১৯৫১) অনুষ্ঠিত বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দলের জয়লাভ অপ্রত্যাশিত ছিল কি না সে সম্পর্কে মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের এই জয়ে বিস্মিত হইবারও কিছু নাই। শ্রমিক দলের পরাজয়ের মধ্যে বৃটিশ নির্ব্বাচকমণ্ডলী যেমন বৃটিশ সমাজতন্ত্রের ভাগ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তেমনি রক্ষণশীল দলকে জয়ী করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষকে সযত্নে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ইউরোপের প্রতি বিপ্লব শক্তিকেই তাঁহারা শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন। ১৯৪৫ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে শ্রমিক দল কমন্স সভার ৩১৮টি আসন দখল করিয়া ১৮৫টি আসনের সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তখন বৃটেনের নির্ব্বাচকমণ্ডলী রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন আশা করিয়াছিলেন, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তবু ঐ নির্ব্বাচনে যাঁহাদের ভোটে শ্রমিক দল জয়ী হইয়াছিলেন তাঁহারা যে একটা পরিবর্ত্তন চাহিয়াছিলেন, এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, বৃটিশ সমাজতন্ত্র বৃটেনের সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে একটা মৌলিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে। তাঁহাদের এই আশা যে আমড়া গাছে আম ফলিবার মত বন্ধ্যা আশাই ছিল, প্রথমে সে-কথা তাঁহারা বোধ হয় বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের পরবর্ত্তী প্রথম শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের শাসনের সাড়ে চারি বৎসরে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্ম সুব্যবস্থা করিবার ক্রটি না করিলেও প্রত্যাশিত সামাজিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে তাঁহারা ব্যর্থ হইয়াছিলেন। উহার প্রতিক্রিয়া প্রথম দেখা গেল ১৯৫০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের সাধারণ নির্ব্বাচনে। এই নির্ব্বাচনেও শ্রমিক দল জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য মাত্র ছয়টি আসনে আসিয়া দাঁড়াইল। ১৯৪৫ সালের নির্ব্বাচনে শ্রমিক দল যেখানে ৩১৮টি আসন দখল করিয়াছিলেন, ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারীর সাধারণ নির্ব্বাচনে সেখানে তাঁহারা পাইলেন মাত্র ৩১৩টি আসন। মিত্রদলগুলি সহ রক্ষণশীল দল ১৯৪৫ সালের নির্ব্বাচনে মাত্র ২১৩টি আসন পাইয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারীর নির্ব্বাচনে তাঁহারা ২৯৬টি আসন দখল করিতে সমর্থ হন। ঐ নির্ব্বাচনের ফল হইতেই শ্রমিক দলের ভবিষ্যৎ অনুমান করা একেবারে কঠিন ছিল না।

বৃটেনের ২৫শে অক্টোবর (১৯৫১) তারিখের সাধারণ নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল ৩২১টি আসন এবং শ্রমিক দল ২৯৫টি আসন লাভ করিয়াছেন। উদারনৈতিক দল ১০০ জন প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছিলেন। কিন্তু মাত্র ছয় জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে এক জনও নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। [illegible]ত্র সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ৩ জন। ১৯৫০ সালের নির্ব্বাচনে [illegible]টারের সংখ্যা ছিল ৩,৪২,৬৯, ৭৬৪জন। তন্মধ্যে শতকরা [illegible] জন ভোট দিয়াছিলেন। এই নির্ব্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ছিল [illegible]৯,১৫,১১২ জন। তন্মধ্যে শতকরা ৮৩ জন ভোট দিয়াছেন। [illegible]শীল দল জয়লাভ করিলেও তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য মাত্র ২০টি [illegible]সনের। ১৯৫০ সালের নির্ব্বাচনে শ্রমিক দলের সংখ্যাধিক্য [illegible]ক্ষা রক্ষণশীল দলের এই সংখ্যাধিক্য যে অনেকটা [illegible]পদ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে-পরিমাণ ভোট দেওয়া হইয়াছে সেদিক দিয়া হিসাব করিলে দেখা যায়, মোটের উপর শ্রমিক দল দুই লক্ষ বেশী ভোট পাইয়াছেন। শ্রমিক দল বেশী ভোট পাইলেও আসন পাইয়াছেন কম। আসন কম পাইবার জন্ম উদারনৈতিক ভোট যে অনেকখানি দায়ী তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। যেখানে উদারনৈতিক দলের কোন প্রার্থী ছিল না সেখানে উদারনৈতিক ভোটারদের দুই-তৃতীয়াংশই রক্ষণশীল দলকে ভোট দিয়াছেন এবং এক-তৃতীয়াংশ দিয়াছেন শ্রমিক দলকে। সহরের নির্ব্বাচন কেন্দ্রগুলিতে শ্রমিক দলের প্রাপ্ত ভোটের খুব বেশী পরিবর্ত্তন হয় নাই। বরং বিগত নির্ব্বাচনের তুলনায় শ্রমিক দল বেশী ভোটই পাইয়াছেন। রক্ষণশীল দল সম্পর্কেও এ কথা কতক পরিমাণে বলিতে পারা যায়। সুতরাং যাঁহাদিগকে ফ্লোটিং ভোটার বলা হইয়া থাকে, তাঁহাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তনের জন্মই যে শ্রমিক দল হারিয়া গিয়াছেন এবং রক্ষণশীল দল জয়ী হইয়াছেন, এ কথা বলিলেও ভুল হয় না। ১৯৪৫ সালে ইঁহারাই শ্রমিক দলকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ করিয়া জয়ী করিয়াছিলেন। এবারের নির্ব্বাচনে তাঁহারাই জয়ী করিয়াছেন রক্ষণশীল দলকে। সুতরাং ফ্লোটিং ভোটারগণ যে এখনও 'ফ্লোটিং', তাঁহাদের দোদুল্যমান মনোবৃত্তির যে পরিবর্ত্তন হয় নাই, বৃটেনের বিগত দুইটি নির্ব্বাচন এবং আলোচ্য নির্ব্বাচন হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই ২০ লক্ষ ফ্লোটিং ভোটারের মর্জ্জি দ্বারাই বৃটেন শাসিত হইবে। ভোটিং পদ্ধতির পরিবর্ত্তন দ্বারা এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কিন্তু কি রক্ষণশীল দল, কি শ্রমিক দল, কোন দলই ভোটের বর্ত্তমান পদ্ধতির পরিবর্ত্তে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্ম কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ফ্লোটিং ভোটারদিগকে বাদ দিলে বৃটিশ ভোটারদিগকে সমাজতন্ত্রী ভোটার এবং সমাজতন্ত্রবিরোধী ভোটার এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। এই দুই শ্রেণীর ভোটারদের সংখ্যাও প্রায় সমান। বৃটিশ সমাজতন্ত্রের ইহা এক প্রধান সমস্যা। বৃটিশ সমাজতন্ত্র ফ্লোটিং ভোটগুলিকে সমাজতন্ত্রবাদে যেমন ভিড়াইতে পারে নাই, তেমন সমাজতন্ত্রবিরোধী ভোটারদের উপরেও কোন প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ হইয়াছে।

রক্ষণশীল দল জয়লাভ করায় মিঃ চার্চ্চিল আবার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইহাতে খুবই আনন্দিত হইয়াছে। মিঃ চার্চ্চিল ক্ষমতা পাওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের মধ্যে সম্পর্কটা যে আরও নিবিড় ও আরও দৃঢ় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে রক্ষণশীল দলের জয়লাভে যে-প্রতিক্রিয়া হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। সাধারণ ভাবে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই সকল দেশের

সাধারণ মানুষ মিঃ চার্চ্চিলের জয়লাভে কতকটা উদ্বিগ্ন না হইয়া পারে নাই। কিন্তু এই সকল দেশের এক শ্রেণীর লোক যে মিঃ চার্চ্চিলের জয়লাভে খুব সন্তুষ্ট হইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। গত ১লা নবেম্বর (১৯৫১) ইরাণের মজলিসে বিরোধী দলের নেতার বক্তৃতার কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ হোসেন মাক্কী বলিয়াছেন, "Some people think now that Mr. Churchill has come to power they have their own father in power and they can say whatever they like." অর্থাৎ "মিঃ চার্চ্চিল ক্ষমতা পাওয়ায় কতকগুলি লোক মনে করিতেছেন যেন তাঁহাদের বাবা ক্ষমতা পাইয়াছেন এবং তাঁহারা যাহা খুশী তাহাই বলিতে পারেন।' তাঁহার এই উক্তির মধ্যে যথেষ্ট তীব্রতা থাকিলেও, এই উক্তি কতকটা অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হইলেও উহাকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যাঁহারা স্বেচ্ছায় মিঃ চার্চ্চিলের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা কাহারা, ইহা লইয়া এখানে আলোচনা করিবার স্থান আমরা পাইব না। বৃটেনের উপনিবেশগুলিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যাঁহাদের কাছে আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ হইয়াছিল, মিঃ চার্চ্চিল ক্ষমতা পাওয়ায় তাঁহারা যে আবার আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ চার্চ্চিল ভাঙ্গা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে আবার জোড়া লাগাইবার চেষ্টা করিবেন, অনেকের মনে এইরূপ আশা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। শ্রমিক দলের ছয় বৎসর শাসন-কালের মধ্যে ভারত, পাকিস্থান, সিংহল এবং ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মিঃ চার্চ্চিল এই স্বাধীনতার ব্যত্যয় করিতে পারিবেন, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু কম্যুনিজম নিরোধের চাপ দিয়া এই দেশগুলির উপর তিনি যে বৃটিশ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা বিশেষ ভাবেই করিবেন, এরূপ আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। চার্চ্চিল গবর্ণমেণ্ট ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধির প্ররোচনা যে আরও অধিকতর পরিমাণে যোগাইবেন, এইরূপ আশঙ্কাও উপেক্ষার বিষয় নয়। মিঃ চার্চ্চিল এবং তাঁহার কমনওয়েলথ সম্পর্ক-সচিব লর্ড ইজমে যদি কাশ্মীর বিভাগের জন্য ভারতের উপর গুরুতর চাপ দেন, তাহা হইলেও বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। ভারতের পররাষ্ট্র নীতির উপরেও মিঃ চার্চ্চিলের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের দেশগুলিকে তিনি হয়ত প্রত্যক্ষ ভাবে পুনরায় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন না। কিন্তু কম্যুনিজম নিরোধের অজুহাতে রক্ষা-ব্যবস্থার খিড়কী পথ দিয়া এই দেশগুলির উপর ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক আধিপত্য চাপাইবার ব্যবস্থা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হওয়ার কোন কারণ নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে ভগ্নাবশেষ এখনও অবশিষ্ট আছে সেগুলিকে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যে কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, সে কথাও অনস্বীকার্য্য। কিন্তু মধ্য-প্রাচী ও মালয়ে ঝুনো সাম্রাজ্যবাদী মিঃ চার্চ্চিলকেও বড় কম অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে না।

ইঙ্গ-ইরাণ এবং ইঙ্গ-মিশর বিরোধের মীমাংসার প্রচেষ্টাকেই মিঃ চার্চ্চিল অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন ইহা খুব স্বাভাবিক। নির্ব্বাচনী বক্তৃতায় তিনি মধ্য-প্রাচীতে বৃটিশ সম্ভ্রম ও প্রভাব ক্ষুণ্ণ হওয়ার জন্য মিঃ এটলীকেই দায়ী করিয়াছেন। ভারত, পাকিস্থান, সিংহল ও ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভকে তিনি বৃটিশারদের উত্তরাধিকার এবং পবিত্র ন্যাসের প্রতি শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। পৃথিবীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যই ছিল বৃহত্তম সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যে এক দিন সূর্য্য অস্ত যাইত না। বস্তুতঃ বৃটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল বৃটেনের ১৩৫ গুণ, পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশই ছিল এই সাম্রাজ্যের অধিবাসী। এই বৃহত্তম সাম্রাজ্য শোষণ করিয়া বৃটেন এক সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী দেশে পরিণত হইয়াছিল, গড়িয়া তুলিয়াছিল এক বিরাট অবসরভোগী শ্রেণী, তাহার নৌবহর সপ্ত-সমুদ্রের উপর আধিপত্য করিত। গ্রেট বৃটেন ছিল সমগ্র পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল। সমগ্র পৃথিবীর নেতা ছিল বৃটেন। বৃটেনকে আবার সেই নেতৃত্বের আসনে বসাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মিঃ চার্চ্চিল ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। ক্ষমতা লাভের পরেও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট যে ক্ষতি করিয়াছেন তাহা তিনি পূরণ করিবেন। বৃটেনকে পূর্ব্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মিঃ চার্চ্চিল দ্বিতীয় ডিজরেলির ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিবেন কি না, তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পরবর্ত্তী পৃথিবীর আন্তর্জ্জাতিক শক্তি হিসাবে বৃটেনের আপেক্ষিক গুরুত্বের উপর। ইচ্ছাতেই হউক আর অনিচ্ছাতেই হউক, বৃটেন আজ একান্ত ভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। বৃটেনকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার রাষ্ট্র বলিলেও ভুল বলা হয় না। রুশ-মার্কিণ বিরোধই তাহার একমাত্র সম্বল বা উপজীবিকা, তাহার একমাত্র কায়েমী স্বার্থ। পৃথিবীতে আজ সুরু হইয়াছে মার্কিণ-যুগ। আর এক দিকে আন্তর্জ্জাতিক দিক্‌চক্রবালে উদীয়মান কম্যুনিজম-যুগের নবারুণ আভা দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে মার্কিণ-যুগ প্রতিষ্ঠিত হইবে, না কম্যুনিজম-যুগ প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা লইয়া চলিতেছে প্রবল দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বকে মূলধন করিয়া মিঃ চার্চ্চিলের পক্ষে বৃটেনের হৃত প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার করার পক্ষে বাধাও বড় কম নয়। অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে বৃটেনের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। আবার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা-যুদ্ধে সে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপরেই একান্ত ভাবে নির্ভরশীল। সোভিয়েট রাশিয়ার অস্তিত্বই বৃটেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের গুরুতর বিপদ। সোভিয়েট রাশিয়া যে সাম্রাজ্যবাদের চ্যালেঞ্জ-স্বরূপ, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের পরে ইউরোপ ও এশিয়ায় সোভিয়েট রাশিয়া প্রবল পরাক্রান্ত শক্তিতে পরিণত হওয়ায় এই চ্যালেঞ্জের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। মালয়ে, মধ্য-প্রাচীর ইরাণে, মিশরে এই চ্যালেঞ্জ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। এই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মিশরের সহিত সুয়েজ ক্যানাল লইয়া বিরোধে বৃটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যেরূপ অকুণ্ঠ সমর্থন পাইয়াছে, ইরাণের সহিত তৈল লইয়া বিরোধে তেমন সমর্থন পায় নাই।

মধ্য-প্রাচীতে ক্ষীয়মাণ বৃটিশ-প্রভাব পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মিঃ চার্চ্চিল কি নীতি গ্রহণ করিতে পারেন? আমেরিকার

সমর্থনপুষ্ট হইয়া মিশরকে ধমক দিতে এবং সেই সঙ্গে ইরাণের সহিত আপোষ-মীমাংসার মধুর সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা তিনি করিতে পারেন। কিন্তু ইরাণের সহিত মীমাংসার চেষ্টা শুধু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবেই সাফল্য লাভ করিতে পারিবে। ইহাতে গুরুতর বিপদ, ইরানে মার্কিণ অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুপ্রবেশ। ইতিমধ্যেই ইরাণের তৈল-বিরোধ মীমাংসার জন্ম প্রায় গোটা ছয়েক বে-সরকারী মার্কিণ পরিকল্পনা গঠিত হইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালী ভারত এবং পাকিস্থান, সিংহল এবং ব্রহ্মদেশ বৃটেন হারাইয়াছে। মার্কিণ নেতৃত্বে জার্ম্মাণ এবং জাপানী শিল্প বৃটেনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রবল আঘাত হানিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার উপর ইরাণেও হয়ত 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' নীতিই অনুসরণ করিতে হইবে। এই ভাবে ইরাণে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেও নীল নদীর উপত্যকার সমস্যা আরও কঠিনতর হইয়া উঠিবে। মিশরের প্রধান মন্ত্রী নাহাশ পাশার কম্যুনিজম-প্রীতি আছে মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু সুয়েজ ক্যানেলের ব্যাপারে মিঃ চার্চ্চিল যত বেশী দৃঢ়তার সহিত কঠোরতা অবলম্বন করিবেন, মিশরও তত রাশিয়ার দিকে ঢলিয়া পড়িবে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারের কথা বাদ দিয়া বৃহত্তর আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে মিঃ চার্চ্চিলের পররাষ্ট্র নীতি শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের মতই লেজুড় পররাষ্ট্র নীতি ছাড়া আর কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? মিঃ চার্চ্চিলের বিশ্ব-গবর্ণমেণ্ট গঠনের অভিপ্রায়ের কথা আমরা শুনিয়াছি। এই বিশ্ব-গবর্ণমেণ্টের চারিটি পায়ার মধ্যে রাশিয়াকে তিনি অন্যতম পায়া করিতে চান, তাহাও আমরা জানি। নির্ব্বাচনের সময় শ্রমিক দল এই কথাই নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে শুনাইয়াছিলেন যে, মিঃ চার্চ্চিলকে ভোট দিলে তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামকেই ডাকিয়া আনা হইবে। আবার মিঃ চার্চ্চিলও রাশিয়ার সহিত মীমাংসার পথে শান্তি-প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু মিঃ চার্চ্চিল তৃতীয় যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করিয়া তুলিবেন, ইহা মনে করিবার যেমন কারণ নাই, তেমনি ঠাণ্ডা-যুদ্ধকে তিনি আরও তীব্রতর করিয়া তুলিবেন এইরূপ আশঙ্কা করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতির উপর তিনি কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। ১৭৭৬ সালে যে টোরী কথাটিকে আমেরিকাবাসী অত্যন্ত বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত, প্রায় পৌণে দুই শত বৎসর পরে সেই টোরী দলের জয়লাভ আমেরিকাবাসীর কাছে আনন্দের বিষয় হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ ইহাই যে, শ্রমিক গবর্ণমেণ্টকে মতে ভিড়াইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যেরূপ চাপ দিতে হইয়াছে, টোরী গবর্ণমেণ্টকে সেরূপ চাপ দিবার প্রয়োজন হইবে না। মিঃ চার্চ্চিল বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এক জোটে কাজ করিবার পক্ষপাতী। বিশেষতঃ রুশ-মার্কিণ বিরোধকে জীয়াইয়া রাখিতে পারিলেই বর্ত্তমান অবস্থায় বৃটেনের কিছু লাভ আছে। মিঃ এটলী মনে করেন, একমাত্র সোশ্যালিমই বৃটেনকে এবং পৃথিবীকে কম্যুনিজমের হাত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ। কিন্তু মিঃ চার্চ্চিলের দৃষ্টিতে কম্যুনিজম এবং সোশ্যালিজমের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সোভিয়েট রাশিয়াকে যদি সাম্রাজ্যবাদের চ্যালেঞ্জ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে যে সকল দেশের সমৃদ্ধি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য শোষণের উপর নির্ভর করে, তাহারা কখনই সোভিয়েট-ব্যবস্থার সহিত শান্তিতে বাস করিতে চাহিতে পারে না। সোভিয়েট-ব্যবস্থার মধ্যে এই বিপদের আশঙ্কা বৃটিশ শিল্পপতিরা মার্কিণ শিল্পপতিদের মতই উপেক্ষা করিতে অসমর্থ। নব-নির্ব্বাচিত কমন্স সভায় রক্ষণশীল দলের ৩২১ জন সদস্যের মধ্যে লিমিটেড কোম্পানীর ডিরেক্টর এবং ভূম্যধিকারী আছেন ১১৩ জন এবং ব্যবসায়ী বা ব্যবসা-পরিচালক আছেন ৪২ জন। ১২ জন সদস্য আছেন যাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যক্তিগত উপায় (private means) আছে। উকীলের সংখ্যা আছে ৫৮ জন। এই অবস্থায় রক্ষণশীল দল বিনা আপত্তিতে মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতি সমর্থন তো করিবেই, অধিকন্তু রুশ-মার্কিণ বিরোধকে প্রবলতর করিয়া তুলিতেই চেষ্টা করিবে। ইহার পরিণামে সশস্ত্র সংগ্রাম যে আরম্ভ হইয়া যাইতে পারে না, তাহা নয়। কিন্তু রাশিয়া যেমন যুদ্ধ চায় না, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও তেমনি প্রথম আক্রমণ করিতে রাজী নয়। তবে এ কথাও ঠিক যে, বিশ্ব-সংগ্রাম যে কখন কি ভাবে আরম্ভ হইবে, তাহাও কেহ বলিতে পারে না।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি অপেক্ষা বৃটেনের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও কম বিপজ্জনক নয়। ইস্পাত-শিল্পকে সরকারী কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত করা কঠিন হইবে না। কিন্তু বৃটেনকে তাহার অর্থনৈতিক শোচনীয় অবস্থা হইতে মুক্ত করা বড় সহজ হইবে না। এ সম্পর্কে মার্কিণ সাহায্য মিঃ চার্চ্চিল কি পাইবেন, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থ এক সময়ে সম্পদের মুখ দেখিয়াছিলেন, দরিদ্র হইয়া তিনি ধনী আত্মীয়ের কাছে যে ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন, মিঃ এটলী সেই ভাবেই আমেরিকার দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ চার্চ্চিলের অবস্থা অভিজাতশ্রেণীর নিঃস্ব ব্যক্তির মত। তিনি হয়ত মুখ ফুটিয়া এক পয়সা সাহায্যও চাহিবেন না, বাহিরে বড়লোকী চাল বজায় রাখিবেন এবং বন্ধু-বান্ধবরা অযাচিত সাহায্য করিলে নির্ব্বিকার চিত্তে তাহা গ্রহণ করিতেও তাঁহার লজ্জা হইবে না। কিন্তু আমেরিকার সাহায্যের উপর নির্ভর করিলেই তো শুধু চলিবে না। জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয়বৃদ্ধি বৃটেনের প্রায় সকল শ্রেণীকেই হয়ত কিছু-না-কিছু স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আঘাত হানিয়াছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে। শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট অল্প আয়ের লোকদের জন্ম নানা রকম সাহায্য ও সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণী শুধু মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণের অর্থ সাহায্য ছাড়া আর কিছুই পায় নাই। তাঁহারাই জলে নিমজ্জিত ব্যক্তির তৃণখণ্ড আঁকড়াইয়া ধরিবার মত রক্ষণশীল দলকে ভোট দিয়াছিলেন। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্য ও জ্বালানীর ঘাটতি, ডলারের অভাব, ক্রমহ্রস্বমান রপ্তানি-বাণিজ্য এবং মজুরি বৃদ্ধির দাবী মিলিয়া বৃটেনের আর্থিক ব্যবস্থাকে অত্যন্ত শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। অস্ত্রসজ্জা এবং জনকল্যাণ ব্যবস্থা দুই-ই বজায় রাখিয়া শাসন-কার্য্যে ব্যয়সঙ্কোচ করা সহজ হইবে না। মন্ত্রীদের বেতন-হ্রাসের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে এবং বৃটেনের নূতন অর্থ সচিব মিঃ বাটলার ৩৫ কোটি ষ্টার্লিং আমদানি হ্রাসের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। এই আমদানী হ্রাসের ফলে অনেক খাদ্যদ্রব্য আমদানিও বন্ধ হইবে। সুতরাং খাদ্য-রেশনের পরিমাণ যে হ্রাস পাইবে সে-কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক উভয় শ্রেণীই উহার ফলভোগ করিবে। বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস চার্চ্চিল গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। খাদ্য হ্রাসের ফলে তাহাদের এই ইচ্ছার কতটুকু অবশিষ্ট থাকিবে তাহা বলা কঠিন। শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি স্থগিত না রাখার নির্ব্বাচন প্রতিশ্রুতি যদি গবর্ণমেণ্ট প্রতিপালন করিতে না পারেন, তাহা হইলে শ্রমিক-অসন্তোষ বৃদ্ধি পাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না। শিল্পপতি-মহল আশঙ্কা করেন যে, শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের সময়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যে-ভাবে বেতন বৃদ্ধির দাবীকে নিয়ন্ত্রিত রাখিয়াছিল, রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্টের আমলে সে-ভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখিবে না। শ্রমিক অশান্তি বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই তাঁহাদের আশঙ্কা। চার্চ্চিল গবর্ণমেণ্ট জনপ্রিয় হওয়ার চেষ্টার পরিবর্ত্তে দৃঢ়হস্তে শাসন-কার্য্য পরিচালনের চেষ্টাই হয়ত না করিয়া পারিবেন না। ইহাতে বৃটেনের ঘরের এবং বাহিরের সঙ্কট বৃদ্ধি পাওয়ারই সম্ভাবনা।

শান্তি-অভিযানের প্রহসন—

পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের শান্তি-অভিযান বেশ নাটকীয় ভাবেই শুরু করা হইয়াছে। গত ৩রা নবেম্বর (১৯৫১) ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-সচিব মঃ সুম্যান এক বক্তৃতায় পশ্চিমী মিত্রশক্তিত্রয় কর্ত্তৃক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এক চাঞ্চল্যকর অভিযান আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করেন। অতঃপর ৬ই নবেম্বর প্যারী নগরীতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের ষষ্ঠ অধিবেশন আরম্ভ হওয়া উপলক্ষে ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট মঃ অরিয়ল বক্তৃতা-প্রসঙ্গে অচল অবস্থার সমাধানের জন্য প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল, ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঃ প্লেভাঁ এবং মঃ ষ্টালিনের মধ্যে আলোচনা হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ইহার পরই ৭ই নবেম্বর ত্রিশক্তির শান্তি প্রস্তাব ঘোষিত হয় এবং পরে উহাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে উপাপনের জন্য প্রেরিত হয়। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই শান্তির প্রস্তাব রাশিয়ার নিকট করা হয় নাই। উহা উত্থাপন করা হইয়াছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে এবং সাধারণ পরিষদে উত্থাপনের পূর্ব্বেই উহা সাধারণ্যে প্রচার করা হইয়াছে। ত্রিশক্তির এই শান্তি অভিযানের প্রস্তাব যখন সাধারণ পরিষদে পেশ করা হয়, ঠিক সেই সময়েই প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এই শান্তি প্রস্তাব সম্পর্কে বেতার বক্তৃতা দেন। মিঃ ডীন একিসন সাধারণ পরিষদে ত্রিশক্তির শান্তি অভিযান সম্পর্কে যে বক্তৃতা দেন, তাহা প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের বেতার বক্তৃতার প্রতিধ্বনি মাত্র। নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের এই যে শান্তি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাকে ইতিমধ্যেই অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে রুশ শান্তি-প্রস্তাবের পাণ্টা জবাব বলিয়া অভিনন্দন করা হইলেও উহার মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় অপেক্ষা প্রচারের মনোভাবই বেশী পরিস্ফুট দেখা যায়।

পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের শান্তি প্রস্তাবের মূল কথা এই যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক নিযুক্ত এক দল পরিদর্শক সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র এবং সশস্ত্র সৈন্যের হিসাব গ্রহণ করিবেন ও হিসাব মিলাইয়া দেখিবেন এবং প্রথম হিসাব গ্রহণ এবং পরীক্ষা-কার্য্যের পর প্রত্যেক দেশের কি পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র এবং সৈন্যসংখ্যা থাকিবে তাহা পরস্পর আলোচনা দ্বারা স্থির করা হইবে। কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র এবং সশস্ত্র সৈন্যের তথ্য সংগ্রহ ও হিসাব মিলাইয়া দেখার কাজ ক্রমাগতই চলিতে থাকিবে। এই পরিকল্পনা গৃহীত হইলে কোরিয়া যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর উহা কার্য্যকরী করা হইবে এবং সেই সঙ্গে যে সকল প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা লইয়া সমগ্র পৃথিবী দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইয়াছে সেগুলিরও মীমাংসা করা হইবে। এই প্রস্তাবে পরমাণু-শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিকল্পনা অর্থাৎ বারুচ-পরিকল্পনাকেই সমর্থন করা হইয়াছে এবং নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত সাধারণ পরিকল্পনায় পরমাণু-শক্তির দিক্‌টা বারুচ-পরিকল্পনার ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ সমগ্র প্রস্তাবটাকে বারুচ-পরিকল্পনার সম্প্রসারণ মনে করিলেও ভুল হইবে না। রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব মঃ ভিসিনস্কি পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের এই প্রস্তাবকে 'অর্থহীন প্রলাপ' (mere babble) এবং মৃত ইন্দুর বলিয়া অভিহিত করিয়া এই নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবের পাণ্টা প্রস্তাবরূপে আগামী জুন মাসের মধ্যে চীন সহ পঞ্চশক্তির বৈঠক এবং একটি আন্তর্জ্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।

গত তিন বৎসর ধরিয়াই রাশিয়া আলাপ-আলোচনার পথে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়া আসিতেছে। ১৯৪৮ সালে মঃ ভিসিনস্কি বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের সৈন্যবাহিনী এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়। ১৯৪৯ সালে তিনি পঞ্চশক্তির সহিত চুক্তি সম্পাদনের যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাহাও গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া মঃ ষ্ট্যালিন ১৯৪৯ সালের ৩০শে জানুয়ারী একটি এবং ১৯৫১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী আর একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন। ১৯৫০ সালে মঃ ভিসিনস্কিও প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, যে-শক্তি সর্ব্বপ্রথম পরমাণু বোমা বর্ষণ করিবে তাহাকে যুদ্ধাপরাধী বলিয়া ঘোষণা করা হউক। গত আগষ্ট মাসে (১৯৫১) সোভিয়েট সভাপতিমণ্ডলীর প্রেসিডেণ্ট মঃ সেভার্নিক শান্তি প্রচেষ্টাকে সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে পঞ্চশক্তির চুক্তি সমর্থনের জন্য প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর চেষ্টায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত ভাবে যে চেষ্টা করা হইতেছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থান এখানে আমরা পাইব না। বিশ্ব-শান্তি কংগ্রেসের ষ্টকহলম অধিবেশনে গৃহীত শান্তির আবেদন, বার্লিন, ভিয়েনা এবং ওয়ারসতে অনুষ্ঠিত শান্তি কংগ্রেসের পঞ্চশক্তির চুক্তির প্রস্তাবকে কম্যুনিষ্ট প্রচারকার্য্য বলিয়া উপেক্ষা করা হইয়াছে। সম্প্রতি চীনা জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের (Chinese People's Political Consultative Conference) জাতীয় কমিটি পঞ্চশক্তির শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের আবেদন জানাইয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল প্রস্তাবের পিছনে পৃথিবীর সাধারণ মানুষের সমর্থন থাকিলেও শান্তি-চুক্তির আশা সুদূর-পরাহত বলিয়াই মনে হইতেছে।

শান্তি-চুক্তির অঙ্গ হিসাবে বৃহৎ শক্তিবর্গের অস্ত্র-সজ্জা এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করিবার রুশ-প্রস্তাব পশ্চিমী শক্তিবর্গ সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, রাশিয়ার সামরিক

শক্তি বৃহত্তর বলিয়া অস্ত্রসজ্জা এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করিলে রাশিয়ার পক্ষেই উহা সুবিধাজনক হইবে। পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের অস্ত্র-শস্ত্র এবং সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর সামঞ্জস্যপূর্ণ হ্রাস এবং অস্ত্র-শস্ত্র, সশস্ত্র বাহিনীর শ্রেণী এবং পরিমাণ নির্দ্ধারণের প্রস্তাব সম্পর্কেও রাশিয়া অনুরূপ কারণেই আপত্তি উত্থাপন করিবে। উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী অস্ত্র-শস্ত্র এবং সশস্ত্র সৈন্যের হিসাব গ্রহণ ও হিসাব পরীক্ষার পর শান্তি-প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে রাশিয়ার সামরিক শক্তির পরিমাণ উদ্‌ঘাটিত হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক বলিয়া মনে করাই রাশিয়ার পক্ষে স্বাভাবিক। শান্তি-চুক্তিও হইল না, অথচ রাশিয়ার সামরিক শক্তি সম্পর্কে সমস্ত তথ্যই পশ্চিমী শক্তিবর্গ জানিয়া ফেলিল, এইরূপ অবস্থা রাশিয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিবে না। ত্রিশক্তির প্রস্তাব রাশিয়া গ্রহণ করিলে উত্তর-আটলাণ্টিক জোট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে, রাশিয়াকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে-সকল মার্কিণ সামরিক ঘাটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলি তুলিয়া দেওয়া হইবে, প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের সহিত যে ত্রিপক্ষীয় রক্ষা-চুক্তি করিয়াছে, ফিলিপাইনের সহিত যে রক্ষা-চুক্তি করিয়াছে, জাপানের সহিত যে নিরাপত্তা-চুক্তি করিয়াছে, এই সকল চুক্তি বাতিল করা হইবে, জাপান হইতে মার্কিণ সৈন্য সরাইয়া লওয়া হইবে, মধ্য-প্রাচী রক্ষা-পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইবে এমন কোন প্রতিশ্রুতি তো দূরের কথা, এইরূপ ইঙ্গিত পর্য্যন্তও ত্রিশক্তির শান্তি-প্রস্তাবে নাই। কাজেই রাশিয়া যে এইরূপ প্রস্তাব গভীর সন্দেহের চক্ষে দেখিবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু থাকিতে পারে না। রাশিয়াই ভাবী আক্রমণকারী, এই অজুহাতই এই সকল চুক্তির মূল। এই অজুহাতের মূলে প্রকৃতপক্ষে কোন সত্য নাই। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনই রাশিয়াকে শান্তিপ্রয়াসী করিয়াছে। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পৃথিবীর বাজার দখল করিবার কোন প্ররোচনা রাশিয়া অনুভব করে নাই। যুদ্ধ-প্ররোচনা হইতে লাভবান হইবে এরূপ কোন গ্রুপও রাশিয়ায় নাই। অধিকন্তু ১৮০০ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত মোটের উপর ১৪ বার বিদেশী শক্তি দ্বারা রাশিয়া আক্রান্ত হইয়াছে এবং এই সকল আক্রমণের ফলে রাশিয়ার প্রায় দুই কোটি লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে. এই মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতা রাশিয়ার পক্ষে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই উত্তর-আটলাণ্টিক জোট, রাশিয়ার চারি দিকে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সামরিক চুক্তিগুলিকে যে রাশিয়া গভীর আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

গত অক্টোবর (১৯৫১) মাসের প্রথম দিকে 'প্রাভদা'র প্রতিনিধির সহিত মঃ ষ্ট্যালিনের সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে মিঃ গর্ডন ডীন পশ্চিমী শক্তিবর্গকে জানাইয়াছিলেন, "আমরা এমন এক যুগে প্রবেশ করিতেছি, যখন পরমাণু অস্ত্র-শস্ত্র এত বেশী পরিমাণে এবং এত বিভিন্ন রকমের পাওয়া যাইবে এবং এত বিভিন্ন উপায়ে উহা ব্যবহার করা যাইবে, যাহা ইতিপূর্ব্বে কখনই সম্ভব ছিল না।" জেনারেল মার্ক ক্লার্ক উত্তর-আটলাণ্টিক জোটের সদস্যদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, নূতন এবং অপ্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্র শীঘ্রই সৈন্য-বাহিনীকে সরবরাহ করা হইবে। উল্লিখিত মন্তব্যগুলি যখন করা হইয়াছে তাহারই প্রায় সম-সময়ে গত ৫ই অক্টোবর (১৯৫১) মস্কোস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূত এডমিরাল কার্ক সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিব মঃ ভিসিনস্কির হাতে মার্কিণ গবর্ণমেন্টের এক বার্ত্তা অর্পণ করেন। এই বার্ত্তায় কোরিয়া যুদ্ধবিরতির আলোচনা সন্তোষজনকরূপে সম্পন্ন হওয়ার জন্য মার্কিণ গবর্ণমেন্ট রুশ গবর্ণমেন্টের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয় বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গেই এডমিরাল কার্ক এই মন্তব্য করেন যে, কোরিয়া যুদ্ধবিরতি আলোচনার পরিণাম সন্তোষজনক না হইলে রাশিয়া ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অপ্রীতিকর অবস্থার (unpleasantness) উদ্ভব হইবে। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান রাশিয়ার সহিত চুক্তিকে এক টুকরা ছেঁড়া কাগজেরও সমান নয় বলিয়া ঘোষণা করার পর সশস্ত্র যুদ্ধ ব্যতীত আর কোন অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হওয়া সম্ভব নয়। এডমিরাল কার্কের মন্তব্য লইয়া আলোচনার সময়েই বৃটিশ সংবাদপত্রে খুব ফলাও করিয়া এক সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, জনৈক বৃটিশারের রুশীয় পত্নী মস্কো হইতে অপহৃতা হইয়াছেন। এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরই মস্কো হইতে জানান হয় যে, বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের তিন জন সাংবাদিক উক্ত মহিলাটিকে তাঁহার মাতার গৃহে দেখিয়াছেন এবং সেখানে তিনি পীড়িতা মাতাকে শুশ্রূষা করিবার জন্য আছেন, সোভিয়েট পুলিশ তাঁহাকে অপহরণ করে নাই।

শান্তি-চুক্তির জন্য পশ্চিমী ত্রিশক্তির প্রস্তাব এবং রুশ-প্রস্তাবের পরিণাম কি হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। ত্রিশক্তির প্রস্তাব সোজাসুজি রাশিয়ার নিকট উপস্থিত না করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মারফৎ উপস্থিত করায় উহা রাশিয়ার নিকট চরমপত্র দেওয়ার মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিকাংশ সদস্যই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইঙ্গিতেই ভোট দিবে। সুতরাং ত্রিশক্তির প্রস্তাবটি জাতিপুঞ্জে উপস্থিত করার উদ্দেশ্য যে এই চরমপত্রকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুগত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিকাংশ সদস্য দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লওয়া, রাশিয়ার মনে এই আশঙ্কাও জাগিবে। তাই যদি হয়, তবে ইহাকে শান্তি-প্রচেষ্টা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বৃহৎ পঞ্চশক্তির চুক্তি অপেক্ষা আঞ্চলিক চুক্তিই বেশী পছন্দ করে। তাহার ধারণা, পঞ্চশক্তির চুক্তি দ্বিতীয় কেল্লগ-চুক্তি (Kell gg Pact) ছাড়া আর কিছুই হইবে না। এই ত্রিশক্তির প্রস্তাব ছাপাইয়া যুদ্ধের কানাঘুষা কথাও যে শোনা যাইতেছে না, তাহা নয়। নবেম্বর মাসের (১৯৫১) প্রথম দিকে পশ্চিম ইউরোপীয় রক্ষা-ব্যবস্থার সর্ব্বাধিনায়ক জেনারল আইসেনহাওয়ার প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সহিত আলোচনার জন্য ওয়াশিংটন গিয়াছিলেন। ৫ই নবেম্বর তারিখে তাঁহাদের মধ্যে কি আলোচনা হইয়াছে তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটার' পত্রিকা লিখিয়াছেন, জেঃ আইসেনহাওয়ার প্রেসিডেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, ১৯৫২ সালে রাশিয়া সর্ব্বাত্মক যুদ্ধ আরম্ভ করিবে ইহাই তাঁহার বিশ্বাস এবং ১৯৫২ সালে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, ইহা ধরিয়া লইয়াই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং তাহার মিত্রশক্তিবর্গের প্রস্তুত হওয়া উচিত। 'মনিটার' কি সূত্রে এই তথ্য জানিতে পারিয়াছেন তাহা প্রকাশ নাই। তবে যুদ্ধের হাওয়াই যে বহিতেছে

'মনিটারে'র উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। গত অক্টোবর মাসে (১৯৫১) 'কলিয়াস' (Collier's) পত্রিকার "Preview of the War We Do Not Want" নামক যে একটি বিশেষ সংখ্যা বাহির হইয়াছে, তাহার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫২—৬০ সালের বিশ্ব-সংগ্রামে কি কি প্রধান ঘটনা ঘটিতে পারে এবং রাশিয়ার পরাজয়ের পর কি অবস্থা হইবে, বিভিন্ন লেখকের রচনায় তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা হইয়াছে। শেরউডের রচনায় ১৯৫২ সালের মে মাসে টিটোর প্রাণনাশের চেষ্টা হইতে সুরু করিয়া যুদ্ধের পর যুদ্ধের চাঞ্চল্যকর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৫ সালে রাশিয়ার পরাজয় এবং মস্কোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অস্থায়ী দখলকার কমাণ্ড প্রতিষ্ঠার ভবিষ্য বিবরণ এই বিশেষ সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ—

গত ৬ই নবেম্বর (১৯৫১) হইতে প্যারী নগরীতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের যে অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে, উহা এই প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ অধিবেশন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের বিধানে সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার তারিখ সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার ধার্য্য করা হইয়াছে। কিন্তু গত বৎসর কোরিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর রাশিয়ার ভেটো ক্ষমতা এড়াইবার জন্ম নিরাপত্তা পরিষদের প্রায় অধিকাংশ ক্ষমতাই সাধারণ পরিষদ গ্রহণ করিয়াছে। ঐ সময় হইতে এই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্ম সাধারণ পরিষদের যে অধিবেশন অবিচ্ছেদে চলিতেছিল, তাহা গত ৫ই নবেম্বর (১৯৫১) শেষ হয় এবং পরদিন প্যারী নগরীতে উহার নিয়মিত অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণ পরিষদের উল্লিখিত সুদীর্ঘ অধিবেশনে কম্যুনিষ্ট চীনকে আক্রমণকারী ঘোষণা এবং চীনে সামরিক উপকরণ প্রেরণ নিষিদ্ধ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য আর কোন কাজই হয় নাই। বর্ত্তমান অধিবেশনেও যে উল্লেখযোগ্য কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, ঠাণ্ডা-যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাসের কোন ব্যবস্থা হইবে, এইরূপ আশা করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

জার্ম্মাণ-সমস্যা, পরমাণু-শক্তি-নিয়ন্ত্রণ সমস্যা, নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা, শান্তি-সমস্যা, কোরিয়া-সমস্যা প্রভৃতি পুরাতন সমস্যাগুলি এই অধিবেশনে আলোচিত হইবে বটে, কিন্তু এই সকল সমস্যার পটভূমির এক বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। পরমাণু বোমা আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া নয়। পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর প্রধান মন্ত্রী হের গ্রোটেওল অখণ্ড জার্ম্মাণী গঠনের প্রস্তাবই শুধু করেন নাই, ডাঃ এডেনুয়েরের চৌদ্দ দফার ভিত্তিতে মীমাংসা সম্ভব বলিয়াও মনে করেন। কোরিয়া যুদ্ধ যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিচালন করিতেছে না, করিতেছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছে। যদি যুদ্ধবিরতি না হয়, তাহা হইলে কোরিয়া যুদ্ধের জন্ম আরও সৈন্ম দাবী করিবে। সম্মিলিত ব্যবস্থা কমিটির (The Collective Measures Committee) রিপোর্টে সদস্যরাষ্ট্রদের জাতীয় বাহিনীর একটা অংশ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্ম নির্দ্দিষ্ট রাখিবার সুপারিশ করা হইয়াছে এবং সম্মিলিত রক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনাও তৈয়ার করা হইয়াছে। উহা যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পরিকল্পনা, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

কাশ্মীর সমস্যা, দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের সমস্যা প্রভৃতি পুরাতন সমস্যাগুলি রহিয়াই গিয়াছে। মরোক্কো-সমস্যা এবং মিশর-সমস্যাও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উত্থাপিত হইতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনকে গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাও এই অধিবেশনে উত্থাপিত হইবে। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে ক্রমশঃ কম্যুনিষ্ট-বিরোধী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে চলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আক্রমণ আশঙ্কা নিরোধের জন্ম সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অপেক্ষা আঞ্চলিক চুক্তির উপরেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সর্ব্বাধিক জোর দিয়াছে। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোন গুরুত্বই আর নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই অধিবেশনই ইউরোপে উহার শেষ অধিবেশন, এইরূপ আশঙ্কাও হয়ত উপেক্ষার বিষয় নয়। এই অধিবেশনের শেষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যখন আবার জাঁকজমকপূর্ণ সদর কার্য্যালয়ে ফিরিয়া যাইবে, তখন তাহার আন্তর্জ্জাতিক মর্য্যাদার কতটুকু অবশিষ্ট থাকিবে তাহা কে বলিবে?

বিক্ষুব্ধ মধ্য-প্রাচ্য—

ইরাণের তৈল-সমস্যা বর্ত্তমানে শিকায় ঝুলিতে ঝুলিতে ঝিমাইতেছে। ইরাণের তৈল-বিরোধ সম্পর্কে রায় প্রদান করিতে আন্তর্জ্জাতিক আদালতের অধিকার নিরাপত্তা পরিষদ স্বীকার না করায়, রায় প্রদানে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক আদালত যে-পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত না করিতেছেন, সে-পর্য্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা স্থগিত রহিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদের এই সিদ্ধান্ত বৃটেনের মনঃপূত হইবে না, ইহা খুব স্বাভাবিক। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে ইরাণের তৈল লইয়া আর একবার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন এই বিরোধ মীমাংসার জন্ম লীগ অব নেশনস্ বা জাতিসঙ্ঘে উপস্থিত করা হইয়াছিল। জাতিসঙ্ঘ অত্যন্ত তৎপরতার সহিত যে মীমাংসা করিয়াছিলেন, আজ তাহাই বিরোধের কারণে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান মধ্য-প্রাচীও বিশ বৎসর পূর্ব্বের মধ্য-প্রাচী আর নাই। ইরাণের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোসাদেকের দীর্ঘ দিন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান হইতে মনে হয়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে একটা কিছু না লইয়া তিনি ইরাণে ফিরিতে চান না। বৃটেন মনে করে, মোসাদেক-গবর্ণমেন্টের পতন হইলেই তৈল-সংক্রান্ত মীমাংসা সহজ হইবে। কোটিপতি রাজনীতিবিদ্ গোভাস এস্ সুলতানা পুনরায় প্রধান মন্ত্রী হইতে পারেন এরূপ কথাও শোনা যাইতেছে। শাহ ডাঃ মোসাদেককে দেশে ফিরিতে তার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নট্-নড়ন নট্-চড়ন অবস্থাতেই রহিয়াছেন।

আমেরিকার চাপে ইরাণের তৈল-সমস্যার একটা মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু মিশরের সমস্যা ইরাণের সমস্যা অপেক্ষাও গুরুতর। ইরাণ অপেক্ষা মিশরে বৃটেন অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় অবস্থিত। গত ১৫ই অক্টোবর (১৯৫১) মিশর পার্লামেন্টের উভয় পরিষদেই সুয়েজ খাল অঞ্চল সংক্রান্ত ১৯৩৬ সালের সন্ধি এবং সুদানের শাসন সংক্রান্ত ১৮৯৯ সালের কোণ্ডিমোনিয়ম চুক্তি বাতিল করিয়া

এবং রাজা ফারুককে সুদানেরও রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ দিনই মিশর চতুঃশক্তির মধ্য-প্রাচী রক্ষা-পরিকল্পনাও অগ্রাহ্য করিয়াছে। ইহার পর হইতেই মিশরের প্রশ্ন গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। সুয়েজ খাল অঞ্চলে বৃটেন সৈন্যসংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে এবং এই অঞ্চলে সামরিক শাসন অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের ৭০ হাজার মিশরীয় শ্রমিকের মধ্যে ৪০,৫৮১ জনই চলিয়া আসিয়াছে। অবশিষ্ট শ্রমিকদিগকে বৃটিশ সৈন্যরা জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে বলিয়া মিশর অভিযোগ করিয়াছে। এদিকে সুয়েজ খাল অঞ্চলে গরিলা যুদ্ধ করিবার জন্য মিশরে বেসরকারী মুক্তি-ফৌজ গঠিত হইতেছে। মিশর গবর্ণমেণ্ট ইহাতে বাধাও দিতেছেন না, স্বেচ্ছা-সেবকদিগকে সাহায্যও করিতেছেন না।

সুদানে ইঙ্গ-মিশর যৌথ শাসন-ব্যবস্থা নামেই শুধু প্রচলিত, প্রকৃত ক্ষমতা বৃটেনের হাতে। মিশর গবর্ণমেণ্ট সুদানের গবর্ণর জেনারেলকে বরখাস্ত করিলেও কার্য্যতঃ উহা অর্থহীন। সুদানের তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে আশিগ্‌গা দল মিশরের দিকে, উম্মিয়া দল বৃটিশের দিকে, জাতীয় ফ্রণ্ট মিশরের রাজার অধীনে স্বায়ত্ত-শাসন চায়। সুদানের প্রশ্ন আসলে স্বাধীনতার প্রশ্ন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি সত্যই সুদানকে স্বাধীনতা দেয়, তাহা হইলে গণভোট দ্বারাই উহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কিন্তু বৃটেন সত্যই সুদানকে স্বাধীনতা দিতে চায় কি?

মধ্য-প্রাচীর রক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনাকে আরব রাষ্ট্রগুলি সন্দেহের চক্ষে দেখিবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। সিরিয়ায় তো এই প্রশ্ন লইয়া মন্ত্রিসভাই ভাঙ্গিয়া গেল। ইহার উপর আছে আরব-ইজরাইল সমস্যা। ইজরাইল এই পরিকল্পনায় আরব রাষ্ট্রগুলিকে তোষণের পরিচয় পাইয়া শঙ্কিত হইতে পারে। আরব রাষ্ট্রগুলিও যে ইজরাইলের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এদিকে রাশিয়া তুরস্ককে এবং আরব রাষ্ট্রগুলিকে এই রক্ষা-ব্যবস্থায় যোগদান সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। রাশিয়ার সহিত মিশরের একটা বুঝাপড়া হওয়ার সম্ভাবনার কথাও শোনা যাইতেছে। রাশিয়ার সহিত আরব রাষ্ট্রবর্গের অনাক্রমণ চুক্তি হইলে মধ্য-প্রাচী রক্ষা-ব্যবস্থার কোন প্রয়োজনই আর থাকে না। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিবর্গ যে মধ্য-প্রাচীর রাষ্ট্রগুলির উপর এই রক্ষা-ব্যবস্থা চাপাইয়া দিবেই, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে কি?

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় অশান্তি—

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলির আভ্যন্তরীণ প্রকৃত অবস্থা যে কি, সে-সম্বন্ধে অতি সামান্য সংবাদই প্রকাশিত হয়। গত আগষ্ট মাসে (১৯৫১) কোনও বৈদেশিক শক্তির প্ররোচনায় ইন্দোনেশিয়ায় এক বিদ্রোহের চেষ্টার অতি-সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। গত ২১শে অক্টোবর (১৯৫১) ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সুকিমান গত আগষ্ট-বিদ্রোহের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও অতি সংক্ষিপ্ত। তিনি বলিয়াছেন, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্ণো, সহ-প্রেসিডেণ্ট ডাঃ হাত্তা এবং অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করা এবং বলপ্রয়োগে ইন্দোনেশিয়ার সরকারকে উচ্ছেদের জন্য বিদেশী-সমর্থিত গোপন আন্দোলন দমন করিবার জন্য প্রায় ১৫ হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গত অক্টোবর মাসে শ্যাম দেশেও গবর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করিবার জন্য এক কম্যুনিষ্ট-ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। গত ২১শে অক্টোবর (১৯৫১) কাম্বোডিয়ার ফরাসী হাই-কমিশনার মঃ দ্য রেমোঁ তাঁহার সরকারী বাসগৃহে ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়াছেন। ১৯৪৯ সালের নবেম্বর মাসে ফরাসী সরকার কাম্বোডিয়াকে ফরাসী ইউনিয়নের নামে স্বাধীনতা দিয়াছেন। কাম্বোডিয়ার সীমান্ত ভিয়েটমীনের সীমান্তের সহিত সংযুক্ত নয় বটে, কিন্তু ওখানেও যথেষ্ট অসন্তোষ রহিয়াছে, ফরাসী হাই-কমিশনার নিহত হওয়াতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। মালয়ে বৃটিশ হাই-কমিশনার স্যার হেনরী গার্ণের হত্যাকারীর সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। এদিকে মুক্তি-ফৌজের তৎপরতা আবার বাড়িয়া উঠিয়াছে। ফলে বাহাউ জেলায় চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী কারফিউ জারী করা হইয়াছিল। গত ৭ই নবেম্বর (১৯৫১) ত্রুশপাহাং গ্রামে হানা দিয়া ঐ গ্রামের দুই হাজার অধিবাসীর সকলকেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই গ্রামটিই না কি স্যার হেনরী গার্ণের হত্যার কেন্দ্রস্থল।

ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও মোটেই সন্তোষজনক নহে। প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু মনে করেন, বিদ্রোহীদের সংখ্যা ৩ হাজার হইতে ৪ হাজারের বেশী নয়। তবু আরও পাঁচ বৎসরের কমে ব্রহ্মদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার আশা তিনি করিতে পারেন না। গত অক্টোবর মাসে তিনি যখন নয়াদিল্লীতে আসিয়াছিলেন তখন সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথাই তিনি বলিয়াছিলেন যে, দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে বিদ্রোহীদের ঘাঁটিতে পৌঁছিবার মত সৈন্যবল ও অস্ত্রশস্ত্র ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের নাই। ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি সৈন্যবল সাহায্য চাহিয়াছেন কি না এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সুশিক্ষিত সৈন্য দিয়া ভারত ব্রহ্মদেশকে সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছে কি না, তাহা কিছুই জানা যায় না। এদিকে গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫১) বিদ্রোহীদের বিভিন্ন দল একটি সংযুক্ত পরিচালনাধীনে

কোরিয়ায় ভারতবর্ষ থেকে পাঠানো এম্বুলেন্স দল

অভিযান চালাইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছে। বিদ্রোহীদের মধ্যে অনৈক্যের ফলেই তাহাদের শক্তি হ্রাস পাইয়াছিল। ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিলে তাহাদের শক্তি আবার বৃদ্ধি পাইবে। ইতিমধ্যেই বিদ্রোহীদের কর্মতৎপরতা বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নেপালে আবার সঙ্কট—

ভারত গবর্ণমেণ্ট জোড়াতাড়া দিয়া নেপাল-সমস্যার যে সমাধান করিয়াছিলেন, তাহা শুধু সঙ্কটের পর সঙ্কটের মধ্য দিয়াই চলিয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৫১) রাণা এবং কংগ্রেসের যৌথ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এপ্রিল এবং মে মাসে (১৯৫১) এই মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। ভারত গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় ভাঙ্গন রোধ হইয়াছে বটে, মন্ত্রিসভার পরস্পরবিরোধী দুই অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য হওয়া সম্ভব হয় নাই। গত ১১ই নবেম্বর (১৯৫১) নেপালী মন্ত্রিসভার কংগ্রেসী দল পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেন। গত বৎসর এই দিনটিতেই নেপালী কংগ্রেস বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছিল।

নেপাল মন্ত্রিসভার চিরস্থায়ী সঙ্কট চরম সীমায় উঠে ৬ই নবেম্বর (১৯৫১) তারিখে কাটমুণ্ডতে ছাত্রসভার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণকে উপলক্ষ করিয়া। ছাত্ররা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী করিবার জন্য এই সভা করিয়াছিল। পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে এক জন ছাত্র নিহত এবং দুই জন ছাত্র আহত হয়। ইহাতে সমগ্র কাটমুণ্ড সহরে একটা চাপা বিক্ষোভ দেখা দেয়। প্রধান মন্ত্রী এই গুলীবর্ষণ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন, স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীযুত কৈরালা উহাকে তাঁহার পক্ষে অপমানজনক বলিয়া মনে করিয়াছেন। ইহাতেও প্রকৃত অবস্থা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা হইয়াছে। তদন্তের ফলাফল প্রকাশিত হইলে গুলীবর্ষণ লইয়া সঙ্কট ঘনীভূত হওয়ার কথা প্রকাশ পাইবে কি না তাহাও অনুমান করা সম্ভব নয়।

মানুষের উপর পরমাণু বোমার পরীক্ষা—

প্যারী হইতে ২১শে অক্টোবর (১৯৫১) তারিখের টেলিপ্রেসের এক সংবাদে পরমাণু বোমার পরীক্ষার জন্য এক হাজার কোরীয়, ভিয়েটনাম এবং ইয়েমেন বন্দীকে জাহাজ বোঝাই করিয়া অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণের যে বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর। কায়রোর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দজুমহুর আল মিশরী'র ২৪শে সেপ্টেম্বরের (১৯৫১) সংখ্যায় সর্ব্বপ্রথম এই বিবরণ প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকার এই সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করিয়া সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। কিন্তু আদালত তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন। কায়রোর উক্ত সাপ্তাহিক পত্রিকার উক্ত বিবরণ পরে প্যারীর দৈনিক পত্রিকা 'সিসয়েরে' প্রকাশিত হইয়াছে। প্যারীর 'সিসয়ের' পত্রিকা লিখিয়াছেন যে, সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার পর সরকারী ভাবে উহা অস্বীকার করা হয় নাই এবং তিন সপ্তাহ পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রে স্বীকার করা হইয়াছে যে, পরমাণু বোমার পরীক্ষার জন্য গিনিপিগের পরিবর্ত্তে মানুষ ব্যবহার করা হইতেছে।

কায়রোর উক্ত সাপ্তাহিক পত্রিকার সংবাদ এডেন হইতে প্রেরিত এবং উহা এক জন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলিয়া কথিত। জাহাজখানা না কি বৃটিশ Seven XXX জাহাজ। উহাতে প্রথমে ৫০০ কোরীয় যুদ্ধবন্দী বোঝাই করা হয়। তার পর উহা ভিয়েটনামে যায়। সেখানে ৩০০ ভিয়েটনাম যুদ্ধ-বন্দীকে জাহাজে তোলা হয়। সেখান হইতে জাহাজখানি এডেনে যায় এবং ২০০ ইয়েমেন বন্দীকে জাহাজে তুলিয়া লওয়া হয়। এই সকল বন্দীকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করিয়া তাহাদের উপর পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করা হইবে। কায়রোর সংবাদদাতা উক্ত জাহাজে থাকিয়া যখন ফটো তুলিতেছিলেন তখন ধরা পড়ায় লাফাইয়া পড়েন এবং গুলী বর্ষণের মধ্যেও পলাইতে সমর্থ হন।

ভারতবর্ষে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের দূত মিঃ চেস্টার বাউলেস, এবং তাঁর পরিবারবর্গ

ভোটরঙ্গ

"আগামী নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের মনোনয়নপত্রে বয়স উল্লেখ সম্বন্ধে নির্ব্বাচন কমিশনের প্রেস-নোটটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উহাতে বলা হইয়াছে, ভোটার-তালিকায় যে বয়সই থাকুক না কেন, মনোনয়নপত্রে সঠিক বয়স উল্লেখ করিতে হইবে। এই দুইয়ের মধ্যে অমিল হইবেই, কারণ ভোটার-তালিকায় প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বেকার বয়স উঠিয়াছে। এ বিষয়ে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত বয়স এবং ভোটার-তালিকার বয়সের পার্থক্য হইবে প্রায় সাত বৎসর। কারণ, এখানে রেশন-কার্ডের বয়স ভোটার-তালিকায় তোলা হইয়াছে এবং রেশন কার্ডে প্রথমে যে বয়স ছিল এখনও তাহাই রহিয়াছে, বদলানো হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গে এই কারণে অনেকে প্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া গণ্য হয় নাই, ভোটারও হইতে পারে নাই। এ বিষয়ে আর একটু স্পষ্ট নির্দ্দেশ পশ্চিমবঙ্গের বেলায় দেওয়া ভাল। প্রতীক-চিহ্নের উল্লেখের ত্রুটি মনোনয়নপত্র নাকচের হেতু হইবে না বলিয়াও কমিশন নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ভোটার-তালিকায় শেষের দিকে নাম তোলার জন্য ৫০ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা হইয়াছিল। অনেকে প্রথমবার নাম তোলার জন্য দরখাস্ত করা সত্ত্বেও নাম উঠে নাই। পরে ৫০ টাকা জরিমানা দিতে হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের দোষে যে ত্রুটি ঘটিয়াছে, তাহার জন্য নাগরিকের জরিমানার বিধি উচিত হয় নাই। মনোনয়নপত্রে অনাবশ্যক খুঁটিনাটি কড়াকড়ি যেমন অবাঞ্ছনীয়, ভোটার-তালিকার নির্ভুলতাও তেমনি কাম্য।" —দৈনিক বসুমতী।

"বামপন্থী দলের মধ্যে ঐক্য নাই, এবং এইরূপ বহু বিভক্ত দলের দ্বারা দেশের শাসন-ক্ষমতা পরিচালনা সম্ভবপর নহে, সুতরাং বুদ্ধিমান লোকেরা স্থায়ী সরকার গঠনের প্রয়োজনে কংগ্রেসপ্রার্থীদের সমর্থন করিবেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। সাধারণ নির্ব্বাচন ভাবী সরকার গঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব লইবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, ইহা সত্য। কংগ্রেস-বিরোধী বহু দলের দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইবে না, ইহাই তাঁহার কথা এবং বিরোধী দল সমূহের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ কংগ্রেস লাভ করিবে ইহাও তাঁহার আশা। কিন্তু তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে বলি যে, বিরোধী দলের এই ত্রুটি বা দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করাই বড় কথা নয়। বড় কথা: কংগ্রেস জনগণের নিকট হইতে যে দূরে সরিয়া গিয়াছে, কংগ্রেসের প্রতি জনগণের যে আস্থা ও বিশ্বাস অবিচলিত ছিল তাহা যে টলিয়াছে, তাহার প্রতিকার করা। সেই প্রকৃত শক্তিলাভের পথে না গিয়া বিরোধী দলের দুর্ব্বলতার ছিদ্রপথে জয়লাভও দেশের বৃহত্তর শ্রেয়ঃ সাধনের পথ নহে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

"কংগ্রেসকে যদি হারাইতে হয়, যদি বাংলার মাটি হইতে নিশ্চিহ্ন করিতে হয় বিশ্বাসঘাতকদের রাজ্যপাট, তবে এই ঐক্য না গড়িয়া উপায় নাই। সমস্ত শত্রুতাকে পরাস্ত করিয়া সে ঐক্যের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতের দায়িত্ব সর্ব্বোপরি জনগণের। কমিউনিষ্ট পার্টির নির্বাচনী সভা তাই নিতান্ত দলীয় সভা নয়, এই সমাবেশ হইতেছে কংগ্রেসকে হারাইবার জন্য সব চেয়ে বলিষ্ঠ ঘোষণার সভা, জনগণের ক্ষমতার জন্য ব্যাপকতম ঐক্য গঠনের প্রতিশ্রুতির সভা। বাংলার মানুষের কণ্ঠে স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্রের জয়ধ্বনির সভা। বাংলায় কংগ্রেসকে নির্মম ভাবে পরাজিত করিতেই হইবে। জয়যুক্ত করিতে হইবে জনগণের সমস্ত প্রতিনিধিদের।" —স্বাধীনতা।

"পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ সম্প্রতি হুগলীতে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, যাহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আজ চীৎকার করিতেছে, তাহাদের কাহারও কোনও আদর্শ নাই; পক্ষান্তরে, কংগ্রেস নিজ আদর্শে অটল। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাহারা চীৎকার করিতেছে তাহাদের কোন আদর্শ আছে কিনা, সে কথা স্বতন্ত্র। তবে, কংগ্রেস যে নিজ আদর্শে অটল, সে বিষয়ে জনসাধারণের মনে আর সন্দেহ নাই! রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের বিঘোষিত আদর্শ; ইংরাজের অপসারণের পর ভারতের সেই 'রামরাজ্য' নিঃসন্দেহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আদর্শচ্যুতির অভিযোগ করা অন্যায়; তবে, সে আদর্শ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত 'রামরাজ্যে' হনুমানের উৎপাতে জনসাধারণ এখন অতিষ্ঠ। ত্রেতাযুগের হনুমানগুলির পেট আজ কলিতে আসিয়া অনেক বড় হইয়াছে; তাহাদের দাঁত ও নখ এখন অনেক বেশী তীক্ষ্ণ। বড় বড় পেটওয়ালা হনুমানের ধারালো নখ ও দাঁতের আঘাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য জনসাধারণ আজ ব্যাকুল। 'রামরাজ্যে'র কাহিনী পুরাণে পড়িতেই ভাল; বাস্তব ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ এই ঘোর কলিতে উহার জ্বালা অসহ্য।"

—সত্যযুগ।

"মনোনয়ন ব্যাপারে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির প্রতিক্রিয়া এখনও পুরাপুরিই চলিতেছে এবং উহার ফলে কংগ্রেসের ফাটল জোড়া না লাগিয়া ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া উঠিতেছে। গত সোমবার পশ্চিমবঙ্গে শতাধিক কংগ্রেসকর্মী কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। পাঞ্জাবে ভার্গব, উত্তর-প্রদেশে ট্যাণ্ডন-প্রমুখ কংগ্রেসসন্তানেরা কংগ্রেস টিকিট না নিবার সঙ্কল্প দ্বারা সেই ফাটলেরও মুখ আরও ব্যাদিতই করিতেছেন মাত্র। বিহারে তো ভয়ানক অবস্থা! জওহরলালজীর কংগ্রেস পুনর্গঠনের প্রচেষ্টার পরিণতি এই সকল ঘটনা হইতেই বুঝা যাইতেছে। অন্যান্য রাজ্যেও কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দলাদলি এখনও মিটে নাই। মিটিবে বলিয়াও মনে হয় না। কারণ, কংগ্রেস সর্বত্রই যাহাদের মনোনয়ন দিতেছে, তাহারা অধিকাংশই প্রতিক্রিয়াশীল ও জনস্বার্থ-বিরোধী। এই অবস্থায় জনসেবায় উদ্বুদ্ধ, চেতনাশীল কর্মীরা ঐরূপ মনোনীত ব্যক্তিদের নির্বাচনে জয়ী হইতে সহায়তা করিতে পারে না।" —লোকসেবক

ভোট-যুদ্ধ

"অতএব হে ভোটার—! সাবধান! জাতি দেখিও না, খাতির করিও না। মনের মধ্যে সমঝাইয়া তবে ভোট দিবে, নহিলে ঘরে ঘুমাইবে আর মাঠে ধান কাটিবে সেও ভাল!" —রাঢ় দীপিকা।

কস্মৈ দেবায় ভোট হবিবা

"ভোট! হাঁ, ভোটের অর্ঘ্য-থালি সাজাইয়া তোমাকেই নিবেদন করিব। জগদ্ধাত্রী পূজার সুপ্রভাতে বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রীর শ্রীচরণ সমীপে প্রতিজ্ঞা করিতেছি: আমাদের ভোট-ভাণ্ডের ননী-মাখন সবই তোমাকে নিবেদন করিয়া দিব হে আমাদের রাষ্ট্রগোপ! হে পসৃটিফেক্স ম্যাক্সিমাস্! ওগো ভোট-কাঙ্গালীর দল! একবার বিজাতীয় ভাব মুক্ত হইয়া বল: এক ধর্ম্মরাজ্য পাশে ছিন্ন খণ্ড বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি। হরিনাম শুনিলে হিরণ্যকশিপু যেমন আঁতকাইয়া উঠিত, ধর্ম্মরাজ্য শুনিয়া তেমনই শিহরিয়া উঠিও না। হিন্দু ধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, গান্ধী ধর্ম্ম নহে, এ ধর্ম্ম দেশ-ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম দেশাত্মার আত্মধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম। মানুষের যেমন প্রাণ আছে, আত্মা আছে, তেমনি এক-একটা দেশের আত্ম-সম্ভূত যে ধর্ম্ম, তাহাই জাতিধর্ম্মশ্চ শাশ্বতাঃ; এ দেশের সমাজ, সভ্যতা, শাস্ত্র-সাহিত্য, আচার-বিচার, বিবাহ, গার্হস্থ্য জীবন, তাহার প্রাণ-ধারণের রীতিনীতি, পদ্ধতি-প্রকরণ সবই এই অধিদেবতার—এই দেশাত্মার দান। এ-তত্ত্ব ইটনের গ্রামার স্কুলের ফিরিঙ্গী পড়ুয়ারা না বুঝিতে পারিলেও ইহাই প্রকৃত কথা। ইহাই বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান। ফিরিঙ্গী সাজিও না, ভ্রষ্ট হইও না। কংগ্রেসী তুমি? সাতকোটির ভোট ত তোমারই জন্য নিনাড় করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু একবার বল, এই খণ্ডিত ভারতের মহাশ্মশানে শবমূর্ত্তির উপর দাঁড়াইয়া বল: হে মহাশিব! এক ধর্ম্মরাজ্য পাশে ছিন্ন খণ্ড বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি। তুমি, কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি! তুমিও তো আমার ব্রজকিশোর। তোমাকেও ভোট দিব। কিন্তু ঐ আমার এক বামন ভিক্ষা! ভারতের সেই অখণ্ড মহিম্ন মূর্ত্তি। তুমি হিন্দু মহাসভা! তুমিও আমার স্নেহ-শ্রদ্ধার সমভাগী। কিন্তু ঐ এক জাতি, এক ভগবান! তুমি জনসঙ্ঘ? শ্রদ্ধার অর্ঘ্য তোমার জন্যও রচিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু ভবানী শব্দে ভেদিয়া গগন উঠ শিব অবতার! ফরোয়ার্ড ব্লক তুমি! সুভাষের নামপূত রাজনৈতিক গোষ্ঠী! তোমাকে বঞ্চিত করিবার সাধ্য নাই। কিন্তু একবার বল, এক ধর্ম্মরাজ্য পাশে ছিন্ন খণ্ড বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি!!! কস্মৈ দেবায় হবিবা বিধেম!" —আর্য্য।

বর্দ্ধমানের কংগ্রেস-বিরোধী শক্তি

"বর্দ্ধমানে কংগ্রেস-বিরোধী বামপন্থী শক্তিগুলি মিলিত ভাবে কংগ্রেস-প্রার্থীদিগকে পরাজিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইতিমধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টি অন্য দলের সহিত পরামর্শক্রমে কয়েকটি কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম প্রকাশ করিয়াছেন, কিষাণ-মজদুর-প্রজা পার্টির প্রার্থীদের তালিকা সরকারী ভাবে প্রকাশিত না হইলেও যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা দামোদরে প্রকাশিত হইল। ফরোয়ার্ড ব্লকও প্রায় কাজ সমাপ্ত করিয়া আসিয়াছেন। এইবার দুই-একটি কেন্দ্রে যদি সামান্য রদ-বদল করিতে হয় তাহা করিতে বিশেষ অসুবিধা হইবে না। উপরোক্ত বিশিষ্ট বামপন্থী দলগুলির নিজস্ব প্রার্থী ছাড়াও তাঁহাদের সমর্থিত বিশিষ্ট প্রতিনিধিস্থানীয় প্রার্থীও সম্মিলিত দলের তালিকায় স্থান লাভ করিতেছেন। বামপন্থীরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এক হইতে পারিতেছে না, এই সুখস্বপ্নে কংগ্রেস মহল ক্ষণিকের জন্য আশান্বিত হইয়াছিলেন এইরূপ গুঞ্জন উত্থিত হইয়াছিল, বামপন্থীদের মিলিত তালিকা প্রকাশিত হইতে দেখিয়া এক দিকে কংগ্রেসী মহলে আতঙ্ক ও অন্য দিকে জনসাধারণের মধ্যে উল্লাস দেখা দিয়াছে। কংগ্রেস মহলের টাকার অভাব নাই—প্রচারে তাঁহাদের পক্ষে বাছাই-বাছাই চিরকালের প্রতিক্রিয়াপন্থিগণ বাহির হইয়া যেরূপ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে তাহাতে কংগ্রেসের পরাজয় অনিবার্য। কংগ্রেস জনমতকে খোঁচাইয়া দিয়া বামপন্থীদের সুবিধাই করিয়া দিয়াছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে সমস্ত বামপন্থী প্রার্থী নির্ব্বাচন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই অর্থহীন, কোন কোন ক্ষেত্রে পথের ভিখারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কংগ্রেস দম্ভ করিতেছে তাহাদের বিপুল অর্থবল আছে বলিয়া। কিন্তু জাগ্রত জনমত কি অর্থের প্রলোভন ও জৌলুষে কেনা গোলাম হইবে? যে কংগ্রেসী শাসন জাতিকে ইংরাজ রাজত্ব হইতেও সর্ব্ব দিক দিয়া পরাধীন করিয়াছে, চাষীর মুখের অন্ন কাড়িয়াছে, দেশকে উলঙ্গ করিয়া ছাড়িয়াছে তাহার যোগ্য জবাব দিবার জন্য বর্দ্ধমান আজ বদ্ধপরিকর।" —দামোদর।

জনসঙ্ঘের রূপ

"ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ চাহেন যে সত্যকার কর্ম্মী, দৃঢ়চরিত্র এবং যোগ্য ব্যক্তিরাই যেন নির্ব্বাচন-যুদ্ধে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য মনোনীত হন—তা' তিনি যে কোন দলের লোকই হউন না কেন। দলের অস্তিত্ব ক্ষুণ্ণ করিবার বা আদর্শমত মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিবার প্রয়োজন নাই। সকল দল ও উপদল যদি সম্মিলিত হইয়া যোগ্য ব্যক্তি মনোনয়ন করেন, তাহা হইলে কোন দল বা উপদলের মধ্যে বিরোধ বাধিতে পারে না। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যদি যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযান চালান যায়, তাহা হইলে সুনিশ্চিত ভাবে গত চারি বৎসরের কংগ্রেসী কু-শাসনের অবসান ঘটাইয়া নূতন সম্মিলিত দলের উদ্বোধনে বাংলায় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হইবে। নতুবা বর্ত্তমান বাংলার এক জন উচ্চতম কংগ্রেসী কর্ণধার যাহা বলিয়াছেন—"It is not that we deserve to be returned but they will make us return." এই সমস্ত উক্তিই ফলবতী হইয়া বাংলার দুঃখ-দুর্দ্দশাকে আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিবে। ইহাতে সন্দেহ নাই। আজ সকল দল ও উপদলের মধ্যে তাই একান্ত ভাবে প্রয়োজন ঐক্য সাধনের। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে দেশবাসী এই সকল দল-উপদলের নেতাদের কোন দিন ক্ষমা করিবে না। দেশবাসী জানিবে, নেতৃত্বলোভী নেতা ও উপনেতারাই তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধনের মুখ্য যন্ত্রস্বরূপ হইয়া কংগ্রেসীরাজকে কায়েমী করিয়া দিয়া গেলেন। দেশবাসীর প্রতি আমরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করিব যে, যদি এই সকল দল ও উপদলের মধ্যে আপোষ, মীমাংসা না হয়, যদি ইহাদের মধ্যে ঐক্য সাধন না হয়, তাঁহারা যেন বৃথা কথায় ও বাক্যাড়ম্বরে ভুলিয়া তাহাদের

ভোট অযোগ্য দল ও উপদলের প্রতিনিধিদের পক্ষে বর্ষণ করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ না ডাকিয়া আনেন। দেশব্যাপী যে কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার অভিব্যক্তি যেন আমরা দেখিতে পাই শক্তিশালী দলের প্রতিনিধিদের নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়া।" —জনসঙ্ঘ

কংগ্রেস ও নির্বাচন

"নির্বাচন যতই আসন্ন হইয়া আসিতেছে তলাকার জল ততই গুলাইয়া উঠিয়া ভিতরের বস্তুকে প্রকট করিয়া দিতেছে। দীর্ঘ চার-পাঁচ বৎসর ধরিয়া তলায় যত আবর্জনা জমিয়াছে, অকস্মাৎ আজ এক বিরাট আলোড়নের আওতায় পড়িয়া সব একে-একে কেবল উপরেই ঠেলিয়া উঠিতে চায়। তাহা আর রোধ করিবার উপায় নাই। গদীর স্বাদ কংগ্রেসী মহোদয়েরা একবার পাইয়া আর ভুলিতে পারিতেছেন না। মধুর সে স্বাদ তাই আর ছাড়া যায় না। এই দীর্ঘদিন ধরিয়া তাঁহারা রক্তপায়ী জোঁকের মতোই শাসনতন্ত্রের গায়ে লাগিয়া থাকিয়া কোটি কোটি মানুষের জীবনীশক্তি-রূপ রক্ত শোষণ করিয়া আসিতেছেন। প্রথমে মাত্র একটি কাঠামো কোনোমতে খাড়া করিয়া—সুযোগসন্ধানী মুসলমান নেতাদের অর্দ্ধেক দেশ ঘুষ দিয়া শাসনতন্ত্রে মাথা গলাইয়া ছিলেন। তাহার পর দেখা গেল তাঁহাদের আর উঠিবার গা নাই। ঠিক তেমনি ভাবেই তাঁহারা যেন-কেন-প্রকারেন গদী অধিকার করিয়া বসিয়া থাকা মনস্থ করিয়াছেন। যথাসময়ে গণপরিষদ গঠিত হইল বটে, কিন্তু কংগ্রেসী শাসনের দাপটে তাহার সহিত গণ-সংযোগই বিদূরিত হইল। অতি কূট-কৌশলে নিজেদের ধামা-ধরা লোক দিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাড়াইয়া তাঁহারা এতাবৎকাল মনের আনন্দে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। নির্বাচনের ধারে-কাছেও যাইতে চাহেন নাই। কারণ, বক্তৃতার খাতিরে বুক থাবড়াইয়া আপনাদের জনপ্রিয়তা তাঁহারা যতই ঘোষণা করুন না কেন, কংগ্রেস যে আজ জনসাধারণের কাছে কতখানি প্রিয় তাহা এই সকল সত্যসেবী মহোদয়েরা ভাল ভাবেই জানেন। জানেন যে—তাঁহাদের মুখোস খুলিয়া গিয়াছে। প্রতিমা বলিয়া যাহাকে খাড়া করা হইতেছিল তাহাতে মাটি দিয়া আর রঙ করা হইয়া উঠে নাই, কেবল খড়ই নির্লজ্জ দেহ বাহির করিয়া নগ্ন দৈন্যের পরিচয় দিতেছে। এতাবৎ-কালের কংগ্রেসী শাসনের ইতিহাস যে শুধু স্বার্থসর্বস্বতার স্বরূপ তাহা আর কাহারও অনুভব করিতে বাকী নাই। এই স্বার্থ আবার দুইমুখী—ব্যক্তিগত ও দলগত। ধীরে ধীরে সেই সত্য যত স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে, বীতশ্রদ্ধ জনসাধারণের মন তত কংগ্রেসী শাসনের উপর বিষাইয়া উঠিয়াছে। পাপী যেমন জানে তাহার পাপের কথা, খুনী যেমন জানে তাহার খুনের বিষয়, চোর যেমন জানে তাহার চৌর্যবৃত্তির ইতিকথা—অপরাধী যেমন জানে নিজের অপরাধ, কংগ্রেসও তাহার কার্যের ফলাফল যথাযথ ভাবেই মনে-প্রাণে অনুভব করিতে পারিয়াছে। আবার ব্যাপার ভাল বা মন্দ যাহাই হউক, তাহার উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবেই। বাহির ও ভিতরে দুই দিকেই। ভিতরেও যে আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহাও বড় কম নয়। সুবিধা—ক্ষমতা—স্বার্থ লইয়া মারামারি কাড়াকাড়ি। যাহাদের মনোমত ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই, তাহারাই আবার সেম-সাইড গোল দিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। চারি দিকে বিপদ! নির্বাচনী অগ্নি-পরীক্ষায় কলুষিত কংগ্রেসের কোনোমতেই রেহাই নেই।" —স্বস্তিকা।

বামপন্থী ঐক্যে দেরী কেন?

"এই প্রশ্ন আজ জনসাধারণের মুখে। গত চার বছরের কংগ্রেসী শাসন আর এক দিনও টিকিয়া থাকে, জনসাধারণ ইহা চায় না। ভাত, কাপড়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, ব্যবসায় প্রতিটি ক্ষেত্রে কংগ্রেসী সরকার সাধারণ মানুষের জীবনকে আঘাত করিয়াছে। দু'শ বছরের সাম্রাজ্যবাদী আমলের যে ব্যবস্থা চলিতেছিল, যাহা দেশের জীবনকে শোষণ করিয়া ঝাঁঝরা করিয়া দিতেছিল, কংগ্রেসী শাসন সেই

ডাঃ শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

ডাঃ শ্রীহরেন্দ্র-কুমার মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ভারতীয় গণ-পরিষদের সহ-সভাপতি এবং পার্লা-মেন্টের সদস্য ছিলেন। যদিও তিনি ইংরেজী ভাষাতে এক জন বিচক্ষণ পণ্ডিত, অর্থ এবং রাজনীতিতেও তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ আছে। শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় জাতিতে খৃষ্টান। ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু খৃষ্টান সমাজের তিনি অন্যতম প্রতিনিধি। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজীতে এম-এ উপাধি লাভ করেন এবং 'ডক্টরেট' হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় তিনি উপদেষ্টা হিসাবে ছিলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। স্বর্গত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে যোগদান করেন। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের সেক্রেটারী এবং ইনস্পেকটর অব কলেজ হিসাবে কার্য্য করেন। বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের তিনি এক জন সদস্য। তিনি 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার আধুনিক ভাষা-পরিষদের তিনি অবৈতনিক সদস্য আছেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তিনি কংগ্রেসকে সমর্থন করেন। ইংরেজী এবং বাঙলা ভাষায় লেখক হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতিমান। তিনি প্রদেশপাল নির্ব্বাচিত হওয়ায় আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে টিকিয়া আছে এবং জনসাধারণের জীবনকে ব্রিটিশ আমলের চেয়েও আরও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। যে কংগ্রেসী শাসনে চালের দাম ৭০৲ টাকা, কাপড় ১৫৲ টাকা হইয়াছে, কালোবাজার প্রকাশ্য বাজারে পরিণত হইয়াছে, শিক্ষা-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, বেকার সমস্যা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, সরকারী আমলাদের ঔদ্ধত্য বাড়িয়াছে, কথায় কথায় গুলী আর বিনা বিচারে গ্রেপ্তার বেওয়াজ হইয়াছে, তাহাকে ভোট দিব না, এ কথা প্রতিটি মানুষের মুখে। জনতার এই স্বতঃস্ফূর্ত কংগ্রেস-বিরোধী চেতনাকে বাড়াইয়া তোলা, সক্রিয় করার দায়িত্ব হইতেছে প্রতিটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের। জনতা এই প্রশ্নও সাথে সাথে তুলিয়াছে, কংগ্রেসী শাসনকে যদি মোকাবিলা করিতে হয়, কংগ্রেসী শাসনকে যদি শিথিল করিতে হয়, তবে একা কোন বামপন্থী পার্টির পক্ষে সম্ভব নয়। যদি বামপন্থী পার্টিগুলি মিলিত হইয়া নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে না পাবে, তবে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইবে, হতাশা আসিবে এবং কংগ্রেসই জিতিয়া যাইবে। মালদহ নির্ব্বাচনে ঠিক এই ঘটনাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু যেখানেই বামপন্থী পার্টিগুলি ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিয়াছে, জনসাধারণ এক বিপ্লবী শক্তি অনুভব করিয়াছে, নূতন আশা দেখিয়াছে এবং কংগ্রেসকে চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত করিয়াছে। এমনি হইয়াছে হাওড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান ও চন্দননগরে। এমন কি, চন্দননগরে কংগ্রেসকে নির্ব্বাচন শেষ হইবার পূর্ব্বেই নির্ব্বাচন-ক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হইয়াছে।"

—সংগঠন।

গণতন্ত্র

"আজকাল সকলেরই মুখে গণতন্ত্রের কথা শোনা যাইতেছে। স্বাধীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদের তথা পুঁজিবাদের ধ্বংস হইয়া, গণরাজ ও সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হইবে। তাহারই সূচনা ভারতের গণভোট। ভারতবর্ষে কয়েকটি দল-উপদল নির্ব্বাচন-যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। কোনও দল একক, কোনও দল যুক্তভাবে স্ব স্ব প্রাধান্যলাভের জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। সকলেই সভা-সমিতিতে ভবিষ্যতে দশ ও দেশের মঙ্গলবিধানের বুলি শুনাইয়া জনসাধারণের মন-জয়ে সচেষ্ট হইয়াছেন। প্রত্যেকেই গণতন্ত্রের মুখরোচক বুলি আওড়াইয়া গণভোট বনাম গণতন্ত্রের ভাষ্য সহকারে নির্ব্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু জন-সমাজের অধিক সংখ্যক গণতন্ত্রের বা গণভোটের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার কি সার উপলব্ধি করিতেছেন! গণতন্ত্র গলাবাজীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। উহার সক্রিয়তায় কোন দল বা ব্যক্তিবিশেষ কাজ করিতেছেন না। আমরা দেখিতেছি, লোকসমাজে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ান অসার মাত্র। কারণ সমাজে এক দিকে ধনিকের আবাস, অন্য দিকে গরীবের আবাস। সমাজদেহে অর্থনৈতিক বিভেদ পরিস্ফুট। উৎপাদনে যন্ত্রের মালিকানা ক্ষমতাশালী লোকদের করায়ত্ত। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় গণতন্ত্র, ধনতন্ত্রেরই আজ্ঞাধীন সহচর মাত্র। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে ধনিকরাই আইন পরিষদ, সংবাদপত্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং প্রচারের অন্যান্য প্রক্রিয়ার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। গণতন্ত্রকে তাহারা নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে ব্যবহার করে এবং পরিণামে তাহাকে ধনিকতন্ত্রে পরিণত করে। অর্থক্ষমতা অপেক্ষা গণতন্ত্রের কপট শত্রু আর নাই। তোষণ ও পোষণ ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আর এক শয়তানী দিক্।"

—গ্রামসেবা।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

"গত ৫ই আশ্বিন আনুষ্ঠানিক ভাবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হইয়াছে। ভারত-রাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই উৎসবে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-নাথের "বিশ্বভারতী"—তাঁহার সাধনার ধন নব-কলেবর ধারণ করিল। এই উপলক্ষে "বিশ্বভারতী"র হিতৈষীরা আনন্দিত হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রশ্ন তাঁহাদের মনে জাগিয়া উঠিবে। তাহার নানা কারণ আছে। "বিশ্বভারতী"র বীজমন্ত্র ছিল—"সত্যম্ শিবম্ আনন্দম্"। ভারত-রাষ্ট্রের বিধান পরিষদ, অজ্ঞাত কারণে, খামখেয়ালি বশে—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করিবার কালে "সত্যম্"কে দিয়াছেন বিসর্জ্জন। এই খেয়াল কাহার তাহা জানি না। সেই জন্যই নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং এই বিষয়ে "পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা" ৮ই আশ্বিন সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা বাঙালী মনের ক্ষোভের পরিচায়ক: "...রবীন্দ্রনাথ একক প্রচেষ্টায় যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, সহস্র শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে তাহার বিরোধিতা করিয়াছে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সেই প্রচেষ্টাকে বিকৃত করিয়াছে, চতুর্দ্দিক হইতে পিষ্ট করিয়া শ্বাস রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সমগ্র পৃথিবী যে পথে চলিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহার বিরোধিতা করিয়াছেন, তাঁহার উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ধ্বংসের গতিকে তিনি রোধ করিতে পারেন নাই। "বর্ত্তমানে বিশ্বভারতীর যে পরিবর্ত্তন ঘটিল, আমাদের আশঙ্কা, সেই পরিবর্ত্তন কি রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে সফল করিবার সহায়তা করিবে? আজ যাঁহাদের কর্ত্তৃত্বে, যাঁহাদের নির্দ্দেশে বিশ্বভারতী পরিচালিত হইবে, তাঁহারা কি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বিশ্বাস করেন? যে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের বাণী রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন-আদর্শের মূল ভিত্তি, তাহা কি তাঁহাদেরই কর্ত্তৃত্বাধীনে চূড়ান্ত অপমান, লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের সম্মুখীন হইতেছে না? যে যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর সৃষ্টি, সেই যান্ত্রিকতাই কি বর্ত্তমান কর্ণধারদের অভূতি, চেতনাকে প্রস্তরীভূত করে নাই?" —প্রবাসী

কংগ্রেসী নির্ব্বাচন

"মন্ত্রিগণ অনেকেই যে এখন তাঁহাদের সরকারী সফরে নির্বাচনী-প্রচার করিয়া বেড়ান তাহার একটি দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করিবার প্রলোভন আমরা সংবরণ করিতে পারিতেছি না।—সম্প্রতি আসামের স্বায়ত্ত-শাসন মন্ত্রী জনাব আবদুল মতলিব মজুমদার কাছাড় সফরে আসিয়া কোথায় কি করিয়াছেন সে-সম্বন্ধে যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, তিনি করিমগঞ্জে আসিয়া পার্লামেন্টের কাছাড়-লুসাই সাধারণ আসনের জন্য এক জন নূতন কংগ্রেসপ্রার্থী খুঁজিয়াছেন এবং পৌরসভায় সরকারী মনোনয়নের টোপ ফেলিয়া সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস সমর্থন আদায়ের ফন্দি-ফিকির আঁটিয়াছেন; হাইলাকান্দিতে স্বকীয় নির্বাচনী প্রচার করিয়াছেন আর শিলচরে শ্রীসতীন্দ্রমোহন দেব মহাশয়ের ভবনে গিয়া তাঁহাকে প্রজা দল ছাড়িয়া কংগ্রেসে ফিরিয়া আসিবার জন্য কাকুতি-মিনতি করিয়াছেন এবং

নির্বাচন সম্পর্কিত মুখরোচক নানা প্রস্তাব দিয়াছেন। মন্ত্রী সাহেব সরকারী সফরে আসিয়া এরূপ দলীয় প্রচার বা সংগঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে ন্যায়তঃ বা আইনতঃ অধিকারী নহেন বলিয়াই আমরা মনে করি।" —যুগশক্তি।

কংগ্রেসী দালালদের প্রতি

"আজ বেকার যুবক দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া চারিদিকে দেখিতেছে আত্মীয় পোষণের দৌরাত্ম্য। নিরুপায় হইয়া সে করিতেছে মৃত্যুকে বরণ। মায়ের জাত শিশুপুত্রকে অন্ন দিতে না পারিয়া রাস্তাঘাটে তাহাকে করিতেছে পরিত্যাগ। মা-বোনেরা বস্ত্রাভাবে বিসর্জন দিতেছে নিজের অমূল্য জীবন। যে দুঃখের জ্বালায় মরিয়া হইয়া আজ তাহারা অস্বাভাবিকতার পথে পা বাড়াইয়াছে, তাহাতে জাতির কেন্দ্রমূল ধরিয়াই টান পড়িয়াছে, কাজেই আজ চরিত্রহীনতার দোষ জাতির ঘাড়ে চাপাইলেই চলিবে কেন? যদি আমরা দেখিতে পাইতাম যে, আজ জনগণ যে ভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতেছে, কংগ্রেসী নেতারাও তাহার অংশভাগী হইতেছেন, তাহাদের দুঃখ-কষ্টে সমব্যথী হইতেছেন, তাহা হইলে জনতার অভিযোগের কোনই কারণ ঘটিত না।" —কম্মিদল।

ব্যর্থ আন্দোলন

"'ফসল বাড়াও' আন্দোলন যারা ব্যর্থ হয়েছে বলে তারা নেহাৎই মিথ্যাবাদী। ফসল নিশ্চয়ই বেড়েছে কিন্তু যেমন বীজ তেমনি ফসল তো হবে। কংগ্রেস বীজ বুনেছে চৌর্যবৃত্তির, এখন চোরে দেশটা ভরে গেল। বোম্বায়ের এক সাপ্তাহিক নবতম চুরির 'ফসলে'র এক বিবরণ প্রকাশ করেছেন। ৬০ কোটি টাকা খরচ করে উড়িষ্যায় হীরাকুঁদ বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। এই বাঁধ তৈরী হলে ১০ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচের ব্যবস্থা হবে ও ৩ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। কিন্তু বাঁধের পাশেই ১ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমি জলে ডুবে যাবে বাঁধটা সম্পূর্ণ হলে। যে জমিগুলো জলে ডুবে যাবে সেগুলোর মালিকদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিগুলো দখল করার ব্যবস্থা করতে হবে। যাদের জমি গেল তাদের অন্য জায়গায় জমি দিয়ে বসতি করার ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৪৭ সালে উড়িষ্যা সরকার হিসেব করেছিলেন, এই দেড় লক্ষ একর জমির ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা লাগবে। হিসেব করা হয়েছিল এই ধরে যুদ্ধের আগে ঐ জমির দামের দেড় গুণ হিসাবে ক্ষতিপূরণ করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার যখন বাঁধ গঠনের কাজে হাত লাগালেন তখন তারা ঠিক করলেন, সওয়া ৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণে কুলাবে না। ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ১১ কোটি টাকা। অর্থাৎ উড়িষ্যা গভর্ণমেন্টের হিসাবের ডবল। সে তো লাগবেই, উড়িষ্যা গভর্ণমেন্ট একটা ছোট্ট রাজ্যের গভর্ণমেন্ট, ওদের চুরির হার কিছু সর্বভারতীয় প্রকাণ্ড সরকারের মত হতে পারে না। এই বেশী টাকাটা যদি গরীব চাষীদের হাতে পড়তো তাহলেও না হয় বোঝা যেতো সাধারণ লোকের কিছু উপকার হলো। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। এই ক্ষতিপূরণের লাভটা যাচ্ছে জমিদারদের পকেটে। তারা সরকারী কর্ম্মচারীদের যোগসাজসে ক্ষতিপূরণটাকে কত বাড়ান যায় তার চেষ্টা দেখবে। ক্ষতি যাদের হবার কথা তাদের ক্ষতি রয়েই গেল, পূরণটা হচ্ছে অন্য লোকের পকেটে। এই ব্যাপারে আর একটি লক্ষ্য করার ব্যাপার হচ্ছে, ঐ দেড় লক্ষ একর জমি তো আজই জলে ভর্ত্তি হবে না। যখন বাঁধ সম্পূর্ণ হবে ৫-১০ বছরে, তখন ঐ জমিতে জল উঠবে। কিন্তু সরকার টাকা দিয়ে জমিদারদের থেকে জমি কিনে নিলেও তারা ঐ জমি ভোগ করছে বিনা বাধায়। তার জন্য সরকারকে খাজনা বা ভাড়া দেবার কোন দায়িত্ব তাদের নাই। এমন কি, ঐ দেড় লক্ষ একর জমির গাছ কাটছে, ঘর-বাড়ী ভোগ-দখল করছে জমিদাররা বিনা খাজনায়। বাঁধের পাশের জমি থেকে যাদের উচ্ছেদ করা হল, তাদের পুনর্বসতির জন্য জঙ্গল কেটে ট্রাক্টর দিয়ে চাষের জমি তৈরী করার ব্যবস্থাও হয়েছে। সেটাও সরকারী কর্মচারীদের চুরির আর একটা রাস্তা হয়েছে। আগের হিসাবে জঙ্গল কেটে বসতি বসাতে খরচ ধরা হয়েছিলো একর-প্রতি ১২৫৲ টাকা। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে লাগবে একর-পিছু ২২৫৲ অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও প্রায় আগের হিসাবের ডবল। অথচ লক্ষ্য করার বিষয়, উত্তর-প্রদেশে তরাই অঞ্চলের জঙ্গল কেটে বসতি করতে খরচ পড়েছে একর-পিছু ৫০ টাকা। প্রচুর যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে, কিন্তু বাজার-দর যাচাই না করেই বা কেন্দ্রীয় সরকারের সরবরাহ বিভাগকে না জানিয়েই, হিসাবপত্র দাখিল না করেই। নমুনা ১৬টা ট্রাক্টর কেনা হয়েছে প্রত্যেকটি ২৯ হাজার টাকা দামে। কিন্তু সেই ট্রাক্টরই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট কিনেছে ১৮ হাজার টাকা করে। অর্থাৎ ট্রাক্টর-পিছু ১১ হাজার টাকা চুরি! কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য চুরি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় চিরাচরিত প্রথামত একজোয়ারী কমিশন বসিয়েছেন। কিন্তু চুরি প্রমাণ হলেও কেন্দ্রীয় সরকার কি করেন তা তো সকলেরই জানা আছে।"

—জনসাধারণ।

রাষ্ট্রদ্রোহীদের শাস্তি চাই

দুর্গাপূজা গেল। এ পূজা বিশেষ করে বাঙ্গালীদের পূজা। তাই তারা ছেলে-মেয়েদের নূতন নূতন রঙীন জামা-কাপড় আর নিজেদের ছিন্ন-সেলাই জামা-কাপড়ের বদলে অন্ততঃ একখানি করে নূতন কাপড় আর জামা চাইল—কিন্তু হায় রে বরাত! এ যে কংগ্রেসী রাজত্ব! শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতব যতই লোকের সুখ-সুবিধার জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করুন—সে কাপড় কি এসে পৌঁছায় দরিদ্র জনসাধারণের কুটিরে—তাদের—মুখে পূজার হাসি ফুটিয়ে তুলতে? এখানে সরকারের যে সব চেলা-চামুণ্ডা আছে, তারা কি বোঝে দরিদ্রের ব্যথা? তারা যে স্বার্থপর! নয় কি? যখন ফাইন্ সুপার-ফাইন্ কাপড় এসে পৌঁছোয় এই উলুবেড়িয়া মহকুমায় তখন সেই ভাল কাপড়গুলি বিতরিত হয় কোথায়? এ সংবাদ অনেকেই রাখেন। কারণ দিনের পর দিন ধর্ণা দিয়েও যারা কাপড় পায় না—তাদেরি সামনে দিয়ে যখন কাপড়গুলি উলুবেড়িয়ার সুপরিচিত ব্যবসায়ী, দোকানদার কর্তৃপক্ষের ইয়ার-বন্ধুদের ঘরে ঢোকে তখন কার না নজরে পড়ে? কিন্তু সাধারণ লোক ভাল কাপড় চায় না—কোন রকমে তাদের দিন কেটে গেলেই যথেষ্ট। কাপড়ের ত বা দাম তার উপর আর ব্ল্যাক করবার উপায়ই নাই।

তবু ঐ বেশী দাম দিয়েও—এমন কি শেষ সঞ্চয় কপর্দ্দক ছাড়া ধার-কর্জ্জ করেও পূজার সময় কাপড় তাদের চাই-ই। মন্ত্রীদের আশ্বাস-বাণীতে তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু উলুবেড়িয়া মহকুমার স্থানীয় বস্ত্রবণ্টনকারী কর্তৃপক্ষ "কে অত ঝামেলা পোহাবে" এমনি মনোভাব নিয়ে উলুবেড়িয়া মহকুমার জন্ম নির্দ্দিষ্ট প্রচুর কাপড় থাকা সত্ত্বেও কাপড় তুললেন না, তাঁরা প্রচার করলেন কাপড় অপ্রচুর এসেছে সবাইকে দেওয়া যাবে না—আর ৫০।৬০ হাজার টাকা জমা দেওয়ার মত কোন হোল-সেলার ব্যবসায়ী নাই। সারা উলুবেড়িয়া শহরে ৫০।৬০ হাজার টাকা জমা দেওয়ার মত একটাও লোক পাওয়া গেল না! কেন, উলুবেড়িয়া মহকুমায় কি ধনী নাই? ডিলারদের কাছ থেকে উপরিপাওনা আদায়ে অসুবিধা অনেক—হোল-সেলারদের সঙ্গে বোধ হয় সর্ত্তে পুষোচ্ছে না কিংবা ভাগ বাঁটোয়ারার গোলমাল হয়েছে—যার জন্ম কর্তৃপক্ষের এই চালাকি? তাই বড় একটা সংসারেও একখানার বেশী কাপড় পাওয়া গেল না এই মহাপূজায়। কংগ্রেস সরকারকে লোকে গালাগাল দেয় কেন? কাদের দোষ? দোষী কারা? দরিদ্র জনসাধারণকে সরকার ভুল করে পীড়ন করেন—বুঝতে পারেন না যে, তাঁরা যাদের গদিতে বসিয়েছেন তাঁদের অকীর্তি-কুকীর্তির জন্যই আজ সরকার জনসাধারণের চোখে হেয়, অবজ্ঞেয়, হাস্যাস্পদ। এদের চালাকীর ও জোচ্চুরীর কার্য্য-কলাপ তো সহসা ধরা পড়ে না—কারণ, এরা যে জ্ঞানপাপী। তাই তো কংগ্রেসের সহিত জনসাধারণের কোন সহযোগিতা নাই। রাষ্ট্রের বদনাম হয়তো এদের দোষেই। এরাই কি জাতির শত্রু নয়—দেশের শত্রু নয়? যাদের জন্য দেশের নিরীহ জনসাধারণ কষ্ট পায়—তারা দেশের কে? যারা রাষ্ট্রের অগ্রগতিতে বাধা দেয় তারাই তো রাষ্ট্রদ্রোহী।"

—উলুবেড়িয়া সংবাদ।

মানুষ চাই

"সাধারণ নির্ব্বাচনের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে অসংখ্য দল আসন অধিকারের আকুল আগ্রহে দামামা বাজাইতেছেন। ব্যবস্থা সভায় যাইবার জন্ম তথাকথিত দেশসেবকগণের ভিড় লাগিয়াছে। নেপথ্যে দল-উপদলের টিকিট আঁটিবার সলা-পরামর্শ চলিয়াছে। দুঃস্থ দেশবাসী বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। মনে মনে বলে—দলই কি সব? মানুষ কোথায়? আমরা যে মানুষই চাই। মানুষের মত মানুষ,—দুঃখের দরদী, সুখের বন্ধু। দল-উপদলের কাদা ছোঁড়াছুড়ির ভিতর হইতে সত্যকারের মানুষ বাছিয়া লইবার দিন আসিয়াছে। কথার ছলনায় আজ আর কেহ বিভ্রান্ত করিও না। তোমরা বল—সত্য করিয়া বল—কে আমাদের দুঃখ ঘুচাইতে চাও। স্বাধীনতা পাইয়াও আজ দুঃখের অন্ত নাই—আজও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারি না। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, রোগের চিকিৎসা নাই, শিক্ষা নাই, সংস্কৃতি নাই, প্রীতি নাই, ভালবাসা নাই, ধর্ম্ম নাই, আচার নাই—এ কি ছাই সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। নোংরামীতে দেশ ভরিয়া উঠিয়াছে। সমাজের এ পূতিগন্ধময় কাঠামো ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে হইবে। অসামঞ্জস্যের প্রাচীর চূর্ণ করিয়া মানুষকে তাহার স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে হইবে। অন্ন-বস্ত্রের দুশ্চিন্তায় দেশের কোটি কোটি নরনারী হাঁফাইয়া উঠিল, আর অন্য কতক কায়েমী স্বার্থপর বগল বাজাইয়া নারকীয় নৃত্য করিয়া বেড়াইবে—ইংরাজী শাসনের এই শেষ চিহ্ন নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে হইবে। তাই দল নয়, মানুষ চাই।"

—পল্লীবাসী।

আগামী নির্ব্বাচন

"আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের দামামা উচ্চ রবে বাজিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। এখন হইতেই পুরা মাত্রায় তোড়জোড় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মোটের উপর ভোটের আসর গরম হইতে সুরু করিয়াছে। মনে হইতেছে যে, সময় নিকটবর্ত্তী হইলে তাপমান যন্ত্র হয়ত বা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইবে। তবে শীতকাল, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় গরম প্রলেপ ভালই জমিবে। প্রতি কেন্দ্রেই তিন, চার বা ততোধিক প্রার্থীর নাম শুনা যাইতেছে। স্বাধীন ভারতের এই প্রথম পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্ব্বাচনে প্রার্থী হইবার সুযোগ কেহই ছাড়িতে রাজী হন নাই। সকলেরই মনে এম-এল-এ অথবা মন্ত্রী হইয়া দেশসেবার বাসনা জাগিয়াছে। নামগোত্রহীন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক হইয়া যে কোন লাভ নাই, তাহা প্রার্থীদের অনেকে বোধ করি ভাল ভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। মোটের উপর, কেহই এ যাত্রা সুযোগ ছাড়িতে রাজী নন। 'এসপার আউর ওসপার' মন্ত্রে উদ্দীপিত হইয়া সকলে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন। কংগ্রেস, স্যোসালিষ্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক, কৃষক-মজদুর, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী, কমিউনিষ্ট, জনসঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা, স্বতন্ত্র, রাজনৈতিক ও প্রগতিশীল স্বতন্ত্র ও বিত্তশালী স্বতন্ত্র ইত্যাদি কত রকমের ও কত প্রকারের ছাপে সমৃদ্ধ হইয়া অনেকে ভোটারদের দ্বারে ধর্ণা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। গণতন্ত্রের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে কীর্ত্তনীয়া দলের গলা ধরিয়া যাইতেছে, এদিকে কীর্ত্তনীয়া দলের সঙ্গীতে আসরের মূর্খ ভক্ত শ্রোতার দল ত্যক্ত হইয়া প্রমাদ গণিতেছে। গণতন্ত্রের এ কি অসহনীয় রূপ? এ যেন পারিবারিক কলহের মত ব্যাপার! ভোটদাতার মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। কি যে সে করিবে তাহা ভাবিয়াই ঠিক করিতে পারিতেছে না।"

—বীরভূম বার্ত্তা।

৺পরিমল রায়

নয়াদিল্লীতে ইণ্ডিয়ান এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিস (আই এ এস) ট্রেণিং স্কুলের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীপরিমল রায় গত ১৪ই অক্টোবর নিউ ইয়র্কের একটি হাসপাতালে হৃদযন্ত্র বৈকল্যের দরুণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরলোক গমন করেন। অধ্যাপক রায় গত জুন মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘ দপ্তরের আন্তর্জ্জাতিক কর বিভাগের অর্থনীতি বিষয়ক উচ্চপদ গ্রহণ করিয়া নিউ ইয়র্ক গমন করেন। তিনি দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ ধরিয়া ঢাকা ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন এবং ইকনমিক থিয়োরি এবং পাব্লিক ফাইনান্সে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্যেও অধ্যাপক রায়ের যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার রচনা "ইদানীং" সুধী সমাজের যথেষ্ট প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি স্ত্রী ও দুইটি শিশু-সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা পরিমল বাবুর আত্মার শান্তি কামনা করি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

বাঙলায় দুর্ভিক্ষ
শ্রীযামিনী রায় অঙ্কিত
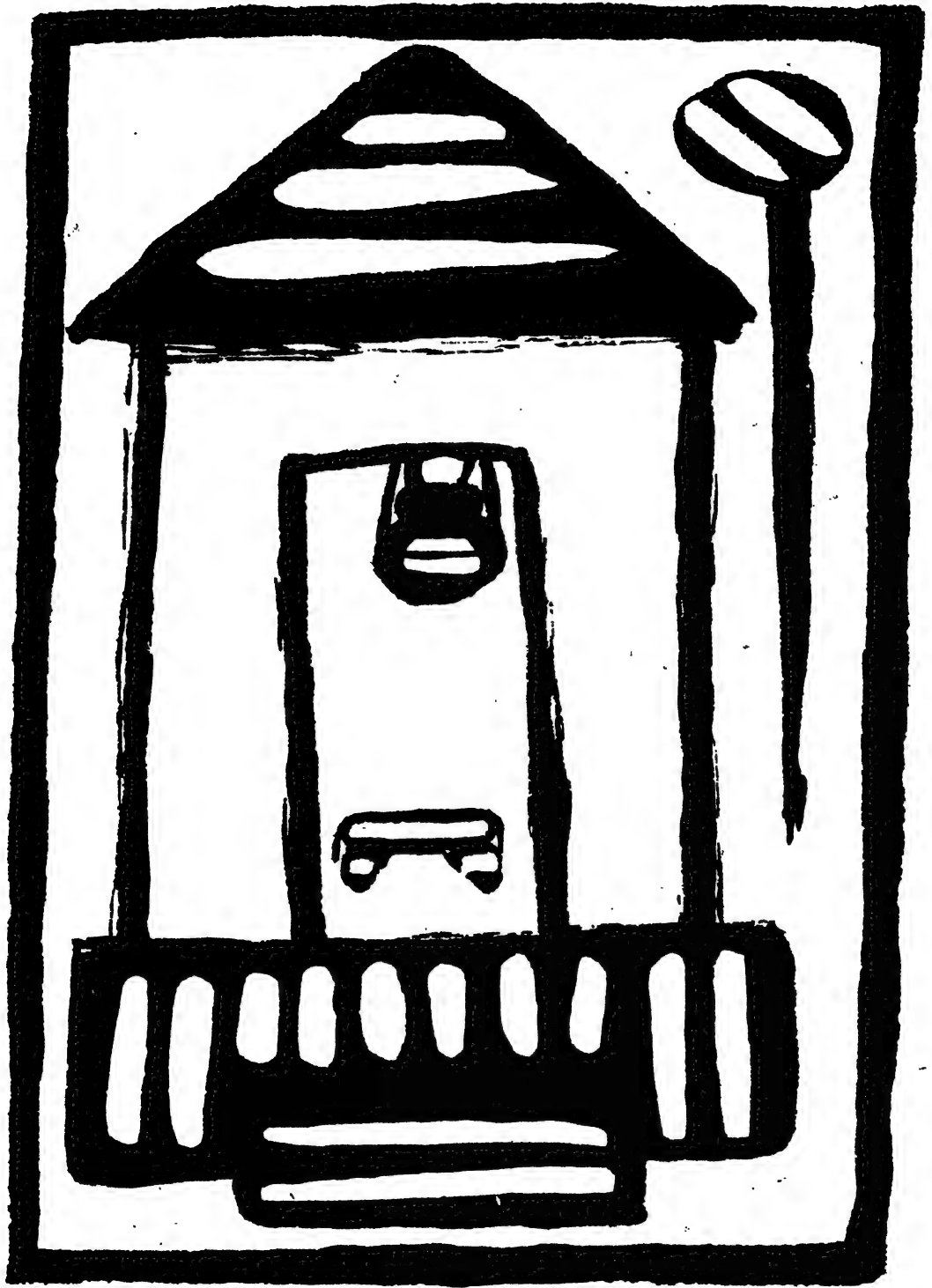
শ্রীঅমল মিত্রের সৌজন্যে

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

ক থা মৃ ত

তোতাপুরী। তোম কুছ সাধন করোগ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হামারা মাই কহেগা তো শিখেগা।

তোতাপুরী। তব্ যাও তোমারা মাইকো পুছো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা।

কথা বলিতে বলিতে তিনি মা ভবতারিণীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মা কালীকে বিষয়টি জানাইলেন।

ভবতারিণী। হ্যাঁ, তবে শেখ্।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কে শেখাবে মা ?

ভবতারিণী। ওই তোকে বেদান্ত শেখার জন্য এসেছে। ওরি কাছে শেখ্।

মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই ভাবস্থ হইয়া এইরূপ প্রশ্নোত্তর আপনা আপনি করিয়া তোতাপুরীর নিকট পুনরাগমন করিলেন এবং বলিলেন :

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ হামরা মাই বোলা হ্যায়, তোমারা পাশ বেদান্ত শিখেগা ; তুম্ শিখাও।

তোতাপুরীর নিকট তিনি তিন দিন সাধনা করিয়াছিলেন। তোতাপুরীই তাঁকে 'পরমহংসজী' নামে প্রথম ডেকেছিলেন।

ধর্ম্ম সংগীতে

নানা দেশে সঙ্গীতের বিকাশ ধারা অনুসরণ করে দেখা গেছে যে, ধর্ম্মের সঙ্গে তার যোগ সুস্পষ্ট। ভারতের প্রাক্-আর্য জাতিদের মধ্যে অবস্থা কি ছিল ভাল করে না জান্‌লেও প্রাচীনতম ঋক্ মন্ত্রকে 'ছন্দ'-বদ্ধ আকারেই পেয়েছি এবং উদ্‌গাতাগণ মন্ত্রকে গান করতেন, তার ফলে দেখা দিয়েছিল সামবেদ। অতি প্রাচীন পূজা-পার্ব্বণাদির সঙ্গে গীতবাদ্যের তথা নৃত্যের বিকাশ সর্ব্বত্র দেখেছি। মধ্যযুগের 'গান ও দোহা' ভজন ও কীর্ত্তন হাজার বছর ধরে এই পূর্ব্ব-ভারতে বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে বিরাট নদীর মত বয়ে এসেছে। শৈব ও বৌদ্ধ, শাক্ত ও বৈষ্ণব—কত বিচিত্র সাধনধারা বাংলার গানে রূপ নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সেই বিরাট সাধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী, আবার তিনিই সেই বাঙালীর গানকে বিশ্বের সম্পদ করে তুলেছেন। তাই এ বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

তাঁর পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ১৮১৭ সালে জন্মেছেন তখন রামমোহন রায় মফঃস্বলের কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে কায়েমী ভাবে কলিকাতায় বসেছেন ও ধর্ম্মমূলক 'আত্মীয়-সভা' প্রতিষ্ঠা করে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম প্রচারে নেমেছেন। ১৮১৭-১৮২৮ সালে অনেক অধিবেশন, অনেক সঙ্গত হয়েছে তার প্রমাণ পাই রামমোহন ও তাঁর ধর্ম্ম-ভ্রাতাদের রচিত "ব্রহ্মসঙ্গীতে"—সে বিষয়ে অনেক বার আলোচনা করেছি—'সঙ্গীতে উপাসনা" উপলক্ষ্যে। ২৮শে আগষ্ট ১৮২৮ সালে (১৭৫০ শক, ৬ই ভাদ্র) ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিন রামমোহন উপাসনার সঙ্গে দু'টি সংস্কৃত ('শাশ্বতমভয়মশোকং' এবং 'বিগতবিশেষম্') এবং একটি বাংলা স্বরচিত গান "ভাব সেই একে, জলে-স্থলে-শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে" (ইমনকল্যাণ—তেওট) গাইয়েছিলেন। সেকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্তের সঙ্গে রামমোহনের সহযোগ ছিল এবং উচ্চাঙ্গের মার্গসঙ্গীত রীতি অনুসরণে, বাগেশ্রী—আড়াঠেকা তালে—রচনা করে রামমোহন বিলাত প্রবাস থেকে তাঁর প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীতটি চিঠিতে পাঠান তাঁর পুত্রকে (১৮৩৩) মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে :

"কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায়-তথায় থাকি।
তোমার রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি।"

রামমোহনের বন্ধু ও সহকর্ম্মী দ্বারকানাথ ঠাকুর সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতকুশল ছিলেন। তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ দেখি তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার পর আদি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার জন্য ১৮৪৫এ (২৮ বছর বয়সে) মহানির্ব্বাণতন্ত্র থেকে 'নমস্তে সতে তে জগৎ কারণায়' স্তোত্রটিতে নূতন আকার ও সুর দিয়েছেন। আবার ১৮৪৯ সালে মাঘোৎসবের জন্য 'পরিপূর্ণমানন্দম্' গানটি (দেশ—তেওট) নিজে রচনা করে গাইয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গতে ও উপাসনায় যোগ দিতেন অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বর গুপ্ত ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্যগণ। ১৮৫৭তে হিমালয় বাস কালে দেবেন্দ্রনাথ গভীর রাত্রে "যোগী জাগে" (কেদারা—চৌতাল) গানটি তন্ময় হয়ে গাইতেন। তিনি মূল ফার্সী ভাষায় মহাকবি হাফেজের "দিভান্" সুফী-গীত গাইতেন, তার উদ্ধৃতি পাই দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে। ১৮৫৮-১৮৬৮ এই দশ বছর ব্রাহ্মসমাজে যেন উপাসনা-সঙ্গীতের সুরধুনী বয়েছিল—ভাবের সঙ্গে সুরের বন্যা ছুটেছিল। তার অনেক গানই আমরা ভুলে গেছি তবু তার স্পষ্ট পরিচয় আছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মধ্যে। সুর তাল মান সমেত এই সব গানগুলি উদ্ধার করে আবার ছাপান উচিত। ভক্ত কেশবচন্দ্র সেন—যাঁকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপাধি দেন "ব্রহ্মানন্দ"—তাঁর প্রেরণায় অদ্বৈতবংশজ সাধক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় গায়ক চিরঞ্জীব শর্ম্মা প্রভৃতি ভক্ত মনীষিগণ বহু গান, অনেক কীর্ত্তনাঙ্গের পদ রচনা করে পথে পথে, গ্রামে গ্রামে প্রচার করেছিলেন। কেশব যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা (২৪ জানুয়ারী ১৮৬৮) করেন তখন থেকে বহু উচ্চাঙ্গের কীর্ত্তন-ভজনাদি রচিত হয়েছে। ১৮৭৮ সালে সাধারণ সমাজ প্রতিষ্ঠার পর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ভক্তগণ বহু ধর্ম্মসঙ্গীত রচনা করে বাংলার সাধন-ধারাকে পুষ্ট করেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান সমাজ থেকে প্রকাশিত "ব্রহ্মসংগীতের" বিভিন্ন সংস্করণে রবীন্দ্র-পূর্ব্ব ও রবীন্দ্রযুগের অনেক গান সংরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু কাল ও যুগ অনুসারে তাদের বিচার করা আশু প্রয়োজন, সেই দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে "ধর্ম্মসংগীতে রবীন্দ্রনাথ" উপলক্ষ্য করে এ প্রবন্ধে হাত দিয়েছি।

তাঁর নিজের কথা দিয়েই আলোচনা সুরু করা যাক :—"কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে, বাল্যকালে গাঁদা ফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম—এ খেলায় অনুকরণের আর আর সমস্ত অঙ্গই একেবারে অর্থহীন ছিল, কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না। এই খেলার ফুল দিয়া সাজানো একটা টেবিলের উপর বসিয়া আমি উচ্চকণ্ঠে—'দেখিলে তোমার অতুল প্রেম আননে' গান গাহিতেছি বেশ মনে পড়ে।"

এর পরের পংক্তি : 'কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে।' রবীন্দ্রনাথের "গণ-দাদা"—গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—এই ব্রহ্মসংগীতটি কবে রচনা করেছেন জানি না। কিন্তু শিশু রবি সেই ব্রহ্মসংগীতটি (বাহার—একতালা) নিখুঁত ভাবে গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিশু গায়ক রবীন্দ্রনাথ আরও কিছু তথ্য আমাদের দিয়ে গেছেন : "গান সম্বন্ধে তিনি প্রিয়শিষ্য ছিলেন তার পিতৃসখা শ্রীকণ্ঠ সিংহের এবং তাঁরই দেওয়া হিন্দি থেকে ভাঙা একটি প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসংগীতের কথা বলেছেন :

রবীন্দ্রনাথ

ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ

'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে—ভুল না রে তায়' (আলাইয়া—কাওয়ালী ; তাঁর "জ্যোতিদাদার" রচিত এই গানটি) (শ্রীকণ্ঠ বাবু)! "এই গানটি তিনি পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে আবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন···আসন্ন মৃত্যুর সময়ও—'কি মধুর তব করুণা প্রভো' গানটি গাহিয়া তিনি চির নবীনতা লাভ করেন।"

উপনয়নের পর রবীন্দ্রনাথকে সংগে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ে যাত্রা করেন। পথে বোলপুরে কিছু দিন কাটিয়ে, এলাহাবাদ কানপুর হয়ে পৌঁছলেন অমৃতসরে। সেখানকার বিখ্যাত শিখ মন্দিরেও পিতার সংগে গিয়েছেন এবং তাদের ভজন-গানের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথও যোগ দিতেন সে কথা "জীবন-স্মৃতিতে" পড়ি :—

"যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত, পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন—তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসংগীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত।—চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে—আমি বেহাগে গান গাহিতেছি :—

'তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে
কে সহায় ভব অন্ধকারে'— রচনা—(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন—সেই সন্ধ্যেবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে" (গগনেন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রখানি দ্রষ্টব্য)।

রবীন্দ্রসংগীতের ইতিহাসে কত বড় বড় ফাঁক ভরাতে হবে তার সুস্পষ্ট ঈঙ্গিত তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'র মধ্যেই পেলাম। তাঁর উপনয়নের যুগে অর্থাৎ দশ-বারো বছরের রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাবা ও দাদাদের ধর্ম্মসংগীতই গেয়েছেন। সতেরো বছরের কিশোর রবীন্দ্রনাথ হয়ত ধর্ম্মসংগীত রচনা করেননি, কিন্তু বাঙালীর গান যে প্রধানত ধর্ম্মপ্রাণ তা সে বয়সেই তিনি বুঝেছিলেন। তাই ১৭।১৮ বছর বয়সে যখন বিলাত যাত্রা করছেন সে কালেরই তাঁর দু'টি গান আজ মনে পড়ে: (১) "তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ" এবং (২) "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।" যদি ১৭৭৭-৭৮ সালে এ দু'টি লেখা হয়ে থাকে তা'হলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচিত দেশমাতৃকার স্তব এবং প্রথম ব্রহ্মসংগীত তাঁর ১৬-১৭ বছরের মধ্যেই পেলাম। সেই তরুণ সুরকার কুড়ি বছর বয়সে "বাল্মীকি-প্রতিভার" ভিতর রামপ্রসাদী সুরে, শ্যামা-সংগীতের ছাঁদে কত গান রচনা করেছেন এবং ১৮৯১ সালে ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে কত গভীর অধ্যাত্ম-সংগীত রচনা করে গেছেন—"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে" গানটি তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

"এবারে মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরী করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে একটি—

পদরত্নাবলী।

অর্থাৎ

মহাজন পদাবলীর ... কবিতা

... সংগ্রহ।

...ন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

...শচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

...সুরেশচন্দ্র মজুমদার দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা

...দি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

...কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত।

... নং ... চিৎপুর রোড হইতে প্রকাশিত।

বৈশাখ ১২৯২।

মূল্য এক টাকা।
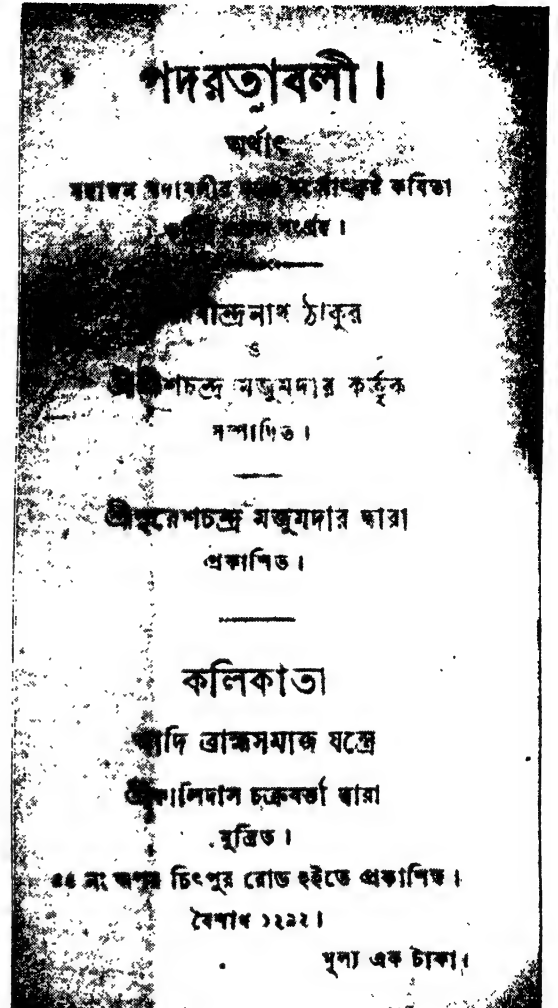
বৈষ্ণব পদাবলীগুলির অধিকাংশ ভুল-ভ্রান্তি ও চয়ন-দোষে দুষ্ট হ'তে দেখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহায়তায় "পদরত্নাবলী" সম্পাদনা করেন বৈশাখ, ১২৯২ সালে। 'পদরত্নাবলী'র প্রচ্ছদপট মুদ্রিত হ'ল।

'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে।'

গান গাওয়া শেষ হইল তখন তিনি (দেবেন্দ্রনাথ) বলিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত তবে কবিকে ত তারা পুরস্কার দিত, রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ শত টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।" ভাবের গভীরতা ও ধর্ম্মবোধের নিবিড় অনুভূতির সংগে রবীন্দ্রনাথের তাল, মান ও সুর যুগে যুগে কি ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, সে আলোচনা এখনও ভাল করে সুরু হয়নি। তবু তাঁর মুখে অনেক পুরনো গান শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল বলেই, এ আলোচনা করতে এগিয়ে এসেছি।

'গীত-বিতানে' কবিগুরুর পূজা-শীর্ষক গানগুলি পত্রাঙ্ক ১ থেকে ২৪৩এর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে, কিন্তু তার ধারাবাহিকতা 'গীত-বিতানে' পাই না। ২০০ পাতার মধ্যে তিনি সাজিয়ে গেছেন ১৪৪টি গান, তার উপর আরও ১১১ যোগ করে মোট ২৫৫টি ধর্ম্মসংগীত 'গীত-বিতানে' রবীন্দ্রনাথ সাজিয়েছেন। কিন্তু গীতবিতানের বিষয়ানুক্রম ছেড়ে গ্রন্থানুক্রমে তাঁর গানগুলি সাজাবারও একটি তাৎপর্য্য আছে সেই কথাই আজ রবীন্দ্র-ভক্তদের স্মরণ করাতে চাই; এবং তাঁদের সংগে ফিরে যেতে চাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীত-সংগ্রহ ১৮৮৫ সালে ছাপা (১২৯২—বৈশাখ) "রবিচ্ছায়া" গ্রন্থে। কবিবন্ধু যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র প্রকাশিত এই বইখানিতে দেখি ১১৬টি "কাব্য ও প্রেম-সংগীতে"র সংগে, সাতটি "জাতীয় সংগীত" ও ৭৪ + ৪, মোট ৭৮টি "ব্রহ্মসংগীত"—রবীন্দ্রনাথ তেইশ বছর বয়সেই রচনা করেছেন। তার মধ্যে প্রথম ছাপা হয়েছে "তাঁহারে আরতি করে চন্দ্রতপন" (সারং —চৌতালা)। এই গানটি এখনও উপাসনার সংগে গীত হলে প্রাণে অপূর্ব্ব ঝঙ্কার সৃষ্টি করে। ১৮৮১ সালে বিলাত থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ যখন 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' রচনা করে সংগীতে সৃজন-প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছিলেন সেটির মধ্যে আকস্মিক বা ঐন্দ্রজালিক রহস্য কিছু ছিল না। অবশ্য রহস্য করে তিনি সর্ব্বদাই বলতেন যে, ভালো করে গান শেখা তাঁর হয়ই নি। কিন্তু তাঁর বিদ্যা শিক্ষার বেলায় সেকালের লোকেরা তাঁকে "অশিক্ষিত" বলে যেমন ধরে নিয়েছিল—সংগীত শিক্ষায় পাছে সেই ভুল আমরা করে বসি, তাই জনসাধারণকে সাবধান করাতে চাই কতকগুলি তথ্য নির্দ্দেশ করে। তাঁর জন্মাবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখি ১৮৬৬ সালে রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা) প্রমুখ সংগীত-রসিকদের আনুকূল্যে কলিকাতায় বড় ওস্তাদদের একটি সম্মিলন হয় এবং তার ফলে ১৮৭১ সালে সৌরীন্দ্রমোহনের প্রধান ওস্তাদ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি ১৮৫৮ সাল থেকেই দেশী যন্ত্রে ঐক্যতান সংগতের জন্য গৎ-এর স্বরলিপি দু'খানি প্রকাশ করেন (১৮৬৭-১৮৬৮)। সেই সময়ে আবার কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় "বঙ্গৈকতান"—বিলাতী স্বরলিপিতে প্রকাশ করেন এবং ১৮৮৪ সালে তাঁর "গীতসূত্রসার" গ্রন্থে তানসেন প্রভৃতি বড় বড় ওস্তাদদের ধ্রুপদ ও খেয়াল বিলাতী staff notationএ লিপিবদ্ধ করেছেন।

বিষ্ণুপুর সেকালে ওস্তাদদের আড়ৎ ছিল। সেখানকার বড় ওস্তাদ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ অনেকেই জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ীর গুণী ওস্তাদরূপে বহু কাল সম্বর্দ্ধনা পেয়ে এসেছেন। ক্ষেত্রমোহন ও তাঁর শিষ্যেরা ছিলেন পাথুরিয়াঘাটায় এবং যদু ভট্ট, রাধিকা গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি জোড়াসাঁকো ও আদি ব্রাহ্মসমাজের সংগীত বিভাগে বহু কাল সাহচর্য্য করেছেন। অবশ্য আদি সমাজের আদি গায়ক ছিলেন বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী। তিনি রামমোহনের যুগ থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্য্যন্ত সক্রিয় ভাবে বেঁচেছিলেন। ১৮৭৫ সালে আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে একটি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় বিষ্ণু চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক সংগীত-শিক্ষক এবং আদি সমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক। তাঁর কাছেই রবীন্দ্রনাথ শৈশবে মার্গ-সংগীত শিক্ষা করেন। যৌবনে রবীন্দ্রনাথ পিতার আদেশে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকতা যখন গ্রহণ করেন, প্রায় সেই সময় ১২৮৯ সালে বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী অবসর গ্রহণ করেন। বিষ্ণু চক্রবর্ত্তীর ব্রহ্মসংগীত শুনে সেকালের বহু ধর্ম্মপিপাসু মানুষ অশ্রুবর্ষণ করতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বাংলা ছড়ার ভিতর দিয়ে সুর, তাল, মাত্রা কেমন করে শিখিয়েছিলেন তা আজ আমাদের জানবার উপায় নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁর দান স্বীকার করে গেছেন এবং অপূর্ব্ব গুরুদক্ষিণা দিয়েছেন নিজে ছোট ছেলেমেয়েদের গান শেখাবার অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করে।

বিষ্ণুর পরে যদু ভট্ট যখন তাঁদের বাড়ীতে এসেছেন, তাঁর মনীষাও রবীন্দ্রনাথ প্রচার করে গেছেন :—"ছেলেবেলায় আমি এক জন বাঙালী গুণীকে দেখেছিলাম : গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজমর্য্যাদায় ছিল, কাষ্ঠের দেউড়ীতে ভোজপুরী দরোয়ানের মত তালঠোকাঠুকি করত না।" সেকালের রচিত ব্রহ্মসংগীত রচনায় যদু ভট্টের স্বরচিত হিন্দি গানকে রবীন্দ্রনাথ একটি অপূর্ব্ব ব্রহ্মসংগীতে রূপান্তরিত করেছিলেন :—

"আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে।"

এই গানটি মৃদঙ্গের সংগতে যাঁরা শুনেছেন তাঁরা বুঝবেন রবীন্দ্রনাথের বড়হংসসারঙ—চৌতালে রচিত নিম্নলিখিত ব্রহ্মসংগীত রচনার রহস্য :

"তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন
দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব শরণ
তাঁর জগত মন্দিরে।"

বাইশ-তেইশ বছরে রবীন্দ্রনাথ যখন সুরকার বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন এবং তাঁর প্রিয়বন্ধু যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র যখন "রবিচ্ছায়া" ছেপেছেন, তা'র মধ্যে দেখছি,—হয়ত তাঁর প্রথম রচিত ব্রহ্মসংগীত—"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা" গানটি রয়েছে। *

বিবাহ-উৎসবে রচিত তাঁর গান আজও ব্রহ্মোপাসনায় গীত হয়—"দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি" (সাহানা—ঝাঁপতাল)। আবার শেষ বিদায়ের বহু মর্ম্মস্পর্শী গানও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"যাও রে অনন্তধামে মোহমায়া পাশরি" (প্রভাতী—ঝাঁপতাল)।

---

* বন্ধুবর দীপেন্দ্রনাথ ভঞ্জ র্যাঁর পিতামহ দেবেন্দ্রনাথ ভঞ্জের 'বাল্মীকি লাইব্রেরী'র দুষ্প্রাপ্য বইগুলি আমায় পড়তে দিয়ে প্রবন্ধ-রচনায় সাহায্য করেছেন, সে জন্য ধন্যবাদ জানাই।

ভাব ও ভক্তির সংগে রাগিণীর কারুণ্য এমনি ভাবে কবি মিলিয়েছেন যে, আজ ৭০ বছর পরেও এই সব ধর্ম্মসংগীত সুখে-দুঃখে আমাদের মনকে শক্তি ও নির্ভয় দেয়।

যদু ভট্টের পর রাধিকা গোস্বামী মহাশয় তাঁদের বাড়ীতে এসে বহু কাল ছিলেন এবং তাঁর 'ঘরানা'র কত সুর রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসংগীতে আছে তার সন্ধান করতে হবে।

ধ্রুপদ ছাড়া উচ্চাঙ্গ খেয়ালের সুর সেকালের ব্রহ্মসংগীতে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা যখন তাঁর কাছে গিয়েছি তখন সে সব গান গাইবার কণ্ঠ প্রায় নীরব হয়ে এসেছে। তবু আমার সৌভাগ্য হয়েছিল দু'-এক বার কবির মহড়ায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভগিনী স্বর্গীয়া শ্রীমতী অমলা দাশের অপূর্ব্ব আলাপ শোনবার: "কে বসিলে আজি হৃদাসনে, ভুবনেশ্বর প্রভু!" (সিন্ধু—আড়াঠেকা।

সেই যুগেরই সিন্ধু—মধ্যমানে রচিত আর একটি ব্রহ্মসংগীত অমলা দেবীর মুখে শুনেছি—"এ পরবাসে রবে কে হায়!"

তান-কর্ত্তবের সংগে এই গানগুলির আলাপ অমলা দেবীর কিন্নরী-নিন্দিত কণ্ঠে শুনে বুঝেছিলাম উচ্চাঙ্গ সুরের কত বড় "জহুরী" ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ঠিক ১৮৮১ সাল থেকে ১৯০১ সাল অর্থাৎ কুড়ি বছরের যুবক যখন প্রায় চল্লিশ বছরের প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন—তার মধ্যে, অন্য গানের সঙ্গে ধর্ম্মসংগীতের কত বড় বিকাশ তিনি দেখিয়েছেন সে বিষয়ে বিচার হওয়া দরকার। ইতিমধ্যে তিনি "গানের বহি" একবার ছেপেছেন এবং "চিত্রা" ও "চৈতালী" পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব কাব্য-গ্রন্থনের সংগে ১৩০৩ সালে (১৮৯৭) আর একবার তাঁর প্রথম প্রকাশিত "কাব্য গ্রন্থাবলীর" মধ্যে অনেকগুলি গান—তথা ধর্ম্মসংগীত ছেপেছেন। প্রথম গানটি কীর্ত্তনের সুরে—

"বড় বেদনার মত বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে।"

এখনও অনেকের প্রাণকে নাড়া দেয়—পূরবী রাগিণীতে—

"বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।"

শান্তিনিকেতনের "দেহলীর" ছোট ছাদটিতে বসে গুন্‌গুন্ করে রবীন্দ্রনাথ এ গান গাইতেন শুনেছি।

ভোরের উপাসনায় শান্তিনিকেতনের মন্দিরে বসে. বিভোর হয়ে শুনেছি কবি একাই তন্ময় হয়ে ভৈঁরো রাগে আলাপ করছেন:—"তুমি আপনি জাগাও মোরে।"

তার পরে জমাট সমবেত সংগীত—দীনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে—

"প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুম গন্ধে
বিহঙ্গম গীতছন্দে তোমার আভাস পাই"—
(গুর্জ্জরী টোড়ি—চৌতাল)

সেকালে সমবেত উপাসনার জন্য রচিত একটি গান আজও সর্ব্বত্র শুনি— "পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে।"

আদি সমাজের এক সম্মিলিত উৎসবে (১৮৮৫ কংগ্রেস-জন্মের যুগে) তিনি রচনা করেছিলেন "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।" সরল রামপ্রসাদী সুরের সেই গান ১৯০৫ সালে—স্বদেশী যুগে আমরা পথে পথে গেয়ে বেড়িয়েছি। এই যুগ থেকেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যেন মোড় ফিরে গেল। বাংলায় নিজস্ব বাউল, ভাটিয়ালী ও কীর্ত্তন সুরের প্রভাব এখন থেকে রবীন্দ্র-সংগীতের যেন নূতন প্রেরণা জুগিয়েছিল। ১৯০১-১১ সালের মধ্যে স্বদেশী সুরের বন্যায় রবীন্দ্রনাথকে যখন আমরা পেয়েছি তখন স্বদেশের মধ্যেই তিনি বিশ্বদেবকে পূজা করেছেন। সে যুগে অনেকের জন্য গান যেমন লিখেছেন তেমনি মাঝে মাঝে এমন সুরে আলাপ করেছেন যা একেবারে তাঁর নিজস্ব এবং যে সুর শুধু একাই গাওয়া যায়। সেকালের গায়কদের সংগে সংগে গানগুলিও যেন লুপ্ত হবার সম্ভাবনা দেখছি। তেমনি দু'টি গান—যা তাঁর কাছে গুন্‌গুন্ করে শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল,—সে দু'টি আজ স্মরণ করিয়ে দিই।

"অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ" (ধুন—ঠুংরী)
আর একটি কীর্ত্তন—"ওহে জীবনবল্লভ—ওহে সাধন দুর্লভ।"

১৮৯১ সালে (১২৯৮, ৭ই পৌষ) যে মন্দির প্রতিষ্ঠা হল সেটি সাজাবার ভার মহর্ষি দেন তরুণ শিল্পী—নাতি অবনীন্দ্রনাথের উপর। তাঁকে আজ ৬০ পূর্ত্তি বর্ষে শান্তিনিকেতন ও সারা দেশ হারাল।

১৯০০-১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ পিতার জমিদারী পরিদর্শন ছেড়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে স্থায়ী ভাবে বসলেন (১৯০১); ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা হ'ল—দারুণ অর্থাভাব। রথীন্দ্র-জননী মৃণালিনী দেবী, উপযুক্ত সহধর্ম্মিণীর মত নিজের গায়ের গহনা দিয়েছেন বিদ্যালয়ের দায় মেটাতে—হঠাৎ (৭ই অঘ্রাণে) তিনি চোখ বুঝলেন (১৯০২); পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথও স্বর্গারোহণ করলেন (১৯০৫)। মৃত্যু যেন কবির বক্ষে বাসা বেঁধেছে; মাতৃহারা কন্যা রেণুকা (১৯০৫) ও প্রাণোপম শিশুপুত্র শমীন্দ্র (১৯০৬) অকালে চলে গেল। পিতাকে উৎসর্গ করেছেন "নৈবেদ্য" পত্নীকে দিয়েছেন "স্মরণে" কবিতাগুলি। আর সন্তানদের মৃত্যুর অসহনীয় বেদনা চিরন্তন রূপ নিল অমলের মৃত্যু-চিত্রে—অমর-নাটক "ডাকঘরে"। তাই কি অভিনয়ের সময় রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ দিয়েছিলেন—পর্দ্দার আড়াল থেকে গাইতে এ যুগের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মসঙ্গীত—"জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"

৪০ বছরের প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯১১ পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করবেন, তখন শান্তিনিকেতনে গিয়ে প্রথম কাছে থেকে যখন তাঁকে দেখলাম, মনে হল, বৈদিক যুগের প্রবীণ ঋষি-কবি। মরণের সিংহদ্বার পেরিয়ে এসেছেন বলেই কি সব চুল—শাদা? চোখে-মুখে লোকাতীত চৈতন্যের দীপ্তি? মনে পড়ে গেল, নৈবেদ্যের যুগ থেকে আমরা এসেছি গীতাঞ্জলীর যুগে; সংগীতের অর্ঘ্য নিয়ে পূজায় মেতেছেন সেই রবীন্দ্রনাথ কে পেয়েছি—হয়ত সেই পাঁচ বছরের শিশুরূপে, যিনি খেলার সাথীদের নিয়ে তন্ময় হয়ে ব্রহ্মসংগীত গাইছেন।

গীতাঞ্জলী-যুগ থেকে ধর্ম্মসংগীতে রবীন্দ্রনাথের নব নব দানের ইতিহাস বারান্তরে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা রইল। *

---

* শান্তিনিকেতনের ষষ্টি পূর্ত্তি উৎসব স্মরণে।

আত্ম-স্মৃতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

প্রথম তরঙ্গ

পরিচয়

১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ৯ ভাদ্র তারিখে আমার পঞ্চাশত্তম বার্ষিক জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সংক্ষেপে আমার জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন; তাহা আমার সেই জীবনের কাহিনী যাহা প্রত্যক্ষ-সকলের-গোচর; সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া হাকিমের সম্মুখে হলপ করিয়া তাহা স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে বলা যাইতে পারে। ইহার বাহিরে আমার আর একটা জীবন আছে, যাহা শুধু অন্তের অগোচর নয়, আমারও পরিপূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে নহে—অবাঙ্‌মনসগোচর; সৃষ্টি-রহস্য-সমুদ্রের উপরিভাগে যাহা মাঝে মাঝে কমলের মত শোভমান হইয়া সুরভি বিস্তার করিয়া অতলে তলাইয়া যায়—যাহার প্রকাশ শুধু অনুভব করা যায়, বাস্তবে ধরা-ছোঁয়া যায় না। এই দ্বিধাবিভক্ত জীবন শুধু আমারই একান্ত নহে, প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই ইহা সত্য নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান ও সাধনা করিলে সকলেই স্ব-স্ব-অগোচর জীবনকে অন্তত অংশতও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। কিন্তু তাহার অবসর সংসারবদ্ধ জীবের পক্ষে কদাচিৎ ঘটে। ঝড়ের তাড়নায় শুষ্ক পাতার মত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ নিরন্তর অজ্ঞাত ও অনিশ্চিতের পশ্চাতে ধাবমান, পরিণামে কোথায় কোন্ আবর্জনাস্তূপের মধ্যে তাহার বিলুপ্তি—কে তাহার সন্ধান রাখে? অতি গূঢ়, গোপন, রহস্যময় এই জীবনকে বাঙ্ময় প্রকাশ দিতে পারেন শুধু কবিরা। তাঁহারা ভাগ্যবান, বিশেষকে সাধারণ করিয়া তুলিবার অধিকারী তাঁহারা। তাঁহারাই প্রমাণ করিয়া দেন—সহৃদয়-হৃদয়-বেদ্য কাব্যই যথার্থ মানুষের আত্মকথা, সন তারিখের ইতিহাস—অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য, রসিকজনের কাছে অগ্রাহ্য। স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ প্রাণতোষ অনুরোধ করিতেছেন আমার আত্মকথা লিপিবদ্ধ করিতে। তাহাতে আমি রাজি নহি। আমার জীবন যদি কোন দিন সম্যক্ ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করে তখন তাহার কাহিনী রচনা করিবার ভার সমসাময়িক বা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের—আমার নহে। যে অগোচর জীবনের কথা আগে বলিলাম তাহা কেবল আমি একাই লিখিতে পারি। কিন্তু একটানা সে কাহিনী ইনাইয়া-বিনাইয়া বলিতে পারি তেমন সাধ্য এবং অবসর আপাতত আমার নাই। সৌভাগ্যক্রমে কাব্যসরস্বতী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছেন, ছন্দের বন্ধনে অগোচর ও অধরা ক্ষণে ক্ষণে বাঁধা পড়িয়াছেন—মহাজীবন-জলতরঙ্গে আমার নগণ্য জীবনও ঢেউয়ের শীর্ষে উঠিয়া উদ্ভাসিত হইয়াছে। সেই তরঙ্গমালার কথা সকলকে শুনাইবার উপকরণ আমার আছে আত্মকথার বদলে জীবন-"জলতরঙ্গ"কথা লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি; বসিয়াছি বলা ঠিক হইবে না, জীবনের ঢেউ গনিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছি মহা-জীবনজলধি ব্যাপিয়া ঢেউয়ের উপর ঢেউ, তরঙ্গের পর তরঙ্গ, কোনটি উত্তাল হইয়া গগন স্পর্শ করিবার স্পর্ধা করিতেছে, কোনটি নীরবে নিভৃতে ভাল করিয়া মাথা তুলিবার পূর্বেই ভাঙিয়া গুঁড়া গুঁড়া হইয়া যাইতেছে, বায়ুপ্রঘাতে উচ্ছ্রিত ফেনপুঞ্জে কোনটি আত্মহারা, কোনটি মুহুর্মুহু বীচিভঙ্গে বর্ণাঢ্য প্রতিবিম্বমালায় সমুজ্জ্বল। এই নির্বিশেষ তরঙ্গমালার মধ্যে একটি বিশেষকে চিহ্নিত করিবার জন্য কিছু লৌকিক প্রত্যক্ষ পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। প্রথম তরঙ্গে সেই পরিচয়-কাহিনীই বলিব।

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরান গ্রামে দাসগোষ্ঠীর আদি নিবাস। বহরান উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থপ্রধান গ্রাম ছিল। আমরাও ওই সমাজভুক্ত। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে একাধিক প্রসিদ্ধ পদকর্তা ও কবি ছিলেন। আমাদের কোনও পূর্বপুরুষ বিবাহসূত্রে বহরান ত্যাগ করিয়া বীরভূম জেলার বোলপুর ষ্টেশনের সন্নিকটবর্তী রাইপুর গ্রামে বসবাস করেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ লর্ড সিন্‌হা অব রাইপুর হইয়া এই গ্রামকে প্রসিদ্ধি দান করিয়াছেন। দাসেরা সেই রাইপুরের অধিবাসী। আমার পিতা হরেন্দ্রলাল দাস সিউড়ি সরকারী স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া বর্ধমান রাজ কলেজে এফ-এ পড়িতে পড়িতে কানুনগো হিসাবে সরকারী চাকুরিতে প্রবিষ্ট হন, পরে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুর হইতে পার্টিশন ডেপুটি কলেক্টররূপে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি পাবনায় সাবডেপুটি কলেক্টর হইয়াছিলেন। আমার মাতুলালয়

['আত্ম-স্মৃতি' লিখতে অনুরোধ করায় শ্রদ্ধেয় সজনীকান্ত আপত্তি ক'রেছিলেন। যে-লেখায় কেবল 'পরিচয়' দেওয়ায় অন্যান্য কত শত পরিচয়ের প্রয়োজন হয়, সে-লেখা তিন পৃষ্ঠায় শেষ হয় না। লেখাটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হ'লে বাঙলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও সাহিত্যিকমণ্ডলীদের বিষয়ে কত অজ্ঞাত অতীত জানা যাবে—যে জন্য বহুমুখী-প্রতিভা সজনীকান্তকে "আত্ম-স্মৃতি" লেখার ক্ষান্ত করা হ'ল না।—স]

বর্ধমান জেলার মানকর ষ্টেশনের অনতিদূরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত বুদ্বুদ থানার দক্ষিণে বেতালবন গ্রাম। সেখানকার সুবিখ্যাত দত্ত-পরিবারের কন্যা আমার মাতা তুঙ্গলতা। তাঁহার ন'দাদা সুর্বলাল দত্ত বাঁকুড়া শহরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা নটবর দত্ত মানকরের নাম-করা ডাক্তার, ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের একজন বন্ধু ও সহপাঠী। ছয় ভাই দুই বোনের মধ্যে এখন একমাত্র তিনিই জীবিত আছেন। আমার পিতৃকুল ঘোরতর শাক্ত এবং মাতৃকুল ঘোরতর বৈষ্ণব। মাতাঠাকুরাণী সামান্য যেটুকু লেখাপড়া জানিতেন তাহার সাহায্যে তাঁহাকে আমাদের বাল্যকালে গোবিন্দ-লীলামৃত চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি পড়িতে দেখিতাম। প্রত্যহ ভোরে তাঁহার সুর-করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম আবৃত্তিতে আমাদের ঘুম ভাঙিত।

বেতালবনে মাতুলালয়ে ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৯ই ভাদ্র শনিবার সন্ধ্যায় আমার জন্ম হয়, ইংরেজী ১৯০০, ২৫এ আগষ্ট। কুম্ভলগ্নে জন্ম, সিংহরাশি। আমার জন্মের ঠিক এক বৎসর পূর্বে পিতামহ বৈদ্যনাথ দেহরক্ষা করেন, তিনিই আমার দেহে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছেন পিতার বৃদ্ধা আত্মীয়ারা এইরূপ উল্লেখ করিতেন। আমার পূর্বে তিন সহোদর এবং এক ভগিনী, পরে দুই ভগিনী, এক সহোদর। নয় ভাইবোনের মধ্যে এখন তিন ভাই দুই বোন বর্তমান আছি। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই বাঁকুড়া শহরে মাতার এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় পিতার মৃত্যু হয়। আমার সর্বজ্যেষ্ঠ অমরেন্দ্রনাথ (মৃত্যু: কলিকাতা, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪১) যৌবনে স্বদেশী আমলে কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

চার পাঁচ বৎসর বয়সে যখন জ্ঞানের উন্মেষ হয় তখন আমরা উত্তর-বঙ্গের মালদহ শহরে (ইংরেজবাজার) কালীতলা নামক পাড়ার বাসিন্দা। তৎপূর্বে স্বগ্রামস্থ লর্ড সিংহের পিতা সিতিকণ্ঠ সিংহের নামে স্থাপিত বিদ্যালয়ে আমার হাতেখড়ি হয়। কিন্তু জ্ঞানার্জনের পথে আমার প্রথম স্মরণীয় গুরু স্বনামধন্য অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকার—তাঁহার পিতা তখন মালদহে আমাদেরই প্রতিবেশী ছিলেন। বিনয়কুমার নিজের পড়াশোনার অবকাশে আমাকে শিক্ষাদান করিতেন। স্বদেশী আন্দোলন তখন বঙ্গবিভাগকে কেন্দ্র করিয়া সবে শুরু হইয়াছে। বিপিন ঘোষ ও রাধেশ শেঠের নেতৃত্বে বিনয়কুমারের দল সমগ্র মালদহ শহরকে জাতীয়তা-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। মাত্র পাঁচ বছরের শিশু হইলেও আমার মনে তখন হইতেই স্বদেশভক্তির রঙ ধরিয়াছিল। "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক" গানের সঙ্গে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে দল বাঁধিয়া নগর পরিভ্রমণ করার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আর মনে আছে গম্ভীরা গান—সামান্য খুঁটিনাটি দৈনন্দিন ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গবিভাগ ও বিদেশীবর্জন প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয় লইয়া ফাল্গুন-চৈত্র মাসে শিব-মহাদেবকে উপলক্ষ্য করিয়া সেই গম্ভীরা গানের মহিমা স্মরণ করিলে আজিও এক অনির্বচনীয় রসে মন ভরিয়া যায়। জাতীয় সাহিত্যের সহিত আমার প্রথম পরিচয় এই গম্ভীরা গানের সাহায্যেই ঘটে। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে মালদহে সসম্মানে নিমন্ত্রিত হইয়া আমারই নামে বাঁধা গম্ভীরা-গান শুনিয়াও চিত্তে সে অনির্বচনীয়তার সঞ্চার হয় নাই। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইলেও "হায় রে সেকাল" বলিয়া আক্ষেপ যে রক্তে-মাংসে গড়া মানুষকে করিতেই হয় ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

আরম্ভ যেখানে যাহার কাছেই হউক, দীনবন্ধু চৌধুরী বা প্রসিদ্ধ দীনু পণ্ডিতের পাঠশালার শিক্ষা আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া আছে। সার্থক গুরুমহাশয় হিসাবে তাঁহার তুলনা এ যুগে তো মিলেই না, সে যুগেও মিলিত না। মালদহের বর্তমান প্রবীণ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের অধিকাংশেরই শিক্ষার পত্তন এই দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায়। দীনু পণ্ডিতের কাছে কি শিখিয়াছিলাম—সরাসরি এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া আজ কঠিন। আজ আমার সমগ্র জীবনের আলোকে হিসাব খতাইয়া এইটুকু মাত্র বলিতে পারি, তিনি আমাকে বিশেষ যত্নের সহিত অঙ্ক বা গণিত-শাস্ত্র শিখাইয়াছিলেন—পরবর্তী জীবনে যাহা নিয়মানুবর্তিতা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে রূপান্তরিত হইয়াছে। পাঠশালা এবং স্কুল-জীবনে লেখা-পড়ায় আমার কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। এই পাঠশালা হইতে নিম্ন-প্রাইমারি পরীক্ষা দিয়া আমি সমগ্র জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলাম। অতঃপর স্থানীয় সরকারী জিলা স্কুলে ক্লাস ফোর এবং ক্লাস ফাইভের হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষা পর্যন্ত পড়িয়া পিতা পাবনায় ১৯১২ সালে বদলি হওয়ায় ন'মামার কর্মস্থল বাঁকুড়ায় নীত হই। সেখানে ছয় মাস কাল বাড়ীতেই পড়াশোনা করিয়া ১৯১৩ সালের গোড়ায় পাবনা জিলা স্কুলের ক্লাস সিক্সে ভর্তি হই। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ক্লাস সেভেনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পড়িয়া বাবার সঙ্গে দিনাজপুরে উপস্থিত হই এবং সেখানে জিলা স্কুলে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হইয়া কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করি। সেখান হইতেই ১৯১৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি লাভ করি।

আমার এই স্কুল-জীবনে স্কুলের শিক্ষা নিতান্ত গৌণ ছিল। নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া অবাধ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ভবিষ্যৎ সাহিত্যিক জীবনের জন্য আমার কিশোর মন ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছিল। কয়েকটি ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীর সঙ্গে আমার মনের ক্রম-পরিণতির ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে। জন্মভূমির শীতে-শীর্ণতোয়া এবং বরষায় দুকূলপ্লাবী অজয়, মালদহের কুলুকুলু-কল-স্রোতা মহানন্দা, বাঁকুড়ার ক্বচিৎ-মুমূর্ষু ক্বচিৎ-ভীষণ দ্বারকেশ্বর এবং তাহার নিত্যসঙ্গিনী বালুমাত্রকপা গন্ধেশ্বরী, পাবনার পরপার-চিহ্ন-হীন সুবিপুলা ভয়ঙ্করী পদ্মা এবং দিনাজপুরের পল্লীবধূর মত শান্ত নিরলঙ্কার নিরহঙ্কার কাঞ্চন—ইহাদেরই খর অথবা ক্ষীণ ধারার সিঞ্চনে আমার মনের কাব্যরসপিপাসা আবাল্য শুধু মিটে নাই, আমার কাব্যজীবনের সহিত তাহারা ওতপ্রোত হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। কুষ্টিয়া হইতে ষ্টীমারে প্রথম পদ্মা পাড়ি দিয়াছিলাম শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রিতে; পরদিন রৌদ্রালোকিত প্রভাতে কুল-ঝাউবনের মাঝে দাঁড়াইয়া পদ্মার যে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম তাহা আজিও আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করিতেছে। পাবনা হইতে দিনাজপুর যখন যাই তখন সবে প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে, সারা-ব্রীজনির্মাণ তখনও শেষ হয় নাই—কি বিপুল আতঙ্ক ও উন্মাদনার মাঝখানে খেয়া-ষ্টীমারের যাত্রী হিসাবে সেদিন যে আবার পদ্মাকে দেখিয়াছিলাম, তাহা মাত্র অনুভবগম্য। এই নদী, তটভূমি ও বালুবেলাগুলি আমার অন্তর্জীবনকে কি ভাবে

প্রভাবান্বিত করিয়াছে পরবর্তী তরঙ্গের জন্য তাহা রাখিয়া আমি আপাতত পরিচয়-কথাই বলিতেছি।

প্রেসিডেন্সী কলেজেই ভর্তি হইয়াছিলাম, কিন্তু দিনাজপুরে থাকিতেই সর্বাঙ্গে রাজনৈতিক কলঙ্কের ছাপ পড়িয়াছিল ; সুতরাং সকল বিপ্লব-বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল রাজধানী কলিকাতায় অধ্যয়ন আমার বারণ হইয়া গেল। পিতা সরকারী চাকুরীজীবী, সুতরাং আদেশ অমান্য করা গেল না। বিপ্লব-বিদ্রোহের ক্ষেত্রে অনগ্রসর বাঁকুড়ার শান্ত-পরিবেশে ওয়েসলিয়ান মিশনারী কলেজে আমাকে ভর্তি করা হইল এবং সংলগ্ন হোষ্টেলে খাস বিলাতী সাহেবদের তত্ত্বাবধানে আমাকে রাখা হইল। এই পরিবর্তনের ধাক্কায় মন উদাসীন হইয়া গেল, ফলে পড়াশোনার পাঠ সম্পূর্ণ শিকায় তুলিয়া রাখিয়া সহপাঠী ও সহবাসী বন্ধুদের মোড়লির কাজ লইলাম। মাট্রিকুলেশন পর্যন্ত অধ্যয়নের ভিত্তি এমনই দৃঢ় ছিল যে, তাহার জোরেই আই-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে বত্রিশতম স্থান অধিকার করিলাম। দুই বৎসর ঠাণ্ডা গারদে থাকিয়া কলিকাতার গরমে আসিবার আর কোনও বাধা ছিল না। সুতরাং ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে স্কটিশ চার্চেস কলেজে বি-এস সি কেমিষ্ট্রী অনার্সের ছাত্ররূপে কলিকাতায় পদার্পণ করিলাম। তোড়জোড়ে একটু দেরি হইয়াছিল সুতরাং সাধারণ হোষ্টেলগুলিতে স্থানাভাব ঘটিল। অগত্যা প্রধানত খৃষ্টীয়ান ছাত্র-অধ্যুষিত মুসলমান বাবুর্চি-বয়সেবিত ডাফ হোষ্টেলেই ডেরা বাঁধিলাম। অতি ভালমানুষ ক্রামজার সাহেব ছিলেন হোষ্টেলের প্রধান রক্ষক, কিন্তু নামেমাত্র ; আসলে আমাদের আহার-বিহারের তত্ত্বাবধান করিতেন একজন দাস সাহেব ; যে কারণেই হউক প্রায়শই আহার্যবস্তুর ত্রুটি ঘটিতে লাগিল। আমার নেতৃত্বে কয়েকজন বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, মামলা উর্ধ্বতন কলেজ কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহারা অখৃষ্টিয়ান নেতাকে ওগিলভি হোষ্টেলে বদলি করিয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন।

আমি ডাফ হোষ্টেলে থাকিতেই কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে স্পেশাল কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকজন যুবকের সহিত তখন আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, তাহাদের সহায়তায় একটি ভলাণ্টিয়ার দল গঠন করিলাম এবং যোগ্যতার সঙ্গে নেতা-সেবা করিয়া কলিকাতার রাজনৈতিক মহলে পরিচিত হইলাম। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে তখনই খুব নিকট সান্নিধ্যে দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল এবং উক্ত কয়দিনের অভিজ্ঞতায় দেশ ও মানুষ সম্পর্কে নূতন জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলাম।

ওগিলভি হোষ্টেলে দেড় বৎসর অতিশয় সুখে অত্যন্ত আমোদে ও আনন্দে ছিলাম। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বি-এস-সি পরীক্ষা দিয়া সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করি। দেড় বৎসরকাল যাহাদের সহিত এই কালে দিনরাত্রি একত্র কাটাইয়াছিলাম, তাহাদের অনেকেই আজ কৃতী পুরুষ। সেই সময় খেলাধূলার মধ্য দিয়া যে অনাবিল চাপল্যে আমরা দিন কাটাইয়াছিলাম তাহা স্মরণে রাখিবার মত। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরেই লেখাপড়ায় আমার যে ঔদাস্য জন্মিয়াছিল, তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছিল, কমে নাই, শুধু প্রাক্-ম্যাট্রিক পাকা ভিতের জোরে বি-এস-সিও পাস করিয়াছিলাম। খেলাধূলা ও সাহিত্যচর্চা লইয়া অধিকাংশ সময় কাটাইতাম, বিজ্ঞানের ছাত্র সুতরাং সাহিত্যও খেলার পর্যায়ভুক্ত ছিল। পরবর্তী কোনও তরঙ্গে আমার সাহিত্যজীবন গঠনে বাঁকুড়া কলেজ-হোষ্টেল ও ওগিলভি হোষ্টেলের স্থান বর্ণন করিতে হইবে, আপাতত এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পত্তনের কাজ নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

বি-এস-সি পাস করিয়া মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার জন্য প্রার্থী দাঁড়াইলাম। ডাক্তার নটবর দত্ত আমার মাতুল, তাঁহার নামে কাজ হইল। আমি নির্বাচিত হইলাম কিন্তু আমার আর এক মামার পুত্র বিভূতিভূষণ দত্ত আই-এস-সি পাস করিয়া প্রার্থী দাঁড়াইয়াছিল, সেও নটবর দত্তের নিকটতর আত্মীয়তার দাবি জানাইয়াছিল। কর্তৃপক্ষ আমাকেই মনোনীত করিয়া তাহার আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। আমি তখন কঠিন আত্মত্যাগ করিয়া নাম প্রত্যাহার করিয়া লইলাম। বিভূতি নির্বাচিত হইল।

ইহার পর আর কলিকাতায় নয়। আমি সুদূর বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়িতে গেলাম। সুবিখ্যাত কিং সাহের তখন সেখানকার অধ্যক্ষ, তাঁহার বাঙালীপ্রীতি সর্বজনবিদিত। ইহার জন্য ইউনিভার্সিটি-প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর সঙ্গে তাঁহার প্রায়শই খিটিমিটি বাধিত। এই কলহের যূপকাষ্ঠে আমিই প্রথম বলি। কলেজ-সংলগ্ন হোষ্টেলগুলিতে মাছ মাংস ডিম রান্না বা খাওয়া নিষেধ ছিল। আজিও সেই ব্যবস্থা আছে কি না জানি না। কিন্তু আমরা, বাঙালী ছেলেরা, তখনই বিদ্রোহ ঘোষণা করিলাম। অনেকগুলি পাঞ্জাবী ও সিন্ধী ছাত্রও আমাদের সহিত যোগ দিল। আমি হইলাম নেতা সুতরাং পণ্ডিত মালব্যজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। আমাকে সমর্থন করিলেন কিং সাহেব, কিন্তু রক্ষা করিতে পারিলেন না। ফলে দুই মাস যাইতে না যাইতেই ইঞ্জিনীয়ারিং-সরস্বতীকে বর্জন করিতে বাধ্য হইলাম। সেকালের সেই কলহের ইতিহাস অতিশয় চমকপ্রদ, বাঙালীবিদ্বেষ তাহার পূর্ব হইতে পশ্চিম ভারতে রূপপরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যাহা হউক, আমি বীরের মতন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে ফিজিক্স (হীট) বিভাগে ভর্তি হইয়া এম-এস-সি পড়িতে লাগিয়া গেলাম। কিন্তু আমার বিজ্ঞান-সরস্বতীর ভাগ্যও তেমন জোরালো ছিল না। রবীন্দ্র-সাহিত্যচর্চা এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীত উপভোগের সঙ্গে কয়েকটি কঠিন রোগীর সেবাই মুখ্য কাজ হইয়া দাঁড়াইল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে এই সময় ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে এবং তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এখানে সেখানে সঙ্কটত্রাণের কাজে বিশেষ উৎসাহী হইয়া পড়ি। দুই বৎসর পরে কলেজের পাঠক্রম যথন সম্পূর্ণ এবং শেষ-পরীক্ষার দাবী যখন প্রবল, ঠিক তখনই 'শনিবারের চিঠি'র আবর্তে পড়িয়া বিজ্ঞান-জগৎ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইলাম, এবং একদা শুভ প্রভাতে অনুভব হইল নৌকাডুবির পর সাহিত্যের বালুচরে পড়িয়া আছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় স্বাভাবিক সমাপ্তিরেখা আর টানা হইল না।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের সেই দিন হইতে সাহিত্য এবং তদনুষঙ্গিক নানা ব্যাপার আমার উপজীবিকা হইয়াছে এবং নানা বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়া আমি বর্তমান পরিণতিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এম-এস-সি পড়িবার সময়েই ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুন—১৩৩০ সালের ৪ঠা আষাঢ় স্বগ্রামনিবাসী ও তখন কলিকাতা-প্রবাসী পশুপতিনাথ চৌধুরীর (মৃত্যু : ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪) জ্যেষ্ঠা কন্যা

শ্রীমতী সুধারাণীর সহিত আমার বিবাহ হয়। তিনি আমার সাহিত্য-জীবনে কতখানি ছায়া বা আলোকপাত করিয়াছেন আমার এতাবৎকালরচিত সাহিত্যের মধ্যে নানা স্থানে তাহা গোপনে বা প্রকাশ্যে বিধৃত হইয়া আছে। যথাকালে সে প্রসঙ্গ আসিবে।

প্রথম পরিচয়তরঙ্গ আর একটি কথা বলিয়াই শেষ করিব—আমার চাকুরী-জীবনের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়-সরস্বতীর সেবায় ইস্তফা দিয়া 'শনিবারের চিঠি'র লেখক হিসাবে যেদিন সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম তখন পৈতৃক মাসহারা বন্ধ হইয়াছে এবং আমি প্রাইভেট টিউশানি করিয়া কলিকাতায় দিন গুজরান করিতেছি। সে আয় এত সামান্য যে মূল্যবিনিময়ে একসঙ্গে আহার ও বাসস্থানের জোগাড় হইত না, কাজেই রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রুফ দেখার বদলে ১° কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—বিশ্বভারতীর আপিসে কিছুকাল থাকিতে হইয়াছিল। 'শনিবারের চিঠি' শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের নিতান্ত শখের কাগজ ছিল। তিনি 'প্রবাসী'র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র এবং তখন 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিউ' কার্যালয় ও প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ। ১১নং আপার সার্কুলার রোডে সেই প্রেস ও আপিস ছিল এবং সেখান হইতেই সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' বাহির হইত। প্রথম সাত সংখ্যা ইহার সহিত আমার সামান্য মাত্র যোগও ছিল না। অষ্টম সংখ্যা হইতে আমি লেখক। এই সুবাদে অত্যল্প-কাল মধ্যে 'প্রবাসী'র প্রুফ-রীডার হিসাবে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলাম, এবং সেখানে প্রায় সাত বৎসরকাল প্রুফ-রীডার, 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিউ' ও 'ওয়েলফেয়ার' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং সর্বশেষে ছাপাখানার ম্যানেজাররূপে কাজ করিয়া ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর তারিখে ইস্তফা দিই। তখন আমার মাসিক বেতন ১১০৲।

'প্রবাসী'র সম্পর্ক ত্যাগ করিবার কিছু দিনের মধ্যেই 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদকীয় "সাময়িক প্রসঙ্গ" লেখার কাজে আমাকে নিযুক্ত করেন। ব্যবস্থা হইল এই কার্য আমি গোপনে করিব। এই চুক্তি মুখোপাধ্যায় মহাশয় ক্ষুণ্ণ করেন নাই। যে কয় মাস তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলাম, সে কয় মাসের স্মৃতি আমার পক্ষে সুখকর। তখন হইতে তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার স্নেহ ও প্রীতিতে কখনও বঞ্চিত হই নাই।

এই 'বসুমতী'র একটু ২৬শে চৈত্র সংখ্যায় "বঙ্কিম-প্রসঙ্গ" লিখিয়াছিলাম। এই লেখাটি "বঙ্গলক্ষ্মী"র স্বনামধন্য সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্নেহদৃষ্টি লাভ করে। তিনি তখন 'উপাসনা' পত্রিকা ছাপাখানা সহ খরিদ করিয়াছেন এবং 'উপাসনা' পত্রিকাটিকে ঢালিয়া সাজিবার মতলব করিতেছেন। উক্ত "বঙ্কিম-প্রসঙ্গে"র অধম লেখককে খুঁজিয়া বাহির করিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। সাক্ষাতের প্রথম দিনেই তিনি আমাকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে 'উপাসনা'র সম্পাদক ও মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। 'উপাসনা'র নাম বদল করিয়া 'বঙ্গশ্রী' রাখি এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নবেম্বর হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় দুই বৎসর দুই মাস কাল ওই কার্য করিয়া শেষে মতান্তরের জন্য ছাড়িয়া দিই।

এইখানেই প্রকৃতপক্ষে আমার চাকুরী-জীবনের সমাপ্তি। ইহার পর শখের কাজ অনেক করিয়াছি, উপ্‌রি দক্ষিণাও মন্দ পাই নাই; কিন্তু পাকাপাকিরূপে চাকুরীর যূপকাষ্ঠে আর বাঁধা পড়ি নাই। একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। ১৯৩১ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে যখন 'প্রবাসী'র কাজ ছাড়ি তখন 'শনিবারের চিঠি'র নবপর্যায় সবে এক মাস সম্পূর্ণ নিজ-দায়িত্বে বাহির করিয়াছি এবং কেবলমাত্র টাইপ খরিদ করিয়া 'চিঠি'র নিজস্ব ছাপাখানাও স্থাপিত হইয়াছে। পরবর্তী চাকুরী-জীবনের সমান্তরাল ভাবে 'শনিবারের চিঠি' নিয়মিত চলিতেছে এবং 'রঞ্জন পাবলিশিং হাউসে'রও পত্তন হইয়াছে। এই 'শনিবারের চিঠি', 'শনিরঞ্জন প্রেস' ও 'রঞ্জন পাবলিশিং হাউসে'র ইতিহাস আমার সাহিত্য-জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এগুলির স্থাপনা ও পরিচালনার ইতিহাস যেমন চমকপ্রদ তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

বাল্যকালে স্কুল-জীবনের মাঝামাঝি পর্যায়ে বঙ্গভারতীর দরবারে প্রথম অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, সতীর্থরাই সহযোগী ছিল। কলেজ-জীবনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বহু খ্যাতনামা ও অখ্যাতনামা সাহিত্যসেবীর সংস্পর্শে আসিয়াছি, উচ্চতম হইতে নিম্নতম—অনেকের প্রীতি সহানুভূতি ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছি, কলহ ও বিরোধও বড় কম ঘনাইয়া উঠে নাই। এই সকল ঘটনার বিবরণ নিতান্ত আমার ব্যক্তিগত ইতিহাস নয়, ইহার সহিত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেরও ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। দেশের প্রসিদ্ধ শিল্পীদের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। শ্রীমান্ প্রাণতোষের অনুরোধ আমাকে যে কাজে প্রবৃত্ত করিল, প্রথম তরঙ্গ লিখিতে লিখিতেই তাহার ব্যাপকতা, বিশালতা ও গুরুত্ব আমি স্বয়ং অনুভব করিয়া ভীত হইয়াছি। "আত্মকথা" হিসাবে লৌকিক বাহ্য পরিচয় মাত্র প্রকাশ করিলাম; কিন্তু ইহা আমার জীবনের কতটুকু? জীবন-জলধি-তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিস্তার করিয়া চলিয়াছে, শুধু ধরিবার অপেক্ষা।

খেয়ালী প্রতিভা

ডেমোসৃথেনিশ চেয়েছিলেন বিখ্যাত বক্তা হতে, যে জন্ত তিনি লুকানো পড়ার ঘর তৈরী করিয়েছিলেন,—যেখানে বেশীক্ষণ সময় কাটাতে হবে। কিন্তু তিনি জানতেন, লোকে নিশ্চয়ই ডাকাডাকি করবে। ভেবে-চিন্তে তিনি অর্দ্ধেক মাথাটা কামিয়ে ফেললেন! ডেমোসথেনিশকে অতি কদাকার দেখালো। কেউ ডাকলে তিনি দেখা দিতেই লজ্জা বোধ করতেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আটান্ন

বিজয়কৃষ্ণকে লিখে পাঠাল কেশব সেন : বন্ধু, একবার রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখবে এস।

বন্ধু? তা ছাড়া আবার কি। হোক দলাদলি, হোক রেষারেষি, হোক বাদ-বিতণ্ডা, তারা সতীর্থ। তারা এক তীর্থের যাত্রী। যারা সমানতীর্থসেবী তারাই সতীর্থ। তারা এক গুরুর ছাত্র। এক পাঠশালার পড়ুয়া। তাদের দুজনের একই ঈশ্বর-সন্ধান।

তখন তাদের ঝগড়া চরমে উঠেছে। তবু লিখে পাঠাল কেশব : বন্ধু, এমনটি তুমি আর দেখনি।

শান্তিপুরে প্রভু অদ্বৈতাচার্যের বংশে বিজয়কৃষ্ণের জন্ম। বাপের নাম আনন্দকিশোর গোস্বামী। নিত্য-পূজার শালগ্রাম শিলা গলায় বেঁধে এক দিন হঠাৎ পুরীর দিকে যাত্রা করলেন আনন্দকিশোর। বাসনা জগন্নাথ দর্শন। যাত্রা করলেন পায়ে হেঁটে নয়, বুকে হেঁটে। গণ্ডি কেটে-কেটে। পুরী পৌঁছুতে এক বছর লাগল। মাটির ঘষায় বুকে-পায়ে ঘা হয়ে গেছে তবু হটছেন না আনন্দকিশোর। ঘায়ের উপর ন্যাকড়া জড়িয়ে নিয়েছেন।

ভক্তের যদি ন্যাকড়াও না জোটে, তবু ভক্ত ন্যাকড়ার আগুন।

জগন্নাথ স্বপ্ন দিলেন। 'তুই বাড়ি যা, আমি পুত্র হয়ে তোর ঘরে আসব।'

পুত্র? দু-দুবার বিয়ে করেছিলেন আনন্দকিশোর, দুই স্ত্রীই গত হয়েছেন নিঃসন্তান অবস্থায়। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স হল, এখন আর তবে পুত্র কি। কিন্তু স্বপ্নবাক্য কি নিষ্ফল হবে?

তৃতীয় বার বিয়ে করলেন আনন্দকিশোর। বিয়ে করলেন নদীয়া জেলার গৌরী জোদ্দারের মেয়ে স্বর্ণময়ীকে।

সেদিন ঝুলন-পূর্ণিমার রাত। পূর্ণিমার চন্দ্র, কিন্তু সবাই বলে কৃষ্ণচন্দ্র।

কিন্তু গৌরীপ্রসাদের ঘরে সেদিন বিপদ উপস্থিত। পরের দুঃখে মন কাঁদে, কোন এক দেনদারের জামিন হয়েছিলেন গৌরীপ্রসাদ। সেই দেনদার হঠাৎ ফেরার হয়েছে। তাই জামিনদারের বিরুদ্ধে ক্রোকী পরোয়ানা বেরিয়েছে আদালত থেকে। অস্থাবর ধরবার পরোয়ানা, আদালতের পেয়াদা চড়াও হয়েছে বাড়িতে।

সে সব দিনে আদালতের পেয়াদা মানে কৃতান্তের অনুচর। বাড়ির মেয়েরা পেয়াদা দেখে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। স্বর্ণময়ী পালাল বাড়ির পিছনে পিটুলি গাছের নিচে ঘন কচুবনের মধ্যে।

স্বর্ণময়ী আসন্নপ্রসবা।

ক্রোকের হাঙ্গামা চুকে গেল, বাড়ির মেয়েরা সব একে-একে ফিরল বাড়িতে। কিন্তু স্বর্ণময়ী কোথায়? স্বর্ণময়ী কোথায় গেল?

খুঁজতে-খুঁজতে পেল তাকে কচুবনে। এ কি! তার কোলে প্রসন্নহাস হিরণ্ময়বপু শিশু।

বিপদ কোথায়। বিপদের দিনে বিপদভঞ্জন। বিপন্নপালক।

এই শিশুই বিজয়কৃষ্ণ।

নিম গাছের নিচে জন্মেছিলেন শ্রীচৈতন্য। পিটুলি গাছের নিচে জন্মালেন বিজয়কৃষ্ণ।

আর আমাদের প্রভু রামকৃষ্ণ জন্মালেন ঢেঁকিশালে। জন্মেই উনুনের ছাই মেখে বিভূতিভূষণ হলেন।

রামকৃষ্ণের রঘুবীর, বিজয়কৃষ্ণের শ্যামসুন্দর।

ভোর বেলা, মন্দিরের দরজা বন্ধ। পূজারী এসে দরজা খুলবে।

শিশু বিজয়কৃষ্ণ সেই দরজা ঠেলছে প্রাণপণে। কাঠের রঙিন বল্ নিয়ে সে খেলছিল, সে-বল্ সে খুঁজে পাচ্ছে না। খুজে পাচ্ছিস্ না তো এখানে কি।

'এই শ্যামসুন্দরই আমার বল্ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। ও-ও যে খেলছিল আমার সঙ্গে।'

কে শোনে কার কথা। দরজা যখন খুলতে পারছে না গায়ের জোরে, তখন কাকুতি-মিনতি করছে। দাও না আমার বল্। কেন বসে আছ দোর এঁটে? বাইরে বেরিয়ে এস না।

দাঁড়াও। কতক্ষণ বন্ধ হয়ে থাকবে? শিশু বিজয়কৃষ্ণ এক লাঠি নিয়ে এসেছে। পূজুরী এসে দরজা খুললেই দেখে নেব তোমাকে। কে তখন তোমাকে বাঁচায় দেখব।

দরজা খোলা হলেও মন্দিরে তাকে ঢুকতে দেওয়া হল না। তার যে এখনো পৈতে হয়নি।

সারা দিন উপোস করে রইল বিজয়। মা এসে কত সাধ্যসাধনা করলেন, নরম হল না এতটুকু। শ্যামসুন্দরের উপর প্রতিশোধ না নিয়ে অন্নজল গ্রহণ করবে না সে।

মা ঘরে ভাত রেখে শুয়ে পড়লেন। খিদের কাছেও যে হার মানেন। সে কেমনতরো ছেলে!

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেল স্বর্ণময়ীর। বিজয় যেন কথা কইছে কার সঙ্গে।

'যাক, ঘাট মানলে। তাই ছেড়ে দিলাম। নইলে দেখাতাম একবার মজা।'

গলার সুর বদলাল বিজয়।

'আমি না হয় তোমার উপর রাগ করে খাইনি। কিন্তু তাই বলে তুমি কেন খেলে না?'

স্বর্ণময়ী তো বাক্যহীন।

'বেশ, বেশ, দুজনে একসঙ্গে খাই এস।'

ঢাকা তুলে ভাত খেতে লাগল বিজয়। তার সঙ্গে আরো এক জন কে খাচ্ছে।

শিকারপুরের পাঠশালায় ভর্তি হয়েছে বিজয়। ভীষণ কলেরা লেগেছে শান্তিপুরে। চক্ষের পলকে বহু লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তার মধ্যে অনেকগুলি বিজয়ের সমপাঠী।

বিজয়ের বেদনার চেয়ে বিস্ময় বেশি। যে মাদুরে তারা বসত সে মাদুর আছে, যে বই তারা পড়ত সেই বই আছে, যে জিনিস নিয়ে খেলাধূলো করত সেই জিনিসগুলি আছে। অথচ তারা নেই। এ কখনো হতে পারে? এটুকু শিশু মহা সমস্যায় পড়ে গেল। যা একবার থাকে তা কি আবার না-থাকে? যা একবার হয় তা কি আবার না-হয়?

চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছে শিশু। কে তাকে মীমাংসা করে দেবে? কে তার সেই গুরুমশাই?

এক দিন ভারী মন নিয়ে চলেছে পাঠশালায়। হঠাৎ তার সেই মৃত সমপাঠীরা দর্শন দিলে তাকে, দিনের আলোয়, পথের মধ্যে। বলে উঠল সমস্বরে: 'বিজয়, আমরা আছি। আমরা আছি।'

আমরা আছি? আমরা যদি আছি, তবে নিশ্চয়ই তিনিও আছেন।

পাঠশালায় চলে এল একছুটে। পাঠশালার গুরু ভগবান সরকার, তাঁকে বললে সব বিজয়। ভূতের গল্প বলে হেসে উড়িয়ে দিলেন গুরুমশাই। বিজয় জেদ ধরল, আপনি একবার চলুন আমার সঙ্গে। সেই ঝোপের পাশে, পথের উপর।

নেইআঁকড়ার পাল্লায় পড়েছেন গুরুমশাই। শেষে তিনি শক্ত হয়ে বললেন, 'ঠিক বলছিস? তাদের কথা তুই শোনাতে পারবি?'

'নিশ্চয়ই পারব।'

সেই চেনা জায়গায় নিয়ে এল গুরুমশাইকে। কিন্তু কোথায় সেই ছেলের দল? কোথায় তাদের সেই কচি গলার কলস্বর?

ওরে তোরা কোথায়? তোরা কথা ক। আমরা শুধু আমাদের কথা কইছি। তোরা তোদের কথা ক। তোদের কথাই তাঁর কথা।

চার দিকে শুধু মৌনময় মুখরতা। এ কি গুরুমশাইদের কানে ঢোকে? তারা ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ চায়। বলে, দেখাতে পারো? শোনাতে পারো?

'যত সব ফাজলামো—' ভগবান সরকার মারতে উঠলেন বিজয়কে।

হঠাৎ একসঙ্গে কতগুলি ছেলে কলধ্বনি করে উঠল: 'গুরুমশাই, মারবেন না বিজয়কে।'

উদ্যত হাত অসাড় হয়ে গেল। ব্যাকুল চোখে চার দিকে তাকাতে লাগলেন ভগবান সরকার।

'এই যে আমরা। এইখানে, এইখানে। সবখানে—'

বিজয়কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ভগবান সরকার। কে কার গুরু? যে দেখায় আর শোনায় সেই তো আচার্য।

সেই তো দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, ত্রাতা, রসয়িতা।

পুরন্দর পূজারী মরে ব্রহ্মদৈত্য হয়েছে। থাকে গাছের উপর। আগে শ্যামসুন্দরের পূজারী ছিল।

পুজো করত আর জিনিস সরাত। ভোগ-নৈবেদ্য শুধু নয়, আরো কিছু মোটা জিনিস। তারই পাপে এই গতি।

কিন্তু বিজয়ের উপর ভারি টান। তার সর্বত্র অপদে গতায়াত, তাই আপদে-বিপদে সব সময়ে সে বিজয়কে রক্ষা করে। থাকে তার সঙ্গে-সঙ্গে। কখনো দেখা দেয় কখনো বা দেয় না।

যাত্রা শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে বিজয়। আসর ভেঙে গিয়েছে। যে যার মনে কখন ফিরে গিয়েছে বাড়ি-ঘর। ফরাসের একধারে বিজয় শুধু একা ঘুমিয়ে। ঘুম ভেঙে চোখ চেয়ে তো তার চক্ষু-স্থির। রাত ঝাঁ-ঝাঁ করছে, সঙ্গী-সাথী নেই কেউ ধারে-কাছে, এখন সে বাড়ি ফেরে কি করে?

খড়মের শব্দ শোনা গেল চটপট। হাতে লণ্ঠন আর লাঠি, কে এক জন কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, 'চল্, পৌঁছে দিয়ে আসি।'

এমনি আরো কয়েক বার সে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। বিপদে বা বিপথে পড়লেই লাঠি হাতে পুরন্দর এসে দেখা দেয়।

'ঐ লোকটা কে রে?' এক দিন জিগ্গেস করলেন স্বর্ণময়ী।

'কোন্ লোক?'

'যে তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়?'

'বা, আমি তো জানি তুমিই পাঠিয়ে দাও ওকে। আমাকে ডেকে নিয়ে আসবার জন্যে বুঝি লোক রেখেছ। তবে—'

'শোন, ওর সঙ্গ করবি নে। ও ব্রহ্মদত্যি।'

হোক ব্রহ্মদৈত্য। দৈত্য থেকেই ক্রমে এক দিন ব্রহ্মে নিয়ে পৌঁছুব।

বিজয় না চাইলে কি হবে, পুরন্দর তাকে ছাড়ে না। বলে, আমি যতদিন আছি, ততদিন তোকে আগলে যাব।

'কিন্তু মা বলেছে, গয়ায় যদি তোমার পিণ্ড দিই?'

ব্যস্, তা হলেই বন্ধন মুক্তি। তাহলেই ঊর্ধ্ব-যাত্রা। ক্রমোন্নয়ন।

'কিন্তু, দেখো, তোমরা যেন গয়ায় মরে ভূত হয়ো না।' হেসে উঠল পুরন্দর।

সেদিন গান শুনে বাড়ি ফিরতে বেজায় দেরি হয়ে গিয়েছে।

পুরন্দর বললে, 'এই পোড়ো বাড়ির আঙিনার ভেতর দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। গাছে বাঁদর আছে, ডালপালায় ঝুপঝাপ করলে ভয় পেয়ো না।'

অমনি গাছের উপর থেকে কে একজন বলে উঠল ব্যঙ্গ করেঃ 'বেশ বলেছ যা হোক। গাছে যখন আছি তখন বাঁদর ছাড়া আর কি। কিন্তু ছেলেটার কাছে আসল কথাটা ফাঁস করে দেব না কি?'

তার মানে ছেলেটাকে ভয় দেখাবে। পুরন্দর তেড়ে এল। বললে, 'ঐ যে বলেছে মরলেও স্বভাব যায় না তোদের হয়েছে তাই—'

ঝগড়া বাধে দেখে বৃক্ষস্থ আরেক জন মধ্যস্থতা করতে এল। গম্ভীর গলায় বললে, 'পরলোক দেখ! পরলোক দেখ।'

শুধু পরলোক নয়, পরম লোককে দেখব। যা প্রেত ও প্রস্থিত তাই এক দিন মহা-স্থিতের কাছে পৌঁছে দেবে। সেই তো আদি বাড়ি। সেখানেই তো আসল উপনয়ন।

ন বছর বয়সে উপনয়ন হল বিজয়ের। টোলে গিয়ে ঢুকল। এক বছরে মুগ্ধবোধ মুখস্ত করে ফেললে। তার পর নিয়ে পড়ল সাংখ্য আর বেদান্তদর্শন।

কিন্তু যতই পড়ো আর লড়ো, তার মুখে শুধু এক বুলি। সে বুলির নাম 'হরিবোল'। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হরি-ভোলা সংসারে বাস করে না, বাস করে হরি-বোলা সংসারে।

দক্ষিণেশ্বরে যখন আসে তখনই মুখে ধ্বনি করেঃ 'হে শ্রীহরি—'

এই শ্রীহরি ডাকটিই পর-পর তিন বার তিন রকম স্বরে সে উচ্চারণ করে। এমন করুণ এমন আর্দ্র সেই স্বর যে তপ্ত চিত্ত শীতল হয়, তৃষিত চিত্ত তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। মনে হয় সর্বতীর্থময় হরি যেন বাস করছেন এই দক্ষিণেশ্বর তীর্থে।

নামাগ্নিতে দগ্ধীভূত হয়ে যাচ্ছে—বিজয়কৃষ্ণকে চিনতে পারল রামকৃষ্ণ।

বিধৌত হয়ে যাচ্ছে পরমপাবনী ভক্তিতে। এসেছে সেই ক্ষমা, বৈরাগ্য আর মানশূন্যতা। সেই আশাবদ্ধসমুৎকণ্ঠা, ভগবানকে পাবার জন্যে বেগবতী আশা আর না পাওয়ার জন্যে ঐকান্তিকী কাতরতা। সেই নামগানে সদারুচি। আসক্তিস্তৎগুণাখ্যানে,

প্রীতিস্তৎবসতিস্থলে। বিজয়ের সর্বাঙ্গে সেই ভাব-কদম্ব পরিস্ফুট।

ঠাকুরের তখন হাত ভেঙে গেছে, খুব কষ্ট পাচ্ছেন।

একজন ব্রাহ্ম ভক্ত বললে, 'আপনি তো জীবন্মুক্ত, এই কষ্টটুকু ভুলতে পাচ্ছেন না?'

ঠাকুর বললেন, 'তোদের সঙ্গে কথা বলে ভুলব? তোদের বিজয়কে আন। তাকে দেখলে আমি আপনাকে ভুলে যাই।'

উনষাট

কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হল বিজয়কৃষ্ণ। রামচন্দ্র ভাদুড়ীর মেয়ে যোগমায়াকে বিয়ে করলে। বিজয়ের বয়স আঠারো আর যোগমায়ার ছয়।

বিজয়ের ছুই বন্ধু রামময় আর কৃষ্ণময় খৃষ্টান হয়ে গেল।

বিরক্তিতে বিভ্রান্ত হয় না বিজয়, বেদনায় ভাবতে বসল। হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানে তুলসী-বিল্বপত্রের সঙ্গে অনেক আগাছা এসে ভিড়েছে। তাই লোকে আস্থা হারাচ্ছে। রাস্তা হারাচ্ছে। উন্মার্গগামী হচ্ছে।

এখন উপায় কি।

রংপুরে শিষ্যবাড়ি গিয়েছিল, শিষ্য মন্ত্র আওড়ে পা-পুজো করলে। বললে, তুমি জ্ঞানবর্তিকা জ্বেলে অজ্ঞানের চক্ষুরুন্মীলন করেছ, তোমাকে প্রণাম।

ছাই করেছি। কিছু করিনি। আমার নিজের চোখ কে খুলে দেয় তার ঠিক নেই, আমি গেছি পরের চোখ খুলতে। একেই বলে গয়ায় মরে ভূত হওয়া। করব না আর কপটাচরণ।

যজমানগিরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন ভাবে খেটে খাব কলকাতায়। পড়ব মেডিকেল কলেজে।

রংপুর থেকে বগুড়ায় এল বিজয়কৃষ্ণ। বগুড়ায় তিন জন ব্রাহ্মভক্তের সঙ্গে দেখা হল। এরা তো চমৎকার। যেমন শুনেছিলাম তেমন তো নয়। মদও খায় না, স্বেচ্ছাচারও করে না। শুধু ঈশ্বরের কথা কয়। সেই তো 'অমৃতস্য পরং সেতু'। বাক্যে তাঁর প্রকাশ হয় না অথচ বাক্যই তাঁর প্রকাশ।

কলকাতায় এসে ব্রাহ্মসমাজে হাজির হল এক দিন। সেদিন দেবেন ঠাকুর বক্তৃতা দিচ্ছেন। বক্তৃতার বিষয়—'পাপীর ছুর্দশা ও ঈশ্বরের করুণা'। বক্তৃতা শুনে বিজয় অভিভূত, দ্রবীভূত হয়ে গেল। নিজেকে হঠাৎ মনে করল নিরাশ্রয় বলে। নির্জন, নিঃসহায় বলে। প্রার্থনা করতে বসল। 'এইমাত্র শুনলাম তুমি অনাথের নাথ, তুমি দীন জনের বন্ধু। তবে আমাকে তুমি নাও, আমাকে তুমি রাখো। তোমাকে যে পায়নি তার মত আর দীন কে। তুমি আমার, এই নিকট অনুভূতি যার নেই সেই তো অনাথ। আমি আর কোথাও যাব না, আর কোথাও ঘুরব না, এই তোমার ছুয়ার ধরে পড়ে থাকলাম—'

তাঁর দরজায় তিনি যে আমাকে পড়ে থাকতে দেবেন এই তো তাঁর অনেক দয়া।

ভিখারীকে দোরগোড়ার স্থানটুকুই বা কে দেয়।

শুধু শরণাগতিতেই শান্তি। সর্বসাধনস্তম্ভরূপা শরণাগতি।

'শান্তিরেব শান্তিঃ, সা মা শান্তিরেধি।' যা আপনাতেই শান্তি সেই শান্তিই আমার হোক।

ঠাকুর বললেন, 'কাঠ পোড়া শেষ হলে আর শব্দ থাকে না—উত্তাপও থাকে না। সব ঠাণ্ডা। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।'

মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগে পড়ছে বিজয়কৃষ্ণ। সাহেব অধ্যক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ বেধেছে। বিজয় সেই ছাত্রদলের পাণ্ডা।

ব্যাপার কি?

এক ছাত্রকে ওষুধচুরির অপবাদ দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন অধ্যক্ষ। শুধু তাই নয়, জাত তুলে বাঙালীদের গাল দিয়েছেন। আর যায় কোথা। বিজয়ের নেতৃত্বে ছাত্রেরা সব কলেজ ছেড়ে দিলে।

এই নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা বিজয়কৃষ্ণের।

বিজয়কে দেখে বিদ্যাসাগরের আনন্দ ধরে না। ছুই তেজস্বী চক্ষু সত্যের আলোতে জ্বলছে। দৃপ্ত ব্যক্তিত্বে অবক্র নির্ভীকতা। শুধু তাই নয়, সঙ্গে তীব্র ঈশ্বরানুরাগ।

বিজয় বললে, 'আপনার বোধোদয়ে সবই তো লিখেছেন, কিন্তু সত্যিকার বোধোদয় হয় যাঁকে আশ্রয় করে, তাঁর কথাই কিছু নেই।'

কোনো উত্তর খুঁজে পেল না বিদ্যাসাগর। বিদ্যার সে সাগর বটে কিন্তু তার নামের প্রথমেই যে ঈশ্বর তার দিকেই বুঝি তার চোখ পড়েনি।

বোধোদয়ের পরের সংস্করণে 'ঈশ্বর' এল নতুন পাঠ। কিন্তু নব-নবায়মান রস।

পৈতে ফেলে দিয়ে ব্রাহ্ম হল বিজয়কৃষ্ণ। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে লাগল। শুধু বক্তৃতা নয়, প্রচারণা। চাই ব্রহ্মবিদ্যা, পরা বিদ্যা। জড় ধর্ম থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে লাভ করার সারমর্মই হচ্ছে ব্রাহ্মধর্ম।

এই সময় কেশব সেনের সঙ্গে আলাপ হল বিজয়ের। আলাপের সঙ্গে-সঙ্গেই গভীর বন্ধুতা। একে অন্যের দর্পণ হয়ে দাঁড়াল। এ দর্পণে পরস্পরের মুখ দেখে না, পরাবরের মুখ দেখে।

মেডিকেল-কলেজের শেষ পরীক্ষা কাছে, বিজয় বললে, পরীক্ষা দেব না, ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করব। দেশে-দেশে দিকে-দিকে ঈশ্বরের নাম গেয়ে বেড়াব এই ব্যাকুলতাই আমার জীবনের আকর্ষণ। জীবিকার চেয়ে জীবন বড়। জীবনের চেয়ে জীবনবল্লভ।

কিন্তু প্রচার মুখের কথা নয়। কেশব বললে, দস্তুরমতো পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হবে।

'তাই করব।'

পড়াশোনা করে পাশ করলে সহজেই। ধর্মের বৈজয়ন্তী নিয়ে বিজয় বেরুল দিগ্বিজয়ে।

'এ যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।' আপত্তি করল বন্ধুরা। 'পেট চলবে কি করে?'

'যিনি মরুভূমিতে ঘাস বাঁচিয়ে রাখেন, তিনিই রাখবেন।'

মহর্ষি বললেন, 'নির্দিষ্ট কিছু বৃত্তি দেওয়া যাক তোমাকে।'

প্রবৃত্তির বৃত্তি করতে আসিনি। ঈশ্বরই আমার উদ্যম, ঈশ্বরই আমার উদ্দেশ্য। তাঁর উপরে যদি সত্যি আমার নির্ভর থাকে তা হলেই আমি অভীঃ।

সংসারে তার জায়গা হয়নি, তাই বলে সংসারকে ত্যাগ করেনি বিজয়কৃষ্ণ। শান্তিপুর তাকে তাড়িয়েছে কিন্তু বিজয় চলেছে আসল শান্তিপুরে।

তার গতি দুর্গবিঘাতিনী, তার বাণী অপরাঙ্মুখী।

কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য হল বিজয়।

বুধবার, উপাসনার দিন। প্রলয়ংকর ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। পথঘাট ডুবে গেছে, গাছ পড়েছে অনেক, গাড়ি-ঘোড়া জনমানবের চিহ্ন নেই। জলস্রোতে মৃতদেহ ভাসছে। ঘোর অন্ধকার। কার সাধ্য রাস্তায় বেরোয় এই দুঃসময়ে?

বিজয়ের সাধ্য। প্রথমে হাঁটুজল থেকে গলাজল। তার পরে সাঁতার। পথনদী পার হয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছুল মন্দিরে। কিন্তু হা হতোঽস্মি, এক জনও আসেনি, ব্যাকুলতার ঝড়ে ভক্তির নদী সাঁতরে। বিশ্বাসের ভেলায় ভেসে। অশ্রুজলের বর্ষণে।

মন্দিরের চাকরকে পাঠাল আচার্যের কাছে। আচার্য মানে দেবেন ঠাকুরের কাছে। তিনি লিখে পাঠালেন প্রকৃতির আজ করালমূর্তি, আজ এর মধ্যেই পরমেশ্বরের লীলা দর্শন করো।

একাই উপাসনায় বসল বিজয়। বিজয় একাই একশো।

কতক্ষণ পরে কেশব এল পালকিতে করে। বসে পড়ল উপাসনায়। নীরন্ধ্র অন্ধকারে দুটি নিষ্কম্প দীপদ্যুতি—কেশব আর বিজয়। স্বস্থ, শান্ত, স্পন্দন-বিরহিত। ব্রহ্মনিষ্পন্ন।

বিজয়ের দিন কাটছে অর্ধাশনে, কখনো অনশনে। চাঁদার খাতায় চার আনা আট আনা ভিক্ষে করে। কখনো বা দেড় পয়সার মুড়ি খেয়ে। বাড়ির প্রাঙ্গণে কাঁটানটে শাক ফলেছে অজস্র, তাই দিয়ে ভাত মেখে। তাও না জোটে তেঁতুলগোলা দিয়ে। তবু ঈশ্বরস্খলন নেই, নেই স্বভাবচ্যুতি।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি—এই কাম্যকর্মত্রয় বিজয়ের। 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'—এ যেন বিজয়ের পক্ষে খাটে না। সে জানে তৃষ্ণাসূত্র ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত জীবের সমস্তই দুঃখ, তৃষ্ণাচ্ছেদ থেকে যে কৈবল্য তাই একমাত্র আনন্দ। বিজয় আছে সেই বৃহদানন্দে, জগদানন্দে। যদি সে পৌত্তলিকতা বর্জন করে থাকে তবে সে সুখ-শান্তি অর্থ-আরাম যশ-মান—সমস্ত উপাধিই বর্জন করবে। উপাধিরই বিকার, উপাধিরই মৃত্যু, আত্মা স্থির, নির্বিচল।

আত্মা প্রকাশক, জড় প্রকাশ্য। কেবল উপাধির যোগেই ভাবি আত্মাই বুঝি কর্তা, আত্মাই বুঝি ভোক্তা। অবিদ্যার বশেই নিজেকে দেহবান মনে করি। মন মায়া, আভাস মাত্র। আমাদের আসল অধিষ্ঠান চৈতন্যে। ঈশ্বর মায়ার অতীত। ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ।

বিজয় সেই চৈতন্যের দ্যোতনা।

কেশব আর বিজয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারছে না। পাদ্রিরা। খৃষ্টধর্মে আর আকৃষ্ট হচ্ছে না বাঙালী, ব্রাহ্মধর্মেই পাচ্ছে তাদের পিপাসার পানীয়।

এখন কি করা। পাদ্রিরা ঠিক করল তর্কসভায় ব্রাহ্ম-প্রচারকদের আহ্বান করা যাক। তাদের তর্কে

পরাস্ত করতে পারলেই বিদ্বৎ সমাজ কৃতনিশ্চয় হবে যে খৃষ্টধর্মই শ্রেষ্ঠধর্ম।

তখন কেশব বিজয় আর প্রতাপ এলাহাবাদে। উপাসনার পরে মন্দিরে এক দিন এসেছে এক পাদ্রি। মহাজ্ঞানী আর তর্কবীর বলে প্রখ্যাত। খোদ বিলেত থেকে এসেছে খৃষ্টান মিশনের প্রতিনিধি হয়ে। আগে পাদ্রী, পরে বেনে, শেষকালে সৈন্য। এই ইংরাজী কূটনীতি। আগে মিষ্টি বুলি, পরে টাকার টুং-টুং, শেষকালে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা।

সাদরে অভ্যর্থনা করল কেশব।

'তোমরা খৃষ্টধর্ম প্রচারে বাধা দিচ্ছ। সে বিষয়ে খোঁজ করতে এসেছি আমি। ধর্ম সম্বন্ধে আমি বিচার করতে চাই তোমাদের সঙ্গে। কি তোমাদের বক্তব্য, কি বা তার ভাব—'

চার দিকে তাকাল পাদ্রি। কার সঙ্গে কথা কইব? কে তোমাদের মধ্যে উপযুক্ত?

যাকে ইচ্ছে তাকেই বেছে নাও। কিন্তু তোমাকে কে বাছল, তাই ভেবে পাচ্ছি না।

'ঐ যে এক জন বসে আছে স্থির হয়ে, উপাসনা শেষ হয়ে যাবার পরেও যে নড়ছে না, ওর নাম কি?'

'বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।'

'ওর সঙ্গেই আমি কথা কইব। ওকে বলো না, চেয়ারে এসে বসবে, ও ভাবে পা মুড়ে বসবার আমার অভ্যেস নেই।'

বিজয়ের ধ্যান ভাঙল। জানল সাহেবের অভিপ্রায়। বললে, 'সাহেব, পাণ্ডিত্য তো অগাধ সঞ্চয় করেছ। আমার পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আগে দাও। প্রশ্ন থেকেই বুঝে নাও ভারতবর্ষের জিজ্ঞাসার গভীরতা। ধর্ম কি? তার উৎপত্তি কোথায়? আত্মা কাকে বলে,আর তার স্বরূপ কি? সত্য কি জিনিস? কাকে মায়া বলে? পাপ কি, কেন?'

পাদ্রি সাহেব এ পাশ ও পাশ তাকাতে লাগল, বললে, 'এ সব প্রশ্ন তো কই শুনিনি কোথাও। এ আবার কি কথা! আমরা তো শুধু বাইবেল জানি, বাইবেলই পড়েছি—'

'সাহেব, এ দেশের নাম ভারতবর্ষ।' কেশব বললে, 'এ দেশ থেকেই ধর্ম আর সভ্যতা গ্রীস হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তোমাদের ইউরোপে। এ দেশকে জানো, বোঝো, তবে এসো এ দেশকে ধর্মে দীক্ষা দিতে। প্রশ্নের উত্তর তুমি যদি নিজে দিতে না পারো, তোমার দেশে ফিরে যাও, সেখান থেকে উত্তর নিয়ে এস।'

সৃষ্টির প্রথম প্রশ্নের ভারতবর্ষই শেষ উত্তর।

ভারতবর্ষ বৃক্ষ, আর সব ছায়া। একে সেবা করো, উচ্ছিন্ন কোরো না। আমাদের সেবা মঙ্গলরূপিণী। "সেবিতব্যঃ মহাবৃক্ষঃ"।

যখন তিনি দূরে তাঁকে আরাধনা করি আর যখন তিনি কাছে তখন তাঁকে সুখে সেবা করি। তিনি সুখসেব্য দুরারাধ্য। তিনি গুহ্যগম্ভীরগহন হয়েও সহজ-সুন্দর। তুমি, সাহেব, বুঝবে না এ তত্ত্ব। আগে শ্রদ্ধা দিয়ে বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করো। পরে দেখ ভারতবর্ষকে।

আর বাক্যস্ফুট না করে চম্পট দিলে পাদ্রি সাহেব।

শুষ্ক জ্ঞানে মন ভরে না বিজয়ের। মন ভক্তি চায় প্রীতি চায়। প্রীতিই একমাত্র মাধুর্যবিষয়িণী। আর ভাগবতী প্রীতিই ভক্তি। ভক্তিতেই সমস্ত জ্ঞানের অবসান।

ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার করতে-করতে বিজয় বৃন্দাবনে এসেছে। উপাসনার মধ্যে হঠাৎ কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার বর্ণনা সুরু করে দিলে। ব্রাহ্মরা যারা শুনছিল তারা চঞ্চল হয়ে উঠল। এ কি পথস্খলন!

'কে জানে! স্পষ্ট চোখের উপর দেখলাম কৃষ্ণ গোঠে গরু নিয়ে যাচ্ছে।'

শুধু তাই নয়, উপাসনায় বসে মাঝে-মাঝে 'মা' 'মা' করে ওঠে।

এ কী হচ্ছে! ক্ষুণ্ণ হয় ব্রাহ্মরা। এ কি ভগবতী না জগদ্ধাত্রীর আবাহন?

কিন্তু সেই অধীর আর্তি স্পর্শ করে সবাইকে। এ তো বৈধী ভক্তি নয়, এ রাগানুগা ভক্তি। শাস্ত্রের শাসনে ঐশ্বর্যবানে যে ভক্তি তা বৈধী ভক্তি আর মাধুর্যময়ী স্বভাবরুচির ভক্তিই রাগানুগা ভক্তি। বৈধী ভক্তি পিতা, রাগানুগা ভক্তিই মা।

'জয় জয় বিজয়ের জয়!' কেশব চিঠি লিখছে বিজয়কে: 'ঈশ্বরকে একমাত্র নেতাজ্ঞানে উচ্চকণ্ঠে তাঁর নাম কীর্তন কর। বৈরাগী হয়ে পদানত কর সংসারকে। উৎসাহের উত্তাপ দিয়ে জাগাও প্রসুপ্তকে, এক প্রীতির বন্ধনে সবাইকে বেঁধে ফেল। যারা নিজেদের দরিদ্র বলে বোধ করছে, তাদের ভগবৎ-বিত্তে সম্রাটের চেয়েও ধনবান কর। দেশে-বিদেশে আমাদের রাজ্য বিস্তৃত হোক।'

বাইরে প্রচার হচ্ছে আর এদিকে ঘরের মধ্যে চেঁচামেচি। বিধবা-বিয়ে, অসবর্ণ বিয়ে, ব্রাহ্মমতে শ্রাদ্ধ

—এই সব নিয়ে। তুমুল হট্টগোল। কেশবকে সবাই খৃষ্টান বলতে সুরু করে দিয়েছে। শুধু তাই নয় দিচ্ছে তাকে আরো অপকৃষ্ট অপবাদ। বইছে শুধু ঈর্ষার বিষবায়ু।

বিজয়ের মন বিমুখ হয়ে উঠল। আছি শ্রীপাদপদ্ম-বিষয়িণী ভক্তি নিয়ে, এ সব আবার কি সংস্কারের উৎপাত! যেন অধিষ্ঠানের চেয়ে অনুষ্ঠান বড়! বিজয় চলে এল কালনায়, ভগবান দাস বাবাজীর আশ্রমে।

জল খেতে চাইল বিজয়। বললে, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, আমাকে কিন্তু আলাদা পাত্রে জল দেবে।

বাবাজী বললে, 'যার জ্ঞান তারই তো ভক্তি। ভক্তি বাদ দিয়ে কি জ্ঞান সম্ভব? আমার পিপাসাও আজ চরিতার্থ করব। আমার কমণ্ডলুতেই জল খান।'

বাবাজীর পাত্রেই জল খেল বিজয়।

এক ঢোঁকে বাকি জল খেয়ে নিলেন বাবাজী। কমণ্ডলু মাথায় ঠেকালেন।

'এ কি করলেন? ইনি যে ব্রাহ্ম।' কে এক জন চেঁচিয়ে উঠল: 'এঁর যে পৈতে নেই।'

'আমার অদ্বৈতেরও ছিল না। ব্রাহ্মসমাজে গেছেন, কিন্তু সেখানেও আমার গোঁসাইই আচার্য।'

'আহা, আচার্যের কি বাহার! গায়ে জামা, পায়ে জুতো, আহা, ফিটফাট ফুলবাবুটি!' ব্যঙ্গ করে উঠল সেই অভক্ত।

'প্রভুকে আমার পরিপাটি করে সাজাও।' ভগবান দাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন: 'আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার প্রভুর ললাটে তিলক, শিরে জটাজূট ও গলায় তুলসীর মালা। সর্বাঙ্গে বৈষ্ণব-চিহ্ন।'

ব্রাহ্মমন্দিরে কীর্তন ঢোকাল বিজয়।

"কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ,
নেত্রের ভূষণ আমার সে রূপ দর্শন,
বদনের ভূষণ আমার সে রূপ কথন,
হস্তের ভূষণ আমার সে পদ সেবন,
(ভূষণের কি আর বাকি আছে)
আমি কৃষ্ণচন্দ্রহার পরেছি গলে॥"

কেশবকে কীর্তনে দীক্ষিত করলেন ঠাকুর। কেশব গলায় খোল ঝোলালো। মাঝখানে ঠাকুরকে রেখে সকলে নাচছে। কেশবও সুরু করল নাচতে।

কেশব যেমন আসে তেমনি ঠাকুরও যান কেশবের বাড়িতে।

নিমাই সন্ন্যাস দেখতে কেশবের বাড়িতে গিয়েছেন ঠাকুর। কেশবের এক খোসামুদে শিষ্য কেশবকে বললে, 'কলির চৈতন্য হচ্ছেন আপনি।'

কেশব ঠাকুরের দিকে তাকাল। হাসতে-হাসতে বললে, 'তাহলে ইনি কি হলেন?'

ঠাকুর বললেন, 'আমি তোমার দাসের দাস। রেণুর রেণু।'

কেশবকে বড় ভালোবাসে রামকৃষ্ণ। তার সঙ্গে তার অন্তরের মাখামাখি।

কিন্তু কাপ্তেন খড়্গহস্ত। সে বলে, কেশব ভ্রষ্টাচার, সাহেবের সঙ্গে খায়, ভিন্ন জাতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে।

'আমার সে সবে দরকার কি? কেশব হরিনাম করে, দেখতে যাই, শুনতে যাই। আমি কুলটি খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ?'

কাপ্তেন ছাড়ে না তবু।

'কেশব সেনের ওখানে যাও কেন তুমি?'

'আমি তো টাকার জন্যে যাই না। আমি হরিনাম শুনতে যাই। আর তুমি লাট সাহেবের বাড়িতে যাও কেমন করে? তারা তো ম্লেচ্ছ—'

তবে নিবৃত্ত হল কাপ্তেন।

কেশবকে লক্ষ্য করে রঙ্গরসের গান গায় রামকৃষ্ণ:

"জানি ওহে জানি বঁধু
তুমি কেমন রসিক সুজন,
বলি, আর কেন কর প্রাণ জ্বালাতন।
নেচে ঘুরে ঘুরে
অভিমানে মুখ ফিরায়ে
বঁধু, আর কেন কর প্রাণ জ্বালাতন॥
রমণীর মন ভুলাতে
নিতি হয় আসতে-যেতে
কেন এলে নিশি প্রভাতে
ওহে, মদনমোহন বংশীবদন॥"

বিজয়কে কবে গান শোনাবে রামকৃষ্ণ? কবে তাকে নাচতে শেখাবে? কবে দেখবে তার গৈরিক-বাস সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী মূর্তি?

আর, বিজয়কৃষ্ণ কবে এসে রামকৃষ্ণের পদতলে পড়বে? বক্ষে ধারণ করবে সেই পাদপদ্ম?

আর, সেই তো পরং পদং, পরা কাষ্ঠা।*

[ক্রমশঃ।

* শ্রীবিজয়কৃষ্ণের কাহিনী শ্রীঅমৃতলাল সেনগুপ্তের "শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী" থেকে গৃহীত।

আখ্যান

সিদ্ধনাথকে ভগবান এক জোড়া পা দিয়েছেন। ডানা দেননি। তাই গতি দ্বারা তিনি সৃষ্টিকর্ত্তার সে ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেন। তাঁর অকস্মাৎ আগমন ও নির্গমন মাটিতে হেঁটে চলার চাইতে আকাশে উড়ে যাওয়ার সঙ্গেই বেশীটা মিলে। দ্রুত প্রবেশ ও দ্রুততর ভাষণের দ্বারা মিনিট পাঁচ ছয় ব্যাপী তিনি যে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন, তার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, অভিনয় সুরু হতে আর অধিক বিলম্ব নেই অথচ অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাজ সজ্জার এখনও অনেক বাকী।

অভিনয়ে প্রধান ভূমিকা মলী সেনের। প্রথম দৃশ্যে যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পার্ট। তিনি সলজ্জে স্বীকার করলেন, ত্রুটিটা তাঁরও। আশ্বাস দিলেন, তাঁর প্রস্তুত হতে বিলম্ব হবে না।

নিজের নির্দ্দিষ্ট প্রসাধন কক্ষটিতে প্রবেশ করে মলী সেন খুসি হলেন। অতি পরিপাটি ব্যবস্থা। ড্রেসিং টেবিলের উপরে নিপুণভাবে সাজানো ভেসেলীন, পেইন্ট, গ্রীজ, পাউডার, গ্লীসারিন, সফ্ট টিস্যু, প্যানকেক, ম্যাস্কারা, আইব্রো পেন্সিল ইত্যাদি মেক-আপের নানাবিধ সরঞ্জাম। কেশবিন্যাসের চিরুণী, ব্রাস, ফিতা, ট্যাসল্। আলনায় অভিনয়ের বিভিন্ন অঙ্কে বা গর্ভাঙ্কে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরণের জামা কাপড় পৃথক্‌ভাবে ভাঁজ করা। রাজকন্যা মঞ্জুশ্রী ঠিক কোন্ দৃশ্যে কোন্ বস্ত্র এবং অঙ্গাবরণটি পরিধান করবেন, সুস্পষ্টাক্ষরে লেখা ছোট কাগজের লেবেল দিয়ে তা চিহ্নিত। ছোট টেবিলটার উপরে অলঙ্কারগুলি থাকে থাকে অনুরূপ সুবিন্যস্ত। এক কোণে একটি ইজিচেয়ার, বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যকালীন অবসর ক্ষণে ক্লান্ত মলী সেন যাতে দেহ এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন। অন্য সময় অব্যবহৃত এ ঘরটাতে পাখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। গরমে ঘামে মুখের মেক্-আপ গলে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা। তাই জানালার ভেতর দিয়ে তার গলিয়ে দূরবর্ত্তী প্লাগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে ছোট একটি টেবিল ফ্যান। অন্য কোণে স্পিরিট ষ্টোভে ফুটছে ছোট কেটলীতে গরম জল। টিপাইর উপরে ফ্ল্যাস্কে ভরা গরম দুধ, নাকে দেওয়ার ড্রপ্‌স, গলার জন্য স্প্রে, অডিকলোনের বোতল, থ্রোট পেষ্টিলস্ ও এ্যাস্পিরিণের শিশি ইত্যাদি স্নায়ু ও কণ্ঠ সতেজ রাখার অতি পরিচিত বিবিধ ডাক্তারী আয়োজন।

যাযাবর

মনে মনে ধীরার নিপুণ ব্যবস্থার যথেষ্ট সুখ্যাতি করে প্রসন্ন চিত্তে মলী সেন অভিনয়ের জন্য সজ্জাবিন্যাসে ব্যাপৃত হলেন। বাঁ হাতের ঘড়িটা খুলে রাখলেন ড্রেসিং টেবিলের উপরে, ডান হাতের চুড়ি ক'গাছা, গলার মফচেন ও কাণের দুল দুটি পুরলেন ড্রয়ারের মধ্যে। একটা ড্রেসিং গাউন জড়ালেন গায়ে। কপালের ঠিক উপর থেকে একখানা তোয়ালে জড়িয়ে মাথার চুলগুলি ঢেকে দিলেন এমনভাবে যাতে মেক-আপের পেইন্ট বা পাউডারের ছোপ না লাগে। ডান হাতের তর্জ্জনী দ্বারা শ্বেত চীনেমাটির জারটা থেকে অনেকখানি ক্রীম তুলে নিয়ে দু'হাতে মাখতে সুরু করলেন গণ্ডে, কণ্ঠে ও কপোলে।

"কে? ধীরা? কোথায় ছিলি রে? মেয়েদের ড্রেসিং রুমে?"

ঘরে প্রবেশ করেই ধীরা যেন কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। সে মলী সেনকে ঠিক এ সময়ে এখানে প্রত্যাশা করেনি।

"হ্যাঁ" বলে পিছন ফিরে তাড়াতাড়ি সে আলনার কাপড় জামাগুলি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এক শব্দের ঐ অস্তিবাচক উত্তরটার মধ্যে সত্য প্রকাশের চাইতে প্রসঙ্গটি চাপা দেওয়ার প্রয়াসটাই যেন প্রবল। কিন্তু মলী সেনের সে দিকে খেয়াল ছিল না। তিনি ধীরার নৈপুণ্যের প্রচুর প্রশংসা করতে লাগলেন।

"মলী মামী, এক জন লোকের সঙ্গে একবার কথা বলবে?"

অকস্মাৎ এমন ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল ধীরা যে, স্পষ্টই বোঝা গেল, প্রশ্নটা নিয়ে মনে মনে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্বের পরে হঠাৎ কোন রকমে সে মুখ থেকে বের করেছে।

"কে সে?"

"আমার এক জন বন্ধু, মানে—ইয়ে—একটি চেনা ছেলে।"

মলী সেন পিছন ফিরে ধীরার পানে তাকালেন। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "বন্ধু ?"

অত্যন্ত বিব্রতভাবে মাটির দিকে চোখ রেখে ধীরা বলল, "না, ঠিক বন্ধু নয়, মানে, আমার সঙ্গে পড়ে একটি মেয়ে, তারই দাদা।"

মলী সেন ঈষৎ হাস্য করে সকৌতুক কণ্ঠে বললেন, "বটে ! হাঁউ মাঁউ কাঁউ, প্রেমের গন্ধ পাঁউ। বন্ধু নয়, বন্ধুর দাদা! ব্যাপারটা খুলে বল্ দিকিন, শুনি।"

"বাঃ রে, খুলে বলার আবার কী আছে এর মধ্যে ?"

"কিছুই নেই ? উহঃ, এ যে মনে হচ্ছে, ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।"

এ যুগের মামীরা ভাগিনেয়ীদের সঙ্গেও পরিহাস করতে ছাড়েন না। বিশেষতঃ বয়সের যদি খুব অনেকটা তফাৎ না থাকে এবং হৃদ্যতাটা যদি প্রগাঢ় হয়।

"তুমি ও রকম দুষ্টুমি করলে আমি চলে যাব কিন্তু।"

ধীরা প্রস্থানোদ্যোগ করতেই মলী সেন সহাস্যে বললেন, "আরে শোন, শোন্; কোথায় যাচ্ছিস্? আমাকে সবটা বললে লাভই হবে। যুদ্ধে এবং প্রেমে এ্যালাই থাকা ভালো। জানিস্ তো, তোর মা আমার কথা কেমন মানেন ? আমার সুপারিশ আঁচলে বেঁধে, চাই কি, একেবারে নির্বিবিঘ্নে বাসরঘর অবধি পৌঁছতে পারবি।"

"যাঃ।" ধীরা লজ্জায় একেবারে রাঙা হয়ে উঠল।

মলী সেন সস্নেহে ধীরাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "যাঃ কি রে ? দেখি, দেখি, মুখ তোল্। ও মা, তাই তো, ধীরা আমাদের সে ধীরা আর নাই তো! সত্যি, বেশ বড় হয়ে উঠেছিস্ যে। ঠাট্টা নয়। আমাকে কিছু লুকোসনে।"

কিছুটা ধীরার সলজ্জ ও স্বতঃপ্রবৃত্ত স্বীকৃতিতে, কিছুটা বা মলী সেনের সহৃদয় জিজ্ঞাসায় বিষয়টা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হলো।

ছেলেটির নাম সমীর। লাহোরে মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। ধীরার সহপাঠিনী তার মাসতুতো বোন। তাদের বাড়িতেই প্রথম দেখা। দেখতে ? ছাই, হাত-পা-গুলি চোয়াড়ের মতো। একটা আস্ত শুণ্ডা বললেই হয়। পদ্য লেখা ? রামচন্দ্র! দু'লাইন বাংলায় চিঠি লিখতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। শুধু খেলা নিয়ে পাগল, কলেজ কামাই করে অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট খেলার কমেণ্ট্রী শুনবে রেডিওতে! সিনেমা ? না, সিনেমায় তারা যায়নি কখনও। হ্যাঁ, দু'দিন বেড়াতে গেছে বটে। বিকেলে গঙ্গার ধারে।

মলী সেন পরিহাসতরল কণ্ঠে মন্তব্য করলেন, "অ্যাঁ, দু'জনে লুকিয়ে নদীর ধারে ? একেবারে ধীরা-সমীরে যমুনারই তীরে—?" তার পর স্নেহপূর্ণ প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, "আমাদের অভিনয় দেখতে এসেছে বুঝি ? যা, ডেকে নিয়ে আয়। আগে দেখি, রোমিও মশাই আমাদের জুলিয়েট ঠাকরুনের যোগ্য কি না।"

ছেলেটি সত্যি সুদর্শন। দীর্ঘ, সুঠাম গড়ন, সর্ব্বাঙ্গে স্বাস্থ্যের দীপ্তি, মুখে বুদ্ধির আভা। ঘরে দ্বিতীয় চেয়ার ছিল না; জামা কাপড়ের ওয়ার্ড্রোবের উপরে বসতে দিয়ে মলী সেন আলাপ করতে লাগলেন।

ধীরা মলী সেনের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী। তার কল্যাণ মলী সেনের বিশেষ কাম্য। তিনি কথাচ্ছলে অতি নিপুণতার সঙ্গে সমীরের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বহু তথ্য সংগ্রহ করলেন। তার পড়াশুনা, খেলাধুলা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক উৎসাহ দিলেন।

সমীর বিদায় নিতে চাইলে ধীরাকে বললেন, "কিছু খেতে টেতে দিয়েছিস ওকে ? সে কী রে ? এই বুঝি তোর হস্‌পিট্যালিটি ? এক্ষুনি উপরে আমার বসার ঘরে নিয়ে যা। ফ্রিজে আইসক্রীম আছে। না না, তোমাকে অত লজ্জা করতে হবে না। খেতে পারবে না বৈ কি ? খুব পারবে। জানো তো, সুশীল ও সুবোধ বালক যাহা পায় তাহা খায়।" মলী সেন কৌতুকোচ্ছল সস্নেহ দৃষ্টিতে সমীরের দিকে তাকালেন।

বোঝা গেল, পাত্রটি পছন্দ হয়েছে মলী মামীর।

সজ্জাকক্ষ থেকে বেরিয়ে দোতলার ড্রয়িং রুমে বসে মলী সেনের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সমীর। বাস্তবিক অনেক কিছু জানা শোনা আছে ধীরার মামীমার। ঠিক বলেছেন, আজকাল জেনারেল প্র্যাকটিশনারদের পসার নেই। লোকে ভাবে, জ্যাক অব অল ট্রেড। স্পেশিয়েলিষ্ট না হলে রোগীরা ডাকে না। হ্যাঁ, বিলাতে গিয়ে সে গাইনোকলজি অ্যাণ্ড অবষ্টেটি্রক্‌সে স্পেশিয়েলিষ্টই হবে। ভারি চমৎকার কথা বলতে পারেন কিন্তু মলী মামী। নিখুঁত এ্যাকসেন্ট বিলেতী মেমসাহেবদের মতো।

সাধারণ কলেজে পড়া বাঙ্গালী মেয়েদের মতো হিষ্টিরিক্যাল বলেননি একবারও; সেকেণ্ড সিলেবল-এ জোর দিয়ে বলেছেন, হিস্‌ট্রিরিক্যাল। ধীরা লক্ষ্য করেছে কী? আর ক্রিকেটেরই বা কত খবর রাখেন! বললেন, এদেশে পেস্ বোলারের অভাব, সে যদি বল ভালো সুইং করাতে শেখে, তবে হয়তো বছর কয়েক পরে টেষ্ট ম্যাচে চান্স পেতেও পারে। সত্যি তো, এ কথাটা তো সমীর কখনও ভাবেনি। ফটোগ্রাফিতেও মলী মামীর যথেষ্ট উৎসাহ আছে। আশ্চর্য্য! লাইকার নাম করতেই কেমন বলে দিলেন, ওতে প্রত্যেকটি ছবি এনলার্জ্জ না করালে সুখ নেই; বড্ড বেশী খরচ। তার চাইতে রোলীকর্ড বা রোলীফ্লেক্স ভালো। সমীরের এ্যালবামটা দেখতে চেয়েছেন। কালই তাঁকে সেটা এনে দেখালে……

হঠাৎ খেয়াল হলো সমীরের, সে একাই কথা বলে যাচ্ছে। শ্রোত্রীটির কাছ থেকে কোন সমর্থনসূচক সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো!

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "মলী মামী নিজেও ফটো তোলেন বুঝি?"

"জানিনে।"

ধীরার কণ্ঠের নিস্পৃহতায় সমীরের বিস্ময় বৃদ্ধি পেল। কিন্তু সে সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন না করে আইসক্রীমের প্লেটটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "প্লেট একটা কেন? তুমি খাবে না?"

"না।"

"সে কি হয়? তুমি না খেলে আমিও খাচ্ছিনে। আইসক্রীম তো তুমি খুব পছন্দ……"

অসহিষ্ণু স্বরে বাধা দিয়ে ধীরা বলল, "আঃ, কেন মিছে বকাচ্ছ? তোমার খেতে ইচ্ছে হয় খাও, না হয়, বাইরে ফেলে দাও।"

ধীরার এই অহেতুক উষ্মায় হতবাক্ সমীর মিনিট খানেক তার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। সে ভেবেই পেল না, হঠাৎ কোথায়, কখন এবং কী তার অপরাধ ঘটেছে।

সমীর প্রেক্ষাগারে ফিরে গেলে ধীরা চুপ করে ড্রয়িং রুমেই বসে রইল। তীব্র অসন্তোষ ও ক্রোধে তার মন দগ্ধ হতে লাগল। কিন্তু কেন এই বিরক্তি, কার উপরে এই রাগ, তার কোন হদিস সে খুঁজে পেল না।

সমীরের দোষ কী? সে তো কথা উঠলেই ঠাট্টা করে বলতো, মলী মামী কি কুতুবমীনার না ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যে, দেখতে যেতে হবে? ধীরা নিজেই তো তাকে এক রকম জোর করে মলী সেনের কাছে নিয়ে গেছে। সমীর মলী সেনের প্রশংসা করেছে? তাতে রাগ করার কী আছে? মামীর প্রশংসা সে নিজে যতখানি করে, এত আর করে কে? এর আগে সমীর কি তাকে মলী মামীর পাবলিসিটি অফিসার বলে কম পরিহাস করেছে? ধীরা কোন সঙ্গত কারণ ভেবে পায় না।

তার রূঢ়তায় আহত সমীরের মুখে সুস্পষ্ট বেদনার ছায়া ও ভীত অপরাধীর মতো ঘর থেকে তার নিঃশব্দ প্রস্থান স্মরণ করে ধীরার বুকে ছুঁচ ফুটতে থাকল। অথচ তার প্রতি উদ্যত অভিমানকেও কোনমতেই সে মন থেকে তাড়াতে পারল না।

মলী মামী তাকে কত গভীর স্নেহ করেন, তা সে জানে। সমীরকে তিনি অবজ্ঞা করলে ধীরা নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হতো। তিনি যে সমীরকে যথেষ্ট সমাদর করেছেন তাতেও সে প্রসন্ন হতে পারল না। তার মনে অযথা অভিযোগ খচ্ খচ্ করতে লাগল। নিজের হৃদয়ের এই দুই বিপরীত ভাবধারার কঠিন ঘাত প্রতিঘাতে সে কণ্টকারণ্যে মৃগশিশুর ন্যায় অবিরত ক্ষত বিক্ষত হতে থাকল। কিছুতেই ভেবে পেল না, কেন যে ঝড়ের রাতে উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গের মতো তার বুকের কাছে দুর্নিবার কান্নার ঢেউ ক্ষণে ক্ষণে কেবলি উদ্বেল হয়ে উঠছে।

মলী সেনের প্রসাধন কক্ষের দ্বারে মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

মুখে ফাউণ্ডেশান লোশান লেপনে ব্যস্ত মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "কে?"

বাইরে থেকে যে নাম উচ্চারিত হলো, তা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া না গেলেও বোঝা গেল, নারী কণ্ঠ।

মলী সেন ভিতরে আসতে বললেন।

দোর খুলে প্রবেশ করলেন নীরজা।

"এ কী, তুমি এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছ? সাজতে হবে না? ওঃ তাই তো, তোমার তো পার্ট একেবারে চতুর্থ অঙ্কে। তেমন তাড়া নেই।" বললেন মলী সেন।

নীরজা নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু চাই কি?"

"না।"

যদিও বিনা প্রয়োজন মলী সেনের প্রসাধন কক্ষে নীরজার প্রবেশ কিছু একটা অভাবনীয় অঘটন নয়, তবুও মলী সেনের মনে হল, উত্তরটা যথার্থ নয়।

নীরজা সমীরের পরিত্যক্ত আসন ওয়ার্ড্রোবটার উপরেই চেপে বসলেন। খানিক চুপ করে থেকে বললেন, "মলীদি, তোমাকে একটা কথা বলব। রাগ করবে না, বল ?"

মলী সেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নীরজার পানে তাকালেন। কিন্তু নীরজা মলী সেনের দৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নির্ব্বাক বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তার পর আর্ত্তকণ্ঠে হঠাৎ বলে উঠলেন, "আমাকে তুমি মেরে ফেল না, মলীদি।"

বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "মানে ?"

চকিতে আসন থেকে উঠে এসে নীরজা নতজানু হয়ে মলী সেনের হাত দুটি চেপে ধরলেন। বললেন, "মিষ্টার রয়কে তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না। দোহাই তোমার, তাঁকে তুমি ছেড়ে দাও।"

সকাতর প্রার্থনার ভারে কণ্ঠ তাঁর করুণ, দুর্দ্দমনীয় আবেগে দেহ তাঁর কম্পিত। মলী সেনের কোলের মধ্যে মাথা রেখে কাতর কণ্ঠে বারম্বার বলতে লাগলেন, "দয়া কর, আমাকে দয়া কর, মলিদি।"

স্বভাবতঃ শান্তস্বভাব নীরজার এই অপ্রত্যাশিত আচরণে অভিভূত মলী সেনের যেন আর বাকশক্তি রইল না। কঠিন আঘাতে হতচেতন ব্যক্তির মতো তিনি নিশ্চল নিস্তব্ধ বসে রইলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নীরজা আত্মসংবরণ করে উঠে দাঁড়ালেন। আপন অঞ্চলে অশ্রুসিক্ত দুই চক্ষু মার্জ্জনা করে নিজের আসনে ফিরে গেলেন। ম্লান হেসে বললেন, "আমাকে নিশ্চয় তুমি পাগল ভাবছ। অন্যায় নয়। উন্মাদ না হলে এমন অসম্ভবের পানে আমি হাত বাড়াবো কেন ? কিন্তু আমার সব কথাও আজ তোমাকে শুনতে হবে।"

চিত্রার্পিতের মতো নির্জীব মলী সেন যেন বহু আয়াসে শক্তি সঞ্চয় করে উচ্চারণ করলেন, "বেশ, বল "

নীরজা বিদুষী নয়। কথোপকথনেও তার তেমন দক্ষতা নেই। কিন্তু জগতে সত্য মাত্রেরই একটি অনাড়ম্বর অথচ অপ্রতিরোধনীয় আবেদন আছে। অতি অকিঞ্চিৎকর কাহিনীও তার প্রভাবে হৃদয়-স্পর্শী হয়ে ওঠে। নীরজার মুখে নিরলঙ্কার বর্ণনায় সত্যের সেই ঋজু, সহজ রূপটি তার সামান্য জীবন কাহিনীকেও একটি কমনীয় মাধুর্য্য দান করল।

কন্যা জন্মের পূর্ব্বেই নীরজার পিতা লোকান্তরিত হন। তিন বছর বয়সে মাও মারা গেলেন। মামার বাড়িতে মানুষ নীরজা জ্ঞান হওয়া মাত্রই শুনেছে, সে দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত, তার বিয়ে হওয়া দায়।

আশঙ্কাটা মিথ্যা নয়। তার গায়ের রং মিশ্ কালো, হাত দুটি সরু সরু, কপালটা মস্ত এবং দাঁতগুলি মারাত্মকরূপে অসমান। মামী রাগ করে বলতেন, দিনের বেলায়ও নাকি নীরজাকে দেখে ছোট ছেলেরা আঁৎকে উঠতে পারে।

কিন্তু বিয়ের দুর্ভাবনা দেখা দেওয়ার অনেক পূর্ব্বেই মাতুল ও মাতুলানী গ্রামের মড়কে মরলোক থেকে পরলোকে পাড়ি দিলেন। এক দল খৃষ্টান মিশনারী এসেছিল ঔষধপত্র নিয়ে মহামারী নিবারণে। তাঁদের মধ্যে এক সন্তানহীনা মহিলা নীরজাকে নিয়ে গেলেন কলকাতায়। তাঁরই অনুগ্রহে নীরজা ম্যাট্রিক পাশ করলেন। ততদিনে নীরজার বুদ্ধি হয়েছে। বুঝেছেন, রূপহীনা মেয়েদের কপালে বর নিয়ে ঘর করার সম্ভাবনা অল্প। তাদের খেটে খেতে হয়।

কিন্তু চাকরীর বাজারেও ষ্টেনোগ্রাফার নির্ব্বাচনে অফিসারেরা স্পিডের সঙ্গে চান অন্ততঃ চলনসই চেহারা। শিক্ষয়িত্রী নিয়োগেও স্কুল-কমিটি এম, এ, বি, টি-র মুখ না দেখে ভর্ত্তি করেন না। স্ত্রী জাতীয় পেশার মধ্যে বাকী থাকে নার্সিং। দু'বছর ট্রেনিং নিয়ে নীরজা নার্স হলেন।

বসন্ত দিনের পুষ্পবনে যখন প্রজাপতির মেলা বসে, তখন পথের ধারে নাম-গোত্রহীন অনাদৃত ফুলের চার পাশেও নাকি ভ্রমরের আনাগোনা ঘটে। আশ্চর্য্য নয়। শ্রীহীনা নীরজার দুয়ারেও একদিন ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি প্রসারিত হল। লোকটা হাসপাতালেরই এক জন তরুণ ডাক্তার। তাঁর স্তুতি শুনে নীরজার প্রথম জ্ঞান হলো,—সেও নারী; যুগ-যুগান্ত হতে পুরুষের আরাধনার ধন। ভুলে গেলেন, তিনি কুদর্শনা। মনে হলো, অনুরাগের চন্দনতিলক ললাটে ধারণ করে জগতের সমস্ত কবিজনের কল্পলোকবিহারিণী তিলোত্তমা, হেলেন ও ক্লিওপেট্রাদের

রাজ্যে এই সামান্য নীরজারও একটি অসামান্য পরিচয় আছে।

তারপর একদিন পূজা হলো সাঙ্গ। পূজারী হলেন নিখোঁজ। স্বর্গলোকচ্যুত দেবী তাঁর মাটির মূর্ত্তিতে ফিরে এসে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়লেন ধূপহীন, দীপহীন, ক্ষান্তস্তব, স্তব্ধপাঠ, পরিত্যক্ত মন্দিরের শোকাবহ দীনতার মধ্যে। সেই কলঙ্কিত পরাভবের দুরপনেয় লজ্জায় নিজের কুরূপ নিজের কাছে দ্বিগুণিত কদর্য্যতায় আবার নতুন করে প্রকট হলো।

অশ্রুমোচন করে নতুন হাসপাতালে কর্ম্ম সন্ধান করলেন নীরজা। সেখানেই একদিন এ্যাম্বুলেন্স বহন করে আনল বসন্ত রোগাক্রান্ত মরণোন্মুখ নিখিলকে। তার আরোগ্যের আশা মাত্র ছিল না কারো মনে।

এ রোগে চিকিৎসার সুযোগ সামান্য। পরিচর্য্যাই প্রধান। প্রত্যহ শত শত পীড়িত লোক নিয়ে যাদের কারবার, তাদের কাছে কোন বিশেষ লোকের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ প্রত্যাশা করা বৃথা। হাসপাতালে একজন নতুন রোগী আর একটি নতুন 'কেস' মাত্র। আর কিছু নয়। কেন যে এ রোগীটির প্রতি নীরজার মনোযোগ আকৃষ্ট হলো, তা আজও তার কাছে অজ্ঞাত। ভয়াবহ ছোঁয়াচে ব্যাধির সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করে প্রাণপাত পরিশ্রম ও পরিচর্য্যা দ্বারা নীরজা নিরাময় করে তুললেন নিখিলকে। সে ঋণ নিখিল জীবনে ভোলেননি।

আরোগ্যান্তে নার্সদের পুরস্কার দেওয়ার রীতি নতুন নয়। সত্যি সত্যি প্রাণদান করেছেন যিনি, কৃতজ্ঞ নিখিল তাঁকে স্ফীত অঙ্কের চেক লিখে দিলেন। নীরজা সে টাকা মাথায় ঠেকিয়ে সযত্নে বাক্সে তুলে রাখলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, কোন দুর্দ্দিনে এর একটি কপর্দ্দকও স্পর্শ করবেন না।

বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে চৈত্রের খর রৌদ্রে বিশুষ্ক জলাশয়ের কোন প্রান্তে যে কলমীলতার মূল সঙ্গোপনে লুকিয়ে থাকে, তা কেউ জানে না; নবীন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণেই সেই অদৃশ্য লতার নব পত্রোদগম ঘটে। নীরজার হৃদয়েরও যে ভাবাবেগ একদা প্রবঞ্চনার অগ্নিদাহে নিঃশেষ ভস্মীভূত হয়েছে বলে তার ধারণা ছিল, অলক্ষিত জলসিঞ্চনে কখন যে তার আবার নতুন অঙ্কুর দেখা দিয়েছে, সে সন তারিখ তার জানা নেই।

রেসিডেন্ট ফিজিসিয়নের সঙ্গে ঝগড়া করে হাসপাতালের কাজ ছেড়ে দিতে হলো নীরজাকে। খবর পেয়ে নিখিল এসে প্রস্তাব করলেন, তার অসুস্থ পিসিমাকে প্রত্যহ নিয়মিত দেখা শোনা করার। নীরজা বুঝলেন, পিসিমা উপলক্ষ মাত্র; লক্ষ্য যতদিন তার অন্যত্র স্থায়ী কর্ম্মসংস্থান না ঘটে ততদিন পরোক্ষে অর্থসাহায্য। এপক্ষেও টাকাটা গৌণ, মুখ্য নিখিলের সান্নিধ্য। মাইনে একবেলার, কিন্তু নীরজা দু'বেলাই নিখিলের বাড়ি আসতে লাগলেন। পিসিমার পরিচর্য্যার প্রয়োজন সামান্যই ছিল। দেখা গেল, নার্সেরও রোগীর চাইতে সুস্থ লোকের প্রতিই দৃষ্টিটা যেন বেশী সজাগ। নিখিল দেখেন, আজকাল তার আহার্য্যে নিত্য নতুন ব্যঞ্জন, রুমালে মনোরম সূচীশিল্প, আলমারীতে হাতে বোনা সুদৃশ্য পুলোভার।

এক বন্ধু ডাক্তার নতুন ক্লিনিক খুলছিলেন। নিখিল সুপারিশ চিঠি দিয়ে নীরজাকে পাঠালেন তাঁর কাছে। নীরজা রাস্তায় চিঠিখানা খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন ডাষ্টবিনে। পরদিন এসে নিখিলকে বললেন, ডাক্তার আগেই অন্য নার্স নিযুক্ত করেছেন। চাকরি খালি নেই আর।

ভক্তিমতী গৃহিণীরা পাথরের ঠাকুর পূজা করেন পরম নিষ্ঠায়। নানা উপচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে ধরেন তাঁর সামনে। ঠাকুর প্রসন্ন হন কিনা, কে জানে? নীরজার মনেও সংশয় জাগে। তাঁর অর্ঘ্য কি সমস্তই বৃথা?

অবশেষে পাষাণেও চাঞ্চল্য দেখা গেল। বৈজ্ঞানিকেরা জানেন, সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী ভূখণ্ডের মৃদুতম কম্পনটুকু পর্য্যন্ত রেখাপাত করে। তার চাইতেও বহুগুণ স্পর্শকাতর তন্ত্রী আছে মানুষের হৃদয়ে। দৃষ্টির অগোচর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনের সামান্য আভাষটুকু পর্য্যন্ত ধরা পড়ে তাতে। নীরজা আবিষ্কার করলেন, ক্লাবের প্রতি সম্প্রতি নিখিলের মনোযোগটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সভয়ে অনুমান করলেন, আকর্ষণটা কেবলমাত্র তাস বা টেনিস বলের মতো নির্জীব বস্তুর প্রতি নয়।

নিখিলের উদ্যোগে ক্লাবে ভর্ত্তি হওয়া নীরজার পক্ষে কঠিন নয়। সেখানে প্রথম পদার্পণেই বুঝতে পারলেন, কোথায় আছে নিখিলের আনন্দের উৎস, কার হাতে আছে নীরজার মৃত্যুবাণ। অনুরক্ত নারীর

চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। তার দৃষ্টি দূরবীক্ষণের মতো সন্ধানী, অণুবীক্ষণের মতো তীক্ষ্ণ।

নীরজার আত্মকাহিনী সমাপ্ত হলে মলী সেন কয়েক মিনিট অধোমুখে চুপ করে রইলেন। তারপর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি আশা কর, মিষ্টার রয় তোমাকে বিয়ে করবেন?"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিত নীরজা উত্তর দিলেন, "না। আমি জানি সে কোন দিন সম্ভব নয়।"

"তিনি তোমাকে ভালোবাসেন?"

"জানিনে।"

"মিথ্যে কথা। পুরুষের ভালোবাসা টের পায় না এমন মেয়ে জগতে নেই। তুমি ভালো করেই জানো, তোমার প্রতি তার আকর্ষণ নেই।" দৃঢ় কণ্ঠে বললেন মলী সেন।

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে নীরজা বললেন, "হয়তো তোমার কথাই ঠিক।"

"তবে?"

সত্যি তো, এই তবের কোনো জবাবই নেই নীরজার। কী কামনা করে সে? কিসের প্রত্যাশা তার? কেন এই ঈর্ষাভারাক্রান্ত হৃদয়ের নিরন্তর আকুলি-বিকুলি?

নীরজা বললেন, "মলীদি, যুক্তি দিয়ে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। সত্যি বলছি তোমাকে, এতদিন ভাবতেম আমার মনে ঝাপ্‌সা কিছুই নেই। জানতেম, মিষ্টার রয় চিরকাল একেলা থাকবেন না। একদিন তাঁর ঘরে সত্যিকার গৃহকর্ত্রী আসবে; মাইনে-করা নার্সের নকল গৃহিণীপনার আর প্রয়োজন থাকবে না। সেদিন দুঃখ করব না। যথার্থ অধিকারীর হাতে আমার গায়ে-পড়া দায়িত্বভার তুলে দিয়ে সহজভাবেই আমি বিদায় নেবো। কিন্তু সম্প্রতি বুঝেছি, সে সমস্তই ভ্রান্তি। বুঝেছি নিজের মনকেও মানুষ সব সময়ে ঠিক বুঝতে পারে না।"

মলী সেন মুরুব্বীয়ানার ভঙ্গিতে বললেন, "সেজন্যেই আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন।"

নীরজার কাণে এ কথা আদৌ প্রবেশ করল কি না সন্দেহ। তিনি আপন বক্তব্যেরই অনুবৃত্তি করে বলতে লাগলেন, "কতদিন কল্পনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি যে, যতটুকু পাওয়া সম্ভব, তার বেশীতে আমার লোভ নেই। বাস্তবের প্রথম আঘাতেই সে ভুলের ঘোর ভেঙেছে। যাঁকে আমার হাতে পাইনি, তাঁকে তোমার হাতে হারাবার শঙ্কাতে আজ আমি অস্থির। বুঝেছি, নাটক উপন্যাসের মহীয়সী নায়িকার মতো নিঃস্বার্থ প্রেমের গৌরব ঘোষণা করা আমার সাধ্য নয়। যে বলে, ভালোবেসেই সুখী, প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখিনে, না মলিদি, সে মেয়ে আমি নই।"

মলী সেন এমন সতেজ-সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কী চাও?"

"আমি মন দিতে চাই, মন নিতে চাই।"

মলী সেন কিছুটা বিদ্রূপ কিছুটা বা যুদ্ধের ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, "বটে? কিন্তু মাই ডার্লিং, ভালোবাসা তো ক্রিসমাস্ প্রেজেণ্ট নয়। স্যাণ্টাক্লস তা কারো জন্যে বয়ে আনে না। সেটা জয় করার ধন; ভিক্ষে করার নয়।"

"আমি বুঝেছি। কিন্তু তোমার এ চ্যালেঞ্জের কোন বাহাদুরী নেই, মলিদি। প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে সমানে সমানে। তুমি আর আমি কি এক? তোমার অসামান্য রূপ, তোমার প্রখর বুদ্ধি, তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার সামাজিক প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে তুমি দাঁড়িয়েছ অতি কুরূপা, কুলহীন, বিত্তহীন, নগণ্য এক নারীর বিরুদ্ধে। এ যে মোহনবাগানের সঙ্গে নেবুতলার ম্যাচ্। এই জয়ের বড়াই কর তুমি? ধিক!"

মলী সেন ড্রেসিং টেবিলের উপরে ঘড়িটার পানে তাকিয়ে বললেন, "অভিনয় সুরু হওয়ার আর বেশী দেরী নেই। আমাকে তৈরী হতে হবে, নীরজা। এ প্রসঙ্গ থাক। সেকালে স্বামী নিয়ে ঝগড়া হতো সতীনে সতীনে। কিন্তু একালে সখা নিয়ে কলহ চলে না কারো সঙ্গে। অন্ততঃ নার্সের সঙ্গে তো নয়ই।"

কঠিন অপমানের তীব্র আঘাতে মুহূর্ত্তের জন্য নীরজার সমস্ত দেহ যেন অসাড় হয়ে গেল। চোখে অন্ধকার দেখলেন। দুই হাত দিয়ে ওয়ার্ড্রোবটার প্রান্ত দুটি সবলে চেপে ধরে কোনমতে যেন নিজকে পতন থেকে রক্ষা করলেন। কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুমি আমার চেয়েও অযোগ্য, তোমাকে ঈর্ষা করব না, করুণা করব।"

ধীর, শান্ত, সংযত পদক্ষেপে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন নীরজা। দীনার মত সঙ্কোচে নয়, রাণীর মতো গৌরবে।

[ক্রমশঃ।

আকাশ-পাতাল

অ, আ, ই

চকমকি ঘষে গাঁজার কল্কেটা ধরিয়ে ফেললে অনন্তরাম। নিঝুম রাত। শুধু ঝিঁঝির কীর্ত্তন চ'লেছে। মশা উড়ছে ভোঁ-ভোঁ। কাজল-কালো অন্ধকারে ডুবে গেছে যেন সকল কিছু। কল্কেয় আগুন ধরাতে ধরাতে অনন্তরাম হাই তুললে কয়েকটা। টপ্পা শুনতে যাওয়ার ঠিক ছিল, খাওয়া-দাওয়া ক'রে যাবে ভেবেছিল। শেষ পর্য্যন্ত গেল না অনন্তরাম। ভূষো-পড়া লণ্ঠনটা পাশেই ছিল। জ্বালাবে মনে ক'রেছিল, জ্বালিয়ে খানিক পড়বে যতক্ষণ না ঘুম আসে চোখে। গড়-গড় ক'রে না হ'লেও অনন্তরাম বাঙলা পড়তে জানে। কবে শৈশবে পড়তে শিখেছিল গ্রামে থাকতে। পড়েছিল বোধোদয়, ঈশপের গল্প। শিখেছিল শুভঙ্করী। এখন অনন্তরাম ফাঁক পেলে পড়ে বিল্বমঙ্গল, লয়লা-মজনু, হাতেমতাই, গোপালভাঁড়, আলিবাবা। বই থাকে প্যাটরায় লুকানো, লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে পড়ে অনন্তরাম। বটতলা থেকে বই কিনে আনে। ভেবেছিল টপ্পা শুনতে যাবে, চিৎপুরে কাদের চত্বরে টপ্পা-গায়েন হচ্ছে। গাঁজার কল্কেয় টান দেয় অনন্তরাম। অন্ধকারে কল্কেটা রাঙা হয়ে ওঠে। অনর্গল ধোঁয়া ছাড়ে অনন্তরাম। বোধ করি দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে যায় ঘরটা। অনন্তরামের ঘর। মহলযুক্ত সুদীর্ঘ গৃহে একটা পরিত্যক্ত ঘর বেছে নিয়েছে অনন্তরাম। ঘরে আছে অনন্তরামের বাক্স-প্যাটরা! দেওয়ালের কোণে আছে কয়েকটা বল্লম, বর্শা, ভোঁতা খাঁড়া। কখনও যদি প্রয়োজন হয়।

—অনন্ত!

চমকে ওঠে যেন অনন্তরাম। নিশুতি রাতে হঠাৎ ডাক শুনে। মেয়েলী গলায় অস্ফুট ডাক। নিশির ডাক নয় তো?

প্রথম ডাকে সাড়া দেয় না অনন্ত। কল্কেটা লুকিয়ে ফেলে।

—অনন্ত! অনন্ত শুনছো?

—শুনছি।

—দূর ছাই, ভালো লোক তো!

—তুমি লোকটা কে? শুধোয় অনন্তরাম। বলে,—কে, নিশি না?

হ্যাঁ, নিশিই তো ডাকছে। নিশীথে দেখা দিয়েছে। ডাকছে ফিসফিসিয়ে।

—হাঁ, নিশিই বটে। তুমি ছাই কোথায়?

নিশির কথা ভয়-জড়ানো। চোরের মত। অন্ধকারে মিশে গেছে নিশি। কষ্টি কুঁদে তৈরী যেন নিশি। নিটোল দেহ, শিলামূর্ত্তি যেন। খাটো শাড়ীতে আঁটসাঁট বেঁধেছে দেহটা। তবুও যেন উপ্‌ছে পড়ছে নিশির দেহের কিনারা। জড়ানো-শাড়ী থেকে মুক্ত হতে চাইছে। মাথা থেকে তেল গড়িয়েছে মুখে, মুখটা তৈলাক্ত। মাথার চুল চূড়া ক'রে বেঁধেছে নিশি। বেশ টেনে আঁচড়ে বেঁধেছে। চূড়ায় গুঁজে দিয়েছে একটা পাশচিরুণী। চিরুণীতে লেখা আছে কি একটা বচন। গলায় আছে কণ্ঠি। গলায় জড়িয়ে আছে।

—ডাকাত পড়েছে বুঝি? শুধোয় অনন্তরাম।

—হাঁ, উদ্ধার কর তুমি। নিশি ফিসফিস করে। বলে,—চোখে পোড়া দেখতে নারি। তুমি ছাই কোথায়?

—আয়। বলে অনন্তরাম।—ডর নাই, চলে আয়।

—বর্শায় বিঁধে যাবো না তো? তোমার ঘরে সড়কি, বল্লম ছড়িয়ে থাকে যে।

হেসে ফেললে অনন্তরাম। বললে,—বিঁধে তো গেছিস। ভয় কেনে?

চাপা-গলায় খিলখিল করে হাসে নিশি। হাসির বেগে দুলে উঠলো যেন দেহটা। বললে,—বুকটা যে ছরকুটে গেছে। বিঁধেছে যে বুকে। হাসতে হাসতেই বললে,—দেখ না কেনে, ঘা দগদগ করছে। জ্বালা ধরছে যখন-তখন।

অনন্তরাম ডাক শুনে ভেবেছিল কে না কে। নিশিকে দেখে কল্কেটা আর লুকোয় না। কড়া টান দেয়। ধোঁয়া ছাড়ে অনর্গল। কল্কের আগুন দেখে এগোয় নিশি। পা টিপে-টিপে। অনন্তরাম জিজ্ঞেস করে,—তোর মা কোথায়?

নিশি কথার সুরে খুশীর আমেজ টেনে বললে,—ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে এতক্ষণে। দম নেয় নিশি। বলে,—আমিও শুয়েছিনু। পোড়া চোখে ঘুম আসে ছাই। উঠে এলাম।

—বেশ ক'রেছিস। বললে অনন্তরাম।—ঘরে যাবি কবে?

নিশি বললে,—ভেবেছি যাবো না। তুমি কি বল?

চাকুরী করতে করতে অনন্তরাম দেখেছে কত কি। এমন কত নিশিকে দেখেছে।

—যাবি না? অনন্তরামের কথায় বিস্ময়।

অন্ধকারে নিশি গান জুড়ে দেয়। গানের মধ্যে কথার উত্তর শুনতে পায় অনন্তরাম। নিশি ইচ্ছাকৃত রুদ্ধকণ্ঠে গাইতে থাকে :

যেতে তুমি ব'লো না আমায়।
যেতে যে ভাই পা চলে না,
যাওয়ার নামে ভয়ে মরি, হায়
চোখের আড়ালে রাখি,
যেতে যে ভাই মন চলে না॥

গানটা শুনলে অনন্তরাম কান খাড়া ক'রে। দেখলো নিশির মায়ের মেয়ে নিশিকে, বর্ষার বাঁধভাঙ্গা খরস্রোতা যেন। উথলে উঠছে যেন কূলে-কূলে। অনন্তরাম বললে,—ভয়-ডর নেই তোর নিশি! কেউ যদি শোনে?

নিশি হাসির হিল্লোল তুলে গায়:

আমরা যে লজ্জার মুখে মেরেছি ঝাঁটা,
যা খুশী হয় বলুক লোকে,
কার যাবে মাথা কাটা॥

নিশি বৃত্তিভোগী দাসী নয়।

নিশির মা দাসীদের অন্যতমা। যম দয়া করছেন না, যে জন্য এখনও নিশির মা বেঁচে আছে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আটের কোঠাতে গিয়েও। নিশি ছিল না, মা'র কাছে এসেছে হুজুরের বিয়েতে। বিয়ে হয়ে গেছে নিশির, থাকে শ্বশুর-ঘরে। কাটোয়ায়। অজয় নদের তীরে।

অনন্তরামকে দেখে কেন কে জানে মিটি-মিটি হেসেছে নিশি। যত বার দেখা হয়েছে তত বার। প্রথমে কেমন খটকা লেগেছিল অনন্তরামের, নিশির মতি-গতি অবোধ্য ঠেকেছিল। লক্ষ্য ক'রে-ক'রে বুঝেছিল অনন্তরাম। দেখেছিল নিশির মুখে কেমন যেন ধূর্ত্তামি। আড়ালে পেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল অনন্তরাম। বলেছিল,—ছেনাল।

নিশি আপত্তি করবে না, খিলখিল ক'রে হাসির জোয়ার তুললে।

অনন্তরাম বললে,—হ্যাঁ রে নিশি, শেয়াল ডেকেছে?

—হাঁ ডেকেছে। দু'-দু'বার ডেকেছে। বললে নিশি।

—ভোরে উঠেই যেতে হবে গাড়ী নিয়ে হুজুরের পিশীকে আনতে।

বেশ ক্ষোভের সঙ্গে কথাগুলো বললে অনন্তরাম। কাছারী থেকে হুকুম হয়েছে অনন্তরামের প্রতি। আগামী প্রাতে গাড়ী নিয়ে যাবে কর্ত্তা মশাইদের মাননীয়া ভগিনী হেমনলিনীর গৃহে। অনন্তরামের কেয়ারে তিনি আসবেন।

হোক রাত্রি, হোক না যত ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঘড়ি-ঘরের বিরাম নেই। যারা ঘড়ির কাঁটা দেখে ঘড়ি বাজায়, ছুটন্ত সময়কে ধ'রে রাখে, তাদের ছুটি নেই। অন্ধকারকে যেন তিরস্কার করতে করতে বেজে চললো ঘড়ি-ঘর। নিশি অনন্তরামের পিঠে একটা হাত রাখে হঠাৎ। নেহাৎ কালোয় তখন কিছু দেখা যাচ্ছে না, নয় তো অনন্ত নিশির মুখটা দেখতো। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না, নিশি চিবুকটা ঠেকায় অনন্তরামের কাঁধে। ঘড়ি-ঘরের ঘণ্টা শুনে কত যেন ভয় পেয়েছে।

অনন্তরাম শুধু বলে,—আয়, কাছে আয়।

নিশি কাছেই ছিল। বললে,—অনন্ত, বৌটাকে খুশী দেখছিনে তো। কেনে বল তো?

অনন্তরাম কথায় হাসি ফুটিয়ে কথা কয়। বলে,—দেখে-শুনে বুঝে ফেলেছে যে। হুজুরের যে এক বিবিজান জুটেছে। হুজুর এখন নিয়মমত লাল জল খেতে শিখেছে। যা হয়ে থাকে হয়েছে। মালিকানা পেয়ে উড়তে লেগেছে।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো নিশি। বললে,—হুজুরদের একটা মেয়েমানুষে চলে না কি! আহা, জানবে কেমনে, বৌটা যে ছেলেমানুষ।

—যথার্থ কথাটা তুই-ই বললি নিশি। দ্যাখ, না, হৈ-হৈ প'ড়ে গেছে। কেঁদে-কেঁদে চোখ দুটোকে রাঙা ক'রে ফেললে বৌটা! বললে অনন্তরাম। বললে,—এখন টাইম বদলে গেছে। কর্ত্তাদের দু'জন ছিলেন দেবশিশু। একটা দিনের তরেও বেচাল দেখা গেল না! ছেলেটা যে হয়েছে মুখ্যু, আহাম্মুক!

অনন্তরামের কথাগুলো শুধু শুনে যায় নিশি। বলে না কিছু। অনন্তরাম বলে,—বৃথা মাংস কখনও কর্ত্তাদের মুখে তুলতে দেখি নাই। ছেলে কাক-বক মেরে খাচ্ছে! মুরগী চিবোচ্ছে?

এমন কত যে তুলনামূলক কথা বলে যায় অনন্তরাম, নিশি শুনতে শুনতে বুঝি বা ঘুমিয়ে পড়ে অনন্তরামের কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে।

—ঘুমোলি? কখনও হয়তো শুধোয় অনন্তরাম।

ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে নিশি বলে,—না না।

অনন্তরাম যেন জানতো, নিশি এই রাতেই না হোক যে কোন এক দিন দেখা দেবে বিজনে। চাকুরী করতে করতে এমন কত নিশিকে দেখেছে পুরাতন ভৃত্য অনন্তরাম। নিশি বুঝি মুগ্ধ হয়ে গেছে অনন্তরামের পেশীগুলো দেখে। আবলুস কাঠের মত ঘন কালো রঙে। অনন্তরামের মুখে কোমলতা নেই, আছে ক্রূর, হিংস্র কাঠিন্য। তবুও নিশি হেসেছে যখন তখন, দেখিয়েছে দেহটা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়েছে।

যখন ভোর হ'ল, তখন শুধু খিলানে কবুতরের দল জেগেছে, নয় তো দুর্গ-পুরী সুপ্তিমগ্ন। নাটমন্দিরে পুরোহিত জেগেছেন। অনুচরেরা কেউ কেউ উঠে মন্দির মার্জ্জনা করছে। স্তব্ধ সকাল, শুভ্র হয়েছে দিগন্ত। পুরোহিত সিন্দূরপরিশোভিত গণ্ডযুগ্মের স্তোত্র বলছেন। বিলাসচতুর গৌরীপুত্র গণেশের। ভোরের হাওয়ায় টলমলিয়ে উঠছে জবা আর মল্লিকার ঝাড়। মালী দূর্ব্বা তুলসী চয়ন করছে পূজার্থে। ভোরের ভোঁ বেজে চলেছে শহরতলীতে কোথায়। পুরোহিতের উচ্চারিত স্তব বুঝি হাওয়ায় ভাসছে।

ময়লা-ফেলা গাড়ীগুলো পথে বেরিয়েছে। চাকার শ্রুতিকটু শব্দে মুখরিত হয়ে উঠলো পবিত্র প্রভাত!

মনটা পুরোহিত মশায়ের কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। পূর্ণশশীকে দেখে, পূর্ণশশীর মুখে কাতর মিনতি শুনে পর্য্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে আছেন। বধূটির অসহায় মুখাকৃতি বারে

বারে জেগে উঠছে। মুহূর্ত্তের জন্য পুরোহিতের অনুভূতিতে কি দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ দেখা যায়? কি অপরূপ মুখশ্রী বধূটির, কি অপূর্ব্ব গঠন, চোখে কি বিনম্র দৃষ্টি! কি মিষ্টি বাচনভঙ্গী। স্মৃতির লাগাম কষেন পুরোহিত। ভোরের স্নিগ্ধ আকাশে চোখ তুলে বধূটির মুখ ভুলতে সচেষ্ট হন। ধিক্কার দেন স্বীয় মনোভাবকে। গণনাথের মন্ত্র আওড়াতে থাকেন। সূর্য্যস্তোত্র। নাটমন্দিরে ধূপ ধূমায়িত হয়। হাওয়ায় অগুরুগন্ধ।

চোখ মেলে শুভ্র আকাশ দেখেই ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো রাজেশ্বরী।

বেলা হয়ে যাওয়ার লজ্জায় তাড়াতাড়ি উঠে দ্বার খুলে বেরিয়ে দেখলো কে কোথায়। খিলানে কবুতরেরা শুধু ডাকছে। পাখা ঝাপটাচ্ছে। পিশীমা হেমনলিনী আসবেন, এসে দেখবেন বৌ তখনও ঘুমোচ্ছে, সেই লজ্জাতেই চোখে বুঝি ঘুম ছিল না। অনুমানে বোঝে রাজেশ্বরী, আকাশই ফর্সা হয়েছে, বেলা বেশী হয়নি। হেমনলিনীই শিখিয়ে দিয়েছেন, প্রত্যহ সকালে নাটমন্দিরে যেন যাওয়া হয়। কুলবধূর কর্ত্তব্য। যেখানেই যাক, এলোকেশীকে যে চাই। কিন্তু কোথায় এলোকেশী, কোথায় কে। ঘুমোচ্ছে কোথায় কে জানে। ভাল ক'রে এখনও চেনা-জানা হয়নি। এলোকেশীকে সঙ্গে না নিয়ে যাওয়া যায় পুকুর-ঘাটে! বৌ-মানুষ হয়ে। রাজেশ্বরী চুল খুলতে থাকে খোঁপার বিনুনী থেকে।

শয্যাসঙ্গী তখনও ঘুমে অচেতন। রাজেশ্বরী বেলা হয়ে যাওয়ার ভয়ে এগোয় দাসীদের এলাকার দিকে। কেউ কোথাও নেই, ভোরের থমথমে আবহাওয়ায় বুঝি ভয়-ভয় করে। দাসীদের ঘরের কাছাকাছি গিয়ে ডাকে রাজেশ্বরী,—ও এলো, এলো।

এলোকেশীর সাড়া পাওয়া যায় না। সাড়া দেয় বিনোদা। ঘর থেকে বেরিয়ে বলে,—সাতসকালে উঠে পড়েছো বৌদিদি! ডেকে দিই এলোকেশীকে। কাকপক্ষী ওঠেনি যে এখনও।

রাজেশ্বরী বললে,—হ্যাঁ বিনোদা। পিশীমা আসছেন, খাওয়া-দাওয়া করবেন, জোগাড়জাত করতে হবে না?

হাসে বিনোদা। বলে,—আক্কেল তো দেখছি খুব। গিন্নী হয়ে গেছে বৌদিদি আমাদের। ডেকে দিই এলোকেশীকে। বলি ও এলোকেশী। উঠে পড়' গো ভালমানুষের মেয়ে। বৌদিদি উঠে ডাকতেছেন তোমাকে।

কথার শেষে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বিনোদা। বিনোদার বাসি মুখের দু'পাশে পান খাওয়ার গড়ন্ত চিহ্ন। বিনোদা দেখে রাজেশ্বরীকে। ভোরের টাটকা আলোয় এমন স্পষ্ট কোন দিন দেখতে পায়নি বিনোদা। চোখে ঘুম-ভাঙ্গা দৃষ্টি, এলোমেলো রুক্ষ চুলের বোঝা নেমেছে পিঠে। বাসি রূপের বোধ করি বিশেষ এক আকর্ষণ আছে—বিনোদা চেয়ে থাকে অবাক চোখে। রাজেশ্বরী বললে,—বিনোদা, ব্রাহ্মণীকে বল' উনুন ধরাবে।

চক্ষুলজ্জায় মরে যায় যেন এলোকেশী। রাজেশ্বরী উঠে প'ড়েছে অথচ ঝি হয়ে এলোকেশী তখনও ওঠেনি!

নাট-মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজে।

হয়তো পূজায় ব্রতী হয়েছেন পুরোহিত। এক জন অনুচর ধূম্রমান ধুনাচি ঘরের দ্বারে-দ্বারে দেখাতে বেরিয়েছে। অন্য এক জন গঙ্গাজলের ছিটে দিচ্ছে।

ক্রমে ক্রমে ঘুমন্ত শহরও জেগে উঠলো। কলের ভোঁ বাজতে বাজতে ক্লান্ত হয়ে কখন ক্ষান্ত হয়ে গেছে। পথে মানুষ দিয়েছে দেখা। পুণ্যার্থী গঙ্গাযাত্রী। ভিস্তি কাঁধে মেথর পথ ধৌত করে। ঝাড়ুদার সাফ করে পথ। কোচম্যান আবদুল জুড়ী ছোটায় অনন্তরামকে পাশে নিয়ে। বীরদর্পে জুড়ী ছুটতে থাকে পথিকজনকে সচকিত ক'রে। মালিক তখনও ঘুমে অচেতন। প্রথম সূর্য্যালোক দেখার সৌভাগ্য হয় না কোন দিন। কিন্তু সময়ের কেউ মালিক নেই। ঘড়ি-ঘর সময় জানান দেয়।

কাছারীতে কাজে মন দেয় আমলাতন্ত্র। দলিল-দস্তাবেজ খোলাখুলি হচ্ছে। আমিন আদায় ওয়াশীলের কাগজাত পরীক্ষা করে। খাতাঞ্চী আয়-ব্যয় হিসাব করে। জমানবিশ রেজেষ্ট্রী ওলটায়। মোক্তার মকদ্দমার কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে। মহাফেজ দলিলাদি পর্য্যবেক্ষণ করে। মুন্সী মফঃস্বলে পত্রোত্তর লিখতে বসে। কড়চা, সেহা, চেকমুড়ী, রোকড় এবং জমাওয়াশীলবাকির নথিপত্র স্তূপীকৃত হ'তে থাকে। মালিক শুধু তখনও ঘুমে অচেতন থাকেন।

নাটমন্দিরে প্রণাম ক'রে ভাঁড়ার দিতে চলেছিল রাজেশ্বরী।

ব্রাহ্মণীর সঙ্গে দেখা হ'ল মুখোমুখি। ব্রাহ্মণী বললে,—পিশীমা ঠাকরুণ খাবেন, কি রাঁধতে দেওয়া হবে? দু'টো উনুন জ্বলে যাচ্ছে।

কথাটা রাজেশ্বরীও ভেবেছিল। পিশীমাকে কি খাওয়াবে ভেবেছিল মনে মনে। রাজেশ্বরী বললে,—আমি কি ব'লবো বল'? আমি তো জানি না।

অন্দরের কাছাকাছি কোথায় ছিল বিনোদা।

হরিনামের মালা জপছিল। হয়তো কথা ক'টা বিনোদার কানেও পৌঁছেছিল। বিনোদা বললে,—দু'দিনের বৌমানুষ, ও জানবে কোত্থেকে বামুনদি! পিশীমা এয়োস্তিরি মানুষ, খাবে মাছ-মাংস। মাছের ভালমন্দ কিছু কর।

হঠাৎ দৈববাণী শুনলে যেমন বিস্ময় উপস্থিত হয়, রাজেশ্বরী তেমনি বিস্মিত হ'য়ে পড়ে হঠাৎ কথা শুনে। যদিও মিথ্যা বলেনি বিনোদা। মালা জপতে জপতে বললে বিনোদা,—নায়েবদের ব'লে পাঠাও মাছ কিনে আনিয়ে দিক। মাছের ঝাল, ঝোল, পোলাও, মুড়ীঘণ্ট যা খুশী কর', ল্যাটা চুকে যাবে। আমি জানি পিশীকে, পিশীর যে মাছের নোলা!

ব্রাহ্মণী বললে,—ঠিক কথা। বিনো অন্যায় বলেনি।

রাজেশ্বরী বললে,—তবে তাই হোক।

বিনোদা তখনও থামে না। বলে,—মাছটা আনতে পাঠাও, বেলা হ'লে ভাল মাছ মিলবে না। গোবিন্দভোগ চালের ভাতটা ততক্ষণ চাপিয়ে দাও। দুধটা ফোটাতে দাও। চিঁড়ে বার হোক, পায়েস তৈরী কর'।

সমস্যা তো চুকেই গেল। রাজেশ্বরী বললে,—তবে, মাছটা যাতে শীঘ্রি আনে ব'লে দাও ব্রাহ্মণী।

ব্রাহ্মণী বলে,—ব'লে দিচ্ছি। তুমি বৌদিদি জল খাও আগে।

চাতালে তিনটে রূপোর রেকাবী সাজানো, দেখলো রাজেশ্বরী। একটায় ছাড়ানো ফল, একটায় মিষ্টান্ন, একটায় কতগুলো ফুলকো লুচি; আলু-পটল ভাজা। রাজেশ্বরী দেখে তো হেসে ফেললে।

কাছারী থেকে লোক পাঠিয়েছে অন্দরে। লোক খোঁজ নিতে এসেছে, হুজুর কি শয্যাত্যাগ ক'রেছেন? একটি জরুরী চিঠি আছে, হুজুরকে লেখা। মালিক ব্যতীত কেহ খুলিবেন না, লেখা আছে লেফাফার গায়ে। পত্রবাহক হুজুরের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

রাজেশ্বরী ঘোমটা টানে মাথায়। ব্রাহ্মণীকে বলে ফিসফিসিয়ে—ঘুম থেকে ওঠাতে বল না।

কেউ সাহসী হয় না। হুজুরের কাছে এগোয় কার সাধ্য! অনন্তরাম থাকলে না হয় কথা ছিল। অনন্তরাম গেছে হেমনলিনীর গৃহে। বিনোদা হরিনাম শেষ ক'রে উঠে আসে। ব্রাহ্মণীর মুখে ঘুম থেকে তোলার কথা শুনে বলে,—কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে ঘুম থেকে ডেকে তুলবে ছেলেকে? গরজ থাকে তো অপিক্ষা করতে বল চিঠি নিয়ে।

লোক খোঁজ পেয়ে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়। পত্রবাহক অপেক্ষাই করে। পত্রাধিকারীর সাক্ষাৎ না পেয়ে যাবে না বাহক। কাছারী থেকে প্রশ্ন করা হয়, কে দিয়েছে পত্র, কোথা থেকে আসা হয়েছে। কিন্তু বাহক বলতে চায় না। বলে,—হুজুরকে ব'লবো।

আমলা-তন্ত্র বিস্মিত হয় বিষয়টায়। অথচ পত্রবাহক ভদ্রবেশী নয়। চাপরাসির মতই আকৃতি।

প্রথম সূর্য্যালোকে স্বচ্ছ হয়েছে আকাশ। পেঁজা তুলার মত ছিন্নভিন্ন মেঘে পরিপূর্ণ হয়ে আছে আকাশ। পুরোহিত আকাশে চোখ তুলে চিন্তামগ্ন হয়ে থাকেন। কপালের বলিরেখাগুলি কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। পুরুষানুক্রমে বেতনভোগে পৌরোহিত্য করছেন পুরোহিত। বোধ করি কখনও মনটা যেন কিছুতে এত আচ্ছন্ন হয়নি।

—চরণামৃত দিন। উপবাসী আছি, চরণামৃত খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করব।

পুরোহিতের জরাগ্রস্ত অপটু দেহটা যেন চমকে শিউরে ওঠে। কে কথা বলে? সেই বধুটি কি, না অন্য কেউ? নাট-মন্দিরের দালানে বসেছিলেন পুরোহিত। পিছনে দৃষ্টি ফেরাতেই দেখলেন এক জন মহিলা। প্রাপ্তবয়স্কা হ'লে কি হবে, রূপের জৌলস আছে অক্ষুণ্ণ।

—কে মা তুমি? কম্পিত কণ্ঠে বললেন পুরোহিত।

—চিনতে পারলেন না আমাকে? আমি হেম।

লজ্জা পেলেন যেন পুরোহিত। কিছুটা অপ্রস্তুত হ'লেন। বললেন,—কিছু মনে ক'র না মা! কখন এলে মা? কুশল তো?

—হ্যাঁ। এলাম এখনি।

ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন হেমনলিনী কথার শেষে।

—জয়তু। কম্পমান হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন পুরোহিত। বসেছিলেন, উঠে পড়লেন। বললেন,—তিষ্ঠ, চরণামৃত দিই।

পুরোহিতের অন্যান্য অনুচরগণ পলকে দেখে নেয় কেউ কেউ, মৃত গৃহস্বামীদের ভগিনীকে। হেমনলিনী অতি দুঃখে কালাতিপাত ক'রে চ'লেছেন। এখনও যেন চক্ষুপ্রান্ত অশ্রুসিক্ত দৃষ্ট হয়। তবুও মুখে হাসি ফুটিয়ে কথা বলেন হেমনলিনী। অনাবিল মন-খোলা হাসি। তবুও পরিধান করেন শুভ্র ধৌতবাস। অঙ্গে তোলেন দু'-একটা গয়না। পায়ে অলক্তক।

কি অপূর্ব্ব মানিয়েছে হেমনলিনীকে! কটিদেশে জড়িয়ে আছে মুঘলাই মোহরের বিছা। দিবালোক পেয়ে জল্-জল্ করছে শেলীর মুক্তাগুলো। কর্ণমূলে চঞ্চল দু'টি বাঘের নখ।

প্রথম পূজা শেষ হয়ে যায়। নাট-মন্দিরের দেওয়ালে দৃষ্টিপাত করেন পুরোহিত। দেওয়ালের ঘড়িটা দেখেন। বেলা কত হয়েছে। হয়তো দেখেন, বেলা একটা বাজতে দেরী আছে কত। বধুটির মুখটি কেন এত ঘন ঘন মনে উদিত হয়। বধুটির বেদনা-কাতর মুখ—অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য সে মুখে। পুরোহিত লোলচর্ম্মা বৃদ্ধ। বার্দ্ধক্যের জরায় শরীরটার ধনুকের মত আকার হয়েছে। কপালে বলিরেখা ফুটেছে। চোখে দৃষ্টিহীনতা। তবুও ক্ষণেকের জন্য পুরোহিতের অনুভূতিতে চাপল্যের উন্মেষ হয়। কখনও যা হয় না।

কত প্রতীক্ষার পিশীমা এসেছেন।

হেমনলিনীকে দেখে রাজেশ্বরী যেন অকূলে কূল দেখলো। দেখেই হাসলো একমুখ। ভাঁড়ারে ছিল রাজেশ্বরী, বেরিয়ে পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম করলে পিশীমাকে। বললে,—চলুন, ঘরে চলুন। কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি!

বৌকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন হেমনলিনী। মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। বললেন,—তুই ভালো আছিস তো? আমার ভাইপোটি?

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য ম্লান হয়ে যায় মুখটা। অধোবদন হয়ে বলে রাজেশ্বরী,—হ্যাঁ, বেশ ভাল আছি। তবে ঠাগ্‌মার

জন্যে মাঝে-মাঝে মনটা ভাল লাগে না। দেখতে ইচ্ছা হয়। পিশীমা, ঘরে চলুন।

—ব্যস্ত হয়ো না বৌ। সহাস্যে বললেন হেমনলিনী।— তুমি তো কালকে এয়েছো, আমি যে এখানে মানুষ হয়েছি। কেমন লাগছে বল'। ঘর-দোর চিনে জেনে নেওয়া হয়েছে ?

বিনোদা ছিল বঁটিতে। কুটনো কুটছিল। আলুর দমের আলু। বললে,—তোমাকে বলতে হবে না। লক্ষ্মী মেয়ে বটে, কোন' হাঙ্গামা নেই। কথায়-বাত্তায় কাজে-কম্মে বৌ খু—ব দড় হয়েছে। পিশীমা আসবে শুনে ওবধি হেদিয়ে হেদিয়ে গেল। উঠেছে কখন ? আকাশে নক্ষত্র থাকতে উঠেছে। পিশীমা খাবে এখানে, ভাবনায় ঘুম নেই চোখে!

হেমনলিনী কথায় কৃত্রিম ক্রোধ ফুটিয়ে বললেন,—হ্যাঁ বৌ, সত্যি ? এমন জানলে আসতুম না তো।

হেমনলিনী যা বলছেন যেন শুনতেই পায় না রাজেশ্বরী। স্তব্ধ-বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। চোখে যেন ফুটে ওঠে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি। যত দেখে ততই যেন অবাক হয়। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। বলতে গিয়েও নয়।

—হ্যাঁ বৌ, বড়মা এসেছিল শুনলুম ? অনন্ত বললে। কি দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলে ? হেমনলিনীর কণ্ঠে সাগ্রহ কৌতূহল।

রাজেশ্বরী যেন শুনতেই পায় না। দেখে, হেমনলিনীকে দেখে। আরও চোখ ছুটো বিস্ফারিত করে দেখে। হেমনলিনীর শেষ কথাটা বোধ করি কানে পৌছেছিল। রাজেশ্বরী বললে,—জড়োয়া টায়রা দিয়ে।

—আমি এসেছি, তুমি বৌ ভাঁড়ারে বসে থাকবে ? চল, তোমার ঘরে চল। বললেন হেমনলিনী।

হাসলে রাজেশ্বরী। মৃদু হাসি। বললে,—চলুন। বামুনদিদি আছে, কিছু দেখতে হবে না।

টায়রাটা মনে পড়তেই বুকের ভেতরটা যেন ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো। মনে মনে ভাবতে থাকে, টায়রা কি তোলা হয়েছিল ? কোথায় আছে টায়রাটা। কিন্তু মুখে কিছু বললে না।

হেমনলিনী চললেন ভাঁড়ারের এলাকা থেকে। পেছনে চললো রাজেশ্বরী। আড়ালে গিয়ে হেমনলিনী বললেন,— অমন ক'রে কি দেখছিলি বৌ আমার মুখে ?

বলবে কি বলবে না ভাবছিল রাজেশ্বরী। হেমনলিনীর প্রশ্নটা শুনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো যেন। মনে মনে লজ্জিত হ'ল। আঘাতের চিহ্ন যে হেমনলিনীর মুখের কোথাও কোথাও। লাল দাগ হয়ে আছে। কালসিটা। রাজেশ্বরী বললে,—পিশীমা কি প'ড়ে গেছলেন ? লাগলো কোথায় ?

খানিকটা দুঃখের হাসি হাসলেন হেমনলিনী। যেন কিছুই নয়। নির্ম্মল হাসি হেসে বললেন,—হ্যাঁ বৌ, দেখে বোঝা যাচ্ছে বুঝি ? বড্ড লেগেছে, এখনও টন-টন করছে!

রাজেশ্বরী বললে,—প'ড়ে গেছলেন ?

সিঁড়ির মুখে পৌছে হেমনলিনী লজ্জিত হয়ে বললেন,— বল' কেন বৌ! তোমাদের পিশে মশায়ের কীর্ত্তি। জানো তো ওঁকে ? জানবেই বা কোত্থেকে! পিশে মশাই ধ'রে মেরেছেন। নেশায় চুর হয়ে ফিরলেন। ফিরেই বললেন, তুমি তৈরী হও। তা বললুম যে, কি দোষ হয়েছে ? বললেন—

কথা বলতে বলতে থেমে গেলেন তিনি। চোখ দুটোতে বোধ করি যন্ত্রণা ফুটে উঠলো। চিক-চিক ক'রে উঠলো। বললেন,—আমি না কি তাঁকে মদ খেতে বাধা দিয়েছি। তুমিই বল' বৌ ? নেশায় চুর হয়ে ফিরেই বললেন কি না, ডিকেণ্টার গেলাস দাও। মদ ঢেলে দাও। বাধা আমি দিয়েছিলুম সত্যি ; কিন্তু তাই বলে মেরেছে দেখো বৌ! এখনও টন-টন করছে।

লজ্জায় যেন মরে যায় রাজেশ্বরী। এমন জানলে কি কেউ শুধোয়। তবুও ঘোরতম বিস্ময়ে কেমন বুঝি হয়ে যায় বৌ। চোখ দুটোতে জল টলমলিয়ে ওঠে। নেশা কথাটা শুনে মনে মনে যেন হতাশ হয়ে পড়ে। নেশায় মানুষ এমন করে ?

জড়োয়া টায়রা! যত বার মনে পড়ে তত বার রাজেশ্বরী ভীত হয়ে ওঠে। কোথায় আছে টায়রাটা। ঘরে আছে তো। হেমনলিনী সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বললেন,— শুধু মুখে, সর্ব্বাঙ্গে দাগ। নড়তে-চড়তে পর্য্যন্ত যেন পারছি না।

যেন শুনতে চায় না রাজেশ্বরী। বলে,—চলুন, ঘরে চলুন পিশীমা।

অনন্তরামই ভাঙ্গিয়েছিল ঘুম। ঘুম থেকে তুলে বলেছিল, —কে চিঠি নিয়ে এসেছে। জরুরী চিঠি।

—চিঠি! কে পাঠিয়েছে ? জিজ্ঞেস করলে কৃষ্ণকিশোর।

—তোমাকে লেখা চিঠি। কে পাঠিয়েছে বললে না লোকটা। বললে অনন্তরাম।

—মালিক ছাড়া কা'কেও কিছু বলবে না বলছে।

—যাচ্ছি চল'। বললে কৃষ্ণকিশোর।

কাছারীতে বসেছিল পত্রবাহক। হুজুরকে দেখেই নত হয়ে কুর্ণীশ করলে। বললে,—কসুর মাফ করবেন হুজুর। দিক্‌দারী মাফ করবেন। গরিবকে যেমন হুকুম হয়েছে হুজুর।

—কে দিয়েছে চিঠি ? শুধোয় কৃষ্ণকিশোর।

পত্রবাহক ইদিক-সিদিক দেখে চুপি-চুপি বলে,—হুজুর, গহরজান বাই পাঠিয়েছে।

আশাতীত কথাটা শুনে কিছু দ্বিরুক্তি করে না কৃষ্ণকিশোর। চিঠিটা হাতে নিয়ে শুধু বলে,—ঠিক আছে।

—বহুৎ আচ্ছা হুজুর। পত্রবাহক কথার শেষে নত হয়ে বলে,—সালাম হুজুর, সালাম।

পিছু হটতে হটতে, সেলাম জানাতে জানাতে চলে যায় পত্রবাহক। চিঠিটা মুঠোয় নিয়ে কৃষ্ণকিশোর কোথায় যাবে

ভেবে পায় না। পিশীমা এসেছেন শুনেও যায় পড়ার ঘরের দিকে। বিরলে গিয়ে দেখতে হবে চিঠিটা। গহরজান কেন চিঠি লিখেছে। খামে লেখা আছে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে, মালিক ব্যতীত কেহ খুলিবেন না।

ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা বাজতে থাকে। বেলা অনেক হয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়ে গেছে। সূর্য্যালোকে তখন ঢেকে আছে দিগ্বিদিক। হলুদ-রঙ কাঁচা রৌদ্রে। নীলাভ আকাশে ছড়িয়ে আছে শুভ্র-মেঘ পেঁজা তুলার মত।

যে লোকটা চিঠি দিয়ে গেল তাকে যেন ঠিক হাব্সীর মত দেখতে। যেমন কালো তেমনি কদাকার! চুলে তেল নেই, পায়ে ভেল্ভেটের সেলিম। জামায় সেলাই হ'লে কি হবে, জামাটা সাদা অর্গাণ্ডির। ময়লা হয়ে গেছে। পাজামাটা ততোধিক। লোকটা যেন হাল-হকিয়ৎ দেখতেই এসেছিল। কি যেন হাসিল করতে। মৎলবটা যে ভাল ছিল না, দেখেই বোঝা গিয়েছিল। তবুও কাকেও কিছু মালুম দিলে না। মোলায়েম হাসি হেসে কাজ ফতে ক'রে হাওয়ার মত চলে গেল।

লোকটার মুখে যেন কদর্য্য দাগ। অন্যায়ের শারীরিক বিকাশ? হয়তো উপদংশের ক্ষত, নয় তো অন্য কিছু, যার কোন ওষুধ নেই। বংশে বর্ত্তে যায় যে ব্যাধি।

গহরজান লিখতে জানে!

জানলেও কোন মতে উচিত হয়েছে এমন বেইজ্জতী দেখিয়ে চিঠি দেওয়া। কেউ যদি জানে তো কত ফেসাদ হবে। কৃষ্ণকিশোর খামটা খুলতে দেখলো গোলাপী কাগজ। কড়া চামেলী আতরের খোশবায় মাখানো। চিঠিতে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লাল কালিতে লেখা:

জাঁহাপনা,

ইল্লৎ হারাইয়া চিঠি লিখিতেছি। হুজুরকে জুলুম করিতে ভয় হয়। বহুৎ মেহনতে আমি মুর্গীর ঝোল ও লুচি বানাইতেছি। মালিক যদি মেহেরবাণী ক'রে আসতে রাজী থাকেন আমি কৃতার্থ হইব। বেওকুফের বেআদবী মাফ করিয়া কাঙ্গালের মর্জ্জি মঞ্জুর করুন। খোদা হুজুরকে আমীর করিবেন। ইতি

হুজুরের বাঁদী
গহরজান বাই

গহরজান লেখাপড়া জানে না। গহরজানের হয়ে কে লিখে দিয়েছে কে জানে! কৃষ্ণকিশোর ভেবেছিল কি না কি। চিঠিটা প'ড়ে আশ্বস্ত হয়! চিঠিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলে দেয়। পাছে কেউ দেখে।

—পিশীমা যে ডাকছে।

পেছন থেকে বললে অনন্তরাম।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—যাচ্ছি বল।'

অনন্তরাম বুঝেছিল চিঠিটা জমিদারী সংক্রান্ত নয়। চিঠিটা কে পাঠিয়েছে বুঝে ওঠে না, কিন্তু চিঠি যে বিশেষ কেউ পাঠিয়েছে আন্দাজে অনুমান করে। অনন্তরাম বলে,—কে দিয়েছে চিঠি? প'ড়ে যে ছিঁড়ে কুটি-কুটি ক'রে ফেলা হ'ল?

হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে ওঠে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—তুমি চিনবে না অনন্তদা। এমন কিছু ছিল না চিঠিতে।

—কে লিখেছে কে? শুধোয় অনন্তরাম।

থতমত খেয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। বলে,—চিঠিটা? চিঠিটা? চিঠিটা দিয়েছে—

—থাক্, শুনতে চাই না। বললে অনন্তরাম।—তুমি মুখ-হাত ধুয়ে পিশীর কাছে যাও। কাছারী থেকে ডাকতে পাঠিয়েছে, বলছে হুজুর যখন এসেছেন তখন সই-টই মিটিয়ে দিয়ে গেলে ভাল হয়।

সই করতে হয় কাগজ-পত্রে। দলিল-পত্রে। বজেটে। মফঃস্বলে লেখা চিঠিতে। কাছারীতে প্রস্তুত হয়ে থাকে, নায়েব শুধু আসল জায়গাটা দেখায়। সই ক'রে দিতে হয়।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—পিশীমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসছি, বলে দাও অনন্তদা।

পিশীমা তখন বসেছিলেন পালঙে।

বৌ ভয়ে ব্যস্ত হয়ে টায়রা খোজাখুঁজি করছিল। পিশীমা দেখছিলেন শয্যা, আলমারীতে পুতুল, আসবাব। পিত্রালয় থেকে দিয়েছে রাজেশ্বরীকে। এলোকেশীও খুঁজতে লেগেছিল। রাজেশ্বরী বললে,—এলো, অনন্তকে বল' দেখি জিজ্ঞেস ক'রে আসবে। কোথায় আছে জানেন কি না।

হেমনলিনী বললেন,—ব্যস্ত হয়ো না বৌ। আছে আছে, যাবে কোথায়!

এলোকেশীও বললে,—ডানা তো নেই যে উড়ে যাবে ঘর থেকে!

রাজেশ্বরী বললে,—পাচ্ছি কৈ! থাকলে তো পাওয়া যাবে। আশ্চর্য্য!

অলক্ষ্যে বিধাতা হয়তো হাসলেন। জড়োয়া টায়রাটা কোথায় লুকিয়ে থেকে হয়তো আভা বিচ্ছুরিত ক'রে হাসলো। কিছুক্ষণের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো। দাস-দাসীদের কানে পৌছলো। তাজ্জব হয়ে গেল যে শুনলো। কখনও এমন হ'তে দেখেনি কেউ যে, ঘর থেকে গয়না বেমালুম লোপাট হয়ে গেছে। এলোকেশী পরিচারিকা, লজ্জা ও ভয়ে কেমন যেন হয়ে গেছে। কারও দোষ ধরবে না কেউ, যত দোষের ভাগী হবে এলোকেশী। হেথায়-সেথায় খোজাখুজি করেও আশা মেটে না এলোকেশীর। অনেক তল্লাশী ক'রেও যখন মিললো না তখন প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে,—না পিশীমা, আমি ছাড়বো না। দুষবে তো আমাকেই! কি ঘেন্নার কথা মা! রাজো, তুই চাল-পোড়া খাওয়া। বাটি-চালা ডাক।

রাজেশ্বরী যেন দিশাহারা হয়ে গেছে। মুখে কথা নেই। ফ্যাল-ফ্যাল চোখে চেয়ে থাকে শুধু।

অনন্তরাম এসে বললে,—হুজুর তো বলে, জানি না। বললে, ঘরেই আছে, যাবে কোথায় ?

হেমনলিনী বললেন,—ঠিক কথাই তো। যাবে কোথায়! বৌ, তুমি গয়নাগাটি কোথায় রেখেছো ?

হতচকিতের মত বললে রাজেশ্বরী,—ঐ সিন্দুকে পিশীমা!

ঘরে ছিল একটা লোহার সিন্দুক—তার চাবি থাকে দেরাজে। একটা চাবি-দেওয়া ক্যাস-বাক্সে।

দাস-দাসী মহলে কথাটা ছড়িয়ে গেছে। শুনে কেউ গালে হাত দিচ্ছে, কেউ কোন কথা বলছে না। বলাবলি করছে কত কথা। ফিসফাস গুঞ্জন চলছে। সামান্য বস্তু হ'লেও না হয় কথা ছিল, কিন্তু একটা টায়রা। জড়োয়া টায়রা!

—দেখো দেখি, পিশীমা এসেছে, কত আনন্দ করবে! কোথা থেকে এলো ছেঁড়া ঝামেলা, ঘর থেকে বেমালুম দামী গয়নাটা চুরি হয়ে গেল ? বললে অনন্তরাম। কা'কে বললে কে জানে!

পরিস্থিতিটা যেন ভাল লাগছিল না হেমনলিনীর। ক'ঘণ্টার জন্যে এসেছেন, খোঁজাখুঁজি আর মন্তব্যে কেটে যাবে সময়টুকু, ভাল লাগে না যেন। হেমনলিনী বললেন,—থাক্ বৌ, থাক্। ঠিক পাওয়া যাবে। বৌ তুমি বৌঠানের ঘরটা খুলতে বল'। চল যাই ঐ ঘরে বসি গে। আহা, ঘর জুড়ে থাকতো বৌঠান!

কুমুদিনী! মা কুমুদিনী।

মণিকর্ণিকার শ্মশানঘাটে তখন লকলকে অগ্নিশিখা জ্বলছে—দেখা যাচ্ছে শেষ-সীমা হরিশ্চন্দ্রের ঘাট থেকে। গঙ্গাতীরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কাশীধাম। বরুণা ও অসির সঙ্গম-স্থল। গঙ্গাতীরে অসংখ্য স্নানার্থী। কুমুদিনী তখন স্নান-শেষে সিঁড়ি ভাঙছেন। স্বর্গের সিঁড়ি—যার শেষ নেই বুঝি। কুমুদিনীর পা দু'টোয় বেদনা ধ'রে গেছে। কুমুদিনী গুণ্ঠনাবৃত কপালে ভস্ম মেখেছেন। ছাইভস্ম। দগ্ধচিতার ছাই তুলে মেখেছেন কপালে। হাতে পেতলের কমণ্ডলু। গঙ্গোদক। কেটের থান পরিধান ক'রেছেন। জলগ্রহণ হয়নি তখনও।

ডুলী ভাড়া ক'রা আছে কুমুদিনীর। ডুলীতে চেপে যাবেন তিনি কোন দেবালয়ে। তেত্রিশ কোটির কাকে পূজা করবেন, কে জানে! পেছনে কুলু-কুলু শব্দে ব'য়ে চলেছে দু'কূলপ্লাবী গঙ্গা। আদ্রের ভরা গঙ্গা।

শেষ-সিঁড়িতে উঠে কমণ্ডলু নামিয়ে করজোড়ে প্রণাম করেন কুমুদিনী। গঙ্গাকে প্রণাম করলেন।

ঘর খুলে কিছুক্ষণ দেখেই কেঁদে ফেললেন হেমনলিনী। যেমনকার তেমনি সাজানো আছে। যেখানকার যেটি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখেন হেমনলিনী—অশ্বপৃষ্ঠে যুবক কৃষ্ণচরণ। মাথায় মুকুট, হাতে লাগাম। মুখে আহ্বানের হাসি মাখানো। অয়েল-পেণ্টিং।

কাগজে-পত্রে সই করলে কি হবে, ভূসম্পত্তি ও জমিদারীর মালিক হ'লে কি হবে, সই করতে করতে বুকটা যে ধড়াস-ধড়াস করছে। টায়রা খোঁজাখুঁজি হচ্ছে শুনে পর্য্যন্ত আশঙ্কায় যেন ভীত হয়ে ওঠে কৃষ্ণকিশোর। ইতিপূর্ব্বে কখনও চৌর্য্যবৃত্তি জাগেনি মনে, চুরি কা'কে বলে জানা ছিল না। সত্যিই চুরি করেছে, বুকটা ধুকপুক করছে। কিন্তু টায়রাটা যে চাই।

দেখা হতেই বললেন হেমনলিনী,—এতক্ষণে মনে পড়লো পিশীকে ? বৌ যে একটা গয়না হারিয়েছে! ব্যাচারী তোলপাড় ক'রে ফেললে।

—হারিয়েছে তো কি হবে! যাবে কোথায়, আছে কোথাও। ভয়ে-ভয়েই বললে কৃষ্ণকিশোর। বললে,—জহর-পান্নাকে আনলে না কেন ?

ঠোঁট ওল্টালেন হেমনলিনী। বললেন,—কলকাতায় আছে না কি ? গেছে কাশীপুরে কোথায় কাদের বাগান-বাড়ীতে। হপ্তাটাক থেকে ফিরবে বলেছে। ভাগ্যি যেমন আমার!

জহর আর পান্না দু'ভাই হেমনলিনীর দুই গুণধর পুত্র।

ইয়ার-বন্ধুদের পাল্লায় প'ড়ে গেছে কাশীপুরে। কাদের উদ্যান-বাটীতে। দল বেঁধে ফুর্ত্তি করতে। কলকাতার কাছাকাছি কাশীপুর, দমদম, ব্যারাকপুরে কলকাতার বাবুদের সাজানো বাগান-বাড়ী আছে। কাপ্তেন বাবুদের মাঝে-মিশেলে যেতে হয় শহর থেকে দূরে। তখন বোতলে কুলায় না, ডজন বোতলের বাক্স কিনতে হয়। বীয়রে নেশা হয় না, বীয়রের সঙ্গে হুইস্কি মেশাতে হয়। বাগান মাতোয়ারা হয়ে ওঠে ইয়ারদের উপদ্রবে। গাছে উঠে টিয়া, কোকিল ও ময়না সেজে হুবহু পাখীদের নকল ; বাই সেজে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচানাচি, ভাড়া-করা মেয়েমানুষের ঝামা-ঘষা পায়ে লুটিয়ে পড়া—বাগান-বাড়ীতে বাবুদের করতেই হয়!

জহর আর পান্না গেছে কাদের বাগান-বাড়ীতে। হেমনলিনী টাকা তুলে দিয়েছেন হাতে। টাকা না পাওয়া গেলে দু'ভাই যখন ছাদ থেকে ঝাঁপ খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে হেমনলিনী তখনই সিন্দুক খুলে নোটের বাণ্ডিল খুলেছেন। টাকা পেয়ে জহর আর পান্না মাকে গড় ক'রে কাশীপুর অভিমুখে যাত্রা করেছে। বারোইয়ারী ফুর্ত্তিতে চাঁদা দিয়ে তবে হাসিতে যোগ দিয়ে হাসতে পেয়েছে।

মাথায় ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়েছিল রাজেশ্বরী। চিত্রার্পিতের মত। ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চললো ভাঁড়ারের দিকে। পিশীমার খাওয়া-দাওয়ার কি কত দূর এগিয়েছে দেখতে গেল।

বৌ চলে যেতে হেমনলিনী বললেন,—ক'টা কথা বলছিলাম। মন দিয়ে শোন'।

কৃষ্ণকিশোর বসলো হেমনলিনীর কাছে। অনেক কাছে যেতে দেখলো পিশীমার মুখটা, দেখলো ক্ষত-বিক্ষত। বললে,—পিশে মশাই তোমাকে বাঁচতে দেবে না। মেরেছেন তো ?

অব্যক্ত দুঃখে কিছু উত্তর করলেন না হেমনলিনী। শুধু চেয়ে থাকেন অপলক শূন্যদৃষ্টিতে। হেমনলিনীর ওষ্ঠাধর কি কাঁপছে থরো-থরো! তিনি চেয়ে আছেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণচরণের ছবিতে। কুমুদিনীর খাস-মহলের খাস-কামরা। যেখানকার যা সেখানে সাজানো আছে, ঘরে শুধু মানুষটা নেই। দেরাজে আলমারীতে কত মহার্ঘ সামগ্রী। যেন একটা মিউজিয়াম। কত দুর্মূল্য বস্তুর একত্র মিলন হয়েছে। ঐ যে কৃষ্ণচরণের ঘড়ি—ঘড়ির চেন, প্লাটিনামের চেনটা, ঘড়িটা ওয়ালথাম। কাচের আলমারীতে ঐ তো হীরার বোতামের নীল ভেলভেটের কেশটা। আড়াই রতির ছাঁকা কমল হীরার বোতাম একেকটা। কত রকমের জঙলা বেনারসী, কত উঁচু দামের। একটা শো-কেশে শুধু হাতীর দাঁতের পুতুল। দেব-দেবীর মূর্ত্তি। হেমনলিনীর চোখ দুটো জলে ভরে গেলেও হেসে কথা বললেন তিনি। ম্লান হেসে বললেন,—বলছি যে, মাকে আনাও। নয় তো দোষের ভাগী হবে যে। কারও কি জানতে বাকী আছে যে, মায়ে-ছেলে মন-কষাকষি হতেই মা চলে গেছে। চিঠি দাও না তুমি?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—মা আমাকে যে চিঠি দেয় না।

—ছিঃ! সে অভিমান ক'রে আছে। তুমি চিঠি দাও তাকে। ক্ষমা চেয়ে চিঠি দাও। বললেন হেমনলিনী চুপি-চুপি ফিসফিসিয়ে।

—চিঠি দিলে মা কি আসবে? আমি চিঠি লিখলে?

হতাশ-কণ্ঠে বললে কৃষ্ণকিশোর। কঠিন দৃষ্টি-ভরা মুখটা মনে পড়ে! সঙ্কল্পে অনড় কুমুদিনী, সামান্য চিঠি পেয়ে কি মত পরিবর্ত্তন করবেন? কাশীতেই মন বেঁধে ফেলেছেন তিনি। একাহারী হয়ে সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দেবতাদের দুয়োরে মাথা খুঁড়ে চলেছেন। সেবাশ্রমে, মন্দিরে কীর্ত্তন ও নাম-গান শুনছেন। প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু কামনা করছেন। যেন তিনি ভুলে গেছেন গত দিনের স্মৃতি। ভুলে গেছেন, তিনি ছিলেন একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞীর মতই জমিদার-বধূ। জটাজুটধারী সাধক তপস্বী সন্ন্যাসীদের পদতলের ধুলা মাখছেন মাথায়। উদ্বৃত্ত পয়সা-পাই বিলিয়ে দিচ্ছেন ভিক্ষুকদের। চলাচলে পা দু'টো বুঝি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে, খেয়াল নেই; কাশীর মাটিতে বিকিয়ে দিয়েছেন নিজেকে। অসিতে ঘর নিয়েছেন কুমুদিনী, গঙ্গার তীরে। বিশ্রামের সময়ে ভাদ্রের উত্তাল গঙ্গায় প্রতি দৃষ্টি নিমীলিত ক'রে ব'সে থাকেন সাধিকার মত। কত যেন অভিমান পুষে রেখেছেন মনে, দুঃখের ছায়া দেখা যায় মুখে। কথা ক'ন না, মৌন থাকেন অধিক সময়ে।

মাঝে মাঝে ছেলেই বিস্মিত হয়ে পড়ে, কখনও কখনও মা যখন মনে ভাসে, অমন মায়ের মত মাকে ছেড়ে কেমন ক'রে আছে। খাঁ-খাঁ করছে দুর্গ-পুরী, ফাঁকা হয়ে গেছে কেমন যেন কুমুদিনীর অনুপস্থিতিতে।

—লোকে কি বলবে? শত্রু হাসবে যে! বললেন, হেমনলিনী।—তুমি চিঠি দিয়েই দেখো না।

চুপ-চাপ থাকে কৃষ্ণকিশোর। পিশীমার মুখের দিকে চেয়ে।

লজ্জিত হন হেমনলিনী, কথা বলতে বলতে মুখ নামিয়ে নেন। রাত্রি হ'লে কথা ছিল, দিনের আলোতে লুকানো যায় না আঘাতের চিহ্ন। ঘরের কোণে ছিল গ্র্যাণ্ডফাদার্স ঘড়িটা। চেনে-বাঁধা পেতলের পেণ্ডুলাম দুলে চলেছে বিরামবিহীন। প্রতি পনেরো মিনিট তফাতে চার্চ্চের পবিত্র সুরে যেন পিয়ানো বাজতে থাকে। ঘড়ি বাজতেই হেমনলিনী বললেন,—বেলা কত হ'ল? তুমি জল খেয়েছো?

টায়রাটার চিন্তায় বিভোর ছিল কৃষ্ণকিশোর। বললে,—না। এখন খাবো।

—ও মা ষাট্! যেন চমকে উঠলেন হেমনলিনী। স্নেহের আতিশয্যে। বললেন,—যাই আমি নিয়ে আসি। কথা বলতে বলতে উঠে পড়লেন। সত্যিই বুঝি চললেন জল-খাবার আনতে।

চিঠি আর টায়রা। গহরজানের দেওয়া বেহায়া চিঠি আর রাজেশ্বরীর পাওয়া টায়রা।

হেমনলিনী উঠে যেতেই টায়রাটা কোথায় ছিল, অতি দ্রুত নিয়ে কামিজের পকেটে পুরে ফেললে কৃষ্ণকিশোর। সত্যি সত্যিই চুরি করলে! গহরজানের জন্যে চুরি করলে?

গহরজান ঘুম থেকে উঠে কিংখাবের কাঁচুলি কড়া ক'রে আঁটতে আঁটতে ফন্দিটা এঁটেছিল। দিনের আলোতে গরাণহাটা তখন স্বচ্ছ পরিষ্কার। দোকানীদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। জর্দ্দা আর আতরের দোকান, মুসলিম টুপীর দোকান, তামাকের দোকান খাটি হিন্দুর হোটেল, পান আর সোডা-জলের দোকান। অধে দোকান-ঘর আর উর্দ্ধে মেয়েমানুষদের ঘর। এমন সময় নেই যে কেনা-বেচার ডাক না চলতে থাকে;

মাসী যাচ্ছিল শ্মশানেশ্বরের কাছে। গঙ্গায় দু'টো ডুব দিতে। গহরজান মাসীকে পাকড়াও করলে। ফাঁস করলে ফন্দিটা। মাসী হাসলে শুনে। আপত্তি করলে না। বললে, —তবে, রামপাখী আনতে দে। বেশ তো, দ্যাখ না চিঠি লিখে।

সাত-সকালে মুরগীর নাম করতে চায় না সৌদামিনী। মুরগীকে বলে রামপাখী। গহরজানের মনের মণিকোটায় ঘর বাঁধবার সাধ, অপেক্ষা প্রতীক্ষা সহ্য হয় না যেন। যাকে পেয়েছে তাকে নিকট করতে চায় গহরজান। অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিংখাবে জরির ঝিলিমিলি দেখা যায় বুকে। আয়নায় দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যায় গহরজান। চটুল হাসে, ফন্দি আঁটে। বুকে দু'টো উঠপাখীর ডিম, চাঞ্চল্যে দোলায়িত হয়।

সতীর্থ ছিল গহরজানের কেউ কেউ। আশে-পাশে।

ছিল চপলা, যূথিকা, গোলাপের দল। মল্লিকাকে বললে গহরজান। কাগজ-কলম দিয়ে বললে চিঠিটা লিখে দিতে। মল্লিকা আলতায় কলম ডুবিয়ে লিখলে গহরজান যা বললে। চিঠিটা লিখিয়ে পাঠিয়ে দিলে কে এক জানপছনের লোক

মারফৎ। হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে ব'লে দিলে লোককে। বললো,—ফিরতি পথে দু'টো আচ্ছা মুরগী সওদা করতে। রাঁধবে গহরজান।

বেলা কারও অপেক্ষা করে না। বেলা ঠিক বয়ে যায়।

নাট-মন্দিরে পুরোহিত ঘড়িতে চোখ তুলে অপেক্ষা করছিলেন। আহারাদি শেষ ক'রে হরীতকী মুখে দিয়ে বসেছিলেন। এক জন অনুচর কোথা থেকে এসে বললে,—লোক এসেছে।

কথা মত লোক পাঠিয়েছে পূর্ণশশী। পুরোহিতের পট্টবস্ত্র, কাঁচা-কোঁচার ঠিক নেই। পুরোহিত উঠে দাঁড়ালেন কাঁপতে কাঁপতে। বার্দ্ধক্যের জরায় জর্জ্জরিত তিনি। গলায় ঝুলছে গলকম্বল। বাহুতে লোলচর্ম্ম। পক্ককেশ মাথায়। বললেন,—যষ্টিটা দেওয়া হোক আমাকে।

সূর্য্য তখন ঠিক মধ্যাকাশে।

ভাদ্রের ঘোলাটে আকাশে কতকগুলো চিল উড়ছে অচঞ্চল ডানা মেলে। খেয়ালী হাওয়া চলেছে থেকে থেকে। দুপুর গড়িয়ে এসেছে।

হেমনলিনী খেতে বসেছিলেন তখন। রাজেশ্বরীও বসেছিল পিশীমার পাশে। রূপার সেটে খেতে দেওয়া হয়েছে। রূপার থালা, গেলাস, বাটিতে।

পিশীমাকে শুধোয় কৃষ্ণকিশোর। বলে,—কখন যাবে পিশীমা? আজ থাকো না তুমি।

হেমনলিনী বললেন,—পিশে মশাই ব'লে দিয়েছেন বিকেলে যেতে। না গেলে যদি কুরুক্ষেত্র করে!

কথাটা শুনে কিছুক্ষণ কেউ কিছু কথা বলে না। কৃষ্ণকিশোর বললে,—আমি তোমাকে পৌছতে যাবো।

আর মনে মনে ভাবলো, পিশীমাকে রেখে ফেরার পথে যদি গহরজানের কাছে যাওয়া যায়। একটা লুকানো আনন্দে ক্ষণেকের জন্য মনটা কোথায় উড়ে যায়।

কিংখাবে ইজ্জৎ সামলে গহরজান তখন কোমর বেঁধে রাঁধতে বসেছে। রাঁধছে মুরগী-মুসল্লম। কড়ায় ফোড়ন দিয়ে হাঁচতে হাঁচতে ভাবছে কখন আসবে সেই মধু-মুহূর্ত্ত।

[ক্রমশঃ।

রামমোহনের রামায়ণ পাঠ

রামমোহন রায়ের পাঠাসক্তি ছিল অত্যন্ত অধিক। রামমোহন কখনও রামায়ণ পড়েননি, রামায়ণ পড়তে হবে। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পাঠারম্ভ করেন। পড়তে পড়তে অধিক বেলা হয়ে গেছে। দু'প্রহর অতীত হয়ে গেল, তবুও পাঠ শেষ হ'ল না। রামমোহন পরিবারবর্গকে বিশেষ ক'রে নিষেধ ক'রেছেন, যেন কেউ পাঠে ব্যাঘাত না করে।

আহারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, অথচ কেউ সাহসী হয় না গম্ভীরপ্রকৃতি রামমোহনের পাঠে বিঘ্ন করে। ক্রমে ক্রমে সকলেই আহার করেন, রামমোহন কিন্তু পাঠে মগ্ন। বেলা তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হ'ল। পুত্র উপবাসী থাকতে জননী ফুলঠাকুরাণী কেমন করে আহার করবেন? তখন রামমোহনের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন এক জন প্রতিবেশী সাহস-পূর্ব্বক রামমোহনের ঘরের দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করতে সাহসী হয়। রামমোহন প্রতিবেশীটিকে প্রতীক্ষা করতে ইঙ্গিত করলেন। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই পাঠ সাঙ্গ হ'লে রামমোহন আহারে প্রবৃত্ত হলেন! কথিত আছে, রামমোহন ঐ দিনে সমগ্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শেষ ক'রেছিলেন।

বাংলা ভাষায় প্রথম কবিতা

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চিত্র পইঠা কাল ॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভনই গুরু পুচ্ছিঅ জান ॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই ॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনু পাখ ভিতি লেহুরে পাস ॥
ভনই লুই আমহে ঝাণে দিঠা।
ধমন চমণ পিণ্ডি বইঠা ॥

(ভাবানুবাদ)

কায়ারূপ তরুবর, পাঁচ তার ডাল।
চঞ্চল চিত-মাঝে পশে আসি কাল ॥
দৃঢ় করি মহাসুখ কর পরিমাণ।
লুইভনে গুরুকে পুছিয়া ইহা জান ॥
সকল সমাধি দ্বারা কিবা করা যায়।
সুখ দুখে নিশ্চিত মরিবেই হায় ॥
ছান্দের বন্ধন এড় করণের (পরিপাট্য) আশ।
শূন্যতা পক্ষের দিকে লহ তুমি পাশ ॥
লুই বলে ইহা আমি ধ্যানে দেখিয়াছি।
ধমণ চমণ দুই পিঁড়িতে বসেছি ॥

বাঙলা ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টির আদিমতম বিকাশ হ'ল "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়"। বৈষ্ণব পদাবলীর মতই চর্য্যাপদ বিভিন্ন পদকর্ত্তাদের সৃষ্টি। বাঙলা কীর্ত্তন গানের পুরাতনতম রূপ চর্য্যাপদ ১১০৭ খৃষ্টাব্দে নেপালে আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কর্ত্তা ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কেহ কেহ বলেন, চতুর্দ্দশপদী কবিতা পাশ্চাত্য প্রভাবে বাঙলা সাহিত্যে চালু হয়েছে, কিন্তু চতুর্দ্দশপদী কবিতা চর্য্যাপদে আছে। লুইপাদ, ডুম্বকপাদ, আর্য্যদেব, কাহ্নুপাদ প্রভৃতি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের সহজযানী বৌদ্ধ ধর্ম্মের গুহ্য আচার বিষয়ে পদগুলি লিখিত হয়। পদগুলি চব্বিশ জন সিদ্ধাচার্য্য লিখেছিলেন। সিদ্ধাচার্য্যগণ তিব্বতে স্বীকৃত চুরাশী জন মহাসিদ্ধার তালিকাভুক্ত। লুইপাদ বঙ্গদেশবাসী। চর্য্যাপদ খৃষ্টীয় নয় থেকে বারো খৃষ্টাব্দে রচিত হয়েছে। বঙ্গানুবাদ সহ চর্য্যাপদের প্রথম পদটি মুদ্রিত হচ্ছে। পদটি লুইপাদের রচনা।

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে পরলোকগত শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আধুনিক বাঙলা ছায়াছবির প্রিয়তম অভিনেতা কুমার প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার ছায়াচিত্র মুদ্রিত হইল। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রটি কলিকাতাস্থিত ইউনিভার্সাল আর্ট গ্যালারী এবং প্রমথেশের চিত্রটি গৌরীপুর এষ্টেটের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে।

আমার দেখা রাশিয়া

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

১

"লৌহ-য ব নি কা র" ওপার থেকে যখন সোভিয়েত রাশিয়ার লেখক-সঙ্ঘের আমন্ত্রণ এলো, তখন জানতাম না এপারেও একটা 'খা দি-য ব নি কা' আ ছে। অহিংস নিরপেক্ষতায় সমুজ্জ্বল দুগ্ধ-ধবল সাদা, কিন্তু তার ওপরও সিকিউরিটি পুলিশের ছায়ামূর্ত্তি অস্পষ্ট ভাবে নড়াচড়া করে। চেনা যায় না, কিন্তু বোঝা যায়। বোম্বাইএর দু'জন সাংবাদিক ছাড়পত্র পেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে তা বাতিল করা হল। তিন জনকে ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করা হল। ৭ই জুন (১৯৫১) বোম্বাই থেকে পাঁচ জন সাংবাদিক, লেখক কবি ও বৈজ্ঞানিক এক বিবৃতিতে বললেন, "যাঁরা বৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করতে চান, তাঁদের অবারিত ভাবে সুবিধা দেওয়া হয়, কিন্তু যাঁরা সোভিয়েট রাশিয়া বা গণতান্ত্রিক চীনে বা অনুরূপ দেশে ভ্রমণ করতে চান, তাঁদের নানা ভাবে বাধা দেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের বৈদেশিক নীতির মূল ভিত্তি, কোনো শক্তি-শিবিরে জড়িয়ে না পড়া এবং নিরপেক্ষ নীতির ঘোষিত উদ্দেশ্যের এটা বিপরীত।

"আমরা ব্যক্তিগত ভাবে ও সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করেও, গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে ছাড়পত্র না দেবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ জানতে পারিনি, গভর্ণমেন্টের মনোভাব দুর্বোধ্যই রয়ে গেল। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের একমাত্র অপরাধ আমরা মস্কো থেকে আমন্ত্রিত হয়েছি। এটা তাঁরা অস্বীকার করবেন, কিন্তু আমাদের ভারতের বাইরে যাওয়াটা অবাঞ্ছনীয় কেন, তার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু তাঁরা নির্দেশ করবেন না। আমরা দাবী করছি, শিষ্টাচারের খাতিরেও তাঁরা আমাদের ও জনসাধারণের নিকট একটা কৈফিয়ৎ দিন। কেন না এর সঙ্গে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন জড়িত।"

১১ই জুন নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৈফিয়ৎটা দিলেন স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল। তিনি বললেন, ৩১ জন আমন্ত্রিতের মধ্যে ৩০ জনকেই ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। বিদেশে যেতে কাউকে বাধা দেবার প্রশ্ন উঠে না। যে কয় জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি, তার কারণ তাঁরা রাশিয়া যেতে চাচ্ছেন বলে নয়। তিনি মত এ ব্যাপারে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিরও বক্তব্য আছে এবং তাঁরা ঐ সকল ব্যক্তির "অতীত কার্যকলাপ" বিবেচনা করে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। আমি ত্রিশ বৎসর বাঙ্গলা দেশে সাংবাদিকতা করছি। স্বাধীনতা লাভের পরও আমার "অতীত কার্যকলাপ" রাজ্য-সরকারের নিকট দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে আছে জেনে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হলাম। ছাড়পত্র না পাই, কিন্তু এই অপবাদ নিঃশব্দে পরিপাক করা কঠিন। নয়াদিল্লীর বৈদেশিক দপ্তরে কথাটা জানালাম। তারের উত্তরে জবাব এলো ছাড়পত্র মঞ্জুর হয়েছে। ১৫ই জুন বিকালে ছাড়পত্র নিয়ে সেই দিন রাত্রেই দিল্লী যাত্রা করলাম। 'খাদি-যবনিকা' উত্তোলিত হল।

১১শে জুন সকালে আমরা ১৬ জন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক দিল্লী বিমানঘাঁটিতে, বন্ধু-বান্ধবদের নিকট বিদায় নিয়ে লাহোরগামী বিমানে যাত্রা করলাম। দুপুরে লাহোর ফেলেটি হোটেলে বিশ্রাম করে বিকেলের ট্রেনে পেশোয়ার যাত্রা। আফগান-কনসাল এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন এবং কাবুল-যাত্রার ব্যবস্থা করে দিলেন। জমরুদ দুর্গের সামনে পাশপোর্ট ইত্যাদি পরীক্ষা হল। আমরা কিছুটা দূর অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় কাবুলের সোভিয়েত দূতাবাসের এক জন রুশ কর্মচারী আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। খাইবার পাস—আঁকা-বাঁকা রাস্তা, দু'ধারে রুক্ষ তরুগুল্মহীন তরঙ্গায়িত পর্বতমালা—ইংরাজ সরকার সাম্রাজ্যরক্ষার প্রয়োজনে চমৎকার রাস্তা করেছেন। একটি রেলপথও খাইবারের পশ্চিম প্রান্তে লাণ্ডিখানা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। আমি পূর্বে দু'বার রেলপথে লাণ্ডিখানা পর্যন্ত এসেছি।

ক্রেমলীনে রেড স্কোয়ার

তখন এটা বৃটিশ ভারতের সীমান্ত ছিল। তোরখামে এসে মোটর থামলো—সুরু হল আফগান দেশ।

লৌহদ্বার উন্মুক্ত হল। রাস্তা কদর্য্য, যেন কোন শুকিয়ে-যাওয়া নদীর উপল-আস্তীর্ণ বুকের উপর দিয়ে চলেছি। ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলেছি, উলঙ্গ পাহাড়শ্রেণী—মাঝে দুর্গ বা পাহারা দেবার ঘাঁটির ধ্বংসাবশেষ পাহাড়ের গায়ে ঝুলছে। কোথাও সবুজের রেশ দেওয়া ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। ডেকায় এসে আবার ছাড়পত্র পরীক্ষা হল। যুবক অফিসারটি যথেষ্ট সৌজন্য দেখালেন। তরমুজ ও খরমুজা খাওয়ালেন। মাঝখানে খরস্রোতা নদী, নদীর দুই তীরে শস্যক্ষেত্র, সবুজ গালিচার মত বিস্তৃত। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। কিছু কাল বিশ্রাম করে বেলা ৪টা আন্দাজ জেলালাবাদ ডাকবাংলোয় পৌছান গেল। তখন দস্তুর মত খিদে পেয়েছে। কিন্তু রমজান মাস। খাদ্য তো দূরের কথা, এক পেয়ালা চা'ও পাওয়া গেল না। সহরের খাবার দোকানও বন্ধ। দেখলাম, স্থানে স্থানে সরবতের পাত্র নিয়ে লোকে পশ্চিমমুখো হয়ে বসে আছে,—কামান দাগা হলেই রোজাভঙ্গ করার প্রতীক্ষায়। হতাশ হয়ে যাত্রা করা গেল। রাত্রি নয়টায় সুরাইয়া পান্থনিবাসে আসা গেল। দুপুরে ছিল অসহ্য গরম। এখন শীতল হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে গেল। এটা জার্মানরা তৈরী করেছিল—আধুনিক আরামের সাজ-সরঞ্জামের অভাব নেই। আহার-পর্ব শেষ করে, বাইরে চত্বরে খাটিয়ার ওপর নরম বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ফুলের গন্ধ, চেনার গাছের মর্মর ধ্বনি, গিরি-নির্ঝরিণীর কলস্বরের একতারা, তরুণ চাঁদের আলো—মনোরম পরিবেশ!

বুধবার ২০শে জুন চা-পান শেষ করে যাত্রা সুরু হল। এখান থেকে কাবুল ৪০ মাইল। তরঙ্গায়িত পর্বতশ্রেণীর বুক চিরে খরস্রোতা কাবুল নদী—তার দু'পাশে চাষের জমি, ফলের বাগান। নদীর জল নিয়ন্ত্রণ বা সেচ-ব্যবস্থা এ সব কিছুই নেই। কৃষি-ব্যবস্থা সনাতন-কালের, মাংসপেশী ও আদিম যন্ত্রের ওপর নির্ভর। কৃপণ প্রকৃতি দয়া করে যা দেয়, দরিদ্র কৃষকদের তাই সম্বল। শুনলাম, জল-বিদ্যুৎ, কারখানা ও আধুনিক সেচ-ব্যবস্থা পত্তন করবার ভার এক মার্কিন কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা তিন বৎসর কেবল জরিপ করছেন। যন্ত্রশিল্প আফগানিস্থানে নেই—সামন্ততান্ত্রিক যুগের ধারা অব্যাহত। পথে দেখলাম, উট, গাধা, খচ্চরের পিঠে গৃহস্থালীর জিনিষপত্র ও ছাগল ভেড়া মুরগী শিশুদের বোঝাই দিয়ে এক শ্রেণীর যাযাবর চলেছে। পাহাড়ের ওপর থেকে আমরা নামতে লাগলাম। সম্মুখে সমতল কাবুল উপত্যকা—শ্রীহীন জীর্ণ কুটিরে মলিন-বসন নর-নারী, ছোট ছেলেরা ভেড়া চরাচ্ছে। ক্রমে রাস্তা চওড়া হল। দু'ধারে শস্যক্ষেত্র, ফলের বাগান, গাছপালায় ঘেরা পাকা বাড়ী দেখতে দেখতে আমরা কাবুল সহরের দ্বারে এলাম। এখানে আফগান সরকার, সোভিয়েত ও ভারতীয় দূতাবাসের প্রতিনিধিরা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আমরা আফগান সরকারের অতিথিরূপে কাবুল হোটেলে এসে উঠলাম।

হিন্দুকুশ পর্বতের দক্ষিণে কাবুল সহর—মাঝখানে নদী। বাজার বা চাঁদনীতে আবর্জনা, বিশৃঙ্খলা আমাদের দেশের সহরের মতই, আধুনিক সহর অনেকটা পরিচ্ছন্ন। এখানেও চৌরঙ্গী আছে, আবার বস্তীও আছে। বড় রাস্তার পাশের গলিতে ঢুকলেই দারিদ্র্য, আবর্জনা, উলঙ্গ ধূলিধূসর শিশুর দল প্রাচ্যের অচলায়তনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা রাজা আমানুল্লার প্রাসাদ, মৃাজিয়ম, সম্রাট বাবরের সমাধি প্রভৃতি দর্শন করলাম। রাত্রে হোটেলে আফগান স্বরাষ্ট্র-সচিব এক বিরাট ভোজে আমাদের আপ্যায়িত করলেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত গান-বাজনা হল। কাবুলী ওস্তাদদের সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র হুবহু ভারতীয় বলেই মনে হল।

২২শে জুন প্রভাতে কাবুল বিমান-ঘাঁটি। সোভিয়েত বিমান প্রস্তুত। সোভিয়েত রাশিয়ার জয়ধ্বনি দিয়ে বিমানে আরোহণ করলাম। বিমান অতি উর্দ্ধে উঠেছে—নীচে হিন্দুকুশ পর্বতমালা—রুক্ষকঠিন বিস্তারে বহু বিচিত্র আকার ও আয়তনের তুষার স্তূপ। দেখতে দেখতে আমরা আমুদরিয়া নদী পার হয়ে সোভিয়েট ভূমি তেরমেজে অবতরণ করলাম। তেরমেজ আফগানিস্থান ও উজবেকীস্থানের সীমান্তে একটা ছোট্ট সহর—সোভিয়েত রেলপথের শেষ সীমা। বাক্স-পেঁট্রা ও ছাড়পত্র পরীক্ষার পর আবার বিমান আকাশে উঠ্‌লো। অল্পক্ষণ পরেই আমরা উজবেক রিপাবলিকের রাজধানী তাসকেণ্টে এসে পৌছলাম। স্থানীয় লেখক-সংঘ মহিলা কবি জুলফিয়ার নেতৃত্বে অভ্যর্থনা করলেন। এখান থেকে আমাদের ভার নিলেন সোভিয়েত লেখক-সঙ্ঘের বৈদেশিক বিভাগের সহকারী সভাপতি মিকায়েল এপ্লেটিন। বয়স ৬৩ বৎসর, সুগঠিত দেহ শক্তিমান প্রৌঢ়, সদা হাস্যময়, পরিহাস-রসিক। রুশ ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানেন না। এ ছাড়া যিনি আট সপ্তাহ আমাদের সঙ্গে সর্বদা ছিলেন এবং দোভাষীর কাজ করেছেন, তাঁর সঙ্গেও পরিচয় হল। বিধবা যুবতী—মহাযুদ্ধে স্বামী নিহত হয়েছেন। একটি কন্যা আছে। কমরেড অকসানা সিমনোভার মত বিদুষী মার্জিতরুচি দৃঢ়চেতা মহিলা জীবনে কম দেখেছি। অসঙ্কোচ সারল্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনার জন হয়ে গেলেন। এঁর আদর-যত্ন নিরলস সেবা সব জিনিষ খুঁটিয়ে দেখাবার আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমার অপটু দেহের জন্য খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক থাকতেন, অভিভাবকের মত তিনি নিষেধ করতেন, নির্দেশ দিতেন। আমি ওঁকে ডাকতাম, 'বউমা'। বউমা কি? আমি বললাম, পুত্রবধূ। শুনে তো হেসে কুটিপাটি। কর্তব্যে কঠোর, কর্মে নিরলস কমরেড অকসানা, আধুনিক সোভিয়েত সমাজের এক জন আদর্শ নারী।

তাসকেণ্ট সহরটি ছোট নয়, লোকসংখ্যা সাত লক্ষের ওপর। জারের আমলে এখানে শিল্প-কারখানা কিছুই ছিল না। দরিদ্র কৃষক-শ্রমিকদের মাটির কুঁড়ে আর যাযাবরদের তাঁবু, নোংরা বস্তী আর সরকারী কর্মচারীদের বাড়ী ও আপিস-আদালত নিয়ে ছিল মফঃস্বলের সহর। বর্তমান সহর দেখে বিস্মিত হলাম। চওড়া রাস্তা—রাস্তার মাঝখানে দু'ধারে গাছের সার দেওয়া ফুলবাগানের মধ্য দিয়ে হাঁটবার পথ। ট্রাম, বাস, ট্রলী-বাস চলছে। অতি আধুনিক সহরের সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহর। আমরা ঘুরতে ঘুরতে একটা বাগানে এলাম—বাগানে উজবেক জাতীয় কবি আলি শের নভইএর প্রকাণ্ড মূর্তি—দক্ষিণে তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত প্রকাণ্ড পাঁচতলা সংগীত সংস্কৃতি ভবন। আমরা বাগানে বসতেই এক পাল ছেলেমেয়ে ঘিরে দাঁড়ালো. বিদেশী দেখে কৌতুহলী হয়েছে। আমরা যখন নিজেদের দেখিয়ে বললাম 'হিন্দী', তখন ওদের মধ্যে উল্লাসের রোল পড়ে গেল। কেউ বলে রুশী, কেউ কেউ পরিচয় দেয় উজবেকী, তাতার, তুর্কী, তাজিক ব'লে। পোষাকে ও চাল-চলনে লক্ষ্য করলাম, এই সহরের মধ্য-এশিয়ার সমস্ত রিপাবলিকের লোক আছে, এবং জারের আমলের প্রবাসী রুশরাও আছে। মধ্য-এশিয়ার বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র তাসকেণ্ট থেকেই ২২শে জুন আমাদের সোভিয়েত ভ্রমণ আরম্ভ। ৪ঠা আগষ্ট আমাদের ভ্রমণের পরিসমাপ্তি তাসকেণ্টেই।

বহু ভাবাভাষী বহু জাতি-অধ্যুষিত সোভিয়েত রাশিয়া বিশাল দেশ। ছয়-সাত সপ্তাহ প্রায় অবিশ্রান্ত আমরা বিমানে, ট্রেণে, মোটরে হাজার হাজার মাইল ভ্রমণ করেছি, উত্তরে লেনিনগ্রাদ, মধ্যে মস্কো ও স্তালিনগ্রাদ, দক্ষিণ-পূর্বে সমরখন্দ, দক্ষিণ পশ্চিমে কৃষ্ণসাগরের তীরে ককেশাস পর্বতমালার কোলে সুকুমী, গাগরী। জর্জিয়া ও উজবেকীস্থান এই দুইটি এশিয়ার রিপাবলিকের গ্রাম, নগর দেখেছি। মনে রাখতে হবে, ত্রিশ বছর পূর্বে জারতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের শাসন-শোষণে এখানকার কৃষক-শ্রমিকরা ছিল হতদরিদ্র, নিরক্ষর, কুসংস্কারে পঙ্গু। দশাটা আমাদের দেশের মতই। আমাদের দেশের মতই মুষ্টিমেয় ধনী, জমিদার, সরকারী চাকুরিয়া এবং স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত চূড়ার ওপর
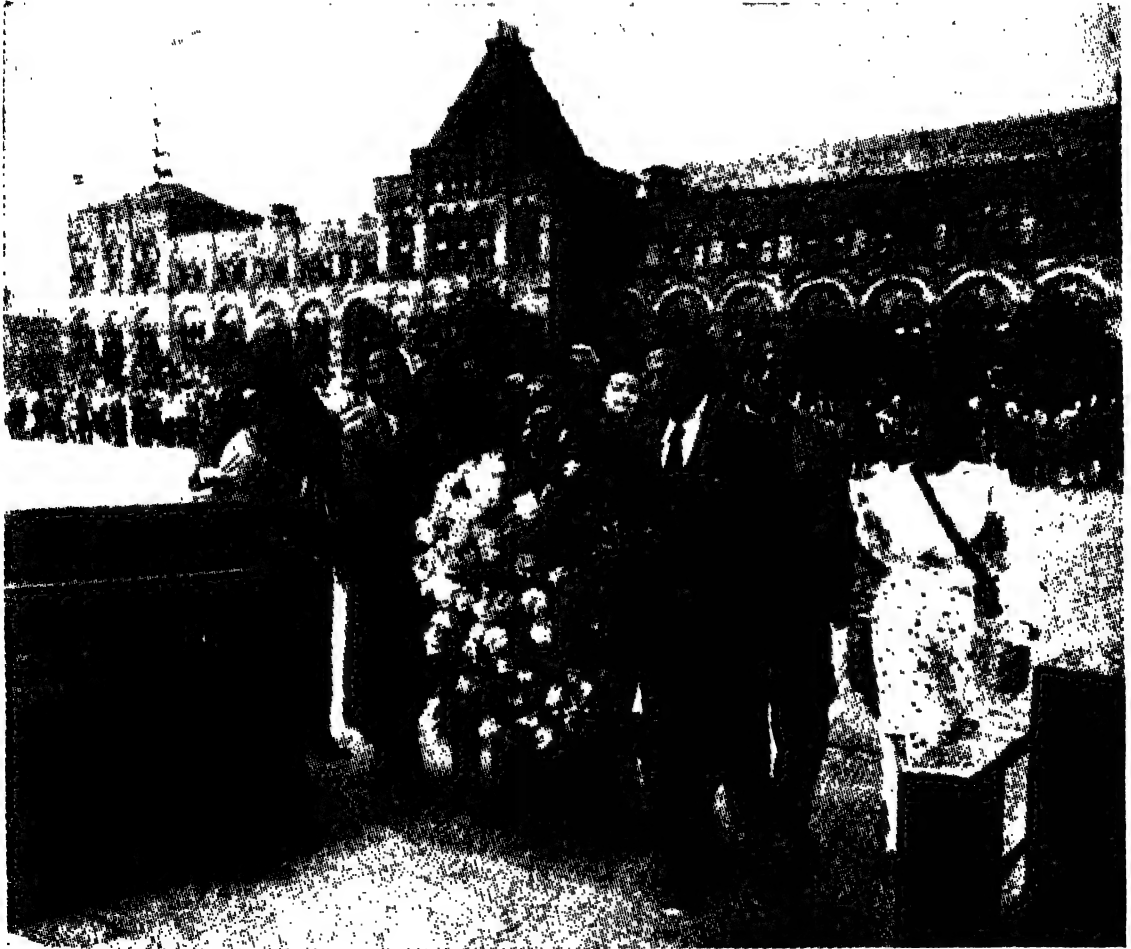
লেনিনের স্মৃতি-মন্দিরে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্যামলাল, জংবাহাদুর সিং, হরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভবানী ভট্টাচার্য্য, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মাল্য দিতে চলেছেন।

ময়ূরপাখার মত বিরাজ করতেন। রুশ দেশের এই মন্দভাগ্য জন-জীবন আমরা টলষ্টয়, তুর্গেনিভ, গর্কীর লেখার মধ্যে দেখেছি, লক্ষ লক্ষ মানুষ পশুর স্তরে নেমে কি ভাবে নতশিরে অসীম অমর্যাদার মধ্যে জীবন যাপন করে, তা তো স্বদেশে চক্ষুর সম্মুখেই প্রকট। যারা যত কঠোর পরিশ্রমী, সমাজে তাদের অবজ্ঞা ও অসম্মান তত বেশী। সকল প্রকার হীনতা স্বীকার করে শূদ্র দাসবৎ সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর ধন-ঐশ্বর্য আরাম-আয়েসের ব্যবস্থা করবে, ধর্মতন্ত্রে এই বিধান বহু শতাব্দী পূর্বেই পাকা করে দেওয়া হয়েছে। এই দুর্বল নিরুপায়েরা যে কোন দিন জোটবদ্ধ হয়ে মানুষের অধিকার দাবী করবে, এ তো কল্পনারও অগোচর ছিল। হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় তৈরী সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দুর্ভেদ্য দুর্গ ধূলিসাৎ করে দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া সর্বমানবের সমানাধিকারের ভিত্তিতে এক নয়া সমাজ-ব্যবস্থা পত্তন করেছে, যার নিন্দা ও প্রশংসা দীর্ঘকাল শুনে এসেছি।

১৯১৭র মহান্ অক্টোবর বিপ্লব, লেনিন-স্তালিন চালিত বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবার দুর্বার সঙ্কল্প—বিশ্ব-ইতিহাসের এক বৃহৎ পটপরিবর্তন। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মান আক্রমণে দেশ ক্ষতবিক্ষত; বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দ্বারা আক্রান্ত, প্রতিবিপ্লবীদের কৃতঘ্ন আঘাত অতিক্রম করে শিশু-সোভিয়েত নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো—প্রতি পাঁচ বছরে এক এক শতাব্দী এগিয়ে যাবে, এই তার পণ। দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বহু কালের দাসত্ব ও শোষণে পঙ্গু মানুষের জড়বুদ্ধি এই দুস্তর বাধা অতিক্রম করে তারা সকল রকম শোষকশ্রেণীর উচ্ছেদ করলো। গড়ে উঠ্‌লো এক ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা—যেখানে সর্বসাধারণের অভিপ্রায় ও উদ্যম কেন্দ্রীভূত হয়ে অসাধ্য সাধনকে সম্ভব করল। উদ্দেশ্যের ঐক্য লক্ষ্যের ঐক্য—সমাজতান্ত্রিক কলকারখানা, সমবায় কৃষিপদ্ধতি, সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের বিস্ময়কর ক্ষিপ্র অগ্রগতির মধ্য দিয়ে যখন এরা কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন আচম্বিতে হিটলারের ফাসিষ্ট বাহিনীর কৃতঘ্ন আক্রমণ। মনুষ্য জাতির ইতিহাসে কোন দেশ কোন জাতি এত বড় যুদ্ধের সম্মুখীন হয়নি। ভূমিকম্পের মত প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্যে দৃঢ়পদে দাঁড়ালেন মার্শাল স্তালিন—তাঁর নির্দেশে লাল-পল্টন অকুতোভয় শৌর্যে মানব-মুক্তির রণক্ষেত্রে ধাবিত হল। তার আঘাত ও প্রতিঘাত করবার প্রচণ্ড শক্তি মহাসময়ের রক্তাক্ত বহ্নিশিখায় দীপ্যমান হয়ে উঠলো। জগত বিস্ফারিত নেত্রে দেখলো সোভিয়েত রাশিয়ার কঠিনবীর্য পৌরুষ, তার রণনৈপুণ্য, তার সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর বিস্ময়কর সাফল্য। অগ্নিপরীক্ষায় বিজয়ী সোভিয়েত রাশিয়ার এই নৈতিক শক্তি আজ আবার শান্ত-সমাহিত চিত্তে গঠন ও পুনর্গঠন কাজে প্রবৃত্ত। মহাযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েও সে অতলান্তিকের ওপারে ভিক্ষের জন্য হাত পাতেনি, ধনতন্ত্রী দুনিয়া তাকে একঘরে করেছে, তবু সে ক্ষোভহীন নিঃশঙ্ক। এই নূতন জগতকে চোখে দেখবার সুযোগ এক দুর্লভ সৌভাগ্য। কৌতূহল ছিল, তাই শ্রদ্ধাসন্নত মন নিয়েই সোভিয়েত ভূমিতে এসেছি। এই বিশাল দেশের বন্ধনজর্জর পরস্পরবিচ্ছিন্ন বক্রমেরুদণ্ড মানুষগুলিকে এরা মাত্র ত্রিশ বছরে জ্ঞানের ক্ষেত্রে, আনন্দের ক্ষেত্রে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে কত বড় মুক্তি দিয়েছে—তার কিছুটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

২

অবশেষে মস্কোএ আসা গেল। ২৩শে জুন শনিবার বেলা সাড়ে এগারটা। বিমান-ঘাঁটিতে সোভিয়েত লেখক-সঙ্ঘের প্রতিনিধিরা রাশি রাশি পুষ্পগুচ্ছ উপহার দিয়ে সম্বর্দ্ধনা করলেন। নির্মেঘ আকাশ, উজ্জ্বল রৌদ্রালোক, আরামপ্রদ প্রশস্ত মোটরকারে চলেছি। পথের দু'ধারে বন, উপবন, বার্ক গাছের শুভ্র সমুন্নত ঋজু দেহ, চেনার ও ওকেরা মাথা তুলে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারি ফাঁকে-ফাঁকে বাগান, কত রকমারি রংএর ফুল! ত্রিশ মাইল পথের দু'ধারে কৃষিক্ষেত্রও আছে। সহরের কাছাকাছি আসতেই অনেক পুরনো ধরণের বাড়ী দেখা গেল। বামে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ী তৈরী হচ্ছে, ছোট-বড় ক্রেন হেলছে-দুলছে! ক্রমে মস্কোয়া নদীর সেতু পার হয়ে ক্রেমলিন প্রাসাদ-দুর্গ ডাইনে রেখে, আমাদের গাড়ী হোটেলের দরজায় থামলো। হোটেলটির নাম,—"হোটেল ন্যাশনাল।" এর আসবাবপত্র, সাজসজ্জা, মখমল ও রেশমের পর্দা, সুবিন্যস্ত শয়নগৃহ, পরিপাটি ভোজনাগার দেখে অবাক হ'লাম। বোম্বাইএর বিখ্যাত তাজমহল হোটেলও এর তুলনায় দরিদ্র। এই পাঁচতলা হোটেলে পাঁচশ'র ওপর কামরা আছে। এই হোটেলেই আমরা বরাবর থেকেছি। সাত সপ্তাহের মধ্যে তিন সপ্তাহই আমরা মস্কোএ ছিলাম। মস্কোএ এমন এবং এর চেয়েও বড় চার-পাঁচটা হোটেল আছে। শুনলাম, আরও গোটাকয়েক অতিকায় হোটেল তৈরী হচ্ছে। এরই ১২৭ নং কামরা আমার জন্য নির্দিষ্ট হল। পূব দিকে জানালা, সম্মুখে সিকি মাইল চওড়া রাস্তা, তার ওধারে ক্রেমলিন; উচ্চ প্রাচীরের ওপরে জারের আমলের গীর্জার গম্বুজ—পথের দুই প্রান্তে সারিবদ্ধ চেনার গাছগুলি গ্রীষ্মকালের পত্রসম্ভারে ঘন সবুজ। ট্রাম, বাস ট্রলী-বাস মোটর চলেছে, আর চলেছে জলস্রোতের মত জনস্রোত। ভীড় নেই, ঠেলাঠেলি নেই, নেই চীৎকার ও হট্টগোল। এ কোন্ লোক থেকে কোন্ লোকে এলাম!

অপরাহ্ণে পুষ্পতোরণ দিয়ে আমরা রেড স্কোয়ারের দিকে অগ্রসর হলাম। প্রায় দুই মাইল লম্বা শ্রেণীবদ্ধ জনতা মন্থর পদে এগিয়ে যাচ্ছে লেনিনের সমাধির দিকে। আমাদের 'গাইড' এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিলেন, "ইণ্ডিসকী পিশাচলী ডেলীগাৎসী"—জনতা সম্ভ্রমে বিদেশীদের জন্য পথ করে দিল। রুশ ভাষায় সাহিত্যিক লেখকদের বলে "পিশাচ"। আমাদের দেশে লেখকদের যে দশা, তাতে ও শব্দটা বাঙ্গলা ভাষাতেই মানানসই হ'ত। যা হোক, আমরা সমাধির দ্বারদেশে পুষ্পতোরণের শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। মর্মর-নির্মিত বেদীর ওপর ডিম্বাকৃতি কাঁচের আবরণের মধ্যে, চিরপদদলিত মানুষের মুক্তি-সংগ্রামের প্রথম ও প্রধান সেনাপতি মহামানব লেনিন চিরনিদ্রায় শায়িত, প্রশস্ত ললাটে দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠে স্বল্প শ্মশ্রু-মণ্ডিত কপোলে চিবুকে বিশ্বমানবের মুক্তির মৃত্যুঞ্জয়ী সঙ্কল্প। অবনত শিরে প্রণাম-নিবেদন করে নিষ্ক্রান্ত হলাম। মানবের ইতিহাসে এ এক অভাবনীয়ের আবির্ভাব। প্রত্যহ জানলা দিয়ে দেখেছি, কাতারে কাতারে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চলেছে তাদের মহান্ নেতা লেনিনকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করতে। লেনিন ও স্তালিন এই দুই বিপ্লবী নেতার প্রতি লোক-সাধারণের কি অবিচল শ্রদ্ধা! এক জন সোভিয়েত সমাজ ও রাষ্ট্রের স্রষ্টা। অপর তাঁর উত্তরাধিকারকে অঙ্গীকার করে পালয়িতা।

দেখেছি, এই দুই নরকেশরীর প্রতিমূর্তি এবং প্রতিকৃতি রাশিয়ার সর্বত্র। ভারতেও এক দিন স্বতন্ত্র ভাবে এমনি ঘটনা ঘটেছিল। তন্ত্রমন্ত্রসহায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কুহকে অধিকার-বঞ্চিত স্ত্রী-শূদ্র ভগবান বুদ্ধদেবের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করে ধর্মের সমানাধিকারের নামে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল, সেদিন ভগবান তথাগতের অগণিত মূর্তিতে সমস্ত এশিয়া ছেয়ে গিয়েছিল। যুগ-যুগান্ত থেকে মানুষ নর-পূজক। অহিংসা শান্তি মৈত্রী সর্বমানবের কল্যাণ এ সব আদর্শ যখন কোন মানুষের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তখনই তিনি বহু মানবের পূজা পেয়েছেন। রুশদের এই বীরপূজা হয়তো অনেকের দৃষ্টিতে আতিশয্য মনে হবে, কিন্তু আমার ভারতীয় দৃষ্টিতে এটা অস্বাভাবিক মনে হবে কেন? আমরাও রাজঘাটকে তীর্থ করেছি, সরকারী দপ্তরখানায় আপিস-আদালতে বিদ্যালয়ে বৈঠকখানায় গান্ধীজীর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেছি।

২৩শে জুন থেকে ৬ই জুলাই দু'সপ্তাহ মস্কোএ কাটলো। যেখানে যা দেখছি সবই আশ্চর্য। ৭০ লক্ষ নরনারীর বাসভূমি এই বিশাল সহরে বাসগৃহের টানাটানি আছে, বসবাসের কৃচ্ছ্রতাও আছে, কিন্তু বস্তী নেই, আমাদের দেশের মত কেউ ফুটপাতেও সংসার পাতেনি। বড় বড় নূতন রাস্তা ও সহরের উপকণ্ঠে অতিকায় প্রাসাদ নির্মিত হচ্ছে—কর্মীদের বাসের জন্য। দশ-বারো তলা একটা বাড়ী একশ' দিনে তৈরী হচ্ছে। শুনলাম, বছর খানেকের মধ্যে গৃহ-সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। শ্রমিকদের থাকবার বাড়ীগুলোকে বলে 'এপার্টমেণ্ট হাউস'। এক থেকে পাঁচ কামরার ফ্লাট; পারিবারিক প্রয়োজন মত ষ্টেট্ বা ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বণ্টন করে দেওয়া হয়। উপার্জনের তারতম্যে বাড়ীভাড়া উপার্জনের শতকরা এক ভাগ থেকে চার ভাগ। বাড়ীর ভাড়া বাড়িয়ে অথবা খালি বাড়ী নজর নিয়ে চড়া ভাড়ার দাঁও মারা এ দেশে বহু কাল বাতিল হয়ে গেছে। এখানে জমি ও বাড়ীর (সহরে) মালিক হয় রাষ্ট্র, নয় শ্রমিক ইউনিয়ন কিম্বা ম্যুনিসিপালিটি। বিগত যুদ্ধে মস্কো এত সুরক্ষিত ছিল যে নাৎসী বিমান বোমাবর্ষণ করতে এসে বারম্বার পুচ্ছ-প্রদর্শন করে পালিয়েছে। মহাযুদ্ধের সময়ও গঠন-কাজ চলেছে পূরো দমে। এমন কয়েকটা হাসপাতাল স্কুলবাড়ী বাসগৃহ ও সংস্কৃতি-ভবন দেখলাম, যা যুদ্ধের সময় তৈরী হয়েছে। বাড়ীর পর বাড়ী উঠছে, সহরের আয়তন ও পরিধি বেড়ে চলেছে, নগরীর উপকণ্ঠে দু'টো নূতন সহর পত্তন হচ্ছে। তবে এখন লোকে ঠাসাঠাসি করে বাস করে, কারো মুখে নালিশ নেই। আমার এক পুরাতন বন্ধুর বাসায় গেলাম, ইনি বুদ্ধিজীবী, সাড়ে চার হাজার রুবল মাসে মাইনে পান। সস্ত্রীক থাকেন; সম্প্রতি একটি ছেলে হয়েছে। একখানা ঘর শোবার ও বৈঠকখানা; স্নানাগার ও রান্নাঘর। বিজলী ও বাড়ীভাড়া দেন ত্রিশ রুবল। এক দিন এক রুশ যুবতীর সঙ্গে আলাপ হল। টাইপিষ্ট, ইংরেজী জানে, দোভাষীর কাজও করে। বিয়ে করেছে এক জন মোটর-মিকানিককে। দু'জনের উপার্জন মাসে প্রায় দু'হাজার আটশ' রুবল। এরাও এক কামরার ফ্লাটে থাকে। আমি বললাম, এ দেশের নিয়মে বিবাহের পর তোমরা তো দু'কামরা ফ্লাট চাইলেই পেতে পার। মেয়েটি হেসে বললে, দরকার হয় না, যাদের ছেলেপুলে আছে তাদের দরকার আমাদের চেয়ে বেশী। আমি কৌতুক করে বললাম, ধর স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে মান-অভিমানের ব্যাপার ত আছে, আর একটা ঘর থাকলে গোসা করে স্বতন্ত্র হবার সুবিধা হয়। আমার কথা শুনে সলজ্জ ভাবে বললো, ওটা আমরা মানিয়ে নেই। সোভিয়েত শিক্ষাপদ্ধতির ফলে এই স্বার্থবুদ্ধিহীন সমাজ-চেতনা ওদের মনে জাগ্রত হয়েছে। আরো অনেক ব্যাপারে প্রমাণ পেয়েছি, সোভিয়েত তরুণ-তরুণীদের মনের চেহারা আমাদের দেশের মতই নয়। আত্মপরায়ণ অনুদারতা এদের সমাজ-ব্যবস্থায় প্রায় দূর হয়েছে।

মস্কো সহরে দশ-বারটি বৃহৎ ম্যুজিয়ম আছে। এগুলিতে ঐতিহাসিক, কলাবিদ্যা, কারুশিল্প, প্রাচীন ও হাল আমলের নিদর্শন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার বিভিন্ন বিভাগের ক্রমবিবর্তনের ধারা স্তরে স্তরে সাজানো হয়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, বাদশাহী আমলের অভিজাতদের প্রাসাদগুলিকে এরা জনশিক্ষার নিকেতনে পরিণত করেছে। মস্কো পুনর্গঠন ম্যুজিয়ম এর অন্যতম। মস্কো নগরীর আটশ' বছরের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস এখানে ছবি নক্সা মানচিত্র নানা মডেলে স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত। সমাজতান্ত্রিক আমলে পুরাতন মস্কো কি ভাবে বদলাচ্ছে ও বদলাবে তার বড় বড় ইমারতের খসড়া ও নমুনা। এ কেবল পাদদেশে পরিচয় লেখা বস্তুপুঞ্জের সমাবেশ নয়। প্রত্যেক ঘরে সব বিষয় বুঝিয়ে দেবার জন্য উপদেষ্টা আছে। দেখলাম, দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশই স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। এরা রাজধানীর সমস্ত পরিচয় জানছে, বুঝছে। ভবিষ্যতের গঠনের কথা শুনছে। আমাদের 'সবে ধন নীলমণি' কলকাতার যাদুঘরে এমন ব্যবস্থা নেই। লোকে ভীড় করে দেখে যায়, লোক-সাধারণ বুঝলো কি না বুঝলো তা নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠেছে এমন কথা শুনিনি। এখানে সোভিয়েত রাশিয়ার গর্ব ও গৌরবের 'মস্কো-মেট্রো' বা ভূগর্ভ রেল-লাইনের পরিকল্পনা দেখলাম। কতটা হয়েছে, কতটা প্রসারিত হবে, কি ভাবে কাজ এগুচ্ছে, নানা রংএর আলোক সম্পাত করে তা' আমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হল। বড় বড় বাড়ী কি ভাবে অক্ষত অবস্থায় ইচ্ছামত সরিয়ে নেওয়া হয়, সেই যন্ত্রের একটা মডেল দেখলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় এরা কোন দেশ থেকে পিছিয়ে নেই। এদের মস্কো-ভল্গা কেনাল, মরুভূমিতে খাল কেটে সেচ-ব্যবস্থা, মেট্রো বা ভূগর্ভস্থ রেলপথ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি সোভিয়েতের তরুণ ইঞ্জিনিয়রদের সৃজনী-প্রতিভার সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছে।

যে প্রশস্ত রাস্তাটি 'রেড স্কোয়ার' থেকে বেরিয়ে, 'হোটেল ন্যাশনালের' গা ঘেঁসে পশ্চিমমুখো চলে গেছে, তার নাম গর্কী ষ্ট্রীট। সহর-কর্তারা স্থির করলেন, রাস্তাটাকে চওড়া করতে হবে, অতএব এক পাশের বাড়ীগুলো ভেঙ্গে ফেলা যাক। আপত্তি উঠলো, ওতে অনেক ঐতিহাসিক স্মৃতি-মণ্ডিত ভবন লুপ্ত হবে। অতএব ইঞ্জিনিয়রদের পরামর্শে বাড়ীগুলো সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা হল। শুনলাম, দশ-বার তলা অতিকায় ইমারতগুলি, বিজলী টেলীফোন ও জলের পাইপের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন না করে, যন্ত্রযোগে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ মাত্র দু'বৎসর পূর্ব্বের কথা। এই গর্কী ষ্ট্রীট দিয়ে বহু বার যাতায়াত করেছি, দেখেছি দু'ধারে ১০।১২ হাত উঁচু চেনার গাছের সার। দু'বছরে গাছগুলি এত বড় হল কি করে? জবাব পেলাম, সমান মাপের এই গাছগুলিকে বন থেকে তুলে

এনে লাগান হয়েছে। এখানে বাগান ও গাছপালার কত যত্ন! পথের ধারের গাছের গোড়ায় বৃত্তাকার লৌহবেষ্টনী—যাতে গাছের শিকড়ে পথিকের পায়ের চাপ না লাগে।

মস্কোর রাস্তায় দিবারাত্র লোক চলাচল করছে। সকলেরই ফিটফাট পোষাক, দৈন্যের মালিন্য নেই। দেখলেই বোঝা যায়, এরা সব কাজের লোক। অথচ জীবন-সংগ্রামের নিষ্ঠুর তাগিদে এরা উন্মত্তের মত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে না। মেয়েদের পোষাকে রুচিবোধ আছে, কিন্তু বিলাসিতার পালিশ নেই। ঠোঁটে-মুখে রং দেওয়া, আঁকা ভ্রূ, অতি-প্রকট প্রসাধন কদাচিৎ চোখে পড়েছে। রূপের কৃত্রিম জৌলুষ রুশ-যুবতীরা পছন্দ করে না, তারা স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক লাবণ্যের শ্রী-মণ্ডিত। এরা প্রগলভা নয়। রাস্তায় পুরুষের সঙ্গে কোমর জড়াজড়ি করে এরা চলে না। সোহাগে গলে পুরুষের বাহু নির্ভর করে এরা মরালগামিনী নয়। পশ্চিম-ইয়োরোপের মত পথে-ঘাটে-উদ্যানে প্রকাশ্য 'ভাবে চুম্বন-আলিঙ্গন এরা কল্পনাও করতে পারে না। এক দিন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ সোভিয়েত নারীদের খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, 'শিক্ষাবিধি এদের চরিত্র বদ্‌লে দিয়েছে। এদের চরিত্রে কঠোরতা আছে, রুক্ষতা নেই। এরা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করে, জাতীয় কর্মশালার সকল বিভাগেই এরা কাজ করে। এ দেশ থেকে বিলাসিনীর দল অন্তর্ধান করেছে। বৃহৎ যন্ত্র এরা পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চালাচ্ছে, বিপণী, কারখানা, হাসপাতাল, বিদ্যালয় এরা কর্ত্রী হয়ে নিয়ন্ত্রণ করছে। এরা অবলাও নয়, দুর্বলাও নয়, অথচ স্নেহ-মমতায় ভরা নারী।

কয়েক দিন ক্রমাগত ৮।১০ ঘণ্টা হেঁটে ম্যুজিয়ম কারখানা নানা প্রতিষ্ঠান দেখবার শ্রম দেহ সইল না ; এক দিন শেষ রাত্রে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলো। সকালে লেডী ডাক্তার এসে ওষুধের ব্যবস্থা করলেন, দুপুরে আর এক জন এলেন, নাক কান গলা পরীক্ষা করে দেখলেন। হোটেলের বুড়ী ঝি ওষুধ খাওয়ায়, মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, ভেবো না আমরা আছি। হেসে বলি, 'আমার দেশে এর চেয়ে বেশী যত্ন হত না। শুনলাম, এখানে শতকরা চল্লিশ জনই নারী ডাক্তার। সেদিন আমার শয্যার পাশে এলেন এক জন মহিলা, আমার নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্য। নাম কমরেড রুবি। ইংরেজী ও জর্মন ভাষা জানেন। বহু বর্ষ চীনে কাটিয়েছেন। চীনের কমিউনিষ্টদের অনেক গল্প বললেন। ভারতেরও অনেক খবর রাখেন। চীনে জনগণের দারিদ্র্য, রক্ষণশীলতা আর চিরাগত অভ্যাসের মূঢ়তা কেমন ভাবে বদ্‌লাচ্ছে, সেই কথা বলতে বলতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা তো আত্মকর্তৃত্ব পেয়েছ, তোমরা পারছো না কেন? আমাদের কি দারিদ্র্য ও দুঃখ ছিল, তা আমি নিজেই ভোগ করেছি। এখন যা দেখছো, এ তো আমাদেরও স্বপ্নের অগোচর ছিল।' আমরা যে কেন পারি নে, সে অক্ষমতা আমাদের স্বভাবের মধ্যে পাকা আসন পেতেছে। জড়প্রথার দাসত্ব করতে করতে আমরা দৈব ও পরের ইচ্ছায় চালিত হই। এটা এই বিদেশিনীকে কেমন করে বোঝাই। দেড়শ' বছরের ইংরেজ শাসন আমাদের সর্বরিক্ত দারিদ্র্যের মধ্যে, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-অবিশ্বাসের মধ্যে পঙ্গু করে ফেলে রেখে গেছে। ইংরেজের পরিত্যক্ত ব্যবস্থা আমরা বদ্‌লাতে পারিনি, সে সাহসও পাই নে। আত্মকর্তৃত্ব লাভ আমাদের ভাগ্যে ফাঁকিই রয়ে গেল। মুখে বলি, বিপ্লবের পর লেনিন-স্তালিনের পার্টির নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তোমরা প্রাচীন বাঁধনগুলো ছিঁড়ে ফেলতে পেরেছ বলেই তোমাদের সমাজের সর্বস্তরে এমন মুক্তির হাওয়া বইছে। রুবি সচকিত হয়ে বললে, সর্বস্তর বলতে তুমি কি বোঝ? আমাদের সমাজে শ্রেণী নেই। শ্রেণীভেদ আমরা লুপ্ত করেছি। আমাদের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। ফলে সমাজের জ্ঞান বিদ্যা ঐশ্বর্য, একটা অংশে সঞ্চিত না হয়ে তা সকলের সম্পদ হয়েছে। মানুষের মধ্যে জাতিগত বা কুলগত বিশেষ গুণ বংশগত হয়ে সঞ্চারিত হয়, এ থিয়োরী যে মিথ্যা, আমাদের সমাজের দিকে চাইলেই বুঝতে পারবে।

সকল মানুষকে সমান অধিকার দেবার নামে, তোমরা বিশেষ মাপের মানুষ তৈরী করার জবরদস্তী চালাও, দেশে থাকৃতে এমন অভিযোগ শুনেছি।

রুবী হেসে বললে, ধনতন্ত্রী দেশের বুর্জোয়ারা দীর্ঘকাল এই অপবাদটা রটাচ্ছে। সোস্যালিজম এদের দৃষ্টিতে ব্যক্তির বিকাশকে দাবিয়ে দেওয়া, ব্যক্তিগত চেষ্টাকে নিরুৎসাহ করা, প্রত্যেককে কলে তৈরী পণ্যের মত সমান মাপে তৈরী করা। এই যদি হত, তা'হলে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে, সোভিয়েতের যুবক-যুবতীরা এত সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, স্বকীয় শক্তির প্রেরণায় কাজ করার উৎসাহ পেল কোথা থেকে? তুমি চোখ খুলে যদি আমাদের দেশটা দেখ, তা'হলে দেখবে, সোভিয়েত যুবশক্তি কমিউনিষ্ট-সমাজ গঠন করবার জন্য এগিয়ে আসছে,—আবিষ্কারক শিক্ষক কারুশিল্পী ইঞ্জিনিয়র স্থপতি বৈজ্ঞানিক শিল্পী অভিনেতা সঙ্গীতজ্ঞ। এরা কি কলে-ছাঁটা এক মাপের মানুষ?

রুবীর সঙ্গে সেদিনের আলোচনার পর আমার দেখে-শুনে মনে হয়েছে, কশাকের কশাঘাতে অপহৃত পৌরুষ, ধর্মমোতে আবিষ্ট, প্রথার অনুবর্তনে পঙ্গু মানুষকে সচল করবার জন্য প্রথম দিকে হয়তো বলশেভিকদের জবরদস্তি ছিল, ধনিক শ্রেণীকে উচ্ছেদ করার কঠোরতাও ছিল। বহু দিনের পতিত জমিতে ফসল ফলাতে হলে প্রথমে আগাছা মারতে হয়। বলশেভিকেরা তীক্ষ্ণ লাঙ্গল চালিয়ে এক দিন পুরাতন বিধি-ব্যবস্থা শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলেছিল। সেই অবস্থা এখনো চলছে, এ কথা বললে এদের ওপর অবিচার করা হবে। শাসননীতির জবরদস্তী চলে, যেখানে অধিকাংশ মানুষ অবুদ্ধির অন্ধকারে থেকে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী শ্রেণীর দাসত্বকেই বিধিলিপি বলে মেনে নেয়। কিন্তু যারা শিক্ষা-প্রচারকে এমন প্রবল করে তুলেছে, সভ্যতার জ্ঞান-ভাণ্ডার সর্বসাধারণের সম্মুখে উন্মুক্ত করেছে, সেখানে জবরদস্তিকে সংযত হতেই হয়।

এ দেশে পুলিশী রাষ্ট্রের বিভীষিকা, গুপ্ত গোয়েন্দা পুলিশের নিঃশব্দ পীড়নের কাহিনী অনেক শুনেছি। দেশশুদ্ধ লোককে সর্বদা ভয়ার্ত করে রাখার পাকাপাকি ব্যবস্থা। কিন্তু মুস্কিল এই, এ জিনিষটা চোখে দেখা যায় না। আমাদের বাঙ্গলা দেশে শৈশব কাল থেকেই পুলিশী-পীড়নের ব্যবস্থা দেখেছি। পুলিশের বিষাক্ত দংশনে কত তরুণ জীবন মুকুলে ঝরে গেছে। রাজদ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ড এক দিন নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছে এই সন্দেহে গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে কত যুবক বিনা বিচারে আটক হয়েছে, দ্বীপান্তরে বছরের পর বছর আকাশের

নক্ষত্র গুণে কাটিয়েছে। ইংরাজরাজের সেই পুলিশী ব্যবস্থা আজও অব্যাহত আছে। বিশেষ রাজনৈতিক মত পোষণের অপরাধে গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে সরকারী চাকুরী পায়নি বা চাকুরী থেকে বরখাস্ত হয়েছে, স্বাধীন ভারতেও এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের হাতবদল হলেও শাসকশ্রেণী পুলিশী দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করেনি। এই তো সেদিন স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে পুলিশী নিষ্ঠুরতার একখানি ছায়াচিত্র কর্তৃপক্ষ দীর্ঘকাল মঞ্জুর করেননি। তাঁদের যুক্তি, এতে পুলিশের প্রতি জনচিত্তে ঘৃণার উদ্রেক হবে। ইংরাজ আমলের পুলিশের আচরণ সম্পর্কেও সেন্সারী সতর্কতা আমরা দেখি। নাটকাভিনয় সম্বন্ধেও এমনি সতর্কতা আছে। পক্ষান্তরে, সোভিয়েত রাশিয়ায় এমন অনেক চলচ্চিত্র দেখেছি, যাতে জারের আমলের পুলিশের বীভৎস নিষ্ঠুরতা উলঙ্গ করে দেখান হয়েছে। এক দিন মস্কোএর এক সার্কাসে দু'জন পুলিশ কনেষ্টবলকে কয়েকটি ছেলে কি ভাবে নাকাল ও নাস্তানাবুদ করলে, তার ব্যঙ্গাভিনয়ে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ হাস্যধ্বনিতে মুখরিত হল, এও দেখলাম। ম্যুজিয়মেও পুলিশী অত্যাচারের ছবি দেখেছি, বিপ্লবীদের প্রতি জারীয় পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার কেবল ছবির পর্দায় নয়, রঙ্গমঞ্চের অভিনয়েও দেখেছি। নিষ্ঠুর পুলিশী শাসনের ধারা যদি তেমনিই থাকতো, তবে তার প্রতি জনচিত্তে ঘৃণার উদ্রেক করাটা আর যাই হোক, সোভিয়েত গভর্ণমেন্টের দূরদর্শিতার পরিচয় নয়। আমাদের ইংরাজ শাসকেরা তো নয়ই, দেশী শাসকেরাও এমন ভুল করেন না।

প্রতিদিন ম্যুজিয়ম, লাইব্রেরী, পাঠাগার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেখছি; মোটরে সহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাচ্ছি। সকাল ১০টার পর থেকে পরিদর্শন সুরু হয়, সান্ধ্য ভোজনের পর অভিনয়, গীতি-নাট্য, ব্যালে নৃত্য দেখবার জন্য যাই, রাত্রি ১২টার পর নৈশ-ভোজন ও শয়ন। ১লা জুলাই থেকে নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যাবে। নাটুকে দল, নট-নটীরা কেউ গ্রীষ্মাবকাশ যাপন করতে যাবেন অথবা নানা প্রান্তের নাট্যশালায় অভিনয় করতে যাবেন। আমরা বলশই থিয়েটার, মস্কো আর্ট থিয়েটার, মালী থিয়েটার, চেকোভস্কী ম্যুজিক হল প্রভৃতি নাট্যশালায় নৃত্য-গীত-অভিনয় দেখেছি। এক মস্কো সহরেই ২৫।৩০টি নাট্যশালা আছে। বিপুল এগুলির আয়তন, ৪।৫ তলায় অর্দ্ধবলয়াকৃতি বসবার সুখদ আসন, দেয়ালে স্বর্ণরঞ্জিত কারুকার্য, মহার্ঘ আস্তরণ। এ সমস্তই জাতীয় সম্পদ। পূর্বকালে যা অভিজাত ও ধনী সম্প্রদায়ের বিলাস ও ব্যসন ছিল, তার দ্বার আজ কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত। অভিনয় সঙ্গীত বিশেষত ব্যালে নৃত্য ও অপেরায় এরা সকল দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার রসবোধ আদৌ নেই, ও নিয়ে অনধিকার চর্চা করবো না। ভাষা না জানার দরুণ অভিনয়ের অনেকখানি আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। উক্রেন লোক-নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি। এক দিন সন্ধ্যায় বলশই থিয়েটারে এক স্বপ্নরাজ্য চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত হল। বিখ্যাত নর্তকী চিখামিরনোভা তাঁর দলবল নিয়ে 'সোয়ান লেক' অপেরার পালা অভিনয় করলেন। আমি তরুণ বয়সে কলকাতায় আনা পাবলোভার রাজহংস নৃত্য দেখেছি। [ক্রমশঃ।

ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ

নরেন্দ্র দেব

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ

মনে আছে সেদিনের কথা। তরুণ জীবন। চলেছে তখনও আমাদের শিক্ষায়তনের দীক্ষা। বিদ্যার্জনের বন্ধুর পথে একদা পরিচয় ঘটেছিল ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌বার্থের অনবদ্য রচনা ও বিচিত্র জীবন-কাহিনীর সাথে। উইণ্ডিয়ারমিয়ার, গ্রাসমিয়ার, রাইডাল লেক আমাদের স্বপ্নালু নবীন চোখে সেদিন যেন আশ্চর্য রহস্যময় হয়ে দেখা দিয়েছিল। ডেজি, ড্যাফোডিল, প্রিমরোজের সঙ্গে আমাদের সুকুমার মনের সেই প্রথম রোমাঞ্চকর পরিচয়। কিশোর যৌবনের কমনীয় অন্তরে লেক ডিস্‌ট্রিক্টের যে রমণীয় স্নিগ্ধ ছবি সেদিন মুদ্রিত হয়েছিল আজ এই প্রবীণ বয়সেও তা ম্লান হয়নি একটুও। ইংলণ্ডে এসে পর্যন্ত এই 'কবিতীর্থ' দেখে যাবার আগ্রহ ছিল প্রবল।

বিশ্বের আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনের (Worlds International P. E. N. Congress) অধিবেশন বসেছিল এবার প্রাকৃতিক শোভায় সুন্দর স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরায়। আমরা স্বামি-স্ত্রী উভয়েই ভারতীয় 'পি-ই-এন' প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বা ডেলিগেট হ'য়ে যোগ দিয়েছিলাম এই কংগ্রেসে। সাত দিন ধরে সেখানে এই সাহিত্যের রাজসূয় যজ্ঞ বসেছিল। অধিবেশন সমাপ্ত হবার পর আমরা স্কটল্যাণ্ডের নানা দিক ঘুরে লণ্ডনে ফেরবার পথে ঈষৎ একটু বাঁকা রাস্তায় চলে এলাম ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চলের কবিস্তুত লেক ডিস্‌ট্রিক্টএ।

এডিনবরা থেকে লণ্ডনে ফেরবার যে রথ-পত্র (রেলওয়ে টিকেট) আমাদের কাছে ছিল, সেই টিকেটেই স্কটল্যাণ্ড পার হ'য়ে আমরা এসে নামলুম যুক্তরাজ্যের 'কার্লাইল' ষ্টেশনে। লেক ডিস্‌ট্রিক্ট যেতে হলে এইখানেই গাড়ী বদল করতে হয়। 'কার্লাইল' নামের সঙ্গে আমাদের পঠদ্দশার পরিচয়। কার্লাইলের 'Character' প্রবন্ধটি আমাদের এন্‌ট্রান্স কোর্সে পাঠ্য ছিল। কাজেই 'কার্লাইল' এই নামটায় একটা বেশ সম্ভ্রমপূর্ণ 'চার্ম' ছিল আমাদের মনে। কিন্তু এখনি ল্যানকাষ্টার যাবার ট্রেণ এসে পড়বে। আমরা তাড়াতাড়ি কার্লাইল থেকে উইণ্ডিয়ারমিয়ার পর্যন্ত টিকেট কেটে নিয়ে ষ্টেশনের রিফ্রেশমেণ্ট-রুমে চলে গেলুম কিছু খেতে। ট্রেণের সঙ্গে যে একখানি করে 'ভোজন-যান' (Restaurant Car) থাকে, সেখানে খেতে গেলে খাদ্য-দ্রব্যের যে উচ্চ হারে মূল্য দিতে হয় তাতে আমাদের মতো গৃহস্থ-পরিবারের সে চলমান ভোজনাগারে বিলাস করতে যাওয়া পোষায় না। আমরা তাই দূরপাল্লার রেলপথে বরাবরই সঙ্গে রাখি রুটি, মাখন, জ্যাম, জেলি, পিক্‌লস্‌, ডিমসিদ্ধ ও কিছু ফল, যেমন আপেল, ষ্ট্রবেরি, পিয়ার্স, আঙুর ইত্যাদি। রিফ্রেশমেণ্ট-রুম থেকে স্যাণ্ডুইচ, কেক্‌, বিস্কুট, চা এবং অরেঞ্জ ও লেমনেড নিয়ে মধ্যাহ্নভোজ শেষ করলাম। বেলা তখন প্রায় তিনটে। গাড়ী এসে পড়ল। ভীড় নেই বেশী। দিব্যি আরামে বসে সন্ধ্যার আগেই উইণ্ডিয়ারমিয়ারে এসে নামলুম।

লেক ডিস্‌ট্রিক্টের মধ্যে এসে পড়েছি। কথাটা ভাবতেই সর্ব দেহ যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। ষ্টেশনের কাছাকাছি একটি মাঝারী দরের হোটেল 'হোটেল-উইণ্ডিয়ারমিয়ার' ঠিক করে জিনিসপত্র রেখে বেরিয়ে পড়লুম উইণ্ডিয়ারমিয়ার লেকটা ঘুরে আসতে। এগারোটি ছোট-বড় লেক ও একাধিক ক্ষুদ্র তটিনী-পরিবেষ্টিত এই গিরি-বনভূমি। এখানে এসে পড়ে কেবলই মনে হচ্ছিল যেন সেই যৌবনমুখী কৈশোর স্বপ্নরাজ্যে অকস্মাৎ কোন্‌ যাদুমন্ত্রে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখানে এলে মুগ্ধ মনের কলভাষা হয়ে ওঠে স্বতঃই উচ্ছ্বসিত। বোধ করি তা এই কবিতীর্থেরই মাটির গুণে। এই স্বচ্ছ-সলিলা বহু সরসী-পরিবেষ্টিত শৈলারণ্যময় শ্যামলাঞ্চলের স্বাভাবিক শোভা ও সৌন্দর্য এতই চিত্তহারী যে, অকবির মনকেও মুগ্ধ না করে পারে না। য়ুরোপের দেশ-দেশান্তরে প্রকৃতির আরও কত আশ্চর্য রূপ দেখে এসেছি। দেখে এসেছি স্কটল্যাণ্ডের উচ্চতর পার্বত্যভূমে, নরওয়ে ও সোয়েডেনের সুদূর উত্তর প্রত্যন্ত প্রদেশে, দেখে এসেছি তুষারকিরীট আল্পসের কোলে প্রকৃতির সৌন্দর্য-নিকেতন সুইজারল্যাণ্ডে, এবং মধ্য-য়ুরোপের ইন্‌সব্রুক ও সালস্‌বুর্‌গ অঞ্চলে। কিন্তু সেখানে কোনও ওয়ার্ডসবার্থ ছিলেন না, যিনি তাঁর স্বপ্ন-কল্পনার বিচিত্র রঙে রঞ্জিত করে, তাঁর আপন মনের কবিমাধুরী মিশিয়ে সে রূপরাশিকে অপরূপ করে তুলবেন। কবিরই ভাষায় বলি—The fine dazzling trembling network, breezy motion, and streaks and circles of intermingled smooth and rippled water, which makes the surface of our lakes a field of endless variety.

এগারোটি লেকের বিবরণ এখানে দেওয়া অবান্তর হবে না বলে মনে করি। 'ল্যানকাষ্টার' থেকে 'কেণ্ডাল' রোড ধ'রে 'কেসিক' জনপদ হয়ে আসতে প্রথমেই চোখে পড়বে 'ডারওয়েণ্ট ওয়াটার', 'বাসেন্থওয়েট', ও 'থার্লমিয়ার' লেক তিনটি। তার পর 'ডানমেলের' মালভূমি ও 'ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড' পার হয়ে এসে পড়া যায় 'গ্রাসমিয়ার'

ও 'রাইডাল লেকে'। এইখানেই লেক-পোয়েটদের শীর্ষস্থানীয় ওয়ার্ডসবার্থ বহু দিন ছিলেন। এখান থেকে দক্ষিণে একটু বেঁকে এলে দেখা যাবে 'এলটার ওয়াটার' এবং আর একটু অগ্রসর হ'লেই 'কনিষ্টন লেক'। তার পরই 'এস্‌থওয়েট'। এস্‌থওয়েট লেক পার হলেই পাওয়া যাবে 'উইণ্ডিয়ারমিয়ার লেক'। উইণ্ডিয়ারমিয়ার থেকে বোওনেস্‌ ও ট্রাউটবেক্‌ উপত্যকা এবং 'কার্কষ্টোন্‌' গিরি-সংকট উত্তীর্ণ হয়ে লেক ডিস্‌ট্রিক্‌টের শেষ দু'টি সরোবরে এসে পৌঁছাই—'ব্রদার্স ওয়াটার' ও 'আল্‌স ওয়াটার'।

ওয়ার্ডসবার্থ তাঁর অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় ইংলণ্ডের এই লেক ডিস্‌ট্রিক্‌টকে ভুবন-বন্দিত করে গেছেন। তিনি কিন্তু এর প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের কথা ভোলেননি। ওয়েলস্‌, স্কটল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডের বিরাট সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন:—"ওদের সে বিপুল রূপের যেন নাগাল পাওয়া যায় না। ওদের সৌন্দর্য এত বিস্তৃত ও বিশাল যে, সে ছবির মাঝে মাঝে যেন অনেকটা ক'রে ফাঁক রয়ে গেছে। ওদের সবটুকু রূপ একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় না বলে একটা কেমন যেন অতৃপ্তি থেকে যায় অন্তরে। কিন্তু, ইংলণ্ডের এই লেক ডিস্‌ট্রিক্‌টের রূপ অতি শান্ত ও সুপরিমিত অথচ বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ। এক লহমায় এর সবটুকু দেখতে পেয়ে খুশী হওয়া যায়।"

আমরা কিন্তু কেসিক থেকে এই কবিতীর্থ সন্দর্শন শুরু না করে এরই অপর দিকের প্রান্ত থেকে দেখা শুরু করেছিলাম। অর্থাৎ উইণ্ডিয়ারমিয়ার থেকে উপর দিকে এগিয়ে কেসিক পর্য্যন্ত ঘুরে এলাম। উইণ্ডিয়ারমিয়ার ষ্টেশন থেকে প্রতি সাত মিনিট অন্তর এক একখানি দোতলা বাস বওনেস্‌ (Bownes) পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। ভাড়া মাত্র ছ'পেনি। বোওনেসের ধারেই সুবিস্তীর্ণ উইণ্ডিয়ারমিয়ার লেক। এগারোটি লেকের মধ্যে এইটিই সকলের চেয়ে বড়।

আমরা যখন লেকের ধারে এসে দাঁড়ালাম, সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গোধূলির সোনালী আলোয় আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। অধীর লেকের অথির জলে তার প্রতিচ্ছবির সঘন কম্পন দেখে মনে হচ্ছিল 'এ কি চঞ্চলতা পবনে, এ কি আকুলতা ভুবনে!' এখানে দেখি ছোট-বড় নানা রকম 'মোটর-বোট' রয়েছে, যাত্রীদের লেকের বুকে নৌবিহারে নিয়ে যায়। ভাড়া বেশী নয়; মাথা পিছু মাত্র আড়াই শিলিং।

আমরা একখানি মোটর-বোট নিয়ে নেমে গেলাম উণ্ডিয়ার-মিয়ারের লীলায়িত তরঙ্গ-প্রবাহে। শরতের সুমধুর সন্ধ্যায় সেই আনন্দ-সুন্দর নৌবিলাস জীবনে এক অবিস্মরণীয় সুখ-স্মৃতি হ'য়ে রইল। বিমুগ্ধা পত্নী মৃদুস্বরে আবৃত্তি করছিলেন—

"It is a beauteous evening calm and free
The holy time is quiet as a nun,
Breathless with adoration the broad sun
Is sinking down in his tranquillty.
The gentleness of Heaven is on the sea."
—(Wordsworth)

এক ঘণ্টার উপর লেকের বুকে ঘুরিয়ে বোট আমাদের যখন ঘাটে এনে নামিয়ে দিলে, তখন রাত্রি নেমেছে। লেকের চার পাশে ও পাহাড়ের মাঝে মাঝে বসতিগুলিতে অসংখ্য বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠেছে। রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। হোটেলের তত্ত্বাবধায়ক জানতে চাইলেন আমাদের 'ডিনার' দরকার হবে কি না? ধন্যবাদ দিয়ে বললাম আমরা লেকের ধারে একটি মনোরম ভোজনালয়ে নৈশ-ভোজ শেষ করে এসেছি। টমাটো স্যুপ, রুটি, পোটাটো চিপস্‌, ফিস-ফ্রাই এক প্লেট, পুডিং ও গরম দুধ এক গ্লাস—ভরপুর খাওয়া—দাম মাথা-পিছু মাত্র পাঁচ শিলিং।

পুরু গদিওয়ালা নরম বিছানায় পালকের গরম লেপের ভিতর ঢুকে যে স্বপ্ন-সুষুপ্তির মধ্যে রাত কেটে গেল সে শুধু আগামী দিনের আশার আকাশকুসুম।

পরের দিন সকালে প্রাতরাশের পরই আমরা বেরিয়ে পড়লাম গ্রাসমিয়ার লেকের দিকে। কবিবর ওয়ার্ডসবার্থের 'Dove Cottage' দেখে আসবার সাধ ছিল মনে। হোটেলের অধ্যক্ষ আমাদের সব কিছু হদিস বাৎলে দিলেন। বাসে যাওয়া যায়। 'প্রাইভেট কারে'ও যাওয়া যায়। 'কারে' যাওয়ার সুবিধা, যেখানে খুশী থামতে ও নামতে পারা যাবে। বাসে কিন্তু ষ্টেশন থেকে ষ্টেশন পর-পর বিরাম নির্দ্দিষ্ট থাকে, সুতরাং যেখানে খুশী নামা চলবে না। 'বাসে'র চেয়ে 'কারে' যাওয়ার খরচ দ্বিগুণ পড়বে শুনে আমরা বাসে যাওয়াই স্থির করে ফেললাম। বাসে এ অঞ্চলের সর্বত্রই যাওয়া যায়।

লেক ডিস্‌ট্রিক্‌ট বলতে প্রকৃত পক্ষে ল্যানকাষ্টার অঞ্চলের কেসিক (Keswick) থেকে কেণ্ডাল (Kendal) পর্যন্তই বোঝায়। প্রকৃতির পূজারী নিসর্গ-প্রেমিক কবি ওয়ার্ডসবার্থের জন্ম ও জীবনের নানা ঐশ্বর্যে ভরা এ ভূমি। তাঁর প্রতিভার সুন্দর স্মৃতিকাগার। কবির বাসগৃহ, স্মৃতি-সৌধ, তাঁর সাধন-পীঠ, তাঁর শিক্ষাভবন, উপাসনা-মন্দির এবং তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণে তাঁর অনাড়ম্বর সমাধি সমস্তই এ অঞ্চলে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।

কবিবর ওয়ার্ডসবার্থ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন ক্যাম্বারল্যাণ্ডের ডারওয়েন্ট নদী-তীরে 'ককারমাউথ' (Cockermouth) গ্রামে, আট বছর বয়স পর্য্যন্ত তিনি এই ককারমাউথেই ছিলেন। মাতৃবিয়োগের পর

ককারমাউথে কবির জন্মভূমি

তিনি আসেন হকসহেডে (Hawkshead) গ্রামার স্কুলে পড়তে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে ওয়ার্ডসবার্থ এই স্কুলেই সতেরো বছর বয়স পর্য্যন্ত পড়েছিলেন। তাঁর কাব্যপ্রতিভার প্রথম বিকাশ এই স্কুলেরই ছাত্রাবস্থায়। ওয়ার্ডসবার্থের পড়ার ডেস্কটি এখানে সযত্নে রাখা হয়েছে। ডেস্কের উপর নিজের হাতে ছুরি দিয়ে কেটে তিনি যে নাম খোদাই করেছিলেন সেটিও কৌতূহলী দর্শকদের জন্য সুরক্ষিত। শৈশবের সুখ-স্মৃতি বোধ করি যৌবনেও কবির চিত্তকে প্রীতির সরস স্পর্শে উদ্বুদ্ধ ক'রেছিল। কবি তাঁর 'prelude' কবিতায় বেশ একটু ভাবাবেগের সঙ্গেই তাঁর বাল্যলীলার স্থানগুলির উল্লেখ ক'রেছিলেন। সতেরো বছর বয়স পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন হক্সহেডে শ্রীমতী এ্যান টাইসনের কুটিরে উক্ত ভদ্রমহিলার সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে। কবি তাঁর 'প্রিলিউড' কবিতায় এ্যান টাইসনের এই কুটিরের অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়ে গেছেন।

গ্রাসমিয়ারে নেমে চারি দিকে চেয়ে দেখলে এক নিমেষে বোঝা যায় কেন এ জায়গাটি কবির এত ভাল লেগেছিল। কবি এখানেই একটি কুটির নির্মাণ করিয়ে দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন। কুটির ঠিক নির্মাণ করিয়েছিলেন বললে ভুল বলা হবে, তিনি একটি পুরাতন সরাইখানাকে কিনে তাকে 'Dove Cottage'এ রূপান্তরিত করেছিলেন। এই গ্রাসমিয়ার লেক আর এর তীরে ভীড়-করা জনহীন ঘন বনগিরি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে এই স্থানটিকে—এই গ্রাসমিয়ারকেই—যথার্থ কবিতীর্থ বলা চলে। এইখানেই ওয়ার্ডসবার্থের জীবনের বহু বৎসর সুখে-দুঃখে কেটেছিল। এখানকার পথে পথে, পাহাড়ে পাহাড়ে, তরুতলে, উপাসনা-মন্দিরে তাঁর অসংখ্য জীবন-স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে। রাইডালের 'সেন্ট অসওয়াণ্ড চার্চ', রাইডাল মাউণ্ট, রাইডাল লেক কবির একাধিক রচনার মধ্যে বারংবার আত্মপ্রকাশ করেছে। নির্জ্জন পাহাড়ের কোলে প্রকৃতির শান্ত নীড়ের মতো এই রমণীয় স্থানটি তদানীন্তন কবি ও সাহিত্যিক মাত্রেরই একান্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

ওয়ার্ডসবার্থের জন্মের বৎসরাধিক কাল আগে 'এলেজি'র কবি সুবিখ্যাত 'গ্রে' এখানকার সৌন্দর্যের এক মনোরম বর্ণনা রেখে গেছেন। ওয়ার্ডসবার্থের বন্ধু সুকবি কোলরীজের অমর

হকশেডের গ্রামার স্কুল

স্মৃতি-বিজড়িত এই দেশ। ইংরাজী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ লেখক ডি'কুইন্সি এখানে ওয়ার্ডসবার্থেরই পরিত্যক্ত গৃহে বহু কাল বাস করেছিলেন। ওয়ার্ডসবার্থের সমসাময়িক ইংরাজ কবি 'সাদে'ও এইখানেই কিছু দূরে এক গ্রামান্তরে বাস করতেন। ইংরাজি কাব্যে ও সাহিত্যে সুপরিচিত শ্রীযুত আর্ণল্ড এইখানেই মানুষ হয়েছিলেন।

আমরা কবির বাসগৃহ 'Dove Cottage' দেখে বড় আনন্দ ও তৃপ্তি পেলাম। যদিও ওয়ার্ডসবার্থ এ-বাড়ী ছেড়ে দেবার পর ডি'কুইনসি দীর্ঘকাল এখানে বসবাস করেছিলেন, তা'হলেও তিনি ওয়ার্ডসবার্থের কোনও স্মৃতিই এ-বাড়ী থেকে নষ্ট হ'তে দেননি। জুঁই ফুল ও গোলাপের কুঞ্জ-ঘেরা এই কবি-কুটিরে কবির বসার ঘর, শোবার ঘর, তাঁর পড়ার ঘর বা লাইব্রেরী সমস্তই অক্ষত আছে। কবিভগ্নী ডোরথির শয়নঘর, রন্ধনশালা, এমন কি কবির সেই কোকিল-ডাকা ঘড়িটিও আজও সিঁড়ির ধারে তেমনিই সাজানো রয়েছে—ঠিক যেমনটি কবির জীবদ্দশায় ছিল। এ বাড়ীখানি এখন 'ওয়ার্ডসবার্থ মিউজিয়মে' পরিণত হয়েছে। এখানে কবির ব্যক্তিগত ব্যবহারের বহু জিনিস এবং তাঁর পরিবারবর্গের ব্যবহার-করা বহু মূল্যবান অলঙ্কার, আসবাব-পত্র, তৈজস, ছবি প্রভৃতি সংগ্রহ করে সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

গ্রাসমিয়ার থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম রাইডাল লেকের ধারে কবির পরবর্ত্তী বাসগৃহ 'রাইডাল মাউণ্ট' পরিদর্শনে। 'ডভ কটেজ' ছেড়ে এসে ১৮১৩ খৃঃ অব্দ থেকে কবি এখানেই বসবাস করেছিলেন প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর। 'Dove Cottage'কে যথার্থই 'কবি-কুটির' বলা চলে, কিন্তু 'রাইডাল মাউণ্ট' রীতিমতো একটি ছোটখাটো প্রাসাদ। কবি তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু ও খেলার সাথী কুমারী মেরী হাচিসন্‌কে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বিবাহ করে নিজের জীবন-সঙ্গিনী ও পরিণত বয়সের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কবি-দম্পতির চার-পাঁচটি সন্তান হবার পর 'ডভ কটেজে' আর স্থান সংকুলান হয় না দেখে ওঁরা কিছু দিন 'এ্যালান ব্যাঙ্কে' এসে বসবাস করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে আসার পরই একে একে তাঁর দু'টি প্রিয়তম সন্তানকে হারিয়ে কবি বড় কাতর হয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন সন্তানবৎসল পিতা। শোকে অধীর হয়ে সুদীর্ঘ তের বৎসরের স্মৃতি-বিজড়িত গ্রাসমিয়ার ছেড়ে চলে আসেন এই 'রাইডাল মাউণ্টে'। গ্রাসমিয়ার ও এ্যাম্বেল সাইডের ঠিক মাঝামাঝি রাইডাল লেকের উপরেই এই 'রাইডাল মাউণ্ট'। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কবির এইখানেই কেটেছিল। এখানকার পার্বত্য উপত্যকা ও শৈলসরণির ভিতর দিয়ে, শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও কুসুমিত কুঞ্জকাননের পাশ দিয়ে, রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে স্বভাবমুগ্ধ কবি প্রত্যহ অনেক দূর পর্যন্ত বেড়িয়ে আসতেন। এই লেক অঞ্চলকে তিনি এত বেশী ভালবেসেছিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট যখন তাঁকে মোটা মাইনেতে হোয়াইট হ্যাভেনের কালেক্টার করে পাঠাতে চাইলেন, তিনি তাঁর এই সুন্দর বাসস্থান, এই প্রিয় পরিবেশ ছেড়ে যেতে হবে বলে সে কাজ গ্রহণ করলেন না।

তিনি শুধু কলমেই কবি ছিলেন না, তাঁর ছিল প্রকৃত কবি-মানস। কবিবর রবার্ট সাদে একবার এঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, "ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে মিল্টনের পাশেই ওয়ার্ডবার্থকে

স্থান দেবে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা। কিন্তু সে সময় ওয়ার্ডসবার্থের রচনা নিয়ে কাগজে-পত্রে এত বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হচ্ছিল যে, ওয়ার্ডসবার্থ ক্ষুব্ধ হ'য়ে সাদেকে একখানি পত্রে লিখেছিলেন "বর্ত্তমান যুগে তার আঁধার তমসার গাঢ় প্রেমে বিভোর হয়েই থাক্। আমি কিন্তু দেবলোকের যে স্বর্গীয় আলো পেয়েছি, তারই দীপ্তিতে আনন্দে লিখে চলে যাবো সারা জীবন।"

'রাইডাল মাউণ্ট' থেকে ফেরবার পথে আমরা এলাম ওয়ার্ডসবার্থের 'সেণ্ট অস্ওয়াল্ড, চার্চ' দেখবার জন্য। গ্রাসমিয়ারের এই গির্জ্জাটি বহু পুরাতন। কবিবর ওয়ার্ডস্বার্থ এখানে যখন উপাসনা করতে আসতেন, সে-সময় এই ভজনালয়টির যে অবস্থা ছিল আজ এই একশ' আশী বছর পরেও না কি ঠিক সেই অবস্থাতেই আছে শোনা গেল। শতাব্দীর ব্যবধানেও এর বিশেষ কোন রূপান্তর ঘটেনি। আজও প্রতি রবিবার এখানে সেই ঘণ্টাই বাজে, যে-ঘণ্টা একদা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কবিকে তাঁর উপাসনার সময় হয়েছে বলে মন্দিরে আহ্বান জানাতো। উপাসনা-মন্দিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে মনোরম উদ্যান। এই বাগানটিকে রক্ষা করবার জন্য কবির নিয়ত যত্ন ছিল। এখানে ওয়ার্ডসবার্থেরই উদ্যোগে ও চেষ্টায় এক দিন যে সব 'ওক্' 'ঈয়ু' এবং 'এ্যাশ' প্রভৃতি বৃক্ষশিশু রোপণ করা হয়েছিল আজ সেগুলি মহামহীরুহ হয়ে উঠেছে। কবি বলতেন—'প্রকৃতির এই শ্যামল আবেষ্টনের মধ্যে আমরা সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য যেন বেশী করে উপলব্ধি করতে পারি।' এই ভজনালয়েরই উদ্যান-প্রাঙ্গণের একধারে ওয়ার্ডসবার্থ-পরিবারের সমাধিক্ষেত্র রয়েছে। অত্যন্ত সাধারণ সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর এই সমাধি ও সমাধি-গর্ভে চিরনিদ্রিত ব্যক্তিগুলির স্মৃতিফলক। আমরা কিছু ফুল সংগ্রহ করে কবির সমাধির উপর সুদূর ভারতবর্ষের এক কোণ থেকে আগত এক অকিঞ্চিৎকর কবি-দম্পতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি-স্বরূপ অর্পণ করলাম।

সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। আমরা শেষ বাস ধরে উইণ্ডিয়ারমিয়ার হোটেলে ফিরে এলাম।

পরের দিন আবার প্রাতর্ভোজনের পর আমরা পুণ্যতীর্থ 'কেসিক' অভিমুখে রওনা হলুম। প্রায় দু'শতাব্দী কাল 'কেসিক' হয়ে উঠেছিল ইংরেজ কবি ও সাহিত্যিকদের যেন বারাণসীধাম! টমাস গ্রে থেকে শুরু করে লেক-কবিরা প্রায় সকলেই এখানে ঘুরে গেছেন। সার হিউ ওয়ালপোল, টেনিসন ও কার্লাইল প্রভৃতি বড় বড় নামজাদা লেখকেরাও মাঝে মাঝে এসে হাজির হতেন এখানে। 'গ্রেটা-হলে' কবি সাদে ও কোলরীজ এসে বাস করেছিলেন। কবিশ্রেষ্ঠ শেলী তাঁর নবোঢ়া তরুণী পত্নী ও ভগ্নীকে নিয়ে এসে কিছু দিন এখানকার 'চেষ্ট্নাট্ হিলে' কাটিয়ে গিয়েছিলেন। চার্লস ও মেরী ল্যাম্ব এক বছর এইখানেই তাঁদের ছুটি যাপন করেছিলেন, যার সুখ-স্মৃতি তাঁরা জীবনে কখনো ভুলতে পারেননি। আর, ডি'কুইন্সি তো ছিলেন এ অঞ্চলের এক জন প্রধান অনুরাগী ভক্ত। কবিবর রবার্ট সাদের প্রিয় বাসভূমির ধূলি-কণা স্পর্শ করে আসবার অভিপ্রায়ের সঙ্গে আমাদের আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। স্কটল্যাণ্ডে সেণ্টএ্যাণ্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এক ধর্মযাজক-দম্পতীর। রেভারেণ্ড মিঃ ও মিসেস্ প্যাঙ্কহার্স্ট। এঁরা ছুটিতে স্কটল্যাণ্ডে বেড়াতে এসেছিলেন। আমরা লেক ডিস্ট্রিক্ট বেড়াতে যাবো শুনে অনেক ক'রে বলেছিলেন ওঁদের সঙ্গে যেন অতি অবশ্য দেখা করি। ওঁরা এই কেসিকেই থাকেন। স্কটল্যাণ্ড ছেড়ে সেই দিনই তাঁরা দেশে ফিরে যাচ্ছেন বলেছিলেন।

কেসিক বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। প্রায় একটি ছোটখাটো শহরের মতো। স্থানটি সমৃদ্ধ ও জনবহুল বলে মনে হ'ল। আমরা কবি সাদের বাসস্থান ঘুরে কেসিক লেকে বেড়াতে এলুম। এখানেও মোটর-বোট পাওয়া যায়। একখানি বোট নিয়ে আমরা কেসিক লেকের বুকে খুব খানিকটা নৌবিহার করে এলাম। তার পর গেলাম সেই পাদ্রী-দম্পতির খোঁজে। তাঁদের নামটা আমাদের স্মরণ ছিল কিন্তু কোন্ চার্চের ধর্মযাজক তিনি, সেটা আমাদের মনে ছিল না, অথচ সেই চার্চে গিয়ে খোঁজ করলেই তাঁদের দেখা পাওয়া যাবে বলে দিয়েছিলেন তাঁরা। গির্জ্জার নামটা কোন মতেই স্মরণ করে বলতে পারা গেল না বলে এখানকার অধিবাসীরা অনেকেই দুঃখপ্রকাশ করে জানালেন যে, এখানে খৃষ্টধর্মের নানা শাখার একাধিক গির্জ্জা আছে। তিনি কোন গির্জ্জার অন্তর্ভুক্ত না বলতে পারলে আমাদের এ বিষয়ে কোনও প্রকার সাহায্য করা প্রায় অসম্ভব। অগত্যা আমরা নিজেরাই তখন একখানা ট্যাক্সী নিয়ে কয়েকটা গির্জ্জায় খুঁজতে বেরুলাম রেভারেণ্ড মিঃ এণ্ড মিসেস্ প্যাঙ্কহার্স্টকে। পাত্তা পাওয়া গেল না। বেশীক্ষণ ঘোরাও সম্ভব হ'ল না। কারণ, বেলা তখন গড়িয়ে এসেছে। পাঁচটায় উইণ্ডিয়ারমিয়ারে ফেরার শেষ বাস ছাড়বে। কাজেই আমাদের ফিরে আসতে হ'ল।

ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের মতোই আমরা লেক ডিস্ট্রিক্টের এই কবি-তীর্থে তিন রাত্রি বসবাসের অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করে এলাম। প্রকৃতির রূপমুগ্ধ মায়াবী কবি ওয়ার্ডসবার্থের কল্পনার সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে এই লেক ডিস্ট্রিক্ট আজ দেশ-দেশান্তরের মানুষকে মুগ্ধ করছে। এখানকার ছোট-বড় নানা শৈলমালা—কেউ শ্যামল, কেউ ধূমল, কেউ বা বনরাজিনীলা। এদেরই পাদপীঠ স্পর্শে আনন্দোজ্জ্বল প্রত্যেকটি সরোবর। তাদের তরঙ্গস্ফীত বুকে দুলছে—ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল আকাশের ছবি। ডারওয়েণ্ট ও এলটার আদি চটুলগতি পার্বত্য স্রোতস্বিনী তাদের দুই তীর সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে এখান থেকেই ছুটে চলছে চির-আকাঙ্ক্ষিত সাগরাভিমুখে। এদেরই দু'কূলে ঢেউ তুলে চলেছে এই লেক অঞ্চলের উঁচু-নীচু মালভূমি ও তার ছায়া-স্নিগ্ধ সুন্দর উপত্যকা। এরই মাঝে মাঝে জলতরঙ্গের সুর-ঝংকারে ঝরে পড়ছে কত না নব নব নৃত্যরতা নির্ঝরিণী। প্রকৃতির শ্যামল সুন্দর স্নিগ্ধ পরিবেশকে যেন সার্থক করে তোলবার জন্যই মানুষ গড়েছে এর বুকে আঁকা-বাঁকা পায়ে চলার পথ। কত না ছোট-ছোট গ্রাম ও জনপদ এই বিরল-বসতি অঞ্চলকে প্রাণ-চঞ্চল ক'রে রেখেছে। আশে-পাশে গিরিপথ ভেঙে দিনান্তে নেমে আসছে শ্রান্ত রাখালেরা তাদের মেষপাল নিয়ে। তরী বেয়ে চলেছে ধীরে সরসী-নীরে কত না হাস্য-মুখরা দৃপ্ত-যৌবনা তরুণ-তরুণী। উষার অরুণচ্ছটা ও সন্ধ্যার অস্তরাগ আলো-ছায়ার অপূর্ব বর্ণমায়া সৃষ্টি করছে প্রতি দিন চারি দিকের পাহাড়ে-পাহাড়ে। কোমল রৌদ্রকরোজ্জ্বল অথবা মেঘমেদুর সজল দিবসে এখানকার এই মায়া-সরোবরগুলির স্বচ্ছ-স্ফটিক বুকে যে অনুপম লাবণ্য প্রহরে-প্রহরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখেছি—আঁধার ঘন নিবিড় নিশীথে বা জ্যোৎস্নাপুলকিত শুক্লা রাতে এ-অঞ্চলে প্রকৃতির যে অপরূপ রূপ আমাদের মুগ্ধ চোখে ধরা দিয়েছে, তা যথার্থই অনির্বচনীয়।

অধরলাল সেন

(১৮৫৫—১৮৮৫)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশের যে কয়জন সাহিত্যসেবীর উপর পরমহংসদেবের কৃপা হইয়াছিল, অধরলাল সেন তাঁহাদের অন্যতম। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ (মাঘী অমাবস্যা শুক্রবার) দ্বিপ্রহরে প্রথম দর্শনের পর ১৮৮৫ সনের জানুয়ারি মাসে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রায় এক বৎসর নয় মাস কাল অধরলাল রামকৃষ্ণ পরমহংসের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন; ইহার অনেক লিখিত বিবরণ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র পৃষ্ঠায় আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিতান্ত অকাল মৃত্যুর জন্য অধরলাল স্বয়ং পরমহংস-প্রসঙ্গ কিছু লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। পরমহংসদেব তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহাকে "আত্মীয়" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ সনের ১৮ই আগষ্ট তারিখে তিনি অধরের জিহ্বা স্পর্শ করিয়া ও সেখানে বীজমন্ত্র লিখিয়া দিয়া তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার বেনেটোলার (সভাবাজার) বাড়ীতে পরমহংসদেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের যোগাযোগ হইয়াছিল। 'কথামৃত'-পাঠক ও পরমহংস-ভক্তদের কাছে অধরলাল সেন অত্যন্ত পরিচিত নাম।

বংশ-পরিচয় : জন্ম

১২৬১ সালের ১৯এ ফাল্গুন (২ মার্চ ১৮৫৫) এক সম্ভ্রান্ত সুবর্ণবণিক্-পরিবারে অধরলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামগোপাল সেন। রামগোপাল কলিকাতা আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীটে সুতার কারবার করিতেন; তাঁহার বসতবাটী ছিল সভাবাজার বেনেটোলায়।

বিবাহ : বিদ্যাশিক্ষা

অতি অল্প বয়সেই অধরলালের বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বারো বৎসরে পদার্পণ করিলে রামগোপাল পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন; পাত্রীর বয়স তখন সাত।

অধরলালের ছাত্র-জীবন বিলক্ষণ উজ্জ্বল ছিল। তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; ক্যালেণ্ডারে তাহার বিবরণ এইরূপ :—

ইং ১৮৭১···এনট্রান্স, ১ম বিভাগ, ৮ম স্থান···হিন্দু স্কুল।

১৮৭৩···এফ. এ., ১ম বিভাগ, ৪র্থ স্থান···প্রেসিডেন্সী কলেজ। Duff-বৃত্তিলাভ।

১৮৭৭···বি. এ., ১ম বিভাগ, ২১শ স্থান···প্রেসিডেন্সী কলেজ।

অধরলাল প্রেসিডেন্সী কলেজে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সহপাঠী ছিলেন।

রাজকার্য্য

চব্বিশ বৎসর বয়সে অধরলাল রাজকার্য্যে যোগদান করেন; ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ডেপুটি কলেক্টর-রূপে তাঁহাকে চট্টগ্রাম যাত্রা করিতে হয়। ১৮৮০ সনে যশোহরে এবং শেষে ১৮৮২ সনে তিনি কলিকাতায় বদলি হন। রাজসরকারে তাঁহার সুনাম ছিল।

১৮৮৪ সনে 'ফেলো' এবং ফ্যাকাল্টি-অব-আর্টসের সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিরও সভ্য ছিলেন।

সাহিত্যানুরাগ

কলেজের ছাত্রাবস্থা হইতেই অধরলাল কাব্য-সরস্বতীর উপাসক। উনিশ বৎসর বয়সে প্রকাশিত তাঁহার প্রথম রচনা 'ললিতা-সুন্দরী' সমালোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (শ্রাবণ ১২৮১) মন্তব্য করিয়াছিলেন :—"লেখক অতি তরুণবয়স্ক, আমরা জানিয়াছি।··· উপস্থিত কাব্যে নবীনত্বের বিশেষ অভাব, কিন্তু দেখিয়া বোধ হয় বয়োবৃদ্ধি হইলে ইঁহার রচনা বিশেষ প্রশংসনীয় হইতে পারিবে।" স্বল্পায়ু জীবনে অধরলাল মাতৃভাষায় পাঁচখানি কাব্য ও ইংরেজীতে তথ্যমূলক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; সেগুলি—

১। **ললিতা-সুন্দরী**, ১ম সর্গ (কাব্য)। সম্বৎ ১৯৩১ (১৪ এপ্রিল ১৮৭৪)। পৃঃ ৪৮।

১৮৭৮ সনে ইহার সহিত কয়েকটি খণ্ড-কবিতা যুক্ত হইয়া 'ললিতাসুন্দরী ও কবিতাবলী' (পৃঃ ৪৮+১৬) নাম ধারণ করে। 'ললিতাসুন্দরী' ১৮৭০-৭৪ সনে ও 'কবিতাবলী' ১৮৭৮ সনে লিখিত।

২। **মেনকা** (গীতিকাব্য)। সম্বৎ ১৯৩১ (ইং ১৮৭৪)। পৃঃ ৫১।

মূরের 'লাল্লা রুখ' কাব্যের অন্তর্গত "প্যারাডাইজ এণ্ড দি পেরী" কবিতার অনুসরণে লিখিত।

৩। **নলিনী** (কাব্য)। সম্বৎ ১৯৩৪ (১৩ জুন ১৮৭৭)। পৃঃ ৩২।

৪। **কুসুম-কানন** (কাব্য) :

১ম ভাগ। সম্বৎ ১৯৩৪ (৮ অক্টোবর ১৮৭৭)। পৃঃ ৬৪।

২য় ভাগ। সম্বৎ ১৯৩৫ (২৩ এপ্রিল ১৮৭৮)। পৃঃ ৫১।

১৮৮৩ সনে প্রকাশিত ২য় সংস্করণে সমগ্র গ্রন্থ একত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। **লিটোনিয়ানা** (কাব্য)। (৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮০)। পৃঃ ৮৩।

লর্ড লিটনের কতকগুলি কবিতার পদ্যানুবাদ।

৬। THE SHRINES OF SITAKUND in the District of Chittagong in Bengal. 1884, June. pp. 55.

১৮৮০ সনে শিবচতুর্দ্দশীর উৎসব উপলক্ষে অধরলাল সীতাকুণ্ড দর্শন করেন। এই সময়ে তিনি যে-সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই অবলম্বন করিয়া পর-বৎসর ২রা মার্চ বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন; এই পুস্তকখানি সেই প্রবন্ধেরই সংস্কৃত রূপ।

মৃত্যু

১৮৮৫ সনের ৬ই জানুয়ারি অধরলাল মাণিকতলা ডিষ্টিলারি পরিদর্শন করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার বাঁ-হাতের কব্জী ভাঙিয়া যায়; ইহা হইতেই শেষে ধনুষ্টঙ্কার দেখা দেয়। আট দিন রোগ ভোগের পর ২ মাঘ ১২৯১ (১৪ই জানুয়ারি) সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৩০ বৎসর হইয়াছিল।

এই আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে পরমহংসদেব অনেকক্ষণ ধরিয়া মা'র কাছে কাঁদিয়াছিলেন।

অধরলাল ও বাংলা-সাহিত্য

কবি সতীশচন্দ্র রায়কে স্মরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, জীবনে যে ভাগ্যবান্ পুরুষ সফলতা লাভ করিয়াছে, মৃত্যুতে তাহার পরিচয় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। কিন্তু যাহার মধ্যে সফলতার বীজ ছিল অথচ তাহা অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু যাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, তাহার সম্বন্ধে পরম দুঃখ এই যে, আমার দুঃখ সকলের দুঃখ হইয়া উঠিল না। কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে অধরলাল সম্বন্ধেও আমাদের দুঃখ অনুরূপ। তথাপি তাঁহার সাহিত্য-কীর্ত্তির যে মুদ্রিত পরিচয় আছে, তাহা হইতেই তাঁহার সফলতার সম্ভাবনা সহৃদয় পাঠক লক্ষ্য করিতে পারিবেন, এই ভরসায় কিছু নমুনা নীচে উদ্ধৃত হইল।—

'ললিতাসুন্দরী ও কবিতাবলী' :

৪

যে নারীর রূপ ভাবি মহেশ পাগল,
মধুকালে নিধুবনে কেশব বিকল,
বাজে আজো ব্রজপুরে রাধা রাধা রব,
যমুনা লহরী খেলে—প্রণয়-উৎসব ;
শোনা যায় দূরদেশে নূপুরের ধ্বনি ;
উজলে কদম্বতলে চারু চূড়ামণি ;
নাহি তথা কালাচাঁদ, বাজিছে বাঁশরী,
কুহরে কোকিলকুল, "কোথা প্রাণেশ্বরী!"
দেখা যায় শ্যামরূপ শশীর কিরণে,
প্রেম অভিমান যেন সাধেন চরণে ;
সেই রমণীর রূপ চির শোভাময়,
উজল লাবণ্যরাশি, পূর্ণচন্দ্রোদয় ; (পৃ. ৫-৬)

'নলিনী' :

১৪

কোথায় সে প্রেম ? কাল সব ফক্কিকার !
বাজে কি শ্যামের বাঁশী যমুনার তীরে ?
আঁধার, আঁধার মন, আঁধার, আঁধার !
চলে যাই দুই জনে, চাই ফিরে ফিরে !
সে প্রেম কোথায় ?
ভালবেসে পরিশেষে কিবে সুখ হ'ল ?
তামাসা ফুরায়ে গেল, হৃদয় শ্মশান হ'ল,
চক্রবাক, চক্রবাকী কাঁদে উভরায়,
বাজে 'হায়! হায়! হায়!'

১৫

দাঁড়া'য়ে বিষাদে শেষে দুপারে দুজনে,
মাঝে বয় কুলুস্বরে বিরাগের নদী,
অভিমান ম্লানমুখে দাঁড়া'য়ে পিছনে,
জ্বলিবে, দাঁড়া'বে কিম্বা পার হ'বে যদি।

উদ্দেশে দোঁহার*
প্রসারিব কর আর করিব চুম্বন,
পবনেতে আলিঙ্গন, পবনেতে সম্মিলন—
চারি দিক সে বিষাদে করে হাহাকার,
ওরে নলিনি আমার। (পৃ. ৮)

'কুসুম-কানন' :

এখনও নীরব নহে

... ...

জীবন-মরণ যদি নিদ্রা-জাগরণ,
হয় না তা' হ'লে কেন অনন্ত মরণ ?
জনম-মতন, হায়, ভুলিব তা' হ'লে
হৃদয়ের অনির্ব্বাণ অনন্ত-জ্বলন।

ভুলিব তা' হ'লে মম সুখসরোবরে
দুলিত কিরূপে ফুল্ল কবিতা-কমল,
বাসনা-সমীরে আর আশার সৌরভে
কোন্ ভাবে ভ্রমিতাম পীযূষ-চপল।

ভুলিব তা' হ'লে মম যৌবন কাননে
কিরূপে উঠিল এক কামিনী-কণ্টক,
নাশিল কোমল মম সুখের লতায়,
করিল আমার মনে বিকট নরক।

ভুলিব তা' হ'লে সেই প্রিয়সখাগণে,
যাঁদের প্রণয়মণি হৃদয়-আকর
আঁধারি, গিয়েছে চুরি কালের করেতে,
উজল করিতে, হায়, ত্রিদিব-নগর।

এস সবে প্রাণসম প্রিয় সখাগণ,
একবার তোমাদিগে হৃদয়েতে ধরি।
আয় রে শৈশবকাল সুখের সময়,
আয় রে বারেক তো'রে আলিঙ্গন করি।

তখন ক'জনে মিলে হৃদয়ে হৃদয়ে
কি সুখেই কেটে যেত সুখময় দিন!
কি সুখের মদিরায় ছিলাম মগন,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমে করিয়ে বিলীন!

কবিতায় ভাসমান পরাণ-নিকর,
তোমাদেরই রাগে ছিল এ চিত রঞ্জিত ;
জীবনে মরুভূমে শ্যাম ওয়েসিস,
জুড়ায়েছ শান্তিদানে হৃদয় তাপিত।

আসিব না আর আমি তোমাদের কাছে
শুনাইতে হৃদয়ের বিষাদের গান ;
চাহিব না স্নেহজল প্রণয়ের কর,
দূরদেশে নিবে' যা'বে আমার পরাণ।

* "We stand on either side the sea," etc.—Swinburne.

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

ফক্কা—পূর্ব্বপক্ষ, ফাঁকি, ছলনা, ফাকি, ফক্কিকা, ফাকড়া।
ফটকা—বিপথগামী, কুকাপ, বিকল্প।
ফটকারী—ফট্‌কিরী।
ফটিক—স্ফটিক, কাচবিশেষ।
ফড়ফড়ানি—বাচাল, বাবদূক, বকা।
ফণী—ফণধর, ভুজঙ্গ, বিষধর, সর্প।
ফন্দী—ছল, কৃত্রিম, ব্যবহার, অনুষ্ঠান।
ফরফরাণ—আত্মশ্লাঘা করণ, বড়াই করণ।
ফল—বৃক্ষাদির ফল, শস্য, লাভ, প্রয়োজন।
ফলক—ঢাল, লিখিবার পাটা, ফাল।
ফলতঃ—বস্তুতঃ, যথার্থতঃ, অর্থাৎ।
ফলদ—ফলদায়ক, হিতদায়ক, উপকারক।
ফলা—বাণাদির অগ্রভাগ, বানান।
ফলাফল—লাভালাভ, হিতাহিত।
ফলার—ফলাহার, জলপান।
ফলিতার্থ—নিষ্কৃষ্টার্থ, চরমার্থ, অর্থাৎ।
ফলোদয়—উপকার, কার্য্যসিদ্ধি।
ফল্গু—ফাগু, ফাগ, আবীর।
ফল্গুৎসব—দোলযাত্রা, হুলি, হোলি।
ফষ্টি—পরিহাস, বিদ্রূপ, ব্যঙ্গোক্তি।
ফষ্ট্যা—রসিক, ভণ্ড, নকলকারী।
ফস্কা—আল্‌গা, ঢিলা, শিথিল, ব্যর্থ।
ফাও—ব্যাজ, অতিরিক্ততা, উদ্বৃত্ত, উপরি, ফাউ।
ফাঁড়া—রিষ্টি, আপদ, বিপদ, বিভ্রাট।
ফাঁদ—কল, জাল, পাশ, রজ্জুকূটযন্ত্র।
ফাঁদনী—কৌশল, উপায়, অনুষ্ঠান।
ফাঁপ—স্ফীতি, ফোস্কা, ফুলা, বুদ্‌বুদ্।
ফাঁপা—অন্তঃশূন্য।
ফাঁস—ফাঁদ, পাশ, ফাঁসি, জাল।
ফাঁসা—ছিদ্র, ফাক, ফাইট, চির।
ফাঁক—দূর, ছিদ্র, অন্তর, রন্ধ্র, ফাটল।
ফাটান—বিদারণ, চিরাণ, ভাঙ্গন।
ফাতা—ফাতনা, শোলা, ছিপের শর।
ফাল—লাঙ্গল, বাণাদির অগ্রস্থ লৌহ।
ফালি—খণ্ড, কুচি, টুকী, টুকরা।
ফিক—ঠেস, ঠেকুয়া, হঠাৎ বেদনা।
ফিকা—পাণ্ডুর, ম্লান, অনুজ্জ্বল, মসৃণ।
ফিঙ্গা—পক্ষিবিশেষ, শিকা, ছিটকা।
ফিচাল—ধূর্ত্ত, শঠ, খল, চতুর, সেয়ানা, ফিচেল।
ফিসফিসনি—সূক্ষ্ম বৃষ্টিপাত, কর্ণে জপ, ফিসফিসানি।

ফুট—বিন্দু, দ্রাবক, ফলবিশেষ।
ফুটা—ছিদ্র, বিকসিত, ফাটা।
ফুৎকার—মুখ হইতে বায়ু ত্যাগ, ফুঁকন।
ফুরণ—ব্যয় হওন, অকুলান, টুটন।
ফুল—পুষ্প, কুসুম।
ফুলখড়ি—চূর্ণ খটিকা, রামখড়িবিশেষ।
ফেনা—ফেন, মলা, গাঁজলা, গাদ।
ফের—পুনরায়, দায়, বিপদ, উল্টা।
ফেরতা—পুনরায়, দায়, বিপদ, উল্টা।
ফেরফার—ব্যতিক্রম, বৈপরীত্য।
ফেরা—ঘূর্ণী, চক্রগমন, পর্য্যটন।
ফোঁপরা—ফাঁপান, ফাঁপা।
ফোঁটা—বিন্দু, ছিটা, তিলক।
ফোড়া—স্ফোটক, আঁচড়।
বউ—স্ত্রী, পুত্রবধূ, বৌ, বধূ।
বউভাত—পাকস্পর্শ।
বংশ—কুল, গোত্র, বাঁশ, বেণু।
বংশজ—সদ্বংশজাত, কুলজাত।
বংশাবলি—কুলজী।
বংশী—মুরলী, বেণু, বাঁশি।
বংশীয়—বংশ্য, কুলজ, গোত্রজ।
বক—কঙ্ক, পক্ষিবিশেষ।
বকা—জল্পক, কথক, নিরর্থক বাক্যবাদী।
বক্তব্য—কহনের যোগ্য, বচনার্হ, বাচ্য।
বক্তা—সুকথক, বাক্যবাদী, বক্তৃতাকর্ত্তা।
বক্ত্র—মুখ, আস্য, আনন।
বক্র—বাঁকা, নত, ক্রূর, খল।
বক্ষ—বক্ষস্থল, উরঃ, বুক, ক্রোড়।
বক্ষোজ—স্তন, কুচ, উরোভব।
বগল—বাহুমূল, কক্ষ।
বঙ্কিম—বক্র, পাকপড়া, বাঁকা।
বচন—কথন, বাক্য।
বচনস্থ—বাধ্য, বশীভূত, বাক্যপালক।
বজ্র—অশনি, বাজ, ঝঞ্ঝনা, কৌমুদ্য।
বটক—বটবৃক্ষ, ন্যগ্রোধবৃক্ষ।
বটিকা—বড়ী, বটী, ঔষধের গুলি, বর্ত্তুল।
বড়—বৃহৎ, অতিবাদ, বিশাল।
বড়শী—বড়িশ, বঁড়শী।
বড়া—ফুলুরী, পিষ্টক।
বড়াই—আত্মশ্লাঘা, অহঙ্কার, অহমিকা, দর্প।

বড়ী—গুলী, গুটী, বটিকা।
বণিক—বাণিজ্যধারী, ব্যাপারী, বেণ্যা, বেণিয়া, বেণে।
বণ্টন—অংশন, পরিবেষণ।
বৎ—ন্যায়, সদৃশ, আঠা।
বৎস—বাছুর, শাবক, শিশু।
বৎসল—স্নেহকারী, অনুরাগী, দয়ালু।
বদ্ধ—বন্ধনগ্রস্থ, বাঁধা, আটকান।
বধ—হত্যা, নাশ, হনন।
বধনীয়—বধ্য, বধার্হ, হত্যাযোগ্য।
বধিক—বধী, হন্তা, বধকারী, ঘাতক।
বধির—কালা।
বন—কানন, বিপিন, অরণ্য, গহন, বন্য।
বনচর—বনচারী, পশ্বাদি, বিপিনগামী।
বনপ্রিয়—কোকিল, পিক।
বনবাসী—কাননবাসী, তপস্বী, গৃহত্যাগী।
বনস্পতি—বিনা পুষ্পে যে বৃক্ষের ফল জন্মে।
বনান—বানান, রচন, নির্ম্মাণ, গঠন।
বনিতা—স্ত্রী, কান্তা, ভার্য্যা, পত্নী।
বন্দ—পগার, ভূমিখণ্ডবিশেষ।
বন্দনা—নমস্কার, গানের মঙ্গলাচরণ।
বন্দী—স্তুতিপাঠক, কারারুদ্ধ।
বন্ধক—আধি, ঋণ-গ্রহণার্থ গচ্ছিত দ্রব্য।
বন্ধনী—রজ্জু, দড়ী, পাশ, পটী।
বন্ধু—সুহৃদ, মিত্র, সখা, প্রিয়তম।
বপন—বীজ দেওয়া, বুনা, রোপা।
বপুঃ—শরীর, দেহ, কলেবর, কায়, গাত্র।
বমন—বমী, ছর্দ্দি, হুঙ্কার, বমি।
বয়ঃ—বয়স, আয়ু, পরমায়ু।
বয়ঃপ্রাপ্ত—বয়স্থ, প্রাপ্তব্যবহার।
বয়স্য—সমবয়স্ক, সখা, বন্ধু।
বর—বাঞ্ছিত, বিবাহকর্ত্তা, শ্রেষ্ঠ।
বরং—বরঞ্চ, অপেক্ষাকৃত শ্রেয়ঃ।
বরশা—টেঁটা, পোলো; বর্শি।
বরাহ—শূকর, বরা, কোল, শূয়ার।
বরিষা—বর্ষাকাল, প্রাবৃটকাল।
বরেণ্য—প্রধান, উত্তম, উৎকৃষ্ট, প্রার্থনীয়।
বর্গ—একজাতীয় সমূহ, বর্ণ, গণ।
বর্গায়—জাতীয়, বর্ণক।
বর্জ্জন—ত্যজন, ছাড়ন, মোচন।
বর্ণ—ব্রাহ্মণাদি জাতি, শুক্লকৃষ্ণাদি, অক্ষর।
বর্ণসঙ্কর—দ্বিবর্ণ হইতে জাত, মিশ্রিত জাতি।
বর্ণী—চিত্রকর, লেখক, ব্রহ্মচারী।
বর্ত্তন—জীবিকা, বৃত্তি, হওন, জীয়ন, থাকন।
বর্ত্তমান—বিদ্যমান, জীবৎ, প্রস্তুত।
বর্ত্তি—বর্ত্তিকা, বাতী, শলিতা।
বর্ত্তিকা—তুলী, শলিতা, প্রদীপ।
বর্ত্ম—বর্ত্মন, পথ, মার্গ।
বর্দ্ধন—বৃদ্ধি, উন্নতি, বাড়ন, বর্দ্ধিষ্ণু হওন।
বর্ব্বর—নির্বুদ্ধি, জড়, মূর্খ, অজ্ঞান।
বর্ম্ম—লৌহময় গাত্রকবচ, সাঁজোয়া।
বর্ষ—বছর, বৎসর, সমা, হায়ন, পৃথিবীর খণ্ড।
বর্ষজীবি—ওষধি, ফলপাকান্ত, ধান্যাদি।
বর্ষণ—বৃষ্টিপতন, বিতরণ।
বর্ষাভূ—বর্ষাভী, মণ্ডুক, বেঙ্গ, ভেক।
বর্ষোপল—করকাপাত, শিলাবৃষ্টি।
বল—পরাক্রম, সামর্থ্য, শক্তি, তেজ, সৈন্য।
বলয়—বালা, কঙ্কণ, করভূষণ।
বলয়িত—বেষ্টিত, ঘেরিত, চতুর্দ্দিকে রুদ্ধ।
বলাৎকার—আক্রমণ, অত্যাচার।
বলিভুক্—কাক, বায়স, বলিমাংসাহারী।
বলিষ্ঠ—বলী, বলবান, সমর্থ।
বল্কল—বাকল, বৃক্ষের ছাল, ত্বক্।
বল্কা—ঈষত্তুষ্ণ, অল্প তপ্ত।
বল্গু—মনোহর, সুশ্রী, সুরূপ, সুন্দর।
বল্লব—গোপ, গোয়ালা, পাচক, রন্ধনকর্ত্তা।
বল্লভ—প্রিয়, ইষ্ট, পতি, স্বামী।
বশ—আয়ত্ত, অধীন, বাধ্য, দমিত।
বশতাপন্ন—আয়ত্ত, বশীভূত, বশগ।
বশীকরণ—আয়ত্তী করণ, দমন।
বশ্য—বাধ্য, নম্য, বশের যোগ্য।
বসতি—বস্তি, বাস, গৃহ, আবাস।
বসতবাটী—বাসালয়, বাস্তুগৃহ।
বসন—উপবেশন, থাকন, বস্ত্র, বাস করণ।
বসা—বপা, মাংসতৈল, উপবেশন।
বসিন্দা—বাসিন্দা, নিবাসী, বাসকারী।
বসু—ধ্রুবাদি অষ্ট দেবতা, বিত্ত।
বসুমতী—বসুধা, বসুন্ধরা, পৃথিবী, পৃথ্বী।

[ক্রমশঃ

পত্র-যুদ্ধ

[১৮৮২ সালে হেষ্টি সাহেবের সঙ্গে বাংলার যুগান্তকারী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের এক ঘোরতর পত্র-যুদ্ধ হয়। শোভাবাজার রাজবাড়ীর এক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এই সঙ্ঘর্ষ বাধে। মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে বাঙলার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ আমন্ত্রিত হন। সুবৃহৎ সভামণ্ডপে চার হাজার অধ্যাপক আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় গৃহ-বিগ্রহ গোপীনাথজীকে রৌপ্য-সিংহাসনে স্থাপন করা হইলে হেষ্টি সাহেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং তিনি হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন ও হিন্দুদের দেব-দেবীকে গালাগালি দিতে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র সহ্য করতে না পেরে শেষে তাঁর লেখনী ধারণ করেন। 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বাঙলার ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই পত্রাবলী আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতেন। ফলে 'ষ্টেটসম্যানে'র বিক্রয় এত বৃদ্ধি পায় যে, কোন কোন দিন দুই বার পর্য্যন্ত কাগজখানি ছাপতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র "রামচন্দ্র" এই ছদ্মনামে তাঁর পত্রগুলি প্রকাশ করেন, কেবল শেষ পত্রে তিনি নিজের নাম প্রকাশ করেন। এখানে সেই পত্রাবলী প্রকাশিত হ'ল]

হেষ্টির পত্র

"যে সভায় গোপীনাথ জীউএর বিগ্রহ স্থাপন করা হইয়াছে, সে সভায় ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কিরূপে উপস্থিত রহিলেন? হিন্দুদের ঠাকুরগুলির মূর্ত্তি অতি ভয়ানক; বিলোলরসনা নৃমুণ্ডমালিনী কালীর প্রতিমা বা হস্তিমুণ্ড গণেশ-মূর্ত্তি দেখিলে উপাসকের মনে কখনও ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের কাহিনীর মধ্যে যত রসই থাকুক, ইহা কাম ভাবেরই উদ্রেক করে। বলা হইয়া থাকে যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের ধ্যান করা সম্ভব নহে বলিয়া মূর্ত্তি গড়িয়া সেই মূর্ত্তিকে ঈশ্বরের প্রতীক হিসাবে ধারণা করার সুবিধা হয়, সুতরাং এর প্রয়োজন আছে। সাকারের মধ্যেই তাই নিরাকারের উপাসনা করা হয়। তাই যদি হয়, তবে কি কল্পনা-কুশল আর্য্যসন্তান বাঙ্গালী, বুদ্ধিশক্তিতে কোল, ভীল, সাঁওতাল অপেক্ষা নিকৃষ্টতর? না, বাঙ্গালীরা কখন এত নীচ, এত স্থূলবুদ্ধি হইতে পারে না যে, তাহাদের হাতে-গড়া মাটীর পুতুলের সাহায্য ব্যতীত তাহারা ঈশ্বরের ধ্যান বা উপাসনা করিতে অক্ষম? শ্রীকৃষ্ণ কি?—প্রাচ্যের কামাসক্তির কাল্পনিক প্রতীক ছাড়া আর কিছু নয়। এই মূর্ত্তিপূজার ফলে কতকগুলি কাপুরুষ, প্রবঞ্চক, অলস, কামুক, বারাঙ্গনা ও অশ্লীল কবির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা চরিত্রহীনতা, মিথ্যা, অন্যায় আচরণ, নিষ্ঠুরতা, ডাকাতি ও নরহত্যাকে প্রশ্রয় দিয়াছে। দেবতাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা লক্ষ লক্ষ অধিবাসীকে অসাম্যের শিক্ষা প্রদান করিয়াছে। কেবল হিন্দুরাই মূর্ত্তিপূজার দ্বারা আর্য্য নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে। হায় ভারতবর্ষ! আজ তোমার কি দুর্দ্দশা! গৌরবের সিংহাসন হইতে তুমি কিরূপে বিচ্যুত হইলে! কে তোমাকে ঘৃণ্য বারাঙ্গনাদের জননীতে পরিণত করিল!"

রামচন্দ্রের উত্তর

"মিঃ হেষ্টিকে আমি এই কথাই বলিতে চাহি যে, হিন্দুধর্ম্মকে ধ্বংস করিতে চাহিবার পূর্ব্বে তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান সঞ্চয় করা দরকার। তাঁহার যুক্তিগুলি জঘন্য এবং আমার মনে হয়, 'ষ্টেটস্‌ম্যান' যদি এই সব বাজে কথা না ছাপিয়া তাহার স্থানে দুর্গাপূজার ছুটিতে ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতেন, তবে তাহার অধিক মূল্য থাকিত। ভাবাটি একটু রূঢ় শুনাইতে পারে, কিন্তু যে লেখক বৈদান্তিক মতবাদকে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া ভুল করেন এবং সেই মতবাদের ব্যাখ্যার জন্য মিঃ মোনিয়ার উইলিয়মসের শরণাপন্ন হন, তিনি এর চেয়ে ভাল ব্যবহার আশা করিতে পারেন না। মিঃ হেষ্টির হিন্দুধর্ম্মের আভ্যন্তরীণ দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা আমাদের বায়ুচালিত কলের নিকট বিখ্যাত নাইট লা মাঞ্চার অনুরূপ বীরত্বব্যঞ্জক অভিযানের কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়।

মিঃ হেষ্টিকে আমি এই উপদেশ দেই যে, তিনি যেন মূল সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করেন। তিনি হিন্দুদর্শনের সকল শাখা সম্বন্ধে পড়াশুনা করুন। ভগবদ্গীতা, শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্র প্রভৃতি পাঠ করুন। তিনি যেন এ বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দ্বারস্থ না হন, কারণ তাঁহারা নিজেরা যাহা বুঝেন না, তাহা অপরকে শিখাইবেন কিরূপে? অন্ধ অপর এক জন অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না। তিনি এ বিষয়ে কোন হিন্দুর সাহায্য গ্রহণ করুন। ইহার পরেও যদি তাঁহার ধারণার পরিবর্ত্তন না হয়, তবে আমরা তাঁহার যুক্তি না মানিলেও অন্ততঃ তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিব না। বিতর্কের বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির সহিত বিতর্ক চলে না।"

হেষ্টির পত্র

"আপনার পত্রিকায় অনেকেই আমার পত্রের সমালোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অবান্তর উক্তির উত্তর দিবার জন্য আমি আপনার কাগজের স্থান নষ্ট করতে চাহি না। কিন্তু আধুনিক ব্রাহ্মণদের বীর-নেতা রামচন্দ্র আপনার পত্রিকার মারফৎ আমাকে

সদয় ভাবে যে উপদেশ দিয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহাকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতে দিবেন বলিয়া আশা করি। যদি তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, আমার তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণের প্রয়োজন আছে, তাহা হইলে আমি তাহা পালনের প্রতিশ্রুতি দিতেছি। আপনার পাঠকবৃন্দ—যাঁহারা তাঁহার অপেক্ষা সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত অধিক পরিচিত—তাঁহারা আমি হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৈদান্তিক মতবাদকে মিশাইয়া ফেলিয়াছি কি না, ইতঃপূর্ব্বেই তাহার বিচার করিয়া থাকিবেন।"

হেষ্টির পত্র

"তিনি 'অন্ধ' ইউরোপীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে উহার অপকৃষ্টতার যে অভিযোগ করিয়াছেন, এই শিক্ষার বিনা সাহায্যে "চতুস্ত্রিংশদ্বাজিনো দেববন্ধোর্বংক্রীরশ্বস্য স্বধিতিঃ সমেতি" এই সাধারণ বৈদিক উক্তির বোধগম্য ব্যাখ্যা করিয়া সেই অভিযোগ সপ্রমাণ করিতে আহ্বান করিতেছি। ইহার অর্থ নিরূপণের জন্ত আমি তাঁহাকে সমগ্র দুর্গাপূজার ছুটি সময় দিতেছি এবং ইহাতেও যদি না কুলায় তবে আমি তাঁহাকে ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগদানকারী চার হাজার অধ্যাপককে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ব্যাখ্যা আবিষ্কারের জন্ত যত দিন খুশী তত দিন সময় দিব।"

হেষ্টির পত্র

"আমি বিজ্ঞ রামচন্দ্র ও শ্রাদ্ধে যোগদানকারী চার হাজার অধ্যাপকের নিকট হইতে আমার শেষ পত্রের উত্তরের জন্ত ধৈর্য্য-সহকারে অপেক্ষা করিতেছি। বাংলার পণ্ডিত সমাজ তাঁহাদের নিজেদের পবিত্র সংস্কৃত সাহিত্য উপলব্ধি করিয়াছেন কি না এবং আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে তাহার যাথার্থ্য বজায় রাখিতে সমর্থ কি না, তাহা প্রমাণ করিবার জন্ত আমি তাঁহাদের চ্যালেঞ্জ করিতেছি। যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ, এবং এমন কি, আধুনিক রামচন্দ্র পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া 'পাশ্চাত্য জনকে'র এই ধনু বাঁকাইতে না পারেন, তবে হিন্দু পৌত্তলিকদের নেতারা যেন এখন হইতে অধিকতর শক্তিশালী ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজের নিকট তাঁহাদের নতমস্তক লুকাইয়া রাখেন।"

রামচন্দ্রের উত্তর

"মিঃ হেষ্টি যেরূপ দুর্দ্দান্ত সাহসের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানাইয়াছেন, আমি তাহার প্রশংসা করিতেছি এবং একটি ক্ষুদ্র সেলাম ঠুকিয়া সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতেছি।

"সোজা কথায় বলিতে গেলে, মিঃ হেষ্টি মানসিক স্থৈর্য্য হারাইয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের স্বপক্ষে এটা একটা বড় লাভ। মিঃ হেষ্টি উত্তেজিত হইবার কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও দেশের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহে অনুষ্ঠিত এক শোকানুষ্ঠানকে আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি আক্রমণ করিয়াছেন দেশীয় সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তিদের, তাঁহাদের ধর্ম্মকে, সমগ্র জাতির ধর্ম্মকে। সম্পূর্ণ বিনা কারণে তিনি ইহা করিয়াছেন। যে জাতির ধর্ম্মকে মিঃ হেষ্টি পদদলিত করিয়াছেন, সেই জাতিরই এক জন সামান্ত একটু প্রতিবাদ করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ফাটিয়া পড়িয়াছেন। যোদ্ধা যদি যুদ্ধে মানসিক স্থৈর্য্য হারাইয়া ফেলেন, তবে তাঁহার জয়লাভের আশা ক্ষীণ হয়। হিন্দুধর্ম্মের স্বপক্ষে এটা আমার একটা জিত। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি খৃষ্টান মিশনারীর এই যদি মনোভাব হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি হইতে হিন্দুধর্ম্মের আশঙ্কা করিবার কিছু নাই।

"মিঃ হেষ্টির নিকট আমি এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, হিন্দু-ধর্ম্মকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে তিনি যেন হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী দেশীয় পণ্ডিতগণের নিকট মূল হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করেন। মিঃ হেষ্টি আমার প্রস্তাব গ্রহণ না করায় আমার বা আমার ধর্ম্মের কোনও ক্ষতি হয় নাই। আক্রমণকারীরা যদি অধিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইতে না চাহেন, হিন্দুধর্ম্মের তাহাতে ক্ষতি হইবে না। কিন্তু মিঃ হেষ্টির এই প্রত্যাখ্যানের অন্তরালে যে সকল ত্রুটি রহিয়াছে, তাহা কেবল তাঁহাতেই সীমাবদ্ধ নহে, বহু ইউরোপীয়ের মধ্যেও ইহা বর্ত্তমান।

"...একটু চিন্তা করিলেই মিঃ হেষ্টি ও তাঁহার ন্তায় অন্তান্তেরা বুঝিতে পারিবেন যে, ইউরোপীয় ভাষায় সংস্কৃতের কোন তর্জ্জমায় মূল বিষয়টি হুবহু, এবং এমন কি, মোটামুটিও প্রতিবিম্বিত হয় না। অনুবাদক যত বড় পণ্ডিতই হউন না কেন এবং অনুবাদের ভাষা যতই নির্ভুল হউক না কেন, তথাপি সে অনুবাদের সহিত মূলের অনেক ব্যবধান থাকিবে। কারণটি স্পষ্ট। আপনি একটি শব্দের অনুবাদ করিতে পারেন, কিন্তু সেই শব্দের পিছনে একটি ভাব আছে এবং এই ভাবের অনুবাদ আপনি করিতে পারিবেন না।

"এই ভাবধারণার উপযুক্ত ব্যাখ্যা করিতে পারে কে—এ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশী না এই ভাবধারণার মধ্যে জাত দেশীয় ব্যক্তি? স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শেষোক্ত ব্যক্তিই এ বিষয়ে সক্ষম হইবেন। আমি মিঃ হেষ্টিকে বলিয়াছিলাম যে, কেবল ব্রাহ্মণের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিলেই হইবে না, এই ধর্ম্মে বিশ্বাসী এরূপ এক জন ব্রাহ্মণের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। মিঃ হেষ্টি যদি মনে করিয়া থাকেন যে, জ্ঞানের মূল উৎসের সন্ধান না করিয়াই তিনি হিন্দুধর্ম্মের জটিল তত্ত্ব অনুধাবন করিতে পারিবেন তাহা হইলে তিনি নিরাশ হইবেন। প্রত্যেক ইউরোপীয় এই ভাবে চেষ্টা করিয়া যেমন ব্যর্থ হইয়াছেন, তাঁহার দশাও তদ্রূপ হইবে।

"ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞদের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া মিঃ হেষ্টি প্রশ্নটি জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে না। মোক্ষমূলর, গোল্ড ষ্টাকার, কোলব্রুক, মুইর, ওয়েবর ও রথের ন্তায় মনীষীদের পক্ষে মিঃ হেষ্টির ন্তায় ব্যক্তির ওকালতির প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের শিক্ষা, জ্ঞান, মহানুভবতা ও সামর্থ্য সম্বন্ধে আমি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি। কিন্তু মিঃ হেষ্টি যখন বলেন যে, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য ভারত অপেক্ষা ইউরোপ ও আমেরিকার লোকেই বেশী বোঝেন, তখন তাহা আমি মানিয়া লইতে পারি না। এরূপ জঘন্ত উক্তি ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই।

"হিন্দুধর্ম্মের মূল নীতি ও উহার বিস্তারিত বিবরণ বিশ্লেষণ করা কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের কর্ম্ম নহে। আমি এই কথাই বলিতে চাহিয়াছিলাম এবং এখনও সেই কথাই বলিতেছি। আমি আরও বলিব যে, ধর্ম্মনীতি ব্যতীত ভারতীয় সাহিত্যও ভারতীয় দর্শনে নএম

বহু বিষয় আছে, যাহা কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বুঝেন না এবং সে সম্বন্ধে শিক্ষাও দিতে পারেন না।

"যদি হেষ্টি সাহেব নিতান্তই জেদ করেন, তাহা হইলে আমার প্রকৃত নাম শেষ পত্রে সন্নিবেশিত করিব। আপাততঃ হেষ্টি সাহেবের অবগতির জন্য আমার নামের কার্ড পাঠাইলাম। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী এক জন নগণ্য ব্যক্তি, ইহা দেখিয়া হয়ত তিনি হতাশ হইবেন; কিন্তু সে প্রতিদ্বন্দ্বী যে এক জন প্রকৃত ব্রাহ্মণ, সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ থাকিবে না।"

হেষ্টির পত্র

"আমি ভাবিয়াছিলাম, আমাদের বীর রামচন্দ্র এক জন বিজ্ঞ পুরোহিত ও হিন্দুধর্ম্মের এক জন প্রধান মুখপাত্র, কিন্তু এখন আমি সে বিষয়ে নিরাশ হইলাম। এই শক্তিশালী রামচন্দ্র যখন এক জন নূতন অবতারের ন্যায় ভারতের সমস্ত জ্ঞানের প্রতীকরূপে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া আমার প্রতি অবমাননাসূচক আচরণ করিলেন, তখন আমি তাঁহারই ভাষায় উত্তর দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করিলাম। আমার কোনরূপ ক্রোধের সঞ্চার হয় নাই। পত্র লিখিবার সময় মনের ভাব এত প্রফুল্ল ছিল যে, সে রকম প্রফুল্লতা কদাচিৎ ইতঃপূর্ব্বে অনুভব করিয়াছি। আমার নিজের অন্তরঙ্গ মহলে তাঁহার পত্র হাসির খোরাক যোগাইতেছে এবং তিনি এ বিষয়ে যত অধিক লিখিতে থাকিবেন, আমরা ততই কৌতুক অনুভব করিতে থাকিব।"

রামচন্দ্রের উত্তর

"মিঃ হেষ্টি ও তাঁহার অন্তরঙ্গ মহলকে প্রতিশ্রুত কৌতুক উপভোগের জন্য প্রতীক্ষায় থাকিতে হইয়াছে বলিয়া আমি দুঃখিত। কিন্তু দুর্গাপূজার সময় ব্রাহ্মণের কাজ আনন্দোৎসব করা, বিতর্ক নহে। যাঁহারা যে ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহারা যে সেই ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা ভাল বুঝেন, ইহা প্রমাণ করিতে যাওয়াকে আপনার পাঠকবৃন্দ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতে পারেন। এ কথা মিঃ হেষ্টিও অস্বীকার করেন নাই। হেষ্টি সাহেব যাহা করিতেছেন তাহা অর্থহীন। নিজেকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করিলে তাঁহার ফল এইরূপই হয়। ইউরোপীয়দের সমালোচনায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত হেষ্টি সাহেবদের নিকট কোন জ্ঞান জ্ঞানই নহে। পাশ্চাত্য টাকশালের ছাপ না থাকিলে কোন মুদ্রা মুদ্রাই নহে। ইউরোপীয়দের স্বীকৃতি না পাইলে সত্য মিথ্যায় পরিণত হয়।

"গল্পে আছে—'এক জন জাহাজী গোরা পিপাসা ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া জনৈক ভারতবাসীর নিকট কিছু আহার্য্য প্রার্থনা করিল। দেশবাসী তাহাকে একটি নারিকেল দিয়া কিরূপে তাহা খাইতে হয় উপদেশ দিল। ক্ষুধার্ত্ত নাবিক পূর্ব্বে কখনও নারিকেল দেখে নাই; সে দাঁত দিয়া ছোবড়া ছাড়াইয়া চিবাইতে লাগিল। ছোবড়ার স্বাদ সে পছন্দ করিল না। অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া নারিকেল ছুঁড়িয়া দাতার মাথায় মারিল।'

"ভারতীয় ফল সম্বন্ধে এই নাবিকের যে অভিমত, হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে হেষ্টি সাহেবেরও সেই অভিমত। তিনি কেবল সংস্কৃতের ছোবড়া চুষিয়া তাঁহার অভিমত গঠন করিয়াছেন।

"যুক্তির কথা বাদ দিয়া ভারতের অবস্থার বৈশিষ্ট্যের কথায় আসা যাউক। ভারতের লিখিত সাহিত্যের পুষ্টি ও ব্যাখ্যার জন্য যে অলিখিত ঐতিহ্যমূলক জ্ঞানভাণ্ডার রহিয়াছে, তাহা অপরিমেয়। ইউরোপীয়গণ ইহা অবগত নহেন। সকলেই জানেন যে, লিখন-শিল্প আবিষ্কারের পূর্ব্বেও ভারতে অগাধ সাহিত্য-ভাণ্ডার ছিল, যাহা গুরু হইতে শিষ্যের মারফৎ মুখে মুখে চলিয়া আসিত। এই ভাবে পরে যখন লেখার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়, তখন কিছু লিখিত হয় এবং কিছু অলিখিত থাকিয়া যায়। যাহারা ভট্টাচার্যদের টোলে পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, এমন বহু বিষয় আছে যাহা লিপিবদ্ধ হয় নাই, তাহা কেবল অধ্যাপকদের স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত। শিল্পকলা এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এইরূপ ছিল। পাছে অপরে এক জনের আবিষ্কার জানিয়া ফেলে, এ জন্য কেহ আবিষ্কারের ফলাফল লিপিবদ্ধ করিতে চাহিতেন না, কেবল নিজের অনুরক্ত শিষ্যদের মধ্যে তাহা বিতরণ করিতেন। এই পারস্পরিক হিংসার ফলে ভারতের বহু প্রাচীন শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের আবিষ্কার লুপ্ত হইয়াছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই অলিখিত ও ঐতিহ্যমূলক জ্ঞান লিখিত সাহিত্যের শুষ্ক অস্থির রক্ত-মাংস, ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহা কোথায় পাইবেন? তাঁহার হাতে কেবল এই শুষ্কাস্থির ঠক্‌ঠকানি সভ্য জগতের কর্ণকুহরে প্রবল শব্দে ধ্বনিত হইয়া উঠে। প্রাচীন সভ্যতার জীবন্ত রূপ কেবল দেশীয়দের চক্ষুতেই প্রতিভাত হয়।

"বৈদিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় অনুসন্ধিৎসুর প্রাধান্য স্বীকার করিতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই। ভারতীয় ছাত্রের নিকট বেদ মৃত। মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি তাহার যে শ্রদ্ধা বেদের প্রতিও তাহাই। ইহা ছাড়া তাহার আর কিছু করিবার আছে বলিয়া সে মনে করে না। ইউরোপীয় পণ্ডিতের এইটুকুই লাভ। ভারতীয় ও আর্য্য ইতিহাসেও তাহার দান অতুলনীয়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে টোলের পণ্ডিতের সুগভীর জ্ঞানের সহিত ইউরোপীয় অধ্যাপকবৃন্দের অগভীর জ্ঞানের তুলনা হয় না। তবে টোলের পণ্ডিতের বাহ্যাড়ম্বর নাই, ইউরোপীয় অধ্যাপকের তাহা আছে। ভারতীয় দর্শনের বিপুল ও বিশাল ক্ষেত্রে ইউরোপীয় অধ্যাপকগণ অতি সামান্যই অগ্রসর হইয়াছেন। বাংলার ন্যায়-দর্শনের ক্ষেত্রে—যেখানে রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশ প্রমুখ পণ্ডিত-মণ্ডলী বাঙ্গালীর বিজয়-নিশান উড়াইয়াছেন—ইউরোপীয় অধ্যাপক সে ক্ষেত্রের দর্শন পান নাই। বৈষ্ণব-দর্শনে ভাগবত পুরাণ এবং রামানুজ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীজীব গোস্বামী পর্য্যন্ত পণ্ডিত-মণ্ডলী দ্বারা সৃষ্ট বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতের কোন সঠিক ধারণা নাই। যে তন্ত্রশাস্ত্র ভারতে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে, ইউরোপীয়েরা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কালিদাস সম্বন্ধে ইউরোপের যে জ্ঞান, বাবু চন্দ্রনাথ বসুর শকুন্তলা এক ঘণ্টা পাঠ করিলেই তাহা অর্জ্জন করা যায়। হিন্দু আইন স্মৃতি এখনও এক প্রকার কেবল হিন্দুরাই অনুশীলন করিয়া থাকেন।

"হেষ্টি সাহেব তাঁহার পত্রে এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমি যেন সামর্থ্য অনুযায়ী হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও তাহার পক্ষ সমর্থন করি। ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের মধ্যে যে প্রশ্ন উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের

গুণাবলীর বৃহত্তম প্রশ্ন নাই। প্রথম পত্রেই আমি তাঁহাকে সে কথা জানাইয়া দিয়াছি। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে, তাঁহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নাই বলিয়া তাঁহার সহিত বিতর্ক সম্ভব নহে। মেকলের ভাষায় বলিতে গেলে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে এখনও যথাযথ ভাবে কোনও অভিযোগ গঠিত হয় নাই। তবে হেষ্টি সাহেব হিন্দুদের নিকট হইতে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা দাবী করিতে পারেন। ধর্ম্মমত, পূজা বা ক্রিয়াকর্ম্ম এবং নীতিশাস্ত্র লইয়া হিন্দুধর্ম্ম। দর্শন, সাহিত্য এবং পুরাণের মধ্যে সেই মতের সন্ধান পাওয়া যাইবে। সমগ্র হিন্দু-দর্শন সম্ভবতঃ প্রাক্‌বৈদিক এবং ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখার কাজ করিয়াছে। প্রত্যেক আধুনিক হিন্দু-সম্প্রদায়ের এখন নিজের দর্শন আছে, কিন্তু দর্শনের সাধারণ উপসংহার একই; এবং তাহার মধ্যে একটি ভারতের ভাগ্য নির্ণয়ে সর্ব্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কপিলই প্রথম ইহা ঘোষণা করেন। জগতের মধ্যে তিনিই প্রথম প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া দর্শনশাস্ত্র লেখেন। এই ধারণা আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত স্রষ্টাদের রচনার ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছে। হিন্দুদের সমগ্র চিন্তাধারার মধ্য দিয়া ইহা প্রবাহিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের ছাত্র যত দিন এই আদর্শ সম্মুখে রাখিবেন, তত দিন হিন্দুধর্ম্ম সজীব থাকিবে। প্রকৃতির ইংরাজী অনুবাদ 'নেচার'। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে যে, প্রকৃতি শক্তিরই বিকাশ। হিন্দুরা চিরদিনই ইহা জানিতেন। ধ্বংসের অর্থে শক্তি হইলেন কালী। ধ্বংসের রূপ ভীষণ বলিয়া কালীমূর্ত্তিও ভীষণদর্শনা। সৃজন-ক্ষমতা অর্থে শক্তি হইলেন দুর্গা, এ জন্ম তাঁহার রূপ সৌন্দর্য্যময়ী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন রূপে পরমাত্মার আরাধনা করা হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষ আমাদের নিয়ামক। কৃষ্ণ পুরুষ আর রাধা প্রকৃতি। সাংখ্য-দর্শনে বলা হইয়াছে, প্রকৃতি ও পুরুষের সম্পর্ক অবৈধ; সেই জন্ম রাধা-কৃষ্ণের কাহিনীতে উভয়ের সম্পর্ক অবৈধ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হিন্দুরা এই অবৈধ মিলনকে পূজা করিয়া থাকে, কারণ তাহারা জানে যে, পুরুষ ও প্রকৃতির এই মিলনের মধ্যেই সকল সৌন্দর্য্য, সকল সত্য ও প্রেম নিহিত। আর এই কাহিনীকে ইউরোপীয় সমালোচকগণ সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধমূলক বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। কুমারসম্ভবেও উমা ও শিবের বিবাহের মধ্য দিয়া প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন দেখান হইয়াছে। কাম-ভাবকে বিসর্জ্জন দিয়া এই মিলন হইয়াছিল এবং তাহার প্রমাণ মদন-ভস্ম। হেষ্টি সাহেবকে আমি আরও বলিতে চাহি যে, মূর্ত্তিপূজা হিন্দুর পক্ষে অবশ্যকরণীয় নহে। তাহার প্রাত্যহিক পূজা হইল সন্ধ্যা ও আহ্নিক। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ প্রত্যহ বিষ্ণু ও শিবপূজা করিতে বাধ্য, কিন্তু তাঁহারা মূর্ত্তিপূজা করিতে বাধ্য নহেন। কোন দিন মন্দিরে প্রবেশ না করিয়াও নিষ্ঠাবান হিন্দু হওয়া যায়। মানুষ তাহার সহজাত প্রবৃত্তিবশেই কবি ও শিল্পী। সৌন্দর্য্য, শক্তি ও পবিত্রতার মধ্যে সে তাহার আদর্শের সন্ধান করে এবং তদনুযায়ী তাহার রূপ দেয়। প্রতিমা ঈশ্বর নহে। প্রতিমার মধ্য দিয়া আমরা ঈশ্বরকে কল্পনা করি। প্রতিমার মধ্যে কোন পবিত্রতা নাই। বাজারে ইহা খেলনার মত বিক্রয় হয়। কিন্তু প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পর ইহা পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়। এখানে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার অর্থ পূজা করিতে সম্মত হওয়া। সত্য বটে, আমাদের প্রতিমানিচয় বীভৎস-দর্শন, কিন্তু সে দোষ হিন্দুধর্ম্মের নয়—দোষ হিন্দু কারিগরের। বাংলায় যে সকল প্রতিমা নির্ম্মিত হয়, তাহা বাঙ্গালী কারিগরের কলঙ্কস্বরূপ। ধনবান হিন্দুদের উচিত, কৃষ্ণ ও রাধার মূর্ত্তি ইউরোপ হইতে প্রস্তুত করিয়া আনয়ন করা। হিন্দুদের নীতিশাস্ত্রও এক অপূর্ব্ব বিষয়। ব্যক্তি ও সমাজের আচরণকে ইহা নিয়ন্ত্রিত করে, এ জন্য শারীরিক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। ইহার চমৎকারিত্ব দর্শনে হেষ্টি-প্রমুখ ইউরোপীয়েরা মনে করেন যে, ইহা খৃষ্টান-ধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের মুখ্য ও গৌণ বিষয়গুলিকে কেহ যেন মিশাইয়া না ফেলেন। সমাজ-ব্যবস্থা গৌণ বিষয়। সমাজ-ব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ জাতিভেদ প্রথাও গৌণ। হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে জাতিভেদ মানেন না। চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবরা তাহার প্রমাণ। হেষ্টি আমাকে বলিতে পারেন যে, 'আপনি হিন্দুধর্ম্ম হইতে ক্রিয়াকর্ম্ম, মূর্ত্তিপূজা ও জাতিভেদ প্রথা বাদ দিতেছেন, তবে আর ইহার রহিল কি?'—আমি ছোবড়া বাদ দিয়া কেবল শাঁসটি রাখিলাম।

"আমার কথা শেষ হইয়াছে। আমি আশা করি, মিঃ হেষ্টি আমার উত্তর হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। তবে আধুনিক রামচন্দ্র 'পাশ্চাত্য জনকে'র ধনু স্পর্শ করেন নাই। কারণ নূতন জনক তো আর জানকীকে উপহার দিতে পারিবেন না?"

হেষ্টির পত্র

"এই সব অর্থহীন বড় বড় কথা, সামঞ্জস্যহীন যুক্তি, হিন্দু পুরাণ ও দর্শন সম্বন্ধে এই অজ্ঞতাই যদি শিক্ষিত হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মব্যাখ্যা হয়, তাহা হইলে ইহা ইউরোপ বা আমেরিকাকে জানাইবেন না, যত শীঘ্র সম্ভব ইহার অন্ত্যেষ্টি করুন। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁহারা অধিকতর ওয়াকিবহাল, তাঁহারা যদি প্রকাশ্যে রামচন্দ্রকে এই বিতর্কে অনধিকার-প্রবেশকারী বলিয়া ঘোষণা না করেন, তাহা হইলে আমি বিস্মিত হইব। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বা ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হইলে তাঁহারা হয়ত রামচন্দ্রের অপেক্ষা ভাল ইংরাজী লিখিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহারা অধিকতর সতর্কতা ও যুক্তি সহকারে আট-ঘাট সামলাইয়া লিখিতেন।

"হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে ছোবড়া ছাড়া শাঁস কিছুই নাই।"

[বঙ্কিমচন্দ্র এ পত্রের উত্তর দেন নাই। অতঃপর রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার এক পত্র-বিনিময় হইয়াছিল।]

খেয়ালী প্রতিভা

জেমশ, ম্যাকনিল হুইশলার রীতির বিপরীত পথে চলতেন। পোষাকে কখনও টাই ব্যবহার করতেন না। জুতোয় রঙীন ফিতে বাঁধতেন।

শ্রীরাজশেখর বসু

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
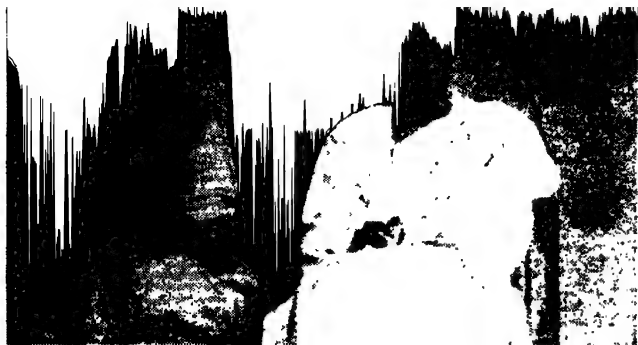
বুদ্ধদেব বসু
ও
প্রতিভা বসু

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীদিলীপকুমার রায়
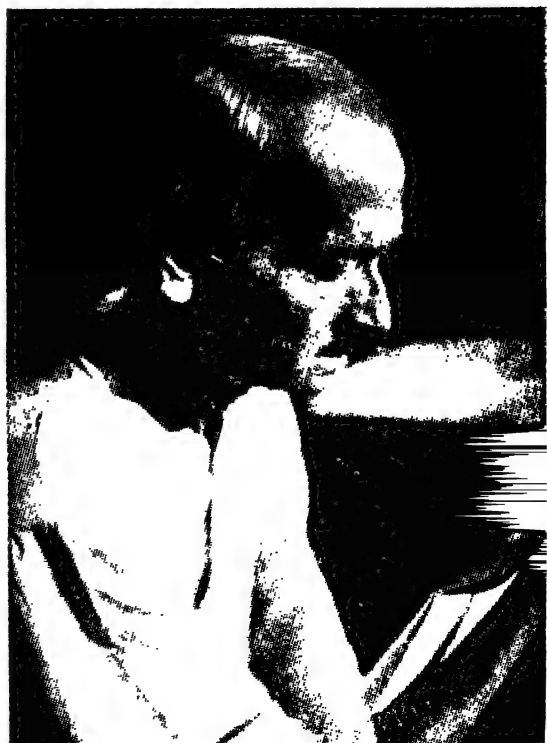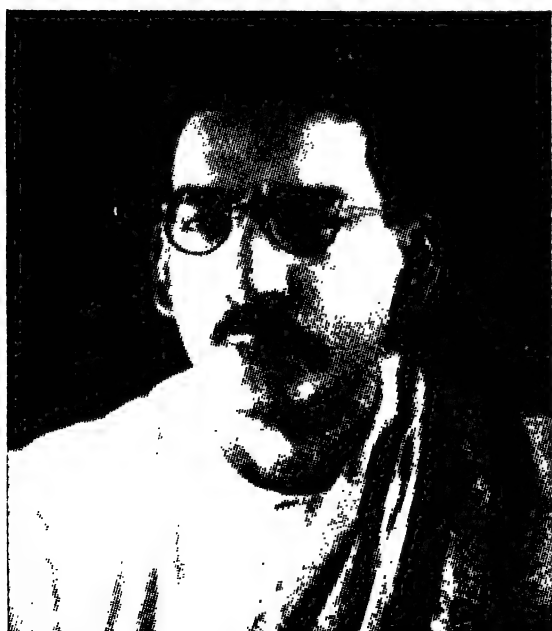
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
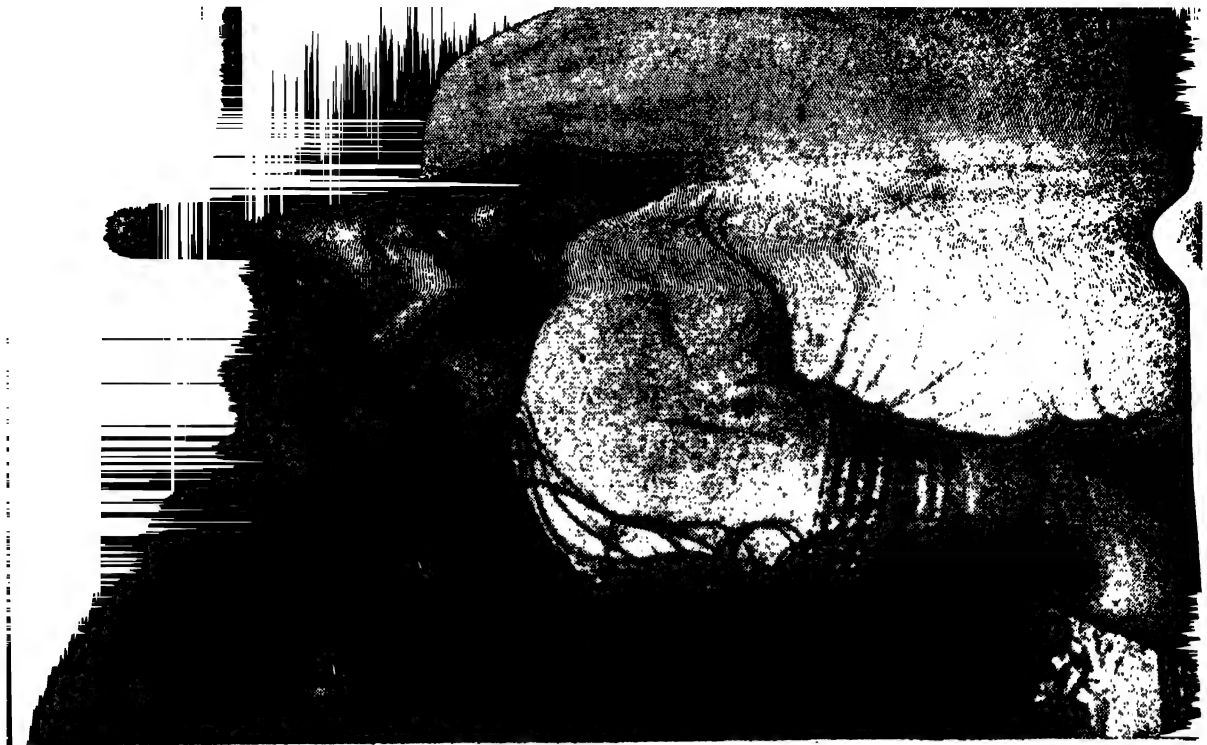
আমেজ ? (ঘুরিয়ে দেখুন) —পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

বাই
—মনীষিকুমার ভট্টাচার্য্য

—বিখ্যাত সাহিত্যিকদের—

আলোকচিত্র পাঠিয়েছেন

ও পুরস্কৃত হয়েছেন

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় (প্রথম পুরস্কার)

শ্রীকৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্বিতীয় পুরস্কার)

শ্রীঅজিতকুমার দত্ত (তৃতীয় পুরস্কার)

শ্রীরণজিৎ রায়চৌধুরী

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীজলধিরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

সশিষ্য অবনীন্দ্রনাথ

কয়েক জন ছাত্রের সঙ্গে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের ছায়াচিত্রটি দুষ্প্রাপ্য। ছবিতে আছেন (বাম থেকে ডাইনে) প্রথম সারি—দুর্গেশচন্দ্র সিংহ, অসিতকুমার হালদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার। মধ্যম সারি—কে ভেঙ্কটপ্পা, নন্দলাল বসু। তৃতীয় সারি—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কবি নয়), শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ, হাকিম এম, খান এবং সুরেন্দ্রনাথ কর। চিত্রটি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত হয়।

যাদু ও কাব্য

অবন্তী সান্যাল

১

অসভ্য মানুষের যাদু অনুষ্ঠান ছিল সর্বক্ষেত্রেই সমষ্টিগত ; কারণ আদিম সমাজ সমষ্টিগত শ্রমের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই সমষ্টিগত শ্রমের ফলেই ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। মানুষের সমষ্টিগত শ্রমঘটিত বহু বিস্তৃত সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার প্রয়াস থেকেই ভাষার উন্নতি। এই ভাষার আবার দু'টি রূপ,—একটি দৈনন্দিন প্রয়োজনের ভাষা, অপরটি কাব্যের ভাষা। কাব্যের ভাষার একাধিক বৈশিষ্ট্য আছে। এ ভাষা গভীর আবেদনশীল, অবাস্তব (fantastic), তাললয়সমন্বিত এবং মোহকর। কাব্যের ভাষার তাললয়ের সৃষ্টি অস্ত্রের (tool) ব্যবহার থেকে। এর সংগে কায়িক ভঙ্গীও ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। শ্রমের প্রকৃতি ও ব্যবহৃত অস্ত্রের প্রকৃতি থেকেই বিভিন্ন তাললয়ের উৎপত্তি। আদিম সমাজের কথা বাদ দিলেও, এর দৃষ্টান্ত এ যুগেও প্রচুর মিলবে। গুণ-টানা, নৌকা-বাওয়া, ছাদ-পেটান, চরকা কাটা প্রভৃতি শ্রমঘটিত কাজের সংগে মানুষ যে কথা বলে বা গান গায়, তাদের প্রত্যেকের তাললয় ও সুর লক্ষ্য করবার জিনিষ। তাদের পৃথক্ পৃথক্ সুর ও তাল শ্রম ও অস্ত্রের প্রকৃতির পার্থক্যের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

কাব্যের ভাষার আবেদনশীল, অবাস্তব ও মোহকর বৈশিষ্ট্যগুলি সম্ভব হয়েছে যাদু-সম্পৃক্ত হয়ে। বাক্‌ভঙ্গী ও কায়িক ভঙ্গী ব্যতিরেকে যাদু সম্ভবই নয়। যাদুর মূল কথা মায়া (illusion) সৃষ্টি। মায়া সৃষ্টি করতে গেলে কল্পনার সাহায্য অপরিহার্য্য। আর যাদু-সৃষ্ট মায়া স্বতঃই আবেদনশীল ; কারণ যাদুর অনুষ্ঠানে বাস্তব ও কল্পনার বিরোধিতা মায়ার জগতেই সমন্বয় লাভ করে। তারই ফলে সমষ্টিভুক্ত মানুষ অভিভুত না হয়ে পারে না। এই জন্যেই কাব্যের ভাষার মধ্যে যাদুর সব গুণগুলিই বর্তমান। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আদিম কাব্যের প্রকৃতি আজকের কাব্য থেকে অনেক পৃথক্। আদিম কাব্য আর সংগীতে কোন পার্থক্যই ছিল না। আর এই কাব্য বা সংগীত ছিল সর্বক্ষেত্রে কায়িক ভঙ্গী ও যন্ত্র-সংগীতের সংগে জড়িত। নৃত্য, সংগীত ও কাব্য একই জন্মসূত্রে আবদ্ধ। এদের মধ্যে প্রথমে পৃথক্ হয়েছে নৃত্য। তার পর ধীরে ধীরে সংগীত থেকে পৃথক্ হয়েছে কাব্য। সংগীতে কাব্যাংশ হচ্ছে ভাববস্তু (content), আর কাব্যে সংগীতাংশ হচ্ছে তার বহিরঙ্গ (form)। বহিরঙ্গকে (form) অপ্রধান রেখে যখনই ভাববস্তু প্রাধান্য লাভ করেছে, তখনই পৃথক্ হয়ে পড়েছে বিশুদ্ধ কাব্য। কাব্যে সংগীতাংশ সহজ এবং সরল। অন্য দিকে সংগীতে কাব্যাংশ অর্থাৎ ভাববস্তু প্রাধান্য লাভ না করায় বহিরঙ্গের জটিলতা ও সূক্ষ্মতায় পৃথক্ শাখার উদ্ভব হয়েছে। কাব্যে একটি সুসংবদ্ধ বক্তব্য অথবা কাহিনী প্রয়োজন। কাব্যের এই কাহিনী অথবা বক্তব্য ক্রমশঃ সংগীত-নিরপেক্ষ হওয়ায় অতি-আধুনিক যুগে সৃষ্টি হয়েছে গদ্যকাব্য উপন্যাসের—যার মধ্যে তাললয়সমন্বিত ভাষাকে স্থানচ্যুত ক'রেছে দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে ভাষা।

আবার অন্য দিকে ভাষাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে সৃষ্টি হয়েছে ঐক্য-সংগীতের (symphony)। অধ্যাপক টমসনের ভাষায়: ঐক্য-সংগীত আধুনিক উপন্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। উপন্যাস তাললয় বর্জিত ভাষা, আর ঐক্য-সংগীত ভাষাবর্জিত তাল আর লয় মাত্র। উপন্যাসে কাহিনীর ঐক্য এবং বাস্তবতা অক্ষুণ্ণ রাখাটাই বড় কথা ; উপন্যাসের বিষয়বস্তু গৃহীত হয় দৈনন্দিন জীবন থেকে। কিন্তু তাললয়ের একটা মোটা কাঠামো ছাড়া ঐক্য-সংগীতের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোন ঐক্যই নেই ; আর এর বিষয়বস্তুও আহরিত হয় সম্পূর্ণ ভাবে কল্প-জগৎ থেকে।* সংগীত থেকে কাব্য পৃথক্ হয়ে পড়ায় এবং কাব্য ক্রমশঃ তাললয় বর্জিত হওয়ার ফলেই লুপ্ত আদিম অবাস্তবতার সবটুকুই যেন আশ্রয় নিয়েছে আধুনিক কাব্যে।

২

যাদু থেকে কাব্যের উদ্ভব হয়েছে এ কথা স্বীকার ক'রে নেবার সংগে সংগেই—আদিম কাব্যের কবি কে ? আদিম মানুষের মনে সমাজ-জীবনে কবির স্থান কোথায় ?—মনে এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এই প্রশ্ন আলোচনা করবার সময় বর্তমান সভ্য সমাজ ও আদিম অসভ্য সমাজের মূল প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। আদিম অসভ্য সমাজের ভিত্তি ছিল সম্পূর্ণ ভাবে সমষ্টিগত শ্রম ও অধিকারের উপর। সে সমাজ ছিল দরিদ্র ; সমষ্টিগত ভাবে বিচরণ না করলে সে সমাজের অস্তিত্বই বজায় থাকত না। সে সমাজের বিরোধিতা ছিল সম্পূর্ণ ভাবে সমষ্টি ও প্রকৃতির মধ্যে। সে সমাজে ব্যষ্টি ও সমষ্টি ছিল অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। বর্তমান সভ্য সমাজ এর বিপরীত। এ সমাজের বিরোধিতা মূলতঃ ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে। সভ্য সমাজ অনেক কিছু লাভ করেছে বটে, কিন্তু তার সংগেই তার ভাগ্যে জুটেছে এক অভিশাপ—ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিরামহীন বিরোধিতা। শ্রমবিভাগ এ সমাজে পরিণত হয়েছে শ্রেণীবিভাগে। এ সমাজের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্ত কিছুরই মূল্য নিরূপিত হয় এরই ভিত্তিতে।

এই সভ্য সমাজের কবি এক স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত ; তিনি এককও বটে। সভ্য সমাজে কাব্য রচিত হয় নির্জনে। সে কাব্য লিপিবদ্ধ হয়, প্রকাশিত হয় এবং পাঠকও পাঠ করেন সে কাব্য নির্জনে, একক ভাবে। কিন্তু আদিম কাব্য ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে কাব্য কোন সময়েই লিখিত ছিল না ; রচনাও হ'ত না নির্জনে। সমবেত অনুষ্ঠানে সামাজিক সমসূত্রে গ্রথিত আদিম মানুষ মাত্রেরই মনে থাকত সে কাব্যের বিষয়বস্তু ও উপাদান। প্রকৃতপক্ষে আদিম সমাজে কবি ছিল প্রত্যেকেই ; কারণ, যে কারণে কাব্যের অনুভূতি জাগে, সে কারণগুলি প্রত্যেকের মনে থাকত অল্প-বিস্তর সমান ভাবে আবেদনশীল। সে সমাজে একক মানুষের অস্তিত্ব ছিল না ব'লেই অসম্ভব ছিল একক চিন্তার।

আদিম কাব্য সর্বদেশে ও সর্বকালে ধর্মসম্পৃক্ত। আদিম ধর্মগ্রন্থ ও কাব্যগ্রন্থ একই জিনিষ। "ধর্ম', শিল্প, সাহিত্য সমস্তই একান্নবর্তী পরিবারের অন্তর্গত রয়েছে এবং তারাই বড় বড় হ'য়ে ক্রমে স্ব স্ব-প্রধান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে—ধর্ম ও শিল্পসাহিত্যের ইতিহাসের মূলে এই কথা র'য়েছে দেখি।"—(অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; বাংলার ব্রত, পৃঃ ৫৮)। কারণ, যাদু এদের সকলেরই জন্মদাতা। যাদু অনুষ্ঠানই ধর্মানুষ্ঠান ; সেই অনুষ্ঠানের উদ্গীত কামনাই কাব্য, সেই কামনাই বেদ, বাইবেলের স্তোত্র, মন্ত্র। আদিম কাব্যের মূল কবি এক জন ছিলেন বৈ কি। তিনি ছিলেন সমাজ বা গোষ্ঠীর নেতা অথবা যাদু অনুষ্ঠানের প্রধান বা পুরোহিত ; ঋষি। যে কোন

সমবেত অনুষ্ঠানেই এক জন নেতার প্রয়োজন ছিল, যিনি অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতেন। তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই আর সকলের ক্রিয়াগুলি সুসমন্বয় ও সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করত। এই নেতার অবশ্যই কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন ছিল। অনুষ্ঠানের সময়কার উদ্গীত ভাষণ, মূলত: তাঁরই ভাবাবিষ্ট অবস্থায় স্বত:স্ফূর্ত ভাবে উচ্চারিত হ'ত। তাঁর ভাষণের সংগে প্রত্যেকেরই মনের যোগ থাকতে বাধ্য। তাই এই ভাষণগুলি প্রতিটি মানুষকে অভিভূত ক'রত। একই অনুষ্ঠান একাধিক বার অনুষ্ঠিত হবার ফলে ভাষণগুলি মার্জিত ও নূতন ভাবে সংযোজিত হওয়ার সুযোগ পেত।

আদিম সমাজের ক্রমবিবর্তনে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক জটিল ও বহু বিস্তৃত হওয়ার সংগে সংগে যাদু অনুষ্ঠানের নেতা পৃথক্ হয়ে পুরোহিত শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন। তাঁদের সামাজিক কর্ম ক্রমশ: নির্দিষ্ট হয়েছে; তা আবার বংশানুক্রমে অনুশীলনের দ্বারা সূক্ষ্মতা, কুশলতা ও চাতুর্য লাভ করেছে। কিন্তু কবি আখ্যাধারী ব্যক্তিটি যাদু অনুষ্ঠানের এই পুরোহিত ছাড়া আর কেউ নন। বেদে যে 'কবি'র বারংবার উল্লেখ পাওয়া যাবে, সেই 'কবি' সম্পূর্ণ আধুনিক অর্থে কবি কখনই নন। সে 'কবি', 'ঋষি' এবং পুরোহিতের সংগে একার্থবাচক।

আদিম কবির সংগে শ্রোতার মনটি বাঁধা ছিল এক তারে। সংবেদনশীল শ্রোতা না হলে তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল কাব্যসৃষ্টি করা। শ্রোতাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আদিম কবি স্বত:স্ফূর্ত ভাবে কাব্যের ভাববস্তুকে তাললয়সমন্বিত, মোহময় ভাষায়, সুর ও অংগ-বিক্ষেপের সাহায্যে রূপ দিয়ে যেতেন। কবি কাব্যের অভিভব (inspiration) লাভ করার সংগে শ্রোতা ও দর্শকের মধ্যেও তা সঞ্চারিত হ'ত। কবির সৃষ্ট মায়ার জগতে কবি, শ্রোতা ও দর্শক সকলেই আত্মহারা হ'য়ে উঠত। গ্রামাঞ্চলের রামায়ণ গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা গ্রাম্য ও অসংস্কৃত মনবিশিষ্ট শ্রোতাদের আসরে বসে আত্মহারা হবার দৃশ্যটি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। রামের বনবাসে, দশরথের শোকে অথবা বন্দিনী সীতার দুঃখে গায়কের সংগে সংগে শ্রোতাদেরও চোখে জল, মুখে আনন্দের অভিব্যক্তি। রামায়ণ গানের মধ্যে কবি ও শ্রোতার সম্পর্কের আদিম রূপটি এখনো অনেকখানি বেঁচে আছে। অসভ্য সমাজের যাদু অনুষ্ঠানের সময় থেকে শ্রোতার সামনে দাঁড়িয়ে রাম বা অনুরূপ বীরের কাহিনী গান করার সময়ের মধ্যে অবশ্যই বহু শতাব্দীর ব্যবধান। কিন্তু এদের মধ্যেকার যোগসূত্রটি কখনই ছিন্ন হয়নি।

আদিম যাদু অনুষ্ঠানের নৃত্য গীত ও সংগীতের প্রয়োজন, আর পরবর্তী কালের প্রয়োজনের মধ্যে পার্থক্য ঘটেছে প্রচুর। কারণ, মানুষের উদ্যমে নূতন নূতন অস্ত্রের উদ্ভব হওয়ায়, তার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার পথ সুগম হয়েছে বলেই বাস্তববিরোধিতার সম্মুখীন হবার ক্ষেত্রে মানুষের কাছে ক্রমশ: যাদুর ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। এক কথায় যাদু অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য থেকে তার অর্থনৈতিক প্রয়োজনটি ক্রমশ: দূরে সরে গেছে। কিন্তু যাদুর মৃত্যু ঘটেনি। আগে যেখানে শিকার ও খাদ্য-সংগ্রহের জন্য যাদু অনুষ্ঠান অপরিহার্য ছিল, পরবর্তী কালে খাদ্য-সংগ্রহের উপায় সহজতর হলে যাদু সেখানে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়লেও তার প্রয়োজন ঘটেছে দৈব-দুর্বিপাক, মহামারী, ব্যাধি, ইত্যাদি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে—যে সব ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক কারণগুলিকে আয়ত্ত ক'রতে আরও বহু কাল ধ'রে অপেক্ষা ক'রতে হয়েছে মানুষকে। তাই ব্যবহারিক জীবন থেকে যাদু ক্রমশ: সরে এলেও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। যাদু বেঁচে আছে ধর্মসম্পৃক্ত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে তার সংস্কৃত ও অসংস্কৃত রূপ নিয়ে। সভ্যতার ক্রমোন্নতির ফলেই যাদু সরে গেছে দৈনন্দিন জীবন থেকে। আর সেই জন্যই যাদু থেকে পৃথক্ হ'য়ে প'ড়েছে একে একে কাব্য, সংগীত, নৃত্য। কিন্তু এদের প্রত্যেকেই পরবর্তী কালে বহু শতাব্দী ধ'রে যুক্ত ছিল ধর্মানুষ্ঠান ও দেবমন্দিরের সংগে ওতঃপ্রোত ভাবে। "এক সময়ে দেবমন্দিরের সংগে নাটমন্দির এবং পূজা-পার্বনের সংগে দেবতার চরিত বর্ণন ক'রে চন্দনযাত্রা রাসযাত্রা রুক্মিণীহরণ এমনি নানা অভিনয় ও চিত্রকার্য জড়িয়ে ছিল; এখন তারা সে সম্পর্ক, সে গলাগলি ভাব ছেড়েছে; ধর্মমন্দিরে, নাটকের রঙ্গমঞ্চে ও শিল্প-প্রদর্শনীতে সুনির্দিষ্ট ভাগ হয়ে গিয়েছে।"—(অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বাংলার ব্রত, পৃ: ৫৮)। তাই এদের ক্রমবিবর্তনের পথ খুঁজে বার করতে হলে দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াতেই হবে।

আধুনিক সভ্য সমাজের কবি আদিম কবি থেকে অনেক স্বতন্ত্র। প্রকৃতি-জয়ের কত অসংখ্য অস্ত্র তাঁর সমাজ-জীবন তথা মনো-জীবনকে উন্নত, জটিল ও সূক্ষ্ম করেছে; কত শতাব্দীর মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষায়, জয়-পরাজয়ের ঐতিহ্যে তাঁর মন পুষ্ট। তাই সভ্য যুগের কবির কাব্য এত জটিল, ঐশ্বর্য ও ব্যঞ্জনাময়, এত প্রচণ্ড শক্তিমান। অপর দিকে, সভ্য সমাজের কবির মনোজগতে যে দ্বন্দ্ব তা আদিম কবির দ্বন্দ্ব থেকেও সম্পূর্ণ পৃথক্। তাঁর দ্বন্দ্ব ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব—আদিম মনোজীবনের সহজ ও সরল প্রকৃতি ও মানুষের দ্বন্দ্ব নয়। যাদুর ভিত্তি ছিল—প্রকৃতি ও সমাজের দ্বন্দ্ব, কিন্তু এ সমাজের কবির কাব্যের ভিত্তি—ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব। কিন্তু বাস্তব দ্বন্দ্বকে মায়ার জগতে সমন্বয় সাধন করা উভয়েরই উদ্দেশ্য। তাই দুই সমাজের কবির মধ্যে যে পার্থক্য তা মূলগত নয় কখনই। আদিম যাদু অনুষ্ঠানের মৌলিক প্রেরণা ও সভ্য সমাজের কবির কাব্য-রচনার মৌলিক প্রেরণায় ইতর-বিশেষ নেই। আদিম যাদু অনুষ্ঠানের পরিচালক বা নেতা আর সভ্য যুগের কবি একই ব্যক্তির ক্রম-পরিবর্তিত রূপ মাত্র।

কাব্যের মূল রহস্যটি কি? এর রহস্যকে অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় বলে ভাববাদীরা ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। যুক্তি, তথ্য ও মনোবিজ্ঞান প্রয়োগে দেখা যায় যে, কাব্য বাস্তব থেকে জাগ্রত-চৈতন্যকে অপসারিত ক'রে মায়ার জগতে প্রেরণ করে, যে জগতে চিত্ত দ্বন্দ্বহীন এক অসীম আনন্দ লাভ করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে হাজার রকমের দ্বন্দ্ব ব্যক্তি-মানসকে পীড়িত ও খণ্ডিত করে রাখে, জাগ্রত-চৈতন্যে এই দ্বন্দ্বগুলি সক্রিয়; কিন্তু কাব্যের ছন্দ তাললয় ও মোহময় ভাষার সাহায্যে সৃষ্ট স্মৃতির উদ্বোধনে এই দ্বন্দ্বগুলি ক্রমশ: নিষ্ক্রিয় হয়ে সুপ্ত-চৈতন্যকে জাগ্রত করে; সে অবস্থায় সমস্ত দ্বন্দ্বের নিরসন হয়ে ব্যক্তি-মানসের, বাসনা-কামনা নিরঙ্কুশ লীলার সুযোগ ঘটে। কাব্যোপলব্ধির এই অবস্থাকে স্বপ্নাবস্থার সংগে তুলনা করলেও ক্ষতি নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য এই যে, পাঠকের মনে কাব্য যে উপায়ে উপলব্ধি ঘটায় ঠিক একই উপায়ে কবির মনে উক্ত কাব্যের উপলব্ধি ঘটে থাকে

কিন্তু তা সত্বেও পাঠক যা উপলব্ধি করেন তা কেবল মাত্র কবির উপলব্ধিই নয়, তা পাঠকের নিজস্ব উপলব্ধিও বটে; কবি ও পাঠকের মন সমসূত্রে বাঁধা। কাব্য হচ্ছে 'সহৃদয় হৃদয় সংবাদী'। এ যুগের কবি ও তাঁর পাঠকের মধ্যে যে সম্পর্ক, যাদুর যুগের আনুষ্ঠানিক পরিচালক ও তাঁর গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক সেই একই ছিল।

৩

যাদু থেকে কাব্যের উৎপত্তি হয়েছে এ কথা স্বীকৃত হলে, আমরা যাকে কাব্যের অভিভব (inspiration) বলি, সে জিনিষটির ব্যাখ্যা অনেক সহজ হয়ে পড়ে। যখন কবি বাস্তব থেকে চৈতন্যকে বিচ্যুত ক'রে মায়ার জগতে প্রেরণ করেন, এবং যখন এই মায়ার জগতে তাঁর সমাজ ও ব্যক্তি-মানসের দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়ে নির্দ্বন্দ্ব উপলব্ধি ঘটে, তাঁর তখনকার অবস্থাকেই বলি অভিভূত (inspired) অবস্থা। সেই মায়ার জগতের উপলব্ধির প্রকাশই তাঁর কাব্যে রূপায়িত হয়। এই অভিভূত অবস্থায় কবি যা উপলব্ধি করেন, দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষের ভাগ্যে তা ঘটে না; কিন্তু উপলব্ধ সত্য কাব্যের মাধ্যমে পাঠকের মনের সমর্থন পায় বলেই কবির জনপ্রিয়তা।

কাব্যের অভিভব (inspiration), যোগের সমাধি ও লৌকিক 'ভর-করা' (possession) মূলতঃ একই জিনিষের প্রকারভেদ মাত্র। বাস্তবকে অতিক্রম ক'রে তুরীয় মার্গে চিদানন্দ লাভ করা যায় যে অবস্থায়, তার নাম সমাধি; আর স্নায়বিক দুর্বলতা বশতঃ যখন মানুষের সুপ্ত-চৈতন্য জাগ্রত-চৈতন্যকে পরাভূত ক'রে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখনকার সেই অবস্থার নাম 'ভর-করা'। তিনটিই মূলতঃ এক; আশ্রয় বিভিন্ন পাত্র। কবির অভিভূত অবস্থা আর গ্রাম্য লোকের 'ভর-করা'র অবস্থার পার্থক্য দু'জনের মানসিক পার্থক্যের মধ্যেই নিহিত।

আদিম মানুষের মন ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন; মগ্ন-চৈতন্যের কামনা-বাসনা তাই তাকে অতি সহজেই অভিভূত করতে সক্ষম ছিল। এই জন্যে যাদুর প্রভাব ছিল তাদের মনের উপর অসাধারণ প্রভাবশালী। যাদু অনুষ্ঠানে তাই নৃত্য-গীতের মাধ্যমে তাদের যে মানসিক পরিবর্তন ঘটত তা হ'ত অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, স্থূল এবং উদ্দাম। কিন্তু সভ্য সমাজের মানুষের মন আদিম মানুষের তুলনায় অনেক বেশী দৃঢ় এবং ঘাতসহ; তাই এ সমাজের কবির অভিভব ঘটার কারণও অতি জটিল ও সূক্ষ্ম; অভিভূত হ'য়ে রচিত কাব্যও তাই আদিম কাব্য থেকে অনেক বেশী সূক্ষ্ম, জটিল ও ব্যঞ্জনাময়। এ যুগে অভিভবের কারণটি আমরা আবিষ্কার ক'রেছি; কিন্তু অতীতের কবিরা তাঁদের অভিভূত হওয়ার কারণটি বুঝে উঠতে পারতেন না বলেই ব্যাখ্যা করতেন অন্য ভাবে। তাঁরা ব'লতেন দৈবী প্রেরণা, দেবতার ভর। তাঁদের মতে দেবতার বাণীই তাঁদের মুখ থেকে উদ্গাত হয়। আর এই জন্যেই আদিম মানুষ কবি ও ভবিষ্যবাকের (prophet) মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পেত না। অবশ্য এদের মধ্যে পার্থক্যও কিছু নেই। এ যুগে আমরা কবিকে বলি 'ঋষি', বৈদিক যুগের আর্য্যেরা ঋষিদের বলতেন 'কবি'। ভবিষ্যবাক্ ও কবির মধ্যে পার্থক্য নেই বলেই কাব্য ও ভবিষ্য-বাণীতেও (prophecy) মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। কবির উপলব্ধ সত্যই ভবিষ্য-বাণী আর তার ছন্দোময় রূপ কাব্য। আদিম মানুষের কাছেও কাব্য ও ভবিষ্য-বাণীর মধ্যে কোন সীমারেখাই ছিল না।

কবে, কখন, কোথায় সংবাদ-পত্র?

বিদ্যালয়ে পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্রে রচনা লিখতে দেওয়া হয় নানা বিষয়ে। কতকগুলি রচনার মধ্যে "সংবাদ-পত্র" বিষয়টা হামেসাই দেখতে পাওয়া যায়। উপকারিতায় সংবাদ-পত্র, লিখতে লিখতে যেন শেষই হয় না। কিন্তু খুব কম ছাত্র-ছাত্রী সংবাদ-পত্র কবে প্রথম সৃষ্টি হয়েছে, লিখে থাকে। অন্য কোথাও সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হওয়ার আগে চীনে "পিকিংপাও" নামে একটি কাগজ প্রকাশ পায়। ১৫৩৪ বছর পূর্ব্বে। ৪০০ খৃষ্টাব্দে সু কুং নামে জনৈক মুদ্রাকর "পিকিংপাও" প্রকাশিত করে। গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে "পিকিংপাও" প্রকাশিত হচ্ছে না।

দ্বিতীয় সংবাদ-পত্রটি হ'ল হল্যাণ্ডের। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে "কোরাণ্টি ভ্যান ইউরোপা" নামে কাগজটি হল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান-জাতি কাগজটিকে বাতিল করে দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হ'লে কাগজটি একটি হার্লেম দৈনিকের সঙ্গে যুক্ত হয়।

তৃতীয় কাগজটি হ'ল ব্রিটিশ সংবাদ-পত্র। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে "ওরশেশ টার পোষ্ট-ম্যান" কাগজটি প্রকাশিত হয়। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দ থেকে কাগজটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে এখনও পর্য্যন্ত।

অন্যান্য ষোলটি ব্রিটিশ সংবাদ-পত্র গত দু'শো বছর ধ'রে প্রকাশিত হচ্ছে।

ডেনমার্কে "বেলিংস্কি টিডেণ্ডি" নামে কাগজটি সম্প্রতি দু'শো বছরের জন্ম-বার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্পন্ন ক'রেছে।

আয়ার্ল্যাণ্ডের "বেলফাষ্ট নিউজ লেটার" দাবী করে দু'শো এগারো বছরের।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

ঠাকুরদাস বসু—সাহিত্যিক। সম্পাদক—দুর্জ্জনদমন মহানবমী (মাসিক, ১৮৪৭)।

ঠাকুরদাস, বৈষ্ণব—অনুবাদক। গ্রন্থ—উজ্জ্বলনীলমণি (শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত—পদ্যানুবাদ)।

ডফ, রেঃ, ডাঃ আলেকজান্দার (Rev. Dr. Alexander Duff)—খৃষ্টীয় ধর্মযাজক। জন্ম—১৮০৫ খৃঃ ২৫এ এপ্রিল। মৃত্যু—১৮৭৮ খৃঃ ১২ই ফেব্রুয়ারি। শিক্ষা—স্কটল্যাণ্ডের St. Andrews বিশ্ববিদ্যালয়ে। মিশনারীরূপে কলিকাতায় আগমন (১৮২৯), Free Church Institution প্রতিষ্ঠা (পরে Duff Church)—১৮৩০। ভারতে অবস্থান (১৮২৯—১৮৬৩)। সম্পাদক—Calcutta Review (১৮৪৫—১৮৫৯), Calcutta Christian Registrar (পরিচালনা—১৮৩২), The Observer, Calcutta Quaterly (১৮৪৪)।

ডেবিডস্ (T. W. Rhys Davids)—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪৩ খৃঃ ১২ মে। শিক্ষা—ব্রেসলাউ বিশ্ববিদ্যালয়। কর্ম—সিংহল সিবিল সার্ভিস (১৮৬৬), আইন ব্যবসায় (১৮৭৭)। অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটী কলেজ, সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষ, রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী। গ্রন্থ—Buddhism (১৮৭৮), Buddhism, its History & Literature (১৮৯৬), Buddhist India (১৯০২)।

ডিরোজিও, হেনরী লুই বিবিয়ান (H. L. Vivian Derozio)—শিক্ষাবিদ্। জন্ম—১৮০৯ খৃঃ ১০ই এপ্রিল কলিকাতা ইণ্টালী পদ্মপুকুর অঞ্চলে। মৃত্যু—১৮৩১, ১৭ই এপ্রিল। পিতা—ফ্রান্সিস ডিরোজিও। শিক্ষা—কলিকাতায় Mr. Drummond's Academy. কর্ম—সওদাগরী অফিস, ভাগলপুরের নীলকুঠি পরে অধ্যাপক, হিন্দু কলেজ। স্থাপনা—অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েসন। ইঁহার সময় বাংলা দেশের এক নবযুগের সময় বলিলেই হয়। তৎকালীন বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ইঁহার ছাত্র ছিলেন। সম্পাদক—The East Indian.

ডোম্বী হেরুক—মগধের নৃপতিবিশেষ। জন্ম—৮ম শতাব্দীর শেষ ভাগে। ইনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। গ্রন্থ—বজ্রযান, সহজযান, ডোম্বীগীতিকা।

ঢুণ্ডিরাজ—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। পিতা—নৃসিংহ দৈবজ্ঞ। গ্রন্থ—জাতকাভরণ (জ্যোতিষ গ্রন্থ—১৫৩৮ খৃঃ)।

তত্ত্বরাম ভট্টাচার্য—কবি। ইনি কবিরত্ন উপাধি লাভ করেন। নিবাস—চট্টগ্রাম (আমু)। পিতা—গৌরী পঞ্চানন। গ্রন্থ—বস্ত্রহরণ (ভাটগীত)।

তমিজউদ্দীন—মুসলমান গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গোলশানে মোহাব্বত (১২৮৬ খৃঃ)।

তরণীরমণ—পদকর্তা। ইনি মহাপ্রভুর প্রায় সমকালবর্ত্তী। গ্রন্থ—চণ্ডীদাস।

তরু দত্ত—বিদুষী মহিলা কবি। জন্ম—১৮৫৬ খৃঃ রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্তবংশে। মৃত্যু—১৮৭৭ খৃঃ ৩০এ অগষ্ট। পিতা—গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। ইনি পিতার সহিত ইংলণ্ডে (১৮৬৯—১৮৭৩ খৃঃ) অবস্থান করিয়া ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন ও ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় বহু কবিতা রচনা করেন। ফ্রান্স, ইটালী ভ্রমণ। গ্রন্থ—A Sheaf Gleaned in French Fields (১৮৭৬ খৃঃ), Le Journal de Mademoiselle, D' Arvers (উপন্যাস ১৮৭৯)। Ancient Ballads and Legends of Hindusthan (লণ্ডন, ১৮৮১)।

তানসেন মিঞা—প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ। জন্ম—১৫৪৯ খৃঃ (৯৫৬ বঙ্গ) গোয়ালিয়ারে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ-বংশে। মৃত্যু—১৫৯৫ খৃঃ (১০০১ বঙ্গ) আগ্রা শহরে। ইহার প্রকৃত নাম—রামতনু পাঁড়ে। পিতা—মকরন্দ পাঁড়ে। ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ (১৫৬৭ খৃঃ)। ১৫৬৩ খৃঃ সম্রাট্ অকবরের দরবারে গায়ক নিযুক্ত এবং তানসেন উপাধি লাভ। গ্রন্থ—সঙ্গীতসার।

তামসরঞ্জন রায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—অঞ্জলি (১৩৩৫)।

তারকগোপাল ঘোষ—শিক্ষাব্রতী ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। জন্ম—১২৭২ বঙ্গ ফরিদপুরের ঘোষপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩১১ বঙ্গ ১১এ চৈত্র। বি, এ (১৮৮৭)। ব্রাহ্মসমাজভুক্তি। শিক্ষকতা, মেদিনীপুর, কাঁথি ইংরেজি স্কুল (১৮৯১-১৯০৫)। গ্রন্থ—সাকারোপাসনা, ব্রহ্মজ্ঞান, কবিতামুকুল। সম্পাদক—কান্তি (মাসিক ১৮৯৭)।

তারকচন্দ্র চূড়ামণি—সাংবাদিক। গ্রন্থ—সপত্নী নাটক। সম্পাদক—ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্র (পাক্ষিক, ১৮৬১)।

তারকচন্দ্র রায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—ভাণ্ডার (১৩২৫-৩০)।

তারকনাথ অধিকারী—সাহিত্যিক। সম্পাদক—উষা (পাবনা, মাসিক ১২৮৯)।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪৫ খৃঃ যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার বাঘআঁচড়া গ্রামে। মৃত্যু—১৮৯১ খৃঃ। পিতা—মহানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়। কর্ম—চিকিৎসা ব্যবসায়, পরে অধ্যাপক—মেট্রোপলিটন কলেজ, Vaccination Inspector এবং সহকারী সার্জেন। গ্রন্থ—স্বর্ণলতা (১২৮১ বঙ্গ), ললিত সৌদামিনী (১২৮৮), হরিষে বিষাদ (১২৯৪), তিনটী গল্প (১২৯৫), অদৃষ্ট (১৮৯১), বিধিবিলাপ (উপ)। সম্পাদক—কল্পলতা (মাসিক, ১২৮১)।

তারকনাথ চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিজ্ঞানশিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ (১৮৭১ খৃঃ)।

তারকনাথ দত্ত—সাহিত্যিক। গ্রন্থ—সুকুমারবিলাস (কাব্য), কামিনী-কুসুম (১২৯০)। সম্পাদক—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৭৮৩ শক), ধর্মরাজ (মাসিক, ১৮৫৩ খৃঃ)।

তারকনাথ বিশ্বাস—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—হুগলী জেলার অন্তর্গত বালোড় গ্রামে। পিতা—দিগম্বর বিশ্বাস। গ্রন্থ—বিরজা (১২৯৪), গিরিজা, মহামায়া, রাণা প্রতাপসিং Reference Book of Registering Officers, Th Registration Act. সম্পাদক—উপন্যাস-লহরী (মাসিক ১২৯৩), আদরিণী (মাসিক, ১২৮৭), Registration Journal

তারকনাথ বিশ্বাস—গ্রন্থকার। নিবাস—বদনগঞ্জ, হুগলী। গ্রন্থ—পরলোক, অমলা, অভিষেকগীতি।

তারকনাথ বিষ্ণু—সাহিত্যিক। সম্পাদক—ভারত দর্পণ (মাসিক—১২৮৬, সাপ্তাহিক—১২৮৯)।

তারকনাথ মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—তত্ত্বজ্ঞান (মাসিক, ১৩০৩)।

তারকনাথ শর্মা—গ্রন্থকার। নিবাস—উত্তরপাড়া, হুগলী। গ্রন্থ—মুগ্ধবোধসার চন্দ্রোদয় (১৮৪৭ খৃঃ)।

তারকনাথ সাধু—ব্যবহারজীবী ও সাহিত্যিক। জন্ম—১২৭৪ বঙ্গ ২০এ কার্ত্তিক। পিতা—রামনাথ সাধু। শিক্ষা—মতিলাল ফ্রী স্কুল, জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ, বি, এল। কর্ম—আইন ব্যবসায়, পাবলিক প্রসিকিউটর (১৯০৭)। রায়বাহাদুর (১৯১৬) ও সি, আই, ই (১৯২৪) উপাধিলাভ। গ্রন্থ—ভোলানাথের ভুল, মেনকারাণী, ঋণমোক্ষ, মহামায়ার মহাদান, হুদ্দাদার (কবিতা), স্বরীতি কথা, উপেক্ষিতের উপকারিতা, স্মৃতিকথা। যুগসম্পাদক—গন্ধবণিক সমাচার (মাসিক, ১৩২৭)।

তারকেশ্বর সেনশাস্ত্রী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মিলনমালা, বিপিন বিলাস, নদীয়া বিলাস, যমুনা বিলাস।

তারণবন্ধু শর্মা—সাহিত্যিক। সম্পাদক—সুহৃদ (মাসিক, দিনাজপুর-ভাটপাড়া—১২৮৫)।

তারাকান্ত কাব্যতীর্থ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রসাল, গুপ্ত উপন্যাস।

তারাকান্ত বিদ্যাসাগর—পণ্ডিত। গ্রন্থ—পদার্থবিদ্যা, প্রশ্নোত্তরাবলী (১৮৭৩)।

তারাকুমার কবিরত্ন—পণ্ডিত। জন্ম—১২৫৪ বঙ্গ ২৪ পরগনার অন্তর্গত চাংড়িপোতা গ্রামে। পিতা—কৃষ্ণমোহন শিরোমণি। শিক্ষা—সংস্কৃত কলেজ। মেট্রোপলিটন কলেজ; গ্রন্থ—কৃষ্ণভক্তি-রসামৃত, পঞ্চামৃত, অকিঞ্চনের নিবেদন, তারা মা, কবিবচন সুধা, জীবন মৃগতৃষ্ণা, শিবশতকম্, নীতিমালা, চাণক্য শ্লোক, কথাসার, সমাজ-সংস্কার, সতীধর্ম। যুগ্ম সম্পাদক—বিশ্বদর্পণ (পাক্ষিক, ১২৭৮, পরে মাসিক)।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—কলিকাতা, বর্ধমান-রাজের অধীনে কর্ম। গ্রন্থ—ইংরেজি বাঙ্গালা অভিধান, মনুসংহিতা (ইংরেজি অনুবাদ)। পরিচালনা—Quill (সংবাদপত্র)।

তারাচাঁদ দত্ত—গ্রন্থকার। বর্ধমানস্থ পাদরী কাপ্তেন ষ্টুয়ার্টের অধীনে কর্ম। গ্রন্থ—মনোরঞ্জন ইতিহাস (১৮১৯)।

তারাচাঁদ (চরণ) সিকদার—সাহিত্যিক। গ্রন্থ—ভদ্রার্জুন (নাটক—১৮৫২ খৃঃ)। সম্পাদক—বিদ্যারত্ন (পত্রিকা—১২৫৮ বঙ্গ)।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি—টীকাকার। গ্রন্থ—সিদ্ধান্তবিন্দুসার (ব্যাখ্যা), ব্রহ্মস্তোত্র (ঐ)।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি—পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮১২ খৃঃ। মৃত্যু—১৮৮ খৃঃ কাশীধামে। পিতা—কালিদাস ভট্টাচার্য। শিক্ষা—কাশীধাম এবং সংস্কৃত কলেজ (কলিকাতা)। তর্কবাচস্পতি উপাধিলাভ (১৮৩৫ খৃঃ)। অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ (১৮৪৫)। এতদ্ব্যতীত ইনি কাপড়, স্বর্ণালঙ্কার, শাল, কৃষিকার্য প্রভৃতির ব্যবসায় করিতেন। গ্রন্থ—বাচস্পত্য (বৃহৎ সংস্কৃত অভিধান), শব্দস্তোম মহানিধি, বিধবা-বিবাহ-খণ্ডন, আশুবোধ ব্যাকরণ, শব্দার্থরত্ন, বহু বিবাহবাদ, 'লাঠি থাকিলে পড়ে না' (পুস্তিকা), বাক্যমঞ্জরী। টীকাগ্রন্থ—বেণীসংহার, কাদম্বরী, মালবিকাগ্নিমিত্র, গয়ামাহাত্ম্য (১৮৬১), গয়াশ্রাদ্ধাদিপদ্ধতি (১৮৬১)।

তারানাথ বিদ্যারত্ন—তান্ত্রিক। সম্পাদিত গ্রন্থ—তন্ত্রাভিধানম্ (কলি, ১৯১৩), প্রপঞ্চসারতন্ত্র (১৯১৪)।

তারানাথ রায়—বিপ্লবী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৯০১ খৃঃ রাজসাহীতে। শিক্ষা—এম. এ। ১৯১৬—১৯২১ পর্যন্ত কারাদণ্ড। কংগ্রেসে যোগদান (১৯২১)। ১৯৩০ খৃঃ হইতে বসুমতীতে যোগদান। ফরোয়ার্ড পত্রিকায় অন্যতম কর্মী (১৯২৩)। ১৯২২ হইতে সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী। গ্রন্থ—মুসোলিনী ও নব্য ইটালী, অগ্নিশিখা, রাগরেখা (১৩৩৪), নব্যচীন, কামালপাশা ও নবতুর্কী (১৩৩৬), গণবিপ্লব ও ষ্টালিন, বন্দেমাতরম্ (Mother এর প্রথম বাংলা অনুবাদ)। সম্পাদক—নবশক্তি (সাপ্তাহিক—১৯২৮-২৯)।

তারাপদ রাহা—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রক্তধুলির পথ, যে দেশে যেতে মানা, বিপথে।

তারাপ্রসন্ন ঘোষ—সাহিত্যিক। সম্পাদক—বাল্যাশ্রম (পত্রিকা, ১৩১১—২০ বঙ্গ)।

তারাপ্রসাদ চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভূদর্পণ (১৮৭২ খৃঃ)।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন—পণ্ডিত। জন্ম—নদীয়া কাঁচফুলি গ্রামে। মৃত্যু—১৮৫৮ খৃঃ ১৫ই নভেম্বর। পিতা—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থাধ্যক্ষ সংস্কৃত কলেজ, নদীয়া জেলা স্কুল সব-ইন্‌স্পেক্টর (১৮৫৪)। গ্রন্থ—কাদম্বরী (বঙ্গানুবাদ, ১৮৫৪), রাসেলাস (জনসন কৃত—বঙ্গানুবাদ, ১৮৫৭)। ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা (১৮৫০) পদ্যাবলী (১৮৫২)।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক। জন্ম—১৮৯৮ খৃঃ ২৩এ জুলাই বীরভূম জেলায় লাভপুর গ্রামে। শিক্ষা—লাভপুর ও কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ও ১ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত (১৯৩০)। গ্রন্থ—মন্বন্তর, পঞ্চগ্রাম, বেদেনী, পাষাণপুরী, গণদেবতা, নাগরিক, ছলনাময়ী, শ্রীপঞ্চমী, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা, চৈতালী, ঘূর্ণী, সন্দীপন পাঠশালা, হারাণো সুর, দ্বীপান্তর, কামধেনু, দুই পুরুষ, তামস-তপস্যা, নীলকণ্ঠ, রাইকমল, আগুন, জলসাঘর, রসকলি, কবি, অভিযান, তিন শূন্য, ধাত্রীদেবতা, যাদুকরী, কালিন্দী, রামধনু, ঝড় ও ঝরাপাতা, নাগিণী কন্যার কাহিনী।

তারাসুন্দর মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। জন্ম—১২৮৩ বঙ্গ বীরভূমে। মৃত্যু—১৩৫১ বঙ্গ। আইন ব্যবসায়, বীরভূম। সম্পাদক—রাঢ়দীপিকা।

তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৩১ বঙ্গ নবদ্বীপে। মৃত্যু—১৩০৩ বঙ্গ ২৮এ আষাঢ়। পিতা—শশিশেখর চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষা—কৃষ্ণনগর কলেজ। কর্ম—সৈনিক বিভাগে, পরে প্রধান শিক্ষক, সংস্কৃত কলেজ। ইনি এক জন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল, তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়। গ্রন্থ—ভূগোল বিবরণ (১৮৫০ খৃঃ, ইহাই বঙ্গভাষায় প্রথম ভূগোল), ভূগোল প্রকাশ, ভারতের ইতিহাস।

তারিণীচরণ মিত্র—সাহিত্যিক ও অনুবাদক। জন্ম—১৭৭২

(আনু) কলিকাতা সিমুলিয়া অঞ্চলে। ইনি হিন্দী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কর্ম—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দ্বিতীয় মুন্সী (১৮০১), প্রধান মুন্সী (১৮০১—১৮৩০ খৃঃ)। অনুবাদক—ওরিয়েণ্ট্যাল ফেবুলিষ্ট (বাংলা, ফার্সী ও হিন্দী অনুবাদ—১৮০৩ খৃঃ—ডাঃ গিলক্রাইষ্টের ফেবুলিষ্ট হইতে অনূদিত), নীতিকথা, ১ম ও ২য়, (নীতিবিষয়ক—১৮১৮ খৃঃ রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের সহযোগে অনূদিত), ভারতবৃত্তান্ত (১৮৭৪)।

তারিণীচরণ সেন—সাহিত্যিক। গ্রন্থ—ভারত-কোকিল। সম্পাদক—বঙ্গজীবন (মাসিক, ১৩০২)।

তারিণীচরণ সেনগুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ব্যবহারিক গণিত, ১ম ভাগ (১৮৭১ খৃঃ)।

তারিণী দেবী—সঙ্গীত-রচয়িত্রী। জন্ম—মেদিনীপুর জেলার বরদা পরগনায় ১৯শ শতাব্দী। ইঁহার রচিত শিবদুর্গা বিষয়ক বহু সঙ্গীত আছে।

তারিণীপ্রসাদ অগ্নিহোত্রী—হিন্দী গ্রন্থকার। শিক্ষা—বি-এ। গ্রন্থ—শিবাজী কা জীবন চরিত (হি)। সরল স্বাস্থ্যবিধি (হি)।

তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী—বিপ্লবী ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আগষ্ট-বিপ্লব।

তারিণীশঙ্কর সান্ন্যাল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ১ম ভাগ (১৮৭১)।

তিনকড়ি ঘোষাল—সাংবাদিক। সম্পাদক—নবপ্রবন্ধ (মাসিক, ১৮৬৬ খৃঃ), নীতিহার (১৮৬৮)।

তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—প্রজাবন্ধু (সাপ্তাহিক, ফরাসী চন্দননগর, ১২৮১ বঙ্গ)।

তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিজুর বিয়ে, চারুশিল্পী, সংসারী, নারীর ঠাকুর, ঝড়ের বাঁশী, মালাবদল, মুক্তির বাঁধন।

তিনকৌড়ি দত্ত—কবি। গ্রন্থ—হিতমালা (কবিতা, ১৮৭২)।

তিনকৌড়ি মুখোপাধ্যায়—কবি। গ্রন্থ—কবিতাকুসুম, (১ম, ১৮৭২)।

তিলক, বাল গঙ্গাধর—রাজনীতিবিদ্ ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৫৬ খৃঃ ২৩এ জুলাই দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত রত্নগিরি নামক স্থানে। মৃত্যু—১৯২০, ৩১এ জুলাই। পিতা—গঙ্গাধর রামচন্দ্র তিলক। শিক্ষা—বি-এ (১৮৭৬), এল, এল, বি (১৮৭৯)। আইন অধ্যাপক। রাজনৈতিক কারণে বহু বার কারাবাস। দেশবাসী কর্তৃক 'লোকমান্য' নামে পরিচিত। মরাঠা, কেশরী (সংবাদপত্র) প্রকাশক। গ্রন্থ—The Arctic Home in the Vedas, গীতারহস্য।

তুলসীচরণ ঘোষ—নাট্যকার। নাট্যগ্রন্থ—কালনেমি (সামাজিক নাটক)।

তুলসীদাস—হিন্দী কবি ও সাধু। জন্ম—গঙ্গা-যমুনার নিকট দোয়াবের অন্তর্গত তরীগ্রামে ব্রাহ্মণ-বংশে। মৃত্যু—১৬২৪ খৃঃ কাশীধামে। ইনি সম্রাট্ অকবরের সমসাময়িক ছিলেন। গ্রন্থ—রামচরিত মানস (১৫৭৫ খৃঃ), তুলসীদাসের দোঁহা।

তুলসীদাস দে—সাহিত্যিক। সম্পাদক—দুরাশা (মাসিক, ১২৮৩)।

তুষারকান্তি ঘোষ—সাংবাদিক। জন্ম—১৮৯৯ খৃঃ ৪ঠা অক্টোবর কলিকাতা। পিতা—মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ। শিক্ষা—বি, এ,। 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রিকা ও অমৃতবাজার এলাহাবাদ সংস্করণের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে যে সাংবাদিক প্রতিনিধি দল মিশরে ভ্রমণ করেন, ইনি তাঁহাদের নেতা ছিলেন। সম্পাদক—দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা।

তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ—সাহিত্যিক। সম্পাদিত গ্রন্থ—ব্রাহ্মণ সর্বস্বম্ (হলায়ুধকৃত। ১২৯৯ বঙ্গ)। সম্পাদক—ব্রাহ্মণ (মাসিক, ১২৯৯)।

ত্রিগুণাতীত, স্বামী—সন্ন্যাসী। সম্পাদক—উদ্বোধন (পাক্ষিক, ১৩০৫—১০)।

ত্রিদিবনাথ রায়—শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৩০৬ বঙ্গ ৯ই ভাদ্র বহরমপুরে (মাতুলালয়ে)। পিতা—ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়। পৈতৃক নিবাস—২৪ পরগনার পুঁড়া গ্রামে। শিক্ষা—বহরমপুর বাংলা স্কুল (রাধার ঘাট), বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল, প্রবেশিকা (এথেরা শ্রীশচন্দ্র ইনস্টিটিউসন—১৯১৬), আই, এ, ও বি, এ (স্কটিশ চার্চ কলেজ—১৯২০), এম, এ (১৯২২), বি, এল (১৯২৩)। কর্ম—আইন ব্যবসায়, কলিকাতা হাইকোর্ট (১৯২৪), অধ্যাপক, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া (১৯২৬—১৯৩১), বালীগঞ্জ গার্লস্ স্কুল (১৯৪০—৪১), মহারাজা মণীন্দ্র কলেজ (১৯৪১)। সম্পাদক—স্বাধীন নাগরিক। সহ-সম্পাদক—বিশ্বকোষ, বঙ্গীয় মহাকোষ। গ্রন্থ—Hindu Law Question & Answers, অনঙ্গরঙ্গ (ইংরেজি হইতে অনূদিত)। সম্পাদিত গ্রন্থ—Secrets of Love. বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত গ্রন্থ—কুট্টনি-মতম্, সময়-সাথিকা (অনুবাদ)।

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন—সাহিত্যিক। সম্পাদক—যুগের খেয়া (পত্রিকা, ১৩৩৫—৩৬)।

ত্রিলোচন চক্রবর্তী—কবি। (আনু) ১৭শ শতাব্দী। গ্রন্থ—মহাভারতের অনুবাদ (কবিতা)।

ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১৮৩৭ খৃঃ ঢাকা জেলার শাক্তা গ্রামে। মৃত্যু—১৮৯৭ খৃঃ। পিতা—ভৈরবচন্দ্র পঞ্চানন। গ্রন্থ—মনোদূত (কাব্য), পরিশেষরত্ন (ব্যাকরণটীকা)।

ত্রৈলোক্যনাথ পাল—ঐতিহাসিক গ্রন্থকার। জন্ম—১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। খড়্গপুর থানার অন্তর্গত ধিতপুর গ্রামে। মৃত্যু—২০শ শতাব্দীর প্রথম পাদে। আইনজীবী। গ্রন্থ—মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, নারায়ণগড় রাজবংশ (১৮৮৮), ২য় খণ্ড (কর্ণগড় রাজবংশ), ৩য় খণ্ড নাড়াজোল রাজবংশ (১৮৯১), ৪র্থ খণ্ড বলরামপুর ও ধারেন্দা রাজবংশ (১৮৯৭)।

ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬০ খৃঃ ২১এ জ্যৈষ্ঠ। মৃত্যু—১৯০০ (১৩০৭ বঙ্গ, ১লা অগ্রহায়ণ)। শিক্ষা—এম, এ, বি, এল। কর্ম—সব-ডেপুটী (১৮৮১ খৃঃ), ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (১৮৯৯)। গ্রন্থ—ঐতিহাসিক গ্রন্থমালা, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবির জীবনী, নেপালের পুরাতত্ত্ব, রাজতরঙ্গিণী, বঙ্গে সংস্কৃত চর্চা।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৫৪ বঙ্গ ৬ই শ্রাবণ, ২৪ পরগনার অন্তর্গত শ্যামনগরের নিকট রাহুতাগ্রামে। পিতা—বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। মাতা—ভবসুন্দরী দেবী। শিক্ষা—চুঁচুড়া ডফ স্কুল। কর্ম—প্রথমে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা, তৎপরে

পুলিশের দারোগা, পরে কৃষি-বাণিজ্য অফিসে, রাজস্ব বিভাগে (১৮৮২), ইংলণ্ডে গমন (১৮৮৬), তৎপরে কলিকাতা মিউজিয়ম। গ্রন্থ—Visit to Europe, Art Manufactures' of India, বিশ্বকোষ (প্রথম আরম্ভ অগ্রজ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সহ)। গ্রন্থ—মজার গল্প (১৩১২), ভূত ও মানুষ (১৩১২), কঙ্কাবতী (১২৯১), ময়না কোথায়? (১৩১১), মুক্তামালা (১৩০১), পাপের পরিণাম (১৩১৫), ফোকলা দিগম্বর (১৩০১), ডমরুচরিত (১৩২৩), ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা (১৩০৩), বিজ্ঞান বোধ (১৮৯৬), নীতি শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা। সম্পাদক—আর্যাবর্ত রীতিবোধিকা (মাসিক, ১২৭৮), উৎকল শুভকরি, Wealth of India, বিজ্ঞান (মাসিক, ১৩০১)।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল—কবি ও গ্রন্থকার। ছদ্মনাম—চিরঞ্জীব শর্মা। (এই নামেই ইনি গ্রন্থরচনা করেন)। চিরঞ্জীব শর্মা দ্রষ্টব্য।

ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত—সাহিত্যিক। জন্ম—১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মেদিনীপুরের তমোলুকে। মৃত্যু—২০শ শতাব্দী ১ম দশকে। গ্রন্থ—তমোলুকের ইতিহাস। সম্পাদক—তমোলুক পত্রিকা (মাসিক, ১২৮০-৮২)।

ত্রৈলোক্যনাথ রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নজীরসার সংগ্রহ (১৮৬৭ খৃঃ)।

ত্রৈলোক্যমোহন গুহ—কবি। গ্রন্থ—কবিতামালা (১৮৬৯ খৃঃ)।

ত্রৈলোক্যমোহন গুহ নিয়োগী—গ্রন্থকার। বি, এল। 'কবি-কিরীটি' উপাধি লাভ। কর্ম—আইন ব্যবসায়, পাবনা। গ্রন্থ—অবিবেকোৎসব (ইংরেজি ও সংস্কৃত), গীত-ভরতম্ (ঐ), মেঘদৌত্যম্ (ঐ), রোগোমুদ্গরম (ঐ)।

দয়ানন্দ সরস্বতী, পরমহংস—সন্ন্যাসী। জন্ম—১৮২৭ খৃঃ কাথিয়াবাড়। মৃত্যু—১৮৮৩ খৃঃ। যৌবনে গৃহত্যাগ, নানা দেশ ভ্রমণ। আর্যসমাজের প্রবর্তক। পঞ্জাবে এই সমাজের বিস্তৃতিলাভ। ব্যাখ্যাগ্রন্থ—ঋগ্বেদভাষ্য, সত্যধর্মপ্রকাশ।

দয়ারাম দাস—মঙ্গলকাব্য-রচয়িতা। জন্ম—১৮শ শতাব্দী মেদিনীপুর জেলায় কাশীজোড়া পরগনার কিশোরচক গ্রামে। কাশীজোড়ার রাজা নরনারায়ণ রায়ের সভাসদ্। গ্রন্থ—লক্ষ্মী চরিত্র, সারদামঙ্গল।

দয়ালচন্দ্র সোম—চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪২ খৃঃ চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ সোমবংশে। মৃত্যু—১৮৯৯ খৃঃ। শিক্ষা—এম. বি (কলিকাতা মেডিকেল কলেজ)। ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী। শিক্ষকতা—আগ্রা ও পাটনা মেডিকেল স্কুল। অধ্যাপক, কলিকাতা ক্যাম্বেল স্কুল ও পরে রাজকীয় অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জেন। গ্রন্থ—Dars-i-Jahari (ইং অনুবাদ)।

দয়ারাম দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—তরণীবধ (গীতিকাব্য)।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার—শিশু সাহিত্যিক। গ্রন্থ—ঠাকুরদার ঝুলি, ঠাকুরমার ঝুলি, ঠানদিদির থলে, আমাল বই, চারুহারু, ১ম, ২য়, আর্যনারী, বাঙলার মুকুট গৌরব, বিশ্ববাণী, ছেলেদের গান, দাদামশায়ের থলে বা বাঙলার রসকথা, গল্প ও কথা, খোকা খুকীর খেলা, সচিত্র সরল চণ্ডী, সপ্তশ্বরা, সরল পুরাণ, সরল রাজস্থান, বিদ্যাসাগর।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজা—সাংবাদিক। জন্ম—১৮১৪ খৃঃ কলিকাতা। মৃত্যু—১৮৭৪ খৃঃ লক্ষ্মৌ। পিতা—জগমোহন মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা—ডেভিড হেয়ার বিদ্যালয়। কর্ম—আইন ব্যবসায়, কলিকাতার কালেক্টর, ত্রিপুরা রাজদরবারে কর্ম, মুর্শিদাবাদ রাজসরকারে কর্ম। রাজা উপাধি লাভ (মুর্শিদাবাদ নবাব কর্তৃক), পরে লক্ষ্মৌ প্রবাসী, তথায় তালুকদার, অবৈতনিক এসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার। তালুকদার সংঘ স্থাপন ও তাহার কর্ম-সচিব। লক্ষ্মৌ ক্যানিং কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদক—জ্ঞানান্বেষণ (সাপ্তাহিক—১৮৩১, ইহা ছাত্রসমাজে বিতরিত হইত), সমাচার হিন্দুস্তানী, ভারত পত্রিকা। পরিচালক—The Lucknow Times.

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৫৩ বঙ্গ ২৭এ জ্যৈষ্ঠ, সিউড়ী। মৃত্যু—১৩০২ বঙ্গ ১৭ই বৈশাখ, সিউড়ী। পূর্ব নিবাস—বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ময়নাপুর গ্রামে। পিতা—কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় (সব-জজ)। শিক্ষা—সিউড়ী জেলা স্কুল, প্রবেশিকা (ভাগলপুর), আইন অধ্যয়ন। কর্ম—পোষ্টমাষ্টার, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, সিউড়ী। গ্রন্থ—অপূর্ব স্বপ্নকাব্য (১২৮২), শব্দজ্ঞান রত্নাকর (অভিধান—১৮৭৮ খৃঃ), পদসার, ৩ খণ্ড (১২৮৫), সুভদ্রার বিবাহ (কাব্যগ্রন্থ)। সম্পাদক—দিবাকর (সাপ্তাহিক, সিউড়ী—১৮৭৮ খৃঃ)।

দণ্ডী—মহাকবি। ৭ম শতাব্দী। গ্রন্থ—কাব্যাদর্শ, দশকুমার-বধ-চরিত।

দামোদর গুপ্ত—গ্রন্থকার। ৮ম শতাব্দী। কাশ্মীরের মহারাজা জয়াদিত্যের মন্ত্রী। গ্রন্থ—কুট্টনীমত।

দামোদর মুখোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক। জন্ম—১২৫৫ বঙ্গ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৩১৪ বঙ্গ, শ্রাবণ। পৈতৃক নিবাস—শান্তিপুর। শিক্ষা—কৃষ্ণনগর ও বহরমপুর। ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত তিন ভাষাতে ব্যুৎপত্তি লাভ। গ্রন্থ—মা ও মেয়ে, দুই ভগিনী, বিমলা, কর্মক্ষেত্র, শান্তি, সোনার কমল, যোগেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, সপত্নী, ললিতমোহন (১৩১১), অমরাবতী, আদর্শ প্রেম, শুক্লবসনা সুন্দরী, শত্রুরাম, নবাবনন্দিনী, মৃন্ময়ী, আয়েসা (১৮৯৭) উপন্যাস, রত্নাবলী (বঙ্গানুবাদ), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য ও টীকা, কমলকুমারী (১৩১১)। সম্পাদক—প্রবাহ (১২৮৯, ১২৯০), অনুসন্ধান (১৩০০) জ্ঞানাঙ্কুর।

দাশরথি মুখোপাধ্যায়—নাট্যকার। নাট্যগ্রন্থ—কণ্ঠহার, রণভেরী, সেলিনা, হীরার নথ।

দাশরথি রায়—পাঁচালীকার। জন্ম—১২১২ বঙ্গ, মাঘ, বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার পাঁচ মাইল পশ্চিমে বাঁধমুড়া গ্রামে। মৃত্যু—১২৬৪ বঙ্গ, ২রা কার্তিক। পিতা—দেবীপ্রসাদ রায়। শিক্ষা—পীলাগ্রামে (মাতুলালয়ে)। এই সময়ে বিদ্যাশিক্ষার পরিবর্তে ইঁহার মন কবিতার দিকে আকৃষ্ট হয়। কর্ম—নীলকুঠি। কবির দল গঠন, পরে পাঁচালী গান রচনা এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঁচালীকাররূপে খ্যাতিলাভ। পাঁচালী গ্রন্থ—(১) শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক—ত্রিশটি পাঁচালী পালা। (২) শ্রীরামচন্দ্র বিষয়ক—দশটি পালা। (৩) শ্রীশিব-শক্তি বিষয়ক—দশটি পালা। (৪) সমাজ বিষয়ক—নয়টি পালা। (৫) অন্যান্য গীত প্রভৃতি।

দাস গোস্বামী—কবি। কাব্যগ্রন্থ—হংসদূত।

দিগম্বর ভট্ট—কোষকার। গ্রন্থ—ললিতাবলী (সংস্কৃত অভিধান)।

দিগম্বর ভট্টাচার্য—কোষকার। গ্রন্থ—শব্দার্থ-প্রকাশ (বাংলা অভিধান)।

দিগম্বর রায়—অনুবাদক। গ্রন্থ—চাণক্য শ্লোকের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ (১৮৪০)।

দিগম্বর নন্দ বিদ্যানিধি—সংস্কৃত পণ্ডিত ও কবি। জন্ম—১২৬০ বঙ্গ ভাদ্র মেদিনীপুরের অন্তর্গত ভগবানপুর থানার মুরাবেড়িয়া গ্রামে। মৃত্যু—১৩১১ বঙ্গ ১৮ই চৈত্র। পিতা—ভোলানাথ নন্দ। জমিদার। গ্রন্থ—কালীকুণ্ডমাঞ্জলী (১৮১৪)।

দিগিন্দ্রনাথ পাঠক—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। জন্ম—১৩১০ বঙ্গ ১০ই শ্রাবণ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত গড়বেলতা গ্রামে। কাব্য-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ উপাধি লাভ। পিতা—কৃপানাথ পাঠক। গ্রন্থ—চিকিৎসা ও জ্যোতিষ, সম্পাদিত গ্রন্থ—জাতকালঙ্কার, চমৎকার-চিন্তামণি। সম্পাদক—শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ (পত্রিকা)। বঙ্গীয় মহাকোষের জ্যোতিষ বিভাগ, যুগ্ম সম্পাদক—কুরুক্ষেত্র।

দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৯১ বঙ্গ পাবনা জেলায় কাওলা কোলাগ্রামে। পিতা—যাদবচন্দ্র ভট্টাচার্য শিরোরত্ন। গ্রন্থ—জলচল ও স্পর্শদোষবিচার, খাদ্যাখাদ্যবিচার, জাতিভেদ, চাতুর্বর্ণ বিভাগ, দেবীপূজায় জীববলি, শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার (১৩২২), হিন্দুর নবজাগরণ।

দিগ্বিজয় রায় চৌধুরী—দার্শনিক। গ্রন্থ—মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন (পাটনা, ১৯২৮), গ্রীক-দর্শন (ভাগলপুর, ১৯১৮)।

দিঙ্‌নাগ আচার্য—বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম—৫ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের কাটঞ্জী নগরে এক ব্রাহ্মণ-বংশে। ইঁহার বিচারশক্তি অসাধারণ ছিল বলিয়া ইনি 'তর্কপুঙ্গব' নামে অভিহিত হইতেন। গ্রন্থ—প্রমাণ-সমুচ্চয় (ন্যায়গ্রন্থ)।

দিতরাম—টীকাকার। পূর্ণ নাম—আদিত্যরাম। জন্ম—শাজহানাবাদের অন্তর্গত বিজনুরে এক ব্রাহ্মণবংশে। কিছু কাল লক্ষ্ণৌ শহরে বাস। সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ। গ্রন্থ—ষড়্‌কর্মকাণ্ড (ফার্সী টীকা—১৭৬১ খৃঃ), ষড়্‌পঞ্চাশগৈ (জৈন দোহার ফার্সী টীকা সহ—১৭১৬ খৃঃ)।

দিনকর ভট্ট—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। গ্রন্থ—ন্যায়মুক্তাবলী টীকা।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি। জন্ম—১৮৮২ খৃঃ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বংশে। মৃত্যু—১৯৩৫ খৃঃ। পিতা—দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষা—বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয় থাকায় ইনি বিলাত গমন করিয়া ইউরোপীয় সঙ্গীতে সুপণ্ডিত হন (১৯০৮)। সঙ্গীতাধ্যাপক, শান্তিনিকেতন। গ্রন্থ—বীণ (সঙ্গীতপুস্তক)। সম্পাদক—সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা (১৩৩৬-৪২)।

দিলীপকুমার রায়—সঙ্গীতজ্ঞ, কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৯৭ খৃঃ। পিতা—কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। শিক্ষা—বি, এস, সি (প্রেসিডেন্সী কলেজ—১৯১৭), কেমব্রিজে আইন অধ্যয়ন (১৯১৯), তথায় সঙ্গীতও শিক্ষা। ভারতীয় সঙ্গীতে দক্ষতা লাভের জন্য সারা ভারত ভ্রমণ (১৯২২—২৭)। শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে (পণ্ডীচেরী) যোগদান (১৯২৭)। গ্রন্থ—রঙের পরশ, দোলা, ১ম, ২য়, তরঙ্গ রোধিবে কে? ২ খণ্ড, মনের পরশ, বহুবল্লভ ও দুধারা। ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা, পত্রাবলী, অনামী, আপদ ও জলাতঙ্ক, দ্বিজেন্দ্র-গীতি, ১ম, ২য়, হাসির গানের স্বরলিপি, গীতি-মঞ্জরী, সাঙ্গীতিকী, আবার ভ্রাম্যমান, আমার বন্ধু সুভাষ, উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল, ছায়ার আলো, শাদা কালো (নাটক), ভাগবতী কথা, আশ্চর্য।

দিবাকর বেদান্ত পঞ্চানন—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। জন্ম—১২৬৪ বঙ্গ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মৈথ্‌না গ্রামে। মৃত্যু—১৩৫৭ বঙ্গ ৯ই অগ্রহায়ণ। পিতা—ত্রিলোচন মিশ্র। অধ্যাপক ভবসুন্দরী চতুষ্পাঠী, কাঁথি (১৮৯৭—১৯৫০ খৃঃ)। প্রতিষ্ঠাতা—কাঁথি সংস্কৃত কলেজ। গ্রন্থ—ত্রিকালসন্ধ্যাপদ্ধতি; শালগ্রামচক্রে নিত্য পূজাপদ্ধতি, সন্ধিসুবন্তসার।

দিব্যসিংহ, রাজা—গ্রন্থকার। জন্ম—১৫শ শতাব্দীতে শ্রীহট্টের লাউড় নামক স্থানে। ইনি স্বাধীন রাজা ছিলেন। ইনি অদ্বৈতাচার্যের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিলে লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত হন। গ্রন্থ—বাল্যলীলাসূত্রম্ (সংস্কৃত), বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী (পদ্যানুবাদ)।

দীনদয়াল গুপ্ত—কবি। জন্ম—রঙ্গপুরের অন্তর্গত তুলসীঘাট নামক গ্রামে। গ্রন্থ—দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়—কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—২৪ পরগনার অন্তর্গত হালিশহর গ্রামে। মৃত্যু—১৯০২ খৃঃ। কর্ম—প্রয়াগে দারাগঞ্জে, এটোয়া, মোগলসরাই, গিরিডি প্রভৃতি স্থানে। এই সময় তিনি তৎকালীন সংবাদ প্রভাকর, অরুণোদয়, প্রয়াগ-দূত, নব্যভারত, হিন্দু হেরাল্ড প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ ও ভ্রমণ কাহিনী লেখেন ও নানা স্থানে সাহিত্যসভা স্থাপন করেন, শেষ জীবনে বিশ্বকোষ কার্যালয়ে ও The Buddhist Text Book Society অফিসে। সাহিত্য সভা স্থাপন (এটোয়া—১৮৬৫), মোগলসরাই, নেটিভ ইমপ্রুভমেণ্ট সোসাইটি (পার্বতীপুর—১৮৭৪), হিন্দুসম্মিলনী (পুণা)। গ্রন্থ—বিবিধ-দর্শন (কাব্য), একতা-ব্রত (কাব্য), জ্ঞান-প্রভা (উপন্যাস), হিন্দুধর্মের আন্দোলন ও সংস্কার, বিচিত্র দর্পণ (কাব্য)।

দীননাথ দত্ত—গ্রন্থকার। নিবাস—বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মন্তেশ্বর থানার অধীন কাইগ্রাম। পিতা—রাধামোহন দত্ত। মাতা—ইচ্ছাময়ী দাসী। গ্রন্থ—অর্জুন-সংবাদ।

দীননাথ ধর—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৩১ (আনু) চুঁচুড়ায়। পৈতৃক নিবাস—কুমারহট্ট-হালিশহর। শিক্ষা—চুঁচুড়া ফ্রি স্কুল, বি. এ. (হুগলী কলেজ), বি-এল। কর্ম—আইন ব্যবসায় হুগলী আদালতে (৫ বৎসর), ঢাকায় (১৮১১—১৬), উকীল সরকারের কর্ম। গ্রন্থ—কংস-বিনাশ (১৮৬১), প্রসূতি বিয়োগে তন্তু সুত (ক্ষুদ্রকাব্য, ১৮৬৫), ত্রিশূল (১৮৮৩), উষাচরিত (১৮৮১), বল্লালচরিতের বাংলা অনুবাদ (১৯০২), সুবর্ণবণিক কুলোদ্ধারক ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত (১৯০৩)।

দীননাথ মুখোপাধ্যায়—সাংবাদিক। জন্ম—১২৭৭ বঙ্গ ৬ই পৌষ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বালুশহরে। মৃত্যু—চুঁচুড়ায়। পিতা—হীরালাল মুখোপাধ্যায়। আদি নিবাস—ঢাকা আম্‌লি গোলায়। শিক্ষা—হুগলী মডেল স্কুল, হুগলী কলেজ (১৮৮৪)। সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা—চুঁচুড়া বার্তাবহ (সাপ্তাহিক, ১৩০০ বঙ্গ)।

[ক্রমশঃ।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝাঁসীর রাণী হয়ে লক্ষ্মী তাঁর শৈশব-সঙ্গীদের কথা ভুলে যাননি; যদিও বিবাহের পর বিঠুরে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি—মধ্যে মধ্যে তাঁর পিতাই ঝাঁসীতে গিয়ে দেখাশোনা করতেন, দু'-চার দিন থাকতেনও কন্যার কাছে। রাজবাড়ীতে তাঁর আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হতো না; মহারাজ স্বয়ং তাঁর সেবা-যত্নের উপর লক্ষ্য রাখতেন। আর এই সময় রাণী লক্ষ্মী পিতার কাছে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিঠুরের সব কথা জিজ্ঞাসা করতেন। পেশোয়া কেমন আছেন, তাঁর কথা তিনি বলেন কিনা, তাঁর ছেলেদের পড়াশোনা, খেলাধুলা, কসরত সব কেমন চলেছে, তান্তিয়া বিঠুরে আসেন কিনা—এমনি কত কথা। তাত্যাজী যেমন জানতেন, তেমনি বলে যেতেন। পিতার কথা থেকে লক্ষ্মী শুধু এইটুকুই বুঝতেন যে, বিঠুর থেকে তিনি চলে এলেও তাঁকে কেউ ভুলে যায়নি, পেশোয়া থেকে সকলেই মনে করে রেখেছেন, তাঁর কথা প্রায়ই সেখানে ওঠে। শুনতে শুনতে লক্ষ্মীর মুখ-চোখ আনন্দে দীপ্ত হতে থাকে; তাঁর ইচ্ছা করে—বাবার সঙ্গে বিঠুরে গিয়ে সবার সঙ্গে দেখা করে আসেন, তাঁর সেই শৈশবের লীলাভূমির চার দিক আর একবার শৈশব-সাথীদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু পরক্ষণেই জোর করে মনের বাসনাকে দমন করে মনে মনেই বলে ওঠেন—এ আমি কি ভাবছি! এতে যে আমার স্বামীর মনে ব্যথা লাগবে, লোকে যে নিন্দা করবে; আমি যে এখন রাণী—নিজের ইচ্ছে মত সব কাজ কি করতে পারি?

রাণী হোয়েও লক্ষ্মী পর্বোৎসবের সময় তাঁর বিঠুরের খেলার সাথীদের উদ্দেশে নানা প্রকার উপহার পাঠিয়ে সম্বর্দ্ধনা জানাতেন। মহারাষ্ট্র দেশে খুব সমারোহ করে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসব সম্পন্ন হয়। মারাঠাদের মধ্যে এ উৎসব যম-দ্বিতীয়া নামে পরিচিত। রাণী লক্ষ্মী ঝাঁসী থেকে নানাভাই, রাও সাহেব ও তান্তিয়ার জন্য এই উৎসবে বস্ত্র, উত্তরীয় এবং কোন না কোন অস্ত্র উপহার পাঠাতেন—সেই সঙ্গে প্রচুর মিষ্টান্নও থাকত। অস্ত্রের মধ্যে কোন বছর তরবারি, কোন বছর বর্শা-ফলক, ছুরিকা বা কিরিচ থাকত। বিঠুরে খেলাধূলা ও আলাপ-আলোচনার সময় সঙ্গী ভাই তিনটির সহিত রাণীর মারাঠা জাতির মুক্তি সম্বন্ধে যে-সব কথা-বার্তা হোত, এই সব অস্ত্র ছিল তাদেরই প্রতীকের মত।

বিবাহের কয়েক বছর পরে একবার পিতার মুখে লক্ষ্মী শুনলেন যে, নানা সাহেব পেশোয়ার খাস মুন্সী হয়েছেন; চিঠিপত্রের মুসাবিদা করতে তাঁর বেশ দক্ষতা আছে দেখে, পুরানো মুন্সী বার্দ্ধক্যের জন্য অবসর নিলে পেশোয়া নানা সাহেবকেই সে কাজে বাহাল করেছেন।

কথাটা শুনেই রাণী যেন আকাশ থেকে পড়লেন। সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলিষ্ঠ ও তেজস্বী ছেলেটি—যিনি সর্বদাই দেশের মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন, অতীতের স্বাধীন পেশোয়াদের শৌর্য ও বীরত্বের আদর্শ যাঁকে অনুপ্রাণিত করে তুলত, তিনি কিনা সে-সব ভুলে কেরাণীর বৃত্তি বেছে নিলেন? দুঃখে-ঘৃণায় রাণীর সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে ওঠে, সেই সঙ্গে মনে পড়তে থাকে একটি একটি করে নানা সাহেবের কথাগুলি:

নানা বলতেন: জানো মুন্না, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি আমাদের পূর্বপুরুষ বীর পেশোয়াদের স্বপ্নে দেখি। তাঁদের সেনাচালনা, শৌর্য, বীর্য, প্রতাপ আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখি, আর মনে হয়—আমিও যেন ঘোড়ায় চড়ে তাঁদের সঙ্গে মিশে লড়াই করছি।

রাণী লক্ষ্মী নানার কথাগুলি আজও মনে করে রেখেছেন। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের কথা উঠলে নানা কেঁদে ফেলতেন; আর্তস্বরে বলতেন—কি ভুলই করেছিলেন বালাজী রাও পেশোয়া নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়ে! তিনি যদি উপস্থিত থাকতেন, তা'হলে কি মারাঠা-নায়কদের মধ্যে আত্মকলহ হোত? সেই কলহের জন্যই ত মারাঠাদের সর্বনাশ হয়ে গেল! পানিপথের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন পেশোয়া মাধব রাও, মহাবীর মাধাজী সিন্ধিয়া; আর সারা মারাঠা জাতির কালস্বরূপ হোয়ে এলেন আমাদের পিতাজী দ্বিতীয় বাজীরাও—শেষ পেশোয়া। কিন্তু এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাকে; তখন আমার সহায় হবে রাও সাহেব, তান্তিয়া আর তুমি—মুন্না।...তখনও লক্ষ্মী মুন্না নামে পরিচিতা। কিন্তু কিশোর নানার সেই কথাগুলি তাঁর মনে কি বড় সামান্য উদ্দীপনার সঞ্চার করত? সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী নানা আজ কিনা তাঁর পিতার খাস কেরাণী!

লক্ষ্মী এর পর নানাকে এক পত্রে সুধালেন: ভাই সাহেব, বাবার মুখে শুনলাম, তুমি নাকি পেশোয়াজীর খাস মুন্সীর চাকরী নিয়েছ—খুব উৎসাহে কলম পিষছ? তোমার সেই তলোয়ার, সাঁজোয়া, আর সব হাতিয়ার কি ভেঙে ফেলেছ, না—জেলখানায় সেগুলো কয়েদ করে রেখেছ? এখন কি অতীতের বীর পেশোয়ারা তোমাকে স্বপ্নে দেখা দেন না? এখন বুঝি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেরেস্তার স্বপ্ন দেখ? সঠিক খবর জানবার জন্য উদ্গ্রীব রইলাম।

নানা সাহেব রাণীর পত্রের উত্তরে জানালেন: তুমি যা শুনেছ তাত্যাজীর কাছে—সবই সত্য। পিতাজীর খাস মুন্সী অসুস্থ হলে, আমাকে একখানা চিঠির মুসাবিদা করতে হয়। সেই মুসাবিদা পড়ে পিতাজী আহ্লাদে আমার পিঠ চাপড়ে বলে ওঠেন—'সাবাস নানা, খাসা মুসাবিদা করেছ, খাস মুন্সীর পাকা মাথা আর পুরানো কলম থেকেও এমন লেখা কোন দিন বেরিয়ে আসেনি। মুন্সীজী বুড়ো হয়েছেন—অবসর চাইছেন। তোমাকেই এই কাজে বাহাল করা গেল। বেশ মনোযোগ দিয়ে এই কাজ কর, আর এই কাজে লেগে থাকলে ইংরেজদের সঙ্গে মেলবার মিশবার ফুরসৎও পাবে। আমার ইচ্ছা, এখন থেকে তুমি ওদের মন যুগিয়ে চল।' পিতাজীর কথাগুলি শুনতে শুনতে আমার স্বপ্নের কথাগুলোও ভেবেছি বৈ কি। তবে পিতৃ-আজ্ঞা ত লঙ্ঘন করতে পারি না।

কাজেই তাঁর কাজে লেগে পড়েছি খুব উৎসাহে। কলম চালাচ্ছি মনের আনন্দে। হ্যাঁ, এই পেশার মধ্যেও অতীতের কোন কোন পেশোয়াকে স্বপ্নে দেখি বৈ কি! প্রথম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ ছিলেন সে যুগের এক প্রকাণ্ড কলমবাজ—নাম-করা কেরাণী, কলম চালাতে চালাতেই তাঁকে পরে তলোয়ার হাতে করে সেনা-বাহিনী চালাতে হয়েছিল। তাঁর কানে থাকত কলম, আর কোমরে তলোয়ার। তারই জোরে মোগল বাদশাদের শক্তিকে বানচাল করে দিয়ে মারাঠা-শক্তিকে অজেয় করে তুলেছিলেন। তাই কলমকে তুমি যতই ঘৃণা কর না কেন, আমি কিন্তু ও বস্তুটিকে ভালোবাসি। রাও সাহেবের অবিশ্যি কলমের প্রতি আদৌ অনুরাগ নেই। কিন্তু তুমি শুনে অবাক হবে—আমাদের বন্ধু, তোমার আর এক ভাই—তাত্তিয়া টোপীও কলমের সাধনা স্বরু করেছে। আমাদের সেরেস্তাতেই আমারই অধীনে নকল-নবিসের কাজে নিযুক্ত হয়েছে। তার কাজেও সেরেস্তা শুদ্ধ সবাই অবাক—কলমবাজীতে আমার পরেই তার স্থান। তবে ও বেচারা নকল করতেই খুব মজবুত—মাথা খাটিয়ে মুসাবিদার ধার বড় একটা ধারে না; এখন আমাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে হোচ্ছে যাতে তাত্তিয়াও মাথা খেলাতে পারে। এখন আমাদের কথা এই বহিন, ভাই দু'টিকে কলম চালাতে দেখে যেন ঘৃণা ক'র না; মনে রেখো—কলম তলোয়ারের চেয়ে কমতি নয় কিছুতেই, কলমই এ যুগে চালাচ্ছে তলোয়ার, দাগছে কামান।

কিন্তু নানা সাহেবের ভণিতাপূর্ণ এই পত্র পাঠ করে রাণী লক্ষ্মী প্রসন্ন হোতে পারেননি। তাঁর বরাবরই ধারণা, যারা সেরেস্তায় বসে কলম পেষে, যাদের নামের আগে আখ্যা বসে কেরাণী, তারা সাধারণ স্তরের নিরীহ প্রাণী—তাদের দিয়ে কোন বড় কাজ হয় না। কাজেই মনে মনে রাণী নানার প্রতি রীতিমত ক্ষুব্ধ হলেন, এমনি কি, এর পর ভাইফোঁটার সময় বিঠুরে উপহার সামগ্রীর সঙ্গে নানা ও তাত্তিয়াকে একটি করে কলম পাঠিয়ে তাঁর মনের ঝাল মেটালেন।

নানা সাহেব তখন তরুণ যুবক। সুন্দর চেহারা, অমায়িক ব্যবহার, অপূর্ব শিষ্টাচার ও নানারূপ বদান্যতায় তিনি তখন বিঠুরের অধিবাসীবর্গ থেকে কানপুরের ইংরেজ-মহলেরও পরম প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন। পেশোয়া সদা-সর্বদা নানার কানে মন্ত্র দেন—ফুরসৎ পেলেই কানপুরে যাবে, ইংরেজদের সঙ্গে মেলা-মেশা করবে। দেখছ ত, আজ আমরা অগাধ টাকা, সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি ও শান্তির উপরে বসে আছি শুধু ইংরেজদের সঙ্গে সম্প্রীতি আছে বলেই। এ সম্প্রীতি যেন কোন দিন ক্ষুণ্ণ হয় না বৎস!

নানাও নীরবে সহাস্যে তাঁর কথায় সায় দেন—কোন আপত্তি তোলেন না মুখে। বরং ইংরেজদের সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগ পেয়ে আনন্দিতই হন। এর জন্যে এক জন পাদরীকে রাখা হয়—নানাকে তিনি ইংরাজী ভাষার সঙ্গে ওদের আদব-কায়দা শেখাবেন এই উদ্দেশ্যে। এমনি সময় রাণী লক্ষ্মীর নূতন উপহার পেলেন নানা এক ভাইফোঁটার উৎসব বা যম-দ্বিতীয়া উপলক্ষে। নানা মনে মনে হাসলেন রাণীর দেওয়া কলম দেখে। তিনি বহু মানে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কলমটি তুলে নিলেন। এর পর রাণীকে লিখলেন: এবার ভাইফোঁটার উপহারে অস্ত্রের বদলে পেয়েছি কলম। কুলদেবতার কাছে প্রার্থনা করছি—যেন এর মান্ রক্ষা করতে পারি।

এ উত্তর পেয়ে রাণী সেদিন ভ্রূকুঞ্চিত করেছিলেন। কিন্তু এক দিন তাঁর ভুল ভেঙে গিয়েছিল—সেদিন তিনি বুঝেছিলেন যে, রাণীর দেওয়া কলমের মান রাখবার জন্য কি কঠোর সাধনা করতে হয়েছে নানা ভাইকে। সে কথা পরে হবে।

এদিকে রাণী রাজকীয় যাবতীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় সেরেস্তার মধ্যে আতঙ্কের সাড়া পড়ে গেল। মহারাজ দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রীর উপর সমস্ত ভার সমর্পণ করেই নিশ্চিন্ত থাকেন; কিন্তু স্বামীর কাছে ভরসা ও ক্ষমতা পেয়ে রাণী এক দিন দেওয়ান লক্ষ্মণ রাওকে আহ্বান করে বিশেষ সম্ভ্রমের সঙ্গে বললেন: দেখুন, আমি লক্ষ্য করছি—রাজ্যের সমস্ত ভার একা আপনাকেই বহন করতে হোচ্ছে; মহারাজ সর্বক্ষণই পারিষদদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদে নয় ত শিকারেই ব্যস্ত থাকেন। আমার চোখে এগুলো বড়ই বিশ্রী লাগে। বৃদ্ধ বয়সে আপনার পক্ষে এরূপ পরিশ্রম খুবই অশোভন মনে হয়—এ যেন অত্যাচার। রাজার উচিত নয়—শুধু আমোদ-প্রমোদেই লিপ্ত থাকা। এখন থেকে নিয়মিত ভাবে তিনি স্বয়ং রাজকার্য পরিচালনা করবেন, তাতে আপনার পরিশ্রমের অনেকটা লাঘব হবে।

দেওয়ান লক্ষ্মণ রাও অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। রাণীর মুখে এই সব কথা শুনে তিনি মুখে তাঁর বিবেচনার জন্য ধন্যবাদ দিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হলেন। এই তরুণী নারী রাণীর আসন অলংকৃত করেই যে অন্দরমহলে রীতিমত একটি আলোড়ন তুলেছিলেন, আর তার স্রোত বহির্মহল পর্যন্ত এগিয়ে গেছে, এ তথ্য তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। মধ্যে মধ্যে শাসন ব্যাপারেও যে নানারূপ কৈফিয়ৎ ওঠে, তাঁকেও জবাব দিতে হয়—তারও মূলে যে এই মেয়েটির দু'টি চোখের সজাগ দৃষ্টি—তাও তাঁর অজ্ঞাত নয়। এমনি সময় প্রত্যক্ষ ভাবে রাণীর এই নির্দেশ ক্ষমতালোভী দেওয়ানের অন্তরে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি করল। অথচ, রাণী এমন কৌশল করে প্রস্তাবটি তুললেন যে, প্রতিবাদ করবারও কিছু নেই।

এই ঘটনার পর যাবতীয় রাজকার্য মহারাজের অনুজ্ঞা অনুসারেই নির্বাহ হতে থাকল—এর পিছনে রইল রাজ্ঞী লক্ষ্মীর অসাধারণ বিচার ও বিবেচনা-শক্তি। রাণীর বুদ্ধিকৌশলে সেরেস্তার অনেক দুর্নীতি ও অনাচার ধরা পড়ে গেল; বিষকুম্ভ পয়োমুখরূপী বহু পদস্থ কর্মচারীর অসাধুতার মুখোস খুলে পড়ল। সমস্ত রাজ্য জুড়ে উঠল একটা আলোড়ন—তার ঢেউ ইংরেজ রেসিডেন্সীতে আঘাত করে রেসিডেন্ট এলিস সাহেবকে পর্যন্ত অবাক করে দিল।

বাহির-মহলে মহারাজের খাস অনুচর ও পারিষদবর্গের কোন হিসাব ছিল না, অথচ প্রত্যহ দুই বেলা খাবার সময় আর বেতন নেবার সময় এত লোক রাজানুগ্রহের নিদর্শন নিয়ে হাজির হয় যে, তাদের সংখ্যা বিস্ময়ের কারণ হয়ে ওঠে। রাজাকে জিজ্ঞাসা করে রাণী জানতে পারলেন যে, জন পঞ্চাশ লোক ছাড়া তিনি অনেককে চেনেন না—তাদের নাম পর্যন্ত জানেন না।

রাণী একটু গম্ভীর হোয়ে রাজাকে বললেন: এ কিন্তু ভারি আশ্চর্যের কথা, বেশীর ভাগ সময় যারা আপনার সংস্পর্শে থাকে, মজলিসে বসে আসর জমায়, শিকারে যায়, খাওয়া-দাওয়া করে—আপনি তাদের সবার নাম জানেন না, ভালো করে চেনেন না

পর্যন্ত—অথচ মাস মাস তারা মাইনে নিয়ে যায়, দু'বেলা রাজবাড়ীর ভোজ খায়।

এর পর রাণী ব্যবস্থা করলেন যে, রাজা নিজে দেখে-শুনে বেছে তাঁর পারিষদ ও অনুচরবর্গের একটা তালিকা করুন; যারা সত্যই কাজের লোক—কোন কোন গুণ আছে, তাদের ভরণপোষণ করা রাজার উচিত; কিন্তু যারা অকর্মা, অলস, খোসামুদে বা চাটুকার—তাদের আস্কারা দিয়ে রাজ-মজলিসে রাখলে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হবে এবং সত্যকার কর্মী ও গুণী লোকদের প্রতি অবিচার করার জন্য রাজ্যের প্রজারা রাজার নিন্দা করবে। এই ধরণের নিন্দার কথাই রাণী শুনেছিলেন। প্রজামহলে একটা কথা রটেছে যে, রাজসভায় যাদের একটু পসার-প্রতিপত্তি আছে, তোষামোদকারীরা তাদের ধরে রাজসভায় খুব সহজেই ঢুকে পড়ে আর রাজ-সংস্পর্শে সুখে দিনপাত করে। রাজার এদিকে নজর নেই। রাজার কানে এ কথা উঠলে তিনি হয়ত গ্রাহ্যই করতেন না, কিম্বা রটনাকারীদের প্রতিই বিরক্ত হয়ে তাদের শাস্তি দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, কিন্তু রাণী সে পাত্রীই নন, খুব সাধারণ লোকের মুখেও গুরুতর কোন কথা শুনলেও তিনি স্থির থাকতে পারেন না—নানা ভাবে সে সম্বন্ধে তদন্ত করে সন্ধান নিয়ে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করে থাকেন। সত্য হোলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে বিহিত করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন, মিথ্যা হোলেও তেমনি রটনাকারীকে শাস্তি দিতে ছাড়েন না; এইটিই তাঁর প্রকৃতির একটা আশ্চর্য রকমের বৈশিষ্ট্য। রাজ-পারিষদদের সম্বন্ধে যে সব কথা তিনি শুনেছিলেন, সেগুলি সত্য জেনে সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিকার করে রাজাকে পর্যন্ত স্তব্ধ করে দিলেন।

শুনলে আশ্চর্য হোতে হয়, রাণী অনুসন্ধান করে জানলেন যে, প্রায় আড়াই হাজার লোক রাজপ্রাসাদের বহির্মহলে রাজ-পারিষদ, সভাসদ, অনুচর ও অনুগৃহীতরূপে কালাতিপাত করছে। রাজার চাটুবাদ এবং পরচর্চা ভিন্ন এদের মধ্যে অধিকাংশের আর কোন কাজ বা সামর্থ্য নেই। রাণীর অনুমোদনে এদের মধ্য থেকে বেছে বেছে এক হাজার লোককে রাখা হলো, বাকি সকলকে রাজপ্রাসাদ ও রাজ-প্রসাদের মোহ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো বটে, কিন্তু তাদের কাউকে জমি দিয়ে, কাউকে মূলধন দিয়ে, কাউকে বা শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করে জীবিকা নির্বাহের উপায় করে দেওয়া হলো। আর রাজার প্রিয়পাত্ররূপে যে হাজার লোক রাজপ্রাসাদে রইলেন, যাঁরা রাজার একান্ত অন্তরঙ্গ সহচরস্বরূপ, তাদের ছাড়া আর সকলের উপর কোন না কোন কাজের ভার দেওয়া হলো।

এই সময় মহারাজা তাঁর প্রিয়পাত্রদের লক্ষ্য করে বলেন: রাণীজী কি বলেন আমার মুখে শুনলেই তোমরা বুঝতে পারবে, কেন এ ব্যবস্থা তিনি করেছেন। তিনি বলেন—রাত চারটের সময় আমি বিছানা ছেড়ে উঠে রাত দশটা পর্যন্ত নানা কাজে খেটে মরি—এর মধ্যে ঘুমাবার বা বিশ্রাম করবার এক নাগাড়ে দু'দণ্ড সময়ও আমি পাই না। কাজেই রাজপ্রাসাদে আলস্যকে আমি প্রশ্রয় দেব না, তাতে লছমীজী কুপিতা হবেন। পত্নীর কথাগুলি নিজেই ভণিতা করে বলে মহারাজ গঙ্গাধর হো-হো করে হেসে ওঠেন।

কথায় বলে—রাজবাড়ী বা রাজ-রাজড়াদের কাণ্ড-কারখানাই আলাদা—অন্যের পক্ষে পর্বতবিশেষ। কথাটা মিথ্যা নয়। তখনকার রাজাদের সঙ্গে সত্য সত্যই হাজার হাজার লোক মোতায়েন থেকে রাজার মনোরঞ্জন করতেন। পাঠান আমলে তোঘলকবংশীয় বাদশাহ মহম্মদ তোঘলকের পারিষদ সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারেরও বেশী। বাদশাহ যখন খানা খেতে বসতেন, পাঁচ হাজার পারিষদও তাঁকে পরিবেষ্টন করে সমান ভাবে রাজভোগে আপ্যায়িত হোতেন। বাদশাহের হুকুম ছিল—তাঁর খানার সঙ্গে তাঁর ইয়ার-বক্সিদের খানায় এক চুল এদিক-ওদিক হবে না। কাজেই মহারাজ গঙ্গাধরের আড়াই হাজার পারিষদ পোষণ বাদশাহ মহম্মদের তুলনায় বাড়াবাড়ি হোলেও, ব্যাপারটা রটানো নয়। এ-যুগেও খেতাবওয়ালা রাজা-মহারাজাদের পারিষদ পোষণের ঘটার কথা অনেকেই শুনেছেন—চোখেও দেখেছেন।

মহারাজ গঙ্গাধর ছিলেন যেমন অমিতব্যয়ী, তেমনি বিলাসী ও আলস্য-পরায়ণ। সাধারণ নারীদের মত তাঁর সহধর্মিণী রাজরাণী লক্ষ্মীকে নানা ভাবে পরিশ্রম করতে দেখে তিনি ব্যথাই পেতেন। প্রথম প্রথম তিনি রাণীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, বিধাতা যাঁদের রাজা বা রাণী করে সংসারে পাঠিয়েছেন, তাঁর ভাগ্যবান, কেন তাঁরা শরীরকে কষ্ট দেবেন—শুধুই সুখভোগ না করবেন? শত শত দাস-দাসী ত তাঁদের পরিচর্য্যা করবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছে। সুতরাং রাজা-রাণীদের দৈহিক পরিশ্রম করার কোন সার্থকতাই নেই।

রাণী কিন্তু স্বামীর কথার উত্তরে প্রতিবাদের সুরে বলেন—পৃথিবীতে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন, মানুষ যাঁদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন—তাঁরা প্রত্যেকেই শ্রম-সহিষ্ণু ছিলেন। শুধু মহাপুরুষরা নন—তাঁদের মহীয়সী পত্নীরাও। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবৎস, নল, হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজাদের কথা মনে করুন—তাঁদের জীবনে যখন দুর্দিন ঘনিয়ে আসে, দৈহিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন বলেই দারুণ কষ্ট সহ্য করতে পেরেছিলেন। তাঁদের পত্নীদের কথাও ভাবুন, সম্পদের সময় যাঁদের সুখের সীমা ছিল না, অসময়ে কি কষ্টভোগই না করেছেন তাঁরা। তা'হলেই বুঝতে হবে, শৈশব থেকেই তাঁরা ছিলেন পরিশ্রমী। এ যুগের কথাও বলি; যে জাতি যখনই অতিমাত্রায় বিলাসী হয়েছে, তখনই হয়েছে তার পতন। মুসলমানরা যখন এ দেশে প্রথম আসে আক্রমণকারীরূপে, তখন আমাদের দেশের রাজারা বিলাসী, সেনাপতিরা বিলাসী, সৈনিকরাও আরামশীল। কিন্তু মুসলমান-নায়করা এমনি পরিশ্রমী যে, নদী পার হোচ্ছেন সাঁতার কেটে—নৌকারও পরোয়া রাখেন না; খানা খেতে বসবার তাঁদের অবসর নেই—লড়াই করতে করতেই ও-পাট সেরে নিচ্ছেন। আর এ দেশের যোদ্ধাদের তখন 'বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি!' লড়াই করবে, না খাবার ব্যবস্থা আগে করবে, সেই তদ্বিরেই অস্থির! আবার দেখুন—মুসলমানদের নসিবের চাকাও কালে ঘুরে যায়! রাজা হয়ে বাদশাহী পেয়ে তাদের বিলাস একবারে চরমে ওঠে—তারই অনুকরণ এখনো চলেছে। বাদশার কথা পরে, তাঁদের সেনাপতিরাও তাঞ্জামে চড়ে লড়াই করতে যান—সঙ্গে বাঈজী! বাপুজীর কাছে আমি গল্প শুনিছি মহারাজ, ভারি মজার গল্প সে। পেশোয়া বাজীরাওয়ের তখন ভারি নামডাক; তিনি যেন জয়মন্ত্রে দীক্ষিত হোয়েই তলোয়ার ধরেছিলেন। খুব বড় রকমের একটা

যুদ্ধ চলেছে দিল্লীর বাদশার সঙ্গে এই পেশোয়ার। শেষ পর্যন্ত বাদশাহী পলটন ঘেরা পড়ে ধ্বংস হবার মুখে সন্ধিপ্রার্থী হলেন পেশোয়ার কাছে। পেশোয়া জানালেন, তা'হলে কথাবার্তা চালাবার জন্যে সেনাপতি সাহেব নিজে আসুন পেশোয়ার শিবিরে। তখন বাদশাহের সেনাপতি এক জন মনসবদারকে নিয়ে পেশোয়ার সেনা-শিবিরে এলেন। কিন্তু তাঁদের আসবার ঘটা আর সাজ-পোষাকের বাহার দেখে পেশোয়ার দলের লোক সব অবাক হোয়ে চেয়ে থাকে। তাঞ্জামে চেপে দুই বীরপুরুষ এসেছেন সন্ধি ভিক্ষা করতে, কিন্তু আড়ম্বর দেখে মনে হলো যে, সাদি করতেই লোকে এমনি জাঁক-জমক করেই আসে। যেমন জমকালো তাঞ্জাম, তেমনি মণিমুক্তা-খচিত পোষাক দুই সেনা-নায়কের। সেনাদলের ভিতর দিয়ে তাঞ্জাম চলেছে। সেনাশ্রেণীর পরে একটা ফাঁকা জায়গা, আশে-পাশে দু'-চারটে তাঁবু দেখা যাচ্ছে, লোক-জন কেউ নেই।

সেনাপতি সাহেব তাঞ্জাম থেকে পথপ্রদর্শক মারাঠা সৈনিককে জিজ্ঞাসা করলেন: পেশোয়া সাহেব কোথায়? তাঁর তাঁবু কোন্ দিকে?

সৈনিক জানাল: তাঁর কাছেই ত নিয়ে চলেছি আপনাকে। তিনি এইখানেই আছেন।

সেনাপতি সাহেব ও তাঁর সহকারী চেয়ে চেয়ে দেখেন—খুব সাধারণ তাঁবু ছাড়া এদিকে দেখবার মত কিছু নেই। তাঁরা ভেবেছেন, বাদশাহ নামদারের মত কিম্বা তার চেয়েও জমকালো তাঁবুর মধ্যে নিশ্চয়ই দিগ্বিজয়ী পেশোয়া দরবার করে তাঁদের প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু তার ত কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না! হঠাৎ তাঁদের নজরে পড়ল—খানিক দূরে একটা গাছের তলায় একটা তেজী ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে; ঘোড়াটা দেখতে খাসা হোলেও তার সাজ-সজ্জায় কিন্তু কোন জলুস নেই। আর সেই ঘোড়াটার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘাকৃতি এক মারাঠা সৈনিক একটা থলি থেকে মুঠি-মুঠি চানা বার করে নিজের মুখে ফেলছে, আবার এক-এক মুঠি ঘোড়ার মুখেও ধরছে। তার কোমরে বাঁধা চামড়ার খাপে লম্বা তলোয়ারখানা ঝুলছে—মাথায় কোন আবরণ নেই।

আশ্চর্য যে, এত বড় দু'টি মানী লোককে তাঞ্জামে দেখেও লোকটির ভ্রূক্ষেপ নেই—নির্বিকার ভাবেই তাঁর চানা ভোজন চলেছে সাথী ঘোড়াটির সঙ্গে! পথপ্রদর্শক সৈনিকটি এখানে এসেই যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল, আর তাকে দেখতে পেলেন না তাঞ্জাম-আরোহী দুই জঙ্গী পুরুষ। অগত্যা সেই চানাখোর পুরুষটিকেই সুধালেন: ওহে বাপু, তোমাদের পেশোয়া সাহেবের তাঁবু কোন্ দিকে?

হাতের চানাগুলি নির্বিকার ভাবে মুখের মধ্যে ফেলে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন তাঞ্জামওয়ালীদের পানে। তাঁরা পুনরায় বললেন: আমাদের সঙ্গের লোকটিকে দেখতে পাচ্ছি না—পেশোয়া সাহেবের কাছে তুমি যদি নিয়ে যাও···

লোকটি এই সময় আস্তে আস্তে পাশের গাছটির ডালের উপর থেকে তাঁর দীর্ঘ শিরোস্ত্রাণটি তুলে নিজের মাথায় পরতে পরতে বললেন: আর যেতে হবে না—আপনাদের জন্ত আমি প্রতীক্ষা করছিলাম। আর এই ফাঁকে দিনের খাওরাটাও সেরে নিলাম।

তাঞ্জামে বসে চোখগুলো কপালের দিকে তুলে দিল্লীর বাদশাহের মহামান্ত সিপাহশালার ও তাঁর সহকারী মনসবদার সাহেব লোকটিকে এতক্ষণ দেখছিলেন। মাথায় শিরোস্ত্রাণ এঁটে শাঁখের শব্দের মত গম্ভীর আওয়াজ তুলে কথাগুলি যেই তিনি বললেন, তার সুর আর চোখের দু'টো তারার অপূর্ব দীপ্তি তাঁদের চোখগুলোকে এমনি অভিভূত করল যে, এর পর আর বুঝতে বাকি রইল না যে, কোথায় তাঁরা এসেছেন! তখনি তাড়াতাড়ি তাঞ্জাম থেকে নেমে মাটিতে মাথা নুইয়ে কুর্ণিশ করতে করতে বললেন: 'আমরা হুজুরকে চিনতে পারিনি, গোস্তাকী আমাদের মাপ করা হোক!' মৃদু হেসে পেশোয়া বাজীরাও বললেন: না, না, আপনারা কুণ্ঠিত হোচ্ছেন কেন, কোন গোস্তাকীই আপনারা করেননি! মহামান্ত বাদশাহের সিপাহশালার বলেই ত তাঞ্জামে চড়ে আপনারা লড়াই করতে আসেন, আর আমরা হচ্ছি হাবিলদার বর্গাদার—পাঁওদলে কিম্বা ঘোড়ায় চড়ে হাতিয়ার চালানোই আমাদের কাজ! যার যেমন অভ্যাস, এতে আর কসুর কি বলুন?

এর পরই সেখানে কয়েকখানি বেতের মোড়া এসে পড়ল। পেশোয়া অভ্যাগতদের সাদরে সেই বেত্রাসনে বসিয়ে বললেন: এই গাছতলাতেই আমার বৈঠক বসুক, আমার বন্ধুরাও আসছেন।

এই পর্যন্ত বলে স্বামীর দিকে চেয়ে রাণী লক্ষ্মী সহাস্যে সুধালেন: বলুন ত মহারাজ, কেমন লাগল গল্পটি?

মহারাজ জানালেন: খাসা। এই পেশোয়াজীর সম্বন্ধে এমনি অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য উপাখ্যান আছে। ইনিই ত বুন্দেলখণ্ডকে রক্ষা করে এ রাজ্যেরও অভিভাবক হয়েছিলেন। সত্যই, মহাত্মা শিবাজীর পর এত বড় মানুষ মারাঠাদের মধ্যে আর জন্মাননি।

রাণী হাসতে হাসতে বললেন: তা'হলে বুঝুন মহারাজ, ঐ বিখ্যাত মানুষটি রাজা-রাজড়াদের রাজা হোয়েও মিথ্যে ভড়ংএ ভোলেননি—পরিশ্রম করতেও কুণ্ঠিত হননি।

মহারাজ গঙ্গাধর বুঝলেন যে, রাণী তাঁর নিজের কথাটি ভোলেননি, তাঁর কথাই যে অকাট্য, মহারাজকে দিয়েই সেটা প্রতিপন্ন করলেন। [ক্রমশঃ।

মেজর শ্রোডার

যামিনীমোহন কর

উড়ো-জাহাজ চালান বিপজ্জনক কাজ স্বীকার করতেই হবে। একবার কোন কল বিগড়োলেই পতন। বৈমানিকের জীবনান্ত। এই জন্ত কোন নতুন বিমান আকাশে ওঠবার পূর্ব্বে খুব ভাল ভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া হয়। কিন্তু মাটিতে রেখে এ পরীক্ষা চলে না। ওড়বার কালে বিমান ঠিক থাকবে কি না, সেইটাই তো আসল প্রশ্ন। তাই এই পরীক্ষা হয় আনকোরা নতুন বিমানকে আকাশে উড়িয়ে। যিনি পরীক্ষা করেন তাঁকে সব সময় জীবন হাতে নিয়ে থাকতে হয়। যদি প্রয়োজন মত কাজ না করে? জলে, ঝড়ে, উঁচুতে, নীচুতে, সকল রকম অবস্থায় পরীক্ষককে চালিয়ে দেখতে হয়, বিমানটা সব ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে পারে কি না। এই শ্রেণীর বৈমানিকদের বলা হয় বিমান-পরীক্ষক। কাজটা যেমন বিপজ্জনক তেমনি সম্মানসূচক। মার্কিণ এয়ার সার্ভিসের মেজর শ্রোডার ছিলেন এক জন ধুরন্ধর বিমান-পরীক্ষক।

কত বিমান যে তিনি পরীক্ষা করেছেন তার কোন হিসেব নেই। সব সময়ই তাঁকে স্মরণ রাখতে হত যে, যে বৈমানিক পরে এই বিমান চালাবে, সে তাঁর মত ওস্তাদ নয়। তাই তাকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হত, কোথাও সামান্যতম ত্রুটিও যেন না থাকে। কারণ তাতে একটা জীবননাশের সম্ভাবনা রয়েছে।

সাধারণ বিমান, যা মাইল দুয়েক উচ্চতা পর্য্যন্ত সুন্দর কাজ করে, সাত মাইল উচ্চতায় তা একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে। কারণ অত উচ্চে বায়বীয় চাপ এত কম যে, এঞ্জিন কাজ করতে পারে না। বিশেষ যন্ত্রের (সুপারচার্জ্জার) সাহায্যে বায়ুকে চেপে সিলিণ্ডারে পুরে বিস্ফোরণ করতে হয়। তা ছাড়া মানুষের শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, কারণ অত কম চাপে হাওয়া টানতে ফুসফুস অভ্যস্ত নয়। বাঁচতে হলে ষ্টীলের সিলিণ্ডারে বিশুদ্ধ অক্সিজেন চেপে পুরে সঙ্গে নিতে হয়। মুখোস-পরা থাকে আর তার নিশ্বাসবাহী নল অক্সিজেনের সিলিণ্ডারের সঙ্গে আঁটা থাকে। ভালভের সাহায্যে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর ওপর আবার অত উঁচুতে ঠাণ্ডা ভীষণ। মানুষ শীতে জমে মারা যাবে। তাই তাকে এক বিশেষ ধরণের পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে হয়, যা তড়িতের সাহায্যে গরম রাখা যায়।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী মেজর শ্রোডার তার উড়ো-জাহাজের ককপিটে (আসনে) উঠে বসলেন। উচ্চতা মাপবার যন্ত্র ব্যারোগ্রাফ আর অক্সিজেন সিলিণ্ডারের ভালভ সব পরীক্ষা করে দেখলেন ঠিক আছে। এঞ্জিনের থ টল খুললেন—ভর-ভর করে শব্দ তাঁকে জানিয়ে দিলে এঞ্জিনে কোথাও কোন দোষ নেই। মুখোসটা মুখের ওপর টেনে চালিয়ে দিলেন মেশিন। একটু সোজা ছুটেই শোঁ করে উঠে পড়ল শূন্যে। বারো মিনিটে এক মাইল উচ্চে, আর একটু পরেই দু'মাইল ছাড়িয়ে উঠলেন। নিজের পোষাকের প্লাগ সুইচে লাগিয়ে উড়ে চললেন, উঁচুতে, উঁচুতে আরও উঁচুতে। হু-হু করে পৃথিবী যেন নীচে নেমে যেতে লাগল। সুন্দর এঞ্জিন চলছে। আরামে হেলান দিয়ে বসে তিনি চেয়ে আছেন স্পীডোমিটার আর ব্যারোগ্রাফের দিকে। দেখছেন গতি আর উচ্চতা। ঠাণ্ডায় কষ্ট হচ্ছে না। তড়িৎ-এ পোষাক গরম হয়ে রয়েছে। সিলিণ্ডার থেকে ধীরে ধীরে অক্সিজেন আসছে নাকে-মুখে। ব্যারোগ্রাফে দেখলেন, পাঁচ মাইল। উঁচু করে দিলেন উড়ো-জাহাজের মুখ। একটু পরেই দে. ., ছ'মাইলের উচ্চতাও ছাড়িয়ে গেছেন।

হঠাৎ যেন কে ভীষণ জোরে তাঁর গলা চেপে ধরল। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। হাঁফাচ্ছেন—এই বুঝি শেষ। বুঝতে পারলেন—অক্সিজেন নেই। দক্ষ চা ক গাড়ীর সামনে ছেলে পড়লে আপনা হতেই ব্রেক চাপে। সে জন্য তাকে চিন্তা করতে হয় না। দক্ষ উড়ো-জাহাজের চালক মেজর শ্রোডার! জ্ঞান হারাবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে জয়ষ্টিক চেপে ধরলেন। উড়ো-জাহাজ বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে আপন মনে নেমে চলেছে পৃথিবীর দিকে। এক মাইল, দু'মাইল, তিন মাইল, চার মাইল—আর দু'মাইল বাকী। প্রচণ্ড বেগে জ্ঞানহীন চালককে নিয়ে প্লেন নেমে আসছে। মৃত্যু অনিবার্য্য—আর কয়েক সেকেণ্ড পরেই!

হাওয়ার চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ফুসফুসে কিছু হাওয়া ঢুকেছে। জ্ঞান ফিরেছে। চোখ মেলে চাইলেন! তখনই বুঝে ফেললেন ব্যাপারটা কি। সামনে মৃত্যু। সময় অত্যল্প। ভয় পেলেন না। কী-বোর্ডে দেখলেন, ওপরে ওঠবার কনট্রোল খোলা রয়েছে কিন্তু এঞ্জিন বন্ধ করা। বুঝলেন অজ্ঞান হয়ে যাবার পূর্ব্বে মুহূর্ত্তে আপনা হতেই তিনি এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে জাহাজ আর না ওপরে ওঠে। এত বিপদেও বুদ্ধি হারাননি। ঠিক যা-করা উচিত তাই করলেন। এঞ্জিন চালু করে জয়ষ্টিক ঠেলে দিলেন। প্লেন আর ঘুরল না। ধীরে ধীরে নেমে আসতে লাগল বিমানঘাঁটির দিকে। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন। আর এক মুহূর্ত্ত দেরী হলেই প্লেন মাটিতে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যেত। ঘাঁটির লোকেরা উড়ো-জাহাজকে ভীষণ ভাবে ঘুরতে ঘুরতে প্রচণ্ড বেগে নীচে নামতে দেখেছিলেন। সপ্রংশস ভাবে পরস্পরে বলাবলি করছিলেন—মেজরের কাণ্ডই আলাদা। বাহাদুর বটে!

উড়ো-জাহাজ থেকে হাসিমুখে ঘাঁটিতে নেমে এলেন মেজর শ্রোডার। তার পর যখন সব কথা খুলে বললেন, সকলে অবাক হয়ে গেলেন। 'চরম বাহাদুরী আর পরম ভাগ্য' এই বলে সবাই মেজরকে অভিনন্দিত করলেন।

এতেও তিনি দমলেন না। নতুন রেকর্ড স্থাপনের জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। সাহস বটে! তিনি আগের বার দেখেছিলেন ছ'মাইলের ওপর বায়ুর চাপ ও তাপে গোলমাল ঘটে। অক্সিজেন আরও প্রয়োজন। সব রকম গোছ করে তিনি মাত্র কুড়ি দিন পরেই আবার আকাশ-অভিযানে বেরোলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি হাজার ফুট উচ্চে। তখনকার উড়ো-জাহাজের পক্ষে এ একটা কম ব্যাপার নয়! আরও পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে ত্রিশ হাজার ফুট। এঞ্জিন সুন্দর চলছে। অক্সিজেন ঠিক আসছে। চোখের গগ্‌লসে বরফ। উড়ো-জাহাজের গায়ে, কাচে বরফ। তাপ শূন্যের চেয়ে পঞ্চাশ ডিগ্রী নীচে। তড়িৎযুক্ত জামা কিন্তু বেশ গরম রয়েছে। তিনি চলেছেন উর্দ্ধে, আরও উর্দ্ধে।

একত্রিশ হাজার একশ' ফুট ছাড়িয়ে গেছেন। হঠাৎ তাঁর কি রকম কষ্ট হতে লাগল। অক্সিজেন আসছে না। বিস্মিত হলেন। কেন? অক্সিজেন তো প্রচুর ছিল। তবে কি ভালভে কিছু হ'ল? হাত দিয়ে বুঝলেন ঠিকই আছে। কিন্তু দেখতে পারছেন না। গগ্‌লসের কাচে বরফ জমে আছে। এদিকে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ব্যাপারটা কি বোঝবার জন্য তিনি চোখের গগ্‌লস ওপরে ঠেলে তুললেন।

তাঁর মনে হ'ল হঠাৎ যেন ভীষণ বিস্ফোরণ হ'ল। মাথা যেন ফেটে গেল। সব অন্ধকার। ব্যাপার হ'ল এই যে, তখন বায়ুর টেম্পারেচার শূন্যের ৬৭ ডিগ্রী নীচে। গগ্‌লস তুলতেই তাঁর চোখ একেবারে বরফ হয়ে জমে গেল। অন্ধ করে দিল। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। উড়ো-জাহাজ আপন ইচ্ছামত ডিগবাজী খেতে খেতে নীচে পড়তে লাগল। তিন মিনিটে ছ'মাইল নামল। কি প্রচণ্ড বেগ! হাওয়ার ঘর্ষণে খানিকটা ডানা ভেঙ্গে গেল। খালি পেট্রল ট্যাঙ্ক দুমড়ে গুঁড়িয়ে গেল।

মাটি থেকে যখন দু'হাজার ফুট উচ্চে, তখন মেজরের জ্ঞান ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে আপনা হতেই তাঁর হাত কণ্ট্রোলের ওপর গিয়ে পড়ল। জাহাজ সোজা হয়ে ধীরে ধীরে ঘাঁটিতে নামল, যেন

পথে কোন বিপদই ঘটেনি। কিন্তু মেজর আর নামেন না। ঘাঁটির লোকেরা ছুটে এসে দেখল, চালক শক্ত হয়ে সীটের উপর বসে—চোখ দৃষ্টিহীন ঘোলাটে।

তখনই তাঁকে ধরাধরি করে নামিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। ধীরে ধীরে তিনি সেরে উঠলেন। তখন সবাই জানল শূন্যে কি বিভীষিকার মধ্যে দিয়ে তিনি বেঁচে ফিরেছেন। পৃথিবীতে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি অজ্ঞান অবস্থায় আকাশ বেয়ে ছ'মাইল নেমেছেন।

এত বিপদ সত্ত্বেও তিনি বিমান-চালনা ত্যাগ করেননি। পরে আরও রেকর্ড সৃষ্টি ও ভঙ্গ করেছেন।

আমার জীবনের কয়েকটি শুভক্ষণ

শ্রীলবকুমার বসু

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে বহু মনীষীর শুভদর্শন লাভের সুযোগ ঘটিয়াছে এবং তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ-আলোচনা করিবার ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ এবং স্নেহ লাভ করিবার মত সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। আমি আজ তাঁহাদেরই কয়েক জনের কথা বলিব।

প্রথমেই আমি বাংলা সাহিত্যের গৌরব, বিখ্যাত কথাশিল্পী স্বর্গীয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলিব। আমাদের বাড়ীতে তাঁহার কথা শুনিয়া এবং তাঁহার অপরূপ ভাষায় লেখা চিঠি দেখিয়া তাঁহাকে দেখিবার অভিলাষ বহুদিন হইতেই ছিল। অনেক দিন হইতেই তিনি পূর্ণিয়ায় বাস করিতেছিলেন এবং তাঁহার বয়সও বেশী হওয়ায় কলিকাতায় আসার সম্ভাবনা যে খুবই কম ছিল তাহা জানিতাম। কিন্তু আমার সেই আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে তাঁহার জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। সেই উপলক্ষে তিনি তাঁহার বহু রসগ্রাহী ভক্তের বিশেষ অনুরোধে, মাত্র কয়েক দিনের জন্য তাঁহার জন্মস্থান দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। ঐ সময়ে এক দিন আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তখন তাঁহার বয়স প্রায় আশী, কিন্তু দেখিলাম তাঁহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদা সরল ও মধুর হাসিতে ভরা এবং তাঁহার মনে যেন বার্দ্ধক্য কোনও রেখাপাত করিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার অননুকরণীয় রসাল ভাষায় উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে আনন্দ বিতরণ করিতে লাগিলেন। ইহার পর বর্ত্তমান বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসসাহিত্যিক শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত পুনরায় এক দিন দাদামশাইএর (কেদারনাথকে সকলেই 'দাদামশাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন) সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি তখন বাড়ীতে ছিলেন না ; তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া আমরা বসিয়া আছি দেখিয়া তিনি তাঁহার স্বভাব-সুলভ অমায়িকতার সহিত লজ্জিত হইয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কারণ সেদিন তিনি নিজেই আমাদিগকে আসিতে বলিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার সহিত নানা কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহার প্রতিটি কথা যেন রসে ভরপুর। হাসির ঝলকে সমস্ত ঘর ভরিয়া গেল। তিনি আমাদিগকে তাঁহার রচিত কয়েকটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। কি সুন্দর তার ভাষা ও ছন্দ! এমনি করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা কাল আমরা মুগ্ধ হইয়া কত গল্প ও কবিতা শুনিলাম। দেখিলাম রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার কি গভীর শ্রদ্ধা ; এবং শরৎচন্দ্রকে তিনি কত বড় স্থান দিয়াছেন মনে। আর শুনিলাম তিনি ছেলেবেলায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার সরস গল্পগুলি শুনিলে সময় যেন কোথা দিয়া কাটিয়া যায়। দক্ষিণেশ্বর গ্রামের উপর সূর্য্যের আলো ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিলে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল। আমরা বিদায় লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এই সময়ে আমি এক অপরূপ দৃশ্য দেখিলাম। দেখিলাম যে, বিদায়ের সময় কেদারনাথ এবং দাদাঠাকুর (শরৎচন্দ্র পণ্ডিত) আলিঙ্গনে বদ্ধ বেশ কিছুক্ষণের জন্য ; এবং তাঁহাদের চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। ইহাই আমার কেদারনাথের সহিত শেষ সাক্ষাৎ। ইহার পরে তিনি ফিরিয়া গিয়া আমাদের বাড়ীতে যখনই চিঠিপত্রাদি দিয়াছেন, আমার সহিত মাত্র দুই-এক দিনের জন্য দেখা হইলেও প্রতি পত্রেই তিনি আমার নাম উল্লেখ করিতেন এবং আমাকে তাঁহার গভীর স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ পাঠাইতে কখনও ভোলেন নাই। এমনি ছিল তাঁহার মহত্ত্ব ও ভালবাসা।

২

ইহার পরে যাঁহার কথা বলিব তাঁহার নাম অর্দ্ধ শতাব্দী কাল পূর্ব্বে বাঙালীর ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইত। তিনি হইলেন বাংলার অগ্নিযুগের স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এমন যুগে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি যখন চারি দিক শুধু অনাচার, অত্যাচার ও জগৎজোড়া অশান্তিতে পরিপূর্ণ। একটু বড় হইয়া দেখিলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অমানুষিক অত্যাচার এবং বীভৎস হত্যালীলা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইল। ঘটিল কলিকাতায় ১৯৪৬-এ দাঙ্গার নৃশংস হত্যালীলা। কিন্তু এই দুঃখময় রাত্রির প্রভাত হইল ও ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্যের উদয় হইল। এই সময়ে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পূজারীদিগের নাম, যাঁহাদের নাম স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে লোকে বৃটিশ সরকারের হস্তে নিগৃহীত হইবার আশঙ্কায় উচ্চারণ করিতেও সাহস করিত না, চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তখন শুনিলাম অগ্নিযুগের শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নির্ভীকতা ও বীরত্বের কথা। তাঁহারা দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বৃটিশ সরকারের চোখ-রাঙানি ও মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে নির্ভীকতার সহিত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তখন হইতে তাঁহাদের এই সকল কাহিনী শুনিয়া তাঁহাদের দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে থাকিতেন, সেই জন্য তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ হয় নাই ; কিন্তু উপেন্দ্রনাথকে দেখিবার সৌভাগ্য হইল। তাঁহার সহিত দাদাঠাকুরের আন্তরিক হৃদ্যতা ছিল। দাদাঠাকুরের তিনি ছিলেন "উপেনদা" এবং দাদাঠাকুরকে তিনি স্নেহ করিয়া "দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এক দিন ভোরবেলায় দাদাঠাকুর তাঁহার উপেনদা'র সিঁথির বাড়ীতে আমায় লইয়া যাইলেন। উপেন্দ্রনাথ তখন পরের দিনের "দৈনিক বসুমতী"র সম্পাদকীয় স্তম্ভ লিখিতেছিলেন (তিনি তখন ঐ কাগজের সম্পাদক ছিলেন)। প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই, "দাদা ছেলেটি কে?" বলিয়া গভীর স্নেহে আমায় জড়াইয়া ধরিলেন

তাঁহার বিশাল বক্ষে। পরিচয় করাইয়া দিলেন দাদাঠাকুর, বলিলেন, "অদ্ভুত এর পাগলামি, বোমার আসামী দেখতে চায়, তাই নিয়ে এলাম আপনার কাছে।" শুনিয়া এক গাল হাসিয়া বলিলেন, "এঁ্যা, এইটুকু বয়সে এত বড় দুঃসাহসিকতা আর অসৎচিন্তা!" আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার বয়স প্রায় সত্তরের উপর, কিন্তু তখনও দেখিলাম তাঁহার প্রতিটি কথা কি গভীর তেজঃপূর্ণ। ইহার পর তাঁহাকে আমি আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলাম এবং তিনিও তাহা গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমার কিন্তু খালি তরকারি খাওয়ার নিমন্ত্রণ।" তাঁহার ছিল ডায়াবিটিস্ (বহুমূত্র) অসুখ। ভাত, রুটি স্পর্শ করিতেন না। দুই-তিন দিনের মধ্যেই তিনি আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। সেই দিন তাঁহার নিকট হইতে ১৯০৬—৮ সালের বিপ্লবের নানা গল্প যাহা "নির্ব্বাসিতের আত্মকথা", "বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী" প্রভৃতি বইতে পড়িয়াছি, তাহা শুনিলাম। অপরিসীম আনন্দে তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলাম বাংলার গৌরবময় যুগের ইতিহাস। তাঁহার নিকট হইতে শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিলাম। শুনিলাম শ্রীঅরবিন্দ জেলেতে সর্ব্বদাই ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন। জেলের মধ্যে মাথার তেল পাওয়া যায় না, সেই জন্য সকলেরই মাথার চুল রুক্ষ, কিন্তু তখনও শ্রীঅরবিন্দকে দেখিলে তাঁহাদের মনে হইত যেন তিনি সবে মাত্র তৈল ব্যবহার করিয়া স্নান সমাপন করিয়া আসিয়াছেন। এমন ধারা অদ্ভুত ছিল তাঁহার সকল ব্যাপারই। প্রথম জীবনে উপেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী হইয়া প্রায় সারা ভারত পর্য্যটন করিয়াছিলেন, এ কথাও বলিলেন। তাহার পর কেমন করিয়া মুরারিপুকুরের বাগানে, জসিডির পাহাড়ে তাঁহারা যাইলেন, কি করিয়া তাঁহারা ধরা পড়িলেন, কি ভাবে তাঁহাদের জেলে রাখা হয়, আলিপুর কোর্টে মামলার শুনানির সময় তাঁহারা জেলখানার বাহিরে আসিবার ও মানুষের মুখ দেখিবার, সুযোগ পাইয়া কিরূপ হৈ-চৈ, আমোদ-আহ্লাদ করিয়া কাটাইতেন, হাসিতে হাসিতে এমন কত গল্পই করিলেন। তাঁহার কাছেই শুনিলাম শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু মামলার সময় স্থিরদৃষ্টিতে একভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার চোখের দিকে তাকাইলে মনে হইত তিনি যেন আলিপুর কোর্ট হইতে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছেন। কোনওরূপ চঞ্চলতা তাঁহাকে স্পর্শ করিত না। এমনি ধারা বহু গল্প তাঁহার নিকট হইতে আমরা শুনিলাম প্রায় তিন ঘণ্টা ধরিয়া। তাঁহার প্রতিটি কথার ভিতরেই ছিল দেশের প্রতি গভীর ভালবাসার পরিচয়। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কবিরাজ চিকিৎসা করতে এলেন, বল্লেন, 'গা-টা জ্বালা করে কখনও?' বল্লুম 'কবিরাজ মশাই, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর সদা-সর্ব্বদা জ্বলছে।" এমনি সহজ সরল গল্পের ভিতর কত বড় দেশভক্তির পরিচয়ই লুকান রহিয়াছে, ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাহার পর তিনি যখন ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন তখন তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাবা, দেশকে ভালবাস, জেনো চরিত্র সব চেয়ে বড় জিনিষ; এই দুর্দ্দিনে বায়স্কোপের 'কিউ' দেখলে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়, তবু নিরাশ হইনি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, বাংলার ঘরে ঘরে তোমাদের মতন ছেলে জন্মাক।" আর আমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। মাত্র দুই দিনের আলাপে তিনি আমায় এতই স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে রোগশয্যায় দাদাঠাকুর যখনই দেখিতে গিয়াছেন তিনি রোগের যন্ত্রণার ভিতরেও হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "দাদা, ছেলেটি কেমন আছে?"

৩

এইবার আমি যাঁহারা জীবিত আছেন এবং যাঁহারা আমাদিগকে তাঁহাদের মনীষার দ্বারা সর্ব্বদা শিক্ষাদান করিতেছেন তাঁহাদের কয়েক জনের কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

প্রথমে আমি বাংলা তথা ভারতের রঙ্গমঞ্চের গৌরব শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীর কথা বলিব। পূর্ব্বে নানা স্থানে বহু ব্যক্তির নিকট তাঁহার অভিনয়-নৈপুণ্যের কথা এবং আমেরিকায় তাঁহার সাফল্যের সহিত অভিনয়ের কথা শুনিয়াছিলাম। তাহার পর তাঁহার 'মাইকেল মধুসূদন" অভিনয় দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম এবং তাহা দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল আমি যেন মাইকেল, রাজনারায়ণ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষীদিগের যুগে ফিরিয়া গিয়াছি এবং আমার সম্মুখে যেন সত্যকার মাইকেল মধুসূদন উপস্থিত। তাঁহার অভিনয় দেখিবার পর হইতেই রঙ্গমঞ্চের বাহিরের মানুষ শিশিরকুমারকে দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হয়। সত্য সত্যই এক দিন তাঁহাকে নিকটভাবে দেখিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। গত বৎসর শিশিরকুমারের জন্মদিনের (২রা অক্টোবর) কিছু দিন পূর্ব্বে স্বনামধন্য সাহিত্যিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস নাগ আমাদিগকে তাঁহার জন্মোৎসব পালন উপলক্ষে সকল ব্যবস্থা চুপি-চুপি করিতে বলিলেন। চুপি-চুপি, কারণ শিশিরকুমার না কি তাঁহাকে লইয়া কোন আড়ম্বর দেখান বা হৈ-চৈ ইত্যাদি করা বড়ই অপছন্দ করেন। চুপি-চুপি সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইল। ইহার পরে তাঁহার জন্মদিনের দিন দাদাঠাকুর, ডাঃ কালিদাস নাগ প্রভৃতির সহিত আমরা তাঁহার বাড়ী (শ্রীরঙ্গমের পিছনে) যাইলাম। (আমরা গোপন রাখা সত্ত্বেও পূর্ব্ব হইতে খবর পাইয়া) সেখানে তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া অত বড় প্রতিভাবান শিল্পীর সামনে দাঁড়াইতেই আমার সমস্ত মন আনন্দে ভরিয়া গেল। বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইল। আমরা প্রথমে তাঁহাকে মাল্য দ্বারা ভূষিত করিয়া কপালে চন্দন-তিলক আঁকিয়া দিলাম শুভ শঙ্খধ্বনির সঙ্গে। দাদাঠাকুর তাঁহাকে বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পরে তিনি আমাদিগকে প্রাচীন এবং বর্ত্তমান নাট্য-জগতের বিষয়ে নানা কথা বলিলেন। তাঁহাকে বর্ত্তমান বাংলা রঙ্গমঞ্চের অবনতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, এখন বাঙালীর একটু বুদ্ধির জড়তা আসিয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও বাঙালীর প্রতিভার অভাব নাই। তিনি বলিলেন যে, ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চেও শেক্সপীয়রের যুগের পরে এইরূপ অবনতি দেখা যায়; কিন্তু বার্নাড শ, ইব্‌সেন প্রভৃতির দ্বারা আবার তাহা গৌরবান্বিত হয়। সেই জন্য তিনি বিশ্বাস করেন না যে, বাংলার রঙ্গমঞ্চের অবনতি চিরকালই থাকিবে এবং তিনি সিনেমার জন্যই যে রঙ্গমঞ্চের অবনতি তাহা অস্বীকার করিলেন। ইহার উন্নতি করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির থিয়েটারের প্রতি আগ্রহ হওয়া উচিত (তিনি ইহাকে বলিয়াছিলেন যে, প্রত্যেকের

Theatre-minded হওয়া প্রয়োজন)। তিনি বলিলেন যে, "A nation is known by its stage." বিলাতে থিয়েটারের জন্ত বহু অর্থ ব্যয় করা হইয়া থাকে এবং ছোটবেলা হইতেই এই বিষয়ে যথার্থ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। সেখানে আবৃত্তির জন্ত বিস্তালয়ে শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে এবং ইহার জন্ত পৃথক্ "একাডেমি" আছে। কিন্তু আমাদের দেশে অভিনয়কে খুব গর্হিত কাজ বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখা হয় এবং কয়েকটি বিস্তালয়েও কেবল কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্ত বৎসরে একবার কি দুইবার কয়েক জন ছাত্রকে কবিতা কোনরূপে কণ্ঠস্থ করাইয়া আবৃত্তি করানো হয়। কিন্তু প্রাচীন কালের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে,শ্রীচৈতন্তদেব অভিনয় করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগেও আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বহু মনীষী যাত্রা বা থিয়েটার করিয়াছেন এবং ভারত তথা জগতের গৌরব রবীন্দ্রনাথ এক জন বিখ্যাত অভিনেতা ছিলেন। ইহার পর তিনি আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বলিতে গেলে প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইয়া যাইবে। তাহার পর প্রায় তিন ঘণ্টা কাল শিক্ষাপ্রদ ও উৎসাহোদ্দীপক আলোপ-আলোচনার পর আমাদের সভা ভঙ্গ হইল। সেই দিন শিশিরকুমারকে দেখিয়াছিলাম—কি তেজোদ্দীপ্ত, কি অসাধারণ তাঁহার পাণ্ডিত্য, কি অদ্ভুত তাঁহার আত্মবিশ্বাস! সর্ব্বদাই জগৎকে নতুন কিছু দান করিবার জন্ত তিনি যেন প্রস্তুত এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার কি অপরিসীম শ্রদ্ধা। আরও দেখিয়াছিলাম সেদিন খ্যাতি ও সম্মানের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম উদাসীনতা।

৪

এখন আমি সাহিত্যিক ও রসিকরাজ শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের বিষয় কিছু বলিব। তিনি ছেলে-বুড়ো সকলের নিকটেই দাদাঠাকুর নামে পরিচিত। এই প্রবন্ধে অনেক বার তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু আমি এখন তাঁহার বিষয়ে পৃথক্ ভাবে কিছু বলিব। তিনি অধুনালুপ্ত 'বিদূষক' পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন। তিনি কাগজের এডিটর (Editor) বানান লিখিতেন Aid-eater (এড্-ইটার)। অন্তান্ত সংবাদপত্রে দেখিয়াছি লেখা থাকে "উদারপন্থী", কিন্তু তিনি লিখিতেন "উদর-পন্থী"। এইরূপ কথার দ্বারা পত্রিকাটি রসপূর্ণ ছিল। শুনিয়াছি, প্রত্যেক রসিক সাহিত্যিক এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তিই এই পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদা এই পত্রিকার প্রকাশের দিনটির জন্ত আগ্রহে অপেক্ষা করিতেন।

তাঁহাকে একবার পত্রিকা প্রকাশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'ব্রাহ্মণীর অসুখ, তাই ক'লকাতায় এসে একটি প্রেস কিনে নিজেই কবিতা লিখে কাগজ ছাপতাম।' ইহার পরে হাসিয়া বলিলেন যে, তিনি নিজেই কবিতা লিখিতেন ও তাহা "কম্পোজ" করিয়া আবার নিজেই ছাপিতেন এবং রাস্তায় রাস্তায় তাহা ফেরি করিতেন। আবার একটু হাসিয়া স্বভাব-সুলভ রসিকতা করিয়া বলিতেন, "যদি কেবল গ্রাহক হ'তে পারতাম তাহ'লেই কাগজখানা self-supporting হ'য়ে যেত।" তাঁহার প্রতিটি কথাই এইরূপ হাস্তরসপূর্ণ। তাঁহাকে মহাযুদ্ধের সময় বলা হইল, "কি হল দা'ঠাকুর, 'বিশমাক' (জাহাজ) যে ডুবল।" তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তর দিলেন, "বিশমাক (নম্বর) গেল তো কি? এখনও ত' আশী মার্ক রইল।" এইরূপ প্রতিটি কথার উত্তর যেন মুখেই যুগিয়েই থাকে।

এক দিন রবীন্দ্রনাথের দিদি "ভারতীর" সম্পাদিকা স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী দাদাঠাকুরের সরস কথাবার্ত্তা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার সঙ্গে রবির দেখা হ'য়েছে?" তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেন, "কি করে হ'বে মা, আমার যখন উদয় হয় তিনি তখন অস্ত যান", অর্থাৎ (শরৎ) চন্দ্রের যখন উদয় হয় রবি বা সূর্য্য (রবীন্দ্রনাথ) তখন অস্ত যায়। ইহা ছাড়া তাঁহার নানা গল্প আছে। সর্ব্বদাই মনে হয়, সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি, কিন্তু তাহা হইলে সর্ব্ব সময়ে তাঁহার সহিত খাতা ও পেন্সিল লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। বিখ্যাত "কলিকাতার ভুল" গানটি তাঁহার রচিত। ইহার দুইটি ছত্র হইল,—

"গোল দীঘিতে গিয়ে আমার লাগলো ভারী গোল
চারকোণা দীঘিটাকে এরা সবাই বলে গোল।"

এমনি ধারা কলিকাতার রাস্তার ও নানা স্থানের প্রতি কটাক্ষ করিয়া তাঁহার রসাল ভাষায় গানটি লেখা।

তিনি জীবনে কখনও গায়ে জামা দেন নাই অথবা পায়ে জুতা পরেন নাই। কি শীত, কি গ্রীষ্ম সর্ব্বদাই তাঁহাকে এইরূপ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে দেখি। আমরা ছেলেবেলা হইতে শুনিয়াছি, বিস্তাসাগর মহাশয় অতিশয় সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন এবং চটিজুতা ও চাদর পরিধান করিয়া লাটসাহেব প্রভৃতির সহিত দেখা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। আমাদের দাদাঠাকুরও খালি পায়ে একখানি মোটা চাদর গায়ে দিয়া সভা-সমিতি প্রভৃতিতে যাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। এই বেশেই তিনি সর্ব্বত্র প্রভূত সম্মান লাভ করেন। মানুষ মানুষকে সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাহার বেশভূষার জন্ত নয়, গুণের জন্তই।

সদা-সর্ব্বদাই তাঁহার মুখ হাসিতে ভরা, জীবনে কোনও দুঃখকষ্ট তিনি গ্রাহ্য করেন না। অসাধারণ প্রতিভার মধ্যে তাঁহার স্মরণশক্তি সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাঁহাকে শ্রুতিধর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দাশরথি রায়ের পাচালি, নীলকণ্ঠ, রামপ্রসাদ প্রভৃতির কত গান তিনি আমাদের শুনাইয়া মুগ্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া থাকেন। তাঁহার বহু গান এখন হয়ত লুপ্ত। এইরূপ তাহার সরল জীবন যাপনের দ্বারা এবং সরস ও জ্ঞানগর্ভ কথাবার্ত্তায় আমাদিগকে তিনি সর্ব্বদাই উচ্চ আদর্শ, শিক্ষা ও আনন্দ দান করিয়া থাকেন। তাঁহার সহিত কোথাও যাইবার সময় দেখি বহু অধ্যাপক, শিক্ষক, সাহিত্যিক প্রভৃতি গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁহার পায়ের ধূলা ও কুশল সংবাদ লইবার জন্ত আগ্রহের সহিত আগাইয়া আসেন এবং আমাদের দ্রুত চলার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

ইহা ছাড়া তাঁহার নিকট হইতে আর একটি বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছি—তাহা হইল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। তিনি কর্ত্তব্য পালনে খুবই সচেতন। তাঁহার প্রেসে নানা বিস্তালয়ের প্রশ্নপত্র ছাপা হয়। অনেক সময় ছাপার কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই ট্রেনের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি পায়ে হাঁটিয়া দুই-তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া প্রশ্নপত্র লইয়া গিয়াছেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় হয়ত খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তিনি ঠিক পরীক্ষা আরম্ভ

হইবার পূর্ব্বে দাদাঠাকুরকে প্রশ্নপত্র সহ উপস্থিত হইতে দেখিয়াছেন ! এমনি তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান।

৫

আমার জীবনে আর এক জন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি খুব গভীর রেখাপাত করিয়াছেন। তিনি হইলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস নাগ। সুন্দর তাঁহার স্বাস্থ্য, অমায়িক তাঁহার ব্যবহার এবং অগাধ তাঁহার পাণ্ডিত্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগী। দেখিয়াছি, রবীন্দ্র-সাহিত্যের নব নব তথ্য আবিষ্কারের প্রতি তাহার কিরূপ উৎসাহ এবং আগ্রহ। তাঁহারই সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের লেখা "বাল্মীকি প্রতিভা", "রবিচ্ছায়া", "কাল-মৃগয়া", "রুদ্রচণ্ড", "ভানুসিংহের পদাবলী", "বনফুল" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতি—যাহার অনেকগুলিই এখনও বহু লোকের নিকট সম্পূর্ণ অজানা ও অপরিচিত।

তিনি এক জন ঐতিহাসিক, সেই জন্য সত্য তথ্যের প্রতি তাঁহার কড়া দৃষ্টি থাকে। তিনি যখনই কোন প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, দেখিয়াছি, সর্ব্বপ্রথমে প্রামাণিক তথ্য আবিষ্কার না করা পর্য্যন্ত তিনি লেখনী ধারণ করেন নাই। লিখিবার ভাষাও তাঁহার অতি প্রাঞ্জল ও সুন্দর। দেখিয়াছি, সকল প্রকার কলাবিদ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ডাঃ নাগের রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ও সুরের প্রতি কি আন্তরিক দরদ ! তাঁহার কণ্ঠে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনিবার সৌভাগ্যও আমার হইয়াছে। নিয়মিত অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার সুগম্ভীর ও ভরাট কণ্ঠে সুন্দর রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাহিয়া থাকেন। তাঁহার রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখাইবার পদ্ধতি দেখিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। গানটি কবি কি কারণে ও কবে লিখিয়াছেন তাহা প্রথমে তিনি বলিয়া দেন। তাহার পর তিনি গানটি নির্ভুল ও নিখুঁত সুরে শিখাইয়া দেন। বহু গান, তাঁহার কাছে শুনিলাম, কবি নিজেই তাঁহাদের শিখাইয়াছেন। পুত্রবৎ স্নেহে তিনি সকল প্রকার ভাল জিনিষই আমাদিগকে দেখাইবার জন্য যেন সর্ব্বদা ব্যগ্র। কত দিন খবর পাঠাইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন কোনও ভাল গান-বাজনার আসরে। অপূর্ব্ব তাঁহার স্নেহ !

আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে আরও অনেক গুণী, জ্ঞানী, প্রতিভাবান ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি এবং তাঁহাদের জীবন হইতে প্রভূত শিক্ষা-লাভ করিয়াছি। ইচ্ছা হয়, আমার জীবনের আনন্দের ক্ষণগুলিকে লিপিবদ্ধ করিয়াই চলি ; কিন্তু লেখাটি দীর্ঘতর হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় আমাকে এইখানেই শেষ করিতে হইতেছে নিতান্ত অনিচ্ছায়, কারণ জীবনের মধুর ক্ষণগুলিকে লিপিবদ্ধ করিবার সময় মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করি।

প্রমোদ চৌধুরী

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অদ্ভুত বাহাদুরি !
নামটি প্রমোদ চৌধুরী তা'র
মেলে না দ্বিতীয় জুড়ি।

অগ্নি-যুগের ছেলে :
ট্রেণ-লুঠ আর বোমা-মামলার
ফাঁদে পড়ে ছিল জেলে।

ছিলো আরো বহু বীর :
অনন্তহরি প্রভৃতি অনেক
সন্তান জননীর।

তাহারাও পড়ে ধরা :
হাজতে আটক থাকে পাহারায়
নজরবন্দী করা।

জুলুম-উৎপীড়ন
পুলিশের হাতে সহিতো নিত্য
বিপ্লবি-সেনাগণ।

লাগিল ডিটেক্‌টিভ—
ভূপেন চট্টো রায়-বাহাদুর
বৃটিশ-ভক্ত জীব।

ধামাধরা গুণধাম !
তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, ক্ষুরধার-মেধা,
জবরদস্ত নাম।

হাজতে আসেন রোজ :
মুখে হাসি টেনে জেনে নিতে চান
স্বদেশী দলের খোঁজ।

বিপ্লবী যে-প্রমোদ
অনন্তহরি বন্ধুর সাথে
নিতে চায় প্রতিশোধ।

জানে না কথাটা রায় :
হাসি-ভরা মুখে হাজতে আবার
পরদিন তাই যায়।

হায়, রায়-বাহাদুর !
ডাণ্ডার ঘায় ঠাণ্ডা বেবাক,
মাথা ফেটে মতিচুর !

অদ্ভুত বাহাদুরি !
বিচারে প্রমোদ-অনন্তহরি
পরিলো ফাঁসির ভুরি।

জেন অস্টিনের

তেতাল্লিশ

গাড়ী চলতে চলতে পেম্বার্লির বনভূমি দৃষ্টিগোচর হোল। তার পর যখন বাসাটি চোখে পড়ল তখন এলিজাবেথের মন উধাও পাখা মেলে দিল।

সামনের পার্কটি বিশাল। উচ্চাবচ গড়নের মাটি। বহু দূর অবধি বিস্তৃত সুন্দর কাননভূমি।

বাইরের মধুর দৃশ্যাবলী তার মনকে এমন ভাবে জুড়ে বসেছিল যে, কথা কইতে ইচ্ছা হচ্ছিল না এলিজাবেথের। আধ মাইল খাড়াই পথে এগিয়ে গেল গাড়ী। সেই অবধি এসে বন শেষ। সেইখান থেকে তারা দেখতে পেল আঁকা-বাঁকা পথের শেষে উপত্যকা-ভূমির ওপারে বিরাট পেম্বার্লি প্রাসাদ। বাড়ীটির পিছনে ঘন বনে ঢাকা পাহাড়। উঁচু জমিতে সেই পাথরের অট্টালিকার সমুখ দিয়েই একটি খরস্রোতা স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা। নদীটির গঠনে, ভঙ্গীতে বা পাড়ে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র নেই। প্রকৃতি যেমন তৈরী করেছেন তেমনই আছে সেটি। মানুষের হাত পড়েনি তাতে। এই নৈসর্গিক দৃশ্যে এলিজাবেথের মন পুলকে নৃত্য করতে লাগল। এমন প্রকৃতির শোভা আর কোথাও দেখেনি সে ইতিপূর্বে। শুধু সে কেন, গাড়ীর সব ক'জন আরোহীই সমস্বরে এই আশ্চর্য সুন্দর প্রাকৃতিক রূপের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। এলিজাবেথ একবার ভাবলে যে, এই বাড়ীর বধূ হওয়ার মর্যাদা পাওয়া তার ভাগ্যেরই কথা।

গাড়ী নেমে এল ভূমিতলে। পার হোল নদীর সাঁকো। তার পর যাত্রাশেষে গিয়ে দাঁড়াল একেবারে সদর দরজায়। সেই বাড়ীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে চকিতে তার মনে সেই ত্রাস ফিরে এল। গৃহস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা। জায়গাটি ঘুরে দেখার কথা বলায় সকলকে হল-ঘরে বসতে অনুরোধ করা হোল। গৃহকর্তার প্রত্যাশায় বসে থাকতে থাকতে এই বিস্ময়ে তার মন আকুল হোল যে, সে কোথায় এসে পড়েছে।

গৃহকর্ত্রী মহিলাটির বয়স হয়েছে। ভারী ভদ্র। সৌজন্যে স্নিগ্ধ। তিনি এদের খাবার-ঘরে নিয়ে গেলেন। সেই সুসজ্জিত পরিপাটি ঘরটির বাতায়ন থেকে এলিজাবেথ একবার বাইরের দিকে চোখ মেলে তাকালে। যে পাহাড় ভেঙে তাদের গাড়ী এসেছে সেটি এখন দূরে দেখা যাচ্ছে। বৃক্ষলতাগুল্মে মণ্ডিত সেই উন্নত রূপটি মনোরম লাগল চোখে। সেই বনভূমি, নদী, ইতস্তত: বিচ্ছিন্ন বীথিকা শ্রেণী, আঁকা-বাঁকা উপত্যকা, নদীতট সব মিলে একটি মিলিত মধুর ছবি অঙ্কিত হয়ে গেল তার মানসপটে। ঘর থেকে ঘরে এই এক দৃশ্য নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল। উচ্চশীর্ষ ঘরগুলি, মূল্যবান আসবাবপত্র সবই গৃহস্বামীর সুরুচি ও অর্থ-স্বাচ্ছল্যের পরিচয় বহন করছে। কিন্তু তার মধ্যে জৌলুস কম, পারিপাট্যের ভাগই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'এই গৃহে আমি প্রতিষ্ঠিত হতে পারতাম।' ভাবলে এলিজাবেথ—'এই সব ঘরের সঙ্গে হোত্যে নিবিড়তম পরিচয়। আজ যে ঘরে আমিও বিদেশী অতিথির মত এসে দাঁড়িয়েছি, সেই ঘরে আমি কাকাকে সাদরে আহ্বান করতে পারতাম; স্বাগত করতে পারতাম স্বামীর প্রিয় অতিথিদের। কিন্তু তা ত হবার নয়। তা'হলে এঁরা সব আমার পর হয়ে যেতেন। এঁদের আমি আমন্ত্রণ করতেই পারতাম না।'—এই চিন্তায় তার মন যেন নিরালম্ব ভাব হতে আবার ভূতলে আশ্রয় পেল।

এ বাড়ীর কর্তা উপস্থিত আছেন কি না সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করার কৌতূহল হলেও তার যেন সাহসে কুলাল না। কিন্তু সে না করলেও মেসো মশায় সে প্রশ্ন তুললেন। মহিলাটি জবাবে বললেন—'কালই তিনি এসে পড়বেন। তাঁর সঙ্গে অনেকগুলি অতিথি আসছে যে।' গভীর তৃপ্তির সঙ্গে এলিজাবেথ ভাবলে, ভাগ্যিস তাঁদের এখানে আসায় এক দিনেরও বিঘ্ন ঘটেনি।

মেসো মশায় তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন দেওয়ালে টাঙানো অনেকগুলি ছবির মধ্যে উইকহ্যামের প্রতিকৃতির অনুরূপ একখানি চিত্রে। মাসীমা সস্নেহে এলিজাবেথের মন জানতে চাইলেন—কেমন দেখতে লোকটিকে। তাদের এই আলাপের মধ্যে গৃহকর্ত্রী এসে যোগ দিলেন। 'কর্তার বাবার আমলে এক জন ষ্টুয়ার্ড ছিল। ঐ ছেলেটি তারই। কর্তার বাবা তাকে পুত্রস্নেহে মানুষ করেছিলেন। কিন্তু ছেলেটি এখন সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে। লোকে বলে সে না কি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে।'

মাসীমা সহাস্যে তার দিকে তাকালেও, সে হাসিতে সানন্দে যোগ দিতে পারলে না এলিজাবেথ।

'আর ঐটি আমাদের কর্তার ছবি। একই সময়ে তোলা। তা প্রায় বছর আষ্টেক হবে।'

'হ্যাঁ, শুনেছি তোমাদের কর্তার না কি চেহারা ভারী সুন্দর। খুবই সুপুরুষ মানুষ। তুই ত জানিস মা এলিজা, তাই না?'

গৃহকর্ত্রীর মুখ আহ্লাদে ভরে উঠল—'আপনি চেনেন তাঁকে?'

'সামান্য'—ঈষৎ রাঙা মুখে বললে এলিজাবেথ।

'সুপুরুষ খুবই। কি বলেন আপনি?'

'হ্যাঁ—ভারী সুন্দর।'

মাসীমা বললেন—'বোনটি কেমন দেখতে। ভায়ের মতই সুন্দর।'

'নিশ্চয়ই। যেমন দেখতে সুন্দরী, তেমনি গুণে। কালই আসবেন দাদার সঙ্গে একসাথে।'

'ওঁরা সারা বছরই এখানে থাকেন, তাই না?'

'না, না। বছরে অন্ততঃ ছ'মাস ওরা থাকেন না এখানে।'

'বিয়ে হলে তখন আর নড়বেন না এখান থেকে।'

'তা ঠিক। তবে সে যে কবে হবে তা আমরা ভেবেই পাই না। ওঁর পছন্দ মত কন্যে পাওয়াই ভার। আর মানুষটাই বা কি রকম। একটা কটু কথা কখনো শুনিনি তাঁর মুখে। চার বছর যখন তার বয়স তখন থেকে রয়েছি আমি।'

তার সম্বন্ধে সব ধারণা মিথ্যে করে দেওয়া এই প্রশংসায় এলিজাবেথ যেন নতুন আলো দেখল। সে ত স্থির বিশ্বাস করত যে, মানুষটার মেজাজ রুক্ষ। আরো শোনার আগ্রহে সে যেন আরও উদ্‌গ্রীব হল।

মেসো মশায় বললেন,—'বেশীর ভাগ মনিবই ত এর বিপরীত। এমন মনিব পাওয়া ভাগ্যের কথা।'

'সত্যি কথা। অমন মানুষ সারা দুনিয়া ঢুঁড়ে বেড়ালেও মিলবে না, এ আমি হলপ করে বলতে পারি। যারা ভালো হয় তারা ছেলেবেলা থেকেই ভালো হয়। এমনি মিষ্টি ছেলে আমি কখনো দেখিনি। আর অমন প্রাণ।'

'ডার্সি সত্যিই কি তাই!' ভাবলে এলিজাবেথ সবিস্ময়ে।

'আর বাপও ছিলেন খাঁটি মানুষ। দীন-দুঃখীর বন্ধু। ছেলেও সেই সব গুণ পেয়েছেন।'

এলিজাবেথ সতৃষ্ণ ভাবে যেন এই সব বর্ণনা শুনতে লাগল।

'অমন মনিব হয় না জানেন। আজকালকার ছোকরা উচ্ছৃঙ্খল। স্বার্থপর। এখানে তাঁর এমন প্রজা নেই, এমন দাস-দাসী নেই, যে তাঁর গুণকীর্তন না করবে। অনেকে বলে যে, মানুষটা দাম্ভিক। কিন্তু আমি ত জানি, আর পাঁচটা যুবকের মত তিনি হাল্কা নন বলেই গম্ভীর। দাম্ভিক মোটেই নয়।'

এক সময় মাসীমা বললেন—'কি জানি কেন শুনতে ভালোই লাগল। কিন্তু উইকহ্যামের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে এ সবের পরিচয় কই?'

'হয়ত আমরা তাঁকে ভুল বুঝেছি।'

'তা হয় কি করে? আমরা ত পাকা খবর পেয়েছি।'

অনেক ঘর ঘুরে তাঁরা ডার্সির বোনের ঘরে উপস্থিত হোলেন। '...নেন,' বললে গৃহকর্ত্রী—'অমন ভাই পাবেন না কোথাও। বোন ...তে অজ্ঞান। যাতে তার আনন্দ হয় সে ব্যবস্থা করতে ভাইয়ের ...র্ত মাত্র বিলম্ব হয় না।'

সারা বাড়ী পরিদর্শন করার পর তাঁরা আবার নীচে বাগানে ...ে এলেন। নদীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে একবার তিন জনেই ফিরিয়ে তাকালেন বাড়ীটির দিকে। মেসো মশায় বাড়ীটির বয়স ...ব করছিলেন, এমন সময় আস্তাবলের পিছনের পথ দিয়ে গৃহস্বামী এঁদের দৃষ্টিপথে এসে দাঁড়ালেন।

প্রায় মুখোমুখী হয়ে পড়ার আকস্মিকতায় দু'জনের চোখেই দু'জনে বাঁধা পড়ে গেল মুহূর্তে। দু'জনের গালেই লাগল গোলাপের রঙ। যেন বিস্ময়ে স্থাণু হয়ে গিয়েছে এমনি ভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ডার্সি। কিন্তু দ্রুত আত্মসংবরণ করে নিয়ে সে ত্রস্তে এগিয়ে এসে পরম প্রীতির সঙ্গে সম্বোধন করলে এলিজাবেথকে।

মাসীমা মেসো মশায় এতক্ষণে ছবির অনুরূপ এই মানুষটিকে দেখে চিনেই নিয়েছিলেন, কিন্তু মাসীর বিস্মিত দৃষ্টি দেখে তাদের আর ভ্রান্তির সম্ভাবনা রইল না বিন্দুমাত্র। এলিজাবেথ কেমন যেন লজ্জায় বেপথু হয়ে আর তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না। কি উত্তর দেবে ভেবে তার মন দিশাহারা হয়ে উঠছিল। ডার্সিরও কথার মধ্যে সেই পরিচিত দাম্ভিকতা ও নির্লিপ্ততার রেশ ছিল না। কত প্রশ্ন করলে ডার্সি ছাড়া-ছাড়া ভাবে। কিন্তু এলিজাবেথ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল নতমুখী হয়ে। একটি প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারলে না।

যখন জানা কথা ফুরিয়ে গেল, তখন ডার্সিও সামান্য ক্ষণ মৌন থেকে যেন নিজের সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দ্রুত গৃহমুখে চলে গেল। আর এলিজাবেথ সেই নিরুত্তর মুহূর্তগুলিকে মনে মনে অভিশাপ দিতে লাগল। মাসীমা, মেসো মশায় এই সুপুরুষটি যুবকটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও এলিজাবেথ কোন সাড়া দিল না তাঁদের কথায়। একটা গভীর লজ্জায় বিরক্তিতে তার সারা মন বিষিয়ে উঠেছিল। কেন মরতে সে এখানে এসেছিল? কি ভাবলেন উনি? হয়ত ভাববেন ছল করে সাক্ষাৎ করার লোভ সামলাতে পারেনি মেয়েটি। কেন সে এসেছিল এখানে? আর উনিই বা এক দিন আগে ফিরলেন কেন? আর একটু আগে যদি তারা বিদায় নিয়ে যেত, তবে ত এ লজ্জার হাত থেকে সে মুক্তি পেত। এই সাক্ষাতের স্মৃতি তার মনকে দংশন করতে লাগল মুহূর্তে মুহূর্তে। আর কতো বদলে গেছেন তিনি। আবার যে তার সঙ্গে আলাপ করবেন, তা যেন বিশ্বাসই করা যায় না। কখনো এমন সহৃদয় প্রীতির সঙ্গে আর তিনি তার সঙ্গে কথা কননি। এমন দরদ-ভরা কণ্ঠে খবর নেননি খুঁটিয়ে তার পরিবারের সকলের সম্বন্ধে। গতবার রোজিংসে যখন চিঠি দিয়েছিলেন, তখনকার থেকে মানুষটার আচরণে কত কি বদলে গেছে। কিন্তু কেন এমন হোল, তা ভেবে কূলকিনারা পেলে না এলিজাবেথ।

নদীর ধার দিয়ে তারা বনভূমির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এলিজাবেথের যেন সাড় ছিল না কিছুতেই। এই সুন্দর বনভূমির কোন মাধুরীই তার মনকে টানতে পারলে না। মাসীমার একটি কথাও তার কানে যাচ্ছিল না। শুধু যন্ত্রচালিতের মত সে মাঝে মাঝে দু'-একটি কথার জবাব দিয়ে যাচ্ছিল। মন তার পড়েছিল সেই বাড়ীটিতে যেখানে এইমাত্র ডার্সি প্রত্যাবর্তন করেছে। এতক্ষণে তিনি কি ভাবছেন? আজকের আচরণের পরেও এলিজাবেথ কি রইল তাঁর হৃদয়ে আসন জুড়ে? আজকের এই হঠাৎ দেখায় মানুষটার মনে দুঃখ-আনন্দের কি দোলা লেগেছে, তা ঠিক বুঝতে না পারলেও অন্ততঃ এটুকু বুঝতে তার বাকী রইল না যে, ডার্সির নিঃশব্দ গাম্ভীর্যে চিড় ধরেছিল।

মাসীমা বোনঝির এই নিরুত্তর ঔদাসীন্যের ভাবটি লক্ষ্য করেছিলেন। সে কথা তুলতেই লজ্জায় এলিজাবেথ নিজের উতলা চিত্তকে নিবৃত্ত করতে যথাসাধ্য করলে।

বনপথে প্রবেশ করে তারা আবার জলের ধার দিয়ে ধীরপদে অগ্রসর হতে লাগল। মাসীমা, মেসো মশায় দু'জনেই শামুক-গতিতে চলেছেন। মেসো মশায় মাঝে মাঝে নদীর জলে কচিৎ লাফিয়ে-ওঠা মাছের গতি নিরীক্ষণের জন্য নীচু হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। এমন মাছ-ধরার ঝোঁক তাঁর!

ডার্সির বাড়ীর বাগানে অপেক্ষমান গাড়ীর দিকে যেতে যেতে হঠাৎ দূরে আবার ডার্সিকে লক্ষ্য করে এরা সবাই সমান আশ্চর্য হল, যেমন হয়েছিল প্রথম বার। অন্ততঃ এবার যদি তিনি নিকটে আসেন তবে ক্ষণপূর্বের অসৌজন্যের প্রায়শ্চিত্ত করবে, ভাবলে এলিজাবেথ। হয়ত বা তিনি অন্য পথে চলে যাবেন, তাদের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য নয় তাঁর। একবার চকিতের জন্য পথান্তরে অদৃশ্যও হয়ে গেল ডার্সি। কিন্তু পর-মুহূর্তেই যখন তাকে দেখা গেল, তখন ডার্সি একেবারে তাদের সামনা-সামনি এসে দাঁড়িয়েছে। এলিজাবেথ, কি সুন্দর জায়গা, বলে সুরু করেছিল প্রায় তখনই, কিন্তু কি ভেবে যেন অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্যেই থেমে গেল। তার বাড়ীর প্রশংসা করার পিছনে হয়ত বা কোন অসৎ উদ্দেশ্য লুকানো আছে, এমন একটা আতংকে শিউরে উঠে এলিজাবেথ আর নিজেকে প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলে না।

এলিজাবেথ থামতেই ডার্সি সপ্রতিভ কণ্ঠে তাকে অনুরোধ করলে এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। এই সৌজন্যে এলিজাবেথ যেন কিছুটা আশ্চর্য বোধ করলে। যেদিন পাণিপ্রার্থী হয়ে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল ডার্সি, সেদিন তার আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে সে বিষোদ্গার করেছিল। অথচ আজ তাঁদেরই সঙ্গে পরিচিত হতে চায় সে।

পরিচয়ের পর ডার্সি মেসো মশায়ের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল। এলিজাবেথের মনের মধ্যে খুশীর জোয়ার এল। এ তারই জয়। অন্ততঃ ডার্সি জানুক যে, এলিজাবেথের এমন আত্মীয়-স্বজন আছেন যাঁদের কারণে তার লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। দুই জনের কথা-বার্তা গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে শুনতে লাগল এলিজাবেথ। মেসো মশায় যেভাবে ডার্সির সঙ্গে কথা কইছিলেন, তাঁর কথায়-বার্তায় এমন একটা স্বচ্ছ ঋজুতা, বুদ্ধির দীপ্তি প্রকট হচ্ছিল যে, এলিজাবেথ মেসো মশায়ের গর্বে গর্বিতা না হয়ে পারলে না।

আলাপে-আলাপে মাছ-ধরার কথায় এসে পড়লেন তাঁরা। মেসো মশায়ের উৎসাহ আছে শুনে তিনি তাকে বারংবার নিমন্ত্রণ জানালেন এখানে এসে মাছ ধরতে। কোন অসুবিধা হবে না তাঁর। মাছ-ধরার সর্বপ্রকার সরঞ্জামের সুবিধা করে দেবে ডার্সি তাঁর জন্য। এলিজাবেথের সঙ্গে হাতে হাত দিয়ে যাচ্ছিলেন মাসীমা। ডার্সির এই আমন্ত্রণী ভঙ্গীতে যেন ঈষৎ বিস্মিত হয়েই তিনি বোনঝির দিকে চাইলেন। মৌন মুখে এলিজাবেথ সে হাসির প্রত্যুত্তর দিলে। কিন্তু তার মন খুশীতে ভরে উঠল। সে ভাবলে—কেন ওঁর এত পরিবর্তন ঘটল? কিসের কারণে না জানি? আমার জন্যেই কি তবে তাঁর ব্যবহার এত স্নিগ্ধ হয়েছে? হানসফোর্ডে আমি যে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, এ সব কি তারই প্রতিক্রিয়া। আজো আমায় ভালবাসেন, এ যে বিশ্বাস করতে চায় না মন।'

দু'টি মহিলা সামনে। পুরুষ দু'জন পিছনে। এই ভাবে জলের ধারে ধারে অগ্রসর হচ্ছিলেন তাঁরা। কিন্তু দীর্ঘ ভ্রমণের পর মাসীমা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি এতক্ষণে এলিজাবেথের আশ্রয় ত্যাগ করে স্বামীর বাহুলগ্না হতে চাইলেন। ডার্সি এবার এলিজাবেথের সঙ্গী হোল। অল্প দূর যাবার পর এলিজাবেথই প্রথম মৌনতা ভঙ্গ করল। 'আমরা ত আপনাকে প্রত্যাশাই করিনি। আপনার গৃহকর্ত্রী বলছিলেন যে, আগামী কালের আগে আপনি আসতে পারবেন না।' ডার্সি সে কথায় সায় দিল। বিশেষ প্রয়োজনেই সে অতিথিদের পূর্বেই এখানে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছে। অভ্যাগতরা কালই সব এসে পড়বেন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জন অন্ততঃ তোমার পরিচিত। বিশেষ করে বিংলে ও তার বোনেরা।

ঈষৎ গ্রীবা দুলিয়ে এলিজাবেথ এ কথায় সাড়া দিল। বিংলের উল্লেখ হয়েছিল সেবার তাদের কথোপকথনের মধ্যে।

'তা ভিন্ন', বললে ডার্সি, 'আর এক জন আছে, যে তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। যে ক'দিন এখানে থাকা হবে, তার মধ্যে সুবিধা করে যদি আমার বোনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি, তাতে কি অসুবিধা হবে তোমার?'

এ অনুরোধটুকুতে এলিজাবেথের মন বিস্ময়ে আপ্লুত হোল। বোন যে তার সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হয়েছে এ তার ভায়েরই কৃতিত্ব, এটুকু বুঝতে পেরে এলিজাবেথ মনে মনে খুশীই হোল। যতই হোক, ডার্সি যে তার সম্বন্ধে কোন তিক্ততা পুষে রাখেনি, মনে এর জন্য এলিজাবেথ ডার্সিকে নিঃশব্দে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলে।

এর পর আপন আপন চিন্তায় মগ্ন হয়ে দু'জন নিঃশব্দে পথ অতিক্রম করতে লাগল। খুশী হলেও আত্মতৃপ্ত হতে পারেনি এলিজাবেথ। সে সম্ভাবনা এখনো দিগন্ত অন্তরালে। তবে উল্লসিত হয়েছে যে, তাতে সন্দেহ নেই। যেচে নিজের বোনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রস্তাবটুকুই এলিজাবেথের প্রতি অপরিসীম সৌজন্যের প্রকাশ। তারা যখন ডার্সিদের বাগানে অপেক্ষমান গাড়ীর নিকটবর্তী হোল, তখনও মাসীমা, মেসো মশায় অনেক পিছনে পড়ে রয়েছেন।

ডার্সি তাকে বাড়ীর ভিতর গিয়ে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ জানাল। কিন্তু এলিজাবেথ সেইখানেই অপেক্ষা করা ভালো মনে করলে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ, এই দু'টি প্রেমিক-চিত্তের নির্জন সঙ্গসুখ, এই মৌন-মুখর মুহূর্তে হৃদয়ের কত নিভৃত কথার বিনিময় হতে পারত। নীরবতা যে এমন জগদ্দল পাথরের মত বুকে চেপে বসে তা আগে কখনো জানত না এলিজাবেথ। কত কথা বলতে চাইলে সে, কিন্তু সব কথাই যেন মুখে বেধে গেল। নির্বাণী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এলিজাবেথ।

চুয়াল্লিশ

এলিজাবেথ ভেবে রেখেছিল যে, বোনকে নিয়ে সত্ত-সত্তই দেখা করতে আসবে ডার্সি তাদের হোটেলে। অন্ততঃ সেই দিন সকালটুকু সে মোটেই চোখের আড়াল করবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, তার অনুমান মিথ্যায় পর্যবসিত হোল। তাদের হোটেলে ফেরার দিন সকাল বেলাই অতিথিরা এসে উদয় হলেন হোটেলে। সকালটুকু এখানেরই এক পরিবারের সঙ্গে

প্রাতর্ভ্রমণ সেরে তারা সেই মাত্র সাজ-প্রসাধন করে আহারের উদ্যোগ করছেন, এমন সময় গাড়ীর আওয়াজে তাঁরা তিন জনে ছুটে গেলেন জানলার ধারে। গাড়ী থেকে নামতে দেখলেন একটি সুপুরুষ যুবক ও একটি সুবেশা তরুণীকে। সেই সুন্দর শকট ও তার সুরুচিসম্পন্ন আরোহীদের দেখেই এলিজাবেথ বুঝতে পারলে এ অভ্যাগত দু'টি কে। মাসীমাকে সে প্রায় আশ্চর্য করে দিল এ সংবাদে। আজকের এই আগমনের সঙ্গে বোনঝির চঞ্চলতাকে সংযোগ করে তাঁরা যেন এই নূতন পরিপ্রেক্ষিতে নূতন আলো দেখতে পেলেন। দু'জনেরই আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। এ তাঁরা ইতিপূর্বে কল্পনাও করতে পারেননি। কিন্তু ডার্সির মত যুবকের কাছ থেকে এতখানি স্নিগ্ধতার পরিচয় পেয়ে তাঁদের বুঝতে বাকী রইল না যে, এলিজাবেথের প্রতি ডার্সির হৃদয়ের একটা নিভৃত কোণ রসসিক্ত হয়েছে। তাঁরা এতখানি ভাবছিলেন যখন, এলিজাবেথের বুকের ভিতর তখন আবেগ অধীর হয়ে উঠেছে। আর ক্ষণে ক্ষণে সে আবেগ যেন বাঁধ-ভাঙা জলের মত উদ্দাম হয়ে উঠছিল। মনের স্থিরতা অটুট রাখা যেন দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিল এলিজাবেথের পক্ষে। তার কেবলি ভয় হচ্ছিল, হয়ত বা ভাই তার সম্বন্ধে বোনের কাছে এমন উচ্চগ্রামে প্রশংসা করেছে যে, বোনের কাছে সে হেয় প্রতিপন্ন হবে এলিজাবেথের ব্যবহারে ও রূপে। হয়ত বা তাকে খুসী করার দুরন্ত সাধনায় সে পদে পদে ত্রুটি ঘটিয়ে ফেলবে।

পাছে চোখাচোখি হয় এই ভয়ে জানলা থেকে সরে এল সে। ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে ঘুরতে ঘুরতে মাসীমা মেসো মশায়ের অবাক চোখের দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হতেই তার যেন মনের স্থৈর্য ভেঙে খান-খান হয়ে যেতে লাগল।

ভাই-বোনে ঘরে প্রবেশ করলে এলিজাবেথ ডার্সির বোনের সঙ্গে পরিচিত হোল। প্রথম ভয়ের ভাব কেটে গেলে লক্ষ্য করে দেখলে এলিজাবেথ যে, তার চেয়েও বেশী বিপন্ন বোধ করছে ডার্সির বোন। সে ত শুনেছিল যে, মেয়েটি দাম্ভিকা। কিন্তু সামান্য পরিচয়েই তার বিশ্বাস বদ্ধমূল হোল যে, সে ভুল সংবাদ সংগ্রহ করেছে। অহঙ্কারী দেমাকী নয়ই, বরং তাকে লজ্জাবতী বলা চলে। এই মেয়েটির মুখে দু'-এক কথা ভিন্ন আর কোন প্রত্যুত্তর সে আদায় করতে পারলে না।

তার তুলনায় দীর্ঘাঙ্গী ডার্সির বোন। ষোল বছর পার হয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে শরীরে মধু-রস সঞ্চিত হয়েছে কোষে-কোষে। কিশোরী ইতিমধ্যেই সুগঠিতা নারীতে পরিণতি লাভ করেছে। ভায়ের মত অত সুন্দর না হলেও মেয়েটির সর্বাঙ্গ সুলক্ষণযুক্তা। মুখে একটি শান্ত শ্রী আছে যা মনকে খুশী করে। আর সর্বোত্তম হোল তার সরলতা ও শীলতা। ডার্সির বোনকে দেখার আগে যে মানসিক উদ্দীপনায় ত্রস্ত হয়েছিল এলিজাবেথ, এখন তা থেকে মুক্তি পেয়ে যেন সে নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

অল্পক্ষণ পরে ডার্সি সানন্দে ঘোষণা করলে যে, এই পার্টিতে বিংলে এসে এখুনি যোগ দেবে। এলিজাবেথ আর একটি মাননীয় অতিথির আগমনের জন্য প্রস্তুত হবার পূর্বেই নূতন আগন্তুকের সশব্দ দ্রুত পদধ্বনি শোনা গেল সিঁড়িতে এবং চকিতের মধ্যে বিংলে এসে ঘরে প্রবেশ করল। বিংলের প্রতি তার যত ক্ষোভ ছিল, তা কত দিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেটুকু অবশিষ্ট থাকতে পারত তার মনের কোন গোপনতম কোণে, তা মুহূর্তে দূর হয়ে গেল বিংলের সাদর সম্ভাষণে। সেই চির-পরিচিত প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতার সঙ্গেই বিংলে তার সম্বন্ধে ও বেনেট-পরিবারের সম্বন্ধে কুশল সংবাদ জেনে নিলে।

বিংলের সম্বন্ধে মাসীমা ও তাঁর স্বামীর ঔৎসুক্যও বড়ো কম ছিল না। বিংলেকে তাঁরাও দেখতে চাইতেন। কিন্তু এই নবীন তরুণ-তরুণীদের সাহচর্যে বসে তাঁদের অভিজ্ঞ চোখ অনেক কিছুর মধ্যে এইটুকু আবিষ্কার করতে পারলে যে, এদের মধ্যে এক জন অন্ততঃ প্রেমের ফাঁদে বন্দী হয়েছে। মেয়েটির সম্বন্ধে তাদের অণুমাত্র সন্দেহ-সংশয় থাকলেও, ছেলেটির মুগ্ধতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

এলিজাবেথ শুধু যে নিজেকে ধীর ভাবে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করছিল তা নয়, সেই সঙ্গে তার অভ্যাগতদের প্রত্যেকের মনের কথা সত্যি করে জেনে নেবার প্রয়াস করছিল। অন্ততঃ তার এ ভয় ছিল না যে, এদের কেউই তার উপর অসন্তুষ্ট হতে পারে। বিংলে যে তার সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান সে ত নিশ্চিত। ডার্সির বোন সমুৎসুক। ডার্সি নিজে খুশী হবার জন্যই এসেছে আজ।

বিংলেকে দেখার পরই দিদির কথা মনে পড়ল এলিজাবেথের। তাকে দেখে জেনের কথাও কি মনে পড়ল না বিংলের? কত বার মনে হোল, আগের চেয়ে যেন স্বল্পভাষী হয়েছে বিংলে। যেন মুগ্ধ উদাস নেত্রে সে তার দিকে চেয়ে আর একটি মুখের সাদৃশ্য খুঁজছে। অন্ততঃ ডার্সির বোনের প্রতি বিংলের দৌর্বল্য সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি তার কানে এসেছিল, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হোল এলিজাবেথ। আলাপের অনেক মুহূর্তে যেন মনে হোল যে, তাদের মধ্যে গভীর কোন মৈত্রী-বোধ সঞ্জাত হয়নি। বরং নানা ভাবে জেনের প্রসঙ্গ ফিরিয়ে আনার চেষ্টাই যেন করছিল বিংলে। কত স্নিগ্ধতা মিশিয়ে সে যেন উল্লেখ করছিল সেই নামটির, যদিও অনেকটা সন্ত্রাসের সঙ্গে। বাকী দু'জন যখন নিজেদের মধ্যে আলাপে মত্ত তখন তাকে উদ্দেশ করে বিংলে বললে, 'কত দিন হোল তোমার দিদির সঙ্গে দেখা হয়নি!' তার গলায় যেন বেদনা মুখর হয়ে উঠল—'আট মাস হয়ে গেল ইতিমধ্যে। গত বছরের ছাব্বিশে নভেম্বর আমাদের শেষ বারের সাক্ষাৎ হয়। তখন আমরা নেদারফিল্ডের নাচের আসরে সকলে মিলিত হয়েছিলাম।'

বিংলের স্মৃতিশক্তি দেখে খুশীই হোল এলিজাবেথ। এখনও সবাই লঙবোর্ণে আছে কি না যখন প্রশ্ন করলে বিংলে, তখন এলিজাবেথের বুঝতে বাকী রইল না, কি কথা লুকিয়ে আছে প্রশ্নকারীর মনে। কার কথা সে জিজ্ঞাসা করতে চায় ছল ক'রে।

আর ডার্সি যেন হৃদ্যতা ও সৌজন্যের প্রতীক। তার এই পরিবর্তন এলিজাবেথের মনে এক গভীর তৃপ্তিবোধ জাগ্রত করল। আজ কত অগ্রসর হয়ে সে সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে। অথচ এই ত কিছু দিন আগেও সে এলিজাবেথের আত্মীয়দের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আপন আভিজাত্যের ক্ষুণ্ণতা বলে মনে করেছিল।

আধ ঘণ্টা পরে অতিথিরা বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ভাই-বোনে এঁদের অনুরোধ জানালে, যেন এই দেশ ত্যাগ করার আগে তাঁরা একবার ডার্সির গৃহে আতিথ্যের পদধূলি দেন। মাসীমা

ও মেসো মশাইকে সে বিশেষ করে বললে। বোনও ডার্সির সঙ্গে যোগ দিলে। মাসীমা সব দিক বিবেচনা করে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। আগামী পরশু দিন এঁরা ডার্সিদের বাড়ীতে যাবেন স্থির হোল।

এলিজাবেথের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনায় এবং তাকে আরো অনেক কথা বলতে পারবে এই প্রত্যাশায় বিংলে আন্তরিক উল্লসিত হোল। দিদির সম্বন্ধেই তার কাছে নানা কথা শোনবার জন্য লুব্ধ হয়েছে বিংলে, এই ভেবে এলিজাবেথও সুখী হোল। অতিথিরা বিদায় নেবার পর অনেকক্ষণ ধরে সেই আধ ঘণ্টার মধু-স্মৃতিটুকু রোমন্থন করলে সে। কিন্তু মুহূর্তে মুহূর্তে সময় যত গড়িয়ে যেতে লাগল, ধীরে ধীরে সেই মনের মাধুরী যেন ফিকে হয়ে আসতে লাগল। মাসীমা ও মেসো মশায়ের মুখ থেকে বিংলের প্রশংসাটুকু শুনে নিয়ে সে প্রসাধনের ছলে পালিয়ে গেল তাঁদের সামনে থেকে। পালিয়ে গেল এই ভয়ে যে, তাঁরা হয়ত নানা কথা উত্থাপন করবেন তার কাছে। এখন তার আর লোক-সঙ্গ ভাল লাগছিল না। একান্তে নিজের মনকে নিয়ে নিরিবিলি হতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল সে।

এলিজাবেথ এইটুকু ভুল বুঝেছিল। এঁরা তার কাছ থেকে কোন কিছুই জোর করে আদায় করতেন না। ডার্সির সঙ্গে তার পরিচয় যে অনেক ঘনিষ্ঠ, এ বুঝতে তাঁদের বাকী ছিল না। এতখানি প্রীতির কথা অবশ্য তাঁদের ধারণার অতীত ছিল। ডার্সি যে তাঁদের বোনঝিকে গভীর ভাবে ভালবাসে এ সত্য গোপন ছিল না।

অন্ততঃ ডার্সির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ও আলাপ যতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাতে কোন খুঁত পাননি ডার্সির চরিত্রে বা বাক্যে। ডার্সির মার্জিত ভব্যতায় প্রীত না হয়ে উপায় নেই। তা ভিন্ন কেবল মাত্র নিজেদের ধারণা এবং দাস-দাসীদের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে যদি তাঁরা ডার্সির সম্বন্ধে নিজেদের ধারণা পোষণ করতেন, তবে হার্টফোর্ডশায়ারের ডার্সির সঙ্গে এই চেনা ডার্সির মিল খোঁজা দুষ্কর হোত। এ কথা সত্যি, যে মানুষ চার বছরের শিশু থেকে দেখে দেখে, আজ এত দিন পরেও তার সম্বন্ধে এমন ভাল রিপোর্ট পেশ করে, তার কথা সহজে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে না। ডার্সির একমাত্র দোষ তার আত্মবোধ। কিন্তু মানুষটির উদারতা কম নয়। এই দেশে সে গরীবের সুহৃদ বলে খ্যাত।

উইকহ্যামকে এখানে অধিকাংশ লোক শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখে না। তার বাবার মালিকের ছেলের সঙ্গে তার সম্বন্ধটুকু অনেকখানি ধোঁয়াটে হলেও, এটুকু তাঁরা সংগ্রহ করতে পেরেছেন যে, উইকহ্যাম এখান থেকে যাবার আগে বহু টাকা ঋণ করে গিয়েছিল যা ডার্সি পরে শোধ করে দিয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যায় যখন সশরীরে ডার্সিদের বাড়ীতে উপস্থিত ছিল, তার চেয়েও যেন বাস্তব ভাবে সেখানে মন দিয়ে বসেছিল এলিজাবেথ আজ সন্ধ্যায়। আজকের সন্ধ্যা কত দীর্ঘ মনে হচ্ছে তার কাছে। কিন্তু এই কালের দীর্ঘতা তার মনের এই সরল প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারলে না, ডার্সিকে সে কতখানি চায়। দু'ঘণ্টা ধরে বিছানায় জেগে শুয়ে এলিজাবেথ সেই সমস্যার সমাধান করতে পারলে না। ডার্সিকে সে ঘৃণা করে না। শুধু করে না নয়, এক দিন যে বিরাগ জন্মেছিল তার মনে, সে কথা ভাবতে লজ্জায় তার মরে যেতে ইচ্ছা হোল। ডার্সির আচরণে যে প্রীতি সঞ্জাত হয়েছিল মনে, ধীরে ধীরে সেই প্রীতি যেন অনুরাগে রূপান্বিত হয়ে উঠছে। মন ছাপিয়ে উঠছে কৃতজ্ঞতায় এই কথা স্মরণ করে যে, তিনি তাকে এক দিন ভালবেসেছিলেন। তার অনেক রূঢ়তা ও প্রত্যাখ্যানের পরেও আজো তেমনি গাঢ় ভাবেই ভালবাসেন তাকে। যাকে পরম শত্রু মনে করে এড়িয়ে যাবে ভেবেছিল এলিজাবেথ, সেই তিনি কেবল যে সুষ্ঠু ভাবে, সৌজন্যের সঙ্গে তার সঙ্গে ব্যবহার করলেন তা নয়, সেই পরম শত্রু তার বন্ধুতার জন্য যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন, যেচে তার আত্মীয়বর্গের সঙ্গে পরিচিত হলেন, পরিচয় করিয়ে দিতে চাইলেন নিজের সর্বাধিক প্রিয় বোনের সঙ্গে। এতখানি নিষ্ঠার একমাত্র উৎস হতে পারে প্রেম, অন্য কোন অনুভূতি নয়। ডার্সির প্রতি শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল তার মন। কি করলে তিনি সুখী হবেন, তারা দু'জনে সুখী হবে তাই এখন ধ্যান-জ্ঞান হোল এলিজাবেথের।

মাসীমা বললেন, ওরা যে ভাবে সদ্য আতিথ্যের পরিচয় দিয়েছে, সে হিসাবে আমাদেরও উচিত কাল সকালেই গিয়ে দেখা করা। এ প্রস্তাবে তৃপ্ত হোল এলিজাবেথ। কিন্তু কেন তার খুশী, তা নিজেকে বোঝাতে পারলে না সে।

পঁয়তাল্লিশ

বিংলের বোনের বিরাগ যে তার প্রতি অসূয়া-প্রসূত এ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিন্ত হবার পর এলিজাবেথ এ কথা না ভেবে পারল না যে, পেম্বার্লিতে তার উপস্থিতি সে অত্যন্ত অপ্রীতির চোখেই দেখবে। কিন্তু ডার্সির বোন কতখানি সৌজন্যের সঙ্গে তাকে স্বাগতম্ জানায় সেটা পরখ করতেই সে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠল।

ডার্সিদের বাড়ী পৌছানোর পর তাঁদের হল-ঘর দিয়ে একটি প্রশস্ত ও সুসজ্জিত কক্ষে নিয়ে যাওয়া হোল—গ্রীষ্ম-সমাবেশে এর উত্তরাংশ বেশ মনোরম হয়ে উঠেছে। বাতায়ন উন্মুক্ত করলেই গৃহের পশ্চাৎ দিকের বনাকীর্ণ সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী আর লনের ওক ও চেষ্টনাটের সারি চোখে স্নিগ্ধ কজ্জল বুলিয়ে দেয়।

এই ঘরটিতেই ডার্সির বোন তাদের সবাইকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। বিংলের বোন চকিত দৃষ্টিপাতেই কর্তব্য সমাপন করল। অতিথিরা আসন নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল ঘরে। প্রিয়দর্শিনী স্নিগ্ধস্বভাব মিসেস্ এ্যানীসলেই প্রথমে কোন একটা বিষয় নিয়ে আলাপের সূত্রপাত করলেন এবং মাসীর সঙ্গে যোগ দিয়ে এলিজাবেথ সে আলাপ অব্যাহত গতিতে চালিয়ে নিতে লাগল। ডার্সির বোনও ভয়ে ভয়ে দু'-একটা কথা উচ্চারণ করছিল।

এলিজাবেথ আবিষ্কার করল যে, বিংলের বোন তাকে গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করছে এবং তার মনোযোগ এড়িয়ে কাউকে, বিশেষ করে ডার্সির বোনকে একটি কথাও বলা সম্ভব নয়। কিন্তু কথা বলতে না পারায় এলিজাবেথ দুঃখিত হোল না মোটেই। প্রতি মুহূর্তেই সে প্রত্যাশা করছিল পুরুষরা কেউ না কেউ এসে পড়বে। পুরুষদের সঙ্গে গৃহস্বামী নিজে এলে সে খুশী হয় কি দুঃখিত হয়, এই দোলায় দুলছিল সে। কিসে সে খুশী হবে তা যেন নিজেই স্থির করতে পারছিল না। প্রায় পনের মিনিট নীরবে বসে থাকার পর বিংলের বোন মামুলি ভাবে এলিজাবেথকে প্রশ্ন করল পারিবারিক কুশল সংবাদ। সমান উদাসীন ও সংক্ষিপ্ত উত্তর এল এলিজাবেথের। এর পর আর কোন কথাই উচ্চারিত হোল না।

এই সময় চাকরেরা খাবার নিয়ে এসে যেন সকলকে উদ্ধার করলে। অতিথিরা আবার একটা কাজ হাতে পেল। মুখে কথা না বললেও খেতে মানা নেই তো কারুর।

এলিজাবেথ এবার চিন্তা করার অবসর পেল—ডার্সির উপস্থিতি সে কামনা করে—না ভয় করে। মুহূর্ত কাল আগে তার উপস্থিতি কামনা করলেও ডার্সি যখন সশরীরে উপস্থিত হোল, সে কিন্তু অনুতাপ বোধ করতে লাগল এই প্রত্যাশার জন্ম।

ডার্সি কক্ষে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এলিজাবেথ যথাসম্ভব নিজেকে সহজ ও অচঞ্চল রাখার সংকল্প করল। কিন্তু এ সংকল্প বজায় রাখা খুব সহজ হোল না। কারণ, ডার্সি কক্ষে পদার্পণ করা মাত্রই তাদের দু'জনের প্রতি ঘরের সকলের কেমন একটা সন্দেহের ভাব জাগ্রত হয়ে উঠল এবং ডার্সির প্রতিটি আচরণ অতি তীক্ষ্ণ নেত্রে নিরীক্ষণ করতে লাগল সবাই। বিংলের বোনের মুখে হাসি সত্ত্বেও এই কৌতূহল সব চেয়ে উদগ্র ভাবে প্রকট হয়ে উঠল। ঈর্ষা এখনও তাকে সম্পূর্ণ মরীয়া করে তুলতে পারেনি এবং ডার্সির প্রতি তার মনোযোগের পালাও শেষ হয়ে আসেনি আজো। দাদা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ডার্সির বোন বেশ সহজ ভাবে কথা বলার জন্ম উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। ডার্সিও তার বোনকে এলিজাবেথের সঙ্গে আলাপচারি দেখতে উদ্‌গ্রীব এবং সর্বপ্রকারে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ করে দিতে লাগল। এ সব কিছুই বিংলের বোনের দৃষ্টি এড়াল না। অসহ্য ক্রোধে আত্মহারা বিংলের বোন প্রথম সুযোগেই বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলল—'মিস্ এলিজা, সৈন্যরা নিশ্চয়ই মেরীটন থেকে চলে গেছে। তোমাদের পরিবারের পক্ষে এ অপূরণীয় ক্ষতি।'

ডার্সি উপস্থিত থাকায় উইকহামের নামোল্লেখ করতে সাহসী হোল না সে, কিন্তু তার নাম যে জিহ্বাগ্রে রয়েছে তা এলিজাবেথ সহজেই বুঝতে পারলে। উইকহাম সম্পর্কিত নানা স্মৃতি মুহূর্তের জন্ম এলিজাবেথকে পীড়িত করে তুলল। কিন্তু মনের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম দ্বারা এই অসৌজন্যোচিত আক্রমণ উপেক্ষা করে স্বাভাবিক নিরাসক্ত কণ্ঠেই উত্তর দিল সে। কিন্তু উত্তর দিতে গিয়ে অজ্ঞাতসারেই ডার্সির দিকে মুখ ফেরাতেই দেখতে পেল ডার্সি আরক্ত মুখে সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। আর তার বোন লজ্জায়, হতবুদ্ধিতায় মাথা নীচু করে চেয়ে আছে মাটীর দিকে।

বিংলের বোন যদি জানত এই আচরণ দ্বারা সে তার প্রিয় বান্ধবীর কী গভীর মর্মবেদনার কারণ ঘটিয়েছে সে নিঃসন্দেহ বিরত থাকত এই প্রকার বক্র ইংগীত থেকে। কিন্তু এলিজাবেথকে লজ্জায় ফেলতেই চায় সে। এই ভাবে ডার্সির চোখে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য।

তবু এলিজাবেথের প্রশান্ত আচরণ তার উত্তেজনাকে প্রশমিত করল। বিংলের বোন নিরুৎসাহ হয়ে আর উইকহামের ধার ঘেঁসে গেল না। ডার্সির বোনও ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল যদিও স্বাভাবিক ভাবে গল্প করার মত মনের সমতা আর ফিরে এল না। দাদার সঙ্গে চোখাচোখি হতে ভয় পাচ্ছিল সে। যে ঘটনার প্রকাশ দ্বারা তাদের মনোযোগকে এলিজাবেথের দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয়েছিল, বরং তারই সুবাদে এলিজাবেথের প্রতি তারা আরো বেশী মনোনিবেশ করল—গল্প চলল সহর্ষ গতিতে।

কিন্তু এলিজাবেথরা আর বেশীক্ষণ রইল না। ডার্সি তাদের গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল। আর বিংলের বোন এলিজাবেথের আচরণ, চেহারা ও পোষাক নিয়ে তুমুল নিন্দাবাদ সুরু করে দিল ঘরে। কিন্তু ডার্সির বোন এ নিন্দায় যোগ দিল না। দাদার প্রশংসাই তার পক্ষে যথেষ্ট—দাদার বিচার-বুদ্ধির ভুল হতে পারে না কখনো। আর ডার্সি এমন অকুণ্ঠিত ভাষায় এলিজাবেথের প্রশংসা করেছে যে, তাকে সুন্দরী মনোরমা ছাড়া কিছুই ভাবতে পারলে না সে। ডার্সি ফিরে এলে তার বোনকে যা-যা বলেছে তার কিয়দংশ তার কাছেও পুনরাবৃত্তি না করে থাকতে পারলে না বিংলের বোন।

—'এলিজাবেথকে এমন কুৎসিত দেখতে হয়েছে। গেল শীতের পর কারুর যে এমন পরিবর্তন হতে পারে আমি জীবনে আর কখনো দেখিনি। ওর রঙ কেমন রূঢ় কালচে হয়ে উঠেছে। লুসি আর আমি এইমাত্র বলাবলি করছিলাম ওর সঙ্গে যেন দেখা না হলেই ভাল হোত।'

এ মন্তব্য অপছন্দ করলেও ডার্সি শুধু নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, ওর রং একটু ঝলসে যাওয়া ছাড়া আর কোন পরিবর্তন তার চোখে পড়েনি।

—'সত্যি কথা বলতে কি, ওর চেহারায় কোন সৌন্দর্য্যই খুঁজে পাইনে আমি'—ঈর্ষান্বিত রসনা তবুও হাল ছাড়ল না—'মুখটা কেমন সরু হয়ে গেছে। গায়ের রংয়ে একটুও চাকচিক্য নেই। সর্বাঙ্গে না আছে কোন শ্রী। নাকটা যেন কেমন ধারা। দাঁতগুলো চলনসই বলা যেতে পারে—তবে এমন অসামান্য কিছু নয়। আর চোখে—যা না কি অনবদ্য বলা হোত এক সময়—আমি তো বিস্ময়কর কিছুই খুঁজে পাই না। কেমন একটা তীক্ষ্ণ কোপন দ্যুতি—যা আমি অপছন্দই করি। সব কিছু মিলে ওর চেহারায় ফ্যাশানহীন একটা সম্পূর্ণতা আছে যা অসহনীয়।'

বিংলের বোনের ধারণা, এলিজাবেথ ডার্সির মনে রং ধরিয়েছে। ক্রোধোন্মত্ত নারী সব সময় সমুচিত কাজ করে না। ডার্সিকে কিছুটা বিচলিত দেখে সে ভাবলে তার উদ্দেশ্য আশানুরূপ সফল হয়েছে। কিন্তু ডার্সি কঠোর নীরবতা বজায় রেখে যেতে লাগল। ডার্সিকে কথা বলাবেই এই দৃঢ় সংকল্প নিয়েই যেন সে আবার সুরু করল।

—'প্রথম যেদিন হার্টফোর্ডশায়ারে দেখা হয় ওদের সঙ্গে, ওর রূপ দেখে সবাই আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। আমার বেশ মনে আছে, নেদারফিল্ডে এক রাত্রে ডীনার শেষে তুমিই না মন্তব্য করেছিলে—মেয়েটি যেন সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি।'

—'হ্যাঁ'—উত্তর এল ডার্সির—নিজেকে আর সে কিছুতেই দমন করতে পারলে না—'সে সেই প্রথম যবে দেখা হয়েছিল। আমার পরিচিত মেয়েদের মধ্যে তাকেই সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা মনে করি আমি।'

এই বলে ডার্সি বিদায় নিল।

মাসীমা আর এলিজাবেথ গৃহে ফিরে আজকের ব্যাপার নিয়ে বিশদ আলোচনা করল নিজেদের মধ্যে। প্রত্যেকের চেহারা, চাল-চলন নিয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা হোল। শুধু একটি মাত্র মানুষের কথা ছাড়া—যে সবার মনোযোগ অধিকার করেছিল। তারা তার বোন, তার বন্ধু-বান্ধব, তার বাড়ী—সব কিছু নিয়েই আলোচনা করলে, শুধু মাত্র তাকে বাদ দিয়ে। ডার্সি সম্বন্ধে মাসীমার কি ধারণা, জানতে ভারী উদ্‌গ্রীব ছিল এলিজাবেথ। কিন্তু বোনঝি যদি আলোচনার সূত্রপাত করত খুশীই হতেন তিনি। [ক্রমশঃ।

বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

আমরা যে এই তাল ঠুকে বলছি রবীন্দ্রসংগীত বিশুদ্ধ ভাবে শেখাব—সেই বিশুদ্ধতার প্রমাণ ও মাপকাঠি কী? এবং শেষ নিষ্পত্তির বিচারক কে?—স্বভাবতঃই মনে হয় যিনি সুর-রচয়িতা। কিন্তু এইখানেই ত সমস্যার মূল বা গোড়ায় গলদ। য়ুরোপীয় সংগীতে সুরকার এবং স্বরলিপিকার একই ব্যক্তি, সুর ও সুরলিপি অঙ্গাঙ্গিভাবে একত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে; সুতরাং সে সুর সম্বন্ধে সর্বসাধারণের মতভেদ হবার কোনো অবকাশই থাকে না।—পাশ্চাত্যের সঙ্গে কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে দু'টি মস্ত বড় প্রভেদ আছে। একটি হচ্ছে এ দেশে রাগ-রাগিণীর অস্তিত্ব এবং প্রভাব, যার ফলে মার্গসংগীতে প্রত্যেক গানের সুরের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা অপেক্ষা তার রাগের রূপ দেখাবার দিকেই ওস্তাদের ঝোঁক থাকে বেশী। অথবা আমি অনেক সময় যা বলি, অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও আমরা ব্যক্তির চেয়ে জাতিকেই বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকি। এবং দেশী সংগীতেও বহু কাল সেই ধারা চ'লে এসেছে। দ্বিতীয় বিশেষত্বটি এই যে—আমরা কানে শুনে গান শিখি, চোখে দেখে নয়; শ্রুতিই আমাদের কাছে প্রামাণ্য, লিপি নয়। স্বরলিপির প্রচলন অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও অনভ্যস্ত ব'লে এখনো তা তেমন বিস্তার বা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি।

কিন্তু শ্রুতিকে আমরা যতই মান্য মনে করি না কেন, স্মৃতির উপর তা নির্ভর করতে বাধ্য; এবং দুঃখের বিষয়, স্মৃতিবিভ্রম ঘটতেও বাধ্য। তাই সুরের পাখি ফাঁকি দিয়ে এক কান দিয়ে ঢুকে আর-এক কান দিয়ে যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, সেই জন্য ডানা একটু ছাঁটতে হলেও আজকাল আমরা তাকে স্বরলিপির খাঁচায় পুরে রাখবার পক্ষপাতী। উপরোক্ত কথাগুলি মনে রাখলে রবীন্দ্রসংগীতের বিশুদ্ধতা রক্ষার সমস্যা ক্রমশ স্পষ্টরূপে বোঝা ও বোঝানো সহজ হবে। বিশুদ্ধতার কথা তুললেই সঙ্গে সঙ্গে আর পক্ষে অবিশুদ্ধতার অস্তিত্বস্বীকার অবশ্যম্ভাবী। গান ভুল সুরে অর্থাৎ রকমারি সুরে গাওয়া প্রচলিত না থাকলে সেগুলির একমাত্র ঠিক সুর শেখাবার জন্য সভা-সমিতির এত মাথাব্যথা হ'ত না। এখন এই ভুল কেন হয় আর তার সংশোধনের উপায়ই বা কী, বর্তমানে সেই সমস্যার সমাধান করতে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

পূর্বেই বলেছি যে সুরে ভুল হবার মূল কারণ এই যে, আমাদের দেশে বহু কালাবধি শ্রুতিশিক্ষাই ছিল প্রথা, স্মৃতির উপর শ্রুতির নির্ভর অনিবার্য, এবং স্মৃতিবিভ্রম হওয়াও অনিবার্য। সেই জন্য সুর রচনা করবার সঙ্গে সঙ্গেই তা স্বরলিপিতে আবদ্ধ করতে পারলে এ ভুল অতি সহজেই নিবারণ হয়; যেমন য়ুরোপে হয়ে থাকে। এও বলেছি যে, আমাদের সংগীতে আবহমান কাল থেকে রাগ-রাগিণীর প্রভাব এত বেশী যে, গানবিশেষের সুরের নির্দিষ্ট স্বরবিন্যাস অবিকৃত রাখার চাইতে তার রাগের রূপ অবিকৃত রাখার প্রতিই আমাদের লক্ষ্য থাকে বেশী। তাতে মূল সুরের ইতরবিশেষ হলে ক্ষতি হয় ব'লে মনে করা দূরে থাক্—প্রত্যেক গায়ককে সে স্বাধীনতা দেওয়াই কর্তব্য এবং সেই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারের উপরে তার গুণপনা নির্ভর করে ব'লে মনে করি।

এখন রবীন্দ্রসংগীতকে এই দুই তত্ত্বের কষ্টিপাথরে কষে দেখলে কী পাই?—অবশ্য তাঁর জন্মের আগে থেকেই বাংলাদেশে স্বরলিপির প্রচলন হয়েছিল; সুতরাং তিনি ইচ্ছে করলে সুর রচনা করবার সঙ্গে সঙ্গে যে তা লিখে ফেলতে পারতেন না, তা নয়; এবং তা করলে ভবিষ্যতে অনেক গণ্ডগোলই মিটে যেত। কিন্তু অনভ্যাস-বশতঃই হোক, আর অনাবশ্যকবোধেই হোক, আর আমাদের ভাগ্যদোষেই হোক, তিনি সে কাজ করেননি, তা সকলেই জানি। তবে এও জানি যে ঠিক প্রথম বয়সে না হোক, পরবর্তী জীবনে, বেশ সময় থাকতেই অন্যান্য লোকে তাঁর হয়ে এই অবশ্যকর্তব্য কাজ ক'রে দিয়েছেন। এবং সে জন্য তাঁদের প্রতি আমরা অতিশয় কৃতজ্ঞ, কারণ তাঁরা এই পরিশ্রমটি না করলে কত সুন্দর সুন্দর গানের সুর যে কোথায় ভেসে যেত তার ঠিক নেই; আর ভারতীয় ভাণ্ডারের একটি অপরূপ মণিকোঠা শূন্যপ্রায় প'ড়ে থাকত। কারণ সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। একটি হচ্ছে তাঁর নিজের সুর নিজে ভোলবার অসাধারণ ক্ষমতা। আর একটি হচ্ছে বেশির ভাগ সুরে প্রচলিত রাগ-রাগিণীর কাঠামো অবলম্বন করলেও প্রত্যেক গানকে স্বাতন্ত্র্য দান করা; অর্থাৎ পূর্বকথিত পুরাপ্রথার বিরোধে তাঁর গানে রাগের জাতি অপেক্ষা সুরের ব্যক্তিত্বই বেশী পরিস্ফুট ও সেই জন্যই তাঁর গানের স্বরলিপি এবং বিশুদ্ধ স্বরলিপি থাকা এত অত্যাবশ্যক!

এ স্থলে কথা উঠতে পারে যে, যদি তাঁর জীবিতকালে তাঁর অধিকাংশ গানই স্বরলিপিবদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে অন্তত সেগুলি সম্বন্ধে ত কোনো সমস্যা ওঠে না, "যথা দৃষ্টং তথা গীতং" করে গেলেই ত হল, তার জন্য এত মাথা ঘামানো কেন?—কিন্তু এখানেও একটু সূক্ষ্ম বিবেচ্য আছে; ব্যাপারটা অত সোজা নয়।

শাস্ত্র এবং লোকাচারের নজির দেখালেই বিষয়টা সহজেই বোধগম্য হবে। শাস্ত্রবিদ্যা পুঁথিগত ভাবে সমান থাকলেও যেমন কালক্রমে ভিন্ন দেশকালপাত্রে ভিন্ন আচারে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি মূল স্বরলিপি এক হলেও তাঁর দীর্ঘজীবনের মধ্যেই গায়কীতে ভিন্নতা এসে পড়া আশ্চর্য নয়, এবং তা এসেওছে। তারও প্রধান কারণ, স্বরলিপি থাকা সত্ত্বেও আমাদের সেই সেকেলে কানে শুনে শেখবার অভ্যাস এখনও বলবত্তর। তিনি থাকতে তাঁর কাছে সন্দেহস্থলে সন্দেহভঞ্জন করে নেওয়াই বুদ্ধির কাজ হ'ত। কিন্তু

প্রথমতঃ, তিনি সুর রচনা ক'রে এবং শিখিয়েই খালাস, মনে ক'রে রাখা তাঁর ধাতে ছিল না, সে কথা আগেই বলেছি। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর গানের এবং শিক্ষকের এবং ছাত্রের এবং স্বরলিপিকারের সংখ্যাধিক্য বশতঃ কোনো এক কর্তৃত্বের অধীনে এনে সংশোধনকার্য পরিচালনার সুযোগ ইতিপূর্বে ঘটেনি; কিম্বা হয়ত আবশ্যকতাও অনুভূত হয়নি। এখন যদি হয়ে থাকে ত তার কারণ, রবীন্দ্র-সংগীতের ব্যাপক প্রচারের দরুণ তার উত্তরোত্তর বিকৃতি ক্রমশ প্রকট হচ্ছে, এবং তাঁর সংগীতভক্তদের তার একটা বিহিত করা কর্তব্য ব'লে বোধ হচ্ছে।

রোগের অস্তিত্ব অর্থাৎ মুখে মুখে সুরের নবজন্মপরিগ্রহসাব্যস্ত এবং তার কারণ মোটামুটি নির্ণয় করা তো হল; এখন তার প্রতিবিধান কী উপায়ে হতে পারে, তাই বিচার্য। তাঁর স্বকৃত স্বরলিপির অভাবে, তিনি সাক্ষাৎভাবে যাদের শিখিয়েছেন তাদের স্মৃতি অথবা লিপিই প্রামাণ্য, সে কথা বলা বাহুল্য। তাঁর প্রথম বা মধ্যবয়সে কলকাতার লোক এবং জীবনের শেষার্ধে শান্তিনিকেতনের লোককে প্রাধান্য দেওয়া বোধ হয় অসংগত হবে না। কারণ, কলকাতা ও শান্তিনিকেতনের মধ্যে তাঁর জীবন প্রায় সমান ভাবে আধাআধি বিভক্ত হয়েছিল। প্রথম জীবনের স্বরলিপিকার হিসাবে প্রধানতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর; মধ্যবয়সের ব্রহ্মসংগীতের কাঙ্গালীচরণ সেন ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য সংগীতের শ্রীমতী প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী ও ইন্দিরা দেবী; আর জীবনের শেষার্ধে শান্তিনিকেতনের দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরাদির নাম করা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে যে দু'-এক জন শ্রুতিসাক্ষী এখনো বর্তমান, তাঁদের জবানবন্দি না নিয়ে পূর্বলিখিত সাক্ষ্য নেওয়াই ভাল; কারণ মজা দেখেছি যে, নিজে যার স্বরলিপি করেছি এমন গানও নিজেই ভুলে যেতে হয় আর প'ড়ে দেখে মনে হয় যেন নতুন কিছু শিখছি। এমনি কানের মাহাত্ম্য আর স্মরণশক্তির মহিমা! তা ছাড়া দুঃখের বিষয়, এঁদের অধিকাংশই এখন ইহজগতে নেই; তাই সব হিসেবে লিপিপ্রমাণই প্রশস্ত। এঁদের স্বরলিপি বেশির ভাগ কোন্ কোন্ বইয়ে পাওয়া যাবে, অনুসন্ধিৎসুর জন্য তার একটা ফর্দ নিয়ে দেওয়া গেল :—

স্বরলিপিকার	স্বরলিপি গ্রন্থ
	কলকাতা
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	স্বরলিপি গীতিমালা। সঙ্গীত-প্রকাশিকা। বীণাবাদিনী।
কাঙ্গালীচরণ সেন	ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি—ছয় খণ্ড।
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	গীতলিপি—ছয় খণ্ড।
শ্রীমতী প্রতিভা দেবী	ভারতী ও বালক। আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা।
শ্রীমতী সরলা দেবী	শতগান।
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	সঙ্গীত প্রকাশিকা। বীণাবাদিনী। আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা। মায়ার খেলা।
	শান্তিনিকেতন
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনাদিকুমার দস্তিদার শান্তিদেব ঘোষ শৈলজারঞ্জন মজুমদার	বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-স্বরলিপি গ্রন্থাবলী এবং বহু মাসিকপত্র—সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকাদি।

যে দুই-চার জন বিদেশী শিক্ষক ছাত্রের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁদের কার্যক্ষেত্রে সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয় বলে এ স্থলে নাম করলুম না।

এঁদের লিখিত গান স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রামাণ্য ব'লেই মানতে হবে; কারণ ধরে নিতে হবে, এঁরা সকলেই রচয়িতার কাছে স্বকর্ণে গান শুনে স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানেও গোল ওঠে :—

(১) যেখানে এই ক'জনের মধ্যে করা স্বরলিপিতেও প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

(২) যেখানে একই গানের সুর সম্বন্ধে এই ক'জনের মধ্যেও মতভেদ শ্রুত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে পূর্বতর কালের স্বরলিপি এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠের শ্রুতিস্মৃতিকেই বেশী নির্ভরযোগ্য বলে আমি মনে করি। কারণ, মূল উৎসের যত নিকটতর হয়, জল ততই নির্মল হবার কথা; তখনো ঘোলা হবার সময় পায় না। যে জন্য ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মধর্মকে শুদ্ধতর হিন্দুধর্ম মনে করেন। অপরপক্ষে প্রচলিত হিন্দুধর্মাবলম্বিগণ সে কথা মানেন না। এ স্থলে আবার সেই শাস্ত্র ও লোকাচারের তর্ক উঠে পড়ে। এবং আমি এই জায়গাতেই একটু বিশেষ সতর্ক হয়ে চলা আবশ্যক বোধ করি।

উল্লিখিত গীতালির নিয়মাবলী গঠনের সময় আমি ১৯১৫-র পূর্বপ্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীতকে সাবেক এবং তার পরবর্তী প্রকাশিত গানকে আধুনিক আখ্যা দিয়েছিলুম। তার একটা প্রধান কারণ এই যে, নোবেল প্রাইজ পাবার পর থেকে, অর্থাৎ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পর থেকে তাঁর গানের যে অফুরান উৎস খুলে গেল, তার স্রোত প্রায় শেষ পর্যন্ত বহমান ছিল; এবং সুর-প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে পূর্বতন রচনাকে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে প্রায় ভুলিয়ে দিল। কলকাতার বাস ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে উঠে আসার সঙ্গেও এ ভাগ সম্পূর্ণরূপে না হোক কতকাংশে মেলে; কারণ যদিও ব্রহ্মচর্যাশ্রম ১৯০১ সালে স্থাপিত হয়, তবুও কয়েক বৎসর পর পর্যন্তও তিনি নিয়মিত কলকাতায় যাতায়াত ক'রে এক রকম দুই দিক রক্ষা করেছিলেন। সুতরাং উভয় দিকেরই সংগীতজ্ঞ আত্মীয়-বন্ধু তাঁর নতুন নতুন গান শোনবার ও শেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, কালক্রমে এই যোগাযোগ রহিত হতে হতে শেষে কলকাতা যেন তাঁর অতীত জীবনেরই সাক্ষ্যস্বরূপ স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে রইল এবং শান্তিনিকেতনের বর্তমানেরই জয় হল।

এই জন্যই দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের সুর নিয়ে বচসা হলে আমি বরাবরই বলতুম যে, আধুনিক সুর সম্বন্ধে তাঁর বিচার মানতে রাজী হলেও, পুরোনো গান সম্বন্ধে নিজের মত ছাড়তে আমি মোটেই রাজী নই; বিশেষতঃ আমার নিজের শেখা হিন্দী গান ভাঙার ক্ষেত্রে। এ কথা একশোবার স্বীকার করব যে, সংগীতে দিনেন্দ্র স্বাভাবিক সুরজ্ঞান, স্বরজ্ঞান, শিক্ষা ও রুচির সঙ্গে রবীন্দ্রসংসর্গের যে রকম সুযোগ দীর্ঘকাল ধ'রে পেয়েছিলেন, তাতে তাঁকে আধুনিক রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেষ্ঠ অধিকারীরূপে মানতে আমরা বাধ্য। তার পর মধ্যম অধিকারীরূপে অনাদিকুমার দস্তিদার, শান্তিদেব ঘোষ, এবং শৈলজারঞ্জন মজুমদারের নাম করা যেতে পারে।

লক্ষ্যের বিষয় এই যে, এঁরা সকলেই স্বহস্তে স্বরলিপি করতে অভ্যস্ত এবং উল্লিখিত দলের মধ্যে যাঁরা জীবিত, তাঁরা এখনো অল্প-বিস্তর সেই কার্যে ব্যাপৃত। কিন্তু আরেক দল আছেন যাঁরা কেবল মাত্র গায়ক, স্বরলেখক নন। তাহলেও, রবীন্দ্রসংগীতের সঠিক সুর সম্বন্ধে এঁদের অভিমত বেশ দৃঢ় এবং সে মতকে উপেক্ষা করতে

আমি প্রস্তুত নই। এঁদের নামকরণ সম্বন্ধে একটি গল্প করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সম্প্রতি কোনো উপলক্ষে একটি মুসলমান ছাত্রলিখিত পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসে। তাতে লেখক তাঁদের শাস্ত্রগ্রন্থের কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে, কোরাণই তাঁদের সর্ব্বাপেক্ষা মহামান্ত ধর্ম্মগ্রন্থ; তার পরে মোহম্মদের নিজ উক্তি ও ব্যবহার প্রামাণ্য; তার পর তাঁর সাক্ষাৎসঙ্গীদের কথা, তাদের বলে সাহাবী; তার পর তাদের সঙ্গ যারা করেছে, তাদের বলে তাবেয়ুন; তার পর তাবেয়ুনদের সঙ্গ যারা করেছে, তাদের বলে তাবেতাবেয়ুন, ইত্যাদি। সেই হিসেবে এতক্ষণ ধ'রে আমি সাহাবীদের কথাই ব'লে এসেছি; কিন্তু তাবেয়ুনদের কথাও একেবারে ফেল্‌না নয়। তারা যখন বলে, আর বেশ জোরের সঙ্গেই বলে যে, 'দিন-দা'র কাছে আমরা এই রকম শিখেছি; তখন আমার পুরাতন স্মৃতি অন্য রকম সাক্ষ্য দিলেও, তাদের জোর ক'রে আমার মতে আনতে বা কোনো উপলক্ষ্যে আমার জানা সুরে গাওয়াতে উভয়তঃই অপ্রবৃত্তি হয়।

তাহলে এতক্ষণ সাতকাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে সংগীতসীতার শুচিতা সপ্রমাণ করবার সদুপায় কী স্থির হল?—আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি অনুসারে সন্দেহস্থলে নিম্নলিখিত অগ্নিপরীক্ষা অবলম্বন করা যেতে পারে:—

(১) স্বরলিপি বা শ্রুতিস্মৃতির সামান্য গরমিল উপেক্ষা করাই শ্রেয়। শুচিতা রক্ষার চেষ্টা যেন শুচিবাইয়ে পরিণত না হয়। মানুষের গলা যখন গ্রামোফোন যন্ত্র নয়, আর শুনে-শেখার প্রচলিত দেশীয় পদ্ধতিকে স্বরলিপি দেখে-শেখা ও শেখানোর পরদেশী পদ্ধতি দ্বারা উচ্ছেদ করা যখন বহু বিলম্বসাপেক্ষ, তখন এক-আধ সুরের ত্রুটি মার্জনীয়। এবং এ দেশে গায়কীর চিরাগত স্বাধীনতা একেবারে বর্জনীয় নয়। অপরপক্ষে গাইয়ের আপ-রুচিকে বেশী প্রশ্রয় দিলে গোড়াকার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। এই উভয়সংকটের মধ্যে প'ড়ে কর্তা ব্যক্তিকে সাবধানে বিচারের পাল্লা ধরতে হবে।

(২) পূর্বেই বলেছি, গানের প্রকাশকাল ১৯১৫-র পূর্ববর্তী হলে কলকাতায় প্রকাশিত উল্লিখিত স্বরলিপিই প্রামাণ্য; এবং যত পূর্ববর্তী, তত বেশী প্রামাণ্য বলে ধরতে হবে। কথার বেলা কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। কবির জীবিতকালে প্রকাশিত নবতম সংস্করণের গীতবিতানের গানের কথাই তাঁর অনুমোদিত বলে বুঝতে হবে, তার পরিবর্তিত আকার আমাদের অভ্যস্ত পূর্বসংস্কারে যতই আঘাত করুক না কেন। কারণ কথার রাজ্যে কবির ভোটই একমাত্র গ্রাহ্য; এ স্থলে ত তাঁর স্মৃতি নয়, সৃষ্টি নিয়ে কারবার।

(৩) গানটি ১৯১৫-র পরবর্তী হলে, বিশ্বভারতী প্রকাশিত এবং বিশেষ ভাবে দিনেন্দ্র-বিরচিত স্বরলিপিই প্রামাণ্য।

(৪) উক্ত শ্রেষ্ঠ অধিকারীর স্বরলিপির অভাবে মধ্যম অধিকারীদের স্বরলিপিই প্রামাণ্য। তাঁদের মধ্যেও মতভেদ দৃষ্ট হলে দুই প্রকার সুরকেই সমকক্ষ বা "bracketed" ধরতে হবে; এবং প্রকাশের সময় দু'টি স্বরলিপিই বিকল্প সুর হিসাবে প্রকাশিত হবে।

(৫) শাস্ত্র এবং লোকাচার অর্থাৎ পূর্ব স্বরলিপি ও বর্তমান গায়কীর মধ্যে বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হলে, শান্তিনিকেতনে প্রচলিত সুরকে প্রাধান্য দিতে হবে; অশাস্ত্রীয় বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। কারণ শান্তিনিকেতনই তাঁর সংগীতসরস্বতীর পীঠস্থান। তবে এখানেও যদি মতভেদ শ্রুত হয়, তাহলে স্থানীয় প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ুনদের একত্র করে তাদের সকলের মতের গ, সা, শু, নিয়ে একটা সুর স্থিরীকৃত হবে, এবং সেইটেই শান্তিনিকেতনের ছাপমারা বিশুদ্ধ সুর বলে গণ্য হবে। বলা বাহুল্য, এই বিচারকালে শ্রুতিমাধুর্যের দাবি উপেক্ষা করা চলবে না।

(৬) যে গানের স্বরলিপি এখনো হয়নি, তারও রচনাকাল অনুসারে সেকালের বা একালের বর্তমান সাহাবীদের উপর লেখবার ভার দিতে হবে। এবং তাঁরাও শ্রুতিস্মৃতি সব দিক সাধ্যমত রক্ষা করে কার্য সম্পন্ন করবেন।

(৭) গ্রামোফোন ও রেডিওতে আজকাল রবীন্দ্রসংগীতের যেরূপ ব্যাপক চর্চা শুনতে পাওয়া যায়, তা'তে সেগুলির প্রচার-কার্যের উপরেও শান্তিনিকেতনের সংগীতভবনের কিছু আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করা উচিত। কী উপায়ে এই কর্তৃত্ব সহজে ও সর্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থাপিত হতে পারে, সে বিষয়ে কার্যকর প্রস্তাব ও পরামর্শ পাঠাবার জন্য আমরা বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এবং বাইরের সংগীতভক্তদেরও অনুরোধ জানাচ্ছি। এ বিষয় দু'-একখানি চিঠি আমাদের ইতিমধ্যে হস্তগত হয়েছে।

মোট কথা, এই শুদ্ধিকার্যে সংগীতভবনকে একটা বিশিষ্ট কর্তৃপদ গ্রহণ করতে হবে। যদিও রচয়িতা এখন সশরীরে এখানে বর্তমান নেই, কিন্তু এখানকার আকাশে-বাতাসে এখনো তাঁর প্রভাব পরিব্যাপ্ত, তাঁর সংগীত মুখরিত। তাঁর এমন প্রাণপ্রিয়, এমন মধুরসুন্দর এই যে জিনিসটি তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন, সে উত্তরাধিকারকে বিশুদ্ধ ভাবে সংরক্ষণের চেষ্টা করা কি আমাদের এই শান্তিনিকেতন-অধিবাসীদেরই বিশেষ কর্তব্য নয়?—আমি এ বিষয়ে সাধ্যমত সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি বলা বাহুল্য।

আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে এইটুকু বলতে পারি যে, এই সব রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ সভা-সমিতি ও ব্যক্তির সংস্পর্শে যতই আসছি ততই দেখতে পাচ্ছি যে, প্রায় কোনো সেকালের গানই আমরা ঠিক এক রকম সুরে জানি নে; যেন পদে পদে হোঁচট খেতে খেতে চলতে হয়। এর একটি সামান্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি যে, এই সেদিন শ্রাবণী পূর্ণিমায় আশ্রমগুরুর বার্ষিকী তিথিরক্ষার্থে যে সংগীত-জলসার আয়োজন করা হয়েছিল, তা'তে অন্যান্য গানের তারতম্যের কথা বাদ দিলেও "বাংলার মাটি বাংলার জল" গানটির সহজ সরল সুরের অন্ততঃ ধুয়োর শেষাংশটি যে আমাদের জানা সুরের তুলনায় মুখে মুখে কত পরিবর্তিত আকার ধারণ করেছে, তা শুনে আশ্চর্য হতে হয়। যত দূর জানি, এই গানটির স্বরলিপি নেই।

এর থেকেই বোঝা যাবে যে, শুধু কানের উপর নির্ভর করলে গানের কত প্রকার রূপান্তর কালক্রমে হওয়া অনিবার্য। যদি বল—তা'তে ক্ষতি কী?—তার উত্তরে যা বলেছি তার উপর আর আমার কিছু বলবার নেই। যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রনাথের সুরের এমন কিছু সুন্দর বৈশিষ্ট্য আছে, যা স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য, তাঁদের সাহায্যকল্পেই এই প্রবন্ধ রচিতং লিখিতং চ। শেষে আবার বলি যে, এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে স্বরলিপি লেখা, শেখা এবং শেখানো অভ্যাস করা খুবই উচিত—নান্যঃ পন্থা। এবং আজকাল রবীন্দ্রসংগীতস্বরলিপির ব্যাপক প্রচলনের দিনে, তাঁর গান ভুল শেখাবার কোনো অজুহাত কোনো ওস্তাদের নেই।

সংগীতভবন যদি রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষকতার পরীক্ষাগ্রহণ ও যোগ্যতার নিদর্শন-পত্র প্রদানের কোনরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহলে উপযুক্ত শিক্ষালাভের কিঞ্চিৎ সৌকর্য সাধিত হয়। আজকাল মেয়েদের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সংগীতকে স্থান দেওয়ায় যোগ্য শিক্ষকের অভাব আরো বেশি উপলব্ধি হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বরলিপি শেখানোর বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, সে বিষয় আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি। তিনি বলেছিলেন, পরের মুখে শুনে নিজের গান বলে এক-একবার চিনতেই পারেন না।—সেই লজ্জানিবারণের আশাতেই এত কথা বলা এবং এই শুভ প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রসংগীত-ভক্তগণের সহযোগিতা প্রার্থনা করা।

পরিশেষে নিজের লেখার একটু টীকা নিজেই করা আবশ্যক মনে করি, নইলে লোকে আমাকে ভুল বুঝতে পারে। স্বরলিপির আবশ্যকতার উপর জোর দিয়েছি বলে কেউ যেন মনে না করেন যে, একমাত্র স্বরলিপি শিখলেই রবীন্দ্রসংগীতে পারগামী হওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে যে, আমার প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে রবীন্দ্রসংগীতের বিশুদ্ধতা রক্ষা, অর্থাৎ ভুল নিবারণের উপায়। তাই যে-সকল স্থলে সুর সম্বন্ধে সন্দেহ বা মতভেদ উপস্থিত হবে, সেই সেই স্থলে কেবল সন্দেহভঞ্জনার্থে স্বরলিপির শরণাপন্ন হতে বলেছি, এবং তার প্রামাণ্যতার দিশারী দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু স্বরশুদ্ধি এক জিনিস, সুরসিদ্ধি বা রসবুদ্ধি আর। সেই রসপূর্ণ গায়কীতে উত্তীর্ণ হওয়াই গায়কের লক্ষ্য; এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য সদ্গুরুর দ্বারস্থ হওয়া চাই, নিজ সাধনার দ্বারা স্বরলিপির কঙ্কালে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা চাই।

রবীন্দ্রনাথ নিজে বলে গেছেন, "যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুই ত বদলায়। তবে সব চেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালিরা, শোকে দুঃখে, সুখে আনন্দে আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এই গান তাদের গাইতে হবেই।" তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল করতে, এই প্রাণের ইচ্ছে পূর্ণ করতে কি আমরা সাহায্য করব না? —বিশ্বভারতী।

জোয়ান অব আর্ক

কেয়া দেবী

"My voices were of God, they have not deceived me." এই শেষ কথা উচ্চারণ করে জ্বলন্ত পাবকে ভস্মীভূত হয়ে গেল মাত্র উনিশ বছরের একটি কচি মেয়ে, যার কথা পৃথিবী কোন দিন ভুলবে না।

পাঁচশ' বছর আগেকার কথা। ফ্রান্সের তখন ভীষণ দুর্দিন। ইংরেজ ফ্রান্সের অধিকাংশ আত্মসাৎ করেছে। এক আধ-পাগলা রাজা ফ্রান্সের মাত্র বোর্জে'স অংশের ওপর প্রভুত্ব করছেন। আর এক অংশে রাজা হয়ে বসে আছেন দর্ফ্যা। চারি দিকে অরাজকতা, লাম্পট্য আর অলসতা। সেই সময় ডোম্রেমীতে চাষার ঘরে এক মেয়ে জন্মাল জোয়ান। আর পাঁচ জন সাধারণ সাধারণ মেয়ের মতই কেটে গেল তার জীবনের যোলোটা বছর। ধর্মে মতি আর দেশের প্রতি ভক্তি প্রগাঢ়। দেশের দুর্দশার কথা, যুদ্ধের খবর, বিদেশীদের লুণ্ঠন ও অত্যাচারের কাহিনী শোনে আর কাঁদে। ভগবানকে ডাকে একমনে—ফ্রান্স স্বাধীন হোক্।

এক দিন বাগানে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ মনে হ'ল, শুভ্রবসন-পরিহিতা দেবীরা যেন তাকে বলছেন—"ভগবানের পুত্রী তুমি। যাও, রক্ষা কর ফ্রান্সকে। রিমসে গিয়ে দর্ফ্যাকে রাজমুকুট পরাও। আমরা সঙ্গে আছি।" মনে-প্রাণে জোয়ান বিশ্বাস করল এই দৈববাণী। বুদ্ধি দিয়ে এই বিশ্বাসকে হয়ত বিচার করা যায় না, কিন্তু এর ফলে যা ঘটল তা বিস্ময়কর। যোলো বছরের মেয়ে, দুর্দ্ধর্ষ ইংরেজ সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত ক'রে সত্যই দর্ফ্যাকে স্বাধীন ফ্রান্সের রাজা করে দিল।

দর্ফ্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য জোয়ান বেরিয়ে পড়ল। বাপ তাকে জলে ডুবিয়ে মারবেন বলে ভয় দেখালেন, সহরের ক্যাপ্টেন তাকে পাগল বললেন, পাদ্রী তাঁকে ভূতে পেয়েছে বলে ভূত ছাড়াবার ব্যবস্থা করতে চাইলেন, কিন্তু জোয়ান অচল অটল। ভগবানের আদেশ, কারো বাধা সে মানবে না। শেষে ভোকুলিয়ের ক্যাপ্টেন দু'জন সৈনিক দিলেন তাকে শিন'র রাজসভায় পৌঁছে দেবার জন্যে। ইংরেজ দস্যুদের ভয়ে তারা রাত্রে ঘোড়ায় চড়ে যেত, দিনে বনে লুকিয়ে থাকত। শহর বা রাজপথ দিয়ে যাবার উপায় ছিল না। নদী-নালা পার হতে হ'ল ঘোড়ায় চড়ে। ঘোর বিপদের সময় জোয়ান সৈনিকদের সাহস দিল—"ভগবান আমাদের রক্ষা করবেন। তাঁর কাজের জন্য আমার জন্ম।" অনেক বাধা-বিপদ অতিক্রম করে তারা গিয়ে হাজির হ'ল রাজসভায়।

দু'দিন অপেক্ষা করবার পর জোয়ান অনুমতি পেল দর্ফ্যার সঙ্গে দেখা করবার। ঘরে ঢুকতেই রাজসভার সকলেই বিদ্রূপ করতে লাগল। জোয়ান সে সবে কান না দিয়ে সোজা দর্ফ্যার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে বলল,—"ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন।" দর্ফ্যা চালাকি করে বললেন—"তুমি ভুল করেছ। আমি দর্ফ্যা নই। উনি দর্ফ্যা।" এই বলে আরেক জনকে দেখিয়ে দিলেন। জোয়ান এতেও দমল না। বললে,—"আমার ভুল হয়নি। ভগবান আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে জানাতে যে রিমসে আপনার শিরে রাজমুকুট পরানো হবে।" তার পর সে চার্লসকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে তার জীবনের এমন এক গোপন কথা বললে যে, তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। সে কথা তিনি ছাড়া আর কেউ জানত না। তিনি তখনও অবশ্য মনস্থির করতে পারলেন না, কিন্তু কিছুটা বিশ্বাস হ'ল। তাঁর ভয়, একটা চাষার মেয়ের কথা মত কাজ করলে সবাই হাসাহাসি করবে। শেষটায় জোয়ানের পক্ষেই গেলেন। ঘোষণা করলেন,—"মেয়েটার মধ্যে অনেক ভাল গুণ আছে। সদ্ব্যবহার করতে দোষ কি!" সকলেই সায় দিলেন,—"বেশ তো। দেখা যাক্, চাষার মেয়ে কি করতে পারে। পারলে আমাদেরই সুবিধা, না পারলে সে নিজেই মরবে।"

ইংরেজ সৈন্য তখন অরলিঁও অবরোধ করে রয়েছে। রিমসে যাবার পথ বন্ধ। দর্ফ্যা প্রথম হুকুম দিলেন এই পথ পরিষ্কার করতে। জোয়ানকে দেওয়া হল সাদা পোষাক আর এক সাদা সোনালী মেশানো পতাকা। সেই পতাকায় আঁকা ছিল যীশুখৃষ্টের মুখ, সুচের কাজ-করা। ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে রাজসৈন্যের পরিচালনা ভার দেওয়া হ'ল সতেরো বছরের ছোট্ট মেয়ে জোয়ানকে। সৈন্য সহ

জোয়ান অরলিঁও অভিমুখে যাত্রা করল। খবর পাঠাল ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষকে—"সহর ত্যাগ কর, নইলে এমন গণ্ডগোল হবে, যার জোড়া হাজার বছরে ফ্রান্সে দেখা যায়নি।"

ইংরেজরা ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিলে। বলে পাঠাল, চাষার মেয়ে ঘরে ফিরে গিয়ে গরুর দুধ দোও। জোয়ান অদ্ভুত হুঁসিয়ারীর সঙ্গে সৈন্য পরিচালনা করে ইংরেজ-ব্যূহ ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলে। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী পালিয়ে বাঁচল। সাত মাসের অবরোধ সাত দিনে উঠে গেল। ডোম্রেমীর কুমারীর নাম হ'ল অরলিঁও-কুমারী।

সমগ্র ফ্রান্স বিস্মিত, স্তম্ভিত। দফ্যাঁ ও তাঁর সভাসদ্‌রা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না এই সুখবর। এমন সময় জোয়ান এল রাজসভায়। বললে,—"দফ্যাঁ, চলুন। রিমসে যাবার পথ পরিষ্কার। মুকুট ধারণ করুন।" দফ্যাঁ তখনও দোমনা। বললেন,—"হবে, হবে, এত তাড়া কিসের।" কিশোরী উদাস কণ্ঠে উত্তর দিলে,—"আমি আর এক বছর মাত্র থাকব; এই বেলা যা করতে পারি করিয়ে নিন।"

সত্যই। আর এক বছর মাত্র জোয়ান ছিল। কিন্তু সে একটা বছরের মত বছর! রিমসে ছেড়ে ইংরেজ পালাল, অরলিঁও-কুমারীকে দেখেই ত্রোয়ার সৈন্যবাহিনী পরাজয় স্বীকার করে নিলে, চার্ল তার কৌশলে পরাভূত হ'ল। যেখানে-যেখানে জোয়ান গেল, সবাই নতশিরে বশ্যতা স্বীকার করে নিল। ছ'সপ্তাহের মধ্যে রিমসের বিখ্যাত গির্জ্জায় জোয়ান নিয়ে গেল চার্লসকে, পরিয়ে দিল মাথায় রাজমুকুট। হাঁটু গেড়ে নতুন রাজার হস্ত চুম্বন করে বলে উঠল,—"ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল।" চোখে আনন্দাশ্রু।

জোয়ান এইবার বাড়ী ফিরে যেতে চাইল, আর অনুরোধ করল, তার জন্মভূমি ডোম্রেমীর কর মাপ করতে। কিন্তু ভয়ে চার্লস রাজী হলেন না। এখনও ফ্রান্সে ইংরেজ সৈন্য রয়েছে। যদি আবার আক্রমণ করে। কিন্তু তাকে যেতে দিলেই ভাল করতেন। এই কলঙ্ক-ইতিহাস তবে লিখিত হত না। নিষ্কলঙ্ক কুমারীর প্রতি এই অবিচার জগৎকে লজ্জিত করত না। কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডাতে পারে? ডোম্রেমী চিরকালের জন্য নিষ্কর হ'ল বটে, কিন্তু জোয়ানের বাড়ী ফেরা হ'ল না।

দেশবাসীর, বিশেষ করে সৈন্যবাহিনীর জোয়ানের প্রতি এই আনুগত্যে, সৈন্যাধ্যক্ষগণ ভিতরে ভিতরে হিংসায় মরে যাচ্ছিলেন। চার্লসকে দিয়ে সভাসদেরা জোয়ানকে উত্তরোত্তর কঠিন কাজে পাঠাতে লাগলেন। উদ্দেশ্য, সফল হলে তাঁদেরই সুবিধা, আর যদি বিফল হয় বা মারা যায় তবে ল্যাঠা চুকে যাবে। এই সময় প্রথম জোয়ানের মনে শঙ্কা জাগে। তার মনে হয়, এ তো ভগবানের আদেশ ছিল না। তার কাজ তো শেষ হয়ে গেছে, আর কেন? কিন্তু তখন ফেরবার উপায় নেই। চার্লস ফেরবার পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে রেখেছিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোয়ান এগিয়ে যেতে থাকল। জোয়ানকে পাঠান হ'ল ফ্রান্সের রাজধানী পারীকে মুক্ত করতে। [illegible]স পরাজয় স্বীকার করল, সাতোথিয়েরী পথ ছেড়ে দিল। পারীর দ্বারে জোয়ান উপস্থিত। চারি দিকে জোয়ানের জয়-জয়কার রাজার কথা কারো মুখে নেই। চার্লস তা সহ্য করতে পারলেন না। বিশ্বাসঘাতক রাজা ও তাঁর সভাসদেরা গোপনে ফ্রান্সের শত্রু ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করে ফেললেন। সন্ধির সর্ত্ত হ'ল, জোয়ানকে ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে হবে। পারীর যুদ্ধে হঠাৎ রাজসৈন্য জোয়ানকে ত্যাগ করে রণস্থল থেকে পালিয়ে গেল। অপরাজেয় জোয়ান এই প্রথম পিছু হটে এল। বুঝল সবই, কিন্তু তখনও ফ্রান্সকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখছে। চার্লসকে তখনও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সবই বৃথা।

এদিকে ইংরেজরা সুবিধা পেয়ে আবার আক্রমণ চালালে। কঁপিয়েঁতে রাজা চার্লসের সমূহ বিপদ দেখে কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে জোয়ান ছুটে গেল তাঁকে সাহায্য করতে। সেইখানে যা ঘটল, তা লিখতে লজ্জা বোধ হয়। রাজা ও তাঁর সৈন্য জোয়ানকে সাহায্য তো করলেনই না, বরং বিপদের মুহূর্ত্তে তাকে ত্যাগ করে ইংরেজের হাতে তুলে দিয়ে এলেন। ঘোড়া থেকে ধুলোয় টেনে ফেলে দিয়ে ইংরেজরা বন্দী করল নিষ্কলঙ্ক দেশপ্রেমিকা জোয়ানকে।

সমগ্র ফ্রান্সে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল। সকলের চোখে জল। কিন্তু কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই। রাজার হুকুম। নগ্ন শিরে নগ্ন পদে দেশবাসী চলা-ফেরা করতে লাগল মনের দুঃখে। ওদিকে পারীতে চলছে আনন্দোৎসব। দীপালির শোভায় সজ্জিত নগরীতে, নত্রেদামে ত্যতুয়ে সঙ্গীত। কিসের আনন্দ, কিসের উৎসব? ডোম্রেমীর জোয়ানকে ইংরেজরা পশুর মত শৃঙ্খলে বেঁধে খাঁচায় পূরে রেখেছে!

রুয়েঁর কারাগারে রাখা হল জোয়ানকে। বিচার আরম্ভ হ'ল। ধূর্ত্ত ইংরেজ প্রাণের ভয় ও অর্থের লোভ দেখিয়ে এক ফরাসী পাদ্রী বিশপ কোশঁকে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট করলে। অন্যায়টা ফরাসীদের ঘাড়ে চাপাবার অভিপ্রায়ে। মূর্খ ফরাসী তাতে সম্মত হ'ল। দেশের উদ্ধারকর্ত্রীর প্রতি সামান্যতম কৃতজ্ঞতা দেখালে না। বিচার প্রহসনেরই নামান্তর। কারাগারে অসহ্য যন্ত্রণা দিলে জোয়ানকে। অপরাধ: ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কার্য্য। জোয়ানকে বলতে হবে, সে ভগবানের আদেশ পায়নি। বলতে হবে, সে অধার্ম্মিক ডাইনী। অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, আর অপরাধ স্বীকার না করলে ডাইনীর প্রতি যা তখনকার শাস্তি, আগুনে পুড়িয়ে মারা। কারাগারে আড়ালে বিশপ কোশঁ চালাকী করে জোয়ানকে বলতে বললেন,—"ভবিষ্যতে চার্চ্চের কথা শুনব।" বেচারী সরল মনে তাই বলল। তিনি তার মাথায় গির্জ্জার পূতবারি দিলেন। কে[illegible]র ক্লার্ক গিলবার্ট মাঁশ তাই লিখে নিল, অবশ্য একটু বদলে। [illegible]লে, "আগুনের ভয়ে জোয়ান দোষ স্বীকার করে বলেছে, ভবিষ্যতে চার্চ্চের কথা শুনবে।" আদালতে পাদ্রী সাহেব বললেন,—"আসামী দোষ স্বীকার করেছে। এর এক মাত্র সাজা আগুনে পুড়িয়ে মারা।"

জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। তার ধারে নিয়ে আসা হল জোয়ানকে। মুখমণ্ডল ভয়শূন্য। চোখে স্বর্গীয় দীপ্তি। চাইলে একটা ক্রুশ চিহ্ন। পাদ্রী সাহেব রাজী হলেন না। আগুনের মধ্যে ঠেলে দেবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে জোয়ান বলে উঠল—"My voices were of God, they have not deceived me." তার পর—বিশ্বের নিকৃষ্টতম কলঙ্কিত ঘটনা। লজ্জায় ঘৃণায় লেখনী বন্ধ হয়ে যায়।

রাজ-রাঁধুনী

জয়া দেবী

হয়তো রাজা-রাজড়ার গল্প শুনতে শুনতে আপনাদের কান পচে গেছে। এবার শুনুন রাজবাড়ীর রাঁধুনির গল্প। গল্প হলেও সত্যি কিন্তু। ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবার স্যানড্রিংহাম অথবা বালমোরালে পদার্পণ করলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে সেখানে যে ঢেঙ্গা যুবকটিকে দেখা যায়, তিনিই রাজপ্রাসাদের রন্ধনশালার সর্বময় কর্তা। ভদ্রলোকের নাম রোণাল্ড অব্রে। জাতে ইংরাজ। সব চেয়ে মজার কথা হল এই যে, অব্রের আগে গত দু'-তিন শতাব্দী যাবৎ এই চাকরীটা ছিল বিদেশীদের অধিকারে। রাজপ্রাসাদে অনেক সব বড় বড় নামজাদা ফরাসী রাঁধুনী আছে। তাদের মধ্যে অনেকেই রন্ধনশালার সর্বময় কর্তার পদটির উপর লোলুপ দৃষ্টি ফেলেছিল কিন্তু তাদের দাবী অগ্রাহ্য করে অব্রেকে যখন ঐ পদে বহাল করা হয়, তখন বহু দিনের একটা ঐতিহ্যেও ছেদ পড়ে। রাজার প্রধান পাচক সব সময় থাকে রাজার সঙ্গে সঙ্গে। এমন কি রাজা যখন রেল-গাড়ীতে ভ্রমণ করেন, তখনও অব্রে তার খাবার-দাবার তদারক করে দেয়। রোণাল্ড অব্রের বাড়ী ইয়র্কশায়ারের গ্যাল্টন নামক স্থানে। খুব অল্প বয়সে বাপ-মায়ের সঙ্গে লণ্ডনে এসেছিল সে। ওয়েষ্টমিনিষ্টার টেকনিকাল স্কুলে তিন বছর রন্ধন-বিদ্যা শিক্ষা করে রাঁধুনির ডিপ্লোমা পকেটে নিয়ে রাজবাড়ীর রান্না-ঘরে ছোট-খাট একটা চাকরী নেয়। বহু দিন আগে রাজবাড়ীর প্রধান পাচকের নিয়ম ছিল, রোজ সকালে রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সেদিনের খাদ্য-তালিকা তৈরী করা। কিন্তু অব্রেকে যখন নিয়োগ করা হয়, তখন ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে, সে রাজা-রাণীর রুচি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। কাজেই খাদ্য-তালিকা তৈরী করবার আগে রাণীর সঙ্গে তার আর পরামর্শ করবার প্রয়োজন নেই। তাই অব্রে নিজেই তৈরী করে তালিকাটা। তার পর সামান্য কিছু অদল-বদল এবং অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দেয় উপরতলায় রাণীর কাছে।

অব্রে বলে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে রাজবাড়ীর লোকেরা বড় পেট-রোগা। রাণী মুখরোচক ভাল ভাল খাবার দাবার খেতে ভালবাসেন বটে তবে খান বড় কম। রাজার অবস্থাও তথৈব চ। তবে রাজকন্যাদ্বয় তাঁদের পছন্দ মত খাবার পেলে বেশ পেট পুরেই খেয়ে থাকেন। রাজ-দম্পতি ওমলেট (কলকাতার রেস্তোরাঁয় থাকে মামলেট বলা হয়) এবং ডিমের খাবার খুব পছন্দ করেন। রাজকন্যা এলিজাবেথের আবার মিষ্টি খাবারের দিকে ঝোঁক বেশী। রাণী ভালবাসেন হেরিং মাছ আর আচার।

রাজ-পরিবার একা খেতে বসলে খাদ্য-তালিকায় মদের স্থান থাকে না। মাত্র তিনটি পদ তাদের খেতে দেওয়া হয়—ঝোল, মাছ অথবা মাংস এবং একটা মিষ্টান্ন। কিন্তু টেবলে নিমন্ত্রিত কেউ থাকলে ঝোল, মাছ, মাংস এবং একটা মিষ্টি খেতে দেওয়া হয়। রাণী প্রায়ই রান্না-ঘর তদারক করতে আসেন। রেশনের কুপন-গুলো ঠিক মত ব্যবহৃত হচ্ছে কি না সেদিকে তাঁর কড়া নজর।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রোণাল্ড অব্রে লোক কেমন? বেশ লম্বা-চওড়া সুন্দর চেহারা। বয়স তার চৌত্রিশ কিন্তু চব্বিশ বলে চালানো যায় অনায়াসেই। বাকিংহাম প্রাসাদের অধিকাংশ চাকর-বাকর প্রাসাদেরই অধিবাসী। অব্রে কিন্তু থাকে মিডল এসেক্সের কেণ্টহ্যামে। রোজ সকালের গাড়ীতে সেখান থেকে আসে সে। অব্রে কিন্তু নিজের বাড়ীতে রান্না-ঘরের ধারটি মাড়ায় না। তার বউ তাকে রেঁধে খাওয়ায়। বউয়ের রান্না খেতে তার খুব ভাল লাগে। সে গর্ব করে বলে বেড়ায়, "বউ আমার পয়লা নম্বরের রাঁধুনী।"

আইন-সভায় নারী

লেডী মেগান লয়েড জর্জ্জ, এম. পি

ভিক্টর হিউগো বলেছিলেন, "অষ্টাদশ শতাব্দী পুরুষের অধিকার ঘোষণা করেছে; উনবিংশ শতাব্দী নারীর অধিকার ঘোষণা করবে।" সময় গণনার সূচনা থেকে নারী সাধারণের বা সরকারের কাজে অপ্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে এলেও উনবিংশ শতাব্দীর আগে নারীর অধিকারের নীতি স্বীকৃত হয়নি। ক্রমশঃ রাজনৈতিক অধিকারের সংগ্রামে নারী একটু একটু করে সুবিধা আদায় করতে থাকে। ৪১ বছর আগে ফিনল্যাণ্ড নারীকে ভোটাধিকার দেয়, আর ১৯১৯ সালে লেডী এ্যাষ্টর কমন্স সভায় আসন গ্রহণ করেন। দু'বছর পরে কানাডা পার্লামেণ্টে এক জন মহিলাকে নির্ব্বাচিত করে। বৃটিশ ডোমিনিয়নে তিনিই প্রথম আইন-সভার সদস্যা হন। বৃটেনে লর্ড সভায় কিন্তু নারীকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি এবং এখনো পর্য্যন্ত নারীর পক্ষে লর্ড সভার দরজা বন্ধ। তবে সম্প্রতি লর্ড সভার সংস্কারের জন্য আহূত এক সর্ব্বদলীয় সম্মেলনে তিনটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দই আইন সভার একটি নতুন উচ্চ পরিষদে নারী সদস্যা গ্রহণে সম্মত হয়েছেন।

বলা হয়েছে যে, স্ত্রী-স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্য্যন্ত অতি অল্প সংখ্যক মহিলাই তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ গ্রহণে এগিয়ে এসেছেন এবং অধিকাংশই আইন-সভায় প্রবেশ করতে ভয় বা সঙ্কোচ বোধ করেন। এই ধারণা কত দূর যুক্তিসঙ্গত? ইউরোপ, কমনওয়েলথ ও ল্যাটিন আমেরিকার পার্লামেণ্ট সমূহে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে মহিলা প্রতিনিধি রয়েছেন। রুশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েটে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা ২৭৭, ইউনিয়ন সোভিয়েটে ১১৬ এবং প্রাদেশিক সোভিয়েটে ১৬১ জন। কিন্তু মধ্য ও সুদূর প্রাচ্যে, মাল্টা, তুরস্ক, চীন, ভারত ও পাকিস্তানে সর্ব্বাপেক্ষা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন দেখতে পাওয়া যায়। ভারতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মহিলারা প্রাদেশিক আইন সভায় এবং ১৯৩৭ সালে কেন্দ্রীয় আইন সভায় নির্ব্বাচিত হ'বার সুযোগ পান। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ সমূহে মহিলাদের জন্য ৪২টি আসন রিজার্ভ রাখা হয়।

জার্ম্মাণীতে নারীর রাজনৈতিক স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে আইন সভায় মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা শতকরা ৬ ভাগ থেকে ১০ ভাগে দাঁড়ায়। রাইখষ্টাগের শেষ স্বাধীন নির্ব্বাচনে মাত্র ৩০ জন মহিলা নির্ব্বাচিত হন। হিটলারের শাসনাধীনে নারীকে রান্না-ঘরে পাঠান হয়। বিভিন্ন মহিলা প্রতিষ্ঠান থাকলেও তাদের কাজ গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পাঠ এবং "মাতৃভবন" পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। গত

আবার তারা বাইরে এসে দেশের পুনর্গঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করছেন। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণ ল্যাণ্ডারে ১৮৮৬ জন ডেপুটীর মধ্যে ২১১ জন মহিলা আর তাদের মধ্যে ৫২ জন বৃটিশ এলাকার। যে সব দেশে প্রথম মহিলা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন, সে সব দেশে মহিলারা কত দূর এগিয়েছেন? ফিনল্যাণ্ডে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা ৪০ বছর আগেও যা ছিল, এখনো তাই আছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১৬ সালে প্রথম মহিলা নির্ব্বাচনের পর থেকে ৪১ জন মহিলা সেনেট ও প্রতিনিধি পরিষদে সদস্যার কাজ করেছেন। গত কয়েক বছর ধরে বৃটেনে অনুপাত একই আছে—অর্থাৎ ২১ জনের কাছাকাছি। পার্লামেণ্টের কাজে ও আইন প্রণয়নে নারীর অবদান কি? ইহাই আশা করা যায় যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের প্রথম যুগে নারী তাদের সমাজের প্রতি অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতিকারের, বাধা অপসারণের ও অসাম্য দূর করবার চেষ্টা করবে। ফিনল্যাণ্ডে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রথম দিকে ২৬টি বিল উত্থাপিত হয় এবং তন্মধ্যে অধিকাংশই নারী সমাজের অবস্থা সংক্রান্ত—যেমন বিবাহিত নারীর সরকারী পদ গ্রহণের বৈধ অধিকার সংক্রান্ত আইন, বালিকাদের বিবাহের বয়স-বৃদ্ধির আইন প্রভৃতি। এই সব আইনের ব্যাপক সামাজিক তাৎপর্য্যও ছিল। মধ্যে মধ্যে এই সকল আইন অগ্রাহ্য হয় এবং পরবর্ত্তী অধিবেশনে আবার উত্থাপিত হয়। দশ থেকে কুড়ি বছরের চেষ্টার পর কিছু কিছু সংশোধন কার্য্যকরী হয়েছে। বৃটেনের অবস্থাও একই প্রকার। প্রথম দিকে কমন্স সভার মুষ্টিমেয় মহিলা সদস্যাগণ প্রধানতঃ নারী সমাজের প্রশ্ন নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় যে সব বিল পাশ হয়, তার মধ্যে ১৮ বছরের কম বয়সের লোকদের নিকট মত্ততা সৃষ্টিকারী মদ বিক্রয় নিবারণ; গর্ভবতী রমণীদের উপর মৃত্যুদণ্ড নিবারণ, দত্তক সন্তানের স্বার্থ ও উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য উত্থাপিত বিলগুলি অন্যতম। প্রথমোক্ত বিলটি লেডী এ্যাষ্টর কর্ত্তৃক উত্থাপিত হয়। যুদ্ধের সময় মহিলা সদস্যাগণ মহিলাদের কাজে লাগেজের উপায় নির্দ্ধারণে ব্যস্ত ছিলেন। পার্লামেণ্টে সকল দলের মহিলা সদস্যাগণ পররাষ্ট্র বিভাগে ও পুনর্গঠনের কাজে মহিলা নিয়োগের জন্য একযোগে চেষ্টা করেন।

রাজনৈতিক অগ্রগতির দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহিলাদের স্বার্থ প্রধানতঃ সামাজিক ও নৈতিক প্রশ্ন, জনস্বাস্থ্য, সেবা-শুশ্রূষা, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে কেন্দ্রীভূত থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ব্যাপক জাতীয় সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করেছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের মহিলা প্রতিনিধি মিস্ নর্টন লেবার কমিটীর সভানেত্রী হিসাবে শ্রমিকদের মজুরি ও কাজের সময় সংক্রান্ত বিলটি পাশ করান এবং এর ফলে আমেরিকার লক্ষ লক্ষ শ্রমিক অনেকটা আর্থিক নিরাপত্তা অর্জ্জন করে। পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে মহিলাদের আগ্রহ খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কতিপয় মহিলা প্রতিনিধি পরিষদের পররাষ্ট্র কমিটীর সদস্যা এবং তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে মিসেস্ নর্টনকে সরকারী প্রতিনিধি ও পর্য্যবেক্ষক করে পাঠান এবং পুরাতন জাতিসঙ্ঘের পরিষদে এবং বর্ত্তমানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিষদে এক জন পরিপূরক মহিলা-প্রতিনিধি প্রেরণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

বহু দেশে নিযুক্ত মহিলা অফিসারদের যোগ্যতা কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। বৃটেনে মার্গারেট বণ্ডফিল্ড ১৯২৯—৩১ খৃষ্টাব্দের সঙ্কট সময়ে শ্রম মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং মার্কিণ সরকার মিস্ পার্কিন্সকে একই কঠিন পদ প্রদান করেন। সুইডেনে ডাঃ কারিন কর্ক অর্থনীতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এবং তিনি এক জন মন্ত্রী। নরওয়েতে মিসেস্ আসল্যাণ্ড একই পদের অধিকারী, তবে তিনি সামাজিক বিষয়গুলি দেখা-শোনা করেন। এলেন উইলকিনসন ১৯৪৭ সালে মৃত্যুর পূর্ব্বে শিক্ষা-মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যা ছিলেন। ডাঃ এডিথ সামারস্কিল খাদ্য-মন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী। ডেনমার্কে প্রথম সমাজতন্ত্রী সরকারের প্রধান মন্ত্রিত্ব করেন এক জন মহিলা। ভারতে ও নিউজীল্যাণ্ডে স্বাস্থ্য-মন্ত্রীরা মহিলা। ভারতের স্বাস্থ্য-মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর ভারতে সঙ্কট অবস্থায় উদ্বাস্তুদের জন্য উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। ফ্রান্সেও এক জন মহিলা কিছু দিনের জন্য স্বাস্থ্য-মন্ত্রী ছিলেন। এখনও মাদাম জার্মেন পেরোল ন্যাশনাল এসেম্বলীর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন রুম্যানিয়ার মহিলা পররাষ্ট্র-সচিব আনা পাউকার। তিনি মোল্ডাভিয়ার এক ইহুদী কসাইএর কন্যা।

আইন সভায় মহিলাদের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে কি বোঝা যায়? আমার মনে হয়, এ থেকে বোঝা যায় যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে মহিলারা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। এ কথা সত্য যে, তাঁদের মধ্য থেকে ক্রমওয়েল, পিট বা এলিজাবেথ বেরোয়নি, কিন্তু তাহলেও তাঁরা যা দিতে পেরেছেন, তাতে তাঁদের কৃতিত্ব ও যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া গেছে এবং তাঁরা সরকারের কাজে পুরুষের সমান হবার পথে অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন।

অনুবাদিকা—লয়লা খান।

পৌরাণিক

আমি যা কিছু পুরানোকে ভালবাসি; পুরানো বন্ধু, পুরানো যুগ, পুরানো আদব-কায়দা, পুরানো বই, এমন কি পুরানো মদ।

—অলিভার গোল্ডস্মিথ।

ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

উপনিবেশ ও সংস্কৃতি বিস্তার

ইংরাজ আমলে এক দল শিক্ষিত লোক সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতেন এবং আপনাদের বিশ্বাস মত প্রচার করিতেন যে, তিন দিকে সাগর ও উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতশ্রেণীর দ্বারা বেষ্টিত ভারতবর্ষ বহির্জগতের সঙ্গে সংস্পর্শ-বর্জিত থাকিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক কৃষ্টি ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। অর্থাৎ, সমুদ্র ও পর্বতের পরিখা ও প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত দুর্গের মত দেশ ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্জগতের বিশেষ কোন আদান-প্রদান ছিল না, ইহাই তাঁহাদের প্রধান বক্তব্য। ইংরাজ ভারত ত্যাগ করিবার পরে এক দল শিক্ষিত ভারতবাসী প্রচার করিতেছেন, স্বভাবজ শান্তিপ্রিয়তা ব্যাহত করিয়া ভারতবাসীরা কখনও রাজ্যবিস্তার করিবার জন্ম দেশের বাহিরে যান নাই, সুতরাং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এই শান্তিপ্রিয়তার অনুশীলনেই ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য রক্ষা হইবে, তাহার মঙ্গল হইবে।

কিন্তু যে চিত্রের আবরণ এখানে উন্মোচন করা হইতেছে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের তাহা এক বিস্ময়কর চিত্র। বিস্ময়কর তাঁহাদের কাছে, যাঁহারা ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যার ট্র্যাডিশনে মানুষ হইয়াছেন। এই চিত্র আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীকে মোহমুক্ত ও স্বাভাবিক হইতে সাহায্য করিবে কি না বলিতে পারি না।

ভারতবাসীরা এক সময়ে উপনিবেশ বিস্তার করিতে মন দিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের কথা সেটা। তখন পশ্চিম-এশিয়ায় ইরাণের আরসিকিডান (পার্থিয়ান) বংশের সম্রাটগণের সঙ্গে রোমের নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছে। য়ুরোপের এশিয়া বিজয়ের অভিযানের প্রথম নায়ক গ্রীস, দ্বিতীয় নায়ক রোম। দীর্ঘ বারো শত বৎসর কাল য়ুরোপকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল এই ইরাণ। চীনে তখন চীনের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন হান-বংশের পতনের পরে পূর্ব হান-বংশ নাম লইয়া নূতন ...ক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বৌদ্ধধর্ম মহাচীনে প্রচারিত হ...তে আরম্ভ করিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে তখন তুষার ...'তুখার সম্রাট কনিষ্কের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত ...র্য ও অশোকের মগধে তখন দক্ষিণ হইতে আগত অন্ধ্র-রাজবংশের ...ন। উজ্জয়িনীতে তখন শক-রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত। মহারাষ্ট্র ... কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ তখন অন্য একটি শক-রাজবংশের অধিকারে। সম্রাট গোতমী-পুত্র শ্রীশতকর্ণি এই শকরাজ্য ধ্বংস করিলেন। ...তহাসিকগণের মতে অন্ধ্র সম্রাটের এই বিজয়লাভের ফলে দেশে ...ন্দু রিভাইভ্যাল" ঘটিয়াছিল। পরবর্তী কালে মধ্য-ভারতের ...রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। তখন আবার ...টা "হিন্দু রিভাইভ্যাল" ঘটিয়াছিল।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার যে পরিচয় ...য়া যায়, সেই অবস্থা রাজশক্তির প্রেরণায় ও সাহায্যে সুসজ্জিত ...র্ণবপোত বাহিনীর দেশ-বিজয়ে যাত্রা করিবার অনুকূল ছিল মনে ... কঠিন। এইরূপ কল্পনা কার্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত সময় ...গার আসিয়াছিল মৌর্যযুগে এবং কয়েক শতাব্দী পরে আবার আসিয়াছিল গুপ্তযুগে। সুতরাং অনুমান করিতে হয় যে, অন্যান্য দেশে উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে যেমন ঘটিয়াছিল, অর্থাৎ সাহসী, উদ্যমশীল ও নেতৃত্ব-শক্তির অধিকারী সাধারণ নাগরিকগণ এই কার্যের ভার লইয়াছিলেন, ভারতবর্ষেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও যে এই শ্রেণীর নাগরিকেরা রাজশক্তির সাহায্য হইতে বঞ্চিত হন নাই, তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় অন্ধ্র-সম্রাট গোতমী-পুত্র যজ্ঞশ্রীর কতকগুলি মুদ্রা হইতে। এই সকল মুদ্রা অর্ণবপোতের চিত্র বহন করিতেছে।

যদিও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতবাসীদের উপনিবেশ বিস্তারের সময় খৃষ্টীয় প্রথম শতক বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, আমরা জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতকে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ ইন্দোচীনের কম্বোজে পৌঁছিয়াছিলেন। মালাক্কা উপদ্বীপ ও সুমাত্রার হিন্দু উপনিবেশগুলি ঐ সময়ের পূর্বে স্থাপিত হইয়াছিল অনুমান করা যায়; কারণ, যবদ্বীপ ও ইন্দোচীনে যাইতে এই স্থানগুলি আগে পাওয়া যায়। মালাক্কার একটি অনুশাসনে বুদ্ধগুপ্ত নামে এক জন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মহানাবিকের কথা জানিতে পারা যায়। তিনি "রক্ত মৃত্তিকা"র অধিবাসী ছিলেন, অনুশাসনে উক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই রক্ত মৃত্তিকা বাংলার রাঙ্গামাটি। অনুশাসনের কাল খৃষ্টীয় ৪র্থ শতক। মালাক্কার হিন্দুরাজ্যগুলির মধ্যে কতকগুলির নাম পাওয়া যায়—চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের বিজিত রাজ্যের তালিকা হইতে। রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয়ী অর্ণবপোত বাহিনী ব্রহ্মের পেগু রাজ্য, মার্তাবান ও তকোলম বন্দর অধিকার করিয়া পূর্বদিকে আরও অগ্রসর হইয়া মালাক্কা ও সুমাত্রার অনেকগুলি হিন্দুরাজ্য জয় করিয়াছিল। সিঙ্গাপুরে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর সংস্কৃত লেখ পাওয়া গিয়াছে।

কম্বোজ :—হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দিকে মেকং নদী বাহিয়া কম্বোজে উপনীত হইয়াছিলেন। চৈনিক ইতিহাসের মত কৌণ্ডিন্য নামে এক জন ব্রাহ্মণ এই হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন কম্বোজ ফু-নান (উচ্চ স্থান) নামে পরিচিত ছিল। অনুমান খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে, অর্থাৎ গুপ্তযুগে দ্বিতীয় দল হিন্দু ঔপনিবেশিক প্রকৃত কম্বোজ (বা কম্বুজ) রাজ্য স্থাপন করেন। পরবর্তী শতাব্দীতে কম্বোজের রাজা চিত্র সেন মহেন্দ্র বর্ম্মণ ফু-নান্ রাজ্য জয় করেন। ইঁহার শাসন-কালের (৬০৪ খৃঃ অঃ) সংস্কৃত অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই হিন্দু রাজবংশের জয় বর্মণ, যশো বর্মণ, ইন্দ্র বর্মণ, সূর্য বর্মণ প্রভৃতি রাজার শাসন-কালের বিবরণ পাওয়া যায়। যশো বর্মণের সময়ে (৮৮১ খৃঃ অঃ) যশোধরপুরে নূতন রাজধানী স্থাপিত হয়। ইহার অন্য নাম এঙ্কোর-টোম। যশোধরপুরের নিকটে কম্বোজে হিন্দু রাজত্বের সর্বপ্রধান কীর্ত্তি এঙ্কোর-ভাট নির্ম্মিত হইয়াছিল সূর্য বর্মণের সময়ে (১১১২—১১৬২ খৃঃ অঃ)। এঙ্কোর-ভাট বিষ্ণুমন্দির। মন্দিরের গাত্রে রামায়ণের, মহাভারতের ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী ক্ষোদিত আছে। এঙ্কোর-ভাট ছাড়া টা-প্রোম, প্র-খান ও বায়ন

মন্দিরের বিরাট ধ্বংসাবশেষও উল্লেখযোগ্য। টা-প্রোমের মন্দির সম্পর্কে রাজা জয় বর্মণের শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, আঠারো জন প্রধান পুরোহিতের অধীনে ২৭৪০ জন সাধারণ পুরোহিত ও ২২৩২ জন সহকারী পুরোহিত মন্দিরের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং এক সময়ে বাট-সত্তর হাজার লোক মন্দিরে পূজা দিতে আসিত। বায়ন মন্দিরের গাত্রে অপ্সরীদের নৃত্য, স্কন্দের অভিযান, সমুদ্র মন্থন প্রভৃতি কাহিনী ক্ষোদিত হইয়াছে।

কাম্বোডিয়ার প্রথম হিন্দুরাজ্য ফু-নানের সঙ্গে চীনের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের বিবরণ চৈনিক ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। ফু-নানের ভারতীয় সন্ন্যাসী নাগসেন ও মন্দ্রসেন সঙ্ঘভর চীনে গমন করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় হিন্দুরাজ্য কম্বোজের রাজারা শৈব ও বৈষ্ণব মতাবলম্বী হিন্দু হইলেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কম্বোজের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি প্রধানতঃ হিন্দুধর্মের পরিচয় বহন করে।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে ১৩শ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত কম্বোজের হিন্দু সাম্রাজ্যের গৌরবের যুগ। থাই জাতির পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে এই বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। বিজেতারা হিন্দু শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন সমূহ ধ্বংস করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। হস্তী ব্যবহার করিয়া তাহারা রাজপুরী ও মন্দিরের প্রাকার ও স্তম্ভ সমূহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। কম্বোজের প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একমাত্র এঙ্কোর-ভাট অক্ষত দেহে দাঁড়াইয়া আছে। প্রকৃত পক্ষে এই বিরাট, বিস্ময়কর মন্দিরের নির্মাণকার্য শেষ হইবার পূর্বেই কম্বোজ সাম্রাজ্যের পতন হয়।

চম্পাঃ—খৃষ্টীয় অব্দের প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে ইন্দোচীনের আনাম উপকূলে হিন্দু উপনিবেশ চম্পা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। সম্ভবতঃ প্রথম ঔপনিবেশিক দল যবদ্বীপ হইতে আসিয়া আনামের উপকূলে অবতরণ করিয়াছিলেন। ক্রমে এই উপনিবেশ সমগ্র আনাম ও কোচীন-চীন লইয়া শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। সাম্রাজ্য চারিটি বিষয় বা বিভাগে বিভক্ত ছিল—অমরাবতী, বিজয়, কৌঠার ও পাণ্ডুরঙ্গ। অমরাবতীর রাজধানী ছিল ইন্দ্রপুরী। বিজয়ের প্রধান বন্দর ছিল শ্রীবিনয়; কৌঠারের রাজধানী ছিল বর্তমান না-ত্রাংয়ের (Nha-trang) নিকটে; পাণ্ডুরঙ্গ (বর্তমান ফান্-রাং) বহু দিন সমগ্র চম্পার রাজধানী ছিল।

চৈনিক ইতিহাসের মতে খৃষ্টীয় ১৯২ অব্দে চম্পা রাজ্যের (লি-ই) পত্তন হয়। চম্পার রাজা শ্রীমারের যে সংস্কৃত অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহা এই সময়ের, কিন্তু অনুমান করা হয় ইহার এক শতাব্দী পূর্বে হিন্দুরা কৌঠারে প্রথম উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও দেশীয় চ্যাম ভাষায় লিখিত অনুশাসন সমূহ ও চৈনিক ইতিহাস হইতে চম্পা সাম্রাজ্যের ১২০০ বৎসরের মোটামুটি বিবরণ পাওয়া যায়।

হিন্দু ঔপনিবেশিকদের প্রদত্ত দেশের চম্পা নাম হইতে দেশবাসীরা চ্যাম নামে পরিচিত হইয়াছে। ভারতীয় ধর্ম, ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান তাহারা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। হিন্দুধর্মের শৈব মত চম্পার ঔপনিবেশিক ও দেশীয়গণের মধ্যে প্রচারিত ছিল। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে চম্পা কম্বোজের মত ঐশ্বর্যশালী হইতে পারে নাই, কিন্তু অমরাবতী ও বিজয়ের মন্দিরগুলি ছাড়া চম্পার মন্দির ও অন্যান্য শিল্প-নিদর্শন সমূহ কম্বোজের মন্দির প্রভৃতির মত একেবারে ধ্বংস হয় নাই। মন্দিরগুলির অধিকাংশ শৈব মন্দির।

কৌঠারের অন্তর্গত পো-নগরের শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন রাজা বিচিত্রসাগর। রাজা সত্য বর্মণের সময়ে (খৃঃ অঃ ৭৭৫) মালয়ীরা সমুদ্রপথে এই মন্দির আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াছিল। পাণ্ডুরঙ্গের শ্রীলিঙ্গরাজ (পো-ক্লাংগ-রাই) মন্দিরে ও নিকটবর্তী অঞ্চলে বহু সংস্কৃত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। রাজা হরি বর্মণের (খৃঃ অঃ ৮০৩—৮১৭) রাজত্বকালে অর্থপুরাণ শাস্ত্র নামে সংস্কৃতে রচিত ঐতিহাসিক আখ্যান গ্রন্থে চম্পায় প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র সমূহ আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। হরি বর্মণ পো-নগরে শৈব মন্দির ছাড়া ভগবতী কৌঠার দেবীর ও শ্রীবিনায়কের মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। চম্পায় বৌদ্ধধর্মও প্রচারিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনার ইহা একটি বড় কেন্দ্র ছিল। রাজা শম্ভু বর্মণের সময়ে এক জন চীন সেনাপতি চম্পা হইতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে লইয়া যান। চম্পার গঙ্গারাজ নামে এক জন রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়া বাকী জীবন গঙ্গা-তীরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন একটি অনুশাসন হইতে জানিতে পারা যায়। খৃষ্টীয় ১০ম শতকে গৌড়ের এক রাজকন্যা চম্পার রাজ্ঞী হইয়াছিলেন।

চম্পায় আনামীদের আক্রমণ আরম্ভ হয় খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী হইতে। অমরাবতী ও বিজয় হইতে সরিয়া আসিয়া চম্পার অধিপতিগণ পাণ্ডুর ও কৌঠারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে আনামীদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে প্রাচীন চম্পা রাজ্যের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। বর্তমানে চম্পার নাম পর্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে, চম্পার নাম হইয়াছে আনাম। চম্পার নাম লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু চম্পায় হিন্দু-সংস্কৃতির মূল কত গভীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহার অতি করুণ পরিচয় বহন করিতেছে আনামের এখনকার ছত্রভঙ্গ, দুর্দশাগ্রস্ত হিন্দু চ্যামগণ। এখনও তাহারা মুদ্রা সাধন করিয়া, বিকৃত সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, শঙ্খ-ঘণ্টা-তাম্রপাত্র ব্যবহার করিয়া প্রাচীন কালের জীর্ণ মন্দিরে শিবলিঙ্গের পূজা করে, এখনও তাহারা সূর্যকে বলে আদিৎ (আদিত্য), নগরকে বলে নোকর, মন্দিরকে বলে সোধির।

শ্যাম (থাইল্যাণ্ড):—এক দিকে ইন্দোচীনের কম্বোজ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া ও অন্য দিকে সুমাত্রার শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের বৃহৎ এক অংশ গ্রাস করিয়া খৃষ্টীয় ১৩শ শতকের মধ্যভাগে শ্যাম রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। থাই জাতি উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল হইতে দক্ষি অবতরণ করিবার পূর্বে সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইন্দোচীন কম্বো সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর সমগ্র উত্তর মালয় উপদ্বীপ ছি শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

থাই জাতি কম্বোজের অধীন ছিল। প্রাচীন কিম্বদন্তী ম থাই রাজা ফ্রা রুয়াং কম্বোজের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করেন ইহার পরে থাইরা কম্বোজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাই আরম্ভ করে। কম্বোজের পতনের পরে প্রসিদ্ধ থাই রাজা ফ্র উথোং (পরবর্তী কালে ইনি ফ্রা রাম থিবোডি নামে পরিচিত হন কামফংপেট পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যার (Ayuthia) রাজধা স্থাপন করেন। ব্রহ্মের মৌলমীন, ট্যাভয় টেনাসেরিম ও সম মালাক্কা উপদ্বীপে তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক

আক্রমণে অযোধ্যা ধ্বংস হইবার পরে ব্যাংককে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

থাইরা কম্বোজের হিন্দু সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল, আনামীরা করিয়াছিল চম্পার হিন্দু সাম্রাজ্য; কিন্তু এই দুই জাতিই ভারতীয় ধর্ম, কৃষ্টি, সাহিত্য, ভাষার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হইয়াছিল। আনামীদের মধ্যে এই প্রভাবের পরিচয় পাইতে হইলে এখন অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হয়, কিন্তু থাইদের মধ্যে এই প্রভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ। প্রকৃত প্রস্তাবে কাম্বোডিয়ার ভারতীয় সভ্যতা থাইল্যাণ্ডে বাঁচিয়া আছে। ড্যাংবেক পর্বতশ্রেণী ও মেীন নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চলের বিস্তীর্ণ, বিরাট ভগ্নস্তূপ সমূহ কম্বোজের প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এক জন প্রাচীন ইতিহাসে অনভিজ্ঞ ভারতীয় পর্য্যটক শ্যামের মন্দিরগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের মন্দিরের সাদৃশ্য দেখিয়া রামায়ণ শ্যামের জাতীয় মহাকাব্য (রামকিয়েন), এই কথা জানিয়া এবং যে কোন পালি ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের শ্যামের ভাষা বুঝিতে অসুবিধা হয় না শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ব্যাংককের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইবার পরে তাঁহার মনে হইয়াছিল ভারতবর্ষের একটি অংশ যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া বাতাসে ভাসিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অংশে আসিয়া পড়িয়াছে।

শ্যামের দ্বারাবতীর স্থাপত্যে ভারতের গুপ্ত আমলের প্রভাবের কথা ও পরবর্তী কালের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে পাল, সেন, চন্দ্র ও বর্মণ আমলের প্রভাবের কথা কেহ কেহ বলিয়াছেন। আসাম-মণিপুর-ব্রহ্ম হইয়া শ্যাম ও ইন্দোচীন পর্যন্ত স্থলপথ মধ্যযুগে ব্যবহৃত হইত। কোন কোন মতে পালযুগের বৌদ্ধ শিল্প এই পথে উত্তর-শ্যামে পৌঁছিয়াছিল।

শ্রীবিজয় ও যবদ্বীপঃ—ইন্দোনেশিয়ার হিন্দু উপনিবেশের মধ্যে সুমাত্রার শ্রীবিজয় ও যবদ্বীপের নাম সমধিক পরিচিত। সুমাত্রা ও জাভার হিন্দু উপনিবেশ ইন্দোচীনের হিন্দু উপনিবেশের মত খৃষ্টীয় প্রথম শতকে বা তাহার কিছু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একখানি চীনা-গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, খৃঃ অঃ ২৭ হইতে ৫৭ সনের মধ্যে চীনের হান সম্রাট কুং-উটির সময়ে উ-ইন-তু (ইণ্ডিয়া) হইতে ঔপনিবেশিকগণ যবদ্বীপে আসিয়াছিলেন।

সুমাত্রা ও জাভায় প্রথমে হিন্দুধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে কাশ্মীরের রাজকুমার গুণ বর্মণ যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতকের প্রথম দিকে ফা-হিয়েন সিংহল হইতে ক্যাণ্টনের পথে শ্রীবিজয় ও যবদ্বীপে অবতরণ করেন। তখন যবদ্বীপে তিনি হিন্দুধর্মের প্রাধান্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতকে ইৎ-সিংয়ের (খৃঃ অঃ ৬৭১-৮৯) বর্ণনায় শ্রীবিজয়ের সম্বন্ধ ও সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তখন শ্রীবিজয় নগরে বৌদ্ধ পুরোহিতের সংখ্যা ছিল হাজারের উপর। মধ্যদেশে (ভারতবর্ষে) যে-সকল শাস্ত্র আলোচনা হইত ও যে সকল আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হইত শ্রীবিজয়েও তাহা হইত। ইৎ-সিং লিখিতেছেন, জ্ঞানলাভের জন্য কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুর ভারতবর্ষে যাইবার পূর্বে শ্রীবিজয়ে কয়েক বৎসর থাকিয়া সেখানে শাস্ত্রালোচনা করা উচিত। খৃষ্টীয় ১৩শ শতক পর্যন্ত শ্রীবিজয় বৌদ্ধধর্ম চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। খৃষ্টীয় ১১শ শতকে বাংলার বিখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ আচার্য চন্দ্রকীর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীবিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। নেপালের ১০ম-১১শ শতাব্দীর একখানি পুঁথিতে শ্রীবিজয়পুরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই উল্লেখ হইতে শ্রীবিজয়ের খ্যাতি কত দূর প্রচারিত হইয়াছিল, জানিতে পারা যায়।

শৈলেন্দ্র সম্রাটদিগের আমলে শ্রীবিজয় সমৃদ্ধির শিখরে উঠিয়াছিল। পনেরটি সামন্ত রাজ্য শ্রীবিজয়ের অধীন ছিল। এই পনেরটির মধ্যে আটটি অবস্থিত ছিল মালয় উপদ্বীপে। মগধের সম্রাট দেবপাল দেবের (খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী) নালন্দা অনুশাসন হইতে জানা যায় যে, শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্র সম্রাটগণ পাল সম্রাটগণের মিত্র ছিলেন।

থাই জাতি খৃষ্টীয় ১৩শ শতকে মালয় উপদ্বীপের উত্তরাংশ দখল করিয়া লইল। এদিকে যবদ্বীপের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য শ্রীবিজয়ের পতন হইল; উহা যবদ্বীপের মাজপাহিত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

বোর্ণিওতে হিন্দু-প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকের রাজা মূল বর্মণের যূপলিপিতে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের উল্লেখ হইতে।

যবদ্বীপের হিন্দু উপনিবেশ প্রধানতঃ মধ্য-জাভায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুরাকর্তা, জোগজোকর্তা প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দু-প্রভাবাধীন নগরগুলি মধ্য-জাভায় অবস্থিত। খৃষ্টীয় ১ম শতক হইতে যবদ্বীপ প্রবল হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে। মধ্য জাভার রাজাদের অনুশাসনগুলি সংস্কৃত ভাষায় কবি লিপিতে লিখিত। এই লিপির সহিত দক্ষিণ-ভারতীয় লিপির সাদৃশ্য আছে। শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্র রাজাদের অনুশাসনের লিপি পূর্ব-ভারতীয় লিপির সদৃশ। বেরোবুদুরের বিখ্যাত মন্দির ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত হয়। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়, বলা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইবার পরে হিন্দুধর্ম আবার প্রবল হয়। পেরাম্বানানের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি এই সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। আটটি মন্দিরের মধ্যে চারিটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও নন্দীকে উৎসর্গীকৃত। মন্দিরগুলির প্রাচীরে রামায়ণের দৃশ্যাবলী ক্ষোদিত।

খৃষ্টীয় ১০ম শতকে পূর্ব-জাভায় এক হিন্দু রাজবংশ প্রবল হইয়া উঠে। এই রাজবংশের উৎসাহে রামায়ণ ও মহাভারত স্থানীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষে শ্রীক্ষেত্র রাজা মাজপাহিত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে এই সাম্রাজ্য সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের মহাযান মত যবদ্বীপে প্রবল হয়। সম্রাট হিয়াম-উরুকের (খৃঃ অঃ ১৪ শতাব্দী) সভাকবি প্রপঞ্চের লিখিত "নাগর কৃতাম" হইতে জানিতে পারা যায়, সেই সময়ে প্রতি বৎসর বহু গৌড়ের অধিবাসী যবদ্বীপে আসিতেন।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে ইসলামের অভ্যুদয়ের ফলে মাজপাহিত সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের সহিত ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়।

ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কথা বলিতে গিয়া উপনিবেশ বিস্তার ও সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণের কথা বলা হইয়াছে, বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা বাহুল্য বোধে বলা হয় নাই। সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ

ও উপনিবেশ বিস্তার যদি খৃষ্টীয় প্রথম শতকে আরম্ভ হইয়া থাকে, বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন অবশ্য তাহার পূর্বের ব্যাপার। ভারতের বাণিজ্য জাহাজে চড়িয়া প্রথম হিন্দু ঔপনিবেশিক দল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাত্রা করিয়াছিলেন। ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজে চড়িয়া ফা-হিয়েন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ বিস্তার ও সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ সম্বন্ধে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। ভারতীয় ধর্ম ও ধর্ম-সাহিত্যের প্রচার হইয়াছে মোটামুটি পশ্চিম-এশিয়া বাদে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে। প্রাচীন যুগে পূর্ব-মধ্য এশিয়ার কাশগড়, খোটান, ফুচার, তুর্ফান প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজ্যে কিছু সংখ্যক ভারতীয় ঔপনিবেশিক হয়ত গিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের অনেক গভীর, অনেক অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে ভারতবর্ষের "জাতীয় ধর্ম" বলা হয় সেই ধর্ম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই ধর্মের ধ্বজাবাহিগণ কম্বোজ, চম্পা, সুমাত্রা, যবদ্বীপে যে সকল উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সহস্র বৎসরের অধিক কাল সেই সকল উপনিবেশ আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিল। ঔপনিবেশিকগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে যে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক দীক্ষা দান করিয়াছিলেন তাহা যে কত অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, শ্যামে পদার্পণ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়; চ্যামদিগের শিবলিঙ্গ পূজার অনুষ্ঠান দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়, জাভা ইসলাম-কবলিত হইলে যে সকল জাভানীজ বলী দ্বীপে পলাইয়া আসেন তাঁহাদের বর্তমান পূজাপদ্ধতি, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ইন্দোনেশিয়া হইতে এই ভারতীয় প্রভাব ফিলিপাইনে প্রসারিত হইয়াছিল। স্প্যানীয়ার্ডগণ যখন ১৬শ শতাব্দীতে ফিলিপাইনে হানা দিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষায় ও বর্ণমালায় সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিল, জানা যায়।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই প্রশান্ত মহাসাগরমুখী অভিযানে ভারতবর্ষ যেন তাহার মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিল। ইহার ভিতরকার রহস্য জানিতে কৌতূহল হয়, কিন্তু এ প্রশ্ন কেহ আলোচনা করেন নাই। আমরা ইহার কারণ শুধু অনুমান করিতে পারি।

জাতি সম্পর্কের দিক দিয়া ভারতবাসীর সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়ার সম্পর্ক বেশী, মোঙ্গলয়েড লক্ষণাক্রান্ত জাতিগুলি বর্তমান কালে যেমন, প্রাচীন কালেও সেইরূপ ভারতের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে আবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষের বাহিরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর না হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মোঙ্গলয়েড লক্ষণাক্রান্ত জাতিগুলির সহিত অন্তরঙ্গতা স্থাপনে ভারতবর্ষ সাগ্রহে অগ্রসর হইয়াছিল কেন? আমাদের অনুমান, ইহার কারণ উত্তর দ্বার দিয়া ভারতীয় সাংস্কৃতিক অভিযান দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িলেও জনপ্রবাহের নির্গমন পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল মধ্য-এশিয়ায় চির-অশান্ত জাতি সমূহের চাপে।

বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায়, পূর্বে মোঙ্গলিয়া ও চীনের কিয়াও চাং হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর ও ককেশাস পর্বতমালা, উত্তরে তুর্কীস্থানের মরু অঞ্চল, বলখাস হ্রদ, আলতাই-তিয়েনশান পর্বতশ্রেণী ও দক্ষিণে হিমালয়-আল্পস মেরুদণ্ড এই চতুঃসীমানার মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চল ঐতিহাসিক যুগের প্রথম হইতে ডাইনী কটাহের তৈলের মত টগবগ করিয়া ফুটিতেছে, উত্তপ্ত তৈল উথলাইয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং যেখানকার মাটি স্পর্শ করিতেছে তাহাই পুড়াইয়া দিতেছে। সোজা কথায়, উত্তর হইতে নূতন নূতন জাতি ক্রমাগত ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল; স্বভাবতই, দেশের অভ্যন্তরের জনস্রোত সেদিক দিয়া বাহিরে যাইবার পথ পায় নাই, সে চেষ্টাও করে নাই। তার পর দেখা যায় যে, খৃঃ পূঃ ২য় শতক হইতে সমগ্র মধ্য-এশিয়া-ব্যাপী বিশাল হুন সাম্রাজ্য উত্তরের নির্গমন পথ রোধ করিয়া অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় ৫ম শতকে হুন সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন, পরাক্রান্ত তুর্ক সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইল সিজিবুর নেতৃত্বে। তুর্ক সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে না পড়িতে হইল ইসলামের উদয়। নবোদিত ইসলামের আক্রমণে ইরাণের গৌরবময় সাসানীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার সংবাদ রটিলে উত্তর দিক হইতে চিরদিনের জন্য মুখ ফিরাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন কি ভারতবাসীরা? মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের নিকট বিদায় লইয়া পরিব্রাজক হুয়েন-চ্যাং যখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন (৬৪৫ খৃঃ অঃ) কাদিসীয়া ও নেহাভেন্দের যুদ্ধে পারস্য সাম্রাজ্য পর্যুদস্ত করিয়া বিজয়ী ইসলাম তখন হিন্দু রাজা-শাসিত আফগানিস্তানের পশ্চিম প্রান্তে হানা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

[ক্রমশঃ।

বিজ্ঞাপন

চোখে না দেখিয়ে বিজ্ঞাপন করেছে কেউ? চোখে না দেখিয়ে বিজ্ঞাপন—ভাবতে বিস্ময় লাগে, চোখে না দেখিয়ে বিজ্ঞাপন! কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন, কানে শুনিয়ে তো বিজ্ঞাপন করা যায়! ফেরীওয়ালা যা করে। কিন্তু কানেও না শুনিয়ে বিজ্ঞাপন হচ্ছে। সম্প্রতি আমেরিকায় একটি মাংস-বিক্রেতা দোকানে এক জন চিকিৎসককে মাইনে দিয়ে রেখেছে। চিকিৎসকের কাজ হ'ল দোকান থেকে মাংস এবং পেঁয়াজের মিশ্রিত সুগন্ধ ছড়ানো—যে গন্ধটা নাকে গেলে কাঁটা-চামচেকে মনে পড়বে।

কিছু দিন আগে ইংলণ্ডে একটি কাগজ বেশ বিজ্ঞাপন ক'রেছিল। তখন শীত পড়েছে খুব। কাশি, সর্দ্দি ও ইনফ্লুয়েনজায় অধিকাংশ লোক ভুগছে। মালিক করলেন কি, তখনকার কাগজে জলীয় ইউকালিপটাস ছড়িয়ে বাজারে কাগজ ছড়াতে লাগলেন। ফলে হল কি, কাগজ বেরোতে না বেরোতে বিক্রী হ'তে লাগলো।

এ্যাটম

শ্রীযামিনীমোহন কর

এ্যাটমের বিভিন্ন অংশ

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে বিখ্যাত জার্মাণ অধ্যাপক রঞ্জন ক্যাথোড রশ্মি সম্পর্কে গবেষণা করতে করতে হঠাৎ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করে ফেলেন। তিনি দেখলেন যে, তড়িৎ-মোক্ষণের সময় নিকটস্থ একটি বেরিয়াম প্ল্যাটিনোসায়ানাইড বা,দস্তার সালফাইড অথবা সিলিকেটের প্রেলপযুক্ত পর্দা দীপ্তিময় হয়ে ওঠে। নলকে কিংবা পর্দাকে কালো মোটা কাগজে ঢেকে তড়িৎমোক্ষণ করলেও পর্দা দীপ্তিময় হয়। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, নিশ্চয়ই নল থেকে কোন অদৃশ্য রশ্মি বার হয়, যার ঢাকা ভেদ করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু কেন এমনটা হয় তা ঠিক করতে না পেরে তিনি এই নতুন রশ্মির নাম দিলেন অজ্ঞাত রশ্মি বা এক্স-রে। তাঁর নামানুসারে একে রঞ্জন-রশ্মিও বলা হয়। তার পর তিনি মোক্ষণ নল ও প্রতিপ্রভ পর্দার মধ্যে কতকগুলি পদার্থ রেখে ছায়া উৎপাদন করলেন। দেখা গেল, বিভিন্ন বস্তুর ছায়া বিভিন্ন ঘনতার হয়। তাহলে হাড়ের এবং মাংসের ছায়ার ঘনতা বিভিন্ন হবে, মাংসের হাল্কা, হাড়ের ঘন। এই হ'ল এক্স-রে ছবির মূল কথা। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, মোক্ষণ নলের যে স্থানে ক্যাথোড রশ্মি আঘাত করে, সেখান থেকে এই রঞ্জন-রশ্মি উদ্ভূত হয়।

এক্স-রশ্মি সাধারণ আলোক-রশ্মির মত ঈথারে এক প্রকার তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, তবে এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের প্রায় হাজার গুণ ছোট। সুতরাং এর কম্পনাঙ্ক দৃশ্য আলোর কম্পনাঙ্কের হাজার গুণ বেশী। গতিশক্তি ও ভেদশক্তিও অধিক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ক্যাথোড রশ্মি তরঙ্গ নয়, আধানে আহিত কণার সমষ্টি।

রঞ্জন-রশ্মি সরল পথে যায়। মনে কর, এই রশ্মির এক সমান্তরাল গোষ্ঠী কোন কৃষ্ট্যালের ওপর θ কোণে হেলে পড়ল। কৃষ্ট্যালকে সমান্তরাল প্রতিফলক গোষ্ঠী মনে করা যায়। মনে কর, দু'টো প্রতিফলক তলের মধ্যে দূরত্ব d. যদি রঞ্জন-রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য λ হয়, তবে

$$n\lambda = 2d\sin\theta$$

যেখানে $n = 1, 2, 3\cdots$ বা যে কোন অখণ্ড সংখ্যা। d এবং θ জানা থাকলে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য λ নির্ণয় করা যায়।

রঞ্জন-রশ্মি আবিষ্কারের অল্প দিন পরেই ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের অধ্যাপক বেকরেল ইউরেনিয়ামের দীপ্তি ও রঞ্জন-রশ্মির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তিনি একটা ফটোগ্রাফ প্লেট কালো কাগজে জড়িয়ে তার ওপর ইউরেনিয়াম রেখে রোদে রাখলেন। প্লেট ডেভালপ করার পর দেখা গেল যে, প্লেট কালো হয়ে গেছে। তাতে বোঝা গেল যে, ইউরেনিয়াম থেকে নির্গত রশ্মি কাগজ ভেদ করতে পারে। তার পর তিনি দেখালেন, শুধু কাগজ কেন, পাতলা অ্যালুমিনিয়াম, তামার প্লেট পর্য্যন্ত ভেদ করে। প্রথমে তিনি মনে করেছিলেন যে, ইউরেনিয়াম সল্টের ওপর সূর্য্যকিরণ-পাতের ফলে এই শক্তিশালী রশ্মি উদ্ভূত হয়। পরে অন্ধকারেও ঠিক এই রকমই ব্যাপার ঘটে দেখলেন। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, এ রশ্মি নির্গত হয় ইউরেনিয়াম থেকে। এই রশ্মি এক্স-রশ্মির মত ফটোগ্রাফিক পাতকে কালো করে, গ্যাসকে আয়নিত করে, বেরিয়াম প্ল্যাটিনেসায়ানাইড পাতে প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে, পদার্থের পাতলা স্তর ভেদ করে। এই রশ্মিকে বেকরেল-রশ্মি বলা হয়। ১৮৯৮ সালে মাদাম ক্যুরী এই অদ্ভুত ব্যাপারের নাম তেজস্ক্রিয়া (radioactivity) রাখেন। যে সকল পদার্থে স্বতঃই রশ্মি বিকীর্ণ করে, তাদের তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলে।

এই আবিষ্কারের কয়েক মাস বাদে প্যারিসের অধ্যাপক পিয়ারী ও মাদাম ক্যুরী দেখেন যে, থোরিয়াম এবং তার যৌগিক পদার্থ থেকেও বেকরেল-রশ্মি বার হয়। পিচব্লেণ্ডি থেকে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনের পর অবশিষ্ট আকরিকের তেজস্ক্রিয়া ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়ার চতুর্গুণ হয়ে যায়। তাহলে নিশ্চয়ই পিচব্লেণ্ডির মধ্যে এমন এক পদার্থ আছে, যা ইউরেনিয়াম অপেক্ষা বেশী তেজস্ক্রিয়। তাঁরা কয়েক টন পিচব্লেণ্ডি থেকে অনেক চেষ্টায় মাত্র দু'-এক গ্রেণ নতুন এক মৌলিক পদার্থ নিষ্কাশন করেন। এই নতুন মৌলিক পদার্থের নাম দেন রেডিয়াম। পিচব্লেণ্ডি অপেক্ষা এই রেডিয়াম দশ লক্ষ গুণ বেশী তেজস্ক্রিয়। রেডিয়াম থেকে এক প্রকার তেজস্ক্রিয় গ্যাস বার হয়, যাকে রডন বলে।

১৮৯৯ সালে বেকরেল এবং আরও দু'-চার জন বৈজ্ঞানিক প্রায় একই সময় দেখান যে, চৌম্বক ক্ষেত্রে ক্যাথোড রশ্মি যে দিকে বিচ্যুত হয়, এই রশ্মিও ঠিক সেই দিকেই বিচ্যুত হয়। তা হলেই বলা যায় যে, ক্যাথোড রশ্মির মত এই রশ্মিও ঋণাত্মক আধানে আহিত কণার সমষ্টি। বিলাতের রাদারফোর্ড পাতলা অ্যালুমিনিয়াম পাতের মধ্যে দিয়ে এই রশ্মিকে চালিয়ে তার আয়নিত করার ক্ষমতা হ্রাস করেন। পরীক্ষা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইউরেনিয়ামের যৌগিক পদার্থসমূহ থেকে যে রশ্মি বিকীর্ণ হয়, তা দু'টো ভিন্ন জাতীয় রশ্মির সমষ্টি: একটার নাম দিলেন অ্যালফা রশ্মি, আরেকটার নাম দিলেন বিটা রশ্মি। বিটা রশ্মির ভেদ ক্ষমতা অ্যালফা রশ্মির প্রায় শত গুণ।

তার পর পৃথক্ ভাবে রশ্মিগুলির গবেষণা আরম্ভ হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে রাদারফোর্ড খুব শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র আরোপ করে অ্যালফা রশ্মিকে বিচ্যুত করতে সমর্থ হন, কিন্তু এই বিচ্যুতি ইলেকট্রোনের বিচ্যুতির বিপরীত হয়। সুতরাং প্রমাণিত হ'ল যে, অ্যালফা রশ্মি ধনাত্মক আধানে আহিত কণার সমষ্টি। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এই কণা সমূহের আপেক্ষিক আধান অর্থাৎ e/m নির্ণয় করেন। এর মান হ'ল গ্রাম পিছু $1{\cdot}5\times10^{14}$ স্থিতীয় তড়িৎ একক ; প্রোটোনের অর্থাৎ একক আধানে আহিত হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রায় অর্দ্ধেক।

দু'রকম ভাবে এই সিদ্ধান্তের অর্থ করা যায়। অ্যালফা কণাকে হাইড্রোজেন অণু মনে করা যেতে পারে, যার ভার হাইড্রোজেন পরমাণুর দ্বিগুণ কিন্তু আধান একক মাত্র ; অথবা এই কণা একটি হিলিয়াম পরমাণু, যার ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর চতুর্গুণ এবং দুই একক আধানে আহিত। রাদারফোর্ড দ্বিতীয়টাকেই ঠিক বলে মনে করেন। পরে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, একটা অ্যালফা কণার আধান $9{\cdot}6\times10^{-10}$ স্থিতীয় তড়িৎ একক, অর্থাৎ মূল ইলেকট্রোনিক আধানের দ্বিগুণ। যেহেতু এই কণার e/m প্রোটোনের অর্দ্ধেক, এবং এর আধান দুই একক, সুতরাং এর ভর নিশ্চয়ই প্রোটোনের অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুর চতুর্গুণ। অতএব দ্বিতীয় মতবাদই ঠিক প্রমাণিত হ'ল, অর্থাৎ এই কণা একটি হিলিয়াম পরমাণু। প্রতীক হিসেবে একে লেখা হয় He^{++}.

এর পর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রাদারফোর্ড এবং রয়েড্‌স, দু'জনে মিলে এমন এক প্রমাণ দিলেন যে, এই মতবাদ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না। অ্যালফা রশ্মি বিকীর্ণকারী এক তেজস্ক্রিয় পদার্থকে একটা কাচের নলে পুরে তাকে আরেকটা বায়ুহীন কাচের আবরণের ভেতর রাখা হ'ল। অ্যালফা কণা ভেতরের নল ভেদ করে বাইরে চলে এল। কয়েক দিন পরে বাইরের বায়ুহীন আবরণে তড়িৎ মোক্ষণ করে হুবহু হিলিয়ামের বর্ণালী পাওয়া গেল। নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হ'ল যে, অ্যালফা কণা হিলিয়ামই বটে।

বিটা-রশ্মির পথ তড়িৎ বা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা অ্যালফা রশ্মির বিপরীত অভিমুখে বিচ্যুত হয়, সুতরাং বিটা-রশ্মি ঋণাত্মক আধানে আহিত কণার সমষ্টি। এই কণার ভর অ্যালফা কণার ৭৪০০ ভাগ, সুতরাং এদের ভেদ-ক্ষমতা যেমন বেশী, গ্যাসকে আয়নিত করবার ক্ষমতা তেমনই কম।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের অধ্যাপক ভিলার্স আর এক প্রকারের বিকীরণ রশ্মি আবিষ্কার করেন, যার চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুতি ঘটে না। তিনি এর নাম দিলেন গামা-রশ্মি। এই রশ্মি রঞ্জন-রশ্মির মত ঈথারে তরঙ্গ, কারণ এর চৌম্বক বা তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা বিচ্যুতি ঘটে না। এই রশ্মি তড়িতাহিত নয়। এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য রঞ্জন-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সহস্র ভাগ কম। সুতরাং এর ভেদ-ক্ষমতা বেশী কিন্তু গ্যাসকে আয়নিত করবার ক্ষমতা কম।

	অ্যালফা	বিটা	গামা
আপেক্ষিক আয়নিত ক্ষমতা—	১০০০০	১০০	১
" ভেদ-ক্ষমতা—	১	১০০	১০০০০

মাদাম ক্যুরি যে পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে তাঁর ডক্টর উপাধির থিসিস লেখেন তা এইখানে দেওয়া হ'ল। তিনি এক খণ্ড মোটা সীসার মধ্যে গর্ত্ত করে তাতে একটু রেডিয়াম লবণ রাখেন। তার থেকে এক সঙ্কীর্ণ রশ্মিগুচ্ছ ওপর দিকে উত্থিত হয়। তিনি রশ্মিতলের অভিলম্ব ভাবে একটা শক্তিশালী চুম্বক রেখে দেখেন যে, অ্যালফা রশ্মি বাম দিকে একটুখানি, বিটা-রশ্মি ডান দিকে অনেকখানি বিচ্যুত হয়, কিন্তু গামা-রশ্মি অবিচ্যুত থাকে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের হার্কিন্স, অষ্ট্রেলিয়ার ম্যাসন এবং বিলেতের রাদারফোর্ড প্রায় একই সময় উল্লেখ করেন যে, পরমাণুর গঠনে কোন একটা বিশেষ এবং এখন পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত কণা আছে, যা ধনাত্মক প্রোটোন এবং ঋণাত্মক ইলেকট্রোনের পরস্পরের সঙ্গে মিলনের ফলে সৃষ্ট। এই কণা আধানহীন এবং আণবিক ওজনের পরিমাপ অনুযায়ী এর ভর একক। নিউট্রাল অর্থাৎ আধানহীন শব্দ থেকে এই কণার নাম দেওয়া হ'ল নিউট্রোন। কিন্তু তখনও নিউট্রোন আবিষ্কৃত হয়নি।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে জার্মাণীর বথ ও বেকার জানালেন যে, তেজস্ক্রিয় মৌল পলোনিয়াম থেকে নির্গত অ্যালফা রশ্মি খুব হাল্কা মৌল বেরিলিয়ামের ওপর ফেললে অতি প্রবল ভেদ-ক্ষমতাশালী রশ্মি উদ্ভূত হয়। তাঁরা মনে করলেন, হয়ত এও এক রকম গামা-রশ্মি। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে আইরিণ জোলিও ক্যুরি ও তাঁর স্বামী (মাদাম ক্যুরির কন্যা ও জামাতা) দেখলেন যে, প্যারাফিন-সিক্ত পদার্থের ওপর এই নতুন রশ্মি ফেললে প্রচণ্ড বেগে প্রোটোন সমূহ বেরিয়ে যায়। তাঁরা ভাবলেন, বৈদ্যুতিক শক্তিকে গতীয় শক্তিতে পরিণত করবার এটা বুঝি একটা নতুন পন্থা। কিন্তু বলবিদ্যার নিয়ম খাটল না। তাহলে এ ক্ষেত্রে হয় বলবিদ্যার নিয়ম প্রযোজ্য নয়, অথবা এই রশ্মি গামা-রশ্মির সমধর্মী নয়। ১৯৩২ সালে এই রহস্যের মীমাংসা করলেন, ইংলণ্ডের চাডউইক। তিনি বললেন যে, যদি এই রশ্মিকে নিউট্রোন অর্থাৎ আধানহীন কণার সমষ্টি মনে করা হয়, তাহলে বলবিদ্যার নিয়ম প্রয়োগ করা যায়। তাহলেই দ্রুত গতিশালী নিউট্রোন নিশ্চয়ই হাল্কা হাইড্রোজেন বা অন্য পরমাণুকে গতীয় শক্তি প্রদান করতে পারে। আণবিক ওজনের পরিমাপ হিসেবে এই কণার ভর একক ধরলেই সব প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়। এইবার নিউট্রোন আবিষ্কৃত হ'ল।

যেহেতু নিউট্রোনের কোন আধান নেই, সুতরাং গতিপথে বিশেষ কোন আয়ন সৃষ্টি করতে পারে না ; অতএব "মেঘ-কক্ষে" এর গতিপথ দেখা যায় না। সেই জন্যই এত দিন একে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। আধান নেই বলেই এর ভেদ-ক্ষমতা এত প্রবল। আজকাল আরও অনেক উপায়ে নিউট্রোন উৎপাদন করা যায়। এখন স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, পরমাণুর গঠনে নিউট্রোন একেবারে মূল অংশ। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে বলা হবে।

[ক্রমশঃ।

ভক্ত কবীর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস (শান্তিনিকেতন)

কবীরদাসের চোখে জগৎ প্রেমময়, জীবন প্রেমময়। জগৎ জুড়ে অবিরত প্রেমের রাগিণী বাজছে। সেই সুরে মত্ত হয়ে জীবন-মৃত্যু, রাহু-কেতু, সমুদ্র-পর্বত, সারা দুনিয়া নাচছে, হাজার ভাবে এই প্রেমের স্পর্শ লাগছে কবীরের মনে আর সে আনন্দে নাচছে আর এতে আনন্দিত হচ্ছেন স্বয়ং স্রষ্টা।

কবিরাজ গোস্বামীর মত কবীরদাসও মনে করতেন এই প্রেম ভাগ্যবলেই লাভ করা যায়। সে সৌভাগ্য কি এক জন্মেই হয়? তা হয় না। কবীরদাস বলেন, যুগ-যুগ প্রতীক্ষা করার পর তবে প্রভুর প্রতি প্রেম জন্মে। কত জন্ম-জন্মান্তর যুগ-যুগান্তের প্রতীক্ষার পর এক দিন প্রভু কৃপা করেন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, হৃদয়-মুকুল প্রস্ফুটিত হয় ভরে উঠে প্রেমসুধায়।

যার অন্তর প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল সে জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করল। সংসারে তার সকল চাওয়া সকল পাওয়ার অবসান হয়ে গেল। মানুষ সংসারে এসে অবিরত সুখ-সম্পদের সন্ধানে ফিরে। সুখের আশায় সে প্রাণপাত করে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার সে আশা পূর্ণ হয় না। সুখের তৃষ্ণা তাকে মরীচিকার পিছনে ছুটিয়ে মারে। তার কারণ, যথার্থ সুখ কেমন করে পাওয়া যায় তা সে জানেই না। সুখ বলে যা সে খুঁজে মরে তা যে সুখাভাস মাত্র তা-ই সে বোঝে না। কবীরদাস এমনি ধরণের ভ্রান্ত মানুষকে যথার্থ সুখের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রভুকে পেলেই তবে যথার্থ সুখ পাওয়া যায়। আর তাঁর মতে এই সুখ পেতে হ'লে চাই প্রেম, চাই বৈরাগ্য।

সুখের তৃষ্ণা অফুরন্ত। সে তৃষ্ণা মিটাতে হ'লে চাই সুখের একটি সাগর। তাই, কবীরদাস বললেন প্রেম ও বৈরাগের কথা। কেন না, তাঁর মতে প্রেম ও বৈরাগ্যের পথে চললে পরেই এই পরম সুখ-সাগরের সন্ধান পাওয়া যায়। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

কিন্তু এই প্রেম সহজ জিনিষ নয়, আরামের জিনিষ নয়। ঠিক তার উল্টো। প্রভুর প্রতি যার প্রেম জন্মাল ঘুচল তার সকল আরাম, আগুন লাগল তার তথাকথিত সকল সুখে। অসীম তার বেদনা। দুঃসহ তার বিরহ-দহন। সে-দহনে সে দিন-রাত ছটফট করে মরে। প্রিয়ের সঙ্গে মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত তার ব্যাকুলতার অন্ত নেই; তার দিনে নেই স্বস্তি, রাতে নেই ঘুম। কিন্তু অতি কঠিন সে-মিলন। অন্য সব ছেড়ে কেবল মাত্র প্রিয়ের জন্য যখন সমস্ত দেহ-মন ব্যাকুল হয়ে কেঁদে ফিরবে, চাতক যেমন বারিবিন্দুর আশায় অনবরত মেঘের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চীৎকার করতে থাকে, প্রাণ গেলেও অন্য জল খায় না, তেমনি যখন প্রিয়-মিলন-পিয়াসী হয়ে অনবরত প্রিয় প্রিয় বলে ডাকতে থাকবে, সতী যেমন করে পতিপ্রেমের কথা স্মরণ করে হাসতে হাসতে আরোহণ করে পতির চিতায়, তেমনি যখন প্রিয়তমের জন্য ব্যাকুল হয়ে নিজের দেহ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে পারবে তখন হয়ত হবে মিলন।

প্রেমের পরিচয় ত্যাগে। সকল ত্যাগের সেরা ত্যাগ আত্মত্যাগ। তাই কবীরদাস বলছেন, পেয়ে যদি থাকিস, বন্ধু, তা হ'লে দিয়ে দে নিজেকে। প্রেমের পরিণতি আত্মবিসর্জনে। প্রেমের ক্ষেত্রে 'আমি' নেই সব 'তুমি', সব তিনি। প্রেম আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান্। যার সত্যিকারের প্রেম জন্মাল তার আর তা হারাবার ভয় নেই, সেই জন্যই কবীরদাস বলেন, পেয়েছিস ত তার আবার হারানো কি। এ জিনিষ যে একবার পেয়েছে সে আর হারাতে পারে না।

এই পরম বস্তু, এই 'অমূল রতন' পাওয়া যায় কি করে। ভাগ্য প্রসন্ন হ'লে প্রভু কৃপা করেন আর তা হ'লেই পাওয়া যায়। কবীরদাস প্রভৃতির এই মতের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু ভাগ্যের প্রসন্নতা, প্রভুর কৃপা, সে ত কোনো একটা উপলক্ষ করে আসবে। কি সে উপলক্ষ? ভক্তেরা বলেন, সে উপলক্ষ সদ্‌গুরু।

ভক্তিবাদের সঙ্গে গুরুবাদ অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। ভক্তিপথের গুরু দিশারী। ভক্তিরস-সায়রে গুরু কর্ণধার। গুরু-কৃপা ভিন্ন অন্তরে ভক্তি-বীজ উপ্ত হয় না। গুরু-কৃপা ভিন্ন প্রেম জন্মে না। তাই কবিরাজ গোস্বামী গুরু কৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতাবীজ পাবার কথা বলেছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, গোস্বামী-পদে কৃষ্ণেরও আগে গুরু শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটি আকস্মিক নয়। তিনি ইচ্ছা করেই করেছেন। ভক্তদের কাছে বিশেষ করে বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে গুরু এমনি গুরুই বটেন।

কে এই গুরু? গুরু স্বয়ং ভগবান। বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক শ্রীভাগবতস্বামী বলেন—"গুরুরূপে শ্রীভগবানই অবতীর্ণ ইহা সর্ববাদি-সম্মত গুরুতত্ত্ব।" কিন্তু যিনি অবাঙ্‌মনসগোচর সেই অসীমকে কেমন করে সসীম জীব গুরুরূপে পাবে? তার উত্তরে ভক্তেরা বলেন—সর্বভূতান্তরাত্মা ভগবান নরদেহে বিরাজমান। মানুষের কাছে তাই তিনি মানুষ গুরুরূপেই প্রকাশিত, কিন্তু ভক্ত তাঁকে মানুষরূপে দেখেন না। ভক্তের কাছে তিনি ভগবদ্‌স্বরূপ। ভক্তিশাস্ত্র মতে স্বয়ং ভগবানের বাণী—আচার্য্যং মাং বিজানীহি—আমাকে আচার্য্য বলে জানবে। এর উপর আর কথা নেই। তাই, ভক্তের কাছে 'সর্বদেবময়ঃ গুরুঃ,' গুরু সর্বাগ্র-পূজ্য। তাই ভক্তিশাস্ত্র মতে স্বয়ং ভগবানের বাণী 'প্রথমন্তু গুরুঃ পূজ্যঃ ততশ্চৈব মমার্চনম্।'—আগে গুরুর পূজা করে পরে আমার অর্চনা করবে।

আগে গুরু পাছে কৃষ্ণ। অথবা এ কথা বলা হয়ত ভুল। বলা উচিত, যেই গুরু সেই কৃষ্ণ। তবে কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ-স্বরূপ গুরুকে অবলম্বন করে হয় কৃষ্ণসেবা।

গুরুর এই মাহাত্ম্য, গুরুর গৌরব শুধু ভক্তিধর্মে নয়, ভারতে উদ্ভূত সকল ধর্মেই স্বীকৃত। যাঁরা গুরুকে ভগবান মনে করেন না, তাঁরাও তাঁকে ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে থাকেন। জ্ঞানপন্থী, যোগপন্থী, সহজপন্থী, তান্ত্রিক, এমন কি বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি মতেও গুরুর স্থান সর্বোচ্চে। যোগ মত, তান্ত্রিক মত প্রভৃতিতে ত গুরু ভিন্ন এক পা-ও এগোবার উপায় নেই। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে গুরু গরিষ্ঠ।

বলা বাহুল্য যে, কোনো লোক গুরু হতে পারেন না। সকল ধর্মমতেই গুরুর লক্ষণ বিস্তৃত ভাবে দেওয়া আছে। সহজ কথায় বলা যায়, সব মত অনুসারেই যিনি সিদ্ধ তপস্বী, যিনি নরোত্তম, তিনিই সদ্‌গুরু। সাধারণ লোকের ভগবান সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ধারণা নেই। সদ্‌গুরুকে দেখে তারা ভগবান সম্বন্ধে ধারণা করতে

পারে। এই জন্য, ঈশ্বরকোটি মহাগুরুরা কালে ভগবানের অবতাররূপেই পূজিত হন।

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে ও সাহিত্যে গুরুর মাহাত্ম্য অজস্র প্রচারিত হয়েছে। কি প্রাচীন যুগ, কি মধ্য যুগ, এমন কি আধুনিক যুগেও অধ্যাত্ম পথের পথিকেরা উচ্ছ্বসিত ভাবে সদ্‌গুরুর মহিমা কীর্ত্তন করেছেন। কবীরদাসও এই দলভুক্ত। তাঁর রচনায় বার বার সদ্‌গুরুর কথা এসেছে। কবীরদাসের অধ্যাত্ম-জীবনের পটভূমিকা রয়েছে যোগমতের পরিবেশের মধ্যে আর তাঁর পূর্ণ পরিণতি হয়েছে ভক্তি মতে। এই উভয় মতেই গুরুবাদ প্রবল। তা ছাড়া, গুরু রামানন্দের মাহাত্ম্য কবীরদাস স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই জন্য কবীরদাস আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সদ্‌গুরুকে সকলের উর্দ্ধে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রামই তাঁর গুরু, রামই তাঁর পীর। তবে কি কবীরদাসের সদ্‌গুরু মানুষ নন? মানুষ নিশ্চয়ই। কবীরদাস আপন গুরু রামানন্দকে স্মরণ করেই সদ্‌গুরুর কথা বলেছেন। মহাগুরু রামানন্দ কবীর-নির্দিষ্ট সদ্‌গুরুর মূর্ত্ত বিগ্রহ। কবীরদাস মানুষ মাত্রকেই রামেরই রূপ মনে করতেন। কাজেই তাঁর সদ্‌গুরু রামেরই নব রূপ।

কবীরদাস সদ্‌গুরুর মহিমা কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হয়েছেন। তিনি গুরুকে গোবিন্দেরও আগে স্থান দিয়েছেন। বললেন, গুরু আর গোবিন্দ দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছেন। কার পায়ে আগে প্রণাম করব? কবীরদাসের উত্তর হল, গুরুর পায়ে। বললেন—যে গুরু গোবিন্দকে দেখিয়ে দিলেন তাঁকে বলিহারি যাই।

"গুরু গোবিন্দ দোউ খড়ে, কাকে লাগুঁ পাঁয়।
বলিহারি গুরু আপণৈ জিন গোবিন্দ দিয়ো দিখায়।"

কবীরদাসের সদ্‌গুরু পূর্ণ জ্যোতিস্বরূপ। তাঁর দর্শনে জন্মের সংস্কার ঘুচে যায়। দেবতা-মানুষ সবাই মায়ার ফাঁদে পড়ে ঘুরে মরছে। সদ্‌গুরুর কৃপা, তাঁর উপদেশ ভিন্ন কেউ এর থেকে উদ্ধার পায় না।

কণ্টকাকীর্ণ সংসারে এসে মানুষ জড়িয়ে পড়ে। তার আর উদ্ধারের পথ থাকে না। এই অবস্থায় সদ্‌গুরুর নাম তার একমাত্র গতি। জীব সংসারে বহু দুঃখ পায়। এই দুঃখের হাত এড়াবার একমাত্র উপায় সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ, এই জন্য কবীরদাসের উপদেশ, যত দিন বেঁচে থাকবে আশ্রয় নেবে সদ্‌গুরুর। সদ্‌গুরুর কৃপাতেই শিষ্যের সিদ্ধিলাভ হয়। তিনি প্রেমের পেয়ালা ভরে ভরে খান ও খাওয়ান। তিনি ব্রহ্মদর্শন করান।

কবীরদাসের স্পষ্ট অভিমত ছিল, সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন ভগবানকে পাওয়া যায় না। প্রণয়িনী (ভক্ত) প্রিয়তমের (ভগবানের) কাছে থেকেও তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারছে না। বিরহ-বেদনায় ছটফট করছে। কবীর বলছে, 'ওগো, আমার সেয়ানা সখি, শোন কথা, সদ্‌গুরু বিনা প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন হয় না।'

কবীরদাস স্বয়ং এই কৃপা লাভ করেছিলেন। বলছেন—গুরু আমাকে অজর সিদ্ধি-ঘোঁটা খাইয়ে দিয়েছেন। যেদিন থেকে গুরু আমাকে এই সিদ্ধি-ঘোঁটা খাইয়েছেন সেদিন থেকে আমার চিত্ত স্থির হয়ে গেছে, আমার সকল দোটানার ভাব দূর হয়ে গেছে। অধর-কটোরায় নাম-ঔষধ খেয়ে আমার কুমতি তৃপ্ত হয়ে চলে গেছে। এটি ব্রহ্মা-বিষ্ণু খেতে পাননি। শম্ভু এর খোঁজে জন্ম কাটালেন। কবীর বলছে, সুরতি-ধ্যানে বসে এ যে খেতে পারে সেই অমর হয়।

সদ্‌গুরুর আশ্রয়কেই কবীরদাস স্বীয় আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশের হেতুস্বরূপ নির্দেশ করেছেন। বলেছেন—রামানন্দকে যখন গুরু-রূপে পেলাম তখনই আমার সকল দুঃখ-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল, দূর হয়ে গেল সকল দোটানার ভাব। তিনি স্বীয় গুরুর পায়ে আপনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাতে করেই তিনি গুরুর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নালার জল গঙ্গার সঙ্গে মিশে যেমন গঙ্গা হয়ে যায় তেমনি হয়েছিলেন কবীরদাস আপন গুরুর সঙ্গে মিশে। তাই তিনি গৌরব করে বলেছেন, গুরুপ্রসাদ আর সাধুসঙ্গ এই দুই দিয়ে জোলা জগৎ জয় করে যাবে।

এই জয় তিনি করেছিলেন তাঁর প্রেম-ভক্তি দিয়ে। সে প্রেম-ভক্তিও গুরুকৃপাতেই পেয়েছিলেন। আমরা দেখেছি, ভক্তরা মনে করেন ভাগ্য না থাকলে ভক্তিলাভ করা যায় না। কবীরদাসও এই কথাই বলেছেন। তিনি বলছেন, 'ভাগ্য বিনা ভক্তি মিলে না। প্রেম-প্রীতির বিষয় ভক্তি। সারা দুনিয়া ভক্তিতে ভরে আছে কিন্তু যার প্রেম নেই সে ভক্তি পায় না।' অন্যত্র বলেছেন—'কবীরের কর্মটি দেখ। যাঁর ধাম মুনিরও অগম্য সেই অলখ পুরুষকে বন্ধু করল। এ আর কিছু নয়, জন্মান্তরের ললাটলিপি।'

কিন্তু শুধু ভক্তিলাভের ভাগ্য হলেই হবে না। সেই ভক্তির রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য সদ্‌গুরু লাভের প্রয়োজন। কেন না, ভাগ্যক্রমে ভক্তির অঙ্কুর দেখা দিলেও সদ্‌গুরুর আশ্রয় ভিন্ন তা বাড়তে পারে না ও রক্ষা পায় না। ভক্তি অটুট রাখতে হ'লে গুরুর কৃপা লাভ করতে হবে। তাই কবীরদাস বলেছেন—সদ্‌গুরু তোমাকে যে সত্য দর্শন করাবেন তাতেই ভগবদ্‌-চরণে তোমার ভক্তি অটুট থাকবে।'

কবীরদাসের এই ভক্তি কেমন, তা জানতে হ'লে আগে জানা প্রয়োজন সেই ভক্তির ভগবান যিনি, কবীরদাসের সেই আরাধ্য রাম কেমন।

ভগবান অনন্ত। অনন্ত তাঁর নাম, অনন্ত তাঁর রূপ। শাস্ত্র আর সাধু-সন্তরা অনন্ত প্রকারে তাঁর কথা বলেছেন। গোস্বামী তুলসীদাসের কথায়—

"হরি অনন্ত হরিকথা অনন্তা
বহুপ্রকার গাব‌হি শ্রুতি-সন্তা।"

নানা ভক্ত নানা নামে নানা রূপে ভগবানকে জেনেছেন, পেয়েছেন। কবীরদাসের ভগবান রাম। গুরু রামানন্দের কাছ থেকে তিনি এই নাম পেয়েছিলেন, কবীরদাস বহু পদে তাঁর ভগবান, তাঁর আরাধ্য রামের কথা বলেছেন। রাম পূর্ণব্রহ্ম। তাঁর মূর্ত্তি নেই। তিনি অদ্বৈত ব্রহ্ম। নাম লওয়া উচিত নয়, কেন না তাতে তাঁকে ভিন্ন মনে হবে। তিনি নির্গুণ। সগুণ নির্গুণের অতীত সত্যস্বরূপ। তিনি শিব (পরমাত্মা) জীব-মহলে অতিথি। রাম বেদ-কোরাণের অগম্য। তিনি অগম অগোচর। তাঁকে চোখে দেখা যায় না, হাতেও ধরা যায় না। অথচ তিনি দেখা ও ধরা থেকে দূরেও নন। তিনি চাঁদ ছাড়া চাঁদনি অলখ নিরঞ্জন রায়। তিনি অবিগত অকল অনুপম। তিনি অচিন্ত্য অকথনীয় ইত্যাদি ইত্যাদি। কবীরদাসের ভগবান দ্বন্দ্বাতীত, পক্ষাতীত, দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ, ত্রিগুণরহিত, অপারংপার পুরুষোত্তম।

প্রসঙ্গত এখানে বলা আবশ্যক, কবীরদাস তাঁর আরাধ্যকে

প্রধানত রাম নামেই অভিহিত করেছেন। কবীরদাসের রাম দাশরথি রাম নন। কবীরদাস অবশ্যি হরি, গোবিন্দ, কেশব, মাধব প্রভৃতি নামও ব্যবহার করেছেন তাঁর আরাধ্য সম্পর্কে; কিন্তু এ সব নামও তিনি প্রচলিত পৌরাণিক অর্থে ব্যবহার করেননি।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, যিনি পূর্ণব্রহ্ম, যিনি নির্গুণ অদ্বৈত, তাঁর প্রতি আবার ভক্তি কি, কিসের প্রেম? ভক্তি ত বৈয়ক্তিক ঈশ্বরের অপেক্ষা রাখে। উত্তরে বলা যায়, কবীরদাসের রাম বৈয়ক্তিক ঈশ্বরও বটেন। তিনি প্রভু সাহেব সাঁই, তিনি প্রিয়, তিনি ননদের ভাই। তিনি অবিনাশী দুলহা (বর) ভক্তের রক্ষাকারীও বটেন। আবার প্রশ্ন হ'তে পারে, তা হ'লে এ সব কথা কি পরস্পর-বিরোধী নয়? না, নয়। তার কারণ 'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'—একই সৎ বিপ্রেরা তাঁকে নানা প্রকারে প্রচার করেন এই মাত্র।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।

"তত্ত্ববেত্তাগণ অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন, সেই জ্ঞান নির্বিশেষ-রূপে প্রকাশ হইলে উপনিষদেরা তাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, অন্তর্যামিরূপে প্রকাশ হইলে যোগীরা পরমাত্মা বলেন, এবং পরিপূর্ণ সর্বশক্তি-বিশিষ্ট হইলে সাত্বতেরা তাঁহাকে ভগবান বলেন।"

কাজেই, ভগবানের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেউ বা তাঁকে বলছে নির্গুণ, নিরাকার, নিরঞ্জন, নৈর্ব্যক্তিক অদ্বৈত ব্রহ্ম, আবার কেউ বা বলছে সগুণ সাকার বৈয়ক্তিক ঈশ্বর। তিনি সবই আবার সবকে অতিক্রম করেও রয়েছেন।

কবীরদাসের বাণীর মধ্যে যে ভগবান সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী কথা দেখা যায়, তার হেতু তিনি ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন, ভাবৈকগম্য অনুভবৈকগম্য পরমাত্মাকে আপন অন্তরের অনুভূতির মধ্যে পেয়েছিলেন আর তখনই দেখেছিলেন, মানুষের বুদ্ধি যে সব পরস্পরবিরোধী ভাবের কথা চিন্তা করে তা সবই তাঁর মধ্যে আছে, আবার তিনি সে সবকে অতিক্রম করেও রয়েছেন।

ভক্তরা ভগবানকে অবাঙ্মনসগোচর বলেই মনে করেন। ভগবানের স্বরূপ মানুষের সীমিত মানসের মধ্যে ধরা পড়ে না। মানুষ তাঁকে সোপাধিক বা নিরুপাধিক যে ভাবেই চিন্তা করুন না কেন, তার দ্বারা তাঁর সম্বন্ধে শুধু একটা আভাস মাত্র পেতে পারে। তাঁকে সচ্চিদানন্দই বলুক আর নির্গুণ নিরঞ্জনই বলুক তাতে করে সে শুধু ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে মাত্র।

এই জন্যই কবীরদাস বার বার বলেছেন, তিনি অকথনীয় অচিন্ত্য। যে তাঁকে পায় সেও বলতে পারে না তিনি কেমন, যেমন বোবা গুড় খেলেও বলতে পারে না গুড় কেমন।

কোথায় আছেন তিনি? কোথায় আছেন কবীরদাসের রাম? বহু পদে কবীরদাস এর সন্ধান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—তিনি আছেন অন্তরে, যত নরনারী তাঁরই রূপ। মানুষ আপন মন-গড়া সঙ্কীর্ণতার মধ্যে ভগবানের আবাস নির্দেশ করে। সাধারণ হিন্দু মনে করে ভগবান আছেন মন্দিরে। সাধারণ মুসলমান ভাবে মসজিদে তাঁর স্থান। আর সাধারণ যোগি-সন্ন্যাসী এঁদের ধারণা, যোগ-বৈরাগ্যের মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়। কবীরদাস বলেন' তিনি কোনো সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হন। মন্দির-মসজিদ যোগ-বৈরাগ্য কোথাও তিনি নেই। তিনি আছেন প্রাণের প্রাণে। বললেন—ভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড। ভাণ্ডের মধ্যে আছেন প্রভু। আবার বললেন—ঘটে ঘটে প্রভুই বিরাজ করছেন, কাউকে কটু বলো না। অন্যত্র বললেন, যেখানে সত্য বস্তু সেখানেই তাঁর দর্শন পাওয়া যায়। তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে তা ত জানা গেল, কিন্তু কেমন করে পাওয়া যাবে? কবীরদাস তারও জবাব দিয়েছেন নিজের সিদ্ধ-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। বলেছেন—যোগসাধনা করে রঙমহলে প্রিয়তমকে পেয়েছি। আরও সহজ করে বললেন, সৎসঙ্গে মতি আর মন স্থির করা রামকে পাওয়ার সহজ উপায় জেনে কবীরদাস তারই সাধনা করছে। কিন্তু কবীরদাসের পক্ষে যা সহজ উপায় তা ত সত্যি সত্যি সহজ নয়? মন স্থির করার চেয়ে কঠিন কাজ খুব কমই আছে। সাধারণ মানুষ দূরের কথা, অর্জুনের মত এত বড় উচ্চকোটির ভক্ত, যাঁকে ভগবান স্বয়ং অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে মনে করতেন, তিনি পর্য্যন্ত বলে উঠেছিলেন—চঞ্চল মনকে নিরোধ করা আকাশস্থ বায়ুকে নিরোধ করার মত সুদুষ্কর। কবীরদাসও এ কথা জানতেন। তাই সাধারণ মানুষের জন্য আরও সহজ পথের কথা বললেন। বললেন—যে ভগবানের কর্ম করে সে-ই তাঁকে পায়।

কিন্তু ভগবানের প্রতি যার প্রেম-ভক্তি জন্মায়নি, সে ত তাঁর কর্ম করতে চাইবে না। এই জন্য ভগবানকে পাওয়ার সব চেয়ে সহজ পথ প্রেম-ভক্তি, কিন্তু সব চেয়ে যা সহজ তাই সব চেয়ে কঠিন। সত্যিকারের প্রেম-ভক্তির লক্ষণ ভগবানের পায়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়া। কবীরদাস বলেছেন—প্রেম যে পায় সে নিজেকে দিয়ে দেয়। কিন্তু এই দিয়ে দেওয়া কি সোজা কথা? 'অহং'টি যে কিছুতেই যেতে চায় না। সংসারের কত বাঁধনে সে জড়িয়ে আছে, কত ভাবের কত উত্তেজনা তাকে অবিরত উগ্র করে তুলছে।

এই জন্য কবীরদাসের প্রেম-ভক্তি কঠিন সাধনার জিনিষ। কবীরদাস ভগবদ্-সাধনাকে সহজ জিনিষ মনে করতেন না। তাঁর কাছে সাধনা সংগ্রামবিশেষ। যত দিন দেহ থাকে তত দিন অবিরত চলে এই সংগ্রাম। 'দেহের মধ্যেই আছে শত্রু, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ। শীল, সত্য আর সন্তোষকে সাথী করে নামের তলোয়ার নিয়ে লড়তে হয়।' কবীরদাসের সাধনা বীরের সাধনা।

ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজী বলেন, 'রামানন্দের প্রেম-ভক্তি কবীরের মধ্যে অভূতপূর্ব পরিণতি লাভ করল। কবীরের প্রেম-ভক্তি কঠিন সাধনার জিনিষ। এর মধ্যে ভক্তির অশ্রু, স্বেদ, কম্পাদি মহাভাবের স্থান নেই।'

ভগবদ্-প্রেম আবদারের ব্যাপার নয়। প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকলে তবে এই প্রেম মিলে। কবীরদাস বলেন, মাথা কেটে মাটিতে রাখলে তবে এই প্রেম লাভ হয়। এই প্রেম ক্ষেতে জন্মায় না, হাটেও বিকায় না, শুধু যে চায় সে পায়। সাহস চাই, তা হ'লে ভগবান এগিয়ে আসবেন মিলনের জন্য। এই প্রেমে নেই ভাবালুতার বা উচ্ছ্বাসের স্থান। আপন ইষ্টের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাসই এর ভিত্তি। কবীরদাসের ভগবদ্-প্রেমে মাদকতা নেই, আছে আনন্দে বিভোর হয়ে থাকা; কর্কশতা নেই, আছে কঠোরতা; অসংযম নেই, আছে আনন্দ; উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, আছে স্বাধীনতা; অন্ধ অনুকরণ

নেই, আছে বিশ্বাস ; অশিষ্টতা নেই, আছে দৃঢ়তা। অথচ, কবীরদাস ভগবদ্-প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন। তিনি ছিলেন 'মস্ত মৌলা' মানুষ। প্রেম-ভক্তির বাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই ছিল না। ভগবানের জন্ত তাঁর ছিল অসীম ব্যাকুলতা। ভগবদ্-বিরহে তিনি ছটফট করেছেন। তাঁর দিনে স্বস্তি ছিল না, রাতে ছিল না ঘুম।

কবীরদাসের প্রেম-ভক্তির মধ্যে এই যে কোমলে-কঠোরে সংমিশ্রণ, তার কারণ তাঁর চিত্তক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল যোগ মতের কঠোর সাধনার আবহাওয়ার মধ্যে আর সেই ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়েছিল কোমল প্রেম-ভক্তির বীজ। অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। ঔপনিষদিক তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্-প্রেম ও সকল প্রকার ভাববিহ্বলতা, উন্মত্ত উচ্ছ্বাস, সকল প্রকার অসংযম-অধীরতা বর্জিত, শান্ত সংযত নিবিড়।

ভক্তিশাস্ত্র অনুসারে প্রেম ও ভক্তি এক জিনিষ নয়। ভক্তি পরিপক্ক হ'লে তবে প্রেমে পরিণত হয়। আগে ভক্তি পরে প্রেম। প্রেম অতি দুর্লভ। ভক্তি থাকতে পারে অনেকেরই, কিন্তু ভক্তদের মধ্যেও খুব অল্প লোকেরই প্রেম থাকে। অনেকে আবার প্রেম-ভক্তিকে ভক্তিরই এক প্রকারভেদ মনে করেন। তবে সত্যিকারের ভক্তের মধ্যে ভক্তি ও প্রেম পরস্পর জড়িয়ে থাকে, একটি ছেড়ে আর একটি থাকতে পারে না ; সেখানে উভয়ের ভেদও লোপ পেয়ে যায়। ভক্ত কবীরের মধ্যেও আমরা এই জিনিষটিই দেখতে পাই। তাঁর জীবনেও প্রেম ও ভক্তির ভেদ লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

প্রেম সাধারণতঃ নামরূপের উপর নির্ভরশীল। ডাঃ দ্বিবেদীজী বলেন, 'সাধক রূপ আর সীমার সহায়তায় অরূপ অসীমকে দেখতে পান ; ভক্ত নাম আর রূপের সিঁড়ি বেয়ে উঠে অরূপ পরম তত্ত্বের দর্শন পান।'

মানুষ জানার মধ্য দিয়ে অজানাকে জানতে চায়, পেতে চায়, অন্ত কোনো পথ তার নেই। তাই মানব-প্রেমের ভাষায় সে ভগবদ্-প্রেমের কথা বলেছে। ভগবানের সঙ্গেও সে মানব-প্রেম-সম্বন্ধই স্থাপন করেছে। এই সম্বন্ধ বহু প্রকারের হ'তে পারে। তার মধ্যে কয়েকটি প্রধান : যেমন দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বৈষ্ণব ভক্তেরা যে পঞ্চ ভাবের সাধনার কথা বলেন তার মধ্যে এই চারটি অন্যতম। অন্য ভক্তেরাও সাধারণতঃ এরই কোনো একটি ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন ভগবানের সঙ্গে। মানবীয় প্রেমের চেনা পথেই তাঁরা ভগবানের কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছেন।

কবীরদাসও ভগবানকে মানব-সম্বন্ধের মধ্য দিয়েই পেতে চেয়েছেন। তাঁর ভগবান কখনও প্রভু, কখনও প্রিয়তম। তবে কবীরদাসের পদে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভক্ত বধূ, ভগবান বর ; ভক্ত দুল্‌হিন, ভগবান দুলহা ; ভক্ত প্রণয়িনী, ভগবান প্রণয়ী। এইটি মধুর ভাব। বৈষ্ণবদের মতে এইটি সকল ভাবের সেরা। প্রেমের পরাকাষ্ঠা মধুর ভাবে। মনে হয়, কবীরদাসেরও তাই মত ছিল। কেন না; যেখানে তিনি দাস্য ভাবের কথা বলেছেন সেখানেও বহু ক্ষেত্রেই যেন মধু ভাবের একটি আমেজ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। তাঁর প্রভু শুধু প্রভু নন, প্রিয়ও বটেন। কবীরদাসের ভাবগম্ভীর তত্ত্বপ্রধান পদগুলি যেখানে কাব্যসৌন্দর্য্যে রসাল হয়ে উঠেছে সেখানেই দেখা যায়, এই চিরন্তন প্রেমের কথাই তিনি বলেছেন।

কবীরদাসের প্রেম বৈষ্ণবদের স্বকীয়া প্রেম। তাঁর প্রিয় শুধু প্রণয়ী মাত্র নন ; তিনি বর, স্বামী, কিন্তু প্রিয়বিরহে কবীরদাসের যে অধীর ব্যাকুলতা, যে বিপুল আবেগ প্রকাশ পেয়েছে, একমাত্র বৈষ্ণবদের পরকীয়া প্রেমের ব্যাকুলতার সঙ্গেই তার তুলনা হ'তে পারে।

কবীরদাসের বিরহিণীর কত দুঃখ, কত বেদনা! কখনো বলছেন—'প্রিয়তমের বিরহে আমার প্রাণ ছটফট্ করছে। আমার দিনে শান্তি নেই, রাতে নেই ঘুম। আমার কাজকর্ম মাটি হ'ল। শূন্য শয্যায় আমার জন্ম কেটে গেল। চেয়ে-চেয়ে চোখে ব্যথা হ'য়ে গেল কিন্তু পথ চোখে পড়ল না।'

খুব অভিমান হয়েছে! প্রিয়তমকে বলছেন বেদরদী। বলছেন, বেদরদী বন্ধু আমার খোঁজ নিলে না। অভিমান আরও প্রবল হয়ে উঠল। বললেন—'বিরহের আগুনে এই দেহ পুড়িয়ে ছাই করব। সেই আগুনের ধোঁয়া গিয়ে পৌঁছাবে স্বর্গে। সেই রাম যেন দয়া না করেন। তিনি যেন বর্ষণ করে এই আগুন নিবিয়ে না দেন। এই দেহ পুড়িয়ে কালি বানাব। সেই কালি দিয়ে লিখব রামের নাম। বুকের পাঁজর দিয়ে বানাব কলম আর লিখে লিখে রামকে পাঠাব। এই দেহকে করব প্রদীপ আর প্রাণকে করব তার পলতে। এই প্রদীপের আলোতে করে আমার প্রিয়তমের মুখ দেখব। হয় বিরহিণীকে মৃত্যু দাও, নয় নিজেকে দেখাও। অষ্ট প্রহরের এই দহন এ যে আমি সহ্য করতে পারছি না।'

কিন্তু অভিমান কতক্ষণ থাকে? বিরহ যখন প্রবল হয়ে ওঠে, বেদনা যখন অসহ্য, তখন অভিমান অশ্রুসিক্ত মিনতিতে পর্য্যবসিত হয়। বিরহিণী বলে—'বন্ধু, আমি ত তোমারই দাসী। তুমি আমার ভর্ত্তা। দীনদয়াল, এস তুমি দয়া করে। তুমি শক্তিমান, তুমি স্রষ্টা। প্রিয়তম, হয় তুমি এসে আপন করে নাও, নয় আমি প্রাণ ত্যাগ করি।'

এই প্রেমের কত না রূপ, কত না বৈচিত্র্য! কখনো বিরহ-বেদনায় প্রাণ কণ্ঠাগত হচ্ছে, কখনও বা মিলনের আনন্দে মন বিভোর হয়ে যাচ্ছে। বন্ধু পাশে রয়েছেন কিন্তু অধীর ব্যাকুলতায় তাঁকে দেখতে পায় না, তাঁর খোঁজে ছুটে ছুটে বেড়ায়। বিহ্বল হয়ে ছুটে বেড়ায় কিন্তু কান্তকে কোথাও দেখতে পায় না। বাইরে কোথায় দেখবে। তিনি যে চোখের মধ্যেই রয়েছেন। কিন্তু প্রেম ভীরু, এত বড় কথা সহসা বলতেও সাহস পায় না। কবীর বলছে—'আমার চোখেই বন্ধুর বাসা এ কথা মুখে বলতে গেলে ভয় হয়।'

যে একবার প্রিয়তমের দেখা পেয়েছে আর কিছুই তার চোখে পড়ে না। পড়বেই বা কি করে। কবীর বলছে, 'যেখানে সিঁদুরের রেখা দিতে হয় সেখানে কাজল দেওয়া যায় না। আমার চোখের মধ্যে যে রাম আনন্দ করছেন, সেখানে অন্যের স্থান হবে কোথায়?'

[ক্রমশঃ।

নীলাম্বরী

অমরেন্দ্র ঘোষ

বধূ চিঠি লিখেছে এবার এই প্রথম। তার চিঠিতে মধু কতটুকু ছিল জানি নে কিন্তু মাদকতা ছিল যথেষ্ট। সারা দিন রোদে পুড়ে এইমাত্র অমল মেসে ফিরে চিঠিখানা পেল। ঘরে ঢুকে একটা ছেঁড়া মাদুরের ওপর ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে একে একে অনেক বার তা পড়ল। তবু কি তৃষ্ণা মেটে? না ঐটুকু পত্রে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে!

সরলা গ্রাম্য বধূ যা লিখেছে তা একটু গোছালে এই দাঁড়ায়—

শুধু শুধু আর পরের দোরে কপাল কুটে লাভ কি? চাকরী যখন পাওনি, জুটবেই না যখন, তখন বাড়ী ফিরে এসো। আর দুপুর রোদে পীচের পথে টোঁ-টোঁ করে ঘুরো না। এখানে এসে দু'দিন বিশ্রাম করে যাও। তোমার কি ক্লান্তি বোধ নেই? শরীরের ওপর মমতাও বুঝি নেই?···তোমায় কত দিন দেখিনি বলো তো। কত দিন!

দেখবে এসে তোমার হাতে রোয়া সেই চারা আম গাছটিতে প্রথম মুকুল ধরেছে—ফর্‌ফর্‌ করে মৌমাছিগুলো পাখা মেলে উড়ে এসে বসে, মধু খায়। তুমি জানতে চেয়েছ—আমি রোজ বিকালে ঐ গাছটার গোড়ায় জল দিই কি না? দিই গো, দিই। আর দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ভাবি।

সেই চোখ, সেই মুখ, সেই সব আমার চোখের সুমুখে ফুটে ওঠে!

সেদিন এক কলসী জল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—কে যেন হঠাৎ পিছন থেকে ছুটে এলো, দিল আমার খোঁপা ধরে এক টান, শিউরে উঠে চেয়ে দেখলাম: না! কেউ নয়—পোড়ারমুখী আভা। কত কথাই যে ছাই মনে পড়ে তখন।···

আর আমি কিচ্ছু জানি নে। বুঝতেও পারি নে, লিখতেও পারি নে—তুমি ফিরে এসো, ওগো কেবল তুমি ফিরে এসো!

এই পর্যন্ত পড়ে থামতে হয়, আর পড়া যায় না। শেষের তিনটি লাইন একেবারে কুচিকুচি করে কাটা।

সরলা গ্রাম্য বধূ একবার যা লিখেছে, বার বার তা গোপন করতে প্রয়াস পেয়েছে। অপটু মেয়েলী হাতের কারিকুরি দেখলেই হাসি পায়, আনন্দও হয়। সে জন্যই অমলের ঔৎসুক্যের সীমা থাকে না। সে পড়ে দেখবে। তার কাছে মণিমালার এমন কি গোপনীয় বিষয় থাকতে পারে যে, তার ওপর অমন করে কলম চালিয়েছে?

ঘরটা অন্ধকার হয়ে উঠেছে; সে চিঠিখানা নিয়ে বারান্দায় গেল এবং ভাল করে দেখতে লাগল। সে থেমে-থেমে পড়ে যেতে লাগল—

···তোমার হাত খালি···এখানেও···অভাব···আসবার··· আমার জন্য···শাড়ী···ভাল হয়।···

অমল অনুমানে বুঝল সবই। সেই কবে সবাইকে মাত্র এক-একখানা কাপড় দেওয়া হয়েছে, সে কাপড় হয়ত ছিঁড়ে গেছে, এখন এ বাজারে কাপড় কেনা যে কি কঠিন! তাই হয়ত মণিমালার খুব কষ্ট হচ্ছে। সেই জন্যই বুঝি লিখেছিল একখানা শাড়ীর কথা এবং শেষ পর্যন্ত কি যেন ভেবে আবার মণি তা কেটে দিয়েছে।

যদিও অমল বেকার, তবুও মণির এই আচরণে সে বড় দুঃখিত হলো।

সে কি এত দূর অক্ষম যে, মণিমালাকে একখানা শাড়ী কিনে দিতে পারে না? এত অকর্মণ্য তাকে ভাবা মোটেই উচিত নয়। যদিও সে মণির চিঠি পেয়েই বাড়ী যেত না, এবার সে যাবে এবং সংগে করে নিয়ে যাবে একখানা শাড়ী। বুঝিয়ে দেবে মণিকে যে মানুষ বেকার থাকলেও কিছু তার রোজগার থাকে। নইলে চলে কি করে এত বড় সহরে!

অমল হিসাব করে দেখল যে তার কাছে রাহা খরচ ছাড়া যা আছে তা দিয়ে একখানা শাড়ী খরিদ করা যায় না। সে একটু দমে গেল—একটু লজ্জিতও হলো মনে-মনে। যাবে না কেন কেনা, তবে ভাল শাড়ী কেনা হয় না। এক বন্ধুর কাছ থেকে ক'টি টাকা ধার করে আনার সংকল্প করল সে। এবং তখনই আবার সে প্রস্তুত হলো জামা-জুতা পরে।

না—মণিমালার জন্য সে কিছুই কিনবে না, বন্ধুর কাছে হাত পেতেও কাজ নেই। ভাড়ার টাকা ছাড়া যা-কিছু বেশী আছে তা দিয়ে সে ভাই-বোনদের জন্য কিনে নেবে খেলনা, নয়ত খাবার। মণি কাটল কেন চিঠি? তার তো কোনও কিছুর প্রয়োজন নেই!

বড় রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়েই তার মত বদলে গেল—মাত্র কয়েক গজ পথ!

দূরে একখানা ছাদে সান্ধ্য বাতাসে দোদুল্যমান একখানা নীলাম্বরী। দু'পাশের সোনালী কল্কা পাড় দু'টি তরল সন্ধ্যালোকে ঝিক্‌মিক্‌ করছে। থেকে-থেকে ঢেউ খেলছে নদী-তরংগের মত।

গৌরাংগী মণির সুগঠিত দেহে অমনি একখানা শাড়ী বড় সুন্দর মানায়। বেশ দেখায় তাকে! বেশ দেখায়! অমলের হৃদয় একটা পুলকে নেচে উঠল।

অমল যখন রাত্রে মেসে ফিরে এলো তার হাতে দু'টো মোড়ক। একটাতে তার ডাইং অ্যাণ্ড ক্লিনিংয়ের কাপড় আর অন্যটাতে তার মণির নীলাম্বরী। মোড়ক দু'টো সে এমন করে বাঁধল যাতে মণি হাতে ধরেই ঠিক বুঝতে না পারে কোনটাতে তার শাড়ী! মণিকে অমল সবই দেবে কিন্তু তার আগে একটু হয়রাণ করে ছাড়বে।

আজ এখনও যে সময় আছে, চটপট করে গুছিয়ে নিলে ট্রেণ ধরা যায়। অমল তাড়াতাড়ি চারটি ভাত মুখে দিয়ে বিছানাপত্তরটুকু বগলে নিয়ে ষ্টেশনের দিকে চলল। ষ্টেশনে পৌঁছে হাতের ছোট সুটকেসটা সাবধানে নামিয়ে রেখে টিকিট কাটতে গেল।

গাড়ী ছাড়ল রাত ন'টায়। অমল ভাগ্যক্রমে যে কামরাটায় উঠে বসেছে সেটা বেশ ফাঁকা। ছিল মাত্র গুটি দুয়েক লোক, তারাও নেমে গেল মাঝ-পথে। অমলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বড্ড ঘুম পেল। কিন্তু তার আশংকা হলো, সুযোগ পেয়ে পাছে কেউ সুটকেশটি টেনে নিয়ে না যায়। সে বালিশের মত করে সুটকেশটাকে মাথার তলে টেনে নিল।

সে মণিমালাকে হয়রাণ করবে ভেবেছিল, কি আশ্চর্য, তাকেই এসে হয়রাণ করতে লাগল দুরন্ত এই পল্লী-বধূ। কখনও এসে যেন তার চুল ধরে টানছে, কখনও বা পায়ের আঙুল। ঘুমাতে দেবে না অবুঝ আদুরী বৌ। ধরতে গেলে চকিতে বেঞ্চের তলায় গিয়ে লুকায়, নইলে মিলিয়ে যায় অসীম আঁধারে।

অমল উঠে বসল। এত ঝাঁকুনিতে কি ঘুম আসে?

রাত কম হয়নি। আর বড় জোর দু'ঘণ্টা। সময় মত ট্রেণটা পৌঁছালে হয়ত কোন্ না রাতারাতিই বাড়ী যাওয়া যাবে।

মণিমালা যদিও তাকে যেতে লিখেছে তবুও এত অতর্কিতে প্রত্যাশা করেনি। সে নিশ্চয়ই খুব বিস্মিত হয়ে যাবে। শুধু কি তাই? সে যখন জানবে যে, তার কাটাকুটি-করা পত্রাংশের লেখা উদ্ধার করে তারই জন্ত এনেছে একখানা নীলাম্বরী, তখন সে কি করবে? হয়ত প্রথম সে কিছু বলতে পারবে না। শুধু লজ্জারুণ মুখে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকবে। ক্রমে সে কাছে আসবে, ধরা দেবে তার বাহু-বন্ধনে। তখন কাপড়ের কথা একবারও না তুলে ফেলে প্রশ্ন করবে, 'কেমন আছ? ভাল তো?'

সময় মতই ট্রেণ এসে গন্তব্য ষ্টেশনে থামল। এখন ফেরি ষ্টীমারে ওপার যেতে হবে।

রাত্রি একটা। ষ্টীমার এসে পারে ভিড়ল। অমল জিনিষ-পত্র নিয়ে নেমে পড়ল। ষ্টীমারের পোড়া কয়লা ও ধোঁয়া ছড়ান একটা সোজা রাস্তা। তার দু'পাশে দোকান। সেই রাস্তা ধরে অন্ধকারেই অমল খালের দিকে রওনা হলো। একখানা নৌকা কেরায়া করে বাড়ী যেতে হবে।

অমল যে ষ্টীমারে পাড়ি দিয়ে এপার এসেছে তা এখনও ছাড়েনি। সার্চলাইটটা ঘুরাতেই খালের মোহনার কাছাকাছি সব ছোট-ছোট এক বৈঠার ডিঙিগুলি চক্‌চক্ করে উঠল। প্রায় প্রত্যেকখানা নৌকার গলুইর ওপর এক-এক জন মাঝি লগি ধরে দাঁড়িয়ে আরোহীর আশায় অপেক্ষা করছে। এক সারিতে সাজান নৌকাগুলি কখনও কাঁপছে, কখনও বা স্থির হয়ে আছে। একটা প্রকাণ্ড কচুরিপানার ঢোপ দুলতে দুলতে খালের মোহনা দিয়ে নদীতে গিয়ে পড়ল।

অমল একখানা নাও ভাড়া করে তাতে গিয়ে উঠে বসল। ষ্টীমারটাও ছাড়ল নদীর জলে মোচড় দিয়ে।

'হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!' অমল সুটকেশ খুলে একটা কি যেন বের করছিল। শংকিত হয়ে মাঝির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'মাঝ-গাঙ ছেড়ে কিনার ধরে যাও। জাহাজ এসে পড়ল যে! এক্ষুণি তোলপাড় করে ছাড়বে!'

এ অঞ্চলে কোম্পানীর এ জাহাজখানা নতুন, অতি দ্রুতগামী—ভীষণ ঢেউ হয়। সময় সময় জাহাজ মোড় ঘোরার চোটে পার পর্য্যন্ত ভেঙ্গে পড়ে দু'টো পাখনার দাপটে। অমল আবার বলল, 'সাবধান, খুব সাবধান মাঝি!'

যদিও মাঝি মনে-মনে ভয় পেয়েছিল, কারণ তার নৌকাখানা জীর্ণ, তবুও জবাব দিল, 'ভয়-টয় নেই কত্তা, দিনে-রেতে আমরা এই গাঙে নাও বাই। বৈঠা ধরক জানলে মাঝ-গাঙেও নাও মারা যায় না।'

তবু অমল আশংকায় ব্যাকুল হয়ে রইল। সে তাড়াতাড়ি সুটকেশ ফেলে রেখে নৌকার এক পাশে গিয়ে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসল। 'কত্তা কাৎ দিলেন? এমনিই নৌকা রাখা দায়!'

অমল তাড়াতাড়ি এসে আবার ভারসাম্য করে মাঝ-বরাবর বসল। জাহাজটা হস্-হস্ করে চলে গেল একটা মোড় ঘুরে। যাক, বাঁচা

গেল এবার। অমল বিছানাটাকে বালিশ করে শুয়ে পড়ল। শুতে পারা যায় যত সহজে, চোখ বোজা যায় তার চেয়েও অনেক সহজে—কিন্তু পোড়া চোখে ঘুম আসে না। খানিক এদিক-ওদিক করে সে উঠে বসল। 'আর কত দূর মাঝি? রাতারাতি কুসুমপুর পৌঁছা যাবে না?'

'কি করে বলি! এখন তো গাঙে ভাটা, উজান পানি। তবে ভোর নাগাদ যাওয়া যাবে।'

'সে তো আমিও জানি।'

অমল মুক্ত আকাশের দিকে চেয়ে রইল। কোন নিপুণ কারিগরে যেন কোটি কোটি উজ্জ্বল পাথর নীলাকাশে বসিয়ে দিয়েছে। না, না অসংখ্য দীপ যেন টিপ-টিপ করছে। ঐ ছায়া-পথ, ঐ ধ্রুবতারা, ঐ কালপুরুষ! কিন্তু এ সবও তার বেশীক্ষণ ভাল লাগে না। সে অগত্যা মাঝির সংগে আলাপ জুড়ে দিল। 'তোমার নাম কি মাঝি?'

'পবন।'

'ক'টি ছেলে-মেয়ে তোমার? বৌ আছে?'

'না বাবু, পরিবার মারা গেছে গত শাওনের জ্বরে। দু'টি ছেলে, একটি মেয়ে আছে। ছেলে দু'টি ছোট—এই তিন-চার বছরের। মেয়েটি ডাগর।'

'ডাগর!' অমল চুপ করে রইল, বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করল না।

পবন অমলের নীরবতা দেখে তাকে মহা দরদী ঠিক করল। এবং দুঃখের কাহিনী নিঃশেষ করে বলে যেতে লাগল। তারও ক্ষেত-খামার গরু-বাছুর ছিল···ছিল সবই, কিন্তু নষ্ট হয়ে গেল কোন বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সংগে ঝগড়া ক'রে জেল খেটে। আজকাল এ দুর্দিনে কত কষ্টে সংসার চালায় ইত্যাদি, ইত্যাদি। অমল কখনও হুঁ কখনও হ্যাঁ করে শুনে যেতে লাগল। পবনের কথা বলার ক্ষমতা আছে বটে!

অবশেষে সে কাজের কথা পাড়ল। 'একটা বিচার চাই কত্তা!'

'কি বিচার?'

'যদি অভয় দেন তো বলি।'

'বল না কি বলবে?'

'অভয়—?'

'দিলাম তো।'

'ঐ যে বললাম মেয়েটা আমার ডাগর—একেবারে লেংটা। যদি একটু পুরান-ধুরান কাপড় দেও তবে বড় উবগার হয়।'

এবার অমল সব বুঝল। কিন্তু তারও তো অবস্থা কাউকে বলার নয়। অভাবের সংসারে একখানা পুরান কাপড়ও যে কত মূল্যবান তা অমল কি করে বোঝাবে এই অতি দরিদ্র পবনকে? অথচ দুঃখ হয় অপরিচিতা ডাগর মেয়েটির জন্য। সে কিছু সময় ধরে চিন্তা করে উপায়ান্তর না পেয়ে একটা কাটা জবাব দিয়ে দিল। যদিও তার মনে খুবই লাগল, তবুও বলল, 'আমাদের সংসারে পুরান কাপড় থাকে না, আর থাকবে কি করে, গরীবের তো অভাব নেই। সবাই চায়, দিন-রাত এসে জ্বালাতন করে।'

পবন আর অনুরোধ না করে মুখ বুজে নৌকা বাইতে লাগল।

তার এই নীরবতায় অমল ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে উঠল। অত কঠিন কথা তাকে বলা উচিত হয়নি। কিন্তু পবন যে সত্য কথাই বলেছে তার প্রমাণ কি? এমন করে কত লোকই তো মিথ্যা কথা বলে কাজ হাসিল করে। মানুষ চেনা বড় কঠিন ব্যাপার। এমনি আরও অনেক কথা চিন্তা করতে করতে পবনের ওপর বরঞ্চ বিরক্ত হয়ে উঠল অমল।

মাঝি মাত্রেই মিথ্যাবাদী।

নাওখানা হঠাৎ নেচে উঠতেই অমলের তন্দ্রা ভেঙে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠে দেখল যে, মাঝি লগি পুঁতছে। ডিঙিখানা দু'ধারের হোগলা বন চিরে পারে এসে ভিড়েছে।

'কি, কুসুমপুর না কি? কিন্তু এ কার ঘাটে নাও ভিড়ালে? তখনও রাত আছে খানিকটা।'

'না, এ আপনাদের বাড়ীর ঘাট নয়। এই যাঃ! লগিটা ভেঙে গেল যে। মাটিটাও এমন কাঠ শক্ত।'

'আমাদের বাড়ীর ঘাট নয় তবে এখানে নাও ভিড়ালে কেন?'

'নদীতে জাল পেতেছিল, এক পয়সার চুনো চিংড়ি কিনেছি, তাই বাড়ী দিয়ে যাব।' গলুইর কাছে অন্ধকারে চিংড়ি মাছগুলোর চোখ ছোট-ছোট দামী পাথরের মত জ্বলজ্বল্ করছে। দু'টো-একটা লাফিয়ে পড়ছে এদিক-ওদিক।

শক্ত মাটিতে বৈঠা পোঁতা অসম্ভব, লগিটাও ভেঙে গেল—সোঁতের মুখে বিনা বাঁধনে নাও রেখে কূলে ওঠা যায় না, অগত্যা পবন মেয়েকে ডাকতে আরম্ভ করল, 'মালতী! ও মালতী! মাছ ক'টা নিয়ে যা এসে।'

এমনি ডাক মালতীর কাছে নতুন নয়। খানিক বাদেই তা বোঝা গেল। খাল পারে একখানা ছোনের ঘরে বাতি জ্বলে উঠল। একটি তের-চৌদ্দ বছরের মেয়ে নায়ের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। হাতের আবডালে একটা প্রদীপ। পাছে আলো নিবে যায় তাই সে পা ফেলছিল ধীরে-ধীরে। তার মাথার ওপর দিয়ে বাঁশ-ঝাড় নুয়ে পথের ওপাশে গিয়ে লোটাচ্ছে। দূর থেকে তার মুখখান স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সুন্দর মুখ, কিন্তু সুখের চিহ্ন নেই, আছে দুঃখের ছোপ। তার পরনের কাপড়খানা গামছা, না ধুতি, না শাড়ীর আধ ফালি, বোঝা দায়। গ্রন্থি আছে কম করে পাঁচটা।

মাছগুলো একটা মাটির বাসনে তুলে নিয়ে মালতী বলল, 'তাও ভাল যে, ফিরে এলে! সেই হপ্তা খানেক হয় বেরিয়েছে, আর বাড়ীর কথা মনে পড়ল আজ। উঠবে না?'

'উঁহুঁ, আমি ভোর বেলাই ফিরে আসব, নায়ে সোয়ারী আছে এক বাবু।'

'এক বাবু!'

মালতী চকিতে একবার অমলের দিকে চেয়েই এক ফুঁতে বাতিটা নিবিয়ে অদৃশ্য হলো। কয়েকটা মাছ পড়ে গেল খালের জলে।

পবন নাও খুলল।···

অমলের কিছুতেই আর ঘুম এলো না। সে শুয়ে-শুয়ে আকাশ-পাতাল সব ভাবতে লাগল। অস্বস্তি ও অনুশোচনায় তাকে অধীর করে ফেলল। ইচ্ছা করল তার পবনের ঐ বুড়ো হাতজোড়া জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইতে।

'ও কত্তা ওঠো ওঠো, কুসুমপুর। এইটে তোমার বাড়ীর ঘাট না?'

অমল একদৃষ্টিতে চিনে ফেলল তাদের বাপ-দাদার আমলের খাল-পার—দাদা মশাইর হাতে রোয়া তাল গাছটাই তো নির্বাক চিহ্ন। এত বড় গাছ না কি এ গেরদে আর নেই।

পবন অমলকে উঠতে দেখে বলল, 'কেরায়া?'

'ওঃ, এই নেও, তোমার আর ওপরে কষ্ট করে উঠতে হবে না। বুড়ো মানুষ, বাড়ী যাও। আমি নিজেই এ বোঝা নিয়ে যেতে পারব।'

যত শীগ্‌গির অমল বাড়ী পৌঁছাবে ভাবল, তত তাড়াতাড়ি কি পৌঁছান যায়? এখনও একটু রাত আছে। ঘন আম, সুপারি, নারকেল বাগের ভিতর দিয়ে সরু পথ। এপাশে খানা, ওপাশে ডোবা। একবার পা হড়কে পড়ে গেলেই মজা। ভাবতে ভাবতেই অমল সত্যি সত্যি জুতো সমেত একটা কর্দমাক্ত ডোবায় পড়ে গেল। তেমন ব্যথা পেল না, কিন্তু পা সমেত জুতো জোড়া টেনে তুলল অতি কষ্টে। দিদিমা দেখলে আর অমলের রক্ষা নেই। তক্ষুণি হয়ত মণিকে ডাকাডাকি করবে, বলবে, 'ও মণি, ও বৌ দেখে যা—এবার সংক্রান্তির সংগ এসেছে কত আগে।'

একটা টিমা লণ্ঠন হাতে এমন সময় পবন এলো ছুটতে ছুটতে। 'ও কত্তা, দাঁড়াও, কি সব ফেলে গেছ।'

কি ফেলে এসেছে অমল? নীলাম্বরীখানা নয় তো? তার বুকটা ধক্ করে উঠল। 'কি মাঝি?'

'এই একখান ধুতি-টুতি হবে।' পবন কাছে এসে অমলের হাতে একখানা কাপড় দিল। মেসে-পরা বাসি ময়লা কাপড় দেখেই চিনল অমল। 'আর একখানা কাঁকই।'

অমল ঢেউর সময় যখন সুটকেশ খুলেছিল তখনই পড়ে গিয়েছিল। 'আর কিছু আছে না কি?'

'না। নায়ে জল হয়েছিল, বাতি জেলে জল ছেঁচতে গিয়ে এগুলো দেখলাম।'

পবন এগুলো অনায়াসে গোপন করতে পারত, তা সে করেনি। প্রয়োজন থাকলেও সে লোভ সামলেছে। গরীব হলেও তার প্রাণটা ছোট নয়, কাপড়খানা খুবই পুরান হয়েছে। ওখানা ওকেই দিয়ে দেওয়া ভালো। অমল তো নীলাম্বরীখানাও ভুলে ফেলে আসতে পারত!

না। ওখানা দেওয়াও যা ফাঁকি দেওয়াও তা। তার চেয়ে বরং ধোপ-দেওয়া ধুতিখানাই দেওয়া উচিত। 'একটু দাঁড়াও পবন—ভালো করে আলোটা ধরো।' অমল সুটকেশ খুলে ছেঁড়া ধুতিখানা ও চিরুণীখানা ভিতরে রাখল। দু'টো মোড়কের ভিতর যেটায় ধুতিখানা রয়েছে সেইটা পবনের হাতে দিয়ে বলল, 'ভেবেছিলাম ওখানাই দেব, ওখানা বড্ড ময়লা হয়েছে, তাই বদলে এই ধোপ-দেওয়াখানাই দিলাম। আমি বেশী দিন ব্যবহার করিনি। হারিয়েই তো যাচ্ছিল, তুমি যখন পেয়েছ, সেখানার বদল এখানা দিলাম, তুমি নেও—পরতে দিও তোমার ডাগর মেয়েটিকে।'

পরম সন্তুষ্ট হয়ে পবন বহু বার অমলের দীর্ঘ জীবন কামনা করে চলে গেল। অমলও যথেষ্ট তৃপ্তি বোধ করল। বাড়ী পৌঁছাল মহা আনন্দে।

বাবা মা ও অন্যান্য সকলের' কুশলাদি প্রশ্ন করতে করতে পূর্ব দিকটা ফর্সা হয়ে গেল। তখন আর মণির সাথে একান্তে দেখা হলো না। হলেও গৃহস্থ-ঘরের বৌ, কাজ-কর্ম আছে, আছে লাজ-সরম। কিন্তু তবু অমলের চার দিকে একটি গ্রাম্য বধূর ছায়া উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেছে। ঘরে অমল একা। হঠাৎ চাবির শব্দ হতেই অমল ডাকল, 'মণি!'

বধূ ঘরে এসে প্রবেশ করল। ঘাটে যাচ্ছিল। চালের গামলা নীচে রেখে গলায় আঁচল দিয়ে স্বামীকে প্রণাম করে তার আশীর্বাদ নিল। 'কি?'

ধীরে ধীরে অমল বলল, 'তোমার জন্য একখানা শাড়ী এনেছি।'

'কি শাড়ী?'

কেন জানি অমলের কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল, বলল, 'ছোট কাল থেকে তুমি যা ভালবাস, সেই নীলাম্বরী।'

'নীলাম্বরী! কাপড়খানা কেমন? পাড় দু'টি কি সোনালী—না রূপালী, না শুধু কল্কা?...কিন্তু আমি তো কেটেই দিয়েছিলাম। তুমি কি করে পড়লে চিঠি?'

'যেমন করে সবাই পড়ে।...একটি বার দেখবে না?'

'এখন আমার সময় নেই যে। তুমি রাগ করো না—স্নান করতে যাওয়ার সময় আসব।'

'এসো কিন্তু।'...

'ঠিক আসব।'

'বধূ যেতে উদ্যত হলো, অমল তার আঁচল ধরে একটু টান দিল। অমনি বধূ ফিরে দাঁড়িয়ে স্বামীর মুখের ওপর বড় বড় দু'টি সরল চোখের চাউনি মেলে ধরল—'কি?'

'না, কিছু না—শাড়ীখানা যদি একবার দেখতে!'

'ধেৎ, তাই বুঝি?' বলে মণি চোখ নামাল।

* * * *

দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পরে সকলে বিশ্রাম করছে।'

শুধু অমলের চোখে ঘুমের বালাই নেই। সে দেখল, মণি রান্না-ঘরের কাজ-কর্ম সেরে সবে বের হলো। তার মুখখানা উত্তপ্ত—যেন টকটক করছে। কপাল ও গালের ওপর খসে-পড়া চুলগুলি বিন্দু-বিন্দু ঘামে ভিজা। সে একখানা গামছা টেনে নিয়ে ঘাটের দিকে রওনা হলো। কথা ছিল প্রথম এখানে আসবে, শাড়ীখানা সে দেখবে। কিন্তু সে তা ভুলে গেল। এত ভুল তো ভাল না! কতক্ষণ ধরে অমল তার জন্য অপেক্ষা করছে, এটুকু সে বুঝল না।

ইচ্ছা করলেই অমল মণিমালাকে ডাকতে পারত, সে ডাকল না। ওদিকের জানালাটা দিল বন্ধ করে।...মণি তো কাপড় নিয়ে ঘাটে যায়নি। আসবে কি পরে?

ভিজা কাপড়ে গামছা জড়িয়ে।

লুব্ধ যুবা হাসল এবার।

কিছু সময় বাদে সত্যই মণি এসে জানালায় ধাক্কা দিল। ধ্বনি উঠল হাতের নানা রকমের চুড়ির। 'ওগো, আলনা থেকে একখানা শাড়ী দাও—শুনছ? ভুলে গেছি। ভিজা কাপড়ে ঘরে আসতে নেই। কেউ সজাগও নেই যে চাইব। ঘুমিয়েছ না কি? অমল বাবু, ও রাতজাগা বাবু?'

অমল সাড়া দিল না। কেবল পাশ ফিরল।

'কি গো—কতক্ষণ এ ভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব? দাও একখানা শাড়ী।'

তবু নিরুত্তর অমল রায় চৌধুরী।

'ও বুঝেছি, দোষ হয়েছে—এবারে মাপ করো। আমি আলনার কাপড় চাই নে। সুটকেশের শাড়ীখানা দাও—সেই নীলাম্বরী।'

কোন জবাব না পেয়ে মণিমালা একটু পরে এসে ঘরে ঢুকল। অমনি যেন ঘরের চার দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মণিমালা আলনার দিকে হাত বাড়াল, ইচ্ছা ছিল যে-কোনও একখান কাপড় নিয়ে পালাবে—অমল তার হাত দু'খানা ধরে ফেলে স্থির উজ্জ্বল চোখে চেয়ে রইল।

যুবতী নারীর সিক্ত শ্রী এত অপরূপ! এত মাধুর্যে ভরা! তার সারা দেহে যেন এক অনির্বচনীয় রসধারা বয়ে গেল। দেহটি কি শীতল! কত স্নিগ্ধ!

অসহায় মণি আর কত সইবে। বলল, 'আর ঘুরতে পারি নে, কাপড় ছাড়ব চাবি দাও।'

অমল বালিশের নীচ থেকে চাবি বের করে দিল।

স্পন্দিত বক্ষে মণি সুটকেশ খুলল।

তাড়াতাড়ি অমল মোড়কটা তুলে নিয়ে অপর হাতে মণির ক্ষীণ কোমর আবার বেড়ে ধরে বলল, 'আমি পরিয়ে দিই।'

অস্ফুট স্বরে মণি আপত্তি করল, 'না, না, না।'

'কেন, কি দোষ, তুমি যে প্রতিমা।'

মণি নত নেত্রে দাঁড়িয়ে রইল। ঈষৎ হাস্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল তার গালের টোলটি।

অমল মোড়কটা খুলল। তার পর সুটকেশটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজল।

আর সবই ঠিক আছে, শুধু সেই নীলাম্বরীখানা নেই।

বাইরে একটা সামান্য কলরব শোনা গেল। তাড়াতাড়ি অমল জানালাটা খুলে ফেলল এগিয়ে এসে। কি হয়েছে?

উঠানে পবন দাঁড়িয়ে—তার পিছনে নীলাম্বরী পরনে সেই ডাগর মেয়েটি। হাতে তার গুটি চারেক কচি শশা। এসেছে কৃতজ্ঞতা জানাতে। কিন্তু লজ্জায় রাঙা হয়ে রয়েছে ভোরের গোধূলির মত।

অমল একদৃষ্টে চেয়ে আছে, মণিও কাছে এসে দাঁড়াল, সে এক নিমেষে বুঝে নিল সব। একটা ক্ষীণ ব্যথা বাজল তার বুকে। কিন্তু তবু স্বামি-স্ত্রীতে আজ স্থির বুঝতে পারছিল না যে, পেয়ে হারিয়ে মানুষ ধন্য হয় বেশী!

জ্ঞানানন্দ

"ভাস্কর"

জ্ঞানানন্দ কোন সন্ন্যাসীর নাম নহে। জ্ঞান ও আনন্দ, অতি সাধারণ দ্বন্দ্ব-সমাস, বহুব্রীহি নয়, তৎপুরুষও নয়। এই দ্বন্দ্ব লইয়াই শিশির বাবু বিব্রত।

শিশির বাবু উকিল। সন্ধ্যার পর বাইফোকাল চশমা, নথিপত্র এবং মক্কেল লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার ত্রয়োদশবর্ষীয় পুত্রের গৃহশিক্ষক মহাশয় বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং একটু পরেই ফিরিয়া গেলেন।

শিশির বাবু মক্কেলদিগের সহিত কথাবার্তা শেষ করিয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়াই গৃহিণী কমলাকে বলিলেন, পারির মাষ্টার মশায় ফিরে গেলেন কেন?

পুত্রের নাম পারিজাতকুসুম, ডাক নাম পারি। কমলা বলিলেন, পারি থিয়েটার দেখতে গেছে।

থিয়েটার?

হ্যাঁ।

দু'দিন বাদে এগ্‌জামিন, এখন থিয়েটার কেন?

এগ্‌জামিন বলেই তো উজ্‌জুগ করে পাঠালাম।

তার মানে?

মানে, ও সংস্কৃতে কাঁচা কি না।

সংস্কৃতে কাঁচা বলে থিয়েটারে যেতে হবে?

তাও জান না?

তোমার অদ্ভুত হেঁয়ালি আমি বুঝতে পারছি নে।

শোননি, থিয়েটারে ব্যাকরণকৌমুদী প্লে হচ্ছে?

তাই না কি?

হ্যাঁ, একসঙ্গে জ্ঞান আর আনন্দ।

আমার ধারণা ছিল, জ্ঞানলাভ একটা কঠিন ব্যাপার। কত পরিশ্রম, কত রাত্রি-জাগরণ, কত উদ্বেগ—তবে তো জ্ঞানলাভ। তা সে ব্যাকরণই হোক আর যাই হোক।

তোমাদের সে যুগ আর নেই। আহা! বাছাদের কি কষ্টই না করতে হত! এখন সব কেমন সোজা হয়ে গেছে। হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে, খেলতে খেলতে ছেলেরা কেমন সব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করছে।

আমাদের সময়ে শুনতাম, Work while you work, play while you play.

তা শুনতে। এখন শোন, Play while you work, work while you play. মানে জ্ঞান আর আনন্দ ঠিক এক-সঙ্গে চলবে।

এই ধরণের তর্ক চলিতেছিল এবং হয়তো আরো কিছুক্ষণ চলিত। কিন্তু পারিজাতকুসুম থিয়েটার হইতে ফিরিয়া আসিতেই তাঁহাদের তর্ক আপাতত মুলতুবি রাখিয়া শিশির বাবু তাঁহার ঘরে চলিয়া গেলেন, কমলা আহারাদির ব্যবস্থা দেখিতে গেলেন। পারিজাতকুসুম তার ভাই-বোনেদের সঙ্গে থিয়েটার সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিল। কে তাহাদের ড্রিল-মাষ্টার মহাশয়ের মত চীৎকার করে, কে তাহাদের পণ্ডিত মহাশয়ের মত টিকি রাখিয়াছে, কে ভীষণ রং মাখিয়াছে, কে ঠিক মেজবৌদির মত শাড়ী পরিয়াছে, ইত্যাদি।

ইহার পরেই আহারের পালা। আহার শেষ হইলে, শিশির বাবু ডাকিলেন, পারি!

পারিজাত আসিল। কমলা আসিলেন। অন্য ভাই-বোনদের মধ্যে যাহাদের ঘুম পাইয়াছিল, তাহারা শুইতে গেল। মেজবৌদিও আসিয়া বসিলেন। শিশির বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, পারি, থিয়েটারে কি নাটক ছিল?

বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণকৌমুদী।

সমস্তটা?

না, আজকে ছিল স্ত্রী-প্রত্যয়ের অধ্যায়। ক্রমশ আর সবও অভিনয় করা হবে।

কি দেখলে, কিছু মনে আছে?

হ্যাঁ।

বল তো, কি দেখলে?

দেখলুম, একটা প্রকাণ্ড অর্কেষ্ট্রা। প্রায় বিয়াল্লিশ জন স্ত্রী-পুরুষ নানা রকম যন্ত্র নিয়ে বাজাচ্ছে।

তার পর?

অর্কেষ্ট্রায় ব্যাকরণকৌমুদীর একটু সূত্র বাজানো হচ্ছে, আর তার সঙ্গে তাল দিয়ে এক জন পণ্ডিত মশাই টিকিতে ফুল গুঁজে পায়ে ঘুঙুর পরে নেচে নেচে সূত্র গাইছেন। উদাহরণগুলো সার দিয়ে নানা ভঙ্গীতে নাচতে নাচতে ষ্টেজে ঢুকছে, আর ঘুঙুর পায়ে চমৎকার নাচের সাজ পরে নানা রকম করে নাচতে আরম্ভ করছে।

তাতে ব্যাকরণের কি শেখা হ'ল?

যে সূত্র বাজানো হচ্ছে, আর গাওয়া হচ্ছে, তারই উদাহরণগুলো তো নাচছে। স্ত্রীপ্রত্যয় লাগিয়ে যে সব শব্দ তৈরী হয়, সেই শব্দগুলো ওই নাচিয়ে মেয়েদের গায়ে বেশ বড় বড় করে লেখা আছে।

যেমন?

যেমন, অলকা, কেতকী, কলিকা, মালিকা, মালিনী, মঞ্জরী, মলিনা, উত্তরা, তরলা, তারকা, গৌরী, কুমারী, মানিনী, সতী, শ্রীমতী, সুষমা, অচলা, সরলা, আভা, যূথিকা, বেলা, শীলা, অমলা, বাণী, রমা, শকুন্তলা, এই সব।

অনেক উদাহরণ মনে আছে তো দেখি। অথচ, এগারর ঘরের নামতা তো এখনো মুখস্থ হয়নি। আচ্ছা, বানান কর তো 'সুষমা।'

অনেকক্ষণ মাথা চুলকাইবার পর পারি কোন মতে আরম্ভ করিল, তালব্য শয়ে উকার—

থাক্, ওতেই হবে।

ব্যাকরণকৌমুদীর কোন্ কোন্ সূত্রগুলো আজ অর্কেষ্ট্রায় বাজানো হল?

তা তো মনে নেই, তবে প্রোগ্রামে লেখা আছে।

দেখি প্রোগ্রাম।

প্রোগ্রামখানি হাতে লইয়া শিশির বাবু পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এক জায়গায় লেখা—

সূত্র—টিড্‌ঢাণঞ্‌দ্বয়সজ্‌দঘ্নঞ্‌মাত্রচ্‌তয়প্‌ঠক্‌ঠঞ্‌কঞ্‌ক্বরপঃ।

সূত্রটি পড়িয়াই শিশির বাবু যেন একটু গম্ভীর হইয়া গেলেন উঃ, কত পরিশ্রমই না করিতে হইয়াছিল, এই ব্যাকরণের সূত্রগুলি আয়ত্ত করিতে। এই বৃদ্ধ বয়সেও এইরূপ কত সূত্র কখনো কখনো তাঁহার স্মৃতিপথে 'আসিয়া উদয় হয়। কণ্ঠস্থ করিতে সে কি কঠোর পরিশ্রম! কোথায় ছিল থিয়েটার, আর কোথায় ছিল অর্কেষ্ট্রা!

প্রোগ্রামখানি পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সূত্রটির পরেই অর্কেষ্ট্রার সুরটি লেখা আছে—সুর আধুনিক—'একটুখানি মিষ্টি কথা, আর কিছু নয়—'

শিশির বাবু জ্ঞান ও আনন্দের অপূর্ব সমন্বয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। পারি ইতিমধ্যে শুইতে গিয়াছে। শিশির বাবু কমলাকে বলিলেন, পারির পড়াশুনা সম্বন্ধে আমাদের আর না ভাবলেও চলবে।

কয়েক দিন পরে।

স্কুলে পরীক্ষা চলিতেছে। সংস্কৃত পরীক্ষার দিন পারি স্কুলে গিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছে। কমলার প্রশ্নের উত্তরে পারি বলিল, প্রশ্নপত্র দেখিয়া তাহার মাথাটা হঠাৎ ঘুরিয়া উঠে। অসুস্থ বোধ করায় শিক্ষকেরা তাহাকে বাড়ী চলিয়া যাইতে পরামর্শ দেন। তাই সে রিক্শ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে।

লোভ

রমাপতি বসু

তেরো বছর বয়সের বৌ সাবিত্রী হারিয়ে যাওয়ার পর সহদেব যেন একটু মুষড়ে পড়েছিল। এমনিতে হিন্দু-মুসলমানের হাঙ্গামা—তার পর অভাব, অনটন। এই সব মিলে বিচ্ছিন্ন করে দেয় সহদেবের শান্ত গ্রাম্য-জীবন। চোখের সামনে সহদেব দেখেছে মানুষ মানুষকে খুন-জখম করেছে। টাকার জন্য খুন করার কথা সহদেবের জানা ছিল, কিন্তু বিধর্মী বলে হত্যা করার কথা সহদেব এই প্রথম জানে। তাই যখন সাবিত্রীর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না, তখন গ্রামের আর পাঁচ জনের মত সহদেব কোলকাতায় এসে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আস্তানা গাড়ে। যা কিছু ধান-জমি বা ঘটি-বাটি ছিল, সবই সে ফেলে এসেছিল! আর তা ছাড়া ঘটি-বাটি নিয়ে সহদেবের কি হবে? সাবিত্রী থাকলেও বা সে সবের প্রয়োজন হত। মানুষে মানুষে এই মারামারি তার মনকে একেবারে বিষিয়ে দিয়েছিল।

কোলকাতায় এসে সহদেব প্রথমটা ঠিক করে উঠতে পারেনি কি করবে। শেষে সহৃদয় কোন দেশসেবকের দয়ায় সে একটু মাথা-গোঁজার জায়গা খুঁজে পায় আর তার সঙ্গে পেটভাতের কাজও জুটে যায়। কোলকাতা থেকে বিশ মাইল দূরে কোন একটি উদ্বাস্তদের গড়া গ্রামে সহদেব থাকে। দেশসেবকের দয়ার সীমা নেই! উদ্বাস্তদের জন্য তিনি অনেক কিছুই করেছেন। যারা পুরুষ তারা জন-মজুরের কাজ পেয়ে গেছে, আর মেয়েরা অনেক বাবুর বাড়ীর কাজ নিয়েছে, সেলাই, বোনা, হাসপাতালে আরো সব কত কি কাজ। সহদেব নিজের কাজ ছাড়া কিছুই বোঝে না। শুধু বারোয়ারি একটি ব্যাপারে তাকে থাকতে হয়—যখন দেশসেবক স্বয়ং শোভাযাত্রা বা মিছিল বার করার ব্যবস্থা করেন।

তবু সহদেব খুশী থাকে। মাঝে মাঝে মনটা হুহু করে ওঠে

শুধু সাবিত্রীর জন্ত। বিয়ে করার পর মাত্র মাস-খানেক ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশার সুযোগ পেয়েছিল সহদেব। তার পর সাবিত্রী ছিল তার বাপের বাড়ী। সাবিত্রীর বাপের বাড়ীতে সহদেব দু'-এক দিন গিয়ে দেখা করলেও, সে-দেখায় মন ভরেনি সহদেবের। তাই অপরের বৌকে দেখলে মাঝে মাঝে মনমরাও হ'য়ে পড়তো সহদেব।

এদিকে জন-মজুরের কাজে সহদেবের অভ্যাস থাকলেও যেন মোটেই ভাল লাগে না। এক-এক বার সাবিত্রীর কথা মনে পড়লে সহদেবের মনটা মুচড়ে ওঠে! আবার মনে হয়, নিশ্চয় মরে গেছে। না হলে যাবে কোথায়? তবু মন বোঝে না। মাঝে দু'বার সহদেব পাকিস্থানে তার গ্রাম ঘুরে এসেছে—যদি সাবিত্রীর কোন সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এই সাড়ে তিন বছরের ব্যবধানে সহদেবের মনটা বেশ দমে যায়। মনে মনে সে স্বীকার করে নেয় সাবিত্রী আর বেঁচে নেই।

সেদিন সহদেব তার ডেরায় ফিরেছে অন্ত দিনের চেয়ে একটু আগে। আশে-পাশে যারা আজ তার প্রতিবেশী, সকলেই প্রায় তার গ্রামের লোক। চেনা যারা ছিল তারা আজ সহদেবের আত্মীয়ের মতন মনে হয়—আর যারা এক দিন অচেনা ছিল, তারা আজ একই গ্রামের লোক জেনে বেশ একটু মেলা-মেশা করে। মাঝে মাঝে চেনা-অচেনার আলাপে ক্লান্ত বোধ করতো সহদেব। অর্জুন, কালী মণ্ডল, সুধীর বারুই—সকলেই সহদেবের গ্রামের লোক। শুধু গ্রামের লোক নয়—একই পাড়ার পাশাপাশি বাড়ীর লোক। একই পুকুর এরা দিনের পর দিন ব্যবহার করে এসেছে।

বাড়ী ফিরে সহদেব মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। এমন সময় থানার জমাদার এসে খবর দেয় সহদেবকে, বড়ো দারোগা বাবু ডেকে পাঠিয়েছে।

সহদেব চমকে ওঠে। বুক তার শুকিয়ে যায়। কি অপরাধ সে নিজেই জানে না। অন্তায় সে জ্ঞানতঃ করেনি—তবে কেন ডাক পড়লো? জমাদারের সঙ্গে চললো সহদেব থানায়। মনে মনে ভাবে সে, দেশ স্বাধীন হলে হবে কি? এরা তো ইংরেজ আমলের দারোগা! নিজেদের আগের অভ্যাস মত কাজ করে চলেছে। যা হোক বরাতে। সহদেব ভয় পায় না। জমাদারকে জিগগেস ক'রে কোন কারণই জানতে পারে না সহদেব, তাই মরিয়া হ'য়ে হাজির হয় থানার দারোগা বাবুর সামনে।

দারোগা বাবু সহদেবকে দেখে বলে: দেশ কোথায়?

সহদেব বলে: এখন আর কোন দেশ নেই বাবু!

দারোগা বলে: এখন যে নেই তা আমি জানি। আগে কোথায় ছিল?

সহদেব বলে: এই দেখুন বাবু আমার কাগজ, এতে সব আছে।

দারোগা পড়ে যায়। সহদেবের উদ্বাস্তু সার্টিফিকেট। লেখা আছে: সহদেব কুর্মী। নোয়াখালি জেলার সোনামুখী গ্রামের লোক। বয়স ৩৪। বিবাহিত। স্ত্রীর কোন সন্ধান নেই।

দারোগা জিগগেস করে, বৌএর কত দিন খোঁজ পাও না? বিনয় করেই সহদেব উত্তর দেয়, তা বাবু প্রায় সাড়ে তিন বছর হবে।

দারোগা বলে: তোমার বৌএর নাম কি?

—সাবিত্রী। সহদেব উত্তর দেয়।

আর তার বাড়ী কোথায়?

দারোগা আরো প্রশ্ন করে: সাবিত্রীর বাবার নাম কি?

সহদেবের এত কথার উত্তর দেওয়ার মত মানসিক অবস্থা ঠিক নেই। ইচ্ছাও হয় না এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা হয়। তবু উপায় নেই, তাই উত্তর দিতে বাধ্য হয়। সহদেব বলে: জয়দেব ঘড়ুইএর মেয়ে। বাড়ী রামগঞ্জ থানায়।

দারোগা বলে: একটু দাঁড়াও।

হুকুম করে দারোগা: দরোজা—ওকে পাঠিয়ে-দাও।

একটি মেয়ে দরোজার সঙ্গে ভেতরে আসে। সিঁথি ঢাকা আছে ঘোমটায়। বেশ ডাগর চেহারা। গায়ের রঙ যেন ফেটে পড়ছে।

সহদেব মেয়েটিকে দেখে চমকে ওঠে। নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারে না। কি আশ্চর্য! কি করে সাবিত্রী এখানে এলো!

দারোগা বলে: একে তুমি চেনো?

—বাবু, এই আমার সাবিত্রী। সহদেবের চোখে জল এসে যায়।

দারোগা বলে: একে তুমি ঘরে নিয়ে যেতে চাও?

—হ্যাঁ বাবু। নিশ্চয় নিয়ে যাবো। সাড়ে তিন বছর ধরে যে আমি এর জন্ত অপেক্ষা করছি। আরো কত কি একসঙ্গে বলে যায় সহদেব।

দারোগা বলে: ঠিক আছে। এই কাগজে একটা সহি করে দাও।

সহদেব বলে: কালি দিন দারোগা বাবু। টিপ দেবো। লেখাপড়া তো আমার জানা নেই।

দারোগা সহদেবের টিপ-সহি নিয়ে বলে: যাও, এবার একটু পাহারা দিস্ বেটা।

হাত জোড় করে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সহদেব বেরিয়ে পড়ে সাবিত্রীকে নিয়ে। খুব আনন্দ হয় সহদেবের। বুকের ভেতরটা তার কি রকম করতে থাকে। সাবিত্রীকে দেখে সহদেব বলে: তুই যেন ডাগর হ'য়ে গেছিস্ সাবি।

সাবিত্রী নির্বাক্। কোন উত্তর দেয় না।

এগিয়ে চলে দু'জনে সহদেবের ডেরার দিকে। সবই নতুন লাগে সাবিত্রীর। কি করে সহদেব এখানে এসেছে? কি সে করে? সব কিছুই জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কিছুই জিগ্‌গেস করার সাহস নেই সাবিত্রীর।

ডেরায় ঢোকার পথে সহদেব যত তার জানা-শোনা লোক ছিল সকলকে জানিয়ে দিয়েছে যে, তার বৌ ফিরে এসেছে। আর তা ছাড়া এত আনন্দের কথা না বলেই বা থাকা যায় কি করে?

সহদেবের পাড়ায় তার গ্রামের যারা ছিল, সকলেই জেনেছে সাবিত্রী ফিরে এসেছে। কেউ কেউ কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে দেখতে এসেছে সাবিত্রীকে। যারা খুব ভালো করে চেনে সাবিত্রীকে, তারা কত কথাই না জিগেস করে। কিন্তু সাবিত্রী নির্বাক্। কোন উত্তরই সে দেয় না।

রাত্রি বেশ হয়ে গেছে। সকালের জল-দেওয়া ভাত সহদেব ও

সাবিত্রী ভাগাভাগি করে খেয়ে নিয়েছে। যারা দেখতে এসেছিল তারা সব রাত্রির মত এদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে

এমনি একটা রাত্রির কথা সহদেবের মনে পড়ে। তার প্রথম বিয়ের রাত্রি। জীবনে সেদিন সহদেব যে অনুভূতি পেয়েছিল, আজও যেন তার সেই অনুভূতি, সেই শিহরণ দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়। একটা মাদুর পেতে একটা বালিশে সাবিত্রী ও সহদেব সে রাত্রের মত শোয়। সহদেব মনে মনে ভাবে, কাল থেকে সে সাবিত্রীর জন্ত সব ব্যবস্থা করে ফেলবে। সহদেবের কৌতূহল হয় জানতে—জিগ্‌গেস করে, এত দিন কোথায় ছিলি সাবি ?

সাবিত্রী সঙ্কোচ করে বলতে।

সহদেব সাবিত্রীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলে: আজ আমার বুকটা জুড়িয়ে গেছে সাবি। সাড়ে তিন বছর ধরে আমি শুধু কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছি তোর জন্তে।

সাবিত্রী ভয় পায় কিছু বলতে। কিন্তু স্বামীর কাছে কি গোপন করা যায়? না—না, সাবিত্রী সব-কিছু সত্যি কথা বলবে।

সাবিত্রীর উপাখ্যান এইখান থেকে সুরু হোল। সাবিত্রীর মত হাজার হাজার বাঙলা দেশের সাবিত্রীরা এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে গেছে। যাদের কথা ইতিহাসে কোন দিন লেখা হবে না। তবু সহদেবের জন্তই বোধ হয় সাবিত্রীর উপাখ্যান কয়েক জনের মনে থেকে যাবে।

সাবিত্রী বলে: রাত্রি তিনটের সময় আমাদের বাড়ী ঘিরে ফেলে গুণ্ডারা। আগুন লাগিয়ে দেয় চালায়। মা আমার ছোট বোনটাকে নিয়ে কোথায় লুকিয়ে পড়লো তা আজো জানি না। বাবাকে এসে গুণ্ডারা ছোরা দিয়ে দু'-তিনটে ঘা বসিয়ে দিলে। অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেল বাবা। রক্তে আমাদের দাওয়াটা ভরে গেল। বাবার এই অবস্থা দেখে আমার আর কোন জ্ঞান রইলো না। বঁটি-কাটারী যা-কিছু সামনে ছিল তাই ছুঁড়ে মারতে লাগলাম গুণ্ডাদের। তার পর কখন আর কি করে ওদের খপ্পরে আমি পড়েছি তা আমার জ্ঞান নেই।

দু'দিন বাদে আমার জ্ঞান ফিরে আসে। যখন আমার জ্ঞান ফিরলো, তখন দেখি আমাদের পাশের বাড়ীর হাসান আমার মাথার কাছে বসে আছে। হাসানকে দেখে প্রথমে আমার একটু বিশ্বাস হয়েছিল, কিন্তু কেন জানি না, ওর হাব-ভাব দেখে আমার সন্দেহ হয়।

জ্ঞান ফিরতে আমি হাসানকে বললাম: আমি এখানে কি করে এলাম ?

হাসান বলে, পথ থেকে অচৈতন্ত অবস্থায় সে কুড়িয়ে পেয়েছে।

যাই হোক, অবিশ্বাস আমি করিনি। কেন না, গুণ্ডাদের বর্বরতা চরমে উঠেছিলো। আমার অসহায় ও অচৈতন্ত অবস্থার সুযোগ তারা নিতে ছাড়েনি। তাই আমার রক্তাক্ত কাপড় দেখে আমি নিজেই শিউরে উঠেছিলাম। সে সময়ে আমার কাছে এমন কেউ ছিল না যে, পালিয়ে আসি। হাসান আমাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবার ছল করে নিয়ে আসে ঢাকায়। ঢাকা থেকে চাটগাঁ, ময়মনসিং, বগুড়া—আরো কত কি জায়গায় সে আমাকে ঘোরালো। শুধু আমার প্রাণের ভয় ছিল

বলে আমি বেশী কিছুই করতে পারিনি। রাত্রে রাত্রে মসজিদে কাটিয়েছি। বোরখার আড়াল থেকে দেখেছি আমার অনেক জাত-ভাইকে, কিন্তু সাহস হয়নি বোরখা তুলে কথা বলি। কেন জানো? ভয় হয়, যদি কেউ আমাকে সাহায্য করতে না আসে। এক দিন রাত্রে হাসান আমাকে নিয়ে গেল মসজিদ থেকে তার কোন জামাই-বাড়ী। প্রতিবাদ করি না, যা বলে সব কথাই শুনে যাই। রাত্রে আমাকে যেখানে নিয়ে গেল—সে এক বীভৎস জায়গা। সেখানে ঢুকেই আমার বুক গেল শুকিয়ে। ঘরে ঢুকে দেখি, কম করে দশ বারো জন গুণ্ডা মদ খেয়ে মাতলামি করছে। কড়িকাঠ থেকে তিনটে মেয়েছেলের মড়া ঝুলছে! সবাই উলঙ্গ! উঃ—উঃ! আমি এই দৃশ্য দেখে কেঁদে উঠি। হাসান সেদিন প্রথম আমাকে একটা চড় মারে। আমি তো জানি এই-খানেই আমার শেষ। আর হয়তো পৃথিবীর কোন কিছুই আমি দেখতে পাবো না। শুধু বার বার মনে হয়েছে—আমি যদি হিঁদু বা মেয়েছেলে না হ'তাম, তবে এই অসহ্য যন্ত্রণা আর সহ্য করতে হোত না। লাঞ্ছনা বা গঞ্জনা সহ্য করার মত সাহস আমার ছিল, কিন্তু গুণ্ডা পুরুষের কাছে নিজেকে সামলে রাখবার কোন পথই খুঁজে পাইনি।

এক দিন রাত্রে সবই ঠিক করে ফেলি। হাসানের এক ভাবীকে আমার সব কথা বলেছিলাম। সে বলেছিল, আমাকে যে করে হোক এই নরকপুরী থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দেবে। এক দিন বোর্‌খা পরে রাত্রি তিনটের সময় বেরিয়ে পড়ি রাস্তায়। সঙ্গে ছিল হাসানের বড়ো ভাইয়ের ছেলে মুজাফর। কিছুটা পথ চলার পর মুজাফর আমাকে এক ঝোপের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিল। তার পর··· তার পর আর কিছুই বলার আমার নেই। আমার দুর্বল দেহকে নিয়ে মুজাফরের বন্ধুরা ছিনিমিনি খেলেছিল। বিশ্বাস করো, বাড়িয়ে আমি এতটুকু বলছি না। আজ যা বলছি সবই আমার নিজের কথা। শুনেছি অনেক মেয়ের ভাগ্যেই এ রকম হ'য়েছে, কিন্তু আমার মত এতটা সহ্য করেছে কেউ কি না, জানি না। শেষে মুজাফরদের দলের একটি লোক আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে বর্দ্ধমানে। বর্দ্ধমানে এসে লোকটা দাগী গুণ্ডা বলে ধরা পড়ে পুলিশের কাছে। আর সেই সূত্রে আমাকে পুলিশ আজ এখানে এনেছিল। তোমার পায়ে পড়ি আমাকে তুমি ফেল না। আমার তো কোন দোষ নেই। শুধু দোষ—আমি বাঁচতে চেয়েছি। আর এই বাঁচার জন্যই এত কিছু দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে।

সহদেব চুপ করে শুনে যায়। কি সে বলবে! সত্যি তো সাবিত্রীর কোন দোষ নেই। তবু সহদেব বলে: তুই মরে গেলি না কেন সাবি! এর চেয়ে ঢের ভাল করতিস।

—কেন, তুই কি আমায় ঘরে নিবিনি?

সহদেব চুপ করে থাকে। সাবিত্রীর দেহের স্পর্শ যেন আর তার ভাল লাগে না। সাবিত্রী সহদেবের বুকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে: তোর জন্যই শুধু আমি বেঁচে ছিলুম।

সহদেব তবু কোন কথা বলে না। বুকের ভেতরটা তার কি রকম যেন মুচড়ে ধরে।

সাবিত্রী কি যেন ভেবে বলে: না, কাল ভোরে উঠে আমিই চলে যাবো।

সহদেব বলে: কেন?

সাবিত্রী বলে: চেহারা দেখে বুঝিস না। এ মুখ দেখাবো কি করে?

সহদেব তবু বলে: তোর আর কি দোষ সাবি? দোষ আমার বরাতের।

সাবিত্রী বলে: দোষ আমার সত্যি নেই। কিন্তু পেটেরটাকে নিয়েই আমার যত ঝামেলা!

সহদেব সাবিত্রীর এই কথায় স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। মনটা তার ঘৃণায় রি-রি করে ওঠে। তবু সে কোন কথাই আর বলে না।

* * * *

ভোর বেলায় পাড়ার যত লোক ছিল সব ভেঙে পড়ে সহদেবের ঘরের সামনে। সহদেবের বাড়ীর সামনে যে প্রকাণ্ড বট গাছ আছে, তারই একটা ডালে সহদেবের মৃতদেহ ঝুলতে থাকে। প্রতিবেশীরা যে যার খুশি অভিমত প্রকাশ করে। সব কথাই ভাল-মন্দে মেশানো। কিন্তু যা কিছুই তারা বলে যায়—সবই সাবিত্রীকে লক্ষ্য করে।

আগামী কালের ইতিহাসে সাবিত্রী-সহদেবের কথা লেখা হবে কি না জানি না, তবে বার বার এই কথাই মনে হয় যে, সহদেব যে আত্মহত্যা করলো—তা কার ওপর অভিমান ক'রে?

মরীচিকা

শ্রীমতী সুষমা দেবী

কুনাল বাড়ী ফিরে সোজা তার শোবার ঘরে ঢুকে দেখল মঞ্জুলিকা খাটের উপর শুয়ে আছে। দাসী বিন্দু পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সারা ঘর অন্ধকার। জানালায়-জানালায় খসখসের পর্দায় পিচকারি করে জল মাত্র অল্পক্ষণ আগে দেওয়া হয়েছে। তাই টপ-টপ করে মেঝেতে ঝরে পড়ছে। মাথার উপর পাখা পুরা দমে চলেছে। খাটের গায়েই লাগান একটি ছোট টেবলের উপর ফুলদানিতে টাটকা ফুল সাজান আছে। আর তারই পাশে রূপার ডিবাতে কতকগুলি মিঠা পানের খিলি রাখা রয়েছে।

জুতার শব্দ পেয়ে মঞ্জুলিকা মাথা তুলে স্বামীকে দেখে বলল—আচ্ছা, এই দুপুরের রোদে কোথায় বেরিয়েছিলে বল ত? গাড়ী করে গেলেই কি আর রোদ লাগে না? সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়েও ত আমার গরম মনে হচ্ছে। দেউড়ির ঘড়িতে তিনটে বেজে গেল, অথচ তোমার দেখা নেই! খুব তেষ্টা পেয়েছে ত? তার পর নিজের পা দু'টি গুটিয়ে নিয়ে বিন্দুর দিকে ফিরে বলল, যা ত বিন্দু, বাবুর জন্যে ডাবের জল নিয়ে আয়, রামধনি বরফের বাক্সে রেখে গেছে।

বিন্দু ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরই কুনাল খাটের উপর উঠে মঞ্জুলিকাকে জড়িয়ে ধরে বলল—আমি একটা কাজ করেছি, তুমি কিন্তু বকতে পাবে না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে সে বলল—কেন, আমি কি তোমায় কেবল বকি না কি?

কি কাজ করেছ আগে বল, তার পর না হয় বিবেচনা করে দেখা যাবে। কুনাল স্ত্রীর মুখে চুমু খেয়ে বলল, তুমি বায়োস্কোপে 'ইন্দিরা' দেখতে চেয়েছিলে। তাই আজ ছটার 'শো'র জন্যে টিকিট কিনে এনেছি। যাবে ত? বল মঞ্জি, সত্যি রাগ করনি?

পানের ডিবাটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে খুলে তা থেকে একটি লবঙ্গ বার করে মুখে দিয়ে মঞ্জুলিকা বলল, আমার শরীরটা দিন-দিন কেন এত খারাপ লাগছে, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। এবার সত্যিই হয়ত কিছু হল। আর সেই জন্যেই আজকাল আমি কোথাও নড়তে চাই না। সব সময়ে এত গা-বমি করে আর মাথা ধরে থাকে যে কিছু ভাল লাগে না। কুনাল আনন্দ ও দুঃখ-মিশান স্বরে বলল—তুমি যা বলছ, তা কি সত্যি মঞ্জি? আজ দু'বছর ধরে যে আশা আমরা করে আসছি, সে কি আজ সত্যিই সফল হতে বসেছে? তার পর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমার শরীর খারাপ জানি। ভাবলাম, ছবিটা দেখতে চাইলে, অথচ দেখা হচ্ছে না, আজকাল করে দিন কেটে যাচ্ছে। হয়ত শীগ্‌গিরই ছবিটা চলেও যাবে। আর, একটু অন্যমনস্ক হলে শরীরের কষ্টটাও ত ভুলতে পার। মঞ্জুলিকা হাত দিয়ে নিজের কপাল টিপতে টিপতে বলল—যে কষ্ট দিন-রাত্রি হচ্ছে, এ কি তোমার বায়োস্কোপ দেখে কমবে? তাহলে আর ভাবনা ছিল না! তার পর মৃদু হেসে স্বামীর ঘন চুলের উপর হাত বুলাতে বুলাতে বলল,—যখন টিকিট করে এনেছ, তখন যেতেই হবে। বিন্দু ডাবের জলের দু'টো গ্লাস এনে টেবলের উপর রেখে বেরিয়ে গেল। মঞ্জুলিকা বিছানার উপর উঠে বসে একটা গ্লাস স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে বলল—খেয়ে ফেল দেখি। রোদে পুড়ে এসেছ, মুখ-চোখ সব লাল হয়ে গেছে। তার পর নিজের গ্লাসটা মুখে দিয়ে দু'বার ঢক-ঢক করে গিলে টেবলের উপর দুম করে বসিয়ে মুখ চেপে আবার শুয়ে পড়ল।

কুনাল সেন বড় জমিদার, মায়ের একমাত্র ছেলে। যখন তার বাবা মারা যান তখন সে শিশু। তার পর ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটিয়ে তার মা তাকে মানুষ করে তুলেছেন। বিশাল জমিদারী নিজেই দেখা-শোনা করে আরও বাড়িয়েছেন। কুনালের বাবা মারা যাবার পর তাঁর সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে চলে গিয়েছিল। তার মা নিজেই চেষ্টা করে সম্পত্তি ছাড়িয়ে তাঁর আয়ত্তের মধ্যে এনেছিলেন। সেই কুনালের বিয়ের পর দু'বছর কেটে গেল, কিন্তু তার কোনও ছেলে হল না দেখে তার মা ষোড়শী দেবীর মনে খুবই অশান্তি হয়েছিল। ছেলের যদি কোনও সন্তান না হয় তাহলে এই জমিদারীর ভবিষ্যৎ কি হবে, ভেবে তিনি বিশেষ চিন্তিতা হয়েছিলেন। পুত্রবধূকে দুনিয়ার মাদুলি পরান থেকে ভিন্ন ভিন্ন ঠাকুরের কাছে ধর্ণা দেওয়া, ষষ্ঠীতলায় ঢিল বাঁধা, কিছুই করতে বাকি রাখেননি। সেই বৌয়ের শরীরে যখন সন্তান হবার সমস্ত লক্ষণ দেখা দিল তখন আনন্দে কি যে করবেন কিছু যেন তিনি বুঝতে পাচ্ছিলেন না। তখনই মোটর নিয়ে কালীঘাটে গিয়ে পূজা দিলেন। মায়ের চরণামৃত নিয়ে বাড়ী ফিরে এসে মঞ্জুলিকার মুখে ও মাথায় বুলিয়ে দিলেন, তার পর আদর করে তাকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁ মা, কি খেতে ভাল লাগে বল ত আমায়? কিছু লজ্জা করবার দরকার নেই বেটী, আমার কাছে!

মঞ্জুলিকা টেবল-ক্লথের উপর রেশম দিয়ে গোলাপ ফুল তুলছিল। লজ্জায় মুখ নীচু করে বলল—মা যেন কি! কি আবার খাব? খাবার নামেই আমার শরীর কেমন করে ওঠে। ষোড়শী দেবী মোক্ষদা ঝিকে ডেকে বললেন—যা ত মুখি, চট করে বৌমার জন্যে এক গ্লাস কমলা লেবুর রস করে নিয়ে আয়। যার আমার মুখ কি রকম শুকিয়ে গেছে দেখছিস না?

মঞ্জুলিকা হাতের সেলাইটা সেইখানে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—মা, আমার রোজ এত মাথাব্যথা করে যে, কি বলব! আবার কাল থেকে পেটটাও কেমন করছে। তিনি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, সে আবার কি? তার পর তার কপালে হাত দিয়ে দেখে বললেন, না, জ্বর হয়নি। কিন্তু যাই হোক, ওরকম ত ভাল নয়। তুমি নড়াচড়া কোরো না দেখি। লক্ষ্মী মেয়ে আমার, বিছানায় গিয়ে শুয়ে-বসে থাক। ডাক্তার বাবুকে আমি এক্ষুনি খবর দিচ্ছি।

ডাক্তার এসে মঞ্জুলিকাকে দেখে বললেন, না, ও কিছু নয়। প্রথম প্রথম অনেকেরই ও রকম হয়ে থাকে। খুব সম্ভব হজমের গোলমালের জন্যেই এই রকম হচ্ছে। আপনি বৌমাকে একটু চলতে-ফিরতে দেবেন। রাত-দিন শুইয়ে-বসিয়ে রাখবেন না যেন। যাই হোক, আমি একটা ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি। বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

কুনাল মঞ্জুলিকাকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাচ্ছে। ষোড়শী দেবী এসে ছেলেকে বুঝিয়ে বললেন, কুনু, বৌমাকে যেন হাঁটিও না। ডাক্তারেরা অমন বলেই থাকেন। কষ্ট হচ্ছে বললেই সোজা বাড়ী চলে আসবে। তার পর রামধনির দিকে ফিরে বললেন—বরফের ফ্লাস্কটা গাড়ীতে তুলে দিয়েছিস ত? শেষে মঞ্জুলিকাকে সাবধান করে দিলেন—বেশী বমি না এলে বরফ যেন খেও না, মা, গলায় ব্যথা হবে।

গড়ের মাঠ পার হয়ে গাড়ী গঙ্গার ধারে আসতেই মঞ্জুলিকা আনন্দ ও তৃপ্তিতে বলে উঠল—আঃ, কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে! শরীর যেন জুড়িয়ে যায়। কুনাল মোটরের বেগ কমিয়ে দিয়ে বলল—তোমার কষ্ট হলে চুপ করে থেক না, আমায় বোলো মঞ্জি! মঞ্জুলিকা আনন্দে হেসে স্বামীর গায়ে গড়িয়ে পড়ে বলল, দেখ, দেখ, কি সুন্দর লঞ্চগুলো যাচ্ছে! বড় ষ্টীমারগুলোতে এখনি আলো জেলে দিয়েছে কেন? দেখ, দেখ, ঐ নৌকোটা করে কতকগুলো লোক পিকনিক করতে গিয়েছিল। তার পর গুণে বলল, আট জন। আচ্ছা, হ্যাঁ গো, ওদের যেতে ভয় করে না? আমায় এক দিন লঞ্চে চড়াবে? কত দিন চড়িনি, যেন মনেই পড়ে না। আমরাও পিকনিক করতে যাব। খুব মজা হবে তাহলে, কি বল? কুনাল হেসে বলল—তোমার সখ ত কম নয়? সেদিন 'ইন্দিরা' দেখতে যেতে কত আপত্তি করলে! আর আজ লঞ্চে গিয়ে পিকনিক করার সখ! বলিহারি তোমার সখকে। এই সময়ে আর ঐ শরীরে তুমি কখনও কষ্ট সহ্য করতে পার? মা যদি শোনেন আমি তোমায় লঞ্চে করে বেড়িয়ে নিয়ে এসেছি, তাহলে আমার সঙ্গে তোমার বেড়াতে আসাই যে বন্ধ হয়ে যাবে, সে খেয়াল আছে মহারাণীর?

মঞ্জুলিকা অভিমান-রুদ্ধ স্বরে বলল, বেশ, দরকার নেই! ছেলে হবার পর কি মা আমায় বেরোতে দেবেন? কত দিন যেতে পারব না, তার ঠিক নেই। সেই জন্যেই বলেছিলাম। থাক, আর আমি বলব না।

কুনাল মোটর থামিয়ে মঞ্জুলিকার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল। তার পর চারি দিকে দেখে নিয়ে চট করে মুখের কাছে তুলে একটি ছোট্ট চুমু খেয়েই হাতটি নামিয়ে নিজের মুঠির মধ্যে ধরে বলল—আর রাগে কাজ নেই। তার পর নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল—জান, মঞ্জুলিকার মুখে হাসি দেখবার জন্যে পৃথিবীতে এমন কাজ নেই, যা কুনাল সেন না করতে পারে? এই সামান্য জিনিষেই এত অভিমান! আমি শীগ্‌গিরই লঞ্চে করে তোমায় বোটানিকল্ বেড়িয়ে নিয়ে আসব। ফেরবার সময়ে অবশ্য গাড়ীতে আসব। ড্রাইভারকে বলে দোব, আমাদের ঘাটে পৌঁছে দিয়ে সোজা গাড়ী নিয়ে ওখানে হাজির থাকবে। কি বল, রাজি ত? কিন্তু মাকে লুকিয়ে, আর তোমার শরীর যদি বেশী খারাপ না হয় তাহলে। মঞ্জুলিকা হেসে নিজের কোলের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল—বা, বা, বেশ মজা হবে। তার পর কুনালের দিকে চেয়ে বলল, আমি কিন্তু খাবার-টাবার নিয়ে যেতে পারব না, তাহলেই মা টের পাবেন। কুনাল জবাব দিল, সে ভাবনা আমার গো, মহারাণী! তার পর গঙ্গার ধারে আরও খানিকটা ঘুরে তারা বাড়ী ফিরল।

কয়েক দিন পরেই বেলা তিনটা বাজবার আগেই কুনাল ও মঞ্জুলিকা তৈরী হয়ে মার ঘরে ঢুকে বলল—মা, আমরা আজ সকাল সকাল বেড়াতে যাচ্ছি। ষোড়শী দেবী তখন শুয়ে শুয়ে মহাভারত পড়ছিলেন। বিমলা তাঁর গা-হাত-পা টিপে দিচ্ছিল। তাদের দেখে তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। হাতের বই বন্ধ করে এক পাশে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন—সে কি রে, এই রোদে কি মানুষ বেরোয়? তুই আমার রোগা বৌটাকে কোথায় নিয়ে যাবি? পড়ন্ত রোদ গায়ে লেগে শেষে আবার একটা কাণ্ড হোক! রোদ পড়ুক, তার পর যাস। তাছাড়া এখন ত তোদের কিছু খাওয়াও হয়নি। আগে খেয়ে নে। তার পর পুত্রবধূর দিকে চেয়ে বললেন—বৌমা কি রকম হয়ে গেছে দেখ। গোল মুখখানি রোগা হয়ে যেন লম্বা দেখাচ্ছে। একেবারে খেতে পারে না, তা হবে না?

কুনাল জবাব দিল, আমাদের খাবার টিফিন বাক্সে দিয়ে গাড়ীতে তুলে দিতে বলেছি। আমরা ছায়া দেখে গাছের তলায় কি অন্য কোনও জায়গায় বসে খেয়ে নোব। তিনি ব্যস্ত হয়ে কুনালকে সাবধান করে দিলেন—বৌমাকে আমার যেখানে-সেখানে খেতে দিস না। পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে, সেটা মানলে এমন কিছু দোষ হবে না। কুনাল হেসে বলল, তুমি ভেব না মা! গাছের তলায় বসিয়ে তোমার বৌকে খেতে দোব না। তুমি অপদেবতার ভয় করছ ত? তিনি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন, তোমরা আজ-কালকার ছেলে, কিছুই মানতে চাও না। তা বললে কি চলে? আমি যত দিন বেঁচে আছি, একটু-আধটু মানতে হবে বই কি, বাবা। তার পর মঞ্জুলিকাকে আদেশ করলেন—বৌমা, তোমার ঘোলের সরবৎটুকু খেয়ে যাও, আমি নিজেই এখনই চট করে এনে দিচ্ছি। দাসীদের আনতে এক ঘণ্টা যাবে!

কুনাল ও মঞ্জুলিকা লঞ্চের ডেকের উপর বসে গঙ্গার দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। মঞ্জুলিকা তখনকার মত তার নিজের শরীরের কষ্টের কথা ভুলে গেল। একবার এপার একবার ওপার করতে করতে লঞ্চ চলেছে। ক্রমে রৌদ্রের তেজ কমে এল। নীল মেঘের উপর বকের সারি চলেছে। মাছ-রাঙা পাখী মাঝে মাঝে জলের কাছে এসে ছোঁ মেরে মাছ মুখে করে নিয়ে আবার আকাশে উঠে যাচ্ছে। একটা এয়ারোপ্লেন খুব শব্দ করে তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। তার পর ক্রমশ দেখতে দেখতে দূরে আকাশে মিলিয়ে গেল। গঙ্গার জলের উপর রোদ পড়ে চকচক করছে, মনে হচ্ছে যেন লক্ষ লক্ষ হীরা জ্বলে উঠছে।

মঞ্জুলিকা তন্ময় হয়ে দেখছে। তাদের আশে-পাশে আরও অনেক যাত্রী চলেছে। সেদিকে তার দৃষ্টি নেই। লঞ্চের সামনে ও পাশের জলগুলি ফেনার মত হয়ে কেটে কেটে যাচ্ছে, আর লঞ্চ এগিয়ে চলেছে। বোটানিক্যাল গার্ডেনএ নেমে কুনাল মঞ্জুলিকাকে বলল—তোমার শরীর খারাপ, এই দারুণ গরমে খুব কষ্ট হচ্ছে ত? মঞ্জুলিকা হেসে উত্তর দিল—সে কি গো? গরম কোথায় দেখলে? 'ডেকে'তে কি সুন্দর হাওয়া লাগছিল, আমার নামতেই ইচ্ছে করছিল না। চল, এগিয়ে যাই। ঐ লোকগুলো কি রকম হাঁ করে চেয়ে দেখছে দেখ, যেন কখনও মানুষ দেখেনি! কুনাল হো-হো করে হেসে বলল—সত্যিই ত, ওরা তোমার মত একখানা চেহারা দেখবে কোথা থেকে? তুমি যাই বল, আমি কিন্তু বেচারাদের দোষ দিতে পারি না! মঞ্জুলিকা স্বামীকে ঈষৎ ঠেলে দিয়ে বলল, তুমি ভারি অসভ্য। কুনাল বলল—আজ ছ'বছর ধরে তোমায় আমি দেখছি, কিন্তু এখনও দেখে ত কই আমার নিজেরই আশা মেটে না। তা অন্য লোককে দোষ দোব কি করে?

গঙ্গার ধারে একটা জায়গা দেখে কুনাল বলল, এস, এখানেই খাওয়া যাক। বলে টিফিন বাক্সটা সেইখানে নামিয়ে রাখল। তার পর বলল, প্রথমে ভেবেছিলাম নীলাম্বরকে নিয়ে আসব কিন্তু শেষে ভাবলাম, না—আমাদের দু'জনের মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি আজ কিছুতেই সহ্য করব না। কিছু পরে আবার সে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, মঞ্জু, তোমার কি মনে হচ্ছে বল ত? হঠাৎ অত চুপ-চাপ হয়ে গেলে কেন? যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলে। ব্যাপার কি? স্বামীর কাছে তার খাবার এগিয়ে দিয়ে মঞ্জুলিকা খানিকক্ষণ গঙ্গার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চুপ করে বসেছিল। তার কথায় দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল—জান, আমার কি মনে হচ্ছে? যদি আমরা ঐ রকম বড় বড় জাহাজে করে অনেক দূর-দূরান্তরে দিনের পর দিন বেড়িয়ে বেড়াতে পারতাম, কি মজাই না হত! ছোট বেলা থেকে চিরকাল আমার দেশ দেখতে বড় ইচ্ছে করে। ছোট বেলায় স্কুলে পড়েছি, বড় হয়ে কলেজেও কিছু দিন পড়লাম। ইতিহাস আর ভূগোল চিরকালই আমার ভাল লাগে। ভূগোলের ম্যাপ দেখতে দেখতে মনে হত আমি যেন পড়ার সঙ্গেই একটার পর একটা দেশে চলেছি, সব যেন চোখের সামনে ছবির মত একটার পর একটা ভেসে উঠেছে। মনে হত যেন স্বপ্নরাজ্যে বেড়াচ্ছি। সেই রাজ্যে কত জায়গায় যে বেড়াতাম তার ইয়ত্তা নেই। দেখ, এখনও কিন্তু আমার সে আকাঙ্ক্ষা মেটেনি। এখনও পৃথিবীর কোথায় কি আছে দেখবার ও জানবার আগ্রহ আমার ঠিক তেমনিই প্রবল আছে। একটু থেমে কুনালের দিকে চেয়ে লজ্জিত হয়ে সে আবার বলল, তুমি আমার কথায় হাসছ?

আর বলব না। কুনাল স্মিত হাসি হেসে স্ত্রীর পিঠের উপর হাত রেখে বলল, না মঞ্জি, তুমি বিশ্বাস কর, আমারও দেশ-বিদেশে কোথায় কি আছে দেখবার সখ তোমার চেয়ে কম নেই। আমাদের এই মিলিত ইচ্ছে এক দিন পূর্ণ হবেই। আর সেই দিন আমরা মহা-সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর এপার থেকে ওপার অবধি দেখবার চেষ্টা করব। জেন, আমাদের এ আকাঙ্ক্ষা সফল হবেই। আমি যদি বেঁচে থাকি, মঞ্জি, তোমার সখ মেটাবই, এ তুমি স্থির জেন। তৃপ্তির হাসি হেসে মঞ্জুলিকা বলল—সে বিশ্বাস আমার আছে। তবে ছেলে-পিলে হ'লে জড়িয়ে পড়ব। গীগুগির কি আর বেরোতে পারব? কুনাল উত্তর দিল—তাতে কি হয়েছে? আমার মা থাকতে তুমি ওসব কথা একেবারেই ভেব না। আমাদের সুখের জন্তে, আমাদের আনন্দের জন্তে যত কষ্টই হোক যত অসুবিধাই হোক, মা সব করতে রাজি হবেন। আমরা তাঁর কাছে আমাদের বাচ্ছাকে রেখে দিয়ে যাব।

কুনাল দাঁড়িয়ে উঠে মঞ্জুলিকার হাত ধরে এগিয়ে গিয়ে বলল—চল মঞ্জি, বাগানটা ঘুরে একটু দেখি। তার পর অল্প হেসে স্ত্রীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল—আমার এখন কি মনে হচ্ছে, বলব? সে উত্তর দিল—বল না, আবার ইতস্তত কেন? কুনাল বলল—বিয়ের পরই যখন আমরা শিমুলতলা বেড়াতে গিয়েছিলাম তখনকার কথা তোমার মনে আছে কি? লাটু পাহাড় ছাতু পাহাড়ের ধারে ধারে আমরা এমনি করে ঘুরে বেড়াতাম। বেড়াতে বেড়াতে কত দিন সন্ধ্যা হয়ে যেত। আকাশে চাঁদ উঠে তার স্নিগ্ধ আলোয় সমস্ত পৃথিবী ভরিয়ে দিত। বাড়ী ফেরার কথা আমরা ভুলে যেতাম। আমাদের দেরী দেখে মা কত সময়ে দারোয়ানকে আলো দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। জান মঞ্জি, আজও আমার ঠিক সেই রকম মনে হচ্ছে, সেই তুমি আর আমি! কুনাল একটা গাছ থেকে গোটা কয়েক ফুলের গুচ্ছ ছিঁড়ে নিয়ে স্ত্রীর মাথায় পরিয়ে দিল ও তার মাথার কাপড়টা টেনে নামিয়ে দিল। মঞ্জুলিকা লজ্জা-জড়িত স্বরে অনুযোগ জানাল—কি করছ? দেখতে পাচ্ছ না ঐ বড় গাছটার গুঁড়ির পিছনে কতগুলো মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে হাসছে? নিশ্চয়ই ওরা তোমার পাগলামি দেখেছে! কুনাল তাচ্ছিল্যপূর্ণ স্বরে বলল—দেখুক গে, আমি ত আর পরের স্ত্রীর হাত ধরে যাচ্ছি না যে ভয় পাব! তার পর ঈষৎ ঝুঁকে মঞ্জুলিকার কাণের কাছে মুখ রেখে সুর করে বলল—আমার প্রিয়ার পরশটুকু বড়ই মিঠে লাগে। ধেৎ, বলে তার হাত ছাড়িয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে মঞ্জুলিকা স্বামীর দিকে চেয়ে জোরে হেসে উঠল।

যখন তারা ফিরল তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। মাথার উপর নিবিড় নীল আকাশে তারার চুমকি চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। চাঁদের আলোর সঙ্গে সহরের কৃত্রিম আলো মিলে যেন এক স্বপ্নরাজ্য রচনা করেছে।

বাড়ীতে তাদের গাড়ী ঢুকতেই ষোড়শী দেবী গাড়ীবারান্দায় রেলিংএর উপর ঝুঁকে বললেন, হ্যাঁ রে কুনু, বৌমাকে তুই কোথায় নিয়ে গিয়েছিলি? সেই রোদ্দুর থাকতে বেরিয়েছিলি, আর ফিরলি এতখানি রাত করে? এই অবস্থায় ওকে নিয়ে কি এমনি করে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়? তোর ওপর আর আমার একটুও বিশ্বাস নেই। তুই দেখছি যা ইচ্ছে করতে পারিস! বিকেল থেকে আইসক্রীম তৈরী করিয়ে বসে আছি, এলেই আগে আমার বৌমাকে খেতে দোব। তরমুজের আইসক্রীম খেতে চেয়েছিল, তা কখনই বা কি খাবে! বলে বারান্দা পেরিয়ে তিনি বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেলেন।

আসন্নপ্রসবা মঞ্জুলিকা। চেহারার তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চোখের কোলে পুরু করে কালি পড়েছে। মুখশ্রী মলিন, ঠোঁট দু'টি শুকনো। ফর্সা চামড়ার ভিতর থেকে হাত-পায়ের নীল শিরাগুলি দেখা যাচ্ছে। সে ঘরের মেঝেতে কার্পেটের উপর বসে ছোট ছোট ফ্রক সেলাই করছে। মেঝের চারি দিকে রঙিন ছিটের কাপড়ের টুকরা, নানা রঙের সুতো কাঁচি ইত্যাদি ছড়িয়ে রয়েছে। পাশেই সেলাইএর কল। বিকালের পড়ন্ত রোদ খসখসের পর্দার ভিতর দিয়ে ঘরে এসে অল্প অল্প পড়েছে। ঝি-চাকরেরা এখানে-ওখানে চলা-ফিরা করছে। সে পর্দাগুলির দিকে চেয়ে বিন্দুকে বলল—রোদ পড়ে এল, এখনও এগুলোকে তুলতে মনে থাকে না? দেখছ অন্ধকার, সেলাই করতে অসুবিধা হয়! তার পর চোখ দু'টি নীচু করে সমানে সেলাইএর কোঁড় তুলতে লাগল।

স্বামীর জুতার শব্দ শুনেও কোনও দিকে না চেয়ে নিবিষ্ট মনে সে সেলাই করে চলল। কুনাল এসে সেইখানে বসেই তার হাতের ফ্রকটাতে টান দিয়ে বলল, অনেক হয়েছে, এবার সেলাই করা ছাড় দেখি। এ অবস্থায় অত বেশী পরিশ্রম করতে নেই। মঞ্জুলিকা ভ্রূ দু'টি তুলে স্বামীর দিকে কটাক্ষ করে বলল, আঃ, কি কর! ছেড়ে দাও। আর বেশী নেই, এইটুকু হলেই এটা শেষ হয়ে যাবে। কুনাল আরও জোর করে ফ্রকটাকে টেনে বলল, না, আমি তোমার কোনও কথাই শুনব না। কে বলেছে তোমায় সারা দুপুর বসে সেলাই করতে? কেন, যে আসছে তার কি জামার অভাব হবে, না সেলাইএর অভাব হবে? এ তোমার কি বাতিক? উঠে পড়, আমি এখনও চা খাইনি। তোমার জন্তে বসে আছি, সে কথা মনে আছে? মঞ্জুলিকা জামাটা ছেড়ে দিল। তার পর কপট ক্রোধের অভিনয় করে ছুঁচটা নিয়ে অপর হাত দিয়ে স্বামীর একটা হাত টেনে ধরে বলল, এক্ষুনি ফুটিয়ে দোব বলছি, যদি আমায় রাগাও। আমি কেন এগুলো তৈরী করি, তুমি তার কি বুঝবে? ছোট বেলায় স্কুলে কাটছাঁট শিখেছিলাম, সেটা মনে আছে কি না দেখছি। তাছাড়া যে নবাগত আমাদের জীবনে আসছে, সে ভূমিষ্ঠ হবার পর তার মায়ের হাতের তৈরী জামা পরবে, মনে করতে আমার বড় ভাল লাগে। কুনাল ফ্রকটা ঠেলে হাত দিয়ে সরিয়ে রেখে বলল, লক্ষ্মীটি, মঞ্জি, তুমি আমায় ভুল বুঝ না। আমার বিশ্বাস কর। আমিও যে জেগে স্বপ্ন দেখি, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি। কত রকম করে যে তার চেহারা কল্পনা করি! একবার ভাবি, হয়ত তোমার মত দেখতে হবে। আবার ভাবি, বোধ হয় আমার মতই হবে। এক এক সময়ে ভাবি, না আমাদের দু'জনে মিলিয়ে হবে। যদি কোনও ছোট ছেলের কান্না কানে আসে, হঠাৎ চমকে উঠি, ঐ বুঝি মঞ্জির কিছু হল। ছুটে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে যাই, ভাবি আমি পাগল হলাম না ত?

কুনাল দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আমাদের মেয়ে হলে কি নাম রাখব জান? 'মন্দিরা'। এ নামটা আমার বড্ড ভাল লাগে। মঞ্জুলিকা

বলল, আমিও মনে মনে একটা নাম ঠিক করে রেখেছি। ছেলে হলে কিন্তু 'উৎপল' রাখতে হবে। তখন যে বলবে, না, ও নামটা আমার ভাল লাগে না, এই নামটা থাক—সে আমি কিন্তু কিছুতেই শুনব না। কুনাল স্ত্রীর গালে একটি টোকা মেরে বলল, যথা আজ্ঞা মহারাণী! তার পর বলল—এই যে, বেবির খাট এসে গেছে দেখছি কখন এল?

মঞ্জুলিকা উত্তর দিল—আজ সকালেই, তুমি বেরিয়ে যাবার পর। তার পর বলল, মার ঘরে দেখবে চল, কি সুন্দর দোলনা যে এসেছে, বলবার নয়! আমারই তাতে দুলতে ইচ্ছে করে।

মাঝরাত্রি থেকে ব্যথা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জুলিকাকে আঁতুড়-ঘরে আনা হয়েছে। ডাক্তার বসু ও লেডি ডাক্তার মিসেস্ নাগ খাটের পাশে বসে আছেন। নার্স মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে এটা-সেটা ডাক্তারদের এগিয়ে দিচ্ছে। ঘরের এক পাশে টেবলের উপরটা ওষুধপত্র ও তুলার প্যাকেটে ভর্তি হয়ে আছে। তারই অদূরে বেবির খাট রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় কাতরে উঠে মঞ্জুলিকা বলছে, আর যে পাচ্ছি না মিসেস্ নাগ! উঃ, গেলুম, বাবা রে! তার পর একটু থেমে বলছে, জল দিন। ষোড়শী দেবী পুত্রবধূর পাশেই চেয়ার নিয়ে তার গায়ে হাত রেখে বসে আছেন। মাঝে মাঝে তোয়ালে দিয়ে তার কপালের ও গলার ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছেন। থেকে থেকে সাহস দিচ্ছেন, ভয় কি মা? এক্ষুনি সব ভাল হয়ে যাবে। খানিকক্ষণ কতকটা স্থির হয়ে থাকার পর মঞ্জুলিকা আবার ছটফট করে চেঁচিয়ে উঠল।

ক্রমশ আকাশ ফর্সা হয়ে গেল, সূর্য্য উঠল। তখনও পর্য্যন্ত সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার কোনও লক্ষণ না হওয়াতে ডাক্তার বসু বারে বারে মঞ্জুলিকার নাড়ী দেখতে লাগলেন। তার পর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সামনের বারান্দায় কুনাল যেখানে চেয়ার নিয়ে বসেছিল, সেইখানে এসে বললেন—দেখ, বৌমার যা অবস্থা হয়ে আসছে, তাতে এক্ষুনি পেট কেটে ছেলে বার না করে দিলে বাঁচান মুস্কিল হবে। আমি এই মুহূর্তেই সেই ব্যবস্থা করতে চাই। তোমার মাকে বুঝিয়ে বল, আমি ফোন করতে চললাম ডাক্তার বিনয় রায়কে। কুনাল হতভম্ব হয়ে খানিকক্ষণ সেইখানেই বসে রইল। তার পর মাকে ডেকে সব জানিয়ে সেইখানে তেমনি ভাবেই বসে রইল।···অপারেশন চলতে লাগল।

এদিকে ষোড়শী দেবী সানাইওয়ালা আনিয়েছেন, ছেলে হবার খবর পেলেই বাজান হবে। তারা গেটের পাশে বসে আছে। দু'মণ সন্দেশের ফরমাস দেওয়া হয়ে গেছে। আজই কুটুম, আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী বিলান হবে। ঝিয়েরা শাঁখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ষোড়শী দেবীকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি। তিনি আঁতুড়-ঘরের দরজার কাছে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন, কখন নবজাত শিশুর কান্না শুনবেন বলে। সব যেন চুপচাপ। ঘণ্টা খানেক কাটবার পরে ডাক্তার বসু আঁতুড়-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ষোড়শী দেবী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তার বাবু, কি হল? এখনও যে কোন সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না! আপনাদের অপারেশন কি শেষ হয়নি? কতক্ষণ আর লাগবে? বৌমা আমার সহ্য করতে পারবে ত? ডাক্তার বসু কুনালের কাছে গম্ভীর মুখে গিয়ে বললেন—অপারেশন হয়ে গেছে। ষোড়শী দেবী তাঁর কথা শুনে এগিয়ে গিয়ে বললেন—কই, ছেলের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছি না কেন? আমি এক্ষুনি ওঘরে যাব। ডাক্তার বসু দৃঢ় স্বরে জানালেন—না, ঘরে এখন কারও যাওয়া হবে না। আমি এখানেই এনে আপনাকে দেখাচ্ছি।

তার পর ঘরে গিয়ে নার্সকে সঙ্গে করে সেইখানে এসে তার হাতের সাদা কলাই করা 'বোলটি' নামাতে বললেন। ষোড়শী দেবী ঝুঁকে পড়ে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন—কই, ছেলে কই ডাক্তার বাবু? এ যে দেখছি খালি মাংসের খোলো—আঙুরের খোলোর মত? আমার নাতি কই? বলে সেইখানে উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ডাক্তার বসু কঠিন স্বরে বললেন—আপনার বৌমাকে ফিরে পেতে চান, না চান না? যদি বৌমার জীবন চান, তাহলে একটুও শব্দ করবেন না। ছেলে পরে হবে, কিন্তু মায়ের জীবন গেলে আর ফিরে আসবে না, বলে তিনি আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

ভা-ল-বা-সা

(বাইবেল থেকে উদ্ধৃত)

ভালবাসা সর্দ্দি-কাশির মত, কখনও লুকানো যায় না।
ভালবাসা ও ব্যবসা শেখায় বিনম্র হ'তে।
ভালবাসা থেকে ভালবাসা হয়।
ভালবাসা বাধা-বিঘ্নে পূর্ণ।
ভালবাসায় আইন নেই।
ভালবাসা হিংসা ব্যতীত হয় না।
ভালবাসা ছড়ানো থাকে না।
ভালবাসায় প্রথমে মধুমিষ্টি, শেষে তিক্ততা।
ভালবাসা কুটীরেও আছে, যেমন আছে প্রাসাদে।
ভালবাসা অন্তরকে ভদ্র করে।
ভালবাসায় যে কোন লোককে যে কোন কাজ করায়।
ভালবাসা যেখানে কল্পনাতীত, সেখানেই ভালবাসা হয়।

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

২

আশ্চর্য্য, পুঁটিমারা খালের ঠিক যেখানটায় মাত্র দু'দিন পূর্ব্বে গভীর রাত্রে অসুস্থ শ্রীপদকে আমি হাত ধরে নৌকো থেকে নামিয়েছিলাম, আজ ঠিক সেখানটাতেই অপেক্ষা করছে দারোগার নৌকাখানি। আর ওঠবার সময় রাজেন বাবু সত্যি সত্যিই নৌকো থেকে একখানা হাত প্রসারিত করে দিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন : হাত ধরে উঠুন। পড়ে যাবেন না যেন।

জায়গাটির কথা ভোলবার নয়। কারণ এর অনতিদূরেই বড় আকারের যে একখানা এক মাল্লাই নৌকো ডোবানো দেখে গিয়েছিলাম, আজও সেখানা তেমনিই গলা ডুবিয়ে যেন আমার যাত্রাপথের পানে চেয়ে রয়েছে! বিক্রমপুরে বর্ষা শেষ হয়ে এলে নৌকোগুলো দিয়ে তখন মাছ ধরা হয়। প্রথমে কতকগুলো জাবনা বা ধানগাছের খড় নৌকোর খোলে বিছিয়ে দেয়া হয়। তার পর মাঝারী সাইজের গাছের কতকগুলো ডাল নৌকোর মধ্যে গুঁজে দিয়ে ওখানা খালে, বিলে অথবা পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয় একেবারে গভীরতম স্থানে। দিন পনেরো পর দড়ি ধরে টেনে নৌকোখানি ঝটিতি ভাসিয়ে তোলা হয়। জাবনা ও ডালের পাতাগুলো নৌকোর খোলে জমায়েৎ হয়ে মাছের চমৎকার আস্তানা তৈরী করে। ছোট ছোট মাছ, যথা : কৈ, পুঁটি, ট্যাংরা, খলসে, টাকি, পাবতা প্রভৃতি ওতে প্রচুর পাওয়া যায়। অর্থাৎ বর্ষাকালের বাহন নৌকোকে বিক্রমপুরে শীতকালে মৎস্য-শিকারে নিয়োগ করা হয়। এমনি একখানা নৌকো দু'দিন পূর্ব্বে যেখানটায় যে ভাবে দেখে গিয়েছিলাম, আজও দেখি সেখানা তেমনি ভাবেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে।

নৌকো শ্রীনগরের পানে রওনা হলো। র‍্যাপারটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে বসলাম। রাজেন বাবু পাশেই বসলেন আর আমার দেহরক্ষীদের এক জন ছইয়ের সমুখে ও আর এক জন পশ্চাতে ঘাঁটি আগলে রইলো।

কোথা দিয়ে কী ঘটে গেল যেন ভালো করে ঠাওরই করতে পারছিলাম না। বর, বরযাত্রী ও জনবহুল আলোকোজ্জ্বল বিবাহ-সভায় কোথায় আমি গ্রহণ করবো একচ্ছত্র নেতার ভূমিকা, হাঁক-ডাকে ও বচন-বিন্যাসে কোথায় আমি অঘ্রাণের শীতল ও মন্থর রাত্রি উত্তপ্ত ও সরগরম করে তুলবো, ত্রুটিহীন বিলি-ব্যবস্থার জন্য কোথায় আমার উদ্দেশ্যে বর্ষিত হবে অজস্র স্তুতিবাণী, আর কোথায় বন্দী আমি, একাকী নিঃশব্দে চলেছি কারাগারের পথে।······ছইয়ের সাথে ঝোলানো একটি ময়লা হারিকেন লণ্ঠন মৃদু-মৃদু দোল খাচ্ছে আর কানে ভেসে আসছে জলের ছল্-ছল্ একটানা শব্দ।

কে জানে, কারিগর-বাড়ীর ফুটো ডে-লাইটের পরিবর্ত্তে মজুমদারদের লাইটটা আনা হয়েছে কি না, বরযাত্রীদের ঘরে আরো একখানা সতরঞ্চির ব্যবস্থা করা গেল কি না, গণেশ গুরুদাস নৃপেন তপেন পাড়ার ছেলেরা সবাই মিলে শুভ-কাজটা যাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে যায়, কে জানে সেদিকে ওরা দৃষ্টি দিয়েছে, না এখনো ভাবছে যে, দ্বিজেনদা যখন এসেছেন ও রয়ে গেছেন, তখন আর ভাবনা নেই, নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ না করে বরং মরণি পিসিমার সঙ্গে একটু খাতির জমাবার চেষ্টা করা যাক্, যদি ভাঁড়ারের চাবিটা পাঁচ মিনিটের জন্যও পাওয়া যায়! হাঁসাড়া গ্রামের বিখ্যাত ময়রা সুরেনের ওখান থেকে দই ও সন্দেশ এসেছে যে!

একটা অদ্ভুত চিন্তায় সমস্ত মন কেমন যেন কালো হয়ে গেল। হয়তো আলো জ্বালা হয়নি, বরযাত্রীদের ভালো করে অভ্যর্থনা জানানো হয়নি, বিলাস কাকার সঙ্গে বরকর্ত্তার হয়তো যা-তা নিয়ে দারুণ বচসা বেধে গেছে, একটা বিশ্রি উত্তেজনাকর আবহাওয়ায় বিবাহ-সভা একেবারে ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে, হয়তো রেণুই শেষ পর্য্যন্ত ঘোষণা করে দিয়েছে যে, সে বিয়ে করবে না। রেণুর বিয়েটা পণ্ড হয়ে গেলে হয়তো আমি খুশী হই, কিন্তু কেন?···এই কেন'র জবাব সারা অন্তর খুঁজেও কোথাও পেলাম না।

চলে আসবার সময় মা বার বার আমার বিছানাটা আমার সঙ্গেই দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ভাবলেন, শোবার কষ্টটা অন্ততঃ বাঁচবে। কিন্তু মাথার বালিশ দুটো সঙ্গে করে পুলিশের খাঁচায় এসে প্রবেশ করা যে কতখানি বিপজ্জনক, মা তার কী জানেন? তাই বালিশ দু'টিকে এড়িয়ে নিয়ে এসেছি শুধু একখানা সুজনী ও মশারি। রাজেন বাবুও রাজার হুকুমটুকুই শুধু তালিম করেছেন, তল্লাসী করেছেন শুধু আমার বিরাটকায় গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগটি, সামান্য মাথার বালিশের মধ্যে যে একটা রিভলভার থাকতে পারে, সে বুদ্ধি তাঁর হুকুম-তামিল-করা মাথায় আসবে কোত্থেকে?

তাকিয়ে দেখলাম, শ্রীমান্ রাজেন একটা সিগারেট প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। আমার নীরবতায় তাঁর সহানুভূতি জাগ্রত হলো : কী unpleasant কাজ, একবার ভেবে দেখুন দ্বিজেন বাবু। আর এই শালা আই-বি-দের জ্বালায় আমাদের হয়েছে আরও মুস্কিল! আমরা মশাই, চোর-বদমায়েস নিয়েই ব্যস্ত, এর মধ্যে আবার ভদ্রলোকের ছেলেদের নিয়ে টানাটানির কাজটা আমাদের ওপর ঠেলে দিস্ কেন? তোদের প্রিজনার, তোরাই এসে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যা না। আর ওদের গ্রেপ্তারেরও কোনো মাথা-মুণ্ডু নেই। যাকে খুশী ধরলেই হলো, সাক্ষ্য-প্রমাণ তো আর হাজির করতে হবে না আদালতে, 'নইলে হাঙ্গাম যে কত, বাছাধনরা ভালো করে টের পেতেন।—বুঝলেন না, কাজ দেখাতে হবে তো, তাই।

অর্থাৎ, আমার গ্রেপ্তারের একমাত্র কারণ যে ঢাকা শহরের গোয়েন্দা বিভাগ, এ কথাটা তিনি বার বার আমায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন।

আমি কোনো উৎসাহ প্রকাশ করলাম না! কারণ আই-বি হোক বা থানাই হোক, পুলিশকে আমরা সাপের মত খল ও বিশ্বাস-ঘাতক মনে করতাম। সুবিধে ও সুযোগ পেলেই যে এরা ফণা উদ্যত করবে ও দংশনেও লজ্জা পাবে না, এ সত্য আমাদের জানা ছিল। বাপ ছেলেকে ধরিয়ে দিয়ে মোটা পুরস্কার লাভ করেছে, বন্ধু বন্ধুর সর্ব্বনাশ সাধন করেছে, এমনি অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। তাই আমাদের নীতিই ছিল চুপ করে থাকা। বেফাঁস একটি মাত্র কথা কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে বেরিয়ে এসে যে কী বিপর্য্যয় বাধিয়ে দিতে পারে, দলের বৈপ্লবিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার পথে কী পর্ব্বতপ্রমাণ বাধার সৃষ্টি করতে পারে, তা আমাদের জানা আছে।

কিন্তু, আমি নিরুত্তর থাকলেও রাজেন বাবু আদৌ নিরুৎসাহ

বোধ করলেন না। তাঁর কণ্ঠ অনেকটা এ্যাপোলজীর মতো শোনাতে লাগলো : তার পর বললাম বড় বাবুকে যে, আপনি নিজে যান, দ্বিজেন বাবুকে আমি চিনি না, কোন দিন দেখিনি ; আর সম্রাটের এত বড় এক জন শত্রু, এঁকে তো আপনারই অভ্যর্থনা জানানো উচিত,—কিন্তু শুনলেন না। বড় হলে যা হয়, তাঁর কোন্ আত্মীয়ার আজ বিয়ে, সেই শেখরনগর গ্রামে। ব্যস্, তিনি চলে গেলেন। ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন, তিনি নিজে আজ একটি বিয়েতে বেশ ফূর্ত্তি করছেন, আর আপনাকে কি না এমনি একটি বিয়ে থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হলো।

চট্ করে একটা সুযোগ পাওয়া গেল। থানার অফিসারদের মধ্যে চাকরিগত রেষারেষি একটু-আধটু থাকেই জানি। এই রেষারেষির সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক বন্দীদের অনেক সময়ই অনেক রকম সুবিধে এসে যায়। তাই সর্ব্বদাই আমরা এদের ঝগড়া বা ঈর্ষা জিইয়ে রাখি নিজেদের কাজে লাগাবার জন্য। বললাম : অনেক দেখেছি রাজেন বাবু! থানার বড় দারোগা সহকর্ম্মীদের যে কী ঘৃণা করে, তাদের সঙ্গে প্রভু-ভৃত্যের মতো কী বিশ্রি ব্যবহার করে, তা আর আপনি আমায় কি বলবেন। নিজের ঘরে দরজা ভেজিয়ে বসে ওরা চোরের তদ্বিরদারদের কাছ থেকে মোটা ঘুষ নিয়ে হয়তো অনায়াসে আপনার ফাইলের একটা নির্ঘাত convictionএর মামলাই দিল ফাঁসিয়ে। বন্ধ হয়ে গেল আপনার reward আর promotion, মাঝ থেকে পুলিশ সাহেবের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে-দিতে জান কাবার! তাই না?

যা বলেছেন, দ্বিজেন বাবু!—বলে রাজেন বাবু আরো একটু ভালো করে বসে এবার বড় দারোগার শ্রাদ্ধ করতে যেন এগিয়ে এলেন। আমার ও-সব কাহিনী শোনবার আদৌ ধৈর্য্য ছিল না, মাঝে মাঝে শুধু হুঁ-হ্যাঁ করে রাজেন বাবুর উৎসাহ-প্রদীপের সলতেটা উস্‌কিয়ে দিচ্ছিলাম মাত্র। রাজেন বাবুর মুখে খই ফুটতে লাগলো।

রাত প্রায় এগারোটায় এসে আমাদের নৌকো শ্রীনগর থানার ঘাটে ভিড়লো। থানার পূব দিকে এই ঘাট। খালের জল অনেক নীচে নেমে যাওয়ায় বাঁধানো ঘাটটার শেষে মাটি বেরিয়ে পড়েছে।

থানার বারান্দায় এসে উঠতেই বন্দুকধারী সিপাই এগিয়ে এসে মিলিটারী কায়দায় অভিবাদন জানালো। থানা একেবারে নীরব বলা যায়। উত্তর দিকের ব্যারাকে আলো জ্বালিয়ে কোন সিপাই তুলসীদাসের দোঁহা বিচিত্র সুরে পাঠ করছে, আর দক্ষিণ-পূব কোণের পোষ্ট-মাষ্টারের বাসায় একটি শিশুর বিরামহীন ক্রন্দন শোনা যাচ্ছে।

বড় দারোগা শেখরনগর থেকে ফিরে এসে শয্যা গ্রহণ করেছেন, থানার অন্যান্য কর্ম্মীরা সবাই যার-যার বাসায় ফিরে গেছেন, থানার বারান্দায় একটা লম্বা টেবিলের ওপর ওভারকোট বিছিয়ে দু'টি সিপাই নিদ্রামগ্ন। এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করে রাজেন বাবু বললেন : চলুন আমার বাসায়, খাবেন।

তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বললাম : বলেন কি, তাহ'লে বড় বাবু আপনারই নামে ডায়েরী করে রাখবে। চাকরিটি খোয়াবেন।

রাজেনের পৌরুষে ঘা লাগলো বুঝি : রাখুন মশায়, ডায়েরী আমিও করতে পারি। আমিও থানার সেকেণ্ড অফিসার। প্রত্যেক সপ্তাহে আমারও confidential report পৃথক্ ভাবে এস-পির অফিসে যায়।—আসুন।

অতএব রাজেন বাবুর পশ্চাতে থানার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। নৈশ প্রহরীর সম্মুখে আমার বক্রোক্তি ও রাজেন বাবুর উচ্ছ্বাসে এটা স্পষ্ট বোঝা গেল যে, থানায় স্পষ্ট দু'টি দল আছে বড় বাবু ও মেজ বাবুর। সেজো ও ন'দেরও কি এক-আধ জন স্তাবক নেই? খুশী হলাম। Divide and Rule এ তো ইংরেজদেরই প্রথম নীতি এবং সফল নীতি। শাসকদের কাছ থেকে শেখা নীতি এখানে প্রয়োগ করে বোঝা গেল যে, আমরা কৃতকার্য্য হয়েছি। এমনি থানায় রাজনৈতিক বন্দী ও রাজবন্দীদের কোনো অসুবিধা হবে না।

খেতে বসে বেশ তৃপ্তি পাওয়া গেল। ছেলে-মেয়ে রাজেন বাবুর ক'জন কে জানে, এত রাতে হয়তো তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। দেখলাম, রাজেন বাবুর স্ত্রী অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাবে অতীব উপাদেয় সরস খাদ্যগুলি একই সাইজের প্রায় আধ ডজন বাটিতে সাজিয়ে দিয়ে গেলেন। শুধু পোনা মাছ আর মুরগীর মাংসই নয়, আবার কয়েক রকমের পিঠেও। নাম বোধ হয় তার একটারও জানি নে, কিন্তু খেতে সবগুলোই চমৎকার।

আহারের পর এল পান, পান খাই নে শুনে আবার এল ভাজা মসলা। তার পর রাজেন বাবু বললেন : কী করবো বলুন, হাত-পা বাঁধা। নইলে আজ এখানেই আপনার শোবার ব্যবস্থা করে দিতাম। ঐ গারদে কি কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে থাকা সম্ভব?

এবার কিন্তু রাজেন বাবুর অকপটতায় আর সন্দেহ রইলো না। লোকটা সত্যই নেহাৎ গোবেচারা গোছের। জিজ্ঞেস করলাম : কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, বাড়ীতে আপনি আগেই বলে গিয়েছিলেন আমার খাবার কথা। তা—ভালই করেছিলেন। কিন্তু খাবার ঝুঁকি নেয়া এক কথা, আর শোবার ঝুঁকি নেয়া একেবারে সাংঘাতিক। আমি কি আপনার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছি? কাজ নেই রাজেন বাবু, আমায় নিয়ে বড় বাবুর সঙ্গে আর ঝগড়া বাধিয়ে দরকার নেই। আরে মশাই, থানার হাজতে বেশ থাকা যাবে'খন। —চলুন।

রাজেন বাবু তবু দমবার পাত্র নয়। বাড়ী থেকে বেশ ভালো বিছানা, মশারি ও লেপ নিয়ে এসে নিজে হাজতের মধ্যে প্রবেশ করে পরিপাটি করে শয্যা রচনা করে দিলেন, তার পর আর একবার বড় বাবুর শ্রাদ্ধ করে ও অজস্র সমবেদনা ও দুঃখ জানিয়ে রাত্রির মত বিদায় নিয়ে গেলেন।

থানার হাজত কিন্তু একটু ভিন্ন রকমের। থানার ঘরখানা টিনের, তার মাঝখানকার বড় ঘরের মাঝে মোটা মোটা কাঠের চৌকো শিকের তৈরী একটি খাঁচা। খাঁচার মাথায় থানার পুরোনো ডায়েরী, মালখানা রেজিষ্টার ও অন্যান্য অজস্র খাতাপত্র একেবারে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। ধূলোয় যে তা ভর্ত্তি, তাই নয়, তার মধ্যে ইঁদুরের আস্তানা। তার পর কাঠের শিক বলেই আছে তার জোড়, আর সেই জোড়ার ফাঁকে বাসা বেঁধে আছে অসংখ্য ছারপোকা।

একটু পরই তা বেশ টের পেতে লাগলাম। ঘুম ভেঙে গেল। খোলা দরজায় বাইরে বারান্দায় বন্দুকধারী প্রহরী সম্পূর্ণ সজাগ।

কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আজ বুঝি ও একটু বিশেষ রকম সচেতন। বাইরে অজস্র জ্যোৎস্না আর তেমনি ঘন কুয়াসা। উজ্জ্বল পশ্চাৎপটের সম্মুখে সিপাইয়ের শিল্যুট দেহখানা নড়াচড়া করছে। আবার ঘুমোতে চেষ্টা করলাম।

সকাল বেলায় রাজেন বাবুর বাড়ী থেকে এল চা ও মুড়ি। থানা সরগরম হয়ে ওঠবার পূর্ব্বেই একখানা ছোট নৌকোয় আমায় রওনা হতে হলো লৌহজং অভিমুখে। গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ যাবার পথে লৌহজং একটি ষ্টীমার-ষ্টেশন। সেখানে সকাল দশটার মধ্যেই ঢাকা মেল-ষ্টীমার এসে পৌঁছে যায়। সেই ষ্টীমার ধরে আমায় যেতে হবে নারায়ণগঞ্জে, তার পর ট্রেণে ঢাকা।

এবার আমায় নিয়ে চললেন এক জন সহকারী দারোগা, নাম সীতানাথ সেনগুপ্ত। মাত্র বছর পাঁচেক পুলিশে ঢুকেছেন; তাই পুলিশী মনোবৃত্তি এখনো তৈরী করতে পারেননি। কিন্তু সীতানাথ বাবু প্রথমেই আমায় একেবারে অবাক করে দিলেন!

নৌকো শ্রীনগরের গণ্ডী পেরিয়ে মাঠে পড়তেই অকস্মাৎ অত্যন্ত নীরস ভাবে প্রশ্ন করে বসলেন: আপনার নাম?

এই নাটকীয় প্রশ্নে লোকটার ওপর আমার ভারী বিরক্তি এল। আমি জানি, ওরই সঙ্গে আছে একখানা কমাণ্ড সার্টিফিকেট, যাতে লেখা আছে ঠিক কোন্ সময় কি নামের কা'কে নিয়ে ও ঢাকা রওনা হলো। তার পর সকাল বেলা এক জন বিপ্লবী বন্দীকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব গ্রহণ করে শ্রীমান্ যে একটি বারও সেই বন্দীর নাম জেনে নেবার আগ্রহ প্রকাশ করেনি, এ কথা কি বিশ্বাসের যোগ্য?

তথাপি আমার নাম আর একবার উচ্চারণ করলাম। শুনেই ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা বড় মণি-ব্যাগ বার করে ফেললেন এবং তার একটি প্রকোষ্ঠ থেকে ছোট্ট এক টুকরো কাগজ বার করে আমার চোখের সামনে মেলে ধরে বললেন: এই দেখুন। দেখলাম তাতে পেন্সিলে স্পষ্ট ভাবে লেখা: দ্বিজেন গাঙ্গুলী।

ব্যাপার কি? ভ্রূ কুঁচকে মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। লোকটি বেশ মুরুব্বিয়ানা হাসি হেসে আবার সেই কাগজের টুকরোটি মণি-ব্যাগে ভরে রেখে দিয়ে বললেন: বলবো সব পরে। নৌকো আরও খানিকটে যাক্ আগে। দেখুন কি অদ্ভুত ব্যাপার, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, সাক্ষাৎ নেই, আমার নামও আপনি জানেন না, অথচ আপনার নাম লেখা একখানা কাগজ স্থান পেয়েছে আমার ব্যাগে। কি করে তা বলছি সব। দাঁড়ান, আরও একটু এগিয়ে যাই।

কৌতূহল দারুণ বেড়ে গেল। লোকটি তো বেশ সাসপেন্স সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এঁকে আমি খুব সন্দেহের চক্ষে দেখতে লাগলাম। ভাবলাম, এ হয়তো একটি আস্ত ঘুঘু! নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে কথা আদায়ের চেষ্টা করবে। তাই জিহ্বার ওপর অধরের কঠিন বাধা চেপে ধরলাম।

এবারও যথারীতি দু'জন সিপাই এসেছে এবং যথারীতি তারা স্থান নিয়েছে ছইয়ের সম্মুখে ও পশ্চাতে।

অগ্রহায়ণের সকাল। ভারী মিঠে সকালের রোদ। দু'পাশের উঁচু পাড়ের কোথাও সরষে ফুল অজস্র ফুটে রয়েছে, কোথাও বা কলাইয়ের বন। সরু খালে জলও তেমন গভীর নয়, তাই মাঝি লগি মেরেই দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

সীতানাথ কৌতূহল সৃষ্টি করেই থেমে গিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন

আমিই হয়তো বার বার তাগাদা জানাব রহস্যভেদের জন্ত। কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্ত করা আমাদের পক্ষে আদৌ কঠিন নয়। তাই বেশ দিব্যি বসে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সীতানাথ বোধ হয় অনেকক্ষণ আমার দিক থেকে কোনো প্রশ্ন আসে কি না, তার জন্ম অপেক্ষা করে-করে একেবারে হতাশ হয়ে উঠলেন। তার পর এক সময় বলে উঠলেন: গণেশ বোসকে চেনেন? গণেশ বোস? আপনাদের গাঁয়ের কালাচাঁদ দাসের বোনের জামাই? ডেকেছিলেন না কি তাকে কোন দিন সেরাজদীঘা মেইল ডাকাতির জন্ম? অকস্মাৎ তিন দিনের বৃষ্টির ফলে শুকনো মাঠ আবার জলে ভরে যাওয়ায় সেই কাজটি স্থগিত রাখতে হলো।—আচ্ছা, আরো জিজ্ঞেস করি, তন্তর গ্রামের 'সীতা' নাটকাভিনয় আপনার দেখতে যাবার কারণ কি? রাজদিয়া গাঙ্গুলী-বাড়ীর পাশেই কোন্ পণ্ডিতের বাড়ীতে আপনার কে বন্ধু আছেন? মধুসূদন কি তাঁর নাম?

একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম! সেই মুহূর্তে নৌকোর ওপর একটা বজ্র পতনেও বোধ হয় এতটা বিস্মিত হতাম না।······লোকটি তো সত্যিই অনেক সংবাদ রাখে এবং এমন সব গূঢ় ও মারাত্মক সংবাদ রাখে, যা ঘুণাক্ষরেও এর কানে আসবার কথা নয়। আমি অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম সীতানাথের মুখের পানে, শুধু উচ্চারণ করলাম: গণেশ বোস্?

হ্যাঁ।—সোৎসাহে সীতানাথ বলতে লাগলেন: মনে পড়ে মাস দুয়েক আগে একসঙ্গে এদিকে কয়েকখানা গ্রামের প্রায় পঁচিশখানা বাড়ীতে তল্লাসী হয়েছিল? আপনার বাড়ী, হাঁসাড়ার শান্তি সোমের বাড়ী, শেখরনগরের সুবোধ গুহের বাড়ী, তন্তরের সুবোধ চক্রবর্তীর বাড়ী—এমনি আরও অনেক বাড়ী। তল্লাসী দলের সঙ্গে আমি আপনার বাড়ী তল্লাসী করতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে আই-বি'র লোক ছিল। সংবাদ ছিল, আপনার বাড়ীতে অনেকগুলো রিভলভার আছে,—বিপ্লবীদের অস্ত্রাগার! মাটি খুঁড়ে একেবারে লাঙ্গল চালাবার মতো করে এসেছিলাম। রিভলভার তো দূরের কথা, আপনার এক টুক্‌রো হাতের লেখাই পাওয়া গেল না।

বললাম: তাহ'লে বাজে খবরের ওপর নির্ভর করে পরিশ্রমটা আপনাদের মাটি হলো বলুন?

সীতানাথ তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন: নিশ্চয়ই নয়। কাজ আমাদের হাঁসিল হয়ে গেল। কারণ গণেশ বোসের হাতে যে চিঠিখানা আপনি সুবোধ গুহকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, সেখানা সে দু'দিন নিজের বাড়ীতেই রেখে দিয়েছিল। তল্লাসী করে সেখানা হস্তগত করা গেল আর অন্যান্য তল্লাসীগুলো তো শুধু লোক-দেখানো!

আমার বিস্ময়ের সীমা রইলো না: মানে?

মানে অতি সহজ। গণেশ বোসকে বাঁচাতে হবে। চিঠির সংবাদ সে পূর্ব্বেই দিয়ে গেছে। কিন্তু চিঠিখানা যদি তল্লাসীর ছুতোয় হস্তগত করা যায়, তাহ'লে গণেশকে আপনাদের সন্দেহ করবার কারণ থাকবে না আর কাজে-কাজেই আরও অনেক কাল শ্রীমান্ আপনাদের অনেক গুপ্ত সংবাদ বয়ে নিয়ে এসে আমাদের বড় বাবুর কানে ঢালতে পারবে। সুতরাং—

সীতানাথের কোনো কথাই আর আমার কানে যাচ্ছিলো না। সত্যিই, কী সাংঘাতিক লোক এই গণেশ! মনে পড়লো কিছু দিন পূর্ব্বে সত্যিই তাকে আর হাঁসাড়ার প্রবোধ গুহকে আহ্বান করা হয়েছিল মারাত্মক একটি কাজে, যাতে হত্যার প্রয়োজন ছিল আর তা দিনে-দুপুরে ও রামদা' দিয়ে। সবই ঠিক ছিল, সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল সম্পূর্ণ, শুধু শেষ মুহূর্ত্তে সংবাদ এল যে, নির্ব্বাচিত স্থানটিতে বর্ষার জল এসে পড়েছে। মনে পড়লো, কাজটি হলো না বলাতে প্রবোধের অপেক্ষা গণেশই যেন ভারী মুষড়ে পড়লো, এই একটি ডাকাতি দ্বারাই যেন সে গোটা দেশটাকেই স্বাধীন করে ফেলতো—এমনি ভাব! তার পর সে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করতে লাগলো একখানা চিঠির জন্ত। যতই আমি তা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতে লাগলাম, ততই সে চেপে ধরতে লাগলো একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে। সুবোধ গুহের প্রেরিত অতি বিশ্বাসী কর্ম্মী, বার বারই সে অনুরোধ জানাতে লাগলো সুবোধ বাবুকে লিখে দিতে যে, যে কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা হলো না, পরে হবে।

নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি যে চার লাইন লিখে দিয়েছিলাম, আজও স্পষ্ট মনে পড়ে:

'সে কাজ হলো না। জল এসে পড়েছে। হলে আবার জানাবো। পরশু আপনার বাড়ীতে যাবো দুপুরে। না খেয়ে কিন্তু ফিরবো না। খাবার ঠিক রাখবেন।'

বেশ বুঝতে পারলাম এই চিঠিখানাই পুলিশের হাতে পৌঁছেছে। আর গণেশ বোসই হচ্ছে সরকারী গোয়েন্দা। কিন্তু এই সব সংবাদ যথাস্থানে পাঠাই কি করে? তার পর শুধু এই সংবাদই নয়। আমার যে দু'টো বালিশ বাড়ীতে রেখে এসেছি, সে দু'টোরও তো একটা সদ্গতি করা একান্ত প্রয়োজন। যাচ্ছি তো জেলে। চক্রব্যূহের মতো এর আছে অতি সহজ অসংখ্য প্রবেশ-পথ, কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ কোথায়?

অকস্মাৎ সীতানাথের কণ্ঠ কানে এল: দ্বিজেন বাবু, আমার বাড়ী বরিশালে। আমার কাকার নাম করলেই আপনি চিনতে পারবেন। প্রেসিডেন্সী জেলে তিনিও এক জন রাজবন্দী। এটা একটা বিচিত্র এ্যাকসিডেণ্ট বলা যায় যে, কাকার মতো প্রেসিডেন্সী জেলে না গিয়ে ভাইপো আজ শ্রীনগর থানার সহকারী দারোগা! তাই রাজবন্দীদের আমি চিনি। দেশের জন্ত তাঁরা কতখানি আত্মত্যাগ করেছেন, অন্তরে আমি তা উপলব্ধি করি। তাই প্রথমেই যেদিন গণেশ বোস এসে বড় বাবুর ঘরে বসে ফিস্-ফিস্ করে আপনার সম্বন্ধে একটা কাহিনী বিবৃত করছিল, পাশের ঘরে বসে কান পেতে আমি শুনছিলাম তা। সেদিনই এই কাগজখানায় আপনার নাম লিখে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম আপনাদের বাড়ীর দিকে গেলে আপনাকে সব বলে আসবো। গেলাম বটে তল্লাসী পরোয়ানা নিয়ে, কিন্তু কোথায় আপনি?

কথা বলতে পারলাম না। লোকটা শুধু আমার নয়, আরও অনেকের, একটা গোটা বিপ্লবী দলের যে কতখানি উপকার করলো, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। দুর্দ্ধর্ষ বৃটিশসিংহের বিবরে যে এমনি ধারালো-দাঁত ইঁদুর বাস করে, সে সংবাদ নিশ্চয়ই এস-পি'র কানে আজও যায়নি! একবার মনে হলো, লোহজং যাবার পথে এই পুলিশের নৌকোতে বসেই সীতানাথকে recruit করে ফেলি। তা'হলেই বোধ হয় দলের পরম কল্যাণ সাধন করা হবে। আমা

ভাবলাম, অতটা না এগিয়ে এর হাত দিয়েই একটা সংবাদ পাঠাবার চেষ্টা করি ছোট ভাই রঙ্গলালের কাছে, কিংবা বিপদভঞ্জন অথবা খগেনের কাছে। কিন্তু এক দিনের মধ্যে মাত্র দু'এক ঘণ্টা আলাপের পরই এক জন সহকারী দারোগাকে কি অতখানি বিশ্বাস করা ঠিক হবে? তবে সংবাদগুলো পাঠাই কি ভাবে?···

প্রায় সাড়ে দশটায় আমরা এসে পৌঁছোলাম লৌহজং ষ্টেশনে। যথাসময়ে ঢাকা মেইল-ষ্টীমার এল এবং আমরা তাতে চেপে বসলাম। ষ্টীমারে ভিড় যে খুব বেশী তা নয়। তবে সবাই সতরঞ্চি, চাদর বা মাদুর বিছিয়ে নিয়েছে বলে সমস্ত ডেকটাই যাত্রীতে ভরে আছে বলে মনে হয়। এই সব ষ্টীমারের নীচের তলাটা বেশ নোংরা। বাক্স বা চটের ব্যাগ-ভর্ত্তি মালপত্র থাকে, মাছের ঝুড়ি থাকে, দইয়ের ও ক্ষীরের হাঁড়ি থাকে, ষ্টীমারের দড়াদড়ি লোহা-লক্কড় থাকে। তার পর মাঝখানের সবটাই জুড়ে থাকে কলকব্জা,—সেখানটা দারুণ গরম। দু'পাশে সারি সারি ঘর, কোনটা খালাসীদের রান্না-ঘর, কোনটা সুখানি ও কোনটা সারেংএর শয়নকক্ষ, কোনটা মলমূত্রাগার, কোনটাতে বাবুর্চ্চিদের ষ্টোর আর একখানা হচ্ছে কেরাণীর অফিস ও বিশ্রামকক্ষ দুই-ই।

দোতলা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সেখানে শুধু যাত্রীদের আস্তানা। মালপত্রের বা রান্না-ঘরের ঝামেলা নেই। ইণ্টার ক্লাশ, সেকেণ্ড ক্লাশ ও ফার্ষ্ট ক্লাশ সব দোতলাতেই। সীতানাথ বাবু ও আমি ইণ্টার ক্লাশের একটি কামরায় এসে উঠলাম। সীতানাথ বাবুর সাদা পোষাক, তাঁর অনুগামী সিপাই দু'জনেরও তাই; সুতরাং আমি যে এক জন বন্দী, তা টের পাবারই উপায় ছিল না।

লৌহজংয়ের কাছে পদ্মা অত্যন্ত প্রশস্ত। বর্ষাকালের প্রচণ্ড তোড় এই শীতকালে সামান্য একটু কমেছে হয়তো, কিন্তু তবু অকস্মাৎ দৃষ্টিক্ষেপে বুকের ভিতরটায় একটা ধাক্কা লাগে। পাড়ের দিকে চাইলেই বেশ বোঝা যায়, এখনো দিবারাত্র পাড় ভেঙে ভেঙে পড়ছে। একটি হিজল গাছের টিকিটুকু দেখা যাচ্ছে এখনো পাড়ের কাছেই জলের মধ্য থেকে। একটা প্রকাণ্ড বটগাছ তার সংখ্যাতীত ঝুরি সহ বোধ হয় সবে উলটে পড়েছে, তাই পদ্মা এখনো তাকে কুক্ষিগত করতে পারেনি। খান-কয়েক খড়ের ঘরের আধখানা চালা হাঁটু ভেঙ্গে এখনো দাঁড়িয়ে আছে,—একটি সম্পূর্ণ গৃহের শেষ চিহ্নস্বরূপ। দণ্ডাদেশ পেয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় তারা যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে! অনেকগুলি ভিটে খালি পড়ে আছে। বাসিন্দারা পূর্ব্বাহ্নেই সব গুছিয়ে নিয়ে হয়তো—কোনো নিরাপদ স্থানে গিয়ে আবার নতুন করে ঘর বেঁধেছে।

পদ্মার পাড় এমনি অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ভেঙে পড়ে যে, যারা দেখেনি, তারা তা ধারণাই করতে পারবে না। সন্ধ্যায় যে নদী পুরো দু'শো গজ দূরে ছিল, রাতারাতি তা শুধু যে এই দু'শো গজ মাটি গলাধঃকরণ করতে পারে, তাই নয়, পারে আরো চারশো গজ এগিয়ে যেতে। ফলে সন্ধ্যায় যে গৃহ শিশুদের কলহাস্যে ছিল মুখরিত, যে চায়ের দোকানে ছিল লোক-জনের জটলা, সকাল বেলায় তার চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকে না। শুধু রাত্রে কেন, দিনের বেলাতেও তাই। নদীর ধারে সকালের মিঠে রোদে এক দল ছেলে ছুটোছুটি করে খেলছে, কখন যে সেখানকার মাটিতে চুলের মতো সরু একটি চিড় দেখা দিল, তার পর সেই প্রকাণ্ড মাটির চাপের তলা দিয়ে জলের তোড় বার বার আঘাত হেনে কখন্ যে তা ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেল, ছেলেরা তা টেরই পেল না। তার পর এক সময় অকস্মাৎ গাছপালা ঝোপজঙ্গল সহ ক্রীড়ারত ছেলের দল একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে তলিয়ে গেল নদীর মধ্যে।

পদ্মা নদীর ধারে এমনি মর্ম্মভেদী ঘটনা বিরল নয়। আর নদীর পানে চাইলে দেখা যায় তা যেন অনন্ত সমুদ্রের মতোই সীমাহীন, একেবারে দূরে—বহু দূরে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। সকালের রোদ নদীর এলোপাথাড়ি ঢেউয়ের মাথায় মাথায় চিকচিক করছে সাপের মাথার মণির মতো। দুঃসাহসী দু'-একখানা জেলেডিঙ্গি সেই ঢেউয়ের ওপর টাল খেতে-খেতে ভেসে চলেছে। পাল তোলা দু'-একখানা পাটের বা ধানের বিরাটকায় নৌকাও দেখতে পাওয়া যায় এক খণ্ড তৃণের মতোই ঢেউয়ের ঘায়ে যেন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে এগিয়ে চলেছে।

লৌহজং ষ্টেশনে একটি ফ্লাট আছে। সেই ফ্লাটেই এসে ষ্টীমার লাগে। লোহার শিকলে আটকে রাখা সম্ভব নয় বলে ষ্টীমার থেকে নোঙর ফেলা হয়, তাও আবার একটা নয়, সমুখে ও পেছনে দু'টো। ইঞ্জিনহীন ষ্টীমারগুলিকে বলা হয় ফ্লাট, রেলের মালগাড়ীর মতো। এতে বুকিং অফিস আছে, মাল অফিস আছে, কেরাণীদের কোয়ার্টার আছে, তৃতীয় মধ্যম ও প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামাগার আছে, জেনানার জন্যও নির্দ্দিষ্ট আছে একটি কক্ষ। নদীর অবস্থা বুঝে ভাসমান ও চলমান এই ষ্টেশন ও প্লাটফরমটি খুশীমত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

সীতানাথ বাবুর একটা নেশা আছে দেখা গেল ব্রিজ খেলা। ষ্টীমার ছেড়ে দেবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই দেখলাম তিনি এক দল লোকের সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়ে শুধু যে তাঁদের শতরঞ্চিই দখল করে বসেছেন, তাই নয়, দু'জোড়া তাস নিয়ে তাঁদের ব্রিজ খেলা সুরু হয়ে গেছে। আমি জানি সামান্যই, এর কলা-কৌশল তখনো রপ্ত করতে পারিনি; তাই পাশে বসে এঁদের খেলার দর্শক হয়ে রইলাম। কিন্তু বুঝতে দেরী হলো না যে, সীতানাথ এক জন পাকা খেলোয়াড়। তাঁর হিসাব একেবারে নিখুঁত, তাঁর আক্রমণ একেবারে শাণিত, কাজে কাজেই তাঁর জয় একেবারে অবধারিত। সীতানাথ পর-পর জিততে লাগলেন আর আমিও ঘন ঘন উচ্ছ্বাসে তাঁর উৎসাহ সহস্র গুণ বাড়িয়ে দিয়ে তাঁর নেশা লক্ষ গুণ জমিয়ে দিতে লাগলাম।

ব্রিজের নেশায় সীতানাথ যখন একেবারে বুঁদ হয়ে গেছে, সেই সময় আমি আবেদন জানালাম: সীতানাথ বাবু, বসে-বসে আর ভালো লাগছে না। একটু ঘুরে আসি?

সীতানাথ আকাশ থেকে পড়লো: বিলক্ষণ। সে কথা আর বলতে!—রামভদ্দর সিং, বাবুর সঙ্গে যাও।

খুশী হতে পারলাম না। সঙ্গে আবার কেউ কেন? সেই মাথার বালিশ ও গণেশ বোস তখনো আমার মাথায় ঘুরছে। ঢাকা জেলের ফটক পার হবার পূর্ব্বে যে ভাবে হোক্ এই সংবাদ দু'টি পাঠাতে হবে। ভাবছিলাম, ষ্টীমারে ঘুরে একবারটি দেখবো চেনা লোক মিলে যায় কি না। কিন্তু রামভদ্দর 'স্বদেশীর' সঙ্গে কাউকে কথা কইতে দেখলে যে আর আদৌ 'ভদ্দর' থাকবে না! যাই হোক্, কপাল ঠুকে সেই হিন্দুস্থানী দেহরক্ষীকে নিয়েই নীচে নেমে এলাম ও ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ফন্দী আঁটলাম, এদিক-ওদিক ঘুরে-ঘুরে

রামভদ্দরকে একেবারে বিরক্ত করে তুলবো। তাই তৃতীয় শ্রেণীর সিঁড়ি দিয়ে নেমে আবার প্রথম শ্রেণীর সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। ষ্টীমারের একেবারে সম্মুখভাগে ছড়ানো ইজি-চেয়ারগুলোর একখানায় বসেই আবার উঠে পড়লাম। একেবারে পশ্চাতের সেকেণ্ড ক্লাশ ভোজনালয়ে ঢুকে নদীর দিকে বৃথাই দৃষ্টি প্রসারিত করে মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থাকলাম। তার পরই এসে দাঁড়ালাম দোকানের সম্মুখে। বৃথাই এটা-ওটার দাম জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। তার পরই পাশের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গিয়ে ইঞ্জিনের পাশে দাঁড়িয়ে কলকব্জার কর্ম্মব্যস্ততা নিরীক্ষণ করতে প্রবৃত্ত হলাম। সারাক্ষণই আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেমন খুঁজে বেড়াচ্ছিল একটি পরিচিত মুখ, রামভদ্দরও তেমনি সারাক্ষণই আমার পশ্চাতে লেগেছিল একটি ফেউয়ের মতো। তবে নীরবে, হাঁক দিয়ে আমার পরিচয়টা শুধু প্রচার করে বেড়ায়নি।

কি যে করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবার উপক্রম হয়ে এসেছে। নারায়ণগঞ্জ পৌঁছোবার পূর্ব্বে এই সংবাদ দু'টি যে ভাবে হোক আমায় পাঠাতে হবেই। যদি প্রয়োজন হয়, রামভদ্দরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রেলিং-এর পাশে এনে উলটিয়ে জলে ফেলে দিতে হবে এবং তার পর আমাকেই নিঃশব্দে পেছনে গিয়ে পদ্মায় নামতে হবে। দলের নিরাপত্তার চাইতে আমার জীবনের মূল্য বেশী নয়।

সংকল্প প্রায় এঁটে ফেলেছিলাম এবং তা সাধনের জন্তই রামভদ্দরকে নিয়ে ষ্টীমারের পশ্চাৎ দিকে এগিয়ে চললাম একেবারে প্রস্তুত হয়ে। প্রথমে রামভদ্দর, তার পর আমি। মোটা শিকলের সঙ্গে যেখানে হালখানা ঝোলানো রয়েছে, সেখানেই দোব ওকে ঠেলে ফেলে, তার পর একটা বয়ার নিয়ে নিজে নীরবে নেমে যাবো। স্থির-পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি, এমন সময় অকস্মাৎ এক 'দেশওয়ালী ভাই'এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রামভদ্দরের। লোকটা বোধ হয় ঢাকা যাচ্ছে। আর্ম পুলিশে কাজ করে। কাঁধের ওপর বি-এ-পি পেতলের ব্যাজ আঁটা।—ব্যস্, দু'জনে জমে গেল। বালিয়া জেলার কথা, নকরির কথা আর তার সঙ্গে খৈনি। সীতানাথ আর কত বড় নেশাখোর ?

বললাম : সিপাইজি, আমি একটু ঘুরে আসি ততক্ষণ ?

আমার সভক্তি আবেদনে বালিয়া জেলার নরপুঙ্গবের পৌরুষ জেগে উঠলো। তাচ্ছিল্য ভরে নিজেই যুক্তি দেখালো : যান, বাবু যান। আরে, ইষ্টিমার ছাড়িয়ে তো আপনি আর বাহিরে যাইতে পারবেন না। কী হোবে একলা একটুখন ঘুরে বেড়াইলে। —যান, যান। তবে তুরন্ত ঘুমে আসবেন, হ্যাঁ ?—বলে রামভদ্দর তার গোঁফে একটি চাড়া লাগালো।

কিন্তু কি করা যেতে পারে ? সুযোগ তো পেলাম, কিন্তু চেনা লোক কোথায় পাই ? ঘুরতে লাগলাম আবার, যদি পাওয়া যায়। অকস্মাৎ ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। ষ্টীমারের কেরাণীর ঘরের মধ্যে দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখি সুধীর বাবু খুব নিবিষ্ট মনে মোটা বাঁধানো খাতায় কি লিখছেন। একটু ভাবলাম কি করা যায়। তার পর সম্মুখে ও পশ্চাতে একবার তাকিয়ে নিয়ে সটান তার ঘরে ঢুকে ধপ্ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

সুধীর বাবু রীতিমত চমকে উঠলেন : আরে, দ্বিজেন বাবু যে ! কোথায় চললেন ? নারায়ণগঞ্জে ?

ঢাকাতে।—বলেই ফিসফিস করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম এবং তৎক্ষণাৎ দু'খানা চিঠি লেখার কাগজ ও দু'টো খাম চাইলাম। সুধীর বাবু আই. জি. এন ও আর. এস. এন কোম্পানীর নাম-ছাপানো ব্রাউন রংয়ের দু'টুকরো কাগজ আর তাদেরই ব্যবহার্য্য ব্রাউন রংয়ের দু'খানা খাম দিলেন। কলম তাঁর মোটা, লিখতে দেরী হবে বলে পেন্সিল তুলে নিলাম। বন্ধু শ্রীপদর কাছে যে চিঠিখানা ঐ অত বড় ঝুঁকি নিয়ে খস্-খস্ করে লিখে দিয়েছিলাম, সেখানা সে আজো সযত্নে রেখে দিয়েছে :

ভাই, তোমায় অসুস্থ রেখে এসে আমার মন যে কত খারাপ হয়ে আছে, ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারি না। তার পর চলে আসবার সময় তোমার সাথে দেখাটা করেও আসতে পারলাম না। কত দিনের জন্তে চললাম, একমাত্র ভগবানই জানেন। আমার কথা যাতে না ভুলে যাও, সে জন্য আমার মাথার বালিশ দু'টি (যা আমি কলকাতা থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম) তুমি নিয়ো। মাকে এই পত্র দেখালেই তিনি তোমায় বালিশ দু'টি দিয়ে দেবেন।

প্রতি দিন রাত্রে শোবার সময়ও একবারটি আমার বালিশে মাথা রেখে আমার কথা তোমার মনে পড়বে। আজ এইখানে বিদায়।

বন্ধু শ্রীপদর কল্যাণে বহু বার গোয়ালন্দ গেছি ; তাই ষ্টীমারের প্রায় সব কেরাণীদের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল এত বেশী যে, চেনা কেউ গেলে আমার আর টিকিট কেনাই লাগতো না। সুধীর বাবু সেই চেনার দলের এক জন। কিন্তু চিঠি দু'খানা সত্যিই ভদ্রলোক পোষ্ট করবেন কি না, কে জানে ! রাজবন্দীরা তো ভয়ের বস্তু। বলা যায় না, হয়তো তিনি পুরস্কারের লোভে মারাত্মক চিঠি দু'খানা স্রেফ ঢাকার আই-বি অফিসে গিয়েই দিয়ে এলেন। তাহ'লে ?···কিন্তু ভাববার আর সময় নেই, পথও আর নেই !

চিঠি দু'খানা সাবধানে সুধীর বাবুর হেপাজতে দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে দু-চার পা যেতেই দেখি দেহরক্ষী রামভদ্দর দোতলা থেকে নামছে। আমায় দেখেই বলে উঠলো : আরে বাবু, আপনাকে ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে পা বেথা হইয়ে গেল। কুথা গেছিলেন ?

একেবারে চোখ দু'টো কপালে তুলে ফেললাম : কোথায় আবার ? এইখানে দাঁড়িয়ে ইঞ্জিন দেখছিলাম। তার পর সেখানে গিয়ে দেখি আপনি নেই। তাই আমিও খুঁজছি আপনাকে। চলুন, ওপরে যাই। দেখি সীতানাথ বাবু ক'খানা লাল সেট করলেন।

'আপনি' সম্বোধনের ফল একেবারে হাতে-হাতে পাওয়া গেল। বত্রিশটি ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখিয়ে রামভদ্দর হেসে উঠলেন এবং সুড়সুড় করে আবার ওপরে উঠতে লাগলেন।

নারায়ণগঞ্জে নেমেই ট্রেণ আর সেই ট্রেণে সোজা ঢাকায় এসে পৌঁছলাম বেলা আড়াইটেতে। ষ্টেশন থেকে সোজা গিয়ে উঠতে হলো আই-বি অফিসে। আই-বি অফিস তখন ছিল আদালতের কাছেই কোথাও।

রাজেন সরকার অবশ্য তাঁর এস-পির হুকুম তামিল করেছেন মাত্র, আমায় সোজাসুজি রাজবন্দী করা হবে, না অন্য কোনো মামলায় জড়িয়ে দিয়ে একবার ফাঁসবার চেষ্টা করা হবে, তা তিনি জানতেন না বটে, কিন্তু আমি আশঙ্কা করছিলাম গোয়েন্দা বিভাগ আপ্রাণ চেষ্টা করবে আমার কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্য। নেহাৎ না পারলে হয়তো রাজবন্দীই করে দেবে।

কারণ অনেক কথাই পুলিশ জানতো না আর তাদের অজানা কথার স্তূপ বেড়ে চলেছিল দিনের পর দিন। ২১শে আগষ্ট ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলে ঢাকা বিভাগীয় পুলিশ কমিশনার মিঃ এ, ক্যাসেল্‌স্ রিভলভারের গুলীতে আহত হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার তত্ত্বাবধায়ক পুলিশ ইন্সপেক্টার আশানুল্লা চট্টগ্রাম শহরে ৩০শে আগষ্ট নিহত হন। সেপ্টেম্বর মাসে হিজলী বন্দীশিবিরে গুলী চালানোর ফলে রাজবন্দী সন্তোষ ও তারকেশ্বর নিহত হন। ২৮শে অক্টোবর ঢাকা শহরের বুকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডুর্ণোকে গুলী করা হয়। পরদিনই কলকাতায় ইয়োরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্সকে গুলী করার চেষ্টা করা হয়। এ ছাড়া অনেকগুলো রাজনৈতিক ডাকাতিও সংঘটিত হয়।

এতগুলো হত্যা, হত্যার প্রচেষ্টা ও ডাকাতির পশ্চাতে কারা তৎপর, কি ভাবে তারা কাজ করছে, কি তাদের সর্ব্বনাশা কর্ম্মপন্থা, তাদের দলের নেতাদের নাম কি, এ সব অমূল্য কথার একটিও তো জানা নেই গোয়েন্দা বিভাগের। তাই প্রস্তুত হয়ে ইন্সপেক্টার সাহেবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

এলেন ইন্সপেক্টার যোগিনী বসু। কথা কি ভাবে আদায় করা যায়, সে বিদ্যে তাঁর ভালো করেই জানা আছে আর এ ব্যাপারে তাঁর নাম-ডাকও খুব। আমার সঙ্গে এই তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ।

কিন্তু ব্যবহার তাঁর একেবারে অদ্ভুত ঠেকলো: এই যে দ্বিজেন বাবু, এসে গেছেন। বেশীক্ষণ আর আপনাকে আটকে রাখবো না। যদি ইচ্ছে করেন, একটা বিবৃতি দিতে পারেন। সই আপনাকে করতে হবে না, আমিই লিখে নোব। আর যদি না দেন, না দিলেন। দেখবেন, আপনার বন্ধুরা সবাই আছে ওখানে। শান্তি সোম, ভোলা বসাক, বিভূতি চৌধুরী সবাই—বলে যোগিনী বাবু এক গাল হাসলেন।

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললাম: কলকাতার এস-বি অফিসেও আমি কোনো বিবৃতি দিইনি।

যোগিনী বাবু আর অযথা বিলম্ব করলেন না। একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে নিয়ে এলেন আমায় ঢাকা জেলের অফিসে এবং যখন কর্ত্তৃপক্ষের হাতে আমায় বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন তখন অগ্রহায়ণের অপরাহ্ণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

প্রকাণ্ড ঢাকা সেন্‌ট্রাল জেল। প্রায় দু'হাজার কয়েদী এখানে বাস করে। একেবারে শহরের মাঝখানে বলা যায়। জেলের মধ্য থেকে বাইরের দোতলা ও তেতলা বাড়ীগুলি দেখা যায়।

এক জন ডেপুটি জেলার আমার নাম, ধাম, বয়স লিখে নিয়ে এক জন সিপাইকে সঙ্গে দিয়ে পাঁচ নম্বর খাতায় নিয়ে যেতে হুকুম করলেন। জেলের সদর দরজা থেকে বেশ খানিকটে দূরে পাঁচ নম্বর খাতা। পাঁচ নম্বর খাতা মানে খাতা নয়, ইয়ার্ড। কিন্তু পাঁচ নম্বর খাতায় ঐ ইয়ার্ডের ইতিবৃত্ত লেখা থাকে বলে জেলের প্রচলিত অদ্ভুত ভাষায় ওকে বলা হয় খাতা।

ইয়ার্ডে ঢুকতেই অন্যান্য বন্দীরা একেবারে কলরব করে উঠলো: এই যে, তুমিও এসে গেছ দেখছি। ক'দিন ধরেই আমরা বলাবলি করছি তুমিই শুধু বাকি থেকে গেলে কি করে!

কে এক জন বলে উঠলো: কেন, ডুর্ণোর পরেই কি দ্বিজেনের পালা না কি?

সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো।

একটি প্রকাণ্ড তিন তলা লাল রংয়ের বাড়ী। নীচের তলায় থাকে আমাদের চাকর, ঠাকুর, ধোপা, নাপিত ও জমাদারের দল। দোতলা আর তেতলায় আমরা। তেতলার 'এ' ব্যারাকে আমার স্থান নির্দ্দিষ্ট হলো।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। জেলের সাধারণ কয়েদীদের দিনের বেলাতেই রাত্রের আহার শেষ করে বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যেই নিজেদের প্রকোষ্ঠে ঢুকে পড়তে হয়। শুধু আমাদের বেলাতেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম। রাত্রি সাড়ে দশটায় বারো জনের একটি সিপাই দল এসে আমাদের গুণতি করে তালা এঁটে দিয়ে যায়। সন্ধ্যে হতেই কিচেন-ম্যানেজার নীরেন বাবু এসে জিজ্ঞেস করে গেলেন রাত্রে আমি কি খাব, ঢাকাই পরোটা, না পোলাউ।

এক জনের শোবার মত লোহার একখানা খাটিয়া, তার ওপর পাতা মোটা গদী, তোষক ও সুদৃশ্য সুজনী। সাদা ধবধবে খোলে ঢাকা দু'টি নরম শিয়রের বালিশ আর মাথার ওপর ম্যাঞ্চেষ্টার নেটের সাদা মশারি। পাশের টেবিলে কাচের ডোম-আঁটা মোমবাতী।

বিছানায় গা এলিয়ে দেবার আগে কোটটা খুলে ফেললাম। সার্টও। তার পর চশমাটা খুলে কোটের পকেটে রাখতে যেতেই সহসা হাতে ঠেকলো এক টুকরো কাগজ। ওঃ, আমি তো একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম! পরশু দিন বাড়ী থেকে রওনা হবার প্রাক্কালে মধুসূদন পশ্চিম-বাড়ীর কোণে এসে আমার হাতে গুঁজে দিয়েছিল এই টুকরোটি। আশ্চর্য্য, তার পর আর আদৌ মনে পড়েনি এটার কথা। পকেটের কোন্ কোণে উপেক্ষিত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। শ্রীনগরে, আই-বি অফিসে বা জেল-গেটে, কোথাও আবার আমার দেহতল্লাসী হয়নি। রেহাই পেয়েছি হয়তো রাজবন্দী বলে। পকেট থেকে টুকরোটি বার করে আলোর সামনে উঁচু করে ধরলাম। এ কি, এ যে রেণুর লেখা চিঠি! রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেললাম:

দাদা,

আমি তোমায় বলে-কয়ে রাখলাম বলেই আজ তোমায় ধরা পড়তে হলো। দোষ তাই আমারই। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবে কি না জানি নে, আজকের উৎসবে আনন্দ আর এতটুকু অবশিষ্ট নেই। নেহাৎ আদেশ পালন করবার জন্যই হয়তো আমায় সাজতে হবে ও পিঁড়িতে বসতে হবে।

যাঁরা আমায় উৎসর্গ করবেন, তাঁরা কি আদৌ জানতে পারবেন যে, তুমি না থাকাতে আমার দুঃখের আর শেষ নেই?

ইতি

অভাগিনী রেণু।

দুঃখের আর শেষ নেই। তা আমাদের অজানা নয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যখন এই পথে যাত্রা সুরু করেছি, তখনই জানি দুঃখ দিতে হবে অনেককে। মাকে, বাবাকে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীকে। শুধু সর্ব্ব দুঃখের ঊর্দ্ধে থাকবো আমরা নিজেরা। তাই ফাঁসীর দড়িকে মনে করবো মাত্র এক খণ্ড রজ্জু।...

হঠাৎ চমক ভাঙলো। ভোলা বাবু এসে বললেন: চলুন খেতে যাই। ঘণ্টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ।

নিঃশব্দে ভোলা বাবুর পশ্চাতে নীচে নেমে এসে খাবার-ঘরে প্রবেশ করলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

৮

বহরমপুরের সিপাহীদের বিদ্রোহের সংবাদ কলিকাতায় কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছিলে তাঁহারা প্রমাদ গণিলেন। গবর্ণর জেনারেল ভাবী বিপদের আভাষ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। তিনি বিদ্রোহী সৈনিকদের শাস্তি বিধান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। ঐ সময় কলিকাতা হইতে তিন শত মাইল দূরে দানাপুরে মাত্র এক রেজিমেণ্ট ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। সুতরাং রেঙ্গুণ হইতে ৮৪ সংখ্যক ইউরোপীয় রেজিমেণ্টকে আনিবার জন্য একটি ষ্টীমার প্রেরণ করা হয়।

ইতিমধ্যে বহরমপুরের সিপাহীদের হাঙ্গামার এক সপ্তাহ পরে কর্ণেল মিচেল বিদ্রোহী সৈনিকদের নিরস্ত্র করিবার জন্য বারাকপুরে আনিতে আদিষ্ট হন। রেঙ্গুণ হইতে ইউরোপীয় সৈন্যের আগমন সংবাদ সেনাপতি হিয়ারসে পূর্ব্বে জানিতে না পারিলেও সৈনিক-নিবাসের প্রায় সকলেই জানিতে পারে। ইহার ফলে সৈনিকদের মধ্যে প্রবল আতঙ্ক দেখা দেয় এবং ইংরাজদের মনোভাব সম্পর্কে তাহারা আরও সন্দিহান হইয়া উঠে।

বারাকপুরের সিপাহীরা প্রধানতঃ কলিকাতার দুর্গ ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানের পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। ১০ই মার্চ্চ সন্ধ্যার সময়ে দ্বিতীয় সংখ্যক সৈনিক দলের কয়েক জন দুর্গে পাহারা দিতেছিল। ঠিক এই সময় টাকশালার পাহারার ভার ৩৪ সংখ্যক সিপাহীদিগের উপর সমর্পিত ছিল। সন্ধ্যার সময়ে দ্বিতীয় সংখ্যক দলের দুই জন সিপাহী টাকশালার দ্বারে আসিয়া সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল। সুবাদার আলোর নিকট বসিয়া নিজেদের কার্য্য-সংক্রান্ত একটি পুস্তক দেখিতেছিলেন, এই সময়ে দুই জন সিপাহী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল যে, "গবর্ণর জেনারেল বারাকপুরে গিয়া অস্ত্রাগারের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিবেন এবং তথায় সিপাহীদের সহিত সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় কলিকাতার সিপাহীরা কেল্লার সান্ত্রীদিগের সহিত একত্র হইবে। সুবাদার যদি এই সময়ে আপনার দল লইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হন তাহা হইলে কোম্পানী সরকারকে পর্য্যুদস্ত করা সুসাধ্য হইয়া উঠিবে।" সুবাদার এই কথা শুনিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিতে আদেশ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সুবাদার এই দুই জন বন্দী সিপাহীকে দুর্গে পাঠাইলেন। সামরিক বিচারে ইহাদের চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

সেনাপতি হিয়ারসে বিপ্লবের পূর্ব্বাভাসের ইঙ্গিত মনে করিয়া এই ঘটনাকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। হিয়ারসে গবর্ণর জেনারেল লর্ড কানিঙের পরামর্শ অনুযায়ী সিপাহীদিগকে ১৭ই মার্চ্চ প্রাতঃকালে কাওয়াজের স্থলে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। হিয়ারসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অশ্বারোহণে সিপাহীদিগের সম্মুখে আসিয়া তাহাদিগকে নানা প্রকার স্তোক-বাক্যে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া বলেন যে, "তোমাদের শত্রুগণ এই কথা বলিয়া বেড়াইতেছে যে, বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও কামান-রক্ষক হঠাৎ আসিয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে। তোমরা এই অলীক কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভীত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছ, কিন্তু আমার অনুমতি না পাইলে কোন ইউরোপীয় সৈন্য বারাকপুরে আসিতে পারিবে না।" এই ভূমিকার পর তিনি ১৯ সংখ্যক সিপাহী দলের অবাধ্যতার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উক্ত সিপাহী দল ঘোরতর অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে। বোধ হয়, তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট নিরস্ত্র করিতে আদেশ দিবেন। যদি তিনি এরূপ আদেশ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সমস্ত পদাতি অশ্বারোহী ও কামান-রক্ষক সৈন্যকে, এই আদেশ যেরূপে কার্য্যে পরিণত হয় তাহা দেখিবার জন্য একত্র হইতে হইবে।

গবর্ণর জেনারল এই সময়ে প্রধান সেনাপতিকে লিখিয়াছিলেন, "১৯ সংখ্যক দলের সিপাহীরা ৩০শে মার্চ্চ প্রাতঃকালে বোধ হয় বারাকপুরে আসিয়া পৌঁছিবে। তাহাদিগকে যে নিরস্ত্র ও সৈনিক দল হইতে নিষ্কাশিত করা হইবে, ইহা তাহারা নিশ্চিত জানে না। আমার বিবেচনায় ইহা তাহাদিগকে না বলাই ভাল।"

কিন্তু এদিকে বারাকপুরে সেনাপতি হিয়ারসের বক্তৃতা সিপাহীদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। ইউরোপীয় সৈন্যের আগমন সংবাদে তাহারা সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষিপ্ত হইয়া যায়। ধূমায়িত বহ্নি এত দিন পর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

সেনাপতি মিচেল ১৯ সংখ্যক সিপাহী দল সঙ্গে লইয়া ২০শে মার্চ্চ বহরমপুর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। মিচেল সৈনিক দলের সহিত ৩০শে মার্চ্চ বারাকপুর উপনীত হইয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল, বারাকপুরের উত্তেজিত সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। এক জন ইউরোপীয় অফিসার উত্তেজিত সিপাহীর অসির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে।

২৯শে মার্চ্চ বৈকালে বারাকপুরের সিপাহীদিগের মধ্যে ইউরোপীয় সৈন্যপূর্ণ জাহাজ কলিকাতায় আসার সংবাদ দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল। তাহারা আরও সংবাদ পাইল যে, এই সৈন্যদল শীঘ্রই বারাকপুরে আসিয়া পৌঁছিবে। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় সৈন্যদলকে চুঁচুড়া পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং প্রয়োজন হইলে যে কোন সময় হুগলী নদী পার হইয়া বারাকপুরে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা রাখা হয়।

ইউরোপীয় সৈন্য আসার সংবাদ যখন চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল, তখন ৩৪ সংখ্যক দলের ২৬ বৎসর বয়স্ক যুবক মঙ্গল পাঁড়ে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন যে, ইংরাজের সহিত শক্তি-পরীক্ষার দিন আগত। উত্তেজনায় তরুণ সিপাহী যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইল এবং তরবারি ও গুলীভরা পিস্তল হস্তে আবাস-গৃহ হইতে বাহির হইল। বাহিরে আসিয়া তিনি সহকর্ম্মীদের তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে বলিলেন। যুদ্ধের সময় যাহারা ভেরীধ্বনি করে, তাহাদের ভেরীধ্বনি করিয়া সকলকে একত্রিত করিবার জন্য আদেশ

দেন। কিন্তু সেই আদেশ প্রতিপালিত হইল না। সিপাহী যুবক উন্মত্তের ন্যায় সৈনিক-নিবাসের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই সময় এক জন ইউরোপীয় অফিসর সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গল পাঁড়ে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িল, কিন্তু ইহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৩৪ সংখ্যক দলের সিপাহীরা ঘটনা-স্থলে উপস্থিত থাকিলেও মঙ্গল পাঁড়েকে নিরস্ত কিম্বা তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই; ইহাদের মধ্যে এক জন হাবিলদার অ্যাডজুটান্টের গৃহে যাইয়া সংবাদ দেয়।

উক্ত সিপাহী দলের অ্যাডজুটান্ট লেঃ বগ সংবাদ পাওয়া মাত্র যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহী সিপাহীর অনুসন্ধান করিলেন। মঙ্গল পাঁড়ে একটি কামানের পশ্চাদ্দেশ হইতে অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিল। গুলী অশ্বারোহীর কোন অনিষ্ট করিল না কিন্তু উহার আঘাতে তাহার বাহনটি ভূতলশায়ী হইল। অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে লেঃ বগও মাটিতে পড়িয়া গেলেন। বগ নিমেষ মধ্যে উঠিয়া আক্রমণকারীর দিকে পিস্তল ছুঁড়িলেন। কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, বগ তখন অসি নিষ্কাষিত করিলেন। এই সময়ে সার্জ্জেন মেজর হিউসন অসি-হস্তে তাঁহার সাহায্যার্থ সমাগত হইলেন। মঙ্গল পাঁড়েও নির্ভীক চিত্তে ইহাদের সম্মুখে আসিলেন, অসিতে অসিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মঙ্গল পাঁড়ে অসীম সাহসে অসি চালনা করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের দেহ অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষদ্বয় ইহার আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিলেন না। বিদ্রোহী সিপাহী যুবকের অসিচালনা কৌশলে লেঃ বগ ও তাহার সহকারী উভয়েরই জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে সেখ পলটু নামে এক জন মুসলমান সৈনিক ইউরোপীয় সৈনিকদ্বয়ের প্রাণরক্ষার জন্য ঘটনা-স্থলে অগ্রসর হইল। মঙ্গল পাঁড়ে লেঃ বগকে লক্ষ্য করিয়া তরবারি উঠাইয়াছিলেন, এমন সময় পলটু ত্বরিত-গতিতে আসিয়া দক্ষিণ বাহু দ্বারা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। পলটুর বাম বাহু সিপাহী যুবকের উত্তোলিত অসির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি পলটু মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িয়া দিল না। লেঃ বগ ও তাহার সহকারীর প্রাণ রক্ষা হইল। অসির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত লেঃ বগ ও সার্জ্জেন্ট মেজর হিউসন শোণিতাপ্লুত অবস্থায় স্বকীয় আবাসে যাইবার সময় উপস্থিত সিপাহীদের গালি দিতে দিতে চলিয়া গেলেন। সিপাহীরা কেহই কোন উত্তর দিল না। লেঃ বগ চলিয়া গেলে, সিপাহীরা মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িবার জন্য পলটুর উপর পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। পলটু আর কোন কথা না বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। কথিত আছে, ইউরোপীয় সৈনিকদ্বয় আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইলে, কোন কোন সিপাহী আপনাদের বন্দুকের বাঁট দ্বারা তাঁহাদিগকে আঘাত করিতেও ত্রুটি করে নাই। এই সময় এক জন সুবাদার ও ২০ জন সিপাহী পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ইহারা কেহই মঙ্গল পাঁড়েকে ধরিবার চেষ্টা করে নাই।

উপস্থিত গোলযোগের সংবাদ ক্রমে সেনাপতি হিয়ারসের নিকট পৌছিল। সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ও সামরিক পোষাকে অশ্বারোহণে

পিতার অনুগামী হইলেন। মঙ্গল পাঁড়ে অধীর ভাবে ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছিল, এমন সময় সেনাপতি হিয়ারসে এবং অন্যান্য সকলে ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইলেন। মঙ্গল পাঁড়েকে বন্দুক উঠাইতে দেখিয়া হিয়ারসের একটি পুত্র চীৎকার করিয়া বলে, "বাবা! উন্মত্ত সিপাহী আপনাকে লক্ষ্য করিতেছে।" কিন্তু মঙ্গল পাঁড়ে সেনাপতিকে লক্ষ্য করিল না। সে দেখিল যে, তাহার সতীর্থেরা তাহার সহিত যোগদান করিয়া বিদেশী ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল না, তখন সে বিরাগে হতাশ্বাসে আপনার বন্দুক আপনার দিকে ধরিয়া পা দিয়া ঘোড়া ফেলিয়া দিল। গুলীর আঘাতে মঙ্গল পাঁড়ে বিশেষ ভাবে আহত হয়।

৩০শে মার্চ্চ ১৯ সংখ্যক সৈনিক দল যখন বারাসতে অবস্থিতি করিতেছিল, তখন বারাকপুরের সিপাহীদিগের কয়েক জন গুপ্তচর তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়। চরেরা এই সকল পুরাতন বন্ধুদের তাহাদের সহিত বিপ্লবে যোগদান করিতে অনুরোধ করে। যদি তাহারা তাহাদের সহিত যোগদান করে তাহা হইলে কলিকাতার ও বারাকপুরের ইউরোপীয় সৈন্যের পরাজয় সুসাধ্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু বারাসতের সিপাহীরা এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। তবে তাহারা বারাকপুরের সিপাহীদের গুপ্ত অভিসন্ধি প্রকাশ করিল না।

সেনাপতি হিয়ারসে ১৯ সংখ্যক সিপাহীদিগের ৩১শে মার্চ্চ নিরস্ত্রীকরণের দণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত করার আদেশ প্রাপ্ত হন। এই সময় দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত সৈনিক দল আপনাদের অস্ত্র পরিত্যাগে হয়ত অসম্মত হইতে পারে এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের সিপাহীরা তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে বাধা দিতে পারে বলিয়া বারাকপুরের ইউরোপীয়গণ মনে করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংবাদ পাইলেন যে নিরস্ত্রীকরণের পূর্ব্ব দিন সিপাহী দল গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে এবং উত্তেজিত সিপাহীরা সমস্ত ইংরাজ অফিসার ও তাঁহাদের পরিবারবর্গকে হত্যা করিবে। অনেক ইংরাজ-মহিলা এই সময় কিছু দিনের জন্য বারাকপুর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সৈনিক দল সেনাপতি হিয়ারসের আদেশে কাওয়াজের মাঠে শান্ত ভাবে দণ্ডাদেশের অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের সম্মুখে কামান সকল স্থাপিত ছিল। কামানের পার্শ্বে ইংরাজ সৈন্য রণ-সাজে সজ্জিত। এই সমর-সজ্জার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, অবাধ্য সৈনিকদের নির্ম্মম ভাবে হত্যা করা। অদূরে ৩৪ সংখ্যক সিপাহী দলও দাঁড়াইয়াছিল। বারাকপুরের সিপাহী দল নীরবে ইংরাজ সেনাপতির আদেশে সামরিক চিহ্ন সকল ও অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিল। ঐ দিন আর কোন প্রকার গোলযোগ হইল না।

১৯ সংখ্যক দলের নিরস্ত্রীকরণের ছয় দিন পরে মঙ্গল পাঁড়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও উর্দ্ধতন সামরিক কর্ম্মচারীকে আঘাতের অপরাধে বিচার আরম্ভ হইল। ১৮৫৭ সালে ৬ই এপ্রিল ফোর্ট উইলিয়ামে সুবেদার মেজর জবাহিরলাল তেওয়ারীর সভাপতিত্বে ১৪ জন দেশীয় সামরিক কর্ম্মচারীকে লইয়া এক আদালত গঠিত হয়। ক্যাপ্টেন হাচ ডেপুটি জজ এডভোকেট জেনারেল মঙ্গল পাঁড়ের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করেন। মঙ্গল পাঁড়ের বিরুদ্ধে ৫ জনের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। মামলা আরম্ভ হইবার দুই দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪ঠা এপ্রিল মঙ্গল পাঁড়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত এক জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন—তোমার কি কিছু প্রকাশ করিবার আছে, অথবা তোমার কোন বক্তব্য আছে?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—গত রবিবারে তুমি যাহা করিয়াছিলে তাহা কি তুমি স্বেচ্ছায় করিয়াছ অথবা অন্যের প্ররোচনায় করিয়াছ?

উত্তর—আমি স্বেচ্ছায় করিয়াছিলাম। আমি মৃত্যুর আশা করিয়াছিলাম।

প্রশ্ন—তুমি কি নিজের জীবন রক্ষা করার জন্য বন্দুকে গুলী ভরিয়াছিলে?

উত্তর—না, আমার জীবন শেষ করিতে চাহিয়াছিলাম।

প্রশ্ন—তুমি কি অ্যাডজুটান্টের জীবন নাশ করিতে চাহিয়াছিলে, না অন্য কাহাকেও গুলী করিয়া হত্যা করার উদ্দেশ্য ছিল?

উত্তর—যে কেহ আমার সম্মুখে আসিত তাহাকেই গুলী করিতাম।

উক্ত ঘটনার সহিত আরও কেহ জড়িত আছে কি না ইহা বন্দীকে প্রশ্ন করা হয়, তাহাকে ইহাও আশ্বাস দেওয়া হয় যে, তাহার কোন প্রকার ভয়ের কারণ নাই—নির্ভয়ে প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু বন্দী দৃঢ় ভাবে অন্য কিছু বলিতে অসম্মতি প্রকাশ করে।

বিচারের প্রহসনের পর বন্দী কোন প্রকার জেরার উত্তর দিতে অস্বীকার করে। ইহার পর বিদ্রোহী মঙ্গল পাঁড়ের উপর নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করা হয়।

"The court sentence the prisoner, Mungal Pandy, Sepoy, No 1446, 5th Company, 34th Regiment, Native Infantry, to suffer death by being hanged by the neck untill he be dead."

Approved and confirmed.

Barrackpore } (sd.) J. B. Hearsey
The 7th April 1851 } Maj-Genl,
Comdg. the Presy. Divn.

৮ই এপ্রিল প্রাতে সাড়ে পাঁচটার সময় মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসীর সময় নির্দ্ধারিত হয়। গুলীর আঘাতের ক্ষত তখনও তাঁহার ভাল হয় নাই। অবিকার চিত্তে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণের জন্য সে প্রস্তুত হইল। অন্তিম সময়েও সতীর্থগণের বিরুদ্ধে সে কোন কথাই বলে নাই। ফাঁসীর পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রকার সাবধানতা গ্রহণ করা হয়। চুঁচুড়া হইতে ইংরাজ সৈন্যদল বারাকপুরে নদীর কিনারায় অপেক্ষা করিতে থাকে। কাওয়াজের মাঠে সমুদয় সৈন্যের সম্মুখে ফাঁসীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ধীর শান্ত পদক্ষেপে বীর যুবক ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করিয়া ফাঁসীর রজ্জু চুম্বন করিয়া স্বহস্তে আপনার গলায় পরাইয়া দেয়।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম বলি মঙ্গল পাঁড়ে!

এই ঘটনার দুই দিন পরে জমাদার ঈশ্বরী পাঁড়ের সামরিক আদালতে বিচার আরম্ভ হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি বিপন্ন ইংরাজের জীবনরক্ষার্থে বিদ্রোহী মঙ্গল পাঁড়েকে ঘটনা-স্থলের নিকটে থাকিয়াও গ্রেপ্তার করিতে সাহায্য করেন নাই।

বন্দী নিজেকে নির্দ্দোষী বলে।

তিন দিন বিচারের প্রহসনের পর ঈশ্বরী পাঁড়ের প্রতি মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। সেনাপতি হিয়ারসের উপর এই আদেশ

কার্য্যে পরিণত করিবার ভার দেওয়া হয়। ২১শে এপ্রিল অপরাহ্ণে জমাদার ঈশ্বর পাঁড়ের ফাঁসী হয়।

মুসলমান আর্দ্দালী সেখ পলটুর মঙ্গল পাঁড়ের আক্রমণ হইতে লেঃ বগ ও সার্জ্জেণ্ট মেজর হিউসনকে রক্ষা করার জন্ত পদোন্নতি হয়। সেখ পলটু হাবিলদার শ্রেণীতে নিবেশিত হয়।

এ পর্য্যন্ত ৩৪ সংখ্যক সিপাহী দলের সম্বন্ধে কিছুই করা হয় নাই। সেনাপতিদিগের মতে এই সৈনিক সম্প্রদায় ১১ সংখ্যক সিপাহী দল অপেক্ষাও অধিকতর অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, ইহারা ধীর ভাবে মঙ্গল পাঁড়ের আক্রমণ চাহিয়া দেখিয়াছিল, অবজ্ঞার সহিত লেঃ বগের কথায় অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিল। বারাকপুরের ইউরোপীয়-দিগের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ৩৪ সংখ্যক সৈনিক দল সশস্ত্র থাকিলে পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এই সৈনিক দলের কার্য্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিবার জন্ত একটি সামরিক কমিটির উপর ভার দেওয়া হয়। কমিটি বিশেষ অনুসন্ধানের পর এই মত প্রকাশ করিলেন যে, ৩৪ সংখ্যক সিপাহী দলের শিখ ও মুসলমান সৈন্ত বিশ্বাসী, কিন্তু এই দলের হিন্দু সৈন্ত তাদৃশ বিশ্বাসী নহে। "The court, from the evidence before them, are of opinion that the Sikhs and Mussalmans of the 34 Regiment, Native Infantray are trustworthy soldiers of the state, but the Hindus generally of that corps are not trustworthy."

কলিকাতার টাকশালার যে সুবাদার কেল্লার দুই জন উত্তেজিত সিপাহীকে অবরুদ্ধ করিয়া আপনার বিশ্বস্ততার পরিচয় দেন, বিচারকগণ তাঁহাকেও ঘোরতর অবিশ্বাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ৩৪ সংখ্যক সিপাহী দলের যে সাত কোম্পানী সৈন্ত বারাকপুরে ছিল তাহাদের ৬ই মে নিরস্ত্রীকরণ করা হয়। এই নিরস্ত্রীকরণের পালা শেষ হইবার পর ৮৪ সংখ্যক ইউরোপীয় রেজিমেণ্টকে লর্ড কানিং যখন বর্ম্মায় ফেরত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, সেই সময় মীরাটে সেনানিবাসে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

১০ই মে মীরাটে বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করে। তাহারা মীরাটের সমস্ত ইংরাজ সেনানায়ককে বধ করে। তাঁহাদের বাড়ী-ঘর পোড়াইয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ভারতবর্ষের সিপাহী সেনা বারুদের স্তূপের মত অগ্নিগর্ভ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, বারাকপুরের বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পরে সারা ভারতে সেই দাবাগ্নি-শিখা পরিব্যাপ্ত হইল।

সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানে গণ-বিদ্রোহ দেখা দিল। অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, বুন্দী, ঝান্সী, বিহারের কিয়দংশে প্রথম হইতেই জনসাধারণ সিপাহীদের সহিত যোগদান করিয়া সিপাহী বিদ্রোহকে গণ-সংগ্রামে পরিণত করে। বিদ্রোহী সিপাহী দল চলিল দিল্লী অভিমুখে, সিপাহীদের সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল "দিল্লী চলো, চলো দিল্লী।"

বাহাদুর শাহের জয়ধ্বনি করিয়া সিপাহীরা সেদিন দিল্লী দখল করিল, সমস্ত ইংরাজ নিহত হইল, তাঁহাদের ধনাগার লুণ্ঠিত

হইল, দিল্লীর লাল কেল্লায় মোগল সাম্রাজ্যের বিজয়-কেতন আর একবার সগৌরবে উড্ডীন হইল।

জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, আলোয়াড় প্রভৃতি দেশের হিন্দু রাজন্যদের নিকট বাহাদুর শাহ স্বহস্তে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, হিন্দুস্থান হইতে ইংরাজ বিতাড়নই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। হিন্দুস্থানের স্বাধীনতার জন্য সম্মিলিত ভাবে অস্ত্র ধারণের আহ্বান জ্ঞাপন করিলেন দিল্লীর শেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহ।

বিপ্লবের বহ্নিশিখা প্রবল বেগে সারা দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বিদ্রোহীদের প্রধান কেন্দ্র হইল দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, মীরাট, বেরেলী ও ঝান্সী। কানপুরে বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাওএর পুত্র নানা সাহেব। নানা সাহেবকে লর্ড ডালহাউসী পেশবার বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করেন।

বেরেলিতে মে মাসে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। বিদ্রোহীরা রোহিলা সর্দার হাফিজ রহমৎ খাঁর পৌত্রকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করে। এক বৎসর যাবৎ সেখানে বিদ্রোহীদের আধিপত্য চলিতে থাকে। ১৮৫৮ সালের মে মাসে সার কলিন ক্যাম্পবেল উহা অধিকার করেন।

ঝান্সীর বিদ্রোহীদের নায়িকা ছিলেন ঝান্সীর বিংশতিবর্ষীয়া তরুণী রাণী লক্ষ্মীবাই। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে পুরুষ-বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এই বীরাঙ্গনা। তাঁহার নিজ সৈন্য সহ তিনি বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিলেন; ঝান্সীতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বলিত হইল। রাণী রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দেন।

গোয়ালিয়র রাজ্য, গোয়ালিয়রের ঐতিহাসিক দুর্গ দখল করেন মহারাষ্ট্র বীর তাঁতিয়া টোপী। শিবাজীর শৌর্য্য ও চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়া তিনি বহু বার বিপ্লবীদের রক্ষা করিয়াছেন। মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর সৈন্যরা বিদ্রোহে যোগদান করে নাই, ফলে দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ সফল হয় নাই। একমাত্র তাঁতিয়া টোপীই নর্মদার দক্ষিণে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

ফৈজাবাদের নেতৃত্ব করেন মৌলবী আহম্মদ শাহ। হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর বাণী এবং ব্রিটিশ-বিদ্বেষ তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া অযোধ্যার হিন্দু-মুসলমানকে সম্মিলিত ভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে।

দিল্লী অঞ্চলে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বাদশাহ বাহাদুর শাহের পুত্রদ্বয়। আম্বালার বিদ্রোহ দমন করিয়া বিজয়ী ইংরাজ সৈন্য সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লী আক্রমণ করে। সেনাপতি নিকল্‌সন ছিলেন তাহাদের অধিনায়ক। বিদ্রোহীরা দিল্লী সহরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নগর-প্রাচীরের উপর হইতে ব্রিটিশ সৈন্যের উপর গোলাবর্ষণ করিতে থাকে। অবরোধকারী ব্রিটিশ সৈন্য পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। যমুনা-পথে আক্রমণের চেষ্টা হইলে দিল্লীর লাল কেল্লা হইতে ইংরাজ সৈন্যের উপর প্রচণ্ড গোলা-বৃষ্টি হয়। অবশেষে সেনাপতি নিকল্‌সন কাশ্মীর দরওয়াজার উপর অবিরত গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাশ্মীর দরওয়াজা ১৪ই সেপ্টেম্বর ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইংরাজ সৈন্য ভগ্ন দ্বারপথে অগ্রসর হইল। বাদশাহের সিপাহীরা বিনা যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যকে অগ্রসর হইতে দিল না। এই যুদ্ধে সেনাপতি নিকল্‌সন নিহত হইলেন। নিকল্‌সনের সহকারী হাডসান সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে সিপাহী সৈন্যকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। দিল্লীর পথে পথে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, মন্দিরে-মসজিদে বীরের রক্তচিহ্ন অঙ্কিত হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য হিন্দু-মুসলমানের—দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের—দিল্লী নগরীর পতন হইল।

সেনাপতি হাডসন বাহাদুর শাহের পুত্রদ্বয় ও এক পৌত্রকে স্বহস্তে গুলী করিয়া নিহত করেন।

বর্ত্তমানে যাহাকে গেরিলা যুদ্ধ বলা হয় সিপাহীরাই তাহার প্রথম নমুনা দেখাইয়াছিল ১৮৫৭ সালের গণ-সংগ্রামে। অকস্মাৎ আক্রমণ ও অতর্কিত যুদ্ধই ছিল বিদ্রোহের রণনীতি। এই গেরিলা যুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা সাফল্য লাভ করিয়াছিল বিহার প্রদেশে, জগদীশপুরের অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা কুমারসিংহের নেতৃত্বে। রণ-পণ্ডিত কুমার-সিংহ ব্রিটিশের যোগাযোগ ব্যবস্থা বারংবার ধ্বংস করিয়াছেন। স্বাধীন জগদীশপুরের পতাকার নীচে দাঁড়াইয়া উলঙ্গ অসি হস্তে সংগ্রাম করিতে করিতে অশীতিপর বৃদ্ধ প্রাণদান করেন।

সাম্রাজ্য-লোলুপ ইংরাজ কোম্পানীর অত্যাচার ও কু-শাসনের কবল হইতে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করিবার এই সংগ্রামে দুই লক্ষাধিক ভারতবাসী আত্মাহুতি দেয়। বিদ্রোহ দমনকল্পে ইংরাজরা ভারতীয়দের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়াছিল, নৃশংসতা ও ভয়াবহতার দিক দিয়া ইতিহাসে তাহার তুলনা খুব কমই পাওয়া যায়। ক্রমাগত কিছু কাল ধরিয়া ইংরাজরা দোষী, নির্দ্দোষী, স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু-নির্ব্বিশেষে ভারতীয়দের হত্যা করে, তাহাদের বাড়ী-ঘর পুড়াইয়া ছারখার করিয়া ফেলে; গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাইয়া দেয়। প্রায় প্রত্যেক ইংরাজের মনে প্রতিশোধ লওয়ার জন্য যেন রক্তের নেশা পাইয়া বসিয়াছিল। এক-একটি সহরে ভারতীয় সৈন্যদের বিনা বিচারে পাইকারী হারে ফাঁসীতে লটকান হয়। উর্দ্ধতন ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অসমর্থিত এক পুস্তকে বলা হইয়াছে: "তিন মাস কাল প্রতিদিন মৃতদেহ-বোঝাই আটখানি গাড়ী সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত শব স্থানান্তরিত করার কাজে যাতায়াত করিত। ঐ সকল শব চৌমাথা ও বাজারে ঝুলান থাকিত। এই ভাবে ছয় হাজার লোককে সরাসরি মৃত্যুর কবলে পাঠান হয়।" ইংরাজদের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

[ক্রমশঃ।

—আগামী সংখ্যায়—

ভদ্দোরলোকের মেয়ে

(কবিতা)

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

ক্যাষ্টরল
ক্যালকেমিকোর
এই সুগন্ধি ও সুপরিশ্রুত ক্যাষ্টর অয়েল দল ঘন চিকণ ও রমণীয় ক'রে তোলে।
এর সুমধুর সুরভি স্নানের পরও অনেকক্ষণ আপনার মনটিকে প্রফুল্ল রাখবে।
৫ ও ১০ আউন্স পরিমাণ সুদৃশ্য শিশিতে পাওয়া যায়।
CASTOROL

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

প্রমথেশ বড়ুয়া

হেমেন্দ্রকুমার রায়

আন্দাজ কুড়ি বৎসর আগেকার কথা। আমি তখন "নাচঘর" পত্রিকার সম্পাদক, পাথুরেঘাটায় আমার পৈতৃক বাড়ীতে বাস করি। এক দিন সকাল বেলায় প্রখ্যাত প্রমোদ-পরিবেশক স্বর্গীয় হরেন ঘোষের সঙ্গে একটি সুদর্শন যুবক আমার সঙ্গে 'দেখা করতে এলেন। তাঁদের নিয়ে আমার পাঠগৃহে গিয়ে বসলুম।

হরেন বললেন, "দাদা, ইনি হচ্ছেন শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া। এঁর বাবা রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার নাম আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ, তাঁকে দেখেছি, তাঁর লেখা একখানি পুস্তকও পাঠ করেছি।"

হরেন বললেন, "প্রমথেশ বাবুর প্রযোজনায় একখানি নতুন ছবি তৈরি হয়েছে। সেই সূত্রেই ইনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

শুনে মন প্রসন্ন হ'ল না। প্রায় তিন যুগ ধ'রে বিভিন্ন পত্রিকায় নাট্যকলার বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে আলোচনা ক'রে আসছি। আমার মত অন্যান্য সমালোচকরাও জানেন, থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের কর্তৃপক্ষরা কোন নূতন নাটক খোলবার বা ছবি দেখাবার আগে সমালোচকদের কাছে গিয়ে অল্প-বিস্তর মিষ্টি কথা শুনিয়ে নির্জ্জলা প্রশংসা-বাণী আদায় করতে চান। আগে যখন বাজার এখনকার মত আক্রা ছিল না, সিনেমাওয়ালারা তখন কেবল মিষ্টি কথাই শোনাতেন না, সমালোচকদের মিষ্টিমুখ না করিয়েও ছেড়ে দিতেন না। অথচ তাঁদের ঘটে কখনো এটুকু বুদ্ধির উদয় হয় না যে, যতই থাকুক সমালোচকদের কলমের জোর, ভাঁওতা দিয়ে নিকৃষ্ট জিনিষকে উৎকৃষ্ট ব'লে চালাবার চেষ্টা করলে তাঁরা কোনক্রমে দুই-চার দিনের জন্যে তার চাহিদা বাড়ালেও বাড়াতে পারেন, কিন্তু তার পরেই জনসাধারণের দিব্যদৃষ্টি উন্মেষিত হ'তে দেরি লাগে না। ভালো জিনিসেরই চাহিদা বাড়াতে পারে ভালো সমালোচনা। এ কথা শুনে অনেকে মুরুব্বির মত বলতে পারেন, ভালো জিনিবের জন্যে সমালোচকের কাছে ধর্ণা দিয়ে কোনই লাভ নেই, ফুল ফুটলে মধুকরের অভাব হয় না, ভালো জিনিষ আপনিই আকর্ষণ করবে দর্শকদের দৃষ্টি। নির্ভুল ঐ ফুল ও মধুকরের উপমাটি। অনেকেই উপমার দ্বারা প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করতে চান, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপমাকে যুক্তি ব'লে গ্রহণ করলে ন্যায়শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় না। এ বিষয় নিয়ে ভালো ক'রে আলোচনা করবার প্রশস্ত জায়গা এখানে নেই, তবে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এডওয়ার্ড ফিৎজেরাল্ড যখন ওমর খৈয়মের রুবায়তের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন, তখন কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায়নি, পুস্তিকাখানি গ্রন্থ-কীটের আহার্য্যে পরিণত হয়েছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। বহু দিন পরে এক পুরাতন পুস্তকের দোকানে গিয়ে কবি-চিত্রকর রোসেটির দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট হয়। তার পর তাঁর এবং তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের মুখে ঐ অনুবাদের গুণ-ব্যাখ্যান শুনে সবাই তার দিকে ঝুঁকে পড়েন, ফলে আজ কেবল ফিৎজেরাল্ড নন, স্বদেশে অবহেলিত ওমর খৈয়ম পর্য্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে আসন লাভ করেছেন। বিভিন্ন আর্টের ক্ষেত্রে এ-রকম আরো দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু কথায় কথায় অনেকটা এগিয়ে এসেছি, আবার পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক্।

হরেনের মুখে প্রমথেশ বাবুর আগমনের কারণ শুনে জিজ্ঞাসু-চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম।

প্রমথেশ শান্ত, নিম্নস্বরে বললেন, "আপনার সমালোচনা কিছু কিছু আমি পড়েছি। আপনার মতামতের উপরে আমার শ্রদ্ধা আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "এ ক্ষেত্রে আমি কি সাহায্য করতে পারি?"

তিনি বললেন, "কাল আপনাকে একবার আমার বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাই।"

—"কেন?"

—"জনসাধারণ দেখবার আগে ছবিখানি আগে আপনি দেখবেন। তার পর আপনার মতামত শুনলে উপকৃত হব।"

বুঝলুম প্রমথেশ সত্য সত্যই সুধী ব্যক্তি। এ দেশে চলচ্চিত্রের প্রায় জন্মকাল থেকেই এখানকার অধিকাংশ ছবিকারের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন ও তাঁদের কার্য্যপদ্ধতি লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছি। ছবি চালু হয় একমাত্র ভালো গল্পের জোরে। গল্প-রচনাকে পেশা ক'রে যাঁরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন, আমাদের ছবিকারদের কাছে তাঁদের মতামতের বিশেষ কোনই মূল্য নেই। বরং তাঁরা এমন ভাব দেখান, যেন পেশাদার ও স্বনামধন্য গল্প-লেখকদের চেয়ে গল্প সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান অধিকতর টনটনে। এই কারণে সুলেখকদের গল্পও তাঁদের হাতে প'ড়ে কত বার যে মাঠে মারা গিয়েছে, কারুর কাছেই তা অবিদিত নেই।

কিন্তু প্রমথেশ ছিলেন না সাধারণ চিত্রনির্ম্মাতা। তিনি ছিলেন উচ্চ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আভিজাত্যের অধিকারী। এবং ইতিপূর্ব্বেই প্যারিসের বিখ্যাত ফক্স ফিল্মসে সহকারী ক্যামেরাম্যানরূপে কাজ করে ওখানকার চলচ্চিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কাজেই তাঁর কাছে ফ্যালনা ছিল না পেশাদার গল্প-লেখকের মতামত।

এই পদ্ধতিতে কাজ করতে দেখেছি কেবল আর এক চিত্রপরিচালককে। তিনি হচ্ছেন শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ। ইণ্ডিয়ান সিনেমা আর্টস্‌এর হয়ে তিনি যখন তাঁর বিখ্যাত চিত্র "নিষিদ্ধ ফল" তোলেন, তখন জনসাধারণের সামনে ছবিখানি প্রদর্শিত হবার আগে আমাকে দেখাবার জন্যে আমন্ত্রণ ক'রে ষ্টুডিয়োয় নিয়ে গিয়েছিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে প্রমথেশ এসে আমাকে তুলে নিয়ে গেলেন। প্রথমে গেলেন হরেন ঘোষের অফিসে। সেখান থেকে গাড়ীতে এসে উঠলেন হরেন ও শ্রীদেবকীকুমার বসু। দেবকী বাবুর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। তার আগেই তিনি "পঞ্চশর" নামে একখানি চিত্র পরিচালনা করেছিলেন। এবং যত দূর মনে পড়ে, আলোচ্য চিত্রেরও পরিচালক ছিলেন তিনিই। এবং কথাপ্রসঙ্গে দেবকী বাবু জানিয়ে দিলেন, এক সময়ে তিনিও সাহিত্য-ষ্টি।

করতেন, বর্দ্ধমান থেকে প্রকাশিত "শক্তি" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

প্রমথেশ বাবুদের বালিগঞ্জের বাড়ীর একতলার ঘরে বসে "অপরাধী" ছবিখানি দেখলুম। বাংলা চলচ্চিত্র-জগতে তখন এসেছে যুগসন্ধি কাল। নির্ব্বাক্ ছবিকে বিদায় দিয়ে আমরা তখন সবাক্ ছবিকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে উৎসাহ প্রকাশ করছি। "অপরাধী" ছবিতেও সেই মনোবৃত্তির ছোঁয়াচ লেগেছিল একটুখানি। তার কুশীলবরা মুখরতা প্রকাশ করেনি বটে, কিন্তু ছবির এক জায়গায় পাওয়া গিয়েছিল ধ্বনির বিস্ময়।

"অপরাধী"র বিষয়বস্তু হয়তো উচ্চশ্রেণীর ছিল না, কিন্তু তার আখ্যানে ছিল লোকপ্রিয়তার প্রভূত উপাদান। আলোকচিত্রকরের কাজ হয়েছিল ভালো এবং অধিকাংশ ভূমিকাতেই নট-নটীরা আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করেছিলেন যথাযথ ভাবেই। প্রমথেশ বাবু নিপুণ ভাবে করেছিলেন প্রধান ভূমিকার মর্য্যাদা রক্ষা। নির্ব্বাক্ যুগের উল্লেখযোগ্য শেষ চলচ্চিত্র হচ্ছে "অপরাধী"।

তার পর চিত্রাকাশে প্রমথেশের তারকা হয়েছে ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী। এক হিসাবে এ দেশে তাঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি কেবল প্রয়োজক নন, পরিচালকও। আবার তিনি কেবল ক্যামেরাম্যান নন, অভিনেতাও। এবং তিনি যে মনে-প্রাণে ছিলেন উচ্চশ্রেণীর শিল্পী, তাঁর বিভিন্ন চিত্রের কলা-কুশলতা দেখলে সে কথাও বুঝতে বিলম্ব হয় না।

"অপরাধী"র পর তিনি সবাক্ ছবি তৈরি করেছেন অনেকগুলি—যেমন মুক্তি, গৃহদাহ, অধিকার, দেবদাস, শাপমুক্তি, রজত-জয়ন্তী, মায়ের প্রাণ, শেষ উত্তর, জবাব, উত্তরায়ণ, চাঁদের কলঙ্ক, মায়া ও আমীরি প্রভৃতি। বহু চিত্রেই তাঁর গুণপনা প্রকাশ পেয়েছে বটে, কিন্তু অনন্যসাধারণ হয়ে আছে তাঁর দ্বারা পরিচালিত ও অভিনীত "দেবদাস"। ছবিখানি মুক্তিলাভ করে ১৯৩৪ অব্দে, কিন্তু আজও অটুট আছে তার জনপ্রিয়তা।

চিত্রজগতে তাঁর কর্ম্মজীবন পূর্ণ বিশ বৎসর কালও নয়। কারণ শেষের দিকে দুরারোগ্য রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘকালের জন্য তাঁকে অলস হয়ে থাকতে হয়েছিল। মাত্র যোলো-সতেরো বৎসরের মধ্যে তিনি যে এতগুলি চিত্র প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন, এর মধ্যে কেবল তাঁর কর্ম্মপরায়ণতারই নয়, রীতিমত প্রতিভারও পরিচয় পাওয়া যায়; কারণ বিশেষজ্ঞের মতে, প্রতিভার একটি বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে অসাধারণ কর্ম্মশীলতা। বাংলা দেশে প্রথম শ্রেণীর যে দুই-তিন জন পরিচালকের নাম করা যায়, তাঁদের মধ্যে প্রমথেশ ছিলেন অন্যতম। উপরন্তু একাধারে প্রয়োগকর্ত্তা, পরিচালক, অভিনেতা ও আলোকচিত্রকররূপে আর কোন শিল্পী যে অদূর ভবিষ্যতে এখানে আত্মপ্রকাশ করবেন, এমন আশাও করতে পারছি না।

অনেকগুলি নূতন শিল্পীকে তিনি অভিনয়-ক্ষেত্রে আনয়ন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্ব্বাধিক প্রশস্তি অর্জ্জন করেছেন সায়গল, শ্রীমতী যমুনা, শ্রীরবীন মজুমদার ও শ্রীপঙ্কজ মল্লিক।

তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে নানা স্থানে। তাঁকে স্মরণ করলেই আমার মনের মধ্যে জেগে ওঠে একটি স্বল্পবাক্, মৃদুভাষী, শান্তশিষ্ট ও নির্ব্বিরোধী মানুষের ছবি। যাঁরা ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের মত কি জানি না, কিন্তু আমি যে ভাবে দেখেছি, সেই ভাবেই চিরদিন তাঁকে মনে ক'রে রাখব।

জীবনের শেষ চার বৎসর তিনি চলচ্চিত্রের কোন কাজে হাত দেননি বটে, কিন্তু মুখে বলতেন না কি সর্ব্বশেষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট একখানি চিত্রের জন্যে তিনি ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত হয়ে আছেন। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁর জন্যে আরো কিছু দিনের ছুটি মঞ্জুর করলে না, তাই আমাদেরও আর শোনা হ'ল না তাঁর সেই সর্ব্বশেষের গান বা swan-song!

যাত্রাপথে চলচ্চিত্র

তিন

আমি বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস লিখতে প্রবৃত্ত হইনি। কিছু দিন আগে "দৈনিক বসুমতী"তে শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সে চেষ্টা করেছেন। তার পর শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীও প্রথম যুগের বাংলা চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেছেন এবং তাঁর বক্তব্য এখনো শেষ হয়নি। সুতরাং ওদিক দিয়ে আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না।

যদিও আমি ঘনিষ্ঠ ভাবে কোন বিশেষ চলচ্চিত্রের দলে গিয়ে ভিড়িনি, তবে গোড়ার দিকে যাঁরা বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—শ্রীনীতিশ লাহিড়ী, স্বর্গীয় অনাদিনাথ বসু, শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী ও শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতি—আমি তাঁদের বন্ধুত্ব লাভ করেছি। তাঁদের সঙ্গে বহু কাল ধ'রে ওঠা-বসা ক'রে আসছি, সুতরাং বাংলা ছবির মুলুকের অধিকাংশ ঘটনাই ঘটেছে আমার চোখের উপরেই। পরে চিত্রনাট্যকাররূপে আমাকে কয়েকটি ষ্টুডিয়োর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হয়েছে এবং অন্যান্য কোন কোন বিভাগেও আমি অন্তরালে থেকে অল্প-বিস্তর কর্ত্তব্যপালন করেছি। ইচ্ছা করলে অনায়াসে চিত্রপরিচালকও হ'তে পারতুম। এমন কি চৌদ্দ-পনেরো বৎসর আগে কোন সম্প্রদায় পরিচালকরূপে আমার নাম পত্রিকায় কয়েক বার ঘোষণাও করেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমি রাজি হইনি। কারণ আমার বিশ্বাস, নিছক সাহিত্য যাঁদের জীবনের ব্রত, চলচ্চিত্রের বাঁধা-ধরা কর্ম্মী হওয়া তাঁদের সাজে না। চলচ্চিত্রে লক্ষ্মীলাভের লোভ আছে বটে, কিন্তু সরস্বতীকে স্মরণ করবার অবসর থাকে অত্যল্প; সাহিত্য চায় একনিষ্ঠতা। অর্থ উপার্জ্জনের আরো তো অনেক পথই খোলা আছে, কিন্তু সে সব দিকে বেশী ঝুঁকলে ক্ষুণ্ণ হয় সাহিত্যসেবা। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র আগে রাশি রাশি রচনা করতেন। কিন্তু তাঁরা এখন চলচ্চিত্রের দ্বারা এমন ভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়ছেন যে, তাঁদের কলমে প্রায় মরিচা প'ড়ে যাচ্ছে সেটা দেখবারও সময় পান না। শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী আগে ভূরি পরিমাণ রচনা দিয়ে সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করতেন, কিন্তু চলচ্চিত্রের প্রেমে প'ড়ে তিনি লেখনী প্রায় ত্যাগ করেছিলেন বললেও চলে। অথচ তাঁর রচনাশক্তি যে অটুট আছে, এই সেদিন "মহাস্থবিরজাতক" লিখে সেটা তিনি বিশেষ ভাবেই প্রমাণিত করেছেন। ছবির অন্দরমহলে ঢুকলে সাহিত্যকে উপেক্ষা না করলে চলে না, তাই ও-পথ মাড়াতে চায়নি আমার মন। কিন্তু অবসরকালে স্বাধীন ভাবে অন্দরমহলে উঁকি-ঝুঁকি মারবার সুযোগ পেয়েছি যথেষ্ট, সুতরাং আমি যা বলব তা

নিতান্ত অবিশেষজ্ঞের কথা হবে না। তবে ধারাবাহিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি রেখে আলোচনা করবার ইচ্ছা আমার নেই, কারণ গোড়াতেই বলেছি। মাঝে-মাঝে এক-এক সময়ের ঘটনা নিয়ে মত প্রকাশ করব সাধারণ ভাবেই। সব ছবির কথা উল্লেখ করবারও দরকার নেই, যা হচ্ছে ঐতিহাসিকের কাজ।

সহরের বিভিন্ন চিত্রগৃহে বিলাতী ছবিগুলি দেখে মনে হ'ত, চলচ্চিত্ররাজ্য হচ্ছে এক রহস্যময় রোমান্সের দেশ! সেখানে সদাত্মার সঙ্গে দুরাত্মারাও থাকে বটে, তবু তারই মধ্যে পাওয়া যায় পরীলোকের স্বপ্নমাধুরী। কালো ছায়াকে ঢেকে জেগে ওঠে মায়াময় আলো, হেসে ফোটে প্রেমের গোলাপ, খেলে যায় রূপের লহর। বিচিত্র যৌবনের অভিনব খেলা-ঘর, নব রসের বিস্ময়কর লীলাকানন, জীবনে যা অসম্ভব, এখানে তাও সম্ভবপর।

চিত্রলোকের গুপ্তকথা ভালো ক'রে জানবার জন্যে বিলাত থেকে খানকয়েক কেতাব আনালুম। চলচ্চিত্রের ইতিহাস পড়লুম, কেমন ক'রে চিত্রনাট্য লেখা, ফোটো তোলা, সেট সাজানো ও অভিনয় করা হয় প্রভৃতি অনেক কথাই জানতে পারলুম। কেতাবে অজস্র ছবি ছাপিয়ে সব ব্যাপার স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং কিঞ্চিৎ জ্ঞানসঞ্চয়ের পর চলচ্চিত্র সম্বন্ধে খানিকটা "ইলিউসান" নষ্ট হয়ে গেল বটে, কিন্তু এটুকু উপলব্ধি করতে পারলুম যে, জীবন্ত ছবি তোলা হচ্ছে একটি দুরূহ আর্ট।

মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল, বাংলা দেশে যখন ছবির চাহিদা হু-হু ক'রে বেড়ে যাচ্ছে, তখন এখানেও বাঙালী কুশীলব নিয়ে ছবি তোলা কি নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার?

কিন্তু এ প্রশ্ন জেগেছিল আরো অনেকেরই মনে। খবর পেলুম, এখানে-ওখানে বাংলা ছবি তোলবার তোড়জোড় সুরু হয়ে গিয়েছে। তার পর প্রথম ভারতীয় ছবি তোলা হয় বোম্বাই প্রদেশে এবং তার পর বাংলা দেশে এ বিভাগে হাত দেন ম্যাডান কোম্পানি। তাঁদের ছবিতে য়ুরোপীয় অভিনেতাও থাকতেন, কি একখানা ছবিতে মহাদেব সেজেছিলেন এক ইতালিয়ান ভদ্রলোক। কিন্তু দর্শকরা সে জন্যে অসুবিধা বোধ করেনি, কারণ ছবি ছিল তখন বোবা, বাংলায় কথা কইতে হয়নি ফিরিঙ্গী মহাদেবকে।

কিন্তু বাংলা নাটকের আংশিক চিত্ররূপ দেখেছিলুম সর্ব্বপ্রথমে সাধারণ রঙ্গালয়েই। অধিকাংশ মঞ্চাভিনয়, অল্প-স্বল্প চিত্রাভিনয়।

তার পর দেখি ইণ্ডো-ব্রিটিশ চিত্র-সম্প্রদায়ের প্রথম বাংলা ছবি "বিলাত-ফেরৎ"। নায়ক ছিলেন শ্রীধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, নায়িকা স্বর্গীয়া সুশীলা (রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁর কোন সংস্রব ছিল না)। তখনও কোন বাঙালীর নিজস্ব ছবিঘর ছিল না, তাই ছবিখানি দেখানো হয় মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে। বেশ মনে আছে, ছবিখানি দেখবার জন্যে দর্শকদের মধ্যে প্রভূত আগ্রহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। রাত্রির পর রাত্রি পরিপূর্ণ হয়ে থাকত প্রেক্ষাগৃহ।

দর্শকরা পর্দ্দার উপরে খাঁটি বাঙালী নট-নটীর জীবন্ত মূর্ত্তি দেখে ঘন ঘন হাততালি দিয়ে ও অট্টহাস্য ক'রে প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করেছিল, কারণ ব্যাপারটা ছিল একেবারেই নূতন। কিন্তু ছবিখানি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য হয়নি। দুর্ব্বল গল্প। নায়ক ধীরেন বাবু পরিবেশন করেছিলেন "লো কমিক" বা নিম্নশ্রেণীর হাস্যরস এবং তাঁর উপরে ছিল চার্লি চ্যাপলিনের স্পষ্ট প্রভাব।

বোধ হয় এর কিছু আগে বা পরে অরোরা ফিল্মের অনাদি বাবু চিত্রে দেখান "বিদ্যাসুন্দরে"র কাহিনী। ইণ্ডো-ব্রিটিশের দলও আরো একখানি কি দুইখানি ছবি তুলে হাত গুটিয়ে ব'সে থাকেন। সে সব ছবি আমি দেখিনি। তার কিছু দিন পরেই একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটে, যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে-পড়তে আমি বেঁচে গিয়েছি কোন ক্রমে। প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা।

আলমগীররূপে শিশিরকুমার কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে দেখা দিয়ে বোধ হয় তখন আবার স'রে দাঁড়িয়েছেন। স্বর্গীয় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র অভিনয় করছেন মিনার্ভা থিয়েটারে। আমিও সেখানে যাই প্রত্যহ।

নরেশচন্দ্র তখনই ঝুঁকেছেন চিত্রজগতের দিকে। যত দূর মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন" নাট্যকাব্য অবলম্বন ক'রে তিনি একখানি চিত্রনাট্যও রচনা করেছিলেন, পরে যার আর পাত্তা পাওয়া যায়নি। এবং সেই সময়েই তিনি ও রাধিকানন্দ ছবিতে প্রথম অভিনয় করেছিলেন। কেবল তাঁরা দু'জন নন, তাঁদের সঙ্গে ছিলুম আমরা তিন জন—স্বর্গীয় "ভারতী"-সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী এবং আমি।

ইণ্ডো-ব্রিটিশ চিত্র-সম্প্রদায়ের আর কোন নূতন ছবির নাম শোনা যায় না বটে, কিন্তু ওখানকার প্রবীণ কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীনীতিশ লাহিড়ী মিনার্ভা থিয়েটারের সাজঘরে এসে মাঝে-মাঝে নরেশ, রাধিকা, মণিলাল ও আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে যান।

নীতিশ বাবু এক দিন বললেন, "এইবারে আমার এমন একখানি ছবি তোলবার ইচ্ছা হয়েছে, যার মধ্যে থাকবেন কয়েক জন বিখ্যাত সাহিত্যিক।"

প্রস্তাবটা অভিনব বটে। জিজ্ঞাসা করা হ'ল, ছবির বিষয় কি?

নীতিশ বাবু একটি পৌরাণিক কাহিনীর নাম করলেন, যার মধ্যে ছিল রাম ও সীতা প্রভৃতি চরিত্র। চিত্রনাট্যও রচনা করেছিলেন তিনি নিজেই (ইংরেজীতে টাইপ করা তাঁর সেই চিত্রনাট্যখানি আমার একটি টেবিলের দেরাজে রক্ষিত ছিল, কিন্তু এই প্রবন্ধ লেখবার সময়ে খুঁজতে গিয়ে আর খুঁজে পেলুম না)।

নীতিশ বাবু বললেন, "নরেশ বাবু আর রাধিকা বাবুর সঙ্গে আপনারাও (মানে মণিলাল ও আমি) এই ছবিতে অভিনয় করুন। আরো কয়েক জন সাহিত্যিককেও দলে ভিড়িয়ে নিন। কি বলেন, রাজি আছেন?"

মণিলাল মুখ টিপে হেসে বললেন, "মন্দ কি?"

মনে জাগল একটা খটকা। যদিও থিয়েটারের মত সিনেমার বদনাম নেই, তবু সে সময়ে কোন ভদ্রমহিলাই ছবিতে অভিনয় করবার দুরাকাঙ্ক্ষা স্বপ্নেও মনের মধ্যে পোষণ করতে পারতেন না। আর আমি যদি শ্রেণীবিশেষের নারীদের সঙ্গে চিত্রাভিনয়ে যোগদান করি, তাহ'লে অভিভাবকদের রক্তচক্ষু নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবে না। কাজেই জিজ্ঞাসা করতে হ'ল, "সাহিত্যিকরা তো পুরুষ মানুষ। মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করবে কারা?"

নীতিশ বাবু বললেন, "সে একটা নূতন ব্যবস্থা করা যাবে। চলুন, কাল আমাদের ষ্টুডিয়োটা একবার দেখে আসবেন।"

মনে মনে ভাবলুম, দুর্গা ব'লে নেমে তো পড়ি, কোথাকার

জল কোথায় গড়ায় দেখাই যাক্ না কেন ?— বিপদের সম্ভাবনা দেখলে চম্পট দিতে কতক্ষণ ?

প্রথমেই আর এক জন সাহিত্যিককে সংগ্রহ করলুম—প্রেমাঙ্কুর। তিনি সাহসী ছেলে, একটুও নারাজি নন।

ষ্টুডিয়ো ছিল বোধ হয় বনহুগলীতে। ষ্টুডিয়ো তো ভারি! আজ-কাল কেউ তেমন ষ্টুডিয়ো দেখলে হেসেই হবে অস্থির। একখানা একতলা বাগান-বাড়ী। খানিকটা জমি। কিছু গাছপালা। একটা পুকুর।

জল্পনা-কল্পনা ও গল্প-গুজব করতে করতে বেলা গড়িয়ে এল বৈকালের দিকে। নীতিশ বাবু তাঁর খাবারের বাক্স বার ক'রে জলযোগের অংশ দিয়ে বাধিত করলেন। তার পর সিগারেট টানতে টানতে বাড়ীমুখো হলুম।

তার পরও বোধ করি দুই-এক দিন গিয়েছিলুম তথাকথিত ষ্টুডিয়োয়। নীতিশ বাবু হঠাৎ এক দিন ব'লে বসলেন, "আজ খানিকটা ছবি তোলা হবে।"

বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল। ছেলেবেলা থেকে অভিনয় দেখে আসছি বটে, কিন্তু নাট্যমঞ্চে আরোহণ ক'রে নিজে কোন দিন মুখ দেখাইনি পাদ-প্রদীপের আলোকে। তবু সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয়-পদ্ধতি ছিল আমার কাছে সুপরিচিত, কিন্তু তখনও চিত্রাভিনয়ের অ, আ, ই পর্য্যন্ত জানা ছিল না আমার। ক্যামেরার সামনে অচঞ্চল দীপশিখার মত স্থির হয়ে এবং চোখের পাতা একটুও না নেড়ে ব'সে বা দাঁড়িয়ে ছবি তোলাতেই অভ্যস্ত ছিলুম, কিন্তু ক্যামেরার সামনে হস্ত-পদ সঞ্চালন ক'রে চ'লে-ফিরে কেমন ক'রে যে মৌখিক ভাবের অভিব্যক্তি দেখাতে হয়, সে সম্বন্ধে ছিল না আমার কিছু মাত্র অভিজ্ঞতা। তার পর বহু ষ্টুডিয়োর ভিতরে গিয়ে চিত্রাভিনয়ের পদ্ধতি লক্ষ্য করেছি এবং সময়ে সময়ে আমার নির্দ্দেশে চালিত হয়ে নট-নটীরা অভিনয়ও করেছেন, কিন্তু আমি বলছি ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা, বাংলা চলচ্চিত্র তখন বোধ করি হামাগুড়ি দিতেও শেখেনি।

মনের ভিতরে যথেষ্ট অস্বস্তি, তবু পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। পরদিন যথাসময়ে সকলের সঙ্গে গুটি-গুটি ষ্টুডিয়োর মধ্যে প্রবেশ করলুম।

সেদিন আমাদের সঙ্গে মণিলাল ছিলেন কি না স্মরণ হচ্ছে না। বোধ হয় ছিলেন না। নীতিশ বাবু ছাড়া ছিলুম আমরা চার জন—স্বর্গীয় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী এবং আমি। আমরা যথাক্রমে পেলুম এই ভূমিকাগুলি : রাম, বশিষ্ঠ, মারীচ ও জনক।

রাজর্ষি জনক সাজবার জন্মে আমাকে কাপড়ে কাপড়ে ধড়াচূড়া পরতে হ'ল। যথাযথ বেশে সজ্জিত হ'লেন আর সকলেও। তার পর বাইরে বেরিয়ে মুক্তাকাশের তলায় ঘাসজমির উপরে গিয়ে উঠলুম।

আমাদের প্রত্যেককে কি করতে হবে, নীতিশ বাবু মুখে মুখে সেই নির্দ্দেশ দিয়ে যেতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তোলা হ'তে লাগল ছবি। রাম প্রকাশ করলেন বীরত্বব্যঞ্জক ভাবভঙ্গি, বশিষ্ঠ দেখালেন মুনিজনোচিত অভিনয়, মারীচ দিলে তার স্বভাবসিদ্ধ দুষ্টুমির পরিচয়, আর জনক যে কি করলেন, আমার আর তা মনে নেই। খুব সম্ভব, লোক-হাসানো ছাড়া তিনি আর কিছু করতে পারেননি। তবে বরাত আমার ভালো ব'লেই হয়তো মুখ ফুটে সে কথাটা ব'লে কেউ দিতে চাননি আমার কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে।

নীতিশ বাবু যখন বললেন, "ব্যাস্, আজ এই পর্য্যন্ত।" তখন কান যেন জুড়িয়ে গেল। ফোঁশ, ক'রে ফেললুম একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস। ধড়া-চূড়ো পরেছিলুম অত্যন্ত নাচার ভাবে ধীরে ধীরে, এখন জনকত্ব থেকে চটপট মুক্তিলাভ করবার জন্মে সেগুলো খুলে ফেললুম যারপরনাই তাড়াতাড়ি।

কিন্তু অতিশয় অবাক হয়ে গেলুম। এই তা'হলে চিত্রাভিনয়ের এক টুক্‌রো নমুনা ? বিলাতী কেতাবে চলচ্চিত্র সম্পর্কীয় যত বড় বড় বচন পড়েছিলুম, তার সঙ্গে যে এর কিছুই মেলে না! এমন নিশ্চিন্ত ভাবে এমন অনায়াসে যা তৈরি করা যায়, তাকে তো একটা বড় আর্ট ব'লে স্বীকার করাই চলে না! আজ আমার মত পরিবর্ত্তিত হয়েছে বটে, কিন্তু তখন ভেবেছিলুম ঠিক ঐ কথাগুলিই।

তার পর ? তার পর deluge।

ইণ্ডো-ব্রিটিশ চিত্র-সম্প্রদায়ের স্বত্বাধিকারী ছিলেন পি. এন. দত্ত। পরে যেদিন ষ্টুডিয়োয় যাবার জন্মে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি, নীতিশ বাবু এসে জানালেন, শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী একটি নূতন চিত্র-সম্প্রদায় গঠন করবেন ব'লে ইণ্ডো-ব্রিটিশের সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম কিনে নিয়ে গিয়েছেন। ইণ্ডো-ব্রিটিশের দরজা বন্ধ।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আমার ঘাড় থেকে নেমে গেল নকল জনকের প্রেতাত্মা। আঃ, কি আরাম!

তার পর নীতিশ বাবু হয়েছেন এখন চিত্রজগতের এক জন করিৎকর্ম্মা, তালেবর ব্যক্তি। রাধিকানন্দ চিত্রাভিনেতা ও নরেশচন্দ্র নট-পরিচালকরূপে প্রখ্যাত হয়েছেন। প্রেমাঙ্কুরও অভিনয় ও চিত্রপরিচালনা দুই-ই করেছেন। নীতিশ বাবুর পাল্লায় প'ড়ে আমার Baptism of fire বা অগ্নি-দীক্ষা হয়ে গেল বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। আর কোন দিন ও-পথ দিয়ে হাঁটিনি।

[ক্রমশঃ।

খেয়ালী প্রতিভা

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন মনে করতেন, শীতে দেহ উন্মুক্ত থাকলে শরীর ভাল থাকে। ঘোরতর শীতেও ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে উঠে তিনি কিছুক্ষণ নগ্ন থাকতেন। চারটে বিছানা প্রয়োজন হ'ত। শয্যা উষ্ণ হয়ে যায়, এক বিছানা থেকে অন্য বিছানায় যেতেন ফ্রাঙ্কলিন।

থিওডর ডস্টয়েভ্স্কি

প্রথম অধ্যায়

৩

যে সমস্ত লোক আক্রমণকারীর ওপর প্রতিশোধ নিতে সমর্থ কিংবা সাধারণ ভাবে যারা নিজেদের পা বাঁচাতে পারে, তারা কী ভাবে পারে তা? এটা অনুমান করা যেতে পারে যে, সাময়িক ভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছে তাদের সমগ্র সত্তার ওপর চেপে থাকে, এবং সেই সময়টুকুর জন্যে তখন আর কোনো কিছুই স্থান পায় না। এই ধরণের লোকে তাদের লক্ষ্য অভিমুখে সোজা ছোটে, যেমন শিং উঁচিয়ে ছোটে একটা উন্মত্ত ষাঁড়, আর তাকে একটা প্রস্তর-প্রাচীর ছাড়া আর কিছুই নিবৃত্ত করতে পারে না। (সেই রকম, এই সব লোক অর্থাৎ এই সব আত্মনির্ভর ও কাজের লোক ঐ প্রাচীরের কাছে পরাজিত হতে দ্বিধা করে না। তাদের কাছে দেওয়ালটা বাঁক ফিরবার পক্ষে একটা ওজর নয় [যেটা আমরা যারা চিন্তা করি এবং সেই কারণে কিছুই করি নে, তাদের পক্ষে ঘটে]; এটা রাস্তা থেকে সরে আসার ওজর নয় [এই যে ওজর, এটাতে সাধারণত কেউ বিশ্বাস করে না, কেউই না, কিন্তু তা সত্ত্বেও এর প্রতি মাথা নোয়ায়]। না, তারা এর সামনে এসেই থেমে পড়ে। তাদের কাছে এই প্রাচীর হলো একটা কিছু নির্বীর্যকারক, একটা কিছু ধর্মসম্মতরূপে শেষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, এমন কি দুর্বোধ্য কিছু।···আর প্রাচীর সম্বন্ধে পরে বলছি।) আমি এই ধরণের আত্মনির্ভর লোককে খাঁটি ও স্বাভাবিক মনে করতে পারি নে, যা তার স্নেহশীলা মা প্রকৃতি তাকে এ পৃথিবীতে এনে করতে চেয়েছিলেন। তবুও আমি তাকে আমার আক্রোশের সমস্ত শক্তি দিয়েই ঈর্ষা করি। সত্যি কথা, সে ভোঁতা—কিন্তু তা'হলে সকল স্বাভাবিক লোকই ভোঁতা। আর এ-ও বা আপনি কী করে বলেন যে, তার ভোঁতাপণা তার সকল শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যের একটা নয়? যা হোক, আমি প্রতিদিন আমার সন্দেহে আস্থাবান্ হচ্ছি যে, যদি সে স্বাভাবিক মানুষের বিপরীত হয়ে ওঠে, অর্থাৎ হয়ে ওঠে তীক্ষ্ণ চৈতন্যসম্পন্ন মানুষ, যে মানুষ প্রকৃতির গর্ভজাত নয়, যে রাসায়নিক বকযন্ত্র থেকে এসেছে (এটা যেনো একটু দুর্বোধ্যতার কাছে-পিঠে ঘেঁসে চলেছে—এ জিনিষটাতেও আমি সন্দেহ করি)—সেই বকযন্ত্র-জাত মানুষটি কখনো-সখনো এমন সচেতন বোধ করতে পারে যে, সে তার বিপরীত কাজের মানুষটির দ্বারা পরাজিত হয়েছে, যে, সে তার তীক্ষ্ণ চৈতন্যসম্পন্নতা সত্ত্বেও নিজেকে একটা মানুষ হিসেবে ভাবার চেয়ে ভাবছে একটা ইঁদুর। একটা অত্যন্ত চৈতন্যসম্পন্ন ইঁদুর, এইটেই সত্যি (ভাবছে সে মনে মনে), ইঁদুর ছাড়া কিছু নয়; অথচ অপর লোকটি হলো মানুষ, এবং সেই কারণে ইত্যাদি ইত্যাদি। সব কথা ছেড়ে দিলেও সে নিজেই—সেই চৈতন্যসম্পন্ন মানুষ—নিজেরই ইচ্ছে অনুযায়ী নিজেকেই ইঁদুর ভেবে আরাম পাবে। এই বিষয়ে আর কারো মতামত আহ্বান করবে না। এটা একটা দামী কথা। এর পরে দেখা যাক্ ইঁদুরের কার্যক্রম। উদাহরণ স্বরূপ ধরে নিলাম এই ইঁদুরটা অপমানিত হলো (আর এ প্রায়ই অপমানিত হয়), এবং তখন সে চাইবে প্রতিশোধ নিতে। সম্ভবত সে তার বুকের ভেতর প্রচণ্ড পরিমাণ অনিষ্টসাধন-প্রবৃত্তি পোষণ করবে স্বাভাবিক প্রকৃতিজাত মানুষের চেয়ে। হাঁ, অপরাধীর ওপর সমান ভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার নীচ হীন সামান্য ইচ্ছেটা এই ইঁদুরের বুকের মধ্যে এমন ভাবে বেড়ে ওঠে যা স্বাভাবিক প্রকৃতিজাত মানুষের মধ্যে হয় না; কারণ, শেষোক্ত লোকটির সহজাত ভোঁতাপণা প্রতিশোধ নেওয়াটাকে সাধারণ ন্যায্য আচরণ হিসেবে দেখতে বাধ্য করে, সে ক্ষেত্রে ইঁদুরটা তার অতিরিক্ত চৈতন্য দিয়ে সে-আচরণের অস্তিত্বটাকেই প্রায়শ অস্বীকার করে। সব শেষে ধবি সেই কাজটা—প্রতিশোধ নেওয়ার বাস্তবিক ঘটনাটা। ইত্যবসরে সেই হতভাগা ইঁদুরটা মূল অপমানটাকে আরো অনেক সন্দেহ, অবিশ্বাস জড়ো করে ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে ফেলেছে, মূল অপমানের সংগে আরো অনেক অমীমাংসিত অপমানের রশি বেঁধে দিয়েছে এমন করে, যাতে অনিচ্ছাকৃত ভাবে সৃষ্টি হয়েছে এক মারাত্মক জলাভূমি, এক পূতিগন্ধময় স্থান ভুল-বোঝাবুঝির, সহজ আবেগের; এবং তখন আশ-পাশের বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান আত্মনির্ভর ব্যক্তিরা, বিচারকরা, নেতারা থু-থু করছেন এবং ভরা-গলায় হাসতে হাসতে এই ক্ষুদ্র জীবটিকে বাহবা দিচ্ছেন। তখন স্বভাবতই ইঁদুরটির পক্ষে ছোট্ট থাবা তুলে বিকট ভংগী করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না, এবং অননুমোদনসূচক অবজ্ঞার হাসির প্রদর্শ-দেওয়া ছাড়া সে হাসিতে হাস্যকারী ব্যক্তির কোনো বিশ্বাস নিহিত নেই, এবং লজ্জাবনত

মুখে তখন গর্তে গিয়ে ঢুকতে হয়। সেখানে সেই নোংরা, পূতিগন্ধময় পাতালে আমাদের হতভাগ্য অপমানিত ভড়্‌কে-যাওয়া ইঁদুরটি ডুবে গেলো অবিশ্রান্ত ঈর্ষার শীতল উৎকটতায়। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে (সময়টা ঐ রকমই হবে) মনে মনে রোমন্থন করতে লাগলো খুব খুঁটিনাটি, খুবই লজ্জাকর জিইয়ে-রাখা অপমান এবং সাধারণত যা ঘটে, তার সংগে যোগ করতে লাগলো দফাওয়ারি ভাবে আরো লজ্জার বিষয়গুলোকে, আর এই ক'রে নিজের কল্পনায় নিজেকেই ব্যংগ করতে, বিপর্যস্ত করতে লাগলো। এ সব কল্পনায় সে নিজেই লজ্জিত হতো, তবু সে প্রত্যেকটি মনে করে রাখলো, ফাঁপাতে-ফোলাতে লাগলো, এবং যা ঘটেনি তা-ও কল্পনা করতে লাগলো এই ধারণায় যে, সে এক দিন প্রতিশোধ নেবে। এর ফলে এই সময়ের মধ্যে সে কিছুই ভুলে গেলো না। হয়ত বা এর মধ্যে প্রতিশোধ নেওয়ার চক্রান্তও ভেঁজে বস্‌লো; কিন্তু তা করলেও কাজ যা করা হলো সে ত' এখন-খানিক তখন-খানিক ভাবে, আড়ালে-আবডালে, ছদ্মবেশে এবং এই রকম একটা প্রণালীতে যে, পরিষ্কার বোঝা যায় ইঁদুরটির নিজেরও প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার ও চক্রান্তের শেষ সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েছে; কারণ আগে-ভাগেই সে জানে, প্রতিশোধ নেওয়ার এই দুর্বল প্রচেষ্টায় তার নিজেরই মাথার ওপর এসে পড়বে শত গুণ দুর্দশা—যার ওপর প্রতিশোধ নিতে চলেছে তার চেয়ে, তার গায়ে আঁচড়ও লাগবে না। হাঁ, ইঁদুরটি তার মৃত্যুশয্যায় শুয়েও সমস্তটা ঘটনা মনে করবে, আর করবে তা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ যোগ দিয়ে।

এখন, আমি যে অদ্ভুত আনন্দের কথা বলেছি, তার নিষ্কর্ষ নিহিত রয়েছে ঠিক এই তেজোহীন ঘৃণ্য অর্ধ-উন্মত্ততায়, এই অর্ধ আত্মবিশ্বাসের মধ্যে, চল্লিশ বছর ধরে সচেতন ভাবে নিজেকে এই পাতালপুরীতে কবরস্থ রাখার মধ্যে, নিজের অবস্থা থেকে পলায়ন করার স্বেচ্ছা-কল্পিত অথচ নির্জনে সন্দিগ্ধ এই অক্ষমতার মধ্যে, নিহিত রয়েছে এই অতৃপ্ত ইচ্ছার বিষের মধ্যে যে বিষ চিরকাল সেঁধিয়েছে ভেতরে, এই অস্থিরমতিত্বের ব্যাধিতে, যুগ-যুগ ধরে সংকল্প গ্রহণের ব্যাধিতে, আর এক লহমায় অনুশোচনার ভরে যাওয়ার ব্যাধিতে। এই আনন্দ এতো সূক্ষ্ম, এতো অনমুভূতিপ্রদ যে, অত্যন্ত মুষ্টিমেয় ক'জন বা যাদের মাত্র স্নায়ুতন্ত্রী শক্ত-সবল তারা এর একটুও গ্রহণ কর্‌তে পারে না। নির্বোধের মতো হেসে আপনি বল্‌তে পারেন, "আর সম্ভবত যারা মুখের ওপর ঘুষি খায়নি তারা অনুভব করতে পারবে না।" এর দ্বারা আপনি বোঝাতে চাইছেন যে, কোনো-না-কোনো সময়ে আমার জীবনে আমি অনতত্বো ঘুষি খেয়েছি এবং সেই কারণে বিজ্ঞজনের মতো বল্‌তে পারছি। হাঁ, আপনি যা ভাবছেন তা নিয়ে আমি বাজি ধরতে সাহস পাই নে। মুখের ওপর ঘুষি আমি একবার কখনো খাইনি, অবশ্য আমি পরোয়া করি নে এ-বিষয় নিয়ে কী আপনি ভাবছেন। আমার একমাত্র দুঃখ এই যে, আমার জীবনে কতো কম ঘুষির ব্যবহার করতে হয়েছে......। এ-কথার আলোচনা যথেষ্ট হয়েছে। আচ্ছা, এই যে বিষয়টা যাতে আপনি অপর্যাপ্ত আনন্দ পাচ্ছিলেন, তা নিয়ে আর কোনো কথা না বলি? আমি আগে যে শক্তিশালী লোকদের কথা বল্‌ছিলাম তাদের কথা আমাকে বলতে দিন, যারা সুখের উচ্চতর সুষমা কী বোঝেই না তাদের কথা।

ভালো লোকেরা অন্য সময়ে ষাঁড়ের মতো সজোরে চীৎকার করলেও (অবশ্য এটা আমরা স্বীকার করবোই যে, এতে তাদের অশেষ গৌরব লাভ হয়) অসম্ভবের মুখে এসে পড়লে একেবারে মূক হয়ে যাব। অসম্ভব বলতে আমি প্রস্তর-প্রাচীর বোঝাচ্ছি, যে-সম্বন্ধে আগেই বলেছি। আপনি বলছেন, কী এই প্রস্তর-প্রাচীর? কেনো, প্রস্তর-প্রাচীর হলো প্রাকৃতিক নিয়ম, জ্ঞানের সিদ্ধান্ত আর গাণিতিক বিজ্ঞান নিয়ে গঠিত। উদাহরণত, যখন এই ধরণের লোক আপনার কাছে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে যে আপনি বানরের বংশোদ্ভূত, আপনার মুখ-ভেংচানোর দরকার নেই; তারা যা বলছে আপনি সেইটে শুধু মেনে নেবেন। আবার, যখন তারা আপনার কাছে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে যে, আপনার কাছে আপনার মতো দেখতে শত-সহস্র লোকের দেহের চেয়ে আপনার নিজেরই চর্বি প্রয়োজনীয় এবং এই অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করে তথাকথিত ধর্ম, কর্তব্য ও অন্যান্য আবিষ্কার সমূহ অহেতুক ও সংস্কারজাত, তখন আপনি অবশ্যই তাদের বক্তব্য মেনে নেবেন এবং কোনো কিছু না-করার জন্যে মনটাকে তৈরী করে ফেলবেন, যেহেতু দু'য়ে আর দু'য়ে চার হওয়ার সূত্রটা অংকশাস্ত্রের। দেখুন, পারেন কি-না প্রতিকূল যুক্তি বের করতে!

এই সমস্ত লোকে চীৎকার করে বলে, "ক্ষমা করবেন আমাদের; কিন্তু, আমাদের বক্তব্যকে খণ্ডন করতে ত' আপনি পারবেন না; দু'য়ে আর দু'য়ে চার হবেই; প্রকৃতি এর জন্যে কোনো কৈফিয়ৎ দেবে না; আপনি তার আইন-কানুন মানেন আর না-ই মানেন, এ-বিষয়ে আপনার ইচ্ছে নিয়ে প্রকৃতি মাথা ঘামায় না। আপনার উচিত প্রকৃতিকে মেনে নেওয়া এবং তার সংগে তার সিদ্ধান্তগুলোকেও। প্রাচীর প্রাচীরই থাকবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি......

ধন্য ভগবান্! কি করবো আমি প্রকৃতির কানুন নিয়ে বা পাটিগণিত নিয়ে, যখন সব সময়ে দেখছি কানুন আর দু'য়ে-দু'য়ে চার হওয়ার সূত্র আমার গ্রহণ করার সংগে খাপ খাচ্ছে না? অবশ্য আমার প্রয়োজনীয় শক্তি না থাকলে প্রাচীরের গায়ে কপাল ঠুকতে আমি যাচ্ছি নে; তবু, আমি প্রাচীর অবধি ছুটে গেছি এবং ভেঙে ফেল্‌তে পারছি নে জেনেও আমি প্রাচীরটাকে স্বীকার করতে পারছি নে।

প্রাচীরটা সত্যিই একটা পূর্ণচ্ছেদ, সংগ্রাম শেষ করার একটা সংকেত, যেহেতু প্রাচীর ও দু'য়ে-দু'য়ে চার হওয়ার সূত্র একই? উঃ, নির্বুদ্ধিতার চেয়েও নির্বুদ্ধিতা! তার চেয়ে আমরা বরং সব কিছু হৃদয়ংগম করবো, করবো বিবেচনা সব কিছু—সকল অসম্ভবতা হৃদয়ংগম করবো, তাদের সম্মুখীন হবো, প্রতিটি প্রস্তর-প্রাচীরের। যদি আমরা মেনে নেওয়ার বিষয় না উপলব্ধি করি তাহ'লে কোনো অসম্ভবতা, কোনো প্রস্তর-প্রাচীর মেনে নেবো না; (সব চেয়ে অনিবার্য যুক্তি ও তর্কশাস্ত্রের সব চেয়ে অকাট্য সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও) যতোই কেনো হতভম্ব না-হয়ে-যাওয়ার ভাব দেখা যাক্, আমরা সনাতন সত্য লাভের চেষ্টা করবো, হয়ত তাতে প্রস্তর-প্রাচীর সম্বন্ধেও হতভম্ব হয়ে যেতে পারি; শেষত, এই কথাটা মেনে নিয়ে নিঃশব্দে তলিয়ে যাবো জড়ত্বের নিশ্চেষ্ট দশায়, আত্মসমর্পণের ভংগীতে মুখ বুঁজে আর হৃদয়ে কটু-মিষ্ট অনুভূতি নিয়ে,—সেখানে স্বপ্ন দেখবো যে, কেউ কারোর

ওপর যেন রাগ না করে, কারণ রাগের কারণ কখনও ঘটেনি, কখনও ঘটবেও না এবং কারণগুলো হয়েছে পরিবর্তিত, উল্টে-পাল্টে গেছে, একটার বদলে আর একটা এসেছে এবং মন থেকে অর্ধেক মুছে গেছে (যদিও কী ভাবে এবং কার দ্বারা সে-কথা কেউই ভাবে না, যদি-না প্রশ্নের রহস্যগুলো অ-সিদ্ধান্তপূর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকার জন্যে অজ্ঞাত কারণ ও পরিবর্তনগুলো কারো ক্রমাগত মাথা ধরিয়ে দেয়)।

৪

"হা-হা-হা! তা'হলে আমরা দেখছি দাঁতের যন্ত্রণাতেও আপনি আনন্দ খুঁজে পাবেন?" আমার আপনি এ কথা দাঁত বার করে বলতে পারেন।

"কিন্তু কেনো নয়?"—আমার উত্তর। "দাঁতের ব্যথাও আপনার প্রীতি সাধন করতে পারে। আমার নিজেরই একবার এক মাসের জন্যে ঘটেছিলো, তাই আমি জানি এর কী অর্থ। যখন এক জনের দাঁতের ব্যথা ধরে, তখন অবশ্য শান্ত হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকতে পারে না সে; যন্ত্রণায় সে চীৎকার করে। কিন্তু সে-ই চীৎকার অকপট নয়, চাপা বিদ্বেষের সংগে তা উচ্চারিত এবং সেই বিদ্বেষপূর্ণ অবস্থায় যে-কোনো জিনিষই তামাসা বলে মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই আর্তনাদ ত' দুঃখভোগীর আনন্দই প্রকাশ করে। যদি সে আনন্দ না পেতো, তা'হলে আর্তনাদ করতো না।"

হাঁ, আপনারা চমৎকার একটা বিষয়ের উল্লেখ করেছেন আমার কাছে, ভদ্রমহোদয়গণ, এবং আমি যথাশীঘ্র সেটা কাজে লাগাবো। ঐ আর্তনাদগুলো প্রথমত প্রকাশ করে, কারো নালিশের অপমানজনক ব্যর্থতা, প্রকৃতির বিধিসিদ্ধ অত্যাচার যা সে ঘৃণা করে কিন্তু যা তাকে ভোগ করতেই হবে, প্রকৃতি কিন্তু করে না। তারা আরও প্রকাশ করে একটা সত্যার্থ যে, সেই সময়ে ওই ব্যথা ছাড়া তারা আর কোনো শত্রু নেই; সত্যার্থ যে, লোকে একেবারেই দাঁতের দয়ার ওপর নির্ভরশীল; একটা সত্যার্থ যে, ভগবান্ এমনি একটা অবস্থায় বসে রয়েছেন যে, সেখান থেকে তিনি হয় ইচ্ছে করতে পারেন আপনাদের দাঁতের ব্যথা এই মুহূর্তেই বন্ধ হয়ে যাক, বা আরো তিন মাস ধরে এই ব্যথা চলতে থাকুক; এবং শেষত, সত্যার্থ হলো এই যে, যদি অবস্থাটাকে না মেনে নিয়ে উল্টে আপনারা তার প্রতিবাদ করেন, তা'হলে আপনাদের একমাত্র করণীয় হলো, হয় আপনারা গলা কেটে ফেলুন, নয় ত আপনাদের ঘরের দেয়ালের গায়ে জোরে জোরে খুব জোরে ঘুষি মারতে থাকুন, যেহেতু এ ছাড়া আপনাদের কিছু করার নেই। এখন, এই সমস্ত আত্ম-অবমাননা, আত্ম-উপহাস শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায় এমন আনন্দ-উপভোগের দিকে, যে আনন্দ-উপভোগ ইন্দ্রিয়-বিলাসিতার সর্বোচ্চ শিখরে টেনে তোলে। ভদ্রমহোদয়গণ, উনবিংশ শতাব্দীর এক জন সুসভ্য ব্যক্তির দাঁতের ব্যথার কষ্ট পাওয়ার আর্তনাদ শোনার প্রথম সুযোগ গ্রহণ করেছি বলে মাফ চাইছি। কিন্তু তার এই ব্যাধির দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, প্রথম দিনের থেকে একেবারে অন্য রকম ভাবে সে আর্তনাদ করতে সুরু করেছে (তখন সে আর্তনাদ করতো যন্ত্রণারই জন্যে); এখন সে অসভ্য চাষার মতো আর্তনাদ করতে সুরু করেনি, করেছে য়ুরোপীয় প্রগতি ও সভ্যতার স্পর্শ-পাওয়া একটা লোকের মতো; সুরু করেছে আর্তনাদ করতে তেমন একটা লোকের মতো, যে কি-না "মৃত্তিকা এবং ইতরজনোচিত নীতি-তন্ত্র হইতে পৃথক্" (অধুনা-প্রচলিত শব্দসমষ্টি ব্যবহার করলাম)। আর, ইত্যবসরে তার আর্তনাদ হয়ে উঠেছে বিদ্বেষসম্ভূত ও নীচ ক্রোধপরায়ণতায় ভরা। এবং যে সারা দিন সারা রাত ধরে এক নাগাড়ে আর্তনাদ করে চললেও কিন্তু তার এই চীৎকারের দ্বারা তার নিজের কোনো উপকারই হবে না, বরং বৃথাই সে নিজেকে এবং আর পাঁচ জনকে ক্রুদ্ধ, বিরক্ত করে তুলবে। অন্য কারোর চেয়ে সে নিজেই বেশ ওয়াকিবহাল যে, তার পরিবার এবং অন্য পাঁচ জন যাদের সামনে সে ঐ রকম করছে তারা এতোক্ষণ বিরক্তির সংগেই তার আর্তনাদ শুনছে; তারা তাকে ভাবছে একটা পাকা বদমায়েস্ এবং তাদের মতে তার উচিত ছিল নিতান্ত সাধারণ ভাবে আর্তনাদ করা (অর্থাৎ এই রকম বিশেষ ভাব-ভংগী না করে), কারণ তার বর্তমানের আর্তনাদ করার ঢং ক্রোধ থেকেই উৎপন্ন এবং নেহাৎ ঈর্ষ্যার বশবর্তী হয়ে সে এই রকম বোকামিপণার দিক ঠেলে দিচ্ছে নিজেকে। এখন, এই সব আত্ম-বিজ্ঞাপন, অপরের প্রতি এই অপমান, এ জিনিযটে নির্দেশ করে একটা ইন্দ্রিয়বিলাসজাত আনন্দের। আপনি বলতে পারেন আপনার বন্ধুদের, "আমি আপনাদের বিরক্ত করছি, আপনাদের চিত্তবিভ্রান্তি ঘটাচ্ছি এবং আপনাদের বাড়ীর সবাইয়ের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি। ভালো কথা। দোহাই আপনারা ঘুমোবেন না। আমার যে দাঁতের যন্ত্রণা হচ্ছে এইটের দিকে সকলে সর্বদা নেকনজর দিন। আমি আগে যে নিজেকে মহাপুরুষ ভাবতাম, তা এখন নই, এখন আমি দশ জনের বালাই। ভালো কথা; তাই-ই হোক। খুশী হলাম আপনারা আমার স্বরূপ চিনতে পেরেছেন দেখে। আপনারা কি আমার এই বদমায়েসী আর্তনাদ শুনতে অপছন্দ করেন? তা'হলে তাই হোক, এবং আমি আরো এই রকম নারকীয় ভংগী-রংগী করতে থাকি। এখন বুঝতে পেরেছেন, ভদ্রমহোদয়গণ? না, আমি বাজি রেখে বলছি, পারেননি। বো[illegible] যাচ্ছে, আমি যে আনন্দের কথা বললাম তার সব কিছু খুঁটিনা[illegible] বোঝাতে গেলে আরো কিছু বলা, ব্যাখ্যা করা দরকার। হাসছেন? তা'হলেই আমি খুশী। যদি আমার এই ঠাট্টা-তামাসা বদ[illegible] অসভ্যতা, বাজে হেঁয়ালী বলে মনে হয় তা'হলে বুঝতে হবে আ[illegible] আত্মসম্মান জ্ঞান নেই। বাস্তবিক, কোন্ চৈতন্যসম্পন্ন মানু[illegible] আত্মসম্মান জ্ঞান আছে?

[ক্রমশঃ

অনুবাদ: আনন্দ [illegible]

মুলুকচাঁদের বিচার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

৺মনোমোহন ঘোষ

সাক্ষী নং আট

ডাঃ ব্রাগারের জবানবন্দী। বয়স প্রায়······বৎসর। আজ ১৮৮২, ১৬ই মে তারিখে, নদীয়ার দায়রা জজ পি ডিকেন্স, আমার এজলাসে শপথ পাঠান্তে গৃহীত :—

আমি নদীয়ার সিভিল সার্জ্জন। এই ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাঠ করেছি ও বিচার করে দেখেছি। লাসের আকৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষক যা লিপিবদ্ধ করেছেন, শড়কীর আঘাতে ক্ষতের ফলে মৃত্যুর সঙ্গে তার সামঞ্জস্য আছে। এক ইঞ্চ গভীর ক্ষতের ফলে যকৃত ফেটে মৃত্যু হয়, আমার এই মত। এতে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু না-ও হতে পারে, তবে shockএর ফলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হতে পারে। আসামীর ওজনের একটা মানুষ যদি একটা সামান্ত শিশুর গলায় পা দেয়, তা মৃত্যু ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট। মাত্র চাপের ফলে দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু হবে। আমার এই মত যে, আঘাতের ফলে অবিলম্বে মৃত্যু হয়েছে, গলায় চাপও আংশিক কণ্ঠরোধের সঙ্গেও সামঞ্জস্যহীন নয়। বেয়নেট বা শড়কীর আঘাতের ফলে দেহে একটা খিঁচুনির লক্ষণ দেখা যায়, এই নিয়ম। কিন্তু, যদি কণ্ঠরোধ হয়ে থাকে বা হয়ে পড়ে, তা'হলে, মাত্র শড়কীর আঘাতে মৃত্যুতে দেহের যে বিকৃতি হয়, তা ঘটাবার পক্ষে দেহের শক্তি তেমন থাকে না।

বাইরে যে রক্তক্ষরণ হয়নি তা আমি এই ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। যদি কণ্ঠরোধ ও শড়কীর আঘাত এই দুই কারণে মৃত্যু হয়, তা'হলে শ্বাস বন্ধের ফলে ধমনীতন্ত্রটা আংশিক অকর্ম্মণ্য হওয়ায় রক্ত বেশী দূর বাইরে বের করে দিতে পারে না। মাত্র শড়কীর আঘাতে মৃত্যু হলে রক্ত বাইরে বের হতে পারত। ভিতরে ভিতরে রক্তক্ষরণের ব্যাখ্যা এই ভাবে করা যায়। হৃদযন্ত্রের ভেনট্রিকলগুলি খালি ছিল, রিপোর্টে বলা হয়েছে। কাজেই রক্তক্ষরণ supervened হয়েছিল! রক্তক্ষরণ নিশ্চয় ভিতরে ভিতরে হয়েছিল।

জুরীদের প্রশ্নের উত্তরে—ক্ষতের ধার যদি হাঁ করা থাকে, তা'হলে বলা হবে যে, প্রাণ সম্পূর্ণ বেরিয়ে যাবার আগেই আঘাত করা হয়েছিল।

স্বাঃ পি ডিকেন্স।

একজিবিট ঘ

আসামীর জবানবন্দী

ছোট আদালতে

১৮৮২, ৩১শে মার্চ্চ বনগাঁর ১ম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, গোপালচন্দ্র মুখার্জ্জি, আমার এজলাসে মুলুকচাঁদ চৌকীদারের এই জবানবন্দী লওয়া হয়। মুলুকচাঁদের বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর—

আমার নাম মুলুকচাঁদ চৌকীদার। পিতার নাম আশরফ সর্দ্দার। জাতি মুসলমান। পেশা চৌকীদারী। সাকিন মৌজা ভুলাৎ।

প্রঃ—তোমার মেয়ে নেকজানকে তুমি খুন করেছ?

উঃ—না, আমি তাকে খুন করিনি।

প্রঃ—কোন্ তারিখে, কোন্ সময় সে মারা যায়?

উঃ—মঙ্গলবার ভোর বেলা আমার পেঁয়াজ ক্ষেত দেখতে গেছলাম। ঘরে দুই মেয়েই ছিল, আর কেউ না। সোমবার বিকেল বেলা বৌ গেছল গোগার। মাঠ থেকে ফিরে দেখি, আমার বড় মেয়ে নেকজান বিছানা থেকে একটু দূরে পড়ে আছে। ডাকলাম, সাড়া দিল না। গায়ে ধাক্কা দিলাম, নড়ল না। দিনের আলো ফুটতেই দেখলাম আঘাতের ক্ষত। দেখলাম মরে গেছে। মেয়ে গোলকজান ঘুমুচ্ছে। কেঁদে উঠলাম। চার-ছয় দণ্ড বেলায় থানায় যাচ্ছিলাম, পথে পিয়াদা আমায় গ্রেপ্তার করল। কদম আলী ফকীর মামলা করে আমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করিয়ে নিয়েছিল।

প্রঃ—এর পর কখন থানায় গেলে?

উঃ—দুপুর গড়ে গেলে। থানায় গিয়ে দারোগাকে সব কথা বললাম।

প্রঃ—তোমার বাড়ী থেকে থানা কদ্দুর?

উঃ—চার, সাড়ে চার ক্রোশ হবে।

প্রঃ—মেয়েদের রেখে কখন মাঠে গেলে?

উঃ—এক প্রহর রাত থাকতে।

প্রঃ—বৌকে ঘর থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিলে কেন ?

উঃ—টাকা আনতে, আমার নামে যে মামলা চলছিল তার খরচার জন্তে।

প্রঃ—এই শড়কী তোমার ?

উঃ—আজ্ঞে।

প্রঃ—দেখে মনে হয় ঘসে ফেলা হয়েছে, কেন বলতে পার ?

উঃ—বলতে ত পারি নে, আমি ঘঁসিনি। মাঠে যাবার সময় এ আমি নিয়ে যাইনি। লাঠি নিয়ে গেছলাম।

প্রঃ—যখন মাঠে যাও বা বেঁদে বের হও, তখন শড়কী নিয়ে যাও, না লাঠি ?

উঃ—কখনো শড়কী, কখনো লাঠি।

প্রঃ—তোমার মেয়েকে কে খুন করেছে সন্দেহ কর ?

উঃ—কাউকে ত খুন করতে চোখে দেখিনি, কাজেই কারুর উপর সন্দেহ হয়নি। তবে কদম আলি ফকীর আর মিরণের সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে।

প্রঃ—তোমার শড়কী ক'খানা ?

উঃ—মাত্র এইখানা, আর একখানি মিথ্যে করে আদালতে দাখিল করা হয়েছে।

প্রঃ—মেয়ের গায়ে কোন গয়না ছিল ?

উঃ—না।

দায়রা আদালতে

১৮৮২, ১৬ই মে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩৪৬ ধারা অনুসারে নদীয়ার দায়রা জজ মিঃ ডিকেন্স কর্তৃক গৃহীত—

আমার নাম মুলুকচাঁদ চৌকীদার। আমার বাবার নাম আশরফ চৌকীদার। জাতিতে মুসলমান। সাকিন গোগা, থানা শরষা। হাল সাকিম ভুলাৎ।

প্রঃ—তুমি দোষী, না নির্দ্দোষ ?

উঃ—আমি দোষী নই।

প্রঃ—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এই জবানবন্দী দিয়েছিলে ? ঠিক আছে ? [একজিবিট ঘ, পড়ে শুনান হইল]

উঃ—হাঁ, এ জবানবন্দী আমি করেছি, ঠিক আছে।

প্রঃ—গোগায় নিজে না গিয়ে, বৌকে পাঠিয়েছিলে কেন ?

উঃ—পুলিশ আমার গাঁয়ে দেখতে না পেয়ে মার-ধর করবে এই ভয়ে যাইনি।

প্রঃ—দিনের বেলায় কেন গেলে না ?

উঃ—ওরা (গোগায় আমার আত্মীয়রা) দিনের বেলা ঘরে থাকে না, কাজে যায়, মাঠে যায়। তাই দিনে যাইনি।

প্রঃ—তুমি বলছ, রাতে মাঠ থেকে ফিরে দেখলে, তোমার মেয়ে বিছানা থেকে কিছু দূরে পড়ে আছে, দিন হতেই তুমি প্রতিবেশীদের ডাকলে। এসে যখন দেখলে তখনই বাতি জ্বালালে না কেন ? চুপ করে না থেকে তখন তখনই প্রতিবেশীদের ডাকলে না কেন ?

উঃ—মাঠ থেকে ফিরে মেয়েকে দেখবা মাত্রই আমি প্রতিবেশীদের ডেকেছিলাম।

প্রঃ—মেয়েকে সাপে কামড়ে মেরেছে, এ কথা গ্রামের পঞ্চায়েৎ আর থানায় পুলিশের কাছে বলেছিলে ?

উঃ—হাঁ, বলেছিলাম। প্রতিবেশীরা বলছে আমার মেয়েকে সাপে কামড়ে মেরেছে।

প্রঃ—কোন সাক্ষী মানবে ?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—তারা কি প্রমাণ করবে ?

উঃ—সাপে কামড়ের কথা যে তারা বলেছে এই কথাই তারা বলবে।

পি, ডিকেন্স,
দায়রা জজ

[আসামী আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিন জন প্রতিবেশীকে সাক্ষী মানে। সাক্ষীরা বলে যে, শিশু কি করে মরল সে সম্বন্ধে তারা কিছু জানে না। তবে তারা গ্রামে এ কথা শুনেছে যে, মেয়েটিকে সাপে কামড়ে মেরেছে।]

জুরীদের প্রতি জজ

জেণ্টলমেন অব দি জুরী (জুরী ভদ্রমহোদয়গণ),—আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ। সে তার নিজের মেয়ে, ১ বছরের ছোট্ট মেয়েকে খুন করেছে। এখানে আইনের এমন কোন সমস্যা নেই, যার ব্যাখ্যা শুনতে আপনাদের আমি সময় দিতে বলব। আসামী যে অভিযোগে অভিযুক্ত, আপনারা যদি সিদ্ধান্ত করে থাকেন যে, সত্যি সে অপরাধ করেছে, তা'হলে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে সে যে হত্যার অপরাধে অপরাধী, এ মত আপনাদের ব্যক্ত করতে হবে। হে ভদ্রমহোদয়গণ, তা'হলে আপনাদের বিচারের বিষয় হ'ল, এই বাস্তব ঘটনা—আসামীর বিরুদ্ধে নিজের কন্যাকে হত্যার যে অভিযোগ আনা হয়েছে—তা কি সত্যি ?

আত্মপক্ষ সমর্থনে আসামী নির্ভর করেছে হত্যার উদ্দেশ্যের উপর—আমারই মেয়েকে আমি কেন খুন করতে যাব ? কিন্তু মতলব এই দেখান হয়েছে যে, আসামীর সঙ্গে কদম আলি ফকীর নামে এক জনের শত্রুতা, সে তার বিরুদ্ধে এক ফৌজদারী অভিযোগ করেছে (তা ব্যাভিচার, না, তার স্ত্রীকে বের করে নিয়ে যাওয়া, বলা হয়নি)। এ মামলার বিচার আসন্ন। হয় এই শত্রুকে জড়িত করবার জন্তে, অথবা নিজকে বাঁচিয়ে মামলার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্তে সে তার নিজের সন্তানকে হত্যা করেছে। মতলবটা সংক্ষেপে, কতকটা প্রতিহিংসা সাধন, কতকটা আত্মরক্ষা। নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, আদালতে আসামীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা উঠবার তারিখ ছিল ২৭শে মার্চ। এখন অপরাধের গুরুত্বে অভিভূত হয়ে, তার সংঘটন সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ দাখিল করা হয়েছে সেগুলোর বিচার-বিবেচনাকে হাল্কা করা চলবে না। অপরাধের গুরুত্বের সঙ্গে তুলনা করে, আপাতদৃষ্টিতে যাকে উদ্দেশ্যের অভাব বলা হচ্ছে, তার ভাবপ্রবণতাও আপনাদের সুবিবেচনাকে যেন আকৃষ্ট করে না ফেলে। প্রথমটার সম্বন্ধে বাদী পক্ষকে বাধ্য করা চলে না। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে আপনাদের এ ক' আমি বলব যে, বাদী পক্ষ, উদ্দেশ্য বা মতলব কি, তা প্রমাণ করতে বাধ্য নন। আসামী সত্যি অপরাধ করেছে কি না নিঃসন্দি' তা প্রমাণ যদি তাঁরা করতে পারেন তবেই যথেষ্ট। [এখা'

এক নজীর পাঠ করা হয়] বাদী পক্ষ এক উদ্দেশ্যের কথা বলে দেখিয়েছেন আসন্ন বিপদের একটা চাপ আসামীর ছিল। একটা গুরুতর ফৌজদারী অপরাধ তাকে অপ্রমাণ করতে হবে, অথচ হাতে টাকা নেই। এই উদ্দেশ্য কত দূর উপযুক্ত তা আপনারা বিবেচনা করে দেখবেন। কিন্তু আইনতঃ বাদী পক্ষের এটা অবশ্য প্রমাণ করবার বিষয় নয়।

প্রথমে বাদী পক্ষকে ডাক্তারী সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করতে হবে যে, হত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, বাদী পক্ষকে আপনাদের মনে এমন ন্যায় বিশ্বাস উৎপাদন করিয়ে দিতে হবে যে, আসামীই সেই হত্যা-কর্ম্ম করেছে। সর্ব্বোত্তম সাক্ষী-সাবুদ দিয়ে এই দুইটি বিষয় প্রমাণ করা বাদী পক্ষের কর্ত্তব্য। যদি যথাসম্ভব সর্ব্বোত্তম সাক্ষী-সাবুদ দিয়ে বাদী পক্ষ আপনাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করিয়ে দিতে পেরে থাকেন যে, আপনাদের নিজেদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এরূপ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে আপনারা প্রত্যেকে কাজ করতে পারেন, তা'হলে হত্যার উদ্দেশ্যের উপযুক্ততার কাল্পনিক অংশের সংশয় সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য বিবেচনা করতে আপনারা ইতস্ততঃ করবেন না। পিতা নিজের সন্তানকে হত্যা করছে, এ অবশ্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও অত্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার ; কিন্তু এ কথা আরও ভয়ঙ্কর ও অসম্ভব যে স্ত্রী, সন্তান, আর প্রতিবেশীরা ইচ্ছা করে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে একটা মানুষের মৃত্যুদণ্ড দেওয়াবে। আপনারা দুই দারুণ অসম্ভব ব্যাপারের সম্মুখীন। বুদ্ধি-বিবেচনার বিধি অনুসারে এই দুইএর একটি নিশ্চয় সত্য। হয় শিশুর কথা সত্য, নয় সে মিথ্যা বলছে। যদি শিশু সত্য কথা বলে থাকে তবে তার বাবা অপরাধী। যদি শিশু সত্য না বলে থাকে, তা'হলে ইচ্ছা করে মিথ্যা বলে সে তার পিতৃ-জীবন নাশ করবে। তার পর শিশুর মা, তার মাসী, তার প্রতিবেশীরা এই ষড়যন্ত্রে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়ে থাকবে। এই দুই সম্ভাবনার যেটিই আপনারা গ্রহণ করবেন, তাতেই চলতি অভিজ্ঞতা, চলতি সম্ভাবনাবোধের অদ্ভুত নড়চড় হবে—হয়ত মনে হবে, এ কখনও হয়নি, কখন হতে পারে না। তবু বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, দুইটি সম্ভাবনার একটি সত্য হবেই হবে।

সাক্ষ্য-প্রমাণের কথা ছেড়ে দিলে—হত্যার জন্ম হত্যা—আপনাদের বেছে নিতে হবে লঘুতরটি।

কিন্তু আপনাদের সামনে প্রমাণ-প্রয়োগ উপস্থিত করা হয়েছে। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে আসামী অপরাধী বা অপরাধ এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করতে আপনারা বাধ্য। কাজেই 'পরবিরোধী সম্ভাবনা এবং মতলব সম্বন্ধে দুর্ভেদ্য রহস্যের কল্পনার কথা ছেড়ে দিয়ে আপনাদের কর্ত্তব্য হবে এই মামলার পক্ষ প্রমাণ পরীক্ষা করে দেখা। ডাক্তারী প্রমাণ এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনাচক্রের প্রমাণের সঙ্গে এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের সঙ্গতি আছে কি না তাও দেখতে হবে। এই সব বাইরের পাল্লা দিয়ে যেমন সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অর্থাৎ বালিকা বালকের সাক্ষ্যের, সত্যাসত্যের যাচাই করতে হবে আপনাদের, তেমন তা যাচাই করতে হবে মনের প্রমাণ—হাব-ভাবের মাধ্যমে। যে ভাবে শিশুটি সাক্ষ্য দিয়েছে যদি তাতে আপনাদের দাগ লেগে থাকে, যদি আপনারা সিদ্ধান্ত করতে পেরে

থাকেন যে, যে ঢং-এ গোলক ঘটনার বর্ণনা করেছে তা শেখান বুলি নয়, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, যদি আপনারা বুঝতে পেরে থাকেন যে, তার কথাকে সমর্থন করছে অন্ত সাক্ষীরা, যদি এর সঙ্গে ডাক্তারী প্রমাণের, আর বাদী পক্ষ যে আনুসঙ্গিক অবস্থার উপর নির্ভর করছে, তারও সমর্থন আছে বুঝে থাকেন, তা'হলে আসামীকে সাজা দেবার পক্ষে শিশুর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য আইনতঃ যথেষ্ট। আইন এর চাইতে আর বেশী চায় না। যদি আপনাদের মনোমত অপর প্রমাণ দ্বারা এ প্রমাণ সমর্থিত হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন তাহ'লে এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে আসামীকে দণ্ডিত করতে আপনাদের ইতস্ততঃ করবার কোন কারণ থাকতে পারে না।

বলেছি, অপর প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত, কারণ আইনতঃ অপর প্রমাণের সমর্থনের প্রয়োজন না হ'লেও, অপর প্রমাণের অকাট্য সমর্থন না পেলে, ঐ বয়সের একটা শিশুর কথা মেনে নিতে আপনাদের পরামর্শ আমি দিতে পারি না। চোখে সত্যি যা দেখেছে তা যথাযথ স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করবার পক্ষে যথেষ্ট বুদ্ধি যে ৬।৭ বছর বয়সের শিশুর—বিশেষতঃ এ দেশের শিশুর আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আসামী পক্ষ এক রকম স্বীকারই করেছে যে, শিশুটি সাক্ষী দেবার পক্ষে উপযুক্ত, আর উপযুক্ত বলেই সে শেখান সাক্ষী। যে দৃশ্য সে নিজে কখন চোখে দেখেনি, আপনাদের মত শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ভদ্রমহোদয়গণকে প্রভাবিত করবার মত স্বাভাবিক ভাবে সে দৃশ্যের সম্পূর্ণ মিথ্যা বিবরণ দেবার মত বুদ্ধি যদি এই শিশুর থেকে থাকে, তা'হলে, সত্যি যা নিজের চোখে দেখেছে, তার বর্ণন করবার শক্তিও তার আছে বলতে হবে। তা'হলে কথা হ'ল এই যে, যদি মেনে নেওয়া যায় যে, শিশু শেখান-পড়ান সাক্ষী, তা'হলে সে যে সাক্ষী দেবার পক্ষে অনুপযুক্ত, এ যুক্তি অর্থহীন। আমি কিন্তু কতকটা দীর্ঘ দিনের ফৌজদারী মামলার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, ভারতে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা চোখে দেখা ঘটনা বেশ যথাযথ স্পষ্ট ভাবে বর্ণন করতে পারে, অবশ্য ঘটনা এমন স্পষ্ট হওয়া চাই যাতে তাদের মনে দাগ লেগে থাকে। এই মামলার সকল সত্যের বিচার করবেন মাত্র আপনারা। মেয়েটির সাক্ষ্যে যে গুরু বা লঘু মূল্য দিবেন তার পক্ষে আমার মত আপনারা গ্রহণ যেন না করেন।

[এখানে গোলকের জবানবন্দী পড়ে শুনান হয়]

এই বালিকার জবানবন্দী আপনাদের নিকট উপস্থিত করছি। এইবার অন্যান্য প্রমাণের উল্লেখ করে নিম্নবিষয়গুলি সম্বন্ধে আপনাদের সিদ্ধান্ত কি তা জানতে চাইব—

১। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে ডাক্তারী প্রমাণ বালিকার কথাকে সমর্থন করে কি না ?

২। অন্যান্য মৌখিক প্রমাণ যা গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলি বালিকার কথাকে সমর্থন করে কি না ?

৩। পারিপার্শ্বিক প্রমাণ, বিশেষ করে সাক্ষীর আচরণ, বালিকার প্রমাণকে সমর্থন করে কি না ?

[এখানে ডাঃ ব্রাণ্ডারের জবানবন্দী পাঠ করা হয়]

এই সাক্ষ্য এবং নেটিভ ডাক্তারের যে জবানবন্দী আপনারা শুনেছেন, তাতে ভগিনীর মৃত্যু কি ভাবে ঘটেছিল তার সম্বন্ধে বালিকাটির কথা খুবই সুস্পষ্ট ভাবে সমর্থন করা হয়েছে। ডাঃ ব্রাণ্ডার একে বলেছেন, মৃত্যুর মিশ্রিত কারণ—অর্থাৎ মৃত্যু ঘটবার জন্য দুই পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল। বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় যে, রক্তক্ষরণ হয়নি এ কথা সব সাক্ষীই বলেছে। অবশ্য এ-ও হতে পারে যে, দেহটি প্রথম দেখবার আগেই আসামী যে এক-আধটু রক্তের দাগ ছিল, তা সরিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু রক্ত না থাকবার যথেষ্ট হেতু মনে হয় ডাক্তারী সাক্ষ্যে দেখান হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বা আঘাতের পূর্ব্বে কণ্ঠরোধ হয় ও ভিতরে ভিতরে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। দেহ যে অবস্থায় ছিল, এবং পেটের ঠিক উপরটার আঘাতের যে অবস্থা ছিল, তা ভিতরে ভিতরে রক্তক্ষরণ সমর্থন করে। কিন্তু বাইরে রক্তক্ষরণের অভাব এবং ক্ষতের অত্যন্ত কম গভীরতা, শিশুর জবানবন্দীকে ভাল করে সমর্থন করেছে বলেই আমার কাছে মনে হয়েছে। আসামী যদি হত্যা না করে থাকে, তা'হলে হত্যা নিশ্চয় করে থাকবে বাইরের কেউ, কোন শত্রু। শিশুর গায়ে কোন অলঙ্কার ছিল না। বাইরের কেউ যদি হত্যা করে থাকে, আর হত্যা করবার জন্যে শড়কী ব্যবহার করে থাকে, সে তা'হলে খুব সম্ভব জোরে গভীর ভাবে শড়কী বিদ্ধ করে তাড়াতাড়ি তা টেনে বের করে নিত। এ স্থলে দুই ব্যাপার ঘটত—(১) রক্তক্ষরণ হ'ত ও (২) ক্ষত আরও গভীর হ'ত। যদি একটা ভারী মানুষ গলায় পা দিয়ে চাপবার ফলে মৃত্যু হয়ে থাকে, যদি তাতে আংশিক বা সম্পূর্ণ দম বন্ধ হয়ে থাকে, আর সেই সময় আস্তে ইচ্ছে করে শড়কী ঢুকিয়ে দিয়ে (হত্যার উদ্দেশ্যে নয়, বাইরের কেউ হত্যা করেছে এ দেখাবার জন্যে) তা ধীরে টেনে বের করে নিয়ে থাকে, তা'হলে রক্তক্ষরণের অভাব, রক্তের দাগের অভাব ও ক্ষতের অগভীরতা বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়। কাজেই এখানে সর্ব্ব সন্দেহের অতীত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ শিশুর সাক্ষ্য সমর্থন করছে। সাজান গল্পের রচনা যারা করেছিল, তারা এ প্রমাণ যে রয়ে গেল তা আগে থেকে দেখতে পায়নি।

বালিকার বর্ণিত কাহিনীর সত্যতা প্রমাণের জন্য যে সকল প্রত্যক্ষ মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে, এইবার আমি সেগুলোর কথা বলব।

[এখানে হারু, খিরু ও বরাতির জবানবন্দী জুরীদের সামনে উপস্থিত করা হয়]

এই সব সাক্ষী একবাক্যে বলেছে, বালিকাটি ২৮শে মার্চ্চ প্রাতে পুলিশ গ্রামের কাছে-ভিতে আসবার ঢের আগে একই কাহিনী ব্যক্ত করেছিল। এ সব সাক্ষী যদি সত্য বলে থাকে, তা'হলে তাদের সাক্ষ্য বালিকার কাহিনীর যথাসম্ভব সর্ব্বোত্তম অনুমোদন বলতে হবে। যদি বালিকা শেখান-পড়ান সাক্ষ্য দিয়ে থাকে, তা'হলে বলতে হবে, তার জবানবন্দী সমর্থন করবার জন্য এ সব সাক্ষীকেও শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল। এ সব সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার করে সেগুলো বিশ্বাসযোগ্য কি না তা আপনারা বিচার করবেন। কোথায় কথা হয়েছিল, তা নিয়ে হারু ও বালিকার জবানবন্দীর মধ্যে ফারাক দেখা যায়। বালিকা বলে, উঠানে কথা হয়েছিল, আর এই স্ত্রীলোকটি বলছে বারান্দায় গোলকমণি বসেছিল। এ খুবই তুচ্ছ। এ কথা ঠিকই যে, স্ত্রীলোকটি উঠানে ছিল। মায়ের সাক্ষ্য সম্বন্ধে আরও কিছু বলব, এখন নয়, পরে। এইবার প্রমাণের তৃতীয় অংশে আসা যাক—এই অংশের উপর বাদী পক্ষ নির্ভর করেছে।

প্রথম শড়কীর কথা। যে শড়কী দাখিল করা হয়েছে তা যে আসামীর, তা স্বীকার করা হয়েছে। এ কথা সন্দেহ করবার কিছুমাত্র কারণ নাই যে, যে-ই হত্যা করে থাকুক এই শড়কী দিয়েই করেছে। যদি তা না হ'ত তবে (ধরে নেওয়া গেল আসামী নিরপরাধ) কেন পঞ্চায়েৎকে দেখাবার জন্য বাইরে ফেলে রাখা হয়েছিল? যে-ই খুন করে থাকুক, শড়কী দিয়েই হত্যা করা হয়েছে, এ কথা ধরে নিলে বালিকার কথা অর্থাৎ হত্যাকারী তার নিজের শড়কী ব্যবহার করেছিল অথবা অপর অনুমান যে, এক জন বাইরের হত্যাকারী আসামীর শড়কী ব্যবহার করেছিল—এই দুই অনুমানের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। সবাই বলেছে, রাত ছিল অন্ধকার। এ-ও প্রমাণিত হয়েছে, শড়কী সাধারণতঃ রাখা হ'ত বারান্দার চালায়। এখানে রাতের অন্ধকার আরও গভীর ছিল। যদি কেউ এক প্রতিবেশীর সন্তানকে হত্যা করবার সঙ্কল্প নিয়ে অন্ধকার রাত্রিতে আসে, সে কি খালি হাতে আসে? আপনার কার্য্যসিদ্ধির জন্যে একটা লাঠি, একটা দা বা একটা শড়কী কি সে সঙ্গে আনে না? আসামী পক্ষের কথা সমর্থন করতে হলে বলতে হয় যে, বাইরের লোক এসেছিল, তাদের হাতে হয় কিছু ছিল না, নয় যে হাতিয়ার তারা সঙ্গে এনেছিল, তা তারা ব্যবহার করেনি। আবার, শড়কীগাছা ঘরের চালে রাখা ছিল। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে বলতে হবে, বাইরের যে লোক এসেছিল তার হয় ঘরের সব-কিছু জানা ছিল, অথবা জানা ছিল না। যদি জানা না থাকে, তবে অন্ধকারে শড়কীর সন্ধান তার না পাবারই সম্ভাবনা। যদি জানা থাকে, তা'হলে শড়কী ঘরেই মিলবে এই বিশ্বাস নিয়ে সে যে খালি হাতে এসেছিল এ খুবই অসম্ভব। আসামী বলেছে যে, রাত্রিতে বাড়ী থেকে বেরোবার সময় সাধারণতঃ সে শড়কী হাতে নিয়ে যায়। বাইরের কেউ যদি খুন করতে এসে থাকে, সে নিশ্চয় আসামী যখন ঘরে ছিল না তখনই এসে থাকবে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে, এবং তা বালিকার বলা কাহিনীর সঙ্গে মেলে। যে হাতিয়ার দিয়ে মৃত্যু ঘটান হয়েছে তা আসামীর কাছেই ছিল, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। নিজের কোন অস্ত্র সঙ্গে না এনে বাইরের কোন খুনী এই হাতিয়ারই ব্যবহার করবার মতলব নিয়ে এসেছিল, এ সম্ভব নয়। অন্য প্রমাণের সঙ্গে সম্পর্কহীন ভাবে এই বিষয়টির উপর খুব বেশী গুরুত্ব প্রদান করতে আপনাদের আমি বলি না। তবে এ অন্য প্রমাণকে সমর্থন করছে। উপসংহারে বালিকার জবানবন্দীর সত্যতা যাচাই (অন্য কথায় আসামীর দোষ বা নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে তার নিজের আচরণ—সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে) এই মামলার অদ্ভুত পরিবেশে সব চাইতে বেশী দামী। ঘটনার আগে আসামীর আচরণ কি রকম ছিল? ঘটনার সময়? ঘটনার পরে? তার অবস্থায় একটা নির্দ্দোষ লোক যেমন আচরণ করতে পারে, তার সঙ্গে কি আসামীর আচরণের সামঞ্জস্য ছিল? যে বালিকার বিরুদ্ধে (ধরে নেওয়া গেল সে নিরপরাধ) একটা ঘৃণ্য পাপ করা হয়েছে, সে বালিকার আচরণের সঙ্গে কি এর সামঞ্জস্য আছে? এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের আছে আজ উপস্থিত। এ সব প্রশ্নের উত্তর আপনারা যা দেবেন তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। কি উত্তর দেবেন স্থির করবেন আপনারা, সমগ্র মামলার সম্বন্ধে আপনারা যা সিদ্ধান্ত করবেন, আপনাদের উত্তরগুলোর প্রভাব তার উপর কি হবে তাও আপনাদের নির্ণয় করতে হবে। এ সকল বিষয়ের উপর যে সব প্রমাণ যা পাওয়া গেছে আমি মাত্র তা-ই দেখিয়ে যাব।

প্রথম—ঘটনার আগে আসামীর আচরণ কেমন ছিল? আগের দিন সন্ধ্যায় সে স্ত্রীকে অন্য জায়গায় পাঠিয়েছিল, রাত্রিতে সে যাতে ঘরে উপস্থিত না থাকতে পাবে। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? তার নিজের ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা আনতে (টাকা অবশ্য পাওয়া যায়নি)। এখানে লক্ষ্য করতে হবে, স্ত্রীলোকটি টাকা চাইতে গেছল তার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে নয়—গেছল তার স্বামীর ভাইয়ের কাছে। গোগা গ্রাম খুব কাছেই—আসামীর মত বলবান ও লম্বা লোকের কাছে ২০।৩০ মিনিটের পথ। তবু সে নিজে যাচ্ছে না, পাঠাচ্ছে স্ত্রীকে। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়েছিল দুই কচি সন্তানকে, এতে গেরস্থালীর চলতি ব্যবস্থার নড়-চড় হয়েছিল। এ সম্বন্ধে আসামীর কৈফিয়ৎ আপনারা শুনেছেন। সে কৈফিয়ৎ যথেষ্ট কি না এবং সন্তোষজনক কি না, তার বিচার করবেন আপনারা। আসামীর এই আচরণের কৈফিয়ৎ কিছুমাত্র যদি না থাকত, তবুও তা তার নির্দ্দোষিতার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন নয়, এতে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ প্রমাণিত হয় না। কিন্তু যদি আপনারা মনে করেন যে, আসামীর কৈফিয়ৎ যথেষ্ট নয়, তা'হলে বাদী পক্ষের অনুমানই তাতে সমর্থিত হবে।

দ্বিতীয়—ঘটনার সময় অর্থাৎ হত্যার রাত্রিতে আসামীর আচরণ কেমন ছিল? [ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আসামীর জবানবন্দী এখানে পাঠ করা হয়।] অন্ধকার থাকতে আসামী ঘরে ফিরে দেখছে, তার সন্তান—তার ঔরসজাত সন্তান মরে আছে। তবু বাতি জ্বালায় না। চীৎকার করে না। তা'হলে সে জানে না (যদি ধরে নেওয়া যায় সে নির্দ্দোষ) মেয়ের কি হ'ল। হতে পারে সাপে কামড়েছে; হতে পারে হঠাৎ অসুখ করেছে। এ অবস্থায় সাধারণতঃ লোকে কি করে? সে কি বাতি জ্বালিয়ে দেখে না? সে কি প্রতিবেশীদের ডাকে না? কাছেই ত থাকে মানুষটার অনুপস্থিত স্ত্রীর বোন, মেয়েটির মাসী—তাকেও সে ডাকে না। কখন্ দিনের আলো ফুটবে তার জন্যে বসে থাকে। আলো ফুটলে সে পরখ করে দেখে। দেখে মেয়ের অঙ্গে মরণ-আঘাত। তখনও সে ভয়ার্ত্ত হয় না। সে কাউকে ডাকে না। সে হায় হায় করে আর কাঁদে, প্রতিবেশীরা যখন সবে উঠেছে। এমন করে লোকটা কাঁদে যে, প্রতিবেশীরা তা শোনে, শুনে খোঁজ করতে আসে। নিজের মেয়ে খুন হয়েছে দেখে বাপ কাঁদতে বসে গেল,—লোকটা নির্দ্দোষ হলে এ যেন অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। সে নিজেই বলেছে যে, দিনের আলো না ফোটা পর্য্যন্ত শোকের উচ্ছ্বাস আর তার এল না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—সত্যি করেই হোক বা ভাণ করেই হোক, এই শোক-উচ্ছ্বাসের আগের আসামীর আচরণ এক জন নির্দ্দোষীর আচরণের সঙ্গে মেলে কি না? হারু মেয়েটি শপথ করে বলেছে, যখন সে যায়, তখন পরিষ্কার দিন। কেন অতটা বেলা পর্য্যন্ত আসামী সাহায্য চাইতে কাউকে ডাকল না? সাহায্যের দরকার যদি আর না থেকেই থাকে, এই ঘৃণ্য দুষ্কার্য্য, তার ঘরে যে এমন একটা কদর্য্য হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে, তা দেখাবার জন্যেও সে কাউকে ডাকল না কেন? আপনারা দেখেছেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের

কাছে আসামী যে জবানবন্দী দিয়েছে, তাতে সে স্পষ্ট বলেছে যে, অন্ধকার থাকতে সে বাড়ী ফেরে, কিন্তু ভোর হবার আগে আঘাতের ক্ষত তার নজরে পড়েনি। এই কথা যদি সত্যি হয় (স্বেচ্ছায় সে এই বিবৃতি দিয়েছে আর তা ঠিক ঠিক লিপিবদ্ধও হয়েছে), তা'হলে সাহায্য পাবার সময় চলে গেছে, এ তার জানবার কথা নয়। আমি যখন তার এই আচরণের হেতু কি জিজ্ঞেস করলাম, সেই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝে নিয়ে সে তার আগের কথা ঘুরিয়ে বলতে চেষ্টা করল। তার এই চেষ্টা সন্তোষজনক, কি নয়—তা আপনারা বিচার করে দেখবেন।

তৃতীয়—ঘটনার পরে আসামীর আচরণ কেমন? যে অবস্থায় সে পড়েছিল তাতে বাধ্য হয়ে মৃত্যুর খবর তাকে দিতে হয়েছে। জানত, এর পর তদন্ত হবে। সত্যি ঘটনার খবর দেবার ঠিক ঠিক পন্থা সে অবলম্বন করেছিল কি? অপরাধ যে কত বড়, তা যথাযথ ভাবে জানিয়েছিল কি? অজ্ঞাত হত্যাকারীর বিচারের জন্তে জিদ করেছিল কি? না, সে থানায় গিয়ে খবর দিয়েছিল যে, প্রতিবেশীরা বলছে, সাপে কামড়ে মেরেছে, এই বলে সে তদন্ত এড়াতে চেষ্টা করছিল? ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের উচিত ছিল লিখিত এতালা পাঠিয়ে দেওয়া, তিনি তা দেননি। তাই এতালায় কি ছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ আমি মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু ময়না তদন্তের রিপোর্টে দেখা যায় যে, প্রথমে বলা হয়েছিল সাপে কামড়ে মরা। আসামীও আপনাদের কাছে স্বীকার করেছে যে, থানায় গিয়ে সে বলে যে প্রতিবেশীরা বলছে, সাপে কামড়ে মেরেছে। আসামী তার কথার সমর্থনের জন্ত তিন জন সাক্ষী হাজির করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, একটা অত্যাচারিত পিতা প্রথমে হত্যার সোজাসুজি কোন অভিযোগ করেনি। মিথ্যা বর্ণনা দিয়ে তদন্ত এড়াবার চেষ্টা হয়েছে দেখা যাচ্ছে। এখন এ কথা জিজ্ঞেস করা যেতে পারে যে, এতে কি বাদী পক্ষের উক্তি নষ্ট করে ফেলে না? এতে কি স্পষ্ট প্রমাণ হয় না যে, কদম আলির বিরুদ্ধে আসামীর কিছুমাত্র শত্রুতাচরণের চেষ্টা ছিল না? আসামীর মতলব, আসামীর বিরুদ্ধে যে অপকর্ম্মের অভিযোগ—মামলা যা হ'ল ভিত্তি, এতে কি সে ভিত্তি উড়ে যায় না? প্রথম দৃষ্টিতে তাই অবশ্য যায়। কিন্তু খুব যত্ন করে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পরীক্ষা করে দেখেন, তা'হলে হেতু বুঝতে পারবেন। হারুর সাক্ষ্য যদি সত্য হয়, সাক্ষী ঠিকই জানত যে, সে তার মেয়ের মুখ বন্ধ করতে পারবে না। সূর্য্য উঠবার আগেই তার নিজের সন্তানই তাকে হত্যাকারী বলে ঘোষণা করে দেয়। পঞ্চায়েৎ আসবার আগে আসামীর সাজান চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আসামী তখনই অনুভব করে যে (যদি তার সন্তানের সাক্ষ্য আর হারুর সাক্ষ্য সত্য হয়) তার মতলব হাসিলের আর আশা নাই—শত্রুকে নিপাত করবার চেষ্টায় সে নিজে জড়িয়ে পড়ে সর্ব্বনাশ ডেকে আনছে। সে বুঝতে পারে যে, তার বাঁচবার একমাত্র উপায় তদন্ত। মাত্র এই অনুমান মেনে নিলে সাপে কাটা সম্বন্ধে পঞ্চায়েতের কাছে, আর থানায় তার কথা পরিষ্কার বুঝা যায়। যদি সে নির্দ্দোষ হয়, যদি তার সন্তান তাকে ত্যাগ না করে থাকে, তবে চোখের সামনে একটা মৃত্যু-ক্ষত তার দিকে চেয়ে রয়েছে প্রত্যক্ষ করেও সে কেন এমন ব্যাখ্যা করে যেতে থাকে? যদি সে অপরাধই করে থাকে, আর যদি তার মেয়ে তাকে সমর্থন করতে না চেয়ে থাকে, তবেই এই আচরণ পরিষ্কার বুঝা যায়। সে হয়ত মনে মনে এই যুক্তি এঁটেছিল যে, প্রতিবেশীরা বলছে সাপে কেটেছে এই কথা শুনে পুলিশ আর কষ্ট করে তদন্ত করবে না। কিন্তু পুলিশ যখন এল, আর তদন্ত অপরিহার্য্য হ'ল, তখনও কি আসামী তদন্তে সাহায্য করে হত্যাকারীকে আদালতে অভিযুক্ত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল? [এই সময় জুরীদের নিকট হেড কনষ্টেবলের জবানবন্দী উপস্থিত করা হয়] এই লোকটি যে সাক্ষ্য দিয়েছে, তাতে মনে হয়, সে তার পদের অযোগ্য। নিজের চোখে সে নিশ্চয় দেখেছে যে একটা অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে, তবু সে তার কোন রকমের তদন্ত করেনি। বাপের—এই আসামীর—কথা সে শুনল, আর কারু না। আর কোন উপযুক্ত তদন্ত করতে চেষ্টা না করে ২১শে মার্চ্চ, যেদিন সে এল, সেদিনই গ্রাম থেকে চলে গেল। কৈফিয়তে সে বলেছে যে, তদন্তের আগে দেশী ডাক্তারের রিপোর্টের জন্ত সে অপেক্ষা করছিল। এই আচরণ অদ্ভুত হলেও আপনাদের সম্মুখে যে সব মুখ্য সমস্যা আছে এতে তার কিছুমাত্র নড়চড় হয় না। এতে মাত্র এই প্রমাণিত হয় যে, আসামী তদন্তের জন্ত জিদ করেনি, ২১শে মার্চ্চ সে তার মেয়ে গোলককে উপস্থিত করেনি। যদি আপনারা সাক্ষীর জবানবন্দী বিশ্বাস করেন, তা'হলে এতে বাদী পক্ষের অনুমানও সমর্থিত হয়, আর গোলক যে বলেছে, ২১শে মার্চ্চ কাছের এক মাঠে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বালিকার এই গুরুত্বপূর্ণ কথাও অনুমোদিত হয়। হত্যার সময় মাত্র গোলক ঘরে ছিল। কাজেই গ্রামে যখন পুলিশের এক কর্ম্মচারী তদন্ত করতে এল, তখন গোলকের এই মাঠে যাবার কথা পুলিশকে বলা উচিত ছিল।

এই হ'ল বাদী পক্ষের মামলা। এখন বাদী পক্ষ যে কাহিনী বলছে তাতে একটু সন্দেহ ওঠাচ্ছে জননীর জবানবন্দী। ২১শে মার্চ্চ হেড কনষ্টেবলের কাছে সে স্বামীকে দোষী ক'রে কোন কথা বলেনি। কেন বলেনি তার হেতু এই [পাঠ]। হেতুর বিচার আপনারা করবেন। হতে পারে সেই দিন সে স্বামীকে দোষী করতে চায়নি, অথবা কি পথ সে নেবে তা স্থির করে উঠতে পারেনি। হয়ত সে তার ভরণপোষণের উপায় নষ্ট করতে চায়নি। এ-ও হতে পারে সে সোয়ামীর ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল; সোজাসুজি সে যদি তাকে দোষী করে, তার ফলাফল সম্বন্ধেও হয়ত তার সন্দেহ হয়েছিল। হয়ত অনুভব করেছিল যে, তার অভিযোগ সে প্রমাণ করতে পারবে না। জননী বলেছে—"স্বচক্ষে কাজটা দেখিনি",—হয়ত সে অনুভব করে থাকবে, যেটুকু সে যা বলেছে তাই স্বামীকে অভিযুক্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট। যদি সে প্রমাণ করতে না পারে, তা'হলে স্বামী তার উপর প্রতিশোধ নেবে, তার সঙ্গে চিরদিনের শত্রুতা হবে। এই সব চিন্তা-যুক্তি হয়ত তার মনে কাজ করছিল, তাই সে নিজের দায়িত্বে সরাসরি ভাবে কোন অভিযোগ করবার দায়িত্ব নেয়নি।

যদি আপনারা এই ধারণা করেন যে, প্রমাণ-প্রয়োগে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, তা'হলে এই সব বিষয় আপনাদের ওজন করে দেখতে হবে। বাদী পক্ষ যে মামলা দাঁড় করিয়েছে, আসামী তা কোন মতে খণ্ডন করতে পারেনি, এর গুরুত্বও আপনাদের নির্ণয় করতে হবে। আসামী বলছে, থানায় যাবার পূর্ব্বে গ্রামবাসীরা বলাবলি

করছিল যে, সাপে কেটে মেরেছে, আর এ কথা প্রমাণ করবার জন্যে তিন জন প্রতিবেশীকে সাক্ষী মেনেছিল। সাক্ষীরা এ কথা প্রমাণ নিশ্চিত করতে পারেনি। প্রমাণও যদি করত, তবু লোকটার বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই এই অনুমান ছাড়া, এতে আসামী যে নির্দ্দোষ তা কি করে প্রমাণিত হবে বুঝে ওঠা মুস্কিল। সাপ যখন কামড়ায় তখন মানুষের শরীরে গর্ত্ত করে না। শিশুর অঙ্গে যে ক্ষত হয়েছিল তা কি করে হয়েছিল তা আসামী নিশ্চয় ভাল করেই জানত।

আমার এই সব মনে হয়েছে। এইবার আপনাদের মতামতের জন্য মামলা আপনাদের কাছে ছেড়ে দিলাম। বাদী পক্ষের প্রমাণ-প্রয়োগ যদি আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট মনে আপনারা না করেন, বালিকা-সাক্ষীর কথার সত্যতা ও সে কথার অনুমোদন সম্বন্ধে সন্দেহ করবার যুক্তিসঙ্গত হেতু যদি আপনারা পান, তা'হলে আসামীকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া আপনাদের উচিত হবে। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত সংশয়ের অবসর যদি না থাকে, যদি আপনারা মনে করেন যে, আসামী এমন কাজ করেছে, যার ফলে মৃত্যু হয়েছে, এর সম্বন্ধে সকল প্রমাণের সত্যতা সম্বন্ধে আপনাদের মনে কিছুমাত্র সংশয় নাই, তা'হলে আসামীকে হত্যার অপরাধে দণ্ডিত করতে সঙ্কুচিত হলে আপনারা নাগরিকের কর্ত্তব্য করছেন না বুঝতে হবে।　　স্বা: পি. ডিকেন্স,

দায়রা জজ।

জুরীদের অভিমত ও দণ্ডাদেশ

ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় যে অপরাধের অভিযোগ আসামীর বিরুদ্ধে আনা হইয়াছিল, অর্থাৎ—সে হত্যা করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে জুরীরা একবাক্যে আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। আদালত নির্দ্দেশ দেন যে, হাইকোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষে মুলুকচাঁদ চৌকীদারকে মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত তার গলায় ফাঁসী দিয়ে লটকে দেওয়া হোক।

[যখন জজ আসামীর বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়া তাহাকে জানান যে, হাইকোর্টে আপিল করিতে হইলে সাত দিনের মধ্যে যেন তাহা করে, তখন আসামী বলে যে, তাহার শেষ প্রার্থনা এই যে, তাহাকে তাহার গাঁয়ে লইয়া গিয়া ফাঁসী দেওয়া হোক। তাহা হইলে গ্রামের লোকেরা বুঝিবে যে, যে অপরাধ সে কিছুতেই করেনি, তাহারই জন্য অন্যায় ভাবে তাহাকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—তারানাথ রায়।

—সাহিত্য পরিচয়—

(প্রাপ্তি স্বীকার)

চণ্ডীদাস-পদাবলী—বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

সরলা—৺অমৃতলাল বসু। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ—শ্রীজওহরলাল নেহরু। প্রকাশক—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা। মূল্য বার টাকা আট আনা।

ছন্দ-পতন—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

কালপেঁচার নকসা—কালপেঁচা। দি বিহার সাহিত্য ভবন লিমিটেড, ২৫/২ নং মোহনবাগান রো, কলিকাতা—৪। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

চড়াই-উৎরাই—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। মিত্রালয়, ১০ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য তিন টাকা।

নবযুগের মহাপুরুষ (২য় ভাগ)—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

নারী—মনোজমোহন রায়। ১৩০ নং কাসুন্দিয়া রোড, হাওড়া। মূল্য এক টাকা।

স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ—স্বামী পরমানন্দ পুরী। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মঠ, বলরামপুর, মেদিনীপুর। মূল্য এক টাকা চার আনা।

চীনের বিপ্লবী-যুদ্ধের নীতিগত সমস্যা—মাও সে তুঙ, নয়া দুনিয়া, ৪৪৫ নং ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা—৩৪। মূল্য এক টাকা আট আনা।

রাষ্ট্রভাষা-প্রবেশ—শ্রীবিধুভূষণ দাসগুপ্ত। প্রকাশক—শ্রীবিশ্বনাথ নাথ, ৩৫ নং ট্যাংরা রোড, কলিকাতা—১৫। মূল্য এক টাকা আট আনা।

শিক্ষামৃত নির্যাস—শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য দুই টাকা।

অভিসার রজনটী—রমাপদ চৌধুরী। ক্যালকাটা বুক ক্লাব, ৮১ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা চার আনা।

গণেশের কাহিনী—শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথ। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা চার আনা।

জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর—শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা। পি ১২ নং লেক রোড, কলিকাতা—২১। মূল্য বার আনা।

ভবানী মঙ্গল—রামনারায়ণ। শ্রীঅজয়কুমার চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। সুকুমারী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ধুবড়ী, আসাম। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

জ্ঞানসাধন—শ্রীমৎ অতুলানন্দ স্বামী। প্রকাশক—শ্রীসুধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৬ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

সাধুর কথা (৪র্থ খণ্ড)—শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১১১/১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য এক টাকা।

পৌত্রান্ত—বিধুভূষণ বসু। ৩/১বি পর্চা কার্ট লেন, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

প্যারী ও রোম—

প্যারী নগরীর প্যালাইস্ দ চ্যাইলোতে (Palais de chaillot) শান্তি-প্রস্তাবের আলোচনা চলিতে থাকার সময়েই গত ২৪শে নবেম্বর (১৯৫১) চিরন্তন নগরী রোমে পশ্চিম-ইউরোপকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার ব্যবস্থা নির্দ্ধারণের জন্য উত্তর-আটলাণ্টিক ট্রিটি কাউন্সিলের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে কোন মর্য্যাদা ও গুরুত্ব পশ্চিমী শক্তিবর্গও স্বীকার করেন না, পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয়ের পররাষ্ট্র-সচিবগণ শান্তি আলোচনায় উপস্থিত থাকার পরিবর্ত্তে রোমে অস্ত্রসজ্জার আলোচনায় যোগদান করিতে চলিয়া যাওয়া হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। রোমের অস্ত্রসজ্জার বৈঠক যেন বিদ্রূপের অট্টহাসিতে প্যারীর নিরস্ত্রীকরণ আলোচনাকে লাঞ্ছিত করিতেছিল। নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব নির্দ্ধারণের জন্য গঠিত বৃহৎ চতুঃশক্তির সাব-কমিটির অধিবেশনে একমাত্র রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব মঃ ভিসিনস্কি ব্যতীত পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়ের কোন পররাষ্ট্র-সচিবই যোগদান করেন নাই, শুধু তাঁহাদের সহকারিগণ যোগদান করিয়াছেন, ইহাও কি তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং বৃহৎ চতুঃশক্তির সাব-কমিটি আজ যেখানে শান্তি আলোচনা করিতেছেন, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সেখানে আরও একটি শান্তি আলোচনা হইয়াছিল। ঐ শান্তি আলোচনায় ফ্রান্স ও স্পেনের যুদ্ধ অবসান করিয়া পিরানিজের শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। চ্যাইলো ছিল তখন প্যারী নগরীর বাহিরে একটি গ্রাম মাত্র। পিরানিজ শান্তি-সম্মেলন উপলক্ষে উহাকে সহরতলীতে উন্নীত করা হয়। প্যালাইস দ চ্যাইলো প্রাসাদ ঐ শান্তি-চুক্তির স্মৃতি বহন করিতেছে। উহা যে পিরানিজ শান্তি-চুক্তি অপেক্ষা বহু গুণে গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ চতুঃশক্তির মধ্যে শান্তি-চুক্তি হওয়ার গৌরব অর্জ্জন করিতে পারিবে, সে-সম্বন্ধে ভরসা করিবারও কিছু নাই। এই সঙ্গে এ কথাও মনে না পড়িয়া পারে না যে, পিরানিজদের শান্তি-চুক্তি ইউরোপের স্থল-শক্তি হিসাবে স্পেনের মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল।

পশ্চিমী শক্তিবর্গের একই সঙ্গে প্যারীতে নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা এবং রোমে অস্ত্রসজ্জার আলোচনা করা তাঁহাদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গতই হইয়াছে মঃ ভিসিনস্কির এই তীব্র শ্লেষোক্তিকে নিছক রুশ প্রচার-কার্য্য বলিয়া অভিহিত করা যায় কি না, নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার ধারা বিবেচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। পশ্চিমী শক্তিত্রয় নিরস্ত্রীকরণের নয় দফা সম্বলিত যে নূতন পরিকল্পনা উপস্থিত করেন তাহাতে একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করিবার ব্যবস্থাকে প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্র হ্রাসের পরে স্থান দেওয়া হয় নাই। প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্র হ্রাস এবং পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ-করণের কাজ একই সঙ্গে চলিবে, ইহাই নূতন পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাশিয়া এই পরিকল্পনার যে বারো দফা সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে, সেগুলি গৃহীত হইলে পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের পরিকল্পনা কার্য্যতঃ রুশ-পরিকল্পনায় পরিণত হইবে, পশ্চিমী শক্তিত্রয় এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বারো দফা সংশোধন প্রস্তাবে রাশিয়া যে-সকল বিষয়ে রাজী হইয়াছে সেগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাশিয়া চায়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণ কমিশন নিরাপত্তা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে। এই কমিশন নিরাপত্তা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিয়া পরমাণু অস্ত্র সম্পর্কে তদন্ত করিবে, কিন্তু এ ব্যাপারে ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করা হইবে না। অর্থাৎ কন্ট্রোল কমিশনের আলোচনায় ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করা হইবে না বটে, কিন্তু বিশেষ অবস্থায় বিষয়টি যখন নিরাপত্তা পরিষদে আলোচিত হইবে তখন প্রয়োজন হইলে সংরক্ষিত ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করা চলিবে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ ইহাতে রাজী হইতে পারেন নাই। নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে নিরাপত্তা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিবার জন্য রাশিয়া দাবী করে কেন, পশ্চিমী শক্তিত্রয় তাহা না বুঝিবার ভাণ করিতে পারেন। কিন্তু মঃ ভিসিনস্কি রাশিয়ার আশঙ্কা গোপন রাখেন নাই। তিনি সোজাসুজিই বলিয়াছেন যে, নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় তদন্ত ও হিসাব মিলাইয়া দেখিবার জন্য এমন সব ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইতে পারে যাঁহারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতিই কার্য্যকরী করিবেন (who would carry out U. S. policy)। কাজেই জরুরী অবস্থা উদ্ভব হইলে রাশিয়া নিজের নিরাপত্তার জন্য একটা উপায় হাতে রাখিতে চাহিবে, ইহা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়া চায়, সশস্ত্র সৈন্যসংখ্যা এবং প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্র হ্রাস করিবার পূর্ব্বেই পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে হইবে। সাধারণ মানুষ যে রাশিয়ার প্রস্তাবই সমর্থন করিবে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। ধ্বংসকর অস্ত্র-শস্ত্রকেই যদি নিষিদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে গোটাকতক বন্দুক-কামান কমাইবার পূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা ধ্বংসকর পরমাণু বোমাকেই নিষিদ্ধ করা কি উচিত নয়?

পশ্চিমী শক্তিত্রয় রাশিয়ার উল্লিখিত প্রস্তাবে রাজী না হওয়ার কারণ অবশ্য গোপন রাখেন নাই। গত ২৮শে নবেম্বর (১৯৫১) বৃটেনের সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ লয়েড বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বলিয়াছেন যে, "মঃ ভিসিনস্কির সংশোধন প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইলে, পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা অবিলম্বে পরমাণু বোমা নষ্ট করিয়া ফেলিবার রুশ-পরিকল্পনায় পরিণত হইবে। সেই সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, তাঁহার বিশ্বাস, সোভিয়েট ইউনিয়নের ২১৫ ডিভিশন সৈন্য সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে এবং পুরোভাগ রক্ষার জন্য ২ লক্ষ ৫০ হাজার ট্যাঙ্ক আছে এবং সামরিক বিমান আছে ২০ হাজার। সুতরাং পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের আশঙ্কা যে কি, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। পরমাণু বোমা রাশিয়ার বেশী নাই, কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলি পরমাণু বোমা আছে। এই সকল পরমাণু বোমার জন্যই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব। এইগুলি যদি আগেই ধ্বংস করিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে সুবিধা হইবে রাশিয়ারই। মঃ ভিসিনস্কি অবশ্য বলিয়াছেন যে, নিরস্ত্রীকরণের রুশ-পরিকল্পনা

গৃহীত হইলে রাশিয়া তাহার শেষ সৈন্য এবং শেষ কামানটি পর্য্যন্ত উপস্থিত করিবে। তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে, রাশিয়ার সৈন্যের সংখ্যা বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত সশস্ত্র সৈন্যসংখ্যার অর্দ্ধেকেরও কম। তাঁহার এই উক্তিকে বিশ্বাস না করিলে রাশিয়ার সশস্ত্র সৈন্যের সংখ্যা তদন্ত করিয়া দেখিতে হয় এবং তদন্ত করিবার আগে রুশ-পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। রুশ-পরিকল্পনা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু বোমা নষ্ট করিবার একটা ফাঁদ বলিয়া পশ্চিমী শক্তিত্রয় মনে করিতে পারেন। কিন্তু উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি, রাশিয়ার চারি দিকে বিভিন্ন দেশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি প্রভৃতি বজায় থাকিতে রাশিয়াই বা নিজেকে নিরাপদ মনে করিবে কিরূপে?

নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে বৃহৎ চতুঃশক্তির আলোচনা বৈঠকের জন্য পাকিস্থান, সিরিয়া এবং ইরাক যে প্রস্তাব করিয়াছিল, বৃহৎ শক্তি-চতুষ্টয়ের সকলেই তাহা গ্রহণ করায়, গত ৩রা ডিসেম্বর (১৯৫১) উক্ত প্রস্তাব অনুসারে গঠিত বৃহৎ চতুঃশক্তি নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা সাব-কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। কিন্তু কয়েক দিন আলোচনার পর প্রধান প্রধান সকল বিষয়েই মতানৈক্য হওয়ায় গত ৬ই ডিসেম্বর উক্ত আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। অতঃপর সাধারণ পরিষদের সভাপতি ডাঃ লুই প্যাডিলো নার্ভো পশ্চিমী শক্তিত্রয় এবং রুশ-প্রস্তাবের সমন্বয় সাধন করিয়া এক স্মারকলিপি রচনা করিয়াছেন। এই স্মারক-লিপির ভাগ্য সম্পর্কে কিছু অনুমান করিবার চেষ্টা করা নিরর্থক। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি মনে করে যে, তাহার বাঁচিয়া থাকা সোভিয়েট শক্তির ধ্বংসের উপরেই একান্ত ভাবে নির্ভর করিতেছে, তাহা হইলে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক একটা বিপুল পরিহাস ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধির উপরেই বিশ্বাসী, তাহা এক দিকে তাহার অস্ত্র-শস্ত্র বৃদ্ধির পরিকল্পনা এবং আর এক দিকে রোমে উত্তর-আটলাণ্টিক কাউন্সিলের বৈঠকের মধ্যেই পরিচয় পাওয়া যায়। মঃ ভিসিনস্কি শান্তির জন্য সামরিক শক্তি বৃদ্ধির মার্কিণ নীতিকে দু'মুখো নীতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পশ্চিমী শক্তিবর্গ যে 'থলের ভিতর বিড়ালটি'কে গোপন রাখিতে পারেন নাই, রোমে উত্তর-আটলাণ্টিক কাউন্সিলের অধিবেশন হইতেই কি তাহা বুঝা যায় না?

উত্তর-আটলাণ্টিক কাউন্সিলের রোম অধিবেশন আগামী জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে ইহাই ছিল ফ্রান্সের অভিপ্রায়। মিঃ চার্চ্চিলও চাহিয়াছিলেন, তিনি ওয়াশিংটন হইতে ঘুরিয়া আসিবার পর এই অধিবেশন হইলেই ভাল হয়। শুধু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে এবং চাপেই এই অধিবেশন হইয়াছে। ইহার কারণ খুবই সুস্পষ্ট। কোরিয়া যুদ্ধে ২৫ হাজার মার্কিণ সৈন্য আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ছয় ডিভিশন সৈন্য ইউরোপে পাঠাইয়াছে। তাছাড়া পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলিকে যে-সকল সমর-সম্ভার দিয়াছে তন্মধ্যে আছে ২১৪৮টি ট্যাঙ্ক এবং ৬৫৮টি ভারী কামান। কিন্তু এই সকল ট্যাঙ্ক চালাইবার এবং কামান দাগিবার লোক কোথায়? বৎসরাধিক কাল ধরিয়া ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের কথাবার্ত্তাই শুধু চলিতেছে। কিন্তু ইউরোপীয় বাহিনী গঠনের ইউটোপীয় পরিকল্পনা এখনও কার্য্যকরী হওয়া বহু দূরবর্ত্তী। কাজেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে অধীর হইয়া উঠিবে ইহা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু রোম অধিবেশনের শেষে যে ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে এই অধিবেশনের সত্যিকার ফলাফল অনুমান করা কঠিন। জেনারেল আইসেনহাওয়ার এই অধিবেশনে গত ২৬শে নবেম্বর (১৯৫১) যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে কেন্দ্রীয় ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনী সহ অতি দ্রুত ইউরোপীয় বাহিনী গঠনের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। উত্তর-আটলাণ্টিক-গোষ্ঠীর সামরিক শক্তি আগামী গ্রীষ্মকালের মধ্যে অতি দ্রুত বৃদ্ধি করিয়া ৪০ ডিভিসন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া এক সংবাদে প্রকাশ। প্রস্তাবিত দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনায় পদাতিক ও আর্ম্মার্ড বাহিনী লইয়া ইউরোপীয় বাহিনীতে ৪৩ ডিভিশন সৈন্য গ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই ৪৩ ডিভিশনের মধ্যে ফ্রান্স ১৪, জার্ম্মাণী ১২, ইটালী ১২ এবং বেনেলুক্স দেশত্রয় ৫ ডিভিশন সৈন্য যোগাইবে। কিন্তু সৈন্য-বাহিনী গঠনের সহিত যে গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যা জড়িত রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে রোম অধিবেশনে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে সে-সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ নাই। এ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট প্রদানের জন্য তিন জনের এক কমিটি গঠিত হয়। মিঃ হ্যারিম্যান এই কমিটির চেয়ারম্যান। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট উহার নামকরণ করিয়াছে three wise men বা 'তিন জন জ্ঞানী ব্যক্তি।' এই কমিটি উত্তর-আটলাণ্টিক-গোষ্ঠীর ১২টি পশ্চিম-ইউরোপীয়

রাষ্ট্রের নিকট নিম্নলিখিত তিনটি প্রশ্ন প্রেরণ করিয়াছিলেন: (১) আপনাদের সশস্ত্র বাহিনীর বর্ত্তমান অবস্থা কি? (২) ১৯৫২ সালের মধ্যে উহা সর্ব্বোচ্চ কি সংখ্যায় বর্দ্ধিত করার আশা করা যায়? (৩) শতকরা ত্রিশ ভাগ বর্দ্ধিত করা হইলে আপনাদের জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উহার প্রতিক্রিয়া কি হইবে? উক্ত ১২টি দেশ এই তিনটি প্রশ্নের একই রকম উত্তর দিয়াছেন। তাঁহাদের উত্তরের সারমর্ম্ম এই যে, সশস্ত্র বাহিনীগুলির বর্ত্তমান অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। এমন কি, ১৯৫২ সালেও কি সংখ্যার দিক হইতে, কি গুণপনা বা দক্ষতার দিক হইতে বিশেষ কিছুই উন্নতি হইবে না? শতকরা ত্রিশ ভাগ বৃদ্ধির কথা বাদ দিলেও তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা এরূপ যে, কোন সরকারী সনদপ্রাপ্ত (chatered) সম্ভ্রান্ত হিসাব-পরীক্ষকই তাঁহারা যে দেউলিয়া নহেন এইরূপ সার্টিফিকেট দিবেন না।

গত কয়েক বৎসর মার্শাল সাহায্য ভোগ করিয়াও পশ্চিম-ইউরোপের দেশগুলির ইহাই আর্থিক অবস্থার স্বরূপ। ইহার উপর সমর-সজ্জা বৃদ্ধি করিতে গেলে বেকার সমস্যা এবং মূল্যবৃদ্ধির ফলে পশ্চিম-ইউরোপের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা অনুমান করা বোধ হয় কঠিন নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আরও সাহায্য দিবে কি না, তাহা অনুমান করা হয়ত সহজ নয়। কিন্তু সমগ্র পশ্চিম-ইউরোপই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে পরিণত হওয়ায় এই দেশগুলির অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে খাড়া রাখিবার দায়িত্ব তাহার পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হইবে কি?

রোমের মুসোলিনি স্পোর্টস্ ষ্টেডিয়ামে উত্তর-আটলাণ্টিক পরিষদের অধিবেশন হইয়াছে। মুসোলিনি রোমের পূর্ব্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন। 'পূর্ব্ব গৌরব' বলিতে তিনি কি বুঝিতেন তাহা বলা কঠিন। ইটালীর প্রধান মন্ত্রী সিগনর ডি গ্যাসপারী উত্তর-আটলাণ্টিক গোষ্ঠী-ভুক্ত দেশগুলির ত্রিশ জন মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করিতে যাইয়া রোমের পূর্ব গৌরবের কথা স্মরণ করিয়াছিলেন কি না, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল অঞ্চল রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলির প্রায় সকলেই স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে উত্তর-আটলাণ্টিক পরিষদের রোম অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিল, শুধু এক স্পেন ছাড়া। স্পেনও যে উত্তর-আটলাণ্টিক রাষ্ট্র-গোষ্ঠীভুক্ত হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। একমাত্র জার্ম্মাণীই ছিল প্যাক্স রোমানার বাহিরে। আজ প্যাক্স আমেরিকা প্যাক্স রোমানা অপেক্ষাও বৃহত্তর। সমগ্র জার্ম্মাণী না হইলেও পশ্চিম-জার্ম্মাণী উহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রোমান যুগের ইলিরিকান (Illyricun) উত্তর-আটলাণ্টিক গোষ্ঠীতে এখনও আসে নাই বটে, কিন্তু মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে সে এখন পশ্চিমী শক্তিবর্গের বন্ধু, যদি আশ্রিত বলা সঙ্গত না-ই হয়। ইউরোপীয় বাহিনীতে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সৈন্য-বাহিনী গৃহীত হইলে কার্য্যতঃ পশ্চিম-জার্ম্মাণীও উত্তর-আটলাণ্টিক গোষ্ঠীভুক্ত হইবে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে জার্ম্মাণীর ঐক্য সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা এইখানে বিলুপ্ত হইল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যেরূপ একান্ত অসহায় ভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাতে রাশিয়ার সহিত শান্তি চুক্তি হওয়ার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না।

জার্ম্মাণ সমস্যা—

বন্ আলোচনায় পশ্চিমী মিত্রশক্তিত্রয় এবং পশ্চিম-জার্ম্মাণীর মধ্যে চুক্তির যে-খসড়া রচিত হয়, তাহাকে গত ২১শে ও ২২শে নবেম্বর প্যারীতে মিঃ শুম্যান, মিঃ ইডেন এবং মিঃ একিসন ও পশ্চিম-জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেনেয়ুরের মধ্যে আলোচনায় চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হইয়াছে। এই চুক্তিতে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর দখলীকৃত অবস্থার পরিবর্ত্তে সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সহিত তাহার তিনটি দখলকার রাষ্ট্রের নূতন সম্পর্ক কিরূপ হইবে, তাহাই সাধারণ ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উহার পরিপূরক হিসাবে আরও আলোচনায় আরও কয়েকটি নূতন চুক্তি হইবে। ডাঃ এডেনেয়ুর এই চুক্তির খুব উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন এবং আশা করেন যে, বর্ত্তমান বৎসর শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই এই চুক্তি কার্য্যকরী হইবে। এই চুক্তির সহিত সাধারণ সন্ধি-চুক্তি, উহার পরিশিষ্ট এবং পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থায় জার্ম্মাণ সৈন্যের যোগদান সম্পর্কিত বিষয় সংযু করা হইবে। কিন্তু মূল বিষয় সম্পর্কে পশ্চিম জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার যাহা পাইয়াছেন, আসলে তাহা পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়ের প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মূল বিষয়ের একটি জার্ম্মাণীর ঐক্য সাধন, আর একটি অখণ্ড জার্ম্মাণীর পূর্ব্ব সীমান্ত নির্দ্ধারণ। এই দুইটি সমস্যা সম্পর্কে দ্রুত কোন মীমাংসা হইবে, সে-সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয় ডাঃ এডেনেয়ুরকে দিতে পারেন নাই।

পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর প্রধান মন্ত্রী হের গ্রোটেওল যখন জার্ম্মাণীর ঐক্য সম্পাদনের জন্য সর্ব্বপ্রথম নিখিল জার্ম্মাণ-গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব করেন তখন ডাঃ এডেনেয়ুর প্রথমে উহা সরাসরি অগ্রাহ্য করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু উহা অগ্রাহ্য করিলে রাজনৈতিক দিক হইতে যে কত বড় মারাত্মক ভুল করা হইবে, তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। এই জন্যই তিনি অখণ্ড জার্ম্মাণী গঠনের জন্য ১৪ দফা সর্ত্ত উপস্থিত করেন। এই সর্ত্তগুলির মধ্যে নির্ব্বাচন পরিচালনের জন্য আন্তর্জ্জাতিক খবরদারীর প্রস্তাবটিই পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর কাছে গুরুতর আপত্তিকর বলিয়া গণ্য না হইয়া পারিবে না। অখণ্ড জার্ম্মাণী পশ্চিম-ইউরোপের রাষ্ট্র-গোষ্ঠীভুক্ত হয়, ইহাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিচালনায় নির্ব্বাচন হইলে ডাঃ এডেনেয়ুরের প্রধান মন্ত্রিত্বেই জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে এবং জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট রুশ-বিরোধী হইবে এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের দলে থাকিবে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু যে-জাতি বহু শতাব্দী ধরিয়া স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে জাতির পক্ষে আন্তর্জ্জাতিক হস্তক্ষেপ ব্যতীত স্বাধীন নির্ব্বাচন সম্ভব না হওয়ার আর কোন কারণ দেখা যায় না। বস্তুতঃ, সমগ্র জার্ম্মাণীতে স্বাধীন এবং গোপন নির্ব্বাচন হওয়া সম্ভব কি না, সে-সম্বন্ধে তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটি কমিশন নিযুক্ত করিবার জন্য বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গত ২রা ডিসেম্বর (১৯৫১) সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কমিটিতে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতেই উল্লিখিত অভিপ্রায় অনুস্যূত রহিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে না।

জার্ম্মাণীর নিজস্ব সৈন্যবাহিনী থাকা এবং জার্ম্মাণ শিল্পের উপর হইতে বিধি-নিষেধ অপসারণ সম্পর্কে কোন কথাই উক্ত

খসড়া-চুক্তিতে নাই। অথচ জার্ম্মাণীর সহিত শান্তি-চুক্তি হইয়া স্থায়ী শান্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই জার্ম্মাণীর সীমা সম্পর্কে চূড়ান্ত ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতিই শুধু ডা: এডেনেয়ুর পাইয়াছেন। তিনি অবশ্য সুস্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন যে, ওডার-নিসি রেখার পূর্ব্বদিকস্থ অঞ্চল জার্ম্মাণীরই রাজ্য। কিন্তু ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, তিনি যে সকল অঞ্চল দাবী করিয়াছেন, সেগুলি গত এগার শত বৎসরের জার্ম্মাণীর আত্ম-সম্প্রসারণের ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। এক হিসাবে রাইন ও এল্‌ব নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলকেই খাঁটি জার্ম্মাণী বলিতে পারা যায়। কারণ, এল্‌ব্‌ নদী হইতে আরম্ভ করিয়া ভলগা পর্য্যন্ত অঞ্চল বহুবার হাত বদলাইয়াছে। শার্লিম্যানের মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়াই ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি গঠিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পর ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ভার্দ্দুনের সন্ধি অনুসারে জার্ম্মাণীর যে সীমারেখা নির্দ্ধারিত হয়, দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পর পূর্ব্ব ও পশ্চিম-জার্ম্মাণীর মিলিত সীমান্ত প্রায় তাহাই দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপের মানচিত্র হইতে পোল্যাণ্ডের অস্তিত্ব একরূপ বিলুপ্তই হইয়া গিয়াছিল। প্রথম বিশ্বসংগ্রামের পর আবার পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় এবং পূর্ব্ব-প্রুশিয়াকে জার্ম্মাণী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মধ্যখানে গঠিত হয় পোলিশ করিডর। হিটলারের ডানজিগ ও পোলিশ করিডর দখল হইতেই দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের সূত্রপাত। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পর আবার যে স্বাধীন পোল্যাণ্ড গঠিত হইয়াছে তাহার পশ্চিম সীমান্ত দাঁড়াইয়াছে ওডার নদী। পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার অস্তিত্ব আজ আর নাই। হিটলার ইউক্রেন ও ককেশাস দখল করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহারই পরিণামে জার্ম্মাণী বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে। ডা: এডেনেয়ুরের দাবীর পরিমাণ কি দাঁড়াইবে, তাহা অনুমান করা অসম্ভব।

ক্যানাল অঞ্চল ও সুদান—

সুয়েজ ক্যানাল অঞ্চলে বৃটিশ-নীতি সঙ্কটকে ক্রমশ: ঘনীভূত করিয়াই তুলিতেছে। মিশরের বে-সরকারী মুক্তি-ফৌজের সহিত বৃটিশ সৈন্যের দৈনন্দিন সংঘর্ষ ক্যানাল অঞ্চলকে যে মধ্য-প্রাচীর মালয়ে পরিণত করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হাঙ্গামা শুধু ইহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহে নাই। বৃটিশ সৈন্য এবং মিশরীয় পুলিশের মধ্যেও সংঘর্ষ হইয়াছে। ইহাঁর জন্য কি মিশর গবর্ণমেণ্ট, কি মিশরের জনসাধারণ কাহাকেও দায়ী করা যায় না। মিশর ১৯৩৬ সালের সন্ধিকে একতরফা বাতিল করিয়া দিয়াছে, বৃটিশের তরফ হইতে অভিযোগ করা হইয়াছে। ক্যানাল অঞ্চলে বৃটেন তাহার আইন-সঙ্গত অধিকার রক্ষার অজুহাত দেখাইতেও ত্রুটি করে নাই। কিন্তু বৃটেনই কি সর্ব্বপ্রথম সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করে নাই? সন্ধির সর্ত্তানুসারে বৃটেন ক্যানাল অঞ্চলে ১০ হাজার স্থল-সৈন্য এবং ৪০০ বৈমানিক রাখিতে অধিকারী। কিন্তু মিশর গবর্ণমেণ্ট উক্ত সন্ধি বাতিল করিবার পূর্ব্বেই বৃটেন ক্যানাল অঞ্চলে প্রায় ৪০ হাজার সৈন্য রাখিয়াছিল। ইহাতে কি সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করা হয় নাই? মিশর সন্ধি বাতিল করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যানাল অঞ্চলে আরও নূতন সৈন্য প্রেরণ করা হয়। বর্ত্তমানে প্রায় ৮০ হাজার সৈন্য ক্যানাল অঞ্চলে বৃটেনের পক্ষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে বৃটেনের স্থল-সৈন্য সুয়েজ ও ইসমাইলিয়ার মধ্যবর্ত্তী বিটার হ্রদের পশ্চিম তীর বরাবর ফায়েদের উত্তরে ও দক্ষিণে সমাবেশ করিয়া রাখিতে হইবে। ফায়েদ হইল মধ্য-প্রাচীতে বৃটিশ স্থলবাহিনীর সদর কার্য্যালয়। বিমান-বাহিনী কোথায় কি ভাবে রাখা হইবে, সন্ধিতে তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। কান্‌টারা হইতে ইসমাইলিয়া পর্য্যন্ত ক্যানাল বরাবর রেল-লাইন এবং মিশরের বদ্বীপ অঞ্চল পর্য্যন্ত প্রসারিত সড়ক, রেলপথ এবং জলপথের পাঁচ মাইলের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিমান-বাহিনীকে বিভক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। সন্ধির সর্ত্তানুসারে বৃটেন সুয়েজ এবং পোর্ট সৈয়দের ডকে ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী রাখিতে অধিকারী। ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশর সন্ধি এবং সুদানের শাসন সংক্রান্ত ১৮৯৯ সালের কোণ্ডমনিয়ম চুক্তি মিশর গবর্ণমেণ্ট বাতিল করিয়া দিবার পরই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ক্যানাল অঞ্চলে সৈন্যসংখ্যাই শুধু বৃদ্ধি করে নাই, বৃটিশ সৈন্যরা ১৯৩৬ সালের সন্ধি-চুক্তিতে তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত অঞ্চল হইতে বাহির হইয়া সুয়েজ ক্যানালের সমগ্র পশ্চিম অঞ্চল দখল করিয়া বসিয়াছে। পোর্ট সৈয়দ, ইসমাইলিয়া সহর এবং সুয়েজ বন্দর তো তাহারা দখল করিয়াছেই, সুয়েজ ক্যানেলের সহিত মিশরের অবশিষ্ট অংশের সংযোগ রক্ষা করিয়া যে-সকল রাজপথ, জলপথ এবং রেলপথ আছে, সেগুলিও তাহারা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। সুয়েজ খালের পূর্ব্ব তীর দিয়া যাতায়াতও তাহারা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। ইহাতেও বৃটেন মনে করে যে, সন্ধির সর্ত্ত সে ভঙ্গ করে নাই।

বৃটিশের দৃষ্টিতে আজ সুয়েজ খাল এশিয়া ও সুদূর-প্রাচ্যের সহিত গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক সংযোগ-ব্যবস্থাই শুধু নয়, মধ্য-প্রাচী এবং আফ্রিকার রক্ষা-ব্যবস্থায়ও উহার গুরুত্ব সর্ব্বাধিক। কিন্তু সুয়েজ খাল কাটিবার জন্য ফ্রান্স যখন কোম্পানী গঠন করে, তখন উহার একটি শেয়ারও বৃটেন ক্রয় করিতে রাজী হয় নাই। তদানীন্তন বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড পামারষ্টোনের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, সুয়েজ খাল কাটা হইলে প্রচলিত বাণিজ্য-ব্যবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিবে! সুয়েজ খাল কাটার কাজ বন্ধ করিতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ১৮৫৪ সালে সুয়েজ খাল কাটার কাজ আরম্ভ হয়। এই খাল কাটা সম্পর্কে মিশরের শাসনকর্ত্তা খেদিব ইসমাইলের সঙ্গে সুয়েজ ক্যানেল কোম্পানীর এই চুক্তি হইয়াছিল যে, খাল কাটার জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে শ্রমিক (forced labour) নিযুক্ত করা হইবে। এই ভাবে যখন কাজ আরম্ভ হইল, তখন ১৮৬৪ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তুরস্কের সুলতানের নিকট খেদিবের বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক শ্রমিক নিয়োগের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। তুরস্কের সুলতানের নির্দ্দেশে বাধ্যতামূলক ভাবে শ্রমিক নিয়োগ করা বন্ধ হইল এবং খাল কাটার কাজ বন্ধ হইয়া গেল। অবশেষে যন্ত্রপাতি আনিয়া খাল কাটার কাজ শেষ করা হয়। কিন্তু বাধ্যতামূলক শ্রমিক নিয়োগের সর্ত্ত ভঙ্গের দরুণ খেদিব সুয়েজ খাল কোম্পানীকে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত খাল কাটার প্রায় অর্দ্ধেক ব্যয়ই মিশরকে বহন করিতে হয়। অথচ সুয়েজ খালের ব্যাপারে মিশর আজ কেউ নয়। সুয়েজ খালের উদ্বোধন উপলক্ষে যে বিরাট সমারোহ হইয়াছিল তাহাকে অভূতপূর্ব্ব

বলিলেও ভুল হয় না। সুয়েজ খাল কোম্পানী ফ্রান্সের বলিয়া স্বয়ং সাম্রাজ্ঞী ইউজেনি এই উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। আর আসিয়াছিলেন অষ্ট্রীয়ার সম্রাট, প্রুশিয়ার যুবরাজ, রাশিয়ার গ্রাণ্ড ডিউক মাইকেল, নেদারল্যাণ্ডের যুবরাজ হেনরী। ইহা ব্যতীত আরও প্রায় শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি ইউরোপ হইতে সুয়েজ খাল উদ্বোধনে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই যাতায়াত ও আহারাদির জন্য ১৪ হাজার পাউণ্ড ব্যয় মিশরের খেদিবকেই বহন করিতে হইয়াছিল। ফলে খেদিবের আর্থিক অবস্থা এমন হইল যে, সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানীকে তাঁহার প্রায় সবগুলি শেয়ারই বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বেঞ্জামিন ডিজ্‌রেলী ১৮৭৫ সালে শেয়ারগুলি ক্রয় করিলেন। এই ভাবে সুয়েজ খাল কোম্পানীতে বৃটেনের স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হইল।

বৃটিশ এবং ফ্রান্স উভয় গবর্ণমেণ্টই তাঁহাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কায়রোতে প্রতিনিধি রাখিয়াছিলেন। ক্রমে মিশরের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরেই বৃটিশ এবং ফ্রান্সের যৌথ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত শুধু বৃটিশের কর্ত্তৃত্বই সুপ্রতিষ্ঠিত-থাকে। মিশরের শাসন পরিচালন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ায় ইসমাইল পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং তাঁহার পুত্র মিশরের খেদিব হন। এই সময়ে মিশরের উপর বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণের প্রতিক্রিয়ায় কর্ণেল আরাবি পাশার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদীরা বিদ্রোহ করিয়াছিল। এই বিদ্রোহ দমনে ফ্রান্স কোন অংশ গ্রহণ করে নাই। বৃটিশ সৈন্য আসিয়া এই বিদ্রোহ দমন করে। এইরূপে ১৮৮২ সালে মিশরের উপর বৃটিশের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৬ সালের সন্ধিতে মিশর সুদানের শাসন সম্পর্কে ১৮৯৯ সালের কোণ্ডিমনোনিয়াম চুক্তি মানিয়া লয় এবং বৃটেন কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া হইতে বৃটিশ সৈন্য সরাইয়া লইবার এবং মিশরকে লীগ অব নেশান্‌সের সদস্য করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু কোনটাই কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। লীগ অব নেশান্‌সের মুমূর্ষু অবস্থা এবং আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম ইহার কারণ হইতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পরেও কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সহজে বৃটিশ সৈন্য সরাইয়া লন নাই। বহু আন্দোলনের ফলে বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া হইতে বৃটিশ সৈন্য সরাইয়া লন বটে, কিন্তু মিঃ চার্চ্চিল উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন।

সুদানের সমস্যাটা সুয়েজ খাল অঞ্চলের সমস্যা হইতে স্বতন্ত্র ধরণের মনে করিলে ভুল হইবে না। সুদানের আধুনিক ইতিহাস মহম্মদ আলী পাশার সুদান অভিযান হইতে সুরু হইয়াছে বলিতে পারা যায়। ঐ সময় মিশর ছিল তুরস্কের অধীন এবং মহম্মদ আলী ছিলেন তুরস্কের সুলতান কর্ত্তৃক নিযুক্ত মিশরের পাশা। মহম্মদ আলী সুদানকে আয়ত্ত করিতেই শুধু সমর্থ হন নাই, সুলতানের নিকট হইতে স্বাধীন শাসন পরিচালন করিবার এবং বংশানুক্রমে ক্ষমতা ভোগ করিবার অধিকারও আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত সুদান মিশরের অধীনেই থাকে। এই সময় মেহিদি মহম্মদ আহমদ মিশরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া খারটুম দখল করিয়া লন। ইহার পূর্ব্বেই ১৮৮২ সালে মিশরের উপর বৃটিশ-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। মেহেদিকে দমন করিবার জন্য জেনারেল গর্ডনের অধীনে এক দল বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। সুদানীরা তাঁহাকে টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে বৃটিশ এবং মিশর গবর্ণমেণ্ট সুদানের আশা ছাড়িয়াই দেন। ১৮৮৫ সাল হইতে ১৮৯৭ সাল পর্য্যন্ত বারো বৎসর সুদান ছিল দরবেশদের শাসনাধীনে। সুদানের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান প্রেরিত হয় ১৮৯৮ সালে লর্ড কিচেনারের নেতৃত্বে। ওমদুরমানের যুদ্ধে তিনি সুদানী সৈন্যবাহিনীকে চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত করেন। মিঃ চার্চ্চিলও এই যুদ্ধে ছিলেন এবং বিজয়ী লর্ড কিচেনারের সঙ্গে তিনিও খারটুমে প্রবেশ করেন। এই যুদ্ধে বৃটিশ সৈন্য অপেক্ষা মিশরীয় সৈন্যই বেশী ছিল। কিন্তু সুদান বিজয়কে বৃটিশ তাহার একার কৃতিত্ব বলিয়াই দাবী করে। শেষ পর্য্যন্ত এক চুক্তি হইয়া মিশরের দাবীও স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। উহাই কোণ্ডিমনিয়ম্ চুক্তি নামে অভিহিত। এই চুক্তি অনুসারে সুদানের উপর বৃটিশ এবং মিশরের যৌথ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু আসলে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব বৃটেনেরই।

সুদানকে স্বাধীনতা দেওয়ার অজুহাতে বৃটেন সুদানের উপর কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিতে চায়। মিশর সুদানকে দিতে চায় আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বায়ত্ত-শাসন। সুদানের আশিগ্গা পার্টি মিশর-সুদান ঐক্যের সমর্থক এবং সুদানকে আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্ত-শাসন দিতে মিশরের প্রস্তাবকে এই পার্টি সমর্থন করিয়াছে। সুদানের আর যে সকল রাজনৈতিক-দল মিশর-সুদান ঐক্যের সমর্থক, তাঁহারা মিশর যেটুকু স্বাধীনতা দিতে চাহিয়াছে তাহাতে সন্তুষ্ট নয়। তাঁহারা আরও বেশী স্বাধীনতা দাবী করিয়াছেন। কিন্তু উম্মা দল মিশরের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করিয়াছে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, মিশর ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দিয়াছে যে, মিশরের অভিপ্রায়কে সুদানীরা সর্ব্বপ্রকারে বাধা দান করিবে। এই দলটিকে বৃটেন সমর্থন করিয়া থাকে। ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির দিক দিয়া মিশরের সহিত সুদানের উত্তর-অঞ্চলের অনেকটা সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু দক্ষিণ-সুদানে অধিকাংশই নিগ্রো-জাতীয় লোক। কি ভাষা, কি ধর্ম্ম, কি সংস্কৃতি কোন দিক দিয়াই কোন সাদৃশ্য মিশরের সহিত তাহাদের নাই। তাহারা মিশরের সহিত যোগদান করিতে চায় না। ১৯৩৬ সালের সন্ধি অনুসারে মিশরীরা সুদানে যাইয়া বসবাস করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। মিশর এই অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করায় উত্তর-সুদান মিশরের সহিত যোগদান করিবার পক্ষপাতী। কাজেই সমস্যাটা খুব সহজ নয়।

সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের দাবী মিশর কিরূপে বৃটেনকে দিয়া স্বীকার করাইয়া লইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন। মিশর পার্লামেণ্টে জনৈক ওয়াফাদী ডেপুটী ক্যানাল অঞ্চল হইতে বৃটিশকে তাড়াইবার জন্য রাশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপনের প্রস্তাব করিলে অন্যান্য সদস্যরা চীৎকার করিয়া তাঁহাকে থামাইয়া দেয়। তাঁহার উক্ত মন্তব্যও পার্লামেণ্টের কার্য্য-বিবরণী হইতে বাদ দেওয়া হইবে। কিন্তু এই প্রস্তাবের মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইরাণের শাহ আব্বাস পারস্য উপসাগরের হরমুজ দ্বীপ হইতে পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইবার জন্য বৃটিশকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। ইরাণে বৃটিশের আগমন এবং ইঙ্গ-ইরাণীয় তৈল কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের ইরাণ ত্যাগের মধ্যবর্ত্তী সময়ের মধ্যে মধ্য-প্রাচ্যের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে সন্দেহ নাই।

কিন্তু মধ্য-প্রাচ্য এখনও সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। মধ্য-প্রাচীর মুসলিম-দেশগুলির শাসকশ্রেণী পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষা রাশিয়ার কম্যুনিজমকেই বেশী ভয় করে, ইঙ্গ-মার্কিণ-গোষ্ঠীর ইহাই একমাত্র ভরসা। আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও ঐক্য স্থাপিত হয় নাই। মধ্য-প্রাচ্য রক্ষা-ব্যবস্থার টোপ ফেলিয়া এই অনৈক্যকে আরও বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা চলিতেছে: ইরাণের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোসাদ্দেক আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কায়রোতে অবস্থানের সময় মিশরের প্রধান মন্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া মধ্য-প্রাচীর মুসলিম ব্লক গঠনের গোড়া পত্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার পরিণাম অনুমান করা কঠিন। মধ্য-প্রাচীর সামরিক ও অর্থনৈতিক দুর্ব্বলতা তো আছেই, শাসকশ্রেণীর নীতির মধ্যেও স্ববিরোধ রহিয়াছে। সর্ব্বোপরি রহিয়াছে জনগণের স্বার্থের সহিত শাসকশ্রেণীর স্বার্থের বিরোধ।

সিরিয়ার জটিল সমস্যার স্বরূপ—

গত ২৯শে নভেম্বর (১৯৫১) সিরিয়ার সেনাবাহিনী কর্ত্তৃক শাসন-ক্ষমতা দখল করিয়া নবগঠিত মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্যকে গ্রেফতার করায় তিন বৎসরের মধ্যে চারি বার সেনাদল কর্ত্তৃক শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করা হইল। ১৯৪৯ সালের ৩০শে মার্চ্চ সৈন্যদলের সর্ব্বাধিনায়ক হুসেনী জাইম ক্ষমতা দখল করেন। তাঁহার শাসন-ক্ষমতার অবসান করেন শামী হেন্নাউই ১৯৪৯ সালের ১৪ই আগষ্ট। অতঃপর কর্ণেল আদিব শিসাকৃলি সেনাদলের অধ্যক্ষের নিকট হইতে ক্ষমতা দখল করেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এবারও কর্ণেল আদিব শিসাকৃলিই শাসন-ক্ষমতা অধিকার করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য সিরিয়ার শাসনতান্ত্রিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সিরিয়া তুরস্কের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া ফ্রান্সের ম্যাণ্ডেটরী শাসনাধীনে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামে ১৯৪০ সালে ফ্রান্স হিটলারের নিকট আত্মসমর্পণ করায় ফ্রান্সের বাহিরে ভিসি গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত হওয়ায় সিরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের শেষভাগে জেনারেল দ্য গল সিরিয়ার উপর আবার অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃটিশ হস্তক্ষেপের ফলে এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ১৯৪৬ সালের গ্রীষ্মকালে সিরিয়া হইতে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারিত হয়। অতঃপর কিছু দিন ধরিয়া সিরিয়া প্রজাতন্ত্র যে ভাবে শাসিত হইতে থাকে, সে-সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলা চলে যে, শুকরি কুওয়াইটলি সিরিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও পর্য্যায়ক্রমে কখনও জামিল মর্দ্দাম বে, কখনও খালিদ এল আজম এবং কখনও ফারেস এল খোরী প্রধান মন্ত্রীর পদে বহাল হইতেন। ১৯৪৮ সালে রুশদি কেখিয়া এবং নাজিম এল কোধী উদারনৈতিক এবং নিয়মতন্ত্রবাদী-দিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া 'পিপলস্ পার্টি' বা জনসঙ্ঘ গঠন করেন। জাতীয়তাবাদীরা এই নূতন দলের প্রভাবের প্রতিযোগিতা বিশেষ ভাবে অনুভব না করিয়া পারেন নাই। এই সময়ে প্যালেষ্টাইনে নবগঠিত ইজরাইল রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধে প্রবল আঘাত পাইয়া সামরিক বিভাগের এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, শাসকশ্রেণী সৈন্যবাহিনীকে অত্যন্ত অবহেলা করিতেছেন। প্যালেষ্টাইন যুদ্ধের সময় সিরিয়ার সৈন্যসংখ্যা সাত হাজার হইতে আট হাজারের বেশী ছিল না। তাহাদের অস্ত্রসজ্জাও ছিল অসন্তোষজনক। অনেক অস্থায়ী সৈন্যবাহিনী গঠন করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগকে সশস্ত্র বাহিনী বলা চলিত না। অস্ত্রসজ্জা ভাল করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছিল বটে। কিন্তু সেই অর্থ রহস্যজনক ভাবে উধাও হইয়া গেল এবং দেখা গেল, কয়েক জন খ্যাতনামা রাজনীতিক হঠাৎ বেশ ফাঁপিয়া উঠিয়াছেন। এই অবস্থায় সৈন্যবাহিনীর সহিত বিরোধী দলের একটা আঁতাত গড়িয়া উঠে। উহারই পরিণামে হোসেনী জাইম ক্ষমতা দখল করেন। হোসেনী জাইম সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠনে বিশেষ ভাবেই মনোযোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সৈন্যসংখ্যা ৪৫ হাজার হইতে ৫০ হাজার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবেন। আর এক জন সামরিক অফিসার কর্ণেল শামী হেন্নাউইর গুলীতে তাঁহার শাসনেরও অবসান হইল। ইহার পর সিরিয়ার সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কথা আর শোনা যায় না। কর্ণেল হেন্নাউইর গণ-পরিষদ গঠনের জন্য নির্ব্বাচনের উপর বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। ১৯৪৯ সালের ১৫ই নবেম্বর নির্ব্বাচন হয়। গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার কয়েক দিন পরেই শিসাকৃলি ক্ষমতা দখল করেন। খালেদ এল আজমকে মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, জাইম যখন ক্ষমতা দখল করেন তখন তিনিই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করিবার স্থান এখানে নাই। তবে ইহা উল্লেখযোগ্য যে,

আকরাম হৌরাণীকে দেশরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী করা হয়। তিনি শিসাক্লীর লোক। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে আকরাম হৌরাণী আরব সোশ্যালিষ্ট পার্টি গঠন করিবার পর মন্ত্রিসভায় মতভেদের জন্য খালেদ এল আজমের গবর্ণমেণ্টের পতন হয়। অতঃপর নাজিম এল কৌদ্সীর প্রধান মন্ত্রিত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তিনি পিপলস্ পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। দেশরক্ষা বিভাগের ভার দেওয়া হয় কর্ণেল ফৌজী সেলোর হাতে। তিনিও শিসাক্লীর হাতের লোক।

১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিরিয়ার নূতন শাসনতন্ত্র গৃহীত হয় এবং গণ-পরিষদকেই চেম্বার অব ডেপুটীজে পরিণত করা হয়। ইহাতে জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক রিপাবলিকান প্রভৃতি দল অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। কারণ, তাহারা ১৯৪৯ সালের নির্ব্বাচন বয়কট করিয়াছিল। এদিকে পুলিশ বিভাগকে দেশরক্ষা-সচিবের হাত হইতে স্বরাষ্ট্র-সচিবের হাতে আনিবার চেষ্টা লইয়া ছয় মাস পরে মন্ত্রিসভার পতন হয় এবং ২৫শে মার্চ্চ (১৯৫১) খালেদ এল আজমের প্রধান মন্ত্রিত্বে সম্পূর্ণ নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু কর্ণেল ফৌজী সেলোর হাতেই দেশরক্ষা ও পুলিশ বিভাগের ভার থাকে। এই মন্ত্রিসভার পতন হয় ১৯৫১-৫২ সালের বাজেট লইয়া। গত আগষ্ট মাসে হাসান যে এল হাকিমের প্রধান মন্ত্রিত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভায় রসীদ বারমদা স্বরাষ্ট্র-সচিব হন এবং দেশরক্ষা এবং পুলিশ বিভাগের ভার থাকে ফৌজী সেলোর হাতেই। কিন্তু পুলিশ বিভাগের ব্যাপার লইয়া স্বরাষ্ট্র-সচিব ও দেশরক্ষা-সচিবের মধ্যে বিরোধটা বেশ পাকিয়া উঠে। প্রধান মন্ত্রি শিসাক্লির হাতের পুতুল বলিয়াও চেম্বার অব ডেপুটীজে অভিযোগ উপস্থিত হয়। ইতিমধ্যে গত অক্টোবর মাসে মধ্য-প্রাচী রক্ষা-ব্যবস্থা সমর্থন করিয়া প্রধান মন্ত্রী হাকিম এক বিবৃতি দেওয়ায় অবস্থা চরমে উঠে এবং গত ৮ই নবেম্বর তিনি পদত্যাগ করেন। অতঃপর প্রায় ৩ সপ্তাহ সঙ্কট চলিবার পর পপুলার পার্টির নেতা দোয়ালবী নূতন মন্ত্রিসভা গঠন এবং স্বরাষ্ট্র-সচিবের হাতে পুলিশ বিভাগের এবং জনৈক অসামরিক ব্যক্তির হাতে সামরিক বিভাগের ভার অর্পণের আদেশ-পত্রে প্রেসিডেণ্ট স্বাক্ষর করিবার পরই কর্ণেল শিসাক্লির নেতৃত্বে সেনা-বাহিনী শাসন-ক্ষমতা দখল করেন। অতঃপর সিরিয়ার ভাগ্য কি ভাবে পরিচালিত হইবে তাহা অনুমান করা সহজ নয়।

শ্যামে সামরিক অভ্যুত্থানের তাৎপর্য্য—

গত ২৯শে নবেম্বর (১৯৫১) শ্যামে এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে পিবুলসংগ্রামের গবর্ণমেণ্টের পতন, স্থল-সৈন্যবাহিনী কর্তৃক শাসন-ভার গ্রহণ এবং পুনরায় পিবুলসংগ্রামের প্রধান মন্ত্রিত্বেই নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠন এই সামরিক অভ্যুত্থানের স্বরূপকে যে দুর্ব্বোধ্য করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পিবুলসংগ্রাম কার্য্যতঃ শ্যামের ডিক্টেটর হইলেও তাঁহার এই ডিক্টেটরশিপকে আইনসঙ্গত রূপ দিবার এবং তাঁহার ক্ষমতাকে আরও সুদৃঢ় করিবার জন্যই যে এই সামরিক অভ্যুত্থানের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। এই সামরিক অভ্যুত্থান দ্বারা ১৯৪৭ সালের শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে ১৯৩২ সালের শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের শাসনতন্ত্রে শ্যাম পার্লামেণ্টের দুইটি পরিষদের বিধান আছে। কিন্তু ১৯৩২ সালের শাসনতন্ত্রে শুধু যে একটি পরিষদেরই বিধান আছে তাহা নয়, এই শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী এই পরিষদে ১২৩টি আসন নির্দ্দিষ্ট আছে মনোনীত সদস্যের জন্য। পিবুলসংগ্রাম এই সামরিক অভ্যুত্থানের পরেই শ্যামের পার্লামেণ্টের জন্য ১২৩ জন সদস্য মনোনীত করিতে বিলম্ব করেন নাই। এই মনোনীত সদস্যরাই বর্ত্তমানে অস্থায়ী পার্লামেণ্টরূপে কাজ সুরু করিয়া দিয়াছেন এবং প্রথম অধিবেশনেই তাঁহারা নির্ব্বাচনী আইন সংশোধন করিয়া প্রতি দেড় লক্ষ অধিবাসীর পক্ষে এক জন করিয়া সদস্য নির্ব্বাচনের বিধান করেন। ১৯৩২ সালের শাসনতন্ত্রে প্রতি এক অধিবাসীর পক্ষে এক জন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হওয়ার বিধান ছিল। নূতন বিধানের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা হ্রাস পাইবে এবং পার্লামেণ্টে মনোনীত সদস্যদেরই হইবে প্রাধান্য।

সাম্প্রতিক বিদ্রোহে শ্যামের যে পরিবর্ত্তন হইল, তাহাতে রাজার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা বলা কঠিন। নৌবিভাগের মেকলং জাহাজে রাজা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে প্রধান মন্ত্রী পিবুল তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য জাহাজে উঠেন নাই। তিনি ব্যাঙ্ককের জেটিতেই অবস্থান করিতেছিলেন। বোধ হয়, আবার অতর্কিতে নৌবাহিনী কর্ত্তৃক বন্দী হওয়ার আশঙ্কাই ইহার কারণ। ১৯৩২ সালের শাসনতন্ত্র আইনসঙ্গত করিবার ঘোষণাপত্রে রাজা দস্তখত করেন নাই। নূতন নির্ব্বাচন আইনে স্বাক্ষর করিতেও তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। পিবুল এবং তাঁহার স্থল-সৈন্যবাহিনী ইহার জন্য 'থোড়াই কেয়ার' করে। কিন্তু রাজা কত দিন এই ভাবে টিকিতে পারিবেন ?

যুদ্ধবিরতি আলোচনায় সঙ্কট—

কোরিয়ায় সাময়িক ভাবে স্থলযুদ্ধের বিরতি হওয়ার যে সংবাদ ২৮শে নবেম্বর (১৯৫১) তারিখে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা সত্য নয় বলিয়া পরে প্রকাশ পায় এবং এখন পর্য্যন্ত যুদ্ধবিরতির আলোচনা আদৌ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। যুদ্ধবিরতির চুক্তি প্রতিপালিত হইতেছে কি না, তাহা পর্য্যবেক্ষণের জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন সম্পর্কে নীতির দিক দিয়া উভয় পক্ষই প্রায় একমত হইয়াছেন। অসামরিক অঞ্চল হইতে সৈন্য অপসারণ সম্পর্কেও নীতির দিক দিয়া মতানৈক্য নাই। যুদ্ধবিরতি কমিশন গঠন সম্পর্কে মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রস্তাব এই যে, উহাতে উভয় পক্ষেরই সমান সংখ্যক সদস্য থাকিবেন এবং আরও থাকিবেন আলোচনায় সাহায্য করিবার জন্য নিরপেক্ষ পর্য্যবেক্ষক। নূতন বিমান-ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিতে পারা যাইবে না, তবে পুরাতন বিমান-ঘাঁটি মেরামত করিতে পারা যাইবে। তা ছাড়া আছে যুদ্ধবন্দী-বিনিময়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হিসাব মতে কম্যুনিষ্টদের হাতে যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে কোরিয় বন্দী ৮০ হাজার এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সৈন্য ১৪ হাজার। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হাতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার উত্তর-কোরিয় এবং ১৮ হাজার চীনা বন্দী আছে। কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে বহুসংখ্যক যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করার অভিযোগ করা হইয়াছে। কম্যুনিষ্টরাও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিরুদ্ধে পরমাণু বোমার পরীক্ষা-কার্য্যে কোরিয়া যুদ্ধের বন্দীদিগকে ব্যবহার করার অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে।

করুণা চাই না

"বাঙ্গালা দেশে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্ম আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘকালের। বৃটিশ আমলে তৎকালীন শাসক-বর্গকে বহুবার এই আন্দোলনের চাপে নতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। স্বাধীনতার পরবর্ত্তী আমলেও রাজনৈতিক বন্দীদের বিশেষ করিয়া বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্তিদানের দাবী লইয়া আলোড়ন কম হয় নাই। সাধারণ নির্ব্বাচন আসন্ন হওয়াতে এই দাবী আবার বেশ মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠিতেছে, গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনের নামে দিল্লী হইতে সুরু করিয়া কলিকাতার সরকারী কর্ত্তারা পর্য্যন্ত অনেক হৈ-চৈ করিলেও বিরোধী দলের লোকদের আটক রাখিয়া নির্ব্বাচন পরিচালনা করাকে ঠিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা চলে না। সরকারী কর্ত্তারা যদি সত্যই গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন চান, তবে সমস্ত রাজনৈতিক দলের লোককে সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে তাঁহাদের আপত্তির কারণ কি? বিশেষতঃ বিহার ও মাদ্রাজে সর্ত্তাধীনে রাজনৈতিক বন্দীদের নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে মুক্তিদানের ব্যবস্থা হওয়াতে পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিবার কোন যুক্তি জনসাধারণ খুঁজিয়া পান নাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্র-তরণীর কর্ণধারেরা এত দিন এই দাবীর প্রতি কর্ণপাত না করিয়া অদ্ভুত জিদের সহিত ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছিলেন যে, অন্যান্য প্রদেশে যাহাই ঘটুক, এই প্রদেশে নির্ব্বাচনের আগে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের কোন প্রশ্নই ওঠে না। গভর্ণমেণ্টের এই মনোভাবের কঠোর সমালোচনা শুধু যে বিরোধী দলই করিয়াছিলেন এমন নয়, অনেক কংগ্রেসপন্থী পত্রিকাও ইহাকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। দেখিতেছি, এই সমালোচনা এবং আন্দোলনের ফলে গভর্ণমেণ্ট কিছুটা নতিস্বীকার করিয়াছেন। প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিধানসভা ও লোকসভার নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন, এমন সতের জন রাজনৈতিক বন্দীকে সর্ত্তাধীনে মুক্তি দিবার সিদ্ধান্ত সরকারী কর্ত্তারা করিয়া ফেলিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রনেতাদের শুভবুদ্ধির কিঞ্চিৎ উদ্রেক যদি বিলম্বেও হইয়া থাকে, তবু মন্দের ভালো বলিতে হইবে। নির্ব্বাচনের সময় যখন প্রার্থীদের নানা ভাবে নির্ব্বাচনী আন্দোলন ও কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হয়, তখন প্রার্থীদের উপর সর্ত্ত আরোপ করিয়া মুক্তি দিলে তাঁহাদের অনেকখানি অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে সন্দেহ নাই; তবু কারাগারের অভ্যন্তরে প্রার্থীদের আটক রাখিয়া নির্ব্বাচন পরিচালনা অপেক্ষা ইহা নিশ্চয়ই শ্রেয়ঃ। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কেবল বাছিয়া-বাছিয়া কয়েক জন প্রার্থীকে মুক্তি দিলেই কি সমস্যা মিটিয়া যাইবে? পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা বর্ত্তমানে ২ শতের কাছাকাছি। ২ শত বন্দীর মধ্যে মাত্র সতের জনকে মুক্তি দিয়া গভর্ণমেণ্ট যদি মনে করেন যে, তাঁহারা অনেকখানি করুণা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন এবং এবার বিরোধী দল বা জনসাধারণের ক্ষুব্ধ থাকিবার কোন হেতু নাই—তবে তাঁহারা নিঃসন্দেহে ভুল করিবেন। দেশের লোক শুধু যে নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের মধ্যে আটক ব্যক্তিদের মুক্তি চাহিয়াছেন, তাহা নয়—তাঁহারা সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীরই মুক্তি কামনা করিয়াছেন। কারণ, এই সব বন্দীদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, নির্ব্বাচনের সময় যাঁহাদের কথা হয়ত লোকে শুনিতে চায়, যাঁহাদের হয়ত লোকে নিজেদের মধ্যে পাইতে এবং নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে দেখিতে ইচ্ছুক।"

—দৈনিক বসুমতী।

খুলনায় দুর্ভিক্ষ

"দুর্ভিক্ষে কি পরিমাণ লোক মারা গিয়াছে তাহার হিসাব সরকারী মতে মিলিবে না। প্রকাশ, খুলনা মিউনিসিপ্যাল রেজিষ্টারীতে ১০।১২টি মৃত্যুর কারণ-স্তম্ভে 'অনশন' লিপিবদ্ধ আছে, অনেক মৃত্যু 'অপুষ্টি-আহারজনিত' (malnutrition) বলিয়া লিখিত হইয়াছে। লোক অর্ধাহারে, অপুষ্টিকর খাদ্যে এবং জীবনধারণের অনুপযোগী অখাদ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহাকে অনশন-মৃত্যু না বলিলেও তাহা যে প্রকৃত প্রস্তাবে অনশন-মৃত্যু তাহাতে সন্দেহ নাই। খুলনার খাদ্যাভাবে আট হাজার বা দশ হাজার লোক মারা গিয়াছে বলিয়া এবং ৫০ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষাবস্থার কবলে নিপতিত হইয়াছে বলিয়া যাহা দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, পূর্ববঙ্গের সাহায্য-মন্ত্রী তাহা স্বীকার করিবেন—ইহা মনে হয় না। কিন্তু খুলনার জনসাধারণের অবস্থা যে অত্যন্ত সঙ্কটজনক এবং ভয়াবহ, তাহাদের সাহায্য ও বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার প্রশ্ন যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, তাহা আশা করি, পূর্ববঙ্গ সরকার স্বীকার করিবেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সাহায্য-দপ্তরের মন্ত্রী জনাব মফিজুদ্দীন সাহেবের আচরণ বিসদৃশ মনে হইতেছে। সংবাদে দেখিতেছি, এশিয়ার কারিগরী জনশক্তি সম্মেলনে যোগ দিবার জন্ম তিনি সত্বরই ব্যাঙ্ককে যাইতেছেন। খুলনার জনশক্তি যেখানে অনশনের মুখে, তাহাদের সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা যেখানে অগ্রাধিকারের দাবী রাখে, সেখানে ছুটিয়া না গিয়া সাহায্য-মন্ত্রী চলিয়াছেন ব্যাঙ্ককে। অপর কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্ককে গিয়া গোটা এশিয়ার জনশক্তির প্রতি কর্তব্য করিতে পারিতেন, জনাব মফিজুদ্দীনের কি খুলনার দুর্গত জনের নিকটই সাহায্য লইয়া যাওয়া এবং খুলনার সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত তথায় থাকা একান্ত কর্তব্য ছিল না? খুলনার দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সংখ্যার অনুপাতে, সমস্যার ব্যাপকতার অনুপাতে, সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ও ব্যবস্থা "মরুভূমিতে বারিবিন্দুর মত" বলিয়া প্রত্যক্ষদর্শিগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সাহায্য দানের সুব্যবস্থা এবং তৎপরতা একান্ত বাঞ্ছনীয়। খুলনার এই দুর্ভিক্ষাবস্থার কারণ সম্পর্কে পূর্ববঙ্গ সরকার অজন্মার কথা বলিয়াছেন। অজন্মা একটা কারণ, কিন্তু ইহাই দুর্গতির একমাত্র হেতু নহে। দেশ বিভাগের পূর্বে খুলনার জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশ কলিকাতার সঙ্গে ব্যবসায় করিয়া জীবিকার্জন করিত। জ্বালানী কাঠ, মাদুর, মধু, ঝাঁটার কাঠি, মাছ, তরকারী কলিকাতায় চালান দিত। এই কার্যে ২০ সহস্র বড় বড় নৌকা খাটিত। কম পক্ষে এক লক্ষ লোক এই ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ

করিয়া জীবিকার্জন করিত। আজ সহজ স্বাভাবিক এবং তাহাদের অভ্যস্ত ও চলতি ব্যবসায় একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাহারা বৃত্তিশূন্য হইয়া আর্থিক অনটনের চরম সীমায় পৌছিয়াছে। এই ভয়াবহ বৃত্তি ও অর্থাভাবের উপর অজন্মা যুক্ত হইয়া তাহাদের সর্বহারায় পরিণত করিয়াছে। এক দিকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দান আর এক দিকে লক্ষ লোকের পূর্ব-জীবিকার পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া পূর্ববঙ্গ সরকারের কর্তব্য।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

উত্তর যথাসময়ে দিবে

"পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের দিকপালগণ নির্বাচনের জন্য আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রকাশ্য সভা করিতে গেলে কি দুর্গতি হয়, একাধিক ক্ষেত্রেই তাহা দেখা গিয়াছে। কোথাও ক্লাব ঘরে, কোথাও বা জমিদার-বাড়ীতে পাড়ার তথাকথিত মাতব্বর ব্যক্তিদের একত্রিত করিয়া, সেই বৈঠককে পেটোয়া সংবাদপত্রের দৌলতে বিরাট সভারূপে ছাপাইয়া নির্বাচনী প্রচারের তৎপরতা তাঁহারা মন্দ দেখাইতেছিলেন না। হাজরা পার্কে পুলিশ ও লাঠিধারী "বীর্যবান আপোষহীন স্থিতপ্রজ্ঞ" কংগ্রেস ভলান্টিয়ার দ্বারা দুই দুই বার সভ্য করিতে গিয়া সভাপতি ঘোষ মহাশয় যে ভাবে নাজেহাল হইয়াছেন, তাহার সংবাদ দেশবাসী রাখে। কংগ্রেসের সভা না করিলেও চলে। জনগণের নিকট তাঁহাদের ভোট প্রার্থনার তো প্রয়োজন নাই। তাঁহারা ভোট দাবী করিতেছেন—প্রার্থনা করিতেছেন না। একাধিক কংগ্রেস-নেতাই 'দাবী' কথাটার উপর খুব জোর দিয়াছেন। দাবীর পশ্চাতে একটা শক্তি থাকে—সে শক্তি কিসের শক্তি? টাকা দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া, পুলিশ ও আপোষহীন বীর্যবান কর্মী দেখাইয়াই তাহারা সে শক্তির পরিচয় দিতেছেন এবং ঐ শক্তিবলেই ভোট 'দাবী' করিতেছেন—প্রার্থনা করিতেছেন না। তাহা করুন, উহাতে বলিবার কিছুই নাই। মনোনয়নপত্র বাতিলের ব্যাপারে, জেলাবোর্ড নির্বাচনে, পাকিস্থান হইতে মুসলমান ভোটার আমদানীর ব্যাপারে, এমন কি, কোন কোন স্থলে রিটার্ণিং অফিসারকে ভোট ক্যানভাস করিতে দেখার অভিযোগে এই আশঙ্কাই জন-মনে প্রবল হইয়া উঠিতেছে যে, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন নির্বাচন সম্ভব নহে। কাজেই সভা-সমিতি না করিলেও বা না করিতে পারিলেও যে কংগ্রেসই নির্বাচনে জিতিবে, এই আনন্দে তাঁহারা মশগুলই আছেন। তবু তাহাকে সভা-সমিতির আয়োজন করিতে লোকে দেখে। কেন এই আয়োজন? রেকর্ড সৃষ্টির জন্য—ফাইল ঠিক রাখিবার জন্য। ইংরেজের তল্পীবাহক আজিকার কংগ্রেসীরা ফাইল-দুরুস্তি কি ভাবে করিতে হয়, তাহা রপ্ত করিয়াছেন ভালো। তাই পশ্চিমবঙ্গে গোটা কয়েক সভা যে কংগ্রেসের তরফ হইতে হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য শ্রীজগজীবনকে তাঁহারা সম্প্রতি ধরিয়া আনিয়াছেন। উহার পিছনে আসিতেছেন উত্তর-প্রদেশের মহাংমুর্দ্ধ'র পন্থ, তাঁহার পশ্চাতে আছেন কাশ্মীরের শের সেখ আব্দুল্লা। সর্বশেষে কিস্তিমাৎ করিতে আসিতেছেন শ্রীনেহরু—যিনি ১৯৪৯ সনে শরৎ বসুর জয়ে বিচলিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মতামত নিয়া ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা জনগণের আস্থা হারাইয়াছে। আজ আবার সেই প্রিয়দর্শন শ্রীনেহরুই পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া আমাদিগকে আবার শুনাইবেন, ইহারা আস্থাভাজন, করিৎকর্মা লোক। ইহাদিগকে যদি তোমরা ভোট না দাও, তবে দেশ-ধর্ম-জাতি রসাতলে যাইবে। শুনাইবেন, কংগ্রেসের অতীত ঐতিহ্যের গৌরব-গাথা—স্বীকার করিবেন, খানিকটা নিজেদের দোষ-ত্রুটির কথা, বলিতে থাকিবেন কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলিকে 'ব্যাঙের ছাতা'। অরাজকতার ভয়, সাম্প্রদায়িকতার ভয়, রক্তপাতের ভয় তো দেখাইবেনই। ইহা আমরা বুঝিয়া নিয়াছি। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ উহার উত্তর জানে—সে উত্তর তাহারা যথাসময়ে দিবেও।" —লোকসেবক।

মার্কিনী লাঙ্গল

"চুঁচুড়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কৃষি ফার্মে এক অনুষ্ঠানে কলিকাতাস্থ মার্কিন কন্সাল মুখ্যমন্ত্রীকে বলদ-চালিত দুইটি মার্কিনী লাঙ্গল উপহার দিয়াছেন। এই লাঙ্গল দুইটি হাতে করিয়া মুখ্যমন্ত্রী ভাবে গদগদ হইয়া ঘোষণা করিয়াছেন—"গবর্ণমেণ্ট যে নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার সহায়তায় তাঁহারা আগামী তিন-চার বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এরূপ পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবেন, যাহা দিয়া শুধু এই রাজ্যের জনগণেরই যে চাহিদা মিটিবে তাহা নহে, প্রতিবেশী অন্যান্য রাজ্যগুলির জনসাধারণেরও প্রয়োজন মিটাইতে সাহায্য হইবে।" এই উক্তির একমাত্র তাৎপর্য হইতেছে—"হে বঙ্গজন, যদি এই প্রাচুর্যের স্বর্গে তোমরা আরোহণ করিতে চাও তবে ভোট দিয়া আমাদের গদিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠ কর।" কুলোকে অবশ্য প্রশ্ন করিবেন যে, এই মহাপুরুষেরা গত চার বৎসর ধরিয়া কি করিলেন? সত্যিই, কি-ই বা তাঁহারা করিবেন। উদ্বাস্তুরা আসিয়া প্রথমে সরকারকে বেকায়দায় ফেলিয়া দিল। তার পর অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, মহামারী, অজন্মা এবং সর্বোপরি পঙ্গপালের হুমকি—এই সব সামলাইয়া লইতেই চার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। নির্বাচন যখন সম্মুখে তখন ঐ সব কথা না তোলাই ভাল। যদিও জানা কথা যে, সরকারের মুখ রক্ষার জন্য প্রকৃতি দেবী নিশ্চয়ই আগামী বৎসরে উপরোক্ত সব কয়টি মূর্তিই ধারণ করিবেন। ইংরেজ দয়ার্দ্র হইয়া স্বাধীনতা দিয়াছে বলিয়াই যে প্রকৃতি দেবীও তাঁহার ভাণ্ডার কংগ্রেসের জন্য মুক্ত করিয়া দিবেন এমন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তবে কিসের ভরসায় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের অমন আশ্বাস দান করিলেন? খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার এমন কি পরিকল্পনা করিয়াছেন? "অধিক খাদ্য ফলাও" আন্দোলন তাঁহাদের একটি চমকপ্রদ ব্যবস্থা। কিন্তু এই ব্যবস্থায় শস্যোৎপাদন প্রতি বৎসর কমিতেছে। জমির উৎপাদনী শক্তি পর্যন্ত কমিয়া যাইতেছে এবং তাহা বৃদ্ধির কোনও ব্যবস্থা নাই। জমিদারী জোতদারী প্রথাও ঠিকই থাকিবে—কারণ মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়াছেন যে, ঐগুলি কোনও সমস্যা নয়। মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন—"এ প্রদেশে খাদ্যোৎপাদন বাড়াইতে হইলে প্রয়োজন লাঙ্গলের কলকব্জার উন্নতি সাধন, উৎকৃষ্ট বীজের ব্যবস্থা, উন্নত ধরণের সার প্রস্তুত এবং সেই সঙ্গে সেচের সুবন্দোবস্ত।" সেচের সুব্যবস্থা, জলাভূমির জল নিষ্কাশন ও পুষ্করিণী খনন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সরকার সর্বপ্রকারে উৎপাদন বৃদ্ধির না কি চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধি

না হইয়া যায় কোথায়? শুধু তাই নয়—ডাঃ রায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, খাদ্য-সচিবকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কৃষি বিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়া যে সকল ছাত্র বাহির হইবে তাহাদের প্রত্যেককে ছোট ছোট কৃষি-প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ দিতে হইবে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ভূমি-সেনার কথা ডাঃ রায় বলিতে সম্ভবতঃ ভুলিয়া গিয়াছেন। এই ভূমি-সেনা আর পাশ-করা ছাত্ররা যদি কৃষিকার্যে লাগিয়া যায় তাহা হইলে আর কথা আছে! সর্বাপেক্ষা বড় কথা, মার্কিনী লাঙ্গল আসিয়াছে এবং আসিতেছে। অন্ত কেউ কিছু পারুক আর না পারুক, মার্কিনী লাঙ্গলে চষিয়া কৃষিক্ষেত্রে সোনা ফলান যাইবেই।" —সত্যযুগ।

ছাত্রদের স্বাস্থ্য

"রিপোর্টে দেখা যায়, বর্তমান কলিকাতার সমস্ত আর্থিক গোষ্ঠীর ও বয়সের ছাত্র-সমাজের অবস্থা দুর্ভিক্ষ বছরের খুব কাছাকাছি গিয়াছে। গত আট বছরে হৃষ্টপুষ্ট ছাত্রের সংখ্যা শতকরা ৩১.৬ হইতে ২৫.২তে নামিয়া গিয়াছে। খারাপ ছাত্রদের সংখ্যার হার শতকরা ৩১.৬ হইতে বাড়িয়া ৩৮.৩এ পৌঁছিয়াছে। অবিলম্বে চিকিৎসিত হওয়া প্রয়োজন এমন ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা শতকরা ৪০ হইতে ৫০এ উঠিয়াছে। ক্ষয়িষ্ণু দৃষ্টিশক্তি ছাত্রের হার শতকরা ১৫.৮ হইতে ৩১.৭ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, তাহাদের শতকরা ৬৪.২ জন ক্ষীণদৃষ্টি, শতকরা ৩০.৬ জন টনসিল বৃদ্ধি রোগে ভুগিয়া থাকে। ইংরেজের রাজত্বকালে ১৯৪৩।৪৪ সনের আকাল-ধবা বাংলায় ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য এমন শোচনীয় পর্যায়ে একবার পৌঁছিয়াছিল। ১৯৪৪-৪৬ সনে আংশিক রেশন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর এই ক্রমাবনতির গতি কিছুটা স্তব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সে স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়াছে। অবনতির হার উদ্বেগজনক গতিতে বাড়িয়া যাইতেছে। কারণ, এই কয় বছরে খণ্ডিত বাংলার সমাজ-কাঠামোয় একটা ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে। সস্তা দামের সরকারী রেশনের পরিমাণ কমিতে কমিতে হাস্যকর পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; অপর দিকে খাদ্যমূল্য লাফাইয়া লাফাইয়া বাড়িয়া গিয়াছে। রেশন-বহির্ভূত খাদ্যসামগ্রীর দাম যে হারে বাড়িয়াছে, পারিবারিক আয় সেই অনুপাতে অতি নগণ্য হারেই বাড়িয়াছে। ফলে বাঁধা আয় আর অনিচ্ছাকৃত বিপুল খরচের মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে গিয়া বহু পরিবারকেই নানা ভাবে নাজেহাল হইতে হইয়াছে। চির অভাবের সংসারে পুষ্টিকর খাদ্যের পরিমাণও ধীরে ধীরে কমিয়া গিয়াছে। গোটা সমাজের এমনি শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থায় শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক ভাবেই বিব্রত হইয়াছে। কিন্তু অন্ততঃ ছাত্র-সমাজের এই দুরবস্থাকে লাঘব করার জন্ত সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় আজ পর্যন্ত কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। বরঞ্চ সরকারী শিক্ষাখাতে ব্যয়-বরাদ্দ 'নেহাৎ মঞ্জুর না করিলে নয়।' গোছের হইয়াছে; স্কুলে বেতন বাড়িয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফী বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিপুল কলেবর পাঠ্য-পুস্তকের তালিকা বিপুল কলেবরেই বিরাজ করিতেছে। আবার আজকাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মহলে শিক্ষিত বেকারের হার কমানোর একটা মনোভাব দেখা দিয়াছে। বর্তমান বছরের পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়া অন্ততঃ সেই কথাটাই বেশ স্পষ্ট হইয়া মনে পড়ে। অথচ এই ক্ষীণস্বাস্থ্য ছাত্র-ছাত্রীরাই না কি দেশের ভবিষ্যৎ। সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক—এক কথায় গোটা জাতির ভবিষ্যৎ-স্রষ্টা এই ছাত্র-সমাজ। কিন্তু কংগ্রেসী সুশাসনে গোটা দেশ যেমন করিয়া ধীরে ধীরে রসাতলে যাইতেছে, জাতির ভবিষ্যৎও তেমনি আস্তে আস্তে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে অস্তমিত হইতেছে।"

—গণবার্তা।

গুরুতর অভিযোগ

"ঔষধ বিক্রয় সম্বন্ধে আমাদের নিকট একটি গুরুতর অভিযোগ আসিয়াছে। একটি রোগীকে কলিকাতার এক জন সুপরিচিত ক্যাপ্টেন, বি-এস-সি, এম-বি, এফ-আর-সি-এস (এডিনবার্গ) এফ-এফ-আর (লণ্ডন) প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তার নিম্নলিখিত ইঞ্জেকসনের প্রেস্ক্রপসন দিয়াছিলেন—

মর্ফিন এসিটাস	১/৬ গ্রেণ
কোকেন হাইড্রোক্লোর	১/৮ "
জল	৫ সি-সি

বাথগেট কোম্পানী হইতে ঔষধ কিনিতে বলা হয়। রোগীর গৃহ-চিকিৎসক বি-এস-সি, এম-বি, ডি-টি-এম, ডি-এম-আর। রোগী বাথগেট কোম্পানী হইতে ইঞ্জেকসনটি ক্রয় করেন, কিন্তু তাহাকে ৫ সি-সির পরিবর্ত্তে একটি ১৫ সি-সি এমপুল দেওয়া হয়। রোগীর গৃহ-চিকিৎসক উহার ৫ সি-সি ইঞ্জেকসন দেন, ১০ সি-সি তাঁহার নিকট থাকে। ইঞ্জেকসনে কোন ফল না হওয়ায় রোগী ডাক্তারকে তাহা জানান। ইঞ্জেকসনের অবশিষ্ট ১০ সি-সি সরকারী রসায়নাগারে পরীক্ষার জন্ত পাঠানো হয়। তাঁহারা যে রিপোর্ট দেন তাহাতে জানা যায় যে উহাতে মর্ফিন নাই, কোকেন হাইড্রোক্লোর যে পরিমাণে থাকার কথা তার ৫ ভাগের এক ভাগ মাত্র আছে। রোগী পুলিশকে জানান। পুলিশ বলে যে তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম ছাড়া কিছু করিতে পারিবে না। রোগী তখন বাঙ্গলা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে যান। ইঁহারা রোগীকে বলেন যে আপনি ৬০ সি-সির অর্ডার দিন, উহা হাতে পাইলে তার পর দেখা যাইবে। এখানেও কিছু হইল না। অতঃপর রোগী গেলেন আবগারী বিভাগে। একসাইজ কালেক্টারের নিকট তিনি লিখিত দরখাস্ত করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। কলিকাতার দুই জন বিশিষ্ট চিকিৎসক ব্যাপারটি অনুসন্ধানের জন্ত চেষ্টা করা সত্ত্বেও পুলিশ, সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ এবং আবগারী বিভাগকে টলানো গেল না। এই ব্যাপারে দেশের সমস্ত রোগীর স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে এবং ইহার অনুসন্ধান ও সত্য নির্দ্ধারণ একান্ত প্রয়োজন। এক জন নাগরিক অতি গুরুতর অভিযোগ করিতেছেন, তার কথায় কেহ কর্ণপাত করিতেছে না, প্রতিকারের জন্ত তিনি বিভিন্ন দুয়ারে মাথা ঠুকিয়া ফিরিতেছেন, ইহা গণতান্ত্রিক সমাজ নহে।" —যুগবাণী।

Good Government চাই

"আসন্ন নির্বাচনের ভিতর দিয়া জাতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চলিতেছে। এই নির্বাচনের ফলে রাষ্ট্রের রূপ পরিবর্তন হইতে পারে। কেবল দেশের ভিতর নহে, বহির্ভারতে—আন্তর্জাতিক

ক্ষেত্রেও তাহার প্রভাব বিস্তার হইবে। আমাদের সব কিছু সমস্যা সমাধানের সহিতও যেমন এই নির্বাচনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, তেমনি বিশ্বের পরস্পর-বিরোধী দুই শিবিরের মধ্যে আমরা কাহারো নিকটতম হইতে পারি, এবং কাহারো নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে পারি। সব দিক দিয়া এই নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ভোটদাতাদের দায়িত্ব অপরিসীম। সমস্ত অবস্থা বিচার-বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ নহে। নির্বাচনের প্রধান লক্ষ্য হইবে, দেশে একটি Good Government গঠন করা। কংগ্রেস দল আজ দেশের শাসনতন্ত্র পরিচালনা করিতেছেন, তাহাদের কাজ আমাদের ভাল না লাগিলে এবং তাহাদিগকে উৎখাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে অন্য আর একটি দলকে বরণ করিয়া লইতে হইবে! এই গ্রহণ ও বর্জন একই সঙ্গে, আমাদের ভোটদানের ভিতর দিয়াই হইয়া যাইতেছে। যে দলকে ভোট দিব, মনে রাখিতে হইবে, তাহারই উপর সরকার গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করিতেছি, সুতরাং এই দল এই দায়িত্ব গ্রহণের ও বহনের উপযুক্ত কি না, বিচার করিয়াই ভোট দিতে হইবে। দলের নীতি ও কর্মপদ্ধতি আমাদের স্বার্থরক্ষার উপযোগী কি না, পূর্বাহ্ণেই এই কথা ভাবিয়া লইতে হইবে। একটা সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শ অনুসারী কর্মপন্থায় বিশ্বাসী ঐক্যমতাবলম্বী দল ব্যতীত কোন দেশে সরকার গঠন করা সম্ভব হইতে পারে না; ঐক্যমতাবলম্বী দল ছাড়া বিরোধী দল গঠন করাও অবাস্তব ব্যাপার।" —যুগশক্তি।

তবুও ক্ষমা নাই?

"কংগ্রেসী শাসনের ক্ষুধায় দেশের মানুষ আজ কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কংগ্রেসী ফেরুপালগণের কুটিল দৃষ্টিতে কখনও বিশ্লেষিত হইবে না। দারিদ্র্য, অনাহার, অবিচার ও লাঞ্ছনার মধ্যে আমরা নিত্য তাহাদের ক্ষুধার উপকরণ জোগাইয়া চলিয়াছি। তাহাদের এই বিশাল ও স্ফীতোদর দেহকে আরও স্ফীতকায় করিবার জন্য মানুষের অস্থি, চর্ম, আশা, আনন্দ সব বিসর্জন দিতে হইতেছে।···কিন্তু তবুও ক্ষমা নাই। দেশের কর্ণধাররূপে কংগ্রেস যেদিন ইংরাজের হাত হইতে শাসনরজ্জু গ্রহণ করিয়াছিল, সেদিন দেশের লোক ইহা কখনই ভাবে নাই যে, কংগ্রেসী শাসনের মহিমায় দিন রাত হইয়া যাইবে এবং রাত দিনে পরিণত হইবে। এ কথা এখানে বলিবার উদ্দেশ্য ইহাই যে, কংগ্রেসী দালালগণ বঞ্চিত মানুষের কাছে এই একটি কথাই আজকাল জিজ্ঞাসা করিতে শিখিয়াছে। তাঁহারা আমাদের প্রায়শঃই বলিয়া থাকেন যে—তোমরা ভাবিয়াছিলে 'Miracle' কিছু হইবে।—ভাবিয়াছিলে কংগ্রেস দিনকে রাত বানাইতে পারিবে।—না, আমরা কখনও তাহা ভাবি নাই। সাধারণ মানুষের মন তাহাদের মত শয়তানী চক্রে আচ্ছন্ন নয়। জাতি ভাবিয়াছিল—স্বাধীনতা তাহার জীবনে অফুরন্ত উৎসাহ ও সম্ভাবনার জোয়ার আনিয়া দিবে। আর কংগ্রেস সেই সম্ভাবনাকে সার্থক ও সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া দেশের ভাবী কালের ভবিষ্যদেব জীবনকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে চেষ্টিত হইবে।—কিন্তু সেই সংগঠনের পথে না চলিয়া আজ কংগ্রেস ও কংগ্রেসী সরকার যে পথে পরিক্রমা সুরু করিয়াছেন, তাহা জাতির পক্ষে অতি মারাত্মক। মারাত্মক বলিতেছি এই কারণে যে, বর্তমান কংগ্রেসের নীতির সঙ্গে গণজীবনের কোন যোগসূত্রই নাই। তবে এ কথা সত্য যে, কায়েমী স্বার্থের যাহারা পরিচালক—বাঙ্গালীর রক্তশোষণকারী মাড়োয়ারীর যাহারা পদলেহনকারী, কংগ্রেসের নিকট হইতে জাতির সর্ব ধ্যান-ধারণার কেন্দ্রমূল মধ্যবিত্ত সমাজ বঞ্চনা, লাঞ্ছনা ও অবিচার ছাড়া আর কিছুই আশা করিতে পারে না। আমরা আজ দেখিতে পাইতেছি যে, কংগ্রেসী নির্বাচনী তহবিল চোরাকারবারীর অর্থে দিন দিন পুষ্ট হইতেছে। এই কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের দ্বারা আমাদের কোন উপকার সাধিত হইবে কি? যখন দেখি, অযথা ও অকারণ লক্ষ লক্ষ টাকা নর্দমার পথে ব্যয় হইয়া যাইতেছে, আর অন্য দিকে দরিদ্র মেধাবী ছাত্র অর্থের অভাবে তাহাদের কাছে সাহায্যের জন্য গিয়া বঞ্চনা, প্রতারণা ও ছলনার বাণ শিরে ধারণ করিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, তখন মনকে কি বলিয়া প্রবোধ দেওয়া যায়?" —কর্ম্মিদল।

বিবেচনা অপরিহার্য্য

"সমগ্র ভারতবর্ষে নির্ব্বাচনের তোড়জোড় বিপুল ভাবে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাচনে যে দল বা দলের সমষ্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবে, তাঁহারাই কেন্দ্রে ও প্রদেশে রাষ্ট্র পরিচালনা করিবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সর্ব্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেস ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছেন। ক্ষমতায় আসীন কংগ্রেস দল প্রতিটি কেন্দ্রে প্রার্থী মনোনীত করিয়া নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে বিভিন্ন বামপন্থী দল একক ভাবে বা কোন কোন স্থানে মিলিত ভাবে প্রার্থী মনোনীত করিয়াছেন। ফলে প্রত্যেকটি ভোটদাতার মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছে, এই নির্ব্বাচনে কাহাকে সমর্থন করা উচিত। কংগ্রেস চারি বৎসরের অধিক কাল রাষ্ট্রতরণী পরিচালনা করিতেছেন কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি বা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। বরং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-নির্বাহ ক্রমে দুঃসাধ্য হইতে অসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। কোন ক্ষেত্রেই তাঁহারা কোন কৃতিত্ব বা উন্নতির আভাষও দেখাইতে পারেন নাই। কংগ্রেস দলকে ভোট দেওয়ার পূর্ব্বে তাহাদের কার্য্যাবলীর কথা বিবেচনা অপরিহার্য্য।" —দৃষ্টি।

ফসল গৃহে তুলিতে হইবে

"খাদ্য লইয়া তথাকথিত ব্যবসায়ীদের ও দালালদের খপ্পরে পড়িয়া ধান্য ও চাউলের মূল্য যে স্বাভাবিক অবস্থায় নামিতে পারে না, ইহা জানা কথা। ঘাটতি বাড়তির হিসাব মানুষকে কিছুমাত্র আশান্বিত করে না। আমাদের মনে হয় যে, জেলায় স্বাভাবিক অবস্থা আনিতে হইলে ইহাকে সর্ব্বাগ্রে বিধি-নিষেধ হইতে মুক্ত করিয়া যাহাতে দালালদের হাতে গিয়া ইহা না পড়ে, তৎপ্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এটা দৃষ্টিবিভ্রমের যুগ। সেই জন্য দৃষ্টিহীনতাই চতুর্দ্দিকে দেখা যায়। ধান্য ও চাউল স্বাভাবিক পথে পূর্ব্বেকার ন্যায় যাহাতে হাটে-বাজারে আসিতে পারে তাহার জন্য সর্ব্ববিধ চেষ্টা করা প্রয়োজন। গৃহস্থ, উৎপাদনকারী ও ক্রেতার মধ্যে অপর কেহ যত প্রবেশ না করিতে পারে ততই মঙ্গল এবং মূল্য ততই কমিবে। কিন্তু বর্ত্তমান পটভূমিকায় যাহা চলিতেছে তাহা ইহার ঠিক বিপরীত। এরূপ অবস্থায় খাদ্য বিষয়ে আমরা

বিশেষ কোন আশা পোষণ করি না। চাষী যাহাতে তাহার ফসল যথাযথ ভাবে গৃহে তুলিতে পারে, আপাততঃ তাহার ব্যবস্থা হইলেও কিছুটা কল্যাণ হয়।" —ত্রিস্রোতা।

প্রস্তুত হও

"সংগ্রামের এক অবকাশ আজ জাতীয় জীবনের দ্বারে উপস্থিত। সংগ্রামের প্রতি অবসরকে আজ সবলে ধরিতে হইবে। স্বাধীন জীবন প্রতিষ্ঠার কল্পনার রূপ আজ জনগণের মনে মনে আহ্বান দিতেছে—মানুষের মর্ম্মবেদনার আহ্বান আজ মানুষকে কর্ম্মে ব্যাকুল করিতেছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের অন্তরের তেজদৃপ্ত ন্যায়বোধ মানুষকে দৃঢ়তার জাগ্রত করিতেছে—হে সৈনিকের দল, তাহাকে ভাষা দাও, তাহাকে যথার্থ পথে পরিচালিত করো। আজ এই জাতীয় সংগ্রামে জনতার শক্তিতে, সেবকের শক্তিতে সমুন্নত জাতীয় ভাবধারা সমূহের জয় হোক। দেশের সংকীর্ণ পুরাতন ভাবধারার বাহকেরা তাহাদের স্বার্থ-প্রয়োজনে তাহাদের কায়েমী স্বার্থ ও কায়েমী ভাবধারাগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে আজ প্রাণপণ সংগ্রাম করিবে। যে শোষণ ও লুণ্ঠনের প্রেরণা ও দুষ্টচক্র আজ জাতীয় জীবনকে এরূপ অবনত করিয়াছে—তাহারই প্রেরণায় আজ তাহারা মরিয়া হইয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহিবে। তোমাদের আজ দিকে দিকে তাহার উপযুক্ত শক্তিশালী সংগ্রাম দিতে হইবে; তাহার জন্য প্রস্তুত হও।" —মুক্তি।

বীরভূম জেলা বোর্ডের দুর্নাম

"বীরভূম জেলা বোর্ডের দুর্নাম আজ সকলের নিকটই বিদিত। এর দুর্নীতির সুদীর্ঘ অধ্যায়, কলঙ্কজনক দলাদলির পটভূমিকা বার বার সরকারকে স্বহস্তে এই প্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা ইহার পরিচালনে বাধ্য করিয়াছে। বারে বারেই সেই 'খোড় বড়ি খাড়া' আর 'খাড়া বড়ি খোড়' সদস্যরা অজ্ঞ সাধারণের অজ্ঞানতার সুযোগে নির্ব্বাচিত হইয়া সদস্য হইয়াছেন ও কলঙ্কের মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তাই এত দিন সরকার বাধ্য হইয়া যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সঠিকই হইয়াছিল বলিয়া আমরা মনে করি।

এখন পুনরায় নূতন করিয়া নির্ব্বাচন হইয়া নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার পর পরাজিত ও মনোনয়ন-পত্র পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ যে সং ব্যক্তি সদস্য হইবার অভিলাষী ছিলেন, তাঁহাদের চক্রান্তে ও নানাপ্রকারের বাধা দানে নূতন সদস্যের দল বোর্ডের পরিচালন ভার নিজেদের হাতে লইতে পারেন নাই এবং নিজেদের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করিবার সুযোগও পান নাই ও নানা প্রকারের আইনগত বাধা তাঁহাদের সে সুযোগ অবরুদ্ধ করিয়াছে। তার পর সমস্ত বাধার জাল যখন অপসারিত হইল তখন সদস্যরা ভাবিলেন যে, হয়ত বা এইবার তাঁহারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করিবার সুযোগ লাভ করিবেন। কিন্তু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর নব নির্ব্বাচিত সদস্যদের প্রত্যেককে জানাইলেন যে, উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ মত তিনি চেয়ারম্যান মনোনয়ন করিবেন। তিনিও কূট আইনগত বাধা-নিষেধের অজুহাত দেন। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে যে নির্ব্বাচন এবং তাহার ভিত্তিতে নির্দ্ধারিত সদস্যদের আইনানুযায়ী যে ক্ষমতা ন্যায্য প্রাপ্য তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া যে ব্যবস্থা করিতে যাওয়া হইতেছে, তাহা গণতন্ত্রের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত ছাড়া আর কি হইতে পারে? এমন নহে যে, সদস্যগণ তাহাদের ব্যবস্থা, চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন ইত্যাদি করিতে অপারগ হইয়াছেন। তাহা হইলে এ ব্যবস্থার হয়তো বা অর্থ হইত। কিন্তু সদস্যরা সুযোগই যেখানে পাইলেন না, সেখানে সরকার কর্ত্তৃক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে যাওয়া নিতান্ত অন্যায় বলিয়া আমরা মনে করিতেছি। পূর্ব্বে দল-স্বার্থের মাত্রা এতই চরম ছিল যেখানে সরকারের ব্যবস্থা অবলম্বন হয়ত ন্যায়ই হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে সে অজুহাত অযৌক্তিক।" —বীরভূম বার্ত্তা।

শোক-সংবাদ

বিগত ৬ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাত্রি সাড়ে দশটায় শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার বরাহনগরস্থ বাসভবনে দেহরক্ষা করিয়াছেন। ১৮৭১ খৃঃ জন্মাষ্টমীর দিন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাঙলা চিত্রকলার জন্মদাতা অবনীন্দ্রনাথকে হারাইয়া বাঙলা ও বাঙালী একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে হারাইল। আমরা আচার্য্যের আত্মার শান্তি কামনা করি।

দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ভারতের বিখ্যাত চলচ্চিত্র-শিল্পী প্রমথেশ বড়ুয়া গত ২৯শে নভেম্বর তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। প্রমথেশ বাবু ১৯০৩ সালের ২৪শে অক্টোবর আসামের গৌরীপুর রাজ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৯২৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এস-সি পাশ করিয়া তিনি রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন এবং ১৯৩০ সালে এই সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তিনি আসাম ব্যবস্থাপক সভায় দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের চীফ হুইপ ছিলেন। ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই সভার সদস্য থাকেন। ১৯৩০ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন। তিনি এক জন ভাল টেনিস ও বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় ছিলেন। প্রমথেশ বাবু উইম্বলডনে বিশ্ববিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় টিলডেনের নিকট টেনিস খেলা শিক্ষা করেন। যৌবনের সূচনায় অভিনয়ের প্রতি তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং এই আকর্ষণ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিখ্যাত চলচ্চিত্র-শিল্পীতে পরিণত করে। ১৯২৮ সালে ইউরোপ পরিভ্রমণের সময় তিনি প্যারিসে ফক্স ষ্টুডিওতে প্রবেশ করেন এবং বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান মিঃ রজার্সের অধীনে সহকারী ক্যামেরাম্যানের কাজ করেন। রবীন্দ্রনাথের সুপারিশের জোরে তিনি উক্ত ষ্টুডিওতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। পর-বৎসর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি অধুনালুপ্ত বৃটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম কোম্পানীতে অন্যতম ডিরেক্টর হিসাবে যোগ দেন এবং দেবকী বসুর পরিচালনাধীনে "পঞ্চশর" চিত্রে একটি ছোট ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁহার মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা দেখিয়া কিনেমা আর্টসের "ভাগ্যলক্ষ্মীতে" তাঁহাকে প্রধান ভূমিকা দেওয়া হয়। এই সময় তিনি বড়ুয়া ষ্টুডিও প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের "অপরাধী" চিত্রে তিনি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই চিত্র তোলার সময় তিনি

ভারতে প্রথম ঘরের মধ্যে চিত্র তুলিবার জন্ত কৃত্রিম আলোক ব্যবহারের পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করেন। এই ষ্টুডিওতে প্রথম বাংলা সবাক চিত্র "১৯৮৩ সালের বাংলা" তোলা হয়। এর পর তিনি শ্রীবি, এন, সরকারের আহ্বানে নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন। "দেবদাস" "গৃহদাহ," "মুক্তি," "জিন্দেগী" প্রভৃতি ছবিতে তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠে। নিউ থিয়েটার্স ত্যাগ করার পর বিভিন্ন ষ্টুডিওতে তিনি কয়েকটি চিত্র প্রযোজনা করেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি ভারতে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা ও তথ্যমূলক চিত্র প্রযোজনার জন্ত বৃটিশ ফিল্ম-সম্রাট আর্থার র‍্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনা চালাইতেছিলেন। তাঁহার তিন বিবাহ, তন্মধ্যে তৃতীয়া পত্নী অন্যতম চিত্রতারকা যমুনা দেবী। তাঁহার ছয় পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ অমরেশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। আমরা প্রমথেশ বাবুর আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৫১ সাল, মঙ্গলবার, ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানে অস্থায়ী অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন, পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ভারতীয়দের মধ্যে আমেরিকার একুষ্টিক্যাল সোসাইটির তিনিই একমাত্র ফেলো ছিলেন। ডাঃ সি, ভি, রমণের তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ১৯২১ সালে ডি, এস-সি পাইবার পর হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে নিযুক্ত ছিলেন। পদার্থ-বিজ্ঞানে বাক্ শাস্ত্রে তিনি বহু পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে জিওফিসিক্স ডিপার্টমেণ্ট তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ১৯৪১ সালে পুণা সায়েন্স কংগ্রেস পদার্থ-বিজ্ঞানে তিনি সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার দুই পুত্র, দুই বিবাহিতা কন্তা এবং শোকসন্তপ্তা স্ত্রী এবং বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন।

গত ২১শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ৮ ঘটিকার সময় দমদম বিমানঘাঁটী হইতে তিন মাইল দূরে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি লালা দেশবন্ধু গুপ্ত সহ বোল জনের জীবনান্ত হওয়ায় আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। লালা দেশবন্ধু গুপ্ত ভারতের এক জন বিশিষ্ট সাংবাদিক ছিলেন। তাঁহার এই শোচনীয় অকাল-মৃত্যুতে ভারতীয় সাংবাদিক-জগতের এবং রাজনৈতিক-জগতেরও অপূরণীয় ক্ষতি হইল। তিনি কংগ্রেসী সদস্ত হইয়াও ভারতীয় পার্লামেণ্টে কংগ্রেসে গভর্ণমেণ্টের ক্রটি-বিচ্যুতির কঠোর সমালোচনা করিতেন। ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত তিনি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি 'নিউজ ক্রনিক্যাল' ও 'তেজ' পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটার ছিলেন। তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যুতে সাংবাদিক মাত্রেই গভীর ব্যথা অনুভব করিতেছেন। লালা দেশবন্ধু গুপ্ত সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতিরূপে কেবল ভারতীয় সাংবাদিকগণের শ্রদ্ধার ও প্রীতির পাত্রই ছিলেন না, তিনি দেশের প্রতি গভীর দরদসম্পন্ন, সদালাপী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। লালা দেশবন্ধু গুপ্ত ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতরণ করেন। তিনি পরে লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে তিলক অনুসৃত রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হন। দুই বৎসর পরে তিনি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন এবং ১৯২৪ সালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত 'তেজ' পত্রিকায় যোগ দেন। তিনি আইন অমান্ত ও অন্যান্য জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর যাবৎ লালা দেশবন্ধু গুপ্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১৯৪১ সালে 'ইণ্ডিয়ান নিউজ ক্রনিকেলের' ভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৫০ সালে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। লালা দেশবন্ধু গুপ্তের মৃত্যুতে দেশ স্বাধীনতার এক জন সাহসী যোদ্ধা ও খ্যাতনামা নির্ভীক সাংবাদিককে হারাইল। আমরা পরলোকগত দেশবন্ধু গুপ্তের আত্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খ্যাতনামা ইঞ্জিনীয়ার শ্রীসাধনচন্দ্র রায় ২০শে নভেম্বর মঙ্গলবার তাঁহার ১৪১৫, গড়িয়াহাটা রোডস্থ বাসভবনে ৭২ বৎসর বয়সে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। কলিকাতার নাগরিক জীবনে শ্রীযুক্ত রায় বরাবরই বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। এক সময়ে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা পত্নী ও একমাত্র কন্তা শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী, বহু আত্মীয়-স্বজন ও অগণিত বন্ধু-বান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

কলিকাতার অন্যতম সহকারী পুলিশ-কমিশনার শ্রীপঞ্চানন ঘোষালের পিতৃদেব আশুতোষ ঘোষাল গত ৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরিণত বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। আমরা পরলোকগতের আত্মার শান্তি কামনা করি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

শিবম

—ফেলিশ টপোলস্কি অঙ্কিত

কথামৃত

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি আর তোমাদের কি বলিব? আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক! (কল্পতরুভাবে)

শ্রীরামকৃষ্ণ। কালে ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তের জন্য অবতার, জ্ঞানীর জন্য নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা অদ্বৈতজ্ঞান, একই কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়, তখন স্ত্রী-পুরুষ ভেদবুদ্ধি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান সূর্য্য—ভক্তি চন্দ্র। সূর্য্যের তাপে সব জ্বালিয়ে দেয়, চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ প্রাণ শীতল করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁতে যদি ভক্তি হ'ল—তো সবই হ'ল। আর কিছুরই দরকার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এক জন আগুন করলে দশ জনে পোয়ায়। মহাপুরুষের কৃপায় অনেকে উদ্ধার হয়।

কুটির শিল্প ও

আমাদের দেশবাসী যে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে সে কথা চিন্তা করে যাঁরা গভীর বেদনা বোধ না করে পারেন না, তাঁদের কাছে এ নিবন্ধটি চিন্তা-উদ্দীপক হবেই।

খাদ্যের প্রশ্ন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে ছয় থেকে সাত কোটি টন খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়। অপচয় ভিন্নও, বীজ ও গৃহপালিত প্রাণীর খাদ্য হিসাবে কিছু বাদ দেওয়া প্রয়োজন। তা ভিন্ন রপ্তানি আছে। যাঁরা এ পরিসংখ্যানে অভিজ্ঞ, তাঁরা বলেন যে, এই সব খাতে যায় প্রায় এক কোটি টন। সুতরাং আমাদের আহার্য অবশিষ্ট থাকে পাঁচ থেকে ছয় কোটি টন মাত্র। ১৯৩১ সালে জনসংখ্যা ছিল অন্যূন ৩৫ কোটি। অর্থাৎ জন-পিছু দিনে আধ সেরের চেয়েও কম। ১৯৪১ সাল বরাবর এই জনসংখ্যা ৪০ কোটিতে গিয়ে ঠেকবে, বলেছেন মহামান্য বড়লাট এক বক্তৃতায়। তখন মাথা-পিছু দৈনিক খাদ্য বরাদ্দ হবে বড় জোর একপো'র চেয়ে সামান্য বেশী।

গত শতাব্দীর সপ্তম স্তবকে ভারতবর্ষের পরিসংখ্যানের ডাইরেক্টর ও ওড়িষ্যা এবং ভারতের ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়ম হান্টার বলেছিলেন যে, তখন কেবল বৃটিশ-ভারতেই চার কোটি লোক অর্দ্ধাশনে বাঁচে ও মরে। এ বিবৃতিতে আজো অবধি কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। সে যুগের তুলনায় অধুনা জনসংখ্যা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়েছে কিন্তু ফসল ফলন বাড়েনি সে মাত্রায়।

স্যার হান্টারের বিশ বছর পরে আর এক জন পরিসংখ্যাবিদ্ স্যার গ্রীয়ারসন লেখেন, 'শ্রমিক শ্রেণী সকলে এবং কৃষক শ্রেণীর শতকরা দশ ভাগ অর্থাৎ সারা ভারতের অধিবাসীর শতকরা ৪৫ ভাগ হয় অপর্যাপ্ত আহার পায় বা বাসস্থান ভোগ করে, হয়ত দুই-ই। অর্থাৎ ব্রিটিশ-ভারতের ১০ কোটি লোক অচিন্ত্য দারিদ্র্যের মধ্যে দিনযাপন করে।

কুড়ি বছর গভীর গবেষণার পর বোম্বের কৃষি-ডিরেক্টার ১৯২৭ সালে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা কালে বলেছিলেন—'ভারতবর্ষে জাতীয় প্রগতির প্রধান অন্তরায় হোল শূন্য উদর।—...এ দেশের সামগ্রিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা উচিত জনসাধারণের উদরপূর্তির জন্য।' আজ যদি তিনি লিখতে বসতেন, তবে আরো গভীর কালিমা-মণ্ডিত করে অঙ্কিত করতেন তিনি এই দুঃস্থতার ছবি। কেন না, কৃষিজাত দ্রব্যের দাম পড়ে যাওয়ায়, ভারতের কৃষিজীবিদের অর্থনৈতিক সঙ্কট আরো দারুণ হয়ে উঠেছে।

ভারতের সার্জেন-জেনারেলের অনুমানে দেশের শতকরা ৬১ ভাগ অপর্যাপ্ত আহারপুষ্ট।

অধিক ফসল ফলনের উন্নততর পদ্ধতির দ্বারা খাদ্য উৎপাদন বর্দ্ধিত হবে, যখন জনসাধারণ সেই সকল পদ্ধতি গ্রহণ করবে এবং তাও সম্ভব হবে যদি লোকে শিক্ষিত হয়ে ওঠে। ১৫০ বছরের অধিক ইংরেজ শাসনের পর ১৯৩১ সালে শিক্ষিতের হার মাত্র আট দশমিক এক। এই কারণেই কংগ্রেস অশিক্ষা নিবারণ ও উন্নততর কৃষিপদ্ধতি প্রচলনের প্রোপাগাণ্ডার জন্য অধিক তাগিদ দিয়ে এসেছে। এ প্রচেষ্টা সাফল্যের সঙ্গে সারা দেশে চালু করলেও, দেশের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি হয়ে জাতীয় অনাহারের ক্রনিক ব্যাধির একটি সুরাহা হবে বটে, কিন্তু অর্থনৈতিক দিক হতে কোন সমৃদ্ধি ঘটবে না যত দিন জনসাধারণ কেবল মাত্র ভূমিজ উৎপাদনেই নির্ভরশীল থাকবে।

ভারতবাসীর এই চিন্তা মহাত্মা গান্ধীর কণ্ঠে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। এ সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেছেন, "এ দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবি এবং ভারতীয় কৃষি চাষীকে বৎসরের কয়েকটি মাসে দুর্দ্ধর্ষ পরিশ্রম করায় এবং অবশিষ্ট মাসগুলি বেকার করে রাখে। এই কাজহীন মাসগুলি কাটে একান্ত অলস ভাবে। কিন্তু যেখানে চাষী এই বেকার সময় এমন কোন শিল্পে নিয়োজিত করে যেখানে জমির মত ক্লান্তিহীন মনোযোগ লাগে না, সে শিল্প-দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ তার অপচয়িত সময়ের খাঁটি লাভে দাঁড়ায়। এই শ্রেণীর শিল্পের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত হোল তাঁত বোনা, নিত্য ব্যবহারের পরিধেয় তৈরী।" পাঞ্জাব সরকারের সদস্য এবং প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ মনোহর লাল যে বলেছিলেন, 'এ দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার আলেখ্য বস্তুতঃপক্ষে মানসিক ও দৈনিক নিরন্নতা। এ ছবি কোন জাতির পরিচায়ক হতে পারে না', মহাত্মা গান্ধীর এই ছবি ও শিল্প-সমন্বয়ের ব্যবহারিক সমাধান সেই জাতিকে জগদ্দল দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে।

গোটা পৃথিবীর মত ভারতেও বেকার সমস্যা প্রবল। নানা কমিশন নানা সময়ে বহু বিচিত্র সমাধান ও সুচারু পণ্ডিতী রিপোর্ট পেশ করেছেন সে সম্বন্ধে। সমাধানগুলির মধ্যে এইগুলি প্রণিধানযোগ্য। চাকুরীতে ও শিল্পে ভারতীয়করণ করা প্রয়োজন। সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের বয়স কমানো যুক্তিযুক্ত। শিক্ষিত বেকার যুবকদের চাকুরী দেওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন। আরো বিস্তৃত আকারে জনস্বার্থের কাজ শুরু করা উচিত এবং কাজের সময় কমানো প্রয়োজন। ভারতকে শিল্পায়িত করা এবং বেকারদের সরকারী সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

এতগুলি পরিকল্পনার মধ্যেও মূল একটি সূত্র আছে। অতিরিক্ত কাজ প্রবর্তনের পরিবর্তে রোজগারী লোকেদের ভাঙিয়ে বেকারদের সাহায্য করার উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা। জনস্বার্থের কাজ চালু করা এবং কর্মহীনদের সরকারী সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে এটুকু সুস্পষ্ট। সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থ আমাদেরই দিতে হবে এবং শেষ অবধি করভার-জর্জরিত দেশবাসীর স্কন্ধেই তা অতিরিক্ত কর আকারে চাপানো হবে।

কেবল মাত্র ধনীদের করভারে পীড়িত করা হবে এ যুক্তির বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করে বলব যে, ধনীদেরও করভার বহন করার সীমা আছে এবং তার অতিরিক্ত যাওয়ার অর্থ স্বর্ণডিম্বের লোভে হংসী বধ করা। ১৯৩২-৩৩ সালের ইনকাম ট্যাক্সের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ-ভারতের শতকরা একের পাঁচশ' ভগ্নাংশ মাত্র বৎসরে হাজার বা ততোধিক রোজগার করে। তারও অর্দ্ধেক বৎসরে দু'হাজারের অধিক। আর সারা ভারতে মাত্র তিনশ' পঞ্চান্ন জনের আয় লাখের উপর। এই তথ্য থেকে দেশে অতিরিক্ত কর বসানোর যুক্তিযুক্ততা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আমাদের দেশের মুষ্টিমেয় ধনীর উপর অধিক কর বসিয়ে কতটুকু আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি পেতে পারে, এই তথ্যটুকু থেকে সকলেই বুঝবেন।

সুতরাং এ উপায়ে কোন স্থায়ী বা সন্তোষজনক সমাধান হওয়া

বেকার সমস্যা

ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্ভব নয়। য়ুরোপীয় আদর্শ অনুযায়ী ভারতেও ব্যাপক ভাবে শিল্পীকরণ এই বেকার সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। এ কথা স্বীকার করি যে, সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা ভিন্ন এবং রাসায়নিক দ্রব্য, লৌহ ও সভ্য জগতের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যোৎপাদন ভিন্ন গত্যন্তর নেই। কিন্তু এ ভ্রান্তি যেন আমাদের না ঘটে যে, অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় হয়েও এই শিল্পীকরণ জাতীয় বেকার সমস্যাকে দূর করতে পারবে বা বিশেষ ভাবে হ্রাস করবে। কেন না, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মত অগ্রগামী ও শিল্পসমৃদ্ধ দেশেও বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করাও পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। জনসাধারণের অভাব-বোধকে বাড়িয়ে তুলতে পারলে, নানাবিধ সামগ্রীর প্রয়োজনও বাড়তির মুখে এগোবে। এই চাহিদার পথে উৎপাদন ও বণ্টন বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সঙ্গে বেকার সমস্যার সমাধান হবে। সমালোচকরা বলেন যে, জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর প্রথম ধাপ হোল আয়বৃদ্ধি কিন্তু যে দেশে বার্ষিক মাথা-পিছু আয় ৫০ টাকার বেশী নয় সেখানে এই আয়বৃদ্ধি হবে কি ভাবে? আমাদের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে জাতির চল্লিশ কোটি লোকের মুখে আমরা প্রতিদিন গ্রাস তুলে দিতে পারি না। আমি নিজে অর্থনীতিবিদ্ নই কিন্তু আমার ধারণা যে, আয় যতটুকু বাড়বে তা আমাদের খাদ্য ও পরিধেয়ে প্রথম নিয়োজিত করা প্রয়োজন। বিলাসের প্রশ্ন তার অনেক পরে।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক কাঠামো হিসাবে ধনতন্ত্র ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে। ধনতন্ত্রেরও সুদিন ছিল কিন্তু আজ আমরা নূতন ও সন্তোষজনক অন্য কাঠামোর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি। পশ্চিম দেশগুলির মত ভারতেও কৃষিজীবনে ও শ্রমজীবনে ধনিক ও শ্রমিকের বিরোধ ঘনিয়ে উঠছে। এ কথা বলা চলে না যে, এ বিরোধ সর্বক্ষেত্রে অর্থহীন। আমাদের দেশের শ্রমজীবির জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তার জীবনে অধিকতর অভাব বোধ জাগ্রত করা অর্থাৎ তার ক্রয়ক্ষমতা অধিকতর হ্রাস করা। সে ক্ষেত্রে কাজ না করা বা ধর্মঘট করা তার পক্ষে অসুবিধাজনক হবে। নিজের কাজে আরো কঠিন ভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়বে সে। আমার নিজের ধারণা, এই পথে নিতান্ত অচেতন মানসেই ধনতন্ত্র শ্রম-সমস্যাকে এক স্থিরস্থায়ী পরিহাসে পরিণত করার চেষ্টা করছে।

কাজের নূতন সড়ক আবিষ্কার করে বেকার সমস্যা সমাধানের পথে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করার অর্থ নূতন বাজার সৃষ্টি করা বা বর্তমান বাজারকে আরো বিস্তারিত করা। ইতালী যখন আবিসিনিয়া গ্রাস করার প্রচেষ্টা করে বা চীনের উপর জাপানের প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা দেখি, তখন পৃথিবীর বাজারে নিজেদের বাণিজ্যিক আধিপত্য বিস্তারের লজ্জাহীন অপচেষ্টার উদাহরণ পাই শক্তিশালী জাতিসমূহের। এ সকল পদ্ধতির অন্তর্নিহিত অন্যায় ও নির্দয়তার কথা বাদ দিয়ে চিন্তা করলেও এটুকু উপলব্ধি করা যায় যে, এই উপায়ে অধিকতর শ্রমিককে কাজ দেওয়া সম্ভব হলেও, মোটা মুনাফা ঘরে তোলে ধনিকরা। ভারতবাসী হিসাবে আমরা ত কোন দিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি না এই উপায়ে বাণিজ্যিক প্রতিপত্তি লাভের, পরন্তু য়ুরোপীয় জাতির সংস্পর্শে ভারতের মূল সত্তার পরিবর্তন যদি না ঘটে থাকে তবে কোন দিন ভারত সে পথ গ্রহণ করতে পারবে না। আমাদের প্রধান সমস্যা কি, তা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। 'ভারতের অগ্রগমনের প্রধান অন্তরায় জাতির শূন্য উদর।···জনসাধারণের ক্ষুধা নিবৃত্তি করাই আমাদের প্রধান ব্রত।'

এ পথে আমাদের একমাত্র উপায় নিজেদের প্রয়োজনের দ্রব্যাদি আমাদের নিজেদের উৎপাদন করা। জাতির জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির অর্থ যদি আরাম ও বিলাসের দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয় তবে আমরা তার দ্বারা উপকৃত হব না, হবে যারা উৎপাদক ও বণ্টক। এ উদাহরণটি আরো বিশদ্ ভাবে বিবৃত করতে চাই। ল্যাঙ্কাশায়র হতে তুলাজাত দ্রব্য আমদানী করার পূর্বে আমাদের দেশের তাঁতীদের হাতে কাজের অন্ত ছিল না। কিন্তু বর্তমানে যদিও কাপড়ের চাহিদা পূর্বাপেক্ষা বেড়েছে কিন্তু তাঁতীদের কাজ সেই পরিমাণে বাড়েনি। জাতীয় মোটা কাপড়ের পরিবর্তে মিহি কাপড়ের চাহিদা বাড়ার ফলে ল্যাঙ্কাশায়র মালিকদের মধ্যে কতকগুলি কোটিপতি গজিয়ে উঠেছে। ল্যাঙ্কাশায়রের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের অর্থনাশে। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ উইনষ্টন চার্চিলের বেতার বক্তৃতা: 'আমার শ্রমিক বন্ধুগণ, ইংলণ্ডের শ্রমজীবিদের জন্য ভারত অনেক করেছে। ভারত-সাম্রাজ্য হারালে কেবল যে কয়েক হাজার শ্রমিক বেকার হবে তা নয়, প্রায় বিশ লক্ষ লোক অনাহারে জর্জরিত হয়ে পথের ভিক্ষুকে পরিণত হবে। আমাদের এই দ্বীপে সাড়ে চার কোটি লোক পৃথিবীর সব দেশের তুলনায় উন্নততর জীবন যাপন করে। পৃথিবী-জোড়া সাম্রাজ্য ও বাণিজ্যিক আধিপত্য নষ্ট হলে সেই জাতির এক-তৃতীয়াংশ একেবারে ডুবে যাবে। ইংলণ্ডের সেই নিদারুণ ললাটলিপি জাতির অধিকাংশকে স্পর্শ করবে।' আমদানীর পরিণামের একটি উদাহরণ দিলাম আমি। এ দৃষ্টান্ত শতেক করা যায়। দেশীয় কুটিরশিল্পের এক-একটি মুমূর্ষু হয়েছে আর আমরা অসহায় চক্ষে সেই মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছি। কুটির-শিল্পের সেই সব কারিগরেরা বাধ্য হয়ে জমিতে ফিরে গেছে জীবিকার কারণে এবং সেই সর্বনাশা পথে আমরা নিরন্নতার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি। এক জন য়ুরোপীয় বলেছেন যে, ভারতবর্ষে তিন জন লোকের জন্য দু'টি মুষ্টি ভাত।

যত বার আমরা আমদানী দ্রব্য ক্রয় করি, তত বারই আমরা আমাদের ক্রয়ক্ষমতা রপ্তানী করি এবং সেই জাহাজে নিজেদের অধিকতর অর্থনাশ করে বিদেশী মানুষদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে সাহায্য করি। দেশের বেকার সমস্যা আরো চরম করে তুলি সেই আত্মঘাতী পথে। এ কথাও নির্মম ও অপ্রিয় সত্য যে, যান্ত্রিক শিল্পের দ্বারা অনেকের কাজ একের দ্বারা সাধন ক'রে আমরা সেই বেকার সমস্যাকে ক্রমশঃ ব্যাপক করে তুলেছি। স্বদেশী এবং কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য ক্রয়ের যুক্তি হিসাবে এইটিই সর্বাধিক বলবান এবং এদেশীয় কারখানাজাত দ্রব্যাদি অপেক্ষা পল্লীজাত দ্রব্যাদি কেনাই আমাদের মতে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। নিজেদের স্বার্থের ক্ষতি করেও, জাতীয় অনাহারের নিষ্ঠুর বাস্তবতার ছবি স্মরণ রেখে আমাদের কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করা উচিত। অতীতে করে এসেছি বলে আর আমাদের জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিস্মৃত

হলে চলবে না। চিন্তানায়ক হিসাবে এ দায়িত্ব আমাদেরই। প্রতিদিনের জীবনে এ দৃষ্টান্ত আমাদের তুলে ধরতেই হবে। ইতিপূর্বে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়ে আমরা জনসাধারণের অবিশ্বাসভাজন হয়েছি। এখন কার্যকরী ভাবে তাদের সেই আস্থাকে পুনর্জাত করা প্রয়োজন। আমার মতে কুটিরশিল্পকে পরিপুষ্ট ক'রে আমরা সেই লুপ্ত আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারব।

কুটিরশিল্পকে যথাযথ ভাবে সংহত করার দ্বারা আমরা বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারি। নিখিল ভারত কাটুনী-সংঘের গত বৎসরের বিবরণী এখন আমি পেশ করছি। আমেদাবাদে এই সংঘের মূল কেন্দ্র। সারা ভারতে বিস্তৃত এর শাখা। এই সংঘ নির্ভেজাল খাদি প্রস্তুত করে। এই সংঘের ৩ লক্ষ ৮ হাজার কাটুনি গত বৎসর মজুরি হিসাবে রোজগার করেছে ৩১ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। এই একটি মাত্র উদাহরণই কার্যকরী ভাবে প্রমাণিত করতে পারে মহাত্মা গান্ধীর খদ্দর পরিকল্পনার মহৎ সার্থকতা।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে, নিখিল ভারত কাটুনি-সংঘ খদ্দর উৎপাদনে নিযুক্ত অনেক প্রতিষ্ঠানের মাত্র একটি। এ ভিন্ন বহু প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী খদ্দর উৎপাদন ও বণ্টনে যুক্ত আছে। আমাদের জাতীয় নেতার এই পরিকল্পনার প্রেরণা না থাকলে এই লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার জীবন যাপনে বাধ্য থাকত। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কে বলবে যে, কুটিরশিল্প বেকার সমস্যা সমাধানে অন্ততঃপক্ষে বহুলাংশে সমর্থ নয়? এই শিল্পের দ্বারা প্রভূত মজুরী অর্জন করা এখুনি সম্ভব না হলেও, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, যে দেশে মাথা-পিছু আয় বৎসরে ৫০ টাকার অধিক নয়, সে দেশে এ পরিকল্পনা আরো দৃঢ়তা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা চালিত হলে অদূর ভবিষ্যতে শ্রমিককে অধিকতর আয়ের ব্যবস্থা সে করে দিতে পারে।

শিল্পসংক্রান্ত অর্থনীতি নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁদের অজানা নয় যে, বর্তমানে চিনি ও দিয়াশলাইএর চাহিদার পূর্ণ উৎপাদন ভারতে সম্ভব হচ্ছে, তুলাজাত দ্রব্যের তিন-চতুর্থাংশ, লৌহ ও ইস্পাতের দুই-তৃতীয়াংশ এবং কাগজ ও সিমেন্টের একটি মোটা ভগ্নাংশ ভারত উৎপাদন করে। কিন্তু তথাপি মোট পনের লক্ষ শ্রমিকের অধিককে ভারত ব্যবহার করতে পারে না। শিল্পসমৃদ্ধি আরো অগ্রসর হলে এই শ্রমিকের সংখ্যা বিশ লক্ষ অবধি উঠতে পারে।

১৯৩১ সালের সেন্সাস অনুসারে ৩৫ কোটি লোকের মধ্যে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা দেড় কোটি। এই সংখ্যার মধ্যে যান্ত্রিক শিল্পে নিযুক্ত-সংখ্যা পনের লক্ষ। সুতরাং ১৯৩১ সালে কিছু কম প্রায় দেড় কোটি লোক কুটিরশিল্পে সংশ্লিষ্ট ছিল। ১৯৩৫ সালে কারখানা সংখ্যা বেড়ে ছিল ৭০০ কিন্তু শ্রমিক সংখ্যা ১ লক্ষ ৮০ হাজার মাত্র বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং এ কথা সত্য যে, কেবল মাত্র কারখানার সংখ্যা বাড়লেই শ্রমিক সংখ্যা তদনুপাতে বাড়তে পারে না। এ কথাও দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলে, যে সকল দ্রব্যাদি এখন কুটিরশিল্প দ্বারা উৎপন্ন হয়, সে সকল যখন কারখানায় উৎপাদিত হতে সুরু করবে তখন কারখানাগুলি ঐ সকল শিল্পে নিযুক্ত সকল শ্রমজীবিকে কাজ দিতে পারবে না।

ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা যে, কৃষির পরই কুটিরশিল্পের স্থান। বর্তমান কালে অর্থাৎ ১৯২৯-৩০ সালের তুলনায় ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতবর্ষে কাপড়ের কলের সংখ্যা ২৫০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০৪টি দাঁড়িয়েছে। এই সব কলে কাজ করে সাড়ে চার লক্ষ লোক। যখন ভারতবর্ষ তার প্রয়োজনীয় সমস্ত তুলাজাত দ্রব্য উৎপন্ন করতে সক্ষম হবে, তখনও সে কাপড়ের কলে বর্তমানে নিয়োজিত শ্রমিকদের সংখ্যা বড় জোর দু' লক্ষ আরো বৃদ্ধি করতে পারবে। তার অধিক নয়। আমাদের তাঁতী-শ্রেণীর লোকগুলিকে যদি ঐ সকল কারখানাতে নিয়োজিত করাও হয়, তবু বাকী ৭০ বা আশী লক্ষ শ্রমিকের ভাগ্যের ভবিষ্যৎ আমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে, যদিও অনুমান করা হয় যে অন্ততঃ ১০ লক্ষ লোক পশম, রেশম বা ঐ জাতীয় দ্রব্যোৎপাদনে নিযুক্ত।

এ কথা নিশ্চিত যে, পশ্চিমদেশীয় শিল্পীকরণের অনুকরণে শিল্পবিস্তার করলে একটি মাত্র অবশ্যম্ভাবী পরিণাম আমরা লাভ করব। সে পরিণামের অর্থ শিল্পসংক্রান্ত কাজের কুশলতা বাড়িয়ে কম লোকের সাহায্যে উৎপাদন আরো বর্ধিত করা অর্থাৎ যাকে বলা হয় শিল্পে সমীকরণ।

এই গুরুতর সমস্যার অন্তর্নিহিত প্রশ্নটিকে মহাত্মা গান্ধী অনুধাবন করেছিলেন। তিনি জানেন যে, এ দেশের তাঁতীদের অধিকাংশের হাতে প্রভূত অর্থ নেই। অপর দিকে এই সকল তাঁতীদের ঐ প্রকার কাজে নিয়োজিত রাখতে পারলেই তবে জমির উপর চাপ কমবে। এই দুই কারণে তিনি খদ্দর চালু করার পক্ষপাতী।

এ অবধি আমরা তুলাজাত দ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। আমাদের পল্লী-জীবনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে, অধুনা যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে আমাদের দেশে বেঁচে আছে অনেকগুলি কুটিরশিল্প যা শত বর্ষ পূর্বেও এ দেশে চালু ছিল। তাদের কুশলী কাজের ন্যায্য মূল্য পায় না আমার দেশের শিল্পী। ফলে সেই সব কুটিরশিল্প ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে আসছে। কালক্রমে হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অথচ জাতীয় স্বার্থের কারণে আমরা সে অপমৃত্যু ঘটতে দিতে পারি না। বর্তমানে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে সস্তা বিদ্যুৎ প্রবর্তনের চেষ্টা চলছে। যদি আমরা সার্থক ভাবে সেই সস্তা বিদ্যুৎকে আমাদের কুটিরশিল্পগুলির উন্নততর রূপান্তরের সঙ্গে সংহত করতে পারি, তবে উৎপাদনের মূল্য বহু গুণ হ্রাস পাবে এবং কারখানা হতে দ্রব্যগুলির ফিনিশের সঙ্গে সেগুলি সহজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। কিন্তু প্রারম্ভেই অতখানি প্রত্যাশা করা দুরাশা।

বর্তমান কালে কলে-ছাঁটা ধান ও কলে-পেষা গম ও তৈলবীজ আমাদের সুপ্রাচীন কুটিরশিল্পগুলিকে প্রায় বিনষ্ট করেছে। অথচ আমরা জানি যে, কলে প্রস্তুতের ফলে এই সকল আহার্য দ্রব্যের খাদ্যপ্রাণ অনেকাংশে হ্রাস পায়। তা ভিন্ন মিল-মালিক ও দালালরা সেই সকল খাদ্যদ্রব্যে অবাধে ভেজাল মিশিয়ে দিচ্ছে।

আমাদের দেশী কামাররা কিছু কাল আগেও আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় দা কুড়ুল কাস্তে সরবরাহ করত। কিন্তু দেশী বিলাতী কারখানা-মালিকদের প্রতিযোগিতায় তারা হটে যাচ্ছে দিন দিন। এই সকল বিতাড়িত কর্মী বাধ্য হয়ে জমিতে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই জমির মালিকানা নেই,

তারা হয় ঠিকে নয় জমিহীন ভাগচাষী। এ কথা সত্য যে, দেশের বৃহত্তর প্রয়োজনে আমাদের দেশী কামারের প্রস্তুত যন্ত্রপাতি ব্যবহার প্রচলিত হওয়ার পূর্বে সেগুলিকে কেবল ষ্টাণ্ডার্ড মাপেই তৈরী করতে হবে তা নয়, সেগুলির নির্মাণ-কৌশল যথেষ্ট উন্নত করতে হবে। আমার ধারণা, এ সকল বাধা দুর্লঙ্ঘ্য নয়।

তুলা, সিল্ক ও পশমজাতীয় কিছু কিছু কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের উপর সরকারী রক্ষণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করতে হবে। যত দিন সেগুলি যথেষ্ট পরিমাণ উন্নীত না হচ্ছে তত দিন সেগুলি কারখানায় উৎপন্ন করা চলবে না। লৌহ, কাপড় ও চিনি-শিল্পের উন্নতির জন্য জাতীয় স্বার্থের অনুপন্থী রক্ষণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন যদি সম্ভব হয় তবে কেবল মাত্র বৈদেশিক নয়, দেশীয় বৃহৎ শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে কুটিরশিল্পের রক্ষা কেন সম্ভব হবে না, তার কোন যুক্তি নেই।

এই প্রকার রক্ষা-কবচ কি শ্রেণীর হবে সে প্রশ্ন উঠতে পারে। বিদেশী মালের উপর উচ্চ হারে কর এবং দেশী কারখানাজাত দ্রব্যের উপর উচ্চ ডিউটি ও বিক্রয়কর প্রবর্তনের দ্বারা এ রক্ষা-ব্যবস্থা করা সম্ভব। এ রকম প্রস্তাব করা হয়েছে যে, মিলগুলি কেবল অর্থবান লোকেদের জন্য মূল্যবান কোট, সার্ট, ফাইন ধুতি, শাড়ী উৎপন্ন করবে এবং দেশের অধিকাংশ গরীব লোকেদের জন্য মোটা টেঁকসই কাপড় তৈরী হবে দেশের কুটিরশিল্পগুলিতে। কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা থাকবে পল্লীগুলিতে। মিলগুলি বিশ সূতার কম কাপড় তৈরী করতে পারবে না। উচ্চ হারে বিক্রয়কর ও লাইসেন্স-ফি চড়িয়ে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে অত কম দামে মিলজাত উৎপাদন বিক্রয় লোকসানের কারবার হয়ে পড়বে। এ ভিন্ন তাঁতীদের দাদন দিয়ে এবং বাজারে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের সুবিধা করে দিয়ে তাদের উৎসাহিত করতে হবে। চাকী-ভাঙা আটা, হাতে-ভাঙা চাল এবং ঘানি-ভাঙা তেল বিক্রয়ের সুবিধা করার জন্য কলের প্রস্তুত দ্রব্যাদির উপর সমভাবে বিক্রয়কর চাপাতে হবে।

আমার নিজস্ব ধারণা, কোনরূপ রক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হলে অথবা কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের বিস্তৃত বাজার সৃষ্টি করে দিতে না পারলে আমাদের দেশীয় শিল্পগুলির অধিকাংশের মৃত্যুকাল আসন্ন হয়ে পড়বে।

এ পরিকল্পনা গ্রহণের সুবিধা দ্বিমুখী। প্রথম ও প্রধান উপকারিতা, এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে পারলে বহু লোককে আমরা সারা বৎসর কাজে ব্যাপৃত রাখতে পারব। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের কৃষিজীবিদের অবসরকালীন অলসতা লাভবান কাজে রূপান্তরিত হতে পারবে। কোন কোন শিল্পে তারা বিত্তলাভ করবে আবার কোন কোনটি থেকে তারা ব্যয়-সঙ্কোচ করতে পারবে নিজেদের প্রয়োজনীয় পরিধেয় উৎপন্ন করে।

বিহারের উন্নয়ন পরিকল্পনার কংগ্রেসী মন্ত্রী অনুমান করেন যে, সারা প্রদেশে যদি উক্তরূপ পরিকল্পিত কুটিরশিল্প চালু করা যায় তবে পাঁচাত্তর হাজার থেকে এক লক্ষ লোক তাতে সারা বৎসর খেটে রোজগার করতে পারবে। এই কুটিরশিল্পে কাঁচা মাল সরবরাহ করার কাজে আরো এক লক্ষ লোক নিযুক্ত হবে। এই সকল লোকের পরিবার সমেত হিসাব করলে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের এই ভাবে ভরণ-পোষণ সম্ভব হবে। আর এই জনসংখ্যা আমাদেরই দরিদ্র দেশবাসীর একাংশ। এই হিসাবে আমরা সকল শিল্পসংক্রান্ত কাজে প্রয়োজনীয় শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ম্যানেজার, সুপারভাইজার, দালাল, সেলসম্যান প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করিনি।

যে সকল শিল্পী আমাদের সমাজে মুমূর্ষ ভাবে জীবনযাপন করছে, তাদের সমস্যা ক্ষণেকের জন্য অপসারিত করলেও, এই পথে আমরা জাতীয় আয়বৃদ্ধির এক প্রশস্ত উপায় লাভ করতে পারি। আয়বৃদ্ধির অর্থ জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং পক্ষান্তরে জাতীয় জীবন-যাত্রার মানের উন্নতি। এই পথে দেশের সম্পদগুলির আবিষ্কার ও ব্যবহার বাড়বে। জনসাধারণের মধ্যে নূতন উদ্যমের চেতনা আসবে। অভিনব উন্নত ধরণের শিল্পপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে তারা সাম্প্রতিক কালের জাগতিক প্রগতির সঙ্গে পরিচিত হবে। নিজেদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করে তারা জীবন সম্বন্ধে ব্যাপকতর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। এই বিবর্তনের দ্বারা তারা এ দেশের কৃষিজীবিদের মধ্যেও নব জাগৃতির প্রেরণা সঞ্চার করতে পারবে। কুটিরশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা ও উৎসাহিত করার জন্য এই বলিষ্ঠ অগ্রগামী পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় তাগিদ এই জন্য যে, সেই ভাবেই এ দেশের জনসাধারণের বহুকালীন মানসিক স্থবিরত্ব ঘুচবে। এই কারণই যথেষ্ট বলে আমার ধারণা।

১৯৩৮ সালে মাদাম চিয়াং কাইশেক লণ্ডনের 'স্পেকটেটর' কাগজে এক চিন্তাবহুল চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন—'জনসাধারণের নিত্য-প্রয়োজনের দ্রব্যাদি দেশের গ্রামীণ শিল্পের দ্বারা উৎপন্ন হচ্ছে এই আমি দেখতে চাই। যান্ত্রিক সাহায্য কোন কোন ক্ষেত্রে অপরিহার্য সন্দেহ নেই, কিন্তু শ্রমিকের মজুরী বাঁচাবার জন্য যান্ত্রিক কুশলতার প্রবর্তন চীন দেশে হবে না, এ বিশ্বাস আমি করি। দেশী কারিগরদের নিপুণ হাত যা পারে না, কেবল সেই সকল জিনিষ উৎপাদনের জন্যই যন্ত্রের ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু তার অধিক অনুপ্রবেশ আমরা মানব না। তা ভিন্ন যন্ত্রের সেই গলা-কাটা প্রতিযোগিতাও আমরা বরদাস্ত করব না। শ্রমিককে আমরা দুঃস্থ হতে দিতে পারি না।'

এ অবধি ভারতবর্ষ কোন যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে আপন দুর্ভাগ্যকে এড়িয়ে এসেছে। চীনের মত যেন আমাদের না বলতে হয় যে, একটা সর্বগ্রাসী যুদ্ধের ফলে এই শিক্ষা আমরা লাভ করেছি যে ধনতন্ত্রী অর্থনীতিবিদ্ যাই বলুন না কেন, জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ একমাত্র সম্ভব দেশীয় কুটিরশিল্পের উন্নয়নের দ্বারা। এবং শুদ্ধ সেই কারণে আমি গ্রামীণ শিল্পের পুনর্জন্ম ও বিস্তারের পক্ষপাতী। কেন না, সেই পথেই আমাদের ব্যাপক বেকার সমস্যারও সমাধান।

অনুবাদক—শ্রীশিশির সেনগুপ্ত

উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত সমিতি

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

[খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে দেশে পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষাবিস্তার ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য যে সব সমিতির উদ্ভব হয়েছিল, বর্তমান প্রবন্ধে সেই সকল সমিতির ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। ক্যালকাটা বুক সোসাইটী, ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটী, ক্যালকাটা ইণ্ডিজেনাশ লিটারারি ক্লাব, একাডেমিক এসোসিয়েশন, সোসাইটী ফর দি একুইজিসন অফ জেনারেল নলেজ, বেথুন সোসাইটী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটী, এসিয়াটিক সোসাইটী প্রভৃতি সমিতিগুলি কি ভাবে স্থাপিত হয় এবং সমিতিগুলির লক্ষ্য চিত্তাকর্ষক বর্ণনায় এই লেখায় সন্নিবেশিত হয়েছে। বহু প্রয়োজনীয় তথ্যে লেখাটি সমৃদ্ধ। —স]

বাংলা দেশে পাশ্চাত্য প্রভাব আলোচনা করতে হ'লে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সমিতিরও আলোচনা করা দরকার। এই সব সমিতির মধ্যে কয়েকটির আয়ু স্বল্পস্থায়ী হয়, কতকগুলি অনেক দিন পর্য্যন্ত চালু থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে দেশে পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা হিসেবে এই সব সমিতির উদ্ভব হয়। বৃটিশ শাসনের পূর্ব্বে বাংলায় এরূপ কিছু ছিল না। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে লোকে আত্মোন্নতির জন্য দলবদ্ধ হ'তে শেখে, জ্ঞানবিস্তার ও সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য উদ্যোগী এবং সংহত ব্যবস্থা অবলম্বনে সচেষ্ট হয়। কয়েকটি সমিতির কার্য্য-তালিকার মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের পরিকল্পনা ছিল এবং স্কুল-কলেজের সাহায্যে এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করা হয়। কতকগুলি সমিতির কাজ ছিল মাতৃভাষায় পুস্তক প্রকাশ করা, আর কতকগুলি ছিল মজলিস এবং এখানে বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা ও আলোকপাত করা হ'ত। এখানে যে তালিকা দেওয়া হচ্ছে তা যে বিশদ এ কথা বলছি না; কারণ তা অসম্ভব এবং এত দীর্ঘকাল পরে সে সম্বন্ধে জ্ঞান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'তে পারে না। তবে এই সব সমিতি সম্বন্ধে যত দূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করা এবং তাদের প্রভাব উপলব্ধি করা একান্ত দরকার।

দি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটী

এই সকল সমিতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটী। ১৮১৭ সালে এই সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা-সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং সস্তায় বা বিনামূল্যে তা' প্রচার। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মিঃ ক্যারি ও মিঃ রুবাক এই সোসাইটীর কার্য্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। ষোল জন ইউরোপীয় ও আট জন ভারতীয় নিয়ে এই সমিতি গঠিত হয়। ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিলেন। হিন্দু সদস্যদের নাম—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, বাবু রাধাকান্ত দেব, বাবু রামকমল সেন, বাবু তারিণীচরণ মিত্র এবং মুসলমান সদস্যদের নাম—মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ, মৌলবী কুরুম হোসেন, মৌলবী আবদুল হামিদ, ও মৌলবী মহম্মদ রসিদ। সোসাইটীর তিনটি সাব-কমিটীর মধ্যে একটির উপর সংস্কৃত ও বাংলার ভার দেওয়া হয়েছিল। প্রথম বছর সংগঠন করতেই কেটে যায়। নিম্নলিখিত প্রকার পুস্তক সরবরাহের জন্য শ্রীরামপুর প্রেসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়।—

গণিত; লিপিধর; শুভঙ্কর কৃত আর্য্যা; জমিদারী কাগজ; দিগ্‌দর্শন।

(শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বারা প্রকাশিত সংবাদপত্র)—প্রত্যেক সংখ্যার প্রায় হাজার কপি সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়...এবং রামচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক একখানি অভিধান প্রকাশিত হয়।

পরে তিন জন হিন্দু ভদ্রলোক বাংলা ভাষায় ফার্গুসানের Astronomyর অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। তাঁরা এ বিষয়ে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটীর অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করেন। দ্বিতীয় বছরে অর্থাৎ ১৮১৮-১৯ সালে পুস্তক প্রকাশের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির নাম করা যেতে পারে—

শ্রীরামপুরে মুদ্রিত ষ্টুয়ার্টের 'সেভেন ফোলিও ফেবলসে'র দ্বিতীয় সংস্করণ।

চুঁচুড়া হ'তে প্রকাশিত এরই অক্টেভো সংস্করণ বাঙ্গলা উপকথা।

রাধাকান্ত দেবের 'বাঙ্গলা বানান পুস্তক'।

তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব এবং রামকমল সেন কর্ত্তৃক একযোগে প্রচারিত 'নীতিকথা'।

তারাচাঁদ দত্তের 'মনোরঞ্জন ইতিহাস' (ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত ইতিহাস)।

ষ্ট্রেচের Beauties of History থেকে অনুবাদিত 'উপদেশ কথা'।

মিঃ ফেলিক্স কেরী কর্ত্তৃক অনুবাদিত 'গোল্ডস্মিথের ইতিহাস'।

মিঃ কেরীর 'বিদ্যাহারাবলী' বা 'বাঙ্গলা বিশ্বকোষ'।

দেশীয় শিক্ষকদের জন্য ডাঃ বেলের লেখার পিয়ার্স'ন কৃত অনুবাদ।

তৃতীয় বছরে রেভাঃ মিঃ কীথ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় "একখানা নতুন গ্রামার", শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বারা "গোলাধ্যায়", পিয়ার্সের "ভূগোল বৃত্তান্ত", রাজা রামমোহন রায়ের "ভূগোল" এবং পিয়ার্সনের "পত্রকৌমুদী" প্রণীত হয়। সোসাইটীর আবশ্যকতা এত সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণিত হয় যে, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইএ অনুরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সরকার সোসাইটীকে এককালীন সাত হাজার টাকা সাহায্য করেন ও মাসিক পাঁচ শত টাকা সাহায্য দিতে আরম্ভ করেন।

মার্কুইস অফ হেষ্টিংসের মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে আমরা সোসাইটীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের উপসংহার করবো। ১৮১৮ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রাচ্য ভাষার সপ্তদশ আলোচনা সভায় তিনি নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য করেন:—

"There is a public object connected with the best advantages which we contemplate from the College, that I can not close this address without expressing the happiness I have derived from observing the progress of that useful association entitled The Calcutta School Book Society, in extending to the natives of this country the benefit of European science and morals. The Institution has yet been only a year in existence, but the number of tracts and elementary books, which have been translated from English and other languages, evinces an activity of zeal for the diffusion of useful knowledge, in the highest degree creditable to those who have associated themselves together for the promotion of this especial object. Their efforts have not, however, been confined to this department, they have further been instrumental in preparing and circulating elementary books of Instruction in the Sciences and Languages of the country, and it is impossible to look forward to the efforts which their continued exertions will produce, in extending the means and improving the mode of education that prevails among the several classes of the native population, without forming a happy presage of the advance that will be made by the coming generation in general and technical knowledge."—(Annals of the College of Fort William, P. 580)

ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটী

১৮১৪ সালে এমন একটা সোসাইটী প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হয়, যার কাজ হবে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। স্কুল বুক সোসাইটী স্কুলে ব্যবহারের উপযোগী যে সব পুস্তক সরবরাহ করছিলেন, সেগুলি সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগাতে হ'লে দেশের সর্ব্বত্র স্কুল প্রতিষ্ঠা করা দরকার হয়ে পড়ে। স্কুল বুক সোসাইটীর সাফল্যে উদ্যোক্তারা সাহস পান এবং বর্ত্তমান স্কুলগুলিকে সাহায্য ও নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয়। মিঃ হেয়ার ও শ্রীরাধাকান্ত দেব এর যুগ্ম-সম্পাদক হন। এই সোসাইটী আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঠনঠনিয়ায় একটি এবং চাঁপাতলায় একটি নিয়মিত এবং অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৪ সালে এই স্কুল দু'টি এক হয়ে যায় এবং পরে এর নাম হয় ডেভিড হেয়ার স্কুল। সোসাইটীদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে আরও স্কুল চলতে থাকে। স্কুল সোসাইটী প্রথম তিন মাসে ১,৬১১ টাকা চাঁদা পান এবং বার্ষিক ৫,০৬৯ টাকা চাঁদা পেতে থাকেন। প্রধানতঃ হিন্দুরাই এই চাঁদা দেন।

ক্যালকাটা ইণ্ডিজেনাস লিটারারি ক্লাব

আমি এখনো পর্য্যন্ত ক্যালকাটা ইণ্ডিজেনাস লিটারারি ক্লাবের কোন ইতিহাস দেখিনি, কেবল শোভাবাজারে রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে "Robinson's Grammar of History" নামক পুস্তকে উক্ত ক্লাবের ছাপ দেখেছি। পুস্তকখানি ১৮৩২ সালে প্রকাশিত হয়। এতে লেখা আছে—"অর্থাৎ রাবিনসন কর্ত্তৃক ইতিহাস সার সংগ্রহ কলিকাতা ইণ্ডিজেনাস লিটারারি সভা কর্ত্তৃক গৌড়ীয় সাধু ভাষায় কমিটী অব পাবলিক ইনস্ট্রক্শনের আদেশে প্রকাশিত হইল—(লেবেণ্ডিয়র সাহেবের মুদ্রাযন্ত্রে)।" পুস্তকের তৃতীয় পাতায় নিম্নলিখিত হিন্দু অধ্যক্ষদের নাম আছে:—

শ্রীশিবচরণ ঠাকুর
শ্রীঅমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীহেরম্বচন্দ্র ঠাকুর
শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীশম্ভুচরণ ঠাকুর
শ্রীজয়কৃষ্ণ শেঠ
শ্রীজগৎচন্দ্র রায়
শ্রীরাধাকান্ত শেঠ
শ্রীনসিরাম মিত্র
শ্রীসুখময় রায়।

দুর্ভাগ্য বশতঃ এই ক্লাব সম্বন্ধে আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

একাডেমিক এসোসিয়েশন

১৮২৮ সালে ডিরোজিও একাডেমিক এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। মাণিকতলা সিংহ-পরিবারের এক বাগান-বাড়ীতে এর প্রতিষ্ঠা হয়। ডিরোজিও এই এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং উমাচরণ বসু সম্পাদক হন। সমিতির সভায় মাঝে মাঝে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং ডেভিড হেয়ারের মত ব্যক্তিরা যোগদান করতেন। সভায় বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ করা হ'ত এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হ'ত। এই সমিতি বাঙ্গালীদের মনে এমন সাড়া জাগায় যে, এর অভিমত প্রচারের জন্য খান-বারো সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় এবং এই আদর্শে বহুসংখ্যক বিতর্ক-সভা স্থাপিত হয়। এসোসিয়েশনটি পরে হেয়ার স্কুলে স্থানান্তরিত হয় এবং মিঃ হেয়ার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সপ্তাহে একবার সভা হ'ত।

সোসাইটী ফর দি একুইজিসন অফ জেনারেল নলেজ

শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে যোগাযোগ এবং জ্ঞান বিস্তারের জন্য ১৮৩৮ সালে "সোসাইটী ফর দি একুইজিসন অফ জেনারেল নলেজ" স্থাপিত হয়। একাডেমিক এসোসিয়েশন এই সময় উঠে না গেলেও তরুণদের উপর এর আর কোন প্রভাব ছিল না। কাজেই একাডেমিক এসোসিয়েশনের চেয়ে আরও সাধারণ এবং ব্যাপক ভাবে কাজ করবার জন্যই যে জ্ঞান বিস্তার সমিতি স্থাপিত হয়, তা মনে করা চলে। এই সমিতি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত ইস্তাহারে বলা হয়,—"The fate of our debating associations, most of which are now extinct, while not one is in a flourishing condition, as well as the puerile character of the native productions that appear in the periodical publications, are lamentable proofs of this sad neglect of knowledge."

প্রস্তাব করা হয় যে, মৌখিক বা লিখিত বক্তৃতা সদস্যদের পক্ষে

বাধ্যতামূলক করা হবে এবং স্থির হয় যে, বিষয়গুলি সদস্যগণ নিজেরাই স্থির করবেন। এই সর্ত পালন না করলে জরিমানা ধার্য্যের ব্যবস্থা হয়। ১৮৩৮ সালের ১২ই মার্চ্চ সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় সংস্কৃত কলেজ-হলে প্রথম সভা হয়। প্রায় দু'শ' সদস্য নিয়ে সমিতির কাজ আরম্ভ হয়। আলোচ্য বিষয়গুলির অধিকাংশই ইংরেজীতে লেখা হ'ত, অল্প কয়েকটি বিষয় দেশীয় ভাষায় রচনা করা হ'ত। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ইতিহাস, কবিতা, ভাষা, দেশবাসীর সামাজিক অবস্থা, ভৌগোলিক বিবরণ, অধ্যাত্মবিদ্যা, শারীর-বিজ্ঞান প্রভৃতি ছিল। সক্রিয় সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রেভাঃ কে, এম, ব্যানার্জী, রাজনারায়ণ বসু, পিয়ারীচাঁদ মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিরা। ডেভিড হেয়ার অনরারি পরিদর্শক এবং পিয়ারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী অনরারি সম্পাদক ছিলেন।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সমিতির সভায় আলোচিত হয়—

১। শিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে সামাজিক সংস্কার
২। বাঁকুড়ার ভৌগোলিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক ইতিহাস
৩। হিন্দু নারীদের অবস্থা
৪। হিন্দুস্থানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
৫। চট্টগ্রামের বিবরণ
৬। হিন্দুদের অধীনে হিন্দুস্থানের অবস্থা
৭। ত্রিপুরার বিবরণ
৮। শবব্যবচ্ছেদ-বিজ্ঞান
৯। দেশীয় ভাষা চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা
১০। কবিতা।

প্রায় সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীই এই সমিতির সদস্য হন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কিশোরীচাঁদ মিত্রের প্রবন্ধে পাণ্ডিত্য অধিক থাকায় তাঁদের প্রবন্ধেরই উল্লেখ অধিক মাত্রায় হ'ত। প্রতি মাসে সংস্কৃত কলেজ-হলে সমিতির অধিবেশন হ'ত। ১৮৪৩ সাল নাগাৎ এই সমিতি লোপ পায়। এর বিলুপ্তির একটি কারণ ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের ক্রোধ। সমিতির এক সভায় দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী বৃটিশ সরকারের নিন্দা করায় তিনি চটে যান। রিচার্ডসন সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও রিফর্ম পার্টির বিশিষ্ট সদস্য তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর নামানুসারে সমিতির নাম দেন চক্রবর্ত্তীর দল।

বেথুন সোসাইটী

১৮৫১ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে বেথুন সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাঃ মোয়াট কলিকাতার শিক্ষিত বাঙ্গালীদের উদ্দেশে এক সার্কুলার প্রচার ক'রে তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে একত্রিত করার সদুপায় নির্দ্ধারণকল্পে মিলিত হবার অনুরোধ জানান। মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে উদ্বোধন-সভা হয়। সেই সভায় ডাঃ মোয়াট তাঁর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন এবং তাহা গৃহীত হয়। কাউন্সিল অফ এডুকেশনের স্বর্গীয় প্রেসিডেণ্টের নামানুসারে এই নূতন সমিতির নামকরণ করা হয়। সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চায় আগ্রহ সৃষ্টি এবং অবাধ শিক্ষামূলক আলোচনার ব্যবস্থা করাই এই সোসাইটীর লক্ষ্য ছিল। শীতকালে সোসাইটীর মাসিক অধিবেশন মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে বসতো এবং সমাজ, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা হ'ত। এইরূপ একটি মাসিক অধিবেশনে জনৈক বিশিষ্ট হিন্দু ভদ্রলোক "সংস্কৃত কবিতা" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং উপসংহারে বলেন—

"It is in the vernacular field alone that the poets of Bengal can hope to distinguish themselves—the late John Elliot Drinkwater Bethune, the educator of India's sons and daughters, was most anxious to patronize the vernacular poetry in Bengal. He advised all aspirants after poetical fame to turn their attention to the Bengali Language. One of the last acts contemplated by himself was the preparation, by means of competent Bengali Scholar, of a small volume of vernacular poetry, as well for the use of his female school, as for educational institutions in general."

এ থেকে প্রমাণ হয় যে, নব্য বাঙ্গলা দেশী সাহিত্যের চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ ছিল।

১৮৬৩ সালে ডাঃ ডাফ যখন ভারত থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, তখনো এই সোসাইটী সক্রিয় ছিল। ডাঃ ডাফ ১৮৫৯ সালে বেথুন সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন এবং বিভিন্ন অধিবেশনে যোগদান ক'রে ভাল ভাল বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৮৬৬ সালে যখন মিস্ মেরী কার্পেণ্টার ভারতে আসেন, তখনো সমিতির অস্তিত্ব ছিল। অনরেবল্ সে, বি, ফীয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে মিস্ কার্পেণ্টার 'সংশোধন স্কুল প্রথা এবং নারী অপরাধীদের উপর এর প্রভাব" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

দি ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটী

মিঃ ই, বি, কাওয়েলের সম্পাদনায় দি ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটী কতকগুলি পুস্তক অনুবাদের ভার গ্রহণ করেন। এই সময় সমিতি বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত ও সোসাইটীর গ্রন্থাগারিক ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় এক আনা দামের একখানি ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন। এর প্রচার-সংখ্যা ছিল ৯০০। প্রতি সংখ্যায় ৩।৪খানি ছবি এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ এই ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হ'ত। সোসাইটী ঘোষণা করেন যে, তাঁদের নির্দ্দেশ মত বই লিখলে প্রত্যেক বইএর জন্য ২০০৲ টাকা দেওয়া হবে। এইরূপে প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তকের নাম, তাদের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ও মূল্য নীচে দেওয়া হ'ল—

১। রবিনসন ক্রুশোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, বারখানি চিত্রযুক্ত—৩২৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৵০

২। পল এবং বর্জ্জিনিয়ার জীবন-বৃত্তান্ত, চিত্রদ্বয় যুক্ত—২৫৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৵০

৩। সেক্সপিয়ার কৃত গল্প—২১২ পৃষ্ঠা, মূল্য ৶০

৪। মনোরম্য পাঠ—১১৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৶০

৫। রাজা প্রতাপাদিত্যের চরিত্র—৬৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০

৬। বৃহৎ কথা (প্রথম ভাগ)—১০১ পৃষ্ঠা, মূল্য ।০

৭। হংসরূপী রাজপুত্রাদির বিষয়, এক চিত্রযুক্ত—৫৪ পৃষ্ঠা, মূল্য /১৫

৮। পুত্রশোকাতুরা দুঃখিনী মাতা ও নায়ক শোকাতুরা দুঃখিনী নায়িকা—৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য /০

৯। ছোট কৈলাস ও বড় কৈলাস—২৫ পৃষ্ঠা, মূল্য /০

১০। চকমকি বাক্স ও অপূর্ব্ব রাজযন্ত্র, এক চিত্রযুক্ত—৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য /০

১১। মৎস্যনারীর উপন্যাস—৭৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵৫

১২। চীন দেশীয় বুলবুল পক্ষীর গল্প—২৮ পৃষ্ঠা, মূল্য /০

১৩। অহল্যাগড্ডিকার জীবন-বৃত্তান্ত—১১৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵৫

১৪। নূরজাহান রাজ্ঞীর জীবন-চরিত—১৮২ পৃঃ, মূল্য ।/০

১৫। এলিজিবেথ (Exiles of Siberia).

অন্যান্য বইএর মধ্যে আমরা ময়মনসিংহের বাবু দ্বারিকানাথ গুপ্তের "হেমপ্রভা" নামে একখানি উপন্যাস দেখতে পাই। এই বইএর জন্য সোসাইটী থেকে তাঁকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রকাশিত পুস্তকগুলি এক আনা থেকে দশ আনা মূল্যে এবং বড় বড় অর্ডারে শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশনে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সোসাইটী সংস্কৃত-ভাবাপন্ন লেখার পক্ষপাতী ছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

বেপরোয়া লেখা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় এবং কর্ত্তৃপক্ষ-স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ১৮৭২ সালে বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জন বীমস্ আই-সি-এস লেখেন—

"Bengal has so completely taken the lead in education and culture among the Provinces of India that its literature has passed out of the stage in which that of the other provinces still remains, and is now closely approximating to an European Standard."

সাহিত্য-সৃষ্টির গোড়াতেই বেপরোয়া লেখার বিপদ দেখা দেয়। বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা ও উন্নতিসাধনের জন্য ১৮৯৪ সালের ২৯শে এপ্রিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বা উহার মূল নাম দি একাডেমি অফ বেঙ্গলী ল্যাঙ্গোয়েজ এণ্ড লিটারেচার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা এখনও বর্ত্তমান আছে এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এর প্রধান কাজ—প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি এবং ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়সমূহ সংগ্রহ ও রক্ষা; বাঙ্গলা ভাষায় ত্রৈমাসিক মুখপত্র মারফৎ গবেষণার ফলাফল প্রকাশ; মধ্যে মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুঁথি প্রকাশ। পরিষৎ বৈজ্ঞানিক পন্থায় একখানি বাঙ্গলা অভিধান প্রকাশ করেছে; বাঙ্গলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী পরিভাষার তালিকা প্রস্তুত হয়েছে এবং বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় এবং এমন কি বাঙ্গলার বাহিরেও শাখা-পরিষৎ গঠন করেছে। প্রথমে ৩০ জন সদস্য নিয়ে কাজ সুরু হয় এবং কুড়ি বছরের মধ্যে সদস্য-সংখ্যা দু'হাজারের অধিক হয়। ইহা সাফল্যের অন্যতম নিদর্শন।

অন্যান্য সমিতি

উপরোক্ত সমিতিগুলির সঙ্গে অন্যান্য বহু সমিতি সহযোগিতা করে এবং দেশে পাশ্চাত্য ভাব আমদানী করাই এই সব সমিতির কাজ ছিল। আমরা এখানে এইরূপ পাঁচটি সমিতির নাম উল্লেখ করছি—

১। দি এসিয়াটিক সোসাইটী অফ বেঙ্গল।

সার উইলিয়ম জোন্স ১৭৮৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১০ বছর এর সভাপতি ছিলেন। তাঁর সময়ে এশিয়ার ইতিহাস, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধের আলোচনার জন্য প্রায়ই জুরি ক্রমে সাপ্তাহিক সভা হ'ত। ১৭৯৪ সালে সার উইলিয়ম জোন্সের মৃত্যুর পর সমিতি কিছু দিন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সাপ্তাহিক অধিবেশনের স্থানে মাসিক অধিবেশন হ'তে থাকে এবং ১৮০০ সালে তা ত্রৈমাসিক হয়ে দাঁড়ায়। ১৮০৬ সালে হেনরী টমাস কোলব্রুক সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি এশিয়া সংক্রান্ত পুস্তক সমূহের একটি বিবরণমূলক তালিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু তা কোন দিন কার্য্যে পরিণত হয়নি। সোসাইটীর ভবনের বর্ত্তমান স্থান সরকারের কাছ থেকে ১৮০৫ সালে দান হিসাবে পাওয়া যায় এবং ১৮৩১ সালে কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্ মাসিক ৫০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। ১৮৪৩ সাল থেকে সোসাইটীর মুখপত্র সরকারী ভাবে স্বীকৃত হয়। এই সমিতিই প্রথম প্রাচীন পুঁথি রক্ষা ও প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২। ১৮২০ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটী। রেভাঃ ডব্লিউ, এইচ, পিয়ার্স এর সভাপতি ছিলেন। সমিতি শ্যামবাজার, জানবাজার ও এণ্টালীতে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।

৩। লেডিজ সোসাইটী ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন। ১৮২৪ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগঠিত বার্ষিক সভা। প্রতি বছর বাঙ্গলা নববর্ষে (১লা বৈশাখ) সকল শ্রেণীর লোক সমবেত হয়ে সাহিত্য-বিষয়ক আলাপ-আলোচনা ও অনুষ্ঠানাদি করতেন।

৫। ১৮৬৭ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন। মেটকাফ-হলে উদ্বোধনী সভা হয় এবং মিঃ এইচ, বিভার্লি ও বাবু পিয়ারীচাঁদ মিত্র অনরারি সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। কলিকাতায় একটা সমাজ-বিজ্ঞান সমিতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য মিস্ মেরী কার্পেণ্টারকে আমন্ত্রণ করা হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল—"to promote social development in the Presidency of Bengal by uniting Europeans and Indians in the collection, arrangement and classification of facts bearing on the social, intellectual and moral condition of the people." ১৮৬৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী এই সমিতির সভায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ "বাঙ্গালায় নারীর পেশা" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

উপসংহারে আমি আবার এই কথাই বলি যে, ইউরোপীয় চিন্তাধারার ফলস্বরূপ সৃষ্ট এই সকল সমিতি দেশবাসীকে সেই ভাবধারা গ্রহণে ও সেই ভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত করাতে চেষ্টা করেছে। এই সকল সমিতি তৎকালে কিরূপ অভিনব ছিল এবং কি ভাবে তারা নতুন ভাব ও চিন্তাধারা গ্রহণে সাহায্য করেছিল, তা স্মরণ করলে এদের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি হবে।

রামমোহন রায়

[রাজা রামমোহন রায় একটি চিঠিতে জনৈক অজ্ঞাতনামা বন্ধুর অনুরোধে সামান্য কয়েক ছত্রে আত্ম-পরিচয় দিয়েছিলেন। মূল চিঠিখানি ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত রামমোহনের জীবনীতে প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে। রামমোহনের জীবনের বিস্তৃত ও ঘটনাবহুল কাহিনী হয় তো কয়েক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হয় না, তবুও 'আত্ম-স্মৃতি' হিসাবে চিঠিখানির মূল্য অশেষ। চিঠিতে একটি ছত্রে রামমোহন মুক্তকণ্ঠে বলেছেন: "আমার সমস্ত তর্ক-বিতর্কে আমি কখনও হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই।" আত্ম-পরিচয়ে স্পষ্টবাদী রামমোহনের যথেষ্ট পরিচয় আছে। —স]

প্রিয়বন্ধু,

আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে লিখিয়া দিবার জন্য আপনি আমাকে সর্ব্বদাই অনুরোধ করিয়াছেন। তদনুসারে আমি আহ্লাদের সহিত আমার জীবনের একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে লিখিয়া দিতেছি।

আমার পূর্ব্বপুরুষেরা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা তাঁহাদিগের কৌলিক-ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। পরে প্রায় এক শত চল্লিশ বৎসর গত হইল, আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য্য ও উন্নতির অনুসরণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা সেই অবধি তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া আসিয়াছেন। রাজসভাসদ্‌দিগের ভাগ্যে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাঁহাদিগেরও সেইরূপ অবস্থার বৈপরীত্য হইয়া আসিয়াছে; কখন সম্মানিত হইয়া উন্নতি লাভ, কখনও বা পতন; কখন ধনী, কখন নির্ধন, কখন সফলতা লাভে উৎফুল্ল, কখন বা হতাশ্বাসে কাতর। কিন্তু আমার মাতামহ বংশীয়েরা কৌলিক ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মযাজক ব্যবসায়ী এবং উক্ত ব্যবসায়িগণের মধ্যে তাঁহাদিগের পরিবারের অপেক্ষা উচ্চতর পদবীস্থ অপর কেহই ছিলেন না। তাঁহারা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সমভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মচিন্তাতে অনুরত ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরের প্রলোভন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগ্রহ অপেক্ষা তাঁহারা মানসিক শান্তি শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন।

আমার পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতার ইচ্ছানুসারে আমি পারস্য ও আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম। মুসলমান রাজসরকারে কার্য্য করিতে হইলে উক্ত দুই ভাষার জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। আমার মাতামহ বংশের প্রথানুসারে আমি সংস্কৃত ও উক্ত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়নে নিযুক্ত হই; হিন্দু সাহিত্য, ব্যবস্থা ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকলই উক্ত ভাষায় লিখিত।

ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে আমার মতামত এবং ঐ পুস্তকের কথা সকলে জ্ঞাত হওয়াতে আমার একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত আমার মনান্তর উপস্থিত হইল। মনান্তর উপস্থিত হইলে, আমি গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি। পরিশেষে বৃটিসশাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃ আমি ভারতবর্ষের বহির্ভূত কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইলে, আমার পিতা আমাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিলেন; আমি পুনর্ব্বার তাঁহার স্নেহলাভ করিলাম। ইহার পর হইতেই আমি ইয়োরোপীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাঁহাদিগের সংসর্গে আসিতে আরম্ভ করিলাম। আমি শীঘ্রই তাঁহাদিগের আইন ও শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে এক প্রকার জ্ঞানলাভ করিলাম। তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ অধিকতর বুদ্ধিমান, অধিক দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং মিতাচারী দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমার যে কুসংস্কার ছিল, তাহা আমি পরিত্যাগ করিলাম;

তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। আমার বিশ্বাস জন্মিল, তাঁহাদিগের শাসন বিদেশীয় শাসন হইলেও উহা দ্বারা শীঘ্র দেশবাসিগণের অবস্থোন্নতি হইবে। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাসপাত্র ছিলাম। পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কার বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের সহিত আমার ক্রমাগত তর্কবিতর্ক হওয়াতে এবং সহমরণ ও অন্যান্য অনিষ্টকর প্রথা নিবারণ বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করাতে, আমার প্রতি তাঁহাদিগের বিদ্বেষ পুনরুদ্দীপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং আমাদিগের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদিগের ক্ষমতা থাকাতে আমার পিতা প্রকাশ্যরূপে আমার প্রতি পুনর্ব্বার বিমুখ হইলেন। কিন্তু আমাকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হইত। আমার পিতার মৃত্যুর পর, আমি অধিকতর সাহসের সহিত পৌত্তলিকতার পক্ষ সমর্থনকারীদিগকে আক্রমণ করিলাম। এই সময়ে ভারতবর্ষে মুদ্রা যন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল। আমি উহার সাহায্য লইয়া তাঁহাদিগের ভ্রমাত্মক মত সকলের বিরুদ্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় অনেক প্রকার পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার করিলাম। ইহাতে লোকে আমার প্রতি এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে, দুই তিন জন স্কট্‌লণ্ডবাসী বন্ধু ব্যতীত আর সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। সেই বন্ধুগণের প্রতি ও তাঁহারা যে জাতির অন্তর্গত, তাঁহাদিগের প্রতি আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ।

আমার সমস্ত তর্কবিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের পৌত্তলিকতা, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরণের ও যে সকল শাস্ত্রকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন ও যদনুসারে তাঁহারা চলেন বলিয়া স্বীকার পান, তাহার মতবিরুদ্ধ। আমার মতের প্রতি অত্যন্ত আক্রমণ ও বিরোধ সত্বেও আমার জ্ঞাতিবর্গের ও অপরাপর লোকের মধ্যে কয়েক জন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমার মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে ইয়োরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল তত্রত্য আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক অবস্থাসম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার জন্য স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসনা করিলাম। যাহা হউক, যে পর্য্যন্ত না আমার মতাবলম্বী বন্ধুগণের দলবল বৃদ্ধি হয়, সে পর্য্যন্ত আমার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। পরিশেষে আমার আশা পূর্ণ হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, নূতন সনন্দের বিচার দ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজশাসন ও ভারতবাসিগণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহু বৎসরের জন্য স্থিরীকৃত হইবে, ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভিকৌন্সিলে আপিল শুনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সালের নবেম্বর মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম। এতদ্ভিন্ন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, দিল্লীর সম্রাট্‌কে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে ইংলণ্ডের রাজকর্ম্মচারীদের নিকট আবেদন করিবার জন্য আমার প্রতি ভারার্পণ করেন। আমি তদনুসারে ১৮৩১ সালের এপ্রেল মাসে ইংলণ্ডে আসিয়া উত্তীর্ণ হই।

আমি আশা করি, এই বৃত্তান্তটি সংক্ষিপ্ত হইল বলিয়া আপনি ক্ষমা করিবেন, কেননা এখন বিশেষ বিবরণ সকল লিখিবার আমার অবকাশ নাই।

সে যুগে ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ যশস্বী শিল্পীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাধিয়ে দিতেন। সে যুগের বিখ্যাত শিল্পীদ্বয় জেউক্‌সিশ এবং প্যারাসিয়াশকেও প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে হয়েছিল।

শিল্পী জেউক্‌সিশ আঙুরে পরিপূর্ণ একটি রেকাবী আঁকলেন। ছবিটি দেখে পাখী আঙুর খেতে উড়ে এসেছিল সত্যি মনে ক'রে। বিচারকবৃন্দ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। পুরস্কার নিশ্চয়ই তিনিই পাবেন মনে ক'রে জেউক্‌সিশ প্রতিদ্বন্দ্বীর ছবিতে ঢাকা পর্দ্দাটি উন্মুক্ত করতে বলেন।

কথা শুনে প্যারাসিয়াশ তো হেসেই খুন। জেউক্‌সিশ যে পর্দ্দাকে মনে করেছিলেন সত্যিকার, আসলে সেই পর্দ্দাটাই প্যারাসিয়াশ এঁকেছিলেন।

প্যারাসিয়াশ পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

দ্বিতীয় তরঙ্গ

উন্মেষ

মালদহে দীনু পণ্ডিতের পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া তখন জিলা-স্কুলে ভর্তি হইয়াছি, বয়স নয় কি দশ হইবে। গ্রীষ্মাবকাশে কি করিয়া অবসর যাপন করিব তাহাই ছিল সমস্যা। বাবা সদরের দশটা-পাঁচটা চাকরি এবং প্রায়শই মফস্বলের সফর লইয়া ব্যস্ত, বড়দা সুদূর বাঁকুড়ায় মাতুলালয়ে থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন, জিলা-স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র মেজদাই বলিতে গেলে আমাদের অভিভাবক। তিনি পেল্লায় পালোয়ান, ডন বৈঠক কুস্তি কুম্ভক লইয়াই মত্ত। লেখাপড়াটা তাঁহার গৌণ-সাধনা। দাদা সেজদা ও আমি পিঠোপিঠি, মাত্র আড়াই বছরের ব্যবধান। পড়াশুনায় আমরা এক রকম খেয়াল-খুশিতেই চলি। আজকালকার মত তখন গৃহ-শিক্ষকের রেওয়াজ ছিল না; নিজের চরকায় নিজেকেই তেল দিতে হইত। আমাদের ক্ষেত্রে তাহাতে ফল যে মন্দ হইয়াছে বলিতে পারি না। পাঠ্যের সঙ্গে অপাঠ্য পুস্তক পড়িবার প্রচুর সুবিধা আমাদের দেওয়া হইত। প্রচুরতম সুযোগ মিলিত এই গ্রীষ্মাবকাশে। স্কুল-জীবনের মধুরতম ছুটি এই গ্রীষ্মের ছুটি, কারণ অভিভাবকেরা চাকরিতে যূপবদ্ধ, ছেলেদের ছুটি। সমস্যা ছিল বই সংগ্রহের। এত লাইব্রেরি তখন প্রতিষ্ঠা হয় নাই, সাধারণ গৃহস্থ-বাড়িতেও পাঠ্যেতর বইয়ের আমদানি ছিল না বলিলেই চলে। শিশু-সাহিত্যের একমাত্র পরিবেশক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়। বাংলা দেশের এই কালের ছেলে-মেয়েদের তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহারা বড় হইয়া বিস্মৃতিপরায়ণ না হইলে তাঁহার নামে উচ্চতম স্মৃতিস্তম্ভ বাংলা দেশের কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই নির্মিত হইত। আমরা প্রায়ই এ পাড়ায় ও-পাড়ায় পুস্তক সংগ্রহের অভিযানে বাহির হইতাম। যোগীন্দ্রনাথ সরকারেরই সঙ্কলিত কি একখানি বই সংগ্রহীত হইল। গোড়া হইতে বিমুগ্ধ মন লইয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ সেই বাস্তব জীবনের পটভূমি হইতে এক অজ্ঞাত রহস্যলোকে উত্তীর্ণ হইলাম। সামান্য একটি কবিতা, ধরণ-ধারণ যে খুব অচেনা তা নয়, কথাগুলাও নূতন নয়—কিন্তু মনে কোথা হইতে একটা নূতন রঙ ধরিল, একটা অপরূপ সুরের মূর্ছনা লাগিল। সেই দিন সেই গ্রীষ্মের দাবদাহের মধ্যে উঠানের ডালিম গাছতলায় বসিয়া পড়িতে লাগিলাম—
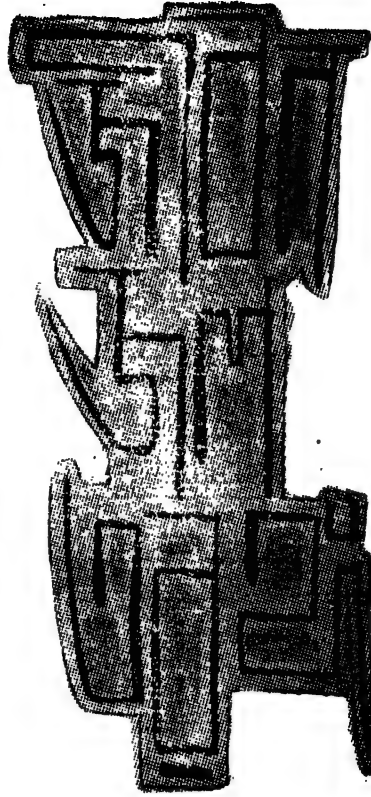
> "দিনের আলো নিবে এল,
> সূয্যি ডোবে ডোবে
> আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে
> চাঁদের লোভে লোভে।
> মেঘের উপর মেঘ করেছে,
> রঙের উপর রঙ।
> মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা
> বাজল ঠঙ ঠঙ।
> ওপারেতে বিষ্টি এল
> ঝাপসা গাছগালা।
> এপারেতে মেঘের মাথায়
> একশো মাণিক জ্বালা।
> বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
> বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান॥"

এক সঙ্গে দেহ ও মন স্নিগ্ধ হইয়া গেল, মনের মধ্যে একটা সুগভীর ব্যাকুলতা অনুভব করিলাম। তেমনটি আর কখনও করি নাই। প্রখর রৌদ্রালোকে নিখিল ভুবন পুড়িয়া যাইতেছে, একটা অলস রুক্ষ ঔদাসীন্যে চারিদিক থম্‌থম্‌ করিতেছে। বিরলপথিক পথের দিকে নিবিষ্ট ভাবে চাহিলে মরীচিকাও যেন দেখা যায়। শুধু গৃহ-পারাবতের উদাস কূজন আর দূরে ক্লান্ত ঘুঘুর একটানা ডাক প্রকৃতির সজীবতার করুণ সাক্ষ্য দিতেছে। কবিতা পড়িতে পড়িতে অবোধ বালকের মনে প্রচণ্ড মধ্যাহ্নেই নিদাঘ-দিবাবসানের রমণীয়তা নামিয়া আসিল, মেদুর মেঘে যেন সারা আকাশটা ছাইয়া গেল, বুঝি এখনি বৃষ্টি নামিবে। পড়া আর অগ্রসর হইল না, বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। হঠাৎ দাদা আসিয়া ছোঁ মারিয়া বইখানা লইয়া অন্তর্ধান করিল। আমি প্রতিকারার্থ

করুণ ভাবে মাকে ডাকিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। মা রান্নাঘরে বাবার জন্য বৈকালিক জলখাবার প্রস্তুত করিতেছিলেন। তিনি আমল দিলেন না। মামলা মুলতুবি রহিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে অত্যন্ত সজাগ রহিলাম। অসন্দিগ্ধ দাদা বইখানিকে ঘরের তাকের উপর জলের গেলাস চাপা দিয়া রাখিয়া মেঝেতেই ঘুমাইয়া পড়িল, আড়চোখে দেখিলাম। পা টিপিয়া টিপিয়া তাকের ধারে গিয়া ডিঙি মারিয়া বইখানিতে হাত দিলাম। তর সহিতেছিল না। অতি ব্যস্ততায় জলের গেলাসের কথা ভুল হইয়া গেল। বইটি টানিয়া লইতেই জলশুদ্ধ গেলাস মেঝেয় শায়িত দাদার বুকের উপর আসিয়া পড়িল। তাহার পর যে হুলস্থূল কাণ্ড ঘটিল তাহা অনুমানসাপেক্ষ, বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। পালোয়ান মেজদাদা আসিয়া আমার কানে ধরিয়া শূন্যে উত্তোলন করিলেন, মা দাদার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কাঁদিতে বসিলেন। পাড়াপড়শিনীদের সমাগম হইল। আমার মনের সাহিত্য-ব্যাকুলতা সূচনাতেই ঘোর বাধাগ্রস্ত হইল। ব্যাপারটার জের অনেক দূর গড়াইয়াছিল বলিয়া আজও এমন স্পষ্ট মনে আছে। রাশভারি বাবা গলদ্‌ঘর্ম হইয়া কাছারি হইতে ফিরিয়া আসামী-ফরিয়াদী উভয়কেই ছাতা-পেটা করিয়া নাই দেওয়ার অপরাধে মায়ের মুণ্ডপাত করিতে লাগিলেন। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে গিয়া পড়াতে কয়েকটা লঘু ছত্রদণ্ডেই আমরা নিষ্কৃতি পাইলাম।

দুর্ঘটনার পূর্বে বইখানি সেই যে সংগ্রহ করিয়াছিলাম আর ছাড়ি নাই। কোলাহল শান্ত হইলে খেলিতে যাইবার অছিলায় মহানন্দা নদীতীরবর্তী একটি কাঠের গোলার সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড গুঁড়ির উপর একলা বসিয়া আবার পড়িলাম—

“কবে বিষ্টি পড়েছিল, বান এল সে কোথা,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হ’ল কবেকার সে কথা।
সেদিনো কি এমনিতরো মেঘের ঘটাখানা,
থেকে থেকে বাজ-বিজুলি দিচ্ছিল কি হানা।
তিন কন্যে বিয়ে ক’রে কী হ’ল তার শেষে,
না জানি কোন্ নদীর ধারে, না জানি কোন্ দেশে।
কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান॥”

এ যেন একান্ত আমারই কথা। এমন করিয়া আমার মনের কথা এতদিন পর্যন্ত তো আর কাহাকেও বলিতে শুনি নাই! তলায় নাম দেখিলাম—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গুরুমন্ত্রের মত সেই নাম জপমন্ত্র হইল। কবিতাটিও মুখস্থ হইয়া গেল।

আমার জীবনের বাণী-সাধনার এখানেই সূত্রপাত। পরের জবানিতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া মন নিজের জবানিতে প্রকাশ খুঁজিতে লাগিল। আমরা প্রতিদিন যাহা দেখি, যাহা শুনি, যাহা কল্পনা করি তাহারও যে একটা ছন্দোবদ্ধ বিচিত্র রূপ দেওয়া যাইতে পারে, যাহা তুচ্ছ, যাহা সাময়িক তাহারও যে একটা বিরাট চিরন্তন মহিমা পর পর শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলা শব্দের মধ্যে প্রকাশ পাইতে পারে তাহার অস্পষ্ট অনুভূতি সেই দিন আমার মনকে আচ্ছন্ন করিল। এই অনুভূতির কথা পরবর্তী কালে ‘রাজহংসে’র অন্তর্গত “তমসা-জাহ্নবী” কবিতায় এই ভাবে ধ্বনিত হইয়াছে—

“কুলুকুলু মহানন্দা, দুই তীরে শান্ত জনপদ ;
এপারে দাঁড়ায়ে এক ক্ষুদ্র শিশু গণে জল-ঢেউ—
এক, দুই, তিন, চারি। কাঠের গোলার
আশেপাশে,
সঙ্গীরা প্রসন্ন মনে খেলিতেছে লুকাচুরি খেলা।
আকাশ আঁধার করি’ ওঠে মেঘ, নামে জলধারা,
জলশরবিদ্ধ হয়ে পরপার ঝাপ্‌সা দেখায়।
স্নানার্থী এসেছে যারা তারা কলকোলাহল তুলি’
আছাড়ি’ সাঁতারি’ খেলে বরষার নবীন উল্লাসে।
নদীপাড়ে শিশু-মনে সহসা সে অপূর্ব প্রকাশ—
টাপুর টুপুর বৃষ্টি, কোন্ সে নদীতে এল বান ;
গান তার ভেসে এল, শিহরিল বিহ্বল বালক।”

এই আদি শিহরণই আমার জীবনকে প্রধানত নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে। অন্য গুরুতর স্পন্দন যে ছিল না তাহা নয়, কিন্তু বাণীতরঙ্গের আঘাতে সমস্তই ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। শিশু যেমন অবোধ আগ্রহে মাকে খুঁজিয়া বেড়ায় আমার মনও তেমনি খুঁজিয়া ফিরিয়াছে সুর আর ছন্দ। আমার মায়ের সঙ্গে এই নবজীবন-উন্মেষের সম্পর্ক অতি গূঢ়। ‘রাজহংসে’র উৎসর্গ-পত্রে মায়ের কথা স্মরণ করিতে গিয়া এই উৎস-মুখের কথা সর্বাগ্রে মনে জাগিয়াছিল, কিন্তু সেই উৎস-মুখের সঠিক সন্ধান পাই নাই। আজ যে তাহা পাইয়া “জীবনজলতরঙ্গ” কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি, তাহা নয়। অ-ধরাকে ধরার প্রয়াসই

এই রচনার প্রেরণা। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে আমার কথা ছিল—

"যে চপল নদী পার হয়ে এল গিরি-বন-প্রান্তর,
কখনো আলোকে, কখনো অন্ধকারে,
থমকি দাঁড়ায়ে সহসা সে যদি চাহিত পিছন ফিরে,
হিমালয়-শিরে পেত কি দেখিতে কোথায় উৎস তার?
এপারে-ওপারে ব্যবধান-ছেঁড়া গোমুখীর গূঢ় ব্যথা
বুঝিত কি নদী নদীজল-কলকলে?
বুঝিত না, তবু স্রোতোজলে পেত উৎসের পরিচয়।"

প্রান্তরে ক্রমপ্রসারিত শীর্ণ গিরিনদী বার বার পিছন ফিরিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু মাকে খুঁজিয়া পায় নাই। অবিচ্ছিন্ন গতিপথে তাহার সেই বেদনাই বিচিত্র মর্মরধ্বনিতে ছন্দায়িত হইয়াছে।

"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুরে"র পূর্বে প্রস্তুতির আরও একটু ইতিহাস আছে, যাহা এ-যুগের অভিভাবক ও ছাত্রদের পক্ষে শোনা দরকার। কোনও মানুষই বৃন্তহীন পুষ্পের মত আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে না। তাহার বিকাশের পক্ষে পরিবেশের প্রভাব এবং জাতীয় সংস্কার—গাছের পক্ষে মাটি-জল-বায়ুর মতই প্রয়োজন। আজকাল দেখিতে পাই, অনেক শিশুই সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' এবং 'হ য ব র ল' দিয়া কল্পনা-জীবন শুরু করে। তাহাতে ছন্দ ও সুর অধিগত হয় বটে, কিন্তু যে বহু পুরাতন ধারা ধরিয়া যুগে যুগে আমরা বহিয়া আসিয়াছি তাহার কোনও সন্ধান মিলে না। যে মহৎ আদর্শ, বিরাট চরিত্র ভারতবর্ষের মানুষকে আদি কাল হইতে গঠন করিয়া আসিতেছে, দেহে রক্তমাংসের মত যাহা আমাদের জাতীয় চরিত্রে ওতপ্রোত হইয়া আছে তাহাকে বাদ দিয়া কোনও শিশুই দেশের মানুষ হইয়া উঠিতে পারে না। আমি ভারতীয় ঋষিপ্রোক্ত বেদ-বেদান্ত উপনিষদের কথা বলিতেছি না। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের সার চুঁইয়া-গড়াইয়া যে দুইটি থালায় আশ্রয় লাভ করিয়া সর্বসাধারণের ভোজে পরিবেশিত হইয়াছে সেই রামায়ণ ও মহাভারতের কথা বলিতেছি। এই থালা দুইটিও স্থানভেদে ও কালভেদে স্থান ও যুগোপযোগী আহার্যের আধার হইয়াছে। মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণ বাংলা দেশে হইয়াছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পশ্চিমে হইয়াছে তুলসীদাসী রামায়ণ; বাংলা দেশে বেদব্যাসের মহাভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পরিবেশক হইয়াছেন কাশীরাম দাস। মধ্যে এই দুইটি মহাগ্রন্থেরই রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছিল; ফলে এক ধরণের নিরাকার কল্পনারাজ্যে দেশের শিশুমন হাঁপাইয়া মরিতেছিল, থই পাইতেছিল না। আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছি, দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কারের প্রতি আবার সকলের দৃষ্টি ফিরিতেছে, শুধু আরব্য উপন্যাস এবং বৈদেশিক পরীকাহিনী শুনিয়া শুনিয়া এবং ধ্বনি-অনুপ্রাসপ্রধান আজগুবি শিশু-কবিতা আওড়াইয়াই দেশের ছেলেমেয়েদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে না।

গ্রীষ্ম অথবা পূজা কোনো এক অবকাশ মালদহে যাপন করিবার জন্য আমাদের প্রায় অপরিচিত বড়-দাদা বাঁকুড়া হইতে আসিলেন। অপরিচয়ের দরুণ আমাদের ভালবাসা ও ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের পর্যায় ছাড়ায় নাই। তিনি সকলের জন্য উপহার আনিয়াছিলেন। ভয়ে ভয়ে তাঁহার নিকট গেলাম, আমার ভাগ্যে উঠিল—এক খণ্ড 'সরল কৃত্তিবাস'—কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু বি. এ. সম্পাদিত, বহু চিত্র সম্বলিত। বইখানি হাতে দিয়া বড়দাদা বলিলেন, যদি ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি, আগামী ছুটিতে একখানি কাশীরাম দাসের মহাভারত পুরস্কার মিলিবে' উৎফুল্ল হইয়া বই লইয়া মাতৃসন্নিধানে গিয়া বসিলাম। পাতা উল্টাইতেই চোখে পড়িল—

"অমৃত-মধুর এই সীতারাম-লীলা।
শুনিলে পাষাণ গলে, জলে ভাসে শিলা॥"

অত্যল্পকালমধ্যে সমগ্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ নিঃশেষে পড়িয়া ফেলিলাম এবং তাহা মর্মের মধ্যে এমনই গাঁথিয়া গেল যে, মাস ছয়েক যাইতে না যাইতেই বইখানি হাতে না লইয়াই

"গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর।
লক্ষ্মীসহ তথায় বৈসেন গদাধর॥
মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।
এক অংশ চারি অংশে হইতে প্রকাশ॥
শ্রীরাম, ভরত, আর শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ।
এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ॥"

হইতে আরম্ভ করিয়া "এত দূরে সমাপ্ত হইল সপ্তকাণ্ড" পর্যন্ত আবৃত্তি করিতে পারিলাম। সুতরাং যথাকালে কাশীরাম দাসের মহাভারতও উপহার লাভ করিলাম। শুধু রামায়ণ-মহাভারত কাহিনীই যে আয়ত্ত করিলাম তাহা নহে; পুরাতন পয়ার, লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদী

ছন্দের উপর দখল জন্মিল এবং অতি বাল্যকালেই আমার মনের অভিধান বহু শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। ইহা হইল গৌণ লাভ, মুখ্য লাভ হইল—জীবনের জটিল দুর্গম পথে চলিতে চলিতে যেখানেই অপ্রত্যাশিত সমস্যা আসিয়া পথরোধ করিত, সেখানেই সমাধানের ইঙ্গিতও এই রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র হইতে পাইতে লাগিলাম। ইহা যে কত বড় লাভ, লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না, এখনও প্রতিদিন মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি।

এই অনুভূতি রবীন্দ্রনাথই আমার মনে সঞ্চারিত করিয়াছেন। 'সরল কৃত্তিবাস' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে, সেই বৎসরেই তাহা আমার হস্তগত হয়। বইটির "ভূমিকা" লিখিয়াছিলেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহার সব কথা যে বুঝিয়াছিলাম তাহা নহে, তবু তাঁহার এই কয়টি কথা মনের মধ্যে গাঁথিয়া গিয়াছিল, রামায়ণের উদ্‌ধৃত পয়ারের মত সেই কথাগুলি আজও সম্পূর্ণ স্মৃতি হইতে তুলিয়া দিতে পারি—

"এই রামায়ণ, মহাভারত আমাদের সমস্ত জাতির মনের খাদ্য ছিল; এই দুই মহাগ্রন্থই আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। মহানদী যেমন সকল দেশে নাই, তেমনি মহাকাব্য পৃথিবীর অতি অল্প জাতির ভাগ্যেই জুটিয়াছে। আবার যে দেশের মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত, সে দেশের সৌভাগ্যের অন্ত নাই। এই সৌভাগ্যের ফল যে কত সুদূরবিস্তৃত, তাহা আমাদের স্বাভাবিক ঔদাসীন্য বশতঃই আমরা চিন্তা করিয়া দেখি না। এ কথা আমাদের নিশ্চিত জানা উচিত যে, ভাগীরথী ও ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা যেমন আমাদের বঙ্গভূমিকে জলে ও শস্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, ঘরে ঘরে চিরদিন ধরিয়া যেমন আমাদের ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল যোগাইয়া আসিতেছে—কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরামের মহাভারতও তেমনি করিয়া চিরদিন, আমাদের মনের অন্ন-পানের অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে। এই দুইটি গ্রন্থ না থাকিলে, আমাদের মানস-প্রকৃতিতে কিরূপ শুষ্কতা ও চিরদুর্ভিক্ষ বিরাজ করিত, তাহা আজ আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন।" [৩০শে শ্রাবণ, ১৩১৪]

পয়ার-ত্রিপদীর ভাণ্ডারে "বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর"-এর ছন্দ একটা নূতনত্বের আমদানি করিল, এবং মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল আবার এই "শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" নাম। অনুসন্ধিৎসু চিত্ত এই নামের সন্ধানে ফিরিতে লাগিল। মেজদাদা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পালোয়ানী জবাব দিলেন—স্বদেশী গান লেখেন, "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক" ওঁরই লেখা; রাখীবন্ধনের গান "বাংলার মাটি, বাংলার জল"ও তিনিই রচনা করিয়াছেন। বিস্মিত মন বিমুগ্ধ হইতে বিলম্ব হইল না এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাতে পাইলাম বাল্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নসম্ভার 'কথা ও কাহিনী', ওই "শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" প্রণীত। "কথা কও, কথা কও"—এই বিচিত্র মর্মস্পর্শী আদেশ আমিও শুনিতে পাইলাম। কথা কহিতে হইবে। কবে, কখন, কোথায়, কাহাকে, কেমন করিয়া? এ সকল অতি সমীচীন প্রশ্ন চপল অবোধ বালকের মনে ক্ষণিকের জন্য উদয় হইল না। শুধু হুকুম শুনিলাম, কথা কও, কথা কও।

শেষ পর্যন্ত হুকুম পালন করিলাম, কথা কহিলাম।

* * * *

দ্বিতীয় তরঙ্গের এখানেই শেষ, কিন্তু প্রথম তরঙ্গের জের একটু বাকি রহিয়াছে। প্রথম তরঙ্গ প্রকাশের পর ঘর ও বাহির, দুই দিক হইতেই দুইটি প্রতিবাদ আসিয়াছে। আমার দাদা বলিতেছেন, আমাদের পিতৃকুল অর্থাৎ দাসগোষ্ঠী শাক্ত ছিল না, তাহারাও বৈষ্ণব। যেদিন হইতে আমার জ্ঞান হইয়াছে সেই দিন হইতে স্বচক্ষে দেখিয়া যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার হইয়াছে তাহার জোরেই বলিয়াছিলাম, দাসেরা ঘোরতর শাক্ত। পঞ্চ মকারের অন্তত প্রথম দুই মকারের সাধনায় ইঁহাদের প্রায় সকলকেই যেরূপ পটু ও সিদ্ধহস্ত দেখিয়াছি, তাহাতে অন্যরূপ ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাবা মাঝে মাঝে কালীসঙ্গীত রচনা করিয়া গান করিতেন। এততেও যদি দাসেদের বৈষ্ণবত্ব না খণ্ডিয়া থাকে তাহা হইলে আমি নাচার।

দ্বিতীয় ভ্রম সংশোধনের অনুরোধ জানাইয়াছেন কবি-অগ্রজ শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা উদ্‌ধৃত করিয়া কর্তব্য পালন করিলাম:

"...আপনার সাহিত্যিক জীবনের তরঙ্গে ছোট-বড় অনেক ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে, তাহাদের বিষয় যথাযথ

বর্ণনা করিলে সাহিত্য-ইতিহাসের অনেক উপাদান উত্তরকালের জন্য ছাপার অক্ষরে সংরক্ষিত থাকিবে।

আপনার বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনা তথ্যের দিক হইতে ভুল হইয়াছে। আশা করি আপনার পরবর্ত্তী রচনার মধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন। আপনি লিখিয়াছেন "……স্বনামধন্য সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্নেহদৃষ্টি লাভ করে। তিনি তখন 'উপাসনা' পত্রিকা ছাপাখানা সহ খরিদ করিয়াছেন এবং 'উপাসনা' পত্রিকাটিকে ঢালিয়া সাজিবার মতলব করিতেছেন।……'উপাসনা'র নাম বদল করিয়া 'বঙ্গশ্রী' রাখি—" ইত্যাদি ইত্যাদি

আপনার জ্ঞাতার্থ নিবেদন করি—"উপাসনা প্রেস"ই বিক্রীত হইয়াছিল, কিন্তু 'উপাসনা' পত্রিকা বিক্রীত হয় নাই। ছাপাখানার বিক্রয় কবলা দেখিলে আমার কথার সত্যাসত্য উপলব্ধ হইবে। তাহা ছাড়া 'উপাসনা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা, উহা বিক্রয় করিয়া দিবার অধিকারও আমার ছিল না। আমি কেন আবার 'উপাসনা' পত্রিকা প্রকাশ না করিয়া 'অভ্যুদয়' পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহারও একটা ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে—কিন্তু তাহার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া নিরস্ত থাকিলাম।"

কিন্তু ঠিক সেই সময়কার মুদ্রিত ইতিহাস অন্যরূপ। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা পর্যন্ত বাহির হইয়া 'উপাসনা' নামান্তরিত হয়, মাঘ মাস হইতে 'বঙ্গশ্রী' নাম হয়। আমি ভট্টাচার্য কোম্পানির চাকুরে হিসাবেই শেষ সংখ্যা 'উপাসনা'য় প্রথম কবিতা লিখি "অন্নপূর্ণা জাগো"—উহা বন্ধুবর চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ত্রিবর্ণ চিত্রিত হইয়া বাহির হয়। প্রথম সংখ্যা (মাঘ, ১৩৩৯) 'বঙ্গশ্রী'র প্রথম তিন পৃষ্ঠায় সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যের "নিবেদন" বাহির হয়। তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :

"…শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'উপাসনা' পত্রিকাটি লইয়া একটু বিব্রত হইয়াছিলেন। আমরা 'উপাসনা'কেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু পুরাতন শিথিল জীর্ণ ভিত্তির উপর নূতন সৌধ নির্ম্মাণের চেষ্টা নানা ভাবে বাধাগ্রস্ত হইতে লাগিল দেখিয়া আমরা অবশেষে নূতন নামে পত্রিকা প্রকাশ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম। আমাদের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া 'উপাসনা'র নাম পরিবর্তন করিয়া 'বঙ্গশ্রী' রাখা হইল।"

ভুল হইয়া থাকিলে সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্যের ভুলেই আমার ভুল হইয়াছিল।

মানুষের চতুর্দ্দশটি ভুল

(লণ্ডন বিচারালয়ের এক বিচারপতি রেণ্টুল সাহেব মানুষের নিম্নলিখিত চতুর্দ্দশটি মহাভ্রমের উল্লেখ করেন।)

১। নিজের ধারণানুযায়ী ন্যায় অন্যায়ের আদর্শ স্থির করিয়া, সকলেই সেই আদর্শের সমর্থন করিবে এইরূপ আশা করা।

২। নিজের আনন্দের মাত্রার হিসাবে অন্যের আনন্দ মাত্রার হিসাব করা।

৩। জগতে সকলেই একমত হইবে এরূপ আশা করা।

৪। বালক ও যুবার মধ্যে বিচার-শক্তি এবং অভিজ্ঞতার আশা করা।

৫। সকলের স্বভাবকে এক রকম করিয়া গঠিত করিবার চেষ্টা করা।

৬। সামান্য বিষয়ে আপনার পরাজয় স্বীকার না করা।

৭। নিজেদের কর্ম্ম পরিপূর্ণ নির্দ্দোষ দেখিবার ইচ্ছা।

৮। যাহা সংশোধিত করিবার উপায় নাই সেই বিষয় লইয়া আপনাকে ও অপরকে বিরক্ত করা।

৯। সক্ষম স্থলে দুঃখ বা অধঃপতন দেখিলে দূর করিবার চেষ্টা না করা।

১০। অপরের দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা করিবার অশক্তি।

১১। নিজে যাহা করিতে পারি না তাহাই অসম্ভব বলিয়া মনে করা।

১২। আমাদের সীমাবদ্ধ মন যাহা ধারণা করিতে সক্ষম কেবল তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা।

১৩। এরূপ ভাবে জীবন অতিবাহিত করা যেন জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত, কাল ও দিন অনন্তকাল স্থায়ী হইবে।

১৪। গুপ্ত গুণগুলিকে উপেক্ষা করিয়া বাহিরের গুণের হিসাবে লোকের মূল্য নিরূপণ করা।
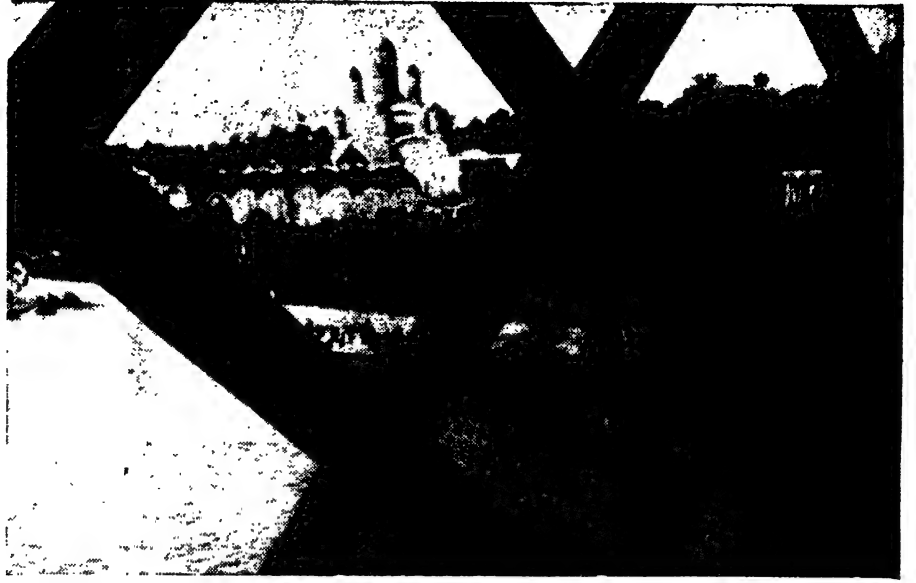
বালী ব্রিজ থেকে দক্ষিণেশ্বর

—অরুণমাধব বসু
(প্রথম পুরস্কার)

কালীঘাট
—অভয়কুমার দাস

দক্ষিণেশ্বর
—বৈদ্যনাথ সেনগুপ্ত

ফটোগ্রাফী
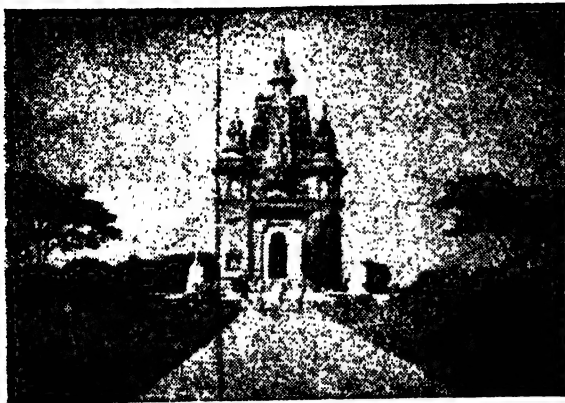
সারনাথ
—ভূপতি ঘোষ
(দ্বিতীয় পুরস্কার)

কোণারক মন্দির —সুধীরকুমার পাল

রাজগীরের মন্দির
।শিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

সারনাথ
-কালীনারায়ণ পাল

ভূবনেশ্বর মন্দির
—কালীদমন মুখোপাধ্যায়
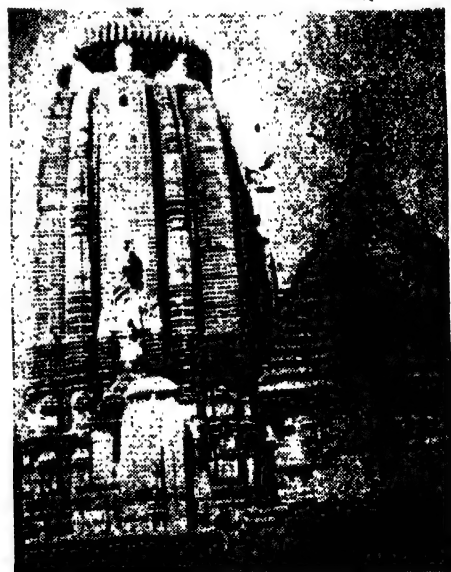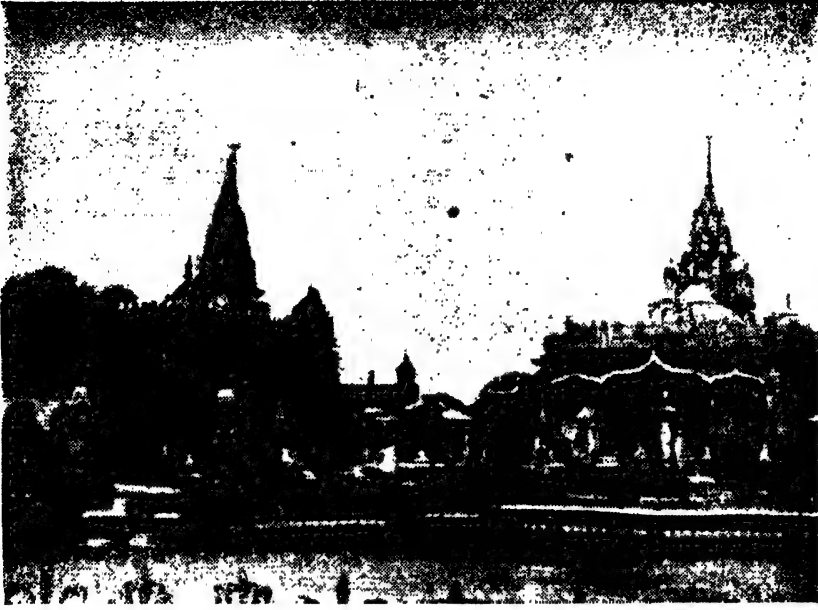
পরেশনাথ মন্দির (কলিকাতা) —অসীমা পাল
(তৃতীয় পুরস্কার)

রুক্মিণী মন্দির (মাহুরা) —উমারাণী ঘোষ

বৈদ্যনাথের মন্দির
—নবকুমার বসু
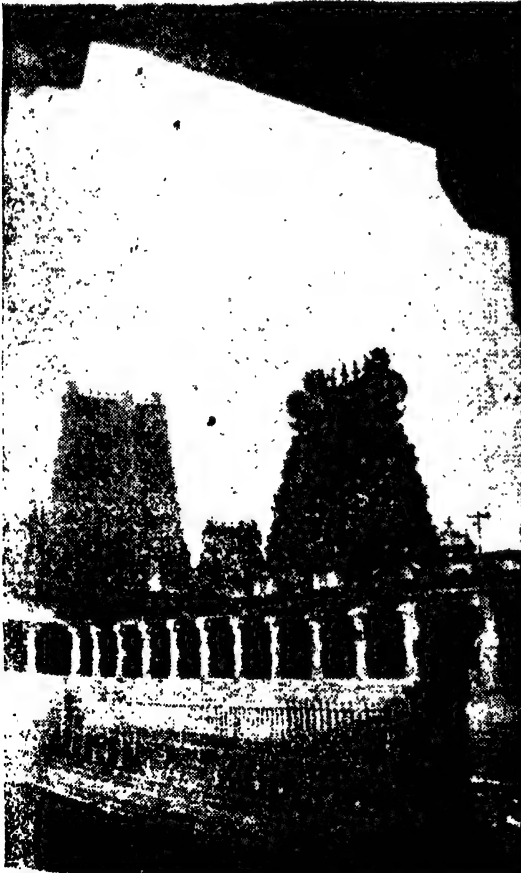
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ষাট

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করছে বিজয়, আবার সেই সঙ্গে চিকিৎসাও করছে। চার দিকে এত রুগী, চুপ করে বসে থাকলে চলে কি করে? যেটুকু জ্ঞান ভাণ্ডারে আছে তা পরিবেশন না করে শান্তি কই?

দর্শনী ঠিক করল আট আনা। কিন্তু শুধু রোগ তো নয়, রোগের সঙ্গে নিষ্ঠুরতম রোগ—দারিদ্র্য। তাই গরিব রুগীদের ওষুধ আর পথ্য জোগাতে গিয়ে দর্শনী অদৃশ্য হয়ে গেল। দর্শনী নেই বটে কিন্তু হতে লাগল অপূর্ব দর্শন।

রাত্রে প্রায়ই স্বপ্ন দেখে বিজয়। দেশনেতা সুরেন বাঁড়ুয্যের বাপ দুর্গাচরণ বাঁড়ুয্যে নামজাদা ডাক্তার। তিনি গত হয়েছেন বটে, কিন্তু স্বপ্নে প্রায়ই দেখা দেন বিজয়কে। কঠিন সব রোগের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে যান। বিজয় তাই বিছানায় কাগজ ও পেন্সিল নিয়ে ঘুমোয়। স্বপ্নে-পাওয়া প্রেসক্রপশান ভোরে উঠেই টুকে রাখে। সে অন্ধকারে-ঢিল-ছোঁড়া ওষুধ নয়, সে একেবারে বিশল্যকরণী।

ডাক্তার হিসেবে বিজয়ের তাই জয়-জয়কার।

শুধু ডাক্তার হিসেবে?

শান্তিপুরের ওপারে গুপ্তিপাড়া। সেখানকার এক রুগী এসেছে বিজয়ের হাতে। সকালে একবার দেখে এসেছে, এখন আবার বিকেলে গিয়ে খোঁজ নেওয়া দরকার। শুধু খোঁজ নেওয়া নয়, নতুন আরেক দফা ওষুধ দিতে হবে। কিন্তু যায় কি করে? বর্ষাকাল, নিদারুণ ঝড়-বৃষ্টি সুরু হয়েছে। খেয়া বন্ধ, পাটনী রাজি নয় নৌকো ছাড়তে। তবে, উপায়? উপায় জগৎপিতা। কাপড়ের পাগড়ি করে ওষুধের শিশি মাথায় বাঁধল বিজয়, বর্ষার ভরা নদী পার হয়ে গেল সাঁতরে।

রুগী চোখ চেয়ে দেখল, দুয়ারে ধন্বন্তরি দাঁড়িয়ে।

সেই দুর্গাচরণই শেষে আরেক দিন স্বপ্ন দেখালেন। বললেন, 'তুমি কি শুধু দেহের চিকিৎসা করেই দিন কাটাবে? অন্তরের চিকিৎসা করবে না? তুমি শুধু আয়ুর্বেদী নও, তুমি ভবরোগবৈদ্য।'

ডাক্তারি ছেড়ে দিল বিজয়। থাকে বন্ধু ব্রজসুন্দর মিত্রের বাড়িতে। তাকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখল তক্ষুনি: 'ভাই, আমার ভিখিরির ঘরে জন্ম, তাই আবার ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে তুলে নিলাম। ব্যবসা করা আমার পোষাল না। তাই তোমার আশ্রম ছেড়ে চললাম আবার নিরুদ্দেশে। ঈশ্বরের পায়ে নিজেকে বহু দিন বেচে দিয়েছি, তাই তিনি আর আমাকে ত্যাগ করতে পারবেন না। ব্রাহ্মধর্মের জয় হোক। আমার শোণিত পোষণ করুক ব্রাহ্মধর্মকে। ব্রাহ্মধর্মই আচরণীয়। প্রচরণীয়।'

শান্তিপুরে নির্জনে এসে বাস করছে বিজয়। শুধু স্থানের নির্জনে নয়, গুহাশয়ী মনের নির্জনে। হঠাৎ এক দিন সেখানে দেখা দিল শ্যামসুন্দর। বিজয় তাকে ত্যাগ করেছে বটে, কিন্তু শ্যামসুন্দর যে ত্যাগীকেও ত্যাগ করে না। ছাড়তে শিখিয়েও যে ধরে থাকে। পথহারা করিয়েও যে পথ দেখায়।

'তোকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এলাম, নিয়ে এলাম মন্দির থেকে মুক্ত প্রাঙ্গণে—' বললে শ্যামসুন্দর: 'আবার তুই এসে সেই ঘরে ঢুকেছিস? ঢুকেছিস সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে? বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় আগল ভেঙে—'

কে শোনে কার কথা! বিজয় ভাবলে ছলনা। নিরংশ জ্ঞানের জগতে ভাবের কুজ্ঝটিকা।

আরেক দিন গভীর রাত্রে ব্রহ্মনাম সাধন করছে বিজয়, মনে হল রুদ্ধ দরজায় কে ঘা মারছে বাইরে থেকে।

ভাবতন্দ্রা ঘুচে গেল বিজয়ের। প্রশ্ন করলে: 'কে?'

কোন উত্তর নেই। শুধু দ্রুত করশব্দ। মনে

হল এক জন নয়, বহু লোকের সমাগম হয়েছে বাইরে।

খুলে দিল দরজা। এক দল জ্যোতির্ময় পুরুষ ঘরে ঢুকল একসঙ্গে। জ্যোতির প্লাবনে ভরে গেল গৃহাঙ্গন।

তাদের মধ্য থেকে এক জন এল এগিয়ে। বললে, 'আমি অদ্বৈত আচার্য। আর চেয়ে দেখ, ইনি মহাপ্রভু, ইনি নিত্যানন্দ, ইনি শ্রীবাস—'

প্রিয়তন্ময়তায় বিহ্বল হয়ে রইল বিজয়।

'তোমার ব্রাহ্মসমাজের কাজ শেষ হয়েছে।' বললে অদ্বৈত আচার্য: 'এবার মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হও। স্নান করে এসো চট করে। মহাপ্রভু দীক্ষা দেবেন তোমাকে। নাম দেবেন।'

কুয়োর ধারে চলে এল বিজয়। নিশীথ রাত্রে স্নান করলে। মহাপ্রভু তাকে দীক্ষা দিয়ে সদলবলে অন্তর্হিত হলেন।

পরদিন সকালে কুয়োতলায় ভিজে কাপড় দেখে যোগমায়া তো অবাক। স্বামীর দিকে জিজ্ঞাসু চোখ তুলতেই বললে সব বিজয়। শুধু স্ত্রীকেই নয়, কেশব সেনকেও বললে চুপিচুপি।

কেশব বললে, 'কাউকে বোলো না আর এ-কথা। কেউ বিশ্বাস করবে না। তোমাকে পাগল বলবে।'

নিজেরই পাগল বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে স্বপ্নজাল। ব্রাহ্মধর্মে তার ভক্তি অচলা কি না তাই পরীক্ষা করবার ভৌতিক ষড়যন্ত্র। কতগুলি প্রেত-লোকবাসী আত্মা এসেছিল হয়তো, তাকে একটু দেখে গেল বাজিয়ে। দেখে গেল মন টলে কি না। খাঁটি কি না সে তার ব্রহ্মৈক্যবাদে।

বিজয় আছে বজ্রবন্ধনে। তার ব্রাহ্মী স্থিতি নিশ্চল স্থিতি। সে টলবার পাত্র নয়।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে কাশীতে এসেছে বিজয়। এসে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে দেখা। শুধু দেখা নয়, সাহচর্য। সঙ্গে-সঙ্গে থাকে আর দেখে তার কাণ্ড-কারখানা। নৈকট্যের তাপ নেয়। নেয় যোগামৃত রসের স্বাদ।

তখনো স্বামীজী অজগরবৃত্তি নেননি, কিন্তু মৌনাবলম্বন করে রয়েছেন। সারা দিন ধরে ঘুরছে-ফিরছে দুজনে, খাওয়া নেই। এক সময় হঠাৎ ইসারায় জিগগেস করলেন স্বামীজী, কিছু খাবে? বিজয় হ্যাঁ করল। অমনি স্বামীজী ইসারা করলেন আরেক জনকে, বিজয়ের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এস। খাবার এসে গেল তক্ষুনি, কিন্তু পাঁচ-সাত জনের খাবার। বিজয় বললে, এত আমি খেতে পারব না। আপনি কিছু খাবেন?

খাব। স্বামীজী হাঁ করলেন। ইসারায় বললেন, মুখের মধ্যে ফেলে দাও।

আস্তে-আস্তে সমস্ত খাবারই নিঃশেষ হবার জোগাড়। গ্রাস আর রুদ্ধ হয় না কিছুতেই।

বিজয় দেখলে, সমূহ বিপদ। তার ভাগে আর থাকে না বুঝি এক মুঠ। তাড়াতাড়ি সে তার ভাগটা সরিয়ে রাখল চালাকি করে। ঠিক চোখে পড়েছে স্বামীজীর। স্বামীজী হাসলেন, লিখে দিলেন মাটিতে —বাচ্চা সাঁচ্চা হ্যায়।

এক দিন এক কালীমন্দিরে নিয়ে গেলেন বিজয়কে। প্রস্রাব করে কালীর গায়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন। বিজয় তো হতভম্ব। জিগগেস করলে, এ কি?

মাটিতে লিখে দিলেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী: 'গঙ্গোদকং।'

'কিন্তু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেবার মানে?'

'পূজা—পূজা করছি।'

'এ পূজার দক্ষিণা কি?'

'দক্ষিণা? দক্ষিণা যমালয়।'

অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে যমালয়।

মন্দিরের পুরোত-পূজারীদের কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করে দিল বিজয়। তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। বললে, 'তা তো ঠিকই। এঁর প্রস্রাব তো গঙ্গোদকই। ইনি যে সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ।'

এক দিন ত্রৈলঙ্গ স্বামী মৌনভঙ্গ করলেন। দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে বললেন, 'আস্নান করো।'

নিজের হাতে ধরে স্নান করালেন বিজয়কে। বললেন, 'তোকে দীক্ষা দেব।'

বিজয় পরিহাস করে উঠল: 'আর রাজ্যে লোক নেই, আপনার কাছ থেকে দীক্ষা! আপনার গঙ্গোদকের যে নমুনা তাতে ভক্তি উড়ে গেছে।' পরে গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমি ব্রহ্মজ্ঞানী। গুরুবাদ মানি না। মাপ করুন, পারব না দীক্ষা নিতে।'

'বাচ্চা সাঁচ্চা হ্যায়'—এবার মুখর হয়ে ঘোষণা করলেন স্বামীজী। পরে বললেন, 'শোন্, তোর গুরু আমি নই—সে আসবে ঠিক সময়ে। আমি শুধু তোর শরীর শুদ্ধ করে দেব। আমার উপরে তাই ভগবানের আদেশ।'

কানে মন্ত্র দিল বিজয়ের। বিজয় ভাবল একাকিনী গঙ্গা দিয়ে বুঝি হবে না। গঙ্গাকে এসে মিশতে হবে যমুনার সঙ্গে। জ্ঞানকে এসে মিলতে হবে ভক্তির নির্মল মুক্তিতে। জ্ঞান আত্মানন্দ, ভক্তি বিশ্বানন্দ। ভগবৎ-তত্ত্বের প্রকাশকারিণী শক্তির নামই ভক্তি। ভক্তই ভগবৎ-অস্তিত্বের প্রমাণ। ভক্তিই বিশ্বাত্মতা।

দেহ-গেহে ভক্তিই প্রীতি-প্রদীপ। ভক্তি ছাড়া সবই অন্ধকার।

লাহোরে এসেছে বিজয়, প্রচারের কাজে। হঠাৎ খবর পেল, তার মা, স্বর্ণময়ী পাগল হয়ে গেছেন। পাগল হয়ে কোন দিকে যে চলে গেছেন কেউ জানে না। •

তক্ষুনি বাড়ি ফিরল বিজয়। কিন্তু কোথায় মা। কে এক জন কাঠুরে বললে, 'বাঘের গায়ে শিয়র দিয়ে ঘুমোচ্ছেন।'

বনগাঁয়ের কাছাকাছি দুর্ভেদ্য বন। মার খোঁজে সেখানেই ঢুকল বিজয়। এমন স্থান নেই যা বিজয়ের কাছে অজেয়।

ঠিকই বলেছে কাঠুরে। বাঘের গায়ে মাথা রেখে মা ঘুমোচ্ছেন। মার বসন নেই, বাঘের নেই হিংসে। মার চোখ বোজা, কিন্তু বাঘ চেয়ে আছে মার দিকে। বশ্যতার তৃপ্তিতে।

লোকজন জড়ো করল বিজয়। বাঘকে তাড়িয়ে মাকে সরিয়ে আনতে হয়। কিন্তু কে এগোয়—কী নিয়ে এগোয়!

গোলমালে তন্দ্রা ভেঙে গেছে স্বর্ণময়ীর।

বাঘকে জিগগেস করছেন, 'বাঘ, তুই কার?'

দুই চোখে ভয়ঙ্কর স্থৈর্য নিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে বাঘ।

'বল্ সত্যি করে, তুই আমার? আমার যদি হোস, আমাকে তবে তোর পিঠে কর দিকিনি?'

নিশ্চল হয়ে বসে রইল বাঘ। একটা শুধু হাই তুলল।

'বুঝেছি, তুই আমার নোস। কি করেই বা আমার হবি? আমি যে উলঙ্গ কালী। আমি তো দশভুজা নই। দশভুজা দুর্গা যদি হতাম, তুই তবে আমায় পিঠে চড়াতিস।'

বাঘ তেমনি প্রশান্ত দৃষ্টি।

'দাঁড়া, তোর জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসি।' বলেই স্বর্ণময়ী বেরুলেন বন থেকে। ছুটলেন নক্ষত্র-গতিতে। চক্ষের পলকে বিজয় তাঁর পায়ে পড়ল।

'কে তুই?' থমকে দাঁড়ালেন স্বর্ণময়ী।

'আমি আপনার দাস।'

'দাস হওয়া কি মুখের কথা? কিন্তু দেখি তোর মুখখানি। কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।'

'আপনি চিনবেন না? বিশ্বভুবনের সমস্ত আপনি চেনেন, আর আমাকে চিনবেন না?'

'কে কাকে চেনে? কিন্তু তোকে কোথায় এর আগে দেখেছি বল্ তো? দেখেছি তো, আবার দেখিনি কেন? কোথায় ছিলি? সেখান থেকে আবার এলি কি করে এখানে?'

মাকে স্নান করাল বিজয়। পরিয়ে দিল নতুন কাপড়। বাড়িতে এনে তুলসী তলায় আসন পাতলে। সে-আসনে মাকে বসিয়ে বললে, 'মা, আহ্নিক করো।'

'আহ্নিক কাকে বলে?' স্বর্ণময়ী যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

'সে কি কথা? আহ্নিক তোমার মনে নেই? আমি বলে দেব?'

মৃদু-মৃদু হাসলেন স্বর্ণময়ী। 'বল্ তো—শুনি।'

কোন বাল্যকালে মন্ত্র দিয়েছিলেন মা, তাই মার কানে উচ্চারণ করল বিজয়। শোনামাত্রই স্বর্ণময়ীর চোখ অশ্রুতে আচ্ছন্ন হয়ে এল। ভক্তির অশ্রু, আনন্দের অশ্রু। বিজয় এখনো তা হলে ভোলেনি। মুক্তির পথে বেরুলেও এখনো তার মাকে মনে আছে। আর, ভক্তিই তো মুক্তির মা।

চিদ্‌বিলাসের সূচনাই ভক্তি। সমাপ্তিই প্রেম। সেই ভক্তির আভাস কি এখনো জাগবে না বিজয়ে?

প্রতিমায় কি শুধু শিলা? মন্ত্রে কি শুধু অক্ষর-যোজনা? শুদ্ধ চেতনার চেয়ে আবেগানুরাগ কি বড় নয়? শুষ্ক একটা বিদ্যমানতার বোধে বুক ভরে কই? সেই বোধের বস্তুতে নিয়তচিত্ত থাকবার জন্যে চাই আতীব্র অনুরাগ। সুখকর অনুসরণ। সেই ঈশ্বর-প্রীতি-প্রার্থনাই ভক্তি। ভক্তিই জাগতিক ক্ষুধানাশক।

না, বিজয় আছে নির্বিশেষ জ্ঞানের স্বরাজ্যে। ঈশ্বরের অগাধবোধে।

তাই তার অসহ্য মনে হল যখন শুনল কেশব সেনকে ব্রাহ্মরা কেউ-কেউ অবতার বলে খাড়া করতে চাইছে। ঈশ্বরজ্ঞানে কেশবের পায়ের ধুলো নিচ্ছে; শুধু তাই নয়—জল দিয়ে পা ধুয়ে দিচ্ছে নিজের

হাতে। এ কী পৌত্তলিক তামসিকতা। খেপে গেল বিজয়। সরাসরি গিয়ে পাকড়াও করল কেশবকে।

'এ সব কি হচ্ছে? তুমি আর-সবাইর পূজো নিচ্ছ?'

'তার আমি কি জানি!' কেশব পাশ কাটাতে চাইল কথাটার। বললে, 'লোকে কি করে না করে তাতে আমার কি যায় আসে! অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার আমার অধিকার কোথায়?'

উত্তর মোটেই মনঃপূত হল না বিজয়ের। লোকে তোমাকে নিয়ে যদৃচ্ছা নাচবে, আর তুমি বলবে কি না স্বাধীনতা! বিজয় লেখনীতে কশাঘাত সুরু করলে। সংবাদপত্রের কালো কালি লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কেশবের দলের লোকেরা বিজয়কে নাস্তিক বলে গাল দিলে। কেউ-কেউ বা মারের ভয় দেখাল। বিজয়ের দল নেই। কোনো বন্ধনে সে বন্দীভূত নয়।

হতশ্রী কোলাহল সুরু হয়ে গেল চার দিকে। কেশবের নিজেরই কেমন খারাপ লাগতে লাগল। আতিশয্যের মাঝে আর দেখতে পেল না ঐশ্বর্য। সর্বত্র অভ্যাসের শুষ্কতা।

কে এক ভক্ত পায়ে ধরে কাঁদছে।

'এখানে কি?' ধমকে উঠল কেশব। 'আমার কাছে কাঁদলে কি হবে? ঈশ্বরের কাছে গিয়ে কাঁদুন।'

'আপনিই তো সেই ঈশ্বরের অবতার।'

'মিথ্যে কথা। আমি এক জন সামান্য মানুষ।'

সামান্য মানুষ? ভক্তের দল চটে গেল। কেশবকে গাল পাড়তে সুরু করলে। বললে, ভণ্ড, মিথ্যেবাদী।

বিজয়ের সঙ্গে হাত মেলাল কেশব। আমরা কেউ কারু নিজের জয় চাই না। শুধু ঈশ্বরের জয় হোক। জয় হোক ব্রাহ্মধর্মের।

কিন্তু সে বারের ঝগড়া বুঝি আর মেটে না।

কেশবের আন্দোলনে ব্রাহ্মবিবাহ আইন পাশ হয়েছে। সে আইনে অন্যূন বয়স ধার্য হয়েছে, ছেলের পক্ষে আঠারো আর মেয়ের পক্ষে চৌদ্দ। বেদী থেকে ঘোষণা করল কেশব, এ বিধি কেবল রাজবিধি নয়, এ ঈশ্বরের বিধি।

কিন্তু ঘটল বিধি-বিড়ম্বনা। কুচবিহারের রাজার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছে কেশব। কিন্তু মেয়ের বয়স চৌদ্দ হয়নি এখনো। তাতে কি! রাজার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবে। আইন লঙ্ঘন হয় হোক, কেশব মানবে না সে-আইন। আবার ঘোষণা করল কেশব, এ বিয়ে ঈশ্বরের আদেশ। ঈশ্বরের আদেশের কাছে আবার আইন কি!

এ হচ্ছে সংকীর্ণ সুবিধাবাদীর ব্যবস্থা। বিজয় খেপে গেল। ফুলের চেয়ে সে মৃদু হোক, সে আবার বজ্রের চেয়েও কঠোর। ক্ষমায় সে পৃথিবীর সমান হোক কিন্তু তেজে সে কালানল।

তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল। শুধু লেখনীতে নয়, বক্তৃতায়। অন্যায় ও অসত্যের প্রতিবাদ না করা পাপ। আর নিজের যা স্খলন বা বিচ্যুতি তা ঈশ্বরের উপর আরোপ করা ঘোরতর দুষ্কৃতি।

তুমুল লড়াই সুরু হল। এ যদি মারে ঢিল ও ছোঁড়ে কাদা। শেষ পর্যন্ত বিজয়ের স্ত্রী যোগমায়াকে ভয় দেখিয়ে চিঠি। বিজয়কে ক্ষান্ত করুন, নইলে বিপদ অনিবার্য।

চিঠি পড়ে হাসল বিজয়। বললে, 'কেশব কি আমার সৃষ্টিকর্তা না পালনকর্তা যে ও আমাকে বিপদে ফেলবে? আসুক বিপদ, তবু সত্যের অপমান আমি সইতে পারব না।'

মেয়ের বিয়ে শেষ পর্যন্ত হিন্দুমতেই দিতে হল কেশবকে। আহত ভুজঙ্গের মত সে ফুঁসতে লাগল। 'নববিধান' নাম দিয়ে সে নতুন ব্রাহ্মসমাজ চালু করলে। বিজয়ের দলে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু আর দুর্গামোহন দাশ। তারা স্থাপন করলে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।'

অসাধারণ ঝগড়া। আকাশ রইল আকাশের মনে, ঘট নিয়ে মারামারি।

কিন্তু কেশব যখন একবার রামকৃষ্ণের দেখা পেল তখন আর আবার ঝগড়া কি! কিসের বিবাদ-বচসা, কিসের মতভেদ! মনের মালিন্য মুছে গেল এক মুহূর্তে, বইতে লাগল প্রসন্নতার মুক্তবায়ু। চোখের সামনে জ্বলছে মূর্তিমান ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি! এ আগুনের কাছে আবার শত্রু-মিত্র কি, মান-অপমান কি, নিন্দা-স্তুতি কি! শুধু নির্গলিত আনন্দ। অমৃতায়িত নির্মলতা।

এ আর কেউ নয়—জাজ্বল্যদর্শন রামকৃষ্ণ। সর্বকামদ কল্পতরু। অহেতুকদয়ানিধি।

এর খবর কি কেউ না দিয়ে থাকতে পারে?

বিজয় গুরুর সন্ধানে বনে-বনে ঘুরছে। সে একবার দেখে যাক রামকৃষ্ণকে।

তাই কেশব লিখে পাঠাল: বন্ধু, একবারটি দেখবে এস। এমনটি তুমি আর দেখনি।

বিজয় ছুটে এল খবর পেয়ে। এসে কী দেখল?

কি দেখল কে জানে! রামকৃষ্ণের দুই পা বুকের মধ্যে চেপে ধরল। স্পর্শাতীতের জগতের স্পর্শমণিকে খুঁজে পেয়েছে।

দেখল, সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর বসে আছে। সমস্ত প্রশ্নের সমাধান। সমস্ত তর্কের নিষ্পত্তি। সমস্ত জটিলতার মীমাংসা। সমস্ত যাত্রার উত্তরণ।

নরপূজার বিরুদ্ধে এক দিন প্রতিবাদ করেছিল বিজয়। কিন্তু, এখন এ সব কী হচ্ছে?

নর কোথায়? এ যে নরাকারে নিরাকার!

পরমেশ্বর ইচ্ছাবশে মায়াময় রূপ ধরে অবতীর্ণ হয়েছেন সংসারে।

অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সম্রাট হয়েও আছেন হৃদয়েশ্বর হয়ে। খেলার সাথী হয়ে, বিশ্রম্ভের সখা হয়ে। স্নেহে মাতা পালনে পিতা হয়ে। দশদিগন্ত-ব্যাপী প্রেমের মহাসমুদ্র হয়ে।

বিজয়ের কণ্ঠে শুধু সেই শ্রবণলোভন আকুতি, 'হে শ্রীহরি—'

একত্রিশ

শুধু বিজয়কে নয়, আরো অনেককেই কেশব ডেকে নিয়ে গেল একে-একে।

কেশব শুধু নিমিত্ত। যিনি অন্তরে বসে ডাক দেবার তিনিই ডাক দিলেন।

এগারো নম্বর মধু রায় লেনে থাকে রামচন্দ্র দত্ত—সে গেল সকলের আগে। ক্যাম্বেল মেডিকেল ইস্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়েছে—ঘোরতর নাস্তিক। নাস্তিক হলেও রামকৃষ্ণের প্রতি অশ্রদ্ধাবান নয়। যখন কেশব বললে, যীশুখৃষ্টের মত রামকৃষ্ণেরও 'ট্রান্স' হয়, তখন রামদত্ত ভাবল, মিরগি রোগ নিশ্চয়ই।

'না হে, হাত-পা খেঁচাখেঁচি করে না। ধীর-স্থির শান্ত হয়ে থাকে। আপনা-আপনি ভালো হয়। ডাক্তার লাগে না কখনো।'

কি জানি বা! এমনতরো কই পড়িনি বইয়ে।

প্রগতিবাদী ছেলে-ছোকরারা ব্যঙ্গ করে পরমহংসকে। বলে, Great Goose—গ্রেট গূস। *

পানিহাটিতে বৈষ্ণবদের উৎসব হচ্ছে। যাকে বলে হরিনামের হাটবাজার। ভক্তদের নিয়ে ঠাকুর যাচ্ছেন সে উৎসবে। ভক্তদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ দুইই আছে। চার চারটে পানসি ভাড়া করা হয়েছে।

শ্রীমা যাবেন কি না—এক জন স্ত্রী-ভক্ত এসে জিগগেস করলে ঠাকুরকে।

'তোমরা তো সবাই যাচ্ছ—' বললেন ঠাকুর, 'ওর যদি ইচ্ছা হয় তো চলুক—'

ইচ্ছা হয় তো চলুক—নিশ্চয়ই মন খুলে মত দিচ্ছেন না। প্রচ্ছন্ন সুরটি ঠিক ধরতে পেরেছেন শ্রীমা। যদি মন খুলে সম্মতি দিতেন, তা হলে প্রফুল্ল স্বরে বলে উঠতেন, হ্যাঁ, যাবে বৈ কি। তার বদলে, ইচ্ছা হয় তো চলুক। একটু যেন কুণ্ঠার কুয়াসা আছে কোথাও।

শ্রীমা গেলেন না। বললেন, 'অত ভিড়ে আমি যাব না। তোমরা যাও।'

উৎসবশেষে ঠাকুর ফিরেছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বলছেন, 'সাধে কি আর ও যায়নি? ও মহা-বুদ্ধিমতী। ওর নাম সারদা।'

স্ত্রী-ভক্তরা ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল উৎসুক হয়ে।

'ওখানে আমার ভাবসমাধি হচ্ছিল, তাই দেখে কেউ-কেউ রঙ্গ করছিল আমাকে নিয়ে।' ঠাকুর বললেন ক্ষমাময় স্নিগ্ধ হাস্যে: 'ওকে সঙ্গে দেখলে নিশ্চয়ই বলত ঠাট্টা করে—হংস-হংসী এসেছে।'

তুমি যদি মানসসরোবর, আমরা মানসযাত্রী হংস। আমাদের সমস্ত প্রাণ তোমার দিকে উড়ে চলুক পাখা মেলে। দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে আমাদের সমাপ্তি নেই, আমরা তাই যাত্রা করেছি তোমার দিকে। পরিপূর্ণের দিকে। অপর্যাপ্তের দিকে।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের সহকারী রসায়ন-পরীক্ষক হয়েছে রামদত্ত। কুরচি গাছের ছাল থেকে রক্তামাশায়ের ওষুধ বের করেছে। বিজ্ঞানের আওতায় এসে নাস্তিকতার নেশায় পেয়েছে। ঈশ্বর আছেন তার প্রমাণ কি? তাঁকে কি দেখা যায়?

ব্রাহ্মসমাজে ঘোরে রামদত্ত। তারা তো ঈশ্বরকে

---

* শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান

নিরাকার বলেই কাজ সেরেছে। দেখবার আর দায় রাখেনি।

পর-পর এক মেয়ে আর দুই ভাগ্নী মারা গেল কলেরায়। বিজ্ঞানে কুলোল না। ডাক্তারি ডাক্তারকে উপহাস করলে। অস্থির হয়ে পড়ল রামদত্ত। দগ্ধ মনে শান্তির ওষুধ দেবে এখন কোন ডাক্তার?

হঠাৎ এক দিন দক্ষিণেশ্বরের দিকে রওনা হল। সঙ্গে দুই মিত্তির—মনোমোহন আর গোপালচন্দ্র। দেখি রামকৃষ্ণ কি বলে।

গিয়ে দেখে, দরজা বন্ধ। ভিতরে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কি বলে তাঁকে ডাকে। দ্বিধা করতে লাগল রামদত্ত। রামকৃষ্ণ মনের কথা টের পেয়েছে। অমনি খুলে দিল দরজা। 'নারায়ণ' বলে নমস্কার করলে।

আমাদের মনের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে নারায়ণ। জেনে-শুনেও খুলি না দরজা। অর্গল এঁটে মনের অন্ধকারে বসে কাঁদি।

'বোসো।'

বসল তিন জন। রামদত্তের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রামকৃষ্ণ। বললে, 'হ্যাঁ গা, তুমি না কি ডাক্তার। আমার হাতটা একবার দেখ না।'

রামদত্ত তো অবাক। কি করে জানলে?

এক মুহূর্তে ফুটে উঠল অন্তরঙ্গতার আবহাওয়া। একে যেন সব কিছু বলা যায়, এ একেবারে ঘরের মানুষ।

জিগগেস করল রামচন্দ্র: 'ঈশ্বর কি আছেন?'

'দিনের বেলায় তো একটি তারাও দেখা যায় না। তাই বলে কি বলবে তারা নেই?' বললে রামকৃষ্ণ। 'দুধে মাখন আছে কিন্তু দুধ দেখলে কি তা ঠাহর হয়? যদি মাখন দেখতে চাও, দুধকে আগে দধি করো। তার পর সূর্যোদয়ের আগে মন্থন করো সে দধিকে। তখন দেখতে পাবে মাখন।'

'কিন্তু কি করে তাঁকে দেখা যায়?'

'বড় পুষ্করিণীতে মাছ ধরতে চাইলে কি করো? আগে খোজ নাও। যারা সে পুকুরে মাছ ধরেছে তাদের থেকে খোঁজ নাও। কি মাছ আছে, কি টোপ খায়, কি চার লাগে। শেষে সেই পরামর্শানুসারে কাজ করো। ধরো সেই মনোনীত মাছ।' একটু থামল রামকৃষ্ণ। বললে, 'কিন্তু ছিপ ফেলামাত্রই কি মাছ ধরা পড়ে? স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে হয়। তবেই আস্তে-আস্তে 'ঘাই' আর 'ফুট' দেখা যায়। তখন বিশ্বাস হয়, পুকুরে মাছ আছে—আর বসে থাকতে-থাকতে আমিও এক দিন ধরে ফেলব।'

ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাই। গুরুর কাছে তত্ত্ব করো। ভক্তি-চার ফেল। মনকে ছিপ করো। প্রাণকে কাঁটা। নামকে টোপ। তার পরে টোপ ফেল সরোবরে। ঈশ্বরের ভাব-রূপ 'ফুট' আর 'ঘাই' জানান দেবে। বসে থাকো তন্নিষ্ঠ হয়ে। টোপ গিলবে মাছ। খেলিয়ে খেলিয়ে ডাঙায়, মানে সংসারে তুলে নিয়ে আসবে। সাক্ষাৎকার হবে।

তার পর?

তার পর আর কি। সেই মাছ তখন ঝালে খাও ঝোলে খাও ভাজায় খাও অম্বলে খাও।

শান্তি পেল রামদত্ত। শোকে অস্থির হয়ে কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছিল, আবার ধীর-স্থির হয়ে কাজ করতে লাগল। ঈশ্বর যদি আছেন তবে সুরাহা এক দিন একটা হবেই। সমস্ত কাটাকুটি ও যোগ-বিয়োগের পর হিসেব এক দিন মিলবেই। মন খাঁটি করে রইল।

কুলগুরুর কাছে দীক্ষা না নিয়ে রামকৃষ্ণের থেকে দীক্ষা নিল রামদত্ত। রামদত্ত বৈষ্ণব, দীক্ষাদাতা শাক্ত। পাড়ায় ঢি-ঢি পড়ে গেল। 'রাম ডাক্তারের গুরু জুটেছে হে। ঐ যে দক্ষিণেশ্বরে থাকে—কৈবর্তদের পূজুরী। কেলেঙ্কারি করলে মাইরি—'

সবাই চটল। চটল কিন্তু পিছিয়ে গেল। পিছন থেকে চিপটেন কাটতে লাগল। এগিয়ে এল পাড়ার সুরেশ মিত্তির, আসল নাম সুরেন মিত্তির। দুর্ধর্ষ শাক্ত। কেশব সেন যখন বিডন স্কোয়ারে ব্রাহ্মধর্মের বক্তৃতা দেয়, তখন তার খোলের চামড়া কেটে দিয়েছিল ছুরি দিয়ে।

'ওহে রাম, তোমার গুরুর কাছে একবার নিয়ে চল।' বললে সুরেশ। 'কেমন হংস একবার দেখে আসি।'

রামদত্ত হাসল। বললে, 'চল।'

'কিন্তু এক কথা। তোমার হংস যদি মনে শান্তি দিতে না পারে তবে তার কান মলে দিয়ে আসব।'

সে যুগে "কান মলে দেব" কথাটার বড় বেশি চল। অন্যের কানটা যেন হাতের কাছেই আছে এমনি একটা আত্মদৃপ্ত উদ্ধত ভাব সকলের।

সিমলে ষ্ট্রীটে থাকে। সদাগরি অফিসের মুৎসুদ্দি। বুদ্ধিতে পাটোয়ার। আর মদে টুপভুজঙ্গ।

গেল রামদত্তের সঙ্গে। দেখল ভক্ত পরিবৃত হয়ে ভাবে বিভোর হয়ে বসে আছে রামকৃষ্ণ।

রামদত্ত প্রণাম করল। এক পাশে সুরেশ বসল

নির্লিপ্ত হয়ে। ভাবখানা এই, কান মলে যে দিইনি এই যথেষ্ট।

বাঁদরের বাচ্চা না বেড়ালের বাচ্চা—এই গল্পটাই তখন বলছিল রামকৃষ্ণ।

'বাঁদরের বাচ্চা জোর করে মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মা ব্যাজার হয়ে ফেলে দেয়, পড়ে গিয়ে কিচমিচ করে। কিন্তু মা-অন্ত প্রাণ বেড়ালছানা মা-ও মা-ও, কি না মা-মা বলে ডাকে। মা যেখানে রাখে সেখানেই সুখে থাকে। ছাইয়ের গাদাই হোক বা গদি-বিছানায়ই হোক। একেই বলে নির্ভরের ভাব—'

অমৃতময় কথা। সুরেশের সমস্ত জিজ্ঞাসার নিরসন হয়ে গেল। ভক্তিভরে প্রণাম করল রামকৃষ্ণকে।

রামকৃষ্ণ বললে, 'কালী ভজনা কর যখন, মার উপর নির্ভর রাখ ষোল আনা। তবে মাঝে-মাঝে এসো এখানকে, ভগবৎ-ভাবের উদ্দীপনা হবে।'

'ভাই, কান মলতে গিয়েছিলাম, কান মলা খেয়ে এলাম।' রামদত্তের কানে-কানে বললে সুরেশ।

নরেন্দ্রনাথেরও সেই কথা।

নরেন্দ্রনাথ আরো দুর্বর্ষ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় ধ্রুপদ গায়। হার্বার্ট স্পেনসার, ষ্টুয়ার্ট মিল পড়ে। গলার জোরে গায়ের জোরে তর্ক করে। পাদরিদেরও ছাড়ে না। তেড়েফুঁড়ে কথা কয়। কথার দাপটে ভূত ভাগায়

তাকে এক দিন ধরলে রামদত্ত।

'বিলে, শোন্—'

নরেন দাঁড়াল।

'দক্ষিণেশ্বরে এক পরমহংস আছেন দেখতে যাবি?'

'সেটা তো মুখখু—' এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিল নরেন। বললে, 'কী তার আছে যে শুনতে যাব? মিল স্পেনসার লকি-হ্যামিলটন এত পড়লুম, কোনো কিনারা হল না। ঐ একটা কৈবর্তের বামুন, কালীর পুজুরী—ও কি জানে?'

'একবার গিয়ে কথা বলেই দেখ না—'

কি ভাবল নরেন। বললে, 'বেশ, যদি রসগোল্লা খাওয়াতে পারে তো ভালো, নইলে কান মলে দেব বলছি।'

স্যার কৈলাস বসুও চেয়েছিলেন ঠাকুরের কান মলতে। রামদত্তকে বললেন, 'তুমি বলছ, তাই যাচ্ছি একবার তোমার পরমহংসকে দেখতে। যদি ভালো লোক হয়তো ভালো, নইলে তার কান মলে দেব বলে রাখছি।'

ঠাকুর তখন কাশীপুরের বাগানে, অসুস্থ। উপরে আছেন। নিচে বসে অপেক্ষা করছে কৈলাস। নিচের ঘরের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছে এই ভাবে: 'আরে, গিয়ে দেখলুম নরেনটা বি-এ পাশ করে একেবারে বকে গেছে। নিচেকার হল-ঘরের কতগুলো ছোঁড়া নিয়ে এলোমেলো ভাবে বসে আছে আর রামের বাড়ির সেই চাকর-ছোঁড়া লাটু—সেটাও বসে আছে ওদের সঙ্গে। আরে ছ্যা!'

উপর থেকে কে এক জন চলে এল নিচে। বললে, 'ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, যে বাবুটি আমার কান মলে দেবেন বলেছেন তাঁকে ওপরে নিয়ে এস। তাই নিতে এসেছি। তিনি কে, কোনটি?'

কৈলাস তো স্তম্ভিত। সিমলেতে ঘরের মধ্যে বসে রামের সঙ্গে কি কথা কয়েছি কাশীপুরের বাগানে সে-কথা এল কি করে এখুনি?

স্খলিত পায়ে উঠে গেল কৈলাস। অচ্যুত-পায়ে প্রণাম করলে। মানলে গুরু বলে, দিগদর্শক বলে।

কিন্তু গিরিশ ঘোষ আরেক কাঠি সরেশ।

তার থিয়েটারে গিয়েছেন ঠাকুর, মাতাল হয়ে তাঁকে বাপান্ত গালাগাল করলে গিরিশ। নেপথ্যে নয়, মুখের উপর। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে তাই বলছেন ঠাকুর: 'শুনেছ গা। গিরিশ ঘোষ দেড়খানা লুচি খাইয়ে আমায় যা না তাই বলে গালাগাল দিয়েছে।'

'ওটা পাষণ্ড। ওর কাছে আপনি যান কেন?'

যাই কেন। যাই বলে এই ব্যবহার। রামদত্তের কাছে নালিশ করলেন ঠাকুর।

কেন, বেশ তো করেছে। ঠিকই করেছে। গিরিশকে সমর্থন করল রামদত্ত।

'শোন, শোন, রাম কি বলে শোন। সে আমার মাতৃপিতৃ উচ্চারণ করল, আর রাম বলে কি না—'

'ঠিকই বলি। কালীয় দমনকে শ্রীকৃষ্ণ তাড়া করলেন, কি জন্যে তুমি বিষ উদ্গীরণ কর? কালীয় দমন কি বললে? বললে, ঠাকুর, তুমি আমাকে বিষ দিয়েছ, সুধা উদ্গীরণ করব কি করে? গিরিশ ঘোষকে আপনি যা দিয়েছেন তাই দিয়ে সে আপনার পূজা করছে।'

হাসলেন ঠাকুর। বললেন, 'যাই হোক, আর কি তার বাড়িতে যাওয়া ভালো হবে?'

'কখনোই না।' অনেকে বলে উঠল একসঙ্গে।

'রাম, গাড়ি আনতে বলো।' উঠে পড়লেন ঠাকুর। 'চলো তার বাড়ি যাই।'

সকলে তো লুপ্তবাক।

তুমিও চলো, রাম। তুইও চল, নরেন।

পতিতপাবন চললেন জীবোদ্ধারে। [ক্রমশঃ।

যাযাবর

আখ্যান

বীরেশ্বর এসে বললেন, "মিসেস সেন, আমি একটু আমার বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।"

মলী সেন বললেন, "অভিনয় সুরু হতে আর আধ ঘণ্টাও বাকী নেই। এখন বাড়ি যাচ্ছেন কী রকম?"

"অভিনয়ে আমার যা কাজ তা সবই শেষ হয়েছে।"

"শুধু সিন, সিনারি আঁকা শেষ হলেই আর্ট ডিরেক্টারের কাজ ফুরোয়, ভেবেছেন বুঝি?"

"সেগুলি যাতে ঠিক মতো যথাসময়ে ব্যবহার হয়, তার ব্যবস্থাও করেছি। প্রথম দৃশ্যের জন্য ষ্টেজ সেট করাই আছে। পরের ছুটো দৃশ্যের সাজসরঞ্জামও জড়ো করা হয়েছে। এখন যবনিকা তুললেই হয়।"

মলী সেন মাথা নেড়ে বললেন, "না, হয় না। আপনি নিজে সর্ব্বক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে না থাকলে দেখবেন কোনো কিছুই নির্ভুল হবে না।"

এ বিষয়ে অবশ্য বীরেশ্বরের মনেও কিছুটা আশঙ্কা ছিল। যদিও তিনি সহকর্ম্মীদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন, তবুও তাঁর ভয়, হয়তো পটোত্তোলনের পরে দেখা যাবে কুঞ্জবনের দৃশ্যে রাজপথের চিত্র, অথবা রাজসভার দৃশ্যে জলের প্রস্রবণ। বললেন, "আমি সেই কাল বিকেল থেকে এখানেই আছি। এখন একবার বাড়ি না গেলে—"

"আপনার স্ত্রী ভাববেন যে, হয় হারিয়ে গেছেন, নয়তো ছেলেধরায় ধরেছে।" কৌতুকমিশ্রিত কণ্ঠে মন্তব্য করলেন মলী সেন।

বীরেশ্বর হেসে বললেন, "না, তা ঠিক নয়। তবে স্ত্রীর কারণেই বাড়ি যেতে হচ্ছে সেটা ঠিক।"

"ব্যাপার কী?"

"তাঁকে অভিনয় দেখতে নিয়ে আসতে যাচ্ছি।"

"সেজন্যে আপনার যাওয়ার প্রয়োজন কী? আমি এক্ষুনি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"না, গাড়ি পাঠালে হবে না। আমিই যাব।"

"কেন, বলুন তো?

একটু ইতস্ততঃ করে বীরেশ্বর বললেন, "সুবালা, মানে আমার স্ত্রী, একটু—ইয়ে—যাকে বলে রিজার্ভ। আমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে না আসলে, হয়তো আসবেনই না।"

মলী সেন জানেন, মঞ্চসজ্জার সমুদয় আয়োজন একেবারে ত্রুটিলেশহীন না হওয়া পর্য্যন্ত বীরেশ্বরের ক্ষান্তি নেই। তাঁর দিক থেকে অভিনয়ের সমুদয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না করে তিনি ষ্টেজ থেকে একদণ্ডও অন্যত্র যাবেন না। সুতরাং কিছুক্ষণের জন্য বীরেশ্বরের অনুপস্থিতিতে মলী সেনের বিশেষ আপত্তি ছিল না। তিনি বীরেশ্বরের অনুরোধে সম্মত হতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বীরেশ্বরের স্ত্রীর উল্লেখ মাত্রই মলী সেনের মত পরিবর্ত্তন ঘটল।

সুবালাকে তিনি কখনও দেখেননি। তাঁর সম্পর্কে কিছু জানেনও না। তবুও মলী সেনের মনে হলো, এই অজ্ঞাত, অপরিচিত মহিলাটি অন্তরালে থেকে অভ্রভেদী ঔদ্ধত্যে তাঁকে যেন দ্বন্দ্বে আহ্বান করেছে। বীরেশ্বরের গতিবিধি নিয়েই যেন দু'পক্ষের ক্ষমতার পরীক্ষা। বীরেশ্বরকে এই দণ্ডে বাড়ি যাওয়া থেকে নিবৃত্ত না করতে পারলেই যেন এই টেষ্টে মলী সেনের ইনিংস ডিফিট। তিনি শক্ত হয়ে বললেন, "কিন্তু এখন তো আপনার এখান থেকে নড়া সম্ভব নয়, বীরেশ্বর বাবু।"

"আমার বেশী বিলম্ব হবে না। আমি ট্যাক্সি নিয়ে যাচ্ছি। খুব সম্ভব অভিনয় সুরু হওয়ার আগেই ফিরে আসতে পারব।"

"আমি জানি, পারবেন না। কিন্তু আপনি যখন মন স্থিরই করে ফেলেছেন তখন আর এ নিয়ে তর্ক করে কী ফল?"

বীরেশ্বর সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, "একান্ত প্রয়োজন না হলে আমি কখনও, আপনি বিশ্বাস করুন…"

বিরস কণ্ঠে বললেন মলী সেন, "বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা এর মধ্যে কী আছে, বীরেশ্বর বাবু? আর এত অনুরোধ উপরোধেরই বা প্রয়োজন কী? আমি স্কুলের হেডমাষ্টারও নই, এখানে কেউ আমার মাইনে করা কর্ম্মচারীও নয় যে, আমার অনুমতি না নিয়ে তারা কোথাও যেতে পারবে না। এই সাহায্য-রজনীর উদ্যোগ করেছি আমি। নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত ও দর্শকদের কাছে ভালো-মন্দ জবাবদিহির দায়ও

আমারই। আপনারা দয়া করে আমাকে সাহায্য যতটুকু করেছেন, সে আপনাদের মহত্ব। তার চেয়ে বেশী প্রত্যাশা করাটাই ভুল।"

স্পষ্টই বোঝা গেল, মলী সেন অত্যন্ত ক্ষুন্ন হয়েছেন। আশ্চর্য্য কী? বেচারী আজ মাসখানেক ধরে এই অভিনয়ের জন্য কী কঠোর পরিশ্রমটাই না করেছে। কোন কারণে অভিনয় যদি শেষ পর্য্যন্ত সার্থক না হয়, তবে সমস্ত ব্যর্থতার লজ্জা তো তাঁরই। মঞ্চসজ্জা নিয়ে তাঁর এই উৎকণ্ঠা তো স্বাভাবিক। বীরেশ্বর হৃদয়ঙ্গম করলেন। অনুতপ্ত হয়ে বললেন, "আমার অন্যায় হয়েছে, মিসেস সেন। অভিনয় শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ষ্টেজ থেকে আমি নড়ছি না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, অন্ততঃ মঞ্চসজ্জার দিক থেকে অভিনয়ে খুঁত থাকতে দেবো না।"

ব্যস্। আউট। একটি ইন্‌সুইঙ্গারে সুবালার লেগষ্ট্যাম্প উড়িয়ে দিয়েছেন মলী সেন।

খুশি হলেন। কিন্তু মনোভাব সম্পূর্ণ গোপন করে কিছুটা উদ্বেগের ভঙ্গিতে বললেন, "কিন্তু আপনার স্ত্রী যদি আপনি না গেলে সত্যি না আসেন, তবে তো..."

"আমি একবার তাঁকে টেলীফোন করার চেষ্টা দেখিগে।"

প্রস্থানরত বীরেশ্বরের পানে তাকিয়ে সদ্য জয়লাভের আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠলেন মলী সেন। মৃদুকণ্ঠে একটা গানের কলি গুন্‌গুন্ করতে করতে পুনরায় প্রসাধন সুরু করলেন। গভীর আত্মপ্রসাদের সঙ্গে মনে মনে বললেন, "যে কোন পুরুষ মানুষকে দিয়ে যা ইচ্ছে করাতে পারি আমি। হ্যাঁ, যা ইচ্ছে তাই। তর্জ্জনী সঙ্কেতে যদৃচ্ছা চালনা করতে পারি তাকে।" ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় আপনার অপরূপ দেহলাবণ্যের দিকে তাকিয়ে সগর্ব্বে ভাবলেন, তিনিই সেই অনন্যা নারী, রূপকথার রাজপুত্রেরা যাঁর কমল নয়নের প্রসাদ যাচ্ঞা করে অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন করেছে দুঃসাধ্য সাধনে। বেদ পুরাণের যোগীঋষিরা যুগযুগান্ত ধরে অর্জ্জিত তপস্যার ফল নিমেষে ডালি দিয়েছে যাঁর চরণে। নগণ্য সুবালা! তাঁর জন্য অবজ্ঞামিশ্রিত কারুণ্য বোধ করলেন মলী সেন।

আগন্তুকের ছায়া পড়ল সামনের দর্পণে। মলী সেন পিছনে তাকিয়ে দেখলেন সত্যসিন্ধু। অপ্রত্যাশিত। কিন্তু অনাকাঙ্খিত নয়। মন খুশিতে ভরা ছিল, তারই প্রকাশ ঘটল অভ্যর্থনায়। স্নিগ্ধ হাস্যে সুরের রেশ টেনে বললেন, "কেন এলে মোর ঘরে আগে নাহি বলিয়া?"

সত্য জবাব দিলেন, "ত্রুটি স্বীকার করছি। কিন্তু শঙ্কিত হয়ো না। প্রণয় নিবেদন করতে আসিনি।"

আনন্দের যে জাল বুনেছিলেন মলী সেন এতক্ষণ নিজের মনে মনে, মুহূর্ত্তে সে খান্‌খান্ হয়ে ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে গেল।

আহত কণ্ঠে বললেন, "তা জানি। কিন্তু যদি আসতেই, তাতেই বা এমন অগৌরব ছিল কী? রমণীর মন, সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন। সঞ্চয়িতাখানা আনতে বলবো কী?"

"থাক্, দরকার হবে না। স্মৃতিশক্তি সমস্তটাই এখনও লোপ পায়নি। কিন্তু আমি তো উত্তরায়ণ বা শ্যামলীতে বসে পঁচিশ ভল্যুম রচনাবলী লিখতে পারিনে। আমি সাধারণ মানুষ। জীবনদেবতার চাইতে জীবনসঙ্গিনীর প্রতি আমার বেশী লোভ, ভূমার চাইতে ভূমিকে আমি অধিকতর সত্য মনে করি। তাই তোমার এ্যাডমায়ারার-প্লেটে "অলসো র্যান"-এর সংখ্যা বাড়াতে আমার প্রবৃত্তি নেই।"

ম্লান হেসে মলী সেন বললেন, "কোনো কিছুই একেবারে ষোল আনা স্বত্বে না পেলে তোমার মন ওঠে না। মনোভাবের দিক দিয়ে তুমি হচ্ছ এক জন ঝানু ক্যাপিট্যালিষ্ট। হেনরী ফোর্ড বা জি. ডি. বিড়লার সগোত্র। আর যাই হোক সিন্ধু, তুমি আধুনিক নও।" কথার শেষের দিকে তাঁর গলার স্বর কৌতুকে লঘু চপল হয়ে উঠল।

অনুরূপ পরিহাসতরল কণ্ঠে সত্য জবাব দিলেন, "সানন্দে স্বীকার করছি, আমি অনাধুনিক। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রাইভেট ওনারশিপই আমার পছন্দ। হৃদয়াবেগের ন্যাশন্যালাইজেশানে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু এসব বৃহৎ তত্ত্বকথার আলোচনা আপাততঃ থাক। আমি একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। না, ঘড়ির দিকে তাকাতে হবে না। আমি কয়েক মিনিটের বেশী সময় নেব না। শুধু কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব।"

মলী সেন জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁর পানে তাকালেন।

সত্য এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করে বললেন, "বিষয়টা

আমার পক্ষে একটু সঙ্কোচের, ইংরেজীতে যাকে বলে এম্বেরাসিং। হয়তো তোমার মনে হবে, ওসমান-জগৎসিংহের দ্বিতীয় সংস্করণ। শুনে তুমি যদি অনধিকারচর্চ্চা বলে থামিয়ে দিতে চাও, তা'হলেও আমি অভিযোগ করব না।"

"ভূমিকা তো হলো। এবার বল।" বললেন, মলী সেন।

"প্রশ্নটা মিষ্টার ব্যানার্জ্জী—শচীন—সম্পর্কে।"

মলী সেন দৃষ্টি নত করে বললেন, "কী জানতে চাও ?"

ঠিক সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সত্য বললেন, "সাধারণতঃ অন্য লোকের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো আমার স্বভাব নয়। চরকা নিজের থাকলে তাতেও তেল দিতুম কিনা সন্দেহ, পরেরটা তো দূরের কথা। কিন্তু শচীনের ব্যাপারটার দিকে চোখ বুজে থাকতে পারছিনে। তাঁর মা আমার দূর সম্পর্কে বোন। তাঁকে তুমি কখনও দেখেছো ?"

"না। তবে তাঁকে আজ আমাদের অভিনয় দেখার নিমন্ত্রণ করেছি। হয়তো আসবেন।"

"খুব সম্ভব আসবেন না। সংসারে এসব আনন্দ উৎসবের আসরে কখনও কোথাও তাঁকে দেখেছি, স্মরণ হয় না। শচীন তোমাকে তাঁর কথা কী বলেছে ?"

"বিশেষ কিছু নয়। শুধু এই যে ভগবানে তাঁর অগাধ বিশ্বাস, আর ছেলের উপরে অসীম স্নেহ।

"পুত্রস্নেহ কোন মায়ের কম ? কিন্তু এই মহিলা যেন অন্য সকল মায়ের চাইতেও বেশী মা। জীবনে বহু দুঃখ পেয়েছেন তিনি। সে জন্যেই আমার ভয়।"

"কিসের ভয় ?"

"বিধবা বুঝি বা তাঁর সর্ব্বশেষ আশা ও অবলম্বন একমাত্র ছেলের দিক থেকেও ঘা খান।"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করে মলী সেন বললেন, "অর্থাৎ সাদা কথায়, ভয় আমাকে ?"

সত্য সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "নিজের অজ্ঞাতেও আমরা অনেক সময়ে অপরের দুঃখের কারণ হই। অনিচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধনের দৃষ্টান্তও পৃথিবীতে কম নেই। সেবার আমাদের পাড়ায় দেয়ালীর রাত্রে দূরবর্ত্তী এক ছাদ থেকে জ্বলন্ত বাজির একটা স্ফুলিঙ্গ ছিটকে এসে একটা বড় বস্তিকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পুড়িয়া ছাই করে দিল। কত দরিদ্র হলো গৃহহীন, কত দুঃস্থ হলো সর্বস্বান্ত। অথচ যারা বাজি পোড়াচ্ছিল তাদের মনে তো কোন দুরভিসন্ধি ছিল না।"

মলী সেন বললেন, "সিন্ধু, তুমি যা বলতে চাও সোজা করেই বল। কোদালকে কোদাল বললে বুঝতেও সহজ, চিনতেও কষ্ট নেই। সাধু ভাষায় খনিত্র নাম দিয়ে তাকে অনাবশ্যক রহস্যময় করে তুলো না।"

সত্য বুঝলেন, তর্কে অবতীর্ণ হচ্ছেন মলী সেন। পুরাতন স্মৃতি মনে পড়ল। কতদিন কত বিষয় নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে তাঁদের। প্রখর মলী সেনের বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ তাঁর অনুভূতি, অসাধারণ তাঁর বাকনৈপুণ্য, জোরালো তাঁর যুক্তিজাল। তর্কে তাঁকে সহসা পরাজিত করা সহজ নয় কারো পক্ষে।

নিজেও প্রস্তুত হয়ে বললেন, "বেশ, তাই বলছি। শচীনকে তুমি মুক্তি দাও।"

বটে! এও তো সেই, "আমাকে দয়া কর মলীদি"রই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ভাষণ—রিভাইজড্ ভার্ষণ। নীরজার অনুনাসিক কান্নারই পুনরাবৃত্তি! অসহ্য!

নিজের মনে মনে মলী সেন নীরজার সেই অবজ্ঞাভরে প্রস্থানের অপমানে নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছিলেন। পুরাতন ক্ষতস্থানে পুনরায় আঘাত লাগতেই ক্রোধে উদীপ্ত হয়ে উঠলেন। অগ্নিস্রাবী দুই চক্ষু সত্যসিন্ধুর পানে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, "মুক্তি কার কাছ থেকে ?"

"মিথ্যা থেকে, অলীক স্বপ্নবিলাস থেকে, তার আপন মোহপাশ থেকে।" উত্তর করলেন সত্য।

মলী সেন এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। নম্র স্বরে বললেন, "শচীনকে আমি পছন্দ করি, এ যেমন মিথ্যা নয়, আমাকে তার ভালো লাগে এও তেমনি সত্যি। একে অস্বীকার করতে চাও তুমি ?"

"না, চাইনে। কিন্তু সংসারে ভালোলাগা নিয়ে বিবাদ বাধে না। কারণ তার তো কোন দায় নেই। যত গোল ভালোবাসা নিয়ে। তার দাবী যে অফুরন্ত। তোমার কথা ভাবিনে। তুমি চিরকাল দোরকেই ঘর ভেবে আনন্দ পাও। তোমার ভুল ভাঙ্গাবার চেষ্টা বৃথা। দুঃখ হয় শচীনের জন্য।"

খোঁচাটা মলী সেনকে যথেষ্টই বিঁধল। কিন্তু সে নিয়ে কলহ না করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কারণ ?"

"কারণ, তার ভালোলাগার স্রোত তো তোমার ভালোলাগার সরু ধরা-বাঁধা খাদ বেয়েই চিরকাল বইবে না। কবে, কখন যে সে ক্ষীণ ধারা হৃদয়ের একূল-ওকূল দুকূল ছাপানো প্লাবনে ভালোবাসার বিরাট সমুদ্রে পরিণত হবে, হতভাগ্য তা জানতেও পারবে না। তারপরেই শুরু হবে আশাভঙ্গের পালা।"

"কিন্তু আশা যদি হয় অসম্ভবের তবে মনস্তাপ থেকে তাকে ঠেকাবে কে? শচীন চায় আমাকে বিয়ে করতে।"

"কী বললে?" বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন সত্য। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারেন না।

"হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যেবেলা সে রীতিমতো ফর্ম্যালী প্রপোজ করেছে। পাগল আর কাকে বলে?"

মিনিট কয়েক দুজনেই চুপ করে রইলেন। মনে মনে বোধ হয় সমস্ত বিষয়টা পর্য্যালোচন করলেন সত্য। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অনেকটা অর্দ্ধস্বগতোক্তির মতো বললেন, "না, এতটা আমিও ভাবতে পারিনি। ব্যাড, অফুলি ব্যাড।

"আমাকে কী করতে বল?"

"শচীনকে বিয়ে করতে বলি না নিশ্চয়ই। না, পরিহাসের বিষয় বা সময় এটা নয়। কিন্তু পরামর্শ দেওয়ার কালও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ক্ষতি যা ঘটার তা ঘটেছে।"

মলী সেন আহত হলেন। কথা বলার ভঙ্গিটা দেখ না একবার। ক্ষতি ছাড়া কারো কোন ভালো করেননি যেন তিনি কোন দিন। শ্লেষের সঙ্গে বললেন, "মন্দ ছাড়া আমার কাছে তুমি আর কী আশা কর? কিন্তু জানো, এই মন্দ মলী সেনের জন্যেই তোমাদের শচীন ব্যানার্জ্জী একদিন আন্দামান বা জেলের হাত থেকে বেঁচেছে?"

"সে কী?"

"হ্যাঁ, সে মিশেছিল সন্ত্রাসবাদীদের দলে। বোমা তৈরী করে দেশ স্বাধীন করার মতলবে। সেখান থেকে তাঁকে সরিয়ে আনলে কে? স্বদেশী ডাকাতিতে পুলিশের হাতে যে ধরা পড়েনি, সে কার অনুগ্রহে? খোঁজ রাখো তার? একবার বরং তাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখো।"

বিস্মিত সত্য অনুরোধ করলেন, "সবটা খুলে বলতো, শুনি।"

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই,—

সেবার পূজার ছুটিতে কলকাতা থেকে শিলং যাচ্ছিলেন মলী সেন। স্বামী শিবনাথ সোজা দোকান থেকে ষ্টেশানে এসে ট্রেণে উঠবেন, কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে গাড়ি ফেল করলেন। রিজার্ভ করা কম্পার্টমেণ্টে একা শুয়ে ঘুমুচ্ছিলেন মলী সেন। হঠাৎ পিস্তলের আওয়াজ ও যাত্রীদের আর্ত্তনাদে জেগে উঠে দেখেন, গাড়ি নিশ্চল, বাইরে অন্ধকার এবং ভিতরে মানুষের অস্পষ্ট ছায়া।

আলোর সুইচ টিপতেই চোখে পড়ল, দরজার কাছে মেজেতে একটি যুবক। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহ। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বার বার পড়ে যাচ্ছে। মলী সেনকে বলল, "আপনি ভয় পাবেন না। আমরা টেররিষ্ট। পাশের কামরায় মাড়োয়ারীর সঙ্গে হাজার কুড়ি টাকা আছে খবর পেয়েছিলাম। অন্ধকারে ভুল করে আপনার গাড়িতে উঠে পড়েছি। আমার সঙ্গীরা শিকল টেনে পালিয়েছে। আমি তাড়াতাড়িতে গাড়ির জানালা দিয়ে লাফাতে গিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলেছি। নড়তে পারছিনে। যাক, এক্ষনি লোকজন এসে পড়বে। আশা করি, কাঁধে করেই বয়ে নিয়ে যাবে থানায়। পায়ে হেঁটে আর কষ্ট করতে হবে না।" বলে সে মৃদু হাস্যের চেষ্টা করল।

বিশিষ্ট চেহারার মতো কোন কোন মানুষের হাসিরও একটা আলাদা জাত আছে। অন্য আর পাঁচজনের চাইতে তা এতই স্বতন্ত্র যে, একবার দেখলেই তা ব্রোমাইড পেপারের গায়ে ফটোগ্রাফের রেখার মতো মনের ফলকে দাগ কেটে বসে। বিস্ময়ে হতবাক, ভীত, সচকিত মলী সেনও তরুণ বিপ্লবীকে তার হাসি থেকেই চিনলেন।

মনে পড়ল, বছরখানেক আগে এক এগজিবিশনের দরজায় মোটর থেকে নামতেই চাঁদার বাক্স এগিয়ে ধরেছিল একটি যুবক তাঁর সামনে। হাতের ব্যাগ খুলে একটা টাকা দিতে যাচ্ছিলেন। যুবকটি বাধা দিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, "মাত্র এক টাকা দিচ্ছেন যে? দশ টাকার নোট বের করুন।"

এ কী রকম চাঁদা সংগ্রহের রীতি রে বাপু! এ তো প্রার্থনা নয়, এ যে হুকুম!

কৌতুক বোধ করে মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি চাঁদা কুড়োতে এসেছেন, না ইনকামট্যাক্স আদায় করতে এসেছেন?"

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে সহাস্তে জবাব দিল যুবক, "হ্যাঁ, ট্যাক্স বললেও ক্ষতি নেই। কনশেন্স-ট্যাক্স। যাদের শোষণকরা-পয়সায় বড়মানুষি করে বেড়াচ্ছেন, সেই গরীবদের জন্য মাঝে মাঝে কিছু দেওয়াকে দান ভেবে গর্ব বোধ করবেন না। বরং নিজেদেরই বিবেক শান্ত রাখার একটা সুযোগ পাচ্ছেন মনে করে কৃতজ্ঞ থাকবেন। এ তো ভিক্ষা দিচ্ছেন না; প্রায়শ্চিত্ত করছেন।"

কথাগুলি শ্রুতিকটু। ভাষাটাও খুব রুচিকর নয়। কিন্তু প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে এক জন অজ্ঞাতকুলশীল চাঁদাপ্রার্থীর সঙ্গে বাদ প্রতিবাদে ব্যাপৃত হতে যে কোন সম্ভ্রান্ত মহিলারই সম্মানে বাধে। কোন কথা না বলে মলী সেন অবজ্ঞার সঙ্গে একখানা নোট ফেলে দিলেন চাঁদার বাক্সে। ফুঃ। এমন কত দশ টাকা কত সময় এখানে ওখানে হারিয়ে যায় মলী সেনের।

চাঁদা যে নিল সে ক্রোধে ও বিরক্তিতে আরক্ত মলী সেনের মুখের পানে চেয়ে শুধু একটু হেসে বলল, "ধন্যবাদ।"

সে হাসিতে না ছিল শ্লেষ, না ছিল অনুকম্পা, না ছিল অভিযোগ। সকাল বেলার শিশিরে ধোয়া প্রস্ফুটিত গন্ধরাজের শ্বেত পাপড়ির মতো নির্ম্মল সে হাসিটি মলী সেনের মন থেকে অনেক দিন মোছেনি।

ট্রেণের বাইরে রেলের লোকজনের ব্যস্ত-সমস্ত পদধ্বনি শোনা গেল। মুহূর্ত্তে মন স্থির করলেন মলী সেন। ক্ষিপ্রহস্তে শচীনের হাত থেকে একপাশে ছিটকে পড়া রিভলভারটা গাড়ির জানালা দিয়ে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাইরে। নিজের বিছানার একটা কম্বল ও বালিশ তুলে নিয়ে দ্বিতীয় শয্যা রচনা করলেন ওদিককার বার্থে। বললেন, "বাঁচতে চান তো, চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ুন বিছানায়। আমি মলী সেন। মনে রাখবেন, আপনার নাম শিবনাথ। কলকাতায় পটলডাঙ্গায় বাড়ি, বড়বাজারে ব্যবসা। কেউ প্রশ্ন করলে বলবেন, স্ত্রী নিয়ে পূজার ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছেন শিলংএ। বাকীটা আমি সামলাবো।"

কিন্তু উঠতে বললেই তো যদি ওঠা যেতো, তবে পালাতেই বা বাধা ছিল কী? নিজ চরণের অভদ্র আচরণে বিব্রত নকল শিবনাথ কোনমতে মলী সেনের বাহুতে ভর দিয়ে নির্দ্দিষ্ট বার্থে আশ্রয় নিলেন।

বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাসের অসম্ভব কাহিনীর মতো প্রায় অবিশ্বাস্য পরিবেষ্টনে সেই আকস্মিক যোগাযোগ স্মরণ করলে আজও তাঁরা দুজনেই বিস্মিত বোধ করেন।

হত্যার প্রতি একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে প্রত্যেক নারীরই অন্তরে। তাঁদের কাছে রাজনৈতিক বিশেষণের দ্বারাই হত্যাকাণ্ড কৌলীন্য লাভ করে না। তাই পিস্তলতান্ত্রিক দেশোদ্ধারব্রতের নরঘাতন নিষ্ঠুরতা থেকে শচীনকে নিরস্ত করার নিরন্তর প্রয়াস করেন মলী সেন। দিনের পর দিন তর্ক করেন, কলহ করেন। করেন অনুরোধ, অনুনয় ও অভিমান। প্রতিনিয়ত ঘর্ষণের দ্বারা নাকি পাথরও ক্ষয় করা যায়, দেশসেবীর প্রতিজ্ঞা কোন্ ছার? ধীরে ধীরে কোন অদৃশ্য প্রক্রিয়ায় নিজের অলক্ষ্যে তার মতপরিবর্ত্তন ঘটেছে, তা শচীন জানে না। মলী সেন জানেন।

অচিরেই বিপ্লববাদের নভঃমণ্ডল থেকে খসে পড়ল একটি তারা। কিন্তু বিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে, বস্তুর বিনাশ নেই। আছে রূপান্তর। সেই ক্ষীণদ্যুতি নক্ষত্র নতুন জন্ম নিয়ে নবরূপে দেখা দিল ক্ষুদ্র সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশায় ভরা জীবনের বিচিত্র আকাশে শুক্লা চতুর্দ্দশীর রাতে স্নিগ্ধ চন্দ্রমার মতো। অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা জানেন, চাঁদের আলো তার নিজের নয়। কোন সূর্য্য থেকে আলোক আহরণ করছে শচীন সে তথ্যও কি ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন আছে?

গভীর মনোযোগের সঙ্গে সমস্ত শুনলেন সত্যসিন্ধু। বললেন, "তোমার সাহস, তোমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তোমার সাফল্যের প্রশংসা করি। কিন্তু শচীনের ভালো করেছ, একথা বলতে পারলে সুখী হতেম। খুনের আসামীকে জেলের চিকিৎসকেরা রোগে ওষুধ দিয়ে বাঁচায়, সুস্থ হলে ফাঁসিতে মরার জন্যে। সে ডাক্তারেরা রোগীর সত্যিকার মিত্র কি না আমার সন্দেহ আছে।"

"মানে? শচীন আত্মহত্যা করতে পারে, তুমি এমন আশঙ্কা কর কি?" মলী সেনের কণ্ঠে উদ্বেগের আভাস।

"করি বললে অত্যুক্তি হবে, করিনে বললেও সত্য

হবে না। শচীন হচ্ছে সেই জাতের মানুষ, ইংরেজীতে যাকে বলে ইম্পেচ্যুয়াস। এরা বুদ্ধি দিয়ে বাঁচে না, অনুভূতি দিয়ে বাঁচে। অতীতে তার সমস্ত অস্তিত্বকে জুড়িয়েছিল উদগ্র স্বাধীনতার স্পৃহা। তাকে সে ছেড়েছে। বর্ত্তমানে তার সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করেছিলে তুমি। তাকে তুমি ছেড়েছ। ভবিষ্যতে তার আর অবলম্বন রইল কী? বাকী জীবন সে টিকে থাকবে হয়তো; বেঁচে থাকবে না নিশ্চয়।"

মলী সেন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, "তার কৃতকর্মের সমস্ত দায়িত্ব কি আমার? তার মূর্খতার শাস্তিও কি আমাকেই নিতে হবে? তোমাদের কি এই আইন-কানুন? এ যে দেখছি খাঁটি শিবঠাকুরের আপন দেশ! না, "প্লিড গিল্টী" বলে মার্সি পিটিশন পেশ করতে পারলেম না। তোমার ওকালতি সত্ত্বেও না।"

"দায়িত্ব তোমার খানিকটা আছে বৈ কি! দিনে দিনে প্রত্যাশা যদি জাগিয়ে থাক, তবে প্রত্যর্থীর প্রার্থনা দেখে আজ রাগ করলেই বা চলবে কেন? কিন্তু মলী, তর্ক করে তো তোমাকে বোঝাতে পারব না। এবার আমি চলি, তোমারও ড্রেস করা দরকার।"

আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে ঈষৎ হাস্য করে বললেন, "কেন জানি না, এখনও তোমার ভালো মন্দ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে পারিনে। বুঝেছি, ক্ষয়রোগের মতো হৃদয়রোগের ব্যাসিলিও বড় মারাত্মক। একবার ধরলে আর কিছুতেই ছাড়তে চায় না। তোমার কল্যাণ কামনা করি বলেই আমি চাই শাস্তি তুমি নাও। অন্য কারো হাত থেকে নয়, তোমার নিজের বিবেকের কাছ থেকে। পরের বেদনা আর বাড়িও না।"

সত্যসিন্ধুর কণ্ঠের ব্যাকুলতা মলী সেনের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। কিন্তু তার শেষ উক্তিটি শোনামাত্রই আবার তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ওঃ, পরের ব্যথার জন্যই যত দুর্ভাবনা! তা'হলে দূর সম্পর্কের বোনের জন্যই আসল দরদ!

উদ্যতরোষ ফণিনীর মতো গ্রীবা উন্নত করে মলী সেন সদর্পে ঘোষণা করলেন, "জানি তুমি আমার হিতাকাঙ্খী। তাই আমিও তোমাকে বলছি, নীতি-কথার সুধাপান করে তৃষ্ণা মেটানো আমার ধাতে নেই। স্বামীর ভালোবাসা পাইনি বলেই সংসারে আর কোন কিছুতেই আমার অধিকার নেই, এ অনুশাসন আমি মানিনে। আমি জানি, সৃষ্টির আদি থেকে যে নিয়মে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলে আসছে, সে হচ্ছে যোগ্যতমের জয়,—সারভাইভাল অব দি ফিটেষ্ট। জগতে সর্ব্বত্র যদি প্রতিযোগিতা চলে, তবে শুধু প্রেমের ক্ষেত্রেই তা নিন্দনীয় হবে কেন? আর মাঠে খেলতে নামলে মাঝে মাঝে আঘাত দেওয়া ও আঘাত নেওয়ার আশঙ্কা তো রয়েছেই। তা নিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা নির্ব্বুদ্ধিতা। না, সিন্ধু, কোথায় কোন অনূঢ়া কন্যার বর জোটাতে বিঘ্ন হচ্ছে, কোন্ কুরূপা নার্সের বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, কোন্ কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকের স্বপ্নভঙ্গ ঘটছে, বা কোন্ বিধবা জননীর দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমি আমার নিজের প্রাপ্য ছাড়বো না!"

গভীর সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে সত্য উত্তর করলেন, "সংসারে যা পেতে চাই তাই যে প্রাপ্য নয়, সে কথা জানার দিন তোমার আজও আসেনি। খেলার উপমা দিয়েছ তুমি? কিন্তু ভুলে গেছ যে তাতেও রুলস্ অব দি গেম বলে' একটা কথা আছে। অফসাইড থেকে গোল দেওয়া তো গ্রাহ্য নয়। দোহাই তোমার, মলী, আত্মপ্রতারণা দ্বারা নিজকে কেবলি নষ্ট করো না। হৃদয় নিয়ে হৃদয়হীনতা দ্বারা নিজের বিড়ম্বিত জীবনের ব্যর্থতাকে আর গভীর করে তুলো না।"

[ক্রমশঃ।

শেষ মুহূর্ত্তে বলবো

যখন আমার একটা পা থাকবে কবরে, তখনই আমি মেয়েদের বিষয়ে পূরা সত্যি কথা বলবো। আমি বলবো, বলেই আমার কফিনে লাফিয়ে পড়বো, পড়েই ঢাকা দিয়ে দেবো আপাদমস্তক এবং বলবো, "এখন তোমরা যা খুশী বলতে পারো।"

—কাউণ্ট লিও টলষ্টয়।

শ্রীসুকুমার মিত্র

শ্রীঅরবিন্দের অগ্রজ স্বর্গীয় বিনয়ভূষণ ঘোষ ১৮৯৪ সালের এক সন্ধ্যায় অরবিন্দকে লইয়া ৬ কলেজ স্কোয়ারের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার কার্য্যালয়ে তাঁহাদের মাসীমার বাড়ীতে আসেন এবং রাত্রে আহারাদি করিয়া যান। তখন আমার বয়স সম্ভবতঃ ১০।১১ বৎসর। অরবিন্দের সহিত ইহাই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। দেখিলাম, তাঁহার লম্বা বাবরী চুল, কোট-প্যাণ্ট পরা, মাথায় পিরালী পাগড়ী, শরীর কৃশ ও স্বল্পবাক্।

অরবিন্দের পিতা ডাঃ কে, ডি, ঘোষের বন্ধু ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষ। তাঁহার নামানুসারে অরবিন্দের মধ্যম ভ্রাতার নামকরণ করা হয়। তাঁহার বাড়ীতে অরবিন্দের মাতা কিছু কাল বাস করেন। সেই বাড়ীতে অরবিন্দের জন্ম হয়।

অরবিন্দের পিতার সহিত বিলাতে এ্যাক্রয়েড পরিবারের ঘনিষ্ঠতা হয়। উপরোক্ত পরিবারের সহিত তিনিও অন্তরঙ্গ ছিলেন। অরবিন্দের নামের সহিত এ্যাক্রয়েড নাম এইজন্য সংযুক্ত করা হয়। বাঙ্গালা দেশে স্থায়িভাবে বাস করারপূর্ব্বে অরবিন্দ তাঁহার নাম অরবিন্দ এ্যাক্রয়েড ঘোষ লিখিতেন।

অরবিন্দের শিশুকালে আমার মাতা স্বর্গীয়া লীলাবতী মিত্র (রাজনারায়ণ বসুর চতুর্থী কন্যা) তাঁহার লালন-পালনের ভার অনেকটা লইয়াছিলেন। কারণ, অরবিন্দের পরে তাঁহার যে ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করে, শিশুকালেই তাহার মৃত্যু হয়। ইহার ফলে অরবিন্দের মাতা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুত্রের শোক তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। আমার মাতা কর্তৃক লালন-পালনের কথা অরবিন্দ জানিতেন এবং বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পরে অরবিন্দকে দেখিবার জন্য আমার মাতা ও আত্মীয়-স্বজন অত্যন্ত উৎসুক থাকায় অরবিন্দের অগ্রজ তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে বলেন। বিলাত প্রবাসের পরে কলিকাতা ও বৈদ্যনাথে তাঁহার এই প্রথম আগমন। বৈদ্যনাথে তিনি তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর গৃহে কিছুদিন থাকিয়া তাঁহার কর্ম্মস্থল বরোদায় ফিরিয়া যান।

ইহার পর হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে বৈদ্যনাথ দেওঘরে আসিতেন। তাঁহার সহিত তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা হইত। বার বার আসা-যাওয়াতে অরবিন্দের
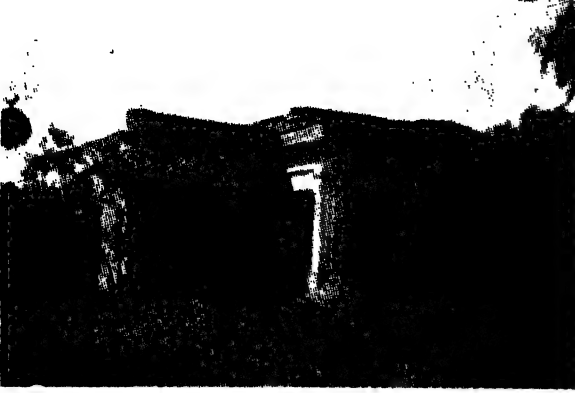
দেওঘরে রাজনারায়ণ বসুর গৃহ

সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। তিনি সমবয়সীর মত আমাদের সহিত ব্যবহার করিতেন। তখন হইতে তাঁহাকে "অরোদা" বলিতাম। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু সংবাদপত্রের সম্পাদক ও লেখক ছিলেন। তিনি 'সুরভি' নামক কলিকাতার সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পরে উহা অপর পত্রিকার সহিত মিলিত হওয়ায় 'সুরভি ও পতাকা' নামে প্রকাশিত হইতে থাকে। ঐ পত্রিকায় প্রতিবারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাস্য-কৌতুকের গল্প অনেকগুলি প্রকাশিত হইত। রাজনারায়ণ বসুও অনন্ত হাস্য-কৌতুকের গল্প জানিতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি এই সকল গল্প বলিতেন ও সকলে হাসিয়া ফাটিয়া পড়িত। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে রাজনারায়ণ বসু ধর্ম্ম ও দেশ সম্বন্ধে গভীর ভাবে আলোচনা করিতেন। পরে যোগীন্দ্রনাথ বসু মাদ্রাজের 'হিন্দু', লাহোরের 'ট্রিবিউন' এবং ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও জার্ম্মানীর ভারতস্থ সংবাদদাতা ছিলেন। তাঁহার সময়ে এদেশের অপর কেহ এই ভাবে কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই।

অরবিন্দ অধিকাংশ সময়ে যোগীন্দ্রনাথ বসুর সহিত আলোচনা ও গল্প করিতেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রভাতে ও রাত্রে দেওঘরের রাস্তায় অনেকক্ষণ বেড়াইতেন। অরবিন্দ প্রায়ই তাঁহার সঙ্গী হইতেন। আনন্দ ও হাসিতে ভরা যোগীন্দ্রনাথ বসুর জীবন ছিল। দুঃখ-কষ্ট তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। চিরকুমার যোগীন্দ্রনাথ ১৯০৬ সালে পরলোক গমন করেন।

একবার পূজার ছুটিতে দেওঘর যাইয়া দেখিলাম, অরবিন্দ প্রতিদিন সকালে ডন-বৈঠক করিতেছেন। এই সময়ে আমার সহিত তিনি এমন ব্যবহার করিতেন যেন উভয়েই সমবয়সী। আমার বালসুলভ চাপল্যের প্রত্যুত্তরে তিনি সমভাবে পাণ্টা লইতে ছাড়িতেন না। ইহার ফলে কখন কখন উভয়ে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়াছি। ইহাতে তাঁহার বিরক্তি নাই, সম্ভ্রমে আঘাত লাগে নাই।

রাজনারায়ণ বসুর ধর্ম্মভাব ও দেশপ্রেম অরবিন্দকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। অনেক সময় উভয়ে এই সম্বন্ধে নানা আলোচনা ও আলাপ করিতেন। ১৮৯৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে, তাঁহার মাতামহের পরলোক গমনে তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত পান। ঐ সময়ে তাঁহার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কবিতা লেখেন :

Not in annihilation lost, nor
given to darkness
Art thou fled from us, Oh ! strong
and santient spirit."

* * * *

ইহার পরে তিনি যখন কলিকাতায় আসিয়া আমাদের বাসায় বাস করেন, তখন তাঁহাকে বলা মাত্রই তিনি আমার ফনোগ্রাফে এই কবিতাটি রেকর্ড করিয়া দেন। বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহার এই কবিতা ফনোগ্রাফে বার বার শুনিতাম এবং অপরকে শুনাইতাম। তাঁহার অগ্রজ স্বর্গীয় প্রফেসর মনমোহন ঘোষ এই কবিতা শুনিয়া খুসী হইয়াছিলেন।

স্নেহ ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা

আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্গীয়া কুমুদিনীর জন্মদিনে অরবিন্দ কবিতা লিখিয়াছেন এবং তাঁহার এনলার্জ করা রঙ্গীন ফটোগ্রাফ উপহার দিয়াছেন। অরবিন্দের অপর মাসীমা সুকুমারীর (রাজনারায়ণ বসুর তৃতীয়া কন্যা) এক কন্যা ছিল। তাঁহার নাম ছিল উষা। একবার অরবিন্দ দেওঘরে আসিয়া দেখেন যে উষা দিদি বহুদিন ধরিয়া জ্বরে ভুগিতেছেন, বহু চিকিৎসায়ও কিছু হইতেছে না। এক জন চিকিৎসক উপদেশ দিলেন তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে। তাহা করা হয় নাই। অরবিন্দ তাহা শুনিয়া বর্ত্তমান যশিডির (পূর্ব্বে এই ষ্টেশনের নাম বৈদ্যনাথ জংশন ছিল) পরবর্ত্তী ষ্টেশন সিমুলতলায় এক বাড়ী ভাড়া করিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন। পক্ষকালের মধ্যে এত কালের রোগ আরাম হইয়া গেল। একবার তিনি বরোদা হইতে কাশ্মীরে যান। তথা হইতে তিনি কাশ্মীরের পেপিয়ার মাসে ও কাষ্ঠের শিল্প দ্রব্য আনিয়া তাঁহার মামা, দিদিমা ও আমাদিগের সকলকে উপহার দিয়াছিলেন।

অন্য একবার পূজার সময়ে দেওঘরে যাইয়া দেখি, অরবিন্দ আমাদের পূর্ব্বেই তথায় আসিয়াছেন। কিছুদিন পরে অরবিন্দের কাছে এক জন লোক আসিলেন। নাম শুনিলাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে ইহাও শুনিলাম যে, তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য ভারতের সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালী বলিয়া তাঁহাকে সৈনিক-বৃত্তি করিতে দেওয়া হয় নাই। পরে তিনি ভারতের নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বরোদা রাজ্যে ঢুকিয়া নিজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া যতীন্দ্র উপাধ্যায় নামে সৈনিক হইয়াছেন। ক্রমে আরও শুনিলাম যে, ভারতকে স্বাধীন করিবার ব্রতে তিনি ব্রতী হইয়া অপর সকলকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক এবং

জন্য নানা বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ও করিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবু কয়েক দিন থাকিয়া চলিয়া গেলেন। অরবিন্দের উপর যতীন্দ্রনাথের প্রভাব বিশেষ ছিল।

এই সময়ে অরবিন্দের মারাঠি ও গুজরাটি ভাষা শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার মামা যোগীন্দ্র বাবুর নিকট বাঙ্গালা শিক্ষা করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মামা উপদেশ দিলেন যে, কোনও বিশিষ্ট সাহিত্যিককে যদি তিনি শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে উত্তমরূপে লিখিত ও কথিত বাঙ্গালা শিখিতে পারিবেন। তদনুসারে স্বর্গীয় দীনেন্দ্রকুমার রায়কে শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তাঁহাকে লইয়া অরবিন্দ বরোদা গমন করেন। অরবিন্দ মারাঠি ও গুজরাটি ভাষা নিজের চেষ্টায় শিখিলেন, কিন্তু মাতৃভাষা নিঁখুত ভাবে শিখিবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন!

পূজার সময় প্রতি বৎসর আমরা পিতামাতা ভগিনীদের সহিত দেওঘরে যাইতাম। সকল বারেই না হউক অধিক সময়ে অরবিন্দ তথায় ঐ সময়ে আসিতেন। অন্য সময়ে যে আসেন নাই তাহা নহে। অরবিন্দ তথায় থাকার সময়ে বিভূতিভূষণ সরকার, প্রফুল্ল চাকী, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর সরকার প্রভৃতি বহু যুবক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

বিবাহ

কলিকাতায়ও বহুবার অরবিন্দ ৬ নং কলেজ স্কোয়ারের বাড়ীতে আসিয়া বাস করিয়াছেন। (সম্ভবতঃ) ১৯০১ সালে পূজার সময় যখন কলিকাতা সহর তিন দিন ধরিয়া জলমগ্ন ছিল, তখন তিনি ঐ গৃহে ছিলেন। তাহার পরে তিনি মধ্যে মধ্যে ৫৩ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। এই বাড়ী ছিল বাংলার বিখ্যাত বাগ্মী ও জননেতা স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষের। শ্মশান-যাত্রীদের কষ্ট দেখিয়া স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ কলিকাতার নিমতলা ঘাটে নিজ ব্যয়ে পাকা ঘাট ও বাড়ী তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ আমাদিগের মেসো মহাশয়। ঐ বাড়ীতে তখন আমার বিধবা মাসীমা প্রভৃতি বাস করিতেন। স্বর্গীয় [illegible]চরণ দত্তও তথায় বাস করিতেন। সম্পর্কে তিনি আমাদের মাতুল ছিলেন। কলিকাতার হাটখোলার বিখ্যাত [illegible] মদনমোহন দত্তের তিনি পৌত্র ছিলেন। মদনমোহন [illegible] কন্যার সহিত স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর বিবাহ [illegible]াছিল। এই মদনমোহন দত্তের সরকার ছিলেন রামদুলাল [illegible] সরকার। তাঁহার নামে কলিকাতায় এক রাস্তা আছে। [illegible]মোহন দত্তের নামে কোন রাস্তা নাই। সততার জন্য [illegible]দুলাল সরকার বিখ্যাত। মদনমোহন বহু দান করিয়া [illegible]ছেন। তিনি গয়াতে তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য [illegible]ড়ের গায়ে সিঁড়ি বানাইয়া দেন।

মেছুয়াবাজারে থাকা সময়ে আমরা অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ঐ বাড়ী যাইতাম। ঐ বাড়ীতে বাল্যকাল হইতেই আমাদের যাতায়াত ছিল। তথায় থাকার সময়েই অরবিন্দের বিবাহের কথা উঠে এবং তথা হইতেই অরবিন্দ বিবাহ করিতে যান। আসাম কৃষি বিভাগের স্বর্গীয় ভূপালচন্দ্র বসুর কন্যা মৃণালিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। যেহেতু তিনি বিলাত গমন করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মের সন্তান, তজ্জন্য বিবাহের পূর্ব্বে গোময় ভক্ষণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলা হয়। তেজস্বী অরবিন্দ তাহা করিতে অস্বীকার করেন। এই বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি তাঁহার সহিত ফষ্টিনষ্টি, ছেলেমানুষী সবই করিয়াছি। নূতন লোক আসায় এ সকল বন্ধ হয়। ২৩ নং স্কটস্ লেনে সস্ত্রীক বাস করিবার সময়ে দুই-একবার তথায় গিয়াছিলাম।

৺যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে যখন তিনি বরোদার কার্য্য হইতে ছুটি লইয়া আসেন ও পরে কার্য্যে ইস্তফা দেন, তখন আমরা তাঁহার কার্য্যে বিস্মিত হই। তাঁহার সারাজীবনের সংগ্রহ সমস্ত পুস্তক তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে লইয়া আসেন ও তথায় তিনি অধ্যক্ষরূপে শিক্ষা দান করিতে আরম্ভ করেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ। 'বন্দে মাতরম্' বলার জন্য, অথবা বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায়, অথবা স্বদেশী পালনের

৪৮ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, যেখানে শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়

জন্য কিম্বা বিলাতী বস্ত্র বয়কট করায় যখন দলে দলে ছাত্রদিগকে স্কুল-কলেজ হইতে বিতাড়িত করা হইতে লাগিল, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলামখানা' নামে অভিহিত করা হয়। কোন কোন অত্যুৎসাহী যুবক সেনেট হাউসে কালো রং দিয়া 'গোলামখানা' এবং 'To Let' লিখিয়াও দিয়াছিল। এই সময়ে রিজ্‌লী ও কার্লাইল সার্কুলার বাহির করিয়া ছাত্রদিগকে উপরোক্ত আন্দোলন সমূহে যোগ দিতে নিষেধ করা হয়। নির্ব্বিচারে আদেশ ও শাসন মানিয়া লওয়ার দিন তখন অতিক্রম হইতে চলিয়াছে। বহু ছাত্র এই সকল আদেশ মান্য না করিয়া আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তাহাদিগকে স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করা হয়, জরিমানা হয় ও অন্যান্য শাস্তি দেওয়া হয়।

১৯০৬ সালে এইরূপ অবস্থায় ঐ সকল সার্কুলার অমান্য করিবার জন্য 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের নেতৃত্বে ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে গোলদীঘিতে এক ছাত্র-সভায় 'এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি' স্থাপিত হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব হিসাব-পরীক্ষক শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু সহকারী সভাপতি, স্বর্গীয় শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু উহার সেক্রেটারী এবং আমি সহকারী সেক্রেটারী হই। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মল্লিক তাঁহার ৪ নং কলেজ স্কোয়ারের বৃহৎ খালি গুদামটি সোসাইটির কার্য্যালয়ের জন্য বিনা ভাড়ায় ছাড়িয়া দেন। ১৯০৬ সাল হইতে ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত ঐ গৃহ উক্ত সোসাইটির হস্তে ছিল। পূজার ছুটির পরে শিমুলতলা হইতে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা আসিলে কলেজ স্কোয়ারের নিকট যুবকগণ ও ছাত্রগণ তাঁহার নিকট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দাবী করেন। সুরেন্দ্রনাথ এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে যে সকল অসুবিধা তাহা প্রকাশ করিয়া উহা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। পরে নেতাদের মধ্যে উহা স্থাপনের চেষ্টা ক্রমে শিথিল হইয়া পড়ে প্রধানতঃ অর্থাভাবের জন্য। সর্ব্বপ্রথম নোয়াখালী ও রংপুরের কয়েক জন স্কুল-বিতাড়িত ছাত্রদের লইয়া এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি কর্তৃক তাহার গৃহে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই অবস্থায় যুবক ও জনসাধারণের চেষ্টায় কলিকাতার ডালহাউসী ইনষ্টিটিউটে নেতা ও শিক্ষা-ব্রতিগণের এক সভা আহ্বান করা হয়। সভায় বহু ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণ উপস্থিত ছিল। সভায় এক হতাশার ভাব আসিয়া পড়ে। নেতাগণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভবপর নহে বলিয়া প্রকাশ করেন। তখন ছাত্রদের অন্যতম নেতা স্বর্গীয় শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু এমন এক আবেগময়ী বক্তৃতা করেন যে, তাহার ফলে সার রাসবিহারী ঘোষেরই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতে থাকে ও সার তারকনাথ পালিত বিচলিত হন। সার রাসবিহারী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দেন। তাহার পরে ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, অর্থ সাহায্য করিবেন, বলেন। সুবোধচন্দ্র মল্লিক পূর্ব্বেই অর্থ সাহায্য করিবেন বলায় জনসাধারণ তাঁহাকে রাজা উপাধি দেয়। এই ভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অরবিন্দ উহার অধ্যক্ষ হন।

এই সম্পর্কে শচীন্দ্রপ্রসাদের জীবনীতে স্বর্গীয় নেতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন :—

"ছাত্রেরা যখন এইরূপে স্কুল-কলেজ হইতে বিতাড়িত হইতে লাগিল, তখন কলিকাতাস্থ নেতৃবর্গের টনক পড়িল। বিশেষতঃ তখনকার পান্তির মাঠে (যেখানে বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ-হোষ্টেল) ছাত্রেরা এক বিরাট জনসভা করিয়া নেতৃবর্গকে স্বকীয় কর্ত্তব্য পালনের জন্য অনুরোধ জানাইলেন। সুতরাং তখনকার Land holder's Association হলে নেতৃবর্গ কিংকর্ত্তব্য স্থির করার জন্য এক পরামর্শ-সভা আহুত করিলেন। অনেক নেতাই ঐ সভায় উপস্থিত হইলেন, (আমি নেতা নই তথাপি তাঁহাদের পরিকররূপে ঐ সভায় উপস্থিত হইলাম) তৎপূর্ব্বে আমার আত্মীয় সুবোধচন্দ্র মল্লিক জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের পোষকতা করিয়া এক লক্ষ টাকা দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং ঐ পান্তির মাঠের সভায় ঐ প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হইলে মহোৎসাহের সহিত গৃহীত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, পরামর্শ-সভার কথা বলি। পরামর্শ আরম্ভ হইল। সভায় অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা স্বভাবতঃই বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া হঠকারিতায় আপত্তি তুলিলেন। 'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্'। বিশেষতঃ কলিকাতার স্কুল-কলেজে যাঁহারা কর্তৃপক্ষ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা vested interest এর প্ররোচনায় বন্ধন সংযত করিতে পরামর্শ দিলেন। হঠকারী আমাদের মত যাঁহারা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলাম—আমরা প্রমাদ গণিলাম, এমন সময় যুবক শচীন্দ্রপ্রসাদ—যিনি সম্প্রতি রংপুরের কাণ্ডমাণ্ড দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন—তিনি বক্তৃতা দিতে উঠিলেন। সে কী বক্তৃতা—কী উদ্দীপনা—কী তরঙ্গভঙ্গ! পরামর্শ-সভার আবহাওয়া একেবারে

বদলাইয়া গেল। সকলেই বলিতে বাধ্য হইলেন যে, বিতাড়িত ছাত্রদিগের জাতীয় ভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে।

উক্ত জীবনীতে স্বর্গীয় ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস লিখিয়াছেন—'আমি আছি সভাস্থলে। তরুণরা আছেন বারান্দায়। আমি বাহিরে গিয়া শচীন্দ্রকে বলি তরুণদের পক্ষে বলিবে যে * * তাহারা যে এম, এ, বি, এ হবার আশা ত্যাগ করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়াছে, তাহাদের ভবিষ্যতে কি হইবে। শচীন্দ্র যখন তাঁর স্বভাবসুলভ আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় ঐ ভাব প্রকাশ করেন, অন্তঃকোমল বহিঃকঠোর রাসবিহারীর দুই চক্ষু হয় সজল।'

নোয়াখালীর শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী উক্ত জীবনীতে এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন—'কলিকাতার জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে যেদিন ব্রজেন্দ্রকিশোর,—টি, পালিত,—রাসবিহারী ঘোষ লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, তাহা এই শচীন্দ্রপ্রসাদের প্রভাবে। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে আলোচনা-সভায় যখন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়, তখন শচীন্দ্রপ্রসাদের বিদ্যুৎগর্ভ বক্তৃতা স্যার রাসবিহারীর চক্ষে অশ্রু সঞ্চার করিয়াছিল। তদ্দৃষ্টে স্যার গুরুদাস বলিলেন, "ডাঃ ঘোষ, আপনার সওয়াল জবাবে আমরা বিচলিত হই, আর আপনি এই বালকের বাক্য-প্রভাবে কাঁদিয়া ফেলিলেন?"

ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে জাতীয় শিক্ষালয় যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরিবর্ত্তিত হয়।

কিছু কাল জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতা করিবার পরে অরবিন্দ ঐ পদ ত্যাগ করেন। অতঃপর পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে বক্তৃতা করিতে বহির্গত হন। তাহার পরে ১৯০৬ সালে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। তিনি উহার সম্পাদনা করিতেন। বন্দে মাতরম্ পত্রিকার বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্ট রাজদ্রোহের মামলা আনয়ন করিলে অরবিন্দের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হয়। তাঁহার জামিন হইবার জন্য আমার পিতা 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং কুন্তলীন নামে বিখ্যাত কেশ-তৈল প্রস্তুতকারক স্বর্গীয় হেমেন্দ্রমোহন বসু—(এইচ, বসু) জামিন হইতে চাহিলে পুলিশ তাহা অগ্রাহ্য করে। মামলায় অরবিন্দ মুক্তি পান এবং সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পালের জেল হয়। তখন রবীন্দ্রনাথ—

"অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্ত্তি তুমি। * * * * * *

কবিতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। ঐ সময়ে অরবিন্দ ১২ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে স্বর্গীয় সুবোধচন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে বাস করিতেন। আমি প্রায়ই তথায় যাইতাম।

বিখ্যাত ৬ নং কলেজ স্কোয়ার, গোলদীঘির ঠিক পেছনে

চরমপন্থী দল

১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর মেদিনীপুরে যে কনফারেন্স হয় তথায় বাঙ্গালার রাজনৈতিক দুই দলের মধ্যে ভেদ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ত্যাগ করিয়া অন্য পথ ধরিতে রাজী ছিলেন না। অরবিন্দ চরমপন্থী দলের নেতারূপে অপর দলের নেতৃত্ব করেন। ফলে দুই দলের পৃথক্ অধিবেশন হয়। তাই বলিয়া এখনকার মত এক দল অন্য দলকে হেয় করিতে চেষ্টা করিত না কিম্বা উভয় দলের মধ্যে শ্রদ্ধারও অভাব ছিল না। এই স্থানে অরবিন্দ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও ক্ষুদিরাম বসুর সংস্পর্শে আসেন। সুরাট কংগ্রেসের সময়ে সমগ্র ভারত লইয়া দুইটি রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। তথায় এই ভেদ বিরাট আকারে প্রকাশ পায়। তাহার ফলে সে বার কংগ্রেসের অধিবেশন হইল না। এই স্থানে বারীন্দ্র কর্ত্তৃক অরবিন্দকে লিখিত এক পত্র যাহা মাণিকতলা বোমার মামলায় পুলিশ পায় তাহাতে রসগোল্লা বিতরণের কথা ছিল। আমি সুরাটে যখন অরবিন্দের উগ্রপন্থী দলের শিবিরে যাইতাম তখন একদিন তথায় এক ভদ্রলোক বলিলেন, "সুকুমার বাবুর ভারী সুবিধা, তাঁহার পিতার দলের জিত হইলেও যে সুবিধা, তাঁহার দাদার দলের জিত হইলেও সেই সুবিধা তাঁহার থাকিবে।"

সরকারের অত্যাচার

একবার টাউন হল হইতে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ প্রতিবাদ সভা শেষ করিয়া পদব্রজে যখন সহস্র সহস্র লোক সমগ্র বৌবাজারের রাস্তা পূর্ণ করিয়া রাত্রে গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিল তখন বৌবাজারের পুলিশ ঐ রাস্তার আলোকসমূহ

নিবাইয়া দিয়া পথচারী সকলকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। অনেকে রক্তাক্ত হইয়াছিল। আমার হাতেও লাঠির আঘাত পড়ে। তখন আমার মনে ইহার প্রতিবিধানের কথা উদয় হয়। ইহার কয়েক মাস পরে ১৯০৭ সালের শেষ ভাগে দেখি যে, বিডন স্কোয়ারে লাঠিধারী কনেষ্টবল, রিভলভারধারী সার্জ্জেণ্ট উক্ত সভা ঘিরিয়া সূর্য্যাস্ত আইন অমান্যকারী সভার লোকজনকে প্রহার করিতে থাকে। পুলিশের সহিত সভার লোকজনদিগের দাঙ্গা হয় ও পরে জনসাধারণ ও কয়েক জন সাহসী ও বলিষ্ঠ যুবক লাঠি ও সোডার বোতল লইয়া উৎসাহের সহিত পুলিশ বাহিনীকে আক্রমণ করে। তাহারা অনেক পুলিশ কনেষ্টবলকে ভীষণ ভাবে আহত করে। বিডন ষ্ট্রীটের উপর অনেক পতিতার বারান্দা হইতে পুলিশের উপর লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হয়। দাঙ্গায় ওয়ান্টার্স নামে এক য়ুরোপীয় সার্জ্জেণ্টের হাত কাটিয়া ফেলা হয়। তৎকালের প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর কালীর এক পুত্র এই সম্পর্কে অভিযুক্ত হন। 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় 'হাত কাটা ওয়ান্টার্স' শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরে কোনও কেন্দ্র হইতে ইহার প্রতিশোধস্বরূপ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির মেথর-ধাঙ্গড় প্রভৃতিকে উত্তেজিত করিয়া উত্তর-কলিকাতায় এক হাঙ্গামা বাধান হয়। দাঙ্গায় বহু গৃহবাসী ও পথচারী আহত হয়, কাহারও হাত-পা ভাঙ্গিয়া যায় ও অনেক লুঠ হয়। এই ভাবে জনসাধারণকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ আন্দোলন বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হয়।

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অরবিন্দকে সভাপতি করিয়া এবং আমি সেক্রেটারীরূপে Defence Association নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করি। ইহার স্থান হয় এ্যাণ্টিসার্কুলার সোসাইটির পার্শ্বে অবস্থিত এক লম্বা হলে। ইহাও স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মল্লিকের বাড়ী ছিল। এইখানে লাঠি-খেলা শিক্ষা দেওয়া হইত। একজন পশ্চিম দেশীয় মুসলমান নূতন রকমের লাঠি-খেলা শিখাইতেন। খালি হাতে আত্মরক্ষার বিদ্যাও তিনি শিখাইয়াছিলেন। তিনি বেনোট নামক এক ধরণের লাঠি-খেলা শিখাইতেন। স্বর্গীয় রমাকান্ত রায়ের পরিচিত এক জাপানী জিউযিৎসু শিখাইতেন। তখন জিউযিৎসু এদেশে কেহ দেখে নাই। বিপ্লবী-কর্ম্মী স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা আমাদিগকে বক্সিং শিখাইতেন। এখানে অনেক শিক্ষার্থী জুটিত।

একদিন স্বর্গীয় কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন এই Defence Association দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি কয়েক জনের হাতে ও গাত্রে লাঠির আঘাতের দাগ ও ফুলিরা রহিয়াছে দেখিয়া দুই বোতল Rum পাঠাইয়া দিয়া উপদেশ দিলেন যে, হঠাৎ আঘাত লাগিলে উহার দ্বারা মালিশ করিলে বেদনা ও ফুলার উপশম হইবে।

'যুগান্তর' পত্রিকার মুদ্রাকর রাজদ্রোহের অপরাধে জেলে গমন করিলে তাঁহার পরিবারের সাহায্যের জন্য আমি Defence Associationএ এক সাহায্য-ভাণ্ডার খুলি। অরবিন্দ তাহার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রাপ্ত টাকা এক ব্যাঙ্কে রাখা হইত। উহার পাশবহি ও চেকবহি অরবিন্দের গৃহে তল্লাসের সময় পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া আমার লিখিত কয়েকটি পত্র তথায় পাওয়া যায়; তাহার ফলে আমাকে মাণিকতলা বোমার মামলায় গভর্ণমেণ্টের পক্ষে আলিপুর আদালতে সাক্ষী মানা হয়।

মাণিকতলার বোমার মামলা

মজঃফরপুর বোমার ঘটনার পূর্ব্ব হইতেই গোয়েন্দা পুলিশ মাণিকতলা বাগানের খবর লইতেছিল। রামসদয় মুখার্জ্জি নামক পুলিশের গোয়েন্দা কর্ম্মচারী উহার তথ্য লইতেছিলেন। এরূপ শুনিয়াছি যে, বর্দ্ধমান জেলার রায়না নামক স্থানের এক যুবক পুলিশকে প্রথমে অনেক সন্ধান দিয়াছিল। ১৯০৮ সালের ১লা মে পুলিশ একই সময়ে মাণিকতলার বাগানে যথায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি ছিল ও ৪৮ নং গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীতে যথায় অরবিন্দ বাস করিতেন,—খানাতল্লাস করে। মাণিকতলার বাগান-বাড়ীর অধিবাসীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার পরে মাটি খুঁড়িয়া বোমা, বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্র পায়। ৪৮ নং গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীতে অরবিন্দকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বৃটিশ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ক্রেগান অরবিন্দকে মাটিতে মাদুরের উপর শুইয়া থাকিতে দেখিয়া বলেন, 'একজন আই সি এস পরীক্ষোত্তীর্ণ বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তির এইরূপে থাকিতে লজ্জা করে না?' এক পুলিশ সার্জ্জেণ্ট অরবিন্দের ভগিনী শ্রীমতী সরোজিনীর বুকের নিকট রিভলভার ধরিয়া ছিল।

প্রভাতে আমার পিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র সংবাদ পাইলেন যে, অরবিন্দের গৃহ খানাতল্লাস হইতেছে এবং তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় যান। অরবিন্দ তাঁহাকে দেখিয়া বলেন, 'দেখ ন'মেসো, আমার হাতে হাত-কড়া দিয়াছে'। আমার পিতা পুলিশ কর্ম্মচারীকে হাত-কড়া খুলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে তাঁহার পলায়নের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং যেন হাত-কড়া খুলিয়া দেওয়া হয়। পুলিশ অনুরোধ রক্ষা করে। পুলিশ তাঁহাকে জামিনে ছাড়িয়া দিবে না বলায় আমার পিতা, তখন তাঁহার বন্ধু ও অন্যতম নেতা ও এটর্নী স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ী যাইয়া অরবিন্দকে জামিনে খালাস করিবার জন্য চেষ্টা করিতে বলেন। তাঁহারা পুলিশ কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু পুলিশ কমিশনার জামিন দিতে রাজী হইলেন না।

তাহার পরে আলিপুর আদালতে জামিনের জন্য চেষ্টা করা হইল। অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের জন্য আমার পিতা মোক্তার নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার পরিচিত স্বদেশকর্ম্মী উকিল স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ বসু প্রভৃতি কয়েক জনকে ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। প্রায় সকলেই

বিনা ফিসে কার্য্য করিতে থাকেন। নিম্ন আদালতে আমাকে সাক্ষ্য দিতে গভর্ণমেণ্ট পক্ষে ডাকা হয়। আমার তখন বয়স অল্প, সাংসারিক জ্ঞান নাই বলিলেই হয়। আদালতে জেরায় আমি কি বলিতে কি বলিব? অপর পক্ষের তাড়া খাইয়া ভয়ে কি বলিয়া ফেলিব? এই সকল চিন্তায় আমার পিতা অত্যন্ত আশঙ্কিত হইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্সী জেলে যাইয়া আমি কয়েক বার আমার মাসতুতো ভাই বারীন্দ্রকুমার ও অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। সে সময়ে জেলারকে বলিলেই ওয়ার্ডার পাঠাইয়া অভিযুক্তদিগকে লোহার গরাদের অপর পার্শ্বে আনা হইত এবং আমি এ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা বলিতাম, কোনও কড়াকড়ি ছিল না।

বোমার মামলা দায়রা আদালতে উঠিল। আসামীদের জন্য বৃহৎ কাঠগড়া নির্ম্মিত হইল। তাঁহাদের মামলা চালাইবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আমার পিতা অরবিন্দের কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীযুক্তা সরোজিনীর নামে 'সঞ্জীবনী' ও 'বেঙ্গলী' পত্রে জনসাধারণের নিকট মামলা চালাইবার জন্য অর্থ সাহায্য চাহিয়া আবেদন প্রকাশ করিলেন। ইহার ফলে অর্থ আসিতে লাগিল। বোমার মামলা চালাইবার জন্য বিশিষ্ট কোনও এটর্ণীকে না পাইয়া আমার পিতা তাঁহার প্রাক্তন ছাত্র ধন্নলাল আগরওয়ালাকে মামলা চালাইবার জন্য অনুরোধ করেন। ধন্নুলাল বাবু তখন ম্যানুয়েল ও আগরওয়ালা নামক এটর্ণী ফারমের অন্যতম অংশীদার। ধন্নু বাবু উৎসাহের সহিত মামলা চালাইতে মনোনিবেশ করেন। কিছুদিন মামলা চালাইবার পরে দেখা গেল যে কোন কোন ব্যারিষ্টার মাত্র কয়েক দিন আদালতে দাঁড়াইয়া আর আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন না, এমন কি অর্থ লইয়াও কেহ কেহ আদালতে দাঁড়ান নাই। তখন কয়েক জন উকিলই কোনও রকমে মামলা চালাইতেছেন। এইরূপ অবস্থায় আমার পিতা তাঁহার বন্ধু-পুত্র ও নবীন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশকে এই মামলার ভার লইতে অনুরোধ করেন। এবং তাঁহাকে ইহাও বলেন যে, যে টাকা আবেদনের ফলে উঠিয়াছিল তাহা প্রায় সবই শেষ হইয়া গিয়াছে, মাত্র তিন হাজার টাকা আছে, উহা লইয়াই যত দিন মামলা চলে তাহা চালাইতে ও সওয়াল করিতে হইবে। চিত্তরঞ্জন দাশ তখন নবীন ব্যারিষ্টার, তাঁহার তখন খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হয় নাই। আমার পিতার অনুরোধে চিত্তরঞ্জন ত্যাগ স্বীকার করিয়া মামলার ভার লন। তাহার দুই দিন পরে আমার পিতাকে গ্রেপ্তার করিয়া দেশান্তরিত করিয়া অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। এই মামলায় স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জনের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

পিতাকে গভর্ণমেণ্ট নির্ব্বাসিত করায় মামলার ক্ষতি হইবে বুঝিয়া অপরিচিত হইলেও আমি স্বর্গীয় ধন্নুলাল আগরওয়ালার সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহার নিকট গচ্ছিত সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক মামলার সাহায্যার্থে প্রদত্ত টাকা স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশকে দিবার জন্য অনুরোধ করি। আমার পিতা এই কথা ধন্নু বাবুকে বলিয়া যাইবার সময় পান নাই। পরে স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশের নিকট যাইয়া উক্ত অর্থ আনিবার জন্য বলিয়া আসি।

[ক্রমশঃ।

কোবিদ শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

যখন তখন ভাবি আমি যথা তথা
সুলভ-কোপ ওই মহর্ষিটির কথা।
কি সিদ্ধি চায়? জানে না'ক লাভ ক্ষতি,
মারণ যজ্ঞ, উচাটন ব্রতে ব্রতী।
বুঝিতে পারি নে কি ইন্দ্রত্ব যাচে?
তনু পিঙ্গল হ'ল যে হোমের আঁচে।
না, না, মূঢ় আমি ভুল করিয়াছি তায়,
অস্থি দিয়া সে বজ্র গড়িতে চায়।
মাশিতে দেশের যাহা গ্লানি হানিকর।
যাহা অসত্য, কুৎসিত শিবেতর।
পারিবে কি? থাকে মৌনী তাপস চুপ
আমি হেরি তার ভীমকান্ত ও রূপ।
বলি বিস্ময়ে হোক যুগ ব্যবধান
যোগভ্রষ্ট, ও একটা মহাপ্রাণ।

বৈজ্ঞানিক গ্যালেলিওর চিঠি

[শিল্পিশ্রেষ্ঠ মিখেল এ্যাঞ্জেলো যেদিন এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন তার ঠিক তিন দিন পূর্বে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ গ্যালেলিও প্রথম পৃথিবীর আলোক সন্দর্শন করেন। গ্যালেলিও পিতার নির্দেশে শারীর-বিদ্যা অধ্যয়নে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু শারীর-বিদ্যা তাঁর মনকে আদৌ আকর্ষণ করতে পারেনি। যা তাঁকে দুর্নিবার আকর্ষণ করত সে হোল গণিত ও পদার্থবিদ্যা এবং শেষ পর্যন্ত তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন। গ্যালেলিও পিসা বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন এবং এখানে অধ্যাপনার সময় তাঁর যুগান্তরকারী আবিষ্কার দ্বারা বিদ্যায়তন ও গীর্জার শাসকদের বৈরিতা অর্জন করেন। তিনিই প্রথম বলেন, উর্ধ থেকে নিক্ষিপ্ত তিনটি পদার্থ একই সময়ে ভূতলাশ্রয়ী হবে। কিন্তু তাঁর এ আবিষ্কার এ্যারিষ্টোটেল প্রমুখ মনীষিগণ-প্রচারিত পদার্থবিদ্যার মূল সত্যগুলির একান্ত পরিপন্থী। শাসক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় যখন তিনি স্বনির্মিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আকাশ-প্রাঙ্গণ পরীক্ষা সুরু করেন। ভেনিসে অবস্থান কালে গ্যালেলিও গ্র্যাণ্ড ডিউক, দ্বিতীয় কেসিমোর সেক্রেটারী বেলিসারিও ভিন্টাকে তাঁর নবরচিত "Siderius Nuncius" নামক পুস্তকখানি প্রকাশ করা সম্বন্ধে নীচের পত্রখানি লিখেছিলেন।]

৩০শে জানুয়ারী, ১৬১০

আমার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আকাশের গ্রহ-উপগ্রহগণের বিষয় যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতেছি, সেগুলি মুদ্রিত করার উদ্দেশ্যে বর্তমানে আমি ভেনিসে অবস্থান করিতেছি। মন আমার অপার বিস্ময়ে পরিপ্লুত। ঈশ্বরকে শত কোটি ধন্যবাদ, তিনি আমায় এতাবৎ অনুদ্‌ঘাটিত এই মহা বিস্ময় প্রথম নয়নঙ্গম করার সৌভাগ্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই আমি এ সত্যে উপনীত হইয়াছি যে, চন্দ্র পৃথিবীর মতই একটি গ্রহ। গ্র্যাণ্ড ডিউককেও ইহা দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু অসম্পূর্ণ ভাবে। কারণ এখনকার মত তখন আমার এমন চমৎকার দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না। এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কেবল মাত্র চন্দ্র নয়, অগণিত স্থির নক্ষত্রও দেখিতে পাইয়াছি যাহা আজো অবধি কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। নগ্ন-নেত্রে যত নক্ষত্র দেখা যায় তাহার দশ গুণ বেশী নক্ষত্র দেখিতে পাইয়াছি। অধিকন্তু যাহা এত দিন পর্যন্ত দার্শনিকদের বাদানুবাদের বিষয়ীভূত ছিল সেই ছায়াপথের স্বরূপ নির্ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছি।

কিন্তু সব চেয়ে বিরাট বিস্ময় হইল চারিটি নতুন গ্রহ আবিষ্কার। ইহাদের নিজস্ব ও আপেক্ষিক গতিবেগ এবং অন্য গ্রহদের সহিত কোথায় পার্থক্য তাহাও পর্যবেক্ষণ করিয়াছি। এই চারিটি গ্রহ শুক্র ও বুধের মতই আর একটি বিরাট নক্ষত্রের চতুর্দিকে আবর্তিত হয়। সম্ভবতঃ অন্য গ্রহগুলিও সূর্য্যের চারি দিকে আবর্তিত হইতেছে। আমার পুস্তক মুদ্রিত হইলে প্রচারের জন্য সমস্ত দার্শনিক ও গাণিতিকদের নিকট প্রেরণের ইচ্ছা করি। মহামান্য গ্র্যাণ্ড ডিউককেও এক কপি উপহার দিব এবং সেই সঙ্গে চমৎকার একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রও তাঁহাকে উপহার দিব—যাহার সাহায্যে তিনি নিজেই এই বহির্জাগতিক দৃশ্যের রূপ ও সত্যতা নিরূপণে সমর্থ হইবেন।

[গীর্জার অভিভাবকগণ কর্তৃক সমর্থিত টলেমির থিয়োরীর পরিপন্থী কপার্নিকাসের থিয়োরীর স্বপক্ষে যুক্তি প্রচার দ্বারা গ্যালেলিও ধর্মযাজকদের দারুণ কোপে পতিত হন। গ্যালেলিও প্রচার করেন, সূর্যই পৃথিবীর আবর্তন বৃত্তের কেন্দ্র এবং পৃথিবী সূর্যের চারি দিকে আবর্তিত হচ্ছে স্বীয় কক্ষপথে। কিন্তু গীর্জার অভিমত, এই থিয়োরী মিথ্যা, অবাস্তব ও ধর্মবিরুদ্ধ। অতএব গ্যালিলিওর ডাক পড়ে ধর্মগুরুদের বিচারসভায় এবং তিনি শাস্তির ভয়ে এই মতবাদ প্রচার বন্ধ রাখতে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন।

১৬৩২ খৃষ্টাব্দে গ্যালেলিওর Dialogue নামক পুস্তকখানি প্রকাশিত হয় এবং পুস্তক প্রকাশ দ্বারা তিনি তাঁর পূর্ব-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। আবার তাঁর কৈফিয়ৎ তলব হয় ধর্মনায়কদের বিচার-সভায়। সত্তর বছরের বৃদ্ধ, ভগ্ন-স্বাস্থ্য গ্যালেলিও অত্যাচারের ভয়ে ঐ মতবাদ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

এর পর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গ্যালেলিওকে স্বজন-বন্ধু পরিত্যক্ত হয়ে কর্তৃপক্ষের নজরবন্দী হয়ে কালযাপন করতে হয়েছিল। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে কবি মিল্টন যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন ইতালীতে, গ্যালেলিও তখন অন্ধ। তাঁর Discourses on Two New Sciences নামক বিখ্যাত পুস্তকখানি সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে গ্যালেলিও এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন, ঠিক যে বছর ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্যার আইজ্যাক নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। নিউটন গ্যালেলিওর আরব্ধ কার্য সুসম্পাদিত করেছিলেন।]

কুইন এলিজাবেথের চিঠি

[অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত থাকার অপরাধে অষ্টম হেনরী তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীকে অভিযুক্ত করায় কন্যা এলিজাবেথের গোত্র নি‹ মতদ্বৈধ সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি এলিজাবেথ‹ নিজ কন্যা বলে স্বীকার করেন—স্বীকার করেন এ্যানী বোলেন‹ মস্তক শত্রু-হস্তে দ্বিখণ্ডিত হবার অনেক পরে। ইংলণ্ডের ইতিহা‹ এলিজাবেথের রাজত্বকাল নানা কারণে বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাপে‹

মতই এলিজাবেথের গীর্জার প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না। শুধু যে তিনি গীর্জার প্রতি অবহেলাই পোষণ করতেন তা নয়, গীর্জার বিষয়-সম্পত্তি নিজের ভোগদখলের জন্ত ব্যবহার করতেন, এবং খেয়াল-খুশী মত বাজেয়াপ্ত করে নিতেন। স্যার ক্রিষ্টফার হ্যাটন নামক জনৈক সুদর্শন পুরুষ উপপতি ছিলেন এলিজাবেথের এবং এলিজাবেথের দৌলতেই সামান্ত অবস্থা থেকে লর্ড চ্যান্সেলার পর্যন্ত হয়েছিলেন তিনি। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে এই ব্যক্তিটি বিশফ রিচার্ড কক্সকে তাঁর লণ্ডনের বাড়ীটি নাম মাত্র ভাড়ায় তাঁকে দেওয়ার জন্ত আব্দার ধরেন। এই বাড়ীটির উদ্যানের গোলাপ, জাফরাণ ও কাল জামের খ্যাতি লণ্ডন-জোড়া এবং স্যার ক্রিষ্টফার ফুল ও ফলের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। এমনিতেই বিশফের বহু সম্পত্তি এলিজাবেথের প্রিয়জনের লোভ মেটাতে হাতছাড়া করতে হয়েছিল—কাজেই হ্যাটনের আবদার যে সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হবে তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু হ্যাটন নাছোড়-বান্দা—এলিজাবেথের শরণাপন্ন হলেন তিনি। এলিজাবেথ তখন বিশফকে তিরস্কার করে নীচের এই চিঠিখানি লিখেছিলেন।]

উদ্ধত বিশফ— (১৫৭৩)

তোমায় যা করে তুলেছি তার আগে তুমি কি ছিলে নিশ্চয়ই তা ভোলনি। আমার অনুরোধ যদি অবিলম্বে পালন না কর, পরমেশ্বরের নামে আমি তোমায় সতর্ক করে দিচ্ছি—যাজকীয় মর্যাদা থেকে তোমায় চ্যুত করব।

এলিজাবেথ।

[বিশফকে বাধ্য হয়ে হার মানতে হোল। তাঁর এই পরাজয়ে সেদিন হাততালি দিয়েছিল অনেকে। এলিজাবেথের প্রিয়পাত্রদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তিনি বিশফের গদী ত্যাগ করেছিলেন এবং এর অল্পকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয়—হয়ত এই শোকেই।]

মাকে লেখা অলিভার গোল্ডস্মিথের চিঠি

[অলিভার গোল্ডস্মিথের যৌবন কেটেছে নানা দুঃখ, দৈন্ত ও ঘটনা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে। ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়নের সময় বাপ গতায়ু হন এবং বাপের মৃত্যুর পর সংসারের অবস্থা এসে পৌছায় দারিদ্র্যের চরম সীমায়। ১৭৪৪ সালে গোল্ডস্মিথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরবর্তী দু'বছর কখনো বাড়ীতে কখনো অন্যত্র স্থিতিলাভের চূড়ান্ত চেষ্টা চলে। এমন কি, তিনি পাদরীর জীবনও গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আন্তরিকতা ও অটুট অধ্যবসায় সত্ত্বেও তাঁর সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৭৫১ সালে তিনি আমেরিকায় ভাগ্যান্বেষণে যাত্রা করার সঙ্কল্প নিয়ে গৃহত্যাগ করেন এবং মাত্র ত্রিশ পাউণ্ড নিয়ে কর্ক অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি ঘটেছিল কর্ক থেকে মা'কে লেখা এই চিঠিখানিতে তা' প্রকাশিত।]

ক, ১৭৫১

স্নেহময়ী মা,

আমি যা-যা বলব যদি মন দিয়ে শোন তা'হলে তোমার প্রশ্নের প্রত্যেকটির উত্তর পাবে। কর্কে পৌছে সর্বপ্রথম অশ্বরকে টাকায় বদলে ফেলে একটি আমেরিকাগামী জাহাজে উঠলাম। অবশ্য জাহাজের ক্যাপ্টেনকে যথাবিধি ভাড়াস্ব টাকা ও বহুবিধ দক্ষিণা দিতে কসুর করিনি। কিন্তু এমনি আমার কপাল যে, তিন সপ্তাহ পবনদেবের টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না, অথচ এ পরিস্থিতির উপর একটুও আমার হাত ছিল না। আমার পক্ষে সব চেয়ে মর্মান্তিক হোল, যখন পালে হাওয়া লাগল আমি তখন সহরে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে বসে রইলাম। আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন সাহেব পরম নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ততায় আমার কোন খোঁজ-খবর না নিয়েই জাহাজ ছেড়ে দিলেন। আমি জাহাজেই আছি যেন ধরে নিলেন তিনি। কাজেই বাকি সময়টা আমি সহরে, সহরতলীতে দর্শনীয় যা-কিছু দেখে বেড়াতে বাধ্য হলাম। পকেটে যখন টাকা থাকে তখন কে আর উপবাসে থাকে বল?

মাত্র আর দু'গিনি যখন পকেটে, তখন আমার স্নেহময়ী ও প্রিয় বন্ধু-পরিজন যাদের আমি ফেলে এসেছি—তাদের কথা মনে পড়ল। কাজেই তখন আবার সেই মহানুভব পশুটিকে ক্রয় করলাম এবং পকেটে পাঁচ শিলিং নিয়ে বিদায় জানালাম কর্ককে। একশ' মাইলেরও বেশী পথ—আর একটি মানুষ ও সঙ্গী ঘোড়ার এই দূর পথ অতিক্রম করার পক্ষে ঐ সামান্ত পুঁজি নিতান্ত নগণ্য পাথেয়। কিন্তু নিরাশ আমি হলাম না—পথে নিশ্চয়ই কোন বন্ধু-সন্দর্শন ঘটবে।

বিশেষ করে কলেজের এক অতি বিশ্বস্ত ও পুরোনো বন্ধুর কথা মনে পড়ল। প্রায়ই সে তার ওখানে গ্রীষ্ম কাটাতে পীড়াপীড়ি করত গভীর আন্তরিকতার সহিত। কর্ক থেকে সে মাত্র আট মাইল দূরে থাকে। এই নৈকট্যের সুবিধা সালংকারে ও খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বর্ণনা করত সে, বলত—'আমার ওখানে একই সঙ্গে গ্রাম ও সহরকে ভোগ করতে পারবি আর তুই হবি আমার অশ্বশালা ও কোষাগারের একচ্ছত্রাধিপতি।'

কিন্তু পথে অশ্রুভারাক্রান্ত এক হতদরিদ্র রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল। সে বললে, ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় তার স্বামীর জেল হয়েছে। এখন তাকে গুটি আষ্টেক ছেলে-মেয়ে নিয়ে উপবাসে থাকতে হবে। স্বামীই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন আর সেই অবলম্বনটি থেকেই বঞ্চিত হয়েছে সে। আমি নিজেকে গৃহবাসী, সুখী ভাবলাম—ভাবলাম আমার স্বজন-বন্ধুর বাড়ীও বেশী দূরে নয়। কাজেই আমার শেষ সম্বলের অর্ধেক তাকে দান করলাম। বাকি অর্ধেকও তাকে দেওয়া হয়ত উচিত ছিল আমার। ঐ যৎকিঞ্চিতে আমার কি এসে-যাবে? যা হোক, শীঘ্রই আমার বন্ধুর বাসায় এসে উপস্থিত হলাম। একটি বিরাট মাষ্টিফ কুকুর দ্বারে পাহারায় রত ছিল—আমাকে দেখেই সে তেড়ে এল আমার দিকে এবং আমাকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতই যদি না এক জন স্ত্রীলোক বাঁচাতো সে যাত্রা। স্ত্রীলোকটিরও মুখের চেহারা কুকুরটির চেয়ে কম বিরাট ছিল না। যাই হোক, অপার মানব-প্রেমে প্রবুদ্ধ হয়ে সে আমায় এই যমপুরীর দ্বাররক্ষক সারমেয়টির হিংস্র দংষ্ট্রা থেকে বাঁচিয়েছিল এবং অনেক সাধ্যি-সাধনার পর আমার নামটি তার প্রভুর নিকট পৌছে দিতে রাজী হয়েছিল।

আমাকে বেশীক্ষণ বসিয়ে না রেখে আমার পুরোনো বন্ধু—সে না কি সেই সময় রোগের একটি বড় রকম আক্রমণ সামলাচ্ছিল—

নৈশ টুপি মাথায় দিয়ে, নৈশ গাউনে, নৈশ স্লিপার পায়ে নীচে নেমে এসে সাদরে আলিঙ্গন করল আমায়—তার পর ভিতরে নিয়ে গিয়ে তার রোগের একটি সালংকার ইতিহাস শোনাল এবং এ কথা বলে আশ্বস্ত করল যে, তার গৃহতলে এমন একটি লোককে পেয়ে—যাকে সে সব চেয়ে ভালবাসে পৃথিবীতে—নিজেকে বিশেষ ভাগ্যবান মনে করছে সে এবং তার সাহচর্য তার পক্ষে দ্রুত আরোগ্যলাভের সহায়ক হবে। কেন সেই দুঃস্থা রমণীকে বাকি অর্ধেক দিইনি তার জন্যে ভারী অনুশোচনা হতে লাগল—কারণ আমার মনুষ্যোচিত যত-কিছু দাবী এই সুযোগ্য লোকটিই যখন যথাযথ মেটাবে। লোকটির কাছে আমি আমার হৃদয়ের দ্বার অবারিত করলাম—বললাম তাকে আমার দুঃখের কাহিনী এবং খোলাখুলি ভাবেই বললাম যে, আমার পকেটে আর মাত্র এই সামান্য আছে। হৃদয়ের কথা সব খুলে বলার পর নিজেকে ঝঞ্ঝামুক্ত জাহাজের মত নিরাপদ ও উদার পোতাশ্রয়ে আশ্রিত মনে হতে লাগল। বন্ধু আমার কোন কথার জবাব না দিয়ে ধ্যানগম্ভীর হয়ে ঘরময় পায়চারী করতে আর হাত ঘষতে লাগল। বন্ধুর এই যোগ-প্রক্রিয়াকে আমি কোমল হৃদয়ের উদার নির্বাক্ অভিব্যক্তি বলেই জানলাম নিশ্চিতরূপে। এ আচরণ আমার নিকট অতি বিনয়সঙ্গত বলে সন্দেহ হতে লাগল। কথার জাল বুনে সহৃদয়তা প্রকাশ দ্বারা আমার মনে আঘাত দিতে দ্বিধা-বিড়ম্বিত সে—তার বিশাল হৃদয়ের ঔদার্য স্বয়ং প্রকাশিত হবে।

মাকে লেখা বোঁদেলিয়ারের চিঠি

[অস্কার ওয়াইল্ডের মত বোঁদেলিয়ারও মিথ্যার মুখোস পরে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি ছিলেন এক জন বড় কবি। গীর্জার অনুশাসন তিনি মানতেন না—অন্ততঃ সাধারণের চোখে। কিন্তু অন্তরে তিনি নীতিবাগীশই ছিলেন—নিজের অপকর্মের জন্য নিয়ত নিজেকে অভিসম্পাত করতেন। প্যারিসের যত্র তত্র হত্যা ও মৃত্যু সম্বন্ধে রহস্যময় কথা গোপনে ফিসফাস করে বেড়াতেন বোঁদেলিয়ার। তিনি না কি মাথার চুল সবুজ রং করিয়েছিলেন—গাঁজা খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকতেন এবং কোন এক কাফের গায়িকাকে নিয়ে প্রমত্ত জীবন যাপন করতেন। মেয়েটির নাম—জীন ডুভাল—দেখতে যেমন অতি সাধারণ তেমনি গায়ের রংটি ছিল তার কালোর ধার-ঘেঁসা। কিন্তু বোঁদেলিয়ার এমনই মজেছিলেন মেয়েটির প্রেমে যে তারই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বোঁদেলিয়ারের উপর কোন সময়ই আস্থা স্থাপন করা যেত না—খরচে যেমন ছিলেন তেমনি বন্ধু-বান্ধবকে পর্যন্ত ঠকাতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না তিনি। কুড়ি বছর বয়সে বোঁদেলিয়ার ভারতে প্রেরিত হন স্বভাব শোধরাতে, আর স্নায়ুর সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে। দেশে ফিরে এসে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হলেন এবং সে সম্পত্তি উচ্ছৃংখল ভাবে আর এমন দ্রুততার সহিত উড়িয়ে দেন যে, এদিক থেকে একটা আদর্শ রেখে গেছেন বলা যেতে পারে। টি, এস, ইলিয়ট বোঁদেলিয়ার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন—"বোঁদেলিয়ার সেই দলের, যাদের শক্তি আছে অদ্ভুত কিন্তু সে শক্তি দুঃখভোগের। দুঃখকে এড়াতে পারতেন না তিনি, দুঃখের ঊর্ধ্বেও উঠতে পারতেন না—দুঃখকে যেন চুম্বক আকর্ষণে টেনে আনতেন নিজের দিকে।" ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ফ্লুরার্স দু মাল প্রকাশিত হয় কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশের শাসক-সম্প্রদায় যারা, তাদের চোখে এ বই দেশ ও জাতির ধর্মনীতির বিরুদ্ধাচারী হোল। কাজেই বোঁদেলিয়ার, তার প্রকাশক ও মুদ্রাকরকে আদালতের কাঠ-গড়ায় এসে দাঁড়াতে হোল—হোল অর্থদণ্ড। অর্থদণ্ডের টাকা অবশ্য দিতে হয়নি শেষ পর্যন্ত কিন্তু অশ্লীল কবিতাগুলিকে পরবর্তী সংস্করণ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ভিক্টর হিউগো তাঁর কবিতার এক জন উৎসাহী পাঠক ছিলেন। বোঁদেলিয়ার পো ও ডি কুইন্সি'র অনেক লেখা অনুবাদ করেছিলেন—অনেক সমালোচকের মতে মূলের চেয়ে অনুবাদই না কি উৎকৃষ্টতর হয়েছে।

ফ্লুয়ার্স দু মাল যে বছর প্রকাশিত হয় সেই বছরই মায়ের সঙ্গে পুনর্মিলন হয় বোঁদেলিয়ারের। বাপের মৃত্যুর পর মা আর এক জনকে পতিত্বে বরণ করেন যার জন্যে মার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছিল তাঁর। বাপের পবিত্র স্মৃতির প্রতি এই অপমান কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেননি তিনি। কিন্তু এই দ্বিতীয় পিতার মৃত্যুর পর আবার মায়ে-ছেলে মিলন হয়। মা পুত্রের সকল ঋণ পরিশোধ করে দেন এবং পুত্রকে তার কাছে এসে বাস করতে আহ্বান জানান। কিন্তু বোঁদেলিয়ার সাময়িক ভাবে এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছিলেন।]

১১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৮

তিন সপ্তাহ আগে তুমি একখানা অনুপম পত্র লিখেছ আমায়—অনেক বছর পরে এই ধরণের পত্র পেলাম। কিন্তু এখনও তার উত্তর দেওয়া হয়নি। তুমি হয়ত খুব দুঃখিত, বিস্মিত হয়েছ। চিঠিখানা যখন পড়লাম মনে হোল এখনও আমায় ভালবাস তুমি—আমার যা ধারণা ছিল তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী। বুঝলাম, অনেক কিছুই এখনও মধুরেণ সমাপয়েৎ করা যায়—আবার হয়ত আমরা সুখের দিনগুলি ফিরে পেতে পারি।

আমার নিঃশব্দতার নানান দিক থেকে হয়ত তুমি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছ—তাতে সম্ভবতঃ আমার প্রতি অবিচারই করা হয়েছে। আসল কথা বলতে কি, মায়ের এই আদরের চিঠি আমায় ব্যথায় আতুর করে তোলে। যখন ভাবি কত আন্তরিক ভাবে তুমি আমায় কাছে পেতে চাও তখন দুঃখ পাই মনে। অথচ এখনও তোমার মনে ব্যথা দিতে বাধ্য হব, কারণ এখনও আমি প্রস্তুত হইনি।

প্রথমতঃ, এখনও প্যারিস ছাড়তে সাহস পাচ্ছি না, কারণ আমার একখানা বই (গর্ডন পিম) ছাপা হচ্ছে। জান ত, সব বিষয়ে আমি কী ভীষণ এবং নিখুঁত যত্ন নি'……

তার পর যে ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দিন কাটছে তার কথা এক মুহূর্ত ভাব—বার জন্যে একটুও সময় নেই। যাবার আগে যে অসংখ্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে তার অবসর কই? (এই মাসের গোড়াতে গ্রেপ্তার এড়াতে প্রায় এক সপ্তাহ নষ্ট করতে হয়েছে—সমস্ত পাণ্ডুলিপি অসমাপ্ত অবস্থায় বাড়ীতে ফেলে রেখে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার জীবনের শত-সহস্র বিপর্যয়ের এটি একটি নমুনা মাত্র।)

সুখকে হাতের মুঠোর ভেতরে পেয়েও ধরতে না পারা কী ভয়ংকর বল ত? কেবল নিজেই সুখী হওয়া নয় আর এক জনের জীবনও সুখময় করে তোলা, যার কাছে এ সুখের জন্য ঋণী আমি।

কিন্তু তার বদলে দুঃখে ভরে তুলতে হবে জীবন—তুমি হয়ত তা ঠিক বুঝতে পারবে না। যখন হাজারো রকমের দুশ্চিন্তা ও দুর্ভোগে স্নায়ু দুর্বল, তখন মহৎ সংকল্প সত্ত্বেও দুষ্টু সরস্বতী প্রতিদিন সকালে মস্তিষ্কে অনুপ্রবেশ করে বলে—'আর একটা দিন সব ভুলে থেকে বিশ্রাম নাও না কেন? রাত্রে এক দমকায় সব কাজ শেষ করে দেব।' তার পর রাত আসে; তখন অসমাপ্ত কাজের বহর দেখে মাথা ঘুরতে থাকে। গভীর বিষাদে কর্মবিমুখতা আনে। পরের দিনও আবার যথাপূর্ব একই প্রহসনের পুনরাবৃত্তি চলে—সেই শুভ সংকল্প, সেই সাধুতা—সেই অচল আস্থা।

কিন্তু এই অভিশপ্ত নগরী থেকে যেখানে এত দুঃখভোগ করছি এবং এত সময় নষ্ট করছি যেখানে—সেখানে থেকে পালিয়ে যেতে আন্তরিক কামনা করছি। কে বলতে পারে, অঁফ্লুরে সুখ ও শান্তির ছায়ায় আবার মন তারুণ্যে উজ্জীবিত হয়ে উঠবে না? দু'টি নাটক ও অনেকগুলি উপন্যাসের প্লট মাথায় আছে। অতি সাধারণ যশের স্বপ্ন আমি দেখি না—বায়রন, বালজ্যাক, সাতোঁব্রিয়ারের মত সবাইকে বিস্মিত, অভিভূত করে দিতে চাই। হায়! যখন ছোট ছিলাম তখন যদি সময়, স্বাস্থ্য, অর্থের মূল্য বুঝতাম? আর এই অভিশপ্ত ফ্ল্যুর্স যা আমায় এখনও লিখতে হবে? কিন্তু তার জন্যেও তো মনের শান্তি চাই। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে কৃত্রিম উপায়ে আবার কবি হওয়া—খনিত, পরিসমাপ্ত পথে আবার ফিরে আসা—নিঃশেষিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা—মেনে চলতে হবে তিন জন ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ! একটুও বাড়িয়ে বলছি না,—আমি বিশ্বাস করি, অঁফ্লুরে দু'বছর কঠোর পরিশ্রম করলেই আমি আমার সকল ঋণ শোধ করে ফেলতে পারব। অর্থাৎ এখানকার চেয়ে তিন গুণ বেশী উপায় করতে পারি আমি। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য, এক বছর আগে কেন তুমি এই প্রস্তাব করলে না যখন আমি এমন বাধা-বিপত্তিতে জড়িয়ে পড়িনি এমন গভীর ভাবে?

যাক্, আবার আমার সুখ-পরিকল্পনার গল্পে ফিরে আসা যাক—আবার আমি শুধু পড়া—পড়া—পড়া নিয়ে ডুবে থাকতে পারব! আমার লেখার বিঘ্ন না করেই! মনকে আবার চাঙ্গা করে তুলতে আমার সকল সময় কাটাব। তোমায় মা সত্যিই করে বলছি, নিজের নির্বুদ্ধিতা, নানা বিপর্যয়ের দরুণ লেখাপড়া এমন নিষ্ঠুর, এমন দুঃখজনক ভাবে ব্যাহত হয়েছে। যৌবনও দ্রুত শেষ হতে চলেছে। মাঝে-মাঝে কালের গতির দিকে আতংকিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। ঘণ্টা আর মুহূর্তের সমন্বয়ে বছর। মানুষ যখন সময় নষ্ট ক'রে সময়ের ভগ্নাংশটাই দেখে, তখন যোগফলের দিকে তাকায় না।

অনেক ভাল ভাল পরিকল্পনা আছে—সেগুলি সম্পন্ন করা খুব যে অসম্ভব, মনে হয় না। আর অঁফ্লুরে বাজে ওজরেরও বালাই থাকবে না।

চিঠি পড়ে যেন মনে ক'রে বসো না যে, স্বার্থে প্রবুদ্ধ হয়ে লিখছি। আমার ভাবনার প্রধান অংশ হোল—আমার মা আমায় জানে না, মা আমায় দেখেনি—একসঙ্গে থাকারও সুযোগ হয়নি আমাদের। তবুও কয়েকটি বছর একত্রে সুখে কাটাবো! সাড়ে চারটে বাজে—বিদায়। কল্পনায় তোমার হৃদয় থেকে চুমু দিলাম। চিঠিখানা অতি লজ্জাজনক ভাবে কাটাকুটি হোল কিন্তু বড় বড় গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছি যাতে না পড়তে তোমার কষ্ট হয়।

[কিন্তু ঋণের অঙ্ক ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে—জীন দুভালও তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করে—তাঁর সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে পালায়। শেষ পর্যন্ত দেহে পক্ষাঘাত দেখা দেয় বোঁদেলিয়ারের—ছেচল্লিশ বছর বয়সে মারা যান তিনি। অনুবাদ ছাড়াও বোঁদেলিয়ার 'ফ্ল্যুর্স দু মাল' আরো বাড়িয়েছেন—কবিতাগুলির গদ্য রূপান্তরও করেছেন এবং লিখেছেন বহু সমালোচনা প্রবন্ধ। ওয়াগনার, সাতোব্রিয়ঁা, দেলাক্রোয়া, মানে'র প্রতিভার দুন্দুভিনাদ প্রথম যাঁরা করেছেন বোঁদেলিয়ার তাঁদের অন্যতম।]

প্রতিবাদ পত্র

['ইংলিসম্যানে'র সম্পাদক ওয়াল্টার ব্রেটকে জাতিতে হাঙ্গেরীয় বলা হয়েছিল 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায়। ব্রেট নীলদর্পণকে "কুরুচিপূর্ণ জঘন্য সাহিত্য" আখ্যা দিয়েছিলেন। রবার্ট নাইট ছিলেন 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার' সম্পাদক। ব্রেটের মতিগতি দেখে ব্রেটকে ইংরেজ নয় মনে করেছিলেন। ব্রেট চ'টে গিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন, রবার্ট নাইটও উত্তর দিয়েছিলেন।]

দি ইংলিসম্যান
কলিকাতা, ২১শে আগষ্ট, ১৮৬১

'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া' সম্পাদক সমীপেষু—

মহাশয়, আপনাদের ১০ই তারিখের পত্রিকার একটি প্রধান প্রবন্ধে আমার নাম উল্লেখ করিয়া বিশেষ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন দেখিলাম, কিন্তু কোন্ যুক্তিতে জানি না, আমার নামের সহিত এমন একটি গুণ সংযোজিত করিয়াছেন, যাহার উপর আমার বিন্দুমাত্র দাবী নাই। কোন্ তথ্যের ভিত্তিতে আপনারা আমাকে হাঙ্গেরীয় (হাঙ্গেরীর অধিবাসী) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন জানি না। ইহা একেবারেই মিথ্যা। আমি একেবারে খাঁটি ইংরাজ এবং সে জন্য গর্ব অনুভব করি বলিয়া অকারণে জন্মাধিকারচ্যুতি মোটেই অনুমোদন করি না। সুতরাং ইংরাজ বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী হাঙ্গেরীয় বলিয়া আপনারা আমার সম্বন্ধে যে অযৌক্তিক এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত রায় দিয়াছেন, সৌজন্যের খাতিরে (যে সৌজন্যের কোন অভাব আমার দিক হইতে পরিলক্ষিত হয় নাই) তাহার যথোপযুক্ত প্রতিবাদ ছাপিলে বাধিত হইব।

আপনাদের
ওয়াল্টার ব্রেট
ইংলিসম্যানের সম্পাদক।

টাইম্স্ অফ ইণ্ডিয়া অফিস
বোম্বাই, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬১

ওয়াল্টার ব্রেট মহাশয়,
কলিকাতার ইংলিসম্যান পত্রিকার সম্পাদক।

মহাশয়,—

কোন্ দেশ আপনাকে জন্ম দিয়া ধন্য হইয়াছে, সে সম্পর্কে কলিকাতায় যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া শুনিয়াছিলাম এবং সম্প্রতি জানিতে পারি, সাধারণ লোকের ধারণা, আপনি ইংরাজ নন, হাঙ্গেরীয়।

আপনি নিজেকে ইংরাজ বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন, সাধারণ

অবস্থায় বিনা দ্বিধায় তাহা মানিয়া লইয়া আপনার অভিলাষ অনুযায়ী সংশোধন প্রকাশ করিতাম, কিন্তু আপনিই বলুন, নীলদর্পণ পুস্তিকার বক্তব্য সংশোধনের কোন উপায় পাঠকের নাই—ইহা সম্পূর্ণ ভাবে জানা সত্ত্বেও যে লেখক সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাহাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে, উহা "কুরুচিপূর্ণ জঘন্য সাহিত্য" (নীলদর্পণ), তাহার উপর বেশী বিশ্বাস স্থাপন করা যায় কি? আপনি সত্যের প্রতিও অনুরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া রেভারেণ্ড জেম্স্ লঙের বিরুদ্ধে নীলদর্পণ মানহানি মামলায় বিচারকের অভিযোগের বিকৃত বিবরণ বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরণ করিয়া উহাকে তাহার মুক্তির প্রকৃত এবং বিশ্বস্ত বিবরণ বলিয়া চালাইয়াছেন। যে সমস্ত উদাহরণ দিলাম, তাহার পর আর কেমন করিয়া বুঝিব যে, নিজের মাতৃভূমি সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিতে আপনি ইতস্তত করিবেন?

আপনার কোন কোন সহযোগী যে পরিমিত বৃত্তি, ধৈর্য্য ও ন্যায় প্রীতি দেখাইয়াছেন, তাহাকে আপনি ভুলক্রমে ইংরাজ-চরিত্রবিরোধী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন দেখিলাম এবং এইরূপ মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে, জাতীয় চরিত্রের সহিত আপনার সঠিক পরিচয় নাই বলিয়াই আপনি এইরূপ ভুল করিয়াছেন।

আপনার বিশ্বস্ত সেবক
রবার্ট নাইট।

প্লিনির চিঠি

[সিসেরোর মত কনিষ্ঠ প্লিনিও রোমের এক জন বিদগ্ধ আইনবিদ্ ভূস্বামী। সিসেরোর মত তাঁরও পত্রগুলি ভাবীকালের পাঠকদের উদ্দেশ্যে রচনা করা। কতকগুলি পত্র হয়ত আদৌ প্রেরিত হয়নি এবং সেগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সতর্কতা সহকারে রচিত। প্লিনির জীবন নানা ঘটনা-সমৃদ্ধ ধনকুবেরের জীবন। আদালতে তিনি উপস্থিত হোতেন তখনই যখন মোটা টাকা ফী পেতেন মক্কেলদের কাছ থেকে এবং দীর্ঘ বক্তৃতা দেবার সুযোগ মিলত। তিনি নির্জনতা-বিলাসী আয়েসী লোক ছিলেন। তাঁর বন্ধু-সংখ্যা ছিল পরিমিত এবং সুনির্বাচিত। তিনি রাজনীতি করতেন ঠিক ততখানি যতখানি করলে নিজের শান্তিময় জীবনে কোনপ্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়, অথবা শত্রুসংখ্যাও না বাড়ে।

ট্যাসিটাস যখন তাঁর Histories নামক পুস্তকখানির জন্য মাল-মশলা সংগ্রহ করছিলেন, তখন নিশ্চয়ই বন্ধু প্লিনির সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এ বিষয়ে। বিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। প্লিনি নিজেই এক জন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না, তাঁর খুল্লতাত জ্যেষ্ঠ প্লিনি আগ্নেয়গিরি উত্থিত বিষাক্ত বাষ্পে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। নীচের এই অনবদ্য চিঠিখানিতে সেই নিদারুণ অগ্ন্যুৎপাতের করুণ কাহিনী অতি স্বচ্ছ ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে—যে অগ্ন্যুৎপাতে প্রসিদ্ধ পম্পাই নগরী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, ভূগর্ভে প্রোথিত হয়েছিল।]

সি. এ. ভি. ১০০

খুল্লতাতের জীবনাবসানের একটি বিবরণী লিখিয়া জানাইবার যে অনুরোধ করিয়াছেন যাহাতে ভাবীকালের সহিত ইহার একটি সঠিক সম্পর্ক নির্ণীত হইতে পারে—সে-অনুরোধ আমি নতমস্তকে গ্রহণ করিতেছি। যদি আপনার লেখনীর যাদু স্পর্শে তাঁহার মৃত্যু-আখ্যানকে বিশ্রুত করিতে চান, আমার ধারণা, সে গৌরব চিরকাল অম্লান, শাশ্বত হইয়া থাকিবে। তিনি এক অভূতপূর্ব অচিন্ত্য ভয়াল সুন্দর বিধ্বংসের সময় জনসাধারণের সহিত একত্রে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছেন এবং ইহা এমন একটি অবিস্মরণীয় মহা সর্বনাশ যে, ইহাই তাঁহাকে অমরত্ব দান করিবে। যদিও তিনি নিজেই বহু চিরস্মরণীয় সৃষ্টির জনক, তথাপি আপনার অবিস্মরণীয় রচনায় তাঁহার উল্লেখ যে তাঁহার স্মৃতিকে পরিপূর্ণ অমরত্ব দান করিবে, আমি এ বিশ্বাসে প্রণোদিত হইতেছি।

পুস্তকে গ্রন্থন করিয়া রাখার মত অথবা পাঠযোগ্য রচনা সৃষ্টি করিবার প্রতিভা ভূষিত করিয়াছেন ভাগ্য যাঁহাদের, তাঁহাদের শ্রদ্ধা জানাই। তাঁহারা ইহজগতে সুখী। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সুখী তাঁহারাই যাঁহারা এই দুই প্রতিভার সমন্বয় সাধন করিয়াছেন নিজ জীবনে। খুল্লতাত নিজের এবং আপনার লেখনের গুণে এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য। কাজেই ঐকান্তিক ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া আমি এই মহান্ কর্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হইলাম।

খুল্লতাত তখন তাঁহার রণ-বহর সমভিব্যাহারে Misenum এ অবস্থান করিতেছিলেন। ২৪শে আগষ্ট অপরাহ্ণ এক ঘটিকার সময় আমার মা আকাশে অস্বাভাবিক বৃহৎ একখণ্ড মেঘের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। সেই মুহূর্তে তিনি রৌদ্রতাপিত দেহ শীতল জলে স্নিগ্ধ করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপনান্তে পাঠকক্ষে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাদুকা আনয়নের আদেশ দিলেন এবং একটি সুউচ্চ স্থানে অধিরোহণ করিলেন, যেখান হইতে এই অভূতপূর্ব দৃশ্য স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যাইবে। ঠিক কোন্ পর্বত হইতে ধূম উদ্গীরণ হইতেছিল সেই দূরত্ব হইতে তাহা বুঝা যাইতেছিল না, কিন্তু পরে জানা গিয়াছিল যে, উহা বিসুভিয়াস। আমি উহার আকার সঠিক বর্ণনা করিতে পারিব না—তবে এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, উহা দেখিতে অনেকাংশে একটি পাইন বৃক্ষের মত। কাণ্ডের ন্যায় অনেকটা উচ্চে উঠিয়া কয়েকটি শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত। আমার ধারণা, হঠাৎ ঝটিকায় ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পরে ঋজু পথ পরিত্যাগ করিয়া সমান্তরাল ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, অথবা নিজের ওজনের চাপে এই ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া পূর্বোক্ত দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে। এক সময় ধূম্রজাল শ্বেতকায় প্রতীয়মান হইতেছিল, আবার পর-মুহূর্তে মসীময় প্রতিভাত হইতেছিল যেন মৃত্তিকা ও তপ্তাঙ্গার রহিয়াছে উহাতে।

খুল্লতাত প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি এই দৃশ্যপটকে গুরুত্বপূর্ণ ও নিকট হইতে পর্যবেক্ষণযোগ্য মনে করিলেন। তিনি একটি হাল্কা ধরণের জলযান প্রস্তুত রাখিতে আদেশ দিলেন এবং যদি উপযুক্ত মনে করি আমাকেও তাঁহার সঙ্গে যাইবার স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। আমি বলিলাম, আমি বরং পাঠরতই থাকিব, কারণ তিনি নিজেই একটি বিষয় লিখিবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যখন বহির্গত হইতেছিলেন বেসাসের স্ত্রী রেকটিনা তাঁহাকে একখানি লিপিতে জানাইলেন যে, এই আসন্ন বিপদ আশংকায় তাঁহারা অত্যন্ত ভয়ার্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার গৃহটি আমাদের গৃহের ঠিক নীচেতেই অবস্থিত এবং সমুদ্রপথ ভিন্ন পলায়নের দ্বিতীয় পথ ছিল

না। এই ভীষণ বিপদে সাহায্য করিবার জন্ম তাঁহাদের কাতর অনুনয়ের পরিণামে তাঁহাকে প্রথম পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইল। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু হইয়া প্রথমে যাহা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন নির্ভীকতার সহিত এবার তাহা সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। তিনি বড় বড় দাঁড়-টানা জাহাজ জলে ভাসাইতে আদেশ দিলেন। রেকটিনা এবং অন্যদেরও সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং একটিতে আরোহণ করিলেন। সেই রমণীয় নদীতটে গৃহগুলি অতি ঘন সন্নিবেশিত ছিল। যেখান হইতে সকলে পলাইতেছে সেখানে উপস্থিত হইয়া অকুস্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি এমনিই নিঃশঙ্ক চিত্ত ছিলেন যে, এই ভয়াবহ দৃশ্যের দ্রুত পরিবর্তন ও বিন্যাস সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশ দান করিয়াছিলেন।

এইবার যতই তিনি নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন তপ্ত ধাতব-খণ্ড সকল দ্বিগুণ উত্তপ্ত হইয়া মুষলধারে জাহাজের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল—তার পর মসীময় তপ্ত ঝামা পাথর ও কুচিকুচি শিলাখণ্ড অগ্নির সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িতে লাগিল। হঠাৎ জাহাজের তলদেশ হইতে সমুদ্রের জল যেন ভাঁটার টানে দূরে অপসৃত হইল—গিরিগাত্র হইতে স্খলিত ভূখণ্ডে পথ অবরুদ্ধ হইতে লাগিল। এবার প্রত্যাবর্তন উচিত কি না বিচার করিয়া তিনি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—'ভাগ্য সাহসীর গলায় বরমাল্য পরান। আমাকে পম্পোনিয়ানাসের নিকট লইয়া চল।' পম্পোনিয়ানাস তখন Stabiaeতে অবস্থান করছিলেন। Stabiaeর দূরত্ব উপসাগরের প্রস্থের অর্ধেক। তটভূমিতে সে ইতিমধ্যে তাহার মালপত্র নামাইয়াছিল—Stabiaeতে তখনও বিপদের সম্ভাবনা না থাকিলেও স্থানটি নৈকট্য হেতু সমূহ বিপদসংকুল এবং যে কোন মুহূর্তে বিপদপাত অবশ্যম্ভাবী। প্রতিকূল বায়ু বন্ধ হইলেই তিনি পলায়নের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি তাহার ভয়ার্ত বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়া সান্ত্বনা দিলেন, সাহস দিলেন এবং নিজের নিরুদ্বিগ্নতার দ্বারা তাহার ভয় প্রশমিত করিবার জন্ম স্নানাগারে গমন করিলেন, স্নান সমাপন করিয়া পরম আনন্দে বা আনন্দের ভাণ করিয়া (ইহাও কম সাহসিকতার পরিচায়ক নয়) আহারে উপবেশন করিলেন।

ইতিমধ্যে বিসুভিয়াস আর একটি স্থানে অনল বর্ষণ শুরু করিল —ভ্রূকুটি-কুটিল বিস্তীর্ণ অনলশিখার তীব্র দ্যুতিময় ঔজ্জ্বল্যে রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইল। কিন্তু খুল্লতাত ভয় নিরসনকল্পে বলিতে লাগিলেন—আতংকগ্রস্ত লোক-জনেরা হয়ত আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়া গিয়াছে—তাহারা যাহা দেখিতেছে উহা পরিত্যক্ত এলাকার সমস্ত গৃহাদির অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই বলিয়া তিনি বিশ্রামের জন্ম অবসর গ্রহণ করিলেন এবং এ-ও সুনিশ্চিত যে, বিশ্রাম অর্থেই তিনি প্রগাঢ় নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। কারণ স্থূলকায় বলিয়া তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস বেশ গাঢ় হইয়া পড়িতেছিল এবং তাঁহার নাসিকা গর্জন করিতেছিল।

যাঁহারা দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান ছিলেন তাঁহারা এই নাসিকা-ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। তাঁহার কক্ষে যাইবার চত্বরটি ঝামা পাথর আর ছাইয়ে এমন আচ্ছাদিত হইয়া গেল যে, আর অধিক সময় শয়নকক্ষে অবস্থান করিলে বহির্গমনের পথ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। নিদ্রোত্থিত করায় তিনি বাহিরে আসিয়া পম্পোনিয়ানাস ও অন্যান্যদের সহিত যোগদান করিলেন—তাঁহারা সারা রাত্রি জাগিয়াছিলেন। গৃহেই অবস্থান করিবেন, না উন্মুক্ত প্রান্তরে চলিয়া আসিবে ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল। কারণ এইবার গৃহ ভীষণ ভূকম্পনে কাঁপিতেছিল—মনে হইতেছিল যেন মূলচ্ছিন্ন হইয়া ধরাশায়ী হইবে। উন্মুক্ত প্রান্তরে আবার হাল্কা ও সচ্ছিদ্র হইলেও ঝামা পাথর বর্ষণের ভয় রহিয়াছে। কিন্তু তুলনায় ইহাও কম ভীতিসংকুল বিবেচিত হইল—খুল্লতাত যুক্তির দ্বারা আর অন্যেরা ভয়কে সংহত করিয়া পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। তাঁহারা তখন বস্ত্রখণ্ডে মাথায় শিরোপা বাঁধিয়া বাহিরে আসিলেন—বস্তুতঃ আক্ষিপ্ত প্রস্তরবৃষ্টির হাত হইতে আত্মরক্ষার এই একটি মাত্র অবলম্বনই তাঁহাদের ছিল।

ভোর হইল, কিন্তু তখনও অন্ধকারতম নিশার অপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকার চারি দিকে জমাট বাঁধিয়াছিল, যদিও মশাল ও অন্যান্য বহুবিধ আলোকের সাহায্যে এই অন্ধকার কথঞ্চিৎ বিদূরিত হইয়াছিল। সমুদ্রে আশ্রয় লওয়া যায় কি না দেখিবার জন্য তাঁহারা তটাভিমুখে গমন করিলেন, কিন্তু সেখানে আসিয়া দেখিলেন সমুদ্র বিপুল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ। এই সময় খুল্লতাত একটি অব্যবহৃত জলযানে শুইয়া পড়িয়া বারংবার জল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অগ্নিবর্ষণের পরই তীব্র গন্ধকের গন্ধ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। অবশিষ্ট সকলে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। আমার খুল্লতাতকেও ডাকিয়া উঠান হইল। দুই জন ক্রীতদাসের সাহায্যে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইলেন। এক অস্বাভাবিক ভারী গ্যাস তাঁহার শ্বাসনালীর গতিপথ অবরুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠনালী দীর্ঘকাল রোগগ্রস্ত হইলেও দুর্বল বা জীর্ণ ছিল না। প্রভাত-আলোক ফুটিয়া উঠিলে দেখা গেল, তাঁহার পোষাকাচ্ছাদিত সম্পূর্ণ ও অনাহত দেহ পড়িয়া আছে—যেন দেহে তখনও প্রাণ আছে, যেন তিনি মরেন নাই, ঘুমাইয়া আছেন মাত্র।

মা ও আমি তখন মাইসেনামে ছিলাম। কিন্তু ইহার সহিত ইতিহাসের বা খুল্লতাতের মৃত্যুর অধিক কোন প্রশ্নের সহিত সম্পর্ক না থাকায় এইখানেই পত্র শেষ করিলাম। তবে এইটুকু মাত্র যোগ করিতে চাই যে, যাহা আমি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং যাহা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি যখন সংবাদের সত্যতা নির্ভুল থাকে—তাহাই অতি বিশ্বস্ত ভাবে বিবৃত করিয়াছি। তোমার কার্যের পক্ষে যেটি উপযোগী বিবেচিত হইবে বাছিয়া লইও—কারণ পত্র ও ইতিহাসের মধ্যে, বন্ধুকে লেখা ও জনসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। বিদায় ইতি।

[খুল্লতাতের বৈজ্ঞানিক অভিযানে সঙ্গী হবার আহ্বান পেয়েও অধ্যয়নের অজুহাতে তাঁর অনুগমন না করে কনিষ্ঠ প্লিনি গৃহে অবস্থান করেছিলেন এবং এই ভাবে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। এর আগেও ট্যাসিটাসকে লেখা একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন, বন্য বরাহ শিকারে প্রচুর উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও বীটারগণ যখন বন ভাঙতে সুরু করে, তখনই তিনি শিকার ছেড়ে অভিযানের প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ সংগ্রহ করেন। বস্তুতঃ প্লিনি ছিলেন অত্যন্ত অলস প্রকৃতির ও কর্মবিমুখ। উত্তরকালে তিনি বিথিনিয়ার প্রদেশপাল হয়েছিলেন এবং দু'বছর অতিবাহিত হতে না হতেই কঠোর পরিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে অবসর গ্রহণে বাধ্য হন।]

বৈষ্ণব কবিতা

(দ্বাদশ শতক)

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

জয়দেব কবির গীতগোবিন্দ কাব্যখানি সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা বিস্ময় রহিয়াছে, কি করিয়া গড়িয়া উঠিল দ্বাদশ শতকে রাধাকৃষ্ণ অবলম্বনে এমন পূর্ণাঙ্গ মণ্ডলকলাসমৃদ্ধ কাব্য! কিন্তু একটু সন্ধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব, আমাদের এই বিস্ময় কত অহেতুক। রাধা-কৃষ্ণকে লইয়া যে বৈষ্ণব-সাহিত্যের ধারা তাহা জয়দেবের বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই আবর্তিত হইয়া আসিয়াছে; পুরাণাদির কথা ছাড়িয়াই দিলাম, প্রাচীন সাহিত্যের ভিতরেই এই ধারার স্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই প্রাচীন ধারাটি দ্বাদশ শতকে বাঙলা দেশে একটি বিশেষ সমৃদ্ধ পরিণতি লাভ করিয়াছিল, আমরা জয়দেবের গীতগোবিন্দের ভিতরে এই পরিণতিরই সুষ্ঠ প্রকাশ দেখিতে পাই। জয়দেবের সময়ে বাঙলা দেশে বা বৃহত্তর বঙ্গে সত্যই একটা সাহিত্যের যুগ গড়িয়া উঠিয়াছিল। জয়দেব নিজেই তাঁহার কাব্যে উমাপতিধর, শরণ, গোবর্ধনাচার্য এবং ধোয়ী প্রভৃতি কবির উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই কবিগোষ্ঠী বাঙলার সেন-রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেনরাজাগণ বৈষ্ণব ছিলেন, সেই কারণেই হয়ত এই যুগের কাব্যে বৈষ্ণবতাও একটা প্রধান স্থান লাভ করিল। বাঙলা দেশের বাহিরেও এই সময়ে কৃষ্ণের গোপীগণ সহ নর্মলীলাকে অবলম্বন করিয়া যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, আমরা এই প্রসঙ্গে তাহার প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে পারি। সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতকে রচিত লীলাশুকের 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃত' গ্রন্থখানি এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।(১)

জয়দেবের গীতগোবিন্দকাব্য সম্বন্ধে আমাদের এতখানি বিস্ময়ের কারণ এই, আমরা মনে করি, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করিয়া ঐ যুগে একমাত্র জয়দেব কবিই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের এ ধারণা সত্য নহে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করিয়া জয়দেবের সমসাময়িক কবিগণও অনুরূপ কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কবিতা শ্রীধরদাসের 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' গ্রন্থে (ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে সঙ্কলিত) এবং রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী' গ্রন্থে সংগৃহীত রহিয়াছে। এক 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' গ্রন্থখানিতেই জয়দেব, তাঁহার পূর্ববর্তী এবং তাহার সমসাময়িক বহু কবির রচিত বৈষ্ণব কবিতা—এমন কি, রাজা লক্ষ্মণ সেন এবং তৎপুত্র কেশব সেন রচিত বৈষ্ণব কবিতাও সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার ভিতরে গীতগোবিন্দে নাই এমন রাধা-কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক জয়দেব-রচিত পদও পাওয়া যায়। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ে জয়দেব যে শুধু গীতগোবিন্দ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ে অন্যপ্রকার কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। রাধা-কৃষ্ণ প্রেম-বিষয়ক ছাড়া জয়দেব-রচিত অন্য প্রকীর্ণ কবিতাও এই সংগ্রহ-গ্রন্থে পাওয়া যায়, অবশ্য এই সব জয়দেবই যদি একই কবি হন।

সদুক্তি-কর্ণামৃতে যে-সকল বৈষ্ণব কবিতা উদ্ধৃত আছে তাহার ভিতরে বিবিধ কবির শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য এবং মধুর প্রায় সব রসের কবিতাই পাওয়া যায়। ইহার ভিতরে মধুর রসের কবিতাগুলির সহিত বাৎসল্য রসের কবিতাগুলিও ভাব এবং প্রকাশভঙ্গির চমৎকারিত্বের জন্য উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণের কৌমারলীলার দুই-একটি পদের সহিত পরবর্তী কালের গোষ্ঠ কবিতার সাদৃশ্য বেশ লক্ষ্য করিতে পারি। নমুনা-স্বরূপে দুই-একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি।—

> বৎস স্থাবরকন্দরেষু বিচরংশ্চারপ্রচারে গবাং
> হিংস্রান্ বীক্ষ্য পুরঃ পুরাণপুরুষং নারায়ণং ধ্যাস্যসি।
> ইত্যুক্তস্য যশোদয়া মুররিপোরব্যাজ্জগন্তি স্ফুর-
> দ্বিম্বোষ্ঠদ্বয়গাঢ়পীড়নবশাদব্যক্তভাবং স্মিতম্। অভিনন্দ।

'হে বৎস, পর্বতকন্দরে গোচারণভূমিতে যখন বিচরণ করিবে তখন যদি সম্মুখে কোন হিংস্র পশু দেখ তবে পুরাণপুরুষ নারায়ণকে ধ্যান করিবে। যশোদা এই বলিলে, মুরারি কৃষ্ণের স্মিতহাস্য স্ফুরৎ বিম্বোষ্ঠদ্বয়ের গাঢ়পীড়ন বশে একটি অব্যক্ত ভাব ব্যঞ্জিত করিয়াছিল, তাহা সকল জগৎকে রক্ষা করুক।'(২)

কৃষ্ণের প্রতি স্নেহময়ী যশোদার এই জাতীয় সাবধান-বাণী আরও অনেক পদে পাওয়া যায়। যেমন—

> মা দূরং ব্রজ তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি পুরস্তে লূনকর্ণো বৃকঃ
> পোতানত্তি ইতি প্রপঞ্চচতুরোদারা যশোদাগিরঃ। ইত্যাদি,
> কস্যচিৎ।

ময়ূর-কবির একটি পদে দেখি, ঘুমের ভিতরে বাল-কৃষ্ণ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব প্রভৃতি দেবতাগণকে আহ্বান করিয়া কথা বলিতেছে; মাতা যশোদা তাহার বাল-পুত্র ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করিয়া কি বলিতেছে বলিয়া থুৎকার দিতেছেন। পরবর্তী কালের হিন্দী কবি সুরদাসের বাৎসল্য রসের পদগুলির ভিতরে এই সকল পদের আশ্চর্য ছায়া লক্ষ্য করিতে পারি। জয়দেবের সমসাময়িক কবি উমাপতিধরের কৃষ্ণের কৌমারলীলা বিষয়ক পদে দেখিতে পাই, কৃষ্ণ কুমার অবস্থায় কালিন্দী-পুলিনে অথবা শৈলে বা উপশল্যে (গ্রামের প্রান্তে) অথবা বটবৃক্ষের তলে যেমন ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তেমনি রাধার পিতার প্রাঙ্গণেও আনাগোনা করিয়া বেড়াইতেন। অন্বেষণরতা এক গোপিনীকে তাই বলিতে শুনি—

> কালিন্দীপুলিনে ময়া ন ন ময়া শৈলোপশল্যে ন ন
> ন্যগ্রোধস্য তলে ময়া ন ন ময়া রাধাপিতুঃ প্রাঙ্গণে।
> দৃষ্টঃ কৃষ্ণ ইতি। ইত্যাদি।

উমাপতিধরের হরিক্রীড়ার আর একটি মধুর পদ পাইতেছি। কৃষ্ণ যখন পথ দিয়া যাইতেছিল, তখন কোন গোপ-রমণী তাহাকে ভ্রূবল্লী চলনের দ্বারা, কোন গোপী নয়নোন্মেষের দ্বারা, কোনও গোপী ঈষৎ হাসির জ্যোৎস্না-বিচ্ছুরণের দ্বারা গোপনে কৃষ্ণকে সম্ভাষণ জানাইতেছিল; রাধা হয়ত দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়াছে, ইহাতে গর্বজনিত অবহেলায় রাধার আনন বিনয়শ্রী ধারণ করিয়াছিল; ওদিকে আবার এই বিনয়শোভাধারী রাধার মুখে যে কংসারি-কৃষ্ণের দৃষ্টিপাত, তাহার ভিতরেও আসিতেছে আতঙ্ক এবং অনুনয়!

---

(১) 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃতে'র রচনাকাল সম্বন্ধে বিতর্ক রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীধরদাসের 'সদুক্তি-কর্ণামৃতে' 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃত' হইতে যখন শ্লোক উদ্ধৃত রহিয়াছে তখন এই গ্রন্থের রচনাকাল দ্বাদশ শতকের পরবর্তী কিছুতেই নহে।

(২) কিঞ্চিৎ পাঠান্তর সহ 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে'ও উদ্ধৃত আছে।

ভ্রূবল্লীচলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত-
জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিতস্যাধ্বনি।
গর্বোদ্ভেদকৃতাবহেলবিনয়শ্রীভাজি রাধাননে
সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ।

এই কবির আর একটি পদে দেখি, আভীরবধূ রাধাকে লইয়া নির্জনে কৃষ্ণের বিহারের ইচ্ছা; অথচ গোপকুমারগণকেও সঙ্গছাড়া করা যাইতেছে না, এ অবস্থায় কৃষ্ণ গোপকুমারগণকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তমাললতাগুলিতে সাপ ভরা, বৃন্দাবনও বানরে ভরিয়া গিয়াছে, যমুনার জলে আছে কুমীর, আর গিরির সন্ধিতে আছে ঘোরবদন সব ব্যাঘ্র; গোপবালকগণের প্রতি এই কথা বলিয়া নয়নের আকুঞ্চনরূপ ইঙ্গিতের দ্বারা তিনি মিলনতৃষিত আভীরবধূ রাধাকে নিষেধ জানাইতেছেন।

ব্যালাঃ সন্তি তমালবল্লীষু বৃতং বৃন্দাবনং বানরৈ-
র্নক্রং যমুনাম্বু ঘোরবদনব্যাঘ্রা গিরেঃ সন্ধয়ঃ।
ইত্থং গোপকুমারকেষু বদতঃ কৃষ্ণস্য তৃষ্ণোত্তর-
স্মেরাভীরবধূনিষেধি নয়নস্যাকুঞ্চনং পাতু বঃ।

লক্ষ্মী, রুক্মিণী আদির প্রেম হইতে রাধা-প্রেম যে শ্রেষ্ঠ এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদক কতকগুলি পদ সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত আছে; তাহার ভিতরে উমাপতিধরের রচিত (৩) একটি পদে দেখি, রাধার অহেতুক রোষ প্রশমিত করিবার জন্য শার্ঙ্গধর স্বপ্নের ভিতরে যখন কথা বলিতেছিলেন তখন কমলা (পাঠান্তরে রুক্মিণী) তাহা শুনিতে পাইয়া সব্যাজে শার্ঙ্গধরের কণ্ঠ হইতে তাহার বাহুযুগল শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন।

এই কবির আর একটি পদে কৃষ্ণের যে বেণুরবে গোষ্ঠ হইতে গাভী সকল গৃহে ফিরিয়া আসে, যে বেণুরব গোপনারীগণের চিত্তহরণে সিদ্ধমন্ত্রস্বরূপ, যে বেণুরবে বৃন্দাবনের রসিক মৃগগণের মন সানন্দে আকৃষ্ট হয়, সেই বেণুরবের জয়গান করা হইয়াছে; এবং সেই বেণুনাদ হইতেই সকল সৌভাগ্যের প্রার্থনা করা হইয়াছে।—

সায়ং ব্যাবর্তমানাখিলসুরভিকুলাহ্বানসঙ্কেতনামা-
ন্যাভীরীবৃন্দচেতোহঠহরণকলাসিদ্ধমন্ত্রাক্ষরাণি।
সৌভাগ্যং বঃ সমন্তাদ্দধতু মধুভিদঃ কেলিগোপালমূর্তেঃ
সানন্দাকৃষ্টবৃন্দাবনরসিকমৃগশ্রেণয়ো বেণুনাদাঃ।

অভিনন্দ কবির একটি পদে নবযৌবনে উপনীত কৃষ্ণের রাধার সহিত নর্মক্রীড়ায় লুব্ধচিত্ত হইয়া—অথচ যশোদা ভয়ে ভীত হইয়া—যমুনাকূলের অতি নির্জন লতাগৃহে প্রবেশের ইঙ্গিত পাই।—

রাধায়ামনুবদ্ধনর্মনিভৃতাকারং যশোদাভয়া-
দভ্যর্ণেষ্বতিনির্জনেষু যমুনারোধোলতাবেশ্মসু। ইত্যাদি।

লক্ষ্মণ সেনের নামেও চমৎকার একটি হরিক্রীড়ার পদ পাই। লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশব সেনেরও যখন পদ পাওয়া যাইতেছে, তখন এই লক্ষ্মণ সেন রাজা লক্ষ্মণ সেন বলিয়াই মনে হয়। পদটি এই:—

কৃষ্ণ ত্বদ্বনমালয়া সহ কৃতং কেনাপি কুঞ্জান্তরে
গোপীকুন্তলবর্হদাম তদিদং প্রাপ্তং ময়া গৃহ্যতাম্।
ইত্থং দুগ্ধমুখেন গোপশিশুনাখ্যাতে ত্রপানম্রয়ো-
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি বলিতস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ।

'কৃষ্ণ, অন্য একটি কুঞ্জে তোমার বনমালার সহিত কেহ আসিয়া গোপীকুন্তলের সহিত ময়ূরপুচ্ছ একসঙ্গে করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, আমি ইহা পাইয়াছি, ইহা নাও। একটি দুগ্ধমুখ গোপশিশু এইরূপ বলিলে রাধামাধবের যে বলিতস্মেরালস এবং লজ্জানম্র দৃষ্টিসমূহ তাহাদের জয় হৌক।' লক্ষ্মণ সেন কৃত বেণুনাদের আর একটি পদ পাওয়া যাইতেছে, সেখানে তির্যকৃস্কন্ধ কৃষ্ণ তাঁহার আমীলিত দৃষ্টি গভীর আকৃতির সহিত রাধার প্রতি ন্যস্ত করিয়া বেণু বাজাইতেছেন।—

তির্যককৃকন্ধরমংসদেশমিলিতশ্রোত্রাবতংসং স্ফুর-
দ্বর্হোত্তংসিতকেশপাশমনৃজুভ্রূবল্লরীবিভ্রমম্।
গুঞ্জদ্বেণুনিবেশিতাধরপুটং সাকূতরাধানন-
ন্যস্তামীলিতদৃষ্টি গোপবপুষো বিষ্ণোর্মুখং পাতু বঃ।

লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশব সেনের রচিত একটি পদের সহিত জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুর' ইত্যাদি প্রথম শ্লোকটির মিল অতি ঘনিষ্ঠ।

আহূতাদ্য ময়োৎসবে নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা
ক্ষীবঃ প্রৈষ্যজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি।
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয়মিতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুরস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ।

'আমি আজ রাত্রিতে ইহাকে উৎসবে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি, এ ঘর শূন্য রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ভৃত্যগুলিও মাতাল; এখন এ একাকিনী কুলবধূ কি করিয়া যাইবে? বাছা, তুমি তাহা হইলে ইহাকে ইহার ঘরে লইয়া যাও। যশোদার এই কথা শুনিয়া রাধামাধবের যে মধুর স্মেরালস দৃষ্টিসমূহ—তাহাদের জয় হৌক।' গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটিকে মনে করাইয়া দিতে পারে এই জাতীয় আর একটি শ্লোক প্রাচীনতর সঙ্কলনগ্রন্থ 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়ে' পাওয়া যায়।

(……) ধেনুদুগ্ধকলসানাদায় গোপ্যো গৃহং
দুগ্ধে বষ্কয়িনীকুলে পুনরিয়ং রাধা শনৈর্যাস্যতি।
ইত্যন্যব্যপদেশগুপ্তহৃদয়ঃ কুর্বন্ বিবিক্তং ব্রজং
দেবঃ কারণনন্দসূনুরশিবং কৃষ্ণঃ স মুষ্ণাতু বঃ।

'গাভীদুগ্ধের কলস লইয়া গোপীগণ গৃহে যাও, যে গাভীগুলি এখনও দোহা হয় নাই সেগুলি দোহা হইলে এই রাধাও তোমার পরে যাইবে। অন্যব্যপদেশ হৃদয়ে গুপ্ত রাখিয়া এইরূপে ব্রজ নির্জন করিতেছেন যিনি, সেই নন্দপুত্ররূপে অবতীর্ণ দেব তোমাদের সকল অমঙ্গল হরণ করুন।'

রূপদেবের একটি পদে দেখি,—'বৃন্দা সখী অন্যান্য গোপরমণীগণের নিকটে বলিতেছে—এখানে এই নিচুল নিকুঞ্জের একেবারে অভ্যন্তর দেশে কচিঘাসের এই বিজন শয্যা কোন্ রমণীর? এই কথা শুনিয়া রাধা-মাধবের যে বিচিত্র মৃদুহাস্যসমন্বিত দৃষ্টিসমূহ তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক।' (৪) আচার্য গোপীকের একটি পদে কৃষ্ণের অভিসারের একটি চাতুর্যপূর্ণ বর্ণনা পাইতেছি। গভীর রাত্রিতে কৃষ্ণ রাধার গৃহের কাছে আসিয়া কোকিলাদির নাদের দ্বারা রাধাকে সঙ্কেত

(৩) সদুক্তি-কর্ণামৃতে কবির নাম নাই, কিন্তু 'পদ্যাবলী'তে উমাপতিধর নাম পাই।

(৪) সদুক্তি-কর্ণামৃত—হরিক্রীড়া।

করিতেছে, এদিকে সেই সঙ্কেত শুনিয়া রাধাও দ্বারমোচন করিয়া বাহিরে আসিতেছে, রাধার চঞ্চল শঙ্খবলয় এবং মেখলাখানি শুনিয়াই কৃষ্ণ রাধার বহির্গমনের কথা বুঝিতে পারিলেন। এদিকে শব্দ পাইয়া বৃদ্ধা (জটিলা কুটিলা) 'কে কে' করিয়া বার বার চিৎকার করিতেছে এবং তাহাতেও কৃষ্ণের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে; এইরূপ অবস্থায়ই কৃষ্ণের সেই রাত্রি রাধা-গৃহের প্রাঙ্গণের কোণে যে কেলিবিটপ—তাহারই ক্রোড়ে গত হইল।

সঙ্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্বতো-
দ্বারোন্মোচনলোলশঙ্খবলয়শ্রেণিস্বনং শৃণ্বতঃ।
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভজরতীনাদেন দূনাত্মনো
রাধা-প্রাঙ্গণকোণকেলিবিটপিক্রোড়ে গতা শর্বরী॥

প্রশ্নোত্তর ছলে রাধা-কৃষ্ণের শ্লেষপূর্ণ রসালাপ এবং রসিকতার নমুনা 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে'ই পাওয়া যায়। সদুক্তি-কর্ণামৃতেও এই জাতীয় কবিতা পাওয়া যায়। একটি পদে রাধা কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"এই রাত্রে তুমি কে?"—কৃষ্ণ জবাব দিল, 'আমি কেশব' (শ্লেষার্থে কেশবহন করে যে); 'মাথার কেশের দ্বারা আর কি গর্ব করিতেছ?' 'ভদ্রে, আমি শৌরি' (শ্লেষার্থে শূরের পুত্র); 'এখানে পিতৃগণগুণের দ্বারা পুত্রের কি হইবে?' 'হে চন্দ্রমুখি, আমি চক্রী' (শ্লেষার্থে, কুম্ভকার); 'বেশ ত, তাহা হইলে আমাকে কলসী, ঘটী, দুধ দুহিবার ভাঁড় কিছুই দিতেছ না কেন?' এইরূপে গোপবধূর লজ্জাজনক উত্তরের দ্বারা দুঃস্থ হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।"

কস্ত্বং ভো নিশি কেশবঃ শিরসিজৈঃ কিং নাম গর্বায়সে
ভদ্রে শৌরিরহং গুণৈঃ পিতৃগতৈঃ পুত্রস্য কিং স্যাদিহ।
চক্রী চন্দ্রমুখি প্রযচ্ছসি ন মে কুণ্ডীং ঘটীং দোহিনী-
মিত্থং গোপবধূহ্রিতোত্তরতয়া দুঃস্থো হরিঃ পাতু বঃ॥

এই জাতীয় শ্লেষাত্মক প্রশ্নোত্তর আরও আছে। আর একটি শ্লোকে আছে,—'হে কেশব, সম্প্রতি তোমার বাস কোথায়?' (অর্থাৎ সম্প্রতি থাকা হয় কোথায়)'; 'মুগ্ধেক্ষণে, এই আমার বাস (বস্ত্র)।' 'বাসের (থাক কোথায়) কথা বল হে শঠ'। 'হে প্রকামসুভগে, এ বাস (গন্ধ) তোমার গাত্রালিঙ্গন হইতে।' 'যামিনীতে কোথায় ছিলে?' 'যাহার তনু নাই এমন যামিনী কি চুরি করে?' এইরূপ ছলে গোপবধূকে পরিহাস করিতেছিলেন যে কৃষ্ণ তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।"

বাসঃ সংপ্রতি কেশব ক্ব ভবতো মুগ্ধেক্ষণে নম্বিদং
বাসং ব্রূহি শঠ প্রকামসুভগে ত্বদ্গাত্রসংশ্লেষতঃ।
যামিন্যামুষিতঃ ক্ব ধূর্ত বিতনুর্মুষ্ণাতি কিং যামিনী
শৌরির্গোপবধূং ছলৈঃ পরিহসন্নেবংবিধৈঃ পাতু বঃ॥

শতানন্দ কবির একটি পদে দেখি, গোবর্ধন-বহনে কৃষ্ণের কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া রাধিকা ব্যথিত হইতেছে এবং কৃষ্ণকে সাহায্য করিবার আগ্রহাতিশয্যে সে শূন্য গগনেই গোবর্ধন ধারণের অনুকার করিয়া বৃথা হাত নাড়িতেছে।—

শৈলোদ্ধারসহায়তাং জিগমিষোরপ্রাপ্তগোবর্ধনা
রাধায়াঃ সুচিরং জয়ন্তি গগনে বন্ধ্যাঃ করভ্রান্তয়ঃ॥

অজ্ঞাতনামা ('পদ্যাবলী'তে শুভাঙ্গ কবির বলিয়া উল্লেখিত) আর এক কবির পদে আছে, কৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করিয়া আছেন, সব গোপিনীদের সহ রাধাও কৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া আছে। অন্য সব গোপীরা রাধাকে বলিল, রাধে, তুমি কৃষ্ণের দৃষ্টিপথ হইতে অনেক দূরে সরিয়া যাও; তোমার প্রতি আসক্তদৃষ্টি হইয়া কৃষ্ণের হাত শিথিল না হইয়া পড়ে, কিন্তু গোপীদের মুখে রাধাকে দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিবার এই কথা মনে চিন্তা করিয়া গিরি-ধারণের শ্রমে কৃষ্ণের যেন ঘনশ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল।—

দূরং দৃষ্টিপথাত্তিরোভব হরের্গোবর্ধনং বিভ্রত-
স্ত্বয্যাসক্তদৃশঃ কৃশোদরি করঃ স্রস্তোঽস্য মা ভূদিতি।
গোপীনামিতিজল্পিতং কলয়তো রাধা-নিরোধাশ্রয়ং
শ্বাসাঃ শৈলভরশ্রমভ্রমকরাঃ কৃষ্ণস্য পুষ্ণন্তু বঃ॥

'গোপীসন্দেশ' নামে 'সদুক্তি-কর্ণামৃতে' যে পদগুলি উদ্ধৃত আছে তাহা চমৎকারিত্বের জন্য যেরূপ লক্ষ্যণীয়, তেমনই পরবর্তী কালের 'বিরহে'র পদাবলীর সহিত ইহাদের নিবিড় যোগের জন্যও লক্ষ্যণীয়। কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া দ্বারবতী চলিয়া গিয়াছেন, রাধা এবং অন্যান্য গোপীগণ সেখানে দূতের দ্বারা নানা ভাবে বিরহবেদনা নিবেদন করিয়াছে। একটি পদে বলা হইয়াছে,—'গোবর্ধন গিরির সেই সকল কন্দর, সেই যমুনার কূল, সেই চেষ্টারস, সেই ভাণ্ডীর বনস্পতি, সেই তোমার সহচরগণ—সেই তোমার গোষ্ঠের অঙ্গন—হে দ্বারবতীভুজঙ্গ (সর্পের ন্যায় ক্রূর), সে সকল কি ভুলেও একবার মনে আসে না? হরির হৃদয়ে ব্রজবধূ-সন্দেশরূপ এই দুঃসহ শল্য তোমাদিগকে রক্ষা করুক।'

তে গোবর্ধন-কন্দরাঃ স যমুনাকচ্ছঃ স চেষ্টারসো
ভাণ্ডীরঃ স বনস্পতিঃ সহচরাস্তে তচ্চ গোষ্ঠাঙ্গনম্।
কিং তে দ্বারবতীভুজঙ্গ হৃদয়ং নায়াস্তি দোষৈরপী-
ত্যব্যাদ্বো হৃদি দুঃসহং ব্রজবধূসন্দেশশল্যং হরেঃ॥

আর একটি পদে বিরহখিন্না গোপীগণ দ্বারকাগামী পথিককে ডাকিয়া বলিতেছে,—হে পথিক, তুমি যদি দ্বারবতী যাও তবে দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে এই কথাটি একবার বলিও,—'স্মরমোহমন্ত্রবিবশা গোপিনীদের তুমি ত্যাগই করিয়াছ; কিন্তু এই যে শূন্য দিক্‌গুলি কেতকগর্ভ ধূলিসমূহের দ্বারা (ভরিয়া গিয়াছে, ইহাদের) দিকে তাকাইয়াও কি সেই সব কালিন্দীতটভূমি এবং তথাকার তরুগুলির কথা কি কখনও তোমার চিন্তায় আসে না?'—

পান্থ দ্বারবতীং প্রয়াসি যদি হে তদ্দেবকীনন্দনো
বক্তব্যঃ স্মরমোহমন্ত্রবিবশা গোপ্যোঽপি নামোজ্ঝিতাঃ।
এতাঃ কেতকগর্ভধূলিপটলৈরালোক্য শূন্যা দিশঃ
কালিন্দীতটভূময়োঽপি তরবো নায়ান্তি চিন্তাস্পদম্॥

বীরসরস্বতীকৃত একটি অপূর্ব্ব বিরহের কবিতা রহিয়াছে। এখানেও গোপিনীরা বলিতেছে,—'হে মথুরাপথিক, মুরারির দ্বারে তুমি এই গোপীবচনটি অবশ্যই গাহিয়া শুনাইও,—'পুনরায় সেই যমুনার জলে কালিয়গরলানল (কালিয়গরলের ন্যায় বিরহানল) জ্বলিতেছে।'—

মথুরাপথিক মুরারেরুদ্গেয়ং দ্বারি বল্লবীবচনম্।
পুনরপি যমুনাসলিলে কালিয়গরলানলো জ্বলতি॥

আচার্য গোপীকের একটি দিবাভিসারের পদে আছে,—

মধ্যাহ্নস্ফুরদর্কদীধিতিজলৎসম্ভোগবীথীপথ-
প্রস্থানব্যথিতাব্জপালিদলং রাধাপদং মাধবঃ।

মৌলৌ প্রকৃণবলে মুহুঃ সমুদিতস্বেদে মুহুর্বক্ষসি
ন্যস্য প্রাণয়তি প্রকম্পবিধুরৈঃ শ্বাসোর্মিবাতৈর্মুহুঃ ॥

পুষ্পদলের মতন অরুণাঙ্গুলিদলে কমনীয় হইল রাধার পদ, সেই পদ আজ সম্ভোগবীথীপথ-প্রস্থানে ব্যথিত, কারণ সে পথ মধ্যাহ্নের দ্বিগুণ সূর্যতাপে তপ্ত, এই জন্য কৃষ্ণ রাধার পদের তাপ দূর করিবার নিমিত্ত বার বার তাহা মাল্যযুক্ত মস্তকে রাখিতেছেন, ঘর্মশীতল বক্ষে রাখিতেছেন, প্রকম্পবিধুর শ্বাসোর্মিবাতের দ্বারা বার বার উপশমিত করিতেছেন। এই জাতীয় পদ বাঙলা বৈষ্ণব কবিতায় প্রচুর আছে। যেমন গোবিন্দদাসের—

মাথহিঁ তপন　　তপত পথ বালুক
আতপ দহন বিথার।
নোনিক পুতুলি তনু　　চরণকমল জনু
দিনহিঁ কয়ল অভিসার। ইত্যাদি।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-কবিতা জয়দেব কবির বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। হালের 'গাহা-সত্তসঈ', ভট্টনারায়ণের 'বেণী-সংহার' নাটক, আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক' প্রভৃতিতে রাধা-কৃষ্ণের কবিতা রহিয়াছে। এগুলি সকলই দশম শতকের পূর্বের। দশম শতকের সংগ্রহ-গ্রন্থ 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' কয়েকটি রাধা-কৃষ্ণের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, সুতরাং এগুলিরও দশম শতকের পূর্বেই রচিত হইবার কথা। দশম বা একাদশ শতকের বাক্‌পতি-লিপিতে রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে চমৎকার শ্লোক পাইতেছি। উপরে 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' হইতে অনেকগুলি বৈষ্ণব-কবিতার আলোচনা করিলাম। আমরা আশা করি, জয়দেবের সমসাময়িক এবং পূর্ববর্তীদের যে সকল কবিতা লইয়া এতক্ষণ আলোচনা করিলাম তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, দ্বাদশ শতকের জয়দেব কবির গীতগোবিন্দ কাব্য কি লীলারসের দিক হইতে—কি কাব্যরসের দিক হইতে—কোনও দিক হইতেই আকস্মিক নয়, বরঞ্চ বেশ স্বাভাবিক। জয়দেবের যুগে এবং তাহার দুই-এক শতাব্দীর পর হইতেই রাধা-কৃষ্ণ প্রেম-সম্বলিত বৈষ্ণব-কবিতার কিরূপ প্রসার ঘটিয়াছিল তাহার আরও পরিচয় পাওয়া যায় রূপ গোস্বামীর সংগৃহীত 'পদ্যাবলী' সঙ্কলন গ্রন্থে। এই গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে রূপ গোস্বামীর সমসাময়িক কবিগণ, তাঁহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবিগণ, জয়দেবের সমসাময়িক কবিগণ এবং বহু প্রাচীনতর কবিগণের বহু কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙলা দেশে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে জয়দেব, চণ্ডীদাসই যে শুধু বৈষ্ণব কবিতা রচনা করেন নাই, আরও অনেক খ্যাত-অখ্যাত কবিও যে বৈষ্ণব-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। 'পদ্যাবলী'র সঙ্কলনের ভিতরে আরও লক্ষ্য করিতে পারি, শুধু বাঙলা দেশে রচিত কবিতাই রূপ গোস্বামী সংগ্রহ করেন নাই, দাক্ষিণাত্য, উৎকল, তিরভুক্তি (ত্রিহুত) প্রভৃতি অন্যান্য অঞ্চল হইতেও এই সকল কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার একটা ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া রাধা-কৃষ্ণের প্রেমগান রচিত হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, জয়দেবের পর চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিকে ছুঁইয়া আসিয়াই বৈষ্ণব কবিতার জন্য যে আমাদিগকে একেবারে ষোড়শ শতাব্দীতে উপস্থিত হইতে হয়, এই জাতীয় আমাদের একটি প্রচলিত বিশ্বাস অনেকখানি ভ্রান্ত।

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য। অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতকের ভিতরে দেবতাবিষয়ক যত শৃঙ্গাররসাত্মক কবিতা লিখিত হইয়াছে, তাহাও সবই রাধা-কৃষ্ণকে লইয়া এরূপ মনে করা উচিত হইবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণকে লইয়াও এই যুগে এই জাতীয় শৃঙ্গাররসাত্মক বহু কবিতা রচিত হইয়াছে। হরগৌরী সম্বন্ধে শৃঙ্গার-রসাত্মক কবিতা রাধাকৃষ্ণ-অবলম্বনে শৃঙ্গার-রসাত্মক কবিতা হইতে কিছু কম নহে। কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি পর্যন্ত হরগৌরীর শৃঙ্গার-লীলা ভারতীয় সাহিত্যের রস-সম্পদে কম উপজীব্য দান করে নাই। জয়দেবের সমকালেও হরগৌরীর শৃঙ্গার-রসাত্মক বহু কবিতা রচিত হইয়াছে। তবে, মনে হয়, শৃঙ্গার-রসাত্মক প্রেম লীলোপাখ্যানেরই ক্রম-প্রাধান্য লাভ ঘটিতে লাগিল। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে এই যে প্রেম-কবিতার ক্ষেত্রে রাধা-কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা তাহাও হয়ত দুইটি কারণে ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ সেন রাজাগণের পারিবারিক ধর্ম বৈষ্ণবধর্ম বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে; আর দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাঙলা এবং বৃহত্তর বাঙলার কবিগোষ্ঠীর ভিতরে সেন রাজাগণের প্রভাব অনস্বীকার্য। দ্বিতীয় রাধা-কৃষ্ণের রাখালিয়া প্রেম কবিতার পক্ষে অধিকতর উপযোগী ছিল এবং লীলাবৈচিত্র্যেও সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ছিল। এই লীলা অবলম্বনে রচিত প্রেম-কবিতার ভিতর দিয়া কবিগণ এক দিকে দেবলীলা বর্ণনার একটা আত্মপ্রসাদও লাভ করিতে পারিতেন, অথচ ইহার ভিতর দিয়া মনুষ্য-প্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রসবিচিত্র লীলাকে রূপ দিতেও তাঁহারা সম্পূর্ণ সুযোগ পাইতেন। এই ভাবেই রাধাকৃষ্ণ প্রেম-কবিতার ক্রম-প্রাধান্য। প্রেম-কবিতায় এইরূপে একবার রাধা-কৃষ্ণের প্রাধান্য যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, তাহার পর হইতেই প্রেম-কবিতা লিখিতে গেলে "কানু ছাড়া গীত নাই।' বাঙলার প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাই গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে এই রাধা-কৃষ্ণ কবিতারই প্রায় একটানা আধিপত্য দেখিতে পাই।

খেয়ালী প্রতিভা

ইটালীর শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। বিখ্যাত প্রতিভাটি লিখতেন নিয়মানুযায়ী বাম দিক থেকে ডান দিকে নয়, ডান দিক থেকে বাম দিকে—যে-লেখা শুধু পড়তে পারতেন দস্তুরমত শিক্ষিত লোক। আর্শির সাহায্যে পড়তেন।

আমাদের সাহিত্যে শীত

শ্রীকামিনীকুমার রায়

বাংলা দেশে কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগ হইতেই শীত অনুভূত হইতে থাকে এবং ফাল্গুন মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত উহা স্থায়ী হয়; পৌষ এবং মাঘ মাসে উহার প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায়। শীতকালের প্রাকৃতিক দৃশ্য মানুষের চিত্ত-বিনোদন করিতে পারে না; তখন পৃথিবী কুয়াশায় আচ্ছন্ন থাকে, শিশির পড়ে, উত্তর দিক হইতে অত্যন্ত শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়; উহা যেন চর্ম্ম ভেদ করিয়া অস্থি-মজ্জায় গিয়া প্রবেশ করে। বৃক্ষরাজির জীর্ণ পাতা সমস্ত ঝরিয়া পড়ে, চারি দিকে একটা নগ্নমূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠে। বিভিন্ন কবি শীতের এই মূর্ত্তিটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া দেখিয়াছেন এবং অঙ্কিত করিয়াছেন। আমরা প্রথমেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ' হইতে শীতের একটি চিত্র উপস্থিত করিব। তিনি শুধু শীতের বাহ্য রূপের বর্ণনাই করেন নাই, উহার অন্তরনিহিত বাণীও আমাদিগকে শুনাইয়াছেন।

'ওগো শীত, ওগো শুভ্র, হে তীব্র নির্ম্মম,
তোমার উত্তরবায়ু দুরন্ত দুর্দ্দম
অরণ্যের বক্ষ হানে। বনস্পতি যত
থর থর কম্পমান, শীর্ষ করি নত
আদেশ-নির্ঘোষ তব মানে। 'জীর্ণতার
মোহবন্ধ ছিন্ন করো' এ বাক্য তোমার
ফিরিছে প্রচার করি জয়ডঙ্কা তব
দিকে দিকে। কুঞ্জে কুঞ্জে মৃত্যুর বিপ্লব
করিছে বিকীর্ণ শীর্ণ পর্ণ রাশি রাশি
শূন্য নগ্ন করি শাখা, নিঃশেষে বিনাশি
অকাল পুষ্পের দুঃসাহস।
হে নির্ম্মল,
সংশয়-উদ্বিগ্ন চিত্তে পূর্ণ করো বল।
মৃত্যু-অঞ্জলিতে ভরো অমৃতের ধারা,
ভীষণের স্পর্শঘাতে করো শঙ্কাহারা,
শূন্য করি' দাও মন; সর্ব্বস্বান্ত ক্ষতি
অন্তরে ধরুক শান্ত উদাত্ত মূরতি,
হে বৈরাগী! অতীতের আবর্জ্জনাভার,
সঞ্চিত লাঞ্ছনা গ্লানি শ্রান্তি ভ্রান্তি তার
সম্মার্জ্জন করি দাও। বসন্তের কবি
শূন্যতার শুভ্র পত্রে পূর্ণতার ছবি
লেখে আসি, সে-শূন্য তোমারি আয়োজন,'

* * *

দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ এই শীতের! বিশাল বনস্পতি, অরণ্যের বৃক্ষলতা যত, নতশিরে তাহার আদেশ পালন করে। উত্তর বায়ুর প্রবাহে শাখা-প্রশাখা হইতে সমস্ত জীর্ণ পত্র ঝরিয়া পড়ে। বনে-উপবনে একটা নগ্ন রূপ,—বিনাশের রূপ দেখা দেয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যুই কোন কিছুর শেষ নয়; আপাত যাহা বিনাশ বলিয়া মনে হয়, তাহার মধ্য হইতেই নবীনের উন্মেষ হয়। জীর্ণ যাহা তাহা ঝরিয়া পড়িবেই, উহার জন্য মমতা করিয়া কোনও লাভ নাই। শীতের রুক্ষ মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইবার কিছু নাই ইহা তাহার ছদ্মবেশ মাত্র, ইহার অন্তরালে চিরনবীন ও চিরযুবা বসন্তের মূর্ত্তিটিই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সর্ব্বস্বত্যাগের শক্তিতে শক্তিমান শীত তাপসের মতোই অবিচলিত চিত্তে সমস্ত জীর্ণতা, আবর্জ্জনাভার, সংশয়-দুর্ব্বলতা দূর করিয়া পরিপূর্ণতার মূর্ত্তি বসন্তের প্রকাশের পথ মুক্ত করিয়া দেয়। বসন্ত যে অপরূপ সাজে ফুলে দলে বিচিত্র কোলাহলে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, তাহার মূলে রহিয়াছে এই বৈরাগী শীতেরই সাধনা। সে সমস্ত বাহুল্য, সমস্ত আবিলতা বিনষ্ট করিয়া ধরার পাত্রখানি শূন্য ও নির্ম্মল করিয়া রাখিয়া যায়, তাই বসন্তের প্রাচুর্য্যে উহা ভরিয়া উঠিতে সুযোগ পায়। শীতের আগমনে কবি তাই উচ্ছসিত হইয়া গাহিয়াছেন—

'এসেছে শীত গাহিতে গীত বসন্তেরি জয়,—
যুগের পরে যুগান্তরে মরণ করে লয়।
তাণ্ডবের ঘূর্ণিঝড়ে
শীর্ণ যাহা ঝরিয়া পড়ে,
প্রাণের জয়-তোরণ গড়ে
আনন্দের তানে,
বসন্তের যাত্রা চলে অনন্তের পানে।'

কবিশেখর কালিদাস রায় শীতকে সমস্ত ভোগ-বন্ধজয়ী ধ্যান-গম্ভীর নিষ্কাম আচার্য্যের মূর্ত্তিতে দেখিয়াছেন। সে যেন সমস্ত গৃহ-ধর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, আড়ম্বর-আন্দোলন ত্যাগ করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধের মতো প্রশান্ত চিত্তে বসিয়া আছে। অন্যান্য ঋতু যেমন নানা বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া, ঐশ্বর্য্যের বাহুল্য দেখাইয়া ধরণীতে আবির্ভূত হয়, শীতকাল তেমন সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব প্রকাশ করে না। তাহার যেন সমস্ত কামনা-বাসনা চরিতার্থ হইয়া গিয়াছে। কবি বলিয়াছেন—

'ওগো জ্ঞানী ওগো বৃদ্ধ স্তব্ধ-ধ্যানী হে শীত মহান্
আড়ম্বর-আন্দোলনশূন্যচিত্ত গম্ভীর ধীমান্।

* * * *

আজি নাই দৃপ্ত কণ্ঠে বজ্র-গর্জ্জ ঘোর ঘনদলে,
বিদ্যুৎ ভ্রূকুটী রোষে আঁখিপুটে আজি নাহি জ্বলে।
তরঙ্গের চললাস্যে আজি নাই যৌবন বিলাস
কূজনের কলহাস্যে নাহি আজি প্রমত্ত উল্লাস।
অশোক কদম্ব চম্পা মুচুকুন্দ মল্লিকার মালা
শুকাইছে উপবনে, শূন্য আজি প্রেমোৎসবশালা।
তোমার দেউল শূন্য, পূর্ণ শুধু শুষ্ক পত্রহারে,
দশা-তৈলহীন দীপে, শূন্য কুম্ভে, ধূপভস্ম ভারে।
একে একে শেষ এবে জীবনের পর্ব্বপূজা সব,
শূন্য দোল রাসমঞ্চ থেমে গেছে শঙ্খঘণ্টারব।
গৃহধর্ম্ম করি শেষ ওগো ত্যাগি চিত্ত করি স্থির,
আচার্য্যের দর্ভাসনে বসিয়াছ বন্ধজয়ী বীর।'

* * * *

অনেক কবির দৃষ্টিতে আবার শীতের দুঃখের মূর্ত্তিটিই ধরা পড়িয়াছে। তাঁহারা শিশির-বিন্দুর মধ্যে শীতের অশ্রুকণাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ঝরা পাতার মধ্যে একটা ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের শীত বসন্তের আগমনী গাহিয়াছে, আবার কাহারো শীত নূতনের আসার ভয়ে জড়সড় হইয়াছে। কবি নজরুলের শীত-বিষয়ক একটি কবিতা—

'পউষ এলো গো !
পউষ এলো অশ্রু-পাথার হিম-পারাবার পারায়ে।
ঐ যে এলো গো—
কুজ্‌ঝটিকার ঘোমটা পরা দিগন্তরে দাঁড়ায়ে।
সে এলো আর পাতায় পাতায় হায়
বিদায়-ব্যথা যায় গো কেঁদে যায়,
অস্ত-বধূ (আ-হা) মলিন চোখে চায়
পথ-চাওয়া দীপ সন্ধ্যা-তারায় হারায়ে।

পউষ এলো গো—
এক বছরের শ্রান্তি পথের, কালের আয়ু-ক্ষয়,
পাকা ধানের বিদায়-ঋতু, নতুন আসার ভয়।
পউষ এলো গো ! পউষ এলো—
শুকনো নিশ্বাস, কাঁদন-ভারাতুর
বিদায়-ক্ষণের (আ-হা) ভাঙাগড়ার সুর
'ওঠ পথিক ! যাবে অনেক দূর
কালো চোখে করুণ চাওয়া ছড়ায়ে।'

কবি আশ্বস্ত হইয়াছেন, এই ভাঙ্গাগড়ার মধ্যেই চলিতে হইবে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বসিয়া থাকিলে চলিবে না,—অনেক পথ অতিক্রম করিতে হইবে।

এইবার আমরা পল্লীর কয়েক জন অখ্যাত অজ্ঞাত কবির শীতের প্রাসঙ্গিক বর্ণনার দুই-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব :

মাঘমণ্ডল ব্রতের দুই-একটি ছড়ায় এবং সেই ব্রত ও সূর্য্যব্রত উপলক্ষে গীত সূর্য্যের পাঁচালীতে শীতকালের সূর্য্যোদয়-দৃশ্যটি অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাংলার কোনও আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হইলেও রচনাটি অতি সরস ও সাবলীল। শীতকালের রৌদ্র একটি অতি উপভোগ্য বস্তু। দীর্ঘ রাত্রির অবসানে কুজ্‌ঝটিকার অন্ধকার ভেদ করিয়া সূর্য্য যখন পূর্ব্ব আকাশে উঁকি দেয়, সকলে তখন মহোল্লাসে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠে, কেহ বা তাহার স্তব-স্তুতি করে। মাঘমণ্ডল ব্রতে মাঘ মাসের প্রতিদিন সকালে ছয়-সাত বৎসর বয়স্কা ব্রতিনী বালিকারা দল বাঁধিয়া পুকুর কিংবা নদীর ঘাটে যায়, একটি ফুল হাতে লইয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া বসে, ছড়া বলিতে বলিতে সূর্য্যের উদয়-দৃশ্য দেখে। চারি দিক তখন কুয়াশায় আচ্ছন্ন থাকে, সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হইতে প্রায়ই বিলম্ব ঘটে। অধীর আগ্রহে বালিকারা গাহিতে থাকে,—

'উঠ উঠ সুরজাই ঝিকিমিকি দিয়া।
তোমারে পূজিব আমি রক্তজবা দিয়া।
উঠ উঠ সুরজাই ঝিকিমিকি দিয়া।
উঠিতে পারি না আমি হিমানীর লাগিয়া।'

পূজার অর্ঘ্য লইয়া বালিকারা বসিয়া আছে, কিন্তু হিমানী-সম্পাতের প্রবল বাধা ঠেলিয়া সূর্য্যঠাকুর উঠিতে পারিতেছে না। ব্রতিনীরা তখন তাহার মায়ের দোহাই দিয়া আবার গাহিতে থাকে, কোন্ দিক দিয়া উঠিবে পথ বলিয়া দেয়,—

'উত্তর আলা কদম গাছটি দক্ষিণ আলা বাও রে।
গা তোল গা তোল সূর্য্যাই ডাকে তোমার মাও রে।
শিয়রে চন্দনের বাটি বুকে ছিটা পড়ে রে।
গা তোল গা তোল সূর্য্যাই ডাকে তোমার মাও রে।
কাঁস বাজে করতাল বাজে তবু সূর্য্যাইর ঘুম নাহি ভাঙ্গে রে।
গা তোল গা তোল সূর্য্যাই ডাকে তোমার মাও রে।'

প্রচণ্ড শীতে সূর্য্যঠাকুরের যেন ঘুম আর ভাঙ্গে না, বিছানা ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না! ঠিক যেন একটি অলস বালক! শেষে অনেক ডাকাডাকিতে এবং কাঁসর-করতালের ধ্বনিতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল, ঘন কুয়াশার অন্তরাল হইতে তিনি রক্তচক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, অস্পষ্ট সে চাহনি। বালিকারা সমস্বরে গাহিতে লাগিল,—

'সূর্য্য ওঠে কোন্ কোন্ বর্ণ।
সূর্য্য ওঠে আগুন-বর্ণ।
সূর্য্য ওঠে কোন্ কোন্ বর্ণ।
সূর্য্য ওঠে রক্তবর্ণ।
সূর্য্য ওঠে কোন্ কোন্ বর্ণ।
সূর্য্য ওঠে তাম্বুল-বর্ণ।'

সূর্য্য যতই উপরে উঠিতে থাকে, তাহার বর্ণেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। ছড়ায় অবশ্য বর্ণগুলি ঠিক পর-পর উল্লিখিত হয় নাই। এখানে সূর্য্যোপাসনা উপলক্ষে পল্লীগ্রামের সূর্য্যোদয়ের কথাই বলা হইতেছে। সেখানে ব্রাহ্মণ, কাঁসারী, মালী, ঋষি, তেলী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকই বাস করে। সূর্য্যঠাকুর তাহাদের প্রত্যেকের ঘরের কোণ স্পর্শ করিয়া ক্রমে উপরে উঠিতেছেন। তাঁহার আলোকে পুলকিত হইয়া বালিকারা তাঁহার পূজার অর্ঘ্য রচনা করিতেছে।

'ওঠ সূর্য্য উদয় দিয়া (পূর্ব্ব দিক হইতে)।
বাওনের ঘরের কোণ ছুঁইয়া।
বাওনের মাইয়া বড় সেয়ান।
সূর্য্যাইর পৈতা জোগায় বেয়ান বেয়ান (প্রাতঃকালে)।
ওঠ সূর্য্য উদয় দিয়া।
কাঁসারীর ঘরের কোণ ছুঁইয়া।
কাঁসারীর মাইয়া বড় সেয়ান।
পূজার সাজ জোগায় বেয়ান বেয়ান।
ওঠ সূর্য্য উদয় দিয়া।
মালীর ঘরের কোণ ছুঁইয়া।
মালীর মাইয়া বড় সেয়ান।
পুষ্প জোগায় বেয়ান বেয়ান।'

—বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়

* * * * *

লৌকিক সূর্য্যোপাসনার ছড়ায় ও গানে শীতকালের সূর্য্যোদয়-দৃশ্যটি আমরা দেখিলাম। এইবার পল্লীকবির শীতের একটি চিত্র দেখিব। শীতকালের রাত্রি অতি দীর্ঘ এবং দিন অতি ছোট। তদুপরি সারাটা সকাল ঘন কুজ্‌ঝটিকায় আচ্ছন্ন থাকে ; সূর্য্য উঠিলেও তত বুঝা যায় না, বিছানায় থাকিতে থাকিতেই অনেক বেলা হইয়া যায়। ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকায় তখন সকলেই কয়েকটা দিন হাসিয়া-খেলিয়া অতিবাহিত করিতে সুযোগ পায়। এক জন পল্লীকবি কি আন্তরিক ভাবেই না এই চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন,—

'হাসিয়া খেলিয়া দেখ পৌষ মাস যায়।
পৌষ মাসের পোষা আজি সংসারে জানায়।
সকলের ছোট বোন পৌষ মাস হয়।
চোখ মেলাইতে দেখ কত বেলা হয়।'
—মৈমনসিংহ গীতিকা

দরদী কবির দৃষ্টিতে পৌষ মাস আমাদেরই সংসার-সমাজের এক জন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে সকল মাসের ছোট বোন বলা হইয়াছে! ভাই-বোনদের মধ্যে যে সকলের ছোট, হাসিয়া-খেলিয়া নিশ্চিন্ত আরামে দিন অতিবাহিত করিবার সৌভাগ্য তো তাহারই।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলি কলেজের ছাত্র, তখন তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকরে' কবিতা লিখিতেন। অনেক কবিতাই প্রশ্নোত্তরের ছলে রচিত; সেই সকল রচনার মধ্যে শীতকালের একটি বর্ণনা আছে; বাল্যরচনা হইলেও উহা বেশ উপভোগ্য। এখানে দুই-একটি অংশ উদ্ধৃত করিব। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিতেছে, এখন জল, বাতাস, জিনিসপত্র যাহা কিছু সকলই শীতল, একেবারে কাল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দেখিতেছি, এই সর্ব্বব্যাপী শৈত্যের মধ্যে তোমার দেহই মাত্র প্রতপ্ত!

'সকল শীতল, করয় বিকল,
কিন্তু অপরূপ, নিরখি তায়।
সমস্ত শীতল, প্রতপ্ত কেবল,
বোধ হয় প্রাণ, তোমার গায়।'

স্বামী উত্তর দিতেছে,—না হইবে কেন? তোমার প্রখর নেত্র-বহ্নি আমাকে অহর্নিশ দগ্ধ করিতেছে, তাই তো আমার দেহ এত উত্তপ্ত।

'মোরে নিরন্তর, তব নেত্রকর
পাবক প্রখর, দাহন করে।
মম দেহোপর, বহ্নি খরতর,
তাই উষ্ণভাব, এ দেহ ধরে।'

স্ত্রী আবার জিজ্ঞাসা করিতেছে, আচ্ছা বল তো! শীতকালের রজনী এত দীর্ঘ কেন? কিছুতেই যেন উহা আর ধরণী ছাড়িয়া যাইতে চায় না!

'কেন বিভাবরী, দীর্ঘ দেহ ধরি
ধরায় বিহরি, রহে এখন।
ত্যজিতে ধরণী, না চায় রজনী,
বল গুণমণি, শুনি কারণ।'

স্বামী উত্তর দিতেছে, দেখ, তুমি যখন ঘুমাইয়া থাক, তখন সতী বিভাবরী তোমার মুখচন্দ্রকে স্বামী জ্ঞান করিয়া তাহার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, তাই পৃথিবী হইতে তাহার যাইতে বিলম্ব ঘটে।

'নয়ন মুদিয়ে, থাক ঘুমাইয়ে,
তখনি হেরিয়ে তোমার মুখ।
সতী বিভাবরী, শশী জ্ঞান করি,
হেরি প্রাণপতি, পায় কি সুখ।'

* * * *

শীতকাল বাঙ্গালীকে উদর-পূর্ত্তির দিক দিয়া সর্ব্বাধিক সুখ-সচ্ছলতা ও আরাম-অবকাশ দান করে। এই সময় তাহার বহু যত্ন ও পরিশ্রমের এবং একান্ত প্রতীক্ষার ফল বৎসরের সর্ব্বপ্রধান ফসল আমন ধান গৃহগত হয়। ঘরে ঘরে 'নবান্ন' উৎসবের, 'পিঠা-পরবের' উল্লাস-ধ্বনি উঠে। নিতান্ত দীন-দুঃখীও কয়েকটা দিন উপবাসের ক্লেশ হইতে রেহাই পায়। শীতের এই সম্পদের কথাও আমাদের কবিরা ভুলেন নাই। ঝরা পাতা, ঝরা ফুল এবং তুষারের স্তূপের মধ্যে তাঁহারা উহার কল্যাণময়ী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিটিও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী বলিয়াছেন,—

'কল্যাণময়ী মূর্ত্তি যে ওই জগদ্ধাত্রী অন্নদার—
ধরারে সাজায় বসুন্ধরা যে বহি' নিজ করে অন্নভার;
বক্ষ-কলসে খর্জ্জুর-রস পুণ্য পানীয় তুলনাহারা
অন্নপূর্ণা জননীর মতো কার হেন রূপ হিমানী ছাড়া?'

বাস্তবিক শীতকাল যেন অন্নপূর্ণা জননীর মতোই অনশনক্লিষ্ট বাঙ্গালীর সম্মুখে তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার উজাড় করিয়া দেয়। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, খাদ্যসামগ্রীর বিপুল সমাবেশ। নিতান্ত দীন-দুঃখীও এই সময়ে অভুক্ত থাকে না। কবিশেখর কালিদাস রায় পৌষ মাসকে লক্ষ্মীমাস বলিয়াছেন; তিনি ঋতুমঙ্গলে লিখিয়াছেন,—

"আজিকে আমার ভরেছে 'খামার' কনক বৈভবে,
হাসিভরা মুখ, সুখভরা বুক পরম উৎসবে।
পালায়-গোলায়-আঁটিতে-আঁটিতে,
লক্ষ্মীমায়েরে বেঁধেছি বাটীতে।
অঞ্চল তার পড়েছে লুটিয়া উঠজ প্রাঙ্গণে
আজি দৈন্যের দুঃখ শাসন হয়েছে সাঙ্গ যে।
* * * *
তেল-হলুদের উৎসব আজি সরিষা অঙ্গনে,
মটরের চারা পিচকারি দেয় বেগুনী রঙ্গনে,
বরবটি শুঁটী পড়ে লুটি লুটি,
শীষানো পালং হেসে কুটি কুটি,
অতসী দোপাটী গাঁদারে ঘেরিয়া সীম সে ফুলভরা
যেন রামধনু গৃহ আঙ্গিনায় লুটিছে মনহরা।
* * * *
পদতলে ধান গায়ে শিরে ধান ধান যে চৌপাশে,
যেন মোরা আছি জননীর কোলে অভয় আশ্বাসে,
তবু মা গো তব সুত বারমাস,
অন্নের লাগি অন্তের দাস,
আজিকার সুখ সম্পদ্ হেরি মনে তো হয় না গো,
তারা যে মাগিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বাঁচিয়া রয় মা গো।"

শীতের দিনে বাঙ্গালীর অঙ্গন-প্রাঙ্গণ, ঘর-দুয়ার যেমন সোনার ধানে ভরিয়া যায়, তেমনি শাক-সব্জী, তরি-তরকারিরও প্রাচুর্য্য ঘটে। আলু, রাঙ্গাআলু, কপি, কড়াইশুঁটী, শিম, লাউ, পালং, মূলা, বীট, গাজর, কমলালেবু, নলেন গুড়, আখের গুড়,—সব যেন একসঙ্গে আসিয়া হাত-ধরাধরি করিয়া দাঁড়ায়। ভাণ্ডারের এই পরিপূর্ণতার মুখে কবির মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগিয়াছে,—জননীর

দানের যেখানে এত প্রাচুর্য্য, সেখানে তাহার সন্তান উপবাস করে, পরের দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া খায়, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? ইহার চেয়ে দুঃখের আর কি আছে?

কবিগুরু হেমন্তকে

'তুমি ক্ষুধার্তজন-শরণ্য,
অমৃত-অন্ন-ভোগ ধন্য
করো অন্তর মম।'

বলিয়া প্রণাম জানাইয়াছেন। হেমন্তলক্ষ্মী যেন আপনাকে আড়ালে রাখিয়া 'ধরার অঞ্জলি' তাঁহার বিপুল দানে 'পক্ক ধানে' ভরিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু সেই দানের সঙ্গে আপনাকে প্রকাশের বা প্রচারের লোভ তাঁহার নাই। এই ধূলা-মাটির পৃথিবী আজ তাঁহার দানে সমৃদ্ধ, দরিদ্রও বৈভবশালী; তাঁহার অমৃত-স্নিগ্ধ হাসিতে প্রতি কুটীর সমুজ্জ্বল। শীতের রিক্ততা সে তো তাহার ঐশ্বর্য্যেরই ছদ্মবেশ! কবি বলিয়াছেন,—

'স্বর্গলোক ম্লান করি প্রকাশিলে ধরার বৈভব
কোন্ মায়ামন্ত্রগুণে, দরিদ্রের বাড়ালে গৌরব।
অমরার স্বর্ণ নামে ধরণীর সোনার অঘ্রাণে।
তোমার অমৃত-নৃত্য, তোমার অমৃতস্নিগ্ধ হাসি
কখন ধূলির ঘরে সঞ্চিত করিলে রাশি রাশি,
আপনার দৈন্যচ্ছলে পূর্ণ হলে আপনার দানে।'

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'পৌষ-পার্ব্বণ' কবিতায় শীতকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একটি জীবন্ত চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন। সামাজিক ভেদ-বিবাদ এবং শত অভাব-অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও শীতকালটা বাঙ্গালীর একরূপ সুখেই কাটে। কবি তাই বলিয়াছেন—

'সুখের শিশির-কাল সুখে পূর্ণ ধরা!
এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গ ভরা।'

*　*　*　*

পল্লীকবিরাও তাঁহাদের আঞ্চলিক ভাষায় শীতের এই সুখ-সম্পদের কথা প্রসঙ্গক্রমে অনেক স্থলে বিবৃত করিয়াছেন। এক জন কবি বলিয়াছেন,—

'জয়াদি জোকার পড়ে প্রতি ঘরে ঘরে।
নয়া ধানে নয়া অন্নে চিড়াপিঠা করে।'

আর এক জন কবি তাঁহার মুসলমানী নায়িকার মুখ দিয়া বলাইতেছেন,

'লক্ষ্মী না আগন মাসে বাওয়ার দাওয়া-মাড়ি।
খসম মোর আনে ধান আমি ধান লাড়ি।
দুই জনে বস্তা পরে ধান সেই উনা।
টাইল ভরা ধান খাই করি বেচা কিনা।'

কৃষকদের তখন এতটুকু অবসর থাকে না; ধান কাটিয়া বাড়ীতে আনা, খড়-কুটা হইতে ধান পৃথক্ করা, রৌদ্রে দেওয়া, গোলাজাত করা ইত্যাদি কার্য্যে স্বামি-স্ত্রীর সহযোগিতায় তাহাদের দিন মহানন্দে অতিবাহিত হয়।

মহাকবি কালিদাসও এই শিশির সময়কে উপভোগের প্রকৃষ্ট সময় বলিয়াছেন। এই সময় 'বহুগুণরমণীয়' এবং প্রমদা জনের 'চিত্তহারী।' এই সময়ে গ্রামের প্রান্তদেশ নানাপ্রকার পরিপক্ক শস্যে,—শালি ধান্যে পরিপূর্ণ থাকে। শিশিরকাল বড়ই উপভোগক্ষম—তখন গৌড়ী সুরার খুবই প্রাচুর্য্য ঘটে এবং শালি ও ইক্ষুরসের সুরা বড়ই স্বাদু ও রমণীয় হয়—'প্রচুরগুড়বিকারঃ স্বাদুশালীক্ষুরম্যঃ।'

কিন্তু গরীবদের পক্ষে উপভোগের যথেষ্ট সামগ্রী, বিশেষতঃ উপযুক্ত শীতবস্ত্র না থাকায় শীতকাল একটু ক্লেশকর হয় বৈ কি। শীতের দীর্ঘ রাত্রি তাহাদের যেন আর প্রভাত হইতে চায় না। সুখীদের উহা অভিপ্রেত হইলেও, দরিদ্রেরা সেই দীর্ঘ রাত্রিতে শীতের প্রকোপে অল্প-বিস্তর কষ্টই ভোগ করিয়া থাকে। এক জন দরিদ্র পল্লীনায়িকা বলিতেছে,—

'পোষ গেল মাঘ আইল শীতে কাঁপে বুক।
দুঃখীর না পোহায় রাতি হইল বড় দুখ।
শীতের দীঘল রাতি পোহাইতে না চায়।
এইরূপে আস্তে ব্যস্তে মাঘ মাস যায়।'

একটি সংস্কৃত শ্লোকেও শীতকালের এই ক্লেশকরী রাত্রির কথা বলা হইয়াছে,—

'গ্রীষ্মকালে দিনং দীর্ঘং শীতকালে তু শর্ব্বরী।
পরোপতাপিনঃ সর্ব্বে প্রায়শো দীর্ঘজীবিনঃ।'

অপরকে তাপ দেওয়াই যাহাদের স্বভাব, তাহারা প্রায়ই দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে; গ্রীষ্মকালে দিন এবং শীতকালে রাত্রি এত দীর্ঘ হইবার ইহাই কি কারণ?

গরীবের শীত যাপনের একটি অতি বাস্তব চিত্র কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম 'ফুল্লরার' বার মাসের সুখদুঃখ বর্ণনা প্রসঙ্গে অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। ফুল্লরা ছদ্মবেশিনী চণ্ডিকাকে বলিতেছে:—

*　*　*　*

'দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।
মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবকার ধান।
উদর পুরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি।
যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি।
অভাগ্য মনে গণি অভাগ্য মনে গণি।
পুরাণ দোপাটা গায় দিতে টানাটানি।
পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্ব্বজন।
তুলা তমুনপাৎ তৈল তাম্বুল তপন।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।
অভাগী ফুল্লরা মাত্র শীতের ভাজন।'

যাহার চাষবাস নাই, সেও যাহার আছে তাহার কাছে চাহিয়া শীতকালে দুই মুষ্টি পায়; উদরের জ্বালা কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত করিতে পারে। এই সময়ে লোক শীতবস্ত্র ব্যবহার, তৈল-মর্দ্দন, তাম্বুল চর্ব্বণ, অগ্নি ও রৌদ্র-সেবন প্রভৃতি দ্বারা শীত নিবারণ করে; কিন্তু গরীবের ভাগ্যে সবগুলি জুটে না। তাহাদিগকে অনেক সময়ই কেবল 'জানু ভানু কৃশানু'র আশ্রয় লইতে হয়। তাহারা দুই জানুর মধ্যে মাথা প্রবেশ করাইয়া কুঞ্চিত দেহে বসিয়া থাকে, না হয় আগুন কি রৌদ্র পোহায়

শীতের রাত্রি দরিদ্রদের পক্ষে যেমন, প্রোষিতভর্তৃকাদের পক্ষেও তেমনি ক্লেশদায়িনী, তবে এক জনের ক্লেশ দৈহিক, আর এক জনের ক্লেশ মানসিক। প্রিয়তম যাহার দূরে, বিদেশে—হিম-রাত্রিতে তাহার মন ঝরে বৈ কি! পল্লীকাব্যের এক নায়িকা বলিতেছে,—

'আঘন মাসেতে দূতী শীতের কুয়াশা।
পরাণ-বন্ধু বৈদেশে রইল না মিটিল আশা।
পৌষ মাসে পোষা আছি অঙ্গ কাঁপে শীতে।
একেলা শয্যায় শুইয়া বন্ধু বৈদেশেতে।'

—মৈমনসিংহ গীতিকা

বৈষ্ণব পদাবলীতেও আমরা রাধার এই অন্তর্বেদনার পরিচয় পাই। এখানে ঘনশ্যাম দাসের কয়টি পদ উদ্ধৃত হইল। কৃষ্ণ-বিরহে রাধা দূতীকে বলিতেছেন :—

'দেখ পাপি আঘন মাস।
যনু নাহ-বিরহ-হুতাশ।
দরশাই সুখ বিহি নেল।
হিয়ে কৈছে সহই শেল।
ভেলয় প্রাণ-প্রিয় পরদেশিয়া।
যনু ছুটল বিষ-শর ফুটল অন্তর রহল তঁহি পরবেশিয়া।
অব পৌষ ভেল পারবেশ।
মঝু নাহ রহ পরদেশ।
গণি সোয়ি কামিনী ভাগী।
রহু প্রিয়ক হিয় হিয় লাগি।
শয়নঁহি বয়নে নয়নহিঁ ঝাপিয়া।
হামসে পাপিনী পৌষ-যামিনী রহু থরহরি কাঁপিয়া।'

সখি রে, দেখ, পাপী অগ্রহায়ণ মাস আসিয়াছে। (যে মাস বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলন ঘটাইতে পারিল না, তাহাকে পাপী না বলিয়া পুণ্যবান বলা যায় কিরূপে?) ইহা অনলের মতো আমাকে দগ্ধ করিতেছে, প্রিয়-বিরহ সেই অনল। বিধাতা সুখের মুখ দেখাইয়াও তাহা ফিরাইয়া লইলেন! প্রাণ-প্রিয় আজ প্রবাসী (পরদেশিয়া), এই শেল আমি কিরূপে সহ্য করিব। সখি রে, বিষ-শর আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া বিঁধিয়া রহিল।

পৌষ আসিল, তবু আমার প্রিয়তম আসিল না! সৌভাগ্যবতী কামিনীরা তাহাদের প্রিয়দের বুকে বুকে লাগিয়া, শয্যায় চোখ-মুখ ঢাকিয়া নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাইতেছে, আর আমি পাপিনী কি না পৌষের রজনী থর-থর, কাঁপিয়া কাটাইতেছি!

গতিবেগ

জীব-জগতে মানুষ মানুষকে জ্ঞান ও বুদ্ধিতে অন্যান্য জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করলেও দৌড়ের গতিতে মানুষকে হারিয়ে দিয়েছে জ্ঞানবুদ্ধিহীন পশু। মানুষ যুক্তি দেখায়, পশু যে চতুষ্পদবিশিষ্ট, পশুর দৌড়ের গতি যে জন্য মানুষ অপেক্ষা দ্বিগুণ বেশী।

প্রায় ঘণ্টায় চব্বিশ মাইল দৌড়ে রেকর্ড সৃষ্টি ক'রেছে মানুষ। কিন্তু গ্রে-হাউণ্ড ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল দৌড়তে পারে; ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া ঘণ্টায় চল্লিশ মাইলের অধিক; অষ্ট্রীচ ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল; চিতা বাঘ ঘণ্টায় ষাট মাইলের বেশী; হরিণ ঘণ্টায় ষাট মাইল এবং সিংহ দৌড়য় ঘণ্টায় ষাট মাইলের বেশী।

ঈগল পাখী ঘণ্টায় একশো কুড়ি মাইল বেগে উড়তে পারে। পায়রা ঘণ্টায় ষাট মাইল।

ভদ্দোরলোকের মেয়ে

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ফাটা কপালের শুষ্ক রক্তের সিঁদুরে
আমাদের সতীত্ব উজ্জ্বল!
সতী সীমন্তিনী আমরা ভদ্দোরলোকের মেয়ে
ক্লান্ত ধৈর্য প্রত্যাশায় অর্থহীন ভাগ্যের দেউলে ;
সুতরাং শীলভদ্রা অকলঙ্ক সংসারের কূলে।
আমরা অনন্যা পতিপরায়ণা সতী
নিষ্ঠুর পাষাণ মূক পৈশাচিক সমাজ-শাসনে,
গরল-সমুদ্রে নীল শব্দহীন ঢেউ তুলে তুলে
ভেঙে পড়ি সর্বংসহা ধরিত্রীর বালুকা-বেলায়
অবিশ্রান্ত দুঃসহ আঘাতে,
অপমানে জর্জরিতা লাঞ্ছনার ঘন তমিস্রাতে।

ইতিহাসে উপেক্ষিতা দীর্ঘ রাত্রি দীর্ঘ দিন ধরে
পথপ্রান্তে জেগে থাকি কত না পতন অভ্যুদয়
মহাশূন্যে মিশে গেছে
পুরুষের পৌরুষের দম্ভের আকাশে
আমাদের সামনে শুধু রেখে গেছে প্রতীক্ষার অনন্ত সময়।

ভদ্দোরলোকের মেয়ে আমরা সালঙ্কারা ভদ্দোরলোকের মেয়ে
সোনার গহনা মোড়া সম্মানের কালসিটের দাগ
আমাদের বাহু পদ উরস কটিতে
নাসারন্ধ্রে কর্ণপুটে
সুবর্ণ শলাকা বিদ্ধ ক্ষতচিহ্ন জুড়ে
সলজ্জ অঙ্গের প্রতি ভঙ্গিমার পরতে পরতে
জ্বালায় অকথ্য জ্বালা
জ্বলি' তাই আভিজাত্য-চিতার আগুনে।
কাব্যের ভাষায় বলে ওরা :
কর্তা ভর্তা স্বামীরা প্রভুরা :
আমরা না কি মনোমোহিনী!!!
ভস্ম-অপমান শয্যা থেকে
টেনে তুলি পুষ্পধনু মকরকেতনে।
আমাদের বরতনু পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পোড়া কাঠ
গর্ভে ধরি পুরুষেরে,
পুরুষেরি পদতলে দাসীত্বের মন্ত্র করি পাঠ।
কাঁচা বয়সের কাঁচা রঙের নেশায়
যদি কারো মন ভোলে
যদি কোনো প্রেমিকের আগুন ধরায় মত্ত চোখে
প্রেমের একাধিপত্যে
কামনায় পাকা সত্বে
ওরা আমাদের ঘিরে রাখে
ঘোমটায় বোরখায় আর ঝিলিমিলি রঙীন পর্দায়
ঐস্পাতিক অবিশ্বাসে অচলায়তনে।
আমরা শুধু ওঁদেরই মনোমোহিনী
ধর্মমতে কেনাকেনে মাননীয়া দাসী!!

আমরা আজো দেহপণ্যা কুমারী-সভায়
ওদের পছন্দমত দেখে শুনে ওরা বেছে নেয়
(আমাদের আবার পছন্দ ? ছিঃ!
আমরা যে ভদ্রঘরের কুমারী মেয়ে ?)
মুখ বুজে হাটে বেনা পয়স্বিনী গাভীর মতন
আমরা ওদের-ঘরে যাই
(আমরা না কি গৃহলক্ষ্মী ?)
লম্পট চরিত্রহীন ব্যভিচারী মাতাল হ'লেও
পতি স্বর্গ পতি ধর্ম
পতি-পদাঘাত সয়ে নির্বিবাদে জীবন কাটাই।
ভদ্দোরলোকের মেয়ে আমরা মহানন্দে জীবন কাটাই।

ক্ষয়কাশে ভুগে মরি সূতিকায় রক্তশূন্যতায়
বর্ষে বর্ষে সন্তানের অশান্ত বন্যায়
সলজ্জ সম্ভ্রমে সঙ্কুচিতা
আমরা সতী অরুন্ধতী অগ্নিদগ্ধা সীতা ;
বসুন্ধরা দ্বিধা হয়! (মিথ্যা কথা)
আমাদের সমবেদনায়
দীর্ণ ললাটের রক্ত জ্বলে ওঠে জমাট শিখায়।
দেবীসূক্তে আমাদেরি মাহাত্ম্য অপার
ছিন্নমস্তা অট্টহাসি হাসে যন্ত্রণার।
সুসজ্জিত নরকের নিম্নপথ বেয়ে
পোষমানা শান্তশিষ্ট ভদ্দোরলোকের মেয়ে।
সামন্ত যুগের দম্ভ তেমহলা প্রাসাদ-বিবরে
আমাদের বধূ-আত্মা বিদ্ধ মহামাণ্ডলিক ব্যাঘ্রের নখরে
মেকি দর্পে টলমল সতীন-সমাজে
সতীত্বের নিদারুণ লাজে।
দাসী-বাঁদী-পরিবৃতা
হাবসী খোজা প্রহরী-বেষ্টিতা
কত যুগ কেটে গেছে লোহার বাসরে
পুরুষের ইতিহাসে সে কাহিনী লেখা আছে রক্তের অক্ষরে।

ইংরেজ বণিক এল আলো কোরে সুড়ঙ্গের পথ
থরহরি কম্প তুলে বিজয়ী যান্ত্রিক তার রথ
কী উদ্দাম চাকার ঘর্ঘর
আমাদের ভেঙে গেল দাসীত্ব-বাসর।
কেরাণী মুৎসুদ্দী আর বেনিয়ান প্রভুদের ঘরে
শ্বেতাঙ্গ রাজার মনোমুগ্ধকর নব রূপান্তরে
আমরা হ'লাম দেবী শ্রীমতী মিসেস্
বেথুনে গোখেলে পড়া প্রগতির রুচিরম্য বেশ।

আমরা হ'লাম খাঁটি ভদ্দোরলোকের মেয়ে
নব যুগ জাগৃতির সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে।

অথচ সন্ত্রাসে থাকি সংস্রব এড়ায়ে
কৃসাণীর কুলী রমণীর
স্বদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের
দূরে দূরে বর্ণাশ্রমী আভিজাত্য-মদে
মদমত্তা নারীসত্তা শৃঙ্খলিতা পিতৃ-শাসনের
দুঃসহ জ্বালায় জ্বলি।
শীলভদ্রা নারী আহা আমরা যে শীলভদ্রা নারী!

শুভলগ্নে রামমোহন বিদ্যাসাগরের
মাতৃমন্ত্র সাধনার চেতনার চকিত আলোয়
আমরা দেখেছি মুক্তিপথ
তার পর অন্ধকার
পর যুগে মাতৃদ্রোহী কুসন্তান ভুলেছে শপথ
স্বরাজ্যের ক্রুর পরিহাসে
গুলীবিদ্ধ যন্ত্রণায় মাতৃরক্তে রাজপথ ভাসে
শত শত লতিকার অহল্যার তপ্ত রক্তধারা
আমাদের করে দিশাহারা।
মুক্তির লড়াই এল শতাব্দীর অগ্নি-ঝড় নিয়ে
খোড়ো চাল কোঠা বাড়ী বাহিরে অন্দরে একাকার
মাতৃভূমি রুদ্রাণীর গম্ভীর হুঙ্কার!
ভাঙনের বন্যা এল সৃজনের উদ্দাম আঘাতে
মর্মর প্রাসাদে দুর্গে অচলায়তনে
অগ্নিগর্ভ পৃথিবীর অগ্নি-ঝড় ক্রুদ্ধ গণ-মনে।
লোহার পাদুকা আঁটা আমাদের চৈনিক চরণে
প্রলয়-ক্ষেপণ ছন্দে এলো ঝঞ্ঝাগতি,
এলো ঝড় মুক্ত এলোকেশে।
আমাদের জঠরের অমৃত-সমুদ্র-গর্ভ হতে
ঊর্দ্ধমুখী জ্যোতির্ময় রক্তপদ্মদলে
লেনিনের মহাজন্ম—ষ্টালিনের—মাও-সে-তুঙের।
আমাদেরি দীর্ঘ প্রত্যাশায়
জন্ম নেয় নূতনা পৃথিবী।
আমরা যে বিপ্লবীর মাতা
বিপ্লবীর প্রণয়িনী, বিপ্লবী-নায়িকা।
ভদ্দোরলোকের মেয়ে নই মহাবিশ্বভুবনের মেয়ে
নই মনোমোহিনী কামিনী।
সভ্যতার জন্মদাত্রী আমরা যে শিবের শিবানী।
ত্রিশূলে ত্রিকাল কাঁপে মহাশূন্যে ওড়ে রক্ত জটা
সীমন্তে সিন্দুর জ্বলে বিপ্লবের জ্বলদর্চিচ্ছটা।

৭ই নভেম্বর, ১৯৫১

—নাতি-নাতনী—

রাজকুমারী এলিজাবেথের পুত্রকন্যার সঙ্গে ষষ্ঠ জর্জ ও রাণী এলিজাবেথ

ভক্ত কবীর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস (শান্তিনিকেতন)

কিন্তু ভগবানের দর্শন পাওয়া ত সহজ ব্যাপার নয়। ভগবান যাকে কৃপা করেন মাত্র সেই তাঁর দর্শন পায়, তাঁর প্রেম লাভ করে। অন্য কোনো উপায়ে এটি হবার জো নেই। সাধন ভজন আরাধনা জ্ঞান ভক্তি সবই এই কৃপা লাভের প্রচেষ্টা মাত্র। কত জন্ম-জন্মান্তর যুগ-যুগান্তরের সাধনার পর তবে এই কৃপা লাভ হয়, ভগবানের প্রতি প্রেম জন্মে। কবীরদাস বলেন, যুগ-যুগ প্রতীক্ষার পর তবে সাহেবের প্রতি প্রেম জন্মে। মানুষের এর চেয়ে পরম সৌভাগ্য আর কিছুই হতে পারে না। আর এই সৌভাগ্য লাভ জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফলেই সম্ভবপর হয়। মানুষের দৃষ্টি বর্ত্তমানের অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। সে তার পিছনে-ফেলে-আসা সুদীর্ঘ অতীতের কিছুই দেখতে পায় না। অনাগত ভবিষ্যতের অসীম সম্ভাবনাও তার কাছে রহস্যাবৃত। তাই ভগবদ্‌-কৃপা তার কাছে আকস্মিক মনে হয়। বিশেষ করে সে যখন দেখে যাদের পাপী-তাপী মনে করা হয়, এমন লোকও ভগবদ্‌-প্রেমে বিভোর হয়ে যায়, তার হয়ে যায় নবজন্ম ; অথচ যারা ধার্মিক বলে গণ্য তারা এই সৌভাগ্য লাভ করতে পারে না, তখন তার বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না। অনেকে হয়ত ভগবানকে খামখেয়ালী বলেই ধারণা করে বসে। কিন্তু তারা যদি মানুষের অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সবটা দেখতে পেত তা হ'লে এ কথা বলত না। যাক্‌ সে কথা।

ভগবানের কৃপা যে পেল, যার হৃদয়ে জন্মাল ভগবদ্‌-প্রেম 'তার বক্ষে বেদনা অপার, তার নিত্য জাগরণ।' কবীরদাস বলেন—'ওরে মন, ওরে আমার প্রিয়বন্ধু, বিবেচনা করে দেখ, প্রণয়ী হ'লে কি আর শোয়া চলে।'

ভগবানের প্রেমের বাঁশী নিত্য বেজে চলেছে। আনন্দময় তিনি। তাঁর বাঁশীর সুরে-সুরে আনন্দের হিল্লোল উঠছে। সেই আনন্দে বিশ্ব-চরাচর হল গতিমান। তারা নাচতে-নাচতে চঞ্চল। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে, সব মানুষ এ বাঁশী শুনতে পায় না, কানে শুনলেও মনে শোনে না। বাঁশীর আহ্বান তাদের কানে প্রবেশ করে, মরমে প্রবেশ করে না। কিন্তু যাঁ'র করে তাঁ'র আর ব্যাকুলতার অন্ত নেই। প্রাণান্ত হয় তার। কবীর বলছেন—'মুরলীর ধ্বনি শুনে আমি আর থাকতে পারছি না।' বাঁশীর সুরে বিকশিত হ'ল তার হৃদয়-কমল, মন হ'ল সমাধি-মগ্ন। তখন 'আমি' আর রইল না, 'অহং'-এর বিলোপ হয়ে গেল। তাই কবীরদাস বলছেন, 'আজ আমার প্রাণ জ্যান্ত থেকেই যাচ্ছে মরে।'

এ কেমন কথা, বেঁচে থেকেই মরে যাওয়া এর মানে কি! ডাঃ দ্বিবেদীজী বলেন, 'ভক্তের মৃত্যু হ'ল 'আমি' বা 'অহং'কে ত্যাগ, একে বলি দেওয়া। প্রতি মুহূর্ত্তে যে এই অহং বলি দিচ্ছে সে-ই ত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বেঁচে আছে। না মরলে যে বাঁচাই হয় না।'

আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে যাঁদের সামান্য মাত্রও পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন, এই 'আমি'কে ত্যাগ করা কি কঠিন কাজ। সব যায় কিন্তু 'আমি' যায় না। এই জন্য যে প্রেম-সাধনা এই 'অহং' ত্যাগের মধ্য দিয়ে চলে সে যে সহজ জিনিষ নয়, তা বলাই বাহুল্য। কবীরদাসের প্রেম-সাধনা তাই এত কঠিন। 'নিজের মাথা কেটে হাতে নিয়ে প্রবেশ করতে হয় এই প্রেম-মন্দিরে। দুর্গম এর পথ, অসীম এর বিস্তার। এ মামা-বাড়ী নয় যে আব্দার করলে আর একটু চোখের জল ফেললেই যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যাবে।

ভগবানের সাধনা কঠিনই বটে। যে ভাবেরই সাধনা হোক না কেন, জ্ঞানের পথেই হোক, কর্মের পথেই হোক, আর প্রেম-ভক্তির পথেই হোক, সাধনার পথ অতি দুর্গম, 'দুর্গমঃ পথস্তৎ কবয়ঃ বদন্তি।' কবীরদাসও এ কথা বার বার বলেছেন। তাঁর প্রেম-সাধনা অবিরত সংগ্রাম। এ আরামের ব্যাপার নয়, দুঃসহ এর দুঃখ।

কবীরদাসের প্রিয়তম যিনি, যিনি তাঁর আরাধ্য, তিনিও তাই রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তমের মত দুঃখ-রাতের রাজা। কঠিন দুঃখের মধ্য দিয়েই তাঁকে পেতে হয়। দুঃখের দুর্গম পথ দিয়েই তিনি আসেন। সেই পথ ধরেই যেতে হয় তাঁর কাছে। দুঃখের বরষায় চক্ষের জল নামলে যেমন বক্ষের দরজায় রবীন্দ্রনাথের বন্ধুর রথ এসে থামে তেমনি কবীরদাসেরও 'প্রিয়তম এই দুঃখের পথেই আসেন। কান্না তাঁর পথ, হাসি নয়, সুখ নয়। অশ্রুজল প্রিয়-মিলনের নিশ্চিত পথ।'

ভগবান লীলাময়। বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত করে অবিরত চলছে তাঁর প্রেমলীলা। রাজার রাজা তিনি, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে তাঁর ঐশ্বর্য্যভাব নেই। সেখানে তিনি শুধু প্রেমিক। প্রেম দেবার জন্য আর প্রেম পাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ফিরছেন। ভগবানের এই প্রেমলীলা সম্পর্কে আধুনিক যুগের কবি সার্বভৌমের সঙ্গে মধ্যযুগের সন্তশিরোমণির অনেক মিল দেখা যায়। ডাঃ দ্বিবেদীজী বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ প্রেমলীলার যে আদর্শের কথা বলেছেন কবীরদাসের আদর্শের সঙ্গে তার অনেক মিল আছে। বলা যায়, উভয়ে একই আদর্শের কথা বলেছেন। এক জন সরস কবিত্বপূর্ণ ভঙ্গীতে যা বলেছেন, অন্য জন সরল অর্থপূর্ণ ভাষায় তাই বলেছেন। উভয়েই বলেছেন, ভগবান ভক্তের সঙ্গে প্রেমলীলার জন্য ব্যাকুল। তবে একটি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বিশেষ গরমিল আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভগবান প্রধানতঃ ভক্তের কাছে যান অভিসারে আর কবীরদাসের কবিতায় ভক্ত যান অভিসারে।

অভিসারিকা চলেছে। কবীরদাস বলছেন—'বিন্দু বিন্দু প্রেমরসে ভিজে গেছে তার চুনরী। আপন প্রিয়তমের খোঁজে সোহাগী চলেছে ব্যাকুল হয়ে।' কিন্তু সোহাগীই শুধু যায় না। প্রিয়তমও আসেন। আমরা আগেই বলেছি, কবীরদাস স্বকীয়া প্রেমের কথা বলেছেন। তাঁর ভক্ত বধূ। বধূ বাপের বাড়ীতে এসেছে। কিন্তু সেখানে আর তার মন টিকছে না। স্বামীর কাছে শ্বশুরবাড়ী যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। স্বামী আসবেন তাকে নিয়ে যেতে। ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছে। বলছে, স্নান-টান করে কনে হয়ে বসে আছি প্রিয়ের পথ চেয়ে, সখি রে, একটু ঘোমটা খুলে দেখতে দে আমায়। আজ আমার মিলনের রাত যে! রাত গভীর হয়ে আসে। পথ চেয়ে-চেয়ে বধূ ঘুমিয়ে পড়ে। তখন তিনি আসেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমিকা প্রিয় চলে যাবার পর জানতে পারে। প্রিয় তাকে জাগিয়ে দেন না, শুধু পাশে বসে বীণা বাজিয়ে যান। প্রেমিকার 'স্বপনমাঝে' মধুর রাগিণী বাজে। ঘুম ভাঙ্গলে পর তাই তার আর আপশোষের অন্ত থাকে না। সে নিজেকে বার বার ধিক্কার দেয়—

"কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী,
সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি।"

কবীরদাসের বধূ কিন্তু সৌভাগ্যবতী, প্রিয় তাকে জাগিয়ে দেন। ঘুমিয়ে পড়ার জন্য তার লজ্জার সীমা থাকে না। আর এমনটি হবে না ব'লে সে সঙ্কল্প করে। বলে, 'আমি ঘুমে অচেতন হয়ে শুয়ে রয়েছিলাম। প্রিয়তম আমাকে জাগিয়ে দিলেন। আমার চোখে লাগিয়ে নিয়েছি তাঁর চরণ-কমলের অঞ্জন। যা'তে আর ঘুম না আসে, শরীরে যা'তে আলস্য না লাগে তাই করব।'

বধূ বাপের বাড়ীতে থাকতে চায় না। এখান থেকে তার মন উঠে গেছে। তাই বলছে, 'ও আমার ননদের ভাই, এবার আমাকে তোমার আপন দেশে নিয়ে চল।' রাজি হলেন তিনি। তখন বধূর কী আনন্দ, কী গর্ব্ব! বিয়ের পর মেয়ে অনেক দিন বাপের বাড়ীতে থাকলে লোকে নানা কথা বলে। বেচারা সব চুপ ক'রে সহ্য ক'রে যায়। তার পর যেদিন স্বামী নিতে আসেন কথাটা পাকে-প্রকারে সবাইকে শুনিয়ে দেয়। ওরা শুধায়, কি গো, শ্বশুর-বাড়ী যাচ্ছ না কি? কার সঙ্গে যাবে? উত্তর দেয়, "কার সঙ্গে আর যাব। স্বামীর সঙ্গেই যাব। হাতে নেব নারকেল, মুখে দেব পানের খিলি। সীঁথি ভরে পরব মোতি।" সৌভাগ্যের চিহ্ন এ-সব, মাঙ্গল্য। শ্বশুর-বাড়ী যাবার সময় মেয়ের মনের সে এক অদ্ভুত অবস্থা; ক্ষণে হর্ষ, ক্ষণে বিষাদ। কখনো গুন্-গুন্ করে গান করে, কখনো এটা-ওটা বায়না ধরে। দেখে-শুনে বিজ্ঞজনেরা বলে, "ও গো কনে, তোমাকে স্বামীর ঘরে যখন যেতেই হবে তখন কেন কান্না- কাটি কর, গান গাও কেন, কেনই বা বায়না ধর! সবুজ-সবুজ চুড়ি পরেছ কেন? প্রেমের পোষাক পর।" কনে কিন্তু বাপের বাড়ীর পোষাকই পরে রয়েছে। তাতে দাগ লেগে আছে। আর তা ছাড়া, তার মনটাও দোটানায় পড়েছে। একবার বাপের বাড়ীর দিকে টানছে একবার শ্বশুর-বাড়ীর দিকে। তার কখনো বা আপশোস হচ্ছে, হয়ত বা শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া ঠিক করে ভাল করেনি। হিতৈষীরা বলছেন, "ওগো নতুন বৌ, তুমি কাঁচুলি ধোওনি কেন? তোমার ছেলেবেলার ময়লা কাঁচুলি। তাতে দাগ লেগেছে। না ধুলে প্রিয়তম তোমার খুশি হবেন না আর তোমাকে বিছানা থেকে নীচে ফেলে দেবেন।" তার পর বলছে, "ওগো বৌ, দোটানার ভাবটা ঘুচিয়ে ফেল, মনের ময়লা ধুয়ে ফেল। এখন শ্বশুর-বাড়ী যাবার সময় হয়েছে। স্বামী দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন, এখন আর পছতিয়ে কি হবে।"

শ্বশুর-বাড়ী যাবার দিন। স্বামী আগে রওনা হয়ে গেছেন, বধূর মন খুশিতে ভরা। নির্জ্জন বনের মধ্য দিয়ে পথ। সে পথে পরিচিত কেউ নেই। ডুলি নিয়ে চলছে কাহারেরা। আবার আপন জনদের জন্য বধূর মন কেমন করতে লাগল; বলল, "ওরে কাহার, তোদের পায়ে পড়ি একটু সময়ের জন্য ডুলিটা রাখ। আমি আমার সখিদের সঙ্গে একটু দেখা ক'রে নি। দেখা ক'রে নি আমার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে।" বধূ ত চলেছে স্বামীর কাছে, ওরা শুধায় ওগো বৌ, কোথায় থাকেন তোমার স্বামী, কোথায় যাবে তুমি? বধূ বলে, আমার প্রভু বাস করেন অগম্য পুরীতে। সেখানেই আমি যাব। জায়গাটার পরিচয় দিয়ে বলে—সেখানে আছে আটটি কুঁয়ো আর নয়টি বাপী আর আছে ষোলটি মেয়ে, তারা জল আনে। এর মানে হ'ল, তিনি সারা জগৎ জুড়ে রয়েছেন, রয়েছেন প্রত্যেক জীবের মধ্যে। কবীরদাস এ কথা স্পষ্ট করেই বলেছেন। বলেছেন—ভাই সাধু, শোন, এরই মধ্যে (এই ঘটের মধ্যে) আমার সাঁই রয়েছেন।

ভগবান সর্ব্বব্যাপী বটেন। কিন্তু ভক্ত তাঁকে পায় আপন অন্তরের মধ্যে। তাই কবীরদাস বললেন, অন্তরে খোঁজ—কেবল অন্তরেই খোঁজ, এখানে আছেন করীম, এখানেই আছেন রাম।

পুরাণ বলে, ভগবান থাকেন বৈকুণ্ঠে। সাধারণ লোকে মনে করে, এই বৈকুণ্ঠ জগতের বাইরে সুদূর ঊর্দ্ধলোকের কোনো একটা স্থান। কবীরদাস এ সব কথা বিশ্বাস করতেন না। তিনি মনে করতেন, বৈকুণ্ঠ ঊর্দ্ধে কোথাও নয়, তা এই জগতেই রয়েছে; সাধু-সঙ্গই সেই বৈকুণ্ঠ। ভগবান সর্ব্বত্রই আছেন। তিনি আছেন অন্তরে। সাধুসঙ্গেই এই সত্যের উপলব্ধি হয়, সাধুদের মধ্যে তাঁর অস্তিত্ব স্পষ্ট অনুভব করা যায়। এই জন্যই বুঝি কবীরদাস সাধুসঙ্গকে বৈকুণ্ঠ বলেছেন। কবীরদাস বার বার বলেছেন; প্রভু থাকেন উঁচু অট্টালিকায়। বধূ সেখানে উঠতে সাহস পায় না, তার ভয় করে। উন্মুনি সমাধির অবস্থাকেই কবীরদাস উঁচু অট্টালিকা বলেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্তর ছাড়িয়ে মন যখন উপরে উঠে সমাধি-মগ্ন হয়, তখনই হয় তার ভগবদ্-উপলব্ধি। আবার কবীরদাসের প্রিয়-তমের উঁচু মহল হ'ল যোগের পরিভাষায় সহস্রার। ষট্চক্রের ঊর্দ্ধে সহস্রার। এই সহস্রারেই হয় জীবে-শিবে মিলন। তাই এই দিক দিয়ে দেখলেও প্রিয়তমের মহল উঁচুই বটে।

বধূ এল স্বামীর ঘরে। কিন্তু তবু মিলন হ'ল না। দুঃখ করে সে বলছে, "স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর-বাড়ী এসেছি। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে আমি থাকতে পারলাম না; জানলাম না সেই সঙ্গের কি স্বাদ। স্বপ্নের মত কেটে গেল আমার যৌবন।

মিলনের অন্তরায় বহু। তার মধ্যে প্রধান অন্তরায় বধূর মনের দোটানা ভাব। স্বামীর কাছে এসেও সে ভাব তার যায়নি। তার মন একবার বাপের বাড়ীর দিকে টানছে, একবার টানছে স্বামীর বাড়ীর দিকে। এই ভাব না গেলে মিলন হ'তে পারে না। আর সব ছেড়ে কায়মনোবাক্যে যদি তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা যায় তবেই মিলন হওয়া সম্ভব।

আর একটি বাধা আছে। বধূর গায়ে রয়েছে পোষাক, কাঁচুলি, চুনরী। বাপের বাড়ীর এ সব পোষাক। বিষয়ের দাগ লেগে লেগে ময়লা। এগুলো না ধুয়ে ফেললে ত প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন হবে না? কিন্তু ধোয়া কি সহজ? রগড়ে-রগড়ে ধুলেও তবু দাগ যায় না। জ্ঞানের সাবান দিয়ে ধুতে হয়। কিন্তু প্রিয়তম কৃপা না করলে তা'ও করা যায় না। তাই কবীরদাস বললেন, প্রভু যখন তোমাকে আপন করে নেবেন তখনই দাগ সব উঠে যাবে। এর থেকে বোঝা যায়, কবীরদাসের মতে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন হ'তে পারে তখনই, যখন তিনি স্বয়ং কৃপা করবেন। তিনি কৃপা করলে মিলনের আর কোনো বাধা থাকে না। শাশুড়ী ননদী সবাইকে এড়িয়ে তার কাছে যাওয়া যায়। সমস্ত ছেলেমানুষি নিমেষে ঘুচে যায়। তিনি যে স্বয়ং হাত ধরে কাছে টেনে নেন।

মানুষের আছে দুই রূপ; এক জৈব বা মৃন্ময়, অপর চিন্ময়। জৈব রূপে সে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা জটিলতা-আবিলতার মধ্যে জড়িত; ক্ষুধা-তৃষ্ণাদিতে কাতর; রিপু-তাড়িত। অজ্ঞে তার কত

ধূলো-বালি, মলিনতা, আর চিন্ময় রূপে সে শুদ্ধমুক্ত-স্বভাববান। প্রিয়তম যখন কাছে টানেন তখন জীবের এই চিন্ময় রূপই প্রধান হ'য়ে উঠে। এরই সঙ্গে. হয় প্রিয়তমের মিলন। সীমার মধ্যে আছে অসীম। তারই সঙ্গে হয় অসীমের মিলন। নইলে মিলন হয় না। কারণ, প্রেমশাস্ত্র বলে, সমানে সমানে নইলে প্রেম হয় না। ভক্তের মধ্যে আছে চিরন্তন প্রেমিকা। তারই সঙ্গে মিলন হয় চিরন্তন প্রেমিকের।

তিনি চির প্রেমময়। তাঁর প্রেমের সীমা নেই। তাঁর প্রতি যার প্রেম জন্মাল, তাকে তিনি কত ভাবে কত রূপে প্রেম দান করেন। রবীন্দ্রনাথের ভগবান যেমন রাজার রাজা হয়েও মানুষের হৃদয় হরণ করার জন্য কত মনোহরণ বেশে এসে দেখা দেন, মানুষ তাঁকে চায় কি চায় না সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন না, তেমনি কবীরদাসের প্রিয়তম সম্বন্ধে কবীরদাস নিজেই বলছেন—"কবীরদাসের তাঁর প্রতি ক্ষণেকের জন্যও প্রেম জন্মাল না। তবু তাঁর প্রীতি দিন দিন নব-নব রূপে দেখা দিচ্ছে।"

প্রিয়তমের প্রেম সবাই পায় কিন্তু তাকে গ্রহণ করতে পারে, তার মর্য্যাদা রাখতে পারে অল্প লোকেই। কেন না, যে একে গ্রহণ করে, দুঃসহ তার দুঃখ, অসীম তার বেদনা। তবে তাঁর বাণী যে ভাগ্যবানের মরমে প্রবেশ করল তার আর অন্য গতি নেই, উপায় নেই, অন্তরে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে বর্ষণ-মুখরিত রাতে অন্ধকারে দুঃখের বন্ধুর পথেই সে চলে অভিসারে। শত বাধা এলেও যে প্রিয়তমের সঙ্গে 'তার মিলন হবেই এ বিষয়ে তার মনে কোনো সংশয়ই থাকে না। কবীরদাসও এই আশ্বাসই দিচ্ছেন—"ওরে, তোর সঙ্গে প্রিয়তমের মিলন হবেই। এবার সরিয়ে দে ঘোমটার কাপড়।"

[ক্রমশঃ।

দুইটি যন্ত্র

তড়িচ্চুম্বকীয় গবেষণার জন্য জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল গতিবিদ্যা নিয়েও মাথা ঘামাতেন। তাঁর আবিষ্কৃত একটি লাটিমের চিত্র দেওয়া হ'ল। এটি এমন ভাবে তৈরী যে, ভারকেন্দ্রের উপর ব্যালান্স করে রাখলে, অন্য কোন বলের দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে না। পৃথিবীর গতি নির্ণয়ের জন্য তিনি এই যন্ত্র ব্যবহার করেন।

অফিসে যোগ দেওয়ার এবং বিল তৈরী করবার যন্ত্র রাখা হয়। কিন্তু এই যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে বহু দিন পূর্ব্বে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে। চিত্রে চার্ল্স ব্যাবেজের আবিষ্কৃত একটি
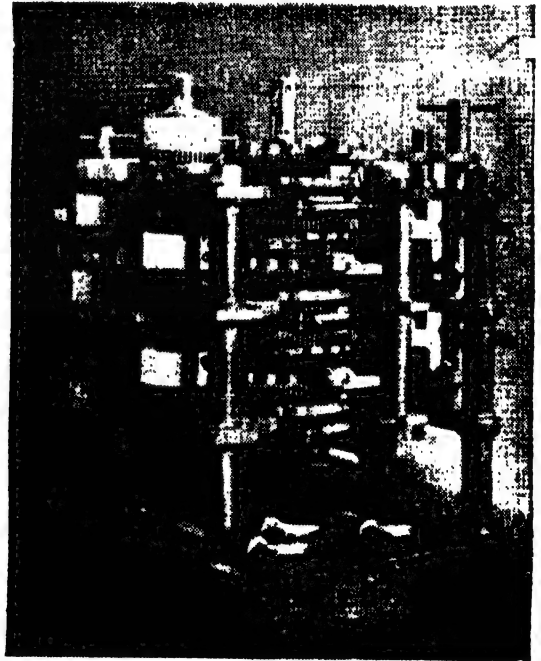
অঙ্ক-কষা যন্ত্রের একাংশ দেখান হয়েছে। তখনই (১৮৩০-৪০) এই যন্ত্রের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ১৭,০০০ পাউণ্ড খরচ হয়েছিল।

সা হি ত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

দীননাথ সান্যাল—সমালোচক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬৪ বঙ্গ শ্রীরামপুরে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৩৪২ বঙ্গ ৪ঠা পৌষ। পৈতৃক নিবাস—কৃষ্ণনগর। শিক্ষা—ছাত্রবৃত্তি (শ্রীরামপুর), সি. এ. ও এম. বি। ডাক্তারী পাশ করিয়া সরকারী চাকুরী গ্রহণ এবং সিবিল সার্জেন পদে অধিষ্ঠিত। রায় বাহাদুর উপাধি লাভ। গ্রন্থ—মেঘনাদ বধ (১৩১৩), সীতা ও সরমা (১৯২১), ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা, তিলোত্তমা, নীলু খুড়ো, কুমারসম্ভব, স্বাস্থ্যবিদ্যা প্রবেশিকা (১৯২০)।

দীননাথ সেন—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৩৯ ঢাকা জেলায় মাণিকগঞ্জের বায়রা গ্রামে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৮৯৮ খৃঃ। পিতা—গোকুলচন্দ্র সেন (মুন্সি), মাতা—দয়াময়ী। পৈতৃক নিবাস—দাসরা গ্রাম (মাণিকগঞ্জে)। শিক্ষা—কুমিল্লা জিলা স্কুল ও ঢাকা কলেজ। কর্ম—নর্মাল স্কুলে শিক্ষকতা। পূর্ব্ববঙ্গে স্কুল পরিদর্শকরূপে কার্য। ঢাকার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা। গ্রন্থ—শিক্ষাদান প্রণালী, মানসিক গণনা, বঙ্গদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

দীননাথ সেন—সাহিত্যিক। নিবাস—বরিশাল। সম্পাদক—হিতৈষিণী (বরিশাল, মাসিক ১২৮২ বঙ্গ)।

দীনবন্ধু গুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অজেন্দু-চরিত (১২৬৪ বঙ্গ)।

দীনবন্ধু মিত্র—নাট্যকার ও সাহিত্যিক। জন্ম—১২৩৬ বঙ্গ নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে। মৃত্যু—১২৮০ বঙ্গ ১৭ই কার্ত্তিক। পিতা—কালাচাঁদ মিত্র। পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্বনারায়ণ মিত্র। শিক্ষা—লঙ সাহেবের স্কুলে, জুনিয়ার স্কলারশিপ, সিনিয়ার স্কলারশিপ (হিন্দু কলেজ)। কর্ম—পাটনার পোষ্টমাষ্টার (১৮৫৫), ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার, উড়িষ্যা বিভাগ, নদীয়া, ঢাকা। সুপার নিউমারি ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার (১৮৭০)। রায় বাহাদুর উপাধিলাভ। গ্রন্থ—নীলদর্পণ (নাটক, ১৮৬০), নবীন তপস্বিনী (নাটক, কৃষ্ণনগর ১৮৬৩), বিয়ে পাগলা বুড়ো (প্রহসন, ১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৬), লীলাবতী (নাটক, ১২৭৪), সুরধুনী কাব্য, ১ম (১৮৭১), ২য় (১৮৭৬), জামাইবারিক (প্রহসন, ১৮৭২), কমলে-কামিনী নাটক (১২৮০), কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়া মহেশ্বর (উপন্যাস), দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২), পদ্যসংগ্রহ।

দীনবন্ধু দাস—বৈষ্ণব কবি। ইনি এক জন পদাবলী সংগ্রাহক। গ্রন্থ—সংকীর্তনামৃত।

দীনহীন দাস—কবি ও পদকর্ত্তা। প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। গ্রন্থ—কিরণদীপিকা (গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার পদ্যানুবাদ)।

দীনেন্দ্রকুমার রায়—গ্রন্থকার। জন্ম—নদীয়া জেলার মেহেরপুর গ্রামে। কর্ম—শিক্ষকতা, বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগে এবং কিছু দিন শ্রীঅরবিন্দের বাংলা শিক্ষক। গ্রন্থ—অরবিন্দ-প্রসঙ্গ (চন্দননগর, ১৩৩০), সোনার পাহাড়, নানা সাহেব, নারীর প্রেম, পল্লীচিত্র, পল্লীবৈচিত্র, কলির কালনেমি, আরব্য রজনী (১৩৪২), নেপোলিয়ান বোনাপার্টি, মহিমময়ী ; এতদ্ব্যতীত রহস্য-লহরী ডিটেক্টিভ সিরিজের বহু গ্রন্থ।

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—বৈষ্ণব। নিবাস—আন্দুল-মৌরী গ্রামে। ইনি পরম বৈষ্ণব এবং সুকণ্ঠী কীর্তনগায়ক। গীতরত্ন উপাধি লাভ। গ্রন্থ—কীর্তন-গীতি সংগ্রহ, পঞ্চগীতা, প্রাণের কথা, প্রেমানন্দ-সংবাদ। সম্পাদক—ভক্তি (মাসিক ১৩১৫-৩৬)।

দীনেশচন্দ্র সেন—শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৬৬ খৃঃ ঢাকা জেলায় বকজুড়ি গ্রামে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৯৩৯ খৃঃ কলিকাতার উপকণ্ঠে বেহালা নামক স্থানে। পিতা—ঈশ্বরচন্দ্র সেন। পৈতৃক নিবাস—ঢাকা সুয়াপুর গ্রামে। শিক্ষা—ঢাকা স্কুল, বি. এ (ঢাকা কলেজ)। কর্ম—কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রধান শিক্ষক, রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২০—১৯৩২), বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার (১৯০৯), সিনেটের সভ্য (১৯১০), ডি, লিট (অনারারী, ১৯২২), রায় বাহাদুর উপাধিলাভ। গ্রন্থ—রেখা, কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ (কাব্য), গৃহশ্রী, নীলমাণিক, ওপারের আলো, বেহুলা, ফুল্লরা, সতী, গায়ে হলুদ, সাঁজের ভোগ, আলোকে আঁধারে, মলুয়া, চাকুরীর বিড়ম্বনা, শ্রীগৌরাঙ্গ, রামায়ণী কথা (১৩১৪), ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ (১৩৩০), মহাভারত, রামায়ণ, মুক্তাচুরি, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬), বাংলার পুরনারী, তিনবন্ধু (১৩১১), পতিমন্দির, জড়ভরত, সুকথা, বৃহৎ বঙ্গ, ১ম, ২য়, History of Bengali Language & Literature, Folk Literature of Bengal, Bengali Prose Style, Medeaval Vaishnava Literature of Bengal, Chaitanya & his Companions, Chaitanya & his age, Typical Selections from old Bengali Lit. 2 Vols. Eastern Bengal Ballads, 3 Vols. Glimpses of Bengali Life, রাগরঙ্গ, রাখালের রাজগী, সুবল সখার কাণ্ড, কানু পরিবাদ, সরল বাঙ্গালা-সাহিত্য, বৈদিক ভারত, বৈশাখী, ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য।

দীনেশচরণ বসু—সাহিত্যিক। জন্ম—১২৫৭ বঙ্গ ১২ই ফাল্গুন (পূর্ণিয়া)। মৃত্যু—১৩০৫ বঙ্গ ২৭এ আশ্বিন ঢাকা। পিতা—অভয়াচরণ বসু। পৈতৃক নিবাস—ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমায় শ্রীবেড়িয়া (শ্রীবাড়ী) গ্রামে। শিক্ষা—প্রবেশিকা (ভাগলপুর), মেডিক্যাল কলেজ। শারীরিক অসুস্থতার জন্য অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া ইনি সাহিত্যের সেবা করেন। গ্রন্থ—মানসবিকাশ (কবিতা, ১২৮০), কবিকাহিনী (কবিতা, ১৮৭৬), কুলকলঙ্কিনী (উ, ১৮৮৩) মহাপ্রস্থান কাব্য (১২৯৪), নিরাশ প্রণয় (১৮৮৯) জাগ মা আমার (১২৮২)। সম্পাদক—চারুবার্তা (সাপ্তাহিক, মৈমনসিং ১২৮৮), ঢাকা-প্রকাশ।

দীনেশরঞ্জন দাশ—সাহিত্যিক। সম্পাদক—কল্লোল (মাসিক, ১৩৩০)

দুঃখী শ্যামাদাস দে—বৈষ্ণব ভক্ত কবি। জন্ম—(আনু) ১০৭০ বঙ্গ মেদিনীপুরে হরিহরপুর গ্রামে দে-বংশীয় কায়স্থ-বংশে। উপাধি অধিকারী। পিতা—শ্রীমুখ অধিকারী। মাতা—ভবানী। গ্রন্থ—গোবিন্দমঙ্গল (কাব্য), শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ।

দুর্গাভঞ্জন—জ্যোতিষী। গ্রন্থ—রেখাজাতক সুধাকর (সামুদ্রিক গ্রন্থ)।

দুর্গাচরণ চক্রবর্তী—কবি। নামান্তর—ধুলা চক্রবর্তী। ইনি ফরমাইসামত যে কোন ছন্দ বা ভাবের গীত রচনা করিতে পারিতেন। পালাগ্রন্থ—তরণীসেন-বধ, রাসলীলা।

দুর্গাচরণ চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—স্থপতিবিজ্ঞান, সার্ভেয়িং জরিপ শিক্ষা, অলৌকিক রহস্য, যষ্ঠেন্দ্রিয় ও অলৌকিক রহস্যের যৌগিক ব্যাখ্যা।

দুর্গাচরণ রক্ষিত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভারত প্রদক্ষিণ, নিবৃত্তির পথে।

দুর্গাচরণ রায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪৭ খৃঃ বর্ধমানের দীর্ঘপাতার বৈদ্যবংশে। মৃত্যু—১৮৯৭ খৃঃ। গ্রন্থ—দেবগণের মর্ত্যে আগমন, পাশ করা ছেলে, দুঃখ নিশি আসা, চিনির বলদ।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাংবাদিক। গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ। সম্পাদক—প্রভাত সমীর (দৈনিক—১২৮১)।

দুর্গাচরণ সান্যাল—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪৭ খৃঃ ১ই জুন দিনাজপুর। গ্রন্থ—বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, ভাষাবিজ্ঞান, মহামঙ্গল কাব্য।

দুর্গাদত্ত ঝাঁ—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮শ শতাব্দীতে দ্বারবঙ্গের অন্তর্গত মধুবাণীর উপরিভাগে ভরাম গ্রামে। অনুবাদ গ্রন্থ—'দুর্গাসপ্তশতী'।

দুর্গাদাস দে—সাহিত্যিক ও নাট্যকার। জন্ম—১৮৬৫ খৃঃ কলিকাতা। মৃত্যু—১৯১১ খৃঃ। কর্ম—মডেল স্কুল স্থাপন ও তথায় কর্ম। পরে—সিটি, মিনার্ভা, ক্লাসিক, গ্রাণ্ড নাট্যমঞ্চের কার্যাধ্যক্ষ। গ্রন্থ—আদর্শ ব্যাকরণ। নাট্যগ্রন্থ—স্ত্রী, জুবিলী যজ্ঞ, ল' বাবু, ছবি, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, মহিলা মজলিস্। সম্পাদক—মজলিস, গল্পগুজব, দুর্গাদাসের দপ্তর।

দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ—টীকাকার। পিতা—নৈয়ায়িক পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম। গ্রন্থ—মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকা, কবিকল্পদ্রুমের টীকা (১৬৩১ খৃঃ)।

দুর্গাদাস লাহিড়ী—ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক। জন্ম—১২৬০ বঙ্গ বর্ধমান জেলার চকব্রাহ্মণ-গড়িয়া। মৃত্যু—১৩৩১ বঙ্গ ২১এ শ্রাবণ। পিতা—সুধারাম লাহিড়ী। শিক্ষা—সাঁত্রাগাছি স্কুল, মেট্রোপলিটান কলেজ। অন্নরক্ষিণী সভা স্থাপন। সম্পাদক—বঙ্গবাসী। সম্পাদক ও পরিচালক—অনুসন্ধান (পাক্ষিক—১২৯৪, সাপ্তাহিক, ১৩০১-১৩০৮)। গ্রন্থ—পৃথিবীর ইতিহাস, স্বাধীনতার ইতিহাস, জুয়াচুরী-রহস্য (১৩০৪), রাণী ভবানী, সাধনতত্ত্ব, চিত্রাবলী, মণি (১৩২৩), সুখ ও শান্তি, রাজা রামকৃষ্ণ, লক্ষ্মণ সেন, স্বর্ণ বলয়, নবরঙ্গ, মর্ত্যের ভগবান্, জ্ঞানযোগ, জাল ও খুন, ভারতে দুর্গোৎসব, দ্বাদশ নারী, নির্বাণ-জীবন, বাঙ্গালীর গান, বৈষ্ণব পদলহরী, শিখ যুদ্ধের ইতিহাস, অদৃষ্ট চক্র, পঞ্চানন্দের পঞ্চরং, সাধনা, সৎপ্রসঙ্গ। সম্পাদিত গ্রন্থ—রামায়ণ ও মহাভারত; অনুবাদ গ্রন্থ—চতুর্বেদ (বঙ্গাক্ষরে অনুবাদ), এনক আর্ডেন (Enoch Ardenএর পদ্যানুবাদ)।

দুর্গানাথ রায়—বাঙ্গালী সাধক। মৃত্যু—১৩৪৪ খৃঃ। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। সম্পাদক—বঙ্গবন্ধু (পাক্ষিক পত্র), মিলন।

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—কবি। জন্ম—১৯শ শতাব্দীতে নদীয়ার উলা বা বীরনগর গ্রামে। পিতা—আত্মারাম মুখোপাধ্যায়। মাতা—অরুন্ধতী। গ্রন্থ—গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী (কাব্য—১২৮৪ বঙ্গ)।

দুর্গাপ্রসাদ শর্মা—গ্রন্থকার। জন্ম—কলিকাতার দক্ষিণে মদনমল্ল পরগণার অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর। পিতা—রামচন্দ্র বাচস্পতি। গ্রন্থ—মুক্তাবলী।

দুর্গাবতী ঘোষ—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—পশ্চিমযাত্রিকী।

দুর্গারাম, দ্বিজ—অনুবাদক। গ্রন্থ—রামায়ণ (অনুবাদ), কালিকাপুরাণ (ঐ)।

দুর্গাশঙ্কর—জ্যোতিষী। গ্রন্থ—আগার-বিনোদ (বাস্তুবিদ্যা), জাতক পদ্ধতির টীকা।

দুর্জয় দাস—গ্রন্থকার। জন্ম—শ্রীখণ্ড। পিতা—বিশ্বম্ভর দাস। গ্রন্থ—বৈদ্যকুলপঞ্জিকা।

দুর্লভ মল্লিক—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮শ শতাব্দী। গ্রন্থ—গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র রাজার কীর্তি বিষয়ক গীত।

দেবকান্ত বাগ্চী—সাহিত্যিক। সম্পাদক—লাঠ্যৌষধি (সাপ্তাহিক, ১৮৮০)।

দেবকীনন্দন দাস—বৈষ্ণব গ্রন্থাকার। জন্ম—হালিশহরে ব্রাহ্মণ বংশে। পিতা—সদাশিব কবিরাজ। গ্রন্থ—বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবাভিধান।

দেবকুমার রায়চৌধুরী—গ্রন্থকার। জন্ম—বরিশাল জেলার লাখুটিয়া গ্রামে জমিদার বংশে। মৃত্যু—১৩৩৬ বঙ্গ। পিতা—রাখালচন্দ্র রায়। গ্রন্থ—দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী, দেবদূত (নাটক)। কাব্যগ্রন্থ—অরুণ, মাধুরী, প্রভাতী, ব্যাধি ও প্রতিকার ধারা।

দেবদাস—আয়ুর্বেদবিদ্। গ্রন্থ—চিকিৎসামৃতসার।

দেবজ্যোতি বর্মণ—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। এম, এ (৬টি বিভিন্ন বিষয়ে)। অধ্যাপক—সিটি কলেজ। গ্রন্থ—ভারতীয় রাষ্ট্রবিধি ১৯৩৫, বিড়লাবাড়ী-রহস্য। সম্পাদক—যুগবাণী।

দেবদাস করণ—সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ্। জন্ম—১৮৭৬ খৃঃ মেদিনীপুর পোড়াবাজার। মৃত্যু—১৯১৪ খৃঃ ২৩এ মে। সরকার কর্তৃক নিগৃহীত দেশসেবক। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—মেদিনীবান্ধব (সাপ্তাহিক, ১৮৯৮—১৯১৪)।

দেবনাথ—বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবি। গ্রন্থ—গৌরগণাখ্যান, ভ্রমর গীতা।

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী—রাজনীতিবিদ্ ও আইনজীবী। জন্ম—১২৬৮ বঙ্গ হাওড়া জেলার বামুনপাড়া গ্রামে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ সর্বাধিকারী বংশে। মৃত্যু—১৩৪২ বঙ্গ ভাদ্র কলিকাতার স্থরি লেনে। পিতা—রায় বাহাদুর সূর্যকুমার সর্বাধিকারী। শিক্ষা—প্রবেশিকা (১৮৭৬), এফ, এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ—১৮৮২), এটর্নীশিপ পরীক্ষা (১৮৮৮)। আইন-ব্যবসায়, ল' ফ্যাকালটী ও সিণ্ডিকেটের সভ্য। ডি-এল, সি-আই-ই ও কে-টি উপাধিলাভ। ভাইস-চ্যান্সেলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৪-১৮), বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে লণ্ডনে বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে গমন। এল. এল. ডি উপাধিলাভ (১৯১৩), জেনেভায় লীগ অফ নেশনসে প্রতিনিধি, (১৯৩০)। গ্রন্থ—ইউরোপে তিন মাস (ভ্রমণ), স্মৃতি-রেখা, দক্ষিণ আফ্রিকা দৌত্য কাহিনী, জেনেভা ভ্রমণ, সঙ্গীতলহরী, সনাতনী, Thoughts & Problems.

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী—সাহিত্যিক। জন্ম—১২৬০ বঙ্গ বরিশাল কালীপুর গ্রামে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৩২৭ বঙ্গ ১৮ই আশ্বিন কলিকাতায়। পৈতৃক নিবাস—ফরিদপুরের অন্তর্গত উলপুর গ্রামে। পিতা—রামচন্দ্র (বসু) রায়চৌধুরী। শিক্ষা—ফরিদপুর, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ (১৮৭৩)। সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ। গ্রন্থ—অপরাজিতা, নবলীলা (১২৯২), পুণ্যপ্রভা (১৩০৩), বিরাজমোহন, ভিখারী (১২৮৮), মুরলা (১২৯৯), যোগজীবন (১২৯৮), শরৎচন্দ্র ১ম, ২য়, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, বিবাহ-সংস্কার, বিবেকবাণী, দীপ্তি, দ্যুতি, জ্যোতিঃকণা, প্রসাদ, সন্ন্যাসী, শান্তিবন, সোপান, সান্ত্বনা। সম্পাদক—ভারত-সুহৃদ, নব্যভারত (মাসিক—১২৯০-১৩২৭)।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন।

দেবীপ্রসাদ, মুন্সী—গ্রন্থকার। জন্ম—শ্রীহট্ট জেলায় আখালিয়া গ্রামে। ইনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মুন্সী। নানা ভাষায় ইঁহার জ্ঞান ছিল। গ্রন্থ—পলিগ্লট গ্রামার (Polyglot Grammer)।

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী—শিল্পী। অধ্যক্ষ, আর্ট কলেজ (মাদ্রাজ)। চিত্র-শিল্পে ও ভাস্কর্য-শিল্পে ইঁহার দান অতুলনীয়। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—মাংসলোলুপ, পিশাচ।

দেবীবর ঘটক, বন্দ্যোপাধ্যায়—মেলবন্ধন কর্তা। জন্ম—১৬শ শতাব্দী। পিতা—সর্বানন্দ ঘটক। গ্রন্থ—মেলবন্ধন, ভাগভাবাদিনির্ণয়।

দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অহল্যা (১২৯৮), গায়ত্রী।

দেবেন্দ্রকুমার রায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—কাঁচড়াপাড়া-প্রকাশিকা (মাসিক, ১২৮০)।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি—ব্রাহ্মসমাজপতি ও প্রধান আচার্য। জন্ম—১২২৩ বঙ্গ জ্যৈষ্ঠ, কলিকাতা। মৃত্যু—১৩১২ বঙ্গ ৬ই মাঘ। পিতা—প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। শিক্ষা—হিন্দু কলেজ। পিতৃবন্ধু রাজা রামমোহনের সংস্পর্শে আসিয়া ইনি জ্ঞান ও ধর্মপিপাসু হন এবং একেশ্বরবাদের অনুরাগী হইয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে মনোনিয়োগ করেন (১২৫০)। ব্রাহ্ম সমাজপতি এবং প্রধান আচার্য উপাধি (১৮৬২ খৃঃ), 'মহর্ষি' মানপত্র (১৮৬৭)। স্থাপন—তত্ত্বরঞ্জিনী সভা (পরে উহা তত্ত্ববোধিনী সভা), ব্রহ্মবিদ্যালয় (১৮৫৯), কার্যাধ্যক্ষ—হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়; বহু দেশ ভ্রমণ, (হিমালয়, চীনদেশ)। বীরভূম জেলার ভুবনডাঙ্গা নামক স্থানে ভূমি ক্রয় করিয়া সাধন আশ্রম (বর্তমান শান্তিনিকেতন) স্থাপন (১৮৭৬ খৃঃ)। ইঁহারই পুত্র—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। গ্রন্থ—আত্মতত্ত্ববিদ্যা, (১৭৭৪ শক) ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস, (১৭৭২ শক) জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি, (১৮১৫ শক) পরলোক ও মুক্তি (১৮১৫), প্রবন্ধ সংগ্রহ, স্তুতিমালা, ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান (১৭৮৩ শক)। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, ব্রাহ্মধর্ম ১ম ও ২য় (১৮৫০), ঐ, অনুবাদ (১৮৫১-৫২), পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্য সংগ্রহার্থে ব্রাহ্ম-সমাজের বক্তৃতা (১৯৬১), কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা (১৮৬২), মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ (১৭৮৯ শক), ব্যাখ্যানের পরিশিষ্ট (১৮০৭ শক), ব্রাহ্মবিবাহ প্রদর্শনী (১৭৮৫ শক) ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত (১৭৮৬ শক), ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতি (১৮৬৫), ভবানীপুর ব্রাহ্ম-বিদ্যালয়ে উপদেষ্টা (১৮৬৫-৬৬), স্বরচিত জীবনী (১৮৯৮), পত্রাবলী, Vedantic Doctrines Vindicated (১৮৪৬)।

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র—গ্রন্থকার। জন্ম—ধুমুর্ধাগড়, মেদিনীপুর। পিতা—কাশীনাথ মিত্র (জমিদার)। শিক্ষা—এম. এ (১৯১১), বি-এল (১৯২৫)। গ্রন্থ—কৌতুক-কথা, গল্প-ঝরণা, অঞ্জলি, কাকলি, মঞ্জুলিকা।

দেবেন্দ্রনাথ মহাপাত্র—গ্রন্থকার। জন্ম—আড়গোয়াল, মেদিনীপুর। মৃত্যু—১৯৫১ খৃঃ। পিতা—প্রেমচাঁদ মহাপাত্র। আইন-ব্যবসায়ী। গ্রন্থ—কোহিনুরমণি কাহিনী (ইতিহাস—১৯৪৯ খৃঃ)।

দেবেন্দ্রনাথ দাস—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৫৬ খৃঃ। মৃত্যু—১৯০৮ খৃঃ। পিতা—শ্রীনাথ দাস। শিক্ষা—প্রবেশিকা (হিন্দু কলেজ—১৮৭২), এফ. এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ), সিবিল সার্বিস পরীক্ষা (কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়), নানা ভাষা শিক্ষা। বিলাতে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন। স্বদেশে প্রত্যাগমন (১৮৯৯ খৃঃ); সিটি কলেজের অধ্যাপক, রিপন কলেজের অধ্যাপক। গ্রন্থ—মিরোগী (ইতালী ভাষা হইতে অনুবাদ), পাগলের কথা (আত্মজীবনী)।

দেবেন্দ্রনাথ বসু—কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১২৬৭ বঙ্গ, ৮ই বৈশাখ কলিকাতা কাঁটাপুকুর বসু-বংশে। মৃত্যু—১৩৪৫ বঙ্গ ২৩এ কার্ত্তিক। পিতা—গোপীনাথ বসু (সব-জজ)। শিক্ষা—প্রবেশিকা (নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল, ১৮৭৮), জেনারেল এ্যাসেমব্লী। কর্ম—একাউন্টেণ্ট জেনারেলের অফিস, নিউ ম্যান কোং, মিনার্ভা থিয়েটার, কাশিমবাজার মহারাজার সচিব। গ্রন্থ—বাসি ফুল, চক্রবিকা, গোপালের মা, পরমহংসদেব (১৩২৯), শ্রীকৃষ্ণ (বসুমতী)। অনুবাদ গ্রন্থ—ওথেলো, অ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা (উপন্যাস)। সম্পাদক—নলিনী (১২৮৭)।

দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন—সাহিত্যিক। সম্পাদক—শিক্ষাদর্পণ (মাসিক, ১৩০১)।

দেবেন্দ্রনাথ সেন—কবি। জন্ম—১৮৫৮ খৃঃ যুক্তপ্রদেশের গাজীপুরে। মৃত্যু—১৯২০ খৃঃ। পিতা—লক্ষ্মীনারায়ণ সেন (গাজীপুরে তুলা ও চিনি ব্যবসায়ী)। পৈতৃক নিবাস—হুগলী উলাগড়। শিক্ষা—এনট্রান্স (পাটনা কলেজিয়েট স্কুল—১৮৭২ খৃঃ), বি. এ. এম. এ. (এলাহাবাদ)। কর্ম—আইন ব্যবসায়, এলাহাবাদ হাইকোর্ট (১৮৯৪ খৃঃ)। প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীকৃষ্ণ মিশন, শ্রীকৃষ্ণ রিভিয়ু পত্রিকা, শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা (১৯০০)। কাব্যগ্রন্থ—ফুলবালা (১২৮৭), উর্মিলাকাব্য (১২৮৭), নির্ঝরিণী (১২৮৭), আশাগুচ্ছ (১৩০৭), অপূর্বনৈবেদ্য (১৩১৯), অপূর্বশিশুমঙ্গল (১৩১১), অপূর্ববীরাঙ্গনা (ঐ), শ্যামামঙ্গল (ঐ), গোলাপগুচ্ছ (ঐ), কালিকামঙ্গল (ঐ), গণেশমঙ্গল, (ঐ), খ্রীষ্টমঙ্গল (ঐ), শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (ঐ), গৌরাঙ্গমঙ্গল (ঐ), জ্ঞানদামঙ্গল (ঐ), অপূর্বব্রজাঙ্গনা (ঐ), পারিজাতগুচ্ছ (১৩১৯), শেফালীগুচ্ছ (১৩১৯), হরিমঙ্গল (১৩১১), দশুকচু, রসরচনা, ১৩১৯)।

দেবেন্দ্রবিজয় বসু—গ্রন্থকার। শিক্ষা—এম. এ. বি. এল। বর্ধমানের সবজজ। গ্রন্থ—সমাজ ও আদর্শ, শ্রীমদ্ভগবতগীতার ব্যাখ্যা।

দৌলত কাজী—মুসলমান কবি। জন্ম—চট্টগ্রাম ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান। কাব্যগ্রন্থ—সতী ময়না, লোরচন্দ্রাণী।

দ্বারকানাথ অধিকারী—কবি ও সাহিত্যিক। ছদ্মনাম—বুনোকবি। জন্ম—নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোস্বামী দুর্গাপুর। শিক্ষা—কৃষ্ণনগর কলেজ। দ্বারকানাথ কৃষ্ণনগর কলেজ, দীনবন্ধু হিন্দু কলেজ ও বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে পাঠাবস্থায় কবিতা-যুদ্ধ করিতেন। উহা ক্রমাগত এক বৎসর কাল 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ' বলিয়া প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশ হইত। গ্রন্থ—সুধীরঞ্জন (কাব্য)।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—সাহিত্যিক ও কবি। জন্ম—১২৫১ বঙ্গ ১ই বৈশাখ বিক্রমপুর পরগণার মাগুরখণ্ড গ্রামে। মৃত্যু—১৩০৫ বঙ্গ আষাঢ়। পিতা—কৃষ্ণপ্রাণ গঙ্গোপাধ্যায়। শিক্ষা—ফরিদপুর ও বিক্রমপুরের কালীপাড়া গ্রামে। শিক্ষকতা। স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী। স্থাপন—হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় (১৮৭৩), ভারত-সভা। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ। বঙ্গ মহিলা-বিদ্যালয় স্থাপন (১৮৭৮), পরে ইহা বেথুন স্কুলে যুক্ত হয়)। অন্যতম প্রতিষ্ঠা—সঞ্জীবনী (সংবাদপত্র)। কাব্যগ্রন্থ—কবিগাথা, কবিতা-কুসুম, সুরুচির কুটির (উপন্যাস), বীর নারী, নববার্ষিকী, সরল পাটীগণিত, ভূগোল, স্বাস্থ্য-তত্ত্ব। সম্পাদক—অবলাবান্ধব (পাক্ষিক, ঢাকা—১৮৬০ পরে কলিকাতা—১৮৭০), সমালোচক (সাপ্তাহিক—১২৮৪), নববার্ষিকী (১২৮৪)।

দ্বারকানাথ গুপ্ত—কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১২৩০ বঙ্গ ১ই বৈশাখ যশোহর জেলার ইতিনা গ্রামে। পিতা—নীলমণি গুপ্ত। শৈশবেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মাতুলালয়ে (বিক্রমপুর কাদাচিয় গ্রামে) আশ্রয় গ্রহণ। শিক্ষকতা—হার্ডিঞ্জ স্কুল। গ্রন্থ—হেমপ্রভা (১২৬৪ বঙ্গ—Vernacular Literary Society কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত), বিক্রমোর্বশী (১২৬৮), ষড়্ঋতুস্তোত্র, ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র (কবিতা, ১২৭০)।

দ্বারকানাথ ন্যায়ভূষণ—পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৩৬ বঙ্গ, মেদিনীপুর জেলায় ভগবানপুর থানার অন্তর্গত বিভীষণ গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৮ বঙ্গ। পিতা—উমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। অধ্যাপক মুগবেড়িয়া ভোলানাথ চতুষ্পাঠী (১২৬৮-১৩১৮)। গ্রন্থ—লঘু সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ (১৮১৫), গণকারিকা (১৮১১), অব্যয়কোষ ও বৃহদাকার অব্যয়কোষ, তাণ্ডবস্তব টীকা ও কীচক বাক্যাবলী (১৮১১ খৃঃ)।

দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—অনুবাদক। গ্রন্থ—বাইবেলের ইতিহাস (বি, বি, ট্রিমার কৃত। বঙ্গানুবাদ—১৮৪৩)।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—পণ্ডিত ও সংবাদপত্রসেবী। জন্ম—১২২৬ বঙ্গ বৈশাখ ২৪-পরগণার চাঙ্ড়িপোতা গ্রামে। মৃত্যু—১২৯১ বঙ্গ ৮ই ভাদ্র জব্বলপুরের নিকট রেওয়া রাজ্যে। পিতা—হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। শিক্ষা—গ্রাম্য পাঠশালা ও চতুষ্পাঠী, সংস্কৃত কলেজ (১৮৩২-১৮৪৫) বিদ্যাভূষণ উপাধি লাভ (১৮৪৫) অধ্যাপক, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, গ্রন্থাধ্যক্ষ—সংস্কৃত কলেজ (১৮৪৪)। গ্রন্থ—রোম রাজ্যের ইতিহাস (১৮৫৭), গ্রীস দেশের ইতিহাস, (১৮৫৭), নীতিসার, ১ম ও ২য় (১৮৫৬), ৩য় (১৮৭৮), বিশ্বেশ্বর-বিলাপ (১২৮১), ভূবণসার ব্যাকরণ (১৮৬৫), উপদেশমালা ১ম, ২য় (১২৯০), সাংখ্যদর্শন (১৮৮৬)। সুবুদ্ধি ব্যবহার (১৮৬০)। সম্পাদক—সোমপ্রকাশ (সাপ্তাহিক ১৮৫৪ খৃঃ), কল্পদ্রুম (মাসিক, ১২৮৫-৮১)।

দ্বারকানাথ মজুমদার—সাহিত্যিক। সম্পাদক—উত্তরবাসিনী (মাসিক, ১২৮১)।

দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। হিন্দু ব্যায়াম বিদ্যালয়ের অধীন হিন্দুসভার সম্পাদক। সম্পাদক—হিন্দুরঞ্জন (মাসিক, ১২৮১)।

দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়—চিকিৎসক। সম্পাদক—চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ (মাসিক, ১৩০০)।

দ্বারিকাপ্রসাদ শর্মা, চতুর্বেদী—হিন্দী গ্রন্থকার। জন্ম—১৯৩৪ সংবতে দরাগঞ্জ (এলাহাবাদ)। হিন্দী গ্রন্থ—আরব্যোপন্যাস, শ্রীমদ্ভাগবতসংগ্রহ, সংক্ষিপ্ত মনুস্মৃতি, সংক্ষিপ্ত বিষ্ণুপুরাণ, সচ্চী মনোহর কহানিয়েঁ, উপদেশ রত্নমালা, সংক্ষিপ্ত পরাশরস্মৃতি, আশ্চর্য সপ্তদশী, গ্রীস ঔর রোমকে দণ্ড কথায়েঁ, সংক্ষিপ্ত মার্কণ্ডেয় পুরাণ, হিন্দী মহাভারত, ভারতীয় উপাখ্যানমালা, সরল পত্রবোধ, সংক্ষিপ্ত কালীপুরাণ, শিষ্টাচার-পদ্ধতি, ভাষা হিতোপদেশ, দশ কুমারোঁ কা বৃত্তান্ত, নাটকীয় কথা, হিন্দী ব্যাকরণ-শিক্ষা, যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিসার, আদর্শ মহাত্মাগণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার্থ-সংগ্রহ, উপাসনা-কল্পদ্রুম, পৌরাণিক উপাখ্যান, পদ্যসংগ্রহ।

দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য—জ্যোতির্বিদ্ ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৩০১ বঙ্গ ২৪শে পৌষ শ্রীহট্টের আচার্য ব্রাহ্মণবংশে। পিতা—কবিরাজ কামদেব শর্মাচার্য। শিক্ষা—প্রবেশিকা (পঞ্চখণ্ড হরগোবিন্দ হাই স্কুল—১৯২৪), আই-এ ও বি-এ (শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজ—১৯২৬, ১৯২৮), এম, এ, (কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৩০)। গবেষক—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩১-৩২। আশুতোষ পুরস্কার (১৯২৮)। কর্ম—অধ্যাপনা, স্কটিশ চার্চ কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ, হাজারিবাগ সেণ্ট ষ্টেনস্ কলেজ। শনিবারের চিঠির সহকারী (১৫ বৎসর)। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—ভাগ্যলিপি (জ্যোতিষ গ্রন্থ), বিধিলিপি (জ্যো); References to the Brahmanical Religion in the Pali Canon (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়)। সম্পাদিত গ্রন্থ—রায়শেখরের পদাবলী (কলিঃ বিশ্ব)। প্রধান সম্পাদক, আলোক (মাসিক), সহ-সম্পাদক—বঙ্গীয় মহাকোষ।

দ্বিজদাস দত্ত—শিক্ষাব্রতী ও রাজকর্মচারী। জন্ম—১৮৪১ খৃঃ ত্রিপুরা জেলায় কালীগচ্ছ গ্রামে। মৃত্যু—১৩৪১ বঙ্গ। পিতা—রামচরণ দত্ত। শিক্ষা—বি, এ। ইংলণ্ডে গমন। এম, এ। কর্ম—শিক্ষকতা, বীটন কলেজ, কুমিল্লা জেলা স্কুল (প্রধান শিক্ষক) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পরে সেটেলমেণ্ট অফিসার, অধ্যাপক, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ইঁহার পুত্র বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত। গ্রন্থ—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য ও শাঙ্করদর্শন, ২ খণ্ড, বৈদিক ধর্ম ও জাতিতত্ত্ব, ঋগ্বেদ, সর্বধর্মসমন্বয় (১৯৩৩), ইস্লাম (১৯২৭), বেদমাতার সেবা, বৈদিক সরস্বতী ও লক্ষ্মী (১৩৩০), সম্প্রদায় নিরপেক্ষ ঈশ্বরোপাসনা (১৯৩৩), পাট বা নালিতা (১৩১৮)।

দ্বিজমাধব—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গঙ্গামঙ্গল।

দ্বিজরাম চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মালতীমাধব।

দ্বিজানন্দ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রসশৃঙ্খলা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কবি। জন্ম—১২৪৬ বঙ্গ ২৬ ফাল্গুন জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশে। মৃত্যু—১৩৩২ বঙ্গ ৪ঠা বৈশাখ। পিতা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষা—সেণ্ট পলস্ কলেজে। কাব্যগ্রন্থ—স্বপ্নপ্রয়াণ, কাব্যমালা, শান্তিনিকেতন (১৩২৭), নানা চিন্তা (১৩২২), রেখাক্ষর বর্ণমালা, প্রবন্ধমালা (১৩২৭), সারতত্ত্বের আলোচনা, গীতাপাঠ, চিন্তামণি (১৩২১), শুষ্ক আক্রমণ, হারামণির অন্বেষণ, সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা, সোনার কাঠি রূপার কাঠি, ব্রাহ্মধর্ম (পদ্যানুবাদ), মেঘদূত (পদ্যানুবাদ)। সম্পাদক—তত্ত্ববোধিনী (১৭১২ শক, ১৮০৬ শক—১৮২৩ শক, ১৮২৫—১৮৩০ শক), ভারতী (১২৮৪—১২৮৭ বঙ্গ)।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী—কবি। জন্ম—১৩০২ বঙ্গ নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরে। মৃত্যু—১৩৫৮ বঙ্গ ২১এ শ্রাবণ কলিকাতার উপকণ্ঠে সিঁথিতে। কর্ম—সরকারী কার্য, রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান, সরকারী কার্য ত্যাগ করিয়া শিক্ষকতা গ্রহণ (পাইকপাড়া, রাজা মণীন্দ্র-স্মৃতি-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক), অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী। কাব্যগ্রন্থ—বিশ্ববৈতালিক (১৩৩৪), পাদপাদপ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—কবি ও নাট্যকার। জন্ম—১২৭০ বঙ্গ শ্রাবণ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। মৃত্যু—১৩২০ বঙ্গ ৩রা জ্যৈষ্ঠ। পিতা—দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়। মাতা—প্রসন্নময়ী। শিক্ষা—প্রবেশিকা (অ্যাংলো ভার্ণাকুলার স্কুল, ১৮৮৪), এফ, এ (হুগলী কলেজ), বি, এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ), এম, এ (কলি: বিশ্ব:), সরকারী বৃত্তি পাইয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত গমন। স্বদেশে প্রত্যাগমন (১৮৮৬), কর্ম—শিক্ষকতা, 'নজীর ও জমাবন্দী' বিভাগে উচ্চপদ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। প্রতিষ্ঠাতা—ভারতবর্ষ (মাসিক, ১৩২০)। ইনি নাটক, স্বদেশ-সঙ্গীত ও হাসির গানে বিশেষ প্রসিদ্ধ। গ্রন্থ—কাব্যগ্রন্থ—গান (১৩২২), হাসির গান (১৩০৭), মন্দ্র (১৩০৯), ত্রিবেণী (১৩১১), আষাঢ়ে, (১৩০৫), আলেখ্য (১৩১৪), আর্যগাথা, ১ম (১৮৮১), ২য় (১৮৯৩), চিন্তা ও কল্পনা; প্রহসন—কল্কি-অবতার, (১৩০২) বিরহ (১৩০৪), ত্র্যহস্পর্শ (১৩০৭), পুনর্জন্ম (১৯১১), একঘরে (১৮৮৯), প্রায়শ্চিত্ত (১৩০৮), আনন্দবিদায় (১৯১২), নাটক—তারাবাঈ (১৩১০), পাষাণী (১৩০৭), সীতা (১৯০৮), দুর্গাদাস (১৩১৩), নূরজাহান (১৯০৮), মেবার পতন (ঐ), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), পরপারে (১৯১২), ভীষ্ম (১৯১৪), সিংহলবিজয় (১৩২২), বঙ্গনারী (ঐ), সোরাবরুস্তম (১৩১৫), The Crops of Bengal (১৯০৬), প্রতাপ সিংহ (১৯০৫), কালিদাস ও ভবভূতি (১৯১৫), The Lyrics of Ind (লণ্ডন—১৮৮৬), Lessons in English, ১ম (১৯০৭), ২য় (১৯০৮), ৩য় (১৯০৯)। দ্বিজেন্দ্র গীতি (স্বরলিপি) ১ম ও ২য় (১৩৩১)।

ধনকৃষ্ণ সেন—গীতিনাট্যকার। জন্ম—১২৭১ খৃ: বর্ধমান খাঁড় গ্রামে। মৃত্যু—১৩০৯ বঙ্গ। পিতা—রামপরাণ সেন। শিক্ষা—গ্রাম্য পাঠশালা, বর্ধমান রাজকলেজ। বি০ এ। কর্ম—নবদ্বীপের অদূরবর্তী সমুদ্রগড়ে ম্যানেজারী। শ্রীরামপুর গোস্বামী এষ্টেটের সুপারিণটেণ্ডেণ্ট। গীতিনাট্য—পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ, সতী মালাবতী, পাণ্ডব-মিলন বা কর্ণবধ, গোবর্ধন-মিলন, জয়ধ্বজের হরিসাধন, বিল্বমঙ্গল, রাবণের মোহমুক্তি, উমাতারা, পরামুক্তি, সুদর্শনের রাজ্যাভিষেক (১২১৫)।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়—আমেরিকা প্রবাসী খ্যাতনামা লেখক ও অধ্যাপক। জন্ম—জুলাই, ১৮৯১ খৃ: কলিকাতা। মৃত্যু—১৯৩৬ নিউ ইয়র্ক (আমেরিকা, আত্মহত্যা)। পিতা—কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় (তমলুকের আইন-ব্যবসায়ী)। শিক্ষা—প্রবেশিকা (কলি: বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৯), পরে পিতামাতার অজ্ঞাতসারে যন্ত্রবিদ্যা শিখিবার জন্য জাপান ও আমেরিকায় গমন। কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত ষ্ট্যান্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া উপাধিলাভ। মার্কিন মহিলাকে বিবাহ (১৯১৭), দুইবার ভারতে আগমন (১৯২১ ও ১৯৩২)। রামকৃষ্ণ মিশনের শিবানন্দ মহারাজার শিষ্য। গ্রন্থ—A son of Mother India Answers, Jungles Beasts & Man, Kari the Elephant, Hari, the Jungle God, Ghond the Hunter, Caste & out-castes (১৯২৩), Gay Neck, The Chief of the Herd, Devotional Passages from the Hindu Bible (১৯২১), The Face of Silence, The Secret Listners of the East, My Brother's Face (১৯২৪), Visit India with me, Disillusioned India.

ধনঞ্জয়—জৈন আচার্য। ১২শ শতাব্দী। গ্রন্থ—নামমালা (অভিধান)।

ধনঞ্জয় দৈবজ্ঞ—জ্যোতিষী। গ্রন্থ—জাতক-চন্দ্রোদয়।

ধনপতি—পণ্ডিত। গ্রন্থ—জ্ঞানমুক্তাবলী।

ধনপাল—সংস্কৃত কবি। জৈন ধর্মে দীক্ষিত হন। পিতা—সর্বদেব। গ্রন্থ—তিলকমঞ্জরী (কাব্য), পায়িয় লচ্ছি (অভিধান)। ঋষভপঞ্চাশিকা (স্তোত্র)।

ধনরাজ—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। গ্রন্থ—মহাদেবী সারণী-দীপিকা (টীকাগ্রন্থ—১৬৩৫ খৃ:)।

ধনিক—গ্রন্থকার। পিতা—বিষ্ণু। গ্রন্থ—দশরূপ-কাব্যালোক (টীকা)।

ধনেশ্বর—জৈন গ্রন্থকার। ১১শ শতাব্দী। গ্রন্থ—সুরসুন্দরী-চরিতম্ (কাব্য—প্রাকৃত ভাষায়)।

ধন্বন্তরি—আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ্। পিতা—কাশীর রাজা বাহুক। নামান্তর—দিবোদাস (ধন্বন্তরি নামে খ্যাত)। ইহার শিষ্যদের মধ্যে সুশ্রুতই বিখ্যাত। গ্রন্থ—বিদ্যাপ্রকাশ-চিকিৎসা, ঔষধি-প্রয়োগ, চিকিৎসা-দীপিকা, চিকিৎসাসার, চিকিৎসা-তত্ত্বজ্ঞান-নামমালা, বাল-চিকিৎসা, যোগচিন্তামণি, যোগ-দীপিকা, বিদ্যারহস্য-প্রকাশ-চিকিৎসা।

ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী—গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলার মহীরামশেথের জমিদার বংশে। গ্রন্থ—ভারত ভ্রমণ।

ধরণীধর সরকার—সাহিত্যিক। সম্পাদক—নব-ভারতী (মাসিক, ১২৮৭)।

[ক্রমশঃ

স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞরা বলেন —

জনগণের স্বাস্থ্য ও কল্যাণই জাতীয় উন্নতির মূল

জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে দেশের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের উপর — তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় থেকেই সন্তানকে নিরাপদে রাখা মা-বাবার কর্তব্য। চিকিৎসকেরা জানেন, প্রসবান্তিক সূতিকা-জ্বরের পরিণাম খুব সাংঘাতিক ; অথচ সন্তানসম্ভবা নারীরা এই বিপদের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রায়ই সচেতন নন। তাঁরা জানেন না যে এর দরুন তাঁদের একেবারে বন্ধ্যা হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। প্রসবপথের ঝিল্লীতে অথবা মুখে ক্ষত হলে রোগ-জীবাণু সেখান দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে, আর তার ফলেই শরীরের রক্ত বিষাক্ত হয়ে সূতিকা-জ্বর দেখা দেয়।

সব সময় এক শিশি 'ডেটল' কাছে রাখবেন

রোগ-জীবাণু সুযোগ পেলেই আক্রমণ করে। এই চির-জাগ্রত সংক্রমণের আশঙ্কা থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে আপনার চিকিৎসক জীবাণুনাশক 'ডেটল'-এর উপর একান্তভাবে নির্ভর করেন। তাঁর পরামর্শ নিন এবং ঘরে 'ডেটল' রাখুন, আর চিকিৎসকের মতো আপনিও 'ডেটল' ব্যবহার ক'রে সংক্রমণের বিভীষিকা থেকে আত্মরক্ষা করুন।

মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য :

'ডেটল'-এর ক্রিয়া মৃদু অথচ অব্যর্থ — এজন্য মহিলাদের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় এর তুলনা নেই। 'ডেটল' মানব-শরীরের পক্ষে অনুত্তেজক কিন্তু জীবাণুর পক্ষে মারাত্মক। বিনামূল্যে 'মডার্ণ হাইজিন ফর উইমেন' (মহিলাদের আধুনিক স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি) নামক পুস্তিকার জন্য লিখুন।

'DETTOL'

TRADE MARK

DBI. 7

এ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড, পোঃ বক্স ৬৬৪, কলিকাতা

সাধারণতঃ শক্তি নিম্নলিখিত রূপেতে প্রকাশিত হয়: যান্ত্রিক শক্তি, তাপ, আলো, শব্দ, চুম্বক, তড়িৎ, রাসায়নিক শক্তি ও আণবিক শক্তি। যখন তেল অর্থাৎ হাইড্রো-কার্বন বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নিয়ে জ্বলে, তখন রাসায়নিক শক্তির ফলে জল ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড উদ্ভূত হয়। অর্থাৎ হাইড্রোজেন, কার্বন ও অক্সিজেনের অণু-সমূহের নতুন বিন্যাসের ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়। এটা হল রাসায়নিক শক্তি। কিন্তু যদি কোন অণুর আভ্যন্তরীণ বিন্যাসের ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়, তবে তাকে আণবিক শক্তি বলে। যদি সুবিধা মত এই শক্তি জোগাড় করা যায়, তবে তাকে দিয়ে প্রয়োজনীয় কাজও করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। অত্যল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হলে বিস্ফোরণ ঘটে। পেট্রল খোলা স্থানে জ্বালালে কোন বিস্ফোরণ হয় না, কিন্তু বন্ধ সিলিণ্ডারে পেট্রল অর্থাৎ হাইড্রো-কার্বন এবং বাতাস অর্থাৎ অক্সিজেনের মিশ্রণে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ চালিত করলে বিস্ফোরণ হয়। আণবিক শক্তির ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে। হঠাৎ অনেকটা শক্তি নির্গত হলে, যেমন আণবিক বোমায়, প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। কিন্তু এই শক্তি যদি ধীরে ধীরে নির্গত করা যায়, তবে ধ্বংসের বদলে এর দ্বারা উপকারী কাজ পাওয়া যেতে পারে।

এ্যাটম

শ্রীযামিনীমোহন কর

শক্তি ও বিকিরণ

শক্তির সরল অথচ সঠিক সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, শক্তি মানেই কাজ অর্থাৎ যাকে কার্য্যে রূপান্তরিত করা যায়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কাজ কি? যখন কোন বল একটি কণা বা বস্তুর ওপর ক্রিয়া করলে প্রয়োগ-বিন্দু সরে যায়, তখন বল কাজ করছে বলা যায়। অথবা কোন প্রতিরোধেচ্ছু বলের বিরুদ্ধে কোন কণা বা বস্তুর গতি থাকলে কার্য্য সম্পন্ন হয়। গতি না থাকলে কিন্তু কার্য্য হয় না, যত বলই প্রয়োগ করা যাক না কেন। বল প্রয়োগ করলেই শক্তি সঞ্চারিত হয়, কিন্তু হয়ত কোন কারণে গতি হ'ল না অর্থাৎ দৃশ্যতঃ কার্য্য হ'ল না। তবে শক্তি গেল কোথায়? গতীয় শক্তি তখন তাপশক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মানে, যে কাজ প্রয়োজন নেই হয়ত সেই কাজ হয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, প্রয়োজনীয় কাজ না হয়ে অপ্রয়োজনীয় কাজ হ'ল। কিন্তু শক্তি হারিয়ে গেল না। কয়লা জ্বলছে, বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নিয়ে। শক্তি ব্যয় হয়ে তাপ শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। সেই তাপে জল গরম হয়ে বাষ্পে পরিণত হল। বাষ্পের অণুসমূহের শক্তি ঠাণ্ডা জলের অণুসমূহের শক্তি অপেক্ষা অধিক। এই বেশী শক্তি এল কোথা থেকে? তাপ থেকে। তার পর সেই বাষ্পের শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হল। ইঞ্জিন চলতে শুরু করল। রেল-গাড়ী বা জাহাজ প্রতিরোধেচ্ছু ঘর্ষণ ও হাওয়ার বাধাকে জয় করে এগিয়ে চলল। আবার ইচ্ছে করলে যান্ত্রিক শক্তিকে ডায়নামোর সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তিতে এবং সেই বৈদ্যুতিক শক্তিকে পুনরায় মোটরের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। এক কথায় বলা যায় যে, কতকগুলি বস্তুর পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে শক্তি সৃষ্ট বা বিনষ্ট হ'তে পারে না, কেবল মাত্র উহা একরূপ হ'তে অন্য বা অন্যান্য রূপে পরিবর্ত্তিত হ'তে পারে। বিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ নিত্য থাকে। এই সূত্রকে শক্তির অবিনশ্বরতা বা নিত্যতা বলে। এই সূত্রের উল্লেখ বেদেও আছে।

শক্তি প্রধানতঃ দুই প্রকারের: গতীয় এবং স্থৈতিক। গতির জন্য পদার্থের কাজ করবার ক্ষমতাকে গতীয় শক্তি বলে। যদি কোন বস্তুর ভর m হয় এবং বেগ v হয়, তবে গতীয় শক্তি $\frac{1}{2}mv^2$ হবে। কোন পদার্থের বিশেষ স্থানে স্থিতির জন্য বা তার বিভিন্ন অংশের অবস্থানের জন্য কাজ করবার ক্ষমতাকে স্থৈতিক শক্তি বলে। ছাদের ওপর অবস্থিত ইটের স্থৈতিক শক্তি আছে। পড়তে আরম্ভ করলেই সেই শক্তি গতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। দাহ্য পদার্থে বা কোন কোন পরমাণুতে স্থৈতিক শক্তি নিহিত থাকে, যা কোন বিশেষ উপায়ে গতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। তাপের জন্য কোন পদার্থ গরম হলে, তার অণুসমূহের গতি বৃদ্ধি হয়, ফলে গতীয় শক্তিও বৃদ্ধি পায়।

আণবিক তথ্যাদি বুঝতে হলে বিকিরণ ও তার শক্তি সম্পর্কে কিছুটা জানা দরকার। বিকিরণের দ্বারা শক্তি শূন্যের মধ্য দিয়ে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে স্থানান্তরিত করা যায়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, আলো ও রেডিও-তরঙ্গ। প্রথমটা দৃশ্য এবং দ্বিতীয়টা অদৃশ্য বিকিরণ। সূর্য্য থেকে শক্তি (এক প্রকারের আণবিক শক্তি) পৃথিবীতে স্থানান্তরিত হয় আলো বা দৃশ্য বিকিরণের সাহায্যে। এই আলো পৃথিবীকে গরম করে (গতীয় শক্তি)। গাছ-পালা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা আলো থেকে শক্তি টেনে নিজেদের মধ্যে জমা করে (স্থৈতিক শক্তি)। রেডিও-তরঙ্গ এক স্থান হ'তে শক্তিরূপে নির্গত হয়ে অপর স্থানে রিসিভারে জমা হয়। এটা হল অদৃশ্য বিকিরণ। আলট্রা-ভ্যায়োলেট (অতিবেগুনি) আলো, এক্স রে, গামা রে ইত্যাদি অদৃশ্য বিকিরণের বিভিন্ন উদাহরণ।

যেহেতু দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় বিকিরণের ধর্ম্ম মূলতঃ এক, সুতরাং আলোক সম্পর্কে আলোচনা করলেই ব্যাপার অনেকটা

সহজ হয়ে যাবে। খৃষ্ট জন্মাবার পাঁচশ বছর পূর্ব্বে পাইথাগোরাস দলের দার্শনিকদের মত ছিল যে, উজ্জ্বল পদার্থ থেকে প্রক্ষিপ্ত কণা-সমূহ দর্শকের চোখের মধ্যে গিয়ে পড়ে। এরই নাম আলো। ষোড়শ শতাব্দীতে নিউটনও এই মতেরই সমর্থন করে। কণা-সমূহের নাম দেন কর্পাসাল্‌স্‌। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেন, আলোর সরল রেখা ক্রমে গতি এবং বস্তুর পরিষ্কার ছায়ার কথা। কিছু দিন পরে ইংলণ্ডের হুক ভাসা-ভাসা ভাবে আরেকটি মতবাদ প্রচার করেন। তিনি বলেন যে, আলোর গতিপথ তরঙ্গের মত। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক আলোর তরঙ্গ-গতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। কিন্তু নিউটনের মতবাদীরা তা মানলেন না, যেহেতু এই নতুন মত দিয়ে ছায়ার পরিষ্কার সীমারেখার কারণ ব্যাখ্যা করা গেল না।

এক শতাব্দীরও ওপর পুরানো মতবাদই বাহাল রইল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ইংলণ্ডের ইয়ং ও ফ্রান্সের ফ্রেসনেল তরঙ্গ মতবাদের সাহায্যে নিউটনীয় মতবাদীদের আপত্তি খণ্ডন করলেন। বললেন যে, আলোর তরঙ্গ-সমূহ অত্যন্ত ক্ষুদ্র, সেই জন্য ছায়ার সীমারেখা স্পষ্ট হয়। আপত্তিকারীরা বললেন যে, তাহলে ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে যাবার সময় তো আলোকরশ্মি বেঁকে যাবে। ফ্রেসনেল প্রমাণ করে দিলেন যে, সত্যই আলোকরশ্মি বেঁকে যায়। এর নাম আলোর ডিফ্র্যাকশান বা আবর্ত্তন।

যদি কোন খুব পাতলা ফাঁক দিয়ে আলো নির্গত হয়ে পর্দার ওপর পড়ে তবে দেখা যাবে, কতগুলো পাতলা আলো এবং অন্ধকার ব্যাণ্ড (লম্বা পটি)। আলোর গতি সরলরেখাক্রম হলে কেবল পাতলা পাতলা আলোর দাগ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয় না। এই পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় যে, আলোর তরঙ্গায়িত গতি। পরস্পরে কাটাকুটির ফলে উজ্জ্বল এবং অন্ধকার পটির সৃষ্টি হয়। এর নাম আলোর প্রতিবন্ধকতা বা ইণ্টারফেরেন্স।

এর ব্যাখ্যা বুঝতে হলে তরঙ্গ সম্পর্কে একটু জানা দরকার। জলের ওপর একটা ঢিল ফেললে দেখা যায় যে, ঢেউ বা তরঙ্গ সেই স্থান থেকে বাইরের দিকে এককেন্দ্রিক বৃত্তে চলতে থাকে। মনে হয়, যেন জল উঁচু-নীচু হয়ে এগিয়ে চলেছে। জলের ওপর এক-টুকরো শোলা ফেলে দিলে দেখা যাবে যে, শোলাটি একই স্থানে দাঁড়িয়ে উঠছে আর নামছে। তা হলেই বোঝা যাচ্ছে যে, জলকণা সমূহ এগিয়ে যাচ্ছে না, কারণ তা হলে শোলাও এগিয়ে যেত। এই ধরণের তরঙ্গগতিকে অনুপ্রস্থগামী বলা হয়, কারণ কণাসমূহের গতি এবং তরঙ্গের গতি আড়াআড়ি বা অনুপ্রস্থ বা তির্য্যক্‌ (transverse) ভাবে থাকে। আলোর তরঙ্গের গতিও এই ধরণের। প্রত্যেক তরঙ্গের দু'টো ভাগ থাকে: কিরীট বা অগ্রভাগ, যার মধ্যিখানে তরঙ্গের সর্ব্বোচ্চ স্থান এবং খোল বা নিম্নভাগ, যার মধ্যিখানে তরঙ্গের সর্ব্বনিম্ন স্থান। দু'টো আনুপূর্ব্বিক সর্ব্বোচ্চ বা সর্ব্বনিম্ন স্থানের মধ্যবর্ত্তী দূরত্বকে এক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বলা হয় এবং $\surd$ দ্বারা প্রকাশিত হয়। যদি অগ্রসরের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে v সেণ্টিমিটার হয়, তবে এক সেকেণ্ডে $v/\surd$ সংখ্যক তরঙ্গ কোন একটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে যায়। এই সংখ্যার নাম হ'ল আবৃত্তি। যদি একে n দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তবে

$$n = v/\surd \quad \text{অথবা} \quad \surd = v/n.$$

তা হলে আলোক-তরঙ্গের বেগ, আবৃত্তি এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক পাওয়া গেল।

এইবার আলোর আবর্ত্তনের কথায় ফিরে আসা যাক। খুব কাছাকাছি দু'টো সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে দু'টো আলোকরশ্মি বেরিয়ে এল এবং বেঁকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রথমের তরঙ্গ মনে কর দ্বিতীয়ের তরঙ্গের সঙ্গে মিশে গেল। যদি পর্দায় পড়বার সময় প্রথমের একটা এবং দ্বিতীয়ের একটা তরঙ্গের দশা একই হয় অর্থাৎ উভয়ই নীচের দিকে বা ওপরের দিকে যেতে থাকে, তবে সেখানটা উজ্জ্বল হবে; আর যদি একটা তরঙ্গের দশা অপরটার বিপরীত হয়, অর্থাৎ যদি একটা ওপর দিকে এবং অন্যটা নীচের দিকে যেতে থাকে, তবে সেখানটা অন্ধকার হবে। এই ভাবে একান্তর কালো শাদা পটি বা ব্যাণ্ড পর্দার ওপর প্রতিবন্ধকের ফলে দেখা যাবে। ভাল ফল পেতে হলে ছিদ্রগুলি এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়া উচিত। শাদা আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রায় 5×10^{-5} সেণ্টিমিটার, সুতরাং দূরত্বও প্রায় একই হওয়া প্রয়োজন। যে জাফরীর সাহায্যে এই পরীক্ষা করা হয়, তাকে আবর্ত্তন জাফরী বলে।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফরাসী বৈজ্ঞানিক ফিজিও এবং ফুকো আলোর বেগ প্রায় সঠিক ভাবে নির্ণয় করেন। এইবার আলোক সম্পর্কীয় দু'টো মতবাদের কষ্টিপাথরে যাচাই করবার সুযোগ মেলে। নিউটনের মতবাদ অনুসারে হাওয়ার চেয়ে জল ভারী, সুতরাং হাওয়াতে আলোর যা বেগ হবে জলেতে তদপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত। তরঙ্গবাদে হবে ঠিক উল্টো। পরীক্ষামূলক ভাবে হাওয়া এবং জলে আলোর বেগ মেপে দেখা গেল যে, তরঙ্গবাদই ঠিক। হাওয়াতে জলাপেক্ষা বেগ অধিক হয়। আলোর তরঙ্গবাদ স্বীকৃত হ'ল। বায়ুহীন শূন্যে আলোর বেগ সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বা $2{\cdot}99776 \times 10^{10}$ সেণ্টিমিটার। এটা একটা ধ্রুব রাশি। মাপবার একক হিসেবে ব্যবহার করা চলে। সুবিধার জন্য এই ধ্রুবকে 3×10^{10} সেণ্টিমিটার ফি সেকেণ্ড ধরা হয়।

আলো বলতে সাধারণতঃ শাদা আলো বোঝায়। শাদা রং সাতটা রঙের মিশ্রণে উদ্ভূত। রামধনুর সাতটা রং—লাল, কমলা হলদে, সবজে, নীল, ইণ্ডিগো (গাঢ় নীল) এবং বেগুনী। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সৌভাগ্যবশতঃ সকল রঙের আলোর বেগ একই। তাই কেবল আলোর বেগ বললেই কাজ চলে যায়। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়, তবে আলোর বিভিন্ন রঙ হয় কেন? এর উত্তর হ'ল বিভিন্ন রঙের আলোর বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সুতরাং বিভিন্ন আবৃত্তি। এই বর্ণগুলির মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সব চেয়ে বেশী $7{\cdot}60 \times 10^{-5}$ সেণ্টিমিটার এবং বেগুনী আলোর সব চেয়ে কম $3{\cdot}85 \times 10^{-5}$ সেণ্টিমিটার। অন্যান্য রঙের আলোক-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এদের মাঝামাঝি। এক আঙ্গষ্ট্রম $= 10^{-8}$ সেণ্টিমিটার, সুতরাং দৃশ্য আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 7600 থেকে 3850A° পর্য্যন্ত। এর বেশী বা কম হলে তা অদৃশ্য হয়ে যাবে। যেমন অবলোহিত (ইনফ্রা-রেড) আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য লালের চেয়ে বেশী, তাই অদৃশ্য। আবার অতি-বেগুনী (আল্ট্রা-ভায়োলেট) আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেগুনীর চেয়ে কম, প্রায় 1000A°, তাই দেখা যায় না।

এইখানে একটা প্রশ্ন মনে জাগতে পারে। অবলোহিতের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যাপেক্ষা দীর্ঘতর অথবা অতি-বেগুনীর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অদৃশ্য বিকিরণ থাকতে পারে না কি? নিশ্চয়ই পারে, এবং তার সন্ধানও পাওয়া গেছে। বেতারের লং-ওয়েভ, রাডার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আধিক্যের দিক দিয়ে আর এক্স-রে, গামা-রশ্মি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ক্ষুদ্রতার দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। এদের বেগও আলোর বেগের সমান, কিন্তু সব চেয়ে দীর্ঘ বেতার-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 10^8 সেণ্টিমিটার এবং সব চেয়ে ছোট গামা-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 10^{-10} সেণ্টিমিটার।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ডেনমার্কের ওয়েরস্টেড এবং ফ্রাঁসের অ্যাম্পিয়ারের নির্দেশ মত ম্যাক্সওয়েল পরীক্ষামূলক ভাবে তড়িৎপ্রবাহ এবং চৌম্বকত্বের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্ণয় করেন। ফ্যারাডে দেখালেন যে, তড়িচ্চুম্বকীয় আবেশের জন্য যোগাযোগের প্রয়োজন হয় না, দূর থেকেই হতে পারে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সওয়েল গণিতের সাহায্যে সিদ্ধান্ত করলেন যে, বৈদ্যুতিক বিশৃঙ্খলার ফলে তড়িৎ-তরঙ্গ উদ্ভূত হয়। অর্থাৎ কোন তড়িৎ-ক্ষেত্রের তীব্রতা পর্য্যায়ক্রমে কম-বেশী হতে থাকলে তরঙ্গ-গতির ধর্ম্মানুসারে তড়িৎ-তরঙ্গ বিশৃঙ্খলার মূল বিন্দু থেকে বাইরের দিকে এগিয়ে যায়। জলে ঢিল ফেললেও তাই হয়। তবে এ ক্ষেত্রে মধ্যস্থিত পদার্থ রয়েছে জল। কিন্তু তড়িৎ-তরঙ্গে অগ্রগতির জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। পুনরায় তড়িৎ-ক্ষেত্রের তীব্রতা পর্য্যায়ক্রমে কম-বেশী করলে তড়িৎ-তরঙ্গের মত চৌম্বক-তরঙ্গও উদ্ভূত হয়। উভয় তরঙ্গ সমধর্ম্মী, অর্থাৎ উভয়ের আবৃত্তি ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সমান। একটির অভিমুখ অপরটির অভিমুখের লম্ব এবং উভয়ের অভিমুখ তরঙ্গের গতির অভিমুখের সহিত লম্ব ভাবে থাকে। তড়িৎ এবং চৌম্বক-তরঙ্গকে একত্র করে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ বলা হয় এবং এই তরঙ্গ তির্য্যক্ তরঙ্গ-গতির ধর্ম্ম মানে। ম্যাক্সওয়েল পরীক্ষা করে দেখালেন যে, এর বেগ সব সময় আলোক-তরঙ্গের বেগের সমান। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, আলোক-তরঙ্গ তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের একটা বিশেষ রূপ। তখন একমাত্র আলো ব্যতীত তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের আর কোন দৃষ্টান্ত ছিল না। তবে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, দৃশ্য আলোক-তরঙ্গের গতির সমান কিন্তু ভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণ নিশ্চয়ই পরে আবিষ্কৃত হবে। হ'লও তাই। তাঁর মৃত্যুর আট বছর পরে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর হার্জ আবেশকুণ্ডলীর সাহায্যে তড়িৎ-মোক্ষণের দোলনে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ উৎপন্ন করলেন, যার অনেকগুলো গুণ আলোর সঙ্গে মেলে। এই তরঙ্গের বেগ আলোক-তরঙ্গের বেগের সমান, তবে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনেক বড়, লক্ষ গুণেরও অধিক। তখন এর নাম ছিল হার্জিয়ান-তরঙ্গ। এখন একে বলা হয় রেডিও-তরঙ্গ। আজকাল বায়ুশূন্য নলে যে কোন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়। নিম্নে বিভিন্ন তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের মোটামুটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ও আবৃত্তির সীমা দেখান হয়েছে।

লক্ষ্য করা যায় যে, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বাড়লে আবৃত্তি কমে এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কমলে আবৃত্তি বাড়ে। তা তো হবেই, কারণ উভয়ের গুণফল ধ্রুব এবং তা অলোক-তরঙ্গের বেগের সমান অর্থাৎ 3×10^{10} সেণ্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ডে। প্রত্যেক তরঙ্গই আলোক-তরঙ্গের সমধর্ম্মী অর্থাৎ এদেরও আলোক-তরঙ্গের মত আবর্ত্তন ও প্রতিবন্ধক ক্রিয়া হয়।

[ক্রমশঃ।

বঙ্গদেশে কত জাতির বসবাস ?

বাঙলা দেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, গোপ, তন্তুবায়, সদ্গোপ, মুসলমান, আগুরি, কৈবর্ত্ত, তৈলকার বা কলু, তিলি তাম্বুলী, নাপিত, মালাকার, কাঁসারি, শাঁখারি, বারুই, গন্ধবণিক, মোদক, কামার, কুম্ভকার, স্বর্ণবণিক, ধোপা, চাষা-ধোপা, কাপালী, শুঁড়ী, হাড়ি, বাগ্‌দী, বাউরী, মাল, বেদিয়া, সাপুড়িয়া, লেট, ঢুলিয়া, ভুঁইমালী, কেওড়া, চণ্ডাল, যুগী, ডোম, ডোকলা, নমঃশূদ্র, ধাঙড়, বুনো, নট, মালা, মালো, ঝালা, কেওট, জেলে, তীয়র, নলে, পাতর, পাড়ুই, পুড়া, পোদ, মাঝি, গৌড়ি, পাটনি, চাষেত্তি, গঙ্গৌত, নাগর, মণ্ডল, চাঁই, মুনিয়া, বিন্দ, থারু, পুণ্ড্র, তিপরা, ধীমাল, কোচ, পালি, দেশী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি।

জেন অস্টিনের

ছেচল্লিশ

এখানে এসে প্রথম প্রথম দিদির কাছ থেকে কোন চিঠি না পেয়ে ভারী মনমরা হয়ে পড়েছিল এলিজাবেথ। আর প্রতিদিনই এই নিরাশা বাড়ছিল। কিন্তু তৃতীয় দিন সকালেই তার পথ চাওয়ার শেষ হোল। এক সঙ্গে দু'খানা চিঠি পেল এলিজাবেথ। একটির ছাপ দেখে বোঝা গেল সেখানা ভুল ঠিকানায় চলে গিয়েছিল। এমন বিশ্রী ভাবে ঠিকানা লিখেছিল জেন যে, ভুল ঠিকানায় চলে যাওয়ার দোষ ছিল না কিছু।

প্রাতভ্রমণে বেরোবে ঠিক সেই সময় এল চিঠি দু'খানা। সেই দু'খানিকে তার সঙ্গিনী করে রেখে মাসীমা স্বামীকে নিয়ে একলাই বেরোলেন। ভুল ঠিকানায় চলে যাওয়া চিঠিখানা নিয়েই প্রথম বসল এলিজাবেথ। পাঁচ দিন আগে লেখা। পার্টি ও দেখা-সাক্ষাতের সমাচার দিয়ে পত্র আরম্ভ, কিন্তু শেষের অংশটুকু এক দিন পরে লেখা এবং বিশেষ উত্তেজনার ছাপ পড়েছে তাতে।

—"ওপরের ঐটুক লেখার পর ইতিমধ্যে, জানিস লিজি, ভারী একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেছে এবং অতি অপ্রত্যাশিত ভাবেই। ভয় হচ্ছে, তুই হয়ত শুনেই আতংকিত হয়ে পড়বি কিন্তু নিশ্চিন্ত থাক আমরা শারীরিক কুশলেই আছি। আমি যা বলতে চাচ্ছি সে হোল অভাগী লিডিয়ার সম্বন্ধে। কাল রাত বারটায় কর্ণেল ফরষ্টারের নিকট হতে এক টেলিগ্রাম আসে। তিনি জানিয়েছেন, লিডিয়া এক জন অফিসারের সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডে পালিয়েছে অর্থাৎ পালিয়েছে আমাদের উইকহামের সঙ্গে। একবার ভাব কথাটা। কিটি এতে অবাক না হলেও আমি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছি। এ বিয়ে উভয়ের পক্ষেই হঠকারিতার কাজ হয়েছে। উইকহামের চরিত্রও ভুল বুঝেছি আমরা। অবিবেচক, অপরিণামদর্শী সে—এটা বোঝা যায় কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার কোন কুমতলবের পরিচয় পাচ্ছি না। তার উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থই বলতে হবে, কারণ বাবা তো তাকে এক কপর্দকও দিতে পারবেন না। মা অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছেন কিন্তু বাবা স্বাভাবিক ভাবেই নিয়েছেন। ভগবানকে ধন্যবাদ। উইকহাম সম্বন্ধে আমাদের কী ধারণা জানতে দেওয়া হয়নি তাঁদের। আমাদের এখন ভুলে যাওয়া উচিত সে সব কথা। যত দূর অনুমান করা যাচ্ছে, শনিবার রাত বারটা নাগাদ উধাও হয়েছে তারা এবং পরদিন সকাল আটটা পর্যন্ত কোন খোঁজ হয়নি তাদের। তার পর সোজা তার পাঠান হয়েছে এখানে। আমাদের দশ মাইল ব্যবধানের মধ্য দিয়েই ওরা চলে গেছে। মাকে ছেড়ে বেশীক্ষণ দূরে থাকা চলে না—তাই ইতি টানলাম এখানে। মাথামুণ্ড কি লিখলাম জানি না।"

চিঠি পড়ে মনের অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য অপেক্ষা করলে না এলিজাবেথ। তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় চিঠিখানা খুলে ফেলে অধীর আগ্রহে পড়তে লাগল। প্রথম চিঠি ডাকে দেওয়ার এক দিন পরে লেখা এ চিঠিখানা।

—"এত দিনে আমার তাড়াহুড়া করে লেখা প্রথম চিঠিখানা নিশ্চয়ই পেয়েছিস। আশা করি, এ চিঠিখানা কিছুটা বোধগম্য হবে। কিন্তু মনের এমন বিভ্রান্ত অবস্থা যে, সুসংলগ্ন কোন কিছু লেখা আমার সাধ্যাতীত। কি যে লিখব ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছি না। আমার চিঠির ঝুলিতে শুধু অশুভ সংবাদ জমা হয়ে আছে এবং তাদের আর বিলম্বিত করে রাখা যায় না। হঠকারিতা হলেও লিডিয়া আর উইকহামের বিয়েটা ঘটেছে, এ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিন্ত হতে চাই আমরা। তারা যে স্কটল্যাণ্ডে যায়নি এ মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। কর্ণেল ফরষ্টার গতকাল এখানে এসেছিলেন। তিনি ব্রাইটন ত্যাগ করেছেন তার আগের দিন অর্থাৎ টেলিগ্রাম পাঠানোর সামান্যই পরে। মিসেস্ ফরষ্টারকে লেখা চিঠিতে লিডিয়া যদিও লিখেছে যে তারা গ্রেটনা গ্রীনে যাচ্ছে, কিন্তু ডেনীর পত্রে এ বিশ্বাস করবার কারণ আছে যে, উইকহামের সেখানে যাওয়ার বা লিডিয়াকে বিয়ে করার কোনই ইচ্ছে নেই। এ সংবাদ কর্ণেলকে জানান মাত্র তিনি তক্ষুনি বিপদের সংকেত বুঝে তাদের খোঁজে ব্রাইটন ত্যাগ করেন। ক্ল্যাপহাম পর্যন্ত তাদের সূত্র পাওয়া গেল কিন্তু তার পর আর নয়। কারণ সেখানে পৌঁছে তারা এপসাম থেকে নেওয়া গাড়ী ছেড়ে দিয়ে আর একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করেছে। এর পর যেটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, তারা লণ্ডনের দিকে গেছে। ভাবনার খেই হারিয়ে ফেলছি ভাই। লণ্ডনের ঐ অংশে পুংখানুপুংখ অনুসন্ধান চালিয়ে কর্ণেল ফিরে এসেছেন হার্টফোর্ডশায়ারে। প্রত্যেক পান্থনিবাস, প্রত্যেক মাশুল-ঘাঁটিতে খবর নিয়েছেন তিনি। কিন্তু সব বৃথা,—কেউ দেখেনি তাদের। দারুণ উৎকণ্ঠা বহন করে তিনি লংবোর্ণে এসেছিলেন—এমন ভাবে তাঁর উৎকণ্ঠার কথা ব্যক্ত করেছেন যা খুবই প্রশংসনীয়। তাঁর ও মিসেস্ ফরষ্টারের জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত—তাঁদের একটুও দোষ দেওয়া যায় না। সত্যি লিজি, অন্তহীন আমাদের দুঃখ।

"বাবা-মা চরম পরিণতির কথাই ভেবে নিয়েছেন, কিন্তু উইকহাম সম্বন্ধে এত খারাপ ভাবতে পারছি না আমি। এও তো হতে পারে, তারা গোপনে বিয়ে করেছে। ধরেই নেওয়া যাক, লিডিয়ার মত

তরুণীর সর্বনাশ করার কুমতলবই তার আছে, যদিও আমি তা বিশ্বাস করি না—লিডিয়া কি তার বুদ্ধি-সুদ্ধি হারিয়ে ফেলবে? এ অসম্ভব! দুঃখের বিষয়, কর্ণেল ফরষ্টার তাদের বিয়ের সম্বন্ধে খুব আশান্বিত নন। আমার ধারণার কথা শুনে তিনি শুধু মাথা নেড়ে বললেন—'উইকহ্যাম আদৌ নির্ভরযোগ্য লোক নয়।' মা সত্যিই খুবই অসুস্থ—আর ঘরের বার হন না তিনি। মা যদি এ সময় সুস্থ থাকতেন খুব ভাল হোত। কিন্তু তেমন আশা আর নেই। আর বাবা—এমন বিচলিত আর কখনো দেখিনি তাঁকে। লিডিয়া তার প্রেমের কথা গোপন করায় কিটি তো রেগে কাঁই। সত্যি বলছি লিজি, এই দুঃখময় অবস্থা থেকে তুই দূরে আছিস দেখে ভারী আনন্দ হচ্ছে আমার। প্রথম ধাক্কা কেটে গেছে—এবার তুই ফিরে আসবি কামনা করতে পারি কি? অবশ্য এতটা স্বার্থপর আমি নই যে, অসুবিধা হলেও তোকে ফিরে আসার জন্য চাপ দেব। বিদায়! আবার কলম ধরেছি—এই মাত্র যে কথা বলব না বলেছি আবার তাই লিখতে। কিন্তু ঘটনার গতি এমন মোড় নিয়েছে যে তোমাদের প্রত্যেককে এখানে আসার জন্য সকাতর অনুরোধ জানাতে বাধ্য হচ্ছি। মেসো-মাসীকে আমি যত দূর জানি তাঁদেরও আসতে না বলে পারছি না, যদিও মেসোর কাছে আরো অনেক কিছু প্রত্যাশা করি। বাবা কর্ণেলের সঙ্গে এখুনি লণ্ডনে রওনা হচ্ছেন ওকে খুঁজে বের করতে। তিনি কি করতে চান আমি জানি না। অথচ কর্ণেলকে কাল বিকেলে ব্রাইটনে ফিরে যেতে হবেই। এই সংকট মুহূর্তে মেসো মশায় আমার মনের অবস্থা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। তাঁর অপেক্ষা করে রইলাম।"

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল এলিজাবেথ। চিঠি শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে মেসোর খোঁজে ছুটল সে। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান তখন। দরজায় পৌঁছতেই চাকর দরজা খুলে দিল কিন্তু দরজা খুলতেই ঘরে প্রবেশ করল ডার্সি। তার রক্তহীন মুখ আর আবেগ-চঞ্চল চেহারা দেখে চমকে উঠল সে। নিজেকে সামলে নিয়ে কোন কিছু বলার আগেই এলিজাবেথ জানাল—তার মন এখন বড় চঞ্চল, একমাত্র লিডিয়ার চিন্তায় ভারাক্রান্ত—'ক্ষমা করবেন, আমি চলে যেতে বাধ্য হচ্ছি। এই মুহূর্তে মেসো মশাইকে খুঁজে বের করতেই হবে। একটি মুহূর্ত নষ্ট করবার উপায় নেই আমার।'

—'কি হোলো'—ভদ্রতা ছাপিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল ডার্সির কণ্ঠে। —'এক মুহূর্তও তোমার দেরী করে দিতে চাই না। তবে তোমাদের চাকরকে তাঁর খোঁজে যেতে দাও। তুমি সুস্থ নও—তোমার একা যাওয়া হতে পারে না।'

এলিজাবেথ একটু দ্বিধা করল। বেপথু হতে পারে ভেবে চাকরকেই ডেকে নির্দেশ দিল মেসো-মাসীকে এক্ষুনি ফিরিয়ে আনতে। কি যে নির্দেশ দিল হাঁফাতে হাঁফাতে অস্ফুট ভাষায়, নিজের কাছেই তা অবোধ্য বোধ হোল।

চাকর ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্রই এলিজাবেথ বসে পড়ল আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল ডার্সি—'তোমার পরিচারিকাদের ডেকে দেব? কিছু খাবে? সামান্য কিছু পানীয়। আমি নিজে নিয়ে আসতে পারি। তোমার এত অসুস্থ দেখাচ্ছে।'

—'না, ধন্যবাদ!'—এলিজাবেথ আত্মস্থ হবার চেষ্টা করলে—'এমন কিছু হয়নি আমার। আমি সুস্থই আছি। লংবোর্ণ থেকে এমন সাংঘাতিক কতকগুলো সংবাদ পেয়েছি।' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল এলিজাবেথ। কয়েক মুহূর্ত আর একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারল না সে। অস্বস্তিকর উৎকণ্ঠায় দোদুল্যমান ডার্সি উদ্বেগ প্রকাশ করে অস্ফুট ভাষায় কি বললে বোঝাই গেল না। অনুকম্পায় বিগলিত মনে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল সে। অবশেষে মুখ খুলল এলিজাবেথ—

'এই মাত্র জেনের কাছে দুঃসংবাদ-ভরা চিঠি পেয়েছি। কারুর কাছ থেকে সে সংবাদ গোপন রাখা যাবে না। আমার ছোট বোন সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে—পালিয়ে গেছে—উইকহ্যামের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তারা দু'জন একত্রে ব্রাইটন ত্যাগ করেছে। এর শেষ পরিণতি কি আপনি বুঝবেন। লিডিয়ার কি আছে। না সম্পত্তি না আভিজাত্য। লোভনীয় কোন কিছুই নেই তার। তাকে আমরা চিরকালের মত হারালুম।'

সব শুনে ডার্সি বিস্ময়ে স্থাণু হয়ে গেল। এলিজাবেথ আরো উত্তেজিত কণ্ঠে বলল—'যখন ভাবি আমি তো সর্বনাশ রোধ করতে পারতুম। আমি তো জানতুম উইকহ্যাম কেমন লোক। তার সম্বন্ধে যা জেনেছিলাম তার আংশিকও যদি বাড়ীতে বলতাম। উইকহ্যামের স্বভাব সবার জানা থাকলে এ রকম ঘটত না কখনো। কিন্তু এখন—এখন তো আর কোন উপায় নেই।'

—'সত্যিই আমি ভারি দুঃখিত—মর্মাহত হয়েছি; কিন্তু এও কি সম্ভব?'

—'রবিবার রাত্রে তারা ব্রাইটন ত্যাগ করেছে। লণ্ডন অবধি তাদের সংবাদ পাওয়া গেছে, কিন্তু তার পর আর কোন হদিশ নেই। নিশ্চয়ই তারা স্কটল্যাণ্ড যায়নি।'

—'তাকে ফিরিয়ে আনার কি ব্যবস্থা হয়েছে?'

—'বাবা লণ্ডনে গেছেন। মেসো মশাইকে জানানোর জন্য দিদি আমায় লিখেছে মিনতি করে। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই চলে যাব আমরা। কিন্তু কিছুই করবার নেই—আমি জানি, কিছুই করবার নেই। কি করে তাদের পাত্তা পাওয়া যাবে। আমি তো একটুও আশা রাখি না।'

ডার্সি মৌন সম্মতিতে মাথা নাড়ল।

—'মানুষটার প্রকৃত চরিত্রের খবর যখন জানলাম তখনই সাবধান হতাম যদি। ভুল—সর্বনেশে ভুল হয়ে গেছে।'

ডার্সি কোন উত্তর দিল না। এলিজাবেথের একটি কথাও তার কানে গেল কি না সন্দেহ। গভীর চিন্তান্বিত মুখে শুধু ঘরময় পায়চারী করত লাগল। বলি-রেখায়িত হয়ে উঠল তার কপাল। এলিজাবেথের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষিত হয়ে আসছিল। এমন পারিবারিক কলংকের সামনে কারই বা মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে! নিন্দা বা বিস্ময়—সব চেতনা হারিয়ে ফেলল সে। ডার্সির ধৈর্য না দিতে পারল তাকে সান্ত্বনা—না পারল তার দুঃখের লাঘব করতে। বরং নিজের মনের বাসনার প্রকৃত স্বরূপ চিনতে পারল সে। ডার্সিকে সে ভালবাসে এই সত্যটুকুই এত দিনে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল তার কাছে। কিন্তু এখন সে ভালবাসা স্বপ্ন। তবু নিজের চিন্তা তার মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করতে পারল না। যে অসম্মান ও দুঃখ চাপিয়ে দিচ্ছে লিডিয়া তাদের পরিবারের সুনামে, তার নীচে

ব্যক্তিগত সাধ-স্বপ্ন সব চাপা পড়ে গেল। রুমালে মুখ ঢেকে এলিজাবেথ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলল নিজেকে। কয়েক মিনিট পরে এই আত্মহারা অবস্থা থেকে সহকর্মীর কথায় জেগে উঠল যেন সে। ডার্সি সংযত, অনুকম্পা-ভরা কণ্ঠে বলল—'হয়ত এখন আর অপেক্ষা করার কোন অর্থ ই হয় না আমার।' এই সংকটে সান্ত্বনা দেবার বা কোন কিছু করার ক্ষমতা যদি আমায় ভগবান দিতেন! কিন্তু বৃথা সদিচ্ছা দ্বারা তোমায় অনর্থক পীড়িত করতে চাই না। এই অপ্রীতিকর ঘটনার মুখে আমার বোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ফুরসৎ নিশ্চয়ই তোমার হবে না?'

—'না। আমাদের হয়ে বোনের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবেন। বিশেষ প্রয়োজনে এখুনি বাড়ী চলে যাচ্ছি আমরা। যত দিন সম্ভব এই শোচনীয় ঘটনা গোপন রাখতে চেষ্টা করবেন। জানি, বেশী দিন এ গোপন থাকবে না।'

সে সম্বন্ধে ডার্সি নিশ্চিন্ত করল এলিজাবেথকে। আন্তরিক সমবেদনা জানাল তার দুঃখে—আশা প্রকাশ করল এ ব্যাপারের সুখকর পরিসমাপ্তির। আশা করার মত সঙ্গত কারণ আছে এখানে। তার পর তার আত্মীয়দের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে ডার্সি এলিজাবেথের দিকে শেষ বারের মত গভীর দৃষ্টি মেলে বিদায় নিল।

ডার্সি ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্রই এলিজাবেথ ভাবল, এই রকম আন্তরিকতার মধ্যে আবার যে তারা মিলিত হবে, এ তার স্বপ্নের অতীত।

কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা যদি ভালবাসার উপাদান হয়, এলিজাবেথের মনের এই বিবর্তন আদৌ অসম্ভব বা দোষণীয় নয়। যাই হোক, ডার্সি চলে যাওয়ায় দুঃখিতই হোল সে। কিন্তু লিডিয়ার কলঙ্ক এই প্রেমের ব্যাপারে কি পরিণতি নেবে, ভেবে সে মনঃকষ্টে আরো নির্যাতিত হতে লাগল। উইকহ্যাম যে লিডিয়াকে বিয়ে করবে না,, জেনের দ্বিতীয় চিঠি পড়ে নিঃসন্দেহ হয়েছে সে। জেন ছাড়া আর কেউই এমন কল্পনাবিলাস করতে পারে না। এই পরিণতিতে বিস্মিত সে একটুও হয়নি।

জেনের প্রথম চিঠিখানা পড়ে বিস্মিত হয়েছিল সে—উইকহ্যাম টাকার লোভে লিডিয়াকে বিয়ে করবে এ হতেই পারে না। অথচ লিডিয়া কি ভাবে যে তার মনে রং ধরাতে পারে, তাও তার ধারণার অতীত। কিন্তু এখন সবই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। হয়ত মনে রং ধরানোর মত যথেষ্ট মাধুর্য আছে তার। যদিও সে বিশ্বাস করে না যে, লিডিয়া বিয়ে করা ছাড়াও অন্য কোন উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করেছে, তবুও লিডিয়ার বুদ্ধি-বিবেক, লিডিয়ার চরিত্র তাকে এই সর্বনাশ থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

হার্টফোর্ডে রেজিমেণ্ট থাকার সময় এলিজাবেথের কোন দিনই মনে হয়নি যে, উইকহ্যামের প্রতি লিডিয়ার কোন প্রকার দুর্বলতা আছে। তবে এ কথা সত্য যে, লিডিয়া যে-কোন পুরুষের ভালবাসা পাওয়ার জন্য লালায়িত ছিল। এক এক সময় এক এক জন অফিসারের দিকে ঢলেছে সে, যাকে সে মনে করত তার প্রতি অনুরাগী। লিডিয়ার ভালবাসা চিরদিনই দ্বিধান্বিত, উদ্দেশ্যবিহীন। অবহেলা আর অতি আদরের এই পরিণাম। এবার সে তার ফল ভোগ করবে হাতে হাতে—অতি করুণ ভাবেই।

বাড়ী ফেরার জন্য এলিজাবেথের মন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল—বাড়ীতে উপস্থিত থেকে নিজের চোখে সব দেখতে, শুনতে, জেনের সঙ্গে সমান ভাবে দুঃখ-দুশ্চিন্তা ভাগ করে নিতে চায় সে। তাদের সংসারের তখন তচ্‌নচ্‌ অবস্থা—বাবা বাড়ী নেই—মা অসুস্থ—কোন পরিশ্রম করতে অপরাগ তিনি। তারই তখন সব সময় সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজন। যদিও লিডিয়া সম্বন্ধে কোন কিছুই করার নেই, তবুও মেসোর উপস্থিতি সেখানে খুবই সহায়ক হবে। যতক্ষণ না মেসোরা বাড়ী ফিরলেন এলিজাবেথের অধীরতার আর অবধি রইল না। মেসো-মাসী চাকরের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে সশঙ্কিত চিত্তে গৃহে ফিরলেন—তাঁরা ভাবলেন, এলিজাবেথ হয়ত হঠাৎ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁদের নিশ্চিন্ত করে এলিজাবেথ তাঁদের ডেকে পাঠানোর আসল কারণ বর্ণনা করল, দিদির চিঠি দু'খানাও পড়ে শোনাল। তাঁরাও সব শুনে অত্যন্ত বিচলিত হলেন। কেবল লিডিয়া নয়, সকলেরই স্বার্থ জড়িত এ ব্যাপারে। প্রথম বিস্ময় ও উদ্বেগ প্রকাশের পর মেসো সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এলিজাবেথ মনে মনে এ রকম আশা পোষণ করলেও সাশ্রুনয়নে কৃতজ্ঞতা জানাল। একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে তিন জনই অনতিবিলম্বে যাওয়ার সকল ব্যবস্থা নিষ্পন্ন করে ফেলল। যাত্রার আর দেরী নেই।

—'কিন্তু পেমবার্লীতে যাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে?'—জিজ্ঞেসা করলেন মাসী—'ডার্সি না কি এসেছিল, জনের মুখে শুনলাম।'

—'তাকে বলেছি, আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে পারব না। সে ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছি।'

মাসী আর তাকে তাড়াতাড়ি অনেক কিছু করে নিতে হবে। ল্যাম্বটনের বন্ধু-বান্ধবদের হঠাৎ চলে যাওয়ার একটা মিথ্যা কৈফিয়ৎ জানিয়ে চিঠিপত্র লিখতে হবে। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই তারা তৈরী হয়ে নিল। মেসো ইতিমধ্যে পান্থনিবাসের হিসেব মিটিয়ে ফেললেন। এখন যাত্রা করা ছাড়া আর বাকি রইল না কিছুই। সকালের দুঃখ-দুর্ভাবনার শেষে এই সামান্য বিরতির মধ্যেই এলিজাবেথরা প্রস্তুত হয়ে গাড়ীতে চেপে বসল—গাড়ী ছুটল লংবোর্ণের পথে।

সাতচল্লিশ

'আমি আবার ভেবে দেখলাম এলিজাবেথ,' বললেন মেসো মশায় গাড়ীতে যেতে যেতে, 'গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখলাম যে, জেনের ধারণাই বোধ হয় সত্যি। যে মেয়ে সংসারে নিঃসহায় নয়, নির্বান্ধব নয়, কর্ণেলের বাড়ীতে তারই তত্ত্বাবধানে যে ছিল, তার সম্বন্ধে কোন ছেলে যে এমন কুধারণা পোষণ করতে পারে এ যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। উইকহ্যাম কি ভাবে যে লিডিয়ার বন্ধুরা তার পথরোধ করে দাঁড়াবে না? কর্ণেলের প্রতি এ রকম বিশ্বাসঘাতকতা করার পর সে কি ভাবে সেনা-বাহিনীর শাস্তি পাবে তা কি ভুলে গেছে উইকহ্যাম? এত বড় ঝক্কিও কি তার লোভের পথে কাঁটা হবে না?'

মুহূর্তের জন্য এলিজাবেথের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—'সত্যিই বিশ্বাস করেন এ কথা?'

'আমায় বিশ্বাস কর। এত বড় অসাধুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে উইকহ্যাম, এ আমি বিশ্বাসই করতে পারি না। এত বড়

অপরাধ করার মত জঘন্য চরিত্র তার নয়। তোমার কি মনে হয় না?'

'নিজের ক্ষতি করবে না সে, কিন্তু আর সবই সে করতে পারে স্বচ্ছন্দে। কিংবা হয়ত আপনার কথাই সত্যি মেসো মশায়। আর যদি তাই হবে, তবে তারা স্কটল্যাণ্ডে গেল না কেন?'

'তাই বা তুমি নিশ্চিত হতে পারছ কি করে যে তারা যায়নি স্কটল্যাণ্ডে?'

'যাবেই যদি তবে ডাকগাড়ী থেকে নেমে অন্য গাড়ী নেবে কেন? আর খবরও পাওয়া যাচ্ছে না কেন?'

'লণ্ডনেই যদি তারা গিয়ে থাকে, সে হয়ত আত্মগোপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। অন্য কোন দুরভিসন্ধি তাদের হয়ত নেই। তা ছাড়া টাকারও অনটন আছে দু'জনের। হয়ত ভেবেছে যে, লণ্ডনেই অল্প খরচে বিয়ে করে থাকতে পারবে।'

'কিন্তু এ লুকোচুরি কেন মেসো মশায়? ওরা কি ভেবেছে ধরা পড়বে না? বিয়েতেই বা এত চুপ-চুপ ভাব কেন? জেনের চিঠি পড়লেন ত আপনি মেসো মশায়। তার সব চেয়ে যে বড় বন্ধু, তার কাছেও সে বিয়ে করার কথা বিন্দু-বিসর্গ জানায়নি। যে মেয়ের সম্পত্তি নেই তাকে বিয়ে করার মত ছেলে উইকহ্যাম নয়। সে করবেই না এমন কাজ। তা ছাড়া নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে শুধু একটি তরুণী যুবতীকে বিয়ে করার নেশায় আত্মহারা হয়ে পড়ার লোক উইকহ্যাম নয়। সেনা-বাহিনীতে তার এই অপরাধের কি শাস্তি হবে আমি জানি না, কিন্তু উইকহ্যাম ভাল রকমই জানে যে, লিডিয়ার নিজের ভাই নেই, সুতরাং সে দিক দিয়ে তার বিপদের আশঙ্কা কম। তা ছাড়া বাবার চরিত্র সে ভাল রকমই জানে। সংসারের ব্যাপারে বাবার নির্লিপ্ততার সুযোগ সে ভাল ভাবেই নিয়েছে। তাতেই তার সাহস বেড়ে গেছে।'

'লিডিয়ার কথাটাও একবার ভেবে দেখ এলিজাবেথ। বিয়ে করবে না যে পুরুষ, তার সঙ্গে শুধু প্রেমের জন্যেই গৃহত্যাগ করবে, এত বড় দুর্মতি কি সত্যই হবে লিডিয়ার?'

এলিজাবেথের দুই চোখে অশ্রু টলমল করতে লাগল। কান্না-জড়ান গলায় বললে—'ভাবতে পারি না। নিজের বোনের এত বড় লজ্জার কথা ভাবতেই পারি না। কিন্তু সে যে ভারী ছেলেমানুষ। কখনো গভীর ভাবে চিন্তা করতে শেখেনি সংসার সম্বন্ধে। গত এক বছর সে শুধু আমোদ-কৌতুক করে কাটিয়েছে। লিডিয়ার চরিত্রটা গড়ে উঠেছে অলসতায়, আমোদপ্রিয়তায় আর লোকের মুখের কথায়। এখানে সৈন্য-শিবির পড়া অবধি সে দিবারাত্র খালি অফিসারদের সঙ্গে লঘু ভাবে মেলা-মেশা করেছে। উইকহ্যামের চেহারায় কথা-বার্তায় তার মত হাল্কা মেয়ের যে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটতে পারে এ আমি মোটেই অবিশ্বাস করতে পারি না।'

'কিন্তু জেন কখনো এতখানি খারাপ চিন্তা করতে পারে না।'

'দিদির কথা ছেড়ে দাও। সে কার সম্বন্ধেই বা খারাপ চিন্তা করে। কিন্তু দিদি জানে, কি প্রকৃতির মানুষ উইকহ্যাম। তার মত অপরাধপ্রবণ লোক জগতে বিরল। সে কথা আমার মত দিদিও ভালো মত জানে।'

মেসো মশায় তবু আলোচনার সূত্র ছিন্ন করলেন না। বললেন, 'এ সব কথা কি লিডিয়া জানে না?

'জানে বৈ কি। আর সেই ত হোল চরম। যখন ঠিক হয় লিডিয়া কর্ণেলের সঙ্গে যাবে, তখন উইকহ্যামের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাকে কিছু বলা আমি অসামাজিক মনে করেছিলাম। কর্ণেল বা তার স্ত্রী যে লোকটার প্রতারণায় ভুলতে পারেন, এ সম্ভাবনা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।'

'আচ্ছা, তা যেন হোল। কিন্তু লিডিয়ার সঙ্গে উইকহ্যামের সম্প্রীতির কোন সংবাদ কি তোমরা রাখতে না?'

'বিন্দু-বিসর্গ নয়। ওদের দু'জনের মধ্যে এমন কিছু ঘটেনি যাতে আমরা এ কথা বুঝতে পারি। বুঝলে আমরা নিশ্চয়ই তার কোন ব্যবস্থা করতাম।'

সারা পথ দু'জনে সেই একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। কত রকম ভয় সংশয় ভাবনা যে তাঁদের কথাবার্তায় প্রকাশ পেল—বিশেষ করে এলিজাবেথ একটি মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারলে না। কত বার করে সে আত্মশোচনায় পুড়লে। নিজেকে কত বার অপরাধিনী করলে, কেন সে এ সব সম্বন্ধে সকলকে সতর্ক করে দেয়নি যথাসময়ে। মন তার সংশয়-দোলায় দুলতে লাগল।

শুধু রাত্রি বেলা বিশ্রাম করে সারা দিন সারা সকালে চলে তারা দুপুরের আগেই বাড়ীতে পৌঁছে গেল। দিদিকে যে যথাশীঘ্র একলা থাকার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করেছে, এই চিন্তায় অনেকখানি আরাম পেল এলিজাবেথ।

ছোটদের আদর করেই এলিজাবেথ ছুটল দিদিকে খুঁজে ধরতে। সিঁড়ির গোড়াতেই দেখা হল দু'জনের। এলিজাবেথ এসেছে খবর পেয়েই জেন মায়ের ঘর থেকে দ্রুত ছুটে আসছিল বোনকে সম্ভাষণ করতে।

দু'জনের চোখেই জল এল প্রথম সাক্ষাতে। দিদির আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়েই এলিজাবেথ লিডিয়ার খবর জিজ্ঞাসা করলে।

'এখনো কিছু পাওয়া যায়নি। কিন্তু মেসো মশায় যখন এসেছেন, আর ভাবনা নেই রে এলিজাবেথ।'

'বাবা কি সহরে গেছেন?'

'হাঁ, মঙ্গলবারে গেছেন। তোকে ত লিখেছিলাম।'

'খবর পেয়েছ কিছু তাঁর কাছ থেকে?'

'একখানা চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে জানিয়েছেন যে, ওদের কোন খবরাখবর না পেলে আর চিঠিপত্তর দেবেন না।'

'মা কেমন আছেন?'

'মা'র কথা বলিস না। একেবারে ভেঙে পড়েছেন। ঘর থেকেই বেরোন না আজকাল।'

বসে কথাবার্তা আবার পুরানো খাতে প্রবাহিত হল। জেনের কাছে অতিরিক্ত কোন খবর পাওয়া গেল না। কল্যাণব্রতী তার মন তখনও শুভের আশা ত্যাগ করতে পারেনি, এইটুকুতে সকলেই যেন মনে শান্তি পেল। তার প্রত্যাশা, যে কোন মুহূর্তে লিডিয়ার সংবাদ এসে পড়বে, হয়ত বা তার বিয়ের খবরই বহন করে আনবে পোষ্ট অফিস।

মায়ের ঘরে যখন সবাই মিলিত হল, মা রাগে দুঃখে অভিমানে কান্নায় শতধা হয়ে ভেঙে পড়লেন। উইকহ্যাম যে কত বড় অসচ্চরিত্র যুবক তা হাজার বার করে তিনি বললেন। সে যে লিডিয়ার মত সুকুমারমতি বালিকাকে প্রলোভিত করে অনিশ্চিত পথে টেনে

নিয়ে গেছে তার জন্ত তাকে অভিশাপ দিলেন। সকলকেই তিনি ভর্ৎসনা করলেন, অপরাধী করলেন, শুধু করলেন না নিজেকে, যার অপরিমিত স্নেহে ও আদরে লিডিয়া এমন ভ্রান্তবুদ্ধি হ'ল।

'আমি নিজে যদি ওদের সঙ্গে যেতে পারতাম, এমনটা কিছুতেই হোত না। সে কে ছিল? লিডিয়ার ভালো-মন্দ দেখবার মত লোক সেখানে কে-ই বা ছিল? কর্ণেলই বা কেমন লোক, যে পরের মেয়েকে চোখের আড়াল করে রাখতেন? নিশ্চয়ই স্বামি-স্ত্রীতে ওর দিকে কোন দৃষ্টিই রাখতেন না, নইলে এমন কাজ করার মত মেয়ে আমার লিডিয়া নয়। আমি জানতাম যে, কর্ণেলের বাড়ীতে তার অযত্ন হবে। সে কথা হাজার বার করে বলেওছিলাম, কিন্তু আমার কথায় কে কান দেয়? এখন উনি গেছেন উইকহ্যামকে খুঁজে বার করতে। দেখা যদি পান, একটা মারামারি খুনোখুনি হবেই। উনি খুন হলে তখন আমাদের কি হবে? কোথায় গিয়ে দাঁড়াব আমরা? কলিন্স ত দু'দিন না যেতেই আমাদের ঘর-ছাড়া করে তাড়িয়ে দেবে। তখন তুমি যদি দাদা আমাদের না দেখ, আমরা একেবারে ভেসে যাব।'

মায়ের এই আক্ষেপে সবাই পরম বিচলিত হয়ে পড়ল। মেসো মশায় নানা ভাবে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। কালই তিনি লণ্ডনে রওনা হবেন, খুঁজে বার করবেন বেনেটকে। লিডিয়ার উদ্ধার তিনি করবেনই।

দুই বোনে অনেক ক্ষণ পরে নির্জন হলে আবার প্রাণের কথা হতে লাগল।

'যদি উইকহ্যামের কথা আমরা ওদের বলে দিতাম, এমনটা কিছুতেই হতে পারত না।'

জেনও বোনের কথায় সায় দিল। 'বলাই বোধ হয় উচিত ছিল আমাদের। কিন্তু লোকের অতীতের কলঙ্কের কথা রাষ্ট্র করা কি ভাল, যতক্ষণ না তার বর্তমান দুরভিসন্ধির কথা প্রকাশ পায়? আমরা ত ভাল মনেই কাজ করেছিলাম, কিন্তু আমাদের কপালই মন্দ।'

'কর্ণেলের স্ত্রীর কাছে লিডিয়া যে চিঠি লিখে গিয়েছিল, সে কথা তুমি কিছু জান না কি দিদি?'

'সে চিঠিও তিনি আমায় দিয়ে গেছেন। দেখবি?'

এলিজাবেথ পড়ে দেখলে।

'প্রিয় বন্ধু—

যখন জানতে পারবে আমি কোথায় গেছি, তুমি নিশ্চয়ই হাসবে। কাল সকালে আমায় দেখতে না পেয়ে তুমি কতখানি আশ্চর্য হবে, ভেবে আমি নিজেই হাসি সংবরণ করতে পারছি না। গ্রেটনা গ্রীণে যাচ্ছি আমরা। আমার সঙ্গে কে সঙ্গী হয়ে যাচ্ছেন তা যদি তুমি না বুঝতে পার, তবে বলব যে, বুদ্ধি তোমার ঘটে ভগবান কিছুমাত্র দেননি। পৃথিবীতে তেমন মানুষ তুমি দেখোনি, যিনি আমার ভালবাসার জন। তাঁকে ছেড়ে আমি কিছুতেই সুখী হতে পারতাম না, তাই তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলাম। মা'র কাছে চিঠি দিয়ে এ খবর না পাঠালেও ক্ষতি নেই, কেন না আমি নিজে যখন বিয়ের কথা জানাব তখন কি অবাক হবেন মা-বাবা-দিদিরা, ভাবো ত? তলায় সই দেব চেনা নাম নয়, লিডিয়া উইকহ্যাম। কি মজা হবে বল ত? লঙবোর্ণে ফিরে জামা-কাপড় চেয়ে নোবো তখন। তার আগে কিন্তু আমার মসলিনের পোষাকটা সামান্য রিপু করিয়ে রাখতে বলবে। কর্ণেলকে আমার শ্রদ্ধা জানাবে। আমাদের যাত্রার শুভ কামনা করছ ত তোমরা? ইতি

তোমার বান্ধবী লিডিয়া।'

চিঠি পড়ে এলিজাবেথ আত্মসংবরণ করতে পারলে না। 'কি দুর্বুদ্ধি মেয়েটার! এমন চিঠি লিখলে কি করে? অন্ততঃ এটুকু বোঝা যায় যে, লিডিয়া লোভের পথে পা বাড়ায়নি। উইকহ্যাম তাকে নিয়ে যাই করুক, লিডিয়ার মনে পাপ নেই। বাবা এ কথা শুনলে কি দুঃখটাই না পাবেন?'

'শুনেছেন বৈ কি। আর তাঁর সে কি মনোযাতনা! দশ মিনিট একটা কথা কইতে পারলেন না, যেন পাথরের মূর্তির মত মৌন হয়ে বসে রইলেন। মায়ের কথা ত আর বলার নয়! একখানা চিঠিতে যেন বাড়ীর সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল।'

তার পর এলিজাবেথের কৌতূহল নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে বললে— 'বাবা গেছেন প্রথমতঃ ডাকগাড়ীর ঘোড়া-পালটানোর জায়গায় খবর নিতে। ডাকগাড়ী ছেড়ে তারা যে গাড়ী নিয়েছে তার গাড়োয়ান বা গাড়ীর নম্বর খুঁজে বার করবেনই তিনি। আর তা করতে পারলে লিডিয়ার হদিস মেলা তখন আর শক্ত হবে না। তা ছাড়া আরও কিছু ধারণা নিশ্চয়ই আছে তাঁর। সে সব ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে। বাবা যে রকম হুড়দাড় করে চলে গেলেন, তাঁর সঙ্গে যে দু'টো কথা কয়ে নেব, তার সুযোগই হল না।'

আটচল্লিশ

পরদিন সকালে মিঃ বেনেটের কাছ থেকে চিঠির আশায় বাড়ীর সবাই উদ্গ্রীব হয়ে রইল। ডাক এল যথারীতি। কিন্তু কোন খবরই পাওয়া গেল না। চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে মানুষটি চিরদিনই গেঁতো-প্রকৃতির। তবুও এ ক্ষেত্রে তাঁর মৌনতা বড় বেশী করে লাগল যেন সকলের। মনে করে নিতে হোল যে, হয়ত দেবার মত কোন খবর পাননি তিনি। মেসো মশায় এই চিঠির অপেক্ষায় যাত্রা স্থগিত রেখেছিলেন। এখন অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করে তিনি যাত্রা করলেন।

তিনি ঠিকই খবর আনবেন এই ভরসায় আশ্বস্ত হোল সবাই। যাবার আগে এই প্রতিশ্রুতিও দিয়ে গেলেন তিনি যে, বুঝিয়ে-সুজিয়ে লিজির বাবাকে বাড়ী ফেরাবার চেষ্টা করবেন। স্বামী একটা খুনোখুনি না করে বসেন সে-সম্বন্ধেও অনেকটা আশ্বস্ত হলেন মা।

মাসীমা ছেলেমেয়েদের নিয়ে আরো কয়েকটা দিন থেকে গেলেন হার্টফোর্ডশায়ারে। এ অসময়ে বোনঝিদের অনেক উপকার হোল তাতে। বোনের সেবা-শুশ্রূষারও ভাগ নিতে লাগলেন তিনি। মেরীটনের মাসীও মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যেতে লাগলেন। এই বিপদে যদিও সান্ত্বনা দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য তবুও কথার ফাঁকে ফাঁকে উইকহ্যামের উচ্ছৃংখলতা ও হীন আচরণের নিত্য-নতুন তথ্য পরিবেশনেও কার্পণ্য করতেন না। এবং প্রতিবারই বেনেট-পরিবারকে আরো বেশী নিরুৎসাহিত করে চলে যেতেন।

যে লোকটি তিন মাস আগেও এখানে সকলের নয়নমণি ছিল আজ তার চরিত্রে কাদা ছোড়াছুড়ির প্রতিযোগিতা চলতে লাগল।

প্রত্যেক দোকানেই না কি সে ধার ফেলে গেছে। প্রত্যেক পরিবারে সে মেশামেশির চেষ্টা করত শুধু মেয়েদের ফুসলানোর উদ্দেশ্য নিয়েই। সবার মুখেই এখন এক কথা—উইকহ্যামের মত এমন মন্দ লোক দু'টি মিলবে না। সবাই বুক বাজিয়ে বলতে লাগল যে, তারা কেউই তার সাধুতায় বিশ্বাস করেনি। যা শোনা গেল, তাতে সে যে তাদের বোনের সর্বনাশ করেছে তাতে সন্দেহ রইল না। এমন কি এ সব নিন্দা-রটনায় বিশ্বাস করত না যে জেন, সেও যেন ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়তে লাগল। ওরা যদি সত্যি স্কটল্যাণ্ড যেত, এত দিনে নিশ্চয়ই কোন খবরাখবর পাওয়া যেত তাদের।

মেসো মশায় গেছেন রবিবার। মঙ্গলবারে পত্র এল তাঁর। লিখেছেন তিনি, লণ্ডনে পৌঁছেই বেনেটকে খুঁজে বার করেছেন এবং তাকে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাঁর ওখানে আসতেও সম্মত করেছেন। মিঃ বেনেট ইতিমধ্যে দু'-এক জায়গায় খোঁজ-খবরে গিয়েছিলেন কিন্তু সন্তোষজনক কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। এবার তিনি সহরের প্রধান প্রধান সব ক'টি হোটেল খুঁজে দেখার মনস্থ করেছেন। তাঁর বিশ্বাস, বাড়ীভাড়া করবার আগে নিশ্চয়ই তারা কোন হোটেলে উঠেছিল। এই পন্থা বিশেষ ফলপ্রসূ হবে না বলেই বিশ্বাস মেসো মশায়ের। অবশ্য বেনেটের ইচ্ছা মতই তাকে সাহায্য করতে সংকল্প করেছেন তিনি। আরো মন্তব্য করেছেন—মিঃ বেনেট বর্তমানে লণ্ডন ত্যাগ করতে আদৌ ইচ্ছুক নন। সত্বরই আবার চিঠি দেবেন। পুনশ্চ দিয়ে লিখেছেন তিনি।

—"কর্ণেল ফরষ্টারকে লিখেছি আমি—রেজিমেণ্টে উইকহ্যামের এমন অন্তরঙ্গ কেউ আছে কি না যাকে সে সহরের কোন্ অংশে আত্মগোপন করে আছে সে সম্বন্ধে চিঠি দিতে পারে। তেমন কেউ যদি থাকে তার কাছ থেকে কোন সূত্র পেলে আমাদের বিশেষ সুবিধে হবে। বর্তমানে আমাদের হাতে অগ্রসর হওয়ার মত কোন সংকেত-সূত্র নেই। কর্ণেল ফরষ্টার নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, লিজি হয়ত সবার চেয়ে ভাল জানতে পারে এখন সে কোন্ আত্মীয়ের সঙ্গে বাস করে।"

এ সিদ্ধান্তের কী যে কারণ থাকতে পারে অনুধাবন করতে একটুও অসুবিধা হয় না এলিজাবেথের। কিন্তু এর কোন সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা নেই তার। একমাত্র বাবা-মা ছাড়া উইকহ্যামের যে আর কোন আত্মীয় আছে সে শোনেনি কখনও। এবং মা-বাবাও তো গতায়ু হয়েছেন বহু দিন। হার্টফোর্ডশায়ারের তার বন্ধুরা হয়ত কোন খবর রাখতে পারে। অবশ্য এ সম্বন্ধেও সে খুব আশান্বিত না হলেও এদিকটাও একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

লংবোর্ণে প্রতিটি দিন আসে দুশ্চিন্তার বোঝা নিয়ে আর ডাক যখন আসে তখনই দুশ্চিন্তার মাত্রা হয়ে ওঠে তীব্রতম। প্রতিদিন প্রভাতে চিঠির প্রতীক্ষায় সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। চিঠির মারফৎই আসবে ভাল-মন্দ যা কিছু সংবাদ আর প্রতিদিনই গুরুত্বপূর্ণ কোন সংবাদের আশাপথ চেয়ে থাকে সবাই।

মেসো মশায়ের কাছ থেকে আর কোন চিঠি আসার আগে অপ্রত্যাশিত ভাবে কলিন্সের কাছ থেকে একখানা চিঠি এল মিঃ বেনেটের নামে। বাবার অনুপস্থিতিতে তার সকল চিঠি খোলার অনুমতি পেয়েছিল জেন। কাজেই চিঠি খুলল সে। চিঠিতে লেখা—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু—

গতকল্য হার্টফোর্ডশায়ার হইতে প্রাপ্ত পত্রে আপনার গভীর মনস্তাপের কথা অবগত হইয়া আপনার সহিত সম্পর্ক হেতু এই দুঃখে সমবেদনা জানাইতে বাধ্য হইলাম। বলা বাহুল্য, আমি ও আমার স্ত্রী আপনার ও আপনার পরিবার-বর্গের বর্তমান মন্দভাগ্যে নিরতিশয় দুঃখিত। জানি, এ দুঃখ অপরিমেয় এবং কালান্তরেও এর তীব্রতা হ্রাস পাইবে না। পিতামাতার পক্ষে সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক দুঃখে আমাদের অকুণ্ঠিত ও আন্তরিক সমবেদনা জানিবেন। এর তুলনায় কন্যার মৃত্যুও পরম আশীর্বাদ বলিয়া বিবেচিত হইত। সর্বাধিক শোকের কারণ শার্লটির নিকট হইতে যত দূর জানিতে পারিয়াছি, আপনার অতি আদরই মেয়ের উচ্ছৃংখলতার জন্য দায়ী। অবশ্য আপনার ও মিসেস্ বেনেটের সান্ত্বনার পক্ষে এ কথা আমি বলিব যে, মেয়ের মানসিক প্রকৃতিও দূষণীয়। নতুবা এই বয়সে সে এই প্রকার বিষম অপরাধ করিত না। যাহাই হউক, আপনার দুঃখে আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আমার স্ত্রী, লেডী ক্যাথারিণ ও তাঁহার কন্যাও এই সঙ্গে সমবেদনা জানাইতেছেন। তাঁহাদের নিকট আমি সকল ঘটনা বিবৃত করিয়াছি। একটি মেয়ের এই প্রকার ভুল আচরণ অন্য মেয়েদের ভবিষ্যতের পক্ষে যে বিশেষ ক্ষতিকারক হইবে, এ সম্বন্ধে তাঁহারা আমার সহিত একমত। আমার সুপরামর্শ যদি গ্রহণ করেন, আমি বলিব, এই রকম অপদার্থ কন্যার সহিত চিরকালের মত সকল সম্পর্ক ছেদন করাই উচিত। সে তার জঘন্য অপরাধের ফল ভোগ করুক। ইতি—"

কর্ণেল ফরষ্টারের নিকট হতে কোন উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত মেসো মশায় আর চিঠি লেখেননি। কিন্তু এর পর যে চিঠি এল সেও কোন শুভ সন্দেশ বহন ক'রে নয়। উইকহ্যামের এমন এক জন আত্মীয়েরও খবর পাওয়া যায়নি যার সঙ্গে তার কোন প্রকার সম্পর্ক আছে। নিকট-আত্মীয় বলতে তার যে কেউ নেই, এও এক রকম সুনিশ্চিত। তার পূর্ব-পরিচিতের সংখ্যা অনেক। কিন্তু সৈন্য-বাহিনীতে যোগদানের পর সে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সমাজ থেকে। কাজেই তার সম্বন্ধে খবরাখবর দিতে পারে এমন কাউকেও নির্দিষ্ট করা সম্ভব হোল না। একে অর্থ-কষ্ট তার উপর লিডিয়ার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার ভয়। জুয়োতে তার প্রচুর ঋণের সংবাদ ক্রমশঃ পাওয়া গেল। কর্ণেল ফরষ্টারের মতে একমাত্র ব্রাইটনের ঋণ পরিশোধ করতেই হাজার পাউণ্ডের বেশী লাগবে। সহরে ঋণের পরিমাণও কম নয়—তা ছাড়া অন্য ধারও যথেষ্ট।

—'উইকহ্যাম একটা জুয়াড়ী'—বিস্মিত আতঙ্কে বললে জেন—'এ একেবারে নতুন। কোন ধারণাই ছিল না আমাদের এ সম্বন্ধে।'

মেসো মশায় আরো জানিয়েছেন চিঠিতে যে, মিঃ বেনেট হয়ত শনিবার বাড়ী ফিরতে পারেন। সকল চেষ্টা বিফল হওয়ার হতাশায় তিনি শেষ পর্যন্ত সহধর্মীর অনুরোধে গৃহে প্রত্যাবর্তনে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এবং অনুসন্ধান-ব্যাপারে যা-যা করণীয় তাও তাঁর হস্তেই

সমর্পণ করেছেন। মেয়েরা আশা করেছিল মা হয়ত এ সংবাদে খুশী হবেন। কিন্তু মা তেমন উৎসাহ দেখালেন না। যদিও স্বামীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন ইতিপূর্বে।

—'লিডিয়াকে না নিয়েই বাড়ী ফিরে আসছেন তিনি?' কেঁদে বললেন তিনি—'তাদের খোঁজ না নিয়ে কিছুতেই ওঁর বাড়ী ফিরে আসা উচিত হবে না। উনি চলে এলে কে উইকহামকে বিয়ে করতে বাধ্য করাবে?'

মাসীমা বাড়ী ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। স্থির হোল, মিঃ বেনেট লণ্ডন থেকে ফিরে এলেই তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে লণ্ডনে যাবেন। গাড়ী প্রথমে তাঁদের সেখানে পৌঁছে দিল—পথে মিঃ বেনেটকে নিয়ে ফিরে এল লংবোর্ণে।

এলিজাবেথ ও তার ডার্বিশায়ারের বন্ধু সম্বন্ধে একটা সংশয় নিয়ে ফিরে গেলেন মাসীমা। তার নাম কখনো স্বেচ্ছায় উল্লিখিত হয়নি তাদের মধ্যে। হয়ত কোন চিঠিপত্র আসবে সে-প্রত্যাশাও মিথ্যায় পর্যবসিত হোল শেষ পর্যন্ত। পেমবার্লি থেকে ফেরার পর একখানিও চিঠি পায়নি এলিজাবেথ সেখান থেকে।

এলিজাবেথ নিজের মনের সঙ্গে এত দিনে সম্পূর্ণ বোঝাপড়া করে নিয়েছে। ডার্সির সঙ্গে যদি পরিচয় না ঘটত তা'হলে হয়ত লিডিয়ার এই কলঙ্ক সে আরো সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারত। দু'টি নিদ্রাহীন ব্যাকুল রজনীর বদলে একটির বেদনা হয়ত সইতে হোত তাকে।

মিঃ বেনেট গৃহে ফিরলেন তার দার্শনিক-সুলভ প্রশান্তি নিয়েই। চিরদিনের স্বভাব মত কথা বললেন খুবই কম। যে ব্যাপার ঘর-ছাড়া করেছিল তাঁকে, সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখই করলেন না। মেয়েরাও তাঁকে কিছু প্রশ্ন করতে সাহসী হোল না।

বিকেলে চায়ের আসরে এলিজাবেথই সাহস করে প্রথম কথাটা উত্থাপন করলে।

—'ও আলোচনা থাক এখন'—বললেন তিনি—'আমি ছাড়া কে আর এ দুঃখ ভোগ করবে? এ আমারই দোষে ঘটল—আমিই এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করব।'

—'নিজের উপর অতো নির্মম হোচ্ছ কেন, বাবা?'

—'এ বিপদ সম্বন্ধে তুমি তো আমায় সতর্ক করে দিয়েছিলে। কিন্তু মানুষের প্রকৃতিই হোল পথে পা বাড়ান। না লিজি, না, জীবনে অন্ততঃ একবার নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন হতে দাও। এ আমাকে একেবারে অভিভূত করতে পারবে না। এ আমি কাটিয়ে উঠবই।'

—'ওরা কি লণ্ডনে আছে মনে হয়?'

—'তা ছাড়া আর কোথায় এমন আত্মগোপন করে থাকতে পারবে?'

—'লিডিয়া তো লণ্ডনেই যেতে চাইত'—মন্তব্য করল কিটি।

—'তা'হলে খুশীই হয়েছে সে'—শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দিলেন বাবা। 'বেশ কিছু কাল তা'হলে সে থাকবে সেখানে।'

সামান্য বিরতির পর আবার বললেন তিনি—'এবার আমাকে সাবধান হতে হবে। কোন অফিসারকে আর বাড়ীর ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেব না—এমন কি এ গ্রামের ভিতর দিয়েও যেতে দেব না। বল-নাচে যাওয়া একেবারে বন্ধ—যদি না দিদিরা কেউ সঙ্গে থাকে। দিনে অন্ততঃ দশ মিনিট ভদ্র মতে থাকার প্রমাণ দিতে যদি না পার, বাড়ীর বার হবে না।'

বাবার কাছে এমন ভাবে বকুনি খেয়ে কিটি কান্না জুড়ে দিল।

—'মন খারাপ করো না মা! দশটি বছর যদি ভাল মেয়ে হয়ে থাক আমি নিজে তোমায় সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখাতে নিয়ে যাব।'—বললেন মিঃ বেনেট।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক :—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

ফিরাইয়া চাহি মোর পুরানো পৃথিবী

বন্দেআলী মিয়া

এখনো নয়ন হতে মুছে যায়নি কো আকাশের নীল আলো
এখনো মাধবী-শাখে ফোটে বুঝি ফুল—পাখীরা উড়িয়া আসে,
বাতাসে ভাসিয়া আসে মাটির সুবাস—নিঝুম নিশীথ রাতে
বাতায়ন হতে আজো শুকতারা মোরে নীরবে খুঁজিয়া যায়।

এখনো মনের কোণে জেগে আছে বুঝি এতটুকু মধু সাধ
তাই আজও ভালো লাগে পুরানো পৃথিবী—ভালো লাগে হাসি গান,
চেয়ে থাকি ম্লান মুখে দিগ্‌-সীমানায়—দেয়া নামে-ভরুণি রে—
এখনো বলাকা দল উড়ে চলে যায় অজানা সিন্ধু পানে।

আমার মাধবী রাতি শেষ হয়ে আসে—ক্ষীণ হয় দীপশিখা
আঁধার ঘনায়ে আসে মোর চারি দিকে—আঁখি হতে ঝরে জল,
সেদিনের বসুমতী আজো মনে হয়, তেমনি সে রূপময়ী
আমি হায় বাসি হয়ে গেছি—আমারে ঘেরিয়া কাঁদে নিখিল ভুবন।

মনের স্বপন মোর গুমরিয়া কাঁদে—এতটুকু চাহে প্রীতি
নূতন জনম লভি বাঁচিবারে চাহি এই বিশাল ধরায়—
হারাইয়া যাবো আমি মাটির গহনে—তৃণে তৃণে তারায় তারায়,
নব রূপ লয়ে আমি আসিব ফিরিয়া পুরাতন জনতার ভিড়ে।

নামঞ্জুর

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে ওঠে, দুর্যোগময়ী রজনীর পূর্বাভাস। আকাশের গায়ে কালো মেঘ অন্ধকারে মিশে একাকার হয়ে উঠলো। সমস্ত বিশ্বে কালো রঙের এক পোঁছ ব্যাপ্ত হয়ে আছে। শিল্পীর প্রকাণ্ড তুলির এক আঁচড়ে যেন মুহূর্তে সব কালো হয়ে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে পশুপতি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে, এক্ষুণি তাকে ষ্টুডিওতে ফিরে যেতে হবে। 'ইষ্টার্ণ ফটো এনগ্রেভিং ষ্টুডিও'—বিরাট কারবার কিন্তু আসলে ওটা ব্লক তৈরির কারখানারই নামান্তর মাত্র।

স্ত্রী বাসন্তী বলে,—আজ আর কাজে নাই বা গেলে? আমাদের তো এইটুকুন সংসার, দু'টো পেট, যা মাইনে পাও তাইতেই চলবে। কি হবে আমাদের অতিরিক্ত কাজ করে রোজগারে? তোমার শরীরটার দিকেও কি তাকিয়ে দেখবে না? অতিরিক্ত খেটে-খেটে কি হয়ে যাচ্ছ দিন-দিন!

কথাগুলো সত্যি। আজ বার বছর ওদের বিয়ে হয়েছে, ছেলেপুলে হল না, আর হবার আশা আছে বলেও মনে হয় না। এ জিনিষটা কাঁটার মতো বাসন্তীর মনের কোণে বিঁধে আছে আর তার খোঁচাটা সে যখন-তখনই অনুভব করে থাকে। পশুপতি কি করতে পারে এর? অসহায় ভাবে চেয়ে দেখে একটার পর একটা মাদুলি যোগাড় করে এনে বাসন্তী পরছে। তার পর কোনটাকে বা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, কোনটাকে বা রাখে। কোন দিন কিছু বলেনি পশুপতি। কে জানে, হয়তো এক দিন এর ফল ফলে যাবে,—দৈবকে অবিশ্বাস করবার বা অস্বীকার করবার স্পর্ধা পশুপতির নেই।

টাকা সে যথেষ্ট রোজগার করে সত্যি কিন্তু টাকাটাই কি সব? সে কি শুধু টাকার জন্তই কাজ করে? এ কথাটা সে কোন মতেই বোঝাতে পারবে না বাসন্তীকে। সে জানে, তার কাজের উপর একটা অহেতুক বিরূপ ভাব রয়েছে বাসন্তীর। দশ বছর ধরে নিজের রক্ত দিয়ে সে একটা কারবার গড়ে তুলেছে, নাই বা হল সে মালিক? এ কথাটা স্বয়ং হরবিলাস বাবু পর্যন্ত জানেন, তাকে না হলে কারবারের চলে না—কারবার চলবে না। হরবিলাস বাবু তাকে ছোট ভাইএর মতো স্নেহ করেন—যথেষ্ট টাকা দেন সত্যি কিন্তু সেটা কি এমনি? তাকে না হলে চলবে না বলেই না? এ কারবার গড়ে তোলায় হরবিলাস বাবুর চেয়ে তার কৃতিত্ব কি কম? দশ বছর ধরে তিলে-তিলে রক্ত দিয়ে সে এ বিরাট কারবার গড়ে তুলেছে, অনেক লোক আজ এখানে খাটছে সত্যি, কিন্তু যেদিন সে আর হরবিলাস বাবু এটা আরম্ভ করেন, সেদিন কোথায় ছিল ওরা? বাসন্তী ভাবে, টাকার জন্ত সে মালিকের কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু এ কথাটা সে বাসন্তীকে বোঝাবে কি করে গত দশ বছরে সে তার কতটা পরমায়ু এখানে ঢেলে দিয়েছে,—টাকার জন্তে নয়—মালিকের জন্তে নয়—এ কথাটা সে বোঝাবে কি করে? স্বয়ং হরবিলাস বাবু পর্যন্ত এ কথাটা বোঝেন, তাকে না হলে কারবার চলে না।

তাকে যেতেই হবে, পশুপতি জামা-কাপড় পরে তৈরি হয়।

বাসন্তী চেয়ে দেখে, তার পর কাছে এসে বলে,—আজ কিছুতেই তোমাকে কাজে যেতে দেবো না আমি—এই বলে দিলাম।

পশুপতি বলে,—কথা দিয়েছি বাসন্তী, নইলে তোমার কথাই মেনে নিতাম। আটটায় যাবো বলে এসেছি, সাড়ে সাতটা বাজে এখন।

—বল, বেশী রাত করবে না। ক'টায় ফিরবে?

—আজ সারা রাত কাজ করতে হবে!

—সারা রাত?—বাসন্তী চমকে উঠলো,—তোমাকে আজ কিছুতেই আমি যেতে দেবো না। এই অসুস্থ শরীর নিয়ে সারা রাত? আমার মন বলছে ভাল হবে না, কিছুতেই তোমাকে আজ যেতে দেবো না, বাসন্তী বললো।

পশুপতি বললো,—অবুঝ হয়ো না বাসন্তী, কথা দিয়েছি—আমাকে আজ যেতেই হবে। শরীর যে আমার ভাল যাচ্ছে না এ ঠিক। আজকের রাতই শুধু, তার পর রাতে কাজ করা একেবারেই ছেড়ে দেবো ভাবছি। আজ কথা দিয়েছি, না গেলেই চলবে না।

বাসন্তী আর কিছু বললো না, পশুপতি উঠে দাঁড়ালো।

বাইরে বেরিয়ে পশুপতি একবার উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে, তার পর দ্রুত এগিয়ে চলে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার, কিন্তু তাকে যেতেই হবে। সে করে দেবে কথা দিয়েছে বলেই না হরবিলাস বাবু কাজটা হাতে নিয়েছেন। নইলে, এমন একটা লাভের কাজ জেনেও তিনি এ কাজ হাতে নিতে চাননি। তারি কথায় তবেই না তিনি নিয়েছেন।

আজ দুপুর বেলার কথা। হরবিলাস বাবু আফিস-ঘরে তাকে ডেকে পাঠালেন। আফিস-ঘরে আরো দু'জন ভদ্রলোক বসে। হরবিলাস বাবুর হাতে একটা ব্লকের ডিজাইন। সে গিয়ে বাইরে থেকে শুনলো হরবিলাস বাবু বলছেন,—দেখুন, আপনাদের জরুরী কাজ, টাকা অবশ্য আপনারা দিতে চাচ্ছেন বেশীই। তবু আমি আপনাদের এ কাজ নিতে পারবো না। হাতে আমাদের কাজ অনেক, এ সময়ের ভেতর এটা করে দেওয়া অসম্ভব। আপনারা অন্যত্র বরং চেষ্টা দেখুন। তিন-রঙা ছবি—এতো অল্প সময়ের ভেতর আমরা পারবো না।

অপরিচিত ভদ্রলোক দু'জনের এক জন বললেন,—সে চেষ্টা কি আর আমরা করিনি ভাবছেন? সর্বত্র কাজের চাপ রয়েছে, এ সময়ের ভেতর করে দিতে কেউ রাজি হলেন না। দু'-এক জন আপনার নাম করে বললেন, পারেন তো একমাত্র আপনিই পারবেন, তাই তো এলাম। দেখুন হরবিলাস বাবু, কাজটা করে দিন, যা দেবো বলেছি তারো উপর বরং বিবেচনা করবো। কাজটা আমাদের কাল সকাল বেলা চাই-ই।

হরবিলাস বাবু মাথা নেড়ে বললেন,—আ-হা—আপনারা ঠিক বুঝতে পারছেন না। টাকার কথা তো হচ্ছে না, কথা হচ্ছে সময় মতো কাজ দিতে পারবো কি না! আচ্ছা একটু বসুন, আমি পশুপতিকে ডেকে পাঠিয়েছি, ও কি বলে শুনি। ও হল আমার ডান হাত, তাকে ছাড়া আমার এ ব্যবসা কি করে চলতো মাঝে-মাঝে ভাবি!

পশুপতি আফিস-ঘরে ঢুকলো।

হরবিলাস বাবু হাতের ডিজাইনখানা এগিয়ে ধরলেন তার দিকে, বললেন,—পশুপতি, ওদের ঠেকা কাজ, কাল সকাল আটটায় চান। পারবে এটা সারা রাত জেগে করে দিতে? অতিরিক্ত সময়ের মজুরি অবশ্য তোমাকে তিন গুণ দেবো। ওঁরা টাকা দিচ্ছেন, আমি তোমাকে দেবো না কেন বল? পারলে একমাত্র তুমিই

পারবে। তবে আমি বলি কি, কঠিন কাজ সারা রাত জেগে তোমাকে করতে হবে। সারা দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাতে আবার এতোটা পরিশ্রম সইবে কি? তার চেয়ে ভদ্রলোকদের ফিরিয়েই দিই—কি বল?

পশুপতি বললো,—করে দেবো, রেখে দিন।

হরবিলাস বাবু বললেন,—ভেবে বল, টাকা বেশীই পাবে। কথা দিলে কাজ কিন্তু করে দিতেই হবে, জানো তো আমার যে কথা সেই কাজ। তোমার আবার শরীর ভালো যাচ্ছে না আজ-কাল। তুমি বল তো রাখবো, কিন্তু কাজটা না রাখাই বোধ হয় ভালো।

হাতের ডিজাইন টেবিলের উপর রেখে পশুপতি ভদ্রলোকদের বললে,—আপনাদের ঠেকা কাজ, রেখে যান। কাল আটটায় এসে নিয়ে যাবেন।—ভদ্রলোক দু'জন কৃতজ্ঞ ভাবে তার দিকে চাইলেন কিন্তু তাদের কোন কথা শোনবার অপেক্ষা না রেখে পশুপতি বেরিয়ে গেল।

বলতে গেলে এ কাজটা সেই জোর করে রেখেছে,—পশুপতি ভাবে।

সত্যি ভাগ্যবান লোক ওই হরবিলাস বাবু। লেখাপড়া যে খুব বেশী করেছেন তা নয়। প্রথম বয়সে বড় বিলিতী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি নিলেন, তাঁর কর্মক্ষমতায় সাহেব ম্যানেজার হলেন মুগ্ধ, ধাপের পর ধাপে করলেন উন্নতি। ওরা ব্যবসা করতে জানে, লোক চেনে, লোক খাটাতে পারে। তাঁর বয়স তখন পঁয়ত্রিশ—তাঁকে রোগে ধরলো। সন্দেহ ক্ষয়রোগ—জলের মতো টাকা খরচ করতে লাগলো সাহেব কোম্পানী। হরবিলাস বাবু বায়ু পরিবর্তনে গেলেন, বছর দুই কাটলো এ রকমে। শেষটায় ভালো হয়ে ফিরে এলেন সাহেব ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে,—'সম্পূর্ণ সুস্থ, কঠিন পরিশ্রমের কাজ করলে বিপদ হতে পারে।' সার্টিফিকেটখানা হাতে নিয়ে সাহেব ম্যানেজার কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইলেন, তার পর বললেন,—দুঃখিত হরবিলাস, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তোমাকে আমরা আর কাজে রাখতে পারি না। অবশ্য তোমার যাতে আর্থিক ক্ষতি না হয় সেটুকু আমি দেখবো।

নগদ পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে কোম্পানী তাকে কাজ থেকে অবসর দিলে।

অন্ধকার গলিপথ ধরে দ্রুত এগিয়ে চলে পশুপতি। দূরে দূরে গ্যাসপোষ্টে আলোগুলো জ্বলছে, ঘন অন্ধকারের নীচে সেগুলোকে দেখাচ্ছে ম্লান। আটটার আগে তাকে ষ্টুডিওতে পৌঁছাতে হবে। সে জানে, হরবিলাস বাবু তারি প্রতীক্ষায় আফিসে বসে আছেন, কি ধৈর্য ঐ লোকটির? কোন কিছুতেই ক্লান্তি নেই যেন, সে এতো দিন ধরে দেখে আসছে তাঁকে।

গলিপথ ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লো পশুপতি। সাবধানে দু'দিক চেয়ে সে রাস্তাটা পার হয়ে গিয়ে ওপারে ফুটপাথে উঠলো। এই সামনেই তাদের ষ্টুডিও। চলতে চলতে ভাবতে থাকে পশুপতি।

যুদ্ধের বছর খানেক আগের কথা, আজ থেকে ঠিক দশ বৎসর আগে। এই পুঁজি আর পশুপতিকে নিয়ে কারবারে নামলেন

হরবিলাস বাবু। সব কাজই পশুপতির জানা, দু'জনে আরম্ভ করলেন। সে কি দিনগুলো গিয়েছে তখন! পশুপতি কারবারের প্রথম দিককার কথা ভাবতে চেষ্টা করে। এ যেন তাদের এক বিরাট স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ পেয়ে জেগে উঠেছে। খুশি হয়ে ওঠে পশুপতি, দিনের পর দিনের অক্লান্ত চেষ্টার এ এক সার্থক রূপ,—আজকের এই এতো বড় ষ্টুডিও! হরবিলাস বাবু আজ বড়লোক হয়েছেন সত্যি কিন্তু সেটা হবার যোগ্যতাও তাঁর আছে। ধনী অংশীদার জুটিয়ে কারবার আরো বড় করেছেন, নিজে তিনি মালিক ও ম্যানেজারও। এ কারবারের প্রত্যেকটি দিনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পশুপতি,—তাকে বাদ দিয়ে এ কারবারটা কি হতে পারতো পশুপতি ভাবতে চেষ্টা করে সে কথাটা! আফিস-ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পশুপতি দু'হাতে বুক চেপে ধরে, বহু দিনের ব্যথা যেন সেখানে জমা হয়ে আছে—নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার! কিছু দিন ধরে এ রকম হচ্ছে, এ কিছু নয়—ক্রমে নিশ্বাস সহজ হয়ে আসে। পশুপতি দরজা খুলে আফিস-ঘরে ঢুকে পড়ে—এখনো আটটা বাজতে দু'মিনিট বাকি!

হরবিলাস বাবু অপেক্ষা করছিলেন, আফিসে ঢুকতেই চাবি তাকে সমজিয়ে দিয়ে বললেন,—এবার আসি পশুপতি, প্রুফ তুলে ভালো করে দেখবে, কোন খুঁত যেন না ধরতে পারে ওরা। তোমার চাএর বন্দোবস্ত করে গেলাম, ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা দেবে। আর দারোয়ান রইল, যখন যা দরকার ফরমাস কোরো। হরবিলাস বাবু বেরিয়ে গেলেন।

সারা রাত ধরে কাজ করে চললো পশুপতি, সে কি কঠিন কাজ! ভুল-ত্রুটিগুলো সারলো, ধীরে ধীরে ধৈর্যের সঙ্গে কাজটাকে সে সম্পূর্ণ করে তুললো সারা রাতে। তার পর কাঠের উপর মাউণ্টিং যখন শেষ করলো, প্রভাত হয়ে গেছে তখন!

ব্লকখানা হাতে নিয়ে সে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। বুকটা টনটন করে উঠলো হঠাৎ। হাত কাঁপছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না সে। মাটিতে বসে পশুপতি জোরে বুকটা চেপে ধরলো। ধূসর জগৎটা ধীরে ধীরে চোখের উপর মিলিয়ে যাচ্ছে। পশুপতি অজ্ঞান হয়ে পড়লো ঘরের মেঝেয় লুটে। দারোয়ান সেখানেই ছিল, কি করবে সে,—পরনের কাপড় দিয়ে বাতাস করতে লাগলো। একটু পরেই জ্ঞান ফিরে এলো পশুপতির। দারোয়ানকে বললো,—সব বন্ধ করো, শরীর ভাল নেই, আজ আর কাজে আসবো না। রিক্সা চড়ে পশুপতি বাড়ী চলে গেল।

হরবিলাস বাবু এসে সমস্ত শুনলেন কিন্তু কিছুই বললেন না।

দু'-তিন দিন কাজে এলো না পশুপতি। তার পর আবার আগের মতোই নিয়মিত কাজে আসতে লাগলো। শরীর কিন্তু তার দিন-দিনই খারাপ হচ্ছে।

বাসন্তী এবার আর বাধা মানলো না, বললো—এ শরীরে তোমাকে আর কাজে যেতে দেবো না। তোমার তো পাওনা ছুটি আছে, ছুটি নাও। ডাক্তার দেখাও, ওষুধের ব্যবস্থা কর।

—পাওনা ছুটি তো বছরে মাত্র পনেরো দিন!—পশুপতি উত্তরে বললে।

—তা হোক, তাই বলে শরীর সারাতে হবে না! কারবারের জন্ম তুমি এতো করেছো, তোমার দুর্দিনে ওরা নিশ্চয় চাইবে। ছুটি নাও।

পশুপতি জানে, এ রকম আর বেশী দিন চলবে না। অগত্যা সে ছুটি নেবে ঠিক করলো।

ছুটি হরবিলাস বাবু দিলেন, বললেন,—কাজের এতো চাপ, আর তুমি ছুটি চাইলে পশুপতি! এ ক'দিন যে করে হোক চালাবো, ছুটি শেষ হতেই চলে এসো। জানো তো, তোমাকে না হলে আমার চলে না।

পশুপতি এর চেয়ে বেশীই জানে কিন্তু ছুটি না নিয়ে যে তার উপায় নেই।

ডাক্তার বললেন,—হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, পরিশ্রমের কাজ করতে পারে না। চিকিৎসা চললো। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে আরো এক মাসের ছুটি চাইলো পশুপতি। ডাকে সে দরখাস্ত পাঠালো, ষ্টুডিওতে সে নিজে গেল না। ছুটি তার মঞ্জুর হল বিনা বেতনে।

পশুপতি দরখাস্তখানা হাতে নিয়ে বাসন্তীকে বললো,—ছুটি তো মঞ্জুর হল, ভাবছি খাবো কি?

বাসন্তী কেন কি জানি এমনিতেই হরবিলাস বাবুকে ভালো চোখে দেখতো না, এবার জ্বলে উঠলো,—তাই বলে অসুখ নিয়ে কাজ করতে যাবে না কি? ওদের জন্যেই তো মরতে বসেছ, আর শেষটা ওরা এই করলে? এমন হবে আমি জানতাম! আমি বলছি, দেখে নিয়ো ওদের ভালো হবে না।

পশুপতি হেসে ওঠে—সে তো পরের কথা, এখন বাঁচলে তো তবে দেখবো?

ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে বাসন্তী,—দেখবো গো, দেখবো! না দেখে কিছুতেই মরবো না! দেখে নিয়ো, এই বলে দিলাম।—তার বলে দেওয়ার চেয়ে বড়ো কথা যেন আর কিছুই হতে পারে না।

এদিকে হরবিলাস বাবু এবার ক্ষেপে ওঠেন। পশুপতির জায়গায় এক জনের বদলে দু'জন লোক রেখেও তিনি তেমন কাজ পাচ্ছেন না। টাকা তো অনেক বেশী দিচ্ছেনই, কিছু বলতে গেলেও ওরা আবার ভয় দেখায়—কাজ ছেড়ে চলে যাবে। ওদের রাখতে হয়, ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে তাঁর কি অবস্থা হবে সেটা হরবিলাস বাবু বোঝেন। তাঁর নিজের আর ব্যবসার সুনাম বজায় রাখতে গিয়ে তিনি হাঁফিয়ে ওঠেন। হরবিলাস বাবু যতো বিরক্ত হয়ে ওঠেন ততই তার রাগ আর বিরক্তি পড়ে গিয়ে পশুপতির উপর। জেনে-শুনে আর ইচ্ছা করেই যেন পশুপতি তাঁকে এই বিপদে ফেলেছে—তাঁর উপর এ অন্যায় করেছে। পশুপতির জন্যেই তো তাঁর এ ক্ষতি আর অসুবিধে! পশুপতির বিরুদ্ধে দিন দিন তাঁর মন নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে,—আসুক একবার পশুপতি, তিনি তাকে দেখে নেবেন। আজকার বিশৃঙ্খলার জন্ম একমাত্র পশুপতিই দায়ী—সবই পশুপতির দোষ। হরবিলাস বাবুর মনে পশুপতির বিরুদ্ধে বিরূপ ভাব জেগে ওঠে—জেগে ওঠে এক অকারণ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি তীব্রতায়।

বিশ্রামে আর চিকিৎসায় কিছুটা ভালো হয়ে ওঠে পশুপতি। কাজ না করলে সে খাবে কি?—সুস্থ, কাজের যোগ্য,—ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট যোগাড় করে পশুপতি কাজে যোগ দিতে গেল।

ষ্টুডিওতে পৌঁছেই পশুপতি সমস্ত খবর জেনে নিল, জানতে পারলো সর্বদা সেখানে খিটিমিটি লেগেই আছে। সে না থাকলে এ হবেই তো!

হরবিলাস বাবুর সঙ্গে যখন সে দেখা করতে গেল তখন তিনি এক-মনে কি লিখে যাচ্ছেন। অফিস-ঘরে ঢুকে তার টেবিলের পাশে দাঁড়ালো পশুপতি। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে তিনি আবার কাজে মন দিলেন, বললেন,—পশুপতি যে, কেমন আছো?—হাতের কাজ তাঁর বন্ধ হল না। পশুপতির মনে হল এটা ঠিক হরবিলাস বাবুর মতো নয়, এ যেন আর কেউ তাকে প্রশ্ন করলো।

পশুপতি উত্তর দিল,—ভালো আছি, কাজে যোগ দিতে এলাম। সহজ ভাবে বলতে সে চেষ্টা করলো, ডাক্তারের সার্টিফিকেটখানা রাখলো টেবিলের উপর।

হরবিলাস বাবু এবার হাতের কাজ বন্ধ করে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভালো হয়ে বসলেন। বললেন,—হৃদযন্ত্র দুর্বল, আমার এখানে কঠিন কাজ। যে কোন মুহূর্তে একটা কিছু ঘটে বসতে পারে। তোমার জীবনের দায়িত্ব তো আমার কোম্পানি নিতে পারে না পশুপতি?

—সার্টিফিকেট রয়েছে, এই দেখুন না।—পশুপতির নিজের কানেই নিজের কথাগুলো বিশ্রী শোনালো—কতো দুর্বল!

কঠিন হেসে উত্তর দিলেন হরবিলাস বাবু,—ডাক্তারকে টাকা দিলে এমন সার্টিফিকেট ঢের মেলে। আমার ডাক্তার দিয়ে তোমাকে পরীক্ষা করিয়ে আমি ছুটি দেবো—ছুটি নিতে তোমাকে বাধ্য করবো, বুঝলে?

পশুপতির মনে হল, সে যেন হরবিলাস বাবুকে চিনতে পারছে না। সে বললো,—কাজ না করলে আমি খাবো কি? আর আমি না থাকাতে বিস্তর অসুবিধেও তো হচ্ছে শুনতে পেলাম।

হরবিলাস বাবুর চোখ-মুখ নিষ্ঠুর হাসিতে ভরে উঠলো। তিনি উত্তর দিলেন,—খাবে কি আমি কি জানি? তাই বলে তোমার জীবনের দায়িত্ব তো আর আমার কোম্পানি নিতে পারে না? তোমাকে না হলে কাজ চলবে না ভাবছো, এ ভুল। খুব চলবে। দু'জন লোক রেখেছি, না চলে আরো দু'জন রাখবো।

হরবিলাস বাবু আজ এ কথা বলতে পারেন বটে! একটা উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাস চেপে অগত্যা পশুপতিকে বেরিয়ে যেতে হয়।

এ ঘটনা পশুপতির মনে বিষম বাজলো, তার বুকের ব্যথাটা যেন আবার মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছে,—বাড়ী গিয়ে শয্যা নিলে। তার মনে হল, হরবিলাস বাবুকে সে ঘৃণা করে, এমন ঘৃণা যে সে এক জন মানুষকে করতে পারে এ কথা কোন দিন ধারণায়ও আসেনি পশুপতির! আজ সে প্রথম বুঝতে পারলো সে এক জন সামান্য কর্মচারী মাত্র, সে না থাকলেও কারবারের কিছুই যায়-আসে না। আজ শুধু মাত্র তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে নয়, নিজেও সে নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে,—তাই হরবিলাস বাবু এ কথা বলতে পারলেন? কি শয়তান ওই হরবিলাস বাবুর জাতটা! কি অদ্ভুত কৌশলে ওরা ধীরে ধীরে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত নিঙড়ে নেয়, তার পর ছুঁড়ে ফেলে দেয় রিক্ত-রস ছিবড়েকে অবহেলায় আবর্জনার মতো। উঃ, কি শয়তান!

সব শুনে বাসন্তী বলে,—আমি জানতাম এমন হবে! ভেবো না তুমি, আমাদের যে করেই হোক চলবে গো—চলবে। ওদের ভালো হবে না—কক্ষনো ভালো হবে না—তুমি দেখে নিয়ো, এই বলে দিলাম।—কি যে ওদের হবে বাসন্তী কিছুই বললে না, কিন্তু পশুপতি আর কাজ ওখানে করবে না বলে সে যে বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা অসন্তুষ্ট হয়েছে, তার মুখ দেখে তা মোটেই বোঝা গেল না।

সাত-আট দিন পরে পশুপতি ছুটির জন্য আবার দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলে। দরখাস্তখানা হাতে নিয়ে হরবিলাস বাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন কিন্তু তাঁর এ হাসিটা তাঁর নিজের কানেই কেমন বিশ্রী বেখাপ্পা শোনালো, ঠিক যেন প্রকৃতিস্থ নন তিনি! হরবিলাস বাবু গম্ভীর হয়ে উঠলেন।

এক জন অংশীদার সামনেই বসেছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন তিনি,—হাসলেন যে?

হরবিলাস বাবু বললেন,—ছুটির দরখাস্ত। ছুটি মঞ্জুর হল, তবে একেবারেই ছুটি!

সতী

নিখিল সেন

মেয়ে এদিকে ডাগর হয়ে উঠেচে। পাত্র খুঁজে খুঁজে সবাই হয়রাণ। সুস্থ সবল বাড়ন্ত গড়ন। মেরে-কেটে বড় জোর দু'-চার বছরই কমান যায়। কুলীনের ঘরে এটা অবশ্য খুব নতুন কিছু নয়। তবু অহোরাত্র ভাবনা। ভেবে ভেবেই জানকীজীবন বাবুর রোগা লম্বা মুখখানা হয়ে গেল আমসির মতো চিমসে। চোখ গেল বসে। আর মায়ের নিদ্রা গেল উবে।

সান্যালদের বাড়ি কিন্তু এক দিন সহসা মুখর হয়ে উঠল। খসে-পড়া কার্নিশ আর দেয়ালগুলোতে শুরু হোল চুনকাম। রোঁয়া-ওঠা বিবর্ণ গালিচা আর সতরঞ্চিগুলো বহু খানসামা টেনে টেনে রোদে দিল বিছিয়ে আর পুরানো ঝাড়-লণ্ঠনগুলো রাখল ঝেড়ে-মুছে। দেউড়িতে সানাই উঠল বেজে। তার পর এক দিন সকালে সানাই যখন বিদায়ের করুণ তান ধরেছে, সতী তার মা, দাদা আর বৌদিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাল্কিতে গিয়ে চাপল সাশ্রু-নয়নে।

দীর্ঘ উনিশ বছর পর আজ তার কুমারী-জীবনের অবসান হতে চলল—পাল্কীর দুলকি চালে চলতে চলতে ভাবতে বসল সতী। দীর্ঘ উনিশ বছর পর! কত আশা, কত স্বপ্ন—রঙিন স্বপ্নের কত মিনার সে গড়ে তুলেচে নিজেকে ঘিরে। আজ বুঝি তা সফল হতে চলল।···শান্তির কথা তার মনে পড়ল: মল্লিকদের মেয়ে শান্তি। তার ছেলেবেলাকার বন্ধু। বিয়ের আগে কী নোংরাই না ছিল সে। আলুথালু একরাশ চুল—উকুনে ভর্তি। ঘাড়ে চিমটি কাটলে একগাদা ময়লা বুঝি উঠে আসে নখে করে। কিন্তু বিয়ের পর সেই শান্তিরই না কী পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল! ফিট-ফাট, কায়দা-দুরস্ত,

চোখে-মুখে কী প্রশান্ত ভাব! সোনার কাঠি আর রূপার কাঠিটা কে যেন ছুঁইয়ে গেছে শান্তিকে!···ব্রতিশঙ্করকেও যে সতীর অপছন্দ হয়েছে এমন নয়। ফাইন, সত্যি কী ফাইন দেখতে! বিড়-বিড় করে উঠল সে বুঝি। তবে বড়ো রোগা। আচ্ছা, চোখের কোণ দু'টো অতো কালো কেনো? রাত জেগে খুব পড়তেন বুঝি? তিন-তিনটে পাশ—হবেই তো!···শান্তি বিয়েতে এলে মন্দ হোত না। শাশুড়ী কিন্তু আসতে দিল না। ছেলে হবে শান্তির। আর এক দিনের কথা তার মনে পড়ল। শান্তি তার বিবাহিত জীবনের কামার্ত্ত রাত্রির কাহিনী সব বলছিল গল্প করে। মা গো, বিয়ের পর মানুষ কি অশ্লীলই না হয়ে পড়ে! মুখের অর্গল যায় খসে। শুনতে শুনতে সতী হঠাৎ বলে উঠেছিল: 'মেয়ে তো ইদিকে আহ্লাদে আটখানা, তবু বর যদি এক-আধটা পাশ দিতো। আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি নে।' শান্তি যদি আজ আসতো বিয়েতে।

যা লাজুক বাপু! বৌদিরা অতো ঠাট্টা-তামাসা করলেন, একটাও যদি তার জবাব দিতেন। বাসর-ঘরে সেই যে মুখ গুঁজে বসলেন, একবারটি যদি মুখ তুলতেন। তা লাজুক মানুষ এক হিসেবে কিন্তু ভালো। পেটে তাদের হাড়ে-হাড়ে দুষ্টামি। মুখ একবার ফুটলেই হোল। আর রক্ষে নেই—অতিষ্ঠ করে তুলবে দৌরাত্ম্যপনায়।

পাল্কী এসে ঢুকল ফটকে। শাশুড়ী নেই। জায়েরা এসে বরণ করে তুলল নববধূকে। বড় লোক এঁরা, এ কথা সতী আগেও শুনেছিল। কিন্তু এতো বড়ো লোক, সে জানত না। বাড়ি তো নয় —যেন আরব্যোপন্যাসের সেই এক রাত্রিতে গড়া বিরাট অট্টালিকাটি! কিন্তু বিয়ে-বাড়ি—বিয়ে-বাড়ি বলে বুঝবার জো নেই বাইরে থেকে দেখে। পাড়ারই বুঝি জন কয়েক লোক—ছেলেপিলের দলই সংখ্যায় বেশী—অকারণ কেবল ছুটোছুটি হৈ-হল্লা করে বেড়াচ্ছে। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এসেছেন কেবল বিধবা এক পিসিমা আর এ-গাঁয়ে-বিয়ে-হয়েছে বড় জা'র এক বোন আর তাঁর ছেলেপিলে। সতীর কেমন খটকা লাগল: এ যেন উদ্বাহ-উৎসব নয়—উদ্বন্ধন!

তবু যথারীতি সাজিয়ে-গুছিয়ে ফুলশয্যার রাতে তাকে পাঠান হোল ব্রতিশঙ্করের ঘরে। এবং পাড়াগাঁয়ের চিরাচরিত প্রথা মত কোন কৌতুকপ্রিয়া বৌদিস্থানীয়া দরজার শিকলটা লাগিয়ে দিয়ে হেসে বুঝি পালিয়েও গিয়েছিল। বুঝি বলেও গিয়েছিল: 'দেখলি তো ভাই, কি বেহায়া মেয়ে। এক মুহূর্ত আর তর সইল না।

সতীর বুক টিপ-টিপ করছিল। সশঙ্ক পা দু'টো যেন চলচ্ছক্তি হারিয়ে ফেলেছে। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে ব্রতিশঙ্কর কি যেন পড়ছিল। আলোতে মুখের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে। সতী আড়-চোখে একবার তাকাল: সুঁচাল নাক;. চোয়ালের হাড়টা গালের পাতলা ফরসা চামড়া ঠেলে যেন বেরিয়ে আসছে। যাড়ে খানিকটা মাংস থাকলেই ভালো হোত।

ব্রতিশঙ্কর এবার ঘাড় ফিরালে: 'আমার অশিষ্ট কৌতূহল মাপ করো কিন্তু। আচ্ছা, তোমার পৃথ্বীশদাটি কে বলো তো?'

প্রশ্নের আকস্মিকতায় চমকে উঠেছিল সতী। পৃথ্বীশদা! কী জানি, কী আবার করে বসেছে খেয়ালী লোকটা? আলাপ আছে না কি? সতী বুঝি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল—'কেনো? পৃথ্বীশদাকে চেনো না কি?' কিন্তু ব্রতিশঙ্কর তার আগেই বলে উঠল: 'না। এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। ভদ্রলোকের কিন্তু রুচি-বোধ আছে। উপহারের বইগুলো দেখে ভাবছিলাম, হয়তো দেবসাহিত্য-মন্দিরের একগাদা ট্র্যাস নভেল দেখে নিরাশ হবো। এ যে দেখছি, রবীন্দ্রনাথের হোল্ সেট রচনাবলী!'

ফুলশয্যার রাতে নববিবাহিত স্বামি-স্ত্রীর প্রথম আলাপের এই বুঝি নমুনা! হাসি পেল সতীর! বলল: 'তোমার বুঝি খুব ভালো লাগে রবি ঠাকুরের কবিতা?'

'ভালো তো অনেক কিছুই লাগে সতী!' ব্রতিশঙ্করের কণ্ঠ শেষের দিকে নিষ্প্রভ, নিঃস্ব, সকরুণ হয়ে এল। ব্রতিশঙ্করের মুখে নিজের নাম প্রথম উচ্চারিত হতে শুনে সতী সহসা সচকিত হয়ে মুখ তুলে তাকাল। কিন্তু চার চোখের মিলন হতেই ব্রতিশঙ্কর অমনি নিজের চোখ দু'টি নামিয়ে নিল। বলল: 'ইউনিভার্সিটির দৌলতেই খালি গুটিকয়েক কবিতার স্বাদ পেয়েচি রবীন্দ্রনাথের। 'চোখের বালি' যেনো এক দিন পড়ছিলাম, বইখানা দাদা কেড়ে নিলেন। বললেন, নাটক-নভেল পড়বার আমার না কি এখনো সময় হয়নি। সময় যে কখন হবে—এ জীবনে তা আদৌ হবে কি না জানি না সতী!'

চেয়ারের পিছনে মাথাটা এলিয়ে দিল ব্রতিশঙ্কর। জোরে জোরে সে নিশ্বাস ফেলতে লাগল। আর খুক্-খুক্ করে মাঝে মাঝে শুষ্ক কঠিন কাশি। সতীর কেমন যেন মায়া হোল। সসংকোচে জিজ্ঞেস করল: 'ঠাণ্ডা লেগেছিল বুঝি?'

'কার?' ব্রতিশঙ্কর সোজা হয়ে বসল।—'ওঃ, আমার কথা বলছো? না, ও কিছু না। তোমার কি ঘুম পাচ্ছে? শোবে? রাতও তো কম হোল না। আমার কিন্তু আজ এত ভালো লাগছে, সতী!'

মেঝের সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হোল সতীর। বলল: 'না না, ঘুম পায়নি। আমারও খুব ভালো লাগছে। জানলাটা খুলে দেবো?'

ব্রতিশঙ্কর সহসা হাঁ-হাঁ করে উঠল। সতী ভেবে পেল না, কি অন্যায় কাজ সে করে বসেছে। বৈশাখ মাস। অসহ্য গুমোট ঘরের মধ্যে। জানলাটা খুলে দিলে তবু খানিকটা হাওয়া আসত। বিস্মিত চোখ তুলে সে ব্রতিশঙ্করের পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকাল।

ব্রতিশঙ্কর তখনও কাশছিল খুক-খুক করে। হাঁফ নিয়ে বলল: 'হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগেছিল কি না, বাপ্! বিয়ে-বাড়ির যা অনিয়ম! উত্তুরে হাওয়াটা, বুঝলে?···' ব্রতিশঙ্কর সাফাই গাইবার চেষ্টা করলে।—'চেয়ারটা নিয়ে পাশে এসে একটু বসবে সতী?' ব্রতিশঙ্কর এবার সাহসে বুক বেঁধে সতীর মুখের দিকে তাকাল। 'ইস্, তুমি অমন সুন্দর! আমি যে আগে ভালো করে তাকাইনি সতী! বাঁ দিকের ভুরুর ঠিক ওপরটায় পড়ে গিয়ে বুঝি কেটে ফেলেছিলে?'

সতী সলজ্জ মাথা নাড়লে:—'হ্যাঁ!'

ব্রতিশঙ্কর এবার দু'হাতে সতীর এলো-খোঁপাটা ভেঙে দিল। এক রাশ দীর্ঘ চুল চূর্ণ হয়ে লতিয়ে পড়ল তার সারা পিঠে, মুখে।

'জানো সতী, তোমার আগে আমার একটাও কিন্তু বান্ধবী ছিল না। আর মাকে যে কখন হারিয়েছি, তা আজ মনেও পড়ে না। কোন দিন তো কারো কাছে একটু মিষ্টি কথা, এতটুকু ভালোবাসা পেলাম না···।'

ব্রতিশঙ্কর আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল। সতী সহসা ব্রতিশঙ্করের মাথাটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরল। ব্রতিশঙ্করের লম্বা ঘন চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে মনটা তার গলে গেল সমবেদনায়। কেমন এক বাৎসল্য-রসে ভিজে উঠল মনটা। স্পন্দমান সতীর সুকোমল বুকের উপর মাথা রেখে ব্রতিশঙ্কর কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে পড়ে রইল। তার পর সহসা বলে উঠল: 'না সতী, তোমার কাছে আমি কিছুতেই লুকোতে পারবো না। আমার যে টি-বি হয়েছে।'

'টি-বি!' সতী যেন দূরে ছিটকে পড়ল। 'টি-বি হয়েছে, তা কাউকে বলোনি?'

ব্রতিশঙ্কর বিজ্ঞের মতো হাসল: 'তুমি ছাড়া তা আর সবাই জানে সতী! আর জানে বলেই তো তোমার এ-বাড়িতে আসা সম্ভব হোল।'

সম্ভব হোল? টি-বি? সতী ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ব্রতিশঙ্কর আপন মনে বলে চলল: 'আমিও প্রথমে আপত্তি তুলেছিলাম। কিন্তু দেখলাম, আপত্তি করা মানে নিজেরই ক্ষতি করা। বাড়ির কেউ তো আমার ত্রিসীমাটাও মাড়ায় না। দেখাশুনারও তো এক-আধটা লোক দরকার। কোন ফিরিঙ্গী নার্স রাখলে অবশ্য সব ঝঞ্ঝাটই চুকে যায়। কিন্তু তাতে তো এক কাঁড়ি টাকা দরকার। এ-বাড়ির টাকার পাহাড়ে পুরু হয়ে শ্যাওলা জমতে পারে, কিন্তু—।' ব্রতিশঙ্কর দম নিল। জিভ দিয়ে শুষ্ক, শীর্ণ ঠোঁট দু'টো একবার চেটে নিয়ে আবার সুরু করলে: 'শুধু তা নয় সতী! লোকেও তো ছি-ছি করবে। বলবে—আহা, মা-মরা ছেলেটা রোগে ভুগে-ভুগে অমন করে মরল, কেউ একবার চোখ তুলে তাকালও না। পর তো নয়? বাড়ির সুনাম কি না, বুঝলে না?'

'এখন আছো কার ট্রিট্‌মেণ্ট-এ?' নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক গলায় শুধাল সতী।

'আর ট্রিট্‌মেণ্ট!' হতাশ, নিষ্প্রভ কণ্ঠে জবাব দিল ব্রতিশঙ্কর: 'দু'টো লাংস্‌ই সমান এফেক্‌টেড্‌। গিরিজা কোবরেজের পচা পাঁচন গিল্‌ছি বসে বসে।' ব্রতিশঙ্কর উঠে দুর্বল মন্থর পদে ঘরের মধ্যে একবার পায়চারী করে এল। এক সময় বলল: 'অসুখের কথা মাঝে মাঝে যখন ভাবতে বসি সতী, আমার এতো কান্না পায়। বিশ্বাস হয় না এরি মধ্যে—এই তো এ বৈশেখে সবে মাত্র পা দিলাম সাতাশ বছরে—এরি মধ্যে আমি কি না যাবো ফুরিয়ে। আচ্ছা সতী, আমি কি আর বাঁচব না?'

সতী আর থাকতে পারল না। এগিয়ে এসে বলল: 'বাঁচবে বই কি। টি-বি তো কত লোকেরই হয়ে থাকে। তারা কী আর বাঁচে না? তোমাকে আমি স্যানিটোরিয়ামে নিয়ে যাবো। তুমি সেখানে সেরে উঠবে।'

ব্রতিশঙ্কর কি যেন বলতে যাচ্ছিল বিড়-বিড় করে। কিন্তু বলতে পারল না। শুধু সতীর ডান হাতখানি নিজের দু'মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরল

সতী পরদিনই বড় জা'র কাছে গিয়ে বলল: 'দিদি, ওঁর তো অসুখ, ভাসুর ঠাকুরকে বলে কোথাও ওঁকে চেঞ্জে পাঠালে হয় না?'

বড় জা নীচু হয়ে সচরাচর অব্যবহৃত বাসন-কোসনগুলো কাঠের সিন্দুকের মধ্যে তুলে রাখছিলেন। মুখ তুলে বললেন: 'কি বলছিলে ভাই নতুন বৌ?'

'ওঁকে কোথাও চেঞ্জে পাঠানোর কথা বলছিলাম, দিদি!'

বড় জা এবার সতীর উক্তির সম্যক্‌ অর্থ উপলব্ধি করলেন। পিসিমাকে ডেকে বললেন: 'অ পিসিমা, পিসিমা, শুনছো তোমাদের নতুন বৌ-এর কথা? বাবুকে নিয়ে উনি এখন হাওয়া খেতে যেতে চান, তোমরা তার একটা ব্যবস্থা করে দাও না কেনো? তা ভাই…' বড় জা সতীর দিকে এবার মুখ ফেরালেন: 'তা ভাই, আমাকে কেনো এ সব বলতে আসা? পরের বাড়ির মেয়ে, গতর দিয়ে খাটি, তাই চারটে খেতে পাই বই তো নয়? অতো যদি সখই চেপে থাকে, তোমার বাপের বাড়ি থেকে টাকার ব্যবস্থাটা তো করলে পারতে ভাই?'

সতী এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। এ-বাড়িতে সে পা দিয়েছে এখনো ত্রিযাম পূর্ণ হয়নি। কিন্তু এরি মধ্যেই এ-বাড়ির নগ্ন রূপ তার চোখের উপর ফুটে উঠেছে। নীচের ঠোঁটটাকে যত দূর সম্ভব সংযত করে জবাব দিল: 'অসুখটা তো আমার বাপের বাড়ির কারো নয় যে, টাকার ব্যবস্থাটা তাঁরাই করবেন, দিদি?'

সেখানে দাঁড়িয়ে কোন কথা কইতে আর সতীর মন সরল না। সোজা সে শ্বশুরের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঘোমটাটা কপালের উপর আরও খানিকটা টেনে দিয়ে দ্বিধা-সংকুচিত গলায় বলল: 'বাবা, ওঁর তো খুব কঠিন অসুখ, কোন স্যানিটোরিয়ামে…'

বৃদ্ধ খাতা থেকে মুখ তুললেন: 'কার কথা বলছো মা?'

সতী কি জবাব দেয়? মাথাটা তার ঝুলে পড়ল বুকের উপর। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিল তার কপালে। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা সে কেবল ঘষতে লাগল চৌকাঠের উপর।

'ও: বুঝেছি। ব্রতি তোমাকে কিছু বলেছে বুঝি?' বৃদ্ধ হাতের কলমটা কলমদানীর উপর রাখলেন—'তা অসুখটা একটু কঠিনই বটে। গিরিজাও বলছিল সেদিন। আমি অতো করে বলি, জলপাইগুড়ি যাস নে বাপু, এখানেই থাক—আমার এখানেও তো এক জন লোক দরকার। তা কি শুনবে আজকালকার ছেলে-ছোকরারা? যেন চা-বাগানে না গেলেই নয়।' বৃদ্ধ নববধূর বেহায়াপনায় মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। নত-মুখে তখনও সতীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন: 'তা ব্রতি আজ-কাল ওষুধপত্র কিছু খাচ্ছে না না কি বৌমা?'

'কি জানি বাবা, খান বোধ হয়।' আমি বলছিলাম, কোন স্যানিটোরিয়ামে পাঠালে…'

'হ্যাঁ, স্যানিটোরিয়াম!' বৃদ্ধ হা-হা করে হাসিতে ফেটে পড়লেন। —তুমি ক্ষেপেছো বৌমা? ও-সব হালফ্যাসানী এলাহি কাণ্ড-কারখানা আমাদের সাজে না। কেন গিরিজা কি আজ-কাল ওকে নিয়মিত দেখা-শুনা করে না বুঝি?' বৃদ্ধ শুধালেন সতীকে।

সতী দাঁড়িয়ে রইল। কোন উত্তর দিল না।

শ্বশুর মশাই সান্ত্বনার সুরে বলে উঠলেন: 'তুমি কিছু ভেবো না মা। ব্রতি ঠিক সেরে উঠবে। গিরিজার হাতযশ আছে।' বৃদ্ধ এবার গলাটা খাদে নামালেন—'বুঝলে মা, ওষুধ-বিষুধ তো কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র, তাতে কি আর কারো রোগ সারে? ব্রতি, দেখবে, আরোগ্য হয়ে উঠবে তোমার বরাতের জোরে। তোমাদের

রাজযোটক : কোষ্ঠী-গণনা কি কখন মিথ্যে হতে পারে ?' তিনি মুখ তুলতেই দেখলেন, সতী কখন বেরিয়ে গেছে অলক্ষ্যে।

সতী এবার কোমর বেঁধে লেগে গেল আপন বরাতটাকে যাচাই করে দেখতে। ভিষকৃরাজকে সে এক দিন বিদায় করে দিল অপমান করে। রোগীর পথ্য ব্যবস্থাপনা থেকে সুরু করে পরিচর্যা ইত্যাদি সব কিছু ভারই নিল সে আপন হাতে। প্রথম প্রথম রোগীরও কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। শীর্ণ পাণ্ডুর গণ্ডে রক্তাক্ত আভা ফুটে উঠল ব্রতিশঙ্করের। হাতের আঙুলের ডগায় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গিয়ে জমল। • এদিকে সতীর প্রশংসা আর ধরে না। সারা বাড়ি মুখর হয়ে উঠল তার গুণকীর্তনে।

এ ভাবে মাস আষ্টেক ধরে চলল ক্রমাগত ব্রতিশঙ্করের মধ্যে প্রাণবায়ুর ক্ষীণতম শিখাটি উজ্জীবিত করে রাখবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। সলতেটা বার বার উস্কিয়ে দিয়েও আর গেল না জ্বালিয়ে রাখা। ব্রতিশঙ্কর মারা গেল।

ব্রতিশঙ্করের মৃত্যুর সময় সতী কাছে ছিল না। শেষ রাত্রির দিকে নাভিশ্বাস উঠতেই সে অন্য ঘরে চলে গিয়েছিল। দীর্ঘ মাসের পর মাস ধরে ক্রমিক রাত্রি জাগরণ, শারীরিক ও মানসিক দুশ্চিন্তার ও অনিয়মের ঝড় গিয়েছে তার উপর দিয়ে। সতী ভেঙে পড়েছিল একেবারে। পাশের ঘরের জানলার উপর মাথা রেখে সতী দাঁড়িয়েছিল স্থাণুর মত। সতীর এই স্তব্ধ সমাহিত ভাব ভাঙল অন্নার মা এসে।

'হ্যাঁ গা তুমি এখনো ঠায় দাঁড়িয়ে আছো এখানে ? ওদিকে যে তোমার কপাল পুড়ে গেল গো !

বাড়িতে তখন কান্নার রোল উঠেছে।

অন্নার মা-ই ঘা মেরে মেরে সতীর হাতের শাঁখা জোড়াটা ভাঙল শশ্মানঘাটে। নদী থেকে খানিকটা মাটি তুলে নিয়ে এসে ঘষতে ঘষতে তার সীঁথির সিঁদূরের দাগটি দিল মুছে। পিঠের উপর এলিয়ে-পড়া আলুথালু দীর্ঘ চুলের গোছাটায় হাত দিতেই সতী সহসা রুখে দাঁড়াল। কঠিন গলায় বলল : 'না।'

অন্নার মা পুরোন লোক। চোখ দু'টি তার ছল-ছল করে উঠল : 'হায় রে কপাল, কালোবরণ অমন চুল, তা মুড়িয়ে কাটতে আমার কি হাত যায় বৌমা ? কিন্তু সোয়ামীর সঙ্গে সঙ্গেই কপালটাও যখন পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তখন ও-আপদের মায়া বাড়িয়ে লাভ কী বলো তো ?'

'খবরদার, চুলে আমার হাত দিস্ নে।' সতী থান কাপড়খানা হাতে তুলে নিলে।

কথাটা একটু জোরেই বুঝি মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। নিজের কাছেও তার কেমন যেন কড়া ঠেকল। বৃদ্ধ শ্বশুর মশাই শুনতে পেয়ে ছুটে এলেন : 'না বৌমা, আমাদের মুখুজ্জে-বাড়ির চিরাচরিত যে রীতি চলে আসছে তার ব্যতিক্রম এক চুলও হতে পারে না।' নিদারুণ আঘাতে বৃদ্ধও কম অভিভূত হয়ে পড়েননি। গলাটা তাঁর ধরে এল : 'হতভাগাটা যখন আমাদের ছেড়ে-ছুড়েই চলে যেতে পারল, আমাদেরও যে তখন কঠিন হতে হবে মা !'

সতী একবার শ্বশুর মশাইএর দিকে তাকালে। এক মুহূর্ত সে কি যেন ভাবলে। হাত দু'খানা তার বার কয়েক কেঁপে উঠল। কাঁচিখানা তার পর তুলে নিল স্বহস্তে।

মুখুজ্যে-বাড়ি শোকে মুহ্যমান হয়ে রইল দিন কয়েক। তার পর এক দিন আবার মুখর হয়ে উঠল। লোকজনের অবিরাম ছুটাছুটি, হাঁকাহাঁকি, কাঙালি-বিদায় আর দান-দক্ষিণার এত সমারোহ পড়ে গেল যে, এটা মৃত্যু-বাসর না বিবাহ-বাসর বলে না দিলে চিনবার কোন উপায় নেই। আর এর এক-তৃতীয়াংশের অর্দ্ধেকও যদি সেদিন ব্যয় করা হত—সতী আপন-মনে আন্দাজ করলে—তবে বুঝি আজ ব্রতিশঙ্কর সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারত তার শ্রাদ্ধ-বাসরে।

শ্রাদ্ধকর্ম চুকে গেল। এ বাড়ির ধমনীতে আবার ফিরে এল পূর্বের রক্ত-ধারা। কিন্তু দু'টি লোক আর তাদের পূর্বের স্বাভাবিকতা ফিরে পেল না। বৃদ্ধ শ্বশুর মশাই আর তাল সামলে উঠতে পারলেন না। একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। আর সতী—সতী একটু কাঁদতে পারলেই যেন নিষ্কৃতি পেত। মনের গুমোট সব কেটে যেত।

দিন গড়িয়ে চলে ধীর-মন্থরপদে।···

মুখুজ্যে-বাড়িতে আবার সাড়া পড়ে যায়। অন্নার মা পিতলের ভারী ভারী ডেক আর লোহার কড়াইগুলো বুঝি নিয়ে যাচ্ছিল কলতলায়। সতী তাকে ডকল : 'ওগুলো বুঝি মাজতে নিয়ে যাচ্ছিস্ ? ছাদেও দেখছি দরমার ছাউনি বাঁধা হচ্ছে। হ্যাঁ রে, কী ব্যাপার বল্ তো ?'

অন্নার মা যেন আকাশ থেকে পড়ল : 'ওমা, জানো না বুঝি, আমাদের ছোট দাদামণির বিয়ে যে গো।'

'কে পরিমল ঠাকুর পো'র ?'

'হ্যাঁ গো। বিয়ে আমাদের নন্দা দিদিমণির সাথে গো।'

বড়জা'র বোনঝি নন্দা, তার সাথে বিয়ে পরিমলের। সতী এ-বাড়ীর বৌ হয়ে কি না এ খবরটুকু পর্যন্ত রাখে না। কি লজ্জার কথা। আর পরিমল তো পর নয়—তারই খুড়শ্বশুর মশাইএর ছেলে। এ বাড়িরই এক জন। পূজা-আহ্নিক, ধ্যান-ধারণা নিয়ে নিজেকে কি এতো নির্লিপ্ত, নিঃসঙ্গ করে রাখতে হয় ? এতো আত্মকেন্দ্রিক ? সত্যি, কি লজ্জার কথা।

'তাই বল, আমি ভাবছিলাম কি না কি ?' সতী গিয়ে ঢুকল আপন ঠাকুর-ঘরে।···

বিয়ে-বাড়ি। শত কর্ম-কোলাহল। লোক-লৌকিকতা, আদর-আপ্যায়ন না করে উপায় নেই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ কয় দিন তার দৈনন্দিন রুটিনের ব্যতিক্রম করতে হল। বৌ-ভাতের দিন পূজা-আহ্নিক সেরে সে যখন ফিরছিল আপন ঘরে, রাত তখন অনেক। ক্লান্ত-অবসন্ন সারা বাড়িটা তখন নিঝুম হয়ে পড়েছে। নীচের রান্না-ঘরে কেবল আলো জ্বলছে। চাকর-বাকরদের ছিন্ন কথা-বার্তা আর বাসন-কোসনের টুং-টাং শব্দ কেবল ভেসে আসছে। সিঁড়ির কাছে এসে সতী হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। পাশের রুদ্ধ-ঘর থেকে চাপা অস্ফুট কয়েক টুকরো কথা ছিটকে এল তার কানে।

'ইস্, আর বলো না মশাই, আমি যেন জানি নে!' তার পর মৃদু অস্ফুট এক গুঞ্জন। তার পর কাচের গ্লাস ভেঙে পড়ার মত এক ঝলক হাসি এবং সঙ্গে সঙ্গে মিহি চিকন গলায়—'যাও, সুড়সুড়ি দিয়ো না বলছি।'

এবার শুনা গেল পুরুষের অপেক্ষাকৃত মোটা, গম্ভীর গলা:—'আর বলবে—'লেডি-কিলার' আর বলবে?'

তার পর পাড়াগাঁয়ে সাপে ব্যেঙ-গেলার সময়কার মত একটানা দীর্ঘ শব্দ।

সতীর কান দু'টি সজাগ, উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। সিঁড়ি ছেড়ে সে যে কখন বারান্দায় এসে জানলা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল, খেয়াল ছিল না সতীর। হঠাৎ তার চোখে-মুখে এক ঝলক তীব্র আলো এসে পড়ল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই এক পুরুষ-কণ্ঠ শোনা গেল: 'কে?'

সতী বুঝি সংবিৎ ফিরে পেল। পর-মুহূর্তেই সে ঝুঁকে পড়ল নীচু হয়ে। বলল—'চাবির তোড়াটা ভাই কোথাও যেন হারিয়ে ফেলেছি। খুঁজে দেখছিলাম।'

সতী আর এক মুহূর্ত দাঁড়াতে পারল না সেখানে। উর্দ্ধশ্বাসে সে পালিয়ে এল। পিছন হতে শুনল—'হ্যাঁ গা, ছোড়দি না? মা গো, কি ঘেন্নার কথা! আড়ি পেতে সব শুনছিল?'

সতী নিজের ঘরে এসে কপাট দিল। আলোটা জ্বাললে সে হাত বাড়িয়ে। বুকের ভিতর তার তখনও ঢেঁকির পাড় দিচ্ছে। স্থির হয়ে সে এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলে। তার পর ভীরু, দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে এসে দু'হাতে সে আঁকড়ে ধরলে ব্রতিশঙ্করের ব্রোমাইড ফটোগ্রাফখানা। ফটোখানা সে বুকে চেপে ধরে নিস্পন্দ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। হঠাৎ কী মনে করে ফটোখানা সে ছুড়ে দিলে কঠিন মেঝের উপর। কাচখানা তার ভেঙে চুরমার হয়ে গেল আর আলেখ্যটা গেল থেবড়ে। সতী গিয়ে দাঁড়াল তার ড্রেসিং টেবিলের সামনে। কোথাও যেন প্রবল ঝড় উঠেচে—নটরাজের রুদ্র তাণ্ডব যেন শুরু হয়ে গেছে। দু'হাতে সে চেপে ধরল বুকটাকে। তার পর এক সময় এক টানে খুলে ফেলল তার বডিশটাকে। আয়নার স্থির প্রতিবিম্বটির দিকে তাকিয়ে সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল সতী।—'ইস্, তুমি অমন সুন্দর! আমি যে আগে ভালো করে তাকাইনি সতী?' সে যেন সহসা কার কথারই পুনরাবৃত্তি করলে।—"ইস্, তুমি অমন সুন্দর?" সে তাড়াতাড়ি তার পীনোন্নত পরিপূর্ণ স্তন দু'টিকে দু'হাতে ঢাকবার চেষ্টা করলে। মুঠোর মধ্যে নিয়ে আদর করলে তাদের। ঈষৎ পিঙ্গল বোঁটা দু'টির উপর ডান হাতের তর্জনিটা বার কয়েক বুলালে চক্রাকারে। সত্যি, সে এত সুন্দর!

অস্থির-পদে সতী গিয়ে দাঁড়াল জানলার কাছে। নীচের নির্দিষ্ট সেই ঘর থেকে তখনো ভেসে আসচে পাড়াগাঁয়ের সন্ধ্যে বেলায় সাপে ব্যেঙ-গেলার সময়কার মত একটানা সেই দীর্ঘ চিকন শব্দ আর ফিস্-ফিস্ করে কানে-কানে কথা কওয়া!

বিয়ে হয়েছে এখনও তার বছর পূরোয়নি। এরি মধ্যে কি না তার গেল সব ফুরিয়ে! নিতে হল তাকে নিরাসক্ত ব্রতচারিণীর বেশ। জীবনটা তিতো কি মিঠা সে তো কোন দিন চোখেও দেখল না। পরখ করবার পূর্বেই তিতো বলে সরিয়ে রাখতে হোল দূরে। গৌতম মুনিও কি করেননি?—সতী শুধাল নিজেকে।—হ্যাঁ, করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে আস্বাদনও পূরো মাত্রায় করে গেছেন জীবনের মিঠে ভাগটা। রাজার দুলাল—রাজৈশ্বর্য, পরমাসুন্দরী পত্নীর সুকোমল দেহসম্ভোগ আর রাজকুমারের মুখ-দর্শনের পর মনে তাঁর এসেছিল বৈরাগ্য। আর তার?—সতী শুধালে নিজেকে।—আর তার? তার কেন এই যোগিনীর বেশ? কেন এই কৃচ্ছ্র-সাধনা? আত্ম-প্রবঞ্চনা? এই মহর্ষি-মনোবৃত্তি? শুষ্ক নিষ্প্রাণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলো কতটুকু সান্ত্বনা দিল তাকে? যোগবাশিষ্ঠ তাকে কি শিখাল? এই-ই নিয়ম? এমন ধারায় চলে আসছে চিরন্তন পৃথিবী। তোমার বৈধব্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাকে। কেন এই সংস্কার? প্রতিকার কোথায় এর?…

সত্যি, নিজেকে সে ফাঁকি দিয়ে এসেছে আগাগোড়া। চোখ ঠেরে এসেছে মনকে। সতী শেলফ্-এর কাছে এগিয়ে গেল। তার পর শেলফ্ থেকে এক-একখানা করে ওই গ্রন্থগুলো টেনে নিয়ে পাঁতি পাঁতি করে ছিঁড়ে স্তূপাকার করে তুলতে লাগল মেঝের উপর।

শ্বশুর মশাইয়ের ডাকাডাকিতে সতী উঠে বসল ধড়ফড় করে। দেয়ালের গায়ে তখন রোদ এসে পড়েছে। অসংবৃত বসনখানা যত দূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ঠিক করে নিয়ে বেরিয়ে এল সে।

শ্বশুর মশাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন: 'তোমার কি কোন অসুখ করেছে, মা? চোখ দু'টো অমন ফুলে উঠেছে, কী হয়েছে বলো তো?'

শ্বশুর মশাইএর উৎকণ্ঠিত দৃষ্টির নীচে সতীর মাথাটা আজ নত হয়ে রইল লজ্জায়।

'লজ্জা কি মা, অসুখ-বিসুখ তো সব মানুষেরই হয়। আর এ কয় দিন কি কম খাটুনি গেছে? দাঁড়াও, গিরিজাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।'

শ্বশুর মশাই গিরিজা কোবরেজকে ডেকে পাঠালেন। কোবরেজ মশাই এসে সতীর নাড়ি টিপলেন। জিভ দেখলেন। তার পর নিকেলের চশমাটা কপালের উপর তুলে বার কয়েক মাথা নাড়লেন। বললেন: 'হুঁ, মাথা-ধরা আর কোমরে ব্যথা, না? আচ্ছা, ঠিক করে কও তো দেখি মা—বুড়া ছেইলার কাছে আবার লজ্জা করো না—তোমার নিয়মিত মাসিক হয়?'

মাসিক! সতী জিভ কাটলে মা কালীর মত। মাসিক! ছি ছি! কী ঘেন্নার কথা। উত্তর দেবে কী, সতী রাঙা হয়ে উঠল সরমে। শ্বশুর মশাইও এদিকে তামাকের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এবং 'ওরে কে আছিস, কোবরেজ মশাইকে তামাক দিয়ে যা'—বলে তিনি প্রস্থান করলেন সে স্থান হতে।

'হুঁ, বুঝেছি। তা তুমি যাও মা, অনুপান সহ ওষুধ পাঠাই দিমু। অ মুখুজ্যে মশয়, এদিকে আসেন—তামুক পরে খাব'খন।'

সতী পালিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে সে তার ঘরে ঢুকে পড়ছিল, একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল পরিমলের। পরিমল পথ ছেড়ে দাঁড়াল। ঠোঁটে তার বাঁকা হাসি।

'এ কি বৌদি, ছুটছো কেন? তা চাবির তোড়াটা তোমার খুঁজে পেলে তো?'

সতী আঘাতটা ফিরিয়ে দিল। তীব্র জ্বালাময় দৃষ্টি হেনে বলল: 'এক বার যা হারিয়ে যায় তা কি আর অতো সহজে মেলে ভাই? খুঁজতে হয় না?'

হন-হন করে পাশ কেটে সতী তার ঘরে গিয়ে ঢুকল। পরিমল তাকিয়ে রইল মুখ তুলে। সত্যি, গত রাত্রির অপ্রত্যাশিত আচরণের জন্য ঠাট্টা করেই সে প্রসঙ্গটা তুলেছিল। কিন্তু বৌদি যেন ইচ্ছে করেই হুলটা বিঁধিয়ে দিয়ে গেল গায়ে। তারও রোখ চাপল। পিছু-পিছু সেও উঠে এল ওপরে।

কিন্তু চৌকাঠের উপর পা দিয়েই চোখ দু'টি তার উঠে এল কপালে। সতী তখনও অচলায়তন পাষাণ-প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে পিছন ফিরে।

'সত্যি, কি কাণ্ড বলো তো বৌদি, কাল রাতে তোমার ঘরে কি চোর ঢুকেছিল? জিনিষ-পত্তোর সব ছত্রখান—তছনছ দেখছি, কী ব্যাপার?'

'হ্যাঁ ভাই, চোর ঢুকেছিল। কাল আমি যখন তোমার ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাবি খুঁজছিলাম, চোর ঢুকে এদিকে আমার সর্বস্ব নিয়ে গেল।'

'তাই না কি? কিন্তু ভাই, চোরের সাহসখানা দেখে বলিহারি যাই। অতোগুলো দুর্গ-প্রাচীর টপকে কি না খোদ তপস্বিনীর অন্দর মহলে ঢোকা চুরির মতলবে। এ কি যে-সে কথা?'

সতীর ঠোঁট দু'টি কেঁপে উঠল থর-থর করে। কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে প্রত্যুত্তরে। কিন্তু বলতে পারল না। বাঁধ-ভাঙা দামোদরের বন্যার মত সহসা সে ভেঙে পড়ল কান্নার তোড়ে। মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আহত শকুনির মত। হতভম্ব হয়ে গেল পরিমল। সামান্য ঠাট্টাটা যে এমন ভাবে গড়িয়ে যাবে এত দূর, সে কল্পনা করেনি। বুঝে উঠতে পারল না, চাপা গম্ভীর নির্ধূম বহ্নি এ রমণীর অন্তরের কোন্ নিভৃত কন্দরে সে আঘাত করে বসেছে আপনার অজ্ঞাতসারে। ঝুঁকে পড়ে সে সতীকে দু'হাতে বসাবার চেষ্টা করল। ক্ষুণ্ণ আহত স্বরে বলল:—'ছিঃ, কাঁদে না। ঠাট্টা বোঝ না? আমি যে তোমাকে ঠাট্টা করছিলাম বৌদি!'

'না, না, ঠাট্টা নয় ভাই, ঠাট্টা নয়। সত্যি চোর ঢুকে যে সর্বস্ব আমার নিয়ে গেছে।'

সতী মেঝে আঁকড়ে পড়ে রইল।—'না, না, তুমি যাও, এ ঘর থেকে যাও। নতুন বিয়ে করেছো, কেউ হয়ত দেখে ফেলবে, তোমায় মন্দ বলবে।'

এর পর আরও অনেক দিনের এক দিন।

সতী পর্দার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। কান খাড়া করে শুনল: নীচে মেয়েদের খাওয়া বুঝি এখনো শেষ হয়নি। বড়জা'র বাজখাঁই গলা শোনা যাচ্ছে। মুড়িঘণ্টের জন্য তিনি সপ্রশংস তারিফ করছেন বামুন ঠাকরুণকে। সতী তবু কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত: করলে। বুকের ভিতর তার ঢিপ-ঢিপ করছে এখনো। হাত বাড়িয়ে সে সুইচ টিপলে। পিছনে তাকালে একবার। খাটের উপরে শোয়া লোকটা এরি মধ্যে নাক ডাকাতে সুরু করেছে। সতী একবার মুচকি হাসলে। তার পর সতর্ক পা ফেলে ঘর থেকে বেরুতে গিয়েই পর্দার ওপাশে হঠাৎ কার সঙ্গে সে ধাক্কা খেল আর উঠল চমকে। গলা তার শুকিয়ে গেল। পাশ কেটে সে পালিয়ে আসছিল। নন্দা তার আঁচলটা চেপে ধরল।

'বলো, আমার ঘরে তুমি কি করতে ঢুকেছিলে?'

নন্দা সতীকে হিড়-হিড় করে বড়জা'র কাছে টেনে নিয়ে গেল। বড়জা'র কাছে গিয়ে নন্দা কান্নায় ফেটে পড়ল। চাকর বাকর

সবাই ছুটে এল। রোরুদ্যমান নন্দার মুখ থেকে যেটুকু শোনা গেল, তাতেই সবাই থ' বনে গেল। ও মা, রাঁড়ী মাগীর পেটে-পেটে অতোখানি! এদিকে তো সন্ধ্যে-আহ্নিক জপ-তপের ঠ্যালায় টেঁকা দায় বাড়িতে। বেড়াল-তপস্বিনী আর বলে কাকে?

রাসী বামনি তার ষণ্ড-গণ্ডদেশে বাম করতল রাখলে।

বড়জা' এক ঢোকে মুখের গ্রাসটা গিলে নিলেন: 'বলি, ওগো ভাল মানুষের মেয়ে, সোনার চাঁদ অমন সোয়ামীটাকে কাঁচা খেলে, এখনও তো একটা বছর ঘুরে আসেনি। পরকালের ডর-ভয় কি নেই একটুও?'

সতী এতক্ষণ অপরাধীর মত ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল। মুখ তুলে এবার বলল: 'সে চিন্তা আপনারাই করবেন দিদি! কিন্তু বলুন তো, আমি আপনাদের কাছে কি অপরাধটা করেছিলাম যে, সব জেনে-শুনে একটা মুমূর্ষ লোককে সাত পাক ঘুরিয়ে ঝুলিয়ে দিলেন আমার গলায়?'

'য়্যাঁ, কী বললে?'

'আমি আপনাদের কাছে কি অপরাধটা করেছিলাম? আমার ঘাট হয়েছে মানি। কিন্তু আমার চোখের উপরই আপনারা ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করবেন সুখে-শান্তিতে—কিন্তু দিদি, আমার কি অপরাধ যে, পৃথিবীর সব কিছু হতে এমন করে বঞ্চিত হতে হবে?'

সতী আর দাঁড়াল না। এক ঝটকায় নন্দার মুঠি থেকে নিজের আঁচলটা মুক্ত করে নিয়ে সে চলে এল হুম-হুম করে।

শ্বশুর-বাড়িতে আর ঠাঁই নেই। সতী এসে আশ্রয় নিল দাদার সংসারে। মা মুখভার করলেন। দাদা হলেন গম্ভীর। আর বৌদি হলেন মুখর। সবাই জানতে চায়, সতী শ্বশুর-বাড়ির রাজ-দৌলত ছেড়ে চলে এল কেনো? রাশভারী এই মেয়েটাকে সবাই সমীহ করে চলত ছোটবেলা থেকে। মুখ ফুটে কেউ বলতেও সাহস পেল না কিছু। ভাবলে, অল্প বয়স—এরি মধ্যে কপাল গেল পুড়ে। যক্ষপুরীতে কি মন বসে?

দিন চলে পর্বের মত গড়িয়ে—ধীর, মন্থর, একঘেয়ে ঢিমেতালে।

এক-এক সময় সতীর মনটা কেমন যেন করে ওঠে। টন্-টন্ করতে থাকে ব্যথায়। দুঃখ হয়, শ্বশুর মশাইয়ের জন্য। আহা, অসহায় বৃদ্ধ মানুষটি! সতী গিয়ে দাঁড়ায় জানলার কাছে। ভেজান জানলাটা দেয় খুলে, মনের রুদ্ধ দ্বারটাও যেন খুলে যায়! মনের আনাচে-কানাচে বন্দী পাখীগুলো এবার যেন পথ পায়। উড়ে যায় ডানা মেলে মুখর কল-কাকলিতে। হালকা হয়ে ওঠে তার মনটা।

স্তব্ধ অলস দুপুর। কোলের ছেলেটাকে বুকে নিয়ে ঘুম পাড়াতে গিয়ে বৌদিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। মা গেছেন বুঝি পাশের বাড়িতে। দাদা আছেন আপিসে আর চিনু তার ইস্কুলে। সতী বাইরে পা বাড়াল। ছোট উঠানটুকুর প্রান্তে মাত্র একখানি ঘর। এটাতে থাকে পিণ্টুদের মাষ্টার। শ্লেটখানা কোলে নিয়ে টুলের উপর বসে পিণ্টু একমনে তাকিয়ে আছে জানলা দিয়ে বাইরে।

'কি রে, কি করছিস্?'

পিণ্টু চমকে উঠল: 'আ রে পিসিমা, দেখে যাও, কী মজা! জামরুলটা মুখে করে কাঠবিড়ালীটা যেই পালাতে যাবে, অমনি একেবারে নীচে কুপোকাৎ। হি-হি; কি মজা!'

'য়্যাঁ, আঁক না কষে বসে বসে বুঝি তাই দেখছিস? আসুক তোর মাষ্টার, বলে দেবো আমি।'

'বা রে, পাচ্ছি না যে; বাবা, কী শক্ত!'

'কই দেখি, ভারী তো আবার আঁক! দে, আমি করেই দিচ্ছি—কিন্তু খবরদার, তোর মাষ্টারকে যেন বলিস নে।'

পিসিমা কি বোকা, তা কি কখন বলতে আছে? পিণ্টু সমান মাথা নাড়ল। সতী শ্লেটখানা হাতে তুলে নিলে।

'হ্যাঁ রে, আমার কথা তোর মাষ্টার তোকে খুব জিজ্ঞেস করে, না রে?'

'হ্যাঁ পিসিমা, দিদিকে সেদিন জিজ্ঞেস করছিল।'

'য়্যাঁ, কাকে? চিনুকে?'

'হ্যাঁ, দিদিও আঁক কষতে আসে কি না। জানো পিসিমা, মাষ্টার মশাই দিদিকে কোন দিন একটুও বকে না—খালি হেসে হেসে গল্প করে দিদির সঙ্গে।'

হুঁ, চিনুও তা হলে পড়তে আসে। তাই অত হাসাহাসি, চোরা চাহনি চোখের। অত বড় ধাড়ী মেয়ে, মাষ্টারের কাছে এসে পড়তে লজ্জা করে না একটুও? তার কাছে এসেও তো পড়া দেখিয়ে নিতে পারে? আর ভারী তো বিদ্যের দৌড় মাষ্টারটার। মাত্র ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে—ইস্কুলের বোঁটকা গন্ধ এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এখনও তাকাতে জানে না চোখ তুলে। এদিকে তো খুব! ভিজে বেড়াল! সতীর রাগ হয়। ফুলতে থাকে সে ক্ষুব্ধ অভিমানে।

কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকের। পর-মুহূর্তে সতী উঠে গিয়ে বিশৃঙ্খল টেবিলখানা ঝেড়ে-মুছে গুছিয়ে রাখে। মা গো, কী ডেঁপো ছেলে! সতী হেসে ফেলে ফিক করে। মরক্কো লেদারের একখানা মজবুত বাঁধাই খাতা সে তুলে নেয় হাতে। দেশ-বিদেশের নাম-করা চিত্র-তারকাদের অটোগ্রাফ সহ একখানা ফটো-য়্যালবাম। এই বুঝি পড়াশুনা করা হয়—অমুক দেবী আর তমুকবালার অটোগ্রাফ যোগাড় করে করে? য়্যালবামখানা সতী আবার রেখে দিল টেবিলের উপর। বিছানার চাদরখানা নোংরা হয়ে আছে। চাদরখানা পালটিয়ে সে বিছানাটা করে রাখে পরিপাটী করে। ইস্ত্রি-করা ধবধবে কাপড় আর জামাগুলো সুটকেশের উপর ঝুলে পড়ে আছে অনেক দিন থেকে ধুলো-বালিতে। কাপড়-জামাগুলো সে ভাঁজ করে সাজিয়ে রাখে ব্র্যাকেটের উপর। তার পর ছোট একটা নিশ্বাস চেপে বেরিয়ে আসে নিঃশব্দে।

নিজের ঘরে গিয়ে আবার জানলার শিক ধরে দাঁড়ায়। 'Olenka'-কে তার মনে পড়ে—চেখবের "ডার্লিং"-কে। সে অবলম্বন চায়—জড়িয়ে থাকতে চায় কোন মহা মহীরুহকে।···

গলির মোড়ে একটি অতি পরিচিত মুখ এগিয়ে আসে। গায়ে আস্তিন-গুটান আদ্দীর পাঞ্জাবী। ব্যাক-ব্রাশ চুল। হাতে খাতা আর বই। এখনো ছেলেমানুষ—মাছির ডানার মত পাতলা সরু গোঁফ চাড়া মেরে উঠেছে সবে মাত্র। চার চোখের মিলন হতেই ছেলেটা অমনি চোখ নামিয়ে ঘাড় গুঁজে ঢুকে পড়ল বাড়ির মধ্যে। সতীর হাসি পায়। ভিজে বেড়াল!···

সে আবার সমাহিত হয়ে পড়ে। মাথাটা এলিয়ে পড়ে জানলার গরাদের উপর। হঠাৎ তার চমক ভাঙে গলির মোড়ে বিড়িওয়ালা

কামতাপ্রসাদের অভদ্র, ইতর ইঙ্গিতে। জানলাটা সে বন্ধ করে দেয় সশব্দে। ক্রুদ্ধ স্বরে চীৎকার করে উঠে : গুণ্ডা—ছোটলোক কোথাকার!

* * * *

দরজাটা খোলাই ছিল। খামখেয়ালী স্বভাবের জন্তও হতে পারে কিংবা রোগের যন্ত্রণায় ভুলে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। সতী পা টিপে-টিপে ঘরে গিয়ে ঢুকল। ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হাত বাড়িয়ে সে সুইচটা জ্বালল। তার পর নত হয়ে হাতখানা উত্তপ্ত কপালে রাখতেই ছেলেটা চমকে উঠল : 'কে?'

সতী নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা সে কেবল ঘষতে লাগল মেঝের উপর।

'কে, আপনি? আপনি এখানে এত রাত্রে!' ছেলেটা উঠে বসল।

'তোমার অসুখ করেছে কি না, মাথাটা একটু টিপে দেবো?'

সতী বুঝি দু'হাতে ছেলেটার রোগ-পাণ্ডুর মুখখানা আপনার কোলের উপর টেনে আনতে যাচ্ছিল, ও কিন্তু এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিল : 'না না, আপনি যান। ছিঃ, আপনি এমন জানা ছিল না! দরজাটা আবার বন্ধ করলে যে?'

তার পর অপ্রত্যাশিত একটি সোরগোল। আর বাইরে বারান্দায় সমবেত বহু জনের সচঞ্চল পদধ্বনি।

আবার যবনিকা উঠল। শ্বশুর-বাড়ির সেই মসীময় তিমির রাত্রির পূর্বানুবৃত্তি। বৌদির ধারাল টিপ্পনী, চিনুর ফোঁস-ফোঁসানী, মা'র সখেদ ক্রন্দন আর দাদার সাড়ম্বর আস্ফালন মিলে সৃষ্টি করল দদুর্'র এক ঐক্যতানের। এবং শেষে এক সময় : 'আমরা বাপু ছেলেপিলে নিয়ে ঘর-সংসার...এ সব এখানে...'

সতী এবার টুঁ শব্দটি করলে না।

কিন্তু পরদিন রাত্রির শেষ যামে দেখা গেল : একখানি ছ্যাকরা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে জানকীজীবন বাবুর বাড়ির ফটকে আর মোড়ের বিড়িওয়ালা কামতাপ্রসাদ সতীর বিয়ের ভারী ট্রাংকটা টানতে-টানতে তুলছে গাড়ির ছাদের উপর। তার পর একটু ইতস্ততঃ করে নিজেও বুঝি বসতে যাচ্ছিল গাড়োয়ানটার সঙ্গে উপরে। সতী তাকে হাত ধরে ভিতরে নিয়ে বসালো।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

দাম্ভিক হাউই

শ্রীসুলতা কর

রাজপুত্রের বিয়ে। রাজ্য জুড়ে উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে। রুশ দেশের রাজকুমারী ছয়-হরিণ-টানা স্লেজে চড়ে এলেন। তিনিই হলেন এই বিয়ের কনে।

রাজকুমারী এসে পৌঁছবার পর বিয়ের উৎসব আরম্ভ হল। উৎসবের সব শেষে মাঝ রাতে বিরাট সমারোহ করে বাজীর খেলা দেখান হবে ঠিক হল। রুশ দেশের রাজকুমারী কখনও বাজীর খেলা দেখেননি! সেই জন্ত এই অনুষ্ঠানটা বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে করবার হুকুম দেওয়া হল।

বাজারে প্রকাণ্ড বাগানের এক পাশে হাজার হাজার বাজী জমা করা হল। রাজসভার প্রধান বাজীকর অসংখ্য অনুচর নিয়ে বাজীগুলো যথাযথ জায়গায় সাজাতে লাগলেন। দশ ঘণ্টা খাটবার পর বাজীকর বিশ্রাম করতে গেলেন। তখন বাজীগুলি নিজেদের মধ্যে গল্প করতে আরম্ভ করল।

ছোট তুবড়ী বলল—"পৃথিবীটা ভারী সুন্দর জায়গা। বাগানের ওই করবী ফুলগুলোর দিকে চেয়ে দেখ। ভাগ্যে এত দেশ-বিদেশ বেড়াতে পেয়েছি সেই জন্তই ত এত সুন্দর সুন্দর জিনিষ দেখতে পেলাম।"

নীল মশাল বলল—"বোকা তুবড়ী, রাজার বাগানটাকেই পৃথিবী বলে ভাবছিস বুঝি? পৃথিবীটা এত ছোট জায়গা নয়। পুরো তিন দিন না হাঁটলে পৃথিবী ভ্রমণ হয় না।"

হঠাৎ বাগানের এক কোণ থেকে একটা শুকনো কাশির খক্‌খক্ আওয়াজ হল। বাজীগুলো সবাই চমকে সেই দিকে চাইল। লম্বা লাঠির কোণে বাঁধা একটা বড় হাউই শুয়ে শুয়ে কাশছিল। যাতে সবাই তার মুখের দিকে চায়, সে জন্ত ভাল বক্তৃতা দেবার আগে ও বরাবর কাশে।

হাউই আর একবার কেশে বক্তৃতা আরম্ভ করল। খুব জোরালো গলায় স্পষ্ট ভাষায় সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—"মহাশয়রা, শুনুন, শুনুন। রাজকুমারের ভাগ্যটা খুবই ভাল। কারণ যেদিন আমাকে দেখান হবে ঠিক সেই দিনই রাজকুমারের বিয়ে হচ্ছে। ভাগ্যে বুড়ো রাজা আগে থেকে ব্যবস্থা করেছিলেন, তা না হলে আমার রূপ দেখবার সৌভাগ্য কি আর রাজকুমারের ঘটত?"

ফুলঝুরি সরু-গলায় বলে উঠল—"আমি ত ভেবেছিলাম ব্যাপারটা অন্ত রকম। রাজকুমারের বিয়ের দিনে যে আমাদের দেখান হচ্ছে, সেটা ত আমাদেরই সৌভাগ্য।"

হাউই তাচ্ছিল্যের সুরে বলে উঠল—"তোমাদের মত ক্ষুদে বাজীদের কাছে ও-কথা সত্যি হতে পারে, কিন্তু আমার মত গণ্যমান্য বাজীর উপর ও-কথা খাটে না। আমার বংশ-পরিচয় শুনলেই বুঝবে আমার সঙ্গে তোমাদের তফাৎ কোথায়? বিখ্যাত হাউই-বংশে আমার জন্ম হয়েছে। আমার মা ছিলেন সে যুগের চরকা-বাজীদের মধ্যে সেরা নর্তকী। পৃথিবী জুড়ে তাঁর চমৎকার নাচের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। বড় বড় রাজসভায় যখন তিনি নাচতে আরম্ভ করতেন, তখন পুরো উনিশ বার বন্‌বন্ শব্দে ঘুরপাক খেতেন, আর প্রত্যেক বার সাতটি করে তারা আকাশে ছুঁড়ে মারতেন। আমার বাবা আমারই মত এক জন যশস্বী হাউই ছিলেন। ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ কারিগর তাঁকে তৈরী করেছিল। তিনি এত উঁচুতে উড়ে যেতেন যে লোকে অবাক হয়ে যেত, ভাবত, আর বুঝি তিনি পৃথিবীতে নামবেন না। কিন্তু সকলের কৌতূহল মেটাবার জন্ত কিছুক্ষণ বাদে চার দিকে সোনালী ফুলঝুরি ছড়াতে ছড়াতে আকাশ ঝলমলে আলোয় ভরিয়ে দিয়ে নেমে পড়তেন। পরদিন

শহরের সব খবরের কাগজে তাঁর এই আশ্চর্য্য কীর্ত্তির কথা বড় বড় অক্ষরে লেখা বেরোত।"

পটকাবাজী হাউইয়ের কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল।

হাউই বলল—"হাসছ যে বড়? হাসবার মত কি বলেছি যে হাসছ?"

পটকা বলল—"আমার মনে আনন্দ হয়েছে, তাই আমি হাসছি।"

হাউই রেগে উঠে বলল—"কি স্বার্থপরের মত কথা! তোমার আনন্দ পাবার অধিকার আছে না কি? আর কি আশ্চর্য্যের ব্যাপার! আজকের দিনে তোমরা মনের আনন্দে হাসছ? যেন ভাবতেই পারছ না যে, আজই রাজকুমার রাজকুমারীর বিয়ে হবে।"

আগুনে বেলুন বলল—"ঠিকই ত, এর চেয়ে আনন্দের ব্যাপার আর কি আছে। আমি যখন আকাশের অনেক উঁচুতে উড়ব, তখন আমি আকাশের সব তারাদের ডেকে ডেকে এই আনন্দের খবর শোনাব।"

হাউই ঠাট্টার সুরে বলল—"তুমি নিজে যেমন ফাঁপা, পৃথিবীর সব ব্যাপারকে তেমনি বাজে বলে ভাব। কত কথা ভাববার আছে। মনে কর, বিয়ের পর রাজকুমার একটি গ্রামে বাস করতে গেলেন। সেখানে তাঁর একটি সুন্দর ছেলে হল। ছেলেটির বয়স দু'বছর। সুন্দর রাজপুত্র এক দিন পরিচারিকার সঙ্গে পুকুরের ধারে বেড়াতে গেছেন। পরিচারিকা গাছের ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, আর রাজকুমার পুকুরের জলে নেমে ডুবে গেছেন। কি সাংঘাতিক দুর্ঘটনা বল ত? আমি ত এত বড় দুঃখ সইতেই পারব না।"

বেলুন বলল—"কিন্তু তাঁর ছেলে ত ডুবে যায়নি বা কোন দুর্ঘটনাও ঘটেনি যে এখন থেকে কাঁদতে হবে।"

"আমি কি বলছি এই সব ব্যাপার ঘটেছে? কিন্তু এ রকম কত কি ব্যাপার ঘটতে পারে। সুতরাং এখন থেকে আমাদের দুঃখ করা উচিত।"—হাউই বলল।

নীল মশাল ঠাট্টা করে বলল—"তোমার মত অসাধারণ লোক ছাড়া আজকের দিনে রাজপুত্রের দুঃখ কেউ দেখতে পাবে না।"

রেগে উঠে হাউই বলল—"তোমাদের মত নগণ্য লোকেরা এ সব ব্যাপারের বুঝবে কি? রাজপুত্র যে আমার কত বড় বন্ধু, তার দুঃখে যে আমি কত বেশী কাতর হচ্ছি, সে কথা তোমরা কি বুঝবে?"

নীল মশাল বলল—"রাজপুত্রকে ত চোখেও দেখনি, কি করে সে তোমার বন্ধু হল?"

"চোখে দেখিনি বলেই ত রাজপুত্র আমার বিশেষ বন্ধু, এ সহজ কথাটাও বোঝ না?"—হাউই বলল।

বেলুন বলল—"যাক গে ও-সব কথা। আসল কথা হচ্ছে, আজকের দিনে নিজেকে শুকনো রাখা দরকার। চোখের জলে শরীর ভিজিয়ে ফেললে আজ বাজীর খেলা সব নষ্ট হয়ে যাবে।"

হাউই বলল—"তোমাদের মত নগণ্য লোকেরা নিজেদের শুকনো রাখে। আজকের দিনে আমার মত অসাধারণ লোকেরা দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে নিশ্চয়ই কাঁদবে।"—এই বলে হাউই সত্যই কেঁদে উঠল। এত বেশী কাঁদতে লাগল যে, বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ে তার সমস্ত বারুদ ভিজিয়ে দিল। এমন কি, তলার কাঠিটা পর্য্যন্ত ভিজে গেল।

চরকা বাজী বলল—"সত্যি, এক জন মহৎ লোক বটে! যেখানে কাঁদবার কিছু নাই সেখানেও কাঁদছে।"

কিন্তু নীল মশাল আর পটকা ঠাট্টা করে হেসে উঠল। রাত বারোটা বাজল। রাজ-প্রতিহারী মধ্যরাত্রি ঘোষণা করল। ঘোষণা করবার সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমার রাজকুমারী আর তাঁদের ঘিরে শহর সুদ্ধ লোক বাগানে জমা হল।

এবার বাজীর খেলা আরম্ভ হবে। প্রধান বাজীকর রাজাকে অভিবাদন করে বাগানের যে কোণে বাজীগুলো রাখা হয়েছে, সেই দিকে চললেন।

বিরাট আড়ম্বর করে বাজীর খেলা আরম্ভ হল। বন্-বন্, বন্-বন্—ঘুরতে লাগল চরকা বাজী চার দিকে আলোর ঝলকানি ছড়িয়ে

দুম্-দাম্—ফাটতে লাগল পটকার দল।

হিস্-হিস্—উড়তে লাগল তুবড়ীরা।

লাল-নীল মশালেরা চার দিক আলোয় ভরিয়ে তুলল। আগুনে বেলুন লাল আলোয় চার দিক ভরিয়ে আকাশের অনেক উঁচুতে উড়ে গেল।

দুম্ ধড়াস্, দুম্ ধড়াস্—বিরাট গর্জ্জনে পৃথিবী কাঁপিয়ে তুলল কামানবাজীরা। ছোট থেকে বড় পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি বাজী নিজের নিজের রূপ চমৎকার করে ফুটিয়ে তুলে সবাইকে অবাক করে দিল।

এই রকম রাশি রাশি বাজীর ভিতরে একা হাউই এক কোণে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। কেঁদে কেঁদে নিজেকে সে এমন ভিজিয়ে ফেলেছিল যে, রাজ-বাজীকর প্রাণপণে চেষ্টা করেও তাকে জ্বালাতে পারলেন না। কিছুতেই সে আকাশে উঠতে পারল না। তার ভিতরে খুব ভাল বারুদ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তার সবটাই চোখের জলে ভিজে গেছে। কি আর করা যাবে।

শুয়ে শুয়ে হাউই দেখতে লাগল, খুব ছোট ছোট বাজীরা—যাদের সে ছোটলোক বলে ঘৃণা করেছে তারা পর্য্যন্ত কি চমৎকার খেলা দেখাচ্ছে। হাজার হাজার বাজী আগুনের গোলার মত আকাশে উড়ে গিয়ে, সোনার ফুলের মালার মত হয়ে ঝরে পড়ছে।

অসংখ্য লোক চেঁচিয়ে উঠছে—"বাহবা, বাহবা!"

সুন্দরী রাজকুমারী বাজীর খেলা দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠছেন।

কিন্তু দাম্ভিক হাউই দমবার পাত্র নয়। নিজের মনে সে বলতে লাগল—"আমি যে খেলা দেখালাম না, তার মানে হচ্ছে এর চেয়েও বড় উৎসবে আমাকে যেতে হবে। এই সব ছোটলোক বাজীদের সঙ্গে আমার মত মহামান্য বাজীকে কি দেখান যেতে পারে?"—এই বলে গম্ভীর মুখে সে শুয়ে রইল।

পরদিন সকালে রাজবাড়ীর চাকরেরা এসে বাজীর জায়গা পরিষ্কার করে ঝাঁট দিতে লাগল।

হাউই তাদের দেখে ভাবল—এই সব রাজ-অনুচরেরা নিশ্চয় আমাকে কত বড় উৎসবে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে তাই পরীক্ষা করবার জন্ম এসেছে। সুতরাং আমার এখন নিজের পদমর্য্যাদা অনুযায়ী গম্ভীর হওয়া উচিত—এই ভেবে সে কপাল কুঁচকে নাক সিঁটকে একটা গম্ভীর বিষয় ভাবতে আরম্ভ করল।

কিন্তু চাকরেরা তার দিকে মোটেই তাকাল না। নিজের মনে কাজ করে যেতে লাগল। শেষে চলে যাবার সময় হঠাৎ তাদের এক জনের চোখ তার উপর পড়ল। সে চেঁচিয়ে উঠল—"এ যে দেখছি, সেই জঘন্য হাউইটা।" এই বলে সে হাউইকে ধরে বাগানের বাইরে ছুঁড়ে ফেলল।

মাটিতে পড়বার আগে বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে হাউই বলে উঠল—"জঘন্য হাউই, জঘন্য হাউই! কখনও না, লোকটি নিশ্চয় বলেছে চমৎকার হাউই। চমৎকার আর জঘন্য শব্দ দু'টো শুনতে প্রায় একই রকম, তাই আমার শুনতে ভুল হয়েছে।"—বলতে বলতে হাউই বাগানের বাইরে চটচটে নরম কাদার ভিতর গিয়ে পড়ল।

"এখানটা খুব আরামের জায়গা নয় দেখছি। তা হোক, এটা নিশ্চয় নদীর ধারের কোন স্বাস্থ্যনিবাস হবে। রাজা আমাকে এখানে পাঠালেন স্বাস্থ্য ফিরে পাবার জন্য। বড় উৎসবে যাবার আগে স্বাস্থ্য ভাল করার দরকার আছে বৈ কি। এখন আমাকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে।"—এই বলে হাউই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

পাশের ডোবা থেকে একটা ছোট কোলা ব্যাঙ লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এল। জলজলে চোখে তাকাতে তাকাতে বলল, "নতুন লোক দেখছি যে! আজই এসেছ বুঝি? এ জায়গা তোমার খুব ভাল লাগবে। চটচটে কাদার মত সুন্দর পৃথিবীতে আর কি আছে বল?"

হ্যাঁচ্ছো, হ্যাঁচ্ছো—চটচটে কাদায় ডুবে হাউইয়ের ভীষণ কাশি হতে লাগল।

কোলা ব্যাঙ বলল—"বাঃ, চমৎকার তোমার গলার আওয়াজ ত? ঠিক যেন গোঙানীর মত। আজ সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গীত-সভা বসবে। চমৎকার গান হবে। তুমি এখান থেকেই শুনতে পাবে। চাষার বাড়ীর সামনে যে ডোবা দেখছ ওইখানেই সঙ্গীত-সভা হবে। এমন সুন্দর আমাদের গান যে, সবাইকে জেগে থাকতে হয়। কালই আমি শুনলাম, চাষার বৌ বলছে, সারা রাত নাকি সে আমাদের গানের জন্য চোখের পাতা বুজতে পারেনি। সত্যি, আমাদের গানের এত আদর শুনলে খুবই আনন্দ হয়।"

হ্যাঁচ্ছো, হ্যাঁচ্ছো—ক্রমাগত কাশতে লাগল হাউই। কাশির জন্য একটাও কথা বলতে পারল না।

"আচ্ছা, এখন তবে আসি। তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলাতে খুব খুশী হলাম।"—ব্যাঙ বলল।

এতক্ষণে হাউইয়ের কাশি একটু কমল, বলল, "একে কি কথাবার্তা বলে না কি? তুমি ত একাই বকে গেলে সমস্ত সময়, আমাকে কথা বলবার সুযোগই দিলে না।"

ব্যাঙ বলল—"কথাবার্তায় এক জন বক্তা আর এক জন শ্রোতা হলেই ভাল। আমি কথা বললাম আর তুমি শুনলে, এই ত বেশ। এ রকম হলে সময়ও বাঁচে, তর্ক-বিতর্কও হয় না।"

হাউই বলল—"কিন্তু আমি তর্ক-বিতর্ক পছন্দ করি।"

ব্যাঙ মুরুব্বির সুরে বলল—"ও মতটা ভুল।"—এই বলে থপ্-থপ্ করে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

নিজের মনে হাউই গজ্-গজ্ করতে লাগল—"ব্যাঙটা একেবারে ছোটলোক। আমার মত উঁচু বংশে জন্মায়নি আর শিক্ষাও পায়নি। কেবল নিজের গুণের কথা বলে গেল। এ রকম লোকদের স্বার্থপর ছাড়া আর কি বলা যায়! আমার মনে হয়, জগতের সব লোকের কেবল আমার গুণের কথা বলা উচিত। কারণ আমার মত গুণ আর কার আছে?"

কাছেই জঞ্জালের স্তূপের উপর একটা বড় মাছি বসেছিল। সে বলল—"কাকে অত কথা শোনাচ্ছ? কথা বন্ধ করে চুপ করে বস। ব্যাঙ ত অনেকক্ষণ হল চলে গেছে। কে তোমার কথা শুনবে?"

"চলে যদি গিয়ে থাকে তবে তারই ক্ষতি, আমার ক্ষতি নয়। আমি যে অমূল্য উপদেশ দিচ্ছি তার কিছুই সে শুনতে পেল না। ব্যাঙ চলে গেছে বলে আমি কথা থামাব কেন? কোন শ্রোতা না থাকলে আমি নিজে কথা বলি আর নিজেই শুনি। আমি এমন জ্ঞানী যে, অনেক সময় নিজের কথার অর্থ নিজেই বুঝি না।"

"তা যদি হয় তবে ত কথাই নাই।"—বলে মাছি জালের মত হাল্কা পাখা দু'টি ছড়িয়ে আকাশে উড়ে গেল।

"ওঃ মাছিটা কি মূর্খ! আমার এমন দামী উপদেশ না শুনে উড়ে গেল! ওর জীবনে এমন সুযোগ আর আসবে কি? যাক গে, আমি ও-সব তুচ্ছ লোককে গ্রাহ্য করি না। আমার পাণ্ডিত্য এক দিন না এক দিন পৃথিবীতে সম্মান পাবেই।"—বলতে বলতে হাউই আরও গভীর কাদাতে ডুবে বসল।

একটু পরে একটা ধবধবে রাজহাঁস উড়ে এসে তার কাছে বসল। তার পায়ের রং হলদে, ঠোঁট টুকটুকে লাল। সে ভাবত, তার মত সুন্দর আর কেউ নাই।—"প্যাক্, প্যাক্, প্যাক্"—সে বলতে লাগল: "কি অদ্ভুত শরীরের গড়ন আপনার? আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি এই রকম শরীর নিয়েই জন্মেছিলেন না কোন দুর্ঘটনায় পড়ে গিয়ে এমন অদ্ভুত বাঁকা-চোরা শরীর হয়েছে?"

গম্ভীর হয়ে হাউই বলল—"তুমি পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত লোক। সহরের হাল-চাল কিছুই জান না, সেই জন্য আমার শরীর নিয়ে এমন কথা বলছ। যাই হোক, অশিক্ষিত গেঁয়ো লোকদের আমার মান-মর্য্যাদা সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। জেনে রেখো, আমার মত গণ্যমান্য লোক জগতে আর কেউ নাই।"

"ভাল ভাল, এ ত বেশ কথা"—বলল রাজহাঁস। ঝগড়া করা মোটেই সে পছন্দ করে না, স্বভাব তার বড় শান্ত। "আচ্ছা, আপনি কি তা'হলে এখানেই থাকবেন?"—জিজ্ঞেস করল রাজহাঁস।

"না না, এখানে থাকব কেন?" তাড়াতাড়ি বলে উঠল হাউই। "আমি হলাম তোমাদের এক জন বিশিষ্ট অতিথি। শীঘ্রই আমি রাজসভায় ফিরে যাচ্ছি। রাজসভায় গিয়ে আমার আশ্চর্য্য রূপ-গুণ দেখিয়ে পৃথিবী-সুদ্ধ লোককে মুগ্ধ করে দেবার জন্যই আমার জন্ম হয়েছে।"

"এক দিন আমিও পৃথিবী-সুদ্ধ লোকের উপকার করব ভেবেছিলাম। এমন কি, একটা প্রকাণ্ড সভাও ডেকেছিলাম। সেই সভায় আমি সভানেত্রী হয়েছিলাম। কিন্তু"—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাজহাঁস বলল—"দেখলাম, অত প্রস্তাব করেও পৃথিবীর কিছু উপকার করা গেল না। সে জন্য এখন আমি ঘর-সংসার দেখা-শোনার কাজ করছি।"

হাউই বলল—"আমি জন্মেছি জগতকে আমার রূপ-গুণ দেখিয়ে মুগ্ধ করে দেবার জন্য। আমার আত্মীয়েরাও সবাই ওই উদ্দেশ্যেই

জন্মেছে। এখন পর্য্যন্ত আমার আশ্চর্য্য কীর্ত্তি জগতকে দেখাইনি কিন্তু শীঘ্রই দেখাব। ঘরকন্নার কাজ বলছ, ও-সব বড় নীচু কাজ।"

"পৃথিবীকে মুগ্ধ করে দেওয়া, সত্যি কত সুন্দর কথা! শুনেই আমার খিদে পেয়ে গেল। যাই খাবারের চেষ্টা দেখি।"—প্যাঁক্ প্যাঁক্ করতে করতে হাঁস পুকুরের দিকে চলে গেল।

"ফিরে এস, ফিরে এস। এখনও অনেক কথা বলবার আছে, শুনে যাও।"—ডাকতে লাগল হাউই। কিন্তু রাজহাঁস কোন কথা না শুনে চলে গেল।

হাউই বলতে লাগল—"যাক্, গেছে ভালই হয়েছে। ওর মনটা একেবারে ছোটলোকদের মত। বড় কথা বোঝবার ক্ষমতাই নাই ওর।" বলতে বলতে সে কাদার ভিতর আরও খানিকটা ডুবে গেল।

ডুবে গিয়ে ভাবতে লাগল—"পৃথিবীতে আমার মত উঁচু দরের লোকেদের সঙ্গী পাওয়া যায় না। তারা চিরকালই একলা থাকে।"

হাউই একমনে এই সব ভাবছে, এমন সময় সাদা-ফ্রক-পরা দু'টি ছোট মেয়ে ছুটতে ছুটতে ডোবার কাছে এল। তাদের হাতে একটা ছোট কেটলী আর দু'-চারটা কাঠের টুকরো।

হাউই ভাবল—"এরা নিশ্চয় আমাকে অভ্যর্থনা করে রাজসভায় নিয়ে যাবার জন্য আসছে। এদের কাছে নিজের মর্য্যাদা বজায় রাখা উচিত। এই ভেবে সে গম্ভীর মুখে আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

"ও ভাই, দেখ, একটা পুরানো লাঠি এখানে পড়ে রয়েছে।" বলতে বলতে একটি ছেলে হাউইকে টেনে তুলল।

"কি বলল, পুরানো লাঠি? অসম্ভব! সোনার লাঠি বলল নিশ্চয়, আমার শুনতে ভুল হয়েছে। ওরা বোধ হয় আমাকে রাজসভার মহামান্য অমাত্য ভাবছে।"—হাউই নিজের মনে বলল।

"আয়, আমরা এটাকে কাঠের সঙ্গে পোড়াই, তা'হলে কেটলীর জল তাড়াতাড়ি ফুটে যাবে।" বলল অন্য ছেলেটি।

তার পর দু'জনে মিলে হাউইকে নিয়ে কাঠের টুকরোগুলোর মধ্যে গুঁজে দিয়ে আগুন জ্বালল।

"চমৎকার এই রাজদূতদের ব্যবহার! দিনের আলোয় ওরা আমাকে জ্বালাচ্ছে, যাতে পৃথিবী-সুদ্ধ লোক আমার রূপ দেখতে পায়।"—বলল হাউই।

"চল্ ভাই, একটু শুয়ে পড়ি। ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখব জল ফুটে গেছে।" এই বলে ছেলেরা ঘাসের উপর চোখ বুজিয়ে শুয়ে পড়ল।

নরম কাদায় অনেক ক্ষণ ডুবে থাকার জন্য হাউই ভয়ানক ভিজে গেছল। তার শরীরটা শুকোতে অনেক সময় লাগল। শেষে তার গায়ে আগুন লাগল।

"হিস্ হিস্ হিস্"—আস্তে আস্তে সে উপরে উঠতে লাগল।

আনন্দে সে চেঁচিয়ে উঠল—"ওঃ, চমৎকার! আমার মত আশ্চর্য্য পদার্থ আর পৃথিবীতে নাই। কি আমার রূপ সবাই চেয়ে দেখ। আমি তারাদের চেয়েও উঁচুতে উঠব, চাঁদকে ছাড়িয়ে যাব, সূর্য্যের মাথায় গিয়ে বসব।"

আগুন লেগে তার শরীরের ভিতরটা সির্-সির্ করতে লাগল। মনের আনন্দে সে আরও জোরে চেঁচাতে লাগল—"এবার আমি ফাটব, সমস্ত পৃথিবীতে আগুন জ্বালিয়ে দেব। এমন ভয়ানক শব্দ করব যে, পৃথিবীর সব লোক এক বছর ধরে কানে আর কিছু শুনতে পাবে না।"—বলতে বলতে সে সামান্য উঁচুতে উঠে খুব আস্তে শব্দ করে ফেটে মাটিতে পড়ে গেল। এত অল্প শব্দ হল যে, কেউ শুনতে পেল না। ছোট ছেলে দু'টি ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, তাদের পর্য্যন্ত ঘুম ভাঙ্গল না।

"হিস্ হিস্"—শব্দ করতে করতে অহঙ্কারী হাউই নেববার আগে বলতে লাগল—"ওঃ, কি আশ্চর্য্য কাণ্ডই না করলাম! জানি আমার মত আশ্চর্য্য রূপ-গুণ আর কারও নাই।"

হাউই পুড়ে গেল, শুধু তার কাঠিটা ঠিক রইল। সে সময় রাজহাঁস ডোবার ধারে বিকালে একটু বেড়াতে বেরিয়েছিল কাঠিটা তার পিঠে এসে পড়ল।

"ওরে বাবা, এ যে দেখছি আকাশ থেকে কাঠিবৃষ্টি হচ্ছে!"—বলতে বলতে সে ডোবার জলে নেমে গেল।

কাণ্ডগড়ায়

শ্রীস্বর্ণপ্রভা ভাদুড়ী

বিরক্ত হয়ে নরেন দু'টো হাত আড়াআড়ি ভাবে ষ্টিয়ারিং-এর উপর রেখে বাঁ পা দিয়ে এ্যাকসিডেণ্ট ব্রেক কষে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক একটা শব্দ করে গাড়ীটা রাস্তার মাঝখানে থেমে গেল। ইঞ্জিনের সামনে ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল একটি বৃদ্ধ এবং তার পিছনে কয়েকটি শিশু সহ জড়পুত্তলীবৎ একটি নারী। অভ্যাস বশতঃ নরেন বৃদ্ধটিকে একটি কটূক্তি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার গতিবিধি লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারল, এরা কলকাতার নূতন আমদানী; কাজেই এই পথে হাঁটায় এরা এখনও অভ্যস্ত হয়নি। বৃদ্ধকে কটূক্তি করা নরেনের আর হোল না, কিন্তু পিছন থেকে ওকে অনুযোগ শুনতে হোল। যেন বৃদ্ধটিকে গাড়ীর সামনে হুড়মুড় করে এসে পড়তে নরেনই বলেছিল। পিছনের আসন থেকে মনিব-কন্যা রুমা তখন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলছে, "এত দেরী করলে ট্রেণ ধরা যাবে কি করে নরেন?"

নরেন এখন অনেকগুলি গাড়ীর পিছনে রীতিমত পিছিয়ে পড়েছে। পার্ক ষ্ট্রীটের ট্রাফিক এখন বন্ধ, চৌরঙ্গীর খোলা, প্রমত্ত ঝঞ্ঝার মত অবিশ্রাম গতিতে গাড়ীর স্রোত চৌরঙ্গীর বক্ষ মন্থন করে ছুটে চলেছে। সমুদ্র-সৈকতে দাঁড়ালে তার প্রচণ্ড গর্জ্জন শোনা যায়; কিন্তু এই যন্ত্র-যানের তীরে দাঁড়িয়ে এক ইঞ্জিনের শব্দ ছাড়া আর কিছুই কর্ণগোচর হয় না। গাড়ীর হর্ণ বাজানো নিষিদ্ধ হওয়ায় আনাড়ী লোকেদের পক্ষে পথ চলা আরও বিপদের হয়ে উঠেছে। অন্যমনস্ক ভাবে নানা কথা ভাবতে ভাবতে নরেন বললে, "ট্রেণ আপনাকে ঠিক ধরিয়ে দিতে পারবো দিদিমণি; হর্ণ না দিয়ে গাড়ী চালানো বড় অসুবিধে—"

"ঠিক বলেছ"—পিছন থেকে রুমা বললে, "বুড়োটা যদি চাপা পড়তো নরেন, তা'হলে কি হোত?"

"কি আর হোত!"—অম্লান কণ্ঠে নরেন বললে, "আমার ফাঁসী হোত—"

পিছনের আসন থেকে উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ ভেসে এল; "পিছনের বউটা কি অদ্ভুত! রাস্তায় হাঁটতে পারছে না তবু ঘোমটা-টানা চাই।" মিষ্ট হাসির শব্দে অন্য গাড়ীর আরোহী চকিত হয়ে উঠল, কিন্তু নরেন মনে মনে সরোষে মন্তব্য করল, "তোমাদের কাছে সবই অদ্ভুত বটে।"

চৌরঙ্গীর ট্রাফিক খুলেছে; কোনও রকমে ভীড় কাটিয়ে এখন রেড রোডে গিয়ে পড়তে পারলে হয়; তার পর স্ট্র্যাণ্ড রোডে একেবারে ফিপটি মাইল স্পীড; তখন নরেনকে পায় কে? অদম্য উৎসাহে সে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই দেখা গেল, গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে বাস্তুহারাদের এক বিরাট মিছিল এগিয়ে আসছে; আবার ট্রাফিক বন্ধ হোল। গাড়ীর মধ্যে রুমা অধৈর্য হয়ে উঠল: "নাঃ, আজ আর মাদ্রাজ মেল ধরা যাবে না। তপন এসে ওকে দেখতে না পেয়ে কি ভাববে? এরা এ সব পথে আসে কেন? ওদের জন্য ত নর্থ ক্যালকাটা পড়ে রয়েছে, যত খুশী সেখানে গিয়ে সভা শ্লোগ্যান করুক।"—গভীর বিরক্তিতে রুমার রক্ত-রঞ্জিত অধর-প্রান্ত বিকৃত হয়ে উঠল। হাতের কাচ-বসানো রেশমের ঝোলা থেকে রুমাল বার করে সে বার বার মুখ মুছতে লাগল।

এদিকে সেই মিছিলের পানে চেয়ে নরেনের মনটা হঠাৎ কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল। এই চাকরীটা না থাকলে সেও ত গিয়ে ওই দলে ভিড়তো। এই মিছিলটাকে বাস্তুহারা না বলে বেকারদের মিছিল বললেও ভুল বলা হয় না। ভীড় একটু পাৎলা হতে নরেন পাশ কাটিয়ে গাড়ী বের করে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে এসে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অপেক্ষাকৃত শান্ত নির্জন পথ। হু-হু করে ছুটে আসছে গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া, নরেনের উত্তপ্ত দেহ-মন ধীরে ধীরে শীতল হয়ে আসতে লাগল। বাঁ হাতে কাঁধটা একবার মুছে নিয়ে সে অস্পষ্ট স্বরে বললে, "আঃ, কি মিষ্টি হাওয়া, ঠিক যেন ভুলে-যাওয়া মায়ের হাতের স্পর্শের মত মৃদু কোমল, হারিয়ে যাওয়া প্রিয়ার হাতের স্পর্শের মত রোমাঞ্চকর!" নরেনের দেহের মধ্যে কেমন যেন শির-শির করে ওঠে, ওর চোখের সামনে সমস্ত দৃশ্য ঝাপসা হয়ে যায়।

"এই গেল গেল, ধর, ধর। শালা, চোখ নেই? নেশা করে গাড়ী চালায়?" উত্তেজিত জনতার চিৎকারে ও আক্রমণে কি হয়েছে ঘটনা বুঝবার আগেই হতভম্ব হয়ে নরেন গাড়ী থামিয়ে দিল। জনতা হাত ধরে তাকে গাড়ী থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে গালাগালির সঙ্গে মারপিট সুরু করে দিল। দু'হাতে ভীড় ঠেলে নরেন ঝুঁকে পড়ে দেখল, তার গাড়ীর ইঞ্জিনের সামনে ধূলিতে লুটিয়ে পড়ে আছে একটি মলিনবসনা রমণী। মুখখানি সম্পূর্ণ অনাবৃত। কপালের বাঁ পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ক্ষীণ একটি রক্তের ধারা। মুহূর্তের মধ্যে নরেনের চোখ দু'টি বন্ধ হয়ে গেল। কে এই নারী? একেই সে একটু আগে স্মরণ করছিল না?

সেটা ষ্ট্র্যাণ্ড রোড আর ক্যানিং ষ্ট্রীটের মোড়। পুলিশের আগমনে জনতার ভীড় দেখতে দেখতে দেখতে পাৎলা হয়ে গেল। রুমার সকাতর অনুরোধে গাড়ীর নম্বর টুকে নিয়ে তারা

নরেনকে ছেড়ে দিল। নির্বাক্ নরেনের হাতে যন্ত্রযান আবার গর্জে উঠল। পশ্চাতে ধূলি-ধূসরিত রাজপথে মুমূর্ষ অবস্থায় পড়ে রইল রক্তমুখী নীলা।

হাওড়া ব্রীজের উপর দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ একটা ট্যাক্সি ওদের গাড়ীর পাশে এসে থেমে গেল। তার আরোহীর ইঙ্গিতে নরেনও সঙ্গে সঙ্গে তার গাড়ী থামিয়ে দিল। ট্যাক্সির জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে একটি যুবক বললে, "হ্যালো ডারলিং, হোয়াই সো লেট্?"

রুমার অবস্থা তখন অবর্ণনীয়; সজল চোখে যুবকের পানে চেয়ে সে বললে, "এক্সকিউজ মী ডিয়ার, তুমি চলে এস এই গাড়ীতে;"

অবস্থা বুঝে নরেন সেখান থেকে সরে গিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাহায্যে যুবকের মাল-পত্তর নিজের গাড়ীর কেরিয়ারে তুলে ফেলল। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সাহেব এসে রুমার পাশে বসল। জ্বলন্ত চোখে নরেনের পানে চেয়ে রুমা আদেশ করলে, "কোঠী চলো।"

ভিটে-মাটী-ছাড়া স্ত্রীহন্তারক নরেনের মনে আহত পৌরুষ গর্জে উঠল। চাপা ক্রোধে গাড়ীতে উঠে বসে সে ষ্টার্ট দিল। পিছনের আসনে কলগুঞ্জন মুখর হয়ে উঠেছে। নরেনের বুকে আগুন জ্বলছে, আর চোখের সামনে ভাসছে একটি সুন্দর পরিচিত মুখ, তার ললাটে ক্ষীণ রক্তের ধারা! ঠিক তার মনিব-বাড়ীর সাদা চুণকাম করা দেওয়ালে লাল রেশমের পর্দার মত।

হাজতের অপরিচ্ছন্ন কক্ষে অন্যমনস্ক ভাবে বসে আছে নরেন। তার জামীন কেউ হয়নি। খুনী আসামীর আবার কেউ জামীন হয় নাকি? তার জন্য ওর মনে কোনও দুঃখ নেই, আসন্ন শাস্তির আশঙ্কায় ও মোটেই বিচলিত হয় না। একটি প্রশ্ন ওকে শুধু দিবা-রাত্র বিমনা করে রেখেছে, সেটি হচ্ছে সেই রক্তমুখী নীলার প্রসঙ্গ। তার কি হোল? সে বেঁচে আছে, না মারা গেছে? তার চোখের সামনেকার সূর্য্যালোকিত উজ্জ্বল সকাল বেলাটি ধীরে ধীরে ঘন কুয়াসায় আবৃত হয়ে যায়। তার পিছনে অস্পষ্ট ভাবে ভেসে ওঠে শ্যামল বনে ঘেরা শান্ত একটি গ্রামের দৃশ্য। তার আম-কাঁটালের ছায়ায় ঘেরা পর্ণকুটিরের মৃন্ময় অঙ্গনে লক্ষ্মীপূজার আল্পনা আঁকছে একটি লাবণ্যবতী তরুণী, সর্বাঙ্গে তার কাঞ্চন ফুলের শুভ্রশ্রী। নরেন বিদেশে চাকরী করে, তিন মাস, ছয় মাস অন্তর সে দেশে যায়; তার প্রতীক্ষায় ঘরে বসে প্রহর গোণে নীলিমা। সেই কথা ভেবে নরেনের প্রবাসের কর্ম-নীরস দিনগুলি রসসিক্ত হয়ে ওঠে। এখন সময় দেশে বেঁধে গেল দাঙ্গা; বিদেশে বসে নানা রকম গুজব শুনে শুনে নিজের গ্রামে যাবার জন্য নরেন মনে মনে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু গাড়ী চলাচল না হলে লোকে দেশে যাবে কি করে? সে সব দিনের কথা মনে হলে আজও নরেনের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তার পর দেশের অবস্থা কিঞ্চিৎ শান্ত হলে নরেন দেশে গিয়ে ভাবল, এখানে না এলেই ভালো ছিল। কেন না তাদের গ্রামে কোনও লোক-জন নেই। বাড়ী-ঘর সমস্ত গভীর শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করছে। তার মধ্যে দামী বস্তু আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু সব চেয়ে বড় দুঃসংবাদ হোল এই যে, তার স্ত্রী নীলিমার সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না—ভিন্ গাঁয়ের লোকেরা কেউই কোনও সঠিক খবর দিতে পারল না। নরেন তার সম্বন্ধে অনেক কিছুই ভাবত, কিন্তু কোনও চিন্তাই শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করত না। সেই থেকে নরেন আর দেশে যায়নি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, তার দেশের পরিত্যক্ত ভিটেতে একটি ভিখারিণী রমণী যেন শূন্য মনে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে—তার কুটিরের শ্রীর সঙ্গে সঙ্গে রমণীর সমস্ত সৌন্দর্যও যেন মায়ামন্ত্রে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাস্তবিক, এ পৃথিবী থেকে অনেক বস্তু অতর্কিতে অদৃশ্য হয়ে যায়!

একটি অস্পষ্ট কোলাহলে নরেনের চোখের সামনে থেকে পাৎলা কুয়াসা কেটে গেল। তার হাজতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জেলার; আদালতে যাবার সময় হয়েছে। স্তিমিত দীপশিখার মত তার আচ্ছন্ন দেহটা সকালের জ্বলন্ত আলোয় প্রাঙ্গণের মধ্যে দিয়ে কেঁপে কেঁপে এসে কয়েদী-গাড়ীর অন্ধকার আবর্ত্তের মধ্যে হারিয়ে গেল।

লোকে লোকারণ্য আদালত-কক্ষ। বিচার আরম্ভ হতে আর দেরী নেই; কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে নরেন। তার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ ভাবলেশহীন। পাগলের মত সে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে আছে দর্শকমণ্ডলীর দিকে। এক সময় সবিস্ময়ে সে দেখল, অপরিচ্ছন্ন বসন-পরিহিতা তার স্ত্রী নীলিমাকে সঙ্গে নিয়ে ও কে আসছে? সেই কজ্জলটানা চক্ষু, রক্তবিম্বাধরা তার প্রভুকন্যা রুমা নয় কি? হ্যাঁ, তাই ত! কিন্তু এ যে অসম্ভব ব্যাপার! যারা তার হাজতবাসের সময় পুরাতন ভৃত্য বলেও তাকে একবার স্মরণ করেনি, আর আজ!—ওঃ বুঝেছি, আজ বিচার দেখতে এসেছে কিন্তু নীলিমাকে সংগ্রহ করল কোথা থেকে? নরেন নিজের চোখকে কিছুতে বিশ্বাস করতে পারছে না। ওদিকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় নীলিমা বেশ সপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কে বলবে যে, সে পথের ভিখারিণী? বিচার আরম্ভ হয়ে গেছে; রুমা চকিত হয়ে বার বার নীলিমার দিকে দৃষ্টিপাত করছে; না সে ঠিক আছে। এক সময় আদালত-কক্ষকে স্তম্ভিত করে দিয়ে নীলিমা বেশ স্পষ্ট স্বরে বললে, "আমি যে গাড়ীর নীচে পড়েছিলুম, তাতে গাড়ীর চালকের কোনও দোষ ছিল না; কেন না, আমি ইচ্ছে করেই চলন্ত গাড়ীর সামনে দিয়ে ঘুরে ওর কাছে ভিক্ষা চাইতে আসছিলুম। ও আমার স্বামী!"

জোড়া জোড়া বিস্মিত দৃষ্টি অগ্নিগোলকের মত বিদ্ধ করতে লাগল লাবণ্যবতী নীলিমার কম্পিত দেহলতাকে। ইতিমধ্যে সকলে শুনলো যে, মামলা ডিসমিস হয়ে গেছে। কলগুঞ্জনে আদালত-কক্ষ মুখর হয়ে উঠল।

উত্তাল জনসমুদ্রে আন্দোলিত মধ্যাহ্নের রৌদ্রতপ্ত রাজপথ। নরেন সেই মুক্ত রাজপথে দাঁড়িয়ে মুক্তির একটা পরিপূর্ণ নিশ্বাস নিল। রুমা এবং নীলিমার সঙ্গে দেখা করার জন্য সে গাড়ী-ষ্ট্যাণ্ডের ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। এমন সময় অদূরে গাছের আড়ালে দেখা গেল লাল শাড়ীর জরীর আঁচল, তার পাশে ময়লা ডুরে শাড়ীর ফুলপাড়। ওরা এদিকেই আসছে; নরেনের হৃদ্‌পিণ্ডটা ধ্বক্-ধ্বক্ করে উঠল। যে রুমাকে ধনিকন্যা বলে ও চিরদিন মনে মনে অবজ্ঞা করে এসেছে, আজ নিজের স্ত্রীর পাশে দেখে ওর মন অকারণ সহানুভূতিতে ছল্‌ছল্ করে উঠল। এক জন ছিল আহত হয়ে পথে পড়ে, আর এক জন ছিল মিলনের নেশায় বিভোর হয়ে প্রাসাদের উচ্চতম শিখরে, এ দু'জনের মধ্যে মিলন সম্ভব হোল কি করে?

নরেন বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, এমন সময় তার কানের পাশে পরিচিত কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল, "এই যে নরেন, কেমন আছ? তোমার জন্য এই কয় দিন ধরে আমায় যা পরিশ্রম করতে হয়েছে, সে কথা নীলিনা জানে।"

বিনীত হেসে নমস্কার করে নরেন বললে, "দিদিমণি, আপনি এ সবের মধ্যে কেন এলেন? বড় সাহেব শুনলে কিন্তু খুব অসন্তুষ্ট হবেন।"

সুন্দর ভ্রুভঙ্গী করে রুমা বললে, "কচু, তোমার বড় সাহেব জানবেন কি করে? জানতে পারলে আমি কিন্তু নির্ঘাৎ ত্যাজ্য-কন্যা হবো।"

কথা বলতে বলতে তারা একটি ছোট্ট গাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। রুমা ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "এখন আমাদের বাড়ী চল নরেন, বাবা-মা তোমাদের দু'জনকে দেখলে খুব খুশী হবেন; কেমন, যাবে ত?"

নরেন চকিতে নীলিমার দিকে দৃষ্টিপাত করল; কিন্তু সে-মুখ তখন গুণ্ঠনে আবৃত। নরেন ভাবল, পুরানো আবাসে ফিরে না গিয়ে সে স্ত্রীকে নিয়ে যাবেই বা কোথায়? এত বড় পৃথিবীতে আজ তার নিজের বলে কোথাও এক ফোঁটা মাটি নেই। এই শোচনীয় বেকারত্বের যুগে অন্য চাকরিই বা সে পাচ্ছে কোথায়? ঘাড় নেড়ে সে বললে, "হ্যাঁ দিদিমণি, সেখানেই আমি যাবো।"

"তুমি নীলিমাকে নিয়ে ভেতরে বোসো।"—বলে রুমা চালকের পাশে গিয়ে বসল। নরেন দেখলো, ষ্টিয়ারীং ধরে বসে আছে সেদিন হাওড়ার পথে দেখা সেই যুবকটি।

পরিচিত পথ দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে। নরেনের প্রভুর আসনে বসে মনে মনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তার পাশে সঙ্কুচিত হয়ে বসে আছে নিতান্ত গ্রাম্য-বধূ নীলিমা। পথের এলোমেলো বাতাসে তার মাথার গুণ্ঠন খসে গেছে। মুখখানি সম্পূর্ণ অনাবৃত। শ্রমক্লান্ত হলেও ভারী কমনীয়। কপালের পাশের ক্ষতচিহ্নটি দগ্‌দগ্‌ করছে। এ মুখ নরেনের অত্যন্ত পরিচিত। সে চকিতে একবার বাইরের আসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখল, তাদের উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়ে রুমা আর তপন গল্পে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নরেন অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে ডাকল, "নীলা?"

নীলা তার স্তিমিত দীপশিখার মত দৃষ্টিখানি তুলে ধরল নরেনের মুখের পানে। নরেন তার পাশে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বললে, "তুমি কোলকাতায় এলে কি করে?"

নীলিমার চোখ দু'টি ছল্‌ছল্‌ করে উঠল। সে বললে, "মরে যাইনি কেন সেই কথা জিগ্যেস কর? কিন্তু মরতে পারিনি শুধু তোমার জন্য—"

নরেনের বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল; না জানি এবার কি সাংঘাতিক কথা শুনতে হয়। সে ভালো করে নীলিমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল—নাঃ, মুখের কোনও রেখা কলঙ্কের কালিমায় কুটিল হয়ে ওঠেনি; সেই রকম ঠিক পূর্বের মতই ভীরু রজনীগন্ধার মত প্রাণ-রসে টলটল করছে। তবে—

নরেনের দৃষ্টিপাতে সঙ্কুচিতা হয়ে নীলিমা বললে, "দাঙ্গার ভয়ে তখন দেশের কি অবস্থা, তুমি ত জানো না? সকলে ভিটে-মাটি ছেড়ে পালাবার জন্য ছটফট করছে। শুধু প্রাণটুকু রক্ষা করবার জন্য লোকে টাকা-পয়সা জলের মত খরচ করছে, নানা লোকে নানা রকম ভয়ের কথা বলছে। একলা ঘরে দুয়ার বন্ধ করে আমি সারা দিন কেঁদে মরি, এমন সময় বামুনপাড়ার এক জনরা কোলকাতায় যাচ্ছে শুনে অনেক কেঁদে-কেটে আমি তাদের সঙ্গী হলাম—তারা কোলকাতায় পৌঁছে আমায় ইষ্টিশানে ফেলে চলে গেল। আমি জানতুম তুমি গাড়ী চালাও, তাই সেই থেকে পথে পথে ঘুরে বেড়াই, গাড়ী দেখলেই গিয়ে ভিক্ষে চাই, এই ভিক্ষে করে খেয়ে কোনও রকমে বেঁচে আছি; রাত্রে একটা বুড়ীর কাছে থাকি, তাকে রান্না করে দিতে হয় শুধু সন্ধে বেলা।" নীলিমা থামল, উত্তেজনায় তার দেহ থর-থর করে কাঁপছে; একটু চুপ করে থেকে আবার সে বললে, "সেদিন তোমায় দেখেই গাড়ীর সামনে দিয়ে ছুটছিলুম, ইচ্ছে ছিল তোমায় গিয়ে ধরে ফেলবো, কিন্তু তা হোল না। হাসপাতালে যখন জ্ঞান হোল, তখন পাশে এই দিদিমণিকে দেখতে পেলুম, বড় ভালো মেয়ে, আমায় বড় যত্ন করেছে। সেই ত বুদ্ধি করে আজ আমায় এখানে নিয়ে এসেছে।"—নরেনকে নীরব দেখে সে আবার বললে, "আমি ভিখিরী হয়েছি বলে কি তুমি আমায় ঘেন্না কোরছো?"

নিতান্ত সরল প্রশ্ন—কিন্তু এর উত্তর নরেনের কণ্ঠে এসে আটকে গেল।

বিজ্ঞাপনে বীতস্পৃহা?

—আপনি, বিজ্ঞাপন দেন না কেন কাগজে? এক জন ক্রেতা দোকানের মালিককে জিজ্ঞেস করে।

—বিজ্ঞাপন? বলবেন না, বিজ্ঞাপন দিতে বলবেন না। বললে দোকানের মালিক।

—বিজ্ঞাপন দিতে বলব না, বলেন কি আপনি? বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞাপন না দিয়ে কেউ ব্যবসায় লাভ করেছে? বললে ক্রেতাটি।

—আমি বিজ্ঞাপন দেওয়ার বিরুদ্ধে। দোকানের মালিক বললে গম্ভীর হয়ে। —বিজ্ঞাপন কেউ যেন কখনও না দেয়।

—বলেন কি? বিজ্ঞাপন দেবেন না কি? ক্রেতাটি বিস্মিত হয়ে বললে।

মালিকটি তদুত্তরে বললে,—গত বছরে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম কাগজে। ফলে হয়েছিল কি, আমি তখন থেকে এখনও পর্য্যন্ত দেশে যাওয়ার সময় পেলাম না! বিজ্ঞাপন দিয়ে দোকানে এত বেশী ভিড় আর এত বেশী বিক্রী হচ্ছে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

৩

নৃত্যশাস্ত্রে আমার এমন কোন জ্ঞান নেই যে, তুলনামূলক বিচার করবো। পঞ্চাশটি রূপসী নর্ত্তকীর মধ্যে চিখামির-নোভার অপূর্ব সাবলীল দেহের বিচিত্র ভঙ্গিমা, লীলাচঞ্চল পদদ্বয়ের লঘু গতি, তিন হাজার দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন। নৃত্যের অনায়াস নৈপুণ্যে তিনি প্রণয়বেদনা- বিহ্বল একটা ভাবলোকের সৃষ্টি করলেন, যার মাধুর্য রসে অভিভূত হয়ে গেলাম। মূর্খ ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ধনীর মন-ভোলানো নটীর চপল নৃত্য নয়, মানুষের নীচ প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করবার জন্য বিশেষ অঙ্গের স্থূল সঞ্চালন নয়,—এ দেহাতীত আনন্দময় সত্তার প্রকাশ। এই অভিনয়ের রাতে বৃটেনের 'রেড-ডীন' ডাঃ হিউলেট জনসন উপস্থিত ছিলেন। তিনি যবনিকা পড়লে, আমাদের 'বক্সে' এসে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। পক্ক কেশ, সৌম্য মূর্ত্তি, দেখলেই শ্রদ্ধায় অবনত হতে হয়।

রুশ-দর্শকেরা আনন্দ প্রকাশ করবার বা নট-নটীদের অভিনন্দিত করবার জন্য বারম্বার দীর্ঘস্থায়ী করতালি দিয়ে থাকে। যবনিকা পড়া মাত্র হাততালি গ্রামে গ্রামে উঠতে থাকে। যাঁর বা যাঁদের উদ্দেশ্যে এই করতালি, তাঁরা পর্দা সরিয়ে দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত হন। তাঁরা অন্তরালে গেলে আবার দ্বিগুণ জোরে হাততালি পড়তে থাকে। এই ভাবে অন্তত তিন-চার বার নট-নটীদের গুণমুগ্ধ ভক্তদের দর্শন দিতে হয়। যবনিকা পড়া মাত্র আমি তো কানে আঙুল দিতাম, পার্শ্ববর্তীরা অবাক হয়ে তাকাত। আনন্দে আত্মহারা হয়ে এই বিরামহীন করতালির মাধুর্য আমি কিছুতেই উপভোগ করতে পারতাম না। এটা আতিশয্য সন্দেহ নেই, কিন্তু এ দেশে শিল্পী লেখক কবির প্রতি লোক-সাধারণের যে অনুরাগ ও শ্রদ্ধা দেখেছি, তা আমাদের দেশের শতকরা আশী জন অশিক্ষিত এবং শিক্ষিতম্মন্য কুশিক্ষিত-দের কাছে প্রত্যাশাই করা যায় না।

এদের অভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্যকলার উৎকর্ষ সাধনের পেছনে রয়েছে রাষ্ট্রের সাহায্য। জাতীয় নাট্যশালা আমাদের দেশে এখনও কল্পনার ব্যাপার। কলকাতা সহরে এক কালে বেসরকারী নাট্যশালার সমাদর ছিল। কিন্তু সিনেমার খেলো চটকদার ছবি তাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। অন্যত্র দূরস্থান, রাজধানী নয়াদিল্লীতেও একটা নাট্যশালা নেই। রাশিয়ায় দেখলাম, সিনেমায় বা নাট্যশালায় যৌন আবেদনপূর্ণ অভিনয় নেই, প্রায়-উলঙ্গ নারী-দেহের অংশ-বিশেষকে অনতি-উদ্ঘাটিত করে লোভীদের উদ্ভ্রান্ত করা ওখানে অচল। কেন না এরা এগুলোকে লোকশিক্ষার বাহন বলেই মনে করে। লোকের রুচিবোধ নেমে না যায়, সেদিকে এদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। আর আমাদের দেশে হলিউডের নকলে চলচ্চিত্র-শিল্পের দিনে-দিনে যে কত অধঃপতন হচ্ছে, তা নিয়ে বিলাপ করাও নিষ্ফল। আমি রাষ্ট্রের সাহায্যের কথা বলেছি, কিন্তু এখানে সিনেমা নাটকের ওপর রাষ্ট্র বা কমিউনিষ্ট পার্টির দরদ আছে, খবরদারী নেই। চলচ্চিত্র এবং অভিনয়ের গল্প ও নাটক নির্বাচন করেন লেখক ও

পাইয়োনিয়র্স ছেলেমেয়েদের কুচকাওয়াজ ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ দেখছেন

হোটেল ন্যাশানাল—মস্কো
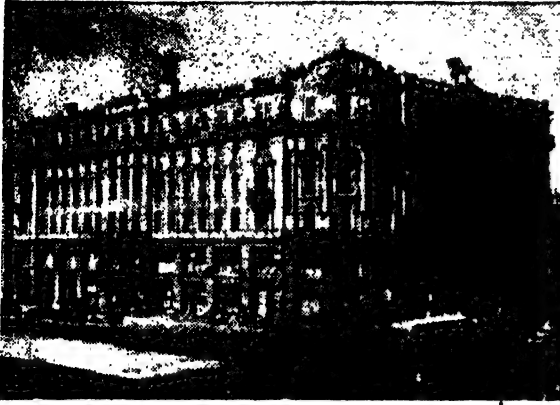
শিল্পীসঙ্ঘ। এঁদের ইউনিয়ন থেকেই এগুলো সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, লোকে পয়সা দিয়ে দেখে এবং যে আয় হয়, তা থেকে শিল্পীরা মজুরী পান এবং তৈরী ও পরিচালনার খরচাও উঠে আসে।

মস্কোএর সরকারী শিশুসাহিত্য প্রকাশভবন। কিন্তু শিশুসাহিত্য বললে ভুল হবে। পাঁচ থেকে সতের বছরের স্কুলের ছেলেদের জন্য ছবি গল্প উপন্যাস ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগীয় বই সুনির্বাচিত হয়ে এখান থেকে প্রকাশিত হয়। নির্বাচন করেন শিশু-সাহিত্যিক-সঙ্ঘ। কেবল রুশ ভাষার মৌলিক রচনা নয়, পৃথিবীর সব ভাষার ভাল বই অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা আছে। সংস্কৃত ভাষার কথাসরিৎসাগর, দশকুমারচরিত ও বিষ্ণুশর্মার উপাখ্যানের অনুবাদ দেখলাম, অবশ্য ভারতীয় চলতি ভাষা থেকে অনুবাদ খুবই কম হয়েছে। ফরাসী, জর্মন ও ইংরেজীই বেশী। প্রবেশ-পথের পরই পাশাপাশি দু'টো পাঠাগার। একটায় ৫।৬ বছরের ছেলেরা নানা রঙ্গীন ছবির বই দেখছে, আর একটায় ১৪।১৫ বছরের ছেলে-মেয়েরা পড়ছে। দেয়ালে সাহিত্যিকদের ছবি—দু'পাশের তাকে থরে-থরে বই সাজান। পড়ুয়াদের সাহায্য করার জন্য পরিদর্শিকারা রয়েছেন। এখানে কর্ত্রী থেকে সকলেই নারী। পরিপাটি পড়বার ও বসবার জায়গা। পড়ুয়ারা আমাদের দেখে সচকিত হয়ে উঠ্‌লো। আমরা এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটি ১৪ বছরের মেয়ে ভিক্তর হুগোর "নাইনটি থ্রি" পড়ছে, আর একটি মেয়ে পড়ছে, বিশ্ব-ইতিহাস। সে ভারতের অংশটা বার করে দেখালো, সম্প্রতি ভারত যে ভাগ হয়ে পাকিস্তান হয়েছে সে খবরও রাখে। এদের সঙ্গে আমরা আলাপ জমিয়ে নিলাম। এক জন মোটর-চালকের মেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের দেশে কিশোর-আন্দোলন, কিশোর-সঙ্ঘ আছে? উত্তর দিলাম; ছাড়া ছাড়া ভাবে সঙ্ঘ-সমিতি আছে বৈ কি? তারা কি করে? বিজ্ঞান-ইতিহাস আলোচনা করে কি না, দেশের পরিচয় লাভের জন্য দল বেঁধে ভ্রমণে যায় কি না? উত্তর দিলাম, এ-রকম সুবিধা আমাদের দেশে খুব কম ছেলে-মেয়েই পেয়ে থাকে। একটি ছোট মেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো, কোরিয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে তোমার মত কি? আমি বললাম, আমাদের দেশের লোক যুদ্ধকে ঘৃণা করে। আমেরিকার এই জুলুমে আমাদের সহানুভূতি কোরিয়ানদের দিকে। সে উৎসাহিত হয়ে বললে, তোমাদের দেশে শান্তি-আন্দোলন আছে? নিশ্চয়ই আছে। আমার কথা শুনে মেয়েটি দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। এক মুঠো চীনেমাটির ছোট ঘুঘু এনে আমাদের জামায় পরিয়ে দিল। আগ্রহ ভরে বললো, তোমাদের দেশের কিশোর-কিশোরীদের আমাদের অভিনন্দন জানিয়ো, বলো, আমরাও যুদ্ধ-বিরোধী শান্তি-আন্দোলন করছি।

এখানে নানা বিভাগ। একটা বড় হল দেখলাম, মাসে দু'বার নামজাদা শিশু-সাহিত্যিকেরা এসে বক্তৃতা করেন, দেশ-বিদেশের শিশুশিক্ষার কথা শোনান। অগ্রসর হয়ে দেখি, একটি কক্ষে ১৫।২০টি যুবতী মেয়ে শিশু-সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছে। এরা গ্র্যাজুয়েট, গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে ডিপ্লোমা পেলে, হয় শিক্ষয়িত্রী নয় লাইব্রেরিয়ান হবে। শিক্ষা স্বাস্থ্য শিশুপালন সমাজসেবা ব্যাপারে এখানে নারীদেরই প্রাধান্য। শিশুদের সব রকম যত্ন নিয়ে মানুষ করে তোলা এরা ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে। ছোটদের সব রকম প্রতিষ্ঠানে কমরেড স্তালিনের বাণী লেখা দেখেছি, শিশুদের অকল্যাণে রাষ্ট্রের অকল্যাণ। একটি শিশুকেও যেন অবহেলা না করা হয়। ছোটদের মানসিক উন্নতির জন্য এখান থেকে বৎসরে ৫০ লক্ষ বই সোভিয়েতের নানা কেন্দ্রে পাঠান হয়, এদের ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী আছে। আমরা অধ্যক্ষকে প্রশ্ন করলাম, কোন্ শ্রেণীর বইএর চাহিদা বেশী। তিনি বললেন, গল্প ও জীবজন্তুর কথা ও ভ্রমণকাহিনীর পরেই ছোটরা বিজ্ঞান-ইতিহাসের বই বেশী পছন্দ করে। ডিটেক্‌টিভ বা খুন-চুরি-ডাকাতি নিয়ে লেখা বই আমরা ছোটদের হাতে দেই না।

আমরা যখন মস্কোএ তখন স্কুল-কলেজের গ্রীষ্মের ছুটি। এ সময় সহরের ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। চলে যায় গ্রামে, স্বাস্থ্যনিবাসে। সাইবেরিয়া, ককেশাস, কৃষ্ণসাগরের তীর, সর্বত্র ছোটদের পাইওনিয়র ক্যাম্প ও সেনাটোরিয়াম আছে। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা আসে সহরে। গ্রামের ও সহরের খালি স্কুল-কলেজের বাড়ীগুলোতে এরা থাবার-থাকবার ব্যবস্থা করে নেয়। এই ভাবেই এদের শিক্ষা তো চলেই, বিশাল দেশের সঙ্গে পরিচয়ও নিবিড় হয়ে ওঠে। এর জন্য সরকার থেকে এবং বিভিন্ন শ্রমিক-সঙ্ঘ থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। কৃষ্ণসাগরের তীরে সুকুমীতে দেখেছি, বেলো-রুশ, উক্রেনের ছেলে-মেয়েরা এসেছে, মহানন্দে সমুদ্র-স্নান করছে। আবার লেনিনগ্রাদের "পাইওনীয়র্স প্যালেস" বা কিশোর-প্রাসাদে দেখেছি, দূর-দূরান্তর থেকে ছেলে-মেয়েরা এসেছে। এটি জারের আমলের প্রকাণ্ড প্রাসাদ ছিল। ২০০ কারুকার্যময় কক্ষ। এখন ৯ থেকে ১৪ বছরের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ও আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হয়েছে। আমরা যখন গেলাম, তখন দেখি বাজনার তালে তালে বাগানে প্রায় দু'শো ছেলে-মেয়ে গান গেয়ে নাচছে। বাগানের গাছতলায় ছেলে-মেয়েরা জটলা করে নানা রকম খেলায় মেতেছে। এই প্রাসাদে সিনেমা, থিয়েটার, পুতুলের থিয়েটার, লাইব্রেরী, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণীবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। জারের আমলে যে সব সুরম্য কক্ষে কার্পেটের ওপর অভিজাত সুন্দরীরা নৃত্যে-লাস্যে বিভোল হতেন, সেখানে কৃষক-শ্রমিকের ছেলে-মেয়েরা নানা রকম শিক্ষা লাভ

করছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা-কক্ষটি দেখে চমৎকৃত হলাম। আলো নিবে যাওয়া মাত্র দেখি, উপরে আকাশে সূর্য চন্দ্র পৃথিবী গ্রহগুলি অগণিত তারকামণ্ডলীর মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে! গ্রহ-নক্ষত্রের গতি, দূরত্ব প্রভৃতি এই ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। এটাকে ছোটদের একটা বিশ্ববিদ্যালয় বললে অত্যুক্তি হয় না। এমনি সব শিক্ষায়তন এরা দেশের সর্বত্র গড়ে তুলেছে। ভাবীকালের সুস্থ-সবল মানুষ গড়বার জন্য।

২৫শে জুন সোমবার। সোমবার এখানে ছুটির দিন। জানলা দিয়ে দেখছি, মেয়েরা থলেয় রুটি-তরকারী, মাছ-মাংস নিয়ে চলেছে। সোমবার অন্য সব দোকান বন্ধ হলেও খাবারের দোকানগুলো খোলা থাকে। কাজেই অত্যধিক ভীড়। একটা দোকানে ঢুকে দেখি, চিনি কিনবার জন্য বিরাট কিউ। যেখানে রেশনকার্ড নেই, বাঁধা-বরাদ্দ নেই, সেখানে এত ভীড় কেন? জানতে পারলাম, এখন ষ্ট্রবেরীর মরশুম। মেয়েরা সারা বছরের জন্য জ্যাম-জেলী তৈরী করে রাখবে, তাই চিনির চাহিদা বেড়ে গেছে। শুনেছিলাম, এ দেশে গেরস্থালী বলে কিছু নেই। সকলেই সরকারী লঙ্গরখানায় পাইকারী ভাবে তৈরী খাবার খায়, ব্যক্তিগত রুচির বালাই নেই। এখানে মেয়েরা কারখানায় হাসপাতালে স্কুলে আপিসে কাজ করে বটে, তেমনি আবার স্বামী ছেলেপেলে নিয়ে ঘরকন্নাও করে। বাজার মেয়েরাই বেশীর ভাগ করে। কয়েকটা দোকান ঘুরে দেখলাম, তরি-তরকারী আমাদের দেশের মতই। আলু, পেঁয়াজ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমাটো, শাক, মটরশুটি, মায় আমাদের লাউ কুমড়ো বেগুন পর্যন্ত। এ ছাড়া শশা আঙুর আপেল পীয়ার ষ্ট্রবেরী প্রভৃতি ফল। অবশ্য ফলের অজস্রতা দেখেছি জর্জিয়ায়, উজবেকীস্থানে। মস্কো-এ বেশীর ভাগ ফল বাইরে থেকে আমদানী করা। দোকানে এদের জিনিষপত্র কেনা দেখে লোক-সাধারণের স্বচ্ছলতার আঁচ পাওয়া যায়। যাকে বলে একেবারে নিঃস্ব, এ দেশে তারা লোপ পেয়েছে।

মস্কো এবং অন্যান্য সহরের সর্বত্র দেখেছি, ঠেলা-গাড়ীর ওপর রাস্তার ফুটপাতে সরবত ও আইসক্রীমের দোকান। ছেলে-বুড়ো সকলেই রাস্তায় আইসক্রীম বা "মারোজনা" চিবুতে চিবুতে যাচ্ছে। দাম কম নয়, ৭৫ কোপেক থেকে দেড় রুবল। এ কথাটা মনে পড়লো একটা বিশেষ কারণে। রাশিয়া থেকে ফিরবার পথে কয়েক দিন রোমে ছিলাম। এখানে আমেরিকানরা ইংরেজীতে দৈনিক "রোম আমেরিকান" নামে একখানা কাগজ বার করে। এক দিন দেখি, ঐ কাগজে লিখেছে, বার্লিন যুব-উৎসবে যোগদানকারী দেড় হাজার রুশ যুবক-যুবতী পুলিশ-কর্ডন ভেঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিণ এলাকায় প্রবেশ করে। ওরা পেটুকের মত আইসক্রীম খেতে লাগলো। এ জিনিষ ওরা জীবনে কখনো খায়নি। রাশিয়ানদের সম্বন্ধে এমন আজগুবী গল্প বললে, বিশ্বাস করার লোকের অভাব হয় না! খাবার ওদেশে প্রচুর ও সস্তা, ওদেশে ভেজিটেবল ঘি বা মার্গারিন নেই। কৃত্রিম স্নেহ-পদার্থ ওদেশে আইনতঃ নিষিদ্ধ।

দলবদ্ধ হয়ে দোভাষী সঙ্গে নিয়ে লাইব্রেরী, ম্যুজিয়ম, কারখানা প্রভৃতি দেখার সুবিধে আছে, এ ছাড়া অল্প সময়ে অনেক জিনিষ দেখাই কঠিন। মোটরে পথের দু'ধারে যা দেখি, তার পরিচয় রুশ-সঙ্গী না থাকলে অজ্ঞাতই থেকে যায়, তবুও মাঝে মাঝে আমি
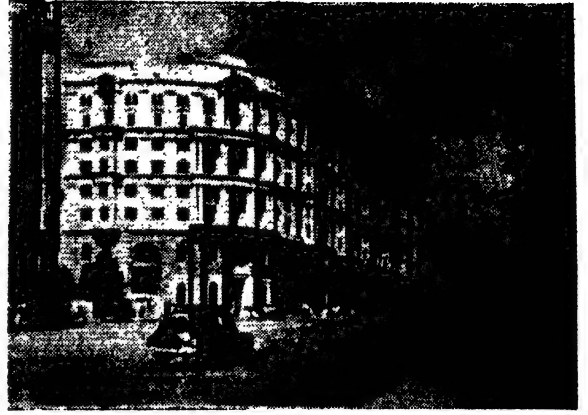
গর্কী ষ্ট্রীট—মস্কো

মস্কোয় রাস্তায় একা বেরিয়ে পড়তাম। আমাদের ভ্রমণ-তালিকা সুরু হত ১০টায় প্রাতরাশের পর। প্রভাতে অনেকটা সময় পেতাম। সুযোগ পেলেই ৩।৪ মাইল চক্কর দিয়ে আসতাম। দোকান-পশার আর জনতা দেখতাম, কথা বলার কোন সুবিধাই হত না। কিন্তু চোখে দেখার শিক্ষাও কম নয়। দেখতাম, ঝাড়ুদারণী হাতলওয়ালা লম্বা ঝাঁটা নিয়ে রাস্তা সাফ করছে, পায়ে জুতো, সিল্কের মোজা, রঙ্গীন ছিটের পোষাক, হাতে হাতঘড়ী, হাঁটু পর্যন্ত একটা সাদা কাপড়ের আবরণী। মাথায় রুমাল দিয়ে চুল বাঁধা। নিটোল স্বাস্থ্য, মুখে বিরক্তির চিহ্ন নেই। চোখের সম্মুখে ভেসে উঠতে কলকাতার মেথরাণীরা—রূপ ও সজ্জার বর্ণনার প্রয়োজন নেই। নীল রঙের কোট, পাতলুন পরা পোর্টার ঠেলা-গাড়ীতে দুধ বা দৈএর বোতল, বরফ নিয়ে চলেছে, আমাদের দেশের মতো শতছিন্ন মলিন কটিবাস পরা নয়। একটি লোকও কোন দিন রাস্তায় ভিক্ষের জন্য হাত পাতেনি। বড় রাস্তার পাশ দিয়ে গলিতে ঢুকেও দেখেছি, উলঙ্গদেহ ধূলি-ধূসরিত অপুষ্ট দেহ ছেলে-মেয়ে নেই। মস্কোএর নাগরিকেরা সকলেই ধনী, স্বচ্ছল—এমন কথা বলি না, কিন্তু আমাদের দেশে হতদরিদ্র, পরের উচ্ছিষ্ট-ভোজী, পশুর মুখের গ্রাস কেড়ে খাওয়া মানুষের সঙ্গে তুলনায়, এরা জীবন যাপনের অসম্মান ও হীনতা থেকে মুক্তি পেয়েছে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। রোমের রাস্তায় ধুতি-পাঞ্জাবী পরে বেরিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছিলাম, ছেলের দঙ্গলের টিটকারীর চোটে পালিয়ে এসে হোটেলে ফিরিঙ্গী সেজে বাঁচি। কিন্তু মস্কো, স্তালিনগ্রাদ, তাসকেণ্টে আমার বাঙ্গালী পোষাক দেখে, ছেলে-বুড়ো সকলেই বিদেশী বলে সম্ভ্রম দেখিয়েছে। বহু জাতির বাস সোভিয়েতে জাতি, বর্ণবিদ্বেষ একেবারেই লুপ্ত হয়েছে। এর কারণ, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সর্বসাধারণের দেশভ্রমণের দরাজ ব্যবস্থা করেছেন। ইয়োরোপ থেকে এশিয়া পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত সুবৃহৎ এদের দেশ, বহু ভাষাভাষী বিচিত্র জাতীয় মানুষ এর অধিবাসী। আমাদের বিশাল ভারতে কিছু তীর্থযাত্রী ও সৌখীন ভ্রমণকারী ছাড়া কে দেখেছে বিচিত্র মানবমণ্ডলীকে! আমাদের এবং অন্যান্য দেশে যেমন ভ্রমণটা সখের ও ব্যয়সাপেক্ষ, যা ধনী লোকের পক্ষেই সম্ভব,
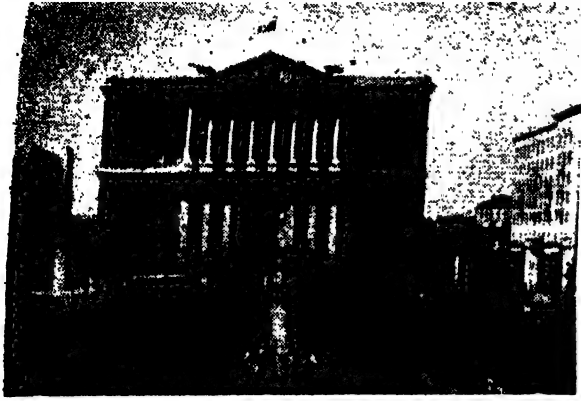
সোভিয়েত দপ্তরখানা—মস্কো

সোভিয়েতে ঠিক তার উল্টো। কৃষক শ্রমিক বুদ্ধিজীবী নরনারীরা দল বেঁধে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সরকারী খরচে ও ব্যবস্থায় ভ্রমণ করছে, এ ও-দেশের সাধারণ নিয়ম। বিভিন্ন রিপাবলিককে ভ্রমণের উৎসাহ দেওয়া, তার সুবিধে করে দেওয়ার ফলে অপরিচয়ের সঙ্কোচ গেছে ঘুচে। তাই এরা ভারতীয় পোষাক দেখলেও চমকায় না, আত্মীয়ই মনে করে। মস্কোর রাস্তায় বাঙ্গালী পোষাকে ভ্রমণ করবার সময় দেখেছি, অনেক মেডেলওয়ালা সামরিক কর্মচারী আমাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে অভিবাদন করে অপ্রস্তুত করেছেন। এরা কেবল শ্রেণীভেদ লুপ্ত করেনি, জাতিভেদ, বর্ণভেদও লুপ্ত করেছে।

৪

আমরা একটা 'পাইয়োনীয়র্স ক্যাম্প' দেখবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করাতে কুশলকর্মা কমরেড অকসানা ব্যবস্থা করে ফেললেন। ছোটদের লালন-পালন, শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে এ দেশে নানা রকম পরীক্ষা ও গবেষণা চলেছে, তার কথা বইএ পড়েছি, কিন্তু শিক্ষা কি ভাবে মানুষের মন ও চরিত্রের মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠছে সেটা চোখে দেখা স্বতন্ত্র কথা। মস্কো থেকে আমরা রওনা হলাম মোটরে, ৬০ মাইল পথ। চওড়া পীচ-ঢালা মসৃণ রাস্তা। সহরের পর গ্রাম আরম্ভ হল। পথের দু'ধারে বাগান-ঘেরা কৃষকদের পুরনো ধরণের কাঠের বাড়ী, দূরে দূরে আধুনিক দোচালা ধরণের বাংলো, সব্জীবাগান ও অবারিত শস্যক্ষেত্র, কোথাও রাই ও গমের শীষ বাতাসে দুলছে। কোথাও বা আলুর ক্ষেত। তারি মাঝে মাঝে বার্চ, পাইনের বন। এখানকার জমি আমাদের দেশের মত আল দিয়ে টুকরো টুকরো করা নয়। দিগন্তে শ্যামল বনরেখাবলয়িত প্রসারিত শস্যক্ষেত্রগুলি দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। ক্রমে বড় রাস্তা ছেড়ে একটা কাঁচা রাস্তায় আসা গেল। গ্রামের মধ্য দিয়ে বাঁক ঘুরে ঘুরে চলেছি—বাড়ীগুলোর উঠানে ছাগল, ভেড়া, মুরগী; পুকুরে হাঁস; বাইরে চেয়ারে বসে মেয়েরা উল বুনছে, ছেলে-মেয়েরা খেলা করছে। সব চলচ্চিত্রের ছবির মত দু'পাশে সরে যাচ্ছে।

একটা বৃহৎ গ্রামের এক প্রান্তে একটা উঁচু ডাঙ্গা জমির ওপর ছেলে-মেয়েরা শিবির স্থাপন করেছে। স্থানীয় স্কুলবাড়ী দুটোতে শোবার ব্যবস্থা, এ ছাড়া খাওয়া, পড়াশুনা, খেলাধুলার স্বতন্ত্র ঘর আছে। চারদিক অজস্র হলদে, সাদা বেগুনী ফুলে ছেয়ে আছে, তার পর নানা রকম গাছপালা। এই অপূর্ব পরিবেশের মধ্যে ফুল-লতাপাতা আর লাল পতাকা দিয়ে সাজান তোরণদ্বারে ছেলে-মেয়েরা দুই সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছিল, আমরা প্রবেশ করতেই ওরা জয়ধ্বনি করে উঠলো। নিজেদের হাতে গড়া ফুলের তোড়া উপহার দিল। হাসি-খুসী ছেলে-মেয়েদের কি নিঃসঙ্কোচ আচরণ! আমাদের যেন কত পরিচিত। একটা ঘরে আমাদের নিয়ে গেল। এখানে একধারে ক্ষুদে বৈজ্ঞানিকরা কীট, পতঙ্গ, প্রজাপতি, নানা রকম গাছের পাতা বীজ ইত্যাদি সংগ্রহ করেছে। নিজেদের আঁকা ছবিতে দেয়াল ভরে ফেলেছে; মাটি দিয়ে খেলনা তৈরী করেছে, সেলাই ও বোনার কাজও আছে। একধারে একটা পিয়েনো, সমবেত সঙ্গীত হল। আগ্রহ ভরে সব দেখতে লাগলাম। নয় থেকে পনর বছরের প্রায় একশ' ছেলে-মেয়ে মস্কো থেকে এই শিবিরে এসেছে। এরা লেখক, সাংবাদিক ও কবিদের ছেলেমেয়ে।

এদের সঙ্গে আমরা গল্প জমিয়ে তুললাম। শিবিরচালনা, খাওয়া-দাওয়া, রান্না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ছোটদের সাহায্য করা এ সব ভার নিজেরাই ভাগ করে নিয়েছে। পরিদর্শিকা ও শিক্ষয়িত্রীরা আছেন। নিয়মিত ব্যায়াম, খেলাধুলা, ক্লাস চলে। দল বেঁধে এরা গ্রাম প্রদক্ষিণে যায়, প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশে গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে বসে, দেশের গঠন-কাজের গল্প করে। এদের সঙ্গে কথা কয়ে দেখলাম, সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাভাবিক প্রবণতাকে সযত্নে বাড়িয়ে চলেছে। নয়-দশ বছর বয়সেই ছেলে-মেয়েরা মোটামুটি জীবনের লক্ষ্য বুঝতে পারে—বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রশিল্পী, লেখক বা কারিগর কে কি হবে। সেই ভাবে এদের স্কুলের শিক্ষায় প্রত্যেকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে লালন করা হয়। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের মত হৃদয়াবেগ ও বুদ্ধির সঙ্গে সংযোগহীন পড়া মুখস্ত করার পাইকারী ব্যবস্থা এখানে নেই। আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালীতে ছেলেদের মনে জ্ঞান লাভ করবার, জানবার কোন কৌতূহলই উদ্রিক্ত হয় না। এরা কেবল নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের পড়া মুখস্ত করে, যথাসময়ে তারই পুনরাবৃত্তি করে পাশের নম্বর সংগ্রহ করে। এখানে শিক্ষার গোড়ার কথাই হল, মানুষ তৈরী করা, পরীক্ষায় পাশ করান নয়। গাছ বেড়ে ওঠে প্রাকৃতিক নিয়মে, তবু চারা অবস্থায় তাকে বেড়া দিয়ে রক্ষা করতে হয়, জল ও সূর্যের আলোর ব্যবস্থা করতে হয়। এরাও তেমনি ভাবে মানব-শিশুর ভিতরের শক্তির স্বাভাবিক বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে, তার বাড়তির প্রবণতা কোন্ দিকে লক্ষ্য করে।

আশ্চর্য হ'লাম, এই সব কিশোর-কিশোরীরা তাদের দেশের কত খবর রাখে। এরা কল-কারখানা, হাসপাতাল, যান্ত্রিক চাষের প্রণালী, এ সব দেখেছে। মানুষকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিক্ষায় স্বাস্থ্যে উন্নত করার জন্ম দেশব্যাপী যে উত্তম চলেছে, একদিন তারা তার ভার পাবার যোগ্যতা লাভ করবে, এই এদের উচ্চাশা। এদের কথা শুনি, আর আমার দেশের সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় মানবজীবনের নির্দয় অপচয়ের কথা ভাবি। ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত এখানে সরকারী খরচে শিক্ষার আবশ্যিক ব্যবস্থা। স্কুলের শিক্ষা

শেষ করে কেউ যায় কলেজে, কেউ বা কর্মশালায় প্রবেশ করে। কলেজ বা স্কুল থেকে পাশ করে কেউ বেকার থাকে না। এদিকে আমাদের দেশে ছেলেরা আই, এস, সি পাশ করেও জানে না যে, সে কি হবে, কোন্ পথে যাবে! মেডিকেল কলেজ বা ইঞ্জিনিয়রিং কলেজে ভর্ত্তি হওয়া তো লটারীর টিকিট পাওয়ার মত দুর্লভ সৌভাগ্য। শিক্ষিত সুস্থকায় যুবক-যুবতীকে ওদেশে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে চাকুরীর জন্য তোষামোদ করে দ্বারে দ্বারে ফিরতে হয় না। বেকারী, দারিদ্র্য ও অচরিতার্থতার জগদ্দল পাথরে চাপা পড়ে, সোভিয়েত রাশিয়ার যৌবন আমাদের দেশের মত হতোদ্যম নৈরাশ্যে ম্রিয়মান নয়। শিক্ষাশালা থেকে বেরিয়ে আসলেই তাকে বরণ করবার জন্য রাষ্ট্র ও সমাজের কর্মশালার দ্বার উন্মুক্ত।

বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, আমাদের বিদায় নেবার সময় হল। এঁরা না খাইয়ে ছাড়বেন না। গ্রামের মাতব্বরেরা এসেছেন। সস্ত্রীক এক জন প্রাচীন ডাক্তার এসেছেন। জারের আমলে বাইরে কাটিয়েছেন, ইংরাজী জানেন। এঁর সঙ্গে পুরনো দিনের গল্প করতে করতে আমরা সুসজ্জিত টেবিলে বসে গেলাম। মেয়েরা পরিবেশন করছিলেন; তাঁরাও এসে অতিথিদের পাশে বসে গেলেন। এটা খাও ওটা খাও বলে অনুরোধ, ঠিক আমাদের দেশের মেয়েদের মতই। পশ্চিমী শিষ্টাচারের আড়ষ্টতা নেই। আমার পাশে যে মেয়েটি বসেছিল, দীর্ঘদেহ উন্নত নাসা, আয়ত নীল চক্ষু, সর্বাবয়ব সুঠাম! ও হাস্য পরিহাসে উচ্ছল হয়ে উঠেছে, এমন সময় আমি বললাম, তুমি রূপে লক্ষ্মী, গুণেও হয়তো সরস্বতী, বিয়ে করনি কেন? তোমার পাণিপ্রার্থীর নিশ্চয়ই অভাব নেই।

পলকে ওর মুখে বিষাদের ছায়া নামলো। গাঢ় স্বরে বললে: বিয়ে হয়েছিল, এখন বিধবা, গত যুদ্ধে আমার স্বামী মারা গেছে।

বিধবা বিবাহ তো তোমাদের সমাজে অগৌরবের নয়।

নিশ্চয়ই নয়। যুক্তির দিক দিয়ে যখন চিন্তা করি, তখন বুঝি এই বৈধব্যের কোন মানে হয় না। কিন্তু হৃদয়াবেগ স্বতন্ত্র জিনিষ; আজ ছয় বছরেও তার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা ও বিশ্বাস নিয়ে আমরা নীড় রচনা করেছিলাম। স্বদেশপ্রেমিক সাহসী যুবক; ফাসিস্ত দস্যুদের আক্রমণ থেকে পিতৃভূমি রক্ষার যুদ্ধে ছুটে গেল? বীরত্ব ও যুদ্ধে কৃতিত্বের জন্যও তিনটে সোনার মেডেল পেয়েছিল। আমাদের মহান্ নেতা কমরেড স্তালিনের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত মেডেলটা আমি আজীবন বুকে বহন করবো। ভাবি, এত দিনে হয়তো আমাদের ছেলেপুলে হত। তা যখন হয়নি, তখন এই পাইয়োনিয়র্সদের মধ্যেই আমার ছেলে-মেয়েদের পেয়েছি; এদের সেবা করি, আর শান্তির কথা বলি। যুদ্ধ বড় ভয়ঙ্কর সর্বনাশের। বলতে-বলতে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের দেশেও তো শুনি বিস্তর বিধবা আছে, তারা কি করে জীবন কাটায়?

কি আর করবে। আত্মীয়-গৃহে দাসীবৃত্তি করে, নয়তো তীর্থস্থানে ভিক্ষে করে খায়, সমাজে তাদের স্থান— আর বলতে পারলাম না, কথা আটকে গেল।

কেন তোমরা তো তাদের শিক্ষয়িত্রী, নার্স করতে পার। যেমন আমাদের দেশে শিশুপালনাগার, কিণ্ডারগার্টেন আছে, তোমাদের তা কি নেই! মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা?

না নেই, ও সব হতে অনেক দেরী আছে।

মেয়েটি উন্মনা হয়ে বলে, আমরা যদি তাদের পেতাম, শিখিয়ে দিতাম, স্বাধীন দেশের মানুষ কি করে তৈরী করতে হয়। কথার মোড় ঘুরিয়ে ও জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা, তোমাদের দেশের মেয়েরা শান্তি আন্দোলন করে? আর একটা বিশ্বযুদ্ধ না বাধে, আমরা যে জন্যে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব গঠন করছি।

আমাদের দেশে শিক্ষিতা মেয়েরা যুদ্ধবিরোধী। আমরাও যুদ্ধ চাইনে। কেন না, তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধলে নিরন্ন রোগগ্রস্ত দরিদ্র ভারতে মৃত্যুর মহামারী লেগে যাবে। আমরা শান্তিরক্ষার জন্য তোমাদের সাথেই চলেছি।

মেয়েটি আগ্রহে আমার হাত চেপে ধরে বললে, দেশে গিয়ে তোমাদের মেয়েদের বলো, যুদ্ধ বড় ভয়াবহ। আমাদের দেশে আমার মত কত হতভাগিনী স্বামী-পুত্র হারিয়েছে, কত সুখের ঘর ভেঙে গেছে। যে বুলেট আমার স্বামীর বুকে বিঁধেছিল, সেটা আমার পাঁজরে এখনো বিঁধে আছে। সীসের মত ভারী, বুক ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। সব দেশের মেয়েরা এক হয়ে দাঁড়ালে যুদ্ধ রোখা সম্ভব।

পায়োনিয়র্সরা 'ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী দৃঢ় হোক' ধ্বনি দিয়ে আমাদের বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানালে। মস্কোয় ফিরছি। নির্মল আকাশে অসংখ্য তারা ঝলমল করছে! এমনি পলকহীন দৃষ্টিতে ওরাও এক দিন দেখেছে,—নাৎসী বর্বরতার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। রুশ-যুবতীর বেদনার্ত চোখ দু'টি যেন অজস্র হয়ে অনন্ত শূন্যে শান্তির মৌন আকুতি জানাচ্ছে।

লিসিস্কো সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ

৫

প্রাক্-বিপ্লব যুগের রুশ-সাহিত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সকলেরই জানা। পুষকিন, গোগোল, টলষ্টয়, তুর্গেনিভ, গর্কির রচনার সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যামোদীদের অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। রুশীয় সাহিত্যের এই প্রাচীন সম্পদ্ যা এক দিন মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, আজ তা সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঐতিহ্যের ধারায় সমসাময়িক সোবিয়েত সাহিত্যও স্বদেশের গণ্ডী অতিক্রম করে সকল দেশের প্রগতিশীল নর-নারীর চিত্তে রেখাপাত করছে। শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থায় নবযুগের নর-নারীর রূপান্তরিত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্যোতনায় অনুরঞ্জিত আধুনিক রুশ-সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বিশ্ব-মানবের বাস্তব জীবনের সঙ্গে এর যোগসূত্র অব্যাহত রয়েছে। এই কারণেই বিপ্লবোত্তর যুগের কবি, নাট্যকার, লেখকেরা আমাদের কাছে অপরিচয়ের বিস্ময় নন।

সোবিয়েত রাশিয়ায় আমরা মস্কো লেখক-সঙ্ঘের অতিথিরূপে গিয়েছিলাম। এই কারণে নানা উপলক্ষ্যে এঁদের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিলাম। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, স্তালিনগ্রাদ, তিবলিসি, তাসকেণ্ট প্রভৃতি সহরে লেখক, কবি, নাট্যকারদের ইউনিয়ন আমাদের অভ্যর্থনা করেছেন। কেবল ভাবের আদান-প্রদানের শিষ্টাচার নয়, বর্তমান যুগের সঙ্কট ও সমস্যাগুলি সমাধানে সকল দেশের সাহিত্যিকদের কর্তব্য কি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার উপায় কি, এ সব নিয়েও আলোচনা চলতো। দেখেছি, কোন বিশেষ মতের পোষকতা করবার জন্ত এঁরা সাহিত্যকে একই মাপে ঢালাই বা যাচাই করেন না। ডিকেন্স, আনাতোল ফ্রাঁস, সেক্সপীয়র, বায়রণ, গেটে প্রভৃতির রচনা এখানে খুবই জনপ্রিয়। ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার এঁদের আগ্রহ অকৃত্রিম। অনেকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এঁদের মনের প্রসারণ দেখে মুগ্ধ হলাম। সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে এঁরা দেশ-বিদেশের গণ্ডি অতিক্রম করে, সর্বমানবের কল্যাণে অতীতের রক্ষণশীলতার কুহকমুক্ত জ্ঞানের সাধনাকে গ্রহণ করেছেন। সাহিত্যের মধ্যে সর্বকালের একটা আনন্দরূপ আছে, যে তীর্থে প্রাচীন ও নবীনের সৃষ্টির অর্ঘ্য এক সমন্বয়ের মধ্যে বিধৃত, এইটি অস্বীকার করলে রুচিবিকার ঘটে, এবং তা এড়াতে হলে ভাবের আদান-প্রদান চাই। এই কারণেই এঁরা রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস অনুবাদ করছেন, সংস্কৃত ভাষার আবরণে অতীতের মহার্ঘ চিন্তাসম্পদ, এঁরা স্বদেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের চলতি ভাষা এবং আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে এঁদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য খুব বেশী। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা, হিন্দী, উর্দ্দু সাহিত্যের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচন্দ, কিষেনচন্দ, মুলুকরাজ আনন্দ, ভবানী ভট্টচার্যের রচনা রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে, এর পাঠক-সংখ্যা কম নয়। শ্রমিকদের সংস্কৃতি ভবনগুলির লাইব্রেরীতে এই সব বই দেখেছি। সোভিয়েতের সাধারণ মানুষের পাঠস্পৃহা, সকল দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি এদের অনুরাগ প্রশংসনীয়।

রবীন্দ্রনাথ কোন উপলক্ষ্যে বলেছিলেন, সাহিত্যসৃষ্টি যৌথ কারবার নয় বলেই একক নিঃসঙ্গ সাধনায় আমরা সাহিত্যসৃষ্টি করতে পেরেছি। বৈষয়িক ক্ষেত্রে সকলে মিলে কাজ করবার অপটুতা সত্ত্বেও সাহিত্য-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যমে বাঙ্গালীর সাফল্য স্বীকার করতেই হবে। কথাটা আমিও স্বীকার করি কিন্তু এও তো সত্য, এই শতকরা ৮৫ জন নিরক্ষরের দেশে সাধারণ কবি ও লেখকদের তো কথাই নেই, রবীন্দ্রনাথের রচনার রস কয় জন উপভোগ করতে পারে। এখানে সমষ্টি মানবের মনের দ্বার, বাতায়ন রুদ্ধ। আমাদের দেশে একক চেষ্টায় যেখানে সাহিত্যসাধনা সফল হয়েছে, তার সার্থকতার পেছনে একটা বেদনার ইতিহাসও আছে। গিরি-নির্ঝরিণীর কল্লোলিত নৃত্যের নূপুর নিক্কণে, পাষাণবন্ধ ভেদ করার বেদনার সুরও ধ্বনিত হয়। এমন দিন ছিল যখন কবিরা ছিলেন সভাকবি। সম্রাট বা সামন্ত নৃপতিদের স্তাবক ও বিদূষক হয়ে, তাঁদের প্রসাদ-লালিত কবিরা স্তুতিবাদ রচনার ফাঁকে ফাঁকে কাব্য রচনা করতেন। কালিদাস, বানভট্ট থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্র পর্যন্ত এই ধারাই চলেছে। বাঙ্গলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদার শ্রেণীর মধ্যেও এই ধারা গত শতাব্দীতেও ক্ষীণভাবে বয়েছে। বিদেশী শাসন ও ইংরাজী শিক্ষিতবর্গের অবজ্ঞা সত্ত্বেও সাহিত্যপ্রতিভার যে বিকাশ হল, তাও জমিদারী ও সরকারী চাকুরীর আওতায়। পরবর্তী যুগে দেখলাম, হঠাৎ টাকা করা এক শ্রেণীর মুর্খ ও আত্মম্ভরী ধনীর আবির্ভাব—সাহিত্য, শিল্পকলা এদের নিকট অবজ্ঞেয়। অথচ গণতান্ত্রিক জনতা মহারাজও তাঁর সিংহাসন পাননি। এই প্রতিকূলতা ঠেলে যাঁরা জনপ্রিয় হয়েছেন, তাঁদের বন্দনা করবার সময় আমার মনে হয়, সেই সব কবি ও সাহিত্যিকের কথা, যারা দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, উদরান্নের জন্ত রক্ত-পিপাসু প্রকাশকের নিকট সামান্য মূল্যে গ্রন্থ বেচে দিয়েছে, অথবা আশ্বাস পেয়ে বঞ্চিত হয়েছে। যে মনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের ফসল ফলবে, সেই মন চতুর বিষয়ীর বিষাক্ত নিশ্বাসে মরুভূমি হয়ে গেছে। কল্পনাপ্রবণ সংবেদনশীল তরুণ মন—যেখানে সোনা ফলতো, সেখানে অচরিতার্থতার গ্লানির ক্লেদ দীর্ঘশ্বাসে জ্বলে ওঠে। কে নভেল লিখে পয়সা করলো, কে সিনেমার গল্প লিখে বাড়ী-গাড়ী করলো, আমরা তাই চোখ মেলে দেখি। কিন্তু দেখিনে,

বলশই থিয়েটার ভবন

একটু সহানুভূতি, সাহায্য এবং জীবিকার নিষ্ঠুর প্রয়াস থেকে একটু অবকাশ পেলে যারা জাতীয় সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি করতে পারতো, তারা ঝরে যায়, সরে যায়, কালের চিহ্নহীন পথে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। যৌবনে কবি গোবিন্দদাসকে তিন দিন চিঁড়ে খাওয়ার পর অভুক্ত অবস্থায় মরতে দেখেছি, সুরেশ সমাজপতিকে প্রায় অচিকিৎসায় চিরনিদ্রায় অভিভূত হতে দেখেছি। মলিন শয্যাশায়ী রুগ্ন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার হাত ধরে বলতে শুনেছি, "আমার জন্য তোরা চাঁদার খাতা খুলিসনি। হয়তো ২৭।/০ আনা চাঁদা উঠবে, সে তো মরণাধিক অপমান।" পরিণত বয়সে কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকেও নিদারুণ যক্ষ্মা রোগে প্রায় অচিকিৎসায় মারা যেতে দেখলাম। রাগ বা অভিমান করে এ সব কথা বলছিনে, যে সব পাটোয়ারী বুদ্ধি, সাহিত্যিক লেখকদের অপমান করে বঞ্চনা করে, কটুভাষী সাহিত্যিক ভাড়াটে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে পরিবাদ রটনা করে, তাদের আমি অভিশাপ দেবো না। যে সমাজের মধ্যে জন্মেছি, তার মূঢ়তাকে ক্ষমা করবো ; কিন্তু দেশের সাহিত্যসেবকদের বেদনা ও অপচয় তো ভুলে থাকতে পারিনে। ভাবি, সিনেমার ছবির চটকদার, খেলো ও ক্ষণিক উন্মাদনা আর রেডিয়ো যন্ত্রের সঙ্গীতের নামে রাসভ নিনাদ তার স্থূল রুচি নিয়ে বর্তমানকে আচ্ছন্ন করে রাখবে, এই কি আমাদের বিধিলিপি!

সোভিয়েট রাশিয়ার অবস্থা স্বতন্ত্র। এখানে সাহিত্যিক লেখক সাংবাদিকদের প্রচুর উপার্জন ও প্রভূত সম্মান। দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের মানদণ্ড উন্নত করবার ভার যাঁদের হাতে, তাঁরা যাতে নিরুদ্বেগ স্বচ্ছল জীবন যাপন করতে পারেন, সেদিকে সোভিয়েট রাষ্ট্র ও সমাজ অবহিত। অন্যান্য বৃত্তিজীবী শ্রমিকদের মত এঁদেরও সঙ্ঘ বা ইউনিয়ন আছে। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এঁরা অবশ্য ফরমাইসী সাহিত্য সৃষ্টি করেন না, তবে লেখকদের বৃত্তিগত স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করেন। এখানে বুভুক্ষু লেখকদের সংবাদপত্রের মালিক বা প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয় না। বিভিন্ন শ্রেণীর দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, সাময়িক পত্রিকা আছে, লেখক-সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রের আনুকূল্যে রুশ ও অন্যান্য ভাষায় বই প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। ইংরাজী, ফরাসী, জর্মণ প্রভৃতি ভাষা থেকে অজস্র বই অনুবাদ করা হয়। এর জন্য সকলেই প্রায় সমান মজুরী পেয়ে থাকেন। লেখকের অবস্থা বুঝে প্রকাশকদের দাঁও মারবার দর-কষাকষি নেই।

বিখ্যাত "লিটারারি গেজেটের" সম্পাদক, কবি ও নাট্যকার সিমোনভের আমন্ত্রণে আমরা একদিন "গর্কী লিটারারি ইনষ্টিটিউট" দেখতে গেলাম। তরুণ-তরুণীদের কবি সাহিত্যিক সাংবাদিকরূপে তৈরি করে তুলবার এই প্রতিষ্ঠানটি লেখক-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ছাত্র-জীবনে যাদের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও রচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাদের এখানে শিক্ষা ও আত্মবিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। সাহিত্য রচনা ছাড়াও, শিক্ষার্থীদের ভাষাতত্ত্ব, বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস, মার্কসীয় দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও অধ্যাপকগণ এখানে নিয়মিত ক্লাস নেন, ছাত্রদের রচনা সংশোধন করেন। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২০ জন। এখানে পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন ও শিক্ষানবিসী করতে হয়। ছাত্রদের কোন বেতন দিতে হয় না, বরং গুণানুযায়ী ২৫০ থেকে ৮০০ রুবল ভাতা পায়। বিনা ভাড়ায় ট্রামে বাসে ট্রেণে যাতায়াত এবং সরকারী ভোজনালয়ে সস্তা দামে খাবার সুবিধেও এরা পায়। দেখলাম, বাপ-মার ওপর নির্ভরশীল ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্প।

সহরের মাঝখানে বাগান-ঘেরা একটা পুরনো বাড়ী—চাপা সিঁড়ি বেয়ে আমরা হল-ঘরে প্রবেশ করলাম। ছাত্রেরা ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী ও বিশ্বশান্তির জয়ধ্বনি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলো। একটা লম্বা টেবিলের দু'ধারে ছাত্রদের নিয়ে আমরা বসলাম। এরা চা কেক বিস্কুট ফল সরবতের ব্যবস্থা করেছে। ছেলে-মেয়েদের মুখ আগ্রহে ও প্রীতিতে উজ্জ্বল। এরা এই প্রথম ভারতীয় লেখকদের অভ্যর্থনা করার সুযোগ পেয়েছে। এখানে প্রায় সব রিপাবলিকের ছাত্র আছে। রুশ মোঙ্গল কাজাক আর্মানী তুর্কোমান সাইবেরিয়ান জর্জিয়ান উজবেক ছাড়াও, বুলগারিয়া রুমানিয়ার ছাত্র আছে। অধ্যাপক এক জন আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার পর, ছাত্রদের অনুরোধে আমরাও একে একে আত্মপরিচয় দিলাম। এইবার সুরু হল প্রশ্নের পালা। আলোচনা কেবল প্রগতিশীল সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো না, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, কৃষক-শ্রমিকদের আন্দোলন অবস্থা, ভারতের শিক্ষাবিধি, সাহিত্যিকদের অবস্থা এ-সব আমাদের বলতে হল। বৃটিশ আমলে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের যে ব্যবস্থা ছিল এখন তা অনেক পরিমাণে শিথিল হয়েছে একথা বলায় এক জন ছাত্র জিজ্ঞাসা করলো, তোমাদের গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতিতে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখার বিরুদ্ধে তোমরা আন্দোলন কর কি না? গোঁজামিল দিয়ে জবাব দেওয়া ছাড়া কোন সদুত্তর দিতে পারলাম না। এইবার আমরা প্রশ্ন করতে লাগলাম। এক জন মোঙ্গল যুবককবি বললে, সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা হবার পূর্বে আমাদের কথ্য ভাষার কোন বর্ণমালা ছিল না, কতকগুলি লোকসঙ্গীত

ক্রেমলিনে লেনিনের সমাধি

ও মুখে মুখে চলতি গল্প গাথা ছিল। সোভিয়েত আমলে আমাদের নিজস্ব বর্ণমালা (রুশ নয়) হয়েছে। মোঙ্গল ভাষায় কবিতা ও সাহিত্য রচিত হয়েছে। বিদ্যালয়ে মোঙ্গল ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হয়। আমার রচিত কবিতা জনসাধারণ প্রশংসা করায়, মোঙ্গল রিপাবলিক বৃত্তি দিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এখানে পাঠিয়েছেন।

শুনলাম, জারের আমলে মধ্য-এশিয়ায় জাতীয় ভাষার পরিবর্তে জোর করে রুশ ভাষা চালান হত। বিদ্যালয়ে, আপিস-আদালতে দেশী ভাষা চলতো না। সোভিয়েত আমলে জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য অতি ক্ষুদ্র উপজাতিদের কথ্য ভাষাকেও উন্নত করে তোলা হয়েছে। কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রত্যেক ভাষা জীবন্ত ও গতিশীল হয়ে উঠেছে মাত্র ২৫ বৎসরের মধ্যে। কোথাও মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে জোর করে রুশ ভাষা চালাবার চেষ্টা নেই। এক জন আর্মেনীয়ান যুবতী বললে, এক দিকে তুর্কীদের অত্যাচার, অন্য দিকে জারের পীড়ন-নীতি এই দুই চাপে পড়ে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার পর কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে আমাদের জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি তার অতীত ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। এক জন উজবেক তরুণীর মুখেও ঐ কথাই শুনলাম। মোল্লা-মৌলভীরা আরবি, পারসিক ভাষা চর্চা করতেন; উজবেক ভাষা কেবল কথ্য ভাষা ছিল। আমরা রুশ বর্ণমালা গ্রহণ করে সাহিত্যসৃষ্টি করেছি; নানা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য উজবেক ভাষায় অনুদিত হয়েছে। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়কলার এত উন্নতি হয়েছে যে, সমস্ত সোভিয়েত রাশিয়ার সংস্কৃতিতে আমরা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছি।

এই সব শিক্ষার্থীরা, পাঁচ বছরের অধ্যয়ন শেষ করে 'ডিপ্লোমা' পাবে; তার পর লেখক ও সাংবাদিক সঙ্ঘের সভ্য হয়ে কর্মজীবন আরম্ভ করবে। অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে জীবিকার অন্বেষণে সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত করার নিষ্ঠুর অপচয় এখানে নেই। যৌথ ভাবে এরা সাহিত্যসৃষ্টি করে না, পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল নিবিড় ঐক্যের মধ্যে এরা অনুদ্বিগ্ন চিত্তে সাহিত্যসাধনা করে। সে সাধনার প্রস্তুতির মধ্যে কত অধ্যবসায়, কত সহানুভূতি, রাষ্ট্র ও সমাজের কত আনুকূল্য—'গর্কী সাহিত্য শিক্ষালয়' তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাহিত্য, ললিতকলা ও কারুশিল্পের সাধকগণের চিন্তা, কল্পনা ও সৃষ্টির ঐশ্বর্য বিস্তারের অবাধ সুযোগের পথ এরা সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এদের সাম্প্রতিক সাহিত্য রচনায় যুদ্ধ, হিংসা, জাতিবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষের স্থান নেই। সাহিত্যিক ও লেখকদের প্রত্যেক অভ্যর্থনা-সভায় তাঁরা ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেছেন: আপনারা দেশে ফিরে গিয়ে আপনাদের সতীর্থদের বলবেন যে, সোভিয়েতের লেখকেরা মানবমৈত্রী ও বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাসী। মুনাফাশিকারীদের লোভের দ্বারা কলুষিত রাষ্ট্রনীতি বহু মানবের দুর্গতির প্রতি অন্ধ হয়ে আর একটা যুদ্ধের ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলছে, ভারতের প্রগতিশীল লেখকেরা তার বিরুদ্ধে জনমত সজাগ করে তুলুন! আমরা যখন উত্তরে বলেছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমাদের আত্মকর্তৃত্ব ছিল না, ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরশাসনের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা—তবুও রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা ফাসিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে জনমত সজাগ করেছি; ফাসিজমের নিদারুণ বলদৃপ্ত পরের অধিকার লঙ্ঘনের নির্লজ্জ পাশবিকতা থেকে আপনারা কেবল আত্মরক্ষা করেননি, ইয়োরোপ তথা মানব-সভ্যতাকে বহু ত্যাগস্বীকারে রক্ষা করেছেন; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু আমাদের জীবন খর্ব, দারিদ্র্যে পীড়িত, শিক্ষায় বঞ্চিত; আমাদের লোকসাধারণের বৈষয়িক রিক্ততার মধ্যেও নৈতিক বল আছে, আজ অতলান্তিকের দুই তীর থেকে সভ্যতার প্রতি ভদ্রদায়িত্বহীন যে বিদ্বেষ-বিষ উদগ্র মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করছে, তার অভিসন্ধি আমাদের অজানা নেই, আত্মপ্রকাশ করবার যে স্বাধীনতা বিংশ শতাব্দীর মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ইঙ্গ-মার্কিণ ষড়যন্ত্র তার কণ্ঠরোধ করতে উদ্যত হয়েছে; এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা আপনাদের সহযাত্রী, আমরাও শান্তি ও বিশ্বমানবের মিলনে বিশ্বাসী—তখনই প্রত্যেক সভায় সমর্থনসূচক করতালিধ্বনি উঠেছে। এশিয়ার প্রতি ভারতের প্রতি হয় অবজ্ঞা নয় মুরুব্বীয়ানার ভঙ্গীতে অনুকম্পা, ইয়োরোপ-আমেরিকার এই মনোভাবের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘকালের পরিচয়। কিন্তু রুশ লেখকদের মানসিক গঠন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রাচ্যের প্রতি এদের শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও আগ্রহ দেখে আনন্দিত হয়েছি।

[ক্রমশঃ।

৩৬৫ দিনে বছর ?

বিখ্যাত ব্যবসায়ীর অফিসে চাকুরী খালি আছে! লোক নেওয়া হবে। প্রচুর আবেদনকারী। পরীক্ষা-কার্য্য চলেছে। ব্যবসায়ী এক জন আবেদনকারীকে প্রশ্ন করলেন,—পূর্ব্বে যেখানে কাজ করতে সেখানে কত দিন কাজ করেছিলে।

প্রার্থী বললে,—তা পঁয়তাল্লিশ বছর হবে।

ব্যবসায়ী বললেন,—পঁয়তাল্লিশ বছর! কিন্তু তোমার বয়স এখন কত হবে?

প্রার্থী বললে,—আটত্রিশ।

ব্যবসায়ী বিস্মিত হ'লেন। বললেন,—অর্থাৎ? আটত্রিশ বছর তোমার বয়স বলছো, তুমি পঁয়তাল্লিশ বছর কাজ কি ক'রে করলে?

প্রার্থী বললে,—ওভারটাইম খেটেছি যে। বুঝলেন না?

বস্তু—পদার্থ, দ্রব্য, সামগ্রী, সারাংশ।
বস্তুতঃ—যথার্থতঃ, ফলতঃ, অর্থাৎ।
বস্ত্র—অম্বর, পরিচ্ছদ, বাস, কাপড়।
বহান—চালান, দৌড়ন, যাপন।
বহি—খাতা, পুস্তক, পুথী, লিপি।
বহিঃ—বাহির, অনভ্যন্তরে, বাহ্য।
বহিরঙ্গ—অনাত্মীয়, অসম্পর্কীয়, শত্রু।
বহির্দেশ—বিদেশ, বাহ্যদেশ, বাহ্যস্থান।
বহির্মুখ—বিরত, পরাঙ্মুখ, নিবৃত্ত, ক্ষান্ত।
বহিস্তন—উপরিভাগ, ঊর্দ্ধভাগ।
বহু—ভূরি, অধিক, অনেক, অতিশয়।
বহুদর্শী—বহুদর্শক, নানা বিষয়ক দ্রষ্টা।
বহুধা—বিবিধ প্রকার, নানা মত।
বহুমূল্য—মহার্ঘ্য, মহামূল্য ও উপাদেয়।
বহুরূপী—নানা বেশধারী, নানাকার।
বহুল—অধিক, অনেক, বিস্তর, বহু।
বহ্নি—অগ্নি, অনল, অগ্নিকোণাধিপতি।
বা—বিকল্পবোধক শব্দ, কিম্বা।
বাই—বায়ুরোগ, ঔৎসুক্য, নর্ত্তকী।
বাইশ—কুঠার, পাখুরা, দ্বাবিংশতি।
বাউনিয়া—বামন, হ্রস্ব, খর্ব্বকায়।
বাঁও—বাহু, ব্যাম, যুগ, ধনু।
বাঁক—বক্রতা, ভারের দণ্ড, বাদ্যযন্ত্র।
বাঁকা—বক্র, টেরা, দুরন্ত।
বাঁচন—রক্ষা পাওন, জীবৎ থাকন।
বাঁট—বিভাগ, অংশ, পশুস্তন, আছাড়।
বাঁটুল—বর্ত্তুল, গুলী, কর্কর, মৃৎখণ্ড।
বাঁট্টা—ব্যাজ, মিতি, ফাও।
বাঁড়িয়া—বণ্ড, পুচ্ছবিহীন, ছিন্নলেজ, বেঁড়ে।
বাঁদর—বানর, মর্কট, প্লবগ।
বাঁধ—রোধন, আলি, বাঁধাল।
বাঁশ—বংশ, বেণু।
বাঁশী—বেণু, মুরলী, বংশী।
বাক—কথা, ভাষা, বাক্য, বচন, বাণী।
বাকচাতুরী—গদ্দি, ব্যঙ্গ, শ্লেষোক্তি।
বাকছল—বাকপ্রতারণা, বাক্যের ছল।
বাকজাল—বাক্যের বাহুল্য, বাকসমূহ।
বাকপটু—সৎকথক, সদ্বক্তা, বাগ্মী।
বাকপারুষ্য—কটূক্তি, গালাগালি।
বাকযুদ্ধ—কলহ, ঝকড়া, বাকবিবাদ।
বাকলা—গাছের ছাল, বল্কল, তবক।
বাকসিদ্ধ—অব্যর্থ বাক্যবাদী।
বাকস্থ—আজ্ঞাবহ, বচনস্থ, বশ।
বাখান—অর্থ করা, ব্যাখ্যা।
বাখারি—বাকারী, বংশখণ্ড, তপ্ত চুণ।
বাগীশ—বাকপতি, বৃহস্পতি, গীষ্পতি।

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

বাগুন—বার্ত্তাকু, বেগুন।
বাগুরিক—মৃগজীবী, লুব্ধক, ব্যাধ।
বাগে—দিগে, কাছে, পানে, পার্শ্বে।
বাগড়া—প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত, বিঘ্ন।
বাগদণ্ড—হিক্কারাদি, অনুযোগ।
বাগদত্ত—প্রত্ত, বিবাহে দত্ত।
বাগদেবী—সরস্বতী, বাণী, ভারতী।
বাগ্‌বজ্র—অভিশাপ, মন্যু, অমঙ্গলেচ্ছা।
বাগ্মী—বাবদূক, বাচাল, বহুবক্তা।
বাঘ—ব্যাঘ্র, শার্দ্দূল, হিংস্র জন্তুবিশেষ।
বাঙ্‌নিষ্পত্তি—কথা কওন, বাকাস্ফূর্ত্তি।
বাচক—কথক, সূচক, সুস্পষ্ট, পাঠক।
বাচড়া—পতিত ভূমি, ঘোটকের শাবক।
বাচনিক—বচনলব্ধ, কথিত, প্রমুখাৎ।
বাচান—ঝুঝান, প্রকাশন, কহান।
বাচ্চা—শাবক, ছা।
বাচ্য—কথনীয়, অর্থ, অভিপ্রায়।
বাছন—পৃথক পৃথক করণ, মনোনীত করণ।
বাছা—শিশু, মনোনীত।
বাজ—বজ্র, অশনি, ঘৃত, পক্ষীবিশেষ।
বাজন—ক্বণন, শব্দ দেওন, জ্বলন।
বাজনা—বাদ্য, বাজা, বাদ্যযন্ত্র।
বাজরা—চেঙ্গারী, ঝাঁকাবিশেষ।
বাজান—বাদ্য করণ, শব্দ করণ।
বাজী—ঘোটক, অগ্নিবাণ, পণ, পক্ষী।
বাজীকর—ভেল্কীকর, কৌশলকর।
বাজু—বাহুর অলঙ্কারবিশেষ, অঙ্গদ।
বাজুবন্ধ—হস্তালঙ্কার, বাহুভূষণ।
বাঞ্ছা—ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, ইপ্সা।
বাটন—পেষণ, দলন, অংশ করণ।
বাটা—তাম্বূলাধার, পর্ণপত্রাধার, ব্যাজ।
বাটালী—পাখুরা, বাইশ।
বাটিয়া—দড়ি, রজ্জুতাল।
বাটী—বাড়ী, গৃহ, নিকেতন।
বাড়—কাঠাম, আকাকল, তট, অঞ্চল।
বাড়তী—বৃদ্ধি, উদ্‌বর্ত্ত, অধিক।
বাণ—শর, আশুগ।
বাণিজ্য—বণিক-ব্যবসায়, বণিকবৃত্তি।
বাত—বায়ু, বায়ুরোগ।
বাতায়ন—গবাক্ষ, জানালাবিশেষ।
বাতাস—বায়ু, পবন, হাওয়া, মরুৎ।

বাত্তিক—বায়ুজনিত, বায়ুরোগগ্রস্ত।
বাতী—লাক্ষাবিশেষ, মাক্ষিক দীপ।
বাৎসল্য—অত্যন্ত স্নেহ, অনুরাগ।
বাদ—বাক্য, কথক, আক্রোশ, বিবাদ।
বাদক—বক্তা, কথক, বাদ্যকর।
বাদবিতণ্ডা—বাদ'নুবাদ, বিরোধ, বিতর্ক।
বাদল—দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টি, বাদলা।
বাদিয়া—সাপুড্যা, ওঝা, জাতিবিশেষ, সাপুড়ে, বেদিয়া, বেদে।
বাদুড়—বড় চামচিকা, রাত্রিচর পক্ষীবিশেষ।
বাদ্যকর—বাজন্দার।
বাধা—প্রতিবন্ধ, বিঘ্ন, ব্যাঘাত, বাধ।
বাধ্য—বশীভূত, আজ্ঞাবহ, অনুগত।
বানপ্রস্থ—বানাশ্রম, তৃতীয়াশ্রম।
বানপ্রস্থী—বানাশ্রমী, তপস্বী, সন্ন্যাসী।
বান্ধব—বন্ধু, জ্ঞাতি, আত্মীয়, কুটুম্ব।
বাপী—দীর্ঘিকা, জলাশয়, সরোবর।
বাম—সব্য, বিপরীত, বিমুখ, মনোরম।
বামা—স্ত্রীলোক।
বার—দিন, পালা, সময়, মদ্যপাত্র।
বারবধূ—বেশ্যা, বারাঙ্গনা, বারস্ত্রী, বারবিলাসিনী।
বারাণ্ডা—চাঁদনী, পিঁড়া, চন্দ্রাতপ।
বারি—জল, নীর, সলিল, উদক।
বারিজ—জলোৎপন্ন, পদ্ম, গুগলী, শঙ্খ।
বারিদ—মেঘ, জলধর, জলদ, নীরদ।
বারুণী—পশ্চিম দিক, মদ্য, তিথিবিশেষ।
বারোদ্বারী—দ্বাদশ দ্বারযুক্ত, ভিক্ষুক।
বার্ত্তা—কথা, সংবাদ, বৃত্তান্ত, কথোপকথন।
বার্দ্ধক্য—বৃদ্ধাবস্থা, বুড়ানী, শেষাবস্থা।
বার্হস্পত্য—নীতিশাস্ত্র, নীতিবিদ্যা।
বালক—অবগণ্ড, শিশু, ছেলে, কুমার।
বালা—বালিকা, কন্যা, স্ত্রী, বলয়।
বালাই—বিপত্তি; আপদ, উৎপাত।
বালিয়া—সিকতাময়, বেল্যা, বালীময়।
বালিশ—শিতান, উপাধান, উচ্ছীর্ষক।
বালী—বালুকা, সিকতা, কঙ্কর।
বাল্তি—দুঃখী, অনাথ, জলযন্ত্রবিশেষ।
বাল্য—বাল্যকাল, শৈশবাবস্থা।
বাষ্ট্যা—বাসি, পচা, সড়া, পর্য্যুষিত।
বাসন—পাত্র, আধার, বাসন, বাসনা।
বাসা—প্রবাসীর আবাস, নীড়।
বাসাড়ীয়া—প্রবাসী, বিদেশী।
বাস্তব—বাস্তবিক, প্রকৃত, যথার্থ।
বাস্তু—বসৎবাটী, বাসগৃহ।
বাষ্প—ভাপ, ধূম, অশ্রু, উল্লেখ।
বাহক—ভারসহ, মুটিয়া, দাঁড়ী।
বাহন—যান, হস্ত্যশ্বাদি।
বাহন—নৌকা চালান, ভার সহন, চড়ন।
বাহিনী—সৈন্য, তিনগুণ সেনা, অভিমুখী।
বাহু—বাহু, ভুজ, ব্যাম।
বাহ্য—বহনীয় বস্তু, বাহির, বহির্দ্দেশ।
বিউনি—বেণী, জড়িত কেশ, বিনুনী।
বিঁধ—ছিদ্র, রন্ধ্র, ছেঁদা, বিবর, কুহর।
বিকচ—প্রস্ফুটিত, প্রসারিত, প্রকাশিত।
বিকট—ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, কুৎসিত।
বিকল—বিঘটিত, কাতর, ভাবিত, অপূর্ণ।
বিকলাঙ্গ—নুলা, পঙ্গু, খোড়া, কুডৌল।
বিকল্প—দ্বৈধ, সংশয়, দ্বিধা।
বিকশন—বিকাশ, প্রকাশ, ফুটন।
বিকশিত—প্রফুল্ল, প্রকাশিত, প্রস্ফুটিত।
বিকার—স্বভাবের অন্যথা, মান, কিডে।
বিকাশ—প্রকাশ, ফুলের ফুটন, প্রস্ফুটন।
বিকীরণ—ছড়ান, নিক্ষেপন, ছিটান।
বিকীর্ণ—নিক্ষিপ্ত, ছিটান, ছিন্নভিন্ন।
বিকৃত—মতান্তর, পরিণত, নষ্ট, অপকৃষ্ট।
বিক্রম—শক্তি, বল, সাহস, প্রতাপ।
বিক্রয়—বেচা, বিক্রী, পণ্য।
বিক্রান্ত—বিক্রমী, বলবান, বীর, সাহসী।
বিক্রেতা—বিক্রয়কারী, মূল্যগ্রাহক।
বিক্রেয়—পণিতব্য, বিক্রয়ের যোগ্য।
বিক্লব—ভয়াকুল, বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, ঘবরাণ।
বিক্লান্ত—পরিশ্রান্ত, অবসন্ন, ম্লান।
বিক্লিন্ন—শুষ্ক, ম্লান, জীর্ণ, আর্দ্র।
বিক্ষুব্ধ—কাতর, ভাবিত, উদ্বিগ্ন, ক্লিষ্ট।
বিক্ষেপ—ফেলা, ঘবরাণী, ক্ষোভ।
বিক্ষোভ—কাতরতা, ভাবনা, চিন্তা।
বিখ্যাত—প্রসিদ্ধ, বিদিত, সুখ্যাত।
বিগণ—শত্রু, রিপু, বিপক্ষ, বৈরী।
বিগত—প্রেত, অন্তর্হিত, বিযুক্ত।
বিগর্হণ—দোষ দেওন, নিন্দাকরণ।
বিগলিত—পতিত, ঝরা, অবদ্ধ, মুক্ত, দ্রুত।
বিগীত—তিরস্কৃত, নিন্দিত, ভৎর্সিত।
বিগুণ—মন্দ, অকর্ম্মণ্য, ক্ষতি, অপকার।
বিগ্রহ—আকার, যুদ্ধ, প্রতিমা, শরীর।
বিঘটন—দুর্ঘটনা,আপদ, দুরদৃষ্ট।
বিঘা—বিশ কাঠা ভূমি, কুড়া।
বিঘ্নরাজ—গণপতি, গজানন, গণেশ।

[ক্রমশঃ।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

হেলেন কেলার

কেয়া দেবী

"The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched, but just felt in the heart"—একটি অন্ধ বোবা মেয়ে লিখেছিল। কি করুণ অথচ দার্শনিক! ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আলাবামার টাস্কাম্বিয়া শহরে ক্যাপ্টেন কেলারের এক মেয়ে হল। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনই স্বাস্থ্য। দেড় বছর অবধি চাঁদের কলার মত বাড়তে লাগল। তার মাস খানেক পরে হঠাৎ মেয়েটির হল ভীষণ অসুখ। যখন সেরে উঠল, তখন সে দৃষ্টিহীনা, বাক্যহীনা। অন্ধ, বোবা। এই মেয়েটির নামই হেলেন কেলার। আরোগ্যের পথে মেয়েটির মুখ থেকে অস্ফুট ধ্বনি বেরোচ্ছে, যার কোন অর্থ হয় না। কেবল জলের (ওয়াটার) জন্ম ওয়া-ওয়া ধ্বনিটারই মানে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সামান্য ধ্বনিই ক্যাপ্টেন কেলারের বুকে আশা দেয়। হেলেনের বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তি লোপ পায়নি। সে শুধু একটা নীরব অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধা। কারাগারের দ্বার ভেঙ্গে মেয়েকে মুক্তি দিতে হবে। ক্যাপ্টেন কেলার চিন্তা করছেন মুক্তিপথের কথা।

ওদিকে হেলেন হয়ে পড়েছে যেমন দুষ্ট, তেমনই নির্দ্দয়। মনের কথা ব্যক্ত করতে পারে না, যা চায় তা দেখতে পায় না। এই অকৃতকার্য্যের প্রভাব মনের ওপর বিস্তার লাভ করে। তার প্রভাবে হেলেন হয়ে ওঠে হিষ্টেরিক। বোনকে মারছে, জিনিষপত্র ভাঙছে, মাকে ঘরে বন্ধ করছে। এই অস্থিরতা অন্তর্দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ।

ক্যাপ্টেন কেলারের হাতে হঠাৎ এক দিন চার্লস ডিকেন্সের আমেরিকান নোট্‌স পড়ল। দেখলেন যে, ডাক্তার হাউ একটি অন্ধ ও কালা মেয়ে লরা ব্রিজম্যানকে ভাষা শিখিয়েছিলেন। কিন্তু সে ডাক্তার এখন বেঁচে নেই। যেখানে তিনি কাজ করতেন সেই বোষ্টনের ব্লাইণ্ড ইনষ্টিটিউটে চিঠি লিখলেন ক্যাপ্টেন কেলার, হেলেনের সব বিবরণ দিয়ে। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় এক জন উপযুক্ত মহিলা কাজ খুঁজছিলেন। এবং তিনি এই কাজের জন্ম বিশেষ ভাবে শিক্ষিতা ছিলেন। তিনটি গুণের জন্ম শিক্ষয়িত্রী অ্যান সালিভান হেলেনকে কৃতী করতে পেরেছিলেন: প্রচুর উপস্থিত বুদ্ধি, অসীম ধৈর্য্য, অনন্ত সহানুভূতি ও ভালবাসা। এক সময় তিনিও অন্ধ ছিলেন। সেই জন্ম অন্ধের দুঃখ অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারতেন। ডাক্তার হাউএর রেকর্ডগুলো ভাল করে পড়ে, কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি আর একবার ঝালিয়ে নিয়ে মিস্ সালিভান ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যাপ্টেন কেলারের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন। হেলেনের বয়স তখন ছ'বছর।

প্রথম পরিচয়ে হেলেন মিস্ সালিভানের হাত থেকে ব্যাগ কেড়ে নিয়ে খোলবার চেষ্টা করে এবং খুলতে না পেরে ভীষণ চটে যায়। তখন তিনি আবার তার হাতে নিজের ঘড়ি দিয়ে ভোলান। তার পর নিজের ঘরে গিয়ে বাক্স খুলে তিনি হেলেনকে একটা পুতুল (doll) বার করে দেন, আর তার হাতের তালুতে ডল বানান লিখে দেন। হেলেনকে লিখতে বললে সেও ঠিক সেই রকম ভাবে মিস্ সালিভানের হাতের তালুতে ডল বানান লিখে দেয়। ছাত্রীর স্মরণ-শক্তি দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে যান। তার পর তিনি হেলেনকে কেক (cake) খেতে দিয়ে বানান করতে শেখান। উদ্দেশ্য—কথা, বানান ও জিনিষের মধ্যে সম্পর্ক-নির্ণয়। এই হেলেনের প্রথম শিক্ষা।

পরদিন সকালে হেলেনের হাতে একটা সেলাইয়ের কার্ড দিয়ে মিস্ সালিভান তার হাতের চেটোতে কার্ড (card) বানান লিখে শেখাতে গেলেন। c-a লেখা হতেই হেলেন শিক্ষয়িত্রীকে ঠেলে নিয়ে চলল কেক আনবার জন্ম। পূর্ব্ব-সন্ধ্যার শিক্ষার জের।

হেলেনের বদমায়েসী কিন্তু দিন দিন বেড়েই চলল। ভাঙ্গা-চোরা, মার-ধোর করা, কেড়ে খাওয়া! কথায় কথায় রাগ, কান্না। মা-বাপ কিছু বলেন না—আহা বেচারী! মিস্ সালিভান দেখলেন, মা-বাপের কাছ থেকে না সরালে হেলেনকে মানুষ করা যাবে না। এক দিন তিনি মিসেস্ কেলারকে এই কথা জানালেন। মিসেস্ কেলার যুক্তির সারবত্তা বুঝতে পেরে তাঁদেরই এষ্টেটের এক ছোট বাংলোতে গুরু-শিষ্যার বাসের বন্দোবস্ত করে দিলেন।

প্রথম দিন সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা-ব্যাপী ধস্তাধস্তি। হেলেনও শোবে না, মিস্ সালিভানও না শুইয়ে ছাড়বেন না। শেষে হেলেন শুতে বাধ্য হল। এই হল হেলেনের প্রথম বাধ্যতা শিক্ষা। দু'সপ্তাহ পরে গুরু তাঁর এক বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন,—"বিস্ময়কর ব্যাপার! দু'সপ্তাহ পূর্ব্বের অবাধ্য গোঁয়ার অশিষ্ট মেয়ে আজ বাধ্য, শান্ত-শিষ্ট হয়ে গেছে।"

হাঙ্গামা বাধল mug এবং water শেখাতে গিয়ে। রেগে হেলেন তার নতুন পুতুল আছড়ে ভেঙ্গে ফেলল। পা দিয়ে টুকরোগুলোকে মাড়াতে লাগল। শিক্ষয়িত্রী তাকে ধরে নিয়ে গেলেন কলতলায়। তার এক হাত নলের মুখে দিয়ে জল ছেড়ে দিলেন, অপর হাতের তালুতে w-a-t-e-r বানান লিখে দিলেন। হেলেন জলের স্পর্শে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ক্রমে চোখে-মুখে একটা আনন্দের ভাব ফুটে উঠল। গায়ে-মাথায় জল মেখে বার বার ওয়াটার বানান করতে লাগল। বাড়ী ফিরতে ফিরতে বহু নতুন কথা শিখে ফেলল সেদিন। সেই দিনই প্রথম তার মনে দুঃখ বা

অনুশোচনা দেখা দিল। সেই দিনই প্রথম সে শুতে যাবার সময় শিক্ষয়িত্রীকে জড়িয়ে চুমু খেয়েছিল।

পরদিন সকাল থেকে হেলেন কেলারের নতুন জীবনের সূত্রপাত হল। পাঠের ধরণও নতুন। মিস্ সালিভান চেষ্টা করতে লাগলেন, গল্প করে করে জগতের সঙ্গে হেলেনের পরিচয় করিয়ে দিতে। তাতে নতুন কথা, বাক্য-রচনা আর জ্ঞান একসঙ্গে শেখান যায়। মাস তিনেক এই ভাবে চলবার পর তিনি হেলেনকে ব্রেল-পদ্ধতিতে লেখা-পড়া শেখাতে লাগলেন। এ হল অন্ধদের উঁচু উঁচু বিন্দুর সাহায্যে বর্ণপরিচয়-পদ্ধতি। কয়েক দিন একটা ব্রেল-শ্লেট নিয়ে নাড়া-চাড়া করে হেলেন শিক্ষয়িত্রীকে একটা চিঠি দিলে ডাকে পাঠাবার জন্য। এই তার প্রথম চিঠি:

Much words. Puppy motherdog—five. Baby—cry. Hot. Helen walk—no. Sun-fire—bad. Frank come. Helen kiss Frank. Strawberries very good.

তখন হেলেন তিনশ' শব্দ শিখেছে। চার বছর পরে বিশপ ব্রুক্সকে যে চিঠি লিখলে, তাতেই বোঝা যায়, কত তাড়াতাড়ি সে লেখা-পড়া শিখে ফেলেছিল। তাতে লিখেছিল: আমি চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু সে জন্য কোন ক্ষোভ নেই। আমার শিক্ষয়িত্রী আমায় সব বুঝিয়ে দেন। তা ছাড়া জগতে যা-কিছু ভাল, স্বর্গীয়, তা তো চোখে দেখাও যায় না, মনে অনুভব করতে হয়। কাল প্রথম মনে হল, গতি কি চমৎকার। যেন প্রত্যেক দ্রব্য চলেছে ঈশ্বরের পানে।

এগার বছর বয়সে তাকে লেখার নেশা পেয়ে বসে। এবং সেই সময় যে রূঢ় আঘাত পায়, তাতে তার লেখার সখ চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যায়। বোষ্টনের অন্ধদের পার্কিন্স ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ মিষ্টার অ্যানাগসের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। হেলেন তাঁর কাছে একটা গল্প লিখে পাঠায়। গল্পের নাম 'তুষার দেশের রাজা'। তিনি গল্প পড়ে খুশী হয়ে কাগজে ছাপিয়ে দেন। এক পাঠক সেই গল্পের সঙ্গে মার্গারেট ক্যানবি লিখিত 'তুষার দেশের পরী' গল্পের অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করে হেলেনের বিরুদ্ধে চুরির এবং মিষ্টার অ্যানাগসের বিরুদ্ধে জোচ্চুরীর অপবাদ দেয়। খোঁজ-খবর নিয়ে দেখা যায় যে, হেলেন চুরি করেনি, কারণ সে মার্গারেট ক্যানবির লেখা কোন বই-ই পড়েনি। অপবাদ থেকে অব্যাহতি পেলেও তার মন ভেঙ্গে যায়। ক'দিন ভীষণ কাঁদতে থাকে। সেই তার প্রথম ও শেষ গল্প। জীবনে আর কখনও সে "খেলাচ্ছলেও কথার মালা গাঁথেনি।"

চিকাগো ওয়ার্ল্ড্‌স ফেয়ারে হেলেনের বিস্তৃত জ্ঞানার্জ্জনের সুযোগ ঘটে। প্রদর্শনীর সভাপতি তাকে সব বিভাগের জন্য এক হুকুমনামা দেন: "বয়সের তুলনায় অনেক বেশী জ্ঞান ও মেধা এই বালিকার আছে। একে যেন সব জিনিস দেখতে দেওয়া হয়।" এর ফলে প্রত্যেক বিভাগে সে যেতে পেরেছে আর সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ তাকে সব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য হেলেনের সঙ্গে মিস্ সালিভান সব সময়ই ছিলেন, আর তার হাতের তালুতে লিখে দিচ্ছিলেন। তিন সপ্তাহের এই শিক্ষায় তার পরিচয় ঘটল আধুনিক জগতের বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে।

এইখানে একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছেলেবেলা থেকে হেলেন লক্ষ্য করেছে, লোক গলা দিয়ে এক বিচিত্র ধ্বনি করে। মা যখন কথা কইতেন, তাঁর কোলে বসে হেলেন তাঁর মুখে হাত দিয়ে মুখ নড়া অনুভব করেছে। কুকুর কি বেড়াল ডেকেছে আর হেলেন তাদের গলায় হাত দিয়ে পেশী নড়া লক্ষ্য করে নিজেও সেই রকম ভাবে ধ্বনি ফোটাবার চেষ্টা করেছে। এক দিন শুনলে, নরওয়ের এক অন্ধ বোবা মেয়ে কথা বলতে পেরেছে। আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল, সেও কথা বলবে। ক্রমাগত চেঁচিয়ে চলেছে হেলেন, যখন-তখন, দিনের পর দিন। অদ্ভুত বিকৃত ধ্বনি। মিস্ সালিভান ভীত হয়ে পড়লেন। এত চেষ্টার পরও যদি মেয়েটা কথা বলতে না পারে তবে তার মনটা একেবারে ভেঙ্গে যাবে। তিনি খুঁজে-পেতে মিস্ সারা ফুলার নামক এক বাক্-যন্ত্রের এক্সপার্টের কাছে হেলেনকে নিয়ে গেলেন। এগারোটা লেসনের পর হেলেনের গলা দিয়ে মানুষের ভাষা বার হল। প্রথম বাক্য উচ্চারণ করে হেলেনের সে কি আনন্দ। "কারাগারের শৃঙ্খল ভেঙ্গে আমার আত্মা যেন বেরিয়ে এল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথার মধ্যে দিয়ে যেন অগ্রসর হল সকল জ্ঞান ও বিশ্বাসের পানে।" তার পর বাড়ী ফেরা। প্ল্যাটফর্ম্মে বাড়ীর সকলে অপেক্ষা করছেন। তাঁরা এ সুখবর পেয়েছেন! পরবর্ত্তী জীবনে হেলেন এই দৃশ্যের বর্ণনা করেছে—"এখন সে দিনের কথা ভাবলে আমার চোখে জল ভরে ওঠে। মা আমায় বুকে চেপে ধরেছেন। আনন্দে বাকহারা। পুলকে শিউরে উঠছেন। আমি ধীরে ধীরে কথা বলছি। ছোট্ট বোন মিলড্রেড আমার হাত ধরে নাচছে আর চুমু খাচ্ছে। বাবা দাঁড়িয়ে দেখছেন। মুখ তাঁর আনন্দ ও গর্ব্বে উদ্ভাসিত।"

যাতে হেলেনের মনে কোন রকম হীনমন্যতা না আসতে পারে, সে জন্য মিস্ সালিভান তাকে কোন কাজে বাধা দিতেন না। স্বাভাবিক পাঁচ জনের মতই তাকে খেলা-ধুলা, সাঁতার, বাইসাইকেল চড়া, নৌকা চালান, সবই করতে দিতেন। তার মনে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে, 'করবই' মনে করলে পৃথিবীতে সব কাজই করা যায়।

হেলেনের বয়স তখন এগার বছর। সেই সময় সে টমির দুর্ভাগ্যের কথা শুনলে। বেচারা তারই মত অন্ধ ও বোবা। বয়স মাত্র চার বছর। মা নেই। বাপ এত গরীব যে, দু'বেলা খেতে দিতেই পারে না। হেলেন তখন পার্কিন্স ইন্‌ষ্টিটিউটে। সে বললে, টমিকে এইখানে কিণ্ডারগার্টেনে ভর্ত্তি করে দেওয়া হোক। কিন্তু অর্থ? 'আমরা তুলে দেব' হেলেন প্রতিশ্রুতি দিলে ও সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল। প্রথমেই হেলেন বিশপ ব্রুক্সকে দিয়ে তার সাহায্য-ভাণ্ডারের জন্য একটা বক্তৃতা দেওয়ালে। তার পর খবরের কাগজে আবেদনপত্র ছাপালে। কিছু কিছু অর্থ আসতে লাগল। হেলেন আবার কাগজওয়ালাদের চিঠি লিখলে: "অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদের 'হেরাল্ড' কাগজে এই খবরটা ছাপাবেন কি? পাঠকরা সন্তুষ্ট হবেন এই জেনে যে, টমির জন্য বেশ খানিকটা অর্থ উঠেছে। তবে আরও প্রয়োজন। তাঁদেরই দানে টমি মানুষ হয়ে উঠবে।" ছোট চিঠি, কিন্তু কতটা দরদ-ভরা! যত দিন স্কুলের মাইনের জোগাড় হয়নি, গভর্ণেস রাখা সম্ভব হয়নি, তত দিন হেলেন ও মিস্ সালিভানই টমিকে দেখা-শুনা করতেন।

হেলেন শুনলে, ইংলণ্ড ও আমেরিকার লোকেরা চাঁদা তুলে তাকে

একটা সুন্দর কুকুর উপহার দেবে ঠিক করেছে। সে লিখে পাঠালে, ঐ অর্থে টমির শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করলে ভাল হয় না? ফলে সেই অর্থ দশ গুণ হয়ে এল তার সাহায্য-ভাণ্ডারে। টমির শিক্ষা-সমস্যা দূর হল। তখন হেলেন ভাবলে, জগতে তো এমন অনেক টমিই আছে। কেবল এক জনের দুঃখ দূর করলেই তো চলবে না। কিণ্ডারগার্টেনের সাহায্যকল্পে সে একটা টিকিট করে চায়ের পার্টি দিলে। তাতে দু'হাজার ডলার চাঁদা উঠল। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে সে অন্ধ ও বোবাদের জন্য এক বিরাট ফাণ্ড সৃষ্টি করলে। বড় হয়ে সমগ্র যুক্তরাজ্য ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে এ ফাণ্ডের জন্য দু' মিলিয়ন ডলার জোগাড় করে দিয়েছে।

বছর খানেক পরের কথা। হেলেন পড়াশুনা খুব ভালবাসত। তার নিজের জন্মভূমি টাস্কাম্বিয়ায় কোন লাইব্রেরী ছিল না। নিজেদের বাড়ীর সমস্ত বই দিয়ে সে এক পাঠাগার স্থাপন করে। তার পর এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরে বই ভিক্ষা করে বেশ বড় করে তোলে পাঠাগারটিকে। এক ধনী ব্যক্তি পাঠাগার প্রদর্শন করতে এসে স্থাপনার কাহিনী শুনে একখণ্ড ভূমি দান করেন। অর্থ আসতে আরম্ভ করে অযাচিত ভাবে। এখন এটা এক বিরাট পাঠাগারে পরিণত হয়েছে।

পড়াশুনায় হেলেন চিরকালই তার সমবয়সী মেয়েদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে ছিল। স্কুলের শিক্ষা-পদ্ধতি সে কোন দিনই পছন্দ করত না। বড় ধীরগতি আর অগভীর, মুড়ি-মুড়কীর এক দর। যে জানতে চায় তাকে ক্লাসের চেয়ে বেশী বা তাড়াতাড়ি শেখাবার উপায় ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য সে বাড়ীতে প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে তৈরী হতে থাকল। কিন্তু মুস্কিল হল পরীক্ষা দেবার সময়। পরীক্ষকরা তাকে অন্ধ দেখে অনর্থক কড়াকড়ি করতে লাগলেন। ইংরেজী ব্রেল-পদ্ধতিতে সে বীজগণিত শিখেছিল। পরীক্ষার সময় সে ইণ্টারপ্রেটার পেল, সে জানে কেবল আমেরিকান ব্রেল-পদ্ধতি। এক রাত্রির মধ্যে হেলেন এই নতুন পদ্ধতি আয়ত্ত করে পরদিন পরীক্ষা দিল। পরে এক সময় বক্তৃতা প্রসঙ্গে হেলেন বলেছে, "পরীক্ষকরা হয়ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার পথে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, আমি সকল বাধা অতিক্রম করতে পেরেছিলুম।"

পরীক্ষায় পাশ করে হেলেন র‍্যাডক্লিফ কলেজে ভর্ত্তি হল। ভর্ত্তি হবার পর সে বলেছিল, "জগৎ যেন নতুন আলোকে, নতুন সৌন্দর্য্যে প্রকট হল। মনে হল, আমার মধ্যে যেন কিছু জানবার ও বোঝবার ক্ষমতা আছে।" কিন্তু কিছু দিন পরেই কলেজের শিক্ষা-পদ্ধতিতে সে বিরক্ত হয়ে উঠল। "শিক্ষা হবে আনন্দের মধ্যে দিয়ে, যেমন বেড়ানো। মনকে তৈরী করতে হবে সকল রকম অনুভূতির ছাপ নেবার জন্য। জ্ঞানই শক্তি। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা জ্ঞানই আনন্দ। জ্ঞানেই মানুষ পাবে প্রকৃত পথের সন্ধান, খারাপ আর ভালো, নীচু আর উঁচুর মধ্যে পার্থক্য করবার ক্ষমতা।"

জ্ঞানলাভের প্রচণ্ড তৃষ্ণা ছিল হেলেনের। দৃষ্টিহীনতা তাকে বাধা দিতে পারেনি। সে জানে খুব ভাল ভাবে পাঁচটা ভাষা, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য। সম্মানের সঙ্গে বি-এ পাশ করলে। পরে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব ল' উপাধি পেল। আজ সে ডক্টর হেলেন কেলার।

অতি আমোদপ্রিয় ডক্টর কেলার। গোমড়া-মুখ তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। হাত মেলাবার কায়দা থেকেই তিনি ধরে ফেলেন লোকটা আমুদে না গোমড়া-প্রকৃতির।

আজ ডক্টর হেলেন কেলার জগদ্বিখ্যাত, জগতের বিস্ময়। জ্ঞানের দিক দিয়ে, দানের দিক দিয়ে, মানবতার দিক দিয়ে তিনি জগৎবরেণ্যা। তবু এক-এক সময় তিনি নিজেকে বড়ই একা মনে করেন। "জগতে আলো আছে, আছে গান, আছে প্রাণ; কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আমি সবের বাইরে, একবারে একা। আমার হৃদয় আজও গুমরে ওঠে প্রকৃতির বিরুদ্ধে, মানবের বিরুদ্ধে। কিন্তু মুখ ফুটে উচ্চারণ করি না কোন কথা। স্তব্ধ থেকে থেকে আমার আত্মাও বুঝি স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। আবার নিরাশার মধ্যে আশা জেগে ওঠে। জগৎকে ভুলে, দূরে ঠেলে আনন্দ পেতে চাই। পরের চোখের আলোকে করি আমার সূর্য্য, পরের কানে শোনা সঙ্গীতকে মনে করি আমার সিম্ফনি, পরের ঠোঁটের হাসিকে ভাবি আমার আনন্দ।"

কি মহৎ অথচ কি করুণ এই জীবন! যুগপৎ শ্রদ্ধা ও বেদনায় বুক ভরে ওঠে। আজও এই মহীয়সী মহিলা আপ্রাণ খেটে চলেছেন অন্ধ, বোবা ছেলে-মেয়েদের দুঃখ দূর করবার জন্য।

কুইন মেরী

চামেলী দেবী

কুইন মেরী এখন আর রাণী নন, এখন তিনি বৃটেনের রাজমাতা। বৃটিশ রাজ-পরিবারে তিনি একটি উজ্জ্বল তারকা, এত ঔজ্জ্বল্য আর কারো মধ্যে দেখা যায় না। তিনি তাঁর আড়াইশো বছরের প্রাচীন মার্লবরো হাউসের মতই শক্ত ও অপরিবর্ত্তনীয়। আজ গুণের কদর নেই, কিন্তু যে সব গুণাবলী বৃটেনকে মহান্ ক'রে তুলেছে, তিনি সেই সব গুণের প্রতীক।

তাঁর যে সব ফটো আছে, তাতে তাঁকে হাসতে খুব কমই দেখা গেছে। তাঁর চেহারার মধ্যে সদয় ভাবের আবরণে কঠোর ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

রাজমাতা মেরী কখনও ককটেলের আস্বাদন গ্রহণ করেননি, কখনও বিমানে চড়েননি, কোন এনগেজমেণ্ট রাখতে দেরী করেননি আর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ডিউক অফ উইণ্ডসরের পত্নীর নাম উল্লেখ করেননি। তিনি টেলিফোন ব্যবহার করেন না, তিনি নিজের হাতে চিঠি লেখেন।

আধুনিক প্রগতি সম্বন্ধে তিনি যে কত উদাসীন, তা তাঁর পোষাক দেখলেই বুঝতে পারা যায়। তিনি আধুনিক ফ্যাশন পছন্দ করেন না। তিনি সাধারণ দর্জ্জীর প্রস্তুত সাদাসিদে গাউন ও টুপি ব্যবহার করেন।

রাজমাতার স্বাভাবিক সম্ভ্রমবোধ খুব বেশী। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর এক শান্তি উৎসবে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরী যোগদান করেন। জনতা তাঁদের চার দিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং পিষে ফেলবার উপক্রম করে। পুলিশ অসহায় হয়ে পড়ে এবং রাজাও জনতাকে থামাবার জন্য বৃথাই অঙ্গভঙ্গী করেন। তখন রাণী মৃদু হাসির সঙ্গে ভ্রূকুটি মিশিয়ে উঠে দাঁড়ান এবং দু'হাত তুলে ছেলেদের পিঠ চাপড়ে বসিয়ে দেবার ভঙ্গী করেন। অকস্মা

জনতা তাদের আচরণে লজ্জিত হয়ে শান্ত ভাব ধারণ করে এবং রাজা-রাণীকে পথ ছেড়ে দেয়।

১১৩১ খৃষ্টাব্দে একবার এক বিষম অগ্নি-পরীক্ষায় তিনি তাঁর সম্ভ্রম বজায় রাখতে সমর্থ হন। একখানা লরীর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের ফলে তাঁর বড় ডেমলার গাড়ী উল্টে যায়। রাণী মইএর সাহায্যে ভাঙ্গা জানলা দিয়ে বেরিয়ে এসে বলেন, "আমার এক কাপ চা হলেই চলবে, এ ছাড়া আর আমার কিছু দরকার নেই।" অথচ প্রকৃত পক্ষে তাঁর চোখে ও সর্ব্বাঙ্গে চোট লেগেছিল।

তিনি অতিশয় লাজুক প্রকৃতির এবং এখনও তিনি বক্তৃতা দিতে লজ্জা পান। তিনি একবার মাত্র বেতারে বক্তৃতা দেন ১১৩৪ সালে "কুইন মেরী" জাহাজ ভাসানোর সময় এবং এই বক্তৃতায় তিনি মাত্র ২৩টি শব্দ ব্যবহার করেন।

পঞ্চম জর্জ্জ ও মেরী ১১১০ সালে যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন জনসাধারণের নিকট তাঁরা অপরিচিত ছিলেন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁদের গুরুত্ব বেড়ে যায়। রাণী মেরী যুদ্ধের সময় নানা ভাবে সহায়তা করেন। হাসপাতাল ও সৈন্য পরিদর্শন, অর্থসংগ্রহ, কমিটী গঠন প্রভৃতি কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। যুদ্ধোত্তর কালে রাজা ও রাণী প্রকৃত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেন। ১১৩৫ সালে তাঁদের শাসনের রজত-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে জনসাধারণের কাছ থেকে তাঁরা যে প্রীতি অর্জ্জন করেন, তার তুলনা হয় না।

রাজা জর্জ্জের মৃত্যুর পর এবং অষ্টম এডোয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগের সময় যে সঙ্কট উপস্থিত হয়, তাতে মেরী ঠিক রাণীর মতই আচরণ করেন। তিনি বলেন যে, এতে দ্বিধার কিছুই নেই। কর্ত্তব্যই সকলের চেয়ে বড়, তার পর ব্যক্তিগত ব্যাপার। এক দিকে সিংহাসন অন্য দিকে প্রেম। সিংহাসন রাখতে হলে প্রেমকে বিসর্জ্জন দিতে হবে, আর প্রেম যদি বড় হয়, তবে সিংহাসন ছাড়তে হবে। এর মধ্যে কোন মধ্য পন্থা নেই।

ডিউক অফ উইণ্ডসর সম্বন্ধে রাণী মেরী বেশী কিছু বলেন না। তবে ডিউক মাকে খুব ভালবাসেন। বৃটেনে অবস্থানের সময় তিনি প্রায়ই মা'র সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব মিসেস্ সিম্পসনকে তিনি কখনও মা'র কাছে নিয়ে যান না। মা'র সঙ্গে দেখা করার সময় তিনি স্ত্রীকে বাইরে মোটরে বসিয়ে রেখে যান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ব্যাডমিন্টনে ডিউক অফ বোফোর্টের বাড়ীতে। এই বাড়ীতে অবস্থান কালে তিনি একখানি কার্পেট তৈরী করতে আরম্ভ করেন এবং আট বছর পরে এই কার্পেট তৈরী সম্পূর্ণ হয়। এই কার্পেটখানি ইংলণ্ডে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে।

রাণী মেরীর বয়স এখন ৮৩ বছর। এই বয়সেও তিনি জাঁক-জমকের মধ্যে বাস করতে ভালবাসেন। ৪৭ জন ভৃত্য তাঁর কাজে নিযুক্ত আছে। কারো জোরে কথা বলবার বা হাঁটবার উপায় নেই। সবাইকে যথোচিত কেতাদুরস্ত হতে হবে এবং এমন কি নাতি-নাতনীদেরও এই নিয়ম থেকে পরিত্রাণ নেই। রাজকুমারী এলিজাবেথ ও রাজকুমারী মার্গারেটকে মোটরে তুলে দিয়ে আসতে হয় বৃদ্ধা ঠাকুমাকে। রাজকুমারী মার্গারেট রাত্রে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলে তিনি খুশী হন না। মার্কিণ রাষ্ট্রদূতের বাড়ীতে এক পার্টিতে মার্গারেট নাচ দেখিয়েছে শুনে তিনি আতঙ্কে শিউরে উঠেন।

রাজমাতা রাষ্ট্রের ব্যাপারে খুব আগ্রহ প্রকাশ ক'রে থাকেন। ১১৪৭ সালে কয়লা-সঙ্কটের সময় রাজা, রাণী ও রাজকুমারীরা যখন দক্ষিণ-আফ্রিকা পর্য্যটনে গিয়েছিলেন, তখন তিনি প্রত্যেক সপ্তাহে প্রধান মন্ত্রী এটলীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতেন। যদি তাঁর কাছে কেউ অভিযোগ ক'রে পত্র লেখে, তিনি সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগে সে সম্বন্ধে নোট পাঠান।

তাঁর সখ হল ভাল ভাল জিনিষ সংগ্রহ করা। মূল্যবান্ আসবাবপত্র ও শিল্পদ্রব্যে তিনি ঘর ভরিয়ে ফেলেছেন। এ ছাড়া মণিমুক্তা, হীরা-জহরত সংগ্রহও তিনি কম করেননি।

আনুষ্ঠানিক পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সজাগ। এ বিষয়ে কারো কোনো ত্রুটি দেখলে তিনি তা সহ্য করেন না। একবার এক আইরিশ রক্ষী দলের ক্যাপ্টেনের জামার বোতাম ঠিকমত বসান হয়নি। তাতে তিনি ঐ রক্ষী দলের কর্ণেলকে বলেছিলেন যে, ক্যাপ্টেনটি যেন দর্জ্জী দিয়ে বোতাম ঠিক করে বসিয়ে নেয়।

রাজমাতা মেরী সকাল সওয়া সাতটায় ওঠেন এবং রাত্রি পৌনে এগারটার সময় শুতে যাবার আগে পর্য্যন্ত কখনও চুপ ক'রে বসে থাকেন না। সকালে প্রাতরাশের পর ন'টার মধ্যে তিনি চিঠিপত্র দেখতে বসেন এবং পেশাদার ভিক্ষুক ছাড়া আর সকলের চিঠিরই উত্তর দেন। দুপুরে তাঁর এক পরিচারিকা তাঁকে 'লণ্ডন টাইমস' পড়ে শোনায়। 'টাইমসে'র সংবাদাদি শুনতে শুনতে তিনি বুনতে থাকেন। সওয়া একটার সময় তিনি দ্বিপ্রাহরিক আহার—যা অতি সাধারণ—গ্রহণ করেন। তিনি চায়ের খুব ভক্ত। বিকেলে চা খেতে কোন দিন ভোলেন না। রাত্রে ডিনারের আগে তাঁকে জীবনী প'ড়ে শোনান হয়। আজকাল তিনি চার্চ্চিলের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনছেন।

তাঁর আহার অতি সামান্য এবং এতে তিনি বেশী সময় নষ্ট করেন না। তাঁর সঙ্গে যারা খায়, তাদের একটু আগে থাকতে বসতে হয়, কারণ মেরীর ইচ্ছা সকলে একসঙ্গে উঠবেন। তাঁর প্রিয় খাদ্য গোমাংসের রোষ্ট আর খুব বেশী সেদ্ধ করা ডিম। তিনি মদ স্পর্শ করেন না, তবে খাবার পর একটি সিগারেট খান।

রাজমাতা আজও সোজা হয়ে দাঁড়ান—যেমন তিনি দাঁড়াতেন চল্লিশ বছর আগে। বিশ্রাম গ্রহণের সময়ও তিনি মেরুদণ্ড খাড়া রেখে বসে থাকেন। তবে গত বছর শীতকালে কোমরে বাত হওয়ায় তিনি দুর্ব্বল হয়ে পড়েন। এ জন্য তাঁকে কাজকর্ম্ম একটু কমিয়ে দিতে হয়েছে।

কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য্য

গিরীন্দ্রমোহিনী ১২৬৫ সালের ৩রা ভাদ্র ভবানীপুর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র দশ বৎসর বয়সে বহুবাজারের জমিদার ৺দুর্গাচরণ দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ৺নরেশচন্দ্র দত্তের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবি-প্রতিভার বিকাশ দেখিয়া পিতা ৺হারাণচন্দ্র মিত্র কন্যার শিক্ষা পরিচালনায় মনোযোগ দেন।

যে যুগে গিরীন্দ্রমোহিনীর জন্ম, সে যুগে কুলকামিনীদিগের বিদ্যাচর্চা এবং গ্রন্থাদি অধ্যয়ন অশোভন বিলাসিতা বলিয়া গণ্য হইত। বধূর হস্তে গ্রন্থ দেখিলে অথবা বধূকে কিছু লিখিতে দেখিলে শাশুড়ী-ননদীবর্গ তিরস্কার করিতে কসুর করিতেন না। এইরূপ শিক্ষাবর্জ্জিতা শাশুড়ী-ননদীর হস্তে বিদ্যার্থিনী বধূকে কিরূপ গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত, তাহা গিরীন্দ্রমোহিনী বর্ণনা করিয়াছেন 'বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা' নামক কবিতায়:

আমাদের মধ্যে যদি কোন বিনোদিনী,
লেখে যদি ধরি করে কখন লেখনী।
শাশুড়ী আসিয়া তার বাঘিনীর প্রায়,
বলে আজি কেবা রক্ষা করে দেখি আয়।
কি কাজ করিলি ওলো কুলকলঙ্কিনি!
চিঠি লিখে কারে গৃহে আনিবি এখনি?
যদি কেহ বই পড়ে গৃহের ভিতরে,
ননদী অমনি তার হেরিয়া অদূরে।
লোহিত লোচনে আসে কাঁপিতে কাঁপিতে,
বলে "বই প'ড়ে বুঝি যাইবি বিলাতে?
... ...
ইহাতে কেমনে বল কুলের কামিনী,
বিদ্যারত্ন লাভে আর হইবেক ধনী।

বিদ্যাচর্চার পক্ষে এইরূপ ঘোর প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও যে গিরীন্দ্রমোহিনী মহিলা-কবিগণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার গভীর কাব্যপ্রীতি ও অক্লান্ত অধ্যবসায়েরই নিদর্শন পাই।

গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে "অশ্রুকণা" শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত হইলেও 'স্বদেশিনী' গ্রন্থখানির আলোচনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক ভাববিশিষ্ট কবিতাগুলি বহন করিয়া ১৩১২ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে "স্বদেশিনী" প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রে লেখা আছে—"ভারতের স্বদেশভক্ত নর-নারীর করে স্বদেশিনীকে অর্পণ করিলাম।"

স্বদেশ উদ্ধার-মন্ত্রে যাঁহারা দীক্ষিত, কবিরাণী গিরীন্দ্রমোহিনী তাঁহাদের উৎসাহ দিতেছেন: তোমরা দেশমাতৃকার আশীর্ব্বাদ শিরে লইয়া, একতার বর্ম্ম অঙ্গে ধরিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হও; সাহস অবলম্বন কর, জয় তোমাদের অনিবার্য্য।

এস শিরে লয়ে আশিস্ মাতার
পর আঁটি অঙ্গে বর্ম্ম একতার
ধরহ একতা কিসের ভয়
সাহস যাহার তাহারি জয়।

"আদেশবাণী" কবিতার মধ্যে কবি যেন দেশমাতৃকারই আদেশ-বাণী আমাদের শুনাইয়াছেন—

ঐ শোন শোন কাহার আদেশ
হতেছে ধ্বনিত বিষাণে
পূরবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে
নৈঋতে অগ্নি ঈশানে।
... ...
বাজ তবে শিঙা ঘন ঘন ঘোর,
বল ভারতের অমানিশা ভোর;
যে আছে নিদ্রিত ভেঙ্গে যাক ঘোর—
নব রবিচ্ছটা গগনে।
... ...
বাঙ্গালী-বিহারী-শিখ-উৎকল,
মারাঠা-পাঞ্জাবী-পাঠান-মোগল;
চলেছে ধাইয়ে করি কোলাহল;—
কি জানি কাহার আহ্বানে।

এই কবিতাটির উপর হেমচন্দ্রের "ভারত-সঙ্গীত" এবং রবীন্দ্রনাথের "জন-গণ-মন" সঙ্গীতের কিছুটা প্রভাব থাকিতে পারে কিন্তু যেটুকু মৌলিকতা ইহার মধ্যে পাওয়া যায় তাহাও অনবদ্য।

"মাতৃস্তোত্র" কবিতাটির শব্দ-চয়ন ও ভাব-সম্পদ সত্যই মনোমুগ্ধকর। স্তোত্রটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলাম। এইরূপ সাবলীল বন্দনা-গীতি যিনি রচনা করিতে পারেন, নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, তিনি সামান্য প্রতিভার অধিকারী নহেন।

নমো নমঃ জননী,—
অশেষ গুণধারিণী,
নিত্য-সরসা, চিত্ত-হরষা,
রৌপ্য কনক-বরণী;
শস্য-শ্যামলা, কুন্দ-ধবলা,
অম্বু-মেখলা-ধারিণী;
নিত্য-নবীনা, চিত্ত-প্রবীণা,
সপ্ত-স্বর সুভাষিণী;
তুঙ্গ-হৃদয়া, দিক-বলয়া,
স্নিগ্ধ-মলয়া শ্বাসিনী;
দীপ্তি-প্রোজ্জ্বলা, চন্দ্র-কুন্তলা,
অজ্ঞ-বিলোল-লোকনী,
স্রোত-মধুরা, নীর-ক্ষীর-ধারা,
সন্তান-জরা-নাশিনী;
জ্যোৎস্না-মধুর-হাসিনী।
পল্লীশোভনা, মল্লি-ভরণা,
ক্রম-চামর-ধারিণী,
লোক-বন্দিতা, বেদ-ছন্দিতা,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-বাদিনী।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র 'বন্দেমাতরম' যেরূপ আমাদের হৃদয়ে উন্মাদনা সৃষ্টি করে, গিরীন্দ্রমোহিনীর "মাতৃ-স্তোত্র"ও সেইরূপ আমাদিগকে ভাবে অভিভূত করে। বঙ্কিমচন্দ্রের অমর প্রতিভার সহিত গিরীন্দ্রমোহিনীর তুলনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে এতটুকু হয়ত বলিতে পারি যে, ভারত-জননীর এইরূপ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি গিরীন্দ্রমোহিনীর পূর্ব্বে আর কোন মহিলা-কবি কল্পনা করিতে পারেন নাই।

আমাদের "নিত্য-সরসা" "চিত্ত-হরষা" ভারতমাতার "নীর-ক্ষীর-ধারা" পরস্বাপহারী বিদেশী কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া কবি দুঃখিতা হইয়াছেন;—তাই তিনি দেশের গণ-শক্তিকে "আহ্বান" করিয়াছেন

তাঁহার "লোক-বন্দিতা, বেদ-ছন্দিতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বাদিনী" জননীর উদ্ধারের জন্ত—

ঝটিকার মত আয়—উচ্ছৃঙ্খল—
—উদ্দাম বেগে ছুটিয়া—
ঘর-ভরা মোর সাধের ভাণ্ডার
চোরে ঐ নিল লুটিয়া।

লর্ড কার্জ্জনের কুখ্যাত বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার প্রতিবাদে যখন শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া ওঠে, তখন অন্তঃপুর হইতে গিরীন্দ্রমোহিনী আমাদের উৎসাহ দিয়াছেন;—আজি শুভদিন উপস্থিত, চিতোর-পতি প্রতাপের আদর্শে তোমরা অনুপ্রাণিত হও, মাতৃ-স্নেহ-ঋণ পরিশোধ কর:

বুঝি এসেছে সেদিন—
কর পণ শোধিবারে মাতৃ-স্নেহ-ঋণ।
স্মরি সেই মহামতি,
প্রতাপ চিতোর-পতি,
হও দৃঢ় ব্রতে ব্রতী—স্ববশ স্বাধীন;
লহ ব্রত শোধিবারে মাতৃ-স্নেহ-ঋণ।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ৩০শে আশ্বিন সমগ্র বঙ্গদেশে রাখীবন্ধন উৎসব প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ভ্রাতৃ-ভাব জাগরিত হয়। এই রাখী উৎসব উপলক্ষ করিয়াও গিরীন্দ্রমোহিনী একাধিক কবিতা রচনা করেন।

'রাখী-সংক্রান্তি' দিনে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছেন—

আজি কি শুভদিন আইল
চির-মনোরথ পূরিল;
মা তোমার কোটি কোটি পুত্রগণ
ছিল মোহ নিদ্রাভরে বিচেতন
আজিকার নব তপন কিরণে
সবে আঁখি-মেলি জাগিল।

কল্পনায় উচ্ছসিতা কবি নিজেই কাহারো বাহুমূলে রাখী বাঁধিয়া দিতেছেন—

আজিকার দিনে স্মরিয়া মায়ের মুখ,
হরিষে-বিষাদে বাঁধিনু মঙ্গল রাখী;
পূতচিত্তে শুভক্ষণে ওই ভুজমূলে,
অচ্ছেদ্য বন্ধনে;—হিন্দু-মুসলমান ভুলি;
যে আশায়—দৃঢ়তম, অটুট রহুক
সেই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন;··· ···

বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা ব্যর্থ হইল; উপরন্তু এই পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে বাঙালীর মধ্যে জাগিল প্রবল স্বাজাত্য-বোধ—যাহা বঙ্গ-ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নাই—ইহাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সর্ব্বোত্তম অবদান। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে এই যে আমাদের স্বাজাত্য-বোধের নব জাগরণ, ইহা কবি গর্ব্বভরে উল্লেখ করিয়াছেন:

কে বলে ভেঙ্গেছে বঙ্গ, ভেঙ্গেছে মোহের বাসা,—
জাগিয়া উঠেছে বঙ্গ-হৃদয়ে তরুণ আশা।
ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর
নিরাশ বিলাস-চোর
ঐ উদিত সুখের ভোর—কাকলী নবীন ভাষা
কে বলে ভেঙ্গেছে বঙ্গ, ভেঙ্গেছে মোহের বাসা।

উল্লিখিত কবিতাবলী ছাড়া "শিবাজী উৎসব," "আত্মদ্রোহিতা", ও "সমুদ্র-গর্জ্জন-শ্রবণে" কবিতাগুলির মধ্যেও গিরীন্দ্রমোহিনীর স্বদেশপ্রীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

"স্বদেশিনী"র কবিতাগুলির মধ্যে "আত্মদ্রোহিতা" কবিতাটিই দীর্ঘতম। দীর্ঘ এবং দৃষ্টান্তবহুল হইলেও ইহা পুলকসঞ্চারী এবং সুখপাঠ্য। রামায়ণের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয়কারী গৃহবিচ্ছেদের ইহা একটানা করুণ কাহিনী। রাবণ-বিভীষণের আত্মকলহ, কুরু-পাণ্ডবের গৃহযুদ্ধ, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ কালে পুরুর সহিত তক্ষশিলা-রাজ অম্ভির অসহযোগ, প্রতাপের বিরুদ্ধে মানসিংহের আত্মঘাতী অভিমান, পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে রাঠোর জয়চাঁদের হীন ষড়যন্ত্র, শিবাজীর বিরুদ্ধে জয়সিংহের বিরূপ মনোভাব এবং সর্ব্বশেষে রাক্ষসী পলাশী প্রান্তরে সিরাজের সহিত দুরাত্মা মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার শোচনীয় পরিণাম—এই সকল আত্মদ্রোহের বেদনা-জড়িত ইতিহাস একে একে গিরীন্দ্রমোহিনী সঙ্ক্ষেপে অথচ করুণ সুরে গাহিয়া গিয়াছেন। শৈশবে পিতার নিকটে ইতিহাস এবং মাতামহীর নিকটে পুরাণাদি হইতে যাহা কিছু আত্মদ্রোহের দৃষ্টান্ত পাইয়াছেন, "আত্মদ্রোহিতা" কবিতা তাহারই সার সঙ্কলন।

সমুদ্র-গর্জ্জনের মধ্যে কবি শুনিয়াছেন "বহুজনাকীর্ণ স্থানের হলহলাধ্বনি"। সমুদ্র-তরঙ্গের ভৈরব নর্ত্তনের মধ্যে কবি দেখিয়াছেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের অদম্য নর্ত্তন। তাঁহার মনে পড়িয়াছে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈএর নেতৃত্বে ভারতের বীর সিপাহীদের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের রক্ত-রঞ্জিত ইতিহাস; মনে পড়িয়াছে হিন্দুর লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারকল্পে ছত্রপতি শিবাজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র বীরবর্গের গৌরবময় সংগ্রাম; মনে পড়িয়াছে গুরুজীর মন্ত্রে অনুপ্রাণিত "পঞ্চনদীর তীরে" শিখ জাতির নির্ম্মম নির্ভীক অভ্যুত্থান:

.........................ফেন-শুভ্র হাসি
তরঙ্গে তরঙ্গে ছোটে উচ্ছাসি উচ্ছাসি;—
এমনি প্রচণ্ড নৃত্যে নারী গরীয়সী
নেচেছিল ঝান্সীর শ্রেয়সী মহিষী।
অমনি ভৈরব নৃত্যে অমনি নির্ভীক,
মেতেছিল একদিন মহারাষ্ট্র, শিখ;
... ...
আজি তারা নিদ্রামগ্ন।—কি অভিসম্পাতে
জাগে না হৃদয় আর ওই মহাঘাতে।

কালের গর্ভ হইতে নিঃসৃত বিস্মৃতি-লাভা-প্রবাহে বঙ্গ-সাহিত্যের কত সম্পদই না চাপা পড়িয়া রহিয়াছে! আমাদের দুর্ভাগ্য যে, নূতনের জয়গান করিতেই আমাদের সর্ব্বশক্তি নিঃশেষিত হয়—পুরাতনের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার বড় একটা সময় হয় না; তাই মুকুন্দদাস বা গিরীন্দ্রমোহিনীকে আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। সুখের বিষয়, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের কর্তৃপক্ষ বহু পুরাতন সাহিত্য সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

ভুলব আমি কেমন করে?

শ্রীবারি দেবী

কেমন করে ভুলবো বল, ভুলবো তোমায় কেমন করে?
দিবানিশি আছ তুমি আমার সকল চিত্ত জুড়ে!
রক্তে আমার আছ মিশে আছ আমার গানের সুরে
নামটি তোমার সদাই বাজে আমার জীবন-বীণার তারে!

কেমন করে ভুলবো তোমায়, ভুলবো তোমায় কেমন করে
তোমার লাগি গৃহত্যাগি বেড়াই সারা বিশ্ব ঘুরে!
কোথায় রহ বন্ধু আমার, কোন্ সে গোপন গহন পুরে
হে অজানা, নাই ঠিকানা, সে পথ আমি শুধাই কারে?

কেমন করে ভুলবো তোমায়, ভুলবো তোমায় কেমন করে?
তোমার ছায়ামূর্ত্তিখানি সদাই আমার সাথে ফেরে!
সারা বেলা থাকে সে যে আমার সকল চিন্তা জুড়ে
স্বপন হয়ে দেয় সে দেখা, আমার রাতের ঘুমঘোরে!
ভুলতে তোমায় বলে সবাই; ভুলবো আমি কেমন করে?

ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতবর্ষের উপনিবেশ বিস্তার ও সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণের কাহিনী সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষ ভুলিয়াছিল, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়াও ভুলিয়াছিল। প্রথমে ইসলাম, তার পর পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দীর কয়েক বৎসর পর্যন্ত বিস্মৃতির পুরু কালো পরদা টানিয়া দিয়াছিল আমাদের চোখের সম্মুখে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক-বিচ্যুত হইয়া শিক্ষিত ভারতবাসীর দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছিল য়ুরোপ অভিমুখে। ঘরের পাশে যাহাদের বাস, তাহাদের অপেক্ষা সাগরপারের পরস্ব-লুণ্ঠক জাতিগুলি আমাদের নিকট অধিকতর আপন জন !

য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইতে সময় লাগিয়াছিল। অনেক সময়, অনেক লাঞ্ছনা, অনেক দুঃখ-দুর্দশার প্রয়োজন হইয়াছিল এশিয়ার পরাধীন জাতিগুলিকে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে যে, য়ুরোপের এই সকল জাতি এশিয়ায় রাজ্য শাসন করিতে আসে নাই, সভ্যতা বিস্তার করিতে আসে নাই, আসিয়াছিল লুণ্ঠন করিবার জন্য। যেদিন এই সত্য তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিল, সেদিন হইতে আরম্ভ হইল এশিয়ার নব জাগরণ। ভারতবর্ষের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির প্রাচীন সংযোগের লুপ্ত স্মৃতির উদ্ধার এশিয়ার নব জাগরণ আন্দোলনের একটি দান।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের উদ্যমের কথা এশিয়ায় প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে এশিয়ার পরাধীন জাতিগুলির দৃষ্টি সাগ্রহে আকৃষ্ট হইল ভারতবর্ষের প্রতি। ইহার পরিচয় পাওয়া যায় প্রাচ্য দেশগুলি হইতে রবীন্দ্রনাথকে সাদর নিমন্ত্রণে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রিয় নেতা মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, পণ্ডিত জহরলালের জনপ্রিয়তায়, ইহার পরিচয় পাওয়া যায় ভারতবর্ষের সহিত প্রাচীন বন্ধনের সকৃতজ্ঞ স্মরণে।

এশিয়ার নব জাগরণের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলি কর্তৃক ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রাচীন আত্মীয়তার স্বীকৃতি। রেজা খাঁ পহ্লবীর অভ্যুদয়ের পরে জাতীয়তাবাদী ইরাণও এই আত্মীয়তা স্বীকার করিয়াছিল। এই আত্মীয়তা হিন্দু ও বৌদ্ধ-ভারতের সঙ্গে, মুঘল-পাঠান-ইংরাজ আমলের ভারতবর্ষের সঙ্গে নহে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রসার

ব্রহ্ম, মালয়, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন লইয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আয়তন প্রায় ১৬ লক্ষ বর্গ-মাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি, ইহার মধ্যে ইন্দোচীনের আয়তন প্রায় ২ লক্ষ ৮৬ হাজার বর্গ-মাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি এবং ইন্দোনেশিয়ার আয়তন ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার বর্গ-মাইল ও লোকসংখ্যা ৬ কোটির উপর। অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ও অতি উর্বর এশিয়ার এই অংশ খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দী হইতে য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগমুখে অবস্থিত দ্বীপময় ভারতের অবস্থানের গুরুত্বও তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

খৃষ্টীয় ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তার করা লইয়া ইহাদের পরস্পরের মধ্যে মারামারি ও কাড়াকাড়ির কথা পূর্বের এক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে।

১৫২১ খৃষ্টাব্দে ফার্ডিন্যাণ্ড ম্যাগেলান য়ুরোপীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম ফিলিপাইন দ্বীপমালার সন্ধান পান। ইহার পরে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে নেগ্যাজপি কের্বুর নায়কত্বে ফিলিপাইনে প্রথম স্প্যানিশ উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি দ্বীপ বাদে সমগ্র ফিলিফাইনের উপর স্প্যানিশ অধিপত্য স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষে ঘাঁটি স্থাপন করিবার পরে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও লোহিত সমুদ্রে পর্তুগীজ-প্রভাব যখন প্রবল হয়, তখন ব্রহ্মে ও থাইল্যাণ্ডে পর্তুগীজরা প্রভাব বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ব্রহ্মের বিভিন্ন রাজাদের মধ্যে যুদ্ধে এবং ব্রহ্ম ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যে যুদ্ধে এক পক্ষের সমর্থন করিয়া তাহারা সৈন্য দিয়া সাহায্য করিয়া প্রভাব বিস্তার করিবার চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, কিন্তু বাণিজ্যিক সুবিধা ছাড়া থাইল্যাণ্ডে আর কোন সুবিধা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। ব্রহ্মের আরাকানে সাময়িক ভাবে পর্তুগীজ-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা স্থায়ী হয় নাই।

ইন্দোনেশিয়ায় মাজপাহিত সাম্রাজ্যের পতনের (১৫শ শতাব্দী) পরে ইসলামের প্রভাব প্রবল হয়। বাহির হইতে বহু সংখ্যক ঐস্লামিক জাতি ইন্দোনেশিয়ায় প্রবেশ করে নাই। দেশবাসী ও নৃপতিরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা ইন্দোনেশিয়ায় উপস্থিত হইয়া বাণিজ্য বিস্তারের নামে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিয়া বসে।

ইন্দোনেশিয়ার জাভা ও অন্যান্য দ্বীপের রাজারা বিনা সংগ্রামে বিদেশীদের হাতে দেশ ছাড়িয়া দেন নাই। এই সংগ্রামে তাঁহাদের কেহ কেহ ভারতবর্ষ হইতে সাহায্য পাইয়াছিলেন। কালিকটের জামোরিন ছিলেন পর্তুগীজদের চিরশত্রু। তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি মিশর, জেড্ডা, সুমাত্রার অচিনের রাজা, গুজরাটের মুসলমান অধিপতির নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। মালাক্কার রাজার সঙ্গে পর্তুগীজ শাসনকর্তা আলবার্কের যুদ্ধের সময়ে জামোরিন কামান ও সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন মালাক্কার রাজার সাহায্যের জন্য। আলবার্কের হস্তে পরাজিত ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া মালাক্কার রাজা মুদালিয়র উপাধিধারী এক জন হিন্দুকে দূত হিসাবে চীন সম্রাটের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন সাহায্যের আবেদন জানাইতে।

১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগে পর্তুগীজদের অনুসরণ করিয়া ডাচ ও ইংরাজরা ইন্দোনেশিয়ায় উপস্থিত হইল। পর্তুগীজরা বিতাড়িত হইল। পরে ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করিয়া ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানী সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার আধিপত্য বিস্তারে মনোযোগী হইল। মাজপাহিত সাম্রাজ্যের পতনের পরে মধ্য-জাভায় দেমক রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দেমক রাজবংশের পরে মাতরং রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে মাতরং রাজ্যের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নিরন্তর সংগ্রামে দুর্বল হইয়া মাতরং রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহার জায়গায় সুরাকর্তা ও জোগজাকর্তা, এই দুইটি রাজ্য গঠিত হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১৭৯৮) হলাণ্ডের রাজা সাম্রাজ্যের শাসনভার কোম্পানীর নিকট হইতে স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ইহার পরেও জাভা স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালাইয়াছিল, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এই সংগ্রাম শেষ হয় নাই।

ডাচ কর্তৃক ইন্দোনেশিয়া হইতে বিতাড়িত হইয়া ইংরাজরা ভারতবর্ষে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিল আর ইংরাজ কর্তৃক ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া ফরাসীরা ভাগ্য পরীক্ষা করিতে গিয়াছিল ইন্দোচীনে।

কোচীন-চীনে গৃহযুদ্ধের সুযোগ লইয়া ফরাসীরা ইন্দোচীনে থাবা গাড়িয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের বিশ বৎসর পরে তাহারা আনামের অংশ ছিনাইয়া লইয়া ইন্দোচীনে ফরাসী সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করিল। ইন্দোচীনে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করিবার সময় ফরাসীদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, ইংরাজের ব্যবসায়ে আঘাত করিয়া তাহারা ভারতবর্ষে ইংরাজের বিরুদ্ধে পরোক্ষে লড়াই চালাইয়া যাইবে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির মধ্যে দূর-প্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

কোচীন-চীনের পরে ক্রমে আনাম, কাম্বোজ, টংকিং ও লাওসে ফরাসীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে চীনের কোয়াং-চোয়ান প্রদেশ ইজারা লইয়া তাহারা উহা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিল। আনাম, কাম্বোজ ও লাওসে এক জন করিয়া দেশীয় সাক্ষীগোপাল রাজা আছেন। টংকিং নামে আনামের অধীন, সেখানেও ফরাসী-আশ্রিত এক জন রাজা আছেন। ২ লক্ষ ৮৬ হাজার বর্গ-মাইল আয়তনের সমগ্র দেশটির শাসনভার ফরাসী গবর্ণর জেনারেলের হাতে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্বাধীনতা-সংগ্রাম

ভারতবর্ষে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ শাসন ও শোষণের জন্য যে সকল নীতি অবলম্বন করিয়াছিল, ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনে ডাচ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ সামান্য রকমফের করিয়া সেই সকল নীতিই অবলম্বন করিয়াছিল। ইন্দোনেশিয়ায় দেশীয় রিজেণ্ট ও ইন্দোচীনে আশ্রিত রাজাদের সম্মুখে রাখিয়া রেসিডেণ্টগণ প্রকৃত শাসনকার্য চালাইতেন। এই ব্যবস্থার ফলে যাহারা জনগণের শোষণের জন্য প্রকৃত দায়ী, তাহারা আড়ালে থাকিবার সুযোগ পাইত। ইন্দোনেশিয়ার তৈল, রবার ও টিনের ব্যবসায়, চিনি ও কুইনাইন উৎপাদনের ব্যবসায় ডাচ ও কিছু সংখ্যক ইংরাজ ও আমেরিকানের হাতে রহিল, দেশের লোক পাইল শুধু মজুরের কাজ করিবার সুযোগ। কাঁচা মাল রপ্তানী করিবার ও বিদেশ হইতে তৈয়ারী মাল আমদানী করিবার অধিকার বিদেশীদের করতলগত রহিল। ইন্দোচীনে দেশের শিল্পোন্নতি সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া রাখা হইল কাঁচা মালের আড়ৎ। কাঁচা মালের অধিকাংশ যাইত ফ্রান্সে, অন্য ক্রেতা ভাগাইবার জন্য শুল্ক-প্রাচীরের ব্যবস্থা হইল। দেশের লোক যাহাতে শুধু কৃষিকাজ লইয়া ব্যস্ত থাকে, দেশের শিল্পোন্নতির কথা না ভাবে, দেশে শিক্ষার প্রচার যাহাতে না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হইল। আঁটঘাট বাধিয়া শোষণের ফলে দেশের লোকের দারিদ্র্য বাড়িয়া চলিল।

ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শোষণ ও কুশাসনের বিরুদ্ধে ব্যাটাভিয়ার প্রথম বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন পিটার এরবারফিল্ড নামে এক জন যুরেশীয়ান (মিশ্র ডাচ ও জাভানীজ)। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ যখন সমগ্র এশিয়ার পরাধীন জাতিগুলির মধ্যে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তখন জাভায় প্রথম জাতীয় দল (Badi Octomo) গঠিত হইয়াছিল। ইহার কয়েক বৎসর পরে ইটালী তুর্কীর অধিকৃত ত্রিপোলী আক্রমণ করিলে তাহার ফলে যে প্যান-ইসলাম আন্দোলনের ঢেউ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে, তাহার প্রভাব যেমন ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল তেমনি ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মুস্লিম লীগের মত জাভাতেও "সরিকট ইসলাম" নামে একটি দলের উদ্ভব হয়। ইন্দোনেশিয়ার নেশনালিষ্ট দল সেকালের ভারতীয় কংগ্রেসের মত ডাচ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া স্বায়ত্ত-শাসন লাভের আন্দোলন চালাইতে লাগিল। ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীনের বিপ্লব জাভায় জাতীয় আন্দোলনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিল। এই সময়ে জাতীয় দলের নেতা ডেক্কারের (যুরেশীয়ান) অভ্যুদয় হইল। ডেক্কারের পরিচালিত জাতীয় দলের আন্দোলনের ফলে ডাচ গবর্ণমেণ্ট কিছু পরিমাণে শাসন-সংস্কার করিতে বাধ্য হইলেন। এই শাসন-সংস্কারে জাতীয় দলের সকলে সন্তুষ্ট হইলেন না। ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারতবর্ষের বিপ্লবী দল জার্মাণীর সাহায্য লইয়া ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত হানিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহাদের কার্যক্ষেত্র ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে, চীনে, জাপানে, ইরাণে, আমেরিকায় ও য়ুরোপে প্রসারিত হইয়াছিল। ইন্দোনেশিয়ার ব্যাটাভিয়া ও থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্কক ও মালয়ের সিঙ্গাপুর তখন ভারতীয় বিপ্লবী ও জার্মাণীর এজেণ্টদের সংযোগ-ক্ষেত্র হইয়াছিল। বিপ্লবীরা থাইল্যাণ্ড হইতে স্থলপথে ব্রহ্ম আক্রমণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় সিঙ্গাপুরে ভারতীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫) ঘটিয়াছিল। একপক্ষকাল সিঙ্গাপুর নিজেদের দখলে রাখিবার পরে ডাচ, ফরাসী, ইংরাজ ও জাপানী যুদ্ধ-জাহাজগুলির সমবেত আক্রমণের ফলে তাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় বিপ্লবীদের যাতায়াতের ফলে স্থানীয় জাতীয় দলের কোন কোন ব্যক্তি যে ভারতীয় বিপ্লববাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, বৈপ্লবিক চিন্তা ও প্রচেষ্টার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। একটি প্রমাণের উল্লেখ করা হইতেছে। জাতীয় দলের নেতা ডেক্কারের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার

পুরা নাম ডাঃ ডাউস ডেক্কার। ডাচ গবর্ণমেণ্ট ডাঃ ডেক্কারকে জাভা হইতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। জাভা হইতে তিনি য়ুরোপ যান। য়ুরোপে বাস করিবার সময়ে তিনি পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও য়ুরোপের অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লবীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। ডাঃ ডেক্কার ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্য্যে সহায়তা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে য়ুরোপে ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতিষ্ঠান বার্লিন কমিটি তাঁহার ও তাঁহার বন্ধু এক বিপ্লববাদী জাভানীজ প্রিন্সের সহায়তা লইতে স্বীকৃত হইয়া ভারতীয় বিপ্লবীদিগকে অস্ত্রসংগ্রহের কার্য্যে সাহায্য করিবার ভার দিয়া তাঁহাদিগকে জাভায় প্রত্যাগমন করিবার নির্দ্দেশ দেন। এই কার্য্যের ভার লইয়া ডাঃ ডেক্কার প্রথমে আমেরিকায় যান। ক্যালিফর্ণিয়ায় গদর দলের সভ্যদের ও দলের কর্ম্মসূচীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। আমেরিকা হইতে চীন হইয়া জাভায় ফিরিবার সময়ে ইংরাজ পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া অষ্ট্রেলিয়ায় লইয়া গিয়া আটক করিয়া রাখে। ১৯১৭ সালে সানফ্রান্সিসকোতে গদর দলের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলিবার সময়ে এই জাভানীজ জাতীয় দলের নেতা ভারতীয় বিপ্লবী নেতাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের সকল গোপন তথ্য প্রকাশ করিয়া দিয়া তিনি সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। ডাঃ ডেক্কারের সাক্ষ্য দিবার সময়ে তাঁহার ভগিনীর ভরণ-পোষণের জন্য বার্লিন কমিটি নিয়মিত অর্থসাহায্য করিতেছিলেন।

যুদ্ধের পরে জাভার জাতীয় দলের রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর ভারতবর্ষের কংগ্রেসী রাজনীতি ও অসহযোগে আন্দোলনের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র দেশে স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠে। নেতাদিগকে মৃত্যুদণ্ড বা নির্বাসন দিয়া, নির্দ্দোষ জনসাধারণের উপরে এরোপ্লেন হইতে বোমা ফেলিয়া ও কঠোর দমন-নীতির সাহায্যে এই আন্দোলন দমন করা হয়।

ইহার পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ড জার্ম্মাণীর কবলিত হইল। সাম্রাজ্যের অবসান আসন্ন বুঝিয়া রাণী উইলহেলমিনা ইন্দোনেশিয়ার প্রজাদের উদ্দেশ্যে এক উদার ঘোষণা-বাণী প্রচার করিলেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ইন্দোনেশিয়া জাপান অধিকার করিয়া লইল। দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল।

ইন্দোচীনের ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, সিপাহী বিদ্রোহের কয়েক বৎসর পরে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যখন কংগ্রেসের জন্ম হয়, তখন আনামের অংশ ফরাসীদের হাতে ছাড়িয়া দিবার প্রতিবাদে গুরুতর প্রজা-বিদ্রোহ দেখা দেয় আনামে। উত্তর-আনামের বিখ্যাত নেতা ফান দিন ফুইং ও টংকিংএর গুয়েন থিয়েন থুয়াট গেরিলা অভিযান চালাইতে আরম্ভ করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুসংহত গেরিলা-যুদ্ধ আরম্ভ হয় টংকিংএ। এই অভিযানের নায়ক ছিলেন হোয়াং হোয়া থাম। সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরিয়া এই সংগ্রাম চলিয়াছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে সমগ্র ইন্দোচীনে চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

রাজবংশের ও অভিজাত-শ্রেণীর ব্যক্তিগণও স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনে যোগদান করিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন প্রিন্স দুই থাম। ফরাসীরা এক দিকে কঠোর দমননীতির চাপে আন্দোলন পিষিয়া মারিবার চেষ্টা করিতে ও অন্য দিকে শাসন-সংস্কারের আশ্বাস দিতে থাকে, যেমন ইংরাজ ভারতবর্ষে করিতেছিল।

ইতিমধ্যে ইন্দোচীনের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব মান্দারিন বা অভিজাত-শ্রেণীর হাত হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক দলের হাতে আসিয়া পড়িল। আনামে বিপ্লবী দল গড়িয়া উঠিল। ইন্দোচীনের জাতীয় আন্দোলনের নেতারা এশিয়ার অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হইলেন। আনামের বিপ্লবী দলের সঙ্গে দক্ষিণ-চীনের বিপ্লবী দলের সংযোগ স্থাপিত হইল। ইন্দোচীনের জাতীয় দলের নেতা হুয়োং ভ্যান জিউ পণ্ডিত জহরলালের সঙ্গে মিলিয়া League of Oppressed Peoples নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন (১৯২৭)। হুয়োং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইন্দোচীনে কম্যুনিষ্ট দল গঠিত হয় এবং এই দলের নেতৃত্বে যে কৃষক আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহা ধ্বংস করিবার জন্য ফরাসীরা বীভৎস অত্যাচার করিতে ত্রুটি করে নাই। ইহার পরে ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্ট পার্টির সহায়তায় সায়গনে নিয়মতান্ত্রিক জাতীয় দলের প্রতিষ্ঠা হইল। এই নূতন দল বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইন্দোনেশিয়ার মত ইন্দোচীনও জাপানের কবলিত হইল। ইন্দোনেশিয়ার মত ইন্দোচীনেও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রকৃতির পরিবর্তন হইল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার বৎসরাধিক কাল পরে অতর্কিত আক্রমণে পার্ল হারবার ধ্বংস করিয়া জাপান বিদ্যুৎগতিতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইল। আমেরিকান, ডাচ, ফরাসী ও ইংরাজ-অধিকৃত ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, মালয় ও ব্রহ্ম বিজয়ী জাপানের হাতে চলিয়া গেল। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের আধিপত্য স্থাপিত হইল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মাণীর সাহায্য লইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে আঘাত হানিবার যে পরিকল্পনা ভারতীয় বিপ্লবীরা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইতে পারে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যে সুযোগ আনিয়া দিল তাহা গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন দুই জন ভারতীয় বিপ্লবী; এক জন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ের বিপ্লবী আয়োজনের প্রধান নায়ক জাপান-প্রবাসী রাসবিহারী বসু, অন্য জন ভারতের ইতিহাসের মহা বিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্র। আবার ভারতবর্ষে ইংরাজকে আঘাত হানিবার আয়োজনের প্রধান কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হইল ইন্দোচীনে, থাইল্যাণ্ডে, ইন্দোনেশিয়ায়, মালয়ে, ব্রহ্মে।

জাপান যেমন বিদ্যুৎগতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া গ্রাস করিয়াছিল তেমনি অকস্মাৎ তাহার পতন হইল। তাহার অগ্রগতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরাধীন, নিপীড়িত জাতিগুলির মধ্যে যে উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল, যে আশা জাগিয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইল। আমেরিকা, ডাচ, ফরাসী, ইংরাজের সাম্রাজ্য কাড়িয়া লইয়া জাপান পরাধীন জাতিগুলিকে স্বাধীনতার আশ্বাস বা আনন্দ দিল না, পরাজয় অবধারিত জানিয়াও সে তাহাদিগকে স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার উৎসাহ দিল না বা বিদেশী শোষকদিগের প্রত্যাবর্তন ঠেকাইবার জন্য হাতিয়ার দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিল না।

আধুনিক এশিয়ার ইতিহাসে সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। তাহাদের চামড়ার রং যাহাই হউক, সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির মধ্যে অন্তরের টান, সমস্বার্থবোধ যে কত প্রবল—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে জাপানের ব্যবহার তাহার প্রমাণ। ইন্দোনেশিয়ায়, ইন্দোচীনে, মালয়ে পূর্ব মালিকরা ফিরিবার সময়ে দেশবাসীরা যাহাতে বাধা না দেয়, এ জন্য একদা বিজয়ী জাপানী সৈন্য সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির সৈন্যদের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-কামী প্রতিরোধ-বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করিতে লাগিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রভাত হইতে এশিয়াবাসীর চোখে এশিয়ার "হিরো" জাপানের এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহার সত্ত্বেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাহার আকস্মিক অভ্যুদয় ও ততোধিক আকস্মিক পতন পূর্বের ব্যবস্থার ভিত্তি আলগা করিয়া দিয়াছিল।

জাপানের পরাজয়ের পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে নূতন উদ্যমে সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

[আগামী বারে সমাপ্য।

-আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা-

"বিখ্যাত মন্দির" পর্য্যায়ের ছায়াচিত্র প্রতিযোগিতায় যে পরিমাণ ছবি আমাদের কাছে পৌছেছে, মাসিক বসুমতীর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠাগুলিতে ছাপা হ'লেও হয়তো ছবি শেষ হবে না—সে জন্য বাধ্য হয়ে আগামী প্রতিযোগিতা স্থগিত রেখে "বিখ্যাত মন্দির"ই পুনরায় আগামী সংখ্যায় ছাপতে হচ্ছে। ছায়াচিত্রে মন্দির যদি কেউ পাঠাতে ইচ্ছুক থাকেন, আগামী সংখ্যার জন্য ২০শে মাঘ তারিখের মধ্যে পাঠাবেন।

যাদু ও মহাকাব্য

অবন্তী সান্যাল

অসভ্য মানুষের কাছে সত্য ও কল্পনা, জ্ঞান ও কুসংস্কারের মধ্যে কোন সীমারেখাই ছিল না। তার জৈবিক ও মানসিক—সমগ্র সত্তার একটি মাত্র মূল প্রেরণা ছিল—প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজেকে টিকিয়ে রাখার প্রেরণা। যাদুর মধ্যে প্রতিফলিত হ'ত তার এই সত্তার সামগ্রিক আকাঙ্ক্ষা। কুসংস্কার থেকে জ্ঞানকে, কল্পনা থেকে সত্যকে পৃথক ক'রে নিতে তার বহু হাজার বছর সময় লেগেছে। আর এরা পৃথক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাদু থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে মানুষের মানস-ভোজের বিচিত্র উপাদানগুলি। ধর্মানুষ্ঠানের সংগে যাদু ওতপ্রোত ভাবে বহু কাল মিশে থাকলেও পরবর্তী কালে মানুষের বহু ধর্ম যাদুর প্রত্যক্ষ চিহ্নগুলিকে পরিহার করতেও চেষ্টা করেছে। তাই যাদু সভ্য মানুষের জীবন থেকে বিতাড়িত হয়ে আজকের দিনে বেঁচে আছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মনে, ডাইনি-ওঝার তুকতাকের মধ্যে।

কিন্তু এ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশই নেই যে, ডাইনি-ওঝাদের তুকতাকই আমাদের আদিমতম সংগীত। আমাদের মনোজগতের যা কিছু সৃষ্টি, তাদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন। ভারতীয় প্রাচীনতম ধর্মশাস্ত্রের (কাব্যও বটে) বেদের চতুর্থ অংশ অথর্ববেদ। অথর্ববেদ তুকতাক ও তন্ত্র-মন্ত্রের, এক কথায়, যাদুবিদ্যার শাস্ত্র। একে বেদ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে অনেক পরে। কিন্তু পণ্ডিতেরা অথর্ববেদের ধর্মানুষ্ঠানকে ঋক্-যুগের ধর্মানুষ্ঠানের পূর্ববর্তী ব'লে অনুমান করেন। তাঁদের এ অনুমান যুক্তি ও বিজ্ঞানসিদ্ধ।

যাদু থেকে কাব্য পৃথক হতে বহু শতাব্দীর পথ অতিক্রম ক'রেছে। যাদু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কাব্যের নজির মেলে সভ্য-যুগের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এই সভ্য-যুগের প্রকৃতির যে যে বৈশিষ্ট্যের ফলে আমরা তাকে অসভ্য যুগ থেকে আলাদা ক'রে নিতে পারি, তার মধ্যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এ যুগে একটি অবসরভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি। এই অবসরভোগী শ্রেণীই শাসকশ্রেণী। এই যুগের সামাজিক বিন্যাসে এই শ্রেণীর অস্তিত্ব বজায়ের জন্য অর্থনৈতিক শ্রমের প্রয়োজন নেই। আর সেই জন্যে আদিম যাদুর প্রত্যক্ষ প্রয়োজনও তার কাছে মূল্যহীন। সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এই শ্রেণী; এবং এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (শক্তি, সাহস, ঐশ্বর্য ও চাতুর্যে) সমাজের প্রধান বা নেতা।

আদিম যাদু-অনুষ্ঠানের নেতা পুরোহিত ও কবিরূপে এই যুগে গোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনক্ষেত্র ছেড়ে অবসরভোগী শ্রেণীর দরবারে অনুগ্রহের ছত্রচ্ছায়ায় স্থান গ্রহণ করেছেন। এ যুগের কাব্য তাই যাদু-অনুষ্ঠানের সমবেত সংগীত নয়; কবি বা পুরোহিতের 'একক সংগীত' (solo)। "রাজা বা প্রধান যখন পারিষদবর্গ নিয়ে অবসর-বিনোদনে রত, তখন কবি গান ধরেন বীণা বাজিয়ে। গানের সংগে কখনো নাচতেও হয় তাঁকে কথা, সুর আর অঙ্গভঙ্গীকে সুসংবদ্ধ রূপ দেবার জন্যে; কারণ প্রাচীন (সমবেত যাদু) অনুষ্ঠানে এগুলি ছিল অবশ্যকরণীয়। একক হলেও তাঁকে পরিচালক ও অন্যান্য সকলের অংশও সম্পন্ন করতে হয়। কবিকে একক গান গাইতে হয়; আবার ধূয়াও ধরতে হয় তাঁকেই।"—(এম, ইলিন—হাউ ম্যান বিকেম এ জায়াণ্ট—পৃ: ২১৬)

কিন্তু তাঁর এ সঙ্গীতের বিষয়-বস্তু কি? অসভ্য সমাজের যাদু-অনুষ্ঠানের অনাবৃষ্টি বা শিকারের বিশদ বর্ণনা নয়। তাঁর বিষয়-বস্তু দেবতা অথবা বীরের কাহিনী; তাঁর বিষয়-বস্তু রাজার স্তুতি, শত্রুর উৎসাদনকারী নেতার বীরত্ব, যুদ্ধে নিহত বীরের শোক-গম্ভীর গাথা (Ballads) অথবা প্রতিহিংসার রোমাঞ্চকর ঘটনা। তাঁর এ সংগীত তন্ত্র-মন্ত্র বা যাদু-অনুষ্ঠানের অর্থহীন মোহকর শব্দসমষ্টি নয়; ঘটনা ও চরিত্রে সুসংবদ্ধ কাহিনী—বাস্তব মানুষের জীবন থেকে আহরিত শব্দ, সুর-সম্বদ্ধ ঘটনা ও চরিত্রের অনুকৃতি।

হোমারের পূর্ববর্তী যুগে এই ব্যাপার ঘটেছে প্রাচীন গ্রীস দেশে, এই ব্যাপার ঘটেছে এ দেশেও। বৈদিক সুক্ত থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় রাজার সংগেই কবি বা পুরোহিতের বংশানুক্রমিক সম্পর্কের। বৈদিক কবির কাজ ছিল রাজা ও তাঁর শাসিত প্রজার গুণ, বীরত্ব ও ঐশ্বর্য কীর্তন করা। একটি সুক্তে বলা হচ্ছে: 'স্তুতি শুনে রাজা যেমন খুশী হন, দুধ মেশালে তেমনি সোম পবিত্র হয়।' (এখানে উপমাটি লক্ষ্যণীয়। কোন বস্তু সর্বজনগ্রাহ্য না হলে উপমান হিসাবে উপস্থিত করা হয় না।) যিনি বৈদিক রাজার স্তুতিগায়ক, তিনিই সুক্তকার, আবার তিনিই রাজার পুরোহিত। আমরা এ যুগে তাঁদের বলি ঋষি। এঁদের রচিত দেবতা ও নৃপতির স্তুতি ও বীরত্ব-গাথাই বেদের বিষয়-বস্তু।

পুরোহিত ও কবি বহু কাল ধ'রে একই ব্যক্তি ছিলেন। কারণ কাব্য ও ধর্মানুষ্ঠান জড়িত ছিল ওতপ্রোত ভাবে; আর ছিল ধর্মানুষ্ঠানে পুরোহিতের একচেটিয়া অধিকার। বহু কাল পর্য্যন্ত ধর্মানুষ্ঠানে আবশ্যিক ও অপরিহার্য ছিল কাব্য-সম্পর্কিত নৃত্য ও গীত, কায়িক ও বাচিক ভঙ্গী। পুরোহিত ও কবি শ্রেণী হিসাবে পৃথক হয়েছেন অনেক পরে। যেখানে সামাজিক শ্রেণী বিভাগ অনেক বেশী রকমের দৃঢ়—যেমন ভারতীয় সমাজে—সেখানে দেখা যায়, কবি ও পুরোহিত প্রায় আধুনিক কাল পর্য্যন্ত, হাত-ধরাধরি করে এসেছেন। কবি ও পুরোহিতের সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে প্রকৃত পক্ষে অতি-আধুনিক যুগে।

সভ্য যুগের প্রথম দিকের কবির রচিত বীর ও রাজন্য-চরিত-গাথারই (Ballad) পরবর্তী মহিমান্বিত ও বৃহত্তর সংস্করণ মহাকাব্য (Epic)। পৃথিবীর সব জাতিরই প্রাচীন সাহিত্যে মহাকাব্য বিশিষ্ট আসন গ্রহণ ক'রে আছে, কোন রাজা বা রাজবংশের কাহিনী যুগ-যুগান্ত ধ'রে শব্দাকারে গ্রথিত ও বর্ধিত হয়ে যে মহাকাব্যের সৃষ্টি, পরবর্তী কালে কোন কবি বা কবি-সম্প্রদায় তা লিপিবদ্ধ করেছেন। মহাকাব্য কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়, বহু কাল ধ'রে বহু কবির কল্পনা ও শব্দ-সম্ভারে মহাকাব্য সমৃদ্ধ। হোমারও 'ইলিয়াড' 'অডেসী'র রচক নন, বাল্মীকি ও বেদব্যাসও 'রামায়ণ' 'মহাভারতে'র রচক নন। প্রাক্-ইতিহাস যুগের 'ট্রয়ে'র মর্মান্তিক ধ্বংস, ইউলিসিসের অসাধারণ বীরত্ব, প্রজারঞ্জক রামচন্দ্রের মহিমা এবং কুরু-পাণ্ডবের ভয়াবহ ভ্রাতৃযুদ্ধ এক দিন সত্য ঘটনাই ছিল—আরগস ও ইথাকা, সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশের গুণমুগ্ধ কবিদের সে কাহিনী অনুপ্রাণিত করেছিল। তার ফলে তাঁরা যে গাথা রচনা করেছিলেন, বহু কাল ধ'রে বহু ধর্মানুষ্ঠানে তা গীত হয়েছে। বংশানুক্রমিক ভাবে কবিরা সেই সম্পদকে রক্ষা করেছেন; 'শতেক যুগের কবিদলের' মিলিত প্রতিভায় সৃষ্টি হয়েছে বিশাল মহাকাব্যের। হোমার কে ছিলেন তার সন্ধান আজ মিলবে না;

সন্ধান মিলবে না বাল্মীকি, বেদব্যাসের। কিন্তু হোমারের নামে উদ্বুদ্ধ 'হোমেরিডাই' বা হোমারের সন্তানেরা এবং ভরতের সন্তান 'ভাটেরা' সুদূর অতীতের বীরত্ব-কাহিনীকে মুখে মুখে বহন ক'রে এনেছে। এ কথা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, একদা এই 'হোমেরিডাই' ও 'ভাটেরা' বংশগত ভাবেই সম্পর্কিত ছিল।

মহাকাব্য আগেকার দিনে আজকের মত পঠিত না হয়ে গীত হ'ত। লব-কুশ বীণা-সংযোগে প্রথম রামায়ণ গান করেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণ সম্পর্কে বলেছেন: "পাঠে ও গানে মধুর, দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত এই তিন মানে এবং ষড়্জ, ঋষভ, প্রভৃতি সপ্তস্বরে বীণাদি তন্ত্রীবাদ্যের সমলয়ে গানের যোগ্য।"—(বালকাণ্ড ৪।৮)। প্রাচীন গ্রীসের 'হোমেরিডাইরা বিশ্বাস ক'রত যে, হোমার বীণাযোগে গান করতেন তাঁর কাব্য। পরবর্তী কালে 'হোমেরিডাইরা অনুষ্ঠান সময়ে হাতে একটি ক'রে দণ্ড ধারণ করতেন। বিশেষজ্ঞদের মতে দণ্ডটি প্রাচীন কালে ব্যবহৃত বীণার প্রতিকল্প। মহাকাব্য-গীতের ক্ষেত্র ছিল ধর্মোৎসব। রামায়ণ গীত হয়েছিল রামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞের সময়। পরীক্ষিতের অশ্বমেধ-যজ্ঞের সময় সর্বপ্রথম পঠিত হয়েছিল মহাভারত। ধর্মানুষ্ঠানের বিষয়-বস্তুর সংগে সম্পর্ক না থাকলেও আজো নিষ্ঠাবান ভারতীয় হিন্দুর কয়েকটি ধর্মানুষ্ঠানের সময়ে মহাকাব্য পঠন ও শ্রবণ আবশ্যিক কর্ম।

গীত-বিবর্জিত হয়ে মহাকাব্যের বিশুদ্ধ পাঠ-কাব্য রূপপ্রাপ্তি সম্ভব হল কি ক'রে? 'অডেসি'তে চার বার ভাটের সংগীতানুষ্ঠানের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। প্রথম অনুষ্ঠানে কেবল বীণা-সংযোগে গীতের উল্লেখ পাই। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি প্রথমটির মত হলেও বীণার সংগে নৃত্যের উল্লেখও আছে। অপর দুই অনুষ্ঠানে দেখতে পাই, ভাট গাইছেন আর তাঁর সংগে রয়েছে সমবেত নৃত্য (chorus dancing)। এগুলি থেকেই মহাকাব্য-গীতের প্রাচীন রূপটি চিনে নিতে কষ্ট হয় না। আর যুক্তিসঙ্গত ভাবেই অনুমান করা যেতে পারে যে, আদিম অনুকার-নৃত্যানুষ্ঠানের পরিচালক এবং সমবেত অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা অনেক দিন ধ'রেই বেঁচে ছিল মহাকাব্য-গীতানুষ্ঠানের একক ও ধুয়ার মধ্যে। পরিচালক বা এককের ভূমিকার উপর জোর দেওয়ায় কালক্রমে সমবেত ও ধুয়ার ভূমিকা অপ্রধান হয়ে পড়েছিল। তার ওপরে একক ভূমিকা থেকে বাদ্যযন্ত্রটি বর্জিত হওয়ায় সংগীত-বর্জিত বিশুদ্ধ পাঠ-কাব্যের ক্রমিক বির্বতনটি সম্পূর্ণ হয় এবং মহাকাব্য তখন থেকেই পঠনযোগ্য হয়ে ওঠে।

মহাকাব্য খাঁটি অর্থে কখনই হয়নি একেবারে আধুনিক কাল ছাড়া। প্রাচীন ভারতে দেবমন্দিরে মহাকাব্য আবৃত্তির রেওয়াজ ছিল। সপ্তম শতকের 'কাদম্বরী'তে দেখি, রাণী শিবের মন্দিরে চলেছেন মহাকাব্য আবৃত্তি শুনতে। সেই শতকের একটি অনুশাসনে দেখতে পাই, সুদূর কাম্বোজে ব্রাহ্মণ সোমশরণ নিয়মিত আবৃত্তির জন্য দেবমন্দিরে মহাভারত উপহার দিয়েছেন। মহাভারতের শেষ দিকে মহাকাব্য আবৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এ কথা জোর করেই বলা যেতে পারে যে, এ আবৃত্তি আধুনিক অর্থে আবৃত্তি কখনই ছিল না। সংগীত না হলেও এতে সুরের প্রাধান্য মোটেই কম ছিল না।

মহাকাব্য-গীতের প্রাচীন রূপটি আমাদের দেশে বহু কাল বেঁচে ছিল। আসরে রামায়ণ গান করা হ'ত বলেই সাধারণ ভাবে জিনিষটা এখনো 'রামায়ণ-গান' নামে পরিচিত। এতে আসরে এক জন মূল গায়েন কাহিনী বিবৃত করেন বিভিন্ন সুর-সংযোগে, কখনো কখনো বা ব্যাখ্যাও করেন শ্রোতার বুঝবার সুবিধার জন্য এবং বিভিন্ন রস, এমন কি হাস্যরসটি সৃষ্টি করতেও ভোলেন না। তাঁর সংগীরা ধুয়া ধরে থেকে-থেকে। 'রামায়ণ-গানে'র এই পদ্ধতিটি এখনো একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি এ দেশ থেকে। এই পদ্ধতির প্রকার-ভেদও আছে। কোথাও 'পাঠক' ও 'ধারক' এই দুই দলে ভাগ হয়ে এক দল কাহিনী অংশ বিবৃত করে যায়, অপর দল ধুয়া ধরে তাল ও সুরের সঙ্গতি রক্ষা করে। এ অনুষ্ঠানের মধ্যে নাটকীয় হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গীর প্রাচুর্য মোটেই কম থাকে না। বিষয়-বস্তুর ভাব অনুযায়ী মূল গায়েন স্বাভাবিক ভাবেই নাটকীয় রস সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। মহাকাব্য-গীতপদ্ধতির সহজ, সরল ও পরবর্তী রূপ কথকতা। কথক কাব্যাংশ আবৃত্তি করেন, মাঝে মাঝে আবার সুর-সংযোগে কাব্যাংশকে সংগীতে রূপান্তরিত করেন। কথকতায় আবৃত্ত্যংশের বাহুল্য বেশী এবং কথক সম্পূর্ণ ভাবে একক।

দুর্লক্ষণের স্বপ্ন সত্যি হয়!

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের পরিষদের সভ্যগণ পরিষদ-কক্ষে প্রবেশ ক'রেই দেখলেন, আব্রাহাম লিঙ্কন চিন্তিত এবং অতি বিষণ্ণ মুখে আছেন। লিঙ্কন সভ্যদের বললেন,—ভদ্রমহোদয়গণ, খুব শীঘ্র আপনারা বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ জানতে পাবেন।

সভ্যদের এক জন প্রশ্ন করলে,—সভাপতি, কোন কিছু দুঃসংবাদ আছে কি?

লিঙ্কন বললেন,—আমি কিছুই শুনতে পাইনি, কোন সংবাদও নেই। কিন্তু গত রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখলাম, আমি একা একটা নৌকায়। নৌকায় হালও নেই, নোঙরও নেই।

এক মুহূর্ত্ত চুপচাপ থাকেন সভাপতি। পুনরায় বলেন,—আমি ঐ ধরণের স্বপ্ন অনেক বার দেখেছি গত মহাযুদ্ধের সময়। যখনই দেখেছি, তখনই কোন না কোন যুদ্ধ নিকটবর্ত্তী হয়েছে দু'-এক দিনের মধ্যে। হাঁ, ভদ্রমহোদয়গণ। বোধ হয় আগামী কল্য, কিংবা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আপনারা জরুরী কোন সংবাদ পাবেন।

পাঁচ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। আততায়ীর গুলীর আঘাতে নিহত হন আব্রাহাম লিঙ্কন।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাণী লক্ষ্মী এই ভাবে স্বামীর অনেক ভুল-চুক নানা রকম গল্প বলে এবং কখনো বা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সেগুলি সংশোধনের উপায় করে দেন। ফলে পত্নীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আলোকে মহারাজ গঙ্গাধর সত্য নির্ণয়ে সমর্থ হন। ক্রমে ক্রমে রাণীর প্রতি তাঁর আস্থা ও নির্ভরতা এমনই প্রবল হয়ে ওঠে যে, অন্দর-মহলের অনেক বিধিনিষেধ তিনি তুলে দিয়ে অন্তঃপুরিকাদের স্বাধীনতার পথও খুলে দেন।

মহারাজ গঙ্গাধরের, একটি প্রধান সখ ছিল—শিকার। পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হয়ে প্রায়ই তিনি শিকার করতে বেরুতেন এবং মহারাজের এই শিকারে যাওয়ার ব্যাপারটি কোন রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার মতই আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে রাজধানীতে চাঞ্চল্যের শিহরণ তুলত, আর অজস্র টাকারও শ্রাদ্ধ হোত এই বিলাস-উল্লাসে। শিকারে বেরিয়ে সদ্য-সদ্যই যে মহারাজ সদলবলে ফিরতেন তা নয়—দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চলত এই একটানা শিকার-পর্ব। রাণী লক্ষ্মী একটি একটি করে রাজার অপব্যয়মূলক সখগুলি বন্ধ করে দিয়েছেন, এখন এই শিকার-পর্বটির দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। তিনি অনেক দিন ধরেই লক্ষ্য করছিলেন, রাজার এই সখটি নিছক ব্যক্তিগত এবং সেই সঙ্গে তাঁর অনুগত স্তাবকদের স্বার্থ-প্রণোদিত বিরাম ছাড়া আর কিছু নয়; এ ব্যাপারে প্রজাদের কোন ইষ্ট নেই, বরং মাঝে মাঝে রাজ-দরবার ছেড়ে রাজধানীর বাইরে সপার্ষদ মহারাজার এ ভাবে অবস্থিতির জন্য রাজকার্য্যেরই অসুবিধা হয়—অনেক প্রয়োজনীয় কাজ মহারাজের প্রতীক্ষায় পড়ে থাকে এবং শিকারের লোভে অনেক বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীও কার্যভার সহকারীদের উপরে চাপিয়ে এই শিকার-পর্বে যোগ দিয়ে থাকেন।

রাণী লক্ষ্মী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এ সব লক্ষ্য করতেন। সব জেনেও তাঁকে নীরব থাকতে হোত; কারণ, সহজাত বুদ্ধিতেই তিনি মহারাজের প্রকৃতি ভালো ভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন—শিকার-পর্বকে তিনি রাজধর্ম ভেবেই মহোৎসাহে এ কার্যে ব্রতী থাকেন; রাণীর আপত্তি এখানে অনর্থ উপস্থিত করবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রাণী যখন রাজার অনেক অপব্যয় বন্ধ করে রাজার চোখ খুলে দিলেন, রাণীর পরামর্শে রাজ-সেরেস্তারও শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকল, রাজকার্য্যের মধ্যে রীতিমত একটা শৃঙ্খলা এসে গেল, রাণীর সর্বতোমুখী প্রতিভায় মহারাজ অভিভূত হলেন, সেই সময় এক দিন সময় বুঝে রাণী লক্ষ্মী শিকারোৎসব সম্পর্কে এই বিপুল অপব্যয়টি বন্ধ করতে তাঁর বুদ্ধির অস্ত্রটি উদ্যত করলেন।

মহারাজ গঙ্গাধর রাও শিকারে বেরুবেন—কয় দিন ধরেই তার আয়োজন চলেছে। রাজপুরীর সর্বত্রই 'সাজ সাজ' রবে সাড়া পড়েছে। সেরেস্তার পদস্থ কর্মচারীরা রাজার কাছে একে একে আর্জী পাঠিয়েছেন—আগামী শিকারে তাঁরাও যাতে মহারাজের অনুগমনের অনুমতি লাভ করে ধন্য হন। রাজকর্মচারীদের মধ্যে কা'দের ভাগ্য এবার প্রসন্ন হবে, এখনো তা অজ্ঞাত, যেহেতু মহারাজ তাঁর অভিপ্রায় প্রকাশ করেননি।

এমন সময় রাণী লক্ষ্মী এলেন মহারাজ গঙ্গাধরের খাস-কামরায়। রাণী জেনেছিলেন যে, রাজকর্মচারীদের ভিতর থেকে শিকার-সঙ্গী নির্বাচন করতে মহারাজ এবার বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছেন। কারণ, রাণীর ব্যবস্থায় এমন ভাবে কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়েছে যে, সেরেস্তা থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য এক পাল পদস্থ কর্মচারীর একসঙ্গে কোথায় যাওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়—তা'হলে সেরেস্তা অচল হয়ে পড়বে। এ অবস্থায় দেওয়ান লক্ষণরাও কিম্বা রাণী লক্ষ্মীর সঙ্গে পরামর্শ প্রয়োজন।

রাণীর প্রতি রাজার এতখানি আস্থার এক রহস্যময় কারণ আছে। মহারাজার পার্ষদ বলে পরিচিত আড়াই হাজার লোকের মধ্যে তিনি যখন পঞ্চাশ জনকে মাত্র তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গরূপে চিহ্নিত করেন, বাকি সকলে পারিষদ হোলেও তাদের অনেকের নামও তিনি জ্ঞাত নন বলে জানিয়েছিলেন, তখনই রাণী লক্ষ্মী অবাক হয়ে মন্তব্য করেন—"এ কিন্তু খুবই আশ্চর্যের কথা মহারাজ, এতগুলি লোক আপনার পার্ষদ, আপনাকে ঘিরে বসে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে-ফেরে, অথচ আপনি তাদের নামও জানেন না! আমি কিন্তু এক বার যাকে দেখি, আর আমাদের কারোর সঙ্গে তার সম্বন্ধ আছে বুঝি, তার নাম কখনো ভুলি না।"

মহারাজ গঙ্গাধর রাণীর মুখে কথাটি শুনে ভেবেছিলেন, তিনি এটা বাড়িয়ে বলেছেন। এত লোকের নাম কেউ কখনো মনে রাখতে পারে না।

দেওয়ান লক্ষ্মণরাও পর্যন্ত রাণীর কথায় চমকে উঠেছিলেন। তিনি রাণীর অজ্ঞাতে রাজাকে বলেন—'মেয়েদের সব কথায় কান দিতে নেই, ওঁরা সব বিষয়েই মাত্রা বাড়িয়ে বলেন। আমার নিজের সেরেস্তায় যে সব কর্মচারী কাজ করে, আমিই তাঁদের সকলের নাম জানি না। বেশ ত, উনি ত ঠিক করেছেন—হাজার লোককে বেছে বেছে কাজে লাগাবেন; তাঁরা না কি আপনার কাজও করবেন, আর সেরেস্তায়ও বাহাল থাকবেন; এখন এঁদের নামগুলো তিনি যদি মনে করে রাখতে পারেন তা'হলে বুঝব—আপনাকে এ ভাবে কটাক্ষ করবার অধিকার রাণীর আছে।'

মহারাজ গঙ্গাধর দেওয়ানের কথায় উৎফুল্ল হয়ে বলেন—ঠিক কথাই বলেছেন আপনি। কিছু দিন যাক, এর পর কথাটা তোলা যাবে।

মাস কয়েক পরেই মহারাজার খাস-কামরায় তাঁর সামনে সেদিন দেওয়ান লক্ষ্মণরাও এবং রাণী লক্ষ্মী উভয়েই উপস্থিত; গঙ্গাধর রাও ভাবলেন, এই ঠিক সময় এসেছে রাণীর সঙ্গে স্মৃতিশক্তি নিয়ে একটা বোঝাপড়া করবার।

ব্যয়-সঙ্কোচ সম্পর্কেই সেদিন আলোচনা চলেছে। রাজ্য-সংক্রান্ত আলোচনার সময় এখন মহারাজার খাস-কামরায় রাণী লক্ষ্মীকেও আহ্বান করা হয়। অবশ্য, দেওয়ান লক্ষ্মণরাও এ ব্যবস্থায় সম্মত হননি প্রথমে, রাজনীতির ব্যাপারে নারীবুদ্ধির সহায়তা নেওয়া—বিচক্ষণ মহারাজ এবং তাঁর মত নীতিবিদ্ দেওয়ানের পক্ষে গৌরবের কথা নয়—এই যুক্তিতে প্রতিবাদও করেছিলেন। তবে মহারাজের দৃঢ়তায় শেষ পর্যন্ত সম্মতি না দিয়ে পারেননি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, যখনই রাজনীতি সম্পর্কে গুরুতর কোন আলোচনার প্রয়োজন হয়েছে, সেই আলোচনা-সূত্রে রাজ্যের তরুণী রাণী লক্ষ্মীর বলিষ্ঠ মতবাদ ঝুনো রাজনৈতিক লক্ষ্মণরাও কোন দিনই খণ্ডন করতে সমর্থ হননি।

সেদিন আলোচনার প্রথমেই মহারাজ বললেন: দেওয়ানজী তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করছিলেন রাণী! যে দেড় হাজার লোককে প্রাসাদ থেকে সরিয়ে বাহিরের কাজে লাগানো হয়েছে, তাদের কোন নালিশ নেই—ভালো ভাবেই দিন গুজরান করছে তারা।

লক্ষ্মী বললেন: তাদের নালিশ করবার পথ ত আমি খুলে রাখিনি মহারাজ। তারা এখন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথই চিনেছে। এখানে পড়ে থাকলেই বরং তাদের দিনে দিনে পতন হোত।

মহারাজ পুনরায় বললেন: তার পর যে হাজার লোক আমাদের কাজ করছে, তুমিই যাদের সুপারিশ করেছিলে—তাতে আমাদের সুবিধাই হয়েছে, এই ক' মাসে ব্যয়-সঙ্কোচও কম হয়নি। অবিশ্যি, বেচারাদের ঘাড়ে কাজের চাপটা বেশীই পড়েছে।

লক্ষ্মী সহসা কিছু গম্ভীর হয়ে বললেন: মনের জোর থাকলে কাজের চাপের জন্যে কাজের মানুষ কখনো অসন্তুষ্ট হতে পারে না, বরং সেই চাপটা নামাবার দিকেই তার মন পড়ে থাকে, আর তাতে আনন্দই পায়। এই যে আমাদের দেওয়ানজী বৃদ্ধ হয়েছেন, তবুও কাজকে ভয় পান না, কাজও তাই ওঁর কাছেই এগিয়ে আসে।

দেওয়ানজী বললেন: এ কথা সত্য, রাণী কথা হিসাব করেই বলেন। তবে কাজের মর্ম বোঝে তারাই—যারা কাজের সঙ্গেই বরাবর সংশ্লিষ্ট। সেরেস্তার কাজ ত আর রাণীর পক্ষে জানা সম্ভবপর নয়, কাজেই ওঁর হিসেবে যদি ভুল হয়, তাতে দোষ দেওয়া যায় না।

রাণী বললেন: কিন্তু আমার হিসাবের ভুল ত বড় একটা হয় না দেওয়ান সাহেব!

দেওয়ান বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন: সেরেস্তার লোকেই ভুলটি দেখিয়েছেন কি না! রাণী যাঁদের বাহাল করেছিলেন সেরেস্তায়, তাদের মধ্য থেকে এক জন এই নালিশ করেছে!

রাণী: ভারি আশ্চর্য ত! আমরা যাঁদের এখান থেকে সরিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবিকার সংস্থানের কঠিন ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তাঁরা কেউ নালিশ করলেন না—অথচ, সেরেস্তায় বাঁধা মাইনের কাজ পেয়ে স্বচ্ছন্দে সচ্ছল ভাবে যাঁরা জীবন-যাত্রার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের পক্ষ থেকেই নালিশ এসেছে? কে নালিশ করেছেন শুনি?

দেওয়ানজী একবার মহারাজার মুখের দিকে তাকালেন, তার মধ্যে যেন একটা প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন রয়েছে। মহারাজা তখন বললেন: হ্যাঁ, হ্যাঁ, লোকটার নাম বলুন দেওয়ানজী—রাণী ত সবার নাম জানেন, বললেই উনি চিনতে পারবেন।

অভিযোগকারীর নামটি ভুলে গেছেন, এমনি একটা ভঙ্গি করে দেওয়ান লক্ষ্মণরাও আমতা আমতা করে বললেন: সে লোকটি আবার মহারাজের খুবই প্রিয়পাত্র, তার ইচ্ছা, খানিকটা সময় মহারাজের মজলিসে বসে ওঁকে আনন্দ দেয়; কিন্তু বেচারীর ঘাড়ে সেরেস্তার কাজের চাপ এত বেশী যে, ঘাড়টি তোলবারও ফুরসৎ পায় না—শিকার-মহল দপ্তরের কাজ কি না···

মহারাজ গঙ্গাধর বললেন: আ হা—তার নামটা বলুন?

তেমনি আমতা আমতা করে দেওয়ানজী বললেন: নামটাই মনে পড়ছে না···হাজারো লোক সেরেস্তায় কাজ করে, কাঁহাতক প্রত্যেকের নাম মনে রাখি! আমার সেরেস্তায় সে লোকের দরখাস্ত আছে—নামটা মনে পড়েও পড়ছে না যে!

রাণী বললেন: আপনার সেরেস্তায় শিকার-মহলে পাঁচ জন লোক ত কাজ করে। তাদের কারুরই নাম মনে পড়ছে না?

দেওয়ান জবাব দিলেন: এক জনের নাম মনে আছে—সখারাম ভাস্কর।

রাণী বলিলেন: বাকি চার জনের নাম হচ্ছে—তুকাজী, ত্র্যম্বকরাও, সদাশিব আর নৃপৎরাম।

দেওয়ান এই সময় সহর্ষে বলে উঠলেন: হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি এই সদাশিবের কথাই বলছিলাম।

গঙ্গাধর রাও অবাক-বিস্ময়ে কিছুক্ষণ রাণীর দিকে চেয়ে থেকে তার পর সুধালেন: আশ্চর্য, তুমি ওদের নাম সব কণ্ঠস্থ করে রেখেছ না কি?

রাণী সহাস্যে বললেন: মহাভারতের গান্ধারীর একশ' ছেলে ছিল শুনিছি; তিনি কি তাদের নাম ভুলে যেতেন বলতে চান মহারাজ? যাঁরা আমাদের সংস্পর্শে থেকে কাজ করেন—সবাই ছেলের মত, তাঁদের নাম মনে থাকবে না? আপনি দয়া করে যেদিন থেকে সেরেস্তার সঙ্গে আমার সংযোগ করে দেন, সেই দিন থেকে সেরেস্তার সবাইকে আমি জেনেছি, চিনিছি, প্রত্যেকের নাম মনে করে রেখেছি।*

মহারাজ গঙ্গাধর এ কথার পর আর একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধ দেওয়ানের দিকে তাকালেন। দেওয়ান লক্ষ্মণরাও সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেলেন।

রাণী এর পর জিজ্ঞাসা করলেন: সদাশিবের নালিশটা সম্বন্ধেই এখন তা'হলে বিচার হোক; তাকে এখানে আনবার ব্যবস্থা করুন।

হো-হো করে এইবার হেসে উঠলেন মহারাজ গঙ্গাধর; হাসির পর মৃদু স্বরে বললেন: আসলে ওটা বাজে কথা; রাণীর স্মৃতিশক্তি

---

* রাণীর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও প্রশংসা করে লিখেছেন যে, তাঁর আমলেও ঝাঁসী-সেরেস্তার কর্মচারীদের সংখ্যা ছিল সাড়ে সাত শত। রাণী ব্যক্তিগত ভাবে এঁদের প্রত্যেককে চিনতেন এবং নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পূজা-অর্চনার পর প্রত্যহ দরবারের পূর্বে প্রাসাদের এক বিশেষ স্থানে কর্মচারীরা রাণীকে দর্শন করতে আসতেন। কেহ অনুপস্থিত থাকলে রাণী তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন। অসুস্থ হয়েছেন শুনলে তৎক্ষণাৎ তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতেন।

পরীক্ষা করবার জন্যেই ব্যাপারটা সাজানো হয়েছিল। রাণী পরীক্ষায় জিতে গিয়ে আমাদের দু'জনকেই তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছেন।

অতীতের এই রহস্যময় কাহিনীটি স্মরণ করেই মহারাজ গঙ্গাধর রাণীকে সুধালেন: বল ত, সেরেস্তা থেকে দিন কয়েকের জন্যে কোন্ কোন্ লোককে আমার শিকার-সঙ্গী করা যায়? তুমি ত প্রত্যেকেরই নাম আর এলেম জানো, কাজেই তুমি ঠিক বলতে পারবে।

রাণী নিবিড় ভাবে মহারাজের প্রসন্ন মুখখানির উপর তাঁর টানা টানা দু'টি আয়ত চোখের অপূর্ব দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন: মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে আমি যে কথা বলব, সে কি মনঃপূত হবে?

ঈষৎ হেসে মহারাজা বললেন: বিলক্ষণ! তোমার কোন কথাই ত বাজে বা খাপছাড়া নয়; যা বলো, তার পিছনে থাকে জোরালো যুক্তি—তবে মনে লাগবে না কেন?

রাণী এবার গম্ভীর ভাবে বললেন: তা'হলে এবারকার শিকারে সেরেস্তার কোন লোককেই সঙ্গে নেবেন না।

মহারাজ গঙ্গাধর চমকে উঠে বললেন: সে কি! তুমি জানো যে, সেরেস্তায় আমার অনেকগুলি অন্তরঙ্গ লোক কাজ করে; তারা বরাবরই প্রত্যেক মজলিসে হাজির থাকে। আমি যখন যেখানে যাই—ছায়ার মত আমার অনুগমন করতে তারা অভ্যস্ত। এখন তুমি তাদের নিরাশ করতে চাও? তারা কি মনে করবে বল ত?

রাণী বললেন: আপনি যদি সেরেস্তা থেকে বেছে-বেছে আপনার অন্তরঙ্গদের নিয়ে আমোদ করতে যান, আপনার সেরেস্তা কি করে চলবে? তার পর—কতকগুলি লোকের উপর এ রকম পক্ষপাতিতার জন্যে সেরেস্তার আর সকলে কি মনে করবে, সেটাও আপনার ভাবা উচিত। এই জন্যেই বলেছি। এবার শিকারে সেরেস্তা থেকে কেউ আপনার সঙ্গে যাবে না।

একটু বিরক্ত হয়েই মহারাজ সুধালেন: তা'হলে কি তুমি বলতে চাও, কতকগুলো সিপাহী, শিকারী আর খিতমতদার নিয়েই এবার আমি শিকারে বেরুব? অবসর সময়ে এরাই আমার মজলিস জাঁকিয়ে বসবে—এ কি সম্ভব?

রাণী জবাব দিলেন: না, না, তা কি আমি বলতে পারি মহারাজ? একে জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু ফেলে থাকা, সেখানে অন্তত গল্প-গুজবের ব্যবস্থা না থাকলে টেঁকবেন কি করে? তাই আমি ব্যবস্থা করেছি, এবার আমিই আপনার সঙ্গে যাব, আর আমার সঙ্গিনীরাও আমার সঙ্গে থাকবে।

রাণী যে কথায় কথায় এই প্রস্তাব করে বসবেন হঠাৎ, মহারাজ তা কল্পনাও করেননি। শুনেই দুই চোখ বিস্ফারিত করে বলে উঠলেন: বল কি? তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও, আর তোমার সঙ্গিনীরাও—

রাণী তাড়াতাড়ি বললেন: তারা প্রত্যেকেই নানা রকম কলাবিদ্যা জানে, শিকারের সময় তাদের লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা দেখলে আপনার শিকারী কিম্বা সিপাহীরা পর্য্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যাবে। এরা গেলে সিপাহী-শাস্ত্রীও আপনাকে নিতে হবে না—এরাই সে কাজ করবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ সোজা হয়ে বসে মহারাজ গঙ্গাধর বললেন: তোমার মতলবটি এখন বুঝিছি—তুমি দেখছি সাধারণ মেয়ে নও।

রাণীও সহাস্যে উত্তর দিলেন: আমি যে সাধারণ মেয়ে নই, এ কথা বাপুজীই বলে গেছেন। কিন্তু আমার মতলব সম্বন্ধে মহারাজ কি বুঝেছেন জানতে পারি?

মহারাজ গঙ্গাধর বললেন: সেরেস্তায় যারা আমার প্রিয়পাত্র, তুমি তাদের সেরেস্তায় আটকে রাখতে চাও—যাতে তারা আমার সংস্পর্শে আসতে না পারে।

মুখখানি হঠাৎ কঠিন করে রাণী বললেন: মহারাজ যা বললেন, ঠিক তাই নয়। তবে সেরেস্তার কাজ ফেলে তারা মহারাজের প্রিয়পাত্র হয়ে আমোদ করতে যায়—এ আমার ইচ্ছা নয়। সেরেস্তার কাজ বজায় রেখে তারা মহারাজের সঙ্গে মজলিস করলেও আমার কোন আপত্তি নেই। এক সন্তানের প্রতি বাপ-মা'র পক্ষপাতিতা দেখলে আর সব সন্তানের মন যেমন ভেঙে যায়, প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। এখানে প্রভুর পক্ষপাতিতা অনর্থ ঘটায়। এ ছাড়াও আমার আর এক মতলব আছে মহারাজ!

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মহারাজ রাণীর পানে তাকাতেই তিনি বললেন: আমাদের রাজ্যের পরেই কাল্পীর বিরাট জঙ্গল। ওর নামই শুনিছি, কখনো দেখা হয়নি। এবারকার শিকার খেলা হোক্ কাল্পীর জঙ্গলে।

মহারাজ বিস্ময়ের সুরে বললেন: সে যে অনেক দূর; তাছাড়া কাল্পী ঝাঁসীর এলাকার বাইরে।

রাণী বললেন: কিন্তু কাল্পীর বেওয়ারিশ জঙ্গলকে ঝাঁসীর এলাকার মধ্যেই আনতে হবে। আপনার পূর্বপুরুষ কাল্পীতেই নানা পণ্ডিতকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে ইংরেজকে রক্ষা করেছিলেন। সেদিক দিয়ে ঐ জঙ্গলের উপর ঝাঁসীর দাবী আছে। শিকারকে উপলক্ষ করে আমরা ঐ জঙ্গলকেই ঝাঁসীর সীমান্ত অঞ্চল বলে চিহ্নিত করতে পারি।

মহারাজ বুঝলেন যে, ভবিষ্যৎ ভেবেই দূরদর্শিনী রাণী এই প্রস্তাব তুলেছেন—শিকারের মধ্যেও রাজ্যের স্বার্থ তিনি এই ভাবে উদ্ধার করতে চান। যে জঙ্গল বহু কাল ধরে অনধিকৃত হয়ে আছে, রাণী তাকে রাজ্যাঙ্গে মিশিয়ে ঝাঁসী রাজ্যকে সুরক্ষিত করতে চান। আশ্চর্য, এ চিন্তা কোন দিন তাঁর মনে ওঠেনি, তাঁর সচিবগণ এবং বিচক্ষণ দেওয়ান সাহেবও কাল্পীর সম্বন্ধে এ কথা চিন্তাও করেননি।

রাণীর অনেক দিনের প্রচ্ছন্ন আগ্রহ এই সূত্রে চরিতার্থ হলো। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে রাজান্তঃপুরের যে সব তরুণীকে মারাঠা বীরাঙ্গনার যোগ্য শিক্ষা দিয়েছেন, এই শিকার উপলক্ষে কাল্পীর জঙ্গলে তার পরীক্ষার অবকাশ ঘটল।

৯

সকলেই শুনল যে, মহারাজ মত-পরিবর্তন করেছেন। কাল্পীর জঙ্গল দেখবার জন্য রাণী আগ্রহ প্রকাশ করায়, মহারাজ এবার দূরবর্তী কাল্পী ভ্রমণে চলেছেন, সঙ্গে থাকবেন মহারাণী এবং তাঁর সহচরীরা। রাজ-পারিষদবর্গ এবার পরিত্যক্ত হয়েছেন।

স্বামীর সঙ্গে রাজ্যসীমা পরিদর্শন এবং কাল্পীর মহাবনটির

সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করাই রাণীর প্রধান লক্ষ্য ছিল। রাণীর সহচরীরা মারাঠা বীরাঙ্গনাদের মত সজ্জিত হয়ে রাণীর সঙ্গে চললেন। তাঁদের প্রত্যেককে পশুহনন ও আত্মরক্ষার উপযুক্ত নানা রকম অস্ত্র দিলেন রাণী—ধনুর্বাণ, বন্দুক, বর্শা, তরবারি, কোমরে ভোজালী। বাড়তি সিপাহীদের পরিবর্তে মহারাজার দেহরক্ষীদের সঙ্গে বেতন-ভোগী শিকারীরাই এবার আগে-পিছনে চলল।

এ পর্য্যন্ত কাছাকাছি অরণ্যগুলিতেই মহারাজ শিকার করেছেন; তাঁর শিকারের জন্য অনেকগুলি জঙ্গল অনেক দিন ধরেই বিশেষ ভাবে সুরক্ষিত হয়ে আছে। বহু লোক সেই সব জঙ্গল রক্ষণাবেক্ষণ করে—এই ব্যাপারেও প্রচুর অর্থের অপব্যয় হয়ে থাকে। কিন্তু এবার রাণীর প্ররোচনায় মহারাজ চলেছেন রাজধানী থেকে বহু দূরে অরক্ষিত ও অনধিকৃত এক দুর্গম মহাজঙ্গলে শিকার করতে—সঙ্গে মহারাণী এবং তাঁর প্রিয় সহচরীবৃন্দ। মহারাজের কতিপয় বিশ্বস্ত খিতমতদার ভিন্ন অন্তরঙ্গ পারিষদবর্গের কেউই এই শিকার-যাত্রায় যোগদানের সুযোগ পাননি।

দীর্ঘ পথ পর্যটনে পরিশ্রান্ত হলেও মহারাজ প্রচুর আনন্দ পেলেন। তথাপি তাঁকে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র মিছিলটিকে নিরস্ত করে বিশ্রাম নিতে হলো, কিন্তু রাণীর দেহে ক্লান্তির লেশমাত্র নেই। তাঁর সহচরীদের মধ্যেও কেউ কেউ হয়ত অল্প-স্বল্প শ্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু রাণী অক্লান্ত ভাবেই এগিয়ে চলেছেন—তাঁর ইচ্ছা, একেবারে কাল্পীর জঙ্গলে গিয়েই বিশ্রাম করবেন। কিন্তু মহারাজকে বিশ্রামার্থী দেখেই তাঁকে মত-পরিবর্ত্তন করতে হলো।

এই মিছিলে এ পর্যন্ত রাজা ও রাণী সুসজ্জিত রাজহস্তীর হাওদায় ছিলেন। তবে রাণীর ইচ্ছা ছিল, সহচরীদের সঙ্গে বরাবর ঘোড়ার পিঠে চড়েই কাল্পীর জঙ্গলে যাবেন। কিন্তু মহারাজ গঙ্গাধর আপত্তি করে বললেন: সেটা ভালো দেখাবে না। তুমি আমার সঙ্গে বরং হাতীতেই চলো, তোমার সহচরীরা শিবিকায় যাবে।

স্বামীর আপত্তির কারণ বুঝতে পেরে রাণী আর আপত্তি করেননি; তবে তিনিও এই মর্মে একটা পাল্টা প্রস্তাব তুলেছিলেন: 'রাজধানীর পথটুকু না হয় এই ভাবেই যাওয়া যাবে; কিন্তু তার পর গ্রামাঞ্চলে পৌঁছালেই আমরা ঘোড়ায় চড়ে কাল্পী যাবো—আমাদের ঘোড়াগুলো মিছিলের সঙ্গে সঙ্গেই চলবে। ফেরবার সময়ও এই ভাবে রাজধানীতে আসা হবে।'

মহারাজ এ প্রস্তাবে সম্মতি দেন। তার ফলে রাণীকে মহারাজের সঙ্গে হাতীর পিঠে হাওদায় আরোহণ করতে হয়। তাঁর সঙ্গিনীরা শিবিকায় ওঠেন। সঙ্গে চলে তাঁদের সুসজ্জিত তেজীয়ান ঘোড়াগুলি।

হাওদায় উপবিষ্ট মহারাজ রাণীকে সুধালেন: হাতীর পিঠ থেকে নেমে এর পর ঘোড়ার পিঠে উঠতে তোমার কষ্ট হবে না?

মৃদু হেসে রাণী বললেন: কষ্ট! বরং হাতীর পিঠে এ ভাবে যেতেই আমার কষ্ট হচ্ছে। অলস আর বিলাসী লোকের পক্ষেই হাতীর পিঠে চড়া সাজে।

মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন: এ কথা বলবার অর্থ?

রাণী বললেন: হাতীকে চালায় মাহুত, হাতীর মাথায় বসে বসে তার মাথাও ঢিমে হয়ে গেছে—হাতীকে এরা ছোটাতে ভয় পায়। কিন্তু ঘোড়াকে চালায় যে তার পিঠে বসে—ঘোড়া চায়, সওয়ার তাকে যত খুসি জোরে চালিয়ে এগিয়ে যায়। একবার বিঠুরে এই হাতী চালানো নিয়ে ভারি এক মজার কাণ্ড হয়েছিল মহারাজ!

মহারাজ বললেন: কি রকম কাণ্ড—শুনি?

রাণী বলতে লাগলেন: সেখানে ত ঘোড়ায় চড়ে সব সওয়ারকে পিছিয়ে দিয়ে তাক লাগাতাম, সে কথা শুনেছেন। আজ হাতীর কথা মনে পড়ে গেল হাতীর পিঠে উঠে; বলি সেই গল্প শুনুন। পেশোয়াজীর ত অনেকগুলো হাতী, তার মধ্যে 'পাহাড়' নামে হাতীটা ছিল সবার সেরা—পাহাড় ত পাহাড়! এক দিন আমরা সেই হাতীতে উঠে দিলাম পাড়ি। যে পথে ঘোড়ায় চড়ে বিজলীর মত এগিয়ে যাই, অ-মা! হাতী দেখি ব্যাঙের মত থপাস্-থপাস্ করে চলেছে। সঙ্গে ছিলেন নানা ভাই; বললাম—'এই তোমার সেরা হাতী, আদর করে এর নাম রাখা হয়েছে পাহাড়?' মাহুতকে বললাম—'আমার ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস, হাতীর পিঠ ভালো লাগছে না, পা দু'টো নিস্‌পিস্ করছে। হয়, আরো জোরে চালাও, নয় ত এখানেই নামিয়ে দাও।' তখন ত ছেলে মানুষ, কত আর বয়স—মাহুত গ্রাহ্য করে না, হাসতে থাকে ফিক-ফিক করে। তখন করলাম কি—মাহুতের হাত থেকে অঙ্কুশটা কেড়ে নিয়ে হাতীর মাথায় জোরে জোরে হাঁকরাতে লাগলাম! মাহুত তখন ভয় পেয়ে হাঁ-হাঁ করে বলতে থাকে—'কর কি খোকী কর কি—এখুনি—এখুনি পাহাড় বিগড়ে যাবে।' বিগড়াল না ছাই করল—তেমনি ব্যাঙের মতই চলতে লাগল। সেই থেকে হাতীর ওপরে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। হাতীর চেয়ে ঘোড়াই আমার পছন্দ।

মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন: আচ্ছা, বিশ্রামের পর তুমি ঘোড়ার পিঠেই উঠো—তোমার আর্জি আমার মনে আছে।

বিশ্রামের পর মহারাজ উঠলেন হাতীর পিঠে। রাণী তাঁর সঙ্গিনীদের নিয়ে ঘোড়ায় চেপে নূতন যাত্রা সুরু করলেন। চোখের পলকে মহারাজার হাতী ও মিছিলকে পিছনে ফেলে তাঁর ঘোড়া এগিয়ে চলল কাল্পীর পথে। শূন্য শিবিকাগুলি মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে চলল—যেখানে এতক্ষণ ঘোড়াগুলি ছিল।

মিছিল অবশেষে কাল্পীর জঙ্গলে প্রবেশ করল। বিরাট বিশাল অরণ্য—গাছে গাছে পাতায় পাতায় মিশে এগিয়ে চলেছে। প্রাসাদ থেকে মহারাজ গঙ্গাধর রাণীর অশ্বচালনায় নৈপুণ্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন, কাল্পীর জঙ্গলে এসে বুঝলেন, অক্লান্ত ও অবিশ্রান্ত ভাবে রাণী অশ্বারোহণে কিরূপ অভ্যস্তা। শিকার-কালেও তাঁর লক্ষ্যভেদে দক্ষতা দেখে মহারাজ চমৎকৃত হলেন। শুধু তাই নয়, শিকারের সময় এক অসতর্ক মুহূর্তে ভীষণাকৃতি একটি বাঘকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়বার সময় মহারাজের হাতের বন্দুকটি হঠাৎ বিকল হয়ে গেল। সকলেই শিকারে ব্যস্ত, মহারাজার দেহরক্ষীও তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, নিকটে কেউ নেই এবং তাঁর অবস্থাটিও কেউ হয়ত উপলব্ধি করেনি; কিন্তু মহারাজের এই নিরুপায় অবস্থায়—বাঘটা যখন তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত, মহারাজও মৃত্যু স্থির জেনে ভগবানকে স্মরণ করছেন—ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে অব্যর্থ গুলী এসে বাঘটির দুই চক্ষুর মধ্যস্থলে বিদ্ধ হলো; সে আঘাত এত সাংঘাতিক যে, অন্তিম কালের একটা গর্জ্জনের সঙ্গে কিছুটা লম্ফ দিয়েই বাঘটা পড়ে গেল। পরক্ষণে সামনের দিকে তাকাতেই মহারাজ দেখলেন—

ঘন বনের ভিতর দিয়ে রাণী ছুটে আসছেন! সেখান থেকেই তিনি মহারাজের বিপন্ন অবস্থা লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছিলেন।

আর এক দিন এই জঙ্গলেই রাণীর অসিচালনার প্রচণ্ড শক্তি মহারাজা গঙ্গাধরকে প্রথম চমৎকৃত করে। সেদিন শিকারকালে জঙ্গলের একটা নির্জ্জন অংশে রাণী এক দল চিতার মধ্যে গিয়ে পড়লেন। রাণী তাঁর শিক্ষিত ঘোড়ার পিঠে নির্ভয়ে চলেছিলেন এই পথে, এমন সময় এই ঘটনা। ক'দিনের হানাহানিতে জানোয়ারগুলো উত্যক্ত ও বিরক্ত হয়েছিল। অশ্বারোহিণী রাণীকে দেখেই তারা একসঙ্গে তাঁকে করল আক্রমণ। দলের লোক-জন এবং রাণীর সঙ্গিনীরা তখন অনেকটা তফাতে—জঙ্গলের আর এক দিকে। রাণী কিন্তু এই সাংঘাতিক অবস্থায় কিছু মাত্র ভীত হলেন না—তিনি তাঁর ঘোড়াটিকে সুকৌশলে বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তরবারি চালনা করতে লাগলেন। একটা চিতা মরিয়া হয়ে রাণীর ঘোড়ার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি—কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে রাণী তাঁর তরবারি এমন জোরে চিতার মাথার উপরে হানলেন যে, সেই ভীষণ জানোয়ারটির একটি চোখ, খানিকটা নাক আর মাথার আধখানা ছিন্ন হয়ে তার পিছনের চিতাটার মুখের উপরে পড়ল। দলপতির এই দুর্দ্দশা দেখে দলের আর চিতাগুলো যেন দমে গেল; এমনি সময় নানা ভাবে চীৎকার তুলে বন্দুকের আওয়াজে বনভূমি কাঁপিয়ে দিয়ে দলের লোকেরা এসে পড়ল—দূর থেকেই তারা রাণীর বিপন্ন অবস্থা লক্ষ্য করেছিল। লোকগুলি আসবার আগেই চিতাগুলো বিক্ষিপ্ত ভাবে পালিয়ে গেল।

একটু পরে মহারাজ গঙ্গাধরও এলেন। রাণীর তরবারির আঘাতে নিহত চিতাটিকে দেখেই তিনি স্তম্ভিত আর কি! তার পর রাণীর দিকে চেয়ে বললেন: অনেক শিকার এ জীবনে আমি দেখিছি, কিন্তু তলোয়ার হাঁকরে দুরন্ত চিতার আধখানা মাথা এ ভাবে উড়িয়ে দিতে কাউকে দেখিনি। তোমার হাতে এত জোর! সত্যিই এ আশ্চর্য!

রাণী বললেন: ছেলেবেলা থেকেই যে আমি হাতের কসরৎ করে আসছি মহারাজ! এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। চেষ্টা করলে, কসরৎ করলে, নিয়মিত ভাবে হাতিয়ার চালালে হাতে এ রকম জোর হয়। চিতা ত সামান্য, যে প্রকাণ্ড বাঘটাকে সেদিন আমি গুলী করে মেরেছিলাম, এই হাতে এই তলোয়ার হাঁকরে তার গলাও আমি কাটতে পারতাম।

প্রায় সপ্তাহ কাল কাল্পীর জঙ্গলে কাটিয়ে মহারাজ গঙ্গাধর রাজধানীতে ফিরে এলেন রাণীর সম্বন্ধে নূতন এক অভিজ্ঞতা নিয়ে। তাঁর অন্তর এই ভেবে আনন্দে অভিভূত হলো যে, তিনি এমন এক নারীকে সহধর্ম্মিণীরূপে পেয়েছেন, বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান বিবেচনা ও শক্তিতে যিনি অতুলনীয়া। বিলাসে যিনি নিস্পৃহ, অথচ কর্ত্তব্য পালনে এবং অন্যায়ের প্রতিবিধানে যাঁর দৃঢ়তার অন্ত নেই। তিনি এত দিনে বুঝতে পারলেম যে, তাঁর অবর্ত্তমানেও এই মনস্বিনী নারী সুশৃঙ্খলেই ঝাঁসীর শাসন-কার্য নির্বাহ করতে সমর্থ হবেন।

রাণী লক্ষ্মীর বয়স এ সময় আঠারো বছর মাত্র। এই বয়সেই তিনি রাজ্যের অপব্যয় ও নানারূপ দুর্নীতি দমন করে, বহু অনাচার নিবারণ এবং জনকল্যাণকর অনুষ্ঠানগুলির প্রবর্ত্তনের দিক দিয়ে রাজ্যের প্রজাদের পক্ষ থেকে 'মাতৃশ্রীজননী—করুণাময়ী রাণীমা' আখ্যা পেলেন।

রাণীকে নিয়ে মহারাজের কাল্পী গমন এবং কাল্পীর অরক্ষিত জঙ্গলের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের ব্যাপারে দেওয়ান লক্ষ্মণরাও পরিতুষ্ট হননি, যেহেতু এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত মহারাজ জিজ্ঞাসা করেননি। তিনি অনেক দিন থেকেই বুঝতে পেরেছেন যে, মহারাজ এখন রাণীর পরামর্শে চালিত হচ্ছেন এবং কাল্পীর ব্যবস্থাও রাণীর পরিকল্পিত। তাই এ সম্পর্কে মহারাজের সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা প্রসঙ্গে দেওয়ান সাহেব সহসা বললেন: শাস্ত্রে একটা দামী কথা আছে মহারাজ, সেটা স্মরণ করে কাজ করা কর্ত্তব্য।

মহারাজ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কি বলেছেন শাস্ত্রকাররা দেওয়ানজী?

দেওয়ানজী একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন:

আত্মবুদ্ধিঃ শুভঙ্করী গুরুবুদ্ধি বিশেষতঃ
পরবুদ্ধি বিনাশায় স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

মহারাজ গঙ্গাধর বললেন: আপনার এই শ্লোকটি আবৃত্তি করবার তাৎপর্য বুঝলাম। কিন্তু এ শ্লোক নিশ্চয়ই কোন শাস্ত্রকার রচনা করেননি, স্বার্থপর কোন ব্যক্তি আত্মকার্য উদ্ধারের জন্যই সম্ভবত রচনা করেছিলেন।

অপ্রসন্ন ভাবে দেওয়ানজী জিজ্ঞাসা করলেন: মহারাজ কি তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন?

মহারাজ বললেন: নিশ্চয়ই। প্রমাণ আমি স্বয়ং। প্রথমেই বলি—আত্মবুদ্ধিতে আমি এমন অনেক কাজ করেছি, যেগুলি শুভকর না হয়ে রাজ্যের পক্ষে অনিষ্টকরই হয়েছে। আপনিও জ্ঞাত আছেন। তার পর—গুরুবুদ্ধির কথা ছেড়ে দিন, যেহেতু আমার গুরু নেই। এর পর আসে পরবুদ্ধির কথা। কিন্তু এ যদি বিনাশের কারণ হয়, তা'হলে অনেক আগেই আমি বিনষ্ট হতাম। কেন না, পর নিয়েই আমার কাজ, তাঁরা কেউ গুরুও নন, পরমাত্মীয়ও নন। যেমন রাজ্যের দেওয়ান আপনি, আরও অনেকে আছেন—যাঁদের বুদ্ধিতে আমি চালিত হই। আপনিও স্বীকার করবেন—আমার বিনাশের জন্যই কেউ বুদ্ধি আমাকে দেন না। শেষে স্ত্রীবুদ্ধিকেও আমি প্রলয়ঙ্করী বলব না। স্ত্রীবুদ্ধিতেই আমি কাল্পীর জঙ্গলে বাঘের মুখ থেকে রক্ষা পেয়েছি। তার পর রাণীর বুদ্ধিতে রাজ্যের কত শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, আপনারও ত অজ্ঞাত নয়।

মহারাজের কথাগুলি শুনতে শুনতেই দেওয়ান সাহেবের মুখখানা কালো হয়ে গেল, তিনি এর পর আর কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না।

কাল্পী ভ্রমণের পর মহারাজ গঙ্গাধরের অন্তরে দত্তক-গ্রহণের বাসনা প্রবল হয়ে উঠল। একদা তিনি দরবারে বিশিষ্ট অমাত্যবর্গ, দেওয়ান এবং রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে প্রস্তাবটি উত্থাপিত করলেন। মহারাজের পরিণত বয়স এবং পুত্রলাভের সম্ভাবনা নেই বুঝে তাঁরা সকলেই প্রস্তাবটির সমর্থন করলেন। দেওয়ান লক্ষ্মণরাও বললেন: মহারাজের বংশের ন্যায় উচ্চ বংশ এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের কোন পুত্রকে দত্তকরূপে নির্বাচিত করা উচিত।

দরবারের পর অন্দর-মহলে এসে মহারাজ রাণীর কাছে প্রস্তাবটি তুলে বললেন: আমার ইচ্ছা, একটি সুন্দর শুভ লক্ষণযুক্ত শিশুকে দত্তক নিই, আর তুমিই তাকে লালন-পালন কর, উপযুক্ত শিক্ষা দাও।

রাণী বুঝলেন, পুত্রের অভাবে বংশরক্ষার জন্য ঝাঁসীর ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে মহারাজ এই প্রস্তাব করেছেন। তিনিও স্বামীর কথায় তাঁর সম্মতি জানালেন, কিন্তু দৃঢ় ভাবে অনুরোধ করলেন : রাজ্যে সদ্‌ব্রাহ্মণের অভাব নেই। সদাচারী ধার্মিক কোন ব্রাহ্মণ—তিনি দরিদ্র হলেও ক্ষতি নেই, সেই ঘর থেকেই উপযুক্ত শিশুর সন্ধান করা হোক মহারাজ! উঁচু বংশ বা বড়-ঘরের চেয়ে সদাচার ও ধর্মনিষ্ঠায় যে বংশের খ্যাতি, তাকেই সর্বোচ্চ বলে মানা চাই। আমার এই যুক্তি মহারাজ!

মহারাজ গঙ্গাধর রাণীর যুক্তি নিয়েই রাজধানীর কোন বিশিষ্ট ধার্মিক ব্রাহ্মণ-প্রজার মধ্য থেকেই এক প্রিয়দর্শন শিশুকে এই উপলক্ষে গ্রহণ করলেন। মহারাজ ঘোষণা করলেন যে, গৃহীত শিশুকেই তিনি শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি অনুষ্ঠান দ্বারা দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করবেন। ১৮৫৩ অব্দের ১১শে নভেম্বর তারিখে দত্তক-গ্রহণের দিন নির্দ্ধারিত হলো। মহারাজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবর্গ এবং সন্নিহিত রাজন্য সমাজ এই উৎসবে আমন্ত্রিত হলেন। বৈদিক অনুষ্ঠানের পর আত্মীয়-পরিজন, আমান্ত্রিত বিশিষ্ট সমাজ, রাজ্যের বিশিষ্ট ভূস্বামী, সরদার, বণিক, প্রধান প্রধান নাগরিক, প্রত্যেক মহলের প্রজা-প্রতিনিধি,—বৃটিশ রেসিডেণ্ট মেজর এলিস এবং বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর মার্টিনের সমক্ষে এই দত্তকগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। অনুষ্ঠান অন্তে দত্তকপুত্র দামোদর গঙ্গাধর রাও নামে অভিহিত হলেন।

[ক্রমশঃ।

হিদাইও নোগুচি

শ্রীযামিনীমোহন কর

জাপান। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দু'হাতে কাদা মাখছে আর পুতুল গড়ছে। একটি ছেলে দূরে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে, তার বাঁ হাতটা জামার মধ্যে লুকিয়ে। ওরই নাম হিদাইও নোগুচি। ভারী গরীব ওরা। বাপ নেই। মা সমস্ত দিন ক্ষেতে কাজ করে। বাচ্চা বয়সে তাকে একলা রেখে মা গিছল কাজ করতে। ঘরে আগুন জ্বলছে। ছেলেটা লাল অগ্নিশিখাকে খেলনা মনে করে বাঁ হাত দিয়ে ধরতে গিছল। কচি হাত আগুনে পুড়ে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় ছেলেটা গেল অজ্ঞান হয়ে। কাজ শেষে বাড়ী ফিরে মা দেখে ছেলের এই অবস্থা! গরীব মানুষ। যতটা সম্ভব চিকিৎসা করাল, প্রাণ দিয়ে সেবা করল। ছেলেটা প্রাণে বাঁচল, কিন্তু বাঁ হাতটা অকর্ম্মণ্য হয়ে গেল। হাতের তেলো তালগোল পাকিয়ে কদাকার হয়ে গেছে। অন্য ছেলেরা তাই ওর হাত নিয়ে বিদ্রূপ করে। বেচারা লজ্জায় সর্ব্বদা হাতটাকে ঢেকে রাখে। খেলতে পায় না, দূরে দাঁড়িয়ে থাকে ছলছল নেত্রে। দু'হাত তো সে আর সকলের মত ব্যবহার করতে পারে না।

খেলতে পায় না, সঙ্গীদের বিদ্রূপ সহ্য করতে পারে না। তাই সে সমস্ত মন সংযোগ করলে পড়াশোনার দিকে। হাতের অভাবই তাকে করে তুলল ভবিষ্যতে বিশ্ববিখ্যাত। এক দিন নোগুচি শুনল, সেখান থেকে কিছু দূরে এক ডাক্তার থাকেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ডাক্তার। কিছু অর্থ সংগ্রহ করে নোগুচি গিয়ে হাজির হল তাঁর কাছে। হাতটা ভাল ভাবে টিপে-টুপে পরীক্ষা করে ডাক্তার জানালেন, হাড় ঠিক আছে। অপারেশান করলে হাত ব্যবহারযোগ্য হবে। তার পর বাড়ীর কথাবার্ত্তা। ডাক্তার জানলেন, হিদাইও খুব গরীবের ছেলে। অথচ বেশ ভাল পড়াশোনা জানে। বুদ্ধিও খুব। তিনি বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করে হাত তো ব্যবহারযোগ্য করে দিলেনই, উপরন্তু তাকে নিজের অধীনে একটা কাজও দিলেন। হিদাইও শিশি ধুতে-ধুতে স্বপ্ন দেখতেন, এক দিন তিনিও ডাক্তার হবেন কিন্তু পথে কত বাধা। কত পড়াশোনা, কত সাধনা, কত অর্থের প্রয়োজন। শেষ অবধি তিনি সকল বাধাই অতিক্রম করেছিলেন। একান্ত চেষ্টায় অসম্ভবও সম্ভব হয়।

ডাক্তার এক দিন, যে সব ছেলেরা তাঁর অধীনে কাজ করত তাদের অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এক স্লাইড দেখালেন। দেখে কেউ বিশেষ কিছু বলতে পারল না। হিদাইও কিন্তু ঠিক ঠিক সব বলে দিল। ঘোরানো ঘোরানো এক রকম ক্ষুদে-ক্ষুদে পোকা। ডাক্তার খুশী হয়ে বললেন—"ঠিক বলেছ। এই পোকার নাম স্পাইরোসেট। জাপানের মহামারী স্বরূপ পীত জ্বরের কারণ এই পোকা।" সেই দিন হিদাইও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, এই জীবাণুকে মারবার ওষুধ তিনি আবিষ্কার করবেন। তিনি জীবাণুবিদ্ হবেন। দিন-রাত ডাক্তারী পড়া নিয়ে মেতে রইলেন। তাঁর একাগ্র সাধনা এবং বিনীত ব্যবহারে অনেকেই মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন।

অল্প দিন পরে তিনি বিখ্যাত জীবাণুবিদ্, বিউবোনিক প্লেগের বীজাণুর আবিষ্কারক কিটাসাটোর ল্যাবরেটরীতে চাকরী পেলেন। কিছু দিন সেখানে গবেষণার পর তাঁর অতৃপ্ত মন যেতে চাইল আমেরিকায়। জ্ঞান, আরও জ্ঞান চাই। কিন্তু পয়সা কোথা? বন্ধুদের বললেন তাঁর স্বপ্নের কথা। তাঁরা অর্থ জোগাড় করে দিলেন।

তিনি হাজির হলেন গিয়ে মার্কিণ মুল্লুকে, ফিলাডেলফিয়ায়। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে, অদম্য উৎসাহে সকলেই সন্তুষ্ট হলেন। এতে কিন্তু তিনি তৃপ্ত হলেন না। আরও জ্ঞান চাই। আতলান্তিক মহাসাগর পার হয়ে তিনি গেলেন কোপেনহাগেনে, সীরাম ইনষ্টিটিউটে কাজ করতে। সেখানে শিখতে লাগলেন রোগ-জীবাণুধ্বংসী অ্যাণ্টি-টক্সিন তৈরী করার প্রণালী। কাজ শিখে তিনি যুক্তরাজ্যে ফিরে এসে রকফেলার ইনষ্টিটিউটে কায়েমী হয়ে গবেষণার কাজ শুরু করলেন এবং এইখান থেকেই বিশ্ববিখ্যাত হলেন।

প্রথমেই হিদাইও গবেষণা শুরু করলেন স্পাইরোসেট জীবাণু সম্পর্কে। বিশ্বময় বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করছিলেন মনুষ্য-দেহের বাইরে এই জীবাণুদের বাঁচিয়ে রেখে, তাদের সম্পর্কে গবেষণা করতে, বিশেষ আহার্য্য দিয়ে তাদের পুষ্ট করতে। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হয়ে উঠছিলেন না। মানুষের শরীরের বাইরে এলেই তারা মারা যায়। অথচ বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে গবেষণা করা সম্ভব নয়। তিনিও কাজে লেগে গেলেন। পাঁচ বৎসর ধরে নানা রকম চেষ্টা করে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, বায়ুহীন পাত্রে এই জীবাণুদের বাঁচিয়ে রাখা যায়। তিনি এই বার এই জীবাণুদের সম্বন্ধে পূরাপূরি গবেষণা করবার সুবিধা পেলেন এবং আবিষ্কার করলেন যে, দশটা পাগলের মধ্যে অন্ততপক্ষে আট জনের পাগলামীর জন্য এই জীবাণু দায়ী। ছোটদের অন্ধ করে দেয়, বড়দের পাগল করে, শেষ অবধি মৃত্যু।

দক্ষিণ-আমেরিকার ইকিউডোর রাজ্যের গুয়ায়াকুইলে এক

পীত জ্বর মহামারীরূপে দেখা দেয়। তিনি গেলেন সেখানে, রোগের কারণ নির্ণয় করতে। রোগীদের রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করে তিনি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। তার পর গেলেন ব্রেজিলে। সেখানেও পীত জ্বরের ভীষণ প্রাদুর্ভাব। আবার রোগীদের রক্ত নিয়ে পরীক্ষা চালালেন কিন্তু এবার সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়াল অন্যরূপ। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন, ভুলটা কোথায়?

ভুলটা সত্য তাঁর নয়। প্রথম স্থানের রোগীদের জণ্ডিস হয়েছিল আর দ্বিতীয় স্থানের রোগীদের হয়েছিল পীত জ্বর। তিনি ভাবলেন, এ দু'টো পীত জ্বরেরই দু'টো বিভিন্ন রূপ। নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে আরও পরীক্ষার প্রয়োজন, তাই তিনি গেলেন আফ্রিকার গোল্ড কোষ্টে আক্রায়। বন্ধুদের নিষেধ অমান্য করে। তাঁরা বললেন—"যেও না। ভারী বিপজ্জনক জায়গা।" তিনি হেসে উত্তর দিলেন, "আমারও পীত জ্বর হতে পারে এই তো? হোক না। আমি বৈজ্ঞানিক। নিজের দেহের ওপর পরীক্ষা করে নিজের প্রাণ দিয়ে জগদ্বাসীকে বাঁচাব। এই তো আমার সাধনা, আমার কর্ত্তব্য।"

বন্ধুরা যা ভয় করেছিলেন তাই হল। তিনি এবং এক জন ইংরেজ জীবাণুবিদ্ প্রচণ্ড উৎসাহে গবেষণা করতে থাকলেন। সাফল্য এল। তিনি প্রমাণ করলেন যে, পীত জ্বরের জন্য স্পাইরোসেট জীবাণু দায়ী নয়। এর জন্য দায়ী···

নোট শেষ করতে পারেননি। মারা গেলেন তিনি সেই পীত জ্বরে যার বিরুদ্ধে চালাচ্ছিলেন সংগ্রাম। কারণ আবিষ্কার করেছিলেন তা নোট দেখেই বোঝা যায়। তার সহকারীও লেখাটা শেষ করতে পারেননি। তিনি তখন জ্বরে অচৈতন্য, দু'দিন পরে তিনিও প্রাণত্যাগ করেন পীত জ্বরে। সাফল্যের পাত্র ওষ্ঠের কাছে, কিন্তু তাঁরা পান করতে পেলেন না। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'

বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঞ্জাব সাহিত্য-সঙ্ঘকে লিখিত এক পত্রে জর্জ্জ বার্ণার্ড শ' নিজের নামের আগে "গুরু" বিশেষণ জুড়ে দিয়ে লিখেছিলেন, "গুরু শ'।"

এই বিশ্ব-বিখ্যাত ব্যঙ্গ-রচনাকার হয় ত পরিহাসচ্ছলেই নিজেকে "গুরু" বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু পরিহাসচ্ছলে তিনি যে কথা বলেছিলেন তা যে কত সত্য, তাতে যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন ছিল না, এ কথা কে না স্বীকার করবে? কৌতুক করে শ' যে সব মন্তব্য করতেন, তারই ভেতর দিয়ে প্রকট হত সত্যের অমোঘ রূপ।

খরধার কৌতুকই শ'র বিশেষ অস্ত্র। তাঁর এই কৌতুকের ভিতর দিয়েই সত্যের শাণিত রূপ ঝলসে ওঠে। তাই শ'কে মনে হয়, তিনি যেন কেবল ভাঁড়ামি করছেন এবং সেই ভাঁড়ামির ভেতর দিয়েই প্রকাশ করছেন অমোঘ সত্য।

ব্যঙ্গচ্ছলে সত্য প্রকাশ ফেবিয়ান-গোষ্ঠীর সত্য প্রচারের পদ্ধতি। "জন বুল্‌স্ আদার আয়রল্যাণ্ড"এ পিটার কীগান বলেছেন, পরিহাসচ্ছলে সত্য প্রকাশই আমার নীতি। ইহাই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৌতুক।

১৯২৫ সালে শ' সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়ে টাকা নিতে অস্বীকার করে বলেন,—"এই পুরস্কার যে ডুবন্ত মানুষ তীরে এসে উঠেছে তাকে লাইফবেল্ট ছুঁড়ে দেবার মত। যারা এখনও সাহিত্যিক-খ্যাতির তীরে এসে পৌছতে পারেনি, তাদের জন্যই এই টাকাটি ব্যয় করা হোক।"

সত্যিই শ' ছিলেন "বিশ্বগুরু"। বিধি-নিষেধ ও প্রচলিত প্রথার দোহাই দিয়ে সমাজে যে অন্যায় ও অনাচার চলেছে, তা তিনি কৌতুকচ্ছলে উদ্‌ঘাটিত করে আমাদের চোখের সামনে ধরে তার ভিতর দিয়ে আমাদের শিক্ষা দিতেন। আমাদের মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তনে তিনি হয়ত প্রচুর সাফল্য লাভ করেননি, কিন্তু সে দোষ তাঁর নয়।

১৯৩৩ সালে বিশ্ব-ভ্রমণ ব্যপদেশে শ' কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি একবার মাত্র পরিদর্শন করেন। বোম্বাইএ এক দিন খবরের কাগজের লোকেরা মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানতে চান।

শ' বলেন—"আমি ভারতের সব লোককে জানি না। তবে আমার মনে হয়, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁর মত বিচক্ষণ লোক শত-সহস্র বৎসর অন্তে একবার পৃথিবীর মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মাঝে মাঝে তাঁর এত অসহ্য বোধ হয় যে, তিনি আমরণ অনশনের ভয় দেখান। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলে আমি বলব, 'এ আপনি ছেড়ে দিন। এ কাজ আপনার নয়'। পৃথিবীসুদ্ধ লোক যে ঠিক তাঁর মত নয়—এ কথা বুঝতে তাঁর বড় বেশী সময় লাগে।"

গান্ধীজীর মৃত্যু সংবাদে শ' তাঁর স্বভাবসুলভ মন্তব্য করে বলেন, "এ থেকেই দেখা যাচ্ছে, অত্যধিক ভাল হওয়া কত বিপজ্জনক।"

এই দুই মনীষীর মানসিক গঠনে কি বিচিত্র প্রভেদ! শ' যুক্তিবাদী ও বামপন্থী, গান্ধীজী পুরাতন ঐতিহ্যের ধারক ও রক্ষণশীল। অবশ্য কতকগুলি গুণ তাঁদের উভয়ের মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান ছিল। উভয়েরই মধ্যে ছিল একটা দুঃসাহসিক মনোভাব। উভয়েই ছিলেন মানব-প্রেমিক ও নিরামিষভোজী। জীবনে কখন তাঁরা কেউ মাদক দ্রব্য স্পর্শ করেননি। উভয়েরই বিশ্বাসের দৃঢ়তা ছিল অতুলনীয়। উভয়েই ছিলেন বর্ত্তমান সমাজ-জীবনের অনাচার ও ভণ্ডামির প্রবল বিরোধী। ভারতের যুব-সমাজ ও ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের উপর জর্জ্জ বার্ণাড শ'এর প্রভাব কম নয়।

শ'এর জীবদ্দশায় বৃটেনের যুদ্ধকালীন প্রধান মন্ত্রী ও রক্ষণশীল দলের নেতা মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল তাঁর সম্বন্ধে বলেন—

যিনি বর্ত্তমান যুগে লোকচক্ষুর অন্তরালে উপেক্ষিত বহু বিষয় আমাদের চোখের সম্মুখে এনে উজ্জ্বল ভাবে ধরতে পারেন, তাঁর মত মনীষীকে পেয়ে যে কোন জাতিই গর্ব্ববোধ করবে। ঋষি বার্ণার্ড শ', ভাঁড় বার্ণার্ড শ', বিভিন্ন মানব-সমাজের সংযোগসূত্র বার্ণার্ড শ', ইংরেজী ভাষাভাষী জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বার্ণার্ড শ' বর্ত্তমান যুগের প্রত্যেকটি লোকের অভিনন্দন লাভ করবেন।

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

৯

সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সিপাহী যুদ্ধের সমসাময়িক সময়েই (১৮৫০-১৮৬০) বাংলা দেশে নীল-চাষীদের বিদ্রোহ দেখা যায়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য ও 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইউরোপীয় সমাজ ও ততোধিক প্রবল ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া নীল-চাষীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা সর্ব্বপ্রথম শিক্ষিত সাধারণের গোচরে আনিলেন। নীল-চাষের ইতিহাস নীলকরদের অত্যাচার-নিপীড়নের কালিমায় রঞ্জিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই প্রথমে নীল ব্যবসা আরম্ভ করে। পরে তাহার ব্যবসাধিকার বিলুপ্ত হইলে বে-সরকারী শ্বেতাঙ্গরা এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়।

নীলকরগণ নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থের খাতিরে দরিদ্র নীল-চাষীদের উপর অত্যাচার বহু দিন হইতেই চালাইয়া আসিতেছিল। এই অত্যাচার নদীয়া, যশোহর, পাবনা প্রভৃতি জেলায় ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে চরমে উঠে। নীলকরদের অত্যাচার বাংলা-দেশে যেমন ছিল বিহারের কয়েকটি জেলাতেও সেইরূপ ছিল। নীল-চাষীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা রুশিয়ার সার্ফ ও আমেরিকার নিগ্রো দাসদের সামিল হইয়া পড়িয়াছিল। নীলকর কর্ত্তৃক টাকা দাদন দিয়া উৎকৃষ্ট জমিতে নীল চাষে চাষীদের প্ররোচনা, আশানুরূপ ফসল উৎপন্ন না হইলে পর-বৎসর নীল উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট চাষীকে বাধ্য করান, নীল চাষের জন্য দশ বৎসরের চুক্তি, পুরুষানুক্রমে নীলকরের আজ্ঞাবহ প্রজায় পরিণতি, নীলকরদের জমিদারী, তালুকদারী ক্রয়, প্রজাদের দ্বারা বেগার খাটান, চুক্তিভঙ্গকারী চাষীদের নীলকুঠিতে কয়েদ রাখা প্রভৃতি যত রকমের অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে পারে, নির্ব্বিচারে অব্যাহত ভাবে চালান হইত। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় হইতে মফঃস্বল অঞ্চলে নীলকরগণ কেহ কেহ সরকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা লাভ করেন। ইহার ফলে প্রজাদের দুর্দ্দশা আরও বহু গুণ বৃদ্ধি পায়।

নীলকর-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রথম সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন নদীয়া জেলার অন্তর্গত চৌগাছার অধিবাসী বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। এই দুই ভ্রাতা কুঠিয়ালদেরই দেওয়ান ছিলেন; কিন্তু নীলকরদের ক্রম-বর্দ্ধমান অত্যাচার ও নীল-চাষীদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহারা বিচলিত হইয়া পড়েন। বিশ্বাস-ভ্রাতৃদ্বয় কাজে ইস্তফা দিয়া প্রজাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় নীলের বিরুদ্ধে ছড়া ও গান রচিত হইয়া গ্রামে গ্রামে প্রজাদের উত্তেজিত করিতে লাগিল। প্রজার পক্ষ লইয়া মোকদ্দমা লড়াই, লাঠিয়াল পাঠাইয়া প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ প্রভৃতি ব্যাপারে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়, তবুও তাঁহারা বিন্দুমাত্র দমেন নাই। বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই দুই ভ্রাতার নাম নীল-কৃষাণ-বন্ধু হিসাবে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

হিন্দু-মুসলমান কৃষাণদের এই যুক্ত আন্দোলনে মালদহের নারায়ণপুর গ্রাম-নিবাসী রফিক মণ্ডলের অবদানও বড় কম নহে। এক জন ইংরাজ ঐতিহাসিক এই রফিক মণ্ডল সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, নীল-সংক্রান্ত আন্দোলনে রফিক সর্ব্বাপেক্ষা বড় নায়ক।

নীল-আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জাগাইয়া তুলিতে থাকেন। বারাসত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এই মর্ম্মে এক পরোয়ানা জারী করেন যে, নিজ জমিতে নীল চাষ করা কৃষকদের ইচ্ছাধীন, এই জন্য চাষীদের উপর জোর-জুলুম করা বে-আইনী বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই ঘোষণায় আশান্বিত হইয়া ১৮৫৯ সালে অনুমান পঞ্চাশ লক্ষ দরিদ্র নিরক্ষর চাষী একযোগে ধর্ম্মঘট করে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শিশিরকুমার ঘোষ এই ধর্ম্মঘট পরিচালনায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। চাষীদের এই ধর্ম্মঘট বা জোট 'নীল হাঙ্গামা' নামে পরিচিত।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ডাক বিভাগের কর্ম্মচারিরূপে বিভিন্ন জেলায় অবস্থানকালে নীলকরদের অত্যাচারের স্বরূপ স্বচক্ষে দেখেন। তাঁহার এই অভিজ্ঞতার ফল বিখ্যাত "নীলদর্পণ" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। পাদ্রী জেমস লঙ উক্ত নাটকটি কবিবর মাইকেল মধুসূদনকে দিয়া অনুবাদ করাইয়া ইংরাজ মহলে প্রচার করেন। ইহাতে বাংলার সমস্ত ইংরাজ-গোষ্ঠীই ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মুখপত্র হিসাবে 'ইংলিশম্যানে'র সম্পাদক ওয়ালটার ব্রেট লঙের বিরুদ্ধে এক মামলা জুড়িয়া দিলেন এবং বিচারে বিচারপতি মর্ডাণ্ট ওয়েলস্ লঙকে অর্থদণ্ড অনাদায়ে এক মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জরিমানার টাকা দিয়া দেন স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়। নাটকটি অনুবাদ করার কালে মধুসূদনকে সরকারী কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়। এই সময় হরিশচন্দ্র মারা যান। ১৮৬৮ সালে 'আট আইন' দ্বারা নীল-চুক্তি আইন রদ করা হয়। নীল-আন্দোলনে লঙ, এবং হরিশচন্দ্রের ত্যাগস্বীকার এবং বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়ের ও রফিক মণ্ডলের সক্রিয় প্রতিরোধ বৃথা যায় নাই। তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফলেই অল্প সময়ের মধ্যে নীল-অত্যাচার দমিত হয়।

এদিকে সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলেও এই বিদ্রোহের ফলে বিলাতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তাহার ফলাফল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে সামলান কঠিন হইয়া পড়ে। ১৮৫৮ সালে নূতন ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করা হয়। ইহার পর কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌' তুলিয়া দেওয়া হয় এবং ভারত-শাসনের চূড়ান্ত দায়িত্ব মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক দেশ-শাসনের দায়িত্ব গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধিত হয়। (১) প্রথমতঃ, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে নূতন করিয়া গঠন করিবার নীতি গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন। যে যে অঞ্চলের সৈন্যরা বিদ্রোহের প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল সেই সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের যথাসম্ভব সেনাবিভাগে প্রবেশাধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়। (২) সিভিল সার্ভিসকেও যথাসম্ভব মজবুত করা হয়। ছোটখাটো সরকারী চাকুরীগুলিতে ভারতীয় গ্রহণের নীতি গৃহীত হয়। (৩) ১৮৬০ সালে ভারতীয় দণ্ডবিধি

এবং পরবর্ত্তী সালে ফৌজদারী কার্য্যবিধির প্রবর্ত্তন করা হয়। শেষোক্ত বৎসরেই সুপ্রীম কোর্ট তুলিয়া দিয়া হাইকোর্ট স্থাপন করা হয়। ব্রিটিশ জাতি ভারত শাসনের ভার গ্রহণের পর নবগঠিত শিখ ও গুর্খা বাহিনী সরকারকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ব্রিটিশ নীতি-চাতুর্য্যের ফলে শিখ ও গুর্খারা ইংরাজের পরিবর্ত্তে নিতান্ত ভ্রমবশতঃই স্বদেশবাসী হিন্দুস্থানী সিপাহীদের শত্রু বলিয়া গণ্য করিত। সেনাপতি ম্যান্‌সৃফিল্ড বলেন, 'শিখরা যে সিপাহী বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা না করিয়া আমাদের পক্ষ লইয়া লড়াই করিয়াছে তাহার কারণ এই নয় যে, তাহারা আমাদের অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখে; তাহার কারণ এই যে, তাহারা বাঙ্গালী পল্টনকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে!'

সিপাহী বিদ্রোহের সময় পাঞ্জাবের চীফ কমিশনার ছিলেন সার জন লরেন্স। তিনিও স্বকীয় অভিজ্ঞতার ফলে বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালী পল্টনের ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্যমত আমাদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইয়াছে। সরকার বাঙ্গালী পল্টনের স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া শিখ, পাঞ্জাবী, মুসলমান, পাহাড়ী, জাঠ, রাজপুত ও গুর্খা দিয়া সৈন্যদল পূর্ণ করিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যও অধিক সংখ্যায় ভারতে রাখার ব্যবস্থা করা হইল।

সিপাহী যুদ্ধের অনাচারের ফলে ১৮৬১ সালে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। কোম্পানীর আমলে ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে কতকগুলি বড বড় দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষের ক্লেশ ভারতবাসীদের একভ্রাতৃত্ব ও একজাতীয়ত্ব বোধে অনুপ্রাণিত করে। সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকারী ও বে-সরকারী ইউরোপীয় সমাজ এমনি একান্ত ভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হইল যে, ইহার প্রতিক্রিয়া ভারতীয়দের মনে উপস্থিত হইতেও অধিক বিলম্ব হইল না।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর অমর কাব্য 'মেঘনাদ বধ' ১৮৬০ সালের মধ্যেই লিখিয়া শেষ করেন। মেঘনাদ বধ বাঙালীর প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন বা তাহার প্রশস্তিবাদ করিতে তখন কেহই ভরসা করিত না। ক্যানিঙের আমলে যে প্রেস আইন নূতন করিয়া বিধিবদ্ধ হয়, তাহার বলে সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকা সমস্তই বাজেয়াপ্ত হইতে পারিত। মধুসূদন কাব্যচ্ছন্দে বিভীষণের দেশদ্রোহিতা ও জ্ঞাতিদ্রোহিতা ও তাহার বিষময় ফল স্বদেশবাসীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে কংগ্রেসের জন্মলাভের সময় পর্য্যন্ত বিদেশী শাসকবর্গের দমন-নীতির প্রতিবাদে দেশপ্রেমিক মনীষীদের লেখনীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে ভারতের গণ-চেতনার বৈপ্লবিক বিবর্ত্তন এক নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে।

ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে ভারতের ভাবধারার এক ঐক্য-সূত্র বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষকে এক অখণ্ডরূপ দান করিলেও রাজা রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথম এই ঐক্যবোধে জাগ্রত হইয়া ভারতীয়দের চিন্তাধারায় বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিলেন। সেদিক দিয়া রাজা রামমোহন রায়কেই ভারতীয় জাতীয়তার প্রবর্ত্তক ও নব্য ভারতের স্রষ্টা বলিতে হইবে। সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান ছাড়াও পরাধীনতার গ্লানি মোচনের জন্যও তিনি আজীবন ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সময় দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ভারতীয়দের চেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন এবং দেশী ভাষা সমূহে সংবাদপত্রের প্রকাশ।

রাজা রামমোহনের এই প্রচেষ্টা বাংলা দেশে যে আলোড়ন জাগায় তাহার ফলে তাঁহার শিষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক, ইয়ং বেঙ্গল দলের নায়ক রামগোপাল ঘোষ এবং রামমোহনের সংস্কারের উত্তর-সাধক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অখণ্ড ভারত সম্পর্কে রাষ্ট্রিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে থাকেন। রাষ্ট্রিক চেতনাকে জাগাইয়া তুলিতে এই সময় সংবাদপত্র ও পত্রিকা সমূহের অবদান বড় কম নহে। রামমোহনের 'সংবাদ-কৌমুদী', 'মিরাৎ-উল-আখবর' ও 'বেঙ্গল হেরাল্ড,' প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফরমার,' তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর 'কুইল', কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইনটেলিজেন্স'; রামগোপালের 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'; হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রভৃতি সংবাদপত্র ও পত্রিকা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীন চিন্তাধারার পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা ক্রমশঃ ভারতীয়দের মধ্যে রাষ্ট্র-চেতনার উন্মেষ সাধন করিতেছিল।

এই নব্য ভাবধারার প্রতি জনমত আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া সরকার প্রমাদ গণিলেন এবং পত্রিকাগুলির কণ্ঠরোধের উদ্দেশ্যে লর্ড লিটন 'প্রেস এক্ট' পাশ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করিলেন। ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল এডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত ৩৫টি পত্রিকার মধ্যে ১৫টি পত্রিকার প্রবন্ধের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হয় যে, এইগুলি রাজদ্রোহমূলক। 'সমাজ-দর্পণ,' 'সাধারণী,' 'হিন্দু হিতৈষিণী,' 'সুলভ সমাচার,' 'প্রতিকার' 'বিশ্বদূত,' 'ঢাকা প্রকাশ,' 'ভারত মিহির,' 'ভারত সংস্কারক' ও 'সোমপ্রকাশে'র উপর সরকারী রোষ তীব্র হইয়া উঠে। সংবাদপত্রগুলির মুক্তি-বার্ত্তা প্রচার বৃথা যায় নাই। 'ভারত সভা'র আন্দোলনের পর দশ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই বাংলার জেলায় জেলায় "পিপলস্ এসোসিয়েশন" নামে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। সিপাহী বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ার ফলে ধনী-প্রভাবিত বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অত্যন্ত রাজভক্ত হইয়া উঠায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের লইয়া শিশিরকুমার ও তাঁহার ভ্রাতা হেমন্তকুমার ঘোষ একটি প্রগতিশীল দল গঠনের পরিকল্পনা করিলেন। ১৮৭৫ সালে "ইণ্ডিয়া লীগের" প্রতিষ্ঠা প্রকাশ্য ভাবে ঘোষিত হয়।

এই ঘটনার কিছু পূর্ব্বে চৈত্র বা 'হিন্দু মেলা' ভারতবাসীর জাতীয়-জীবনে এক নূতন যুগের সূচনা করে। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধিকল্পে রাজনারায়ণ বসুর স্থাপিত জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার আদর্শে নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ সালে ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৮ সালে উক্ত মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চৈত্র মেলার' উদ্দেশ্য বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয়-সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য।" ইহার অপর উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া গণেন্দ্রনাথ বলেন, "যাহাতে আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।" 'হিন্দু মেলা'র

কর্তৃপক্ষগণ জাতীয়-জীবনকে বিভিন্ন দিক হইতে সজীব করিতে উদ্বুদ্ধ হইলেন। ঐক্যবোধ বৃদ্ধি, সামাজিক উন্নতি, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে মেলার কর্ম্মিবৃন্দ দৃষ্টিদান করেন। জাতীয়-জীবনের সকল দিকের সংগঠন ও সংস্কারকল্পে সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই প্রথম। আর এই সকল কার্য্যের মূল লক্ষ্য বহু দূরবর্ত্তী হইলেও ভারতের রাষ্ট্রিয় স্বাধীনতা লাভ।

সিপাহী বিদ্রোহ ভারতবর্ষে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সমাজকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দিয়াছিল এবং ভারতীয়দের উচ্চ শিক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন অতঃপর ইউরোপীয় সমাজকে তাহাদের উপর ঈর্ষান্বিত ও কুপিত করিয়া তুলিলেও সমগ্র ভারতে বাঙ্গালী শিক্ষায় অধিক অগ্রসর হয়। এ জন্য কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি তাহাদের উপরই পড়িল বেশী করিয়া। ১৮৬৯ সালেই বাংলার বাহিরে কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে এই আদেশ জারি হইয়াছিল যে, উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালীকে সরকারী কার্য্যে পারত-পক্ষে যেন নিয়োগ করা না হয়।

রাজরোষ কেবল বাঙলা ও বাঙালীর উপর নিবদ্ধ থাকে নাই, অন্যত্রও ইহার প্রকোপ কম-বেশী পতিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহ হইতেই মুসলমানদের উপর ইংরাজ বিরক্ত হইয়াছিল। তাহার উপর ওয়াহবী আন্দোলন ভারতবর্ষে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সরকারের মতে ওয়াহবীদের বৃটিশকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া ভারতের শাসন-যন্ত্র হস্তগত করারও অভিপ্রায় ছিল। তবে এ কথা সত্য যে, উত্তর-ভারতে ওয়াহবী দলভুক্ত এক দল গোঁড়া মুসলমান সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে মোগল সম্রাটকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইতে যেমন উদ্‌গ্রীব হয়, বিদ্রোহের পরে অত্যাচার-অনাচারে, দুর্ভিক্ষে নিষ্পেষিত হইয়া বৃটিশের উপর বিশেষ ভাবে বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠে। যদিও তাহারা সমগ্র উত্তর-ভারতে ছড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র ছিল পাটনা। ওয়াহবী-নেতা আমীর খাঁকে সরকার ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুসারে ১৮৭১ সালে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত করেন। তাঁহার প্রকাশ্য বিচারের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জন পেণ্টন নরম্যানের এজলাসে আবেদন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে বোম্বাই হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ এ্যানেষ্টি আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি সওয়াল জবাবে লর্ড মেও'র শাসন-কালের (১৮৬৯-৭২) অনাচার-অবিচারের কথা বিশদ ভাবে উল্লেখ করেন। এ্যানেষ্টির এই বক্তৃতা সমেত মোকর্দ্দমার বিবরণ ওয়াহবীরা পুস্তিকাকারে চতুর্দ্দিকে বিলি করে। 'ইহার কিছু দিন পর ১৮৭১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর টাউন হলের সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় প্রধান বিচারপতি নরম্যান, আবদুল্লা নামে এক আততায়ীর ছোরার আঘাতে অচৈতন্য হইয়া পড়েন এবং সেই দিন রাত্রেই মারা যান। ইউরোপীয় সমাজ এ জন্য এত দূর ক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, আবদুল্লার ফাঁসি হইবার পর তাহার শব কবর না দিয়া সংকার করা হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই ১৮৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী আন্দামান ভ্রমণ কালে শের আলী নামক এক কয়েদীর হস্তে বড়লাট লর্ড মেও প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। এই শের আলী খাইবার গিরির পাদদেশে জামরাদ গ্রামের বাসিন্দা। এই সকল ঘটনার মূলে ওয়াহবী দলের কার্য্য বলিয়াই সরকারের ধারণা।

এই সময় দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিবিল সার্বিস হইতে বিতাড়ন একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি বিলাতে ও ভারতে কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্ব্যবহারে সমগ্র শিক্ষিত সমাজ বিচলিত হইয়া উঠিল; তাহাদের কর্ম্মশক্তি নব নব পথ অনুসন্ধানে নিয়োজিত হইল।

ভারতবাসীর জাতীয়ত্ব বোধের উন্মেষে বঙ্কিমচন্দ্রের অপরিসীম দান ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করেন এবং ক্রমাগত পাঁচ বৎসর কাল স্বহস্তে সম্পাদনা করিয়া আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতির মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেন। ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয়। 'বন্দে-মাতরম্' মন্ত্র বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর ধমনীতে নূতন রক্ত-প্রবাহের সৃষ্টি করে; জাতীয়-জীবনে এক নূতন জোয়ার আনিয়া দেয়।

এদিকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা নগরীতে দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্ম আন্দোলনের তরুণ নেতৃবৃন্দ সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি আন্দোলনকে সার্থক করিয়া তুলিবার যে প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন, তাহার আদর্শ ও কার্য্য-ধারার সহিত রাষ্ট্রিক মুক্তির এক নব রূপ প্রদানের অভিনব প্রকাশ দেখা যায়। তাঁহারা তাঁহাদের আদর্শ ঘোষণা করিলেন, "অন্যায়ের উপর ন্যায়, অসাম্যের উপর সাম্যের, রাজশক্তির উপর প্রজাশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া পৃথিবীব্যাপী এক মহা সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। তাঁহাদের মধ্যে এক দল নবীন কর্ম্মী শিবনাথের অনুপ্রেরণায় দীক্ষা গ্রহণ করিলেন; সেই 'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা'র বর্ণনা প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র বলেন, "এক দিন মধ্য রাত্রে শিবনাথের ভবনে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া তাহা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাঁহারা সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ক আদর্শের সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার অঙ্গীকার করেন। একটি অঙ্গীকারের স্পষ্ট এই নির্দ্দেশ ছিল যে, জীবন গেলেও কেহ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দাসত্ব করিবেন না। কারণ তাঁহাদের মতে ব্রিটিশ জাতি বলপ্রয়োগ দ্বারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছে। তবে তাঁহারা সরকারী আইন ভঙ্গ করিবেন না।" শিবনাথ তখনও সরকারী চাকুরিয়া। তিনি আত্ম-জীবনীতে লিখিয়াছেন, "যখন ইঁহারা ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আগুনের চারি দিকে ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন এক আশ্চর্য বল ও আশ্চর্য প্রতিজ্ঞা আমার মনে জাগিতে লাগিল।" শিবনাথ ইহার কিছু কাল পরে সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।

আনন্দমোহন বসু এই সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি-সাধকের দলে যোগদান করিলেন। তাঁহাদের রাষ্ট্রিক পরিকল্পনার সহিত সহানুভূতি বশত সরকারী কর্ম্মে সদ্য ইস্তফা দিয়া সুরেন্দ্রনাথ ও মনমোহন ঘোষও এই দলে যোগদান করেন। ইহার ফলস্বরূপ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে এলবার্ট হলে জনসভার অধিবেশনে 'ভারত সভার' প্রতিষ্ঠা হয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর সহযোগিতায় সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রসমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন; তাঁহার যুগান্তকারী বক্তৃতা "ম্যাটসিনী ও নব্য ইতালী" "শিখ-শক্তির অভ্যুদয়", "চৈতন্য ও সমাজ বিপ্লব ছাত্র" সমাজকে নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে।

বিপিনচন্দ্র তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, "সুরেন্দ্রনাথের ম্যাটসিনী সম্পর্কীয় বক্তৃতা হইতে প্রেরণা পাইয়া আমরাও ভারতে স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিলাম। কিন্তু তখনও কোনরূপ বিপ্লবী মনোভাব দ্বারা

আমরা চালিত হই নাই বা স্বদেশের রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির জন্ত কোনরূপ গুপ্তহত্যার কথাও চিন্তা করি নাই। সুরেন্দ্রনাথ নিজেই এইরূপ বহু গুপ্ত সমিতির অধিনায়ক ছিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মতালিকা যুবকদের ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহারা আদর্শে খুবই নিষ্ঠাবান ছিলেন। আমি একটি সমিতির বিষয় জানি—আমি অবশ্য ইহার সভ্য ছিলাম না—যাহার সভ্যগণ তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষঃস্থল ছিন্ন করিয়া রক্ত বাহির করিতেন এবং সেই রক্ত দিয়া অঙ্গীকার-পত্রে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিতেন।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তেও তাঁহাদের একটি গুপ্ত সমিতির কথা বিশদ্ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ইহার সভাপতি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান কর্ম্মনায়ক। [ক্রমশঃ।

—সাহিত্য পরিচয়—

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য আড়াই টাকা।

রাবণ বধ—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য আড়াই টাকা।

নবদীপন—নিশিকান্ত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য আড়াই টাকা।

গীতা—অনুবাদক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ, সরস্বতী। সাধন কুটীর, ঝরিয়া। মূল্য পাঁচ টাকা।

Proceeding and Transactions of the All India Oriental Conference Fifteenth Session. The BBRA. Society, Town Hall, Bombay—1

আফগানিস্থানের সিনওয়ারী বিদ্রোহ—অসিতনাথ রায়চৌধুরী। রায়চৌধুরী এণ্ড কোং, ১১১ নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা—২২। মূল্য তিন টাকা।

আমার দেশের মানুষ (১ম খণ্ড)—শ্রীঅনাথ রায়। নব প্রকাশক, কলিকাতা—১২। মূল্য বার আনা।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন—শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, সাংখ্য-বেদান্ত-ভক্তি-তীর্থ। ১৫ নং গোলোক দত্ত লেন, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

অন্তরাগ—শ্রীরাইহরণ চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক—শ্রীমতী আশালতা দেবী। মোগলটুলী, চুঁচুড়া। মূল্য এক টাকা।

ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

জীব জাগরণ কাব্য—শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য। মালক, বালীবা, হালীশহর, চব্বিশ পরগণা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

প্রথম অর্ঘ্য—ভূপেন্দ্রনাথ। প্রকাশক—বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য, ২৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের অন্তরায়—শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী। প্রেম মন্দির, রিষড়া, হুগলী। মূল্য চৌদ্দ আনা।

ভলিবলের নিয়মাবলী—শ্রীবরাজ দাশগুপ্ত। দাশগুপ্ত ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৩১বি নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; কলিকাতা—৪। মূল্য আট আনা।

MISS A MEAL MOVEMENT. Organiser —Jog Pravesh Chandra. Constitution House. New Delhi.

চতুষ্টয় আশ্রম-ধর্ম্ম সাধনা—স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি। প্রকাশক—শ্রীসতীশচন্দ্র মাল। গয়লাডাঙ্গা, শান্তিনিকেতন, গঙ্গাধরপুর, হাওড়া। মূল্য দুই টাকা।

আত্ম-রূপ—শ্রীশ্রীমহান্ত মহারাজ গণপতি দাস গোস্বামী। শ্রীরাম বৈকুণ্ঠধাম, জিয়াগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ। মূল্য দুই টাকা।

সরল সংক্ষিপ্ত শ্রীশ্রী৺বলরাম তত্ত্ব ও ৺মদনগোপাল দের জীবনী—শ্রীইন্দ্রনারায়ণ দে। ৭ নং মদনগোপাল লেন, কলিকাতা। মূল্য লেখা নাই।

বরাহমিহির—শ্রীগজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী। প্রকাশক—শ্রীসুধীরচন্দ্র আইন। ক্যালকাটা বুক এজেন্সী, ৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য তিন টাকা।

বুনিয়াদী সঙ্গীত শিক্ষা—বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য। ইণ্ডিয়া বুক সাপ্লাই, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য তেরো আনা।

শ্রীগুরু লাভ ও দাক্ষিণাত্যের তীর্থ দর্শন—শ্রীবাসন্তী দেবী। প্রকাশক—শ্রীমলয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য, "দেবসঙ্ঘ", বোমপাশ টাউন। বৈদ্যনাথধাম, দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা, বিহার। মূল্য চারি টাকা।

মাটির মাধুরী—শ্রীসুধীর গুপ্ত। চয়নিকা, ১৪০এ নং রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

মেঘে ঢাকা চাঁদ—শ্রীমতী মিনতি নাথ। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ৫৪/৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

পরিণাম—বিধুভূষণ বসু। ৩/১বি নং গর্চা ফার্ষ্ট লেন, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

যে গল্পের শেষ নেই (১ম খণ্ড)—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। পরিবেশক—দি ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ, ৮৯ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য এক টাকা চার আনা।

ধীরে বহে ডন—মিখাইল শলোখফ। অনুবাদক—প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ নং বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

৩

তখন আমি জেলে

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

উনিশ বছর বয়সে রাজবন্দী হয়ে জেলে আসার মধ্যে কেমন একটা রোমাঞ্চময় অনুভূতি আছে, বাইরের সাধারণ লোক তা সহজে উপলব্ধি করতে পারবে না। মাত্র এক ঘণ্টার নোটিশে পারিবারিক আনন্দ-কলমুখর শান্তিপূর্ণ গৃহ ছেড়ে চলে এলাম। পশ্চাতে রেখে এলাম বাবা ও মা'র স্নেহের বন্ধন, কাকা ও কাকীমাদের মমতার বন্ধন, প্রতিবেশীদের সহানুভূতির বন্ধন, সমবয়সীদের প্রীতি ও বন্ধুত্বের বন্ধন, গ্রামবাসীর সহযোগিতার বন্ধন—সর্ব্বপ্রকার বন্ধন সম্পূর্ণ অস্বীকার করে স্বচ্ছন্দ মনে চলে এলাম একেবারে জেলে। যাদের বাইরে রেখে এলাম, নিশ্চিত জানি আমার কথা তাদের মনে পড়বে, দৈনন্দিন হাজারো কাজের ফাঁকে অকস্মাৎ আমার স্মৃতি তাদেরকে নিমেষের জন্যে হলেও চঞ্চল করে তুলবে, কবে আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে, সেই অনাগত সুদিনের অপেক্ষায় জানি দিনের পর দিন চলবে তাদের নিরবকুণ্ঠ প্রতীক্ষা, দক্ষিণের কোঠায় প্রবেশ করলেই জানি মায়ের চোখে পড়বে আমার প্রতীক সেই গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগটি আর অমনি এক বিন্দু অবাধ্য অশ্রু তাঁর চোখের কোণে উদ্বেল হয়ে উঠবে! এও জানি, গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্নদের শিক্ষা দান করতে গিয়ে বাবা বার বার আমার অভাব অনুভব করবেন, বার বার তাঁর নিমের লাঠিখানা দু'হাতে ঘোরাবেন।

কিন্তু সর্ব্বপ্রকার বন্ধন, সর্ব্বপ্রকার পশ্চাতের টান অস্বীকার করে চলে এসে বাড়ী ও বাহির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে থাকার জন্যে যে প্রচণ্ড মনোবল ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন, সেকালে বিপ্লবীদের তার অনুশীলন করতে হতো। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ছিল আমাদের ইষ্টমন্ত্র: পাঁকাল মাছের মতো কাদায় বাস করবি। কিন্তু গায়ে যেন এক ছিটে কাদা না লাগে। বাবা-মা আত্মীয়-পরিজন পড়শী-গ্রামবাসী সবাইকে নিয়ে গোটা দেশকেই আমরা জীবনের চাইতে অধিক ভালবাসি সত্য, কিন্তু সে ভালোবাসায় মায়া নেই, দাসখৎ নেই। সেই ভালোবাসাই আমাদের বেহিসাবী করে তোলে, বিঘ্নসঙ্কুল পথে পা বাড়াবার সাহস জোগায়, মৃত্যুকে শ্যামের মত বরণ করে নেবার শক্তি জাগিয়ে তোলে, একেবারে একাগ্র মনে তদ্গতচিত্তে সুনিবিড় ভালোবাসা, শ্রীরাধিকা যেমন করে ভালোবেসেছিল কৃষ্ণকে, কিন্তু তথাপি ভালোবাসার বন্ধন আমরা স্বীকার করি না। যাদের নিয়ে এই মাত্র আমি হাস্য-পরিহাসে, গল্পে-গুজবে একেবারে মশগুল হয়েছিলাম, অপ্রত্যাশিত ভাবে এল বিদায় নেবার নোটিশ, তৎক্ষণাৎ সেই অম্লান হাসি নিয়ে, সেই হাল্কা মন নিয়েই বাইরে বেরিয়ে এলাম। যারা ভেতরে রইলো, তাদের পানে ফিরে চাইবারও অবসর নেই আমার, কারণ গ্রেপ্তার করে নিয়ে অত্যাচারী শাসক জানিয়েছে যে আর একটি চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ আমায় গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের জীবনের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে অপর অধ্যায়ের অ-মিল ও অসামঞ্জস্য এত বেশী যে, সাধারণ লোক তার হদিস করতে পারবে কি না সন্দেহ। কলকাতার গা-ঢাকা জীবনের ওপর যবনিকা টেনে দিয়ে এলাম বাড়ীতে, সেখানে পাড়ার আনন্দে নিজেকে ঢেলে দিয়ে সুরু করলাম আর-এক অধ্যায়। তার পর পুলিশ-সুপারের শমন যেতেই পশ্চাৎপট একেবারে মুছে ফেলে দিয়ে সুরু হলো সম্পূর্ণ নতুন এক অধ্যায়। এক-একটি অধ্যায় অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ধরে নিতে হবে। ভাড়াটেদের বাসগৃহ পরিবর্ত্তনের মতো। জাঁকিয়ে যেখানে বাস করছিলেন বছরের পর বছর, অকস্মাৎ এক দিন সকালবেলা দেখা গেল, তাঁরা চলে যাচ্ছেন পাড়া ছেড়ে চিরদিনের মতো। রান্নাঘরের উনুন ভেঙে দিয়ে গেছেন।

উনিশ বছরের স্বাস্থ্যবান্ কিশোরের মনে বন্ধন-জয়ের আনন্দ রোমাঞ্চ সৃষ্টি করবেই তো!

আমাদের ইয়ার্ড বেশ বড়। সম্মুখে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা, খোয়া ভর্ত্তি। মাঝে মাঝে পুরোনো ছাতিম বা কদম গাছ, তার নীচটা গোল করে শাণ দিয়ে বাঁধানো। তারই এক কোণে সারি-সারি বোধ হয় চল্লিশটা মলত্যাগের কুঠরী। এই কুঠরীগুলো মুখোমুখি দু'টি সারিতে বিভক্ত, কুড়ি আর কুড়ি। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, এই কুঠরীর সম্মুখ দিকে একেবারে খোলা আর বাকি তিন দিকে আড়াই ফুট উঁচু লোহার শিটের পার্টিশন। ভেতরে দু'পাশে সিমেন্ট দিয়ে বসানো দু'খানা ইট আর তার মাঝখানে পিচ-লাগানো ছোট বেতের একটি ঝুড়ি! মাথা নীচু করে দু'-চার দিন যাতায়াতের পরই আমরা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সাকরেদী করতে অভ্যস্ত হয়ে যাই। তখন মুখোমুখি বসতে যে আমাদের আদৌ অসুবিধে হয় না, শুধু তাই নয়, আমরা অনেক সময় অমনি ভাবে বসে নানা রকম গল্প-গুজব করি, নানা রকম আলাপ-আলোচনা করি, হয়তো একটা গুরুত্বপূর্ণ সভাই করে ফেললাম। তাতে মারাত্মক একটি প্রস্তাবই হয়তো সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো যে, আশু বাবুর নামে সুপারিনটেনডেন্টের কাছে নালিশ করতে হবে।

ইয়ার্ডের পূব দিকে ফুলের ছোট্ট একটা বাগান। তাতে বাংলা দেশীয় নানা রকম অজস্র ফুল ফোটে। তার পাশেই রান্না-ঘর। বিরাট দু'টি চুল্লীতে বিরাটকায় হাঁড়ী-কড়া চাপিয়ে প্রত্যেক বেলায় প্রায় দেড়শো জন রাজবন্দীর আহার্য্য প্রস্তুত করেন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ কিচেন-ম্যানেজার নীরেন মুখার্জ্জীর তত্ত্বাবধানে হয়তো শেখ রহিমদ্দী, অথবা বাঞ্ছারাম মণ্ডল।

সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত সাধারণ কয়েদীরাই রাজবন্দীদের চাকর, ঠাকুর, ধোপা, নাপিত ও জমাদারের কাজ করে থাকে। জেলের ব্যাপার সবই অদ্ভুত। বাইরে যে ছিল চাষী, দেখা গেল সে জেলের মধ্যে নাপিতের কাজ করছে, আর যে ছিল নাপিত, জমাদারের ঝাড়ু তার হাতে। এমনি ভাবে রান্নার বামুনগিরি করে হয়তো ইউনিয়ন বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট, ধোপার কাজ করে হয়তো পথের ভিক্ষুক, চাকরের কাজ করে কোনো ভদ্রলোকের ছেলে আর জমাদারের কাজ করে সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকই। কারণ, জমাদারেরা প্রত্যেক দিন বারোটা বিড়ি পায়, তাদের খাদ্য "উন্নত" শ্রেণীর এবং দণ্ড তাদের একটু ঘন-ঘন আর একটু বেশী পরিমাণে মকুব হয়ে থাকে। সুতরাং জেলের দুর্ভোগটা যথাসম্ভব কমিয়ে নিয়ে হাতের ঝাড়ু জেলের মধ্যেই ফেলে রেখে বাইরে গিয়ে তারাই আবার হয়ে বসবে হয়তো কোনো সওদাগরী অফিসের বেয়ারা। জেলের মধ্যেকার সংবাদ ওখানেই

সমাধিপ্রাপ্ত হয়, বিশ ফুট দেয়াল টপকে বা সান্ত্রী-পাহারাওলার লোহার দরজার মধ্য দিয়ে তা ঘৃণাক্ষরেও বাইরে আসে না। এলেই বা ক্ষতি কি? সোজা অস্বীকার করে বসলে মারে কে? সাক্ষী কোথায়?

রান্না-ঘরের পেছনে গোটা দুই ব্যাডমিণ্টন খেলার মাঠ। সামান্য কিছু সব্জীরও চাষ সেখানে হয় দেখা যাচ্ছে।

আইন অনুযায়ী যেখানেই আমরা থাকি না, গভর্ণমেণ্ট আমাদের খেলাধূলার ব্যবস্থা করতে বাধ্য। কিন্তু এখানে ঘাস কোথায়? মাঠ কোথায়? কিন্তু আমরা সে অসুবিধায় দমবার পাত্র নই। তাই সম্মুখের খোয়া-ঢাকা মাঠে আমাদের রাগবি খেলা হয়। তারই এক পাশে হয় ভলি বল। রাগবির বল মাঝে মাঝে ফুটবলেও রূপান্তরিত হয়। আছড়ে পড়ে শরীরের নানা স্থানে ছড়ে যায়, কেটে যায়, পাইখানার নীচু লোহার চালে লেগে হরিদাসের একটা আঙুল এক দিন প্রায় ভেঙ্গেই গেল, তবুও থামবার পাত্র আমরা নই।

সংবাদপত্রের মধ্যে আমাদের জন্ম বরাদ্দ ষ্টেটস্‌ম্যান আর বাংলা সঞ্জীবনী ও হিতবাদী। ষ্টেটস্‌ম্যানে থাকে আগা খাঁয়ের ঘোড়ার সংবাদ আর যত ফিল্ম-ষ্টারদের পারিবারিক খোশ-খবর, তাই সঞ্জীবনীই ছিল আমাদের কাছে প্রিয় ও উপভোগ্য। প্রিয় এ জন্ম যে, ওতে রাজবন্দী সংবাদ নামে একটা ফিচার-কলাম ছিল, যাতে নয়া-নয়া রাজবন্দীর নাম, রাজবন্দী স্থানান্তর ও রাজবন্দীর অসুস্থতার সংবাদ থাকতো। উপভোগ্য এ জন্ম যে, সঞ্জীবনী একেবারে ফোঁটা-তিলক-কাটা গোঁড়া হিন্দুর পত্রিকা। শান্তিনিকেতনের মেয়েরা 'জনসাধারণের কুদৃষ্টির সম্মুখে লাস্য নৃত্য' করে বলে সম্পাদক স্বয়ং বিশ্বকবিকেই অজস্র গালমন্দ করেছেন, এক দিনের কাগজে পড়লাম। তথাপি, বাইরের চলিষ্ণু দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো এই সঞ্জীবনীই।

খাবার জন্ম প্রত্যেকের বরাদ্দ ছিল এক টাকা দশ আনা দৈনিক আর মাসিক পকেট-খরচা বাবদ কুড়ি টাকা। টাকা-পয়সা এরা আমাদের হাতে দিত না। নীরেন বাবু দৈনন্দিন খাবার জন্ম ঐ বরাদ্দ অঙ্কের মধ্যে যা-খুশী তাই রিকুইজিশন করতেন এবং আমরা পকেট-খরচার টাকা দিয়ে যা-খুশী তাই কিনতে পারতাম।

ঢাকা শহরে নীরেন বাবুর না কি হোটেল ছিল শোনা গেল। তাই ভদ্রলোক যেমন শহরের প্রতিটি তরী-তরকারির দর জানেন, তেমনি পরিপাটি করে খাওয়াতেও জানেন। শহরে ঠিকাদারের পক্ষে খুব বেশী ঠকানো যেমন সম্ভব ছিল না, তেমনি চর্ব্বচোষ্য-লেহ্যপেয় ভোজনে আমাদের স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর উন্নত হতে লাগলো। আমাদের কিচেনকে আমরা নীরেন বাবুরই হোটেল বলে আখ্যা দিতাম। সত্যি লোকটা অত্যন্ত পরিশ্রমী। রাবণের চিতার মতো অনন্ত চুল্লীর ওপর বিরাটকায় কড়াইতে আমাদের রাঁধুনী বামুন ইয়াসিন হয়তো মিষ্টান্নের দুধটা ঠিক মত নাড়তেই পারছে না দেখে নীরেন বাবু নিজেই এলেন এগিয়ে। খুন্তী নয়, খন্তা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আধ মণ দুধ নাড়তে সুরু করলেন। সেই ভোর থেকে ভদ্রলোক ঠায় বসে থাকেন রান্না-ঘরের দরজায়। চতুর্দ্দিকে শ্যেন-দৃষ্টি, এক চিমটি নুণ এদিক-ওদিক করবার উপায় নেই; আর সেই রাত দশটায় আমাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে নীরেন বাবুর খাবার আসে তাঁর ঘরে। সম্ভব হলে আর সম্মত হলে আমরা নীরেন বাবুকে কিছু কিছু পারিশ্রমিকও দিতে প্রস্তুত ছিলাম। এত তাঁর কৃতিত্ব!

সকালে কোনো দিন লুচি ও মুর্গীর মাংস, কোন দিন ফেণাভাত ও ঘি, আবার কোন দিন নারকেল-কোরা দিয়ে চিঁড়ে ভাজা, সঙ্গে হাঁসের বা মুরগীর ডিম—কাঁচা থেকে সুরু করে কোয়ার্টার, হাফ, থ্রি-কোয়ার্টার ও ফুল্ বয়েল্‌ড্, যার যতটা খুশী। এক-এক রকমের ডিমের জন্ম পৃথক্ পৃথক্ বালতী।

দুপুরের আহারটা অনেকটা অমানুষিক বলা যেতে পারে। ঢাকা শহরের সর্ব্ববৃহৎ চিতল মাছের পেটিগুলোই শুধু এক দিন আনা হলো। এক দিন আনা হলো এক ঝুড়ি-ভর্ত্তি বেলে হাঁস। এক দিন এলো প্রত্যেকের জন্ম একটি করে রুই মাছের মাথা। কোন দিন হলো জন-প্রতি দু'টো করে মুর্গীর রোষ্ট। কোন দিন আস্ত ইলিস মাছ ভাজা।

বিকেলে নানা জাতীয় ফল ও পোয়াটেক ছানা ও আধ সের ঘন দুধ। মাঝে-মাঝে সে দুধে বাদাম পেস্তা ও কিসমিসও পাওয়া যেত। আঙুর, বেদানা, আপেল ও কমলা রোজই মিলতো।

রাত্রের খাবার শেষ হলে লেমনেড, সোডা, কমলা ও অন্যান্য ফলের ব্যবস্থা ছিল। সকালে ঢাকার বিখ্যাত খাদ্য 'বাখরখানি' ও বিকেলে 'অমৃতি'ও থাকতো মাঝে-মাঝে।

খাওয়া ব্যাপারে নাম-করাদের মধ্যে আমিও এক জন ছিলাম। তাই দু'-চার দিন যেতে-না-যেতেই আমিও 'ভক্ষণ সমিতির' এক জন বিশিষ্ট সভ্য হয়ে গেলাম।

তেতলায় আমাদের ঘরে, ঘর মানে দীর্ঘ হল-ঘরে ভক্ষণ সমিতির আড্ডা। সভাপতি সুরেন্দ্র মজুমদার, সর্ব্ববয়োজ্যেষ্ঠ। সহ-সভাপতির পদ এখনো খালি আছে। অবশ্য সে পদের জন্ম প্রার্থী আছেন নাম-করা ক'জন খাদক; যথা, তরণী সোম, বীরেন ঘোষ ও সতীশ দাশ। সভ্য-সংখ্যা বর্ত্তমানে পনেরো জন।

সভ্য হবার নিয়ম কিন্তু সহজ নয়। কোনো বিশেষ ফরম্-এ আবেদন-পত্র পেশ করতে হয় না বটে, তবু নিয়ম হচ্ছে, প্রার্থীকে সভায় বসে হয় একটি গান করতে হবে, নয় তো স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করতে হবে। গানের গলা না থাকলেও ক্ষতি নেই, কবির কলম ভেঙে গেলেও আপত্তি নেই। গম্ভীর ভাবে যে-কোনো গান যে-কোনো সুরে ও তালে গলা ছেড়ে গাইতে হবে অন্ততঃ দু'মিনিট কিংবা ছন্দ ও মিল ও অর্থহীন হলেও যে কোনো স্বরচিত কবিতা সুর করে পাঠ করতে হবে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট। তার পর সভাপতি ও কার্য্যকরী সমিতি তার আবেদন সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন।

সভ্য হবার আর-একটি যোগ্যতা চাই এবং সেটাই প্রাথমিক ও সর্ব্বপ্রধান। খেতে পারা চাই। সাধারণে যা খায়, অন্ততঃ তার দ্বিগুণ। ব্যঞ্জনের কোনো বাছাই থাকতে পারবে না, স্বাদের কোনো বালাই থাকবে না, সময়ের কোনো বিচার নেই, যখন-তখন যা-তা জিনিষ বাটি-বাটি বা থালা-থালা সাবাড় করে দিতে হবে। এবং সর্ব্বোপরি এর ফলে অসুখ হলে তৎক্ষণাৎ তার সভ্য-পদ কাটা যাবে। যে যত বেশী টানতে পারবে, সে তত বেশী সিনিয়রিটি দাবী করতে পারবে এবং তার সভ্য-পদের শিকড় ততটা পাকা হয়ে উঠবে এবং তার কর্তৃত্বও বেড়ে যাবে ততখানি।

ভোলা বাবু এক দিন সভাপতি সুরেনদা'র সঙ্গে আমার পরিচয়

করিয়ে দিলেন। পরদিনই সন্ধ্যার পর ভক্ষণ সমিতির সভায় আমার ডাক পড়লো। গান আমি যে গাইতে না জানতাম তা নয়। বিয়ে-বাড়ীর মজলিসে বহু গান গেয়েছি। তথাপি কবিতা রচনায়ও ক্ষমতা যে আমার আয়ত্তে, সেটা প্রমাণ করবার জন্তই সভার সমক্ষে সুর করে স্বরচিত যে কবিতাটি পাঠ করেছিলাম, তার অনেকখানিই আমার মনে আছে আজো:

ওরে বীরেন, ওরে আমার ভোলা,
ওরে যতীন, ওরে বিপিন,
খাবার-ঘরের দুয়ার বুঝি খোলা।
পেট-রোগারা ভাঙ্গা গলার জোরে
যা খুশী তাই বলে বেড়াক তোরে,
সকল যুক্তি হেলায় তুচ্ছ করে
দিন-রাত্তির চালা, খাওয়া চালা।
আয় দিবাকর, আয় রে আমার ভোলা।
এদিক-ওদিক তাকাস্ নে আর কেউ,
ভ্যখ্ না চেয়ে বান ডেকেছে
কড়াই ছেপে উঠছে ডালের ঢেউ।
ঢালতে ওরা চায় না বাটি-বাটি,
নেবার বেলা এমনি আঁটিসাটি,
মনে মনে জানে কিন্তু খাঁটি
একটু পরেই ঠক্‌ঠকাবে তলা।
তরণী রে, ওরে আমার ভোলা।
নীরেন বাবু করবে তোরে মানা,
খালি কড়াই দেখবে যখন,
ভাববে এ কী বিষম কাণ্ডখানা।
খাওয়া দেখে উঠুন তিনি ঘেমে,
আসন ছেড়ে আসুন তিনি নেমে,
সেই সুযোগে দমের পরে দমে
কর রে সাবাড় বাটি এবং থালা।
ওরে রমেশ, ওরে আমার ভোলা।
ম্যানেজারের খাবার আলমারী
চিরকাল কি রইবে বন্ধ?
হরিদাস, তুই আয় রে নীচে নেমে।
ভীমের মতন, কিন্তু গদা ছেড়ে,
হাসি নয় রে, নিছক্ চুপিসাড়ে
খাবার-ঘরের আলমারীটা ঝেড়ে
অমৃতি আর আন্ রে রসের গোলা।
ওরে নির্ম্মল, ওরে আমার ভোলা।
আপেলগুলি আন রে দেখে দেখে।
টক্ না লাগে আঙ্গুরগুলি,
মুখে ফেলে দেখিস্ নিজে চেখে।
কলা আছে, জানি শশা আছে,
তাই জেনে তো সিক্ত জিহ্বা নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পেট-রোগাদের কাছে
আহার নিয়েও হিসাব করে চলা।
ওরে ননী, ওরে আমার ভোলা।
সভাপতি তুই যে চিরজীবি।
গলা সমান আহার করে
ঢেঁচোর করে শয্যা এসে নিবি।
খাবার নেশায় ভোর করেছিস্ কারা,
খাবার তরেই জেলে আমার তাড়া,
খেয়ে খেয়ে হোস যদি বা সারা,
গলায় দেবে কমলালেবুর মালা।
ওরে সুরেন, ওরে আমার ভোলা।

কবিতা শুনে সভাপতি গদগদ ভাষায় আমার অজস্র প্রশংসা করে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করলেন এবং যেমন সভ্যদের মনের কথা এমনি সরস ভাবে কবিতার ছন্দে প্রকাশ করেছি, তেমনি নীরেন বাবুর ভাতের হাঁড়ীও যেন উজাড় করে দিতে পারি, তেমনি একটা আন্তরিক আশা প্রকাশ করে তাঁর ভাষণ শেষ করলেন। করতালির শব্দে হল-ঘর কম্পিত হয়ে উঠলো। তরণী বাবু আতাঙ্কত হলেন সহ-সভাপতির শূন্য আসন বুঝি দ্বিজেন বাবুই পূরণ করে বসেন।

আলোচ্য বিষয়ের তালিকার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে সুরেনদা ঘোষণা করলেন: এবার নির্ম্মল বসুর সঙ্গীত! জীবনে নির্ম্মল কোনো দিন গান করেনি, সুর, তাল, লয়, মান এ সব তার কাছে গ্রীক, কোনো গানের কোনো লাইনও সে জানে না। কিন্তু ভক্ষণ সমিতি নিয়মানুবর্ত্তিতায় অগ্রগামী, সভাপতির আদেশ তাকে পালন করতে হবেই।

দু'বার কেশে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে খুব গম্ভীর ভাবে মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে প্রাণ-মন ঢেলে দিয়ে সে সুরু করলো:

জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে
ভারত ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ।
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ।

এর পরের লাইন নির্ম্মলের কিছুতেই আর মনে পড়ছে না। ওদিকে কয়েদীদের এ্যালুমিনিয়মের থালা বাজিয়ে তবলচী বীরেন ঘোষ যে তাল রাখছে, যদি সে তাল কেটে যায়? তাই দেরী আর না করে নির্ম্মল অকস্মাৎ প্রচণ্ড চীৎকারে পাঁচ নম্বর ইয়ার্ড প্রকম্পিত করে ধরে বসলো:

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় হে,
ভারত ভাগ্যবিধাতা।

অধিবেশন চলতে থাকা কালে হাসি নিবিদ্ধ। অথচ হাসির চোটে প্রত্যেকেরই দম ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছে! সুরেনদা'র দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এলেও অন্তর্দৃষ্টি তাঁর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। অবস্থা সঙ্গীন দেখে তৎক্ষণাৎ তিনি সভাভঙ্গের আদেশ-বাণী ঘোষণা করলেন। আর যায় কোথা! হাসির চোটে সবাই একেবারে পাগল হয়ে উঠলো। ভোলা বাবু তো ছুটেই পালিয়ে গেলেন একেবারে ঘরের বাইরে। সে এক অদ্ভুত, অফুরন্ত একটানা হাসি। কিছুতেই আর থামতে চায় না। হয়তো এক জন খানিকটে সামলে নিয়েছে, অমনি পাশের এক জন আবার খুক-খুক সুরু করলো।—ব্যস্, আবার হো-হো সুরু হয়ে গেল।

কতক্ষণ হেসেছিলাম জানি না। অকস্মাৎ আমাদের হাসিতে বাধা দিয়ে যুদ্ধের দামামার মতো খাবার ঘণ্টা বেজে উঠলো। অমনি হাসি একেবারে থেমে গেল। বিরাট কর্ত্তব্য আমাদের সম্মুখে, এসেছে তারই উদাত্ত আহ্বান, কারণ নীরেন বাবুর ডালের কড়াই আজ আমরা আক্রমণ করবো। অতএব, চল সবে, যাই সমরে!

আমাদের সংগ্রাম-নীতি অতীব উদার। প্রতিপক্ষকে আমাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুর কথা জানিয়ে দিই পূর্ব্বাহ্নেই। হোক না সে প্রস্তুত, কী বায়-আসে? 'সমুদ্রমপি শোষয়ামি' মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে ভক্ষণ সমিতির সম্মিলিত আক্রমণ-ধারা নীরেন বাবু কতক্ষণ সইতে পারবেন? অতএব বিরাট ডালের কড়াইয়েরও তলদেশ দেখা যেতে লাগলো এবং সাত বাটি চুমুক দিয়ে খাবার পর তখনো হরিদাস ডাল-ডাল বলে হাঁক ছাড়ছে। সভাপতি সুরেনদা ডালের বাটির মধ্যে এক মুঠো ভাত ছড়িয়ে নিয়েছেন আর নির্ম্মল নিয়ে বসেছে ছোটখাটো একটি গামলা।

নীরেন বাবু এগিয়ে এলেন! সবিনয়ে নিবেদন করলেন: ডাল আর নেই। ভক্ষণ সমিতির সভ্যবৃন্দ শোভাযাত্রা করে বিজয়োল্লাসে ঘরে ফিরে এল। রাত তখন প্রায় দশটা। একটু পরই আমাদের লোহার শিকের দরজা রাতের মত বন্ধ হয়ে গেল।

দরজা বন্ধ হলেও আমাদের আলাপ-আলোচনা তখনো বন্ধ হয় না। আমাদের দিন তখনো শেষ হয় না। বীরেন র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে আমার সীটে এসে বসলো। নানা বিষয়ে কথা-বার্ত্তার পর অকস্মাৎ এক সময় গলা খাটো করে বললো: কুমিল্লার বিস্তৃত সংবাদ জানা গেছে দ্বিজেন বাবু! ষ্টীভেন্স সাহেবকে যারা হত্যা করেছে, তাদের নাম শান্তি ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরী। হত্যা করে স্বেচ্ছায় তারা ধরা দিয়েছে। পালাবার এতটুকু চেষ্টা করেনি তারা। কিন্তু এদের নির্ঘাৎ ফাঁসী হয়ে যাবে।

চুপ করে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় ঘটনাটি যা পড়েছি: মিঃ ষ্টীভেন্স কুমিল্লার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট। এক দিন তাঁর বাংলোতে যেমন অনেকে অনেক রকম আবেদন ও নিবেদন নিয়ে আসে, তেমনি ভাবেই এল দু'টি স্থানীয় স্কুলের ছাত্রী। বয়েস কতোই-বা আর হবে! ষোলো কি সতেরো। শহরেরই বাসিন্দা, অপরিচিত নয় কেউ। ষ্টীভেন্স সাহেবের হাতে যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর একখানি আবেদন-পত্র তারা পেশ করলো—একটি সন্তরণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা তারা করতে চায়; এ ব্যাপারে স্বয়ং জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট যদি অনুগ্রহ করে একটু অগ্রণী হয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন···সাহেব ভ্রূ কুঁচকে বললেন: দেখা যাবে।

আবেদন-পত্রখানা এক জনের হাতে ফিরিয়ে দিতে যেতেই অপর মেয়েটি ফস্ করে সাড়ীর আড়াল থেকে বার করলো একটি রিভলভার। একটি মাত্র গর্জ্জন শোনা গেল আর শোনা গেল জেলা-নায়ক ষ্টীভেন্স সাহেবের পতন-শব্দ। বাধা দিতে ছুটে এল ক'জন এ ঘর-ও ঘর থেকে। কিন্তু অপর মেয়েটি সে জন্ম প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। আবেদন-পত্র ফেলে দিয়ে সেও রিভলভার উঁচিয়ে ধরলো ও এলোপাথাড়ি গুলী চালাতে লাগলো। তার পর শান্ত হয়ে তারা ধরা দিল।

মনের কোণে একটা কাঁটা যেন খচ্‌খচ্ করতে লাগলো। এ পর্য্যন্ত মারণাস্ত্র দেখা গেছে ছেলেদেরই হাতে। তাদেরই অস্ত্র-গর্জ্জনে একে একে ধরাধাম থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেছেন পেডি, লোম্যান, সিম্পসন, গার্লিক। কিন্তু মেয়েদের হাতে রিভলভার?

সহসা কিছু বলতে পারলাম না। বীরেন বোধ হয় সেটা উপলব্ধি করেই আর কিছু বললো না। ধীরে ধীরে নিজের সীটে গিয়ে মশারির মধ্যে প্রবেশ করলো। কি ভাবছিলাম জানি নে। সে ভাবনার যেমন নেই অর্থ, তেমন নেই সঙ্গতি। কিন্তু কোথা থেকে যে কী সব অজস্র চিন্তার পোকা মাথার মধ্যে ঢুকে কিলবিল করতে লাগলো।

চেয়ে দেখলাম প্রায় সবাই শুয়ে পড়েছে। ভোলা বাবু মা'র কাছে নিবিষ্ট মনে একখানা চিঠি লিখছেন আর মশারির মধ্যে বসে বসে নির্ম্মল পড়ছে স্বামী বিবেকানন্দের "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।" সবার টেবিলের মোমবাতীগুলো আমাদের ভৃত্যেরা নিবিয়ে দিয়ে গেছে। সারা রাত ঘর অন্ধকার রাখা নিয়মবিরুদ্ধ বলে মেঝের ওপর গোটা চারেক হারিকেন কমিয়ে রাখা হয়েছে।

বাইরের শহরেও চাঞ্চল্য কমে এসেছে নিশ্চয়। শীতের রাত এগারোটায় সবাই এসে নিজের নিজের গৃহে আশ্রয় নিয়েছে। পাটবিহীন দরজার সমান জানালা-পথে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, আকাশে কাস্তের মত এক ফালি চাঁদ আর তাকে ঘিরে অসংখ্য মিটমিটে তারা। কেমন যেন কুয়াসায় ঢাকা মনে হয়। হাঁক দিলাম: হালিম, আলোটা নিয়ে যাও।

হালিম আলো নিয়ে গেল। আমি লেপখানা মাথার ওপর টেনে দিয়ে চোখ বুজলাম। কিন্তু চোখ বুজলেই কি ঘুম আসে? কিংবা ঘুম এসেছিল। ঘুমের মধ্যে দেখলাম বিচিত্র এক স্বপ্ন!······ মিশমিশে কালো আকাশ। নেই চাঁদ, নেই একটিও তারা। জমাট অন্ধকারের পুরু একটা সামিয়ানা দিগ্‌দিগন্ত ছেয়ে যেন টাঙ্গানো রয়েছে। হঠাৎ দেখলে অন্তরাত্মা বুঝি কেঁপে ওঠে ভয়ে! মনে হয়, অক্টোপাশের মতো হিংস্র চোখ মেলে অন্ধকার যেন ওৎ পেতে বসে আছে কিংবা পাইথনের মতো মুখব্যাদান করে রয়েছে!···অকস্মাৎ সেই কালো যবনিকায় দেখা গেল কেমন নীলাভ আলোকের বিচ্ছুরণ। দু'টি সরু লিকলিকে শিখা কেঁপে-কেঁপে একেবারে লেলিহান হয়ে হয়ে উঠলো। স্পষ্ট দেখা গেল, দু'টি নারীমূর্ত্তি ফাঁসীর রজ্জুতে ঝুলছে! আলুলায়িত কুন্তলা, স্খলিতবসনা ষোড়শী। আকাশের কালো মেঘের অন্তরাল থেকে নেমেছে দু'টি রজ্জু, সেই রজ্জুতে লম্বমান দু'টি কিশোরী। কোথা-থেকে-আসা ঝিরঝিরে হাওয়ায় তাদেরই বন্ধনহীন কেশরাশি আকাশে উড়ছে। তারাগুলোকে ঢেকে দিয়েছে, আড়াল করে রেখেছে পূর্ণিমার চাঁদকে। চুলের ফাঁকে-ফাঁকে এলোপাথাড়ি হাওয়া শন্‌-শন্ করে বয়ে চলেছে। শব্দ শোনা যাচ্ছে গোখরো সাপের ফোঁসফোঁসানির মত। নারী দু'টির শুষ্ক অধর-কোণে তখনো অপরিম্লান হাসির ঝিলিক। দু'কস বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে গরম রক্তের ধারা, ইথারের গা বেয়ে এক-একটি বিন্দু হয়ে। বাতাসের সংস্পর্শে এসেই ফসফরাসের মতো তা জ্বলে-জ্বলে উঠছে, উল্কার মতো তির্য্যক্‌গতিতে ছিটকে পড়ছে পৃথিবীর প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তরে।···

অপরিসীম সাহসে ভর করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম নারী দু'টির

মুখের পানে।—এ কি, চেনা-চেনা মনে হয় কেন? কোথায় যেন দেখেছি এদের? কোথায়? আমাদের দেশে? আমাদের গ্রামে? আমাদের পাড়ায়? তোমার বাড়ীতে? আমাদের বাড়ীতে? এ কি, তোমাদের-আমাদের বোনের মত কেন এদের দেখতে? তবে কি—তবে কি—

অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গেল। হালিম এসে ডাকছে: বাবু চা। পাঁচটা বেজে গেছে।

ইঃ, লেপখানা ঘামে একেবারে ভিজে গেছে দেখছি।···হাত বাড়িয়ে ব্র্যাকেট থেকে তোয়ালেখানা টেনে নিলাম।

দিবাকর সেনগুপ্ত নামে এক ভদ্রলোক আমাদেরই ঘরের বাসিন্দা। সুপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান্ এবং বেশ আলাপী। কিন্তু মুশকিল দেখা দেয় সেখানটাতেই। ভদ্রলোকের আলাপটা কেমন যেন গায়ে-পড়া গোছের। যা তিনি জানেন না, তা জানবার জন্ম তাঁর কৌতূহল বেশ তীব্র মনে হয়, অথচ ভাবখানা এমনি দেখাতে চেষ্টা করেন যেন ও-সব কেন, ওর চাইতে অনেক বেশী কথা তাঁর জানা আছে; এটা শুধু গল্পচ্ছলেই এসে গেছে বলেই এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। ইচ্ছে হয় জবাব দিন্, না-হয় না দেবেন। তাতে হায়-আফশোস্ নেই।

অথচ হায়-আফশোস্ যে তাঁর যথেষ্ট থাকে, তার প্রমাণ আমি নিজেও পেলাম। পেডি, লোম্যান, সিম্পসন আর গার্লিককে যাঁরা হত্যা করেছেন, তাঁরা কি সবাই বি-ভি-র লোক? এক দিন দুপুরে খোলা মাঠে বসে শরীরে তেল মর্দন করতে-করতে তিনি এই প্রশ্নটি আমায় করলেন।

আকাশ থেকে পড়লাম! বললাম: তা কি করে বলবো বলুন। রিভলভার নিয়ে যারা গেল, তারা তো আর আমায় জিজ্ঞেস করে যায়নি।

দিবাকর এই হত্যাকাণ্ডগুলোর ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন: কিন্তু শোনা যায়, ঢাকার এই বি ভিই সেই মেদিনীপুরে গিয়ে প্রথম বিপ্লবী দল গড়ে তোলে। সত্যি নয়?

তা তো জানি নে।

মৃদু হেসে দিবাকর বললেন: বুঝেছি, আপনি কিছুই বলবেন না। কিন্তু অনুশীলনের লোকেরা এই সব life for life কাজগুলো নিজেদের বলে দাবী করছে, সে সংবাদ রাখেন? এই তো সেদিন এসেছে রমেশ ভট্টাচার্য্য। ও কি প্রচার করছে জানেন? বিনয় বসু না কি কায়েৎটুলীর ওদের কুস্তীর আখড়ায় নিয়মিত কুস্তি করতে যেতো। আর দীনেশ গুপ্ত তো না কি ওর নিজের হাতের recruit করা ছেলে, রিভলভার ছোড়া সে-ই না কি তাকে শিখিয়েছিল। ওদের এ সব কথার প্রতিবাদ করাও কি আপনি উচিত মনে করেন না?

নির্ব্বিকার কণ্ঠে জবাব দিলাম: না।

কেন?

কারণ রমেশ বাবু নিজেই জানেন যে, তিনি চাল মারছেন, কারণ ঢাকা শহরের এমন একটি লোক নেই যে, বিনয় বোস আর দীনেশ গুপ্তকে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের পুরোভাগে মার্চ্চ করতে দেখেনি। শুধু শহর কেন, বিক্রমপুরের গ্রামে-গ্রামেও এই অফিসার দু'জনকে হামেশা দেখা যেত ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠনের কাজে।

দিবাকর বাবু অকস্মাৎ ক্ষেপে ওঠেন: চলুন, এখনই যাই রমেশ বাবুর কাছে। মিথ্যেবাদীর—

বাধা দিলাম: থাক্, প্রয়োজন নেই। Falsehood shall meet a natural death—অপেক্ষা করুন।

কিন্তু দিবাকর বাবুর ধৈর্য্য যেন আর বাঁধ মানছে না। সেদিনই রাত্রে ঘর বন্ধ হয়ে যাবার পর ভদ্রলোক আবার এসে হাজির।

দ্বিজেন বাবু, কি করছেন?—ও, ডষ্টয়ভস্কির "মাদার"! পড়ুন। চমৎকার বই। কিন্তু আগে পড়েননি?

সময় কোথায়?—বলে বইখানা টেবিলে রাখলাম। দিবাকরও বসে পড়লো এবং আমার কথার রেশ ধরে বেশ বলে যেতে লাগলো: তা তো নিশ্চয়ই। বাইরে থাকলেই খালি কাজ আর কাজ। নাওয়া-খাওয়ারই সময় মেলে না, তার আবার বই পড়া! বিক্রমপুরের দক্ষিণ ভাগটা পুরোই তো আপনার চার্জ্জে ছিল, তাই না? তা থাকবেই তো। এই প্রায় এক মাসের পরিচয়ে যতটুকু আপনাকে বুঝতে পেরেছি দ্বিজেন বাবু, তাতে করে মনে হয়, আপনি বি ভির একটা স্তম্ভস্বরূপ।

খুশী হলাম না শুধু নয়, বেশ বিরক্ত বোধ করতে লাগলাম। যে সব মারাত্মক কথা ও আমার মুখে ভরে দিতে চায়, তা যে কতখানি সাংঘাতিক, তা তো আর আমার অজানা নয়।

পরদিনই বীরেনকে গোপনে জিজ্ঞেস করলাম। বীরেন তো তখনি তাকে দু' ঘা বসিয়ে দিতে চাইলো। বললো: আপনি তো জানেন না, আমিও বলতে ভুলে গেছি, শালা আই-বির চর। ডেটিনিউ সেজে এসেছে। দিই লাগিয়ে দু'টো ঘুসি!

বীরেনের ঘুসির ওজন যে কতখানি, তা আমার অজানা নয়। ঢাকা শহরে তখন গুপ্ত সমিতির দলীয় চেতনা একটু মাত্রাধিক ছিল। শুধু অনুশীলন আর যুগান্তর দল নয়, একই দলের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যেও নানা গুরুতর ও তুচ্ছ বিষয়ে মন-কষাকষি চলতো এবং তার অনিবার্য্য পরিণতি ছিল আর্ম্মাণীটোলার খেলার মাঠে বা রেস-কোর্সে অথবা ঢাকেশ্বরী মন্দিরের কাছে খোলা ময়দানে দুই দলের মারামারি। অতর্কিতে নয়, সংবাদ আদান-প্রদান করে, এনগেজমেন্ট করে। কখনো লোহার শিক দিয়ে, কখনো হকি ষ্টীক দিয়ে, কখনো পেতলের তৈরী পাঞ্চ দিয়ে আবার কখনো-বা হাণ্টার দিয়ে। রক্তদর্শন ছিল অবধারিত।

১১২৬ সালের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে আমি পড়ি, কলেজ-হোষ্টেলে থাকি। ১১৩০ সালের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মেজর বিনয় বসুও তখন থাকতো হোষ্টেলে আমারই পাশের ঘরে। সেও ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে। এক দিন বিকেল বেলা শিশির সেনগুপ্ত এসে আমাদের বলে গেল সন্ধ্যার পর আর্ম্মানীটোলার মাঠে যেতে। তাঁতিবাজারের রবীন রায় না কি আমাদের একটি ছেলেকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। তাই এই চ্যালেঞ্জ। সন্ধ্যার মধ্যে যদি এই মামলার ফয়সালা না হয়, তা'হলে ঐ মাঠেই হবে শক্তি-পরীক্ষা।

প্রস্তুত হয়েই গেলাম। অর্থাৎ রাত ৯টায় হোষ্টেলে ফিরে আসবার সম্ভাবনা কম বলেই রোল-কলের সময় যাতে আমাদের দু'জনকার প্রক্সি দেয়া হয়, তার ব্যবস্থা করে গেলাম।

মাঠে গিয়ে দেখি, পরিস্থিতি বেশ সঙ্গীন! অনেকগুলো হকি

ষ্টীক এসে গেছে, সঙ্গে আবার গোটা দুই ছোরাও। বীরেন কোমর থেকে বার করে বললো : আজ একটাকে আমি নোবই।

বিনয় কুস্তিগীর। বড়লোকের ছেলে। কেমন নাদুস-নুদুস সুডৌল শরীর। বুকে জড়িয়ে ধরতে ভালো লাগে। থাকেও খুব পরিচ্ছন্ন ভাবে। মুখে একটা স্বাভাবিক মৃদু হাসি যেন লেগেই আছে। সে বললো : ও-সব ষ্টীক লাগবে না আমার। বেঁচে থাক্ আমার কুস্তি! এমনি করে ধরবো আর 'ঢাক্'—ব্যস্, একেবারে চিৎ! —বলে সে আমাকেই চিৎ করে ফেলে দেয় আর কি!

বিপক্ষ দলও প্রস্তুত হয়েই এসেছে বোধ হয়। মাঠের অপর প্রান্তে তারা অপেক্ষা করছে দেখা গেল। সন্ধ্যের পর মাঠের সাধারণ জটলা ও জনতা কমে গেলে দলীয় সবাই এসে জড়ো হলো। প্রতিপক্ষও এগিয়ে এল। দেখা গেল, তাদের প্রত্যেকের হাতে হকি ষ্টীক।

দুই পক্ষের বড়দের মধ্যে এই ব্যাপার নিয়ে যে আলোচনা চলছে পাটুয়াটুলীতে রাঙ্গাদা'র বাসায়, সেখানে আমাদের এক জন বার্ত্তাবহ অপেক্ষা করছে। যাহোক একটা কিছু সিদ্ধান্ত হয়ে গেলেই সে সাইকেল নিয়ে ছুটে আসবে আমাদের সংবাদ দিতে। তারই ওপর নির্ভর করছে যুদ্ধ, অথবা শান্তি।

কিন্তু কোথায় সে? জিতেন বললো : আর দেরী করা যায় না। সুরু হোক্।

প্রতাপ তৎক্ষণাৎ তাকে সমর্থন করলো : যা বলেছিস্। যদি ভালো খবর আসেই, তখন থেমে গেলেই চলবে।

তাই ঠিক হলো। প্রতিপক্ষ ও আমাদের মধ্যেকার ব্যবধান শনৈঃ শনৈঃ কমে এল এবং ক্রমে তা মাত্র দশ-বারো হাতে এসে ঠেকলো। সূচনা করে দেবার জন্য, আমার আজো স্পষ্ট মনে আছে, অকস্মাৎ বীরেন ছুটে গিয়ে সম্মুখে যে লোকটিকে পেলো, তাকেই এমনি প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিল যে, সে ছিটকে গিয়ে পড়লো কয়েক হাত দূরে, আর উঠলো না। তার পরই প্রচণ্ড বিক্রমে দুই দলের বাছা-বাছা পালোয়ানেরা এগিয়ে এসে যেই একে অপরের ওপর লাফিয়ে পড়বে, এমন সময় তীরবেগে এসে হাজির আমাদের বার্ত্তাবহ। মিটমাট হয়ে গেছে—অতএব সন্ধি! কিন্তু বীরেনের ঘুষির জের ছেলেটিকে কয়েক মাস টানতে হয়েছিল।

সেই জাতীয় একখানা ঘুষি যদি দিবাকর বাবুর নাকে পড়ে, তা'হলে কোন কালে তাঁর নাক ছিল কি না, তাও বোধ হয় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না! তাই ওকে নিরস্ত করলাম : মাবার চাইতে চিনে রাখা ও সাবধানে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বীরেন বললো : জানেন, ও লোকটা প্রায়ই যায় অফিসে। বলে যায় ওর ইণ্টারভিউ আছে। মাসে দু'বারের বেশী আমাদের আত্মীয়েরা মাথা কুটলেও দেখা করবার অনুমতি পায় না, ও কি প্রাসবি সাহেবের পোষ্যপুত্র না কি? আমার মনে হয়, যোগিনী বোস বা জিতেন ধর অফিসে আসে আর ও এখানকার যাবতীয় সংবাদ তাদেরকে জানাতে যায়। বিশ্বাস করবেন না।

গুপ্ত সমিতিতে সে যুগে যেমন ছিল পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা, ঠিক তেমনিই ছিল কঠোরতম নিয়মানুবর্ত্তিতা ও গোপনতা রক্ষার প্রচেষ্টা। একই কাজে হয়তো পাঁচ জনকে প্রেরণ করা হলো, বলে দেয়া হলো, কাজ সুসম্পন্ন করে পলায়নের সুবর্ণ সুযোগ না পেলে পালিও না, পকেটে রইলো পটাসিয়াম সায়নাইড আর হাতের রিভলভারের শেষ গুলীটি তো রইলোই। পাঁচটি কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র-নেতার সুপারিশ অনুযায়ী হয়তো এই পাঁচ জনকে সংগ্রহ করা হলো। এরা কেউ কাউকে চেনে না, এর আগে কার্য্য-ব্যপদেশে একাধিক বার দেখা হলেও কেউ কারুর সঙ্গে কথা কয়নি। আজ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বার পূর্ব্বক্ষণে অর্থাৎ মৃত্যুকে নিয়ে হোরি-খেলায় মত্ত হবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে সরকারী ভাবে এদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। পরিচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এরা নিবিড় বন্ধুত্বে বদ্ধ হলো। তার পর যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে হয়তো দেখা গেল, একখানা মোটর গাড়ী এদের নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। কে পাঠিয়েছে গাড়ী, চালক বিশ্বাসী কি না সে সব প্রশ্ন করবার অধিকার এদের নেই। নীরবে গাড়ীতে উঠে বসে এরা যথাস্থানে গিয়ে অবতরণ করলো।

অর্থাৎ তোমার যতটুকু না জানলে কাজ আটকে যাবার আশঙ্কা আছে, ঠিক ততটুকু তোমায় জানানো হবে। এই নিয়ম সবার ক্ষেত্রেই সমান ভাবে প্রযোজ্য। বিক্রমপুরকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা আছে। প্রত্যেক অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মীর সঙ্গে অপর অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মীর যোগাযোগ থাকে সত্য, কিন্তু একে অপরের সমগ্র সদস্য-সংখ্যা কত বা কারা এর সদস্য, সে সব সংবাদ জানতে পারে না। নিয়ম নেই। ঢাকার কেন্দ্রীয় সমিতির সঙ্গে সারা বিক্রমপুরের যোগাযোগ রক্ষা করে চলে মাত্র এক জন কর্ম্মী। কেন্দ্রীয় সমিতিরও মাত্র এক জনকেই সে চেনে। প্রত্যেক অঞ্চলের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি যার কাছে থাকে বা বেনামী ইস্তাহারে ব্যবহৃত ব্লকগুলি যার কাছে গচ্ছিত থাকে অথবা অন্যান্য বাজেয়াপ্ত পুস্তক, ছবি বা পুস্তিকা যার গুপ্ত গ্রন্থাগারে আছে, সে শুধু কেন্দ্রীয় সমিতির একটি মাত্র সদস্যকেই চেনে ও জানে। তাঁরই আদেশে মালখানা সে খোলে আর বন্ধ করে ও মনে মনে মালপত্রের জমা-খরচের হিসাব রাখে।

এই যে নিয়ম ও অনুশাসন, আশ্চর্য্য যে, এর একটিও লেখা নেই। গুপ্ত সমিতিতে কাগজ-কলমের ব্যাপার নেই। সবই মুখে-মুখে, মনে-মনে, অন্তরে-অন্তরে। সেখানকার অদৃশ্য শ্লেটে তা লেখা হচ্ছে ও প্রয়োজন বোধে মুছে ফেলা হচ্ছে। দলে যোগদানের প্রথম দিন থেকে একেবারে শেষ দিন পর্য্যন্ত কেউ তোমার নাম লিখে নেবে না এবং অনেক জায়গাতেই তোমার কি নাম, তাও কেউ জিজ্ঞেস করবে না। সাধারণ সদস্য থেকে নিজের কর্ম্মক্ষমতার দ্বারা ধীরে ধীরে বা একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবেই কবে, কখন্ যে তুমি দলীয় কর্ম্মকর্ত্তাদের অন্যতম হয়ে উঠলে, অপরে তো দূরের কথা, নিজেও যেন তা টের পেলে না। এর নিয়োগ, বদলি, প্রমোশন বা বরখাস্ত কোনো ব্যাপারেই কোনো সার্কুলার নেই, বিজ্ঞপ্তিরও প্রয়োজন হয় না। কর্ম্মদক্ষতার দ্বারা তোমার উন্নতিও যেমন এল একটি স্বতশ্চল যন্ত্রের মতো, তেমনি সামান্যতম দুর্ব্বলতার দোষে স্বতশ্চল পেষণ-যন্ত্রেই তুমি কবে যে একেবারে নিষ্পিষ্ট হয়ে পাউডার হয়ে বাতাসে উড়ে গেলে তার হদিসই পাওয়া যাবে না।

সমগ্র সমিতিটাই চলতো স্বয়ংচালিত যন্ত্রের মতো। যেমন নিশ্চিত ও শাণিত তার গতি, তেমনি মজবুত ছিল তার কল-কব্জাগুলি। মাটির নীচের জমাট অন্ধকারে একটা অদৃশ্য জগৎ

এমনি ভাবে চলতো, বাইরের দৃশ্যমান জগতে তার প্রাণস্পন্দনের বিন্দু মাত্র ধ্বকধ্বকানিও শোনা যেত না !

এমনি কড়া নিয়মের প্রয়োজনীয়তাও ছিল যথেষ্ট। সন্দেহবশে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারলেই আই-বি অফিসের রুদ্ধদ্বার কক্ষে চলতো তার ওপর অমানুষিক অত্যাচার। প্রথমেই নয়। প্রথমে চলতো অনুরোধ, উপরোধ, আবেদন-নিবেদন : ভাই আমার, দাদা আমার, বল না ঐ রিভলভারটা কে তোমায় দিয়ে পাঠিয়েছিল ? আহা হা, এমনি কচি শরীর, হাজতের কষ্টে কেমন কালি হয়ে গেছে। ওরা বুঝি ভালো খাবার দেয় না ?—এই রামসিং, ইউ উল্লু, ইধার আও। এই বাবুকে খেতে দিস্ না না কি রে ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! শোন্, আজ থেকে রোজ রাত্রে মাংস আর পরোটা দিবি। আর যা, এক্ষুনি কিছু খাবার নিয়ে আয় !—বলে ঝনাৎ করে একটা টাকা মেঝের ওপর ফেলে দিলেন মনোরঞ্জন দারোগা। তার পরই : তুমি আমার ছেলের বয়সী। দেখতেও আমার বড় ছেলের মতো ; তাই তোমায় দেখে কেমন-একটা মায়া ধরে গেছে। তাই তো স্যারকে বলে আর কাউকে দিইনি তোমার কাছে ঘেঁসতে, আমি নিজেই এসেছি। বল তো বাবা, সব খুলে বল তো। বলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। মা-বাবা হয়তো কত কান্নাকাটি করছেন। —আরে, হাজতে কি ভদ্রলোকের ছেলেরা থাকতে পারে ?—বল।

আবেদন-নিবেদন অচল হলে চলতো প্ররোচনা বা পারসুয়েশন। একশো টাকার নোটের একশোখানার একটি বাণ্ডিল টেবিলের ওপর এগিয়ে দিয়ে প্রফুল্ল বসু বলে উঠলেন : পাছে তোমার অবিশ্বাস হয়, তাই চেক না এনে একেবারে ক্যাশ টাকা নিয়ে এসেছি। নাও, ভালো করে গুণে ত্যাখ, দশ হাজার আছে কি না। এই টাকা নিয়ে বাড়ী চলে যাও। গরীবের সংসার, মার্চেন্ট অফিসের ত্রিশ টাকার গোলামী আর খুঁজে বেড়াতে হবে না। বরাত ফিরে যাবে। আর তার বদলে তুমি দিচ্ছ কি ? কতটুকু তার মূল্য ? তাতে তোমার কোন ক্ষতি আছে কি ? এখানে এই ঘরে গোপনে বসে যে নামটি আমায় বলে যাবে, তোমার দলের কে জানতে পারছে তা ? আমি তোমায় তো আর লিখে দিতে বলছি না। তোমার এই দুর্ভোগেরও যেমন শেষ হলো, তেমনি দলের মধ্যেও তোমার প্রতিপত্তি আগের মতই রইলো। মাঝখান থেকে নীট লাভ দশ হাজার টাকা। ইচ্ছে করলে বিলেতও ঘুরে আসতে পারো। জার্ম্মাণীতে গিয়ে হয়তো সাবান তৈরীই শিখে এলে। তখন তো টাকা দিয়ে তোমার দলকেই পারবে সাহায্য করতে। সেটাই ভালো, না একটা ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ভালো ?—নাও, আর দ্বিধা করতে হবে না। ও-সব সংকোচ দূর করে ফেল।

আবেদন বা পারসুয়েশন ব্যর্থ হলে প্রথমে চলে হুমকী ও লজ্জার-জনক অশ্লীল ভাষায় বাপ-মা তুলে গালাগাল, তার পর মুখে থুতু ছিটিয়ে দেয়া বা চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে দেয়া। সে সব অস্ত্র ব্যর্থ হলে প্রয়োগ করা হয় একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র, শারীরিক নির্য্যাতন। যত রকম নির্য্যাতন কল্পনা করা যেতে পারে, সব। মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান মেশানো। তাই কম্বল দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে মেঝের ওপর শুইয়ে দিয়ে একটা বাঁশ আড়াআড়ি ভাবে শরীরের ওপর রেখে দু'পাশে দু'জন বসে চাপ দেয়া হয়। ঘটির মধ্যে বালি ভর্ত্তি করে সেই ঘটি দিয়ে প্রহার করা হয়। এতে ওপরকার চামড়া ফেটে যাবার আশঙ্কা যেমন নেই, তেমনি মাংসের ভেতরটা একেবারে থেঁতলে পিষে কাদা করে দেবে। নখের ফাঁকে সূঁচ বিঁধিয়ে দেয়া হয়। তিনটি আঙুলের ফাঁকে একটি সরু লোহার শিক ঢুকিয়ে দিয়ে ভীষণ ভাবে চাপ দেয়া হয়। চেয়ারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে বসিয়ে রুল টানবার কাঠের রোলার দিয়ে শরীরের প্রতিটি জয়েন্টে আঘাত করা হয়। পরে হয়তো হাণ্টার দিয়েই বেদম প্রহার করা হয়।

আইন আছে বটে যে, গ্রেপ্তার করবার পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই কোনো ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে ধৃত ব্যক্তিকে হাজির করতে হবে, বিশেষ কারণ ব্যতীত পুলিশের হেফাজতে রাখা যাবে না, তাও পনেরো দিনের বেশী নয়। কিন্তু বৃটিশের আমলের বিচারক। তাই প্রহৃত আসামী হয়তো কয়েদীর গাড়ীতে ধুকছে, এমন সময় এস, বি বা আই, বির দারোগা স্যারের সম্মুখে কাগজ-পত্র স্থাপন করলেন আর অমনি স্যার বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রশ্নে অবলীলাক্রমে স্বাক্ষর করে দিলেন : The accused is produced before the Court and on enquiry it is learnt that he is getting good behaviour in the hands of the police and he has got nothing to complain against…ইত্যাদি।

পনেরো দিন এস, বি অথবা আই, বির খপ্পরে আতিথ্য গ্রহণের পর অনেকেরই প্রায় হেঁটে চলবার শক্তি থাকে না।

শান্তি সোম এক দিন আড়ালে ডেকে নিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলো : আই, বি অফিসে তোমায় টরচার করেনি গাঙ্গুলী ?

বললাম : না, একেবারেই না। একটা কটু ভাষা পর্য্যন্ত ব্যবহার করেনি।

এর কারণ পরে জানতে পারা গিয়েছিল। আমি না কি ছিলাম সেনট্রাল আই, বির আসামী, তাই জেলার কর্ত্তারা আমার নিয়ে বেশী ঘাঁটাতেন না। তবে জেলার এলাকায় আমার কখনো আগমন বা আনাগোনাও তাঁরা আদৌ পছন্দ করতেন না। তাই ১৯২৮ সালের পর থেকেই দেশের বাড়ীতে যাওয়া আমার প্রায় ঘটতোই না।

শান্তি সোম বললো : এবার ওরা পাইকারী ভাবে গ্রেপ্তার সুরু করে দিয়েছে। বোধ হয় সবাইকেই দেবে কনফার্ম করে।

নিয়ম ছিল, গ্রেপ্তার করে গভর্ণমেণ্ট তদন্ত করে দেখবেন যে, সত্যিই এ নিশ্চিত ভাবে বৈপ্লবিক কার্য্যাবলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত কি না। তার পর তাঁরা সিদ্ধান্ত করবেন, একে রাজবন্দীর পদে পাকা ভাবে নিযুক্ত করবেন, না মুক্তি দেবেন। শান্তি সোম অন্তাস্ত আরও প্রায় পঞ্চাশ জনের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছে আমি গ্রেপ্তার হবার দিন পনেরো পূর্ব্বে। সুতরাং ওদের ভাগ্য সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হবার সময় আগতপ্রায়।

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, তাই হলো। এক দিন সকাল বেলা আমাদের বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি জেলর আশু বাবু এসে তাঁর ড্যাবডেবে চোখ দু'টোতে খুশীর ঝলমলানি ফুটিয়ে তুলে সংবাদ জানিয়ে গেলেন যে, এক মদন ভৌমিক ব্যতীত সবাইকে গভর্ণমেণ্ট কনফার্ম করেছেন।

আশু বাবুর পক্ষে পরম সুসংবাদ। কারণ, এবার আমরা প্রত্যেকে প্রারম্ভিক ভাতা বাবদ পাবো বাট টাকা আর তার ওপর জন-প্রতি মাসিক হাত-খরচার জন্ত আরো কুড়ি টাকা। এই আশী টাকার একটি পয়সাও তো আমাদের হাতে দেওয়া হয় না। আমরা জিনিষপত্রের অর্ডার দিই আশু বাবুর মারফৎ আর বাইরের ঠিকাদার সেগুলো সাপ্লাই দিয়ে যায় আশু বাবুরই কাছে। তার পর ভাউচারে স্বাক্ষর করে দেবার পর আমাদের চাওয়া জিনিষ আমাদের হাতে আসে। মাঝখানের লোক হিসেবে আশু বাবুর কিছু কমিশন লাভ হয় আর রাজবন্দীর সংখ্যা যত বেশী হবে, তত বেশী টাকার অর্ডার হবে, আর কাজে-কাজেই কমিশনের অঙ্কটাও বেশ মোটা হয়ে ওঠে। তাই আমাদের সর্বনাশ হলেও আশু বাবুর পৌষ মাস দেখা দিল।

সিভিল ইয়ার্ডে একখানা ঘরে আশু বাবুর দোকান। দোকান মানে, আমাদের প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্যের নমুনা সেখানে সাজানো আছে। রোজ বিকেলে আমাদের প্রতিবারে পাঁচ জন করে সিপাই-পাহারায় সেখানে যাবার অধিকার আছে। সেখানে আমরা ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী নমুনা দেখে জিনিষপত্রের অর্ডার দিয়ে আসি। অনেকে অনেক নতুন জিনিষের অর্ডার দিয়ে থাকেন আশু বাবুর দোকানে যার নমুনা নেই। ঠিকাদারকে দিয়ে আশু বাবু তা আনিয়ে দেন।

এই আশু বাবুটি একটি অদ্ভুত জীব! ব্যবসায়ী বুদ্ধি তাঁর অত্যন্ত প্রখর বলে যা-তা জিনিষ দিয়ে দ্বিগুণ মূল্য আদায়ের ফিকিরে সর্বদা তিনি ঘোরাফেরা করেন। এ জন্ত রাজবন্দীরা চোর বা দালাল আখ্যা দিয়ে অকথ্য ভাবে গালাগাল দিলেও, আশ্চর্য্য, তাঁর ড্যাবডেবে চোখ দু'টোতে হাসির ঝিলিক থাকবেই। কানে তুলো ও পিঠে কুলো নিয়েই দিব্যি তিনি প্রায়ই সকাল বেলা এসে আমাদের সঙ্গে বেশ জমিয়ে বসে প্রাতরাশটা শেষ করে যান এবং নির্লজ্জের মতো আবার মন্তব্য করে যান: আপনাদের এখানে খেতেও তো ভয় করে। পটাসিয়াম সায়নাইড যারা অবলীলাক্রমে খেয়ে ফেলতে পারে, তারা অপরকেও তা পরিবেশনও তো করতে পারে? তার পর রাজবন্দীদের সাথে বেশী মেলামেশার সংবাদ সাহেবের কানে গেলে আর রক্ষে নেই। আই, বি নির্ঘাত জেনে ফেলবে, তা'হলেই চাকরিটি খোয়া গেল আর কি!

আমরা প্রায় সকলেই ওঁকে করুণার চক্ষে দেখি। কিন্তু বীরেন কাছে থাকলে আর উপায় নেই। জিজ্ঞেস করে: তা'হলে না এলেই তো পারেন এখানে?

ড্যাবডেবে চোখে হাসি ফুটিয়ে জবাব আসে: কিন্তু কাজ যে আমার আপনাদের দিয়ে। কত বলি সাহেবকে এই কাজের ভার অপরকে দিতে। কিছুতেই দেবে না।

অর্থাৎ যেন কত অনিচ্ছাতে এই অস্বস্তিকর কাজটি আপনি ক'রে থাকেন। জিনিষপত্র সরবরাহ ভারী হাঙ্গামের কাজ তাই না? কিন্তু মাসের শেষে মুনাফাটি যখন আসে আশু বাবু, তখন?

ড্যাবডেবে চোখ কপালে ওঠে: বলেন কি বীরেন বাবু, মুনাফা? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আপনাদের টাকা থেকে আবার কমিশন খাবো আমি? অমন দুর্মতি ভগবান যেন কোন দিন না দেন।

লোকটা কিছুতেই রাগ করে না। খুব ভালো আই, বি অফিসার হতে পারতো। খাবার লোভ ভীষণ, খেতেও পারে বেশ। রাজবন্দী হয়ে এলে সসম্মানে ভক্ষণ সমিতির সহ-সভাপতির শূন্য পদে ওকে নেয়া যেত।

কিন্তু বীরেন ওকে একেবারেই সইতে পারে না। আমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে যতই রগড় করতে যাই, বীরেন সিরিয়াসলি ততই চটে যায় ওঁর ওপর।

এক দিন সকালে তো সাংঘাতিক কাণ্ড। সুপার সাহেব এসেছেন সকাল বেলা যথারীতি আমাদের ইয়ার্ড পরিদর্শনে। সঙ্গে জেলের নরেন সরকার, জনকতক ডেপুটি জেলরের মধ্যে আশু বাবু, বড় জমাদার, সশস্ত্র জেল-সিপাই ও কয়েক জন কয়েদী মেট্।

সুপারিনটেনডেন্ট লিওনার্ড সাহেব নিরক্ষর হলেও পাকা লোক। কোথাও ছুঁচটিকে বাধা দিয়ে কোথাও হাতীকে কি ভাবে ছাড়পত্র দিয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়, সে কৌশল তাঁর ভাল করেই জানা আছে। তাই চার নম্বর ইয়ার্ডেই কয়েক জন সাধারণ কয়েদীকে লাথি মেরে ৫ নম্বর ইয়ার্ডে রাজবন্দীদের মধ্যে এসেই তিনি দিলখোলা গল্পবাগীশ হয়ে ওঠেন। এ-কথা ও-কথা নিয়ে অনর্থক বাজে বকেন ও হাসাহাসি করেন অকারণে। আহ্লাদে আটখানা হয়ে একেবারে যেন ফেটে পড়েন।

সেদিন বীরেনের সহ্য হলো না। আশু বাবু যে বাজে সব জিনিস দিয়ে দ্বিগুণ দাম আদায় করেন, সে কথাটা সে আশু বাবুর সম্মুখেই লিওনার্ডকে জানিয়ে দিল। লিওনার্ড তাঁর চশমার মধ্য দিয়ে আশু বাবুর পানে নীল চোখের ক্রুদ্ধ চাহনি হেনে ডাকলেন: আশু!

আশু বাবুর ড্যাবডেবে চোখে ভয়, দুঃখ ও ক্রোধ মিলিয়ে একটা অদ্ভুত দ্যুতি দেখা দিল। তিনি প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে সাহেবের সম্মুখে কি একটা কথা বলে সমস্ত রাজবন্দীদের নামেই একটা পাল্টা অভিযোগ করে বসলেন।

আর যায় কোথা! বীরেন তৎক্ষণাৎ ঝেড়ে দিল আশু বাবুর ড্যাবডেবে চোখের কোণে সেই সাংঘাতিক একখানি ঘুসি। তৎক্ষণাৎ আশু বাবু একেবারে ধরাশায়ী হলেন।...এ অপমান অসহ্য! জমাদার পকেট থেকে বাঁশী বার করে বাজিয়ে দিল। গেটে ঢং-ঢং করে "পাগলা ঘণ্টি" বেজে উঠলো। চারি দিকে বাঁশী শোনা যেতে লাগলো। ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। হাঁক-ডাক চীৎকারে জেলের মধ্যে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটে গেল যেন।

পাঁচ নম্বর লেখা একখানা প্রকাণ্ড বোর্ড জেল-টাওয়ারে ঝুলছে দেখা গেল।

[ক্রমশঃ।

——আগামী সংখ্যায়——

কলকাতায় চিত্র-প্রদর্শনী

(বিভিন্ন চিত্র-প্রদর্শনীর বিস্তৃত আলোচনা)

পিওডর ডষ্টয়েভস্কি

প্রথম অধ্যায়

৫

যে লোক আত্ম-অবমাননাবোধে স্বেচ্ছায় আনন্দ লাভ করে, সে কী করে নিজেকে সম্মান দেবে? এ কথাটা আমি কিছু নাকে-কাঁদা আক্ষেপের ঢঙে বল্‌ছি নে, কারণ এমন কখনও সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে যে ঘোষণা করতে পারি, "পিতঃ, ক্ষমা করো আমায়, আমি আর পাপ করিব না।" অবশ্য এর কারণ এ নয় যে, কথাগুলো উচ্চারণ করার মতো অবস্থা আমার হয়নি, যেহেতু কথাগুলো সব সময়েই খুবই তাড়াতাড়ি এসে গেছে আমার জিহ্বাগ্রে। আর যখনই আমি সেগুলো বলে ফেলেছি, তখন কী ঘটেছে? তখন ঘটেছে—যেনো আমি ঝাঁপ দিতে বাধ্য এই ভাবে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়েছি পাপে, যে-সময়ে চিন্তায় এবং কাজে আমি বস্তুত নিষ্পাপ ছিলাম। এর থেকে খারাপ কিছু হতে পারেই না। পরে মনে-মনে নরম হয়েছি, চোখের জল ফেলেছি আর নিজেকে ভর্ৎসনা করেছি এবং জিনিষগুলোকে ঠিক মতো প্রত্যক্ষ করেছি, আর উপলব্ধি করেছি আত্মা অপবিত্র হয়ে গেছে। তবু আমি এই জন্যে কখনই প্রকৃতির নিয়ম-নীতিকে দোষ দিই নে, যেহেতু তাদের বিরোধিতা করাই হলো আমার জীবনের প্রধান ও অবিচ্ছিন্ন বৃত্তি। পরে সে সব স্মরণ করা অপমানকর কথা, তবু সে কথা ত' সত্য। দু'-এক মুহূর্ত পরে আমি সব ক্ষেত্রেই রাগের সংগে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, আমার সমস্ত আচরণ অত্যন্ত গর্হিত হয়েছে—ভীষণ, সাংঘাতিক গর্হিত হয়েছে ('সে সব' কথা দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি ঐ আমার অনুতাপ, হৃদয়ের দৌর্বল্য, নব জীবন গ্রহণের শপথ)। তাই আমি আপনাদের জিগগেস্ করবো, ভদ্রমহোদয়গণ,—এ ভাবে আমি যে আমার নিজের ওপর অত্যাচার করতাম, নিজেকে পীড়ন করতাম এর কারণ কী? হাঁ, উত্তর হলো, হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকাটাকে আমি সব সময়ে বিরক্তিকর দেখতাম। সেই জন্যেই আমি সব সময়ে মন্দ কাজে নিজেকে দিতাম ছেড়ে। ভদ্রমহোদয়গণ, যা বল্‌লাম লক্ষ্য করুন, যা বল্‌ছি আমি তা সত্য এবং এতেই আপনারা গোটা ব্যাপারটার হদিশ পেয়ে যাবেন। এই উদ্দেশ্যের জন্যেই আমি খুঁজতাম তেমন-তরো সুযোগ আমার অস্তিত্বটাকে সেই ভাবে চালিত করার দিকে, যাতে অন্তত পক্ষে খানিকটে জীবনের স্বাদ রয়েছে। যেমন ধরা যাক্, আমি সর্বদা সজাগ থাকি কখন রুষ্ট-বিরক্ত হবো—কোনও ভালো যুক্তিতে নয়, শুধু তাই হতে চাই বলেই। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা নিজেরাই জানেন যে, যদি কেউ বিনা কারণেই বিরক্ত হয়—যে ধরণের বিরক্তি সাধারণত নিজের ওপর নিজে যে-কেউ টেনে আনে তাহলে শেষে সত্যি সত্যিই সে একেবারে বিরক্ত হয়ে যায়। সমস্তটা জীবন ধরে আমি এই ধরণের মজা কৌতুক কষ্ট করেই করেছি, তার ফল হয়েছে এই যে, আমি সব রকমে আত্মসংযম রহিত হয়ে পড়েছি। এ ছাড়া, আমি দু'বার চেষ্টা করেছি প্রেমে পড়তে; কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের আশ্বা[স] দিচ্ছি, এই করতে গিয়ে আমি ভীষণ ভুগেছি। কারো মুখে হাসি খেল্‌ছে দেখলে মনে হয় বুঝি তার হৃদয় পুড়ছে না, সব সময়ে [সে] কিন্তু কষ্ট পাচ্ছেই, আবার পাচ্ছে তা বেশ ভালো রকমে, অসংশয়ি[ত] ভাবে, যেহেতু সে-সময়ে সে ঈর্ষাপরায়ণ হয়, নিজেকে ছাড়িয়ে যায়। এ-সবের একমাত্র কারণ হলো, ভদ্রমহোদয়গণ, মনের অবসাদ। হাঁ, এক মাত্র কারণ হলো এর, মনের অবসাদ। এই যে লোক বিরক্তিবোধের চাপে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে বোধ করে, চিন্তি[ত] হাত গুটিয়ে জ্ঞাতসারেই বসে থাকে, এটা সহজ, অবশ্যম্ভাবী, স্বতস্ফূ[র্ত] ভাবে চৈতন্যবোধেরই ফল। এ সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি···· তাই আমি আবার বলছি,···আবার বলছি অকপটেই যে, যারা স্বা[ভাবিক] সত্তার মানুষ, কাজের মানুষ—যারা কাজের মানুষ তারা কা[জের] মানুষ এই জন্যে যে তারা কাজের প্রতি আসক্ত—তারা ভোঁতা ও সীমাবদ্ধ তাদের দৃষ্টিভংগীতে। এটাকে কী ভাবে ব্যাখ্যা করা যে[তে] পারে? দেখা যাক্। এই সমস্ত লোকে তাদের দোষ-ত্রুটির জন্যে সাধা[রণ] এবং গৌণ কারণগুলিতেই ভুল করে মুখ্যটার জন্যে। এবং তা[রা] অন্য পাঁচ জনের চেয়ে অতি সহজে আর অতি শীগ্‌গিরই বো[ঝে] যায় যে, তাদের একটা নির্দিষ্ট কর্মভিত্তি রয়েছে, এবং এই ভা[বে] নিজেদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলার হাত থেকে তাদের নিবৃত্তি চলে। এইটে সত্যি এবং গোটা ব্যাপারটায় এইটেই সত্যি কে[ননা] কোনো কাজের শুরুতেই ঠিক করে নিতে হবে নিশ্চিত

নিজের সম্বন্ধে যাতে কি না সেই কাজের শেষ-ভালোর জন্যে কোনো সন্দেহ না থেকে যায়। কিন্তু আমার মতো একটি লোকের পক্ষে প্রয়োজনীয় নিশ্চিন্ত অবস্থার মধ্যে আসা কী করে সম্ভব? মুখ্য কারণগুলো আমি কোথা থেকে পাবো? কোথা থেকে পাবো ভিত্তি? বেশ, আমি জিনিষটা সম্বন্ধে চিন্তা করতে সুরু করলাম। এর ফলে প্রত্যেক বার যে মৌলিক কারণটা পেলাম সেটা আর একটা আরো ভালো মুখ্য, আরো মৌলিক কারণের দিকে চলে যেতে লাগলো। এই ভাবেই আত্ম-চেতনা ও চিন্তার সারবস্তু মেলে (যদিও এইটেই আবার প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতি)। কী তার ফল? না, সব সময়েই সেই এক জিনিষ। মনে পড়ছে আপনাদের, একটু আগে আমি প্রতিশোধের কথা বলেছি (যদিও আপনারা আমার কথা পুরোপুরি বোঝেননি হয়ত)। বলেছি যে, একটা লোক যে প্রতিশোধ নিতে চায়, তার মানে, সে সেইটেকেই ভাবে ন্যায়-বিচার; এই জন্যেই সে ন্যায়বিচারের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যেই খুঁজে পেয়েছে তার আদিতম কারণ, এবং নিজের সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ, এবং তাই সে প্রতিশোধ নিতে ছোটে খুব শান্ত ভাবে; আর সফলতার সংগেও, কারণ তার প্রত্যয় হলো, সে যা করছে তা একেবারে খাঁটি ও সম্মানজনক। কিন্তু, আমার পক্ষ থেকে বলতে পারি, আমি এই ধরণের ব্যাপারে কখনও ন্যায়বিচার বা সদ্ধর্ম খুঁজে পাই নে: যেহেতু, যদি আমি এমনতরো প্রতিশোধ নিতে যাই, আমি নিতে যাই স্বভাবত ঈর্ষ্যার বশে। অবশ্য, ঈর্ষ্যা শেষ কালে সন্দেহ জয় করে—ঈর্ষ্যা (উত্তম সফলতার সংগেও বটে) কাজ সুরু করার (যদিও ওটা কাজই নয়) প্রথম কারণ যোগায়; কিন্তু যখন ঈর্ষ্যাও আমার মধ্যে না থাকবে তখন আমি কী করবো (এই কথাটা দিয়েই আমি সুরু করেছিলাম)? চৈতন্য-বোধের দুরাচার নিয়ম-নীতিতে ঈর্ষ্যাও রাসায়নিক বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ার অনুসারী, কারণ এটা প্রায়ই ঘটে যে, যদি কোনো একটি কাজের উদ্দেশ্য বে-চাল হয়ে যায়, তাহলে সেই কাজের কারণগুলো সহজেই উবে যায় এবং দায়িত্বও থাকে না এবং বিরক্তিটাও আর মোটেই বিরক্তি থাকে না—তখন সব মনে হয় ভ্রান্তি, যখন (যেমন দাঁতের ব্যথায়) কেউই আর দোষী মনে হয় না এবং যার থেকে রেহাই পাওয়ার আর কোনো উপায় থাকে না দাঁতের ব্যথার মতো—যথা, দেয়ালে মাথা কোটা। সম্ভবত, কাজের প্রথম কারণ খোঁজার হতাশায় লোকে দ্বিধান্বিত হয়? তাহলে আমার উপদেশ, প্রথম কারণগুলোকে অন্ধ ভাবে, না-চিন্তা করে একা ছেড়ে দিন, এবং নিজের সহজাত প্রবৃত্তির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিন, আর কিছুক্ষণের জন্যে আপনাদের ইচ্ছাশক্তিকে পাশে সরিয়ে রাখুন। তার মানে হলো, হয় ঘৃণা করুন, না-হয় ভালোবাসুন, কিন্তু যে কোনো ব্যাপারে যা হয় একটা করুন হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে। এই যদি আপনারা করেন তা'হলে বলতে পারি, আগামী কালের পরের দিনেই (সব চেয়ে দেরীতেই ধরা যাক্) আপনারা তখন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ওঠার জন্যে নিজেদেরকেই কটূক্তি করতে থাকবেন। ফল হবে, আবার ফিরে আসবেন শান্ত ভাবে অবসাদের ভেতরে, আর সাবানের ফেনা-বুদ্বুদের মতো ফেটে-পড়ায়। কী বলবো, ভদ্রমহোদয়গণ, অন্তত আমি এই দিক্ থেকে এই জন্যে নিজেকে জ্ঞানী-গুণী ভাবি যে, আমি নিজে কখনও কোনও কাজ আরম্ভ বা শেষ করতে সফল হইনি। ধরে নিলাম আমি বোকা, অপদার্থ, বিরক্তিকর বাচাল, যা আমরা সবাই বটে—হাঁ, ধরে নেওয়া গেল: তবু বলি, সকল বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের এইটেই ঠিক কাজ নয় যে, তারা বাচালের মতো চলে—মোদ্দা, বলতে পারি, তারা বাতাসের তৈরী ফুলঝুরি ছড়ানোর কাজ করে থাকে?

৬

যদি আমি কিছুই না করে থাকি, তাহলে তা করিনি নেহাৎ আলসেমি করেই! কী করে' আমি নিজেকে শ্রদ্ধা করবো! হাঁ, আমার নিজেকে শ্রদ্ধা করা উচিত ছিল একটি কারণে যে, আমি আলসে হয়ে যেতে পেরেছিলাম—আমার মধ্যে অন্তত একটা খাঁটি গুণ আছে যার জন্যে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। যদি আপনারা আমায় জিগ্‌গেস্ করেন, "কে বট তুমি?" আমি ধন্যবাদের সংগে এই উত্তর দিতে সমর্থ হবো, "একটা গোঁফ্-খেজুরে।" হাঁ, বেশ সন্দেহাতীত ভাবেই আমি নিজের সম্বন্ধে এ-কথা বলতে চাই যে, আমি একটা গোঁফ্-খেজুরে। "একটা গোঁফ্-খেজুরে"—কথাটার মধ্যে একটা গোটা বৃত্তির কথা, গোটা ভাগ্যের কথা, গোটা জীবনযাত্রার কথা লুকিয়ে রয়েছে। উপহাস করবেন না আমায়। যা বলছি আমি, তা সত্যি। এক কালে আমি একটা মস্ত বড়ো ক্লাবের সংগে জড়িত ছিলাম, এবং তখন আত্মসম্মানের কলাকৌশল চর্চা করতাম; আর আমার ক্লাবের পরিচিতদের মধ্যে এমন এক জন ছিলেন যাঁর আজীবনের গর্ব হলো

যে, তিনি "চ্যাটো লাফিতে"র প্রচণ্ড সমালোচক। এই গুণটিকে তিনি দেখতেন একটা খাঁটি গুণ হিসেবে এবং এ-সম্বন্ধে কোনো দিনই তিনি সন্দেহাকুল হননি। তার ফলে, শাস্ত বিবেকের সংগে না হলেও প্রায় সব ক্ষেত্রেই তিনি সম্মানের সংগে পরাভব মেনে নিতেন। অথচ তাঁর জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে তিনি ঠিকই করেছিলেন। আমিও ঐ রকম একটা জীবনযাত্রা পছন্দ করি। আমিও একটা গোঁফ-খেজুরে ও আত্মম্ভরী ব্যক্তি হয়ে ওঠার ইচ্ছে করি—তাই বলে শুদ্ধ মাত্র গোঁফ-খেজুরে বা আত্মম্ভরী হতে চাইনে, এমন একটা গোঁফ্-খেজুরে এবং আত্মম্ভরী ব্যক্তি হয়ে উঠতে ইচ্ছে করি—তাই বলে শুদ্ধ মাত্র গোঁফ্-খেজুরে বা আত্মম্ভরী হতে চাই নে, এমন একটা গোঁফ-খেজুরে এবং আত্মম্ভরী-ব্যক্তি হতে চাই যে, যে কি-না 'মহৎ ও সুন্দরে'র প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারবে। এ-কথায় কি আপনাদের সম্মতি পাওয়া যাবে? অ নে-ক দিন হলো আমার এই ধরণের ইচ্ছে সব ছিল। আমার চল্লিশ বছরের অবিখ্যাত জীবনের সব সময়েই "মহৎ ও সুন্দরে"র প্রতি আমার মনের প্রবণতা আমার চিত্ত অধিকার করে রেখেছিল। সে-কালে সব কিছু ছিল আজকের থেকে আলাদা। এক কালে আমি চাইতাম কাজ-কর্মে'র এমন একটা মনোমত আবহাওয়া, যেখানে আমি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে "মহৎ ও সুন্দরে"র স্বাস্থ্যপান করতে সমর্থ হবো। "মহৎ ও সুন্দরে"র স্বাস্থ্যপান করার জন্যে পূর্ণ পানপাত্র নিঃশেষে শেষ করার আগে আমি সব সময়েই একটা সম্ভাব্য সুযোগ খুঁজতাম আমার চোখের জলের একটি ফোঁটা সেই পানপাত্রে ফেলতে (অর্থাৎ মহৎ ও সুন্দরে"র রসপ্রমাতার জন্যে নায়ক সবটুকু শক্তি দিয়ে ফেলতেন—অনু)। দুনিয়ার সমস্ত জিনিষকে আমি সেই অদ্বিতীয় মাপকাঠিতে মেপে দেখতাম, এবং এমন কি সব থেকে জঘন্য আর অবিসংবাদিত বাজে জিনিষগুলোর বিচারের ক্ষেত্রেও আমি "মহৎ ও সুন্দরে"র কানুন মেনে চলতাম; এ জন্যে চোখের জলে ভিজে স্পঞ্জের মতো হয়ে যেতে রাজী ছিলাম। উদাহরণ-স্বরূপ, এক জন চিত্রশিল্পী একখানা-দু'খানা ছবি আঁকলেই আমি সেই চিত্র-শিল্পীর স্বাস্থ্যপান করতে ছুটতাম সেই ছবি আঁকার জন্যে, কারণ, আমি যে "মহৎ ও সুন্দর"কেই ভালো-বাসতাম কেবল। অথবা, কোনো এক জন সাহিত্যিক যে-কোনো একখানা সাহিত্য রচনা করলেন, আমি আবার ছুটলাম সেই সাহিত্যিকের স্বাস্থ্যপান করতে সেই সাহিত্য তিনি রচনা করেছেন বলে, কারণ, আমি যে কেবল "মহৎ ও সুন্দরে"র প্রেমিক।

এ ছাড়াও আমার কেমন গভীর প্রতীতি জন্মে গিয়েছিল যে, আমি এর জন্যেই উন্মুখ হয়ে থাকবোই থাকবো; এবং এই জন্যে যদি কেউ আমাকে সেই সম্মান দেখাতে অস্বীকার করতো তাহলে আমি তাকে সেই সম্মান দেখাতে বাধ্য করার জন্যে তৈরী ছিলাম। শান্তিতে জীবন যাপন করা এবং তার পরে সুখ্যাতির সংগে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া—এই হলো আমার জীবনের সব কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এমন কি, আমি এমন অলীক কল্পনাও করতাম যে, আমি বেশ ভুঁড়ি মোটা করবো, তিন-তিনটে হবে আমার থুতনি, নাকটাকে করবো রাজকীয় ঢঙের, করবো এই আশায় যে লোকে আমার নজর করে দেখেই বিস্ময়ে চীৎকার করে বলবে, "হাঁ, যাচ্ছে বটে একটা লোক, ভেতরে কিছু গব্য ঘৃত আছে!" বলুক তারা যা-খুসী বলতে চায় বলুক এ-সম্বন্ধে; জানেনই ত' ভদ্রমহোদয়গণ, আজকের এই নেতি-বাচক যুগে কিছু একটা ইতিবাচক বিষয় শুনতে বেশ ভালোই লাগে লোকের, সব সময়ই। [ক্রমশঃ

অনুবাদ: আনন্দ দে।

ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাতে কি যায় আসে?

এক জন ক্লান্ত ধর্ম্মযাজক, প্রকৃতির উপাসক, এক গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে শহরতলীতে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় ভীষণ বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নেমে এলো আকাশ থেকে। কাছেই ছিল একটি আপেল বৃক্ষ। ধর্ম্মযাজক গাছটির তলায় আশ্রয় পাওয়ার জন্য এগোতেই দেখলেন, দু'জন তরুণ-তরুণী সেখানে পূর্ব্বেই আশ্রয় নিয়েছে ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে। ধর্ম্মযাজক দেখলেন, অপেক্ষমান তরুণীটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কেন কাঁদছে প্রশ্ন করায় তরুণীটি বললে,—হায় মশায়, আমরা চলেছিলাম গির্জ্জায়, সেখানে আমাদের আজ বিয়ে হওয়ার কথা।

—ঐ তরুণটির সঙ্গে? শুধোলেন ধর্ম্মযাজক।

হ্যাঁ মশায়। বললে তরুণীটি।

—ঝড়-বৃষ্টির জন্যে হুতাশ হয়ো না। আমিই তোমাদের বিয়ে দেওয়াবো। এইখানেই দেওয়াবো এবং এখনই দেওয়াবো। বললে ধর্ম্মযাজক।

প্রচণ্ড ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ এবং বজ্রপাতের মধ্যে প্রার্থনা-পুস্তক খুলে বিয়ের মন্ত্রোচ্চারণ করলেন ধর্ম্মযাজক। মন্ত্র বলা শেষ হ'লে প্রার্থনা-পুস্তক থেকে একটি পাতা ছিঁড়ে ধর্ম্মযাজক বিয়ের সার্টিফিকেট লিখে তরুণীটির হাতে দিলেন। সার্টিফিকেটে লেখা ছিল: "প্রচণ্ড বর্ষার মধ্যে একটি গাছের তলায় আমি এই তরুণ-তরুণীটির বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছি। যিনি ঐ বজ্রের স্রষ্টা তিনিই এই তরুণ-তরুণীকে রক্ষা করুন।"

স্বামী, স্ত্রী, দু'জনের কেউই ধর্ম্মযাজকের নামের সইটিকে যেন মূল্য দিতে চাইলে না দেখে ধর্ম্মযাজক "ডিন সুইফ্ট" নামটাকে কেটে লিখে দিলেন, "গালিভার্স ট্রাভেলের লেখক।"

বিখ্যাত গালিভার্স ট্রাভেলের লেখক ডিন সুইফ্ট ছিলেন ধর্ম্মযাজক।

যাত্রাপথে চলচ্চিত্র

চার

শ্রীশিশিরকুমার ভাতুড়ীর নূতন চিত্র-সম্প্রদায়ের নাম "তাজ-মহল ফিল্ম কোম্পানি"। এ নাম শুনলে মাইকেল মধুসূদনের সমসাময়িক বিখ্যাত নাট্যকার মনোমোহন বসুর দ্বিতীয় রিপু নিশ্চয় প্রবল হয়ে উঠত। মনে আছে, যখন তিনি অতি-বৃদ্ধ ও আমি তরুণ যুবক, সেই সময়ে এক দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। সেটা বোধ হয় ১৩১৬ কি ১৭ সালের কথা।

তিনি বলেছিলেন: "আমাদের সব কাজেই ফিরিঙ্গীদের অনুকরণ। দেখুন না, জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করব, নাম দেওয়া হ'ল "ন্যাশনাল থিয়েটার।" মাতৃভাষাকে আমরা ঘৃণা করি। তাই টিকিট আর বিজ্ঞাপনেও ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা হয়। "ন্যাশনাল থিয়েটারে"র সাংবাৎসরিক-উৎসবে (১২৮০ সালে) আমাকে বক্তৃতা দিতে ডেকেছিল। বক্তৃতাতেও আমি ঐ সব কথা উল্লেখ করি। কিন্তু আমার বলা মুখব্যথা মাত্র, কে শুনবে আমার কথা, ফিরিঙ্গীয়ানা যে আমাদের অস্থি-মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করেছে। তার পর কত কাল কেটে গিয়েছে, অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। আজও সব নাট্যশালার বিলাতী নাম, সব টিকিটের উপরে ইংরেজী অক্ষর।"

অথচ দেশে যখন ইংরেজী ভাষা ও সভ্যতার প্রভাব অধিকতর প্রবল ছিল, সেই সময়ে মনোমোহন বসুর নাটকাবলী যে সৌখীন রঙ্গালয়ে অভিনীত হ'ত, তার নাম ছিল "বহুবাজার বঙ্গ-নাট্যালয়" এবং তার প্রবেশপত্রও ছাপানো হ'ত বাংলা ভাষায়।

এদেশে পেশাদার রঙ্গালয়কে খাঁটি দেশী নাম দেন সর্ব্বপ্রথমে শিশিরকুমার। তিনি প্রবেশপত্রও মুদ্রিত করেন মাতৃভাষায়। তাঁর দেখাদেখি কয়েকটি চিত্রগৃহ আজ দেশী নাম ধারণ করেছে বটে, কিন্তু আমাদের স্থায়ী ও প্রধান চিত্রপ্রতিষ্ঠানগুলি আজও নির্লজ্জ ভাবে পরিচিত হয় ফিরিঙ্গী নামেই। ইংরেজরা বিতাড়িত হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের অভিশাপ শিকড় গেড়ে বসে আছে আজও ভারতবর্ষের মধ্যেই।

শিশিরকুমার যা ভেবে সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করেছিলেন, প্রথমটা তাঁর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। ম্যাডানরা বিদেশী ব্যবসায়ী, বাংলা নাট্যকলার উন্নতির জন্যে ছিল না তাঁদের কিছুমাত্র মাথা-ব্যথা। কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারের "আলমগীর" নাট্যাভিনয়ের দৃশ্য-পটাদির উপরে ছিল কুখ্যাত পার্সী থিয়েটারের সুস্পষ্ট প্রভাব। অন্যান্য হাস্যকর উৎপাতেরও অভাব ছিল না। "আলমগীরে"র মাঝখানে এক জায়গায় জনৈক নর্ত্তক অভিনয়ের ও নাটকের পক্ষে সম্পূর্ণ অবান্তর একটি নাচ দেখাতেও ছাড়তেন না! "আলমগীরে"র নামভূমিকায় শিশিরকুমার অতুলনীয় খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন বটে, তবে সেটা তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে তিনি যোগ দিয়েছিলেন ব্যক্তিগত সাফল্য লাভের জন্যে নয়, বাংলা রঙ্গালয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধির জন্যেই। বিদেশী ব্যবসায়ীর অধীনে চাকরি নিয়ে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় নাট্যকলাকে সর্ব্বতোভাবে পরিপুষ্ট করবার সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। তাই তিনি ম্যাডানদের কাছ থেকে আবার বিদায় গ্রহণ করলেন।

কিন্তু থিয়েটার ত্যাগ করলেও শিশিরকুমার ত্যাগ করতে পারলেন না নাট্য-সাধনাকে। চলচ্চিত্র তখন নাট্যজগতে একটি নূতন দিক খুলে দিয়েছিল। মঞ্চাভিনয়ে অঙ্গভঙ্গের চেয়ে বেশী কাজ করে কণ্ঠস্বর। বাংলা দেশে অমৃতলাল মিত্র, পূর্ণচন্দ্র
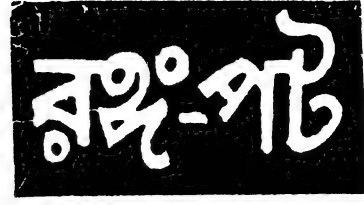
হেমেন্দ্রকুমার রায়

ঘোষ ও উপেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ সুখ্যাত অভিনেতারা প্রধানতঃ নির্ভর করতেন কণ্ঠস্বরের উপরেই। কিন্তু চলচ্চিত্র তখন ছিল নীরব। আর্ট হিসাবে সে বিকোতে পারত অর্দ্ধমূল্যেই; কারণ যুক্তির দিক দিয়ে আংশিক ভাবে বিচার করলে চিত্রনাট্যকে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত করতে পারলেও, মঞ্চে প্রদর্শিত দৃশ্যকাব্যের মত, তাকে উপভোগ করবার সময়ে দরকার হ'ত না চক্ষুর সঙ্গে কর্ণও। সুতরাং চলতি দৃশ্যকাব্যের ঐতিহ্য অনুসারে তৎকালীন চিত্রনাট্যগুলির মধ্যে পরিপূর্ণতার অভাব ছিল যথেষ্ট। তবু নাট্যকলার এই নূতন বিভাগটি অবলম্বন ক'রে কতখানি অগ্রসর হওয়া যায়, তা জানবার বা পরীক্ষা করবার জন্যে শিশিরকুমার যে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন, এটুকু অনুমান করা যেতে পারে। তাই মঞ্চাভিনয় ত্যাগ করবার পর তিনি ঝুঁকে পড়লেন চিত্রাভিনয়ের দিকে।

তাঁকে অনুসরণ করলেন আরো কোন কোন নট এবং তাঁদের মধ্যে সমধিক বিখ্যাত হচ্ছেন শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র। শিশিরকুমার ম্যাডানদের সম্পর্ক ছাড়বার পরেও নরেশচন্দ্র অল্প কিছু দিন মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন বটে, কিন্তু ওখানকার কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতান্তর ক্রমেই পরিণত হ'ল মনান্তরে। ফলে তিনিও মঞ্চাভিনয় ত্যাগ ক'রে যোগ দিলেন শিশিরকুমারের সঙ্গে। মঞ্চে নবযুগের পতাকাবহনের ভার নিলেন কেবল দুই জন অভিনেতা— "মিনার্ভা"য় স্বর্গীয় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও "কর্ণওয়ালিসে" স্বর্গীয় নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী।

এইখানে আর একটি কথা নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, ছবিওয়ালাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কোণঠাসা হয়ে থিয়েটারওয়ালারা আজ দুর্ভাবনায় প'ড়ে গিয়েছেন বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে খাল কেটে কুমীর এনেছিলেন তাঁরা নিজেরাই—যদিও এ কথাও ঠিক যে, তাঁরা হাত গুটিয়ে বিমুখ হয়ে ব'সে থাকলেও আরো কিছু দিন পরে কুমীর নিজেই খাল কেটে এসে হাজির হ'ত যথাস্থানেই।

ছবিঘরের অভাবে চলচ্চিত্রের অবস্থা যখন দস্তুরমত হাঘরের মত, তখন তাকে আদর ক'রে আশ্রয় দিয়েছিলেন বাংলা রঙ্গালয়ের মালিকরাই। কিন্তু কেবল কি আশ্রয়? "বিলাত-ফেরৎ" প্রমুখ তিন-চারখানা ছবি ছাড়া বাংলা চলচ্চিত্রের গোড়াপত্তন হয়েছিল প্রধানতঃ মঞ্চাভিনেতাদেরই দিয়ে। অধিকাংশ প্রধান মঞ্চাভিনেতাই পরে এখানে প্রখ্যাত হয়েছেন চিত্রাভিনেতা রূপে। নীরব যুগের পর যখন আসে মুখর ছবির যুগ, মঞ্চাভিনেতাদের সার্থকতা তখন আরো বেড়ে ওঠে। অভিনয়বিদ্যায় হাতে খড়ি হবার আগেই সুচেহারা দেখিয়ে যাঁরা ছবির বাজার দখল করতে আসেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা একটি হিন্দী প্রবাদবাক্যের সত্যতাই প্রমাণিত করেন —"পিত্তলক কটারি কামে নাহি আবল, উপরহি ঝকমকী সার।"

সেই জন্যে সবাক ছবির যুগে বাঙালী মঞ্চাভিনেতারা অধিকতর দলে ভারি হয়ে উঠেছেন। বাঙালী ছবিকারেরা ক্রমাগত মঞ্চশিল্পীদের সাহায্য গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু বাংলা ছবির মুলুকে আজ পর্য্যন্ত এমন এক জন মাত্র নিছক চিত্রনট দেখা যায়নি, মঞ্চের উপরে যিনি যথার্থরূপে উচ্চশ্রেণীর কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন। আমি একাধিক বিখ্যাত চিত্রনটকে জানি, মঞ্চের উপরে আহ্বান করলে যাঁরা রীতিমত ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। মঞ্চাভিনেতারা হচ্ছেন পরিপূর্ণ শিল্পী। বীজ যেমন ধারাবাহিক ভাবে ধীরে ধীরে চারায় পরিণত হয়ে বাড়তে বাড়তে পত্রবহুল শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে অবশেষে দেয় তার ফুল বা ফল, মঞ্চাভিনয়ও হচ্ছে সেই রকম। তার ধারাবাহিকতার মধ্যে কোথাও ছেদ বা আকস্মিকতা নেই, আছে অবশ্যম্ভাবিতা। গোড়া ছেড়ে বা শেষের দিকে গিয়ে হঠাৎ দেখা দেয় না বা শেষের দিকে যেতে আবার গোড়ার দিকে ফিরে আসে না। ধীরে ধীরে ফুটতে ফুটতে তা সোজা যাত্রা করে চরম পরিণতির দিকে। এই ধারাবাহিকতা থেকে বঞ্চিত ব'লে চিত্রাভিনয় হচ্ছে নিম্নতর শ্রেণীর আর্ট। নিছক ছবির কাজ ক'রে কোন শিল্পীই উচ্চতর শ্রেণীর অভিনয়কলায় পাকাপোক্ত হ'তে পারে না। মঞ্চশিল্পীরা দীর্ঘকালব্যাপী প্রাথমিক নাট্যসাধনায় নিযুক্ত ও অভ্যস্ত হয়ে তবে কোন বিশিষ্ট ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করতে পারেন, কিন্তু চিত্রশিল্পীরা সাধারণতঃ এ-রকম সুযোগ পান না। এই জন্যেই তাঁদের শিক্ষা হয় আধাখেঁচড়া।

কেবল এদেশ ব'লে নয়, পাশ্চাত্য চলচ্চিত্র-জগতেও দেখা যায় ঐ ব্যাপার। হলিউডের হিসাবে প্রকাশ, ওখানকার শতকরা ৮৭ জন চিত্রনট মঞ্চাভিনয়ের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। চার্লস চ্যাপলিনও আগে ছিলেন মঞ্চাভিনেতা। চিত্রনটরূপে বিশ্ববিখ্যাত হয়েও কিছু কাল আগে তিনি নিজের একটি বিশেষ উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। সাধারণতঃ কৌতুকাভিনয়ের জন্যেই তিনি লোকপ্রিয় হ'তে পেরেছেন। তার মধ্যে নিম্নতর শ্রেণীর হাস্যরস ও ভাঁড়ামিও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু চ্যাপলিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, মঞ্চের উপরে তিনি করবেন বিয়োগান্ত মহানাটক "হ্যামলেটে"র নামভূমিকায় অভিনয়। প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখি, ইংলণ্ডের স্যর লরেন্স অলিভারও একাধারে মঞ্চনট ও চিত্রনট। তিনিও হ্যামলেটের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন মঞ্চে এবং পর্দ্দায়। হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে অসাধারণ নাম কিনেছেন বহু প্রথম শ্রেণীর মঞ্চাভিনেতা। তাঁদের মধ্যে স্যর ফোর্বস্ রবার্টসনের অভিনয় দেখে সমালোচক বলেন যে, তিনিই হচ্ছেন "The most human, the most natural, and in temperament the most lovable of all the Hamlets of our time, English, French, Italian, or German।" আমরা এদেশে ব'সেই নির্ব্বাক্ ছবিতে স্যর ফোর্বস রবার্টসনকে হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছি। কিন্তু "হ্যামলেটে"র প্রধান সৌন্দর্য্য হচ্ছে তার অপূর্ব্ব সংলাপ। তাথেকে বঞ্চিত হয়ে ছবির হ্যামলেট আমাদের মনকে অতিশয় অভিভূত করতে পেরেছিল ব'লে স্মরণ হচ্ছে না।

নির্ব্বাক ছবির এই অসম্পূর্ণতার উপরেও বাংলা দেশের প্রথম যুগের ছবিকারদের আর একটি অক্ষমতাও পীড়িত ক'রে তুলত আমাদের চিত্ত। তাঁদের পাটোয়ারী বুদ্ধি কতটা ক্ষুরধারনিশিত ছিল, আমি সে খবর রাখি না, কিন্তু তাঁদের রুচি ও রসবোধ যে শিক্ষিত নব্য বাঙালীর উপযোগী ছিল না, এ বিষয়ে নেই কিছুমাত্র সন্দেহ। তাঁরা যে দু'-চারখানা ছবি তুলেছিলেন, তা হয়তো গাছতলার পড়ুয়াদের আকর্ষণ করতে পারত, কিন্তু সেগুলির মধ্যে পাওয়া যেত না রসিক-জনের মনের খোরাক। বাংলা দেশে এই শ্রেণীর মেঠো ছবিকারেরা আজও দলে নিতান্ত হাল্কা নন (তাঁদের কথা নিয়ে আলোচনা করব যথাসময়েই), কিন্তু তখনকার অবস্থা ছিল আরো খারাপ। বাজারে অম্লানবদনে বার করা হ'ত যার পর-নাই অকিঞ্চিৎকর ছবি, সে সবকে ছেলে-ভুলানো বেলেখেলা বললেও চলে, নূতনত্বের জলুষ ছাড়া তাদের মধ্যে ছিল না আর কোন আকর্ষণী শক্তি। যেমন বাজে গল্প, তেমনি অকেজো অভিনয়, তেমনি মস্তিষ্কহীন পরিচালনা। নির্ব্বাক যুগে ছবি তোলার কাজ আজকের দিনের মত নানা গুরুতর সমস্যার জন্যে জটিল হয়ে ওঠেনি। ঠিকমত গল্প ও নটনটী নির্ব্বাচন করতে পারলে খুব বেশী মাথা না ঘামিয়েও তখন রুচিসম্মত ও উপভোগ্য ছবি তোলা যেত অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসেই। কিন্তু দৃষ্টি দেবার চেষ্টা বা দৃষ্টি দেবার শক্তি ছিল না প্রথম যুগের বাঙালী ছবিকারদের।

সেই সময়েই বাংলা চিত্র-জগৎ লাভ করলে শিশিরকুমারের প্রতিভা, মনীষা ও রসগ্রাহিতাকে। বাংলা দেশে ভালো গল্পের অভাব ছিল না তখনও এবং নেই এখনোও। কিন্তু বরাবরই এখানে অভাব অনুভব করি রসজ্ঞ নির্ব্বাচকের। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন, শকুনি যে অত উঁচু আকাশে ওড়ে, কিন্তু তার নজর পড়ে থাকে নীচেকার ভাগাড়েরই দিকে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বিশেষরূপে বিখ্যাত ও সর্ব্ববাদিসম্মত কথাশিল্পীদের ছেড়ে দিলেও বাংলা সাহিত্যের প্রশস্ত ভাণ্ডারে উৎকৃষ্ট চিত্রকাহিনী পাওয়া যাবে ভূরি পরিমাণেই। কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রের দুর্ভাগ্য যে, গোড়া থেকেই আমাদের প্রযোজকদের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়নি। বারংবার তাঁরা কাঞ্চন ফেলে কাচের দিকে হাত বাড়াবার জন্যে হীন আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এমন কি প্রথম প্রথম এখানে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র প্রভৃতিও কল্কে পাননি। আবার সব চেয়ে বিপদজনক হচ্ছেন সেই সব প্রযোজক ও পরিচালক, যাঁরা গল্প বলায় ভার পেশাদার লেখকের হাতে ছেড়ে না দিয়ে, নিজেদের কাঁচা হাতের ওঁচা রচনা চালু করবার জন্যে প্রবেশ করেন চিত্রজগতে।

চলচ্চিত্রে শরৎচন্দ্রের কাহিনীর মধ্যে একাধারে লোকপ্রিয়তার ও উচ্চশ্রেণীর আর্টের কত উপাদান আছে, সেটা সর্ব্বপ্রথমে প্রমাণিত করেছিলেন শিশিরকুমারই। অন্যান্য চিত্রনির্ম্মাতারা যখন ইয়াঙ্কিদের নকলে সামাজিক প্রহসন ও পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতি নিয়ে সস্তায় কিস্তিমাৎ করবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন, শিশিরকুমার তখন বিপথ বা সন্দেহজনক কুপথ ছেড়ে সোজা পথে এগিয়ে গিয়ে ধর্ণা দিলেন শরৎচন্দ্রের কাছে। অনতিবিলম্বেই জানা কথাই আরো ভালো ক'রে জানা গেল। দুনিয়ায় সোজা পথই হচ্ছে সেরা পথ।

আমাদের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে আজও চলছে শরৎচন্দ্রের যুগ। তাঁর একই কাহিনী বিভিন্ন প্রযোজকের দ্বারা চিত্রিত হচ্ছে একাধিকবার। শরৎচন্দ্রের কাহিনীর মধ্যে তাঁরা যেন খুঁজে পেয়েছেন "Open sesame"এর মত অর্থভাণ্ডারের দ্বার-উদ্ঘাটন-মন্ত্র। অরসিকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মাঝে মাঝে তাঁকেও কম নাকাল হ'তে হয়নি, কিন্তু

বড় গাছই ঝড়ে পড়ে। সে রকম কোন কোন দৃষ্টান্ত বাদ দিলে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্রের রচনা থেকে গৃহীত চিত্রকাহিনীর মহিমায় প্রয়োজকরা লাভ করেছেন লক্ষ্মীদেবীর প্রচুর দয়া-দাক্ষিণ্য। প্রথমেই "আঁধারে আলো" গল্প নির্ব্বাচন ক'রে চিত্রজগতে শরৎচন্দ্রের রেওয়াজ প্রবর্ত্তন করেন শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীই। চলচ্চিত্রে এইটিই শরৎচন্দ্রের প্রথম গল্প এবং বাংলা ছবির ইতিহাসে "আঁধারে আলো"ই হচ্ছে প্রথম সুরচিত চিত্রকাহিনী। পরে শিশিরকুমার নিজে এবং আরো অনেকে শরৎচন্দ্রের বহু কাহিনীই নির্ব্বাক্ ও সবাক চিত্রে রূপায়িত করেছেন বটে, কিন্তু তাদের চেয়ে বেশী মর্য্যাদা পাবে "আঁধারে আলো"।

প্রসঙ্গক্রমে আর এক দিকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। চলচ্চিত্রের মত সাধারণ রঙ্গালয়েও শরৎচন্দ্রের চাহিদা হয়েছে অসাধারণ। তাঁর উপন্যাসের ("বিরাজ বউ") প্রথম নাট্যরূপ দেখান স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে। ষ্টার থিয়েটারে তাঁর অভিনয় আমি দেখেছিলুম। শরৎচন্দ্রের নিজের মুখেই শুনেছিলুম, সে নাট্যরূপ তাঁর ভালো লাগেনি। এবং অমৃতলাল বসু, তারক পালিত, ক্ষেত্রনাথ মিত্র, কুসুমকুমারী ও বসন্তকুমারী প্রভৃতি প্রখ্যাত নটনটীর অভিনয়ও "বিরাজ বউ"এর পরমায়ুকে সুদীর্ঘ করতে পারেনি। বাংলা রঙ্গালয়ে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ সর্ব্বপ্রথমে স্থায়ী নাম কেনে এবং দীর্ঘকাল ধ'রে আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে আকর্ষণ করে "ষোড়শী" পালা। সেখানেও দেখি শিশিরকুমারের কৃতিত্ব। সুতরাং মঞ্চে এবং পর্দ্দায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে শিশিরকুমারের মিলন হয়েছে মণিকাঞ্চন সংযোগেরই মত।

[ক্রমশঃ।

ষ্টুডিয়ো-পরিচিতি

নিউ থিয়েটার্স

শ্রীরমেন চৌধুরী

হাতির শুঁড়ের ছবি দেখলেই চকিতে মনে পড়ে যায় এন. টি. বা নিউ থিয়েটার্সে'র কথা। সারা ভারতের আকাঙ্ক্ষার বস্তু নিউ থিয়েটার্স সূচনার সংগে সংগেই সকলের মনে যে আসন লাভ করেছিলো, সুদীর্ঘ কুড়ি বছরেও তার ভিত্তি দৃঢ় আছে। পুরোপুরি অটুট হয়তো নেই, হয়তো কিছু ইট নানা কারণে খসে গেছে, তবু এ-কথা স্বীকার করতেই হবে—প্রকৃত ছায়াছবি সৃষ্টির পথ-প্রদর্শক, বাঙলা তথা সর্বভারতীয় গর্বের প্রতিষ্ঠান এন. টি. যে ছবিই করুক তার মাঝে অতীত ঐতিহ্যের নিদর্শন থাকবেই। এই বৈশিষ্ট্যই নিউ থিয়েটার্সে'র জনপ্রিয়তার প্রথম সোপান। কিন্তু সময় পরিবর্তনশীল। মানুষ যদি তার সংগে সমান তালে পা ফেলে না চলতে পারে, তাহলে তাকে পিছিয়ে পড়তেই হবে। সহজ এই সত্যকে উপলব্ধি করা আমাদের সকলেরই উচিত। একই মানুষ চিরদিন কর্মক্ষম থাকে না, তার সৃজনীশক্তি হ্রাস পেতে বাধ্য। এতে অপরাধ নেই তার মোটেই। মানুষ তো যন্ত্রবিশেষ নয় আর যন্ত্রেরও ক্ষয় আছে। তাই একই লোককে দিয়ে চিরকাল কাজ করানো (সেই কাজই আমি বলছি—যাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে গল্প-গান-সুর-অভিনয়) কখনোই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। হয়তো মামুলি জিনিস এতে সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু উঁচু দরের কিছু যে হবে না—মৃত্যুর মত এটা নিশ্চিত। আজকের সংকটের দিনে এ কথা ভুললে কিছুতেই চলবে না, অন্তত নিউ থিয়েটার্সে'র মত প্রতিষ্ঠানের তো নয়ই। শিল্পী, সুরকার, শব্দযন্ত্রী, পরিচালক, আলোকচিত্রী—এক কথায় ছায়াছবি তৈরি করতে যাদের প্রয়োজন হয় সেই সবাইকে যে-প্রতিষ্ঠান একের পর এক দেশকে দান করেছে, তার পক্ষে দীর্ঘ দিনের ব্যবধানেও ইদানিং কিছু না দিতে পারা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই।

সে-কথা যাক।···প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন নিবে যাওয়ার পর বেশ কিছু দিন কেটে গেছে, পৃথিবীর লোক যখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সুখে দিন কাটাচ্ছে, সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯৩১ সালে পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, অমর মল্লিক, প্রফুল্ল রায়, নীতিন বসু প্রভৃতি বন্ধুকে নিয়ে বীরেন্দ্রনাথ সরকার মশাই টালীগঞ্জে চণ্ডী ঘোষ রোডে এখনকার জায়গাতেই নিউ থিয়েটার্সে'র কাজ শুরু করেন। কাহিনী নির্বাচিত হোলো শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা'। পরিচালন-ভার পড়লো প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর ওপর। তাঁকে সুর-সংগতি, শব্দ-ধারণ ও চিত্রগ্রহণে সহায়তা করতে এগিয়ে এলেন যথাক্রমে রাইচাঁদ বড়াল, মুকুল বসু ও নীতিন বসু। স্বর্গত দুর্গাদাস ও নিভাননী শ্রেষ্ঠাংশে নির্বাচিত হলেন। যথাসময়ে চিত্রা চিত্রগৃহে ছবিটি আত্মপ্রকাশ করলো। দর্শক-সাধারণ সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করলো হাতীর মুখকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে লেখা—'জীবতাং
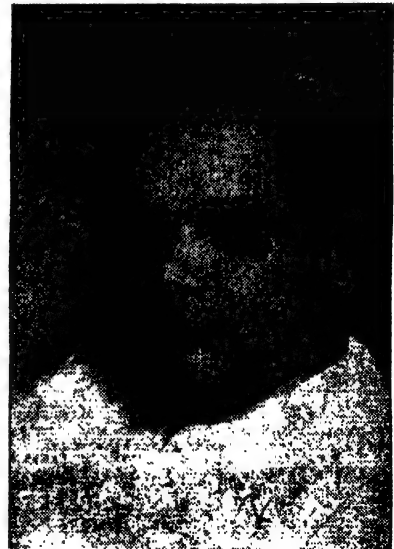
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার

জ্যোতিয়েতু ছায়াম্'! এই প্রতীক-চিহ্নের বাণীটি পরিপূর্ণ ভাবে এঁরা সার্থক করেছেন জনগণ-অভিনন্দন-ধন্য অসংখ্য চিত্রের মাধ্যমে। জীবিত্তের প্রাণ-স্পন্দন ছায়াচিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে সার্থকতার সংগেই।

'দেনা-পাওনার' পর এঁরা করলেন হিন্দী ছবি 'জিন্দা লাশ'; তার পর হোলো 'নটীর পূজা', 'পুনর্জন্ম', 'চিরকুমার সভা', 'যো সে মহব্বৎ', 'পল্লীসমাজ', 'সুবে কি সিতারা', 'চণ্ডীদাস' ও 'পুরণ ভকৃত'। বাঙ্লা তথা ভারতের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো এন, টি-র জয়গানে। সকলের মনে আসন স্থায়ী হবার পথে এগিয়ে গেল।

জয়যাত্রা অপ্রতিহত গতিতে চললো, দেখা দিলো 'ইহুদি কি লেড়কি', 'দেবদাস' (বাংলা ও হিন্দী), 'ভাগ্যচক্র', 'মুক্তি', 'দিদি', 'প্রেসিডেণ্ট', 'বিদ্যাপতি' (বাংলা ও হিন্দী), 'জীবন-মরণ', 'প্রতিশ্রুতি', 'অধিকার', 'জিন্দেগী', 'কাশীনাথ', 'উদয়ের পথে', 'হামরাহি,' 'ওয়াপস্', 'প্রিয় বান্ধবী', 'মাই সিসটার', 'অঞ্জনগড়', 'রামের সুমতি', 'ছোটা ভাই' প্রভৃতি সর্বভারতীয় গর্বের চিত্রসমূহ। ভারতবর্ষে একটি ষ্টুডিয়োর এতোখানি সার্থকতা আজ পর্যন্ত দেখা যায় না! সেদিক থেকেও নিউ থিয়েটার্স প্রথম স্থান অধিকার করে আছে।

এই ষ্টুডিয়োর কল্যাণে আমরা পেয়েছি পরিচালক হিসাবে ৺প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বসু, নীতিন বসু, প্রফুল্ল রায়, বিমল রায়, অমর মল্লিক প্রভৃতিকে। উমাশশী, চন্দ্রাবতী, ভারতী, সুনন্দা দেবী, ৺দুর্গাদাস, ৺সাইগল, ৺শৈলেন চৌধুরী, কে. সি. দে, পৃথ্বীরাজ, অসিতবরণ ও আরো অনেক আজকের দিনের সার্থকনামা শিল্পীকে এঁরাই সর্বপ্রথম সাধারণ্যে পরিচিত করেন। সংগীত-পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল, পংকজ মল্লিক, শিল্প-নির্দেশক সৌরেন সেন, চিত্র-সম্পাদক সুবোধ মিত্রকে এই এন, টি-তেই আমরা দেখতে পেয়েছি।

আজকের নিউ থিয়েটার্স ফুলে-ফলে পল্লবিত হয়ে উঠেছে, সেদিনের একটি মাত্র সাউণ্ড ফ্লোরের সংখ্যা আজ হয়েছে তিনটি। প্রথম শ্রেণীর ষ্টুডিয়োর পক্ষে যে যে বিভাগ থাকা দরকার—যেমন Make-up, Costume, Tailoring, Mouldering, Laboratory, Artistes প্রভৃতি সবগুলি বিভাগই আছে এখানে। এখানকার ছায়া-সুশীতল মনোরম বাগানটি নিদাঘের তপ্ত দুপুরে সকলেরই শ্রান্তি-ক্লান্তি অপনোদনের পরম সহায়ক। নিয়মানুবর্তিতার বিশিষ্ট রূপটি ধরা পড়ে এই ষ্টুডিয়োর সীমানার ভেতর, যেটা অন্য অনেক ষ্টুডিয়োতেই নেই বলা চলতে পারে। প্রবেশ-পথে চাপরাশ-আঁটা উর্দিপরা দরোয়ান সর্বপ্রথম আপনাকে আটক করে আগমনের উদ্দেশ্য জানবে—দ্বার এখানে অবারিত নয় মোটেই। অবিশ্যি পরিচিত মুখের ভাগ্যে জোটে নিঃশব্দ কুর্ণিশ।

১১০টি চিত্র-নির্মাতা এন, টির গৌরবময় সার্থকতার মূলে আছে কর্ণধার শ্রীযুক্ত সরকারের সকলের সাথে অমায়িক ব্যবহার। তাঁর সান্নিধ্যে এসে কেউ-ই বিরূপ-ভাবাপন্ন হতে পারেনি। এখানকার অন্যান্য কর্মীর ব্যবহারও সুন্দর।

এখন প্রবোধ সান্যালের সর্বজন-পরিচিত 'মহাপ্রস্থানের পথে'র চিত্ররূপ দেয়া হচ্ছে। কিছু দিনের মধ্যেই শহর ও শহরতলীতে মুক্তি পাবে এবং এই ছবিই হবে এ-বাঙলা বছরের শেষ দান। আরও দু'খানা নতুন ছবির কাজ অবিলম্বে আরম্ভ হবার মুখে।

নিউ থিয়েটার্সের প্রচেষ্টা সার্থক হোক। যে দক্ষতা ও দৃষ্টিভংগি তাকে অনতিদূর অতীতে যশের শিখরে ওঠার সুযোগ দিয়েছে তার পুনরাবৃত্তি ঘটুক, এই শুভ-কামনা জানাই। তবে এই সাথে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি—তাঁরা যেন ভুল আর না করেন। আজকের দুনিয়ায় new blood চাই, fresh fields and pastures new দরকার—অতীতের রোমন্থনের আর অবকাশ নেই।

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওর ভিতরে শ্রীঅমর মল্লিক ও প্রমথেশ বড়ুয়াকে দেখা যাচ্ছে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

৺মনোমোহন ঘোষ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতা হাইকোর্ট

আসামীর আপিল, জুন, ১৮৮২

[বিচারপতি দি অনরেবল মিঃ জাস্টিস উইলসন এবং দি অনরেবল মিঃ জাস্টিস ম্যাকফার্সন]

মৃত্যুদণ্ডের মামলা

মহারাণী বঃ মুলুকচাঁদ চৌকীদার

আসামীর পক্ষে মামলা পরিচালন করেন মিঃ মনোমোহন ঘোষ। বিচারপতিদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন—

নদীয়ার দায়রা জজ আসামীকে যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন, তার অনুমোদনের জন্ত মামলাটি হাইকোর্টে পাঠান হয়েছে। দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত লোকটিও আপনাদের নিকট আপীল করেছে। আমি আসামীর পক্ষে দাঁড়াচ্ছি। বাদী বা বিবাদীর দুই পক্ষ থেকেই দেখলে মামলার যে অসুবিধা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তা সচরাচর চোখে পড়ে না। এদেশী জুরীরা একবাক্যে আসামীকে তার ৯ বছরের শিশু-কন্তাকে হত্যা করবার নির্ম্মম অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন। মেয়েটিকে যে আসামী ভালবাসত, তা প্রমাণিত হয়েছে। বাদীপক্ষ হত্যার মতলব হিসাবে দেখিয়েছেন যে, শত্রু কদম আলি ফকীরের উপর দোষ চাপাবার জন্তে আসামী এই খুন করেছে। এ মতলব সত্যি হলে অপরাধ খুবই নির্ম্মম। সাধারণতঃ যেখানে জুরীরা একমত হয়ে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন সেখানে দণ্ডাদেশের উপর হস্তক্ষেপ করতে এই আদালতকে বলা অত্যন্ত মুস্কিল হয়ে পড়ে। যে সব মামলায় মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়, সে সব মামলায় এই হাইকোর্ট প্রমাণ-প্রয়োগের পরীক্ষা করে জুরীর সিদ্ধান্ত যে নড়চড় করতে পারেন, আইনের এ বিধান আছে। তবু এ ক্ষেত্রে, আপাত-দৃষ্টিতে মনে হবে, আসামীর আপীল একেবারেই অচল। নীচু আদালতে আসামীর পক্ষে কোন উকীল ছিল না। আসামী নিজে মাত্র একটি সাক্ষীকে জেরা করতে পেরেছিল, আর কোন সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি। আপাত-দৃষ্টিতে প্রায় অলঙ্ঘ্য এই অসুবিধা ছাড়া আর এক অসুবিধা এই যে, এমন এক প্রত্যক্ষদর্শী তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে, যে সাক্ষী আর কেউ না, আসামীর নিজেরই সন্তান। আর সে সাক্ষ্য অনুমোদন করছে আসামীর নিজের স্ত্রী। তথাপি, এই মামলায় এমন অনেক চাঞ্চল্যকর ব্যাপার প্রকাশ পেয়েছে, যাতে মনে হয়, যে সব নথিপত্র এ আদালতে পেশ করা হয়েছে, তার উপর নির্ভর করে আসামী সম্পূর্ণ নির্দোষ এ সিদ্ধান্ত করতে না পারলেও, নীচু আদালতের মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করতে আপনারা নিশ্চয় ইতস্ততঃ করবেন।

জুরীর বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী যখন হাইকোর্টে আপীল করে, তখন লঘুতর দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীদের চাইতে তার সুবিধা থাকে বেশী। লঘুতর দণ্ডের আপীল মাত্র আইন-ঘটিত আপীল। মৃত্যুদণ্ডের বেলায় আইনের সুব্যবস্থা এই যে, জুরীদের নিকট উপস্থাপিত প্রমাণগুলো পরীক্ষা করে, সে সব প্রমাণের মূল্য সম্বন্ধে হাইকোর্ট আপনার মত দিতে পারেন।

এই মামলার প্রথম কথা হল এই যে, এত বড় একটা নির্ম্মম অপরাধ কি মতলবে করা হল তার একেবারেই কোন প্রমাণ নেই। নীচু আদালতের জজ মন্তব্য করেছেন, বাদী পক্ষ অপরাধের মতলব প্রমাণ করতে আইনত বাধ্য নন। কথাটা সত্যি। কিন্তু প্রমাণের মূল্য এবং সম্ভাবনাগুলোর কথা বিবেচনা করলে, অপরাধের মতলব সম্বন্ধে যা অনুমান করা হয়েছে তা যথোপযুক্ত কি না তা দেখতে হবে বৈ কি! বাদী পক্ষ এখানে মতলব সম্বন্ধে কি ইঙ্গিত করেছেন? না, এক শত্রুর বিরুদ্ধে খুনের মিথ্যে অভিযোগ আনা। বাংলায় ও-জাতীয় অপরাধ একেবারে যে না আছে তা নয়, তবু মিথ্যা খুনী মামলায় জড়িত করে শত্রুর উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্তে মানুষটা তার নিজের সন্তানকে হত্যা করেছে, এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পক্ষে খুব প্রবল প্রমাণ আদালতের অবশ্য চাই। এ ক্ষেত্রে, সুখের বিষয় এই যে, আসামীর নিজের আচরণ এরূপ অনুমানের সম্পূর্ণ বিরোধী।

[বিচারপতি উইলসন—আসামী কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে?]

কারু বিরুদ্ধে সে অভিযোগ করেনি। এমন কথাও বলেনি

যে, শিশুকে কেউ খুন করেছে। প্রথম থেকে বরাবর সে পুলিশের কাছে বলেছে—"বলতে পারি না আমার মেয়ে কি করে মরল; প্রতিবেশীরা অনুমান করছে সাপে কেটে মরেছে।"

কিন্তু বাদী পক্ষের অনুমান-ইঙ্গিত—হত্যার পরই আসামীর মতি বদলে যায়, কাজেই কদম আলি ফকীরকে দোষী করতে সাহস করেনি। একমাত্র ফকীরের ঘাড়ে দোষ চাপাবার জন্তেই যদি আসামী নিজের মেয়েকে হত্যা করে থাকে, তা'হলে সে মতি পরিবর্ত্তন কেন করবে এ বুঝে ওঠা কঠিন। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, আসামীর মতলব সম্বন্ধে বাদী পক্ষের ইঙ্গিত-প্রস্তাব সম্পূর্ণ অহেতুক।

জুরীদের কাছে মামলা দাখিল করবার সময় জজ বরাবর ধরে নিয়েছেন যে, খুন ইচ্ছাকৃত। এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে তিনি জুরীদের এই দু'টোর একটা অনুমান মেনে নিতে বলেছেন—যথা, হয় শিশুকে হত্যা করেছে আসামী নিজে, অথবা, হত্যা করেছে আসামীর কোন শত্রু। এ গুরুতর ভুল।

আরও একটা অনুমান যে হতে পারত, অতি স্পষ্ট অনুমান। নীচু আদালতে কারু মনে এই অনুমানের কথা জাগেনি। নথিপত্র পড়বার সময় থেকে আমার মনে যে দৃঢ় ধারণা হয়েছে, তা গ্রহণ করতে এ আদালতকে বলা আমার কর্ত্তব্য।

জুরীদের কাছে মামলা দাখিল করবার সময় জজ যা বলেছেন তাতে জুরীদের এক সিদ্ধান্ত—মাত্র একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্তে বিস্তৃত ভাবে, টেনে-বুনে—আর বললে যদি অন্তায় না হয় তবে বলব—বেশ মুন্সীয়ানী চেষ্টা করেছেন। তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত, আসামীই খুন করেছে। এই সিদ্ধান্ত এড়াবার কোন সুযোগই জজ জুরীদের দেননি। কাজে কাজেই এতে জুরীদের আসামীর সম্বন্ধে বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছে বলে আপনাদের কাছে অনুরোধ করি যে, যদি মামলার প্রমাণ-প্রয়োগ নতুন করে পরীক্ষার সুবিধে না-ও থাকে, তবু অন্তায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এ কারণেও এ মামলায় আপনাদের হস্তক্ষেপ করতে আমি বলব।

[বিচারপতি উইলসন—কিন্তু আসামীর নিজের সন্তানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। তাকে জেরাও করা হয়নি। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণকে কি করে অগ্রাহ্য করি বলুন ?]

শিশুর সাক্ষ্যের বিচার করবার সময়, এ জাতীয় মামলার সম্ভাবনার কথাও আপনাদের বিবেচনা করতে হবে। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, আসামী অশিক্ষিত চাষী, কাউকে জেরা করবার মত বুদ্ধি তার আদপেই নাই। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নাই যে, বয়স্ক মানুষের সাক্ষীর চাইতে শিশুর সাক্ষী অধিকতর বিশ্বাস্য বলে গণ্য হয়। ভারতীয় শিশুরা অকালপক্ক, তাদের মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্তে অতি সহজে এমন করে শিখিয়ে-পড়িয়ে তোলা যায় যে, অতি বড় ওস্তাদী জেরাতেও অনেক সময় তাদের মুখ দিয়ে সত্য কথা বের করা যায় না। এ দেশে পুলিশ প্রভৃতি প্রায়শঃ ভারতীয় শিশুদের এই বুদ্ধির সুযোগ যে নিয়ে থাকে, এ কুখ্যাতি আছে। এই মামলায় যখন আপনারা শিশুর বলা গল্পের এবং অন্তান্ত সাক্ষীর কথার অসম্ভবতা উপলব্ধি করতে পারবেন, তখন আপনারা নিশ্চিত বুঝতে পারবেন যে, মেয়েটির সাক্ষ্যের উপর কিছুমাত্র নির্ভর করা চলে না। আমার মনে হয়, পিতার বিরুদ্ধে সন্তান সাক্ষ্য দিচ্ছে, স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রী সাক্ষ্য দিচ্ছে, মাত্র এই ব্যাপার থেকে বেশ বুঝা যায় যে, একটা বিশেষ গল্প বলাবার জন্তে এদের দাঁড় করান হয়েছে। মনে হয়, মামলার মূলে একটা কোন রহস্য আছে, যা মামলার প্রমাণ থেকে প্রকাশ পায়নি।

ইহার পর সাক্ষীর সমগ্র জবানবন্দী পাঠ করিয়া তাহার সমালোচনা করিয়া মিঃ ঘোষ বলিতে লাগিলেন—

প্রথমেই দেখতে হবে, কখন্ ও কি ভাবে আসামীর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ প্রকাশ করা হয়। এ জাতীয় মামলায় এ সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যদি শিশু গোলোক নিজের চোখে দেখে থাকে যে তার বাবা তার বোনকে হত্যা করেছে, তা'হলে এ কথা ভাবাই যায় না যে, যখন ২১শে তারিখে জমাদার আসামীর বাড়ী যায়; তখন কেউ এ কথা বলল না যে আসামীই হত্যাকারী। মামলার এইটাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ। ২১শে মার্চ্চ প্রতিবেশীরাও আসামীকে দোষী করল না, আসামীর স্ত্রীটিও অভিযোগ করল না, এ কেমন কথা ? পুলিশের জমাদার শপথ করে বলেছে যে, আসামীর স্ত্রীকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, স্ত্রী কিছু বলেনি। অবশ্য পরে স্ত্রীলোকটি মিথ্যে কথা বলে—সাফ বলে যে, কেউ তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করেনি। একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ হল পরস্পরবিরোধী কথা। স্বামীকে রক্ষা করাই যদি স্ত্রীর মতলব থেকে থাকে, তবে কি এমন ব্যাপার ঘটে উঠেছিল, যার ফলে পরে স্বামীকে সে অভিযুক্ত করল ? ময়না তদন্তের ফল জানা যাবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুলিশের কাছে আসামীকে কেউ অভিযুক্ত করেনি। এ থেকেই স্পষ্ট মনে হচ্ছে যে, ডাক্তার যখন প্রকাশ করলেন যে, ব্যাপারটা সাপে-কাটা ব্যাপার নয়, তখন পুলিশ স্ত্রী ও সন্তানের উপর চাপ দিয়ে তাদের বর্ত্তমান গল্প বলতে বাধ্য করেছে। এ কথা আমি বলব যে, সাক্ষীদের জেরা করা না হলেও মাত্র এ রকম অবস্থায় এ দেশে প্রমাণ বাজে হয়ে দাঁড়ায়। এ দেশে এ কুখ্যাতি আছে যে, পুলিশ ময়না তদন্তের ফলের জন্য অপেক্ষা করে, তার পর ডাক্তারী সাক্ষ্যের সঙ্গে খাপ খায় এমন প্রমাণ তৈরী করতে লেগে যায়। শিশুটি যে কাহিনী বলে গেছে তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, বর্ত্তমান ব্যাপারেই ঠিক এ-ই হয়েছে।

[বিচারপতি উইলসন—তা'হলে শিশু কি করে মারা গেল ? সাপে কামড়েও ত মারেনি।]

মৃত্যু কি করে ঘটেছিল, যদি তার সঙ্গে আসামীর কোন সম্পর্ক থেকে না থাকে, তা'হলে শিশু কি করে মারা গেল, তার সন্তোষজনক কারণ আসামীকে দেখাতেই হবে, এ একেবারে অপরিহার্য্য নয়। এই মামলার নথিপত্র পড়ে একটা অনুমান আমার মনে জেগেছে। আমার মনে হয়, তাই থেকে এই রহস্যের সত্যিকার সন্ধানের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। বাংলা দেশের ফৌজদারী মামলার বিচার সম্বন্ধে যাঁর কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই জানেন যে, অধিকাংশ মামলাতেই, সম্ভবতঃ শতকরা ৯০এরও বেশী ক্ষেত্রে, বাদী বা বিবাদী কোন পক্ষই সমগ্র সত্য প্রকাশ করে না। দুর্ভাগ্যক্রমে, সকল ক্ষেত্রেই দুই পক্ষই যত দূর সম্ভব সত্য গোপন করার অদম্য চেষ্টা করে থাকে। কাজেই মিথ্যা ও রচা প্রমাণের স্তূপ থেকে যথাসম্ভব সত্য আবিষ্কার করবার কঠিন দায়িত্ব এসে পড়ে আমাদের আদালতগুলোর উপর। এ কথা মনে রেখে, আর এ দেশে মূর্খ-লোকগুলো

কোন অপরাধে অভিযুক্ত হলে সত্যি কথা কখন বলবে না, সম্পূর্ণ নির্দোষ হলেও মিথ্যা সাফাই দাঁড় করাবে—এ কথাও মনে রেখে, এ কথা বলতে আমি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করব না যে, এ মামলার সমগ্র সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশেষ ভাবে বিবেচনা করে আমার এই ধারণাই হয়েছে—শিশুর মৃত্যু হয়েছে আকস্মিক কারণে।

[বিচারপতি উইলসন—ডাক্তারী প্রমাণে দেখা যাচ্ছে, পেটে একটা ক্ষত যকৃত পর্য্যন্ত বিদ্ধ করেছে, মৃত্যু তাতেই হয়েছে।]

এই ক্ষেত্রে ডাক্তারী প্রমাণ অগ্রাহ্য করতে আপনাদের আমি বলব। বেঁচে থাকবার সময় এমন একটা আঘাত করে ক্ষত করা হল, অথচ এক ফোঁটা রক্ত পড়ল না, এ ত ভাবতে পারি নে। শিশুর কাপড়-চোপড়ে বা বিছানাতেও রক্ত ছিল না।

[বিচারপতি উইলসন—তা'হলে আকস্মিক মৃত্যুটা কি করে হল আপনি বলতে চান?]

প্রমাণ যখন কিছু নেই, তখন অনুমান মাত্র করতে পারি। মেয়েদের নিয়ে আসামী বারান্দায় মেজেয় ঘুমিয়েছিল। এ অনুমান কি একেবারেই অসম্ভব যে, হয়ত আসামীকে কোন কারণে রাত্রিতে উঠতে হয়েছিল, হয়ত অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে শিশুর গলায় বা বুকে পা দিয়ে থাকবে? এ কৈফিয়ৎ যে সন্তোষজনক তা বলছি না, তবে এ ত হতে পারে?

[বিচারপতি উইলসন—ধরে নেওয়া গেল, এমনি একটা আকস্মিক ব্যাপারে শিশু খুন হয়েছে, কিন্তু আঘাতের ক্ষত?]

আঘাতের ক্ষত বুঝান খুব কঠিন নয়। এক সন্তোষজনক কারণ আমি দেখাতে পারি বলেই আমি আপনাদের অনুরোধ করছি যে, আপনারা এই সিদ্ধান্ত করুন যে, কোন না কোন আকস্মিক ব্যাপারে শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আসামীর পক্ষে দাঁড়িয়ে, আমার এই অনুমান-ইঙ্গিত খুব বিপজ্জনক সন্দেহ নাই, কিন্তু বাংলার এই সব অশিক্ষিত মূর্খ সাধারণের ভাব-চরিত্র আমি জানি বলেই এ কথা বলতে আমি সাহসী হচ্ছি যে, আঘাতটি করা হয়েছে মৃত্যুর পর।

[বিচারপতি উইলসন—কে আঘাত করল? কেন করল?]

সম্ভবতঃ আসামী নিজেই করেছে, শিশুর মৃত্যু প্রমাণ করবার জন্যে। অপর কথায়, সাপে-কাটা ব্যাপারটাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বড় করবার জন্যে।

[বিচারপতি ম্যাকফার্সন—কিন্তু সাপের কামড়ে অমন বিশ্রী ক্ষতের গর্ত্ত হয় না।]

আমি ত এ কথা বলছি না যে, ক্ষত সাপে কেটে করেছে। আমার অনুমান এই যে, সাপে কাটার ধরণ দেখাবার জন্যে ক্ষত করা হয়েছে।

[বিচারপতি ম্যাকফার্সন—বাংলার প্রত্যেক চাষী সাপে-কাটা কি রকম তা জানে। অমন একটা ভীষণ ক্ষত দেখে কেউ এ কথা বলবে না যে, সাপে কেটেছে।]

সৌভাগ্যক্রমে আমার অনুমানের সমর্থনে খুব ভাল প্রমাণ পেয়েছি। যখন এ কথা মেনে নেওয়া হয়েছে যে, আসামী নিজে ক্ষতকে সাপে-কাটা ক্ষত বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল, তখন সত্যকার সাপে কাটলে ক্ষতের আকৃতি এ রকম হয় কি হয় না, তার খোঁজের প্রয়োজন নেই। আসামী, যা হোক, মনে করেছিল যে, লোকে হয়ত মেনে নেবে সাপের কামড়। আমার বর্ত্তমান প্রয়োজনের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

ক্ষতের আকৃতি দেখে, আর রক্তের সম্পূর্ণ অভাব দেখে, এ কথা স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, ক্ষত করা হয়েছিল মৃত্যুর পর। ক্ষতের যেমন-তেমন আকার-আকৃতি দেখেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোন হত্যাকারী আঘাত করে এই ক্ষত করেনি। হত্যা যে করবে সে শড়কী গভীর ভাবে বিদ্ধ না করে কেন তা দিয়ে আলগোছে সামান্য ক্ষত করবে? সাপে কাটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে এ মনে করলে, ক্ষতের আকৃতির কারণ সহজেই ধরা পড়ে যায়।

মিঃ ঘোষ অতঃপর জুরীদের নিকট জজের চার্জ্জ পাঠ করিয়া তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। উপসংহারে তিনি বলেন—

যে অপরাধের অভিযোগ করা হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুতর, আসামীদের জেরাও করা হয়নি—এ সব কারণে মামলার প্রমাণাদি বিশেষ বিবেচনা করবার পরেও যদি এ আদালত আসামীকে একবারে অব্যাহতি দিতে না পারেন, তা'হলে আর এক পন্থা অবলম্বন করতে পারেন, নূতন জুরীর সামনে মামলার নতুন বিচারের আদেশ দিতে পারেন। আইনতঃ এ করা চলে। জজ তাঁর সংক্ষেপনার শেষে যে মন্তব্য করেছেন, তাতে আসামী পুনর্ব্বিচারের দাবী করতে পারে।

দণ্ডাদেশ সমর্থন করিবার জন্য সরকারের কেহ পক্ষ-সমর্থন করেন নাই।

সুবিজ্ঞ বিচারকগণ কয়েক দিন বিচার-বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত রায় প্রদান করেন—

এই মামলার দণ্ড ও দণ্ডাদেশ আমরা অনুমোদন করতে পারি না। কারণ, বিজ্ঞ জজ যে ভাবে জুরীদের নিকট মামলা উপস্থিত করেছেন, তা গুরুতর আপত্তিজনক বলে আমাদের মনে হয়েছে।

অভিযোগ, পিতা তার সন্তানকে হত্যা করেছে। অপরাধের সকল প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষদর্শী হল একটি শিশু। মামলার অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। আসামীর কেউ পক্ষ-সমর্থন করেনি। এক সাক্ষীকে একটি প্রশ্ন করা ছাড়া কোন সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি। এমন অবস্থায় অতি সতর্ক ভাবে জুরীদের কাছে মামলা দাখিল করলে, আর জুরীরা যাতে বাদী পক্ষের প্রমাণের অযথা গুরুত্ব প্রদান না করেন, যাতে বাদীর প্রমাণের ত্রুটি ও পরস্পর-বিরোধিতা উপেক্ষা বা লঘু না করেন সে দিকেও যথেষ্ট যত্ন নিলে জজ বিজ্ঞতার পরিচয় দিতেন। কিন্তু বিজ্ঞ জজ তাঁর চার্জ্জের উপসংহারে যে মন্তব্য করেছেন, তার ফলে, আসামীর বিরুদ্ধে অনেক বিষয়ে অযথা গুরুত্ব আরোপ করেছেন, আর অভিযোগের আপত্তি করবার যদি কোন বিষয় থাকে, তার গুরুত্ব খর্ব্ব করেছেন বলে আমাদের মনে হয়েছে।

তাঁর মন্তব্যের প্রায় প্রথমাংশে বিজ্ঞ জজ অপরাধের মতলবের কথা তুলেছেন। তিনি বলেছেন—"মতলব যথাযথ কি না এ নিশ্চয় আপনাদের বিবেচনার বিষয় নয়, বাদী পক্ষ ন্যায়তঃ ও আইনতঃ এ বিষয় প্রমাণ করিতে বাধ্য নয়।" এই নির্দ্দেশ খুবই ঠিক। বিজ্ঞ বিচারক যদি এ কথা বলেই চুপ করতেন, তা'হলে মতলব সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা আপত্তিকর হত না। কিন্তু তাঁর মন্তব্যের অনেক অংশে তিনি মতলবের অনুমান মেনে নেবার জন্যে জুরীদের

চাপ দিয়েছেন, অথচ এই মতলবের সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই, এ একেবারে প্রায় গবেষণা।

সম্ভাবনার বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে, বিজ্ঞ জজ এক দিকে দেখিয়েছেন অপরাধের অসম্ভাবনার কথা, আবার অন্য দিকে মিথ্যা অভিযোগের কথাও তুলেছেন। তিনি বলেছেন—"যে অনুমানই আপনারা গ্রহণ করুন না, সাধারণ অভিজ্ঞতা ও সাধারণ সম্ভাবনা এতে ধাক্কা খেয়েছে, তবু কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, একটি অনুমান সত্য নিশ্চয়।" এ কথা অবশ্য সত্যি যে, বিজ্ঞ বিচারক সম্ভাবনার উপর নির্ভর না করে প্রমাণের উপর নির্ভর করতে জুরীদের বলেছেন। কিন্তু সম্ভাবনার কথা কি ভাবে তাঁদের সামনে দাঁড় করান হয়েছে, তা আমরা দেখিয়েছি। সংক্ষেপণার অন্যান্য অংশেও একই ভাবে জজ মামলার বিষয় উপস্থিত করেছেন। যেমন বলা হয়েছে—"আসামী যদি শিশুকে হত্যা না করে থাকে, তা'হলে বাইরের কেউ এবং শত্রু কেউ নিশ্চয় হত্যা করেছে।" বাইরের কেউ বালিকাকে হত্যা করেছে, এর অসুবিধার কথাও জজ দেখিয়েছেন, পরে এক স্থানে, যে শড়কী দিয়ে বালিকাকে হত্যা করা হয়েছে বলে জজ অনুমান করেছেন, সেই শড়কীর কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"শিশুর কথা যে, হত্যাকারী তার নিজের শড়কী ব্যবহার করেছিল, অথবা বাইরের কোন লোক আসামীর শড়কী ব্যবহার করেছিল এই দুই অনুমানের মধ্যে কোন্ অনুমান সাধারণ অভিজ্ঞতা বা ন্যায়সঙ্গত সম্ভবনার সঙ্গে খাপ খায়?" জুরীদের কাছে মামলা উপস্থাপিত করবার এ অত্যন্ত বিপজ্জনক পন্থা। জুরীদের সামনে যখন দুই বিকল্প মত উপস্থিত করা হয়, যে মতের হয় একটি বা অন্যটি সত্য বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়, [illegible] হচ্ছে, তাই তাঁরা খুব সম্ভব গ্রহণ করবেন। দুই কারণে এ অন্যায়; ১ম—জুরীর কাছে জজ যে অনুমান ও সম্ভাবনা উপস্থিত করছেন তা ছাড়া যে অন্য অনুমান হতেই পারে না এমন কদাচিৎ দেখা যায়। ২য়—মামলার জটিলতার জন্যে, এ-ও হতে পারে, জুরীরা কোন অনুমানই মানতে চাইলেন না, আর সে কারণে আসামীকে অব্যাহতি দিলেন।

সংক্ষেপণার প্রথম দিকটায় জজ বলেছেন, "বাদীকে প্রথমে প্রমাণ করতে হবে, হত্যা অপরাধ সত্যি অনুষ্ঠিত হয়েছে; আর আপনাদের মধ্যে এমন এক যুক্তিযুক্ত ধারণা এনে দিতে হবে, নীতির দিক দিয়ে যা একেবারে নিশ্চিত যে, আসামীই সেই অপরাধ করেছে।" এ কথা খুবই ঠিক। কিন্তু মামলার বিস্তারিত আলোচনা করবার সময় তিনি বরাবর ধরে নিয়েছেন যে, হত্যা হয়েছে। তাই প্রশ্ন উঠিয়েছেন—"হত্যাকারী কে?" এতে ধরে নেওয়া হ'ল কি? ধরে নেওয়া হল মাত্র এ কথাই নয় যে—অপরাধজনক বলপ্রয়োগের ফলেই শিশু নিহত হয়েছে, এ-ও মেনে নেওয়া হল যে, ঘটনাচক্র এমনই ছিল যে, সে অপরাধজনক প্রয়োগ হত্যারই নামান্তর মাত্র। আমাদের মনে হয়, এ জাতীয় অনুমান কোন জজকে করতে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই।

মামলা সংক্ষেপণায় বরাবর আসামীর পক্ষে প্রতিকূল অবস্থার কথাই যথাসম্ভব বেশী করে দেখান হয়েছে। যে সব অবস্থা আসামীর অনুকূল, তার প্রতি ন্যায্য কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে আমাদের মনে হল না।

ঘটনার পর অনেক দিন কেটে গেছল, অথচ আসামীর বিরুদ্ধে কোন চার্জ আনা হয়নি। ব্যাপারটি বিশেষ লক্ষ্য করবার মত। বিজ্ঞ জজ এ সম্বন্ধে বলেছেন যে, "এই একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বাদীর বর্ণিত কাহিনীতে সন্দেহ এনে দেয়।" এর পর জজ স্ত্রীর কৈফিয়তের কথা উল্লেখ করলেন বটে, কিন্তু এ কথা দেখালেন না যে, পুলিশ কর্মচারী সে কৈফিয়ৎ অস্বীকার করছে। এর পর জজ স্ত্রীলোকটির আচরণ সম্বন্ধে এমন কতকগুলো কৈফিয়তের গবেষণা করেছেন, যার ইঙ্গিত পর্যন্ত সে দেয়নি। এ-তরফ ও-তরফের ঘটনাগুলো আলোচনার ধরণের এই মস্ত ফারাক থেকে আমাদের মনে হয়েছে যে, আসামীর বিরুদ্ধে গুরুতর পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে।

প্রমাণের একটা মুখ্য বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বিবেচনাই করা হয়নি বলে মনে হচ্ছে। মামলার সংক্ষেপণায় বরাবর বিজ্ঞ জজ ধরেই নিয়েছেন যে, শ্বাসরোধ ও শড়কীর আঘাতের ফলে মৃত্যু [illegible] ক্ষত করা হয়েছিল, এ বিষয়ে প্রমাণ থেকে যে গুরুতর সন্দেহ জেগেছে, আর গোটা মামলার উপর এর প্রভাব যে কতখানি, তার প্রতি জুরীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি।

এ সব কারণে আমরা দণ্ড ও দণ্ডাদেশ অনুমোদন করতে পারলাম না; অপর পক্ষে আপীল অনুমোদন করে আসামীকে অব্যাহতি দেওয়াও ঠিক হবে বলে আমরা মনে করছি না। আমাদের মনে হচ্ছে, ঠিক পন্থাই হবে আসামীর পুনর্বিচার।

স্বাঃ এ উইলসন

১৩ই জুন, ১৮৮২ „ ডবলু ম্যাকফার্সন।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—তারানাথ রায়

-প্রচ্ছদপট-

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে নৃত্যভঙ্গীর আলোকচিত্রে আছেন শ্রীমতী রিতা চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা রাজভবনে এক অনুষ্ঠানে আশারাম চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক চিত্রটি গৃহীত হয়। শ্রীমতী রিতা সম্প্রতি নৃত্যকলায় যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছেন।

রূপ রচনার রুচিরাগ
রূপের কলিকে সৌন্দর্য্যকুসুমে, বিকশিত করে তোলাই এই প্রসাধনীর সাধনা। রূপ সাধকসাধিকাদের নিকট তাই চিরকাম্য এই সৌন্দর্য্যের সুরম্য সম্ভার।
ক্যালকেমিকোর
মার্গো সোপ
নিম টুথ পেষ্ট
ভৃঙ্গল সুবাসিত মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল
লাবানি স্নো ও ক্রীম
কান্তা মনোমদ গন্ধসার
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা ২৯

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

সঙ্কটপূর্ণ বৎসর ১৯৫২ সাল—

কোরিয়া যুদ্ধের ঘনান্ধকার দুর্য্যোগের মধ্যে খৃষ্টীয় ১৯৫১ সালের সুরু হইয়াছিল। ১৯৫১ সাল শেস হইলেও কোরিয়া যুদ্ধের শেষ হয় নাই। কোরিয়া যুদ্ধ হইতে তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কা ১৯৫১ সালে সত্যে পরিণত হয় নাই বটে, কিন্তু মধ্য-প্রাচীতে যে-রাজনৈতিক আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উদ্গিরণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। ১৯৫১ সালে দুইটি নূতন সঙ্কট সৃষ্টি হইয়াছে ইঙ্গ-ইরাণ তৈল-সঙ্কট এবং সুয়েজ খাল ও সুদান লইয়া ইঙ্গ-মিশর বিরোধ। কোরিয়া যুদ্ধ, ইঙ্গ-ইরাণ তৈল-সঙ্কট এবং ইঙ্গ-মিশর বিরোধে ১৯৫০ সালের শেষ ভাগ অপেক্ষাও অধিকতর দুর্যোগপূর্ণ আন্তর্জাতিক আবহাওয়ার মধ্যে অবসান হইল খৃষ্টীয় ১৯৫১ সালের। ১৯৫২ সাল যে বিশ্ববাসীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বৎসর (fatcful year)-রূপেই আসিয়াছে, এই আশঙ্কাপূর্ণ কথা অনেকের মুখেই শোনা যাইতেছে। এই আশঙ্কার মূলে কোনই কারণ নাই, এ কথা বলা যায় না। গত নবেম্বর (১৯৫১) মাসের প্রথম দিকে পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষাব্যবস্থার সর্ব্বাধিনায়ক জেনারেল আইসেনহাওয়ার বেশ দ্রুততার সহিত প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটার' পত্রিকা লিখিয়াছিলেন, ১৯৫২ সালে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ইহা ধরিয়া লইয়াই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার মিত্র-শক্তিবর্গের প্রস্তুত হওয়া উচিত, এই কথাই জেঃ আইসেনহাওয়ার প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে জানাইয়াছেন। শান্তি-চুক্তি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্যারী অধিবেশনে আলোচনার গতি লক্ষ্য করিলেও ১৯৫২ সাল যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসররূপেই আসিয়াছে, এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক।

আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে-সকল গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছে, সেগুলির মধ্যে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ঠাণ্ডা-যুদ্ধকেই সর্ব্বপ্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহার সর্ব্বাত্মক গুরুত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু যে-সকল কারণ এই ঠাণ্ডা-যুদ্ধের মূল, সেগুলিকে বাদ দিয়া ঠাণ্ডা-যুদ্ধ বন্ধ করিবার প্রচেষ্টা উহাকে আরও প্রবল করিয়াই তুলিবে। বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকা ২রা জানুয়ারীর (১৯৫২) সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, যে-পর্য্যন্ত দুই বৃহৎ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে গভীর ব্যবধান থাকিবে, সে-পর্য্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই আন্তর্জাতিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকা উল্লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "The United Nations seem to be faced with a choice which may even have to be made in the debate now to open on the proposals of the Collective Measures Committee. Either it can seek to remain a universal society of nations, existing to seek peaceful solutions to problems that fall within its sphere, or it can be converted into an anti Communist Combition." অর্থাৎ 'ঐকত্রিক রক্ষা-ব্যবস্থা কমিটির (the Collective Measures Committee) প্রস্তাবের আলোচনা উপলক্ষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে একটা দিক্ বাছিয়া লইতে হইবে বলিয়া মনে হয়। উহার আওতার মধ্যে যে-সকল সমস্যা দেখা দিবে, সেগুলি সমাধানের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ জাতিসমূহের সর্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে থাকিতে পারে অথবা ইহা পরিণত হইতে পারে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী প্রতিষ্ঠানে।' সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে ইতিমধ্যেই কম্যুনিষ্ট-বিরোধী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতেই আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান সহজ হইয়া গিয়াছে তাহাও মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। যে সকল আন্তর্জাতিক সমস্যা ১৯৫২ সালে জটিলতা সৃষ্টি করিবে তন্মধ্যে জার্ম্মাণ সমস্যা, ইঙ্গ-ইরাণ তৈল-সমস্যা, ইঙ্গ-মিশর বিরোধ, ফরমোসার ভবিষ্যৎ সমস্যা এবং কোরিয়া যুদ্ধের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত ইন্দোচীনে, মালয়ে, উত্তর-আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চলিতেছে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম। অশ্বেতকায়দের সম্পর্কে দক্ষিণ-আফ্রিকার নীতি এবং ইজরাইল রাষ্ট্রের সহিত আরব রাষ্ট্রগুলির বিরোধকেও উপেক্ষা করা চলে না।

জার্ম্মাণীর সমস্যা ১৯৫২ সালে বিস্ফোরণকে আগাইয়া আনিবে ইহা মনে করা কঠিন। পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করিতে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের আয়োজনে রাশিয়া কতটুকু উদ্বিগ্ন হইয়াছে, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। এই আয়োজন সত্ত্বেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জার্ম্মাণী বিপুল সামরিক শক্তিতে পরিণত হইবে, ইহা কেহই মনে করে না। হিটলারের যে সকল সুবিধা-সুযোগ ছিল, ডাঃ এডেনেয়ুরের সে সকল কিছুই নাই। পশ্চিম-জার্ম্মাণীর জনসাধারণও অস্ত্রসজ্জা সম্বন্ধে খুব বেশী উৎসাহ অনুভব করিতেছে না। বৃটেন এবং ফ্রান্স তাহাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য লইয়া যথেষ্ট বিব্রত এবং পশ্চিম-ইউরোপের সবগুলি রাষ্ট্রই আর্থিক সমস্যার জটিলতা বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতেছে। ইঙ্গ-ইরাণ ও ইঙ্গ-মিশর বিরোধের অবসান যে শীঘ্র হইবে তাহা মনে হয় না। মিশরে বৃটিশ সৈন্য-বাহিনীর জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং স্যার জর্জ এরস্কাইন সেদিন বলিয়াছেন, "Today things are drifting in a most dangerous manner in canal zone and what happens in canal zone has repurcussions throughout Egypt." অর্থাৎ 'খাল অঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক গতিতে অগ্রসর হইতেছে এবং খাল অঞ্চলে যাহাই ঘটিতেছে সমগ্র মিশরে দেখা দিতেছে তাহার প্রতিক্রিয়া।' মিশরের প্রভাবশালী পত্রিকা 'আল আহ্রাম' লিখিয়াছেন, "ইডেন হয়ত নিঃশব্দে ওয়াশিংটনে যাইবেন। হয়ত কয়েকটা পরমাণু বোমাও তিনি পাইবেন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃতি উপলব্ধি করাইবার জন্য কায়রোকে দ্বিতীয় হিরোশিমায় পরিণত করাও হইতে পারে।"

মিশরে ও ইরাণের সমস্যা কোরিয়া যুদ্ধের তুলনায় কিছুই নহে। দেড় বৎসর ধরিয়া কোরিয়া যুদ্ধ চলিতেছে। সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জের বেনামীতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ায় ঐকত্রিক নিরাপত্তার (collective security) যে প্রহসন অভিনয় করিতেছে তাহার ফলে এশিয়া ভূমিতেই বহু সংখ্যক এশিয়াবাসীর জীবনান্ত হইতেছে। কোরিয়া এমন ভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে যে, ভাবী এক শত বৎসরেও উহার পুনর্গঠন সম্ভব হইবে না। এদিকে ফরমোসা লইয়া ১৯৫২ সালে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। ফরমোসায় চিয়াং কাইশেকের ৬ লক্ষ সৈন্য রহিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উহার অর্দ্ধেক নিয়মিত সৈন্য। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিতেছে, রহিয়াছে মার্কিণ সামরিক পরিদর্শক। চিয়াং কাইশেক ১৯৫২ সালে চীনের মূল ভূখণ্ড আক্রমণের হুমকী দিতেছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হুমকী দিতেছে, কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির সর্ত্ত ভঙ্গ করা হইলে চীন আক্রমণ করা হইবে। কোরিয়ায় যুদ্ধের বিরতি এখনও হয় নাই। তাহার পূর্ব্বেই এই হুমকীকে চীন আক্রমণের একটা ছল সৃষ্টির ইঙ্গিত পূর্ব্ব হইতে দিয়া রাখা মনে করিলে ভুল হইবে না। কিন্তু ফরমোসা সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট চীনের পক্ষে সন্তোষজনক মীমাংসা না হইলে কোরিয়া যুদ্ধবিরতিও ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। ১৯৫২ সাল বিশ্ববাসীর জন্য কি লইয়া আসিয়াছে, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। ১৯৫১ সালের দিকে চাহিলে ১৯৫২ সাল সম্বন্ধে ভরসা করিবারও কিছু দেখা যায় না। মিঃ চার্চ্চিলের ওয়াশিংটন সফর শুধু কম্যুনিষ্ট-বিরোধী ফ্রণ্টকে সুদৃঢ় করিবার আয়োজন মাত্র।

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা—

গত ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৫১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটি যেমন একটি নূতন নিরস্ত্রীকরণ কমিশন গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন এবং সশস্ত্র বাহিনী ও অস্ত্রসজ্জা নিয়ন্ত্রণ, সীমাবদ্ধ করণ ও সুসমঞ্জস ভাবে হ্রাস করণ এবং পরমাণু শক্তি শুধু শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা এবং পরমাণু অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পরমাণু শক্তির কার্য্যকরী ভাবে আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণের জন্য পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি রাশিয়ার সমস্ত সংশোধন প্রস্তাবই অগ্রাহ্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় পরমাণু শক্তি কমিশন এবং প্রচলিত অস্ত্র শস্ত্র কমিশনকে বাতিল করা হইয়া গেল। কিন্তু পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ বারুচ-পরিকল্পনার ভিত্তিতেই করা হইবে, যদি উহা অপেক্ষা কার্য্যকরী কোন পরিকল্পনা গঠন করা সম্ভব না হয়। নিরস্ত্রীকরণ কমিশনকে ৩০ দিনের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে এবং ১৯৫২ সালের ১লা জুনের মধ্যে প্রথম রিপোর্ট পেশ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য অতঃপর এই প্রস্তাবটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে আলোচিত হইবে। কিন্তু সাধারণ পরিষদের যাঁহারা সদস্য তাঁহারাই রাজনৈতিক কমিটিরও সদস্য। কাজেই সাধারণ পরিষদে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ নাই। এই প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে গৃহীত হইলেও উহার পরিণতি কি হইবে, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে চতুঃশক্তির সাব-কমিটিতে আলোচনার ফলাফলের কথা প্রথমে উল্লেখ করা আবশ্যক।

নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয় এবং সোভিয়েট পরিকল্পনার মধ্যে যে-সকল পার্থক্য রহিয়াছে সে-সম্পর্কে আলোচনা করিয়া কোন মীমাংসা সম্ভব কি না, তাহা দেখিবার জন্য সাধারণ পরিষদ যে চতুঃশক্তির নিরস্ত্রীকরণ সাব-কমিটি গঠন করেন, তাহার কথা গত অগ্রহায়ণ মাসের 'মাসিক বসুমতীতে' আমরা উল্লেখ করিয়াছি এবং ঐ সাব-কমিটিতে যে-ভাবে আলোচনা চলিতেছিল তাহারও কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা দিয়াছি। কিন্তু আমাদের ঐ প্রবন্ধ লিখিবার সময় সাব-কমিটির রিপোর্ট তৈয়ার হয় নাই। সাব-কমিটিতে আলোচনার ফলাফল আলোচনা করিলে দেখা যায়, কতগুলি বিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়া এবং পশ্চিমী শক্তিত্রয় একমত হইয়াছেন। কিন্তু যে-সকল বিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়া এবং পশ্চিমী শক্তিত্রয় একমত হইতে পারেন নাই, গুরুত্ব সেইগুলিরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নিরস্ত্রীকরণ কমিশন গঠন, আন্তর্জ্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহ্বান, অস্ত্র-শস্ত্র এবং সশস্ত্র বাহিনীর হিসাব গ্রহণ, এ সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ প্রকাশ এবং জাতীয় নিরস্ত্রীকরণ কর্ম্মসূচী এবং পরমাণু পরিকল্পনার আন্তর্জ্জাতিক পরিদর্শন, এই সকল বিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়া এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয় একমত হইয়াছেন। কোন্ সময়ে এবং কোথায় পরিদর্শন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে তাহা আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানই সংখ্যাধিক্যের ভোটে স্থির করিবেন এবং এ বিষয়ে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইবে না, এ সম্পর্কেও তাঁহাদের একমত হওয়ার পক্ষে কোন বাধা হয় নাই। এমন কি সামরিক ও পরমাণু কারখানায় স্থায়ী ভাবে পরিদর্শক নিযুক্ত করা সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়া যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয় তাহাও মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক নয়। কিন্তু পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্র হ্রাস সংক্রান্ত কার্য্যকরী ব্যাপারে পশ্চিমী শক্তিবর্গ এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে গভীর ব্যবধান বর্ত্তমান রহিয়া গিয়াছে। এই পার্থক্য যে কত গভীর, রাজনৈতিক কমিটির আলোচনা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পার্থক্যের স্বরূপ বুঝিতে হইলে রাজনৈতিক কমিটিতে পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের পরিকল্পনা সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়া যে সকল সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, সেগুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

অস্ত্রসজ্জা হ্রাস এবং পরমাণু 'অস্ত্র-শস্ত্র নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য রাশিয়া একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল। আর একটি সংশোধন প্রস্তাবে বৃহৎ রাষ্ট্র-পঞ্চককে এক বৎসরের মধ্যে তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্রের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করাইবার দাবী উত্থাপন করা হয়। অস্ত্র-শস্ত্র হ্রাস এবং পরমাণু অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিশ্ব-সম্মেলন আহ্বানের জন্য সোভিয়েট রাশিয়া আরও একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কমিটিতে রাশিয়ার সমস্ত সংশোধন প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হইয়া যায়। রাজনৈতিক কমিটিতে পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অভিযোগ এবং পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের পক্ষ হইতে উহার উত্তর আলোচনা করিলে রাশিয়ার সংশোধন প্রস্তাবগুলির গুরুত্ব বুঝিতে পারা যায়।

মঃ ভিসিনস্কী গত ১৮ই ডিসেম্বর (১৯৫১) রাজনৈতিক কমিটিতে বলিয়াছেন, "ঐকত্রিক নিরাপত্তা (collective security) যখন শান্তির বুলিতে আবৃত যুদ্ধের কর্ম্মসূচী হইয়া দাঁড়ায়, তখন

উহা কিরূপ বিপজ্জনক হইয়া উঠে তাহা গত বৎসরের ঘটনাবলী হইতেই বুঝিতে পারা যায়।" গত বৎসরের ঘটনাবলী বলিতে তিনি যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বেনামীতে কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপের কথাই বিশেষ ভাবে বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, "The Atlantic Pact programme is a part of the preperation of new reckless military advertures." অর্থাৎ 'আটলাণ্টিক চুক্তির কর্ম্মসূচী অপরিণামদর্শী নূতন সামরিক অভিযানের প্রস্তুতির একটি অঙ্গ মাত্র।' তাঁহার এই মন্তব্য হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যদের আটলাণ্টিক চুক্তির সদস্য হওয়া পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মঃ ভিসিনস্কী মনে করেন। কাজেই পশ্চিমী শক্তিত্রয় তাহার উল্লিখিত উক্তি সম্বন্ধে তীব্র শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য করিতে পারেন এবং রাশিয়ার পঞ্চশক্তির চুক্তির প্রস্তাবকে চীনের কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করাইয়া লইবার কৌশল বলিয়াও তাঁহারা অভিহিত করিতে পারেন, কিন্তু রাশিয়ার সংশোধন প্রস্তাবগুলি শান্তির উদ্দেশ্যে করা হয় নাই, এ কথা তাহাতে প্রমাণিত হয় না। পরমাণু অস্ত্র-শস্ত্র নিষিদ্ধ করাই যে বিশ্বশান্তির মূল সমস্যা ইহা অস্বীকার করা যায় না। মঃ ভিসিনস্কী বলিয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রতি মাসে ২০ লক্ষ ডলার মূল্যের সমর-উপকরণ নির্ম্মাণ করিতেছে। মস্কোতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পাঁচটি পরমাণু ঘাঁটি তৈয়ার করিতেছে এবং পরমাণু অস্ত্রশস্ত্রের ভিত্তিতেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্র-সজ্জিত করা হইতেছে। এই জন্যই যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অবিলম্বে পরমাণু অস্ত্র-শস্ত্র নিষিদ্ধ করিতে রাশিয়ার প্রস্তাব মানিয়া লইতে রাজী নয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। রাজনৈতিক কমিটিতে পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের যে সংশোধিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, পরমাণু অস্ত্র সম্পর্কে তাহারও মূল ভিত্তি বারুচ-পরিকল্পনা। বারুচ-পরিকল্পনা রাশিয়ার পক্ষে কেন গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না, রাশিয়া তাহা স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছে। এই পরিকল্পনায় রাশিয়ার পরমাণু সম্পদ সহ সমস্ত পৃথিবীর পরমাণু সম্পদ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এজেন্সীর হাতে অর্পণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে তৈয়ারী পরমাণু বোমাগুলি ব্যবহার করিবে না এবং নূতন পরমাণু বোমা তৈয়ার করিবে না, সে-সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি বারুচ-পরিকল্পনায় নাই। রাশিয়ার এই আশঙ্কা ভিত্তিহীন নয়। মার্কিণ পরমাণু শক্তি কমিশনের রিপোর্টে উহার সভাপতি মিঃ লিলিয়েনথল যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতেই রাশিয়ার আশঙ্কা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণ বন্ধ করিবে কি না তাহা উচ্চ স্তরের নীতি (highest policy) দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। পশ্চিমী মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে বৃটেনের সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ সেলুইন লয়েড রাজনৈতিক কমিটিতে বলিয়াছেন, রাশিয়া যে পর্য্যন্ত তাহার সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী এবং অস্ত্র-শস্ত্র হ্রাস না করিতেছে, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা পরমাণু বোমা ত্যাগ করিতে পারেন না।

রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনী এবং অস্ত্র-শস্ত্রের পরিমাণ সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিবর্গের আনুমানিক হিসাবই যে ঠিক, তাহা কেহই বলিতে পারে না। মঃ ভিসিনস্কী বলিয়াছেন যে, রাশিয়া তাহার সীমান্ত রক্ষার উপযোগী সৈন্যবাহিনী রাখিতে চায়। মিঃ ডীন একিসনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, যে-রাষ্ট্রের সীমান্ত খুব বড় সে রাষ্ট্রের বৃহৎ সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন। আগেকার প্রুশিয়ার মত ক্ষুদ্র অথচ আক্রমণোদ্যোগী রাষ্ট্রও বিশ্বশান্তিকে বিশেষ ভাবে বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে। রাশিয়াই ভাবী আক্রমণকারী, পশ্চিমী শক্তিত্রয় ব্যাপক ভাবে এ কথা প্রচার করিতেছেন। রাশিয়া আক্রমণের জন্য কি আয়োজন করিতেছে তাহা কিছুই জানা যায় না। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং তাহার মিত্রশক্তিবর্গ যে বিপুল সমর আয়োজন করিতেছে, তাহাতে শান্তিকামী মাত্রেই উদ্বিগ্ন না হইয়া পারিবে না। রাশিয়া যদি সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেও তাহা হইলে কতখানি বৃদ্ধি করিতে পারে তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক।

বর্ত্তমান যুগে ইস্পাত, কয়লা এবং পেট্রোল এই তিনটি সামরিক শক্তির মূল ভিত্তি। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ ইস্পাত ও কয়লা উৎপন্ন হয়, সোভিয়েট রাশিয়ায় উৎপন্ন হয় তাহার চারি ভাগের এক ভাগ মাত্র। এমন কি, বৃটেন এবং ফ্রান্সে উৎপন্ন ইস্পাত ও কয়লা অপেক্ষাও কম পরিমাণ ইস্পাত ও কয়লা রাশিয়ায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়, রাশিয়ায় তাহার ছয় ভাগের এক ভাগের বেশী হয় না। পৃথিবীতে যে পরিমাণ পেট্রোল উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৭০ ভাগই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে। রাশিয়ার ভাগে সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন পেট্রোলের শতকরা ১০ হইতে ১৫ ভাগের বেশী পড়ে না। মিঃ লয়েড বলিয়াছেন যে, রাশিয়ার সামরিক বিমানের সংখ্যা ২০ হাজার। কিন্তু ১৯৪৭ সালেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিমানের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজারেরও বেশী। পৃথিবীব্যাপী মার্কিণ সামরিক ঘাঁটির কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। আটলাণ্টিক অঞ্চলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ৪টি প্রধান সামরিক ঘাঁটি আছে। তা ছাড়া ২টি দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘাঁটি এবং চারিটি আনুসঙ্গিক ঘাঁটি আছে। প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, মেরিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, আলাস্কা এবং রুইকু এই চারিটি প্রধান সামরিক ঘাঁটি অঞ্চল। ফিলিপাইন, মিডওয়ে এবং সামোয়া এই তিনটি দ্বিতীয় শ্রেণীর সামরিক ঘাঁটি অঞ্চল। ইহা ব্যতীত আরও ১১টি ছোটখাটো নৌ ও বিমানঘাঁটি আছে। পশ্চিম-জার্ম্মাণী এবং জাপান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবে রহিয়াছে। ইউরোপে উত্তর-আটলাণ্টিক চুক্তি এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের সহিত রক্ষা-চুক্তি, ফিলিপাইনের সহিত রক্ষা-চুক্তি এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীলণ্ডের সহিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আবদ্ধ হইয়াছে। এইগুলি বিবেচনা করিলে রাশিয়ার পক্ষেই বরং ভীত হওয়ার কারণ রহিয়াছে বলিতে হয়।

পরলোকে মঃ লিটভিনফ—

দীর্ঘ রোগ ভোগের পর প্রাক্তন সোভিয়েট পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মঃ লিটভিনফ গত ২রা জানুয়ারী পরলোক গমন করিয়াছেন। 'শান্তি অখণ্ড ও অবিভাজ্য', তাঁহার এই বাণী চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মঃ লিটভিনফ ১৮৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭ বৎসর বয়সে তিনি স্বেচ্ছাসৈনিকরূপে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং সেনাবাহিনীতে থাকিবার সময়ই মার্কসীয় মতবাদের প্রতি তিনি

অনুরক্ত হন। অতঃপর সেনাবাহিনী ত্যাগ করিয়া তিনি সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিতে যোগদান করেন। তাঁহার সমগ্র জীবন-কথা এখানে উল্লেখ করিবার স্থান আমরা পাইব না। তিনি এক জন ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী স্যার সিডনী লো-এর কন্যা। প্রথম বিশ্ব-সংগ্রামের সময় জার-শাসনের বিরুদ্ধে রাশিয়ায় যে বিপ্লবের প্রস্তুতি চলিতেছিল তিনি তাহার এক জন উৎসাহী নেতা ছিলেন। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে বৃটেনে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাশিয়ার বিপ্লবী গবর্ণমেণ্টের সহিত বৃটেনের বিরোধ বাধিয়া উঠিলে তাঁহাকে বন্দী করা হয়। ১৯১৯ সালের শেষ ভাগে তিনি মুক্তিলাভ করেন। রাশিয়ার পররাষ্ট্র ব্যাপারে মঃ লিটভিনফ ধীরে ধীরে খ্যাতি অর্জ্জন করিতে থাকেন। ১৯২৫ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে রুশ-নীতি বিশেষ দক্ষতার সহিত তিনি ব্যাখ্যা করেন। বিশ্বশান্তির জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা চিরকাল তাঁহাকে খ্যাতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবে। ১৯২৭ সালে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৩৯ সালের মে মাস পর্য্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর ১৯৪১ সালে তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। হিটলারের আশঙ্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার জন্য ১৯৩৭-৩৮ সালে মঃ লিটভিনফ বৃটেন ও ফ্রান্সের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। সেদিন বৃটেন ও ফ্রান্স যদি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিত তাহা হইলে পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করিত।

লিবিয়ার স্বাধীনতা—

সাম্রাজ্যবাদের আওতায় আরও একটি দেশ স্বাধীনতা লাভ করিল,—গত ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৫১) লিবিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইয়াছে। এক সময়ে লিবিয়া ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ। তুর্কী সাম্রাজ্য ভগ্নদশায় উপনীত হইলে লিবিয়া ইটালীর উপনিবেশে পরিণত হয়। ইটালীতে মুসোলিনীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লিবিয়ার গুরুত্ব তিনি বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইটালীকে একটি শ্রেষ্ঠ ভূমধ্যসাগরীয় শক্তিতে পরিণত করিতে হইলে লিবিয়াকে শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত করা আবশ্যক। সমগ্র লিবিয়াতে ট্রিপোলিটানিয়াতেই অপেক্ষাকৃত লোক-জনের বাস বেশী। সাইরে-নিকা এবং ফেজ্জান জনবিরল অঞ্চল। লিবিয়ার বহু অঞ্চলই মরুভূমি। মুসোলিনীর চেষ্টায় ইটালী গবর্ণমেণ্টের অর্থ-সাহায্যে প্রায় ৮৯ হাজার ইটালীয় লিবিয়ায় যাইয়া বসতি স্থাপন করে। ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ ত্রিপোলি এবং বেনঘাজী বন্দরকেও তিনি সুদৃঢ় সামরিক এবং নৌ-ঘাঁটিতে পরিণত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম সমস্তই ব্যর্থ করিয়া দিল।

দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের পর লিবিয়ার তিনটি অঞ্চলের মধ্যে ট্রিপোলিটানিয়া এবং সাইরেনিকা বৃটেনের এবং ফেজ্জান ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। ইটালীর সহিত যখন শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তখন লিবিয়া সহ ইটালীর উপনিবেশগুলি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। বৃহৎ চতুঃশক্তির মধ্যে ইটালীর উপনিবেশ সমূহ সম্পর্কে মতভেদই ইহার কারণ। অবশেষে বহু আলোচনার পর বৃহৎ চতুঃশক্তি ইটালীর উপনিবেশগুলি সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট প্রদানের জন্য এক চতুঃশক্তি কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনের রিপোর্ট আলোচনা করিয়া বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিবচতুষ্টয়ের সহকারিগণের প্রত্যেকে লিবিয়া সম্পর্কে যে সুপারিশ করেন, তাহা লইয়া এখানে আলোচনা করিবার স্থান নাই। উত্তর-আফ্রিকায় রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার নিরোধ করিবার জন্য লিবিয়াকে ভাগাভাগী করিয়া লইবার ব্যবস্থা পশ্চিমী শক্তিবর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে লিবিয়ার এই স্বাধীনতা লাভ রাশিয়ারই নৈতিক জয় সূচনা করিতেছে।

দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া বহু তর্ক-বিতর্কের পর গত ১৯৪৯ সালের ২১শে নবেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ প্রাক্তন ইটালীয় উপনিবেশ ট্রিপোলিটানিয়া, সাইরেনিকা এবং ফেজ্জানকে মিলিত করিয়া স্বাধীন সার্ব্বভৌম লিবিয়া রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত করেন। এই প্রস্তাব অনুসারেই গত ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৫১) লিবিয়া স্বাধীনতা লাভ করিল। অখণ্ড লিবিয়ার রাজা হইলেন বৃটিশ-বন্ধু সাইরেনিকার আমির সৈয়দ ইদ্রিস এল সেনুসি। কিন্তু লিবিয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইবে। একটি সিনেট গঠিত হইবে ২৪ জন সদস্য লইয়া। অর্দ্ধেক সদস্য রাজা কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন এবং অপর অর্দ্ধেক তিনটি প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। প্রতিনিধি পরিষদ সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়াই গঠিত হইবে। প্রতি ২০ হাজার অধিবাসীর জন্য এক জন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন। আগামী ফেব্রুয়ারী মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রতিনিধি পরিষদের জন্য সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। সাধারণ নির্ব্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত একটি অস্থায়ী প্রতিনিধি পরিষদ থাকিবে। লিবিয়ার এই স্বাধীনতাকে সত্যিকার স্বাধীনতা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ইহা সাম্রাজ্যবাদের আওতায় স্বাধীনতার প্রহসন মাত্র। লিবিয়ার জন্য নিযুক্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কমিশনারের রিপোর্ট সম্পর্কে রাজনৈতিক কমিটিতে আলোচনার সময় রাশিয়া এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল যে, ভূমধ্যসাগরকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্স লিবিয়াকে সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করিতে চায়। এই অভিযোগ মিথ্যা নয়। ট্রিপোলিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের ভারী বোমারু বিমানের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বাধীন লিবিয়া দ্বিতীয় আর একটি জর্ডান ছাড়া আর কিছুই হইবে না। সৈয়দ ইদ্রিস এল সেনুসি গ্রহণ করিবেন রাজা আবদুল্লার ভূমিকা। ট্রিপোলিটানিয়াতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। ট্রিপোলিটানিয়ার জাতীয়তাবাদীরা যদি প্রতিনিধি পরিষদে অধিক সংখ্যায় আসন দখল করিতে পারে, তাহা হইলে রাজা সৈয়দ ইদ্রিস এল সেনুসিকে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

ইঙ্গ-মিশর বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি—

ইঙ্গ-মিশর বিরোধের সত্বর কোন মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। প্যারীতে বৃটিশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর সহিত মিশরীয়

পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও সমস্যা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। সন্ত্রাসবাদীদের সহিত বৃটিশ সৈন্যদের সংঘর্ষ প্রায় লাগিয়াই আছে। সুয়েজের সহিত মিশরের সংযোগ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করা হইয়াছে। গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৫১) কায়রোর বামপন্থী পত্রিকা 'আল গোমোর আল মিশরী' মিশরস্থ বৃটিশ সেনাপতি স্যার জর্জ্জ আর্সকাইনের প্রাণনাশের জন্য এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে। কোন বৃটিশ অফিসারকে হত্যা করিতে পারিলেও এক শত পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। সৈয়দ বন্দরের দেড় হাজার মিশরী শ্রমিক যে-ধর্মঘট আরম্ভ করিয়াছে তাহার সত্বর মীমাংসা না হইলে সুয়েজ খালে জাহাজ চলাচল বন্ধ হইবার আশঙ্কা আছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হয়ত মনে করিতেছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থা চলিতে থাকিলে মিশরের রাজা ফারুক এবং মন্ত্রিসভার মধ্যে একটা বিরোধ বাধিয়া যাইতে পারে অথবা মিশরের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের পতন হইতে পারে এবং উহার ফলে ইঙ্গ-মিশর বিরোধের সমাধান খুব সহজ হইবে। কিন্তু এই আশা দুরাশা বলিয়াই মনে হয়।

রাজা ফারুক অমর পাশাকে তাঁহার পররাষ্ট্র সংক্রান্ত উপদেষ্টা এবং আফিফি পাশাকে তাঁহার মুখ্য নিযুক্ত করায় এইরূপ একটা ধারণা সৃষ্টি হইয়াছিল যে, রাজা ফারুক হয়ত মন্ত্রিসভাকে ডিঙাইয়া বৃটেনের সহিত একটা মিটমাট করিয়া ফেলিবেন। এই আশঙ্কার জন্যই ছাত্রগণ এক প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিল। মিশরের জনমত যে মন্ত্রিসভার অনুকূল, এই ঘটনায়ও তাহা বুঝিতে পারা যায়। ওয়াশিংটন হইতে ৩০শে ডিসেম্বরের (১৯৫১) এক সংবাদে প্রকাশ, মিশর মধ্য-প্রাচ্য রক্ষা-ব্যবস্থায় যোগদান করিবে এই সর্ত্তে রাজা ফারুককে সুদানের রাজা বলিয়াও স্বীকার করিয়া লইবার জন্য বৃটেনকে মার্কিণ রাষ্ট্র-দপ্তর অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু বৃটেন এই অনুরোধ রক্ষা করিতে রাজী হয় নাই। এই অনুরোধ রক্ষা করিলেই যে সমস্যার সমাধান হইত তাহা মনে করা কঠিন। কারণ সুয়েজ খাল অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্যের অবস্থিতি মিশর আর সহ্য করিতে রাজী নয়। চার্চ্চিল-ট্রুম্যান আলোচনায় মিশর ও ইরাণের কথা নিশ্চয়ই উঠিয়াছে। কিন্তু ফল কি হইয়াছে তাহা কিছুই জানা যায় না। মিশর মধ্য-প্রাচ্য রক্ষা-ব্যবস্থায় যোগদান করিতে কোন অবস্থায়ই রাজী হইবে কি না তাহাও বলা কঠিন।

মধ্য-প্রাচ্য রক্ষা-ব্যবস্থায় যোগদান করিলেই মিশর যে পরমাণু বোমার আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইবে, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বরং মিশর যদি নিরপেক্ষ থাকে, তাহা হইলে ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লক এবং সোভিয়েট ব্লকের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলেও মিশরে পরমাণু বোমা বর্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ রাশিয়াই ভবিষ্যৎ আক্রমণকারী—ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লক হইতেই এ কথা প্রচার করা হইতেছে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অতি দ্রুত সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইতে ত্রুটি করিতেছে না। এই অবস্থায় মিশর যদি নিরপেক্ষ থাকে, তাহা হইলে রাশিয়ার দ্বারা কোন অবস্থাতেই আক্রান্ত হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। এই সকল বিবেচনা করিয়া মিশর মধ্য-প্রাচ্য রক্ষা-ব্যবস্থায় যদি যোগদান করিতে না চায়, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

ইরাণ কোন্ পথে ?

ইঙ্গ-মিশর সমস্যার মত ইঙ্গ-ইরাণ সমস্যার সমাধানও বহু দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হইতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বোধ হয় বিশ্বাস, অর্থনৈতিক চাপে পড়িয়া ইরাণ নতজানু হইবে। অথবা ইহাও হয়ত তাঁহারা মনে করিতেছেন, ইরাণের শাহের হস্তক্ষেপের ফলে অথবা মোসাদ্দেক গবর্ণমেণ্টের পতন হইলে বৃটেনের অভিপ্রায় অনুযায়ী ইঙ্গ-ইরাণ তৈল-সমস্যার সমাধান সহজ হইবে। অবশ্য ইরাণের আর্থিক অবস্থার যে-সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহা খুবই শোচনীয়। ইরাণের আমদানি-বাণিজ্য শতকরা ৪০ ভাগ হ্রাস পাইয়া গিয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে অনেক দেশ হইতে ইরাণী রাষ্ট্রদূতকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। এংলো-ইরাণীয় তৈল কোম্পানীর প্রাক্তন কর্ম্মীরা অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাইতেছে। এই সকল সংবাদের কতখানি সত্য তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু ইরাণের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোসাদ্দেক কোনরূপ রাজনৈতিক বা সামরিক সর্ত্তে মার্কিণ সাহায্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইরাণকে ২ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার সাহায্য দিতে চায়। এংলো-ইরাণীয় তৈল কোম্পানী হইতে ছয় মাসে যে পরিমাণ রাজস্ব পাওয়া যাইত এই মার্কিণ সাহায্য তাহার সমান। এই সাহায্য গ্রহণ করিলে আর্থিক দিক দিয়া যে অনেক সুবিধা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইরাণকে আর্থিক সাহায্য দান করে, বৃটেন ইহা অবশ্য পছন্দ করে না। কারণ, তৈল-সমস্যার সমাধান হওয়ার পূর্ব্বে এইরূপ সাহায্য দিলে বৃটেনের বিরুদ্ধে ইরাণেরই শক্তি বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া বৃটেন মনে করে। ইরাণের শাহ অবশ্য প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোসাদ্দেককে মার্কিণ সাহায্য গ্রহণ না করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইরাণের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অনেকে আশঙ্কা করেন যে, শাহের এই অনুরোধ রক্ষিত না হইলে সেনাবাহিনী গবর্ণমেণ্ট দখল করিয়া বসিবে। এইরূপ আশঙ্কাকে একেবারে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ইরাণে মার্কিণ সামরিক মিশন রহিয়াছে। কাজেই ইরাণের সৈন্যবাহিনী স্বভাবতঃই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কথা না শুনিলে সৈন্যবাহিনী গবর্ণমেণ্ট দখল করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করিবে।

ইরাণের তৈল-সঙ্কট সমাধানের জন্য বিশ্ব-ব্যাঙ্ক যে প্রস্তাব করিয়াছেন, ডাঃ মোসাদ্দেক তাহাও গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। তিনি তৈলশিল্প জাতীয়করণের বাহিরে এক পাও যাইতে রাজী নহেন। তবে আবাদানের তৈল শোধনাগার বিশ্ব ব্যাঙ্কের সদস্যদিগকে পরিদর্শন করিতে দেওয়ায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকেই আশা পোষণ করিতেছেন। কিন্তু সমাধান এখনও বহু দূরবর্ত্তী মোসাদ্দেক-গবর্ণমেণ্টের স্থলে অন্য গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইলেও ইরাণের জনগণের দাবীকে উপেক্ষা করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব হইবে না। শাসক-শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের আওতায় থাকিতে পছন্দ করিতে পারেন, কিন্তু জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী।

টোরী গবর্ণমেণ্ট ও মালয়—

বৃটেনে টোরী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক মাস যাইতে না যাইতেই নূতন ঔপনিবেশিক-সচিব মিঃ ওলিভার লিটিলটন স্বচক্ষে মালয়ের অবস্থা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মালয় টিন ও রবর-সাম্রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কাজেই বৃটেনে যে কোন দলই গবর্ণমেণ্ট গঠন করুক না কেন, মালয়-রক্ষাকে মুখ্য স্থান না দিয়া পারিবে না। মিঃ লিটিলটনের মালয় পরিদর্শন উপলক্ষে রাজনৈতিক অধিকার পাওয়ার দুরাশা যাঁহারা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে মুখের মত জবাব দিয়া বলিয়াছেন যে, কোন রকম রাজনৈতিক সংস্কার কার্য্যকরী করিবার পূর্ব্বে আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। মালয়ের অবস্থা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের, সেখানে যে রাজনৈতিক সংস্কার সাধন এবং আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজ একই সঙ্গে চলা আবশ্যক, ইহা তিনি স্বীকার করিতে রাজী নহেন।

নয়টি মালয় রাষ্ট্রের সুলতানদের কথা বাদ দেওয়াই ভাল। কারণ, তাঁহাদের বৃটিশ উপদেষ্টাগণ যাহা বলিবেন তাহাই তাঁহাদের কাছে বেদবাক্য। জননেতাদের মধ্যে একমাত্র স্বাধীন মালয় দলের নেতা দাতো ওন বিন জাফরই মিঃ লিটিলটনের সহিত আলাপ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। দশ বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা লাভ বলিতে তিনি কি বুঝাইতে চাহেন, মিঃ লিটিলটন তাঁহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলেন, "উহা একটা লক্ষ্যস্থল মাত্র, উহাকে সঠিক ভাবেই মানিয়া চলিতে হইবে এমন কোন কথা নাই।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "এখানে আমরা কেহই বোকা নই। মালয় যে এখনও স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য হয় নাই, তাহা আমরা সকলেই উপলব্ধি করিতেছি। স্বাধীনতা লাভের যোগ্য হওয়ার পূর্ব্বেই যে-সকল দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহাদের দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখেই রহিয়াছে।" সুতরাং দাতো ওন বিন জাফরই যে বৃটিশ শাসক-শ্রেণীর মনোমত ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি আবার মিঃ লিটিলটনের মারফৎ মিঃ চার্চ্চিলের নিকট নিম্নলিখিত বাণী পাঠাইয়াছেন, "I feel, Mr. Churchill, that you have a grand opportunity of presiding over unification of British Empire instead of over liquidation." অর্থাৎ 'হে মিঃ চার্চ্চিল, আমার মনে হয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিলুপ্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে উহাকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে পৌরোহিত্য করিবার এক বিপুল সুযোগ আপনি পাইয়াছেন।' তাঁহার এই উক্তির উপর মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

মালয়ে কম্যুনিষ্ট দমনের জন্য মিঃ লিটিলটন যে ছয় দফা কর্ম্মসূচী ঘোষণা করিয়াছেন তাহা দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, কম্যুনিষ্ট দমনের কাজ আরও কঠোর ভাবে আরম্ভ করা হইবে। এই পরিকল্পনা ঘোষণা করা উপলক্ষে তিনি বলিয়াছেন, "বৃটিশ বিশ্বাস করে যে, মালয়ে তাহাদের একটি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার আছে এবং যে-পর্য্যন্ত সন্ত্রাসবাদ ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইয়া স্থায়ী স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া তাহারা বুঝিতে না পারিতেছেন, সে-পর্য্যন্ত এই কর্ত্তব্য বৃটিশ পরিত্যাগ করিবে না। এই ঐক্যের পথ নিশ্চয়ই দীর্ঘ হইবে—সম্ভবতঃ ইহা অত্যন্ত দীর্ঘ হইবে—এই পথ বন-জঙ্গল এবং পার্ব্বত্য অঞ্চল দিয়া প্রসারিত।" মালয় সম্পর্কে বৃটেনের টোরী গবর্ণমেণ্টের ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট ঘোষণা আর কিছু হইতে পারে না। বৃটিশ যে স্বেচ্ছায় কোন দিনই মালয় হইতে চলিয়া যাইবে না, মিঃ লিটিলটন বেশ সোজা ভাষায় সেই কথাটাই মালয়বাসীকে জানাইয়া দিয়াছেন।

ট্রুম্যান-চার্চ্চিল সাক্ষাৎকার—

৯ই জানুয়ারী (১৯৫২) তারিখের সংবাদে প্রকাশ, ট্রুম্যান-চার্চ্চিল আলোচনার প্রথম পর্য্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। এই আলোচনার প্রকৃত ফলাফল আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ মতভেদ থাকা সম্ভব নয় এবং আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে বৃটেনের নিজস্ব সত্তা বিলুপ্তপ্রায়, এ কথা মনে রাখিলেই এই আলোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বৃটেনের সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ও সহযোগিতা পাইতে হইলে মিঃ চার্চ্চিলকে বিনা আপত্তিতে মার্কিণ পররাষ্ট্র-নীতি, সামরিক-নীতি ও অর্থনৈতিক-নীতি মানিয়া লইতে হইবে। এই আলোচনার ফলে মিঃ চার্চ্চিল প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নিকট কতখানি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহা ভবিষ্যতে তাঁহার কার্য্য হইতেই শুধু বুঝিতে পারা যাইবে।

সুদূর-প্রাচ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বৃটেনের কতগুলি বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। কম্যুনিষ্ট চীনকে মানিয়া লওয়া এখনও মিঃ চার্চ্চিল বাতিল করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত জাপানের বাণিজ্য বহু বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও বৃটিশ-অধিকৃত হংকং-এর ভিতর দিয়া চলিতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক বন্ধ করিতে চায়। মিঃ চার্চ্চিল বৃটেনের বাণিজ্যিক স্বার্থের ক্ষতি করিয়া হংকং-এর ভিতর দিয়া কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত জাপানের বাণিজ্য বন্ধ করিতে রাজী হইবেন কি? জাপ শান্তি-চুক্তির প্রতিক্রিয়া জাপানে কিরূপ হইয়াছে তাহাও উপেক্ষার বিষয় নয়। বিশেষতঃ খৃষ্টীয় নববর্ষ উপলক্ষে মঃ ষ্ট্যালিন জাপানের অধিবাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে বাণী দিয়াছেন তাহার গুরুত্ব ট্রুম্যান-চার্চ্চিল সাক্ষাৎকার অপেক্ষা কম নয়।

জাপানীরা তাহাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মুক্তিলাভ করুক, মঃ ষ্টালিন তাঁহার বাণীতে এই কামনা প্রকাশ করিয়াছেন। জাপ শান্তি-চুক্তির বিরুদ্ধে জাপানে অসন্তোষ যখন ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে সেই সময়ে জাপানে গণতান্ত্রিক শক্তির জয় কামনা করিয়া মঃ ষ্টালিনের বাণী পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে যে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জাপানের অনেকেই মনে করিতেছে যে, এই শান্তি-চুক্তির ফলে জাপানের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা আরও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু মিঃ ডুলেস তাঁহার সাম্প্রতিক টোকিও পরিদর্শন উপলক্ষে জাপানকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত তাহার বাণিজ্য-সম্পর্ক রাখা চলিবে না। তিনি চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তি করিতে ও বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিতে জাপানকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। জাপান বুঝিতেছে, অস্ত্রসজ্জা করা তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত এবং উহার প্রয়োজনও তাহার নাই। কিন্তু মিঃ ডুলেস নির্দ্দেশ

করিয়াছেন যে, অস্ত্র-সজ্জিত হওয়াই জাপানের কর্ত্তব্য। জাপানের শিল্পকে ক্রমেই যুদ্ধের প্রয়োজনে নিয়োগ করা হইতেছে। মার্কিণ পুঁজিপতিরা জাপানের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতেছেন। ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর কঠোর বাধা-নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে, ধর্ম্মঘট নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং সংবাদ-পত্রের কণ্ঠরোধ করা হইয়াছে। কাজেই আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানে যে সাধারণ মানুষের অসন্তোষ বাড়িয়া উঠিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ৫৭ লক্ষ জাপানী শান্তির আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে এবং জাপানের অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির অধীনে বাস করিয়া জাপানীদের পক্ষে তাহার নির্দ্দেশ অমান্য করা সম্ভব নয়। জাপানীরা নয়—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই আজ জাপানের ভাগ্যনিয়ন্তা।

নিরাপত্তা বাহিনী—

গত ৮ই জানুয়ারী (১৯৫২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে পররাজ্য আক্রমণে বাধা দিবার জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গের সমর্থিত ঐকত্রিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের সৈন্য লইয়া একটি সামরিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে। রাশিয়া ঐকত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন কমিটি (the Collective Measures Committee) বাতিল করিয়া দিবার জন্য এবং কোরিয়া যুদ্ধের অবসান করিবার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক আহ্বানের যে প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫০ সালের ৩রা নবেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে মিঃ একিসনের 'শান্তির জন্য ঐক্যে'র প্রস্তাব গৃহীত হয়। কম্যুনিষ্ট চীনকে আক্রমণকারী ঘোষণা করা এই প্রস্তাবের প্রথম ফল। এই প্রস্তাব অনুসারেই Collective Measures কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত কমিটিই এই নিরাপত্তা বাহিনী গঠনের প্রস্তাব করিয়াছে।

সৌভাগ্য বশতঃ দৈবাৎ রাশিয়ার অনুপস্থিতির জন্য নিরাপত্তা কমিটিতে কোরিয়া যুদ্ধে হস্তক্ষেপের প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু চিরকাল এইরূপ সৌভাগ্য না-ও ঘটিতে পারে। এই জন্য সনদ অনুযায়ী যাহা নিরাপত্তা কমিটির ক্ষমতা, তাহা হইতে নিরাপত্তা কমিটিকে বঞ্চিত করিয়া সাধারণ পরিষদকে এই ক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভেটো ক্ষমতাকে অকার্য্যকর করিয়া এবং বৃহৎ রাষ্ট্রচতুষ্টয়ের মতৈক্য হওয়ার নীতিকে এড়াইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতের অস্ত্রে পরিণত করাই উক্ত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। এই প্রস্তাবের সাফল্য দেখিয়াই নিরাপত্তা বাহিনী গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং উহা গৃহীতও হইল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এখন তাহার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির সাহায্যে যাহাকে খুশী ইচ্ছা আক্রমণকারী সাব্যস্ত করিতে পারিবে। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পূরাপুরি ভাবে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল।

এই নিরাপত্তা বাহিনী কাহার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করা হইবে, এই প্রশ্ন বিশ্ববাসীর মনে স্বতঃই না জাগিয়া পারিবে না। ইরাণে ও মিশরে যাহা ঘটিতেছে তাহাতে এই প্রশ্নের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নামে কোরিয়ায় যুদ্ধ করা হইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অস্ত্র-সজ্জিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ফরমোসাকে সুরক্ষিত করা হইয়াছে। ফিলিপাইন এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের সহিত চুক্তির সামরিক দায়িত্বের কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। ইন্দোচীনে ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার দায়িত্বও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। মধ্য-প্রাচ্য রক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা গঠন করা হইতেছে। জেঃ ফ্রাঙ্কোর সহিতও চুক্তির আয়োজন চলিতেছে। পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করিয়া উত্তর-আটলাণ্টিক গোষ্ঠীভুক্ত করিবার চেষ্টার ত্রুটি করা হইতেছে না। ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের পথে বিস্তর বাধা সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উহার জন্য যথেষ্ট চাপ দিতেছে। চারি দিকের এই সমরসজ্জার মধ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা বাহিনী যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরই একটি ঔপনিবেশিক সৈন্যবাহিনী ছাড়া আর কিছুই হইবে না, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। এই সকল সামরিক আয়োজনকে ভিত্তি করিয়াই যে প্রেসিডেণ্ট টুম্যান এবং মিঃ চার্চ্চিল তাঁহাদের যুক্ত ঘোষণায় বিশ্ব-সংগ্রাম হইবে না বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিগোষ্ঠী রাশিয়াকেই ভাবী আক্রমণকারী বলিয়া প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের এই সকল সামরিক প্রস্তুতিতে ভীত হইয়া রাশিয়া আর আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না, ইহাই উল্লিখিত যৌথ ঘোষণার সরল অর্থ।

নিরাপত্তা বাহিনী গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। রাশিয়া স্বেচ্ছায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিত্যাগ না করিলে তাহাকে বহিষ্কৃত করাও অসম্ভব। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে থাকিয়াও শান্তিরক্ষার ব্যাপারে কোন কার্য্যকরী ভূমিকা তাহার পক্ষ গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। কাজেই রাশিয়াও আত্মরক্ষার জন্য সমরায়োজন করিতে বাধ্য হইবে। ফলে পৃথিবী দুইটি সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হইয়া বিশ্বশান্তিকেই বিপন্ন করিয়া তুলিবে।

কোরিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে রাজনৈতিক কমিটিতে আলোচনাও স্থগিত রাখা হইয়াছে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ মনে করেন যে, এই আলোচনায় কোন ফল হইবে না। কোরিয়া যুদ্ধ যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিচালনা করিতেছে না, করিতেছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, এই ব্যাপারে তাহাও বুঝা যাইতেছে। উত্তর-কোরিয়া ও কম্যুনিষ্ট চীন বহু সংখ্যক যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করিয়াছে, এই অভিযোগ মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। উভয় পক্ষের শিবিরেই বহু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী রোগে ভুগিয়া মারা গিয়াছে বলিয়া এখন স্বীকার করা হইতেছে। যে যুদ্ধ-বন্দী বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চাহিবে তাহাকেই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রস্তাব খুব তাৎপর্য্য-পূর্ণ। তা ছাড়া প্রতি বন্দী-মুক্তির জন্য এক জন যুদ্ধ-বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার এবং বাড়তি যুদ্ধ-বন্দীদের মুক্তির জন্য সমপরিমাণ অসামরিক ব্যক্তির মুক্তি দাবীর প্রস্তাব যুদ্ধবিরতিকে পুনরাক্রমণের ভিত্তিতে পরিণত করার অভিপ্রায় বলিয়াই যদি কম্যুনিষ্টরা মনে করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না।

নির্ব্বাচনের ইঙ্গিত

"এইবারকার নির্ব্বাচনের যেটুকু ফলাফল বাহির হইয়াছে তাহাতে এই কথাই প্রমাণ করে যে, জনসাধারণ ঠেকিয়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, যদিও ঠেকিয়া শেখার পালা তাহাদের সম্পূর্ণ হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। আগেকার দিনে কংগ্রেস ল্যাম্প-পোষ্টকে ভোট দিতে বলিলে লোকে নিঃসঙ্কোচে তাহাই করিত। আজকাল যাঁহারা কংগ্রেস-বিরোধী, তাঁহারাও চোখ-কান বুঁজিয়া কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থীকে ভোট দিতে ছুটিতে চাহিতেছেন না। প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করিবার, যাচাই করিবার আগ্রহ পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বেশী। সব ক্ষেত্রে সঠিক প্রার্থীকে ভোট-দাতারা নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন কি না সে কথা স্বতন্ত্র; তবে এই লক্ষণ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত শুভ এবং ভারতবর্ষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক। সাধারণ নির্ব্বাচনের ভিতর দিয়া ভবিষ্যতের যে ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিতেছে তাহাতে হতাশ হইবার কোনই কারণ নাই, বরং আশান্বিত হইবার যথেষ্ট হেতু আছে।"

—দৈনিক বসুমতী।

বামপন্থী কোথায়?

"কংগ্রেসের ভিতরকার দুর্নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন,—বামপন্থী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু বামপন্থী কোথায়? কংগ্রেসকে গদীচ্যুত করার হুজুগ তুলিয়া বামপন্থী সাজা যায়, কিন্তু প্রকৃত বামপন্থী হওয়া কঠিন। দেশের প্রগতিশীল ব্যক্তি মাত্রেই এই সব মেকি চালাইবার চালাকি দেখিয়া উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। যত দলের নাম দেখা যাইতেছে তাহাদের কার্য্য-কলাপেরই বা পরিচয় কি? মাঝে-মাঝে রাস্তায় শোভাযাত্রা বাহির করা, ডাঃ বিধান রায়ের বাড়ীর সুমুখে হল্লা করা বা বোমা ছোঁড়া ছাড়া কি কাজ ইঁহারা করিয়াছেন? ইঁহারা ব্যবস্থা পরিষদে যাওয়ার জন্ত ব্যাকুল, কিন্তু সেখানে বাজেট আলোচনা, আইনের খসড়া প্রস্তুত এবং আলোচনায় গভর্ণমেণ্টের অন্যায় কার্য্য বিষয়ে প্রশ্ন করা প্রভৃতি হইল আসল কাজ। এই সমস্ত কাজের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রস্তুতি প্রার্থীদের কয় জনের আছে?"

—দৈনিক বসুমতী।

"সত্যকার বামপন্থী রাজনীতি যেন জনসাধারণকে মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ করে ধোঁকা দিয়ে তাদের বিভ্রান্ত না করে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, এ নির্ব্বাচনে বামপন্থীরা তা করেছে এবং করছে। "কংগ্রেসকে এক ভোটও নয়"—এই আওয়াজ তুলে বামপন্থীরা বলতে চাইছেন যে, এখন সব ভোটগুলি বামপন্থীদের দাও তা'হলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।"

—বর্দ্ধমানের ডাক।

"যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের ভিতর দিয়া বামপন্থী এই জীর্ণ কাঠামোটাকে চূর্ণ করিয়া প্রকৃত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তি প্রোথিত করিতে চায়, এই সব তথাকথিত বামপন্থীদের মধ্যে তাহার কোন চেষ্টাই পরিলক্ষিত হয় না। বামপন্থী ঐক্যের ব্যর্থতা সম্বন্ধে সহযোগী "আমরা চাই" বলিতেছেন—বামপন্থী ঐক্য প্রচেষ্টার ব্যর্থতার প্রথম কারণ এই যে, যারা আজ বামপন্থী বলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে তাদের মধ্যে বাজে ও মেকি মাল আছে। এই সমস্ত ভণ্ড বামপন্থীদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে বামপন্থী বুলির সাহায্যে নিজেদের হীন স্বার্থ সাধন করা। এ সম্বন্ধে বেশী লেখার প্রয়োজন নাই। কংগ্রেস যে সব দুর্নীতি বন্ধ করিতে পারিল না, বামপন্থীরা ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির ফিকির না খুঁজিয়া সেই কাজ করিতেই বদ্ধপরিকর হইবেন, সংঘবদ্ধ হইবেন—এ আশায় একান্ত নিরাশ হইতে হইয়াছে।"

—পল্লীবাসী।

পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কট

"পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্কুলের পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ সম্বন্ধে যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে বঙ্গীয় প্রকাশক-সঙ্ঘ ৭ই জানুয়ারী সোমবার হরতাল পালন করেন। বোর্ডের নীতি একই সঙ্গে দেশের লেখক, প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতাদের পক্ষে কিরূপ ক্ষতিকর হইয়াছে, তাহা কর্তৃপক্ষ তথা দায়িত্বশীল জনসাধারণকে বোঝানোর জন্যই যে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। সকলেই জানেন, ম্যাট্রিকুলেশন বা মাধ্যমিক শিক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত হইতে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে গিয়াছে—এখন মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ পরিচালন, তাহার পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ, সব কিছুর কর্তৃত্বই বোর্ডের হাতে। ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশনের ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক নিজেরা প্রকাশ করিতেন—নবম এবং দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী সেই বইগুলি কিনিত, সর্বোচ্চ দুই শ্রেণীর এই পুস্তকগুলি ছাড়া, আর সব বই এবং নিম্নবর্তী শ্রেণীসমূহের সমস্ত বই-ই বাহিরের প্রকাশকরা প্রকাশ করিতেন। প্রথমে জানা গিয়াছিল যে, বোর্ডও এই রীতিই অনুসরণ করিবেন এবং বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃতের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থাও তাঁহারা করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারা নিম্নতর শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকগুলি ধরিয়াও টান দিতে সুরু করিয়াছেন এবং লক্ষণ দেখিয়া অনুমান করা যাইতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে সমুদয় স্কুলপাঠ্য বই রচনা ও প্রকাশের অধিকার তাঁহারা একচেটিয়া করিয়া লইবেন। পাঠ্যপুস্তক রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশকে বেষ্টন করিয়া দেশে বিরাট যে একটি ব্যবসায় চলিত আছে, তা ধ্বংস হইবে, হাজার হাজার লোক তাহাতে বেকার হইবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরহিত হওয়ায় বোর্ড-প্রকাশিত বইগুলিও ক্রমশঃ উৎকর্ষ হারাইয়া ফেলিবে—তাহাতে দেশে শিক্ষার মানও অনিবার্য ভাবেই নামিয়া যাইবে। বোর্ডের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই আশঙ্কা করার কারণ ঘটিয়াছে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক মাত্র একটি প্রতিষ্ঠানকে রচনা ও প্রকাশের অধিকার দিতে দেখিয়া। এই প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা সম্বন্ধে কাহারো মনে কোন সন্দেহ নাই—তাঁহাদিগকে পুস্তক প্রকাশ করিতে দেওয়া সম্বন্ধেও কেহ কিছুই বলিবেন না। কিন্তু কেবল মাত্র তাঁহারাই এ অধিকার পাইলেন, আর সমস্ত প্রকাশকই সুযোগে

বঞ্চিত হইলেন, ইহা শুধু অন্যায় নয়, রীতিমতো অবিবেচনারও পরিচায়ক। আরো পরিতাপের কথা যে, বোর্ড তাঁহাদের এই সঙ্কল্প আগে প্রকাশ করেন নাই—নিম্নতর শ্রেণীগুলির জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক সিলেবাস বা পাঠ্যতালিকাও প্রকাশ করেন নাই। ফলে সমস্ত প্রকাশকই নিজ নিজ গ্রন্থকারদিগকে দিয়া বিজ্ঞানের বই লেখাইয়াছেন, সে সব বই ছাপাও হইয়া গিয়াছে,—তার পর নভেম্বর মাসের শেষে সহসা বোর্ড তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রচার করিলেন। তাহাতে এক নিমেষেই সমস্ত বই বাতিলের কোঠায় গিয়া পড়িল—লেখকদের শ্রম, প্রকাশকদের ব্যয়, কাগজ, ছবি, ছাপাই সব কিছুর খরচ বেমালুম জলে পড়িল। আজিকার দিনে এই ভূরি পরিমাণ কাগজ, শ্রম ও অর্থের অপচয় কি ব্যাপার, সে সম্বন্ধে যাঁহাদের কোন ধারণা আছে, তাঁহারাই হতবুদ্ধি হইবেন। কয়েক মাস আগেই বোর্ড যদি এই সঙ্কল্প প্রকাশকদিগকে জানাইয়া দিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের নীতি সমর্থনযোগ্য হইত না সন্দেহ নাই, তবু এই অতুলনীয় অপব্যয়টা হইত না! এ ভাবে প্রকাশক ও লেখকদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কোনই অর্থ হয় কি? প্রকাশক-সঙ্ঘের তরফ হইতে এই আদেশ রদ করিয়া, অন্যান্য বইকেও বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বলিয়া ঘোষণা করার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল—জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ শেষ হইল, স্কুলসমূহে পঠন-পাঠন সুরু হইয়া গিয়াছে, এখনো কর্তৃপক্ষের জবাব পাওয়া যায় নাই। সমাজ-জীবনের সর্বাঙ্গ অপরিবর্তিত রাখিয়া, এক নিমেষে স্কুল পাঠ্যপুস্তকের ব্যবসাটা জাতীয় এক্তিয়ারে লইয়া আসা চলে না। তাহার ফল অশুভ ছাড়া আর কিছুই হইবে না। প্রকাশক-সঙ্ঘের এই হরতাল হইতেই বোর্ডের বিজ্ঞ সদস্যেরা আশা করি, সতর্ক হইবেন এবং অযথা স্বৈরাচরণের দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে অনর্থক একটা গণ্ডগোল ডাকিয়া আনিবেন না।" —যুগান্তর।

তেয়াগ?

বোম্বাই অঞ্চলে একটি নূতন আয়কর অফিসের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে বিরাট চারিতলাবিশিষ্ট অট্টালিকা নির্মিত হইবে তাহার ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমহাবীর তেয়াগী বলিয়াছেন, "আয়কর সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা এখন বদলান দরকার। আয়কর ধনীদের দ্বারা প্রদত্ত দান মনে করিতে হইবে। এই দান দেশের দরিদ্র-সাধারণের জন্য রাষ্ট্রের নিকট গচ্ছিত থাকিবে।" মৌলিক গবেষণা সন্দেহ নাই। আয়করের এই উচ্চ এবং পরোপকার-মূলক ধারণা যদি ভারতের কোটিপতি মিল-মালিক ও অন্যান্য ধনীদের মনে বাসা বাঁধিতে পারে, তবে ভালই। কিন্তু আয়কর দরিদ্রের উপকারের জন্য প্রদত্ত অর্থ হইলেও উহা রাষ্ট্রের নিকট গচ্ছিত থাকিয়া প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবে তো? বর্তমান রাষ্ট্রের গরীব-সেবায় যে নমুনা দেখা যায়, তাহাতে রাষ্ট্রের পাঞ্জার মধ্য দিয়া গরীবের উপকারের জন্য জল গলিবে, এমন আশা কিন্তু অনেকেই রাখেন না।"

—যুগান্তর।

হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের নূতন অভিযান

"বিহার সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন—বিহার সরকারী ভাষা আইন (১৯৫০ সাল) বিহারে অবিলম্বে চালু হইবে। অর্থাৎ দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষা বিহারের সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে এখন হইতেই ব্যবহৃত হইবে। তদনুসারে সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রী করাইবার দলিলপত্র দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দীতে লেখাইতে হইবে। থানায় থানায় অভিযোগের প্রথম এত্তালা (ডাইরী) হিন্দী ভাষায় লেখা হইবে। ইন্সপেক্টার, সাব-ইন্সপেক্টররা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষা করিয়া তাহাদের পরীক্ষার মন্তব্য, তাহাদের ও এই সকল স্কুলের হেডমাষ্টারদের মধ্যে পত্রের আদান-প্রদান, এসেম্ব্লী ও কাউন্সিলে প্রশ্নোত্তর সম্পর্কীয় পত্রালাপ ও বিহার গেজেটের ১ম, ৪র্থ ও ৫ম ভাগ এখন হইতে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষায় হইবে। বিহারের আদালতসমূহে হিন্দী ভাষা চলিবে অর্থাৎ মোকদ্দমার আবেদনপত্র জবাব দরখাস্ত আদি হিন্দী ভাষায় লিখিতে হইবে। শমন নোটিশ প্রভৃতি হিন্দী ভাষায় লেখা হইবে ও জারী হইবে। বাদী বিবাদী আসামীর এজাহার ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য হিন্দী ভাষায় লেখা হইবে; এবং হয়ত হিন্দী ভাষাতে দিতে হইবে। উকীল মোক্তারদিগকেও হয়ত হিন্দী ভাষাতেই সওয়াল জবাব করিতে হইবে। এই সময়ে আসন্ন নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে এইরূপ একটা অদ্ভুত বিপর্য্যয়ের ব্যবস্থা কেন করা হইল, তাহা হয়ত অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু গভীর ভাবে একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই নির্ব্বাচনের কাজ হইতে জনগণের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইহা করা হইয়াছে। যে সকল হিন্দীভাষী জনগণ এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছেন তাঁহারা সরকারের দৌলতে তাঁহাদের হিন্দী গোঁড়ামির অনুকূল আবহাওয়া পাইয়াছেন ভাবিয়া কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতে ক্ষান্ত হইতে পারেন, এবং যে সকল বঙ্গভাষাভাষী এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছেন, তাঁহাদের ভাষার উপর এই নূতন আক্রমণের দিকে তাঁহাদের মনোযোগ ও শক্তি-সামর্থ্য আকৃষ্ট হইলে নির্ব্বাচনের কাজে তাঁহাদের শৈথিল্য ঘটিতে পারে—এই অভিপ্রায় ইহার পশ্চাতে থাকা খুবই সম্ভব। তাহা ছাড়া ইহাতে বাংলাভাষীকে বিহার হইতে সমূলে উৎপাটিত করিবার চেষ্টাও রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহাতে বিপরীত ফল হইবে। এই সময়ে এইরূপ একটা অনর্থের সৃষ্টি করায় শত্রু-মিত্র সকলেই সরকারের ও কংগ্রেসের প্রতি আরও বিরূপ হইবে।" —মুক্তি।

বণিকের মানদণ্ড

"নির্ব্বাচনের গণ্ডগোলে একটা জিনিষ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—মারোয়াড়ী বণিকগণের স্বার্থ কায়েম রাখার আপ্রাণ চেষ্টা। ইহারা নানা ভাবে নানা বেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে সহায়তা করিতেছেন, প্রভাবশালী লোকগুলিকে হাতে রাখিবার জন্য সকল প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতেছেন। কোন দলকে সাহায্য করাটাই খারাপ বলি না, তবে যদি দানের পশ্চাতে মৎলব থাকে তবে তাহা খুবই সন্দেহ উদ্রেক করে। ইংরাজ চলিয়া যাইবার পর ইহারা যে ভাবে ভারতের আর্থিক কাঠামোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঝাঁকিয়া বসিয়াছেন, জোঁকের মত তাহাতে লাগিয়া থাকিবার চেষ্টা দেখিলে তাই আঁৎকাইয়া উঠিতে হয়। কোন সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না। ভারতের অর্থ-সমস্যা ও জাতীয়

জীবনকে যাঁহারা নিজেদের কায়েমী স্বার্থের তাঁবে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা সেই শ্রেণীটিকে লক্ষ্য করিয়াই দেশবাসীকে সতর্ক করিতে চাই। আসন্ন নির্ব্বাচনে ইহারা যে আজ সকল দলকেই হাতে রাখিতে চাহিতেছে, ইহার যে কোন সাধু উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না—এ টাকা যে উহারা শত গুণে আদায় লইবেন ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং যে কোন দলই উহাদের টাকা লউন, মনে রাখিবেন, ভবিষ্যৎ ভারত যে কেহ কায়েমী স্বার্থের অনুকূলে কথা বলিবে তাহাকেই শত্রু মনে করিবে। ইংরাজ চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা ভারতের আমদানী ও রপ্তানী-বাণিজ্য করায়ত্ত করিয়া কোটি কোটি লোকের বেদনা বাড়াইয়াছেন। দুই টাকা খরচে দুই লক্ষ পকেটস্থ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি ইহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। সুতরাং দেশবাসীকে সরকার ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী এই শোষক শ্রেণীটির প্রতি সতর্ক থাকিতে হইবে।" —পল্লীবাসী।

পাকিস্থানী অত্যাচার

"জলপাইগুড়িতে পাকিস্থানী সৈন্য পুনঃ পুনঃ অত্যাচার করিয়া লুঠপাট করিতেছে—সম্প্রতি ২৫ হাজার টাকা চা-বাগান হইতে লুঠ করিয়াছে। স্থানে স্থানে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া গরু-মহিষাদি লুণ্ঠন, নারীহরণ, নরহত্যা ও গৃহাদি ধ্বংস ও ধন-সম্পত্তি হরণ করিতেছে। ইহা যেন নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া উঠিয়াছে! সীমান্তবাসিগণ সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই সব বিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ জানাইয়াও প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না—ইহাও ভারতবাসীর আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" —মেদিনীপুর হিতৈষী।

কংগ্রেসী-মহলে বিক্ষোভ

"ত্রিপুরা কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীর নাম নাকচ করিয়া বিড়লার কেরাণী শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তীকে মনোনীত করায় স্থানীয় কংগ্রেসী-মহলে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে ও বহু কর্ম্মী ও নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন। স্থানীয় কংগ্রেসীরা সুকুমার বাবুর মনোনয়নের বিরুদ্ধে ১০২৫৲ টাকার তার করিয়া প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। ত্রিপুরা কংগ্রেস সভাপতি সদলবলে অতুল্য ঘোষ, বিধান রায় প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত মনোনয়ন নাকচ করিবার দাবী করিয়া বিফল-মনোরথ হয়েন। ত্রিপুরা রাজ্য এবং অন্যান্য স্থানের যে সমস্ত কংগ্রেসীরা কংগ্রেসের মাধ্যমে দেশের উন্নতির আশা করেন ও আদর্শ বজায় রাখিতে চাহেন, তাঁহাদের চোখ ইহাতে নিশ্চয়ই খুলিয়া যাইবে।" —জনসঙ্ঘ।

মূল্যবান রাজপথ

"পশ্চিমবঙ্গে রাস্তা নির্ম্মাণের পরিকল্পনা লইয়া গত পাঁচ বৎসরে ৭ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। গড়পড়তায় এক মাইল রাস্তা বানাইতে ৫৩ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। সমগ্র প্রদেশে মাসে গড়ে ২০ মাইল রাস্তা নির্ম্মাণ করাইবার জন্য বারমেসা মন্ত্রী বিমল সিংহ ও ঠিকা মন্ত্রী ভূপতি মজুমদারকে এই দপ্তরের ভার দেওয়া হইয়াছে। বাংলা দেশের রাজস্ব যদি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের লটারীতে পাওয়া টাকা হয়, তবে বলিবার কিছুই নাই। রাষ্ট্র কংগ্রেসীদের পৈত্রিক সম্পত্তি নহে। রাষ্ট্রের মালিক জনসাধারণ এইরূপ অক্ষম, অপদার্থ, এবং স্বার্থলোলুপ, আশ্রিত-বাৎসল্য কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ জনসাধারণের ক্ষতি সাধনই করিয়া আসিতেছে, দেশের উন্নতি কিছুই করে নাই। অক্ষম কংগ্রেস সরকারকে বিদায় দেওয়ার ভার জনসাধারণের হাতে। বাংলা ও বাঙালী জাতির ইতিহাসে গত পাঁচ বৎসরের কংগ্রেসী রাজত্ব সর্ব্বাপেক্ষা কলঙ্কিত অধ্যায়। কংগ্রেস রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব পাইয়া অভিজ্ঞতায় প্রমাণ করিয়াছে যে, তাহারা সেই দায়িত্ব দেশের কোনরূপ কল্যাণে নিয়োজিত করিতে অক্ষম।" —হিন্দুবাণী।

কংগ্রেসী সরকার ও ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ

"বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও রাশিয়ার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ সম্প্রতি যাদবপুর ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজের সমাবর্ত্তন উৎসবে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অযোগ্যতা সম্পর্কে কতকগুলি কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ কৃষ্ণণ বলেন যে, আজকাল নেতৃবর্গ কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হইলেই বলেন যে, কি করিব—দেশে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প—এত অসুবিধার মধ্যে কি কোনো কাজ করা যায়? ডাঃ কৃষ্ণণ নেতৃবর্গকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন যে, পশ্চিম-ইউরোপের ছোট ছোট গণতান্ত্রিক দেশগুলি বিগত মহাযুদ্ধের সময় সব চাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহারা কি করিয়া এত দ্রুত দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইল? ডাঃ কৃষ্ণণ নিজ প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত ভাবে দেন নাই। কিন্তু আমরা তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ একমত। আসল প্রশ্ন আজ 'অসুবিধা নয়', প্রশ্ন হইল সদিচ্ছার এবং যোগ্যতার। কারণ, ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষ আজ যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, অনেক রাষ্ট্রেই সে সব সমস্যা ছিল; কিন্তু সেই সব দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা দৃঢ়হস্তে সমস্যা সমূহের মূলোচ্ছেদ করিয়া দেশকে কল্যাণ ও প্রগতির পথে আগাইয়া দিয়াছেন। তবে ভারতবর্ষে জওহরলাল, বিধান রায়ের মত বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ থাকিতেও ভারতের এত দুর্দ্দশা কেন? কারণ, আজ ভারতের নেতৃবর্গ পুঁজিবাদের কবলে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাই কংগ্রেসী নেতৃবর্গ আজ বন্যা, ভূমিকম্প ও মহামারীর দোহাই পাড়িতেছেন। আমরা অত্যন্ত বিনীত ভাবে আজ জওহরলালজী ও তাঁর অনুচরবর্গকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, জীপস্ক্যাণ্ডাল, সুগার-স্ক্যাণ্ডাল প্রভৃতি শত শত কেলেঙ্কারিতে যে হাজার হাজার কোটি অর্থ অপব্যয়িত হইয়াছে, তাহাও কি বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্পের জন্য হইয়াছে? বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে শিল্প জাতীয়করণ স্থগিত রাখা হইয়াছে—তাহাও কি ঐ একই কারণে? যে প্রশ্ন আজ দেশের অন্যতম ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের মত প্রাজ্ঞের মনেও উদিত হইয়াছে—তাহার জবাব দিবে কে?" —কর্ম্মিদল।

কাশ্মীর সমস্যা

"গণপরিষদ গঠনে কাশ্মীর সমস্যার একরূপ মীমাংসা হইলেও রাষ্ট্রসংঘ বা পাকিস্থান কেহই তাহাতে তুষ্ট নয়। পাকিস্থান প্রধান মন্ত্রী হইতে প্রাদেশিক মন্ত্রীরা পর্য্যন্ত এখনও ইহা লইয়া জেহাদ

ঘোষণা করিয়া চলিয়াছেন। রাষ্ট্রসংঘ প্রতিনিধি ডাঃ গ্রাহামও মীমাংসার পথ খুঁজিতে সেখানে ভারতের প্রতিনিধির সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন। এদিকে কাশ্মীরবাসিগণ কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যে এক অন্তর্বর্ত্তী কালীন সংবিধান প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছে এবং নিয়মতান্ত্রিক শাসকপদে যুবরাজ করণ সিংকে নিয়োজিত করিয়াছে। ইহাতে আরও হতাশ ও রুষ্ট হইয়া আজাদ কাশ্মীরীর সর্দ্দারদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। তাহাতে সুযোগ বুঝিয়া পাকিস্থান তাহাদের অধিকৃত কাশ্মীরাংশের শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করায় এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।" —প্রদীপ।

কলিকাতার নূতন শেরিফ

কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী মহোদয়কে এই বৎসরের জন্য কলিকাতার শেরিফ নিযুক্ত করায় যোগ্য ব্যক্তিকেই সম্মানিত করা হইয়াছে বলিয়া আমরা আনন্দবোধ করিতেছি। মহারাজার ন্যায় এমন অজাতশত্রু লোক এ দেশে দুর্লভ। তাঁহার পরলোকগত পিতৃদেবের ন্যায় তাঁহার নামও দানশীলতা, সামাজিকতা ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্য এ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট সুপরিচিত। শিক্ষা সমাপ্তির পর হইতেই তিনি জনসেবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজা প্রথম বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন প্রবর্ত্তনের পর মিঃ এ, কে, ফজলুল হক প্রথম যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন, ন্যাশনালিষ্ট পার্টি হইতে মহারাজা অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে তাহাতে যোগদান করিয়া সেচ, বস্ত্র ও পূর্ত্ত বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। মহারাজা সাহিত্য সঙ্গীত চারুকলা ও ক্রীড়ানুরাগী। মহারাজা এই নূতন শেরিফ পদে অধিষ্ঠিত হওয়াতে আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

"ঢলতা" প্রথা

"বীরভূমে 'ঢলতা' প্রথার উচ্ছেদকল্পে বহু আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইহার উচ্ছেদ তো দূরের কথা, এখন আবার নব উদ্যমে বিভিন্ন আড়তদারগণ ও মিল-মালিকগণ ধান বিক্রয়কারিগণের নিকট হইতে মণ-প্রতি চার সের হইতে ছয় সের পর্য্যন্ত 'ঢলতা' কাটিয়া নিয়ন্ত্রিত মূল্যে তাহার মূল্য দিয়া সকলকে বিদায় করিতেছে। ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, দরিদ্র চাষী বা নিরক্ষর জনসাধারণ ইহাদের এই অন্যায় জুলুম নির্ব্বিবাদে হজম করিতে বাধ্য হইলেও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ ইহার প্রতি উর্দ্ধনেত্র হইয়া থাকেন কিরূপে? মণ-করা চার সের হইতে ছয় সের "ঢলতা' কাটিয়া যে দাম ধান্য বিক্রয়কারীকে দেওয়া হয়, তাহাতে সরকারী 'বোনাসের' টাকা প্রকারান্তরে চাষীরা না পাইয়া সেই সব মিল-মালিক ও আড়তদারগণের পকেটেই ঢুকিতেছে। একেই তো চাষীদের ঘরে এই সময় ধান নাই—সরকারী 'বোনাসের' বেশীর ভাগই জমিদার বা জোতদারদের ট্যাঁকেই অবাধে ঢুকিতেছে। তার উপর যাহা চাষীরা পাইত তাহাও 'খোদার উপর খোদকারী' করিয়া মিল-মালিক ও আড়তদারগণই পকেটস্থ করিতেছে। কে ইহার প্রতিকার করিবে?" —বীরভূমবার্ত্তা।

কলিকাতা হাইকোর্টের নূতন রেজিষ্ট্রার

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫১ সালের ১১শে নভেম্বর তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রারের পদে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্যাকাল্‌টি অব ল হইতে নির্ব্বাচিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্কাউটের ষ্টেট্ কমিশনার এবং দ্বিতীয় কলিকাতা বয়স্কাউট-সংঘের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার। নূতন পদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য তিনি নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সহিত পালন করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

পরলোকে অনিল রায়

বাংলা দেশের অগ্নিযুগের খ্যাতনামা বিপ্লবী ফরোয়ার্ড ব্লক-নেতা শ্রীঅনিল রায় দুরন্ত আন্ত্রিক ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ৭ই জানুয়ারী সোমবার কলিকাতা প্রিন্স অফ ওয়েলস্ হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অনিল রায় স্কুল-জীবন হইতেই বাংলার তদানীন্তন বৈপ্লবিক কার্য্যাবলীর সংস্পর্শে আসেন এবং সেই সময় হইতে আজীবন দেশের রাজনৈতিক জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকিয়া সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা লীলা রায় ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-পরিজনের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিতেছি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

ঘুমঘোরে

—সুনীলমাধব সেনগুপ্ত অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

কথামৃত

কুমীর জলের উপর ভাসিতে ভালবাসে, কিন্তু মনুষ্যের তাড়নায় তাহাকে অগাধ জলে ডুবিয়া থাকিতে হয়, তথাপি সময়ে সময়ে সে ভোস্ করিয়া জলের উপরিভাগে উঠে। সচ্চিদানন্দ-সাগরে তোমাদেরও সেরূপ ভাসিয়া বেড়াইবার বড় সাধ। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রাদির অনুরোধে তোমাদিগকে মায়ার অগাধ জলে ডুবিতে হয়। তথাপি সময় সময় হরিনাম করিও এবং কাতর-প্রাণে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিয়া দুঃখ জানাইও। যথাসময় শ্রীহরি তোমাদিগকে আশ্রয় দান করিবেন।

শিশু ছেলে যেমন লাল-চুষী পাইয়া তাহাতে ভুলিয়া থাকে, যখন সে চুষী ফেলিয়া মা বলিয়া চেঁচিয়া উঠে, তখন মা তাহার নিকটে আসেন ও তাহাকে বুকে করিয়া স্তন্যদান করেন। এইরূপ সংসারের অনেক চকচকে সামগ্রী আছে, লোকে ছেলেমানুষের ন্যায় তাহা পাইয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকে, তাহা ফেলিয়া ভগবানকে কাতর-প্রাণে ডাকিলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়।

যে হাতে খুব তেল মাখা, সে হাতে কাঁটালের আটা লাগিলে কিছু হয় না। মনে যোগরূপ তেল মাখিয়া সংসারে বাস কর, সংসারের আসক্তি তোমার মনকে বিকৃত করিতে পারিবে না।

ছেলেরা লুকচুরী খেলে। যে বালক বুড়ীকে একবার ছুঁতে পারে, সে যেখানে দৌড়িয়া যাক না কেন, চোর ধরিলেও তাহার কিছু হয় না। একবার ঈশ্বরকে ধরিয়া মনুষ্য পরে সংসারে বিচরণ করিলে সহস্র প্রলোভনের মধ্যেও তাহার কিছুই হইবে না।

অজ্ঞান মনুষ্য ছেলেমানুষের ন্যায়। ছেলেমানুষ একটা রাঙ্গা পুতুল দেখিতে পাইলে টাকা-মোহর ফেলিয়া সেই পুতুল পাইবার জন্য দৌড়িয়া যায়। বাল্যস্বভাব অজ্ঞান লোক ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অসার সংসারে আসক্ত হইয়া পড়ে।

ঘুনির ভিতরে চিক্ চিক্ করিয়া জল যায়, তাহা দেখিয়া যেমন পুঁটি মাছগুলি আনন্দে তাহার ভিতরে প্রবেশ করে আর বাহির হইতে পারে না, মারা পড়ে। এরূপ সংসারের বাহ্য চাকচিক্য দেখিয়া অজ্ঞান লোক সংসারে প্রবেশ করে, সেখানে আবদ্ধ হইয়া থাকে। ঘুনির ন্যায় সংসারে প্রবেশ সহজ, তথা হইতে বাহির হওয়া কঠিন ব্যাপার।

হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকেরা মাথার উপর ৪।৫টি জলের কলস বসাইয়া আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পথে কথা কহে, হাসি-গল্প ইত্যাদি করে, কিন্তু মাথার কলস যেন পড়িয়া না যায়, তৎপ্রতি তাহাদের অন্তরের বিশেষ লক্ষ্য থাকে। এইরূপ কর্ম্মপথের যাত্রিকগণকেও সংসারের কাজ-কর্ম্মের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে, যেন তাঁহা হইতে অন্তর বিচ্যুত না হয়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বাণী

হে ঈশ্বর, তুমি তো জানো আমরা কত দুর্বল, কত অক্ষম, কত ক্ষণভঙ্গুর। মুখোমুখি তোমার সামনে গিয়ে যে দাঁড়াতে পারি এমন আমাদের সাধ্য নেই। কি করে সইব তোমার সেই আলো, কি করে বইব তোমার সেই ভালোবাসা! আমরা ক্ষুদ্র, আমরা ক্ষীণ, আমরা অপ্রাণ। তা জানো বলেই তো আমাদের জন্য তোমার এত কৃপা, এত অনুকম্পা। তাই তো তোমার ও আমাদের মাঝখানে তুমি অন্তরাল রচনা করেছ। তোমার চিরন্তন উপস্থিতির উলঙ্গ উজ্জ্বলতা সইতে পারব না বলেই এই অন্তরাল। এই অন্তরালটিই তোমার মায়া। এই অন্তরালের নামই সংসার।

ছোট-ছোট বেড়া তুলে দিয়েছ আমাদের চার পাশে। ধনের বেড়া মানের বেড়া অহঙ্কারের বেড়া। তুচ্ছ আশা-আকাঙ্ক্ষার শুকনো খড়কুটো দিয়ে চাল ছেয়ে দিয়েছ মাথার উপরে। আশে-পাশে ছোট-ছোট সুখ-দুঃখের ঘুলঘুলি বসিয়েছ। মৃত্তিকার মেঝেটি শীতল করে লেপে দিয়েছ স্নেহ-প্রেমের সিঞ্চনে। এমনি করে অপরিসর ঘরের মধ্যে আমাদের ঢুকিয়ে দিয়ে তুমি দূরে সরে দাঁড়িয়েছ। সরে না দাঁড়িয়েই বা করবে কি। তোমার কি দোষ! আমরাই যে অশক্ত, অসমর্থ। তোমার আলোর ছটায় আমাদের দু চোখ যে ধাঁধিয়ে যাবে, তোমার ভালোবাসার ভারে ভেঙে পড়বে যে আমাদের বুক। তাই তুমি কৃপা করে তোমার ও আমাদের মাঝখানে মায়ার যবনিকা ফেলে রেখেছ। রেখেছ এই রমণীয় ব্যবধান। এই মনোহর দূরত্ব।

সংকীর্ণ পর্বতপথরেখা ধরে চলেছে রামসীতা, অনুগামী লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে। সর্বাগ্রে রাম, রামের পিছনে সীতা, সীতার পিছনে লক্ষ্মণ। এই তাদের বনাভিযানের চিরন্তন চিত্র। রাম আর লক্ষ্মণের মাঝখানে অপরিহরণীয়া সীতা। লক্ষ্মণ ভাবছে, এত দিন চলেছি একসঙ্গে, রামকে দাদা ছাড়া আর কিছু বলে দেখতে পেলাম না কোনো দিন। হনুমান তাঁকে নারায়ণ বলে সেবা করছে, বিভীষণও পূজা করছে বিষ্ণুজ্ঞানে, কিন্তু আমার কাছে তিনি শুধু আমার সেই সাদাসিদে দাদা, দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমি তো কই তাঁকে কেষ্টবিষ্টু রূপে দেখতে পাচ্ছি না। কি করে পারবে? কি করে রামকে দেখবে তাঁর স্বভাব-মূর্তিতে? লক্ষ্মণ আর রামের মধ্যখানে যে মায়ারূপিণী সীতা দাঁড়িয়ে। মায়াই যে দেখতে দিচ্ছে না মায়াধীশকে। সীতা যতক্ষণ না সরে দাঁড়াচ্ছেন ততক্ষণ শ্রীরামদর্শন হচ্ছে না লক্ষ্মণের। ততক্ষণ রাম শুধু দশরথের ছেলে, শুদ্ধ-ব্রহ্ম-পরাৎপর রাম নয়।

তেমনি, ঈশ্বর, এই মায়াময় সংসার সৃষ্টি করে তুমি আমাদের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করেছ। তোমাকে ভুলে-থাকবার খেলায় অষ্টপ্রহর মেতে আছি আমরা। কিন্তু তুমি তোমার নিজের খেলায় মেতে থেকেও আমাদের ভোলনি। যবনিকা সরিয়ে মাঝে-মাঝে উঁকিঝুঁকি মারছ। আভাসে তোমার গায়ের বাতাস আমাদের গায়ে লাগছে। আমরা চমকে-চমকে উঠছি, বুঝতে পারছি না, ধরতে পারছি না। এমন একেকটা আনন্দ দিয়েছ, তোমাকে দেখবার জন্য ব্যগ্র হয়ে বাইরে ছুটে এসেছি। এমন একেকটা দুঃখ দিয়েছ, ঘরের নিঃসঙ্গ অন্ধকারে কেঁদেছি তোমাকে বুকে নিয়ে। তবু, কই, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি কই। রুদ্ধদৃষ্টি বধির যবনিকা দুর্ভেদ্য বাধা মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে চোখের সামনে।

এই যবনিকা উত্তোলন করো। উন্মোচিত করো এই নিষ্ঠুর অবগুণ্ঠন। তোমাকে দেখতে দাও। দেখতে দাও তোমার সম্পূর্ণ মুখচ্ছবি। তোমার নীরবতার মুখ, গভীরতার মুখ, অতলতার মুখ পদ্ম যেমন সূর্যকে দেখে, তেমনি করে দেখতে দাও

তোমাকে। তুমি অপাবৃত হও, উদ্ঘাটিত হও, দূর করে দাও এই আচ্ছাদনের কুহেলি।

সারদা হঠাৎ মুখের ঘোমটা খুলে দাঁড়াল রামকৃষ্ণের সামনে। আর রামকৃষ্ণ করজোড়ে স্তব করতে লাগল।

মুখের ঘোমটা ঠিক সারদা নিজে সরায়নি, সরিয়েছে আরেক জন। সেই কথাটাই বলি।

এমনিতে সব সময়ে মুখের উপর ঘোমটা টানা সারদার। যখন রামকৃষ্ণের কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন জড়পুত্তলী ছাড়া তাকে আর কি বলবে! যা-ও দু-একটা কথা কয়, তা-ও ঘোমটার ভিতর দিয়ে। কথার সঙ্গে-সঙ্গে মুখের ভাবটি কেমন হয় তা কে জানে!

রামকৃষ্ণের তখন খুব অসুখ, সারদা থাকে দূরে, শম্ভু বাবুর সেই চালাঘরে। রামকৃষ্ণের সেবার তাই অসুবিধে হচ্ছে। কাশী থেকে কে একজন মেয়ে এসেছে, সেই সেবা করছে রামকৃষ্ণের। সেই মেয়ের কি নাম, কোথায় বাড়ি, কবে এল কবে যাবে কেউ কিছু খবর রাখে না।

এক দিন রাত্রে সেই কাশীর মেয়ে চালাঘর থেকে সারদাকে ধরে নিয়ে এল। ধরে নিয়ে এল সটান রামকৃষ্ণের ঘরের মধ্যে। রামকৃষ্ণ যেখানে বসে ছিল, সেইখানে তার চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সারদা। মুখে তার সেই দীর্ঘ ও দুর্ভেদ্য ঘোমটা।

কাশীর মেয়ে সহসা সবল হাতে সারদার সেই মুখের ঘোমটা খুলে ফেলল এক টানে। রামকৃষ্ণকে দেখাল সেই মুখ।

রামকৃষ্ণ কী দেখল রামকৃষ্ণই জানে।

করজোড়ে তৎক্ষণাৎ সে স্তব সুরু করল। কোথায় অসুখ, কোথায় সেবা, সমস্ত রাত ভগবৎ-কথা ছাড়া আর কথা নেই। ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল সারদা। পটার্পিতের মত। কখন যে রাত পুইয়ে ভোর হয়ে গেল ধীরে-ধীরে, কেউ টের পেল না।

এবারে কলকাতায় এসে সোজাসুজি দক্ষিণেশ্বরে উঠল না সারদা। সঙ্গে প্রসন্নময়ী ছিল, উঠল প্রথমে তার বাসায়। পরদিন সকালে দক্ষিণেশ্বরে হাজির। সারদার মা শ্যামাসুন্দরী সেবার সঙ্গে এসেছে, সারদা তাই একটু তটস্থ। মনে আশা, মাকে কেউ একটু সমাদর করুক। মিষ্টি করে কথা বলুক দুটো।

বরং ঠিক তার উলটোটা ঘটল। হৃদয় এল তেরিয়া হয়ে। শ্যামাসুন্দরীকে লক্ষ্য করে বললে, 'এখানে কি! এখানে তোমরা কি করতে এসেছ?'

শ্যামাসুন্দরী তো হতবাক। সারদা অপ্রস্তুত। এমন কাণ্ড কে কবে দেখেছে! দরজায় পা দিতে-না-দিতেই গলাধাক্কা!

আর কাউকে কথা বলতে দিল না। নিজেই গজরাতে লাগল হৃদয়: 'তোমাদের এখানে আসবার কি দরকার! বলা নেই কওয়া নেই সটান এখানে এসে হাজির! এখানে মজাটা কিসের জানতে পাই?'

শ্যামাসুন্দরী শিওড়ের মেয়ে, হৃদয় তাই তাকে গ্রাহ্যই করলে না। উলটে অপমান করলে। সবাই ভাবলে রামকৃষ্ণ এর একটা প্রতিকার করবে। কিন্তু হাঁ-না কিছুই বললে না রামকৃষ্ণ। বলতে গেলে গালমন্দ করে হৃদয় তাকে নাস্তানাবুদ করবে। হৃদয়ের মুখ তো নয় যেন বিষের হাঁড়ি। হৃদয়কে রামকৃষ্ণের বড় ভয়।

শেষকালে শ্যামাসুন্দরী বললে, 'চল দেশে ফিরে যাই। এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব?'

অন্তরে মরে গেল সারদা। মার মনের ব্যথাটি গুমরাতে লাগল মনের মধ্যে।

'তাই যাও মেয়ে নিয়ে। ওরে রামলাল, পারের নৌকো এনে দে।'

রামলাল নৌকো নিয়ে এল। সেই দিনই মাকে নিয়ে ফিরে গেল সারদা। আর কোনো দিন আসব না এমন কোনো প্রতিজ্ঞা করল না রাগ করে। বরং মা-কালীকে উদ্দেশ করে মনে-মনে বললে, 'মা, আবার যদি কোনো দিন আনাও তো আসব।'

হৃদয়কে নিয়ে রামকৃষ্ণের বড় যন্ত্রণা। বড় হাঁক-ডাক করে, কথায়-কথায় হৈ-হুজ্জুত। এত শাসন-জুলুম ভালো লাগে না রামকৃষ্ণের। অথচ উচ্চ-বাচ্য করার জো নেই। কিছু বলতে গেলেই আবার তেড়ে আসবে। দাঁতে খড়কে দিয়ে বসে থাকে রামকৃষ্ণ।

শুধু কি তাড়না? ফোড়ন দিতেও ষোল আনা ওস্তাদ।

কাউকে হয়তো উপদেশ দিচ্ছে রামকৃষ্ণ, অমনি হৃদয় টিপ্পনি ঝাড়ল: 'তোমার বুলিগুলি সব এক সময়ে বলে ফেল না! ফি বার একই বুলি বলার মানে কি?'

সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল রামকৃষ্ণের। ঝাঁজিয়ে উঠল

ভক্ষুনিঃ 'তা তোর কি রে শালা? আমার বুলি, আমি লক্ষ বার ঐ এক কথা বলব—তাতে তোর কি?'

গালাগাল তো দেয়ই, আবার থেকে-থেকে টাকা-টাকা করে। জমি-জায়গার ফিকির খোঁজে। হাটে যায় গরু কিনতে। এক দিন রামকৃষ্ণকে এসে বললে, একখানি শাল কিনে দাও দেখি।

রামকৃষ্ণ তো অবাক। আমি কোথা শাল পাব?

'না দেবে তো নালিশ করব বলে রাখছি।' হৃদয় চোখ রাঙালো।

কর্ না। শেষকালে শালের বদলে শূল এসে না জোটে।

শুধু চাওয়া আর চাওয়া! শুধু হৈ-চৈ। আশুতোষের ঘরে কেউ নয়, সবাই অসন্তোষের ঘরে। বাজ পড়লে ঘরের মোটা জিনিষ তত নড়ে না, শার্সিই খটখট করে।

রামকৃষ্ণ ঠিক করল কাশীবাসী হব। আর সহ্য হয় না জ্বালাতন।

কিন্তু কাশী যে যাবে, কাপড় না-হয় নেবে, কোনো রকমে রাখবে না-হয় পরনে, কিন্তু টাকা নেবে কেমন করে? হাতে মাটি দেবার জন্যে মাটি নিতে পারে না রামকৃষ্ণ। বেটুয়া করে পান আনবার জো নেই। কাশী যাবার টিকিট রাখবে কিসের মধ্যে?

আর কাশী যাওয়া হল না।

কিন্তু একটা ব্যবস্থা তো দরকার।

ব্যবস্থা আবার কি! হৃদয় না হলে দেখবে-শুনবে কে, সেবা করবে কে? বর্ষার দিনে পেট-খারাপের সময় মাছের ঝোল আর শুক্তোর জোগাড় দেখবে কে?

তুমি তোমার কাজ করো না। হৃদয়কে থাকতে দাও না তার মোড়লির মণ্ডলে। তুমি এত বড় জগৎ-সংসারের মোড়লি করছ, হৃদয়ের এই সেবার প্রভুত্বে কেন বাদ সাধছ? হৃদয় আর কাউকে তোমার পা ছুঁতে দেয় না, শুধু ঐ পা দুখানি নিজের নিভৃত বুকে ধরে রেখেছে বলে।

তবু জীব-নিয়তির বন্ধন তার গলায়। সে টাকা চায়, জমি চায়, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার চায়। তোমার ও তার মাঝখানে চায় সে একটি সহন-শোভন যবনিকা। জীবনাটকের বিচিত্রিত পটপৃষ্ঠা। তুমি যদি না তোলো, কার সাধ্য তা সারায়! তুমি যদি না খোলো, কার সাধ্য তা নড়ায়!

তেবাট

অর্ধেক রাতে উঠে রামকৃষ্ণ কুটনো কুটতে লেগেছে। তা-ও দিগম্বর হয়ে।

এমন কথা শুনেছে কেউ? হৃদয় খেপবে না তো কি!

শুধু তাই নয়, কাল সকালের চাল-ডাল মশলা সব জোগাড় করে রাখছে রামকৃষ্ণ।

'তুমি তো বেশ লোক।' খুট-খুট শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছে হৃদয়ের। 'চোখে ঘুম নেই বুঝি? মাঝ রাতে উঠে এই কাণ্ড?'

হৃদয়ের কথা রামকৃষ্ণ তো ভারি গ্রাহ্য করে! নিজের মনে কাজ করে চলেছে।

'কেন? ও সব কি সকালে হয় না?'

'তুই তার কি বুঝবি? ঘুম ভেঙে গেল, ভাবলুম বসে-বসে কি আর করি, কালকের রান্নার জোগাড় দেখি গে যাই।' সরল সহাস মুখে বললে রামকৃষ্ণ।

'কিন্তু ও তোমার কি কাজের ছিরি! ঠিক একটা লোকের মত অল্প-সল্প করে জোগাড় করছ। ঐটুকু তরকারিতে তোমার পেট ভরবে?' হৃদয় ঝামটা মেরে উঠল: 'আচ্ছা কিপ্পন যা হোক।'

'তা তো বলবিই। তোদের কি! খুব খানিকটা বেশি-বেশি করে অপচয় করতে পারলেই হল! আমার পেটের আটকোল যখন জানিস না তখন চুপ করে থাক—'

'রাখো। তোমার মত গুনে-গুনে একশোটা ভাতের দানা রাখতে পারব না পাতে।'

'শোন্, এই ভাতের জন্যই কুলীন ব'মুনের ছেলে হয়ে এখানে চাকরি করতে এসেছিস। নইলে কোথায় শিওড় আর কোথা দক্ষিণেশ্বর! যদি দেশে তোর ধানের জমি বা টাকা-পয়সা সচ্ছল থাকতো তা হলে কি আসতিস এখানে? শোন্, লক্ষ্মীছাড়া হতে নেই, মিতব্যয়ী হবি।'

একজনকে একটা দাঁতন-কাঠি আনতে বলল রামকৃষ্ণ। সোজা দু-তিনটে ডাল ভেঙে আনলে সে।

'শালা, তোকে একটা আনতে বললুম, তুই এতগুলি আনলি কেন?'

লোকটা ভেবেছিল রামকৃষ্ণ বুঝি খুশি হবে অনেকগুলি দাঁতন পেয়ে। উলটে ধমক খাবে ভাবতে পারেনি।

দু দিন পরে আবার সেই লোককেই বললে রামকৃষ্ণ: 'ওরে একটা দাঁতন দে না—'

সে আবার ছুট দিল বাগানের দিকে।

'ওরে, কোথা যাচ্ছিস ?'

'আজ্ঞে গাছ থেকে ভেঙে আনতে যাচ্ছি।'

'কেন, সেদিন যে অতগুলি আনলি—নেই ?'

'আছে।'

'তবে আবার ডাল ভাঙতে ছুটছিস যে?' রামকৃষ্ণ শাসনের সুরে বললে, 'ও গাছ কি তুই সৃজন করেছিস যে মনে করলেই টপ করে কিছু ডাল ভেঙে আনবি। যার সৃজন সেই জানে। বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে, বুঝে-সুজে কাজ কর্। জিনিসের অপচয় করবি কেন ?'

ঠিক-ঠিক উপদেশ মত চলতে চেষ্টা করে রামলাল। রাত্রে যত বার বিড়ি খায়, পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে ধরিয়ে নেয় লণ্ঠন থেকে। ফালতু একটিও বাক্সের কাঠি খরচ করে না।

'যত সব হাড়-কিপ্পন—' হৃদয়কে বাগানো যায় না কিছুতেই।

খিটিমিটি বেধেই আছে রামকৃষ্ণের সঙ্গে। সামান্য বচসা নয় দস্তুরমতো লম্বাই-চওড়াই ঝগড়া।

রামলাল বলে, সে সব ঝগড়া দেখবার মত।

একেক সময় ভীষণ রেগে যায় রামকৃষ্ণ। হৃদয়কে যা-তা গালাগাল দিয়ে বসে। এমন সব কথা বলে যা মুখে আনা যায় না।*

হৃদয় তখন চুপ করে থাকে। যখন অসহ্য হয়, বলে, 'আঃ, কি কর মামা। ও সব কথা কি বলতে আছে ? আমি যে তোমার ভাগনা।'

আমার গালাগাল দেওয়া নিয়ে কথা। কথার অর্থ দিয়ে আমার কী হবে ?

আমার পূজা করা নিয়ে কথা। আমার স্তোত্র-মন্ত্র দিয়ে কী হবে ?

আমার ভালোবাসা দেওয়া নিয়ে কথা। আমি রূপ-গুণ রত্ন-বস্ত্র দিয়ে কী করব ?

একেক সময় গালাগালেও মেটে না। হাতের সামনে যা পায়, ঝাঁটা-জুতো, সপাসপ লাগিয়ে দেয় হৃদয়ের পিঠে।*

হৃদয় নীরবে সহ্য করে।

মনে হয় এই বুঝি দু জনে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার দু জনে ভালোবাসা, আবার ঠাট্টা-ইয়ার্কি।

আবার হৃদয়ের প্রাণ-ঢালা সেবা। পর্যন্তহীন পরিচর্যা।

তখন আবার হৃদয় হুকুম করছে রামকৃষ্ণকে। আর রামকৃষ্ণ তাই শুনছে চুপ করে।

হৃদয়ের যখন প্রভুত্বের পালা তখন আবার সেই মাত্রাজ্ঞানহীন কোলাহল। রামকৃষ্ণের যন্ত্রণার একশেষ।

রামকৃষ্ণ ভাবল এ দেহ আর রাখব না। গঙ্গায় ঝাঁপ দেবার জন্যে পোস্তার উপর গিয়ে দাঁড়াল।

দেহত্যাগ করতে হবে না রামকৃষ্ণকে। মা অন্য রকম ব্যবস্থা করে দিলেন।

হৃদয়ের কি খেয়াল হল, কুমারী-পূজা করবে। কিন্তু কুমারী কোথায় ? মথুর বাবুর নাতনি—ত্রৈলোক্য বিশ্বাসের মেয়েকে পাকড়াও করলে হৃদয়। পায়ে ফুল-চন্দন দিয়ে পূজো করলে।

খবর শুনে নিদারুণ চটে গেল ত্রৈলোক্য। কে জানে কি অকল্যাণ হবে না-জানি মেয়ের। যত সব মূর্খ অঘটন।

মন্দিরের কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলে হৃদয়কে। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে চলে যাও মন্দির ছেড়ে। আর কোনো দিন ঢুকতে পাবে না এর ত্রিসীমায়।

হৃদয় চলে গেল হেঁট মুখে। রামকৃষ্ণ দেখল, মা-ই তাকে সরিয়ে দিলেন।

এবার আবার হাজরাকে নিয়ে মুস্কিল হয়েছে। ব্রহ্ম আর শক্তি যে অভেদ এ সে কিছুতেই মানতে চায় না।

তখন রামকৃষ্ণ মাকে ডাকতে বসল। বললে, 'মা, হাজরা এখানকার মত উলটে দেবার চেষ্টা করছে। হয় ওকে বুঝিয়ে দে, নয় ওকে সরিয়ে দে এখান থেকে।'

'হাজরার কথায় আপনার এত লাগল ?' জিগগেস করল ভবনাথ।

'এখন আর লোকের সঙ্গে হাঁক-ডাক করতে পারি না। হাজরার সঙ্গে যে ঝগড়া করব এ রকম অবস্থা আর আমার নয়—'

মা প্রার্থনা শুনলেন।

---

* শ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র-প্রকাশিত "শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ", পৃষ্ঠা ২১

পর দিন হাজরা এসে বললে, 'হ্যাঁ, মানি। বিভু সকল জায়গায় বর্তমান।'

জীবের স্বভাবই সংশয়। হ্যাঁ বললেও, ঢোক গিলে বলে, কিন্তু—। বিশ্বাস হতে হবে প্রহ্লাদের মত। স্বত-সিদ্ধ। স্বতঃস্ফূর্ত। 'ক' দেখেই প্রহ্লাদের কান্না। 'ক' দেখেই দেখেছে কৃষ্ণকে।

বালকের বিশ্বাস চাই।

এক দিন ঘাসবনে কি কামড়েছে ঠাকুরকে। ভয় হল, যদি সাপ হয়! তবে কি করা! ঠাকুর শুনেছিলেন, আবার যদি সাপ কামড়ায়, তা হ'লে বিষ ঠিক তুলে নেয়। তখন সাপের গর্ত খুঁজতে লাগলেন ঠাকুর, যাতে আবার কামড়ায় দয়া করে। কিন্তু গর্ত ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। একজন জিগগেস করলে, কি করছেন? সব বললেন তাকে ঠাকুর। লোকটি বললে, যেখানটায় আগে কামড়েছে ঠিক সেই জায়গায় কামড়ানো চাই। তখন উঠে পড়লেন ঠাকুর।

আরেক দিন রামলালের কাছে শুনেছিলেন, শরতের হিম ভালো। নজির হিসেবে কি একটা শ্লোকও আওড়েছিল রামলাল। কলকাতা থেকে গাড়ি করে ফিরছেন ঠাকুর, গলা বাড়িয়ে রইলেন বাইরে, যাতে সব হিমটুকু লাগে।

তাই লাগল। তার পর অসুখ।

'গঙ্গাপ্রসাদ আমাকে বললে আপনি রাত্রে জল খাবেন না। আমি ঐ কথা বেদবাক্য বলে ধরে রেখেছি। আমি জানি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।'

বিশ্বাসের কত জোর! সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ যে রাম তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু লাগল। কিন্তু শুধু রাম নামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্র ডিঙোল হনুমান। তার সেতু লাগল না।

তোমার-আমার বিরহের অন্তরালে আর কত সেতু বাঁধব? যে সমুদ্রে আমি সে সমুদ্রে তুমিও। আমি যাচ্ছি ও-পার, তুমি আসছ এ-পার। মাঝ-সমুদ্রে দেখা হয়ে যাবে দু জনের। আমাদের হাতে-হাতে সেতুবন্ধ।

কিন্তু হৃদয় কি সত্যিই চলে গেল? রামকৃষ্ণের সঙ্গছাড়া হল?

শ্রীমা বললেন, 'তা ভালো জিনিস কি চিরদিন কেউ ভোগ করতে পায়?'

'কিন্তু ঠাকুরকে অনেক কষ্টও দিত। গাল-মন্দ করত।'

'যে অত সেবা-পালন করেছে সে একটু মন্দ বলবে না? যে যত্ন করে সে অমন বলে থাকে।' শ্রীমার কণ্ঠস্বরে মমতার ফল্গু।

রামকৃষ্ণেরও সেই অন্তঃশীলা করুণা। বললে, 'অমন সেবা বাপ-মাও করতে পারে না।'

কিন্তু এখন তোমাকে কে দেবে সেবা-স্নেহ?

'দেবার সেই ঈশ্বর।' বললে রামকৃষ্ণ: 'শাশুড়ি বললে, আহা, বৌমা, সকলেরই সেবা করবার লোক আছে, তোমার কেউ পা টিপে দিত বেশ হত। বউ বললে, ওগো, আমার পা হরি টিপবেন। আমার কারুকে দরকার নেই। সে ভক্তি-ভাবেই ঐ কথা বললে—'

তার মানে, আমি যখন ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছি তিনিই সব ভারবহনের ব্যবস্থা করবেন। এ চাই, ও চাই, বলে তো বহু বাহানা করি, কিন্তু কী বা কতটুকু আমার সত্যিকার চাইবার মত, তা কি আমি জানি? মা জানেন, মা-ই ঠিক করে দেবেন। হয়তো শয্যা পেলাম, নিদ্রা পেলাম না; বিষয় পেলাম, মামলা বাধল; প্রেয়সী পেলাম কিন্তু প্রেম হল অস্তমিত। কী পেলে আমার চলে, কিসে বা কতটুকুতে আমার শান্তি ও সমতা, তা বুঝি আমার সাধ্য কি। আমি লোভান্ধ, অল্পদৃষ্টি, স্বার্থপর। তাই তিনি বঞ্চনা দিয়ে বাঁচান, আঘাত দিয়ে চেনান, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিয়ে আসেন নতুন পরিচ্ছেদে। রাজার বেটা যদি ঠিক মাসোয়ারা পায়, হরির বেটা ঠিক হরিসেবা পাবে।

যিনি ক্লেশ হরণ করেন পাপ হরণ করেন মনোহরণ করেন তিনিই হরি।

ত্রৈলোক্য নতুন এক হিন্দুস্থানী চাকর রেখে দিল। হৃদয়ের বদলে সে-ই সেবা করবে রামকৃষ্ণের।

কিন্তু শুদ্ধ সাত্ত্বিক লোক ছাড়া আর কারু ছোঁয়া সহ্য করতে পারে না রামকৃষ্ণ। তাই কি করে চলে ও-সব হেটো চাকরে?

দু দিন পরে রাম দত্ত এসেছে দক্ষিণেশ্বরে।

'তোমার সঙ্গে এই ছেলেটি কে হে?' উৎসুক হয়ে জিগগেস করল রামকৃষ্ণ।

'লালটু। আমার বাড়ির চাকর।'

'ওকে এখানে আমার কাছে রেখে দাও। ও বড় শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে।'

এই লাটু মহারাজ। এই স্বামী অদ্ভুতানন্দ।

ঠাকুরের সন্ন্যাসী-শিষ্যদের মধ্যে প্রথমাগত। প্রথম-পরশ-ধন্য।

চৌষট্টি

আদি নাম রাখতুরাম। ছাপরা জেলার কোন এক গণ্ডগ্রামে জন্ম। খুব ছেলেবেলাতেই বাপ-মা মরে গিয়েছে। আছে খুড়োর সংসারে। খুড়োর ছেলেপিলে নেই। রাখতুরামকে সহজেই সে টেনে নিল বুকের কাছে।

কিন্তু রাখতুরামের জন্যে নিভৃত পক্ষিনীড় নয়। ঝড়ের আকাশে তার নিমন্ত্রণ। কোন এক সমুদ্র-গামী জাহাজের মাস্তুলে এসে সে বসবে।

রাখতুরাম রাখালি করে। গোঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়। প্রকৃতির পাঠশালায় পড়ে। খোলা মাঠ তার বই, আকাশ আর মেঘ তার শ্লেট-পেন্সিল, বৃষ্টি তার ধারাপাত। ঘরের পশু আর বনের পাখি তার সহপাঠী।

আর গুরু? কে জানে! থেকে-থেকে গান করে রাখতুরামঃ 'মনুয়া রে, সীতারাম ভজন কর লিজিয়ে।'

মহাজনের খপ্পরে পড়েছে চাচাজী। ঋণের দায়ে নিলেম হয়ে গেল জমি-জমা। রাখতুরামকে নিয়ে চাচাজী পথে বসল।

ভাগ্যের সন্ধানে কলকাতায় এল দু জনে। কিন্তু ইটের পর ইট, ওখানে শুধু মানুষ কীটের বাসা। কোথাও স্নেহ নেই, কোমলতা নেই। অতিথিকে ওখানে ভিক্ষুক মনে করে, ভিক্ষুককে মনে করে চোর।

দেশের লোক কাউকে পাওয়া যায় কিনা, এখানে-ওখানে খুঁজতে লাগল চাচাজী। পাওয়া গেল ফুলচাঁদকে। ফুলচাঁদ মেডিকেল কলেজে রাম দত্তের আরদালি।

'আমার কাছে রেখে যা। দেখি বাবুকে বলে-কয়ে রাজি করাতে পারি কিনা।'

'সব কাজ করবে। খুব বাধ্য ছেলে রাখতুরাম।' খুড়ো মিনতি করল।

দেখেই কেমন পছন্দ হয়ে গেল রাম দত্তের। বেশ উজ্জ্বল চোখ দুটো ছেলেটার। মুখে একটা অকপটতার ভাব। শরীরে কাঠিন্যের লাবণ্য।

কাজ আর কি। বাজার করা, মেয়েদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, মায়েদের ফরমাস খাটা আর আফিসে রাম দত্তের টিফিন দিয়ে আসা। কি, পারবি তো?

'কিন্তু এক কথা। তোর অত বড় নাম আমি বলতে পারব না। ছোট্ট করে বলব, লালটু। কি, রাজি?'

লালটু থেকে লাটু। ঠাকুর ডাকেন লেটো বলে।

কুস্তি করে লাটু। আশ্চর্য, তাতে পাড়ার গৃহস্থদের আপত্তি। চাকর আবার কুস্তি করবে কি! কুস্তিগীর চাকর হলে তো সর্বনাশ।

রাম দত্তের কাছে নালিশ করে কেউ-কেউ। এতে নালিশ করবার কী আছে! শেষ কালে বললে রাম দত্তঃ 'কুস্তি করা তো ভালো। কুস্তি করলে কাম কমে যায়, আপনা-আপনি বীর্য রক্ষা হয়। নিজেরা যেমন দুর্বল, চাকরও তেমনি দুর্বল খোঁজো।'

কিন্তু তবু নিবৃত্ত হয় না পড়শিরা। একজন এসে বললে, বাজারের পয়সা চুরি করে লাটু।

'হ্যাঁ রে ছোঁড়া', হাঁক দিল রাম দত্তঃ 'ক পয়সা আজ চুরি করেছিস বাজার থেকে?'

রুখে দাঁড়াল লাটু। প্রতিবাদের ভঙ্গিতে ফুটে উঠল পালোয়ানের ভাব। জ্বলে উঠল প্রস্ফুট দুই চোখ। আধা হিন্দির তোতলামি মিশিয়ে বললে, 'জানবেন বাবু! হামি নোকর আছে, চোর না আছে!'

এই তো কথার মত কথা! জীবলোকে যত দীপ্তি আছে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সত্যদীপ্তি।

রামকৃষ্ণের থেকে দীক্ষা নিয়ে রাম দত্ত তখন ঈশ্বরমদে মাতোয়ারা। সে মদের ছিটে-ফোঁটা পড়ছে এসে সংসারে। যিনি সর্বমন্ত্রপ্রণেতা তাঁরই বাণী-বিন্দুর বর্ষণ। রামের উদ্দীপনায় বাড়ির সবাই কম-বেশি উৎসাহিত হচ্ছে, কিন্তু একেকটা কথা লাটুর মনে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে। কথার মানে সে ভালো বোঝে না কিন্তু একটি ইসারা মনের মধ্যে কেবল কেঁদে-কেঁদে বেড়ায়।

একটা ভ্রমর যেন গুনগুনিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। তার মনের মধ্যে যে ফুলটি ফুটি-ফুটি করছে তার মধু খেতে।

'ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না।' কথাটা বাজল একটা আশ্বাসের মত। পথহারা প্রান্তরে আলো-জ্বালা আশ্রয়ের মত।

'নির্জনে বসে কাঁদতে হয় তাঁর জন্যে। তবে তো তাঁর দয়া হবে।'

দুপুর বেলায় গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আছে লাটু। মাঝে-মাঝে বাঁ হাত দিয়ে চোখ মুছছে। পাশ ফিরছে খানিক বাদে। আবার চোখ মুছছে ডান হাত দিয়ে।

'কাকার জন্যে মন কেমন করছে রে লাটু?' রাম বাবুর স্ত্রী জিগগেস করলেন কাছে এসে।

তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল লাটু। কার জন্যে কাঁদছি তা কি আমি জানি? কেউ কি তা জানে?

এক রোববার রাম দত্ত চলেছে দক্ষিণেশ্বরে, লাটু এসে তার সঙ্গ নিল। বললে, 'হামাকে নিয়ে চলুন।'

'সে কি, তুই কোথা যাবি?'

'যার কথা আপুনি বলেন, সেই পরমহংসকে হামি দেখবে।'

কেমন মায়া হল রাম দত্তের। সঙ্গে করে নিয়ে গেল লাটুকে।

গোলগাল বেঁটেখেটে জোয়ান চেহারার চাকর। চাকর বলে ঘরে ঢুকতে সাহস নেই। রামকৃষ্ণের ঘরের সামনে পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু হাত-জোড়।

রাম দত্ত ঘরে ঢুকে রামকৃষ্ণকে দেখতে পেল না। বাইরে থেকে রামকৃষ্ণ তখন আসছে নিজের ঘরের দিকে। রাধিকার কীর্তন গাইতে-গাইতে। "তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে—"। নিজের মনে আখর দিচ্ছে রামকৃষ্ণ। "কথা কইতে পেলুম না। আমার বঁধুর সনে কথা হল না। দাদা বলাই ছিল সাথে তাই কথা হল না।" বারান্দায় লাটুর সঙ্গে দেখা। তুই কে রে? তুই কোত্থেকে এলি? তোকে এখানে কে আনল?

রামকৃষ্ণকে দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে রাম দত্ত।

'এ ছেলেটাকে বুঝি তুমি সঙ্গে করে এনেছ? একে কোথা পেলে? এর যে সাধুর লক্ষণ।'

রাম দত্তের দেখাদেখি লাটুও প্রণাম করলে রামকৃষ্ণকে। বুঝলে চোখের সামনে এই সেই নয়নাতীত।

কিন্তু ঘরে ঢুকেও বসছে না সবাইর মত। হাত-জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে ঈষন্নত হয়ে। যেন রামের কাছে হনুমান।

'বোস না রে বোস।' হুকুম করল রামকৃষ্ণ। তখন লাটু এক পাশে বসল জড়সড় হয়ে।

'যারা নিত্যসিদ্ধ তারা যেন পাথর-চাপা ফোয়ারা। জন্মে-জন্মে তাদের জ্ঞান-চৈতন্য হয়েই আছে। এখানে-সেখানে ওসকাতে ও কাতে যেই চাপটা সরিয়ে দিল মিস্ত্রি, অমনি ফোয়ারার মুখ থেকে ফর-ফর করে জল বেরুতে লাগল—' বলেই রামকৃষ্ণ হঠাৎ ছুঁয়ে দিল লাটুকে।

লাটুর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল, ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল ঘন-ঘন, আর দেখতে-দেখতে দু চোখ ফেটে উথলে উঠল কান্না।

সকলে অবাক। এক ঘণ্টার বেশি হয়ে গেল, তবু কান্না থামে না লাটুর।

'ছেলেটা কি এমনি সারাক্ষণই কাঁদবে না কি?' ব্যস্ত হল রাম দত্ত।

রামকৃষ্ণ আবার স্পর্শ করল লাটুকে। কান্না থেমে গেল তৎক্ষণাৎ।

যে হাতে কাঁদাও সেই হাতেই আবার মুছে দাও কান্না। খেলার আরম্ভে যেমন তুমি, খেলার ভাঙার বেলায়ও তুমি।

বাড়ি ফিরে এসে কেমন আনমনা হয়ে রইল লাটু। কাজে-কর্মে উৎসাহ নেই, মন যেন দেশান্তরী হয়েছে। দেহযন্ত্রটা ঠিক-ঠিক চলছে বটে, কিন্তু যন্ত্রের মধ্যে থেকেও যে যন্ত্র নয়, সেই মনটিরই এখন যন্ত্রণা।

পরের রবিবার দক্ষিণেশ্বরে কিছু ফল-মিষ্টি পাঠাবার কথা উঠল। কিন্তু কে নিয়ে যায় বয়ে। রাম দত্তের কোথায় কি কাজ পড়েছে, সে যেতে পারবে না।

মনমরা হয়ে বসে ছিল লাটু। ঝটকা মেরে লাফিয়ে উঠল। জোয়ার-আসা গাঙের মত খুশির ঢেউয়ে উলসে উঠল সর্বাঙ্গ। বললে, 'হামি যাবে। হামাকে দিন, হামি সব উখানকে লিয়ে যাবে। ঠিক পছন লিবে আমাকে।'

তাই গেল লাটু। দীর্ঘ পথ একটা বাঁশির সুরের মত বাজতে লাগল। এত দিন গোষ্ঠে ফিরেছে লাটু, আজ চলল গোকুলে।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে রামকৃষ্ণকে। বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। বেলা প্রায় এগারোটা।

দেখেই দৌড় মারল লাটু। এক ছুটে হাজির হল পায়ের কাছে। লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলে।

'কি রে, এসেছিস? আজ এখানে থাক।'

'শুধু আজ নয়, বরাবরই ইখানকে থাকবে। হামি আর নোকরি করবে না। আপুনার কাজ করবে।'

রামকৃষ্ণ হাসল। বললে, 'তুই এখানে থাকবি আর আমার রামের সংসার দেখবে কে? রামের সংসার যে আমারই সংসার।'

এই বলে রামকৃষ্ণ তাকে বুঝিয়ে দিল কি করে চাকরি করতে হয় মনিবের বাড়িতে। কি করে কর্ম করতে হয় সংসারে। মনিবের বাড়িতে থাকবি আর মন পড়ে থাকবে দেশের বাড়িতে। মনিবের ছেলেদের 'আমার রাম' 'আমার হরি' বলবি, কিন্তু মনে-মনে ঠিক জানবি ওরা তোর কেউ নয়।

কিন্তু এখন কোন ধরনের প্রসাদ নিবি তুই?

কালীবাড়ির আমিষ প্রসাদ নিতে কুণ্ঠা ছিল লাটুর। রামকৃষ্ণ তা বুঝতে পেরেছে। বললে, 'ওরে, মা-কালীর আমিষ ভোগ হয় আর বিষ্ণু মন্দিরে হয় নিরামিষ। সব গঙ্গাজলে রান্না। প্রসাদে কোনো দোষ নেই।'

'আমি অত-শত কি জানি!' লাটু শুধু জানে কোথায় তার আসল প্রসাদ। 'আপুনি যা পাবেন হামনে তাই খাওয়া করবে। হামি তো আপুনার প্রসাদ পাবে—বাকি আর কুছু পাবে না।'

রামলালের দিকে তাকিয়ে বললে রামকৃষ্ণ, 'শালা কেমন চালাক দেখেছিস। আমি যা পাব শালা তাতেই ভাগ বসাতে চায়।'

"বাচ্চা সাঁচ্চা হ্যায়।"

সারা বেলা কাটিয়ে দিল লাটু। বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল রামকৃষ্ণ। যাবার সময় বলে দিল, 'দেখিস বাপু, এখানে আসবার জন্যে যেন মনিবের কাজে ফাঁকি দিসনি। রাম তোর আশ্রয়দাতা, তার যদি কাজ না করবি তা হলে নেমকহারামি হবে। খবরদার, নেমকহারাম হবি না। যখন সময় হবে তখন আমিই তোকে এখানে ডেকে নেব।'

[ক্রমশঃ।

ঈগল পক্ষী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে?

ইউরোপের কয়েকটি বিখ্যাত দেশ থেকে ঈগল পাখী বিলুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ঈগল পাখী জাতীয় প্রতিমূর্ত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ডাকটিকিটে, চেকে, টাকা-পয়সায়, এবং রাষ্ট্রের জাতীয় চিহ্নরূপে ঈগল পাখীকে আমেরিকা মান্য করে থাকে। আদিযুগে আমেরিকায় প্রচুর ঈগল পাখী ছিল। এখন কেবল মাত্র দু'টি দেশ আছে; যথা, ফ্লোরিডা এবং চেশাপিক্ বে'র তীরদেশে ঈগলের অস্তিত্ব আছে। ঈগল পাখী হত্যা ক'রে শীকারের আনন্দ লাভের রীতি ছিল পূর্ব্বে। এখন ঈগল হত্যা করলে দস্তুর মত জরিমানা হয়ে যায়। কানাডায় একটি ঈগল হত্যা করলে পঞ্চাশ ষ্টার্লিং জরিমানা দিতে হয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় আইন জারী ক'রে ঈগল হত্যা নিষেধ করা হয়েছে। ঈগল শরীর বিস্তৃত করলে আট ফুট পর্য্যন্ত আকৃতি-বিশিষ্ট হয়। ঈগলের একেকটি বাসা ওজনে দু'টন পর্য্যন্ত হয়। ঈগল পনেরো পাউণ্ড পর্য্যন্ত ওজনের বস্তু বহন করতে পারে। ময়লা আবর্জ্জনা পরিষ্কারের কাজে লাগে ঈগল। দিন দিন ঈগল যে ভাবে আমেরিকা প্রভৃতি দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, কংগ্রেস থেকে ঈগল রক্ষার আইনগত ব্যবস্থা না করলে কিছু কাল যেতে-না-যেতেই ঈগল হয়তো পৌরাণিক জীব হিসাবেই পরিচিত হ'তে থাকবে। যদিও দূর প্রাচ্যে এখনও ঈগল আছে কত কে জানে?

শ্রীসজনীকান্ত দাস

তৃতীয় তরঙ্গ

প্রস্তুতি (১)

কিন্তু কথা কহিতে হইলে কথা শোনা দরকার। শিশু চোখ কান নাক মুখ দিয়া অবিরত কথা শোনে, বহিঃপ্রকৃতি হইতে নিজের সর্বেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কথা আহরণ করিয়া লয়; দীর্ঘ দিন প্রস্তুতির কাজ চলে, তবে সে সুবোধ্য কথা বলিবার অধিকারী হয়। গোড়ার দিকে অস্পষ্ট কথা, আধ-আধ কথা, ইঙ্গিত ক্রন্দন-চীৎকারের-সঙ্গে কথা সে অনেক বলে, অতিশয় ভাগ্যবান দুই-চারি জন মানুষের বেলায় তাহার ইতিহাস লিখিত বা রক্ষিত হয় এবং সে ইতিহাস তাঁহাদের পরবর্তী জীবনের খ্যাতির অনুপাতে মানুষ কৌতুক, কৌতূহল ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনে। কিন্তু আসলে সকল ক্ষেত্রেই হাঁটি-হাঁটি-পা-পা-চলার কাহিনী এক এবং তাহা পতনে ও হোঁচট-খাওয়ায় কণ্টকিত। আমার প্রথম কথা বলার প্রয়াস আর পাঁচ জনের মতই অত্যন্ত সাধারণ, ঘটা করিয়া তাহার বর্ণনা লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা কহিবার অধিকার লাভ করিয়াছি মনে করিয়া এই যে আমার "জীবন-জলতরঙ্গ" সকলের সামনে মেলিয়া ধরিতেছি—নিতান্ত শিশুকাল হইতে যে সকল কথা শুনিয়া শুনিয়া সেই অধিকার-বোধ জন্মিয়াছে, তাহার তালিকা ও সামান্য বর্ণনা নূতন যুগের সাহিত্যকামীদের কাজে লাগিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

শিল্পী বা সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে শিশুর কথা বলার তুলনা দিয়াছি। শিশুর কথা আহরণ ও সঞ্চয়ের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করেন মা বা তাঁহার স্থানীয় কেহ; তাঁহার স্নেহ-রসধারায় সিঞ্চিত কথা শুধু ভাষাই জোগায় না, ধীরে ধীরে শিশুর মনে ভাবেরও সঞ্চার করে। যে সকল সাহিত্যসাধক মায়ের মুখ হইতে ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনের মনের খোরাকও সংগ্রহ করিতে পায় তাহারা ভাগ্যবান। আমাদের শিশুকালে সে ভাগ্য কদাচিৎ ঘটিত, আমাদের মায়েরা শিক্ষায় দড় ছিলেন না, রান্না-বান্না গৃহস্থালী লইয়াই প্রত্যূষের প্রায়ান্ধকার হইতে নিশীথের নিষুতি পর্যন্ত ব্যাপৃত থাকিতেন, হতভাগ্য শিশুদের কল্পনার আহার্য জোগাইবার অবসর তাঁহারা পাইতেন না। রবীন্দ্র-নাথের 'জীবনস্মৃতি' বা অবনীন্দ্র-নাথের 'আপন কথা' যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন, সে সৌভাগ্য তাঁহাদেরও হয় নাই; তাঁহারা প্রধানত দাসী ও দাস-রাজ্যেই মানুষ হইয়াছিলেন। এ যুগের শিক্ষিত মায়েরা ছেলেদের জুজুবুড়ির ভয় দেখাইয়া থাবড়াইয়া-থুবড়াইয়া না রাখিয়া হয়তো দেশ-বিদেশের রূপকথার রাজ্যে লইয়া যান, নানাভাবে মনের খোরাক জোগাইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর করিয়া তোলেন। আমা-দের কালে নির্ভর ছিল ওই রামায়ণ আর মহাভারত। এই দুইটিই প্রধান। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্কলনগুলি এবং রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' ও 'শিশু' অতি মনোরম ফাউ। আমার যখন ঠিক সাত বছর বয়স, ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে 'ঠাকুরমার ঝুলি' হাতে শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার মহাশয়ের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বাংলার শিশুরাজ্যে। দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই অপরূপ দানের সহিত অনেক বিলম্বে আমার পরিচয় ঘটিয়াছিল।

দুইটি স্বাভাবিক ধারার সাহায্যে সকল যুগের শিশুরাই ধীরে ধীরে মানুষ হইয়া উঠে। এক ধারা পাঠ্য পুস্তকের, অন্য ধারা অ-পাঠ্যের। সেকালের অনেক কড়া নীতিবাগীশ বাড়িতে প্রথমটিই প্রবাহিত হইত, বুদ্ধিমান ছেলের নিজের চেষ্টায় দ্বিতীয় ধারা বজায় থাকিলেও শুষ্ক মরুভূমির তলদেশে তাহা হইত যন্থধারা। আমাদের বাড়িতে বাবা একমাত্র প্রথম ধারাটিরই একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু সাহিত্যিক বড়দার কৃপায় দ্বিতীয় ধারা একেবারে মরু-বালুতলে বিলীন হইয়া যায় নাই বাবাকে খুশি করিবার জন্য ধাপে ধাপে বর্ণপরিচ

প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয় পার হইয়া এক দিকে যখন চরিতাবলী ও আখ্যানমঞ্জরীতে হাত দিয়াছি, অন্য দিকে তখন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের তিন ভাগ শিশুশিক্ষার কাব্যাংশ আয়ত্ত করিয়া ... চট্টোপাধ্যায়ের তি... পদ্যপাঠ মুখস্থ করিতেছে। অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ তিন ভাগও আয়ত্তের মধ্যে। দ্বিতীয় অর্থাৎ অ-পাঠ্য-ধারায় রামায়ণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন স্বাধিকারে কাশীরাম দাসের মহাভারত হস্তগত করিলাম, তখন আর একটি কারণে মহাভারত সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। পাঠ্য অপাঠ্যের সীমারেখার ঠিক মাঝখানের একখানি পুরাতন ছেঁড়া পুস্তক হাতে আসিয়াছিল—তুলোট কাগজের মতন কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা, ফাঁপাফোলা পিচবোর্ডের মলাট। অতি চমৎকার খোদাই চিত্র সম্বলিত। অন্তত সেই কালে চমৎকার মনে হইত। বইটির নাম 'শিশুবোধক'। ইহাতে অক্ষর পরিচয় বানান শতকিয়া কড়াকিয়া সইয়া দেড়িয়া পত্র লিখিবার ধারা হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার বন্দনা গুরুদক্ষিণা কলঙ্কভঞ্জন প্রহ্লাদ চরিত্রে হিরণ্যকশিপুবধ চাণক্য শ্লোক পর্যন্ত অনেক কিছুই ছিল। পড়িতে খুবই ভাল লাগিত কিন্তু সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ হইতাম "দাতাকর্ণ বা কর্ণের দান পরীক্ষা" কাহিনী পড়িয়া। এই বিচিত্র বইখানি সম্বন্ধে পরবর্তী কালে বিস্তর গবেষণা করিয়া ইহার জন্মকাল নির্ণয় করিতে পারি নাই, তবে ইহা যে শতাব্দীরও অধিক কাল বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিয়াছে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি রেভারেণ্ড জে. লং-সঙ্কলিত বাংলা পুস্তক-তালিকা হইতে।* এই মহামূল্য গ্রন্থখানি কাহার রচনা বা সঙ্কলন তাহাও জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, এই "দাতাকর্ণ" কাহিনী পড়িয়া কর্ণকে আরও ভাল করিয়া জানিবার প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম মহাভারতে তাঁহার কথা আছে। মহাভারত পুরস্কার পাইয়াই কর্ণের রহস্যসন্ধানে লাগিলাম।

কিন্তু 'শিশু বোধকে' দ্বিজ কবিচন্দ্র-রচিত বৃষকেতু উপাখ্যানে যে মহাবীর সর্বত্যাগী কর্ণের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, কাশীরাম দাসের বৃহৎ মহাভারতে তাঁহাকে পাইলাম না। তৎপরিবর্তে বীর ধনঞ্জয়ের সহিত পরিচয় ঘটিল। কবিচন্দ্রের—পদ্মাবতী স্বামী কর্ণকে বলিতেছেন :

কান্দিয়া কান্দিয়া কয় শুন কর্ণ মহাশয়
পাষাণে বেন্ধেছ তুমি হিয়া।
করিলে দারুণ পণ কাটি দিলে বাছাধন
কেমনে বাঁচিব না দেখিয়া॥
দশমাস দশদিন উদর হইল ক্ষীণ
যত করিনু এই হেতু।
ভাল মন্দ না ... বাছা মোর ছাড়ি গেল
আর মোর প্রাণ বৃষকেতু॥
পাইয়া অনেক দুখ দেখিয়া পুত্রের মুখ
কেন বিধি করিলে এমন।
রাণী বলে আহা মরি ...ক র কান্দিতে নারি
শুন শুন প্রভু নারায়ণ॥
পুত্রমাথা হাতে করে দু' নয়নে বারি ঝরে
আ... দি... দ্বিজ ...মান।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় ধন্য কর্ণ মহাশয়
দানশীল বিখ্যাত ভুবনে॥

নারায়ণ স্বয়ং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে দাতা নামে খ্যাত কর্ণের গৃহে অতিথি হইয়া মনুষ্যমাংস খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং নির্দেশ দিয়াছেন কর্ণ ও রাণী পদ্মাবতীর একমাত্র পুত্র পাঁচ বৎসর বয়স্ক

বৃষকেতু নামে আছে তোমার নন্দন।
তারে কাটি দেহ মাংস করিব ভোজন॥
স্ত্রীপুরুষ দুই জনে কাটিয়া করাতে।
রন্ধন করিয়া দেহ আমার সাক্ষাতে॥
হাসিয়া কাটিবে পুত্রে না হবে কাতর।
এ যশ থাকিবে তব ভুবন ভিতর॥

মহাবীর কর্ণ রোরুদ্যমানা পত্নীকে বুঝাইয়া তাহাই করিলেন। নারায়ণ আত্মপ্রকাশ করিয়া বৃষকেতুকে ফিরাইয়া দিলেন। পৃথিবীতে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল।

---

* লং-এর 'A Descriptive Catalogue of Bengali Works' (১৮৫৫), ২৩৫ সংখ্যক বই 'শিশুবোধক,' বর্ণনা এইরূপ—"Child's Instructor, 1854, pp. 81, 2 as.. This work, the Lindley Murray of Bengali, has passed through innumerable editions,.. This book has been for centuries the key to Bengali reading." বইখানির এখনও যথেষ্ট প্রচার আছে। বটতলার দোকানেই বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক বিভিন্ন লেখকের নামে এই বই 'শিশুবোধক' বিক্রয় করা হয়। মূল 'শিশুবোধকে'র উপর এখনও কোনও সংস্করণে একটা আধটা কবিতা সংযোজিত দেখা যায়।

এমন যে কর্ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারতে তিনি অনেক হীন বর্ণে চিত্রিত হইয়াছেন। মহাভারতখানি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া কর্ণের কারণে খুবই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম। কিন্তু শিশুমনে বিষাদ-যোগ দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তাহা ছাড়া তাহারা একনিষ্ঠার জন্যও বিখ্যাত নহে। অচিরাৎ এই মহাভারতের পৃষ্ঠা হইতে আমার দ্বিতীয় মনের মানুষ মহাবীর ফাল্গুনী বাহির হইয়া আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় বিপ্রগণের উক্তি মনে গাঁথিয়া গেল—

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখি চারু যুগ্মভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগ্মবর জানু সুবলিত॥
বুকপাটা দন্তচ্ছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে কোথা কে কামিনী॥

আমি কামিনী না হইয়াও গভীর প্রেমে পড়িয়া গেলাম। বিরাট-পর্বের গোধন-হরণ অধ্যায়ে যখন বিস্মিত কৌরবদের দৃষ্টিতে কুরুসৈন্যের বিপুলতায় ভীত ও পলাতক যুবরাজ উত্তরের পশ্চাতে ধাবমান বৃহন্নলাবেশী অর্জ্জুনকে দেখিলাম

পাছে ধায় রড়ে দীর্ঘ বেণী নড়ে
পৃষ্ঠোপরি শোভে চারু।
লোহিত বসন অঙ্গে বিভূষণ
যেন করিবর-উরু॥
আজানুলম্বিত অঙ্গদ-মণ্ডিত
দ্বিভুজ ভুজঙ্গ সম।
দেখিয়া কৌরব নেহালয়ে সব
মনেতে পাইয়া ভ্রম॥
এক জন আগে পলাইছে বেগে
আর জন পাছে ধায়।
একি বিপরীত না বুঝি চরিত
কেবা যে আগে পলায়॥
পাছুতে যে জন নহে সাধারণ
বেশধারী প্রায় লাগে।
যেন ভস্মমাঝে অগ্নি হীনতেজে
সিংহ যেন ধায় মৃগে॥

তখন আমার শিশুমনের জগৎ সম্পূর্ণ অর্জ্জুনময় হইয়া গেল। দীর্ঘকাল পরে মূল সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ পড়িয়াছি। রবীন্দ্রনাথের "কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ" পড়িয়াছি, কর্ণের মহত্ত্ব বারংবার উপলব্ধি করিয়াছি—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার মতে কর্ণের তুল্য মহৎ চরিত্র পৃথিবীর সাহিত্যে আর সৃষ্ট হয় নাই, তথাপি কেন জানি না, আমি অর্জ্জুনকে ত্যাগ করিতে পারি নাই। আজও পর্যন্ত তিনিই আদর্শ পুরুষ হইয়া আমার মনে বিরাজ করিতেছেন।

মহাভারত ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর অতুলনীয় সম্পদ। যাঁহারা মূল মহাভারত অনুবাদেও পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন এই গল্পটি: দেবতারা একদিন ওজন করিয়া বেদ মহাভারত প্রভৃতির গুরুত্ব বুঝিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা দাঁড়িপাল্লা লইয়া এক দিকে চারি বেদ এবং অন্য দিকে ভারত-সংহিতা অর্থাৎ মহাভারতকে স্থাপন করিলেন। ভারত-সংহিতার কাছে চতুর্বেদ অত্যন্ত লঘু প্রমাণিত হইল। আমি যখন 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক তখন ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-সংখ্যায় প্রকাশের জন্য বাংলা দেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষীদের, বাল্যকালে কোন্ কোন্ পুস্তকের প্রভাব তাঁহারা সর্বাধিক অনুভব করিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া দিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম, শ্রীঅরবিন্দ বাল্মীকির রামায়ণ ও বেদব্যাসের মহাভারতকে প্রথম শ্রেণীতে স্থান দিয়াছিলেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন:

"বাল্যকালে মহাভারত পাঠ করিয়াই জীবনের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। যে রীতিনীতি মহাভারতে প্রচারিত হইয়াছিল সেই নীতি যেন বর্তমান কালেও জীবন্ত ভাবে প্রচারিত হয়। তদনুসারে যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্য্যে জীবন-উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফল-নিরপেক্ষ হইতে পারেন। তাহা হইলে বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন যে, বার বার পরাজিত হইয়া যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেই একদিন বিজয়ী হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ কিছু লিখিয়া দিতে পারেন নাই, আমাকে মুখে বলিয়াছিলেন তাঁহার জীবনে উপনিষৎ

ও রামায়ণ-মহাভারতের শিক্ষা চিরস্থায়ী হইয়াছে। কাশীরামের মহাভারত দিয়া যে বাঙালীর ছেলের বাল্যশিক্ষার পত্তন হয় নাই, সে যে অতিশয় দুর্ভাগ্য তাহাই বুঝাইবার জন্য জগদীশচন্দ্রের উক্তি উদ্‌ধৃত করিলাম।

নররক্তের আস্বাদ পাইলে সাধারণ বাঘই মারাত্মক নরখাদক ব্যাঘ্রে পরিণত হয়। রামায়ণ, মহাভারত ও 'কথা ও কাহিনী'র গল্পের মধুর আস্বাদ পাইয়া আমিও সাংঘাতিক গল্পখাদক হইয়া উঠিলাম। বই পাইলেই হইল, তাহাতে যদি গল্পের অংশমাত্র থাকিত লোলুপভাবে তাহা নিঃশেষে গ্রাস করিয়া ফেলিতাম, হয়তো প্রয়োজনীয় অংশই তখন ছিবড়া-জ্ঞানে বর্জন করিতাম। যাহা দুর্বোধ্য, যাহা নাগালের বাহিরে, বামনের চাঁদ ধরার মত তাহাও ধরিবার চেষ্টা করিতাম, রুচি ও নীতির দিক দিয়া যে-সব উপন্যাস বা কাহিনীর বালকরাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল তাহাও গোপনে সংগ্রহ করিয়া সাগ্রহে পাঠ করিতাম। স্কুলে ভাল ছেলে ছিলাম, দৈনিক পাঠ্যপাঠে কখনই অবহেলা করি নাই ; কিন্তু সে বয়সে যাহা অবশ্যকর্তব্য ছিল সেই খেলাধূলা-ব্যায়ামচর্চার মূল্যবান সময় চুরি করিয়া সাহিত্য-জীবনের প্রস্তুতির কাজে লাগাইতে লাগিলাম। বামনদের প্রাংশুলভ্য ফল জোগাইবার ভার সেকালে লইয়াছিলেন বটতলা ছাড়া তিনটি স্মরণীয় প্রতিষ্ঠান—বঙ্গবাসী, হিতবাদী ও বসুমতী। ইঁহাদের উপহার-গ্রন্থাবলী দরিদ্র বাঙালী-মনের বিশুষ্কতা কি পরিমাণ দূর করিয়াছে তাহার ইতিহাস কোনও দিন সঠিক ভাবে লিখিত হইলে এ যুগের ভাল ছাপাই-বাঁধাই দামী কাগজে অভ্যস্ত মানুষেরা বিস্ময় বোধ করিবেন। সস্তা বই, পত্রিকার ফাউ বা উপহারের বই বলিয়া অভিভাবকেরা এই সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে ততটা সাবধান ছিলেন না, অন্তঃপুরে বইগুলির অবাধ গতিবিধি ছিল। ফলে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়িতেই এইরূপ বইয়ের এক-আধখানার সন্ধান মিলিত। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত ও বৈষ্ণবমহাজনপদাবলী, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য, দাশু রায়ের পাঁচালী এবং রামায়ণ ও মহাভারতের ভাষা-সংস্করণ ইঁহারা নামমাত্র মূল্যে অবাধে বিতরণ করিয়া এক দিকে যেমন সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে জীর্ণ পুরুষগুলাকে সঞ্জীবিত রাখিতেন, অন্য দিকে ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর বিপুল প্রচারে বাংলার অর্ধ বা সিকি শিক্ষিত অন্তঃপুর সুনিদ্রার সুযোগ পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন, তাঁহারা সত্যকার চিন্তার খোরাক পাইতেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বৌ' 'যুগান্তর' হইতে। নদীপ্রবাহের পাশে পাশে একটি অপেক্ষাকৃত মলিন নালাও কাটা হইয়াছিল, তাহার ধারা সরবরাহ করিতেন দামোদর মুখোপাধ্যায়, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং পরে দীনেন্দ্রকুমার রায় ও পাঁচকড়ি দে প্রভৃতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ভূদেবের 'পুষ্পাঞ্জলি', বঙ্কিমের 'কমলাকান্ত', 'আনন্দমঠ' এবং রমেশচন্দ্রের 'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা' প্রভৃতির সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'ম্যাটসিনির জীবনবৃত্ত' (১৮৮০) ও 'গ্যারিবল্‌ডীর জীবনবৃত্ত' (১৮৯০) দেশব্যাপী আর এক উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'হিতবাদী'-কার্যালয়ের উপহার-গ্রন্থাবলী-রূপে যোগেন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসও সুলভ হইল।

আমার ভাগ্যে সর্বপ্রথম উঠিল বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর 'রাজসিংহ'-খণ্ড, রমেশচন্দ্রের 'সংসার' ও 'সমাজ' এবং "হিতবাদীর উপহার" 'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী' (আগষ্ট ১৯০৪)। তারক গাঙ্গুলীর 'স্বর্ণলতা' ও দামোদর-গ্রন্থাবলীর 'সোনার কমল'-খণ্ডও কেমন করিয়া জোগাড় হইয়া গেল। দীনেশচন্দ্র সেনের 'সতী' 'জড়ভরত' ও 'বেহুলা' সদ্য সদ্য হাতে পাইলাম। এইগুলি সম্বন্ধে বিশদ করিয়া কিছু বলিবার পূর্বে দুইটি তত্ত্বকথা শুনাইতে চাই।

এই যে অতি বাল্যকালে এই সকল কঠিন কঠিন বই আমি পড়িতেছিলাম, কিছু আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলাম কি ? শব্দ-সম্পদ ও ভাষা-সম্পদের কথা গত বারে বলিয়াছি। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের 'পল্লীশ্রী' পত্রিকার ফাল্গুন-সংখ্যায় আমি লিখিয়াছিলাম :

"আমি আবাল্য সময় পাইলেই পাঠ্য-অপাঠ্য বাংলা বই পড়িতাম, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিবার পূর্বেই বাংলা উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা এবং সাময়িক পত্রিকা যে কত পড়িয়াছিলাম, তাহার হিসাব দেওয়া কঠিন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মাইকেল, রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, দামোদর কেহই আমার অনধীত

ছিলেন না; একাধিক সহস্র রজনী, ইহার-উহার গুপ্তকথা, বটতলার চটকদার প্রেমের ও রহস্যের উপন্যাস, রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ উপন্যাস এবং অসংখ্য তথাকথিত উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া মনে মনে এক অদ্ভুত জগতের সৃষ্টি করিয়াছিলাম, সেখানে অনন্ত কৌতূহল এবং অনন্ত বৈচিত্র্য, আমার উচ্চতর বিজ্ঞান-বুদ্ধিও সেখানে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিত। নির্বিচারে এই সকল কুপাঠ্য-অপাঠ্য পড়িবার ফলে ভাষা ও শব্দ-সম্পদে আমি বাল্যকাল হইতেই সম্পন্ন হইতে পারিয়াছিলাম।"

বোঝা-না-বোঝার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জবাবদিহি আজ আমারও জবাবদিহি। আমার কথা এমন চমৎকার করিয়া বলিতে পারিব না বলিয়া তাঁহার জবানিতেই এই প্রশ্নের জবাব দিতেছি:

"নিজের বাল্যকালের কথা যিনি ভালো করিয়া স্মরণ করিবেন তিনিই ইহা বুঝিবেন যে, আগাগোড়া সমস্তই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে। আমাদের দেশের কথকেরা এই তত্ত্বটি জানিতেন, সেই জন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক বড়ো বড়ো কান-ভরাট-করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয় যাহা শ্রোতারা কখনোই সুস্পষ্ট বোঝে না কিন্তু আভাসে পায়—এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে। যাঁহারা শিক্ষার হিসাবে জমা-খরচ খতাইয়া বিচার করেন তাঁহারাই অত্যন্ত কষাকষি করিয়া দেখেন, যাহা দেওয়া গেল তাহা বুঝা গেল কি না। বালকেরা এবং যাহারা অত্যন্ত শিক্ষিত নহে, তাহারা জ্ঞানের যে প্রথম স্বর্গলোকে বাস করে সেখানে মানুষ না বুঝিয়াই পায়—সেই স্বর্গ হইতে যখন পতন হয় তখন বুঝিয়া পাইবার দুখের দিন আসে। কিন্তু এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। জগতে না-বুঝিয়া পাইবার রাস্তাই সকল সময়েই সকলের চেয়ে বড়ো রাস্তা। সেই রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে সংসারের পাড়ায় হাট-বাজার বন্ধ হয় না বটে কিন্তু সমুদ্রের ধারে যাইবার উপায় আর থাকে না, পর্বতের শিখরে চড়াও অসম্ভব হইয়া উঠে।"

আমিও এই না-বোঝা পাঠকদের দল ভারি করিয়াছিলাম এবং তাহাতে শেষ পর্যন্ত শিক্ষা ও আনন্দ দুই দিক দিয়াই ফাঁকিতে পড়ি নাই। আজিকার দিনে যাঁহারা একান্তভাবে শিশুদের জন্য সাহিত্য রচনায় তৎপর তাঁহাদের প্রচেষ্টার সমবেত পরিণাম দেখিয়া সময় সময় ইহাই মনে হয়, এই জ'লে নীতিসঙ্গত গল্প উপন্যাস পরিবেশন করিয়া ইহারা ভাল কাজ করেন নাই। কি ক্ষতি হইত বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে বিশুদ্ধ খণ্ডিত না করিয়া সম্পূর্ণভাবে শিশুদের পড়িতে দিলে? ইংলণ্ডে রবিনসন ক্রুসো, গালিভার্স ট্রাভেল্স-এর পর ছেলেদের জন্য বিশুদ্ধ অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী অনেক রচিত হইয়াছে কিন্তু কালের দরবারে কোনটিই ওই দুইটির পর্যায়ে উঠিতে পারে নাই। ইহার কারণ ডেনিয়েল্ ডিফো বা জোনাথান সুইফটের সাহিত্যবুদ্ধি এপিক বা মহাকাব্যের পর্যায়ের ছিল। ক্যারোল বা ষ্টিভেনসন গীতিকাব্যের মানদণ্ড বজায় রাখিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারতের পর শিশুদের জন্য কোনও কাহিনীই রচিত হয় নাই। তাই সেই আশ্রয় ত্যাগ করিলে এখন আমাদের ভুল হইবে। বিদেশী সস্তা অ্যাডভেঞ্চারের অনুকরণে বাংলায় যে-সব গল্প লিখিত হইয়াছে সাহিত্যসৃষ্টির দিক দিয়া সেগুলি অক্ষম। তাই শিশু-ভারতীর দরবারে এখানে আবর্জনাই জমা হইয়া চলিয়াছে, শিশুদের হাতে তুলিয়া দিবার মতো অর্ঘ্য প্রস্তুত হয় নাই। এই কারণেই আমাদের ছেলেমেয়েদের নীতির ওজুহাতে মূল বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ হইতে বঞ্চিত করা আরও হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। আমি ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারতের পক্ষপাতী নহি। তাহারা কৃত্তিবাস কাশীদাস মূলে পড়ুক, পরে অনুবাদে হউক, মূলেই হউক বাল্মীকি ও বেদব্যাসের দ্বারস্থ হউক, গোড়ায় বা মাঝখানে অন্য কোনও দালাল বা এজেন্টের সাহায্য লইবার দুর্ভাগ্য যেন তাহাদের না হয়।

কথা শোনা বা প্রস্তুতির কাল যদিও জীবন-ভোরই চলিতেছে তথাপি প্রথম পরিষ্কার কথা বলার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এই প্রস্তুতির কাল ধরিয়াছি। গোগ্রাসে কথা গিলিতেছিলাম, শুনিবার ধৈর্য ছিল না। স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিয়া মাঠে খেলিতে যাইবার অছিলায় বাহির হইয়া যাইতাম এবং প্রতিবেশী বন্ধুর বাড়ির খোলা ছাদে আলিসা আড়াল দিয়া বই পড়িতে বসিতাম। আলো যত স্তিমিত হইয়া আসিত ততই সরিয়া সরিয়া আলোর দিকে আগাইতে থাকিতাম। জ্বালা করিয়া চোখে জল আসিত সে

বাদশাহী জেবুন্নিসার দুঃখে না দৃষ্টিশক্তির অপব্যবহারে তাহা বুঝিতে পারিতাম না ; বই বা গল্প যত ক্ষণ শেষ না হইত তত ক্ষণ মনের জ্বালা যাইত না। এই ভাবে কথা শোনার কাজে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় বাবা মালদহ হইতে পাবনায় বদলি হইলেন। অব্যবহিত পূর্বে অতিরিক্ত পালোয়ানির মূল্যস্বরূপ মেজদাদা মালদহেই দেহরক্ষা করিলেন। মা ও আমাদের তিন ভাই তিন বোনকে বাবা রাইপুর হইয়া মাতুলালয় বেতালবনে লইয়া গেলেন। বাবার পূজার ছুটি ফুরাইলে দাদা ও আমি তাঁহার সঙ্গেই মালদহে ফিরিলাম। কিন্তু কয়েক দিন যাইতে না যাইতে খবর আসিল আমার কনিষ্ঠা কমলা মানকরে ছোট মামার বাড়িতে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বাবা আবার আমাদের দুই জনকে লইয়া ন'মামার কর্মস্থল বাঁকুড়ায় পৌছাইয়া দিলেন, মানকর হইতে মা আমার অবশিষ্ট দুই বোন ও ছোট ভাইকে লইয়া আগেই পৌছিয়াছেন। মাকে দেখিলাম। আর চেনা যায় না। পর পর দুইটি ধাক্কা তিনি সহিতে পারিলেন না, মূর্ছা ব্যাধি ঘন ঘন দেখা দিতে লাগিল। আগুনে পুড়িবার ও জলে ডুবিবার ভয়ে সামাল সামাল পড়িয়া গেল। বাবা এই অবস্থায় চাকরির খাতিরে পাবনা চলিয়া গেলেন। মাকে লইয়া আমরা মামার বাড়িতেই বড় দাদার অভিভাবকত্বে রহিয়া গেলাম। এখানে স্কুলের বালাই ছিল না, আমার মামাতো বৌদি ছিলেন বাংলা সস্তা উপন্যাসের ঘুন, তাঁহাকে পান দোক্তা জোগাইয়া আমারও কথা শোনার পালা অব্যাহত রহিল। ছ-মাসের মধ্যেই ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বাবা আসিয়া আমাদিগকে পাবনায় লইয়া গেলেন। নদীগত ভাবে এই বারংবার স্থান পরিবর্তন ও বহিঃপ্রকৃতির কথা শোনার ইতিহাস এইরূপ :

"সে গানের রেশ টানি এল শীর্ণ অজয়ের তীরে ;
বালি-কাঁকরের পথ, লালমাটি ছোট গ্রামখানি,
পূর্ব্বপুরুষের ভিটা ; গিরিনদী গৈরিক বন্যায়
সহসা ফুলিয়া ওঠে, কৈশোরে ছাপিয়া যায় কূল।
এলোমেলো কত গান, জয়দেব, রবীন্দ্রনাথের,
অদূরে নান্নুর গ্রামে রচে পদ বড়ু চণ্ডীদাস—
মেদুর মেঘের মায়া আবার ঘনায়ে এল নভে।
গুচ্ছে গুচ্ছে থরে থরে নদীচরে ফোটে কাশফুল,
শীর্ণ হ'ল জলধারা, বালুরাশি নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

বালুচরে পদচিহ্ন মুছে গেল ; সে কিশোর কবি
দেখা দিল, নুড়ি ছুঁয়ে যেথা ধীরে বহে গন্ধেশ্বরী
পৌষ-সংক্রান্তির উষা মেশে আসি দ্বারকা-ঈশ্বরে।
দূরে আকাশের গায় কালোছায়া বৃদ্ধ শুশুনিয়া—
কিশোর কবির মনে ঘনাইল পাহাড়ের মায়া,
শাল ও পলাশবন, ধূধু মাঠ দিগন্তপ্রসারী।

নেশা না কাটিতে তা'র, বসন্তের সায়াহ্নে একদা,
বিশাল পদ্মার তীরে এল যেথা কাঁপে ঝাউবন ;
সুপক্ক কুলের লোভে গুটি গুটি খরগোশ-দল
চমকিয়া পদশব্দে ছোটে দীর্ঘ কান খাড়া করি।
সেখানে পাড়ের গায়ে, ক্ষণে ধ্বসে-পড়া খাড়া পাড়—
গর্ত্তে গর্ত্তে উঁকি মারে লাল-ঠোঁট পাখীদের ছানা ;
ইলিশ-ধরার নৌকা সার বাঁধি চলে জাল ফেলে,
বহুদূরগামী যত ষ্টীমারেরা যায় ধোঁয়া ছেড়ে,
পাশে পাশে উড়ে চলে জলচর পাখী সারি সারি।"

ঘরের ও বাহিরের, মানুষের ও প্রকৃতির কথা মন দিয়া শুনিতে লাগিলাম। বাংলার সাহিত্যগগনে তখন শরৎচন্দ্র পূর্ণ গরিমায় প্রকাশ পাইবার জন্য পূর্ব দিগন্ত হইতে সবে উঁকি দিয়াছেন।

-প্রচ্ছদপট-

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে জলকেলিরত হাঁসটি দেশীয় নয়, বিদেশীয়। বিদেশ ভ্রমণকালে শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত হয় চিত্রটি।

যাযাবর

আখ্যান

গান সাঙ্গ হলেও থাকে সুরের রেশ। ঝড় থেমে যাওয়ার পরেও কাঁপে নদীর ঢেউ। তর্কেরও সমাপ্তি ঘটে না বাকরোধ মাত্র। কথা যখন থাকে না মুখে, ব্যথা জেগে রয় বুকে। তাতে চিত্তবিক্ষেপ ঘটে, কাজে মনোনিবেশ অসম্ভব হয়।

ঘড়ির ধাবমান কাঁটার পানে তাকিয়ে মলী সেন শঙ্কিত হলেন। পটোত্তোলনের লগ্ন এগিয়ে আসছে মিনিটে মিনিটে। দ্রুত প্রসাধন সমাপনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু বারে বারে ববিনের সূতো ছিঁড়ে-যাওয়া সেলাইকলের মতো ক্ষণে ক্ষণে হাত অচল হতে লাগল। আসন্ন অভিনয়ের কথা বিস্মৃত হয়ে মনে মনে কেবলই পর্য্যালোচনা করতে লাগলেন কাণ্ডজ্ঞানহীন শচীনের নির্ব্বদ্ধিতা, নীতিবাগীশ সত্যসিন্ধুর সুনীতি সন্দর্ভ। বিরক্তি বোধ করলেন।

জগতে প্রত্যেক মানুষের বিবেকেই আছে একটি ফুলবেঞ্চ। নিজের বিরুদ্ধে নিজেরই মামলা চলছে সেখানে অহর্নিশি। তাতে আপনাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে না পারা পর্য্যন্ত মনে শান্তি থাকে না। মলী সেন ভার্সাস মলী সেনের কেসে নিজেই নিজের ব্রীফ নিয়ে মনে মনে সওয়াল সুরু করলেন মলী সেন।

ন্যায়তঃ, স্বভাবতঃ চিরাচরিত নিয়মেই তাঁর যা পাওনা, সংসার কি তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেনি? প্রচণ্ড অন্যায়ের নির্দয় পীড়নে যারা পীড়িত, নিষ্পেষিত, তাদের সামান্য বিচ্যুতির বেলায়ই বুঝি দেখা দেয় যত কপিবুকের বচন? হুঃ, রুলস্ অব দি গেম। মাই ফুট। অপরিসীম অবজ্ঞায় ওষ্ঠাধর বিকৃত করলেন মলী সেন।

হৃদয় নিয়ে হৃদয়হীনতা। ভাষার গাঁথুনি আছে বটে। কিন্তু এপিগ্রাম যতই চমকপ্রদ হোক না কেন, তা দিয়ে তো বাস্তব ঘটনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পরের ব্যথার কথা ভাবতে হবে তাঁকে। কেন? কিসের জন্য? তাঁর ব্যথার কথা কে বুঝেছে? তাঁর হৃদয়ের খোঁজ রেখেছে কেউ? মনে পড়ল সুধাংশুকে। মনে পড়ল আট বছর আগেকার একটি চরম শোকাবহ সন্ধ্যা। কালের অনন্ত লিপিতে হৃদয়বিদীর্ণবেদনার একটি সকরুণ স্বাক্ষর।

সেও ছিল ঠিক এমনি একটা বন্ধু-বান্ধবীর সম্মিলিত উৎসবের উপলক্ষ। মলী সেনের দলের প্রায় জন কুড়ি-পঁচিশ স্ত্রী-পুরুষে মিলে খড়দায় গঙ্গার ধারে এক বাগানে পিকনিকের আয়োজন। প্রত্যূষে মোটরযোগে গমন, সারাদিন অবস্থান, খাওয়া-দাওয়া, খেলাধূলা ও গান-বাজনার পরে—সন্ধ্যায় কলকাতায় প্রত্যাগমন,—এই ছিল প্ল্যান। ব্যবস্থা যা কিছু, মলী সেনকেই করতে হয়। তাঁর মত নিখুঁত ভাবে সব কিছু করার ক্ষমতা আছে কার? স্থান নির্ব্বাচন করে বাগানের মালিকের অনুমতি সংগ্রহ যেমন করেন তিনি, তেমনি খাওয়ার মেনু তৈরী এবং রান্নার সাজ-সরঞ্জামও যোগাড় করেন তিনিই। কেক কেনা থেকে গাড়িতে পেট্রোল নেওয়া পর্য্যন্ত সমস্তই তাঁর তদারকে।

প্রশংসনীয় নিপুণতায় পরবর্ত্তী দিনের সমুদয় আয়োজন সমাধা করে সন্ধ্যাবেলা নিজের ঘরে আধশোয়াভাবে একটু বিশ্রাম করছিলেন মলী সেন। সুধাংশুর প্রতীক্ষায় ছিলেন। কাল কোন শাড়িটা পরা যায়, কোন গানটা গাওয়া যায় তার পরামর্শ করবেন। সুধাংশুর রুচি ও বুদ্ধির উপরে মলী সেনের অগাধ বিশ্বাস। তাঁকে না হলে মলী সেনের কোন কাজই হয় না। কিন্তু সে আজ এত দেরী করছে কেন? দাঁড়াও, আসুক একবার আজ, খুব কষে বকুনি দিতে হবে।

কিন্তু বিলম্ব ক্রোধের গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রায় উৎকণ্ঠার কোঠায় না পৌছা অবধি সুধাংশুর আর দেখা পাওয়া গেল না। ঘরে ঢুকতেই মলী সেন প্রশ্ন করলেন, "তোমার হয়েছে কী? এমন দুর্ঘট হয়ে উঠেছ কেন? সারাদিন ছিলে কোথায়?"

সুধাংশু জবাব দিলেন, "এখানে, ওখানে, চেম্বারে।"

"বল কী? প্র্যাকটিসে তোমার এত মনোযোগ হলো কবে থেকে? কলকাতা শহরের সমস্ত লোক কি আজকাল দাঁত তোলাতে তোমার চেম্বারেই এসে হা করে বসে থাকে নাকি?"

"না; কিন্তু তাদের জন্যে আমাকে তো হা করে বসে থাকতে হয়।"

সুধাংশুর আহত কণ্ঠস্বর মলী সেনকে আঘাত

করল। সুধাংশুর রোগীর সংখ্যা নগণ্য। তাঁর সেই অসাফল্যের প্রতি অতর্কিত ইঙ্গিত ছিল মলী সেনের প্রশ্নে, সে কথা হৃদয়ঙ্গম করে তিনি অনুতপ্ত হলেন। স্নিগ্ধ হাস্যে বললেন, "আমি ঠাট্টা করছিলেম। ও কী, মুখ ভার করে রইলে যে? কী ছেলেমানুষ তুমি! একটুও সেন্স অব হিউমার নেই। আচ্ছা, আমার অপরাধ হয়েছে। মাপ চাইছি। নাও এখন ঐ ইজিচেয়ারটা টেনে বোস দিকিন। অনেক কথা আছে। দাঁড়াও, বেয়ারাটাকে একটু কফি দিতে বলি। এই বয়, সাবকোবাস্তে—খাবে না? কফিতে তোমার অরুচি? ব্যাপার কী বলো তো?"

সুধাংশু বললেন, "কিছু না।"

মলী সেন মাথা নেড়ে বললেন, "না সুধাংশু, কিছু না বললেই শুনব না। আমি বেশ বুঝতে পারছি, কোথায় কী একটা ঘটেছে। তুমি যেন কেবলই আলগা হয়ে যাচ্ছ। আমি দেখছি, কালকের পিকনিকে তোমার এতটুকু আগ্রহ নেই। দু হপ্তা ধরে এর উদ্যোগ আয়োজনে তুমি কখনও মন খুলে যোগ দাওনি।"

সুধাংশু বললেন, "তুমি অনেক খেটেছ। তাড়াতাড়ি শুয়ে ঘুমোও, নইলে কাল ক্লান্ত লাগবে।"

মলী সেন উঠে দাঁড়িয়ে সুধাংশুর পথ রোধ করে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "অমন ভাবে কথা চাপা দিলে চলবে না। না বলে এখান থেকে তুমি এক পা নড়তে পাবে না। আমাকে তুমি ভালো করেই জানো। আমাকে চটিও না। এক্ষুনি আমি সবাইকে টেলীফোন করে কালকের পিকনিক বন্ধ করে দেবো।"

"তা তুমি পারো। কিন্তু সে পাগলামী করো না। বলার মতো বিশেষ কিছুই নেই। শুধু আমার ভালো লাগে না, এই।"

"ভালো লাগে না? কী ভালো লাগে না?"

"এই পিকনিক।"

মলী সেন বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "ভালো লাগে না? এক সময়ে তোমারই তো উৎসাহ ছিল সব চেয়ে বেশী। গত বছর বটানিক্সে যাওয়ার উদ্যোগী তো ছিলে তুমিই।"

"ঠিক কথা। গোড়াতে বরং তোমারই আপত্তি ছিল। সে সব আমি ভুলিনি, বউদি। কিন্তু আজ কাল আমার এতে মন নেই। শুধু এই পিকনিক নয়, আমাদের ককটেলের পার্টি, গানের জলসা, আমাদের এই সোসাইটি, আমাদের এই জীবনযাত্রা, কোন কিছুই আমার ভালো লাগছে না।"

মলী সেন ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন, "তোমার ভালো লাগে না, সে কথা তুমি আমাকে আগে বলনি কেন? আমি কালকের আয়োজন নাকচ করে দিতেম। তোমাকে বাদ দিয়ে আমি কোনদিন কিছুতে হাত দিয়েছি? তোমার ভালো লাগে না এমন কিছু কখনও করেছি?"

"ঠিক সে কারণেই বলিনি। আমি ভেবেছি, আমার ভালো লাগছে না বলেই তো জিনিষটা মন্দ নয়। তুমি যদি ওতে আনন্দ পাও তবে ক্ষতি কী? তা ছাড়া, ভেবেছি, ঘরে তুমি ইদানীং খুব বেশী অশান্তি ভোগ করছ। বাইরে হয় তো তুমি এসব নিয়ে কিছুটা ভুলে থাকতে পারবে।"

"এখন বুঝেছি, কেন তোমাকে একদিনও এই পিকনিকের পরামর্শে পাওয়া যায়নি, কেন তুমি আমাকে এড়িয়ে চলেছ।"

"এড়িয়ে চলেছি—একথা ঠিক নয়। কিছু দিন আমাকে খুব ঘোরাঘুরিও করতে হয়েছে, একেবারেই সময় পাইনি।"

"কেন?"

"ফ্ল্যাট খুঁজে বেড়িয়েছি।

"ফ্ল্যাট? কার জন্যে?"

"নিজের জন্যে।"

"কেন, হোটেল দোষ করল কী?"

"দোষ কিছু নয়, হোটেলে অনেকগুলো টাকা দিতে হয়।"

"টাকা বাঁচাবার জন্যে তুমি হোটেল ছেড়ে ফ্ল্যাটে থাকতে চাইছ?"

"হ্যাঁ, তা ছাড়া—"

মলী সেন বাধা দিয়ে বললেন, "মিথ্যে কথা, তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ। বল সত্যি কি না।"

বিস্মিত কণ্ঠে সুধাংশু বললেন, "হ্যাঁ সত্যি, কিন্তু তুমি জানলে কেমন করে?"

"হোটেলের চাইতে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকা সস্তা, একথা আর যাকেই হোক মেয়েদের কাছে বলতে যেও না। আর আমার জানার কথা বলছো? আমি যে ইদানীং সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, সে খবরই বা তুমি পেলে কেমন করে? কিন্তু তুমি বিয়ে

করবে সে সংবাদ আমার কাছে লুকোতে এত মিথ্যে কাহিনীও বানাতে হলো! ছিঃ!"

দৃঢ়তার সঙ্গে সুধাংশু বললেন, "মিথ্যে আমি বলিনি। ফ্ল্যাটের নাম শুনলেই তোমরা লাউডন ষ্ট্রীট বা রাজা সন্তোষ রোডের কথা ভাবো। বালীগঞ্জ, কালীঘাট অঞ্চলে অল্প আয়ের গৃহস্থের উপযোগী ফ্ল্যাটও যে আছে, তার খবর রাখ না। আর লুকোবার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। তুমি পিকনিকের ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত ছিলে, ভেবেছিলেম এ ঝামেলা কেটে গেলে তোমাকে বিস্তারিত বলবো। তার আর সুযোগ হলো না।"

"তা যাকগে। ভাগ্যবতীটি কে? আমাদের লুসী মিত্তির নয় তো?"

"না, আমার দিদির এক বিধবা ননদের মেয়ে। আমার মার মনোনীত পাত্রী।"

"বেশ, বেশ। মস্ত সুখবর। কন্‌গ্র্যাচুলেশানস্‌।" বলে মলী সেন বিলাতী কায়দায় হাত বাড়িয়ে দিলেন সুধাংশুর পানে।

শুভ বিবাহের সংবা অবশ্যই সুসংবাদ। কিন্তু মলী সেনের ভাষাটা যতই শ্রুতিমধুর হোক না কেন, তাঁর কণ্ঠে যেন সজীবতার তেমন আভাষ পাওয়া গেল না। দেবরের বিয়ের সুখবরটা ভ্রাতৃজায়ার মনে যে অপরিমিত সুখের সঞ্চার করেছে এমন নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গেল না।

সুধাংশু শেকহ্যাণ্ড না করে নিজের দুই হাতের মধ্যে মলী সেনের দক্ষিণ হস্তটি গ্রহণ করলেন। গভীর আন্তরিকতার সুরে বললেন, "বউদি, বিয়েতে তুমি উপস্থিত না থাকলে কিন্তু চলবে না। পাড়াগাঁ বলে যে-যেতে চাইবে না—"

"বিয়ে স্থির করা যদি আমাকে বাদ দিয়ে চলতে পারে, তবে শুধু মন্ত্র পড়াটা আমার অনুপস্থিতির জন্যেই ঠেকবে না, আশা করি।"

মলী সেনের কণ্ঠের শ্লেষ ও উত্তাপ সুধাংশুর মনোযোগ এড়াল না। তিনি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "বউদি, তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ? আমার কি কোন অপরাধ ঘটেছে?"

মুহূর্তে আত্মসংবরণ করে মলী সেন বললেন, "না, কিছুমাত্র নয়। কে বললে তোমাকে আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি। আমি খুশী হয়েছি—সত্যি, ভারি খুশী হয়েছি। বিলীভ মি। ঐ যা, আমার চোখে কী যেন একটা ঢুকেছে, বড্ড জ্বালা করছে। এক মিনিট বোসো তো, আমি বাথরুম থেকে চোখটা একবার ধুয়ে আসছি।"

মিনিট পাঁচ সাত পরে ফিরে এসে সহাস্যে বললেন, "তুমি তা হলে কাল আমাদের সঙ্গে পিকনিকে যাচ্ছ না?"

সুধাংশু বললেন, "না, একজন বাড়িওয়ালার সঙ্গে কাল পাকা কথা হবে। সকালেই তার কাছে যেতে হবে।"

সুধাংশু প্রস্থানের উদ্যোগ করতেই মলী সেন বললেন, "ও কী, উঠছ যে? এখনই রসুনচৌকী বায়না করতে ছুটবে না কি? এত তাড়া কিসের? বিয়ের লগ্ন তো পার হয়ে যাচ্ছে না। একটু বোসই না।"

সুধাংশু পুনরায় আসন গ্রহণ করে বললেন, "আমার কোন তাড়া নেই। কিন্তু তোমাকে তো কাল খুব সকালেই উঠতে হবে।"

মলী সেন সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, "সুধাংশু, আমাদের প্রথম সাক্ষাতের দিনটি তোমার মনে পড়ে?"

"পড়ে বৈ কি। আমি প্যারিস থেকে দেশে ফিরেছি তার আগের দিন। এ বাড়ির কর্ত্রী তোমার পিসশাশুড়ী আমাকে ছেলেবেলা থেকে স্নেহ করতেন। পরদিন এসে তাঁকে প্রণাম করতেই বউ দেখতে পাঠিয়ে দিলেন দোতলায়। শিবুদার বাবা অতিশয় গোঁড়া হিন্দু, সন্দেহ ছিল না যে, বউ এনেছেন ভট্টপল্লী থেকেই। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেলেম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভাবছিলেম, দেখব, দেড় গজ ঘোমটায় মুখ চোখ ঢাকা সাহা বা মল্লিক কোম্পানীর লেস বসানো জবরজঙ্গ জামা জরিতে মোড়া একটি নির্ব্বাক, নিশ্চল, জড় কাপড়ের পুঁটুলি। ওমা, তার বদলে কি না তুমি? একেবারে যেন আধুনিক কোন লেখকের উপন্যাসের পাতা থেকে সদ্য নেমে এসেছ এক কন্যা। স্মার্ট, মডার্ণ, প্রিটি।"

"কি ভাবলে?

"ভাববার আর অবকাশ ছিল কোথায়? তুমি বসে উলের কী যেন একটা বুনছিলে। মুখ তুলে আমার পানে তাকাতেই নমস্কার করে বললেম, শিবুদার মা আমার মাসি হতেন। বড় ভাইএর স্ত্রীদের এ পরিবারে বলে বৌঠান। বড়, মেজ, সেজ ইত্যাদি বিশেষণ যোগ করে তাঁদের সনাক্ত করা

হয়। সে রকম গুরু গম্ভীর প্রাচীন সম্বোধন আপনাকে ঠিক মানাবে না। যদি অনুমতি করেন, তবে শুধু বউদি বলেই ডাকব।"

"তার পর?"

"তুমি প্রতি-নমস্কার করে চৌকি এগিয়ে দিয়ে বললে, আমার কথা শোনা আছে তোমার। ভাবলেম থাকবারই তো কথা। মানুষ থাকে এক জায়গায়, কিন্তু তার খ্যাতি রটনা হয় সর্ব্বত্র। বিশেষতঃ সেটা যদি অখ্যাতি হয়। কুশল বিনিময়ের পরে সহজভাবে বললে, বয়সে না হলেও সম্পর্কে তুমি বড়। তাই যদি আমার আপত্তি না থাকে তো আমার নাম ধরেই ডাকতে চাও। কথায় নেই অনাবশ্যক আড়ষ্টতা, আচরণে নেই কৃত্রিমতা। সহজ, শোভন, সহৃদয় ব্যবহার। বাঙ্গালী মেয়ে এমন হতে পারে, কল্পনা করিনি এর আগে। মোষ্ট প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ।"

প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজই বটে। শুধু সুধাংশুর পক্ষে নয়, মলী সেনেরও। দুই বৎসর ব্যাপী সুখহীন, আশাহীন, নিরানন্দ বিবাহিত জীবনের শ্বাসরোধকারী ক্লিষ্টতার মধ্যে এই প্রথম যেন অনুভব করলেন মৃদু স্নিগ্ধ বাতাসের সুকোমল স্পর্শ। রুদ্ধ গৃহের ঘন অন্ধকারে হঠাৎ মুক্ত ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে উন্মুক্ত স্বচ্ছ আকাশের ঈষৎ একটুখানি ইসারার মতো যেন মলী সেনের সামনে এসে দাঁড়ালেন সুধাংশু। লেডী ইন ডিসট্রেসের উদ্ধারার্থে নাইট এরাণ্ট।

বাঙ্গালী পরিবারে দেবর-ভ্রাতৃবধূর সম্বন্ধটি প্রীতি ও পরিহাসের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে মধুর। মনোভাবের মিল এই দুটি সমবয়সী নরনারীর সেই স্বভাবতঃ সুন্দর সামাজিক সম্পর্ককে দুদিনেই ঘনিষ্ঠতায় নিবিড় এবং নির্ভরতায় নিকটতর করে তুলল। সরস আলোচনা, অনাবিল কৌতুক, কপট কলহ ও অবিরত মান অভিমানের মধ্য দিয়ে তাঁদের মধ্যে দুজনের জীবনকেই এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মাধুর্য্য দান করল।

যতদিন সংসারের কর্ত্রী শিবনাথের পিসীমা জীবিত ছিলেন, ততদিন মলী সেনের পক্ষে বাড়ির বাইরে চলাফেরার অবাধ সুযোগ ছিল না। তাঁর শাসন ফাঁকি দিতে এই দুই অপরিণত বয়স্ক অপরাধীকে তাই প্রায়ই নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করতে হতো।

একদিন সকালবেলা সুধাংশু এসে বলেন, "পিসীমা, এবার আর ভাবনা নেই। তোমার বাতের ব্যামো একদিনে আরাম হয়ে যাবে। চৌরঙ্গীতে এক রাশিয়ান ভৈরবী এসেছেন, বিনি-পয়সায় রাজ্যের সমস্ত রোগ সারিয়ে দিচ্ছেন। চল, আজ বিকেলেই তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

পিসীমা আশান্বিতা হয়ে জিজ্ঞাসা করলেম, "রাশিয়ান ভৈরবী, সে কি রে? ব্যাটাছেলে না মেয়েছেলে?"

"মেয়ে। মেম সন্ন্যাসী আর কি। একবার তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরতে পারলে, প্রসন্না হয়ে কমণ্ডলু থেকে ভোড্‌কা দান করবেন। দু'ফোঁটা খেলেই আরোগ্য।" বলে মলী সেনের পানে চোখ টিপলেন।

পা জড়িয়ে ধরার প্রস্তাবটা পিসীমার কাছে খুব প্রীতিপ্রদ মনে হলো না। হাজার হোক মেম তো, মেলেচ্ছো। খিরিষ্টান। হিন্দু হয়ে তিনি কেমন করে—। কিন্তু এদিকে বাতের কষ্টটাও তো কম নয়। তাই আসল কথাটা গোপন করে বললেন, "আমি গিয়ে আর কী করব বল? কথা তো বুঝবো না। তুই নিজেই আমার হয়ে খোটকা—না ভোটকা—কি বললি, তাই খানিকটা নিয়ে আসিস।"

সুধাংশু বিস্ময়ের ভান করে বললেন, "ওঃ, তাই তো। তুমি যে ইংরেজি জানো না, সে তো আমার মনেই ছিল না। কিন্তু ভৈরবী তো পুরুষ মানুষের সামনে বেরোন না। মেম হলে কী হয়, মাথায় ইয়া লম্বা জটাজাল, পুরুষ মানুষ কখনও কেউ সামনে এসেছে কি অমনি তা দিয়ে মুখ ঢেকে দেন। না, তোমার বাত তা হলে দেখছি আর সারানো গেল না।"

পিসীমা ব্যাকুল হয়ে বললেন, "না বাবা, এমন সুযোগ হাতে পেয়ে ছাড়তে নেই।" মলী সেনের পানে তাকিয়ে বললেন, "বউমা, তুমি বরং বিকেলে সুধাংশুর সঙ্গে যাও। আমার নাম করে অষুধটা নিয়ে এস। একটু ভক্তি করে ভৈরবীর পায়ের ধূলোটা নিও যেন।"

মেট্রোতে সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরার পথে মলী সুধাংশুকে মনে করিয়ে দেন, পিসীমার জন্যে ভৈরবীর

অষুধ বলে যা হোক কিছু একটা নিতে হবে যে। তাই তো। নিকটবর্ত্তী ডাক্তারখানা থেকে এক টিন ক্রুসেনস্ সল্ট কিনে নেওয়া হয়।

আর এক দিন হয়তো বিলেতী ফুটবলের টীম এসেছে কলকাতায়। সুধাংশু দুখানা টিকিট কিনেছেন যথারীতি। দুপুর বেলা পিসীমা পুরানো ন্যাকড়া ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটা ওল্টানো হাড়ির ওপরে জল দিয়ে প্রদীপের সলতে তৈরী করছিলেন। সুধাংশু এসে বললেন, "পিসীমা, আমার সেজ বোনের ভাসুরঝিকে আজ দেখতে আসবে বাদুরবাগানে। তোমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। কনে সাজাতে। আবলুসের মত কালো মেয়ে, ঘষে মেজে চলনসই করে তোলা, যার তার কর্ম্ম নয়।"

প্রচ্ছন্ন প্রশংসায় পিসীমা মনে মনে খুশি হয়ে বললেন, "কিন্তু সন্ধ্যেবেলা আমার জপের সময় পার হয়ে যাবে যে। তার চাইতে বউমাকে বরং নিয়ে যা।"

মুখে চোখে গভীর হতাশার চিহ্ন ফুটিয়ে সুধাংশু বলেন, "সে কি আর তোমার মতো পারবে? তবে তুমি যখন বলছো, অগত্যা।"

মলী সেন দরজার আড়ালে অপেক্ষা করছিলেন। পাছে আর অধিকক্ষণ হাস্য সংবরণ কঠিন হয়ে পড়ে, তাই সাবধান পদক্ষেপে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়েন।

গুরুজনদের মৃত্যুর পরে মলী সেন যখন নিজেই সংসারের কর্ত্রীপদে উন্নীত হলেন, তখন আর কোথাও কোন বাধা রইল না। সপ্তাহে সাত দিনে সাতটা সিনেমা দেখা এবং একই দিনে দুপুরে রেস-কোর্স, বিকেলে খেলার মাঠ, সন্ধ্যায় ক্লাব এবং রাত্রে ড্যান্সে যাওয়ার দৃষ্টান্ত আছে ভূরি ভূরি।

শুধু আমোদ প্রমোদের ক্ষেত্রেই নয়, তাঁদের প্রায় সমস্ত কর্ম্ম, কল্পনা, মন্ত্রণাই দুজনের সম্মিলিত সত্তাকে কেন্দ্র করে। সুধাংশুর নেশা ডিটেকটিভ উপন্যাসে। তাই মলী সেন নাম জানেন আগাথা ক্রিষ্টীর সর্ব্বশেষ থ্রিলারের। মলী সেনের প্রিয়,— রবীন্দ্র সঙ্গীত। তাই সুধাংশু খবর রাখেন কনক দাসের আধুনিকতম রেকর্ডের। তরুণ বয়সের যে সকল বৃহৎ পরিকল্পনা চিরকাল প্ল্যানের আকারেই শূন্যে মিলিয়ে যায়, কোন দিনই বাস্তবে পরিণত হয় না, সেগুলিতেও দুজনেরই যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে। উদয়-শঙ্করের নাচ দেখে এসে য়ুরোপে ড্যান্স ট্রুপ নিয়ে যাওয়ার যে জল্পনা কল্পনা চলে তাতে ইম্প্রেসারিওর পদ মলী সেনের, ম্যানেজারের পদ সুধাংশুর। এমেরিকার 'লাইফ' কাগজের মতো যে বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশের প্ল্যান হয়, তাতে সম্পাদিকার নাম মলী সেন, প্রকাশক সুধাংশু। এমনি করে কেটেছে সুদীর্ঘ সাতটি বছর।

সমাজের যে উর্দ্ধ বায়ুস্তরে তাঁদের বিহার, বৃহৎ কারেন্সী নোটের ঘন ঘন পক্ষ সঞ্চালন ব্যতীত সেখানে পোঁছানো সম্ভব নয়। সুধাংশুর নিজস্ব উপার্জ্জন পরিমিত। কিন্তু মলী সেনের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে সে বিষয়ে তাঁকে সচেতন হতে হয়নি কোন-দিন। জন-হোয়াইটের জুতা, অষ্টিন রিডের সার্ট, র‍্যাঙ্কিনের স্যুট ছাড়া সুধাংশুকে কখনও বড় দেখা যায়নি। প্রিয়জনের জন্য ব্যয় করার যে ব্যগ্রতা নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সুধাংশুকে দিয়ে তা চরিতার্থের সুযোগ পেয়ে আনন্দ লাভ করেছেন মলী সেন। শিবনাথের বিরুদ্ধে মলী সেনের আর যাই কেন না অভিযোগ থাক, সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হয়, স্ত্রীর যদৃচ্ছা টাকা খরচ নিয়ে কোনদিন কোন প্রশ্ন ওঠেনি।

বিগত দিনের সেই স্মৃতির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে খণ্ড খণ্ড বহু সুখের ইতিহাস মলী সেন সুধাংশুর সঙ্গে আলোচনা করলেন। তাঁর আসন্ন বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে নানাবিধ উপদেশ দিলেন। তাঁর ভাবী পত্নীকে নিয়ে প্রচলিত পরিহাসও করলেন সকৌতুকে। তারপর সুধাংশু প্রস্থান করতেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে শয্যায় উপুড় হয়ে এলিয়ে পড়লেন। বক্ষের সমস্ত শক্তি দ্বারা এতক্ষণ রক্তহীন মুখমণ্ডলে যে বিশুষ্ক হাসির রেখাটি ফুটিয়ে রেখেছিলেন, তা নিমেষে মিলিয়ে গেল। দাঁত দিয়ে ওষ্ঠাধর সবলে চেপে উদ্গত কান্নার বেগ রোধ করতে চেষ্টা করলেন।

বাতাসে অক্সিজেন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তার কথা কারো মনেই থাকে না। তার ব্যত্যয় ঘটা মাত্রই শ্বাসযন্ত্রে গোলযোগের ফলে মুহূর্ত্ত মধ্যে তার অভাব সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। এতকাল সুধাংশুর উপরে মলী সেনের অধিকার ছিল প্রকৃতির আলো

হাওয়ার মতোই স্বতঃসিদ্ধ। তাই তার অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি কিছুমাত্র সজাগ ছিলেন না। এক্ষণে সে অধিকার ত্যাগের প্রশ্ন দেখা দিতেই সজোরে টান লাগল ঘরে নয়, বাইরে নয়,—একেবারে তাঁর বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ের মাঝখানটিতে। সমস্ত জগৎটাকে স্বার্থে ক্রূর ও প্রবঞ্চনায় কুৎসিত মনে হলো।

তবুও একবার স্থির চিত্তে নিরপেক্ষ বিচার করতে চেষ্টা করলেন মলী সেন। হয়তো সুধাংশুর কথাই ঠিক। পুরুষ মানুষ বিরাট মহীরুহের মতো আপন কাণ্ডের উপর আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে চায় সমুন্নত। দড়ি দিয়ে ঝোলানো অর্কিডের মতো পরাশ্রয়ী সৌখীন অস্তিত্ব তার পক্ষে মৃত্যুর অধিক। সে হবে গৃহের প্রধান, নারীর নাথ ও সন্তানের জনক। শুধু পরনারীর সখীত্ব নিয়ে তার সারা জীবন কাটানো চলে না।

দিন কয়েক আগে জরুরী কাজে সুধাংশুকে যেতে হয়েছিল তাঁর দিদির বাড়িতে। মফঃস্বল সহরে। ভগ্নীপতি স্কুল মাষ্টার। সামান্য বেতন। তাই দুবেলা দুটি ছাত্র পড়াতে যান। বোন দুপুরে সাবুর পাঁপড় তৈরী করে বিক্রী করেন কো-অপারেটিভ ষ্টোরে। উঠনের একপাশে স্বামী যে বেগুন ও পালং শাকের বাগান করেছেন, বিকেলে ছোট ঘট থেকে জল সেচন করেন তাতে। সন্ধ্যাবেলা স্বামী যখন হাত মুখ ধুয়ে সামান্য জলযোগের পর শিশুদুটিকে খেলা দেন, স্ত্রী অদূরে মাদুরে বসে কাঁথা সেলাই করেন। দুজনে সংসারের সুখ-দুঃখের গল্প করেন।

সুধাংশু তাঁদের দেখে যেন প্রথম জানলেন, জীবনের সত্যিকার অর্থ। বুঝলেন কত অর্থহীন সংসারে তাঁর নিজের বর্তমান অবস্থিতি। স্থির করলেন, আর নয়। তিনি তো এফ, আর, সি, এস, কিম্বা এম, আর, সি, পি, নন; সামান্য দাঁতের ডাক্তার। নিজের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকের ঊর্দ্ধে বৃহৎ আড়ম্বর বা আকাশচুম্বী কল্পনা তাঁর জন্যে নয়। ভাবলেন, তিনি সারাদিন পরিশ্রম করে যা উপার্জ্জন করবেন তা দিয়ে সংসার চালাবে একটি সাধারণ কর্ম্মপটু, সরল, স্নেহশীলা স্ত্রী! মানুষ করবে একটি দুটি সবল স্বাস্থ্য শিশু। কাজ কী তাঁর শার্কস্কীনের জ্যাকেটে? কী হবে তার লুসী মিত্তির, লিলি ঘোষ, এ্যানিটা সেন বা সোসাইটির ডায়না রায়কে নিয়ে?

শুনে মলী সেন চুপ করে রইলেন।

সুধাংশু যখন বললেন, "বউদি, তোমার ভালোবাসার ঋণ আমি জীবনে ভুলব না। কিন্তু আমাকেও তো আমার আপন পূর্ণতা লাভ করতে হবে।"—তখনও মলী সেনের মুখে কথা জোগাল না।

সত্যি তো। মলী সেনের কাছে কতটুকু পাওয়ার আশা আছে সুধাংশুর? তাঁর ভাগ্যবঞ্চিত জীবনের শোকাবহ বিড়ম্বনার সঙ্গে জড়িয়ে নিজের জীবনকে সুধাংশু ব্যর্থ করবে কেন?

এ সমস্তই যুক্তির কথা! তাতে মাথা সাফ হয়, মন শান্ত হয় না। শিলাখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত পার্ব্বত্য নদীর প্রবল জলস্রোতের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ বেদনায় কেবলি নিরন্তর ফুলে ফুলে ওঠে। বালিশে মুখ ঢেকে আর্তস্বরে মলী সেন বললেন, "আমি একা, আমি শূন্য, আমি নিষ্ফল।" হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য্য কণ্ঠে ঢেলে দিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বার বার ডাকতে লাগলেন, "সুধাংশু, সুধা, সু।"

পরদিন প্রভাতে দেখা গেল মলী সেনের অন্য মূর্ত্তি। পিকনিকে তাঁর উৎসাহ, আনন্দ ও উচ্ছ্বাস যেন ক্ষীণমুখ ফোয়ারার জলের মতো ফিনকি দিয়ে উঠে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো চতুর্দ্দিকে। পুকুরে সাঁতার কাটলেন, গাছের শাখায় দোলনা বেঁধে দোল খেলেন, গানের পরে গান গেয়ে সবাইকে মোহিত রাখলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মনের কোণে কোথায় কোনখানে একবিন্দু বেদনার লেশ আছে এমন আভাষ পাওয়া গেল না। যেন এক রাত্রে আপনার পূর্ব্ব জীবনকে জীর্ণপট্টবাসের মতো পরিত্যাগ করে এসেছেন পশ্চাতে। সেদিন থেকে মলী সেনের নব রূপান্তর। যে ছিল স্থির-জ্যোতি নক্ষত্র, সে হলো তীরগতি উল্কা। খরবেগে ছুটে চললেন লক্ষ্যহীন, মাত্রাহীন নিরুদ্দেশ যাত্রায়। শুধু আলো নিয়ে নয়,—জ্বালা নিয়ে। [ক্রমশঃ।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় রীতি আছে, বক্তা যখন বক্তৃতা করে তখন এক পায়ে দাঁড়াতে হয়। পা মাটিতে ঠেকলেই বক্তৃতা তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যায়।

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

বিঘ্রাণ—গন্ধ, বাস, গন্ধবোধ, আঘ্রাণ।
বিচর্চ্চিকা—কণ্ডু, কচ্ছু, দদ্রু, দাদ।
বিচলিত—স্থানান্তর প্রাপ্ত, চঞ্চল, অস্থির।
বিচার—বিবেচনা, যথার্থের নিরূপণ।
বিচারসূত্র—ব্যবস্থা, তর্কবিধান।
বিচার্য্য—বিবেচনীয়, নির্ণেতব্য, যথার্থ।
বিচালী—ধান্যাদির আছড়া, পোয়াল।
বিচিকিৎসা—সংশয়, ভ্রম, কদর্য্য, বাধা।
বিচিত্র—আশ্চর্য্য, বিভিন্ন বর্ণ, সুন্দর।
বিচ্ছিত্তি—ছেদন, বিদারণ, বিনাশ।
বিচ্ছিন্ন—ছেদপ্রাপ্ত, বিদীর্ণ, বিভক্ত।
বিচ্ছেদ—বিয়োগ, বিরহ, অমিলন।
বিছড়ান—ছিটান, ছানন, মর্দ্দন।
বিছা—বৃশ্চিক, শতপদী, চ্যালা।
বিছান—বিস্তারণ, পাড়ন, পাতন।
বিজন—বিরল, নির্জ্জন, নিভৃত, গোপন।
বিজন্মা—বিজাতক, জারজ, কুণ্ড, বিজাত।
বিজয়—জয়, জিত, অর্জ্জুনের নাম।
বিজয়া——দুর্গা, তিথি-বিশেষ।
বিজলী—বিদ্যুৎ, তড়িৎ, চপলা।
বিজাতি—অন্য জাতি, ভিন্ন জাতি।
বিজিগীষা—জিগীষা, জয় করণেচ্ছা।
বিজেতা—জয়ী, জিতনিয়া, জয়প্রাপ্ত।
বিজ্ঞ—নিপুণ, বিশেষজ্ঞ, পণ্ডিত, সুবুদ্ধি।
বিজ্ঞাত—অবগত, বিদিত, জ্ঞাত।
বিজ্ঞান—শিল্পশাস্ত্রাদি বিষয়ক জ্ঞান।
বিজ্ঞেয়—জ্ঞাতব্য, জ্ঞেয়, বোধগম্য।
বিটপ—গুচ্ছ, স্তবক, পল্লব, শাখা, ধূর্ত্ত।
বিটপী—পাদপ, তরু, বৃক্ষ, মহীরুহ।
বিড়ম্বনা—দুঃখের হেতু, যন্ত্রণা, ক্লেশ।
বিড়াল—মার্জ্জার, আখুভুক, বিরাল।
বিড়বিড়—অব্যক্ত কথা, কচকচি, বচসা।
বিরূপ—কদর্য্যাকার, বিকলাঙ্গ, কুরূপ।
বিতণ্ডা—বাকবিরোধ, বাদানুবাদ।
বিতর্ক—অনুমান, বিবেচনা, তত্ত্বানুসন্ধান।
বিতস্তি—বিঘৎ, দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণ।
বিতান—চাঁদোয়া, চন্দ্রাতপ, টানা।
বিতৃষ্ণ—নিবৃত্ততৃষ্ণ, তৃপ্ত, নিষ্পিপাস।
বিতৃষ্ণা—অশ্রদ্ধা, অনিচ্ছা, অরুচি, ঘৃণা।
বিদগ্ধ—নিপুণ, বিচক্ষণ, পণ্ডিত, লম্পট।
বিদল—অন্য দলস্থ, ডালি, ছোলা, কুচা।
বিদায়—গমনের অনুমতি, অবকাশ।
বিদারণ—ছেদ করণ, ফাড়ন, চিরণ।
বিদিক্—বিদিগ, দিকের মধ্যবর্ত্তী দিক।
বিদিত—জ্ঞাত, পরিচিত, প্রকাশিত।
বিদীর্ণ—চেরা, ফাড়া, বিদারিত।
বিদূষক—নিন্দক, অপবাদক, ছলগ্রাহী।
বিদেশ—দূরদেশ, প্রবাস।
বিদেশী—দূরদেশী, প্রবাসী।
বিদ্ধ—ফোঁড়া, ভেদিত, ছিদ্রিত, বেধপ্রাপ্ত।
বিদ্বান—শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, জ্ঞানবান।
বিদ্বিষ্ট—ঘৃণিত, নিগৃহীত, ক্লিষ্ট।
বিদ্বেষ—বৈরিতা, পরহিংসেচ্ছা, ঘৃণা।
বিদ্বেষ্টা—বিদ্বেষী, পরহিংসেচ্ছুক, বৈরী।
বিদ্যমান—বর্ত্তমান, উপস্থিত, জীবৎ।
বিদ্যা—পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, গুণ।
বিদ্যাগার—বিদ্যালয়, চৌবাড়ী, টোল।
বিদ্যাদাতা—শিক্ষাগুরু, অধ্যাপক।
বিদ্যার্থী—শিষ্য, ছাত্র, পড়ুয়া।
বিদ্যুৎ—তড়িৎ, সৌদামিনী, চপলা।
বিদ্যুতি—দীপ্তি, কিরণ, তেজ।
বিদ্যোত—প্রভা, আভা, দীপ্তি, আলোক।
বিদ্রব—পলায়ন, বুদ্ধি, অপবাদ, নিন্দা।
বিদ্রুত—দ্রবীভূত, তরল, গলিত, পলায়িত
বিদ্রুম—প্রবাল, পলা, কৃত্রিম বৃক্ষবিশেষ।
বিদ্রূপ—ব্যঙ্গোক্তি, কৌতুক, পরিহাস।
বিধবা—মৃতভর্ত্তৃকা, রণ্ডা, স্বামিহীনা।
বিধর্ম্ম—বিপরীত ধর্ম্ম, বিধিবিরুদ্ধ ক্রিয়া।
বিধাতা—সর্ব্ববিধায়ক ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্ত্তা।
বিধান—ব্যবস্থা, নিরূপণ, বিধি, আজ্ঞা।
বিধি—ব্যবস্থা, কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ।
বিধিবৎ—যথাবিধি, নিয়মানুসারে।
বিধু—চন্দ্র, চন্দ্রমা, নিশাকর, কর্পূর।
বিধুত—বিধূত, কম্পিত, বায়ুচালিত।
বিধুর—নিরাশ্রয়, দুঃখী, বিহ্বল।
বিধৃত—স্থিরীকৃত, অবলম্বিত, আক্রান্ত।
বিধেয়—কর্ত্তব্য, ধার্য্য, ব্যবস্থেয়।
বিধ্বংস—বিনাশ, ভ্রংশ, অনাদর।
বিনত—অবনত, নম্র, বক্র, বিনয়ী।
বিনয়—বিনতি, অনুনয়, শিষ্টতা, নম্রতা।

বিনশ্বর—ধ্বংস্য, অনিত্য, অস্থায়ী।
বিনষ্ট—বিনাশিত, ধ্বস্ত, বিকৃত, বিগড়া।
বিনা—অভাবে, ব্যতিরেকে, ছাড়া।
বিনান—কেশ পাকান, ভাঙ্গান।
বিনাম—মিথ্যা নাম, কৃত্রিম নাম, ছদ্মনাম।
বিনায়ক—বৌদ্ধ, গরুড়, গণেশ, নম্র।
বিনায়াস—অনায়াস, সহজ, অকষ্ট।
বিনাশ—ধ্বংস, অপচয়, নাশ।
বিনাশক—ধ্বংসক, নাশক, সংহারক।
বিনাশ্য—ধ্বংস্য, নশ্বর, ক্ষয়নীয়, নাশ্য।
বিনিপাত—পতন, ভ্রংশ, আপদ, পদচ্যুতি।
বিনিময়—পরিবর্ত্ত, মার্জ্জা, প্রতিদান।
বিনিয়োগ—নিযুক্ত করণ, পদস্থাপন।
বিনির্ণয়—নিশ্চয়, অবধারণ, নিরূপণ।
বিনীত—বিনয়ী, নম্র, মৃদু, অনুনয়ী।
বিনেতা—দণ্ডদাতা, শাসনকর্ত্তা, শিক্ষাগুরু।
বিনেয়—সুশাস্য, শিষ্ট, নম্র, দম্য।
বিনোদ—হর্ষ, আনন্দ, আমোদ, ক্রীড়া।
বিন্দু—কণিকা, টুকি, অনুস্বর, পৃষত, চিহ্ন।
বিন্ধন—ভেদক, বিদ্ধকারী, শূলরোগ।
বিপক্ব—পরিণত, পরিপক্ব, পাকা।
বিপক্ষ—শত্রু, বৈরী, প্রতিবাদী, অরি।
বিপণ—বিক্রয়, বিক্রয়ের নিয়ম।
বিপণি—আপণ, পণ্যবীথিকা, হাট।
বিপত্তি—বিপদ, দুর্দশা, দুরবস্থা।
বিপথ—চোরাপথ, কুপথ, দুষ্পথ।
বিপদ—বিপত্তি, আপদ, দুর্দশা, দুরবস্থা।
বিপন্ন—দুর্দশাগ্রস্ত, বিপদাপন্ন, ক্লিষ্ট।
বিপরীত—বিপর্য্যয়, উল্টা, বিরুদ্ধ।
বিপর্য্যয়—বিপরীত, ব্যতিক্রম, ব্যত্যয়।
বিপর্য্যাস—মিথ্যানুমান, ভ্রম, আরোপ।
বিপাক—পরিণাম, দৈব ঘটনা, আপদ।
বিপাদিকা—পাদস্ফোট, পায়ের ব্রণ।
বিপিন—বন, কানন, গহন, অরণ্য।
বিপুল—অনেক, বিস্তর, প্রচুর, অতিশয়।
বিপ্র—ব্রাহ্মণ, দ্বিজ, ভূদেব, দ্বিজাতি।
বিপ্রকৃতি—তিরস্কার, নিন্দা, অপমান।
বিফল—নিষ্ফল, ব্যর্থ, নিরর্থক, অলীক।
বিবর—গর্ত্ত, ছিদ্র, গহ্বর, বিল, কুহর।
বিবরণ—বৃত্তান্ত, ব্যাখ্যা, বর্ণনা।
বিবর্জন—ছাড়ন, ত্যাগ করণ, মোচন।
বিবর্ণ—বিকৃত বর্ণ, মলিন, ম্লান, চণ্ডাল।
বিবর্ত্ত—নৃত্য, ঘূর্ণন, ভ্রম, রাশি, সঞ্চয়।
বিবশ—পঙ্গু, জড়, দুর্ব্বল, অবাধ্য, অবশ।
বিবস্ত্র—উলঙ্গ, নগ্ন, দিগম্বর, বিবাস।
বিবাদ—বিরোধ, কলহ, ঝকড়া, বিতণ্ডা।
বিবাহ—দার পরিগ্রহ, পরিণয়, উদ্বাহ।
বিবাহিত—ঊঢ়, কৃতবিবাহ, পরিণয়াই।
বিবিধ—নানাপ্রকার, নানা, বহুরূপ।
বিবুধ—দেবতা, অমর, বিদ্যাবান।
বিবৃত—বিস্তারিত, প্রকাশিত, প্রসারিত।
বিবৃতি—বৃত্তান্ত, বিবরণ, ব্যাখ্যা, টীকা।
বিবৃত্ত—ঘূর্ণমান, চাকভ্রমী, পরিভ্রমণীয়।
বিবেক—বিচার, বিবেচনা, বৈরাগ্য।
বিবেকী—বিবেচক, সবৈরাগ্য, বিচারক।
বিবেচক—বিশেষজ্ঞ, সদসদ্বিচারক।
বিবেচনা—সদসদ্বিচার, অনুধাবন, চর্চ্চা।
বিবেচ্য—বিচার্য্য, বিতর্ক, বিচারযোগ্য।
বিব্রত—ক্লেশাপন্ন, কাতর, বিপদগ্রস্ত।
বিভক্ত—বিভিন্ন, পৃথককৃত, বণ্টিত।
বিভক্তি—বিভাগ, অংশ, বণ্টন।
বিভা—দীপ্তি, প্রভা, আলোক, সৌন্দর্য্য।
বিভাকর—দিবাকর, সূর্য্য, অগ্নি।
বিভাত—প্রভাত, প্রত্যুষ, প্রাতঃকাল।
বিভাবরী—নিশীথ, হরিদ্রা, বেশ্যা, কুট্টনী।
বিভাস—প্রভা, দীপ্তি, আলোক।
বিভিন্ন—ভেদিত, পৃথক, অন্য, বিদারিত।
বিভীষণ—দারুণ, ভয়ানক, রাবণের অনুজ।
বিভু—সর্ব্বব্যাপী, সমর্থ, কর্ত্তা, ঈশ্বর।
বিভূতি—সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য।
বিভূষণ—অলঙ্কার, গহনা, শোভান।
বিভৃত—ধৃত, স্থিরীকৃত, অবলম্বিত।
বিভেদ—বিচ্ছেদ, পার্থক্য, বিশেষ।
বিভোল—হতজ্ঞান, মূর্খ, মূর্চ্ছিত, বিহ্বল।
বিভ্রম—ভ্রম, ভুল, সৌন্দর্য্য, ঘূর্ণি।
বিভ্রাট—অপ্রতুল, আপদ, দুর্ঘটনা।
বিমত—পরাঙ্মুখ, অসম্মত, অমত।
বিমতি—অনিচ্ছা, অরুচি, অসম্মতি।
বিমনস্ক—বিমনাঃ, অন্যমনাঃ, ঘবড়াণ।
বিমর্দ্দন—বাটন, পিষণ, চন্দনাদি ঘর্ষণ।
বিমর্ষ—বিষণ্ণ, ম্লান, কাতর, উদ্বিগ্ন।
বিমল—নির্ম্মল, স্বচ্ছ, শুদ্ধ, নিষ্পাপ।
বিমাতা—সপত্নী মাতা, সৎমা।
বিমান—দেবযান, রথ, শকট, গাড়ী।

[ক্রমশঃ।

খোকা-পাতাল

অ, আ, ই

খুটখটে স্তব্ধ দুপুরটা হঠাৎ হাসি-খুশীতে হেসে উঠলো যেন।

কাছারীর সমুখের দালানে জনতা কেন? কালো কালো মানুষগুলোর কালো কালো মাথা। রোদ্দুরে পুড়ে গেছে দেহ; মাথায় সর্ষপ তেল চিকচিক করছে; কোরা কাপড় পরেছে; চোখে ভয়-কাতর দৃষ্টি। সাঁওতালদের যেন একটা ক্যারাভান, গ্রামের বুক ফুঁড়ে সোজাসুজি চলে এসেছে মর্ত্তের স্বর্গ কলকাতায়। যদিও চলে এসেছে বললে ভুল হবে, ঐ ক্যারাভান বিশুষ্ক মরুভূমি পেরিয়ে আসেনি, এসেছে জল-পথে। কয়েক দিন পূর্ব্বে, একটা গুরুভার বজরায় পাল তুলে দিয়ে পঁচিশ জন মাল্লায় হাল টানতে টানতে পৌঁছেছে শেষ পর্য্যন্ত বাবুঘাটে। এলোমেলো দুর্দ্দান্ত হাওয়া, গঙ্গার বুকে বুকে বজরা এসেছে অতি ধীরগতিতে। কতটা পথ কে জানে, বজরার হাল চলেনি। গঙ্গা যেখানে শীর্ণকায়া সেখানে গুণ টানতে টানতে টেনে আনা হয়েছে ঐ বিপুলকায় বজরাকে—যে জন্য দিন ফুরিয়ে ক'টা রাতও কাবার হয়ে গেছে। দালানে ভীড় জমেছে ঐ কালো মানুষদের—যারা চর আর দ্বীপের বাসিন্দা। বঙ্গোপসাগরের মোহানা,—মাতলা আর জামীরা নদী যেখানে বয়ে চলেছে কুলু-কুলু—দলটা এসেছে সেখান থেকে। সাগর ছাড়িয়ে, ডায়মণ্ডহারবারের কোল ঘেঁসে বজরা এসেছে ভাসতে ভাসতে। জাহাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে বজরা; কত বাষ্পপোত বজরাকে পিছিয়ে ফেলে এগিয়ে গেছে দুরন্ত বেগে। কল্লোল উঠেছে গঙ্গায়, বজরাটা শুধু দুলে উঠেছে ঢেউয়ের আঘাতে। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে কি না কে জানে বর্ষাশেষে চর আর দ্বীপ জেগে ওঠে নদীবক্ষে। মরুভূমিতে মরূদ্যান দেখলে তৃষিতের যেমন আনন্দ হয়, সীমাহীন জলের মাঝে চর দেখে তেমনি ওরা তৃপ্তির হাসি হাসে। চরে ফসল হয়; ধান, সর্ষে, মুগ, খেঁসারি আর রবিশস্য।

যৌথ-সম্পত্তির সামান্য জমিদারী আছে ঐ জলের দেশে, এখন ভাগ-বাটোয়ারায় যার ভাগ্যে যতটুকু পড়েছে। কোন কোন সালে সর্ব্বগ্রাসী গঙ্গার গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে যায় ঐ চর আর দ্বীপ। তখন দুঃসময়ে দুরবস্থার অন্ত থাকে না। মকর-পূজার উপঢৌকনেও কিছু ফল হয় না। যেমনকার জল তেমনি থাকে,—ঘর-দোর. জমি-জমা ভেসে যায়। ধুয়ে যায় কত কষ্টের ফসল। সেই সঙ্গে দু'-চারটে মানুষেরও মায়া কাটাতে হয়। পশু-পক্ষীর কথাই নেই।

কাছারীতে আমলা-তন্ত্র অভ্যর্থনা জানায়। পানীয় জল দেওয়া হয়। মাদুর আর চ্যাটাই বিছিয়ে দেওয়া হয় বসতে। হাওয়া খেতে দেওয়া হয় কতগুলো হাত-পাখা। দলের হয়ে কথা বলে দলপতি। এক দল অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত সৈনিক, যেন শুধু হুকুম পালনের অপেক্ষায় বসে আছে অধীর আগ্রহে। আজব দেশ কলকাতাকে দেখে বুঝি বা কিছুটা বিস্ময় ফুটে উঠেছে ওদের দৃষ্টিতে। ইটের কোটা দেখে মনে করছে, হয়তো স্বর্গ থেকে পাঠানো যত প্রাসাদ ও অট্টালিকা। যেখানে উত্তরে চাই দক্ষিণে চাই ফেনায় ফেনা, সেখানকার অধিবাসী ইমারত দেখে যেন হকচকিয়ে গেছে। দেখছে শুধু চোখ ফিরিয়ে। যেন গ্রীস দেশ দেখছে।

পাইক আর সিপাইদের ডাক প'ড়েছে।

ওদের সঙ্গে এসেছে একটা মোষের গাড়ী। বাবুঘাট থেকে। তরী পূর্ণ ক'রে এনেছে ঐ চর আর দ্বীপের অধিবাসীরা। ঘরের লক্ষ্মী তুলে দিয়ে যেতে এসেছে। ধান্যলক্ষ্মী। ডাল—ভাজা মুগের ডাল। পোড়ামাটির জারে খাঁটি মধু। মক্কার খৈ। চিনির মুড়কী। রামদানা কা লাড্ডু। মাদুর-পাটি।

আর টাকা এনেছে। কত টাকা কে জানে।

সেলামী বা নজরানা নয়, বকেয়া খাজনার টাকা। মুরুব্বীদের মাথায় মুগার পাগড়ীর খাঁজে খাঁজে আছে। কাছারীর কড়িতে ঝুলন্ত চালিতে চোখ পড়েছে আমলাদের। বঙ্গোপসাগরের মোহানায় যৌথ-সম্পত্তির ভাগে পাওয়া মৌজার রেকর্ড আছে ঐ চালিতে। মনোহরপুর মৌজার কাগজপত্র—যেগুলো জটিলতম ঠেকে গমস্তাদের কাছে। চুল পরিমাণ জমির জন্যে শোনা যায় যেখানে দু'-চার মানুষের জান ধূলি-পরিমাণ গণ্য হয়। তাজা রুধিরে চর আর দহের জল কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য লাল হয়ে উঠে কোথাও কোথাও। নিমেষের মধ্যে রক্ত জল হয়ে, যায় জলেরই ঘূর্ণা-বর্ত্তে। তরোয়াল চলে না সেখানে, কিংবা বর্শা। য' করে তীর-ধনুক। মনোহরপুরের অধিবাসীদের লক্ষ' অব্যর্থ।

হঠাৎ বিষম সমস্যায় প'ড়ে জমিদারের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতে এসেছে। যৌথ-সম্পত্তি বিভক্ত হওয়ায় টাকা লেন-দেনের ব্যবস্থা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন, যার প্রজা তাকেই দিতে হবে খাজনা। মনোহরপুর মৌজার খড়ের চালের মফঃস্বল কাছারী টাকা জমা করতে চাইছে না। টাকা ফেরৎ দিচ্ছে বলছে, কার টাকা কে নেয়?

কতগুলি মানুষ, তবুও কোন হৈ-চৈ নেই। জলের মানুষ ওদের যত কেরামতি জলে। কলকাতার মাটিতে ওরা হয়তো তাই স্তব্ধ-গম্ভীর। বিনম্রচিত্ত।

তখন প্রায় সকলের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে।

কেবল হুজুর শুধু এখনও পর্য্যন্ত আহারাদি করতে ফুরসৎ পাননি। সূর্য্য অস্তাচলের দিকে হেলে না পড়লে কোন দিন খাওয়া হয় না। কি যে করেন ঠিক নেই, বেলা প্রত্যহই হ'য়ে যায়। খেতে খেতে বেজে যায় তিনটে। অসময়ে নাওয়া-খাওয়া না করলে হয়তো জমিদারী চাল বজায় থাকে না। হুজুর তখন স্নানান্তে চুলে টেরী কাটছিলেন। এ্যালবার্ট ফ্যাশনের চুল, ব্রুশ ঘসছিলেন মাথায়। গুন-গুন ক'রে গান গাইছিলেন। ফুলেল তেলের সুগন্ধে মেতে উঠেছিল হাওয়া।

—হুজুরকে কাছারী থেকে ডাকাডাকি করছে যে। কোথা থেকে এসে বললে অনন্তরাম। বললে,—মনোহরপুর থেকে এক পাল প্রজা এসে হাজির হয়েছে। না ব'লে-ক'য়ে এয়েছে, এখন ম্যাও সামলাও কেনে।

কথাগুলো শুনে উত্তর দিতে যাবে, কথা বললেন হেমনলিনী দরজা থেকে। বেশ তর্জ্জন ক'রেই বললেন,—খেয়ে-দেয়ে যেখানে যেতে হয় যাও। বেলা চারটে অব্দি হেঁসেল নিয়ে কেউ ব'সে থাকবে না।

স্বেচ্ছায় কথা ক'টি বললেন না হেমনলিনী। প্রজা এসেছে শুনেই রাজেশ্বরী কানে কানে ব'লে দিয়েছে হেমনলিনীর। বলেছে, পিশীমা, খেয়ে যেতে বলুন।

অগত্যা খেতে বসতে হয়।

কিন্তু খাওয়ার ঘরে যেতে মন চায় না হুজুরের। শয়ন-ঘরেই খাওয়া হয়। হেমনলিনী আজ আছেন, যে জন্য তিনিও কাছাকাছি বসেন। এটা-সেটা খেতে বলেন। মাছি তাড়াতে হাত-পাখা চালান। প্রজা এসেছে, কানে পৌঁছনো পর্য্যন্ত হেমনলিনীর চোখে বিগত দিনের স্মৃতি ভেসে ওঠে। কর্ত্তাদের আমলের ঐ মনোহরপুরের জমিদারী। চর দখল নিয়ে যেখানে কত বার খুনোখুনি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। মনোহরপুরের জমিদারী ছিল সে যুগের দস্তরমত আমোদ-আহ্লাদের জায়গা। কর্ত্তাদের মধ্যে দিল যাঁদের দরিয়ার মত ছিল, মনোহরপুরে গা-ঢাকা দিতেন কখনও সখনও। পোর্ট ক্যানিঙের পথে যাত্রা করতেন। শীকারের পোষাকে। যখন মাতলা আর জামীরা নদীর তীরের মানুষ বুঝতো মৌসুমী ফুল ফুটলো মনোহরপুরে। জমিদার বাবুদের বন্দুকের গম্ভীর আওয়াজে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো চকাচকীর ঝাঁক। উড়ন্ত কাদাখোঁচার বুক থেকে টাটকা লাল রক্ত ঝরলো আকাশেই। মেয়ে-মহলে সাড়া প'ড়ে গেলো। সোমত্থ যুবতীদের কেউ কেউ আঁৎকে উঠলো ভয়ে।

হেমনলিনী ভাবছিলেন—

ঘড়ি-ঘরের ঘণ্টায় ভাবনাটার জাল বুঝি ছিন্ন হয়ে গেলো। অন্য দিন হ'লে ভ্রাতুষ্পুত্রকে এটা-সেটা খাওয়াতে কত জোর-জবরদস্তি করতেন। আজ স্মৃতির পটে ভেসে উঠেছে মনোহরপুর। আরও কত কথা ও কাহিনী ঐ মনোহরপুরকে জড়িয়ে।

খাচ্ছে, কিন্তু খাওয়ায় মন নেই। এক দল প্রজা এসেছে মনোহরপুর থেকে। এসেছে তো কি হয়েছে! জড়োয়া টায়রাটাই তখন মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। আর একটা অপরূপ মুখ—গহরজানের অনিন্দ্য রূপশ্রী। মিষ্টি চটুল হাসি। মধুমাখানো কথা। কৃষ্ণকিশোর বললে,—পিশীমা, আমি তোমাকে পৌঁছতে যাবো। যখন যাবে ডাকতে পাঠিও আমাকে।

হেমনলিনী ক্ষণেক ভেবে বললেন,—তুমি আর যাবে কেন? বৌটা একলা থাকবে! অনন্তই যাক্ না, পৌঁছে আসবেখন।

মৃদু হাসি ফুটে ওঠে মুখে। কৃষ্ণকিশোর বলে,—অনেক দিন জুড়ী চালাইনি। আজ আমি হাঁকিয়ে যাবো। তুমি আপত্তি ক'র না।

দেওয়ালের কাছে, এক কোণে রাজেশ্বরী দাঁড়িয়েছিল। এক গলা ঘোমটায় মুখটি ঢাকা প'ড়েছে। ধবধবে ফর্সা বাহুযুগল শুধু দেখা যায়। আর আলতা-রাঙা দু'টি পা। এক জোড়া তোড়া ছিল পায়ে। দিনশেষের আলো-আঁধারিতে ঝিলিক মারছিল। চাঁদির চাকচিক্য।

হেমনলিনী আপত্তি করতে পারেন না। কথাগুলো শুনে মৌন থাকেন। দেওয়ালের কাছে এক কোণে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে শুধু রাজেশ্বরী। গাড়ীতে যাবে শুনে পর্য্যন্ত মনটা চঞ্চল হয়ে আছে। আশাহত দৃষ্টিতে দেখে রাজেশ্বরী, ঘোমটার ফাঁক থেকে। মনোহরপুরের স্মৃতিতে বিভোর হয়ে থাকেন হেমনলিনী: চোখ মেলে থেকেও যেন দেখতে পান না কখন উঠে গেছে কৃষ্ণকিশোর।. ঘোমটা খুলে ফেলে বললে রাজেশ্বরী,—চলুন পিশীমা। ঘরে বসবেন চলুন।

হেমনলিনী একটা ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলে বললেন,—হ্যাঁ মা, চল' তাই চল'।

টম কুকুরও ঘরের অদূরে বসেছিল পেটে মুখ গুঁজে। লোমে ঢাকা চোখ দু'টো পিটপিট ক'রে দেখছিল। প্রভু উঠে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টমও চললো পেছনে পেছনে।

অত ছক্কাপাঞ্জা জানেন না হেমনলিনী।

দোতলায় উঠে ঘরে ঢুকে কোমরের মুঘলাই মোহরের গয়নাটা খুলতে খুলতে বললেন,—আয় বৌ, আমরা গল্প করি। কেমন ভাবসাব হ'ল, বল্ শুনি।

লজ্জায় আনত করে মুখটা রাজেশ্বরী। রূপোর একটা পানের ডিবে রাখে হেমনলিনীর কাছে। বই-ডিবে। আর জর্দ্দা-সুপুরির কৌটা। কেউ কোথাও নেই, তবুও মাথায় ঘোমটা দেখে বললেন হেমনলিনী তিরস্কারের সুরে,—দ্যাখ, বৌ, আমার কাছে এত লজ্জা চলবে না। হোঁচট খেয়ে প'ড়ে মরবি যে!

স্মিতহাসি ফুটে উঠে মুখে। গুণ্ঠন তুলতেই রাত্রিশেষের রক্তিমাভ শুভ্র এক খণ্ড আকাশ যেন দেখা গেলো। যোড়শী কন্যার ঢলো-ঢলো মুখ! পত্রবহুল চোখ দু'টোতে নম্র দৃষ্টি। বিহারের দেহাতী ছাপা শাড়ী পরেছিল রাজেশ্বরী। ফিনফিনে পাৎলা খোলে হলুদ রঙের সূক্ষ্ম নক্সা। লাল পাড়। হেমনলিনী খানিকক্ষণ দেখে বললেন,—তোকে বৌ, খোট্টাদের

বৌ ব'লে মনে হচ্ছে। দেখিস্ বৌ, বাপ তোর খোট্টা ছিল না তো?

কথাটা শুনে শুধু একটু হাসলো রাজেশ্বরী। হেমনলিনী বলতে পারেন, অবশ্যই বলতে পারেন এমন দু'-একটা কথা। ঠাট্টার সম্পর্কে বলতে পারেন। রাজেশ্বরী বসলো হেমনলিনীর কাছে। মাটিতে সুজনী বিছিয়ে। হেমনলিনী মাতৃতুল্য হ'লে কি হ'বে, স্নেহময়ী পিসীমাকে মনে হয় যেন সমবয়সী। বয়স এবং সম্পর্কের বাচ-বিচার নেই, অন্তরটা যেন সকলের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। শিক্ষিত মন হেমনলিনীর, উঁচু ঘরে জন্ম। অতুল ঐশ্বর্য্যের মাঝে আজন্ম লালিত-পালিত হয়েছেন। শ্বশুরালয়েও তিনি সম্পদশালিনী। নকল হেসে বললেন,—কি লো বৌ, মুখে কথা নেই কেন? বলবি নে বুঝি আমাকে?

অবাক-চোখে তাকিয়ে থাকে রাজেশ্বরী।

হাসে মিটি-মিটি। বলে না কিছু, শাড়ীর আঁচলটা পাকায়। পিসীমার মুখ আর দেহটা লক্ষ্য ক'রে দেখে দুই ছেলের মা, বয়স দু'কুড়ি পেরিয়ে গেছে, তবুও হেমনলিনীর দেহের গঠন এখনও আছে অটুট। রূপ-লাবণ্যে মুখাবয়ব এখনও কত মিষ্টি। গায়ের রঙ কাঁচা হলুদের মত। তাই কালসিটের দাগ স্পষ্ট চোখে পড়ছে। হেমনলিনীর সঙ্গে এসেছিল এক জন পরিচারিকা। খাস-দাসী যাকে বলে। সঙ্গে এনেছিল একটা হাত-বাক্স। তাতে আছে পানের ডিবে, দোকতা-জর্দ্দা। শাড়ী-জামা। আর কি কি এনেছিলেন হেমনলিনী, কে জানে। দাসী এসে হাত-বাক্সটা বসিয়ে দিয়ে যায়। হেমনলিনী দেখলেন বৌয়ের মুখে কথা নেই। বললেন,—তুই তো বৌ গান জানিস। শোনা, একটা গান শোনা।

রাজেশ্বরী লজ্জা পায় যেন। বলে,—না তো পিসীমা, আমি তো গান জানি না।

কৌতুকের ছলে বললেন হেমনলিনী,—তবে যে শুনেছিলুম, তুই খুব ভাল গাস।

ভাইপো-বৌকে নিয়ে যে-ঘরে এসে বসেছিলেন হেমনলিনী, সে-ঘরটা অন্দরে মেয়েদের বৈঠকখানা। দেওয়ালের কোলে ছিল সারি সারি লাল ভেলভেটের সোফা। দু'টো আয়না দেওয়া শো-কেশে হাতীর দাঁত আর পোরসিলিনের পুতুল। কৃষ্ণনগরের মাটির খেলনা—পশু, পক্ষী আর গোটা-ফল। আর এক দিকে ছিল একটা পিয়ানো।

হেমনলিনী যেমন পড়তে শিখেছিলেন, তেমনি শিখেছিলেন গান। কেউ শিক্ষা দেয়নি, নিজে শিখেছিলেন। গাইতে আর বাজাতে শিখেছিলেন। হেমনলিনী বললেন,—জানিস বৌ, আমাকেও গান শিখতে হয়েছিল। আমার খেলুড়ীদের কেউ কেউ গান জানতো। আমিও হার মানি কেন, আমিও শিখেছিলুম।

পেয়ে বসলো যেন রাজেশ্বরী। বললে,—তবে পিসীমা আপনাকে গাইতে হবে। গান না শুনে ছাড়বো না। ঐ তো বাজনাও আছে।

হেমনলিনীর অন্তরটা হ'ল জলের মত। অত ছক্কাপাঞ্জা জানতেন না। বললেন,—ওটা যে পিয়ানো। শুধু বাজাতে হয়। পিয়ানোতে গান খুব জমে না। তবে গাওয়া কি আর যায় না!

খুশীতে যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে রাজেশ্বরী। বলে,—তবে একটা গান গাইতে হবে। বাজনাগুলো প'ড়ে আছে, কেউ বাজায় না।

কথাটা শুনে হেসে ফেললেন হেমনলিনী। বসেছিলেন, উঠে এগিয়ে গেলেন পিয়ানোটার কাছে। বসলেন পিয়ানোর সামনে, গোল তেপায়ায়। বললেন,—তুইও যেমন বৌ! আর কি এখন গাইতে পারি আগের মত! মনে-টনে নেই ছাই।

রীতিমত গানের অভ্যাস না থাকলেও বাঙলা গানের সঙ্গে যোগাযোগ এখনও অক্ষুন্ন রেখেছেন হেমনলিনী। রবি ঠাকুরের কোন্ গানের সুর হালে প্রকাশ হয়েছে হেমনলিনীকে শুধোলে জানা যাবে। কান্তকবি আর অতুলপ্রসাদ কি কি গান রচনা করছেন, হেমনলিনীর অজানা থাকে না কত চেষ্টায়, কত যত্নে খাতায় তুলে রাখেন তিনি গানগুলি; নিজে লিখে রাখেন। গানের খাতা আছে হেমনলিনীর। কয়েক খণ্ড। সোনালী অক্ষরে নাম লেখা আছে, মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো। কেউ জানতে পারে না, অতি গোপনে সংগ্রহ করেন হেমনলিনী। দ্বিজপদর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন সকলের অলক্ষ্যে। সাহায্যে ক্রটি হ'লে অভিমান করে থাকেন হেমনলিনী। সোহাগের সুরে বলেন,—গানগুলো না লিখে এনে দিলে কথা থাকবে না ঠাকুরপো। সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

দ্বিজপদ নামজাদা সাহিত্যিক হয়ে উঠতে না পারলেও, সাহিত্য-প্রচেষ্টায় তিনি যথেষ্ট উদ্যমশীল। হেমনলিনীর অধরোষ্ঠে হাসি দেখতে পাওয়ার লোভে দ্বিজপদ শেষ-পর্য্যন্ত সাহিত্য থেকে সঙ্গীতশিল্পের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। তদুপরি হেমনলিনীর সঙ্গে দ্বিজপদর সম্পর্কটা এখন আর ঠিক যথাযথ নেই। পরমগুরু স্বামীর হিংস্রমূলক অত্যাচারে হেমনলিনীর অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ মুছিয়ে দেন দ্বিজপদ। ব্যথিত মনে আনন্দের খোরাক জোগান। বিধাতা ব্যতীত কেউ জানতে পারে না।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঝঙ্কার উঠলো পিয়ানোতে।

মৃত একটা কিছু যেন সহসা বেঁচে উঠলো যাদুস্পর্শে। কি একটা গানের সুর অনেকক্ষণ ধ'রে বাজিয়ে চললেন হেমনলিনী। ব্যবহার নেই পিয়ানোটার, তবুও কত মধুমিষ্ট আওয়াজ। বেশ কিছুক্ষণ বাজিয়ে অতি মৃদুকণ্ঠে গান ধরলেন হেমনলিনী। গাইলেন: 'তোমারই গেহে পালিছ স্নেহে তুমি ধন্য ধন্য হে—'

অস্ফুট চাপা কণ্ঠে গাইছেন হেমনলিনী আর বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে শুনছে রাজেশ্বরী। ভাবছে পিসীমা'র কত গুণ! কি সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনি! মৃতপ্রায় হয়েছিল যেন এই যক্ষপুরী—হেমনলিনীর গান আর বাজনায় ক্ষণিকের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো। খটখটে শুষ্ক দিনটা যেন হেসে উঠলো হাসি-খুশীতে।

—শুনছো বৌদিদি? ভাঁড়ারে যেতে হবে যে! দু'টো চুলোয় আগুন পড়েছে উদিগে। গান হচ্ছে কেয়ার না ক'রেই বললে।

রাজেশ্বরী থ হয়ে তাকিয়ে থাকে। বিনোদা মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললে,—মনোহরপুর থেকে শত খানেক পেরজা এয়েছে যে! পাত পেড়ে খাওয়াতে হবে, অডার হয়ে গেছে কাছারী থেকে।

রাজেশ্বরী বললে,—চল তুমি, এখুনি আসছি আমি।

বিনোদা মুখ খিঁচিয়ে বলে,—হ্যাঁ, না চলে তো রেহাই নেই। এসো তুমি। উনুন নিকোতে না নিকোতে আগুন পড়লো।

গান থেমে যায়। উঠে পড়েন তেপায়া থেকে হেমনলিনী। বলেন,—আমি আর বসে থাকি কেন? চল্ বৌ, তুই ভাঁড়ার দিবি, আমি দেখবো। আমার ভাইপোটি গেল কোথায়? থাকলে না হয় কথা কইতুম।

অর্থপূর্ণ হাসি এক ঝলক হেসে বললে বিনোদা,—পেরজা এয়েছে, জমিদার দেখা দিতে গেছেন। কথার শেষে রাজেশ্বরীকে শুনিয়ে বলে,—ভাঁড়ার দিলেই শুধু চলবে না বৌদিদি। তুলতেও হবে। কত সামগ্রী এয়েছে মনোহরপুর থেকে।

হ্যাঁ, অনেক খাদ্য এবং ব্যবহার্য্য দ্রব্য সঙ্গে এনেছে মনোহরপুরের প্রজাদল। শুধু বকেয়া খাজনার টাকা নয়, দেশজাত কত কি শস্য আর আহার্য্য বস্তু। হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছে খাঁটি মধুর গন্ধ।

তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

শুধু নারিকেলের শাখে শাখে সূর্য্যালোক কাঁপছে থরো-থরো। বেলা অতিক্রান্ত হওয়ায় ফেরীওয়ালার ডাক শোনা যাচ্ছে পথে পথে। এখন রুদ্ররবির জ্যোতি ম্লান হয়ে গেছে। নীলাকাশে আলুথালু শুভ্র মেঘ। বুঝি কোন্ এক পক্ককেশ জটাধারী অলক্ষ্যে কোথায় ব'সে ব'সে ছিন্ন করছে জটার জট। কাছারীতে যেতেই ঘিরে ধরলো মনোহরপুরের অধিবাসী—কালো কালো মানুষ। জাতিতে শূদ্র, ব্রাহ্মণকে দেবতা জ্ঞান করে। ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলো সকলে। যেন এক পবিত্র মন্দিরে এসেছে; অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করতে এসেছে চর আর দ্বীপের ঐ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মানুষগুলি। আন্তরিক ভক্তিতে ওদের গদগদ চিত্ত। শঙ্কিত দৃষ্টি ওদের চোখে, অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের অভিসম্পাতে চিরদিনের মত বুঝি বা হারিয়ে ফেলেছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। এখনও পাকা তীরন্দাজ হ'লে কি হবে—ওদের দিন যে শেষ হয়ে যায় আল আর ক্ষেতে; সূর্য্য পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে। ফসল বুনতে আর ঘরে তুলতে। ক্ষেতের ফসলের সঙ্গে ওদের যত মিতালী; দিগন্তবিস্তৃত জলাভূমিই শয্যা। কিন্তু বুলবুলিতে যত ধান খেয়ে গেলেও পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়ে দিতে হবে। যার জমিতে চাষ, মুখের গ্রাস,—সেই জমিদারকে ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়তে হয়, ঈশ্বর ক্ষমা করেন না। জমিদার যে দেবতা, কত অনুগ্রহে ভূমি দিয়েছেন।ট মনোহরপুরের মফঃস্বল-কাছারী খাজনা জমা না নেওয়ায় ওদের টনক ন'ড়ে গেছে। সোজা চ'লে এসেছে খোদকর্ত্তার কাছে—ভূমির মালিকের কাছে।

শুধু প্রণাম নয়, শুধু হাতে প্রণাম নয়।

শুধু খাজনাও নয়, সাধ্যমত সেলামী দেয় সকলে। নজরানার টাকা রাখে মেঝেয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রক্ত-জল-করা টাকা। প্রণাম করতেও সমীহ করে ঐ মূর্ত্তিমান অজ্ঞানের দল। পাছে কোন ত্রুটি হয় সেই ভয়েই যেন জড়সড়। দলপতি শুষ্ক কণ্ঠে বলে ভয়ে ভয়ে,—হুজুর, জমি ভাগাভাগি হয়ে গেল, আমাদের ভাগের জমিদার হয়েছেন আপনি। কাছারীও ভাগে পড়েছে। জমির ঠিক-ঠিক মালিক যে কে কে হয়েছেন, কাছারীতে কেউ জানেন না। নায়েব মশয়দের টাকা জমা নিতে সাহস হচ্ছে না। হুজুর, আমাগোর টাকা কেন বাকী পড়ে থাকে! আমরা মা গঙ্গাকে হুজুর পুজো দিয়ে চলে এলাম আপনার দরবারে হুজুর! টাকাটা না দিলে হুজুর খেয়ে সুখ নেই, রেতে ঘুম নেই। ভাবলাম, শেষ পর্য্যন্ত ভাবলাম হুজুর, টাকাটাও জমা দেওয়া যাবে, হুজুরকেও দেখা যাবে। আর দোনামনা না ক'রে মা গঙ্গার পুজো দিয়ে বেরিয়েই পড়লাম হুজুর।

দলপতি যখন বক্তব্য পেশ করছে তখন অন্যান্য সকলে পাষাণ মূর্ত্তির মত বসে আছে অনড় হয়ে। শুনছে, প্রতিনিধির মুখে নিজেদের কথা শুনছে।

কিন্তু হুজুর কি শুনছেন।

সময় হয়ে আসছে যে। দেখতে দেখতে ব'য়ে যাচ্ছে বেলা। এখন ক্লান্তমধ্যাহ্ন। টায়রা, জড়োয়া টায়রা; অন্ধকারে লুকিয়ে রাখলেও জ্বল-জ্বল করে যে গয়নাটা, সেটাই যে এখন অধিকার ক'রে আছে মন আর মেজাজ। যতক্ষণ না একটা কিছু গতি হচ্ছে, যতক্ষণ না কপালে উঠছে গহরজানের, ততক্ষণ হুজুর অন্য কিছু শুনছেন না।

নায়েবদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ যে-জন, তিনি আসতেই বিষয়টা লঘু হয়ে গেল। বললেন, দলপতিকে লক্ষ্য ক'রেই বললেন,—কত কষ্টে এসেছো, দু'দণ্ড এখন জিরিয়ে নাও। পেটে জল পড়ুক। হুজুর তো আছেনই। শুনবেন, যথা-সময়ে শুনবেন তোমাদের আর্জ্জি। হুজুরও খেয়ে উঠলেন এখনই, বিশ্রাম করতে দাও হুজুরকে।

—যথার্থ ব'লেছেন নায়েব মশয়। কথায় বিনয় ফুটিয়ে বললে দলপতি। বললে যুক্তকরে। বলতে বলতে বসে পড়লো।

হুজুর শুধু বললেন,—খাওয়াবেন, গেরস্তকে ব'লে পাঠিয়েছেন নায়েব মশাই?

বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে বললেন,—তৎক্ষণাৎ হুজুর। তৎক্ষণাৎ ব'লে পাঠিয়েছি। মনে হয় এতক্ষণে প্রস্তুত হয়ে এলো।

কিছুই মনে ধরলো না? কত আনন্দ, কত ঐশ্বর্য্য, কত ভক্তি বুকে ক'রে এনেছে ঐ মেহনতী চাষা মানুষগুলি! যেন যাত্রীর মত এসেছে কোন পবিত্র তীর্থে, ভাল করে দেখলেন না হুজুর। ফিরেও তাকালেন না।

পশ্চিমাকাশে বুঝি এতক্ষণে ফুটে উঠলো অস্তচ্ছবি। দিনের আলো ময়লা হয়ে আসছে ক্ষণে ক্ষণে। কাক ডাকাডাকি করছে।

গহরজান বাই নিমন্ত্রণ-লিপি পাঠিয়েছে! কোন অজুহাত চলবে না।

মুরগীমুসল্লম বানিয়ে খাওয়াবে! না গেলে কত আফসোস করবে কে জানে। ভাববে হয়তো আহাম্মক। আমন্ত্রণ ক'রে শুধু কি খাইয়েই খুশী হবে, খোশগল্প করবে!

সূর্য্য ডুব-ডুবু দেখে পল্লীতে তখন সাজগোজের পালা চ'লেছে। মুখে খড়ি-মাটি মাখতে বসেছে। ঠোঁটে আর পায়ে আলতা। চোখে কাজল। চুল বাঁধতে বসেছে কেউ কেউ মেলায় কেনা আয়না সামনে ধ'রে। কিছুক্ষণের মধ্যে দিনের আলো নিবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন মঞ্চে অবতীর্ণ হ'তে হবে, যে জন্য এখন চলছে প্রস্তুতি। সাজসজ্জা। কার কত রূপ, কার দেহশ্রী কত—পরীক্ষা চলবে আঁধার হ'তে না হ'তে। ঘরের কোলে ঝুলন্ত আলসেয় জ্বলবে লণ্ঠন, রূপের হাট ব'সে যাবে।

ও গহর, কে এলো ছাখ। কোথা থেকে বললে সৌদামিনী। খুশীভরা কণ্ঠে। বললে,—কেমন অসময়ে এলো ছাখ, যাতে আর থাকতে না হয় বেশীক্ষণ।

চমকে উঠেছিল গহরজান। ভেবেছিল যার জন্য প্রতীক্ষা, এলো বুঝি সেই।

মুখে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে গহরজান দেখতে গিয়ে দেখলো, না অন্য জন। বললে, কৃত্রিম ক্রোধের সঙ্গে বললে,—কেন এলে তুমি, যাও, চলে যাও। কথা নেই তোমার সাথে।

আগন্তুক দিলখোলা হাসি হাসলো হো-হো শব্দে। অপমান গায়ে মাখলো না। বললে, গহর, তোর তো খুব বাত্‌চিত হয়েছে! বেমালুম বদলে গেছিস তুই?

—কে না বদলায়? গহরজানের রুক্ষ কণ্ঠ।—তুমিও তো বেজায় বদলে গেছো। আগে রোজ আসতে। এখন ন'মাসে ছ'মাসেও পাত্তা মেলে না।

—দোষটা আমাদের কি শুনলুম না তো জলিল। হাসি চেপে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললে সৌদামিনী। বললে,—গহরকে বল' যে, ও তোমার মেয়ের মত। মেয়েকে এক-আধ বার দেখতেও তো আসতে হয় জলিল!

আগন্তুকের দিল-খোলা হাসি থামে না। হাসতে হাসতেই বলে,—পেটের ব্যামোয় ভুগতেছিলুম কত দিন। হাকিমকে দেখাতে হাকিম কত দাওয়াই খেতে দিয়েছে। খানাপিনার নিয়ম ক'রে দিয়েছে। গান গাইতে মানা ক'রেছে বেশ কিছু দিন।

কথা শুনতে শুনতে মুখটি শুকিয়ে যায় গহরজানের। শরীর ভেঙ্গে পড়েছে জলিলের? গাওয়া থামিয়ে দিয়েছে জলিল। অনেকগুলো প্রশ্ন তুফান তোলে গহরজানের মনে।

জলিলই গান শিখিয়ে গাইয়ে ক'রে তুলেছে গহরজানকে। কত চেষ্টায় একটা যোগ্য শিষ্য করেছে জলিল। স্নেহের বশে শিক্ষা দিয়েছে, দিয়েছে কত ভাল ভাল জিনিষ। গহরজান দেখছে, হ্যাঁ, সত্যিই জলিল যেন একটু বেশী বৃদ্ধ হয়ে প'ড়েছে। ভ্রূ দু'টোতে পাক ধ'রেছে। জলিলের পোষাক কিন্তু আছে পূর্ব্বের মতই। সাদা মলমলের বটিদার পাঞ্জাবী, জাম রঙের ভেলভেটের ফতুয়া একটা, যার কারচোবের কাজের জৌলসে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ডুরিদার গুলবদনের ইজার। পায়ে লাল ভেলভেটের জরিদার নাগরা।

জলিল সত্যিকার গুণী ওস্তাদ। সঙ্গীতবিদ্যায় যথেষ্ট দখল। গহরজানের কণ্ঠে গীতসুধার হদিশ পেয়ে পর্য্যন্ত নাড়ানাড়া করছে গহরজানকে। জলিল একটা বিছানো মাদুরে বসে পড়লো। মাদুরের এক পাশে প'ড়েছিল হারমনিয়মটা। কখন হয়তো গলা সাধতে বসেছিল গহরজান। জলিল বললে. গহর, বাঙলা গান শিখেছি, শুনবি?

গহরজানের মুখে কথা নেই। জলিলের শারীরিক পতন দেখে বিস্মিত হয়ে গেছে। জলিল বললে,—ময়না বাই শিখিয়েছে। গজল গান।

বলতে বলতে হারমনিয়মটা এগিয়ে নেয় জলিল! বলে,—দু'টো পান ছেঁচে খাওয়াবি গহর?

সৌদামিনী বললে,—আমি পান ছেঁচে দিচ্ছি জলিল। গহর যাক্‌, চুল বেঁধে পোষাক-আষাক করুক। সময় বেশী নেই।

জলিল বললে,—কেন, কেউ আসছে?

ঠোঁট উলটে হাসলো সৌদামিনী। কেমন যেন দুঃখের হাসি হেসে বললে,—আসুক চাই নাই আসুক, তৈরী হয়ে না থাকলে তো আমাদের মুখে ভাত উঠবে না জলিল।

—হাঁ, হাঁ ঠিক বাত আছে। হারমনিয়মের শব্দ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠলো। জলিল বললে,—চুল বাঁধতে বাঁধতে শুনতে থাক্‌ গহর।

—আমি পান ছেঁচতে ছেঁচতে শুনি, তুমি গাও জলিল কত দিন তোমার গান শুনতে পাইনি। বললে সৌদামিনী।

জলিল গান ধরলো। বাঙলা গজল গান। গাইলে

ভোমরা কে তুঁহারে চায়
তোমার মত কত শত, লোটে আমার পায়।
কে তুঁহারে চায়—

বাইরে আকাশে-বাতাসে আজানের সুর। কাছাকাছি মসজিদ আছে চিৎপুরে। খিলানের কবুতর পাখা ঝাপটায় ভয়ে-ত্রাসে।

মধ্য-কলকাতায় তখন একটি গৃহে ফটক খুলে সেলাম জানাচ্ছে বেশধারী দ্বাররক্ষক—একটা জুড়ী দৌড়তে দৌড়তে পথে বেরিয়ে পড়লো।

হেমনলিনী ফিরে যাচ্ছেন। সঙ্গে চলেছেন হুজুর। কোথায় যেন বিঁধছে হীরা-জহরৎ হুজুরকে। অস্বস্তি করছেন হুজুর। সঙ্গে কোথায় আছে টায়রাটা কে জানে। লুকিয়ে রাখলেও যে দ্যুতি ছড়ায়।

[ক্রমশঃ

চণ্ডী দেবীর মন্দির, হরিদ্বার
—অমল বসু

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, নতুন দিল্লী
—ধনঞ্জয় দত্ত

জগৎ শেঠের মন্দির, বৃন্দাবন
—প্রদ্যোৎ চৌধুরী
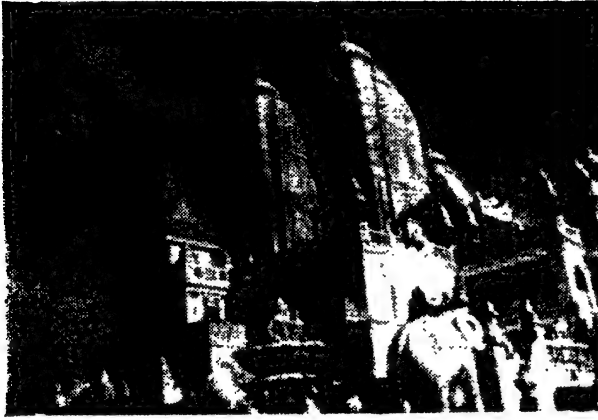
মাসীর মন্দির, পুরী
—শ্যামল দত্ত
(তৃতীয় পুরস্কার)
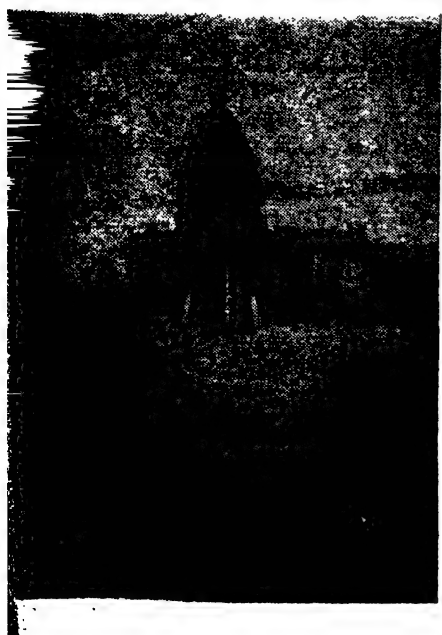
কালী মন্দির, দিল্লী
—ব্রজগোপাল সাহা
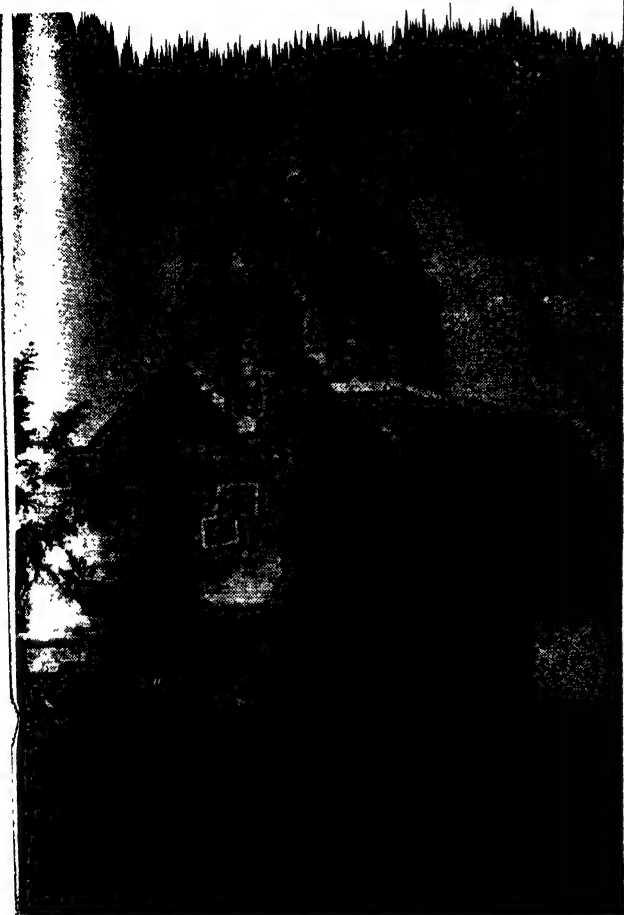
শঙ্করাচার্য্য মন্দির, শ্রীনগর
—গোষ্ঠবিহারী দে
(দ্বিতীয় পুরস্কার)
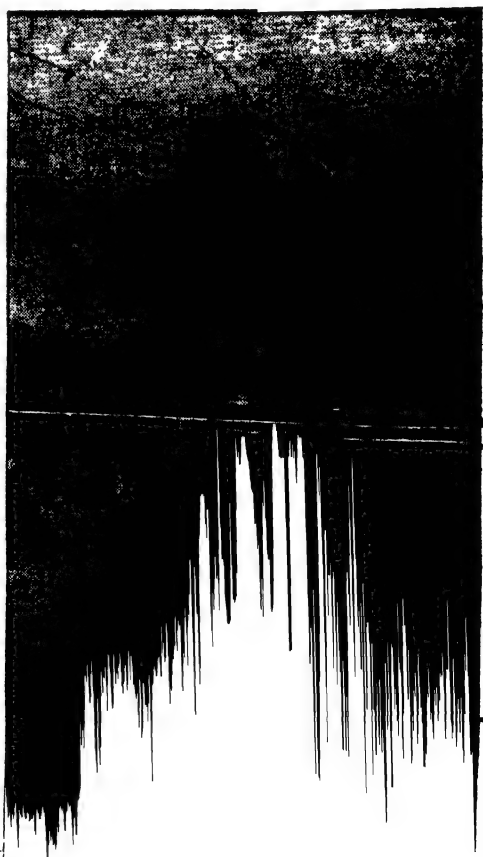
বিড়লা মন্দির, নতুন দিল্লী
—সুনীলকুমার সাহা

পরেশনাথ মন্দির, কলিকাতা

—প্রদ্যোৎ দে

(প্রথম পুরস্কার)

স্বামী বালানন্দজীর মন্দির, দেওঘর

—দীনেশচন্দ্র বসু

—আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা—

বিষয়

এই সংখ্যাতেও বিখ্যাত মন্দির

প্রথম পুরস্কার ১৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৲

তৃতীয় পুরস্কার ৫৲

ছবি দেওয়ার শেষ দিন ২০শে ফাল্গুন

চীন-রমণীর প্রেমপত্র

[এক জন চীনের লেখককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—"চীনে রমণী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না কেন?" তিনি কিছুকাল হতবুদ্ধি হয়ে থেকে বলেছিলেন, "চীনের রমণী! তাদের সম্বন্ধে কেউ কিছু জানেই না—তারা কেবল চীনেদের মাতা, সম্ভবতঃ এ ছাড়া তাদের সম্বন্ধে কেউ কিছু চিন্তাই করে না।"

সত্যই চীনের নারীসমাজ সাধারণের কাছে অজ্ঞাত—তারা তাদের স্বামীর ও পুত্রের পিছনে লুকিয়ে থাকতেই ভালবাসে, তবু প্রাচ্য জাতির পিতা-মাতার প্রতি অগাধ ভক্তি আছে ব'লে তারা পুরুষের উপর অগাধ আধিপত্য বিস্তার করে আছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডের অন্যান্য দেশের রমণীর চেয়ে চীনের রমণীদের সম্বন্ধে খুবই সামান্য কথা জানা যায়। অন্য দেশীয় সাধারণ ভ্রমণকারীর পক্ষে তাদের কথা জানা এক প্রকার অসম্ভব। চীন সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে সাধারণত নীচজাতীয় চীনেদিগকে লইয়াই—কারণ ভ্রমণকারী অথবা ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সহিত যাহাদিগের মেলা-মেশা হয় তাহারা প্রায়ই সামান্য লোক। ভ্রমণকারীরা কুলী রমণী দেখেন অথবা নৌবিহারিণী নারীদের সম্বন্ধে কিছু শোনেন ও দেখেন—কিম্বা চা'র দোকানে শোভন পরিচ্ছদপরিহিতা নর্ত্তকী বালিকার অঙ্গসঞ্চালনে মুগ্ধ হন। কিন্তু প্রকৃত চীনে রমণী—তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ, সংসার-ধর্ম্ম এ সমস্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

আমাদের বিশ্বাস, নিম্নের পত্রগুলি চীনে রমণীর জীবনের কিছু পরিচয় দিতে পারবে। এগুলি চীনের কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী যখন প্রিন্স চুংএর সহিত ভ্রমণে বাহির হয়েছিলেন সেই সময়ে তাঁহার পত্নী কুই-লি তাঁকে লেখেন।

চীনেও আমাদের ন্যায় ছেলেরা বিয়ে ক'রে পত্নীকে নিজেদের বাড়ী নিয়ে আসে—সেখানে তাদের স্বামীর মাতার ইচ্ছানুসারে চলতে হয়। এঁরা ইচ্ছে করলে পুত্রবধূর পক্ষে স্বামিগৃহ নন্দন বা নরক দুই-ই করে তুলতে পারেন। কুই-লির পিতা Chihliর শাসনকর্ত্তা ছিলেন, ইনি চীনের নবভাবের শিক্ষাপ্রথা প্রবর্ত্তনের একজন প্রধান উদ্যোগী,—ইনি কন্যা ও পুত্রকে সমভাবে শিক্ষিত করেন। কুই-লি তাঁহাদের প্রদেশের বিখ্যাত কবি Ling-wing-puর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন, এঁর নিকটেই ইনি কল্পনা ও ভাব-বিকাশের ক্ষমতা লাভ করেন।]

১

প্রিয়তম আমার!

পাহাড়ের উপরের বাড়ীখানি যেন তার সকল সৌন্দর্য্য হারিয়ে গেছে। আমার কাছে সবই শূন্য বোধ হচ্ছে, ছাদে উঠে অস্তাচলাবলম্বী সূর্য্যের কনকরশ্মির পানে চেয়ে থাকি—তখন মনে পড়ে তুমি কাছে নাই—উদয়াস্ত এখন সবই আমার সমান, কিছুতেই আনন্দ পাই না।

তুমি কিন্তু ভেবো না আমি অসুখে আছি। তুমি এখানে থাকতেও যেমন কাজ-কর্ম্ম করতুম—এখনও তেমনি করি—শুধু মনে … তোমার কথা—তুমি কাজগুলো সুনির্ব্বাহিত দেখলে কত সুখী … ! 'মে-কি' তোমার চেয়ারখানা সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল, … সেটা নাকি বড্ডো ভারী—আমি তা বারণ করেছি, ঐ চেয়ারে … বসতে—ঐখানে বসে ধূমপান করতে, বই পড়তে, আমি সব … তাই দেখতে পাই—ওখানা আমার নিকট কত প্রিয়,—কত … । 'মে-কি' ছাদের উপর সেই সরু ছোট পাইন গাছটি এনেছিল … আমি সেটা তাকে নীচে উঠানে রাখতে বলেছি। তুমি বলেছিলে … গুলো যেন বাল্যেই ঘূণে ধরে বৃদ্ধের মত দেখায়।' আমিও এক … টবের গাছগুলোকে বড় ভালবাসতুম—কিন্তু এখন তোমার … দেখতে শিখেছি। প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্যে বর্দ্ধিত তরুর চেয়ে … র চেষ্টাকৃত কৃত্রিম অর্দ্ধাঙ্গ তরুর শোভা কিছুই নয়।

খুব বড় চিঠি লিখে ফেলছি যে তোমাকে। তুমি আমায় ৭ দিন পর পর চিঠি লিখতে বার বার বলে গিয়েছ—সংসারের কথা, আমার কথা সবই জানতে চেয়েছ। তোমার পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী যেন এটা পছন্দ করেন না যে আমি তোমার কাছে চিঠি লিখি—তিনি বলেন তাঁদের সময়ে এ কেউ কল্পনাতেও আনতে পারত না—আজকালকার মেয়েরা লজ্জার মাথা খেয়ে বসেছে। প্রিয়তম—তোমার আফিসের খামগুলি যেমন নির্ম্মম ভাবে ছিঁড়ে ফেল তেমনই ভাবে এ চিঠি খুলো না—এ চিঠির এক-একটা অক্ষরের সঙ্গে আমার হৃদয়ের এক-একটা অংশ তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। ইতি—

তোমারই—'কুই-লি'।

২

প্রিয়তম আমার!

প্রথম পত্রখানিতে শুধু দুঃখ-নৈরাশ্যের কথাই ছিল; নূতন নূতন তোমাকে ছেড়ে মন কেমন হয়েছিল বুঝতেই পার? এক সপ্তাহ কেটে গেছে—অন্তরের দুঃখ শুধু আমিই জানি। তোমার মা ভাঁড়ারের চাবি আমার হাতে দিয়েছেন, পূর্ব্বে তিনি আমায় যেমন বালিকা ভাবতেন এখন আর তেমনটি ভাবেন না—এই ভেবে আমি বড় সুখী হয়েছি।

প্রথম যেদিন আমি স্বামীর সংসারে আসি সেদিনের কথা সদাই আমার মনে জাগে। আমার পক্ষে এইটুকু সান্ত্বনা ছিল যে পিতা-মাতা

শুধু হাতে আমায় অন্যত্র পাঠাচ্ছেন না। বিবাহের মিছিল প্রায় ১ লি (১ লি প্রায় ⅓ মাইল) দীর্ঘ হয়েছিল। আমি দেখছিলাম—বহু কুলী আমার নূতন সংসারের জিনিসপত্র বয়ে আনছে। ভারবাহীরা যখন বহু বিচিত্র কারুকার্য্য-শোভিত রেশমী চাদর, বহুমূল্য আসবাবপত্র নিয়ে আমার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল—আমি ভাবলুম সব আমার নূতন গৃহে যাচ্ছে—ভগবান করুন যেন আমিও সেখানে সকলের ভাল চোখে পড়ি। যথাসাধ্য সাহস সঞ্চয় কোরে তোমার সম্মুখে দাঁড়ালেম—কেমন বেশ ছিল আমার মনে পড়ে—সোনার কাজকরা রেশমের পোষাক পরে—মুক্তাবাঁধা চুলগুলি নিয়ে ব্রেসলেট্ ও আংটি ভারাক্রান্ত হাতখানি নিয়ে এই বালিকা তোমার সম্মুখে তার সকল সাহস সঞ্চয় করে দাঁড়াল বটে—কিন্তু ভয়ে সে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল। এই মাত্র সে পিতা-মাতা তার সব ভালবাসার জন ছেড়ে এসেছে—জানে না সে এখানে কেমন ব্যবহার পাবে—যদি সুনজরে না পড়ে কত দিন অসহ্য যাতনা ভোগ করতে হবে?

আমরা যখন তোমার পিতা-মাতার সম্মুখে নতজানু হয়ে বসেছিলাম—তখনই সর্ব্ব প্রথম আমি স্বামীর মুখ দেখলাম—। তোমার কি মনে পড়ে—যখন ঘোমটা খুলে তুমি একদৃষ্টে আমার চোখের পানে চেয়ে ছিলে? আমি ভাবছিলাম, "সে কি আমায় সুন্দরী দেখবে?" ভয়ে আমি তোমার দিকে ভাল কোরে চাইতেও পারিনি, এক মুহূর্ত্তের জন্যে চেয়ে দৃষ্টি অবনত হয়ে গেল আর তাকাতে পারলুম না—। সেই মুহূর্ত্তেই দেখেছিলেম তুমি সুন্দর সুপুরুষ—চক্ষু দু'টি সুন্দর—বর্ণ উজ্জ্বল—দন্তপাতি মুক্তার মতো—আমি অন্তরে বড় সুখী হয়েছিলাম,—কারণ অনেক কনের কথা জানি যাদের বরের মুখ দেখে কাঁদতে ইচ্ছা হয়েছে—কারণ, তারা বুড়ো এবং বড় কুৎসিত স্বামী পেয়েছে। ভেবেছিলাম যদি এঁর সুনজরে পড়ি তবে কত সুখী হতে পার্ব্বো।—আমার বিশ্বাস, যাঁদের ছেড়ে এসেছি, তাঁদের ভুলবার জন্যই তোমার পূজনীয়া মাতৃদেবী আমার হাতে ভাঁড়ারের চাবি দিয়েছেন, তিনি বলেন, "যে সব সময়ই কাজে ব্যস্ত থাকে সে দুঃখ করবার অবসর পায় না"—আমি সব সময়ই কাজে ব্যস্ত থাকি। ভোরে উঠে—দেখি চুল ঠিক আছে কি না—তার পর এক পেয়ালা চা নিয়ে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করি। ভোরের ভোজন ব্যাপার মিটলে আমি পাচক ও চাকরকে সব জিজ্ঞাসা করি। মাছ তরকারী সব নিজে দেখে নি এবং সব জিনিসের দাম জিজ্ঞাসা করি।

আমি চাবির গোছা নিয়ে ঘুরে বেড়াই—আর যখন ভাঁড়ারের দ্বার খুলি তখন আমার মনে ভারী আনন্দ হয়—কেন জানি না—বোধ হয় এইটা ভেবেই যে, এই গৃহের আমিই কর্ত্রী। চাকর বা ঝি কারো অসুখ হলে আমি সব কাজের বন্দোবস্ত ঠিক করে দেই—তার পর মা-লি'র সঙ্গে বাগানে গিয়ে ফুল গাছ সব দেখি। পাহাড়ের গায়ে যে ফুলগুলি জড়িয়ে থাকে ঐগুলি আমি বড় ভালবাসি। তুমি যে পথে গিয়েছিলে সেই পথের পানে একদৃষ্টে আমি চেয়ে থাকি।—সেই ভোরে তুমি সহরের দিকে যাত্রা কোরেছ—এই পথ দিয়ে আবার এই পথেই ফিরে আসবে—সেই আশায় চেয়ে থাকি।

তোমারই আশায় আছি—

তোমার ভালবাসার
আমি তোমারই—পত্নী।

৩

প্রিয়তম আমার!

দিনগুলি একই ভাবে কাটছে। তোমায় বলবার মতো নূতন খবর কিছুই নাই। সকাল বেলাটা সব গৃহস্থের মতো সাংসারিক কাজেই কেটে যায়। তার পর তোমার মা ঘুমুলে আমি ও তোমার ছোট বোন ছাদে যাই। মা-লি ও আমি সেখানে বহুক্ষণ সেলাইয়ের কাজ নিয়ে থাকি, আমরা কৃষাণদের খালের ভিতর থেকে কাদা উঠিয়ে জমিতে ছড়াতে দেখি—হংস-পালককে হাঁসের পাল নিয়ে লম্বা বংশদণ্ড হাতে কর্কশ কণ্ঠে হাঁসের পাল তাড়াতে দেখি। কখনও বা বিবাহের মিছিল যেতে দেখি—আবরণে ঢাকা কনের আসনখানি থেকে কনেটিকে দেখবার প্রয়াস অনেক সময়ই ব্যর্থ হয়। কখনও বা শবযাত্রী দর্শন করি—মৃতের সঙ্গে কেউ হয়তো পয়সা ছড়াতে ছড়াতে চলেছে—মৃতের আত্মা তৃপ্তি লাভ কোরবে এই উদ্দেশ্যেই এ দান।

এ স্থান এখন বড়ই সুন্দর। শরতের প্রকৃতি একটা নূতন সৌন্দর্য্যে দেশটাকে ছেয়ে ফেলেছে—এখনই শীতের ভয়ে ভীত হয়ে পতঙ্গকুল যেন তাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের সঙ্গীতটুকু শেষ কোরে নিচ্ছে। বন্য হংসীরা দক্ষিণাভিমুখে যাচ্ছে। কিছুই যেন ভাল লাগে না—চক্ষু আমার অজ্ঞাতসারে জলে ভরে আসে,—কেন বুঝি না—প্রভু আমার, প্রিয় আমার, সকাল সন্ধ্যা তোমার বিহনে কিছু ভাল লাগে না আমার,—এ দীর্ঘ দিন কি ফুরাবে না—

তোমারই—সেই।

৪

প্রিয় আমার!

তোমায় অনেক কথা বলতে যাচ্ছি। এর পূর্ব্বের পত্র পেয়ে তুমি নিশ্চয়ই অসুখী হয়েছ—এ পত্রে আশা করি তুমি সুখী হবে। তোমার ভাই সি-পের বিবাহ শীঘ্রই হবে। তুমি জান Chilh-leএর শাসনকর্ত্তার কন্যা লি-টির সঙ্গে বহুদিন পূর্ব্বেই তোমার ভ্রাতার বিবাহ স্থির হয়ে রয়েছে—কনে শীঘ্রই এখানে আসছে। আমরা তার সব বন্দোবস্ত কচ্ছি। জানি না তার সঙ্গে কতটি দাস দাসী আসবে, বেশী কিছু না এলেই ভাল—ভিন্ন দেশের লোক—কিসে কি হবে—সংসারের শান্তি নষ্ট শুধু। আমরা শুনেছি—সে নাকি খুব সুন্দরী—বিদুষী। তোমার মা—তার এ বৌ লেখা-পড়া জানে শুনে বড় অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তিনি বলেছেন, "বেশী লেখাপড়াটা মেয়ে লোকের পক্ষে কিছু নয়।" আমি আর তোমার বোন মা-লি খুব সুখী হয়েছি। আমরা মনে মনে ভেবে ভারী সুখী হয়েছি—অবশ্য এ কথা নৈশ বায়ুরও কাণ আছে বলে প্রকাশ করিনি—এখন দু'জনার পরিবর্ত্তে তোমার মা'র কথা শোনার তিন জন লোক হলো। তুমি বুঝতে পাচ্ছ—তিনি বেশী কথা বলেন বলে নয়—তবে তিনি কথা বললেই আমাদের শুনতে হবে বলে।—আরো খবর আছে—এক জন নূতন ক্রীতদাসী আমাদের বাড়ী এসেছে—তুমি বোধ হয় জান আমাদের উত্তর দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। কতকগুলো নৌকা এসে আমাদের খালধারেই বেঁধেছিল। তার ভেতর থেকে এক জন বালিকা আমাদের এখানে এসেছে। তার চেহারা বড় সুন্দর, কোঁকড়ান চুলের রাশি—তা

মাথা ভরা। নয়নদ্বয় কোমল মধুর। তাকে দেখে আমি ভালবেসেছি—এমন বন্ধুহীনা সহায়হীনা সে।

সে আমায় বললে তারা এক বাড়ীতে বহু স্বজন ছিল; পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী—আত্মীয় সবই ছিল। অন্ন মেলা ভার হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জিনিসেরই মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি হলো, মৃত্যু তাদের পাশে এসে দাঁড়ালো—অন্নাভাবে মৃত্যু এর চেয়ে আর যা কিছু হয় তাই ভালো! এমন সময় বালিকাদের কেনবার জন্য লোক এল—এক জন বালিকা বিক্রী করলে সেই অর্থেই তারা সমস্ত শীত কাটাতে পার্কে—এদিকে দুর্ভিক্ষের প্রকোপও অনেক কমে আসবে; এক জনকে দিলে সব বাঁচতে পারে; বালিকার মাতাকে এ কথা বলাতে মাতা নিজ কন্যাকে বেচতে সম্মতা হলেন না, নিশা তাঁর কাঁদতে কাদতে ভোর হতো দিবসে কন্যাকে সব সময় চোখে চোখে রাখতেন। অবশেষ হতাশ হয়ে একদিন মাতা 'কোরাণ-ইস্'এর পূজো দিতে দূরবর্ত্তী মন্দিরে যান। মা গেলে পিতাকে বহু মুদ্রা দিয়ে এই কন্যাটিকে ক্রেতারা নৌকায় তুলে নেয়, পেট যখন শূন্য, গর্ব্ব তখন দূরে পালায়, আর কত শিশু অনাহারে কাঁদছে—এক জনের ত্যাগে যদি সকলের অভাব পূর্ণ হয়। আমি এখন তার মা'র স্থান অধিকার করেছি। বড় ভালবেসেছি তাকে আমি। এমন উজ্জ্বল দিবস—এই স্বর্ণবর্ণ বিচিত্র সূর্য্যরশ্মি—নিশীথে মধুর চন্দ্রালোক—কত ভাবি—তোমার কথা। এমন দিনে তোমার কি একবারও মনে পড়ে না আমায়? সমস্ত নিশা তোমার অপেক্ষায় থাকি আমার বাহু তোমার উপাধান হোক এই আশায় থাকি—কিন্তু তুমি কোথায়?

তোমারই অপেক্ষায় আছি প্রিয়তম।

৫

প্রিয়তম আমার!

নূতন বধূ এয়েছেন এখানে। এ নূতনের সঙ্গে অনেক নূতনের সঙ্গে দেখছি, বিচিত্রতায় বাড়ীখানি পূর্ণ হয়ে গেছে, কত দাসদাসী, ভূষণ। এটা আমি নিশ্চয় বলছি—যদি তার গাউনগুলি পর পর সাজান যায় তাহলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাবে। সে বসন্তের ফুলের মতো শুভ্র সুন্দর কিন্তু তেমনই অকেজো। এক দল সৈন্য আমাদের বাড়ীর উপর তাঁবু বেঁধে থাকলে যতটা গোল না হতো একটি নূতন বালিকার আগমনে তার চাইতে বেশী হচ্ছে। সে তার সঙ্গে মেজে আচ্ছাদনের বহু কম্বল, দেয়ালে টাঙ্গাবার জন্য কনফিউসিয়াস এবং মেনসিয়সের বহু বাণী, মোড়া খাট-বিছানা এই সব এনেছে।

তোমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী এই সব জিনিষ দেখে আমাদের সব ডাকলেন, তার পর আমাদের বললেন যে তিনি 'সাং ভং'এ তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী চা খেতে যাচ্ছেন। জিনিস সাজাবার গুছাবার ভার এখন আমার একার উপরেই। লি-টি প্রজাপতির মতো চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কথা সে খুব বলছিল কাজ কিছুই করছিল না। শয্যা এমন ভাবে করতে হয়েছিল যাতে শয়তানে নিশীথে ঘুমন্ত ব্যক্তির আত্মা নিয়ে পালাতে না পারে। পর্দা সব খুব ভাল করে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেন শয়তান আক্রমণ করতে আসতেই পর্দায় আটকে যায়। লি-টি ভারী গম্ভীর ভাবে আমাকে বোঝাচ্ছিল, যে সব আত্মা আঁধারে ঘুরে বেড়ায় সেগুলি সাধারণতঃ নূতন কিছু দেখলে তারই মাঝে আশ্রয় নিতে চায়। সে জন্য সতর্ক থাকা দরকার। সে ছাদও পরীক্ষা করেছিল—যদিই বা সে দিক থেকে কিছু আসে। লি-টি রান্না-ঘরেও নূতন মূর্ত্তি স্থাপনের কথা বলেছিল, তোমার মা ছিলেন না তাই রক্ষে। বুঝতেই পাচ্ছ, তোমার মা যদি নবাগতার গৃহের দেবতাকে নিজের রান্নাঘরে দেখতেন, তাঁর কি অবস্থা হোত। তোমার মা আসতেই সব মিটে গেল, তাঁর পুত্রবধূর এতটা বাচালতা তিনি মোটেই পছন্দ করলেন না। তোমার মা প্রায়ই বলেন যে, লি-টির পিতার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হলে হয়—তাঁকে বলবেন যে কন্যার বিবাহে লাখ লাখ খরচ করতে পেরেছেন আর তার চরিত্র গঠনের জন্য হাজারও কি খরচ করতে পারেননি? মনটা বড় খারাপ—আজকের মত তবে বিদায়—

তোমারই পত্নী।

৬

প্রিয়তম আমার!

"অবিনীত স্বভাব, অসন্তোষ ভাব, পরনিন্দা, দ্বেষ এবং নির্ব্বুদ্ধিতা" এই পাঁচটি দুর্ব্বলতা নারী জাতির সর্ব্বপ্রধান শত্রু, প্রথমোক্ত চারিটি এক বুদ্ধিহীনতার দোষেই ঘটে থাকে। তোমার এ সম্বন্ধে মত কি? যতক্ষণ আমরা আমাদিগকে বাড়ীর বধূ হিসাবে ধরে নিই ততক্ষণই অবস্তি বোধ করি, গৃহকর্ত্রী হিসাবে ধরলে তেমনটি নয়। লি-টি এখনও একটি ছোট বালিকা—তুমি হাসছ যে? বোধ হয় ভাবছ আমার চেয়ে মাত্র তিন বৎসরের ছোট—সে হলো বালিকা। তবু আমি তোমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট এক বৎসর বাস করেছি এবং পাকা গৃহিণীর নিকট হ'তে বহু জ্ঞান লাভ করেছি। লি-টিও যদি অবসর সময়ে তার পিতামাতার কথা ভেবে ক্রন্দনে আর বৃথা আলস্যে নষ্ট না করে কিছু দিনের মধ্যেই বুদ্ধিমতী হয়ে উঠবে।

আমার কাছে সে এই পুরাতন প্রাসাদের আনন্দময়ী; সদাই সে হাস্যময়ী—মধুর হাসিতে ভগবান্ সদা তৃপ্ত। গৃহের অশান্তি দূরে পালায়। লি-টি প্রায়ই তোমার মা'র নিকট অপমানিতা হয়। এখন তোমার মা নিয়ম করে দিয়েছেন যে লি-টি ও মা-লি প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ কনফিউসাস থেকে রোজ কিছু পাঠ নেবে।

লি-টি প্রসাধন সম্বন্ধে অতিশয় যত্ন নিয়ে থাকে। দুজন দাসী নিয়ে প্রাতঃকালে সে তার আয়নার সম্মুখে বসে। এক জন জলের গামলা ধরে থাকে, অপরটি প্রসাধনের দ্রব্যাদি গুছিয়ে দেয়। মুখখানি সুগন্ধি মধু দ্বারা সিক্ত করে তার উপরে চাউলের গুঁড়া লাগায়, ক্রমে মুখ চাউলের মতোই সাদা হয়ে যায়। তার পর গণ্ডদ্বয় তোয়ালে দিয়ে মুছে নীচের ওষ্ঠে কিছু লাল রং লাগিয়ে চুলগুলি বাঁধে। তার চুলগুলি খুব সুন্দর (কিন্তু আমার মতো এত দীর্ঘ বা ঘন নয়, আমার তো এই মনে হয়)। সে যখন তার রেশম ও সাটিনের জামা গায়ে দিয়ে বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি প'রে বার হয় তখন তার বেণীবদ্ধ দীর্ঘ কুন্তলরাশি হ'তে পায়ের জুতা পর্য্যন্ত যেদিকেই কেন দেখি না অপূর্ব্ব সুন্দর বলে বোধ হয়। তাকে দেখে আমার হিংসে হয়—কারণ তুমি যখন

এখানে ছিলে তখন আমি ত' ঐরূপ সজ্জিত হতেম। স্বামী আমার, তুমি নিকটে নাই—কার আনন্দের জন্য আর বেশভূষা করবো? পাউডার তোমার যাবার পর ব্যবহার হয়ই নাই—বিরহিণী নারীর কোন্ গাউন মানাবে সে খুঁজতে কত বার কাপড়ের বাক্স ঘেঁটেছি।

তোমার মা বলেন লি-টি গর্ব্বিতা এবং তিনি প্রায়ই বলেন, "রমণীর সুন্দর মুখের চেয়ে ভাল অন্তঃকরণ অনেক মূল্যবান।" আমি বলি, সে আমাদের আনন্দময়ী, তার উপস্থিতিতে চার দিকে আনন্দ উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। তার নারীজন্মও সার্থক হয়েছে—তোমার ভাই সি-পে তাকে পেয়ে যথেষ্ট সুখী হয়েছে, সে তার এই সুন্দর ফুলটিকে পূজা করে। তোমার মার সঙ্গে হয়তো লি-টির একটু কথান্তর হয়েছে, লি-টি বসে দুঃখ কচ্ছে—সি-পে তার কক্ষের চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—যেই তোমার মা একটু নয়নের আড়াল হলেন অমনই দু'জনে মিলন হলো—এখন তাদের হাসি শুনতে পাচ্ছি,—অবসাদ অস্বচ্ছন্দতা সব কেটে গেছে বাঞ্ছিতের সমাগমে।

শীতকাল এসেছে এখন আর আমরা ছাদের উপর অধিকক্ষণ কাটাতে পারি না। সমস্ত দেশ যেন ধূসর কুয়াসায় আবৃত হয়ে গেছে—চাষীরা সব মাঠ ছেড়ে চলে গেছে। পাহাড়ের নীচের রাস্তায় লোক-চলাচল একরূপ বন্ধ—যদিও দু'-এক জন্ ছাতা বা খড়ের টুপি মাথায় দিয়ে চলে।

তোমার কাছে আমি এমন সব চিঠিও লিখি। এর চেয়ে আমাদের নারী-জীবনের ঘটনাই বা কি—আমাদের সংসার এই গৃহের মধ্যেই বদ্ধ—এর বেশী চাইও না কিছু—।

তোমারই পত্নী।

৭

প্রিয়তম আমার!

ভারী একটা মজার ঘটনা, আমরা দোকানে গিয়ে জিনিষ কিনেছি—আমাদের পক্ষে এটা একেবারে অপূর্ব্ব—লি-টির জন্যই আমরা এ আনন্দ লাভ করেছি;—লি-টিকে এ জন্যে কত আশীর্ব্বাদ কচ্ছি। লি-টির জন্যে সব দোকানদারেরা প্রথমে আমাদের বাড়ীতেই জিনিষ নিয়ে আসত, কিন্তু সে এতে সন্তুষ্ট না হয়ে নগরের দোকান থেকে জিনিষ কিনবে এই আবদার আরম্ভ করলে, তোমার মা'র অনুমতির জন্য আমরা কি অস্বস্তিতে দিন কাটিয়েছি—তারপর তোমার মা আমাদের নগরে যাবার জন্য খাটুলির ফরমাস্ করলেন—তখন কি আনন্দ আমাদের! প্রথমে তোমার মা চার বেহারার কাঁদে চড়ে চললেন, তার পর আমি দু'বেহারার কাঁধে চড়ে লি-টি ও মা-লি তার পর চললে; তাদের পেছনে চাকররা সব যাচ্ছিল আমাদের মোট বয়ে আনতে। আমরা যখন নগর-দ্বারে পৌঁছিলাম তখন সকলেরই কি আনন্দ! সেদিন হাট-বার, রাস্তাগুলি মৎস্য ও শাকসব্জীর ঝুড়িতে বেজায় সঙ্কীর্ণ করে তুলেছিল। ঘোড়া-গাধায় চড়ে বহু লোক যাতায়াত কচ্ছিল—আমার তো ভয়ই হলো—এর মধ্য দিয়ে আমাদের বাহকেরা রাস্তা করে যেতে পার্ব্বে কি না! আমাদের বাহকদের 'আঃ হোঃ' শব্দে রাস্তা পেতে কোন কষ্ট হলো না। আমরা সেই লম্বা খোলা দোকানগুলি প্রাণ ভরে দেখে নিলুম। একটা জুতার দোকানের সম্মুখে দেখলুম একজোড়া মস্ত বুট, পার্ব্বতীয় রাজার জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে। পাখার দোকানে পাখাগুলি অবিশ্রাম চল্‌ছিল। রেশমের দোকানীরা জানালা-দরোজা এমন কি রাস্তা পর্য্যন্ত রেশম দিয়ে মুড়ে ফেলেছে।

আমরা অনেক কথা খরচ করে, দর-দাম করে সিল্ক ও সাটিন খরিদ করলাম, স্বর্ণালঙ্কার দেবদেবীর মূর্ত্তিও অনেক কেনা গেল। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত্ত হয়ে বাড়ী ফিরে এসে—মনে হচ্ছিল, কখন চা পান করে প্রাণ জুড়াব! সেই জনপূর্ণ নগরের কোলাহলের চাইতে আমাদের এই দেয়ালঘেরা শান্তিময় জীবন—কত বিভিন্ন। আমি ভাবি এখানে আমরা কতটা শান্তিতে বাস কচ্ছি, দুঃখ-দৈন্য আমাদের পাশে থাকতে পারে বটে, কিন্তু আমাদিগকে স্পর্শ করতে পারে না। তবু ভাবি, আমরা যেন বিশ্ব থেকে কতটা বঞ্চিত—এক একবার এই নূতন দেখবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

তোমারই প্রিয় ক্লান্ত পত্নী।

৮

প্রিয়তম আমার!

আমি এক জনের জন্য বড়ই চিন্তায় পড়ে গেছি। তোমার কি আমাদের দেশের সেন-পের কথা মনে পড়ে? আমার বিয়ের মাস দুই পরে যার লিং-পে-উর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল! সে দুঃখে পড়ে কাল আমার কাছে এসেছিল। তার স্বামীর বাড়ী থেকে তাকে বাপের বাড়ী রেখে গিয়েছে। তুমি বুঝতেই পার, স্বামী-পরিত্যক্তাকে আজীবন কি লজ্জা বহন করতে হয়। আমি জানি না কি করতে হবে, ভারী দুঃখে পড়ে গেছি। তার শাশুড়ীর জন্যেই এতটা ঘটেছে—আমি সেন-পেকে বুঝাচ্ছি যে স্বামীর পিতা-মাতাকে প্রত্যেক নারীরই নিজের পিতা-মাতার চেয়ে বেশী সম্মান করা উচিত।

আমি ভাবছি সে তাঁকে সম্মান দেখাতে ত্রুটি করেছে—তাই এ শাস্তি ভোগ কচ্ছে। আমরা ছেলে বেলায় পড়েছি যে, জ্ঞান লাভের প্রথম উপায়ই হচ্ছে সম্মান করে চলা। আমি বুঝতে পারি যে, সব সময় মুখ বুজে চুপ করে থাকাটা কষ্টকর বটে—কিন্তু শান্তিপ্রয়াসী হলে একটু সহিষ্ণুতা থাকাও যথেষ্ট প্রয়োজন। আমার এখানেই সে দু'দিন থাকবে। কাল রাত্রে সে আঁধার পানে চক্ষু মেলে একদৃষ্টে চেয়েছিল। আমি তাকে একটু বুদ্ধিমানের মতো চিন্তা করতে বললেম—তার স্বামী ও শাশুড়ীর সঙ্গে সরল ভাবে সব কথা বলতে বললেম; কারণ তাঁরা উভয়েই এর যথেষ্ট সম্মানের পাত্র—স্বামীহারা পুত্রহীনা অবস্থায় যখন পরের দয়ার উপর তাকে নির্ভর করতে হবে তখন সে বুঝতে পারবে এর মূল্য। যাক ও সব কথা;—প্রিয়তম আমার, তোমার আমার মধ্যে কখনও অবিশ্বাসের ছায়া মাত্র পতিত হবে না—আমি তোমারই, এ হৃদয়-প্রাণ তোমারই, তুমি আমায় ভালবাসবে আমি শুধু এই চাই—।

তোমার পত্নী।

৯

প্রিয়তম আমার!

তোমার কাছে পত্র লিখতে আর সাত দিন অপেক্ষা করতে পারলুম না—কারণ কাল সন্ধ্যায় যে পত্র দিয়েছি সে শুধু দুঃখের কথাতেই পূর্ণ ছিল। কাল রাত্রে বেশ ঘুম হয়েছিল, আজ মন অনেক ভাল বোধ হচ্ছে।

তোমার মা আমায় খুব বকেছেন, যদিও আমি নিজে বুঝতে ...ছি এটা অনর্থক, তবু কথাগুলো আমার প্রাণে ভারী লাগে—তুমি ...ন, তাঁর কথার উত্তর দিতে আমি অভ্যস্থ নই। লি-টিও ... কষ্টে আছে যদিও এটা সে নিজের জন্যই ভোগ কচ্ছে—তবু জন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। লি-টি তার বাপের বাড়ী ...কে যে সমস্ত চাকর-চাকরাণী এনেছে তার ভেতর এক জন বুড়ো ... সেই লি-টিকে পালন করেছিল, ভালও বাসে খুব তাকে—তবে ...তে কাজ না থাকলে মেয়ে লোকের যে দশা হয়—সে অন্দরে বসে কেবল বাজে গল্পেই সময় কাটায়। তার এই রাজ্যের অবান্তর প্রসঙ্গ—বাজে বকা পরনিন্দা এ সব যদি দাসীদের মহলেই বদ্ধ থাকত তবে কথা এত দূর গড়াত না—সে আবার দিন ভ'রে যা সংগ্রহ করে ...টির প্রসাধনের সময় তার কাছে বসে তাই ঢালে। লি-টি বালিকা ও-সব বাজে কথা শোনবার মোটেই উপযুক্ত নয়। রক্তের সঙ্গে বিষ মিশালে যেমন সমস্ত শরীরেই ব্যাপ্ত হয়—তেমনই একবার যদি এই বাজে বকবার অভ্যাস মেয়ে লোকের হয়ে যায় তবে পরিণাম বড় খারাপে দাঁড়ায়। চাকর-চাকরাণীদের ভিতর কেবল একই আলোচনা চলছে—লি-টির বাপের বাড়ীই বা কেমন, আর তার এ বাড়ীই বা কেমন, সেই বা কেমন এবং তার স্বামীই বা কেমন, এই সব আলোচনা শেষে এত বেড়ে উঠেছিল যে, আমাদের দাসদাসীরাও তাতে যোগ দিয়ে দৈনিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই একরূপ অসম্ভব করে তুলেছিল।

এটা সামান্যই বোধ হয় বটে—কিন্তু এতেই আত্মীয়তার বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল করে ফেলে—গৃহের শান্তিও নষ্ট হয়। অবশেষে একদিন আমি লি-টির বুড়ো ঝিকে বললেম যে, যদি আর তার দেশে যাবার ইচ্ছা নাই থাকে—তবে সে যেন তার মুখটা একটু সংযত করে। কয়েক দিন বেশ ভাল ভাবেই কেটে গেল, আবার যে সেই; ...কে একদিন আমার মহলে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লুম,—"তোমার অন্ন এখান থেকে উঠেছে—তুমি এখন বিদেয় হও। লি-টি কেঁদে অস্থির কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—এক সংসারে থাকতে গেলে এমন ব্যবহারের প্রশ্রয় দেওয়া কোন মতেই সঙ্গত নয়। সে গেল বটে কিন্তু আমাদেরই দরজায় বসে আমাকে গালি দেবার লোভটুকু সম্বরণ করতে পারলে না, সে আমাদের বাহিরের পথে বসে ...নটি ঘণ্টা ধরে 'লি-উ'র বংশের উপর নানারূপ অভিসম্পাত বর্ষণ করতে লাগলো। সে তোমাদের বিখ্যাত পিতৃপুরুষদের কত ...সা! প্রিয়তম আমার, আমি জানতুম না—ইতিহাস এই বংশের ...দের বক্ষে ধরে কত গৌরবান্বিত। আমি কত সুখী হলুম যে ...ন মহৎ বংশ হতে এসেছ তুমি। তার পর সে মিং বংশের ...লোচনায় ও তাদের গুণরাশি ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হলো। লি-টির ...পুরুষদের কত সুযশ কাহিনী—কীর্ত্তিগাথা। ওরা বংশতালিকা সব ...ছিল দেখছি। যাক্ ও সব বাজে কথা। তিন ঘণ্টা সমানে ...র পর বুড়িটা ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়লো। শেষে এক জন ...রের কাছে একখানা চিঠি লিখে বুড়িকে নৌকা করে তার বাড়ী ...ঠিয়ে দিলুম—।

কিন্তু তোমার মা'র সে কি অবস্থা! তুমি দূরে আছ খুবই সুখে ...ই। তিনি এ উঠান থেকে ও উঠান ছুটোছুটি করে বেড়াতে ...লেন, আমি ভাবলুম তিনি বোধ হয় ঝিটাকে জব্দ করতে সৈন্য আনতে পাঠাবেন—তার পর যখন বুঝতে পারলেন যে মেয়ে লোকটা তাঁরই অধীনে আছে তখন একটু সংযত হলেন।

কি যে অবস্থা হয়েছিল তাঁর কেবল মরতেই বাকী ছিল—তুমি জান তোমার মা'র সংযমের অভ্যাস মোটেই নাই—বিশেষতঃ জিহ্বার সংযম নাই বললেই চলে। যা হোক, শেষে কোন রকমে তাঁকে শয়ন-গৃহে নেওয়া গেল—আমরা চা ও কিছু গরম মদ নিয়ে গেলাম এবং যাতে তিনি এই অপমানের কথা ভুলতে পারেন তারই চেষ্টা করতে লাগলেম। এতেও যখন তিনি সুস্থ হলেন না তখন আমরা পূর্ব্ব-ফটক থেকে ডাক্তার আনতে লোক পাঠালেম, ডাক্তার এসে তাঁর স্কন্ধদেশ পুড়িয়ে ভিতরকার গরমটা বের করে ফেলতে বললে, এতে তোমার মা বেজায় আপত্তি করাতে ওঝা তাড়াতাড়ি তার সাজ-সরঞ্জাম গুটিয়ে নিজের কাঁধের পানে ভীত ভাবে চাইতে চাইতে পাহাড়ের পথে চললেন। তার পর আমি তাঁর প্রিয় পুরোহিতকে ডাকতে পাঠালেম। তিনি কিছু গোলাপী মদ, ধূপ-ধূনো ও মোমবাতি নিয়ে এলেন, কিছু কাল মন্ত্রোচ্চারণ করলেন, একটু গানও গাইলেন এর মধ্যে তোমার পূজনীয়া মাতা-ঠাকুরাণী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে লি-টিকে ডেকে আনতে বললেন। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললেম, 'এখন লি-টিকে ডেকে কোন ফল হবে না, তার মন এমনই অস্থির আছে যে এখন সে কোন কথাই বুঝতে পারবে না। তিনি বললেন, 'ও একটা ছবি, শুধু রংই শাদা—ভিতরে কিছু নেই।' আমি বললেম, "আমাদের ওকে গড়ে নিতে হবে।' তিনি রেগে উত্তর করলেন, 'ও ঘুনেখেকো বাঁশ আর নোয়ান চলে না।' আমি আর কোন উত্তর করলেম না—লি-টি ও সি-পিকে "স্বর্ণ-মৎস্য-মন্দিরে' বেড়াতে পাঠিয়ে দিলুম। যখন তারা ফিরে এল ঝড় তখন অনেকটা কেটে গেছে। এতেই আমার মন যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল—যত ঝড়-ঝঞ্ঝা সব আমাকেই মেটাতে হয়। তুমি মনে করো না আমি এতে বড্ডো বিচলিত হয়ে পড়েছি। আমি জানি, এর সমস্তই পরিণামে সুখের জন্য—এ দুঃখের দিকে আমি মোটেই চাই না।' প্রিয়তম আমার, তুমি আমার ভাব, এর চেয়ে সুখ আর কিসে আমার?

তোমার পত্নী।

১০

প্রিয়তম আমার!

সেদিন সহস্রভুজার মন্দিরে মহোৎসব উপলক্ষে আমরা গিয়েছিলাম। তোমার মা ঠিক করলেন যে আমরা নৌকায় কিছু দূর গিয়ে তার পর পাল্কীতে যাব। আমরা সহর থেকে একখানা নৌকা ভাড়া করলুম। কিন্তু নৌকাখানায় আমাদের সকলের ধরবার উপযোগী স্থানের অভাব ছিল—আর একটু বড় হলে ঠিক হোত। তোমার মা, তাঁর চারি জন বন্ধু—আমি লি-টি আর মা-লি ছিলাম, আমাদের সঙ্গে পাচক, চাকর ও তিন জন দাসী ছিল। আমার পক্ষে এই প্রথম নৌকা-যাত্রা—দূর থেকে নৌকা দেখার চেয়ে এতে কত বেশী আনন্দ! আমরা নৌকা থেকে চার দিকের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলাম—বাঁশের ঝাড়ের ভিতর থেকে কুটিরগুলি দেখা যাচ্ছিল। নদীর মাঝে কত নৌকা কত লোক জন। সেই জনাকীর্ণ জলপথে আমাদের নৌকা চলতে লাগলো, দূরে চা-র দোকানে সকলে

চা খাচ্ছিল। ছাদের পাশে ছোট ছোট ছেলেরা দাঁড়িয়ে আমাদের পানে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়েছিল। কোথাও বা ঘাটের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে রমণীরা সব কাপড় কাচছিল। এত নৌকা এখানে, আমার পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল না যে জগতে এত নৌকা থাকতে পারে। সে কত ছোট, বড়, বোঝাই নৌকা—কোনখানা পালে যাচ্ছে—কোনখানা বা দাঁড় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা মাছধরা নৌকা যথেষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম—ক্ষুধিত আঁখি নিয়ে সম্মুখে মাঝিরা তাদের শীকার সন্ধানে বসে আছে। ক্রমে আমরা বিশ্রামস্থলে উপস্থিত হলেম। বাহকেরা আমাদের অপেক্ষায় ছিল, সেখান থেকে বাঁধা রাস্তা ধরে আমরা মন্দির-পথে চলতে লাগলেম।

এখানে যেন সমস্ত জগৎই উপাসনা কচ্ছে—ধনী, দরিদ্র কত প্রকারের রমণী কিন্তু এখানে সব সমান, ভেদ বিবাদ কিছু নেই।

আমরা মন্দিরে প্রবেশ করে বাতি জ্বালিয়ে ধূপ-ধূনো দিলাম, ভগবতী সহস্রভুজার দ্বারে প্রণাম করে তাঁর কাছে নব বর্ষের জন্য আমাদের সমস্ত পরিজনের মঙ্গল প্রার্থনা করলেম। আমি দয়াময়ী দেবী কোয়াণ-ইনের কাছে গিয়ে তাঁকে ভক্তিভাবে প্রণাম করলুম—তুমি জান তাঁর কাছে আমি কত কৃতজ্ঞ—আরো আরো দেব-দেবী প্রণাম করলুম বটে কিন্তু কোয়াণ ইন রমণীরই দেবতা—তাঁর স্থান আমার হৃদয়ের সবটা জুড়ে আছে।

তিনিই আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তুমি বিদেশে বহু দূরে আছ তিনিই আমায় রক্ষা কচ্ছেন। সূর্য্যের আগমনে যেমন আকাশ থেকে চন্দ্র-তারা সব দূরে যায় তেমনই তাঁর কাছে গেলে আমার সমস্ত প্রবৃত্তি লুপ্ত হয়ে যায়, দুঃখ-দৈন্য কিছু থাকে না—কত ভালবাসি আমি তাঁকে সেটা বুঝাতে পারব না—তিনি যেন আমার কথা শুনে থাকেন—আমার কোন আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাছে অপূর্ণ থাকে না।

মন্দির ছেড়ে আসার সময় দেখলুম সেই প্রকাণ্ড আঁধার ঘরে জগতের আলো বুদ্ধদেব বসে আছেন, সে মূর্ত্তি কি সুন্দর—মন আপনা হতেই ভক্তিতে নত হয়ে আসে। শান্ত স্থির নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ—ধ্যানী বুদ্ধ—চারি দিকে সহস্র আলো জ্বলছে, ধূপের ধোঁয়ায় ঘরখানা আঁধার হয়ে গেছে। আমি ভাবলুম "তিনি সর্ব্বক্ষমতাসম্পন্ন"।

মন্দির-দ্বার থেকে 'পিঠে' কিনে আমরা মাছগুলোকে সব বিতরণ করলুম। তার পর কিছু জলযোগ করে বাড়ীর দিকে রওনা হওয়া গেল। তোমার মা ও তাঁর বন্ধুগণ বহু বিষয়ের আলোচনা কচ্ছিলেন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রের আলোচনা থেকে আধুনিক বালক-বালিকা, শিক্ষাপ্রণালী, গৃহকার্য্য, দাসদাসী কোন কথাই বাদ যায়নি। আধুনিক শিক্ষার কথা উঠতেই তাঁদের বক্তৃতার চোট আরও বেড়ে উঠল, কারণ এটা তাঁদের সকলেরই চক্ষুশূল।

ক্রমে আমরা বাড়ীর ঘাটে এসে উপস্থিত হলাম, হঠাৎ যেন আমার অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠলো—হায়, তুমি এখন আমার কাছে নাই—পথের পাশে লি-টির স্বামী তার জন্যে অপেক্ষা করছে—আমার অপেক্ষা করার কোন লোক নেই—আমার পক্ষে সব শূন্য! এতক্ষণ আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলুম—আবার বিষাদে হৃদয় ভরে গেল। প্রিয়তম আমার,—

তোমার ভালবাসার "সেই"।

বিদ্যাসাগরের সৎসাহস

"বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইলে চারিদিক্ হইতে লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিত। কেহ পরিহাস করিত, কেহ গালি দিত। কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার করিবার—এমন কি মারিয়া ফেলিবারও ভয় দেখাইত। বিদ্যাসাগর এ সকলে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। একদিন শুনিলেন, মারিবার চেষ্টা হইতেছে। কলিকাতার কোনও বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি, বিদ্যাসাগরকে মারিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। দুর্ব্বৃত্তেরা প্রভুর আজ্ঞাপালনের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। বিদ্যাসাগর কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না। যেখানে বড় মানুষ মহোদয় মন্ত্রিবর্গ ও পারিষদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া প্রহরীরক্ষিত অট্টালিকায় বিদ্যাসাগরের ভবিষ্যৎ-প্রহারের উদ্দেশে কাল্পনিক সুখ উপভোগ করিতেছিলেন, বিদ্যাসাগর একবারে সেইখানে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সকলেই অপ্রস্তুত ও নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ গত হইলে এক জন পারিষদ্ বিদ্যাসাগরের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, লোকপরম্পরায় শুনিলাম, আমাকে মারিবার জন্য আপনাদের নিযুক্ত লোকেরা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আমার সন্ধানে ফিরিতেছে ও খুঁজিতেছে; তাই আমি ভাবিলাম, তাহাদিগকে কষ্ট দিবার আবশ্যক কি, আমি নিজেই যাই। এখন আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। ইহার অপেক্ষা উত্তম অবসর আর পাইবেন না। লজ্জায় সকলে মস্তক অবনত করিলেন।"

—হিতবাদী।

আলিপুর জেল হইতে পলায়নের চেষ্টা

মাণিকতলা বোমার মামলায় আসামীরূপে অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতি জেলে থাকার সময়ে আলিপুর জেল হইতে কোন কোন ওয়ার্ডার আসিয়া আমাদিগকে গোপনে তাঁহাদের সংবাদ দিত। এই ভাবে আমরা তাঁহাদের সংবাদ ও পত্র পাইতাম। এক দিন বারীন্দ্র দাদা আমাকে পত্রে জানাইলেন যে, তাঁহারা জেল হইতে পলায়ন করিবেন ও তজ্জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তিনি আমাকে জানান যে, আমি যেন একটি ম্যাপ প্রস্তুত করিয়া দেই, তাহাতে জেল হইতে চতুর্দ্দিকে যাইবার রাস্তা সকল এবং কোথায় কোথায় পুলিশের থানা ও ফাঁড়ি আছে, তাহা যেন চিহ্নিত করিয়া দেই। বিশেষ করিয়া গঙ্গার দিকে যাইবার রাস্তা, গলি, ক্ষুদ্র গলি, পায়ে হাঁটা পথ ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া ম্যাপে দেখাইয়া দেই। তদুপরি বাহিরে আসিলে অরবিন্দকে কোনওরূপে দ্রুত সরাইবার জন্য যেন ব্যবস্থা করা হয়।

তখন কলিকাতায় খুব কমই মোটর গাড়ী ছিল। মোটর গাড়ীতেই অরবিন্দকে নিজেই সরাইয়া লইয়া যাইতে মনস্থ করি। তদনুসারে আমার বন্ধু মেদিনীপুরের অন্তর্গত কেঁচকাপুরের জমিদার স্বর্গীয় নাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহকে বলি যে, তিনি যেন তাঁহার বন্ধু নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁকে বলেন যে আমি মোটর গাড়ী চালাইতে শিখিতে চাই, সে জন্য রাজা যেন তাঁহার চালককে দিয়া আমায় গাড়ী চালাইতে শিক্ষা দেন এবং তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার মোটর গাড়ী আমায় দেন। রাজা মহাশয় ইহাতে রাজী হন।

বারীন্দ্র দাদার নির্দ্দেশ পালন করিবার জন্য আমি নোয়াখালীর অন্তর্গত লামচরের স্বর্গীয় সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীকে কলিকাতার আলিপুরের অংশের ম্যাপ দেই এবং তাঁহাকে আদি-গঙ্গার উত্তর দিকে ও পশ্চিম দিকে যত রাস্তা ও গলি আছে সেই সকল রাস্তা দিয়া যাইতে ও পুলিশের ঘাঁটি সকল কোথায় আছে তাহা উক্ত ম্যাপে চিহ্নিত করিয়া দিতে বলি। এই জন্য তাঁহাকে আমার বাইসাইকেল ব্যবহার করিতে দিয়াছিলাম। দুই-তিন দিনের মধ্যে তিনি একটি নিখুঁত ম্যাপ প্রস্তুত করেন। সুরেন্দ্রকুমার ছিলেন এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির অন্যতম কর্ম্মী, ত্যাগী ও নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমিক। সকল কর্ম্মে তিনি আমার দক্ষিণ বাহুস্বরূপ ছিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি নিজের ব্যয় বহন করিতেন। ক্যাসাবিয়াঙ্কার সহিত তাঁহাকে তুলনা করা চলে। এরূপ চরিত্রের সংস্পর্শে আর আমি আসি নাই। সুরেন্দ্রকুমার এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন। অনুরূপ ভাবে অন্যতম কর্ম্মী যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুরের স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাসকে আলিপুরের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকের ম্যাপ তৈয়ারী করিতে বলি ও তাঁহাকে আমার অপর বাইসাইকেল দেই। তিনিও ঐরূপ ম্যাপ তৈয়ারী করিয়া দেন।

অরবিন্দের মাতাঠাকুরাণী

ইতিমধ্যে আমি মোটর গাড়ী চালাইতে শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা করি। তাহার পরে হঠাৎ এক দিন শুনিলাম, আলিপুর জেলে কড়া পাহারা বসিয়াছে এবং জেলের পশ্চিমে যেদিকের দেওয়াল টপকাইয়া আসামীদের পলায়নের কথা ছিল তথায় প্রহরী বসিয়াছে ও দেওয়ালের উপর আলোক দেওয়া হইয়াছে। এই স্থানটি অপেক্ষাকৃত অন্ধকারময় ছিল ও তাহার পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তা ও বেলভেডিয়ার ছিল। জেল হইতে মুক্তি পাইবার পরে আমি অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাঁহারা পলায়নের ব্যবস্থা হঠাৎ বন্ধ করিলেন কেন? তিনি আমাকে বলিলেন যে, তাঁহাদের ভিতরের কোন এক জন কর্ত্তৃপক্ষকে এই পলায়নের কথা জানাইয়াছিল। সে ব্যক্তি পরে খালাস পায়। অরবিন্দ তাঁহার নামও আমাকে বলিয়াছিলেন।

সন্ত্রাসবাদীদের গুরু জ্ঞানেন্দ্রনাথ

মেদিনীপুরে যিনি বালক ও যুবকদিগের মধ্যে স্বদেশ-প্রেমের ভাব জাগরিত করিয়া ও দৃঢ়চিত্ত যুবক দল গঠন করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন রাজনারায়ণ বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় অভয়চরণ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয়

শ্রীসুকুমার মিত্র

এ্যান্টি সারকুলার সোসাইটি অফিস

আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছেন। আমাদের বাল্যকালে তিনি পরাধীনতার জ্বালা কি, তাহা আমাদের বুঝাইয়া দিতেন। মেদিনীপুর কনফারেন্সে যোগদান করিতে যাইয়া অরবিন্দ তাঁহার মামা এই জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ীতে উঠেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের পরম হিতৈষী সেই নাড়াজোলের রাজাকে আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। তিনি অত্যন্ত স্বদেশভক্ত ছিলেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদে নাড়াজোলের রাজা অংশ গ্রহণ করেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলে নাড়াজোলের রাজাকে পরে মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী করিয়া অন্যান্যের সহিত জেলে আটক রাখা হয়। মেদিনীপুরের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার কে বি দত্তের অপূর্ব্ব কৌশলে তাঁহারা মুক্তি পান।
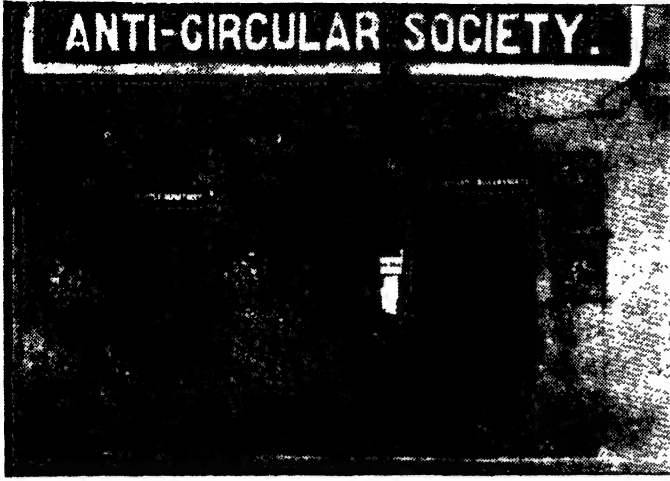
জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু। সম্পর্কে তিনি আমার মামা। মেদিনীপুরে তৎকালে যে স্বদেশ-প্রেমের বন্যা বহিয়া গিয়াছিল এবং ইংরাজ-রাজের দণ্ডনীতির ফলে পরে যে সন্ত্রাসবাদ দেখা দিয়াছিল, সেই সকলের পশ্চাতে নির্ভীক মানুষ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এই জ্ঞানেন্দ্রনাথ। ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দিয়াছেন তাঁহার ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ। তিনিও এই জ্ঞান বাবুর কাছে স্বদেশ-প্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করেন। স্বর্গীয় হেমচন্দ্র দাসকেও তিনি এই পথের পথিক করেন। হেমচন্দ্র মাণিকতলার দলের সহিত পরে যোগদান করেন। ফ্রান্সে যাইয়া বোমা তৈয়ারী করিবার উপায় শিক্ষা করিবার জন্য হেমচন্দ্র দাস প্রস্তুত হন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু তাহার জন্য চাঁদা তুলেন। নাড়াজোলের রাজাও এই ভাণ্ডারে টাকা দিয়াছিলেন। নাড়াজোলের রাজার উপর তাঁহার খুব প্রভাব ছিল। স্বদেশভক্ত ও সাধুচরিত্র বলিয়া তিনি জ্ঞানেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। অপর দিকে হেমচন্দ্র চিরদিনই জ্ঞানেন্দ্রনাথকে "গুরুজী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও ভ্রাতা তাঁহার সত্যেন্দ্রনাথের নিকট ক্ষুদিরাম বসু স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। যখন পিতৃমাতৃহীন ক্ষুদিরাম আত্মীয়-স্বজনের নিকট সকল প্রকার সাহায্য ও স্নেহ হইতে বঞ্চিত হয় ও আশ্রয়হীন বালক ক্ষুদিরামকে নিকটতম আত্মীয়ও যখন মাথা গুঁজিবার ঠাঁই দিতেও অস্বীকার করে, তখন সত্যেন্দ্রনাথ তাহাকে আশ্রয় ও সাহায্য দেন। মেদিনীপুরে সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে ক্ষুদিরামের সহিত ১৯০৬ সালে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অনাথ ক্ষুদিরামের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া আমার মাতা তাহাকে এক দিন সম্মুখে বসিয়া আহার করাইয়াছিলেন।

স্কটস লেনে যখন অরবিন্দ ছিলেন সে সময়ে স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত দেখা করিতেন এবং নানা নির্দ্দেশ লইতেন। অরবিন্দের মুক্তির পরও ৬ কলেজ স্কোয়ারে

রাজসাক্ষীকে হত্যা

ইহার পরের ঘটনা নরেন্দ্র গোস্বামীকে হত্যা। নরেন্দ্র গোস্বামীকে হত্যা না করিলে বোমার আসামিগণ ব্যতীত আরও বহু লোক বিপদগ্রস্ত হইবে, তদুপরি বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দেওয়া উচিত এই কথা চিন্তা করিয়া, সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার ইচ্ছা কানাইলাল দত্তের নিকট প্রকাশ করেন। উভয়ে এই কথা আর কাহাকেও বলিবেন না স্থির করেন। সত্যেন্দ্র একটি বৃহৎ রিভলভার জোগাড় করিয়া কাপড়ের ভিতর কোমরে ঝুলাইয়া রাখিতেন। সত্যেন্দ্রকে এক নির্ম্মম কঠোর ব্যক্তি বলিয়া মনে হয় কিন্তু তাহা ঠিক নয়। তিনি কলিকাতার সিটি কলেজে যখন বি-এ পড়িতেন তখন প্রায়ই ৬ কলেজ স্কোয়ারে আসিয়া আমাদের সহিত নানা গল্প-গুজব করিতেন। তাহা নিছক গল্প-গুজব ছিল না, সবই শিক্ষাপ্রদ। কালিদাসের লেখার গুণ কোথায়, তাহার উপমা সকলের বর্ণনা, বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাসের স্থান ইত্যাদি নানা উচ্চ সাহিত্যের বিষয় চর্চ্চা করিতেন। কি প্রকারে আসামীদের হাতে রিভলভার গিয়াছিল জানি না। তবে সাক্ষাৎ করিবার যে অবাধ সুবিধা ছিল, যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার জন্যই জেলের ভিতর রিভলভার পাঠান সহজ হইয়াছিল। কাঁটালের মধ্যে যে রিভলভার সরবরাহের কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা নিছক কল্পনাপ্রসূত। বোমার মামলার অপর আসামী স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, এক দিন 'হরিলুট' করা হইবে বলিয়া জেলারকে জানান হয়। আসামীদের সহিত যাহারা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা জেলের লোহার গরাদের অপর দিক হইতে নারকলের নাড়ু প্রভৃতি ভিতরে ছুঁড়িয়া দিতে লাগিলেন এবং আসামিগণ তাহা কুড়াইয়া লইতে লাগিল। এই সঙ্গে জেলের কর্ম্মচারিগণও 'হরিলুট' কুড়াইতেছিল, সেই সুযোগে চন্দননগর হইতে আনীত ছোট রিভলভারটি গরাদের ভিতর দিয়া জেলের ভিতর চলিয়া যায়।
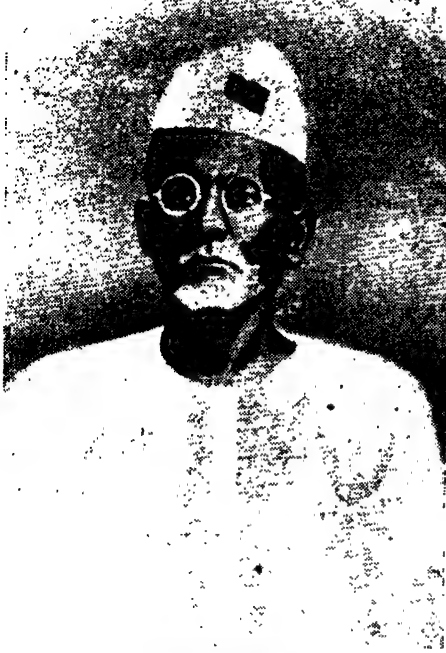
জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু

যেদিন নরেন্দ্র গোস্বামীর হত্যার খবর বাহির হয় তাহার পূর্ব্ব-দিন বারীন্দ্র দাদা প্রভৃতির সহিত জেলে সাক্ষাৎ করিতে আমি ও অরবিন্দের ভগিনী সরোজিনী দিদি গিয়াছিলাম। ইহাতে আমাদিগকে সন্দেহ করা হইবে বলিয়া আত্মীয়গণ সকলেই ভীত হইয়াছিলেন। প্রায় বেলা দুইটার সময়ে কলিকাতা সহরের সর্ব্বত্র জেলের এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে। ইহাতে সহরময় এক বিদ্যুতালোড়ন হয়, বিশেষতঃ স্কুল ও কলেজে। সকলেই বোমারুদের কাণ্ডে চমকিত হইয়া পড়ে ও রাজসাক্ষীর নিধনে আনন্দিত হয়।

নরেন্দ্র গোস্বামী আদালতে রাজসাক্ষীরূপে যে জবানবন্দী করে তাহাতে সত্য, অর্দ্ধসত্য ও কল্পিত অনেক ঘটনার কথা বলে ও ষড়যন্ত্রে সম্পর্কিত বলিয়া বহু লোকের নাম করিয়াছিল এবং তন্মধ্যে আমার নামও ছিল। তাহাকে হত্যা করায় এই সকল লোক পুলিশের হাত হইতে অব্যাহতি পায়।

পরে নরেন্দ্র গোস্বামীকে হত্যা করার অভিযোগে পরে কানাইলাল দত্তের ফাঁসী হয়। জনসাধারণ তাঁহার দেহ পুষ্পাচ্ছাদিত করিয়া সমারোহে মিছিল করিয়া লইয়া গিয়া কালিঘাটে দাহ করে। শবদাহের পূর্ব্বে তাঁহার পুষ্পাচ্ছাদিত মৃতদেহের ফটোগ্রাফ তুলি, তাহা পর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। রাজনৈতিক অপরাধীর মৃতদেহ লইয়া এরূপ শোভাযাত্রা এই প্রথম। এই হত্যাকার্য্যে সহকর্মী সত্যেন্দ্রনাথ বসুরও নরেন্দ্র গোস্বামীকে হত্যা করার অভিযোগে ফাঁসীর হুকুম হইলে তিনি আপীল করেন। উহা নিষ্ফল হয়। ফাঁসীর পূর্ব্বে তাঁহার সহিত স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সাক্ষাৎ করেন। পূর্ব্বে বর্ণিত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতের মৃতদেহের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের ফলে কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ দিলেন যে, সত্যেন্দ্রের মৃতদেহ জেলের মধ্যে দাহ করিতে হইবে এবং মাত্র নির্দ্দিষ্ট কয়েক জন আত্মীয় ব্যতীত অপর কেহ এই কার্য্যে যোগদান করিতে পারিবে না। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় মণীন্দ্রনাথ বসু, তাঁহার অপর কয়েক জন আত্মীয় (রাজনারায়ণ বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র স্বর্গীয় বিপিনবিহারী বসু, রাজনারায়ণের অপর এক ভ্রাতার জামাতা স্বর্গীয় এ, সি, রায়) প্রভৃতিকে লইয়া জেলের মধ্যে দাহকার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহাদিগকে মৃতের ভস্মাবশেষও বাহিরে আনিতে দেওয়া হয় নাই। ফাঁসীর আসামী বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কানাইলাল দত্তের বি-এ ডিগ্রী প্রত্যাহার করেন।

আদালতে আসামিগণ

নিম্ন আদালতে যখন মামলা চলিতেছিল তখন সরোজিনী দিদি এক দিন বলিলেন, "বারীন্দ্রের কোন ফটো নাই, কোনও রকমে দূর হইতে তুমি ফটো তুলিতে কি পার না?" আমাকে এই কথা বলার কারণ এই যে, আমি ১১ বৎসর বয়সের সময় হইতে ফটোগ্রাফ তুলিতে শিখি। তৎকালে খুব কম লোকই ফটোগ্রাফ তুলিতে জানিত। আত্মীয়-স্বজন

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

প্রভৃতি সকলেরই ফটো তুলিয়াছিলাম এবং বারীন্দ্র দাদার স্কুলে পাঠকালের ফটোও তুলিয়াছিলাম। তাঁহার বয়স বেশী হইলে তিনি নানা স্থানে থাকিতেন, সুতরাং সাক্ষাৎও কম হইত, সে জন্য যুবক বারীন্দ্রের ফটো ছিল না। বারীন্দ্রের ফটো তুলিবার ইহাই একটি মাত্র সুযোগ, পাছে আমার দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে ও লুকাইয়া ভাল ছবি না উঠে, তজ্জন্য আমি নিজে ফটো তুলিবার প্রয়াস না করিয়া চৌরঙ্গী রোডে অবস্থিত বিখ্যাত ফটোগ্রাফার হপসিং কোংতে যাই। তথায় স্বর্গীয় সুবোধচন্দ্র দত্তকে আলীপুর আদালতে যাইয়া ফটোগ্রাফ তুলিতে অনুরোধ করি। মিঃ দত্তকে আমি বহু দিন হইতে চিনিতাম। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার ষ্টুডিওতে আমার মাতা, ভগিনীগণ, শ্রীমতী সরোজিনী ও অরবিন্দ সহ আমাদের এক গ্রুপ ফটোগ্রাফ তোলাই। আমার প্রস্তাবে মিঃ দত্ত সঙ্গে সঙ্গে রাজী হইলেন। তাঁহাকে আমি বলিয়াছিলাম যে, টিফিনের সময়ে যখন আসামীদিগকে বাহিরে আনা হইবে তখন যেন ফটো তোলা হয়, এবং বারীন্দ্রকে এই কথা বলিতে বলিলাম যে আমি এই ছবি উঠাইতে বলিয়াছি, পুলিশ নহে। তদনুসারে ফটো তোলা হয়। এই ছবি তুলিতে দিতে পুলিশ কর্ম্মচারী স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী সাহায্য করেন। পরে এই ছবি শ্রীহট্টের উৎসাহী যুবক শ্রীরমেশ চৌধুরী বাজারে বিক্রয় করিয়াছিলেন।

কানাইলালের শব-শোভাযাত্রা

আদালত যখন বসিত তখন অরবিন্দ দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট চিত্তে এক দিকে তাকাইয়া থাকিতেন, কিন্তু বুঝা যাইত যাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাহা তিনি দেখিতেছেন না, নিবিষ্টভাবে কি চিন্তা করিতেছেন। আসামীদের মধ্যে উল্লাসকর সর্ব্বাপেক্ষা প্রফুল্ল-চিত্ত ছিল। সে কখন সুকণ্ঠে স্বদেশ-প্রেমমূলক গান করিত, কখনও ধ্বনি ক্ষেপণ (Ventriloquism) করিয়া সকলকে আমোদিত করিত। স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নানা প্রকার হাস্য-কৌতুক করিতেন। অবশ্য আদালত যতক্ষণ বসিত ততক্ষণ এ সব হইত না। এক দিন উল্লাসকর দত্ত এমন মধুর স্বরে ও আবেগের সহিত আদালত বসিবার পূর্ব্বে "সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে" গানটি গাহিলেন যে জজ আদালতে যাইবার প্রবেশ-পথে গভর্ণমেণ্ট পক্ষের ও আসামী পক্ষের উকিল, ব্যারিষ্টার সকলেই গান শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন, গান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আদালত-গৃহে প্রবেশ করিলেন না। অপর দিকে অরবিন্দ সমস্ত ক্ষণ গরাদের মধ্য হইতে আদালতের দরজার ফাঁক দিয়া যতটুকু দেখা যাইত বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া তন্ময় হইয়া থাকিতেন।

পুনরায় দায়রা আদালতে আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য আমাকে শমন দেওয়া হইল। আমার বয়স অল্প, আমাকে কি বিষয়ে জেরা করা হইবে জানা নাই, ধমক দিয়া ও কথার প্যাঁচে গভর্ণমেণ্ট পক্ষের ব্যারিষ্টার আমার নিকট হইতে কোন বিষয় স্বীকার করাইয়া

লইবে ও নাস্তানাবুদ করিবে ইহা চিন্তা করিয়া সকলে চিন্তিত হইয়া পড়েন। জজ-আদালতে সাক্ষ্য দিবার কালে আমার পিতা নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। দুই-তিন দিন আদালতে যাইয়াও সাক্ষ্য গৃহীত হইল না দেখিয়া এক দিন গোয়েন্দা কর্ম্মচারী স্বর্গীয় শামসুল আলমকে বলিলাম, 'আমি বৃথা হয়রান হইতেছি। আমি আর কিসের সাক্ষ্য দিব।' তিনি বলিলেন, অরবিন্দ প্রভৃতির হস্তাক্ষর চিনে তেমন কোন সাক্ষী নাই। সে জন্য আমার সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে। তখন ইহার অর্থ বুঝি নাই। সাক্ষ্যের সময়ে গভর্ণমেণ্ট পক্ষের ব্যারিষ্টার মিঃ নর্টন অন্যান্য প্রশ্নের পর নানা কাগজ-পত্র আমার হস্তে দিয়া কোনটা কাহার লেখা তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করেন। যাহা চিনিতে পারিলাম তাহা সনাক্ত করি ও যাহা সন্দেহজনক তাহা অস্বীকার করি। আমার সাক্ষ্যে গভর্ণমেণ্ট পক্ষে সুবিধা হইতেছে, আমার বয়স অল্প ও বিনা চিন্তায় তৎক্ষণাৎ সোজা উত্তর পাইতেছেন দেখিয়া মিঃ নর্টন উৎফুল্ল হন ও ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বিষয় ও কাগজ-পত্রাদি প্রমাণ করিবার জন্য উপস্থিত করেন। ইহার মধ্যে বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তি ছিল। স্বহস্তে লিখিত এই স্বীকারোক্তির অধিকাংশ তাঁহার হাতের লেখা মনে করিয়া স্বীকার করিলাম কিন্তু শেষাংশ জাল মনে হওয়ায় অস্বীকার করিলাম। এক সময়ে তিনি একটি কাগজ মুড়িয়া উহা কাহার হস্তলিপি আমাকে তাহা বলিতে বলেন। মোড়া কাগজের উপরের অংশে পেন্সিলে 'বারীন্দ্র' এই কথা লেখা ছিল। হাতের লেখা চিনিলাম না বলিয়া কাগজটি ফেরত দিবার উপক্রম করিলে মিঃ নর্টন বলেন, "কাগজটা খুলিয়া বল কাহার লেখা"। আমি "চিনি না" বলিলাম। তিনি বলিলেন, "পড়"। পড়িয়া দেখি, ইহা বিখ্যাত "রসগোল্লার" চিঠি। বারীন্দ্র না কি "রসগোল্লা"* বিতরণ করিবার অনুমতি পাইবার জন্য অরবিন্দকে ঐ পত্র দিয়াছিলেন। চিঠি পড়িয়া চক্ষুস্থির !! ভাগ্যক্রমে জাল মনে হওয়ায় ঐ চিঠির হাতের লেখা কাহার জানি না বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিলাম। নচেৎ এই চিঠি স্বীকার করিলে অরবিন্দ যে বোমার মামলার সহিত জড়িত তাহা আমার দ্বারা প্রমাণিত হইত।

আলিপুর জেলে থাকার সময় অরবিন্দ আমার নামে একটি পূর্ণ আমমোক্তারনামা (full power of attorney) লিখিয়া আলিপুরে রেজিষ্ট্রী করিয়া দেন। আমি তখন অল্পবয়স্ক হইলেও আমার প্রতি তাঁহার যে গভীর আস্থা ছিল ইহাই তাহার প্রমাণ। তিনি উহা কখন প্রত্যাহার করেন নাই। সুতরাং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহা বলবৎ ছিল। এই আমমোক্তারনামার বলে আমি অরবিন্দের পক্ষ হইয়া মাণিকতলা বাগান বিক্রয়ের দলিলে সহি করি। পরে তাঁহার অংশের টাকা ব্যাঙ্কের মারফৎ পণ্ডিচেরী পাঠাইয়া দেই। ইহা ব্যতীত আরও কয়েক বার পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দকে টাকা পাঠাইয়া দেই। এই সকল টাকা নোয়াখালীর জমিদার স্বর্গীয় হেমচন্দ্র চৌধুরী ও অরবিন্দের অন্যান্য শুভার্থিগণ দিয়াছিলেন।

সিটি কলেজ ও গভর্ণমেণ্ট

১৯০৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর আমার পিতাকে দেশান্তরিত করা হয়। অনেকেই বলেন যে, মাণিকতলা বোমার মামলায় আসামীদের পক্ষে মামলা চালাইবার জন্য অগ্রণী হইয়া তিনি যে আয়োজন ও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সে জন্য যে প্রচুর সময় দিতেন যাহাতে ঐ মামলার ব্যাঘাত হয় ও তদ্বির অভাবে নষ্ট হয় তজ্জন্য আমার পিতাকে নির্ব্বাসিত করা হয়। যে রাত্রে তাঁহাকে পুলিশ ধৃত করে সেই রাত্রে মুচিপাড়া থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর প্রিয়নাথ মুখার্জ্জি আমাদের বাড়ীতে গোপনে সংবাদ দেন যে আমার পিতা গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে, আমরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। তিনি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের এক সভায় যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার পথে তাঁহাকে আটক করা হয়। আমার পিতাকে কোন ষড়যন্ত্র বা রাজদ্রোহ মামলায় জড়িত করা হইবে, এই কথা মনে করিয়া ও রাত্রে বাড়ীতল্লাসী করা হইবে সন্দেহে আমার পিতার কাগজ-পত্র তৎক্ষণাৎ আমি দেখিতে আরম্ভ করি। এক আলমারীতে দেখিলাম আমার পিতার কোষ্ঠী রহিয়াছে, তাহা আমার পিতামহের আদেশানুসারে তৈয়ারী করাইয়াছিলেন সিটি স্কুলের শিশু-শ্রেণীর স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল নামে এক শিক্ষক এক জ্যোতিষী দ্বারা কোষ্ঠী গণনা করাইয়াছিলেন এবং ফল লিখিয়া রাখিয়াছেন। সংস্কৃত শ্লোকের প্রথম পংক্তিটি মনে নাই। তবে তাহার অর্থ ছিল এই যে, ঐ বৎসরে বন্ধু-বিচ্ছেদ, কর্ম্মহানি ইত্যাদি হইবে এবং দ্বিতীয় পংক্তি ছিল "দেশান্তরস্থাৎ ক্ষিতিপালকোপাৎ"। প্রায় ৩ মাস পরে তাঁহার নির্ব্বাসন দণ্ডের কথা শুনিবার পর প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এক গ্রাম্য জ্যোতিষীর কোষ্ঠী গণনার কথা স্মরণ করিয়া অবাক হইলাম। তিনি রাজকোপাৎ লেখেন নাই। লিখিয়াছেন ক্ষিতিপাল-কোপাৎ। সত্যই তখনকার লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের চেষ্টায় বড়লাট এই হুকুম দেন। ছোট লাটই ইতিপূর্ব্বে এই সিটি কলেজের অধ্যক্ষকে পত্র দেন যে, উক্ত কলেজের প্রফেসর কৃষ্ণকুমার মিত্র রাজনীতির সহিত জড়িত হওয়ায় বহু ছাত্র বিপথে যাইতেছে তজ্জন্য কলেজ তাঁহাকে বরখাস্ত

---

* "রসগোল্লা"—নাম করিয়া বারীন্দ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে বোমা বিতরণ করিবার অনুমতি চাহিয়া সুরাটের কংগ্রেসের অধিবেশন কালে অরবিন্দের অনুমতি চাহিয়া এই পত্র লিখিয়াছিল বলিয়া গভর্ণমেণ্ট পক্ষের কৌঁসিলি আলিপুর আদালতে বর্ণনা করেন।

কৃষ্ণকুমার মিত্র

করুক, নচেৎ সিটি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে disaffiliate করা হইবে। সিটি স্কুল গঠন করিতে আমার পিতা মন-প্রাণ দিয়া চেষ্টা করেন এবং কলেজ গঠনের জন্য সমগ্র ভারতে চাঁদা সংগ্রহের জন্য ঘুরিয়া বেড়ান। ত্রিপুরা হইতে অর্থ আনিবার কালে পদ্মায় ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া যায়। সাঁতরাইয়া ফরিদপুরের তীরে অর্থশুদ্ধ আসিয়া উঠেন। সেই সিটি কলেজকে রাজপুরুষ বিনষ্ট করিতে উদ্যত দেখিয়া তিনি কলেজের প্রফেসরের পদ ত্যাগ করেন। সিটি কলেজ রাজরোষ হইতে বাঁচিয়া যায়। তবে ছাত্রগণ রাজনৈতিক আন্দোলন ত্যাগ করে নাই। সিটি কলেজের দায়িত্ব হইতে অবকাশ পাইয়া তিনি এক দিকে বঙ্গ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে নিযুক্ত করিলেন; অপর দিকে বোমার মামলার তদারক করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তারের খবর পরদিন অন্যান্য নেতাদের নিকট পৌঁছিল। স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু খবর দিলেন যে, তাঁহাকে লালবাজারে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া ৫৪ ধারা অনুসারে আটক রাখা হইয়াছে। পরদিন লালবাজারে যাইয়া তাঁহাকে আহার্য্য দিয়া আসা হয়। তাহার পরদিন হইতে ৩ মাস আর তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আমার পিতা নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলেন যে, তাঁহাকে যখন য়ুরোপীয় পুলিশ সার্জ্জেণ্ট সঙ্গে করিয়া হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত করিল তখন তিনি দেখিলেন, রেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় স্বর্গীয় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীকেও ধরিয়া আনিয়া অপর এক সার্জ্জেণ্টের হেপাজতে রাখা হইয়াছে। রেলপথে শ্যামসুন্দর বাবু আমার পিতাকে বলেন, "দেখুন, আপনাকে সুদূর আগ্রাতে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তথায় প্রচণ্ড শীত, আপনার সহিত গরম কাপড় নাই, আপনি আমার এই র‍্যাপারটা লইয়া যান, নচেৎ কষ্ট পাইবেন। আমাকে বর্দ্ধমানে লইয়া যাইতেছে, তথায় তেমন শীত নাই।" আমার পিতা তাহাতে সম্মত হইলেন না, ঐ র‍্যাপারটিই শ্যাম বাবুর একমাত্র গাত্রবস্ত্র ছিল।

দেশের মধ্যে ত্রাশ

বাঙ্গালা দেশের নয় জন নেতাকে বাঙ্গালা দেশের বাহিরে, এমন কি সুদূর ব্রহ্মদেশেও নির্ব্বাসিত করা হয়। নয় জনের মধ্যে তিন জন চরমপন্থী, দুই জন সন্ত্রাসবাদী ও চারি জন ধীরপন্থী ছিলেন। তাঁহাদের বিনা বিচারে নির্ব্বাসনের জন্য কলিকাতা সহরে এক প্রতিবাদ-সভার অধিবেশন করা স্থির হয়। তখনকার আবহাওয়া দেখিয়া যুবকগণই এই সভার ব্যবস্থা করিতে চেষ্টিত হন। তখন যে সকল নেতা ছিলেন তাঁহারা এই সভা সম্পর্কে অনধিক উদাসীন ছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের বিষয়, কাহাকেও উক্ত সভায় সভাপতি হইতে রাজী করিতে পারা যায় নাই। দেশের মধ্যে এমনই ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। রাজনৈতিক নেতাদের অবস্থা দেখিয়া যুবকগণ অবশেষে ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হতাশ মনে উপস্থিত হয় ও তাঁহাকে সভাপতি হইতে দ্বিধার সহিত অনুরোধ করে। অন্যায়ের প্রতিবাদে দাঁড়াইতে হইবে এই বুঝিয়া সানন্দে শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হন এবং সভায় তীব্র ভাষায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিনা বিচারে নির্ব্বাসন দণ্ড ও রুদ্র-নীতির প্রতিবাদ করেন। এই সভা আহ্বান করিলে বক্তারূপে কোন কোনও নেতাদের নাম হ্যাণ্ডবিলে প্রকাশ করা হয়। কোনও বিখ্যাত নেতা এই সভার সহিত সম্পর্ক নাই বলিয়া সংবাদপত্রে পত্র প্রকাশ করেন।

১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে যখন গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া আমি আগ্রাতে আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, তখন তথায় সংবাদপত্রে পাঠ করি যে, অরবিন্দ মুক্তি পাইয়াছেন ও বারীন্দ্র দাদার আরও কয়েক জনের সহিত ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে। অরবিন্দ মুক্তি পাইয়া কারাগার-গৃহ হইতে সোজা তাঁহার ন'মাসী অর্থাৎ আমার মাতার ৬ নং কলেজ স্কোয়ারের বাসায় আসিয়া উঠেন। হঠাৎ তাঁহার উপস্থিতিতে বাড়ীর সকলে তাঁহাকে দেখিয়া অবাক্ ও আনন্দিত হইলেন। তখন হইতে তিনি চন্দন-নগরে চলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত ১০ মাস কাল ঐ বাড়ীতে বাস করিয়াছেন। আমি আগ্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হই। এই সময়ে বারীন্দ্র দাদার ফাঁসীর হুকুম হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত জেল-ওয়ার্ডারদের মারফৎ আমি মর্ম্মান্তিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র দিলে তিনি তদুত্তরে আমাকে সান্ত্বনা দিয়া পত্র দেন ও পত্রের শেষে লিখেন—

"তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি
তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহি না মুকতি—"

[ক্রমশঃ।

ছবির মেলার ভূমিকা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

তিন যুগ আগে মাঝে মাঝে ধনীদের বাড়ীতে গান-বাজনার মাইফেলের আয়োজন হ'ত, দেশ-বিদেশের ওস্তাদরা এসে আসন গ্রহণ করতেন সেখানে এবং যে সব রসিকজনের ট্যাঁক ভারি ছিল না, তাঁরাও অর্থব্যয় না ক'রেই উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত শোনবার সৌভাগ্যলাভ করতেন। তখনও গ্রামোফোনের চলন খুব বাড়েনি। চলচ্চিত্রের ও বেতারের গানও ছিল এ দেশে মুনিজনের ধ্যান-ধারণাতীত।

আজকাল যেখানে-সেখানে যখন-তখন বসে কত বড় বড় জলসার আসর। সারা ভারতের খ্যাতিমান গুণীরা সে সব সভার শোভাবর্দ্ধন করেন। দরিদ্র রসিকদের সাধ থাকলেও সাধ্য হয় না সে সব জায়গায় হাজিরা দিতে, তবু চড়া দামে টিকিট কেনবার লোকের অভাব হয় না। পথে পথে অগণ্য ছবিঘরে শোনা যায় অসংখ্য গান এবং ঘরে-বাইরে বেতার-যন্ত্রগুলো আমাদের কানের ভিতরে হুড়-হুড় ক'রে ঢেলে দেয় সঙ্গীতসুধাধারা।

আগেকার চেয়ে গানের রেওয়াজ ঢের বেড়েছে। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, এই যুগের গাইয়েরা কি দলে ভারি হ'লেও গুণে খাটো হয়ে পড়েননি? যাঁরা আজ প্রথম শ্রেণীর গাইয়ে ব'লে সুবিখ্যাত, তাঁদের প্রায় সকলেই কি তিন যুগ আগেকার লোক নন?

এইবারে আমাদের চিত্রকলার ক্ষেত্রে এসে দাঁড়ানো যাক্। তিন (বা কিছু-কম চার) যুগ আগে যাঁরা ছিলেন নবজাগ্রত প্রাচ্য চিত্রকলার পুরোধা, তাঁরা বৎসরে একবার ক'রে ছবির প্রদর্শনী খুলতেন। যত দূর মনে পড়ে, প্রথম দুই কি তিন বৎসর এই রকম প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল সরকারী চিত্রবিদ্যালয়ের উপরতলায়। ছবির সংখ্যা খুব বেশী ছিল না এবং রূপ-রসিকদের পয়সা দিয়েও টিকিট কিনতে হ'ত না, তবু যাঁরা ছবি দেখতে যেতেন দলে ছিলেন তাঁরা যথেষ্ট হাল্কা। ছবির গুণাগুণ সম্বন্ধে দর্শকদের সচেতনতাও আশাপ্রদ ছিল না, তাই সেদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্তে সর্ব্বদাই আগ্রহ প্রকাশ করতেন স্বর্গীয় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একটা দৃষ্টান্ত দি। তখন প্রদর্শনীতে নূতন শিল্পীদের সঙ্গে থাকত বহু পুরাতন পটুয়ার আঁকা ছবি। এই রকম একখানি প্রাচীন চিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে আমি এক শিল্পী বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করছিলুম। বন্ধুটি ছিলেন সরকারী চিত্রবিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র, পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষিত। তিনি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মত প্রকাশ করেছিলেন সেই প্রাচীন চিত্রের বিরুদ্ধে। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল, সেই ছবিখানির মধ্যে নেই কিছুমাত্র দ্রষ্টব্য। সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি সহাস্য মুখে মতামত শ্রবণ করছিলেন।

হঠাৎ তিনি এগিয়ে এসে বললেন, "এ ছবিখানির একটা বিশেষত্ব দেখবেন?" ব'লেই তিনি ছবির উপরে তুলে ধরলেন একখানা আতশী কাচ।

ছবিখানি একরত্তি। তার ভিতরে আঁকা নারীমূর্ত্তিটি আকারে আধ করি ইঞ্চি দেড়েকের বেশী ছিল না। আতশী কাচের ভিতর দিয়ে তৎক্ষণ পরে লক্ষ্য করবার সুযোগ পেলুম, সেই অতি-ক্ষুদ্র নারীমূর্ত্তির মাথার কেশদামের প্রত্যেক চুলগাছি আলাদা আলাদা ক'রে আঁকা! এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্য খালি চোখে একেবারেই ধরা পড়ে না। য়ুরোপীয় পটুয়াদের আঁকা "মিনিয়েচার" দেখেছি, তার মধ্যেও অনেকে যথেষ্ট সূক্ষ্ম কার্য্য, কিন্তু এর সূক্ষ্মতার সঙ্গে তার তুলনা হয় না।
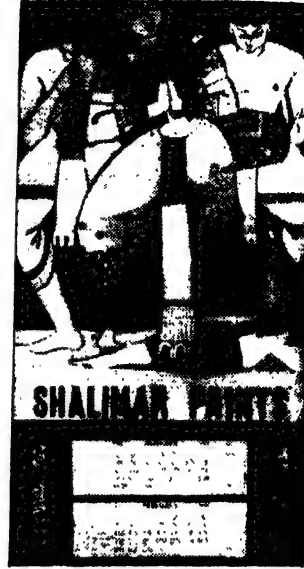
একটি ক্যালেণ্ডার —দিব্যেন্দু চাকী

গগনেন্দ্রনাথ চ'লে গেলেন। বন্ধু বোবা। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ছবির দিকে। ফিরে দেখি, গগনেন্দ্রনাথ ততক্ষণে আর এক দল দর্শকের কাছে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন অন্য কোন ছবির বিশেষ গুণের কথা।

তখন বৎসরে একবার ক'রে বসত ছবির হাট, এখন ফি বছরে ছবির বাজার বসে যখন-তখন অনেক বার ক'রে। কখনো কখনো শিল্পীদের ব্যক্তিগত প্রদর্শনী এবং কখনো কখনো সম্মিলিত শিল্পীদের চিত্র-প্রদর্শনী। কোথাও কোথাও বিশেষ ক'রে শিক্ষার্থীদেরও হাতের কাজ দেখানো হয়। কেবল শিল্পীদেরই যথেষ্ট সংখ্যাবৃদ্ধি হয়নি, দর্শকরাও দলে ভারি হয়ে উঠেছেন যার-পর-নাই। গোড়ার দিকে প্রদর্শনীতে মহিলারা পদার্পণ করতেন কখনো-সখনো,

চায়ের দোকান —অসিত সেন
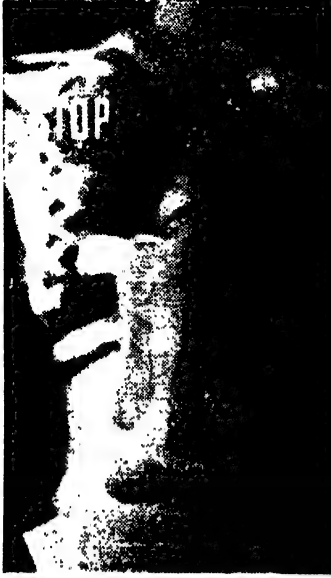
একটি পোষ্টার —বীরেশ গুহ

কিন্তু এখন প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দর্শকই হচ্ছেন মহিলা। এমন কি যাঁদের মহিলা ব'লে ডাকা চলে না, তাঁদেরও দেখা যায় ছবির মেলায়। বিনামূল্যে নয়, ছবি দেখতে আসেন তাঁরা টিকিট কিনেই। অবশ্য দর্শনার্থী জনতার মধ্যে সকলেই যে রূপ-রসিক, এ কথা মনে করা চলে না। তাঁদের মধ্যে এমন সব দর্শকেরও অভাব নেই, যাঁদের কাছে ছবি দেখা হচ্ছে মজা দেখারই সামিল। অন্ততঃ তাঁদের চেহারা ও হাব-ভাব দেখেই আমার মনে জেগেছে এই সন্দেহ।

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের এ-বৎসরের প্রদর্শনীতে গেল বারের চেয়ে বেশী ছবি স্থান পেয়েছে ব'লে মনে হ'ল। যদিও সংখ্যাধিক্য বলতে বুঝায় না গুণাধিক্য, তবু এ দেশে চিত্রবিদ্যা অনুশীলন করবার জন্যে লোকের আগ্রহ যে আগেকার তুলনায় যথেষ্ট বেড়ে উঠেছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না।

এবং দর্শকদের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রমাণিত করে, যে কারণেই হোক্ এখানে ছবির চাহিদাও বেড়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। তাঁদের মধ্যে খাঁটি রূপ-রসিকের সংখ্যা যে অসামান্য নয়, এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যেতে পারে। আমাদের দর্শকরা আজও শিক্ষিত হয়ে ওঠেননি। চিত্র সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। শিল্পীর নাম না জানিয়ে তাঁদের হাতে দেওয়া হয় যদি অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের সঙ্গে হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছবি, তবে অধিকাংশ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ ব'লে গ্রহণ করবেন শেষোক্ত শিল্পীর কাজকেই।

প্রদর্শনীর দর্শকরা অপরিচিত, অধিকাংশেরই মুখ দেখে মনের খবর যায় না জানা। বেশীর ভাগ লোকেই হুজুগে মেতে ছবির মেলায় গিয়ে হাজির হন। অনেক ধনী কেবল নিজেকে চিত্রবোদ্ধা ব'লে প্রমাণিত করবার জন্যে গুণাগুণ না বুঝেই চড়া দামে ছবি কিনে বসেন, আমি একাধিক তথাকথিত চিত্রবোদ্ধার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত আছি। আমার বাড়ীতে শ্রীযামিনী রায়ের আঁকা ছবি দেখে অনেক শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা রীতিমত হাস্যকর মতামত প্রকাশ করেছেন। আমার দ্বারা সংগৃহীত প্রাচীন ভাস্করের গড়া একটি নর্তকী মূর্ত্তি দেখে চিত্রকলার অভিজ্ঞ অদ্বিতীয় নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর কয়েক মিনিট মুগ্ধ চোখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন; আবার সেই মূর্ত্তি দেখেই কোন কোন শিক্ষিত বন্ধু আমার রুচির প্রশংসা করতে পারেননি। ঘরের দেওয়ালে চিত্রলিখিত নগ্ন মূর্ত্তি দেখে বাংলা দেশের কোন প্রধান কবি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন; আবার কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সেই ছবি দেখেই খুসি না হয়ে পারেননি। শরৎচন্দ্র কেবল কলমের শিল্পীই ছিলেন না, তিনি তুলিকাও ব্যবহার করতে পারতেন এবং তাই জানতেন যে, নগ্ন হ'লেই কোন মূর্ত্তি অশ্লীল হয় না, যেখানে উচ্চশ্রেণীর আর্টের প্রকাশ আছে, সেখানে রসিকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে না নিছক নগ্নতা। গ্রীক ভাস্কর রূপলক্ষ্মী ভেনাসের নগ্ন মূর্ত্তি গড়েছেন। তা কি অশ্লীল মূর্ত্তি? তার সামনে কি পিতা-মাতার সঙ্গে পুত্র-কন্যারাও নির্ব্বিকার চিত্তে ব'সে থাকতে পারে না? সমালোচক ও 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি চিত্রকলার বিন্দুবিসর্গ জানতেন না বা জানবার কি বোঝবার চেষ্টাও করতেন না, তাই প্রাচ্য চিত্রকলাকে তিক্ত ভাষায় আক্রমণ করেছেন বারংবার।

যে দেশে চিত্রকলা সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিদের—এমন কি সাহিত্যিকদেরও—ধারণা এমন দরিদ্র, সেখানে জনসাধারণের চিত্র-সম্পর্কীয় শিক্ষা যে কতখানি অসম্পূর্ণ, তা অনুমান করা কঠিন নয়। কাজেই আজকালকার প্রদর্শনীতে প্রচুর দর্শক সমাগম হয় ব'লে খুব বেশী আশান্বিত হবার কারণ নেই। ভিড় বাড়লেই বুদ্ধি বেড়েছে ভাবা চলে না। চিত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নিয়েই প্রদর্শনীতে যায় অধিকাংশ দর্শক। প্রথম যুগে প্রদর্শনীতে উপস্থিত থেকে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের মত শিল্পাচার্য্যগণ জনসাধারণের অন্ধকার চিত্তে আলোকবর্ত্তিকা জ্বালবার চেষ্টা করতেন। উপরন্তু অবনীন্দ্রনাথ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে জনসাধারণের কাছে ব্যক্ত করতেন চিত্রকলার গুপ্তকথা। তুলি, কলম ও মৌখিক

পদ্মফুল —পরীক্ষিৎ বসু

শিল্পীর দ্বারা তিনি কেবল এ দেশে চিত্রবোদ্ধাদেরই সংখ্যাবৃদ্ধি করেননি, সেই সঙ্গে স্বহস্তে গ'ড়ে তুলেছিলেন এমন কয়েক জন শক্তিশালী চিত্রশিল্পী, যাঁদের সার্থক দান আজ আমাদের জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়েছে। তাঁর হাতে-গড়া শিল্পীরা সংখ্যায় আজকের অগণ্য ছবিকারদের মধ্যে নগণ্য ব'লেই প্রতিপন্ন হ'তে পারেন; কিন্তু আগেই বলেছি, সংখ্যাধিক্য বলতে বুঝায় না গুণাধিক্য। এবারকার প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে শ্রীনন্দলাল বসুর একখানি মাত্র চিত্র—"দুর্গা"। ছবি তো নয়, যেন রূপায়িত দীপক রাগ! অসংখ্য শিল্পীর দ্বারা যুগে যুগে কত বার কত রূপে পরিকল্পিত এই মাতৃকা মূর্ত্তিকে শিল্পী আবার সাজিয়ে এনেছেন নূতন সাজে, নূতন ভাবে। সাধকের ধারণার মধ্যে শক্তির প্রতীকরূপে ধরা দেবে এমনি মূর্ত্তিই। আবার ললিতকলার দিক দিয়ে বিচার করলে এই ছবির মধ্যে নিশ্চিতরূপে পাওয়া যাবে ওস্তাদ শিল্পীর প্রতিভার শীলমোহর। কি বলিষ্ঠ রেখা, কি বর্ণসংযম, কি বিচিত্র ছন্দ, কি গতির ইঙ্গিত! শত শত নক্ষত্রের মধ্যে একমাত্র ধ্রুবতারকাকে দেখেই লোকে করে দিঙ্‌নির্ণয়। এবারকার প্রদর্শনীর শত শত চিত্রমালার মধ্যে দুর্গার ঐ আলেখ্যখানিই ধ্রুবতারকার স্থান গ্রহণ করতে পারবে।

ললিতকলার জন্যে যাকে বলে জীবন উৎসর্গ করা, অবনীন্দ্রনাথ তাই করেছিলেন সত্য সত্যই। কেমন ক'রে জাতীয় শিল্পের প্রাণশক্তি পরিপূর্ণ এবং এক নূতন শিল্পিগোষ্ঠী প্রস্তুত হয়ে উঠবে, কেবল সেই দিকেই ছিল না তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। শিল্প ও শিল্পীর জন্যে চাই সচেতন রূপ-রসিকের দল। এবং শিল্পবোধে দরিদ্র বাংলা দেশে সে-রকম দলগঠনের জন্যে চাই রীতিমত প্রচার-কার্য্য—তিনি নিজে সেই কঠিন কর্ত্তব্য পালন করেছেন যথাসম্ভব সুষ্ঠু ভাবেই। উপরন্তু এই প্রচারকার্য্যে নূতন নূতন সাহায্যকারী দেখলে তিনি সানন্দে তাদের উৎসাহ দান করতেন। এ সম্বন্ধে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

গোড়ার দিকে কিছু দিন সরকারি চিত্রবিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে হাত মক্স করেছিলুম। কিন্তু সে বিদেশী পদ্ধতি আমার ভালো লাগল না, ছেড়ে দিয়ে গেলুম অবনীন্দ্রনাথের কাছে। বললুম, "আপনার কাছে আমি ছবি আঁকা শিখব।"

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, "আঁকো তো একটি পদ্মফুল। দেখি তোমার হবে কি না।"

তখনই তাঁর আদেশ পালন করলুম। আমার হাতের কাজ দেখে তিনি বললেন, "তোমার চেয়ে কাঁচা হাত আমার কাছে পাকা হয়ে উঠেছে। তোমার হবে।"

তিনি তো বললেন, হবে। আমার কিন্তু হ'ল না। প'ড়ে গেলুম সাহিত্যের আবর্ত্তে। শিল্পশিক্ষা হ'ল না বটে, কিন্তু শিল্প নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে লাগলুম বিভিন্ন পত্রিকায়।

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আবার দেখা হ'ল। তিনি খুসিমুখে বললেন, "তোমার মত লোককেও আমার দরকার। কেবল তুলি নয়, কলমও চাই। এদিক দিয়েই তুমি কাজে লাগবে।"
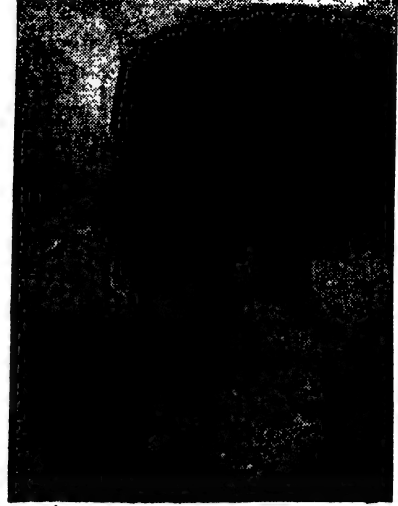
একটি মুখ —মনোরঞ্জন ঠাকুর

তাঁর প্রভূত শিল্পজ্ঞানের কণা মাত্রও আমার মধ্যে ছিল না। সুতরাং বিশেষ কাজে লাগতে পেরেছিলুম ব'লে আমার মনে হয় না। আমার সেই শিল্পনিবন্ধগুলিও তৎকালীন মাসিক সাহিত্য-জগতের অলি-গলির মধ্যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, আজ আর তা ভালো করে স্মরণেও আসে না।

দেশে শিল্পীর-সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু সেই হিসাবে শিল্প-রসিকের দল আশানুরূপ পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে ব'লে বিশ্বাস হয় না। এবং তা না হবার একমাত্র কারণ হচ্ছে, এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য প্রচারকার্য্যের অভাব। প্রচারকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে নিয়মিত ভাবে কাজ করতে পারেন, আজও দেশে এমন মনীষীর অপ্রতুলতা নেই। কেবল প্রদর্শনীর আয়োজন করলেই জনসাধারণের শিল্পবোধ বিকসিত হবে না অধিকতর। কর্ত্তৃপক্ষদের উচিত, শিল্পপ্রচারের দিকে বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়া। গত যুগের শিল্পীরা যে আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন, একালের অধিকাংশ নবীন শিল্পীর মধ্যে তা দেখতে পাই না। অনেকেই যূথভ্রষ্ট জীবের মত লক্ষ্যহীন ভাবে এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি ক'রে পথ ঠিক করতে পারছেন না। তাঁদের পথনির্দ্দেশ করতে পারেন, এমন সব উপদেশকের দরকার। এদিক দিয়ে অন্ততঃ এক জন শিল্পবোদ্ধার কথা মনে হচ্ছে। শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

এ বৎসরের ছবির মেলা দেখলুম। আনন্দের সঙ্গে পেয়েছি নিরানন্দকেও। আশার পাশে ছায়ার মত দেখেছি হতাশাকেও। আসছে বারের জন্যে তোলা রইল সে সব কথা। [ক্রমশঃ।

দেশভক্তি

ইংলণ্ড, তোমার অনেক দোষ, তবুও তোমাকে আমি ভালবাসি। আমার দেশ!

—কাউপার

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

৬

বিশাল মস্কো সহরে দেখবার অনেক কিছুই আছে। যতটা পারি দেখে নিচ্ছি। নানা প্রকার ম্যুজিয়মই আছে দশ-বারটা। আমরা গোটা চারেক দেখলাম। লেনিন ম্যুজিয়মে বাল্যকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর স্মৃতির নিদর্শনগুলি স্তরে স্তরে সাজান রয়েছে। তাঁর গুলীবিদ্ধ ওভারকোট, ব্যবহার্য সব জিনিষই রয়েছে। স্তালিন তাঁর ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে নানা দেশ থেকে কত উপহার পেয়েছেন, একটি ম্যুজিয়ম তাতেই ভরে উঠেছে। লেনিন লাইব্রেরী পৃথিবীর বৃহত্তম পুস্তকাগার। বসে পড়বার ঘরগুলি প্রশস্ত, দু'হাজার লোকের বসবার আসন। পাঁচশ'র অধিক কর্মচারী বইএর তদারক করে। বই পাঠকের নিকট পৌঁছে দেবার জন্ম বহু লিফ্ট আছে, আর আছে ক্ষুদে রেলওয়ে।

রোজই জানালা দিয়ে ক্রেমলিন প্রাসাদ দেখি। জারের আমলের প্রাচীন গির্জাগুলির চূড়া, সুউচ্চ প্রাচীরের মিনার, প্রাসাদ ও আধুনিক সরকারী ভবন দেখা যায়। দিল্লী বা আগ্রার কেল্লা-প্রাসাদ অপেক্ষাও আয়তন ও জাঁকজমক এর অনেক বেশী। ১৮শ শতাব্দীতে রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবুর্গে স্থানান্তরিত হলেও ক্রেমলিনের বৈভব ম্লান হয়নি। সোভিয়েত আমলে এর খ্যাতি তো আজ জগৎজোড়া। এই বিশাল প্রাসাদ-দুর্গের এক কোণে অতি সাধারণ এক অট্টালিকায় তিনখানা সাদাসিদে কক্ষে স্তালিন থাকেন। ৪ঠা জুলাই ছাড়পত্র নিয়ে আমরা দক্ষিণ-পূর্ব দরজা দিয়ে ক্রেমলিনে প্রবেশ করলাম। আমাদের মত আরও অনেক দল নিজস্ব গাইড নিয়ে দেখতে এসেছে। পুরাতন জারদের প্রাসাদের বেশীর ভাগ ম্যুজিয়ম। অতীতের প্রবল প্রতাপ জারদের মণিমাণিক্যখচিত মুকুট, ভূষণ, ঘোড়ার সোনার সাজ, স্বর্ণ ও রৌপ্য-পাত্র, কত অলঙ্কার! প্রধান পাত্রীদের বসন-ভূষণও জারের চেয়ে কোন অংশে নিষ্প্রভ নয়। ধর্মতন্ত্র ও রাজতন্ত্র একত্র হাত মিলিয়ে জনসাধারণকে কি ভাবে শোষণ ও শাসন করতো তার বহু নিদর্শন দেখলাম। রুশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের গোড়ার দিকে গল্প শুনতাম, বলশেভিকরা জারদের ধনরত্ন, শিল্পকলার নিদর্শন সব লুঠপাট করে নিয়েছে। এখানে এবং লেনিনগ্রাদের উইনটার প্যালেসে তার বিপরীত ব্যাপারই প্রত্যক্ষ করলাম। চার শতাব্দীর সম্রাটদের সংগৃহীত এবং পারস্য ও তুরস্কের শাহ সুলতানদের হীরামুক্তাখচিত পানপাত্র, পেটিকা প্রভৃতি এবং ফরাসী, অস্ট্রিয়া, জর্মণ সম্রাটদের উপহার-সামগ্রী এরা সযত্নে রক্ষা করেছে। সম্রাটদের প্রাসাদের সাজসজ্জা, আসবাব; দেয়াল ও ছাদের স্বর্ণখচিত কারুকার্য ফরাসী ও ইতালিয় শিল্পীদের অনবদ্য সৃষ্টি সবই অক্ষত রয়েছে। ছেলেবেলায় পড়া পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য পদার্থ মস্কো নগরীর বিশাল ঘণ্টাও তেমনি ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। ঐশ্বর্য বিলাস প্রতাপ আজ কেবল তার বিষাদময় নিদর্শন রেখে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরনিদ্রিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবের কঙ্কাল।

সামন্ততান্ত্রিক যুগে নিষ্ঠুর শোষক-শ্রেণীর মধ্যেও অর্দ্ধোন্মাদ উদার খেয়ালী মানুষ জন্মেছে। আমাদের দেশে দয়ালু দাতা দরিদ্র ও নিপীড়িতের বান্ধব এমন অনেক রাজা, জমিদার এমন কি দস্যুদের কাহিনীও প্রচলিত আছে। জার সাম্রাজ্যেও এমন একটি মানুষের কাহিনী শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। আমাদের গাইড বা পরিচালিকা কমরেড অকসানা দেবী তাঁর গল্পটা রাতে খাবার টেবিলে আমাদের শোনালেন এবং আশ্বাস দিলেন, পরদিন সকালেই তাঁর প্রাসাদে যাওয়া হবে। সেটাও একটা ম্যুজিয়ম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অভিজাত জমিদার—নাম আস্তানফিনো। বিরাট জমিদারী এবং দু'লক্ষ ক্রীতদাসের মালিক। ফরাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ রুশ-অভিজাতদের ফ্যাসন ছিল। বসনে-ভূষণে চাল-চলনে আহারে-বিহারে, গৃহনির্মাণ ও আসবাবে সর্বত্র ফরাসীর নকল। আস্তানফিনোও যুগধর্ম প্রভাবে ফরাসী সংস্কৃতির ভাবধারার বারি অঞ্জলী ভরে পান করেছিলেন। পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হয়েই ইনি সঙ্কল্প করলেন, সার্ফ বা ভূমিদাসদের মুক্তি দেবেন। কিন্তু এই অসহায় পরনির্ভর মানুষগুলি দাসপ্রথায় পশুর মত কায়ক্লেশে বেঁচে আছে। কিন্তু মুক্তি পেলেই যে মারা পড়বে! ইনি এদের নানা বিদ্যায় পারদর্শী করে তুলবার জন্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। সমাজের সর্বাধিক নীচু স্তরের মানুষের মধ্য থেকে কবি, সাহিত্যিক স্থপতি, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, নর্ত্তকী সৃষ্টি হল। আস্তানফিনো ছিলেন কলারসিক ও রঙ্গমঞ্চপ্রিয়। মস্কো ইনি সাতটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর দাসেরা মস্কো

উপকণ্ঠে যে বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল,—নানা চিত্র, ভাস্কর্য ও কারুকার্য দিয়ে সুষমামণ্ডিত করেছিল, তা আজ সোভিয়েট সরকার যাদুঘরে পরিণত করেছেন। ইনি এক জন রূপসী ও বিদুষী দাসীকে বিবাহ করেন। কিন্তু অতি ধনী হয়েও তাকে সামাজিক মর্যাদা দিতে পারেননি। ক্ষোভে ও অপমানে ইনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর ও শিল্পীদের জার গভর্ণমেণ্ট সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করেন। এত বড় অনাচার অভিজাত সমাজ সইতে পারলো না। আস্তানফিনো ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

মস্কোর উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বিস্তীর্ণ বাগানের মধ্যে আস্তানফিনোর প্রাসাদ। সম্মুখে একটা হ্রদ, ছোট ছোট ডিঙ্গী নৌকা নিয়ে তরুণ-তরুণীরা বাইচ খেলায় মেতেছে। এক কোণে একটা বৃহৎ গীর্জা, অযত্নে পড়ে আছে। প্রাসাদের পাশে দোকান-পশার, খাবার সরবত ও কুলপী বরফ। দলে দলে দর্শনার্থী নরনারীর ভীড়। আমরা পশমের জুতো পরে প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। শক্ত জুতোর ঘষায় মেঝের কাঠের রকমারী নক্সা ক্ষয়ে না যায়, সেই জন্য এ ব্যবস্থা। এ প্রাসাদটি দাসেরাই তৈরী করেছে। কাঠের স্বাভাবিক নানা রংএর টুকরো দিয়ে বিচিত্র নক্সায় মেঝেগুলোর অপরূপ শোভা, চিত্র ভাস্কর্যের কি সংগ্রহ! এই প্রাসাদ কত সুন্দর, তা হায়দ্রাবাদের ফলকনামা প্রাসাদ বা বরোদার রাজপ্রাসাদ যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা কিছুটা অনুমান করতে পারবেন। ইয়োরোপের নানা দেশ থেকে সংগৃহীত বিচিত্র দ্রব্যসম্ভারের কি আশ্চর্য সমাবেশ। এর বৃহৎ নাট্যশালা ও নাচঘরের রূপসজ্জা নয়নময় হয়ে দেখবার মত। কলারসিক এবং সেকালের প্রগতিশীল অভিজাত বলেই এর কীর্তি সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে।

৫ই জুলাই সকালে আমরা সরকারী কৃষি-গবেষণাগার দেখবার জন্য গর্কী গ্রামে যাত্রা করলাম। ৫০।৬০ মাইল পথ। সহরতলী ছাড়াবার পর গ্রাম আরম্ভ হল। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের বাঙলা দেশের মত নয়। উঁচু-নীচু তরঙ্গায়িত শস্যক্ষেত্র, মাঝে মাঝে বার্চ্চ পাইনের বন, ছোট ছোট ক্ষীণস্রোতা নদী, নদীতে শত শত সাদা হাঁস সাঁতার দিচ্ছে, কতকগুলো চোখ বুজে ডাঙ্গায় রোদ পোয়াচ্ছে। কৃষক যুবক-যুবতীরা মন্থরগতি ঘোড়ার গাড়ীতে বসে গান গাইতে গাইতে চলেছে, রঙ্গীন পোষাক-পরা কৃষক-নারীরা আলু ও সব্জী ক্ষেতে কাজ বন্ধ করে গ্রীবা বাঁকিয়ে বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে আমাদের দেখে নিচ্ছে, কোথাও গাছতলায় সুস্থ ও সবল দেহ ছেলেমেয়েরা খেলার আসর হাস্য-কৌতুকে জমিয়ে তুলেছে, এমনি টুকরো টুকরো ছবি চলে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে, দূরে ধূসর পাহাড়ের স্থির পটভূমির ওপর প্রকৃতি ও মানুষের সৃষ্টি তার বিশিষ্ট রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত। আসানসোল থেকে হাজারীবাগ মোটর ভ্রমণের কথা বার বার মনে পড়ছিল।

দিগন্তবিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রের এক পাশে কৃষি-গবেষণাগার। লিসিঙ্কো পদ্ধতিতে গম আর রাই নিয়ে গবেষণা চলছে। অধ্যক্ষ গম ও রাইএর মিশ্রণে উৎপন্ন অথচ রাইএর চেয়ে উৎকৃষ্টতর এবং বেশী ফলনের গাছ দেখালেন। বিজ্ঞানকে কৃষিকাজে প্রয়োগ করে দীর্ঘকালের গবেষণা, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে কোন্ ফল ফুল ফসলের কতটা উন্নতি হয়েছে তা বোঝালেন। এ সব বুঝবার মত পাণ্ডিত্য আমাদের অবশ্য কারো নেই—তবে সাংবাদিকসুলভ সর্ববিত্তাবিশারদের ভান করে আমরা কয়েকটা প্রশ্ন করলাম, উত্তর মেরুর কাছাকাছি স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মকালে দ্রুত গম উৎপাদনের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বললেন; তবে একবার গম বুনে ২।৩ বার ফসল পাওয়া এখনও সাফল্যলাভ করেনি। ফলের বাগানে বিশেষ সার প্রয়োগ এবং কলম করে, আপেল পীয়ার প্রভৃতির ফলন ও আয়তন বেড়েছে, দেখলাম।

এর পর অধ্যক্ষ আমাদের গো-পালনাগারে নিয়ে গেলেন। কয়েকটি বিভিন্ন জাতের ষাঁড় আর শ'দেড়েক গাভী রয়েছে। এখানে মিশ্র প্রজননে গোবংশের উন্নতির চেষ্টা চলছে। এ রকম অতিকায় গাভী আমি জীবনে দেখিনি। দৈনিক আধ মণ থেকে ত্রিশ সের দুধ দেয় শুনে বিশ্বাস না হয়ে উপায় নেই। এখান থেকে দেশের নানা কেন্দ্রে উৎকৃষ্ট ষাঁড় ও গরু পাঠান হয়। আমাদের দেশের খর্বকায়া, বিশুষ্কস্তনা গো-মাতাদের রূপ চকিতে মনে পড়ে গেল। 'গো মাতাকে নিয়ে' আমরা নরহত্যাকে পুণ্য মনে করি, না খেতে দিয়ে বাছুর মেরে ফেলা, ফুঁকো দিয়ে দুধ দোহাকে আমরা পাপ মনে করিনে। গরুর প্রতি আমাদের দরদের একমাত্র প্রমাণ আইন সভায় আমরা গাভী হত্যা আইনতঃ নিষিদ্ধ করেছি। কিন্তু কেবল রাশিয়ায় কেন, সমগ্র ইয়োরোপে গো-খাদকদের গো-পালনের সযত্ন ব্যবস্থা দেখলে লজ্জায় মাথা নোয়াতে হয়।

অধ্যক্ষের সঙ্গে আমরা কৃষিক্ষেত্রে গেলাম। দিগন্তবিস্তীর্ণ উষর স্তেপভূমি, হাজার বছর ধরে বন্ধ্যা হয়ে পড়েছিল। বার্চ, পাইন ও ওকের অরণ্যবলয় তৈরী করে, তীব্র শুষ্ক বায়ু রোধ করে, সেচ ব্যবস্থায় ক্রমে স্তেপভূমি শস্যশালিনী হয়ে উঠছে। অনুর্বর প্রান্তরকে জয় করার সংগ্রাম চলেছে, প্রধান হাতিয়ার ওক্-গাছের চারাগুলি সবল হয়ে উঠছে। এক একটি অরণ্যবলয় তৈরী হবে, আর শস্যক্ষেত্র এগিয়ে যাবে। বহু দিনের পতিত জমিতে বুক-সমান উঁচু রাইএর ক্ষেতে দাঁড়িয়ে মনে হতে লাগলো, এরা পারছে, কেন না রাষ্ট্র মাত্র ত্রিশ বছরে আদিম যুগের কৃষি ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানের যন্ত্রযুগে এনে ফেলেছে। আর আমাদের দেশের কৃষকের এখনো শ্রীরামচন্দ্র বা অশোকের যুগের লাঙ্গল-বলদ ও দৈবের দয়ায় বৃষ্টিই ভরসা। বিদেশ থেকে আমরা অন্ন কিনি, অন্নসৃষ্টির যন্ত্র কিনি না। আমাদের আহার সংগ্রহ করে বেঁচে থাকবার প্রথাটা আদিম যুগেই রয়ে গেল; কিন্তু মরবার ও মারবার অতি আধুনিক মারণযন্ত্রগুলি আমরা বিদেশ থেকে প্রচুর আমদানী করি। কৃষকের ছেলে আকবরের আমলের কাঠের লাঙ্গল নিয়ে কৃষিক্ষেত্রে যায়, কিন্তু সে যদি সৈন্য ও পুলিশ দলে ভর্ত্তি হয়, তার হাতে সে যুগের লাঠী সড়কী বল্লমের পরিবর্তে শোভা পায় দ্রুত মৃত্যুস্রাবী রাইফেল।

এই গর্কী গ্রামেই একটা বাড়ীতে লেনিন (১৯১৮-২৪) বাস করতেন। প্রায় একশ' বিঘা উপবন ও উদ্যানের মধ্যে একটা দোতলা সুগঠিত বাড়ী, পশ্চিমে নীল পাইনের বন ঢালু হয়ে নেমে গেছে। দেখলেই বোঝা যায়, প্রাক্-বিপ্লব যুগে কোন ধনী অভিজাতের উদ্যান-বাটিকা ছিল। বাড়ীর বাইরে চাকরদের থাকবার এবং পাকশালা প্রভৃতির স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। ইদানীং পাহারাদার সোভিয়েত পল্টনেরা এখানে থাকে। চারিদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা, কেউ কোন জিনিস গাছপালা না নষ্ট করে সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। নবীন রাশিয়ায় এটা এক প্রধান তীর্থক্ষেত্র। দলে

দলে নরনারী আসছে, বাসে লরীতে গাড়ীতে। এ বাড়ীর চৌহদ্দীর মধ্যে ধূমপান করা নিষেধ। লেনিনের লাইব্রেরী, শয়নকক্ষ, বসবার ঘরের সব আসবাব সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর চিঠিপত্র, হাতের টুকিটাকী লেখা, তাঁর ছবি এ সব পরিদর্শিকা বুঝিয়ে দিলেন। এখানে একটা রেকর্ডে লেনিনের বক্তৃতা শুনলাম। স্পষ্ট সতেজ আবেগপূর্ণ কণ্ঠস্বর। স্তালিন, মলটোভ, কিরোভ প্রভৃতি বলশেভিক নেতাদের সঙ্গে যে সব চেয়ার বা বাগানের বেঞ্চে বসে লেনিন পরামর্শ করতেন, সেগুলি চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। বাইরে গ্যারাজে লেনিনের ব্যবহৃত দু'খানা সে আমলের রোলস রয়েস গাড়ীও রয়েছে দেখা গেল।

তরুবীথিকার অন্তরালে এক নিভৃত স্থানে বসে মনে হল, এই ভবনে ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে মানব-ইতিহাসের অনন্যসাধারণ বিপ্লবী নেতা মহান্ লেনিন চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়েছিলেন। শিশু সোভিয়েতের সেই মহা দুর্দিনে—লেনিনের নামে, কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী ও লেনিনের একনিষ্ঠ শিষ্য কমরেড স্তালিন শপথ গ্রহণ করেছিলেন: লেনিন-নির্দিষ্ট পথে মার্কস্‌বাদের পাষাণ কঠিন ভিত্তির উপর তিনি কৃষক-শ্রমিকের রাষ্ট্রকে সুপ্রতিষ্ঠ করবেন। এই শপথ-বাক্য বহু বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে স্তালিন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন! সুসম্বদ্ধ শক্তিমান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আজ সর্বহারা নিপীড়িত জনগণের মুক্তির দিশারী, ধনতন্ত্রী শোষক-শ্রেণীর দুশ্চিন্তার স্থল।

৭

রাশিয়ার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সঙ্গে নানা উপলক্ষে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছি। এক মস্কো সহরেই ৭।৮ খানা দৈনিক পত্র প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ের সচিত্র ও সাধারণ সাপ্তাহিক, মাসিক ও সাময়িক পত্রিকা অগুণতি। দৈনিক পত্রিকার মধ্যে 'প্রাবদা'র প্রচারই সর্বাধিক। লণ্ডনের 'টাইমসের' মত মস্কোর 'প্রাবদা' আধা-সরকারী কাগজ, এতে কমিউনিষ্ট পার্টি ও সরকারী মতের প্রাধান্য দেওয়া হয়। লেনিনগ্রাদ ও স্তালিনগ্রাদ থেকেও প্রত্যহ 'প্রাবদা' প্রকাশিত হয়। প্রাবদার পরেই 'ইজভেস্তা' ও অন্যান্য দৈনিক। প্রত্যেক দৈনিক পত্র নিজস্ব ভঙ্গীতে বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে সংবাদ পরিবেশন ও আলোচনা করে থাকেন। এদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। রুচিভেদে পাঠক-শ্রেণীও স্বতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক সমাজের কাগজে চুরী-ডাকাতি, আইন-আদালত, ধনীদের খেয়াল, ভোজসভায় আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকা, নেতাদের ভাষণ, ধনী সমাজের বিবাহ বা প্রণয়-ঘটিত কেলেঙ্কারী এ সব সংবাদ প্রকাশিত হয় না। বিদেশী সংবাদের মধ্যে শ্রমিক-কৃষকদের আন্দোলন-আলোড়ন, যুদ্ধ, কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সংবাদ কিছু কিছু থাকে, কিন্তু প্রাধান্য পায় সোবিয়েত রাশিয়ার নিজস্ব সংবাদ। ইদানীং শান্তি আন্দোলনের সংবাদ দৈনিকের অনেকখানি স্থান অধিকার করছে। গঠন, পুনর্গঠন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বৈজ্ঞানিক ব্যাপারেরই বেশী প্রাধান্য। খেলাধূলা, অভিনয়-নৃত্য-সিনেমা, কলকারখানা নিয়ে আলোচনা হয়, এমন সংবাদপত্রও আছে।

এক দিন সন্ধ্যায় 'লিটারারী গেজেটে'র প্রধান সম্পাদক সিমোনভের আমন্ত্রণে আমরা তাঁর আপিসে এক সান্ধ্য বৈঠকে যোগদান করলাম। কয়েক জন বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। দৈনিক 'লিটারারি গেজেটে'র প্রচার-সংখ্যা ৭ লক্ষ ৫০ হাজার। এতে দেশ-বিদেশের সাহিত্য সমালোচনা এবং ভাল ভাল রচনার অনুবাদকেই মুখ্য স্থান দেওয়া হয়। এ ছাড়া ঘরের ও বাইরের আন্তর্জাতিক সমস্যা আলোচিত হয়। রুশীয় বুদ্ধি-জীবী মহলেই এর পাঠক-সংখ্যা বেশী। আলোচনা প্রসঙ্গে সিমোনভ বললেন, আমাদের দেশের সংবাদপত্র সম্বন্ধে বাইরের লোকের অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে। আমাদের বিরুদ্ধে এই কথাটাই জোর করে বলা হয়, আমাদের সংবাদপত্র পরিচালনায় কোন স্বাধীনতা নেই। সরকারী সেন্সরের অনুমোদন ছাড়া আমরা কিছুই প্রকাশ করতে পারি না। গভর্ণমেণ্ট ও কমিউনিষ্ট পার্টির গুণগান করাই আমাদের একমাত্র কাজ। এ সব অভিযোগ ভিত্তিহীন। সরকারী বিভাগীয় ভুল-ত্রুটির আমরা প্রয়োজন মত সমালোচনা করে থাকি। তিনি তাঁর কাগজের ফাইল থেকে দু'টো দৃষ্টান্ত আমাদের দেখালেন। কোন তৈল-শোধনের কারখানায় তেলের অপচয় সম্বন্ধে তথ্য-সম্বলিত সমালোচনা হয়েছিল। তার জবাবে তেল বিভাগের মন্ত্রী স্বয়ং পত্র লিখে দোষ স্বীকার করে ভুল দেখিয়ে দেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন যে, অবিলম্বে এর প্রতিকার করা হবে।

কমিউনিষ্ট পার্টির কাজের তীব্র সমালোচনা করে লেখা একটি প্রবন্ধ তিনি পাঠ করে শোনালেন, এতে পার্টির কালচারাল ফ্রণ্টের কর্মীদের বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রচারকার্য্যের ধারা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছে। গ্রীষ্মের বক্ষে বিভিন্ন স্বাস্থ্যনিবাসে শ্রমিক ও কৃষকদের সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য যাদের পাঠান হয়েছে, তাদের অপটুতার এবং এই ধরণের আরো সমালোচনা আমরা করে থাকি। সরকারী ও বেসরকারী সব প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হল জনকল্যাণ। ভুল-ভ্রান্তি সর্বত্রই আছে এবং ঘটেও থাকে, সেদিকে সজাগ থাকাই সাংবাদিকের ব্রত। এই কর্তব্য পালনে আমাদের স্বাধীনতা আছে।

আমি রুশ ভাষা জানি না, এ সম্বন্ধে সব তথ্য জানাও কঠিন। তবে এদের সংবাদ সংগ্রহ, প্রচার এবং পরিচালনার ধারা আমাদের দেশের মত নয়। আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলি তার শৈশবকাল থেকেই বৃটিশ সংবাদপত্রগুলির স্তন্য পান করে সাবালক হয়েছে। এই নাড়ীর যোগ এখনো অব্যাহত আছে। আবার আয়তন ভঙ্গিমায় আমরা বিলিতী কাগজের হুবহু নকল করে চলেছি, কোন স্বকীয় ধারা সৃষ্টি করে নেবার সাহস পাই নে। মনে আছে, একবার এক বিখ্যাত ফরাসী সম্পাদক আমাকে বলেছিলেন, তোমাদের দেশের ইংরাজী কাগজগুলোতে বিদেশী সংবাদের এত প্রাধান্য কেন? দেখলে মনে হয়, যেন ইংলণ্ডের কোন কাগজ পড়ছি। উত্তরে বলেছিলাম, আমরা ভারতে ইংরেজ-চালিত কাগজগুলোর আদর্শ অনুসরণ করি, তারা যে শ্রেণীর সংবাদকে প্রাধান্য দেয়, সেগুলোকে তেমনি ভাবে ফলাও না করতে পারলে, ইংরেজী-নবীশ ভারতীয়রা দেশী কাগজ ছোঁবেও না। দ্বিতীয় কারণ, সংবাদ-সংগ্রহ ও পরিবেশনে আমাদের কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠান নেই। সংবাদের একচেটিয়া কারবারী 'রয়েটার'ই আমাদের একমাত্র সম্বল। অবশ্য এখন অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে।...

এক জন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেমন, সে সম্বন্ধে কিছু বল।

উত্তরে আমাদের এক জন বললেন, আমাদের দেশের নয়া শাসনতন্ত্রে সংবাদপত্রে স্বাধীন মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়নি। প্রেসকে সংযত রাখবার জন্য আইনও আছে। তবু আমরা সরকারী ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনায় যথেষ্ট স্বাধীনতা পেয়ে থাকি। আমি বললাম, আমাদের দেশের অধিকাংশ বড় বড় দৈনিক কাগজ মালিকানা স্বার্থে চালিত হয়। কায়েমী স্বার্থের সমর্থক এই সব কাগজের বড় বেশী স্বাধীনতার দরকার হয় না। কেন না, এদের কোন নির্দিষ্ট মতবাদ নেই। সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাতেই প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের সুবিধে আছে। কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে কৃষক, শ্রমিক এবং নিম্নমধ্য শ্রেণীর দাবী সমর্থন করে, এমন দু'-চারখানা কাগজও আছে। অন্যান্য ধনতন্ত্রী দেশের মতই আমাদের দেশে বিভিন্ন মতবাদের সংবাদপত্র আছে। প্রেস-দমন আইন থাকলেও ইংরেজ আমলের মত কড়াকড়ি নেই।

আলোচনা ক্রমে সাংবাদিকদের বৃত্তির নিরাপত্তা ও উপার্জ্জনের প্রসঙ্গে এসে পৌঁছল। এক জন বললেন, আমাদের ইউনিয়ন সাংবাদিকদের স্বার্থ ও অধিকারের সতর্ক প্রহরী। ইউনিয়নের সদস্যরা স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব রুচি ও যোগ্যতা অনুসারে কাজ করেন। বেতন, ভাতা, ছুটি এবং লেখার মজুরীর হার নির্দিষ্ট রয়েছে। মালিকের মুনাফার স্বার্থে কাগজ পরিচালিত হয় না বলে লাভের সমস্তটাই বাড়ী, স্বাস্থ্যনিবাস, শিক্ষালয়, হাসপাতাল প্রভৃতির জন্য ব্যয় হয়। সাংবাদিকদের ছেলেমেয়েদের পায়নিয়র্স ক্যাম্প বা দেশভ্রমণের ব্যবস্থাও আমরা করে থাকি। সাংবাদিকরা প্রথম দেড় হাজার রুবল মাসিক বেতনে কাজ আরম্ভ করেন। অধিকাংশের মাসিক বেতন আড়াই হাজার থেকে ছয় হাজার রুবল। বিশেষ রচনার জন্য প্রতি কলমে ১০০ রুবল দেওয়া হয়। এ ছাড়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি প্রবন্ধের মজুরী দেড় হাজার থেকে আড়াই হাজার রুবল। ত্রিশ বছর কাজ করার পর পেনসনেরও ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের এত প্রসার হচ্ছে যে, বেকার সমস্যার প্রশ্নই ওঠে না।

দেশে ফেরার পর অনেকে আমাকে বলেছেন, ওখানে সাংবাদিকদের আর্থিক অবস্থা ভাল হতে পারে, কিন্তু তাঁদেরো তো একটি বিশেষ মতবাদের পোষকতা করতে হয়, স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও সমালোচনা করার অধিকার কতটুকু? এ বিষয়ে প্রশ্ন করে কোন সদুত্তর পেয়েছেন কি? অকপটে স্বীকার করছি, এমন প্রশ্ন আমি করিনি। কেন না পাল্টা প্রশ্ন করলে, জবাব দিতে বিব্রত হতে হত। আমার নিজের দেশে স্বাধীন মত প্রকাশ করতে হ'লে কি মূল্য দিতে হয় তা আমি জানি। প্রত্যেক বৃহৎ সংবাদপত্রে তার মালিক এবং মালিকের পৃষ্ঠপোষক ধনী ও রাজনীতিক ক্ষমতাচক্রের অধিপতিদের মতামত প্রতিফলিত হয়, সম্পাদক যদি 'বিবেকে'র দোহাই দিয়ে ভিন্ন মত অবলম্বন করেন, তবে নির্ঘাত তার অন্ন মারা যাবে, এবং তার আপীল করবার মত কোন দরকার নেই। এ নিয়ে আলোচনা বাড়িয়ে পাক ঘুলিয়ে না তোলাই ভাল।

রাশিয়ার সাংবাদিকেরা তাঁদের বৃত্তির নিরাপত্তা ও উপার্জ্জন এবং অপটু হয়ে পড়লে নিরাশ্রয় হয়ে অনাহারে না মরা সম্বন্ধে যেমন নিশ্চিন্ত তেমন নিরাপত্তা কিছুটা ইয়োরোপ ও আমেরিকাতেও আছে। সঙ্ঘবদ্ধ সাংবাদিক-সঙ্ঘ মালিকদের স্বেচ্ছাচার সংযত করেছেন, বৃত্তিগত নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের দেশের মালিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন তাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষার জন্য। গত ১০।১২ বছরে এঁরা সাংবাদিক বৃত্তিগত নিরাপত্তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন গ্রহণ করেননি। কোন কোন কাগজের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আছে, ব্যক্তিগত ভাবে কোন মালিক দয়া-দাক্ষিণ্যও দেখিয়ে থাকেন, কিন্তু এটা অনুগ্রহ মাত্র। সাবাদিকদের তরফ থেকে গত ত্রিশ বৎসরে অনেক খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত চেষ্টা বিফল হয়েছে। সাংবাদিকদের স্বার্থ ও বৃত্তিগত মর্যাদা রক্ষার পথে প্রধান অন্তরায়, শিক্ষিত শ্রেণীর বেকার সমস্যা—যার সুযোগ নেবেন না, মালিকরা এত নির্বোধ নন।

এখানে দেখলাম, আমেরিকা-বৃটেন অপেক্ষাও অধিক সংখ্যায় মেয়েরা সাংবাদিকতায় যোগ দিয়েছেন। 'টাস', 'প্রাবদা' কিম্বা অন্য কোন সংবাদ ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান থেকে যাঁরা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, তাঁদের অধিকাংশই নারী। আমাদের দেশ সম্বন্ধে এঁদের প্রশ্নের ধরণ দেখে মনে হয়েছে, ভারত সম্বন্ধে এঁরা অনেক খোঁজ-খবর রাখেন। এক জন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের দেশে শিক্ষিতা মেয়েরা সাংবাদিক বৃত্তি গ্রহণ করে না কেন?

বললাম সুযোগের অভাবে। অনেক বুদ্ধিমতী মেয়ের আগ্রহ দেখেছি; কিন্তু আমাদের দেশের খবরের কাগজের আপিসের পরিবেশ নানা কারণে মেয়েদের কাজ করার অনুকূল নয়; তার ওপর একটা সামাজিক রক্ষণশীলতাও আছে। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েরা অবশ্য নানা বৃত্তিতে এগিয়ে আসছেন। আমাদের দেশে সংবাদপত্রে নিয়মিত লেখিকা অনেক আছেন; কিন্তু এখনও এক জন মেয়েও পুরোপুরী বৃত্তিজীবী সাংবাদিক হননি।

এ দেশের সংবাদপত্র আকারে আমাদের দেশের চেয়েও ছোট। চার পাতার বেশী দৈনিক কাগজ নেই। এদের কাগজে বিজ্ঞাপন নেই, কেন না ব্যবসাদারী প্রতিযোগিতা নেই। কাগজ বিক্রী করে যে আয় হয়, তাতেই ছাপাখানা ও কর্মীদের ব্যয় সঙ্কুলান করতে হয়। কয়েকটি সংবাদপত্রের আপিসের আয়তন, আসবাব-পত্র,

মস্কোয়া নদী-তীরে ক্রেমলিন দুর্গ
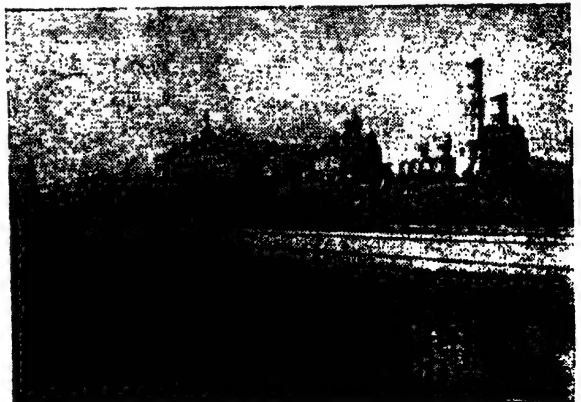
বিশাল ছাপাখানার নানা বিভাগ দেখে আশ্চর্য হ'লাম। আমাদের দেশের প্রধান সংবাদপত্রের কার্যালয়গুলি তুলনায় এদের কাছে-ধারেও এগুতে পারে না।

৮

মস্কোএ ট্রাম, বাস, ট্রলীবাস অজস্র—এগুলি সহর ও সহরতলীতে অবিশ্রাম যাতায়াত করে। ভীড় আছে, কিন্তু ঠাসাঠাসি নেই। তার কারণ, এখানে মেট্রো বা ভূগর্ভ রেলপথ রয়েছে। এতে প্রত্যহ ১৭ লাখ লোক যাতায়াত করে। এটা মস্কোবাসীদের একটা গর্বের জিনিষ। এক দিন বেলা তিনটের সময়, আমরা হোটেলের অনতিদূরে 'রিভলিউসান স্কোয়ারে'র ষ্টেশনে উপস্থিত হলাম। এলিভেটারে বা এস্কেলটারে দাঁড়াতেই সর-সর করে পাতালপুরীতে নেমে গেলাম। পাতালপুরীই বটে! এর নাম রেল-ইষ্টিশান? এ যে পরীরাজ্যের রহস্যময় প্রাসাদ! মসৃণ মর্মরে বাঁধান চত্বর, পাথরের রং মিলিয়ে দেয়ালে কত কারুকার্য। ২৫ হাত চওড়া, দেড়শ' হাত লম্বা চত্বরের দু'পাশে বিপ্লবী ও গত যুদ্ধের নানা শ্রেণীর বীরদের ব্রোঞ্জ নির্মিত অতিকায় মূর্তির সমাবেশ—কি গঠন-ভঙ্গিমা, যেন সোভিয়েটের স্বদেশ-রক্ষার মৃত্যুপণ সঙ্কল্প আপনাতে আপনি অটল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুগ্র উজ্জ্বল আলোকে চার দিক উদ্ভাসিত;···কোথাও ধূলো-ময়লা নেই। এরই দু'পাশে প্রশস্ত বারান্দা বা প্ল্যাটফর্ম, প্রতি দু'মিনিট পর-পর গাড়ী আসছে-যাচ্ছে,—সুশৃঙ্খল ভাবে যাত্রীরা ওঠা-নামা করছে।

যাঁরা প্যারী, লণ্ডন ও নিউইয়র্কের মেট্রো দেখেছেন, তাঁরাও এর রূপ ও সাজসজ্জার আড়ম্বর দেখে অবাক হয়ে গেলেন। আমরা পর-পর পাঁচটি ষ্টেশন দেখলাম। প্রত্যেকটির গঠনভঙ্গী রূপসজ্জা স্বতন্ত্র। বিভিন্ন রিপাবলিকের কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্য উরাল পর্বতের নানা রংএর মর্মরের সমন্বয়ে ফুটে উঠেছে, আলোকমালাও পৃথক ধরণের। গাড়ীগুলিও সুন্দর। চামড়ার পুরু গদী—নিকেলের পালিশ-করা হাতল। ষ্টেশনে গাড়ীতে যাত্রীদের এত আরামের ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সম্ভব। ১৯৩৫এ প্রথম এর পত্তন হয়, যুদ্ধের সময়েও এর কাজ পুরোদমেই চলেছিল, এখনও চলছে, এর পরিধি প্রসারিত হচ্ছে। পৃথিবীতে এত বিরাট পরিকল্পনার ভিত্তিতে মানুষের অতুলনীয় সৃষ্টি আর কোথাও আছে বলে জানি নে।

মস্কোএ আমি দু'বেলা ঘুরে ঘুরে দেখছি। মন সর্বদা উৎসুক থাকে, কিন্তু দেহ বেঁকে বসে। এক দিন দেহ কবুল জবাব দিল। সকালে একটা রুটির কারখানায় গিয়েছিলাম। পাঁচতলা উঁচুতে আটা বা ময়দা কলে মাখা হচ্ছে; আর নানা প্রকার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধাপে-ধাপে একতলার কলের মুখ থেকে নানা আকারের ও মাপের রুটি বেরিয়ে আসছে। এর প্রত্যেক তলায় রাসায়নিক পরীক্ষাগার। প্রত্যেক বার নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, বিশুদ্ধ কি না? এখানে দৈনিক ২৮ টন রুটি তৈরী হয়। মানুষের খাদ্য সম্পর্কে কত সতর্কতা। ময়দা বা আটা গোলা থেকে তপ্ত রুটি তৈরী পর্যন্ত দেখে ও চেখে আমরা কারখানার ডিরেক্টরের ঘরে এসে বসলাম। সাদাসিদে মানুষ; বয়স ৬৫টি পার হয়েছে। ছেলেবেলায় ছোট 'বেকারী'তে মা'র সঙ্গে কাজ করতেন। বিপ্লব এলো-গেলো, 'বেকারী' ধরেই রইলেন। কিছু কিছু লেখাপড়াও শিখলেন। কমিউনিষ্ট পার্টিতেও যোগ দিলেন না, এমন কি ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যও হলেন না, যোগ্যতার গুণে বৃহৎ কারখানার প্রধান পরিচালক হলেন। অনেক কলকারখানা দেখেছি, কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ না দিয়ে এবং শ্রমিক-সঙ্ঘে যূথবদ্ধ না হয়ে এত বড় দায়িত্ব পেয়েছেন, এমন মানুষ হয়তো সোভিয়েতে আরো আছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়নি। ৭৭০ জন কারিগর এঁর অধীনে; অধিকাংশই স্ত্রীলোক। কায়িক শ্রমিক খুবই কম, সবই যন্ত্রে চলছে। শ্রমিকদের শিশু-পালনাগার ও কিণ্ডারগার্টেন আছে। ডিরেক্টর পুরনো দিনের অনেক গল্প বললেন, কারখানা বড় করবার সুরুতে কেতাব-পড়া বলশেভিকরা কি ভাবে কাজ ভণ্ডুল করে, শেষ পর্যন্ত তাঁর হাতেই ভার দিয়েছিল, সে সব কথা কৌতুকের সঙ্গেই বললেন। সোভিয়েতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নেই, এ কথা যারা বলে, এই ডিরেক্টর তার মূর্তিমান প্রতিবাদ।

রুটির কারখানা থেকে, বিখ্যাত বিপ্লবী কবি মায়াকোভস্কীর বাসস্থান দেখতে গেলাম। তিন কামরার একটা ছোট ফ্ল্যাটে তিনি থাকতেন, তার পাশের দু'খানা ঘর নিয়ে একটি ছোট ম্যুজিয়ম করা হয়েছে। এর একটি ঘরে কবির কাব্য নিয়ে আলোচনা ও বক্তৃতা হয়। আলমারীতে কবির রচনার বিভিন্ন ভাষার সংস্করণ-গুলি সাজান রয়েছে। পড়বার ব্যবস্থাও আছে। আমরা কবির ব্যবহৃত কলম, ঘড়ী, খাতাপত্র, শয়ন-ঘর দেখলাম। কবির মৃত্যুকালে যেমনটি যেখানে ছিল তেমনি ভাবে রাখা হয়েছে। আমরা ছাড়া আরো কয়েকটি দল এসেছে। রোজই এমনি ভীড় হয়। জাতীয় কবির প্রতি এদের খুবই অনুরাগ। ম্যুজিয়মের কর্ত্রী কবির জীবনের সব ঘটনা বর্ণনা করলেন।

হোটেলে ফিরে প্রতিনিধি দল একটা জাতীয় চিত্রশালা দেখবার জন্য চলে গেলেন। শরীর ক্লান্ত, চিত্রকলার প্রতি আমার তেমন আকর্ষণও নেই; আমি আর সঙ্গী হলাম না। মাঝে মাঝে দলছাড়া হয়ে একা থাকতে ভাল লাগে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর দেখি অপরাহ্ণ ছয়টা—বাইরে রৌদ্র তখনও প্রখর, সূর্য অস্ত যাবে রাত্রি দশটায়। পথে বেরিয়ে পড়লাম—উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ। দক্ষিণমুখো এগিয়ে লেনিন লাইব্রেরী বাঁয়ে রেখে পশ্চিম বরাবর চলেছি। দু'পাশে দোকান, কাচের জানালায় নানা রকম জিনিষ সাজানো, ক্রেতার ভীড়ও রয়েছে। কিছু দূর এগিয়ে দেখি একটা শিশু-চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল। বাড়ীটার গড়ন পুরনো ধরণের, সম্ভবতঃ কোন ধনীর প্রাসাদ ছিল; এখন হাসপাতাল। অনেক মা ছেলেমেয়ে কোলে এগিয়ে যাচ্ছেন, কৌতূহলী হয়ে তাঁদের সঙ্গ নিলাম। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি দেখে এক জন মধ্যবয়সী মহিলা এগিয়ে এসে স্মিতমুখে হয়তো কিছু জিজ্ঞাসা করলেন; আমি তো এক বর্ণও বুঝলাম না, বললাম, ইণ্ডিস্কী ডেলিগাদসী। তিনি আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন, দেখি, ১০।১২ জন মহিলা ডাক্তার বসে আছেন। আমার বরাত ভাল, এর মধ্যে এক জন ইংরেজী জানেন। তিনি খবরের কাগজে আমাদের কথা পড়েছেন। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন, এই শিশু-হাসপাতালে ৭৫০টি শয্যা আছে। ২৮০ জন ডাক্তার ও ৬০০ নার্স। এরা অবশ্য সারাক্ষণের নয়। পালা করে কাজ করেন। এ ছাড়া প্রায় দু'শো পরিচারিকা আছে। আমি যে

দেশের মানুষ, সে দেশের রাজধানী এবং বৃহত্তম নগরী কলতাতেও এমন হাসপাতাল নেই। পূর্বে শুনেছিলাম, এ দেশের হাসপাতালের ব্যবস্থা আমেরিকার মত ধনী দেশের মতই, আজ তা স্বচক্ষে দেখলাম। বাগানে ছেলেমেয়েদের খেলার দোলনা প্রভৃতি। একটা বড় হল-ঘরে নানা রকম পুতুল, ছবির বই। এখানেও বসে বসে খেলার নানা সরঞ্জাম আছে। দোতলায় সুন্দর খাটে পরিপাটি শুভ্র শয্যায় শিশুরোগীরা শুয়ে আছে। শুনলাম, সমগ্র সোভিয়েতে এই রকম শিশু-হাসপাতালের সংখ্যা নয় হাজার। পায়োনিয়র্স ক্যাম্পে, কিণ্ডারগার্টেনে এবং শিশু-পালনাগারে দেখেছি, ছোটদের মানুষ করে গড়ে তুলবার ব্যবস্থা, আর এখানে দেখলাম, রুগ্ন শিশুদের নিরাময় করে তুলবার নিরলস সেবা। কি শৃঙ্খলা, কি দরদ, কি কর্তব্যবোধ! সর্বত্র দেখেছি, এরা বলে, 'আমাদের ছেলে-মেয়ে', 'আমার ছেলে-মেয়ে' বলে না। এই প্রসঙ্গে জর্জিয়ার রাজধানী তিবলিসিংর একটি ঘটনা মনে পড়ছে। হোটেলের বারান্দায় বসে আছি; ফুটপাতে ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। তিন-চার বছরের একটা ছেলে 'আইসক্রীম' খেয়ে হাত-মুখ নোংরা করে পাশে দাঁড়িয়ে আছে, একটি সুবেশা যুবতী দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন। হাত-ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে আদর করে ওর হাত-মুখ মুছিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। ভাবখানা যেন এই যে, এ তো আমাদের সাধারণ কর্তব্য। এই যুবতীর নিরহংকৃত কর্তব্য পালনের মধ্যে সোভিয়েত নারী-হৃদয়ের যে পরিচয় প্রকাশ পেল, তার মধ্যে দেখলাম, আত্মপরায়ণ অহংকারতার মালিন্য এদের মন থেকে মুছে গেছে।

জগৎগঙ্গা সেবাসদন

সম্প্রতি কলিকাতা বালীগঞ্জে রাসবিহারী এভিনিউএর উপর জগৎগঙ্গা সেবাসদন নামে এক প্রসূতিসদন ও হাসপাতালের উদ্বোধন হইয়াছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ লৌহ-ব্যবসায়ী শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র ঘোষ তাঁহার পিতা-মাতার স্মৃতির উদ্দেশে এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ জন্য তিনি তিন লক্ষ টাকা মূল্যের বাড়ী ও দুই লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া প্রাথমিক ব্যয়ের জন্য তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দানের স্বীকৃতি দিয়াছেন। হাসপাতালটির পরিচালনার ভার একটি ট্রাষ্টিবোর্ডের হাতে দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী প্রসূতি-সদন ও হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। যে রৌপ্য কাঁচি দিয়া হাসপাতালের উদ্বোধন হয়, তাহা সভাস্থলে নিলামে বিক্রয় করা হয় এবং শ্রীরামচন্দ্র সর্দ্দা উহা ১১৫১ টাকা মূল্য দিয়া ক্রয় করেন। এই টাকা হাসপাতাল-ভবন নির্ম্মাণের জন্য ব্যয় করা হইবে। ডাঃ মুখার্জী গভর্ণরের তহবিল হইতে এই হাসপাতালে পাঁচ শত টাকা দান করেন। আমরা ক্ষীরোদ বাবুকে তাঁহার এই সৎকার্য্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বামে হইতে দক্ষিণে—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র ঘোষ (চেয়ারম্যান), রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, রাজ্যপালের সহধর্ম্মিণী এবং ট্রাষ্টিবৃন্দ

শ্রীরামচন্দ্র সর্দ্দা

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

১০

ইউরোপীয় ধারায় এ দেশে গুপ্ত সমিতি গঠন করিয়া দেশের কল্যাণ সাধনের জন্য ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ঋষি রাজনারায়ণের নেতৃত্বে ঠাকুর-বাড়ীর তরুণের দল "হানচু পামু হাফ" নামক রহস্যময় নামে এক সমিতি গঠন করিয়া অতিশয় গাম্ভীর্য্যের সহিত মন্ত্রগুপ্তির অভ্যাস করিতেন। এই সভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে—"জ্যোতি দাদার উদ্‌যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বদেশীর দল। কলিকাতার এক পোড়ো বাড়ীতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সকল অনুষ্ঠান রহস্যাবৃত ছিল। * * * এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিষটা কোথাও বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। * * * রাজ্যের মধ্যে বীর-ধর্ম্মের পথ রাখা চাই, নহিলে মানবধর্ম্মে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে—সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত ও পরিণাম অভাবনীয়।"

জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের জীবন-স্মৃতিতে এই সভার সম্বন্ধে আছে যে,—"সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি; অর্থাৎ এ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে এবং যাহা শ্রুত হইবে তাহা অ-সভ্যদের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। * * * টেবিলের দুই পাশে দুইটি চক্ষু-কোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার এই অর্থ যে, মৃত ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারে ইহাই মূল কল্পনা।"

কার্য্যবিবরণী জ্যোতি বাবুর উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লেখা হইত। এই গুপ্ত ভাষায় সঞ্জীবনী সভাকে "হাঞ্চু পামু হাফ" বলা হইত। এই ধারা গোপনে গোপনে শিক্ষিত সমাজে প্রসার লাভ করিতেছিল। ইংরাজ শাসন যে এদেশের স্বাধীনতার অন্তরায় তাহা বুঝিয়া এদেশবাসীর মন এই শাসনের প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিতে ও যুবজনের মনে স্বদেশের স্বাধীনতা আনিবার সঙ্কল্প জাগাইতে দেশের ভাবুক সমাজ মনোনিবেশ করিলেন।

দ্বারকানাথ বিপ্লবাত্মক ভাবধারা প্রচার মানসে তৎকালে জাতীয় ভাবধারা উদ্দীপক সকল প্রচলিত সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম জাতীয় সঙ্কলন পুস্তক "জাতীয় সঙ্গীত" প্রকাশ করেন।

ঠিক এই সময়েই ম্যাটসিনি গারিবল্ডি দেশ উদ্ধারের জন্য ইতালীতে যে গুপ্ত কারবোনারি আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই দেশে আসিয়া পড়ায় এক নব ভাবের বন্যা যুবজনের চিত্তকে ভরিয়া তুলিল। ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞদেরও এই সংগ্রাম-কাহিনী জানাইবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণকে গারিবল্ডি ও ম্যাটসিনির জীবন-কথা বাঙ্গলা ভাষায় রচনা করিয়া প্রকাশ করিতে উৎসাহ দিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ম্যাটসিনির জীবনের শেষাংশ অনুবাদ করেন নাই,' কারণ তিনি বলিতেন যে, তাঁহার জীবনের শেষ দিকের ইতিহাস বিফলতার ইতিহাস, দেশের যুবজন-চিত্তে যে অনুপ্রেরণা ম্যাটসিনির প্রথম জীবনের কর্ম্মপ্রয়াস হইতে সঞ্চারিত হইবে, শেষ জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাসে সেই উদ্দীপনায় ভাঁটা পড়িতে পারে। যোগেন্দ্রনাথ বিপ্লবী দল গঠন মানসে হুগলি জেলায় বহু স্থানে কুস্তি ও লাঠিখেলার আখড়া স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও বিপ্লবী দলের সহিত সক্রিয় যোগ রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুপ্রেরণায় তাঁহার আত্মীয় অন্নদা কবিরাজ মহাশয় ও জামাতা ললিত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিপ্লবী দলের কর্ম্মী হন। ললিত বাবুর ভাগিনেয় বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও ললিত বাবুর মধ্যস্থতায় বিপ্লবী দলে যোগদান করেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে "সঞ্জীবনী সভা" ও "অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা" প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যে বিপ্লবী মনোভাব দানা বাঁধিবার আশ্রয় খুঁজিতেছিল, তাহা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের পর হইতে শুধু বাঙ্গলা কেন সমস্ত ভারতে দানা বাঁধিয়া উঠিবার মত সুযোগ লাভ করিল। আদেয়ার যুদ্ধে কৃষ্ণকায় আবিসিনিয়াবাসীদিগের নিকট ইতালীর বিষম পরাজয় ঘটে। এই ব্যাপার হইতে এক দল ভারতীয় ভাবুক শ্বেত জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রকাশ্য ভাবে সন্দেহ প্রকাশ করিতে এবং প্রয়োজন হইলে ভারতের পক্ষে শস্ত্রবলে স্বাধীনতা অর্জ্জনের সম্ভাব্যতা প্রচার আরম্ভ করেন। যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রকাশ্য ভাবে গেরিলা যুদ্ধের বিষয় প্রচার করিতে থাকেন।

বাঙ্গলার গুপ্ত আন্দোলনের যে ধারাটি ঠাকুর-বাড়ীর আওতায় জীবিত ছিল সেই ধারাটি জাপানী চিত্রশিল্পী অধ্যাপক কাকাসু ওকাকুরার আগমনে নব তেজে বিকশিত হইয়া উঠে। অধ্যাপক ওকাকুরা "হরি" নামক এক জন আর্টের ছাত্রের সমভিব্যাহারে শ্রীমতী ম্যাকলাউডের সঙ্গে ভারতে আসেন। উভয়েই বেলুড় মঠে কিছু দিন অবস্থান করেন। অধ্যাপক ওকাকুরা সেই সময়ে Ideals of the East নামক একটা পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা (Miss Margaret Noble) দ্বারা পাণ্ডুলিপিটি সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে ওকাকুরা বলিয়াছেন যে, "এশিয়া মহাখণ্ডের কৃষ্টি এক। এশিয়ার সমস্ত স্বাধীন দেশগুলি এই ভূখণ্ডে ইউরোপীয় আধিপত্য বিনষ্ট করিবার জন্য সংগঠিত হইয়াছে—কিন্তু এই বিষয়ে ভারতবাসী নিদ্রামগ্ন। এই জন্য এই ভারতকে স্বাধীন করিয়া এই সংঘের মধ্যে আনিতে হইবে।"

ওকাকুরা ভারতবর্ষে আসিয়া যখন এদেশের সাহিত্যিকগণের সহিত পরিচিত হইতে চাহেন তখন ঠাকুর-বাড়ীর দলে সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রশিষ্য ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র ও তেঘরিয়ার শশিভূষণ রায় চৌধুরীর যাতায়াত ছিল। ইহাদের উপর সাহিত্যিকগণকে আহ্বান

করিয়া আনিবার ভার পড়িল। সভায় যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের সহিত তরুণ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আসিলেন। ওকাকুরা ভারতের পরাধীনতা মোচনে সাহিত্যিকগণের নিশ্চেষ্টতাকে গঞ্জনা করেন। এই সময়ে ভারতে মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্য কয়েক জন বিশিষ্ট লোককে লইয়া এক মণ্ডলী গঠিত হয়। যত দূর জানা যায়, ইহার মধ্যে সুবোধচন্দ্র মল্লিকের খুল্লতাত হেমচন্দ্র মল্লিক, প্রমথ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন।

কিন্তু এই ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত নিবেদিতার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। তিনি বলেন, নিবেদিতা রাজনীতিতে যাইয়া তাঁহার আন্দোলনকে বিপদগ্রস্ত করিবেন। স্বামীজী বলেন, নিবেদিতা কি রাজনীতি করিয়াছে? বিপ্লবোদ্দেশে আমি সমগ্র ভারত ঘুরিয়াছি, আমি কামান প্রস্তুত করিব। এই জন্যই আমি এক দল কর্ম্মী চাই, যাহারা ব্রহ্মচারী হইয়া দেশের লোককে শিক্ষাদান করিয়া এই দেশকে পুনঃসঞ্জীবিত করিতে পারিবেন। এই সম্পর্কে সখারাম দেউস্করের কাছে স্বামীজী বলেন যে, তিনি দেখিয়া যাইবেন ভারত একটি বারুদের স্তূপ হইয়া আছে। তিনি জীবদ্দশায়ই বিপ্লব দেখিয়া যাইবেন বলিয়া আশা রাখিতেন। এই ভারত আর ভুল করিয়া বিদেশীকে ডাকিয়া আনিবে না।

স্বামীজীর মৃত্যুর পর নিবেদিতা রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। তাঁহার বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা বাঙ্গলায় স্বদেশহিতৈষীর ভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকান শিষ্যদের সংস্পর্শে আসিয়া রুশ বৈপ্লবিক নেতা পিটার ক্রপটকিনের সহিত পরিচিত হন। এই সময় তিনি বিভিন্ন স্থানে যে সকল বক্তৃতা করেন তাহার মধ্যে সামাজিক অবস্থার কথাও উল্লেখ থাকে। নিবেদিতার বরোদায় বক্তৃতা উপলক্ষে গমন কালে তথায় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের সহিত পরিচয় হয়। তিনিই অরবিন্দকে কলিকাতার দলের কথা বলেন। অরবিন্দ বিপ্লবী দলের কথা শুনিয়া বারোদা-রাজের দেহরক্ষী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন্দ্রকে সরলা দেবীর নামে এক পত্র দিয়া কলিকাতায় এই বিপ্লবী দলের সহিত সংযোগ সাধনের জন্য প্রেরণ করেন। পরে অরবিন্দ বাংলায় আসিয়া প্রচার করেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষ স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে কেবল ভীরু বাঙ্গালী সুপ্ত আছে। অরবিন্দ কলিকাতা আসার পর পূর্ব্বোক্ত দলটি পূর্ণ বৈপ্লবিক দলরূপে পুনঃ সংগঠিত হয়। এই সংগঠনটি স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হয়।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কলিকাতার ঠাকুর-বাড়ীতে যে গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপিত হয় তাহার সভাপতি হন ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র। সহকারী সভাপতিদ্বয় ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং চিত্তরঞ্জন দাশ (পরে দেশবন্ধু দাশ)। কোষাধ্যক্ষ হন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছাত্রদের পরিচালক ও ব্যায়ামাগারের অধ্যক্ষ হন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে দোল-পূর্ণিমার দিন উক্ত গুপ্ত সমিতি অনুশীলন সমিতি নাম গ্রহণ করে। এই সমিতির ব্যায়ামক্ষেত্র ২১ নং মদন মিত্র লেনে এবং ইহারই সন্নিকটে এক ছোট বাড়ীতে কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। এই সমিতির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়াই ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্র সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলায় বিপ্লবাত্মক কর্ম্মধারাকে সংগঠনের পথে বাস্তব রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। বঙ্কিম বাবুর অনুশীলন প্রবন্ধ হইতেই অনুশীলন সমিতির নামকরণ করা হয়। ঢাকা অনুশীলন সমিতি গঠনের সময় পি, মিত্র এই সমিতির নামকরণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন, "আমি কলিকাতার সমিতির নাম দিয়াছি 'অনুশীলন সমিতি' তোমরা সেই নামই দাও, তবেই বঙ্গদেশময় এক নামে বিরাট শক্তিশালী সমিতি গঠিত হইবে। বঙ্কিম বাবুর অনুশীলন প্রবন্ধ হইতে এই নামটি গ্রহণ করিয়াছি, অনুশীলন শব্দের অর্থ চর্চ্চা। আমরাও চর্চ্চা ও পরীক্ষা দ্বারা যেখানে যাহা ভাল তাহাই গ্রহণ করিব।"

অনুশীলন সমিতির উৎপত্তি বিষয়ে সতীশচন্দ্র বসু এক বিবৃতিতে বলেন, "আমি আগে নারায়ণচন্দ্র বসাকের আখড়ায় (গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট) ব্যায়াম করিতাম। এই স্থান হইতে আমি জেনারাল এসেমব্লী কলেজের জিমনাষ্টিক ক্লাবে ভর্ত্তি হই। গৌরহরি মুখোপাধ্যায় (ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের খুল্লতাত) এই ক্লাবের মাষ্টার ছিলেন। এই সময়ে অধ্যাপক Wann-এর কাছে প্রাথমিক ক্লাসে (First year) পড়ি। ওয়ান উপরোক্ত ব্যায়াম ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। এই ক্লাবের সংযুক্ত "কাশীনাথ লিটেরারী ক্লাব" নামক একটি বিভাগ ছিল। একদা তথায় এক জন সেক্রেটারী সভার বিবরণী লিখিবার জন্য বিলাতি কাগজ আনয়ন করেন; কিন্তু ওয়ান মহোদয় বলিলেন, "India-made কাগজ আন, না-হয় আমি এই ক্লাস বন্ধ ক'রে দেব।" তখন আমার মনে পড়িল, স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এতদ্দ্বারা মনে ধাক্কা লাগিল—আমরা স্বামীজীর স্বদেশী, জিমনাষ্টিক, লাঠিখেলা, বস্তীতে sanitary work প্রভৃতি করার উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছি। ইহার পর আমরা স্বামী সারদানন্দের কাছে যাই। তিনি বলিলেন, "স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন, যে কার্য্য করিতেছ তাহা করিবে, তাহা কখনও ছাড়িবে না।" তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেন: একটা কাক দড়ি দিয়া বাঁধা থাকিলে যেমন মুক্তির জন্য ঝটপট করে, তেমনি তোমরাই বা কেন মুক্তির জন্য জীবন দিবে না? Sister Niveditaর কাছে যাহা বলিয়া গিয়াছি তাহা তোমরা ছাড়িবে না। তিনিই তোমাদের উপদেশ দিবেন। ভগিনী নিবেদিতা বলিলেন, "তোমরা স্বামীজীর উপদেশ জান, বস্তীতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কার্য্য করিবে, লাঠি ও মুগুর খেলা করিবে, শরীরচর্চ্চা করিবে।"

তৎপর, একবার কলিকাতায় সাত দিন বৃষ্টিপাত হয়। কলিকাতায় প্লেগ হইয়া গিয়াছে। আমরা relief work করিবার জন্য ওয়ানের সঙ্গে বাহির হইলাম। তিনি ড্রেন সাফ করিতে আরম্ভ করান। তৎপর বিবেকানন্দ সোসাইটি স্থাপিত হইল। স্বামী সারদানন্দ প্রথম সভাপতি হন। তিনি বলেন, "বিবেকানন্দ সোসাইটি ধর্ম্মচর্চ্চা নিয়াই ব্যস্ত থাকুক, আখড়া আলাদা থাকুক, তুমি (সতীশ) ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রচার কর।" তৎপর ওয়ানের অনুমতিক্রমে স্বামীজীর ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনার নিমিত্ত কলেজের আমতলায় Historical Club বসিতে আরম্ভ হয়, কিন্তু লাঠি খেলার অনুমতি পাওয়া যায় নাই। এই জন্য ইহার পর মদন মিত্রের লেনে একটি ছোট লাঠি খেলার ক্লাব স্থাপন করিলাম।

এই সময়ে আমরা নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের হেড্‌মাষ্টার নরেন্দ্রনাথ

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আখড়ার নামকরণের জন্ত অনুরোধ করি। তাহাতে তিনি "অনুশীলন সমিতি" এই নাম ধার্য্য করেন। এই নামটি বঙ্কিম বাবুর সাহিত্য হইতে গৃহীত হয়। এই সময় ওয়ান বলেন, তোমাদের "ইংরেজ তাড়ান দল" বলিয়া বদনাম উঠিয়াছে।

ইত্যবসরে ভেঘরিয়ার শশী চৌধুরী ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরীর কাছে আমাদের লইয়া যান। শশীদা' বলেন, এই ছোকরারা আমাকে খুব উৎসাহ দেয়, আমার কুলুপ (তাঁহার স্থাপিত টেকনিক্যাল স্কুলে প্রস্তুত) প্রভৃতি বিক্রয় করেন। আমি শশীদা'কে বলি, "আমাদের সভাপতি বা নেতা নেই।" চৌধুরী ক্লাবের কথা শুনিয়া বলিলেন, এই কর্ম্মের উপযুক্ত লোক হইতেছেন ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্র। চৌধুরী মিত্রের নামে পত্র দিয়া তাঁহার কাছে আমাদের পাঠাইয়া দেন। তাঁহাকে সব কথা বলিলে তিনি excited হইয়া আমাকে জাপটাইয়া ধরিলেন ; পরে তিনি ক্লাবের Commander-in-Chief (পরিচালক) হইলেন। সাত দিন বাদে তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বরোদা হইতে একটা দল আসিয়াছে—তোমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী উদ্দেশ্য তাহাদেরও। সর্ব্বপ্রকারের সামরিক শিক্ষা তাহারা দিবে।" তাহাদের সহিত তোমাদের সংযোগ করিতে হইবে। আমরাও রাজী হইলাম। এই সময়ে উভয় দলে মিল হইয়া গেল। তাহার পর যে দল গঠিত হইল তাহার সভাপতি হইলেন প্রমথনাথ মিত্র, সহকারী সভাপতি হইলেন চিত্তরঞ্জন দাশ ও অরবিন্দ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সঙ্গে দলে আসিলেন অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ হালদার (চিত্তরঞ্জনের শ্যালক) ব্যারিষ্টারদ্বয়। সভ্যদের ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করার জন্ত হালদার মহাশয় একটি ছোট ঘোড়া এই সঙ্গে দলকে দান করেন। এই সঙ্গে একটি ব্যায়ামের আখড়া আপার সার্কুলার রোডে স্থাপিত হইল। বরোদা হইতে আগত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, মদন মিত্র লেনের আখড়া পৃথক্ ভাবে থাকুক, আর বয়স্ক সভ্যেরা যতীন বাবুর নেতৃত্বে আপার সার্কুলার রোডের আখড়ায় ব্যায়াম অভ্যাস করুক।

এই সময় অরবিন্দ একবার ছদ্মবেশে মদন মিত্র লেনের আখড়ায় আসিয়াছিলেন। এই কথা আমি মিত্র মহাশয়ের কাছ হইতে শ্রবণ করি। অরবিন্দ আমাকে মেদিনীপুরের জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর কাছে প্রেরণ করেন। সেইখানেই আমি তাঁহার ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে দীক্ষিত করি এবং তথায় আখড়ায় boxing শিক্ষা প্রদান করি।

এই সময়ে যে দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইত তাহাতে "ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন" করার উল্লেখ ছিল বলিয়া আমার মনে হয়। তৎকালের training department-র প্রথম দলের কর্ম্মীদের মধ্যে সব অনুশীলন সমিতির লোক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত, অধ্যাপক নলিনী মিত্র, ইন্দ্র নন্দী (আত্মোন্নতি সমিতির সভ্য), আমি (সতীশ), বারীন, রবীন্দ্র বসু, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর, জ্যোতিষচন্দ্র সমাজপতি (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র) দলে ছিলেন। সখারাম বাবু অনুশীলনের Moral classএ বক্তৃতা দিতেন।

অনুশীলন সমিতির নেতৃবৃন্দ এমন একটি আদর্শ সমাজ কল্পনা করিয়াছিলেন "যেখানে প্রত্যেকটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ ঘটিবে। মানুষের দেহ ও মন লইয়া মানুষ। মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশই মনুষ্যত্ব এবং তাহা অনুশীলন দ্বারাই সম্ভবপর। অনুশীলন-কল্পিত সমাজে প্রত্যেক মানুষ স্বাস্থ্যবান, নীরোগ, হৃষ্টপুষ্ট, কর্ম্মঠ এবং দীর্ঘায়ু হইবে। প্রত্যেক মানুষের স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ হইতে হইলে শৈশব হইতে উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিতে হইবে, স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতে হইবে এবং ব্যায়াম করিতে হইবে। এক জন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ এবং এক জন বাঙ্গালীর মধ্যে দৈহিক পার্থক্যের কারণ—শ্বেতাঙ্গগণ শৈশব হইতে পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করে এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে। এক জন বাঙ্গালী যদি শৈশব হইতে পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করে, স্বাস্থ্যকর স্থানে উত্তম গৃহে বাস করে, তবে শ্বেতাঙ্গ পুরুষের সহিত দৈহিক কোন পার্থক্য থাকিবে না। আমাদের দেশের লোকের দৈহিক অবনতির কারণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, উপযুক্ত বাসগৃহের অভাব, স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকার অভাব এবং সংযমের অভাব।"

অনুশীলনের মতে শুধু শারীরিক বৃত্তির পূর্ণ বিকাশেই মানুষের মনুষ্যত্ব লাভ হয় না, মানসিক বৃত্তিরও পূর্ণ বিকাশ চাই। অনুশীলন-কল্পিত সমাজে "প্রত্যেক নরনারী বিদ্বান, চরিত্রবান, সাহসী ও দয়ালু হইবে। ইহা শিক্ষার উপর নির্ভর করে। অনুশীলন-পরিকল্পিত সমাজে নিরক্ষর ও দরিদ্র লোক থাকিতে পারিবে না, চরিত্রহীন, ভীরু লোক থাকিতে পারিবে না, দুর্নীতিপরায়ণ লোক থাকিতে পারিবে না, স্বাস্থ্যহীন লোক থাকিতে পারিবে না। ঐরূপ সমাজ তৈয়ার করিতে হইলে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করিতে হইবে। বৈষম্যের মধ্যে মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। মানব সমাজ হইতে ধনবৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য, প্রাদেশিক বৈষম্য দূর করিয়া মানুষের মধ্যে সমতা আনিতে হইবে। ইহা একমাত্র জাতীয় গভর্ণমেণ্ট দ্বারাই সম্ভব। পরাধীন অবস্থায় অনুশীলন-কল্পিত সমাজ সম্ভবপর নয়, তাই পরাধীনতার বিরুদ্ধে অনুশীলনের বিদ্রোহ ঘোষণা। অনুশীলন চায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।"

[ক্রমশঃ।

মানুষ-চেনা

"কোন মানুষকে চিনতে হ'লে মানুষটির প্রশ্নগুলি শুনে চিনতে হয়, উত্তর শুনে নয়।"

—ভলটেয়ার

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী যোগ-শাস্ত্রী

(? —১৯০৩)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েকখানি উপন্যাস, প্রহসন বা নাটক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি আজ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তীকে স্মরণ করিতে বসি নাই, বাস্তব-ইতিহাসের সহিত উপন্যাস-কল্পনার সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন বলিয়াও তাঁহার জীবনী লিখিতেছি না,—বাংলা-সাহিত্যের প্রতি যে সুগভীর অনুরাগ তাঁহাকে প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী করিয়াছিল তাহাই স্মরণ করিয়া তাঁহাকে আজ সর্ব্বসাধারণের কাছে পরিচিত করিতে বসিয়াছি। কালের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার উপন্যাস-নাটক টিকে নাই, কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে তিনি টিকিয়া আছেন। তাঁহার জীবনীর উপকরণ যৎসামান্য পাওয়া গিয়াছে; যেটুকু পাইয়াছি সেইটুকুই পাছে হারাইয়া যায় এই ভয়ে অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই ধরিয়া রাখিতেছি।

সাহিত্যানুরাগ

পাঠদ্দশা হইতেই মাতৃভাষায় ক্ষেত্রপালের গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৭৩ সনে যখন তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাসের ছাত্র, তখন হইতেই গ্রন্থকার-রূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন।* সেকালের বহু খ্যাতনামা পত্রিকা—'বান্ধব', 'সহচরী', 'বঙ্গমহিলা' প্রভৃতির পৃষ্ঠায় তাঁহার রচনা গৃহীত হইয়াছে। তিনি প্রতিভাশালী কথা-সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল অধ্যাত্মতত্ত্বদর্শী বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কলিকাতা যোগ সমাজ

১৮৮৬ সনে ক্ষেত্রপাল এক দিন ছায়ামূর্ত্তি দেখেন; ইহার অব্যবহিত পরেই পরিবারে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। ইহা হইতেই পরলোকতত্ত্বের আলোচনায় তাঁহার মন আকৃষ্ট হয়। তিনি যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে হিন্দুধর্ম্ম, দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। The Calcutta Phycho-religious Societyর তিনিই প্রতিষ্ঠাতা; ইহাই কিছু দিন পরে Sri Chaitanya Yoga Sadhan Somaj নামে খ্যাত হয়। মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব এই সমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালীকে বিশেষ অগ্রসর দেখিয়া, ১৮৭২ সনে বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর জন্ বীম্‌স বঙ্গদেশে একটি সাহিত্য-সমাজ স্থাপনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেন; প্রস্তাবিত সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে—"consolidating the language and giving it a certain uniformity, or in short, for creating a literary language." বীম্‌সের এই প্রস্তাব সুধী সমাজে সমাদৃত হইয়াছিল† সত্য, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই। ১৮৮১ সনে ক্ষেত্রপালই প্রস্তাবটি অনুসরণ করিয়া সাময়িক পত্রাদিতে আন্দোলন উপস্থিত করেন। তাঁহার নিজেরই ভাষায়—"In 1881…while in temporary charge of one of the leading vernacular periodicals of the time, contributed a leader in which he discussed the usefulness of forming such an academy as had been advocated by Mr. Beames." তদবধি কৃতকার্য্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার চেষ্টার বিরাম ছিল না।

১৩০০ সালের ৮ই শ্রাবণ (২৩ জুলাই ১৮৯৩) সভাবাজারের মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে ও আশ্রয়ে ক্ষেত্রপাল অভীপ্সিত 'বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার' প্রতিষ্ঠিত করেন। বিনয়কৃষ্ণ ইহার সভাপতি এবং ক্ষেত্রপাল সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

"এক দিকে ইংরাজি সাহিত্যের, এবং অন্য দিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধন, সেই সভার উদ্দেশ্য ছিল।…সভার কার্য্যবিবরণাদি ইংরাজি ভাষাতে লিপিবদ্ধ হইত, এবং দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার নামক মাসিক পত্রিকাখানির অধিকাংশ ইংরাজিতেই লিখিত হইত। একাডেমি অব লিটারেচারের কার্য্যকলাপে এইরূপ ইংরাজিবহুলতা দেখিয়া কতিপয় সভ্য আপত্তি করেন, এবং জাতীয় সাহিত্যানুরাগী কোন কোন ব্যক্তি প্রতিবাদও করিতে থাকেন। একাডেমি অব লিটারেচার এই নাম সম্বন্ধেও অনেক আপত্তি-সূচক কথা উপস্থিত হয়। এই হেতু শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম. এ., সি. এস. মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে একাডেমি অব লিটারেচারের প্রতিশব্দস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নাম পরিগৃহীত হয়। তন্নিমিত্ত সভার পত্রিকাখানি দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এই উভয় আখ্যায় আখ্যাত হইয়া বাহির হইতে থাকে। ফল কথা, ইংরেজি-বহুলতার নিমিত্ত আপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায়, এবং দেশীয় ভাবে দেশীয় সাহিত্যালোচনার আবশ্যকতা ক্রমশঃ বুঝিতে পারায়, বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচারকে পুনর্গঠিত করিয়া নূতন ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে অনেকে ইচ্ছুক হইয়া উঠেন।…সভ্যগণ পূর্ব্বোক্ত স্থানে ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ [২৯ এপ্রিল ১৮৯৪] রবিবার অপরাহ্নে পূর্ব্বোল্লিখিত বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার, বর্ত্তমান ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ নামে অভিহিত করেন।"*

পুনর্গঠিত পরিষদের সহিত ক্ষেত্রপালের কোন যোগসূত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার কারণ বোধ হয় জাতীয়-সাহিত্যানুরাগীদের সহিত তাঁহার মতভেদ।†

---

* "He began efforts as an author when he was only in the First Year Class of the Calcutta Presidency College. Commencing in 1873 he wrote a serier of interesting novels in the Vernacular, which earned for him the reputation of being 'one of the best writers of the day'."—Preface : *Lectures on Hindu Religion*…

† "বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ" : 'বঙ্গদর্শন', আষাঢ় ১২৭৯ দ্রষ্টব্য।

* পরিষদের ১ম বার্ষিক বিবরণী।

† এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর পত্রের উত্তরে তাঁহার বিবৃতি দ্রষ্টব্য (*The Bengal Academy of Literature*, February 1894, pp. 5-6)

যত দিন বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার বিদ্যমান ছিল, ক্ষেত্রপাল অতীব যোগ্যতার সহিত তাহার সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তিনি শুধু সভার সম্পাদকই ছিলেন না, সহকারী সভাপতি—লিওটার্ড ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পরামর্শ অনুসারে সভার মুখপত্রখানিও সম্পাদন করিতেন। The Bengal Academy of Literature পত্রের ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—আগষ্ট ১৮৯৩; ৮ম সংখ্যা (১৭ মার্চ্চ ১৮৯৪) হইতে ১১শ বা শেষ সংখ্যা (১ জুন ১৮৯৪) পর্য্যন্ত ইহা 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ। The Bengal Academy of Literature' এই নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে মুদ্রিত ক্ষেত্রপালের ইংরেজী-বাংলা রচনার মধ্যে এই দুইটি উল্লেখযোগ্য :—

Dramas among the Bengalis…৩য়, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা (সমালোচনা)…১১শ সংখ্যা।

শেষোক্ত প্রবন্ধে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লেখেন :—

"পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ১২৯৯ সালের 'অনুসন্ধান' নামক পাক্ষিক পত্রে "বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা" নামক একটি প্রবন্ধ খণ্ডশ করিয়া প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটি তিনি "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের" সম্পাদককে সমালোচনার জন্য প্রদান করেন। তাঁহারই ইচ্ছামত এই প্রবন্ধটি আমি সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

রচনায় অরাজকতাঃ বিদ্যানিধি মহাশয় প্রথমেই লিখিয়াছেন "আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় অরাজকতা প্রবেশ করিয়াছে," এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ কহিয়াছেন, "আজকাল অধিকাংশ লেখক ব্যাকরণ ত অগ্রাহ্য করেন," অভিধানও তাঁহাদিগের নিকট উপেক্ষিত। সুতরাং সাহিত্যে তাঁহাদের বাহ্যভাবে আস্থা থাকিলেও, কার্য্যতঃ সাহিত্য তাঁহাদের নিকট অনাদৃত হইতেছে। বিশুদ্ধ রীতিসঙ্গত রচনার বিরহে সাহিত্য বিকলাঙ্গ হইয়া যায়।

পূর্ব্বোক্তরূপ শ্রেণীর লেখক সাহিত্য-সমাজে যে কখনই সম্মানিত হইবেন এরূপ আশা করি না; অতএব তাঁহাদিগের উল্লেখ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা দেখি না। তবে যদৃচ্ছা-চারিতা-দোষ কিয়ৎ পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষাকে দূষিত করিয়াছে, যথা ইংরাজীমত বাঙ্গালা ভাষার গঠনপ্রণালী অনেক স্থলে দেখা যায়, এবং গ্রাম্য ও সংস্কৃত শব্দের সকলের এক স্থলে প্রয়োগে ভাষার সৌন্দর্য্য একবারে বিনষ্ট হয়, দৃষ্টান্ত যথা—শৈবলিনী "আগুল্ফ-লম্বিত কেশরাশি চিরুণী দিয়ে আঁচ্‌ড়াচ্ছেন।"

বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থাঃ বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রভৃতির বাঙ্গালার আদি রচনাসকল, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল ও কাশীদাসের মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থসকল বাঙ্গালা ভাষার উষাকাল প্রকাশ করে। অতি শৈশব অবস্থায় কোন ব্যক্তির বাল্য বা যৌবনের কান্তি যেরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না, কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে কোন ভাষার গঠনপ্রণালী স্থিরীকৃত হয় না। বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত গঠনপ্রণালী স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মহাশয়গণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্র অস্বাস্থ্যকর পতিতভূমি ছিল, ক্রমশঃ কয়েক জন জ্ঞানবান সুদূরদর্শী ব্যক্তির যত্নে ও পরিশ্রমে উহা এইক্ষণে হৃদয়তোষিণী শস্য-সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। পতিতভূমি হল-সংমিলনে যে প্রচুর পরিমাণে ফলবতী হইবে তাহা প্রকৃতি-সিদ্ধ, এবং উহাতে যে প্রচুর পরিমাণে অপ্রয়োজনীয় কণ্টকীবৃক্ষ জন্মিবে তাহাও অনিবার্য্য। প্রয়োজনীয় বিষয়সকলের সংবর্দ্ধন ও অপ্রয়োজনীয় এবং অমঙ্গলকর বিষয়ের নিষ্কাশন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে কিয়ৎ পরিমাণে

ভাষার একরূপকতা সংস্থাপন করা আবশ্যক। প্রাচীন পণ্ডিতেরা রসভেদে বর্ণ, সমাস, সন্ধি প্রভৃতির প্রয়োগের আদেশ ও নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতে বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন সময়ের সংস্কৃত লেখকগণের ভাষার একরূপকতা সংরক্ষিত হইয়াছে। এই একরূপকতা সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষ ও বিশেষ সম্মানের অন্যতম কারণ। তাঁহারা যে সকল সুনিয়ম সংস্থাপন এবং পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ সেই সকল অনুকরণ করিয়া ভাষার একরূপকতা সংরক্ষণ করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় সেই সকল নিয়মের উপযোগিতা লক্ষিত হয়।

ভাষার উৎকর্ষঃ বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ বিদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবার নহে, ব্যক্তিগত যত্নে সংসাধিত হওয়া দুরূহ। দেশীয় অধিকাংশ সমালোচকগণ পক্ষপাতশূন্য নহেন, এরূপ অবস্থায় "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের" ন্যায় কয়েকটি সাহিত্য সভা সমিতি কর্ত্তৃক উক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। সকল ভাষার স্ব২ গঠনপ্রণালী আছে, একের গঠনপ্রণালী অপরে সন্নিবেশ করিলে দেশীয় মূর্ত্তি সংরক্ষিত হয় না। যাহাতে যদৃচ্ছাচারিতা-দোষসকল দূর হয় এবং একরূপকতার সংস্থাপন হয় তাহা বিবেচনা করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

অপর দোষসকলঃ পূর্ব্বোক্ত দোষ সকল ভিন্ন অপর কতকগুলি দোষ সর্ব্বদা বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে। স্থানীয় সমাজিকতা, স্থানীয় ভূগোল, স্থানীয় ইতিহাসের অনভিজ্ঞতাই উক্ত দোষসকলের কারণ। বাঙ্গালা সমাজিকতা রাজপুতনায় প্রয়োগ, হুগলী নগরীতে উজ্জয়িনী ভ্রম, বিন্ধ্যাচলের প্রাকৃতিক মূর্ত্তি হিমালয়ে অর্পণ, ইংরাজ স্বাধীনতা, পরাধীন বাঙ্গালীর সংসারে সংঘটন প্রভৃতি দোষসকল সচরাচর লক্ষিত হইতেছে।

বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন "বাঙ্গালা ভাষা কোন কোন বিষয়ে সংস্কৃতের অনুসারিণী, কোন কোন বিষয়ে ইংরাজীর অনুগতা, কিন্তু সর্ব্বাংশে সংস্কৃত বা ইংরাজীর কখন অনুযায়িনী নয়। বাঙ্গালা অনেকাংশ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাষা।"

বাঙ্গালা ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন হওয়া উচিত, কিন্তু ইহা বলিয়া আমরা উহাকে ইংরাজীর অনুগতা হইতে উপদেশ দি না। ভাষার গঠনপ্রণালী উহার বাহ্য সৌন্দর্য্য, সত্যপ্রকাশ উহার আভ্যন্তরিক শোভা ও সম্পত্তি। এই আভ্যন্তরিক সম্পত্তির জন্য আমরা উহাকে বহু স্থানে ভ্রমণ ও বহু জাতির আচার-ব্যবহার দর্শন করিবার জন্য স্বাধীনতা দিতে পারি; কিন্তু উহাকে বিদেশীয় পরিচ্ছদে বা বিদেশী হাবভাবে সুন্দরী দেখিতে চাহি না।

আমরা এ স্থলে ব্যক্তিগত ভাষার উল্লেখ করিতে চাহি না। লোকসকল সর্ব্বদা বিভিন্ন রুচি সম্পন্ন, সুতরাং রুচিভেদে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাষা তাঁহার নিজেরই থাকিবে। তবে বঙ্গভাষার একরূপকতা সাধনের জন্ম দুই চারিটি সাধারণ নিয়মের এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক।

১। ভাষার সরলতা: রচনা সর্ব্বদা সরল ও প্রাঞ্জল হওয়া উচিত। কঠিন ভাষা ও দীর্ঘ রচনা কাহারও প্রীতিকর নহে।

২। রচনা বিশেষে ভাবের গভীরতা: ভাবের গাম্ভীর্য্য প্রার্থনীয়; কিন্তু গাম্ভীর্য্য প্রার্থনীয় হইলেও অস্পষ্টতা প্রার্থনীয় নহে। কোন রচনায় ভাব অস্পষ্ট থাকিলে লেখকের বিজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া উহা বিপরীত প্রতিপাদন করে। পূর্ব্বের লেখকগণ ভাবের অস্পষ্টতা ও দীর্ঘ সমাস ও সন্ধি সমাচ্ছাদিত রচনাসকলকে অলঙ্কারস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। এখন সে রুচির এককালে পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

৩। নূতনত্ব: সামান্য বিষয় লইয়া নূতন ভাবের আবির্ভাব করা সুকল্পনার অধিকৃত। উহা সাধারণে প্রাপ্য নহে এবং উহাই লেখককে সাহিত্যে উচ্চ স্থান প্রদান করে।

৪। রচনার উপকারিতা: যে রচনা সুচিন্তা বা সুকল্পনা প্রসূত নহে অর্থাৎ যাহাতে লেখক ও পাঠক উভয়েরই বিশেষ উপকার দৃষ্ট না হয়, সেইরূপ রচনা নিষ্ফল। উহা জলবিম্ব সদৃশ একবার দেখা দিয়া সময়-স্রোতে বিলীন হয়।

বিদ্যানিধি মহাশয় বর্ত্তমান রচনার ব্যাকরণগত অশুদ্ধি লইয়া বিস্তর বিচার করিয়াছেন, সে সমরক্ষেত্রে অসি ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া আমরা উপস্থিত হইতে প্রস্তুত নহি। যাহা হউক বিদ্যানিধি মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার উপস্থিত অবস্থা সমালোচনা করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে সুচিন্তা ও বিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। সময়ে সময়ে এরূপ আলোচনা না হইলে দুষ্ট বেগগামী অশুদ্ধ ভাষা-স্রোত ভাষার একরূপকতার ধ্বংস করে।"

গ্রন্থাবলী

ক্ষেত্রপালের রচিত গ্রন্থগুলির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। আমরা সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি; বন্ধনী-মধ্যে সাল-তারিখভুক্ত যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে তাহা বঙ্গীয় সরকারের বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **চন্দ্রনাথ** (উপন্যাস)। আশ্বিন ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)। পৃ: ১৮৮।

"আমাদিগের দেশে ধনের কিরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে তাহা দর্শান চন্দ্রনাথের মুখ্য উদ্দেশ্য। অযথা ধন প্রয়োগের দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহাতে কয়েকটি বিষয় সমাজোপযোগী ঘটনা-প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে।"

উপন্যাসখানি পরে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া সেকালের গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

২। **হীরক অঙ্গুরীয়ক** (প্রহসন)। সম্বৎ ১১৩১ (১৮ জানুয়ারি ১৮৭৫)। পৃ: ৩২।

৩। **হেমচন্দ্র** (বিয়োগান্ত নাটক)। সম্বৎ ১১৩২-৩৩ (১০ অক্টোবর ১৮৭৬)। পৃ: ৫১।

৪। **মুরল**[১] (উপন্যাস)। ? (১১ জুন ১৮৮০)। পৃ: ১৪+১ শুদ্ধিপত্র।

"এই উপন্যাসের প্রথম চারি পরিচ্ছেদ পূর্ব্বে বঙ্গমহিলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন স্ত্রী-শিক্ষামাত্রই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত পত্রিকার প্রচার রহিত হইলে, সাধারণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য সত্য, প্রেম (স্নেহ ভক্তি ও প্রণয়), দয়া ও ক্ষমা এই চারিটি বিষয় অবলম্বন করিয়া সামাজিক ঘটনাকারে বর্ণিত হইল।"

৫। **মধুযামিনী ও কৃষ্ণা বা কলিকাতা শতাব্দী পূর্ব্বে** (উপন্যাস)। ১২৯২ সাল (২৩ জানুয়ারি ১৮৮৬)। পৃ: ১৫।

ক্ষেত্রপাল ইংরেজী ভাষাতেও বিলক্ষণ বুৎপন্ন ছিলেন। সেকালের বহু ইংরেজী সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার রচনার সন্ধান মেলে। আমরা তাঁহার এই কয়খানি ইংরেজী গ্রন্থ দেখিয়াছি:—

1. *Lectures on Hindu Religion, Philosophy and Yoga*. 1893. pp. 158.

ইহাতে এই আটটি বক্তৃতা আছে:—1. Spirit Worship of Ancient India; 2. Patanjal Yoga Philosophy; 3. Early Tantras of the Hindus; The Religious Aspects of the Tantras. The Medical Aspects of the Tantras; 4. Some Thoughts on the Gita; 5. Raj Yoga; 6. Chandi; 7. Tatwas: what they may be. এই বক্তৃতাগুলি ১৮৯১ ও ১৮৯৩ সনের মধ্যে যোগ সমাজের অধিবেশনে পঠিত ও 'ষ্টেট্সম্যান', 'ইণ্ডিয়ান মিরার', 'ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়ন', 'থিয়সফিষ্ট' প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। হিন্দুদর্শন, মনোবিজ্ঞান ও যোগশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের ফলে—রচনা-মাধুর্য্যেও বটে, নীরস বিষয়ও তাঁহার লেখনীতে সরস ও মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থপ্রকাশক—বাগবাজার হরি-সভার সহ-সম্পাদক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় স্বীয় বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকারের কৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন।

2. *Sarala* and *Hingana* (Tales descriptive of Indian Life). 1895. pp. 126.

3. *Life of Sri Chaitanya*. 1897. pp. 12.

১৮৯৭, ১৭ই মার্চ্চ তারিখে শ্রীচৈতন্য যোগ সমাজের ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা; অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত।

মৃত্যু

১৯০৩ সনের ফেব্রুয়ারি (মাঘ ১৩০৯) মাসে ক্ষেত্রপালের মৃত্যু হয়। পরিষদের আদি প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান হিসাবে পরিষৎ-মন্দিরে তাঁহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভক্ত কবীর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস (শান্তিনিকেতন)

ভক্ত কবীর ছিলেন সিদ্ধ সাধক। তাঁর সাধনা প্রেমভক্তির সাধনা। এ সাধনা বীরের সাধনা, বড় কঠিন। সাধনার পথ নির্দেশ করেন গুরু। কিন্তু পথ চলার দায় শিষ্যের। পথের সব বাধা-বিঘ্ন তাকেই অতিক্রম করতে হয়। সব দুঃখ-কষ্ট তাকেই সইতে হয়। প্রেমের ক্ষেত্রে গুরু যেন দূতী, তিনি যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন। তার পরে যে প্রেমলীলা চলে সেখানে শুধু প্রণয়ী আর প্রণয়িনী, সেখানে আর কারুর স্থান নেই। এই জন্যই বুঝি কবীরদাস বলেছেন—ওরে, আমার নিজের প্রিয়ের কথা কার কাছ থেকে বুঝব? আমার প্রাণের প্রাণ আমার প্রিয় ছাড়া আর সবই যে মুসাফির। প্রিয়ের কথা প্রণয়িনীই জানে। অন্যে তার কি জানবে। কবীরদাসের প্রেমসাধনার এটি একটি সঙ্কেত। এতে করে সাধনা যে নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এই ভাবটার উপর যেন জোর দেওয়া হ'ল। অবশ্যি, কথাটা নতুন নয়। আমাদের দেশে অধ্যাত্ম সাধনা চিরকালই ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রেম রহস্যময়। সাধারণ মানব-মানবীর প্রেমের মধ্যেই এই রহস্যময়তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের অন্ত পায় না। প্রেম তাদের মধ্যে নব নব রূপ আবিষ্কার করে। তাই প্রেম চির অজানা। তার সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট কথা কেউ বলতে পারে না। তাই যদি হয় তাহ'লে সকল প্রেমের উৎস যিনি সেই অনন্ত প্রেমময়ের কথা কে বলতে পারে! তিনি যে নিতুই নব। নব নব রূপে আসছেন প্রেমিকার কাছে। যে তাঁকে যেমন করে চাইছে তিনি তার কাছে তেমনি ভাবেই দেখা দিচ্ছেন। কাজেই, তাঁর কথা অন্যের কাছ থেকে জানবার নয়। তাঁর কাছে যাবার পথ প্রত্যেকের নিজের পথ। সদ্‌গুরু শুধু দিক নির্দেশ করে দেন। বাকীটা প্রত্যেকের নিজের উপর।

এই জন্যই কবীরদাস বললেন—প্রভুর গতিবিধি অগম্য। তুই চল্ নিজের অনুমান মত। ধীরে ধীরে পা ফেলে ফেলে চল্। পরিণামে পৌঁছে যাবি।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি চমৎকার কথা মনে পড়ে যায়—

"বৃথা আমি কী সন্ধানে যাব কাহার দ্বার
পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।"

আধুনিক যুগের কবির সঙ্গে মধ্যযুগের সন্তের আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়।

প্রেমের কোনো বাঁধা-ধরা পথ নেই। সে আপনার পথের সন্ধান আপনি দেয়। সেই পথে চলে প্রেমিকা। চলতে চলতে সে পায়; পেতে পেতে চলে। ক্ষণে পায়, ক্ষণে হারায়। পায় যখন আনন্দে আত্মহারা হয়। হারায় যখন যাতনায় ছটফট করে। এমনি চলে প্রেমের লীলা। প্রেমিকা প্রিয়তমকে পেয়েও পায় না। বুঝেও বোঝে না তাঁর রহস্য। তাই পেয়েও হারায়; বিরহ-বেদনায় কাতর হয়। কিন্তু একবার যদি রহস্য বোঝে তাহ'লে প্রিয়ের সন্ধানে আর এখানে-ওখানে ছুটাছুটি করে বেড়ায় না। তখন আপন অন্তরের মধ্যেই তাঁকে দেখতে পায়। তাই বিরহিণীকে ডাক দিয়ে কবীরদাস বললেন, ওগো সুন্দরী, আপন পুরুষের বিষয় যদি বুঝতে পার তাহ'লে দেখতে পাবে তিনি তোমার দেহেই নৃত্য করছেন।

দুই নইলে প্রেম হয় না। কিন্তু এমন এক সময় আসে যখন দুই এক হয়ে যায়, ভেদ যায় লোপ হয়ে। শ্রীরাধা সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবি বলেছেন—

"মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেল মাধাই।"

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে কখনো কখনো "মুঞি সেঞি মুঞি সেঞি কহি কহি হাসে।"

প্রেমের এ চরম অবস্থা। তখন দুইয়ে মিলে এক হয়ে যায়। কবীরদাস বললেন—"দুই গিয়ে এক হয়েছে, লহরী প্রবেশ করেছে সমুদ্রে।" অন্যত্র বললেন, কবীর বলছে আর দ্বিতীয় কেউ নেই, যুগে যুগে তুমি আমি এক।

প্রেমের এই যে চরম অবস্থা, এই যে দুইয়ে মিলে এক হয়ে যাওয়া এর অর্থ কি? এর অর্থ কি ভগবদ্‌-সত্তার মধ্যে ভক্ত-সত্তার লোপ পেয়ে যাওয়া? এ বিষয়ে সাধকেরাও সকলে একমত নন। এক দল বলেন, প্রেমের চরম অবস্থায় ভগবানের সঙ্গে মিলন যখন পরিপূর্ণ হয়, তখন ভক্তের স্বতন্ত্র সত্তা আর থাকে না। অন্যেরা তা মানেন না। তাঁরা বলেন, ভক্ত কখনো ভগবানের মধ্যে নিজেকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিতে চায় না। পরিপূর্ণ মিলনের অবস্থায়ও সে তার পৃথক্ সত্তা রাখতে চায় ঐ মিলনেরই আনন্দ উপভোগের জন্য। সে এক হয়ে যাবে অথচ পৃথক্ থাকবে। কবীরদাসেরও এই মত ছিল মনে হয়। তিনি মনে করতেন, ভক্ত ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাবে তবু থাকবে তার পৃথক্ সত্তা। সে মিলনের আনন্দ উপভোগ করবে। এক হয়ে যাবে আবার পৃথক্ সত্তাও থাকবে এ কি রকম ক'রে হবে। কবীরদাস বলেন, লৌকিক দৃষ্টিতে যা অসম্ভব ভগবানের বেলা তা সবই সম্ভব।

অনেকে কিন্তু কবীরদাসের 'যুগে যুগে তুমি আমি এক', এই জাতীয় বাণীর উল্লিখিত ব্যাখ্যা মানেন না। তাঁদের মতে কবীরদাসের এই জাতীয় বাণী স্পষ্টই অদ্বৈত ভাবসূচক। আর এ রকম অদ্বৈত ভাবের কথা কবীরদাসের পদে অনেকই পাওয়া যায়। এর থেকে তাঁরা মনে করেন কবীরদাস ছিলেন আসলে অদ্বৈতবাদী। কিন্তু এঁদের এই মত যথেষ্ট যুক্তির দ্বারা সমর্থিত মনে হয় না। কেন না, 'কবীরদাসের রচনায় শুধু অদ্বৈতবাদ নয়, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, একেশ্বরবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন পদ পাওয়া যায়।' কাজেই, কবীরদাস বিশেষ কোনো একটা মতবাদের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন বলা যায় না।

আসল কথা, কবীরদাস ছিলেন ভক্ত মানুষ। ভক্তের কাছে ভক্তিই মুখ্য, কোন মতবাদ নয়। তাই, ভক্ত কোনো বিশেষ মতবাদের মধ্যে আটকা পড়েন না বা বিশেষ কোনো মতবাদের প্রতি তাঁর কোনো বিরুদ্ধ-ভাবও নেই। তার কারণ, ভক্তের ভগবান অনন্ত ভাবময় আর ভাবৈকগম্য। কাজেই, অনন্ত ভাবে মানুষ তাঁর ভজনা করতে পারে। আর সেই জন্য, ভগবদ্‌বিষয়ে অসংখ্য মতবাদ প্রচলিত হ'তে পারে। ভক্ত জানেন যে, যে ভাবেই ভগবানকে পেতে চায় ভগবান সেই ভাবেই তার কাছে ধরা দেন। কাজেই, ভক্তের কাছে সব মতই মত, সব পথই পথ।

এ বিষয়ে কবীরদাসের বাণী সুস্পষ্ট। হিন্দু-মুসলমান এই দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা ধর্মমতের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'হিন্দু-তুরুক আমি আলাদা মনে করি না। সব মতেরই স্বাদ মিঠা।'

তাই কবীরদাস কোনো মতেরই পক্ষ নিতেন না। তাঁর অভিমত ছিল, ভক্ত মানুষ ভগবানের ভজনা করবে, তার কাছে

ভক্তি হ'ল মুখ্য। মতবাদ নিয়ে মাথা ঘামান তার পক্ষে নিছক বোকামি। অথচ দেখা যায়, সাধু-সন্তরাও পক্ষাপক্ষ গ্রহণ করেন। তাই কবীরদাস বললেন, 'পক্ষাপক্ষ গ্রহণ করে' সারা জগৎ ভুলে রয়েছে। যে কোনো পক্ষ না নিয়ে শ্রীহরির ভজনা করে সেই সন্তই বুদ্ধিমান।

কবীরদাস যেমন কোনো মতবাদে আটকা পড়েননি, কোনো মতবাদের পক্ষ নেননি, তেমনি নিজেও কোনো মতবাদ প্রচার করেননি। কবীরদাস ত শাস্ত্রবিদ্ ছিলেন না যে মতবাদ স্থাপিত করবেন। তিনি ছিলেন তত্ত্ববিদ্, সিদ্ধ ভক্ত। ছিলেন ভগবদ্-প্রেমে পাগল মানুষ। মতবাদ স্থাপন ত দূরের কথা, কোনো বিচার-বিতর্কেরও তিনি ধার ধারতেন না। নিজেই বলেছেন, "লেখাপড়া শিখিনি। বিচার-বিতর্ক জানি নে। হরিগুণ কীর্ত্তন ক'রে আর হরিগুণ কীর্ত্তন শুনে শুনে পাগল হয়েছি।" অবশ্যি, পরবর্ত্তী কালে কবীরদাসের ভক্তরা তাঁর নামে মতবাদ প্রচার করেছেন, পন্থগঠন করেছেন; কিন্তু সে আলোচনা এখানে নয়।

ভক্তরা ভগবান সম্বন্ধে নানা ভাবের কথা বলেন। তার কারণ হ'ল ভগবানের অনন্ত ভাবময়ত্ব। আর এ সব কথা অনেক সময়ই পরস্পরবিরোধী হয়। এ রকম হওয়াটা কিন্তু আশ্চর্য্যও নয়। যিনি একাধারে নির্গুণ এবং সকল গুণের আকর, নিরুপাধিক ও সোপাধিক, তাঁর সম্বন্ধে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী কথা বলাটাই বরং স্বাভাবিক। কবীরদাসের পদে যে নানা পরস্পরবিরোধী মত দেখা যায়, তারও এই হেতু। কবীরদাসের রাম নির্গুণ, ত্রিগুণাতীত, নিরুপাধিক, সোপাধিক, অনন্তভাবময়। কাজেই, তাঁর কথা বলতে গিয়ে কবীরদাসকে এমন সব কথা বলতে হয়েছে আপাতদৃষ্টিতে যা পরস্পরবিরোধী মনে হয়। তবে কবীরদাসের পদ আলোচনা করলে একটা কথা মনে হয় যে, তাঁর উপর বেদান্তের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। বেদান্ত বলতে সাধারণতঃ লোকে অদ্বৈতবাদই বোঝে। আমরাও সেই অর্থে বেদান্ত কথাটা ব্যবহার করেছি। শাস্ত্রানুসারে কিন্তু অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ বা তার বিভিন্ন প্রকার-ভেদ সবই বেদান্ত; ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা থেকেই এ সব বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। অদ্বৈতবাদী বেদান্তীদের মতে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ, নিরাকার, নিরুপাধিক, নির্বিশেষ, নিষ্কল, নিঃসীম। তবে অবিদ্যা বা মায়া বা ভ্রান্তির জন্ত তাতে উপাধির আরোপ করা হয়। সোপাধিক ব্রহ্ম অবিদ্যার সৃষ্টি।

কবীরদাসের রাম বেদান্তের ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নন; আবার ভিন্নও বটেন। কেন না, কবীরদাসের রাম নির্গুণ, নিরুপাধিক, কিন্তু কবীরদাস নির্গুণ নিরুপাধিক ইত্যাদি' বলতে গুণ উপাধি ইত্যাদির অভাব বুঝতেন না, এইগুলির অতীত অবস্থা বুঝতেন। অর্থাৎ তাঁর নির্গুণ রাম গুণহীন নন, গুণকে অতিক্রম করে রয়েছেন। তিনি অরূপ কিন্তু এই সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই রূপ। রূপের মধ্যেই চলেছে তার লীলা। জগতের সব বৈচিত্র্য এই অরূপেরই লীলার প্রকাশ, এই অরূপই কবীরদাসের রাম। সীমাকে পূর্ণ করেই রয়েছেন অসীম। সীমা চঞ্চল, অস্থির, অবিরাম গতিশীল। অসীম অচঞ্চল, স্থির, ধ্রুব। এই অসীমই কবীরদাসের রাম। তিনি সর্বব্যাপী। স্রষ্টা তিনি পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন আপন সৃষ্টি। কবীরদাস বলছেন, সত্য সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি তিনি এই সমস্ত জগতের মধ্যেই আছেন। এই চর্মচক্ষু দিয়েই চেয়ে দেখ তিনি যেখানে-সেখানে (সর্বত্র) আছেন। বলছেন, সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম বিরাজমান। তিনি অন্তরে-বাইরে সর্বত্র। কবীরদাস বলছেন—তিনি শরীরে মনে নয়নে রয়েছেন। এমনি কবীরদাসের রাম। ইনি নির্গুণও বটেন সগুণও বটেন। আবার নির্গুণও নন সগুণও নন। আসলে ইনি নির্গুণ সগুণ উভয়ের অতীত। কবীরদাস স্পষ্টই বলেছেন—সগুণ এবং নির্গুণ এই উভয়ের অতীত যে, আমি করব তারই ধ্যান।

কাজেই এক দিক দিয়ে বেদান্তের ব্রহ্মের সঙ্গে কবীরদাসের রামের যথেষ্ট মিল আছে বলা যায়। এটা কেমন করে সম্ভবপর হ'ল। কবীরদাস বেদান্ত পড়েননি নিশ্চয়ই। কারণ, তিনি নিজেই বহু স্থলে বলেছেন যে, তিনি লেখাপড়া জানেন না। তবে কাশীতে বহু বেদান্তী সাধু-সন্ন্যাসী ঐ সময়ে ছিলেন। কবীরদাস তাঁদের সঙ্গ করেছিলেন অনুমান করা যায়। কবীরদাসের মানসে তাঁদের প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু তার চেয়েও মনে হয়, একমাত্র পরমাত্মার সাধক যোগপন্থীদের প্রভাবাধীন পরিবেশের মধ্যে মানুষ হওয়ায় কবীরদাসের মানস এমনি ভাবে গঠিত হয়েছিল যে, তাতে ভগবদ্-সত্তার যে উপলব্ধি হয়েছে তার সঙ্গে বেদান্তের ব্রহ্মের সাদৃশ্য দেখা যায়। আর এই মানস গঠনে বেদান্তী সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রভাবও থাকতে পারে তা আগেই বলেছি। অথবা, ভগবদ্-সত্তা কেন যে কবীরদাসের কাছে কবীরদাসের রামরূপে ধরা দিলেন তা তিনিই জানেন। হয়ত এ জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফল।

আর একটা বিষয়ে কবীরদাসের উপর বেদান্তের বিশেষ প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কবীরদাস বার বার মায়ার কথা বলেছেন। এই মায়া আর বেদান্তের মায়া একই। ডাঃ দ্বিবেদীজী বলেন, "কবীর মায়া সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন সবই বেদান্ত নির্দ্ধারিত অর্থে।"

বেদান্ত মতে (অদ্বৈত দ্বৈত উভয় মতেই) মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি। অদ্বৈত মতে মায়া জীব বা জীবভূত ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান আচ্ছন্ন করে রাখে। ফলে, জীব ব্রহ্মে ভেদবুদ্ধি দেখা দেয়। জীব-তথা সৃষ্টি ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র এই বুদ্ধি তারই নাম মায়া। অদ্বৈতবাদীদের মতে একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। তবু যে অন্ত কিছুর অস্তিত্ববুদ্ধি হয় তা ঐ মায়ার জন্তই হয়। কেন হয়? এর উত্তর তিনি এরূপ ইচ্ছা করেন তাই হয়। নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম আপন মায়াশক্তি বা প্রকৃতিকে অবলম্বন করে সগুণ সোপাধিক হয়ে উঠেন। কেন হন, তার কারণ আর কিছুই নয় তিনি ঐরূপ ইচ্ছা করেন তাই হন।

দ্বৈতবাদীরা জীব এবং ব্রহ্মের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁদের মতে ব্রহ্মও নিত্য, জীবও নিত্য, ব্রহ্মেরই সনাতন অংশস্বরূপ জীব। শ্রীভগবান বলেছেন—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" জীবলোকে আমারই সনাতন অংশ জীবভূত হয়েছে। কাজেই, জীবও শুদ্ধমুক্তস্বভাববান। ব্রহ্মের প্রতি তার আকর্ষণ স্বাভাবিক। কিন্তু দেহধারণ করা মাত্র মায়াচ্ছন্ন হয়ে সে এ কথা ভুলে যায়। সে অনিত্য সংসার, অনিত্য দেহ আর তাকে অবলম্বন ক'রে যত নশ্বর ভোগ-সুখ তাই নিয়ে মত্ত হয়ে থাকে। ভগবানের কথা তার আর মনে থাকে না।

এই যে মায়া, এ ব্রহ্মেরই শক্তি এ কথা আগেই বলা হয়েছে। সাংখ্য একেই বলেন প্রকৃতি। মায়া বা প্রকৃতি গুণময়ী বা ত্রিগুণাত্মিকা। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে এই মায়া বা প্রকৃতি ব্রহ্ম থেকে স্বতন্ত্র নয়। এ ব্রহ্মেরই নামরূপাত্মক স্বরূপ। ব্রহ্ম আপন সত্ত্বগুণপ্রধান মায়াকে অবলম্বন করে ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হন। মায়োপাধিক ব্রহ্মই ঈশ্বর। ইনি সংসারের কর্ত্তা। বেদান্তের গ্রন্থে মায়াকে অবিদ্যাও বলা হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞান বিদ্যা, তদেতর অবিদ্যা, আবার কোনো গ্রন্থে কথা দু'টির মধ্যে পার্থক্যও করা হয়েছে। বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান প্রকৃতিকে বলা হয়েছে মায়া আর অবিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিকে বলা হয়েছে অবিদ্যা। তবে সাধারণতঃ মায়া আর অবিদ্যা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কবীরদাসও মায়া আর অবিদ্যাতে কোনো ভেদ করেননি।

কবীরদাস বহু পদে এই মায়ার কথা বলেছেন। তার কোনো কোনোটি রয়েছে সন্ধাভাষায়, কোনো কোনোটি রয়েছে রূপকের আকারে আর বাকীগুলি আছে সহজ ভাষায়। সাংখ্যকারের মত কবীরদাস বললেন, "বিচার ক'রে দেখ, একই পুরুষ রয়েছেন আর নারীও রয়েছেন একই।" এই নারী মায়া। তাই বললেন—একই নারী জগৎ জুড়ে জাল পেতেছে। খোঁজ করে কেউ তার অন্ত পায় না। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও নয়। ঘটের ভিতর লাগিয়েছে নাগ-ফাঁস, ঠকিয়ে খাচ্ছে সারা জগৎ। এর অন্ত যেমন নেই, তেমনি এর আদিও নেই। বললেন—"এ চিরকুমারী, কেউ এর জন্ম দেয়নি। এ বিশ্বমনোমোহিনী, নানা মূর্ত্তিতে জগৎকে ভুলায়। প্রথমে ছিল এ পদ্মিনী, তার পর হ'ল নাগিনী। এই নাগিনী সমস্ত জগৎকে তাড়া ক'রে খাচ্ছে।" জগৎ কিন্তু তা বোঝে না। এ সবাইকে মুগ্ধ ক'রে রাখে। সবাই একে ভালবাসে। কবীরদাস একে বলেছেন বেশ্যা। এই যে মোহিনী, এই যে সুন্দরী যুবতী, এর ঠিকানাটা পর্য্যন্ত কেউ জানে না। কবীরদাস বলেন, "সমস্ত জগৎ একে ভালবাসে। কিন্তু এ নিজের ছেলেকে মেরে ফেলে আপনি বেঁচে থাকে।"

জগৎ মায়াময়, মায়ারই সৃষ্টি। সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে কবীরদাস বললেন, "তিনিই ভাঙ্গেন, তিনিই গড়েন, তিনিই সাজান, এ সবই গোবিন্দের মায়া।" মায়া গোবিন্দেরই। কবীরদাস বললেন, "সব দেবতা মিলে একে শ্রীহরিকে দান করল। তার সঙ্গে সে চার যুগ ধরে বাস করল।"

আবার এ রঘুনাথের মায়া। মত্ত হয়ে জগৎ জুড়ে শিকার করে বেড়াচ্ছে। দোর্দণ্ড প্রতাপ এর হাতে কারো রক্ষা নেই। পণ্ডিত মূর্খ সাধু সন্ন্যাসী ধ্যানী যোগী সবাইকে মারছে। ঋষ্যশৃঙ্গের মত ঋষি, মীননাথের মত যোগীকেও এ ঘায়েল করে দিল। এমন কি স্বয়ং ব্রহ্মার পর্য্যন্ত দিল মাথা ঘুরিয়ে। এই দুর্দান্ত নাগিনীর কবল থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কি? উদ্ধার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তবে অসম্ভব নয়। উদ্ধারের উপায় আছে দু'টি। এক জ্ঞান অপর ভক্তি।

মায়া বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে জীবকে যেন তন্দ্রাতুর করে দেয়। সদ্গুরু যাকে কৃপা করেন তার এই তন্দ্রা টুটে যায়। সে যথার্থ জ্ঞানলাভ ক'রে মায়ার হাত থেকে উদ্ধার পায়। কবীরদাস বলেন, যাকে গুরু জাগিয়ে দিয়েছেন—সে-ই উদ্ধার পেয়ে যায়।

সদ্গুরুর কৃপায় যে মায়া দূর হয় ভক্তরা এ কথা খুবই বিশ্বাস করেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

> "নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হইতে নিত্যবহির্মুখ ;
> নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ।
> সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে ;
> আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে।
> কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়,
> ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায় ;
> তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়
> কৃষ্ণভক্তি পায় তবে, কৃষ্ণ নিকট যায়।"

গুরূপদেশে মায়া দূর হ'লেই লোকে কৃষ্ণভক্তি লাভ করে। আবার যাঁরা ভক্ত, যাঁরা অন্য সব ছেড়ে একান্ত ভাবে ভগবানকেই আশ্রয় করেন মায়াকে তাঁরা অতিক্রম করে যান। শ্রীভগবান বললেন—

> দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
> মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

—আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা অলৌকিকী মায়া অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। যাঁরা একান্ত ভাবে একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করেন তাঁরা একে অতিক্রম করতে পারেন।

যথার্থ ভক্তের কাছে মায়া জব্দ। সে সবার উপর প্রভুত্ব ক'রে বেড়ায় 'কিন্তু হরিভক্তের বাড়ীতে সে দাসী।' ভক্তকে মায়া বদ্ধ করতে পারে না এই ছিল কবীরদাসের দৃঢ় মত।

আমরা পূর্বেই বলেছি, কবীরদাস শাস্ত্র-পড়া মানুষ ছিলেন না। তবে এই বেদান্তোক্ত মায়ার কথা জানলেন কি করে? সম্ভবত সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে জেনেছিলেন। অথবা তার চেয়েও সম্ভবপর মনে হয়, স্বীয় গুরু রামানন্দের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে উপদেশ পেয়েছিলেন। ডাঃ দ্বিবেদীজী বলেন, "কবীরদাস মায়া সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন সবই বেদান্ত নির্দ্ধারিত অর্থে। খুব সম্ভব ভক্তি-সিদ্ধান্তের সঙ্গে মায়া সম্বন্ধীয় উপদেশও তিনি গুরু রামানন্দের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।"

কোনো লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য কতকগুলি উপলক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। লক্ষ্যের জন্যই উপলক্ষ্য। কিন্তু এমন যদি হয় যে, উপলক্ষ্যই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় তাহ'লে তা অর্থহীন বিড়ম্বনা মাত্র হয়ে পড়ে।

পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বালোচনা, নিয়ম-ব্রত-পূজা-আর্চ্চা এ সব উপলক্ষ্য। এ সবের লক্ষ্য হ'ল আত্মজ্ঞানলাভ বা ভগবদ্‌প্রাপ্তি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকে এ কথা ভুলে যায়। তারা লক্ষ্য ভুলে গিয়ে উপলক্ষ্যকেই প্রধান ক'রে তোলে। তারা মনে করে, এই উপলক্ষ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করা আর লক্ষ্যে পৌঁছান একই কথা। এই জন্য তারা উপলক্ষ্যের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর লক্ষ্য পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। সাধারণ লোকে এদের খুব ধার্মিক বলে মনে করে, মনে করে এরা অবশ্যই ভগবানকে পেয়েছে। আবার এরা নিজেরাই অনেকে তাই মনে করে।

এই শ্রেণীর মানুষকে বলা হয় শাস্ত্রবিদ্ বা মন্ত্রবিদ্। এরা শাস্ত্র জানে, বেদ-কোরাণে এরা পারদর্শী, ধর্মের বহুবিধ ব্যাখ্যা এরা করতে পারে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। এরা শাস্ত্রবিদ্ বা মন্ত্রবিদ্ বলেই যে আত্মবিদ্ হয়েছে বা ভগবানকে পেয়েছে, তা স্বতঃ

সিদ্ধান্ত করা যায় না। বেদান্ত জানা আর আত্মবিদ্ হওয়া এক কথা নয়। যারা সচেতন, নিজের সম্বন্ধে তাদের কোনো ভুল ধারণা নেই। নিজের অকৃতার্থতার কথা তারা জানে। তারা যে আত্মবিদ্ হ'তে পারেনি বা ভগবানকে পায়নি এ তারা জানে। আর জানে বলেই নিজেদের শাস্ত্রজ্ঞান বা ধর্মাচরণের জন্ত বড়াই করে না বা তা'কেই চরম প্রাপ্তি বলে মনে করে না।

কিন্তু অধিকাংশ তথাকথিত ধার্মিকই এই ধরণের মানুষ নয়। তারা উপলক্ষ্যকেই লক্ষ্য বলে মনে করে। ধর্মের বাহ্যাচারকেই ধর্ম বলে মনে করে; ধর্মের মর্ম জানে না তবু করে ধর্মের ব্যাখ্যা; ঈশ্বরকে পায়নি তবু ঈশ্বর সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলে। গুরু সেজে মানুষকে মন্ত্র দিয়ে বেড়ায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা বাহ্যাচারসর্বস্ব ধর্মধ্বজী, আবার অনেক ক্ষেত্রে ভণ্ডও বটে। মরমী কবি চণ্ডীদাস এই শ্রেণীর মানুষকে লক্ষ্য করেই বলেছেন—

"মরম না জানে ধরম বাখানে এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই, সখি, তাদের কথায়, বাহিরে রহুন তা'রা।"

কবীরদাস কিন্তু এদের এত মোলায়েম কথা বলেননি। তিনি এদের কঠোর ভাবে আঘাত করেছেন। কবীরদাস ছিলেন সিদ্ধ ভক্ত, আত্মবিদ। ভগবানকে তিনি পেয়েছিলেন। তাই পুঁথি পড়তে না জানলেও শাস্ত্রের তথা ধর্মের মর্ম তিনি জেনেছিলেন। এই জন্ত এই ধরণের আঘাত করার তাঁর অধিকার ছিল। যেখানেই তিনি দেখেছেন লক্ষ্য ভুলে মানুষ উপলক্ষ্যকেই প্রধান করে তুলেছে, সেখানেই দেখেছেন সত্যের নামে মিথ্যার বেসাতি চলেছে, চলেছে ভণ্ডামি, সেখানেই তিনি খড়্গহস্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি হিন্দু-মুসলমান কাউকেই রেহাই দেননি।

কবীরদাসের কাছে ভগবান পুঁথির কথা মাত্র, তত্ত্ব মাত্র ছিলেন না, তাঁর কাছে ভগবান ছিলেন প্রত্যক্ষ সত্য। এই জন্ত পুঁথিপড়োর সঙ্গে তাঁর মিলত না। তাই এক জায়গায় বলেছেন —"ওরে, তোর মন আর আমার মন কি ক'রে এক হবে? আমি বলছি চোখে দেখে আর তুই বলছিস পুঁথিতে লেখা আছে।"

শুধু পুঁথিই যারা পড়ে, পুঁথির মধ্যেই তারা বাঁধা পড়ে যায়। পুঁথির লক্ষ্য যে ভগবান তা এরা ভুলে যায়। এমন কি পুঁথি পড়ে পড়ে এদের মন হয়ে যায় সঙ্কীর্ণ, এদের সাধারণ বিচারবুদ্ধি পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। এদের লক্ষ্য করেই কবীরদাস বললেন, "ভাই, বেদ-কোরাণ মিথ্যা। ওগুলো নিয়ে মনের চিন্তা যায় না।" বললেন, "পাঁড়েজী, বেদ-কিতাব এ সব ছেড়ে দাও। এ সব মনের ভ্রম মাত্র।" কবীরদাস শুধু পাঁড়েজীকেই বেদ-কিতাব ছাড়তে বলেননি, মোল্লা সাহেবকেও কোরাণ-কিতাব ছাড়তে বলেছেন।

তার কারণ, এই সব পুঁথিপড়োদের দেখে দেখে কবীরদাসের ধারণা হয়েছিল পুঁথি ভগবানকে ঢেকে দেয়। পুঁথিপড়োরা পুঁথিকেই জানে ভগবানকে জানে না। তাই তিনি বাহ্যাচারসর্বস্ব হিন্দু পণ্ডিত ও গুরুরা যে ভগবানকে জানে না, এ কথা যেমন বলেছেন তেমনি বললেন, "অনেক পীর আর আউলিয়া দেখেছি, তারা কিতাব-কোরাণ পড়ে, শিষ্য করে, কবর দেওয়ার বিধান দেয়। এরাও খোদাকে জানে না।" তা ছাড়া কবীরদাস বিশ্বাস করতেন এবং তিনি জেনেছিলেন, ভগবান বেদ-কোরাণের অগম্য। কিন্তু এ সব কথা কেউ মানত না। তাই দুঃখ করে বলেছেন, "তিনি বেদ-কোরাণের অগম্য এ কথা বললে পর কেউ বিশ্বাস করে না।"

কবীরদাস বেদ-কোরাণ ছেড়ে দিতে বলেছেন বলে' জ্ঞানের বিরোধী ছিলেন না। তিনি বরং জ্ঞানের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন; তবে সে জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হওয়া চাই। তাঁর ভক্তিও ছিল জ্ঞানসম্পৃক্তা ভক্তি। কবীরদাস বার বার বলেছেন তত্ত্ববিচারের কথা। তত্ত্ববিচার না থাকলে অধ্যাত্মসাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়। তত্ত্ববিচার না থাকলে ফোঁটা-তিলক কাটা, জটা ধারণ, মাথা মুড়ান, সন্ধ্যা-তর্পণ প্রভৃতি বাহ্যাচারে কিছুই হয় না। যে সব লোক জ্ঞান-ধ্যানের মর্ম জানে না অথচ ধার্মিক সেজে মোহান্ত হয়ে বসে, কবীরদাস তাদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন।

পরমার্থ-তত্ত্ব ভুলে যারা ধর্মের বাহ্যাচারকেই ধর্ম বলে মনে করে সেই সব অজ্ঞ লোক সত্যকে পায় না। তা'রা নিজেরাও ডোবে অন্তদেরও ডোবায়। তাই, কবীরদাস বললেন—"ওহে গোরখ, শোন, অন্তরে সর্বদা তত্ত্ববিচারই যাঁদের আহার তাঁরা পরিজন সহ উদ্ধার পেয়ে যান।"

কবীরদাসের মতে মায়ার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার অন্ততম উপায় যে জ্ঞান, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। গুরুকৃপায় এই জ্ঞানলাভ হয়। গুরু শুধু ভক্তি উপদেশ করেন না, সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানও উপদেশ করেন।

কিন্তু কবীরদাস কোনো কিছুই বিচার না ক'রে গ্রহণ করার পক্ষপাতি ছিলেন না। তাঁর একটা জোরাল সহজ বিচারবুদ্ধি ছিল। তিনি তা দিয়ে সব কিছু যাচাই করে নিতেন, সেই বিচারে যা অযৌক্তিক মনে হ'ত তিনি তা কিছুতেই মেনে নিতেন না। হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা এবং হিন্দু ধর্মের তীর্থ-ব্রতাদি বাহ্যাচার যে তিনি মানতেন না, তার কারণ তিনি এই সব যুক্তিহীন মনে করতেন। তিনি যেমন বিনা বিচারে কিছু মেনে নিতেন না তেমনি অন্তকেও যখন কিছু বলেছেন, তখন তা বিচার করে দেখতে বলেছেন। এমন কি, গুরুর উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি বিচার করতে বলেছেন। কবীরদাসের অভিমত ছিল, সাধুরা হবে জ্ঞানী। তাই বললেন, সাধুর জাতি জিজ্ঞেস করো না, তাঁর জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞেস কর। অধ্যাত্মসাধনার্থীদের তিনি উপদেশ দিলেন—"জ্ঞানের হাতী বড়। তার পিঠে বিছিয়ে নাও সহজের গালিচা। সংসারটা কুকুরের মত, সে আপশোস মিটিয়ে ঘেউ ঘেউ করুক না।"

কবীরদাসের যোগমতের সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। যোগের অষ্টাঙ্গ সাধন তিনি জানতেন। এই যোগসাধনায়ও তিনি জ্ঞানের প্রাধান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "জ্ঞান ছাড়া যোগ ব্যর্থ।" তা ছাড়া, কবীরদাসের অদ্বৈত ভাবের পদগুলিতে ত তিনি নিছক ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই বলেছেন। কাজেই, কবীরদাস পুঁথির বিরোধী হ'লেও জ্ঞানের বিরোধী ছিলেন না।

ভক্তিপথে বিশ্বাস প্রধান সম্বল। বিশ্বাস না থাকলে ভক্তি সম্ভবপরই হয় না। বিশ্বাস না থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। "বিশ্বাস কিন্তু দু'রকমের। এক, জ্ঞানীর বিশ্বাস; আর এক অজ্ঞানের বিশ্বাস। সত্যিকারের বিশ্বাস যার নেই, ধর্মের সব রকম বাহ্যাচার পালন করলেও তার কিছুই হয় না। ভগবানকে সে পায় না। বললেন কবীরদাস, "মালা ফিরাচ্ছিস, তিলক কেটেছিস, রেখেছিস্

লম্বা জটা। ওরে, তোর ভিতরে যে অবিশ্বাসের ছুরি, এতে ক'রে প্রভুকে পাওয়া যায় না।"

কবীরদাসের মূল লক্ষ্য প্রভুকে পাওয়া। সেই লক্ষ্যকে যা আড়াল ক'রে দাঁড়ায়, কবীরদাস ছিলেন তারই বিরোধী; তিনি তীব্র ভাবে তাকেই আক্রমণ করেছেন। ধর্মের বাহ্যাচারের যে তিনি নিন্দা করেছেন তার কারণও এই, জ্ঞানীদের মত তিনি বাহ্যাচারের নিন্দা করার জন্যই নিন্দা করেননি। তিনি সব কিছুকে দেখেছেন প্রেমভক্তির দৃষ্টিতে। যা প্রেমভক্তিকে আবৃত করে দেয় তিনি তাকেই আঘাত করেছেন। প্রেমভক্তি থাকলে বাহ্যাচার রইল কি রইল না, তা নিয়ে কবীরদাসের মাথাব্যথা ছিল না। তিনি দেখেছিলেন, লোকে মূল লক্ষ্য ভুলে গিয়ে ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান পালনকেই ধর্ম বলে মনে করছে। অনেকেই এই সবের পিছনের তত্ত্ব কি তা কিছুই জানত না, শুধু অন্ধভাবে অনেক ক্ষেত্রেই তত্ত্বহীন যুক্তিহীন প্রথার অনুসরণ করত। ধর্মাচরণ তাদের কাছে একটা জড় অভ্যাস মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অনেকের ধারণা, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের এই বাইরের দিকটার সঙ্গেই কবীরদাসের পরিচয় ছিল। শুধু যোগমতের তত্ত্বের দিকটাই তিনি জানতেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের বাহ্যাচারের পিছনে যে সব তত্ত্ব আছে তা তিনি জানতেন না বা জানবার চেষ্টাও করেননি।

এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় কবীরদাসের পদ থেকেই। যে সব ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু বা মুসলমান ধর্মের বাহ্যাচার খণ্ডন করেছেন, সেই সব ক্ষেত্রে সর্বত্রই তিনি ঐ সব বাহ্যাচারের সমর্থক পণ্ডিত, পাঁড়ে, কাজী বা মোল্লাকে নিতান্ত মূর্খ ভেবেছেন মনে হয়। কারণ প্রতিপক্ষ হিসাবে তারা তাদের মতের সমর্থনে যে সব যুক্তি দিতে পারত তিনি সে সবের কথা ভেবে তা খণ্ডন করেননি। প্রসঙ্গত এখানে বলা প্রয়োজন, কবীরদাসই প্রথম হিন্দুধর্মের বাহ্যাচারের খণ্ডন করেননি। এর সুদীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। কবীরদাসের আগে হঠযোগীরা এ কাজ করেছেন, তারও আগে করেছেন সহজযানী সিদ্ধ ও জৈন সাধকেরা।

কবীরদাসের সময়ে হিন্দু, মুসলমান, যোগপন্থী প্রভৃতি সবার মধ্যেই যারা ধর্মের বাহ্যাচারকে ধর্ম মনে করত এমনি মানুষের সংখ্যা ছিল বেশী। কবীরদাস এ সব ভ্রান্তদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ক'রে ক'রে নানা ভাবে আঘাত ক'রে ক'রে তাদের চোখ ফুটাবার চেষ্টা করেছেন। হিন্দু, মুসলমান, যোগপন্থী কেউ তাঁর হাতে নিস্তার পায়নি।

মোল্লা আজান দেয়, চেঁচিয়ে ডাকে আল্লাকে। কবীরদাস তাকে দিলেন এক খোঁচা। বললেন, "মোল্লা হয়ে যে আজান দিস্, তোর প্রভু কি কালা? ক্ষুদ্র কীটের পায়ে নূপুর বাজে তাও যে প্রভু শুনতে পান।" সাধু-সন্ন্যাসীরা জটা রাখে, মাথা মুড়ায়, গায়ে ছাই মাখে, সন্ধ্যা-তর্পণ করে, মূর্তিপূজা করে। কবীরদাস বলেন, যদি এ সবের পিছনে তত্ত্ববিচার না থাকে, যদি এ সবের দ্বারা ভগবানকে না পাওয়া যায় তাহ'লে এগুলো দিয়ে কি হবে?

ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের বিশেষ কোনো মূল্য কবীরদাসের কাছে ছিল না। এগুলোকে তিনি ছোট মেয়ের পুতুল-খেলার মত মনে করতেন। বলেছেন, পূজো, সেবা, নিয়ম-ব্রত এ সব যেন ছোট মেয়ের পুতুল-খেলা। যতক্ষণ প্রিয়তম স্পর্শ না করেছেন ততক্ষণ এ সবে অনেক সংশয় থাকে। প্রিয়তমের স্পর্শ পেলে, অন্তরে প্রেমভক্তি জাগলে বাহ্যাচার আপনি দূর হয়ে যায়। কবীরদাসের ভক্তি রাগানুগা। কাজেই বৈধী ভক্তির আনুসঙ্গিক পূজা, সেবা ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠান তিনি যে নিরর্থক মনে করতেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। [ক্রমশঃ।

হিট্‌লার

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তুমি রুদ্রের মানস পুত্র, দুরাশা জননী তব, যাতনা-সাগর-মন্থন উদ্ভব।
তুমি লাঞ্ছিতা মহাশক্তির দান,
দিকবধূগণ করায় স্তন্যপান,
বিরাট সাধনা, পরিকল্পনা, সবই তব অভিনব।
যবে অনাহারে ঘৃণা অপমানে স্বদেশ শৃঙ্খলিত, কৃষ্টি এবং দৃষ্টি কলঙ্কিত,
ধর্ম যখন খুঁজিতেছে আশ্রয়,
গুমরে জাতির শ্রেষ্ঠ বৃত্তিচয়,
হতেছে জন্ম-অধিকার হতে দুর্বল বঞ্চিত।
পরাজয়-গ্লানি ক্লিষ্ট কুটীরে তোমার আবির্ভাব—
নিষ্পেষিতের ঘনীভূত উত্তাপ
করি দ্রবীভূত লৌহ-প্রাসাদমালা,
দুষ্কর্মীর দুষ্ট কর্মশালা,
দৃঢ় রক্ষিত সঞ্চিত পাপে সহসা ধরালো কাঁপ।
অশনিগর্ভ নক্ষত্রের আগ্নেয় অনীকিনী—সমরনায়ক তোমারে লইল চিনি
অতি দর্পীরে শিখাইল সভ্যতা,
উপেক্ষিতের শক্তির বিশালতা,
প্রত্যাসন্ন মুক্তি,—জরতী হ'ল রণরঙ্গিণী।
বনস্পতিরা ধূলি লুণ্ঠিত, বিদীর্ণ পর্ব্বত, সিংহ সর্প ব্যূহ ভেঙ্গে তব পথ।
ছিন্ন হইল, সহসা ঝলসি চোখ,
শক্তি-সৌধে বিদ্যুৎ সংযোগ,
অর্দ্ধ পথেতে ধরণী গ্রাসিল তোমার বিজয়-রথ।
যুগ-সন্ধির হে মহামানব, মিলিল না সফলতা,
তব তপস্যা তবুও যায়নি বৃথা।
তুমিই মৌন মুখেতে দিয়াছ কথা
হৃদয়ে অগ্নিশুদ্ধ বিশুদ্ধতা
সমুজ্জ্বল এক জাতি ও জগৎ গঠনের প্রবণতা।
জগতের মনোরাজ্যে আনিলে বিপ্লব, আলোড়ন,
পাষাণ হৃদয়ে বিবেকের স্পন্দন।
জানালে সর্ব্বনিয়ন্তা এক আছে,
উৎপীড়িতেরা আগাইছে তাঁর কাছে,
সাড়া দিয়ে গেল শ্রীভগবানের চক্র সুদর্শন।

জেন অষ্টিনের

উনপঞ্চাশ

বাবা বাড়ী ফেরার দু'দিন পরে এলিজাবেথ আর জেন বাড়ীর পিছনের বাগানে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় দাসী এসে জানাল—'সহর থেকে সুখবর পেয়েছ?'

—'সে কি?' সহরের কোন খবরই পাইনি।'

আশ্চর্য হয়ে দাসী বললে—'জামাই বাবুর কাছ থেকে তার এসেছে। আধ ঘণ্টা হোল বাবু বাড়ী ফিরেছেন। একখানা চিঠিও পেয়েছেন তিনি।'

আর কোন কথা শোনবার অবসর নেই। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঊর্ধশ্বাসে ছুটল তারা—দেউড়ি পেরিয়ে খাবার-ঘর—সেখান থেকে সটান লাইব্রেরীতে। কিন্তু বাবা নেই সেখানে। উপরে মায়ের ঘরে যাবার পথে খবর পেল বাবা বাড়ীর পিছনে ঝোপের দিকে গেছেন।

দু'জনে আবার লন পেরিয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটল। বাবা বেড়া দেওয়া লন পেরিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছিলেন।

লঘুদেহা এলিজাবেথ দিদিকে পিছনে ফেলে হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে বাবার নাগাল ধরল। অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেসা করল:—'বাবা, মেসোর চিঠি পেয়েছ? কি খবর?'

—'একখানা জরুরী চিঠি এসেছে।'

—'কি খবর?'

—'কী ভাল খবর আশা কর?' পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে বললেন তিনি—'পড়তে চাও?'

এলিজাবেথ অধৈর্য্যের মত চিঠিখানা নিল তাঁর হাত থেকে। ইতিমধ্যে জেনও এসে গেছে সেখানে।

—'চেঁচিয়ে পড়।' বললেন তিনি—'আমি নিজেও জানি না কি লেখা আছে চিঠিতে।'

গ্রেসচার্চ ষ্ট্রীট, সোমবার
২রা আগষ্ট

—'অবশেষে লিডিয়ার সংবাদ পাইয়াছি। মনে হয় আপনিও সে সংবাদ শুনিলে প্রীত হইবেন। শনিবার এখান হইতে আপনার যাইবার পর লণ্ডনের কোন্ অঞ্চলে তাহারা আছে সৌভাগ্যক্রমে সে খবর পাই। সাক্ষাৎ সমুদয় ব্যক্ত করিব। তাহাদের যে হদিস পাওয়া গিয়াছে বর্তমানে এইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকুন। আমি তাহাদের দু'জনকেই দেখিয়াছি।'

—'তা'হলে আমি দিবারাত্র যা কামনা করি তাই ঘটেছে।' বললে জেন—'নিশ্চয়ই ওরা বিয়ে করেছে।'

এলিজাবেথ পড়ে যেতে লাগল।

—"আমি তাদের দু'জনকেই দেখিয়াছি। তাদের বিয়ে হয়নি। বিয়ে করার মতলব বা তেমন ইচ্ছাও দেখছি না। কিন্তু আপনি যদি বিয়ের প্রস্তাব করিতে চান—অবশ্য ইতিমধ্যে আমি আপনার হইয়া প্রস্তাব করিয়াছি—আর বিশেষ বিলম্ব করা উচিত হইবে না। আপনার তরফ হইতে মেয়েকে শুধু এইটুকু মাত্র আশ্বাস দিতে হইবে যে, আপনাদের অবর্তমানে কন্যারা যে পাঁচ হাজার পাউণ্ড পাইবে তাহাকেও সেই উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। অধিকন্তু আপনার জীবিত-কালেও বছরে যে একশো পাউণ্ড পাইবে সে-সম্বন্ধেও একটি চুক্তি করিতে হইবে। সব দিক হইতে বিচার পূর্বক আমি আপনাদের তরফ হইতে নিঃসংশয়ে এই শর্তগুলি মানিয়া লইয়াছি। পত্রোত্তরে যাহাতে বৃথা কালক্ষেপ না হয় সেই জন্য এক্সপ্রেস চিঠি পাঠাইলাম। উইকহামের অবস্থা যত দূর খারাপ মনে করা গিয়াছিল তত খারাপ নয়। এ সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত তথ্য প্রচারিত হইয়াছে মাত্র। আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, লিডিয়ার অংশ বাদ দিলেও তাহার সকল ঋণ পরিশোধ করিয়াও সামান্য কিছু অবশিষ্ট থাকিবে। যদি আমার প্রস্তাব মত কাজ করিবার অভিলাষ থাকে তবে আমাকে আপনার হইয়া সকল কার্য সমাধা করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন। তাহা হইলে আমি যথাবিহিত ব্যবস্থা করিব। আপনার এখানে আসিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আমার কর্মকুশলতার উপর নির্ভর করিয়া লংবোর্ণে নিশ্চিন্ত থাকুন। যথাশীঘ্র আপনার উত্তর ব্যর্থহীন ভাষায় প্রেরণ করিবেন। এই গৃহ হইতে লিডিয়াকে বিবাহ দিবার সংকল্প করিয়াছি। আশা করি, আপনিও তাহা অনুমোদন করিবেন। লিডিয়া আজ আমার সহিত দেখা করিতে আসিবে। ভিন্ন সংকল্প থাকিলে জানাইবেন। ইতি

এডোয়ার্ড গার্ডিনার।"

—'এও কি সম্ভব?'—চিঠি পড়া শেষ করে মন্তব্য করল এলিজাবেথ।

—'ও কি লিডিয়াকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে?'

—'উইকহামকে তা'হলে যত মন্দ ভাবা গিয়েছিল তত মন্দ নয় সে।'

আর মুহূর্ত মাত্র যাতে কালক্ষেপ করা না হয় তার জন্য মিনতি জানাল এলিজাবেথ বাবাকে।

—'বাড়ী ফিরে চল বাবা। এক্ষুনি চিঠির উত্তর দিতে হবে। এখন প্রতিটি মুহূর্ত কত মূল্যবান, ভাব তো।'

—'আমি তোমার হয়ে লিখে দিতে পারি যদি তোমার অসুবিধা হয়'—প্রস্তাব করে জেন।

—'এ সমস্তই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে'—বাবা বললেন শেষ পর্যন্ত—'কিন্তু তবুও এ করতেই হবে।' এই বলে তিনি মেয়েদের নিয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন।

—'মেসোর সর্তগুলিই মেনে নেবে নিশ্চয়'—প্রশ্ন করে এলিজাবেথ।

—'মেনে নেব? এত কম চাওয়ায় তো আমি রীতিমত লজ্জা বোধ করছি।'

—'ওর বিয়ে দিতেই হবে। আর উইকহামের মত লোকের সঙ্গে!'

—'হ্যাঁ, বিয়ে ওদের দিতেই হবে। এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু তার আগে দু'টো ব্যাপার আমাকে স্পষ্ট জানতে হবে। প্রথমতঃ, তোমার মেসোকে এ বিয়ে ঘটাতে কত টাকা খেসারৎ দিতে হয়েছে আর আমাকেই বা সে টাকা কী ভাবে পরিশোধ দিতে হবে।'

—'মেসো টাকা খেসারৎ দিয়েছেন?—কি বলছ তুমি!'—বিস্ময় প্রকাশ করে জেন।

—'এখন একশ' এবং আমাদের অবর্তমানে পাঁচশ' পাউণ্ডের লোভে কোন পুরুষই লিডিয়াকে বিয়ে করতে রাজী হবে না।'

—'তা সত্যি'—বললে এলিজাবেথ—'এ কথাটা আমার আগে মনে হয়নি। ঋণ পরিশোধ করা ছাড়াও আরো অনেক কিছু করতে বাকি। সে টাকাটা নিশ্চয়ই মেসো দিয়েছেন। মহানুভব তিনি। নিজের থেকে টাকাটা খেসারৎ দিয়েছেন আর সেও তো কম টাকার ব্যাপার নয়।'

—'উইকহাম যদি দশ হাজার পাউণ্ডের কমে লিডিয়াকে গ্রহণ করতে রাজী হয় আমি তাকে নির্বোধই বলব। আত্মীয়তার সূচনাতেই তার সম্বন্ধে এ রকম হীন কল্পনা করতে হলে দুঃখিতই হব।'

—'দশ হাজার পাউণ্ড! ভগবান না করুন! এর অর্ধেকই পরিশোধ হবে কি করে?'

মিঃ বেনেট কোন উত্তর দিলেন না এ কথার। বাপ আর মেয়েরা তিন জনই আপন আপন চিন্তায় মগ্ন—নিঃশব্দ চরণে বাড়ী পর্যন্ত এল তারা। বাড়ী পৌঁছে বাপ গেলেন পাঠ-কক্ষে চিঠির উত্তর লিখতে তার মেয়েরা গেল খাবার-ঘরে।

—'সত্যিই ওদের তা'হলে বিয়ে হবে'—একান্তে মন্তব্য করল এলিজাবেথ—'কী অদ্ভুত! এর জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। সুখের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হলেও ওদের বিয়ে হওয়া উচিত। উইকহাম জঘন্য চরিত্রের লোক হলেও আমরা আনন্দ করতে বাধ্য। পোড়ারমুখী লিডিয়া!'

—'লিডিয়ার প্রতি যদি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা না থাকত উইকহাম কখনই ওকে বিয়ে করতে রাজী হোত না—আমার কিন্তু এই ধারণা'—মন্তব্য করে জেন—'মেসো যদিও তাকে দায়মুক্ত করেছেন, তবুও দশ হাজার পাউণ্ড বা ঐ ধরণের মোটা অঙ্ক তাকে খেসারৎ দিতে হয়েছে এ আমি বিশ্বাস করি না। মেসোর নিজের ছেলেমেয়ে আছে—ভবিষ্যতেও আরো হবে। কেমন করে তিনি দশ হাজারেরও অধিক খয়রাতি করবেন?'

—'উইকহামের ঋণের পরিমাণ কত এবং কত টাকা গুনাগাত দিয়ে মিটমাট করতে হয়েছে যদি জানতে পারা যেত, তা'হলে মেসোকে আমাদের জন্য কতটা ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে তার আন্দাজ করতে পারতাম। উইকহামের তো কানা-কড়িরও মুরোদ নেই। মেসো-মাসীর ঋণ জীবনে কোনদিনই পরিশোধ করা যাবে না। লিডিয়াকে বাড়ীতে আনা, আশ্রয় দেওয়া—এ যে কত বড় আত্মত্যাগ—দীর্ঘ বছরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও তার পরিমাপ করা যাবে না। এতক্ষণ হয়ত লিডিয়া মেসোর কাছে এসে গেছে। এতখানি উদারতাতেও যদি তার চৈতন্যোদয় না হয় তা'হলে ও জীবনে কখনো সুখী হতে পারবে না।'

—'যা ঘটে গেছে এবার তা ভুলে যেতে হবে আমাদের'—জেন বলল—'আশা করি, ওদের জীবন সুখময় হয়ে উঠবে। উইকহাম যে সঠিক পথে চলেছে লিডিয়াকে বিয়ে করতে চাওয়াই তার প্রমাণ বলে আমি মনে করি। পরস্পরের প্রতি ভালবাসাই ওদের জীবনে স্থিতি আনবে—ওরা সংসারী হয়ে উঠবে—কালক্রমে ভুলে যাবে অবিমৃষ্যকারিতার কথা।'

—'এমন গর্হিত কাজই করেছে ওরা যে তুমি, আমি বা কেউ-ই ভুলতে পারব না সে কথা।'

হঠাৎ মেয়েদের খেয়াল হোল মা হয়তো এ সবের কিছুই শোনেননি। কাজেই তারা বাবার কাছে অনুমতি চাইলে মাকে সব কথা বলার। মিঃ বেনেট চিঠি লিখছিলেন, মাথা না তুলেই বললেন—'যা ভাল বোঝ কর।'

—'মেসোর চিঠিখানা কি নিয়ে যাব মাকে পড়ে শোনাতে?'

—'নিতে হয় নিয়ে সরে পড়'—

লেখার টেবিল থেকে চিঠিখানা উঠিয়ে দু'বোনে উপরে গেল। ছোট দু'টি বোনও ছিল মা'র কাছে। শুভ সমাচারের সামান্য মুসাবিদা করার পর চিঠিখানা চেঁচিয়ে পড়া হোল। সব শুনে মা যেন আর কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না। লিডিয়ার বিয়ে সম্বন্ধে মেসোর মন্তব্য পড়ে শোনান মাত্র তাঁর আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—তার পর প্রতি ছত্র পাঠে সে আনন্দ দ্বিগুণ বর্ধিত হতে লাগল। তাঁর মেয়ের বিয়ে হবে এই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। লিডিয়ার কেলেংকারী আর তাঁকে একটুও বিব্রত বা ভীত করতে পারল না। আবেগ ভরে বললেন তিনি—'লিডিয়ার বিয়ে হবে। আবার তাকে দেখতে পাব। ষোল বছরে সে স্বামীর ঘরে চলে যাবে। গার্ডিনার বড় ভাল লোক। জানি, সে সব ব্যবস্থা করবে। ওকে দেখতে আমার মন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। উইকহামকেও। বিয়ের জামা-কাপড় কেনাকাটি করা—বোনকে এখুনি চিঠি লিখতে হবে। লিজি, বাবার কাছে যাও—কত টাকা তিনি লিডিয়াকে দেবেন? না, থাক থাক। আমি নিজেই যাব। এক মুহূর্তে সব ঠিকঠাক করে ফেলব। আবার কত আনন্দ হবে যখন সবাই একত্র হব।'

মায়ের এই আনন্দ-আবেগকে সংযত করার জন্য মেসো যে দায়ের কথা উল্লেখ করেছেন সে কথা বললে এলিজাবেথ।—'এই সুখকর পরিণতি তাঁরই দয়ায় সম্ভবপর হয়েছে। তিনিই

উইকহ্যামকে অর্থ দিয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ কথা ভুললে চলবে না।'

মা বললেন—'নিজের মেসো ছাড়া আর কে উদ্ধার করবে এই দায় থেকে? তার যদি নিজের ছেলেমেয়ে না থাকত আমরাই তো তার বিষয়-সম্পত্তি পেতাম। এই প্রথম তার কাছ থেকে কিছু পাচ্ছি আমরা। উঃ, কী আনন্দ! আর কিছু দিনের মধ্যে আমার একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে। গেল জুনে লিডিয়া সবে মাত্র ষোলয় পড়েছে। জেন, আমি এখন এত ব্যস্ত যে কিছুই লিখতে পারব না। আমি বলে যাই তুমি লেখ। টাকাকড়ি সম্বন্ধে তোমার বাবার সঙ্গে পরে কথা হবে। কিন্তু জিনিষ-পত্তরের অর্ডার তো এখনই দিতে হবে।'

মা তক্ষুনি হয়ত কেম্‌ব্রিক ক্যালিকো আর মসলিনের তালিকা প্রস্তুত করে ফেলতেন যদি না জেন বহু কষ্টে মাকে প্রতিনিবৃত্ত করত। এক দিনের বিলম্ব ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু মা'র মন সুখ-সৌধ রচনায় এত বিভোর যে, এ নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করলেন না তিনি। অন্য এক পরিকল্পনা ততক্ষণে মাথায় এসে গেছে তাঁর—'এক্ষুনি মেরীটনে গিয়ে ফিলিপস্‌কে এই শুভ সংবাদ দিতে হবে। ফেরবার পথে লেডী লুকাস ও মিসেস্ লংয়ের ওখান হয়ে আসব। কিটি মা, যাও তো গাড়ী তৈরী করতে বল গে। একটু হাওয়া খেয়ে এলে শরীরও চাঙ্গা হয়ে উঠবে আমার। তোদের কিছু দরকার আছে না কি মেরীটনে?'

এলিজাবেথ ভাবতে বসে—হতভাগিনী লিডিয়ার অবস্থা খারাপই বলতে হবে। কিন্তু খুব বেশী যে খারাপ হয়নি এর জন্য ধন্যবাদ ভগবানকে। সামনের দিকে চেয়ে বোনের ভাগ্যে সুখ-শান্তির আশা করা যায় না, কিন্তু অতীতের দিকে তাকালে এই দু'ঘণ্টা আগেও কী সাংঘাতিক পরিণতি ঘটতে পারত ভেবে তারা এমন আত্মহারা হয়ে পড়েছিল যে, এখন তার তুলনায় যা লাভ হোল তার মূল্য তুচ্ছ মনে হোল না তার কাছে।

পঞ্চাশ

সংসারে সবটুকু খরচ না করে, তাঁর অবর্তমানে স্ত্রী ও কন্যাদের জন্য কিছু কিছু সংস্থান করেন এ অভিপ্রায় ছিল মিঃ বেনেটের বহু দিনের। কিন্তু সম্প্রতি তার প্রয়োজনীয়তা তিনি গভীর ভাবে অনুভব করছিলেন। যদি ইতিপূর্বেই তিনি কিছু সঞ্চয় করে রাখতেন তবে লিডিয়ার জন্য আজ তাঁকে স্ত্রীর ভগিনীপতির কাছে এ ভাবে ঋণজালে জড়িয়ে পড়তে হত না। লিডিয়ার ভবিষ্যৎও এ ভাবে লাঞ্ছিত হতে পারত না তাঁর চোখের সামনে।

তাঁর ঋণের পরিমাণ কতখানি জেনে নিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত তা পরিশোধ করার জন্য মিঃ বেনেট দৃঢ় বদ্ধপরিকর হলেন।

যখন বিয়ে করেছিলেন তখন এ মিতব্যয়িতার প্রশ্ন ছিল অচিন্ত্যনীয়। বিয়ে হয়েছে, পুত্র-সন্তান হবে। সেই পুত্র বড় হবে, উপযুক্ত হবে। সেও ভার নেবে সংসারের দায়িত্বের। কনিষ্ঠদের গড়ে ওঠার জন্য পিতার প্রতি অনুকূল হবে। কিন্তু বিধি বাম। পর-পর পাঁচটি মেয়ে ভূমিষ্ঠ হল। লিডিয়া হবার পরও তাঁদের আশা ছিল যে, পুত্র-সন্তান হবেই তাঁদের। কিন্তু সে আশা এখন সুদূরপরাহত হয়ে গেছে। অথচ স্ত্রী মোটেই সংসার সম্বন্ধে মিতব্যয়ী নন। একমাত্র স্বামীর দৃঢ়তার জন্যই তিনি এ অবধি খরচ-পত্তরে যথেচ্ছচারিতা করতে পারেননি।

স্ত্রী ও মেয়েরা পাবে পাঁচ হাজার পাউণ্ড এই ছিল বিবাহের সর্ত। কিন্তু তার মধ্যে কে কতখানি অংশ পাবে সেটুকুর পূর্ণ ভার দেওয়া ছিল পিতা-মাতার উপরেই। লিডিয়ার বিয়ের ব্যাপারে এত দিনে সেই বণ্টনের প্রশ্ন উত্থাপিত হোল। বাপ সানন্দে স্বেচ্ছায় ঋণের পরিমাণ পূর্ণমাত্রায় পরিশোধ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। উইকহ্যাম যদিই বা লিডিয়াকে বিয়ে করতে সম্মত হয়, সে যে এত সহজে সংগঠিত হতে পারে, তা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি তিনি। লিডিয়াকে যা দিতে হোল বা মাঝে মাঝে যৌতুক হিসাবে যেটুকু দিতে হবে, তার পরিমাণ এত কম দেখে মিঃ বেনেটের সানন্দ বিস্ময় বড়ো কম হোল না।

ঘটনার প্রথম ধাক্কায় তাঁর মন এত ক্ষুব্ধ হয়েছিল যে, তিনি বাড়ী থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলেন সেই প্রগল্‌ভা হঠকারী মেয়েটিকে খুঁজে বার করতে। কিন্তু যখন সব ব্যাপার জানতে পারলেন, তাঁর মন আবার থিতিয়ে বসল। চিঠিপত্র দিলেন সবাইকে শুধু লিডিয়াকে ছাড়া। কেন না, তাকে তিনি তখনো ক্ষমা করতে পারেননি।

তাঁর চিঠিতে যে সুস্থ সহজ আবহাওয়া সঞ্চারিত হোল বাড়ীতে, তার স্নিগ্ধতা পড়শীদের মধ্যেও বিস্তৃত হোল অনতিবিলম্বে। পাড়ার মহিলারা, যারা লিডিয়ার অন্ধকার ভবিতব্যের কথা ভেবে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করছিলেন, তাঁরাও এতে অনেকখানি শান্তি পেলেন। তবু মেয়েটার যে কপাল মন্দ সে বিষয়ে তাঁদের এক জনেরও মতদ্বৈধ রইল না।

দিন পনেরো মা উপর থেকে নামেননি। কিন্তু আজ যখন সুখের খবর এল, তিনি আবার খাবার টেবিলে না বসে থাকতে পারলেন না। লিডিয়ার এই লজ্জাজনক আচরণ মায়ের উৎসাহকে নিবিয়ে দিতে পারলে না। জেন ষোলো বছরে পা দেওয়া অবধি তিনি মেয়েদের বিয়ের কথা ভেবে আসছেন। এখন কনিষ্ঠা মেয়ের বিয়ের সম্ভাবনায় তিনি আর কিছু ভাবতে পারলেন না। নতুন গাড়ী, ভালো সজ্জা ও প্রসাধন দ্রব্য, সূক্ষ্ম মসলিন, পরিপাটি ভোজ, এই সব তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে তুলল। তা ভিন্ন মেয়ে-জামাইকে নিকটবর্তী কোন একটি গৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনায় তিনি মুখর হয়ে উঠলেন। অনেকগুলি বাড়ীই উপযুক্ত মনে হোল না। দু'টি একটি সম্বন্ধে কিছু পছন্দসই মনে হলেও, সেগুলির অনেক বদল করার প্রয়োজনীয়তা বোধ হোল তার কাছে। সব কিছুই ভাবতে লাগলেন তিনি, শুধু যে মানুষটি সেই গৃহে কর্তা হয়ে বসবে, তার রোজগারের অঙ্ক তাঁর মনকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারলে না।

স্ত্রীর এই সকল পরিকল্পনায় মিঃ বেনেট ততক্ষণ বাধা দিলেন না যতক্ষণ দাসী-চাকররা উপস্থিত রইল। তারা বিদায় হলেই স্বামী রুক্ষ কণ্ঠে বললেন যে, এখানে তাদের বাসা নিয়ে থাকা চলবে না। তা ভিন্ন তিনি অমন মেয়েকে বিয়ের ব্যাপারে কিছু মাত্র সাহায্য করতে প্রস্তুত নন। এমন কি বিবাহের সজ্জা অবধি তিনি কিনে দেবেন না, এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন তিনি। স্বামীর রাগ যে এমন উগ্র হয়ে উঠতে পারে তা কল্পনাও করেননি তিনি।

তাঁর ধারণা, লিডিয়া বিয়ের আগেই একটি পরপুরুষের সঙ্গে পনেরো দিন বাস করেছে, সে লজ্জার চেয়ে বিয়ের সময় একটি পুরোনো পোষাক পরে কন্যা বিবাহের আসরে উপস্থিত হবে এ আরো গভীরতর লজ্জা।

নিজের পরিবারের এই লজ্জাকর কাহিনী এক উত্তেজিত মুহূর্তে ডার্সির কাছে প্রকাশ করে ফেলার জন্য এলিজাবেথ মরমে মরে যেতে লাগল। লিডিয়ার গৃহত্যাগের পর-পরই যখন তার বিবাহের ব্যবস্থা পাকা হয়ে আসছে, এখন স্বচ্ছন্দেই এ কাহিনীটুকু বাইরের লোকের অগোচর রাখা যেত। কিন্তু এলিজাবেথ তত দূর ভাবতে পারেনি সেই সংকট সময়ে।

অবশ্য ডার্সির মুখ থেকে এ সংবাদ বিস্তৃত হওয়ার ভয় নেই। অন্ততঃ ডার্সির কাছে এটুকু সৌজন্য সে আশা করে। কিন্তু মেয়েরা যে এমন লঘুতার পরিচয় দিতে পারে, এ নির্মম সত্য ডার্সিকে অনেকখানি ব্যথা দেবে সন্দেহ নেই। নিজের ভবিষ্যতের জন্য এলিজাবেথ মোটেই মাথা ঘামায় না। কেন না, লিডিয়ার বিয়ে যদিই বা সাধারণ ভাবে উইকহ্যামের সঙ্গে ঘটত, তবু ডার্সির মত লোক এ পরিবারের কোন মেয়ের সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধতে সম্মত হোত না। উইকহ্যাম যে পরিবারে বিবাহ-বন্ধন দৃঢ় করল, সে পরিবারে ডার্সি কোন সম্পর্ক স্থাপন করবে না নিশ্চয়ই। কি বিজাতীয় বিদ্বেষ পোষণ করেন তিনি উইকহ্যাম সম্বন্ধে, তা ভালো ভাবেই জানে এলিজাবেথ।

ডার্সি চিরদিনের মত এ পরিবার থেকে দূরে সরে গেল। যেটুকু শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল এলিজাবেথ তার কাছে, এই এক আঘাতে শতধা চূর্ণ হয়ে যাবে। তাঁর চোখে এলিজাবেথ আজ নেমে গেল অতলে। একটা না-বোঝা ব্যথায় তার বুকের ভেতর টনটন করতে লাগল। তিনি আমায় কত উঁচুতে বসিয়েছিলেন, ভাবলে সে। আজ আর সে সম্মানের কোন মূল্যই রইল না। ডার্সির একটা খবরের জন্যে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল এলিজাবেথ। কিন্তু বৃথায় সে মাথা কুটে মরল একান্তে। আর কোন দিন তাদের দেখা হবে না। কিন্তু এলিজাবেথ জানে, হৃদয়ের গভীরতম নিভৃততম প্রদেশে তার এ বিশ্বাস অটুট আছে আজো যে, ডার্সিকে নিয়ে সে সুখের সংসার বাঁধতে পারত, হতে পারত তাঁর যোগ্যা সহচরী সহধর্মিণী।

মাত্র চার মাস আগে ডার্সিকে যে প্রত্যাখ্যান সে করেছিল, আজ তা ডার্সির পক্ষে আনন্দের হয়ে উঠল। তিনি সেদিন বিনা তিক্ততায় গ্রহণ করেছিলেন সে পরাজয়ের গ্লানি, কিন্তু তিনিও তো মানুষ, তাঁরও তো জয়-পরাজয়ে মনের ভাঙা-গড়া হয়।

এত দিনে যেন আবিষ্কার করছে এলিজাবেথ যে আচরণে মনে তিনি তার যোগ্যতম পুরুষ। মনের নানা ব্যতিক্রম সত্ত্বেও আজ মনে হচ্ছে, তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চাওয়া-পাওয়ার দাবী মেটাতে পারত একমাত্র সেই। তাদের মিলনে উভয়েরই ঘটত পরিপূর্ণ বিকাশ। এলিজাবেথের স্নিগ্ধ নারীত্বে তিনি আরো কোমল ও দরদী হয়ে উঠতেন। ডার্সির বিদ্যা, বিচার ও ন্যায়নিষ্ঠায় সার্থক হয়ে উঠত এলিজাবেথের নারীত্ব।

কিন্তু আজ সে সব স্বপ্ন হয়ে গেল তার জীবনে। মরীচিকায় পর্যবসিত হল। অথচ লিডিয়ার সমস্যা রয়ে গেল একটা দুর্বিনীত কাঁটার মত। যে মেয়ে-পুরুষ মনের ধর্মকে কোন মূল্য দিলে না, শুধু মাত্র দেহগত লোভে মিলিত হোল, তাদের ভবিষ্যৎ সুখের পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তাই ভাবলে সে একান্তে বসে বসে।

ইতিমধ্যে মেসো মশায়ের চিঠিতে জানা গেল যে, উইকহ্যাম শীঘ্রই লিডিয়াকে বিয়ে করে নিয়ে আরো উত্তরে সৈন্যবাহিনীতে গিয়ে যোগদান করবে। লিডিয়া তার আগে মা ও বোনেদের সঙ্গে দেখা করতে চায়। কত দিন চলে এসেছে বলে তার মন ভারী উতলা হয়ে উঠেছে বাড়ীর জন্যে। মেসো মশায় লিখে পাঠিয়েছেন যে, উইকহ্যামের পাওনাদারদের বিশেষ ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, শীগগিরই তারা পুরো টাকা মিটিয়ে পাবে। তিনি নিজে সে দায়িত্ব নিয়েছেন। যদি মিঃ বেনেটের মত হয় তবে ঐখানে গিয়ে এরা দু'জনে মিলিত হতে পারবে। বিয়ের ব্যবস্থাও সেখানে পাকা হবে।

মেয়ে-জামাই যে বিয়ের পর এখান থেকে দূরে চলে যাবে এটা মায়ের ভাল লাগল না। কিন্তু স্বামী ও অন্য মেয়েরা সেই ব্যবস্থাকেই সুবিধাজনক মনে করলেন।

গৃহত্যাগী লিডিয়া এ বাড়ীতে ফিরে আসবে এ কথায় প্রথমে কারুরই সায় ছিল না। কিন্তু জেন ও এলিজাবেথ দু'জনেই বাবাকে এটুকু বোঝালে যে, লিডিয়াকে আবার তাদের মধ্যে ফিরে পাওয়ার মধ্যে বরং সামাজিক মঙ্গল তাকে অস্বীকার করার চেয়ে। তা ভিন্ন বাপ-মা'র সামনেই তাদের বিয়ে হওয়া উচিত। মিঃ বেনেটও সে যুক্তি অস্বীকার করতে পারলেন না। মা খুসী হলেন এই ভেবে যে, পড়শীদের কাছে তিনি সাড়ম্বরে মেয়ে-জামাইকে উপস্থিত করতে পারবেন। সেই মত চিঠি গেল যে, যথাসম্ভব দ্রুত তারা শুভকর্ম সেরে যেন লঙবোর্ণে ফিরে আসে। গৃহে তাদের স্বাগত সম্ভাষণ অপেক্ষা করছে।

এলিজাবেথ এই ভেবে আশ্চর্য্য হোল যে, উইকহ্যামের মত লোক কি ভাবে এই বিবাহে সম্মত হয়েছে। অন্ততঃ তার মত পুরুষের সঙ্গে কথা কওয়া দূরের কথা, সে তার মুখদর্শন করতে চায় না।

একান্ন

বোনের বিয়ের দিন আসন্ন হয়ে এল। লিডিয়ার চেয়ে জেন আর এলিজাবেথ যেন ঢের বেশী উতলা হয়ে উঠল।

সহরে গাড়ী পাঠান হোল তাদের আনতে। সান্ধ্য-ভোজনের আগেই গাড়ী ফিরে আসার কথা। আজকের সম্মিলনীতে কি হবে এই আশংকায় বিশেষ করে জেন অধীর হোল। লিডিয়া যেন অপরাধিনীর মত বিচার-সভায় উপস্থিত হচ্ছে এই রকম ভাবতে লাগল সে।

অবশেষে গাড়ী এসে পৌছল। সমগ্র পরিবার প্রাতরাশ-কক্ষে অভ্যাগতদের স্বাগতম্ জানাতে সমবেত হলেন। গাড়ী দোর-গোড়ায় পৌছতেই মায়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাপের মুখে দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য। বোনেরা শংকিত—কণ্টকিত।

গাড়ীতে লিডিয়ার গলার আওয়াজ শোনা গেল। দরজা খুলে সে এক ছুটে বাড়ীর মধ্যে চলে এল। মা এগিয়ে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রাণখোলা আনন্দে আদর করলেন তাকে। উইকহ্যামের দিকেও সহাস্য মুখে হাত বাড়িয়ে দিলেন। মা এমন ভাবে

আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন, তাতে তাঁর মনের গভীর সুখই উপচে পড়তে লাগল।

মেয়ে বাপের দিকে ফিরল। কিন্তু তিনি মেয়ে-জামাইকে তেমন আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন না। তাঁর মুখে ফুটে উঠল রূঢ় কাঠিন্য। তিনি একটি কথাও কইলেন না। উইকহ্যাম লিডিয়া যে ভাবে পরস্পরের প্রতি অনুরাগের পরিচয় দিল এই ক'টি মুহূর্তে তাতেই বাপ অখুসী হলেন। এলিজাবেথও বিরক্ত হোল। এমন কি জেন পর্যন্ত অবাক হল। লিডিয়া এখনও ঠিক আগের মতই আছে। তেমনি লজ্জাহীন, অবাধ্য, বন্য কলরবময়ী দুঃসাহসী লিডিয়া। একের পর এক সে বোনেদের কাছে তার এই ভাগ্য-বিবর্তনের জন্য অভিনন্দন যাচ্ঞা করে ফিরতে লাগল। তার পর যে যার আসনে বসলে সে চারি দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে দেখল। কোথায় যেন সামান্য বদল হয়েছে তা ওর দৃষ্টি এড়াল না। শেষে মৃদু হেসে বললে—'অনেক দিন বাদে আবার এলুম।'

লিডিয়ার মত উইকহ্যামের মনে কিন্তু একটুও বেদনার রেখা ছায়াপাত করল না। উইকহ্যামের আচরণ এতই প্রীতি-মধুর যে, ওর বিয়ে যদি সুচারুতায় নিষ্পন্ন হোত, যদি কলংকের ছাপ না দাগ ফেলত ওর চরিত্রে—তা'হলে ওর হাসি, ওর স্মিত সম্ভাষণ সবাইকার মনোরঞ্জন করত সন্দেহ নেই। সে যে এত বেহায়া এ ধারণা ছিলই না এলিজাবেথের। বসে বসে সে প্রতিজ্ঞা করলে, ভবিষ্যতে আর সে কখনো কোন উদ্ধত পুরুষের ঔদ্ধত্যের শেষ সীমারেখা কোথায় টানতে চেষ্টা করবে না। তার মুখ আগুন হয়ে উঠল—জেনেরও। কিন্তু যা'র কথায় আচরণে তাদের মুখে রঙের রামধনু, সে অপরাধীর মুখে রঙের বিন্দু মাত্র বদল হোল না।

গল্প করার পুঁজির অভাব নেই। মা ও মেয়ের মধ্যে আরো তাড়াতাড়ি কথা বলার প্রতিযোগিতা চলতে লাগল। উইকহ্যাম বসেছিল এলিজাবেথের ঠিক পাশেই। সে সহজ ভাবে তার পরিচিতদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে লাগল। কিন্তু এলিজাবেথ তেমন সহজ সুরে উত্তর দিতে পারছিল না। উভয়েরই মনের মণিকোঠায় নানা স্মৃতি জমা হয়ে আছে। উইকহ্যামের সঙ্গে জড়ানো অতীতের কোন ঘটনাতেই বেদনার তন্ত্রীতে আঘাত পড়ে না। প্রাণ থাকতেও বোনেরা যে ঘটনার ইংগিত পর্যন্ত করত না লিডিয়া নিজেই তার সূত্রপাত করল।

—'তিন মাস আগে, যেদিন চলে যাই সেদিনকার কথা ভাবছি। মনে হচ্ছে যেন এই তো দিন পনেরো আগের ঘটনা। কিন্তু ঐ সময়টুকুর মধ্যে কত কিছুই না ঘটে গেল। আমি যখন চলে যাই, ফিরে আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বিয়ের কথা একবারও ভাবিনি। অবশ্য বিয়ে যদি হোত, ভারী মজা হোত এ কথাও ভেবেছিলাম একবার।'

বাবা চোখ তুলে তাকালেন লিডিয়ার দিকে। জেন বিব্রত বোধ করতে লাগল—এলিজাবেথও সাগ্রহে তাকাল লিডিয়ার দিকে। কিন্তু সে তো এমন কিছু শোনেনি বা দেখেনি যা তার নিকট দুর্বোধ্য হতে পারে। নিজের খুশীতেই বলে চলল সে—'আচ্ছা মা, এখানকার সবাই জানে কি যে আমার বিয়ে হয়েছে? হয়তো জানেই না। উইলিয়াম গাউল্ডিংয়ের গাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় ভাবলুম ওকে জানাতেই হবে আমার বিয়ের কথাটা। তাই হাতটা এমন ভাবে রাখলুম জানলার উপর যাতে বিয়ের আংটিটা ওর নজরে পড়তে পারে। নমস্কারও জানালুম।'

এলিজাবেথের কাছে এ বাচালতা অসহ্য বোধ হতে লাগল। সে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আর ফিরে এল না যতক্ষণ না তাদের খাবার-ঘরের দিকে যাওয়ার শব্দ পেল। উৎকণ্ঠিত চিত্তেই সে আবার তাদের দলে যোগ দিল। দাঁড়াল এসে ঠিক মায়ের পাশ ঘেঁসে। মা জেনকে বললেন,—'মা জেন, এবার তুমি পিছনে যাও তোমার জায়গা আমায় ছেড়ে দিয়ে। তুমি আইবুড়ো কি না।'

সবাই ভেবেছিল যে, এই নবলব্ধ অভিজ্ঞতায় লিডিয়ার মুখরতা বেড়েছে মাত্র। ধীরে ধীরে তা কমবে। কিন্তু তা তো হোলই না, বরং তার বাচালতা বেড়েই চলল। সে মিসেস্ ফিলিপস্, লুকাসদের ও পাড়াপড়শী সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠল। সবাই তাকে উইকহ্যামের বৌ বলুক এই যেন চায় সে। ডিনারের শেষে সে বাড়ীর দাস-দাসীদের বিয়ের আংটি দেখাতে গেল—তাদের কাছে বিয়ের ব্যাপার নিয়ে খুব গর্ব প্রকাশ করলে।

খাবার-ঘরে আবার সবাই ফিরে এলে লিডিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করল—'আচ্ছা মা, ওকে তোমার কেমন লাগল বল তো? বোনেরা যে আমার স্বামি-ভাগ্যে ঈর্ষা করবে সন্দেহ নেই। আমার সৌভাগ্যের অর্ধেকও যেন ওদের কপালে জোটে এই আমার কামনা।'

—'সবই সত্যি। কিন্তু মা লিডিয়া, তোমার মতিগতি আমার একটুও ভাল মনে হয়নি।'

—'কী যে বল, মা! আছে কি এতে? আমার বাপু ভালই লেগেছে। তুমি, বাবা ও বোনেরা আমার শ্বশুরবাড়ী এস—শীতটা আমরা নিউ ক্যাসেলে থাকব। বল-নাচ হবে···ওদের প্রত্যেকের জন্য নাচের সঙ্গী জুটিয়ে দেব।'

—'তাতে আমার আপত্তি নেই।'

—'ফিরে আসবার সময় বোনেদের দু'-এক জনকে রেখে যেয়ো। হলফ করে বলতে পারি, শীত শেষ হবার আগেই ওদের বর জুটিয়ে দেব।'

—'আমার তরফ থেকে তোমায় ঔদার্যের জন্য ধন্যবাদ'—বললে এলিজাবেথ—'আমি বিশেষ করে তোমার মত বর জোটানোর পদ্ধতি অপছন্দ করি।'

অতিথিরা দশ দিনের বেশী কেউ থাকবে না লংবোর্ণে। লণ্ডন ত্যাগের আগেই উইকহ্যাম কমিশন পেয়ে গেছে। পক্ষকাল পরেই তাকে সৈন্যবিভাগে যোগ দিতে হবে।

তারা বড় তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে এই নিয়ে মা শুধু মন-খারাপ করলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মেয়েকে নিয়ে এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং বাড়ীতেও হামেশাই পার্টির আয়োজন করেছেন।

উইকহ্যামের প্রতি লিডিয়ার ভালবাসার মত লিডিয়ার প্রতি উইকহ্যামের আন্তরিকতা তত গভীর মনে হোল না এলিজাবেথের। সেও যেন এমনি অনুই করেছিল।

উইকহ্যামকে লিডিয়া সত্যিই ভালবেসেছে প্রাণ ভরে

কারুর সঙ্গেই উইকহ্যামের তুলনা হয় না—সে যা করে সবই সুন্দর লিডিয়ার চোখে।

লংবোর্ণে আসার পর এক দিন দিদিদের সঙ্গে গল্প করতে করতে লিডিয়া বলল এলিজাবেথকে—'তোকে বোধ হয় আমার বিয়ের গল্প বলা হয়নি। মায়ের কাছে যখন গল্প করছিলাম তুই ছিলি না সেখানে। কেমন করে বিয়েটা হোল শুনতে তোর কৌতূহল হয় না?'

—'একটুও না'—বললে এলিজাবেথ—'এ সম্বন্ধে যত কম বলা হয় ততই ভাল।'

'তুই ভারী অদ্ভুত। তবুও আমি বলব তোকে। আমাদের বিয়ে হয়েছে সেণ্ট ক্লিমেণ্ট গীর্জায়। কারণ উইকহ্যামের বাড়ী ঐ পাড়াতেই। ঠিক হোল এগারটার মধ্যে সবাই সেখানে উপস্থিত হব। মেসো-মাসী আর আমি যাব একসঙ্গে—সেখানে অন্য সবাই মিলিত হবে আমাদের সাথে। সোমবারের সকাল এল। মহা ব্যস্ততা—এমন ভয় করছিল আমার! একটা বিরাট কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আমি খুবই মুশড়ে পড়তাম কিন্তু মাসী সব সময় আমার সঙ্গে ছিলেন। সাজছিলুম যখন তখনও। এটা-ওটা নানা উপদেশ দিতে লাগলেন। কথা বলছিলেন যেন ধর্মোপদেশ পড়ে শোনাচ্ছিলেন। কিন্তু দশটির মধ্যে একটি কথা হয়তো আমার কানে ঢুকছিল, কারণ আমার মন তখন উইকহ্যামের চিন্তায় বিভোর। আমার তখন ভারী জানতে ইচ্ছা হচ্ছিল, ও বিয়ের সময় সেই নীল কোটটা গায়ে দিয়ে আসবে কি না।

দশটায় আমরা প্রাতরাশ খেলাম। খাওয়ার পর্ব যেন আর শেষ হতে চায় না। মেসো-মাসী আমার প্রতি ভারী অসন্তুষ্ট ছিলেন। বিশ্বাস কর, এক পক্ষকাল যত দিন ছিলাম সেখানে এক দিনও ঘরের বার হইনি। কোন পার্টিতে না—কোথাও না। লণ্ডন যেন একটু ফাঁকা-ফাঁকা। গাড়ী এলে মেসো কাজ শেষ করে ফেলবার জন্য বেরিয়ে গেলেন। আমার এত ভয় হচ্ছিল যে কি করব ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছিলাম না; মেসোই আমাকে সম্প্রদান করবেন। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে সারা দিনে আর বিয়েই হবে না। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন তিনি। তার পর আমরা যাত্রা করলুম। যাই হোক, পরে মনে হয়েছে বিয়ের সময় তিনি যদি না আসতে পারতেন, ডার্সিই সম্প্রদান করত।

'ডার্সি'—বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করল এলিজাবেথ।

—'হ্যাঁ, তারই তো উইকহ্যামকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবার কথা ছিল। ও যাঃ। বড্ড ভুল হয়ে গেল। এ সম্বন্ধে একটি কথাও বলা উচিত হয়নি আমার। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। উইকহ্যামই বা কি বলবে? খবরটা খুবই গোপনীয়।'

—'গোপনীয় যদি হয় আর একটি কথাও বলো না'—বললে জেন—'আমরাও জিজ্ঞেসা করব না কোন কথা।'

—'নিশ্চয়—নিশ্চয়। কোন প্রশ্নই করব না আমরা'—যদিও এলিজাবেথ কৌতূহলে পীড়িত হচ্ছিল।

—'তোমরা চাপ দিলে আমাকে অবশ্যই বলতে হবে। কিন্তু উইকহ্যাম শুনলে ভারী রাগ করবে।'

এলিজাবেথ তার অদম্য কৌতূহল দমন করতে ছুটে পালাল সেখান থেকে। এ সম্বন্ধে অন্ধকার জগতে বাস করা অসম্ভব তার পক্ষে। অন্ততঃ কোন সংবাদ আহরণের চেষ্টা থেকে বিরত থাকা সত্যিই অসম্ভব। ডার্সি তার বোনের বিয়েতে উপস্থিত ছিল! এমন বিবাহ-উৎসবে যোগ দিতে সে কোন দিনই রাজী হবে না। নানা উদ্ভট কল্পনা দ্রুত তার মস্তিষ্কে ভিড় পাকাতে লাগল। কিন্তু কোন কল্পনাতেই খুসী হতে পারল না সে। এই অনিশ্চয়তা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারল না। তাড়াতাড়ি কাগজ নিয়ে মাসীকে ছোট একখানা চিঠি লিখল লিডিয়া যা বলেছে তার অর্থ জানতে চেয়ে।

—'তুমি তো সহজেই বুঝতে পার'—লিখল এলিজাবেথ—'যে লোকের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং মূলতঃ যে অপরিচিতই আমাদের পরিবারে—সে কি ভাবে এই সময়ে এই বিয়ের ব্যাপারে উপস্থিত থাকতে পারে সে-সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানতে কৌতূহল আমার কত? দয়া করে তাড়াতাড়ি পত্রোত্তর দিও যাতে সব-কিছু পরিষ্কার হয় আমার নিকট—তা না হলে অজ্ঞাত জগতেই বাস করতে হবে। এবং এই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে আমাকে।'

চিঠি শেষ করল সে এই মন্তব্য লিখে—'মাসি, যদি তুমি সম্মানজনক পন্থায় না জানাও সকল ঘটনা, আমাকে ছলা-কলার স্মরণ নিতে হবে।'

জেনের সূক্ষ্ম সম্মানবোধ লিডিয়া যা বলল সে-সম্বন্ধে এলিজাবেথকে কোন প্রশ্ন করার অন্তরায় হবে। এলিজাবেথ খুসীই এতে। যত দিন না নিজের কৌতূহলের সদুত্তর পাচ্ছে তত দিন সে দু'কান করবে না মনের কথা। [ক্রমশঃ।

—অনুবাদক : শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

বলবিদ্যার জনক গ্যালিলিও, আবার দূরবীণের আবিষ্কর্তাও তিনি। অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যই তিনি বার করেছিলেন, কিন্তু সব গুছিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম লেখেন নিউটন,

গ্যালিলিওর অনেক পরে। আলোক-বিজ্ঞান সম্পর্কেও তিনি অনেক নতুন কথা আবিষ্কার করেন, তা ছাড়া কয়েকটি আনুষঙ্গিক যন্ত্রও তৈরী করান। চিত্রে তাঁর সময়কার একটি দূরবীণ দেখান হয়েছে। দূরবীণ দুই প্রকারের—প্রতিফলক (Reflecting) এবং প্রতিসরক (Refracting). এই চিত্রটি প্রতিফলক দূরবীণের।
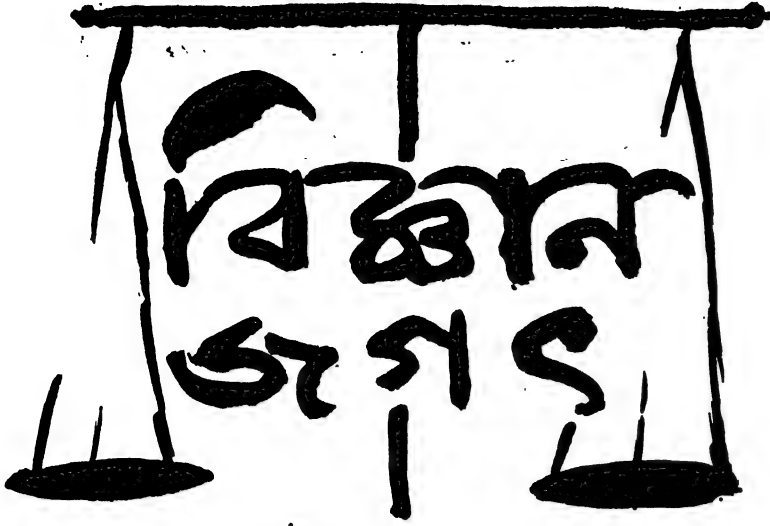
এ্যাটম

শ্রীযামিনীমোহন কর

শক্তি ও বিকিরণ

ম্যাক্সওয়েল দেখিয়েছিলেন যে, আলোকের তরঙ্গবাদের সঙ্গে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ ও বিকিরণের বেশ মিল আছে। কিন্তু এই মিল থেকেই এল গরমিল। কালো রঙের পৃষ্ঠ শোষণ ও বিকিরণ অন্য রঙের পৃষ্ঠাপেক্ষা বেশী করে। বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও তাপের জন্য প্রায় আদর্শ কালো পৃষ্ঠের বিকিরণ শক্তি পরীক্ষামূলক ভাবে মাপা হ'ল। দেখা গেল যে, কোন এক নির্দ্দিষ্ট টেম্পারেচারে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের জন্য বিকিরণ শক্তি বিভিন্ন হয় এবং কোন এক নির্দ্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের জন্য বিকিরণ শক্তির বৃহত্তম মান চরম উষ্ণতার সঙ্গে বিপরীত অনুপাতে থাকে। এর নাম হ'ল ওয়েনের সূত্র। (চরম উষ্ণতা সাধারণ সেণ্টিগ্রেড স্কেলের উষ্ণতার সঙ্গে 273° যোগ করলে পাওয়া যায়)। আবার ষ্টিফান-বোলজ্‌মানের সূত্র থেকে পাওয়া যায় যে, কালো পৃষ্ঠের মোট শক্তির হার চরম উষ্ণতার চতুর্থ ঘাতের সঙ্গে সরল ভেদে থাকে। এই গরমিলের একটা সন্তোষজনক উত্তর দেবার জন্য ওয়েন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এবং লর্ড র‍্যালে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষা চালান। কিন্তু ওয়েনের সমীকরণ কেবল কম উষ্ণতা অর্থাৎ ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের জন্য খাটল আর র‍্যালের সমীকরণ কেবল বেশী উষ্ণতা বা বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হ'ল। অর্থাৎ গরমিল থেকেই গেল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ পদার্থবিদ্‌ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক যুগান্তকারী তথ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করলেন। ওয়েন এবং র‍্যালে উভয়েই বলেছিলেন যে, কালো পৃষ্ঠকে নির্দ্দিষ্ট শোষণ বা বিকিরণের আবৃত্তির সঙ্গে অনুরূপ ভাবে কাঁপছে মনে করা যায়। তাঁরা বলেন যে, যেহেতু বিকিরণ তরঙ্গের ধর্ম্মসম্পন্ন, সুতরাং তা অবিচ্ছিন্ন ভাবে হতে পারে। প্ল্যাঙ্কও কম্পনের কথা মেনে নিলেন কিন্তু আপত্তি জানালেন বিকিরণের অবিচ্ছিন্নতায়। তিনি বললেন যে, কোন বস্তু থেকে নির্গত বা তার দ্বারা শোষিত শক্তির বিকিরণ একটি বিশেষ রাশির (কোয়াণ্টাম) অখণ্ড গুণনীয়ক। এর মান নির্ভর করে পৃষ্ঠের কম্পনের আবৃত্তির ওপর। অর্থাৎ শক্তি অবিচ্ছিন্ন ভাবে বদলায় না, লাফিয়ে লাফিয়ে বদলায়। কারণ তার মান সব সময় কোয়াণ্টামের অখণ্ড গুণনীয়ক হয়, এক, দুই, তিন ইত্যাদি, ভগ্নাংশ হতে পারে না। এই তথ্যের নাম হ'ল কোয়াণ্টামবাদ। যদি n আবৃত্তির বিকিরণের শক্তি E কোয়াণ্টাম হয়, তবে $E = nh$ যেখানে h একটি ধ্রুব রাশি, যাকে সাধারণত প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক বলা হয়। তাহ'লেই দেখা যাচ্ছে যে, শক্তির কোয়াণ্টাম আবৃত্তির সমানুপাতিক। আবার $n = c/\lambda$, যেখানে C আলোর বা বিকিরণের বেগ এবং λ তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। সুতরাং $E = hc/\lambda$.

h যে প্রকৃত পক্ষে কি বস্তু তা এখনও সঠিক ভাবে নির্ণীত হয়নি। এর মান $6{\cdot}62 \times 10^{-27}$ আর্গ-সেকেণ্ড, যদি একক সমূহ গ্রাম, সেণ্টিমিটার সেকেণ্ডে প্রকাশ করা হয়।

এখন পর্য্যন্ত বিকিরণকে তরঙ্গ মনে করা হচ্ছিল কিন্তু আবার এক হাঙ্গামা বাধল। রঞ্জন-রশ্মি যে গ্যাসের মধ্যে দিয়ে যায়, তাকে আয়নিত করে। অর্থাৎ গ্যাসের অণু-পরমাণুকে ইলেকট্রোনে ভেঙ্গে দেয়। কিন্তু বিকিরণ শক্তির পরিমাণের তুলনায় পৃথকীভূত আয়নের সংখ্যা অত্যন্ত কম। যদি এক্স-রে তরঙ্গের মত চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ত, তবে চতুর্দ্দিকের গ্যাসের অণু-পরমাণু ইলেকট্রোনে ভেঙ্গে যেত,- ফলে অনেক আয়ন উৎপন্ন হত। কিন্তু তা তো হয় না। মাত্র বিশেষ কয়েকটা আয়ন উৎপন্ন হয়। এর কারণ কি? ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আবার লেনার্ড দেখালেন যে, তড়িতালোক (photoelectric) প্রভাবে কোন ধাতু থেকে নির্গত ইলেকট্রোনের শক্তি বিকিরণের প্রখরতার ওপর নির্ভর করে না। এই রহস্য ভেদ করলেন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জগদ্বিখ্যাত জার্ম্মাণীর বৈজ্ঞানিক এলবার্ট আইনষ্টাইন। তিনি প্ল্যাঙ্কের তথ্য মেনে নিয়ে বললেন যে, সেই সঙ্গে আরও একটা কথা বলা দরকার। বিকিরণ শূন্যের মধ্যে দিয়ে নির্দ্দিষ্ট কোয়াণ্টা বা ফোটনে আলোর বেগের সঙ্গে এগিয়ে যায়। এতে রহস্যের সমাধান হ'ল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তরঙ্গবাদের মূলে পড়ল প্রচণ্ড আঘাত। আবার সেই পুরানো নিউটনের কণাবাদের মত একটা তথ্য খাড়া হ'ল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ বৈজ্ঞানিক কম্পটন পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণ করে দিলেন যে, আইনষ্টাইনের কথাই ঠিক। বিকিরণের ধর্ম্ম তরঙ্গ নয়, ফোটন। তিনি দেখালেন যে, কার্ব্বন (অঙ্গার) বা ঐ জাতীয় কোন কম আণবিক ওজনের পদার্থের ওপর এক্স-রে ফেললে বিকিরণের মধ্যে আপতিত এক্স-রে অপেক্ষা বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দেখা যায়। তার মানে কার্ব্বন পরমাণুর ইলেকট্রোনের সঙ্গে এক্স-রে'র কোন রকম প্রতিক্রিয়ার ফলে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। এর নাম হ'ল কম্পটন পরিণাম (effect)। যদি আপতিত এক্স-রে'র আবৃত্তি n হয়, তবে তার কণাসমূহের শক্তি hn. অনেকটা দু'টো স্থুল গোলকের ধাক্কাধাক্কির মত। কার্ব্বনের অণু-পরমাণুর সঙ্গে এক্স-রে ফোটনের ধাক্কাধাক্কির ফলে আয়ন সৃষ্টি হয়। তরঙ্গগতি হলে অনেক বেশী আয়ন তৈরী হত, কিন্তু এ ভাবে প্রয়োজন মত ধাক্কা সব সময় সম্ভব হয় না বলে কম আয়ন উৎপন্ন হয়। এইবার অবস্থা দাঁড়াল খুব গোলমেলে। আবর্ত্তন এবং প্রতিবন্ধকের জন্য বিকিরণকে তরঙ্গবাদ মানতে হবে, আবার তড়িতালোক এবং কম্পটন পরিণামের জন্য বিকিরণকে কণাবাদ বা নির্গমবাদ মানতে হবে। ১৯২৩

খৃষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক ডি ব্রগলি বললেন যে, বিকিরণকে দ্বৈত-ধর্ম্মী মনে করা উচিত। বিকিরণকে তরঙ্গ-কণা বলা যায়। যদি কোন কণার ভর m এবং বেগ v হয়, আর যদি তার তরঙ্গগতির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য λ ধরা হয়, তবে $\lambda = h/mv$, যেখানে h প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক। বিকিরণের ক্ষেত্রে বেগ আলোর বেগের সমান হবে।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাইসেনবুর্গ আণবিক বোমার নির্ম্মাণ সম্পর্কে পরীক্ষা করতে করতে এক যুগান্তকারী সূত্র বার করেন। তিনি বলেন যে, তরঙ্গ-কণার দ্বৈতধর্ম্ম প্রকৃতির নিয়মের একটা দিক মাত্র। সব দিক না জানলে সঠিক কোন উত্তর দেওয়া যায় না। এর নাম হ'ল অনিশ্চয়তা সূত্র। ভীষণ জটিল। সহজ ভাবে বলা যায় যে, যুগপৎ কোন কণার অবস্থান এবং ভর-বেগ বা শক্তি নির্ণয় করা অসম্ভব। ইলেকট্রোনের কথা ধরা যাক্। গামা-রশ্মির (ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য) বিকিরণের সাহায্যে আলোকিত করে খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ দিয়ে হয়ত ইলেকট্রোনের অবস্থান নির্ণয় করা গেল কিন্তু ভর-বেগ নির্ণয় করা অসম্ভব, কারণ উভয়ের ধাক্কাধাক্কির ফলে (কম্পটনের পরিণাম) ভর-বেগ বদলে যাবে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে, ভর-বেগ ইত্যাদি নিশ্চয়ই নির্ণয় করা যাবে। যদি ইলেকট্রোনে তরঙ্গ-ধর্ম্ম আরোপ করা যায় তবে জাফরীর সাহায্যে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বার করে ভর-বেগ নির্ণয় করা যাবে (ব্রগলির সূত্র দিয়ে)। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে তা করা সম্ভব নয়। কারণ আবর্ত্তনের জন্ম ইলেকট্রোনের গতির অভিমুখ বদলে যাবে, সুতরাং তখন অবস্থান নির্ণয় করা যাবে না। দু'টো জিনিষ কিছুতেই যুগপৎ নির্ণয় করা যায় না। পরীক্ষার দোষ নয়, এই প্রকৃতির নিয়ম। দেখা যাচ্ছে যে, অবস্থান নির্ণয়ের সময় ইলেকট্রোনকে কণা মনে করা হচ্ছে, আবার ভর-বেগ নির্ণয়ের সময়ে তাকে তরঙ্গ-ধর্ম্মী ধরা হচ্ছে। জড় বা বিকিরণ, প্রকৃতির সকল ক্ষেত্রেই এই দ্বৈতধর্ম্ম প্রযোজ্য। একটা অপরটার পূরক, বিপরীত নয়।

এইখানে একটা প্রশ্ন মনে জাগতে পারে। কণাবাদের ওপর নির্ভর করে চলিত বলবিদ্যার উদ্ভব হয়েছে। ভূ এবং নভঃপৃষ্ঠের সকল ক্ষেত্রেই এই বলবিদ্যার প্রয়োগে সঠিক ফলাফলই পাওয়া গেছে এবং যুগপৎ অবস্থান ও ভর-বেগ নির্ণয় করাও সম্ভব হয়েছে। তবে হাইসেনবুর্গের অনিশ্চয়তা সূত্র কি এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়? এর উত্তরে বলা যায় যে, এই সূত্র সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কিন্তু পরিমেয় বস্তুর জন্ম এর প্রভাব এতই অল্প যে, তা অগ্রাহ্য। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ইলেকট্রোনের ক্ষেত্রে চলিত বলবিদ্যা প্রয়োগ করা যাবে না। সেই জন্ম এক নতুন বলবিদ্যার প্রয়োজন। এর নাম দেওয়া হয়েছে তরঙ্গ বলবিদ্যা (wave mechanics) বা কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা। প্রথম রূপদান করেন অষ্ট্রিয়ার বৈজ্ঞানিক শ্রডিঙ্গার ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে। অত্যন্ত জটিল গণিতে ভরা। এই ভাবে কিছুটা বোঝান যেতে পারে। অনিশ্চয়তা সূত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নির্দিষ্ট ভরবেগ বা শক্তিসম্পন্ন কোন কণার অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তবে পরিসংখ্যক ভাবে সম্ভাব্য অবস্থান নির্ণয় করা যায়। আরও জানা আছে যে, কণাসমূহ তরঙ্গের ধর্ম্ম মানে। তরঙ্গ বলবিদ্যা তরঙ্গগতি ও পরিসংখ্যক সম্ভাব্যতার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে। কিন্তু এই নতুন বিদ্যা যে কি, তা কেউ সঠিক এখনও বলতে পারেননি। অথচ এর সাহায্যে বহু জটিল প্রশ্নের সমাধান হয়েছে, সুতরাং এর নির্ভুলতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ এক ভারী মজার ব্যাপার!

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আলোর তরঙ্গবাদ স্বীকৃত হয়। তখন কথা উঠল যে, তরঙ্গের গতির জন্ম মাধ্যমের দরকার, যেমন জলে ঢেউ। জল না থাকলে ঢেউ হবে না। বাতাসে শব্দতরঙ্গ। বাতাস না থাকলে শব্দ শোনা যাবে না। তেমনি আলোক-তরঙ্গের গতির জন্ম একটা কোন মাধ্যমের প্রয়োজন। এই মাধ্যম বায়ু হতে পারে না, কারণ পৃথিবী থেকে কিছু দূরে গেলে আর বায়ুর অস্তিত্ব নেই। অথচ চন্দ্র, সূর্য্য, তারকারাজি থেকে পৃথিবীতে আলো আসছে। তাই বৈজ্ঞানিকেরা একটা আলোবাহী মাধ্যম কল্পনা করে নিলেন, যা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে আছে আর তার নাম দিলেন ঈথার। কিন্তু এটা যে কি জিনিষ তা কেউ বোঝাতে পারলেন না। অথবা সত্যই ঈথার আছে কি না, তাও কেউ প্রমাণ করতে পারলেন না। জ্যোতিষ্ক বিদ্যার বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে সাব্যস্ত হ'ল যে, পৃথিবী, সূর্য্য, তারকাদির যে গতি, তা তখনই সম্ভব হতে পারে, যদি এই ঈথারকে নিশ্চল মনে করা যায়। যদি তা হয় তবে আলোর বেগ থেকে পৃথিবীর চরম দ্রুতি নির্ণয় করা সম্ভব। মনে কর, স্থির ঈথারের মধ্য দিয়ে পৃথিবী চলেছে ঘণ্টায় v মাইল চরম দ্রুতি সহ, এবং আলোর বেগ ঘণ্টায় c মাইল; তবে উভয় এক দিকে গেলে আপেক্ষিক আলোর বেগ হবে $c+v$ এবং বিপরীত দিকে গেলে হবে $c-v$. তাহ'লে l দূরত্ব যাওয়া-আসা করতে আলোর সময় লাগবে $l/(c+v)+l/(c-v)=2cl/(c^2-v^2)$. এইবার মনে কর, আলো এবং পৃথিবীর চরম দ্রুতির অভিমুখ পরস্পরের ওপর লম্ব। তবে l দূরত্ব লম্ব দিকে যেতে প্রকৃতপক্ষে বাঁকা ভাবে $lc/\sqrt{(c^2-v^2)}$ দূরত্ব আলোকে অতিক্রম করতে হবে। আবার ফেরবার সময়ও ঐ দূরত্ব। আলোর চরম বেগ c; সুতরাং এবার যাওয়া-আসা করতে আলোর সময় লাগবে $2l/\sqrt{(c^2-v^2)}$.

এই দুই সময়ের অনুপাত $= \dfrac{2lc}{c^2-v^2} \cdot \dfrac{\sqrt{(c^2-v^2)}}{2l} = \dfrac{1}{\sqrt{(1-v^2/c^2)}}$.

পরীক্ষা দ্বারা এই অনুপাত নির্ণয় করা যায়। আলোর বেগ c জানা আছে, সেকেণ্ডে 186264 মাইল বা 3×10^{10} সেণ্টিমিটার (প্রায়)। সুতরাং পৃথিবীর চরম দ্রুতি v নির্ণয় করা সম্ভব।

এই হিসেবের ওপর নির্ভর করে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মাইকেলসন জার্ম্মাণীতে পরীক্ষামূলক ভাবে পৃথিবীর দ্রুতি নির্ণয় করেন, কিন্তু যা ফল পেলেন তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি অবিশ্বাস্য। তিনি ওহাইওতে মর্লি নামক অপর এক জন বৈজ্ঞানিককে সঙ্গে নিয়ে আবার সেই পরীক্ষাটা করলেন, আবার সেই অদ্ভুত ফল পেলেন। পৃথিবীর দ্রুতি বার হল শূন্য অর্থাৎ পৃথিবী ঈথারের মধ্যে গতিহীন। যত বার যত দিক দিয়ে পরীক্ষা করেন সেই একই উত্তর। কিন্তু পৃথিবী যে গতিহীন নয় তা সকলেই জানে। সুতরাং ঠিক হ'ল যে, পৃথিবী ঈথারকে সঙ্গে নিয়ে যায়, অর্থাৎ ঈথার নিশ্চল নয়। পূর্ব্বে ঈথারকে নিশ্চল ধরা হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক জগতে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল।

এর সমাধান করতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এগিয়ে এলেন আইরিশ বৈজ্ঞানিক ফিজজেরাল্ড। তিনি বললেন যে, ঈথার নিশ্চলই থাকে,

তবে পৃথিবীর দ্রুতির অভিমুখে কোন জিনিষ চলতে থাকলে সেটা সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এই সঙ্কোচ ধরা সম্ভব নয়, কারণ যে যন্ত্র দিয়ে মাপা হবে তাও তো সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। এই সঙ্কোচের পরিমাণ হ'ল $\sqrt{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}$.

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, ইলেকট্রোনের ভর গতির সঙ্গে বদলায়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কফম্যান প্রথম বিটা কণার আপেক্ষিক আদান e/m মাপেন। পরে ১৯০৮ সালে বুকারার ও ১৯১০ সালে হুপকা পুনরায় e/mএর মান নির্ণয় করেন। তাঁরা দেখালেন যে, যতক্ষণ ইলেকট্রোনের বেগ আলোর বেগের দশমাংশ বা তদপেক্ষা কম থাকে, ততক্ষণ e/mএর মান প্রায় ধ্রুব থাকে। কিন্তু বেগ আরও বর্দ্ধিত হলে আপেক্ষিক আদানের মানও বর্দ্ধিত হয়। যেহেতু কণার আদান e গতির ওপর নির্ভর করে না অর্থাৎ সব সময় ধ্রুব থাকে, সুতরাং সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, দ্রুতি বাড়লে ইলেকট্রোনের ভরও বৃদ্ধি পায়। এই সম্পর্ক নির্ণয় করেন বিখ্যাত ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক লরেঞ্জ, জটিল গণিত শাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে। মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে যে, যদি স্থিরাবস্থায় ইলেকট্রোনের ব্যাসার্দ্ধ (গোলকরূপী ধরে) r_0 হয়, তবে v বেগসম্পন্ন অবস্থায় ব্যাসার্দ্ধ হবে $r_0 (1 - v/c)$. যেহেতু গোলকরূপী ইলেকট্রোনকে তড়িচ্চুম্বকীয় ধর্ম্মী ধরা যেতে পারে, সুতরাং তার ভর ব্যাসার্দ্ধের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে থাকে। অতএব যদি স্থির বা অল্প বেগসম্পন্ন অবস্থায় ইলেকট্রোনের ভর m_0 হয় এবং v বেগসম্পন্ন অবস্থায় m হয়, তবে $m \; m_0 / (1 - v/c^2)$.

লরেঞ্জ যে কথা কেবল ইলেকট্রোনের জন্য বললেন, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বের সাহায্যে দেখালেন যে, সে কথা সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রত্যেক পদার্থের—আদান যুক্ত হোক বা নাই হোক, তার ভর তড়িচ্চুম্বকীয় ধর্ম্মী হোক বা নাই হোক—ভর বেগের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। দেখতে পাই না কেন? কারণ আলোর বেগের তুলনায় সাধারণত পদার্থের দ্রুতি অত্যন্ত কম। মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বললেন যে, ঈথারের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন কারণ বা প্রয়োজন নেই। এইখানে তিনি বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের কথা বলেন। তাতে দু'টো সূত্র আছে, যা বিনা প্রমাণে মেনে নিতে হয়। প্রথম, চরম গতি নির্ণয় করা অসম্ভব; দ্বিতীয়, আলোর বেগ চিরকাল ধ্রুব থাকে, আলোর উৎসের বা দর্শকের গতির ওপর নির্ভর করে না। ফিজ্‌জেরাল্ডের সঙ্কোচের সূত্রানুসারে মাপবার যন্ত্র সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং পৃথিবীতে মাপা দৈর্ঘ্য এবং সময়ের একক ধ্রুব বা চরম নয়, আপেক্ষিক মাত্র। আইনষ্টাইন বললেন যে, ভরের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। বেগসম্পন্ন ভরকে তিনি নাম দিলেন আপেক্ষিক ভর। যদি কোন পদার্থের m_0 স্থৈতিক এবং m আপেক্ষিক ভর হয়, তবে v দ্রুতি হলে $m = m_0 (1 - v^2/c^2)^{-1/2} = m_0 + \frac{\frac{1}{2} m_0 v^2}{c^2}$.

এখন $\frac{1}{2} m_0 v^2$ হ'ল পদার্থটির গতীয় শক্তি। তা'হলেই দেখা যাচ্ছে যে, ভরের বৃদ্ধি = গতীয় শক্তি/(আলোর বেগ)^2. কিন্তু আলোর বেগ ধ্রুবক। সুতরাং ভরের বৃদ্ধি গতীয় শক্তির সঙ্গে সরল ভেদে থাকে। এর নাম আইনষ্টাইনের ভরশক্তি সমীকরণ, $E = mc^2$. এ কথার আভাস বেদেও আছে, যেখানে জড়কে শক্তির একটা রূপ বলা হয়েছে। যেহেতু c^2 ভীষণ রকম বড়, সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অত্যন্ত সামান্য একটা ভর থেকে প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হতে পারে। এই হ'ল আণবিক বোমার মূল রহস্য। [ক্রমশঃ।

"বাঙ্গলার অধিবাসীদিগকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে ব্যুৎপন্ন করার আশা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রসরতর করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। * * ইহাদের নিমিত্ত সরল সুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার করিয়া পাঠ-লিপ্সার সৃষ্টি করিতে হইবে। জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতে হইবে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে অল্পমূল্যের গ্রন্থ প্রচার করিতে হইবে। সেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও মানবশরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সহজ ও চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ থাকিবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার করিতে হইবে। নীতি প্রভৃতি উপদেশসূচক গ্রন্থ প্রচারও অতি প্রয়োজনীয়, ইহাতে সমাজের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। এই সকল প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত সহজ ও সরল সাহিত্য প্রচার অতি আবশ্যক।"

—মহামতি হড্‌সন প্র্যাট্।

চর্যাপদে লৌকিকতা

অবন্তী সান্যাল

১

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন * চর্যাপদগুলি সাহিত্য-বিচারে অকিঞ্চিৎকর হলেও নানা কারণে আমাদের কাছে অতিশয় মূল্যবান। শিক্ষিত সমাজের সৃষ্ট কাব্য-সাহিত্য ও রাজন্যবর্গের শিলালিপি, অনুশাসন প্রভৃতি থেকে ইতিহাসের যে উপাদান আমরা সংগ্রহ করি তাতে, যারাই চিরকাল সমাজের সংখ্যাগুরু তাদের সংবাদ প্রায়ই বিশেষ ক'রে অনুপস্থিত থাকে। অথচ এই ইতর-সাধারণের জীবন-যাত্রার সংবাদ না জেনে ইতিহাস জানার চেষ্টাটাই নিরর্থক। চর্যাপদগুলিতে আমরা এই ইতর-সাধারণ সম্পর্কেই বেশ কিছুটা সংবাদ পাই। হাজার বছরের আগেকার বাংলা দেশের এক শ্রেণীর মানুষের জীবনাচরণের খণ্ড খণ্ড চিত্র, তাদের মনোবৃত্তি ও রূপদৃষ্টির চিহ্ন পাওয়া যায় এই পদগুলিতে। কেবল তাই নয়, এ-ও চোখে পড়ে যে, এদের ভাব, ভাষা, সুর ও চিত্রগুলি (image) ইতিহাসের স্থান ও কালের একটা বিশেষ পরিবেশের মধ্যেই থমকে দাঁড়িয়ে থাকেনি, দীর্ঘ হাজার বছরের ক্রমবিবর্তিত বাঙ্গালীর মানসপটে এরা জাগ্রত থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত একটা ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।

চর্যাগুলি যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁদের সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ-সহজিয়া মতের সাধক বা সিদ্ধাচার্য। সমাজের মধ্যে বিচরণ করলেও সমাজ ছিল তাঁদের কাছে অগ্রাহ্য; নরনারীর যৌনাচরণ আলোচ্য বিষয় হ'লেও যৌনাচার তাঁদের কাছে ছিল পরিত্যাজ্য। তাঁদের অভাব ছিল সমাজ-বোধের। তাঁরা যা কিছু বর্ণনা করেছেন—তা সে যৌনাচরণই হ'ক আর দাবাখেলা বা হরিণ-শিকারই হ'ক—সবই রূপক অথবা উৎপ্রেক্ষা হিসাবে তাঁদের সাধনতত্ত্ব বোধগম্য করবার জন্য। তাই তাঁদের বর্ণিত চিত্রগুলি প্রায়ই সম্পূর্ণ নয়, খণ্ড খণ্ড চিত্রের সমষ্টি মাত্র। যে সমাজের মধ্যে তাঁরা বিচরণ করতেন সেই সমাজের কথ্য ভাষা তাঁরা ব্যবহার করেছেন কিন্তু তাঁদের বক্তব্য কখনোই সাধারণের জন্য ছিল না। সে বক্তব্য তাঁদের নিজস্ব গুহ্য সাধনতত্ত্ব। আর সেই গুহ্য সাধনতত্ত্ব এখন যেমন টীকা ছাড়া দুর্বোধ্য, হাজার বছর আগেও দীক্ষিত ছাড়া অন্যের কাছে সমান দুর্বোধ্যই ছিল।

এই সিদ্ধাচার্যরা সমাজের নিম্নস্তরে বিচরণ করতেন এ কথা যেমন সত্য, তাঁদের অনেকেই যে নিম্নস্তরের লোকই ছিলেন এ কথাও সম্ভবতঃ তেমনই সত্য। চর্যাকার শবর-পাদ সম্ভবত শবর জাতিরই লোক ছিলেন। তাঁর দু'টি চর্যাতেই শবর-জীবনযাত্রার ছবি। মনে হয় বীণা-পাদ নট-জাতিভুক্ত ছিলেন, ডোম্বী পাদ ডোম ছিলেন, তন্ত্রী-পাদ তাঁতি ছিলেন। এমনি কুক্কুরী, গুণ্ডরী বা গুড়্‌ভরী, কম্বল, ভাড়ক প্রভৃতি নামগুলি হয়ত জাতিবাচক; এগুলি সাধকদের পক্ষে ছদ্মনামও হ'তে পারে। সে যাই হ'ক, নিম্নস্তরের সমাজের সংগে এঁদের যোগ ছিল গভীর,—নাড়ীর যোগ বললেও ভুল হবে না।

মহাযান বৌদ্ধধর্মের সংগে তন্ত্র মিশ্রিত হয়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের উদ্ভব। তন্ত্র আর্যেতর আদিম মানসের সৃষ্টি। নারী ও যৌনাচার তন্ত্র-সাধনার অবিচ্ছেদ্য অংগ। আর্যেতর সমাজ-দেহের সংগে সংযোগের ফলেই মহাযান বৌদ্ধধর্মে তন্ত্রের অনুপ্রবেশ, আর তা থেকেই মহাযান মতের বিভিন্নতার সৃষ্টি। এই তন্ত্র-মিশ্রিত মহাযান মতেরই একটি শাখা সহজিয়া বৌদ্ধ-মত—যার প্রতাপ প্রাচীন বাংলায় ছিল অপরিসীম। মূলত প্রাচীন বাংলার আর্যেতর সম্প্রদায়ের খুব বড় একটা অংশ ছিল সহজিয়া বৌদ্ধ-মতাবলম্বী। শিক্ষিত আর্য-মানসের সংগে এদের যোগ ছিল না। আর্যদের সাহিত্য অথবা শিক্ষার বাহন ছিল সংস্কৃত। তাঁদের পক্ষে আর্যেতর সম্প্রদায়কে সু-নজরে না দেখা স্বাভাবিকই ছিল। অপর দিকে সিদ্ধাচার্যরা তাঁদের মত-প্রকাশের বাহন করেছিলেন কথ্য ভাষাকে। আর্য জীবনাচরণ সম্পর্কে তাঁদের বিরূপতাও কম ছিল না। নগর ও নাগর সভ্যতা থেকে বহু দূরে লোকায়ত জীবনযাত্রার সরিক ছিলেন এই সিদ্ধাচার্যরা। কিন্তু সে জীবনযাত্রার বিস্তৃত ও পূর্ণাংগ বিবরণ তাঁরা দেননি। কারণ, কামনা, বাসনা ও দুঃখময় এ জীবনেরই তাঁরা ছিলেন বিরোধী। তবু তাঁদের বর্ণিত খণ্ড চিত্রাংশগুলিকে পর পর সাজালে এমন একটি জীবনের মোটামুটি কাঠামো গড়ে তোলা যায় যা সম্পূর্ণরূপে সাধারণ মানুষের দুঃখ-সুখে ভরা 'কর্মের আর ধর্মের' জীবন।

স্পষ্টই অনুমান করা যায়, আজকের মত হাজার বছর আগেও নিম্নস্তরের মানুষের জীবনে নিত্যসংচর ছিল দারিদ্র্য। সুজলা-সুফলা বাংলা দেশের নিম্নস্তরের মানুষের সংসারে সেদিনও ছিল অভাব আর অনটন। চর্যাকার বলেন:

> হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী। (৩৩ নং)

হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্যই তাঁর আবশ্যক। তবু সংসার তাঁর বেড়েই চলেছে। তাঁর ঘর উঁচু পাহাড়ের চুড়োয়, কোন প্রতিবেশী নেই কাছে-ধারে। ভাবখানা এই, প্রতিবেশীদের দয়া পাবার উপায়ও তাঁর নেই। রাঢ়ের আর এক কবি ব্যাধ-জীবনের দারিদ্র্য বর্ণনায় এমনি করুণ স্বরেই বলেছেন পাঁচশ' বছর পরে—

> কিবাত-নগরে বসি না মিলে উধার।
> হেন বন্ধুজন নাহি যেবা সহে ভার॥
> (মুকুন্দরাম—চণ্ডী)

নিম্নস্তরের মানুষেরা আর্য সমাজ-বিন্যাসে অন্ত্যজ। গ্রামপত্তনে তারা অন্তেবাসী। নগরের বাইরে নদীর পারে আজকের মতই সেদিনও ছিল ডোম প্রভৃতির বাস। নদী পেরিয়ে আসতে হত তাদের নগরে। তারা বেচত ডালা, চাঙ্গাড়ী। নদী পেরিয়ে এপারে আসা খুব সহজ নয়। কাহ্নু তাই জিজ্ঞাসা করছেন—

> হাঁ লো ডোম্বী তো পুছছি সদ-ভাবে।
> আইসসি জাসি ডোম্বী কাহারি নাবেঁ। (১০ নং)

[ওলো ডোম্বী, তোমাকে সদ-ভাবে জিজ্ঞাসা করি। তুমি আস-যাও কার নৌকায়?]

এই অন্ত্যজ সমাজের সেদিনকার বৃত্তিগুলি—মদ-চোলানো (৩ নং), কাঠ-কাটা (৪৫ নং), নৌকা গড়া, সাঁকো তৈরী

* চর্যাপদ না ব'লে এদের 'চর্যা গীতিকা' বলা উচিত। 'পদ' ব'লতে পুরো গীতিকা বোঝায় না—দুই ছত্র বা couplet বোঝায়। টীকাতেও কোথাও পুরো গীতিকা অর্থে 'পদ' ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু সাধারণতঃ পুরো গীতিকা 'পদ' নামে পরিচিত বলেই আমিও 'পদ' কথাটি ব্যবহার করেছি সর্বত্র। এই একই কথা বৈষ্ণব-পদাবলী সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য।

(৫ নং), হরিণ-শিকার (৬ নং), হাতি ধরা ও পোষা (৯ নং), তুলা-ধোনা (২৬ নং), নট-গীত (১০ ও ১৭ নং) প্রভৃতি এখনো অক্ষুণ্ণই আছে।

বন তাড়িয়ে হরিণশিকারের বর্ণনা পাই ভুসুকুর একটি পদে :

বেড়িল হাক পড়অ চৌদীস। (৬ নং),

[চারি দিক বেষ্টিত করে (শিকারীর) হাঁক পড়েছে।]

ভীত-ত্রস্ত হরিণ ছুটেছে—

তরংগতে হরিণার খুর না দীসঅ। (ঐ)

[ত্বরাগামী হরিণের খুর দেখা যাচ্ছে না।]

সারি গেয়ে হাতিধরা (১৭নং) এবং বাঁধন-ছেঁড়া পাগলা হাতির বর্ণনা (৯ নং) আছে একাধিক পদে। গভীর জলে জাল ফেলার ইঙ্গিত আছে এক জায়গায়। কিন্তু মাছ বা মাছ ধরার উল্লেখ নেই কোথাও। মাছ ধরার উল্লেখ পেলে অন্ত্যজ বাঙ্গালীর বৃত্তির তালিকাটি পূর্ণ হত।

সব চেয়ে বেশী উল্লেখ পাই নৌকা ও নৌকা-বাওয়ার—প্রায় আট-নয়টি পদে। নদীবহুল বাংলা দেশে বিশেষ করে নিম্নবঙ্গে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ নৌকা। চর্যাকারের চোখে নদী হয়েছে সংসারের রূপক 'ভবনঈ' ; নৌকা আশ্রয়—যা বেয়েসাধক পৌঁছাবেন শূন্য-মার্গে। কখনো সেই নৌকা বাইছেন সাধক নিজে, কখনো বাইছেন ডোম্বী যিনি নৈরাত্মা দেবীর রূপক। সর্বত্রই গূঢ় অর্থ। কিন্তু বাহ্য অর্থ একেবারে নীরস নয়। নদীতে খেয়া চলে, পাটনি খেয়া পারাপার করে। পারের কড়ি না পেলে যাত্রীর দুরবস্থাও ঘটে। পাটনি যাত্রীর বোঁচকা-বুঁচকি তল্লাস করতেও ছাড়ে না। তাড়ক-পাদ বলছেন :

বাস্ত-কুরণ্ড সন্তারে জানী। (৩৭ নং)

[বটুয়া ও পাত্র পরীক্ষা ক'রে জানে (কড়ি আছে কি না)।]

একটি চর্যায় পাটনির কাজ করতে দেখি জনৈকা ডোম্বীকে।

গঙ্গা জউনা মাঝেরে বহই নাই।

তঁহি বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআ লীলে পার করেই।

বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা। (১৪ নং)

[গঙ্গা ও যমুনার মাঝখানে নৌকা চলে। তাতে মাতঙ্গী যোগীকে ডুবে ডুবে অবলীলায় পার ক'রে দেয়। হে ডোম্বী, বেয়ে চলো, বেয়ে চলো, পথে যে দেরী হয়ে গেল।]

ডোম প্রভৃতি অন্ত্যজ নারীরা চিরকালই অপেক্ষাকৃত স্বাধীন এবং শ্লথ-নৈতিক মনোবৃত্তিসম্পন্না। ষোড়শ শতকের ফুল্লরার মতই চর্যাপদের যুগের অন্ত্যজ নারীরা ফেরী ক'রে জিনিষপত্র বিক্রয়ে অভ্যস্ত ছিল। কাহ্ন্‌পাদ ডোম্বীকে বলছেন তাই :

'তান্তি বিকণঅ ডোম্বী আবরণ চাংগেড়া। (১০ নং)

[ডোম্বী, তুমি তন্ত্রী আর চাঙ্গাড়ী বিক্রয় কর।]

এই নিম্নস্তরের সমাজে নট-গীতের চলন অর্থাৎ নট-নটী বৃত্তি ছিল। আর্য সমাজবিন্যাসে নট-নটীরাও অন্ত্যজ। চর্যাপদেও নিম্নস্তরভুক্ত নট-নটীর উল্লেখ পাই। কাহ্ন্‌ বলছেন :

'এক সো পদ্‌মা চৌষঠী পাখুড়ী।

তঁহি চড়ি নাচত ডোম্বী বাপুড়ী। (১০ নং)

[এক সে পদ্ম, তার চৌষট্টী পাপড়ি। তাতে চড়ে নাচছেন ডোম্বী ও বাপুড়ী।]

বীণা-পাদের চর্যাটিতে বীণাজাতীয় বাদ্যের উল্লেখ পাই। তাতে ৩২টি তন্ত্রী।

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।

অণহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী।

বাজই অলো সহি হেরুঅ-বীণা।

* * *

নাচন্তি বাজিল গাঅন্তী দেঈ।

বুদ্ধ-নাটক বিসমা হোই। (১৭ নং)

[সূর্য-লাউ'তে শশী-তন্ত্রী যুক্ত হ'ল। অনাহত দণ্ডে এক করা হ'ল অবধূতীকে। হে সখি, হেরুক-বীণা বাজছে।······বাজিয়ে নাচছেন (আর) দেবী গাইছেন। (তাই) বুদ্ধ-নাটক বিষম হ'য়েছে]

মেয়েরা নাচত আর পুরুষ গাইত—সম্ভবত এই রকমই ছিল তখনকার দিনের নট-গীতের ধরণ। চর্যাকারের মতে এখানে তার বিপর্যয় ঘটেছে ব'লেই 'বুদ্ধ-নাটক বিসমা' হ'য়েছে।

নট-জাতীয়া নারীদের নৈতিক বন্ধন আবহমান কাল থেকেই শিথিল। কেন শিথিল,—সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর ; তা সমাজ-তাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়। চিরদিনই নট-নটীরা নৈতিক শৈথিল্যের জন্য হেয় ও ধিকৃকৃত। কৌটিল্য ও পতঞ্জলির সময় থেকেই নট-নটীদের চারিত্রিক অখ্যাতি। পতঞ্জলি বলছেন, নটের স্ত্রী (নটী) যাকেই প্রয়োজন, তাকেই ভজনা করে (মহাভাষ্য, ৩য় অধ্যায়)। এই জন্য নটের প্রতিশব্দ 'জায়াজীব' এবং নটী ব্যাপক অর্থে গণিকার সংগে সমার্থক। নটীদের এ হেন চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বৃত্তিগত, না কৌমগত তা স্থির করা কঠিন। এখনো পূর্ববঙ্গের নড় বা নট নামে অন্ত্যজ শ্রেণী আছে, যাদের বৃত্তি আজও বহুলাংশে নট-গীত। সে যাই হ'ক, ছলা-কলায় পারদর্শিনী রঙ্গময়ী নীচজাতীয়া রমণীরা (নটী) প্রাচীন কালে উচ্চবর্ণের পুরুষের চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটাতে পারত, এ অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়। এই ধরণের নারীদের সিদ্ধাচার্যরা সাধন-সংগিনী করতেন কেউ কেউ। এমনই রঙ্গময়ী সংগিনী সম্পর্কে কাহ্ন্‌ বলছেন :

কইসানি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলি।

অন্তে কুলীনজন মাঝেঁ কাপালী।

* * *

কাহ্নে গাই তু কাম-চণ্ডালী।

ডোম্বীত আগলি নাহি ছিনালী। (১৮ নং)

[ওগো ডোম্বী, কেমন তোর চতুরালী। তোর বাইরে কুলিন জন, ভিতরে কাপালী। * * * কাহ্ন্‌ গাইছেন, তুই কামচণ্ডালী, ডোম্বীর চেয়ে বড় ছিনালী (আর) কেউ নেই।]

এই ডোম্বীর জন্যই যোগী কাহ্ন্‌ ছেড়েছেন সংসারের 'নড়-পেড়া' (নট-পেটিকা), অংগে তুলেছেন হাড়ের মালা, লজ্জা ঘৃণা, সংকোচ সব জয় ক'রে সেজেছেন উলংগ কাপালিক। (১০ নং)

আজকের মত সেদিনকার বাংলা দেশেও শুঁড়িখানার অভাব ছিল না। তবে তখনকার শুঁড়িখানার ছবি একটু অন্য রকমের ছিল। শুঁড়ির স্ত্রী মদ বিক্রয় করত ; দোকানের একটা চিহ্ন থাকত। ঘড়া ঘড়া মদ তৈরী হত। দোকানে বসেই মত্তপায়ীরা পান করত। বিরুআ-পাদ তার বর্ণনা দিচ্ছেন : এক শুঁড়িনী দুই ঘরে ঢোকে। চিকণ বাকল দিয়ে সে বারুণী বাঁধে। আর দশমী দুয়ারে চিহ্ন দেখে গ্রাহক আপনিই আসে। চৌষট্টি ঘড়ায় বারুণী ঢালা হ'ল। ঘরে ঢুকে গ্রাহকের আর সাড়া-শব্দ নাই। (৩নং)

এমনি অসংস্কৃত জীবনযাত্রার টুকরো-টাকরা বহু ছবি বিভিন্ন চর্যার ছড়িয়ে আছে সেদিনকার সাধারণ মানুষের আহার-বিহার, ক্রিয়াকর্মের পরিচয় বুকে নিয়ে। এর মধ্যে তাদের গার্হস্থ্য জীবনের ছবিও আছে। কুক্কুরী-পাদের একটি চর্যায় দেখি—শ্বশুর ঘুমিয়ে আছেন, কিন্তু ঘরের বৌটির চোখে ঘুম নেই। তার কানের গহনা চুরি করেছে চোরে। কার কাছে গিয়ে সে বৌটি গহনা চাইবে। তা পরক্ষণেই যেন বিদ্রূপ করা হচ্ছে, যেন একটু কটাক্ষ বৌটির চরিত্র সম্পর্কে— দিবসই বহুড়ী কাগই ডরে ভাঅ।

রাতি ভইলে কামরু জাঅ। (২নং)

[দিনে বৌ কাকের (ডাকে) ভয় পায়, রাতে সে যায় কামরূপ।]

একটি বর-যাত্রার বর্ণনা আছে ১১ নং চর্যায়। মাদল বাজিয়ে, পাখোয়াজ বাজিয়ে, দুন্দুভির আওয়াজে চারি দিক কাঁপিয়ে, 'জয় জয়' শব্দে কাহ্নু চলেছেন ডোম্বীকে বিয়ে করতে। সামাজিক ক্ষেত্রে কনে ডোম্বী নীচু স্তরের, তাই তাকে বিয়ে ক'রে কাহ্নু জাত খুইয়েছেন। কিন্তু যৌতুক যা পেয়েছেন তাতে যেন সব পুষিয়ে গেছে। আজো যেমন সামাজিক অ-কৌলীন্য পুষিয়ে নেওয়া হয় যৌতুকের কৌলীন্যে। ডোম্বীও চণ্ডালীর বাপের বাড়ী বঙ্গে। তাই বঙ্গের অকৌলীন্যের প্রতি একাধিক পদে কটাক্ষ আছে।

আজ ভুসুকু বঙ্গালী ভৈলী।

নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী। (৪৯ নং)

[আজ ভুসুকু বাঙ্গালী হয়েছে; চণ্ডালীকে নিজের ঘরণী ক'রেছে]

দাম্পত্যপ্রেমের একটি আশ্চর্য সুন্দর বস্তুনিষ্ঠ চিত্র পাই শবর-পাদের গীতে। উঁচু উঁচু পাহাড়, সেখানে শবর বালিকার বাস। পরনে তার বিচিত্রবর্ণ ময়ূরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জামালা। শবর কিন্তু তাকে ভুলে ঘুরছে নেশার ঘোরে। আকুল মিনতি জানায় শবরী:

উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গোহারা তোহোরি।

নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী। (২৮ নং)

[উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, পাগলামি করো না, দোহাই তোমার। (আমি) তোমার নিজ ঘরণী, নাম সহজ সুন্দরী।]

গাছে গাছে ফুল ফুটেছে, ডালে ফুলে আকাশ ঢাকা পড়েছে। একলা শবরী ঘুরছে বনে বনে, কানে তার কুণ্ডল। যাই হোক, অবশেষে শবর তার সম্বিৎ ফিরে পেলো। খাট পাতা হ'ল, শয্যা বিছান হ'ল তাতে। কর্পূর মেশান তাম্বুল খেয়ে শবর শবরীকে বুকে নিয়ে অবশেষে রাত্রি ভোর করল। শবরীর জ্বালা কত। শবর প্রায়ই রাগ করে, অভিমান করে। রাগ ক'রে পাহাড়ের গুহায় গিয়ে ব'সে থাকে। কোথায় যে শবরী তাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াবে!

উমত সবরো গরুআ রোষে।

গিরিবর-সিহর-সন্ধি পইসন্তে সবরো, লোড়িব কইসে।

[উন্মত্ত শবর রোষবশে গিরি-শিখরের সন্ধিতে (গুহা) প্রবেশ করে। (তাকে) খুঁজব কেমন ক'রে।]

এমন মান-অভিমানের রং মাখানো প্রেম-লীলার পাশে হতভাগিনীর দীর্ঘশ্বাসও শুনতে পাওয়া যায়। মায়ের কাছে দুঃখ জানাচ্ছে যুবতী কন্যা। একটি মাত্র সন্তান ধারণ করেছিল সে। যৌবন তার পরিপূর্ণ। কিন্তু স্বামী তার অথর্ব, বৃদ্ধ, শক্তিহীন। মিলন তাদের ঘটে না। তার এ ভাগ্যের জন্ত বাপ ছাড়া আর দোষী কে?

হাঁউ নিরাসী খমন-ভতারী।

মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই।

*　*　*

পহিল বিআণ মোর বাসন-পূড়া।

*　*　*

জাণ-জৌবণ মোর ভইলেসি পুরা।

মূল নখলি বাপ সংঘারা। (২০নং)

[আমি আশাহীন। শূন্য (অক্ষম?) আমার স্বামী। আমার বিজ্ঞান (অনুভূতি?) কাউকে বলা যায় না। * * প্রথম প্রসব আমার; বাসনায় পরিপূর্ণ দেহ। * * * যৌবন-জ্ঞান আমার (পরি-) পূর্ণ হয়েছে। মূল নিরাকৃত ক'রে বাপ সংহার (সর্বনাশ?) ক'রেছে।]

হাজার বছর আগেকার এই সাধারণ মানুষের জীবনে দারিদ্র্য, অনটন ছিল, জীবনাচরণে ক্লেদ, মালিন্য ও দুঃখ-বেদনা যেমন ছিল, তেমনি ছিল অসংস্কৃত প্রাকৃত আনন্দ—মদ্যপান, দাবা, জুয়া খেলা, নট-গীত, কাম-কৌতুক প্রভৃতি। এ সমাজে দারিদ্র্য যেমন ছিল, তেমনি প্রহরী দিয়ে রক্ষা করার মত ধন-সম্পত্তিও কারো কারো নিশ্চয়ই ছিল। চোর-ডাকাতও ছিল। নইলে ঘুমন্ত গৃহস্থ বধূর কানের গহনা চুরি হয় কি করে? (২নং) প্রহরী বিয়োগ সম্পর্কে কাহ্নু বলছেন:

সুন বাহ তথতা পহারী।

মোহ ভাণ্ডার সঅলা অহারী। (৩৬ নং)

[শূন্য গৃহে তথতা প্রহরী। আমার ভাণ্ডার সকলই লুঠ হয়েছে।] মনে হয়, প্রহরীই সব লুঠে নিয়েছে, এই ইঙ্গিতই এখানে করা হ'য়েছে। আমার সকল ভাণ্ডার লুঠ করে শূন্য গৃহে প্রহরী দাঁড়িয়ে,—এইটেই সম্ভাব্য অর্থ। এই 'তথতা-প্রহারী' রাজ-প্রহরী বা রাজার সেপাই—যার অত্যাচার এ দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যে চিরকালের উপরি পাওনা।

জলপথে যাতায়াত করতে তখন দস্যুর ভয়ও ছিল। যার উল্লেখ করেছেন সরহ-পাদ; 'বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ,' অর্থাৎ, পথে ভয় আছে খড়্গধারী বলবান দস্যুর। (৩৮ নং) কোন রাজার নৌসেনা অথবা কোন জলদস্যু কর্তৃক পদ্মার পারে বঙ্গ আক্রমণ ও লুণ্ঠনের একটি চিত্রও পাই। ভুসুক বলছেন: রাজ-নৌকা পাড়ি বেয়ে এল পদ্মার খালে। নির্দ্দয় ভাবে বঙ্গ লুণ্ঠন করল। * * * নিজের গৃহিণীর চণ্ডালী অপহৃত হ'ল। পঞ্চ পাটন দগ্ধ হ'ল, ইন্দ্রের বিষয় নষ্ট হল। জানি না আমার চিত্ত কোথায় গিয়ে প্রবিষ্ট হয়েছে। সোনা-রূপা কিছুই রইল না। চার কোটি ভাণ্ডার নিয়ে শেষ করল। অবশেষে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছেন:

জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ। (৪৯ নং)

[(এখন) বাঁচা আর মরা (দুই-ই) সমান।]

এই দরিদ্র, পীড়িত, অমার্জ্জিত প্রাকৃত জীবনে তবু তৃপ্তি নিশ্চয়ই ছিল। সে তৃপ্তি কেবল মাত্র প্রেম ও কাম-কলায় নয়, সে তৃপ্তি শ্রমের ও প্রেমের যুগ্ম সার্থকতায়। শবর-পাদের অপর চর্যায় সেই তৃপ্তির অপূর্ব সুন্দর পরিচয় আছে। তার ভাবার্থ এই: পাহাড়ের গায়ে শবর-শবরীর ঘর—যেন আকাশকে ছুঁয়ে আছে। চার পাশে আলো করে আছে ফুটন্ত কাপাস ফুল। জ্যোছনার বান ডেকেছে ঘরের আঙ্গিনায়। চাচারি দিয়ে ঘেরা ক্ষেতে কঙ্গুচিনা ধান পেকেছে। তার গন্ধে শবর-শবরীর মন আজ বিভোর। আজ তাদের মহাসুখের মিলন—সত্যকার মিলন। দূরে রাতের প্রহরী শেয়াল ডেকে উঠছে মাঝে মাঝে।

প্রাকৃত জীবনের এমন সুন্দর মধুর তৃপ্তির ছবি অন্যত্র দুর্লভ।

সা হি ত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

ধর্মকীর্তি—বৌদ্ধ নৈয়ায়িক। জন্ম—৮ম শতাব্দী দক্ষিণ-ভারতের চোল-রাজ্যের অন্তর্গত ত্রিমলয় নামক স্থানে। পিতা—করুণাময়। ইনি পিতৃব্য কুমারিল ভট্টের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট হইয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং পিতৃব্য কুমারিল ভট্টকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে নিজধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। গ্রন্থ—প্রমাণবার্ত্তিক-কারিকা, প্রমাণবার্ত্তিকবৃত্তি, প্রমাণবিনিশ্চয়, ন্যায়বিন্দু, হেতুবিন্দু বিবরণ, তর্কন্যায় বা বাদন্যায়, সন্তানান্তরাসিদ্ধি, সম্বন্ধপরীক্ষা, সম্বন্ধপরীক্ষাবৃত্তি প্রধান।

ধর্মদাস বসু—রাজকর্মচারী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৫৮ বঙ্গ অগ্রহায়ণ চন্দননগরে। পিতা—পার্বতীচরণ বসু। শিক্ষা—প্রবেশিকা (হুগলী কলেজ—১৮৬৭), এল. এম. এস (মেডিকেল কলেজ—১৮৭৩)। ইংলণ্ড যাত্রা এবং আই. এম. এস (১৮৭৭)। কর্ম—সিবিল সার্জেন। শেষ জীবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ। গ্রন্থ—ধর্মজীবন, Hygine & Public Health.

ধর্মদাস রায়—কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। নিবাস—নবদ্বীপ। ইনি বাণীকণ্ঠ উপাধিলাভ করেন। গীতি-নাট্যগ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা, কবচ-সংহার, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাবর্জন, রত্নাকর-উদ্ধার।

ধর্মরাজা ধ্বরীন্দ্র—বৈদান্তিক। ১৭শ শতাব্দী। গ্রন্থ—বেদান্ত-পরিভাষা।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—হাস্যরসিক ও অভিনেতা। ইনি সিনেমা-জগতের সহিত বহুদিন হইতে সংশ্লিষ্ট। সিনেমা অভিনেতা এবং পরিচালক। চিত্রগ্রন্থ—ভাবের অভিব্যক্তি, বিয়ে, ভালবাসা, শুভদৃষ্টি, ফুলশয্যা।

ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম—১২৭৭ বঙ্গ ভাদ্র ময়মনসিংহ টাঙ্গাইয়েলের অন্তর্গত নাগরপুরের এক প্রসিদ্ধ জমিদার-বংশে। মৃত্যু—১৩৪৫ বঙ্গ ১৭ই বৈশাখ হাজারিবাগে। পিতা—মাধবলাল চৌধুরী। মাতা—দ্রৌপদীসুন্দরী। শিক্ষা—এম. এ ও বেদান্তবাগীশ উপাধিলাভ। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ। অধ্যাপক, ব্রজমোহন কলেজ, দিল্লী হিন্দু কলেজ, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ, অধ্যক্ষ, দিল্লী হিন্দু কলেজ। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। গ্রন্থ—সংস্কার ও ও সংরক্ষণ, মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ, ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন, মৈত্র্যপনিষদ্, In Search of Jesus Christ.

ধীরেন্দ্রনাথ পাল—গ্রন্থকার। জন্ম—যশোহর। মৃত্যু—১৩১৭ বঙ্গ। গ্রন্থ—লক্ষ্মীলাভ (উপ), স্বামি-স্ত্রী (উপ), আশালতা, ভ্রমর, মজলিস, বেদেনী, সোনার সংসার।

ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভারতের স্বরাজ-সাধক।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিদ্রোহী, রিক্তা, দ্রৌপদী (নাটক), শ্রীঅরবিন্দ।

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়—গ্রন্থকার। লালগোলার মহারাজা। গ্রন্থ—অচল প্রেম, স্পর্শের প্রভাব, চিরন্তনীর জয়।

ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৯১ বঙ্গ জ্যৈষ্ঠ, চট্টগ্রামে। কর্ম—পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর, চট্টগ্রাম। গ্রন্থ—নিমীলন, প্রবাহ।

ধীরেন্দ্রলাল ধর—শিশু-সাহিত্যিক। জন্ম—১৯১৩ খৃঃ ১২ই জানুয়ারি, কলিকাতা। পিতা—অমৃতলাল ধর। পৈতৃক নিবাস—চন্দননগর। শিক্ষা—প্রবেশিকা (আর্যমিশন ইনস্টিটিউসন, ১৯২৮), বি-এ, (বিদ্যাসাগর কলেজ—১৯৩২)। কর্ম—দিল্লী অ্যাসেমব্লী স্যর আবদুল্লা সুরাবর্দীর সেক্রেটারী, সাংবাদিকতা, বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রে, শিক্ষকতা, ও পরে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানে কর্ম। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—মৃত্যুর পশ্চাতে (১৯৩৪), অসি বাজে ঝন্ ঝন্ (১৯৪২), গল্প হলেও সত্যি, ১ম (১৯৪৩) ২য় (১৯৪৪), কামানের মুখে নানকিন, (১৯৪০), এই দেশেরই মেয়ে (১৯৪৪), স্বাধীনতা-সংগ্রাম (১৯৪৭), বন্দী জীবন (১৯৫০), আমাদের গান্ধীজী (১৯৪৮), বোমা ও ব্যারিকেট (১৯৪২), কমরেড্ লেনিন (১৯৪৫), ছোটদের কংগ্রেস (১৯৪৫), নীল নায়ের মাঝি (১৯৪৩), হে বীর প্রণাম করি (১৯৫০), কিশোর গ্রন্থাবলী, ৩খণ্ড (১৯৪৯-৫০)।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৯৪ খৃঃ। শিক্ষা—এম. এ। উত্তর প্রদেশের সরকারী প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর ও প্রেস অ্যাডভাইসর (১৩৪৪), অধ্যাপক, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়। সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। গ্রন্থ—ত্রিধারা, মোহনা, চিন্তয়সী, আমরা ও তাঁহারা, রিয়ালিষ্ট, অন্তঃশীলা।

ধোয়ী—বঙ্গীয় কবি। নামান্তর—ধোয়িক। উপাধি—কবিক্ষ্মাপতি। জন্মস্থান—নবদ্বীপ। গ্রন্থ—পবনদূত।

নওসের আলি খান ইউসফজী—গ্রন্থকার। নিবাস—ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জামার্কি গ্রাম। কর্ম—সব-ডেপুটী। গ্রন্থ—উচ্চ বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি, বঙ্গীয় মুসলমান, শৈশব-কুসুম, মোসলেম জাতীয় সঙ্গীত, দলিল রেজেষ্টারি শিক্ষা, সাহিত্য-শিক্ষা।

নগেন্দ্রকুমার গুহরায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চন্দ্রহাস-বিষয়, ফরাসী বীরাঙ্গনা, পঞ্চব্যঞ্জনের আত্মকথা, বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬১ (অঙ্ক) কলিকাতা গ্রে ষ্ট্রীটে, মৃত্যু—১৩৪৭ বঙ্গ পৌষ কলিকাতা। পিতা—মথুরানাথ গুপ্ত (সব-জজ, বিহার)। শিক্ষা—জেনারেল এসেম্বিজ ইনস্টিটিউশন। কর্ম—অধ্যাপনা (লাহোরে কিছু দিন), সাংবাদিকতা বিভিন্ন স্থানে, কিছু কাল টাটা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সেক্রেটারী, মহারাজ মণীন্দ্র নন্দীর সেক্রেটারী। গ্রন্থ—জীবন ও মৃত্যু, লীলা, অমর সিংহ, পর্বতবাসিনী, (১২৯০) তমাস্বিনী, জয়ন্তী, আরাতামা, ব্রজনাথের বিবাহ, উপন্যাস-সংগ্রহ ও রহস্য জাল কুঞ্জলাল, কাঠুরিয়া, বন্ধু, কাহার ভ্রম, ছায়া, টিকিয়া শাহ, চন্দ্রাপীড়ের ঐশ্বর্য, ফুটবল ফাইনাল, জামাল জলিল, মায়াবিনী, প্রতিশোধ, ছোট বৌ, সুরজ কওর, দেবরাত প্রসেন নবনগর, শ্যামার কাহিনী, খেলাঘরে, নিস্তারিণীর রাজনীতি, গল্প ও গুজব, চুলের কলপ, কোঁচার কথা, বিভ্রাট, লক্ষহীরা, প্রজার পোষাক, মিলন, বোম্বেটে, মেহেরজান, মালবিকা, পুঁটেরাম, দুই বার, চুনী না বাহাদুরী, মিরিয়ম ও সোরাব, ঘরের অলক্ষ্মী, ইংরেজ পাঠান,

ভৈরবী, নূতন বাড়ী, মুক্তি, হীরার মূল্য, নির্মলা, ভৈরব-মন্দির, বৃন্দা, অলকা, রোসিনারা, শাহনওয়াজ, বাংলার কবি, A planet and a Star (উপন্যাস)। সম্পাদিত গ্রন্থ—বিদ্যাপতির পদাবলী (১৩১৬)। সম্পাদক—Phoenix (সাপ্তাহিক, করাচী), Tribune (লাহোর), (১৮৯৯, ১৯০১—১৯১২), সুপ্রভাত (কলি, সাপ্তাহিক), Indian People (সাপ্তাহিক, এলাহাবাদ), Panjabee (১৯১২) যুগ্ম-সম্পাদক—Leader (দৈনিক, এলাহাবাদ)।

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—শিক্ষাবিদ্, বাগ্মী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৫৪ খৃঃ অগষ্ট। মৃত্যু—১৯০৯ খৃঃ ৫ই এপ্রিল। পিতা—ভগবতীপ্রসাদ ঘোষ (হাইকোর্টের উকীল)। শিক্ষা—এফ, এ, (১৮৭১), বি, এ পাঠের সময় সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিলাত গমন, অকৃতকার্য হইয়া বার-এট্-ল পরীক্ষা (১৮৭৬)। আইন-ব্যবসায় (১৮৭৬), পরে অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, মেট্রোপলিটান কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। গ্রন্থ—কৃষ্ণদাস পাল (জীবনী), মহারাজ নবকৃষ্ণ (জীবনী)। সম্পাদক—Indian Echo, প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক—Indian Nation (১৮৮৩—১৯০১)।

নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল—সাহিত্যিক। সম্পাদক—বঙ্গমহিলা (মাসিক, ১২৯০)।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বক্তা, লেখক ও ধর্মপ্রচারক। জন্ম—১২৫০ বঙ্গ কার্ত্তিক হুগলী জেলার বংশবাটী নামক গ্রামে। মৃত্যু—১৩২০ বঙ্গ, জ্যৈষ্ঠ। পিতা—দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষা—চুঁচুড়া, হুগলী ও কলিকাতা। প্রবেশিকা (কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল—১৮৬১)। কলিকাতা পাঠকালে ভবানীপুরের ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে গতায়াত। সঙ্গীত-রচনা। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ ও ব্রাহ্মসমাজের (কৃষ্ণনগর) আচার্য। ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারের জন্য (১৮৮৪) দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, কাশী, লাহোর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ। গ্রন্থ—তত্ত্বজিজ্ঞাসা, থিয়োডর পার্কারের জীবনী, মহাত্মা রামমোহন রায়।

নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—একাল সেকাল, বড় ছোট, নারীর দান।

নগেন্দ্রনাথ দত্ত—গ্রন্থকার। শিক্ষা—বি-এল। গ্রন্থ—শিক্ষামঞ্জরী (১৮৬৭)। সম্পাদক—শ্রীতত্ত্ববাসী—(মাসিক—১৮১২)।

নগেন্দ্রনাথ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভাওয়ালের ষড়যন্ত্র, রাণী সন্ন্যাসীর লড়াই।

নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী—গ্রন্থকার। নিবাস—হাওড়া জেলা। গ্রন্থ—Pana Pratha। সম্পাদক—বিশ্বদূত।

নগেন্দ্রনাথ বসু—প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ বিখ্যাত পণ্ডিত। জন্ম—১৮৬৬ খৃঃ কলিকাতা। মৃত্যু—১৩৪৬ বঙ্গ কলিকাতা বাগবাজার। পিতা—নীলরতন বসু। পঞ্চদশ বর্ষ হইতেই সাহিত্যিক জীবন যাপন, কাব্য, নাটক ও ইতিহাস রচনা। শব্দেন্দু-মহাকোষ, বিশ্বকোষ-সঙ্কলনের কার্যে আত্মনিয়োগ। কিছু দিন ময়ূরভঞ্জের Archaeological Surveyor পদে নিযুক্ত। রায় সাহেব, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, ও সিদ্ধান্তবারিধি উপাধি লাভ। গ্রন্থ—কর্ণবীর (অনুবাদ ম্যাকবেথ—১২৯১ বঙ্গ), শঙ্করাচার্য (নাটক), পার্শ্বনাথ (নাটক), কায়স্থের বর্ণনির্ণয়, মহাবংশ বা মিশ্র গ্রন্থ, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড, বৈশ্যকাণ্ড ও রাজন্যকাণ্ড), পীরালি ব্রাহ্মণ-বিবরণ, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড, ১ম ও ২য় খণ্ড, Modern Buddhism & its followers in Orissa, Archaeological Survey of Mayurbhanj (১৯১১), Social History of Kumrupa, ১ম (১৯২২), ২য় (১৯২৬)। সম্পাদিত গ্রন্থ—পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী, চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দের কাশী-পরিক্রমা, ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী। সম্পাদক—তপস্বিনী (মাসিক), ভারত (মাসিক, ১২৯১), সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক, ১৩০৩-৫, ১৩১১-১৮), পল্লীবাসী (১৩২১) কায়স্থ-পত্রিকা (মাসিক, ১৩০১-১৩১০), শব্দেন্দু মহাকোষ (১৮৮৪), বিশ্বকোষ (বাংলা, (১২৯৪) ও হিন্দী)।

নগেন্দ্রনাথ বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অদৃশ্য সহায়।

নগেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ—চিকিৎসক। উপাধি—এম, সি, এস (প্যারিস ও নিউইয়র্ক)। গ্রন্থ—কবিরাজী-শিক্ষা, রোগীচর্চা।

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—সাহিত্যিক। সম্পাদক—দেবালয় (১৩১৬)

নগেন্দ্রনাথ সোম—কবি ও সুলেখক। জন্ম—১২৭৭ বঙ্গ ৬ই আশ্বিন হুগলী জেলায় সবিসা গ্রামে। মৃত্যু—১৩৪৭ বঙ্গ। পিতা—মহেন্দ্রনাথ সোম। বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা। কবিশেখর, কাব্যালঙ্কার উপাধিলাভ। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—প্রেম ও প্রকৃতি, বারাণসী, শ্মশানশয্যা, মধুস্মৃতি (জীবনী)।

নগেন্দ্রবালা মুস্তফী—মহিলা কবি ও সাহিত্যিকা। জন্ম—১২৮৪ বঙ্গ হুগলী ষ্টেসনের পশ্চিমাংশে পালোড়া (মাতুলালয়ে) গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৩ বঙ্গ বৈশাখ। পিতা—নৃত্যগোপাল সরকার (মুন্সেফ)। স্বামী—সুখড়িয়া (হুগলী)-নিবাসী খগেন্দ্রনাথ মিত্র মুস্তফী। শৈশব হইতেই ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ, সাহিত্য-সাধনা ও কবিতা রচনা। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখিকা। 'সরস্বতী' উপাধিলাভ। 'প্রেমচাঁদ গাথা'র কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তেয়ার ফণ্ডের অধ্যক্ষগণ কর্তৃক বিশেষ ভাবে পুরস্কৃতা। স্বামীর সহিত বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া বহু তীর্থভ্রমণ। কাব্যগ্রন্থ—ঊষাপরিণয়, দানবনির্বাণ, মর্মগাথা, চামেলী, গীতাবলী, প্রেমগাথা, ব্রজগাথা, নারীধর্ম, গার্হস্থ্যধর্ম, অমিয়গাথা, শিশুমঙ্গল, ধবলেশ্বর, কুসুমগাথা (অসম্পূর্ণ)।

নগেন্দ্রবালা লাহিড়ী—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—বিবাহ রাত্রি, পদস্খলন।

নজরুল ইস্লাম, কাজী—বিদ্রোহী কবি। জন্ম—১৩০৬ বঙ্গ ১১ই জ্যৈষ্ঠ বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমায় চুরুলিয়া গ্রামে। বাল্য নাম—দুঃখ মিঞা। পিতা—কাজি ফকির আহম্মদ। মাতা—জাহেদা খাতুন। শিক্ষা—গ্রামের মক্তব, শিয়ারশোল রাজ স্কুল, দরিরামপুর হাই স্কুল (মৈমনসিংহ)। কর্ম—৪৯ নং বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান (১৯১৭-১৮), সৈনিকরূপে নওশেরা, করাচী, মেসোপটেমিয়া গমন। হাবিলদার পদ-প্রাপ্তি। ১৯২১ খৃঃ দেশে প্রত্যাবর্তন ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে যোগদান। রাজদ্রোহ-মূলক রচনা প্রকাশের জন্য এক বৎসর কারাদণ্ড (১৩২৯)। হুগলীতে বাস স্থাপন (১৩৩১)। বহু গীত রচনা। স্মৃতিশক্তি-

লোপ (১৩৪৯)। গ্রন্থ—ছোট গল্প—ব্যথার দান, রিক্তের বেদন। উপন্যাস—বাঁধনহারা, মৃত্যু-ক্ষুধা। নাটক—আলেয়া, ঝিলিমিলি। কাব্যগ্রন্থ—অগ্নিবীণা (১৩২৯ বঙ্গ), দোলন চাঁপা (১৩৩০), সঞ্চিতা, ছায়ানট, ভাঙ্গার গান, বিষের বাঁশী (১৩৩৩), চিত্তনামা (১৩৩১), সিন্ধু হিন্দোল, সর্বহারা, নজরুল-গীতিকা, দেওয়ান-ই-হাফিজ। সম্পাদক—ধূমকেতু (১৩২৯ বঙ্গ), নবযুগ, লাঙ্গল।

নজিবর রহমন মুহম্মদ—গ্রন্থকার। নিবাস—পাবনা জেলার ইতিকমোল গ্রামে। গ্রন্থ—আনোয়ারা (উপন্যাস)।

নজীরুদ্দীন আহমদ, মুহম্মদ—সাহিত্যিক। সম্পাদক—সুলতান (মাসিক, কুমারখালি—১৯০১)।

নন্দেরচাঁদ পাল—পাঁচালীকার। জন্ম—বীরভূম জেলার গৌড়েশ্বর থানার হাটপ্রচন্দপুর গ্রামে। পাঁচালীগ্রন্থ—রামশক (১২৮২ বঙ্গ)

ননীগোপাল গোস্বামী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রতিপত্তি।

ননীগোপাল মজুমদার—প্রত্নতাত্ত্বিক। জন্ম—১৩০২ বঙ্গ যশোহর জেলায়। মৃত্যু—১৩৪৫ বঙ্গ ২২এ কার্তিক। শিক্ষা—বি-এ (১৯১৭), এম-এ (১৯২০)। কর্ম—ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগে (১৯২০), গবেষণা (মহেঞ্জোদড়ো—১৯২৫-১৯২৬), সুপারিনটেণ্ডেণ্ট—ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম (১৯৩১)। সিন্ধুপ্রদেশে দাদু জেলায় সরকারী কার্যে রত অবস্থায় দস্যুদল কর্তৃক নিহত। গ্রন্থ—Explorations in Sind (ASI, ১৯৩৪).

ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। গ্রন্থ—আনন্দ আশ্রম (১৮৯৩)। সম্পাদক—আশা (১৩০১-১৩১৪)।

ননীলাল চক্রবর্তী—সাহিত্যিক। সম্পাদক—গৌড়প্রভা (১৩৩০-৩৭)।

ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ব্যবহারজীবী ও কবি। ছদ্মনাম-পরিব্রাজক। জন্ম—১২৬৩ বঙ্গ পৌষ কলিকাতার উপকণ্ঠে বড়িশা-বেহালা গ্রামে। শিক্ষা—বড়িশা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, ভবানীপুর লণ্ডন মিসনারী কলেজ, মেডিকেল কলেজ। আইন অধ্যয়ন। আইন ব্যবসায় (১৮৮৭ খৃঃ) মৈনপুরীতে। গ্রন্থ—অমৃতপুলিন (উপন্যাস), যুগলপ্রদীপ (১৯০১), বসন্তের রাণী, কোহিনুর, পাঁচ রকম (১৩১৩), রুদ্রসেন, শৈলবালা।

ননীলাল ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নারীর অধিকার, বিষপান; নাটক—দ্রোণাচার্য, জরাসন্ধ।

নন্দকিশোর—আয়ুর্বেদবিদ্‌। গ্রন্থ—চিকিৎসা-সার-সাগর।

নন্দকিশোর দাস—বৈষ্ণব কবি। কাব্যগ্রন্থ—বৃন্দাবনলীলামৃত (বরাহ-সংহিতা অবলম্বনে), রসপুষ্পকলিকা (রাধাকৃষ্ণের বিলাস বর্ণনা)।

নন্দকিশোর সিদ্ধান্ত—গ্রন্থকার। পিতা—রুক্মিণী চক্রবর্তী। গ্রন্থ—মন্ত্রবোধিনী (বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা)।

নন্দকুমার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ব্যাকরণ-দর্পণ (১৮৫০)।

নন্দকুমার দত্ত—অনুবাদক। অনুবাদ গ্রন্থ—হনুমান-চরিত্র, কাকচরিত্র ও স্পন্দন-চরিত্র (১৮৭৩)।

নন্দকুমার ভট্টাচার্য, কবিরত্ন—গ্রন্থকার। জন্ম—ধনুক নামক গ্রামে (মাতুলালয়ে)। পিতা—নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। পৈতৃক নিবাস—রাধাকান্তপুর। উপাধি—কবিরত্ন। গ্রন্থ—কালীকৈবল্যদায়িনী (১৮৪১), তত্ত্ববিলাস। সম্পাদক—নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা (পাক্ষিক, ১৮৪৬)।

নন্দকুমার রায়—পণ্ডিত। জন্ম—হুগলী জেলার গরাফা গ্রামের বৈদ্যবংশে। শিক্ষা—হুগলী কলেজ। কর্ম—ভারতীয় সৈনিক বিভাগের একাউণ্টেণ্ট অফিসে। গ্রন্থ—অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌ (অনুবাদ), ব্যাকরণ দর্পণ (১৮৫৩)।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—কবি। জন্ম—১৩১৬ বঙ্গ মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুর গ্রামে। পৈতৃক নিবাস—নদীয়া জেলার ভাজনঘাট গ্রামে। শিক্ষা—মেদিনীপুর ও বহরমপুর। কর্ম—'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে। গ্রন্থ—প্রেম ও পাদুকা, অদৃশ্য সংকেত; ভুলনৌকায়, ছন্দপতন, কাঁটাতার, মিছে কথা, বনটিয়া, সেতু।

নন্দরাম ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা কৃষ্ণলীলা।

নন্দরাম মিশ্র—জ্যোতির্বিদ্‌। গ্রন্থ—সঙ্কেত-চন্দ্রিকা (১৭৭৭ খৃঃ), যন্ত্রসার (১৮৭১ খৃঃ), শ্রীকৃষ্ণ-জন্মপত্র।

নন্দলাল দে—রাজকর্মচারী ও গ্রন্থকার। শিক্ষা—এম, এ, বি, এল। কর্ম—বেঙ্গল জুডিসিয়েল সার্ভিস। গ্রন্থ—Civilisaion in India, The Geographical Dictionary of Ancient & Mediaeval India. (লণ্ডন)।

নন্দলাল বসু—প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী। জন্ম—১৮৮৩ খৃঃ ৩রা ডিসেম্বর। শিক্ষা—গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল ও আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট শিক্ষা এবং তাঁহার যোগ্য শিষ্য। শান্তিনিকেতনে যোগদান (১৯১৪ খৃঃ), শান্তিনিকেতনের কলাভবনের অধ্যক্ষ (১৯১৯—১৯৫১)। ডক্টরেট উপাধিলাভ (বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৫১)। গ্রন্থ—ফুলকারী, ১ম, ২য়, ৩য়, রূপাবলী ৩ খণ্ড, শিল্পকথা (১৩৫১)।

নন্দলাল শর্মা—সঙ্গীতজ্ঞ। গ্রন্থ—সঙ্গীতসূত্র (১৮৭০)।

নন্দলাল শীল—অনুবাদক। জন্ম—১৮৬১ খৃঃ ফেব্রুয়ারি, ২৪-পরগণা বড়িশা-বেহালা। কর্ম—নিজাম ষ্টেটের এ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেল, বিকানীর ষ্টেটের স্পেশাল ফাইন্যান্স অফিসার। গ্রন্থ—বরোগ (কৃষ্ণকান্ত উইলের উর্দু অনুবাদ)।

নন্দলাল সরকার—সাহিত্যিক। সম্পাদক—কলিকাতায় নিগূঢ় তত্ত্ব (মাসিক, ১২৯০)।

নন্দলাল সিংহ—দার্শনিক পণ্ডিত। শিক্ষা—এম. এ., বি. এল। কর্ম—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। গ্রন্থ—The Vaisesika (S.B.H.S.) Sutras of Khanda (ঐ), Narada Bhakti Sutra (ঐ), Sankhya Sutra (ঐ)।

নন্দপণ্ডিত—গ্রন্থকার। ১৬শ শতাব্দী বারাণসী। নামান্তর—বিনায়ক পণ্ডিত। পিতা—রামপণ্ডিত ধর্মাধিকারী। গ্রন্থ—দত্তকমীমাংসা, কেশববৈজয়ন্তী (টীকা), সংস্কারনির্ণয়, কাশীপ্রকাশতত্ত্ব, শ্রাদ্ধমীমাংসা, হরিবংশবিলাস।

নন্দাভিরাম—জ্যোতির্বিদ্‌। গ্রন্থ—ইষ্টদর্পণ (ফলিত জ্যোতিষ)।

নন্দিকেশ্বর—জ্যোতির্বিদ। গ্রন্থ—গণকমণ্ডল, জ্যোতিষ-সংগ্রহসার।

নফরচন্দ্র পাল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বঙ্গ-বিবরণ (১৮৬৮)।

নবকান্ত—গ্রন্থকার। নিবাস—বাহিরগাছি। গ্রন্থ—পঞ্চরত্ন (নীতিমূলক গ্রন্থ—১৮৫৪ খৃঃ)।

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়—দেশকর্মী ও সমাজ-সংস্কারক। জন্ম—১২৫২ বঙ্গ আশ্বিন ঢাকা বিক্রমপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামে। মৃত্যু—

১৩১১ বঙ্গ আশ্বিন ঢাকা। পিতা—কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষা—প্রবেশিকা (ঢাকা সরকারী স্কুল—১৮৬১)। শিক্ষকতা, ঢাকা জগন্নাথ স্কুল (পরে জুবিলি স্কুল নামে পরিচিত, ১৮৭৮ খৃঃ)। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া পিতার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত (১২৭৬ বঙ্গ)। প্রতিষ্ঠাতা—ঢাকা শুভসাধিনী সভা (১৮৭০), অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা —অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা (ঢাকা—১৮৭০)। পরিচালক—The East (পত্রিকা, ঢাকা)। গ্রন্থ—সঙ্গীত-মুক্তাবলী (সংগ্রহ) ৩ খণ্ড, মহাত্মা রামমোহন রায় (ইংরেজি ও বাংলা), পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সঙ্গীত-রসমঞ্জরী, সরল গৃহচিকিৎসা, ডাক্তার নিশিকান্ত ও শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী, Descriptive Geography & a brief historical Sketch of the Dacca District (১৮৬১, ঢাকা)। সম্পাদিত গ্রন্থ—স্ত্রীলোকের রচনাবলী (ঢাকা, ১৮৭১)। সম্পাদক—মহাপাপ বাল্যবিবাহ (ঢাকা বিবাহ-নিবারণী সভার মুখপত্র, মাসিক, ১২৮০)।

নবকুমার চক্রবর্ত্তী—সাহিত্যিক। অন্যতম সম্পাদক—বিজ্ঞান-সারসংগ্রহ (পাক্ষিক, দ্বিভাষিক পত্র—১৮৩৩)।

নবকুমার দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বঙ্গদর্পণ (১২১৫), প্রেম-লহরী, ব্লাক উইল, (১৩১৩), রেলওয়ে-রহস্য, অমরাবতী, কাঁচ মাথা (১৩১৩), রাণী কৃষ্ণভামিনী, প্যারিস-রহস্য (১১০১), রাণী চৌধুরী, কুমারী ইন্দিরা, মূলে ভুল, বীরবল-রহস্য, বিলাতী-রহস্য (১৩১২), বাসরে খুন (১৩১৩), রমণী-ঐশ্বর্য, তাসসূত্র, মুরলা (১৩১৫), স্বর্ণবাই। সম্পাদক—অবসর (১৩১৪—১৭)।

নবকুমার রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রসন্নপ্রদায়িনী (১৮৭৩)।

নবকৃষ্ণ ঘোষ—কবি ও জ্যোতির্বিদ। ছদ্মনাম—কবি রামশর্মা। জন্ম—১৮৩৭ খৃঃ ২১এ আগষ্ট পাথুরিয়াঘাটা বিখ্যাত ঘোষ-বংশে। মৃত্যু—বরাহনগর কুঠিঘাটায়। শিক্ষা—শৈশব হইতেই ইংরেজি সাহিত্য ও কবিতা রচনা। ইংরেজি কবিতা-রচনার সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ (১৮৭৫ খৃঃ)। কর্ম—সরকারী চাকুরী, এ্যাকাউটেণ্ট জেনারেলের সহকারী (১৮৬৬), অবসর গ্রহণ (১৮৭৮)। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বহু ইংরেজি কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন; গ্রন্থ—জ্যোতিষ প্রকাশ (বঙ্গভাষায় প্রথম জ্যোতিষ গ্রন্থ)। A Reply to Mancrieff's fidelity of Conscience, Works of Ran-Sarma (মৃত্যুর পর প্রকাশিত)।

নবকৃষ্ণ ঘোষ—গ্রন্থকার। শিক্ষা—বি. এ। গ্রন্থ—অডিসির গল্প, সরযূ, অপবাদ, অনুতাপ, একালের মেয়ে, তর্পণ, সাধ্বী সৌদামিনী, মনের দাগ, স্নেহের দান, ভোরের আলো, আশার আলো, ভবাণীর মাসকাবার, প্যারী সরকারের জীবনী, দ্বিজেন্দ্রলাল (জীবনী)।

নবকৃষ্ণ বসু—সাহিত্যিক। সম্পাদক—সত্যজ্ঞান-সঞ্চারিণী পত্রিকা (মাসিক, ১৮৫৬)।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—সাহিত্যসেবী। মৃত্যু—১৩৪৭ বঙ্গ। গ্রন্থ—বালক পথ, বাঙ্গালার ছবি, ছেলেখেলা, কবিতাকুসুম; শিশুরঞ্জন রামায়ণ, লেখাপড়া, ১ম, ২য়, টুকটুকে রামায়ণ, সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ, সচিত্র কাশীদাসী মহাভারত। সম্পাদক—সখা (১৮১৩-১৪)।

নবকৃষ্ণ রায়—সাংবাদিক। সম্পাদক—সংবাদ সাধুরঞ্জন (সাপ্তাহিক, ১৮৪৭)।

নবগোপাল দাস—গ্রন্থকার। জন্ম—১৯১০ খৃঃ ঢাকা। শিক্ষা—ঢাকা ও কলিকাতা। ইনি প্রবেশিকা, আই. এস. সি ও বি. এস. সি-তে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পি. এইচ. ডি (লণ্ডন)। গ্রন্থ—চলতি পথের বাঁশী, ছিন্ন পাপড়ি, সাগর দোলার ঢেউ, অসমাপ্ত।

নবগোপাল বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দায়ভাগ-সংগ্রহ (ভুমরাজপুর, ১৮৭৩), দত্তক ব্যবস্থামালা (১৮৭৪), দত্তক-দীধিতি (১৮৭৪)।

নবগোপাল মিত্র—দেশব্রতী। প্রতিষ্ঠাতা—হিন্দুমেলা ব্যায়াম বিদ্যালয়। সম্পাদক—ন্যাশনাল পেপার (সাপ্তাহিক)।

নবদ্বীপ ব্রজবাসী—কীর্ত্তনীয়া। জন্ম—১৯২৪ সংবত বৃন্দাবন ধামে। পিতৃদত্ত নাম—পূরণচন্দ্র ব্রজবাসী। পিতা—কীর্ত্তনীয়া কৃষ্ণদাস ব্রজবাসী। ইনি পণ্ডিত বাবাজীর নিকট 'গরাণহাটী ও মনোহরসাই' অভ্যাস করেন। কলিকাতা আগমন (১৩২০), ভবানীপুর কীর্তন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। সম্পাদিত গ্রন্থ—(রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর সহ) পদামৃতমাধুরী, ১ম ও ২য় খণ্ড।

নবাবালী চৌধুরী, নবাব সৈয়দ, খাঁ বাহাদুর—মুসলমান গ্রন্থকার। জন্ম—মৈমনসিংহ জেলার ধনবাড়ী গ্রামে। গ্রন্থ—মৌলুদ শরীফ, ইদল আজহা।

নবাব উদ্দীন আহম্মদ, মৌলভী কাজি—গ্রন্থকার। নিবাস—খুলনা। গ্রন্থ—মহাত্মা হজরত এনাম আবুহানীফা সাহেবের জীবন-চরিত (১৩০৫), পারসী শিক্ষা (২য় খণ্ড)।

নবীনকিশোর মিত্র—গ্রন্থকার। এলাহাবাদ-প্রবাসী। গ্রন্থ—সৌহার্দকুসুম।

নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জগৎবর্ণন, ১ম (১৮১০)।

নবীনকৃষ্ণ বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চিত্তোৎকর্ষ (১৮৫৮)।

নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক ও সংবাদপত্রসেবী। জন্ম—১৮২৪ খৃঃ নদীয়া জেলার ঘোষপাড়ার জমিদার-বংশে। মৃত্যু—১৮১৬ খৃঃ ডিসেম্বর। শিক্ষা—হুগলী ও কলিকাতা। কর্ম—মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ম্যানেজার (কিছু কাল)। গ্রন্থ—প্রাকৃত তত্ত্ববিবেক, জ্ঞানাঙ্কুর, ১ম, ২য়, করসংক্রান্ত আইনের নজীর। সম্পাদক—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৭৭১ শক), হিন্দু পেট্রিয়ট, এডুকেশন গেজেট।

নবীনচন্দ্র আঢ্য—সাহিত্যিক। জন্ম—বড়বাজারের বিখ্যাত আঢ্য-বংশে। সম্পাদক—বঙ্গবিদ্যা-প্রকাশিকা (মাসিক, ১৮৫৫)।

নবীনচন্দ্র কর্মকার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিলাপমঞ্জরী (১৮৭২)।

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী—চিকিৎসক ও রাজকর্মচারী। জন্ম—১৮৪০ খৃঃ। আদি নিবাস—পাবনা জেলায়। মৃত্যু—১৩১১ বঙ্গ আগ্রা। ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৬৭—কলিকাতা মেডিকেল কলেজ)। অতঃপর সরকারী কাজে নিযুক্ত হইয়া নানা দেশে গমন ও আগ্রার মেডিকেল কলেজের চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক। রায় বাহাদুর উপাধি লাভ। গ্রন্থ—The Principle & Practice of Medicine.

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী—সাহিত্যিক। নিবাস—তারপাশা গ্রাম। সম্পাদক—হিতসাধিনী (মাসত্রৈমিক, ১২৭৮)।

নবীনচন্দ্র দত্ত—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৪৩ বঙ্গ ২০এ আশ্বিন কলিকাতা জোড়াবাগানে। মৃত্যু—১৩০৫ বঙ্গ ৮ই পৌষ। পিতা—দীননাথ দত্ত। শিক্ষা—ফ্রি চার্চ ইনষ্টিটিউসন। কর্ম—একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিসের সুপারিনটেনডেণ্ট। অবসর গ্রহণ (১২৯৭ বঙ্গ)। গ্রন্থ—খগোল বিবরণ (১২৭৩), ব্যবহারিক জ্যামিতি, ক্ষেত্রব্যবহার, জরীপ ও সমস্থান প্রক্রিয়া (১২৭৬), সঙ্গীত রত্নাকর (১২৭৯), সাহিত্যমঞ্জরী (১২৮০), সচিত্র বর্ণবিবোধ (১২৮২), মহাজনী দর্শন ও সোজা শুভঙ্করী জমাখরচী হিসাব অনুসারে জমীদারী ও বাজার হিসাব (১২৮২), গীতসার-সংগ্রহ (১২৮৩), নিধুবাবুর গীতাবলীর সংশোধিত ভূমিকা (১৩০৫), নিত্যকর্মপদ্ধতি (১৩০৫), হারমোনিয়ম সূত্র (১৩০৫), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (টীকা), সঙ্গীত-সোপান, Notes of Practical Geometry (অনুবাদ, ১২৮০), Notes on Surveying (অনুবাদ, ১২৮০), Hints to Ameers on Khusrah Survey in Bengal (অনুবাদ, ১২৮২), Dutt's Educational Series (১৮৬১), The Hand book of Book-keeping (১৮৬১)।

নবীনচন্দ্র দাস—কবি। জন্ম—১৮৫৩ খৃঃ ২৭এ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম জেলার আলামপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩২১ বঙ্গ ৬ই পৌষ। পিতা—মাগনচন্দ্র দাস। শিক্ষা—প্রবেশিকা (চট্টগ্রাম হাই স্কুল—১৮৬৯), এফ. এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ—১৮৭১), বি. এ. (ঐ, ১৮৭৪), এম, এ ঐ, (১৮৭৫), বি, এল (১৮৭৭)। কর্ম—আইন অধ্যাপক, চট্টগ্রাম কলেজ (১৮৭৭), ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর (১৮৭৯)। উপাধি—কবিগুণাকর (১৯০৬)। বিদ্যাপতি (১৯১০), কাব্যরত্নাকর। গ্রন্থ—আকাশকুসুম-কাব্য (১২৯০), কালিদাসের বিদ্যালাভ-কাব্য (১২৮৩), রঘুবংশ (পদ্যানুবাদ) ১ম (১৮৯১), ২য় (১৮৯৭), ৩য় (১৮৯৫), শোকগীতি (১৯০০), শিশুপাল-বধ (১৯০৫), কিরাতার্জুন (পদ্যানুবাদ) ১ম (১৯০৬), ২য় (১৯১৪), চারুচর্চাশতক (১৩১৯)। সম্পাদক—বিভাকর (১৩০৪), প্রভাত (১৩১৯)।

নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সারাবলী (১৮৫১)।

নবীনচন্দ্র ভদ্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ইচ্ছামূলাকর্ষণ (১৮৬৯), ভাওয়ালের ইতিহাস (ঢাকা, ১৮৭৫)।

নবীনচন্দ্র রায়—পণ্ডিত, শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। পাঞ্জাব প্রবাসী। মৃত্যু—১৮৯০ খৃঃ। কর্ম—পঞ্জাবে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, জে, পি ও ডেপুটী একাউণ্টেণ্ট জেনারেল পদ। অধ্যক্ষ, লাহোর ওরিয়েণ্ট্যাল কলেজ, রতলাম (মধ্য ভারত) মহারাজের মন্ত্রী। গ্রন্থ—নবীন চন্দ্রোদয় (হিন্দী), স্থিতিতত্ত্ব ঔর গতিতত্ত্ব (হিন্দী), জলগতি ঔর বালুকাতত্ত্ব (হিন্দী), নারীধর্ম (হিন্দী)।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। ছদ্মনাম—ভুবনমোহিনী দেবী। জন্ম—১২৬০ বঙ্গ ২২এ আষাঢ় বর্দ্ধমান বুড়াগ্রামে। মৃত্যু—১৩২৯ বঙ্গ ১১ই ভাদ্র। পিতা—ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। ইনি ছদ্মনামে গ্রন্থ এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রে লিখিতেন। গ্রন্থ—ভুবনমোহিনী প্রতিভা, ১ম (১৮৭৫), ২য় (১৮৭৭); আর্যসঙ্গীত ১ম-২য় (কাব্য, ১২৮৬), উত্তরভাগ (১৩০১), সিন্ধুদূত (১৮৮৩)। সম্পাদক—বিনোদিনী (মাসিক, নসীপুর, ১৮৭৫)।

নবীনচন্দ্র সেন—কবি। জন্ম—১২৫৩ বঙ্গ ২৪এ মাঘ চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্বর্তী নয়াপাড়া গ্রামে। মৃত্যু—১৯০৯ খৃঃ চট্টগ্রামে। পিতা—গোপীমোহন সেন (মুন্সেফ)। মাতা—রাজরাজেশ্বরী। শিক্ষা—প্রবেশিকা (চট্টগ্রাম স্কুল—১৮৬৩) এফ-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ—১৮৬৫), বি-এ (ঐ, ১৮৬৮)। কর্ম—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। ইনি পাঠদ্দশা হইতেই বিবিধ কবিতা রচনা করিতেন ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রে লিখিতেন। গ্রন্থ—অবকাশ-রঞ্জিনী (১২৮৪), রঙ্গমতী (কাব্য, ১৮৮০ খৃঃ), পলাশীর যুদ্ধ (কা, ১২৮২), ক্লিওপেট্রা (ঐ, ১২৮৪), রৈবতক (ঐ, ১২৯৩), খৃষ্ট (কবিতা, ১২৯৭), শ্রীমদ্ভাগবদগীতা (পদ্যানুবাদ, ১৮৮৯ খৃঃ), প্রবাসের পত্র (১২৯৯), প্রভাস (১৮৯৬), মার্কণ্ডেয় চণ্ডী (পদ্যানুবাদ, ১৮৯৪), ভানুমতী (কাব্য, ১৯০০ খৃঃ), কুরুক্ষেত্র (কাব্য, ১৩০০), অমিতাভ (বুদ্ধ—১৩০২), অমৃতাভ (চৈতন্য—১৩১৬), আমার জীবন, ১ম—৫ম (১৩১৪-১৩২০)।

নবীন পণ্ডিত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সারাবলী (কেট্‌লী, মার্শমান, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতির ইতিহাস হইতে সংগৃহীত—১৮৪৮)।

নবেন্দুভূষণ ঘোষ—সাহিত্যিক। নিবাস—পাটনা। গ্রন্থ—নায়ক ও লেখক, মানুষ (গ), এই সীমান্তে (গ), প্রান্তরের গান, কালো রক্ত, পোষ্ট মর্টেম (গ), ফিয়ার্স লেন, পৃথিবী সবার, কাঞ্চনপুরের ছেলে, ইস্পাত (গ), ডাক দিয়ে যাই (১৩৫১), বসন্তবাহার, কান্না (গ)।

নলিনবিহারী মিত্র—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—কলিকাতা। নিবাস—এলাহাবাদ। এম. এ। অধ্যাপক, Ewing Christian College. গ্রন্থ—Hindu Mathematics, Indian Literary Year Book & Author's who's who.

নবীনাকালী দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—কামিনী-কলঙ্ক, মন্দোদরীর রণসজ্জা।

নয়চন্দ্র সূরী—জৈন গ্রন্থকার। গ্রন্থ—হম্মীর মহাকাব্য (১২৮৭)।

নয়নানন্দ দাস—বৈষ্ণব পদকর্তা। পূর্বনাম—ধ্রুবানন্দ মিশ্র। জন্ম—মুর্শিদাবাদ কান্দী মহকুমার ভরতপুর গ্রামে। পিতা—বাণীনাথ মিশ্র। ইনি বৈষ্ণবাচার্য গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র ও মন্ত্রশিষ্য। ইহার অসাধারণ কবিত্বশক্তি দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও গঙ্গাধর পণ্ডিত ইহাকে স্নেহ করিতেন এবং নয়নানন্দ নাম রাখেন। ইহার অসংখ্য পদ আছে। গ্রন্থ—প্রায়োলক্তি-রসান্তর।

নয়নানন্দ শর্মা—টীকাকার। টীকা গ্রন্থ—কৌমুদী।

নয়নারায়ণ—গ্রন্থকার। পঞ্জাব অধিবাসী। সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষায় অভিজ্ঞ। মৃত্যু—১৭২৬ খৃঃ। গ্রন্থ—গুলশান-ই-রাজ (রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতির বীরত্ব কাহিনী)।

নরচন্দ্র—জ্যোতিষী। গ্রন্থ—নরচন্দ্র জ্যোতিষী বা পদ্ধতি (১৫৯৭ খৃঃ), ভুবনপ্রদীপ।

নরপতি—শাকুন শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত। ধারানগরবাসী জৈন ধর্মাবলম্বী। পিতা—আম্রদেব। গ্রন্থ—নরপতি জয়াচার্য (১১৭৫ খৃঃ)।

নরবাহন—আয়ুর্বেদবিদ্। গ্রন্থ—রসানন্দ-কৌতুক।

নরসিংহ—জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত। গ্রন্থ—গ্রহদীপিকা, বর্ষফল।

নরসিংহ কবিরাজ—আয়ুর্বেদবিদ্। গ্রন্থ—চরকতত্ত্বপ্রকাশকৌস্তুভ (টীকাগ্রন্থ), সিদ্ধান্তচিন্তামণি, মধুমতী।

নরসিংহ দাস—পদকর্তা ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—হংসদূত (ছন্দানুবাদ), দর্পণ-চন্দ্রিকা, প্রেম-দাবানল, পদ্মশৃঙ্গার।

নরসিংহ, দ্বিজ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—উদ্ধব-সংবাদ।

নরসিংহ দেব ঘোষাল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিশ্বজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান (১৮৫৭)।

নরহরি—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সত্যনারায়ণ-ব্রতকথা।

নরহরি আচার্য—গ্রন্থকার। ১৮শ শতাব্দী দাক্ষিণাত্যে। গ্রন্থ—বোধসার (যোগবাশিষ্ঠ শাস্ত্রের সার)।

নরহরি চক্রবর্তী—বৈষ্ণব কবি। পিতা—জগন্নাথ চক্রবর্তী। ইনি নরহরি দাস নামেও পরিচিত। গ্রন্থ—ভক্তিরত্নাকর, গীতচন্দ্রোদয়, ছন্দঃসমুদ্র, প্রক্রিয়া-পদ্ধতি, নরোত্তম-বিলাস। গৌরচরিতচিন্তামণি, শ্রীনিবাসচরিত।

নরহরি দাস, সরকার, ঠাকুর—বৈষ্ণব কবি। জন্ম—১৪৭৮ (আনু) বর্ধমান জেলায় শ্রীখণ্ড গ্রামে। মৃত্যু—১৫৪০ খৃঃ (আনু)। পিতা—নারায়ণ দাস সরকার। ইনি মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য ও অনুরক্ত পার্ষদ। শ্রীখণ্ডে গৌরনিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। গ্রন্থ—ভক্তিচন্দ্রিকা-পটোল, শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত, ভক্তামৃতাষ্টক, নামামৃত-সমুদ্র, গীতচন্দ্রোদয়।

নরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী, চৌধুরী—গ্রন্থকার। কাশ্মীর ও জম্মু (ভ্রমণ)।

নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা—সাহিত্যিক। মহারাজকুমার, ত্রিপুরা। সম্পাদক—রবি (১৩৩৪)।

নরেন্দ্রনাথ অধিকারী—সাহিত্যিক। সম্পাদক—চাষা ও ব্রাত্যক্ষত্রিয় (মাসিক, ১১০১)।

নরেন্দ্র দেব—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৯৫ বঙ্গ কলিকাতা ঠনঠনিয়া কালীতলা। পিতা—নগেন্দ্রচন্দ্র দেব। শিক্ষা—মেট্রোপলিটান স্কুল। ছাত্রাবস্থা হইতেই সাহিত্য-সাধনা ও কবিতা-রচনা ; গ্রন্থ—গরমিল, খেলার পুতুল, বোঝাপড়া, গৌতমের গতজন্ম (শি), যাদুঘর। ছোট গল্প—চতুর্বেদাশ্রম, সুহাসিনী ; কাব্য-গ্রন্থ—রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, মেঘদূত, বসুধারা, কাব্যদীপালী, দেওয়ান-ই-হাফিজ, আকাশকুসুম, সিনেমা, সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র, শরৎপ্রতিভা। ভ্রমণ-কাহিনী—রাজপুতের দেশে, সাহেব বিবির দেশে, তথাগতের পথে ; আনন্দমেলা (শি) পরাগ ও রেণু (শি)। সম্পাদিত গ্রন্থ—সোনার কাঠি (বার্ষিক)। সম্পাদক—পাঠশালা (১৩৪৩)।

নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শুভাশীষ, খেলাঘর, অক্ষয় কীর্তি, বাঁধা পথ, বিয়ের দাম, বৌভাত, বরকনে, পদ্মরাণী।

নরেন্দ্রনাথ বসু—সাহিত্যিক। সম্পাদক—নলিনী (১২৮৮ — ১২৮১)।

নরেন্দ্রনাথ বসু—সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। জন্ম—১২৯৭ বঙ্গ ৪ঠা চৈত্র ২৪-পরগনার অন্তর্গত সোনারপুর কামরাবাদে (মাতুলালয়ে)। পিতা—উপেন্দ্রনারায়ণ বসু। মাতা—বিনোদিনী। নিবাস—পটলডাঙ্গা কলিকাতা। প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা—প্রবেশিকা শ্রেণীতে পাঠকালে ছাত্রসখা (মাসিক, ১৩১৪), বিজ্ঞান-দর্পণ (বিজ্ঞান সভার রসায়ন বিভাগে ছাত্রাবস্থায়, ১৩১৫), অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—বঙ্গ সাহিত্য-সভা (বোম্বাই, ১৩৪৬) ; সম্পাদক—রবিবাসর (১৩৪১)। গ্রন্থ—পূজা (পুস্তিকা, ১১১৬)। তাম্রকূট না কূট (পুস্তিকা, ১১১৫), বড়, অবতার (গল্প, ১৩২৭) মানস-কমল (ঐ, ১৩৩২), খাদ্য-কথা (বিজ্ঞান, ১১২২), আসামের সুদূর

প্রান্তে ভ্রমণ, ১৩৫৮)। সম্পাদিত গ্রন্থ—ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র (১৩৪৭)। সম্পাদক—বাঁশরী (সাপ্তাহিক ১৩৩০), মাসিক (১৩৩১ আষাঢ়—১৩৩৩), সঞ্জীবনী (শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৩ ও ১৩৪৪ ,) ঊষা (শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৩)।

নরেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ—পণ্ডিত। গ্রন্থ—ন্যায়দর্শনের ইতিহাস, Vaisesik system, Advaita Vedanta System, Sremad Vagavat Gita.

নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রূপের নেশা, নবীন গোয়েন্দা, নারীর বল, সংজ্ঞা, দলিতা কুসুম, জয়মাল্য।

নরেন্দ্রনাথ রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কেদার রায়, ঝাঁসির রাণী, বিজয়ী বাংলা, রাজা সীতারাম।

নরেন্দ্রনাথ লাহা—বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পপতি। জন্ম—১৮৮৫ খৃঃ। পিতা—রাজা হৃষীকেশ লাহা। শিক্ষা—প্রেসিডেন্সী কলেজ, এম-এ বি-এল, পি, আর এস, পি এইচ ডি। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার্সের সভাপতি (১৯২৪, ১৯৪১)। গ্রন্থ—ভারতে শিক্ষাবিস্তার, প্রাচীন হিন্দু দণ্ডনীতি, প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ, দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো (১৯৩৩), দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক, Studies in Ancient Hindu Polity, Promotion of Learning in India. ২ খণ্ড। সম্পাদিত গ্রন্থ—হরপ্রসাদ। সংবর্ধন-লেখমালা, ২য় খণ্ড। সম্পাদক—Indian Historical Quaterly, সুবর্ণবণিক সমাচার, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (১৩৩১-১৩)।

নরেন্দ্রনাথ সরকার—নাট্যকার। গ্রন্থ—স্বর্গারোহণ (১৯০১)।

নরেন্দ্রনাথ সেন—দেশহিতৈষী ও সংবাদপত্রসেবী। জন্ম—১২৫০ বঙ্গ ফাল্গুন কলিকাতা, কলুটোলা। মৃত্যু—১৩১৮ বঙ্গ ১৬ই আষাঢ়। পিতা—হরিমোহন সেন। শিক্ষা—হিন্দু কলেজ। কর্ম—এটর্নী ব্যবসায়, রাজনীতিচর্চা, সভাপতি, ভারত-সভা, রায় বাহাদুর উপাধি লাভ (১৯০৮)। সম্পাদক—Indian Mirror (পাক্ষিক, ১৮৬৩), সুলভ-সমাচার (১৯১১), Indian Mirror (দৈনিক ১৮৮৩—১৯১১)।

নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—সাহিত্যিক। সম্পাদক—প্রতিভা (১৩৩৪—৩৬)।

নরেন্দ্র মিত্র—গ্রন্থকার। জন্ম—১৯১৬ খৃঃ ফরিদপুরের অন্তর্গত সদরদী গ্রামে। শিক্ষা—ভাঙ্গা, ফরিদপুর ও কলিকাতা। গ্রন্থ—উল্টোরথ, জোনাকি (কাব্যগ্রন্থ—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিষ্ণু ভট্টাচার্য সহ)।

নরেন্দুমোহন সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিক্ষোভ, ১ম, ২য়।

নরেন্দ্রলাল খাঁ (রাজা)—সাহিত্যিক ও সঙ্গীত-বিশারদ। জন্ম—১৮৬৭ খৃঃ ১৭ই সেপ্টেম্বর নাড়াজোল রাজবাটী, মেদিনীপুর। মৃত্যু—১৯২০ খৃঃ ১৫ ফেব্রুয়ারি। পিতা—রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁ। ব্রিটীশ সরকারের হস্তে নিগৃহীত স্বদেশ-হিতৈষী জমিদার। বঙ্গীয় ব্যবস্থা সভার সভ্য। গ্রন্থ—পরিবাদিনী শিক্ষা।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—আইনজীবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৮২ খৃঃ। শিক্ষা—এম, এ, ডি, এল। অধ্যাপক রিপন কলেজ, সিটি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সহাধ্যক্ষ, ঢাকা আইন কলেজ। আইন ব্যবসায়ী। গ্রন্থ—অগ্নিসংস্কার, রক্তের ঋণ, দ্বিতীয় পক্ষ, পাপের ছাপ, কাঁটায় ফুল, শাস্তি, গ্রামের কথা, বিপর্যয়, ব্যবধান, রাজগী, পিতাপুত্র, মিলন-পূর্ণিমা, দূরের আলো, তৃপ্তি, সতী, একা, রূপের অভিশাপ, তাবিজ, দুষ্টগ্রহ, লক্ষ্মীছাড়া, সর্বহারা, ব্রতী, লুপ্তশিখা, অভয়ের বিয়ে, শুভা, তারপর, অন্তরায়, ঠকের মেলা, নারায়ণী, ঋষির মেয়ে, আনন্দ-মন্দির, আহুতি, বেতারে বর, বিয়ের খাতা, তরুণী ভার্যা, পরিণাম, টিকি বনাম টাক, নিষ্কণ্টক, বংশধর, শেষ পথ, খুনের জের। সম্পাদক—পল্লী-স্বরাজ (১৩৩৫-৩৮), বাসন্তিকা (১৩৩০)।

নরেশ্বর ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জীবনধারা, পাষাণপুরী।

নরোত্তম দাস—বৈষ্ণব কবি। গ্রন্থ—প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-বিলাস, হাটপত্তন, চৌত্রিশ পদাবলী।

নরোত্তম দাস ঠাকুর—বৈষ্ণব পদকর্তা ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৫৩১ খৃঃ মাঘ মাসে রামপুর বোয়ালিয়ার নিকট গড়ের হাট পরগনার খেতুরী নামক মজুমদার উপাধিধারী কায়স্থ রাজবংশে। মৃত্যু—১৫৮৭ খৃঃ ; কার্তিক মাসে। পিতা—রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত। মাতা—রাণী নারায়ণী। বাল্যকালে বৈষ্ণবানুরাগী হইয়া অজ্ঞাতে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ ও ঠাকুর মহাশয় উপাধি লাভ। বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন। ইঁহার কীর্তনগুলি গরাণহাটী কীর্তন নামে খ্যাত। গ্রন্থ—উপাসনাপটল, কুঞ্জবর্ণন, গুরু-শিষ্য-সংবাদ, চন্দ্রমণি, চমৎকারচন্দ্রিকা, প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, প্রেমভক্তিচিন্তামণি, রসভক্তিচন্দ্রিকা, স্মরণমঙ্গল, সাধনভক্তিচন্দ্রিকা, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, সূর্যমণি।

নলিনাক্ষ চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৭৪ খৃঃ রায়নগর, রায়না। কর্ম—ই আর রেলওয়ের ষ্টেশনমাষ্টার, বর্ধমান। গ্রন্থ—শিবাজী ও মরাটাজাতি (১৯০৭), উষারাণী (১৯০৮), দুই ভগিনী (১৯০৯), বনশোভা (১৯১০)।

নলিনীকান্ত ব্রহ্ম—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভারতের অধ্যাত্মবাদ।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী—ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্। জন্ম—১৮৮৮ খৃঃ ২৪এ জানুয়ারি ঢাকার নয়নানন্দ গ্রামে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৯৪৭ খৃঃ ২৩এ ফেব্রুয়ারি ঢাকা। শিক্ষা—প্রবেশিকা (সোনারগাঁ উচ্চ বিদ্যালয়—১৯০৫), এম-এ (১৯১১), ডক্টর উপাধি লাভ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৩৪ খৃঃ)। কর্ম—ঢাকা যাদুঘরের অধ্যক্ষ। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—হাসি ও অশ্রু (গল্প, ১৯১৪), বীরবিক্রম (নাটক) ; সম্পাদিত গ্রন্থ—ময়নামতীর গান, রীনচেতন, কান্তনামা, কৃত্তিবাসের আদিকাণ্ড।

নলিনীকান্ত গুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শিক্ষা ও দীক্ষা, রূপ ও রস, সাহিত্যিকা, ভাবী সমাজ, ভারত রহস্য, আধুনিকী, ভারতে হিন্দু মুসলমান, ফরাসী যোড়শী, বাংলার প্রাণ, পূর্ণযোগ, স্বরাজের পথে, স্বরাজগঠনের ধারা।

[ক্রমশঃ।

কবি-তীর্থে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

দুই

শিক্ষিত বাঙালীরা চিরদিনই ইংরাজ কবিদের ভক্ত। শেলী, বাইরণ, ওয়ার্ডস্‌বার্থ, কীট্‌স্ তাদের আরাধ্য। সেক্সপিয়ারের পর কাব্য-জগতে এঁরাই ছিলেন আমাদের আদর্শ। যখন-তখন আমরা এঁদের কারুর রচনা থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত ক'রে আমাদের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করি। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের লীলাক্ষেত্র বাংলা দেশের কবি-ভক্ত আমরা, ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা দিয়েই বেরিয়ে পড়েছিলাম কবি-তীর্থের সন্ধানে।

লণ্ডনের হ্যাম্পষ্টেড অঞ্চলে থাকেন আমাদের বন্ধু ডাঃ তারাপদ বসু ও তাঁর সুযোগ্যা পত্নী শ্রীমতী লছমী দেবী। এঁদের একটি পুতুলের মতো মেয়ে আছে। তার নাম কুমারী লীনা। আমার স্ত্রী বললেন ওর কিন্তু নাম হওয়া উচিত—'লতা'। অর্থাৎ, লছমীর আদ্যক্ষর 'ল' ও তারাপদর আদ্যক্ষর 'তা' নিয়ে ওর পরিচয়ের রূপ হোক। লণ্ডনে অবস্থান কালে এঁরা স্বামি-স্ত্রী বহুবার আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে ভারতীয় ভোজ্যে পরিতৃপ্ত করতেন। শ্রীমতী লছমী—নামে লক্ষ্মী হ'লেও, রন্ধন-শিল্পে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী। এঁরা দু'জনেই নানা ভাবে আমাদের প্রবাসবাসকে মধুময় ক'রে তুলেছিলেন। আমরা সে জন্য ওঁদের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

এঁদেরই বাড়ী একদা নৈশভোজে নিমন্ত্রণ রাখতে হ্যাম্পষ্টেডের দিকে যেতে হবে ব'লে বেরিয়ে পড়লাম বেশ একটু বেলা থাকতেই। উদ্দেশ্য—হ্যাম্পষ্টেডের যে বাড়ীতে একদিন তরুণ কবি কীট্‌স্ বাস করতে গিয়ে প্রতিবেশিনী তরুণী ফ্যানী ব্রণের প্রেমে নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, সেই কবি-তীর্থের পুণ্য ধূলি স্পর্শ করে ধন্য হয়ে আসবো।

অনেক সন্ধানের পর মিললো সে ঈপ্সিত তীর্থ। কবি কীট্‌স্ লণ্ডনের যে আস্তাবল-বাড়ীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, আজ সেখানে তার কোনও চিহ্ন নেই। এই হ্যাম্পষ্টেডেও তিনি প্রথম যে বাড়ীতে এসে বাস করেছিলেন, সেই "Well Walk" ভবনটিও বহুদিন হ'ল বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু Well Walk নামে পথটি এখনও আছে। এ পথ কীট্‌সের স্মৃতির অসম্মান করেনি আজও। তেমনিই সুন্দর ও মনোহর রয়েছে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা রমণীয় রূপ—যে রূপ একদিন তরুণ কবি কীট্‌সের চিত্ত হরণ করেছিল।

জন কীট্‌সের সহোদর টম কীট্‌সের মৃত্যুর পর কবি তাঁর 'Well Walk' বাস তুলে দিলেন। তখন তাঁর বয়স ২৩ বছর। চলে এলেন হ্যাম্পষ্টেডের এই 'ওয়েণ্ট ওয়ার্থ প্লেসে'। হ্যাম্পষ্টেডের—'কীট্‌স গ্রোভ' রাস্তায় এই ভূতপূর্ব কবি-ভবন। পরে এর নাম হয়েছিল "ল্যনব্যাঙ্ক"। Lawn Bank হ্যাম্পষ্টেডকে আজ আর ঠিক লণ্ডনের উপকণ্ঠ বলা চলে না। টিউব ও বাসের কৃপায় লণ্ডনেরই একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই হ্যাম্পষ্টেড। কিন্তু দেড়শো বছর আগে তা ছিল না। চার ঘোড়ার 'কোচে' বা পায়ে হেঁটে ছাড়া যাতায়াতের উপায় ছিল না। এখানকার

জন কীট্‌স্

(যৌবনের উৎসব দিনে যে প্রতিভাবান কবির জীবন-দীপ নিবে গিয়েছিল)

বিরাট উদ্যান 'হ্যাম্পষ্টেড হীদ্' দেখলে আজও বোঝা যায়, এক সময়ে এখানে ছিল ঘন জঙ্গল।

১৭৯৫ খৃঃ অব্দ। শরতের এক রমণীয় বিদায়বেলা। তারিখ—৩১শে অক্টোবর। ভূমিষ্ঠ হলেন ইংল্যাণ্ডের এই অমিত প্রতিভাশালী কবি লণ্ডনের এক অশ্বশালার মালিকের ঘরে। কবি জন কীট্‌সের পিতাই সেই অশ্বশালার মালিক। তিনি ছিলেন ঘোড়া ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারী। সুতরাং সেদিন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে, এই নবজাত শিশু একদিন তাঁর আশ্চর্য রচনা দ্বারা বিশ্বের হৃদয় জয় করবে। কিশোর বয়সেই শিখতে গিয়েছিলেন তিনি চিকিৎসা বিদ্যা—তবু কীট্‌স্ হ'য়ে উঠলেন ইংল্যাণ্ডের এক জন শ্রেষ্ঠ কবি।

এনফিল্ডের স্কুলে কীট্‌সের প্রথম বিদ্যারম্ভ। পনেরো বছর বয়সে তিনি এলেন স্কুল ছেড়ে সার্জন এডমণ্টনের কাছে ডাক্তারী শিখতে; লণ্ডনের একাধিক হাসপাতালে কেটে গেল চিকিৎসা বিদ্যা নিয়ে জীবনের আরও সাতটি বছর। একুশ বছর বয়সে এল তাঁর ডাক্তারীতে বিতৃষ্ণা। ছেড়ে দিলেন তিনি চিকিৎসার দুরূহ পথ। মনোনিবেশ করলেন সর্বান্তঃকরণে কাব্যচর্চায়। ইতিমধ্যেই আলাপ-পরিচয় হয়েছিল তাঁর ইংল্যাণ্ডের জনকয়েক বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকের সঙ্গে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—Clarke, Leigh Hunt, Hazlitt, Haydon, Shelley ও Godwin.

চিকিৎসা বিদ্যায় ইস্তফা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হ'ল ১৮১৭ খৃঃ অব্দে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "Poems". এই কবিতাগুলির মধ্যে তরুণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের রং একটু বেশী মাত্রায় ছিল। প্রবীণ সমালোচকেরা বলেন, লী'হাণ্টের রচনাভঙ্গীর অনুকরণও না কি এই কবিতাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায়। পরের বছরেই প্রকাশিত হয় তাঁর 'Endymion' কাব্যগ্রন্থ। এলিজাবেথীয় যুগের রোম্যাণ্টিক প্রভাব থেকে মুক্ত নয় এ রচনা।

এর মধ্যে যদিও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-রাগাত্মক চিত্র ও কল্পনার রঙে রচিত বহুবিধ নূতন শব্দবিন্যাস আছে, তা সত্ত্বেও কীট্‌সের বন্ধুরা এ কাব্যকে তাঁদের সপ্রশংস অভিনন্দন জানান। তাঁরা বলেন, উদীয়মান এ কবির কাব্যে প্রভাতের প্রথম উষার অরুণচ্ছটা বিকীর্ণ হয়েছে। প্রাণচঞ্চল সজীবতার অতি চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায় এর মধ্যে। নূতন কবির এ রচনা আশ্চর্য রকম প্রসাদগুণে গরীয়ান। কীট্‌সের সতীর্থ বন্ধুরা যাই বলুন, সমালোচকেরা কিন্তু, কাগজে কাগজে তাঁর এই নব-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'Endymion'কে অত্যন্ত রূঢ় ভাবে প্রচণ্ড আক্রমণ করেছিলেন। এই বিরূপ সমালোচনার কঠিন আঘাত তরুণ কবি কীট্‌সের বুকে অত্যন্ত নিদারুণ ভাবে বেজেছিল।

কীট্‌সের জীবনে তখন অত্যন্ত দুঃসময় নেমেছে। পৈতৃক সম্পত্তি তিনি যা' পেয়েছিলেন তা প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য প্রদেশে পদব্রজে ভ্রমণ করতে গিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও ঠাণ্ডা লেগে তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়েছে। তার উপর, সেই দুর্বল দেহে কঠিন রোগাক্রান্ত মুমূর্ষু ভাইকে বাঁচাবার চেষ্টায় অক্লান্ত ভাবে ভাইয়ের প্রাণপণ সেবা-শুশ্রূষা করায় ফলে শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে।

ভাইটি মারা গেল। পূর্বেই বলেছি, এই ভাইয়ের মৃত্যুর পর কীট্‌স্ এসেছিলেন এই বাড়ীতে বাস করতে। ১৮১৮ খৃঃ অব্দ। ডিসেম্বরের প্রখর শীত। ঘন কুয়াসার অন্ধকারে কবি তাঁর গৃহ বদল করলেন। 'Well Walk' ছেড়ে তিনি এলেন 'Wentworth Place'এ। ইংল্যাণ্ডে যত দিন ছিলেন এই বাড়ীতেই তিনি বাস করেছিলেন। কখনও তাঁর ঘরে বসে, কখনও গৃহসংলগ্ন উদ্যানে কোনও গাছের তলায় আসন বিছিয়ে কত না অনুপম ও অবিস্মরণীয় রচনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তিনি এখানে। আমরা এই 'কীট্‌স্-গ্রোভ' বাগানটিময় ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। মনের মধ্যে ছন্দিত হয়ে উঠছিল,—

"ওয়েণ্টওয়ার্থ্ প্লেস্" [পরে "ল্যান ব্যাঙ্ক"]

(হ্যাম্পষ্টেডের এই বাড়ীতে কবির প্রণয়িনী ফ্যানীর সঙ্গে মিলন ঘটে। 'ওড টু দি নাইটিংগেল' প্রভৃতি কীট্‌সের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি এইখানেই লেখা হয়)

"O fret not after knowledge! I have none,
And yet my song comes native with the warmth."

কীট্‌স্ যখন এ বাড়ীতে আসেন, বাড়ীখানি তখন দু'টি অংশে বিভক্ত ছিল। এক ভাগে বাস করতেন Mr. Charles Wentworth Dilke এবং অপর অংশে বাস করতেন Mr. Charles Brown. কীট্‌স্ এলেন এই চার্লস ব্রাউনের অংশে এক জন স্থায়ী বাসিন্দা-স্বরূপ। এইখানেই প্রথম দেখা পেয়েছিলেন তিনি তাঁর মানসী প্রতিমা, তাঁর পরম প্রেমের পুত্তলী-সুন্দরী তরুণী ফ্যানী ব্রণের সঙ্গে।

ফ্যানীর বিধবা জননী ফ্যানীকে নিয়ে যখন এই চার্লস ব্রাউনের বাড়ীরই এক অংশে বাস করতে আসেন, কীট্‌স্ তখন হ্যাম্পষ্টেডে ছিলেন না। তিনি বন্ধুবর ব্রাউনের সঙ্গে মহা উৎসাহে বেরিয়ে পড়েছিলেন পদব্রজে স্কটল্যাণ্ড ঘুরে আসতে। আর পাশের অংশের ওয়েণ্টওয়ার্থ ডিল্ক তখন এ বাড়ী ছেড়ে উঠে গিয়েছিলেন ওয়েষ্টমিনিষ্টারে তাঁর নূতন গৃহে বাস করতে।

যেদিন কীট্‌স্‌ও চলে গেলেন, ব্রাউনও বিদায় নিলেন, ফ্যানী ও ফ্যানীর মা হারিয়ে গেলেন মহাকালের হাটের ভীড়ে, সেদিন 'ওয়েণ্টওয়ার্থ প্লেস' গিয়ে পড়ে অন্য লোকের হাতে। তাঁরা এ বাড়ীর ভিতরের বিচ্ছেদ প্রাচীরকে উচ্ছেদ করে দু'টি অংশ আবার একত্র মিলিয়ে নিয়েছিলেন। কীট্‌সের সময়ে বাড়ীর ভিতরের যেখানটি যে-রকম ছিল পরবর্তী কালে তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। তবে কীট্‌সের সময় বাড়ীখানি ঠিক যে-রকমটি ছিল, ওয়েণ্টওয়ার্থ ডিল্কের ছোট ভাই তার একটি বিশদ বর্ণনা রেখে গেছেন।

ওয়েণ্টওয়ার্থ ডিল্ক্ নিজেও তাঁর দেশের ও জাতির প্রতি একটা মহান্ কর্তব্য সম্পাদন করে গিয়েছিলেন। হ্যাম্পষ্টেড পাবলিক লাইব্রেরীতে তিনি কীট্‌সের ব্যবহৃত যা-কিছু অস্থাবর সম্পত্তি—তাঁর খাতাপত্র, পুস্তকাদি, কীট্‌সের বহু অপ্রকাশিত রচনাবলী, তাঁর পড়া বইগুলি, যার মার্জিনে কীট্‌সের নিজের হাতের অজস্র 'নোট' আর মন্তব্য আছে, মেডিক্যাল ষ্টুডেণ্টরূপে কীট্‌স্ যে সব ডাক্তারী বই পড়তেন সেগুলি এবং কবির লেখা ও কবিকে লেখা অনেকগুলি চিঠিপত্র, কবির মাথার কেশগুচ্ছ—যা' তাঁর শেষ সময়ের বন্ধু ও সহচর শিল্পী সেভার্ণ কবির মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ সংগ্রহ ক'রে পাঠিয়েছিলেন, কীট্‌সের বিভিন্ন সময়ের প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্তি, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর ছাপা ছবি ইত্যাদি যা-কিছু সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, সমস্তই নিঃস্বার্থ ভাবে দান করেছেন। এই গ্রন্থশালায় কীট্‌সের মুদ্রিত রচনাবলীর প্রায় সর্বপ্রকার সংস্করণই সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। হ্যাম্পষ্টেডে কবির বাসভবনের ছবি, 'কীট্‌স্-গ্রোভ' উদ্যানের ছবি এবং কবির পদপাতে ধন্য হ্যাম্পষ্টেডের অন্যান্য অঞ্চলের ছবি ও রেখাচিত্রও রয়েছে।

১৯২০ খৃঃ অব্দে রোমে মহা সমারোহে কবির মৃত্যু-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এই সময় একটি প্রস্তাব হয়েছিল যে, 'ওয়েণ্টওয়ার্থ প্লেস' বাড়ীখানি কিনে নিয়ে 'কীট্‌স্ মিউজিয়মে' পরিণত করা হোক। বাড়ীখানি কিনতে এবং কীট্‌সের সময়ের মতো করে ভেঙে-চুরে বদলে রূপান্তর ঘটিয়ে 'কীট্‌স্ মেমোরিয়্যাল' স্বরূপ গড়ে ক'রে তুলতে আনুমানিক দশ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হবে স্থির হয়েছিল। এই টাকাটা কবি কীট্‌সের নামে একটি স্মৃতিভাণ্ডার খুলে কবির ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে চাঁদা তুলে সংগ্রহ হবে স্থির হয়েছিল।

এ বাড়ীর বর্তমান মালিক কীট্সের ভক্ত। কবি যে ঘরে বাস করতেন তিনি সেখানিকে সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন। দেখে মনে হবে, কবি যেন এখনও এখানে বাস করছেন। কোনও কাজে হয়ত এইমাত্র উঠে বাইরে গিয়েছেন, কিম্বা, বাগানের কোনও নিভৃত কোণে বসে ফ্যানীর কানে কানে গুনগুন করে অনুরাগ-রঞ্জিত ছন্দে শোনাচ্ছেন—

Ah! Dearest Love, sweet home of all my fears,
And hopes, and joys, and panting miseries,—
To night, if I may guess, thy beauty wears,
A smile of such delight
As brilliant and as bright
As when with ravished, aching vassal eyes,
Lost in soft amaze,
I gaze, I gaze!

কিম্বা হয়ত দেখা যাবে, তিনি বাগানের কোনও তরুতলে বসে নিবিষ্ট মনে লিখছেন—Ode to a Nightingale,

কীট্সের মৃত্যু-শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমেরিকার বোষ্টন পাবলিক লাইব্রেরীতে কবির বিবিধ স্মরণীয় সামগ্রী সংগ্রহের একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। কবির মার্কিণ ভক্ত শ্রীযুক্ত হলম্যান সারা জীবন ধরে কবির স্মৃতিপূত যে সকল দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলি সেখানে প্রদর্শন করেছিলেন। কীট্স্ ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের যেখানে যেখানে গিয়েছিলেন এবং তাঁর রচনার মধ্যে ও চিঠিপত্রের মধ্যে যে যে স্থানের উল্লেখ ছিল, সে সমস্ত স্থানের ছবি হলম্যান সংগ্রহ করেছিলেন।

কীট্স্ যখন বালক, ডাক্তার হ্যামণ্ডের অধীনে কাজ করছেন। একদিন সকালে ডাক্তারের টমটম গাড়ীতে ঘোড়ার রাশ ধরে বসে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, সেই সময় 'হর্ণ' বলে যে ছেলেটি বরফের বল পাকিয়ে কীট্স্কে ছুঁড়ে মারে, হলম্যান খুঁজে খুঁজে সেই ছেলেটির ছবিও সংগ্রহ করেছেন।

কীট্সের বহু বন্ধু-বান্ধব, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও তাঁর পরিচিত যে সব সাধারণ লোক, হলম্যান সাহেব তাঁদের প্রত্যেকেরই চিত্র সংগ্রহ করেছেন। কীট্স্ মাঝে মাঝে কবি ওয়ার্ডসবার্থকে দেখতে লেক্ ডিষ্ট্রিক্টের 'রাইডাল মাউণ্ট' ভবনে যেতেন। হলম্যান এই যাত্রার এমন বিশদ চিত্র রেখেছেন যে, সেগুলি দেখতে দেখতে দর্শকেরাও কীট্সের সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডসবার্থের রাইডালমাউণ্টে ঘুরে আসতে পারবেন।

কীট্স্ থিয়েটার-প্রিয় বা নাট্য-রসপিপাসু ছিলেন। বাজী রেখে যে সব হিংস্র লড়াই ও দ্বন্দ্বযুদ্ধ হ'ত, কীট্স্ সেগুলি দেখতে ভালবাসতেন। শিকারে যাবারও তাঁর সখ ছিল প্রবল। বন্দুকের গুলীতে আহত ভাল্লুক ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট্ করছে, আর একপাল শিকারী কুকুর তার সেই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে দংশনে ক্ষত-বিক্ষত করছে, কীট্স্ না কি এ নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখেও ভারি আনন্দ পেতেন।

সুরে প্রদেশে ডর্কিংয়ের সন্নিকটে 'বার্ফোর্ড ব্রীজ' সরাইখানা। কীট্স একবার পীড়িত হয়ে কিছুদিন এখানে ছিলেন। এইখানেই তিনি তাঁর বহুখ্যাত ও বহুনিন্দিত 'Endymion' কাব্য রচনা করেছিলেন। এই অতিথিশালাটি আজও অক্ষত আছে। ইংল্যাণ্ডের অতি রমণীয় এক পরিবেশের মধ্যে এই সরাইখানাটি স্থাপিত হয়েছিল। দেখলেই বোঝা যায়, কীট্স্ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কত বড় এক জন অনুরাগী ছিলেন; তাই এই অতিথিশালাটি বেছে নিয়েছিলেন তাঁর রোগার্ত্ত দিনগুলি আনন্দে কাটাবার জন্য। সেদিন এ সরাইখানার সামনে দিয়ে চার ঘোড়ার 'ক্যারাভান্' কোচ ছাড়া আর কিছু যানবাহন চলতো না। কখনও কখনও কোন ক্লান্ত পথিক পায়ে হেঁটে এই দীর্ঘ পথ উত্তীর্ণ হতেন। আজ এই শতবর্ষ পরে সেই সরাইখানার সামনে দিয়ে চলেছে অবিরত মোটরকার: মোটরবাস্ ও ল্যরী। কীট্সের সেই 'বারফোর্ড ব্রীজ' সরাইখানা আজও তেমনি করে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদের খাদ্য ও পানীয় দিয়ে সমাদরে অভ্যর্থনা করছে।

কবির সমাধি

"এখানে ঘুমায় সে জলে যার
নাম ছিল লেখা!"

এ কথা বলা আজ একান্তই বাহুল্য বলে মনে করি যে, কীট্সের কবিতা—তাঁর সেই মোহময়—স্বপ্নময়—রচনা, সেই মৃত্যুপথযাত্রীর সকরুণ জীবন—যে কোনও শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান্ নরনারীকে মুগ্ধ না করে পারে না। কিন্তু, কীট্সের সমসাময়িক সমালোচকেরা বলেন, 'The Eve of St Agnes'এর ন্যায় উন্নত ও গম্ভীর ভাবোদ্দীপক কাব্য-রচয়িতাও না কি মাঝে মাঝে তাঁর ব্যক্তিগত গোপনীয় চিঠিপত্রে এবং ঘরোয়া বৈঠকে এমন অশ্লীল রসিকতা করতেন যা একেবারে অশ্রাব্য। এটাকে অবশ্য মানব-মনোবিজ্ঞানের একটা বিশ্লেষণোপযোগী দিক বলা যেতে পারে। এতে প্রমাণিত হয়, কবিও মানুষ, ভাল-মন্দ সুরুচি-কুরুচি সমস্ত কিছু নিয়ে দেহে-মনে সুসম্পূর্ণ। কবি যে শুধুই কেবল চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধ, পাখীর গান আর সুন্দরী তরুণীর রূপসুধা পান করে অমরত্বের সাধনায় তন্ময় হয়ে থাকবে তা সম্ভব নয়, স্বাভাবিকও নয়। মাঝে মাঝে তাদের সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে নেমে আসা দরকার হয়, তারা যে সহজ সত্য মানুষ শুধু এইটুকু প্রমাণ করবার জন্য। তবে, কীট্সের সূক্ষ্মতর ও উচ্চাঙ্গের রসবোধ, তাঁর অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যানুভূতির অসংখ্য পরিচয় আমরা পাই তাঁর পঁচিশ বছরের অতি সংক্ষিপ্ত জীবন-ইতিহাসের মধ্যেই। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধব সঙ্গী-সহচরদের

ভিতর থেকে। তাঁর অনুপম রচনাবলী থেকে। তাঁর প্রিয়দর্শন মূর্তির দিকে চেয়ে।

কীট্‌সের জীবনে প্রেম যেদিন এল সে বড় করুণ কাহিনী। স্কটল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে প্রথম দেখা হল ফ্যানীর সঙ্গে। জীবনে যার কোনও দিনই দেখা পাননি এমন একটি কবির স্বপ্ন-কল্পনার মূর্ত মেয়ে সে। প্রথম পরিচয়ের মধ্যেই কবির সমস্ত হৃদয় লুটিয়ে পড়ল এই মেয়েটির পায়ে। ফ্যানীর প্রতি এত বেশী আসক্ত হয়ে পড়লেন যে, সেই বিপুল প্রেমের প্রবল আবেগ তাঁর রোগজীর্ণ দুর্বল দেহ-মনে একটা প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল, আর সেটাও নাকি তাঁর অকাল-মৃত্যুর একটা কারণ। আঠারো বছরের মেয়ে ফ্যানী। কীট্‌সের বয়স তখন মাত্র তেইশ। ফ্যানী এই তরুণ কবির প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেনি। কীট্‌সের শেষ রচনাবলী "Lamia, Isabella, and Other Poems" ১৮২০তে প্রকাশিত হ'ল। এই গ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত তাঁর দু'টি রচনা 'The Eve of St Agnes' এবং 'Hyperion' তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবির আসনে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছিল। ফ্যানীর প্রেমই তাঁর ললাটে অমৃতের জয়টীকা এঁকে দিয়েছে। ১৮২০ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কীট্‌স্ তার শিল্পী বন্ধু সেভার্ণের সঙ্গে স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় ইংল্যাণ্ড ছেড়ে ইতালিতে আসেন। অনেক দিন থেকেই তাঁর দেহে যক্ষার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। ইতালিতে

কবি-বন্ধু সেভার্ণের সমাধি

(কবির অন্তরঙ্গ এবং শেষ দিনের সহচর শিল্পী সেভার্ণের অন্তিম ইচ্ছানুসারে তাঁর কবরের ধারে প্রাচীর-গাত্রে কবি কীট্‌সের মূর্তি উৎকীর্ণ করা এই মর্মর ফলকটি আছে)

এসেও তিনি আরোগ্য হ'তে পারলেন না। মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হ'ল। বন্ধুবর সেভার্ণের অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষা সত্বেও তিনি ১৮২১ খৃঃ অব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারী এক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরী রোমে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কীট্‌সকে রোমের 'প্রোটেষ্টান্ট সমাধিক্ষেত্রে' সমাহিত করা হয়েছিল।

আমরা যখন ফ্রান্স ঘুরে ইতালিতে আসি, তখন বিশেষ ক'... এই রোমের মাটিতে শায়িত ইংল্যাণ্ডের দুই শ্রেষ্ঠ কবির সমাধি দর্শ... যাই। রোমের Via d'ostia পথে এই ক্ষুদ্র সমাধিক্ষেত্র। প... যৌবনের জয়যাত্রাপথে সহসা তাল ভঙ্গ করে ইংল্যাণ্ডের যে দু... অসামান্য প্রতিভাবান্ অমর কবি মহাপ্রস্থান করেছিলেন, সেই কী... ও শেলীর সমাধি এখানে। গাইড আমাদের এনে যখন পৌঁ... দিলে তখন প্রায় সূর্যাস্তের সময় হয়ে আসছে। আকাশের মুখে... অস্তরাগ মাটির বুকে নেমে এসে যে সব জীবন অস্ত গেছে চিরদিনে... মতো তাদের সমাধিগুলিকে রাঙিয়ে তুলছিল। দীর্ঘ পাইন গাছে... তলা দিয়ে সন্ত্রমে সংকোচে পা ফেলে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছিল... আমরা, পাছে চিরনিদ্রিতদের সুখ-সুপ্তির ব্যাঘাত ঘটে। অজ... ফুল ফুটে রয়েছে চারি দিকে। তবু, কেমন যেন একটা মৃত্যু... অন্ধকার-স্তব্ধতা বিরাজ করছিল সেই নির্জন সমাধিক্ষেত্রে।

আমরা এসে দাঁড়ালাম শেষ শয্যায় শায়িত তরুণ কবি... পদপ্রান্তে। নীরবে নিবেদন করে দিলাম আমাদের শ্বেত-পুষ্পার্ঘ্য... শান্তিময় সুখনিদ্রায় কবি আজ সুপ্ত। স্বল্প জীবনের শেষ ক'... বছর কী যন্ত্রণাই না ভোগ করেছেন! মূঢ় সমালোচকদের নির্ম... কশাঘাত, স্নেহময় ভাইয়ের শোচনীয় মৃত্যু, নিজের ভগ্নস্বাস্থ্য—প্রেমে... দুঃসহ জ্বালা—একসঙ্গে যেন তাঁকে উৎপীড়িত ক'রে তুলেছিল। ফ্যানীকে তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিলেন, তবু যেন সে... পরম প্রেমাস্পদা প্রণয়িনীর প্রেমে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন কর... পারছিলেন না। সংশয় ও সন্দেহে দোলায়মান কবির প্রাণে এতটু... শান্তি ছিল না। আজ তিনি নিশ্চিন্ত মনে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

কীট্‌সের সমাধির উপর কবির ইচ্ছানুসারেই লিখে রাখা হয়ে... —"Here lies one whose name is writ in water"। এ যে কবির কত বড় খেদোক্তি তা সহজেই বোঝা যায়। এ... অভিমান ও বেদনাভরা লাইনটি জীবনে হতাশ কবির প্রেমাস্পদা... লিখিত পত্রের একটি সকরুণ ছত্র। অথচ এই পঁচিশ বছর বয়সে... কবিই একদিন দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন—'হাঁ, আমি লিখেছি বটে কম... অনেক কিছু লিখতে পারিনি ঠিকই। কিন্তু আমার মৃত্যুর প... এই যৎসামান্য লেখার ভিতর দিয়েই আমি ইংরাজী সাহিত্যে হ'... থাকবো অমর!' এমনিই সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ছিল এই তরুণ কবি...

কীট্‌সের অন্তরঙ্গ বন্ধু শিল্পী সেভার্ণের সমাধিও রয়েছে কবির ঠি... পাশেই। এঁরা যে ছিলেন অভিন্ন-হৃদয়, তাই মরণেও তাঁরা পৃথ... হননি। এঁর সমাধিপার্শ্বের প্রাচীর-গাত্রে শ্বেত প্রস্তরফলকে... উপর উৎকীর্ণ আছে কবির একটি অন্তিমের প্রসন্নমূর্তি। ফ্যানী... প্রেমের পরশমণি কবির রচনাকে করে তুলেছিল নিত্যকালের স... ফ্যানীকে তিনি লিখেছিলেন—"তুমি যদি এখনও তেমনি ক'... নাচের মজলিসে আর সামাজিক প্রমোদ-বৈঠকে যোগ দিয়ে বেড়া... তাহ'লে আজকের এই রাত্রিই যেন হয় আমার জীবনের শেষ রাত্রি। তোমাকে ছাড়া আজ যে আমার আর পৃথক্ অস্তিত্ব কিছু নেই!

কিন্তু, আমি চাই তুমি থাকবে অনাঘ্রাত পুষ্পের মত নির্মল ও পবিত্র! জানো কি ফ্যানী, ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেট একদিন আমারই মতো সংশয় ও ঈর্ষার আগুনে জ্বলে উঠে তাঁর প্রিয়তমা ওফেলিয়াকে বলেছিলেন—'Go, go, to the Nunnary go.' ফ্যানী যখন লিখলে—"প্রিয়তম, জীবনে-মরণে তোমারই আমি। তোমা বই আর জানি নে।" কীট্‌স্ তখন আনন্দে উল্লসিত হয়ে লিখলেন—'ফ্যানী আমার! আমার ফ্যানী! তোমারই প্রেম আমাকে মানুষের অমরতায় বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে। বড় সাধ হয়, আমরা দু'জনে অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকি এই সুন্দর পৃথিবীতে!"

মৃত্যুর পূর্বক্ষণে কবি তাঁর প্রিয়ার নিকট হ'তে আত্মনিবেদনের যে শেষ পত্র পেয়েছিলেন, তাঁর জীবনের সেই পরম সার্থক ক্ষণেই জীবনের চরম লগ্নও নেমে এসেছিল। মৃত্যুর কালো ছায়া ঘনিয়ে এসেছে তখন তাঁর দু'চোখে। পড়তে পারলেন না কবি প্রিয়তমার সে পত্র। বন্ধুকে বললেন, "দিও আমার প্রিয়ার এ চিঠি, দিও আমার সঙ্গে, বন্ধু! আমি এ পত্র বুকে ক'রে নিয়ে যাবো আমার যৌবনের রক্তে-রাঙ্গা সমাধির মধ্যে।" এই তরুণ কবির রক্তাক্ত সমাধিতে কুসুমাঞ্জলি দিয়ে আমরা গেলাম মৃত্যুঞ্জয়ী বিদ্রোহী কবি শেলীর সমাধি সন্দর্শনে। কীট্‌সের সমাধি-পার্শ্বে দাঁড়িয়ে শেলী একদিন মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, "এমন রমণীয় স্থানে যদি আমিও আমার শেষ-শয্যা বিছাতে পারি তাহ'লে মৃত্যুকে আমি ভালবেসে গ্রহণ করবো, তাকে ভয় করবো না।"

স্পেজিয়া উপসাগরে নৌকাডুবি হয়ে মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে যৌবনের গৌরবময় মধ্যাহ্নে শেলীর আকস্মিক অন্তর্ধান পৃথিবীর কাব্য-সাহিত্যে এক মর্মান্তিক শোচনীয় দুর্ঘটনা। শেলীর সমাধি-পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কেবলই মনে হচ্ছিল প্রেমরাজ্যের বিপ্লবী কবি, সমাজধর্মের বিদ্রোহী কবি, কী স্বপ্ন দেখছেন আজ এই সমাধি-শয়নে শুয়ে; এমিলি ভিভিয়ানী কি উঁকি মারছে তাঁর মনে? মেরী গড্‌উইনের অশ্রুজল কি সিক্ত করছে তাঁর পাষাণ উপাধান! হ্যারিয়েট এরিয়েলের জীবনের তমসাচ্ছন্ন দিনটি কি আজ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এই অসামান্য প্রণয়ীর মরণ-মাধুর্যে ভরে উঠে? কবিবন্ধু কীট্‌সের কথা কি আজ তাঁর মনে পড়ছে?—যার অকাল-মৃত্যুতে একটি মর্মস্পর্শী সুদীর্ঘ কবিতায় আক্ষেপ করে তিনি বলেছিলেন—'Oh, weep for Adonais, he is dead! কবি বায়রণও তাঁর 'ডন জুয়ান' কাব্যে কীট্‌সের জন্য অশ্রুসজল নেত্রে বলেছিলেন,—"Keats who was killed off by one Critic!'

শেলী আর কীট্‌স্—কাব্যলোকের শ্রেষ্ঠ দু'টি তারকার এই অকালে ঝরে-পড়া জীবনের সমাধিমূলে দাঁড়িয়ে এই কথাই মনে আসে—প্রলয়ধর্মী মহাকাল পরাস্ত হয়েছে প্রতিভার এই দুই দুর্নিবার মৃত্যুঞ্জয়ীর কাছে। মহাকবি শেলী তাই মানুষকে এই আশা ও আনন্দের পরম বাণী শুনিয়েছেন—

"The soul of Adonais like a star
Beacons from the abode where the
Eternal are!"

নমস্কার জানিয়ে এলাম সেই দুই অসামান্য কবির অক্ষয় স্মৃতির উদ্দেশে ভারতের পূর্ব প্রান্তের কাব্যকুঞ্জের সাধক আমরা, যাদের নাম সত্যই কালের জলস্রোতে জলেরই দাগে জললিখিত।

ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

জাপানের পতনের পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভূতপূর্ব মালিকগণ ছুটিয়া আসিলেন তাঁহাদের পূর্ব রাজ্যগুলি দখল করিবার জন্ম। ব্রহ্ম হইতে জাপানীরা সরিয়া গিয়াছিল। মালয়ে, ইন্দোনেশিয়ায়, ইন্দোচীনে জাপানী সৈন্যদল আত্মসমর্পণ করিল। ইংরাজ, ডাচ ও ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষেরা দুর্দিনে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা শিকায় তুলিয়া রাখিয়া পূর্বের ব্যবস্থা কায়েম করিবার জন্ম ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু জাপানী সৈন্যের সম্মুখে পলায়নপর, হৃতগৌরব বিদেশী মনিবদিগকে তৎক্ষণাৎ বাধা দিতে না পারিলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবাসীরা তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার জন্ম প্রস্তুত হইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী অধ্যায়ের চমকপ্রদ ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান ঘটনা বিদ্রোহী এশিয়ার অভ্যুত্থান। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিদ্রোহ এই বৃহত্তর বিদ্রোহের অংশ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পশ্চিম য়ুরোপের বনেদী সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। দীর্ঘকাল এশিয়াবাসীদের সাম্রাজ্যগুলি শোষণ করিয়া তাহারা যে সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছিল, প্রাণরক্ষার সংগ্রামে তাহা নিঃশেষপ্রায় হইল। জাপানের বিজয়ী অভিযান ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া হইতে শোষণের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। তাই যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে আপনাদের বিধ্বস্ত ঘর সংস্কার করিবার, রক্তহীন দেহে পুনরায় রক্ত সংগ্রহ করিবার উদগ্র লোভ লইয়া সাম্রাজ্যবাদীরা আবার ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ব্রহ্মে, মালয়ে, ইন্দোনেশিয়ায়, ইন্দোচীনে বিদ্রোহের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আমেরিকার সাহায্য লইয়া, জাপানী সেনাবাহিনীকে নিজেদের দলে টানিয়া লইয়া কিছু কাল সংগ্রাম চালাইয়া তাহারা বুঝিল, কৌশল পরিবর্তন করিবার সময় আসিয়াছে।

যেমন ভারতবর্ষে তেমনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বিদ্রোহী ও তাহাদের সমর্থক দল গঠিত হইয়াছিল—এক দিকে আপোষকামী জাতীয়তাবাদী ও অন্য দিকে আপোষ-বিরোধী, উগ্রপন্থী জাতীয়তাবাদী লইয়া। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই দুই শ্রেণীর পিছনে ও আড়ালে ছিল কম্যুনিষ্ট দল। ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট দল বাছিয়া লইয়াছিল জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করিবার ভূমিকা।

বিদ্রোহ দমন করিবার জন্ম সশস্ত্র অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে আপোষকামী জাতীয়তাবাদীদের সহিত আপোষের কথাবার্তা, নানাবিধ নিষেধ-কণ্টকিত স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি, দেশের বিভিন্ন জাতি বা ভৌগোলিক অংশের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির ষড়যন্ত্র (encouragement to separatist movements),—এই সকল কৌশল প্রয়োগ করা হইতে লাগিল। এই সকল প্রচেষ্টার ফল কোথায় কিরূপ হইয়াছে দেখা যাউক।

ব্রহ্ম

জাপানীরা ব্রহ্ম অধিকার করিবার পরে তাহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে ডাঃ বা ম ব্রহ্মের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এদিকে ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকান ও ব্রিটিশেরা স্থলপথে, জলপথে ও জঙ্গী বিমান লইয়া ব্রহ্মে আক্রমণ চালাইতে থাকে। দেশের ভিতরেও জাপান-বিরোধী দল গড়িয়া তুলিবার সাহায্য করা হয়। এই প্রতিরোধ বাহিনীকে এ, এফ, পি, এফ, এল (এন্‌টি-ফ্যাসিষ্ট পিপলস্‌ ফ্রিডম লীগ) নাম দিয়া সংহত ও সুগঠিত করিয়া তুলেন জেনারেল আউন স্যাং। জাপান আত্মসমর্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ বা ম'র গভর্ণমেণ্টের অবসান হয় এবং জেনারেল আউন স্যাংয়ের সহায়তায় ব্রিটিশ বাহিনী দেশের অরাজকতা দূর করিয়া শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে। ব্রহ্মে অবস্থিত নেতাজী সুভাষের আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যগণও এই শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করে।

অবস্থা দেখিয়া বিলাতের শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট বুঝিলেন, জেনারেল আউন স্যাংকে তুষ্ট করা প্রয়োজন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস স্বীকার করিয়া ও অবস্থার উন্নতি হইলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দানের প্রস্তাব করিয়া তাঁহারা এক হোয়াইট পেপার প্রকাশ করিলেন। জেনারেল আউন স্যাং ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট গঠন করিলেন। ১৯৪৭ সনে তাঁহার নেতৃত্বে বর্মী প্রতিনিধিরা ইংলণ্ডে গিয়া বর্মী-ব্রিটিশ সন্ধির সর্তাদি আলোচনা করিলেন। এই আলোচনার ফলে এটলী-আউন স্যাং চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইচ্ছা করিলে কমনওয়েলথ হইতে বাহিরে যাইবার অধিকার সহ ব্রহ্মের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করিলেন, কিন্তু চুক্তিতে এমন কয়েকটি সামরিক ও অর্থনৈতিক সর্ত্ত সন্নিবিষ্ট হইল যাহার ফলে দেশের আপোষ-বিরোধী দল সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। সামরিক সর্ত্ত অনুসারে স্বাধীন ব্রহ্মে ব্রিটিশ সামরিক মিশন (স্থল, নৌ ও বিমান) রাখিবার ও অর্থনৈতিক সর্ত্ত অনুসারে স্বাধীন ব্রহ্মে ব্রিটিশের বাণিজ্য-অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার ব্যবস্থা হইল। চুক্তির এই সামরিক ও বাণিজ্যিক সর্ত্তের লক্ষ্য হইল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশের প্রভাব-প্রতিপত্তি রক্ষা করিবার বিধান করা।

সে যাহা হউক, মাই ও চিট দলের নেতা উ স ও দোবামা দলের থাকিন বু সেইন এটলী-আউন স্যাং চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলেন।

ইহার পরবর্তী ঘটনা ছয় জন সহকর্মী সহ প্রধান মন্ত্রী জেনারেল আউন স্যাংয়ের হত্যা।

কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলীর সিদ্ধান্তের ফলে ব্রহ্মে সাধারণতন্ত্রী য়ুনিয়ন অব বর্মা স্থাপিত হইয়াছে ও ব্রহ্ম কমনওয়েলথ ত্যাগ করিয়াছে (জানুয়ারী ১৯৪৮)। ব্রহ্ম কমনওয়েলথ ত্যাগ করিলেও চুক্তির সামরিক ও বাণিজ্যিক সর্তগুলি বাতিল হয় নাই।

প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদীদের পরিবর্তিত কৌশল ব্রহ্মে কতখানি সফল হইয়াছে তাহার এক দিকের কথা বলা হইল। অন্য দিকের কথাও সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

ব্রিটিশ সরকারের সহিত আপোষে স্বাধীনতা পাইবার পরে ব্রহ্মে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। এক দিকে বিভিন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠ দল ও অন্য দিকে কম্যুনিষ্ট দল দেশে ঐক্য, শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপনে

পথে অন্তরায় হইয়াছে। ব্রহ্মের যে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল দেশে ঐক্য স্থাপনের পথে অন্তরায় হইয়াছে তাহার মধ্যে কারেনদিগের কথা প্রথমে বলিতে হয়। কারেন জাতির পরিচয় পূর্বের এক প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে (মাসিক বসুমতী, কার্ত্তিক, ১৩৫৮)। ভারতবর্ষের ঐক্য খণ্ডিত হইয়াছে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্রের দাবীতে, ব্রহ্মের ঐক্য খণ্ডিত হইয়াছে পৃথক জাতিত্বের ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্রের দাবীতে। এই দাবী উঠে কারেনদের পক্ষ হইতে। এই দাবীর উৎপত্তির ইতিহাস পাকিস্তান রাষ্ট্র দাবীর উৎপত্তির ইতিহাস অপেক্ষা কম কৌতূহলোদ্দীপক নহে। কারেনদের পৃথক রাষ্ট্র দাবীর খানিকটা রহস্য ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত ব্রহ্ম গভর্ণমেন্টের এক বিবৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিবৃতি প্রকাশিত হয় আলেকজাণ্ডার ক্যাম্পবেল নামক বিলাতের 'ডেলি মেল' পত্রিকার সংবাদদাতাকে প্রথমে কয়েদ করা ও পরে ব্রহ্ম হইতে বহিষ্কারের আদেশ সম্পর্কে। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—"কারেন জাতির একাংশকে উস্কাইয়া বিদ্রোহ করিবার চেষ্টা সম্পর্কে কর্ণেল জে. সি. টুলুকের তৎপরতার কথা গভর্ণমেন্ট কিছু কাল যাবৎ অবগত ছিলেন। ক্যাম্পবেল এক পত্রে টুলুককে লিখিয়াছিল যে, কারেনরা এ পর্যন্ত যাহা দখল করিয়াছে তাহা পাইলেই সন্তুষ্ট হইবে। তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব হইয়াছে। কর্ণেল টুলুক অস্ত্র-শস্ত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন তাহারা এই আশায় আছে।"

এই কর্ণেল টুলুক যুদ্ধের সময়ে কারেনদের মধ্যে থাকিয়া জাপানীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য তাহাদিগকে সংগঠিত করিবার কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কারেনদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী ব্রহ্ম গভর্ণমেন্ট স্বীকার করিয়াছেন।

কারেনদের দাবী মিটিতে না মিটিতে পেগুর মন (মন-ক্মের, পেগুয়ান বা তলৈং) জাতি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী তুলিয়াছে। তাহাদের বক্তব্য এই যে, প্রাচীন কাল হইতে তাঁহাদের স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি ছিল, যাহা কারেনদের কোন কালে ছিল না; তাহারা স্বতন্ত্র জাতিও বটে। সুতরাং তাহাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী কিছু মাত্র অন্যায় নহে। মনরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া নানা স্থানে খণ্ডযুদ্ধ চালাইতেছে। য়ুনাইটেড মন এসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে জানাইয়াছে যে, তাহাদের দাবী পূর্ণ না হইলে বিদ্রোহ শান্ত হইবে না।

মন-বিদ্রোহের মূলে ব্রিটিশ গোয়েন্দার গুপ্ত হস্ত আছে কি না এখনও প্রকাশ পায় নাই। এদিকে ব্রহ্ম ও থাইল্যাণ্ডের সীমান্তে নূতন আর একটি কারেন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যমের কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহার পরে আরাকানীদের দাবীর উল্লেখ করিতে হয়। আরাকানীরা স্বতন্ত্র জাতি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত তাহাদের স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল। আরাকানে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী এখনও তেমন জোর বাঁধে নাই, কিন্তু মধ্যে মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিতেছে।

আরাকানের সীমান্তে পাকিস্তানের মোজাহিদ দল মংড ও বুথিডং দখল করিয়া ও আরাকানী বৌদ্ধদের উপর প্রণালীবদ্ধ অত্যাচার চালাইয়া ব্রহ্মের সীমানার মধ্যে আর একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দাবীর মূল পত্তন করিতে ব্যস্ত রহিয়াছে। প্রায়ই দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বৌদ্ধদের উপর অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে। মোজাহিদ বাহিনীর নেতা মেজর কাশেমকে গ্রেপ্তারের জন্য ব্রহ্ম গভর্ণমেন্ট পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।

এই সকল স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবীদার অপেক্ষা কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহীদের লইয়া ব্রহ্ম গভর্ণমেন্ট কম বিব্রত হন নাই।

শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলিতে কম্যুনিজম প্রচারকগণ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে উগ্র বামপন্থীদিগকে দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছেন। কোন কোন দেশে (যেমন মালয়ে) এই চেষ্টা বিশেষ সফল হইয়াছে। ব্রহ্মে কম্যুনিষ্ট দলের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব দেখিয়া এই প্রচেষ্টার কথা মনে হয়। বর্মী কম্যুনিষ্ট দলের সঙ্গে ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট দলের যোগাযোগের কথা প্রকাশ পাইয়াছে। বর্মী কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল থাকিন টুনের ভারতবর্ষ ভ্রমণের ও এই পার্টির অন্যতম দুঃসাহসিক বাঙালী নেতা ঘোষালের কার্যকলাপের কথা কিছু কাল পূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। চীনে কম্যুনিষ্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা ও তিব্বতে চীনা কম্যুনিষ্ট সরকারের প্রভাব ব্রহ্মে ও ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট দলের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিবে অনুমান করা যায়।

ব্রহ্মের বর্তমান আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে ব্রহ্ম পার্লামেন্টের কার্য-বিবরণী হইতে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে।

গত অক্টোবরে ব্রহ্মের ধর্মবিভাগীয় মন্ত্রী (Minister for Religious Affair) উ উইন দেশের অরাজক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য এক নীতিমূলক সরকারী প্রস্তাব ব্রহ্ম পার্লামেন্টে উপস্থিত করেন এবং উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাব উপস্থিত করিতে উঠিয়া উ উইন বলেন, "Gave a detailed account of how the intransigence of various political parties in the Union of Burma led finally to widespread insurrections, drawing particular attention to six separate political groups who had tried to set up separate spheres of influence. Since the spread of influence of these parties many villages and towns within the Union had been reduced to ashes and public properties valued at crores of rupees had been destroyed."

দেখা যাইতেছে, সীমান্তে চীনা সরকারী কম্যুনিষ্ট দল ও আভ্যন্তরীণ বর্মী কম্যুনিষ্ট দলের চাপ ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবীদার কারেন, মন, আরাকানীদের চাপের ফলে কমনওয়েলথত্যাগী ব্রহ্ম গভর্ণমেন্ট অবশেষে ধর্ম ও নীতিমূলক প্রস্তাব পাশ করিয়া অবস্থার উন্নতি বিধানের আশা পোষণ করিতেছেন।

ইন্দোনেশিয়া

জাপান আত্মসমর্পণ করিলে ব্রিটিশ ও আমেরিকান কামানের আড়ালে ডাচরা ইন্দোনেশিয়ায় ফিরিয়া আসিল।

জাপানীরা ইন্দোনেশিয়া অধিকার করিয়া নির্বাসিত জাতীয়তাবাদী নেতা ডাঃ সোকর্ণ, ডাঃ হাত্তা ও ডাঃ শারীরকে মুক্তি দিয়াছিল। এই নেতাদের অধীনে ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদীরা ডাচদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিল। এই সংগ্রাম অহিংস অসহযোগ বা নিরুপদ্রব আইন অমান্য আন্দোলন নহে, সশস্ত্র সংগ্রাম। সংগ্রামের গোড়ায় ডাঃ সোকর্ণ ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ও রিপাব্লিকান গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করিলেন (১৯৪৫)।

ডাচের সাহায্যে ইংরাজের নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী সুরাবায়া আক্রমণ করিয়া কামানের গোলায় ও বোমাবর্ষণে সহর ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করিল। ডাঃ সোকর্ণ বেতারে ইংরাজের বোমাবর্ষণে নারী ও শিশু সহ সহস্র সহস্র লোকের প্রাণনাশের খবর জানাইয়া আমেরিকা, চীন ও রুশিয়ার কাছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিবার জন্য হস্তক্ষেপের আবেদন করিলেন। শুধু ডাচ নহে, জাপানী মিলিটারী পুলিশ ও জাপানী সৈন্য ও জেনারেল ম্যালবীর অধীনে ৪৯ নং ইণ্ডিয়ান ইনফ্যাণ্ট্রি ব্রিগেডের গুর্খা ও পঞ্চম ইণ্ডিয়ান ডিভিশনের ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গেও ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদীদিগকে সংগ্রাম চালাইতে হইল। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এক বক্তৃতায় ইন্দোনেশিয়ার অবস্থার উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"It seems that the Dutch forces are wholly unable to meet the situation. So we see British troops trying to buttress up the Dutch. What is still more significant is that Japanese forces are being utilised against the Indonesians." ইন্দোনেশিয়ার পাঁচটি দ্বীপ তখনও সম্পূর্ণরূপে জাপানীদের দখলে, এবং ব্যাটাভিয়ার মত সহরেও শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার জাপানীদের হাতে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মিত্রবাহিনীর প্রধান সেনাপতি য়্যাডমিরাল মাউণ্টব্যাটেন জাপানী সৈন্যবাহিনীর নেতাদিগকে সতর্ক করিলেন তাঁহারা যেন ইন্দোনেশিয়ার বিদ্রোহীদের হাতে কর্তৃত্ব ছাড়িয়া না দেন।

অশান্তি ও অরাজকতার ফলে, গেরিলাদের উপদ্রবে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, ইন্দোনেশিয়ার ডাচ লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর ভ্যান মুক মিত্র-বাহিনীর সেনাপতিদের এক অধিবেশনে প্রস্তাব করিলেন, ডাঃ সোকর্ণকে আহ্বান করিয়া জানাইয়া দেওয়া হউক যে, যদিও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না, তবুও দেশে যে অশান্তি ও উপদ্রব চলিতেছে তাহা দমন করিবার জন্য তাঁহাকে দায়ী করা হইবে।

যখন দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইতে অসমর্থ হইয়া ও বাহিরের জনমতের চাপে ডাচরা ইন্দোনেশিয়ার নেতাদের সঙ্গে আপোষের কথাবার্তা আরম্ভ করা ছাড়া গত্যন্তর দেখিল না ও কথাবার্তা চালাইবার জন্য "গুড অফিসেস কমিটি" নিযুক্ত হইল এবং জনমত সংগ্রহের প্রস্তাব উঠিল, ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মে ইংরাজের পথ অনুসরণ করিয়া ডাচরা মাদুরায় ও পশ্চিম-জাভার অন্যত্র রিপাব্লিকান গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্ণমেণ্ট দাঁড় করাইয়া ইন্দোনেশিয়ার ঐক্য নষ্ট করিবার চেষ্টা করিল। এক জন পর্যবেক্ষকের মতে "The move to plan dissident movements and engineer separatist demands was part of a pre-meditated and carefully worked out programme." ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবার পরে ডাচ আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত এই শ্রেণীর "স্বতন্ত্র রাষ্ট্র"গুলিকে দমন করিয়া দেশের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বহু অর্থব্যয় ও রক্তপাত স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই আন্দোলনের ঝড় এখনও নির্মূল হয় নাই।

সংগ্রামী ইন্দোনেশিয়ার সৌভাগ্যক্রমে তাহার বন্ধুর অভাব হয় নাই। ভারতবর্ষ প্রথম হইতে ইন্দোনেশিয়ার আন্দোলনে সমর্থন ও সহানুভূতি জানাইয়াছে, এবং সামরিক সাহায্য করিতে সমর্থ না হইলেও ভারতবর্ষ তাহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বন্ধুর মত কাজ করিয়াছে। বিশ্বরাষ্ট্র সংঘে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ইন্দোনেশিয়ায় ডাচের অত্যাচার, ব্রিটিশের অত্যাচার ও ইংরাজ কর্তৃক ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় সৈন্য ব্যবহারের প্রতিবাদ জানাইয়াছে। ভারতীয় আইন সভায় ও বহু সভা-সমিতিতে ভারতীয় সৈন্য ব্যবহারের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ডাঃ সোকর্ণের নিমন্ত্রণে পণ্ডিত জহরলাল ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্টের আমলে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য ইন্দোনেশিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। ইহা প্রকাশ পাইয়াছে যে, ডাচ-বর্বরতার প্রতিবাদ করিয়া ইন্দোনেশিয়ায় নিযুক্ত ভারতীয় সৈন্য ডাচদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার সংকল্প প্রকাশ করিয়াছে; ইংরাজ সৈন্য পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার ডক-শ্রমিকরা ইন্দোনেশিয়ার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ব্যাপক ধর্মঘট করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিন জন জাপানী সেনাপতির কথাও উল্লেখ করা আবশ্যক। সুপ্রীম এলায়েড কম্যাণ্ডারের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া ইন্দোনেশিয়ানদিগকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিবার অভিযোগে লেফ্‌টেনাণ্ট-জেনারেল নাগাইও, মেজর-জেনারেল ইয়ামোটেন ও মেজর-জেনারেল মাসিমুরাকে গ্রেপ্তার করিয়া সিঙ্গাপুরে লইয়া যাওয়া হয়। ইন্দোনেশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিবার জন্য ১৭ জন ডাচ সৈন্যের মিলিটারী ট্রিবিউনালের বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশের কথাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাচ সরকারের তদন্তের ফলে প্রকাশ পাইয়াছে যে, যুদ্ধের ফলে ইন্দোনেশিয়ায় ৪০ লক্ষ লোকের প্রাণহানি হইয়াছে এবং ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে হল্যাণ্ডের সহিত চুক্তির ফলে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। এই চুক্তির বাণিজ্যিক সর্তে ডাচদের যুদ্ধের পূর্বের বিশেষ সুবিধা ও একচেটিয়া অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।

ইহার পরের রাজনৈতিক অবস্থা প্রভৃতির কথা কিছু বলা হইতেছে।

যে সকল দ্বীপ লইয়া ইন্দোনেশিয়ার রিপাব্লিক গঠিত হইয়াছে ডাচ অধিকারের আমলে সেই সকল দ্বীপ প্রত্যেকটি পৃথক ভাবে শাসিত হইত। ইহার ফলে জাপানী অধিকারের পূর্বে ইন্দোনেশিয়ায় এক জাতীয়তাবোধ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। এই বিষয়ে ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনের সঙ্গে ডাচ ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ইংরাজ খণ্ডিত ভারতবর্ষকে এক করিয়াছিল কিন্তু ভারতবাসীকে এক করিতে চাহে নাই। দেশে এক জাতীয়তাবোধ বিকাশ লাভ করিলে প্রথমে প্রাদেশিক ঈর্ষা ও পরে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও বিদ্বেষের অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়া ভারতবাসীর ঐক্যকে বাধা দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাতে আশানুরূপ কৃতকার্য না হইয়া ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে এ দেশে তাহার সর্বাপেক্ষা বড় কীর্তি,—অখণ্ড ভারতের সৃষ্টিকে ধ্বংস করিয়া যাইতে তাহা বাধে নাই। সে যাহা হউক, স্বল্পকাল স্থায়ী জাপানী অধিকারের ফলে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপগুলির অধিবাসীর মধ্যে এক জাতীয়তা-বোধের বিকাশ ত্বরান্বিত হইয়াছিল।

ইন্দোনেশিয়ার প্রায় ৬০টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ডাঃ সোকর্ণের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পার্টি (P. N. I. বা Parti

Nasional Indonesia), ডাঃ শারীরের সোশিয়ালিষ্ট পার্টি, ডাঃ নাটশিরের মাসজুমি পার্টি, কম্যুনিষ্ট পার্টি ও দার-উল-ইসলাম দলের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পি. এন. আই. দল ডাঃ সোকর্ণ ও ডাঃ হাত্তা কর্তৃক ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সুসংহত ও সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পথে চালিত করিতে গিয়া এই পার্টি শাসকগোষ্ঠীর দমন-নীতির লক্ষ্য হয়। পি. এন. আই পার্টির এক দল সভ্য ডাঃ শারীরের নেতৃত্বে পুরাতন পার্টি ত্যাগ করিয়া নূতন সোশিয়ালিষ্ট পার্টি গঠন করিয়াছেন। পুরাতন পার্টি ত্যাগ করিবার কারণ এই যে, তাঁহাদের মতে জাতীয় আন্দোলনের ঐক্য রক্ষা করিতে গিয়া নেতারা দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির সহিত অসঙ্গত আপোষ করিতে ইতস্তত করেন নাই। পি. এন. আই পার্টির বামপন্থী দল সোশিয়ালিষ্ট পার্টি গঠন করিলে এক দল দক্ষিণপন্থী পুরাতন পার্টি ত্যাগ করিয়া নূতন দক্ষিণপন্থী মাসজুমি পার্টি গঠন করিলেন। এই মাসজুমি পার্টি প্রকৃতপক্ষে পুরাতন সরিকত ইসলাম দলের নূতন রূপ। এই দলের মতে ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৮৫ ; সুতরাং ইন্দোনেশিয়ায় শরিয়ত মতে ইসলামিক রাষ্ট্র গঠিত হওয়া আবশ্যক। ইন্দোনেশিয়ায় এই ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত মাসজুমি পার্টির প্রতিপত্তি অন্যান্য পার্টির অপেক্ষা বেশী এবং পার্টির সভ্য-সংখ্যাও অধিক। এই পার্টির অন্যতম নেতা ডাঃ সুচিমান ইন্দোনেশিয়ার কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এই পার্টি পি. এন. আই. পার্টির সঙ্গে এখনও সহযোগিতা করিতেছে। ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিষ্ট দল এক দিকে গুপ্ত ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম ও অন্য দিকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত। ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম অনুসরণে নিযুক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে ধর্মান্ধ, উগ্রপন্থী দার-উল-ইসলাম পার্টি। প্রথমটির দৃষ্টি মস্কোর প্রতি আবদ্ধ, দ্বিতীয়টির দৃষ্টি পাকিস্তান ও আরব-জগতের প্রতি আবদ্ধ। দার-উল-ইসলাম পার্টি ওয়াহবী মতাবলম্বী ; এই পার্টি ভারতীয়-চীন-আরব সংস্কৃতিতে পুষ্ট ইন্দোনেশিয়ায় আধুনিক মিশ্র সংস্কৃতির ধারা হইতে অ-ইসলামিক প্রভাবগুলি দূর করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দলের সভ্য-সংখ্যা বর্ত্তমানে অধিক না হইলেও দেশের প্রতিপত্তিশালী প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর অনেকে ইহার পিছনে আছেন।

কম্যুনিষ্ট দলের মত দার উল-ইসলামের ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা দমন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে প্রায়ই সেনাবাহিনী নিযুক্ত করিতে হয় এবং সরকারী সৈন্যদল ও দার-উল-ইসলামের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে খণ্ড-যুদ্ধের সংবাদ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। এই দুই দল ও আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত দস্যুদল দেশে কতকটা অরাজকতা আনিয়াছে, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে গভর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে।

দেশের এই আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা ছাড়িয়া দিয়া শরিয়ত মতে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী মাসজুমি পার্টির অভ্যুদয়ের ভবিষ্যৎ ইঙ্গিতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

এই পার্টির অভ্যুদয়ের রাজনৈতিক পরিণতির প্রতি ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। পণ্ডিত জহরলালের বন্ধু ডাঃ সোকর্ণ এখনও ইন্দোনেশিয়ার রিপাব্লিকের রাষ্ট্রপতি, কিন্তু মাসজুমি পার্টির নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ার বৈদেশিক নীতির গতি ভিন্ন পথ ধরিয়াছে। ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান এখন ইন্দোনেশিয়ার ঘনিষ্ঠতর বন্ধু : ভারতবর্ষ অপেক্ষা পাকিস্তান ও আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ইন্দোনেশিয়া আত্মীয়তা করিতে আগ্রহান্বিত। পাকিস্তানের ভারত-বিদ্বেষী প্রচারকার্য ইন্দোনেশিয়ায় অনুকূল ও প্রশস্ত ক্ষেত্র পাইতেছে। উগ্র দার-উল-ইসলাম দল ইন্দোনেশিয়া হইতে বিধর্মী বিদেশীদিগের অন্তর্ভুক্ত সহস্র সহস্র হিন্দুকে বিতাড়িত করিতে ইচ্ছুক। ইন্দোনেশিয়ার দুর্দিনে ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির কথা এখন আর কাহারও মনে রাখিবার বিষয় নহে। হয়ত মাসজুমি পার্টির স্থানে পি, এন, আই বা সোশিয়ালিষ্ট পার্টি প্রবল হইলে ইন্দোনেশিয়ায় যে ধর্মান্ধতা ও উগ্র মতবাদের প্রসার হইতেছে, তাহা বন্ধ হইতে পারে।

পাকিস্তান ছাড়া ইন্দোনেশিয়ার আরও বন্ধু জুটিতেছে। নানা লক্ষণে বুঝা যায়, ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অষ্ট্রেলিয়া ইন্দোনেশিয়ার প্রতি অতিশয় সহানুভূতিশীল হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ায় ভারত-বিদ্বেষী প্রচারকার্য তাহার অভিপ্রায়ের অনুকূল। ইন্দোনেশিয়া ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগ-পথে অবস্থিত। যদি ভবিষ্যতে কোন দিন ভারতের নৌবাহিনী ভারত মহাসাগরে প্রবল হইয়া উঠে প্রতিবেশী ইন্দোনেশিয়া হইবে তাহার পার্শ্বরক্ষক।

ইন্দোচীন

ব্রহ্মের প্রতিরোধ বাহিনীর নেতা জেনারেল আউন স্যাং নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া তাহার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরোধ বাহিনীর নেতা ডাঃ সোকর্ণ এখন ইন্দোনেশিয়ার রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট। ইন্দোচীনের প্রতিরোধ বাহিনীর নেতা ও ডেমোক্রাটিক রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ হো-চিন-মিন আজ বিপজ্জনক কম্যুনিষ্ট শত্রু বলিয়া পরিচিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক অবস্থার গুরুতর পরিবর্ত্তন ফ্রান্সের বিশ্বাসঘাতকতা ও শাঠ্যকে জয়যুক্ত করিয়াছে। তাহা না হইলে ফরাসীর কবল হইতে ইন্দোচীনের মুক্তিদাতারূপে ও গণতান্ত্রিক রিপাব্লিকের প্রধানরূপে তিনি বিশ্বসভার গৌরবের আসন অধিকার করিতেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে ইন্দোচীনে ফরাসীর উগ্র দমন-নীতির ফলে চীনের কুওমিনটাংয়ের আদর্শে গঠিত ভিয়েটনাম কুওমিনটাং দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং সমগ্র দেশে গুপ্ত কম্যুনিষ্ট আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। যুদ্ধ বাধিবার কিছু আগে প্রকাশ্য আন্দোলন চালাইবার জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টি জাতীয় ডেমোক্রাটিক ফ্রণ্ট নাম দিয়া একটি দল গঠন করে। এই দলের অন্যতম দাবী ছিল ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য দেশরক্ষার ব্যাপারে দেশের লোককে দায়িত্বের অংশ দিতে হইবে। এই দাবীতে ফ্রান্স ভয় পাইয়া যায়। যুদ্ধ বাধিলে ইন্দোচীনের ফরাসী কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি এই দলের নেতাদিগকে জেলে পুরিলেন।

মালয়ে ও ইন্দোনেশিয়ায় ইংরাজ ও ডাচেরা জাপানীদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু ইন্দোচীনের ফরাসী কর্তৃপক্ষ বিনা যুদ্ধে জাপানী বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। জাপানের সহিত মার্শাল পেতাঁর ভিচি গভর্ণমেণ্টের আপোষ-ব্যবস্থার ফলে জাপানী সেনাপতিদের তাঁবেদারীতে ফরাসীরা ইন্দোচীন শাসন করিতে লাগিল। এদিকে জাপানীরা ভিয়েটনামের (আনামের) সম্রাট বাও দাইয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিল।

জাপান ও ভিচি শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা-রূপে দেখা দিলেন ডাঃ হো-চিন-মিন। চীন, ব্রিটেন ও আমেরিকা,—মিত্রশক্তির তিন পক্ষের কাছে তাঁহার মূল্য বৃদ্ধি পাইল। বীর, প্রকৃত দেশপ্রেমিক জননায়ক ও যোদ্ধা বলিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইল। মিত্রশক্তির বিমানে অর্থ ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম তাঁহার কাছে পৌঁছিতে লাগিল। জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইসেকের অধিকারভুক্ত চীনের মাটিতে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া হো-চিন-মিন জাপানের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিলেন। লাওস, কাম্বোডিয়া ও ভিয়েটনাম হইতে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক প্রতিরোধ বাহিনীতে যোগ দিতে লাগিল। চারি দিকের অবস্থা দেখিয়া বাও দাই পরামর্শদাতারূপে হো-চিন-মিনের সঙ্গে যোগ দিলেন।

জাপানের পতনের পরে ইন্দোচীনের সামরিক কর্ত্তৃত্ব চীন, ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের হাতে আসিল এবং হো-চিন-মিন দেশের শাসন-ব্যবস্থার দায়িত্ব পাইলেন। তিনি ইন্দোচীনকে গণতান্ত্রিক রিপাব্লিক ঘোষণা করিলেন (আগষ্ট, ১৯৪৫) এবং স্বয়ং রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট হইলেন। পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্তির আশায় হতাশ হইয়া বাও দাই ইন্দোচীন ত্যাগ করিলেন।

এদিকে আন্তর্জাতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। চীনে কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট প্রবল হইল, ফ্রান্সে জেনারেল দ্য'গলের প্রতিষ্ঠা হইল এবং রুশিয়ার প্রতি ব্রিটেন ও আমেরিকার ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। এই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় মিত্রপক্ষের যুদ্ধকালীন বন্ধু হো-চিন-মিন তাঁহাদের বন্ধুত্ব হারাইলেন। মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায় আমেরিকা ব্রিটিশ ও ডাচদের সাহায্য করিয়াছিল; ফ্রান্স দাবী করিল, ইন্দোচীন পুনরুদ্ধারের জন্ম তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। ব্রিটিশ বাহিনী ইন্দোচীনে প্রবেশ করিল। "when the British entered Indo-China on September 12 (1945), it became clear that they were committed to the return of the French. The Annamites revolted claiming that they were fighting a legitimate war of independence." ব্রিটিশ বাহিনীর নায়ক লেপ্টেনাণ্ট জেনারেল ডগলাস গ্রেসী ইন্দোচীনে অভিযান আরম্ভ করিলেন, তাঁহার সঙ্গে ফরাসী বাহিনী। তাঁহার সাহায্যের জন্ম ব্রিটিশ সরকার ইন্দোচীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠাইলেন, চিয়াং-কাইশেকের গভর্ণমেণ্ট টংকিং দখল করিবার জন্ম সৈন্য পাঠাইলেন। সায়গন দখল করিয়া ফরাসীরা রিপাব্লিকান গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রীদের বন্দী করিল। তার পর যাহা আরম্ভ হইল তাহাকে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড বলা যায়। সায়গনের 'সিডনী সান' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতার ভাষায় "The reconquest of Indo-China with systematic slaughter of Indo-China nationalists seems to be the French policy." দুই-একটা এমন সংবাদও রটিল যে, জাপানীরা ভিয়েটনামীদের সাহায্য করিতেছে। ফ্রান্স হইতে নূতন এক জন অ্যাডমিরাল আসিলেন যুদ্ধ চালাইতে, কিন্তু হো-চিন-মিনের গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। ইহার পর ফ্রাঙ্কো-ভিয়েটনাম চুক্তি হইল। চুক্তিতে ফ্রান্স ফরাসী সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বাধীন ভিয়েটনাম রিপাব্লিকান গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করিল।

চুক্তির অন্যান্য সর্ত্ত আলোচনার জন্ম হো-চিন-মিন প্যারিসে নিমন্ত্রিত হইলেন এবং নানা অজুহাতে তাঁহাকে ছয় মাস কাল সেখানে ব্যস্ত রাখিবার ব্যবস্থা হইল। এদিকে তাঁহার অনুপস্থিত কালে ইন্দোচীনে নূতন উদ্যমে সামরিক অভিযান চলিতে লাগিল। ঐ সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের আন্দোলনে ইন্ধন যোগাইবার ব্যবস্থা হইল এবং বাও দাইয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। লাওস ও কাম্বোডিয়া রিপাব্লিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার ফরাসীর অধীনে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হইল। ফরাসী আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে হো-চিন-মিনের বিরোধীদের লইয়া গঠিত ভিয়েটনাম য়ুনাইটেড নেশনালিষ্ট ফ্রণ্ট বাও দাইয়ের অধীনে সকল দলকে লইয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই দলের উপর ভরসা রাখিয়া ইন্দোচীনের ফরাসী হাই কমিশনার M. Bollaert যে নূতন শাসন-সংস্কার ঘোষণা করিলেন, হো-চিন-মিন তাহা গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। য়ুনাইটেড নেশনালিষ্ট ফ্রণ্ট দেশের সকলের জন্ম নির্দ্ধারিত সর্ত্তে "agreed to take over power." নির্দ্ধারিত সর্ত্তগুলিতে দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও আর্থিক ব্যবস্থার কর্ত্তৃত্ব ফরাসীদের হাতে রাখিবার ব্যবস্থা ছিল।

নূতন বন্দোবস্তের ফলে বাও দাই বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভিয়েটনাম রাষ্ট্রের প্রধান (সম্রাট) হইলেন।

হো-চিন-মিনের রিপাব্লিকান গভর্ণমেণ্ট ফরাসীর হাতের পুতুল দক্ষিণপন্থী ও আপোষকামী নেশনালিষ্ট ফ্রণ্টের ব্যবহারে না দমিয়া দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও আর্থিক ব্যবস্থার কর্ত্তৃত্ব হস্তান্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ইন্দোচীনকে ফরাসীর কবল হইতে মুক্ত করিয়া অখণ্ড দেশ ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার সংগ্রাম চলিতেছে।

আমেরিকার সাহায্য না পাইলে ফ্রান্স এত দিন ইন্দোচীন হইতে বিতাড়িত হইত, দেশে পূর্ণ গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইত। আমেরিকার সাহায্য পাইয়া ও উত্তর-ভিয়েটনামের রিপাব্লিকের অধিকারভুক্ত অঞ্চল হইতে হো-চিন-মিনকে হটান ফরাসীর পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই; বরং হো-চিন-মিনের গেরিলা বাহিনী আক্রমণের ঘাঁটি ক্রমে ফরাসী-অধিকৃত এলাকার মধ্যে সরাইয়া আনিতেছে। প্রায়ই এই বাহিনীর কার্যকলাপের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। ইন্দোচীনে চীনের কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্টের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার ভয়ে ফরাসীকে অনবরত অর্থ ও সামরিক উপকরণ যোগাইয়া আমেরিকা যুদ্ধ জিয়াইয়া রাখিতেছে। নূতন একটি ধূয়া উঠিয়াছে, ইন্দোচীনে কম্যুনিষ্ট প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতবর্ষ পরিবেষ্টিত (encircled) হইবে। কোরিয়ায় বিশ্বরাষ্ট্র সংঘের বেনামীতে আমেরিকা যুদ্ধ চালাইতেছে। ইন্দোচীনে আমেরিকা যুদ্ধ চালাইতেছে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বেনামীতে। কম্যুনিজমকে ঠেকাইবার জন্ম আমেরিকার আগ্রহকে চতুর ফরাসীরা ইন্দোচীনে কাজে লাগাইতেছে।

ভারত গভর্ণমেণ্ট ফরাসীর তাঁবেদার বাও দাইয়ের ভিয়েটনাম গভর্ণমেণ্টকে স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে রাজি হন নাই, প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শেষ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

৺মনোমোহন ঘোষ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মামলা ভিন্ন আদালতে স্থানান্তর করবার আবেদন

৭ই জুলাই, ১৮৮২ তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি মিঃ জাষ্টিস্ ম্যাকলিন ও মিঃ জাষ্টিস ম্যাকফার্সনের এজলাসে মিঃ মনোমোহন ঘোষ আবেদন করেন যে, নদীয়ার দায়রা জজ মিঃ ডিকেন্সের নিকট এই মর্ম্মে কৈফিয়ৎ তলব করা হউক, মুলুকচাঁদ চৌকিদারের মামলা বিচারের জন্য জুরীদের বাছাই করে তিনি যে নির্দ্দেশ প্রকাশ করেছেন তা কেন বাতিল করা হবে না এবং কেন মিঃ ডিকেন্সের এজলাস থেকে মামলা অপর কোন জজের এজলাসে বদলী করা হবে না। আবেদনের সমর্থনে নিম্নের এফিডেভিট দাখিল করা হয়—

বাবু প্রসন্নকুমার মিত্রের এফিডেভিট

১। মুলুকচাঁদ সর্দ্দার চৌকীদার বর্ত্তমানে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। নদীয়া জজ কোর্টের উকীল আমি তার ওকালতনামা পেয়েছি। এতে আমাকে আর অন্যান্য উকীলকে আসামীর পক্ষ সমর্থন করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

২। এই আসামী, মুলুকচাঁদ চৌকীদারকে গত মে মাসে খুনের অভিযোগে নদীয়ার দায়রা জজ পি ডিকেন্স এস্কোয়ার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

৩। আসামী আপীল করলে এবং দণ্ডাদেশ অনুমোদনের জন্য নদীয়ার দায়রা জজ আবেদন করলে, এই আদালতের মিঃ জাষ্টিস উইলসন ও মিঃ জাষ্টিস ম্যাকফার্সনের দ্বারা গঠিত 'ডিভিসন বেঞ্চ', ১৩ জুন, ১৮৮২ তারিখে উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ অগ্রাহ্য করে পুনর্ব্বিচারের আদেশ দেন।

৪। পুনর্ব্বিচারের এই আদেশ নদীয়ার দায়রা জজ মিঃ পার্শিভাল ডিকেন্সের কাছে পৌঁছবার ৩।৪ দিনের মধ্যে কয়েক জন উকীল এবং অন্যান্য ব্যক্তির কাছ থেকে জানতে পারি যে, তাঁরা স্বকর্ণে শুনেছেন যে, মিঃ ডিকেন্স প্রকাশ্য আদালতে বলেছেন যে, তিনি মিঃ সবি, মোল্লা খোদাদাদ প্রভৃতিকে জুরী নির্ব্বাচন করবেন। জজের অভিমত যে, তাঁরা উক্ত আসামীর মামলার বিচার করবার পক্ষে উপযুক্ত।

৫। প্রায় এই সময়, এ কথাই আমি জেনেছি যে, জজ তাঁহার কয়েক জন মিনিষ্টিরিয়াল অফিসারকে বলেছেন যে, মিঃ সবি ও মোল্লা খোদাদাদ ছাড়াও তিনি এই মামলার জুরীরূপে বাছাই করবেন বাবু গোপালচন্দ্র সাহা, মৃত্যুঞ্জয় রায় ও বাবু হরনাথ মিত্রকে।'

৬। দায়রা জজ মামলার বিচারের জন্য আপনার ইচ্ছামত জুরী বাছাই করবেন অবগত হয়ে এবং এই বাছাই পদ্ধতি অবৈধ হবে ও তাতে করে আসামীর বিরুদ্ধে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করা হতে পারে মনে করে, এ কথা আমি কলিকাতায় কৌশুলিকে জানান কর্ত্তব্য মনে করি। কৌশুলীর পরামর্শক্রমে নদীয়ার জজ কোর্টের উকীল বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি একযোগে গত ২০শে জুন নদীয়ার জজ মিঃ ডিকেন্সের নিকট যে আবেদন করি তা এই এফিডেভিটের ('ক' চিহ্নিত) সঙ্গে সংলগ্ন করা হ'ল :—

"নদীয়া জেলে আবদ্ধ কয়েদী মুলুকচাঁদ চৌকীদারের বিনীত আবেদন—

"আপনার এই আবেদনকারী অবগত হইয়াছে যে, তাহার মামলার পুনর্ব্বিচারের যে আদেশ হাইকোর্ট দিয়াছেন তাহা পাইয়া আপনি প্রকাশ্য আদালতে বলিয়াছেন যে, এই আবেদনকারীর বিচারের জন্য এক স্পেশাল জুরী আহ্বান করিবেন এবং মিঃ সবি, মোল্লা খোদাদাদ-প্রভৃতিকে এতদর্থে আহ্বান করিবেন।

"আবেদনকারী নিবেদন করিতে চাহে যে, মফঃস্বল আদালতে স্পেশাল জুরী আহ্বান ব্যবস্থার আইনসঙ্গত কোন বিধান নাই এবং কোন বিশেষ ব্যক্তি ও ব্যক্তিগণকে দায়রা আদালতে কোন বিশেষ মামলার বিচারের জন্য জুরী বাছাইএর আইনগত ক্ষমতা আপনার নাই।

"অতএব আবেদনকারীর সবিনয় প্রার্থনা এই যে, এ বিষয় বিবেচনা করিয়া আপনি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪০৭ ধারা অনুসারে জুরীর তালিকা হইতে নাম প্রকাশ্য আদালতে লটারী করিয়া বাছাই করুন এবং আবেদনকারীর বিচারের দিবস আদালতে হাজির হইবার জন্য অন্ততঃ পক্ষে ১৫।২০ জনকে বাছাই করুন।

"আরও অনুরোধ যে, আবেদনকারী দীর্ঘকাল হাজতে আছে বিবেচনা করিয়া, শীঘ্র বিচারের দিন ধার্য্য করা হউক এবং হাইকোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষ ভাবে প্রয়োজন হইলে দায়রা সেসনের ব্যবস্থা করা হউক।

৭। উক্ত ২০শে জুন বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমি জজ আদালতে উপস্থিত হয়ে আবেদন পেশ করি। বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে জজকে জানান যে, আসামী মুলুকচাঁদ চৌকীদারের বিচারের জন্য শীঘ্র দিন ফেলবার জন্য তিনি আবেদন করতে চাহেন। জজ মিঃ ডিকেন্স বলেন যে, ১৭ই জুলাইএর পূর্ব্বে বিচারের দিন ধার্য্য করার সুবিধা হবে না। বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎপর জানান যে, জুরীদের ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪০৭ ধারা অনুসারে বাছাই করবার আবেদনও আছে। তাতে মিঃ ডিকেন্স বলেন—'এক দল উকীলকে আমি জুরীর আসনে বসতে দিতে পারি না।' ইহাতে বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—মাত্র উকীলরা জুরী হউন ইহা আমাদের বক্তব্য নহে, আমাদের এইটুকু প্রার্থনা যে, লটারী করে জুরী বাছাই হউক। তাতে মিঃ ডিকেন্স বলেন—'মিঃ ঘোষ মামলাটি যশোর বা অন্য কোন জিলায় পাঠাবার ব্যবস্থা করুন না কেন?' বাবু তারাপদ উত্তরে বলেন—যশোর জুরী-বিচারের জিলা নয়। আমরা মাত্র এই চাই যে, আইনসঙ্গত ভাবে জুরী নির্ব্বাচিত হোক। মিঃ ডিকেন্স তার পর বলেন—'মামলা সম্বন্ধে আমার মতামত আমি স্থির করে ফেলেছি। আসামীর অনুকূলে প্রবল কোন প্রমাণ না থাকলে মত পরিবর্ত্তন করা আমার পক্ষে কঠিন হবে। সামনে নথিপত্র নিয়ে বসে হাইকোর্টের গুটিকয়েক বিচারপতির পক্ষে যা খুশী তাই বলা বড় সহজ⋯দুইয়ে-দুইয়ে চার—এ সিদ্ধান্ত আমি পূর্ব্বেই করে ফেলেছি, দুইয়ে-দুইয়ে পাঁচ, এ কথা তাঁরা আমাকে দিয়া বলাতে পারবেন না।' এর পর তিনি জিজ্ঞাসা করেন—'ইংরেজী জানা জুরীতে কি আপত্তির কারণ থাকতে পারে? জজের সংক্ষেপণ ভাঙ্গা বাংলায় অনুবাদ করলে তার অর্দ্ধেক গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায়। অশিক্ষিত অজ্ঞ জুরীর উপরই যদি আসামীর নিষ্কৃতির সুযোগ নির্ভর করে, তা'হলে তার জন্যে আমি দুঃখিত।' বাবু তারাপদ বলেন—আসামী ত এ প্রার্থনা করছে না যে, অশিক্ষিত, অজ্ঞ জুরী বাছাই করা হোক। স্পেশাল জুরী বাছাই না হয়, এই তাঁর আর্জ্জি।' বাবু তারাপদ আবেদনের প্রথম অনুচ্ছেদ পাঠ করে আবেদনের উত্তরে আদেশের প্রার্থনা জানালেন। প্রথম অনুচ্ছেদের অভিযোগের শুদ্ধাশুদ্ধ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করে মিঃ ডিকেন্স বলেন—'আবেদন ইংরেজীতে লেখা; আমার হাতে দিন। বিবেচনা করে পরে আদেশ দেব।' বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মিঃ ডিকেন্সের হাতে আবেদনখানি দিলে, তিনি তা আপনার বাক্সে রাখতে রাখতে বললেন—'এ সব দরখাস্ত দিয়ে যদি আমাকে দিক্ করা হয়, জুরী বাছাই সম্বন্ধে আমার ইচ্ছামত ব্যবস্থার যদি সীমাবদ্ধ করা হয়, তাহা হলে, এই মামলা আমার ফাইল থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও দেবার জন্যে হাইকোর্টকে লিখব।'

৮। পরদিন অর্থাৎ ১৮৮২, ২১ জুন, আবেদনপত্রের পিছনে মিঃ ডিকেন্স যে অর্ডার পাশ করেন, এই এফিডেভিটের সঙ্গে তার এই প্রামাণ্য নকল ('খ' চিহ্নিত) দেওয়া গেল—

'এই দরখাস্তে যে সব বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আগামী সেসনের প্রথম সোমবার এই বিচারের আরম্ভ দিন ধার্য্য হইয়াছে। কতিপয়, উপযুক্ত জুরী যাহাতে উপস্থিত থাকিতে পারেন তৎসম্বন্ধে যথারীতি ব্যবস্থা করা হইবে। ২১শে জুন, ১৮৮২

পি ডিকেন্স।'

৯। আমি জানাচ্ছি যে, কৃষ্ণনগর জজের আফিসে ভাল করে সন্ধান নিয়ে আমি বা বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে পেরেছি যে, আসামীর বিচারের নির্দ্ধারিত দিনে উপস্থিত থাকবার জন্যে প্রকাশ্য আদালতে লটারী করে মিঃ ডিকেন্স কোন জুরী বাছাই করেননি।

১০। এ-ও আমি জানতে পেরেছি যে, ৪ঠা জুলাই তারিখে আসামীর বিচারের জন্য নিম্নলিখিত জুরীদের তলব দিতে জজ নদীয়ার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে নির্দ্দেশ দিয়েছেন—

মিঃ সবি, মোল্লা খোদাদাদ, গোপালচন্দ্র সাহা, উমানাথ ঘোষাল, মৃত্যুঞ্জয় রায়, নকুলেশ্বর ব্যানার্জ্জি, ক্ষীরোদচন্দ্র রায়, যদুনাথ চ্যাটার্জ্জি, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বিপিনবিহারী মজুমদার ও মতিলাল পাল চৌধুরী।

১১। আমি যত দূর সন্ধান জানি ও আমার বিশ্বাস, উপরোক্ত জুরীগুলি বা তাঁদের কেউ প্রকাশ্য আদালতে লটারীতে নির্ব্বাচিত হননি। উপরের ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদে লিখিত যে পাঁচ জনকে জজ বাছাই করেন তার মধ্য থেকে চার জনকে নেওয়া হয়েছে। এদের ছাড়া তিনি সাত জনকে ১৭ই জুলাই হাজির হবার জন্য বেছে নিয়েছেন।

১২ ও ১৩ অনুচ্ছেদ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

১৪। আমি আরও বলতে চাই যে, কৃষ্ণনগরে এ কথা সকলেই জানে যে, আহূত জুরীদের অন্যতম মিঃ সবি নদীয়ার জজ মিঃ ডিকেন্সের বন্ধু। ইনি বা মোল্লা খোদাদাদ মামলার নিরপেক্ষ বিচার করতে পারেন না। যা পূর্ব্বে ঘটে গেছে, তার পর তাঁদের জুরী মনোনয়ন করা ঠিক হয়নি।

১৫। আমার মনে হয়, মিঃ ডিকেন্স যে সঙ্কল্পিত মনোভাব প্রকাশ করেছেন তাতে আসামী মুলুকচাঁদ চৌকীদারের নিরপেক্ষ বিচার জজ মিঃ ডিকেন্সের আদালতে হতে পারে না। আইনতঃ লটারীতে জুরী বাছাই না করে জজের মরজি মত জুরী যদি সংগ্রহ করা হয়, তা'হলে আসামীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব করা হবে।

১৬। এই এফিডেভিট আমি বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখিয়েছি, তিনি বলেছেন যে, ২০শে জুন যা ঘটেছিল বলে উপরে বলা হয়েছে, তার সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতি এই এফিডেভিট বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে মেলে।

স্বাঃ প্রসন্নকুমার মিত্র।

মিঃ ঘোষ বলেন, হাইকোর্টে পর্য্যন্ত এই ব্যাপার যাতে না গড়ায় তার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, তিনি নিরুপায় হয়ে আবেদন করতে বাধ্য হয়েছেন। আইন অগ্রাহ্য করে জজ নিজের খেয়াল মত জুরী বাছাই করেছেন। জজ বলেছেন যে, জুরী বাছাই করবার উদ্দেশ্য হ'ল, উপযুক্ত হাতে আসামীর অদৃষ্ট নির্ণয়ের ভার দেওয়া। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৪০৭ ধারা না মেনে

জজ নিজের ইচ্ছা মত কিছু করতে পারেন না। জুরীর লটারী করতেই হবে। এই বিধি সব জজ সর্ব্বদাই যথাযথ ভাবে মেনে আসছেন বলেই আমার অভিজ্ঞতা। এই প্রথম দেখা গেল আইন মানা হচ্ছে না। বরাবর এই ভাবেই তিনি জুরী বাছাই করে আসছেন, এ অজুহাত দিয়ে মিঃ ডিকেন্স তাঁর বিধি-লঙ্ঘন সমর্থন করতে পারেন না। এই পদ্ধতি যে অবৈধ এ ছাড়াও গুরুতর অভিযোগ আছে। আসামী অপরাধী, এই যাঁদের বদ্ধমূল ধারণা, জজ ইচ্ছে করে তাঁদেরই জুরী করছেন। আসামীর বিরুদ্ধে জজের ধারণা বদ্ধমূল, তিনি তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। এই আদালত এই জজের সিদ্ধান্তে আপত্তি উঠিয়েছিলেন, নতুন বিচারের বেলাও যদি এই জজ আপনার পছন্দ মত এমন সব জুরী বাছাই করেন, তা'হলে জুরীর সিদ্ধান্ত প্রভাবান্বিত হবে। আরও হেতু আছে।

এখানে মিঃ ঘোষ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১০ আইনের ৪০৭ ধারা পাঠ করে বলেন যে, মিঃ ডিকেন্সের কাজ এই ধারার বিরোধী সুতরাং অবৈধ, সুতরাং তাঁর আদেশ বাতিল করতে তিনি অনুরোধ করেন। আইনতঃ জুরী নিয়োগ সম্বন্ধে জজের সিদ্ধান্ত চরম, তাই পর্য্যাপ্ত কারণ না দেখাতে পারলে কোন জুরী সম্বন্ধে আপত্তি করা চলে না। এদিক দিয়ে আসামী যথেষ্ট অসুবিধায় পড়েছে। ফৌজদারী মামলার বিচার সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে মিঃ ঘোষ বলেন যে, যে-সব জুরী সম্বন্ধে উভয় পক্ষের কারু আপত্তি নাই, জজেরা সেই সব জুরীই সাধারণতঃ চান। যেখানে লটারী করে জুরী বাছাই হয় সেখানে অবশ্য দৈবের উপর আসামীকে নির্ভর করতে হয়।

মিঃ ঘোষ বলেন যে, মামলা অন্য আদালতে বদলী করবার পক্ষে এর চাইতে ভাল কারণ আর থাকতে পারে না। তিনি বলেন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে, প্রথমেই আমি প্রস্তাব করে-ছিলাম যে, মামলা পুনর্বিচারের জন্য নদীয়ায় ফেরত পাঠান হোক। তখন এ সব ঘটবে বলে আমি ভাবতে পারিনি। মিঃ ডিকেন্স নিজেও মামলার পুনর্বিচার থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। মামলা অন্যত্র বদলী করবার অসুবিধাও যথেষ্ট। আসামীর অবস্থা স্বচ্ছল নয়। অন্য জেলায় মামলা বিচারের জন্য গেলে সাক্ষীদেরও হয়রানী কম হবে না। এ সব অসুবিধা দূর করবার জন্য আপনারা এক কাজ করতে পারেন, বাংলা সরকারকে এ মামলার বিচারের জন্য অন্য জজকে নদীয়ায় পাঠাতে বলতে পারেন। বিচার করতে দু'দিনের বেশী সময় লাগবে না। সুপ্রসিদ্ধ পূর্ণিয়ার আবদুল কাদেরের মামলায় (২০ উইকলী রিপোর্টার, ২৩ পৃঃ) এই পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। সরকার তাতে আপত্তি করেননি। বিষয়টি জরুরী, মামলার দিন ধার্য্য হয়েছে ১৭ই। সুতরাং এ আদালত মিঃ ডিকেন্সের কাছ থেকে শীগ্‌গির একটা কৈফিয়ৎ চাইতে পারেন।

বিচারপতি মিঃ ম্যাকলিন—কিন্তু প্রসন্নকুমার মিত্র নিজে ত কোন কথা শুনেন নাই, ২০শে তারিখ তিনি যখন দরখাস্ত দাখিল করতে যান, তখন তাঁর সামনে যা ঘটেছিল তা ছাড়া ?

মিঃ ঘোষ—সেদিন দরখাস্তের উপর জজ যে অর্ডার লিখে দেন তা থেকেই অবশিষ্টের সত্যতা সমর্থিত হয়েছে। দরখাস্তখানি ইংরাজীতে যখন লেখা, তখন তিনি এ অজুহাত দেখাতে পারেন না যে বাংলা তিনি বুঝেন না। দরখাস্তে বলা আছে যে, ২০শে তারিখে আমরা মনোনীত ৫ জন জুরীর মধ্যে দুই জনের সম্বন্ধে আপত্তি করেছি। দরখাস্ত মিঃ ডিকেন্সের কাছে পড়ে শোনান হলে, তিনি দরখাস্তে লিখিত আমাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলেননি যে, প্রকাশ্য আদালতে তিনি আপনার পছন্দ মত জুরীর নাম করেছিলেন।

বিচারপতি মিঃ ম্যাকলিন—তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তর প্রকাশ্য আদালতে দিতে অস্বীকার হয়ত তিনি করেছেন।

মিঃ ঘোষ—কিন্তু দরখাস্তে যে রকম গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে, তাতে জজের উচিত ছিল সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করা। পরে যখন তিনি অর্ডার পাশ করলেন, তখনও ত তা করতে পারতেন। তিনি মাত্র "জুরীর" ও "কম্‌পিট্যাণ্ট জুরী"র পার্থক্য দেখিয়েছেন।

এর পর বিচারপতিগণ মিঃ ঘোষের আবেদন মঞ্জুর করিয়া বলেন যে, ঐ দিনের মধ্যেই রায় দিবেন।

১৮৮২, ১২ই জুলাই রুলটি বিচারের জন্য আদালতে ওঠে। মিঃ ডিকেন্স বা সরকারের পক্ষ থেকে হেতু প্রদর্শনের জন্য কেহ দাঁড়ান নাই। বিচারপতিগণ মিঃ ডিকেন্সের লিখিত কৈফিয়ৎ পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত রায় দিয়া মামলাটি নদীয়া হইতে আলিপুরে বদলী করেন।

হাইকোর্টের আদেশ

বিচারপতি ম্যাকলিন—আসামীর দরখাস্তে দুইটি আবেদন করা হয়েছে। প্রথম, তার মামলার বিচারের জন্য যে জুরী ডাকা হয়েছে তা বাতিল করতে। হেতু, ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৪০৭ ধারা অনুসারে সমগ্র জুরী-লিষ্ট থেকে লটারী করে জুরী নির্ব্বাচিত করা হয়নি। দ্বিতীয়, "অন্য জিলায় মামলা বদলী করা হলে তা আবেদনকারী ও সাক্ষীদের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক হবে এবং এতে কৃষ্ণনগরের স্থানীয় উকীল যাঁরা অনুগ্রহ করে তার পক্ষ সমর্থন করতে সম্মত হয়েছিলেন, তাঁদের সাহায্য থেকে সে বঞ্চিত হবে। তাই ১৭ই জুলাই বা কোন পরবর্ত্তী তারিখে নদীয়ায় আবেদন-কারীর মামলার বিচারের জন্য মিঃ ডিকেন্স ছাড়া অপর কোন জজকে নিযুক্ত করবার জন্যে এই আদালত বাংলা সরকারকে অনুরোধ করুন।" প্রথম আবেদন সম্বন্ধে জেলা জজের কাছ থেকে আমরা একখানা চিঠি পেয়েছি। চিঠিতে জজ বলেছেন, জুরী নির্ণয় করা হয়েছে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৪১০ ধারা অনুসারে, ৪০৭ ধারা অনুসারে নয়। যোগ্য জুরী আহ্বান সম্বন্ধে তাঁর কার্য্যপদ্ধতির সমর্থনে তিনি বলেছেন যে, ঐ জিলায় বহু কাল যাবৎ গুরুত্বপূর্ণ অনেক মামলায় এই প্রথাই চলে আসছে, কেউ তাতে আপত্তি করেনি। আজ যে পদ্ধতি সম্বন্ধে আপত্তি উঠান হয়েছে, ঠিক সেই পদ্ধতি অনুসারে আহূত জুরীরা পূর্ব্ববার এই মামলারই বিচার করেছেন।

আদালতে মামলা বেশী থাকায় যখন একাধিক দল জুরীর প্রয়োজন হয়, তখনই ৪০৭ ধারার পরিবর্ত্তে ৪১০ ধারা অনুসারে জুরী ডাকবার বিধান আছে। এ ক্ষেত্রে, আমরা জানতে পেরেছি যে, এ মাসের ১৪ই থেকে নদীয়া জেলার সাধারণ দায়রা আদালত বসছে। কাজেই ৪১০ ধারার প্রয়োজন ছিল বলে আমাদের মনে হচ্ছে না। প্রয়োজন যদিও থাকত, তবু আমাদের অভিমত এই যে, ৪১০ ধারার ব্যবস্থা দায়রা আদালত বসবার সময় ছাড়া

অল্প সময়ের জন্তে হলেও, এ ধারায় এমন কথা বলছে না যে, ৪০৭ ধারার পদ্ধতি ছাড়া অন্ত পদ্ধতিতে জুরী তলব করতে হবে।

নদীয়া জিলায় দীর্ঘকাল প্রচলিত প্রথার যে কথা বলা হয়েছে, তার সম্বন্ধে আমরা বলতে চাই যে, আইনের ব্যবস্থা ছাড়া অন্ত কোন আচার-প্রথার কথা আমরা মানতে পারি নে। আইনে আছে, সাধারণতঃ প্রকাশ্য আদালতে লটারী করে জুরীর বাছাই হবে। ৪০৮ ধারায় যে স্পেশাল জুরীর ব্যবস্থা আছে, তা মাত্র ২৩৪ ধারার অনুসারে গঠিত জুরীর বিচারের বেলায়। নদীয়া দায়রা আদালতে মামলার বিচার চলতে হ'লে ৪০৭ ধারার পদ্ধতিতে নূতন করে জুরীর তলব করতে হবে। কিন্তু আসামী অপর জজের দ্বারা বিচারের জন্ত আবেদন করেছে। বিশেষ জজের জন্ত স্থানীয় সরকারের কাছে আবেদন আমরা অনুপযুক্ত বলে মনে করি। পার্শ্ববর্তী জিলার জজদের নিজেদের কাজ আছে, কাজেই এই মামলার বিচারের জন্তে বিশেষ কর্ম্মচারী প্রেরণ করতে বললে সরকারী কাজের অসুবিধা আমরা করে ফেলব। সুতরাং আমরা প্রস্তাব করছি যে, আলিপুর দায়রা আদালতে মামলার বিচার হোক। সেখানে এ মাসের ১৭ই তারিখ দায়রা আদালতের বিচার স্বরু হবে। এই মর্ম্মে আমরা নদীয়ার জিলা জজকে নির্দ্দেশ দিচ্ছি। নদীয়ার জজ বলেছেন যে, আসামীর প্রতিকূলে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন বলে মামলার বিচারের পূর্ব্বে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কাজেই একই প্রমাণের উপর নির্ভর করে তাঁর আদালতে এ মামলার বিচার তাঁর পক্ষেও যেমন সন্তোষজনক হবে না, আসামীর পক্ষেও তেমনি সন্তোষজনক হবে না। এই সব কারণে মামলা অন্ত আদালতে বিচারের আদেশ দিতে আমরা কিছু মাত্র ইতস্ততঃ করছি না।

বিচারপতি ম্যাক্‌ফারসন, বিচারপতি ম্যাকলিনের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন যে, ৪১০ ধারা ৪০৭ ধারার সঙ্গে একত্র করে পড়তে হবে। নদীয়ার জজ যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তার সম্বন্ধে আইনে কিছু মাত্র নজির নেই। যখন মিঃ ডিকেন্স মামলা ভিন্ন আদালতে বদলী করবার অভিমত ব্যক্ত করেছেন তখন তা আলিপুর জজ আদালতে বিচারের জন্ত পাঠানোর আদেশ সম্বন্ধে বিচারপতি ম্যাকলিনের সহিত আমি একমত।

মিঃ ঘোষ বিচারপতিদের নিকট নিবেদন করেন যে, নদীয়া থেকে পুলিশের নথিপত্র যাতে দাখিল করা হয় এবং ডাক্তারী সাক্ষীদের যাতে তলব করা হয়, তার নির্দ্দেশ দিতে। কিন্তু বিচারপতিরা এ সম্বন্ধে আলিপুর দায়রা জজের আদালতে আবেদন করতে বলেন। তাঁরা বলেন যে, আলিপুরের জজ নিশ্চয় যথাযোগ্য আদেশ দিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পুনর্ব্বিচারের নথীপত্র

আলিপুর দায়রা আদালত—২১ জুলাই, ১৮৮২

(অতিরিক্ত দায়রা জজ এ, সি, ব্রেট্‌ এস্কোয়ারের এজলাস)

সম্রাজ্ঞী বঃ মুলুকচাঁদ চৌকিদার

আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, ১৮৮২, ২৭শে মার্চ্চ, সোমবার রাত্রিতে নদীয়া জিলায় বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত ভুলাৎ গ্রামে আসামী ইচ্ছা পূর্ব্বক তার প্রায় ১ বৎসর বয়স্কা কন্যা নেকজানকে শড়কী দ্বারা বিদ্ধ করে হত্যা করে। এই অপরাধ দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয়।

আসামী অভিযোগ অস্বীকার করে নিজকে নির্দ্দোষ বলে।

মামলার উদ্বোধন করিতে গিয়া সরকারী উকীল বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—একবার নদীয়ায় আসামীর প্রতি দণ্ডাদেশ হয় কিন্তু হাইকোর্ট দণ্ডাদেশ নাকচ ক'রে এই আদালত কর্তৃক পুনর্ব্বিচারের আদেশ দেন। বাদী-পক্ষের অভিযোগ এই যে, ২৭শে মার্চ্চ, সোমবার অপরাহ্নে আসামী তার স্ত্রীকে না কি অন্ত গ্রামবাসী তার ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা আনতে পাঠায়। ঘরের বারান্দায় আসামীর সঙ্গে তার দুই মেয়ে ঘুমুচ্ছিল। মধ্য-রাত্রির কিছু পরে স্ত্রীর অনুপস্থিতির সুযোগে আসামী দুই মেয়ের একটিকে হত্যা করে। প্রমাণ করা হবে যে, আসামী মৃত শিশু নেকজানের গলায় পা দিয়েছিল, ও পরে তাকে শড়কী বিদ্ধ করেছিল। প্রাতে সে প্রতিবেশীদের ডাকে এবং ভাণ করে যে, কি করে মেয়ে মারা গেল সে তা বলতে পারে না। তবে বলে যে, সম্ভবতঃ সাপে কেটে মেরেছে। মঙ্গলবার বিকাল বেলা থানায় গিয়ে এজেহার দেয় যে, সাপে কেটে তার মেয়েকে মেরেছে। আসামীর নিজের মেয়ে অপরাধের প্রথম সাক্ষী। মেয়েটি সে-রাত্রিতে আসামীর সঙ্গে ঘুমিয়েছিল। সে তার বাবাকে হত্যা করতে দেখেছে। পরদিন প্রাতে মেয়েটি মা ঘরে ফিরবা মাত্র তাকে আর তার পিসী ও অপর এক স্ত্রীলোককে মঙ্গলবার ভোর বেলা সে কি দেখেছিল তা বলে। এ সব সাক্ষী বলতে গেলে "শত্রু শিবিরের"—তারা এগিয়ে এসে অভিযোগ প্রমাণ করবে। এ-ও প্রমাণ করা হবে যে, যখন বুধবার প্রাতে পুলিশ তদন্ত করতে এসেছিল, যাতে পুলিশ খুনের প্রত্যক্ষদর্শী তার মেয়ে গোলককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে না পারে, তার জন্ত সে তাকে পেঁয়াজ ক্ষেতে লুকিয়ে রেখেছিল। হত্যার মতলব কি ছিল তা প্রমাণ করা কঠিন, প্রমাণ করবার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু কতকগুলো ঘটনা থেকে —যা প্রমাণ করা হবে—জুরীরা সিদ্ধান্ত করতে পারবেন যে, কদম আলি ফকীর নামে এক জন আসামীর বিরুদ্ধে এক ফৌজদারী মামলা এনেছে, এই কদম আলির ঘাড়ে দোষ চাপানই আসামীর মতলব। ডাক্তারী প্রমাণ দেখাচ্ছে যে, পেটের আঘাতই মৃত্যুর কারণ। এর সঙ্গে জুরীরা যদি শিশুর সাক্ষীতে বিশ্বাস করেন, তাহ'লে আসামীকে দণ্ডিত করবেন।

মিঃ মনোমোহন ঘোষ ও মিঃ লালমোহন ঘোষ আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। প্রথম সাক্ষীকে আহ্বান করা হ'লে মিঃ মনো- মোহন জানতে চান যে, বাদী-পক্ষ তদন্তকারী অফিসার ইনস্‌পেক্টার বিপিনবিহারী চাটার্জ্জীর সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন কি না। ইনস্‌পেক্টার আদালতে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ ঘোষ বলেন, ইনস্‌পেক্টারকে যদি সাক্ষী মানা হয়, তবে তাঁকে আদালত-কক্ষ ত্যাগ করতে হবে।

সরকারী উকীল বলেন যে, তিনি ইনস্‌পেক্টারের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না। এর পর নিম্নলিখিত সাক্ষীদের জবানবন্দী নেওয়া হয়।

সাক্ষী নম্বর এক

দ্বারকা রায়। বয়স ৩৫। ১৮৭৩ এর ১০ আইন অনুসারে সত্য পাঠ করে আজ ১৮৮২, ২১শে জানুয়ারী তারিখে

পরগণার অতিরিক্ত দায়রা জজ এ সি ব্রেষ্ট, আমার এজলাসে সাক্ষ্য দেয়—

আমার নাম দ্বারকা রায়। আমি কনষ্টেবল। আসামীকে জানি। সে ভুলাতের চৌকীদার মুলুকচাঁদ। প্রায় তিন মাস আগে তার মেয়ে বলে কথিত নেকজান নামে একটি ছোট্ট মেয়ের লাস তার ঘর থেকে বনগাঁ নিয়ে গিয়ে এক দেশী ডাক্তারের কাছে পৌঁছে দেই। ডাক্তার আমার সামনে ময়না তদন্ত করেন। পরদিন এই দুইটি অস্ত্র (একখানি শড়কী ও একখানি বগি সনাক্ত করে) আমি আনি। শড়কী বেড়ায় বিঁধে ছিল। বগিখানি পড়ে ছিল বেড়া ও চালার মাঝখানে।

মিঃ ঘোষের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলে—এক দিন বিকেল বেলা, ৩৷৪টের সময়, আমি থানায় বসে, এমন সময় আসামী মেয়ের মরার খবর দিতে আসে। কি বার মনে নাই। জমাদার রামদাস সরকার আমায় ঘটনাস্থলে যেতে হুকুম করেন। সূর্য্যাস্তের পর, সন্ধ্যায় ভুলাতে পৌঁছি। আসামী আগে আগে যায়। রাত্রিতে খুব ঝড়। আসামীর বাড়ীর কাছেই মধু নাপিতের ঘরে শুয়ে ছিলাম। সেখান থেকে একটি মেয়ের লাস দেখতে পাই। বড় ঝড় কি না, তাই নাপিত-বাড়ীতে আশ্রয় নেই। আসামীর বাড়ীতে আসামী ছাড়া আর কেউ ছিল না, তার স্ত্রীও না, আর কোন শিশুও না। ওরা সব কোথায় তা আসামীকে জিজ্ঞেস করিনি। আসামীর কোন আত্মীয়-স্বজনকে দেখতে পাইনি। ঝড়ের জন্যে তাদের সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। আসামীর ঘরে পৌঁছে বাতী জ্বালাতে বলে বলি—এখানে থাকব, লাস পাহারা দেব। কিন্তু যখন ঝড় এল, থাকতে পারলাম না, তাই নাপিত-বাড়ী গেছলাম। রাত্রিতে একবার এই ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে, গিয়ে দেখি লাস ঠিক আছে। লাসের পাশে বসে আছে আসামী। একটা বাতী জ্বলছে। লাসের উপর থেকে কাপড় তুলে দেখিনি। চলে আসি। আসামীকে বলে আসি, দেখো শিয়াল-টিয়াল না আসে। আসামী একাই বসেছিল। ঝড় কমে এসেছিল। খেতে গেলাম। পরদিন ভোর বেলা জমাদার রামদাস এলেন। তদন্তের সময় আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। জমাদার লাস বের করে এনে পরখ করলেন। আসামীর জন কয়েক প্রতিবেশী ও আত্মীয়—জমির, সাজন, শ্যাম বেহারা, উমাচরণ এরা সব সেখানে ছিল। উমেশ গাজী সেখানে ছিল কি না মনে নাই। ধীরুকে আমি চিনি, তার স্বামী উমেশ গাজীকে স্পষ্ট মনে নাই। তাকে একেবারেই চিনি না।

[বিচারকের মন্তব্য—কি জানি কেন, সাক্ষী এই ব্যাপার নিয়ে স্পষ্ট কথার মারপ্যাঁচ করে।]

যখন জমাদার আসামীর ঘরের মেঝে খোঁড়েন আমি তখন

ছিলাম না। লাস বইবার জন্তে রায়তদের ডাকতে গেছলাম। এ প্রাতে প্রায় ৮।• থেকে ৯টার মধ্যে। সেখানে ঘণ্টাখানিক ছিলাম। লাস বইবার জন্ত কাকে কাকে এনেছিলাম, নাম মনে নেই। এক জনারও নাম মনে করতে পারছি নে। আসামীর মেঝে যে খোঁড়া হয়েছিল তা আমি জানি নে। এই প্রথম শুনছি। জমাদার খুঁড়েছে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে কেন আমি বলেছি যে, আমি তখন সেখানে ছিলাম না, তা বলতে পারি না।

[বিচারকের মন্তব্য—আবার এখানে আসামী সত্য কথা বলতে নারাজ হচ্ছে।]

ঐ দিনও আমি আসামীর স্ত্রী বা কন্তাকে দেখি নাই। [সাক্ষীকে বলা হ'ল যে, যেদিন লাস পাঠান হয়, সেদিন বুধবার ছিল।] বৃহস্পতিবার প্রাতে ইনস্‌পেক্টার আমায় বলেন যে, ব্যাপারটা খুন। তিনি আমায় ভুলাতে গিয়ে তদন্ত করতে বলে বলেন যে, তিনিও যাচ্ছেন। ইনস্‌পেক্টার আমায় বলেন—"ডাক্তারের কাছ থেকে শুনলাম শড়কীর ঘায়ে মৃত্যু হয়েছে: তুমি গিয়ে খোঁজ করে দেখ তেমন কোন হাতিয়ার পাও কি না।" আসামীর স্ত্রী ও কন্তাকে আনবার কথাও তিনি আমায় বলেন। বেলা ১টায় ভুলাতে গিয়ে পৌছি, আসামীর স্ত্রী আর মেয়ে গোলককে নিয়ে বনগাঁ রওনা হই। ভুলাত থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে ইনস্‌পেক্টারের সঙ্গে দেখা। আসামীর স্ত্রী ও কন্তা ছাড়া আমার সঙ্গে ছিল জমীর, সাজন, উমাচরণ ও শ্যাম বেহারা। ইনস্‌পেক্টার আমায় গাঁয়ের বিশিষ্ট রায়তদের আনতে বলেছিলেন, তাই এ সব লোককে সঙ্গে নিয়েছিলাম। বেলা প্রায় ১টা বা ২টায় ভুলাত থেকে রওনা হই। ইনস্‌পেক্টারের সঙ্গে যখন দেখা হ'ল, তখন তাঁর সঙ্গে ফিরলাম। যখন ইনস্‌পেক্টার জবানবন্দী লিখলেন তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম কি না মনে নাই।

[জজের মন্তব্য—আবার সাক্ষী কথার মারপ্যাচ করতে লেগেছে।]

ইনস্‌পেক্টারের পৌছবার আগে আমি কখনও আসামীর স্ত্রী বা কন্তাকে তারা কি জানে তা জিজ্ঞেস করিনি। বৃহস্পতিবার প্রাতে যখন ভুলাতে যাবার জন্ত রওনা হই, তখন আসামীকে, আর যারা লাস বয়ে নিয়ে গেছল, তাদের বনগাঁ রেখে আসি। ইনস্‌পেক্টারের সঙ্গে যেদিন আমার দেখা হয় সেদিন বৃহস্পতিবার ছিল না। সেদিন ছিল শুক্রবার। বৃহস্পতিবার রাত্রিতে আমি বনগাঁয়ে আসামীর স্ত্রী, কন্তা এবং অন্তান্ত লোক-জনের সঙ্গে ছিলাম। সত্যিকার যা ঘটেছিল তা এই:—আসামীর স্ত্রী ও কন্তাকে নিয়ে যখন যাই তখন পথে ইন্‌সপেক্টারের সঙ্গে দেখা। ইন্‌সপেক্টার আমার গাঁয়ে ফেরৎ পাঠান বিশিষ্ট রায়তদের ডেকে আনতে। না, সত্যিকার যা ঘটেছিল তা এই—বৃহস্পতিবার আমার সঙ্গে আসামীর স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি নিয়ে যখন যাচ্ছিলাম, তখন পথে ইন্‌সপেক্টারের সঙ্গে দেখা, আমরা সবাই ভুলাতে ফিরে যাই। সে রাত্রি কোথায় কাটিয়েছিলাম, বা ইন্‌সপেক্টার কোথায় রাত্রি কাটিয়েছিলেন মনে নাই। আসামীর স্ত্রী ও শিশুকন্যা কখন বনগাঁ পৌচেছিল বলতে পারি না। তাদের সঙ্গে বনগাঁ গিয়েছিলাম কি না মনে নেই। তারা শুক্রবার কোথায় ছিল ভুলে গেছি। সেদিন আমি কোথায় ছিলাম মনে পড়ছে না। ইনস্‌পেক্টার তদন্ত করতে বেরিয়েছিলেন বৃহস্পতিবার, কিন্তু কি তিনি করেছিলেন বলতে পারি না, কারণ রায়তদের ডেকে আনবার জন্যে তিনি আমায় পাঠিয়েছিলেন। কাকে কাকে আমি এনেছিলাম মনে নেই। রায়তদের আমি নিয়ে যাবার পর ইনস্‌পেক্টার কি করেছিলেন মনে নেই। তাদের আনা হয়েছিল কি না ঠিক বলতে পারিনে। শুক্রবার ইনস্‌পেক্টার গ্রামে ছিলেন কি না বলতে পারি নে। ম্যাজিষ্ট্রেট যখন মামলার তদন্ত করেন আমি উপস্থিত ছিলাম। মামলায় মাত্র একটি শড়কী দাখিল করা হয়। না, না, দুইটি; আমি মাত্র জানি একটা।

আরও প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলে—আসামীর বাড়ীতে মাত্র একখানি ঘর। ঘরের দুইটি বারান্দা। লাস পড়েছিল উত্তর দিকের বারান্দায়। মামলা চলবার সময় থেকে আমি স্ত্রীলোক সাক্ষী ধীরুকে জানি। ইনস্‌পেক্টার আমায় বলেন—"ডাক্তার বলছে এটা খুন। তুমি যাও, শড়কীর খোঁজ কর। তুমি বলছ, আসামীর স্ত্রী আছে, যদি থাকে তাকে জিজ্ঞেস কর সে কি জানে; শিশু-কন্যাটিকেও। তাদের আমার কাছে ডেকে আন।" বনগাঁয় আসামীকে রেখে আসবার পর আবার কবে তার সঙ্গে দেখা হয়, তা আমার মনে নাই। ভুলাতে আমাকে আবার পাঠাবার কতক্ষণ পরে ইনস্‌পেক্টার সেখানে যান, তা আমার মনে নাই। সেদিন কি পরের দিন বলতে পারি না।

স্বাঃ এ সি ব্রেট।

সাক্ষী নম্বর দুই

বাদী-পক্ষের দুই নম্বর সাক্ষী অধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আজ ১৮৮২, ২১শে জুলাই ১৮৭৩এর ১০ আইন অনুসারে সত্য পাঠের পরে ২৪ পরগণার অতিরিক্ত দায়রা জজ এ সি ব্রেট, আমার এজলাসে সাক্ষ্য দেয়—

আমার নাম অধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আমি বনগাঁয়ের এক নেটিভ ডাক্তার। ২১শে মার্চ্চ, কনষ্টেবল দ্বারকা রায় আমার কাছে প্রায় ১০ বছরের একটি মেয়ের লাস আনলে, আমি লাস পরীক্ষা করি। শীর্ণ দেহ, লিভার বড়। মাথায় মাত্র পচন ধরেছে। জিভ সামান্য বেরিয়ে এসেছে। জিভের উপর দাঁত আল্‌গা ভাবে চাপা। মগজ সামান্ত কন্‌জেষ্টেড। গলার অবস্থা পরীক্ষা করিনি। দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে কি না, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত পরীক্ষা করিনি। এপিগ্যাষ্ট্রিক স্থানের উপর আধ ইঞ্চ গভীর ও $১ \times \frac{১}{২}$ ইঞ্চ অগভীর একটা কাটা ক্ষত দেখতে পাই। ক্ষতটা শরীরের ঠিক মাঝখানে। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যখন আমি সাক্ষ্য দেই তখন শড়কীটা দেখি। সে সময় শড়কীটা নতুন করে ধার করা হয়েছে তার লক্ষণ আমার চোখে ধরা পড়েনি। যে শড়কীখানা সামনে দেখছি, তা দিয়ে ক্ষতটা হতে পারে। মৃত্যুর কারণ এই ক্ষত। পাকস্থলীর পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে আমি প্রায় তিন আউন্স রক্ত দেখতে পাই। হৃৎপিণ্ডের দুই ভেন্‌ট্রিকলই খালি ছিল। দেহে কিছু কাপড় ছিল, কিন্তু কাপড়ে রক্তের দাগ ছিল না। ক্ষতের কিনারায় জমাট রক্তও ছিল না—কিছু মাত্র রক্ত ছিল না। পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে যে রক্ত দেখেছি বলে আমি বলেছি, তা তরলই দেখেছি, রক্তটা coagulated

ছিল কি না তা আমি ধরতে পারিনি। খুব যত্ন করে পরীক্ষা করেছি কিন্তু coagulation দেখতে পাইনি। লাস যখন আমার কাছে আনা হয়, তার সঙ্গে এই মর্ম্মে একটা রিপোর্ট ছিল যে, মনে করা হচ্ছে, সাপে কাটবার ফলে মৃত্যু হয়েছে। সাপের বিষের ফলে মৃত্যুর কোন আভাসই আমি দেখতে পাইনি। পুলিশকে আমি বলি যে, পেটের ক্ষতই মৃত্যুর কারণ, আমি মত দেই যে, শিশুটিকে হত্যা করা হয়েছে। ময়না তদন্তের সময় কনষ্টেবল দ্বারকা উপস্থিত ছিল, সে সময় তাকে আমি বলেছি—"এ খুন"। সেই মর্ম্মে একটা রিপোর্টও আমি লিখে দেই।

মিঃ ঘোষের জেরার উত্তরে—আট বছর ডাক্তারী চাকরী করছি। বেতন পাই মাসে ৫৫৲ টাকা। মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স আমায় পড়তে হয়েছে। লাস যখন এল, আমার প্রথম কাজই হ'ল লাসের দিকে নজর দিয়ে দেখা। এ বিষয়ে আমার নিশ্চিত মনে হয়েছিল যে, যা দিয়েই হোক, পেটের ক্ষতের ফলেই মৃত্যু হয়েছে। এই ধারণা নিয়েই আমি ময়না তদন্ত করি। শ্বাসনালী ও ফুসফুস বেশ করে পরীক্ষা করি, কিন্তু গলার টিসুগুলো পরীক্ষা করিনি। দমবন্ধ বা কণ্ঠরোধের ফলে মৃত্যু হয়েছে এমন কোন সন্দেহ আমার হয়নি। গলার উপর কোন চিহ্ন আমি দেখতে পাইনি। দেহের আভ্যন্তরীণ সব অঙ্গেরই আমি খুঁটিনাটি পরীক্ষা করি। ক্ষতের মুখ দিয়ে রক্ত পড়েছে এমন কোন চিহ্নই ছিল না। বেঁচে থাকতে কাটা হয়েছে এমন ক্ষত থেকে রক্তস্রাব হয়নি, দু'-চারটে ক্ষেত্রে এমন হয়েছে আমি জানি। এ সব ক্ষতে মৃত্যু ঘটেছিল।

[জজের মন্তব্য—সাক্ষী কয়েকটি উদাহরণ দিলেন, কিন্তু সে সব উদাহরণ সাক্ষীর বিবৃতিকে সমর্থন করে না। একটি ক্ষেত্রে কতকগুলো ক্ষত থেকে রক্তপাত হয়, আর কতকগুলো থেকে হয় না। আর একটি ক্ষেত্রে ক্ষতমুখ দিয়ে সামান্য রক্ত পড়ে।]

মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্সে মুখ্য পরীক্ষাই হ'ল, আঘাতের ক্ষত বেঁচে থাকতে করা হয়েছে, না, মরে গেলে করা হয়েছে—আর coagulation হয়েছে কি না। কিন্তু তাই sine qua non নয়। শিশুটা ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছিল। যকৃতের বিবৃদ্ধির ফলে ডয়াফ্রামের উপর চাপ পড়ে, এর ফলে দমবন্ধের ভাব হতে পারে, এতে কাশি হতে পারে কিন্তু দমের অভাবে কণ্ঠরোধ হয় না। ক্ষত ত্রিকোণাকার ছিল না। আমার রিপোর্টে (পাঠ করেন) দেখছি ৩য় কলমে লিখেছি যে, ক্ষতের আকার ত্রিকোণ। লেখাটা ঠিক হয়নি, অশুদ্ধ। পুলিশ ক্ষতের আকার ত্রিকোণ রিপোর্ট করেছিল বলে, ত্রিকোণ আমায় লিখতে হয়েছে। ময়না তদন্ত শেষ করে আমি রিপোর্টের ফরম পূরণ করি। এই ভুল সংশোধনের জন্য পরে আমি কোন চেষ্টাও করিনি, এ সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলিওনি। অপরাহ্ণ ৪টায় লাসটি পরীক্ষা করি। যখন পরীক্ষা করি তার ৪০ ঘণ্টা আগে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। মেরুমজ্জা পরীক্ষা করা প্রয়োজন বোধ করিনি—পরীক্ষাও আমি করিনি। ময়না তদন্ত করতে প্রায় দুই ঘণ্টা লেগেছিল। দ্বারকা বরাবর উপস্থিত ছিল। প্লীহার কোন দোষ ছিল না। প্লীহা congested ছিল না। মূত্রথলী ঈষৎ congested ছিল। বাঁ গালে একটা আঁচড়ের মত দাগ ছিল। পেটে ক্ষত আর সেই ক্ষতের আকার ও আকৃতি দেখবা মাত্র এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয় হই যে, এ সাপে কাটা নয়। এ কথা আমি বলব যে, এই জাতীয় ক্ষত হবার ফলে ২ থেকে ১০ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হতে পারে, আবার সঙ্গে সঙ্গেও মৃত্যু হতে পারে। [কিছু ভেবে-চিন্তে বলেন] স্নায়ু বিধানের এক শকের ফলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হতে পারে। মৃত্যুর ঠিক পরে আঘাত করা হয়ে থাকতে পারে, এ সম্ভব বলে আমি মনে করি। ইনস্পেক্টার বিপিনবিহারী চ্যাটার্জ্জীর সঙ্গে আমার মিত্রভাব আছে। যেদিন লাস পরীক্ষা করি সেদিন বা তার পরদিন এই ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কোন কথাবার্ত্তা হয়নি। কি ধরণের অস্ত্র দিয়ে ক্ষতটি হতে পারে এ সম্বন্ধে ২১শে বা ৩০শে তারিখে তিনি কোন প্রশ্ন আমায় করেননি।

পুনঃ প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন—ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হলে, ৪০ ঘণ্টা পরে সে কথা বলা যেতে পারে।

প্রঃ—পচনের ফলে ক্ষতের আকার-আকৃতি বদলে যায় না ?

উঃ—না।

প্রঃ—আপনি কি এ বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, ত্রিকোণ ক্ষত সম্বন্ধে একটা ভুল করা হয়েছে ?

উঃ—না, তা বলা প্রয়োজন মনে করিনি।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে—জিভ বেরিয়ে এসেছে দেখে, পচনের ফলে ঐ রকম হয়েছে বলে আমার ধারণা হয়। চক্ষু দুইটিও congested ছিল। এও পচনের ফলে হয়েছে, এই আমি বলেছি।

স্বাঃ এ সি ব্রেষ্ট।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—তারানাথ রায়।

মাদাম কুরীর সই মেলেনি

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মহিলা মাদাম কুরীর কাছে স্বাক্ষর-সংগ্রহকারীরা হ'ল সর্ব্বাপেক্ষা বিরক্তিকর বস্তু। তিনি স্বাক্ষর দেওয়ায় কখনও রাজী হতেন না। মাদাম কুরীর মনোবাঞ্ছা জেনে এক জন স্বাক্ষর-সংগ্রহকারী বৈজ্ঞানিককে একটি পঁচিশ ষ্টার্লিঙের চেক পাঠিয়ে দিয়ে লিখেছিলেন, কুরীর ইচ্ছানুযায়ী টাকাটা যেন কোথাও দান করা হয়। স্বাক্ষর-সংগ্রহকারী ভেবেছিলেন, কুরী চেক ভাঙালে একটি সই করবেন এবং সেই সইটি স্বাক্ষর হিসাবে রক্ষা করা যাবে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে কুরীর ব্যক্তিগত সেক্রেটারী দাতাকে পত্র দিলেন :

"মাদাম কুরী চেকটির জন্য আমাকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে বলেছেন, যদিও চেকটি তিনি ভাঙাচ্ছেন না। আপনি হয়তো জানেন না, কুরীর স্বাক্ষর সংগ্রহের বাতিক আছে, যে জন্য তিনি ব্যক্তিগত সংগ্রহে আপনার স্বাক্ষর রেখে দিলেন।"

ঈশপ

শ্রীযামিনীমোহন কর

"মিথ্যাকে প্রাণ থাকতে সত্য বলে স্বীকার করব না" এই বলে প্রাণ ত্যাগ করলেন পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সব বয়সের লোকেদের একান্ত প্রিয় গল্প-বলিয়ে ঈশপ। ইতিহাসে সব চেয়ে বিখ্যাত দাস। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্ব্বের কথা। গল্পের মধ্যে দিয়ে যে-সকল সত্য, নীতিকথা তিনি প্রচার করে গেছেন, আজ সে-সব সমগ্র জগতে প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছে।

ফ্রিজিয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। তাঁর বাপ-মা'র নাম, জন্মের তারিখ, ছোটবেলার কথা কিছুই জানা যায়নি। ঐতিহাসিক হেরোডোটাস লিখেছেন যে, তিনি ঈশপকে ইয়াদমনের কাছে দাসত্ব করতে দেখেন। পরে তাঁর প্রভু ভৃত্যের গুণে মুগ্ধ হয়ে স্বাধীনতা দান করেন। তার পূর্ব্বে ঈশপ ছিলেন জান্থাস নামে এক ব্যক্তির অধীনে। জান্থাসও তাঁকে খুব খাতির করতেন। কেন ছাড়াছাড়ি হল জানা যায়নি। ঈশপের খ্যাতি তখন চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ঐতিহাসিক প্লুটার্ক লিখেছেন যে, ঈশপ লিডিয়ারাজের দরবারে বিদূষক ছিলেন। দেখতে বেঁটে, কদাকার, তার ওপর দাস, কিন্তু বুদ্ধি ও চরিত্রবলে তিনি শেষে হলেন রাজা ক্রোসাসের ভাঁড়। ক্রোসাস কিন্তু তাঁকে ভাঁড় মনে করতেন না। আর ঈশপও নিছক ভাঁড়ামি করতেন না। গল্পচ্ছলে তিনি রাজাকে দিতেন সুপরামর্শ। কেবল পারিবারিক জীবনে নয়, রাজনৈতিক ব্যাপারেও। শোনা যায়, লিডিয়ারাজ না কি অত্যন্ত ধনবান ছিলেন। পারস্যের সাইরাস তাঁকে হারিয়ে লিডিয়া নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

লিডিয়া রাজ্যটি অর্থশালী ছিল কিন্তু শক্তিশালী ছিল না। পাশেই শক্তিশালী পারস্য রাজ্য কিন্তু অর্থের অনটন। বিপদ সমূহ। সেই কথাই রাজা ক্রোসাসকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, নদীর স্রোতে কাঁসা ও মাটির পাত্রের পাশাপাশি ভেসে যাওয়া গল্প বলে। কিন্তু ক্রোসাস সাবধান হননি, ফলে তাঁকে রাজ্য হারাতে হয়। ব্যাঙের দেশে ব্যাঙ রাজা পছন্দ না হওয়ায় সারসকে রাজা করেছিল। তার ফলে তারা আশ্রয় পেল সারসের উদরে। এই গল্পে বিজাতীয় রাজার অত্যাচারের কথা বলতে চেয়েছিলেন লিডিয়াবাসীদের।

রাজসভার ভাঁড় বলে সভাসদেরা তাঁকে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। মনের এই দুঃখটা প্রকাশ করেছিলেন সিংহ ও ইঁদুরের গল্পে। ফাঁদে পড়া সিংহকে মুক্তি দিয়েছে সামান্য একটা মূষিক, দাঁত দিয়ে দড়ি কেটে। সামান্য বিদূষকও প্রয়োজন হলে রাজার কাজে লাগতে পারে। সভাসদেরা আচারে ব্যবহারে পোষাকে রাজার অনুকরণ করতেন। দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছের গল্পে তিনি তাঁদের এক হাত নিয়েছেন। বেচারা দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছে সজ্জিত হয়েও ময়ূরের দলে স্থান পেল না, আবার নিজের দলে ফিরে যেতে সকলে ঠুকরে বিদায় করে দিলে। সিংহচর্ম্মাবৃত গাধার গল্পে তিনি এই কথাই আরও তীক্ষ্ণ ভাবে বলেছেন। সিংহচর্ম্মে আবৃত হলেই সিংহ হওয়া যায় না। গাধা ধরা পড়বেই তার জন্মগত স্বভাবের দোষে। তখন সিংহের হাতেই হবে তার মৃত্যু। পতনের পূর্ব্বে লিডিয়ায় দলাদলি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সেই সময় তিনি এই গল্পটি বলেন। এক বৃদ্ধ তাঁর ছেলেদের ডেকে প্রত্যেকের হাতে একটি করে কঞ্চি দিয়ে ভাঙতে বলেন। তারা পট-পট করে ভেঙ্গে দেয়। তখন সব কঞ্চিগুলো একত্র বেঁধে ভাঙতে বলেন। কেউ ভাঙতে পারে না। উদ্দেশ্য এই যে, দলাদলি করলে পতন অনিবার্য্য। একত্র থাকলে শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইতিহাস পড়ে মনে হয়, তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, তিনি নিজের দাসত্ব-জীবনের হীনতা সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলেন। এই গল্পটা তাঁর নিজের জীবনের প্রতি কটাক্ষ। এক রোগা ক্ষুধাতুর নেকড়ের সঙ্গে এক মোটা-সোটা কুকুরের পথে দেখা। কুকুরটাকে মেরে খেতে পারলে মন্দ হয় না, কিন্তু নেকড়ের গায়ে শক্তির বড় অভাব। তাই সাহস হল না। বিনীত ভাবে কুকুরের সঙ্গে কথা আরম্ভ করলে। চেহারার তারিফ করতে কুকুর বললে যে, ইচ্ছে করলে নেকড়েও এমনি চেহারা বাগাতে পারে। প্রভুর বাড়ীতে থাকে। খায়-দায় আর ঘুরে বেড়ায়। কোন কাজও নেই, চিন্তাও নেই। নেকড়ের ভারী লোভ হল। বললে,—"আমাকেও ভাই নিয়ে চল তোমার সঙ্গে তোমার প্রভুর কাছে।" কুকুর জবাব দিলে,—"বেশ তো। তুমিও আমার মতই আরামে থাকবে। মাঝে মাঝে প্রভু আদর করে পিঠ চাপড়ে দেবেন।" চলল দু'জনে। হঠাৎ নেকড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলে,—"হ্যাঁ ভাই, তোমার গলায় ও-দাগটা কিসের?" কুকুর হেসে উড়িয়ে দিলে,—"ও কিছু না। আমায় প্রভু বেঁধে রাখেন কি না তাই।" "বেঁধে রাখেন?" এই কথা বলেই নেকড়ে ঘুরে দাঁড়াল। কুকুর প্রশ্ন করলে,—"কি হল?" নেকড়ে উত্তর দিলে,—"স্বাধীন ভাবে থেকে জঙ্গলে না খেতে পেয়ে মরাও ভাল, কিন্তু দাসত্বের চর্ব্য-চোষ্য আমার সহ্য হবে না।" এর চেয়ে করুণ ভাবে নিজের দুঃখ প্রকাশ করা বোধ হয় সম্ভব নয়।

লীগ অব নেশনস্, ইউ-এন-ও ইত্যাদি সেদিনকার প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্ব্বে এর কল্পনা করেছিলেন ঈশপ। মাঠ ও বনের রাজা ছিলেন সিংহ। রাগী বা নিষ্ঠুর নয়, ন্যায়পরায়ণ এবং সহৃদয়। তিনি একদা সকল পশুপক্ষীদের এক মহতী সভা আহ্বান করে আইন প্রণয়ন করেন, যাতে বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ এবং মেষ, ছাগল, হরিণ, খরগোস সবাই মিলে-মিশে বাস করতে পারে। মহা খুশী হয়ে খরগোস বললে,—"কত দিনের আমার আশা ছিল, দুর্ব্বল সবলের পাশে নির্ভয়ে থাকতে পারবে। আজ সে আশা সফল হল।"

নিজের জীবনের প্রতি চিরটা কালই তাঁর ধিক্কার ছিল। দু'-এক বার আত্মঘাতী হতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভয়ে পারেননি। এই সম্পর্কে তিনি কাঠুরে ও যমের গল্প লেখেন। কাঠুরে কাঠের

...বোঝা নিয়ে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পথের ধারে বসে মৃত্যু কামনা করল। ...তৎক্ষণাৎ যম এসে হাজির—"কি চাই?" প্রাণের ভয়ে কাঠুরে বললে—"কিছু না। এই বোঝাটা তুলে দিতে ডাকছিলুম।"

ঈশপ ছোট ছেলেদের খুব ভালবাসতেন। প্রায়ই তাদের সঙ্গে খেলতেন। একবার এই নিয়ে এথেন্সের এক গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁকে ঠাট্টা করেন। উত্তরে তিনি একটি ধনুকে গুণ চড়িয়ে ভদ্রলোকের পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বলেন,—"বন্ধু, দিন-রাত ধনুকটাকে এই ভাবে রাখলে অকেজো হয়ে পড়বে, হয়তো ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ঢিলে করে দিলে বহু দিন কর্ম্মক্ষম থাকবে।" মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। নমনীয়তা একান্ত প্রয়োজন। মধ্যে মধ্যে মনটাকে হাল্কা করে তুলতে হয়।

যখন ঈশপ তাঁর পূর্ব্বতন প্রভু জান্থাসের কাছে দাসত্ব করতেন, সেই সময়েরও কতকগুলো গল্প বিখ্যাত। একবার জান্থাসের গৃহে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করা হয় এবং ঈশপকে সব চেয়ে উপাদেয় খাদ্য জোগাড়ের ভার দেওয়া হয়। খেতে বসে সবাই বিস্মিত হয়ে দেখেন, প্রত্যেকের পাতে কেবল জিভ। আর কিছু নেই। প্রভু বিরক্ত হয়ে ঈশপকে কারণ জিজ্ঞেস করতে তিনি উত্তর দেন যে, জিভের চেয়ে উপাদেয় আর কিছু নেই। মিষ্টি কথা, জ্ঞানের কথা, উপদেশ, সবই এই জিহ্বাপ্রসূত। তখন তাঁকে জব্দ করার জন্য পরদিন পুনরায় ভোজের ব্যবস্থা করা হয় এবং এবার ঈশপকে নিকৃষ্ট খাবার জোগাড় করতে বলা হয়। খেতে বসে সবাই বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে, আবার প্রত্যেকের পাত্রে সেই জিভ। প্রশ্নের উত্তরে ঈশপ বলেন যে, দুনিয়ায় যত কিছু নীচতা, জোচ্চুরী, অপমান, রাজদ্রোহ ইত্যাদি ঘটে, সবই এই জিহ্বাপ্রসূত। অতিথিরা সবাই ঈশপের তারিফ করেন। পরদিন সাধারণ ভাবে সুখাদ্য, সুপেয় ইত্যাদি সহ ভোজ হয়।

আর একবারের ঘটনা। কর্ত্তা সব বন্ধুবান্ধব সহ পিকনিক করতে বেরিয়েছেন। দাসেরা তাঁদের জিনিষপত্র বয়ে নিয়ে চলেছে। ঈশপও দাস। তিনি নিলেন সব চেয়ে ভারী ও বড় রুটির বোঝা। কর্ত্তা ...হই তিরস্কার করে ঈশপকে বললেন,—"তুমি ভারী বোকা। কোন ছোট পুঁটলী নিলেই পারতে।" ঈশপ কোন উত্তর না দিয়ে শুধু হাসলেন। ফেরবার পথে ঈশপ ফিরলেন খালি হাতে। ...ন্য সবাই বোঝা নিয়ে। কর্ত্তা হেসে বললেন,—"তুমি ভারী ...লোক।"

তার পর ঘটল সব চেয়ে নিদারুণ এবং সব চেয়ে গৌরবময় ঘটনা। ...কে পাঠান হল ডেলফিসের মন্দিরে, যেখানে মূর্ত্তি থেকে দৈববাণী ...র্গত হত। তিনি গিছলেন রাজদূত হিসেবে, অর্ঘ্য এবং কর প্রদান ...রতে। কি কারণে জানা নেই, মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে তাঁর ...মনোমালিন্য হয়। ঈশপ দৈববাণী বিশ্বাস করলেন না, অর্ঘ্যও দিলেন ...। পুরোহিত-সম্প্রদায় গেলেন ক্ষেপে। শাস্তিস্বরূপ তাঁকে ...পাহাড় থেকে ফেলে দেবার আদেশ হল। পুরোহিতেরা শেষ বার ...লেন, "এখনও সময় আছে। বল বিশ্বাস করেছ?" গর্ব্বভরে ...থা উঁচু করে তিনি উত্তর দিলেন,—মিথ্যাকে প্রাণ থাকতে ...ত্য বলে স্বীকার করব না।" তার পরই তাঁকে পাহাড় ...েক ফেলে দেওয়া হল। প্রাণ হারালেন কিন্তু মিথ্যাকে আশ্রয় ...রলেন না।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১০

বৈধব্য জীবন: কর্তব্য পালন ও রাজ্যচ্যুতি

অপুত্রক মহারাজ গঙ্গাধর রাও এই ভাবে রাজ্যের উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করে নিশ্চিন্ত হলেন। রাণী লক্ষ্মীদেবীও দত্তক পুত্রকে আপনার গর্ভজাত সন্তান জ্ঞানে সস্নেহে কোলে তুলে নিলেন।

এই পুত্রও বংশ-গৌরবে হীন ছিলেন না—রাজবংশের সঙ্গে এঁর পিতৃবংশের রক্তের সম্বন্ধ ছিল। পিতার সংসারে এই বালক আনন্দ রাও নামে পরিচিত ছিলেন। পিতার নাম বসুদেব রাও নোবলকার। মহারাজের দত্তকরূপে বালক পূর্বনাম ত্যাগ করে দামোদর রাও গঙ্গাধর নামে অভিহিত হলেন।

রাণী মহারাজ গঙ্গাধরকে বললেন: দামোদরকে আমি কেমন করে গড়ে তুলি তা দেখে আপনিও অবাক হয়ে যাবেন মহারাজ!

গঙ্গাধর সহাস্যে উত্তর করলেন: তুমি ত অনেক কিছু দেখিয়ে আমাকে অবাক করে দিয়েছ। তোমার হাতে পড়ে দামোদর যে ছেলে বয়সেই পাকা ঘোড়সওয়ার হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই; সেই সঙ্গে আর সব এলেমও দেখতে পাব নিশ্চয়ই।

কিন্তু এর পর দামোদরের বা রাণী লক্ষ্মীর কোন কৃতিত্ব দেখা আর মহারাজ গঙ্গাধরের অদৃষ্টে ঘটে উঠল না, বিধাতাও সে সুযোগ তাঁকে আর দিলেন না। দত্তক গ্রহণের পর কয়েক মাসের মধ্যেই কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি সহসা দেহত্যাগ করলেন।

স্বামীর পরলোক গমনে রাণী লক্ষ্মী দারুণ শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। এমন কি, সেই দুর্ঘটনায় তিনি স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় 'সহমরণে'র সঙ্কল্প করে রাজপুরীতে রীতিমত এক আতঙ্কের সৃষ্টি করলেন। পুরবাসিনীদের অজানা নয় যে, রাণী যে সঙ্কল্প করেন, তা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করা খুবই কঠিন ব্যাপার। সৌভাগ্যক্রমে রাণীর পিতা এ সময় ঝাঁসীতে ছিলেন। তিনি কন্যাকে বুঝিয়ে বললেন: তাহলে কুমার দামোদর কার মুখ চেয়ে এ-বাড়ীতে থাকবে—কে তাকে ঠিক মত প্রতিপালন করবে? এই শোক তোমাকে সহ্য করতে হবে, ওর মুখ চেয়ে তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে; মনে রেখ মা—ঝাঁসীর প্রজারা মহারাজের বিয়োগে অভিভূত হলেও তোমার উপরে তারা অনেক ভরসা রাখে।

পিতার কথায় রাণী সহমরণের সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন, কিন্তু পিতাকেও অঙ্গীকার করতে হল যে, এখন থেকে তিনি ঝাঁসীতে থেকে ঝাঁসীর উন্নতির জন্য কন্যাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

অন্তঃপুরের কক্ষে কক্ষে স্বামীর অসংখ্য স্মৃতি, অতীতের নানা ঘটনার কথা ও কাহিনী। স্বামী-দেবতার প্রশান্ত মুখখানি যখন তাঁর চোখের সামনে ফুটে ওঠে তিনি তখন অভিভূত হয়ে পড়েন, কিছুতেই নিজেকে সম্বরণ করতে পারেন না। সর্বদাই বিষণ্ণ হয়ে থাকেন, কারুর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তাও বলেন না। স্বামীবিয়োগের পর কিছু দিন রাণীকে সকল বিষয়েই এই ভাবে নির্লিপ্ত ও উদাসীন দেখা গেল। দেওয়ান লক্ষ্মণ রাও এবং পিতার উপর রাজ্যের ভার অর্পণ করে তিনি বৈধব্য-জীবন পূজা-অর্চনায় অতিবাহিত করতে

বদ্ধপরিকর হলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে শোক লাঘবের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমতী রাণী উপলব্ধি করলেন যে, মৃত্যুকালে স্বর্গীয় মহারাজ তাঁরই হাতে রাজ্য ও দত্তক পুত্র দামোদরের রক্ষার ভার অর্পণ করে গেছেন। এখন তিনি যদি রাজ্যের বিষয়ে অমনোযোগিনী হন, দামোদরের প্রতি অভিভাবিকার কর্তব্য পালন না করেন, তাহলে তাঁকে পক্ষান্তরে স্বামীদেবতার কাছে অপরাধিনী হতে হবে।

এর পর রাণী ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিলেন এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করলেন—'প্রভু, আমায় মনে বল দাও, আগেকার মত উৎসাহ দাও—যার প্রভাবে আমি আমার কর্তব্য পালন করতে পারি।'

রাণী আবার আগেকার মত নিয়মানুবর্তিনী হলেন। রাত্রির চতুর্থ প্রহরেই শয্যা ত্যাগ করে স্নানাদি সমাধার পর শুভ্র ক্ষৌম বস্ত্র পরে পূজা-অর্চনায় বসেন। বেলা আটটা পর্যন্ত একই ভাবে পূজা চলে। পতিবিয়োগের পর মাথায় কেশ রাখতে হলে শাস্ত্রানুযায়ী কৃচ্ছ্রসাধনার প্রয়োজন। তাই রাণীকে নিত্য সেই সাধনা করতে হয় তুলসী-কুঞ্জে বসে কয়েক ঘণ্টা ধরে। তার পর মাটীর শিবমূর্তি স্বহস্তে তৈরী করে বিধিমতে করেন তাঁর অর্চনা। এই সময় ব্রাহ্মণগণ শিবস্তোত্র পাঠ করতে থাকেন। পূজা-অর্চনাদি বেলা আটটা পর্যন্ত চলে প্রত্যহ একই ভাবে, একই নিয়মে। এর পর তিনি বেশ পরিবর্তন করে আঁটসাঁট করে কাপড় পরে বাগানে উপস্থিত হন। তাঁর নির্দেশ মত পাঁচটা সজ্জিত ঘোড়া নিয়ে ঘোড়ার রক্ষকরা তৈরী থাকে। রাণী একটি ঘোড়ার পিঠে উঠে বাকি চারটি ঘোড়ার লাগাম ধরে একসঙ্গে দৌড় করান। ঘোড়াগুলো হিমসিম না খাওয়া পর্যন্ত এই ভাবে দৌড় চলে।

এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাণী বলেন—এতে মন হাল্কা হয়, দেহ যেন তাজা হয়ে ওঠে, মনটাও কাজের দিকে দৌড়াতে থাকে; এমনি করে তাই ঘোড়া দৌড় করিয়ে নিজেকে আবার রাজ্যের পিছনে দৌড় করবার এই নূতন কসরত ধরেছি।

ক্রমে ক্রমে রাণীর সঙ্গিনীরাও তাদের ঘোড়া নিয়ে রাণীর সঙ্গে ঘোড়দৌড়ে যোগ দেন। কিছু দিন পরে রাণী কুমার দামোদরকেও ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে তার জন্যেও একটি টাট্টু ঘোড়া আনিয়ে দিলেন। এই ভাবে কসরত করবার পর রাণী সত্য সত্যই যেন নূতন বল পেলেন, আবার উৎসাহের সঞ্চার হল তাঁর মনে। এই সময় তিনি পিতাকে বললেন: বাবা, আমি এখন থেকে দরবারে যাবো। পাশের ঘরে আমার বসবার ব্যবস্থা করবার কথা দেওয়ানজীকে বলবেন। দরবারের কাজ নিজেই চালাব; সেই মত ব্যবস্থা আপনি করবেন।

পিতা মোরোপন্থজী এ কথা শুনে খুবই খুশি হলেন। কন্যার উপদেশ মত দেওয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি কন্যার বসবার স্থানও ঠিক করে দিলেন। কি ভাবে রাণী দরবার পরিচালনা করতেন, তার একটা বর্ণনা এখানে দেওয়া যাচ্ছে।

ঘোড়দৌড়ের পর রাণী বাগান থেকে ফিরে এসে প্রাসাদের মধ্যে একটি সুসজ্জিত সুবৃহৎ ঘরে বসেন। এ সময় রাজ্ঞীর উপযুক্ত বেশ-ভূষাতেই সজ্জিত হন—সে বেশ বীরাঙ্গনার উপযুক্ত। হাতে হীরার বালা, গলায় মুক্তার মালা, অনামিকায় হীরার আংটি—এই গহনাগুলি উজ্জ্বল বস্ত্রের সঙ্গে রাণীর অঙ্গের শোভাবর্দ্ধন করে। এই ঘরে তাঁর বসবার উপযুক্ত সিংহাসন থাকে, সিংহাসনের সামনে একটি আধারের উপর রত্নখচিত কোষমধ্যে তাঁর তরবারি। রাণীর সঙ্গিনীরা এখানে উপযুক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে রাণীকে পরিবেষ্টন করে থাকে। তাদের হাতে নিষ্কোষিত তরবারি, ভল্ল, ঢাল প্রভৃতি অস্ত্র। রাণীর নির্দেশ মত রাজপ্রাসাদ ও সেরেস্তার প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রতি দিন এই দরবারে এসে রাণীকে অভিবাদন জানাতে হয়। এটি হচ্ছে রাজ-কর্মচারী ও রাণীর আশ্রিত ব্যক্তিদের নিয়ে দরবার। রাণী এই দরবারে প্রকাশ্য ভাবে সকলের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের কথা শুনেন। কারুর কোন অসুবিধা বা অভিযোগ থাকলে সে সব কথাও এই দরবারে তাঁরা অবাধে রাণীকে জানাবেন—রাণীই এই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আগেই বলা হয়েছে, রাণী তাঁর কর্মচারীদের প্রত্যেকের নামের সঙ্গে পরিচিত। রাণীর এই খাস দরবারে কোন দিন কোন কর্মচারী হাজির না হলেই রাণী তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করেন। পরদিন সেই ব্যক্তিকে দেখলেই শুধাবেন: কাল আপনাকে দেখিনি ত, কেন আসেননি?

সেই ব্যক্তির সাহস হয় না রাণীর সামনে মিথ্যা বলবার। অনুপস্থিত না হবার কারণ অসঙ্কোচেই জানায় রাণীকে। রাণী যদি শোনেন, তার বাড়ীতে অসুখ, কিম্বা কোন দিন যদি তাঁর কোন কর্মচারী বা আশ্রিত ব্যক্তির ব্যাধির কথা জানতে পারেন, তখনই চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তবে তিনি আশ্বস্ত হন।

এই দরবারের পর রাণী আবার বস্ত্র পরিবর্তন করেন—একেবারে বিধবা হিন্দু নারীর বিশুদ্ধ বেশ। এ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত ব্যাপারগুলিতে দ্বিপ্রহর অতীত হয়ে যায়। এই সময় রাণী ভোজন করেন। ভোজনের পর তুলট কাগজে এক হাজার এক শত রামনাম লিখে সেগুলি প্রাসাদমধ্যে তড়াগ-জলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে জলের মাছ দল বেঁধে সেগুলি সানন্দে ভক্ষণ করে। এর পর সামান্য একটু বিশ্রাম করেই দরবারে যাবার জন্য রাণীকে আবার সজ্জিত হতে হয়। অপরাহ্ন তিনটার সময় বাহির-মহলে দরবার-কক্ষে যথারীতি এই প্রাত্যহিক দরবারের অধিবেশন হয়। এ সময় রাণীর বেশভূষা ঠিক পুরুষের মত। পায়ে রেশমী কাপড়ের পায়জামা, বেগুনী রঙের অঙ্গরক্ষা গায়ে, মাথায় উষ্ণীষ, কোমরে জরির দোপাটা—তারই পাশ দিয়ে রত্নখচিত এক জোড়া তলোয়ার ঝোলানো; মাথার দীর্ঘ কেশ প্রন্থিবদ্ধ হয়ে ফণিনীর পুচ্ছের মত পিঠে প্রলম্ব। বিশাল দরবার-গৃহের পাশেই তাঁরই নির্দেশ মত উপবেশন-কক্ষ। এই ঘরে আছে সোনালী 'মেহেরাপ' (আস্তরণ)—তাহার উপর জরির কারুকার্য খচিত চিকের পরদা খাটানো। কক্ষমধ্যে কিংখাপের গদির উপর মখমলের তাকিয়ায় পিঠ রেখে রাণী বসেন। দ্বারের দুই পাশে ভল্ল ও রূপার আসাসোটা নিয়ে প্রতিহারিণীদ্বয় হাজির থাকে। বৃহৎ দরবার-গৃহে দেওয়ান লক্ষ্মণ রাও এবং প্রধান মুন্সি দরকারী কাগজ-পত্র নিয়ে উপস্থিত থাকেন। দরবারে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় তাঁরা পার্শ্বকক্ষে গিয়ে রাণীকে বলেন এবং পরামর্শ নেন। কিন্তু সাধারণত, রাণী তাঁর কক্ষে বসেই অভিযোগাদি শুনে অনেক সময় মুখে-মুখেই আদেশ দেন, কিম্বা সময় সময় নিজেই স্বহস্তে হুকুম লিখে দেওয়ানের হাতে অর্পণ করেন। ফৌজদারী দেওয়ানী বিবিধ বিচারই এমন বুদ্ধি-বিবেচনার সঙ্গে এবং সন্ত সন্ত রাণী সমা

করে দেন যে, সে এক বিস্ময়জনক ব্যাপার! বিচারের জন্য প্রার্থীদিগকে যাতে দিনের পর দিন দরবারে হাজিরা দিতে না হয়, সঙ্গে সঙ্গে বিচার-কার্য সম্পন্ন হয়—সেদিকে রাণীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এ জন্য প্রজারা তাঁর নামে রাজ্যময় নূতন করে প্রশস্তির ধ্বনি তুলে জয় ঘোষণা করে।

বিশেষ দরবারে কুমার দামোদরকে রাজপরিচ্ছদে সাজিয়ে এনে রাণীর ব্যবস্থা অনুসারে দরবারীদের সঙ্গে পরিচিত করে দেবার জন্য দেওয়ানকে আদেশ দেওয়া থাকে। দরবারে বিশিষ্ট আসনে তাঁকে বসানো হয়, কখন বা নিজের গদীতে পাশে বসিয়ে উপদেশ দেন।

প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে দরবার ভঙ্গের পর রাণী দামোদরকে সঙ্গে নিয়ে মহালক্ষ্মী-মন্দিরে দেবী দর্শনে যান খুব জাঁকজমক করে। প্রাসাদ থেকে কতকটা দূরে রাজধানীর মাঝখানে এই দেবী-মন্দির। মন্দিরের সামনেই সুবৃহৎ সরোবর, তার নীল জলে নানা বর্ণের পদ্মফুল ফুটে থাকে—সেই পদ্মফুলে রাণী দেবীর পূজা করে আনন্দ পান। রাণী কোন দিন হাতী চড়ে, কখনো বা ঘোড়ার পিঠে, আবার সময়ে সময়ে পাল্কীতে আরোহণ করে মন্দিরে যান। জরিখচিত কিংখাব কাপড়ের আস্তরণে রাণীর পাল্কী ঘেরা থাকে; চার জন সুসজ্জিতা পরিচারিকা সে সময় পাল্কীর খুর ধরে অনুগমন করে। যখন ঘোড়ার পিঠে যাত্রা করেন, রাণীর সঙ্গিনীরা রণরঙ্গিণী বেশে ঘোড়ায় চড়ে তাঁর পিছনে পিছনে চলেন। রাণীর সঙ্গিনী ও অনুচরীদের সাজসজ্জার বাহারও চমৎকার! তাদের প্রত্যেকের পরনে সবুজ, লাল ও ছাই রঙের সাড়ি, গায়ে জরির চেলি, সর্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত, পায়ে চর্ম-পাদুকা, কোমরে কোষবদ্ধ তলোয়ার, হাতে ভল্ল; মিছিলের পুরোভাগে ডঙ্কা বাজতে থাকে, নিশান ওড়ে। রাণীর সঙ্গিনীদের পিছনে থাকে এক শত ঘোড়সওয়ার—প্রত্যেকে সামরিক পরিচ্ছদধারী, দুই শত পদাতিক সৈন্যও মিছিলের সঙ্গে ডঙ্কা বাদ্যের তালে তালে চলে। এ সব ছাড়া, রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্মচারী এবং রাণীর আশ্রিতগণকেও মিছিলে যোগ দিতে হয়। প্রাসাদ থেকে মিছিলের যাত্রা ও প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্যন্ত কেল্লার বুরুজ থেকে নহবৎ বাজতে থাকে। রাণীর এই জমকালো মিছিল দেখবার জন্য রাস্তার দু'পাশে বিপুল জনতার সমাগম হয়—শান্তিরক্ষকগণ সন্তর্পণে তাদের নিয়ন্ত্রিত করে। রাণী বলেন, সামরিক বাদ্যধ্বনির তালে তালে এই ভাবে শোভাযাত্রার ফলে কেল্লার সৈনিকদের মনে উদ্দীপনা জাগবে, দেহের আড়ষ্টতা কাটবে। মহালক্ষ্মী ঝাঁসী-রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী। খুব ঘটা করে দেবীর নিত্য পূজা চলে—রাজকোষ থেকে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হয়ে থাকে। বহু ব্যক্তি এই মন্দিরে নিয়োজিত, বহু যাত্রীর সমাগম হয়। তাদের অবস্থিতির জন্যে ধর্মশালা এবং ভোজনের জন্যে দেবীর প্রসাদ বিতরিত হয়ে থাকে।

অশ্বারোহণে রাণী যে অত্যন্ত পারদর্শিনী, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। অশ্বপরীক্ষাতেও তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। সে সময় ভারতবর্ষে তিন জন অশ্ববিদের নাম প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রথম নানাসাহেব; দ্বিতীয় রাণী লক্ষ্মী; তৃতীয় বাবাসাহেব আপ্‌টে গোহরিকর। কিন্তু অশ্বপরীক্ষার ব্যাপারে রাণী লক্ষ্মীর নাম অগ্রে। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায়।

একদা এক অশ্ববণিক দু'টি তেজস্বী প্রিয়দর্শন অশ্ব সঙ্গে করে রাজবাড়ীতে এলেন বিক্রয় করবার উদ্দেশ্যে। দু'টি অশ্ব দেখেই কর্মচারীরা পছন্দ করলেন; রাণীকে জানালেন যে, দুটিই সমান জাতের ও সমান গুণের অশ্ব। রাণী মৃদু হেসে বললেন: ঘোড়া কি চোখে দেখে বিচার করা যায়? বেশ, আমি নিজেই এদের পরীক্ষা করে দেখব। অতঃপর রাণী একে একে সেই দু'টি অশ্বের পিঠে উঠে চক্রপথে তাদের দৌড় করাতে লাগলেন। এই দৌড়বাজিতেই রাণী বুঝলেন, কোন ঘোড়া কি ধাতের, আর কার কত দাম হওয়া উচিত। তিনি অশ্ববণিককে বললেন: প্রথমটির দাম হাজার টাকা, আর দ্বিতীয়টির জন্যে পঞ্চাশ টাকার বেশী দেওয়া যায় না।

রাণীর এই সিদ্ধান্ত শুনে সকলেই বিস্মিত হলেন। দু'টি ঘোড়াই দেখতে একই রকমের; যেমন তেজী, তেমনি দেখতে সুশ্রী; অথচ দামের এত তফাৎ? অশ্ববণিকও বলল যে, দ্বিতীয়টির দাম মহারাণী সাহেবা এত কম বললেন কেন, সে তা বুঝতে পারছে না।

রাণী বললেন: আমি ভুল বলিনি—প্রথম ঘোড়াটিই ভাল, আর দ্বিতীয়টি একেবারে অচল। তার কারণ—ওর ছাতি ফাটা; সেই জন্যে কাজের বাইরে।

এর পর আর একটি ঘোড়া নিয়ে অপর এক জন বণিক আসেন ঝাঁসীতে। অপূর্ব সে ঘোড়া—রাজহাঁসের পালকের মত তার গায়ের লোমগুলি ধবধবে সাদা—গ্রীবাটিও সর্বক্ষণ উঁচু করে আছে। তাই এ ঘোড়া দেখেই অনেকে পছন্দ করেন, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে চড়ে একটা চক্রও কেউ দিতে পারেননি এ পর্যন্ত, ঘোড়া প্রত্যেক সওয়ারীকে ফেলে দিয়েছে। বণিক অকপটে সব কথা বললেন রাণীকে। রাণী অনেকক্ষণ ধরে ঘোড়াকে পরীক্ষা করলেন তার সর্বাঙ্গ ঠুকে ঠুকে। তার পর বললেন: এ ঘোড়ায় আমি চড়ব—আমাকে এ ফেলবে না।

বণিক অবাক হয়ে চেয়ে রইল—রাণী যখন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে তাকে দৌড় করালেন। তবে এ দিন রাণী ঘোড়ার পিঠে উঠেই ডান পা'টি রেকাব থেকে তুলে রাখলেন। বিদ্যুৎবেগে ছুটল ঘোড়া রাণীকে পিঠে নিয়ে—সবার বুকগুলো ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল ভয়ে। কিন্তু চক্র দিয়েই রাণী নিরাপদে ফিরে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়লেন। বণিক বললেন: সত্যিই এ তাজ্জব কাণ্ড মহারাণীজী! হিন্দুস্থানের বহুৎ বহুৎ রাজা আমীর রইস লোক কোসেস করেছেন এ ঘোড়ার পিঠে উঠতে—কিন্তু কেউ পারেননি, অনেকে জখম পর্যন্ত হয়েছেন।

রাণী বললেন: তার কারণ, এই ঘোড়ার ডান দিকে জিনপোষের নিচে চামড়ার মধ্যে একটা কোন শক্ত জিনিস ঢুকে আছে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে ডান পায়ের ভার রেকাবে পড়লেই সেই জায়গায় দারুণ ব্যথা লাগে ঘোড়ার—সে তা বরদাস্ত করতে পারে না।

রাণীর কথা শুনে বণিক ত অবাক। রাণী দেড় হাজার টাকায় সেই ঘোড়া তখনি খরিদ করলেন। তার পর তাঁর বিশ্বাসী ও অভিজ্ঞ পশুচিকিৎসককে আনিয়ে ঘোড়ার পেটের দিকে সেই স্থানটি দেখিয়ে বললেন: এখানটা ভালো করে দেখুন ত?

অশ্বচিকিৎসক পরীক্ষা করে বললেন: রাণীজীর অনুমান

সত্য; এখানে মস্ত একটা পেরেক ফুটে আছে। তখন অনেক চেষ্টা করে ঘোড়াকে কায়দায় এনে সেই পেরেক উদ্ধার করা হলো তার দেহ থেকে। এই ঘোড়াটিই এর পর রাণীর অতি প্রিয়তম বাহনে পরিণত হয়।

রাণীর দানশীলতা সম্বন্ধেও এমনি অনেক গল্প আছে। মহালক্ষ্মী-মন্দির থেকে ফেরবার সময় রাণী এক দিন দেখলেন, বহু ভিখারী এক স্থানে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। রাণী কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, তারা দারুণ শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছে শীতবস্ত্রের অভাবে। রাণী তৎক্ষণাৎ হুকুম করলেন—ভিখিরীদিগকে এক স্থানে জমায়েত করে প্রত্যেককে এক একটি তুলা-ভরা জামা, টুপী ও কম্বল দেওয়া হোক।

আর এক দিন এক ব্রাহ্মণ রাণীর সামনে কোন প্রকারে এসে প্রার্থনা জানালেন: আমি কন্যাদায়গ্রস্ত মা, টাকার অভাবে কন্যার বিবাহ দিতে পারছি না।

রাণী জিজ্ঞাসা করলেন: টাকা দিলেই কন্যার উপযুক্ত পাত্র কি পাবেন? কেউ রাজী আছেন আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে?

ব্রাহ্মণ বললেন: হ্যাঁ—রাণীমা, সেরূপ পাত্র আছে; কিন্তু নগদ চারশ' টাকা পণ দিতে হবে। এত টাকা আমি কোথায় পাব?

রাণী তখনই ব্রাহ্মণকে পাঁচ শত টাকা দিবার হুকুম জানিয়ে বললেন: কিন্তু বিয়ের সময় আমাদের কুঙ্কুমপত্রিকা পাঠাতে ভুলবেন না যেন!

এই ভাবে রাণী সুষ্ঠু ভাবে শান্তির সঙ্গে রাজ্যশাসন ও কর্তব্য-পালন করতে লাগলেন। তাঁর ব্যবস্থায় রাজ্যের ঋণ পরিশোধ হয়ে অর্থ উদ্বৃত্ত হতে লাগল। ইংরেজদের চেষ্টায় মহারাজ গঙ্গাধর রাওয়ের আমলে যে দু'জন সুবিধাবাদী কুসীদজীবি দরবারে জেঁকে বসেছিল, রাণী তাদের প্রাপ্যাদি পরিশোধ করে সরিয়ে দিলেন। স্বার্থহানি হওয়াতে এরা দু'জনে জোট বেঁধে রাজ্যে একটা বিদ্রোহ বাধাবার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু রাণীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেল। এর পর তারা ইংরেজদের সঙ্গে মিশে অন্য ভাবে রাণীকে বিপন্ন করবার জন্য তৈরী হতে লাগল।

আগেই বলা হয়েছে, মহারাজ গঙ্গাধর যখন দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন, সে সময় ইংরেজ রেসিডেণ্ট মেজর এলিস ও ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর মার্টিন সেই উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু মহারাজের মৃত্যুর পর তাঁর মহিষীকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাজ্যশাসন করতে দেখে ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণ অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তাঁরা লক্ষ্য করলেন, ঝাঁসী রাজ্যটি ইংরেজ অধিকারের মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকায়, ঝাঁসীর শাসনপ্রণালী, সুবিচার-পদ্ধতি ইংরাজ রাজ্যের প্রজাগণকেও প্রলুব্ধ করে তুলেছে; তারা রাণীর রাজত্বে প্রজাদের নানা রকম সুখ-সুবিধা দেখে ইংরেজ রাজ্যের বিধি-ব্যবস্থার খুঁত ধরে সমালোচনা করতে থাকে। ইংরেজ রাজপুরুষরা এ ব্যাপারে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। এই সূত্রে বুন্দেলখণ্ডের পলিটিকাল এজেণ্ট ম্যালকম সাহেবকে কেন্দ্র করে এই মর্মে একটা পরিকল্পনার সৃষ্টি হল যে, ঝাঁসী বৃটিশ অধিকারের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ঝাঁসী অধিকৃত হলে সমুদয় বুন্দেলখণ্ডের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ সাধন করা সহজ হবে। সুতরাং রাণীকে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা মাসিক বৃত্তি দানের ব্যবস্থায় ঐ রাজ্য খাস করে নেওয়া উচিত। এই পরিকল্পনার কথা কলকাতায় ভারতের বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর নিকট পেশ করা হল।

একটা প্রচলিত কথা আছে। পেটুক মেধোকে জিজ্ঞাসা করা হয়—ভাত খাবি? সে অমনি আহ্লাদে গদগদ হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে, আঁচাব কোথায়? বুন্দেলখণ্ডের পলিটিক্যাল এজেণ্টের উক্ত প্রস্তাবটি ভারতের রাজ্যগ্রাসী বড়লাট ডালহৌসীর পক্ষে ঐ মেধোর মতই হয়ে দাঁড়াল। এই ভদ্রলোক কি ক্ষণে ভারতের মাটিতে পা দিয়েছিলেন প্রলয়ঙ্কর মহাকালের খাতাতেই বোধ হয় সেটা লেখা আছে। ইনি কলকাতার প্রাসাদে স্থির হয়ে বসেই ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখে শিউরে উঠলেন। এখনো গোটা ভারত ইংরেজ তার হাতের মধ্যে আনতে পারেনি—দিকে দিকে এমন এক-একটা রাষ্ট্র এখনো পর্যন্ত স্বাতন্ত্র্যের পতাকা উড়িয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করছে—যেন তারা প্রচণ্ড সামরিক শক্তির অধিকারী ইংরেজের সমকক্ষ! সঙ্গে সঙ্গে তিনি তর্জন করে উঠলেন—ননসেন্স! সারা ইণ্ডিয়া এক হয়ে যাবে—একমাত্র প্রভু হবে ইংরেজ।

এই সর্বগ্রাসী নীতি নিয়ে লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্বাধীন রাজ্যের সন্নিহিত পলিটিক্যাল ইংরেজ এজেণ্টদিগকে গোপনীয় পত্রে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে লিখলেন—আপনি অবিলম্বে আপনার এলাকায় যে-সব স্বাধীন বা মিত্র-রাজ্য আছে, তাদের সমস্ত বৃত্তান্ত ও ইংরেজ-সরকারের সঙ্গে তাদের কিরূপ সম্বন্ধ এ সবের বিবরণ লিখে পাঠাবেন। আপনার প্রেরিত রিপোর্টের উপর নির্ভর করেই আমাদের পরবর্তী কার্যপদ্ধতি নির্দ্ধারিত হবে।

ঝাঁসী সম্পর্কে রিপোর্ট পূর্বেই প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু ঝাঁসীর বৃদ্ধ মহারাজের জীবদ্দশায়—বিশেষত: ঝাঁসীর সঙ্গে ইংরেজের সন্ধি-সর্তের কথা জ্ঞাত হয়ে লর্ড ডালহৌসী তৎকালে কোনরূপ আদেশ মন্তব্য প্রেরণ করেননি। বিশেষ করে, ঝাঁসীর চেয়ে কতকগুলি সমৃদ্ধ রাজ্যের উপর তাঁর ব্যাঘ্র-দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ হয়েছিল।

বুন্দেলখণ্ডের পলিটিক্যাল এজেণ্ট ঝাঁসী সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট যে সময় কলকাতায় লর্ড ডালহৌসীর নিকট প্রেরণ করেন, তিনি তখন নবলব্ধ অযোধ্যা অঞ্চল পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। প্রায় ছয় মাস পরে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি ঐ রিপোর্ট পড়ে করে বোধ হয় এই ভেবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে এই রাজ্যটি বৃটিশ এলাকাভুক্ত হতে দীর্ঘ ছ'টা মাস আরো পিছিয়ে গেছে! পূর্বের রিপোর্টে যেটুকু সংশয় ছিল, মহারাজ গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যু এবং দত্তক গ্রহণ ব্যাপারটা তার অবসান ঘটিয়ে দিয়েছে। এখন এ রাজ্য আয়ত্ত করবার পরম সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং লর্ড ডালহৌসী ঝাঁসীর সম্বন্ধে এই এক আদেশ-পত্র প্রেরণ করলেন: যেহেতু ঝাঁসী স্বাধীন রাজ্য নয়, ইংরেজ সরকারের অধীনস্থ মাণ্ডলিক রাজ্য মাত্র, সেই হেতু সার্বভৌম অধিপতি বৃটিশ সরকারের অনুমতি ব্যতীত মহারাজার দত্তক গ্রহণের কোন অধিকার নেই। এবং যেহেতু মহারাজ গঙ্গাধর রাওয়ের যে-সকল পূর্ব-পুরুষের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের বাধ্য-বাধকতা সম্বন্ধ [illegible], তাদের বংশের কোন সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী বর্তমান নেই; অতএব এই দত্তক-বিধান মঞ্জুর করে ঝাঁসীর গদী স্থায়ী রাখতে বৃটিশ সরকার বাধ্য নহেন। এতদ্ব্যতীত ঝাঁসী রাজ্য বৃটিশ সরকা[illegible]

মধ্যে ভুক্ত হলে সমস্ত বুন্দেলখণ্ডের রাজ্য-ব্যবস্থা সুচারুরূপে নির্বাহ হবে এবং বৃটিশ-সুশাসনে সমস্ত প্রজাবর্গেরও কল্যাণ সাধিত হবে। এই অবস্থায় রাণীর জীবদ্দশা পর্যন্ত তাঁর ব্যয়-নির্বাহের জন্য পাঁচ হাজার টাকার মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করে ঝাঁসীর রাজ্য খাস করে নেওয়া হোক্।

খুব গোপনেই এই ভাবে চিঠিপত্র আদেশ-মন্তব্যাদি চালাচালি হতে থাকে। বড়লাটের সিদ্ধান্তের পর বুন্দেলখণ্ডের পলিটিক্যাল এজেন্ট ম্যালকম সাহেব ঝাঁসীর রাণী সম্পর্কে কতকগুলি প্রস্তাব করে ভারত সরকারের পররাষ্ট্রীয় সেক্রেটারী বরাবর এক মন্তব্য-লিপি পাঠালেন। সেই প্রস্তাবগুলির মর্ম এইরূপ:

(১) রাণীর জীবদ্দশা পর্যন্ত পাঁচ হাজার টাকা হিসাবে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হোক্।

(২) বাসের জন্য রাণীকে ঝাঁসীর রাজবাটী অর্পণ করে জানিয়ে দেওয়া হোক্ যে, উক্ত রাজবাটী রাণীর নিজস্ব সম্পত্তি বলে গণ্য হবে।

(৩) মহারাজ গঙ্গাধর রাও মৃত্যুকালে এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করে যান যে, রাজ্যের মূল্যবান জহরতাদি এবং রাজকোষে সঞ্চিত নগদ টাকার অধিকারিণী হবেন রাণীসাহেবা। সুতরাং মহারাজের সেই ইচ্ছানুসারে কার্য্য করা হোক্।

(৪) রাজপ্রাসাদে মহারাজ গঙ্গাধর এবং রাণীসাহেবার যে সকল আত্মীয়-পরিজন ও আশ্রিতগণ বসবাস করে আসছেন, তাঁদের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করে একটা তালিকা প্রস্তুত করা হোক্।

বড়লাট ডালহৌসী ম্যালকম সাহেবের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রস্তাব গ্রাহ্য করে তৃতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন যে, রাজকোষের টাকা ও রাজ্যের জহরতাদি সমস্তই দত্তক পুত্রের প্রাপ্য। যে পর্য্যন্ত উক্ত দত্তক সাবালক না হচ্ছেন—সে সমস্তই উপযুক্ত বিশ্বস্ত ট্রাষ্টীর কাছে গচ্ছিত থাকবে। যদিও দত্তক পুত্র রাজ্যাধিকারী হবেন না, কিন্তু মহারাজ গঙ্গাধরের নিজস্ব সম্পত্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করাও চলবে না।

এই আদেশ-পত্র পাবার পর ম্যালকম সাহেব মেজর এলিসের হাতে বড়লাটের আদেশলিপি দিয়ে ঝাঁসীর দরবারে পাঠালেন।

সেদিনও যথারীতি রাণী লক্ষ্মীর দরবার বসেছে। দেওয়ান থেকে আরম্ভ করে সকলেই উপস্থিত। রাজ্যের সওদাগর, সরদার, ভূম্যধিকারী, জাইগীরদার প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিদেরও কাজ-কর্মের অনুরোধে দরবারে সমাগম হয়ে থাকে। এদিনও অনেকে উপস্থিত। এমন সময় এক দল গোরা পল্টন নিয়ে মেজর এলিস ঝাঁসীর দুর্গদ্বারে উপনীত হলেন। এই সাহেবটিকে প্রায়ই দরবারে আসতে দেখেছে প্রহরীরা; অন্য সময় এঁর সঙ্গে দু'-এক জন সিপাহী শাস্ত্রীও থাকে। কিন্তু এদিনে এমন ঘটা করে সাহেবকে আসতে দেখে দ্বাররক্ষীরাও অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

এই এলিস সাহেবই দত্তক গ্রহণের সময় আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন, আর আজ তিনিই ভারতের ভাগ্যবিধাতা লর্ড ডালহৌসীর আদেশে সেই দত্তক অসিদ্ধ বলে ঝাঁসীর রাজপাট দখল করতে উপস্থিত! এলিস অবশ্য এই নিদারুণ কাজটির ভার গ্রহণে প্রথমে সম্মত হননি—তিনি অন্য কাউকে এ কাজে পাঠাবার জন্য অনুরোধও করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সে আপত্তি শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি।

মেজর এলিস, পলটনের বেশীর ভাগ লোককে বাইরে রেখে তাঁর সহকারী ও জন দুই দেহরক্ষী নিয়ে দরবারে প্রবেশ করলেন। রেসিডেণ্ট হিসেবে সাহেবরা দরবারে এলে তাঁদের জন্যে স্বতন্ত্র আসন থাকে, সেখানে তাঁদের খাতির করে বসানো হয়। এদিনও এলিস সাহেবকে বসবার জন্য যথাযথ ভাবে অভ্যর্থনা করা হলো।

কিন্তু এলিস সাহেব গম্ভীর মুখে গাঢ় স্বরে জানালেন: মাপ করবেন আমাকে; বন্ধু ভাবে আজ এ দরবারে বসবার মত মনোবল আমার নেই। বুন্দেলখণ্ডের পলিটিক্যাল এজেণ্ট ম্যালকম সাহেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়েছেন আমার উপরে।

এই পর্যন্ত বলেই এলিস সাহেব ভারত সরকারের আদেশ পত্রখানি ফাইল থেকে বার করে আর্তস্বরে বললেন: গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী সাহেবের এই জরুরী ঘোষণা আমাকে দেওয়া হয়েছে মাননীয়া রাণীসাহেবাকে জ্ঞাপন করবার জন্যে।

সাহেবের মুখে ঘোষণার কথা-প্রসঙ্গে লর্ড ডালহৌসীর নাম শুনে সমস্ত দরবার যেন স্তব্ধ হলো সেই মুহূর্তে। দেওয়ান লক্ষ্মণ রাও তৎক্ষণাৎ চিক্-পরদার অন্তরালে উপবিষ্টা রাণীকে সাহেবের কথা জানালেন। রাণী বললেন: সাহেবকে বলুন লাট সাহেবের ঘোষণা পড়তে—দরবারের সকলেই শুনুন ঐ ঘোষণা।

কিন্তু ঘোষণা হচ্ছে বড়লাটের সেই আদেশ-মন্তব্য ও কয়টি দফায় ইংরেজ সরকারের সিদ্ধান্ত—ঝাঁসী রাজ্য বৃটিশ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে। এলিস সাহেব ঘোষণা পাঠ করতে লাগলেন। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে দরবারের প্রত্যেকে অবাক-বিস্ময়ে মর্মর-মূর্তির মত স্থির! কিন্তু সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সাহেবের মুখ থেকে ঘোষণার পরম তথ্য—'ঝাঁসী খাস করা হলো' কথাটি নির্গত হবা মাত্র ধৈর্য হারিয়ে রাণী জ্বালাময়ী স্বরে গর্জন করে উঠলেন: 'মেরা ঝাঁসী দেঙ্গী নেহি।'

রাণীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠের স্বর হয়ত পরিচিতদের নিকট অশ্রুত নয়, কিন্তু স্বরের এমন তেজোদৃপ্ত ঝঙ্কার—সুবিশাল দরবারকম্পনকারী এমন গর্জন—এর আগে আর কারুর কানে প্রবেশ করেনি। সাহেব পর্যন্ত স্তব্ধ, চমকিত, চমৎকৃত!

কিছু পরে তিনি আত্মসম্বরণ করে রাণীকে প্রবোধ দেবার উদ্দেশ্যে বললেন: আপনি শান্ত হোন রাণীসাহেবা, ক্রোধ করবেন না; আপনাকে পূর্ণ পরিমাণে বৃত্তি দেওয়া হবে—আপনার যথাযোগ্য মান-মর্যাদা দেওয়া হবে।

রাণীও পাল্টা জবাব দিলেন: থাক, আমাকে এ ভাবে আর আশ্বাস দিয়ে আমার মনের জ্বালা বাড়াবেন না সাহেব! আমি আজ পর্যন্ত এক স্বাধীন রাজ্যের রাণী; আপনারা আমার রাজ্য খাস করে নিয়ে আমাকে নজরবন্দিনী করে বৃত্তি দেবেন, আমার প্রতি ভূয়ো সম্মান দেখিয়ে মান-মর্য্যাদা দেবেন—এ কথা শুনেই আমি গলে যাব ভেবেছেন? এ সব কথা বলতেও আপনার লজ্জা হচ্ছে না?

এলিস সাহেব বুঝলেন, সত্যিই—রাণী যে কথা বললেন, তার উত্তর দেবার কিছু নেই। আজ যিনি রাণী—স্বাধীন ভাবে ক্ষমতা চালাচ্ছেন, তাঁকে রাজ্যহারা করে বৃত্তি দেবার বা মান-মর্য্যাদা বজায় রাখবার কথা বলা মানেই রীতিমত আঘাত করা। তিনি তখন

কথার মোড় অন্য দিকে ফিরিয়ে বললেন : রাণীজী ত আর সব রাজ্যের হাল কি হয়েছে শুনেছেন ! নাগপুর, সেতারা, সম্বলপুর, কেরৌলী, অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্যগুলিও একটি একটি করে বৃটিশ-এলাকাভুক্ত হয়েছে। তাদের অবস্থার কথা ভেবে আপনি আশ্বস্ত হতে পারবেন, আশা করি।

মেজর এলিসের কথার উত্তরে তীক্ষ্ণ স্বরে রাণী বললেন : আপনার যুক্তি চমৎকার সাহেব ! লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী দস্যুর লুণ্ঠনের কথা তুলে—যাদের ধন-সম্পত্তি ডাকাতে লুঠ করে নিয়ে গেছে, তাদের অবস্থার কথা বলে সর্ব্বলুণ্ঠিত সর্বহারাকে আপনি প্রবোধ দিতে চাইছেন ! কিন্তু এ কথা ভুলে যাবেন না—প্রবল অত্যাচারীকেও প্রবলতর অত্যাচারীর সম্মুখীন হতে হয়। আপনাদের এখন একাদশে বৃহস্পতি, হিন্দুস্থানের যোদ্ধাদের তাঁবেদার করেছেন ; হিন্দুস্থানের রাজাদের রাজপাট কেড়ে নিচ্ছেন হিন্দুস্থানী সিপাহীদের এগিয়ে দিয়ে ; বুঁদ করে রেখেছেন তাদের মোহের নেশায়। কিন্তু এ নেশা এক দিন ভেঙে যাবে জানবেন। যে সব রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন—তাদের ফিরিস্তি শুনিয়ে আমাকে আশ্বাস দিচ্ছেন, কিন্তু ঐ সব রাজ্যের যাঁরা ছিলেন দণ্ডধর রাজা—তাঁদের রাজ্যহারা বিধবাদের দীর্ঘশ্বাস ইংরেজের অদৃষ্টের আকাশে কি কাল মেঘের সৃষ্টি করছে, এখন তা দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু এক দিন যখন ঐ মেঘের ভিতর দিয়ে প্রলয়ের দুর্যোগ ঘনিয়ে আসবে, ধ্বংসের মাদল বেজে উঠবে, বিধাতার বজ্র ফুটে বেরুবে, তখন বুঝতে পারবেন—পৃথিবীর শক্তিমানের উপরে আর এক জন মহাশক্তিমান আছেন, যাঁর শক্তির তুলনা নেই, যাঁর বিচারে ভুল হয় না। আপনারা আমার রাজ্য অপহরণের যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তা ভুয়ো—মিথ্যা। আপনি জানাবেন আপনার প্রভু ডালহৌসী সাহেবকে—ইংরেজ সরকার আমাদিগকে ঝাঁসী দান করেননি ; কোন দিনই আমরা ইংরেজের অধীন ছিলাম না, এখনো অধীন নই। মহামান্য পেশোয়াদের রাজত্ব কালে আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক পরাক্রমের কাজ করায় নিজেদের বাহাদুরীর বলেই এই রাজ্য অর্জ্জন করেছিলেন। এর উপর ইংরেজ সরকারের কোন অধিকার নেই। তাই ঐ অন্যায় অবৈধ স্পর্দ্ধিত ঘোষণার জবাব এই বলে আমাকে দিতে হচ্ছে—'মেরা ঝাঁসী দেঙ্গী নেহি !'

[ক্রমশঃ।

বিদ্যাসাগর

শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়

আধুনিক যুগের প্রারম্ভে যুগপ্রবর্তনকারী আন্দোলনের সেই আবর্ত্তস্থলে যে মহাপুরুষ জ্ঞানকর্ম্মের আত্মাভিমানস্বরূপ সমিধে সার্বজনীন হিতেচ্ছার হুতাশন প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে কঠোর-কোমল চিত্তের একাগ্রতা আহুতি দিয়াছিলেন এবং সেই হোমালোকে দেশাচারের অন্তরালে মানবের অবস্থা দেখিয়া যিনি অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন তিনিই নবযুগের ঋত্বিকপুঙ্গব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

আমাদের পূর্বতন পুরুষ যাঁহারা এখনো জীবিত, তাঁহাদের মানসপট হইতে সতীদাহ প্রথার সেই করাল মূর্তি, চিতারোহিণী সাধ্বী স্ত্রীর সেই অরুন্তুদ হাহাকার, অপ্রাপ্তবয়স্ক বঙ্গবিধবার উপর সংযমের নামে অসহ্য শারীরিক উৎপীড়ন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের অদূরদর্শী পরিণাম প্রভৃতি সমাজকলুষ পূর্বস্মৃতি ক্রম-অবলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। তাহার কারণ, সমাজ এখন সভ্যতার সর্বোচ্চ স্থানে উন্নীত হইতে চলিয়াছে—সকল স্থলে শিক্ষার প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

অধুনা বঙ্গীয় নারী অন্যান্য সভ্য নারীসমাজের ন্যায় শিল্পে শিক্ষায় পারদর্শিনী হইতেছে—ইহাতে সমাজের তথাকথিত হিতৈষীবর্গ কেহই সঙ্কুচিত নহেন। কে প্রথম এই নারীশিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়া সমাজের দৃষ্টিশক্তি উন্মোচন করিয়াছেন ? কোন্ মহানুভব ব্যক্তি মাতৃজাতীয়া নারীচিত্তে আরাধ্য দেবোপম হইয়া জাগরূক থাকিবেন ?—তিনি অবিনশ্বরাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়। তদানীন্তন সমাজের প্রতি উৎপীড়িতা বঙ্গনারীবর্গের যে অকাট্য অভিশাপ বর্ষিত হইতেছিল, বিদ্যাসাগরের পুণ্যশীতল করুণাস্পর্শে তাহার অপনোদন হইয়াছে।

সর্বপ্রকার স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া অর্জিত জ্ঞানকে হিতৈষণার খাতে পরিচালন—ইহাই বিদ্যাসাগর-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি সংস্কারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আজীবন শুদ্ধাচারে প্রতিপালিত হইলেন—তৎকালীন আচার-বিচার হইতে যিনি নিজের দিক্ দিয়া বিন্দুমাত্র স্খলিত হন নাই, তিনিই অনমনীয় চরিত্রবলে সমস্ত বাধা-বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া সমগ্র কুসংস্কারকে অশ্রান্ত কর্ম্মরূপ সম্মার্জনী দ্বারা ঝাড়িয়া-মুছিয়া আমাদের সমাজ-প্রাঙ্গণকে ভাগ্যদেবীর পীঠস্থল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে মার্জিত করিলেন।

সংস্কারসাধনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে—তাহা ক্ষুরধারনিশিত। তদুপরি আমাদের প্রগতিশীল উন্নয়নোন্মুখ সমাজব্যবস্থার প্রথম স্রোত বিদ্যাসাগর যে খাত কাটিয়া বহাইতে চাহিয়াছিলেন সে ভূমিপ্রদেশ পেলব মৃত্তিকাযুক্ত ছিল না। কিন্তু এই প্রকার একতৎপর উদ্যম ও অনুরক্তি কোনো বিষয়ের প্রতি উদ্যোক্তার আন্তরিক অবিমিশ্র শ্রদ্ধাকেই প্রকাশ করিয়া থাকে। আমাদের আচারগত বঙ্গসমাজে সর্ব বিষয়ে একটা সুষ্ঠু সামঞ্জস্য আনিতে বিদ্যাসাগর এমন কর্ম নাই যাহা করেন নাই। সর্বগত অকৃত্রিম প্রেম-শ্রদ্ধার পূর্ণ বিকাশ করুণায়। এই করুণাতেই প্রেমের নিঃস্বার্থ পরিচয়। বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই করুণাই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই জন্যই জাতীয় দুরবস্থা দেখিয়া তিনি অশ্রুমোচন করিয়াছেন—মর্মে মর্মে দহিয়া কঠোর কর্ত্তব্যের পথে নিজেকে আপ্রাণ নিয়োজিত করিয়াছেন।

স্বার্থের সর্বপ্রকার সংস্রব ত্যাগ করিয়া অকিঞ্চন সমাজের প্রতি চিত্তের গভীর অনুভূতি-প্রসূত ঔদার্য পোষণ মহিমান্বিত চরিত্রেরই পরিচায়ক। এ ক্ষেত্রে সংস্কারপন্থী সমাজের প্রতি বিদ্যাসাগর-চরিত্রের আন্তরিক শ্রদ্ধাই প্রকাশ পাইয়াছে। যে অদূরদর্শী, হৃদয়ের দৃঢ় মনোবল ও বিবেচনা যাহার নাই, যাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সংস্কার-গণ্ডী ও অবিমৃষ্যকারিতার ক্ষেত্রে আবদ্ধ—তাহার প্রতি করুণা বশতঃ অধঃপতিত সন্তানকে ক্ষমাশীল পিতার ন্যায় উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করার প্রবত্নমূলক দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে সত্যই বিরল।

জনহিতৈষণার পুণ্যব্রত মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগরকে বিষয়বৈচিত্র্যে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। দেশীয় সাহিত্য বিশেষতঃ ভাষার প্রথম আদর্শ-প্রকাশ কি বিদ্যাসাগরের লেখনী-নিঃসৃত নহে ? আমাদে

াহিত্যের ইতিহাস সুদীর্ঘ নহে। তাহার পূর্বপ্রতিষ্ঠিত অভ্রংলিহ সৌধটিকে দেখিবার জন্ম দিক্‌চক্রবালের দিকে সোৎসুক দৃষ্টিকে গ্রীব্র বাঁচাইয়া দেখিবার পীড়া না দিলেও চলিবে। কারণ, তাহার মূর্তি আমাদের পার্শ্ববর্তী মর্মর-মন্দিরটিতেই রহিয়াছে। সেই মন্দিরটিতে প্রথম বাণীমূর্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন বিদ্যাসাগর। আমাদের সাহিত্যেতিহাস খুব দূরবর্তী নহে বলিয়াই বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক দান সহজে অনুমেয়। বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী বঙ্গগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন রামমোহন রায়, রামরাম বসু প্রভৃতি। কিন্তু সে ভাষা কি সাহিত্যের অলঙ্কার—মনোভাবের দর্পণ? রামমোহনের প্রচণ্ড যুক্তিসম্বলিত বেদান্ত-ভাষ্যের বঙ্গভাষা মোটেই উপভোগ্য নহে। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিতও তদ্রূপ। তদুপরি সে-ভাষা দুর্বোধ্য আদালতী ভাষায় পরিপূর্ণ। বিষয়টি যদিও সাহিত্যিক, কিন্তু উক্ত বিষয় পাঠে রত হইলে কয়েকটি দেশী-বিদেশী অভিধান খুঁজিয়া বাক্যার্থ অন্বেষণ করিতেই চরিত্র-মাহাত্ম্যের রসবস্তু মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়। তবুও সে সময়ে বঙ্গভাষাটা ছিল একান্ত অনুগ্রহের বিষয়। উৎসুক পাঠক-সম্প্রদায়কে কোন ক্রমে এইরূপ চরিত-গ্রন্থই বারম্বার পাঠ করিয়া আনন্দ সঞ্চয় করিতে হইত। ঠিক এই সঙ্কটে বিদ্যাসাগর অনবদ্য সালঙ্কারিক অথচ সহজবোধ্য ভাষায় সংস্কৃত রস-সাহিত্যের অনুবাদ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। তাঁহার ভাষাতে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য দেখা যায়। তবে তাহা সহজবোধ্য—কেন না সেই ভাষা প্রাণধর্মী। বিদ্যাসাগরের লেখনীর স্পর্শে বঙ্গভাষা মূর্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার ভাষার ছিল একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারা, আর বিষয়গুলিও ছিল অবিমিশ্র রসধর্মী।

সহসা এই রসের প্লাবন তদানীন্তন ম্রিয়মাণ দেশবাসীকে কতটা পরিতৃপ্ত করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইবে। নব্য-ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কারকার্য এরূপ একটি যুগের সৃষ্টি করিল যাহার অব্যবহিত পরেই মধুসূদন, বঙ্কিম, ভূদেব, রাজনারায়ণ যেন সহসা আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাদের প্রতিভা যে-ক্ষেত্রে সহসা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বিদ্যাসাগরের হলকর্ষণ দ্বারা পূর্ব হইতেই সরস, উর্বর ও ফলদায়ী হইয়া উঠিয়াছিল। সকলের যাহা কল্যাণকর বিদ্যাসাগর তাহাই করিয়াছেন—জ্ঞানের তীব্র রসকে মধুস্নিগ্ধগন্ধ সুধায় পরিণত করিয়া সকলকে বিতরণ করিয়াছেন এবং ভাণ্ড নিঃশেষ করিয়া পূর্ণ-বিতরণের আনন্দেই তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল মুখে অনির্বচনীয় স্বস্তির দীপ্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

অধুনা আমাদের দেশ স্বাধীন হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত জীবনটিকে এবং তাঁহার অতলস্পর্শ মহিমাকে সর্ব দিক দিয়া উপলব্ধি করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। তাঁহার জীবনের অটল নৈতিক দিক্ এবং অধ্যবসায়, সততা, দয়াশীলতা প্রভৃতি যে সকল গুণসমন্বয়ে তাঁহার সপ্রতিভ জীবন অখণ্ড আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে সেই সকল গুণনিচয়ের সম্যক্ আলোচনা প্রয়োজন। গুরুজনের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, স্নেহার্থীদের প্রতি স্নেহ, প্রপীড়িত নিপীড়িতদের প্রতি সোপলব্ধ দয়া-দাক্ষিণ্য এবং সমাজ, স্বদেশ ও জাতির প্রতি তাঁহার গর্বিত অথচ উদার ভাব—যে সকল গুণ থাকিলে একটি মানুষের কার্যাবলী অলৌকিক বস্তুত্ব প্রতিভায় মণ্ডিত হইয়া একটি নব যুগের প্রবর্তন করিয়া তাহার ব্যাপক কল্যাণ সাধন করে, সেই সেই গুণ এবং কার্যের এক-এক দিক্ লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিলে জাতির উন্নতি সাধিত হইবে, দেশ নিরঙ্কুশ সত্য ও শান্তির আসনে অধিষ্ঠিত হইবে।

বিদ্যাসাগর আমাদের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের আদিপুরুষ। তিনিই প্রথম পঙ্গু জাতীয়তার হাত ধরিয়া অশ্রুমোচন করিয়াছেন এবং সর্বপথে তাহাকে সচল শক্তি প্রদান করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার করুণাস্পর্শেই আমাদের সকল মনোদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, অবরুদ্ধ কূপমণ্ডূক আমাদের নিস্তেজ প্রাণধর্ম অপূর্ব শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, বিদ্যাসাগর ছিলেন এক জন পূর্ণ স্বাদেশিক। স্বাদেশিকতা খর্ব করিয়া তিনি কখনো বিজাতীয়ের নিকট মস্তক অবনমিত করেন নাই।

অনাথ ও মৃগেন

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্কুলের ছুটির পর তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে
ষোল বছরের কিশোর অনাথ—
জীবনে প্রথম এই ডেকে বলে জননীরে
বড়ো ক্ষিধে মা গো! খেতে দাও ভাত।

ছোট ভাইটিরে পাশে বসাইল ভালবেসে,
কে জানে ত'ার কী হয়েছিল মনে!
আপনার হাতে মেখে খাওয়াতে লাগিল হেসে
জননীর মত একান্ত যতনে।

হাত ধুয়ে এসে ফের ভাইটির গলা ধরে,
মা'র রাঙা পায় জানায় প্রণাম;
বলে, ভাই সোনামণি! মা'র কাছে থাকো ঘরে,
আমি ফুটবল খেলিতে গেলাম।

টাউন্-ক্লাবের দলে বল খেলা জোর আজ
পাহারা-পুলিশে মাঠে ভারি ভীড়;
চারি দিকে গিস্-গিস্ যতো গোয়েন্দা ইংরাজ,
মাঠ ভরা লোক আগ্রহে অধীর।

'কিক্' কোরে স'াই-স'াই মৃগেন চলেছে ছুটে,
ছুটেছে পিছনে সাহসী অনাথ;
সহসা কী ভয়ানক—পিস্তল গরজি' উঠে!
ম্যাজিষ্ট্রেট 'বার্জ' হোলো ভূমিসাৎ!

পুলিশের গুলী খেয়ে দু'জনে পড়িল মারা
অনাথ-মৃগেন 'মরি' স্মৃতি-স্তম্ভে ঢালো ধারা।

তখন আমি জেলে

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

জেলের "পাগলা ঘণ্টি" সহজ ব্যাপার নয়। মারাত্মক একটা কিছু না ঘটলে এই ঘণ্টা বাজানো হয় না।

বিপদের সঙ্কেতসূচক এই ঘণ্টাটি জেল-দরজার ছাদের গম্বুজ থেকে ঢং ঢং করে যখন বাজানো সুরু হয়, সিপাইদের ব্যারাকে তখন হুলস্থূল পড়ে যায়। তখন যে যে-কোনো অবস্থাতেই থাক্ না কেন, তৎক্ষণাৎ তাকে হাতের কাছে সহজলভ্য হাতিয়ার নিয়ে ছুটে সে ফল্-ইন্ করতে হয় ব্যারাকের সমুখস্থ ছোট্ট প্রাঙ্গণে। মুহূর্তে সবাই এসে দাঁড়ালেই তারা অধিনায়কের হুকুমে ডবল মার্চ্চ করে এসে প্রবেশ করে জেলের অভ্যন্তরে। সাধারণতঃ জেলের বিরাট লৌহদ্বারের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্রাকার দরজা খুলেই সব কাজ চালানো হয়। কিন্তু "পাগলা ঘণ্টি" বেজে উঠলে দ্বাররক্ষী বিনা দ্বিধায় দ্বারের শুধু একটা নয়, দু'টোই একেবারে সটান খুলে দিয়ে এই সশস্ত্র সিপাই দলেরই প্রতীক্ষা করতে থাকে।

জেলের অভ্যন্তরে প্রত্যেক খাতার প্রত্যেক কয়েদীকে ঘরে তালাবদ্ধ করে ঘরের অভ্যন্তরে সমান্তরাল দু'টি ফাইলে বসিয়ে রাখা হয়। জেলের কারখানা, গুদাম, রান্নাঘর, হাসপাতাল বা অন্যত্র যারা কার্য্যে রত ছিল, তাদেরকেও হাতের সমস্ত কাজ ফেলে ফাইল করে বসে থাকতে হয়। তার পর চলে গুণতি। কোথাও গণনা করে স্বয়ং সিপাই, কোথাও মেট্। গোণবার পরে প্রত্যেক খাতা বা অন্যান্য স্থানের সংখ্যা জেলের অফিসে পৌছানো হয়। তৎক্ষণাৎ তা মোট সংখ্যার সঙ্গে মেলে কি না দেখা হয়। মিলে গেলেই সংবাদ প্রেরিত হয় সেই জেল-দরজার ছাদের গম্বুজে। সেখানকার সিপাই এবার ঘণ্টায় ঢং করে একটি মাত্র আওয়াজ করে, যার অর্থ হলো যে, কয়েদী যারা জেলে ছিল, জেলের মধ্যেই তারা আছে এবং গোলমাল যা হয়েছিল, তা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। অতএব আবার জেলের স্বাভাবিক কর্ম্মতৎপরতা সুরু হয়ে যায়।

সশস্ত্র জেল-সিপাইরা অকুস্থলের নিশানা পায় গম্বুজের সিপাইর হাতে লটকানো বোর্ডখানা দেখেই। সুতরাং ত্বরিতে তারা সেখানে হাজির হয়ে লাঠি চালিয়ে এবং প্রয়োজন বোধ করলে গুলী চালিয়েও পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে ফেলে। শুধু তাই নয়। জেল থেকে জেলার সর্ব্বময় কর্ত্তা জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ-সুপারকেও ফোন করে দেয়া হয়। তৎক্ষণাৎ শহরের রিজার্ভ বাহিনীর একটি দল লরী ভর্ত্তি হয়ে এসে জেলের দেয়ালের বাইরে বন্দুক নিয়ে পাহারায় দাঁড়িয়ে যায়।

পূর্ব্বেই বলেছি, ঢাকা জেলটি একেবারে শহরের মাঝখানে। আমাদের তেতলার 'সি' ব্যারাকের ঝুল-বারান্দায় দাঁড়ালে রাজপথের একাংশ স্পষ্ট দেখা যায় এবং রাজপথের যে অংশটিতে দাঁড়ালে আমাদের ঝুল-বারান্দা দেখা যায়, স্বভাবতঃই সেখানে কৌতূহলী দু'-চার জনকে দেখা যেত। আর পাঁচ নম্বর খাতায় যে রাজবন্দীরা বাস করেন, এ সংবাদও তাদের জানতে বাকি ছিল না।

আজ সকালে অকস্মাৎ পাগলা ঘণ্টার শব্দে শহরের লোকেরাও নিশ্চয়ই গম্বুজে দৃষ্টিক্ষেপ করে বিপদের নিশানা সেই বোর্ডখানা দেখতে পেয়েছে; তাই রাজপথের সেই বিশেষ অংশটিতে রীতিমত একটা জনতার সমাবেশ হয়ে পড়েছে। তাদের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি আমাদেরই ঝুল-বারান্দার পানে নিবদ্ধ।

চারু বাবু তেতলা থেকে ঝটাপট নেমে এসে এই সংবাদটাই ছেড়ে দিলেন আমাদের মাঝে।

কি করবো স্থির করতে পারছিলাম না আমরা। ধুলা ঝেড়ে উঠে আশু বাবু জেল-সুপার লিওনার্ড সাহেবের সম্মুখে এসে ক্রন্দন-ভাঙা সুরে কি বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক এমন সময় জমাদার বাঁশী বাজিয়ে দিয়ে এমনি অনর্থ ঘটিয়ে বসেছে যে, আশু বাবুর ড্যাবডেবে চোখের মণি দু'টি যেন আরও বড় হয়ে শূন্য প্রেক্ষণে চেয়ে রইলো। জেলার নরেন সরকার ভুঁড়ির ওপর হাফ প্যান্টটা আরও একটু টেনে দিয়ে গোঁফ জোড়াটায় সাহেবের অলক্ষ্যে আর একটা মোচড় দিয়ে হাণ্টারটা বগলদাবা করে সশস্ত্র বাহিনীর অপেক্ষা করছেন। ভাবখানা—এইবার বাছাধনদের দেখাচ্ছি!

সাহেবের সঙ্গে সিপাইদের যে ক্ষুদ্র দল ছিল, তারা আমাদের বার বারই ঘরে ঢুকে পড়বার অনুরোধ জানাচ্ছে, জমাদার কর্কশ স্বরে "চলিয়ে, নম্বরমে চলিয়ে" বলে হুকুম জারী করছে ও সঙ্গে সঙ্গে এই বলে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, "নেই তো মুসকিল হো যায় গা।" বাইরে তখনো অবিশ্রাম বাঁশীর আওয়াজ চলছে এবং ডবল মার্চ্চ করে যে সিপাইর দল আসছে, স্পষ্ট তাদের পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। আমাদের ইয়ার্ডের দরজা সটান খোলা। এই তারা এসে পড়লো বলে।

অকস্মাৎ ডেপুটি জেলার মহম্মদ রেজ্জাক চীৎকার করে উঠলেন: I say, all of you get inside the Barrack, otherwise you will be fired upon……

রেজাক সাহেব হয়তো আরও কিছু বলতেন, কিন্তু বীরেনের ভীম গর্জ্জনে তিনি থেমে গেলেন: Shut up, you Rascal, shut up—

এমন সময় হুড়মুড় করে এসে সশস্ত্র বাহিনী আমাদের ইয়ার্ডে ঢুকে পড়লো এবং কালবিলম্ব না করে বন্দুকধারীরা বন্দুকে কার্ত্তুজ ভরে ফেললো। নিয়ম হচ্ছে, তারা এসেই কয়েদীদের একচোট "ধোলাই" করবে, তার পর বলপ্রয়োগে তাদেরকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবেই, প্রয়োজন বোধ করলে গুলী চালিয়েও। এখানেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হতো না, যদি না স্বয়ং লিওনার্ড থাকতেন। তাই বন্দুকধারীদের প্রস্তুত করে রেখে জমাদার খটাস্ করে সাহেবের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে গুলী চালাবার হুকুম চাইলো: হুজৌর্-র্!

বেশ বুঝতে পারলাম রক্তারক্তি কাণ্ড একটা ঘটবেই। আশু বাবুর গালের ঘুষি আর ফিরিয়ে নেয়া যাবে না, তেমনি ভয় দেখিয়ে রাজবন্দীদেরও ঘরে ঢোকানো সম্ভব নয়। বন্দুক দেখে শৃগালের মতো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা রাজবন্দীদের নীতির বাইরে ছিল! সুতরাং একেবারে প্রস্তুত হয়ে এসেই দাঁড়ালাম বীরেনের পাশে, তার গা ঘেঁসে। পার্শ্বে দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখলাম একে একে এসে দাঁড়ালো ভোলা বাবু, নির্ম্মল ও ননী। তাদের পাশে এসেছে রমেশ, কামাখ্যাদা, তরণী বাবু, হরিদাস ও চারু বাবু। খাবার-ঘরে ক'জন বুঝি চা খাচ্ছিল, তারাও এসে দাঁড়িয়ে গেল আমাদেরই আশে-পাশে। রান্না-ঘর থেকে নীরেন বাবুর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল নিরঞ্জন, দীনবন্ধু ও অবিনাশ এবং আরও কয়েক জন। দোতলায় তেতলায়

রূপ রচনার
রুচিরাগ
রূপের কলিকে সৌন্দর্য্যকুসুমে বিকশিত করে তোলাই
এই প্রসাধনীর সাধনা। রূপ সাধকসাধিকাদের
নিকট তাই চিরকাম্য এই সৌন্দর্য্যের সুরম্য সম্ভার।
মার্গো সোপ
নিম টুথ পেষ্ট
ভৃঙ্গল
সুবাসিত মহাভৃঙ্গরাজ
কেশ তৈল
লাবণি স্নো ও ক্রীম
কান্তা
মনোমদ গন্ধসার
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

প্রাঙ্গণের এখানে-ওখানে যেখানে যারা ছিল, সবাই একে-একে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। গুলী চলতে পারে নয়, গুলীবর্ষণ অবধারিত। লালমুখ সাহেব নিজেকে মনে করে বৃটিশ ক্রাউনের প্রতিনিধি, মনে করে জেলের অভ্যন্তরে সে হিটলার বা মুসোলিনী; সুতরাং হুকুম সে করবেই, প্রয়োজন হলে একটি-একটি করে এই দেড়শো রাজবন্দীর শবদেহ শোভাযাত্রা করে সে মর্গে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেও কসুর করবে না। অপর দিকে পাথরের মতো সারি সারি দণ্ডায়মান কানাইলাল-ক্ষুদিরামের উত্তর-পুরুষ, বৃটিশ ক্রাউনের সম্মুখে মাথা নত করবার কৌশল আজো যারা শিখতে পারেনি। রক্তের জবাব এরা চিরকাল রক্ত দিয়েই দিয়ে এসেছে। তাই জানি, শেষ নিশ্বাসটুকু বেরিয়ে যাবার পূর্ব্বে এখান থেকে এক ইঞ্চিও এদের কাউকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।···স্পষ্ট অনুভব করলাম, একটা অবাধ্য সর্ব্বনাশা সিদ্ধান্ত যেন সবারই শব্দহীন সমর্থন লাভ করলো: বাধা দিতে হবে।

শোনা গেল নরেন সরকারের গর্জ্জন: বী রেডি। পয়েন্ট ইওর আর্মস্।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকধারীরা ডান হাঁটু মুড়ে দিয়ে বসে বাঁ হাঁটুর ওপর বাঁ কনুই স্থাপন করে টোটাভরা বন্দুকগুলি আমাদের পানে লক্ষ্য করে ধরলো। এবার এগিয়ে এলেন স্বয়ং জেল-সুপার লিওনার্ড। যা বললেন, তা এই: এক মিনিট সময় দিলাম। এর মধ্যে তোমরা যার-যার ঘরে ঢুকে পড়, নইলে রাইফেলের বুলেট তোমাদের বুকে ঢুকবে।

স্তব্ধতা! নিশ্বাসও বোধ হয় পড়ছে না কারুর। নড়বারও লক্ষণ দেখা গেল না এক জনেরও। আর একটি মুহূর্ত্ত! এর পরই নিশ্চয়ই সাহেবের কণ্ঠ শোনা যাবে: ফায়ার!···হ্যাঁ, আমরাও প্রস্তুত! ক্রাউনের হুকুম তামিল করার চাইতে বুলেটকে কী করে আলিঙ্গন করতে পারি, হাসিমুখে দেব তারই পরীক্ষা!

কিন্তু অকস্মাৎ সুরেনদা'র কণ্ঠ শোনা গেল। চেয়ে দেখলাম, তেতলার সিঁড়ি বেয়ে দু'জন বন্দীর স্কন্ধে ভর করে দ্রুত নেমে আসছেন ক্ষীণদৃষ্টি, অসুস্থ, বৃদ্ধ সুরেনদা, ওখান থেকেই চীৎকার করে বলছেন: **Wait wait Leonard, for a second. Let the first bullet pierce through my lungs.**

বাঙালী অফিসার হলে কি করতো জানি না, কিন্তু এমনি সাংঘাতিক জটিল ও উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে লিওনার্ড সাহেবের ধৈর্য্য অপরিসীম। একটি বার মাত্র সুরেনদা'র পানে দৃষ্টিক্ষেপ করেই তিনি মারাত্মক অবস্থাটা চট্ করে উপলব্ধি করে নিয়ে তৎক্ষণাৎ একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করে বসলেন। বন্দুকধারীদের পানে ফিরে তিনি তাদের চলে যাবার হুকুম উচ্চারণ করলেন এবং তারা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সদলবলে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। আর আমাদের পানে ফিরেও চাইলেন না।

আশু বাবুকে অবশ্য বদলী করা হলো না আমাদের বিভাগ থেকে, কিন্তু দুপুরের পরই যে বিজ্ঞপ্তি এলো, তাতে জানা গেল, আশু বাবুকে ঘুষি মারার শাস্তিস্বরূপ আগামী ছ'মাসের জন্য বীরেন্দ্রনাথ ঘোষের পত্রলেখা ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের সুবিধা বাতিল করা হলো।

গুরু পাপে লঘু দণ্ড! সময়বিশেষে তারও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু চুরির কাহিনী একেবারে উদ্ভট কল্পনা নয়। ভবিষ্যতে আরও জানা যাবে যে, সম্মুখ রণে চিরকাল ভঙ্গ দিয়ে লিওনার্ড কী ভাবে পশ্চাৎ থেকে ছুরি চালাতেন।

সীমাহীন ধূর্ত্ত ও মূর্ত্তিমান শয়তান!

৫

কোনও 'বি' ক্লাশ কয়েদীকে আমাদের ইয়ার্ডে কাজ করতে পাঠানো হতো না। 'বি' ক্লাশ মানে একাধিক বার জেলখাটা কয়েদী। সবাই 'এ' ক্লাশ। অর্থাৎ এই প্রথম হাতে-খড়ি।

কিন্তু হাতে-খড়ি দিয়ে সারা জীবনের মতো ফিরে যাবার ইতিহাস খুবই কম। হাতে-খড়ির পরই এরা পড়তে শেখে, বুঝতে শেখে, হাত পাকাবার কৌশলটা আয়ত্ত করতে শেখে। এদেরও রীতিমত রিক্রুট করা হয় প্রসিদ্ধ ডাকাত, চোর বা বদমায়েসের দলের মধ্যে থেকে। বাইরে রিপুর তাড়নায় অকস্মাৎ এক দিন ভুল করে বসে জেলে এসে এরা রীতিমত পাঠগ্রহণ করে ওস্তাদদের কাছ থেকে। বিদ্যাশ্রমের অধ্যয়ন সমাপ্তির পর এরা একেবারে ঝুনো হয়ে বেরিয়ে যায় বাইরে!

কারাদণ্ডের ফলে কোনও চোর বা বদমায়েস সাধু হয়ে গেছে, এমনি দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। কী করে হবে?···জেলে ধূমপান নিষিদ্ধ। বাইরে যা আদৌ আইনবিগর্হিত নয়, চাষী-মজুরদের মধ্যে যা পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসে উপভোগ করে থাকে, দৈহিক পরিশ্রমকারীদের পক্ষে শ্রান্তি অপনোদনের জন্য যা একেবারে অপরিহার্য্য, মধ্যবিত্তদের যা সস্তা বিলাসের অঙ্গ, সেই ধূমপানে জেলের মধ্যে হয় শাস্তি—দাঁড়ানো হাত-কড়া, মাড়ভাত, পায়ে বেড়ি, চটের পোষাক এবং হয়তো বেত্রাঘাতও।

তাই জেলে এসেই নিম্নশ্রেণীর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কয়েদীরা ধূমপানের জন্য অধীর হয়ে ওঠে এবং যে করে হোক্, যে পথেই হোক্, যাকে দিয়েই হোক্, যতটুকুই হোক্, তামাক-পাতা বা বিড়ি বেআইনী ভাবে সংগ্রহে তৎপর হয়ে ওঠে। কয়েদীদের তামাক-পাতা বা বিড়ি সরবরাহের ব্যবসা বেশ লাভজনক—সিপাইরা তা ভা[illegible] ভাবেই জানে। সুতরাং জেলে তামাক-পাতা ও বিড়ির চোরা কারবার বেশ চলতে থাকে। মনে পড়ে, একবার শুনেছিলাম চ[illegible] নম্বর ইয়ার্ডের পাশের আলুর ক্ষেতের নীচে নাকি তামাক-পাতা[illegible] একটা খনি আবিষ্কৃত হয়েছে! খনি!···চমকে উঠেছিলাম সেদিন কিন্তু পরে বেশ বুঝতে পেরেছিলাম এমনি অনাবিষ্কৃত খ[illegible] জেলের অভ্যন্তরে আরও বহু আছে।

অথচ ধূমপান সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ নয়। মেথরেরা পারিশ্রমি[illegible] বাবদ প্রত্যহ বারোটি বিড়ি পেয়ে থাকে। যে সব কয়েদী দক্ষ[illegible] দেখিয়ে কয়েদীদের মাতব্বর হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে[illegible] **convict overseer** খেতাব পেয়েছে, নলচে আড়াল দি[illegible] তারা সিপাইদের কাছ থেকেই তামাক-পাতা বা বিড়ি চেয়ে খা[illegible] যাঁরা প্রথম শ্রেণীর বিচারাধীন আসামী বা দণ্ডাজ্ঞাপ্রা[illegible] কয়েদী, তাঁদের পক্ষে ধূমপান নিষিদ্ধ নয়। আর, রাজবন্দী[illegible] বেলায় তো ওর কোনো পরিমাণেরই বালাই নেই। কি[illegible] কতক লোককে সুবিধা দিয়ে অবশিষ্টদের ঠেকিয়ে রাখতে যা

কতখানি ভ্রান্তিপূর্ণ নীতি, জেলে গেলে তা বেশ উপলব্ধি রা যায়।

তার পর সমাজের দুষ্কৃতকারীরাই এসে জেলে জমায়েৎ হয়। াইরে থেকে জানতে না পারলেও জেলের অভ্যন্তরে সর্বশ্রেণীর য়েদীদের সঙ্গে মিশে ও তাদের সঙ্গে আলাপ করে আমরা জানতে পেরেছি যে, লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়েছে অথবা একের দোষে অপরের প্রতি দণ্ডাদেশ হয়েছে কিংবা একেবারে নিরপরাধ ব্যক্তি আইনের নির্দয় প্যাঁচে পড়ে ফেঁসে গেছে, এমনি দৃষ্টান্ত ওখানে মোটেই অপ্রতুল নয়। জেলে এসে দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে মেলামেশা করে এরাও ভবিষ্যতে বাইরে গিয়ে সমাজের আবর্জনা হয়ে দাঁড়ায়। সংশোধন না হয়ে এখানে এসে হয় এদের কুশিক্ষা ও পাপানুষ্ঠানের দীক্ষাগ্রহণ। নির্দয় আইন মানুষের অন্তরের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করে রক্ষা করে চলে শুধু নিজের দাঁড়ি, কমা ও সেমিকোলন। তাই কারাগার আমাদের দেশে অপরাধী সৃষ্টির কারখানা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আমাদের ঘরের অন্যতম ভৃত্য (জেলের ভাষায় যাদের বলা হয় ফালতু) হালিমের ইতিহাস অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হালিম বরিশাল জেলার লোক। চাষ-আবাদই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন। দু'টি ছেলে ও তিনটি মেয়ে নিয়ে সংসার তার এক রকম চলে যাচ্ছিল। উপচে-পড়ার মতো স্বচ্ছলতা না থাকলেও মুইয়ে-পড়ার মত অভাব-অনটন ছিল না। কিন্তু কাল হলো তার দ্বিতীয় বার বিবাহে ও এক সুন্দরী যোড়শী বধূ ঘরে এনে। গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য তমিজদ্দীন হালিমের ঘরে ঈদ করতে এসে ফাতেমাকে দেখতে পায় ও আলাপ করে তাকে তার ভালো লাগে।

কিন্তু আলাপেই সে ক্ষান্ত হলো না, অন্তরঙ্গ হবার ফিকিরে বার বার ঘুরে-ফিরে আসতে লাগলো। দরিদ্র চাষী হালিম এটা ভালো চোখে না দেখলেও প্রতিবাদ জানাবার সাহস পেল না প্রথম প্রথম।

ক্রমে দেখা গেল, ফাতেমার আসনও টলটলায়মান! এক দিন সন্ধ্যার ঘরে ফিরে এসে হালিম দেখলো দু'জনে বড্ড বেশী ঘেঁসাঘেঁসি বসে মালসার কাঠের আগুন পোহাচ্ছে ও খোসগল্পে মজে গিয়ে বেশ হাসি-তামাসা করছে। গোয়াল-ঘরে আড়ালে ডেকে নিয়ে অনুচ্চ স্বরে ভর্ৎসনা করতে গিয়ে হালিম বিস্মিত হলো স্ত্রীর জবাব দেবার ভাষা ও ভঙ্গী শুনে। অনুচ্চ তিরস্কারের জবাবে স্ত্রী উচ্চস্বরেই বলে বসলো: উনি আমার ধর্ম্মের ভাই। ওঁর সঙ্গে গল্প করলে আবার দোষ কোথায়?

ধর্ম্মের ভাইয়ের সঙ্গে অধর্ম্ম কিছু হবে না এবং হতে পারে না সেই বিশ্বাস করতো সরল মানুষ হালিম। তাই সে লজ্জা ও সন্দেহ পোষণ করে ও তা প্রকাশ করে।

তার পর কিছু দিন যায়। ভাই-বোনের সম্পর্ক গাঢ়তরো হয়ে উঠলেও স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া তেমন দেখা যায়নি। তাই হালিম ও-সব নিয়ে আর মাথা ঘামাতো না। বরং তার মনে হতে লাগলো, প্রথম স্ত্রী গহরজানের চাইতেও ফাতেমা প্রেমময়ী ও সেবাপরায়ণী। পরলোকগতা গহরজানের অভাব সে ভুলে যেতে লাগলো।

কিন্তু হায়, কে জানতো সুচতুরা ফাতেমা পাকা অভিনেত্রীর মতই এক দিকে প্রেম ও সোহাগ দিয়ে স্বামীকে অভিভূত করে আর অপর দিকে মনোরঞ্জন করতো তার ধর্ম্মের ভাইয়ের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে! স্বামীকে তুষ্ট করে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সে দরজা খুলে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বেরিয়ে আসতো গভীর রাত্রে। উঠোনের ওপারে গোয়াল-ঘরের অন্ধকারে তখন তমিজদ্দীনের বিড়ির আগুন দেখা যায়।

হালিমের আজও মনে পড়ে, সেদিন ছিল অমাবস্যার রাত্রি। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশের পুরু কালো আস্তরণের সঙ্গে চারি দিকের গাছপালা যেন এক হয়ে মিশে গেছে। গভীর নিশীথে অকস্মাৎ হালিমের নিদ্রা ভেঙে গেল ছোট মেয়েটার একটানা ক্রন্দনে। নিদ্রা তার অত্যন্ত গভীর। সারা দিন ক্ষেত-খামারে পুড়ে এসে রাত্রে বিছানায় গা দিতে-না-দিতে ঘুমে দু'চোখ তার আচ্ছন্ন হয়ে আসতো। কিন্তু—হালিম বলতে লাগলো: বোধ হয় খোদারই মর্জ্জি ছিল বাবু, তাই ঐটুকু মেয়ের কান্নার শব্দেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাশে হাত বাড়িয়ে ফাতেমাকে ডেকে দিতে গিয়ে দেখি সে নেই। চট্ করে মাথায় একটা ঘা খেলাম যেন। দেখলাম দরজা ভেজানো। নিঃশব্দে বাইরের দাওয়ায় এসে দাঁড়ালাম। কোথায় যেতে পারে?…অকস্মাৎ মনে হলো, তমিজদ্দীনের বাড়ী। তৎক্ষণাৎ রওনা হলাম সাবধানে। কিন্তু গোয়াল-ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় স্পষ্ট ফিসফিস কথার শব্দ শুনতে পেলাম আর সঙ্গে সঙ্গে খড়ের খস্‌খস্‌। থমকে দাঁড়ালাম। বেড়ায় কান পাতলাম। হ্যাঁ, দু'জনের কথা চলছে, মাঝে মাঝে চাপা হাসিও। মাথায় খুন চেপে গেল!…রাতের আঁধারে গোয়াল-ঘরে চুরি করে এসে ভাই-বোনের ধর্ম্মচর্চ্চা হচ্ছে? ধর্ম্মভাই!!—সামনেই দেখি বেড়ায় গোঁজা রয়েছে হাত-দা'খানা।

হালিম একটু থামলো। বোধ হয় উত্তেজনার মাত্রাটা একটু সামলে নিল। তার পর ধীরে ধীরে বললো: আদালতেও সবই আমি স্বীকার করেছি। বলেছি, হ্যাঁ, ঐ দা দিয়েই অন্ধকারে এক ঘা মেরেছি। কার কোথায় লেগেছে জানি নে। পরে দেখেছিলাম, তমিজদ্দীনের একখানা হাত একেবারে উড়ে গেছে, আর ফাতেমার বুকে গিয়ে বিঁধেছে দায়ের ধারালো ফলা।

হালিম আবার থামলো। গলার স্বরটাও তার যেন একটু কেঁপে উঠলো। মুহূর্ত্ত মাত্র! তার পরই সে প্রকৃতিস্থ হয়ে বলতে লাগলো: দায়রা জজ দিলেন ফাঁসীর হুকুম। হাইকোর্টে দু'জন জজের দু'মত হওয়াতে বড় জজ রায় দিলেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

হালিম কেন শুধু, হালিমের মত আরও অনেক কয়েদী এখানে আছে, যাদের দীর্ঘমেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে আইনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে বটে, কিন্তু ন্যায়বিচার হয়েছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আমাদের ইয়ার্ডে যারা কাজ করে, তাদের নিয়মমাফিক খাবার আসে কিন্তু ওদের পৃথক্ চৌকা থেকে। সকাল হতেই আসে বড় বড় বালতী-ভর্ত্তি খুদের লপ্‌সি, কোনো-কোনো দিন ওরই মধ্যে গোটা কয়েক ছোলার ডালের দানা ছড়িয়ে দিয়ে নাম দেয়া হয় খিচুড়ী। মাঝে মাঝে এক-আধটা শুকনো লঙ্কাও মেলে। নুণ একটু দেয়া হয়েছিল কি না, তা বুঝতে হলে বেগ পেতে হয়।

দুপুর বেলায় আসে ট্রাঙ্ক-ভর্ত্তি ভাত। সত্যিই ট্রাঙ্ক। শুধু এর ডালাটা কব্জি দিয়ে আঁটা নয়, আলগা। ঢাকুনির মত্তো। ট্রাম ইন্‌সপেক্টারদের বারান্দাটুকু বাদ দিয়ে টুপীটা উলটে দিলে যা হয়, ঠিক তেমনি ধরণের একটি লোহার পাত্র আছে ট্রাঙ্কের মধ্যে,

তাকে বলা হয় কাঠা। উপচে-পড়া এক কাঠা ভাত জনপ্রতি বরাদ্দ। সিগারেটের টিনের আকার ও বোধ হয় সাইজেরও একটি এ্যালুমিনিয়মের বাটি একটি লম্বা ডাণ্ডার সঙ্গে লাগানো আছে। সেই বাটির এক বাটি করে ডাল। পরিমাণ মন্দ নয়। ঐ ধরণের একটু ছোট সাইজের বাটির এক বাটি তরকারি।

কী কী জিনিষ দিয়ে যে সেই তরকারি রান্না করা হয়, তা বোঝবার উপায় যে একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু কিছু শাক-পাতা তাতে থাকবেই। তা সে পালং থেকে সুরু করে সরষে শাক, মূলো শাক, নটে শাক, পটল-পাতা, শালগম ও ওলকপির পাতা, ফুলকপির পাতা, এমন কি পেঁপে গাছের কচি পাতাও থাকতে পারে। দুষ্ট লোক অবশ্য বলে যে, ঘাসও না কি মাঝে মাঝে তাতে ছেড়ে দিতে কার্পণ্য বা সংকোচ করে না বড় চৌকার বাটলারগণ। একটু বেশী ঝোল ও তাতে এই ঘাস-জাতীয় দ্রব্যগুলি গলিত অবস্থায় থাকে। আর যাই থাক না তাতে, সবই অতিরিক্ত সেদ্ধ করা হয়। ফলে বেশ হড়হড়ে জাতীয় তরকারি প্রস্তুত হয়।

জেলের অভ্যন্তরে বিরাট সবজী-বাগান আছে। তাতে তুলনাহীন সব তরকারি জন্মে। আলু, বেগুন, সিম, শালগম, ওলকপি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাউ, কুমড়ো, মূলো, টমেটো, বরবটি প্রভৃতি বারো মাসের তরকারি এখানে হয়। সেই ক্ষেতে সারা দিন খেটে মরে এই সাধারণ কয়েদীর দল, অথচ খাবার বেলায় এরা পায় শুধু পাতা আর ঘাস এবং খুব বেশী হলে সময়োত্তীর্ণ দু'-একটা জিনিষ। অর্থাৎ, চৈত্র মাসে হয়তো এদের দেয়া হলো ফুলকপির শুকনো ফুলগুলো কিংবা বুড়ো মূলোর ঝাড় কিংবা শালগজানো শালগম। তেল ও মসলাহীন সেই অপূর্ব্ব ব্যঞ্জন থেকে এমনি বোঁটকা গন্ধ বেরুতে থাকে যে, একেবারে সওয়া যায় না। বাগানের তরকারি যায় অফিসারদের বাড়ীতে আর বাকিটা বাইরে বিক্রী করে ফেলা হয়।

ভাত, ডাল ও তরকারি প্রত্যহই পাওয়া যায়। এ ছাড়া সপ্তাহে দু'দিন পাওয়া যায় মাছ ও দু'দিন মাংস। অবশ্য এক বেলা। ইংরেজের রাজত্বে অবিচার হতে পারে না! তাই মাছ-মাংস যেদিন আসে, সেদিন বণ্টনকারীদের সঙ্গে এক জন আসে দাঁড়ি-পাল্লা নিয়ে। যদি কেউ মাছের বা মাংসের টুকরো দেখে চ্যালেঞ্জ করে বসে, তৎক্ষণাৎ ওজন করে তাকে দেখিয়ে দেয়া হয় যে, ঠিক এক ছটাক এক টুকরো মাছ বা আধ ছটাক এক টুকরো মাংসই তাকে দিয়ে সরকারী হুকুমের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়েছে।

কিন্তু মজা হচ্ছে, মাছগুলো আসে ভাজা হয়ে আর মাছের ঝোল আসে পৃথক্ একটি বালতীতে। সেই ঝোল একেবারে পৃথক্ রান্না করা হয়, মাছের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে না। এমনি অভিনব মাছের ঝোলের কারণ দু'টি। প্রথম, কয়েদীদের মধ্যে অনেকে ঐ হলুদ মেশানো জল অথবা ঝোল পছন্দ করে না আর দ্বিতীয়, ঝোলে-ডোবানো মাছের ওজন বৃদ্ধি হবেই, তাতে তারা ঠকতে পারে।

মাংসের ঝোলকে অবশ্য মাংসেরই ঝোল বলা যায়, কারণ একই সঙ্গে রান্না করে মাংসের টুকরোগুলো সাবধানে তুলে নেয়া হয়। আর মাংস ভাজা ওরা কেউ খায় না।

এ ছাড়া পাওয়া যায় একটুখানি তেঁতুল, যাকে বক্সীর ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাষ্ট্র-সচিব সুমধুর চাটনি বা টক আখ্যা দিয়ে উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। এক টুকরো তেঁতুল।

বিকেলে যারা ভাত খায় না, তাদের জন্য রুটিরও ব্যবস্থা আছে। প্রায় তেরো ইঞ্চি ডায়মেটারের এক-একখানা পাতলা রুটি, দু'খানা করে বরাদ্দ। চাইলে আর একখানাও পাওয়া যেতে পারে। চালনিতে ছেঁকে আটা বার করে নেবার পর যে ভুসি থাকে, দেখলে মনে হয় সেই ভুসি দিয়েই ঐ রুটি প্রস্তুত করা হয়। আটা খৈলের সঙ্গে মিশ্রিত করে জেলের প্রধান জমাদারের বিরাটকায় গরুগুলির খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হয়।

আমাদের ইয়ার্ডে যে সব কয়েদী কাজ করতো, তারা অবশ্য এ সব খাদ্য যেমন নিয়ম-মাফিক আসতো, তেমনি নিয়ম-মাফিক গ্রহণ করতো শুধু, কিন্তু মুখে তুলতো না। আমরাই দিতাম না ওদের তা খেতে। বরং সখ করে মাঝে মাঝে আমরাই তা একটু চেখে দেখে বেশ মজা অনুভব করতাম।

রাজবন্দীদের ধূমপানে কোন বাধা ছিল না। তাই আমরা নিজেদের নাম করে বাণ্ডিল বাণ্ডিল বিড়ি কিনে এনে এদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম।

৬

পাগলা ঘণ্টি বাজবার পর প্রায় দু'সপ্তাহ কেটে গেছে। সুতরাং উত্তাপ ও উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত হয়ে আবার স্বাভাবিক জীবন-যাপন সুরু হয়েছে। সপ্তাহে দু'বার সুপারিনটেনডেন্টের আমাদের ইয়ার্ড পরিদর্শনে আসবার কথা। কিন্তু গত দু' সপ্তাহ তিনি আর আসেননি, এসেছেন শুধু জেলর নরেন সরকার। সঙ্গে সিপাইদের সংখ্যাও কম দেখা গেছে। ঘরোয়া সফরের মতো। সেদিনের ঘটনার কথা বেমালুম না তুলে, অকস্মাৎ তিনি আমাদের শুভানুধ্যায়ী হয়ে ওঠেন: "আরে মশাই, চোর চোর, সব শালা চোর। সেদিন আমি নিজে বাজারে গিয়ে ইয়া বড় বড় কৈ মাছ নিয়ে এলাম পঞ্চাশটি এক টাকায়, আর সেদিন সেই রকম কৈ মাছেরই দাম শালা কনট্রাকটর চার্জ্জ করেছে পুরো দু' টাকা করে? আপনাদের আর কি, নীরেন বাবুর সামনে বিল ধরলেই তিনি খস্-খস্ করে সই মেরে দেন। এমনি অন্যায় আমাদের কিন্তু গায়ে লাগে। হোক্ না সরকারি টাকা, তবুও একশো টাকায় একশো টাকা লাভ? আপনাদের বলি, যে টাকাটা শালা বেশী নিয়ে গেল, তা দিয়ে আর-একটা ভালো জিনিষও তো পারতেন কিনতে। কত কাল থাকতে হ… কে জানে! বলি, স্বাস্থ্যটা তো রক্ষা করে চলবেন।

এক দিন যিনি বন্দুকধারীদের প্রতি 'পয়েন্ট ইয়োর গান্' হুকু… দিয়ে আমাদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন, আজ আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাঁর এই উৎকণ্ঠা এত বিসদৃ… ঠেকে যে, কিচেন-ম্যানেজার নীরেন বাবু বেশ একটু শ্লেষই করেন, ওজন নেবার খাতাটায় একবার চোখ দিয়েছেন? দেখেছে… আমাদের গড়পড়তা ওজন-বৃদ্ধির হিসাব? সপ্তাহে এক পাউ… করে প্রায় প্রত্যেকেরই বেড়ে চলেছে। এর চাইতেও বেশী আশ… করলে অবশেষে আপনার দশা হবে যে!

নরেন বাবু দুই হাতে ভুঁড়িটা চেপে ধরলেন, বোধ হয় হাসি… ধাক্কায় সেটা খসে পড়ে না যায়, সে জন্য। তার পর বললেন: না…

তেমন আর বেশী কি! এর চাইতে কত বড় বড় ভুঁড়ি দেখেছি। এই তো সেদিন নবাব-বাড়ীর একটা বিয়েতে গিয়েছিলাম—

বাধা দিয়ে ভোলা বাবু বললেন: তা হতে পারে। গৌরীশঙ্কর যে কাঞ্চনজংঘার চাইতেও উঁচু তা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু তাতে করে কাঞ্চনজংঘা উপেক্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়ায় না।

চারু বাবু বলে ফেললেন: সারা ঢাকা জেলটাই তো আপনার উদরে। তাই সাইজটা তেমনি হওয়া চাই তো। ওতে দোষ নেই।

তীক্ষ্ণ শ্লেষটা সহজ করে দেবার জন্য নরেন বাবু উচ্চ হাস্য করে উঠলেন এবং বললেন: তবুও তো এক দিন নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন না?

রাত্রে দিবাকর বাবু আমার টেবিলে এসে বসলেন। মা'র কাছ থেকে একখানা দীর্ঘ পত্র পেয়েছি, তারই জবাব লিখছিলাম নিবিষ্ট মনে। কখন যে সিপাই রাতের মতো দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেছে, টেরই পাইনি।

বাধা পেলাম। লোকটা অকস্মাৎ এসে হাজির হয় এমনি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এতটুকুও আভাস না দিয়ে যে, গা জ্বালা করে। তথাপি শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম: কি ব্যাপার দিবাকর বাবু?

না, তেমন কিছুই নয়। শুধু ভাবছি বীণা দাসের গুলীটা যদি জ্যাকসনের বুকে লাগতো, তাহলে বাংলা দেশ একটা রেকর্ড করে ফেলতে পারতো। কিন্তু ব্যাটার কি ভাগ্য দেখেছেন? এত কাছ থেকে মারা হলো, অথচ একটি গুলীও শালার বুকে বা গায়ে লাগলো না।

এ সম্বন্ধে মন্তব্য করবার কি আছে এবং থাকলেও সরকারী গোয়েন্দা রাজবন্দী দিবাকর সেনগুপ্তর সঙ্গে তা নিয়ে কেন যাবো আলোচনা করতে? তাই শুধু একটু মুচকি হাসলাম মাত্র।

কিন্তু ঐ হাসিতেই দিবাকর বাবু যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করলেন: আমার কি মনে হয় জানেন দ্বিজেন বাবু, বি-ভির ঐ life for life নীতিই সর্বোৎকৃষ্ট এবং একেবারে নিশ্চিত। মরতে হবে নির্দেশ থাকলে মারবার যত্নটা বোধ হয় আরো বেড়ে যায়। আর পলায়নের পরামর্শ থাকলে আগেই একটা চোখ পড়ে দরজার দিকে। এ জন্যই বি-ভির প্রত্যেকটা প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। মরতে হবে জানলে বীণা দাস একেবারে ডায়েসের ওপরে উঠে গুলী চালাতো। তাহলেই গভর্ণর বাছাধনকে আর রক্ষা পেতে হতো না।

বললাম নেহাৎ কিছু বলতে হবে বলেই: তা কনভোকেশনটা জমেছিল বলুন?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।—বলে দিবাকর বাবু হাসতে লাগলেন। তার পরই অকস্মাৎ স্বর অত্যন্ত খাটো করে বললেন: গত সপ্তাহে সকাল বেলা যে সিপাইটার ডিউটি ছিল, মনে আছে সেই মাধব সিংকে? ওকে হাত করে ফেলেছি। রাজী হয়েছে। যদি কোথাও চিঠি পাঠাতে হয়, পাঠাতে পারেন। জবাবও ও এনে দেবে। টাকা অবশ্য ও চায়নি। তবুও বোঝেন তো—

বললাম: কোথায় আর খবর পাঠাবো। আর কি-ই বা খবর আছে। তবুও দেবেন আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে আবার এখানে ডিউটি পড়লে।

না, না, খুব বিশ্বাসী।—এই দেখুন না, কাল রাত্রে এই আনন্দবাজার'খানা লুকিয়ে দিয়ে গেছে।—বলে তিনি ব্যাপারের নীচে থেকে একখানা 'আনন্দবাজার' সত্যিই বার করলেন। সত্যিই দেখলাম তার তারিখ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২ সাল।

বিনাবাক্যে একটু চোখ বুলিয়ে নিলাম। বাইরের সংবাদ কিছু সংগ্রহ করা গেল, সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্যও। পুরস্কার-স্বরূপ দিবাকর বাবুকে খুশী করে দিলাম: আচ্ছা, ঠিক আছে। প্রয়োজন হলেই জানাবো আপনাকে। আর জানাবোই বা কি? চিঠিই দিয়ে দোব আপনার হাতে, আপনি মাধব সিংকে দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন, কেমন? আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে, আপনাকেই শুধু চিনে রাখুক। পরিচিতের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কি, কি বলেন?

খুব খুশীভরা মন নিয়ে উঠে গেলেন গোয়েন্দা-রাজবন্দী দিবাকর সেনগুপ্ত। ভাবলেন, এইবার কাজ দেখাবার একটা মওকা পাওয়া গেল। যোগিনী বোস বা জিতেন ধর এবার খুশী না হয়েই পারেন না।

খুশী আমিও হলাম ওঁর মূর্খতা অনুভব করে। গোয়েন্দা পুলিশ বিপ্লবীদের সঙ্গে বুদ্ধি বা কূটনৈতিক চালের লড়াইতে কোনো দিনই জয়লাভ করতে পারে না, যদি না বিপ্লবীদেরই অন্তরঙ্গ কেউ ওদেরকে সাহায্য করে সংবাদ সরবরাহ করে। ঢাকার মেডিক্যাল স্কুলে লোম্যান ও হাঁডসন গুলীবিদ্ধ হবার পরই বিনয় স্কুলের রেলিং টপকে নীচে খালে নেমে পড়ে। খালে হাঁটু-সমান জল পার হয়ে সে দৌড়ে গিয়ে ওঠে এক মুসলমানের কুঁড়ে ঘরে। সেখান থেকে তার বন্ধুরা সেই দিনই গভীর রাত্রে নৌকাযোগে তাকে পাঠিয়ে দেয় নদী-পথে চাঁদপুরে। প্রায় সাড়ে তিন মাস পর বিনয় পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস-এ। আর্মানীটোলার মেসে বিনয়ের রুম-মেট ছিল গোপাল সেন। গোপালকে গ্রেপ্তার করে তার ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালায় ঢাকার আই-বি পুলিশ। কিন্তু একটি কথাও প্রকাশ করেনি সে। তাই লোম্যান-হাডসন-সিম্পসন-গার্লিক প্রভৃতির ওপর যে গুলীচালনা হয়, তা নিয়ে পুলিশ কোনও ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করতে পারেনি, যদিও এ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করেছে অনেককে এবং নিশ্চয়ই আই-বি অফিসে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে জামাই-আদর দেখায়নি! তবুও পারেনি। কারণ বি-ভি বিপ্লবী দলে দিবাকর সেনগুপ্ত নেই!······

ফেব্রুয়ারী মাস পড়লে কি হবে, শীতের যেন আর কমতি নেই! হালিম এসে জানালার চিকখানা ভালো করে ফেলে দিয়ে গেল বটে, তবুও আপাদমস্তক লেপ ঢাকা দিয়েও যেন ঠাণ্ডা মনে হতে লাগলো। তরণী সোমের নাসিকা-ধ্বনি সুরু হয়ে গেছে। অন্যান্য সবাইও নিদ্রামগ্ন। দিবাকর বাবু যথারীতি তার কোন্ আত্মীয়কে চিঠি লেখা সুরু করলেন। আত্মীয় যে কে, তা বোঝবার ক্ষমতা উনিশ বছর বয়েস হলেও আমার হয়েছে। আজকের সারা দিনের ডায়েরী লেখা হচ্ছে এবং কালই হয়তো আমার একটা কাজের ছুতো করে যাবেন অফিসে আর ওখানা পাঠিয়ে দিয়ে আসবেন যথাস্থানে। উল্লসিত হয়ে নিশ্চয়ই আজকে আমার কথাও লিখেছেন। লিখুন। ওতে ঘাবড়াবার ছেলে নই আমি।

কারণ, গত বছর আলিপুরের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর গুণেশ সেনের রিভলভার তাঁর ড্রয়ার থেকে উধাও হয়ে যাবার ব্যাপারে যখন আমায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তখনই কলকাতার এস-বি,

অর্থাৎ গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চের সঙ্গে আমার সম্যক্ পরিচয় ঘটে গেছে। বয়লার-ঘর তখনই ঘুরে এসেছি।...

গ্রেপ্তারের দিনের কথা মনে পড়ে। সন্ধ্যার পর যথারীতি ব্যায়াম সেরে ভবানন্দ রোডের আমাদের বাড়ীর সামনে সাইকেলে এসে নামলাম এবং অভ্যাস মতই রাস্তাটার একবার এদিক্ আর একবার ওদিক দৃষ্টি প্রসারিত করে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। গা-ঢাকা দেবার মতো পরিস্থিতি তখনো দেখা দেয়নি।

জানুয়ারী মাস। এদিকে তখন দু'-চারখানা মাত্র বাড়ী উঠেছে। প্রায়ই ফাঁকা মাঠ। তাই বেশ শীত।

বেড়ার গায়ে সাইকেলখানা হেলান দিয়ে রেখে সোজা রান্নাঘরে ঢুকে পড়লাম। দেখলাম, ভাগ্য সুপ্রসন্ন, ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। সেজ বৌদি চা তৈরী করছেন। মেজ বৌদি আর সোনা বৌদিও বেশ জমিয়ে বসেছেন। শুধু চা যে খেতে নেই, এ জ্ঞানটা মেজ বৌদির ভারী টনটনে, তাই তিনি তাড়াতাড়ি ভাঁড়ার-ঘর থেকে এক মুঠ মুড়ি এনে দিলেন।

চায়ের আসর বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় বাইরে কার কণ্ঠ শোনা গেল: দ্বিজেন বাবু বাড়ী আছেন? দ্বিজেন বাবু—

বন্ধু যে নয়, তা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম। বন্ধুরা বাবু বলে না, আর কণ্ঠও অপরিচিত। সাড়া দিলাম: যাচ্ছি, দাঁড়ান।

চা-মুড়ি শেষ করে বাইরে এসে দেখি সত্যিই অপরিচিত এক ভদ্রলোক। বললেন অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করে: একটু আসুন, এক মিনিট।

রাস্তায় পড়তেই দেখলাম, তিনি আড়ামোড়া তোলার ছলে কৌশলে রাস্তার একবার এদিকে আর একবার ওদিকে হাতছানি দিয়ে কাদের ইসারায় ডাকলেন এবং পর-মুহূর্ত্তেই প্রায় বারো-চৌদ্দ জন পুলিশ এসে আমায় ঘিরে ফেললো। তৎক্ষণাৎ বন্ধুর এক মিনিটের তাৎপর্য্য জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

দারোগা প্রফুল্ল মণ্ডল এস-বির চাকুরে। তাই ভারী মিষ্টি তাঁর কথা: অত্যন্ত দুঃখিত দ্বিজেন বাবু! আপনার বাড়ীটা একবার সার্চ্চ করতে হবে।

সার্চ্চ হলো তন্ন-তন্ন করে। ওদের নজর দেখা গেল বিশেষ করে ভাঁড়ার-ঘরে এবং ভাঁড়ার-ঘরের হাঁড়িকুঁড়ির প্রতি। যথারীতি কিছুই পাওয়া গেল না। এবার মণ্ডল মশাইয়ের কণ্ঠস্বর আরো মোলায়েম: দ্বিজেন বাবু, আপনাকে একটি বার পাঁচ মিনিটের জন্য থানায় যেতে হবে আমার সঙ্গে।

কেন?

এই একটা বিবৃতির জন্য। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন মাত্র। পাঁচ মিনিটের ব্যাপার!—বলে মণ্ডল ব্যাপারটার গুরুত্ব একেবারে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলেন।

শীতের রাত। সন্ধ্যে হতেই রাতের রান্না শেষ হয়ে যায়। বৌদিরা তাঁদের দেবরকে খুব ভালো রকম চেনেন। তাই মেজ বৌদি বললেন: এই মাছের ঝোলটা নামছে, একেবারে খেয়েই যাও। পাঁচ মিনিট মানে পাঁচ ঘণ্টাও তো হতে পারে!

পাঁচ মিমিট যে সত্যিই মাত্র তিনশো সেকেণ্ড, মণ্ডল আর একবার সেই সত্যটা উচ্চারণ করে বৌদি'র প্রেরটা সহজ করে দেবার চেষ্টা করলেও দেখা গেল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে খেতে দেবার আপত্তি তাঁর খুব প্রবল নয়।

দাদারা কেউ তখনো বাড়ীতে ফেরেননি। তাই সেজ বৌদিই অগ্রণী হয়ে মণ্ডলকে ঘরে গিয়ে বসতে বললেন। কিন্তু মণ্ডল বোধ হয় মারাত্মক আসামীকে রান্না-ঘরে রেখে স্বস্তি পাবেন না, তাই এই প্রচণ্ড শীতেও বাইরে উঠানেই অপেক্ষা করা শ্রেয় মনে করলেন। বারো জন পুলিশ চব্বিশটি চক্ষু চতুর্দ্দিকে মেলে রেখে সতর্ক পাহারায় দাঁড়িয়ে রইলো।

কাছেই টালিগঞ্জ থানা। পাঁচ মিনিটের জন্য সেখানে এনে একটি কক্ষে বসিয়ে রেখে অপর কক্ষ থেকে প্রফুল্ল মণ্ডল টেলিফোনে যে কথা ক'টি বললেন, তাতেই পরিষ্কার আমার অবস্থাটা জানা গেল।

—হ্যালো, শুনুন, দ্বিজেন বাবুকে এখানে এনেছি।...না, কিছুই পাওয়া যায়নি।...সঙ্গে আর কেউ ছিল না—একা।...অ্যাঁ, কোথায়? ভবানীপুরে? কাল সকালে ওখানে?...রায় বাহাদুর কথা কইবেন?—আচ্ছা।

তার পর ভবানীপুর থানায় রাত্রিবাস এবং তার পর দিন-পনেরো থাকতে হলো পার্ক স্ট্রীট থানায়। সেখান থেকে লর্ড সিংহ রোডে প্রত্যহই যেতে হতো পুলিশ ভ্যানে এবং সারা দিন অঙ্গ সংবাহনের পর ফিরে আসতাম সন্ধ্যার পর। সেখানকার আদর-আপ্যায়ন সীমাহীন হয়ে উঠলো তখন, যখন অকস্মাৎ এক দিন দেখলাম রায় বাহাদুর বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কক্ষে আমার তলব পড়লো।

বনবিহারীর এক চক্ষু একটি প্লেট ঝুলিয়ে ঢাকা। অসুখ নয় কিছু। পরে জেনেছিলাম, ওটা না কি স্কটল্যাণ্ডীয় কৌশল, এক চোখ ঢেকে রাখলে সে লোককে দু' চোখ খোলা অবস্থায় দেখলে চেনা কঠিন। বিপ্লবীরা যাতে তাঁকে চিনে না রাখতে পারে, তাই অসুখের ভাণ।

কিন্তু আশ্চর্য্য তাতে কিছু হইনি। চমকে উঠলাম তখন, যখন দেখলাম, তাঁর সমুখের একখানা চেয়ারে কাঁচুমাচু মুখ করে বসে আছে গুণেশ সেনের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ বিমল সেন।

চেন একে?—বনবিহারীর ক্রুদ্ধ প্রশ্ন শোনা গেল।

মেঝের দিকে চেয়ে বিমল মৃদুস্বরে জবাব দিল: চিনি।

তুমি এর হাতে রিভলভারটা এনে দিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

চমকে উঠলাম: বলিস্ কি রে?

জবাব দিলেন বনবিহারী: হ্যাঁ, এমনিই সব বলছে। ভেবে কিছুই জানি নে আমরা? শোন তবে।—বল তো, কি করে দিলে

মাথা নীচু করে শ্রীমান্ বিমল কুটি-কুটি করে বেশ বলে যে লাগলো: সন্ধ্যার পর সাইকেলে এসে উনি রাস্তায় অপে করছিলেন। আমি বাবার ড্রয়ার খুলে রিভলভারটা ও কার্তুজগু একটা সাবানের বাক্সে ভরে নীচে এনে ওঁর হাতে দিয়ে যাই। উ চলে যান।

এবার?—গর্জ্জে উঠলেন রায় বাহাদুর: কি বলবার আ তোমার? চালাকী পেয়েছ? We have got report all your activities from Dacca—ভেবেছ আমরা সংব রাখি নে।—বল, চুপ করে থেকে লাভ নেই।

বললাম : কি আর বলবার থাকতে পারে!

হ্যাঁ, সত্যিই তাই, বলবার আর কিছু নেই।—এবার লক্ষ্মী ছেলেটির মতো ওটা বার করে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। আর তা নইলে, there will be a big conspiracy case against you and you shall get transportation for life। যান, নিয়ে যান। শুনুন প্রফুল্ল বাবু, ওকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিন। সব বলে দেয় ভালই। নইলে ঐ ডালহৌসী ষড়যন্ত্র মামলাটায় একেও জুড়ে দিন, বুঝলেন?

যে আজ্ঞে।—বলে মণ্ডল মশাই আমায় নিয়ে বেরিয়ে এসে প্রবেশ করলেন সোজা মণি বোসের কক্ষে। বাংলার, বিশেষ করে কলকাতার বিপ্লবীদের সঙ্গে মণি বসুর সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই ঘটেছে একবার অথবা একাধিক বার। কোটর থেকে বেরিয়ে-আসা সেই বিরাট্ ডেলার মত দু'টি চোখ আর গরুড়ের মতো নিম্নমুখী-অগ্রভাগ নাসিকা আর মা-বাবা থেকে সুরু করে ঊর্ধতন সব ক'টি পুরুষেরই উদ্দেশ্যে বাছা-বাছা গালিবর্ষণ, বাংলার, বিশেষ করে কলকাতার প্রত্যেক বিপ্লবী বন্দীরই স্মৃতিপটে চিরকাল জেগে থাকবে।

তাঁর বিখ্যাত কোটরে শুধু হাণ্টারই থাকতো না, মণি বসু এক গ্লাস জলও রাখতেন রেডি করে। কারণ জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্য জলের প্রয়োজন হতে পারে। দূরদর্শী ও সাবধানী। আমরা এই বিশেষ ঘরটিকে বলতাম বয়লার আর এই অগ্নি-পরীক্ষায় যে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসতো, তাকে বলা হতো বয়লার-প্রুফ!

বিমল মুখের ওপর স্বীকারোক্তি করলে কী হবে, দ্বিজেনে সে উক্তির প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল না! তাই প্রায় চার মাস বিচারাধীন আসামীরূপে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করে রাখবার পর আমায় মুক্তি দেয়া হলো কোনরূপ বিধি-নিষেধ আরোপ না করে। পুলিশের আশা ছিল, ছেড়ে দিয়ে কিছু দিন পেছনে ফেউ লাগিয়ে রাখলেই রিভলভারের গুদামের সন্ধান পাওয়া যাবে।···

এর পর ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরে কর্ণেল পেডিকে গুণেশ সেনের বাড়ী থেকে চুরি-করা সেই রিভলভারটি দিয়েই যে হত্যা করা হয়েছে, পুলিশ কোনও সূত্রে সে সংবাদ জানতে পেরে ১১৩২ সালের এই ফেব্রুয়ারী মাসেই ঢাকা জেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে।

দেখা হতো জেলের অফিসের একটি নিভৃত কক্ষে। কে এসেছিলেন, ঠিক মনে নেই। তবে আই-বি দারোগা প্রমোদ দাশগুপ্ত হতে পারেন।

ভারী সহানুভূতি দেখালেন : এই তো গেল তোমার ভবিষ্যৎ, তোমার সমগ্র জীবন। গভর্ণমেণ্ট confirmed করে দিয়েছে মানেই অন্ততঃ দশটি বৎসর। মানে, জেল থেকে বেরুবে উনত্রিশ বৎসর বয়সে। কি করবে তখন? বাবা খেতে দেবে, না দিতে পারবে তোমার ঐ সত্য গুপ্ত আর হেম ঘোষ?···ভারী দুঃখ পাই তোমার মত ব্রাইট ইয়ংম্যানকে আটকে রাখতে। কিন্তু কি করবো, তুমি নিজেই যে বাধ্য কর।

চট করে প্রশ্ন করলাম : কি রকম?

প্রমোদ বাবু বিস্ময় প্রকাশ করলেন : কি রকম! সে বার গুণেশ সেনের রিভলভার তুমি বলেছিলে নাওনি। তা'হলে মেদিনীপুরে তা কি করে গেল, সেই রিভলভারেরই গুলীতে কর্ণেল পেডি কী করে নিহত হলেন?

নির্বিবাদে বলে ফেললাম : বোধ হয় মেদিনীপুরের কেউ টাকা দিয়ে বিমলের কাছ থেকে ওটা সংগ্রহ করেছিল।

দু' চোখ কপালে তুললেন প্রমোদ বাবু : মেদিনীপুরের কেউ! বল কি? জানি আমরা যে, মেদিনীপুরের এই সন্ত্রাসবাদী দলের গোড়া পত্তন করেছে বি-ভি ঢাকা থেকে গিয়ে। বি-ভির এক জন পাকা সংগঠক সেখানে ছিল। তার নাম বলবো না। কথা হচ্ছে, ওটি নিয়ে তুমি দিয়েছ, আর সে চালান করেছে মেদিনীপুরে। তাই নয় কি?

বিরক্ত বোধ করলাম। এটা আর লর্ড সিংহ রোড নয় আর মণি বোসের বয়লারের সমুখে আসিনি এখন যে, সমঝে চলতে হবে। বললাম : আমার সময় নেই আপনার সঙ্গে বক্-বক্ করবার। কাজ করবোই, কিন্তু সে কাজের হদিস্ পাওয়া আপনাদের সাধ্যি নেই। তাই তো পরাজিত হয়ে অবশেষে করলেন রাজবন্দী। পাঠান না দেখি দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে একবার জেলে কয়েদী করে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে। বুঝবো আপনার হিম্মৎ কতখানি!

গট গট করে বেরিয়ে এলাম। ফল এই দাঁড়ালো যে, তার দিন চারেক পরই স্থানান্তরের হুকুম এলো বহরমপুর বন্দীশিবিরে। এক দিন আরও তিন জন রাজবন্দীর সঙ্গে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল ছেড়ে ফুলবাড়ী ষ্টেশনে (ঢাকা ষ্টেশনের নাম) ট্রেণে চেপে বসলাম।

[ক্রমশঃ।

যা কিছু ভাল

ভাল　আরম্ভ হ'লে, শেষটাও ভাল হয়।

ভাল　কাজ কখনও হারিয়ে যায় না।

ভাল　উদাহরণই হ'ল শ্রেষ্ঠতম মন্ত্র।

ভাল　মুখাকৃতিই মানুষের পরিচয়-পত্র।

ভাল　মুখাকৃতির মানুষকে ঢাক পিটোতে হয় না।

ভাল　লোক একটা ভেড়ার চেয়ে বেশী ক্ষতি করে না।

ভাল　অস্ত্রোপচারকের ঈগলের মত চক্ষু হওয়া চাই। সিংহের মত অন্তঃকরণ এবং নারীদের মত হাত হওয়া চাই।

—বাইবেল থেকে অনূদিত।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

শ্রীযামিনীমোহন কর

বৃটিশ সৈন্যবাহিনী মরছে, কেবল যুদ্ধে নয়, আহত অবস্থায় হাসপাতালে। চিকিৎসার অভাবে, ওষুধ-পথ্যের অভাবে, সেবার অভাবে। স্কুটারি হাসপাতাল কেবল নামেই হাসপাতাল, নরকেরই রূপান্তর। লণ্ডনের ধনীর দুলালী, সোসাইটির মধ্যমণি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে দেবদূতীর মত গেলেন সেই নরকে, সেবা-যত্ন দিয়ে, ওষুধ পথ্য দিয়ে মৃত্যুর কবল থেকে অসহায় আহতদের রক্ষা করতে, তাদের কষ্ট-যন্ত্রণা লাঘব করতে।

কিন্তু ভাল করতে চাইলেই কি মানুষ তা করতে দেয়? সৈন্যবাহিনীর ডাক্তার এবং অফিসাররা প্রতি পদে বাধা দিতে থাকেন। তাঁরা থাকতে একটি রমণী এসে কর্তৃত্ব করবে! অসহ্য! তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। কথায় কথায় অপমান। সব কিছুই চন্দন সম অঙ্গে মেখে এই মহীয়সী নারী আহত আর্তদের সেবা করে বাঁচিয়ে তুলতে লাগলেন। তিনি করলেন আধুনিক হাসপাতাল ও নার্সিংএর গোড়াপত্তন। আজ সর্ব্বদেশে যে সকল হাসপাতাল দেখা যাচ্ছে, শিক্ষিতা নার্সরা সেবা করছে, এ সব সম্ভব হয়েছে কেবল তারই জন্য। সেদিনকার অপমানিতা নারী আজ বিশ্বপূজ্যা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। প্রদীপ হাতে ঘুরে পীড়িত, আহত সৈনিকদের মনে আশার প্রদীপ জ্বেলে জগদ্বিখ্যাতা হয়েছেন "লেডি অব দি ল্যাম্প" নামে।

ফ্লোরেন্স নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁর নাম রাখা হয় ফ্লোরেন্স। ধনীর কন্যা, অতি আদরিণী। লেখাপড়া শিখেছিলেন প্রচুর। সঙ্গীতজ্ঞা হিসেবেও সুনাম ছিল। অনেকগুলি ভাষা জানতেন। সুন্দর চিঠি লিখতে পারতেন। দেশ-বিদেশ ভ্রমণের বিশেষ বাতিক ছিল। আর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা, অতি কোমলহৃদয়া ছিলেন। কারো দুঃখ-কষ্ট দেখতে পারতেন না। আত্মীয়-স্বজন— যারই অসুখ করত, তিনি গিয়ে সেবা করতেন। অশেষ গুণবতী মেয়েকে মা বুঝতে পারতেন না। কত রকম অনুযোগ করতেন রোগীর সেবা করা নিয়ে। ফ্লোরেন্স হেসে উত্তর দিতেন,—"নারীর ধর্মই সেবা করা।"

কিন্তু কেবল আত্মীয়-স্বজনের সেবা করলেই কি [illegible] সেবা করা হল? এই প্রশ্ন তাঁকে বার বার পীড়া দিতে লাগল। তখনকার হাসপাতাল সমূহ দেখে তিনি শিউরে উঠলেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের 'সারা'র চরিত্র গল্প-কথা নয়, [illegible] থেকে নেওয়া। তখনকার দিনের নার্স মাতাল, লম্পট এবং অপদার্থ হত। সব কাজের অযোগ্য বুড়ীরাই নার্স বা ধাত্রী হত। তিনি ঠিক করলেন নার্সদের শিক্ষিত করে সুষ্ঠু ভাবে হাসপাতাল চালান প্রয়োজন। পথপ্রদর্শক কই? স্থির করলেন, তিনি নিজে নার্স হয়ে আরও পাঁচ জন ভদ্রঘরের মেয়েকে এই কাজে যোগদান করতে অনুরোধ করবেন। বাপ-মা খাপ্পা হয়ে উঠলেন। সমাজ [illegible] রাঙ্গাল। কিন্তু তিনি নিজ লক্ষ্যে অটল।

প্রথমে তিনি কাজ নিলেন হার্লে ষ্ট্রীটের এক সেবা-সদনে। তখন ইংরেজ সৈন্যবাহিনী ক্রিমিয়ায় যুদ্ধ করছে। স্কুটারিতে তুর্কিরা সামরিক হাসপাতালের জন্য কয়েকটা বাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু রণক্ষেত্র থেকে সেখানে পৌঁছতে সময় লাগে আট দিন, যেতে হয় জাহাজে। কত লোক পথেই মারা যেত, কারণ জাহাজে রোগীর সেবা-পরিচর্য্যার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। হাসপাতালে পেন্সন-ভোগী অশীতিপর বৃদ্ধদের সেবার কাজে লাগান হয়েছিল। সেখানে কোনরূপ বন্দোবস্ত ছিল না। বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর উর্দ্ধতন অফিসারদের চরম গাফিলতী। তাঁরা ওষুধ ও ব্যাণ্ডেজ পাঠাতে ভুলে গেছেন। অথচ হাসপাতালে রোগী ও আহত সৈন্য ভরা। যে ঘরে দশটা সুস্থ লোক থাকতে পারে না, সেখানে পঞ্চাশটা রোগী। মৃত্যু অনিবার্য্য। ফ্লোরেন্স এই সব খবর নিত্য কাগজে পড়েন, আর মর্ম্মপীড়িত হতে থাকেন। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে তিনি সামরিক কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে আর্তদের সেবার জন্য তিনি স্কুটারীর হাসপাতালে যাবেন।

সামরিক কর্তারা তো মহা খাপ্পা। এক জন মেয়েছেলে তাঁদের ভুল ধরছে। সে যাবে কি না সেখানে কর্তৃত্ব ফলাতে? অসম্ভব! মেয়েছেলে আবার নার্সিং করবে কি? যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তো ভয়েই মারা যাবে। সাফ জবাব দিয়ে দিলেন—"ও-সব চলবে না।" কিন্তু সেই সময় এক ব্যাপার ঘটল যাতে নার্সিং-জগতে যুগান্তর আনল। পার্লামেণ্টের সভ্য মিষ্টার সিডনী হার্ব্বার্ট ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। তিনি নিজের ইচ্ছার কথা তাঁদেরও জানালেন। আরও জানালেন যে, খরচপত্র সরকারকে দিতে হবে না, তিনি নিজের গাঁট থেকে দেবেন। মিষ্টার হার্ব্বার্ট উত্তরে জানালেন যে, সরকারের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়েছে। তাঁরা তাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেছেন। উপরন্তু তাঁর অভিযানের সমস্ত খরচ সরকার বহন করবেন। সামরিক কর্তৃপক্ষকেও সেই কথা জানিয়ে দেওয়া হল। ফ্লোরেন্স মিষ্টার হার্ব্বার্টকে একটা পরিচয়-পত্র লিখে দিতে অনুরোধ করলেন, [illegible] হিসেবে নয়, শিক্ষাপ্রাপ্তা অভিজ্ঞা নার্স হিসেবে। তিনি জানতেন যে, সামরিক কর্তারা তাঁকে পদে পদে অপদস্থ করবার চেষ্টা করবেন।

মিস্ নাইটিঙ্গেল যা অনুরোধ করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশী পেলেন। তাঁর পরিচয়-পত্রে লেখা হল—তুর্কে অবস্থিত বৃটিশ হাসপাতাল সমূহের মহিলা নার্সিং প্রতিষ্ঠানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। শিক্ষিতা-অশিক্ষিতা, ভাল-মন্দ যা পেলেন কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ৩৮ [illegible] নার্স সহ তিনি যাত্রা করলেন। সঙ্গে যত রকম জিনিষ দরকার মনে হল নিয়ে চললেন। তিনি স্কুটারীর অব্যবস্থার কথা [illegible]

…ন্যাতেন। প্রচুর ওষুধপত্র, ব্যাণ্ডেজাদি পাঠান হয়েছে, কিন্তু মাল আছে এক জায়গায় আর আহতেরা আছে অন্যত্র। ১৮৫৪ …দের নভেম্বর মাসে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে পৌঁছলেন।

এসে চমকে উঠলেন। হাসপাতাল সমূহে কি নারকীয় দৃশ্য! রোগীদের শোবার বিছানা পর্য্যন্ত নেই। ছারপোকা, আরশুলা, ইঁদুরে ঘর ভরা। সেবার পরিবর্ত্তে প্রথম কাজ হল ইঁদুর মারা। তার পর বাড়ী-ঘর ধোওয়া। রোগীদের জামা-কাপড় কাচা। নার্সের কাজ নয়, ঝিয়ের কাজ। কিন্তু উপায় কি! তার পর রাঁধুনীর কাজে হাত দিলেন। অখাদ্য খাবার, এক জন মাত্র পরিবেশক আর অসংখ্য রোগী। প্রথম লোক দশটায় খাবার পেলে শেষ ব্যক্তি পায় বেলা তিনটায়। তিনি দল-বল নিয়ে রান্না ও পরিবেশনের ভার নিলেন। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ পেশ করতে লাগলেন।

দলে দলে আহতেরা আসছে। কারো হাত নেই, কারো পা নেই, কারো চোয়াল চূর্ণ হয়ে গেছে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, ধরে ছট্‌ফট্ করছে। অস্ত্রোপচারের পৃথক ঘর পর্য্যন্ত নেই। এক জনের চোখের সামনেই আরেক জনের ওপর অস্ত্র চালান হচ্ছে। চীৎকার করছে, মরছে। ভয়ে কয়েক জন হার্টফেল করছে। ফ্লোরেন্স বিছানার চাদর দিয়ে পর্দা টাঙিয়ে কিছুটা সভ্য করবার চেষ্টা করলেন। দেশে লিখে পাঠালেন বিশদ ভাবে হাসপাতালের দুর্দ্দশা ও অব্যবস্থার কথা। অনুরোধ করলেন কিছু টাকা পাঠাতে। চাঁদা করে কনস্তান্তিনোপলে বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের কাছে টাকা পাঠান হল। ফ্লোরেন্স টাকা চাইতে তিনি উত্তর দিলেন য়ে, ও টাকায় পেরাতে একটা সুন্দর গির্জ্জা তৈরী হবে। হাসপাতালে টাকা দেওয়ার কথা উঠতেই পারে না, কারণ স্কুটারীর চীফ মেডিক্যাল অফিসার জানিয়েছেন তাঁর কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই, কোন কিছুরই অভাব নেই। আহতেরা রণক্ষেত্র থেকে আসছে—ছিন্ন কাপড়-জামা, প্রায় উলঙ্গ অবস্থায়। সেরে ওঠবার পর বাইরে যাবার উপায় নেই। কাপড়-জামা কোথায়! অথচ কর্ত্তৃপক্ষ জানিয়ে দিলেন কোন কিছুরই তাঁদের প্রয়োজন নেই। হীনতারও একটা সীমা আছে!

বৃটিশ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় এইখানেই শেষ নয়। শীতের প্রকোপে শতকরা ত্রিশ জন আহত মারা গেল। ফ্লোরেন্স অনুরোধ, ভিক্ষা, মিনতি সবই করলেন, কিন্তু অফিসার তাঁকে একটি গরম জামা পর্য্যন্ত দিলেন না অথচ গুদামে তখন ২৭০০০ গরম শার্ট পচছে। তাঁর এক উত্তর—বোর্ডের মিটিংএ পাশ না হলে দেওয়া যাবে না। এ কেবল গরম জামার ব্যাপারে নয়, পথ্য-পথ্যের ক্ষেত্রেও ঐ এক ব্যবস্থা। মিটিংএ পাশ করতে হবে। মিটিং চট করে হচ্ছে না কেন? এ তো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার! উত্তর—কর্ত্তাদের সময় হলে হবে। মনুষ্যত্বের এমন অবমাননা …ল। এ তো হত্যার সামিল।

অবশ্য অনেক চিঠি লেখালিখির পর হাসপাতালের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরে ফ্লোরেন্সের নামে সোজাসুজি পাঠান হতে লাগল। তাঁর অধীনে কাজ চলতে লাগল সুন্দর সুষ্ঠু ভাবে। অনেক উন্নতি হল হাসপাতাল সমূহের। যেমন অক্লান্ত পরিশ্রম, তেমনই প্রাণ-ঢালা সেবা। এক জন পরিদর্শক ক্রিমিয়া ঘুরে এসে বললেন,—"দু'জনকে দেখলুম—ভগবান আর ফ্লোরেন্স। তাঁদেরই কৃপায় আহতেরা রক্ষা পাচ্ছে।"

কিন্তু যতই ফ্লোরেন্সের জয়জয়কার হচ্ছে, সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ততই চটে উঠছেন। "একটু গরম জল চাই" ফ্লোরেন্স জানালেন। "হবে না"—কর্ত্তৃপক্ষ উত্তর দিলেন, "নিয়ম-বহির্ভূত।" ঘরে আগুন জ্বালাতে হবে, ভয়ানক ঠাণ্ডা। রোগীরা মরে যাচ্ছে। হবে না, নিয়ম-বহির্ভূত। একটু দুধ দিলে ভাল হয়। হবে না, নিয়ম-বহির্ভূত। বর্ব্বর বৃটিশ রেড টেপিজমের চূড়ান্ত। শেষ অবধি ফ্লোরেন্স জয়ী হলেন। সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করলেন মনের জোরে—কাজের জোরে।

ওদিকে বিলেতে তাঁকে নিয়ে হৈ-হৈ পড়ে গেছে! কত কবিতা, কত নাটক লেখা হয়েছে তাঁকে নায়িকা করে। মেয়েদের নামকরণ, পথ-ঘাট, জাহাজের নামকরণ সব হচ্ছে তাঁর নামে। ডাকটিকিটে তাঁর ছবি ছাপা হল। একটা বিরাট কাণ্ড সৃষ্টি করা হয়েছে চাঁদা তুলে, তাঁর হাতে তুলে দেবার জন্য। তিনি যুদ্ধশেষে দেশে ফিরবেন। সরকার থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হল যুদ্ধের জাহাজ, সামরিক ব্যাণ্ড। ডক থেকে সহর পর্য্যন্ত সাজানো হল পুষ্প-তোরণে, আলোকমালায়। অভ্যর্থনার জন্য সে কি রাজকীয় ব্যবস্থা! ফ্লোরেন্স চিরকালই লাজুক প্রকৃতির। "মিস্ স্মিথ" ছদ্মনামে এক অখ্যাত জাহাজে চড়ে তিনি চলে গেলেন নিজের গৃহে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রেহাই পেলেন না।

বৃটিশ সরকার তাঁকে হাসপাতাল সমূহ গড়ে তোলবার ভার দিলেন। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আজ সমগ্র জগতে আধুনিক হাসপাতাল ও শিক্ষিতা নার্স রয়েছে। সৈন্যবাহিনীর স্বাস্থ্যের জন্য আজ যে অপূর্ব্ব ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়, তা তাঁরই সৃষ্টি। বিশ্ববিখ্যাত রেড ক্রশ সোসাইটী তাঁরই কল্পনাপ্রসূত।

অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ল। লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন নিজ গৃহে। কিন্তু তিনি অমর। সমগ্র জগতের হৃদয়ে তাঁর স্থান। তিনি যেন রূপকথার নায়িকা, দেবীস্বরূপা। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর অন্তিম বাক্য আজ জগতে প্রবাদরূপে বিখ্যাত—"আর্ত্তের সেবাই পরম ধর্ম্ম।" প্রাচ্যের বহু দিনের পুরানো নীতি পাশ্চাত্য-জগৎ মেনে নিল।

বিশ্বের নারী-আন্দোলন

কবরী বসু

আজ বিংশ শতাব্দীর যুগে দাঁড়িয়ে চার দিকে তাকিয়ে আমরা নারীকে দেখছি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি চলতে। সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাষ্ট্রিক, রাজনৈতিক সব জায়গাতেই আমরা আজ নারীকে দেখছি নিজ গৌরবে, নিজ অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিতা। এখন আমরা কথায় কথায় তর্ক করি, বলি, মেয়েরা পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু মেয়েদের এ অধিকার এক দিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বহু সংগ্রাম, বহু কষ্ট-স্বীকারের পর মেয়েদের দাবী আজ স্বীকৃত হয়েছে।

পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাস আলোচনা করলে একটা জিনিস আমরা দেখতে পাই যে, সব দেশেই এক সময়ে নারীরা পুরুষের একচ্ছত্র কর্তৃত্বাধীনে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় দিন কাটাত। তাদের নিজেদের কোনো স্বাধীনতা বা মতামত ছিল না, কলের পুতুলের মত তাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যেমন চালাত, তারা

তেমনই চলত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বাধীন চিন্তা করার মত শক্তিও যেন তাদের ছিল না। আজ যে পাশ্চাত্য দেশগুলোর নারীপ্রগতি আমরা অনুকরণ করার চেষ্টা করছি, তাদের অবস্থাও ভারতবর্ষের নারীসমাজের চেয়ে কোনো অংশে উন্নত ছিল না। সোভিয়েট ইউনিয়নের কথাই ধরা যাক্। যে সোভিয়েট দেশ আজ সব দিক দিয়ে এত উন্নত, জারের সময় পর্যন্ত সে-দেশের মেয়েরা রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কোনো রকম অধিকার পায়নি। তারা ছিল স্বামীর কেনা বাঁদী, স্বামীরা ইচ্ছা করলে অন্যের কাছে স্ত্রীদের বিক্রী করে দিতে পারত। বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতিও তারা পেত না সহজে। রাস্তায় বেরোবার স্বাধীনতা মেয়েদের ছিল না। শিক্ষার দরজা তাদের কাছে ছিল বন্ধ। সন্তানসম্ভবা নারীরা তখন ছিল ঘৃণার পাত্রী, অনেক স্থানে তাদের জঙ্গলে সন্তান প্রসব করতে বাধ্য করা হত। এমনি ছিল রাশিয়ার নারীদের দুরবস্থা। এই অবস্থার অবসান ঘটান লেনিন ও তাঁর স্ত্রী কনষ্টান্টিনোভনা ক্রুপ্‌স্কায়া। ১৯১৭ সালে তাঁরা রাশিয়াতে প্রথম বড় বিপ্লব সৃষ্টি করেন। জারের বিরুদ্ধে তাঁদের মতামত, কার্যকলাপের জন্য তাঁরা সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। সেখানে তাঁদের বিয়ে হয়। তাঁরা এ কথা বুঝেছিলেন যে, নারীদের পূর্ণ সমর্থন ছাড়া কম্যুনিষ্ট-বিপ্লব পূর্ণরূপে সফল হবে না। আর নারীজাতির মুক্তি আসতে পারে অর্থনৈতিক দিক থেকে। যদি নারী স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জন করে নিজের ভার নিজে বহন করতে পারে, তবে পুরুষরা আর তাদের ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ পাবে না। সাম্যবাদের প্রবর্তকরা তাই নারীকে দিলেন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। লেনিনের শাসন-ব্যবস্থায় রাশিয়ার মেয়েরা শিক্ষা পেল, কাজ করার সুযোগ পেল। মেয়েরা যুদ্ধের সময় একসঙ্গে মিলিত হলেন দলে দলে। সেই অশিক্ষিত, পদানত রাশিয়ার নারীসমাজ তখন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে, তাঁরা ট্যাঙ্ক চালিয়েছেন, এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলেছেন, গেরিলা বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ডাক্তার, নার্সের কাজ করেছেন ও অন্যান্য সামরিক অফিসের কাজ করেছেন। যুদ্ধের সময় যখন দেশে পুরুষের অভাব হল, তখন নারীরা কৃষিক্ষেত্রে নানা রকম কাজ করেছেন, ফ্যাক্টরীতে নানা যুদ্ধোপকরণ তৈরী করেছেন, তা ছাড়া ট্রেণ, ট্রাম প্রভৃতি চালানো এবং অন্য সব রকম পুরুষের কাজে তাঁরা সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

এখন সোভিয়েট আইনে আঠারো বছরের যে কোন মেয়ে জাতিধর্মনির্বিশেষে ভোট দেবার অধিকার পেয়েছে। তারা এখন যে-কোন পরিষদে নির্বাচিত হতে পারে। শুধু রাঁধা আর খাওয়া নিয়ে যে মেয়েদের জীবন ছিল, তাতে বাইরের কিছু কাজ করার মত সময় তাদের ছিল না। এ জন্য পরবর্তী যুগে রান্নাটাকে বিশেষ প্রাধান্য না দিয়ে সহরে, গ্রামে হাজার হাজার সাধারণ ভোজনাগার সৃষ্টি ক'রে মেয়েরা সোভিয়েটবাসীকে খাওয়াবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

অন্যান্য দেশে মেয়েরা যতখানি সংগ্রাম করে নিজেদের অধিকার, সুখ-সুবিধা আদায় করে নিয়েছেন, সোভিয়েট রাশিয়াতে কিন্তু দেখি যে রাষ্ট্রই আইন ক'রে মেয়েদের সুবিধা ক'রে দিয়েছে। কারখানায় মেয়েরা বেশী পরিশ্রমের কাজ করে না, সন্তানসম্ভবা নারীদের ওপর সেখানে সজাগ দৃষ্টি দেওয়া হয়। কারখানা-কমিটি কারখানার অর্থ দিয়ে বীমা-ভাণ্ডার গঠন করে অসুস্থ, দুর্ঘটনায় পতিত, চিরস্থায়ী পঙ্গুদের অসময়ে অর্থ সাহায্য করে। সন্তান প্রসবের আগে ও পরে মেয়েরা এ-ভাণ্ডার থেকে অর্থ পায়, মৃতের পরিবারদের অর্থ দেওয়া হয়। মেয়ে শ্রমিক জারের আমলেও ছিল—তাদের অত্যন্ত কম মজুরীতে পাওয়া যেত ব'লে। আজকাল পুরুষ ও মেয়ে শ্রমিক সমান হারেই বেতন পায়। মেয়েরা ওদেশে নানা শিল্পকর্ম, নানা রাসায়নিক কাজ শিখেছেন, তাতে দেশের উৎপাদনী শক্তিও গেছে বেড়ে। মেয়েদের সুবিধার জন্য দেশে অনেক মাতৃসদন, শিশুসদন প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছে। মেয়েরা সে দেশে যৌথ প্রথায় চাষ-বাস করছেন।

জারের আমলে সাধারণ মেয়েরা শিক্ষার মুখ দেখতে পায়নি, শুধু ধনী পরিবারের মুষ্টিমেয় মেয়েরাই শিক্ষা পাবার অধিকারিণী ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পুরুষের অভাব ঘটায় মেয়েদের সব রকম কাজে নিযুক্ত করতে বাধ্য হওয়ায় সাধারণ মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বেড়ে গেল, এর ফলে মেয়েরা ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক, শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি হয়ে উঠলেন। মেয়েরা তখন এত উন্নতি করেছিলেন যে, জগতের সর্বপ্রথম মহিলা রাজদূত হলেন এক জন রুশ মহিলা মাদাম কোলোনটায়। ইনি বহু দিন সুইডেনে প্রতিনিধিত্ব করেন। নারী অধ্যাপক সোফিয়া কোভালেভস্কায়ার যশও কোনো অংশে কম নয়। গৃহকোণ থেকে বাইরের মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে সোভিয়েট মেয়েরা প্যারাসুট থেকে লাফানো, নৌকা-দৌড়, ফুটবল, ভলিবল, টেনিস, স্কিপীং, স্কেটিং, বক্সিং, জল-পোলো, ভার উত্তোলন, সাঁতার কাটা, বন্দুক ছোঁড়া, নানা রকম খেলাধূলায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। নানা রকম সংগীত-চিত্রকলা চক্র প্রভৃতিতে, সংবাদপত্র-জগতে, রাজনৈতিক-জগতে, সাহিত্য-জগতে সর্ববিষয়ে তাঁরা সমান অংশ গ্রহণ করছেন।

সোভিয়েট নারী-পুরুষে অবাধে মেলামেশা করতে পারে, কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য যে, পৃথিবীর সব সভ্য দেশে আজো যা আছে, সেই গণিকাবৃত্তি সোভিয়েট থেকে উঠে গেছে। নারীকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করার অধিকার সেখানে নেই। দেশপ্রেমিকা হিসাবে সে দেশের নারী কোনো অংশে কম নয়। যুদ্ধের সময়ে শত্রুহস্তে বন্দিনী জয়া কসমোডেমিয়ানসস্কায়া বা গর্ভবতী আলেকজান্দ্রা ড্রিম্যান প্রমুখ নারীর নাম কখনও মুছবার নয়, যাঁরা মৃত্যুকে বরণ করেও স্বদেশপ্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন। মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে শৃংখল ভেঙে এতটা উন্নতি কোথায়ও দেখা যায় না।

সোভিয়েট নারীরা তাদের রাষ্ট্রের আইনের সাহায্যে যত সহজে নিজেদের অধিকার পেয়েছিল, অন্য দেশের নারীরা তা পায়নি। এর জন্য তাদের প্রবল আন্দোলন, প্রচুর ত্যাগ-স্বীকার করতে হয়েছে। ব্রিটেনের মত দেশেও নারীরা ছিল পুরুষের পায়ের তলায়। সেখানে প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত মেয়েরা নির্বাচনের সময়ে ভোট দিতে পারত না। এ জন্য মেয়েরা সেখানে প্রবল আন্দোলন (সাফ্রেজিষ্ট আন্দোলন) চালায়। এই সাধারণ ভোটাধিকার আদায় করার জন্য ব্রিটেনে বহু মেয়ে পুলিশের লাঠিচালনা, কারাবরণ, অনশন ও নানা অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিল।

এই নারী ভোটাধিকার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় বহু আগে ১৮৭২ সালে. এমেলিন গোল্ডেন (পরে শ্রীমতী প্যাংকহার্স্ট)'নামে একটি মেয়ে তখন থেকে তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। পরে বড় হয়ে নানা শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে সাংসারিক নানা বিপত্তির মধ্যেও তিনি নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে এই আন্দোলন একটু মন্দীভূত হয়। নারীরা দলে দলে যুদ্ধজয় প্রচেষ্টায় গভর্ণমেণ্টকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। যুদ্ধের শেষে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়ে আন্দোলনকে জয়যুক্ত করে। এখন অবশ্য ব্রিটেনে পুরুষের সব রকম কাজে মেয়েরা সাহায্য করছেন ও মেয়েরা সে সব কাজে সমান কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন। এখন ব্রিটেনে নানা রকম নারী-সমিতি গড়ে উঠেছে। ১৯১৬ সালে এক জন ক্যানাডীয় মহিলা মিসেস্ আলফ্রেড ওয়াট প্রথম একটি নারী-প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করেন। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ফলে গ্রামাঞ্চলে আজ বহু নারী-প্রতিষ্ঠান গ্রামের সর্বাংগীন উন্নতিসাধনে সহায়তা করছে। দেশের উন্নতি সাধনে নারীরাও যে পেছিয়ে নেই, তা তাঁরা প্রমাণ করেছেন।

বলশেভিকরা রাশিয়ান গভর্ণমেণ্ট পাবার অল্প দিনের মধ্যেই ইউরোপে যে সব দেশে—যেমন ইটালী, জার্মাণী, স্পেনে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়েছিল, তাতে মেয়েরাও অনেক সাহায্য করেছিল। সে সময়ে মেয়েরা সব রকম কাজে পুরুষের সমানাধিকার পেয়েছিল এবং নানা লেখা ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তারা রাষ্ট্রের মতবাদ প্রচার করেছিল। জার্মাণীতে স্বদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ যে-সব মেয়ে নারী-সংগঠনী স্থাপন করেছিল, তাদের সে-সব সংগঠনী নাৎসীরা প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভেঙ্গে দিয়েছিল।

আমেরিকা আজ সব চেয়ে অভিজাত, ধনতান্ত্রিক দেশ। তার আচার-ব্যবহার, তার মেয়েদের চলন-বলন আজ সবাই অনুকরণ করতে ব্যস্ত। কিন্তু আজকের আমেরিকার মেয়েরা যে কত সংগ্রাম করেছে সমাজে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য, সে কথা আজ কেউ মনে করে না বা তার ইতিহাসের খবরও রাখে না। বিংশ শতাব্দীর আগে থেকেই আমেরিকান সমাজে মেয়েরা বিভিন্ন দিকে নিজেদের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে মেয়েরা সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীক, সামাজিক সব ক্ষেত্রেই নিজের অধিকার বজায় রাখার চেষ্টা করতে লাগল। ১৯০৩ সালে National Women's Trade Union League of America প্রতিষ্ঠিত হল। এর পর চিকিৎসা ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের নানা সংগঠনী গড়ে উঠল। আমেরিকার নারীদের অবস্থা আগে কি রকম ছিল, সে সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য মিসেস্ রুজভেল্টের আত্মজীবনীতে পাই। তিনি বলেছেন, তাঁর ছোটবেলায় তাঁর ঠাকুরমা'র ধারণাই ছিল না যে, খুব দুঃস্থ মেয়ে ছাড়া কেউ কোন কাজ করতে পারে। মেয়েদের কলেজে যাওয়াকে তিনি অস্বাভাবিক বলে মনে করতেন। যাদের খুব দরকার বা বাড়ীর অবস্থা খুব খারাপ, তারাই কাজ করত, তাও কেরাণীগিরি বা অন্য কোন ছোট কাজ। বড় কাজ তারা পেত না, শিক্ষয়িত্রী, ভাল শিক্ষিতা নার্স, সমাজসেবিকা বা গ্রন্থাগারিক প্রভৃতি খুবই কম হত। যারা কাজ করত, পুরুষেরা এবং জনমতও তাদের মোটেই সুনজরে দেখতো না। অনেক আন্দোলন, অনেক সংগ্রামের পর মেয়েরা নিজেদের অধিকার লাভ করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে পুরুষেরা যুদ্ধে চলে যাওয়ায় দেশে কর্মীর অভাব হল। তখন ফ্যাক্টরীতে নানা যুদ্ধোপকরণ তৈরীর কাজে বাধ্য হয়ে মেয়েদের নিতে হল। যুদ্ধের ফলে অনেক মেয়ে স্বামী, পুত্র বা পিতার অভাব পূর্ণ করতে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল। আবার অনেক বিবাহিতা মেয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কিংবা নতুন বিষয়ে আগ্রহী হয়ে কাজে নামল। ১৯১৮ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর ফলে নারী-পুরুষ উভয় জাতিরই বহু লোক প্রাণ হারানোতে এবং অন্য দেশ থেকে বেশী লোক না আসায় মেয়েরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পেল এবং তারা যে কোন বিষয়ে অনুপযুক্ত নয়, তা প্রমাণ করল। তবে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, মেয়েরা অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট ঔৎসুক্য নিয়ে কাজ করলেও যাদের নিজস্ব ক্ষেত-খামার আছে, তারা ছাড়া কৃষিকার্যের দিকে মেয়েরা বিশেষ নজর দিচ্ছে না, সীবন শিল্পেও মেয়ে কর্মী কম। যন্ত্রশিল্পে নূতন আবিষ্কার ও উন্নতির ফলে মেয়েদের অর্থাগমের পথ আরো সুগম হয়। তাঁরা অনেকে সিগার তৈরী, টাইপরাইটার, টেলিফোনের কাজে নিযুক্ত হলেন। তাঁদের উন্নতির জন্য নানা আইন পাশ করা হয়।

কিন্তু ভোটাধিকার তাঁরা এত সহজে পাননি, এর জন্য রীতিমত তাঁদের আন্দোলন করতে হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে এর পরিসমাপ্তি হয়ে এই সম্বন্ধে আইন পাশ হয়। প্রথম প্রথম মেয়েরা বেশী ভোট না দিলেও ১৯২০ সালে The National League of Women Voters আরো নারীকে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করল। ঐ সালের ২৬শে আগষ্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। যদিও ১৯২০ সালের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা মতপ্রকাশের জন্য রাষ্ট্রব্যাপী অনুমোদন লাভ করেনি, তবু ১৮৬৯ সালে উয়োমিং নামে পার্বত্যময় দক্ষিণাঞ্চলের সরকার মহিলাদের মতপ্রকাশের ক্ষমতা অনুমোদন করেছিল। এর চার বছর পরে এ অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৪ সালে নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিয়ে ন্যাশনাল উওমেন্স্ পার্টির সংগে যুক্ত মেয়েরা দাবী পেশ করলেন, তাঁরা মিস্ এম, কেরী টমাসের উক্তিকেই এখানে ব্যবহার করলেন। মিস্ টমাস তখন পরলোকগতা, তিনি মেয়েদের অগ্রগতির এক নেত্রী ছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন,—"The true objection to woman suffrage lies far deeper than any argument. Giving women the ballot is the visible sign and symbol of a stupendous social revolution and before it we are afraid. Women are one-half of the world but until a century ago the world of music and painting and sculpture and literature and scholarship and science was a man's world. The world of trades and professions and of works of all kinds was a man's world. Women lived a twilight life, a half-life apart, and looked out and saw men as shadows walking. It was a man's world. The laws were man's laws, the government a man's

government, the country a man's country.…… The man's world must become a man's and a woman's world. Why are we afraid? It is the next step forward on the path toward the sunrise, and the sun is rising over a new heaven and a new earth."

অর্থাৎ, মেয়েদের ভোটাধিকার দেবার সত্যিকারের আপত্তির কারণ যুক্তিতর্কের গণ্ডীর বাইরে আরও গভীরতর। মেয়েদের ভোট দেওয়া একটা প্রচণ্ড সামাজিক বিপ্লবের প্রতীক ও সুস্পষ্ট লক্ষণ, তাই আমরা এর সম্মুখীন হতে ভয় পাই। নারীরা পৃথিবীর অর্ধাংশ, কিন্তু এক শতাব্দী আগেও সংগীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সাহিত্য, পাণ্ডিত্য এবং বিজ্ঞান সব কিছুই ছিল পুরুষের জগতে। ব্যবসা, বৃত্তি এবং অন্যান্য সকল রকম কাজই ছিল পুরুষের জগতের অন্তর্ভুক্ত। মেয়েরা ছিল যেন এক আবছায়া জীবনে, যার অর্ধেক ছিল শূন্য; তারা বাইরে তাকিয়ে পুরুষের চলা-ফেরাকে দেখত ছায়ার মত। এটা ছিল পুরুষের জগত; আইন ছিল পুরুষের আইন, শাসনতন্ত্রও ছিল পুরুষের, দেশও ছিল যেন পুরুষেরই দেশ।…এই পুরুষতান্ত্রিক জগতকে মেয়ে-পুরুষের মিলিত জগতে পরিণত করতেই হবে। আমাদের কিসের ভয়? নারী-স্বাধীনতার নব অরুণোদয়ের পথে এই আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ। এবং ঐ দেখুন, এক নতুন পৃথিবীর নতুন আকাশে আমাদের স্বাধীনতার সূর্য উর্ধ্বগামী।

দাসত্ববিরোধী আন্দোলন, সংস্কার আন্দোলন, ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন নারীদের বেশ কর্মক্ষম করে তুলল। নানা নারী-সংগঠনীর প্রভাবে নারীরা একটা রাজনৈতিক স্বীকৃতি পেলেন, নারীদের ভোটাধিকার ছাড়া এটা সম্ভব হত না। নারীরা এতটা উন্নতি করলেন যে, ক্রমে তাঁরা গভর্ণর, জজ, কংগ্রেসের সভ্যা হতে আরম্ভ করলেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের শাসন-ব্যবস্থায় এক জন নারীকে সর্বপ্রথম মন্ত্রি-পরিষদে গ্রহণ করা হয়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রেও মেয়েরা ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে লাগলেন। সাহিত্য-জগতে এ সময়ে আমেরিকান মেয়েদের দান অপরিসীম। জগদ্বিখ্যাত বই পার্ল বাকের "গুড আর্থ," মার্গারেট মিচেলের "গন উইথ দি উইণ্ড" প্রভৃতি এর সাক্ষ্য দেয়। বিশ্ববিখ্যাত বই "আঙ্কল্‌স্‌ টমস্‌ কেবিন" লিখেছিলেন এক জন আমেরিকান মহিলা হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে। কাব্যের ক্ষেত্রেও এ দেশের মহিলাদের দান কম নয়। নারীরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলেন ভাল ভাবে। মেয়েরা পুরুষের কাজে সমান মাইনে পেতে লাগল, যুদ্ধের নানা রকম কাজ তারা করতে লাগল। এ বিষয়ে কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত মেয়েদের প্রথম সংগঠনী হল "Woman's Army Auxiliary Corps"—সংক্ষেপে WAACS। এর পরিচালিকা ছিলেন মিসেস্‌ ওভেটা কাল্‌প্‌ হবি। এটা পরে নিয়মিত সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এর নাম হয় "Woman's Army Corps"। আরও নানা সংগঠনী হয় মেয়েদের। এছাড়া অন্তঃসত্ত্বা মায়েদের যত্ন নেবার জন্যও ব্যবস্থা হয়, The National Maternal and Child Health Council অনেক কাজ করেছিল। মেয়েরা ক্রমে চিকিৎসক, কেমিষ্ট, ডিরেকটর, আইন-ব্যবসায়ীর বৃত্তি গ্রহণ করলেন, এয়ারক্রাফট্‌ শিল্প মেয়েদের একটা নতুন কাজে বিশেষ সুযোগ দিল। মেয়েরা ট্রেনে কনডাক্টারীও করতে লাগলেন। যুদ্ধের সময় মেয়েরা অনেকে সামরিক কাজে প্রাণ দিয়েছেন। ওদেশে এলিজাবেথ, কে অ্যাডামস্‌, মিসেস্‌ এমিলি জেমস পুনটাম প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতিনী মহিলারা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য যথেষ্ট আন্দোলন ও চেষ্টা করেছিলেন। আরও অনেকে নারীদের অধিকার সমাজে নানা বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পার্ল বাক চীনা নারীদের সংগে আমেরিকান নারীদের তুলনা করে নানা প্রবন্ধ ও বই লেখেন। তখন চীনা নারীদের অবস্থা অনেক উন্নত ছিল। তবে শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকার মেয়েরা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের অফিসেও গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

শাসনকার্যে মেয়েরা অনেকে অংশ গ্রহণ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদে নয় জন মহিলা প্রতিনিধি এবং সেনেটে এক জন মহিলা আছেন, রাজ্য সরকারগুলোতে বর্তমানে ২৩৫ জন মহিলা ৪০টি রাজ্যের আইন-পরিষদে স্থানলাভ করেছেন। মহিলারা উচ্চ আদালতে বিচারকের পদও অলংকৃত করেছেন। ব্যবসা ক্ষেত্রেও তাঁরা ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তবু তাঁরা মনে করেন, এখনও অনেক জায়গায় মহিলারা পুরুষদের সমান ক্ষমতা অর্জন করেননি। তাঁরা আশা করেন, সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে একসংগে কাজ পরিচালনা করবেন। জাতির সর্বোচ্চ সম্মান প্রেসিডেণ্টের পদ লাভ না করা পর্যন্ত মার্কিণ মহিলারা তাঁদের সর্বক্ষমতা স্বীকৃত হয়েছে বলে মনে করবেন না।

চীনা মেয়েরাও প্রথমে পুরুষের একাধিপত্যের অধীন ছিল, তারা ছিল প্রাণহীন চীনে-পুতুলের মতই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত চীন দেশের মেয়েরা ছিল ক্রীতদাসী। তাদের ভাগ্যে জুটত শুধু প্রহার ও প্রহার খেয়ে জীবন হারানো ছিল তাদের ভাগ্যলিপি। পণ্যের মত বাজারে মেয়েদের বিক্রী করা হত। চীনের বিপ্লবী নেতা ডাঃ সান ইয়াৎসেন নারীদের এই দুঃখে বিচলিত হলেও প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে বিশেষ কিছু করতে পারেননি। বিপ্লবী নারী সুঙ চিঙ লিঙকে পত্নীরূপে লাভ করেও তিনি এদিকে তেমন কিছু সুবিধা করতে পারেননি। চিয়াং-এর আমলেও চীনের নারীরা কোনো সম্মান পায়নি। চিয়াং-পত্নী সুশিক্ষিতা ও পাশ্চাত্য আবহাওয়ার মধ্যে গঠিত হয়েও নিজের দেশের নারীদের দুর্দশা মোচনের জন্য অগ্রসর হননি। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও চীনে ক্রীতদাসপ্রথা ছিল। মেয়েদের তখন ক্রীতদাসীরূপে, পণ্যা নারী হিসাবে বিক্রী করা হত। এ জন্য গণিকাবৃত্তিও বেড়ে গিয়েছিল। বিধবা-বিবাহ চলিত ছিল না, এমন কি বাক্‌দত্তা বালিকার ভাবী স্বামী মারা গেলেও তাকে বিধবারূপে জীবন কাটাতে হত, অথচ পুরুষদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। কারখানাতেও মেয়েদের জীবন ছিল ভয়াবহ। মেয়েদের সম্পত্তিতে কোনো অধিকার ছিল না। এর পর মাও সে-তুং, চু-তে সারা জীবন ধরে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চীনের জনগণকে রক্ষা করেছেন। এঁরা ডাঃ সান ইয়াৎসেনের আদর্শে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ ঘুচিয়েছেন, নারীর ওপর সমাজের অত্যাচার দূর করেছেন। প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে চীনের মেয়েরা পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমানে সংগ্রাম করেছেন, আত্মদান করেছেন, জয়ী হয়ে দেশের শাসনে নেতৃত্ব করেছেন। এদের মধ্যে চীনা নারী-আন্দোলনের প্রধান

নেতা সাই চ্যাঙ্গ, তেং ঈঙ্গ চাও, সৈমেঙ্গ চী প্রভৃতি ও আরো অনেক চীনা নারীর নাম চিরস্মরণীয়। আজ চীনের নারীরা সোভিয়েট ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের নারীর মতই সমাজে, রাষ্ট্রে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিতা। কেন্দ্রীয় গণ-সরকারের শাসন-পরিষদে যে মহিলারা আছেন, তাঁদের মধ্যে মাদাম চিয়াং কাইশেকের দিদি মাদাম সান ইয়াংসেনও আছেন। এখন নয়া চীনে পণপ্রথা নেই, জাঁকজমকপূর্ণ বিবাহ নেই, নারী-নিগ্রহ নেই। বিবাহ-বিচ্ছেদে নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। অসুখী পরিবারে শান্তি ফিরিয়ে আনতে নারীসংঘ (Woman's Union) প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কারখানায় নারীদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, শিল্পোৎপাদনেও মহিলারা বড় বড় পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। নতুন চীনের নারী আজ সবার বিস্ময়ের পাত্রী।

জাপানে অবশ্য চীনের মত নারীরা এখনও এত স্বাধীনতা লাভ করেনি। যদিও আগে পতিদেবতারা নারীদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার করলেও কিছু বলার উপায় ছিল না, এখন এতটা না থাকলেও জাপানের নারী স্বামীর অধীনাই আছেন, স্বামীর মুখের ওপর কিছু বলার অধিকার তাঁদের নেই। সাধারণতঃ পুরুষেরাই সেখানে অর্থোপার্জন করে থাকে, আবশ্যক হলে মেয়েরাও করে। স্বামী সেখানে প্রকাশ্যে স্ত্রীর ওপর অনুরাগ দেখানোকে লজ্জাজনক মনে করে। মেয়েরা পথে-ঘাটে তেমন সম্মান কোথায়ও পান না। এদিক দিয়ে এঁরা এখনও অনেক পেছিয়ে আছেন। মেয়েরা সন্তান পালন করেন অনেক যত্ন দিয়ে, মেয়েকে তৈরী করেন আদর্শ বধূ ও গৃহিণী হবার জন্য এবং ছেলেকে তৈরী করেন দেশের জন্য যুদ্ধে যাবার উপযুক্ত করে। এর জন্য মায়েরা চোখের জল ফেলেন না, দেশের জন্য আত্মদান করাকে তাঁরা পরম গৌরবজনক বলেই মনে করেন। পরাধীনা নারীদের হৃদয়ে এই দেশপ্রেম বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

তুরস্কে এক কালে মেয়েদের হারেমের বাইরে যাবার অধিকার ছিল না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত বোরখা ঢাকা মেয়েরা শুধু দু'টি চোখের ফুটো দিয়ে বাইরের জগতকে দেখার চেষ্টা করতেন। হারেমের অন্তরালে মেয়েরা কি ভাবে জীবন যাপন করতেন, সে সম্বন্ধে কেউ কোন খোঁজও রাখত না। কিন্তু কামাল পাশা যখন বিপ্লবের পর তুরস্ককে গড়ে তুললেন নতুন ভাবে, তখন মেয়েরাও অন্তঃপুরের বাঁধন কেটে বোরখা ফেলে বেরিয়ে পড়লেন পথে। পুরুষের সংগে সমানে তাঁরা যোগ দিলেন সব রকম কাজে। রাতারাতি যেন তাঁরা মুছে ফেললেন সকল বাধা-নিষেধের গণ্ডী। তুরস্কের এই নারী-জাগরণ সত্যিই এক বিস্ময়ের বস্তু। কামাল আতাতুর্ক নতুন তুরস্ককে যে-ভাবে গঠন করেছিলেন, তাতে স্ত্রী-স্বাধীনতার সংগে মেয়েরা শিক্ষালাভে ও সম্পত্তি ভোগে সমান অধিকারিণী হয়েছেন। মুসলমান সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ তুরস্কে নিষিদ্ধ হয়েছে। সেখানে বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের নিয়ম-কানুনও সহজ হয়ে গেছে।

ভারতের প্রতিবেশী বর্মা রাজ্যে মেয়েদের স্বাধীনতা প্রবাদখ্যাত। সেখানে পুরুষেরা অলস, মেয়েরাই সেখানে নানা নিত্য-প্রয়োজনীয় কাজ করে, অর্থোপার্জন ক'রে পুরুষকে খাওয়ায়। রাস্তায়-ঘাটে তাদেরই প্রাধান্য। কিন্তু তবু সেখানে পুরুষেরা নারীকে তাদের সমান মর্যাদা দেয় না। এমন কি পুরুষের ও স্ত্রীর পোষাক পর্যন্ত একত্র সেখানে থাকতে পারে না, তাতে পুরুষের বস্ত্র অপবিত্র হবার সম্ভাবনা। আচার-বিচারে সেখানে নারীকে অনেক নীচু করে রাখা হলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য মেয়েরা সেখানে অনেক স্বাধীনা।

আমাদের ভারতবর্ষেও নারীরা চিরদিন পুরুষের অধীন ছিল। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করার বিষয়, প্রাচীন যুগে এবং পরবর্তী কালেও আমরা দেখতে পাই যে, শিক্ষা দীক্ষায় নারী কখনও পেছনে পড়ে থাকেনি, প্রাচীন যুগের খনা, গার্গী, লীলাবতী, অরুন্ধতী, মৈত্রেয়ীর নাম এই হিসাবে স্মরণীয়। এ ছাড়া তখনও বড় বড় রাজা-মহারাজার অন্তঃপুরে মেয়েদের এক-একটা সংগঠনী ছিল। সে যুগে রাজপুত মেয়েদের আত্মত্যাগও স্মরণীয়। পদ্মিনী প্রভৃতি নারীদের এক-একটা দল ছিল এবং তাঁরা একসংগেই আত্মবিসর্জন করেছিলেন। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সে যুগের মেয়েরা পিছিয়ে থাকেননি, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ও তাঁর নারীবাহিনী, রাণী দুর্গাবতী ও তাঁর বাহিনীর কথা, মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীর কথা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছবে না কোন দিন। আমাদের বাংলা দেশের মংগলকাব্যের মধ্যে ধর্মমংগলে সখিগণসহ লখা, কলিঙ্গা প্রভৃতি নারীর যুদ্ধ-বর্ণনাও মেয়েদের শক্তির কথা ও সংগঠনের কথা সমর্থন করে। কিন্তু এর পরে আর মেয়েদের বিশেষ কোনো নাম শোনা যায়নি। তবে বাংলা দেশে রাণী ভবানী, রাণী রাসমণি, স্বর্ণময়ী, শরৎকুমারী, জাহ্নবী, দিনমণি, বিন্দুবাসিনী প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা জমিদারী পরিচালনায় ও সমাজসেবায় অত্যন্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। আমাদের বাংলা দেশের অতীত গৌরব ছেড়ে দিলে আমরা দেখি যে, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-জগৎ কোনো দিকেই মেয়েদের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। পুরুষ চিরদিন মেয়েদের ওপর প্রভুত্ব করে এসেছে। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে বেথুন সাহেব, তাঁর সংগে বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষী অনেক চেষ্টা করেছিলেন, এ ছাড়া বিদেশিনী মহিলাদের দানও এ বিষয়ে কম নয়। সিষ্টার নিবেদিতা অনেক কষ্ট করে বাড়ী-বাড়ী ঘুরে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করতেন। অ্যানি বেশান্তের নামও এদিক দিয়ে চিরস্মরণীয়। মেয়েরা ধীরে ধীরে স্কুলে যেতে লাগলেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা ছিল অতি মুষ্টিমেয়। কিন্তু এর পর দেশব্যাপী পরাধীনতার বিরুদ্ধে যখন রাজনৈতিক চেতনা জাগল, তখন বিপ্লবী পুরুষের পাশে তথাকথিত অশিক্ষিত মা-বোন-বধূর দলই এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের প্রাণে প্রেরণা দিয়েছে। এর ফলে বাইরের জগতের সংগে পরিচয় ঘটল অন্তঃপুরচারিণী মেয়েদের। বাংলা ১৩১২ সালে ভারতে প্রথম নারী-জাগরণের সূত্রপাতের সময় তাঁদের প্রচেষ্টা স্মরণীয়। বাংলা দেশে তখন ইংরেজের নাগপাশ ছিন্ন করার সংগ্রামের সূত্রপাত, সকলেই বিলাতী পণ্য বর্জনের প্রতিজ্ঞা করছেন। ৩০শে আশ্বিন রাখী-বন্ধন উৎসব প্রবর্তিত হল, বিদেশী বর্জন ছাড়া আরও দু'-একটি বিশেষ ব্রত, অরন্ধন পালন প্রভৃতি কয়েক জন বাঙ্গালী মেয়ে মিলে গ্রহণ করলেন। এঁরা প্রতিদিন চরকায় কিছু পরিমাণে সূতো কাটতেন। এঁরা "মায়ের কৌটা" বলে একটি মাটির বা যে-কোন পাত্রে রোজ এক মুঠো করে চাল রাখতেন। এতে দেশের জন্য দানও হত, ছেলেমেয়েরা স্বদেশভক্তিও শিখত এবং প্রতি গৃহে

এ রকম করাতে সঞ্চয়ও হ'ত। মোগল-যুগে ভারতীয় নারীদের সেই অতীত মর্যাদা হারিয়ে গিয়েছিল, সে যুগ থেকে পর্দাপ্রথা, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি নানা রকম কুপ্রথা ভারতের নারী-সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। রামমোহনের যুগে এবং পরবর্তী যুগে বিভিন্ন মনীষীর চেষ্টায় প্রথমে বাংলা দেশে ও পরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে নারীপ্রগতি ও নারীমুক্তির আন্দোলন ব্যাপক ভাবে সুরু হয়। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হওয়ার ফলে নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে মেয়েরা সচেতন হলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশব সেন, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মেরী কার্পেন্টার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিদের সহায়তায় নারীরা জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করতে লাগলেন। তখনকার দিনে বঙ্গমহিলা সমাজ, ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, আর্য মহিলা সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং বামাবোধিনী ও অবলাবান্ধব প্রভৃতি পত্রিকা, ব্রাহ্ম আন্দোলন নারী-জাগরণে অনেকখানি কাজ করেছিল।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইএ জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ছয় জন মহিলা প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন,—এর মধ্যে প্রসিদ্ধা লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী ভারতের প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী দেবী প্রভৃতি ছিলেন। এটি নারী আন্দোলনের ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা। এর পর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন, এই হল ভারতীয় মহিলার কংগ্রেসে প্রথম বক্তৃতা দান। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, দেশ নারীর মতামত, নারীর সক্রিয় সহযোগিতা ক্রমে স্বীকার করে নিচ্ছিল। এর পরেই সারা ভারতে নারী আন্দোলন উপস্থিত হয়। শিক্ষার বহুল প্রসার ও নারীকল্যাণ সংগঠনীর ভেতর দিয়ে নারীসমাজকে আত্মসচেতন করে তোলার চেষ্টা চলছিল, আর অনেক বিদুষী মহিলা সমাজ, রাষ্ট্র ও সাহিত্য-সেবার মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের অগ্রগতির পথে সহায়তা করতে লাগলেন। বাংলা দেশেই এটা বিশেষ ভাবে হয়েছিল। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর 'ভারতী' পত্রিকার মধ্য দিয়ে স্বাদেশিকতার মন্ত্র প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "সখী সমিতি" বাংলার মেয়েদের প্রাণে স্বদেশী শিল্পের প্রতি অনুরাগ বাড়িয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথকে স্বাদেশিক সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর দুই কন্যা হিরণ্ময়ী ও সরলাকে উপযুক্ত নারীরূপেই গড়ে গিয়েছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবী মেয়েদের জন্য "শিল্প নিকেতন" প্রতিষ্ঠা করেন। আগের সখী সমিতি পরে শিল্পাশ্রম ও বিধবাশ্রমে পরিণত হয়। সরলা দেবী চৌধুরাণী নানা ব্যায়াম সমিতি স্থাপন করে, "বীরাষ্টমী" ব্রতের প্রবর্তন ক'রে বাংলার যুবশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সংগীতের দ্বারা এবং মাতার মৃত্যুর পর তাঁর 'ভারতী' পত্রিকা পরিচালনার মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা দেশে এক অপূর্ব উন্মাদনা এনেছিলেন। সরলা দেবী বাঙালী জাতির মধ্যে স্বদেশ-গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাষ্ট্রের শিবাজী উৎসবের মত এখানেও প্রতাপাদিত্য উৎসবের সূচনা করেন। তিনি স্বদেশী জিনিস সংগ্রহ করে সে সব বিক্রীর জন্য "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার" খুলেছিলেন। ১৯০৪ সনে বোম্বাই কংগ্রেস প্রদর্শনীতে এখান থেকে নানা স্বদেশী জিনিসের নমুনা

পাঠানো হয়। কর্তৃপক্ষ জিনিসগুলোর উৎকর্ষতা দেখে "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার"কে স্বুবর্ণপদক দিয়েছিলেন। বাংলা দেশে ঠাকুর-পরিবারের দানের কোনো তুলনা নেই, তখনকার দিনে এ পরিবারের মহিলারাও যে দান করে গেছেন, তা অবিস্মরণীয়। ১৯১০ সনে এলাহাবাদে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে সরলা দেবী চৌধুরাণী "ভারত স্ত্রীমহামণ্ডল" প্রতিষ্ঠা করেন। নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা প্রভৃতি বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবার জন্ত এতে যে আয়োজন হল, তা কখনও ভুলবার নয়। বংগীয় শাখার সম্পাদিকা হলেন কৃষ্ণভাবিনী দাস, আর পঞ্জাব-শাখার সম্পাদিকা হলেন সরলা দেবী চৌধুরাণী। সরলা দেবী পঞ্জাব-শাখার মারফৎ রাষ্ট্রে নারীর অধিকার নিরূপণ বিষয়ে আলোচনা করতে সুরু করেছিলেন। এই রকম আলোচনার ফলেই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নারীর স্থান ক্রমে সুনির্দিষ্ট হতে থাকে।

ক্রমে শাসন-ব্যবস্থার মধ্যেও নারী নিজের স্থান করে নিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্তা হেমলতা দেবী বাংলা দেশে সর্বপ্রথম মহিলা মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হন, কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্তা কুমুদিনী বসু ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মহিলা কাউন্সিলার হন। অন্যান্ত দেশেও এ নব জাগরণের ঢেউ গিয়ে লাগল। বোম্বাই প্রদেশে পণ্ডিতা রমাবাঈ নারীকল্যাণ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন, পুণাতে ক'জন বিশিষ্ট মহিলা মিলে "আর্য মহিলা সমিতি" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে মেয়েদের উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিদেশিনী মেয়ে নেলী সেনগুপ্তার দানও আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ও নারীর উন্নতির কাজে কম নয়। আচার্য জগদীশ-পত্নী লেডী অবলা বসু স্বামীর গবেষণায় সাহায্য করেছেন, তিনি দেশের নারী ও শিশুদের কল্যাণের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

দেশের মুক্তি-সংগ্রামে গান্ধীজী যখন ডাণ্ডি অভিযান, লবণ সত্যাগ্রহ, বিদেশী বস্ত্র ও মাদক দ্রব্য বর্জন, আইন অমান্ত আন্দোলন চালান এবং পরবর্তী সময়ে বরদৌলী, বন্দবিলা, মেদিনীপুর ও কলিকাতায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলে, তখন পুরুষদের সংগে মেয়েরাও সমানে সে সবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ সংগ্রামে ও পরবর্তী নানা সংগ্রামে মাতা কস্তুরবা, সরোজিনী নাইডু, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, অরুণা আসফ আলী, সুচেতা কৃপালনী, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, বাসন্তী দেবী, কমলা নেহরু, ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা, নির্ঝরিণী সরকার, সরলাবালা সরকার, জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা ও বহু অখ্যাতনামা মহিয়সী নারী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪২এর আগষ্ট-বিপ্লবে মেদিনীপুরের মাতঙ্গিনী হাজরার নাম এ হিসাবে শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়। সশস্ত্র বিপ্লবে বীণা দাস, শান্তি দাস, কল্পনা দত্ত, প্রীতি ওয়েদ্দেদার প্রভৃতি বহু নারীর কথা কেউ ভুলবে না। ১৯০৫ সালে বংগভংগ আন্দোলনের সময় যে সব মহিলা স্বাদেশিকতার বীজ ছড়িয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বরিশালের সরোজিনী বসু (এঁর স্বাদেশিকতার জন্ত এঁকে "বংগলক্ষ্মী" উপাধি দেওয়া হয়), বসন্তবালা হোম, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী ও পরে ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের পত্নী হেমাংগিনী দাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কবি কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, হিরণ্ময়ী দেবী, কুমুদিনী মিত্র প্রমুখ লেখিকারা তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রেমের বাণী প্রচার করেন।

এই মুক্তি-সংগ্রাম ছাড়া ১৯৩৫-৩৬ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৩৫—৩৯ সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যে, যেমন—হায়দরাবাদ, কাশ্মীর, ত্রিবাংকুর, মহীশূর, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে প্রজারা স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে যখন গণ-সংগ্রাম করে, তখনও নারীরা তাতে যোগ দিয়ে অমানুষিক নির্য্যাতন সহ্য করে, অনেকে প্রাণ হারায়। এই রাজনৈতিক সচেতনতা তথাকথিত অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যেও জেগেছিল, এটা মেয়েদের পক্ষে কত বড় আশার কথা! ভারতের সেই পর্দাঘেরা অন্তঃপুরের ঘোমটাবতী নারীরা তাদের শৃংখল ভেঙে দেশ-বিদেশের কত বড়-বড় পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত রাষ্ট্রদূত হিসাবে কত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করছেন, হংস মেটা প্রমুখ মহিলা রাষ্ট্রপুঞ্জের (ইউএনো) কাজে আছেন, রাজকুমারী অমৃত কাউর দেশের শাসন বিভাগে কত বড় গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করছেন, স্বর্গতা সরোজিনী নাইডু প্রদেশপালের দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করে গেছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের আইন সভায়, শাসন-পরিষদে আজ কত নারী দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

পাশ্চাত্য দেশেও যেমন নারীর ভোটাধিকার নিয়ে অনেক আন্দোলন করতে হয়েছে, এখানেও তেমনি নারীদের ভোট দেবার অধিকার ছিল না। সরোজিনী নাইডুর প্রাণপণ চেষ্টায় ও নারী আন্দোলনের চাপে ১৯২৩ সালে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্ম বিলে এ দেশের মেয়েরা সর্বপ্রথম ভোট দেবার অধিকার পায়, তাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ভাবে। এখন ক্রমশঃ মেয়েদের ভোট দেবার অধিকারের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে।

মাদ্রাজের আইন পরিষদে শ্রীমতী মুথলক্ষ্মী রেড্ডি পরিষদের ডেপুটি স্পীকারের পদ অলংকৃত করেছেন। এর আগে আর কোন মহিলা এ সম্মান লাভ করতে পারেননি। শ্রীমতী রেড্ডি নিজে এক জন ডাক্তার। সামাজিক কুসংস্কার ও বাধা-বিপত্তি দূর করে মহিলা সমাজকে আত্মবিকাশের পূর্ণতম সুযোগ দান করাই তাঁর একমাত্র চেষ্টা ছিল। তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় কাজ মাদ্রাজ থেকে দেবদাসী প্রথা দূর করা। সামাজিক সংস্কারে মাদ্রাজে শ্রীমতী রেড্ডি সব চেয়ে অগ্রবর্তিনী।

সাধারণতঃ মেয়েরা এখানে শিক্ষার আলো পেলেও পল্লীতে পল্লীতে এখনও অসংখ্য নারী অজ্ঞানের অন্ধকারে রয়ে গেছে। নানা সংগঠনী গড়ে তাদের মধ্যের অশিক্ষা দূর করার ভার মেয়েদেরই নিতে হবে। সাহিত্য-সৃষ্টিতে অন্ত দেশের নারী যেমন আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন, আমাদের দেশে সরোজিনী নাইডু প্রমুখ দু'-এক জন মুষ্টিমেয় নারী ভিন্ন এখনও তা সম্ভব হয়নি, তবু সাহিত্য-শিল্প-সংগীত সব ক্ষেত্রেই নারী এগিয়ে যাচ্ছে অনেকখানি।

সব সভ্য দেশেই এখন বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন আছে, কিন্তু আমাদের পুরুষতান্ত্রিক দেশে এখনও তা পাশ হয়নি। আমাদের দেশের মেয়েরা চিরদিন মুখ বুজে পুরুষের অত্যাচার সহ্য করে এসেছে, আজ তারা সমস্বরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছে। সম্পত্তিতে আজো (বিশেষতঃ হিন্দু-সমাজে) ছেলে-মেয়ের সমানাধিকার সাব্যস্ত হয়নি। পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় আজো আমরা বহু পেছনে পড়ে আছি।

সম্প্রতি হিন্দু কোড বিল পাশ হওয়ার জন্ম মেয়েরা প্রবল আন্দোলন চালাচ্ছেন। এতে বাল্যবিবাহ-নিরোধ, নিকটাত্মীয় ও সগোত্রীয়দের মধ্যে বিবাহ প্রবর্তন, অসবর্ণ ও আন্তপ্রাদেশিক বিবাহ প্রবর্তন, বিধবা-বিবাহ, পুরুষের বাধ্যতামূলক একপত্নীকতা, আবশ্যক স্থলে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার, পিতৃ-সম্পত্তিতে কন্থার অধিকার প্রভৃতি সর্ত উপস্থাপিত করা হয়েছে। এতে সমাজ-ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়বার প্রয়াস ও মেয়েদের অনেকখানি স্বাধীনতা ও মর্যাদা দেবার চেষ্টা আছে।

শারীরিক শক্তিতে আমাদের দেশের নারীরাও যে কম নয় তা প্রমাণিত করেছে দলে দলে মেয়ে সামরিকবাহিনী, পুলিশবাহিনীতে যোগ দিয়ে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথমের পরিচালনায় নারীবাহিনী সারা বিশ্বের বিস্ময় উদ্রেক করেছিল। দেশের বিপদের সময় আমাদের দেশের বোনেরা যে ভায়েদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, সে বিশ্বাস আমাদের আছে।

অন্ম সব দেশে যুদ্ধের জন্মই মেয়েরা পুরুষের কাজে নেমেছিল, আমাদের দেশে নানা অর্থনৈতিক কারণে আজ মেয়েরা দলে দলে ঘর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছে জীবিকা নির্বাহের উপায় খুঁজতে। তারা আজ পুরুষের সমানে কাজ করছে, তারা যে সে-সব কাজে অনুপযুক্ত নয়, তা প্রমাণ করছে। চিকিৎসা-বিদ্যা প্রভৃতি ছাড়া ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার দিকেও যে দু'এক জন মেয়ে নজর দিয়েছেন, তা অত্যন্ত আশার কথা। মেয়েরা আজ নানা সমিতি স্থাপন ক'রে ভার নিয়েছে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া, সেলাই, নানা শিল্পবিদ্যা শেখাবার, তাদের জীবিকার্জনের এক-একটা পথ ক'রে দেবার। সারা দেশব্যাপী নানা সংগঠনী এ জন্ম কাজ করছেন। "অল ইণ্ডিয়া উইমেন্‌স্ কনফারেন্স", "মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি" প্রমুখ সংগঠনীর নাম এ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। বাস্তহারা মেয়েদের নানা দিকে সুবিধা ক'রে দেবার জন্ম নানা মহিলা প্রতিষ্ঠান আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

বড় বড় অনেক প্রতিষ্ঠান আজ মেয়েরা সুষ্ঠু ভাবে চালাচ্ছেন। দিল্লীর আঠারো মাইল দূরে নজফগড়ে একটি শিশুমংগল ও মাতৃসদন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এর পরিচালিকা হলেন এক জন মহিলা ডাঃ ক্লডিয়া ডি মেলো। এখানে ভারতীয় অনেক মেয়ে এঁর সংগে গ্রামের অনেক উন্নতিবিধান করছেন। মাদ্রাজে "অশোকবিহার" নামে একটি স্বাস্থ্য ও অবসর-বিনোদনের কেন্দ্র আছে, এর সহকারী পরিচালিকা হলেন শ্রীযুক্তা এম. জয়ালক্ষ্মী।

আমাদের দেশে নারীরা জেগেছে, কিন্তু এই বিরাট দেশের সকলে যদি না জাগে, তবে দেশের বা জাতির উন্নতি হতে পারে না। দেশের একটা অংশই যদি শুধু অগ্রগতির পথে এগিয়ে যায় অন্ত অংশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে, তাতে মংগল আসে না। আমাদের দেশের নারীদের এক বিরাট অংশ আজও দিন কাটাচ্ছে নানা কুসংস্কারে, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়ে। এবারের নির্বাচনের ভোটার-তালিকা তৈরী করার সময় এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। পল্লীবাসী মেয়েরা অনেকেই নিজের নাম পর্যন্ত বলতে স্বীকৃত হয়নি, শুধু কার স্ত্রী, কার কন্থা এতেই তাদের পরিচয়। নিজের নাম না বলায় তাদের নাম ভোটার-তালিকাভুক্ত হয়নি। এতে কতগুলো ভোট নষ্ট হল। যারা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে পর্যন্ত অচেতন, তারা যত দিন না জাগবে, নিজেদের অবস্থা ভাল ভাবে বুঝতে না শিখবে, মেয়েদের সর্বাংগীন উন্নতি তত দিন হবে না। আমরা পাড়ায় পাড়ায় মহিলা-সমিতি গড়ে মেয়েদের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করি, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থাভাবে এবং কিছু দিন পরে উৎসাহের অভাবে সেগুলোর অপমৃত্যু ঘটে। আবার দুঃখের বিষয়, এর মধ্যেও দলাদলি আরম্ভ হয়। যদি ছোট ছোট আলাদা আলাদা সমিতি না গড়ে অনেকে একসংগে যোগ দিয়ে দলাদলি না ক'রে এক-একটা বড় বড় সমিতি গড়ে তোলা যায়, তবে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় অনেক বেশী কাজ হবার সম্ভাবনা। অন্যান্য দেশে রাষ্ট্র মেয়েদের সাহায্য করেছে, আমাদের দেশে ক'টা মহিলা-সমিতি রাষ্ট্রের সাহায্য পেয়ে থাকে? তাই মেয়েদের উন্নতি করার ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময়ে হয়ে ওঠে না নানা অসুবিধার জন্ম। এ সব অসুবিধাকে বাধা মনে না ক'রে আজও আমাদের সংগ্রাম করে যেতে হবে এই মনোবল নিয়ে যে, এক দিন পৃথিবীর সব সভ্য দেশের নারীদের মত আমাদের মেয়েরাও সর্ব দিকে অধিকার পেয়ে উন্নত হবে, বরং ভারতের নারীর ঐতিহ্যের সংগে মিলে এ দেশের মেয়ে সকলের আদর্শস্থানীয়া হবেন। সব স্বাধীন দেশের মত ভারতেও নারীপুরুষের সমানাধিকার লাভ ক'রে বা অধিকার ক'রে রাষ্ট্রের সেবায় নিযুক্ত হবেন যেদিন, সেদিন আমাদের দেশ সত্যি সত্যি বড় হবে।

একটি আষাঢ়ে গল্প

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

সেদিন ছিল শনিবার। সুধাংশু বেলাবেলি আপিস থেকে ফিরে দেখতে পেলে তার ঘরের দরজাটা শক্ত ক'রে ভেজানো রয়েছে। স্ত্রী মণিমালা ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলতে লাগল—একটু দাঁড়াও, এখন ঘরে ঢুকো না। একটু—এই দু' মিনিট—এই খুলো না খুলো না—

বলতে বলতেই ভেজানো দরজাটা খুলে দিয়ে সুধাংশু যে দৃশ্য দেখলে তাতে তার মাথা ঘুরে গেল। তার স্ত্রী মণিমালা ওরফে মণি গাছকোমর বেঁধে খাটের ওপরে চড়ে হাতে একটা লম্বা ঝুলঝাড়া নিয়ে ঘরের ঝুল পরিষ্কার করছিল। একটা তোয়ালে দিয়ে মাথা-মুখ পেঁচিয়ে বাঁধায় মণিকে অনেকটা হাসপাতালের সিষ্টারদের মত দেখাচ্ছিল। সুধাংশু ঘরে ঢুকে পড়তেই মণি বললে—কেন এলে! ওদিককার দরজা দিয়ে একেবারে কাপড় ছাড়বার ঘরে ঢুকে গেলে না কেন?

সুধাংশু হেসে বললে—তা'হলে তো এ দৃশ্য দেখতে পেতুম না। সত্যি মণি, তোমাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে।

মণি বললে—আপাতত ইচ্ছেটা সম্বরণ করে এদিক দিয়ে কাপড় ছাড়বার ঘরে ঢুকে যাও।

সুধাংশু বললে—দরজাটা তা'হলে খিল লাগিয়ে দিয়ে যাই, না হলে অন্য কেউ ঢুকে পড়লে তার পক্ষে লোভ সম্বরণ করা মুস্কিল হতে পারে।

মণি কৃত্রিম কোপে ঝুলঝাড়াটা উঁচিয়ে বললে—দেখ, হাতে কি রয়েছে দেখতে পাচ্ছ?

সুধাংশু তাড়াতাড়ি ক্যামেরা এনে এই ভঙ্গির একখানা ফোটো তুলে নিলে। ক্যামেরাটা যথাস্থানে রাখতে রাখতে সে বলতে লাগল—ছবিখানা বড় করে কোনো কাগজে ছাপতে পাঠিয়ে দেব। নিচে লেখা থাকবে—যা দেবী মম গৃহেষু ঝুলঝাড়া হস্তেন সংস্থিতা—

স্যার অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র। জীবনে তাঁকে কখনো ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়নি। সত্য বটে, তিনি দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রথম দিকে দারিদ্র্যের জন্য কিছু কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। তবুও তিনি ছিলেন বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান, তার ওপরে সৃষ্টিকর্তা তাঁকে অসাধারণ মেধার অধিকারী করে পাঠিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সাগর অকাতরে পার হয়ে এসে তিনি দেখলেন তাঁর জন্য ধনীর সুন্দরী কন্যা মালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিয়ের পরেই অভয়াচরণ শ্বশুরের পয়সায় বিলেত গিয়ে আই সি এস পাশ করে দেশে ফিরে এলেন।

কাজে যোগ দিয়ে তিনি যেখানে গিয়েছেন সেইখানেই গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর সুখ্যাতি অর্জন করেছেন—যদিও এই দুই তরফকেই সন্তুষ্ট করা তখনকার দিনে অসম্ভব ছিল বললেই চলে, কিন্তু দেবতার দয়া থাকলে কি না হয়। স্ত্রীর দিক দিয়েও তাঁকে কখনো ভুগতে হয়নি। মনোরমা সত্যই ছিলেন মনোরমা—সুন্দরী, নীরোগ, সাধ্বী এবং স্বামীর গর্বে গর্বিতা। তিনি একাধারে সংসার চালিয়েছেন ঘড়ির কাঁটার মত, ছেলেদের মানুষ করেছেন এবং স্বামীর কর্মজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাইরেও তাল দিয়েছেন। চাকরি-জীবনের শেষ দিকে গভর্মেণ্ট পুরস্কার স্বরূপ অভয়াচরণকে হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত করেছিলেন। বার বছর এই চাকরী করে সম্প্রতি তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। অভয়াচরণের তিন ছেলে—তিনটিই হীরের টুকরো। বড় ও মেজ ছেলে—অংশুপ্রকাশ ও বিমলাংশুপ্রকাশ—দু'জনেই সিভিলিয়ান। ছোট ছেলে সুধাংশুপ্রকাশ তিন ভায়ের মধ্যে ছিল সব চেয়ে মেধাবী। স্কুল কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষাতেই সে জীবনে কখনো দ্বিতীয় হয়নি। অভয়াচরণের খুবই ইচ্ছা ছিল যে, সুধাংশুও বিলেত গিয়ে সিভিলিয়ান হয়ে আসে, কিন্তু তা হয়নি।

বি-এ পাশ করার পরে সুধাংশুর মা'র একান্ত ইচ্ছায় মণিমালার সঙ্গে সুধাংশুর বিয়ে হয়ে গেল। এই বিবাহ অনেক দিন আগেই ঠিক হয়েছিল। মনোরমা ছিলেন মণিমালার মা'র বন্ধু, তিনি কথা দিয়েছিলেন তাঁর ছেলের সঙ্গে মণিমালার বিয়ে দেবেন। এঁদের দুই পরিবারের মধ্যে খুবই মাখামাখি ছিল এবং ছেলেবেলা থেকে সুধাংশু ও মণিমালা উভয়েই জানত যে, তাদের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

বিয়ের সময় মণির বয়স ছিল পনের। তখন সবে সে ম্যাট্রিক পাশ করে আই-এ পড়তে আরম্ভ করেছে আর সুধাংশু বি-এ পাশ করেছে। বিয়ের পর ঠিক হল যে, মণি বাপের বাড়ীতে থেকেই পড়াশুনো করবে আর সুধাংশু এম-এ পাশ ক'রে বিলেতে যাবে এবং সেখানে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ ক'রে এসে একত্রে ঘরকর্ণা করবে। তার আগে পালে-পার্বণে বাপের বাড়ীতে এবং শ্বশুর-বাড়ীতে উভয়ের দেখাশুনো চলবে কিন্তু অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে।

কিছু দিন যেতে না যেতে অভয়াচরণ ও মনোরমা উভয়েই জানতে পারলেন যে, সুধাংশু প্রতি দিনই বিকেল বেলা শ্বশুর-বাড়ীতে যায় এবং সন্ধ্যা বেলা অবধি সেখানে আড্ডা দিয়ে বাড়ী ফেরে। সুধাংশু ছোট ছেলে এবং অত্যন্ত আদরের ছেলে ব'লে অভয়াচরণ কিংবা মনোরমা কোনো দিন তাকে ধমক পর্যন্ত দেননি। সুধাংশুও বাপ-মায়ের এত বাধ্য ছিল যে, ধমক দেবারও কখনো দরকার হয়নি। বাপ-মা'র সঙ্গে সব ছেলেরই, বিশেষ ক'রে সুধাংশুর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। সে প্রতিদিন শ্বশুর-মন্দিরে যাতায়াত করছে জানতে পেরে মনোরমা তাকে ডেকে বললেন—হ্যাঁ রে সুধা, তুই না কি রোজ মণির সঙ্গে দেখা করতে যাস?

সুধাংশু অনেক ভেবে-চিন্তে বললে—হ্যাঁ, দু'দিন গিয়েছিলুম। এক দিন ফাউন্‌টেন পেনটা আনতে, আরেক দিন—

মনোরমা ব'লে দিলেন—ছি বাবা, ও'রকম যেতে নেই। ওতে তোমার নিন্দে হবে, আমাদের নিন্দে হবে, বৌমাকে সবাই নিন্দে করবে।

সুধাংশু মাকে কথা দিলে, আর সে না বলে শ্বশুর-বাড়ীতে যাবে না। সপ্তাহ খানেক অদর্শনের পর তারা চিঠি লিখে ঠিক করলে মণির কলেজের সামনে সুধাংশু এসে দাঁড়িয়ে থাকবে ও সেইখানেই দেখা হবে। প্ল্যান কাজে পরিণত করতে দেরী হল না।

এখন থেকে সুধাংশু-মণির নিয়মিত মিলন হয়। মধ্যে মধ্যে পরেশনাথের বাগান, আলিপুরের চিড়িয়াখানাও চলতে লাগল। কিন্তু চেনা-লোকে যে পৃথিবী ভর্ত্তি হয়ে আছে প্রায়ই সে অভিজ্ঞতা হওয়ায় মধ্যে মধ্যে কলেজ পলায়ন ক'রে চন্দননগর বর্দ্ধমানও চলে। বছর খানেক সময় বেশ নিশ্চিন্তে এই ভাবে তারা কাটিয়ে দিলে।

এক দিন তখন শীতকাল। সুধাংশু ও মণি গড়ের মাঠে

ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছেই একটা বড় গাছের তলায় শুয়ে শুয়ে গল্প করছে এমন সময় আলিপুরে কি একটা কাজ সেরে স্যার অভয়াচরণ মাঠের রাস্তা দিয়ে ফেরবার মুখে দেখলেন, তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ চিৎ হয়ে মাঠে পড়ে আছে, দু'জনের মুখে দু-টুকরো দূর্বা ঘাস।

স্যার অভয়াচরণ প্রথমে তাঁর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি গাড়ী থেকে নেমে গুটি-গুটি তাদের কাছে ফিরে দাঁড়ালেন, কিন্তু তাদের কি তৃতীয় ব্যক্তির দিকে নজর দেবার ফুরসৎ আছে? তারা তখন উচ্চহাস্য ও কথাবার্তায় মশগুল। শেষ কালে অভয়াচরণ ডাক দিলেন—সুধা, মণি।

সুধাংশু কথাবার্তায় এতই মশগুল ছিল যে, বাপের আওয়াজ তার কানেই যায়নি। মণি কিন্তু এই বিজন প্রান্তরে অকস্মাৎ শ্বশুরের ডাক শুনে ব্যাঘ্র-তাড়িত হরিণ-শাবকের মত ঠিকরে দাঁড়িয়ে উঠেই দেখে সামনে শ্বশুর মহাশয় দাঁড়িয়ে আছেন। মণিকে দেখে সুধাংশুও ধড়মড় ক'রে উঠে বাপকে দেখে কি করবে ঠিক পায় না, এমন সময় অভয়াচরণই বললেন—রোদে থাকে না, আয়!

সুধা ও মণি গুটি-গুটি অভয়াচরণের পিছু-পিছু চলল। গাড়ীর কাছে এসেই সুধাংশু সামনের দিকের দরজাটা খুলে ড্রাইভারের পাশে বসে পড়ল। মণি ও অভয়াচরণ ভেতরে বসলেন। এতক্ষণ মণি ঠিক ছিল কিন্তু গাড়ী চলতে আরম্ভ করতেই সে লজ্জায় কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে। অভয়াচরণ তাকে কাঁদতে দেখে একখানা হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—ছি, কাঁদছ কেন? কাঁদবার কি হয়েছে!

শ্বশুরের কাছে এই প্রশ্রয় পেয়ে মণি চোখ মুছতে মুছতে ভাবতে লাগল, সব দোষ ওই ওর—

যা হোক, অভয়াচরণ সেখান থেকে বাড়ী না গিয়ে সোজা বেয়াই-বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং সেখান থেকে মণির বাক্স-প্যাঁটরা জিনিষপত্র সব গাড়ীতে বোঝাই করে নিজেদের বাড়ীতে এলেন। অভয়াচরণের বিরাট বাড়ী, দুই ছেলে বাইরে থাকে, বাড়ী এক রকম খালি বললেই হয়। তেতলাটা সব সময়ে চাবিই দেওয়া থাকে। তারি এক দিকে তিন-চারটি ঘর সুধাংশুদের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে গেল—সেই দিন থেকে এই দিকটার নাম হয়ে গেল মণিমহল।

স্বামীর এই ব্যবস্থায় মনোরমা যদিও বাধা দেননি তবুও এক দিন সুধাংশুকে ডেকে তিনি বলেছিলেন—বৌমাকে নিয়ে এলে কিন্তু যদি পরীক্ষায় ফেল কর তো দু'জনেরই বদনাম হবে।

সুধাংশু মা'র পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বলেছিল—তোমার আশীর্বাদে পরীক্ষার ফল ভালোই হবে দেখে নিও।

সেবার পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল সুধাংশু যথারীতি এবারও প্রথম হয়েছে। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেবার মণিও প্রথম বিভাগে পাশ করলে। আশাতীত আনন্দে অভয়াচরণ ও মনোরমা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

মহা সমারোহে সুধাংশুর বিলাত-যাত্রার আয়োজন চলতে লাগল। আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল দাদাদের মত সেও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবে। সব বন্দোবস্ত চলেছে, বিলেতে চিঠিপত্রও লেখালেখি হচ্ছে, এমন সময় এক দিন সুধাংশু তার বাবাকে জানালে তার বিলেতে যাবার ইচ্ছে নেই।

সুধাংশুর কথা শুনে অভয়াচরণ একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বিবেচক ও শান্ত প্রকৃতির লোক। কোনো রকম গোলমাল না ক'রে তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন—তা'হলে তুমি কি করবে?

সুধাংশু বললে—সিভিলিয়ানের চাকরীর প্রতি তার কোনোও ঝোঁক নেই এবং অদূর ভবিষ্যতে দিশি সিভিলিয়ানদের অবস্থা আরোও খারাপ হ'য়ে দাঁড়াবে ব'লে মনে হচ্ছে। তার ইচ্ছা, এখানকার ফাইন্যান্স পরীক্ষা দিয়ে ভারত গভর্মেন্টের দপ্তরে ঢুকতে পারলে ভবিষ্যতে মাইনের দিক দিয়ে ভালো তো হবেই অথচ সিভিলিয়ানের মত ঝুক্কি পোয়াতে হবে না। এই পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় যদি না পারা যায় তখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার কথা বিবেচনা ক'রে দেখা যেতে পারে।

মন্দ লোকে বলে, বিলেত যাবার কথায় মণি কান্নাকাটি করেছিল ব'লে সুধাংশু যেতে চায়নি, কিন্তু মণি সে অভিযোগ অস্বীকার করত।

বছর খানেক পরিশ্রম করে সুধাংশু পরীক্ষায় এবারেও প্রথম স্থান অধিকার করলে। সরকারী মহলে অভয়াচরণের নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কম ছিল না। তারই ফলে সুধাংশু প্রথমেই একটি দায়িত্বপূর্ণ বড় চাকরী পেয়ে গেল। বৈশাখ মাসে এক দিন সে বাপ-মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে চলে গেল সিমলের পাহাড়ে চাকরী করতে—মণিও সঙ্গে রৈল।

কাজে ঢুকেই সুধাংশু কাজের লোক ব'লে নাম ক'রে ফেললে। ধাঁ-ধাঁ ক'রে তার উন্নতি ও প্রোমোশন হতে লাগল। লোকে বলত, পৃথিবীতে সুধাংশুর দুটো নেশা আছে—এক মণি আর এক আপিস। কিন্তু সুধাংশু আপিসকে নেশা ব'লে স্বীকার করলেও মণিকে সে নেশা বলত না। মণি ছিল তার সকল কর্মের—তার জীবনের সকল ধর্মের অনুপ্রেরণা। আপিস ছাড়া সে সিমলার সামাজিক কোনো কাজেই মিশতে পারত না। সেখানকার সামাজিক-গিন্নীরা প্রথম প্রথম মণিকে তাঁদের কাজের ও হুল্লোড়ের আবর্তে টানবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মণিও তাতে তেমন ক'রে ধরা দিতে পারলে না। শেষ কালে সবাই তাদের হাল ছেড়ে দিলেন—তারা দু'জনে দু'জনকে একান্তে পেয়ে যেন বেঁচে গেল। সুধাংশু আপিসের কাজ করতে করতে ভাবত কখন মণির কাছে ফিরে যাবে আর সারা দিন সংসার গুছোতে গুছোতে মণি ভাবত সুধাংশু কখন ফিরে আসবে। বাইয়ের জগত থেকে ক্রমেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগল। সুধাংশুকে সকলেই ভাবত লোকটা বড় কুনো—কেউ বলত চেলো, কেউ বলত স্ত্রৈণ। কিন্তু তাদের এ সব কথায় কিছু আসত-যেত না। মণি তার ভালবাসা দিয়ে প্রাণপণে আকর্ষণ করত সুধাংশুকে, সেও মণিকে ঠিক সেই রকম প্রবল ভাবে ভালবাসত—কিন্তু তবুও যেন তৃপ্তি হত না, সুধাংশু ভাবতে থাকত তার মধ্যেও যেন কোথায় ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

সুধাংশু ও মণি দু'জনেই বলাবলি করত, এক দিন না এক দিন, সে আজ হোক কাল হোক কিংবা পঞ্চাশ বছর পরেই হোক যখন মৃত্যু এসে দাঁড়াবে তাদের দু'জনের মাঝখানে তখন কি হবে? তারা শুনেছিল মৃত্যুর পর পরলোকে অনন্ত জীবন আছে। সুধাংশু মণিকে বোঝাত, আমি ম'রে গেলে তুমি তো আর অনন্ত কাল বাঁচবে না, কিছু দিন পরে আবার আমরা মিলব। সুধাংশু পর-জীবনের অনেক

কথাই বলতে থাকত—সবই তার শোনা এবং পড়া। মণি তার কাঁধে মাথা রেখে শুনে যেত, কখনো বা তার চোখের কোণে এক বিন্দু অশ্রু ফুটে উঠত। সে বুঝতেই পারত না কোন বেদনায় অশ্রু এ—বেদনার না আনন্দের?

এক দিন সিমলেতে এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে মণি ও সুধাংশু প্রকাণ্ড এক কাচের জানলার ভেতরে সোফায় বসেছিল। বাইরে পাহাড়ের ওপর চাঁদের আলো ও আবছায়ায় মিলিয়ে এক স্বপ্নরাজ্য তৈরি হয়েছিল। এই রহস্যময় আলো-আঁধারিতে মিশে গিয়ে তাদেরও মনে হতে লাগল—এই জীবনটাও যেন একটা রহস্য। কিছু আলো কিছু আঁধার, যেন কিছু বোঝা যায় বাকিটা সবই আচ্ছাদিত। তবুও কি সুন্দর, মধুময় এই পরিবেশ!

সুধাংশু মণিকে পাশে টেনে নিয়ে বললে—দেখ মণি, এমন সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে মানুষকে যেখানে যেতে হয় সে জায়গা কি এর চেয়েও সুন্দর?

মণি বললে—যতই সুন্দর হোক আমি সেখানে যেতে চাই না।

সুধাংশু বললে—যেতে চাই না বললেই হবে না মণি, যেতেই হবে, তোমাকে আমাকে সবাইকে—দু'দিন আগে আর পরে।

—যেতেই যখন হবে তখন আমি সেই অজানা পুরীতে একা যেতে চাই না। তুমি না থাকলে সেখানে আমি একলা কি ক'রে থাকব? ঈশ্বরের কাছে আমার এই প্রার্থনা জানাই যে, তুমি যেন আগে যাও, তার এক দিন পরেই যেন আমি যাই।

সুধাংশু হেসে বললে—কিন্তু মণি, হিন্দু মেয়েরা সধবাই মরতে চায়।

মণি বললে—মরতে চাইত তখন সহমরণ এড়াবার জন্তে।

সুধাংশু ও মণি দু'জনেই হেসে উঠল।

কিন্তু মণিকে আগেই যেতে হল।

কি একটা জরুরি সরকারী কাজে সুধাংশুকে দিন কয়েকের জন্ত কলকাতায় আসতে হয়েছিল। ট্রেণে কি রকমে ঠাণ্ডা লেগে মণির হল জ্বর, বাড়ীতে পৌঁছিয়েই ডাক্তার ডাকা হল। তিনি এসে বললেন ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, দিন দুয়েক শুয়ে থাকলেই সেরে যাবে। কিন্তু সেই ইনফ্লুয়েঞ্জা ডবল-নিমোনিয়ায় দাঁড়িয়ে দিন দশেকের মধ্যেই মণি মারা গেল। মণির তখন ত্রিশ বছর বয়স আর সুধাংশুর বয়স পঁইত্রিশ। বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েক মাস ছাড়া এই পনেরো বছরের মধ্যে কখনো তারা ছাড়াছাড়ি হয়নি—এর মধ্যে তাদের সন্তানাদিও হয়নি।

বলা বাহুল্য, মণির মৃত্যুতে সুধাংশু চারি দিক অন্ধকার দেখলে। তখনো তার বাপ-মা দু'জনেই বেঁচে। কিন্তু বাবা মা ভাই বৌদি ভাইপো ভাইঝি কারুর মুখ চেয়েই সে সান্ত্বনা পেলে না। আপিসে সে দীর্ঘ দিনের ছুটির আবেদন পাঠালে—এই দশ বছর চাকরির মধ্যে সে একবারও ছুটি নেয়নি।

সুধাংশুর ছিল ফোটোগ্রাফির সখ—ছাত্র-জীবনেই সে দেশ-বিদেশে এই ক্ষেত্রে নাম করেছিল। বিয়ের পর সে মণিমালার ছবি তুলেছিল—নানান ভঙ্গিমায়, এবং সেগুলি বড় করে বাঁধিয়ে ঘরময় সাজিয়ে রেখেছিল। এ বিষয়ে সে স্ত্রীকেও ওস্তাদ করে তুলেছিল। তারা কলেজ থেকে পালিয়ে চন্দননগর, বোট্যানিক্যাল গার্ডেন প্রভৃতি জায়গায় ছবি তুলত। মণিও সুধাংশুর অনেক ছবি তুলেছিল—দশ-বারোটা এ্যালবাম ভর্তি ছিল কেবল মণির তোলা ছবিতে।

ছ'মাসের ছুটি মঞ্জুর হয়ে এল। সুধাংশু মণির ছবিগুলো নাবিয়ে নিজের হাতে ধুলো ঝেড়ে তাতে প্রতিদিন টাটকা ফুলের মালা ঝুলিয়ে দিতে লাগল। মণি একটা বিশেষ গন্ধের ধূপ পছন্দ করত, প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা ঘরের মধ্যে সেই ধূপ জলতে লাগল। সুধাংশুর ব্যাপার দেখে তার মা-বাবা ভয় পেয়ে গেলেন কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—সুধাংশু যে রকম করছে তাতে বছর খানেকের মধ্যেই সে বিয়ে করল ব'লে।

সুধাংশু কিন্তু বেশি দিন ছুটি নিয়ে ঘরে ব'সে থাকতে পারলে না, মাস খানেক যেতে না যেতেই সে হাঁপিয়ে উঠল। শেষকালে আপিসে আবার দরখাস্ত ক'রে কাজে গিয়ে যোগ দিল। সিমলেতে যাবার সময় মণির ছবিগুলো নিয়ে যেতেও সে ভুলল না।

মণি-জ্ঞান ও মণি-ধ্যানে সুধাংশুর দিন কাটতে লাগল। চাকরীর সময়টুকু ছাড়া বাড়ীর বাইরে সে থাকত না। কোন পার্টি সভা-সমিতি পূজা-উৎসবে সে যোগ দিত না।

দেশভ্রমণ করবার ইচ্ছা তার প্রবল ছিল। সে ও মণি প্রায়ই পরামর্শ করত ছুটি নিয়ে একবার দু'জনে ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরে আসবে। এখন দেশভ্রমণের ইচ্ছা হলেই তার মনে হত, সে একলা গেলে মণির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। সে ভাবতে থাকত, মণিও নিশ্চয় তার কথা ভাবছে—যেখানে সে গিয়েছে সেখান থেকে এসে দেখা দেওয়া নিশ্চয়ই অসম্ভব, তা না হলে মণি কি দেখা দিত না?

আবার কবে তার সঙ্গে দেখা হবে এই চিন্তায় তার রাত কাটত। ক্রমেই মণির চিন্তা তার একটা প্রবল নেশায় দাঁড়িয়ে গেল—এমনি ক'রে কখন যৌবন পেরিয়ে সে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হল, প্রৌঢ়ত্ব পার হয়ে বার্দ্ধক্যের সামনে এসে দাঁড়াল, তা সে নিজেই জানতে পারেনি। হঠাৎ এক দিন আপিসে তাকে মনে করিয়ে দিলে—মাস তিনেক বাদেই তার পেন্‌সন্ পাবার সময় হবে—যদি আরও কিছু কাল চাকরী করবার ইচ্ছে থাকে তবে এই বেলাতেই আবেদন ক'রে রাখতে হবে। কিন্তু চাকরির মেয়াদ আর না বাড়িয়ে সে পেন্‌সন্ নেওয়াই সাব্যস্ত করলে।

পেন্‌সন্ নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেই সুধাংশু অনুভব করলে সংসারে আপনার বলতে তার আর কেউই নেই। এই ক'বছরে তার জীবনের ওপর দিয়ে দুটো ঝড় বইত—এক চাকরি আর মণির স্মৃতি! এর মধ্যে বাবা-মা মারা গিয়েছেন। বড় দুই ভাই—তারা পাকা সাহেব, তার ওপরে তাঁদের চাকরিতে ছুটি পাওয়া না কি সম্ভব নয়। তাই পিতা-মাতার মৃত্যুতে অশৌচ শ্রাদ্ধ মায় মাথা নেড়া হওয়া পর্যন্ত তাকেই করতে হয়েছে। কিন্তু সে সব সত্ত্বেও সুধাংশু তাঁদের অভাব বোধ করেনি। এর মধ্যেই তার বড় দুই ভাই ও এক বৌদিও চলে গেছেন। বড় ভায়ের এক ছেলে এবং মেজ ভায়ের দুই ছেলে—তারা বিয়ে করেছে, দু'-একটি ক'রে নাতি-নাতনিও আসতে আরম্ভ করেছে, সুধাংশু বাড়ীতে ফিরে এসে দেখলে তার বিধবা মেজ বৌদি এদের নিয়ে সমারোহে সংসার করছে। পঁচিশ বছর পরে বাড়ীতে ফিরে এসে এই অপরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে পড়ে মজ্জমান

ব্যক্তির অবলম্বনের মতন প্রাণপণে সে মণির স্মৃতিকেই আঁকড়ে ধরলে।

দেয়ালের যে সব জায়গা থেকে সে মণির ছবিগুলো নামিয়ে নিয়েছিল সেখানকার পেরেকগুলো তখনও ঠিক সেই রকমই ছিল। সেখানে সে ছবিগুলো টাঙিয়ে দিলে, আবার তাতে ফুলের মালা চড়তে লাগল, সন্ধে বেলা মণির প্রিয় অম্বুরী গন্ধ ধূপ জ্বলতে লাগল। মৃগনাভির সুরভি আবার নতুন করে তাকে যেন সেই দিনগুলিতে নিয়ে যেতে লাগল—যে-দিনে মণিই ছিল এই গৃহের কর্ত্রী।

এক দিন সুধাংশু মণির তোলা ছবির এ্যালবামগুলো ঝাড়া-মোছা করছিল একটা বড় আয়না-টেবিলে বসে। ছবিগুলোকে এ্যালবাম থেকে খুলে ময়লা মুছে আবার এ্যালবামে পুরে রাখছিল। পঁচিশ-ত্রিশ বছর বা তারও আগেকার তোলা সব ফোটো, এত দিনে সেগুলো অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কত লোকের, কত আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের ছবি মণি তুলেছিল, সবাইকে আর সুধাংশু চিনতেও পারছিল না। হঠাৎ একখানা তার নিজের ছবির দিকে নজর পড়ল—ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবার পর মণি যত্ন করে সেখানা তুলেছিল। সুধাংশু নিজের ছবিখানা ভালো করে দেখতে লাগল—তার মনে হল তখন সে দেখতে সুন্দর ছিল, বয়স ছিল পঁচিশ বছর। ছবিখানা বার বার দেখতে দেখতে একবার সম্মুখে নজর পড়ায় দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। তার কি খেয়াল হল, সে নিজের প্রাক্তন ও বর্ত্তমান চেহারা মিলিয়ে দেখতে লাগল। এ্যালবামে নিজের সেই ছবিখানার পাশে হাস্যমুখী মণিরও একখানা ছবি ছিল। সুধাংশুর মনে হতে লাগল আজ যদি মণি বেঁচে থাকত তবে সে কি রকম দেখতে হত!

সেই দিন থেকে মণির স্মৃতির সঙ্গে এই একটা খেলা তার সুরু হল। যত দিন যেতে থাকে ততই সে কল্পনায় মণির চেহারা তৈরি করে। মণি মোটা হয়েছে, তার মাথার চুল ধীরে ধীরে সব শাদা হয়ে যাচ্ছে, কপালে-মুখে বলিরেখা পড়ছে—এই মূর্ত্তিতে সে যেন আরো সুন্দর দেখতে হয়েছে। সুধাংশুর একটানা চিন্তার মধ্যে একটুখানি বৈচিত্র্য এল।

এক দিন সুধাংশুর মেজ বৌদি এসে বললেন—ঠাকুরপো, চল ভাই, একঘেয়ে জীবন আর ভালো লাগছে না, দিন কতক তীর্থ ক'রে আসি। সুধাংশু ভাবলে জীবনে সে কোন দিন ধর্ম্মের কথা—দেবতার কথা ভাবেনি, আজ আবার তীর্থ করতে যাবে কি? মণি থাকলেও না হয় হত। বলা বাহুল্য, সে গেল না। ভাইপোরা বিষয়-আশয় সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এলে সে এক কথায় পরামর্শ দিয়ে দিত কিংবা বলত—যা তোরা ভাল বুঝিস কর না, আমি আর ক'দিন! এই রকম চলতে চলতে তার মেজ বৌদিদি এক দিন মারা গেলেন, সুধাংশুর বয়স তখন সত্তর পার হয়ে গেছে।

ভাইপোদের ছেলেরা বড় হতে লাগল। তারা একে নাতি তায় আজকালকার ছেলে। তারা মানে না, তাদের কুনো দাদুকে ঘর থেকে টেনে বার করতে আরম্ভ করলে। আজ যাদুঘর, কাল বোট্যানিক্যাল গার্ডেন—এই ক'রে তারা বেড়াতে লাগল। এ সব জায়গায় যেতে সুধাংশুর ভালোই লাগত, কারণ সে আর মণি কলেজ থেকে পালিয়ে বাড়ীর সকলকে লুকিয়ে এই সব জায়গায় এসে বসত—এ সব স্থান মণির স্মৃতিতে ভরা। সেখানে গেলে সুধাংশু আগেকার সেই দিনগুলির ভেতর ফিরে যেত, তফাতের মধ্যে মণি নেই আর সে স্বাস্থ্য ও বয়স নেই। এক দিন নাতিরা সুধাংশুকে নিয়ে আলিপুরের চিড়িয়াখানা থেকে ফিরছে, মাঠের মধ্যেকার রাস্তা দিয়ে মোটর গাড়ী হু-হু করে ছুটে চলেছে, এমন সময় এক জায়গায় সুধাংশু গাড়ী থামাতে বললে। নাতিদের মধ্যেই এক জন গাড়ী চালাচ্ছিল সে মাঠের ধারে গাড়ী থামালে। সুধাংশু গাড়ী থেকে নেমে থপ-থপ ক'রে মাঠের মধ্যে একটা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল—নাতিরা অবাক হয়ে তার কাণ্ড দেখতে লাগল। সুধাংশু কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ধপ করে বসে পড়ল, তার পরে চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়ল আকাশের দিকে মুখ ক'রে। নাতিরা হাসাহাসি করতে লাগল—দেখ, দাদুর কাণ্ড দেখ! অনেক ডাকাডাকি করার পরও সুধাংশুর কোনো সাড়া না পেয়ে সবাই সেই গাছের নিচে গিয়ে দেখলে সুধাংশুর দেহে প্রাণ নেই।

* * * *

মৃত্যুমোহ কেটে যাওয়ার পর যখন জ্ঞান হল তখন সুধাংশু দেখলে, তার চারি দিকে ভীষণ অন্ধকার আর সেই অন্ধকারের মধ্যে সে ভেসে বেড়াচ্ছে। অন্ধকার খুব গাঢ় হলেও সে অনুভব করতে লাগল, সেই অন্ধকারে তারই মতন আরোও অনেকে ভেসে বেড়াচ্ছে। প্রথমটা সে বুঝতেই পারেনি যে, তার মৃত্যু হয়েছে। কয়েক মুহূর্ত্ত এই ভাবে কাটবার পর যখন বুঝতে পারলে, সে মরলোক ত্যাগ করেছে তখনই তার মণির কথা মনে পড়ল। মণি কোথায় কি ভাবে আছে, সে কি তার সঙ্গে দেখা করবে না? এই অজ্ঞাত অপার অন্ধকারের মধ্যে কি ক'রে তাকে খুঁজে বার করবে। একান্ত ভাবে মণির কথা ভাবতে ভাবতে সুধাংশু দেখতে পেল, সেই অন্ধকার ফুঁড়ে মণির মুখখানি ভেসে উঠল। সুধাংশু কত কাল মণিকে দেখেনি, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সে নিরবধি তারই ধ্যানে কাটিয়েছে। মনের আবেগে সে হু-হু ক'রে মণিকে ব'লে যেতে লাগল—কি ক'রে, কি দুঃখে পৃথিবীতে তার দিন কেটেছে। শুধু আজকের এই মিলনের আশায় সে এত দিন কাটিয়েছে। আর তার দুঃখ নেই, এবার তারা অনন্ত মিলনে বাঁধা পড়ল, অনন্ত কালের জন্য।

দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর মণির দেখা পেয়ে সুধাংশু এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, সে লক্ষ্যই করেনি যে মণি তার একটি কথারও জবাব দিচ্ছে না। তার মুখে কিন্তু সেই হাসিটি লেগে আছে, যে হাসি পৃথিবীতে সকলের কাছে তাকে প্রিয় ক'রে তুলেছিল। সুধাংশু তার মা দাদা বৌদি আত্মীয়-স্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করলে—জিজ্ঞাসা করলে—তারা কোথায় আছে? চল মণি তাদের কাছে যাই—মণি কিন্তু কোনো উত্তর দেয় না। তার মুখে সেই হাসি—অনির্বাণ রহস্যময় হাসি—সে হাসি কি কান্না, সুধাংশু তাও বুঝতে পারে না।

সুধাংশু মনে করলে, হয়তো এখানকার কোনো নিয়ম বশত কিছু কালের জন্য সে চুপ করে আছে, পরে আবার সে কথা বলবে। কিন্তু যে মহাকালের নিঃসীম সমুদ্রে দিন-রাত্রি-আলো-অন্ধকারে চিত্র-বিচিত্রিত পৃথিবীর বৎসরগুলি রঙিন্ ধূলিকণার মত নিমেষে মিলিয়ে যায়, সে মহাকালের কোন পরিমাণ কে করতে পারে! এমনি ভাবে ক্রমে সেই নিঃসীম অন্ধকার সমুদ্র কোন্

অন্তর্লোক-বিচ্ছুরিত আলোকে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল—তবুও মণি নীরব। ক্রমে সুধাংশু বুঝতে পারলে, তার পাশে যে হাস্যমুখী মণির মুখখানি দেখা যাচ্ছে সে আসল মণি নয়, সে তারই কল্পনা রূপ ধরেছে মাত্র—এই কথা মনে হওয়া মাত্র মণির মুখখানা শূন্যে মিলিয়ে গেল।

সুধাংশু মণির সন্ধান করতে লাগল। কত লোককে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে যে এসেছে কে তার খোঁজ রাখে? এই রকম করে ঘুরতে ঘুরতে সে একটা অপূর্ব আলোকময় জায়গায় এক দিন এসে পৌঁছল। কিন্তু এ আলো বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারা যায় না। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার যেন কি রকম ঘুম পেতে লাগল, কিছুক্ষণের মধ্যেই সে গভীর ঘুমে অভিভূত হয়ে পড়ল।

* * * * *

এবার সুধাংশু জন্মগ্রহণ করলে এক দরিদ্র কায়স্থ-পরিবারে। গরীব হলেও তার বাপ-মা উভয়েই শিক্ষিত। তার বাবা এম-এ পাশ করে একটা কলেজে অধ্যাপকের চাকরি করেন, মাইনে পান দেড়শো টাকা, মা ম্যাট্রিক পাশ। পৈত্রিক একখানা বাড়ী আছে, তারই একাংশ ভাড়ায় খাটে আর বাকিটায় তারা থাকে।

নতুন জন্মে সুধাংশুর নাম হল অসিতকুমার। বাড়ীর বড় ছেলে সে, সুখেই মানুষ হতে লাগল। তার পরে আরো একটি ভাই আসতেই একটু একটু ক'রে সে দারিদ্র্যের দংশন বুঝতে আরম্ভ করলে। সেই বয়সেই মাঝে মাঝে তার মনে নানান চিন্তার উদয় হত। তার চার পাশের অনেক ধনীর ছেলেকে প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতে দেখে তার মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন উঠত—তারা কেন সে রকম থাকতে পায় না। কিন্তু সে ছিল শান্ত প্রকৃতির ছেলে, তার মনের এই আলোড়ন মনেতেই লয় পেত, বাইরে প্রকাশ পেত না।

সেদিন সপ্তমী পূজা। অসিতের তখন বছর ছয়েক বয়স হবে। সে তার দু'-বছরের ভাই নিশীথকে নিয়ে তাদের রকে বসেছিল। দূরে পূজা-বাড়ী থেকে ঢাক ও শানাইএর মিশ্রিত সুর এসে তার কানে লাগছিল—বহু দিন বিস্মৃত সুখস্মৃতির মত। তার মনে হতে লাগল—এই সুখ এই শরতের সোনালি রোদ এই পূজার প্রভাতটি এরা যেন তার বহুদিনের-পরিচিত। রাস্তা দিয়ে দলে দলে সুন্দর পোষাক-পরা ছেলে-মেয়ে চলে যাচ্ছিল। অসিত একটা কোরা ধুতি পরে বসেছিল—এর বেশি সেবারে পূজোর সময় তার বাবা দিতে পারেনি, এই জন্য অসিতের দুঃখ কিছুই ছিল না। কিন্তু সুন্দর বেশে সজ্জিত তারই বয়সী ছেলে-মেয়েদের দেখতে দেখতে তার যেন মনে হতে লাগল, সেও এক দিন ঐ রকম সুন্দর পোষাক পরত, এক দিন যেন তারাও খুব ধনী ছিল। কে এক জন যেন তাকে খুব ভালবাসত, সে চলে গিয়েছে, তাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না। একটা অকারণ বেদনা তার বুকের মধ্যে গুমরে উঠতে লাগল।

চোখের সামনে দিয়ে সুসজ্জিত ছেলে-মেয়ের দল চলে যেতে লাগল, দূরে সানাইয়ের সাহানা করুণতর হয়ে আকাশ ও বাতাসে প্রসারিত হতে লাগল, কি একটা বেদনায় অসিতের দুই চোখ অশ্রুতে ভ'রে উঠল, সে একখানা হাত দিয়ে তার ভাই নিশীথকে আরো কাছে টেনে নিলে। দাদার স্পর্শ পেয়ে নিশীথ তার গা ঘেঁসে এসে বসল।

অসিত তার এই নূতন অনুভূতিকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে অনেক দিন পর্যন্ত জাগিয়ে রাখলে। সে প্রায়ই নির্জনে বসে ভাবতে থাকত তার কথা, যাকে সে ভালবাসে অথচ চেনে না,—বেশ লাগত তার সে কথা ভাবতে।

সেই বছরের শেষের দিকে তার হাতে খড়ি হল। তার পরে সটকে, কড়াকে ও নয়ের ঘরের নামতার বক্রতালে তার সেই অনুভূতি পিষে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল—আবার নবজীবন সুরু হল।

আপনার আমার গল্প

বারীন্দ্রনাথ দাশ

আলমারীর চালের ওপর ছোটো টাইমপীসে দেড়টা যেই বাজলো আর ছায়া নামলো পূবের বারান্দায়, ফেরীওয়ালার সাড়া ক্ষীণ হয়ে হয়ে এলো দূর রাস্তার মোড়ে আর বাড়ীর সামনে দিয়ে ঠুং-ঠুং করে চলে গেল সওয়ারবিহীন এক রিকশওয়ালা, রান্না-ঘরের দরজায় শেকল দিয়ে মুখে পান গুঁজে গায়ে চাদর টেনে আপনি শুয়ে পড়লেন খাটের এক পাশে একটি মাসিকপত্র হাতে নিয়ে। আপনার ছোটো খুকীটি একটি পুতুল বুকে চেপে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে এক পাশে। ছেলেটি স্কুল থেকে ফিরবে চারটের আগে নয়, আর উনি তো ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যের অন্ধকারে শেষ মাঘের কুয়াশা নামবে। এখন আপনার বেশ কিছুক্ষণ ছুটি, সারা দিনের ঝঞ্ঝাট আর খাটুনির মধ্যে এই একটুখানি আয়েসী অবসরের বিলাস। আপনার মন থেকে পালিয়ে গেল সংসারের খুঁটিনাটি ভাবনাগুলো, বিকেলে মুদীর দোকান থেকে তেল এক সের না এলে যে রাত্তিরের রান্না হবে না আর কাল যে ঘরে তুলতেই হবে এ সপ্তা'র রেশান, ও-সব আপনার মনেই পড়লো না। মাসিকের পাতা উল্টে গেলেন আপনি। চোখে পড়লো আমার গল্পটি। নামখানি দেখেই হাসলেন একটুখানি। গল্পটি যে আপনারও—সে কেমন করে হবে?

শুনুন তা'হলে। পশ্চিমের জানলার পর্দাটি তুলে একটুখানি উঁকি মারলে যে দেখা যায় বাড়ির সামনের রাস্তাটি দূরে বড়ো রাস্তায় গিয়ে পড়েছে, সেখানে ট্রাম-লাইনের ওপারে একটি মস্তো বড়ো জনতায় জমজমাট সিনেমা-হল। তারই গায়ে ওই মস্তো বড়ো প্রাচীরচিত্র, সেখানে একটি ভারী সুন্দর মেয়ের খুবই মিষ্টি মুখখানি আঁকা। নামটি আপনার জানা, ময়ূরাক্ষী বোস। আজকের দিনে সিনেমার সব চেয়ে নাম-করা মেয়ে। সামনেই ট্রাম-ষ্টপ। প্রত্যেক দিন সকাল বেলা ময়ূরাক্ষীর ছবির পটভূমিকায় ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করেন আপনার স্বামী আর এদিকের জানালায় দাঁড়িয়ে থাকেন আপনি। ট্রাম এসে তুলে নিয়ে যায় আপনার স্বামীকে। আপনার আর ময়ূরাক্ষীর ছবির মাঝখানে পড়ে থাকে একটি দীর্ঘ পথ,—আপনার জীবন আর ময়ূরাক্ষীর জীবনের মাঝখানের পথটি যতো দীর্ঘ ঠিক ততোখানি। এই দীর্ঘ পথের ধূলোয় ধূলোয় অনেক

লোকের আসা-যাওয়ার স্মৃতি জড়ানো। সেই অনেক লোকের ভীড়ে আমি এক জন আর আপনার স্বামী এক জন।

সে আজ অনেক দিন আগেকার কথা। আপনার স্বামী আমায় চেনেন না। আমি চিনি না আপনাকে। আপনি চেনেন না ময়ূরাক্ষীকে। কিন্তু এক দিন আমাদের চার জনকে নিয়ে সেই দীর্ঘ পথে দুর্দান্ত ধূলো-ওড়ানো ঝড় উঠেছিলো।

* * * * *

আমি যখন এম-এ পড়ছি ময়ূরাক্ষী তখন বি-এ পড়ছে আশুতোষে। ওর আমার চেনা আরো অনেক পুরোনো। যখন সে ফ্রক পরতো আর আমি সবে হাফ-প্যান্ট ছেড়ে ফুল-প্যান্ট ধরেছি ঠিক সেই সময় থেকে। আমারই পুরোনো নোট পড়ে সে ম্যাট্রিক পাশ করেছে, আই-এ পাশ করেছে। তার পর আমি ইকনমিক্সে এম-এ পড়ছি দেখে সেও ইকনমিক্স অনার্স নিলো বি-এতে যা'তে আমার অনার্সের নোটগুলিরও অপব্যয় না হয়, সপ্তায় এক-আধ দিন গিয়ে পড়িয়েও আসতুম ওকে, কখনো কখনো ওকে আর ওর ভাই-বোনদের সঙ্গে নিয়ে সিনেমায়ও যেতুম, চিড়িয়াখানায় যেতুম, বটানিক্সে যেতুম। চেনাশুনোরা ধরে নিয়েছিল যে, হয়তো আমাদের বিয়েটাও হয়ে যাবে এরই মধ্যে কোনো এক দিন। এ ধরণের টুকরো কথাগুলো শুনে আমার মন কাচের জারের সোনালী মাছের মতো দলমলিয়ে ওঠেনি, যদিও কি রকম যেন হাল্কা মেঘের মতো ভেবেছিলো ছাতের ওপর চুল শুকোতে ওঠা মিনমিনে মেয়েটির চোখের খাঁচায় আটকে গেলেও মন্দ হয় না। কিন্তু সেটুকুও সেই হাল্কা মেঘের মতোই। সেই মেঘে কোনো দিন ঝড় ওঠেনি।

ঝড় কোনো দিন না উঠলেও হাল্কা মেঘের পেছনের সোনালী রোদ্দুরটি এক দিন ম্লান হয়ে এলো। ময়ূরাক্ষীর কলেজে টেষ্ট পরীক্ষা যখন সুরু হবো-হবো, অথচ আমার কাছে পড়া বুঝে নেওয়ার জন্তে ওর দেখা নেই, তখন গিয়ে দেখি আরেক জন কার যেন অপটু হাতে তৈরী কাঁচা নোট সে নির্ভাবনায় হজম করবার চেষ্টা করছে।

"কার নোট এ সব", জিজ্ঞেস করলুম।

বললে, "খোকনের নোট।"

"খোকন?"

সেই প্রথম শুনলুন আপনার স্বামীর কথা। তখনও অবশ্যি আপনার স্বামী সে নয়, কারণ আপনাদের বিয়ে সে আরো অনেক বছর পরের কথা। একটি ভালো নাম তার অবশ্যি ছিলো, কিন্তু সেই নামটি এখানে অবান্তর, কারণ তার ঘরোয়া নামে ময়ূরাক্ষী তাকে জানতো। সুতরাং অন্য নামটি জানবার প্রয়োজন আমার কোনো দিন হয়নি।

আর দু'-দশ জন বাঙলা দেশের ছেলের মতো একটি অতি সাধারণ বাপের অতি সাধারণ ছেলে সে। বাপ করতেন একটি মাঝারি গোছের চাকরী। মধ্যবিত্ত সংসারে খোকনই ছিলো প্রাচুর্যময় ভবিষ্যতের একমাত্র সুখস্বপ্ন। ছেলেকে ভালো লেখাপড়া শেখাতে বাপ কার্পণ্য করেননি কোনো দিন। ছেলেটিও সুবোধ বালকের মতো ভাল ভাবেই লেখাপড়া করে এসেছে। সেও পড়তো আশুতোষেই, তারও ইকনমিক্সে অনার্স।

তার পর কি করে যেন সে এক দিন বেড়াতে গেল তার মাসীর বাড়ি। মাসতুতো বোনের স্কুলের বন্ধু ময়ূরাক্ষী। সেও ছিলো সেখানে। আলাপ হোলো। দু'জনে একই কলেজে, একই বিষয়ে —যদিও বিভিন্ন সময়ে—সহপাঠি জেনে দু'জনেই পুলকিত হোলো। ময়ূরাক্ষীর গানের গলা খুব মিষ্টি। সেই গলায় রবি ঠাকুরের রোমান্টিক গান শুনে খোকনের হৃদয় দ্রবীভূত হোলো। খোকনের আবৃত্তি শুনে ময়ূরাক্ষী বিমুগ্ধ হোলো। সন্ধ্যের পর বাড়ী ফেরার পথে খোকন ময়ূরাক্ষীকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিলো। এমনি আরো এক দিন, তার পর আরো এক দিন, তার পর প্রত্যেক দিন।

ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে একটা সহজ বন্ধুত্ব ছিলো আমার। সে খুব সরল মনে সবই বলে ফেলল আমায়।

তার পর বললে, "আর কাউকে যেন বোলো না সলিলদা। বাবা-মা শুনলে খুব রাগ করবেন।"

আমি হাসলুম একটু। বললুম, "পাগল! বলবো কেন? তবে ছেলেমানুষী কিছু করে বোসো না যেন। মনে চোট লাগলে সামলে নিতে অনেক দাম দিতে হয়।"

"সলিলদা", ময়ূরাক্ষী চোখ ঢুলু-ঢুলু করে বললে, "আমি খুবই সিরিয়াস।"

"তোমরা সিরিয়াস হলেও ভগবান যে সব সময় সিরিয়াস থাকেন না", বললুম আমি।

দিন-দুই পর ময়ূরাক্ষী আমাদের বাড়ী বেড়াতে এলো। এসে আমার সঙ্গে গল্প করতে বসলো। কথায় কথায় বললে, "সলিলদা, তুমি কোনো দিন প্রেমে পড়েছো?"

আমি একটু চুপ করে থেকে বললুম, "কি জানি, হয়তো পড়িনি। কেন?"

"যদি পড়তে", ময়ূরাক্ষী বললে, "জানতে প্রেমটা কি জিনিষ", বলে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো, ঠিক আর দশটা প্রথম প্রেমে-পড়া মেয়ে যেমনি তাকিয়ে থাকে।

প্রথমটা হাসি পেয়েছিলো খুবই। কিন্তু তার পর সহানুভূতিতে মনটা ভরে উঠলো। বেচারী বাঙলা দেশের মেয়ে! দু'দিন পরে তো বিয়ে হয়ে যাবে। রোমান্সের 'র'ও থাকবে না জীবনে। যে কয়টা দিন হাতে আছে স্বপ্ন দেখুক যতো খুসী। আর খোকনকে যদি সে পেয়েই যায় নিজের জীবনে আর ঘর বাঁধতে পারে তাকে নিয়ে, রোমান্সের সমুদ্র মন্থন করে যতো গরলই উঠুক কোনো আক্ষেপ থাকবে না ময়ূরাক্ষীর মনে।

প্রায়ই শুনতে হোতো ওদের গল্প আর ছোটো-খাটো এ্যাডভেঞ্চারের ইতিহাস। রেস্তরাঁয় কেবিনের নিভৃত নিরালায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিরিবিলি গল্প, ক্লাস পালিয়ে সিনেমা দেখা আর ট্রাম-ষ্টপে এ ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা, যা' চিরকাল হয়ে এসেছে তারই একটি মাধুর্যময় পুনরাবৃত্তি।

কিন্তু মাঘের হাড়-কনকনে শীতের পর দক্ষিণের টুকরো মেঘে মেঘে যখন বসন্ত ভেসে এলো কলকাতায় আর আশুতোষ কলেজের আশে-পাশের গাছে-গাছে কোকিলের অদম্য কূজনে চঞ্চল হয়ে উঠলো ক্লাস শেষ-হওয়া পথচারিণীরা, বি-এ পরীক্ষার কালো মেঘ ঘনিয়ে এলো দুর্ভাবনার দমকা হাওয়ায়। নিরুপায় বসন্তের নিষ্ফল

স্বপ্নগুলো ক্লাস-নোটের পাতায় পাতায় লাল-নীল দাগ হয়ে নেমে এলো। ময়ূরাক্ষী পাগল হয়ে গেল তার নোটের পাহাড় নিয়ে, ভুলে গেল যে তার কথা দেওয়া ছিলো খুব তাড়াতাড়ি টুকে নিয়ে সেগুলো খোকনকে ফিরিয়ে দেবে। খোকন পাগল হয়ে গেল তার নোটবিহীন টেবিলের মরুভূমিতে বসে থেকে চুপচাপ দিন গুণে-গুণে। তার পর এক দিন ময়ূরের বাড়িতে খোঁজ নিতে এসে দেখলো সেখানে পাহারা বসেছে।

সেই দুর্দিনে আমার যখন ডাক পড়লো ময়ূরাক্ষীর বাড়ীতে তখন সে খোকনকে ভুলে গেছে। সামনে বি-এ পরীক্ষা। অনার্স তাকে পেতেই হবে। সুতরাং সলিলদা লক্ষ্মীটি, আমাকে সাজেসান কিছু এনে দাও না, এই প্রশ্নের উত্তরটা তৈরী করে দাও না, ওই বইটা জোগাড় করে দাও না প্রভৃতির অফুরন্ত ফরমাশ। সলিলদা যখন হিমসিম খেয়েও নিজের হাতে তৈরী শিষ্যাটির সাফল্যের সম্ভাবনায় গর্বিত হবো-হবো, তখন ঠিক সেই অনার্সের পরীক্ষার মুখোমুখী ময়ূরাক্ষী অনার্স ছেড়ে দিলো।

আর ঠিক সেই সময় তার মনে পড়লো খোকনের কথা।

"ছিঃ, ছিঃ, কি অন্যায়টা করলুম সলিলদা। এ সময়টা ওর নোটগুলো দরকার আর আমি কি না সব কিছু ভুলে সেগুলো আটকে রেখেছি?"

নোটগুলো যখন খোকনের কাছে গিয়ে পৌঁছুলো তখন সেও নিরুপায় হয়ে অনার্স ছেড়ে দিয়েছে।

ময়ূরাক্ষী চোখ দু'টো ছলছলিয়ে না কি জিজ্ঞেস করছিলো, "তুমি আমার ওপর রাগ করেছো, খোকন?"

খোকন খুব ভিজে-ভিজে গলায় উত্তর দিয়েছিলো, "কি যে বলো, ময়ূর, আমার জীবনে একটি তুচ্ছ অনার্সের থেকে তোমার ভালোবাসার দাম অনেক বেশী।"

শুনে আমি হেসে ফেলেছিলুম।

খুব রাগ করেছিলো ময়ূরাক্ষী। "সলিলদা, তোমার হৃদয় বলে কোনো কিছু নেই? আমি তোমায় বিশ্বাস করে সব কিছু বলি, আর তুমি কি না হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছ সব।"

তার পর বেশী কিছু আর শোনবার সময় ও সুযোগ হয়নি আমার। এম-এ পরীক্ষা এগিয়ে আসছিলো। খুব ব্যস্ত ছিলুম তাই নিয়ে। মাঝখানে এক দিন ট্রামে দেখা হয়েছিলো ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে।

"জানো, আমি পাশ করেছি পাস-কোর্সে।"

"তাই না কি? বেশ বেশ। খোকন?"

"এই, আস্তে। বাবা বসে আছেন ওদিকে। হ্যাঁ, সে পাশ করেছে, পাস-কোর্সেই। আই-এ'তে নাইন্থ, হয়েছিলো। এবার অনার্সে ফার্স্ট ক্লাশ পেতো। অনার্স রাখতে পারলো না। বেচারা।"

"বেচারা।"

বাপ মনে খুব আঘাত পেয়েছিলেন ছেলে অনার্স পায়নি বলে। তবু বললেন, "তাতে কি? এবার এম-এ পড়। এম-এ'তে ফার্স্ট ক্লাস পাবি।" কিন্তু এম-এতে ভর্তি হওয়ার আগেই তাঁর জীবনের মেয়াদ হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। সামান্য কিছু প্রভিডেন্ট ফাণ্ড রেখে তিনি চলে গেলেন। খোকন পড়া বন্ধ করে চাকরী নিলে। একটি নাম-করা সিডিউলড, ব্যাঙ্কে।

ময়ূরাক্ষী চোখে নায়েগ্রা ফল্‌স্ নামিয়ে বললে, "জানো সলিলদা, জীবনটা এ রকমই। মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক রকম। ওর মনে কতো এমবিশান ছিলো।"

"ভাবছো কেন", আমি বললুম, "ধৈর্য যদি থাকে তো সে এই ব্যাঙ্কিং লাইনেই অনেক উন্নতি করবে।

"সে তো করবেই। কিন্তু সে আমায় বলছে বাবার কথা মতো বিয়ে করে ফেলতে। আমায় বিয়ে করতে তার যতো টাকা আয় হওয়া দরকার সেটা হতে দেরী আছে অনেক। দু'দু'টো বোন মাথার ওপর, ওদের বিয়ে দিতে হবে। একটি ভাই, তাকে মানুষ করতে হবে—।"

"বুদ্ধিমানের মতোই বলেছে। তোমার বাবা যখন বলছেন, তখন বিয়ে করে ফেল তাঁর পছন্দ-করা কোনো ছেলেকে। খোকনের অপেক্ষায় বসে থাকবে আর কদ্দিন?"

"তুমিও এ কথা বলছো, সলিলদা?" ময়ূরাক্ষী বললে। তার পর একটু চুপ করে থেকে বললে, "আমি বিয়ে করবো না।"

"সে কি?"

"হ্যাঁ, যদি করি তো খোকনকেই, নইলে কাউকে নয়।"

"কি করবে তবে।"

"সিনেমায় নামবো।"

'সিনেমায়?"

"হ্যাঁ, যেমন করে হোক আমাকে টাকা আয় করতেই হবে। খোকনের বোনদের বিয়ে দিইয়ে, ওর ভায়ের যা-হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করে, তার পর ওতে-আমাতে মিলে একটি নিরিবিলি সংসার পাতবো। খোকনের টাকা যদি না থাকে না-ই বা থাকলো, কি আসে-যায় তাতে। আমার তো থাকবে। আমার টাকা তো ওরই টাকা।"

"তাই বলে সিনেমায় নামবে?"

"অতো টাকা অতো তাড়াতাড়ি আর কিসে হয় বলো?"

"কিন্তু তুমি নামবে সিনেমায়?"

"কেন? আমার চেহারা কি খারাপ?"

"না।"

"আমার গানের গলা খারাপ?"

"না

"তা' হলে? আমাদের পাশের বাড়ির সুজাতা যদি নামতে পারে, আমি পারবো না কেন? তার তো ওই চেহারা। আর এরই মধ্যে দু'টো বইয়ের হিরোইন হয়েছে সে। আমিই বা হতে পারবো না কেন? জানো? ছেলেবেলা থেকেই আমার ইচ্ছে সিনেমায় নামা।"

"খোকনকে বিয়ে করবার ইচ্ছেও কি তোমার ছেলেবেলা থেকেই?" আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম।

হঠাৎ একটুখানি রাগের বিদ্যুৎ চমকে গেল ময়ূরাক্ষীর চোখে। বললে, "সলিলদা, খোকনের মতো এক জন যে আমার জীবনে আসবে, তার সাড়া আমি ছেলেবেলা থেকেই মনে মনে পেয়েছি।"

"নেমে পড়ো সিনেমায়", আমি বললাম, "তুমি উন্নতি করবে।"

তার পর মাস কয়েক ব্যস্ত ছিলুম এম-এ পরীক্ষা নিয়ে। পরীক্ষার পর বাইরে গেলুম। আরো কয়েক মাস কেটে গেল। ফিরে এসে শুনলুম ময়ূরাক্ষী সিনেমায় কনট্রাক্ট পেয়ে গেছে।

বছর খানেক কেটে গেল। ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে দেখা বড়ো একটা হয় না। ছবিটি নিয়ে সে ব্যস্ত। একটা বই রিলিজের মুখে। বাজার জমজমিয়ে উঠেছে। আরো দু'টো বইয়ের কনট্রাক্ট এসে গেছে। কয়েক বার আমাদের বাড়ি এসেছে যদিও, বদলে গেছে কথাবার্তার ধরণ-ধারণ।

"খোকনের খবর কি ?"

"ভালোই আছে। আচ্ছা সলিলদা, বলতে পারো, এই শনিবার সিলভার প্রিন্সেস কতোর দরে দিচ্ছে ?"

"খোকনের সঙ্গে দেখা হয় ?"

"কখনো-সখনো। জানো, কাল হোয়াইটওয়েস্‌এ এমন লাভলি একটা ব্রোকেড দেখলুম !"

"খোকন কি আজ-কাল—"

"আগামী বছর অষ্টিন যা একটা নতুন মডেল দিচ্ছে, দেখলে তুমি পাগল হয়ে যাবে সলিলদা।"

আমাদের সঙ্গে পড়তো সুশোভন। এক দিন তাদের বাড়ি নেমন্তন্ন। সেখানে আলাপ হোলো সুশোভনের দাদার বন্ধু এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি গাঙ্গুলী সায়েব নামেই সুপরিচিত। একটি সেডিউল্‌ড্‌ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার। খুব সামান্য লেখাপড়া-জানা লোক গাঙ্গুলী সাহেব। কোন এক মফস্বল সহর থেকে নিঃসম্বল অবস্থায় ব্যবসা করতে এসেছিলেন কলকাতায়। এখন প্রচুর টাকার মালিক—গত যুদ্ধের দৌলতে। একটি ব্যাঙ্ক করেছেন, একটি ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, একটি জুট মিল, গোটা-দুই ফ্যাক্টরী, এবং এটা-ওটা-সেটা আরো অনেক কিছু। বয়েস খুব বেশী নয়, আমাদের থেকে বছর খানেক বড়ো। প্রচুর অর্থের মালিক হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত অমায়িক এবং ভদ্র।

কথায়-কথায় জানলুম জি-জি প্রডাকশান্‌স্‌, যারা ছায়াচিত্র-জগতে পরিচিত করেছে ময়ূরাক্ষীকে, গাঙ্গুলী সায়েবকেই সামনে খাড়া করে গড়ে উঠেছে।

তিনি থাকতেন আমাদের পাড়ারই কাছাকাছি। ফেরার পথে আমায় বললেন, "আমার গাড়িতেই চলুন না।"

পথে বললেন, "চলুন একটু ময়দানে হাওয়া খেয়ে যাই। আপনার দেরী হবে না তো ?"

"কিছুমাত্র না," আমি বললুম।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের উল্টো দিকে যে একটা সরু পথ চলে গেছে-ময়দানের মাঝখান দিয়ে, যার দু'পাশে ছায়াঘন গাছের সারি —আর বহুদূরবিস্তৃত মাঠ, সেখানে আড়ালে আড়ালে দেখা যায় দু'-একটি গাড়ি। নিভৃত আসরের মৃদু আভাষ পাতা-ঝিরঝির দমকা হাওয়ায় অস্পষ্ট ভেসে আসে। এ পথের একটি নাম আছে, কিন্তু সে নাম কেউ মনে রাখে না। বেশীর ভাগ লোকের কাছে এই পথটি লাভার্স লেন নামেই পরিচিত। সেখানেই গাড়ী পার্ক করে গাঙ্গুলী সায়েব বললেন, "এই জায়গাটি আমার সব চেয়ে ভালো লাগে। আমি একাই আসি এখানে। অন্য যারা আসে তারা যে একা আসে না, সেটুকু অনুভব করতেই আসি আর সেটুকু খুব ভালো লাগে।"

"বিয়ে করেছেন", আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলুম।

একটু হাসলেন তিনি। বললেন, "না।"

এটাই ছিলো গাঙ্গুলী সায়েবের জীবনে একমাত্র দুর্বলতা। জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য যে কোনো ব্যবসায়ীর মতো নির্মম কঠোর, কিন্তু কোনো ছেলে আর কোনো মেয়ের মধ্যে ভালোবাসাটা দেখলে তিনি তাদের জন্যে যে কোনো কিছু করতে প্রস্তুত, তারা চেনাই হোক আর অচেনাই হোক।

জি-জি প্রডাকশান্‌সের আরম্ভও না কি এ ভাবেই। ব্যবসার বাঁকা রাস্তায় ব্যাঙ্কের হাতে এসে গিয়েছিলো তিনটি সিনেমা-হল। সুতরাং নিজেরাই ছবি তুললে কি রকম হয় সে সব যখন ভাবছিলেন হঠাৎ তাঁর এক জন এসিষ্ট্যান্ট তাঁর ঘরে ঢুকে বললে, "আপনি তো ছবি প্রডিউস করছেন। একটি মেয়েকে চান্স দেবেন ?"

এ রকম অনুরোধ তাঁর কাছে অনেক আসতো। গা' না করে বললেন, "আচ্ছা, পরে দেখা যাবে।"

এসিষ্ট্যান্টটি বললে, "মেয়েটিকে একবার দেখুন। তার পর যা হোক কিছু স্থির করবেন।"

খুব ব্যস্ত হয়েই ফাইল ঘাঁটছিলেন গাঙ্গুলী সায়েব। ফাইল থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়েটি কে ?"

এসিষ্ট্যান্টটি আমতা-আমতা করে বললে, "এই যে আমার চেনা একটি মেয়ে।"

মনে মনে হাসলেন গাঙ্গুলী সায়েব। মায়া হোলো ছেলেটির ওপর। বললেন, "আচ্ছা, কাল ওকে নিয়ে এসো।"

"সেই আমার প্রথম ছবি সুরু হোলো একটি নতুন আনকোরা মেয়েকে নিয়ে। আমার ছবি দাঁড়িয়ে গেল, মেয়েটিও দাঁড়িয়ে গেল। কে জানেন ?"

"ময়ূরাক্ষী ?"

"হ্যাঁ, অদ্ভুত মেয়েটি। ভেলভেট তৈরী জলবিছুটি। বড্ডো ভালো লাগে আমার। আসবেন এক দিন। সে প্রায়ই আসে। আলাপ করিয়ে দেবো।"

"ময়ূর আমার চেনা মেয়ে। ও যখন ফ্রক পরে সেই বয়েস থেকেই চেনা।"

"ময়ূর আপনার চেনা মেয়ে ? মনে হোলো সংসারে যারা ময়ূরের চেনা লোক তারা সবাই যেন গাঙ্গুলীর আপনার জন।

সেদিন থেকে আমার সঙ্গে গাঙ্গুলীর অন্তরঙ্গতা সুরু।

কিছু দিন পর এক দিন সন্ধ্যে বেলা গাঙ্গুলীর সঙ্গে বসে চা খাচ্ছি গাঙ্গুলীর বাড়িতে, এমন সময় ময়ূরাক্ষী এসে উপস্থিত সেখানে।

আমায় দেখে ময়ূর অবাক। "এ কি। সলিলদা' এখানে ?"

"সলিল আমার বন্ধু", গাঙ্গুলী বললে। ময়ূর খুব খুসী, বললে, "সত্যি ? সলিলদা' তো আমায় বলেনি কোনো দিন ?" তার পর বললে, 'পরশু আমার জন্মদিন। আপনাকে নেমন্তন্ন করতে এলুম মিঃ গাঙ্গুলী। আসবেন নিশ্চয়ই। সলিলদা, তুমিও এসো। তোমার ওখানে যাচ্ছিলুম। এখানে পেয়ে গেলুম ভালোই হোলো।"

উঠে পড়লো ময়ূরাক্ষী। আরো কোথায় যেন যেতে হবে তাকে।

সে চলে যাওয়ার পর গাঙ্গুলী বললে, এদের দু'জনকে আমার অদ্ভুত ভালো লাগে।"

"দ্বিতীয় জনটি আবার কে?"

"ময়ূরের বন্ধু, সেই ছেলেটি যে আমার এসিষ্ট্যান্ট। ওরা দু'জনে দু'জনের জন্যে এত পাগল। ছেলেটা চায় ময়ূর খুব নাম করুক সিনেমায়। ময়ূর চায় ছেলেটা উন্নতি করুক জীবনে। সেদিন আমায় বলছিলো। ওর অনুরোধ এড়াতে পারলুম না। ওকে হেড অফিসে সেক্রেটারী করে দিলুম।"

একটু অবাক হলুম। সাধারণ এসিষ্ট্যান্ট থেকে এক লাফে সেক্রেটারী?

তারও একটু কারণ ছিল। জি জি প্রডাকশানস্এর আগের ছবিটি যতো নামই করুক সেই পরিমাণ টাকা দিতে পারেনি। তাই এবারের ছবিটির জন্যে অনেক টাকা দরকার। ওভারড্রাফট্ নিতে হবে ব্যাঙ্ক থেকে। একটু প্যাঁচ আর লুকোচুরী করেই নিতে হবে, নইলে অন্য ডিরেক্টারেরা আপত্তি তুলতে পারে। তাই সেক্রেটারীর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পোষ্টে এক জন নিজের লোক থাকা দরকার, যে বে-আইনী কাজের ধার ঘেঁষে দু'-একটা কাজ করতে আপত্তি করবে না।

আপত্তি কোরলো না খোকন ছেলেটি। এ তো শুধু নিজের জীবনে উন্নতির প্রশ্ন নয়, এ ময়ূরের জন্যেও। নইলে ফিল্ম কোম্পানী দাঁড়াবে কি করে? আর কী-ই বা ক্ষতি? গাঙ্গুলী লোক ভালো। তাকে ভালবাসে। তাকে বিপদে ফেলবে না কখনো।

মাস দু'-তিন যেতে না যেতে বাজারে শুনতে লাগলুম যে, গাঙ্গুলীর ব্যাঙ্কের অবস্থা ভালো নয়।

দূর থেকে খোকনের শুকনো মুখ দেখে মনে হোলো সেও যেন গভীর জলে পড়েছে।

এক দিন মেঘলা দুপুর বেলা, আকাশে যখন মেঘ গুড়মুড়িয়ে উঠেছে আসন্ন বর্ষার আভাবে আর ছুটির দিনের ঘুম-ঘুম আমেজ লেগেছে চোখে আর মনে, ময়ূর এসে বললে, "সলিলদা, চলো, একটা লম্বা ড্রাইভে বেরুই, বহু দিন তোমার সঙ্গে বেরুইনি।

ব্যারাকপুর রোড ধরে ডাইনে ঘুরে কিছুক্ষণ পরে ওয়েলিংটন ব্রিজের ওপর উঠে পড়লো ময়ূরাক্ষীর মরিস মাইনরটি। গঙ্গার হাওয়ায় ময়ূরের চুলগুলি যখন বিপর্যস্ত হয়ে উঠলো আর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক বক। ময়ূর বললে, "জানো সলিলদা, আগের দিনগুলো অনেক ভালো ছিলো।"

"নতুন কথা কি বলছো ময়ূর", আমি বললাম, "সে কথা সবারই মনে হয়, সব সময়ই।"

ময়ূর বললে, "ঠিক তা' নয়। কি ব্যাপার জানো, টাকা পাচ্ছি বেশ, নামও হচ্ছে, কিন্তু শান্তিটা যেন হারাচ্ছি আস্তে আস্তে।"

"কেন?"

"সেদিন গাঙ্গুলী এসে বললে, ময়ূর, খোকনের ভালো দেখে একটা বিয়ে দিয়ে দাও না। আমি জিজ্ঞেস করলুম—কেন? বললে, ছেলেটি ভালো, চাকরীও করে ভালো, এবার তো ওর একটা বিয়ে দেওয়া দরকার। আমি কিছু বললুম না। গাঙ্গুলী বললে, আমি জানি তুমি কি ভাবছো। কিন্তু সে হয় না। ওদের বাড়ীতে তুমি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে না। ওর হোলো সাধারণ গেরস্থ ঘর। এমন মেয়ে ওর দরকার যে রান্নাবান্না করবে, সংসার দেখবে। সে তুমি পারবে না। তোমাদের দু'জনের পোষাকী বন্ধুত্বই ভালো—আটপৌরে ঘরকন্না পোষাবে না। আমি বললুম—আপনি আমায় চেনেন না। গাঙ্গুলী বললে—চিনি না? তার পর হেসে বললে, তুমি নিজের সংসারে নিজেকে আর খাপ খাওয়াতে পারছ না, পরের সংসারে গিয়ে পারবে? আমি আর কিছু বললুম না", বলে ময়ূরাক্ষী থামলো।

"কেন", আমি জিজ্ঞেস করলুম।

"ভেবে দেখলুম গাঙ্গুলী ঠিকই বলেছে।"

পরের বার গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা হতেই সে আমায় জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা সলিল বাবু, একটি নিরিবিলি কটেজ কোনবার জন্যে কোন্ জায়গাটা ভালো, নৈনিতাল না কালিম্পঙ?"

বললুম, "বিয়ে করছেন কবে?"

একটু অপ্রস্তুত হোলো গাঙ্গুলী। বলল, "হঠাৎ এ প্রশ্ন?"

তার পর এক দিন ময়ূরাক্ষী বললে, "খোকনকে বলে দিলুম ওকে বিয়ে করবো না।"

"সে কি?" আমি বিচলিত হবার ভাণ করলুম।

ময়ূর বললে, "ওকে বললুম, আমার জীবনে সংসারের থেকে আর্ট অনেক বড়ো। আর্টের জন্যে আমি সংসারকে ছাড়তে বাধ্য হচ্ছি। দু'টো একসঙ্গে হয় না। আর্টিষ্টের মন ঘর বাঁধবার মন নয়। ঘর পালানোর মন। খোকনকে আমি অসুখী করতে চাই না।"

"খোকন কি বললে", আমি জিজ্ঞেস করলুম।

"খোকন বললে, বেশ, তুমি যা চাইছ তাই হবে। তোমায়ও আমি অসুখী করতে চাই না। সত্যি সলিলদা, খোকনের মন এত বড়ো। সে আমার জন্যে এত করেছে। জানো সলিলদা, খোকন যদি গাঙ্গুলী সায়েবকে সাহায্য না করতো, গাঙ্গুলী সায়েব বই তুলবার টাকা বার করতে পারতো না এত সহজে আর বই না উঠলে আমায় আজ কেউ চিনতো না", বলে রুমালে চোখ মুছলে ময়ূরাক্ষী।

"খোকন বিয়ে করছে কবে?" আমি জিজ্ঞেস করলুম।

"করবে না। সে সারা জীবন বিয়ে না করেই থাকবে।"

"গাঙ্গুলী সায়েব বিয়ে করছে কবে?"

চোখ পিটপিটিয়ে ময়ূর বললে, "তুমি কি করে জানলে? গাঙ্গুলী বলেছে বুঝি?"

আমি হাসলুম, কিছু বললুম না।

"সে আরেক বিপদ বাধিয়েছে।"

"কেন?"

"গাঙ্গুলী বলছে, আমায় বিয়ে করবে। ওর না কি আর ব্যবসা-পত্তর কিছুই ভালো লাগছে না। ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক সব ছেড়ে দেবে বলছে। তবে আমি যদি ওকে বিয়ে করি তা'হলে সে আমার

জন্যে ছবি আরো দু'-চারটে তুলবে। তা' নইলে না কি কালিম্পঙে না কোথায় বাড়ি কিনেছে, সেখানে চলে যাবে। কি করি ভেবে পাচ্ছি না। কারণ আর্টের জন্যে সংসারকে ছাড়তে যদি হয় তো সেখানে গাঙ্গুলী বা খোকনের বাছবিচার চলে না।"

"তাই যদি বুঝেছো তো সমস্যাটা কোথায়?" আমি বললাম।

"কোথায় জানো? যেখানে দেখা যায় দু'জনে মিলে একই আর্টের পূজারী", ময়ূরাক্ষী বললে, "সেখানে ঘর বাঁধা চলে কি না ভেবে পাচ্ছি না।"

চেনা-শোনা মহলে শোনা গেল যে, গাঙ্গুলীর ব্যাঙ্কের অবস্থা খুব খারাপ। হেড আফিসে যেই নতুন সেক্রেটারীটি মাস কয়েক ধরে কাজ করছে তারই গাফিলতিতে না কি অনেক গোলমাল হয়ে গেছে। তাকে নিয়ে না কি খুব ঝগড়া হচ্ছে ডিরেক্টারদের মধ্যে। গাঙ্গুলী সায়েব খুব ভালো লোক। তার কোনো দোষ নেই এ সব ব্যাপারে। লোকটাকে সে বিশ্বাস করতো বলেই এতো ব্যাপার।

গাঙ্গুলী বললে, "আমাদের সেক্রেটারী তো আমায় বড্ডো বিপদে ফেলে দিলে! ওকে এতো বিশ্বাস করতুম। যাক, আমি যতোটা সম্ভব তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবো। ছেলেটা ভালো। আমি বড্ড ভালোবাসি তাকে।"

ময়ূরাক্ষীর বাড়ি বেড়াতে গেছিলুম এক দিন। ওর সঙ্গে যখন বসে গল্প করছি, চাকর এসে বললে কে এক জন খোকন বাবু এসেছে দেখা করতে। বলছে, বড্ড দরকার।

ময়ূর বললে, "বলে দাও বাড়ি নেই।" চাকর চলে গেল। ময়ূর আমাকে বললে, "কী আর হবে মায়া বাড়িয়ে। তুমি ভাবছো আমি খুব নিষ্ঠুর, না? কিন্তু যদি আমার মনের ভেতরটা তোমায় দেখাতে পারতুম সলিলদা দেখতে সেখানে আগুন জ্বলছে।"

তার পর বললে, "সে কেন এসেছে আমি জানি। আমি গাঙ্গুলীকে আগেই বলেছিলুম। গাঙ্গুলী বলেছে খোকনের কোনো ভয় নেই। ওর কোনো ক্ষতি হবে না।"

আমাদের বাড়ির সামনে যে ভদ্রলোকটি থাকতেন, সেবার তাঁর বাড়িতে একপাল অতিথি এলো দেশ থেকে। শুনলুম সেই ভদ্রলোকের কোন এক আত্মীয়ের মেয়ের বিয়ে—তাঁর বাড়ি থেকেই হবে।

কথায় কথায় এক দিন আলাপ হোলো মেয়ের বাপের সঙ্গে। বললেন, আজকালকার দিনে ভালো ছেলে পাওয়া কী দুঃসাধ্য ব্যাপার! শুনলুম এই বিয়েটা আকস্মিক ভাবেই হচ্ছে। তাঁরা কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। সেই ট্রেনে যাচ্ছিলো ছেলেটি। সঙ্গে ছিলো তার মা। মেয়েকে দেখে মায়ের পছন্দ হোলো। মা ধরে পড়লেন ছেলেকে—এই লক্ষ্মী মেয়েটিকে তোর বিয়ে করতেই হবে। ছেলেটি ভালো, মায়ের বড় বাধ্য। প্রথমটা অনেক আপত্তি করে তার পর রাজি হয়ে গেল।

হাসলুম মনে মনে। বেশীর ভাগ বাঙালী মেয়ের বিয়ে এ রকম আকস্মিক ভাবেই হয়।

জিজ্ঞেস করলুম, "ছেলেটি কি করে ?"

"খুব ভালো একটা চাকরী করে। ওই যে গাঙ্গুলী সায়েবের ব্যাঙ্ক আছে না, তাদের সেক্রেটারী।"

খুব খানিকটা চমকে উঠলুম। জিজ্ঞেস করলুম, "বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে ?"

প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কেন ? কাল বাদে পরশু তো বিয়ে।"

বললুম, "না: এমনি।"

সেদিন ছিলো মাঘ মাসের সন্ধ্যে। উত্তরের হাওয়া বার বার দুলিয়ে যাচ্ছিলো খোলা জানালার পর্দা। আকাশে চাঁদ উঠেছিলো একফালি আর চাঁদের ম্লান আলোয় শীত নেমেছিলো অন্ধকার বারান্দায়।

সেই অন্ধকার বারান্দায় একা বসেছিলাম আমি আর ময়ূরাক্ষী—পাশাপাশি দু'টো ডেক-চেয়ারে। সামনে চা জুড়িয়ে আসছিলো আর ঘরের ভেতরটায় মৃদু নীল আলো জ্বলছিলো একটি শেডের আড়ালে।

আর রাস্তার ওপারের বাড়িতে জ্বলছিলো প্রচুর আলো। অনেক লোকের ভীড় সেখানে। শানাই বাজছিলো বড়ো মিষ্টি বেহাগে। আর জনতার হৈ-চৈ ভেসে আসছিলো এপারের বারান্দায়।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলুম, "বিয়েতে গেলে না কেন ? নেমন্তন্ন করেছে যখন যাওয়া উচিত ছিলো। অনেক দিনের বন্ধু তোমার।"

ময়ূর খুব মৃদু গলায় বললে, "সইতে পারলুম না। মনটা বড়ো ফাঁকা লাগছে। আজকের এই রাতটা আমার হতে পারতো। চোখের জলে ভেজা মন নিয়ে নতুন বৌয়ের অকল্যাণ করতে চাই নে। খোকন সুখী হোক।"

দূরের দেওয়ালে একটি চাবুক ঝুলছিলো। চোখ ফিরিয়ে নিলাম সেখান থেকে।

নীচে একটি গাড়ি এসে থামলো। গাঙ্গুলী সায়েবের গাড়ি।

"বিয়েতে গেলেন না ? নেমন্তন্ন করেনি বুঝি ?" ময়ূর জিজ্ঞেস করলো।

গাঙ্গুলী বললে, "করেছিলো। গেলুম না। ভালো লাগছে না। মনটা বড়ো নিরিবিলি থাকতে চাইছে। তাই সলিলের কাছে এলুম। জানতুম ওকে একলা পাবো। তুমিও আছো, ভালোই হোলো। বেশ গল্প করে সময় কাটবে। চা খাওয়াবেন এক কাপ সলিল বাবু ? তুমি বিয়েতে গেলে না কেন ময়ূর ?"

ময়ূর কোনো উত্তর দিলো না।

"আপনি কেন বিয়েতে গেলেন না গাঙ্গুলী মশাই", আমি জিজ্ঞেস করলাম।

গাঙ্গুলী কোনো উত্তর দিলো না।

ময়ূর এক কাপ চা ঢেলে দিলো গাঙ্গুলীকে। চায়ের কাপে প্রথম চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখলো এক পাশে। একটি সিগারেট ধরালো। তার পর বললে, "মেয়ের পক্ষ আমার চেনা। ওদের সঙ্গে আমার ঠিক বনিবনাও নেই, অনেক দিন দেখাও নেই। মফস্বলে একটি সহরে অনেক আগে আমরা থাকতুম পাশাপাশি।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "জানতুম না যে ওদের বাড়িতেই আমাদের সেক্রেটারীর বিয়ে হচ্ছে, নিমন্ত্রণ পত্র দেখে জানলুম।"

বিপুল উৎসাহের উলুধ্বনি ভেসে এলো। শাঁক বাজলো ঘন ঘন। পুরুষ-মেয়ের মেলানো আনন্দমুখর সোরগোলে হাসাহাসি প্রতিধ্বনিতে এদিকে দরজার পর্দাটি দুলে দুলে উঠলো। ও-বাড়ীর পাশের উঠোন আমাদের বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছিলো পরিষ্কার। বিয়ের আসর সেখানেই। জোড় পরে টোপর মাথায় দিয়ে হাতে মালা নিয়ে পিঁড়ির ওপর খোকন এসে দাঁড়ালো। ঘরের ভেতর থেকে পিঁড়িতে করে কনে বয়ে নিয়ে আনলো কয়েক জন মিলে। শানাইতে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি হোলো স্বরগ্রামের উচ্চতম সপ্তকে। সাত পাক শেষ হোলো, মালা বদল হোলো, কাপড় ঢাকা দিয়ে শুভদৃষ্টি হোলো।

সেদিন বড্ডো করুণ দেখাচ্ছিলো খোকনকে। আর বড্ডো মিষ্টি দেখাচ্ছিলো আপনাকে। তখন আপনার বয়েস আরো কাঁচা, শরীর আরো রোগা, চোখ আরো চঞ্চল।

ময়ূরের দিকে তাকালুম না। মনে হোলো একটি সূক্ষ্ম অনুভূতিতে যে তার চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমেছে, যেটা সত্যি সত্যি। তাকালুম গাঙ্গুলীর দিকে। সিগারেটে টান দেওয়া ক্ষণিক আলোর রক্তিম দ্যুতিতে যা দেখলুম তাতে বিস্ময়ে মন স্তব্ধ হয়ে গেল।

গাঙ্গুলী সায়েবের চোখও জলে ভাসছে।

গাঙ্গুলী সায়েবের সঙ্গে তার পর দেখা হয়নি মাস দুই। ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কের অবস্থা খারাপ হতে হতে এক দিন ব্যাঙ্ক সত্যি সত্যি বন্ধ হয়ে গেল। গ্রেপ্তার হোলো গাঙ্গুলী সায়েব। আর শুনলুম খোকনকে কিছু করা হোলো না। গাঙ্গুলী সমস্ত দোষ ও দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়েছে।

জামিনে খালাস পাবার পর এক দিন দেখা করতে গেলুম গাঙ্গুলীর সঙ্গে। ভদ্রলোক ভেঙ্গে পড়েছেন, আর রোগা হয়ে গেছেন অনেকখানি।

বলতেই হাসলেন। বললেন, "শরীর ভেঙ্গে পড়েছে সত্যি। সেটা মন ভেঙে পড়েছে বলে আর মন ভেঙে পড়েছে ঠিক টাকা বা আমার ব্যবসাটির জন্যে নয়।"

অনেক দিন আগে কোনো এক মফস্বল সহরে গাঙ্গুলী সায়েব ছিলো রকে আড্ডা দেওয়া থিয়েটার-পাগল এক নিষ্কর্মা ছেলে। সেই ছেলেটির সঙ্গে একটি মেয়ের ভাব হোলো। আর দু'-দশটা বাঙালী মেয়ের মতো তার নাম খুকী। বড্ডো ভাব ওদের মধ্যে। লুকিয়ে পাঁচিলের এপার-ওপার থেকে গল্প করা। স্কুলে যাওয়ার পথে দূর থেকে একটুখানি মিষ্টি হাসি দেওয়া-নেওয়া। আর বাড়ির ঝিকে পয়সা দিয়ে হাত করে নিয়ে চিঠি পাঠানো। ক্বচিৎ কদাচিৎ সহরের শেষে নদীর পাড়ে হাত-ধরাধরি করে ঘুরে বেড়ানো।

তার পর এক দিন গাঙ্গুলী গিয়ে খুকীর বাবাকে বলল, সে বিয়ে করবে খুকীকে। সে কথা শুনলে আর দু'-দশটা কচি বাঙালী মেয়ের বাপ নিষ্কর্মা পাণিপ্রার্থীকে যে কথা বলে থাকে, খুকীর বাবাও গাঙ্গুলীকে তাই বললে।

গাঙ্গুলী বাড়ি ছাড়লো, চলে এলো কলকাতায়, পয়সা করতে। পয়সাও করলো। তার পর যখন খুকীর খোঁজ করতে গেল, ওরা তখন সেই সহর ছেড়ে কোথায় চলে গেল কেউ জানে না।

অনেক দিন পর গাঙ্গুলী খুকীর ঠিকানা পেলো—খোকনের বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রে।

"আমার সেক্রেটারী যে সমস্ত গোলমালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলো", গাঙ্গুলী বললে, "সে কিছুতেই বাঁচতে পারতো না। ব্যাঙ্ক ডুবতো বটে, কিন্তু আমার কিছুই হোতো না। জেল হোতো তারই। কারো কোনো ক্ষতি হোতো না তাতে। ময়ূরের আমাকে বিয়ে করায় পথ সহজ হোতো। কিন্তু যেই জানলুম যে, সে খুকীরই স্বামী, তখন আমি আর তাকে হাতে ধরে জেলে পাঠাতে পারলুম না। নিজের দোষ আমি নিজের ঘাড়েই তুলে নিলুম। খুকী কোনো দিন জানবে না। কেউ তাকে বলেও দেবে না তার স্বামীর মনিব গাঙ্গুলী সায়েব সেই অনেক দিন আগেকার মফস্বল সহরের সেই নিষ্কর্মা ছেলেটি, যে কলকাতা চলে আসবার আগের দিন খুকী তার হাত দু'টো চেপে ধরে পাঁচিলের আড়ালের অন্ধকারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে খুব কেঁদেছিলো। জানেন সলিল বাবু, জীবনটা এ রকমই। যাকে জেলে পাঠাবার জন্যে এবং নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমি একটা বড়ো পোষ্ট দিয়েছিলুম, আজ তাকে বাঁচাবার জন্যেই আমি জেলে যাচ্ছি। তার কাছ থেকে আমি ময়ূরকে সরিয়ে নিয়েছি। আর ভগবান তার হাতে তুলে দিলো এমন এক জনকে আমার কাছে যার দাম ময়ূরের থেকেও বেশী।"

গাঙ্গুলী সায়েবের জেল হওয়ার খবর যেদিন বেরুলো সেদিন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলো ময়ূরাক্ষী। "জানো সলিলদা", সে বললে, "একটা ভালো খবর। আমি আগরওয়াল পিকচার্সে নতুন কনট্রাক্ট পেয়েছি, গাঙ্গুলী সায়েবের জেল হয়ে গেল, না? আহা বেচারা! শোনো, কাল আমি একটা পার্টি দিচ্ছি আমার নতুন কেনা বাড়িতে। তুমি আসবে তো ঠিক?"

* * * * *

নতুন বিয়ে-করা বৌকে নিয়ে খোকনকে খুব বেশী দিন বেকার হয়ে কাটাতে হয়নি। মাস কয়েক পরে তার আবার চাকরী জুটে গেল আগরওয়াল না কে এক ব্যবসায়ীর অফিসে। জুটিয়ে দিলো ময়ূরাক্ষী—সোজাসুজি নয়, আরেক জনের মারফতে, যাতে খোকন জানতে না পারে, কারণ ময়ূরাক্ষী তাকে চাকরী জোগাড় করে দিচ্ছে জানলে সে কিছুতেই ও-কাজ নিতো না।

আগরওয়ালের ছিলো মস্তো বড়ো ব্যবসা—অনেক কিছুর। তবে সব ব্যবসারই বড়ো মিল ছিলো এক জায়গায়। আগরওয়ালের টাকা ব্যবসার সদর রাস্তা বেয়ে আসতো না, আসতো চোরা রাস্তা দিয়ে। আগরওয়াল পিকচার্স, সে আগরওয়ালের একটা টুকরো ব্যাপার, তার মারফতে আসলে চোরা টাকা এদিক-ওদিক পাচার করে দেওয়ার ব্যবস্থা হোতো। খোকন হোলো আগরওয়ালের পার্সন্যাল সেক্রেটারী। মাইনে ছিলো যতো কম খাটুনী ছিলো ততো বেশী। সমস্ত নোংরা কাজ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হোতো তাকেই, কিন্তু কিছু বলবার উপায় ছিলো না। সংসারের নানা সমস্যা তাকে এমন ভাবে ঘিরে ধরেছে যে, এই চাকরী তার ছাড়বার উপায় নেই। বোন বড় হয়ে গেছে, ভাই স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছে, বছর ঘুরতে না ঘুরতে একটি ছেলেও হোলো, মায়ের শরীর অসুস্থ এবং খুঁটিনাটি আরো অনেক কিছু।

কিন্তু সাংসারিক অশান্তি তাকে যতোটা বিপর্যস্ত করতো তার চেয়ে বেশী বিক্ষুব্ধ করতো তার দৈনন্দিন কর্মজীবনের অবাঞ্ছনীয় কাজগুলো। তার নিজের কাছে যে নিজেকে ছোটো হতে হোতো সেটাই তার কাছে অসহ্য। অথচ কিছু করবার উপায় ছিলো না তার, কারণ চাকরী তাকে করতেই হবে। আপনি অনেক সময় অবাক হয়ে তাকে হয়তো জিজ্ঞেস করতেন, "কেন এত মনমরা হয়ে থাকো সব সময়? সাংসারিক অশান্তি তো সবারই থাকে, তাই বলে সব সময় মন খারাপ করে থাকতে হয়?" সে আপনার প্রশ্ন এড়িয়ে যেতো। আপনার বড্ড মমতা হোতো তার জন্যে, কিন্তু রাগও হোতো সেই সঙ্গে। কী এমন গোপনীয় ব্যাপার তার থাকতে পারে যা আপনাকে বলবার নয়? আপনার অভিমানের রুক্ষতাকে সে আরো ভুল বুঝলো, ভাবলো এ তার অর্থনৈতিক অক্ষমতার উপহাস। কেউ কাউকে কিছু বললেন না। সংসার চালিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন যতোটা সোয়াস্তির মধ্যে দিয়ে সম্ভব। দু'জনেই সুখী করবার চেষ্টা করলেন দু'জনকে, কিন্তু কেউ-ই সুখী হলেন না।

ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে আর দেখা হোতো না খোকনের। আমার সঙ্গেও দেখা হোতো খুবই কম। ওর খবর বেশীর ভাগ পেতুম সিনেমা পত্রিকায়। জীবনে যে সব ঘটনা তার কোনো দিন ঘটেনি ও-সবের রঙ-ফলানো বিবরণ পড়তুম। কোন্ রঙ তার পছন্দ, কোন্ ফল সে বেশী ভালবাসে, কোন্ লেখকের বই তার সব চেয়ে বেশী প্রিয়, কোন বিদেশী অভিনেতা তাকে বিমুগ্ধ করে বেশী, ও-সবের নতুন নতুন খবরে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তুম। চিরকাল জানতুম কলা খেতে সে খুব ভালোবাসে, এখন জানলুম সে ভালোবাসে ডালিম, যা' ওকে খেতে দেখিনি কোনো দিন। চিরকাল দেখতুম আগাথা ক্রিষ্টির ডিটেকৃটিভ উপন্যাস গিলছে, এখন শুনলুম আঁদ্রে জিদের সে পরম ভক্ত। লরেল হার্ডির ছবি সে দু'বার-তিন বার করে দেখতো, এদ্দিনে বুঝলুম তার পছন্দ লরেন্স অলিভিয়েরকে। কোনো দিন ওকে সাইকেল চালাতে দেখিনি, এবার শুনলুম সে না কি ছাত্রী-জীবনে রাইডিং করতে ভালোবাসতো। ইংরেজীও সে ভালো করে বলতে পারতো না, অথচ সে না কি ছেলেবেলা থেকেই ফরাসী ও জার্মাণ বলে মাতৃভাষার মতো। সে আজো বিয়ে করেনি কেন? তার উত্তরও দেখলুম একটি মাসিকপত্রে। সে না কি কা'কে কা'কে খুব ভালোবাসতো, সেই ছেলেটি তাকে কথা দিয়ে বিয়ে করেছে আরেক জনকে। তাই সে আর জীবনে না কি বিয়ে করবে না। তার দুঃখে পাঠকদের সহানুভূতি বাড়লো যত বেশী, ততো বক্স অফিসও বাড়লো সেই পরিমাণে আর বীভৎস গল্পের অতি বীভৎস ছবিতে তাকে নাচিয়ে আর্টের পায়ে খেসারত দেওয়া দর্শকদের টাকাগুলো ঘরে তুলতে লাগলো আগরওয়াল।

এদিকে আগরওয়ালের জন্যে খেটে খেটে মরলো খোকন। কোথায় কোন্ কেসে মিথ্যে সাক্ষী দরকার, আগরওয়ালের হয়ে সাক্ষী দিলো সে। কাকে প্রচুর মদ খাইয়ে কোনো খবর জানতে হবে, জেনে দিলো সে। কোথায় টাকা দিয়ে সাক্ষী

ভাঙাতে হবে, ব্যবস্থা করে দিলো সে। মিথ্যে চিঠির ড্রাফট্ করে দেওয়া, মিথ্যে কাজের হিসেব দেখানো, চোরাই টাকার হিসেব রাখা সবই ঘাড়ে চাপলো খোকনের। প্রত্যেকটি অত্যন্ত নোংরা ব্যাপারের পর সে ভাবতো, আর নয়, এবারে চাকরী ছেড়ে দেবো। কিন্তু চাকরী ছেড়ে দেবে ভেবে যেমনই সে মন শক্ত করে আনতো তখনই দেখতো, হয় তার ভায়ের পরীক্ষার ফী, নয় তো বা মায়ের অসুখ, বাড়ীওয়ালার সঙ্গে মামলা, নয় তো বা ছোটো মেয়েটির জন্ম।

সেবার হঠাৎ আগরওয়াল একটা ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়লো। আগরওয়ালের কোনো এক ফ্যাক্টরীতে এক জন কেরাণী মেশিন-ঘরের এক এ্যাকসিড্যাণ্টে প্রাণ হারালো। আইন অনুযায়ী তার স্ত্রীর ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা। শুধু তাই নয়, উপরওয়ালায় যেই গাফিলতিতে সে প্রাণ হারিয়েছে সেটা বেশী জানাজানি হলে ফ্যাক্টরী অনেক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু অতো টাকা দেবে আগরওয়ালা? সে খোকনকে পাঠালো কেরাণীর বিধবা স্ত্রীর কাছে। কেস লড়তে হলে বহু খরচা, তার চেয়ে বরং অল্প টাকায় কিছু রফা হয়ে যাক। বিধবা দেখলো তার হয়ে লড়বার কেউ নেই। ভাবলো, যা পাই তাই লাভ। সে অল্প টাকায় রফা করলে। আর বহু টাকা বেঁচে গেল আগরওয়ালের।

যেদিন খোকন চেকটি নিয়ে বেরুচ্ছে বিধবাকে গিয়ে দিয়ে আসতে, আগরওয়াল তাকে ডেকে বললে, "বাবুজী, তুমি আমার হয়ে অনেক কাজ করেছো, কোনো দিন কিছু ইনাম দিইনি তোমায়। এবার থেকে তোমার মাইনে বাড়লো পঁচিশ টাকা। আর এই টাকা নিয়ে যাও। লীলারামে আমার অর্ডার দেওয়া আছে একটি মুক্তোর নেকলেসের। আসবার সময় সেটা নিয়ে আসবে। তুমি আমার বিশ্বাসী লোক। সব কাজে সবাইকে পাঠাতে ভরসা পাই না।"

করকরে অনেকগুলো নোট গুণে দিয়ে বললে, "ভাই, সবই মুসিবৎ। এক রাস্তায় টাকা আসে, অন্য রাস্তায় যায়। দুনিয়ার আদতই এই।"

প্রভুভক্ত কর্মচারীর মতো নিরুপায় খোকন বিধবাকে কয়েক শো টাকার একটি চেক দিয়ে এলো, আর আসবার সময় লীলারাম থেকে নিয়ে এলো মুক্তোর মালা। ফিরে এসে আগরওয়ালের ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে চলে এলো নিজের ঘরে।

সেদিন একটা অত্যন্ত ধিক্কার এলো তার মনে। আর সব কিছু ভুলবার জন্যে গভীর ভাবে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিলো নিজেকে। অধীনস্থ কেরাণী, দারোয়ান, বেয়ারারা তার ধমকানিতে তটস্থ হয়ে উঠলো। সারা দিন কাজ করে অফিসের শেষে সন্ধ্যে নাগাদ চলে আসবার সময় মনে পড়লো আগরওয়ালের সঙ্গে একটি কাজ তার বাকি আছে। একবার ভাবলো, আজ থাক, কাল করিয়ে নেবো। তার পর মনে পড়লো, পরদিন আগরওয়াল অফিসে আসবে না, কোন এক ফ্যাক্টরী পরিদর্শনে যাবে। ফাইলটি নিয়ে সে স্প্রীংএর দরজা ঠেলে আগরওয়ালের অফিস-ঘরে ঢুকলো। ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

আগরওয়ালের সামনা-সামনি টেবিলের এ পাশে বসে একটি কোল্ড ড্রিঙ্ক খাচ্ছে ময়ূরাক্ষী। সামনে নেকলেসের ভেলভেট কেসটি খোলা পড়ে আছে। মুক্তোর মালাটি তার ফর্সা গলায় দোলানো।

এই কয়েক বছরের গল্পগুলো শুনেছিলুম টুকরো-টুকরো ভাবে এর-ওর কাছে। আমার এক আত্মীয় কাজ করতো আগরওয়ালের অফিসে, তার কাছে কিছুটা, কিছু ময়ূরাক্ষীর কাছে, কিছু আগরওয়ালের এক বন্ধু দেশাইএর কাছে যার সঙ্গে আমার চেনাশোনা ছিলো যথেষ্ট। কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যে বেলার ইতিহাসটি শুনেছিলাম সেদিনই সন্ধ্যের পর, ময়ূরের কাছেই।

চোখের জলে ভেসে সে সেদিন ছুটে এসেছিলো আমার কাছে।

"জানো সলিলদা," ময়ূর বলেছিলো, "সে যখন ঘরে ঢুকলো আর আমায় দেখলো তখন তার চোখে একটি চাউনী দেখলুম যার বিষ হেলে সাপের বিষের থেকেও বেশী জ্বালা ধরিয়ে দিলো। সে একটু দেখে নিলো আমাদের, তার পর এগিয়ে এলো। এসে আমায় বললে, 'তোমায় গলায় ওই যে মালা, তাতে তোমায় মানিয়েছে ভালো, যদিও কারো-কারো গলায় মুক্তোর মালা মানায় না বলেই জানতুম। কিন্তু ওই মালার দাম কতো জানো? এক হতভাগা কেরাণীর একসিডেন্টে হারানো প্রাণ আর তার পাওনা টাকা, যেটা না পেয়ে তার বৌকে সারা জীবন হয়তো প্রায় উপোস করেই কাটাতে হবে। এমন সময় আগরওয়াল বললে, 'তুমি কোন্ সাহসে আমার অভ্যাগতের অপমান করছো? জানো কে তোমায় চাকরী দিয়েছে? ময়ূরাক্ষী দেবীর সুপারিশ না থাকলে কে তোমার মতো এক অচেনা লোককে চাকরী দিতো?' খোকন কোন কথা বললে না, আগরওয়ালের ব্যক্তিগত ফাইলের আলমারীর চাবী থাকতো তার কাছে। পকেট থেকে সেটি বার করে ছুঁড়ে দিলো তার সামনে। তার পর বেরিয়ে চলে গেল। আমি আর বসতে পারলুম না। ছুটে বেরিয়ে এলুম ওর পেছু-পেছু। কিন্তু ধরতে পারলুম না তাকে। আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসবার আগে সে একটি বাসে উঠে পড়ে চলে গেল। তাকে আর বলা হোলো না যে মুক্তোর মালাটি উপহার—আর কিছু নয়। সে আমায় যা ভেবেছে, আমি তা' নই। তার পর ফিরে আসতে গিয়ে দেখি আগরওয়ালও কখন নেমে নেমে এসেছে। সে উঠে বসলো তার গাড়িতে। কোনো কথা না বলে চলে গেল। তখন আমিও উঠে পড়লুম আমার নিজের গাড়িতে। সোজা চলে এলুম তোমার কাছে।"

অনেকক্ষণ আমরা কেউ কোনো কথা বললুম না।

তার পর জিজ্ঞেস করলুম, "কেন এলে?"

ময়ূরাক্ষীর চোখ দিয়ে জল নেমে এলো। বললে, "অনেক দিন আগেকার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে? যখন আমি কলেজে পড়ি? তুমি প্রায়ই এসে আমায় পড়া দেখিয়ে দিতে? সিনেমায় নিয়ে যেতে আমাদের? আর আমাদের এত বন্ধুত্ব দেখে চেনাশোনারা ঠাট্টা করতো। মনে পড়ে? বলো না? কথা বলছো না কেন? বলো?"

"মনে যখন করিয়ে দিচ্ছো, তখন মনে পড়ে বই কি", আমি বললুম তাকে।

"আমার সেই দিনগুলো ফিরিয়ে দেবে সলিলদা? আমি টাকা চাই না; খ্যাতি চাই না, কিছুই চাই না। চাই একটুখানি শান্তি।

আর্টের ওপর মমতা আর আমার নেই। এবার একটি সুখের ঘর বাঁধতে চাই। বলো, আমায় সেই সুযোগ দেবে ?"

হাসলুম একটুখানি।

"সলিলদা", ময়ূর বললে, "তোমার কাছে আমার কোনো কথাই না বলা নেই। যা আমি আর কাউকে বলিনি কোনো দিন, তোমায় বলে এসেছি সব সময়, কারণ আমি জানি আমায় শুধু তুমিই চেনো, আর কেউ চেনে না। আজ তাই যে কথা আমার মুখ ফুটে তোমার কাছে চাওয়ার নয়, তাও চাইছি। তাতে তুমি আমায় যা ভাববে, ভাবো। কিন্তু তোমার উত্তর না নিয়ে এখান থেকে উঠবো না।"

"ময়ূর", আমি বললাম ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে, "আজ হোলো মঙ্গলবার, সতেরো তারিখ। কাল আমি কলকাতার বাইরে যাচ্ছি। ফিরে আসছি দিন সতেরোর মধ্যেই। আগামী মঙ্গলবার ঠিক এমনি সময় তোমার ওখানে যাবো। সেদিনও যদি ঠিক এমনি ভাবে তোমার ঘর বাঁধবার মন অটুট থাকে, পাঁজি দেখে দিন-ক্ষণ যা' ঠিক করবার তোমার ওখানে বসেই করবো।"

ময়ূর একটি ম্লান হাসি হাসলো। বল্লে, "তুমি কোনো দিন কোনো কিছুই খুব সিরিয়াসলি নিলে না সলিলদা। বোধ হয় সে জন্যেই খুব সুখে আছো।"

আর কোনো কথাবার্ত্তা হোলো না। একটু পরে সে উঠে পড়লো। বেরুনোর মুখে বললে, "কি অতো ভাবছো ?"

"ভাবছি, তোমাকে শুধু আমিই চিনলুম আর কেউ চিনলো না।"

তার পরের মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ময়ূরের ওখানে গিয়ে দেখি সে একা আমার অপেক্ষায় বসে।

এ-কথার সে-কথার পর সে বললে, "সলিলদা, আমি পরশু বোম্বে যাচ্ছি। একটা নতুন কনট্রাক্ট পেয়েছি। এবার বহু টাকা—যা' এখানে কেউ দেবে না।"

বললুম, "আজ এই প্রথম খুশী হলুম যে তুমি একটি কনট্রাক্ট পেয়েছো।"

ময়ূর হেসে ফেলল। তার পর চোখ দু'টো তার জলে ভরে এলো। বললে, "জীবনে না কি ভালোবাসা না এলে সাফল্যও আসে না। সত্যিই তাই। আমাকে তোমরা সবাই ভালোবাসলে, তুমি, খোকন, গাঙ্গুলী সায়েব, আগরওয়াল। তোমাদের ভালোবাসাই আমায় উন্নতির পথে ঠেলে এগিয়ে দিয়েছে।"

তার পর আনমনে আঙুল দিয়ে গঙ্গার মুক্তোর মালাটি নাড়তে নাড়তে বললে, "মালাটি বেশ, না ?"

ওদের কারো সঙ্গে আমার আর কোনো দিন দেখা হয়নি। শুধু এক দিন খোকনকে দেখেছিলুম ট্রামে। একটা অফিস থেকে বেরিয়ে এসে ট্রামে চাপলো। সঙ্গে আরো দু'-চার জন। কথা শুনে বুঝলুম, সে সেই অফিসেই চাকরী করে, মাইনে তার কম, পদ-মর্য্যাদা আরো কম।

তার পেছনেই বসেছিলুম আমি। শুনলুম তার সহকর্মীকে

বোঝাচ্ছে, "ভাই, বৌটা বোঝে না, খালি খুঁত-খুঁত করে। কিন্তু কি আর বোঝাই বলো। অক্ষমতার সাফাই গাইতে আর ভালো লাগে না। তবে কি জানো, বৌ তো আর নিজের জন্যে বলে না, আমার জন্যে, ছেলের জন্যেই বলে। মেয়েটি বড়ো ভালো, বড়ো মিষ্টি মন, কিন্তু আর সব বাঙালীর ঘরের বৌয়ের যা দোষ, দিন-রাত কানের কাছে প্যান-প্যান। ভালো লাগে না, কিন্তু ভালো না লেগেও উপায় নেই।"

আমার ষ্টপে আমি নেমে গেলাম। সে চলে গেল।

* * * *

আমার গল্প পড়া শেষ হতে হতে আপনার মনে পড়লো অনেক দিন আগেকার একটি রাতের কথা। সেদিন খাট আর বিছানা আর ঘরখানি ফুলে ফুলে ভরে দেওয়া আর ঢেকে দেওয়া। সেদিন লজ্জায় আপনার চোখ খুলছে না কিছুতেই একটি অচেনা ছেলের সান্নিধ্যে। সেদিন আপনার মনে নেই কবে কোন এক মফস্বল সহরে পাঁচিলের পাশের অন্ধকারে কোন এক নিষ্কর্মা ছেলের হাত ধরে আপনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন সে আপনাকে ছেড়ে কলকাতায় চলে যাবে বলে। কতো দিন আপনি তার পথ চেয়ে রইলেন। কোনো খোঁজ পেলেন না তার—আর এই ফুলশয্যার রাতে আপনার নতুন করে ভালো লাগলো আরেক জনের মিষ্টি কথাগুলো, যে আপনাকে বলছিলো আপনি বড়ো মিষ্টি দেখতে, বড্ডো লাজুক, বড্ডো নরম।

সেই ছেলেটি যখন আটপৌরে হয়ে উঠলো আপনার জীবনে আর এই টানাটানির সংসারে রেশনের হিসেবে আর অসুখ-বিসুখের খরচায় সংঘাত বাধলো, তেমনি দিনের এক নিরালা এই দুপুরে ঘড়িতে কোথায় চারটে বাজলো। হঠাৎ মনে পড়লো আপনার, এবার তো উঠতে হয়। ছেলেটির ফেরার সময় হোলো।

পশ্চিমের আকাশে হেলে পড়লো শেষ দুপুরের সূর্য্য। রোদ এসে পড়লো ঘরের ভেতর। এই বেলা আপনাকে উঠতে হবে। ছেলে স্কুল থেকে ফিরে এলো বলে। তাকে খাওয়াতে খাওয়াতে একটি স্বপ্ন দেখবেন আপনি। খুব মামুলী, খুব সহজ একটি স্বপ্ন—সন্ধ্যের পর আপনার স্বামীর ফিরে আসা অফিস থেকে। হাত-মুখ ধুয়ে শুয়ে-পড়া খাটের ওপর। ভয়ে ভয়ে আপনাকে ডেকে বলা, "চা করে দেবে একটুখানি।" প্রত্যেক দিনকার মতো আপনি আর ঝাঁঝিয়ে উঠবেন না, বলবেন না, "এই অবেলায় আবার চা কেন? ভাত হয়ে এলো। হজে গরম গরম তাই খেয়ে নিও মাছের ঝোল দিয়ে।" আপনি শুধু একটু পরে রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলবেন, "এই নাও।" পাশ ফিরে উনি দেখবেন টিপয়ের ওপর এক কাপ চা আর একটি প্লেটে দু'টো নিমকি। তিনি অবাক হয়ে আপনার দিকে তাকাবেন। আপনার মনে হবে আপনার বয়েস যেন দশ বছর কমে গেছে। আপনি তাড়াতাড়ি চলে যাবেন ঘাড় বেঁকিয়ে একটুখানি হেসে।

আকাশের চাঁদ তাই দেখে আর নড়তে চাইবে না আকাশের অনেকখানি দেখতে পাওয়া খোলা জানালা থেকে।

বদলী

অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

রক্তচক্ষু বড়কর্ত্তার আক্রোশ ফেটে পড়লো। তিনি বলতে লাগলেন, 'চাকরি করতে এসেছেন, কর্ত্তৃপক্ষের যেখানে ইচ্ছে সেখানে আপনাকে পাঠাবে। কলকাতায় বসে বসে আপনারা মজা লুটবেন, আর আপনাদেরই সহকর্মী কয়েক জন শিলিগুড়িতে থেকে পচে মরবে, এমনটি আমি হতে দেব না।'

শৈলেন বলতে চাইল, 'আজ্ঞে স্যার, বউটার অসুখ—' কিন্তু বলা আর হলো না। ততক্ষণে বড়কর্ত্তা গলার পর্দ্দা অনেকটা বাড়িয়ে ফেলেছেন; সে অনুপাতে গলা চড়াতে গেলে চাকরি থাকে না।

'ওই একই কথা আপনাদের মুখে!' বড়কর্ত্তা ক্রোধে চেয়ারটায় সোজা হয়ে বসলেন।

'বউএর অসুখ হয়েছে তো কি হয়েছে? রুগ্না বউকে তো চেঞ্জে নিয়ে যাবার জন্য ছুটি মঞ্জুর করতে হয় রাশি রাশি ফি বছর। সোজা ট্যাক্সি করে নিয়ে যান ষ্টেশনে। তার পর একটুখানি রিজার্ভ-করা যায়গায় দিব্যি চলে যান। নতুন রেলপথ খুলেছে। কুলো হয়ে গেছেন আপনারা চাকরি করতে এসে। নতুন যায়গায় যাবেন। মাঝে মাঝে ছুটি কাটাতে চলে যাবেন দার্জ্জিলিং। বিদেশ থেকে লোক আসে হিমালয়ে এড্‌ভেঞ্চার করতে। দেখবেন বরফাচ্ছন্ন শৈল-চূড়া; দেখবেন টাইগার হিলে সূর্য্যোদয়।'

বড়কর্ত্তার রঙীন কল্পনায় বাধা পড়লো। তিনি শুনতে পেলেন শৈলেনের শুকনো ভীত কণ্ঠ। 'স্যার, বিশ্বাস করুন, রুগ্না স্ত্রী। মাইনের মোটা অংশ খরচ হয় ডাক্তারের ভিজিট আর অষুধের দাম দিতে।'

বড়কর্ত্তা তারস্বরে চীৎকার করে উঠলেন, 'কোনও কথাই আপনার শুনতে চাই নে। আপনাকে যেতেই হবে শিলিগুড়ি। যান, দাঁড়িয়ে থাকবেন না, বেরুন।'

তবু বেরুবার আগে নমস্কার জানায় শৈলেন দুই হাত তুলে আর মনে মনে ভাবে এ জোড় হাত নয়; জোড় জুতো। দুই চোখ ছাপিয়ে জল আসতে চায়; মনে আগুন জ্বলতে থাকে।

সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি রোড দিয়ে বেড়িয়ে আসতে আসতে শৈলেন ফুটপাথের একটা দোকানের সামনে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ায়। গরম পোষাকের দোকান। পাঁচ বছরের মেয়ের গায়ে ঠিক হবে এমন একটা ফ্ল্যানেলের ফুলহাতা ফ্রক দাম করে দোকানীর সঙ্গে। শেষ পর্য্যন্ত রফা করে দশ টাকা দু' আনায়। যা শীত হবে এখন শিলিগুড়িতে। কিন্তু যদি বদলী রদ হয়? হতেও তো পারে। যাক্‌, বাঁচা যাবে তাহলে; হলোই বা সোয়া দশ টাকা অর্থদণ্ড। প্রমীলা কি রাগ করবে? কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হচ্ছে ওর দিন দিন! মঞ্জুকে আজ-কাল হিংসে করতে সুরু করেছে প্রমীলা।

একটুখানি সময়ও মঞ্জুকে আদর করতে ও দেখতে পারে না। বলে, 'তুমিই আদর দিয়ে মেয়েটার মাথা খাচ্ছ।'

শীতের সন্ধ্যায় ধোঁয়া-মলিন রামগতি মিত্র লেনের সরু পথের এক পাশে গ্যাসের আলো টিম-টিম করে জ্বলছে। এক-রাশ আবর্জ্জনা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে স্তূপাকার হয়ে আছে আজ চার-পাঁচ দিন ধরে। সন্তর্পণে পা দু'টো চালিয়ে শৈলেন এসে ঢুকলো একটা অতি কদর্য্য পুরোনো বাড়ীর প্রবেশ-পথে। পকেট থেকে দেশালাই বের করে একটি একটি করে কাঠি জ্বেলে জীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে দোতলার কোণের ঘরে ঢুকতেই প্রমীলার রুগ্ন কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল :

'রোজ ফিরতে রাত করছো এ ক'দিন।'

'রাত হবে না?' শৈলেন বললো, 'যেখানে যে দেবতা আছেন, সব যায়গায় ধন্না দিচ্ছি যে!'

বলেই সে হ্যারিকেনের আলোটা একটু বাড়িয়ে দিল। মঞ্জু খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে একটু সকালেই। বাবার ফিরে আসা পর্য্যন্ত জেগে থাকে প্রায়ই। ওর জন্য দু'-চার পয়সার লজেন্‌স্‌ অথবা বিস্কুট নিয়ে আসে শৈলেন। ওই তার চরম আনন্দ। প্রমীলা উঠে বারান্দায় চা করতে গেল। প্রমীলার পিঠের উপর অবিন্যস্ত চুলে আঙুল চালাতে চালাতে শৈলেন বললো, 'কি করি বল তো? ছাড়ছে না একেবারেই; যেতেই বোধ হয় হবে।'

প্রমীলা বললো, 'দেখো, আমি ভেবেছি নিমাইকে বলে মঞ্জুকে নিয়ে ওর বাসায় আমি গিয়ে থাকি। তুমি টাকা পাঠিও। তার পর কয়েক মাস পরে টেলিগ্রাম করবো আমার অসুখ বেড়েছে। ছুটি নিয়ে চলে আসবে তুমি। তার পর আর এক দফা চেষ্টা-চরিত্রি করে দেখার সুযোগও পাওয়া যাবে।'

কথাটা ভেবে দেখবার মত। শৈলেন যেন অকূলে পথ পেল।

রেল-গাড়ীর ছোট জানলা দিয়ে নৈশ-প্রকৃতির রূপের অনুভূতি শৈলেনের মনটাকে স্বপ্নাবিষ্ট করে ফেলে। ইঞ্জিনটার ধ্বক্‌-ধ্বক্‌ ছন্দে চলমান জগতের মর্ম্মকথা। মঞ্জু হ্যাঁ, ও কেঁদেছে খুব। কিছুতেই ছাড়বে না। ওর বেদনার্ত মুখের কথা মনে পড়তে কষ্ট লাগে। প্রমীলার রুগ্ন পাণ্ডুর মুখখানি মনে করতে চেষ্টা করছে শৈলেন বার বার। কি আশ্চর্য্য! ও-মুখ আজ হাসির দীপ্তিতে, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো কি করে? প্রমীলা কি ভাল হয়ে গেছে?

শৈলেন দিব্যি নতুন যায়গায় এসে দশটা-পাঁচটা অফিস করছে। কই, কোথাও তো এতটুকু অসুবিধা হয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না? আশ্চর্য্য রকম গোছালো লোক মণি রায়—ওখানকার অফিসের বড় বাবু। শৈলেনকে কোন হাঙ্গামা পোয়াতে হল না। অফিসের কাছেই একটা মেসে থাকবার সুবন্দোবস্ত হলো মণি রায়ের মারফৎ।

জীবনটা নতুন করে যেন জীবন্ত হয়ে উঠলো শৈলেনের। মুক্তির স্বাদ এখানকার আকাশে। বাতাসে ভেসে আসে আনন্দের বাণী। দূরের ধোঁয়াটে পাহাড় হাতছানি দিয়ে ডাকে। শ্যামল বনান্তভূমি কি যেন বলতে চায়। ওর কাছে অতীত স্তব্ধ হয়ে গেছে। এখানকার আদিম অধিবাসী রাজবংশীদের নিয়ে দল বেঁধে শৈলেন শিকারে যায়। জীবন উপভোগের উন্মত্ততা ওকে পেয়ে বসেছে। গভীর জঙ্গলে খুঁজে বেড়ায় শিকার। কচিৎ এক-আধটা হরিণ মারা পড়ে। ওরা মানা করে। একলা জঙ্গলের মধ্যে যেতে ভয় আছে। তবু শৈলেন পিছিয়ে পড়তে নারাজ। সে আজ যেন সারা মনে অনুভব করছে—জীবন এগিয়ে চলেছে। বেচারী প্রমীলা! শৈলেনের যে ওর কথা মনে করবারও অবসর নেই, এ কথা রোগশয্যায় শুয়ে সে কি আর একটুও বুঝতে পারছে? শৈলেন যাচ্ছে গানের জলসায়; নাচের আসরে। সেখানে লীনা সেনের শুভ্র নরম আঙুলের আঘাতে আঘাতে সেতারের তার কেঁপে উঠছে; নেচে উঠছে সমীর রায়ের বাঁশীর ছন্দ।

অপূর্ব্ব, অদ্ভুত সন্ধ্যা! চার দিকে যেন ফাগের রং ছড়িয়ে দিচ্ছে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ কিরণ। দূরে বনের প্রান্ত থেকে পরিপূর্ণ চাঁদ হঠাৎ যেন বেরিয়ে এল। আশ্চর্য্য! কি সুন্দর! শৈলেন নির্জ্জন প্রান্তরে সবুজ ঘাসের উপরে বসে সেই দৃশ্য উপভোগ করছে। ধীরে সন্ধ্যার রক্তরাগ বিলীন হয়ে রূপালি জ্যোৎস্নার প্লাবন নেমে এলো পৃথিবীর বুকে। শৈলেন যেন সেই রূপালি প্লাবনের কলধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। হঠাৎ কার কোমল সুরভিত স্পর্শে চঞ্চল হয়ে ফিরে তাকালো শৈলেন।

'লীনা?' বিস্মিত শৈলেন ফিরে চায়।

'আপনি?' দুইটি কালো চঞ্চল চোখের তারা লীনা বিস্ময়ে বড়ো করে।

'হঠাৎ এদিকে?' শৈলেন প্রশ্ন করে। ওর কণ্ঠ কেঁপে ওঠে।

'আপনার সূক্ষ্ম চিন্তা-জগতে ছেদ পড়বে, বিঘ্ন ঘটবে জানলে আসতুম না।'

লীনা মুগ্ধ ভঙ্গিতে ফিরে দাঁড়ায়।

হঠাৎ দুঃসাহসী হয়ে ওঠে শৈলেন। সে উঠে ওকে হাত ধরে টেনে আনে।

লীনা বাধা দেয় না। ঘাসের উপর চাঁদের দিকে মুখ করে দু'জনে গল্প করতে থাকে; অফুরন্ত, অজস্র কাকলী।

কয়েক দিন পরের ঘটনা। আজ নাচের আসরে সমীর রায়ের বাঁশী যেন বেসুরো বাজছে বলে মনে হলো শৈলেনের। রাণু বোস আর সুচিত্রা সেন একের পর এক নাচ দেখিয়ে থামলো। এবার আরম্ভ হবে নতুন পর্য্যায়ের গান। তার আগে চায়ের কাপগুলো ভর্ত্তি হয়ে আসরের চার দিকে ঘুরলো। এই তো সুযোগ। চায়ের কাপটি রেখে সে উঠে পড়লো। বন্ধুরা উঠলো হৈ-হৈ করে। শরীরটার অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে রেহাই পেল শৈলেন। লীনা সেন যে আসরে অনুপস্থিত, সেখানে নাচ, গান আর বাঁশী মাথা ধরাবার পক্ষে যথেষ্ট।

বাইরে রাতের নীরবতা। আকাশে চাঁদ আর অনেক তারা। বেশ শীত লাগছে। শৈলেনের পদক্ষেপ অনিশ্চিত; বেশ ক্লিষ্ট। শৈলেন মেসে ফিরলো। হঠাৎ নজরে পড়লো বই-চাপা-দেওয়া চিঠিগুলি। শৈলেনের চেতনা ফিরে এল বলিষ্ঠ আত্মনির্ভরতায়। ওই তো! সুন্দর সাজানো অক্ষরে খামের উপর আঁকা তারই নাম-ঠিকানা। কত যুগ-যুগান্ত ধরে সে যেন প্রতীক্ষা করছিল এই চিঠির। খামটা ছিঁড়তেই মঞ্জুর একটা ফটো চোখে পড়লো। দুই হাতে ফটোখানাকে সামনে ধরে চোখে তার ফুটে উঠলো তৃপ্তির সার্থকতা। পরক্ষণেই ব্যাকুল হয়ে প্রমীলার সব কয়টা চিঠিই পাগলের মত খুলে ফেললো শৈলেন। এক নিশ্বাসে প্রমীলার সবগুলো চিঠি পড়ে শেষ করলো সে। নিষ্ঠুর! হ্যাঁ, নিষ্ঠুর শৈলেনের আর্ত্ত মনের ক্রন্দন কি পৌঁছবে না নিভৃতে প্রমীলার মনের কোণে? দুই হাত মাথায় চেপে টেবিলে মাথা গুঁজে বসে রইলো শৈলেন।

ফিওডর ডস্টয়েভ্‌স্কি

প্রথম অধ্যায়

কিন্তু এগুলো ত' মাত্র সোনালী স্বপ্ন। কে এই কথা প্রথম বলেছিলো, কে এই সূত্র প্রথম ব্যাখ্যাত করেছিলো যে, মানুষ মন্দ কাজ করে নিজের স্বার্থের ব্যাপারে অন্ধ বলে ; যদি সে আলোকপ্রাপ্ত হতো, যদি তার চোখ খুলে যেতো তার সঠিক সাধারণ স্বার্থ সম্বন্ধে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সে মন্দ কার্য থেকে বিরত হয়ে 'মহৎ' ও মহনীয় হয়ে উঠতো এই কারণে যে, সে এখন যেটা ভালো সেটার সত্যিকার সুবিধে বুঝতে পারে (যেহেতু এটা আমাদের জানা আছে, কোনো সাধারণ বুদ্ধির মানুষ তার নিজের স্বার্থবিরোধী কাজ করে না) এবং সেই কারণে যেটা ভালো সেইটেই সে অবশ্য করবে, যেহেতু তার ভালো সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠেছে। যে যুবক এ-কথা বলেছিলো, কী সরলতা তার! সে বাচাল কতো অকপট! গোড়া থেকে সুরু করি ; গত হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ কি শুধুই নিজের স্বার্থ ভেবে কাজ করে এসেছে ? আর, যে লক্ষ লক্ষ ঘটনা রয়েছে যারা দেখাচ্ছে মানুষ নিতান্ত জেনে শুনেই প্রায়ই (অর্থাৎ তার সত্যিকার সুবিধের সম্বন্ধে পুরোমাত্রায় ওয়াকিবহাল হয়েই) নিজের সুখ-সুবিধে গুলোকে অন্য একটি সংকল্পের জন্যে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং এমন একটা পথে, এমন ঝুঁকিতে, এমন অজানায় সে পা বাড়িয়েছে যে-জন্যে কোনো শক্তিপ্রকাশক ব্যক্তি বা বস্তু তাকে বাধ্য করেনি ; সে যেনো তার নির্ধারিত পথে যাবে না, সে বেছে নিয়েছে দুঃখদায়ক কষ্টকর পথ—যে পথে অন্ধকারের মধ্যে তার চলা তাকে সচেতন করবে, সেগুলো তবে কী ? এই যে সহজতা, এই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ততা কী এ কথা বোঝায় না যে, এই পথের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেশি তার অন্য কোনো সুখ-সুবিধের চেয়ে ? সুখ-সুবিধে, না ? আচ্ছা, সুখ-সুবিধেটা আসলে কি ? আপনারা, ভদ্রমহোদয়গণ, কষ্ট করে বুঝিয়ে দেবেন কি মানবীয় সুখ-সুবিধে কী কী জিনিষ ? আচ্ছা, যদি মানুষের সুখ-সুবিধেগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন কতকগুলো ইচ্ছার দ্বারা সংগঠিত হতে পারে শুধু নয়, হয়ত যে সে ভালোটাই চিন্তা করে না, খারাপটাও করে, তাহলে কী হয় ? এবং যদি তাই হয়, যদি তাই সত্যি সত্যি হয়ও তাহলে নিয়মটা আর খাটে না। এ সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা কী ? এ কি হতে পারে ? দেখছি আপনারা হাসছেন। ভালো, হেসে উড়িয়ে দিন, ভদ্রমহোদয়গণ ; কিন্তু আমার কথার জবাব দিয়েও যান : মানুষের স্বার্থের কখনও কি ঠিক-ঠিক যাচাই করা চলে ? এমন কতোগুলো স্বার্থ কি সব সময়ে থাকে না যা কখনো শ্রেণীবিভক্ত করা হয়নি বা করা হয় না ? ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা পরিসংখ্যান ও অর্থনীতির সূত্র প্রদত্ত মানুষের সুখ-সুবিধের গড়পড়তা হিসেবের একটা তালিকা তৈরী করে ফেলুন। আপনাদের সুখ-সুবিধের সেই তালিকায় থাকবে কেবল সমৃদ্ধি, সম্পদ, স্বাধীনতা, শান্তি প্রভৃতি এবং যদি কেউ আপনাদের তৈরী তালিকার সংগে প্রকাশ্যে জ্ঞাতসারে একমত না হয় তাহলে আপনাদের মতে (সেদিক থেকে আমার কাছেও) হয় সে-ব্যক্তিকে জ্ঞানার্জনের পথে বিঘ্নকারী বলা হবে কিংবা বলা হবে পাগল। তাই কি-না ? কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যজনক কথা হলো এই যে—এই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা, বিজ্ঞজনেরা ও মনুষ্যপ্রেমিকরা মানুষের সুখ-সুবিধের খতিয়ান করতে গিয়ে কখনও বিশেষ ভাবে একটা সুবিধের কথা উড়িয়ে দিতে পরাঙ্মুখ হন না। এই সুবিধেটাকে যে ভাবে গ্রহণ করা উচিত ঠিক সে ভাবে কখনই গ্রহণ করা হয় না ; এইটে সমস্তটা হিসেবে তাঁদের গলদ ঘটায়। আর এইটেকে যদি তাঁরা তাঁদের তালিকায় জুড়ে দেন তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। গোলমালটা হচ্ছে এই জায়গাটায় যে, এই বিশেষ সুবিধের ব্যাপারটা অন্য কোনো শ্রেণীতে পড়ে না বা অন্য কোনো বিশেষ তালিকায় ঢুকতে চায় না। উদাহরণতঃ আমার একটি বন্ধু আছে, যেমন আপনাদেরও আছে, ভদ্রমহোদয়গণ (আর, কারই বা না থাকে ?)—যে বন্ধু কি-না একটা নির্দিষ্ট কাজ হাতে নিয়ে হয়ত কাউকে বেশ পরিষ্কার করে জাঁকজমকের সংগে বলে বেড়ালো যে, সে স্রেফ সত্য ও যুক্তির ওপর নির্ভর করেই এগুতে থাকবে। সত্যিকার সাধারণ মানুষের সুবিধা-স্বার্থের আবেগ ও আগ্রহ নিয়ে সে এতোখানি বলতেও পারে, বলতে পারে তেঁতো হাসির সংগে অদূরদর্শী বোকা লোকগুলোকে কটূক্তি করার জন্যে যারা তাদের নিজেদের স্বার্থ বোঝে না বা সাধুতার আসল অর্থ বোঝে না। অথচ পনেরো মিনিটের মধ্যে এবং অন্য কোনো আকস্মিক অভাবিতপূর্ব ঘটনা না ঘটলে, তার একত্রীভূত সমগ্র স্বার্থের চেয়ে বৃহত্তর কিছু

জন্যে এই লোকটিই সে নিজে যা বলেছে তা নাকচ করে দিতে পারে, অর্থাৎ নাকচ করে দিতে পারে তার যুক্তির নির্দেশ ও তার নিজের স্বার্থ বা অন্য সব কিছু! তবু আমার এই বন্ধু এই ধরণের লোকের এক জন মাত্র; তাই বলে দোষটা তার একার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া চলে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এমন একটা জিনিষ আছে যা কি না বেশির ভাগ লোকের কাছে তাদের নিজেদের সত্যিকার স্বার্থ-সুবিধের চেয়েও প্রিয়তর? অথবা যুক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অস্বীকার না করে বলা চলে যে, সকল স্বার্থের সেরা এক স্বার্থ কি নেই (অতিরিক্ত স্বার্থের কথাই আমি বলছি) যা আরো শক্তিসম্পন্ন এবং যা আর সকল স্বার্থকে দাবিয়ে দেয়, এবং যার জন্যে মানুষ তেমন প্রয়োজন ঘটলে নিয়মকানুন লঙ্ঘন করতে রাজী আছে এবং সাধারণ জ্ঞান, সম্মান, সমৃদ্ধি, আরাম, এক কথায় সকল সুন্দর হিতকারী বস্তুকে অবহেলা করতে পারে যদি ঘটনাচক্রে সে সেই মুখ্য সেরা সুবিধা লাভ করতে পারে যেটাকে দুনিয়ার মধ্যে সে সব চেয়ে প্রিয় জিনিষ বলে মনে করে?

আপনারা হয়ত এইখানে আমার বাধা দিয়ে বলবেন, 'বাপ রে! কেবল সুখ-সুবিধে, সুবিধে-স্বার্থ?' ভদ্রমহোদয়গণ, আমায় মার্জনা করুন; কিন্তু একটা কথা আমার বুঝিয়ে দেওয়া উচিত শব্দের কারচুপি না করে যে, আমি যে-ই স্বার্থ-সুবিধের কথা বলছি তা বেশ লক্ষ্যণীয়; এটা কোন শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না, এবং মানুষ জাতটার উন্নতির জন্যে মানবপ্রেমিকরা যে সব কানুন খাড়া করেছেন সে সবগুলোও এর কাছে আমল পায় না। সংক্ষেপে বলা চলে, এটাকে আমাদের বুঝতে হবে এই ভাবে যে, এই স্বার্থ-সুবিধেটা সব কিছুর মধ্যে একটা সাধারণ গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। সেই সুখ-সুবিধের নামোল্লেখ করার আগে আমি আপনাদের কাছে শাপ-শাপান্ত করে সোজাসুজি বলতে চাই, মানুষ জাতটার সত্যিকার সাধারণ স্বার্থ-সুবিধে নির্দেশ করে যে সব কানুন আর পরিকল্পনা আছে, এবং কানুন ও পরিকল্পনা আছে যে সত্যিকার সুখ-সুবিধের চেষ্টার মধ্য দিয়ে মানুষ জাতটা আরো মহৎ, আরো সুন্দর হয়ে উঠবে, সে সব কানুন আর পরিকল্পনা অধিকাংশই তর্কের ব্যাপার। হ্যাঁ, আমি বলছি, তা তর্কেরই ব্যাপার। সত্যিকার সুখস্বুবিধের শ্রেণী বিভাগের কানুন-পরিকল্পনা দিয়ে মনুষ্য জাতির উন্নয়নের যে কথা বলা হয়, সেগুলো আমার মতে প্রায়ই—হাঁ, প্রায়ই এই কথার সংগে একই রকম যে, মানুষ সভ্যতার সংগে সংগে বিনম্র হয়ে যায়, এবং পরিশেষে সে আর রক্তপিপাসু থাকে না, যুদ্ধপ্রবণতা কমে যায় তার। তর্কের দিক থেকে তেমনটা হয়ত ঘটতে পারে; মানুষ কানুন-পরিকল্পনা আর অবাস্তব অনুমানের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে; তাতে সে সত্যকে বিকৃত করতে প্রস্তুত থাকে সব সময়ে, প্রস্তুত থাকে যা দেখছে সে তার প্রতি অন্ধ হয়ে থাকতে, যা শুনতে পাচ্ছে তার দিকে কান না দিতে, থাকে যতো দিন পর্যন্ত সে তার যুক্তিকে সমর্থন করে চলতে সমর্থ হয়। এই সম্বন্ধে আমি একটা উদাহরণ দিই, তাহলে সকলের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আপনাদের চারিদিকের পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে তাকান। চারি দিকে দেখতে পাবেন শ্যাম্পেন মদের উচ্ছ্বসিত ধারার মতো রক্তের স্রোতধারা বয়ে যাচ্ছে। আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকে তাকান; তাকান নেপোলিয়নের দিকে—বিখ্যাত নেপোলিয়নের দিকে আর এক জন আধুনিক কারোর দিকে; উত্তর-আমেরিকার দিকে তাকান, চিরস্থায়ী 'ইউনিয়ন'-সমৃদ্ধ যে আমেরিকা; শ্লেজউইগ-হোলস্টেইনের আধুনিক ব্যংগরূপের দিকে তাকান। সভ্যতা আমাদের অন্তরে কতোখানি বিনয়নম্রতা এনে দিতে পেরেছে? সভ্যতা মানুষের মধ্যে কিছুরই বৃদ্ধি ঘটায় না, ঘটায় কেবল আরো বেশিমাত্রায় ধারণা-গ্রহণ শক্তি। এই-ই মাত্র। এবং সেই শক্তির বৃদ্ধি রক্তপাতের মধ্য দিয়ে আনন্দ লাভের প্রবণতা আরো জাগিয়ে তোলে মানুষের মধ্যে। সভ্যতা আর কিছুই মানুষকে দেয়নি। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, আজকের আগ্রহশীল রক্তপাতকারীরা প্রায় ক্ষেত্রেই সব চেয়ে শিক্ষিত-সভ্য লোক—এই জাতের লোক তাঁরা যে তাঁদের পায়ের জুতো খুলে দেওয়ার যোগ্যই নয় অ্যাটিলা বা স্টেন্‌কা রেজিন।* পূর্বোক্ত ব্যক্তিরা অ্যাটিলা বা স্টেন্‌কা রেজিনের মতো জনসাধারণের কাছে খুব বড়ো হয়ে দেখা দেননি, তার এই মাত্র কারণ হলো, পূর্বোক্ত ব্যক্তিরা সংখ্যায় অনেক বেশি আর স্বল্পকাল স্থায়ী। যাই হোক, সভ্যতা যদি মানুষকে অধিকতর রক্তপিপাসু করে না-ও থাকে, অন্তত এইটুকু করেছে যে মানুষ আগের চেয়ে বেশি (নীচ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে) রক্তপিপাসু হয়েছে। একটা সময় ছিলো যখন মানুষ রক্তপাত করাটাকে শুধু প্রতিশোধ নেওয়া হিসেবে নিয়েছিলো এবং সেই জন্যে যাকে নির্মূল করতে চাইতো, তাকে করতো তা শান্ত বিবেকে; কিন্তু আজ আমরা রক্তপাত করাটাকে অপরাধ বলে গণ্য করি—এবং বিগত দিনের চেয়ে আরো বেশি এই অপরাধের প্রশ্রয় দিই। তাহলে এ দু'টোর মধ্যে কোন্‌টা খারাপ? হাঁ, নিজেরাই বিচার করে দেখুন। কথিত আছে ক্লিওপেট্রা (রোমের ইতিহাস থেকে যদি আমাকে উদাহরণ দিতে দেওয়া হয়) তাঁর ক্রীতদাসদের বুকে সোনার আলপিন ফুটিয়ে দিতে ভালোবাসতেন এবং তাদের কান্না ও যন্ত্রণায় ছটফট্ করতে দেখে তিনি উল্লসিত হতেন। সম্ভবত আপনারা বলবেন, এ-সব ঘটেছে অপেক্ষাকৃত বর্বর যুগে, বলবেন সময়টাও আজ বর্বর হয়ে গেছে—জনসাধারণের বুকে এখনও সোনার আলপিন ফুটিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বলবেন যে, যদিও মানুষ অনেক বিষয়ে পূর্বেকার অপেক্ষাকৃত বর্বর যুগের থেকে এখন পরিষ্কার বুঝতে শিখেছে, কিন্তু যুক্তি আর বিজ্ঞান যা করতে বলে সে এখনও পুরোপুরি তা শেখেনি। আমি জানি এতোক্ষণ আপনারা আপনাদের মনে মনে বুঝে নিয়েছেন যে, মানুষ যেই মাত্র কতোকগুলো পুরোনো, বাজে রীতিনীতি ছেঁটে ফেলবে এবং বিজ্ঞান ও সুস্থ চিন্তার দ্বারায় কেবল পরিপুষ্ট হবে স্বাভাবিক পরিচালক হিসেবে সেই দিনই মানুষ উন্নতি করতে পারবে। হাঁ, আমি বুঝেছি আপনারা ধরে নিয়েছেন, মানুষ শেষকালে তার আদৎ উদ্দেশ্যে ভুল করবে না বা তার ইচ্ছের সংগে স্বাভাবিক স্বার্থ-সুবিধের সংঘাত বাধতে দেবে না। পক্ষান্তরে (আপনারা বলুন) কালক্রমে বিজ্ঞান দেখাবে মানুষকে (আমাদের মতে যদিও সেটা অতিরিক্ত হয়ে যাবে) যে, তার নিজের বলতে

---

* হুন-সর্দার অ্যাটিলা; ইনি রোম জয় করেছিলেন। আর, স্টেন্‌কা রেজিন ক্যাথারিন্ দি গ্রেটের রাজত্বকালে কশাক-বিদ্রোহের দলপতি।—অনুবাদক

কোনো ইচ্ছে বা অনুপ্রেরণা নেই, কখনও থাকেনি, বরং সে সেতারের চাবির মতো হয়ে গেছে অথবা সারংগের হাতলের মতো হয়ে গেছে। মোদ্দা কথা, বিজ্ঞান দেখাবে তাকে, পৃথিবীতে কতোকগুলো প্রাকৃতিক নিয়ম আছে যার জন্যে সব কিছু ঘটে, মানুষের ইচ্ছেয় কিছু হয় না, হয় প্রকৃতির ইচ্ছেয় প্রকৃতির নিয়মতন্ত্র মেনে। তাহলে, আপনারা বলবেন, সেই সব নিয়মতন্ত্র মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হোক, তাহলে মানুষ সমস্ত দায়িত্ব থেকে তক্ষুনি মুক্ত হয়ে গিয়ে জীবনটাকে অনেক সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারবে! তখন মানুষের সকল কাজ প্রকৃতির নিয়মতন্ত্রের সংগে গণিতশাস্ত্রের হিসেবে নির্ধারিত হবে এবং সেগুলোকে নিয়ে যাত-অংক গণনার সূচীপত্র তৈরী করতে হবে, তাতে ১০৮০০০তম ডিগ্রী থাকবে, এবং এই ভাবে একটা ক্যালেণ্ডার তৈরী করা যাবে। আরোও ভালো হয়, মাঝে-মাঝে বেশ নিখুঁত পরিমার্জিত সংস্করণও এই ক্যালেণ্ডারে প্রকাশিত হবে (আজকাল-কার বিশ্বকোষ অভিধানাদির ধরণে), তাতে সকল বিষয় এমন নিখুঁত ভাবে বর্ণনার সংগে লিপিবদ্ধ করা থাকবে যে-জন্যে পৃথিবীতে বন্ধ হয়ে যাবে মন্দ কাজ করাটা, বা তেমন কোনো সুযোগ।

তার পরে (আমি কিন্তু ধরে নিয়েছি এখনও আপনারাই কথা বলছেন) এক নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে—সে সম্পর্ক কাজে লাগানোর জন্যেই, সে সম্পর্ক গাণিতিক সঠিকত্বের দ্বারা সীমিত এই ভাবে যে এক লহমায় সকল সম্ভাব্য সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে; তার কারণ সকল সম্ভাব্য সমস্যার সকল সম্ভাব্য উত্তরের ভাণ্ডারও ত' সেখানে রয়েছে। তখন গজিয়ে উঠবে পৌরাণিক গল্পের "স্বর্ণ-প্রাসাদ। তার পর—হাঁ, তার পর, এক কথায়, নেমে আসবে স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে! অবিশ্যি (এবারে কিন্তু আমি-ই কথা বলছি) আপনারা এমন কোনো গ্যারান্টি দিতে পারেন না যে, সব জিনিষ বাড়াবাড়ি রকমের একঘেয়ে হয়ে যাবে না, যেহেতু দেখছেনই আমাদের করবার মতো আর কিছুই থাকবে না, সবই আগেভাগে নির্ধারিত আর ছক-কাটা হয়ে থাকবে। এ কথা দিয়ে আমি বোঝাতে চাইছি নে যে, সব কিছু বাড়াবাড়ি রকমের নিয়মতান্ত্রিক হবে না। আমি শুধু বলতে চাই, এমন কি কিছু আছে যাতে একঘেয়েমি মানুষকে অন্য কোনো মতলব ভাঁজার পথে না ঠেলে দেয়? উদাহরণস্বরূপ, স্রেফ অবসাদের মধ্যে থেকে লোকের বুকে সোনার আলপিন ফুটিয়ে দেওয়া সম্ভব। এ কথা চিন্তা করাও লজ্জার বিষয় যে, যা কিছু ভালো তাতেই মানুষ সোনার আলপিন ফুটিয়ে দিতে ভালোবাসে! হাঁ, সে মানুষ একটা বড় ইতর জন্তু, স্পষ্টতই ইতর! অবশ্য সে এমন ইতর হবে না যে সে তেমন অপ্রীতিকর হয়ে পড়লে পৃথিবীর কোনো কিছুরই সংগে তার তুলনা মিলবে না। উদাহরণতঃ ভবিষ্যতের এই রকমের শান্তি ও নিয়মতন্ত্রের ভেতরে হঠাৎ কোনো-না-কোনো জায়গা থেকে এমন নীচ জাতীয় তথা মনুষ্যদ্বেষী ও অবসাদগ্রস্ত স্বভাব নিয়ে কোনো ভদ্রলোক বেরিয়ে এলে আমি বিস্মিত হবো না; সে কোমরে হাত দিয়ে, কুনুই বাঁকিয়ে আপনাদের হয়তো জিগ্‌গেস্ করতে পারে, "কী খবর, ভদ্র-মহোদয়গণ? আচ্ছা, এটা ভালো হয় না, যদি সকলে একমত হয়ে আমরা সমস্ত গুরুগম্ভীর জ্ঞান এক ঝটকায় হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে, সমস্ত গণনা-সূচী নস্যাৎ করে দিয়ে আবার আমরা আমাদের নির্বোধ বুদ্ধির বশে জীবন যাপন করতে সুরু করি?" এটা কিন্তু কিছুই নয়; তবে সমস্তটা ব্যাপারের সব চেয়ে লজ্জাকর বিষয় হচ্ছে এই যে, ঐ ভদ্রলোকের বেশ মোটামুটি সংখ্যায় অনুচর জুটে যাবে। মানুষের এ একটা স্বভাব। এবং সে হয়ত নিতান্ত সংকীর্ণ যুক্তির বলে কাজ করে চলবে; সে যুক্তির কথা উল্লেখযোগ্যই নয়; এই যুক্তিতে সর্বত্র সর্বসময়ে মানুষ কাজ করতে চায় তার পছন্দ অনুসারে, তার যুক্তি ও আত্মস্বার্থ তাকে যা করতে বলে সে অনুসারে নয় তা সে-মানুষ যে স্তরেরই হোক্ না কেন। হাঁ, সে একেবারে স্ব-স্বার্থের বিরোধী কাজও করতে পারে। অবশ্য তেমন কাজ করতে কখনও কখনও সে বাধ্য হয়ও। অন্ততপক্ষে এ-বিষয়ে আমার ত' তেমনি ধারণা। তার নিজের ইচ্ছা স্বাধীন ও অ-শৃঙ্খলাবদ্ধ; বেতোয়াক্কা দেওয়া তার খেয়াল-কল্পনা; তার সখ কখনও কখনও পাগলামির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে—এই আমাদের সকল স্বার্থ-সুবিধের বাড়্‌তি স্বার্থ-সুবিধে, এটা কোনো শ্রেণী বিভাগের মধ্যে পড়ে না, এটা চিরকাল সব পদ্ধতি-প্রক্রিয়া ও তত্ত্বগবেষণাকে নস্যাৎ করে এসেছে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাহলে কোথা থেকে পেলেন যে, মানুষের দরকারী একটা স্বাভাবিক নীতিনিষ্ঠ ইচ্ছাশক্তি থাকবে? বিশেষত পণ্ডিতরা কী ভাবে কল্পনা করে নিলেন যে, বেশির ভাগ মানুষ চায় এমন একটা ইচ্ছাশক্তি, যে ইচ্ছাশক্তি মানুষের স্বার্থবোধের সংগে সমান তালে চলবে? বরং মানুষ বেশি চায় একটা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, ইচ্ছাশক্তির সে স্বাধীনতায় কী এলো-গেলো বা কোথায় তাকে চালিত করলো সে-ইচ্ছাশক্তি—সে নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তবে কেবল মাত্র শয়তান জানে কী মানুষের ইচ্ছাশক্তি—।

[চলবে

অনুবাদ : আনন্দ দে।

যাত্রাপথে চলচ্চিত্র

পাঁচ

চলচ্চিত্রের কর্মীদের মধ্যে সব চেয়ে যশস্বী হয় কারা?

প্রয়োজক নয়, পরিচালক নয়, চিত্রনাট্যকার নয়, আলোকচিত্রকর বা শব্দধর বা সম্পাদক বা দৃশ্য-পরিকল্পক নয়; ছবির বাজারে চাহিদা ও লোকপ্রিয়তা বেশী হয় নট-নটীদের।

ভক্তদের ভক্তির আতিশয্যে পাছে বিড়ম্বিত হ'তে হয়, সেই আশঙ্কায় বোম্বাইয়ের চিত্রাভিনেতৃগণ নাকি গত নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে ভোট দিতে রাজি হননি! ভোট দিতে গেলে হয়তো লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হবে এবং সেই সময় দুর্লভ চিত্রতারকাদের নাগালের ভিতরে পেয়ে ছবিপাগলারা হয়তো তাঁদের উপরে ভেঙে পড়বে কাতারে কাতারে!

এ-রকম "হিরো ওয়ারসিপ" থেকে অবশ্য জনপ্রিয় মঞ্চাভিনেতারাও বঞ্চিত হন না। বহু কাল আগে এক দিন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি ষ্টার থিয়েটারের গাড়ীবারান্দার দিকে গদগদ ভাবে তাকিয়ে এক দল লোক দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথের উপরে। ব্যাপার কি? না, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত চেয়ারাসীন হয়ে আলবলার নলে মুখ দিয়ে ধূমপান করছেন! নায়ক-নট অমরেন্দ্রনাথের তখন খুব নামডাক। অতএব ধূমপানে নিযুক্ত অবস্থায় অমরেন্দ্রনাথের দর্শনলাভও হচ্ছে সৌভাগ্যের কথা।

শুনেছি—অর্থাৎ খবরের কাগজে পড়েছি যে, হলিউড থেকে কোন নামজাদা চিত্রতারকা লণ্ডনের রাজপথে পদার্পণ করলে বৃহতী জনতাকে সামলাবার জন্যে পুলিস ফৌজকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠতে হয়।

মঞ্চাভিনেতাদের জনপ্রিয়তা হচ্ছে স্বোপার্জ্জিত। তাঁরা হচ্ছেন স্বাধীন শিল্পী, সূর্য্যের আলো ধার ক'রে চাঁদের মত তাঁরা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না, তাঁরা খান নিজেদের শক্তি ভাঙিয়ে।

কিন্তু সেই কথা বলা যায় কি চিত্রনটদের সম্বন্ধেও? এক কথায় তাঁদের বলা চলে না কি, হুকুমের চাকর? পরিচালকের নির্দ্দেশ তাঁদের কাছে বেদবাক্যের মত অলঙ্ঘনীয়। কোথায় তাঁরা হাসবেন, কাঁদবেন, নড়বেন, চলবেন, উঠবেন, বসবেন, এ-সব তাঁরা নিজেরা জানেন না, জানেন একমাত্র পরিচালক। সম্পাদকও ইচ্ছা করলে মাটি ক'রে দিতে পারেন তাদের সব বাহাদুরি। তাঁরা কেবল পরের দ্বারা পরিচালিত নন, তাঁদের পরমুখাপেক্ষী বলাও চলে। আলোকচিত্রকর ও শব্দধরের উপরেও তাঁদের নির্ভর করতে হয় অল্প বিস্তর পরিমাণে। মঞ্চাভিনেতারা খান নিজেদের শক্তি ভাঙিয়ে এবং পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙে খান চিত্রাভিনেতারা, অথচ তাঁদের ভাগেই লাভ হয় যশের বারো আনা। আর্টের অন্য কোন বিভাগে অন্য কোন শ্রেণীর শিল্পীর বরাত এমন ভালো নয়। চিত্রনটরা মস্তিষ্কচালনা না ক'রেও মস্তিষ্কচালনার গৌরব কেড়ে নেন পরিচালক ও সম্পাদকের কাছ থেকে।

কিন্তু তাঁদের এই লোকপ্রিয়তা যেমন ঠুনকো, তেমনি [illegible]। তাঁদের কাঁচা বয়স আর কচি মুখই আকৃষ্ট করে জনসাধারণকে। বৃদ্ধ কবি লাভ করেন বিশ্বের প্রশস্তি। বৃদ্ধ গায়কের আসরে শ্রোতার অভাব হয় না। চিত্রকর ও অন্যান্য শিল্পীদের সম্বন্ধেও ঐ উক্তি প্রযোজ্য। এমন কি বৃদ্ধ মঞ্চাভিনেতাও জনসাধারণের উপেক্ষার পাত্র হন না। জরাজর্জ্জর ও প্রায়-অথর্ব্ব দেহ নিয়ে গিরিশচন্দ্র ও দানী বাবু পেয়েছেন পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগারের অভিনন্দন। কিন্তু বৃদ্ধ চিত্রনটের আর্ট হয়ে পড়ে প্রায় মূল্যহীন।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

গ্রেটা গার্বো তাই সময় থাকতেই গা-ঢাকা দিয়েছেন। মেরি পিকফোর্ডের "বিশ্ব-প্রিয়তমা" উপাধি এখন অতীতের বিস্মৃত কথা। "দিদিমা" হয়েও মার্লিন ডিয়েট্রিক এখনো কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু এমন সৌভাগ্য দুর্লভ। সব বিড়ালই চায় শিকে ছিঁড়ুক, কিন্তু শিকে ছেঁড়ে দৈবাৎ। কত শত শত নট-নটীকে যৌবন হারিয়ে গৌরবও হারাতে হয়েছে, গত অর্দ্ধ শতাব্দীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসেই পাওয়া যাবে তার প্রচুর নজীর।

বাংলা দেশের এক বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী কোন সাংবাদিকের কাছে অভিযোগ করেছেন, আমি যদি ভালো অভিনয় করি, তবে যুবতী না হয়েও যুবতীর ভূমিকায় অভিনয় করতে পারব না কেন?

শিশিরকুমারের তাজমহল চিত্র-সম্প্রদায়ে এক জন অভিনেত্রী ছিলেন, নাম তাঁর শ্রীমতী দুর্গা। একাধিক ছবিতে অভিনয় ক'রে সে সময়ে তিনি রীতিমত নাম কিনেছিলেন। কিন্তু কেন জানি না, পরিপূর্ণ যশগৌরবের মাঝখান থেকে ছবির মুলুক ছেড়ে হঠাৎ তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তার বহু বৎসর পরে আমি যখন কালী ফিল্মসের একখানি ছবিতে নৃত্য পরিকল্পনার জন্যে আহূত হয়েছি, তখন সেইখানে আবার তাঁর দেখা পেলুম। তাঁরই মুখে শুনলুম, তিনি পর্দ্দার গায়ে আবার দেখা দিতে চান। তখন বাজারে উমাশশীর খুব নাম। কাননবালা ও চন্দ্রাবতী উদীয়মানা। সুপটু আরো কয়েক জন চিত্রনটীর অভাব ছিল না। মঞ্চের ও পর্দ্দার যে কোন নট-নটী দীর্ঘকাল চোখের আড়ালে থাকলেই দর্শকদের মনের আড়ালে চলে যান। একে তো গত যুগের চিত্রনায়িকা শ্রীমতী দুর্গার কথা সকলেই এখন ভুলে গিয়েছে, তার উপরে তিনি প্রাচীনা না হলেও গত-যৌবনা, লোকপ্রিয় তরুণীদের ছেড়ে কেউ তাঁর দিকে আকৃষ্ট হবে বলে মনে হ'ল না। তবু তাঁর অতীতের সুযশের কথা ভেবে ওখানকার প্রয়োজক শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় "তুলসীদাস" চিত্রে তাঁকে আর একবার সুযোগ দান করলেন। কিন্তু চিত্র-জগতে তাঁর প্রত্যাবর্ত্তন সার্থক হয়নি। সেই ছবিই তাঁর শেষ ছবি।

ছবির জগৎ বড় নিষ্ঠুর। পুরাতন চাল ভাতে বাড়ে ব'লে আদর পায়। কিন্তু পুরাতন নট-নটীর কোন কদর নেই। গুণসুন্দর না হলেও এখানে রূপসুন্দরকে নিয়ে যেমন-তেমন ক'রে কাজ চালানো যায়। কিন্তু যৌবন-বসন্তের পর বৃদ্ধ শীতের বাতাসে রূপের ফুল যখন ঝরে পড়ে, ছবির নট-নটীদের মত অসহায় জীব তখন আর কেউ থাকে না। তখন তাঁদের কোন গুণপনাই আর কাজে লাগে না। তাঁরা যতই অভিযোগ করুন, তা পরিণত হবে অরণ্যে রোদনে। তাঁদের আর্টের চেয়ে তাঁদের যৌবন হচ্ছে বড়। ক্যামেরা আবার মানুষের চোখের চেয়ে নির্দ্দয়। কালী ফিল্মস্ যখন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের "বিদ্যাসুন্দর" নাটক অবলম্বনে একখানি নৃত্য-গীতবহুল ছবি তোলবার

ব্যবস্থা করছিল, তখন সুন্দরের ভূমিকার জন্যে একটি সঙ্গীতে ও অভিনয়ে সুনিপুণ সুপুরুষ শিল্পীর দরকার হয়। আমার পরিচিতদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কেবল উচ্চশ্রেণীর গায়ক নন, সৌখীন নাট্যজগতে এক জন সুদক্ষ অভিনেতা ব'লেও সুবিখ্যাত। তার উপরে তিনি রূপবান পুরুষ। আমি প্রিয় বাবুকে তাঁর কথা বললুম, তিনিও সাগ্রহে বললেন, "তাহ'লে কালকেই তাঁকে ষ্টুডিয়োয় নিয়ে আসুন, তাঁর মত যোগ্য ব্যক্তি দুর্লভ।"

তাই হ'ল। পরদিনেই তাঁকে নিয়ে ষ্টুডিয়োয় গিয়ে হাজির হলুম। তাঁর চেহারা সকলেরই ভালো লাগল। কিন্তু তার পর ক্যামেরাম্যান যখন তাঁর ছবি তুললেন, তখন দেখা গেল এক অভাবিত বিসদৃশ ব্যাপার। তিনি তরুণ না হ'লেও আমাদের চর্ম্মচক্ষু তাঁকে রূপবান ব'লেই গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ক্যামেরা তাঁর মুখের ভিতরে আবিষ্কার করলে বয়োতীত পুরুষের এমন সব চিহ্ন, যে আর সব দিকে বিশেষ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সুন্দরের ভূমিকায় তিনি হলেন অত্যন্ত বেমানান। মঞ্চের উপরে তিনি সুন্দর সেজে দেখা দিলে তাঁকে একটুও দৃষ্টিকটু দেখাত না। কিন্তু ক্যামেরার সামনে তিনি হলেন অচল। তাঁকে ত্যাগ করতে হ'ল। "হেসে নাও, দু'দিন বই তো নয়!' দ্বিজেন্দ্রলালের এই গানের বাণী চিত্রজগতে যতটা খাটে, ততটা আর কোথাও নয়। চিত্রনটের সুদিন ফুরিয়ে যায় দু'দিনেই।

ইণ্ডো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানীর বাগানে একবার একটুখানি ছবি তোলার ব্যাপারে আমরা অংশগ্রহণ করেছিলুম, এ কথা আগেই বলেছি। তার পর সত্যকার ছবি তোলার দৃশ্য সর্ব্বপ্রথমে আমি দেখি তাজমহল ফিল্ম কোম্পানীর বাগানেই। সেদিন শরৎচন্দ্রের "আঁধারে আলো"র একটি দৃশ্য তোলা হয়। নট ছিলেন শিশিরকুমার এবং নটী ছিলেন শ্রীমতী লীলা নামে একটি সুরূপা তরুণী। এই আর এক জন অভিনেত্রী, চিত্রজগতে যাঁর ছিল যথেষ্ট সম্ভাবনা। কিন্তু তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী উঠে যাবার পর আর কোথাও তাঁর দর্শন পাইনি।

একখানা পর্দ্দার (তার উপরে কিছু আঁকা ছিল কি না মনে পড়ছে না) সামনে ব'সে শ্রীমতী লীলাকে শুনিয়ে শিশিরকুমার কবিতার কেতাব থেকে আবৃত্তি করলেন। অল্পস্বল্প ভাবের অভিব্যক্তি, দুই জনের দৃষ্টি বিনিময়। তোলা হয়ে গেল একটি দৃশ্য।

ছবি তোলা এত সহজ, অনাড়ম্বর ব্যাপার! এই নিয়ে এমন হৈচৈ, এত বড় বড় লেখকের মস্ত মস্ত বই! সামান্যকে অসামান্য ক'রে তোলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা! রীতিমত হতাশ হয়ে ফিরে এলুম। চলচ্চিত্রকে আর্ট ব'লে স্বীকার করতে চাইলে না আমার মন।

আর সত্য কথা বলতে কি, সেই নির্ব্বাক্ যুগে এদেশে যাঁরা ছবি তোলবার কাজে হাত দিয়েছিলেন, তাঁরা এ ব্যাপারটাকে ক'রে তুলেছিলেন অনেকটা ছেলেখেলারই সামিল। রাম-শ্যাম, যদু-মধুদের যে কেহ পাকেপ্রকারে যেমন ক'রে হোক একটা ছবি তোলবার ক্যামেরা সংগ্রহ করতে পারলেই কোমর বেঁধে নেমে যেত কার্য্যক্ষেত্রে।

একটা দৃষ্টান্ত দি। এক ভদ্রলোকের হঠাৎ খেয়াল হ'ল, সবাই যখন ছবি তুলছে, তিনিই বা তুলবেন না কেন? তিনি কোনক্রমে একটা ক্যামেরা হস্তগত ক'রে ফেললেন। তার পর এক জন বিখ্যা লেখকের গল্প সংগ্রহ করতেও বিলম্ব হ'ল না। চলচ্চিত্র সম্ব অভিজ্ঞতা তিনি যে কোথা থেকে সঞ্চয় করেছিলেন, সর্ব্বজ্ঞ ভগ ছাড়া আর কেউ তা বলতে পারবেন না। তিনি নিজে বে চিত্রশালায় হাতে-নাতে কাজ করেননি। কোন বাগান নিয়ে তাকে ষ্টুডিয়োয় পরিণত করবার সঙ্গতিও তাঁর বোধ ছিল না। কিন্তু এ সব অসুবিধা নিয়ে তিনি একটুও মাথা ঘামা না। তাঁর ধারণা, ছবি তোলা ভারি সহজ কাজ।

একখানা ছোট বাসাবাড়ী। তেতালায় একটি কুঠরী ও ছো ছাদ। সেইখানে হ'ল তাঁর ষ্টুডিয়ো। একটি রূপসী তরুণী ছিলে তাঁর সুপরিচিত। তিনিই হলেন তাঁর চিত্রনাট্যের নায়িকা। কলকাতা সহরে নট-নটী পাওয়া যায় পাড়ায়-পাড়ায়, গণ্ডায়-গণ্ডা সাপ্তাহিক পত্রিকার কবিদের মত তাদের সংখ্যা গুণে ওঠা যায় না। ছবিতে অভিনয় করবার সুযোগ পাবে শুনলে তারা ছুটে আস দলে দলে ঊর্দ্ধশ্বাসে।

ঢাল-তরবারিহীন নিধিরাম সর্দ্দারের মত ভদ্রলোক ছবি তুলতে লাগলেন মহাবিক্রমে। অবশেষে ছবি তো উঠল। একটি প্রেক্ষাগৃহে দেখানোও হ'ল। কিন্তু জনসাধারণ সে ছবিকে করলে বয়কট। ভালো লেখকের গল্প, কিন্তু ভালো ক'রে গুছিয়ে বলতে না পারলে ভালো গল্পও জমে না। সুন্দরী নায়িকা, কিন্তু সঠিক নির্দ্দেশ না পেলে তিনি কিছুই করতে পারেন না। অথচ আজ তিনি বাংলা দেশের প্রধান চিত্রাভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতম, যদিও এখানে তাঁর নাম উল্লেখ করবার দরকার নেই।

নির্ব্বাক্ যুগে চলচ্চিত্রের সঙ্গে লেখকদের সম্পর্ক ছিল অল্পই। চিত্রমানবরা যখন কথা কইতে শিখলে, তখনই প্রধানতঃ সংল রচনার জন্যে দরকার হ'ল লেখকদের। যদিও চিত্রশালায় লেখক প্রাধান্য বেড়েছে, কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে এখানে আজ পর্য্যন্ত তাঁদের মনে করা হয় আবশ্যকীয় উপসর্গের মত। কেবল পেট কা ওয়াস্তে যৎকিঞ্চিৎ দানাপানির লোভে যে সব পোষমানা তথাকথিত লেখক চিত্রশালার মালিকদের কাছে দিয়ে থাকেন, তাঁদের নিয়ে কোনই গোল নেই, তাঁরা নি ষ্টুডিয়োর মধ্যে সুবোধ বালকের মত নেচে-হেসে-খেলে বেড়ান মালিকরা জল উঁচু বা জল নীচু বললে কখনো তার প্রতি করেন না। কিন্তু যাঁদের ব্যক্তিত্ব আছে এবং যাঁরা নি রচনাকে আর্ট ব'লে মানেন, যত মুস্কিল হয় তাঁদের নি কিন্তু তাঁদের কথা এখন থাক্। এদিকটা নিয়ে পরে ভালো আলোচনা করব।

বলছিলুম, নির্ব্বাক্ যুগে চলচ্চিত্রের সঙ্গে লেখকদের সম্প অল্প। কেবল এদেশে নয়, পাশ্চাত্য দেশেও। পরিচালকই করতেন চিত্রনাট্য, এবং তদারক করতেন ফোটোগ্রাফি ও অ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি নিয়ে—তখন তো রাত্রে বা কৃত্রিম আলোতে তোলার ব্যবস্থা ছিল না, কাজেই সহজ জ্ঞানের দ্বারাই কাজ কঠিন হ'ত না। মাঝে মাঝে subtitle রচনার জন্যে কে লেখকদের সাহায্য গ্রহণ করতেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ পরিচালকরা নির্ভর করতেন নিজেদের শক্তির উপরেই।

ভেবে দেখুন, এমন ব্যবস্থায় কতখানি অনর্থপাতের

...কে। আগেই বলা হয়েছে, গোড়ার দিকে ছবি তোলবার বেশী ...সাহ ছিল রাম-শ্যাম-যদু-মধুদেরই। ছিল না তাদের চিত্র-...ম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা, ছিল না তাদের সাহিত্যিক শিক্ষা। নাট্যকলা ...রেও তারা কোন দিন কোন রকম সাধনা করেনি। তাদের ...প্তিষ্বর বলেও গ্রহণ করা চলত না, কারণ গত জন্মে তারা ...খন পৃথিবীতে বিচরণ করত, তখন চলচ্চিত্র ছিল স্বপ্নের মতন ...লীক। এক দল আনাড়ি যদি হঠাৎ চলচ্চিত্র শিল্প, নাট্যকলা ... সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে প্রবৃত্ত হয়, ...বে তারা কতখানি অশিক্ষিতপটুত্ব প্রকাশ করতে পারে? চলচ্চিত্র ...স্তুত করবার জন্তে তখন বেশী অর্থবল ও লোকবলের দরকার ...ত না এবং সচল ছবির নূতনত্বের মোহে প'ড়ে দর্শকরাও বহু ...টি-বিচ্যুতি ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করত না, কাজেই অরসিকের দল রসের ক্ষেতে চাষ দিতে আসত বেশ নিশ্চিন্ত মনেই। আজকের মানদণ্ডে বিচার করলে দেখা যাবে, বাংলা চলচ্চিত্রকলাও সে যুগের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত ও শ্রীমন্ত হয়েছে বটে, কিন্তু রসের মধ্যে ভেজাল দেবার জন্তে এখনো বহু অরসিক মহোৎসাহে তাদের বিকৃত মস্তিষ্ক চালনায় নিযুক্ত হয়ে আছে।

সেটা ঠিক কোন্ বৎসর তা মনে নেই, তবে শিশিরকুমার তখনও তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেননি। মনোমোহন থিয়েটারে প্রদর্শিত হ'ল "আঁধারে আলো"! শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শিশিরকুমারের সঙ্গে ব'সে আমিও দেখলুম ছবিখানি।

ষ্টুডিয়োয় ছবির খণ্ডদৃশ্য তোলা দেখে হতাশ হয়েছিলুম। কিন্তু এখন গোটা ছবিখানি দেখে বুঝতে পারলুম, চলচ্চিত্রও আর্টপদবাচ্য হ'তে পারে।　　　　[ক্রমশঃ।

ষ্টুডিয়ো-পরিচিতি

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিয়ো

শ্রীরমেন চৌধুরী

পঁয়তাল্লিশ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর—

দিনটি বাঙালী ব্যবসায়ীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকার মত, কারণ এই দিনে জাত-ব্যবসায়ী মাড়োয়ারীর রাধা ফিল্ম ষ্টুডিয়োটি কিনে নিলেন ঘোষাল-ভ্রাতারা। ব্যবসায় বাঙালী এখনো সে ভাবের পোক্ত হতে পারেনি। ব্যবসায়ী-সুলভ অধ্যবসায় নেই; দূরদৃষ্টি, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি বণিকের গুণরাজি তার চরিত্রে পরিস্ফুট নয়। তাই বাঙালীর ব্যবসাই চিরদিন হাত-পরিবর্ত্তন করেছে। এবার হোলো তার ব্যতিক্রম, যাকে বলে অঘটন। আশার ভাষা সেদিনের বাতাসে ভেসে গেল প্রতিটি বাঙালী ব্যবসায়ীর কানে।...

ঘোষাল-ভ্রাতারা (কানাইলাল ঘোষাল ও মাধবলাল ঘোষাল) চিত্র-জগতে এ সময়ে যথেষ্ট সুনাম কিনে ফেলেছেন প্রথম শ্রেণীর দু'খানি ছবি করে। চিত্ররূপার 'বন্দী' ও 'সন্ধি' শুধু মিলের দিকে থেকেই মনোহারী নয়, গল্প-অভিনয়-গীত এবং সর্বোপরি অর্থের কৌলিন্যে যে কোনো প্রযোজকেরই কাজ্জণীয়। প্রথম ও দ্বিতীয় প্র...টার উপর্য্যুপরি সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ঘোষাল-ভ্রাতৃদ্বয় ই...মধ্যে মুভি টেকনিক সোসাইটি কিনে ফেলেছেন এবং শুরু ক...ছেন হিন্দি ছবি পরিবেশনার কাজ মেট্রোপলিটান ডিষ্ট্রিবিউটার্সের স...তার। যুদ্ধের বাজার চলেছে, কাঁপাই টাকার হাট বসে গেছে ... দেশ জুড়ে। অলিতে-গলিতে প্রযোজকের ভিড়—সকলেই ... রাতি film magnate হবার স্বপ্ন দেখছে (এর ফলে গোটা বা... ছবির রাজ্য গত বছরের ভূমিকম্পে আসামের মত ওলট-পা... হয়ে গেছে। সে কম্পন আজও থামতে পায়নি, থেকে থে...ই দুলে উঠছে। সে দৃশ্য সকলের চোখেই ধরা পড়ছে না ...কি?) প্রতিটি ষ্টুডিয়োয় বেজায় ভিড়। কাজেই ওঁরা রাধা ফি... ষ্টুডিয়োটি বেশ চড়া-দামে কিনে ফেললেন। গোটা ষ্টু...টা তখন সরকারী গুদোম-ঘরে পরিণত হয়েছিলো। তা... মুক্ত করে সাউণ্ড ফ্লোরে প্যাডিং লাগানো শেষ করা হোলো। সাউ...ট্রাক ক্যামেরা, লাইট ও ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি আনিয়ে যথাসম্ভব ত্বরিতে ষ্টুডিয়োকে চালু করে ফেলা হোলো। যে-ষ্টুডিয়ো শূন্য পুরীর মত অনাদরে অবহেলায় জঞ্জাল আর ধুলোর আসর হয়ে উঠেছিলো—যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় সেখানের রূপ পরিবর্তিত হোলো চোখের নিমেষে। কাজের চাঞ্চল্যে, অকাজের হাঁক-ডাকে ষ্টুডিয়ো সরগরম হয়ে উঠলো আবার...ঘরের এবং বাইরের কাজে সকাল-সন্ধ্যা গেল এক হয়ে।

এখানে একবার পেছন ফিরে তাকানো দরকার, তা না হলে রাধা ফিল্মের সৃষ্টি-কাহিনী অ-জানিত থেকে যাবে। হাওড়ার বিখ্যাত ধনী ও ব্যবসায়ী শেঠ রাধাকিষণ চামেরিয়াকে নিয়ে শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাক্ ছবি দু'-একটা বিক্ষিপ্ত ভাবে তোলেন ১১২৮ সালে। তার মধ্যে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উল্লেখযোগ্য। সার্থক সৃষ্টি হিসাবে গণ্য না হলেও এই শ্রীকান্ত দিয়ে 'চিত্রা'র দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছিলো—এটা স্মরণীয় বৈ কি! এর পর ১১৩২ সালের শেষের দিকে এখনকার ষ্টুডিয়ো-বাড়িতে ধারাবাহিক ভাবে কাজ শুরু
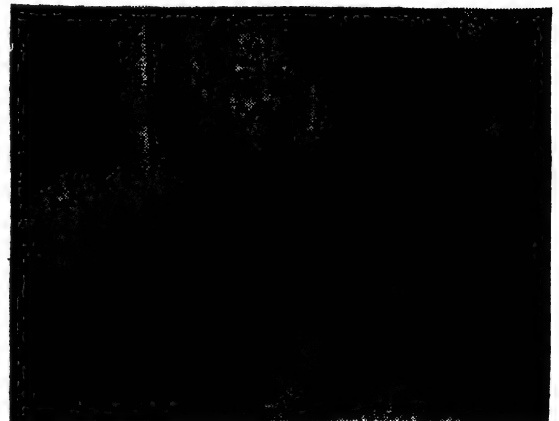
রাধা ফিল্ম কোম্পানীর কর্মকর্তা শ্রীকানাইলাল ঘোষাল

করলেন এঁরা। স্বর্গত প্রফুল্ল ঘোষ সে সময় বম্বেতে 'লায়লা মজনু' প্রভৃতি ছবি তুলে যথেষ্ট নাম করে ফেলেছেন। তাঁকে পরিচালনার ভার দেয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। যোগ্য জনের ওপরেই দায়িত্ব অর্পিত হোলো। কানন দেবী, বিনয় গোস্বামী, তুলসী চক্রবর্তী, শৈলেন পাল ও অন্যান্য শিল্পীর সক্রিয় সাহায্যে গড়ে উঠলো রাধা'র প্রথম মুখর ছবি 'শ্রীগৌরাংগ'। প্রচেষ্টা সার্থক হোলো, দর্শক-সাধারণ তৃপ্তি পেলেন—এ কথা অনায়াসে বলা যায়। কর্ণোয়ালিশ থিয়েটারে (বর্তমান শ্রী চিত্রগৃহ) সাফল্যের সংগে প্রদর্শিত হোলো ছবিটি। এতে ক্যামেরার কাজ করেছিলেন ডি, জি, গুনে এবং শব্দ-নিয়ন্ত্রণ করেন শ্রীনৃপেন পাল এম, এস-সি। পাল মশাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সোজা এখানেই চলে আসেন হাতে-কলমে কাজ করার জন্যে এবং সুখের কথা, এখন পর্যন্ত তিনিই রাধার প্রধান শব্দযন্ত্রী।

এর পর 'চার দরবেশ' (হিন্দি), 'শচী দুলাল', 'হরিভক্তি' মুক্তি পেল এই ষ্টুডিয়ো থেকে। বোঝা গেল, কোম্পানী দৃঢ় পদক্ষেপে চিত্র-জগতে অগ্রসরমান। দেখা দিলো 'দক্ষযজ্ঞ'। আপামর জন-সাধারণ অভিনন্দিত করলেন ছবিখানিকে। উনত্রিশ সপ্তাহ ধরে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ রইলো, অবিশ্যি আজও এ ছবি পুরনো হয়নি। এখনো বাঙলা দেশের ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর দর্শন ও দর্শনী লাভ করে এই পৌরাণিক ছবিটি। দক্ষযজ্ঞ পরিচালনা করেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই।

'রাজনটী বসন্তসেনা' ও 'ওয়ামক এজ্‌রা'র (হিন্দী) পর ৺রবীন মৈত্রের অনবদ্য রচনা 'মানময়ী গার্ল'স স্কুল' খোলা হোলো। রাধা ফিল্মের নাম শহর থেকে গ্রামে, এ-ঘর থেকে অন্য-ঘরে বিস্তৃত হোলো। সফলতা রাধার দোরে বাঁধা পড়লো। ক্রমে 'কণ্ঠহার,' 'কৃষ্ণ-সুদামা,' 'বিষবৃক্ষ', 'প্রভাস-মিলন', 'জনক-নন্দিনী', 'নর-নারায়ণ', 'বামনাবতার', 'ছিন্নহার', 'শ্রীরাধা', 'থাণ্ডার বোল্ট' (উর্দু) নির্মিত হোলো। এই সংগে এক রীলের 'ঝিন্‌ঝিনিয়ার জের' 'কেমন জব্দ', 'অবাক কাণ্ড', 'মিটমাট' প্রভৃতিও তোলা হয়। সে সময় পৌরাণিক ছবির রাজ্যে রাধার একচেটিয়া অধিকার ছিলো—এতে কোনো রকম দ্বিমত নেই; আর এখনও এ-অধিকারে ভাগ

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিয়োর ভেতরে

বসাতে কাউকে দেখা যায় না। যদিও পৌরাণিক ছবির যুগ আবার এসে গেছে, শীগগিরই অনেককে এ-পথে আসতে দেখা যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

যাই হোক, চল্লিশ সালে জাপান যখন যুদ্ধঘোষণা করে বসলো সেই অশুভ মুহূর্তে বাধা পড়লো রাধার পথ চলায়। কিন্তু তাতে দমলেন না কর্তৃপক্ষ। প্রাইভেট লিমিটেড করে বছর খানেক বিরতি দিয়ে আবার উদ্যোগ-আয়োজন করলেন। তার ফল ফললো—পরলোকগত কবি অজয় ভট্টাচার্যের পরিচালনায় তোলা হোলো 'অশোক'। তার পরই আবার ছেদ পড়লো। শহরে তখন বোমার হিড়িক, বিমান আক্রমণের আতংক, এ. আর. পি'র হুল্লোড়! এ. আর. পি'র মালপত্তরের আশ্রয়-স্থল নির্বাচিত হোলো ষ্টুডিয়ো-বাড়িটি। প্রথম অংকের সমাপ্তি এখানেই।

দ্বিতীয় অংকের যবনিকা তুললেন ঘোষাল-ভ্রাতৃদ্বয়—সে কথা শুরুতেই বলেছি। ষ্টুডিয়োর নিজের ছবি তোলা ছাড়া বাইরের অনেক ছবিও তোলা হতে থাকলো। এঁদের শাখা-প্রতিষ্ঠানের ছবি গৃহীত হোলো একাধিক। 'স্যার শংকরনাথ', 'আশাবরী', 'মহাদান' যথারীতি এই সময়ে দর্শককে অভিবাদন জানালো। এখন 'বুনিয়াদ' 'রিয়াসত', 'য়্যারিষ্টোক্রেসী' ও 'সংঘাত' অপেক্ষারত—অদূর ভবিষ্যতের উপহার হবে রাধা ষ্টুডিয়োর।

প্রথম পর্যায়ে যেমন ৺প্রফুল্ল ঘোষ, জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় কালীপ্রসাদ ঘোষ, ফণি বর্মা, চারু রায়, হরি ভঞ্জ, ডি, জি, গুনে ৺রাধাচরণ ভট্টাচার্য, হৃষিকেশ রক্ষিত এম, এস সি, (বর্তমানে ডক্টর), যতীন দাস, বীরেন দে, নৃপেন পাল প্রভৃতি শব্দযন্ত্রী, চিত্রশিল্পী, পরিচালক ও সংগীত পরিচালককে দেখা গেছে, তেমনি নব পর্যায়ে দেবকী বসু, খগেন রায়, বিনয় ব্যানার্জি, চন্দ্রশেখর বসু, দিলীপ মুখার্জি রবিন রায়, জটাধর পাইন, ধীরেন দে, অনিল বাগচী, অপূর্ব মিত্র ধীরেন দে (কেবি) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এবারও কয়েকটি নতুন পরিচালক, শব্দযন্ত্রী, চিত্রশিল্পী ও সংগীত পরিচালককে এঁরা সাধারণের দরবারে হাজির করার গৌরবের অধিকারী।

নানা কারণে ষ্টুডিয়োর নিজস্ব কাজ মাঝে বন্ধ ছিলো; সরকারী সংবাদ-চিত্র এবং ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের ছবি অবিশ্যি ঘড়ি ঘড়ি কাকে তোলা হয়েছে। এঁদের চিত্ররূপা ও মুভি টেক্‌নিকের 'মন্দির' ও 'ষোড়শী' বর্তমানে নির্মাণরত। দু'খানিই শরৎ-সাহিত্য বাঙ্‌ছিত কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠছে।

বর্তমান কর্তৃপক্ষ এক মাত্র সাউণ্ড ফ্লোরটি ছাড়া একটি ... একটি পাকা ফ্লোর তৈরি করে নেন। কাঁচা ফ্লোরটি এখন ... খাড়া নেই—যা কিছু কাজ এক নম্বরেই হয়ে থাকে। ... হলে ২ নং ফ্লোরে আলো জ্বলে, শব্দ ওঠে: লাইট্‌স্‌, ষ্টার্ট মণিটার ...

এডিটিং, ল্যাবরেটরী, কার্পেণ্ট্রি প্রভৃতি বিভাগগুলি যথা... আছে, কর্মীরা সকলেই হাসিখুশি, মিশুক প্রকৃতির।

তৃতীয় অংক শুরু হবার মুখে এখন রাধা ফিল্ম। যে ... বেহিসাবী কর্মপদ্ধতি এঁদের বিপর্যয়ের মুখে এনে ফেলেছিলো তার কালো ছায়া সরে গেছে বলেই ধরা যেতে পারে। অবাঙালীর ... বাঙালীর হাতে এসে অচল হয়ে যেন না যায়, এইটুকু আমরা স্মরণ করিয়ে দিই কর্তৃপক্ষকে। যে অঘটন পঁয়তাল্লিশ সালে ঘটেছে তার মর্যাদা রক্ষা হোক।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

পুনরায় এশিয়া জয়ের আয়োজন-

জানুয়ারী মাসে (১৯৫২) ওয়াশিংটনে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এবং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিলের সাক্ষাৎকারের সময় ইন্দোচীনের যুদ্ধ এবং সুদূর-প্রাচ্যের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাঁহারা যেমন আলোচনা করিয়াছেন, তেমনি ঐ সময়ে ওয়াশিংটনেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্সের যুক্ত সামরিক প্রধানকর্তাদেরও (Joint Chiefs of Staff) এক গোপন সামরিক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। সুদূর-প্রাচ্যের কি কি বিষয় সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দাবীতে মিঃ চার্চিল সম্মতি দিয়াছেন তাহা যেমন সন্দেহাতীতরূপে অনুমান করা সম্ভব নয়, উহা শুধু ফল দেখিয়াই বুঝিতে পারা যাইবে, তেমনি উল্লিখিত সামরিক বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সঠিক কিছু অনুমান করা অসম্ভব। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ ভাবেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, সুদূর-প্রাচ্যে কম্যুনিষ্টদের তথা-কথিত নূতন আক্রমণ নিরোধের উপায় সম্বন্ধেই তাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। মার্কিণ প্রতিনিধি পরিষদের সশস্ত্র-বাহিনী কমিটির (Armed Services Committee) গোপন অধিবেশনে মার্কিণ দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ রবার্ট লভেট জানাইয়াছেন যে, কম্যুনিষ্টদের যে কোন নূতন আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আছে। সুতরাং সুদূর-প্রাচ্যে কম্যুনিষ্টদের নূতন আক্রমণের আশঙ্কা বলিতে মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট কি বুঝিয়া থাকেন তাহা আলোচনা না করিলে সুদূর-প্রাচ্যের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কার স্বরূপ বুঝিয়া উঠা সম্ভব নয়। এই আশঙ্কার স্বরূপটি যদি বুঝিতে পারা যায় তাহা হইলে এই আশঙ্কা নিরোধের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং তাহার তাঁবেদার রাষ্ট্রবর্গ কি কি পন্থা গ্রহণ করিতে চায়, তাহা কতক পরিমাণে অনুমান করা একেবারে অসম্ভব না-ও হইতে পারে। কিন্তু কি এই আক্রমণ আশঙ্কার স্বরূপ, তাহা কতকটা বুঝা গেলেও আক্রমণ-আশঙ্কার কারণটিকে অত্যন্ত ঝাপসা করিয়া রাখা হইয়াছে।

ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে সুদূর-প্রাচ্য স্পষ্ট ভাবে আরও নূতন বিপদের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। কি এই নূতন বিপদ তাহা বিলাতের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখের "সুদূর-প্রাচ্যে আশঙ্কা" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত পত্রিকা লিখিয়াছেন, "কোরিয়ায় পানমুনজনে আরও পূর্ণ এক মাস ধরিয়া আলাপ-আলোচনা চলিয়াছে বটে, কিন্তু ফললাভের আশা আরও হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আরও দক্ষিণে ভিয়েটনামের সীমান্তে চীনাগণ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে রেলপথ নির্ম্মাণ এবং সৈন্য-চলাচলের দুঃসংবাদ আসিয়া পৌছিয়াছে। অবশ্য ইহা হইতে মাও-সে-তুং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না। তাঁহার অভিপ্রায় আরও অনেক কিছু হইতে পারে।" মাও-সে-তুং কি কি করিতে পারেন তাহার এক ফিরিস্তি দিয়া 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন, "এই সকল ব্যাপারের সহিত ইন্দোচীনে কিম্বা ব্রহ্মদেশে আক্রমণ চালাইবার পরিকল্পনার সম্বন্ধ থাকিতেও পারে, না-ও থাকিতে পারে। এই সকল বহুমুখী সম্ভাবনার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া পশ্চিমী মিত্রপক্ষের নীতি গঠিত হওয়া আবশ্যক।" ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিগোষ্ঠী ইহা ধরিয়া লইয়াছেন যে, কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি হইলেও কম্যুনিষ্ট চীন এই চুক্তি ভঙ্গ করিবে। তাঁহাদের এইরূপ ধারণার কোনই কারণ দেখা যায় না। কারণ, যুদ্ধ বিরতির চুক্তি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বেনামদার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভঙ্গ করার সম্ভাবনা যতটুকু, কম্যুনিষ্ট চীনের ভঙ্গ করার সম্ভাবনা তাহা অপেক্ষা একটুকুও বেশী নয়। তথাপি এইরূপ একটা অমূলক আশঙ্কা কল্পনা করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই হুমকী দিয়াছে যে, কোরিয়া যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি ভঙ্গ করিলে কম্যুনিষ্ট চীনকে আক্রমণ করা হইবে। শুধু যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি ভঙ্গের কথা তুলিয়াই এই হুমকী দেওয়া হয় নাই, যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত না হইলেও কম্যুনিষ্ট চীন সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়াও শাসান হইয়াছে এবং এই শাসানিতে মিঃ চার্চিলও সুর মিলাইয়াছেন। ১৭ই জানুয়ারী (১৯৫২) মার্কিণ কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতায় মিঃ চার্চিল বলিয়াছেন: "বৃটিশ এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, যদি যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত না হয়, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যুত্তর দৃঢ়তা সহিত কার্য্যকরী ভাবে দেওয়া হইবে।" তাঁহার এই উক্তির তাৎপর্য্য লইয়া অনেক গবেষণা এ পর্য্যন্ত হইয়াছে। এ সম্পর্কে কমন্স সভায় মিঃ চার্চিল যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহাও বিস্ময়করূপে বিভ্রান্তিজনক। তিনি বলিয়াছেন যে, কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি ভঙ্গ করা হইলে বৃটেন চীনে বোমা-বর্ষণে অংশ গ্রহণ করিবে এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি ওয়াশিংটন বৈঠকে তিনি দেন নাই। সেই সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছেন, "কোরিয়ার ব্যাপারে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সুযোগ পাইয়াছি যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন সম্মিলিত ভাবে কাজ করিবে এবং যদি পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা একযোগে দ্রুততার সহিত কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।" চীনে বোমাবর্ষণে অংশ গ্রহণ করিবার প্রতিশ্রুতি যদি মিঃ চার্চিল না-ই দিয়া থাকেন, তাহা হইলে একযোগে দ্রুততার সহিত কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের অর্থ কি? ইহার একটা ব্যাখ্যা যে তিনি দেন নাই তাহা নয়। মিঃ চার্চিল বলিয়াছেন, "যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষ সহ প্রত্যেককেই সব কথা সর্ব্বদা বলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমি মনে করি, সময় সময় কতকটা বিষয় অনুমান করিবার জন্য রাখিয়া দেওয়া উচিত।" তাঁহার এই মন্তব্যই অনুমান করিবার স্থল আর রাখে নাই।

কোরিয়ায় যদি সত্যই যুদ্ধ-বিরতি হয়, তাহা হইলে কম্যুনিষ্টরা যে তাহাদের শক্তি ইন্দোচীনের সীমান্তে এবং মালয়ে সমাবেশ করিবে না, এ সম্পর্কেও মিঃ চার্চিল নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। তাঁহার এই আশঙ্কার কথা তিনি গোপন রাখেন নাই। কিন্তু এইরূপ আশঙ্কা করিবার সত্যই কোন কারণ আছে কি? কারণ যে নাই তাহা

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যেমন জানেন, তেমনি জানেন মিঃ চার্চ্চিল। তবে কতগুলি মিথ্যা কারণ তৈরী করিবার যে সুযোগ সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই মিথ্যা কারণগুলিকে উপলক্ষ করিয়া সুদূর-প্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন মিঃ চার্চ্চিল যে সাধারণ ভাবে তাহাতে সম্মতি দিয়া আসিয়াছেন তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

মার্কিণ কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনের বক্তৃতায় মিঃ চার্চ্চিল যখন সুয়েজ অঞ্চলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং তুরস্কের টোকেন ফোর্স রাখিবার কথা বলিয়াছিলেন, তখন শ্রোতৃবর্গ বেশ একটু বিব্রত বোধ না করিয়া পারেন নাই এবং পরের দিন মিঃ চার্চ্চিলকে অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাবে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, সুয়েজ খালের কথা আর উল্লেখ করা প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এবং রাষ্ট্রবিভাগ পছন্দ করেন না। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাপে সুদূর-প্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সম্পর্কে কি কি বিষয়ে মিঃ চার্চ্চিল সম্মতি দিয়াছেন, তাহা 'সানডে টাইমস' পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থ প্রতিনিধির প্রদত্ত বিবরণ হইতে কতকটা নির্ভুল ভাবে অনুমান করা যায়। উক্ত বিবরণে বলা হইয়াছে: "বর্ত্তমানে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে, কম্যুনিষ্টরা যদি কোরিয়ায় পুরাদমে যুদ্ধ আরম্ভ করে, তাহা হইলে চীনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির উপর—সহরগুলির উপর নয়—বোমাবর্ষণে বৃটেন অংশগ্রহণ করিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নৌবহর দ্বারা চীনের উপকূল ভাগ অবরোধ করিতে চায়। কিন্তু রাশিয়ার সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে বিরোধ বাধিতে পারে এই আশঙ্কায় বৃটেন উহাতে অংশগ্রহণ করিবে না। চীনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবে না। কম্যুনিষ্ট চীন যদি ফরমোসা আক্রমণ করে, তাহা হইলে উহার রক্ষা-ব্যবস্থায় কার্য্যকরী ভাবে অংশগ্রহণ না করিয়া বৃটেন আমেরিকাকে সমর্থন করিবে।" এই মতৈক্যের গুরুত্বকে বাড়াইয়া বলিবার উপায় নাই। এই সকল সিদ্ধান্ত যদি কার্য্যে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে সুদূর-প্রাচ্যে বিরোধ যে তীব্রতর আকার ধারণ করিবে, সে-কথা বলাই বাহুল্য। ট্রুম্যান-চার্চ্চিল আলোচনায় সুদূর-প্রাচ্যে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় সমস্ত ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষার জন্য যে মতৈক্য হইয়াছে, এই অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে তাহা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

চীনের সামরিক অভিসন্ধির কথা খুব বড়-গলায় প্রচার করা হইতেছে। মিঃ ইডেন এবং মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ইন্দোচীনে এবং মালয়ে চীনের সামরিক আক্রমণের সম্ভাবনার কথা গত জানুয়ারী মাসে (১৯৫২) বহু বার বলিয়াছেন। চীনের এই সামরিক আক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে ওয়াশিংটনে বৃটিশ, ফরাসী এবং মার্কিণ চীফ অব ষ্টাফগণ যে এক গোপন বৈঠকে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। চীনের সামরিক অভিসন্ধির কোন প্রমাণ আছে কি না তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আক্রমণ বলিতে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কি বুঝায়, সে-সম্পর্কেই প্রথম উল্লেখ করা আবশ্যক।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে পররাজ্য আক্রমণে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জ্জাতিক নিরাপত্তা বাহিনী গঠনের জন্ম পশ্চিমী শক্তিবর্গের উত্থাপিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের প্রথম ধারাতেই শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং আক্রমণ নিরোধ করাই যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য, তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। কিন্তু এই সনদে "আক্রমণ" কথাটির কোন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হয় নাই। কিন্তু "আক্রমণ" কাহাকে বলে? গত ৩১শে জানুয়ারী (১৯৫২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে এ সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে এবং আক্রমণের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করার প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করিয়া একটি প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। আগামী অধিবেশনে আক্রমণের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। কিন্তু আক্রমণের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের আপত্তি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যাহাকে আক্রমণ বলিয়া মনে করিয়াছে, মার্কিণ-তাঁবেদার সদস্যরাষ্ট্র সমূহের ভোটের জোরে তাহাই আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কোরিয়ায় কম্যুনিষ্টরা আক্রমণ করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু কাশ্মীরে পাকিস্থানের আক্রমণ সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হওয়া সত্বেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ উহাকে আক্রমণ বলিয়া স্বীকার করে নাই। সপ্তম মার্কিণ নৌবহর যে ফরমোসা দ্বীপে ঘাঁটি করিয়াছে এবং কম্যুনিষ্ট চীন কর্ত্তৃক উহা দখলের অন্তরায় হইয়াছে তাহা কি পররাজ্য আক্রমণ নয়? উত্তর-কোরিয়া এই অভিযোগ করিয়াছিল যে, ফরমোসা দখলের অজুহাত সৃষ্টি করিবার জন্তই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-কোরিয়াকে গৃহযুদ্ধের উস্কানি দিয়াছে। মার্কিণ সপ্তম নৌ-বহরকে যখন ফরমোসা রক্ষায় নিয়োগ করা হয় তখন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, এই দ্বীপটিকে যুদ্ধের আওতা হইতে রক্ষা করিবার জন্ম এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এই ব্যবস্থা দ্বারা ফরমোসায় রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নটি ক্ষুণ্ণ হইবে না। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নির্দ্দেশে জাপান ফরমোসাস্থিত চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি করিতে রাজী হইয়াছে। এই সন্ধির সর্ত্ত শুধু ফরমোসা সম্পর্কেই প্রযোজ্য হইবে না, ভবিষ্যতে চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্টের তাঁবে অতঃপর যে-সকল অঞ্চল আসিবে সেগুলি সম্পর্কেও প্রযোজ্য হইবে। এই সর্ত্তের দ্বারা ফরমোসার উপরেই চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্টের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করারই শুধু প্রস্তাব করা হয় নাই, চীনের মূল ভূখণ্ডের উপরেও উহার প্রভুত্ব মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা কি চীন দখলের জন্ম ভাবী যুদ্ধের ইঙ্গিত নহে? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাপে জাতীয়তাবাদী চীন গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে জাপানের এই নীতি মিঃ চার্চ্চিল মানিয়া লইয়াছেন কি? বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন কমন্স সভায় বলিয়াছেন যে, চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তি করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া জাপ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ যোশিদা মিঃ ডুলেসের নিকট যে-পত্র দেন, তাহার কথা টোকিওস্থিত বৃটিশ সংযোগরক্ষাকারী মিশনকে ১৬ই জানুয়ারী তারিখে জানান হয়। তিনি আরও বলেন যে, জাপান কর্ত্তৃক চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্টকে মানিয়া লওয়া সম্পর্কে বৃটেন এবং আমেরিকা একমত হইতে পারে নাই।

ট্রুম্যান-চার্চ্চিল আলোচনার সময় মিঃ যোশিদার পত্রের বিষয়বস্তু মিঃ চার্চ্চিল জানিতেন কি না, তাহাই আসল প্রশ্ন নয়। কারণ, আমেরিকার নির্দ্দেশেই মিঃ যোশিদা ঐ পত্র লিখিয়াছেন। জাপানের

নির্ভরযোগ্য কূটনৈতিক মহল বলিয়াছেন যে, বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রীর পরোক্ষ সম্মতি পাওয়ার পর চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্টকে মানিয়া লইতে মিঃ যোশিদার সিদ্ধান্ত সাধারণ্যে প্রকাশ করা হয়। জাপানের অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য মহলের সংবাদে প্রকাশ, উল্লিখিত বিষয়টি ট্রুম্যান-চার্চ্চিল সাক্ষাৎকারের সময় আলোচিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অনুরূপ আর একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। গত ২৮শে জানুয়ারী (১৯৫২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে জাতীয়তাবাদী চীনের প্রতিনিধি কর্ত্তৃক উত্থাপিত যে-প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে রাশিয়াকে এই বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে যে, চীনের জাতীয়তাবাদী গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্পাদিত মৈত্রী ও বন্ধুত্বের চুক্তি রাশিয়া রক্ষা করে নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের নেতৃত্বেই এই প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। পাঁচটি কমিনফর্ম্ম দেশ, ভারত, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া এবং ইজরাইল এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। বৃটেন কোন পক্ষেই ভোট দেয় নাই। এই প্রস্তাব সুদূর-প্রাচ্যের জটিল অবস্থাকে বিপজ্জনকরূপে জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

ব্রহ্মদেশের সীমান্তবর্ত্তী পূর্ব্বাঞ্চলে প্রায় দশ হাজার কুয়োমিণ্টাং সৈন্য জেনারেল লি-মির নেতৃত্বে যে এক বৎসরের অধিক কাল যাবৎ অবস্থান করিতেছে, তাহা কি কুয়োমিণ্টাং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ আক্রান্ত হওয়াই নয়? ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট অবশ্য সহজে ব্রহ্মদেশে এই কুয়োমিণ্টাং বাহিনীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মদেশের মাটিতে অবস্থান করিয়া জেঃ লি-মির সৈন্যবাহিনী চীনের বিরুদ্ধে যে সকল শত্রুতামূলক কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠান করিতেছে, পিকিং গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না। পিকিং গবর্ণমেণ্টের এই কূটনৈতিক অনুরোধের চাপে বাধ্য হইয়া অবশেষে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট কুয়োমিণ্টাং সৈন্যবাহিনীকে ব্রহ্মদেশ হইতে অপসারিত করিতে চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবার জন্য মিত্ররাষ্ট্রবর্গের নিকট আবেদন জানাইতে বাধ্য হইয়াছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে ব্রহ্মদেশের প্রতিনিধি স্বীকার না করিয়া পারেন নাই যে, জেঃ লি-মির সৈন্যবাহিনী বাহির হইতে সাহায্য পাইতেছে। রুশ-প্রতিনিধি খোলাখুলি ভাবেই এই কমিটিতে অভিযোগ করিয়াছেন যে, মার্কিণ সামরিক প্রধানকর্ত্তারা ব্রহ্মদেশকে সামরিক ঘাঁটি করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় একটা চক্রান্ত করিতেছে। কম্যুনিষ্ট চীন আক্রমণ করিবার প্রস্তুতির কাজে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ব্রহ্মদেশে অবস্থিত কুয়োমিণ্টাং বাহিনীকে সাহায্য করিতেছে, মার্কিণ প্রতিনিধি এই অভিযোগে অস্বীকার করিবেন, ইহা খুব স্বাভাবিক। মার্কিণ রাষ্ট্রবিভাগও এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা ব্রহ্মদেশ হইতে কুয়োমিণ্টাং সৈন্যবাহিনীকে সরাইয়া লইবার জন্য ফরমোসা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু জেঃ লি-মির বাহিনী ব্রহ্মদেশেই অবস্থান করিতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিবার দুঃসাহস ফরমোসা গবর্ণমেণ্ট কোথায় পাইল? বাহিরের সাহায্য না পাইলে ব্রহ্মদেশস্থ দশ হাজার কুয়োমিণ্টাং সৈন্যের খাওয়া-দাওয়া এবং অস্ত্রসজ্জা বহাল রাখা যে সম্ভব নয়, তাহা নির্ব্বোধেও বুঝিতে পারে। এইরূপ সাহায্যদানের সামর্থ্য কোন্ রাষ্ট্রের আছে তাহাও অনুমান করা কঠিন নয়। ফরমোসা হইতে মার্কিণ অস্ত্রশস্ত্র থাইল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া ব্রহ্মদেশস্থ কুয়োমিণ্টাং সৈন্যবাহিনীর জন্য যে প্রেরিত হইতেছে, তাহার সংবাদও যে পাওয়া যাইতেছে না তাহাও নয়।

১৯৫১ সালের প্রথম দিকে জেঃ লি-মি তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া চীনের ইউনান প্রদেশে হানা দিয়াছিলেন। জেঃ লি-মি যে কুয়োমিণ্টাং বাহিনীর সেনাপতি এবং ব্রহ্মদেশে যে কুয়োমিণ্টাং সৈন্য অবস্থান করিতেছে, ফরমোসা গবর্ণমেণ্ট তাহা অস্বীকার করা দূরে থাকুক জেঃ লি-মির হানাকে সগর্ব্বে প্রচার করিয়া চীন দখলের প্রচেষ্টা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কম্যুনিষ্ট সৈন্যের হাতে লি-মির সৈন্যবাহিনী এমন ভাবেই পরাজিত হইয়াছিল যে, বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিয়া ব্রহ্মদেশে আশ্রয় লয়। কম্যুনিষ্ট সৈন্যরা পলায়নপর কুয়োমিণ্টাং সৈন্যের অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। অনেকেরই হয়ত এই ঘটনার কথা মনে নাই। অতঃপর ইহাও প্রচার করা হয় যে, জেঃ লি-মির সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই প্রচারের আবরণের অন্তরালে যে কুয়োমিণ্টাং সৈন্যবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করিবার আয়োজন চলিতেছে তাহা এত দিন গোপনই ছিল। কিন্তু ১৯৫১ সালের শেষভাগেও কম্যুনিষ্ট সৈন্যের সহিত জেঃ লি-মির সৈন্যদের কতকগুলি সংঘর্ষ হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং কম্যুনিষ্ট

সৈন্তরা কুয়োমিণ্টাং সৈন্তদের তাড়া করিয়া ব্রহ্মদেশের সীমান্ত পর্য্যন্তও আসিয়াছিল। পশ্চিমী শক্তিবর্গ ইহাকে ব্রহ্ম ও ইন্দোচীন সীমান্তে কম্যুনিষ্ট চীনের সৈন্ত চলাচল বলিয়া অভিহিত করিয়া সামরিক অভিসন্ধির ধুয়া তুলিয়াছেন। এই ভাবেই কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্য প্রসারের ধ্বনি তুলিয়া উহা নিরোধের জন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক আয়োজন করিতেছে। জাপানকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার ব্যবস্থা, ফরমোসাস্থিত চিয়াং কাইশেক গবর্ণমেণ্টের সহিত জাপানের চুক্তি করিবার আয়োজন, ব্রহ্ম-সীমান্তে কুয়োমিণ্টাং সৈন্তের অবস্থিতি, সুদূর-প্রাচ্য সম্পর্কে আমেরিকা এবং বৃটেনের মতৈক্য, এই সমস্তই যে পুনরায় এশিয়া জয় করিবার আয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। এশিয়াবাসীর আজ ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন, তাঁহাদের ভাগ্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি-শিবিরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার কে দিয়াছে? আরও কত দিন তাহারা এই অধিকার ভোগ করিবে এবং তাহার পরিণাম কি?

মিশরে নূতন অধ্যায়—

মিশরের রাজা ফারুক গত ২৭শে জানুয়ারী (১৯৫২) নাহাস পাশাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করিয়া আলী মাহের পাশাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করায় ইঙ্গ-মিশর সম্পর্কের যে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহার স্বরূপ ক্রমেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। মিশর পার্লামেণ্টে ওয়াফদ দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা রহিয়াছে এবং এই দলের নেতা হিসাবে নাহাস পাশা মিশরবাসীর আস্থাভাজন। কিন্তু রাজা ফারুক অমর পাশাকে তাঁহার পররাষ্ট্র সংক্রান্ত উপদেষ্টা এবং আফিফি পাশাকে তাঁহার মুখ্য উপদেষ্টা নিযুক্ত করায় তিনি নাহাস পাশাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করিতে পারেন, এইরূপ একটা আশঙ্কা যে জাগে নাই তাহা নয়। এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইবে, ইহা অনুমান করা বড় সহজ ছিল না। গত ২৬শে জানুয়ারী (১৯৫২) কায়রোতে যে বৃটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় তাহাতে সমগ্র কায়রো সহর এক প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় পরিণত হইয়াছিল। ১৯১৯ সালের পরে মিশরে এইরূপ বৃটিশ-বিরোধী জেহাদ এই প্রথম। প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশার অনুরোধে রাজা ফারুক ঐ দিনই সামরিক আইন জারী করেন। পরের দিনই নাহাস পাশাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করা হয়। ওয়াফদী দলের কয়েক জন বিক্ষোভকারীকে নাহাস পাশা না কি বলিয়াছেন যে, প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব হইতে তাঁহাকে মুক্তি দিবার জন্ত তিনিই রাজা ফারুককে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি কেন প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি চাহিবেন তাহা যেমন অনুমান করা কঠিন, তেমনি ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, নাহাস পাশার অনুরোধেই তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে, এমন কথাও রাজা ফারুক বলেন নাই। আবার আলি মাহের পাশা প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পরই সিনেটে এবং চেম্বার অব ডেপুটিজে আস্থাজ্ঞাপক ভোট পাইয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না।

প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে নাহাস পাশার অপসারণ রহস্তাবৃত ঘটনা বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এরূপ ঘটনা মিশরে এই নূতনও নয়। মিশরে রাজা, বৃটিশ এবং জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একটা ত্রিকোণ বিরোধ অনেক দিন চলিয়া আসিতেছে। জাতীয়তাবাদীরা বৃটিশ-প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি চায়। শাসন পরিচালন ব্যাপারে রাজার হস্তক্ষেপও তাঁহারা পছন্দ করেন না। রাজা তাঁহার নিজের ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্ত ওয়াফদীদিগকে বৃটিশের বিরুদ্ধে খেলাইয়া থাকেন, আবার বৃটিশও পিছনে থাকিয়া রাজাকে ওয়াফদীদের বিরুদ্ধে উস্কানী দেয়। রাজা ফুয়াদের সময় সাধারণ নির্ব্বাচনে ওয়াফদ দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের ফলে রাজা ফুয়াদ সংখ্যাগরিষ্ঠ ওয়াফদ দলকে ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। অবশেষে ১৯২৮ সালের নির্ব্বাচনে ওয়াফদ দল ক্ষমতা পায় এবং তদানীন্তন বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ইঙ্গ-মিশর সমস্যা সমাধানের জন্ত ওয়াফদ নেতার সহিত আলাপ আলোচনাও চালাইয়াছিলেন। কিন্তু আলোচনা-বৈঠক হইতে নাহাস পাশা যখন রিক্তহস্তে মিশরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন রাজা ফুয়াদ তাঁহাকে বরখাস্ত করেন। অতঃপর বৃটিশ বেয়নেটের সাহায্যে রাজা ফুয়াদ অনেক দিন পর্য্যন্ত ওয়াফদ দলকে দাবাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। ১৯৩৫ সালে ইটালী-আবেসিনিয়া যুদ্ধের সময় অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হয় এবং ঐ বৎসর যে-সাধারণ নির্ব্বাচন হয়, তাহাতে ওয়াফদ দলই ক্ষমতা পায়। ১৯৩৬ সালের সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর নাহাস পাশাকে পদচ্যুত করা হয়। রাজা ফুয়াদ পরবর্ত্তী সাধারণ নির্ব্বাচন এমন কৌশলে পরিচালন করেন যে, ওয়াফদ-বিরোধীরাই পার্লামেণ্টে ভীড় জমাইয়াছিলেন। রাজা ফারুক তাঁহার পিতা অপেক্ষা কম স্বৈরশাসক তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সেই সঙ্গে বৃটিশ প্রভুত্বের নিকটে তিনি আবার নতশির। ১৯৪২ সালে রোমেলের নেতৃত্বে জার্ম্মাণ বাহিনী যখন মিশরের সীমান্তের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পৌছিয়াছিল, তখন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজা ফারুককে এই চরম নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, হয় তাঁহাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইবে, না হয় নাহাস পাশাকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করিতে হইবে। রাজা ফারুক বুদ্ধিমানের মত সিংহাসন ত্যাগের পরিবর্ত্তে নাহাস পাশাকেই প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উত্তর-আফ্রিকায় জার্ম্মাণ বাহিনী নিঃশেষে পরাজিত হওয়ার পর বৃটেন যখন মিশরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিস্পৃহ ভাব অবলম্বন করিল, তখন ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে রাজা ফারুক নাহাস পাশাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করিতে বিলম্ব করেন নাই। ১৯৪২ সালে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে বৃটেনের চাপে রাজা ফারুক নাহাস পাশাকে প্রধান মন্ত্রী করিয়াছিলেন, দশ বৎসর পরে ১৯৫২ সালে আবার বৃটেনের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের চাপেই রাজা ফারুক যদি নাহাস পাশাকে পদচ্যুত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিস্মিত হইবার কিছু থাকে না।

আলি মাহের পাশা আরও দুই বার মিশরের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি রাজা ফুয়াদের এবং কিছু দিন রাজা ফারুকেরও প্রধান রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া পররাষ্ট্র বিভাগ এবং সামরিক ও নৌবিভাগও নিজের হাতে তিনি রাখিয়াছেন। তিনি যদিও ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের প্রিয় নীতিই অনুসরণ করিবেন, বৃটিশ বাহিনীর অপসারণ ও নীল নদ উপত্যকার ঐক্য সাধনই তাঁহার নীতি, তথাপি

এই নীতি সত্যই তিনি অনুসরণ করিবেন, ইহা মনে করা অসম্ভব। নাহাশ পাশা গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তনের জন্ম বৃটেন যে কূটনৈতিক খেলা খেলিতেছিল আলি মাহের পাশা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় তাহা সফল হইয়াছিল এবং এই গবর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তনের ফল ইতিমধ্যেই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। গত ২১শে জানুয়ারী (১৯৫২) বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন কমন্স সভায় বলিয়াছেন যে, মিশরের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় এইরূপ ভাবে একটা মীমাংসায় পৌছিতে বৃটেন এখনও প্রস্তুত আছে। ইহার পরদিন মিশরের প্রধান মন্ত্রী আলি মাহের পাশা মিঃ ইডেনের উল্লিখিত ইঙ্গিতে সাড়া দিয়া সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছেন, "বুঝাপড়ার জন্ম মিঃ ইডেন যে কোন প্রস্তাব করিবেন আমরা তাহা বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছি।" শীঘ্রই যে মীমাংসার জন্ম আলোচনা আরম্ভ হইবে তাহার প্রস্তুতিও চলিতেছে, বলিয়াই মনে হয়। কায়রোস্থিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত প্রথমে নূতন প্রধান মন্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া রাজা ফারুকের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছেন। মিশর ১৯৩৬ সালের সন্ধি বাতিল করিবার পর মিশরের রাজার সহিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের এই প্রথম সাক্ষাৎকার। যে-চতুঃশক্তি মধ্য-প্রাচ্য রক্ষা-ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিনিধিরাও আলি মাহেরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। মিশরে গবর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তনের প্রথম ফল ইতিমধ্যেই ফলিয়াছে।

আলি মাহের পাশাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিবার পর রাজা ফারুক এক আদেশ জারী করিয়া নেশনাল ফ্রণ্ট গঠনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং উক্ত নির্দ্দেশের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় ফ্রণ্ট গঠিত হইয়াছে। চরমপন্থী ব্যতীত আর সমস্ত রকম রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিনিধিই এই ফ্রণ্টে গৃহীত হওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। কোন রাজনৈতিক দলের নয় এইরূপ কয়েক জন প্রবীণ রাজনীতিককে ফ্রণ্টে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ফ্রণ্টকে কতক পরিমাণে সর্ব্বদলীয় প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে। এই ফ্রণ্টের সদস্যরা অ-সাধারণ প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহাদের পরামর্শ মন্ত্রিসভার উপর বাধ্যকর হইবে। সুতরাং অতঃপর মিশর মন্ত্রিসভা কোন নীতি নির্দ্ধারণ করিবেন না, কেবল নেশনাল ফ্রণ্টের নির্দ্ধারিত নীতি কার্য্যে পরিণত করিবেন। শুনিতে খুব ভালই শোনা যায় বটে, কিন্তু বৃটেনের সহিত মীমাংসার আলোচনার ধাক্কা সামলাইয়া এই ফ্রণ্ট বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে কি?

অশান্ত টিউনিশিয়া—

সম্প্রতি উত্তর-আফ্রিকায় ফ্রান্সের অন্যতম উপনিবেশ টিউনিশিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন গুরুতররূপে তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। ফলে টিউনিশিয়ায় যে সকল অশান্তিপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব যে ফরাসী গবর্ণমেণ্টেরই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উত্তর-আফ্রিকা সম্বন্ধে একটা প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে যে, "টিউনিশিয়াবাসীরা স্ত্রীলোক, আলজিরিয়াবাসীরা পুরুষ, কিন্তু মরক্কোবাসীরা ব্যাঘ্র।" কিন্তু এই নরম-প্রকৃতি টিউনিশিয়াবাসীরাও স্বাধীনতার জন্ম যে তেজ-বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছে তাহাতে ফরাসীরা চিন্তিত হইতে পারে, কিন্তু বিস্মিত হইবার কিছু ইহাতে নাই।

১৯৫০ সালের জুলাই মাসে ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব মঃ সুম্যান টিউনিশিয়াবাসীকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, ক্রমশঃ রাজনৈতিক শাসন-সংস্কারের ভিতর দিয়া আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাহাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হইবে। টিউনিশিয়াবাসীকে অধিক সংখ্যায় সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত করার আশ্বাসও দেওয়া হইয়াছিল। ইহাকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। তথাপি নয়াদস্তুর পার্টির নেতা বোরগুইবা মিঃ সুম্যানের এই প্রতিশ্রুতি মানিয়া লইয়াছিলেন এবং এই দলের সেক্রেটারীকে মন্ত্রিসভায় যোগদান করিতে দিয়াছিলেন। ফরাসী গবর্ণমেণ্টও টিউনিশিয়া মন্ত্রিসভার নেতার পদে ভেটো-ক্ষমতা প্রাপ্ত সেক্রেটারী জেনারেলের পরিবর্ত্তে এক জন টিউনিশিয়াবাসীকেই প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল, ফরাসী রেসিডেণ্ট জেনারেল এক ১৯৫১ সালেই মন্ত্রিসভার দুই শতটি সিদ্ধান্তে ভোট প্রদান করিয়াছেন। টিউনিশিয়াবাসীকে অধিক সংখ্যায় সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত করার প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করা হয় নাই। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন লাভের পথেও বাধা সৃষ্টি করা হইল। প্রায় এক বৎসরের ব্যর্থতার পর গত অক্টোবর মাস (১৯৫১) টিউনিশিয়ার প্রধান মন্ত্রী টিউনিশিয়াবাসীর দাবী লইয়া প্যারীতে গমন করেন। তাঁহার দাবী ছিল শুধু টিউনিশিয়ার অধিবাসীকে লইয়াই মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হইবে, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ব্যবস্থা-পরিষদ নির্ব্বাচিত হইবে এবং সিভিল সার্ভিসে অতিক্রত টিউনিশিয়ার অধিবাসীকে নিযুক্ত করিতে হইবে। দুই মাস ধরিয়া আলোচনার পরেও তাঁহাকে ব্যর্থ হইয়াই ফিরিতে হইল। ১৯৫১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের পত্রে টিউনিশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেনিক টিউনিশিয়ার পক্ষ হইতে যে-দাবী উত্থাপন করেন, মঃ সুম্যান ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে লিখিত পত্রে তাহার উত্তর দেন। এই উত্তরে টিউনিশিয়ার সমস্ত দাবীই অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। M. Perillierকেও টিউনিশিয়ার রেসিডেণ্ট জেনারেলের পদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। তিনি খুব রক্ষণশীল বলিয়াই আলজিরিয়া হইতে তাঁহাকে টিউনিশিয়ায় বদলী করা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মত গোঁড়া রক্ষণশীল ব্যক্তিও টিউনিশিয়ার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া টিউনিশিয়ার শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। এই জন্যই টিউনিশিয়াস্থিত ফরাসীরা তাঁহাকে অপসারিত করিবার দাবী করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই জয় হইয়াছে।

গত ৭০ বৎসর যাবৎ টিউনিশিয়া আশ্রিত রাজ্যরূপে ফ্রান্সের শাসনাধীনে রহিয়াছে। টিউনিশিয়ায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার ফরাসী বাস করিতেছে। কিন্তু ৩৫ লক্ষ লোক টিউনিশিয়ার অধিবাসী। তাঁহাদের স্বাধীনতা আন্দোলন নূতন নয়। নয়াদস্তুর দলের নেতা বোরগুইবা ২০ বৎসর পূর্ব্বে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে তাঁহাকে প্রথম গ্রেফতার করিয়া জেলে পুরিয়া রাখা হয়। দুই বৎসর পর ফ্রান্সে পপুলার ফ্রণ্ট গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৩৮ সালে তাঁহার নেতৃত্বে টিউনিশিয়ায় জাতীয় আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিলে তাঁহাকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয় এবং ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করেন। বোরগুইবাকে প্রথমে দক্ষিণ-টিনিশিয়ায় এক জেলে রাখা হয় এবং যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাঁহাকে

প্রেরণ করা হয় মার্সাইয়ের বন্দিশালায়। ১৯৪২ সালে জার্ম্মাণরা মার্সাইয়ের ফরাসী বন্দিশালা হইতে তাঁহাকে মুক্তি-দান করে। টিউনিশিয়া সম্পর্কে মুসোলিনীর একটা মতলব ছিল। এই মতলব সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই মুসোলিনী তাঁহাকে রোমে আশ্রয় প্রদান করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি গোপনে টিউনিশিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যুদ্ধের পরে তিনি শুধু আরব লীগের সহিতই সংযোগ স্থাপন করেন নাই, বিভিন্ন দেশেও তিনি গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংলণ্ড অন্যতম।

ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া ১৮ই জানুয়ারী (১৯৫২) তারিখে জাতীয়তাবাদীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করায় নয়াদস্তুর দলের প্রেসিডেণ্ট বোরগুইবা এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদিগকে গ্রেফতার করা হয়। ইহাতে টিউনিশিয়ায় এক ব্যাপক বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, নয়াদস্তুর পার্টির নেতাদিগকে গ্রেফতার করিলে নরমপন্থী পুরাতন-দস্তুর পার্টি আবার ভাসিয়া উঠিবে এবং তাহাদের সাহায্যে ফ্রান্স তাহার আধিপত্য বজায় রাখিতে পারিবে। কিন্তু তাহার লক্ষণ কিছুই দেখা যাইতেছে না। টিউনিশিয়ায় ফ্রান্সের একটা বড় অসুবিধা এই যে, রো গুইবাকে কোন রকমেই কম্যুনিষ্ট প্রতিপন্ন করা সম্ভব হইতেছে না। কম্যুনিষ্ট পার্টি পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন হইতে তিনি নয়াদস্তুর পার্টির পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছেন। এই দলের পরিচালিত কৃষক ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলিরই সদস্য-সংখ্যা বেশী। আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার দলের ঘোরতর কম্যুনিষ্ট-বিরোধী প্রতিনিধি মিঃ আইরভিং ব্রাউন গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫১) বোরগুইবাকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি যখন বিলাতে গিয়াছিলেন তখন লর্ড সভা ও কমন্স সভার প্রভাবশালী সদস্যদের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু বামপন্থীদের সংস্রব তিনি সযত্নে পরিহার করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাকে কম্যুনিষ্ট প্রতিপন্ন করা একেবারেই অসম্ভব। অথচ তাঁহার স্বাধীনতার দাবীও দুর্ব্বার।

টিউনিশিয়ার অশান্ত অবস্থা এমন এক পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এশিয়া ও মধ্য-প্রাচীর পনরটি দেশের প্রতিনিধি উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। তাঁহারা টিউনিশিয়ার প্রশ্নটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উত্থাপনের জন্য নিজ নিজ দেশের গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের মুখপাত্ররূপে সিরিয়ার প্রতিনিধি মিঃ আহমদ সুখাইরি একটি অভিযোগপত্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভাপতি এবং নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির নিকট পেশ করিয়াছেন। ইহার ফল কি হইবে তাহা বলা কঠিন। টিউনিশিয়া আর একটি ইন্দোচীনে পরিণত হওয়াও বিচিত্র নয়। টিউনিশিয়া যে আন্তর্জ্জাতিক আর একটি নূতন সমস্যা সৃষ্টি করিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এ সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করিবে? ইসমাইলিয়ার যখন বৃটিশ সৈন্যের সহিত মিশরীদের সংঘর্ষ চলিতেছিল, সেই দিন মার্কিণ রাষ্ট্র-সচিব মিঃ একিসন এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, মুসলিম জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করাই আমেরিকার নীতি। কিন্তু আরবদের মধ্যে জনপ্রিয় হওয়া এবং মধ্য-প্রাচীতে বৃটিশ ও ফ্রান্সের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার স্ববিরোধী নীতি কত দিন চলিতে পারিবে?

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ষষ্ঠ অধিবেশন—

গত ৬ই নবেম্বর (১৯৫১) প্যারী নগরীতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ষষ্ঠ অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল। ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) এই অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। এই অধিবেশনেও যে উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হয় নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের এই অধিবেশনের জন্য নির্দ্ধারিত কর্ম্মসূচীতে ৭০টি বিষয় স্থান পাইলেও, উত্তর-আফ্রিকায় অশান্তি, ইন্দোচীনের সংগ্রাম, মিশরে সংঘর্ষ, এবং সুদূর-প্রাচ্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই অধিবেশনে আলোচ্য কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই নীতির পরিবর্ত্তনের জন্য দক্ষিণ-আফ্রিকার উপর কোনরূপ চাপ দেওয়া হইবে না, বৃহৎ পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিকট হইতে দক্ষিণ-আফ্রিকা এইরূপ আশ্বাস পাইয়াছেন বলিয়া আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নের এবং স্বায়ত্ত-শাসনহীন দেশসমূহের জনগণের সামাজিক উন্নয়ন এবং তাহাদের দাবী-দাওয়া পূরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অস্ত্রসজ্জার সঙ্গে অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নতি সাধন অসম্ভব তো বটেই, তাহা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে উন্নতি সাধনের বিষয় ও পরিণামের কথাও বিবেচনা করা আবশ্যক। যে সকল সাম্রাজ্যবাদী দেশ স্বায়ত্ত-শাসনহীন দেশগুলি শাসন করিতেছে, তাহারা ঐ সকল দেশের অধিবাসীদের রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া পূরণ করিতে রাজী হইবে, ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে নূতন সদস্য গ্রহণে যে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার জন্য রাশিয়াকে দোষ দেওয়া চলে না। এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ দেশ কম্যুনিষ্ট চীনের পক্ষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই অন্যান্য দেশের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। সাধারণ পরিষদের আলোচ্য অধিবেশনে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা গিয়াছে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত আরব রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক সম্বন্ধে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, কতগুলি ব্যাপারে আরব রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েট রাশিয়ার সমর্থন পাইয়াছে। তাই বলিয়া আরব রাষ্ট্রসমূহ এবং এশিয়ার অন্যান্য দল রাশিয়ার দিকে ঝুঁকিয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

অস্ত্রসজ্জা হ্রাস করণ এবং পরমাণু বোমা নিরোধের সমস্যা যেখানে ছিল সেইখানেই রহিয়াছে। বস্তুতঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে অস্ত্রসজ্জা হ্রাস ও পরমাণু বোমা নিরোধের আলোচনা চলিয়াছে বটে, কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিরে গৃহীত হইয়াছে অস্ত্রসজ্জার সিদ্ধান্ত। অস্ত্রসজ্জা হ্রাস ও পরমাণু বোমা নিরোধের আলোচনা এক নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। এই পরিহাস প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের বাজেট প্রস্তাবের মধ্যে অট্টহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। এই বাজেটে সামরিক ব্যয়ের জন্য যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, যুদ্ধকালীন ১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সাল ছাড়া এত অধিক সামরিক ব্যয়-বরাদ্দ আরও কখনও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে করা হয় নাই। প্রস্তাবিত বাজেটে ৮৫.৪৪ মিলিয়ার্ড ডলার ব্যয়ের প্রস্তাব করা

হইয়াছে। এই ৮৫'৪৪ মিলিয়ার্ড ডলারের ৫১'২ মিলিয়ার্ড ডলারই ব্যয় করা হইবে অস্ত্রসজ্জার জন্য। বিমান বিভাগের জন্য ২০'৭ মিলিয়ার্ড, স্থলসৈন্যের জন্য ১৪'২ মিলিয়ার্ড এবং নৌ-বিভাগের জন্য ১৩'২ মিলিয়ার্ড ডলার ব্যয় করা হইবে। পরমাণু-শক্তি পরিকল্পনার জন্য ব্যয় করা হইবে ৫ হইতে ৬ মিলিয়ার্ড ডলার। ইহাকে নিঃসন্দেহে অস্ত্রসজ্জার বাজেট বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়।

রাশিয়া কোরিয়ার যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আলোচনা করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে এবং কোরিয়া যুদ্ধ সম্পর্ক আলোচনা মুলতুবী রাখিবার, যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের এবং যদি পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে জরুরী অধিবেশন আহ্বানের জন্য পশ্চিমী শক্তিবর্গের উত্থাপিত প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে কোরিয়া সমস্যা সমাধানের ভার সামরিক কর্ত্তাদের উপরেই রাখিতে ইচ্ছুক, এ ব্যাপারে তাহা ভাল ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। কোরিয়া যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা যেরূপ ব্যর্থতার পর ব্যর্থতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে এই আশঙ্কাই মনে জাগে যে, যুদ্ধ-বিরতির আলোচনাকে চীনের মূল ভূখণ্ড আক্রমণের অজুহাত সৃষ্টিতে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকা পর্য্যন্ত গত ৫ই ফেব্রুয়ারীর (১৯৫২) সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমানে কম্যুনিষ্টরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দক্ষিণ-কোরিয়াকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে, না চীনে কম্যুনিষ্ট বিপ্লব ব্যর্থ করিবার ফন্দী আঁটিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, উক্ত পত্রিকা বলিয়াছেন, দক্ষিণ-কোরিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া রক্ষার জন্য যেটুকু করা প্রয়োজন, শুধু সেইটুকুর মধ্যেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখা তাহাদের স্বার্থের অনুকূল। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি মনে করে যে, কম্যুনিষ্ট চীনের অস্তিত্ব বজায় থাকা পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া নিরাপদ নয়, তাহা হইলে চীনে কমুনিষ্ট বিপ্লবকে ব্যর্থ করিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ফন্দী কেন আঁটিবে না? 'টাইমস' পত্রিকা উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আরও বলিয়াছেন, "নৈতিক প্রশ্নের দিক হইতে বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যদি সমস্ত ক্ষুদ্র যুদ্ধকে বৃহৎ যুদ্ধে এবং সমস্ত বৃহৎ যুদ্ধকে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত করে, তাহা হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোন স্বার্থই সিদ্ধ হয় না।" কথাটা খুবই ঠিক। কিন্তু উহাতে যদি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উহা হইতে বিরত থাকিবে কেন? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুর্ব্বলতা এই যে, উহার অধিকাংশ সদস্য-রাষ্ট্রই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকেই নিজের স্বার্থ বলিয়া মনে করে। এমন কি এশিয়ার সদস্য-রাষ্ট্রগুলি পর্য্যন্ত সমগ্র এশিয়াকেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দিতে চায়, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়।

—সাহিত্য পরিচয়—

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

শাশ্বত বঙ্গ—কাজী আবদুল ওদুদ। প্রাপ্তিস্থান—সিগনেট বুক শপ, ১০ নং বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

ভজনমালা (স্বরলিপি)—কুমারী বিজন ঘোষ-দস্তিদার। ছাত্র-বান্ধব, ৮বি নং রসা রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

ইসিপতন সারনাথ—ভিক্ষু শীলাচার সঙ্কলিত। মহাবোধি সোসাইটি, ৪এ নং বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য এক টাকা আট আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ-প্রসঙ্গ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। বিশ্বমাতা মন্দির, দক্ষিণেশ্বর, চব্বিশ পরগণা। মূল্য দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী—বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

ছেলেদের গীতা—অধ্যাপক হরিপদ শাস্ত্রী, এম-এ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চার আনা।

আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা—শ্রীজগদিন্দু বাগচী। ৭১ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪।

নতুন পৃথিবীর জন্যে—জুলফিকার। পলাশী পাবলিশিং, ৭ নং গোবিন্দ দত্ত লেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

মেয়েদের ব্রহ্মচর্য্য বা জীবন গঠন—শ্রীশ্রীচিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণী। সত্যব্রত মঠ, গুপ্তিপাড়া, হুগলী। মূল্য এক টাকা।

সম্ভব—মিহির সেন। মহাবীর দীপজ্যোতি প্রকাশনী। ৪৪।১ নং শাঁখারীতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৪। মূল্য চারি আনা।

অবসর গাঁথা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল। ২ নং নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য লেন, কলিকাতা—২৬। মূল্য দেড় টাকা।

তারের স্বপ্ন (স্বরলিপি)—শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র চৌধুরী বি, এল। প্রকাশক—শ্রীসত্যশেখরেশ্বর রায়। রত্নাকর পাবলিশিং হাউস, ১৬৬এ নং রাসবিহারী এভিনিউ। মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রীশ্রীনবগ্রহের পাঁচালী—শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র আচার্য্য। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

বাংলার ছেলেদের সমস্যা—গোপীকৃষ্ণ ভৌমিক। সোম প্রেস, ৩০ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা—১২। মূল্য চার আনা।

জ্ঞানাঞ্জন—শ্রীভাগবতচন্দ্র দাস। বিবিগঞ্জ, মেদিনীপুর। মূল্য আট আনা।

মানবতা—খোশলাল। প্রকাশক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বল্লভ। ২৬-বি নং গ্যালিফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

শতদল—চরণানন্দ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা আট আনা।

কাগজে কলমে দমন ?

"আমাদের অন্ন-বস্ত্র, চিনি, রেশন প্রভৃতির দুর্নীতি দূর করিতে হইলে শত পাঁচেক কায়েমী স্বার্থসর্বস্ব বণিক এবং দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্ম্মচারীকে শায়েস্তা করা দরকার। এমন ভীতির সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে কোন লোক দুর্নীতিপরায়ণ কাজে হাত দিতেই সাহস না পায়। দুর্নীতি দমন বিল পার্লামেন্টে উত্থাপন করিয়া ডাঃ কাটজু বলিয়াছেন যে, সৎ সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতি যাহাতে অবিচার না হয়, দুর্নীতি দমন আইন প্রয়োগের সময় তাহা দেখিতে হইবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা কি করিতেছেন? বাঙ্গালা দেশে একটি সৎ কর্ম্মচারী রাষ্ট্রের জন্য টাকা আনিতে গিয়া কি ভাবে অপদস্থ এবং সাময়িক ভাবে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন, তাহা দেশশুদ্ধ কেন, পৃথিবীশুদ্ধ লোক জানিয়াছে এবং ইঁহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছে। সম্প্রতি হাইকোর্ট এই মামলার রায় দিয়া যেরূপ তীব্র ভাষায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফাইন্যান্স সেক্রেটারী এবং সেল্স ট্যাক্স কমিশনারের বিরুদ্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা অন্য যে কোন দেশে ঘটিলে এত দিনে ইঁহাদিগকে বরখাস্ত করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হইত, ইহাই আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। এক কোটি টাকা যে কর্ম্মচারী আদায় করিতে গিয়াছিলেন তাঁহাকে অন্যায় ভাবে বাধা দেওয়া হইয়াছে, সরকারের রাজস্ব ফাঁকী দিতে এই দুই কর্ম্মচারী সক্রিয় ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, ঐ কর্ম্মচারীর উপর অসঙ্গত ভাবে দোষারোপ করিয়াছেন—হাইকোর্টের এই কঠোর মন্তব্যের পরেও গভর্ণমেন্ট চুপ করিয়া আছেন। হয়ত আমরা দেখিব যে, ঐ কর্ম্মচারীটিকেই বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং যে দুই জনের হাইকোর্ট এত তীব্র নিন্দা করিয়াছেন তাঁহাদেরই উন্নতি হইতেছে। এই সব ঘটনা কম ঘটে, কিন্তু ইহার একটিতেই সৎ কর্ম্মচারীরা যে আঘাত পান, তাহাতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়া থাকে। কোন কর্ম্মচারীই ইহার পর আর কোন বড় দুর্নীতিপরায়ণকে ধরিতে সাহস পান না। দুর্নীতির রাজ্য কায়েম হইয়া ওঠে। ঐ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে চিঠিপত্র প্রকাশ করিয়া দেওয়ার যে সরকারী তদন্ত হইয়াছিল তাহার স্পেশাল জজও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, ইঁহাকে ডিসমিস করা উচিত নয়, তাহা হইলে সরকারী কর্ম্মচারীদের মনোবল একবারে ভাঙ্গিয়া যাইবে। অথচ যে সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে হাইকোর্ট কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন, তিনিই ইঁহাকে ডিসমিস করিবার জন্য কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। চমৎকার ব্যাপার! হাইকোর্ট যাঁহাকে ট্যাক্স ফাঁকীদারের সাহায্যকারী বলিয়া ভৎর্সনা করিয়াছেন, তিনি হইলেন এই কর্ম্মচারীটির ভাগ্যনিয়ন্তা। আর হাইকোর্ট ইঁহার কার্য্যের প্রশংসা করা সত্ত্বেও ইনিই হইলেন তাঁহাদের নিকট অপরাধী! ইহার পর গভর্ণমেন্টের দুর্নীতি দমন প্রচেষ্টার উপরে লোকে কিরূপে বিশ্বাস রাখিবে এবং কেনই বা তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিবে? জিদের বশে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভুলিয়া যাইতেছেন যে, এই একটি ঘটনার পরিণতির উপর সারা ভারতের শোষিত জনসাধারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে।" —দৈনিক বসুমতী।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্য্য করেন নাই

"নানা কারণে কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণের চিত্তে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ জাগিয়াছে। ইহার জন্য বামপন্থী দলগুলিকে দায়ী করা ক্ষমতার দম্ভের অভিব্যক্তি মাত্র। জনসাধারণ নির্বোধ নহে, দুঃখ ব্যথা অসম্মান লাঞ্ছনা কোন্ দিক হইতে কি ভাবে আঘাত করিতেছে তাহা তাহারা জানে এবং ইহাও জানে যে, একদলীয় শাসনপদ্ধতি নীরবে মানিয়া লওয়া অন্যায়কেই প্রশ্রয় দেওয়া। আজ যদি সারা ভারতে বামপন্থী ঐক্যবদ্ধ দলগুলি দ্বিতীয় প্রধান রাজনৈতিক দলরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী কংগ্রেসের নেতারা—যাঁহারা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্য করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। আজও যদি তাঁহারা বিরুদ্ধ সমালোচনার কণ্ঠরোধ করিয়া একদলীয় স্বৈরশাসনের পথ প্রশস্ত করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহারা পুরাতন ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করিবেন। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস অন্যদল নিরপেক্ষ 'মেজরিটি' লাভ করিয়াছেন কাজেই তাঁহারা দুর্বল নহেন। নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রত্যাহার করিয়া বিনাবিচারে আটক বন্দীকে মুক্তি দিয়া নবপর্যায়ের গণতান্ত্রিক আদর্শকে তাঁহারা মর্যাদা দিন। যদি অশান্তি উপদ্রব দেখা দেয় তাহা হইলে প্রতিকারের উপায় তো তাঁহাদের হাতেই রহিয়াছে। সত্যিকার অপরাধীদের প্রকাশ্য আদালতে সাধারণ আইনে বিচার হোক ইহাই দেশবাসীর দাবী। আমরা ভরসা করি, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ব্যক্তিগত আক্রোশ ত্যাগ করিবেন, বৃটিশের গুপ্তচর যাহারা পুলিশ বিভাগে বড় বড় কর্তা সাজিয়া নিয়ত তাঁহার কর্ণে কুপরামর্শ উদ্গার করিতেছে তাহাদের সম্বন্ধে সাবধান হইবেন, রাজ্যের বৃহত্তর কল্যাণের দিক হইতে জনমতের দাবী মানিয়া লইবেন। বন্দীমুক্তির দাবীতে যদি অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হইয়া যায় তাহা হইলে প্রকাশ্য রাজপথে পুলিশ দ্বারা লাঠিপেটা করাটা খুব লোচনানন্দদায়ক হইবে না। এই সকল বিবেচনা করিয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সাহস ও ঔদার্যের সহিত বন্দীমুক্তির প্রশ্ন সমাধান করিয়া গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করুন।" —সত্যযুগ।

"শো!"

"দেশের খাদ্যাভাব মিটাইবার নামে এই বড়লোকী "শো" কংগ্রেসী রাজত্বের অবাস্তব পরিকল্পনার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সারা দেশে যেখানে খাদ্যের অভাবে বুভুক্ষু মানুষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, অনাহারের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতেছে, দুই মাস পরেই কি খাইব বলিয়া চাষীর ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে, সেখানে সঙ্গতিসম্পন্নদের জন্য পরিপূরক খাদ্য প্রচলনের প্রদর্শনী সঙ্গতিহীনদের ব্যঙ্গ করা মাত্র। আর এই ক্ষমাহীন ব্যঙ্গের শহুরে উৎসবে আশীর্ব্বাদ পাঠাইতেছেন শ্রীনেহরু, শ্রীবিধান, শ্রীকাটজু আর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী রাজ্যপাল প্রভৃতি। সারা দেশ যেখানে খাদ্যের পিপাসায় ছটফট করিয়া মরিতে বসিয়াছে, সেখানে বিদ্রূপের বিষ ছুঁড়িয়া দিয়া উপরতলার কংগ্রেসী প্রভুগণ আত্মতৃপ্তি করিতেছেন। বড়লোকী

বকারের বড়লোকী 'শো' গরীবের ক্ষুধা লইয়া বিলাস-ব্যসনের ক্ষেত্র চনা করিয়াছে।" —গণবার্ত্তা।

ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্রের জয়

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জয়কে কংগ্রেসের জয় বলিয়া নাচানাচি করার কোন অর্থ হয় না। ডাঃ রায় কেবলমাত্র সুনাম এবং ব্যক্তিত্বের জন্যই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়া কলিকাতার বহুবাজার কেন্দ্র হইতে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার এই জয়লাভের মধ্যে নির্ব্বাচনের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় গণতন্ত্রের সার্থকতা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। জনমতের হইয়াছে অবিসংবাদী বিজয়। ডাঃ রায় ১৩ হাজার ৯১০ ভোট পাইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় ব্যানার্জ্জি পাইয়াছেন মাত্র ১ হাজার ৭১১ ভোট। প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে কিরূপ তীব্র হইয়াছে ইহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ডাঃ রায়ের বিজয়ের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সার্থকতা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। নিকষিত কাঞ্চন তীব্র অনলে দগ্ধ হইয়াই নিজের বিশুদ্ধতার অব্যর্থ প্রমাণ দিয়া থাকে। ডাঃ রায়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জনপ্রিয়তাও সাধারণ নির্ব্বাচনের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। বহুবাজার কেন্দ্রের ভোটারগণ ডাঃ রায়কে বিজয়ী করিয়া তাঁহাদের কল্যাণ কামনারই অব্যর্থ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, ডাঃ রায়কে তাঁহার আরব্ধ দেশসেবাব্রত সম্পূর্ণ করিবার সুমহান্ সুযোগ দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের অনেক মন্ত্রী নির্ব্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন। জনমত তাঁহাদের সম্পর্কে যে-রায় প্রদান করিয়াছে, তাহা লইয়া আলোচনা করিবার স্থান এখানে আমরা পাইব না। উপনির্ব্বাচনের খিড়কী পথে আবার তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করা সঙ্গত কি না তাহা নির্দ্ধারণ করিবার দায়িত্ব ডাঃ রায়ের সুযোগ্য হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু ডাঃ রায়ই পশ্চিমবঙ্গে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন, ইহাই আমাদের কাছে পরম আনন্দের কথা। অনেক নূতন লোককে তাঁহার মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করিলে ইহার প্রয়োজনীয়তাও অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে হয়। যে-কয়েক জন নূতন মন্ত্রী গৃহীত হইবেন, ডাঃ রায় নিজের হাতে তাঁহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে পারিবেন। ইহা যেমন নূতন মন্ত্রীদের পক্ষে গৌরবের কথা, তেমনি দেশবাসীও ইহাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। পশ্চিমবঙ্গে একদিকে যেমন স্থায়ী ও বলিষ্ঠ গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়া প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কঠিন সমস্যার সমাধান করিয়া পশ্চিমবঙ্গবাসীকে অন্ন-বস্ত্রাভাবের দুঃসহ দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের গৃহপ্রাঙ্গণকে আনন্দের গানে মুখরিত করিয়া তোলা। এই গুরুভার গোবর্দ্ধন ধারণ করিবার ক্ষমতা দুর্ব্বার শক্তিশালী পুরুষসিংহ ডাঃ রায় ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় আর কেহ নাই। পশ্চিমবঙ্গবাসীর কল্যাণের জন্যই আরও দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রনায়কের আসনে তাঁহার সমাসীন থাকা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধিই ডাঃ রায়ের জয়লাভের মধ্যে সূচিত হইয়াছে।

ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীরূপে ইতিপূর্ব্বেই যে সকল পরিকল্পনার কাজে হাত দিয়াছেন, ভবিষ্যতের জন্য আরও যে সকল পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন এবং দেশবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আরও যে সকল পরিকল্পনা গঠনের সঙ্কল্প তাঁহার আছে, ভাবী গবর্ণমেণ্টের নায়করূপে সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ আরও পাঁচ বৎসরের জন্য তিনি পাইবেন। আবার তিনি আরও পাঁচ বৎসরের শক্তিশালী, গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণকামী মন্ত্রিসভা গঠন করিবার অধিকার লাভ করায় আমরা তাঁহাকে আমাদের অন্তরের অন্তস্তল হইতে উৎসারিত প্রগাঢ় বিজয়-অভিনন্দন জানাইতেছি। 'শরদঃ শতম্' দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রনায়করূপে পশ্চিমবঙ্গবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত থাকুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পেটোয়া নীতি

"পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এইরূপ স্বৈরাচারী নীতির প্রতিবাদে বঙ্গীয় প্রকাশক-সঙ্ঘ ৭ই জানুয়ারী, সোমবার হরতাল পালন করিয়াছেন। সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী বোর্ডের পেটোয়া নীতির বিরুদ্ধে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের প্রতিবাদ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, বিভিন্ন সংবাদপত্র ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন ও জানাইতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্কুলের পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, পুস্তক ব্যবসায় তাহার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করিয়া আমরা আশংকা প্রকাশ করিতেছি। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র বাংলার পুস্তক ব্যবসায়ীদের প্রতি হুমকী দিয়া সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার মধ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের প্রতি কোন দরদী মনের ভাব ব্যক্ত হয় নাই। ইহার পরিবর্ত্তে সেখানে ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। আমরা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে এই প্রসঙ্গে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিতে চাই, উপরি-উক্তরূপ সিদ্ধান্তের আগে সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার

বিশ্লেষণ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কারণ ক্ষণিকের ভ্রান্তি বা খামখেয়ালী বাংলার সমাজ-জীবনে অশেষ দুর্গতিকে ডাকিয়া আনিতে পারে, যাহার ফল কি রাষ্ট্র বা কি সমাজ—কাহারো পক্ষেই মঙ্গলের বার্ত্তা বহন করে না। আমরা আশা করি, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড অতঃপর ব্যবসাদারী বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের দিকে আত্মনিয়োগ করিবেন এবং এই অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির অবসান ঘটাইবেন।" —কর্ম্মিদল।

কর্পোরেশন নির্ব্বাচন

"কর্পোরেশন নির্ব্বাচনের তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণ নির্ব্বাচনের আগে যেমন বামপন্থী ঐক্যের বৈঠক হইয়াছিল এবারও তাহা সুরু হইয়াছে। বামপন্থী ঐক্যের মধ্যমণিরূপে অমিয় বসু যত দিন বিরাজ করিবেন, তত দিন ঐক্য শেষ পর্য্যন্ত হইবে কি না আমাদের সন্দেহ আছে। ওয়েলিংটন-উডবার্ণ পার্ক সূত্র ইঁহারা যতটা অদৃশ্য মনে করেন ততটা নয়। আমরা দেখিতেছি, অমিয় বসুর ব্যবহারে বামপন্থী ঐক্য হয় না, ঐক্যের অভাবে বিধান রায় এবং কংগ্রেসের লাভ হয়। আমরা মনে করি, কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে এবার পাড়ার উৎসাহী যুবকদের বেশী করিয়া পাঠানো উচিত। নির্ব্বাচন-কেন্দ্র খুব ছোট হইয়াছে, পাড়ার বিপদে-আপদে যাঁহারা বুক দিয়া পড়েন তাঁহাদের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিলে, কাউন্সিলার নির্ব্বাচন করিলে, কর্ম্মশক্তি এবং উৎসাহ আরও বাড়িবে। ভবানী দত্ত, বিশ্বজিৎ দত্ত প্রভৃতির ন্যায় যুবকদের কাউন্সিলার নির্ব্বাচন করার চেষ্টা হইলে আমরা তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিব। এই ধরণের তরুণেরা কর্পোরেশনে গেলে কায়েমী স্বার্থ প্রবল আঘাত প্রাপ্ত হইবে।" —যুগবাণী।

শুধু জয়গান নয়

"নেতাজীর স্বপ্ন সম্পূর্ণ সফল না হইলেও তাহার সফলতার দায়িত্ব বর্ত্তাইয়াছে দেশের অসাম্যের ভারে উৎপীড়িত সাম্যকামী মানুষের উপর। বহু চেষ্টাতেও নেতাজীর প্রতি অসম্মানকারীর দল নেতাজীর নাম মুছাইয়া দিতে পারে নাই। আকাশে, বাতাসে, নগরে, গ্রামে, মাঠে, ঘাটে নেতাজীর নাম, তাঁর বীরত্বগাথা প্রতিধ্বনি করিয়া ফিরিতেছে। কোথা সেই সাম্যকামী মেহনতী মানুষ? কোথা সেই দেশের যৌবনের উদ্ধত আবেগ? শুধু বন্দনা নয়, শুধু প্রতিকৃতিতে মাল্যদান নয়, শুধু দীপালোকে বাসগৃহের শোভাবর্দ্ধন নয়, শুধু জয়গান নয়, সত্যকার ভাবে তাঁর আদর্শের পূজারী হইতে হইবে। তাঁরই প্রদর্শিত পথে আগাইয়া যাইতে হইবে তবেই তাঁর বন্দনা সার্থক। নেতাজীর উদাত্ত আহ্বানে নব তেজে বলীয়ান হইয়া জাগিয়া উঠুক দেশের যৌবন-শক্তি, আগাইয়া চলুক দুর্নিবার প্রগতির জয়যাত্রায়।" —বীরভূম বার্ত্তা।

ক্যাম্পে শার্দ্দূল?

"কয়েক দিন বন্ধ থাকার পর কুপার্স ক্যাম্পে আবার নর-খাদক জানোয়ারের অত্যাচার সুরু হয়েছে। কিছু দিন হল, একটি শিশু যখন আক্রান্ত হয় তখন তার মাতা সেই জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করে পুত্রের জীবন রক্ষা করে। শিশুটি বেশ আহত হয়েছে। ঠিক এর পরের দিন আবার একটি ৬।৭ বছরের বালককে ক্যাম্প-মধ্য হতে ধরে নিয়ে যায় ও খেয়ে ফেলে। বহু দিন হতে এই অত্যাচার চলেছে, অথচ সরকার এ বিষয়ে উদাসীন রয়েছেন। কোন সভ্য ও স্বাধীন দেশে এই বৈজ্ঞানিক যুগে মাসের পর মাস এইরূপ অত্যাচার চলতে পারে বলে কেউ ধারণাও করতে পারবেন না। সরকারের সৈন্যবাহিনী আছে, তাঁদের হস্তক্ষেপে এই অত্যাচার এখুনি থেমে যেতে পারে কিন্তু এই সরকারী উদাসীনতা সত্যই মর্ম্মান্তিক। বাস্তুত্যাগীদের জীবনের কি কোন মূল্যই নেই? মহকুমা শাসক ও জেলা শাসক নিশ্চয়ই এ সংবাদ রাখেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্য আমরা বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।" —সীমান্ত।

বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিব

"অর্থ মুষ্টিমেয় কয়েকটি ক্ষেত্রে কুক্ষিগত হইয়া থাকায় এবং ব্যবসায় নানা প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপিত হওয়ায় বর্ত্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্যে জীবন ধারণের পথও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ ও অত্যন্ত সংকীর্ণ অবস্থার মধ্যে মধ্যবিত্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রবেশের পথ পাইতেছে না এবং কোন ভাবে প্রবেশ লাভ করিলেও তাহাতে কোন কূল পাইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুর্ভাগ্যের কথা বলিয়াছেন মাত্র এবং তাহাদের স্বার্থরক্ষার সঙ্কল্পও জ্ঞাপন করিয়াছেন, কিন্তু এই সমস্যার সম্মুখীন হইলে দেখিবেন শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সর্ববিষয়েই এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ দেউলিয়া হইতে বসিয়াছে। বিধ্বস্ত, পতন-উন্মুখ, একটা বিরাট ইমারতের ধ্বংসপ্রায় অবস্থা দেখিয়া বিচলিত যে তাঁহাকেও হইতে হইবে এ বিষয়ে কিছুমাত্র ভুল নাই। আজ এই অবস্থায় অনেকেই বিচলিত হইতেছেন এবং কোন পথ পাইতেছেন না। মধ্যবিত্তের এই দারুণ সঙ্কটময় অবস্থা সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বেও বহু বার আলোচনা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী আশ্বাস কতখানি কি ভাবে কোন দিকে কার্য্যকরী হয় তাহা আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিব।" —ত্রিস্রোতা।

মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি

"৭।৮ মাস পূর্ব্বে তমলুক শিশুরক্ষা সমিতির পরিচালনায় কিছু কিছু গোলযোগ দৃষ্ট হওয়ায় সেক্রেটারী পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু এখনও যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আশ্রিত বালকদের বিশেষ কোন সুবিধা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বরং তাহাদের মনে একটা অনিশ্চয়তার আতঙ্ক জাগিয়া উঠিতেছে শুনি। নিয়মিত বিলের অভাবে বা অন্য যে কারণেই হউক, সরকার হইতে প্রাপ্য তাহাদের খোরাকীর টাকা গত ৫ মাস যাবৎ না কি পাওয়া যায় নাই। সেক্রেটারী কোন রকমে চালাইয়া যাইতেছেন। কিন্তু তিনি পোষাক-আসাকের দিকে তেমন নজর দিতে পারিতেছেন না, ফলে বৎসরাধিক কাল পরিধেয় বস্ত্রাদি না পাওয়ায় শীতে ছেলেদের ভীষণ কষ্ট হইতেছে। পড়াশুনার ব্যবস্থাও তদনুরূপ। ৬।৭ মাষ্টাররা বেতন না পাওয়ায় তাঁদের মধ্যে উৎসাহের বিশেষ অভাব দৃষ্ট হয়। তার উপর নূতন বৎসরে নূতন ক্লাসে উঠিলে ছেলেদের যে নূতন বইয়ের প্রয়োজন এবং যাহারা প্রাইমারী সেণ্টার পরী-

উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের নূতন স্কুলে ভর্ত্তি করা আবশ্যক—পরিচালক সমিতি সে বিষয়ে কোনরূপ মাথা ঘামাইতেছেন না। অথচ ইহাদের মধ্যে যে লেখাপড়ায় আগ্রহের অভাব নাই তাহা এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ছেলেদের পরীক্ষার বাৎসরিক ফল ও সেণ্টার পরীক্ষার ফলাফল দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। গত বার চারিটি ছেলে শিশুসদনের সেণ্টার পরীক্ষা দেয় এবং একটি দ্বিতীয় বিভাগ ব্যতীত সবগুলিই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। আবার দুই-এক জনের স্কলারশিপ পাওয়ারও সম্ভাবনা আছে। সেই ১৯৪২ সাল হইতে মানুষ করিয়া এখন ওই সব অনাথ বালকদের প্রতি অবহেলা দেখান দুঃখের কারণ নিশ্চয়ই। যাঁহারা ইহার স্থাপয়িতা বা পরিচালক তাঁহাদের এ ঔদাসীন্য কেন? সমিতির কাজ কি কেবল সরকারী অর্থের আশায় বসিয়া থাকা? না এ সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য উদ্যোগী হওয়া? আমরা এ বিষয়ে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে মহকুমা শাসক মহাশয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করি।" —প্রদীপ।

বাঙলা নেই কেন?

আসাম সরকারের প্রচার বিভাগ কর্ত্তৃক যে-সব পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হয় তাহা সমস্তই অসমীয়া অথবা ইংরাজী ভাষায়। বাঙ্গালায় কিছুই হয় না, যদিও আসামের এক-তৃতীয়াংশ লোকই বঙ্গ-ভাষাভাষী। কাছাড় অসমীয়া-অধ্যুষিত অঞ্চল নহে কিন্তু সেখানেও প্রচারপত্র ইত্যাদি অসমীয়া ভাষায়ই প্রেরিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অধিক শস্য ফলাও সম্পর্কিত প্রচারপত্রের কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু কাছাড়ের কৃষক অসমীয়া ভাষা বুঝে না। সরকারের তরফ হইতে না কি বলা হইয়া থাকে যে বাঙ্গালা ভাষায় পৃথক্ ভাবে ছাপাইতে গেলে অতিরিক্ত খরচ পড়ে। রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ লোকের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা কখনই অপব্যয় নয়। বাহিরে খরচের দোহাই দিলেও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যে ভিন্ন তাহা সুস্পষ্ট। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কাছাড়ের সরকারী অফিস ইত্যাদিতে সাইনবোর্ডও এখন অসমীয়া ভাষায় লেখা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার কোনই যুক্তি নাই—এমন কি উপরের যুক্তিও এখানে খাটে না। ক্ষমতার সুযোগ নিয়া কোন ভাষা জোর করিয়া চাপাইয়া দিতে গেলে কখনও জনপ্রিয় হয় না এবং উল্টা ফলই ফলিয়া থাকে।" —জনশক্তি।

পালা খতম, কিন্তু—

"ভারতের (গণতান্ত্রিক?) নির্ব্বাচনের পালা খতম হয়ে এলো। নির্ব্বাচনে কে জিতলো, কে হারলো সে কৌতূহল ছাপিয়ে সাধারণ মানুষের মনে এখন যে চিন্তাটা বড় হয়ে উঠেছে—তা হচ্ছে ধান-চালের বাজার এবং ভাত, কাপড়, তেল, খোলের চিন্তা। সবে মাত্র ধান কাটা শেষ হয়েছে, এবং নির্ব্বাচনের আগে যে কর্ডন প্রথা কদিনের জন্য সিকেয় তুলে রেখে দেশের "একমাত্র ভালো করনেওয়ালা" কংগ্রেসী দল ভোট পাবার লোভে সাধু সেজে বসেছিলেন, আবার তাঁরা তাঁদের অকৃত্রিম রূপেই দর্শন দিচ্ছেন। থানা কর্ডন ও আঞ্চলিক কর্ডন প্রথা চালু করে একই জেলার মধ্যে সরকার কি রকম অভাব অনটন ও দুর্নীতির প্রসার ঘটিয়েছেন, সরকারী রিকুইজিশন ও নিয়ন্ত্রণ প্রথার চূড়ান্ত অব্যবস্থার দরুণ কি ভাবে উদ্বৃত্ত এলাকায় পর্য্যন্ত সাধারণ চাষী ও ক্ষেত-মজুরদের দিনের পর দিন খাদ্যের সন্ধানে ছটফট করতে হয়েছে, এবং কত সাধারণ মানুষকে পথে মাঠে রেলওয়ে ষ্টেশনে ২।৪ সের চালের জন্য পেট্রল গার্ড ও পুলিশের হাতে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে, এ জেলার অধিবাসীদের তা অজানা নাই। নিয়ন্ত্রণ প্রথার আমরা বিরোধী নহি, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটা এমন ভাবে গড়তে হবে যাতে সাধারণ মানুষের সুখ-সুবিধা বিধান করা যায়। এবং তা যায়ও; কিন্তু কংগ্রেসী সরকার কি মিলজাত তেল, খোল, কাপড় কি ধান চাল কোন জিনিষটাই সুনিয়ন্ত্রিত, সহজলভ্য এবং মেহনতী মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার অধীনে রাখতে পারেনি? এবার বর্দ্ধমান জেলার কয়েকটি অঞ্চলে অনাবৃষ্টির ফলে ফসল একরূপ হয়নি। জেলার গ্রামাঞ্চলে ধানের দর ইতিমধ্যে বেশ চড়তে সুরু হয়েছে এবং স্থানে স্থানে ১০৲।১১৲ হতে ১৩৲।১৩।॰ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি-মণ ধান বিক্রী হচ্ছে, যদিও সরকারী কণ্ট্রোল দর প্রতি মণ মাত্র ৮।॰ টাকা।" —বর্দ্ধমানের ডাক।

শ্রীবিমলকুমার দত্ত

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমলকুমার দত্ত; এম,এ, ডিপ, লিব; ভারত সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া কমনওয়েলথ টেকনিক্যাল কো-অপারেশন ব্যবস্থা অনুযায়ী অষ্ট্রেলিয়ার লাইব্রেরী সেমিনারে যোগদানের জন্য ২২শে ফেব্রুয়ারী বিমানযোগে সিডনী যাত্রা করিয়াছেন। তিনি জয়নগর-মজিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের পুত্র ও ভারতের গ্রন্থাগার-আন্দোলন ও শিল্প সম্বন্ধে এক জন বিশিষ্ট লেখক। আমরা এই তরুণ গ্রন্থাগারিকের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি-উৎসব

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী বুধবার অপরাহ্নে বেলিয়াঘাটায় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি হাসপাতালের প্রাঙ্গণে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র স্বর্গীয় রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। বেলিয়াঘাটার অন্যতম বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীবিধুভূষণ সরকার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন বক্তা স্বর্গীয় রামচন্দ্রের বিদ্যাবত্তা ও কর্ম্মকুশলতার বিষয় উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। আমরাও রামচন্দ্রের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

শোক-সংবাদ

ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ গত ৬ই ফেব্রুয়ারী প্রত্যুষে স্যাণ্ড্রিহাম প্রাসাদে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫৬ বৎসর। ১৯৩৬ সালে তাঁহার ভ্রাতা অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগের পর তিনি রাজা হন। রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের দেহে ১৯১৪ সাল হইতে পাঁচ বার অস্ত্রোপচার করা হয়। ১৯১৪ সালে তাঁহার এপেণ্ডিক্স কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়। রাজা হইবার পর তাঁহার দেহে প্রথম অস্ত্রোপচার হয় ১৯৪৯ সালে। তাঁহার দেহে শেষ অস্ত্রোপচার হয় গত সেপ্টেম্বর মাসে বাকিংহাম প্রাসাদে। তিনি ১৮৯৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরীর তিনি দ্বিতীয় পুত্র। ভারতবাসী আমরা রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের কথা বিশেষ ভাবেই স্মরণ না করিয়া পারি না। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজকুমারী এলিজাবেথকে দ্বিতীয় এলিজাবেথ নামে ইংলণ্ডের রাণী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের বৃদ্ধা মাতা রাণী মেরী এখনও জীবিতা আছেন। আমরা ইংলণ্ডের রাজপরিবারকে তাঁহাদের এই গভীর শোকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

—

শ্রীঅরবিন্দের সহকর্ম্মী অবসরপ্রাপ্ত আই, সি, এস ও সাহিত্যিক শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত গত ২২শে জানুয়ারী রাত্রিতে ৭৬ বৎসর বয়সে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোকগমন করিয়াছেন। গত ৭ বৎসর যাবৎ তিনি সস্ত্রীক শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে থাকা কালেই শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত বিপ্লবাত্মক কার্য্যাবলীর মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মিরূপে কাজ করেন। তিনি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিতেছি।

—

শোভাবাজারের সুবিখ্যাত মিত্র-পরিবারের কর্ত্তা শ্রীকালীশঙ্কর মিত্র গত ৯ই ফেব্রুয়ারী শনিবার তাঁহার ৪৮ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন, মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর ৯ মাস হইয়াছিল। তিনি ব্যারিষ্টার ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি স্বর্গীয় ডাঃ আর, জি, করের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বর্গীয় মেজর বি কে, বসু আই-এম-এস-এর জ্যেষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করেন। টালায় ১ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালনের রিজার্ভার, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, বাঁকুড়া, হুগলী ও সিউড়ীর জলের কল, গয়া জল-নিকাশ পরিকল্পনা প্রভৃতি তাঁহার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ-কার্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি মৃত্যুকালে ছয় পুত্র শ্রীসুধীরশঙ্কর মিত্র, বিমলশঙ্কর মিত্র, নির্ম্মলশঙ্কর মিত্র, মনুজশঙ্কর মিত্র, হিমাংশুশঙ্কর মিত্র ও বিভাংশুশঙ্কর মিত্র, এবং দুই ভ্রাতা দেবশঙ্কর মিত্র ও কাশীশঙ্কর মিত্র এবং বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

—

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পৌত্র, অবিভক্ত ভারতের ডাক ও তার বিভাগের বাংলা ও আসাম সার্কেলের ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল মেজর কুণালচন্দ্র সেন, এম, বি, ই ১৮ই জানুয়ারী ১৯৫২ প্রত্যুষে তাঁহার ল্যান্সডাউন রোডস্থ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন।

মেজর কুণালচন্দ্র বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) ইরাণ, মিশর, গ্রীস প্রভৃতি রণাঙ্গনে অপূর্ব্ব কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও বীরত্বের জন্য বহু বার সম্মানিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতস্থ আর্মি মেল সেকশানের তিনি ডেপুটি এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর ছিলেন। ক্রীড়াকুশলী, সুবক্তা, সুগায়ক ও সু-অভিনেতা হিসাবে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি এক জন সুসাহিত্যিকও ছিলেন। তাঁহার গানের বইগুলি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ও মূল ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া তিনি জন-সমাদৃত হইয়াছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক জন অমায়িক, ধর্ম্মপ্রাণ ও পরোপকারী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

ডাক ও তার বিভাগের বহু গুণমুগ্ধ কর্ম্মচারী, অগণিত আত্মীয়-বান্ধব ও তাঁহার বিধবা স্ত্রীর নিকট তাঁহার অভাব চিরকাল ধরিয়া থাকিবে। করুণাময় ঈশ্বর তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কথামৃত

হৃদু, তুই কেন ও রকম করিস্। ও রকম করিসনি। মা কালী আমায় ঐ অবস্থা করে দিয়েছিলেন, আমার বুদ্ধি উল্‌টে দিয়েছিলেন, তাই আমি ঐ রকম করতুম ; নইলে আমি কি সাধ ক'রে করতুম ? তুই ও রকম করিসনি, তুই কেবল আমার কাছে থাকবি, সেবা করবি ; তুই যে আমারি অংশ, সেবার জন্তে এসেছিস ; নইলে কি সেবা করতে পারিস ; সাধ্যি কি ? তুই যে আমার অংশ, তোর আর কিছু করতে হবে না।"

মথুরানাথ। (হৃদয়কে ডাকিয়া) দেখ! অমন যদি করবে তো তোমার জ্ঞান্ নেব! বাবার কাছে আমরা দু'জনে নন্দীভৃঙ্গীর মত থাকব, আর সেবা করব। খবদ্দার আর ও রকম ক'র না!

হৃদয়। মামা, তোমার ঐশ্বর্য্য আমায় দেও। আমার বড় সাধ, একটি নবরত্ন ক'রে তোমায় সেখানে রাখি, আর তোমার পূজা করি, ভোগ দি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুই ও সব করলে কি হবে ? এর পর দেখবি, কত লোকে কত কি করবে। আর তুই কেবল দেখে দেখে বেড়াবি। তুই একলা করলে কি হবে ? এর পর ঘরে ঘরে পূজো করবে।

হৃদয়। ও রামকেষ্ট, ও রামকেষ্ট, ওরে তুইও যে আমিও সেই। ওরে আমরা মানুষ নই রে, তবে আর কেন, চল্ দেশে দেশে যাই, জীব উদ্ধার করি গে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওরে অমন করে চ্যাচাসনি, চুপ কর, লোকে শুনলে কি বলবে ? চুপ কর!

(হৃদয় কথায় কর্ণপাত না করিয়া, অধিক চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ দ্রুতপদে আসিয়া হৃদয়ের বক্ষস্থলে হস্ত স্পর্শ করিয়া—)

শ্রীরামকৃষ্ণ। থাক্, থাক্, জড় হয়ে থাক। একটু দেখেই এত, আমি চব্বিশ ঘণ্টা এর চেয়ে কত বেশী দেখছি। তোর এখনও সময় হয়নি। চুপ কর, চ্যাচাসনি।

হৃদয়। (কাঁদিতে কাঁদিতে) মামা, তুমি দিব্যচক্ষু দিলে ; দিয়ে কেড়ে নিলে কেন ? তুমি জড় হতে বললে কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি তোকে একেবারে জড় হতে বললুম ? তুই এখন স্থির হয়ে থাক্, সময়ে কত দেখবি, কত বুঝবি।

মথুরানাথ। বাবা, এ সব তো তোমারি খেলা ; তাহা না হইলে এত দিন তো হৃদুর ওসব কিছু হয়নি। সেদিন তোমার কাছে উনি কেঁদেছেন, তাই তোমার কৃপা হয়েছে। আচ্ছা বাবা, ভাব হলে মনের ভিতর কি রকম হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও এবার আর ঢঙ করেনি। একতার হয়ে কচ্ছে। তোমারও যখন হবে তখন বুঝতে পারবে। ঐ অবস্থা না হ'লে বোঝা যায় না। জলের মাছ জলে ছেড়ে দিলে তার যেমন হয়, সেই রকম হয়। তা তোমার যখন হবে তখন বুঝতে পারবে।

(কথা শেষ হইলে হৃদয়ের বক্ষস্থলে হস্তস্পর্শ করিয়া)

শ্রীরামকৃষ্ণ। থাম্ রে থাম্! আর ভাব দেখাতে হবে না। ভাব দেখিয়ে আমারি বড় সব হ'ল ; আবার তুমি ভাব দেখাচ্ছ! চেপে যা, চেপে যা, ভাব চাপতে শেখ!

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পঁয়ষট্টি

রামকৃষ্ণকে এখন একবার দেশে যেতে হয়। এই প্রথম তার হৃদয়-ছাড়া দেশে যাওয়া।

মাকে বলে হৃদয়কে নিজেই সরিয়ে দিয়েছে রামকৃষ্ণ। কায়মনে এত সেবা করে অথচ টাকার মায়া কাটাতে পারে না। থেকে-থেকে কোত্থেকে সব বড়লোক এনে হাজির করে। বলে, এটা চাও, ওটা নাও, এদিক-ওদিক সুবিধে দেখ। লছমীনারাণ মাড়োয়ারীকে ওই ধরে এনেছিল কিনা ঠিক কি। যখন বললে, টাকাটা হৃদয় বাবুর কাছে রেখে যাই, হৃদয় বাবুর স্ফূর্তি তখন দেখে কে।

এক কথায় নিরস্ত করে দিলে রামকৃষ্ণ। টাকা কাছে রাখাই মানে অহঙ্কারকে জীইয়ে রাখা।

মাড়োয়ারী তখন আরেক কৌশল করলে। বললে, তোমার স্ত্রীর নামে লিখে দি।

হৃদয় বললে, 'সেই ভালো।'

রামকৃষ্ণ ভাবল, মন্দ কি, জিগগেস করা যাক সারদাকে।

নিভৃতে ডাকিয়ে আনল। বললে, 'দশ-দশ হাজার টাকা। তোমাকে দিতে চাচ্ছে লছমীনারাণ। নাও না? নেবে?'

সার কথা বুঝতে পেরেছে সারদা। বললে, 'তা কেমন করে নিই? আমি নিলে যে তোমার নেওয়াই হয়ে গেল। আমি আর তুমি কি আলাদা? তুমি যা নিতে পারো না তা আমিও নিতে পারি না।' চলে গেল সারদা।

হৃদয়ের মুখ ম্লান হল বটে কিন্তু হাঁপ ছাড়ল রামকৃষ্ণ।

টাকার যে এত অহঙ্কার কর, তোমার ক হাঁড়ি আছে জিগগেস করি? তোমার যদি আছে হাঁড়ি, ওর আছে জালা। তোমার যদি আছে জালা, ওর আছে মটকি। আধিক্যেরও আতিশয্য আছে। সন্ধের পর যখন জোনাকি ওঠে তখন সে ভাবে জগৎকে খুব আলো দিচ্ছি। কিন্তু যেই আকাশে তারা উঠল, তার অভিমান চলে গেল। তারারা ভাবতে লাগল, আমরাই আলো দিচ্ছি জগৎকে। কিছু পরে যেই চাঁদ উঠল, লজ্জায় মলিন হয়ে গেল তারারা। চাঁদ ভাবল জগৎ আমার আলোতেই হাসছে। দেখতে-দেখতে অরুণোদয় হল, সূর্য উঠলেন। তখন কোথায় বা চাঁদ, কোথায় বা কি।

গোড়ায়-গোড়ায় রামলালও এক-আধটু হাত বাড়াত। ঠাকুরের অসুখের সময় মহেন্দ্র কবরেজ দেখতে এসেছে সেবার। যাবার সময় পাঁচটি টাকা দিয়ে গেল রামলালের হাতে।

ডাক্তার কই ভিজিট নেবে, সেই কিনা উল্টে টাকা দেয় রুগীকে।

বিছানায় ছটফট করছেন ঠাকুর। সারাক্ষণ কত হাওয়া করল লাটু, তবু কমছে না যন্ত্রণা। শেষে বললেন, 'যা তো, রামনেলোকে ডেকে নিয়ে আয় তো, সে শালা নিশ্চয় কিছু করেছে, নইলে চোখ বুঝছে না কেন?'

রামলাল কাছে আসতেই ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন: 'যা শালা যা, এখানকার জন্যে যার ঠেঙে টাকা নিয়েছিস তাকে শিগগির ফিরিয়ে দিয়ে আয়।'

রাত তখন প্রায় দুটো। লাটুকে সঙ্গে নিয়ে রামলাল গেল সেই কবরেজের বাড়ি। কবরেজকে ঘুম থেকে তুলে তার টাকা তাকে ফেরৎ দিলে।

ঠাকুর ঠাণ্ডা হয়ে দুচোখ একত্র করলেন।

'ওরে রামলাল,' ঠাকুর বলেছিলেন এক দিন স্নেহস্বরে: 'যদি জানতুম জগৎটা সত্যি, তবে তোদের কামারপুকুরটাই সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়ে যেতুম। জানি যে, ও সব কিছু নয়, একমাত্র ভগবানই সত্যি।'

ওরে, সে যে আনন্দং নন্দনাতীতং। প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োনাস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ। তার মত ভালোবাসার জিনিস আর কিছু নেই।

শ্রীমতী বললে, 'সখি, চতুর্দিক কৃষ্ণময় দেখছি।'

তা তো দেখবেই। তুমি যে অনুরাগ-অঞ্জন চোখে দিয়েছ।

সখীরা বললে, 'রাধে, ঐ দেখ কৃষ্ণ এসেছে। তোমার সর্বস্ব ধন হ'রে নিতে এসেছে—'

ওরে, নিক হরণ করে। ওই তো আমার সর্বস্ব।

কেশব সেন যখন আসে দক্ষিণেশ্বরে, হাতে করে কিছু নিয়ে আসে। হয় ফল নয় মিষ্টি। রামকৃষ্ণের পায়ের কাছে বসে কথা কয়। একেক দিন বা বক্তৃতা দেয়।

সেদিন বড় ঘাটে গঙ্গার দিকে মুখ করে বক্তৃতা দিলে কেশব।

হৃদয়ের যেমন মুরুব্বিয়ানা করা অভ্যেস, গম্ভীর মুখে বললে, 'আহা, কী বক্তৃতা! মুখ দিয়ে যেন মল্লিকে ফুল বেরুচ্ছে!'

কিন্তু বক্তৃতার মধ্যেই উঠে গেল রামকৃষ্ণ।

যারা জমায়েত হয়েছিল বলাবলি করতে লাগল, লোকটা মুখ্খু কিনা, মাথায় কিছু ঢোকে না, তাই কেটে পড়ল।

কিন্তু কেশবের মনে ডাক দিল, কোনো ত্রুটি হয়েছে নিশ্চয়ই।

তাড়াতাড়ি কাছে এসে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণকে, 'কিছু কি অন্যায় করে ফেলেছি?'

'নিশ্চয়ই। তুমি বললে, ভগবান, তুমি আকাশ দিয়েছ বাতাস দিয়েছ—কত-কি দিয়েছ। তারি জন্যে যেন তোমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ও সব তো ভগবানের বিভূতি। বিভূতি নিয়ে কথা কইবার দরকার কি? এ কি তুমি বলে শেষ করতে পারবে? তা ছাড়া, এ সব বিভূতি যদি তিনি নাই দিতেন, তা হলেও কি তিনি ভগবান হতেন না?' একটু থামল রামকৃষ্ণ। বললে, 'বড়লোক হলেই কি তাঁকে বাপ বলবে? যদি তিনি গরিব হতেন, নিঃস্ব ও নির্ধন হতেন, তা হলে কি তাঁকে বাপ বলবে না?'

কেশব চুপ করে রইল।

হৃদয়কে জিগগেস করি, এখন এ কোন ফুল বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে?

সকলে বলাবলি করতে লাগল, 'সত্যি বড়লোক হলেই কি বাপ হবে? গরিব হলে সে আর বাপ নয়?'

এরই নাম ভালবাসা। ভগবান আমাকে কিছু দিন বা না-দিন আমার দিকে তাকান বা না-তাকান, তবু আমি তাঁকে ভালবাসি। আমি তাকিয়ে আছি তাঁর দিকে।

দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুন কেশব সেনের মাথা ভেঙে দিয়েছে। এই নিয়ে সুরু হল হৈ-চৈ। বলে কিনা, বড়লোক না হলে বাপ কি আর বাপ হবে না? সন্তান কি গরিব বাপকে ডাকবে না বাবা বলে?

তার পরে যখনই কেশবকে বক্তৃতা দেবার জন্যে অনুরোধ করেছে রামকৃষ্ণ, কেশব সলজ্জ হাস্যে বলেছে, 'কামারের দোকানে আমি আর ছুঁচ বেচতে আসব না। আপনিই বলুন, আমরা শুনি।'

হৃদয়ের মাতব্বরি করার দিন ফুরিয়ে গেল। দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যাবার সময়ও নরম হল না। বললে, 'মামা, তুমি এদের ছাড়ো। দু-চারটে বড়-মানুষ ধরো, দেখবে কত বাগানবাড়ি তোমার হবে।'

ত্রৈলোক্য তাড়া দিচ্ছে বেরিয়ে যাবার জন্যে।

'তুমিও আমার সঙ্গে চলো, মামা।' হৃদয় এক মুহূর্ত তাকাল পিছন ফিরে। বললে, 'তোমায় যদি পেতুম, দেখতে কত বড় কালীবাড়ি জাঁকিয়ে তুলতুম! ইট চুন সুরকির মন্দির নয়, একেবারে সোনার মন্দির।'

চলে গেল হৃদয়। রামকৃষ্ণ নিঃসঙ্গ। একা-একা গেল কামারপুকুর।

বালক লাটু একা-একা চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। কিন্তু এসে দেখছে, সমস্ত ফাঁকা, রামকৃষ্ণ নেই, তার ঘর বন্ধ। তখন কি করে লাটু, গঙ্গার ঘাটে বসে অঝোরে কাঁদতে বসল। ডাকতে লাগল আকুল হয়ে, তুমি কোথায়? একবার দাঁড়াও আমার চোখের সামনে।

আর কত কাঁদবি? এবার বাড়ি যা। আজই তাঁর ফেরবার দিন নয়।

ফেরবার দিন নয় মানে? তিনি কি কুথা গেছেন নাকি? তিনি ইখানকেই আছেন।

এখানেই আছেন কি রে? তিনি দেশে গেছেন।

আপুনি জানেন না। ইখানকেই আছেন। হামি তার সাথে দেখা না কোরে যাবে না।

তবে থাক বসে। কতক্ষণে দেখা পাস ছাখ।

মন্দিরে সন্ধ্যারতি হচ্ছে। ওদিকে লক্ষ্য নেই লাটুর। গঙ্গার পরপারে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

কে একজন বুঝি তাকে প্রসাদ দিতে এল। এসে দেখল লাটু যেন প্রাণ ঢেলে কাকে প্রণাম করছে। সামনে লোকজন কেউ নেই, তবু প্রাণ-ঢালা প্রণাম।

অনেকক্ষণ পর মাথা তুলল লাটু। অপরিচিত লোক সামনে দেখে থ হয়ে গেল। বললে, 'সে কি! পরমহংসমশায় কুথায় গেলেন! এই যে ছিলেন এতক্ষণ ইখানকে।'

রাম দত্তকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ: 'কি মধু পেয়ে ছোঁড়াটা এখানে পড়ে থাকতে চায় বলো তো! আমি তো কিছু বুঝি না।'

রাম দত্তও বোঝে না। তার স্ত্রীও বোঝে না।

রাম দত্তর স্ত্রী বলে, 'ওখানে তোকে খাওয়াবে কে? কাপড়চোপড় দেবে কে?'

কি রকম অবুঝের মতন তাকায় লাটু। খাওয়া? কাপড়চোপড়? দক্ষিণেশ্বরের সংসারে এও আবার একটা জিজ্ঞাস্য নাকি? জোটে জুটবে না জোটে না জুটবে। সে যে দক্ষিণ-ঈশ্বর।

তবু বিনা মাইনেয় নোকরি করতে হবে কষ্ট সয়ে! এরই বা অর্থ কি?

কালবোশেখীর দুর্যোগ, তবু নরেন চলেছে দক্ষিণেশ্বর। বাবা বললেন, যদি একান্তই যাবি, ঘোড়ার গাড়িতে যা। কেন মিছিমিছি পয়সা নষ্ট! শেয়ারের নৌকোতেই চলে যাবে দক্ষিণেশ্বর। নৌকো যদি ডোবে তো ডুববে!

একেই বলে ডানপিটের মরণ গাছের আগায়। কোনো সুবুদ্ধির সে ধার ধারে না।

'এসেছিস?' ডাক দিয়ে উঠল রামকৃষ্ণ।

পর মুহূর্তেই গম্ভীর হবার ভান করে বললে, 'কেন আসিস বল তো? আমার কথা যখন শুনিস না তখন আসিস কি করতে?'

'তুমি আবার শোনাবে কি! তুমি কি কিছু জানো? নিজে কি কিছু পেয়েছ যে তাই পরকে দেবে?' নরেনের কণ্ঠে স্পষ্ট অস্বীকার। রূঢ় প্রত্যাখ্যান।

'বেশ তো, জানি না কিছু, পাইনি কাণাকড়ি।' রামকৃষ্ণ স্নেহকরুণ চোখে তাকাল নরেনের দিকে: 'তবু, যার থেকে কিছুই শেখবার নেই, যাকে তুই নিস না, মানিস না, তার কাছে এই ঝড়দাপটে তুই আসিস কেন?'

'আসি কেন?' হাসল নরেন: 'তোমাকে ভালবাসি বলে দেখতে আসি।'

রামকৃষ্ণ জড়িয়ে ধরল নরেনকে। বললে, 'সকলেই স্বার্থের জন্যে আসে। নরেন আসে আমাকে শুধু ভালবাসে বলে।'

একেই বলে ভালবাসা!

ছেগ টি

স্বরবর্ণ হয়ে গিয়েছে। এখন লাটুকে ব্যঞ্জনবর্ণ শেখাচ্ছে রামকৃষ্ণ।

সামনেই বর্ণপরিচয় খোলা।

রামকৃষ্ণ বললে, 'বল্, "ক"—'

লাটু উচ্চারণ করলে, '"কা"—'

'ওরে "কা" নয়, "ক"। বল্, "ক"—'

আবার লাটু বললে, '"কা—'

কিছুতেই পশ্চিমী জিভ মজুত করতে পারছে না। রামকৃষ্ণ যত বলছে "ক", লাটু তত বলছে "কা"।

ঝলসে উঠল রামকৃষ্ণ: 'শালা, "ক"কেই যদি "কা" বলবি তবে "ক"-এ আকারকে কি বলবি? যা শালা, তোর আর পড়ে কাজ নেই।'

ছুটি মিলে গেল লাটুর। তাকে আর পাশের পড়া পড়তে হল না।

ঠাকুর বলেন, 'পাশ করা, না, পাশ পরা!'

লেখা-পড়া না শিখিস, নেশা-করাটা শিখে নে।

কিসের নেশা?

মদ-ভাঙের নেশা নয়। এ একেবারে রাজা নেশা। ব্রহ্ম-নেশা।

বই পড়ে কি জানবি? যতক্ষণ না হাটে পৌঁছুনো যায়, দূর হতে শুধু হো-হো শব্দ। হাটে পৌঁছুলে আরেক রকম। তখন দেখতে পাবি, শুনতে পাবি স্পষ্ট। দেখতে পাবি দোকানীকে। শুনতে পাবি, আলু নাও, পয়সা দাও!

বড়বাবুর সঙ্গেই আলাপের দরকার। তাঁর কখানা বাড়ি, কটা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, এ আগে থেকে জানতে এত ব্যস্ত কেন? কেন এ-দোর ও-দোর ঘোরাঘুরি করা? চাকরদের কাছে গেলে দাঁড়াতেই দেয় না, তারা বলবে কোম্পানির কাগজের খবর! কিন্তু যো-সো করে বড়বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাক্কা খেয়েই হোক বা বেড়া ডিঙিয়েই হোক—তখন একে-একে সব জানতে পাবি। কত বাড়ি কত বাগান কত কোম্পানির কাগজ তিনিই সব বলে দেবেন। বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে চাকর-দারোয়ানরা সব সেলাম করবে।'

'এখন বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ হয় কিসে?' একজন কে জিগগেস করলে।

'তাই তো বলি, কর্ম চাই।' বললে রামকৃষ্ণ: 'ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে চলবে? যো-সো করে তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছুতে হবে।'

'কি করে পৌঁছুই?'

'নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা করো। দেখা দাও বলে কাঁদো ব্যাকুল হয়ে। কামিনীকাঞ্চনের জন্যে তো পাগল হয়ে বেড়াতে পারো, একবার তাঁর জন্যে একটু পাগল হও দেখি। লোকে বলুক, অমুকে ঈশ্বরের জন্যে পাগল হয়েছে।'

একটু নির্জনে যা। নির্জন না হলে মন স্থির হবে না। নির্জনে বসে একটু ধ্যান কর। বাড়ির

থেকে আধ পো অন্তরে ধ্যানের জায়গা কর। নির্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে-করতে তাঁর কৃপা হয়। তার পরেই দর্শন।

'দর্শন ?' চমকে উঠল কেউ-কেউ।

'হ্যাঁ, দর্শন। যেমন ধরো, জলের ভিতর ডোবানো বাহাত্বরী কাঠ আছে—তীরে শিকল দিয়ে বাঁধা। সেই শিকলের এক এক পাপ্ ধরে-ধরে গেলে, শেষে বাহাত্বরী কাঠকে স্পর্শ করা যায়।'

কেন সংসার কি দোষ করল? আমরা জনক রাজার মত নির্লিপ্ত ভাবে সংসার করব।

'মুখে বললেই জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে ঊর্ধ্বপদ করে কত তপস্যা করেছিলেন! তোমাদের হেঁটমুণ্ড বা উর্দ্ধপদ হতে হবে না, কিন্তু সাধন চাই। নির্জনে বাস চাই। দই নির্জনে পাততে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না।'

সবাইর মুখভাব একটু কঠিন হয়ে উঠল। কোমলকে পাবার জন্যে সাধনা চাই কঠিন। বন্ধুর পথটি বন্ধুর হয়ে রয়েছে!

'এ তো ভালো বালাই হল!' রামকৃষ্ণ কথায় একটু বিদ্রূপের টান দিল: 'ঈশ্বরকে তুমি দেখিয়ে দাও আর উনি চুপ করে বসে থাকবেন। দুধকে দই পেতে মন্থন করলে তো মাখন হবে! তা তুমি মাখন তৈরি করে ওঁর মুখের কাছে তুলে ধরো! ভালো বালাই—তুমিই মাছ ধরে হাতে দাও।'

ওরে, রাজাকে দেখতে চাস? রাজা আছেন সাত দেউড়ির পারে। প্রথম দেউড়ি পার না হতে-হতেই বলে, রাজা কই? যেমন আছে, এক-একটা দেউড়ি তো পার হতে হবে। যেতে হবে তো এগিয়ে।

রাম দত্তকে বলে লাটুকে রেখে দিয়েছে রামকৃষ্ণ। এমন শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে আর ছুটি হতে নেই।

গাড়ু ছুঁতে পারে না রামকৃষ্ণ। শৌচে যখন যায় গাড়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে লাটু।

জপে বসেছে লাটু, হঠাৎ জপ ছুটে গেল। কে যেন ছুটিয়ে দিলে।

'ওরে, তুই যার ধ্যান করছিস, সে এক গাড়ু জলও পায় না।' সামনে দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণ। বলছে, 'এ রকম ধ্যানে কী ফল হবে রে?'

গাড়ু হাতে সঙ্গে-সঙ্গে চলল লাটু।

'যার সেবা করবি তার কখন কি দরকার হুঁশ রাখবি। তবে তো সেবার ফল পাবি।'

শোন, কাজের মাঝেই তাকে ধরবি। কিন্তু সব সময়ে জানবি তুই যন্ত্র তিনি যন্ত্রী। তুই চক্র, তিনি চক্রী। তুই গাড়ি তিনি ইঞ্জিনিয়র।

পাতাটি নড়ছে সেও জানবি ঈশ্বরের ইচ্ছে। সেই তাঁতি কি বলেছিল জানিস না? তাঁতি বললে, রামের ইচ্ছেতেই কাপড়ের দাম এক টাকা ছ আনা, রামের ইচ্ছেতেই ডাকাতি হল। রামের ইচ্ছেতেই ধরা পড়ল ডাকাত, রামের ইচ্ছেতেই আমাকে ধরে নিয়ে গেল, আবার রামের ইচ্ছেতেই ছেড়ে দিলে।

ওরে ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল।

এক দিন লাটুকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ: 'ওরে লেটো, বলতে পারিস ভগবান ঘুমোয় কি না?'

প্রশ্ন শুনে লাটুর তো চক্ষুস্থির! বললে, 'হামনে জানে না।'

'ওরে, জীবজগতে সকলেই ঘুমের অধীন, কিন্তু ভগবানের ঘুমোবার যো নেই। তিনি ঘুমুলে সব অন্ধকার! সারা রাত সারা দিন জেগে তিনি জীব-জন্তর সেবা করছেন। তিনি জেগে আছেন বলেই জীবজন্তু নির্ভয়ে ঘুমুতে পারছে।'

শুধু কি তাই? ঘুমে বা জাগরণে কে কখন কেঁদে ওঠে, তিনি না জেগে থাকলে তা শুনবে কে? আমরা অন্ধকারে ঘুমুই, আর তিনি সারা রাত আলো জ্বালিয়ে বসে থাকেন শিয়রে।

অধর সেন দক্ষিণেশ্বরে এসে প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ে।

এক দিন ঠাকুরকে এসে শুধোলেন, 'তোমার কি-কি সিদ্ধাই হয়েছে বলো তো?'

'যারা ডিপটি হয়ে সবাইকে ভয় দেখিয়ে থাকে,' ঠাকুর বললেন হাসতে-হাসতে, 'মায়ের ইচ্ছেয় সে সব ডিপটিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখি।'

তারই জন্যে কি অধর দক্ষিণেশ্বরে এসে ঘুমোয়?

এ কেমন হীনবুদ্ধি! ভাগ্যবলে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিস, 'বিল্ডিং' না দেখে বরং গঙ্গা ছ্যাখ, মাকে ছ্যাখ, ঠাকুরকে দ্যাখ—তা নয়, গা ঢেলে লম্বা ঘুম! সবাই নিন্দে করতে লাগল অধরের। নিতান্তই পাশবদ্ধ জীব, ত্রিনাথের এলাকায় এসেও ত্রাণ নেই।

কিন্তু ক্লান্তিহরণের কণ্ঠে অপূর্ব করুণা। স্নেহ-শান্ত স্বরে বললেন ঠাকুর, 'তোরা কি বুঝবি রে? এ

মায়ের ক্ষেত্র, শান্তি-ক্ষেত্র। ওরা এখানে এসে বিষয়কথা না বলে ঘুমুচ্ছে, সে অনেক ভালো। তবু একটু শান্তি পাচ্ছে।'

কৃষ্ণধন নামে এক রসিক ব্রাহ্মণ আসে দক্ষিণেশ্বরে। সারাক্ষণ কেবল ফষ্টি-নষ্টি করে।

'কি সামান্য ঐহিক বিষয় নিয়ে তুমি রাত-দিন ফষ্টি-নষ্টি করে সময় কাটাচ্ছ? ঐটি ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। শোনো, যে নুনের হিসেব করতে পারে, সে মিছরিরও হিসেব করতে পারে।'

কৃষ্ণধন সহাস্যে বললে, 'আপনি টেনে নিন।'

'আমি কি করব! তোমার চেষ্টার উপর সব নির্ভর করছে। এ মন্ত্র নয়, এ মন তোর!'

'কি করতে হবে বলুন—'

'সামান্য রসিকতা ছেড়ে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে পড়ো। ঈশ্বরই সব চেয়ে বড় রসিক, তাঁর তত্ত্বটিই হচ্ছে সব চেয়ে বড় রসিকতা। সেই রসিকতার সন্ধান করো। শুধু এগিয়ে পড়ো—'

'এ পথের আর শেষ নেই—'

'কিন্তু চলতে-চলতে যেখানেই শান্তি, সেখানেই 'তিষ্ঠ'। সেখানেই বিশ্রাম করে নাও।'

আহা, অধর সেন এখানে এসে শান্তিতে একটু বিশ্রাম করছে! ওকে জাগাস নে। ওকে ঘুমুতে দে একটু ঠাণ্ডা হয়ে!

কিন্তু যে সেবা করতে এসেছে তারই সেবায় লাগল নাকি রামকৃষ্ণ?

লাটুকে শিবমন্দিরে ধ্যান করতে পাঠিয়েছে রামকৃষ্ণ। ঢুকেছে সেই দুপুর বেলা, বিকেল হয়ে এল, লাটুর এখনো বেরুবার নাম নেই। কি করছে দেখে আয় তো রে। রামলালকে খোঁজ নিতে পাঠাল। রামলাল এসে বললে, এক গা ঘেমে আছে। নিথর পাথর! একখানা পাখা নিয়ে আয়। পাখা নিয়ে চলল রামকৃষ্ণ। আর, শোন্, এক গ্লাশ জল চাই ঠাণ্ডা। জল নিয়ে গিয়ে রামলাল দেখে, রামকৃষ্ণ লাটুকে হাওয়া করছে। আর পাখার হাওয়ায় লাটুর শরীর কাঁপছে, তুলো যেমন কাঁপে তেমনি।

'ওরে বেলা যে আর নেই। সন্ধে-টন্ধে কখন সাজাবি?'

রামকৃষ্ণের আওয়াজে লাটুর ধ্যান ভাঙল। চোখ চেয়ে দেখল যাকে ধরবার জন্যে মহাশূন্যে পাখা মেলেছিল তিনিই পাখা হাতে করে পাশটিতে বসে আছেন। সস্নেহে বাতাস করছেন মার মত।

ব্যস্ত হয়ে উঠতে চাইল আসন ছেড়ে। রামকৃষ্ণ বললে, 'আগে একটু সুস্থ হ, তার পরে উঠিস। দেখছিস না, গরমে কেমন ঘেমে গেছিস।'

'আপুনি এ কী করছেন! এতে হামার অকল্যাণ হবে।'

হাসল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তোর কে সেবা করছে? তোর মধ্যে যে শিব এসেছিলেন তাঁর সেবা করছিলুম। গরমে যে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। নে, এখন এই এক গেলাশ জল খা দিকিনি—'

জড় ভরত রাজার পালকি বইছে। রাজা পালকি হতে নেমে এসে বললে, 'তুমি কে গো?'

জড় ভরত বললে, 'আমি নেতি।'

'সে আবার কি?'

'আমি শুদ্ধ আত্মা।'

যেমন বাতাস। ভালো-মন্দ সব গন্ধই বাতাস নিয়ে আসে কিন্তু বাতাস নির্লিপ্ত। যেমন প্রদীপ। প্রদীপের সামনে বসে কেউ ভাগবত পড়ে, কেউ বা দলিল জাল করে। প্রদীপ নির্লিপ্ত। যেমন সূর্য। শিষ্টকেও আলো দিচ্ছে দুষ্টকেও আলো দিচ্ছে। ধোঁয়া যতই কালো হোক দেয়ালকে ময়লা করতে পারে, আকাশকে নয়।

চামড়া-ঢাকা অখণ্ড খোলের মধ্যে খোঁজো সেই প্রাণস্বরূপে। হাড়মাসের খাঁচার মধ্যে ধরো সেই পলাতক পাখি।

সাতষট্টি

রাম দত্তের বাড়ি, মধু রায়ের গলিতে, রামকৃষ্ণ এসেছে।

কলকাতাকে বড় ভয়, বড় সম্ভ্রম রামকৃষ্ণের। সব জ্ঞানী-গুণীর বাসা এখানে। রাজা-রাজড়া সুখী-ভোগীদের আস্তানা। পাড়াগাঁয়ের আলাভোলা ছেলে আমি, এখানে কি কলকে পাব? আমাকে কি কেউ খাতির-যত্ন করবে?

ঠাকুরের তখন হাত ভেঙেছে, দেবেন্দ্র মজুমদার দেখতে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে।

পরনে লাল-পাড় কাপড়, ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত গলার সঙ্গে ঝোলানো, ঠাকুর বসে আছেন তক্তপোশে। দেবেন্দ্রকে জিগগেস করলেন, 'কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

'কলকাতা থেকে।'

কলকাতার নাম শুনে যেন শিউরে উঠলেন ঠাকুর। নিশ্চয়ই তবে একজন গন্যিমান্যি লোক।

'কী দেখতে এসেছ? এমনি—?' বলে ঠাকুর হাতের পর হাত রেখে ত্রিভঙ্গবঙ্কিম কৃষ্ণের ভঙ্গি করলেন।

'না, শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি।'

কণ্ঠস্বরে যেন ভক্তির সুরটি পাওয়া গেল। ঠাকুরের গলায় কান্না ফুটে উঠল: 'আর আমায় কী দেখবে বলো। পড়ে গিয়ে আমার হাত ভেঙে গিয়েছে। দেখ দেখি সত্যি ভেঙেছে কিনা। বড় যন্ত্রণা। কি করি?'

হাতখানি বাড়িয়ে দেবার ইঙ্গিত করলেন। দেবেন্দ্র স্পর্শ করল সেই হাত। একটু বা টিপে-টিপে দেখল। জিগগেস করল, 'কি করে ভাঙল?'

কাঁদ-কাঁদ মুখে ঠাকুর বললেন, 'কি একটা অবস্থা হয়, তাইতে পড়ে গিয়ে ভেঙে গিয়েছে। ওষুধ দিলে আবার বাড়ে। অধর সেন ওষুধ দিয়েছিল, বেশি করে ফুলে উঠল। তাই আর কিছু দিইনি। হাঁ গা, সারবে তো?'

যিনি সকলের ব্যথা সারান তাঁরই কণ্ঠে ব্যথার জিজ্ঞাসা।

'আজ্ঞে সেরে যাবে বৈ কি। নিশ্চয় সারবে।' দেবেন্দ্র জোরের সঙ্গে বললে।

আহ্লাদে শিশুর মতন হয়ে গেলেন ঠাকুর। আর সকলকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন: 'ওগো, ইনি বলছেন আমার হাত সেরে যাবে। আর ভয় নেই। ইনি যেমন-তেমন লোক নন। ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন।'

কলকাতা সম্বন্ধে এত তাঁর ভয়-ভক্তি। সেই কলকাতায় তিনি এসেছেন বিদ্বৎ সমাজে। বসেছেন তাদের বৈঠকখানায়। শেষে চাতরে না হাঁড়ি ভাঙে!

মা গো, পাশে এসে বোস্। রাশ ঠেলে দে।

রামকৃষ্ণের চোখের দিকে চেয়ে মা হাসেন মিটি-মিটি।

রাম দত্তের হাঁপানি, তাই নিয়ে সে ছুটোছুটি করছে। এসেছে সুরেশ মিত্তির, ভাবে বিভোর হয়ে টলছে মাতালের মত। গায়ে জামা নেই গলায় পৈতে, এক পাশে এসে বসেছে দেবেন মজুমদার।

গ্যাস জ্বলছে ঘরে। তাতে আর কতটুকু আলো হবে! রামকৃষ্ণের গায়ের আলোয় মধুরায়ের গলি ভেসে যাচ্ছে। আকাশের সুধাকর এসেছেন নগরের ধূলির নিকেতনে।

ওরে, রাম দত্তের বাড়িতে দক্ষিণেশ্বরের সেই সাধু এসেছে। চল দেখবি চল রাস্তায় কর্পোরেশনের বাতি নেই, সাধুই নাকি সব অলি-গলি আলো করে বসেছে!

একটি সহজসুন্দর মানুষ। ঘরছাড়া হয়েও যেন ঘরের লোক। গালে একটু-একটু কপচানো দাড়ি, চোখের পাতা অনবরত মিটমিট করছে—

ওরে, ভালো করে চেয়ে ছাখ, কমলবিশদনেত্র ক্লেশনাশন কেশব বসে আছেন। সর্ববান্ধবস্বরূপ দীনবন্ধু।

কলকাতায় এসেছে, তাই গায়ে জামা পরে এসেছে। জামার আস্তিন কনুই আর কব্জির মাঝখানে। রঙিন একটি বটুয়া সামনে। তারই থেকে একটু মশলা নিয়ে মুখে দিচ্ছে মাঝে-মাঝে।

কতক্ষণ আর থাকা যায় কাঠের ভদ্রলোক সেজে? গায়ের জামা খুলে ফেলল রামকৃষ্ণ। এমনি যে আভা ছিল তার শতগুণ বিভা বেরুচ্ছে গা থেকে। সুধাকরের বদলে নেমে এসেছে প্রভাতের দিবাকর। নখজ্যোতিতেই যেন শরদিন্দুর দীপ্তি। গায়ের আলো বহু দূর ছড়িয়ে পড়েছে। একটি স্থিরস্ফুট বিদ্যুৎ যেন চিরজীবী হয়ে আছে আকাশে।

বহু লোক এসে জমায়েৎ হয়েছে। ঘর ছাপিয়ে ভিড় করেছে রোয়াকে, রোয়াক ছেড়ে রাস্তায়। অথচ সবাই স্তব্ধ, অভিভূত। বিস্ময়বিভোর।

এ কে বল দেখি? দরিদ্রের মধ্যে রাজরাজেশ্বর! মর্তধামে ত্রিলোকপালক! যিনি শ্মশানে ভূতনাথ তিনিই আবার গৃহে জগদগুরু।

কথা ক' না! প্রশ্ন কর্। যার যা জিগগেস করবার আছে জেনে নে।

কেউই প্রশ্ন করে না। প্রশ্ন করবার কথা মনেও হয় না কারুর। শুধু এই মনে হয়, অশেষ প্রশ্নের শেষ উত্তরটি যেন জীবন্ত হয়ে জ্বলন্ত হয়ে বসে আছে। গভীর উপলব্ধির সহজ একটি উচ্চারণ।

বসে আছে বাকপতি, বিবুধেশ্বর। বাক্য দিয়ে শুধু হরিনামের মালা গাঁথা। তাই যা বাক্য তাই কাব্য।

নিজের মনেই বলে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ। বলছে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ। সতৃষ্ণকর্ণে তাই শুনছে সকলে। কোনো তর্ক-বিচার করছে না। যা বলছে তাই যেন চরাচরের চরম কথা। এর পরে আর বিষয় নেই, বর্ণনা নেই। পারাপার নেই। যা শুনছে তাই

নিঃসন্দেহে মানছে সকলে। কি যে শুনছে মনে ধরে রাখতে পারছে না, তবু মন বলছে এ অত্যন্ত খাঁটি কথা, এ কথার আর ওর নেই।

কথা বলতে-বলতে মাঝে-মাঝে থামছে রামকৃষ্ণ। তখনই সবাই শ্রবণতৃষ্ণায় অস্থির হয়ে উঠছে। রামকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকছে নিষ্প্রাণের মত। কথা কও, তুমি সর্বমন্ত্রপ্রণেতা, তোমার কথায় নিশ্চল নিস্তব্ধতায় প্রাণ সঞ্চার করো।

অথচ কী সরল কথা! পণ্ডিতগিরি ফলানো নেই এতটুকু। এতটুকু বক্তৃতামারা নেই। লঘুতা-প্রগল্‌ভতা নেই। সহজের সংবাদটি সহজ করে পরিবেশন করছেন।

'আগে সাদাসিধে জ্বর হত, সামান্য পাচনেই সেরে যেত। এখন যেমন ম্যালেরিয়া জ্বর, তেমনি ওষুধও ডি-গুপ্ত। আগে লোকে যোগ-যাগ তপস্যা করত, এখন কলির জীব, দুর্বল, অন্নগত প্রাণ—এক হরিনামই তার সম্বল। হরিনামেই সে পেরিয়ে যাবে ভবনদী। নামও করো, সঙ্গে-সঙ্গে প্রার্থনাও করো, দুদিনের জিনিসের উপর থেকে ভালোবাসা যেন কমে যায়। দুদিনের জিনিস মানে টাকা, মান, যশ, দেহসুখ। টাকার জন্যে যেমন ঘাম বার কর, হরিনাম করে নেচে গেয়ে ঘাম বার করতে পারো তো বুঝি।'

তার পর গান ধরে রামকৃষ্ণ।

'নামেরই ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার।
কাজ কি আমার কোশাকুশি দেঁতোর হাসি
লোকাচার।
নামেতে কালপাশ কাটে, জটে তা দিয়েছে রটে ;
আমি তো সেই জটের মুটে, হয়েছি আর হব কার॥'

এ তো গান নয়, শিবের জটা ছেড়ে গঙ্গার মর্তাবতরণ।

'জানতে, অজানতে বা ভ্রান্তে যে কোনো ভাবেই হোক না কেন, তাঁর নাম করলেই ফল হবে।' আবার কথা সুরু করলে রামকৃষ্ণ: 'কেউ তেল মেখে নাইতে যায়, তারও যেমন স্নান হয়, যদি কাউকে জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয় তারও তেমনি স্নান হয়। আর কেউ ঘরে শুয়ে আছে, তার গায়ে জল ঢেলে দিলে তারও স্নানের কাজ হয়ে যায়। নিতাই তাই কোনো রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য। তক্ষুনি-তক্ষুনি ফল না পেলেও এক সময়ে না এক সময়ে পাবেই। বাড়ির কার্নিশে যদি বীজ পড়ে, অনেক দিন পরে বাড়ি পড়ে গেলেও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হয়ে তার ফল হবে।'

রাত হয়ে গেল কিন্তু বাড়ি ফেরবার কারু নাম নেই। খিদে পেয়েছে তেষ্টা পেয়েছে এ অত্যন্ত তুচ্ছ চিন্তা। এখন শুধু নয়নের তৃষ্ণা। জীবনের রাত অনেক হয়ে গেল বটে কিন্তু গৃহ বলতে এরই পদাশ্রয়। রামকৃষ্ণকে ছেড়ে কোথায় আবার আমাদের ঘর-বাড়ি?

হঠাৎ রামকৃষ্ণের সমাধি উপস্থিত হল।

পাড়া-বেপাড়ার ভিড় করা শহুরে লোকেরা দেখুক তা চর্মচক্ষে।

রামকৃষ্ণের ডান হাতের মাঝের তিনটি আঙুল বেঁকে গেল, শক্ত ও সিধে হয়ে গেল হাত দুখানি। মোটেই দেহবিকারের লক্ষণ নয়, বিদেহবিহারের লক্ষণ। রামকৃষ্ণ এখন দিব্য ভাবের দীপ্র মূর্তি। তার সঙ্গে ভাবনবনীর অমিয় লাবণ্য। এ কি কর্পূর-কুন্দেন্দুধবল শিব না রাজীবলোচন দূর্বাদলশ্যাম রাম!

দেবেন্দ্র মজুমদারের মনের মধ্যে গুরুস্তোত্রের শ্লোক গুঞ্জন করে ফিরতে লাগল:

"মন-বারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে,
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে।
গুণগানপরায়ণ দেবগণে,
গুরুদেব দয়া করো দীন জনে॥"

রামকৃষ্ণের ভাবের হাওয়া লেগে সবাইর মন মাটি ছেড়ে উড়তে লাগল আকাশে। ঘোর-ঘোর নেশা আর কাটতে চায় না। মন যেন আর থা পায় না মাটিতে। ভাবের বাতাসেই কেবল উড়তে চায়। উড়তে-উড়তেই যেন ধরতে পারবে কাউকে। সেই চিরকালের অধরাকে।

দেবেন্দ্র তখন পৌঁছে গেছে শেষ শ্লোকে:

"জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বরপ্রাপক হে,
ভবরোগবিকারবিনাশক হে।
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে,
গুরুদেব দয়া করো দীন জনে॥"

[ক্রমশঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের

শ্রীকালিদাস নাগ

স্বামী বিবেকানন্দের ১০০তম জন্মোৎসব নানা স্থানে—বিশেষ তাঁর সাধনপীঠ বরাহনগরে—সম্পাদিত হ'ল। সেই সম্পর্কে কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রশ্ন ও সমস্যা, যা নিজের মনে নাড়া দিল—'বসুমতী'র মাধ্যমে সাধারণের কাছে তুলতে চাই। কলিকাতা-বাসী আমাদের সে বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব আছে বলে আমি মনে করি এবং এই নগরীর—তথা দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠের—বিশেষজ্ঞগণও এই সব প্রশ্নের সমাধানে সাহায্য করবেন এটাও আশা করি।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মেছেন ২৯ পৌষ ১২৬৯ (জানুয়ারী ১৮৬৩) অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তিনি এক বছর ৮ মাসের ছোট। এই দুই মহাপুরুষদের জীবন-ধারা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা খুব কমই হয়েছে কেন জানি না। কিন্তু এবার নরেন্দ্রের সিমুলিয়ার জন্মস্থানে তাঁর স্মৃতিপূজা করতে গিয়ে বাড়ীর লোকেদের কাছেই শুনেছি যে, তাঁর পিতা-পিতামহের যুগ থেকেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে দত্ত-পরিবারের যোগ ছিল। পরে নরেন্দ্রনাথ কলেজে পাঠ্যাবস্থায় কেশবচন্দ্র সেন, আনন্দমোহন বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মনেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবেই মিশেছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দেখি কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর কন্যার বিবাহসভায় রবীন্দ্রনাথ রচিত—'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি'—গানটি নরেন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে দেখি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র দীপেন্দ্রনাথ (সঙ্গীতজ্ঞ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা) ও নন্দলাল সেন (কেশব সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র) ও সর্বোপরি রাখালচন্দ্র (মহারাজ ব্রহ্মানন্দ) ঘোষ—যাঁর সঙ্গে নরেন্দ্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। উচ্চাঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীত গান করে নরেন্দ্র সবাইকে এমন মুগ্ধ করেন যে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর গান শুনতে ছুটে ব্রাহ্মসমাজে এসেছিলেন। ১৮৭৯ থেকেই—অর্থাৎ ১৬ বছরের নরেন্দ্র,—ব্রাহ্মসমাজাদি নানা ধর্ম-সম্প্রদায়ে যাতায়াত সুরু করেন। তিনি তখন মাত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে কয়েক মাস Presidency College-এ F.A. পড়ে পরে General Assemblyতে আসেন ও ঐ কলেজ থেকেই F.A. ও B.A. (১৮৮১—১৮৮৩) পাশ করেন। সেখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (পরে তুলনামূলক দর্শনের প্রবর্তক); দু'জনেই Rev Dr Hastie নামক স্কচ দার্শনিকের শিষ্য; সেকালের কিছু আভাষ আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ বহু কাল পরে দিয়ে গেছেন। কিন্তু, Presidency ও General Assemblyর খাতাপত্র দেখে কেউ নূতন তথ্য প্রকাশ করেননি। নরেন্দ্রের প্রচণ্ড যুক্তিবাদ—এমন কি তথাকথিত 'নাস্তিকতা'র কারণও অন্বেষণ করতে হলে, ১৮৭৯—৮৩ সালের পাঠ্যতালিকা ও অধ্যাপকদের নিয়ে নাড়া-চাড়া করা আশু প্রয়োজন। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, খৃষ্টান পাদ্রী Rev Hastie বোধ হয় জীবন্ত-ধর্ম প্রসঙ্গে নরেন্দ্র-প্রমুখ ছাত্রদের বলেছিলেন শিক্ষাভিমান-বর্জ্জিত ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে দক্ষিণেশ্বরে যেতে। সেখানে প্রথম দেখা ১৮৮১ জুন মাসে।

মাত্র পাঁচটি বছর (১৮৮১—৮৬) গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ: অথচ যেন জন্ম-জন্মান্তরের আত্মীয়তা! নরেন্দ্রনাথ জন্মেছেন ১৮৬৩ আর ঠিক তার কুড়ি বছর আগে ১৮৪৩ সালে, সাত বছরে পিতৃহীন গদাধর এলেন নাথের বাগানে তাঁর দাদা রামেশ্বর বা রামকুমারের বাসায় কলকাতাতে। রামকুমার পূজারী ছিলেন ঝামাপুকুরের "মিত্র-বাড়ী"তে ও গোবিন্দ চাটুয্যের মন্দিরে, কিন্তু সঠিক বিবরণী তার সংগ্রহ করা হয়নি। ১২৬২ জ্যৈষ্ঠে (১৮৫৫) রাণী রাসমণি করলেন দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা। রামকুমার ঝামাপুকুর থেকে কনিষ্ঠ গদাধরকে নিয়ে চলে গেলেন সেখানে; কিন্তু ঐ বছরের শেষে হ'ল তাঁর মৃত্যু এবং গদাধর—রামকৃষ্ণকেই প্রধান পূজারী করা হ'ল। এখন থেকে ঠাকুর তাঁর শেষ-শয্যা গ্রহণ করার আগে পর্য্যন্ত—অর্থাৎ ১৮৫৫—১৮৮৫ বা পূর্ণ ত্রিশটা বছর দক্ষিণেশ্বরের আশে-পাশেই কাটিয়েছেন। ১৮৫৮।৫৯ সালে সারদামণির সঙ্গে বিবাহ এবং ২।৪ বার গ্রামের বাড়ীতে যাওয়া ছাড়া—স্থায়ী ভাবে তাঁর জয়রামবাটী থেকে সেই দক্ষিণেশ্বরে সারদা দেবীর আগমন (১২৭৮ ফাল্গুন) ১৮৭২ সালে।

তার আগের ১২ বছর (১৮৬০—৭২) ধরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কি কঠোর তপস্যা! অন্তরঙ্গদের কাছে তিনি নিজেই বলে গেছেন: "বারো বছর কখন সূর্য্য উঠেছে কখন অস্ত গেছে—কিছুই টের পাইনি। জগৎ-সংসার তো দূরের কথা, নিজের দেহেরই খেয়াল ছিল না..."। তান্ত্রিক ভৈরবী যোগেশ্বরী, রামায়ৎ সাধু জটাধারী, ২১ প্রকার বৈষ্ণবতন্ত্র সাধন, অদ্বৈত বেদান্তী পাঞ্জাবী তোতাপুরী (১৮৬৪), সুফী গোবিন্দ রায় ও ইসলামী সাধনা, যীশু খৃষ্টের 'পিতানোঽহমি' মন্ত্রে আস্বাদান, রামপ্রসাদের মাতৃসাধনা—একে একে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন নিখিল-ভারতের সাধন-স্রোতকে নিজ জীবনে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। শুধু অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পড়েই মনে হয় যেন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে"র জীবন্ত-ইতিহাস শ্রীরামকৃষ্ণ—সেই পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী নাস্তিকতার যুগে। সেই বারো বছরের সাধনা ও সিদ্ধির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার মত মানুষ সেকালে মেলেনি। হয়ত অতি সাধারণ আউল, বাউল, ফকীরের মধ্যে কেউ তাঁর স্পর্শ পেয়ে সেকালে ধন্য হয়ে গেছেন; হয়ত ঐ যুগের পত্রিকাদিতে তার অস্পষ্ট সাক্ষ্যও মিলবে—সেদিকে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ১৮৭৫ সালে মনীষী কেশবচন্দ্র সেন প্রথম কলিকাতাবাসী তথা বঙ্গবাসীদের সামনে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন যে, ঠাকুর "পাগল" নন—দিব্যোন্মাদে বিভোর! কেশবের সহপাঠী বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একবার মাত্র তাঁর দেখা হয়; তার ভাল বিবরণী

আমরা পাই না। শুধু মনে পড়ে, ১৮৫৮তে বঙ্কিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম B.A আর তার ঠিক ২৫ বছর পরে নরেন্দ্র দত্তও "দর্শন" নিয়ে B.A পাশ করেন (১৮৮৩); পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব স্বীকার করেও অরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসু তখন লিখেছেন "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা"; কেশব দিয়েছেন, "নববিধান ও সর্ব্বধর্মসমন্বয়" পরিকল্পনা। বঙ্কিমচন্দ্র—শুধু দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি নভেলে নয়, 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'অনুশীলনে' নব্য-হিন্দুত্বের প্রচার করেন এবং সর্ব্বোপরি ১৮৮৩ নরেন্দ্র দত্ত B.A—১৮৯৩ সালে ভারতের শাশ্বত তত্ত্ব "বেদান্ত" প্রচার করেছেন Chicago সহরের বিশ্বধর্ম্মসভায় (Parliament of Religions).

১৮৮৩তে কুড়ি বছরের Graduate নরেন্দ্র দত্ত কেমন করে বিশ্ববিজয়ী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে হয়ে উঠলেন—সে ইতিহাসও অনেকখানি অজ্ঞাত রয়েছে; ১৮৮৪ (মে)তে পিতৃবিয়োগ ও দারুণ সাংসারিক সমস্যা; ১৮৮৫ (এপ্রেল) শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে cancer দেখা দেয় ও ১৮৮৬ (১৫।১৬ আগষ্ট) মহাগুরু নিপাত। কাশীপুর থেকে বরাহনগর মঠে পাণিনি ও বেদান্তচর্চ্চা ও কঠোর তপস্যা। ১৮৮৭ অভেদানন্দ, অখণ্ডানন্দ, শিবানন্দ প্রভৃতি গুরুভাইদের নিয়ে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ; ১৮৮৮তে বরাহনগর ছেড়ে Dawn Society প্রতিষ্ঠাতা সতীর্থ সতীশ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী গাজীপুরে অবস্থান ও যোগী "পাওহারী বাবা"র সঙ্গে সংযোগ;—"পত্রাবলী"র সূত্রপাত ও পরিব্রাজক জীবনের বিকাশ—হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত তীর্থ পরিক্রমা, সাধুসংযোগ ও দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধ—এ সবই ১৮৯৩ 'মহা অভিনিষ্ক্রমণে'র আগেই হয়েছে। অথচ ভারতের পত্রিকাদি থেকে তথ্যগুলি ভাল রকমে সন্ধান ও উদ্ধার করা হয়নি। মহারাষ্ট্র-কেশরী তিলকের সঙ্গে পরিচয়, ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষদের সঙ্গে আলাপ—এ সবই ছায়ার মত আভাবে আমরা ছাপার অক্ষরে পেয়েছি; কিন্তু আধুনিক ভারতের ইতিহাসে যে "যুগ-প্রলয়" হয়ে গেল সেদিকে হুঁশ জাগাবার মত রচনা এ পর্য্যন্ত কেউ দেননি।

১৮৯২ সেপ্টেম্বর মাসে দেখি, স্বামিজী বোম্বাইয়ে এবং ১৮৯৩এ সারদা দেবীর আশীর্ব্বাদ নিয়ে ৩১মে বোম্বাই থেকে ভারত সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে আমেরিকা যাত্রা। তাঁর জীবনের এই শেষ দশটি বছরের ঘটনা, ভাবনা, সাধনা ও সিদ্ধির ইতিহাসই 'বিবেকানন্দ জীবনী' বলে পরিচিত। কিন্তু তাঁর আগেকার ত্রিশ বছরের জীবন-সংগ্রাম—বাংলার তথা ভারতের নানা সমস্যা—নিয়ে বহু অনুসন্ধান ও আলোচনার অবকাশ রয়েছে। তার যে কোন একটি বিষয়ে গবেষণা করে যদি কেউ লেখেন সেটির জন্য প্রতি বৎসরে "বিবেকানন্দ-পুরস্কার" দেবার ব্যবস্থা এই ১০তম জন্ম বৎসর থেকেই সুরু হওয়া উচিত। Schopenhauer সমিতি এই ভাবে বহু বৎসর অনেক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেছেন, সেগুলি মনীষী Romain Rolland আমায় দেখান যখন তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ জীবনী নিয়ে ইউরোপে কাজ করছিলাম। রলাঁর কাছেও মঠ-মিশন থেকে যে সব উপাদান পাঠান হয়েছিল ও স্বামী অশোকানন্দজী—মহাত্মা শিবানন্দের আদেশ মত তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি ও রলাঁর পত্রাবলী ক্রমশঃ প্রকাশ করা উচিত। ফরাসী পণ্ডিত-মহলে স্বামিজী ১৯০১ সাল থেকেই সুপরিচিত, কারণ ঐ বৎসর International Exhibition উপলক্ষে Congress of the History of Religions প্যারিসে বসে। তিনি হিন্দু সভ্যতা বিষয়ে বহু ভ্রান্ত মত খণ্ডন করেন এবং সেখানে প্রথম সস্ত্রীক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে বন্ধুরূপে লাভ করেন। তাঁদের সঙ্গে বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতাও মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং বসুজায়ার ক্রোড়েই ১৯১১তে নিবেদিতা দেহত্যাগ করেন।

বিবেকানন্দ-নিবেদিতা অধ্যায়ও অনেকখানি নূতন ভাবে লেখা দরকার, সে কথা নিবেদিতার মৃত্যুর ৪০ বৎসর পরে দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলে আমি বলেছিলাম এবং তাঁরা আমাকে আশ্বাস দেন যে, Margaret Nobleএর জন্মস্থান আয়রলণ্ডে এক মৈত্রী-মিশন পাঠাবেন। ১৮৯৬ সালে (এপ্রেল) স্বামী বিবেকানন্দ দু'বছর আমেরিকাতে বেদান্ত প্রচার করে যখন লণ্ডনে আসেন, তখন E. T. Sturdy-ভবনে তাঁর প্রথম দেখা হয় Margaret Nobleএর সঙ্গে; তিনি ছাড়া Captain ও Mrs. Sevier, Goodwin Hammond প্রভৃতি ইংরাজ শিষ্য ও শিষ্যাগণও এই সময় থেকে, স্বামিজীর সঙ্গে ভারতে এসে তাঁর কাজে যোগ দেবেন জানান। Max Mullerএর সঙ্গে দেখা করে ও রামকৃষ্ণ-জীবনী লিখিয়ে স্বামী সারদানন্দ ও অভেদানন্দকে লণ্ডনের "বেদান্ত সোসাইটি"র ভার দিয়ে স্বামিজী সুইস দেশ, ফ্রান্স, ইতালী ও জার্ম্মাণী (বৈদান্তিক Deussenএর সঙ্গে সাক্ষাৎ) পরিভ্রমণ করে কলোম্বোতে নামেন (১৫ জানুয়ারী ১৮৯৭)। ইংলণ্ড ও ইউরোপীয় পত্রিকাদির মধ্যে খোঁজ করলে অনেক নূতন তথ্য পাবার সম্ভাবনা। দেশে ফেরবার পূর্ব্বে স্বামিজী নিবেদিতাকে লেখেন: ["I have plans for the women of my country in which you, I think could be of great help to me.]" "আমার দেশের মেয়েদের উন্নতিকল্পে কিছু পরিকল্পনা করেছি, সে কাজে তুমি খুব সাহায্য করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।"

গুরুর এই আহ্বানে ১৮৯৮ (জানুয়ারী) নিবেদিতা ভারতে এলেন। ঠিক এক বছর আগে স্বামিজী কলকাতায় ফিরে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৯৭ মে) এবং সারদা দেবীকে বেলুড় মঠে প্রথম নিয়ে আসেন (১৩ নভেম্বর ১৮৯৮)। ১৬ মার্চ (১৮৯৮) নিবেদিতাকে দীক্ষা দিয়ে স্বামিজী তাঁকে ও শিষ্যদের নিয়ে উত্তর-ভারত, কুমায়ুন ও কাশ্মীর পরিভ্রমণ করেন।

১৮৯৯ (ফেব্রুয়ারী) গোড়ায় নিবেদিতা "Kali the Mother" প্রবন্ধ পাঠ করেন ও বাগবাজারে নারী শিক্ষামন্দিরের সূত্রপাত করেন। ঐ বৎসর (২০ জুন) তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ) ও নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে শেষ বার স্বামিজী বিশ্বপরিক্রমা করেন (জুন ১৮৯৯—ডিসেম্বর ১৯০০)। ইউরোপ-আমেরিকায় তাদের যে সব কেন্দ্রগুলি স্বামিজী স্থাপন করেছিলেন সেগুলি আবার দেখে ভবিষ্যৎ গঠনে সহকর্ম্মীদের পরামর্শ দিয়ে দেশে ফেরেন। অথচ নিবেদিতা বৎসরাধিক কাল ঐ দেশেই থেকে অর্থসংগ্রহাদি করতে থাকেন; ১৯০২ জানুয়ারী মাসে মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে এক জাহাজে তিনি ভারতে ফেরেন; সেই বৎসরেই নিবেদিতা ও ধর্ম্মপাল, জাপানী পণ্ডিত Okakura প্রভৃতিকে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ শেষ তীর্থযাত্রা করেন বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কাশী প্রভৃতি

স্থানে। ১০ ফেব্রুয়ারী স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সর্ব্বপ্রথম অধ্যক্ষ পদে বরণ করে ও গুরুভ্রাতাদের হাতে মঠ ও মিশনের ভার পূর্ণ সমর্পণ করে শিশুর মত বিশ্বজননীর ক্রোড়ে চিরনিদ্রায় বিবেকানন্দ বিশ্রাম গ্রহণ করেন (৪ জুলাই ১৯০২); সেটি আমেরিকার "স্বাধীনতা দিবস" ; তাই আজ মনে পড়ে, ১৮৯৩ থেকে ১৯০২—এই কয়টি বছরের মধ্যে, নূতন জগৎ আমেরিকাতে, কত বড় কাজ স্বামিজী করে গেছেন। New York, Philadelphia, Brooklyn Boston, Chicago, San Francisco প্রভৃতি বিরাট সহরে যেখানেই গিয়েছি—নিজে স্বচক্ষে দেখে মুগ্ধ হয়েছি যে, সহায় ও বিত্তহীন এক ভারতীয় সন্ন্যাসী তাঁর গুরুর আশীর্ব্বাদে এবং অদম্য অধ্যাত্মপ্রেরণায় ভারতমাতার নাম ও কীর্ত্তি কত স্থানে স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেছেন। চিন্তানায়ক Ingersole, দার্শনিক Wiliam James, অধ্যাপক Lanman (সংস্কৃতজ্ঞ) প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে যোগ স্থাপনা করে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ইন্দো-আমেরিক মৈত্রীমণ্ডল প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনেতৃগণ হয়ত এ বিষয়ে এখনও সজাগ হননি। অর্দ্ধশতাব্দি আগে এক ভারতীয় সন্ন্যাসী যে পরিকল্পনা করেছিলেন, যে সতর্কবাণী ও উপদেশ দিয়ে গেছেন সেগুলি নূতন চোখে দেখে নূতন গ্রন্থাদি রচনা করা উচিত। তাঁর তিরোধানের পর অর্দ্ধশতাব্দি হয়ে গেল ; এখন থেকেই "স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যানমালা" সুরু করা উচিত ; কারণ, আর দশ বছর পরে, ১৯৬২তে তাঁর শতবার্ষিকী পূর্ণ হবে। সেই কথা তাঁর ৯০তম জন্মোৎসবে বার বার মনে পড়েছিল বলেই 'বসুমতী' পত্রিকার ভিতর দিয়ে আমার ঐকান্তিক আবেদন দেশবাসীদের জানালাম।

স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কত ভাবে ঋণী সে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ৭ জুন ১৮৯৩ সালে তিনি নিবেদিতাকে লিখেছিলেন তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য "মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বটি প্রচার করা···নিদ্রিত ভগবান নিশ্চয় জাগবেন।" (To preach the inner Divinity of man to mankind···the sleeping God would wake." তিনিই আবার চিরনির্ব্বাণের আগে দীপ্ত ভাষায় নিবেদিতাকে কাশী থেকে লেখেন—"সর্ব্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্বুদ্ধ হোক। মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে ও বাহুতে অধিষ্ঠিত হউন! অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হউক!" স্বামিজীর এই শেষ প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ শুধু নিবেদিতার জীবনে নয় এ দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণে অপূর্ব্ব প্রেরণা ও শক্তি এনেছিল এবং উচ্চ-নীচ ভেদ ভুলে তাই তারা দেশমাতৃকার দাসত্ব-বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। যাঁরা এই যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের কথা আজ যেন স্বামী বিবেকানন্দ নূতন করে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন! "আমরা সবাই নিজ নিজ ভাবে উৎসর্গীকৃত বলি"। অমর স্বামী বিবেকানন্দের জয় হোক্!

আঠারোটা শক্তি পূর্ণমাত্রায়

এপ্রেল ২৪, ১৮৮৫, ঠাকুর "নরেন্দ্র" "নরেন্দ্র" করিয়া পাগল। নরেন্দ্র সম্মুখের পংক্তিতে অন্যান্য ভক্ত সঙ্গে বসিয়াছেন। মাঝে মাঝে ঠাকুর নরেন্দ্রের খবর লইতেছেন। অর্দ্ধেক খাওয়া হইতে না হইতেই ঠাকুর হঠাৎ নরেন্দ্রের কাছে নিজের পাত থেকে দই ও তরমুজের পানা লইয়া উপস্থিত। বলিলেন, নরেন্দ্র, তুই এইটুকু খা। ঠাকুর বালকের ন্যায় আবার ভোজনের আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—"দেখিলাম, কেশব যেরূপ একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, নরেন্দ্রের ভিতর ঐরূপ আঠারোটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান! আবার দেখিলাম, কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিখার ন্যায় জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল রহিয়াছে ; পরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার ভিতরে জ্ঞান-সূর্য্য উদিত হইয়া মায়ামোহের লেশ পর্য্যন্ত তথা হইতে দূরীভূত করিয়াছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—নরেন্দ্রের অবস্থা কি আশ্চর্য্য। দেখো ; এই নরেন্দ্র আগে সাকার মানত না! এর প্রাণ কিরূপ আটুবাটু হইয়াছে দেখছিস। সেই যে আছে—এক জন জিজ্ঞাসা করেছিল ঈশ্বরকে কেমন করে পাওয়া যায়। গুরু বল্লে, এস আমার সঙ্গে ; তোমায় দেখিয়ে দিই কি হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এই ব'লে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে জলে চুবিয়ে ধরলো। খানিকক্ষণ পরে তাকে ছেড়ে দেওয়ার পর শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার প্রাণটা কি রকম হচ্ছিলো ?' সে বল্লে—'প্রাণ যায় যায় হচ্ছিল।'

ঈশ্বরের জন্তে প্রাণ আটুবাটু ক'রলে জানবে যে দর্শনের আর দেরী নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ইং ১৮৯৩ সালে চিকাগোয় যে টাউন হলে স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দেন

স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। সুতরাং তাঁহার আয়ুঃ ৩৯ বৎসরে শেষ হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি আমেরিকায় যাইয়া ধর্ম্মসম্মিলনে হিন্দুর প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সেই সময় হইতে তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় মনে করিলে দেখা যায়, তিনি ৯ বৎসর কালে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আজ "বিশ্বের বিস্ময়।" যাঁহারা তাঁহার কার্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাদিগের অন্যতম। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—

"যদি কখন কেহ বীরাত্মা থাকিয়া থাকেন, তবে বিবেকানন্দ সেইরূপ এক জন। তিনি পুরুষসিংহ। কিন্তু আমরা তাঁহার সৃষ্টি করিবার শক্তি ও উত্তম সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করি, তাহার তুলনায় তাঁহার কৃত কার্য্য অল্প। আমরা তাঁহার প্রভাব এখনও লক্ষ্য করি—কিরূপে, কোথায়—তাহা জানি না; যাহা এখন ও ভবিষ্যতের গর্ভে, যাহা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, বিরাট তাহাতেই সেই প্রভাব প্রত্যক্ষ করি। আমরা বলি—বিবেকানন্দ তাঁহার দেশমাতৃকার আত্মায় ও সেই জননীর সন্তানদিগের আত্মায় জীবিত।"

লক্ষ্য করিবার বিষয়, বিবেকানন্দ যখন জন্মগ্রহণ করেন, সে সময় যেমন ঘটনাবহুল, তাঁহার জীবনও তেমনই কর্ম্মবহুল, আর তাঁহার জীবনাবসানের পরবর্তী অর্দ্ধশতাব্দী কালও তেমনই ঘটনাবহুল। তিনি যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন পলাশীর প্রাঙ্গণে মুসলমান শাসনের শেষ ও ইংরেজের প্রাধান্যের আরম্ভের এক শত বৎসর পরে সিপাহী বিপ্লবে নূতন অবস্থার সূচনা—সাহিত্যে, রাজনীতিতে, শিক্ষায় অবস্থান্তর। বিপ্লবের মধ্য হইতে তখন নূতন অনুভূতির বিকাশ ও নূতন গঠনের আরম্ভ। তিনি আমেরিকায় যে কার্য্যের সূচনা করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার দ্বারা পৃথিবী জয়ের জন্য অভিযান। তাহা নূতন নহে; কিন্তু সম্রাট অশোকের পরে তাহা ত্যক্ত হইয়াছিল—বিদেশীর বিজয়-বাত্যায় ও বিপ্লবের বন্যায় তাহা ভারতবর্ষ ভুলিয়া গিয়াছিল। বিবেকানন্দের স্বদেশে ও বিদেশে আরব্ধ কার্য্য এক দিকে রক্ষণশীল হিন্দুদিগের ও অপর দিকে বিদেশী শাসকদিগের আতঙ্কের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার বিদেশে বেদান্তবাদ প্রচার খৃষ্টান পণ্ডিতদিগকে বিচলিত করিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আলফ্রেড লায়াল বলিয়াছিলেন—

"A mere troubled sea, without shore or visible horizon, driven to aud fro by the winds of boundless credulity and grotesque invention."

যে সকল লোক সেই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বামীজীর ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্ম্ম তাঁহারা সাদরে স্বীকার করেন নাই। খৃষ্টানদিগের

ত কথাই নাই। তাঁহাদিগের পক্ষ হইতে মার্ডক যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদিগের মনোভাবের পরিচায়ক। এ দেশে ইংরেজ শাসকদিগের আতঙ্ক—স্বামীজী ধর্মের সহিত দেশাত্মবোধের সম্মিলন ঘটাইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালী তরুণরা তাঁহার উপদেশে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

বিবেকানন্দ যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রভাব যে আমরা আজও অনুভব করিতেছি ও লক্ষ্য করিতে পারিতেছি, তাহাই তাঁহার অসাধারণত্বের প্রমাণ। আজ আমরা যে বহু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিতেছি, সে সকলের প্রয়োজন তিনি বহু দিন পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ একেবারে নির্ব্বল নহে—

"বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাব, ওটা কল্পনা; ভারতেরও বল আছে, মাল আছে, এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে, আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।"

ভারতবর্ষের দান করিবার এই সামগ্রী—আধ্যাত্মিকতা। এক দিন যে ভারতবর্ষ বহু দেশ তাহার আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জয় করিয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। সে বিষয়ে বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "ঐ বুড়োশিব ষাঁড় চড়ে, ভারতবর্ষ থেকে, এক দিকে সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবিস—মায় অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার কিনারা পর্য্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এক কালে বেড়িয়েছেন; আর এক দিকে তিব্বত, চীন, জাপান, সিবেরিয়া পর্য্যন্ত বুড়োশিব ষাঁড় চরিয়ে, এখনও বেড়াচ্ছেন। ঐ যে মা কালী, উনি চীন জাপান পর্য্যন্ত পূজা খাচ্ছেন।"

ভারতবর্ষ আবার তাহার আধ্যাত্মিকতার দ্বারা পৃথিবী জয় করিবে এ স্বপ্ন এক দিন রাজনারায়ণ বসু দেখিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন:—

"হিন্দু জাতি সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি, আমি দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে মহাবলপরাক্রান্ত হিন্দু জাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া, পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দু জাতির কীর্ত্তি, হিন্দু জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।"

বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন:—

"বিস্তৃতি-লাভই জীবনের লক্ষণ। তোমরা যদি বাঁচিতে চাহ, তবে বিস্তৃতি লাভ করিতে হইবে। * * * আমার মনোভাব এই যে, হিন্দু জাতি সমগ্র পৃথিবী জয় করিবে। পৃথিবীতে বহু জয়ী জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। আমরাও জয়ী ছিলাম। ভারতের বিখ্যাত সম্রাট অশোক বলিয়াছেন, আমাদিগের জয় ধর্ম্মের ও আধ্যাত্মিকতার জয়। ভারতবর্ষকে আবার সমগ্র পৃথিবী জয় করিতে হইবে। * * * ভারত, তুমি উত্থিত হও—তোমার আধ্যাত্মিকতার দ্বারা পৃথিবী জয় কর। * * * প্রতীচী ধীরে ধীরে বুঝিতেছে, জাতি হিসাবে আত্মরক্ষা করিবার জন্ম তাহাকে আধ্যাত্মিকতা গ্রহণ করিতে হইবে।"

এই জয় করিবার জন্ম হিন্দুকে প্রস্তুত হইতে হইবে। তাহাই সাধনা। সে জন্ম প্রয়োজন—সহানুভূতি, ঐক্য, শিক্ষা, সেবা। বর্ত্তমান ভারতের যে দৃশ্য তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা এইরূপ—

"ভগ্নস্তূপ মৃণ্ময় প্রাচীর জীর্ণচ্ছাদ দৃষ্টবংশ কঙ্কাল কুটীরকুল, ইতস্ততঃ শীর্ণদেহ, ছিন্নবসন, যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিত বদন নরনারী, বালক-বালিকা।"

দুঃখী, দরিদ্র, দীন ইহাদিগের প্রতি সহানুভূতিতে বিবেকানন্দের হৃদয় কিরূপ পূর্ণ ছিল, তাহার প্রমাণ, আমেরিকায় কোন ধনীর গৃহে অতিথি হইয়া তিনি রাত্রিকালে তথায় সুকোমল শয্যা ত্যাগ করিয়া হর্ম্ম্যতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিয়াছিলেন।—"এ দেশে এত ঐশ্বর্য্য আর আমার দেশে কি দারিদ্র্য! কিরূপে দারিদ্র্য দূর হইবে?"

তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভেদেই দৌর্ব্বল্যের কারণ। তিনি বলিয়াছিলেন—"আর্য্য নাম হিন্দুরাই নিজেদের উপর চিরকাল ব্যবহার করেছে। শুদ্ধ হোক, মিশ্র হোক, হিন্দুদের নাম আর্য্য।" অর্থাৎ হিন্দু হইলে সকলেই এক সম্প্রদায়ের। প্রতীচ্য জাতিরাই বলিয়াছে—"ঐ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী, অজ্ঞ, মূর্খ নীচ জাতি উহারা অনার্য্য জাতি! উহারা আর আমাদের নহে!!!"

কিন্তু ঐ বিশ্বাস যদি আমাদিগকে অভিভূত ও প্রভাবিত করে, তবে আমাদিগের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে। তাই তিনি বলিয়াছিলেন।—

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই

শুদ্ধির পরে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়
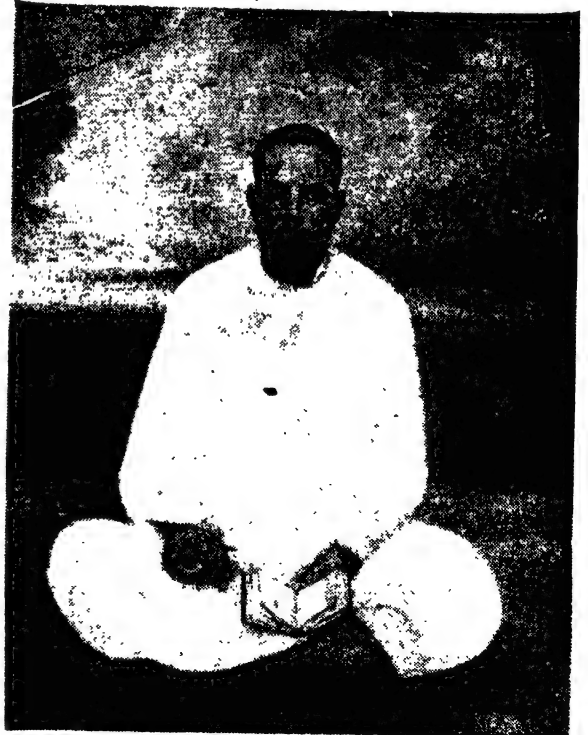
"বন্দে মাতরম্" পত্রিকা হস্তে শ্রীঅরবিন্দ

দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা-সহায়ে তুমি বীরযোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে?"

তিনি বলিয়াছিলেন, "ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"

যাহারা অবজ্ঞাত, পীড়িত তাহাদিগেরও কর্ত্তব্য আছে। কারণ,

"Hereditary bondsmen! Know ye not,
Who would be free, themselves must
strike the blow?"

"তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা—আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ—"

আজ যখন আমরা নানারূপে বিপন্ন—ভেদহেতু দুর্ব্বল, তখন এই উক্তি ভারতের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হউক, সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনে মন্ত্রীভূত হউক, বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক।

শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত দেশের প্রকৃত উন্নতি-সাধন অসম্ভব। ভারতবর্ষ চিরকাল বিস্তার আদর করিয়া গিয়াছে। জাপান তাহার জনগণের অজ্ঞতা দূর করিয়াই দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তথায় জাতির আকাঙ্ক্ষা সম্রাট মিকাডোর ঘোষণায় প্রকাশ পাইয়াছিল—

"It is intended that henceforth education shall be so diffused that there may not be a village with an ignorant family, nor a family with an ignorant member."

অর্থাৎ এমন ভাবে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে যে, কোন গ্রামে একটিও অজ্ঞ পরিবার বা কোন পরিবারে এক জনও অজ্ঞ লোক থাকিবে না।

সোভিয়েট রুশিয়াও সেই পথ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু বিবেকানন্দ যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন ভারতবর্ষ পরাধীন—শাসকদিগের অনুসৃত নীতি যে কেবল জনগণকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখিয়া শাসন ও শোষণে সুবিধা সম্ভোগ করাইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। সেই জন্য বিবেকানন্দ বিদেশী সরকারের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া দেশের লোককে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে বলিয়াছিলেন:—

"যত দিন দেশে কোটি কোটি লোক অন্নাভাবে ও অজ্ঞতায় অভিভূত, তত দিন আমি দেশের শিক্ষিত অধিবাসীদিগকেই সে জন্য দায়ী করিব। কারণ, যাহারা শিক্ষিত তাহারা অশিক্ষিতদিগের অর্থেই শিক্ষালাভ করিয়াছেন।"

সর্ব্বোপরি সেবা—সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বতোভাবে দেশবাসীর সেবা করিতে হইবে। দেশের সেবা-পদ্ধতিকে বিবেকানন্দ নূতন রূপ দিয়াছিলেন; সেই রূপ কালোপযোগী। আজ যে দেশে নানা প্রতিষ্ঠান নানারূপে লোকের সেবা করিতেছে, তাহার আদর্শ—বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত।

শিক্ষা ও সেবা কেবল পুরুষের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলেই চলিবে না। সেই জন্য বিবেকানন্দ দেশের নারীসমাজেও তাঁহার পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই কার্য্যের জন্য তিনি তাঁহার শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাকে এ দেশে আসিয়া সে কাজের ভার গ্রহণ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন; তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন:—

"তোমাকে সুস্পষ্টরূপে বলিতেছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ভারতের কাজে তোমার অশেষ সাফল্য লাভ হইবে। ভারতের জন্য, বিশেষ ভারতের পুরুষ অপেক্ষা নারীসমাজের জন্য এক জন সিংহিনী প্রয়োজন। ভারত এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করিতে পারিতেছে না; সেই জন্য অন্য জাতি হইতে তাহাকে ঋণ হিসাবে আনিতে হইবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্ব্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেলটিক রক্তই তোমাকে সর্ব্বথা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠিত করিয়াছে।"

শিক্ষা কি? বিদ্যা কেবল পঠন-পাঠনে হয় না। সেই জন্যই জড়বাদজর্জ্জরিত প্রতীচীর শিক্ষা তাহাকে বিজ্ঞানকে মৃত্যু ও বিনাশের রথে যুক্ত করিয়াছে—জনকল্যাণেই প্রযুক্ত করে নাই। শিক্ষা যাহাতে মানুষকে মানুষ করে তাহা দেখিতে হইবে।"

"Let knowledge grow from more to more
But more of reverence in us dwell;
That mind and soul, according well
May make one music as before
Bit vaster."

বিবেকানন্দ স্বয়ং কর্ম্মযোগী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম কার্য্যমূলক," আর "প্রত্যেক জীব শক্তিপ্রকাশের এক একটি কেন্দ্র।" সেই জন্ত "নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ"—মোক্ষকামের জন্ত আর "ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ"—ইত্যাদি ধর্ম্মলাভের উপায়।

তাঁহার পরবর্ত্তী কালের চিত্র কি বিবেকানন্দের দৃষ্টির সম্মুখে চলচ্চিত্রের চিত্রের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল? তিনি কি পরবর্ত্তী কালের সমস্যা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন?

এ দেশে যে সম্প্রদায় য়ুরোপীয়ের সবই অনুকরণযোগ্য মনে করিতেন, তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—"এ দেশে যীশুও আসেননি, জিহোবাও আসেননি, আসবেনও না। তাঁহারা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন। আমাদের দেশে আসবার সময় নাই।" এ কথা যখন উক্ত হইয়াছিল, তখনও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মেঘ য়ুরোপের রাজনীতিক গগনে দেখা যায় নাই। কিন্তু তিনি কি তখনই প্রতীচীতে "শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি রব" শুনিতে পাইয়াছিলেন? তিনি কি তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, প্রলয়ের বজ্রগর্ভ মেঘ উঠিতেছে? তিনি কি বুঝিয়াছিলেন, যুদ্ধ ভূমিকম্পের মত য়ুরোপীয় সভ্যতার সৌধ বিধ্বস্ত করিবে?

এ দেশে রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসা ও নির্ব্বৈর লইয়া আলোচনার কথা—বহু দিন পূর্ব্বে বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—

"অহিংসা ঠিক, নির্ব্বৈর বড় কথা; কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে। 'আততায়িনং উদ্যন্তং' ইত্যাদি, হত্যা করতে এসেছে এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নাই—মনু বলেছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, বীর্য্য প্রকাশ কর, সাম দান ভেদ দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক। আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপটি করে, ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক ভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য—স্বধর্ম কর হে বাপু! অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ—গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে অর্থোপার্জ্জন, স্ত্রীপুত্রপরিবার দশ জনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কর্ম্মানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে ত তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও—আবার 'মোক্ষ'!!"

আর একটি কথা—সাম্যবাদ। যে দেশে গৌতম বুদ্ধ রাজপুত্র সন্ন্যাসী—যে দেশে সন্ন্যাস আশ্রম—সে দেশের লোক সাম্যবাদ জানে না? তাহারাই আজ ধনিকবাদের মোহাচ্ছন্ন হইয়া সাম্যবাদ দলিত করিতে আগ্রহশীল! বহু দিন পূর্ব্বে বিবেকানন্দ সমাজে বিকৃতি লক্ষ্য করিয়া ধনতন্ত্রবাদীদিগকে "দশ হাজার বছরের মমি" বলিয়া অভিহিত করিয়া কম্বুকণ্ঠে বলিয়াছিলেন:—

"তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদীর দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে—নীরবে সয়েছে! তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না, এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম! অতীতের কঙ্কালচয়, এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।"

তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, বিপ্লবের মধ্য দিয়া তাহাই হইয়াছে। প্রথমে রাশিয়ায় সাম্যবাদ দেখা দিয়াছে; কারণ, তথায় জনসাধারণের পীড়ন বোধ হয় সর্ব্বাধিক ছিল। তাহার পর মহাচীন সাম্যবাদের ঐন্দ্রজালিক দণ্ডের স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়াছে। যে ভবিষ্যৎ ভারতের আবির্ভাব বিবেকানন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, সে আজ বর্ত্তমানের মঙ্গল উষায় বুধোদয়ে দেখা দিতেছে।

বিবেকানন্দ কি ছিলেন, সে সম্বন্ধে আর এক জন ত্যাগী সন্ন্যাসীর উক্তি—"তোমার প্রাণে সিংহবল আছে, তোমার হৃদয়ে ভারতের জন্ত আগ্নেয় পর্ব্বত ভরা ব্যথা আছে।" এ উক্তি—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের। বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া হাওড়া ষ্টেশনে বিবেকানন্দের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি বেলুড়ে গিয়াছিলেন—বিবেকানন্দের শবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন:—

"তোমার অনুষ্ঠিত ব্রতের সমাধা সহজে ত হইবে না। কত বাধা-বিঘ্ন জয় করিতে হইবে—কত ব্রত-বিদ্বেষী নিশাচর সংহার করিতে হইবে, তবে ত উহার সিদ্ধি হইবে। এই ঘোর সংগ্রামে যখন ক্ষত-বিক্ষত বিধ্বস্ত হইয়া পড়ি, অবসাদ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, তখন তোমার প্রদর্শিত আদর্শের দিকে দেখি, তোমার সিংহবলের কথা ভাবি, তোমার গভীর বেদনার অনুধ্যান করি। অমনি অবসাদ চলিয়া যায়—কোথা হইতে দিব্যালোক দিব্যশক্তি আসিয়া প্রাণমনকে ভরপূর করিয়া তোলে।"

দেশের জন্ত তাঁহার এই গভীর বেদনার বিকাশ আমরা তাঁহার ২৩শে অক্টোবর (১৯০০ খৃষ্টাব্দ) তারিখের পত্রে পাই। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আজ ২৩শে অক্টোবর; কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্য জগতের এক কেন্দ্র—এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী—নানা দিগ্‌দেশাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশদেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভাপ্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্ব্বজনমধ্যে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালী প্রভৃতির বুধমণ্ডলীমণ্ডিত রাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে?"

কিন্তু দেশমাতৃকা বুঝি তাঁহার বেদনা বুঝিয়াছিলেন। পরদিন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর কার্য্যে বিবেকানন্দের বেদনা অপনীত হইয়াছিল। তাই তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"সেই গৌরবর্ণ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের জন্মভূমির নাম ঘোষণা করলেন—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বসু। এক যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্বেগে পাশ্চাত্য-মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা-মহিমায় মুগ্ধ করলেন। সে বিদ্যুৎঝঙ্কার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু, ভারতবাসী বাঙ্গালী। ধন্য বীর।"

বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাই নানা কার্য্যে। কিন্তু তিনি সরলা দেবীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দেশাত্মবোধ সাফল্যমণ্ডিত করিবার কথা যে ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তেমন বুঝি আর কোথাও হয় নাই :—

"জাপানে শুনিয়াছিলাম যে, সে দেশের বালক-বালিকাদিগের বিশ্বাস এই যে, যদি ক্রীড়াপুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। জাপানী বালিকা কখনও পুতুল ভাঙ্গে না। হে মহাভাগে, আমারও বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদবিদলিত, চিরবুভুক্ষিত, কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাসভোগ সুখেচ্ছা বিসর্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার আবর্ত্তে ক্রমশ: উত্তরোত্তর নিমজ্জনশীল কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে।"

ভারতবাসীর অবস্থা তিনি যে ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সে ভাবে—অন্তরের সহানুভূতি দিয়া—কয় জন লক্ষ্য করে? কয় জন তাহাদিগের বেদনা অনুভব করে? কয় জন ভেদ ভুলিয়া ভ্রাতৃত্বের অনুশীলন করে? ভারতবাসীরা দারিদ্র্যে জীর্ণ—মূর্খতার আবর্ত্তে পতিত। তাহাদিগের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। সে জন্য কি প্রয়োজন? কেবল আধ্যাত্মিকতার দ্বারা তাহা হইবে না, কেবল বাহুবলেও তাহা হইতে পারে না। সেই জন্যই গীতার শেষ শ্লোকে সঞ্জয়ের উক্তি :—

"যত্র যোগেশ্বরো কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।"

যে স্থানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও ধনুর্দ্ধর পার্থ সেই স্থানেই শ্রী বিজয় উন্নতি ও নীতি অবস্থান করে।

বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন—

"বিধাতার বিধানে আমরা হিন্দুরা অতি বিষম ও দারিদ্র্যসম্পন্ন অবস্থায় নীত হইয়াছি। প্রতীচীর জাতিসকল আধ্যাত্মিক সাহায্যের জন্য আমাদিগের দ্বারস্থ হইতেছে। ভারতসন্তানদিগকে মানবের স্থিতি সম্বন্ধে জগৎকে সচেতন করিবার কর্ত্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।"

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের জাহ্নবীর কূলে বেলুড় মঠের বিবেকানন্দের এই উক্তির প্রতিধ্বনি অর্দ্ধশতাব্দী পরে মাদ্রাজের সাগর-তীরে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে শুনা গিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন :—

"আজ যখন সমগ্র জগৎ সাহায্য ও জ্ঞানালোকের জন্য দিন দিন ভারতের দিকে অধিক অগ্রসর হইতেছে সেই সময় যদি ভারতবর্ষ তাহার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার বর্জ্জন করে, তবে তাহা শোচনীয় ব্যাপারই হইবে।"

মতপ্রচার সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলিতেন—যে মত উচ্চারিত বা লিখিত হয়, তাহাই শেষে মূর্ত্ত হইতে পারে। ঈর্ষ্যা সর্ব্বদা ত্যাজ্য। তিনি ঈর্ষ্যা জাতীয় পাপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ সত্য সত্যই পুরুষসিংহ ছিলেন এবং সিংহবিক্রমেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য মানবকে উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মকে মোক্ষের পূর্ব্বগামীর স্থান দিয়া গিয়াছেন। সেই উপদেশই তিনি দিয়াছেন :—

"সংসার সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে,
ভয়ে ভীত হইও না মানব ;
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান, যায় যাবে যাক প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্লভ।"

পৃথিবীতে বিদ্বেষ ও ঘৃণা উভয়েরই উপযোগিতা আছে। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন, হিন্দু শাস্ত্রকারগণ মানবচরিত্র নখদর্পণে দেখিতেন বলিয়াই সাধুর জন্য এক আদর্শ, কর্ম্মীর জন্য আর এক আদর্শ, ব্যবসায়ীর জন্য তৃতীয় আদর্শ এবং দাসের জন্য ভিন্ন আদর্শ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সকলের জন্য একই আদর্শ নির্দ্দিষ্ট করিলে বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হয়। রাজনীতি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—ব্রাহ্মণের বা বৈশ্যের নহে। রাজনীতিতে যে প্রেমের স্থান আছে, সে প্রেম স্বদেশের জন্য, স্বদেশবাসীর জন্য, জাতির গৌরবের জন্য। কিন্তু ঘৃণা বা বিদ্বেষ যদি হীনতার উদ্রেক করে, তবে তাহাতে উৎসাহ দানও করে। জীবনে ভাল ও মন্দ উভয়ই থাকে। আমরা ঘৃণা ত্যাগ করির বটে, কিন্তু কোন অনুষ্ঠানে যদি ঘৃণা বা বিদ্বেষ উদ্ভূত হয়, তবে সে জন্য তাহার নিন্দা করা সঙ্গত নহে। কারণ, সে ক্ষেত্রে চেতনা সঞ্চারের ও উদ্দীপনার জন্য তাহাদিগের প্রয়োজন।

বিবেকানন্দ ইতিহাসের শিক্ষার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—

"একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরাণ-বিদ্বেষ গ্রীক জাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরব জাতির, মুর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীর ও ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির এক প্রধান কারণ।"

এই উক্তির ইঙ্গিত বিবেকানন্দের দেশবাসী গ্রহণ করিয়াছিল।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে নেতৃত্ব যে জনগণের শক্তি হইতেই উদ্ভূত হয়, তাহা বলা বাহুল্য। বিবেকানন্দ সমাজের নেতৃত্ব দেখাইয়া তাহা বুঝাইয়াছিলেন—"যে শক্তির উপর সে নেতৃত্ব স্থায়ী হইতে পারে, তাহার আধার প্রজাপুঞ্জ।" আর "যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে সেই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্ব্বল।" যে রাজশক্তি প্রজাশক্তি হইতে যত বিচ্ছিন্ন সে রাজশক্তি তত দুর্ব্বল—তাহার সম্বন্ধেই বলা যায়, তাহা মারণাস্ত্রে নির্ভর করিলেও তাহার মারণাস্ত্র প্রজাপুঞ্জের অসন্তোষে—দধীচির অস্থিতে বজ্রের মত—মিশ্রিত হয়। বিবেকানন্দের উপদেশে বাঙ্গালায় যে আন্দোলন উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার বেগ কে প্রহত করিতে পারে? বাঙ্গালার গোমুখী-মুখ হইতে জাতীয়তার যে পাবনীধারা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র দেশ উদ্ধারে সহায় হইয়াছিল, তাহার উৎস সন্ধান করিলে দেখা যায়—বিবেকানন্দের

শিক্ষা, বাঙ্গালী তরুণ সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছিল।

বিবেকানন্দের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেই জন্ত অত অল্প কালে তিনি অত অধিক কাজ করিয়া গিয়াছিলেন—কালের মাপ বয়সে হয় না, সে মাপ কাজে করিতে হয়। আর—

"'One crowded hour of glorious life
Is worth an age without a name"

বিবেকানন্দ পথের সন্ধান দিতে আসিয়াছিলেন—যে পথ শান্তির পথ, সান্ত্বনার পথ—প্রকৃত উন্নতির পথ—মুক্তির পথ—সেই পথের সন্ধান তিনি তাঁহার গুরুর নিকট পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং' সেই পথে যাইয়া তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, ত্রিতাপতপ্ত মানব মাত্রকেই সেই পথের সন্ধান দিয়া সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধনের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকট হইয়াছিল। স্বার্থকে পদতলে দলিত করিয়া তিনি বিঘ্নকণ্টকিত পথ অতিক্রম করিয়া পরার্থের সুমেরুশিখরশিরে আরোহণ করিয়া তথা হইতে মানুষকে মুক্তির মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। সে কাজে তিনি নিঃশেষে আপনাকে দান করিয়াছিলেন। তিনি যে অমৃত লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি মানবসন্তানকে নির্ব্বিচারে বিতরণ করিয়া সকলকেই মুক্তিলাভের উপযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রাচী ও প্রতীচী কেহই তাহাতে বঞ্চিত হয় নাই। তিনি প্রচারের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতেন—তাহার প্রমাণ, 'বসুমতী' প্রতিষ্ঠা। তাঁহার গুরুভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে তিনি সে কাজে প্রেরণা দিয়াছিলেন এবং 'বসুমতী'র মূলমন্ত্র তাঁহার দান।

সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তিনি ধর্ম্ম-সম্মিলনে আমেরিকায় যাইয়া সিকাগো নগরে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বেদান্ত দর্শনের মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। সমগ্র সভ্য জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ যে ভাবের উদ্ভব করিয়াছিল, তাঁহার উপদেশে সমগ্র সভ্য জগতে সেই ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাচী ও প্রতীচী একযোগে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল।

বিবেকানন্দ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে—পথের সন্ধান দিতে আসিয়াছিলেন। সে কাজ শেষ করিবার পরে তাঁহার সে দেহে আর থাকিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি রোগশয্যায় শয়ন না করিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। এক দিন জাহ্নবীর পূর্ব্বকূলে দক্ষিণেশ্বরে যে কল্যাণ হোমানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, গঙ্গার পশ্চিম কূলে বেলুড়ে সেই হোমানল নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

কিন্তু তাহার প্রভাব সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সেই জন্যই শ্রীঅরবিন্দ চারি দিকে—নানা কার্য্যে—নানা ভাবে—সে প্রভাব প্রত্যক্ষ ও অনুভব করিয়াছিলেন। সেই অনুভূতির প্রেরণায় তিনি বলিয়াছিলেন—বিবেকানন্দ তাঁহার জননীর আত্মায় ও তাঁহার জননীর সন্তানগণের আত্মায় জীবিত রহিয়াছেন। সত্যই তিনি মুক্তির মধ্যে বিরাজিত—তিনি মহাশক্তি।

বাঙ্গালা যে সেই শক্তির আধার হইয়াছিল, তাহার কারণ—"এই বঙ্গভূমি সমুদায়ই মহাতীর্থ। ইহার মৃত্তিকা দেবাদিদেব মহাদেবের শরীরবিধৌত বিভূতি। ইহার জল তাঁহার জটাজুটোচ্ছিষ্ট ব্রহ্মবারি।" ভূদেবচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"এখানকার নর-নারী দেবদেবী। কালধর্ম্ম-বশে ইহারা পাতালশায়ী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ঐ রসাতলগামী গঙ্গাবারি কি ভস্মমাত্রাবশিষ্ট সগরসন্তানগণকে উদ্ধার করে নাই? কপিলদেবের প্রিয়া, ন্যায়শাস্ত্রপ্রসূতি, তন্ত্রশাস্ত্র-জননী বঙ্গমাতা কত কাল আত্মবিস্মৃতা হইয়া নীচানুকরণরতা থাকিবেন?"

এই প্রশ্ন যখন জাতির মনে উদিত হইয়া তাহা আলোড়িত করিতেছিল, এই আক্ষেপোক্তি যখন দিকে দিকে ধ্বনিত হইতে-ছিল, তখনই শত শত বর্ষব্যাপী মোহান্ধকার অপনীত করিয়া তরুণ-অরুণ-কিরণ-বিকাশ হইতেছিল। সেই আলোকের আনন্দ-কেন্দ্রে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গের মত বেদান্ত দর্শনের উপর দণ্ডায়মান—স্বামী বিবেকানন্দের মূর্ত্তি প্রতিভাত হইয়াছিল; তিনি তাঁহার সাধনার কমণ্ডলু হইতে জ্ঞানের অমৃত প্রদান করিয়া মানুষকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—তাহাকে আধ্যাত্মিক সাধনার পথে মুক্তির সন্ধান দিয়াছিলেন।

আজ বলিতে হয়—কাল প্রসন্ন,—আকাশ আলোকিত—সুযোগ সমুপস্থিত—মুক্তির পতাকা উড্ডীন কর—তাহাতে নাম লিখ—স্বামী বিবেকানন্দ।

কাহাকেও care করে না

(দক্ষিণেশ্বরে, ১১শে আগষ্ট ১৮৮৩)

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটী। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। দেখ না, নরেন্দ্র কাহাকেও care (গ্রাহ্য) করে না। আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়ীতে যাচ্ছিল—কাপ্তেন ভাল যায়গায় ব'সতে ব'ল্লে—তা চেয়েও দেখলে না। আমারই অপেক্ষা রাখে না! আবার যা জানে, তাও বলে না—পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে, নরেন্দ্র এত বিদ্বান। মায়ামোহ নাই—যেন কোন বন্ধন নাই। খুব ভাল আধার। একাধারে অনেক গুণ; গাইতে বাজাতে, লিখতে পড়তে। এদিকে জিতেন্দ্রিয়, ব'লেছে বিয়ে কোরবো না। নরেন্দ্র আর ভবনাথ দু'জনে ভারি মিল—যেন স্ত্রী-পুরুষ। নরেন্দ্র বেশী আসে না। সে ভাল। বেশী এলে আমি বিহ্বল হই।

সঙ্গীতজ্ঞ স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(প্রথম পর্য্যায়)

শিল্পকলা ও সাধনা হিসাবে সঙ্গীতের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কি সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল, তারই কথঞ্চিৎ আলোচনার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। শিল্পকলার কথা ছেড়ে দিলেও সঙ্গীত যে সাধনা বা অধ্যাত্মসাধনার একটি মাধ্যম—এর নজির আমরা বিভিন্ন শাস্ত্রে পেয়েছি, কিন্তু সে সাধনা যে সত্যই প্রাণবান ও ব্যবহারিক জীবনে প্রত্যক্ষ হোয়ে ওঠে তার প্রমাণ আমরা লাভ করেছি রামদাস, কবীর, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতির দিব্য-জীবনে। বিশেষ ক'রে বাঙ্গালার দুই সাধক রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণের জীবনে সঙ্গীতের সাধনা ও অনুভূতিময় অভিব্যক্তির পরিচয় পাই চাক্ষুস ও জলন্ত ভাবে। বাঙ্গালার মাঠে-ঘাটে ও পল্লীতে পল্লীতে কেন, বাঙ্গালার আকাশে-বাতাসে রামপ্রসাদের সরল, সাবলীল ও প্রেম-ভক্তিসিঞ্চিত গানের বন্যা ছুটে চলেছে; বাঙ্গালী সব-কিছুকে ভুললেও রামপ্রসাদের প্রাণস্পর্শী শ্যামাসঙ্গীতকে কোন দিন ভুলতে পারবে না। রামপ্রসাদের গান বাঙ্গালার মর্মবেদনার গান; বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব সম্পদ হিসাবে রামপ্রসাদের মাতৃসঙ্গীতকে বাঙ্গালী চিরদিনই শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধেও তাই। বাঙ্গালার রামপ্রসাদকে উনবিংশ শতাব্দীর মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণও কোন দিন ভোলেননি। তীব্র সাধনার কালে ব্যাকুল অন্তরে কত দিন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: মা, আর একদিন চলে গেল, কই তোর দয়া তো হোল না! রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, কিন্তু আমায় কেন দেখা দিলিনি"। রামপ্রসাদের, কমলাকান্তের কত গান তিনি গেয়েছেন অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে, প্রাণের সজীবতা দিয়ে তিনি গানকে করেছিলেন মূর্তিমান, গানের প্রত্যেকটি কথা ও সুরের মধ্যে ছিল জমাট-বাঁধা অনুভূতির প্রেরণা, সান্ত পৃথিবীর কোলে লীলায়িত হোয়েও তাঁর গানের সুর ছুটে যেত অসীম অনন্তের দিকে, অপার্থিব আনন্দলোকের দিত সন্ধান! রামপ্রসাদ যেমন মা জগদীশ্বরীকে লাভ ক'রে জীবনকে করেছিলেন কৃতকৃতার্থ, সাধক রামকৃষ্ণও তেমনি ভবতারিণীর দর্শন লাভ ক'রে সাধনাকে করেছিলেন সার্থক।

বাঙ্গালা দেশে গানের ইতিহাস মোটেই আধুনিক নয়। হাজার বছর আগেকার বৌদ্ধদোহা 'চর্য্যাপদ' থেকে আরম্ভ ক'রে—পদাবলী-কীর্তন, সহজিয়া-গান, বাউল, ভাটিয়ালী, গম্ভীরা, যাত্রাগান, কবিগান, রামায়ণগান, ঝুমুর, তরজা, হাপআখড়াই, শ্যামাসঙ্গীত বাঙ্গালার নিজস্ব সঙ্গীত-সম্পদকে সৃষ্টি করেছে। রস ও ভাবই এদের প্রাণ, অধ্যাত্মভাবে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে এ-সব গানের দেহ, মন, প্রাণ। স্বরূপ-দামোদর, রায় রামানন্দ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বিল্বমঙ্গল থেকে আরম্ভ ক'রে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি প্রেম-ভক্তিরসে সিঞ্চিত করেছেন বাঙ্গালার গান বা সঙ্গীতকে। সঙ্গীত-দামোদরের প্রণেতা শুভঙ্কর, সঙ্গীতসার-রচয়িতা হরিনায়ক, সঙ্গীতদর্পণকার পণ্ডিত দামোদর১, জয়দেবের সমসাময়িক তরঙ্গিণীকার লোচন কবি সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন, তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মন্দাকিনী-ধারার মধ্যেও বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা জাগিয়ে রেখেছিলেন। আধুনিক যুগে রামপ্রসাদের পর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার দিব্য-প্রেরণা দিয়ে বাঙ্গালার ভক্তিমূলক ও ভজন-সঙ্গীতকে করলেন আরো উদ্দীপিত ও মহিমোজ্জ্বল। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে প্রদীপ্ত করার জন্য তাঁর 'দিব্যলীলা'র সহায়করূপে স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্গীতের রূপকে করলেন মার্জিত অথচ লীলায়িত, বাঙ্গালার সহজ সরল ভজনসঙ্গীত রূপ ও ভাব-গাম্ভীর্যে পেল কৌলিন্য।

অধ্যাত্ম-সাধনায় সঙ্গীতের আসন ও মর্যাদা দান করলেন উনবিংশ শতাব্দীতে মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ। গানের মাধ্যমে তিনি ধর্মের ও অধ্যাত্ম-সাধনার জটিল তত্ত্বগুলির ওপর করেছেন আলোক-সম্পাত; 'যত মত তত পথ' এই সার্বভৌমিকী বাণীর আদর্শকে সফল করেছেন তিনি গান বা সঙ্গীত দিয়ে, অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচরিতকারেরা ও আদর্শসেবীরা তাঁর ধর্ম ও দর্শন নিয়েই করেছেন আলোড়নের সৃষ্টি, গানের মর্মকথা ও ইতিহাসকে করেছেন অবহেলা। শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের মধ্যে তাঁর বাণী, সেবা, সাধনা, দর্শন সকল-কিছুর ভাব রূপায়িত ও প্রত্যক্ষ হোতে চলেছে, কিন্তু সাধনার মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণের গানের ব্যবহারিকতা ম্লান হয়েই রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের ভবিষ্যৎ ইতিহাস-রচয়িতারা এই জিনিসটিকে ভাল চোখে দেখবেন বোলে আমরা বিশ্বাস করি না।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্বামী বিবেকানন্দ শুধুই বাগ্মী, শাস্ত্রবেত্তা, ধর্মসেবী, পরিব্রাজক, সাধক ও অধ্যাত্ম-তত্ত্বদ্রষ্টাই ছিলেন না, তিনি সাহিত্যিক, শিল্পী, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও সঙ্গীতজ্ঞানকুশলীও ছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যা তিনি রীতিমত ভাবে শিক্ষা করেছিলেন তদানীন্তন কালের একজন বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সঙ্গীতের প্রেরণা যুগিয়েছিল যেমন উনবিংশ শতাব্দীর ও তার পূর্ববর্তী কালের সহজ সরল পল্লীর ভক্তসাধকদের প্রেমউদ্দীপিত যাত্রাগান, রামায়ণ-গান, কীর্তন-পদাবলী, কথকতা, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতি, বিবেকানন্দের মধ্যে সঙ্গীতের জাগরণ এনেছিল তেমনি উনবিংশ শতাব্দীরই কলিকাতার শিক্ষিত ও মার্জিত সমাজের উচ্চাঙ্গের ভজন ও ব্রহ্মসঙ্গীত। কিন্তু উভয়েরই সঙ্গীত-প্রেরণার পিছনে ছিল ধর্ম ও সাধনার পবিত্র পরিবেশ ও আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন উনবিংশ কেন, বিংশ শতাব্দীরও পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রভাবিত ক্রমবিবর্তিত বাঙ্গালী-সমাজের একজন, আর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন নিছক পাড়াগাঁয়ের সহজ সরল একটি মানুষ; বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের মনোভাব নিয়ে নয়, অধ্যাত্মজ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা নিয়ে সহরবাসী হয়েছিলেন তিনি অজানিত

১। এঁর নামের শেষে 'মিশ্র' পদবী থাকায় অনেকে এঁকে বাঙ্গালী বলতে রাজী নন।

এক দিব্য-প্রেরণার ইঙ্গিতকে উপলক্ষ্য ক'রে। গান বা সঙ্গীত এই দু'জনের মধ্যে পাতালো মিতালী, সঙ্গীতের আকর্ষণ এই দু'জনের মধ্যে বিরাট ব্যবধানকে দিল ভেঙে, এবং প্রেমের অপার্থিব বন্ধন এই দু'টি বাঙ্গালার মহাপ্রাণকে করল একটিতে পরিণত। সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের কর্ণধার শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ এ-দু'জনের জয়যাত্রার সার্থকতাকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলেছিল বাঙ্গালার গান বা সঙ্গীতই; বিচক্ষণ ঐতিহাসিকেরাও বোধ হয় শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মিলন-সাধনের মাধ্যম সঙ্গীতকে দেবেন তাই আন্তরিকতার শ্রদ্ধা ও সম্ভাষণ!

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা তখন সমাপ্ত হয়েছে, প্রাণের আবেগে কখনো নহবতের ওপর, কখনো বা ঘরের ছাদের ওপর উঠে তিনি চিৎকার ক'রে তাঁর লীলাসহচরদের ডেকে বলছেন: 'ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস ছুটে আয়'। সে করুণ ডাক গঙ্গাবক্ষে ও দক্ষিণেশ্বরের আকাশে-বাতাসে ভাসতে ভাসতে দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে গেছে, জানি না তাঁর সন্তানেরা সে ডাক শুনেছিলেন কি না, কিন্তু তার পর থেকেই একে একে লীলাপার্ষদেরা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসতে আরম্ভ করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তথা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন ঘটে প্রিয়নাথ মল্লিকের শ্বশুর রাজমোহন বসুর বাড়ীতে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বর থেকে কলিকাতার রাজমোহন বসুর বাড়ীতে কয়েক বার গেছেন ব্রহ্মসঙ্গীত তথা ভজন ও কীর্তন গান শোনার জন্য। অন্নদা গুহও যেতেন। অন্নদা গুহ ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের একজন সদস্য; শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেও তাঁর যাতায়াত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ অন্নদা গুহ সম্বন্ধে বলেছেন: "অন্নদা খুব ভাল লোক।" নরেন্দ্রনাথ বা ভাবী বিবেকানন্দও রাজমোহন বসুর বাড়ীতে উচ্চাঙ্গ ব্রহ্মসঙ্গীত ও ভজনগানে যোগদান করতেন। একদিন ঐখানেই নাকি নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলন ঘটে শ্রীরামকৃষ্ণের। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের অপূর্ব কণ্ঠে গান শুনে আত্মহারা হন এবং আনন্দে অনুনয় ক'রে নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন: "তুই একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাস্।" এর আগে নরেন্দ্রনাথ নাকি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন ঈশ্বর আছেন কি না জানার জন্য।২ নরেন্দ্রনাথের পাগলের মতন আলুথালু বেশ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে বিফল মনোরথ হয়ে তিনি ছুটে চলেছেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'হ্যাঁ মশায়, ঈশ্বর আছেন কি বলতে পারেন? ঈশ্বরকে কি দেখা যায়?' শ্রীরামকৃষ্ণদেব সহজ সরল ভাবে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন: "হ্যাঁ, ঈশ্বর আছেন বৈ কি। তাঁকে দেখা যায়—যেমন তোমাকে আমি দেখছি"। নরেন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর মস্তক নত হল, প্রাচ্যের পদতলে পাশ্চাত্যের প্রণতি সেদিন থেকেই স্বীকৃত হোল, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও প্রেমোন্মত্ত সঙ্গীত-প্রবাহে প্রেরণা জোগাবার অংশীদার হিসাবে গৃহীত হলেন নরেন্দ্রনাথ!

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীতশিক্ষা ও সাধনার কথা আমরা পরে উল্লেখ করব। নরেন্দ্রনাথের বি. এ. পাশের কিছু আগেকার একটি ঘটনার এখানে পরিচয় দেব। শ্রদ্ধেয় প্রিয়নাথ সিংহ ১৩১৭ সালের 'উদ্বোধন' পত্রিকায় উল্লেখ করেছিলেন: এক দিন সকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব রামলালের (রামলাল দাদা) সঙ্গে কলিকাতায় নরেন্দ্রনাথের 'টঙে'-এ এসে হাজির হলেন। এখানে নরেন্দ্রনাথের টঙ্ সম্বন্ধে অবশ্য কিছু বলা দরকার। প্রমথনাথ বসু তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ' বইয়ে৩ এই টঙ-এর বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন: "নরেন নিজের এই অপূর্ব ছোট ঘরটির নাম রাখিয়াছিলেন 'টঙ্'। কাহাকেও সঙ্গে লইয়া সেখানে যাইতে হইলে বলিতেন 'চল—টঙে যাই'। ঘরটি বড়ই ছোট, প্রস্থে চারি হাত, দৈর্ঘ্যে প্রায় তাহার দ্বিগুণ। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটি ক্যাম্বিসের খাট, তাহার উপর ময়লা একটি ক্ষুদ্র বালিশ, মেঝের উপর একটি ছেঁড়া মাদুর পাতা, এক কোণে একটি তাম্বুরা। তাহারই নিকট একটি সেতার ও একটি বাঁয়া। বাঁয়া কখনও ঐ মাদুরের উপর পড়িয়া থাকে, কখনও বা ঐ খাটিয়ার নীচে পড়িয়া থাকে, কখনও বা তিনি তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া থাকেন। ঘরের এক পার্শ্বে একটি খেলো হুঁকো, তাহার নিকট একটি তামাকের গুল ও ছাই ঢালিবার সরা, তাহার কাছে তামাক, টিকে ও দেশলাই রাখিবার একটি মৃত্তিকা-পাত্র, আর কুলুঙ্গিতে, খাটের উপর মাদুরের উপর যেথা-সেথায় ছড়ান পড়িবার পুস্তক," প্রভৃতি। মেধাবী সঙ্গীতশিল্পী নরেন্দ্রনাথ ও ভবিষ্যৎ বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের এই টঙে তখন ছিলেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও দাশরথি সান্ন্যাল। এঁরা নরেন্দ্রনাথের ছিলেন পরম-বন্ধু। এঁরা দু'জনে পুস্তকপাঠে রত ছিলেন, আবার কখনো বা গল্প করছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বাইরে শুনতে পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গলার স্বর 'নরেন, নরেন'। তিনি নীচে নেমে আসার উদ্যোগ করছেন শশব্যস্তে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ততক্ষণ সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠে পড়েছেন; মাঝপথেই হল দু'জনের মিলন। নরেন্দ্রনাথকে দেখে গদ্‌গদ স্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন: "তুই এত দিন যাস্‌নি কেন? তুই এত দিন যাস্‌নি কেন?" তারপর ঘরে এসে বসলেন ও গামছায় বাঁধা মা ভবতারিণীর প্রসাদী সন্দেশ হাতে নিয়ে "খা, খা" বোলে নিজের হাতে নরেন্দ্রনাথকে খাওয়াতে লাগলেন। স্বর্গের ভালবাসা পৃথিবীর কোলে সেদিন জীবন্ত হোয়ে যেন ফুটে উঠেছিল! শ্রীরামকৃষ্ণ তার পর বললেন: "ওরে, তোর

২। স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম দর্শন নিয়ে সামান্য কিছু মতভেদ আছে। প্রমথনাথ বসু লিখিত "স্বামী বিবেকানন্দ" প্রথম ভাগে (১৩৫৬ সালের সংস্করণ) উল্লিখিত হয়েছে যে, সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে শকটারোহণে নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। "ঠাকুরকে দেখিতে এই তাঁহার প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গমন ও ঠাকুরের সহিত দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ" (স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ, পৃ: ১০৫)। স্বামী সারদানন্দ তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে এটিকে দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎকার বোলে উল্লেখ করেছেন (—উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩২২)। শ্রীম তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে দক্ষিণেশ্বরের সাক্ষাৎকারকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্রের প্রথম মিলন বলেছেন (কথামৃত, ৩য় ভাগ, ১ম সংস্করণ, পৃ: ২৮৬) এবং রাজমোহনের বাড়ীতে দর্শনকে তিনি দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎকার বলেছেন (কথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃ: ২৮৭)।

৩। প্রমথনাথ বসু: 'স্বামী বিবেকানন্দ,' ১ম ভাগ (উদ্বোধন, ১৩৫৬ সালের সংস্করণ), পৃ ৭১

গান অনেক দিন শুনিনি, গান গা।" সত্যই নরেন্দ্রনাথের আকুল-করা একমাত্র গানের আকর্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণকে ঐ ভাবে কতবারই না কলিকাতায় টেনে আনত, নরেন্দ্রনাথের গানকে তিনি প্রাণ দিয়ে শুনতেন, ভালবাসতেন ও নিজেকে তাতে দিতেন ডুবিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ "তানপুরা লইয়া তাহার কান মলিয়া সুর বাঁধিয়া" গান আরম্ভ করলেন—

"জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী,
(তুমি) ব্রহ্মানন্দস্বরূপিণী, (তুমি) নিত্যানন্দস্বরূপিণী,
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা, আধার-পদ্মবাসিনী।"—প্রভৃতি

পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্য-যুবকের মুখে তদানীন্তন দ্রুত বিবর্তনের কালে প্রেম ও ভাবমূলক মাতৃসঙ্গীত বাইরের সমাজে নাই হোক, ভাবের জগতে যে এক নবযুগের সৃষ্টি করেছিল এ কথা এখনকার সমাজের মানুষও কখনই অস্বীকার করবেন না। গানের মাঝামাঝি সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গভীর সমাধির কোলে ঢলে পড়লেন। প্রসুপ্ত কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রতা হোয়ে আকারপদ্মকে ভেদ ক'রে ক্রমশঃ স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, আজ্ঞা ও সহস্রারে পরমশিবে লীন হোয়ে গেল। গুরু ও শিষ্য উভয়েই স্থির, ধীর ও অপলকনেত্র। গানটি শেষ হলে নরেন্দ্রনাথ আবার একটি গান ধরলেন—"একবার তেমনি তেমনি ক'রে নাচ মা শ্যামা" প্রভৃতি।

[ক্রমশঃ।
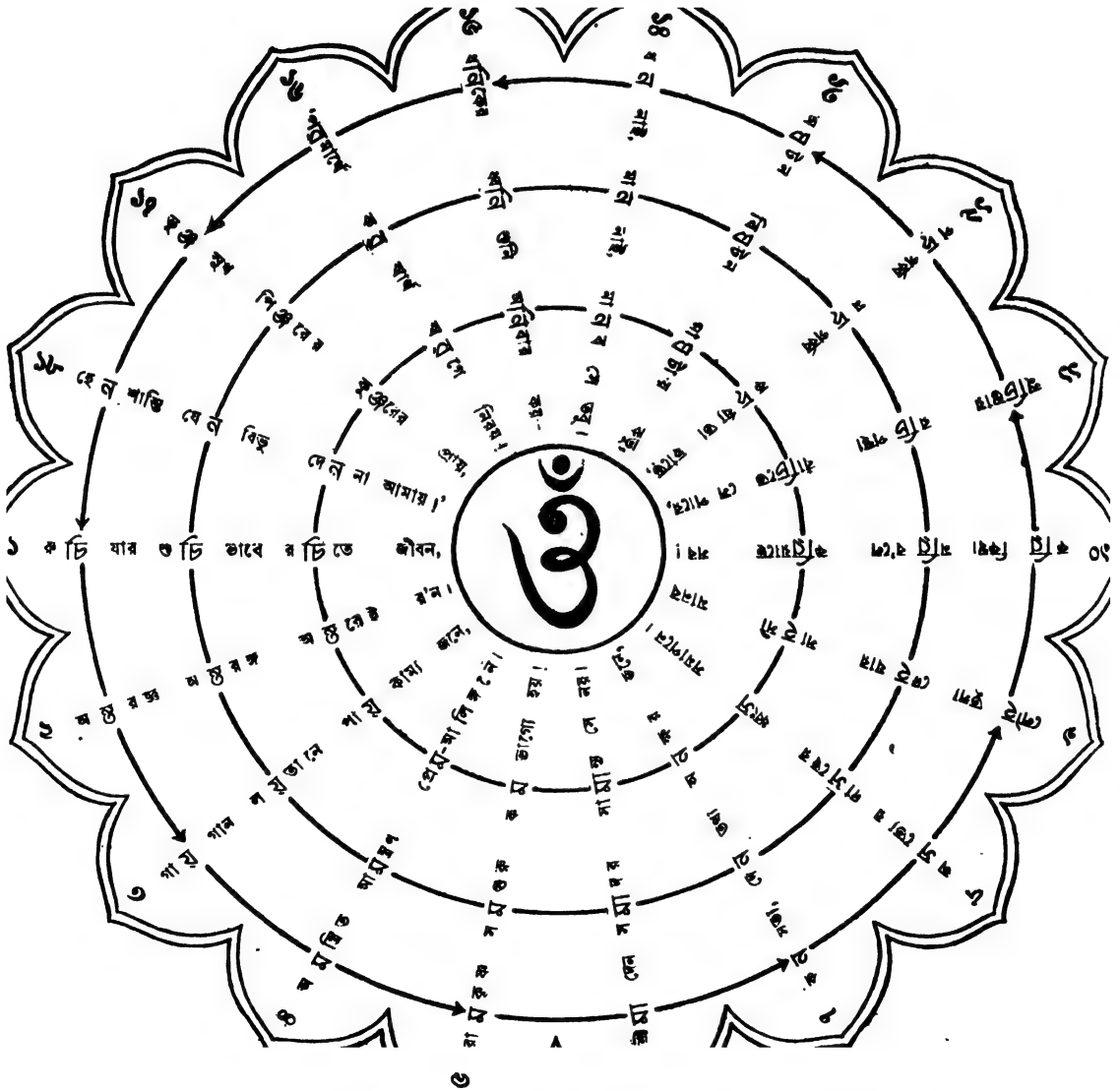
ইং ৫ই মার্চ্চ ১৮৮২, দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রের মুখে যে গান শুনিয়া ঠাকুর সমাহিত হইয়াছিলেন, সেই গানটার প্রথম পংক্তি "চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন" অষ্টাদশ দল পদ্মবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছেন শ্রীশরৎ পণ্ডিত ওরফে দা'ঠাকুর।
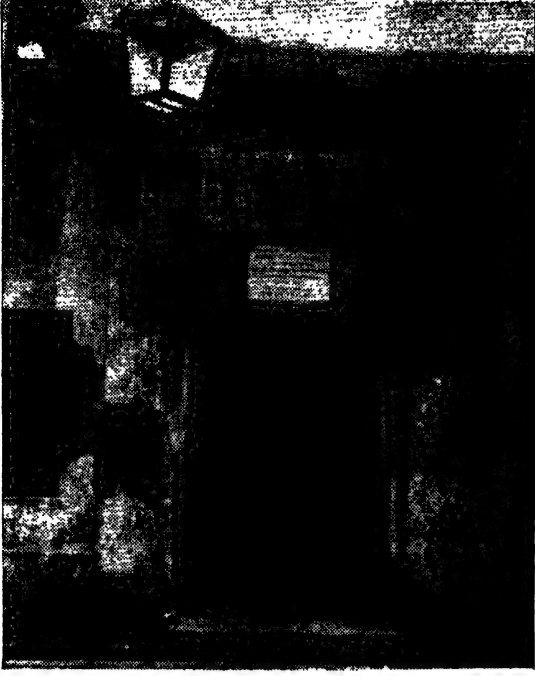
আকাশ-চাচা অট্টালিকায় কলিকাতা মহানগরী এখন প্রায় পরিপূর্ণ। তবুও সে যুগের ভগ্নাবশেষ এখনও কয়েকটি চোখে পড়ে। শিমুলিয়ায় মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান ও পৈতৃক বাসভূমিটি ধ্বংস প্রাপ্ত হ'তে খুব বেশী দেরী নেই—যদি না স্বামিজীর অসংখ্য ভক্তমণ্ডলী গৃহটির প্রতি যথাদৃষ্টি দেন। মুদ্রিত চিত্র দু'টি হচ্ছে গৃহের সম্মুখভাগ এবং অন্যটিতে গৃহ বিভক্ত হওয়ায় সীমান্ত পথ দেখা যাচ্ছে। চিত্রগুলি শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহীত।

কেদারনাথের মন্দির
—কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়
(দ্বিতীয় পুরস্কার)

-প্রচ্ছদপট-

এখন থেকে ঠিক পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে ইং ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে নরেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাব হয়। স্বামিজীর অর্দ্ধশততম তিরোভাব দিবসে উৎসব পালন করতে হবে দেশ এবং দেশবাসীকে।

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে স্বামী বিবেকানন্দের একটি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। স্থান—ষ্টার থিয়েটার। আমেরিকা থেকে প্রত্যাগমনের দিন শিয়ালদা ষ্টেশন থেকে 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে স্বামিজীকে নিয়ে যাওয়া হয়। সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

শ্রীবদরীনাথের মন্দির
—শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

স্বর্ণমন্দির, অমৃতসর
—কে, কে, বন্দ্যোপাধ্যায়
(প্রথম পুরস্কার)

স্বর্ণমন্দির

—রেখা দে

(তৃতীয় পুরস্কার
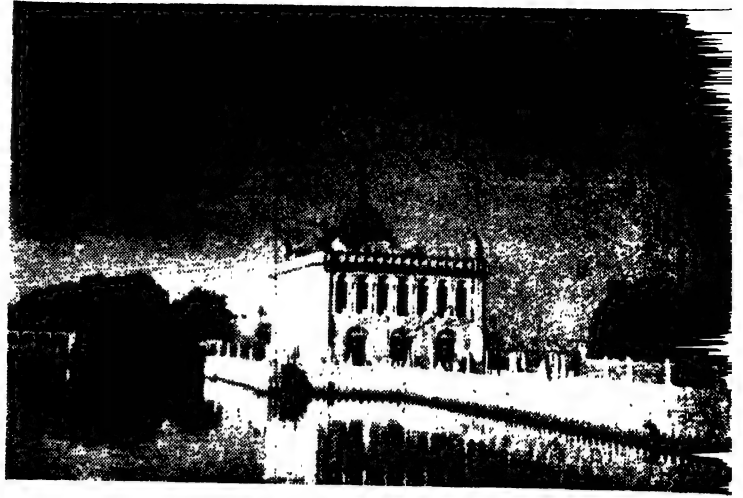
বিশ্বনাথের মন্দির, কাশী

—অমলেন্দু দাশগুপ্ত

জগৎশেঠের মন্দির (বৃন্দাবন)
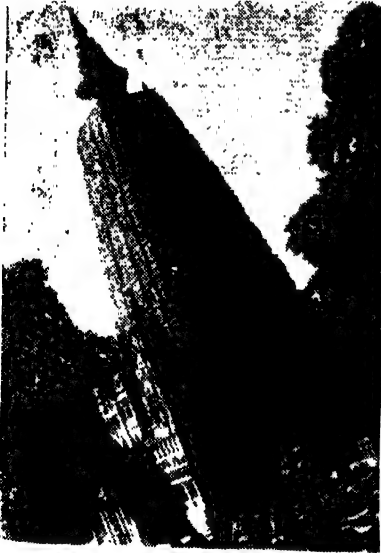
—প্রদ্যোৎ চৌধুরী

বৌদ্ধগয়া —শুভারাণী পাল

রামেশ্বরম্ —শ্রীমতী মঞ্জুষা দেবী

পার্ব্বতী দেবীর মন্দির, পুনা

—নির্ম্মলময় ঘোষ

মন্দিরের পূজারিণী ?

—শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়
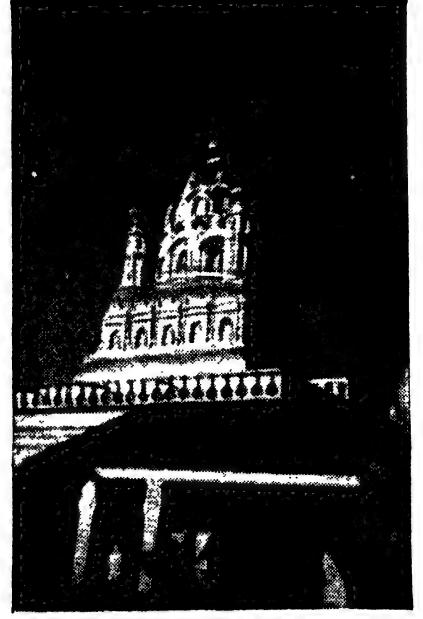
শিবমন্দির, নন্দন পাহাড়, দেওঘর —কুমারী গৌরী ঘোষ

—আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা—

বিষয়

মুখ

প্রথম পুরস্কার ১৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৲

তৃতীয় পুরস্কার ৫৲

ছবি পাঠানোর শেষ দিন ২৪শে চৈত্র

আকাশ-পাতাল

অ, আ, ই

আকাশে ফুল ফুটলো কোথা থেকে!

সদ্য-প্রস্ফুটিত যুঁই না মালতী না টগর কে যেন ছড়িয়ে দিয়ে গেছে মুঠো-মুঠো। অচঞ্চল নক্ষত্র, কোন সাড়া-শব্দ নেই। অতি ধীরে ধীরে অজ্ঞাতে কখন একে একে ফুটেছে। গতি নেই, কেন তবে কাঁপছে ধিকি-ধিকি। মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে যেন। যুগ-যুগ ধ'রে উদিত হচ্ছে, তবুও দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যায় রাজেশ্বরী। পর্দ্দা-খোলা জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে কতক্ষণ। তখনও আকাশে হাসির আভা লেগেছিল, দিনের শেষ আলোটুকু তখনও মোছেনি। কালো হয়নি আকাশ! পিশীমা যখন গালে চুমা খেয়ে হাসি-অশ্রু মাখানো মুখে চলে গেলেন, সেই তখন থেকে। কত তুলসীতলায় শাঁখ বেজে-বেজে থেমে গেছে কখন, ঘরে-ঘরে জ্বলেছে লণ্ঠন, বাতি, লম্ফ। তথাপি খেয়াল নেই, রাজেশ্বরী দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই! যেন সব কিছু ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোমল পা দু'টিতে ব্যথা ধ'রে গেছে, টন-টন করছে। ভুলে গেছে চুল বাঁধতে, সাজতে, কাপড়-জামাটা পর্য্যন্ত বদলাতে। অন্ধকার আকাশের মতই গম্ভীর হয়ে আছে মুখ, স্থির আঁখি আকাশে মেলে মর্ম্মর-মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে আছে রাজেশ্বরী।

শুধু হেমনলিনী গেলে হয়তো ভাবনা থাকতো না। কিন্তু—

—বৌদিদি আছো হেথায়?

কথাগুলি শুনে যেন চমকে উঠলো রাজেশ্বরী। কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। মুহূর্ত্তের মধ্যে সামলে নিয়ে বললে,—হ্যাঁ আছি বিনো দিদি। বল, কিছু বলছো?

বিনোদা বললে,—আমি কিছু বলি নাই। লণ্ঠন জ্বালবে যে, লোকটা কাকেও দেখতে না পেয়ে আমাকে ডাকতে গেছলো। তাই ডাকছি।

লোক এসেছে। ঘরের লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে। রাজেশ্বরী এতক্ষণে যেন বুঝলো সময় কোথা দিয়ে বহে গেছে। দিন শেষ হয়ে আঁধার হয়ে গেছে দিগ্বিদিক! লোক দাঁড়িয়ে আছে, ঘোমটা টেনে মুখটা ঢেকে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো রাজেশ্বরী। বিনোদাকে চুপি-চুপি বললে,—এলোকে বল' না আসতে। আমি পুকুরে যাচ্ছি গা ধুতে।

—সে কি বৌদিদি! এখন যাবে তুমি পুকুরে? অন্ধকারে পা পিছলে পড়বে যে। না বৌদিদি, পুকুরে তোমাকে যেতে আমি মানা করছি! বিনোদা কথা বলে বয়োজ্যেষ্ঠর ভঙ্গীতে।

—তবে? বললে রাজেশ্বরী।

বিনোদা বললে,—ভারীকে বলছি জল তুলে দিয়ে যাবে। চানের ঘরে যাও, আমি এখুনি ব্যাবস্থা করছি।

ভাবতেও যেন শিউরে ওঠে রাজেশ্বরী। গায়ে কাঁটা দেয়। বুকটা ধড়াস-ধড়াস করে। হাতের তালু ঘামে। পা দু'টি হিম হয়ে যায়। পিশীমাকে পৌছতে গিয়ে যায় যদি অন্য কোথাও। হেমনলিনী আসতে কিছুক্ষণের জন্যে তবুও মুখে হাসি ফুটেছিল; অকূলে কূল দেখতে পেয়েছিল যেন রাজেশ্বরী। বুঝেছিল যে শূন্য দুর্গপুরীতে মানুষ আছে। কিন্তু টায়রাটা কে চুরি করলে! কে চুরি করতে পারে? যখন-তখন ঐ হারিয়ে যাওয়া টায়রাটা ভেসে ওঠে চোখে। ভাল করে দেখতেও পাওয়া যায়নি টায়রাটা। মুহূর্ত্তের দেখায় দেখেছিল রাজেশ্বরী, আলো পড়তে ঝলমল করেছিল জড়োয়া টায়রা। সহস্র দ্যুতি ছড়িয়েছিল। তীব্র আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত মনে ধীরে ধীরে এগোয় রাজেশ্বরী। প্রশস্ত দালানে মাত্র একটি বেললণ্ঠন জ্বলছে টিম-টিম ক'রে। ভাল ক'রে অন্ধকার ঘোচেনি। যেতে যেতে সহসা চমকে ওঠে রাজেশ্বরী। কি দেখলো কে জানে! কোন প্রেতাত্মার ছায়া নয় তো! না, ভুল ক'রেছে সে। দেখেছে চলন্ত ছায়া। নিজ মূর্ত্তির। ভুল বুঝতে পেরে তবু কিছুটা আশ্বস্ত হয়। অধীর আগ্রহে কান পেতে থাকে। জুড়ী ফিরলো নাকি এতক্ষণে। অন্দর থেকেও শোনা যায় জুড়ীর ঘণ্টাধ্বনি। কিন্তু কোন শব্দ এখনও কানে পৌছয়নি। মনে মনে রাগ হয়, রাজেশ্বরীর। এলোকেশীর প্রতি। তাকে একা রেখে গেল কোথায় পোড়ামুখী! প'ড়ে প'ড়ে কোথাও ঘুম মারছে না তো!

দেওয়ালে হেলান দিয়ে কে দাঁড়িয়ে আছে, যার এমন বিকটাকার! যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো রাজেশ্বরী। ভীত চোখে দেখলো লক্ষ্য ক'রে। না, কেউ নয়। দেওয়ালে টাঙানো আছে আড়াআড়ি দুটো তরোয়াল, মধ্যে গণ্ডারের চামড়ার একটা ঢাল। অব্যবহারে ও ধূলায় আসল রঙ হারিয়ে ফেলেছে। বিরক্ত হয়ে ওঠে রাজেশ্বরী। কেমন বিশ্রী লাগে যেন এই অচ্ছেদ্য তমিস্রা—তিমিরাকীর্ণ রাত্রি। ষোড়শী কন্যা, বিয়ের যুগল-মিলনের মাল্যগন্ধ এখনও যার দেহে—রাত্রি দেখে সে কেন ভীত হবে! সে তো প্রতীক্ষায় ব্যগ্র হয়ে থাকবে—কখন আলো মুছে গিয়ে নামবে আঁধার। যখন শুধু মুখোমুখি হওয়ার সময়, যখন শুধু সোহাগ-প্রীতির বিনিময় হয়। দিনের আলোয় বেশ থাকে রাজেশ্বরী, যখন কেউ কাছে না থাকলেও গাছের পাতা হাওয়ায় কাঁপতে দেখা যায়, উড়ে-যাওয়া পাখী মিষ্টি মিষ্টি ডাকে, জেগে থাকে দুনিয়ার মানুষ। দিকে দিকে ভয়-ভাঙানো আলো।

—কোথায় ছিলে তুমি পোড়ামুখী?

কাকে দেখে বললে রাজেশ্বরী। কাকে আসতে দেখে।

এত চীৎকার ক'রে এই প্রথম বোধ হয় কথা বললে। দালানের শেষ প্রান্তে দেখা দিয়েছিল এলোকেশী! সম্বোধন শুনে এগোতে সাহস করলে না। বললে,—তোরই ভালর জন্যে গেছলুম রাজো। মিথ্যে গাল দিস কেন! দিন দেখাচ্ছিনু একটা। কাছাকাছি যদি একটা ভাল দিন থাকে তো দিন কতক—

রাজেশ্বরী সত্যিই কুপিত হয়। বলে,—থাক্, আমার ভাল তোমাকে করতে হবে না, দোহাই, এখন কাপড়-চোপড় যা দেবে দাও। দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ।

কথা শেষ হওয়ার আগেই পেছন ফেরে এলোকেশী। বকুনির সুর শুনে কেমন যেন থতমত খেয়ে যায়। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

কথাটা কানে বাজে। দিন দেখাতে গিয়েছিল এলোকেশী? শুভদিন?

নাট-মন্দিরে গিয়ে পড়েছিল এলোকেশী। পুরোহিত বসেছিলেন চিন্তাকুল হয়ে, এলোকেশী তাঁকেই অনুরোধ করেছিল। পুরোহিত নিজে দিনক্ষণ বলেননি, অনুচরদের কাকে আদেশ করেছিলেন। পঞ্জিকা দেখে দিন ব'লে দিতে হবে। কোন্ দিন শুভ, আর কোন্ দিন শুভ নয়। কবে যাত্রা আছে, কবে যাত্রা নাস্তি।

পুরোহিত ব'সে ব'সে কেমন যেন বকছিলেন বিড়বিড়।

এলোকেশী অজ্ঞ দাসী হ'লে কি হবে, ঠিক লক্ষ্য করেছিল। দিন-ক্ষণ দেখতে গেছে জেনে শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন কয়েকটি কথা। ব'লেছিলেন,—বধূমাতা কি পিত্রালয়ে যেতে অভিলাষী?

এলোকেশী কোন প্রত্যুত্তর দেয়নি। শুভদিনের নির্ঘণ্ট শুনেই ত্যাগ করেছিল নাট-মন্দির। পুরোহিত তখন সবে ফিরেছেন। ফিরে পর্য্যন্ত কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। পূর্ণশশী বোধ করি তাঁকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা হাওয়া পাক খেতে-খেতে উড়লো। স্নিগ্ধ-শান্ত হাওয়া। ঘুমন্ত গাছের শাখা কেঁপে উঠলো। পাতায় পাতায় শব্দায়িত হ'ল।

চানের ঘরে ঢুকে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল রাজেশ্বরী। অন্ধকারে একা। ভাবতেও লজ্জিত হয় রাজেশ্বরী। কথাটা মনে আনতে ঘৃণা বোধ করে। বিশ্বাস হয় না ভাবতে, তবুও যেন বিশ্বাস করে রাজেশ্বরী। মন থেকেই বিশ্বাস করে। একটা কথা, মাত্র একটা কথা, ঐ একটা কথাই জুড়ে থাকে যত কিছু ভাবনা। চুরি! চুরি! চুরি!

চৌর্য্যাপবাদ!

হ্যাঁ, সত্যিই চুরি বৈ কি। জুড়ীর ভেতরে বসে হুজুরের মনেও কথাটা যে উদয় না হয়েছে এমন নয়। টায়রা চুরি করতে হ'ল? গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনে দিলে কি ক্ষতি ছিল? ক্ষণেকের জন্ত কেমন অস্বস্তি বোধ হয়।

জুড়ী তখন ছুটছিল দ্রুতবেগে। ফাঁকা পথ, কেউ কোথাও নেই। অন্ধকারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ছুটছিল। দূরে দূরে কোথাও কোথাও আলো জ্বলছে, নয় তো শুধুই কালো, ঢেকে আছে যত দূর চোখ যায়।

টায়রা যদি একটা কিনে দেয় রাজেশ্বরীকে। হারিয়ে গেছে, অভাব পূরণ ক'রে দেয় অন্য একটা দিয়ে। খুশীই হবে রাজেশ্বরী, মনে মনে ভাবছিল কৃষ্ণকিশোর। কত গয়না আছে রাজেশ্বরীর, কত রকমের, কত কত দামের। গা-মেলানো, সেট-মেলানো গয়না। কত মণি-মাণিক্য, হীরা-জহরৎ।

কিন্তু, গহরজানের অঙ্গে গয়না কৈ? অন্ধকারে শুধু একটা মুখ, হাসি-মাখা ধারালো একটা মুখ, চকিতে ভেসে ওঠে আঁখিপাতে। রুক্ষ কেশের ঝুলন্ত বেণীতে জরি পাক খেয়েছে। নাকে নকল হীরের নাকছাবি, কানে পুঁতির ঝুমকো, গলায় স্ফটিকের মালা। বেদেনীর মত ঠিক দেখতে যেন গহরজানকে, কিম্বা বেদুইনদের মত। ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক, চোখে মায়াময়ী চাউনি, চাল-চলনে যেন খুঁজে পাওয়া যায় বেদিয়া ছন্দ। গয়না নেই গহরজানের। যা আছে গিল্টির। নকল। চোখ-ধাঁধানো।

ভেসে-ওঠা মুখে বিকিয়ে দেওয়ার আভাষ। গহরজানের চোখে যেন আত্মসমর্পণ!

চিঠিতে লিখেছে, কি যেন একটা খাদ্য রেঁধেছে গহরজান।

মুরগীর কোপ্তা না কাবাব কি যেন। না ভাজা-মুরগী। গহরজান বানিয়েছে মুরগী-মুসল্লম। বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, ক্ষীর আর মুরগীতে একত্র তৈয়ারী।

গহরজান তখন আলস্যে হেলান দিয়ে বসেছিল উবু হয়ে। দেখছিল ইদিক-সিদিক। জুড়ী কখন দেখা যাবে। যে কোন জুড়ী নয়, সেই বোতল-সবুজ রঙের জুড়ী-গাড়ী। দিনের শেষে এখানে জমজমাট হয় পথ, কত ল্যাণ্ডো, ফীটন, পাল্কী গাড়ী যাওয়া-আসা করে। গহরজান বসে বসে ডালিমকে খেলা দেয়। লোফালুফি করে। চুমু খায়।

—বৌদিদি, পুলিশ এসেছে বাড়ীতে।

মাথায় যেন বজ্রপাত হয় রাজেশ্বরীর। ভুল শুনছে না তো। ফিরে দাঁড়িয়ে বললে,—কি বললে, পুলিশ এসেছে?

দরজা ধ'রে দাঁড়িয়েছিল বিনোদা। দু'হাতে দু'টো দরজা। বললে,—হ্যাঁ গো হ্যাঁ বৌদিদি। পুলিশই এসেছে। আমি কি মস্করা করছি তোমার সঙ্গে?

—সে কি কথা বিনোদা। পুলিশ কেন আসবে?

আয়নার সামনে থেকে বিনোদার কাছে এগিয়ে যেতে যেতে বললে রাজেশ্বরী। ভ্রূ দু'টো বিস্ময়ে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেছে!

চোখ দু'টো যেন ঠেলে ঠিকরে পড়বে বিনোদার। বললে,

—কাছারীতে আমলাদের ঘরে গিয়ে বসেছে। দেখো আবার, খুনের দায়ে ফাঁসী যেতে না হয়!

কি অলক্ষুণে কথা বলছে বিনোদা। রাজেশ্বরীর হাতে কাঠিতে সিঁদুর। টিপ পরতে যাবে এমন সময় কথা বলেছে বিনোদা। মন্থরার মত। লণ্ঠনের আলোয় ঠিক দেখতে পায় না বিনোদা, রাজেশ্বরী চোখ দু'টোকে বন্ধ করে ফেলেছে। অন্তরের চোখ দিয়ে যেন দেখছে। হতাশা, পরিপূর্ণ হতাশায় চোখ বন্ধ করেছে রাজেশ্বরী। বিয়ে হওয়ার স্বাদ যে কত তিক্ত, অনুভব করছে হয়তো মনে মনে।

—উনি ফিরেছেন বিনোদা?

ভয়ে ভয়ে শুধোয় রাজেশ্বরী। আড়ষ্ট কণ্ঠে।

বিনোদা বললে,—কোথায় কে বৌদিদি! পিসীকে পৌঁছুতে যেয়ে কমনে গেছে কে জানে!

রাজেশ্বরী বললে,—পুলিশ কি বলছে? কেন এসেছে খোঁজ নিতে বল' না আমলাদের।

বিনোদা বললে,—ঠিক কথা বলেছো। আমি যাই, আমলাদের কানে কথাটা তুলে দিয়ে আসি।

ছায়াকে পেছনে ফেলে হাঁফাতে হাঁফাতে চলে যায় বিনোদা। সেই হাওয়াটা ঘূর্ণীর মত কোথা থেকে পাক খেতে খেতে আকাশে উড়ে যেতে চায়। গাছপালা ঢলাঢলি করে। ঝরে-যাওয়া পাতা খড়মড়িয়ে ওঠে। মানুষের চোখে-মুখে হিমেল স্পর্শ দিয়ে শন-শন বইতে থাকে হাওয়া। অবিরাম ডেকে যায় ঝিঁঝিঁ পোকা। দুর্গ মধ্যে অত্যন্ত একা মনে হয় নিজেকে, পা টিপে-টিপে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে রাজেশ্বরী।

দালানের লণ্ঠনটা হাওয়ায় দুলছে মৃদু-মৃদু। ভয়-ভয় করছে। ভয়ে জড়সড় হয়ে দালান পেরিয়ে আরেক দালানে পৌঁছয় রাজেশ্বরী। কাকে দেখে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে। বাড়ীতে পুলিশ এসেছে শুনে হয়তো স্থির থাকতে পারেননি, বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এসেছেন উত্তরাধিকারীকে। নধরকান্তি দেহ, পরিধানে শুভ্র বস্ত্র ও উত্তরীয়, বক্ষে উপবীত। কে এসেছেন ঐ রক্ষাকর্ত্তা! ভয়লেশহীন দৃষ্টিতে দেখছেন এই অসহায়া কুলবধূটিকে। রাজেশ্বরী ভেবেছিল ঐ অপরিচিত পুরুষ নিশ্চয় কথা বলবেন। মুখে কথা নেই দেখে রাজেশ্বরী গুণ্ঠনের ফাঁক থেকে আড়-নয়নে দেখলো। দেখলো দাঁড়িয়ে আছেন সেই একই ভঙ্গিমায়। দেখছেন, দেখছেন এই ভয়-পাওয়া বৌটাকে।

এলোকেশী এসেছিল পেছন পেছন। বললে,—কাকে দেখে এত লজ্জা এখানে! এক-গলা ঘোমটা টেনেছিস কেন?

—ছাখ্ তো এলো, ও-দালানে কে দাঁড়িয়ে আছেন? রাজেশ্বরী কথাগুলি বললে ফিসফিস করে।

খানিক গিয়ে দেখে এসে বললে এলোকেশী,—কেউ তো নেই রাজো। কাকে দেখলি তুই?

তখন ঘোমটা খুলে ভাল ক'রে দেখলো রাজেশ্বরী। লণ্ঠনের আলোয় ভুল দেখেছে? আলো-আঁধারিতে ঠাওরাতে পারেনি। সামনের দালানের দেওয়ালে ছিল একটি তৈলচিত্র। মানুষের পূর্ণ আকৃতির আকার। সোনালী গিল্ট-ফ্রেমে বাঁধানো। পূর্ব্বপুরুষদের কে এক জন। হঠাৎ দেখায় মনে হয় যেন ছবি নয়, জীবন্ত।

—কোথায় চলেছিস তুই? জিজ্ঞেসা করলো এলোকেশী।

ঢোঁক গিলে বললে রাজেশ্বরী,—পুলিশ এসেছে যে বাড়ীতে। জানিস না তুই?

এলোকেশী শুনে বুঝি মূর্চ্ছা যায়। কোন কথা বলে না, ভয়-কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কোথায় যাবে এই ভেবে অনন্যোপায় হয়ে ঘরে ফিরে চলে রাজেশ্বরী। আয়নার সামনে যায় না। সাজতে যেন আর ইচ্ছা হয় না। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ী পরেছিল, লাল রঙের ভেলভেটের জামা। মনে হয়, সর্ব্বাঙ্গে যেন বৃশ্চিক দংশন করছে। রাজেশ্বরী পালঙ্কে এলিয়ে পড়ে। ভয় আর আশঙ্কায় মুখে কথা ফোটে না। ভাগ্যকে দোষে।

শুধু দু'জন লাল-পাগড়ী নয়, এক জন উচ্চপদস্থ ইংরাজ পুলিশ কর্ম্মচারীও সঙ্গে এসেছে। দু'জন ট্যাস সার্জ্জন। ওদের কটিদেশে চামড়ার বন্ধনীতে ঝুলছে সত্যিকার আগ্নেয়াস্ত্র। রিভলভার। ইংরাজ কর্ম্মচারীটি ঘুরে-ফিরে দেখছিল কাছারী। গৃহাধিপতি নেই শুনে অপেক্ষা করছিল। কাছারীর দালানের দেওয়ালে এ্যালবার্ট ও ভিক্টোরিয়ার পাশাপাশি যুগল মূর্ত্তির ছবি দেখে কর্ম্মচারীটি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েছিল। রাজপূজা যেখানে হয়, সেখানে রাজদ্রোহী কোন কেউ কি থাকতে পারে? নিস্তব্ধ কাছারীতে ইংরাজের বুটের শব্দ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কর্ম্মচারীটি দালানে ঘোরাফেরা করছিল। কেদারা এগিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও বসছিল না।

আমলাদের মধ্যে থেকে জিজ্ঞেস করায় সে বলেছে,—মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চায়। অন্য কারও সঙ্গে কথা বললে কিছু লাভ হবে না।

কিন্তু মালিক তো নেই এখন! শীঘ্র ফিরে আসবে এই আশায় অপেক্ষা করছিল পুলিশ-পার্টি।

অন্দরে ভয় আর আশঙ্কায় বুকটা ঢিপ-ঢিপ করছিল রাজেশ্বরীর।

দেখে দেখে পুলিশ বিভাগ জেমশ্ ব্র্যাডলেকে তত্ত্বাবধান করতে পাঠিয়েছে। বিষয়টা জটিল, আসামীদের কেউ চোর-বাটপাড় নয়, অথচ বিপক্ষ হলেন খোদ্ গভর্ণমেণ্ট—জেমশ্ ব্র্যাডলে ব্যতীত অন্য কে আছে যে তল্লাশ করবে। কাজে এগোবে। কিন্তু যা দেরী হয়ে গেছে ব্র্যাডলের কানে উঠতে। হদিস্ করতে পারেননি গভর্ণমেণ্ট যথাসময়ে। জেমশ্ ব্র্যাডলে দু'হাত পেছনে পায়চারী করে কাছারীর দালানে। অস্থি-মজ্জায় সে জাতে স্কচ। তদুপরি অভিজ্ঞতায় পাকাপোক্ত। বার্দ্ধক্যের প্রথম ধাপে উপনীত হয়ে ব্র্যাডলে পূর্ব্বের মত স্থির গম্ভীর নেই,

সদাই বিরক্ত হয়ে থাকে। মুখের রেখাগুলি কুঞ্চিত হয়ে থাকে। যাকে বেত মারলে দোষ কবুল করবে, ব্র্যাড্‌লে তাকে বুট-চালনায় অর্দ্ধমৃত ক'রে ছাড়বে।

দল-বল নিয়ে ব্র্যাডলে বেরিয়েছে যখন, তখন সূর্য্য ছিল মধ্যাকাশে। এখনও এক বোতলও বীয়র পেটে পড়েনি। মেজাজ বিগড়ে আছে। কেদারা দেওয়া সত্ত্বেও বসছে না, পায়চারী করছে অন্যমনস্কের মত।

ঘূর্ণী হাওয়ার মত হাওয়া বইছে থেকে থেকে। জামার আস্তিনে কপালের ঘাম মোছে ব্র্যাডলে। পুলিশ-সার্জ্জন কায়দা বজায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু যেন হুকুমের অপেক্ষায় আছে।

শুধু এখানে নয়, অন্যান্য কয়েক জায়গায়ও ঢুঁ মেরে আসতে হয়েছে। বিষয়টা জটিল, জড়িয়ে আছে আরও অনেকে। ব্র্যাডলে গিয়েছিল পার্ক ষ্ট্রীটের দিকে—নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্রর বাঙলোয়। পাক্কা দেড় ঘণ্টা লেগেছে সেখানে। তছনছ করে এসেছে।

কাছাকাছি মিশনারীদের চার্চ্চে তখন অবিরাম ঘণ্টা বেজে চলেছিল। গাছে গাছে ডাকাডাকি করছিল কাক। মুখর হয়ে উঠেছিল যত লুকানো বাসা। চার্চ্চের ঘণ্টায় ছিল যেন কোন মায়ামন্ত্র—হওয়ায় হাওয়ায় ভেসে চলেছিল দূরে—বহুদূরে। পল্লীর ঘরে ঘরে তখন উনানে আঁচ পড়ছিল। ধোঁয়ার ধূসর আস্তরণে বুঝি আকাশ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্র তখন ডুবে ছিলেন পাঠে।

ড্রইং রুমে ছিলেন, সোফায় শায়িত হয়ে। হাতে ছিল বই, একটা ফাইল। রাজা দক্ষিণারঞ্জনের বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর কাগজের। সরকারী কাজে কি প্রয়োজনে কাগজের কোন কোন অংশ বাঙলায় তর্জ্জমা করতে হবে। সরকারী ট্রানশ্লেটর নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্র, বিশ্রামেও তাঁকে কাজ করতে হয়। না করলে চলে না।

জেমশ ব্র্যাডলের দলকে ফটকে দেখেই কিছুটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছিলেন। স্বগত করেছিলেন: Too late, my friends.

ড্রইং রুমটা নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্রর দিনেও থাকে আধো-অন্ধকার। স্কাই-সাইটগুলোর দড়ি ধ'রে কেউ দয়া ক'রেও টেনে দেয় না। বাতিদানে জ্বলছিল বাতি, দপ-দপ ক'রছিল আলো। বেঙ্গল স্পেকটেটর পড়ছিলেন নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্র।

কাছাকাছি চার্চ্চে তখন ঘণ্টা বেজে চলেছে।

আহ্বানের ডাক ডাকছে ধর্ম্মমন্দির থেকে, যত সব ধর্ম্মগতদের ভিড় জমছে চার্চ্চের লনে। আবালবৃদ্ধবনিতা। শুধু ঘড়ির আওয়াজ নয়, সেই সঙ্গে অর্গানের আত্মবিলাপ। বাজনা শুনেই বুঝেছেন নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্র, অর্গানে নিশ্চয়ই মন্টিরো বসেছে। তাকে ঘিরে আছে কয়েকটা প্রতিবেশী ভার্জ্জিন—যাদের চোখে স্বর্গীয় পবিত্রতা।

জেমশ ব্র্যাডলেও পার্ক ষ্ট্রীটের অভ্যন্তরে ঢুকে অর্গান শুনে ক্ষণেকের জন্য বিমনা হয়ে প'ড়েছিল। কাজ-ভোলানো কি একটা গৎ তখন সবে ধরেছে মন্টিরো। গোয়ানীজ মন্টিরো—যাকে দেখতে ঠিক ওথেলোর মত—যার প্রেমে সাড়া দিয়েছিল ডেসডিমোনা। মন্টিরো জাতে মুর নয়, কিন্তু দেখতে ঠিক যেন ওথেলো।

প্রথম কথা জিজ্ঞেস করলে জেমশ ব্র্যাডলে,—বাঙলোটা তোমার না হিজ ম্যাজেষ্টীর গভর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ ক'রে বাস করতে দিয়েছে?

নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্র মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বললেন,—তোমরা তোমাদের সীট টেক্‌আপ না করলে আমি কথা বলছি না। বাঙলোটা আমার পৈতৃক।

জেমশ ব্র্যাডলে ধীরে একটা গর্জ্জন করলে। বললে,—বসতে আমি আসিনি। তবুও ধন্যবাদ, আমি বসছি। এখন কাকে কোথায় পাঠিয়েছো বলে দাও ম্যান; আমি লিখে নিই।

শিশুর মত হাসলেন নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্র। একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। বললেন—সময়টা আমার এখন তত ভাল নয় যে, কারও কোথায় যাওয়া-আসা নিয়ে মাথা ঘামাবো। আমার অতি প্রিয় কন্যার বিয়োগ-ব্যথায় মন আমার কাতর। আমি তোমাদের দেখেই বুঝেছি, তোমরা এসেছো আমার ছেলের জন্যে। কিন্তু বিশ্বাস কর, ভগবানের দিব্যি বলছি, ছেলের কোন খোঁজ আমি জানি না। জানতেও চাই না। তোমরা যদি এখন তল্লাসী করে তাকে খুঁজে পাও। নচেৎ আমার দ্বারা কোন সাহায্য মিলবে না। আমি এখন ডিপলি মোর্ণড।

জেমশ ব্র্যাডলে বললে,—তোমার মেয়ে মারা গেছে? কবে, কত দিন?

আবার এক ঝলক হাসলেন নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্র। হাসিতে দুঃখই যদিও ফুটে উঠলো। অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখালেন কি যেন, বললেন,—ঐ আমার প্রিয়তমা কন্যা। লিলিয়ান। ম্যালেরিয়ার কবল থেকে ওকে আমি বাঁচাতে পারিনি।

জেমশ ব্র্যাডলে পাকা ভ্রূ কুঁচকে দেখলো। নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্রর সমুখের তেপায়ায় এক স্বর্গভ্রষ্ট দেবকন্যা। হাতে ফুলের তোড়া, দাঁড়িয়ে আছে হাসি-হাসি মুখে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে কথা বললে জেমশ ব্র্যাডলে,—ছেলে যেখানে থাকতো সেই কামরা ক'টা সার্চ্চ করতে চাই।

নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্র সায় দেওয়ার ভঙ্গীতে বললেন,—অবশ্যই তোমরা সার্চ্চ করবে। চল' এখুনি চল'। আমি তোমাদের ঘর দেখিয়ে আসি। খানিক থেকে বললেন,—আমি কিন্তু থাকতে পারছি না, আমাকে ছুটি দিতে হবে। জরুরী কাজ আছে হাতে। যদিচ আমি তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি এক জনকে, যিনি সহজে তদারক করতে সক্ষম হবেন।

—অল রাইট। বললে ব্র্যাডলে।

ঘর দেখেই ইশারায় হুকুম করলে তাঁবের আদমীদের। বললে, Don't search, just haunt.

নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্র সোফায় গিয়ে বসলেন একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে। ব্র্যাডলে হঠাৎ দেখলো যে, পাশে এসে কে যেন দাঁড়ালো। ঝলমলে গাউন, কালো জালের ভেল-ঢাকা মুখ। জেমশ ব্র্যাডলে হঠাৎ গর্জ্জন করে ওঠে। বাঙলোটা যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে। বলে,—We want few lanterns.

ঝলমলে গাউন থেকে ফর্সা একটা হাত থেকে লণ্ঠন একটা এগিয়ে ধরা হয়। ব্র্যাডলে এক-নজরে দেখে নিয়ে বলে,—থ্যাঙ্কস্।

ভেল-ঢাকা মুখ বললে,—More lanterns will be supplied. Please wait a minute.

তখনও লণ্ঠন ও বাতিদান সাফ করে উঠতে পারেনি আয়া। নিমেষের মধ্যে আরও দু'টো লণ্ঠন এনে হাজির করে বৃদ্ধা। কাঁপতে কাঁপতে আসে। লণ্ঠন নামিয়ে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে চলে যায়। শুধু বার্দ্ধক্য নয়, পুলিশ এসেছে শুনে পর্য্যন্ত ঠক-ঠক ক'রে কাঁপছে আয়া। শরীরের মধ্যে মাথাটা দুলছে অত্যধিক। লিলিয়ান বিদায় নেওয়ার সময় থেকে সেই যে গম্ভীর হয়েছে আয়া, এখনও হাসিমুখে কথা বলেনি। বোধ করি আর কখনও বলবে না। জেমশ ব্র্যাডলে দু'বার তিন বার দেখলে আয়াকে। ভাবলে ঐ পুরানো পাপীটাকে ধ'রে বন্দুকের কুঁদো দেখিয়ে জেরা করলে কেমন হয়।

পুলিশ আর সার্জ্জন ততক্ষণে ঘরের ভেতরে এটা-সেটা নাড়াচাড়া করতে লেগে গেছে। আনলা থেকে ময়লা পোষাকের স্তুপ নামিয়ে ফেলেছে।

—What's that? হঠাৎ গর্জ্জন ক'রে উঠেছিল জেমশ ব্র্যাডলে। ঘরের এক কোণে কি ছিল কে জানে, ব্র্যাডলে পদাঘাতে রহস্য উদ্‌ঘাটন ক'রে দেয়। কতকগুলো ছিন্নভিন্ন টুপী আর পুরানো জুতো জড় করা ছিল। বস্তুগুলি দেখে আর একবার গর্জ্জন করেছিল ব্র্যাডলে।

একটা ক্যাবিনেট ছিল এক পাশে। ক্যাবিনেটের পাল্লা ধ'রে টেনে খুলে ফেললে এক জন সার্জ্জন। চাবি দেওয়া ছিল, টানাটানি করতে চাবির কল বিকল হয়ে যায় হয়তো। এক লাফে ব্র্যাডলে ক্যাবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বইগুলো কি বই? ব্র্যাডলে বইয়ের গাদা থেকে বই তুলে নেয় খান-কয়েক। একেকটা বই দেখে আর ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলে দেয় মেঝেয়। নামগুলো শুধু সজোরে পড়ে,—

Æshop's Fables! Madame Campan's Memoirs of the Private Life of Marie Antoinette! The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer! John Bunyan's The Pilgrim's Progress! Life of William Blake by Gilchrist! Complete works of William Shakespeare.

জেমস ব্র্যাডলেকে যথেচ্ছ বই ছুঁড়তে দেখতে পেয়েছিল ভেল-ঢাকা মুখ। কোন কথা বলেনি, শুধু একেক বার ভেলের আড়াল থেকে অস্ফুট শব্দ বেরিয়েছে। ক্ষোভ আর ক্রোধে মিশ্রিত মৌখিক প্রকাশ। যদিও ব্র্যাডলে ফিরেও তাকায় না।

সার্জ্জনদের এক জন হঠাৎ যেন আবিষ্কারের আনন্দেই চীৎকার উঠেছিল। একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স। কাগজের মত কি যেন উঁকি মারছে দেখে সার্জ্জন বাক্সটা খাটের তলা থেকে বের করে ফেলেই চীৎকার করে,—Eureka, Eureka!

বাক্স ওলট-পালট ক'রে দেখা যায় কয়েকটা শূন্য বোতল ব্যতীত কিছুই নেই। হুইস্কির শূন্য বোতল। সার্জ্জনের চোখে পড়েছিল বোতলের লেবেল, ভেবেছিল বুঝি বা রাজ-দ্রোহের স্বপক্ষে কোন কিছু লিখিত বক্তব্য।

শেষ পর্য্যন্ত হয়তো ধৈর্য্য থাকে না জেমশ ব্র্যাডলের। বই ছুঁড়তে ছুঁড়তে হঠাৎ বলে নিজের মাতৃভাষায়,—থাকলে কি আর এখানে লুকিয়ে থাকবে! এই ডাষ্টবিনে?

ভেল-ঢাকা মুখ কথাগুলি শুনে মৃদু মৃদু হেসেছিল। কিন্তু একটি কথাও বলেনি। হ্যাঁ কি না, কোন কথা নয়।

কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবলে কে জানে, জামার আস্তিনে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ব্র্যাডলে বললে,—Come, let us go.

সহকর্ম্মীরাও হয়তো ক্লান্ত হয়েছিল। কেউ আপত্তি করতে সাহস পায় না। জেমশ ব্র্যাডলের পিছু-পিছু বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। তছনছ ক'রে দিয়ে যায় ঘরটা। নিস্তব্ধ বাঙলোতে শুধু বুটের খট-খট ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। ড্রইং রুমে যেতেই বেঙ্গল স্পেকটেটর থেকে মাথা তুললেন নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্র। সহাস্যে বললেন ইংরেজী ভাষায়,—বোধ হয় তোমাদের হতাশ হ'তে হয়েছে? ছেলে আমার কোন চিহ্নই রেখে যায়নি। অথচ কোথায় যে গেল কেউ জানলো না। কথা বলতে বলতে মুখের পাইপটা নামিয়ে নিয়ে বললেন,—তোমরা ইচ্ছা করলে আমার পুরানো রিপোর্ট প'ড়ে দেখতে পারো। তখনই আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আমার ছেলের মতিগতি ভাল দেখছি না। ছেলের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তোমরা তো তখন আমার কথা কানে তুললে না! যখন সত্যিই চোখে ধুলো দিয়ে গেল তখন তোমাদের খেয়াল হ'ল।

জেমশ ব্র্যাডলে অযথা বাক্যব্যয় করে না। কথাগুলি গলাধঃকরণ ক'রে বললে,—আমরা তবুও যেখানে যেখানে তোমার ছেলের গন্ধ পাবো, সেখানে খোঁজ করতে পেছপাও হবো না। গুড বাই, এখন আমরা চলি।

নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্র বললেন,—নিশ্চয়ই হবে না। তোমাদের কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করবে কেন?

একটু একটু আলো তখনও ছিল।

বাসায় ফেরা পাখী ডাকছিল দলে-দলে। প্রতিবেশীর উনুনে আঁচ প'ড়েছিল তখন, ধোঁয়ার ধূসর আস্তরণ কোথাও কোথাও। চার্চ্চে একটানা ঘণ্টাবাদ্য থেমে গেলেও ভজনা তখনও থামেনি। সারি সারি নরনারী নতমস্তকে দাঁড়িয়ে বাইবেলের উক্তি পাঠ করছিল মনে মনে। মণ্টিয়ো শুধু অর্গ্যানে ব'সে শব্দ-তরঙ্গ তুলছিল অতি ধীরে ধীরে।

নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্রর বাঙলোয় একটি ভেল-ঢাকা মুখ তখন উন্মুখ হ'য়েছিল ফটকের পানে তাকিয়ে। গরম কেক তৈরী শেষ ক'রে কিচেনের জানলা থেকে দেখছিল সজাগ দৃষ্টিতে। মন্টিরো এখনও কেন আসছে না? মন্টিরোকে দেখতে মুর ওথেলোর মত কালো, অন্ধকারে মিশে যায়নি তো সে! ভেল-ঢাকা মুখ থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কখনও আয়না সামনে ধ'রে ভেল সরিয়ে দেখে। ঢল-ঢল মুখে কি অপূর্ব্ব শোভা! দেখতে দেখতে বিমুগ্ধ হয়ে যায়। মোহ কেটে গেলে ব'সে ব'সে ভাবতে থাকে, কখন আসবে মন্টিরো! কখন মন্টিরোর ডাক শোনা যাবে! কখন মন্টিরো হাঁটু মুড়ে বসে ডাকবে সোহাগী কণ্ঠে,—মিসেস্ বোনার্জ্জী, মিসেস্ বোনার্জ্জী।

নর্ম্মাণ অরুণেন্দ্রকে খুঁজতে পুলিশ এসেছিল, সে জন্য আদৌ মর্ম্মাহত নয় মিসেস্ বোনার্জ্জী, শুধু মন্টিরো এখনও আসছে না ব'লে কিছুটা আশাহত হয়েছেন।

নর্ম্মাণ বিনয়েন্দ্র কিছুই জানেন না। শুধু বাঙলা থেকে ইংরেজী আর ইংরেজী থেকে বাঙলা তর্জ্জমা করতে জানেন এখন আর বলতে বাধা নেই, ভেল-ঢাকা রহস্যময়ী মিসেস্ বোনার্জ্জী হলে কি হবে, নর্ম্মাণ অরুণেন্দ্রর জন্মদাত্রী নয়। তিনি অন্যা, অনন্যা।

দেওয়াল-গাত্রে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি সসম্মানে রক্ষিত হয়েছে দেখেই যেন জেমশ ব্র্যাডলের সকল আশা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। চিবুক চিমটিতে ধ'রে ভাবলো বেশ কিছুক্ষণ, রাজপূজা এবং রাজদ্রোহ একসঙ্গে হয়! হয়তো ছলনা। পার্লামেণ্ট সেটলমেণ্ট করেছেন ভিক্টোরিয়া—যাতে জমিদারের ক্ষতি হলেও প্রজাদের লাভ হয়েছে। যে জন্য সদর আর মফঃস্বলের কাছারীতে হামেশাই দেখতে পাওয়া যায় ভিক্টোরিয়ার ছবি। হয়তো ছলনা, হয়তো চোখে ধুলো-দেওয়া। তবুও জীবটাকে দেখতে হয়, কেমন ধাতুর চিজ!

কাছারী থেকে কেদারা দেওয়া হয়েছে। জেমশ ব্র্যাডলের ঘর্ম্মাক্ত দশা দেখে আমলাদের ঘর থেকে পেতলের গেলাসে জল দেওয়া হয়েছে, ঢক-ঢক ক'রে খেয়ে তৃপ্ত হয়েছে। তাঁবেদার যখন রূপোর গুড়গুড়ি পর্য্যন্ত এনে দিয়েছে তখনও আপত্তি জানায়নি ব্র্যাডলে। অম্বুরী তামাকও খেয়েছে।

আকাশে নক্ষত্র গুণতে গুণতে কি কুগ্রহ দেখলো কে জানে রাজেশ্বরী।

ঘোটা সিঁটিয়ে গেছে যেন। এলোকেশী পালঙ্কের ধারে দাঁড়িয়ে কপালে হাত বুলিয়ে দেয়। বলে,—রাজো, ভয় পেয়েছিস্?

কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। চোখ দু'টোকে বন্ধ করে শুয়েছিল রাজেশ্বরী। ক্লান্তি আর অবসাদে। বিরক্ত হয়ে বললে,—আঃ, যাও না তুমি। দেখো না গাড়ী আসলো না, না।

ঘূর্ণী হাওয়ায় লণ্ঠনের শিখাটা থেকে থেকে লেলিহান হয়ে ওঠে। চোখ খুলে সামনে কাকে দেখতে পায় রাজেশ্বরী। ভয় না পেয়ে চোখ মেলে দেখে। সত্যিই কি কাঁদছেন। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন, চোখের তীর ব'য়ে নেমেছে দর-দর অশ্রুধারা।

জল নয়, লণ্ঠন শিখা দেখা যায় ছবির কাচে। প্রতিচ্ছবি।

কুমুদিনীর ছবিতে। ছেলের জন্যে দুঃখ পেয়েছেন হয়তো, মনে ক'রেছিল রাজেশ্বরী। সধবা অবস্থায় তখন কুমুদিনী, তখনকার ছবি। অলঙ্কারে ভূষিতা, পাতা-কাটা চুল, নাকে নোলক। মাথায় মুকুট।

কুমু তখন কোথায়? পঞ্চকোশী কাশীতে।

অসিতে বাসা। বাঙালীটোলার সর্পিল সুড়ঙ্গ-পথে তর-তর করে চলেছেন ঘরমুখে। তপঃক্লিষ্টার রুক্ষ মূর্ত্তি। তখনও জলস্পর্শ হয়নি বিন্দু মাত্র। উপোষ করেছেন কেন কে জানে! হাতে ফুলের সাজি আর তাম্রকুণ্ড। পথে যেতে যেতে পাত্র থেকে গঙ্গাজল উৎলে পড়ে। যাত্রাপথ পবিত্র করতে করতে প্রায় ছুটছেন কুমুদিনী। কাল-ভৈরবীর মন্দিরে গিয়েছিলেন। ভৈরবীর মুখের হাসি দেখে মোহিত হয়ে পড়েছিলেন। জগদাহ্লাদজননীর সদাহাস্য মুখ।

ফেলে-যাওয়া, ছেড়ে-আসা পেছনের স্মৃতি প্রথমে যেমন উতলা করে তুলেছিল কুমুদিনীকে, এখন আর ততটা নেই। পুণ্যতীর্থের ধূলি অঙ্গে মেখে সকল দুঃখ ও বেদনা লাঘব হয়ে গেছে। গঙ্গার জলে হয়তো ধুয়ে গেছে। তবে কেউ কোথাও কাকেও ম-নামে ডাকলে কেমন অন্যমনা হয়ে যান কুমুদিনী। খোঁজাখুঁজি করেন, কে কোথায় ডাকলো। কে হারালো যাকে!

ধর্ম্মের সাধন কিংবা শরীর পতন—প্রবাদ বাক্যটি অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে চলেছেন কুমুদিনী। পথ পরিষ্কার করছেন; লোকান্তরে যাওয়ার পথ। 'বারেকের জন্য মনে পড়লেও মরমে মরে যান তিনি। ছেলেকে মানুষ ক'রে তুলতে পারলেন না, এই লজ্জায়। বিপথগামী ছেলেকে তিনি মন থেকে ভুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। মনে পড়লে মন বিভ্রান্ত হয়; কাজ ভুল হয়ে যায়; জপ-তপে বাধা পড়ে।

রাজেশ্বরী শয্যা থেকে উঠে পড়লো।

কেমন অস্বস্তি বোধ করছে যেন। এলোকেশী সেই যে গেছে, এখনও ফিরে আসছে না? পোড়ামুখী, হতচ্ছাড়ী,—সত্যিই ফিসফিস গাল পাড়ে রাজেশ্বরী। কান পেতে শোনে, গাড়ী এলো হয়তো এতক্ষণে। এলো নয়, গাড়ী গেল একটা পথ দিয়ে। অন্য কাদের জুড়ী। রাজেশ্বরী জানলার ধারে

যায়। জরির চুমকি দেওয়া কালো কাপড় পরেছে আকাশ। যেন হীরা-মাণিক জলছে অজস্র।

দূরে, কোন গাছের শিখরে বসে একটা প্যাঁচা ডাকাডাকি করছে তীব্র কর্কশ কণ্ঠে।

—নাট-মন্দিরে যাবে না বৌদিদি?

দরজা থেকে শুধোয় বিনোদা। বলে,—পুরোহিত ডেকে পাঠিয়েছেন।

—না, বিনো দিদি। আজ আমি যাবো না। শরীরটা ভাল নয়, ব'লে পাঠাও। রাজেশ্বরী কথা বলে শুষ্ক কণ্ঠে। হতাশায় মুহ্যমান হয়ে।

—তোমাকেও বলি বৌদিদি, তুমিও তো আচ্ছা মেয়ে! কোথায় আমোদ-আহ্লাদ ক'রে হেসে-খেলে থাকবে, না মুখ শুকিয়ে মেজাজ খারাপ ক'রে সময় নেই অসময় নেই বসে থাকবে? কথা বলতে বলতে এক মুহূর্ত থামলো বিনোদা। বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে,—তা হ'লেই হয়েছে। তুমিই দেখছি বশ করবে দাদাবাবুকে!

কথাগুলি শুধু শুনে যায় রাজেশ্বরী। আয়ত আঁখি-যুগলে চেয়ে থাকে ফ্যাল-ফ্যাল। বিনোদার এত দিনে যেন চোখে পড়ে, বৌটা রূপের ডালি। লণ্ঠনের আলোয় তবুও স্পষ্ট দেখা যায় না। যেমন রঙ, তেমনি গড়ন। যাকে বলে পটে আঁকা বিবি। দরজা ত্যাগ করে চলে যায় বিনোদা। যেতে যেতে বলে,—দাদাবাবু কি চট্ করে ফিরবে মনে করছো? স্বর্য্যি তা হ'লে পশ্চিম দিকে উঠতো আর পুবে অস্ত যেতো।

গহরজান হেসেও কেন যে হাসছে না, ভেবে পায় না কৃষ্ণকিশোর!

নিমন্ত্রণ রক্ষা করলো, তবুও মুখে হাসি নেই কেন? গহরজানের গম্ভীর মুখ, কথায় অভিমানের আভাষ। চাল-চলনে কেমন যেন ঔদাসীন্য। জরির ফিতায় জড়ানো লুণ্ঠিত বেণী কেবল প্রকাশ করে চাঞ্চল্য। চলা-ফেরায় হয়ে উঠে দোদুল্যমান। কিংখাবের কাঁচুলীতে বন্দী বিহঙ্গের মত বারে বারে মুক্ত হতে চায় নিটোল বক্ষ। গহরজান কাছাকাছি বসে একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে দু'হাতে মুখ রেখে। দাঁতে দাঁত চেপে বলে,—আমি যে বেহাত হয়ে যাচ্ছি! বেনেটোলার দত্তবাবু আমাকে কিনে নিতে চাইছে। মাসে দু'শো টাকা নগদ দেবে বলেছে হাত-খরচা। বলেছে, গয়নায় মুড়ে দেবে। থাকতে দেবে না এখানে, নিয়ে গিয়ে রাখবে আলমবাজারে, গঙ্গার ধারের বাগানবাড়ীতে।

কৃষ্ণকিশোর নকল হেসে বলে,—বেশ কথা। ভালই হ'ল, তোমার একটা হিল্লে হয়ে গেল।

কথায় কর্ণপাত করে না যেন গহরজান। বুক চিতিয়ে এলিয়ে পড়ে। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলে,—তোমার বুকে জ্বালা ধরবে না আমি যদি বেহাত হয়ে যাই?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—না। তোমার যদি ভাল হয়, আমার বুকে জ্বালা ধরবে কেন! আমি খুশী হব।

দেওয়ালের ঘড়িটা টিক-টিক বেজে যায় ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে। গহরজান ঘরের অর্গল ভেতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়েছে। তবুও আশ-পাশ থেকে ভেসে আসছে গানের কলি; তবলার তাল। নাচের ছন্দ।

তাকিয়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে গলার মালাটা দাঁতে কামড়াচ্ছিল গহরজান। তড়াক ক'রে উঠে প'ড়ে দেরাজ খুলে বললে নিজের মনে,—ভবিষ্যৎ ঠিক লাগছে না।

ভবিষ্যৎ ঠিক হওয়ার ওষুধ দেরাজে আছে না কি। ঠুং-ঠাং আওয়াজ উঠল দেরাজের ভেতর। গহরজান চোখে মোহ মাখিয়ে বললে ঠোঁটের এক কোণে হেসে,—দোস্ত, তুমিও এক পেয়ালা খাও। না খেলে মাইরী জরিমানা হয়ে যাবে। তোফা লাগবে, দু'চুমুক খেয়েই দেখো না।

ঢক-ঢক করে খেয়ে ফেললে গহরজান। এক পেয়ালা। কোমরে-গোঁজা জামরুল রঙের রুমালটা টেনে নিয়ে মুছলে মুখটা। একটা বোতল আর দু'টো পেয়ালা হাতে নিয়ে বসলো তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে।

বেহাত হয়ে যাওয়ার ভীতিতে যেন মগ্ন হয়েছিল কৃষ্ণকিশোর। বললে,—তুমি বলছো যখন দাও খাই। লেমনেড বললে কিন্তু আর ঠকবো না! আমি বুঝেছি সোডা-লেমনেড নয় ও।

—তবে?

পেয়ালা এগিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করে গহরজান। হাসি চেপে বলে,—সাফ বললে যে তুমি ফেসাদ করতে তখন। বেগার ভয় পেতে।

গহরজানের চোখ নেই শাড়ীর আঁচল স্খলিত হয়ে লুটোচ্ছে মাটীতে। কেমন যেন বেহুঁস হয়ে আছে। হায়া হারিয়ে ফেলেছে। কোমর থেকে শাড়ীও খসে পড়-পড় হয়েছে খেয়াল নেই।

পেয়ালাটা মুখে তুলতে গিয়ে তোলে না কৃষ্ণকিশোর। পেয়ালার জলে যেন একটা মুখ ভেসে ওঠে। পাৎলা রঙ যেন এক পেয়ালা। টলমল করছে। দেখা যায় শুধু একটা মুখবিম্ব। বেশ কিছুক্ষণ দেখে বোঝে যে মুখ অন্য কারও নয়। নিজের মুখের ছায়া!

পেয়ালা শেষ করে মুখটা বিকৃত করে কৃষ্ণকিশোর। মুচকি হেসে গহরজান বলে,—মসলা খাবে?

একটা রূপোর রেকাবী ঠেলে দেয় কথা বলতে বলতে। বলে,—মৌরী খাও, এলাচ খাও, ঝাঁজ লাগবে না। জোনাকীর মত জ্বলে আর নিবে যায় না কি কেউ। কথা বলতে বলতে গহরজানের মুখাবয়বে নামে বর্ষার মেঘ। হঠাৎ কেন গম্ভীর হয়ে গেল। ক'দিন থেকেই এমনটি হয়ে আছে গহরজান। হাসতে হাসতে বেবাক কেঁদে বোসছে কখনও বা। চোখ দু'টো কেবল জলসিক্ত হয়ে যায়, বেশী কাঁদে না গহরজান। ক'দিন থেকে যেন মুক্তি পাওয়ার লোভ জাগছে বুকের মধ্যে। এই পরিবেশ যেন আর ভাল লাগছে না। হীন, নোংরা, জঘন্য। যাকে-তাকে দেহ বিলিয়ে দিয়ে মুখের গ্রাস রোজগার করতে বাধ্য করেছে ঐ শয়তানী সৌদামিনী। বাদ সাধে[illegible]

গহরজান ভেবেছে যে, মাসীকে বিষ খাইয়ে দিলে কেমন হয়। শেষ হয়ে যায় ঐ মদ্দানি মাগী। তখন গহরজান খুশীমত বাঁচতে পারে। অনাহারেও মরতে পারে আল্লার নাম করতে করতে। সৌদামিনী যে অনেক পাপ করিয়েছে গহরজানকে। হাসিমুখে এগিয়ে দিয়েছে ব্যাধিতে পঙ্গু মানুষের কাছে, কুষ্ঠরোগীর কাছে। কত বেজাতের খপ্পরে ছুঁড়ে দিয়েছে গহরজানকে। সৌদামিনী মুঠো-মুঠো টাকা কুড়িয়েছে গহরজানকে সাময়িক বিক্রী করে দিয়ে।

কত পশু-মানুষ গহরজানকে খিমচে কামড়ে অজ্ঞান করে দিয়ে গেছে—সৌদামিনী তবুও কত রাত্রি রেহাই দেয়নি গহরজানকে। মানুষ ডেকেছে, টাকা নিয়ে ঘর দেখিয়ে দিয়েছে অম্লান বদনে।

—চোখে জল কেন তোমার? আমি চলে যাই এখন?

মৌরী চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞেস করলো কৃষ্ণকিশোর। আধ-বসা অবস্থায় ছিল গহরজান, দু'বাহুতে চিবুক রেখে। লজ্জা পেয়ে গেল যেন। হাসতে চেষ্টা করলো। দু'হাতের তালুতে চোখ ঢাকলো। বললে,—কোথায় যাবে?

—বাড়ী যাবো। কেমন অপ্রস্তুত হয়ে বলে কৃষ্ণকিশোর। কোঁচানো ধুতির কোঁচাটা ঠিক করে।

কথাটা ছড়িয়ে পড়েছিল তখন বাড়ীময়।

পুলিশ এসেছে। জেমস ব্র্যাডলে কাছারীর দালানে থেকে দেখছে চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে। সাদা জিনের মিলিটারী পোষাক দেখে যে-যার লুকিয়ে পড়েছে যে-যেখানে আশ্রয় পেয়েছে। শমন কৈ হাতে। তবে কেন পুলিশ এলো? রেজিমেণ্ট থেকে যেন ছিটকে এসে গেছে ব্র্যাডলে। ঘড়ি-ঘরে ঘণ্টা পড়তেই কব্জীর সঙ্গে মিলিয়ে নেয় সময়টা। হাত-ঘড়ি ছিল হাতে একটা—যেটা ছুঁড়ে যাকে-তাকে আহত করা যায়। ব্র্যাডলে, দলের লোকদের প্রতি কথা ছুঁড়লে—আর অপেক্ষা নয়। We will come to-morrow. It's useless to wait any more. কথার শেষে মাথায় শোলার সাদা টুপী চড়ালে ব্র্যাডলে। টুপীতে পেতলের চিহ্ন—ব্রিটিশ ক্রাউন। বুকে আরও কয়েকটা উচ্চ পদের নিশানা—আলো-আঁধারিতে চক্-চক্ করছে।

ফটক পেরিয়ে পথে যেতেই ব্র্যাডলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধ হয়েছে সে। ব্র্যাডলে যেন চোখের সমুখে দেখছিল, অশান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ। দুর্দ্দিনের কালো ছায়া।

বাঙলা দেশ থেকে গা ঢাকা দিয়ে কেউ কেউ চলে গেলো দেশান্তরে—বুঝেছে ব্র্যাডলে। কিন্তু যখন বুঝলো তখন জাহাজ বোধ হয় ভিড়েছে খেয়াঘাটে।

ব্যারাকে ফিরেই মিসেস্ ব্র্যাডলেকে বললে,—ডার্লিং, আমি আগুনের ফুলকি দেখতে পাচ্ছি। ভারতবর্ষে কোথাও কি দাবানল জ্বলেছে?

মিসেস্ তো পশম বুনতে বুনতে হতবাক্। ব্র্যাডলে

Oh! East is East, and West is west, and
never the twain shall meet,
Till Earth and Sky stand presently at
God's great Judgment Seat.

কবিতা বললে না তো ব্র্যাডলে, যেন গর্জ্জন করলে কিছুক্ষণ। কিপলিং আওড়ালে। দি ব্যালাড্ অফ্ ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট্।

মিসেস্ বললে,—কোথায় ছিলে এতক্ষণ? মুখ-হাত ধুয়ে এসো, কফি খাও এক কাপ।

ব্র্যাডলে একটা আরাম-কেদারায় শুয়ে পড়লো আড় হয়ে। বললে,—কয়েক মুহূর্ত্ত যাক্। গিয়েছিলাম তদন্ত করতে, দেখা পেলাম না।

দেখা পাওয়া যাবে কোত্থেকে।

পুরোহিত গণনাকার্য্যে দক্ষ। পুলিশ অপেক্ষা করছে শুনে ছক কেটে ব'লে দিলেন,—শীঘ্র, আসবেন না তিনি। বৃথা অপেক্ষা কেন?

ঘরে শুধু একটা আলো।

দেওয়ালগিরিতে স্থির জ্বলন্ত শিখা। চিমনিটা রঙীন, নাবিক-নীল রঙ। গহরজানের বাহু দু'টি শূন্য, গলায় শুধু ঝুলন্ত একছড়া মটরমালা। ঝুলছে ব'লে আভা ঠিকরোচ্ছে প্রায় অন্ধকার থেকে।

কৃষ্ণকিশোর রুমাল খুলে ধ'রলো। জড়োয়া টায়রার জৌলস দেখতে পায় না গহরজান। দু'বাহুতে চোখ ঢেকে যেন ঝিমোতে থাকে।

—তোমাকে দিলাম আমি।

চোখ মেলে তাকালো গহরজান। রত্নের ঝাঁপি খোলা পড়ে আছে জাফরানী আলপাকার রুমালে।

গহরজান ধীরে ধীরে তুলে নেয় গয়নাটা। নেড়ে-চেড়ে দেখে বোঝে মাথায় পরতে হয়।

দু'পাশে পরী-আঁকা আয়নার সামনে উঠে গিয়ে টায়রাটা লাগায় যথাস্থানে যত্ন সহকারে।

রাজপুতানীর মত দেখায় যেন গহরজানকে। জুড়ীতে আবদুল কি ঘণ্টা বাজায়? কোচম্যান কি ডাকছে ঘরে ফিরে যেতে? নেশা লাগে চোখে। না অন্য কারও জুড়ী?

মেবারের যুগের কোন এক রূপসী যেন। মধু-ঝরা হাসিতে ভরে যায় গহরজানের বর্ষার মেঘের মত মুখ।

—না, অন্য কাদের জুড়ী! ঘণ্টা বাজিয়ে পথ চলেছে। রাজেশ্বরীও সেই কথা ভাবে। জানলায় গিয়ে দাঁড়ায়। কালো আকাশে অজস্র নক্ষত্র দেখে। যেন জোনাকী দপ্-দপ্ করছে।

[ক্রমশঃ।

দেশের মনোভাবের পরিবর্ত্তন

ফাঁসীর আসামীরূপে বারীন্দ্র দাদা জেল হইতে তাঁহার পত্রের শেষাংশে রবীন্দ্রনাথের যে সঙ্গীতের কয়েকটি ছত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করায় রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের জাতীয় সঙ্গীত-গুলি ও তাহার সুর কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল তাহা স্মরণ হইতেছে। দেশের অবস্থার সহিত সঙ্গীতের ভাবধারা ও সুরের রকম যে ভাবে তখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার বিষয় এখানে কিছু বলা প্রয়োজন।

পূর্ব্বে দেশপ্রেমমুলক যে সকল সঙ্গীত হইত তাহার অধিকাংশ সঙ্গীতেই দেশের জন্য "অশ্রুবর্ষণ" ইত্যাদি দুর্ব্বল ভাব থাকিত। যেমন—

(১) "—একবার তোরা মা
বলিয়ে ডাক

* * * *

হিমাদ্রী পাষাণ কেঁদে গলে যাক—"

(২) "—এমনি করে দেশের তরে
দ্বারে দ্বারে ঝর আঁখি—"

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরে এ্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ প্রত্যহ গোলদীঘি হইতে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে মিছিল বাহির করিয়া কলিকাতা সহরের নানা রাস্তা পরিভ্রমণ করিত। জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেম উদ্‌বুদ্ধ করিতে ও তাহাদের উপর কি অবিচার হইতেছে, তাহা বুঝাইবার জন্য সঙ্গীত দ্বারা তাহাদের আকৃষ্ট করা হইত। ক্রমেই দেখা গেল জনসাধারণ দলে দলে মিছিলে যোগ দিতেছে।

অরবিন্দের পিতা ডাঃ কে, ডি, ঘোষ

এসিয়ার জাপান তখন য়ুরোপীয় শক্তি রুসিয়াকে যুদ্ধে হারাইয়াছে, দেশের মধ্যে এসিয়ার জাগরণ সুরু হইয়াছে বলিয়া সকলের বিশ্বাস হইল। ক্রমে সঙ্গীতের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। সঙ্গীতও হইল:

"কে আছ মায়ের মুখপানে চেয়ে, এস কে কেঁদেছ নীরবে

* * * * *

এনেছে জাপান উষা এসিয়ায়
মধ্যাহ্ন গরিমা স্বাধীন ভারত
আনিবে নিশ্চয় আনিবে
এস কে কেঁদেছ নীরবে"

সঞ্জীবনী অফিসে সহকারী সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মধ্যে মধ্যে আমাদের দেশের জাতীয় সঙ্গীতের ও সুরের দুর্ব্বলতার বিষয় কথা হইত। তাঁহাকে এক দিন আমি কয়েকটি গম্ভীর ও উত্তেজনাপূর্ণ গান শুনাই এবং দেশের মধ্যে উৎসাহ ও উত্তেজনাপূর্ণ সঙ্গীতের ও সুরের যে প্রয়োজন আছে তাহার আলোচনা করি। রবীন্দ্রনাথের 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটির ছন্দ ও সুরে তাঁহাকে গান লিখিতে অনুরোধ করি। দুই-এক দিন পরে

শ্রীসুকুমার মিত্র

জসিডি, রোহিণীতে শীলস্ লজ্—যেখানে প্রথম বোমা তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হয়

এক শেষ রাত্রে সঞ্জীবনী অফিসের সম্মুখে যুবকদের মুখে শুনা গেল :

"ওঠ রে ওঠ রে ওঠ রে তোরা
* * * *
দেখ রে দেখ রে যায় রসাতল
জাতীয় উন্নতি বাঙ্গালীর বল
রাজদ্বারে আর নাহি প্রতিকার
আপনার পায়ে দাঁড়া রে ভাই"

সতীশ বাবু আমাদের কিছু না বলিয়াই ঐ সুরে ও ছন্দে গানটি রচনা করেন। ঐ ভোর রাত্রেও এই গানে আমাদের বাড়ীর সম্মুখে ভীড় জমিয়া যায়। জনসাধারণ উৎসাহিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহারা বুঝিল সহজ-সরল পথে তাহাদের প্রতিবাদ গ্রাহ্য হইতেছে না।

এই সময়ে স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল, রাজা সুবোধ মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির মনোভাব কঠোর হইল। তাঁহাদের বিশ্বাস হইল, যে উপায়ে তাঁহারা রাজনৈতিক অধিকার চাহেন তাহা বিফল হইয়াছে। সে জন্য তাঁহারা সুরেন্দ্রনাথের পন্থা ত্যাগ করিয়া অন্য পথ ধরিলেন। তাঁহাদের দলকে "চরমপন্থী" বলা হইত।

যখন বহু আন্দোলনের পরেও বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদকে ভারত-সচিব Settled fact বলিলেন তখন বাঙ্গালী ধৈর্য্যের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নূতন নূতন জাতীয় সঙ্গীতে কীর্ত্তন এবং অন্যান্য দুর্ব্বল সুর বদলাইয়া গেল। তখন বলিষ্ঠ সুরে গীত হইল—

"আমরা যা করছি তা করবই করব
আমরা যা বলছি তা বলবই বলব
ছিন্ন কর ভিন্ন কর সাত কোটি প্রাণ হবই জড়
ঝঞ্ঝা তুফান সবই মোরা সইবই সইব
* * * * * *
যে পথে চলেছি মোরা চলবই চলব"

বাঙ্গালীর প্রতিজ্ঞাও আরও কঠোর হইল। তাহারা গাহিল পাশ্চাত্য রণবাদ্যের সুরে—

"অবনত ভারত চাহে তোমারে
এস সুদর্শনধারী মুরারে
* * * *
এস অরি-শোণিতে মেদিনী রঞ্জিতে
নববেশে ভীষণ অসি ধরি
এস ভারত পাশ নাশকারী—"

হোলির দিন মিরজাফর লেনের (বর্ত্তমান কলেজ রো) অধিবাসী ও ব্যবসায়ী স্বর্গীয় ভুপতিনাথ বসু ও বহু যুবক মিছিল করিয়া ৬ কলেজ স্কোয়ারের সম্মুখে আসিয়া গান গাহিতে লাগিলেন—

—"মনে রেখ হোরি খেলা
এ ত শুধু খেলা নয়
* * * *
এই যে মাখিয়া আবির
রঞ্জিত করেছ শরীর
মাখিতে হইবে রুধির
দিতে খেলার পরিচয়
* * * *
জগতে দেখাব সেদিন
হোরি খেলা কারে কয়"—

তাঁহাদের সাদা জামায় রঙ্গের ছোপ ঠিক রক্তের দাগের মত মনে হইতে লাগিল। মিছিল যখন এই গান করিতেছিল তখন অরবিন্দ আমাদের বাড়ীর রাস্তার দিকের বারান্দায় আসিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। ঠোঁটের কোণে তাঁর মৃদু হাসি।

প্রতিদিন নূতন নূতন গান রচিত হইতে লাগিল—

শেকল এত বাঁধছ কসে হঠাৎ কবে যাবে খসে
নড়বে পূত রক্ত মাখা হৃত তক্তখানি
অত্যাচারের প্রতিশোধ নারিবে করিতে রোধ
অধর্ম্মের পতন ইহা ধ্রুব সত্য মানি

কবিগুরু লিখিয়া চলিলেন—

(১) সোনার বাঙ্গালা আমি তোমায় ভালবাসি
(২) বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান
আমাদের ভাঙ্গা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান
(৩) ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে
ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে
* * * * *
(ওরা) ধর্ম্ম যতই দলবে ততই ধুলোয় ধ্বজা লুটবে (ওদের)
(৪) যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে
(৫) আমাদের যাত্রা হল সুরু * * *
* * *

এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক
ফিরবো না গো আর
(৬) তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে
তা বলে ভাবনা করা চলবে না
(৭) আজ বাংলা দেশের হৃদয় হোতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী

আর এক দিক হইতে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিলেন "আমার দেশ"
একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়

* * * * * *

আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য মানুষ আমরা নহি ত' মেষ

বাঙ্গলার জেলায় জেলায় এবং গ্রামে গ্রামেও নূতন নূতন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদসূচক সঙ্গীত তৈয়ারী হইয়া গীত হইতে লাগিল। জনসাধারণ এই সকল সঙ্গীতে আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াও বঙ্গচ্ছেদ দূর করিবে স্থির করিল। কলিকাতা হইতে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল, পাবনা হইতে কান্ত কবি, বরিশাল হইতে মুকুন্দ দাস ইত্যাদি বাঙ্গলাকে আলোড়িত করিলেন।

বোমা ও বিপ্লববাদ

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ আন্দোলনে সভা-সমিতি করিয়া প্রতিবাদ যখন নিষ্ফল হইতে লাগিল, যখন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অসার বলিয়া বহু লোকের মনে হইল, তখন তাহাদের মনোভাব আরও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তাহারা পূর্ব্ব পথ ছাড়িয়া অন্য পথ ধরিল। এই সময়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পরিচালিত 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় "কালী মায়ির বোমা"র কথা লেখা হয়। পরে বাঙ্গলা দেশে সত্যই বোমার বিকাশ হয়। বাঙ্গলা দেশে যেমন বয়কটের প্রস্তাব প্রথম হয়, বোমারূপ "দাওয়াই"র কথাও সংবাদপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়, তেমনি এই বাঙ্গলা দেশেই কংগ্রেস স্থাপিত হইবারও পূর্ব্বে ১২৯২ সালে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় এক বাঙ্গালী যুবক "আমরা কেন অস্ত্র পাইব না" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণে ইংরাজগণ যে বিভীষিকা উৎপাদন করিয়াছিল, তাহার কথা এখনও সমগ্র ভারতবাসী বিস্মৃত হয় নাই। তবুও তৎকালে সিটি স্কুলের শিক্ষক যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র ঐ প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতবাসীর মৌলিক দাবী উপস্থিত করেন।

বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তি জনসাধারণ সংবাদপত্রে পাঠ করে এবং তাঁহাদের দলের স্বদেশপ্রেম, সাহস, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গের বিবরণ জানিতে পারে। বারীন্দ্র বলেন, তাঁহাদের ভুল কোথায় হইয়াছিল, পরবর্ত্তী যাঁহারা, তাঁহারা এই সকল বিবরণ হইতে শিক্ষা লাভ করিবেন বলিয়া তিনি ঐরূপ স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন। জনসাধারণ উহা পাঠ করিয়া উৎসাহিত ও উত্তেজিত হয়। 'সঞ্জীবনী' কর্ত্তৃক যেমন বিলাতী বস্ত্র বয়কট করার প্রস্তাবে দেশের লোক প্রতিশোধ লইবার একটা উপায় পাইয়াছে মনে করিয়াছিল, তেমনি বোমা প্রকাশ পাওয়ায় অন্ধকারে নিরস্ত্র দেশবাসীর কয়েক জন একটা পথ দেখিতে পাইল।

সুরেন্দ্রনাথের ফুলার হত্যার চেষ্টা

এই পথে আপনাকে বলিদান করিবার জন্য কেবল মাত্র কয়েক জন যুবক বদ্ধপরিকর বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু নিয়মতন্ত্রবাদী নেতাদের কেহ কেহ ইঁহাদের সহিত কেবল যে মৌখিক সহানুভূতি করিতেন তাহা নহে, ইঁহাদের সহিত সংযোগ স্থাপনও করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের সময়ে বাঙ্গলায় রাজনৈতিক দল দুই ভাগে বিভক্ত হয়। একটির নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ—অপর পক্ষ তাহাদের নাম দেন 'মডারেট' দল। অপরটির নেতৃবর্গ ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ প্রভৃতি। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বেই অরবিন্দের নির্দ্দেশে বারীন্দ্র প্রভৃতি এক সন্ত্রাসবাদী দল গঠন করেন। প্রথম দিকে এই দলে ব্যারিষ্টার পি, মিত্র, পুলিন দাস প্রভৃতি ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি বরোদায় সেনাবিভাগে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন ও তথায় অরবিন্দের সহিত মিলিত হন, তিনিও এই দলে ছিলেন। দলাদলিতে উত্যক্ত হইয়া যতীন্দ্রনাথ দল ছাড়িয়া দিলেন ও পরে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া নিরালম্ব স্বামী নাম ধারণ করেন।

'মডারেট' নাম দিয়া অপর দলকে সভায় ও সংবাদপত্রে নানা প্রকারে জনসাধারণের সমক্ষে হেয় করিবার চেষ্টা করা আরম্ভ হইল। কিন্তু দেখা যায় যে, নির্ব্বাসিত নয় জনের মধ্যে চারি জনই তথাকথিত মডারেট ছিলেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহারা কম শক্তিশালী ছিলেন না।

তথাকথিত মডারেট নেতা, যাঁহাকে মুকুটহীন নেতা বলিয়া সকলে বর্ণনা করিত, সেই সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তৎকালে গুজব শুনিয়াছিলাম যে, বারীন্দ্র প্রথম বোমা তৈয়ারী করিয়া পূজার ছুটিতে সেই বোমা সিমুলতলায় সুরেন্দ্রনাথের নিকট লইয়া যান। সুরেন্দ্রনাথ পৈতা ছুঁইয়া সেই বোমাকে আশীর্ব্বাদ করেন।(১)

পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট ফুলার সম্বন্ধে জনসাধারণ বিরুদ্ধ মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ এই ফুলারকে বধ করিবার জন্য সন্ত্রাসবাদীদের বিশেষ ভাবে উৎসাহ দেন। তজ্জন্য যাহারা এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিল তাহারা ফুলারকে বধ করিবার জন্য কি করিতেছে তাহার সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে দিত।(২) ফুলারকে বধ করিবার জন্য প্রফুল্ল চাকীকে

---

(১) 'যুগান্তর' দলের ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার "দ্বিতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ" নামক পুস্তকের ৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—বোমা নির্ম্মাণকালে সিমুলতলায় তাঁহাকে দেখান হইয়াছিল। ইহাই ভারতের প্রথম বোমা।

(২) উক্ত পুস্তকের ১৫২ পৃষ্ঠায় আছে "এই বোমা লইয়াই বারীন্দ্র পরে হেমচন্দ্র দাস ফুলারের পশ্চাদ্ধাবন করেন।"

রংপুর হইতে আনা হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের উৎসাহে বোমা লইয়া একবার বারীন্দ্র পরে হেমচন্দ্র দাস ও প্রফুল্ল চাকী ফুলারের অনুসরণ করেন। ফুলার যখন ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতেছিল তখন পথে তাহার প্রতি বোমা নিক্ষেপ করার জন্য তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল কিন্তু ফুলার অন্য পথে যাওয়ায় তাহারা ফিরিয়া আসে।(১)

এই সম্পর্কে ইহাও প্রকাশ করা যায় যে, ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীও অরবিন্দের বোমার দলকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। দেখা যাইতেছে যে, নিয়মতান্ত্রিক দলের অনেকে অরবিন্দের দলের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহারা বাহিরে তথাকথিত "আবেদন নিবেদন" পন্থার সমর্থক ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ নিয়মতান্ত্রিক মতাবলম্বী ছিলেন তাঁহার যৌবন হইতে। তাঁহার জীবনে ও সমস্ত কার্য্যে তিনি এই পথ ও মত অবলম্বন করিয়া চলিতেন। দেশসেবার জন্য তিনি আজীবন এই পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন। ভিতরে ভিতরে তিনি যে সন্ত্রাসবাদীদের সহিত হাত মিলাইয়াছিলেন তাহা দেশের কয়েক জন মাত্র জানিত। তাহাও তিনি দেশসেবার উদ্দেশ্যে করিয়াছেন। মাতা যেমন সন্তানকে রক্ষা করিতে বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে তেমনি সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিতে সন্ত্রাসবাদীর সাহায্য লন। এমন কোন কার্য্য ছিল না, যাহা তিনি জাতিকে রক্ষার জন্য না করিতে পারিতেন। লোকে ভুল বুঝিয়া তাঁহার দুর্ণাম করিলেও তিনি তাঁহার কার্য্যে পিছপাও হন নাই। তাঁহার আদর্শ ছিল ভারতবাসী তাহাদের নিজের দেশ শাসন করিবে। শাসন-সংস্কারের ফলে যখন ভারতবাসীকে মন্ত্রিত্ব করিবার অধিকার দেওয়া হইল তখন তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন এবং নিজ দেশের মন্ত্রী হইয়া দেশসেবার আরও সুযোগ পাইলেন। এই সময়ে নানা ভাবে তাঁহার অপবাদ করা হইত। "৬৪ হাজার টাকা বার্ষিক পাইবার লোভে তিনি মন্ত্রী হইয়াছেন ইত্যাদি।" নানারূপ অসত্য ও অপবাদ প্রচার করিয়া তাঁহাকে ভোটে হারাইয়া দেওয়া হইলে সম্ভবতঃ তিনি মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়াছিলেন। মহৎ ও সম্মানী ব্যক্তিকে অসম্মান করিলে তাঁহাদের মর্ম্মে এরূপ আঘাত লাগে যে, তাঁহাদের জীবনী-শক্তি শুকাইয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ উক্ত ঘটনার কয়েক মাস পরে পরলোকগমন করেন। এরূপ অবস্থায় মৃত্যুর আরও কয়েকটি ঘটনা জানা আছে।

যখন শাসন-সংস্কার হইল তখন সুরেন্দ্রনাথ বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন মাণিকতলা বোমার আসামীদের মুক্তি দিতে। এ জন্য তিনি বহু বার সিমলা যাইয়া কর্ত্তৃপক্ষদের অনুরোধ-উপরোধ করিয়া তাহাদের মুক্তি আদায় করিয়া লন। মনে হয়, তাঁহার এই কার্য্যের পশ্চাতে অনুশোচনা ছিল যে তাঁহারই উৎসাহে তাহারা এই পথে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিল? বা তিনিও কি নিজেকে সম-অপরাধী মনে করিয়া তাহাদের মুক্তির জন্য এত পরিশ্রম করিয়াছেন? আর কোনও নেতার ত' তাহাদের কথা মনে হয় নাই?

"বাঙ্গালী বিপ্লব"

পুনরায় বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের প্রথম দিকের কথা বলিতে হইতেছে। বঙ্গবিভাগ ব্যবস্থা দূর করিবার জন্য ক্রমে বাঙ্গালী বদ্ধপরিকর হয়। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সকল আদেশ ও উপদেশ মানিয়া লওয়াই ছিল এ দেশের অধিবাসীদের অভ্যাস। সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি গভর্ণমেণ্টের আদেশ মানিবেন না ও স্বীকার করিবেন না বলিয়া যে অভিনব আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, তাহার ধারা এ দেশে নূতন। যুবকগণ স্বতঃই ইহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এই সঙ্গে দেশের ভাবধারার বদলের সহিত বাঙ্গালীর অন্তর্নিহিত বহু সদ্গুণ বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। তখনকার বাঙ্গালীর মনোভাব কি পুণ্য ও পবিত্রতাপূর্ণ ছিল! বাঙ্গালী জাতি দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়া যেন অগ্নি-বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিণত হইল।

(১) লক্ষ্য করা গেল যে, পূর্ব্বে যখন দুই-এক জন মহিলা রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাইতে বাধ্য হইতেন তখন রাস্তায় সহস্র জোড়া চক্ষু তাঁহাদের প্রতি নিবদ্ধ থাকিত। কিন্তু এ সময়ে দেখা যাইত নারী দেখিয়া পথচারী মস্তক হেঁট করিয়া যাইতেছে।

(২) বাঙ্গালী নিষ্ঠার সহিত সততার পথ ধরিয়াছিল। নেতাদের আদেশে যুবকগণ বড়বাজারের বিলাতী বস্ত্রের দোকানের সম্মুখে পিকেটিং করিতে আরম্ভ করিল। যে সকল খরিদ্দার মাড়ওয়ারীর দোকানে বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিতে যাইত তরুণ বাঙ্গালী যোড়হস্তে তাহাদিগকে বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করিত। মাড়ওয়ারিগণ দেখিল যুবকদের চেষ্টায় বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় কমিয়া যাইতেছে। অনেক ক্রেতা বিলাতী বস্ত্র কিনিবার পরে যুবকদের অনুরোধে তাহা পুড়াইয়া ফেলিতেও রাজী হয়। তৎক্ষণাৎ রাস্তায় বহ্ন্যুৎসব হইত। এই ভাবে কয়েক দিন চলিবার পরে এক দিন পুলিশ কনষ্টেবল ও সার্জ্জেণ্ট সকল আসিয়া যুবকদের আক্রমণ করিল। কার্য্যে বাধা দেওয়া ও পুলিশকে প্রহার করার অভিযোগে স্বর্গীয় যতীন্দ্র সিংহ (পরে ব্যারিষ্টার) প্রভৃতি প্রায় ৭০ জন গ্রেপ্তার হয়। আমার স্বর্গীয় পিতা কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি সংবাদ পাইয়া তখনই থানায় যাইয়া এই সকল অপরিচিত যুবককে জামিনে খালাস করিয়া আনেন। সকল যুবকই পরদিন আদালতে উপস্থিত হয় ও অনেকের দণ্ড হয়। অপরিচিত হইলেও কেহ পলাইবার চেষ্টা করে নাই বা দণ্ড হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করে নাই।

প্রসঙ্গত ইহা জানা প্রয়োজন যে, তৎকালে দেশী মিলের

---

(১) উক্ত পুস্তকের ৪০ পৃষ্ঠা—"এই ফুলার বধ চেষ্টা ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রণোদিত হইয়াছিল।"

বস্ত্রের কাটতি ক্রমাগত বাড়িতেছে দেখিয়া এবং বিলাতী বস্ত্র অপেক্ষা দেশী বস্ত্রের মূল্য অধিক হওয়া সত্বেও বাঙ্গালী জনসাধারণ দেশী কাপড়ই চায় বলিয়া মাড়ওয়ারী বস্ত্র-বিক্রেতাগণ ও পরে বোম্বাইর মিল-মালিকগণও দেশী কাপড়ের মূল্য বাড়াইয়া দিয়া প্রচুর লাভ করিতে লাগিল। বাঙ্গলা দেশে দেশী মিলের কাপড়ের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। বাঙ্গালী ত্যাগ স্বীকার করিল এবং সস্তায় ভাল টেঁকসই বিলাতী কাপড় পাইতে পারে জানিয়াও, কম দিন স্থায়ী, মোটা ও মহার্ঘ দেশী কাপড় কিনিতে লাগিল। এদিকে বোম্বাইর মিল-মালিকদের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইল, তাহারা কাপড়ের দাম বাড়াইয়া দিয়া এত অধিক লাভ করিতে লাগিল যে, একটির স্থানে দুইটি মিল বসাইল। সেই সময়ে বাঙ্গালী ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিল বলিয়াই ও তখন অনেক মিল হওয়ায় আজ এই দুর্দ্দিনে ভারতবাসী কিছু মিলের কাপড় পাইতেছে। কিন্তু মিল-মালিকের অর্থ-লোলুপতা পূর্ব্বের ন্যায়ই তীব্র আছে।

(৩) ধর্ম্মতলা চোরঙ্গী প্রভৃতি সাহেবপাড়া দিয়া যাইবার সময়ে ভারতবাসী ইংরাজের সম্মুখে পড়িলে প্রায়ই ইংরাজের হাতে মার খাইত। ইহাতে কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি চারি-পাঁচ জন ঐ সকল পাড়ায় যাইয়া ইচ্ছা করিয়া সাহেবদের সম্মুখে যাইত এবং মারিবার জন্য ইংরাজ যখন আগাইয়া আসিত তখন তাহাকে বেদম প্রহার দিত। বিঘাটি ডাকাইতি মামলায় কার্ত্তিক বাবুর দণ্ড হয়।

দেশের ভাবধারা দ্রুত বদলাইতেছিল এবং আরও বদলাইতে সুরু করিল। ইহাকেই স্বর্গীয় অধ্যাপক বিনয় সরকার "বাঙ্গালী বিপ্লব" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ সময়ে কান্তকবি রজনীকান্ত বাঙ্গলার লোকদের পরিবর্ত্তন দেখিয়া গাহিয়া উঠিলেন—

বদলে গেল দেহের আকার বদলে গেল মন
তবু নয়ন মুদে অচেতন
*   *   *   *
যে মাকে তুই হেলা করে বলতিস কুবচন
সেই ক্ষমার ছবি বলছে তোরে ওঠ্‌, রে যাদুধন
ও তোর শিয়রে শমন।

এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ এই গান গাহিয়া মিছিল বাহির করিতেন। দেখা গেল, এক জন অপরিচিত ও বয়স্ক মুসলমান মিছিলের সহিত রোজই যোগ দিতেছেন। প্রথমে কেহ কেহ তাঁহাকে গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করিত। আমরাও তাঁহাকে দূরে দূরে রাখিতাম। পরে আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি এবং ক্রমে তাঁহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁহার নাম জানিলাম মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন। তিনি বিহার প্রদেশের বিহার-শরিফ সহরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গলা দেশে একটা আন্দোলন হইতেছে তাহার কথা শুনিয়া কলিকাতায় আসিয়া এই আন্দোলনে যোগ দিবার চেষ্টা করেন। এখানে আসিয়া আন্দোলনের মর্ম্ম বুঝিয়া মনে-প্রাণে এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির কাজ-কর্ম্মের সহিত মিশিয়া যান। আমরাও তাঁহাকে আপনার জনরূপে গ্রহণ করি।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রদ করিয়া বাঙ্গলা দেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইল। নেতৃবর্গ আশা করিতে লাগিলেন যে, কর্ত্তিত অংশ পুনরায় বাঙ্গলা দেশের সহিত মিলিত হইবে। বিহারের নেতৃবর্গও সেরূপ আশ্বাস দিলেন। কিন্তু সে বিষয়ে বিশেষ কোন আন্দোলন আর চলিল না। কর্ত্তিত অংশ আজও বাঙ্গলার বাহিরে আছে। একমাত্র মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন বৎসরাধিক কাল প্রত্যহ বৈকালে মিছিল লইয়া বাহির হইতেন ও ৩০শে আশ্বিনের ব্রত উদ্‌যাপন করিতেন। অরবিন্দের সহিত মৌলবী লিয়াকতের ৬ কলেজ স্কোয়ারে সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। কি মহাপ্রাণ ছিলেন এই মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন।

এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির কার্য্য

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি কার্লাইল ও রিজলী সার্কুলারের প্রতিবাদে স্থাপিত হয়। ইহার অফিস প্রথমে ৬ কলেজ স্কোয়ারে ছিল। স্কুল হইতে ছাত্রদের বহিষ্কার করা অথবা স্কুল ডিসএফিলিয়েট করার যে ঝড় বহিতেছিল, অনেকেই হয়ত জানেন না তাহা স্যার আশুতোষ মুখার্জির বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপে মন্দীভূত হয়। তদুপরি সোসাইটির সেক্রেটারী শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর আবেগময়ী বক্তৃতার ফলে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; তাহার প্রথম অধ্যক্ষ হইলেন অরবিন্দ, সুতরাং সেদিকে সোসাইটির কার্য্য কমিয়া আসিলে, বিলাতী বস্ত্র বয়কট করিয়া যাহাতে দেশবাসী দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করে, তজ্জন্য নেতাগণ পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতে বলেন। আমরাও সে বিষয়ে মনোনিবেশ করি। ইণ্ডিয়ান ষ্টোর মিঃ জে, চৌধুরী ব্যারিষ্টার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত এবং স্যার আবদুল হালিম গজনভী ইউনাইটেড বেঙ্গল কোং চালাইতেন। সেই দুই দোকান হইতে দেশী কাপড় আনিয়া আমরা কাপড়ের মোট মাথায় করিয়া বাড়ী-বাড়ী যাইয়া দেশী বস্ত্র কিনিবার জন্য গৃহস্থদের অনুরোধ করিতাম। ৮।১০ জন যুবক মোট মাথায় করিয়া প্রত্যহ ৭।৮ ঘণ্টা রাস্তায় রাস্তায় দেশী বস্ত্র ফিরি করিয়াছি। সন্ধ্যায় সোসাইটির কার্য্যালয়ে ফিরিবার সময়ে রজনীকান্ত সেনের সঙ্গীত করিতে করিতে ফিরিতাম।

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই
দীন দুখিনী মা যে তোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই"

এই সকল কার্য্যের মধ্যেও মাঝে মাঝে অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। যখন 'বন্দে মাতরম্' নামে দৈনিক ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশিত হয় তখন পত্রিকার স্তম্ভে চলতি

বিষয়ে আমি চিঠি প্রকাশের জন্য পাঠাইলে তিনি তাহা সকল সময়েই প্রকাশ করিয়াছেন।

ফেডারেশন হল স্থাপন করিবার জন্য যে বৃহৎ জমি ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহার এক অংশ ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, এক অংশ মূক ও বধির বিদ্যালয় ও অন্যান্য লোককে বিক্রয় করা হইবে শুনিয়া 'বেঙ্গলী' পত্রে আমার নাম না দিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এক চিঠি লিখি। স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র রায় ঐ পত্রিকায় চিঠিতে প্রকাশ করেন যে, আমার ভুল হইয়াছে। উক্ত পত্রিকায় বাদানুবাদ হয়। এই সকল পত্র অরবিন্দ নিজে দেখিয়া চোস্ত ইংরাজীতে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেন। শেষ চিঠির শেষাংশে অরবিন্দ যোগ করিয়া দিলেন এই 'পিতৃতুল্য উপদেশ দিতেছি যে বিপক্ষ যেন হঠাৎ সংবাদপত্রে দৌড়িয়া না আসেন'!

ক্রমে সোসাইটির ঘরে কাঠের র‍্যাক স্থাপন করিয়া দেশী মিলের কাপড় আনিয়া রাখা হইল। কলিকাতার বড়বাজারের দেশী বস্ত্রবিক্রেতা স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী সেন ধারে আমাদের নিকট বস্ত্র বিক্রয় করিতে দিতেন ও প্রতি শনিবার তাঁহার প্রাপ্য লইয়া যাইতেন। এক পয়সা লাভ না রাখিয়া যে পাইকারী দামে কাপড় কেনা হইত সেই দামে খুচরা কাপড় বিক্রয় করা হইত। এই জন্য কাপড় অনেকটা সুলভে পাওয়া যায় বলিয়া জনসাধারণ বাজার ছাড়িয়া কলেজ স্কোয়ারে আসিয়া কাপড় কিনিতে লাগিল। দেশী কাপড়ের কাটতি বাড়িতেছে দেখিয়া মাড়ওয়ারী বস্ত্রবিক্রেতাগণ দেশী কাপড়ের দাম আরও চড়াইয়া দিল। বাঙ্গালী ব্যবসায়ী কুঞ্জবিহারী সেন নেতাদের অনুরোধে তাহা করিলেন না। সোসাইটিও ক্রয়মূল্যে কাপড় বিক্রয় করিত। কর্ম্মিগণ ঘরের খাইয়া দোকানে আসিয়া সমস্ত দিন পরিশ্রম করিত।

ক্রমেই সোসাইটির কাপড় বিক্রয় বাড়িতে লাগিল। যখন গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার বাড়িত তখন বেশী কাপড় বিক্রয় হইত। বরিশালে এ্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটির সভ্যবৃন্দের উপর পুলিশের লাঠি চালনায় সর্ব্বপ্রথম স্বর্গীয় ফণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (পরে ব্যারিষ্টার) আহত হন, পরে শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, হেমচন্দ্র সেন প্রভৃতি অনেকে আহত হন। তথাপি তাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে অথবা লাঠির আঘাত ফিরাইতে হাত পর্য্যন্ত উঠান নাই। নেতাদের আদেশ ছিল পড়িয়া মার খাইতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী অনুরূপ আদেশ দিয়াছিলেন উক্ত ঘটনার বহু বৎসর পরে। বরিশালে গভর্ণমেণ্টের এই অত্যাচারের পরে এ্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটির বস্ত্র বিক্রয় মাসে এক লক্ষ টাকা উঠিয়াছিল।

বরিশাল হইতে এ্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটির সদস্যগণ যেদিন শিয়ালদহ ষ্টেশনে ফিরিলেন, সেদিন সকালে তথায় সহস্র সহস্র কলিকাতাবাসী তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হন। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সভ্যগণকে পুরোভাগে রাখিয়া এক মিছিল গঠিত হইল, তাঁহারা গান গাহিতে গাহিতে চলিলেন।

"মা গো যায় যেন জীবন চলে
* * * *
বেত মেরে কি মা ভোলাবে
আমি কি মার সেই ছেলে
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে"—

মিছিল আসিয়া গোলদীঘিতে পৌছিল। তখনই এক সভা হইল। সভায় এক গুপ্তচর দেখিয়া উত্তেজিত জনসাধারণ তাহাকে প্রহার করিতে থাকিলে নেতাদের আদেশে তাহারা নিবৃত্ত হয়।

সোসাইটির কার্য্য কেবল উপরোক্ত সকল বিষয়ে আবদ্ধ ছিল না। আজকাল যেমন হরতাল করিবার কথা মুখে বলিলেই সহরের সমস্ত দোকান বন্ধ হইয়া যায়, তখন এত সহজ ছিল না। ৩০এ আশ্বিন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ দিবসে "দোকান-পাট বন্ধ করিবার জন্য" ব্যবস্থা করিতে হইত। যাহাতে কলিকাতার সকল বাজারের সকল দোকান প্রতিবাদস্বরূপ বন্ধ করে তাহার চেষ্টা করিবার জন্য উক্ত দিবসের তিন মাস পূর্ব্ব হইতে দোকানের মালিকদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া তাঁহাদিগকে নানা ভাবে বুঝাইয়া, তর্ক-বিতর্ক করিয়া রাজী করিতে হইত। অনেকে লোকসান সহ্য করিতে রাজী হইত না। দোকানদারদের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ তখনও আসে নাই। কলিকাতার বাজারে বাজারে যাইয়া বাজারের মালিকদের অনেক অনুরোধ উপরোধ করিতে হইত যাহাতে বাজারের মালিকগণ ৩০এ আশ্বিন বাজার বন্ধ রাখেন। দিনের পর দিন চলিয়া যাইত। কথা বলিতে বলিতে আমাদের গলা শুকাইয়া যাইত। অনেক মালিক রাজী হইতেন না। কেহ বা অপমান করিতেন, কেহ তিরস্কার করিতেন। নিরুপায় হইয়া, এমন কি বাদায় যাইয়া জেলেদের পর্য্যন্ত বাজারে আসা বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। সোসাইটি যে ভিত্তি গড়িয়া দিয়াছিল তাহার ফল পরবর্ত্তী কালের সকলে লাভ করিতেছে।

তিন মাস চেষ্টার পর ৩০এ আশ্বিন দেখা যাইত কলিকাতা সহরের কতকগুলি দোকান ও বাজার বন্ধ আছে। তাহাতেই শ্রম সফল মনে করিতাম। অরবিন্দ যখন পণ্ডিচেরী চলিয়া যান তখন এ্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটির কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে।

মাতৃগৃহে অরবিন্দ

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, আমরা প্রতিবার পূজার ছুটিতে দেওঘর যাইতাম। তথায় প্রায় প্রতিবারই অরবিন্দ বরোদা হইতে আসিতেন। তখন আমার মামা যোগীন্দ্রনাথ বসু, বারীন্দ্র, অরবিন্দ, আমার অন্যান্য মাসতুত ভাই ভগিনী মামা, মাসী সহ প্রভাতে পদব্রজে রোহিণীতে যে বাড়ীতে আমার বড় মাসীমা অর্থাৎ অরবিন্দের মাতা থাকিতেন তথায় সকলে মিলিয়া যাইতাম ও বারান্দায় বনভোজন করিতাম। অরবিন্দ

তাঁহার মাতার সহিত সেখানে সাক্ষাৎ করিতেন। রোহিণীর এই বাংলো তথাকার ধনী তারিণী রায়ের ছিল। ইহা একটি বৃহৎ বাগান ও তাহার মধ্যস্থলে ইংরাজদের ধাঁজে খোলার ছাদের বাংলো ছিল। ঐ বাড়ীতে আমরা সমস্ত দিন হৈ-হল্লা করিয়া সন্ধ্যায় দেওঘর ফিরিতাম।

অরবিন্দ বিলাত হইতে ফিরিয়া তাঁহার মাতার জন্য প্রতি মাসে অর্থ পাঠাইতেন। নিমোনিয়া রোগে দেওঘরের পিতৃগৃহে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। অরবিন্দ জেল হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে আমরাও পূজার ছুটিতে দেওঘর যাই নাই এবং তিনিও যান নাই। অরবিন্দ তাঁহার একমাত্র ও কনিষ্ঠা ভগিনী সরোজিনী দিদিরও শিক্ষার ব্যবস্থার ভার লইয়াছিলেন। তাঁহাকে দার্জিলিং ও অন্যান্য স্থানে স্কুলের বোর্ডিংএ রাখিয়া দিয়াছিলেন। এরূপ দেখিয়াছি যে, দেওঘরে বা অন্যান্য স্থানে তাঁহার গুরুস্থানীয় মামা, মাসী প্রভৃতি যখন যে কথা বলিয়াছেন তাহাই তিনি পালন করিয়াছেন। হয়ত কেহ তাঁহাকে ঘরের এমন স্থানে সরিয়া বসিতে বলিল, সেখানে বসিলে তাঁহার অসুবিধা হয়, তথাপি আদেশ পালন করিবার জন্য তাহাই করিলেন। কোনও প্রতিবাদ করেন নাই। ভাল হউক মন্দ হউক, সকল খাদ্যই আহার করিতেন। মন্দ খাদ্যের জন্য কখনও বিরক্ত হইতে দেখি নাই। দেওঘরের চালে যেরূপ কাঁকর তাহা তথায় যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারা জানেন। অরবিন্দ অম্লান-বদনে তাহা গলাধঃকরণ করিয়াছেন। কোন কোন সময়ে বয়ঃকনিষ্ঠদের কথাও মানিয়া লইয়াছেন। এইরূপ নম্র মানুষটি ছিলেন অরবিন্দ। কিন্তু ভিতরে জ্বলিত অগ্নি অপর দিকে দিব্য জ্যোতি।

বাঙ্গলা দেশে যখন বর্গীর আগমন হয়, সেই মহারাষ্ট্রীয়গণের আধিপত্য কালে কোন কোন মহারাষ্ট্রীয় বাঙ্গলা দেশে তালুক পান। সাঁওতাল পরগণা বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহারাষ্ট্রের দেউস নামক গ্রামের এক ব্রাহ্মণ কর্ম্মাটারের নিকট এক তালুক পান। সেই বংশে সখারাম গণেশ দেউস্কর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেওঘর স্কুলে যখন শিক্ষকতা করিতেন তখন স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বসু সেই স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। যোগেন্দ্র বাবুর বাড়ী ছিল ২৪ পরগণার ন্যাতড়া গ্রামে। তাঁহার সহিত রাজনারায়ণ বসুর আলাপ ছিল। সেই সম্পর্কে সখারাম বাবুর সহিত রাজনারায়ণ বসুর পরিচয় হয়। সখারাম বাবুকে প্রায়ই রাজনারায়ণ বসুর বাড়ীতে আসিতে ও তাঁহার সহিত ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ করিতে দেখিতাম। বারীন্দ্র দেওঘর স্কুলে তাঁহার ছাত্র ছিল। সখারাম বাবুর সহিত অরবিন্দের এইখানে পরিচয় হয়।

রোহিণীর বোমার কারখানা

অরবিন্দের মাতার এক বিশ্বস্ত সাঁওতাল চাকর ছিল। যখন মাণিকতলার বোমার মামলায় বারীন্দ্র প্রভৃতি পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হন, তখন এই চাকরটি রোহিণীর পূর্ব্বোক্ত বাংলোতে বোমা তৈয়ারীর যাহা কিছু সাজ-সরঞ্জাম ছিল বলিয়া সন্দেহ করিয়াছে এরূপ লোহা-লক্কড় লইয়া রাত্রে রোহিণীর রেল-লাইনের পশ্চিমে কুতনিয়া নামক নদীর বালির মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখে। বোমারুরা রোহিণী গ্রাম হইতে উত্তরে রেল-গুমটির পার্শ্বে "শীলস্ লজ" নামে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়াছিল। তথায়ও বোমা প্রস্তুতের জিনিষপত্র, এসিডের শিশি, রাসায়নিক পদার্থ ও ভারী লোহার যন্ত্রাদি ছিল। এই সাঁওতাল সেই সকলও লইয়া রাত্রে রাত্রে উক্ত নদীর মধ্যে প্রোথিত করে। এই সকল ফেলিয়া দিবার পরামর্শ বারীন্দ্রের মামা স্বর্গীয় মণীন্দ্রনাথ বসু দিয়াছিলেন। প্রায় ২৫ বৎসর পরে বর্ষার প্লাবনের জলে বালি ধুইয়া ঐগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকলের ইতিহাস, অনভিজ্ঞ লোকদের নিকট বহু কাল পরে কৌতূহলের বস্তু হইয়াছিল। কারণ, গ্রামাঞ্চল হইতে বহু দূরে নদীর গর্ভে কি প্রকারে লৌহের যন্ত্র, বড় বড় বোতল প্রভৃতি আসিল, কেহ ঠাহর করিতে পারে নাই। বিশ্বাসী সাঁওতাল ভৃত্য গভীর রাত্রে এই সকল ভারী দ্রব্য বহিয়া লইয়া গিয়া নদীর বালির মধ্যে বাঘ, নেকড়ে ও হায়না-পূর্ণ স্থানে যাইয়া মনিবের পুত্রকে ও তাহার বন্ধুবর্গকে বাঁচাইবার জন্য একাকী কি অতুলনীয় চেষ্টা ও শ্রম করিয়াছিল! এই নদীর পশ্চিমে গভীর জঙ্গলপূর্ণ দিঘড়িয়া পাহাড় অবস্থিত। এই পাহাড়ে বোমা পরীক্ষা করিতে যাইয়া উল্লাসকর দত্ত আহত হয় এবং পণ্ডিচেরীর সাহিত্যিক সুরেশ চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতা প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী হত হয়। শীলস্ লজের যে ছবি সেকালে তুলিয়াছিলাম তাহা প্রকাশিত হইল। এই একতলা বাড়ী যশিডি হইতে প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে ও রোহিণীর আমার বড় মাসীর বাড়ী হইতে প্রায় এক মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে এক রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। যশিডি ও রোহিণীর মধ্যে এই বাড়ী ছাড়া তখন অন্য বাড়ী ছিল না। পথে কেহ আসিতেছে কি না তাহা বহু দূর হইতে দেখা যাইত। নির্জ্জন স্থানে ও রেল-লাইনের পাশে এই বাড়ী ছিল।*

[ক্রমশঃ।

* পৌষ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে ৩৩১ পৃষ্ঠায় রাজনারায়ণ বসুর শ্বশুর বলিয়া মদনমোহন দত্তের নাম লেখা হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে অভয়াচরণ দত্ত হইবে।

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

বিমার্গ—বিপথ, কুপথ, চোরাপথ।
বিমুক্ত—ছাড়ান, মোক্ষপ্রাপ্ত, উদ্ধৃত।
বিমুক্তি—উদ্ধার, ত্রাণ, মুক্তি, অপবর্গ।
বিমুখ—অপ্রসন্ন, প্রতিকূল, পরাঙ্মুখ।
বিমুগ্ধ—মায়াবদ্ধ, মোহিত, মুগ্ধ, জড়ীভূত।
বিমোক্তা—ত্রাণকর্ত্তা, রক্ষক, মোচনকর্ত্তা।
বিমোচন—মুক্ত করণ, উদ্ধরণ, ক্ষমা করণ।
বিমোহ—মায়া, কুহক, ভ্রান্তি, জড়তা।
বিম্ব—চন্দ্র-সূর্য্যের মণ্ডল, প্রতিমূর্ত্তি, বুদ্বুদ।
বিয়ৎ—আকাশ দেখুন।
বিয়নি—বেণী, বিউনী, বিন্যস্ত কেশ।
বিযুক্ত—বিচ্ছিন্ন, বিরহী, বিয়োগী।
বিয়োগ—বিচ্ছেদ, বিরহ, অভাব, বিশ্লেষ।
বিযোড়—বিজাতীয় যুগ্ম, অযুগ্ম, বিষম।
বিরক্ত—অসন্তুষ্ট, ব্যস্ত, অননুরক্ত।
বিরচন—গ্রন্থরচনা করণ, গঠন, নির্ম্মাণ।
বিরত—নিবৃত্ত, ক্ষান্ত, নিরস্ত, উপরত।
বিরল—নিরালা, শূন্য, নিভৃত, নির্জ্জন।
বিরস—অস্বাদু, পানস্তা, বিস্বাদু।
বিরাগ—বৈরাগ্য, ঔদাস্য, অরুচি।
বিরাগী—বিরক্ত, বিবেকী, ঘৃণাযুক্ত।
বিরাজ—শোভা, আবির্ভাব, সৌন্দর্য্য।
বিরাম—নিবৃত্তি, ক্ষান্তি, বিশ্রাম, অবকাশ।
বিরাল—বিড়াল, মার্জ্জার, আখুভুক্‌।
বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, প্রজাপতি।
বিরুদ্ধ—বিপরীত, প্রতিকূল, অসঙ্গত।
বিরূপ—কুৎসিতাঙ্গ, কুরূপ, কদাকার।
বিরোধ—বিবাদ, কলহ, ঝকড়া, দ্বন্দ্ব।
বিল—গর্ত্ত, ছিদ্র, গুহা, কুহর, জলাশয়।
বিলক্ষণ—ভিন্ন, বিশেষ, উত্তম, অনুপম।
বিলগ্ন—বিলগ, অসংলগ্ন, অসংযুক্ত।
বিলন—বণ্টন, পরিবেশন, বিতরণ।
বিলপন—ক্রন্দন, রোদন, খেদকরণ।
বিলম্ব—গৌণ, ব্যাজ, টালমটাল।
বিলয়—প্রলয়, কল্পান্ত, বিনাশ, মোক্ষ।
বিলাপ—শোকোক্তি, ক্রন্দন, কাতরতা।
বিলাস—আমোদ, শারীরিক সুখানুভব।
বিলাসী—বিলাসক, কুশলী, আনন্দিত।
বিলিখিত—ডোরিয়া, রেখাযুক্ত।
বিলী—অংশ করা, ধার্য্য করা।
বিলীন—গলিত, অন্তর্হিত, দ্রবিত।
বিলোক—নির্জ্জন, নির্বাণ, মৃত।
বিলোম—বিপরীত, উল্টা, ব্যতিক্রম।
বিল্ব—শ্রীফল, বেল, বৃক্ষবিশেষ।
বিশাল—মহৎ, বৃহৎ, বিরাট, প্রশস্ত।
বিশিষ্ট—উৎকৃষ্ট, শিষ্ট, প্রসিদ্ধ, ভদ্র।
বিশুদ্ধ—পরিষ্কৃত, নির্ভুল, পবিত্র, শুদ্ধ, নির্ম্মল।
বিশেষ—বৈলক্ষণ্য, উপশম, প্রভেদ।
বিশেষক—ভেদসূচক, প্রভেদক, উপাধি।
বিশেষণ—প্রভেদক লক্ষণাদি, গুণবাচক।
বিশেষতঃ—অধিকন্তু, বিশেষরূপে।
বিশেষ্য—দ্রব্যবাচক, ভেদনীয়, উপাধি।
বিশ্রব্ধ—বিশ্বসিত, সহিষ্ণু, ধীর, বিশ্রান্ত।
বিশ্রম্ভ—বিশ্বাস, হর্ষ, কৌতুক, প্রেম।
বিশ্রান্ত—বিশ্রামপ্রাপ্ত, বিগতশ্রম, সুস্থ।
বিশ্রাম—বিশ্রান্তি, অবকাশ, বিরাম।
বিশ্রী—মলিন, কুশ্রী, কুৎসিত।
বিশ্রুত—খ্যাত্যাপন্ন, বিদিত, প্রথিত।
বিশ্ব—জগৎ, সর্ব্ব, ত্রিলোক, সমুদয়।
বিশ্বস্ত—বিশ্বাসযোগ্য, প্রত্যয়িত।
বিশ্বাস—প্রত্যয়, বিশ্রম্ভ, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা।
বিশ্বাসঘাতক—অবিশ্বাসী, অবিশ্বস্ত।
বিষ—গরল, মৃণাল, জল।
বিষণ্ণ—ম্লান, কাতর, ভাবিত, অবসন্ন।
বিষধর—অহি, ভুজঙ্গ, বিষদন্ত, সর্প।
বিষম—দারুণ, দুষ্কর, অতিশয়, অযুগ্ম।
বিষয়—বিত্ত, বস্তু, সম্পত্তি।
বিষয়ী—ব্যাপারী, ব্যবসায়ী, সাংসারিক।
বিষহর—বিষনাশক, বিষঘ্ন।
বিষাণ—কুম্ভ, হস্তির দন্ত, শৃঙ্গ।
বিষাদ—বিষণ্ণতা, মনস্তাপ, খেদ।
বিসম্বাদ—কলহ, বিরোধ, বিবাদ।
বিসৃষ্ট—নিবেদিত, ত্যক্ত, উৎসৃষ্ট।
বিস্পন্দ—অঙ্গকাঁপনি, স্পন্দন।
বিস্পষ্ট—সুব্যক্ত, প্রত্যক্ষ, প্রকাশিত।
বিস্ফোটক—বিস্ফোড়া, ফুস্কুড়ী, ব্রণ।
বিস্ময়—চমৎকার, ঘবড়ানী, আশ্চর্য্য।
বিস্মৃতি—ভুল, ভ্রম, ভ্রান্তি, লোপ।
বিহগ—বিহঙ্গম, পক্ষী, মেঘ, সূর্য্যাদি।
বিহর্ষ—আনন্দ, আহ্লাদ, অসন্তুষ্ট।
বিহার—ক্রীড়া, কেলি, রমণ, ভ্রমণ।
বিহ্বল—ক্ষুব্ধ, ব্যাকুল, ব্যস্ত, ভয়াপন্ন।
বীক্ষণ—অবলোকন, নিরীক্ষণ।
বীচি—তরঙ্গ, ঢেউ, ঊর্ম্মি, লহরী।
বীচী—বীজ, দানা, মূল, আদিকারণ।
বীজ—শস্য, দানা, আঁঠি, হেতু।

[ক্রমশঃ।

ভারতীয় রেনেশাঁস

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

কোন বিশেষ সমস্যা বিশ্লেষণের পূর্বে তিনটি সরল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আমাদের। ঐতিহাসিক আলোচনায় যুগবিভাগ ও দেশবিভাগ কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তবে তাদের সীমারেখা নির্দ্ধারিত হবে কি ভাবে? ঐতিহাসিক আলোচনায় এই প্রকার খণ্ডিত দেশ-কাল-পাত্রে কতখানি স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব? স্যার চার্লস ওমান যথার্থই বলেছিলেন যে, ঐতিহাসিকগণ সরল ভাবে 'হাঁ' 'না' উত্তর দিতে পারেন না। আমাদের উত্তরের সঙ্গে জড়িত থাকে অনেক 'যদি' ও 'অপিচ'।

ইতিহাসের ঐক্যে আমরা আস্থাবান। ঐতিহাসিকের মৌল ধার্মিকতা এরই উপর প্রতিষ্ঠিত। কালের সঙ্গে একসীমান্তিক না হতেও পারে ইতিহাস, কিন্তু ইতিহাস মানব-সমাজের অভিজ্ঞতার বিস্তৃত ক্ষেত্রেই প্রসারিত। ইতিহাস মানুষের কর্মধারার দর্শক। এক দুর্নিবার প্রেরণাবশে মানব জাতি সহস্র শতাব্দী ধরে অবিশ্রান্ত সাধনায় যে অপরিজ্ঞাত আদর্শকে লাভ করার জন্য চেষ্টা করছে, ইতিহাস সেই প্রচেষ্টাকে বিশ্লেষণ করে। বিস্মৃত অতীত হতে অজানা ভবিষ্যৎ অবধি নদীজলধারার মত ইতিহাস প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেই কারণেই ইতিহাসকে কালের সীমারেখা টেনে খণ্ডিত করা সম্ভব নয়। অতীতের বীজ বর্তমানে অঙ্কুরিত। ভবিষ্যৎ বর্তমানেরই দূর প্রতিচ্ছবি। অতীত যেমন অবিনশ্বর রেখাপাত করেছে বর্তমানের উপর, বর্তমানও ভবিতব্যকে সৃষ্টি করছে। অতীত ঘটনাপঞ্জী আলোচনা করি আমরা বর্তমানকে উপলব্ধি করার তাগিদে এবং যত স্বল্প পরিমাণেই হোক, ভবিষ্যতের গতি-প্রগতির স্বরূপ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করার জন্য। এই কারণে আমাদের ঐতিহাসিক খনিত্র অতীতকে আবিষ্কার করে এগিয়ে চলে। কিন্তু আমাদের যাত্রা যত অতীতের পথ ধরে অগ্রসর হয়, নিকট অতীত দূর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়, ঘটনাপুঞ্জ হতে কার্য-কারণের যুক্তি আবিষ্কৃত হয় এবং অবশেষে অতীতের পথরেখা যখন বিলীন হয়ে যায় এবং ইতিহাস পুরাণের জটিল গোলকধাঁধার মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু সে অবধি ইতিহাসের ধারা ব্যাহত বা ক্ষুণ্ণ হয় না। দু'-একটি গুটি হারালেও জপমালার সূত্রটি ঠিক থাকে। ঐতিহাসিকের দায়িত্ব অতীতকে পুনর্গঠিত করা, হারানো গুটিগুলি জোড় দেওয়া—মূল সূত্রকে ছিন্ন করা বা সত্যকে অবহেলা করা নয়।

ইতিহাসের ধারা অবিচ্ছিন্ন এ কথা স্বীকার করলে, কালখণ্ডিত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের লোকপ্রিয়তাকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? এর উত্তরও সহজ। ঐতিহাসিক বিপুলতা আমাদের স্বল্প জ্ঞানকে পরাজিত করে। সুতরাং সীমায়িত মেধা ও স্বল্প কালের পরিধির মধ্যেই মনঃসংযোগ করে আমরা সর্বোত্তম ফললাভের চেষ্টা করি। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ইতিহাসকে অনুধাবন করার পদ্ধতির জন্য আমরা জার্মান পণ্ডিতদের নিকট ঋণী, যাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর মনীষী ছিলেন। সে পদ্ধতিতে গবেষণা করার জন্য মূল নথীপত্র ও মালমশলা নিয়ে গভীর ভাবে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন হয়। এর ফলে স্বভাবতঃই গবেষণার বস্তু সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। যতই বিসদৃশ ঠেকুক, থিয়োরী ও প্র্যাকটিশের মধ্যে মূলতঃ কোন বৈষম্য নেই। এক জন বোটানিষ্ট তার গবেষণার জন্য একটি ফসিল বা কোন বিশেষ এলাকার ফুল বা শ্রেণীবিশেষের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন তাঁর বিজ্ঞানসেবার প্রতি বিন্দুমাত্র অসম্মান না করে। এক জন প্রাণীবিদ্ একই ভাবে বিশিষ্ট কোন একটি বিষয়ে গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন। তার অর্থ এ নয় যে, সামগ্রিক ভাবে জীব-জীবনের সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি অন্ধ। একই ভাবে ঐতিহাসিক যখন খণ্ডিত কালের ঘটনাপঞ্জীকে তাঁর গবেষণার উপজীব্য করেন, তিনি আপন গবেষণার ব্যাপ্তিকে অস্বীকার করেন না। বস্তুতঃ নিজের সীমাবদ্ধতাকেই তিনি প্রতিপন্ন করেন। ঐতিহাসিক যখন সাম্প্রতিক, মধ্যযুগীয় ও প্রাচীন এই তিন অধ্যায়ে ইতিহাসকে বিভক্ত করেন তিনি মূল ধারাকে খণ্ডিত করেন না, অস্বীকার করেন না বিগত এবং আগামী যুগের ধারাবাহিকতা। এ ক্ষেত্রে আদর্শের প্রত্যয় অপেক্ষা সাধনার সুবিধাকেই গ্রহণ করা হয়।

দেশ-কালে খণ্ডিত ঐতিহাসিক গবেষণার বিঘ্নও বহু। এক জন রাসায়নিক তাঁর লেবরেটরীতে একটি মৌলিক বস্তুকে নিয়ে গবেষণা করতে পারেন। এক জন প্রাণীবিদ্ একটি বিশেষ জীবাণুর জীবন-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। ঐতিহাসিক কি একই ভাবে বিশেষ কোন দেশের সম্বন্ধে ঐ ভাবে ইতিহাসের গবেষণা চালাতে পারেন? মনে করা যাক্, এই ভাবে ভারতের ইতিবৃত্ত কি গবেষণার বস্তু হতে পারে? ঘটনার আবর্তে জাফরান কাটা, ভারতবর্ষের অতীত কি কোন যুগে বাহির-বিশ্বের সমস্ত প্রভাবমুক্ত হয়ে থাকতে পেরেছিল? আমাদের জানা ইতিহাস তা বলে না। মহেনদজোড়ো ও হারাপ্পার শিলালিপির আজও আমরা পাঠোদ্ধার করতে পারিনি। সে যুগের মানুষ কি ভাষায় কথা বলত আমরা জানি না, কিন্তু এটুকু জানা গেছে যে খৃষ্টজন্মের বহু পূর্বে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের লুপ্ত নগরীগুলির সমাজ-সভ্যতার ঘনিষ্ঠ মিল ছিল। মেসোপটেমিয়ায় এবং মহেনদজোড়োয় যে একই ধরণের মৃত্তিকা-শিল্প, জীবজন্তু ও প্রাচীর-চিত্রণ পাওয়া গেছে তা কি কোন সূত্রে গ্রথিত নয়? সুমার ও আকাডের সভ্যতার সঙ্গে কি দ্রাবিড় সভ্যতার কোন যোগ ছিল না? পঞ্চনদের তীরে তীরে যে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল আর্যেরা, তা কি সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে যোগহীন হয়ে, না তাদের বিস্মৃত অতীত বাসভূমি হতে তারা এনেছিল তাদের সংস্কৃতির শিকড় বহন করে? ইতিহাসের যুগে উপনীত হলে আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন জাতির কীর্তিকলাপ। ইরাণী অভিযানের মশলা হারিয়ে গেছে, তাই ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা গ্রীক অভিযান। ভারতের অতীত ইতিহাসকে পুনর্গঠিত করার জন্য গ্রীক, সিংহলী, চীন ও তিব্বতী মালমশলা অবহেলা করতে পারি কি আমরা? ভারত ইতিহাসের পৃষ্ঠা যতই বর্তমান যুগের দিকে এগিয়ে আসে ততই বাহির-বিশ্বের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতর যোগ আমরা লক্ষ্য করি। জাতীয় গতি-প্রগতির কোন হিসাব না রেখেই সভ্যতা ও কৃষ্টি দেশে-দেশান্তরে বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

খণ্ডিত ইতিহাস নিয়ে গবেষণার কারণ অনেকাংশে মনস্তাত্ত্বিক ও লজিক ঘেঁষা। ইতিহাসের ঐক্য স্বীকার করলেও আমরা মানব জাতির প্রাণশক্তির বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করতে পারি না। মানুষের মন উদ্দীপনা ও পরিবেশের বিভিন্নতার সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে সাড়া দেয়। ভূগোলই ইতিহাসকে বিবর্তিত করে সত্য, কিন্তু মানুষের কাজের দ্বারাই ভৌগোলিক প্রভাব রূপান্তরিত হতে পারে। তার দৃষ্টান্ত আছে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবং ইংল্যাণ্ডে নূতন পৃথিবী আবিষ্কারের পরবর্তী কালে। মানব-সভ্যতার এক মৌল সত্য থাকলেও, তার নানা স্তর ও বৈচিত্র্য। ব্যক্তিগত মানুষ তার নিকট-প্রতিবেশীর সম্বন্ধেই অধিক আগ্রহশীল হয়। সেই কারণেই ইতিহাস আলোচনার প্রথম ধাপেই আমরা স্বদেশ, স্বজাতি ও সাম্প্রতিক কাল নিয়ে সুরু করি। ভারতীয় ঐতিহাসিক কংগ্রেস ও তার সাম্প্রতিক ভারতীয় ইতিহাস শাখার প্রবর্তনের প্রধান যুক্তি। সেই কারণেই ইতিহাসের পটভূমিকায় এতগুলি সামন্তরিক ও লম্ব রেখার সমাবেশ। কেবল মাত্র রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে তাই আমাদের তৃপ্তি নেই, সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও আমাদের অনুসন্ধিৎসা। বস্তুতপক্ষে ঘটনার চেয়ে চিন্তাধারা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। মানব জাতিকে যে চিৎশক্তি প্রেরণা দেয়, বাস্তব কার্যধারা ত সেই চিন্তা-মানসের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মানুষের চিন্তা স্থান-কালকে অতিক্রম করতে পারে কিন্তু একই চিন্তাপ্রবাহ পৃথিবীর সর্বাংশে সমান কার্যকরী না-ও হতে পারে। ইতিহাসের নানা অধ্যায়ে একই চিৎশক্তি কর্মব্যাপৃত ছিল না। সেই কারণে সকল দেশের পক্ষেই এক কাল রেখা টানা সম্ভব নয়।

বর্তমান যুগের সূত্রপাত কখন সুরু হয়েছে? বর্তমান, মধ্যযুগীয় ও অতীত এই তিনটি পারম্পরিক সম্বন্ধযুক্ত বলে কোন সীমারেখাই চিরকালীন হতে পারে না। নদীর গতিধারা যেমন পরিবর্তিত হয়, ইতিহাসেরও তেমনি কাল-বিবর্তন আছে। আর ভৌগোলিক সীমানার মত ঐতিহাসিক সীমান্ত স্পষ্ট নয়। ইতিহাসের কোন যুগ কোন এক বিশেষ বৎসরের বিশেষ দিনে আর এক যুগে বিলুপ্ত হয় না। পুরাতন কালকে ঘণ্টাধ্বনি করে বিদায় দিয়ে, সেই ঘণ্টাধ্বনিতে আর এক যুগকে আহ্বান করে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি না। দুই যুগ নদীজলের মত মিলিত হয়, তাদের সীমানা থাকে অস্পষ্ট, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সেই কারণে দুই ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে এক বিবর্তন কালকে স্থান দিতেই হবে।

ঐতিহাসিক যুগের মেয়াদ নির্ভর করে সেই যুগের প্রভাবশালী চিন্তার আয়ুর উপর। চিন্তার বিপ্রতীপতা পতন ও বিশৃঙ্খলতার সূত্রপাত করে। প্রাচীন কাঠামো ভগ্ন হতে সুরু হয়। কিন্তু সে নূতনের প্রতিষ্ঠা নয়। এই পতনকাল সেই বিবর্তনের অধ্যায়। নব যুগের সঙ্গে আসে শৃঙ্খলা ও সমন্বয়। যখন আদর্শ বাস্তবের সম্পর্কহীন হয়, ঘটনার সঙ্গে থিয়োরীর সংযোগ থাকে না, তখনই বিপ্লবকাল সমাসন্ন হয়। বিশৃংখলার মধ্য হতে শৃংখলা ও সমন্বয় আনে বিপ্লব। এই পরিবর্তন বহু বর্ষ ধরে চলতে থাকে। মোগল সাম্রাজ্যের পতন কখন সুরু হয়েছিল তা বলা সহজ, কিন্তু তার সঠিক তারিখ নির্দ্ধারণ করা কি সম্ভব? অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই অনিবার্য ধ্বংসের আসন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল কিন্তু এ কথা বলা কি নির্বুদ্ধিতা নয় যে, আলমগীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব শেষ হয়েছিল? মোগল সাম্রাজ্যের অবসান-লগ্ন কখন? নাদির শাহের আক্রমণ কাল? দ্বিতীয় আলমগীরের হত্যা? বৃটিশ কর্তৃক দিল্লী অধিকার? রাষ্ট্র হিসাবে মোগল সাম্রাজ্য বহু পূর্বেই নিঃশেষ হয়েছিল, নাদির শা' সেই শূন্যগর্ভতা প্রকট করেছিলেন। কিন্তু আদর্শহীন কাঠামো তখনো বিরাজমান এবং শাজাহানের লাল কেল্লায় বাদশারা সাড়ম্বরে সমাসীন। গত শতাব্দীর মধ্য পর্বের ঐতিহাসিক সংঘর্ষে তাঁরা অন্ধকারে বিলীন হলেন।

মোগল সাম্রাজ্যের অবসানের সঙ্গেই কি ভারতের নব যুগের সূচনা? অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও মানসিক দিক হ'তে মোগল যুগ সত্যই কি মধ্যযুগীয়?

সপ্তদশ শতাব্দীতেই য়ুরোপে নূতন বিপ্লবের জোয়ার আসে এবং মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের পরিবর্তে যুক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। অন্ধ সংস্কারের স্থান গ্রহণ করে যুক্তিবাদী জীবনদর্শন। পরবর্তী শতাব্দীতে ধর্ম তার কর্তৃত্ব হারায় এবং গীর্জা রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে। ধর্মতত্ত্বের স্থলে বিজ্ঞান মানব-সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে। এ সত্ত্বেও য়ুরোপে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি নব যুগের প্রবর্তন হয়নি। নব চিন্তাধারা তখনো মৃত্তিকায় শিকড় গাড়তে পারেনি, বিপ্লব-চেতনা কার্যকরী হলেও, চিন্তানায়করা তখনো নূতন যুগকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি বহু কাল অবধি। রুশো ভলটেয়ারের সঙ্গে বিপ্লব-যুগ সুরু হয়নি। হয়েছিল তাঁদের চিন্তাধারা যখন সাধারণের মনে নূতন এক ধর্মবোধকে জাগ্রত করতে পেরেছিল। জয়পুরের রাজ-জ্যোতির্বিজ্ঞানী পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখেছিলেন। য়ুরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণাগুলি পারসীক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন জয় সিং যদিও তিনি তাঁর যুগের অগ্রবর্তী ছিলেন। তাঁর যুগের চিন্তানায়ক তিনি ছিলেন না। আর এক জন পথিকৃৎ, বাংলা দেশের রামমোহন। কিন্তু যুগধর্মকে উপলব্ধি করার জন্য প্রতিভাবান মানুষদের নয়, সাধারণ নাগরিকদের মানসিকতাকে বিচার করা কর্তব্য। রামমোহনের যুগে সাধারণ মানুষ যুক্তির সঙ্গে সংস্কারের গোলমাল করত। ভারতবর্ষের যুক্তির যুগ, সাম্প্রতিক যুগ, বৈজ্ঞানিক যুগ এক শতাব্দীর অধিক প্রাচীন নয়। কিন্তু সে যুগও অতিক্রান্তপ্রায়। এই যুদ্ধ মানুষের সভ্যতায় এমন এক বিবর্তন সাধন করছে যে, যুদ্ধান্তকালে বহু প্রচলিত চিন্তা ও আদর্শ অর্থহীন হয়ে পড়বে এবং ভাবীকালের ঐতিহাসিক তার কাল সীমানা নূতন করে নির্দ্ধারণ করতে বসবেন।

সাম্প্রতিক ভারতীয় ইতিহাসের মূল উপজীব্য কি হবে? অনেকগুলি বিষয় উপস্থাপিত করেছেন ঐতিহাসিকগণ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন, ধনতন্ত্রের সমৃদ্ধি, গ্রামীন ভারতবর্ষের অবক্ষয়, সামরিক জাতীয়তাবাধের উৎপত্তি, প্রাচীন যুগের ক্রান্তি, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকিরণ, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি প্রভৃতি সব প্রস্তাবিত হয়েছে। এই সকল আলোচনায় কম পক্ষে এ যুগের শক্তিমান চিন্তাশক্তির কিছু ধারণা হওয়া সম্ভব। এই সকল বিভিন্ন চিন্তাধারা যে বিশেষ প্যাটার্ণে গ্রথিত হতে পারে, সে সাংস্কৃতিক মিলন। সাংস্কৃতিক মিলন ভারতে এবং পূর্ব-এশিয়ায় নূতন নয়। সুপ্রাচীন অতীত কাল হতে ভারত এক মিলনতীর্থ। এই ভারতে নানা ভাষা, নানা জাতি ও নানা সভ্যতা এক মহা সমন্বয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু

এ মিলনের সূত্র কি, বিদেশীয়ানার কতখানি আমাদের ধমনী গ্রহণ করেছে ও কতখানি পরিত্যাগ করেছে তা আমরা সঠিক জানি না। বৈদিক ও আর্য সভ্যতায় মহেনদজোড়ো ও হারাপ্পার সভ্যতার অবদান কত? দ্রাবিড়ী দেব-দেবীর কত জন যে হিন্দুর দেব-দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন কে বলবে? নাসাহীন সেই দস্যু কি তার সুশ্রী বিজেতার কৃষ্টিতে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি? চীন ও তিব্বত, গ্রীস ও রোম, ব্যাবিলন ও আসিরিয়া ভারতীয় সভ্যতায় কত দান দিয়েছে? আমাদের সংগ্রহে মালমশলা এত স্বল্প যে, অনেকাংশেই অনুমান আমাদের সহায়ক। এমন কি মোসলেম পর্বেও আমাদের ঐতিহাসিক মশলা ইচ্ছানুপাতে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আজ আর ভারতবর্ষ কল্পতরুর দেশ নয়। এখন প্রত্যেকটি সভ্য দেশের অতি নিকট সান্নিধ্যে ব্যাপ্ত পৃথিবীর রাজপথেই ভারতবর্ষের অবস্থিতি। পৃথিবীর যে কোন দেশে বাণিজ্যিক ওলট-পালট হলে তার প্রতিক্রিয়া হয় ভারতভূমিতে। লাতিন আমেরিকার কোন নগণ্য পল্লীতে কোন প্রতিভাশালী সাহিত্যিক জন্মালে, তার রচনার পাঠক থাকে আমাদের দেশে। ইউরোপে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটলে তার সুফলে আমরা অংশ গ্রহণ করি। পৃথিবীর ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কখনো দু'টি সংস্কৃতির এমন মিলন হয়নি, হয়নি, দুই সভ্যতার এমন একীকরণ, দুই জাতির মধ্যে এমন ফলপ্রসূ সংযোগ।

কিন্তু একটি বিষয় উল্লেখ করার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারছি না। এ যুগে য়ুরোপ ধর্মকে পিছনে ফেলে চলেছে। ভারতবর্ষে ধার্মিকতার স্থান কি? য়ুরোপের সংস্পর্শে এ দেশেও কি ধার্মিকতা বস্তুবাদের কাছে পরাজিত? ভারতের রাষ্ট্র ধর্মকে তার প্রেরণার উৎস হিসাবে গ্রহণ করেনি। কিন্তু এ যুগের রাজনৈতিক চেতনা কি আমাদের ধর্মপুস্তকের কোন প্রেরণার দ্বারাই উদ্বোধিত নয়? ব্রাহ্মণের প্রভাবমুক্ত রাষ্ট্রনায়করা সত্য। মহাত্মাজি ব্রাহ্মণ নন, মিঃ জিন্নাও মোল্লা নন। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহের এত সমীপবর্তী বলে হয়ত বা আমরা যথার্থ স্বরূপ চিনতে পারছি না। যে বিপুল পরিবর্তনের আবর্তে পড়েছে প্রাচীদেশ, তাতে এ কথা বলা চলে না যে, ভারত তার ধার্মিকতাকে বর্জন করে চলেছে কি না। বিজ্ঞান পৃথিবীতে বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছে প্রতিদিন। হয়ত দেখা যাবে ধর্ম শেষ অবধি বিজ্ঞানকেই আশ্রয় করে থাকবে, যে এক দিন ধর্মের ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়েছিল প্রবল ভাবে।

এ যুগের ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে অধিক গবেষণা ভারত অপেক্ষা ইংল্যাণ্ডে হয়েছে বলে আমার স্বদেশী ঐতিহাসিকগণকে আমরা দোষী করতে পারি না। আমাদের ব্রিটিশ বন্ধুরা বহু পূর্বে যাত্রা সুরু করেছিলেন। তাঁদের হাতে মালমশলা ছিল প্রচুর। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বাগারে আমাদের প্রবেশ ছিল সীমাবদ্ধ। যে ক'জন মাত্র সমুদ্র পার হয়ে লণ্ডন ও প্যারিসে গিয়ে গবেষণা করতে পেরেছেন, তাঁরাই সময় ও সাধনাকে স্বর্ণপ্রসূ করতে পেরেছেন। কিন্তু বর্তমানে ভারত সরকার তাঁর ভাণ্ডার মুক্ত করে দিয়েছেন সকল জ্ঞানলিপ্সু নাগরিকের জন্য। প্রাদেশিক সরকারগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন নিঃসন্দেহে। আজ সেই অমূল্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে স্কলারদের। সকলকে আহ্বান করছি আমি, মিলিত প্রচেষ্টায় কাজ করলে আমাদের সময়, শক্তি ও অর্থ কিছুই অপব্যয়িত হবে না। এই অনাবিষ্কৃত জ্ঞান-রাজ্যে অজস্র উপাদান রয়েছে।

কিন্তু কেবল মাত্র সরকারী ভাণ্ডারের সুযোগ নিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। দেশের সর্বত্র লোকের ঘরে ঘরে বহুমূল্য বিরাট রেকর্ড সঞ্চিত আছে। জমিদারের কাছারী-ঘরে, প্রাচীন মন্দির ও বিহারে, ধনীর প্রাসাদে, মুদীর হিসাবের খাতায়, ব্যাঙ্কারের খাতায়, ধোবীর হিসাবে, চাষীর মাসমাহিনার খতিয়ানে, গৃহিণীর বাজারের ফর্দে সর্বত্র এই উপাদান ছড়িয়ে আছে। এই সকল রেকর্ড পাওয়ার জন্য প্রদেশে প্রদেশে জেলায় জেলায় মিলিত সংগ্রহ-কার্য চালিয়ে যেতে হবে। পাঞ্জাবের এক সুসন্তানের আদর্শ অনুকরণ অপেক্ষা কল্যাণকর কিছু আর নেই। পঞ্চনদের জলধারা-বিধৌত দেশে জন্মগ্রহণ করে ডাঃ বালকৃষ্ণ তাঁর কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেন সুদূর মহারাষ্ট্র দেশে। প্রথমে ব্রিটিশ দপ্তরে কাজ সুরু করে পরে তিনি বেসরকারী ভাণ্ডারের দিকে মনোনিবেশ করেন। মহারাষ্ট্র দেশে তিনি সঙ্গিহীন যাত্রী ছিলেন না, সে দেশের বহু জ্ঞানী এই পবিত্র কার্যে জীবনপাত করেছেন। আমাদের দেবী বড়ো নিষ্ঠুরা। তিনি যে দয়াহীন দাবী করেন, ডাঃ বালকৃষ্ণের দুর্বল শরীর তার দায় বহন করতে পারেনি। তিনি কার্যমগ্ন থাকতেই চিরবিদায় নেন ইহলোক হতে। দু'বৎসর পূর্বে এলাহাবাদ সেসনে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠ আজও আপনাদের কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে। তিনি সরকারের নিকট এক প্রস্তাব করেন, ভারতীয় ঐতিহাসিক রেকর্ড কমিশনের মারফৎ যে বিদেশে রক্ষিত সকল রেকর্ড এ দেশে ফিরাইয়া আনা হউক। তাঁর সেই পবিত্র চেষ্টা সফল হবার পূর্বেই তিনি ধরাধাম পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর আত্মার সদ্গতি করুন পরমেশ্বর। তাঁর অসমাপ্ত কার্য শেষ করবেন তাঁর সহকর্মী ও বন্ধুগণ। তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবে তাঁর দেশবাসী।

ভারতের বর্তমান যুগের ইতিহাস অদ্যাপি অলিখিত। বিদেশীর চোখে ভারত এক বিচিত্র বিভিন্নতার দেশ। ভারতের কৃষ্টি কোন দিনই রুদ্ধদ্বার নয়, ভারতের সভ্যতা আক্রমণাত্মক নয়, ভারতের রক্ষণশীলতা সহনশীলতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী। নূতনের মোহে ভারত কোন দিন প্রাচীনকে অবমাননা করে না। তার জাতীয় ধর্ম বিলুপ্তি নয় গ্রহণ। গত দুই শতাব্দীর বাণিজ্যিক ও জাতিগত সংঘর্ষে ভারত তার আদর্শ রক্ষা করতে পেরেছে কি না, সে বিচার ভাবীকালের ঐতিহাসিকের। বর্তমান কালের সমস্ত উপাদান সেই ভাবীকালের ঐতিহাসিকের জন্য সঞ্চয় করা ও রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। সেই সকল মৌলিক উপাদান সকল ক্ষতি ও বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। আমাদের পবিত্র কর্তব্য জনচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা। জনসাধারণের অর্থ নৈতিক কর্তাদের নিকট আমাদের আবেদন ভারতের সরকারী ও বেসরকারী রেকর্ড দপ্তরের দিকে তাঁরা সজাগ দৃষ্টি দিন।

দাদামশাইয়ের চিঠি

[হঠাৎ ডাকে পাওয়া গেল স্বর্গত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ। পত্র কয়টি তিনি লিখেছেন 'ষ্টেটস্‌ম্যান' দৈনিক পত্রিকার সংবাদদাতা, সাংবাদিক শ্রীশচীন গুপ্তকে। হাসির লেখা প'ড়ে কেদারনাথকে জেনেছে বাঙলা ও বাঙালী। চিঠিগুলির পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে কেদারনাথের সাহিত্য-প্রতিভা বিকশিত হয়েছে, চিঠিগুলি শুধু পাঠের অপেক্ষা রাখে।]

৶

পূর্ণিয়া
10. 12. 41

প্রিয় শচীন,

পক্ষাধিক হ'ল তোমার দীর্ঘ ও সুন্দর পত্রখানি পেয়েছি। একটা লেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তা'তে যে এত' বিলম্ব হবে, সেটা অনুমান করতে পারিনি। তুমি কি মনে করচ' জানি না।

পত্র পাঠান্তে বুঝলাম—রাজধানী বা লাটধানী এখনো তোমাকে মুগ্ধ করতে পারেনি। তরুণদের সঙ্গে পরিচয় হ'লে, ও ভাব থাকবে না। সমানে সমানে বন্ধুত্ব হ'য়ে থাকে, সেটা কাজকর্ম না হওয়া পর্য্যন্ত, সহ্য করতেই হয়,—বড় ঘরের নিয়ম এই। দিল্লীতে প্রায় সকলেই শিক্ষিত,—সাহিত্যের চর্চ্চা আছেই, সেই তোমাকে সাহায্য করবে,—ভেব না।

রাজধানী নর-কঙ্কালের উপর প্রতিষ্ঠিত। গোর ও গোরো-স্থানই তার প্রধান দর্শনীয় ঐশ্বর্য্য। টোগ্‌লকের good luck, ও নাদীরের খাতিরে তা ভরা। কেল্লা আছেন, গুপ্তহত্যার জেল্লা নিয়ে,—রক্ত-লেখা অব্যক্ত ইতিহাস বক্ষে কোরে। উচ্চশিরে 'মিনার' আছেন সাক্ষ্যরূপে। তবে ঘটা আছে বটে পদস্থ অফিসারদের আকাশচুম্বী অট্টালিকার ও লেডিদের অট্টহাস্যের; অবশ্য তার আওতার পাশে দাসেদের (অর্থাৎ আমাদের) সস্তা প্ল্যানের প্লট্ মধ্যে, কষ্টে থাকবার cotও আছে,—দেওয়ালির মাটির প্রদীপে আদপলা তেলের আলোর মতো। সেই ঘোলেই দুধের স্বাদ মেটাতে হয়। মহিলারাও আছেন, সেফটি পিনে চৌহদ্দি আঁটা, কর্জ্জে প্রাপ্ত জর্জ্জেট সাড়ির মধ্যে, 'হার্'ও আছে হারমোনিয়মও আছে। ফ্যাসান্‌ও আছে, ফ্যসন্‌ও আছে, কারণ যথাসম্ভব দিন যাপনের প্রয়োজন আছে তো? মানুষকে এই ভাবেই 'দামী' আবহাওয়ার মধ্যে শোভন ভাবে থাকতে হয়। লাটধানীর বড় জ্বালা। 'সেক্রেটারিয়েট' কথাটি শুনতে বেশ মূল্যবান ও লম্বা, সে, (chariot) 'চ্যারিয়েট' যারা টানেন্ তাঁরাই তার wright জানেন। কষ্ট আমাদের ভাগ্যলিপি হলেও, আমাদের একটি গুণ আছে,—আমরা হাস্‌তে ভুলি না। ওই মুখোসই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। বুদ্ধিমান জাত্, আত্মরক্ষা করতে জানে।

তুমি ভেব না—মন বসতে দেরি হবে না। ভগবানের কৃপায় শীঘ্রই তার উপায় হবে।

উদয়শঙ্কর ভায়ার কল্যাণে নৃত্যের সার্থক অভ্যুদয় হয়েছে, বিশেষ নটরাজের তাণ্ডবের। দেখছি দুনিয়ায় তার প্রচণ্ড প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো। এখন বুকে পিঠে উপভোগ করবার সুযোগ উপস্থিত। জাপানও ঝাঁপান দিলেন। 'চা' পান ছাড়া আমাদের আর কোন্ কাজ আছে! অন্নবস্ত্র দুর্মূল্য, কয়লা ও নুণ মিলছে না—wagon-এর অভাব। এখনি এই অবস্থা! এখানে কাঠের দেখা কচিৎ ও কিঞ্চিৎ। আমার দুর্ভাবনা তাই। দেহটা জলেই ফেলে দেবে দেখছি—কাঠ মিলবে না।

বয়সের মতই আছি। Vertigoর show প্রায়ই আছে। সে বন্ধুর মতই এসেছে—"দেহভারটি" 'go' বা যায় যাতে।

কাশীতে এবার "প্রবাসী সম্মেলন", তাগিদ আসছে যাবার জন্যে। বলও নেই, সাহসও নেই।

আর সবই পূর্ব্ববৎ— এখন ভালবাসা লও।

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—তোমার addressএর বহরটি গহরজানের মতো লহর তুলে, লাটধানীর সম্মান রক্ষা করেছে দেখে সুখী হলাম। কেঃ

৶

প্রিয় শচীন,

মনে কিন্তু রেখো—"তোমায় হ'তে হবে কিছু",—সেই সাড়া জাগে যেন'—তোমার মনের পিছু।

শুভকামী
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ণিয়া
১৪ই নভেম্বর, ১৯৪১

৺

পূর্ণিয়া, ২৮-৪-৪২

প্রিয় শচীন্দ্র,

পত্র পেয়ে চিন্তা গেল। ভাবছিলুম ইরাণেই বা পাড়ি দিয়েছ। পত্রের সঙ্গে আনন্দও পেলুম। লেখার সামর্থ্যও নেই, অবকাশও নেই। খান্ দশবারো পত্র, জবাবের প্রতীক্ষায় তখন রয়েছে! ভালো আছ ও একটা কাজে লেগে আছ, এইতেই আমি খুশি। তোমার 'কনট রোডের' বর্ণনা বেশ লাগলো। দিল্লীর 'গোল্'-বাগিচায় সবুরে মেওয়া ফলবে,—কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য। এখানে নূতনের মধ্যে পলাতকদের দেখা পাচ্ছি, আর কয়লা চাল চিনি আটা আতঙ্ক বাড়াচ্ছে।

পাড়াগাঁয়ে থাকি মোরা—নয় এটা দিল্লী,
সিংহের কেশর নাই,—পথে থাটে 'বিল্লি!'
দাপট্ দব্‌দবা পাবে—যাঁরা 'কমিসনার্'—
পরের চিন্তা নাই তাঁদের—যাদের ভোটে 'অনার্'।
ধুলো পাবে, ধুলো খাবে—কাঁচা মেটে রাস্তা,—
শূন্যে ওড়ে 'মেটিরিয়েল্'—একদম্ খাস্তা!
তার উপর তাঁদের 'মোটর'—আঁধার করে চলে,
ভোটার্‌রা করজোড়ে—"ত্রাহি ত্রাহি" বলে।
তাঁদের রাস্তায় আলো জ্বলে, পাড়া অন্ধকার,
পড়ে মরুক্, সাপে কাটুক্—পরোয়া নেই তার।

বর্ষা, যে দিন,—ধুলো নেই—বাহার সেদিন কাদার—
বাড়ি ফিরতে 'ভুলো' বলে—"জুতো খোলো 'ব্রাদার্'!"—
—ব্যাটারা Carএতে যাবে—ছিটিয়ে দধিকাদা,
বেশ, টেনে হাঁটুর ওপর—কাপড় তোলো দাদা।"

চাপা যদি পড়ে কেউ—সে-ই দেয় fine,—
—না হয় প্রাণ,—এই হেথাকার আইন্।
দিনরাত চিন্তার circle মাথায় সদা ঘোরে,
মোদের এই সম্পত্তি সঁপি—'ইউক্লিড' গেছেন মোরে!
দিল্লীতে গোলাকার সবি—গাছে চলে কাঁচি,—
হেথায় তা 'পকেটে' চলে,—বেশ সুখে আছি!

মোদের "কনট্ রোডে"—গো-যানের সারি—
সংকীর্ণ পথটুকু—রাখিয়াছে সারি।
খানায় নেবে যেতে হবে—থাকলে প্রাণের মায়া,
না হয় ধাক্কায় গড়াগড়ি—ভূতলশায়ী কায়া।
মেয়েরা forward কিন্তু—আড়াই ইঞ্চি heel-এ,—
মৎস্য আশে বক্ যেন—বেড়াচ্ছেন খালে বিলে।
জেব্রা-ফ্যাসান্ শাড়ি তাঁদের করে বেগবান্ *।
হাঁ করে সব চেয়ে থাকে মুগ্ধ গাড়োয়ান্!
'ছাতা' ফেলে সিল্কের রুমাল্ হাতে এখন ঝোলে,
হাসির 'পাল' তুলে তরী—বে-পরোয়া বায় চোলে।
মায়ের চিন্তা I. C. S. জামা'য়ের আশ।
উদাস্-বাপ বিড়ি টানেন (আর) ছাড়েন দীর্ঘশ্বাস।

দিল্লী পল্লী এইখানে এক্—ভেদাভেদ্ নাই,
"কনট রোড" আর 'ঘুঁটে গলির'—সমান বড়াই!
আনন্দের এইটুকু মাত্র—আছে দেখি ফাঁক্,
মধুরেণ সমাপয়েত্,—আর নয় থাক্।

মেয়েদের সম্বন্ধে যা বলেছি, সেটা গরিব অভিভাবকদের ও দর্শকদের চাপা মনোভাব। ঠিক আমার কথা নয়।

এখন ভালবাসা জানাই—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৺

পূর্ণিয়া
৺বিজয়ান্তে
১৩৫১

প্রিয় শচীন—

আজ ৺শ্যামা পূজার রাত্রি। বড় বিলম্ব হয়ে গেল। কারণ শুনলে আমাকে কি ঠাওরাবে জানি না। ৺বিজয়ার পর ৪২।৪৩ খানা পত্র এসে আমাকে বিব্রত করে রেখেছিল। এখনো ৩।৪ খানার জবাব বাকি। কা'কেও ক্ষুণ্ণ করতে পারি না। আজো কানপুর থেকে একখানা পেয়েছি! আমার অবস্থা এই। কেবল আশীর্ব্বাদ লিখে রেহাই নেই। সকলেই আনন্দ পাবার মত কিছু চান। এ অক্ষমের কথা কেউ ভাবেন না। যাক্, তাতে আমার আনন্দই আছে। আর কয় দিনই বা প্রিয়দের পাব। শরীর আর এ দেহ বহন করতে পারছে না। এখন তুমি আমার শুভাশীষ ও ভালবাসা নাও, আনন্দে থাক।

তুমি দিল্লী যাবার পর, প্রথম যে পত্রগুলি লিখেছিলুম, বোধ করি স্মরণ আছে। রাজধানীর নিয়ম—"সবুরে মেওয়া ফলে।" তুমি এক দিন তা পাবে। একটু অপেক্ষা করতে হবে।—সাহিত্যের বীজ আপনি অঙ্কুরিত হয়, ইত্যাদি। তোমার "আগামী কাল" তারই সূচনা। আমি বড় খুশি হয়েছি। যেদিন রাত্রে তোমাদের অভিনয় ছিল, কথাটি ঠিক সময়ে আমার মনে উদয় হয়েছিল, আমি সাফল্য কামনা করতে ভুলি নাই। যাক্, সকলে আনন্দ পেয়েছেন, তাতেই আমার আনন্দ। যাঁরা ঘর ছেড়ে বিদেশে থাকেন, তাঁদের কত লোকের মধ্যে কত সুন্দর বস্তু রয়েছে, এই সব সুযোগ না পেলে, সে সব প্রকাশ পায় না, যেমন—সঙ্গীত, সুর, হাস্য কৌতুক প্রভৃতি, রচনায় স্পৃহাও। গানগুলি বেশ হয়েছে। উৎসাহ, প্রচেষ্টা, অনুষ্ঠানাদি না থাকলে চাপা পড়ে থাকে।

তোমার "আগামী কাল" অনেক "কাল"কেই ডেকে আনবে বলে' আশা করি। একটি কথা কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখবে, সাহিত্যের সবার বড় দায়িত্ব—"দেশ ও জাতি"। তাদের ভুলে যে কাজ—তা মূল্যহীন।

মায়ের পূজা এখানেও সুন্দর ভাবে সমাধা হয়েছে। ছেলেরা দু' রাত্তির থিয়েটারও করেছিল—"প্রলয়", আর "মহারাজা নন্দকুমার। ভালই হয়েছিল। ভোজন-যজ্ঞটা উল্লেখযোগ্য, লোক প্রসাদ পেয়েছিল—আড়াই হাজারের কম নয়। বড় নারাণ সবাই ছিল।

আর নয়, সকলে আমার শুভ কামনা ও ভালবাসা গ্রহণ করো।

তোমাদের প্রীতিকামী
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* 'বেগবতী' বলা চলে না।

পূর্ণিয়া

কল্যাণীয় ও প্রিয় শচীন্দ্রনাথ,

তোমার "এই পৃথিবীর অনেক দূরে" হলেও, আমি পেয়েছি, ততোধিক আনন্দও পেয়েছি। মনে পড়ে কি তুমি দিল্লী যাবার পর আমার প্রথম ২।৩ খানি পত্রে লিখেছিলুম—'স্থান মাহাত্ম্য এইবার দেখতে পাবে, তোমার মধ্যে যা আছে তা আপনি ফুটবে'। এই অল্প দিনেই তার প্রমাণ পাচ্ছি। সকল বস্তুই স্থান কালের অপেক্ষা করে। তোমাকে বলেছিলুম ছেলেরা সত্বরই চিনে নেবে তারা যা চায়, তোমার মধ্যে তা আছে। আমি খুশি হয়েছি। তুমি যে দিক্ বেছে নিয়েছ—অর্থাৎ নাটক, সে শীঘ্রই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেশ হয়েছে। প্রথমে দক্ষিণা বাবুর সাহায্য নিয়েছ, ভালই করেছ,—বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। যোগ্য লোক পেয়েছ।

এখন আমার শুভাশীষ লও, সুখে স্বাস্থ্যে আনন্দে লিখে যাও। এখানে সব পূর্ববৎ চলছে।

তোমার শুভকামী
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ণিয়া
২৫শে মে—৪২

প্রিয় শচীন—

তোমার পত্র পেয়েছি। কী খুশি যে হয়েছি, সে কথা লিখে জানাতে পাচ্ছি না। বাঙালির ওর চেয়ে বড় প্রার্থনীয় বা লেখা-পড়ার বড় সার্থকতা ও লক্ষ্য বস্তু আর কিছু আছে কি না, তার প্রমাণ আজো পাইনি। ভগবানের ভুল হয় না, তিনি তোমার ধাত বুঝেই ক্ষেত্র বাছাই করেছেন। লেখাপড়ার দরবারে নিযুক্ত করেছেন। আমি খুবই আনন্দ অনুভব করছি। এখন যে কাজেই থাকো, ক্রমে "নোট-রাইটার" হবার চেষ্টা পেও, সহজেই নজরে পড়ে যাবে।

বড় গরম, তাই বড় চিঠি ফাঁদবার সাহস পেলুম না—আদমরা কোরে রেখেছে। আমি খুবই আশা পোষণ করবো।

প্রথম কাজ,—সকলের প্রিয় হবার চেষ্টা করবে,—ব্যবহারে সকলকে আপন করা চাই। তারপর সব আপ্‌সে চলবে, কোথাও বাধবে না। আর—পাংচুয়ালিটি। তর্কের ফাঁক পেলেও তর্ক বাদ্ দিও। 'সার্ভিস্' মানেই 'সব্‌মিসন্'। সত্বর উন্নতি হবে।

এখানকার সবই পূর্ববৎ। নূতনের মধ্যে পলাতকদের আগমন-বার্ত্তা কানে আসছে।

কর্মস্থলে বেশী খাটুনি কি দেরি হলে মন খারাপ কর না।
আজ আর বেশী লেখবার বল্ নেই।
ভালই থাকবে—ভালো হবে',—এই আমার শুভকামনা।
এখন ভালোবাসা জানাই।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ণিয়া
৩।১।৪৪

প্রিয় শচীন্দ্রনাথ—

আমি জানতুম—তুমি চুপ করে নাই। যার মধ্যে সাহিত্যের বা শিল্পের রস প্রবেশ-পথ পেয়েছে, সে তাকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেয় না। শুষ্ক জীবন যাপন করা তার পক্ষে সম্ভবই নয়।

বাণী আমাদের সকল শিল্পের রাণী। তাঁকে আহ্বান করে', অঞ্জলি দানান্তে যখন "রসচক্রের" উদ্বোধন, তখন সেবকের আশীর্ব্বাণীর আবার প্রয়োজন বা অপেক্ষা কি? মা স্বয়ং কৃপাদৃষ্টিপাতে, তোমাদের সঙ্কল্প সার্থক করে' যাবেন।

তবুও প্রার্থনা করি—হৃদয়ে উর মা দেবী,
জীবন সার্থক হোক্—তোমার চরণ সেবী।

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

Purnea
1. 2. 45

প্রিয় শচীন—

আমি তোমার পত্র পেয়ে খুব আনন্দ পেলুম। তুমি আমার আশানুরূপ বিষয়ে হাত দিয়েছ। ওটার অভাব ছেলেমেয়েরা বিশেষ অনুভব করে। ইচ্ছা সত্বেও মনের মত পায় না। তাদের অভিনয়োপযোগী ঐরূপ ছোট ছোট নাটকের দরকার যাতে তারা আনন্দ পায়, উৎসাহ জাগে, তাদের জ্ঞানও বাড়ে। কিন্তু সাবধান হওয়া চাই,—আদর্শ ঠিক রাখা চাই।

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বাবু অভিজ্ঞ লোক, তাঁর লেখা পাকা হাতের। আশা করি, তিনি তোমার প্রস্তাবে 'না' বলবেন না। আমার বোধ হয় তাঁকে জানালে ও তাঁর অনুমতি চাইলে তিনি খুশিই হবেন। ভদ্রতার দিক থেকেও, জানানো উচিত বলেই মনে হয়।

আমিও তোমারি মত দুর্ভাবনায় পড়েছি। পরমহংস দেবের কতকগুলি উপদেশ, ছোট একখানি প্যামফ্লেট আকারে প্রকাশ করবার ইচ্ছায় সংগ্রহ করি। ও কাজ করতে হলে "শ্রীম" লিখিত "কথামৃত" পুস্তকের সাহায্য নিতেই হয়। শুনলাম স্বত্বাধিকারীর সম্মতিও নিতে হবে। তিনি নাকি ও সম্বন্ধে কড়া লোক। তাই আমার সংগ্রহ ও সঙ্কলন পড়েই আছে। এক জন বন্ধুকে লিখেছি, তিনি সম্মতি পাবার জন্য চেষ্টা পাচ্ছেন, ফল কি হবে জানি না। তাঁর পত্র পেলে তোমাকে জানাব।

তোমার কথা স্বতন্ত্র। দক্ষিণারঞ্জন বাবুকে লিখলে—সহজেই সম্মতি পাবে বলেই আমার ধারণা। "Play খুব ভাল হয়েছে। সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন" ইত্যাদি লেখবার দরকার নেই। বরং —"আমি নূতন লেখক—আপনার উপদেশ ও সাহায্যপ্রার্থী। আশা করি আমাকে উৎসাহ ও suggestion দানে, অগ্রসর করে দেবেন। আপনার মত অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা মনীষীর দয়া পেলে, আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে"—ইত্যাদি বিনীত ও ভদ্র সম্ভাষণই উচিত।

তুমি তোমার ভাষায় লিখলেই হবে। বেশী কথা বা বিশেষণ বাড়িও না। তাহলেই হবে।

ভালবাসা গ্রহণ করো। শুভকামী
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুক্তিপথে

শ্রীপবিত্রমোহন প্রধান

৩

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অগষ্ট তারিখ। সন্ধ্যার সময় যথারীতি জেলের লোহার কবাট বন্ধ হয়ে গেল। সারা দিন মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম; অগষ্ট বিপ্লবের সময়, ভারতের শেষ স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় আমি নিষ্ক্রিয় থাকলাম! রাত তিনটের সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হোলো কে যেন আমাকে বলছে, "যদি সত্যিই স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দেবার ইচ্ছে থাকে, তবে প্রাণের মায়া ছেড়ে চেষ্টা কর।" জেলের পোষাক ছেড়ে আমার খদ্দর ধুতি পরলাম। পায়ের লোহার বেড়ীর পেঁচ খুলে বেড়ীমুক্ত হলাম। বাইরে তখন খুব বৃষ্টি হচ্ছে। জেলের কবাট সাধারণতঃ ছ'টার সময় খোলা আরম্ভ হয়। আগে সাধারণ কয়েদীদের বার করে দেবার পর রাজবন্দীদের কুঠরী খোলা হয়। কাজেই আমাদের কুঠরী থেকে বেরুতে সাড়ে ছ'টা বেজে যায়।

আজ কিন্তু কেন জানি না, এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গেল। ছ'টা বাজতেই আমাদের কুঠরী খোলা হলো। ওয়ার্ডাররা আমাদের গুণে আমাদের জন্যে স্বতন্ত্র পাইখানার দিকে পাঠিয়ে দিল! সঙ্গে এক জন প্রহরী। আমার কয়েক জন বন্ধু তার সঙ্গে কথা বলে তাকে ভুলিয়ে রাখল। আমি আর আমার তিন জন বন্ধু পাইখানার পাশে জেলের পাঁচিলের দিকে গেলাম। ছু'জনের কাঁধে তৃতীয় জন দাঁড়াল। এই মানুষের পিরামিডের কাঁধে দাঁড়িয়ে আমি কোনও রকমে পাঁচিলের ওপর উঠে শুয়ে পড়লাম। তাকিয়ে দেখলাম, একটু দূরেই বন্দুকধারী গুর্খা পুলিশেরা প্যারেড করছে। জেলের কোঠার ওপরেও বন্দুক ধরে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। আমি আর কিছু না ভেবে বাইরের দিকে নেবে পড়লাম। ভেতর থেকে সঙ্গীরা একটা ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি ছুঁড়ে ফেলে দিল।

আমি কারামুক্ত। কিন্তু পদে পদে ধরা পড়বার আশঙ্কা। আমি ছেঁড়া কাপড় পরে চাষী সাজলাম। ধানের ক্ষেতে ঢুকে দ্রুত-গতিতে এগুতে লাগলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল অঙ্গুল যাবার। কিন্তু পথ ভুলে স্কটল্যাণ্ডপুরে গিয়ে পৌছুলাম। এই উঁচু জায়গা কোনও স্কচ্ পলিটিক্যাল এজেণ্টকে স্কটল্যাণ্ডের কথা স্মরণ করে দিয়েছিল বলে এই বিচিত্র নাম দেওয়া হয়েছিল। সেখানে প্রজাদের অস্থি-মজ্জা চূর্ণ করে বেঠিতে রাজার মেজ ছেলে পটায়েত সাহেবের প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছে*। আমি অঙ্গুলের পথে গেলে নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যেতাম। কারণ আমার জেল থেকে পলায়ন জানা যাওয়া মাত্র সেই রাস্তায় পুলিশ পাহারা দিচ্ছিল। আমি ব্রাহ্মণী নদী পেরিয়ে ঢেঙ্কানাল রাজ্যের জঙ্গলে আশ্রয় নিলাম। জঙ্গলে কিছু দিন আত্মগোপন করে তালচের রাজ্যে ফিরে এসে ঘন জঙ্গলে ঢাকা এক ছোট পাহাড়ের উপর শিবির স্থাপন করলাম। আমার উপস্থিতি কয়েক জন বিশ্বস্ত কর্মীকেও জানালাম।

আমি পালাবার পর দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত জেল-কর্তৃপক্ষ টের পাননি। জেলার আর ওয়ার্ডাররা জেলের ভেতর ও বাইরে তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। কুয়া আর ফাঁসি-মঞ্চের ভেতর লোক নেমে দেখল, আমি আত্মহত্যা করেছি কি না; পটায়েত সাহেব খবর পেয়ে জেল দেখতে এলেন! অঙ্গুলের পুলিশকে সীমান্ত গ্রামগুলিতে খানাতল্লাশ করতে খবর দেওয়া হলো। ভারত সরকারের গড়জাত বিভাগের এক পুলিশ অফিসার তালচের গেলেন। আমার পালাবার পথ তাঁরা আবিষ্কার করতে না পেরে মুস্কিলে পড়লেন। সেই আক্রোশ তাঁরা দেখালেন আমার সঙ্গী রাজবন্দীদের উপর। তাঁদের হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী দিয়ে নির্জন cellএ ভর্তি করা হলো।

আমার পলায়ন খবর রাষ্ট্র হবার পর প্রজারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। তাদের সন্দেহ হলো, রাজা ও পটায়েত সাহেব আমাকে গোপনে হত্যা করেছেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ থেকে রাজা আমাকে হত্যা করতে, বা পঙ্গু করতে চেষ্টা করে এসেছেন। সুতরাং তাঁর কবলে আমাকে পেয়ে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন—এ রকম আশঙ্কা করা স্বাভাবিক। লোকেদের শান্ত করবার জন্যে রাজা ছু'জন রাজবন্দীর ভাইদের জেল পরিদর্শন করতে দিলেন। তাঁরা বাইরে এসে লোকেদের বোঝালেন আমি মরিনি, জেল থেকে পালিয়ে গেছি। কিন্তু অনেকের মন থেকে সন্দেহ গেল না।

জেল থেকে আমি পালিয়ে যাবার পর রাজ্যশাসন পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। কর্মীদের নির্দেশে কৃষকেরা তালচের রাজবাটী আর কাছারি আক্রমণ করে যথেচ্ছা শাসনের এই দুই প্রতীককে ভেঙ্গে ফেলবে স্থির করেছিল। ৬ই সেপ্টেম্বর রাতে আক্রমণ করা হবে স্থির করা হলো। কিন্তু সেদিন রাতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়াতে অভিযান বন্ধ করতে হলো। তাতে নিরুৎসাহ না হয়ে ৭ই তারিখ সকালে কৃষক বাহিনী তালচের সহরের কাছে আম-বনে সমবেত হলো। রাজার পুলিশ ও ভারত গবর্ণমেণ্টের মিলিটারী পুলিশ সহরের প্রবেশ-পথ guard করতে লাগল। এই দুই বাহিনীর মধ্যে আধ মাইল ধানের ক্ষেতের ব্যবধান। এই ব্যবধানের উপরে কয়েকটা বোমারু বিমান উড়তে লাগল। প্রজাদের ফিরে যাবার জন্যে হুকুম করে প্রচারপত্র বিমান থেকে বর্ষণ করা হলো। কিন্তু তাতে কোনও ফল হলো না। প্রজারা এগিয়ে যেতে লাগলো। তার পর এক সঙ্গে বোমারু বিমান আর মেশিন গানগুলি গর্জ্জন করে উঠল। জনতা এবার ছত্রভঙ্গ হলো। বহু লোক হতাহত হয়ে পড়ে রইল। দর্শকেরা বলেন, লরী বোঝাই মৃতদেহ ব্রাহ্মণী নদীর জলে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অনেক প্রজাকে গ্রেপ্তার করা হলো। প্রজা-আন্দোলনকে রাজা ভারত গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে সাময়িক ভাবে দমন করলেন।

আমার কাছে অভিযানের ব্যর্থতার খবর পৌছুল। খবর-কাগজে পড়লাম, উড়িষ্যায় বিপ্লবের আগুন ক্রমশঃ নিবে আসছে। তালচের ছাড়া আর কোনো ষ্টেটে আর আন্দোলন হচ্ছে না। সুতরাং উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের সমস্ত শক্তি তালচের প্রজার বিরুদ্ধে নিয়োগ করা হচ্ছে। কর্ম্মীরা তবু হতাশ হলো না। কয়েকটা বন্দুক জোগাড় করে গুপ্ত সেনাবাহিনী গঠন করা হলো। এই বাহিনীর কাজ ছিল তালচের রাজার অত্যাচারী অনুচরদের শাস্তি দেওয়া। কয়েক জনকে শাস্তি দেওয়ায় অত্যাচারের মাত্রা কমে গেল। কিন্তু ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তালচের রাজার মিলিটারী পুলিশের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে গুপ্ত বাহিনীর কয়েক জন হতাহত হলো। তার ফলে বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হলো।

---

* সম্প্রতি প্রধান মহাশয় পটায়েতকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করে তালচের থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। পটায়েত রাজ্যের ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব ছিলেন।

আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। আমাদের চার দিকে শত্রুসৈন্য। আমাকে ধরতে বা মারতে তারা বদ্ধপরিকর। দেখলাম, আর বেশী দিন তালচের রাজ্যের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকা চলবে না। আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করা হলো, অন্য কোনো প্রদেশে গিয়ে কোনো আন্তঃপ্রাদেশিক বিপ্লব অনুষ্ঠানের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা যাক। সেপ্টেম্বর ১১ তারিখ আমি আমার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী শ্রীগোবর্ধন সাহুর সঙ্গে অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করলাম। জেল থেকে পালাবার পর কোনো দিন ছাদের তলায় শুতে পাইনি। জঙ্গলে, বর্ষায় ভেজা মাটিতে শুয়ে আমার রাত কেটেছে। সেদিন রাত দু'টো নাগাদ বর্ষা হওয়ায় ঘুম ভাঙ্গল। ভিজতে ভিজতে আমরা চলতে লাগলাম। হঠাৎ বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ কানে এলো। বুঝতে পারলাম, আমাদের গ্রেপ্তার করবার জন্যে পুলিশ নিকটবর্তী গ্রাম ঘেরাও করেছে। আমরা ঘন জঙ্গলে লুকালাম। জঙ্গলের মধ্যে দেখি আমার আরও দু'জন সঙ্গী লুকিয়ে আছেন। তাঁরাও এবার আমার সঙ্গে চললেন। আমরা জঙ্গলের পথে সম্বলপুরের দিকে চললাম। আমাদের বেশ চাকরের মত। মাথায় ঝুড়ি, পিঠে বোঁচকা, হাতে লাঠি। তা সত্ত্বেও অনেকে আমাকে সন্দেহ করে জেরা করেছিল। অনেকের ধারণা হলো আমিই পবিত্র প্রধান। কিন্তু পবিত্র প্রধানকে তালচের রাজা জেলের মধ্যে মেরে ফেলেছেন, লোকের বিশ্বাস ছিল। কাজেই তারা আমার ময়লা কাপড় আর চাকরের বেশ দেখে আমাকে রেহাই দিল। সেই সময় রাজনৈতিক বিভাগের নির্দেশ অনুসারে পুলিশ অপরিচিত আগন্তুকদের সামান্য সন্দেহ হলেই ধরে নিয়ে গিয়ে জেরা করত। গোবর্ধন তাদের কবলে পড়ল। দু'ঘণ্টা ধরে জেরার পর তাকে রেহাই দেওয়া হলো।

তালচের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দিনে একবার মাত্র মুড়ী কিম্বা চিড়ে খেয়ে সাড়ে তিন দিনে ১২৫ মাইল হেঁটে আমরা ঝাড়সুগুডা রেল-লাইনের শাসন ষ্টেশনে এসে পৌঁছুলাম। আমরা টাটা নগরের টিকিট কিনলাম। টিকিট খরচ বাদে আমাদের চার জনের কাছে মোট বারটি টাকা ছিল। আমরা টাটা নগরের শান্তিনিকেতন হোটেলে গেলাম। হোটেলওয়ালা আমার পরিচিত ব্যক্তি। তাঁকে আমার পরিচয় দিলাম। কিন্তু আমার মৃত্যু সম্বন্ধে জনরব শুনে আর আমার কদর্য বেশ দেখে তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁকে ত বোঝালাম কিন্তু বোঝাতে গিয়ে আরেক বিপদ হলো। আমার উপস্থিতি সংবাদ সেই পাড়ার উড়িয়া অধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু আমাকে কেউ চিনতে পারল না। আমাকে কয়েক জন লোক প্রশ্ন করল, পবিত্র বাবু টাটা নগরে পালিয়ে এসেছেন কি না। আমি সে কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বললাম, "তাঁকে ত রাজা মেরে ফেলেছেন।" অনেকে বললে, আমার সঙ্গে পবিত্র বাবুর চেহারার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু পবিত্র বাবু এক জন শিক্ষিত ভদ্রলোক আর আমি ত এক জন কুলী!

টাটা নগরে আমি আর আমার সঙ্গীরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিলাম। তবু পুলিশের ভয়ে বাড়ীর বাইরে যেতে সাহস হতো না। আমরা যাঁর বাড়ীতে লুকিয়ে থাকতাম, তাঁকে আমার উপস্থিতি সম্পূর্ণ গোপন রাখতে বলেছিলাম।

তিনি আমার অনুরোধ হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন—টাটা নগরে এত সাবধানতার দরকার নেই। পবিত্র প্রধান তালচের ছেড়ে টাটা নগরে এসেছে, এ কথা পুলিশ জানতেই পারে না। তিনি সতর্কতা অবলম্বন করলেন না। আমি লক্ষ্য করলাম, আমাদের বাসার দিকে এক জন লোক নজর রেখেছে। আমার আশ্রয়দাতাকে এ কথা জানালাম। তিনি প্রথমে আমার কথায় আমল দিলেন না। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললাম, আমি এ বাসা ছেড়ে চলে যাবই। তিনি সাহায্য করুন বা না করুন। যে রাতে বাসা বদলে অন্যত্র গেলাম, তার পর রাত্রে পুলিশ সে বাসা ঘেরাও করে খানাতল্লাশ করল। আমাদের চিনিয়ে দেবার জন্যে তালচেরের প্রধান পুলিশ অফিসার টাটা নগর গিয়েছিলেন। আর এক দিন সেই বাসায় থাকলে সদলবলে ধরা পড়ে যেতাম।

এবারে আমাদের আশ্রয় দিলেন ভক্তপাণি। তিনি গরীব। টাটা কোম্পানীর হোটেলে রাঁধুনী বামুনের কাজ করেন। তিনি নিজেকে বঞ্চিত করে আমাদের সুখ-সুবিধার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। টাটা কোম্পানীর আরও কয়েকটি গরীব কর্মচারী আমাদের কিছু কিছু অর্থসাহায্য করতে লাগলেন। তালচেরে সশস্ত্র প্রতিরোধ ব্যর্থ হবার পর গুপ্ত বাহিনীর কয়েক জন টাটা নগরে পালিয়ে এলেন। আমরা সংখ্যায় হলাম ১৪।১৫ জন। আমাদের তিন-চার জনকে ছেড়ে দিলে বাকী কয়েক জন হিন্দী বা বাঙ্গলা বলা থাক, বুঝতে পর্যন্ত পারত না। সেই সময় অর্থাৎ ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাস থেকে পূর্ব-ভারতে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। বাঙ্গলা দেশে লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মারা গেল। টাটানগরে মোটেই চাল পাওয়া গেল না। আমরা রোজ দু'টাকার ছোলা আর বেশম কিনতাম। সকালে ছোলা ভিজিয়ে খেতাম। আর রাতে আমাদের খাদ্য ছিল বেশমের বড়া। আমাদের প্রধান খাদ্য ছিল শাক। বাড়ীর মধ্যেই অজস্র হতো। মাঝে মাঝে চাল জোগাড় করে ভাত খেয়ে মুখ বদলে নিতাম। ক্রমে আমাদের অবস্থার উন্নতি হলো। ভক্তপাণি কোনো রকমে আমাদের নামে চালের রেশন কার্ড করিয়ে দিল। আমাদের আনন্দ দেখে কে? তখনও আমাদের প্রধান খাদ্য ছিল শাক। কারণ ভাতের পরিমাণ ছিল কম। ভাতের ফ্যান একটুও ফেলতাম না।

ক্রমে আমাদের দলের অনেকে কিছু কিছু বাঙ্গলা-হিন্দী শিখে কাজ জোগাড় করে নিল। রান্নার কাজ, আর্দালীর কাজ, এমন কি গরু-মহিষ চরাবার কাজ নিয়ে তারা বাসা ছেড়ে চলে গেল। আমাদের অর্থ আর খাদ্যসঙ্কট লাঘব হলো। সে সময় টাটা নগরে সি আই ডির উপদ্রব বেড়েছে। সুতরাং একত্র না থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকাই আমরা সমীচীন মনে করলাম। ১৯৪৩এর সেপ্টেম্বর মাসে বাসায় আমি একা থাকলাম।

আমার plan ছিল জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে মিলিত হব। আমি বরাবর সুভাষচন্দ্রের কার্য্যকলাপের উপর গভীর আস্থা পোষণ করতাম। কিন্তু জয়প্রকাশ তখন ভাগলপুর জেল থেকে পালিয়েছেন। সুতরাং তিনি আর তাঁর দল সহজলভ্য ছিলেন। কিন্তু জয়প্রকাশ আবার ধরা পড়ে যাওয়ায় আবার আমার plan বদলাতে হলো। সুভাষচন্দ্রের দলের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হোলো। কিন্তু উদ্দেশ্য কি করে সাধন করব?

তখন আমার শারীরিক আর আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। দিনের মধ্যে এক পো চাল, সেদ্ধ শাক আর ঢেঁড়সের সঙ্গে খেতাম। আমার সঙ্গীরা আমার খাওয়া দেখে অনুযোগ করতেন। তাঁদের স্বল্প মাইনে থেকে কিছু কিছু দিতে চাইতেন। কিন্তু আমার খাওয়ার দিকে প্রবৃত্তি ছিল না। খালি ভাবতাম কি করে আবার বিপ্লব-যুদ্ধে যোগ দেবো। সুভাষচন্দ্রের সন্ধান না পেলে তাঁর দলের যাঁরা বাঙ্গলায় কাজ করছেন তাঁদের খুঁজে বার করব স্থির করলাম। কিন্তু আমি তাঁদের কাউকে চিনতাম না। আমার আশ্রয় ছিল না, সম্বল ছিল না, কিন্তু কল্পনা যতই উদ্ভট হোক্, আমি সেটাকে কাজে পরিণত করবই।

সুভাষ বাবুর ব্যক্তিত্বে আর বীরত্বে আমার সঙ্গীদেরও গাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু যোগসূত্র স্থাপনের উপায় কেউ ভেবে স্থির করতে পারলেন না। হাতে টাকা-পয়সা নেই। যদি আমাকে কলকাতায় যেতে হয়, সেখানে আমার থাকবার জায়গা নেই। এখন টাটা নগরেই আমি নিরাপদ নই, কলকাতায় আমি কি করে আত্মগোপন করে বিপ্লবীদের খুঁজে বার করব? কিন্তু আমি তাঁদের বোঝালাম, আমি আমার নিষ্ক্রিয় জীবনের অবসান ঘটাতে চাই। এ রকম লুকিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়া শ্রেয়। দেশের মুক্তি সাধনের জন্যে সুভাষচন্দ্র কি ভাবে চেষ্টা করছেন, তাঁদের বোঝালাম। তাঁরাও শেষটায় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হলেন। আমার কাছে মোটে ষোলোটি টাকা ছিল। সঙ্গীরা তাঁদের আট-দশ টাকা মাইনে থেকে কিছু কিছু দিয়ে আরও ষোল টাকা জোগাড় করলেম।

আমি দেখলাম যদি কলকাতায় যাই, এই বত্রিশ টাকাতে বারোটা দিনও থাকা চলবে না। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে কলকাতায় থাকা নিতান্ত দরকার। এই মহানগরীর কোনো এক রন্ধ্রে তাঁর দলের লোকেদের সন্ধান পাবো, আমার এই বিশ্বাস ছিল। কলকাতায় অন্ততঃ দুই মাস বিনা খরচে থাকতে পারলে আমার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। কারো বাড়ীতে এই সময়টায় বামুন বা চাকরের কাজ করলে সি আই ডির লোক বা পুলিশ আমাকে সন্দেহ করতে পারবে না। আমার সঙ্গীদের এ কথা বলায় তাঁরা প্রথমে দুঃখিত হলেন। আমি তাঁদের বুঝিয়ে বললাম, দেশের মঙ্গলের জন্যে কোন রকম কাজকে ছোট বা বড় বলা উচিত নয়। তাঁদের এক মনিব খুঁজে দিতে বললাম। অতি কষ্টে তাঁদের রাজী করান গেল।

দু'দিন পরে ফিরঙ্গী প্রধান নামে এক সঙ্গী এসে খবর দিল যে, বামুনের কাজ পাওয়া গেল না তবে চাকরের কাজ খালি আছে। ফিরঙ্গী প্রধানের "বাবুআনী"র (কর্ত্রী ঠাকুরাণী) ভাইয়ের বিয়ে কলকাতায় হবে। তাই একটা চাকর দরকার। তিন দিন পরে কলকাতায় যেতে হবে। তবে মাইনে বড় কম। খাওয়া-পরা সমেত মোটে পাঁচ টাকা! প্রধান এ-ও জানাল যে, আমি রাজী হলে আমাকে তার মনিবের বাড়ী নিয়ে যাবে। কারণ বাবু ও বাবুয়ানী নতুন চাকরকে দেখতে চান।

আমি তার কথায় রাজী হয়ে চাকরের বেশে সন্ধ্যা বেলায় তার মনিবের বাড়ী গেলাম। মনিব মিঃ সেন টাটা ডাক্তারখানার এক জন বড় ডাক্তার। তিনি আগে কটকের মেডিক্যাল স্কুলে পড়তেন। আমিও র‍্যাভেন্সা কলেজে পড়বার সময় অনেক সময় মেডিক্যাল স্কুলের বোর্ডিংএ যেতাম। সেই সময়ে তিনি নিশ্চয় আমাকে দেখে থাকবেন। আমি নমস্কার করে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, "তোমাকে কোথায় যেন অনেক বার দেখেছি।" আমি বললাম, "আমি কটক মেডিক্যাল স্কুলের কাছে এক বাবুর বাড়ীতে কাজ করতাম। মেডিক্যাল স্কুলে আমার পরিচিত চাকরদের সঙ্গে গল্প করতে যেতাম।"

তার পর মাইনের কথা উঠল। আমি আমার আগ্রহ দেখাবার জন্যে বললাম, "খেয়ে-পরে দশ টাকা চাই"। শেষে স্থির হোলো, এখন ছ'টাকা পাবো। ভাল ভাবে কাজ করলে পরে মাইনে বাড়িয়ে সাত-আট টাকা করে দেওয়া যাবে। আমার নাম বললাম—রাম। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর আমি ছ'টাকা মাইনেতে চাকরের কাজ নিলাম। ছ'বছর আগেকার স্কুল-শিক্ষক, ট্রেণ্ড গ্রাজুয়েট পবিত্র প্রধানের অস্তিত্ব লোপ পেল। ছ'বছর পরে চাকর রাম যে মন্ত্রী হবে এ কথা তখন স্বপ্নেরও অতীত ছিল!

কুশ শুদ্ধ কেন?

গরুড় অমৃত বহন ক'রে এনে সর্পজাতিকে বললেন,—এই দেখ, আমি তোমাদের জন্য অমৃত হরণ ক'রে এনেছি। তোমরা আমার মাতৃদেবীকে ছেড়ে দাও। এই কুশের উপর অমৃত-ভাণ্ড রাখলাম। তোমরা স্নান ক'রে শুচি হয়ে এসে অমৃত ভক্ষণ কর এবং অমরত্ব লাভ কর।

গরুড়ের মুখে সকল কথা শুনে সর্পজাতি যখন স্নান করতে গেল তখন ইন্দ্র অমৃত হরণ করে নিয়ে গেলেন। স্নানান্তে সর্পগণ এসে অমৃত-ভাণ্ড দেখতে না পেয়ে সেই কুশ লেহন করতে লাগলো। তীক্ষ্ণধার কুশাগ্রে সর্পজাতির জিহ্বা চিরে দ্বিখণ্ড হ'ল।

অমৃতের স্পর্শে কুশ পবিত্র হয় এবং কুশ ব্যতীত যে জন্য কোন পবিত্রানুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় না।

বৈষ্ণব কবিতা

(আদিযুগের প্রকৃতি)

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ভাবে এই একটা সংস্কার আছে যে, বৈষ্ণবকবিতার মূলপ্রেরণা ধর্মের মধ্যে, ধর্মের প্রেরণাই সাহিত্য সৃষ্টির ভিতরে রস-বৈচিত্র্য এবং রস সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। চৈতন্য-যুগের বৈষ্ণব-সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই এই জাতীয় একটি সংস্কার আমাদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। চৈতন্য যুগে এবং চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণবকবিতা শুধু মাত্র কবিতা নহে, তাহা লীলা-কীর্তন এবং এই লীলা-কীর্তন ভক্ত-বৈষ্ণবগণের নিগূঢ় সাধনারই অঙ্গ। কিন্তু আমরা যদি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রাচীন কবিতাগুলি এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষের কবিগণ-কর্তৃক রচিত সাধারণ পার্থিব প্রেম-কবিতাগুলি আলোচনা করি তবে দেখিতে পাই, প্রাচীন বৈষ্ণব-প্রেমকবিতায় ধর্মের প্রেরণা একান্তই গৌণ ছিল, কাব্য-প্রেরণাই সেখানে আসল কথা। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম-কবিতার আমরা প্রাচীন যত কবির উল্লেখ পাইতেছি, তাঁহারা বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে বৈষ্ণবকবিতা রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ কোন সিদ্ধান্তে পৌছিবার মত কোনও তথ্যই আমরা লাভ করি না; বরঞ্চ দেখিতে পাই, তাঁহারা কবি ছিলেন, নর-নারীর প্রেম-সম্বন্ধে তাঁহারা বিবিধ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সেই একই দৃষ্টি—একই প্রেরণা অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটে প্রেম-কবিতার আলম্বন-বিভাব মাত্র, তাহার অধিক আর তেমন কিছুই নহে। ষষ্ঠ শতাব্দীর ভিতরে রাধাকৃষ্ণের উপাখ্যান প্রেমের গান ও ছড়া-রূপে আভীর জাতির ক্ষুদ্র পরিধি অতিক্রম করিয়া বৃহৎ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। রসজ্ঞ কবিগণ সেই নবলব্ধ বিষয়-বস্তুকেই তাঁহাদের কাব্য-সৃষ্টির ভিতরে একটু-আধটু স্থান দিয়াছেন। তবে দেবতা-বিষয়ক বলিয়া সহজাত সংস্কার বশতঃ তাঁহাদের রাধাকৃষ্ণের প্রতি স্থানে স্থানে (তাহাও সর্বত্র নহে) একটা সম্ভ্রম প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাচীনতর কবিগণের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, বৈষ্ণবকবিতার সমৃদ্ধ যুগ দ্বাদশ শতকের কাব্য-কবিতা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই যুগের কোন কবিই শুধুমাত্র বৈষ্ণব-কবিতা রচনা করেন নাই। 'গীত-গোবিন্দে'র প্রসিদ্ধ কবি জয়দেব শুধু রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক কবিতা রচনা করেন নাই, তিনি অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে—পার্থিব প্রেম বিষয়ে প্রকীর্ণ কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন; 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'ই তাহা উদ্ধৃত রহিয়াছে (অবশ্য এ-বিষয়ে যদি আবার একাধিক জয়দেবের মতবাদকে দাঁড় করান না হয়)। উমাপতি ধর, গোবর্ধনাচার্য, শরণ, ধোয়ী—এমন কি লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন রচিত আমরা রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক বৈষ্ণবকবিতাও বিভিন্ন সংগ্রহ-গ্রন্থে পাইতেছি, আবার তাঁহাদের রচিত মানবীয় বহু প্রকীর্ণ কবিতাও নানা গ্রন্থে পাইতেছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইহারা তৎকালে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, কাব্যের বিষয়বস্তুরূপে রাধাকৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়কার কবিগণের ভিতরে একমাত্র লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃত' গ্রন্থখানি পড়িলে মনে হয়, এখানে একটা প্রবল ধর্মানুরাগ স্পষ্ট প্রতীয়মান। গ্রন্থখানি যিনিই রচনা করুন, তাঁহার সম্বন্ধেই এ-কথা মনে হয়, তিনি মনে-প্রাণে বৈষ্ণব ছিলেন। সেই বৈষ্ণব দৃষ্টিতে লীলা-প্রসার এবং লীলা-আস্বাদনের জন্যই তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম শ্রদ্ধার্হ শ্রীজয়দেব কবি সম্বন্ধে আমাদের এই বিষয়ে নিশ্চয় বিশ্বাস নাই। 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃত' গ্রন্থে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা অধ্যাত্ম আকাঙ্ক্ষা যে-ভাবে প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে, জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' কাব্য সব স্থানে সেই অধ্যাত্ম সুরের উচ্চগ্রামে পৌছিতে পারিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। কাব্যারম্ভে তাঁহার কাব্যের ফলশ্রুতি কি, জয়দেব সে বিষয়ে একটি শ্লোক দিয়াছেন।—

> যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
> যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
> মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
> শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্।

"যদি হরি-স্মরণে মনকে সরস করিতে চাও, আর যদি বিলাসকলা-সমূহে কুতূহল থাকে, তবে এই জয়দেব-ভারতী মধুর, কোমল এবং কান্ত পদাবলী শোন।" গীতগোবিন্দ কাব্যখানির মধ্যে 'হরি-স্মরণে সরসং মনঃ' অপেক্ষা 'বিলাসকলাসু কুতূহলম্'-এর দিকটাই স্থানে স্থানে বড় হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই যুগের এবং ইহার পরবর্তী যুগের রসবিদগ্ধ কবিগণ নরনারীর বিলাসকলা সম্বন্ধে বর্ণনায় যে কৌতূহল এবং নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, জয়দেবের কাব্যের মধ্যেও রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া ঠিক সেই একই বিলাসকলার কৌতূহল এবং নৈপুণ্য আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। ধর্মের সুর লইয়াও জয়দেব যেখানে কথা বলিয়াছেন সেখানেও তাঁহার জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে যুবতী কেলিবিলাসের কথা আসিয়া পড়িয়াছে। যেমন—

> হরিচরণস্মরণজয়দেবকবিভারতী।
> বসতু হৃদি যুবতীরিব কোমলকলাবতী॥

"হরিচরণই যাহার স্মরণ এমন জয়দেব কবির এই ভারতী (কবিতা) কোমল কলাবতী যুবতীর ন্যায় সকলের হৃদয়ে বাস করুক।" ('কোমল-কলাবতী' বিশেষণটি অবশ্য যুবতী এবং ভারতী উভয়ের প্রতিই তুল্য ভাবে প্রযোজ্য)। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নর-নারীর বিলাসকলা-বর্ণনে নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে জয়দেব-রচিত এমন প্রকীর্ণ কবিতাও পাওয়া যাইতেছে।"

আমাদের বক্তব্য হইল এই যে, ভারতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়া রাধা-প্রেমের যে প্রথম প্রকাশ, তাহা রসবিদগ্ধ কবিগণের প্রেম-কবিতার ভিতরেই। সেই প্রেম-কবিতার ভিতরে প্রাকৃত প্রেম এবং অপ্রাকৃত প্রেম লৌহ এবং স্বর্ণের ন্যায় স্বরূপবিলক্ষণ ছিল না। এই স্বরূপবৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে অনেক পরবর্তী কালে, বিশেষ করিয়া চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময়ে বা তাহার কিছু পূর্বে। সাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিলে আমরা বলিব, রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম-কবিতা ভাব, রস এবং প্রকাশ-ভঙ্গি সকল দিক হইতেই ভারতীয় সাধারণ প্রেম-কবিতার ধারা এবং পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছে। এমন কি চৈতন্য মহাপ্রভুর পরবর্তী কালে যে সকল বৈষ্ণবকবিতা রচিত হইয়াছে, তাহাও কাব্যরস এবং প্রকাশ-শৈলীর দিক হইতে মূলতঃ ভারতীয় প্রেম-কবিতার চিরাচরিত ধারাকেই অনুসরণ করিয়াছে। সুতরাং এই সাহিত্যের দৃষ্টি হইতে

রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কবিতাকে আমরা ভারতীয় সাধারণ প্রেম-কবিতার ধারারই একটি রস-সমৃদ্ধ পরিণতি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। এমনও দেখা যায়, পরবর্তী কালে যখন 'কানু ছাড়া গীত নাই'—অর্থাৎ প্রেম-কবিতা হইতে হইলে রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন না করিয়া হয় না, এই বিশ্বাস যখন দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তখন পূর্ববর্তী কালে রচিত একান্ত ভাবে মানবীয় প্রেমের কবিতাও রাধাকৃষ্ণের নামেই চলিয়া যাইতে লাগিল। একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দিতেছি। রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি নির্জনে সখীর প্রতি রাধার বচন বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে :

> যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
> স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
> সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
> রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।

কবিতাটির সরলার্থ হইল এই,—"যে আমার কৌমারহর (অর্থাৎ যে আমার কুমারীত্ব হরণ করিয়াছে) সে-ই আজ আমার বর; (আজও) সেই চৈত্র-নিশি, সেই বিকশিত মালতীর সুরভি, সেই কদম্ববনের পরিণত বা বর্ধিত বায়ু; আমিও সেই আছি, তথাপি সেই নদীর বেতসী তরুতলে (অশোক তরুতলে?) যে সব সুরতব্যাপারের লীলাবিধি, তাহাতেই আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।" রূপগোস্বামী এই শ্লোকটিকে যে অর্থে রাধার উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, 'পদ্যাবলী'তে এই শ্লোকের ঠিক পরে উদ্ধৃত রূপগোস্বামীর একটি নিজের কৃত শ্লোকেই তাহার ভাবটি পাওয়া যাইবে :—

> প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
> স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
> তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
> মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।

"হে সহচরি, সেই প্রিয় কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে; আমিও সে-ই রাধা; সে-ই এই আমাদের উভয়ের সঙ্গমসুখ; কিন্তু তথাপি যে বনমধ্যে মধুর মুরলীর পঞ্চমস্বরের খেলা হইত সেই কালিন্দী পুলিনবিপিনের জন্য আমার মন স্পৃহা করিতেছে।"

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের দুই স্থানে (মধ্যলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ; মধ্যলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ) দেখিতে পাই, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও এই 'যঃ কৌমারহরঃ' প্রভৃতি শ্লোকটিকে অতি গূঢ়ার্থব্যঞ্জক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথ-ক্ষেত্রের ঐশ্বর্য-কোলাহলাদিতে অতৃপ্ত হইয়া যখন বৃন্দাবনের জন্য মনে মনে স্পৃহা করিতেছিলেন, তখন এই শ্লোকটি ভাবাবেশে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে এ-সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাই তাহা এইরূপ :—

> নাচিতে নাচিতে প্রভুর হইল ভাবান্তর।
> হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চস্বর।
> শ্লোক—যঃ কৌমারহরঃ ইত্যাদি।
> এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার।
> স্বরূপ বিনে কেহ অর্থ না বুঝে ইহার।
> এই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
> শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে ব্যাখ্যান।
> পূর্ব্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
> কৃষ্ণের দর্শন পায়া আনন্দিত মন।
> জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল।
> সেই ভাবাবিষ্ট হইয়া ধুয়া গাওয়াইল।
> অবশেষে রাধাকৃষ্ণে কৈলা নিবেদন।
> সেই তুমি সেই আমি সেই নব-সঙ্গম।
> তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
> বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ।
> ইহাঁ লোকারণ্য হাতিঘোড়া রথধ্বনি।
> তাঁহা পুষ্পবন ভৃঙ্গপিকনাদ শুনি।
> ইহাঁ রাজবেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
> তাঁহা গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন।
> ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন।
> সে-সুখ সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এককণ।
> আমা লইয়া পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে।
> তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে।
>
> —চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ।

শ্রীজীবগোস্বামীর 'গোপাল-চম্পূ' নামক চম্পূকাব্যখানির উত্তর-চম্পূতে আমরা দেখিতে পাই, কৃষ্ণের সহিত রাধার বিবাহের পরে (জীবগোস্বামী স্বকীয়া-বাদের একান্ত পক্ষপাতী থাকায় রাধাকৃষ্ণকে বিধিমতে বিবাহ দিয়াছিলেন) বিশাখা সখী রাধার চিত্ত উদ্‌ঘাটন করিবার নিমিত্ত বহুরূপ চেষ্টা করিয়া রাধার মুখেই 'যঃ কৌমারহরঃ' প্রভৃতি শ্লোকটি উচ্চারণ করাইয়াছিল; এবং কৃষ্ণও নির্জনে রাধামুখে শ্লোকটি শুনিতে পাইয়া শ্লোকটির চতুর্থ চরণের পাঠ পরিশোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—'কৃষ্ণারোধসি তত্র কুঞ্জসদনে' এই পাঠই এখন সঙ্গত।

আসলে কিন্তু এই শ্লোকটির সহিত রাধাকৃষ্ণের কোনও সম্পর্ক নাই; এ শ্লোকটি কিছু কিছু পাঠান্তর সহ কোন কোন সংস্কৃত সংগ্রহ-গ্রন্থে মহিলা কবি শীলাভট্টারিকার নামে পাওয়া যায়। 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' কবিতাটি অজ্ঞাতনামা কবির কবিতারূপে 'অসতীব্রজ্যা'র ভিতরে আরও অসতীপ্রেমের অন্যান্য কবিতার ভিতরে পাওয়া যাইতেছে।(১)

এক দিকে যেমন এই অসতীব্রজ্যার কবিতা বৈষ্ণবগণ কর্তৃক রাধার উক্তি বলিয়া গৃহীত হইতে দেখি, তেমনি অন্য দিকে আবার রাধাকৃষ্ণের সহিত কালিন্দীতীরবর্তী লতাগৃহে যে গোপন প্রেম, তাহা লইয়া রচিত কবিতাকে প্রাচীন কাব্য-সঙ্কলয়িতৃগণ এই অসতীব্রজ্যার ভিতরেই স্থান দিয়াছেন, রাধা সেখানে অন্যান্য মানবী অসতীগণের সহিতই সাহিত্যে এক পংক্তিতে স্থান পাইয়াছে।

---

(১) কবিতাটির বহু স্থানে বহু পাঠান্তর পাওয়া যায় (টমাস্-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য)। 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' ধৃত পাঠ হইল এইরূপ :—

> যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তাশ্চন্দ্রগর্ভা নিশাঃ
> প্রোন্মীলন্নবমাধবীসুরভয়স্তে তে চ বিন্ধ্যানিলাঃ।
> সা চৈবাস্মি তথাপি চৌর্য্যসুরতব্যাপারলীলাভৃতাং
> কিং মে রোধসি বেতসীবনভুবাং চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি অসতীব্রজ্যার ভিতরে উদ্ধৃত দেখিতে পাই :—

তেষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দরাজতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্পকল্পনবিধিচ্ছেদোপযোগেঽধুনা
তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ।

প্রবাসী কৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে আগত সখাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"হে ভদ্র, সেই গোপবধূগণের বিলাস-সুহৃৎ এবং রাধার গোপনসাক্ষী কালিন্দীতীরবর্তী লতাগৃহগুলির কুশল ত? স্মরশয্যাকল্পনবিধির জন্য ছেদনের প্রয়োজন না থাকায় মনে হয়, এখন সেই পল্লবগুলি শুকাইয়া জীর্ণ এবং বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে।"

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে'র অসতীব্রজ্যার মধ্যে আর একটি কবিতা পাওয়া যাইতেছে যেখানে প্রত্যক্ষে রাধার নাম পাওয়া যাইতেছে না বটে, কিন্তু পদটি পড়িলে মনে হয়, রাধাই এখানে ব্যঞ্জিত। কোনও এক সখী বলিতেছে, "কুচযুগের বিলেপন কে মুছিয়া দিয়াছে? চোখের অঞ্জনই বা কে মুছিয়া দিল? তোমার অধরের রাগই বা কে প্রমথিত করিল? কে নষ্ট করিল কেশের মালাগুলি? 'সখি, ইহা অশেবজনস্রোতের কলুষনাশী নীলপদ্মভাসের দ্বারা।' '(তা হইলে) কৃষ্ণের দ্বারা?' 'না, যমুনার জলের দ্বারা।' '(বুঝিয়াছি), কৃষ্ণেই (কালোতেই) তোমার অনুরাগ'।"

ধ্বস্তং কেন বিলেপনং কুচযুগে কেনাঞ্জনং নেত্রয়ো
রাগঃ কেন তবাধরে প্রমথিতঃ কেশেষু কেন স্রজঃ।
তেনা[শেবজ]নৌঘকল্মষমুষা নীলাম্বুভাসা সখি
কিং কৃষ্ণেন ন যামুনেন পয়সা কৃষ্ণানুরাগস্তব।

'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকটির ঠিক পূর্বেই 'পদ্যাবলী'তে 'কস্যচিৎ' বলিয়া আর একটি পদ তোলা হইয়াছে :—

কিং পাদান্তে লুঠসি বিমনাঃ স্বামিনো হি স্বতন্ত্রাঃ
কঞ্চিৎ কালং কচিদভিরতস্তত্র কস্তেঽপরাধঃ।
আগস্কারিণ্যহমিহ ময়া জীবিতং ত্বদ্বিয়োগে
ভর্তৃপ্রাণাঃ স্ত্রিয় ইতি নন্বু ত্বং মমৈবানুনেয়ঃ।

"বিমনা হইয়া কেন আমার পদান্তে পতিত হইতেছ? স্বামীরা হইলেন স্বতন্ত্র; কিছু কালের জন্য কোথাও তাঁহারা অভিরত হইয়া থাকিতেও পারেন, এ-ব্যাপারে আর তোমার অপরাধ কি? এখানে আমিই হইলাম অপরাধিনী, কারণ, তোমার বিয়োগেও আমি বাঁচিয়া আছি; স্ত্রীগণ হইল ভর্তৃপ্রাণ, সুতরাং তুমিই হইলে আমার অনুনেয়।"

এই পদটিও রূপগোস্বামী 'অথ রহস্যমুনয়ন্তং কৃষ্ণং প্রতি রাধাবাক্যং' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 'পদ্যাবলী'র পরবর্তী কালের টীকাকার বীরচন্দ্র গোস্বামী তাঁহার 'রসিক-রঙ্গদা' টীকায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"চিরবিয়োগানন্তরং সাক্ষাদ্ভূতেঽপি প্রেয়সি সঙ্গমায় সতৃষ্ণামপি চিরব্রজত্যাগাৎ স্বাভাবিকবাম্যোদয়েন মানিনীং তাং বিলক্ষ্য তৎপ্রেমবশ্যো রসিকশেখরঃ স্বস্য তদধীনত্বাং প্রকাশয়িতুং পাদগ্রহণাদিকং চকার, ততঃ শ্রীরাধা সাক্ষেপং যদাহ তদ্বর্ণয়তি অথেতি।" কিন্তু এত টীকা-টিপ্পনী যে শ্লোক লইয়া তাহা আদৌ রাধাকৃষ্ণের কোনও কবিতা নয়! শ্লোকটি 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' বাক্কূট-কবির নামে 'মানিনী ব্রজ্যা'র ভিতরে এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ভাবদেবীর রচিত বলিয়া 'নায়কে মানিনীবচনম্'রূপে পাওয়া যাইতেছে। 'পদ্যাবলী'তে কুরুক্ষেত্রে রাধার কৃষ্ণের সহিত মিলন হইলে রাধা-চেষ্টিত (অথ কুরুক্ষেত্রে শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরীচেষ্টিতং) বলিয়া শুভ কবির এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

আনন্দোদ্গতবাষ্পপূরপিহিতং চক্ষুঃ ক্ষমং নেক্ষিতুং
বাহূ সীদত এব কম্পবিধুরৌ শক্তৌ ন কণ্ঠগ্রহে।
বাণী সম্ভ্রমাদ্ গদ্গদাক্ষরপদা সংক্ষোভলোলং মনঃ
সত্যং বল্লভসঙ্গমোঽপি সুচিরাজ্জাতো বিয়োগায়তে।

"আনন্দোদ্গত বাষ্পের দ্বারা চক্ষু আচ্ছন্ন হওয়ায় কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, কম্পবিধুর বিকল বাহু দুইটি কণ্ঠগ্রহণে সক্ষম হইতেছে না, বাণী সম্ভ্রমহেতু গদ্গদাক্ষরপদা, সংক্ষোভহেতু মন চঞ্চল; সত্য, সত্যই বহু দিন পরে জাত বল্লভসঙ্গমও বিয়োগের ন্যায়ই হইল।"

এই পদের অনুরূপ পদ দেখিতে পাই গোবিন্দদাসের নবোঢ়া রসোদ্গারের একটি পদে—

দরশনে লোর নয়নযুগ ঝাঁপ।
করইতে কোর দুহুঁ ভুজ কাঁপ॥
দূর কর এ সখি সো পরসঙ্গ।
নামহি যাক অবশ করু অঙ্গ॥
চেতন না রহ চুম্বন বেরি।
কো জানে কৈছে রভস-রস-কেলি। ইত্যাদি।

পূর্বোক্ত সংস্কৃত শ্লোকটি কিন্তু আমরা 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' পাইতেছি সাধারণ নবোঢ়া নায়িকার দেহ-মনের অবস্থান্তরের দৃষ্টান্তরূপে। 'পদ্যাবলী'তে রুদ্রের নামে রাধা-বিরহের একটি পদ উদ্ধৃত আছে—

অচ্ছিন্নং নয়নাম্বু বন্ধুষু কৃতং তাপঃ সখীষ্বাহিতো
দৈন্যং ন্যস্তমশেষতঃ পরিজনে চিন্তা গুরুভ্যোঽর্পিতা।
অদ্যশ্বঃ কিল নির্বৃতিং ব্রজতি সা শ্বাসৈঃ পরং খিদ্যতে
বিস্রব্ধো ভব বিপ্রয়োগজনিতং দুঃখং বিভক্তং তয়া।

"নিরন্তর নেত্রজল বন্ধুসমূহে অর্পণ করিয়াছে, সখীসকলে তাপ নিহিত করিয়াছে, পরিজনে দৈন্য অশেষরূপে ন্যস্ত করিয়াছে, গুরুজনে চিন্তা অর্পণ করিয়াছে; আজকাল সে নির্বৃতি প্রাপ্ত হয়, কেবল শ্বাসের দ্বারা খিন্ন হইতেছে। তুমি শঙ্কারহিত হও, তাহার বিরহজনিত দুঃখ এখন বিভক্ত হইয়াছে।" 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' কিন্তু কিছু পাঠান্তর সহ এই পদটি সাধারণ নায়িকার 'বিরহিণী চেষ্টা'রূপে উদ্ধৃত রহিয়াছে। 'পদ্যাবলী'র ভিতরে ভবভূতির 'মালতী-মাধব' এবং 'উত্তর-রাম-চরিত' নাটকের বিরহ-বিলাপের কবিতাও রাধা-বিলাপের ভিতরেই স্থান পাইয়াছে।

'অমরু-শতকে'র অমরু এক জন প্রাচীন কবি। 'ধ্বন্যালোক'-কার আনন্দবর্ধন অমরুর প্রেম-কবিতার সুখ্যাতি করিয়াছেন; সুতরাং অমরুর প্রেম-কবিরূপে খ্যাতি নবম শতকের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই 'অমরু-শতক' হইতে বিরহ-মানের কবিতা রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে উদ্ধৃত হইয়াছে। অমরু হইতে উদ্ধৃত এই কবিতাগুলি দেখিলে বোঝা যায়, প্রেমের তীব্রতা এবং সুক্ষ্ম সৌকুমার্য প্রকাশে এই জাতীয় প্রেমের কবিতাই পরবর্তী কালের রাধা-প্রেম কবিতার শুধু প্রাগ্‌রূপ নয়, অনেক স্থলে আদর্শ-রূপ। অমরুর এই জাতীয় একটি কবিতাকে 'ক্ষুভিতরাধিকোক্তি' বলা হইয়াছে :

নিশ্বাসা বদনং দহন্তি হৃদয়ং নির্মূলমুন্মথ্যতে
নিদ্রা নৈতি ন দৃশ্যতে প্রিয়মুখং রাত্রিন্দিবং রুদ্যতে।
অঙ্গং শোষমুপৈতি পাদপতিতঃ প্রেয়াংস্তথোপেক্ষিতঃ
সখ্যঃ কং গুণমাকলয্য দয়িতে মানং বয়ং কারিতাঃ॥

"নিশ্বাসগুলি আমার বদন দহন করিতেছে, হৃদয় নির্মূল ভাবে উন্মথিত হইতেছে, নিদ্রা আসিতেছে না, প্রিয়মুখ দেখা যাইতেছে না, রাত্রি-দিন শুধু রোদন করিতেছি। আমার দেহ শুষ্কতা প্রাপ্ত হইতেছে, পাদপতিত প্রিয়কেও উপেক্ষা করিয়া দিয়াছি। সখীরা আমাতে কি গুণ দেখিয়া দয়িতের প্রতি এমন মান করাইয়াছিল?" অমরুর আরও একটি কবিতা পদ্যাবলীতে রাধা-বাক্য-রূপে গৃহীত হইয়াছে :—

প্রস্থানং বলয়ৈঃ কৃতং প্রিয়সখৈরস্রৈরজস্রং গতং
ধৃত্যা ন ক্ষণমাসিতং ব্যবসিতং চিত্তেন গন্তুং পুরঃ।
গন্তুং নিশ্চিতচেতসি প্রিয়তমে সর্বে সমং প্রস্থিতা
গন্তব্যে সতি জীবিত-প্রিয়সুহৃৎসার্থঃ কথং ত্যজ্যতে।

"বলয়গুলি প্রস্থান করিয়াছে, অজস্র অশ্রুর সহিত প্রিয়সখীরাও গিয়াছে, ক্ষণকালের জন্যও ধৈর্য নাই, চিত্তও পূর্বেই যাইবার জন্য উদ্যত। প্রিয়তম যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলে সকলেই সাথে সাথে চলিল; তাঁহার যাওয়া যদি ঠিকই হয়, তবে প্রাণপ্রিয় সুহৃদের সঙ্গ আর ত্যাগ করা কেন?"

ভাব ও বাচন-ভঙ্গির দিক হইতে এই সব কবিতা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী কালের সমজাতীয় বৈষ্ণবকবিতার স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট স্মরণ হইতে থাকে। এই কাব্য-ধারাই যে পরবর্তী কালের বৈষ্ণবসাহিত্যে কি ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে তাহা পূর্বরচিত পদ এবং পরকালে রচিত পদের তুলনা করিলেই বোঝা যাইবে। অমরু ব্যতীত ক্ষেমেন্দ্র, 'নলচম্পূ'র ত্রিবিক্রম, দীপক প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কবিগণের প্রেমের কবিতা 'পদ্যাবলী'তে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কবিতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই গ্রহণের ভিতরে সমাহর্তা রূপগোস্বামীর যে কিছু কিছু লঘু হস্তাবলেপ ছিল না তাহা বলা যায় না। পদগুলি যাহাতে যেখানে যে-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে সেই স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে যথাসম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রূপগোস্বামী পদগুলির ভিতরে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎঅদল-বদল করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং মোটামুটি ভাবে দেখা যাইতেছে, প্রেমের স্থূল-সূক্ষ্ম যত রকমের বর্ণনাই পূর্ববর্তী কবিরা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোন কবিতারই পরবর্তী কালে গোপীপ্রেম বা রাধা-প্রেমের বর্ণনারূপে গৃহীত হইতে কোনওরূপ বাধা ছিল না।

রাধা-প্রেমের যত বিচিত্র এবং বিশদ বর্ণনা তাহা যে মূলতঃ ভারতীয় প্রেম-কবিতার প্রবহমান ধারা হইতে গৃহীত, এ বিষয়ে নিশ্চিত হইবার অন্য উপায় রহিয়াছে। পূর্ববর্তী কালের সংস্কৃত ও প্রাকৃতে লিখিত ভারতীয় সকল প্রেম-কবিতাগুলির সহিত আমরা পরবর্তী কালের রাধা-প্রেমের অসংখ্য কবিতার যদি তুলনা করি তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব, ভারতীয় সাধারণ কাব্যধারা এবং কবি-রীতি ও কবি-প্রসিদ্ধিকেই বৈষ্ণব কবিগণ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতীয় সংগ্রহ-গ্রন্থগুলিতে এই জাতীয় বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কবি কর্তৃক লিখিত বহু প্রকীর্ণ কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে; এই কবিতাগুলি এবং পরবর্তী কালে রচিত বৈষ্ণব-কবিতাগুলিকে পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

সীঙ্গার সেলাই কলের ইতিকথা

যান্ত্রিক দুনিয়ায় সীঙ্গার সেলাই কল মানুষের অসীম উপকারে লেগেছে। আইজ্যাক মেরিট সীঙ্গার ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মাত্র চল্লিশ ষ্টার্লিং নিয়ে সীঙ্গার যন্ত্রটি তৈরী ক'রে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন। ওয়োলটার হাণ্ট, যিনি সেফ্‌টিপিন আবিষ্কার করেন, তিনিও ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে একটি সেলাই যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু যন্ত্রটি কাজে লাগাতে সক্ষম হননি, যখন তাঁর কন্যা আবিষ্কৃত কলের দোষাবলী দেখিয়ে দেয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে সর্বপ্রথম সীঙ্গার যন্ত্র পুরস্কৃত হয়। সীঙ্গার বাজারে চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এত বেশী আদৃত হয় যে, ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন যন্ত্র এত অধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। জাপানে সীঙ্গার ব্যবসায়ীর প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং হাজার হাজার জাপানীকে যন্ত্রে সেলাই-শিক্ষা দেওয়া হ'তে থাকে। রাশিয়ায় কিছু কাল বাদে সীঙ্গার যন্ত্র লোকে দেখতে পায়। জারের সৈন্য-সামন্তের ২৫০,০০০ তাঁবু তৈয়ারীর কাজে লাগে সীঙ্গার। ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম সীঙ্গার যন্ত্র বিশেষ এক ধারায় বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। হাজার হাজার গজ কাপড়ে সীঙ্গারের চিহ্ন ছাপিয়ে কিছু কম মূল্যে ঐ কাপড় বিক্রীত হয়েছিল। কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই সীঙ্গারের ১২০০ সেলাই-কেন্দ্র আছে। যন্ত্রটি শুধু কাপড় সেলাই করে না, সীঙ্গারের এমন এমন যন্ত্র আছে—যাদের দ্বারা বর্ষাতি, পর্দা, বস্তা ও বেলুন পর্য্যন্ত সেলাই করা যায়; বই পর্য্যন্ত বাঁধানো যায়। চুয়ান্নটি ভাষায় সীঙ্গারের 'ক্যাটালগ' ছাপা হয়ে থাকে। শুনলে বিস্মিত হতে হয়, যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা ভারতবর্ষে সীঙ্গারের জনপ্রিয়তা অনেক বেশী। সীঙ্গারের আবিষ্কর্ত্তা স্বর্গত সীঙ্গার ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ব্যবসা থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করতে যান ইংলণ্ডে, তখন সীঙ্গার ব্যবসায়ীর ব্যাঙ্কে ১৩,০০০,০০০ ষ্টার্লিং গচ্ছিত আছে। মিঃ ক্লার্ক সীঙ্গারের সর্ব্বময় কর্ত্তা হ'লেন তখন। যন্ত্রটি জনপ্রিয় করতে কোম্পানীকে বিনা বেতনে অসংখ্য লোককে সেলাই শিক্ষা দিতে হয়েছিল এবং এখনও হয়।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, মহাত্মা গান্ধী সেলাই করতে শিখেছিলেন সীঙ্গার যন্ত্রে প্রথম। তিনি যখন বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের আন্দোলন চালিয়েছিলেন, তখন সীঙ্গারকে শুধু বর্জ্জন করেননি। বলেছিলেন,—"সীঙ্গার এমন একটি প্রয়োজনীয় বস্তু যা কচিৎ আবিষ্কৃত হয়ে থাকে।"

চর্যাপদে লৌকিকতা

অবন্তী সান্যাল

২

চর্যাপদগুলি সন্ধ্যা বা সন্ধা ভাষায় রচিত। এদের বাহ্য এবং আভ্যন্তর অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক্। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, "সন্ধ্যা ভাষা মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার; খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।" সম্যক্ ধ্যান বা চিন্তা ক'রে যে ভাষা বোধগম্য হয়, তাই সন্ধ্যা ভাষা। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থ, টীকা ব্যতিরেকে হাজার বছর ধ্যান করলেও বোধগম্য হবে না। তাও কেবল সংস্কৃত টীকা নয়, সংগে তিব্বতী টীকাও প্রয়োজন।

এ পর্যন্ত আমরা মাত্র ৫০টি চর্যার সন্ধান পেয়েছি, হাতে পেয়েছি মাত্র সাড়ে ছে'চল্লিশটি পদ। কিন্তু সিদ্ধাচার্যরা যে এ ধরণের অসংখ্য পদ রচনা করেছিলেন, সে বিষয়ে আজ কোন সন্দেহ নেই। পি, কোর্দিয়ে সাহেব তেঙ্গুরের যে তালিকা প্রকাশ করেছিলেন, তার অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে লুইপাদের একখানি, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের তিনখানি, ভুসুকু'র, একখানি, কৃষ্ণাচার্যের একখানি, সবাহ'র তিনখানি, কঙ্কনের একখানি, বিরূপের দুইখানি ও শবরের দুইখানি গীতিকাগ্রন্থের উল্লেখ আছে। এ ছাড়া ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত আরও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল নিশ্চয়ই, যাদের খোঁজ আমরা কেউ আজ জানি না। হয়ত তিব্বতের গুহা-গুম্ফায় এখনো সে সব গ্রন্থ আত্মগোপন ক'রে আছে। মধ্যযুগের বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিশালতা আমাদের বিস্মিত করে সন্দেহ নাই। কিন্তু ধর্মাশ্রয়ী বিরাট সাহিত্য গড়ে তোলার ব্যাপারে সিদ্ধাচার্যরাই বৈষ্ণবদের পথপ্রদর্শক।

চর্যাগুলির ভাষা খাঁটি বাংলা। বাংলা ভাষার আদিম স্তরের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই এদের মধ্যে আছে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বহু প্রচলিত ও অপ্রচলিত স্থানীয় শব্দের সাক্ষাৎও এখানে পাওয়া যায়। চর্যার অনেক উক্তি এখনো বাংলা-প্রবচন হিসাবে চালু আছে। যে সব, 'হাতের কাঁকন মা লেউ দাপন,' 'বর সুন গোহালি কি মো দুঠ বলন্দে'। 'অপনা মাংগে হরিণা বৈরী'-র সাক্ষাৎ মিলবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ও ষোড়শ শতকের মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'। কুক্কুরী-পাদের 'দিবসই বহুড়ী' ইত্যাদি উক্তিটি সর্বভারতীয় প্রবচন হলেও, আজো মুখরা গ্রাম্য শাশুড়ীর মুখে বধূ সম্পর্কে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে দেখা যায়।

চর্যাগুলি যে বৈষ্ণব-পদের মত গীত বা কীর্তিত হ'ত তা বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর উল্লেখ থেকেই বোঝা যায়। এই সব রাগ-রাগিণীর মধ্যে পটমঞ্জরী, বরাড়ী, মল্লার, মালশী, ধানশী প্রভৃতি রাগ-রাগিণী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট সুপরিচিত। সাধনার অঙ্গ হিসাবে গাঢ়-ভাব-সমৃদ্ধ পদাবলী গীত ও কীর্তন বৈষ্ণবদের বৈশিষ্ট্য বলে দাবী করা হয়। কিন্তু এদিক থেকে (পদাবলী গীত ও কীর্তনে) সহজিয়া সিদ্ধাচার্যরাই বৈষ্ণবদের অগ্রজ। সহজিয়া বৌদ্ধ সাধনতত্ত্বের অনেক কিছু আত্মস্থ করার সংগে কথ্য ভাষার রচিত গীত ও কীর্তনের ঐতিহ্যটিও পরবর্তী বৈষ্ণবেরা আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। এই ঐতিহ্যের ধারাকেই বহন করেছেন আরও পরবর্তী কালে আউল-

বাংলা ভাষা যখন অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছে সেই সময়ে চর্যাগুলি রচনা সুরু হয়েছিল। অপভ্রংশ যুগের শেষ দিকের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট লক্ষণ কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহার। সকল চর্যাতেই এই অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য দিকে, বাংলা পয়ারের প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যাবে চর্যাপদে। প্রায় সর্বত্র দু'টি করে, ক্বচিৎ ত্রিপদী'র মত তিন পর্ব। চর্যার যুগে বাংলা উচ্চারণে শ্বাসাঘাত প্রতিষ্ঠিত হয়নি; শ্বাসাঘাত পাকাপাকি ভাবে আসন পেয়েছে মধ্যযুগের প্রথম দিকে।

"কা আ তরুবর পঞ্চবি ডাল।"—এই চরণে স্পষ্টত আট মাত্রার দু'টি পর্ব। শ্বাসাঘাতের ফলে দুই পর্বে দু'টি ক'রে মাত্রা লুপ্ত হয়ে, পরবর্তী কালে দুই পর্বের ও চৌদ্দ মাত্রার পয়ারের সৃষ্টি হ'য়েছে। এই পয়ার ও তার প্রকারভেদকে বাহন ক'রে বাংলা সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর ঈশ্বরগুপ্ত পর্যন্ত ছুটে এসেছে কখনো জোর কদমে, কখনো দুলকি তালে, আবার কখনো বা ক্লান্ত পদক্ষেপে। এই পয়ারের নূতন রূপ মধুসূদন ও তারও পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে। পয়ারই খাঁটি বাঙ্গালী ছন্দ, বাঙ্গালীর কাব্যভাবনার প্রধান ধারক ও বাহক। এর জন্ম সিদ্ধাচার্যদের হাতে, আর অপুষ্ট শৈশবের পরিচয় চর্যাগুলিতে।

বজ্র ও সহজযানী বৌদ্ধদের গুহ্য সাধনতত্ত্বই চর্যাগুলির ভাব-বস্তু। এদের আভ্যন্তর অর্থ পণ্ডিতদের কাছে যত মূল্যবানই হ'ক না কেন, আমাদের কারবার বাহ্য অর্থ নিয়ে। সিদ্ধাচার্যরা কাব্যার্থে চর্যা রচনা করার কথা স্বপ্নেও ভাবেননি। কিন্তু তবু এগুলি একেবারে কাব্যরসবর্জিত নয়। তাঁরা খাঁটি সাধক ছিলেন; নিষ্ঠার তিলমাত্র অভাব তাঁদের ছিল না। তাঁদের ভাবের বাহক ছিল সহজ ও সরল কথ্য ভাষা। তাঁদের নিষ্ঠা ও আবেগের ফলে যা সৃষ্টি হয়েছে তাতে একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফুটেছে; তার মধ্যে আছে ভাব-বস্তুর স্পষ্টতা অথচ অনুভূতির গভীরতা।

জোইনি তঁই বিনু খনহ না জীবমি।
তো মুহ চুম্বি কমলরস পিবমি॥

[যোগিনী তোমাকে বিনে তিলেকও বাঁচব না। তোমার মুখ চুম্বন ক'রে কমলরস পান করব।]

এই দুই চরণের লৌকিক অর্থে রক্ত-মাংসের মানুষের যে তীব্র কামনা ব্যক্ত হয়েছে, সেই তীব্র কামনাই ছিল চর্যাকারের হৃদয়ে, কিন্তু সম্পূর্ণ অলৌকিক অর্থে। এ 'জোইনী' লৌকিক কেউ নয়, সুতরাং তার মুখচুম্বনে কমলরস পানও লৌকিক নয়। তবু অলৌকিক 'জোইনি'র জন্য সাধকের কামনার তীব্রতা ও গভীরতা আশ্চর্য ভাবে রসমণ্ডিত হয়েছে যাতে লৌকিক মনও মুহূর্তে মুগ্ধ হয়ে ওঠে।

চর্যাগুলিতে রূপক ও উৎপ্রেক্ষার বিস্ময়কর সুষ্ঠু প্রয়োগ দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। বিমূর্ত ভাব-বস্তুকে সহজ ও সরল ভাবে সঞ্চারিত ক'রতে হলেই উপমার প্রয়োজন। উপমার উপমান প্রায় সর্বক্ষেত্রেই লৌকিক। সার্থক ও সুষ্ঠু উপমান উপস্থিত করার মধ্যেই কবির কৃতিত্ব। আর এই ব্যাপারে সিদ্ধাচার্যরা চূড়ান্ত কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন নিঃসন্দেহে।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, চর্যাগুলির বহু উপমা চিরাচরিত ধারার। যেমন, কায়াকে তরুর সংগে, সংসারকে অরণ্য এবং অবিদ্যা-বিমোহিত আত্মাকে হরিণের সংগে উপমা দেওয়া। এগুলি এবং অবিদ্যার

কমলবনে কেলির সংগে উপমা—সবই 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে' মিলবে। সংসারকে সমুদ্র অথবা বিক্ষুব্ধ নদীর সংগে তুলনাটি আমাদের কাছে সব চেয়ে পরিচিত। কিন্তু চিরাচরিত ধারার বাইরেও সিদ্ধাচার্যেরা লৌকিক জগতের বহু উপমান উপস্থিত করেছেন এবং সেগুলির প্রয়োগও করেছেন সুনিপুণ ভাবে।

১০ নং চর্যায় নৈরাত্মার স্বরূপ এবং তাঁর সহায়তায় চিত্তের আনন্দবিহার বর্ণনা করা হয়েছে। নৈরাত্মা অ-সহজিয়াদের কাছে পুরোপুরি ধরা দেন না, তিনি চিত্তকে অবিদ্যা ও রূপাদি সংস্কার থেকে মুক্ত করেন। এই তত্ত্বের রূপক হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে ডোম্বীকে—যে ডোম্বী অস্পৃশ্যা। স্নাড়া বামুনদের সে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, সে বিক্রয় করে তন্ত্রী আর চাঙাড়ী। নৈরাত্মার সংগে চিত্তের মিলন হতে গেলে তার পক্ষে রূপাদি সংস্কারবর্জিত হতে হয়; তাই ডোম্বীর প্রেমিক কাহ্নুকে কাপালিক বলা হয়েছে—যে কাপালিক হচ্ছেন নির্ঘৃণ ও উলংগ। রূপক হিসাবে এটি সার্থক। এই চর্যাটির প্রথম দুই চরণের আক্ষরিক প্রতিধ্বনি মেলে ধর্মঠাকুরের গাজনের ঘরভাঙ্গা অনুষ্ঠানের ছড়ায়:

পথুর পাড়েতে সদা ডোমের কুড়িআ।
ছোই ছোই জাই সো বাহ্মণ নাড়িআ।

ভুসুকু'র চর্যায় ব্যবহৃত চিত্ত-হরিণ ও কায়-হরিণের উৎপ্রেক্ষার অনুবৃত্তি নরোত্তমদাসের কড়চা'য় মিলবে।

তরংগবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের সংগে সংসারের রূপক কল্পনা বিভিন্ন কাব্য ও ধর্ম-সাহিত্যে সুপরিচিত। রবীন্দ্রকাব্যেও এর প্রয়োগ খুব বেশী। এই রূপকটি চর্যাগুলিতেও বহুল ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সমুদ্র নেই, আছে 'ভব-নঈ' অর্থাৎ ভব-নদী। তার কারণও আছে। বিষয়-বাসনা-সংক্ষুব্ধ সংসারকে উপমিত ক'রতে গিয়ে বাঙ্গালীর পক্ষে সমুদ্রের প্রয়োজন নেই। বাংলার সমুদ্র-সদৃশ ভয়ংকর পদ্মা, ভাগীরথী ও লৌহিত্যই যথেষ্ট। আর বাংলা দেশের মানুষ ব'লেই নদ, নদী, খাল, বিল এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় বস্তুকেই সিদ্ধাচার্যেরা বারংবার রূপক ও উৎপ্রেক্ষা হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

ভবনদী পার হওয়া সাধকের পক্ষে একমাত্র কাম্যবস্তু। পার হওয়া যায় দু'প্রকারে। এক, সেতু রচনা করে; আর, নৌকো ক'রে। কুড়ুল দিয়ে কাঠ চিরে, সেতু অথবা সাঙ্কম (সাঁকো) তৈরী ক'রে নদী পার হবার বর্ণনা আছে একটি চর্যায়। নৌকা ক'রে পার হবার বর্ণনা আছে আট-ন'টি চর্যায়। সে সব নৌকার প্রসঙ্গে হাল, গুণ, কেড়ুয়াল প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে, এবং এদের প্রত্যেককেই সাধনতত্ত্বের এক-একটি বিশিষ্ট বস্তুর রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

কিন্তু নৌকা বাইতে জানার আর্টটা স্বভাবগত নয় মানুষের, সেটা আয়ত্ত ক'রতে হয় অথবা অন্যের সাহায্য নিতে হয়। যেমন সংসারের হাত থেকে ত্রাণ পাবার কৌশল সাধকের জানা থাকে না, গুরুর কাছ থেকে জানতে হয়। সেই জন্য 'ভব-নদী' পারের কাণ্ডারীর প্রয়োজন। এই কাণ্ডারীহীন নৌকারোহীর আকুলতা নাথ-গীতিকা ও আউল-বাউল-মরমিয়াদের গানে খুব বেশী স্পষ্ট। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে পাই:

ভাঙা নৌকা ছেঁড়া কাছি
গুরু কেমনে হব পার?

বাউলের আর্তনাদ:

আমার ছিঁড়িলা হালের পানস
নৌকায় খাইলা পাক
মর্শিদ, রইলাম তোর আশে।

শুধু কাণ্ডারী হলেই চলে না, তার সংগে চাই পারের কড়ি। লৌকিক নদী-পারাপারের কাণ্ডারী যেমন কড়ি না পেলে পার করবে না, তেমনি পার করবেন না ভব-নদীর পারের কাণ্ডারী। কেবল তাই নয়, কাণ্ডারী যাত্রীকে কড়ির জন্য নিগৃহীত করতেও ছাড়েন না। চর্যাকার বলেন, 'বাণ্ড কুরণ্ড, সন্তার জানি'। বৈষ্ণবদের নৌকাবিলাসেও শ্রীকৃষ্ণ রাধাকেও এমনই নিগৃহীত ক'রে আদায় করেছেন।

চর্যাকার ডোম্বীপাদ তাঁর ভব-নদী পারাপারের নৌকার কাণ্ডারী করেছেন ডোম্বীকে। ডোম্বী গঙ্গা-যমুনায় খেয়া পারাপার করে। অবলীলায় সে যোগীকে পার করে দেয়। সে নৌকায় পাঁচ কেড়ুয়াল, পিছনে কাছি বাঁধা। পারের কড়ি সে নেয় না। নৌকার ফুটো দিয়ে জল ওঠে, সেঁউতি দিয়ে সেচে। এখানে ডোম্বী নৈরাত্মার রূপক। তিনি চিত্তের সহায়িকা সহজ-সুন্দরী; চিত্তকে পার ক'রে নিয়ে চলেছেন শূন্যতার দিকে।

এই বিশিষ্ট রূপকটি বার বার ঘুরে-ফিরে দেখা দিয়েছে বাঙ্গালীর বিভিন্ন ধর্ম ও কাব্য-সাহিত্যে। বৈষ্ণবের 'নৌকাবিলাসে' এই রূপকের সুস্পষ্ট ছায়া। তবে একটু ভিন্নতা আছে। 'নৌকাবিলাসে' কাণ্ডারী কৃষ্ণ পুরুষ, যাত্রী রাধা নারী। কিন্তু মর্মগত বক্তব্য একই। প্রাচীন সূর্য্যের গানে (গৌরী সহ সূর্যের নৌকাবিলাসে) এই একই বস্তু চোখে পড়ে।

এই রূপকটিই কাহিনীর অংশ হিসাবে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে, বিশেষ করে মনসার জন্ম ব্যাপারে বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত, কেতকা দাস প্রভৃতির কাব্যে। এর লৌকিক রূপ মহাভারতেও আছে (মৎস্যগন্ধা ও পরাশর)। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা এক সময় লৌকিক কাহিনী ছিল, তত্ত্বব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ রূপকে উন্নীত হয়েছে অনেক পরে। কিন্তু এই রূপকটির ক্ষেত্রে এর ঠিক বিপরীতই ঘটেছে ব'লে মনে হয়। আগে এটা ছিল তাত্ত্বিক-রূপক, পরে হয়েছে মঙ্গলকাব্যের আধা-লৌকিক কাহিনীর অংশ—যেখানে এর লৌকিকত্বই প্রকট।

এই অতি পরিচিত রূপকটি রবীন্দ্রনাথও ব্যবহার না ক'রে পারেননি তাঁর জীবন-দেবতার তত্ত্ব-ব্যাখ্যায়। তাঁর 'সোনার-তরী'তে ঘন বরষায় 'খর পরশা' ভব-নদীতে ভাসমান জীবনতরী। জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল তাতে বোঝাই, তাই ত সে সোনার তরী। তাতে সোনার ফসল ধরে কিন্তু বাসনা-কামনার আধারটির সেখানে 'ঠাঁই নেই'। চর্যাকার ব'লেন:

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী।

রবীন্দ্রনাথের সংগে চর্যাকারের ভাবের মৌলিক পার্থক্য কোথায়—কেবল বেদনাবোধটুকু ছাড়া? এমন কি 'সোনার তরী'র রূপটি চর্যাকারের চোখেও ধরা পড়েছিল। এই সোনার তরীতে রবীন্দ্রনাথেরও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। তাঁর জীবনসঙ্গিনী, জীবনদেবতা নারী, তিনি সোনার তরীর কাণ্ডারী। চর্যাকারের কাছে তাঁর

কাণ্ডারী 'বুড়িল্লী মাতঙ্গী'—যাঁর আভাস চিত্র পেয়েও পায় না। রবীন্দ্রনাথের চোখে তিনি মধুরহাসিনী বিদেশিনী—যাঁর সম্যক্ পরিচয় তিনি কখনো জানেন না। 'তরী' ভেসেছে অকূল সিন্ধুতে, যাত্রীর কণ্ঠে ব্যাকুলতা :

বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়
সোনার তরণী কোথা ভেসে যায়,
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন অস্তাচলে।

এমনি ব্যাকুল কণ্ঠ চর্যাকারেরও :

বাবতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছাড়া।

উভয়ত একই রূপক, একই আকুলতা। শুধু রবীন্দ্রনাথে রূপকটি চূড়ান্ত সৌন্দর্য ও কাব্যমণ্ডিত, চর্যায় যার অভাব। পার্থক্য কেবল এইটুকুই।

নদীবহুল বাংলায়—যেখানে খরস্রোতা নদী পার হতে গিয়ে পথিক মাথায় হাত দিয়ে বসে, যেখানে নৌকা আর কাণ্ডারী ব্যতিরেকে দুস্তর নদী পার হওয়া অসম্ভব—সেখানে এই নদী, নৌকা আর কাণ্ডারী যে মানুষের মনে দার্শনিক তত্ত্বের স্বাভাবিক উপমান হ'য়ে দাঁড়াবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্য প্রাদেশিক সাহিত্যে এই রূপকটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এর সাক্ষাৎ পদে পদে। এর সঙ্গে বাঙ্গালী-মনের একটা স্বাভাবিক আত্মীয়তা আছে। কারণ এই রূপকের চিত্রটি বাংলা দেশেরই খাঁটি লৌকিক চিত্র।

বাংলা দেশের না হ'লেও এমনি আরও কয়েকটি লৌকিক বস্তু-চিত্র সর্বভারতীয় তাত্ত্বিক রূপকে পরিণত হয়েছে, যাদের উল্লেখ এ ক্ষেত্রে অবান্তর হবে না। এদের একটি, বনস্পতির চিত্র—যার ধ্যান-গম্ভীর মৌন মূর্তি অরণ্যচারী মানুষের মনে এক দিন দর্শনের ছায়াপাত করেছিল। কিন্তু আর্য ঋষি তাঁর শান্ত-সমাহিত একেশ্বরের উপমা দিতে গিয়ে এই বনস্পতিকেই খুঁজে পেয়েছেন—'বৃক্ষৈব দিবি স্তব্ধো তিষ্ঠত্যেকঃ।' এই বনস্পতিই রূপান্তরিত হয়েছে স্বর্গের পারিজাত আর কল্পবৃক্ষের রূপকে। দ্বিতীয় চিত্রটিও অতি সাধারণ লৌকিক চিত্র—এক ডালে বসা দু'টি পাখী। কী-ই বা এমন অভিনবত্ব এদের! তবু আত্মা আর পরমাত্মার সম্পর্ক বোঝাতে বেদ ও উপনিষদের ঋষিরা রূপকায়িত করলেন এদের—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।' এরাই আবার দেখা দিয়েছে বেঙ্গমা-বেঙ্গমী আর শুক-সারীর রূপে রূপকথার পাত্র-পাত্রী হ'য়ে। রবীন্দ্রনাথের কাছেও এরা ধরা না দিয়ে পারেনি, যার প্রমাণ 'সোনার তরী'র 'দুই-পাখী'।

বনস্পতি আর দুই পাখী,—এই দু'টি লৌকিক বস্তু-চিত্র তাত্ত্বিক রূপক হ'য়ে নিঃসন্দেহে কয়েক হাজার বছর ধ'রে ভারতীয় মনের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এদের মতই বাঙ্গালী-মানসের একটি বিশিষ্ট দার্শনিক-ভাবনার উপমান জুগিয়ে এসেছে নদী, নৌকা আর কাণ্ডারীর বস্তু-চিত্র—যার ধারা সিদ্ধাচার্যদের সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি। মধ্যে হাজার বছরের ব্যবধান। এই হাজার বছরে আমূল রূপান্তর ঘটেছে বাঙ্গালীর জীবন ও দর্শনের। কিন্তু এই একটি রূপক-চিত্রের মধ্যেই যেন হাজার বছরের বাঙ্গালী-মনের একটি বিশেষ প্রবণতার যোগসূত্র খুঁজে পেতে বিলম্ব ঘটে না।

ফাঁসি দিয়েও রেহাই নেই?

কানাইলালের ফাঁসি হয়ে গেলে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে কালীঘাট শ্মশানে খুব রাজনৈতিক উৎসব হয় এবং কানাইলালের শবদেহের আলোকচিত্র পর্য্যন্ত গৃহীত হয়। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ব্যাপারটিতে খুশী হননি। কলকাতা মহানগরীতে তুমুল আন্দোলন ও উত্তেজনা সৃষ্টি হ'তে দেখে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসির দিনটি—২৩শে নভেম্বর কা'কেও জানতে দেওয়া হয়নি। জেনেছিলেন কয়েক জন সত্যেন্দ্রর আত্মীয়-স্বজন। অতীব-গম্ভীর, স্বল্পভাষী বোমপাস সাহেব তখন আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট। সত্যেন্দ্রর ফাঁসি হয়ে গেলে জেলের ভিতর দাহ করতে হবে এবং দাহ করতে হ'লে আত্মীয়-স্বজনদের পাঁচটি সর্ত্ত পালন করতে হবে অতি অবশ্য—আদেশ করলেন বোমপাস। যথা :—

প্রথম সর্ত্ত —জেলের বাহিরে দাহ নিষেধ।
দ্বিতীয় " —কোন আড়ম্বর ও আন্দোলন নিষেধ।
তৃতীয় " —কোন স্মৃতি-চিহ্ন লইয়া যাওয়া নিষেধ।
চতুর্থ " —জেলের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে দাহ করতে হবে।
পঞ্চম " —লোকসংখ্যা ১৪।১৫ জনের অধিক হবে না।

ভক্ত কবীর

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

উপেন্দ্রকুমার দাস (শান্তিনিকেতন)

মন্দির, মসজিদ, তীর্থ, ব্রত, মূর্তি এ সব সম্বন্ধেও কবীরদাসের অনুকূল মনোভাব ছিল না। তিনি এই সবকেও ব্যর্থ মনে করতেন। তাই বলেছেন, 'এই দুনিয়া দেবালয়ে পূজো করে, করে তীর্থব্রত। চলা-ফেরাতেই পায়ে ব্যথা ধরে যায় এ দুঃখ কোথায় রাখব।' বলেছেন, 'সত্য সৃষ্টিকর্তা যিনি তিনি সমস্ত জগতের মধ্যেই আছেন, মূর্তির মধ্যে নাই।'

সম্ভবতঃ এই সবের পিছনের তত্ত্বও তাঁর জানা ছিল না। তাঁর সময়কার বাহ্যাচারসর্বস্ব ধর্মসম্প্রদায়গুলি দেখে দেখে তাঁর ধারণা হয়েছিল যারা মন্দির, মসজিদ, তীর্থব্রত, মূর্তি ইত্যাদি মানে তারা মনে করে শুধু ঐ সবের মধ্যেই ভগবান রয়েছেন। এই জন্য তিনি এ সবেরও বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, যদি খোদা থাকেন মসজিদে তবে বাকী জগৎটা কার ? উত্তর নিজেই দিয়েছেন। বলেছেন, 'অন্তরে আছেন ভগবান, আছেন তিনি জগৎ জুড়ে। আর তাঁর মধ্যেই তীর্থ, মূর্তি সব রয়েছে। বাইরে কে খুঁজে মরে।'

কবীরদাসের ধর্ম ছিল প্রেমভক্তির ধর্ম আর তিনি স্বভাবতঃই ছিলেন করুণ-হৃদয় মানুষ। এই জন্য সকল প্রকার হিংসার তিনি ছিলেন একান্ত বিরোধী। বিশেষ করে ধর্মের নামে পশুহত্যার তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন। দেবীপূজক শাক্ত পাঁড়েকে ত তিনি নিপুণ কসাই বলেছেন। বলেছেন, 'পাঁড়ে এক পলকের মধ্যে রক্তের নদী বইয়ে দিয়ে নিজের আত্মাকেই বধ করে।'

মুসলমানের গোবধেরও তিনি একই রকম নিন্দা করেছেন। বলেছেন, 'যে গোবধ করে তাকে বলে তুরুক। এই লোকটা পাঁড়ের চেয়ে কম কিসে ?'

বস্তুতঃ কবীরদাস হিন্দুধর্মের বাহ্যাচারের মত মুসলমান ধর্মের বাহ্যাচারেরও এমনি ধরণের নিন্দাই করেছেন। সাধারণ মুসলমানেরাও সাধারণ হিন্দুদের মত ধর্মের বাহ্যাচারকেই ধর্ম বলে মানে। পীর-মুরশিদের কথা মত চলে, কলমা পড়ে, নমাজ পড়ে, রোজা রাখে। তাদের ধারণা, এতে করে তারা বেহেস্তে (স্বর্গে) যেতে পারবে। মুসলমান সমাজে পীর-মুরশিদের খুব প্রভাব। তাদের সম্বন্ধে কবীরদাস বলছেন, 'তারা রোজা করে, নমাজ পড়ে, কলমা পড়ে, কিন্তু তাতে ত স্বর্গ মিলে না।' তিনি ধর্মকে অন্তরের জিনিষ মনে করতেন। তাই বলেছেন, 'এক মনের ভিতরেই আছে সত্তরটি কাবা। যে দর্শন করবে সেই জানবে।'

কিন্তু এই বাহ্য। তাঁর মতে আসল কথা হ'ল প্রিয়কে চেনা, প্রভুকে চেনা, তাঁকে পাওয়া। তাই বললেন, 'প্রিয়কে চেন। একটু দয়া কর আপনাকে। ধন-সম্পদকে তুচ্ছ মনে করো। প্রভু কাছেই এসে রয়েছেন জেনো।'

কবীরদাসের উপর যোগমতের বিশেষ প্রভাব ছিল এ কথা আমরা আগেই বলেছি। তাঁর বহু পদে তিনি যৌগিক পরিভাষা, যোগমতের যুক্তি ও বিচার-পদ্ধতির সাহায্যে তাঁর আপন সাধনার কথা বলেছেন। আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি ইত্যাদির কথা বহু বার তিনি বলেছেন। যোগসাধনার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই ছিল। তিনি যোগের যথার্থ মর্ম জানতেন। কবীরদাস বলতেন, 'জ্ঞান ছাড়া যোগ ব্যর্থ। চরম সত্যকে শারীরিক ব্যায়াম আর মানসিক শমদমের দ্বারা পাওয়া যায় না। যোগের প্রতিপাদ্য যে পরমপুরুষ তিনি আত্ম-গম্য, চোখ আর কানের বিষয় নয়। যথার্থ জ্ঞান হ'লেই তবে তাঁকে পাওয়া যায়।'

কবীরদাস লক্ষ্য করেছিলেন যোগীদের মধ্যেও বাহ্যাচারসর্বস্বতা দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ যোগীএই সাধনায় চেয়ে ভেকের উপর নজর বেশী। তাই এদেরও তিনি কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছেন। বলেছেন, 'ওরে যোগী, কান ফুটো করলি, জটা রাখলি আর দাড়ি রেখে রেখে হয়ে গেলি ছাগল। জঙ্গলে গিয়ে ধুনি জ্বাললি, রে যোগী, কামকে জীর্ণ করে হয়ে গেলি হিজড়া।'

কবীরদাস মার্জিত ভাষার ধার ধারতেন না। ভণ্ডামি দেখলে তিনি এই ধরণের যা মুখে আসে তাই বলে গালি দিতেন। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা অনেকেই তাই করেন। সাধুসন্তদের কাহিনী যাঁরা জানেন তাঁরাই এ কথার সাক্ষ্য দেবেন।

যোগসাধনার মধ্যে একটা দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন আছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদির সাহায্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনকে বহির্বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে ধ্যেয় বস্তুর মধ্যে নিবিষ্ট করতে হয়। তবেই যোগের চরম অবস্থা সমাধিতে পৌঁছান যায়। কিন্তু একবার সিদ্ধিলাভ করলে আর এ সবের প্রয়োজন হয় না। তখন যোগ হয়ে যায় সহজ, তখন ইন্দ্রিয় এবং মনকে প্রত্যাহার বা রুদ্ধ করতে হয় না ; তারা সহজেই ভগবদ্‌মুখী হয়ে যায়।

এই অবস্থা হলে ভগবানের সঙ্গে যোগ হয়ে যায় তেমনি সহজ যেমনি সহজ আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস। তখন সাধক যা করেন তাই অধ্যাত্মসাধনার একটা না একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। কবীরদাসের এই অবস্থা হয়েছিল। তাই, তিনি বলেছেন, সহজ যোগ, সহজ সমাধির কথা। এ কেমন। বলেছেন কবীরদাস—'চোখ বন্ধ করি না, কান ঢাকি না, দেহকে দি না কষ্ট। চোখ মেলে আমি হাসতে হাসতে দেখি, তাঁর সুন্দর রূপ দেখি। যা বলি সেই নাম, যা শুনি সেই স্মরণ, যা কিছু করি সেই পূজা, যেখানে-সেখানে যাই তাই হয় পরিক্রমা, যা কিছু করি সেই হয় সেবা। যখন শুই তখন সেইটেই হয় দণ্ডবৎ, অন্য দেবতার আর পূজা করি না। অনাহত শব্দে নিরন্তর মত্ত হয়ে আছে আমার মন। খারাপ কথা বলা সে ছেড়ে দিয়েছে। উঠতে-বসতে কখনো (তাঁকে) ভোলে না। এমনি হয়েছে প্রগাঢ় মিলন। কবীর বলছে এমনি ধারা আমার উন্মুনি ভাব অর্থাৎ সমাধির অবস্থা।' এই সমাধির অবস্থায় কি হয়, কবীরদাস বললেন, 'সুখ-দুঃখের পরে এক পরম সুখ। তার মধ্যে প্রবেশ করে থাকি।'

সহজ যোগের অবস্থায় নাম-জপ, ভজন, সেবা এ সব আর আলাদা করে করতে হয় না। কিন্তু এই সহজ যোগ ত আর সহজ নয়, তা কঠিন সাধনা-সাপেক্ষ। কাজেই সহজ যোগের অবস্থায় পৌঁছাবার আগে নাম-জপ, ভজন, সেবা প্রভৃতির প্রয়োজন আছে। কবীরদাসও তাই নাম-জপ, ভজন, এবং সেবার কথা বলেছেন।

ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ করে বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রে নামের অসীম মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। কলিযুগে নামই ধর্ম, নামই একমাত্র গতি।

"ব্যক্ত করি ভাগবত কহে আর বার
কলিযুগে ধর্ম নামসঙ্কীর্তন সার।"
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্‌
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

অন্য যুগে যাগ যজ্ঞ পূজা আরাধনা ধ্যান ধারণাদির দ্বারা যে ফল হ'ত, কলিযুগে শুধু নামেই তাই হয়।

"আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়
কলিযুগে কৃষ্ণ নামে সেই ফল পায়।"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেক: মহান্ গুণ:
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধ: পরং ব্রজেৎ।"

হে রাজন, কলিযুগ অশেষ দোষের আকর হ'লেও তার একটি মহান্ গুণ আছে। এই যুগে মানুষ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করলেই মায়া-বন্ধ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে লাভ করতে পারে।

প্রেমভক্তির সাধকেরা নামের এর চেয়েও বড় মাহাত্ম্যের কথা বলেন। ভক্তের কাছে মুক্তির চেয়েও কাম্য ভগবদ্‌প্রেম, নামে সেই ভগবদ্‌প্রেম লাভ হয়।

"নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে।"

নামের মাহাত্ম্যে মহাপাতকী দস্যু সাধুভক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, বেশ্যা পরম বৈষ্ণবী হয়ে গেছে, এ রকম অসংখ্য কাহিনী ভক্তিগ্রন্থে পাওয়া যায়। কবীরদাসও বহু পদে নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বিনয় করে বলেছেন, 'বোবার গুড় খাওয়ার মত ভাবা নেই ত নামের বড়াই করব কি করে।' নাম-মাহাত্ম্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেছেন,—'যার নামের নেশা একটু লেগেছে গণিকা হোক আর সদন কসাই-ই হোক সে ত'রে গেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেছেন—

"নামাভাস হইতে হয় সর্ব্বপাপ ক্ষয়"

কবীরদাসও বললেন—'অধর-কটোরায় নামৌষধ খেয়ে আমার কুমতি তৃপ্ত হয়ে চলে গেছে।'

নামের আছে অমৃত স্বাদ। যে একবার সে-স্বাদ পেয়েছে সে আর নাম ছাড়তে পারে না। কবীরদাসেরও তাই হয়েছিল। দিন-রাত তিনি নাম করতেন। বলছেন, 'নিশিদিন আমি প্রভুর নাম নি।'

নামের নেশা আছে। এ দারুণ নেশা। 'নামের দিকে দৃষ্টি দিলে নেশা বাড়ে। নাম শুনলে মন মুগ্ধ হয়ে যায়। আর নাম স্মরণ করলেই মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অন্য নেশা ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে আর কমে। কিন্তু নামের নেশা দিন দিন সওয়া গুণ করে বাড়তে থাকে।'

যার এই নেশা ধরে সে মাতাল হয়ে যায়, পাগল হয়ে যায়। কবীরদাসও পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। বলছেন, 'সব দুনিয়া সেয়ানা আর আমি পাগল।······হরিগুণ কীর্ত্তন করে করে আর হরিগুণ কীর্ত্তন শুনে শুনে পাগল হয়েছি।'

অনেক ভক্তিগ্রন্থ তথা ভক্তদের মতে যে কোনো প্রকারে হোক্ একবার মুখে নাম নিলেই নামের ফললাভ হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের একাদশ বিলাসের ২৮১ অঙ্কে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণের একটি স্তোত্রে আছে—

"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং
শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং
তারয়ত্যেব সত্যম্।"

"ভগবানের যে কোনো একটি নাম যদি প্রসঙ্গক্রমে বাগিন্দ্রিয় প্রবৃত্ত অথবা মনঃস্পৃষ্ট কিংবা কর্ণগোচর হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণ বা অশুদ্ধবর্ণ অথবা ব্যবহিত কিংবা কোনো অংশে রহিত হইলেও নিশ্চয়ই সংসার হইতে পরিত্রাণ করে।"

দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভের কথা বলেন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী।

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—

"ম্রিয়মাণো হরের্ণাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোহপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্।"

'অজামিল মহাপাতকী হইয়াও অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যখন পুত্রচ্ছলে নারায়ণ-নাম উচ্চারণ করত: বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিল তখন যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তন করিলে অনায়াসে বৈকুণ্ঠে যায়, ইহা আর কি বলিব?'

তবে উপযুক্ত আধার না হ'লে নামের ফল ফলতে বিলম্ব হয় এ কথাও তাঁরা বলেছেন। উদ্ধৃত স্তোত্রের অপরাংশে আছে—

"পাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র।"

'হে বিপ্র, যদি সেই নাম দেহ, ধন এবং জনতাতে লুব্ধ পাষণ্ডি-মধ্যে বিন্যস্ত হয়, তবে ইহলোকে শীঘ্র ফলজনক হয় না অর্থাৎ বিলম্বে হয়।'

কবীরদাসের কিন্তু এরূপ বিশ্বাস ছিল না। মনের সঙ্গে কোনো যোগ না রেখে শুধু মুখে নাম নিলেই মুক্তি পাওয়া যায় এ সব কথা স্বীকার করতেন না। বলছেন, 'পণ্ডিত মিছে কথা বলে। রাম রাম বললেই যদি দুনিয়ার লোক উদ্ধার পায় তাহ'লে চিনি চিনি বললেই ত মুখ মিঠে হবে, আগুন আগুন বললে পুড়ে যাবে, জল জল বললে তৃষ্ণা মিটবে আর ভোজন ভোজন বললে ক্ষিধে দূর হবে।'

শুধু মুখে নাম নিলে কিছু হয় এ তিনি বিশ্বাস করতেন না। নিজের মতের সমর্থনে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন টীয়া পাখীর। বলেছেন, 'টীয়া পাখী যতক্ষণ মানুষের সঙ্গে থাকে ততক্ষণ হরি হরি বলে কিন্তু তার উপর হরিনামের কোনো প্রভাব পড়ে না। তাই, যদি কখনো সে জঙ্গলে উড়ে চলে যায় তাহলে সে-নামের কথা তার আর মনেই পড়ে না।'

কবীরদাস মনে করতেন মানুষের মধ্যেও আছে অনেক টীয়া পাখী। তারা মুখে রাম রাম বলে কিন্তু তাদের সত্যিকারের প্রীতি বিষয়ের প্রতি, তারা মায়াবদ্ধ, তাদের অন্তরে প্রেম জন্মায়নি। সেই জন্য তারা মুখে রাম রাম বললেও তাদের বেঁধে যমপুরীতে নিয়ে যায়। তাদের মুক্তি হয় না।

ভক্তের প্রধান কাজ ভগবদ্-ভজন। এ ছাড়া আর যা তার পক্ষে অকাজ। কবীরদাস বললেন, 'আমি জানি, হরিভজন ছাড়া আর সবই অনুচিত।' এ কথার অর্থ এ নয় যে, কবীরদাস ভজন ছাড়া আর কিছু করতে নিষেধ করেছেন। কেন না, তাঁর বাণীর এই অর্থ করলে সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, কবীরদাসের মত বিশ্বশুদ্ধ লোকের সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বৈরাগী হয়ে শুধু 'ভজ গোবিন্দ' করা উচিত। কিন্তু কবীরদাস স্বয়ং ছিলেন গৃহী আর তাঁর শিষ্যেরাও প্রায় সবাই ছিলেন গৃহী। কাজেই, এ রকম কথা তিনি বলতে

পারেন না। এই জন্য আমাদের মনে হয়, তাঁর বাণীর অর্থ হ'ল ভক্ত যা করবে তাই ভগবদ্‌ভজন মনে করে করবে।

কবীরদাস বিশেষ করে বলেছেন সেবা-কর্মের কথা। বললেন, 'বান্দা, সেবাই তোর কাজ।' ভক্ত ভগবানের দীন সেবক, তাঁর বান্দা। সেবকের একমাত্র কাজ প্রভুর সেবা করা। তাই, কবীরদাস বললেন সেবাই তোর কাজ। ভক্তিশাস্ত্রে এ ভাবের বহু সমর্থন পাওয়া যায়। ভক্তের কাছে ভগবদ্‌-সেবার বাড়া আর কিছুই নেই। সেবা ছেড়ে ভক্ত মুক্তি পর্য্যন্ত চান না। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন,—

"সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণাতি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

—'আমার সেবা ব্যতিরেকে শুদ্ধ ভক্তগণ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিলেও গ্রহণ করেন না।'

কাজেই, এই যে ভগবদ্‌সেবাকেই ভক্তের কাজ বলে কবীরদাস ঘোষণা করলেন এ নূতন কথা নয়। ভক্তিধর্মের মধ্যে এর ঐতিহ্য বরাবর ছিল। কবীরদাস হয়ত গুরু রামানন্দের কাছ থেকে এটি পেয়েছিলেন। কবীরদাস কিন্তু ভগবদ্‌-সেবা বলতে বৈধীভক্তির সাধকদের মত কাঠ-পাথর বা মাটির কোনো ভগবদ্‌মূর্ত্তির সেবা-পূজা করতেন না, কেন না তিনি মূর্ত্তিপূজা মানতেনই না। তাঁর সেবা অর্থ মানুষের সেবা, নর-নারায়ণের সেবা। কেন না, জগতে যত নরনারী জন্মেছে সবই রামের রূপ বলে তিনি মনে করতেন। এই ভাবটিও ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার ঐতিহ্যের মধ্যেই ছিল। বাহ্যাচার-প্রধান ধর্মের আওতায় এটি আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। কবীরদাস আবার এই দিকটার উপর জোর দেন।

কবীরদাস হিন্দুধর্মের তত্ত্বাদি সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানতেন বলে মনে হয় না। এ সম্বন্ধে আমরা এর আগে একবার আলোচনা করেছি। তবে এ কথাও সত্য যে, 'তাঁর পরমার্থতত্ত্ব হিন্দুচিন্তার দ্বারা ওতপ্রোত ছিল।' তিনি হিন্দুধর্মের অনেক কিছুই মানতেন না আবার কয়েকটি প্রধান মতবাদ মানতেনও। কবীরদাস যে মায়াবাদ মানতেন তা আগেই বলা হয়েছে। অবশ্য তাঁর মায়া শঙ্করাচার্য্যের মায়া থেকে একটু অন্য রকমের, তাও দেখা গেছে।

তা ছাড়া কবীরদাস কর্মবাদ ও জন্মান্তর মানতেন। কর্মবাদের সহজ অর্থ—'যে যেমন কর্ম করে সে তেমন ফল তার পায়।' আর এই ফল ভোগ করতে হয় জন্মান্তর ধরে। ফলভোগ করতে গিয়ে জীব আবার কর্ম করে। আবার তাকে এই নূতন কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। জন্মান্তরের কর্মফল ভোগ করবার জন্য হ'ল এই জন্ম। তার পর এই জন্মের কর্মফল ভোগ করবার জন্য হ'ল আবার জন্ম। এমনি চলে জন্ম-জন্মান্তরের প্রবাহ। কবীরদাসেরও এই মত ছিল। তিনি বললেন, 'এখানে ত সবাই নিজের কর্ম ভোগ করছে।' কর্মকে তিনিও বন্ধন মনে করতেন। এ বড় কঠিন বন্ধন! একে কাটাতে পারে কে? কবীরদাস বলেন, 'যে সমাধিমগ্ন হয়ে অলখ পুরুষকে দেখতে পায় তার কর্মবন্ধন আধি-ব্যাধি সব দূর হয়ে যায়।'

কর্মবাদের সঙ্গে জন্মান্তরবাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এর একটিকে মানলে আর একটিকেও মানতে হয়। তাই কর্মবাদের সঙ্গে জন্মান্তরবাদও কবীরদাস মানতেন। তাঁর অনেক পদেই এর নিদর্শন আছে। একটি পদে তিনি বলেছেন, 'কবীরের কর্মটি দেখ। যাঁর ধাম মুনিরও অগম্য সেই অলখ পুরুষকে করল বন্ধু। এ আর কিছু নয় জন্মান্তরের ললাটলিপি।'

জন্মান্তর মানলে আর একটি মতবাদও মানা অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। সে হ'ল আত্মা সম্বন্ধীয় মতবাদ। কেন না, জন্মান্তরের কথা বললেই প্রশ্ন উঠবে। জন্মান্তর হয় কার? জন্ম কথাটারই বা অর্থ কি? উত্তরে বলা যায়, জন্মান্তর হয় জীবের। তক্ষুনি প্রশ্ন হবে, জীব কে? জীবদেহ জীব নয়। তার প্রাণও জীব নয়। এই জন্য মৃত্যুকে বলে দেহত্যাগ করা, প্রাণত্যাগ করা। কাজেই যিনি দেহত্যাগ করেন, প্রাণত্যাগ করেন তিনি দেহ নয়, প্রাণ নয়। তত্ত্ববিদ্‌গণ এই দেহাতিরিক্ত প্রাণাতিরিক্ত বস্তুকে বলেছেন আত্মা।

আত্মার দেহধারণের নাম জন্ম। দেহ থেকে বিমুক্ত হওয়ার নাম মৃত্যু আর দেহান্তর-প্রাপ্তির নাম জন্মান্তর। জীব এই আত্মা, জীব দেহধারী আত্মা। একে বলা হয় জীবাত্মা। এখন প্রশ্ন উঠবে, কে এই আত্মা? জীব বা জীবাত্মা বলায় ত কিছুই পরিষ্কার হ'ল না। তা' ছাড়া আত্মাকে জীবাত্মা বলায় অর্থাৎ আত্মার জীব এই উপাধি ব্যবহার করায় আত্মার নিরুপাধিকত্বও স্বীকার করা হ'ল। তাহ'লে এই আত্মার স্বরূপ কি?

ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে আত্মা সম্বন্ধে প্রভূত আলোচনা হয়েছে। উপনিষদ্‌গুলিতে ত আত্মতত্ত্বই আলোচিত হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ স্পষ্টই বলেছেন—'তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ম্‌'—'সেই আত্মতত্ত্ব বেদের গুহ্য ভাগ উপনিষৎসমূহে নিহিত আছে।'

তত্ত্বদর্শিগণ বলেন, জগতে একমাত্র সদ্বস্তু আত্মা আর অন্য সব অসদ্বস্তু অর্থাৎ একমাত্র আত্মারই বিনাশ হয় না আর সবই বিনাশশীল। আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, অব্যয়, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, সর্বগত, স্থির, অচল এবং সনাতন। ইনি অব্যক্ত অচিন্তনীয়। তত্ত্ববিদ্‌গণ আত্মাকে দেখেছেন এইরূপে, জীবাত্মারূপে আর পরমাত্মারূপে। পরমাত্মা আর জীবাত্মা ভক্তেরা এঁদেরই বলেন ঈশ্বর ও জীব।

উপনিষৎ বলেন আত্মা ব্রহ্ম। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—এই আত্মা ব্রহ্ম। আত্মজ্ঞান আর ব্রহ্মজ্ঞান একই কথা। উপনিষদ্‌গুলিতে সর্বত্র এই ভাবেই আলোচনা হয়েছে। ব্রহ্ম নির্গুণ নিরুপাধিক, নিরবয়ব, অখণ্ড, শুদ্ধ চৈতন্য। ইনি 'বেদান্তে প্রপঞ্চাতীতরূপে' কীর্তিত হইয়াছেন। যদিও তিনি প্রপঞ্চাতীত তবু তিনিই সকলের অচল প্রতিষ্ঠা এবং তিনিই স্বয়ং অধিকারী।

আবার ব্রহ্ম সগুণ সোপাধিকও বটেন। তিনিই জগৎ। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্‌।"—হে সৌম্য সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সদ্‌রূপে (বিদ্যমান) ছিল।

স্বীয় মায়াকে অবলম্বন করে ব্রহ্মই ভোক্তা, ভোগ্য এবং ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। এই ব্রহ্মই আত্মস্বরূপ। শ্বেতাশ্বতর বললেন—

'এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থম্‌
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥'

'ভোক্তা জীব, ভোগ্য নিখিল পদার্থ এবং অন্তর্যামী ঈশ্বর

জ্ঞানিগণের দ্বারা প্রোক্ত এই ত্রিবিধ বস্তুকেই ব্রহ্মস্বরূপে জানিবে। কারণ, এই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিক আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই।'

ব্রহ্ম পরমাত্মা। তিনিই মায়া বা অবিদ্যায় যখন প্রতিবিম্বিত হন তখন জীব।

'অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ'—সেই পরমাত্মাই অনীশ্বর (জীব) রূপে ভোক্তৃত্ব অবলম্বন করিয়া সংসারে আবদ্ধ হন।

ব্রহ্ম সর্বভূতান্তরাত্মা হ'লেও জাগতিক সুখ-দুঃখে লিপ্ত হন না। তিনি ধর্মাধর্ম থেকে ভিন্ন, কার্য্যকারণ থেকে পৃথক্। তিনি যাবতীয় কর্মবন্ধনের অতীত। আর জীব যদি ব্রহ্ম হয় তবে সে-ই বা কর্মফল ভোগ করে কি ক'রে?

ব্রহ্ম স্বরূপতঃ কর্মফলের অতীত, অতএব সুখদুঃখাদির অতীত বটে। কিন্তু মায়াবৃত অবস্থায় বা মায়াতে প্রতিবিম্বিত অবস্থায় অর্থাৎ জীবরূপে তিনি স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হন। কেন হন? তাঁর ইচ্ছা।

যত কাল মায়া যত কাল এই বিস্মৃতি, তত কাল জীবকে কর্মফল ভোগ করতে হয়। পরমাত্মাকে এ সব স্পর্শ করে না। কর্মফল ভোগ প্রসঙ্গে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্কটি উপনিষদে ভারী সুন্দর করে বলা হয়েছে।

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি।'

—'সর্বদা সম্মিলিত ও সমান নামধারী (আত্মা এর সমান নাম) দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই বৃক্ষকে (শরীরকে) আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে একটি (জীবাত্মা) স্বাদু ফল (কর্মফল) ভক্ষণ করে, অপরটি (পরমাত্মা) ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করে।'

এই কর্মফল ভোগের জন্য জীবাত্মাকে বিবিধ দেহধারণও করতে হয়। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলেন—

'গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্মকর্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা,
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রি বর্ত্মা।
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ।'

'কর্ম ও উপাসনা হইতে জাত সংস্কারবিশিষ্ট যিনি ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম করিয়া থাকেন, সেই জীবই স্বকৃত কর্মের ফল উপভোগ করেন। বিবিধ দেহধারী সত্ত্বাদি ত্রিগুণমণ্ডিত ত্রিমার্গে গমনকারী ও পঞ্চপ্রাণের অধীশ্বর সেই জীব নিজ কর্মফলানুসারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।

জীবের বিবিধ দেহধারণ তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি এবং কর্মফল ভোগ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। বেদান্তীদের মতে জীবের স্থূল দেহ ছাড়াও একটি সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহ আছে। এই লিঙ্গদেহও ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। কর্ম ও উপাসনা থেকে সংস্কারগুলি এই লিঙ্গদেহকেই আশ্রয় করে থাকে। জীব মৃত্যুর সময় ভোগায়তন স্থূলদেহ পরিত্যাগ করে লিঙ্গদেহ নিয়ে চলে যায় এবং বাসনাযুক্ত উক্ত সংস্কার অনুযায়ী নূতন ভোগায়তন দেহ লাভ করে। তখন সেই সংস্কারগুলি ফলবান হয় অর্থাৎ জীব পূর্বকৃত কর্মের ফলভোগ করে।

এই কর্মবন্ধন এই জন্মান্তরাদি থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, বা ভগবদ্‌লাভ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলেন—

'অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ।'

'এই প্রপঞ্চে সর্বান্তর ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞগণ সমাধি অবলম্বনে ব্রহ্মেই লীন হন, এবং পুনর্জন্মাদি হইতে মুক্ত হন।'

আমরা দেখেছি, কবীরদাসও ঠিক অনুরূপ কথাই বলেছেন। কাজেই এ ক্ষেত্রেও তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যেরই অনুসরণ করেছেন বলতে হয়। ভারতীয় তত্ত্ববিদ্‌গণের প্রভূত আলোচনার বিষয় এই কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ কবীরদাস হয়ত গুরু রামানন্দের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, হয়ত বা যে হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের তিনি সঙ্গ করতেন তাঁদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে অবশ্য কিছু নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে এ কথা ঠিক যে, যেখান থেকেই পান না কেন, তিনি মতবাদ দু'টিতে পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন।

ভগবান এক। তিনি অনাদি অনন্ত অরূপ। তিনি ভাবৈকগম্যঃ ভক্তেরা বলেন, কেবল ভাবের দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যায়। ভাবকে অবলম্বন করেই তাঁর নাম রূপ। ভাব অসংখ্য। তাই ভগবানেরও অসংখ্য নাম রূপ। যে যে-ভাবে তাঁকে চায়, তাঁর উপাসনা করে, তিনি সেই ভাবেই তাকে অনুগ্রহ করেন। তাঁর কাছে যাওয়ার অনেক পথ। যার যার স্বভাব অনুসারে মানুষ তার একটি বেছে নেয়। কিন্তু যে যে-পথেই থাক না কেন, সে আসলে ভগবানেরই পথে চলে। শ্রীভগবানেরই বাণী—

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।'

—যে যে-ভাবে আমার উপাসনা করে আমি সেই ভাবেই তাকে অনুগ্রহ করি। মানুষ সকল প্রকারে আমার পথের অনুসরণ করে।

যারা অন্য দেব-দেবীর উপাসনা করে তারাও জেনে হোক আর না জেনেই হোক, ভগবানেরই উপাসনা করে। কেন না, সব দেব-দেবী ভগবানেরই মূর্ত্তি। শ্রীভগবান বলছেন—

'যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।'

—যে সব ভক্ত শ্রদ্ধান্বিত হয়ে অন্য দেবতার উপাসনা করে তারা অজ্ঞানে (অর্থাৎ ভগবানই যে অন্য দেবতার রূপ ধারণ করেছেন তা না জেনে) আমারই উপাসনা করে।

মানুষ যতক্ষণ পথে থাকে ততক্ষণ পথ আর মত নিয়ে সে লড়াই করে, ততক্ষণ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সংঘর্ষ; ততক্ষণ ধর্মের নামে চলে দ্বন্দ্ব। কিন্তু পথের শেষে যখন পৌঁছায় তখন দেখে সব পথেরই শেষ এক, সব মতেরই পরিণাম এক। তখনই ভক্ত বলতে পারেন—

'রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকঃ গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।'

রুচির বৈচিত্র্যের জন্য ঋজুকুটিল নানা পথে চলে মানুষ। কিন্তু সব জলস্রোতেরই একমাত্র গতি যেমন সমুদ্র, তেমনি তুমিই তাদের একমাত্র গতি। আর তখন তিনি সবাইকে ডেকে বলেন, মত আর পথ নিয়ে মিছিমিছি বিবাদ করো না, অন্তে সবাই এক জায়গাতেই গিয়ে পৌঁছাবে যে!

কবীরদাস এমনি পথের শেষে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। তিনি ভগবানকে পেয়েছিলেন। তাই মতের বিবাদ দূর করবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। [ক্রমশঃ।

সাহিত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

নলিনীকান্ত মজুমদার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দার্জিলিংএর পার্বত্য-জাতি, বেদের ঐতিহাসিকতা।

নলিনীকান্ত সরকার—সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যিক। সম্পাদক—বিজলী (সাপ্তাহিক—১৩২৭-২১)।

নলিনীকান্ত সেন—সাহিত্যিক। নিবাস—আসাম। বি, এল। সম্পাদক—আলো (অসমীয়া পত্রিকা)।

নলিনীকিশোর গুহ—বিপ্লবী ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পথ ও পাথেয়, বাংলার বিপ্লবচেষ্টা, ভারতের দাবী, তরুণ বাংলা, বিপ্লবের পথে। সম্পাদক—স্বরাজ (দৈনিক, ১৩২১)।

নলিনীনাথ মজুমদার—গ্রন্থকার। পাবনা জেলার হিমায়েতপুর। গ্রন্থ—বার ইয়ারী ব্যঙ্গ কাব্য (কুমারখালি, ১১০১)।

নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত—শিশু-সাহিত্যিক। জন্ম—১৯০০ খৃঃ বরিশাল জেলায় গৈলা গ্রামে। মৃত্যু—১৩৫৬ বঙ্গ (২৮ নবেম্বর) হুগলী জেলায় ভদ্রেশ্বরে। এম, এ, বি টি। শিক্ষকতা জলপাইগুড়ি, গৌহাটি। অধ্যাপক গৌহাটি আর, এইচ, গার্লস্‌ কলেজ। গ্রন্থ—বুলবুল, ভূতের যুদ্ধ।

নলিনীমোহন রায়-চৌধুরী—সাহিত্যিক। সম্পাদক—নাচঘর (সাপ্তাহিক, ১৩৩২-৩৭), প্রভাতী (১৩২৭-১৩৩০)।

নলিনীমোহন সান্যাল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সুভদ্রাঙ্গী।

নলিনীবালা বসু—মহিলা কবি। জন্ম—১২৮৮ বঙ্গ কার্ত্তিক। মৃত্যু—১৩০৪ বঙ্গ অগ্রহায়ণ। পিতা—দেবেন্দ্রবিজয় বসু (সাহিত্যিক), মাতামহ—দীনবন্ধু মিত্র (নাট্যকার)। কাব্য-গ্রন্থ—নলিনী-গাথা।

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—সাহিত্যিক। শৈশব হইতেই অক্লান্ত সাহিত্য-সাধনা। 'সাহিত্য-বন্ধু' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর, কান্তকবি রজনীকান্ত, বাঙ্গালার বাউল সম্প্রদায়, শরতের ফুল। সম্পাদক—জাহ্নবী (১৩১১-১৩১৩)।

নসিরুদ্দিন আহম্মদ, দেওয়ান—গ্রন্থকার। নিবাস—রাজশাহী জেলার দুবলহাটী শিকারপুর গ্রাম। গ্রন্থ—উর্দু শিক্ষক, আরবি-পড়া-শিক্ষা, হাসির তরঙ্গ, সমাজ-সংস্কার, পতিভক্তি, বিদায় ইসলামি নামকরণ, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ও ইমাম মেহেদির আবির্ভাব।

নসিম উদ্দীন—মুসলমান গ্রন্থকার। জন্ম—২৪-পরগনা। গ্রন্থ—শাহঠাকুরা (১৩১০)।

নহমত খাঁ—মুসলমান কবি। উপাধি—আলি এবং সম্রাট্ আলমগীর কর্তৃক 'দানিশ মন্দ খাঁ' উপাধিলাভ। মৃত্যু—১৭০৮ খৃঃ। ইনি সম্রাটের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। গ্রন্থ—সুশন-ওয়া-ইস্ক (বিদ্রূপাত্মক কাব্য), খেয়াল নহমাত।

নাগদেব—জ্যোতিবিদ্। জন্ম ১৭শ শতাব্দী। গ্রন্থ—মুহূর্ত-দীপক (১৬৬৫ খৃঃ)।

নাগনাথ—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮শ শতাব্দী। গ্রন্থ—পর্বপ্রবোধ (১৭১৭ খৃঃ)।

নাগার্জুন—বৌদ্ধ ধর্মাচার্য। জন্ম—মধ্য-ভারতের অন্তর্গত বিদর্ভ প্রদেশে ৩য় শতাব্দীতে। ইনি এক জন দার্শনিক পণ্ডিত। গ্রন্থ—মাধ্যমিক কারিকা, অকুতোভয় (টীকাগ্রন্থ), যুক্তিষষ্টিকা, শূন্যতাসপ্ততি, প্রতীত্যসমুৎপাদহৃদয়, মহাযানবিংশক, বিগ্রহ ব্যাবর্তনী, দশভূমিবিভাষশাস্ত্র, এক শ্লোক, সুহৃল্লেখপ্রমাণবিহেতন, উপায়কৌশল্যহৃদয়শাস্ত্র।

নাগেশ ভট্ট—গ্রন্থকার। জন্ম—১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাষ্ট্রে। মৃত্যু—১৮শ মধ্যভাগে। পিতা—শিব ভট্ট। মাতা—সতী দেবী। হরিদীক্ষিতের নিকট শিক্ষালাভ। রাজা রামদেবের সভাপণ্ডিত। গ্রন্থ—বৃহচ্ছব্দোতাদাহরণদীপিকা, গুরুধর্ম-প্রকাশ (টীকা), পরিভাষেন্দুশেখর, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুষা, পদার্থদীপিকা (ন্যায়গ্রন্থ), সাংখ্যসূত্রবৃত্তি, যোগসূত্রবৃত্তি, ব্যাসসূত্রেন্দুশেখর, চণ্ডীর টীকা, বেদমুক্তভাষ্য।

নাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহ—সাংবাদিক। নিবাস—মেদিনীপুরের অন্তর্গত কেচকাপুর। সম্পাদক—ক্ষত্রিয়বান্ধব (মাসিক, ১৩২১)।

নাছরুল্লা—মুসলমান গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মুসার সওয়াল।

নাছেরোল্লা খাঁ—মুসলমান গ্রন্থকার। পিতা—সরিফ মনসুর। গ্রন্থ—জঙ্গনামা।

নাজির বক্তিয়ার খাঁ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মিরাট আলম বা জগদ্দর্পণ।

নাজির মুহম্মদ—গ্রন্থকার। জন্ম—রংপুর জেলায় গোবিন্দগঞ্জ থানার চাবাকপাড়া গ্রামে। গ্রন্থ—সোনাই-যাত্রা।

নাজির মুহম্মদ সরকার—মুসলমান গ্রন্থকার। জন্ম—বগুড়া জেলা। গ্রন্থ—সোনাই-যাত্রা (১১৮৬ বঙ্গ)।

নারায়ণ—জ্যোতির্বিদ্। পিতা—চিত্তপাবন ব্রাহ্মণদাদা ভট্ট। গ্রন্থ—হোরাসার সুধানিধি (১৭৩৮ খৃঃ), নবজাতক-ব্যাখ্যা, গণকপ্রিয়া (১৬৪১ শক), স্বরসাগর (শকুনগ্রন্থ)।

নারায়ণ উপাধ্যায়—গ্রন্থকার। ১৩-১৪ শতাব্দীতে বর্তমান। গ্রন্থ—ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশ, সময়প্রকাশ।

নারায়ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক। জন্ম—১৯১৭ খৃঃ দিনাজপুর জেলায় বালিয়াডাঙ্গিতে। পৈতৃক নিবাস—বরিশাল জেলায় বাসুদেবপাড়া গ্রামে। শিক্ষা—বরিশাল ও কলিকাতা। এম-এ। অধ্যাপক—সিটি কলেজ। গ্রন্থ—সম্রাট্ ও শ্রেষ্ঠী, সূর্যসারথী, স্বর্ণসীতা, মহানন্দা, উপনিবেশ, ৩ খণ্ড, মন্দ্রমুখর (১৩৫২), কালাবদর, ঘূর্ণীপাকের লাল নিশান, কৃষ্ণপক্ষ (১৩৫৮), শিলালিপি, বৈতালিক, তিমির-তীর্থ, বীতংস, দুঃশাসন, পূর্বরাগ।

নারায়ণচন্দ্র চট্টরাজ, গুণনিধি,—কবি। গ্রন্থ—কলিকুতূহল নামক কাব্য (১২৬০), কৃষ্ণলীলারসোদয় নামক কাব্য (১২৬০), শ্রীশ্রীরাসবিলাসাখ্যা গ্রন্থ (১১১৬ সংবত)।

নারায়ণ দাস—বৈষ্ণব সহজিয়াপন্থী। গ্রন্থ—রসভাবাস্ত।

নারায়ণ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মুক্তাচরিত (পদ্যানুবাদ, ১৬২৪ খৃঃ)।

নারায়ণদাস কবিরাজ—চিকিৎসক। গ্রন্থ—চিকিৎসাপরিভাষা, দ্রব্যগুণরাজবল্লব, সর্বাঙ্গসুন্দরী (টীকাগ্রন্থ)।

নারায়ণদাস তপস্বী—সাহিত্যিক। সম্পাদক—হিন্দুদর্পণ (মাসিক, কোড়াল, ১২৮১)।

নারায়ণদাস রায়—কবি। জন্ম—১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। গ্রন্থ—কামিনীকিশোর (কাব্য, ১২৮৫)।

নারায়ণ দেব—কবি। ১৬শ শতাব্দী ময়মনসিংহে নেত্রকোনা মহকুমার অধীন বোরগ্রামে। পিতা—নরসিংহ দেব। মাতা—রুক্মিণী। গ্রন্থ—পদ্মপুরাণ (পদ্যানুবাদ), কালিকা-পুরাণ (ঐ) স্বপ্নাধ্যায় (ঐ)।

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য—পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—হুগলী জেলার থানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী পোলগ্রামে। মৃত্যু—১৯২৭ খৃঃ। পিতা—পীতাম্বর ভট্টাচার্য। বিদ্যাভূষণ উপাধি লাভ। গ্রন্থ—চিন্তামণি (হেমচন্দ্র কৃত অভিধানের অনুবাদ)। উপন্যাস—কুলপুরোহিত, পরাধীন, মতিভ্রম, পরাজয়, মানরক্ষা, ডিক্রীজারী, ভবঘুরে, নিষ্কর্মা, বিয়েবাড়ী, স্বামীর ঘর, গরীবের মেয়ে, বন্ধুর বিয়ে, অপরাধী, নিষ্পত্তি, নাস্তিক, প্রেমিকা, প্রবঞ্চক, সুরমা, গিনির মালা, ঘরজামাই, একঘরে, কালো বৌ, রাঁধুনী বামুন, পূজা, বন্ধনমোচন, রাঙা কাপড়ের মূল্য, সঙ্গিহারা, স্নেহের জয়, বারবেলা, মনের বোঝা, মেয়ের বাপ, প্রায়শ্চিত্ত, বিধবা, হিসাব-নিকাশ, পরের ছেলে, পতিতা, নিরাশ প্রণয়, পরাজয়, প্রতিদান, গঙ্গারাম, গ্রহের ফের, সতীনপো, পূজার আমোদ, অনুরাগ, অপবাদ, অভিমান, মায়ার অধিকার, ব্রহ্মশাপ, মণির বর, দাদামহাশয়, জেল-ফেরত, ঠাকুরের মূল্য, সুখের মিলন, বৈরাগী, ত্যাজ্য পুত্র, আকালের মা, উত্তরাধিকারী, নববোধন, দুর্বাসা ঠাকুর, গুরুমহাশয়, কথাকুঞ্জ, কলিবদল, মাণিকের মা। সম্পাদক—স্বদেশী (১৩১৩—১৩১৫)।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বৈয়াকরণিক। গ্রন্থ—সারাবলী ব্যাকরণ।

নারায়ণ ভট্ট—জ্যোতির্বিদ। গ্রন্থ—চমৎকার-চিন্তামণি জাতক।

নারায়ণ ভট্ট—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। মহাপ্রভুর আদেশে ইনি বৃন্দাবনে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিতে নিযুক্ত হন। গ্রন্থ—ব্রজভাববিলাস (১৫৫৩ খৃঃ)।

নারায়ণ রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শ্রীবৎসচরিত (যশোহর, ১৮৭১)।

নারায়ণাচার্য—গ্রন্থকার। পিতা—ত্রিবিক্রমাচার্য। গ্রন্থ—মণিমঞ্জরী, মধ্ববিজয়।

নিকুঞ্জবিহারী গুপ্ত—কৃষিতত্ত্ববিদ্ ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৯শ শতাব্দীর ৪র্থ পাদে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ভগবানপুর থানার জনাদাঁড়ী গ্রাম। পিতা—দ্বারকানাথ দত্ত। রয়্যাল এগ্রিকালচারাল সোসাইটির সদস্য। গ্রন্থ—কার্পাস-প্রসঙ্গ, কৃষিসহায়। সম্পাদক—সচিত্র কৃষক (১৩১৪-১৩২১)।

নিখিলনাথ রায়—ঐতিহাসিক। জন্ম—১২৭২ বঙ্গ পৌষ ২৪-পরগনার বসিরহাটের পুড়া গ্রামে। মৃত্যু—১৩৩১ বঙ্গ ১৮ই কার্ত্তিক কলিকাতা মোহনবাগানে। পিতা—জানকীনাথ রায়। মাতা—বসন্তকুমারী। শিক্ষা—খাগড়া মিশনারি স্কুল। প্রবেশিকা (বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল—১৮৮৭), এফ-এ, (বহরমপুর কলেজ —১৮৮৯), বি-এ (ঐ, ১৮৯২), বি-এল (১৮৯৭)। কর্ম—আইন-ব্যবসায়, বহরমপুর জজকোর্ট, কলিকাতা হাইকোর্ট, কাশিমবাজার মহারাজার চাটিবালিয়াপুরের নায়েব (১৯০৭-১৯৩০)। গ্রন্থ—রাজপুতকুসুম (কাব্য, ১২৯১), অশ্রুহার (কবিতাপুস্তক), মুর্শিদাবাদ কাহিনী (১৩০৪), মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (১৩০৯), ডাক্তার রামদাস সেন (জীবনী), সোনার বাঙ্গলা (১৯০৬), প্রতাপাদিত্য (১৯১৩), ইতিকথা (১৩১৫), বারই ডিসেম্বর (১৩১৮), জগৎশেঠ (১৩১৯), কবিকথা ১ম (১৩২২), ২য় (১৩২৬), চুণার (১৩২৭), সমাধান (উপন্যাস, ১৩২৮), কায়স্থ-প্রসঙ্গ (১৩২৯), পৃথ্বীরাজ (১৩৩৫)। সম্পাদিত গ্রন্থ—কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অনুক্রমণিকা ও পর্বসংগ্রহ অধ্যায় (১৩১৪)। সম্পাদক—ঐতিহাসিক চিত্র (মাসিক, ১৩১১-১২, ১৩১৪), শাশ্বতী (১৩২০-২৪), পল্লীবাসী (১৩২৭-২৮)।

নিগমানন্দ পরমহংস—বাঙ্গালী সন্ন্যাসী ও গ্রন্থকার। জন্ম—নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুতবপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ-বংশে। মৃত্যু—১৩৪২ বঙ্গ অগ্রহায়ণ কলিকাতায়। যৌবনেই গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ। প্রতিষ্ঠা—আসাম-বঙ্গ সারস্বত মঠ, কুতবপুরে ইংরেজি বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ও রোগীনিবাস। গ্রন্থ—ব্রহ্মচর্যসাধন, যোগীগুরু, তান্ত্রিকগুরু, জ্ঞানীগুরু, প্রেমিকগুরু, হরিদ্বারে কুম্ভমেলা, মায়ের কৃপা, তত্ত্বমালা ৩য় খণ্ড ও সাধকাষ্টক, উপদেশ রত্নমালা, জ্ঞানালোক, শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বামৃত, সিন্ধু, স্তোত্রমালা, শিক্ষা।

নিগমানন্দ সরস্বতী, স্বামী—বাঙ্গালী সন্ন্যাসী। সম্পাদক—আর্যদর্পণ (১৩১৫-১৩২১)।

নিজামুদ্দিন আহমদ—মুসলমান গ্রন্থকার। পিতা—মুহম্মদ কাবোহ। গ্রন্থ—কেরামত-উল-আউলিয়া, রাউত-উল-কুলুব।

নিজামুদ্দিন অহম্মদ খোজা—মুসলমান ঐতিহাসিক। পিতা—খোজা মুহম্মদ মোকিম। কর্ম—গুজরাত শাসনকর্তার মন্ত্রী। মৃত্যু—১৫৯৪ খৃঃ ২৮এ অক্টোবর। গ্রন্থ—তবকতে অকৃববী।

নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—সাংবাদিক। জন্ম—হুগলী জেলার চুঁচুড়ায়। গ্রন্থ—বালগঙ্গাধর তিলক, ঝরণা, গায়ত্রী (নাটক)। সম্পাদক—চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ (সাপ্তাহিক), বঙ্গদর্পণ, শিল্প ও সাহিত্য (মাসিক ১৩৩৭)।

নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়—গীতিনাট্যকার। গীতিনাট্য-গ্রন্থ—অম্বাদেবী, বিক্রমাদিত্য, শ্মশানে মিলন, যুগল বীরকুমার, শৈশবসাধনা, সপ্তমাবতার, শ্রীবৎস চিন্তা, দিবোদাস, শর্মিষ্ঠা।

নিত্যকৃষ্ণ বসু—কবি ও সাহিত্যিক। মৃত্যু—১৩০৭ বঙ্গ ২১এ আষাঢ়। শিক্ষকতা, কোন্নগর স্কুল। গ্রন্থ—সাহিত্যসেবকের ডায়েরী।

নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়—কৃষিতত্ত্ববিদ্। গ্রন্থ—সরল কৃষি-বিজ্ঞান (১৯০৪), রেশম বিজ্ঞান (১৯০৮)।

নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১৩১৮ বঙ্গ বীরভূম জেলায় অন্তর্গত সিউড়ি। পিতা—রায় বাহাদুর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা—বীরভূম ও কলিকাতা। কৃষিশিক্ষার জন্য ১৯৩৩ খৃঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিক্ষালাভ ও রাশিয়া ভ্রমণ। গ্রন্থ—দুধের ব্যবসা, কাঁটা, অগ্রগতি, রাশিয়া-ভ্রমণ, তুষারতীর্থ অমরনাথ, পশ্চিম প্রবাসী, চিত্রে রুশ-বিপ্লবের ইতিহাস, মাটির পুতুল, Russia Today, Himalayas & Across, Modern Agriculture. সম্পাদক—বীরভূমের কথা।

নিত্যবোধ বিদ্যাবিনোদ—গ্রন্থকার। পটুয়াটুলি, কলিকাতা

পিতা—জীবানন্দ বিদ্যাবিনোদ। প্রহসন গ্রন্থ—কুসুমে কীট, রাজীমাৎ, প্রেমের পাথার, দিলবাহার, একাদশ বৃহস্পতি।

নিত্যহরি ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। পিতা—পঞ্চানন ভট্টাচার্য। কর্ম—সরকারী পুলিশ বিভাগে। গ্রন্থ—শেষের দাবী, অ্যারিষ্টক্রেসী।

নিত্যানন্দ—কবি। নামান্তর—অদ্ভুতাচার্য। গ্রন্থ—অদ্ভুত রামায়ণ।

নিত্যানন্দ ঘোষ—কবি। কাশীরাম দাসের পূর্ববর্তী। গ্রন্থ—মহাভারত (পদ্যানুবাদ)।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী—মঙ্গলকাব্য-রচয়িতা। ১৮শ শতাব্দীতে মেদিনীপুর জেলার কাশীজোড়া পরগনার খয়রাকলাইবক গ্রামে। নিবাস—কাটাদিয়া। পিতা—রাধাকান্ত মিত্র। কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণের সভাসদ। গ্রন্থ—শীতলামঙ্গল, ইন্দ্রপূজা, পাণ্ডবপূজা, বিরাট-পূজা, লক্ষ্মী-মঙ্গল, কালু রায়ের গীত।

নিত্যানন্দ দাস—পদকর্তা। প্রকৃত নাম—বলরাম দাস। গ্রন্থ—প্রেমবিলাস।

নিত্যানন্দ দাস—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রসকল্পসার।

নিত্যানন্দ, দ্বিজ—মঙ্গলকাব্য-রচয়িতা। গ্রন্থ—শীতলামঙ্গল।

নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী—শিক্ষাব্রতী। অধ্যাপক। গ্রন্থ—সংস্কৃত সাহিত্যের কথা, বাংলা-সাহিত্যের কথা, সপ্তপর্ণী।

নিত্যানন্দ বৈদ্য—গ্রন্থকার। জন্ম—চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ার গ্রামে। পিতা—গোকুলচন্দ্র। গ্রন্থ—লীলার বার মাস।

নিত্যেন্দ্রনাথ সান্যাল—সাংবাদিক। সম্পাদক—হিন্দু হিতাকাঙ্খী (মাসিক, ১২৮২)।

নিধিরাম কবিচন্দ্র—কবি। বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহের সভাপণ্ডিত। গ্রন্থ—গোবিন্দলাল, দাতাকর্ণ।

নিধিরাম কবিরত্ন—কবি। জন্ম—চট্টগ্রাম জেলায় পটিয়া থানার অধীন চক্রশালা গ্রামে। পিতা—দুর্লভ আচার্য। মাতা—লক্ষ্মী দেবী। গ্রন্থ—কালিকামঙ্গল (১৭৫৬ খৃঃ)।

নিধিরাম মিশ্র—কবি। নামান্তর—কবিচন্দ্র মিশ্র। জন্ম—১৬শ শতাব্দী মধ্যযুগে। পিতা—হৃদয় মিশ্র। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ। গ্রন্থ—গঙ্গার বন্দনা, গুরুদক্ষিণা, সত্যনারায়ণ কথা।

নিবারণচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাহিত্যিক। শিক্ষকতা, যশোহর জেল স্কুল। সম্পাদক—শুকশারি (মাসিক—১২৯৫)।

নিবারণচন্দ্র গুপ্ত—সংবাদপত্রসেবী। সম্পাদক—রত্নাকর (মাসিক, ১২৮২)।

নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী—কবি। জন্ম—১৩০৮ বঙ্গ ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ। ঢাকা বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ-বংশে। পিতা—কামিনীকুমার চক্রবর্তী। মাতা—ক্ষীরোদা দেবী। শিক্ষা—প্রবেশিকা (ব্রাহ্মণগাঁ উচ্চ বিদ্যালয়)। কর্ম—ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ (১৯২৪)। 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি লাভ (বঙ্গসাহিত্য মহামণ্ডল কর্তৃক, ১৩৪১)। ইনি বহু সাময়িক পত্রের লেখক। কাব্যগ্রন্থ—ফুলকপি (১৩৩১)।

নিবারণচন্দ্র চৌধুরী—কৃষিতত্ত্ববিদ। জন্ম—কলিকাতা। কর্ম—সাকীপুর, মোরাদপুর। গ্রন্থ—কার্পাস-চাষ, খাদ্যতত্ত্ব, কৃষিরসায়ন রসায়ন-পরিচয়, Jute, Mahenjodaro. সম্পাদক—কৃষক ১৩৩১-৩২)।

নিবারণচন্দ্র বসু—দার্শনিক গ্রন্থকার। নিবাস—মেদিনীপুর। আইনজীবী, মেদিনীপুর। সম্পাদক—মেদিনীপুর থিয়োজফিক্যাল সোসাইটী। গ্রন্থ—মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর গুপ্ত শিক্ষা ও সাধনা (১৩৪৩)। মানবের ক্রমবিকাশ (১৩৪৫), ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার্থী (১৩৪৬), Symbolism of Vidyasundar.

নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত—নেতা ও সাহিত্যিক। জন্ম—বরিশাল। মৃত্যু—১৩৪৪ বঙ্গ ১৩ই চৈত্র। আইনব্যবসায়ী; রায় বাহাদুর, দার্শনিক পণ্ডিত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম নেতা। সম্পাদক—ভারত সুহৃদ। গ্রন্থ—ভারত রাষ্ট্রনীতি (১৯২৩)।

নিবেদিতা—ভারতহিতৈষী মহিলা। প্রকৃত নাম—মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল। জন্ম—১৮৬৭ খৃঃ অক্টোবর ইংলণ্ডে। মৃত্যু—১৯১১ খৃঃ ১৩ই অক্টোবর দার্জিলিং শহরে। পিতা—রেভা এস আর নোব্‌ল (ধর্মযাজক)। লণ্ডন নগরে শিক্ষয়িত্রীর কর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন। ভারত আগমন (১৮৯৮ খৃঃ), বেলুড়ে অবস্থান, ভারতের বহু তীর্থভ্রমণ, হিন্দুধর্মে দীক্ষা ও নিবেদিতা নামগ্রহণ। কলিকাতায় মহামারীর সময় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ। উচ্চশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা, অর্থসংগ্রহের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গমন। পুনরায় ভারতে আসিয়া বাগবাজারে বাস এবং বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। (অধুনা নিবেদিতা স্কুল)। বরিশালের বন্যায় আর্তদিগের সেবার্থে আত্মনিয়োগ (১৯০৬)। গ্রন্থ—Cradle Tales of Hinduism (লণ্ডন ১৯০৭), Religion and Dharma (ঐ, ১৯১৫), Siva & Buddha (কলিকাতা, ১৯১১), Studies from an Eastern Home (লণ্ডন, ১৯১৩), Web of Indian Life (ঐ, ১৯০৬), The Master as I saw Him. An Indian Study of Love & Death.

নিমাইচন্দ্র শিরোমণি—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। মৃত্যু—১৮৪০ খৃঃ ১২ই ফেব্রুয়ারি। ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪)। সম্পাদিত গ্রন্থ—ন্যায়সূত্রবৃত্তি (বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য কৃত), মহাভারত।

নিমাইচরণ বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সিরিস্তা (১৮৭২)।

নিমাইচাঁদ শীল—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৩৫ খৃঃ চুঁচুড়ায় বিখ্যাত শীলবংশে। মৃত্যু—১৮৯৩ খৃঃ। শিক্ষা—হুগলী কলেজ। গ্রন্থ—যামিনীযাপন ও কামিনীগোপন (১৭৭৭ শক), চন্দ্রাবতী (Love of the Harem অবলম্বনে), ধ্রুবচরিত্র (১৮৭১), এরাই আবার বড় লোক (প্রহসন), তীর্থমহিমা, সুবর্ণবণিক।

নিমানন্দ দাস—পদকর্তা। নিবাস—বৃন্দাবন। গ্রন্থ—পদরসসার।

নিম্বার্ক, আচার্য—বৈষ্ণব আচার্য। নামান্তর—নিয়মানন্দ বা নিম্বাদিত্য। জন্ম—১১শ শতাব্দী। পিতা—জগন্নাথ। প্রবর্তক—নিমাৎ নামক বৈষ্ণব শাখা। গ্রন্থ—বেদান্তপারিজাত-সৌরভ।

নিরুপমা দেবী—মহিলা সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৮৫ খৃঃ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বহরমপুরে। মৃত্যু—১৯৫১ খৃঃ ৯ই জানুয়ারি, চুঁচুড়া (হুগলী)। বাল্যজীবন—ভাগলপুর। ইঁহারই ভ্রাতা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ ভট্ট। গ্রন্থ—দিদি, অষ্টক, শ্যামলী, বিধিলিপি, অন্নপূর্ণার মন্দির, বন্ধু, পরের ছেলে, আমার ডায়েরী, দেবত্র, অদৃষ্ট লিপি, অনুকর্ষ।

নিরুপমা দেবী, রাণী—মহিলা সাহিত্যিক। ময়ূরভঞ্জের রাণী। সম্পাদিকা—পরিচারিকা (মাসিক, ১৩২৩—৩১)।

নির্ঝরিণী ঘোষ—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—ম্যাডাম গেনিও, মৌনীবাবা।

নির্মলকুমার বসু—শিক্ষাব্রতী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৩০৭ বঙ্গ ১ই মাঘ। পিতা—বিমানবিহারী বসু। শিক্ষা—বি-এস-সি (প্রেসিডেন্সী কলেজ, ১৯২১), ছাত্রাবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান, সরকারী কলেজ ত্যাগ করিয়া আলিগড়ে জাতীয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন, পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এস-সি ডিগ্রি লাভ (১৯২৫); বিশ্ববিদ্যালয় সুবর্ণ পদক, হেমচন্দ্র গোস্বামী সুবর্ণ পদক ও ব্রহ্মমোহন সুবর্ণ পদক পুরস্কার লাভ। মন্দির-শিল্পতত্ত্ব গবেষণার জন্য উড়িষ্যা, উত্তর-ভারত, পাঞ্জাব, রাজপুতনা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ। আন্দোলনে যোগদান হেতু কারাবাস (১৯৩২), অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৮), আগষ্ট-আন্দোলনের সময় 'হরিজন' (বাংলা) পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কর্ম, পুনরায় কারাবাস (১৯৪২-১৯৪৫)। নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বহু নিবন্ধ-রচনা। গ্রন্থ—উড়িষ্যার শিল্পশাস্ত্র (১৯২৬), কণারকের বিবরণ (১৩৩৩), Cultural Anthropology (১৯২৯), নবীন ও প্রাচীন (১৩৩৭), Canons of Orissan Architecture (১৯৩২), Selection from Gandhi (১৯৩৪), Studies from Gandhism (১৯৪০), An Introduction to Gandhism, Studies in Gandhism (১৯৪৭), দেশ-বিদেশ (১৩৪৬), পরিব্রাজকের ডায়েরী (১৩৪৭), গান্ধীজী কি চান (১৯৪৬), স্বরাজ ও গান্ধীবাদ (১৩৫৪), Excavations in Mayurbhanj (১৯৪৮), গান্ধীচরিত (১৩৫৬), কংগ্রেসের আদর্শ প্রতিষ্ঠা (১৩৫৬), Satya & Ahimsa (১৯৪৯), হিন্দুসমাজের গড়ন (১৯৪৯), গান্ধীবাদ হিন্দী (১৯৫১)।

নির্মল দেব—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ঝড়ের ফুল, ছিন্ন তার।

নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়—নাট্যকার ও সাহিত্যিক। জন্ম—১২৯৯ বঙ্গ ২২শে আশ্বিন রাণীগঞ্জে। মৃত্যু—১৩৫১ বঙ্গ ১৭ই ভাদ্র সিউড়ি, বীরভূম। পিতা—যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (জমিদার, লবপুর)। ইনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। লাবপুরে নাট্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৩১২)। রায় বাহাদুর উপাধিলাভ (১৯২৫)। নাট্যগ্রন্থ—নবাবী আমল, বীর রাজা, বাহাদুর, রাতকানা, মুখের মত, ভুলের খেলা, রূপকুমারী (গীতিনাট্য), প্রভাত-স্বপ্ন (গল্প), অন্তরায় (উপন্যাস)। সম্পাদক—পূর্ণিমা (১৩৩৩)।

নিশিকান্ত ঘোষ—কৃষিতত্ত্ববিদ্। সম্পাদক—কৃষি-সমাচার (১৩১৭), কৃষি-সম্পদ (১৩১৮)।

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়—শিক্ষাব্রতী ও সমাজ-সংস্কারক। জন্ম—১২৫৯ বঙ্গ ৭ই শ্রাবণ ঢাকা-বিক্রমপুর জেলার পশ্চিমপাড়া গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৬ বঙ্গ ১৩ই ফাল্গুন হায়দরাবাদে। পিতা—কাশীরাম চট্টোপাধ্যায়, (আইন-ব্যবসায়ী)। শিক্ষা—প্রবেশিকা (প্রগ্রেস বিদ্যালয়—১৮৬৮), এফ, এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ), ইংলণ্ড গমন (১৮৭৩)। লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় ও জুরিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি, এইচ ডি। নানা স্থানে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা। অধ্যাপনা, সেন্ট পিটারবার্গে। স্বদেশ প্রত্যাগমন (১৮৮৩), অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ—হায়দরাবাদ, মজঃফরপুর, মহীশূর কলেজ। বাল্য-বিবাহনিবারণী সভা স্থাপন (১৮৭৪)। গ্রন্থ—The Jatras or the Popular Dramas of Bengal (লণ্ডন), Die Indische Essays (জর্মান ভাষায়)।

নিশিকান্ত সেন—গ্রন্থকার। ত্রিপুরা-নিবাসী। গ্রন্থ—মনোমোহন (১৯২১)।

নিশ্চল দাস—পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী। জন্ম—দিল্লীর সন্নিকটস্থ কিহড়ৌলি গ্রাম। মৃত্যু—১৯২০ সংবত। পিতা তরুজী। মাতা—লছমী। তুলসীদাসের সমসাময়িক এবং দাদুপন্থী। গ্রন্থ—বিচার-সকার, বৃত্তি-প্রভাকর, আত্মজ্ঞানবোধ, কঠোপনিষদের টীকা।

নিস্তারিণী দেবী, সরস্বতী—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—জীবন-বৈচিত্র্য, কেশব-জ্যোতি, রেণুকণা, সতীলীলা।

নিশিকান্ত বসু রায়—নাট্যকার। নাট্যগ্রন্থ—দেবলাদেবী, বঙ্গে বর্গী, ললিতাদিত্য, বাপ্পারাও, পথের শেষে, ধর্ষিতা।

নীরদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—ধূমকেতু (১৩১০-১১)।

নীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—হিতবাদিনী (মাসিক, ১২৯৮)।

নীলকণ্ঠ—শাক্ত বৈদান্তিক। জন্ম—১৬-১৭শ শতাব্দী। পিতা—রঙ্গনাথ দেশিক। মাতা—লক্ষ্মীদেবী। গ্রন্থ—দেবী ভাগবতের টীকা, শক্তিবিমর্ষিণী।

নীলকণ্ঠ দত্ত—পালা-রচয়িতা। জন্ম—নবদ্বীপ। মৃত্যু—১৩০০ বঙ্গ। পিতা—সূর্যকান্ত দত্ত। মতি রায়ের যাত্রার দল হইবার পূর্বে ইঁহার যাত্রার দল ছিল। ইনি পৈতৃক কাপড়ের ব্যবসায় যোগদান না করিয়া সঙ্গীত-রচনা ও যাত্রা-গান করিতেন। পালাগ্রন্থ—দাতাকর্ণ, ধ্রুবচরিত, হরিশ্চন্দ্রের দানকীর্তি, ব্রজলীলাবর্ণন, সুধন্বাবধ।

নীলকণ্ঠ দীক্ষিত—গ্রন্থকার। জন্ম—১৭শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীনগরে। গ্রন্থ—নীলকণ্ঠচম্পূ, চিত্র-মীমাংসা-দোষধিক্কার।

নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব-নির্ণয়ের আলোচনা।

নীলকণ্ঠ মজুমদার—শিক্ষাব্রতী সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৫৫ খৃঃ মেদিনীপুর জেলায় পাথরা-জনার্দনপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৯০১ খৃঃ ২০এ অগষ্ট। পিতা—ঈশানচন্দ্র মজুমদার। শিক্ষা—এম. এ., পি. আর. এস। কর্ম—অধ্যাপক, ঢাকা, রাজসাহী ও প্রেসিডেন্সী কলেজ ; অধ্যক্ষ, কৃষ্ণনগর কলেজ, কটক র‍্যাভেন্স কলেজ (১৮৮১-১৯০১)। গ্রন্থ—গীতা-রহস্য, বিবাহ ও নারীধর্ম, Are we Aryans? The village school-master (উপ), Model essays.

নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী—টীকাকার। গ্রন্থ—তর্কসংগ্রহদীপিকা-প্রকাশ (টীকাগ্রন্থ), তত্ত্বচিন্তামণি (টীকা)।

নীলকণ্ঠ সূরী—অদ্বৈতবাদী গ্রন্থকার। জন্ম—১৬শ শতাব্দী মহারাষ্ট্র দেশে। পিতা—গোবিন্দ সূরী। গ্রন্থ—ভারত-ভাবপ্রদীপ (মহাভারতের টীকা)।

নীলকমল ঘোষাল—গণিতজ্ঞ। গ্রন্থ—গণিতসূত্র (১৮৭১), ভূগোলসার-সংগ্রহ (১৮৭৩), ভূচিত্রাবলী (১৮৬৮)।

নীলকমল দাস—সাহিত্যিক ও সংবাদপত্রসেবী। সম্পাদক—ভৃঙ্গদূত (সাপ্তা, ১৮৪২ খৃঃ), সংবাদ-লস্কর (ঐ, ১৮৫১, সংবাদ-নিশাচর (ঐ, ১৮৪১)।

নীলকমল দাস—গ্রন্থকার। নিবাস—চট্টগ্রাম। গ্রন্থ—বৌদ্ধরঞ্জিকা (পালিভাষায় যাদুত্তং নামক বৌদ্ধগ্রন্থের পত্যানুবাদ—চট্টগ্রামের পার্বতীয় প্রদেশের রাজা ধরমবক্স খাঁর পত্নী রাণী কালিন্দী দেবীর সহায়তায়)।

নীলকমল ভাদুড়ী—গ্রন্থকার। নিবাস—কোরকাড়ি। গ্রন্থ—শুক্কেতিহাস।

নীলকমল মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জমিদার ও প্রজা (১৮৭৩)।

নীলকমল মুস্তোফী—গ্রন্থকার। ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ। নদীয়া জেলায় জজের সেরেস্তাদার। গ্রন্থ—বৃহৎ বাঙ্গালা অভিধান (১৮৩৮)।

নীলকমল লাহিড়ী—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৪৫ বঙ্গ রংপুরের নলডাঙ্গার জমিদার লাহিড়ী-বংশে। মৃত্যু—১৩০৩ বঙ্গ। গ্রন্থ—কাল্যর্চনচন্দ্রিকা, কৃষিতত্ত্ব, শক্তিভক্তিরসকণিকা, শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজাপদ্ধতি, প্রতিষ্ঠালহরী, যাত্রাপদ্ধতি।

নীলনলিনী দেবী—মহিলা কবি। জন্ম—১৮৯৪ খৃঃ। মৃত্যু—১৯০৩ খৃঃ। পিতা—যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট)। গ্রন্থ—বালুকণা (১৯০৩)।

নীলমণি দাস—কবি। গ্রন্থ—কালিকাস্তুতি।

নীলমণি পাল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রত্নাবলী (বঙ্গানুবাদ)।

নীলমণি বরাট—গ্রন্থকার। জন্ম—হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে। গ্রন্থ—তীর্থ-কৈবল্য।

নীলমণি বসাক—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮০৮ (আনু) খৃঃ রামবাগানে উমেশ দত্ত লেনে। মৃত্যু—১৮৬৪ খৃঃ অগষ্ট। পিতা—রাজচন্দ্র বসাক। কর্ম—হুগলী কোর্ট, বদলি হইয়া রাজশাহী, বর্ধমান, পরে বর্ধমানের কালেক্টরের সহকারী। গ্রন্থ—নবনারী (১৮৫২), বত্রিশ সিংহাসন (১৮৫৪), আরব্য উপন্যাস, ১ম (১২৫৬), ২য় (১২৫৭), ৩য় (১২৫৭), পারস্য উপন্যাস (১৮৫৬), পারস্য ইতিহাস (পদ্য, ১৮৩৪), রাজসম্পর্কীয় নিয়ম ১ম (১৮৫৫-৬৩), ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১ম (১৮৫৭), ২য় (১৮৫৮), ইতিহাস (১৮৫৯), ইতিহাস-সার (১৮৬২)।

নীলমণি মুখোপাধ্যায়—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ন্যায়ালঙ্কার উপাধি ও মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ। অধ্যাপক গ্রন্থ—কবিকাকলী (১৯০১), লঘুবোধ ব্যাকরণ (১৯০১), অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার (১৩১২)।

নীলরতন মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার ও সাংবাদিক। জন্ম—বীরভূম। মৃত্যু—১৩২১। কর্ম—শিক্ষকতা। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। সম্পাদিত গ্রন্থ—চণ্ডীদাসের পদাবলী (১৩২১)। সম্পাদক—বীরভূমি (১৩০৬-১২)।

নীলরতন হালদার—সাহিত্যিক ও সংবাদপত্রসেবী। জন্ম—হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়া। মৃত্যু—১৮৫৪ খৃঃ। নিবাস—কলিকাতা চোরবাগান। পিতা—নীলমণি হালদার। কর্ম—মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা (১৮২৫), টরেন্স সাহেবের আমলে সল্ট বোর্ডের দেওয়ান। নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত ও সঙ্গীতজ্ঞ। গ্রন্থ—কবিতা রত্নাকর (১৮২৫), জ্যোতিষ (১৮২৫), পরমায়ু-প্রকাশ (১৮২৬), অদৃষ্ট-প্রকাশ (১৮২৬), বহুদর্শন (১৮২৬), দম্পতী-শিক্ষা (১৮৩৪), সর্বামোদরতরঙ্গিণী (১৮৫১), শ্রুতিগানরত্ন (১৮৫৩), পার্বতী গীতরত্ন (১৮৫৪)। সম্পাদক—বঙ্গদূত (সাপ্তাহিক, ১৮২৯)।

নীলাচল দাস—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দ্বাদশপাট নির্ণয়।

নীলাম্বর দাস—গ্রন্থকার। ইনি শ্যামাদাস আচার্য-বংশ। গ্রন্থ—সংগৃহীত সুধাসার।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—রঙ্গপুর বার্তাবহ (সাপ্তাহিক, ১৮৪৭ ?)।

নীলাম্বর শর্মা—গণিতজ্ঞ। জন্ম—১৮২৩ খৃঃ পাটনা। অলবন দেশের রাজা শিবদাস সিংহের গণিতিক। গ্রন্থ—গোলপ্রকাশ (সংস্কৃত গণিত), লীলাবতী টীকা।

নীলিমা দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—আগমনী, মায়ামুক্তি, Hidden face.

নীহারমালা দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—আদর্শ রন্ধনশিক্ষা, বিদায় বেলা।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত—চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৩১৮ বঙ্গ ২৩এ জ্যৈষ্ঠ। এম. বি. ভারতীয় মেডিক্যাল সার্বিসে যোগদান। লণ্ডনে উচ্চশিক্ষার্থে গমন। বহু রহস্যোপন্যাস রচনা। গ্রন্থ—বিদ্রোহী ভারত, ৩ খণ্ড; মহাসমরের বুকে (১৩৫৪), যৌবনের পিছল পথে (যৌনগ্রন্থ), রঙিন ধরণী, মুক্তি-পতাকা তলে।

নীহাররঞ্জন দাস—গ্রন্থকার। জন্ম—শ্রীরামপুরের (হুগলী) অন্তর্গত চাতরা নামক গ্রামে। গ্রন্থ—অরুণার বিয়ে।

নীহাররঞ্জন রায়—শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৯০৪ খৃঃ ১৪ই জানুয়ারী। শিক্ষা—মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, কলিকাতা, ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড। এম, এ, ডি, লিট, ডি, ফিল, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার। ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। গ্রন্থাধ্যক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অধ্যাপক (বাগেশ্বরী), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থ—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা ২ খণ্ড, বাঙ্গালীর ইতিহাস, প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন (১৩৫৬), বাঙ্গালার নদ-নদী (১৩৫৪), বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ (১৩৫২)।

নুটবিহারী মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। এম. এ. বি. এল, আইন-ব্যবসায়ী। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—নন্দা, মরুযাত্রী।

নুরউদ্দিন সেখ—মুসলমান গ্রন্থকার। গ্রন্থ—তোয়ারিখ কাশ্মির (কাশ্মীরের ইতিহাস)।

নুরউদ্দিন, সৈয়দ—গ্রন্থকার। জন্ম—চট্টগ্রামের অন্তর্গত হাট-হাজারীর অধীন মির্জাপুর গ্রামে। গ্রন্থ—রাহাতুল কুলুপ (বাংলা ভাষা), দাকায়েৎ (বঙ্গানুবাদ)।

নুরউল হক, সাহ বা শেখ—মুসলমান গ্রন্থকার। মৃত্যু—১৬৬২ খৃঃ। পিতা—দিল্লীর শেখ আবদুল হক বিন সয়েফ উদ্দীন। গ্রন্থ—জুবদাত-উৎ-তোয়ারিখ, সরাহ।

নুরউল্লা গুস্তারী, মীর—মুসলমান গ্রন্থকার। নামান্তর—নুরউল্লা বিন সরিফ উল হুসেনী-উস-গুস্তারী। মৃত্যু—১৬১০ খৃঃ নিহত। সম্রাট্ অকবরের সভাসদ্। গ্রন্থ—মজালিস্-উল-মামিনীন (জীবনীসংগ্রহ)।

[ক্রমশঃ।

এ্যাটম

শ্রীযামিনীমোহন কর

এ্যাটমের গঠন

বহু যুগ আগে কনাদ বলেন যে, প্রত্যেক দ্রব্য অণু-পরমাণু সমূহের সমষ্টি মাত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরমাণুদের ঠোস গোলক মনে করা হত। সে ক্ষেত্রে তার আভ্যন্তরীণ গঠনের কথা ওঠে না! ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে টমসন প্রথম বলেন যে, পরমাণু ঠোস গোলক নয়। বোধ হয়, অনেকগুলো কর্পাসলসের সমষ্টি। এই হল কণাবাদ। কর্পাসলস্ প্রকৃতপক্ষে ইলেকট্রোন। তিনি আরও বলেন যে, যদিও এই কর্পাসলস্গুলো ঋণাত্মক আয়নের মত ব্যবহার করে, তবু এদের সমষ্টিতে সৃষ্ট পরমাণু তড়িৎ সম্পর্কে উদাস অর্থাৎ তার কোন আদান নেই। তাহলে নিশ্চয়ই পরমাণুর মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার আছে যাতে কর্পাসলস্ সমূহের ঋণাত্মক আদান প্রশমিত হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর বক্তব্যকে আরও বিশদ ভাবে প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, পরমাণুর ভেতরকার ঋণাত্মক কর্পাসলস্ সমূহ একটি সম ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত গোলকের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তাঁর এই উক্তির মধ্যে গলদ বেরিয়ে পড়ে। একটা ইলেকট্রোনের ভর একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর দু'হাজার ভাগের এক ভাগ। তাহলে ভারী মৌলের একটি পরমাণুর মধ্যে সহস্র সহস্র ইলেকট্রোন থাকবে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে টমসন এর উত্তরে বললেন যে, পরমাণুর ভরের অতি ক্ষুদ্র অংশের জন্য কর্পাসলস্ দায়ী। তার মানে একক ধনাত্মক আদানের বাহকের ভর একক ঋণাত্মক আদানের বাহকের তুলনায় অত্যন্ত বড়। উত্তরটা বিশেষ যুতসই হয়নি।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গারীর লেনার্ড দেখালেন যে, দ্রুতগামী ক্যাথোড রশ্মি এলুমিনিয়াম ও অন্যান্য ধাতুর পাত ভেদ করতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, পরমাণুর মধ্যে অনেকটা অংশ ফাঁকা থাকে। লেনার্ড বললেন যে, বাকী ভরাট অংশে যুগল আদান একত্রে থাকে, তাই তা উদাসীন। কিন্তু এ্যাটম সম্পর্কে উন্নত গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে আজ যা জানা গেছে, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জাপানের বিখ্যাত পদার্থবিদ্ নাগাওকা সে কথা বলেছিলেন। আশ্চর্য্য বটে! কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেউ তার কথায় কান দেয়নি। তিনি পরমাণুকে শনিগ্রহের সঙ্গে তুলনা করেন। গ্রহের চারি ধারে ছোট ছোট উপগ্রহের বলয়। পরমাণুর ধনাত্মক আদানযুক্ত কণা কেন্দ্রে আর চার ধারে ঋণাত্মক ইলেকট্রোনের বলয়।

পরমাণুর গঠনের সম্পর্কে আধুনিক জ্ঞান এসেছে তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহের বিকিরণ সম্পর্কে গবেষণা থেকে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে রাদারফোর্ড দেখালেন যে, তেজস্ক্রিয় উৎস নির্গত অ্যালফা কণা সমূহ পাতলা ধাতব পাত ভেদ করলে তার গতিপথের ছবির ধারগুলো ঝাপসা হয়, স্পষ্ট হয় না। তাহলে বলা যেতে পারে যে, অ্যালফা কণাগুলো একসঙ্গে যায় না, এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। বিখ্যাত জার্মাণ বৈজ্ঞানিক গেইগর রাদারফোর্ডের সঙ্গে মিলে এই পরীক্ষা আরও ভাল ভাবে চালান। এবারও তাঁরা দেখলেন যে, অ্যালফা কণাসমূহ ছড়িয়ে পড়ে, তবে সংখ্যায় খুব কম। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে গেইগর ও মার্সডেন পাতলা প্লাটিনাম পাতের মধ্যে দিয়ে অ্যালফা কণা চালনা করেন। তাঁরা দেখলেন যে, ৮০০০এর মধ্যে মাত্র একটি কণা ৭০° কোণে বেঁকে গেল। আপতিত অভিমুখ থেকে এতটা বেঁকে যাবার কারণ কি, এই হল প্রশ্ন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এর উত্তর দিলেন রাদারফোর্ড। তিনি বললেন যে, ইলেকট্রোনের তুলনায় আলফা কণার ভর, ভরবেগ এবং গতীয় শক্তি অনেক বেশী। সুতরাং ইলেকট্রোন অ্যালফা কণার গতিপথ অতটা বেঁকাতে পারে না। টমসনের সম ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত গোলক দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হয় না। এর একমাত্র উত্তর এই যে, পরমাণুর মধ্যে কোন এক ক্ষুদ্র স্থানে ধনাত্মক তড়িৎ একাগ্রীভূত করা আছে, যার ফলে অ্যালফা কণা বেঁকে চলে যায়। পরমাণু-কেন্দ্রে এই একাগ্রীভূত ধনাত্মক তড়িতের তিনি নাম দিলেন নিউক্লিয়াস। এইবার পরমাণুর গঠনের নবরূপ পাওয়া গেল। কেন্দ্রে ধনাত্মক আদানযুক্ত নিউক্লিয়াস, আর তাকে ঘিরে ঋণাত্মক আদানযুক্ত ইলেকট্রোন সমূহ। ঠিক নাগাওকা যা কল্পনা করেছিলেন, শনিগ্রহের মত।

গেইগার ও মার্সডেনের পরীক্ষায় পরমাণুর গঠন সম্পর্কে জানা গেল বটে, কিন্তু নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক আদানের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হল না। পরে অবশ্য তা করা সম্ভব হয়েছে গণিতের সাহায্যে। একটা অ্যালফা কণায় দুই একক ধনাত্মক আদান থাকে অর্থাৎ $2e$; নিউক্লিয়াসে Ze ধনাত্মক আদান থাকে, যেখানে Z পরমাণবিক ভরের অর্দ্ধ। তাহলে এদের মধ্যে বিকর্ষণ বল মাপা যায়। যদি দুই কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব d হয়, তবে কুলম্বের সূত্রানুসারে এই বলের পরিমাণ হল $2e \times Ze/d^2$ অর্থাৎ $2Ze^2/d^2$. সুতরাং স্থৈতিক শক্তি বা অসীম দূরত্ব থেকে একক আদানকে d দূরত্বে নিয়ে আসার কার্য্য হল $2Ze^2/d$.

এখন যদি একটা অ্যালফা কণার ভর m এবং বেগ v হয়, তবে গতীয় শক্তি হবে $\frac{1}{2}mv^2$. যখন এই কণা নিউক্লিয়াসের সব চেয়ে কাছে যায়, তখন যদি ওদের মধ্যে দূরত্ব d_0 হয়, তবে $2Ze^2/d_0 = mv^2/2$

অর্থাৎ $d_o = 4Ze^2/mv^2$

এখন ইলেকট্রোনের আদান $e = 4{\cdot}80 \times 10^{-10}$ স্থিতীয় তড়িৎ একক ; বেগ v হল প্রায় $1{\cdot}5 \times 10^9$ সেণ্টিমিটার এবং টার্গেট নিউক্লিয়াসের একক ধনাত্মক আদানের সংখ্যা Z হ'ল 20, অর্থাৎ পরমাণবিক ভর 40এর কাছাকাছি। সুতরাং d_o দাঁড়ায় প্রায় 10^{-12} সেণ্টিমিটার। তাহলে টার্গেট নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্দ্ধ এর চেয়ে ছোট হবে অর্থাৎ 10^{-12} থেকে 10^{-13}এর মধ্যে। পূর্ব্বে বলে দেখান হয়েছে যে, ইলেকট্রোনের ব্যাসার্দ্ধ প্রায় 2×10^{-13} সেণ্টিমিটার। দেখা যাচ্ছে যে, নিউক্লিয়াস ইলেকট্রোনের চেয়ে বহু সহস্র গুণ ভারী হলেও উভয়ের ব্যাসার্দ্ধ প্রায় সমান। পূর্ব্বে এ-ও কথা হয়েছে যে, পরমাণুর ব্যাসার্দ্ধ প্রায় 10^{-8} সেণ্টিমিটার। কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস 10^{-12} থেকে 10^{-13} ব্যাসার্দ্ধের গোলক। তাহলে পরমাণুর মধ্যে অধিকাংশ স্থানই ফাঁকা পড়ে রইল। এখন নিউক্লিয়াসে 20 একক ধনাত্মক আদান রয়েছে অথচ পরমাণু তড়িৎ সম্পর্কে উদাস অর্থাৎ তার কোন চার্জ্জ নেই। তাহলে নিশ্চয়ই পরমাণুর মধ্যে 20 একক ঋণাত্মক আদান রয়েছে। কোথায়? নিশ্চয়ই নিউক্লিয়াসের চারি ধারে ইলেকট্রোন সমূহের মধ্যে। নাগাওকার পরমাণুর রূপ চোখের সামনে ভেসে উঠছে। একটা পরমাণুর ঘনফল প্রায় 10^{-24} ঘন-সেণ্টিমিটার, আর নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রোন সমূহের মিলিত ঘনফল প্রায় 10^{-36} ঘন-সেণ্টিমিটার। তাহলে পরমাণুর মধ্যে ফাঁকা অংশ কতটা পড়ে থাকে তারও একটা ধারণা করা যায়।

গেইগার ও মার্সডেনের পরীক্ষা থেকে নিউক্লিয়াসের আদানের পরিমাণে শতকরা কুড়ি ভাগ ভুল ছিল। মোটামুটি ভাবে পাওয়া গেল যে, নিউক্লিয়াসের একক ধনাত্মক আদানের সংখ্যা পরমাণবিক ভরের প্রায় অর্দ্ধেক। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক মোসলি বিভিন্ন কৃষ্টালকে বিকলন জাফরী হিসেবে ব্যবহার করে তার এক্স রে'র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নিরূপণের চেষ্টা করেন। ফটো নিয়ে দেখা গেল যে, প্লেটের ওপর রেখার অবস্থান বিভিন্ন হয়, এবং কোন কৃষ্টালের এক্স রে, তার ওপর নির্ভর করে। আরও দেখা গেল যে, কৃষ্টাল যে মৌলের তৈরী, তার পরমাণবিক সংখ্যার সঙ্গে এক্স রে'র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের একটা যোগাযোগ রয়েছে। রেখার অবস্থান দেখে তিনি অনুরূপ বিকিরণের আবৃত্তি মাপলেন এবং তার পর বিভিন্ন মৌলের জন্য যে বিভিন্ন এক্স রে পাওয়া গেল তার আবৃত্তির বর্গমূলকে প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে, পর্য্যায় তালিকানুযায়ী ক্রমিক ভাবে এক মৌল থেকে পরবর্ত্তী মৌলে গেলে Q ধ্রুব পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তার মানে পরমাণুর মধ্যে একটা মূলগত রাশি আছে যা এক মৌল থেকে পরবর্ত্তী মৌলে গেলে নিয়মিত ভাবে বৃদ্ধি পায়। এই রাশি নিশ্চয়ই পরমাণুর নিউক্লিয়াসের আদান। এখন এক মৌল থেকে পরবর্ত্তী মৌলে গেলে পরমাণবিক ভর গড়ে দুই দুই করে বাড়ে, আবার নিউক্লিয়াসের একক ধনাত্মক আদানের সংখ্যা পরমাণবিক ভরের অর্দ্ধেক, সুতরাং এক মৌল থেকে পরবর্ত্তী মৌলে গেলে নিউক্লিয়াসের একক ধনাত্মক আদানের সংখ্যা এক এক করে বাড়বে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের চাডউইক পরীক্ষা দ্বারা এই মতবাদ সমর্থন করলেন। তিনি নির্ণয় করলেন যে, তামা, রূপা ও প্ল্যাটিনাম নিউক্লিয়াসের আদান যথাক্রমে

29·3, 46·3 এবং 77·4 ; ওদের পরমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 29, 47 এবং 78. সুতরাং মতবাদের সঠিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যে কোন মৌলের পরমাণবিক সংখ্যা, তার নিউক্লিয়াসে একক ধনাত্মক আদানের সংখ্যার সমান। আবার যেহেতু পরমাণু তড়িৎ সম্পর্কে উদাসীন, সুতরাং ঋণাত্মক আদান-যুক্ত ইলেকট্রোনের সংখ্যাও পরমাণবিক সংখ্যার সমান। এই ইলেকট্রোনদের কাক্ষিক ইলেকট্রোন বলা হয়। হাইড্রোজেনের পরমাণবিক সংখ্যা এক, সুতরাং এর একক ধনাত্মক চার্জ্জযুক্ত নিউক্লিয়াস এবং একটি মাত্র কাক্ষিক ইলেকট্রোন। হিলিয়ামের পরমাণবিক সংখ্যা দুই, সুতরাং এর দুই একক ধনাত্মক চার্জ্জযুক্ত নিউক্লিয়াস এবং দু'টো কাক্ষিক ইলেকট্রোন। লিথিয়ামের পরমাণবিক সংখ্যা তিন, সুতরাং এর তিন একক ধনাত্মক চার্জ্জযুক্ত নিউক্লিয়াস এবং তিনটে কাক্ষিক ইলেকট্রোন। এই ভাবে তালিকাভুক্ত সকল মৌলের পরমাণুর গঠনের কথা বলা যায়।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, প্রোটোনের ভর একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের সমান এবং একক ধনাত্মক আদানে আহিত। তাহলে, একটা পরমাণু থেকে একক ঋণাত্মক আদান অর্থাৎ একটা ইলেকট্রোন সরিয়ে নিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই প্রোটোন। যেহেতু হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি মাত্র ইলেকট্রোন থাকে এবং সেটাকে সরিয়ে নিলে কেবল পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে যায়, সুতরাং প্রোটোন আর নিউক্লিয়াস অভিন্ন। অনুরূপ ভাবে বলা যায় যে, একটা অ্যালফা কণা প্রকৃত পক্ষে একটা হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস অর্থাৎ একটা হিলিয়াম পরমাণু থেকে দু'টো ইলেকট্রোন সরিয়ে নিলে যা বাকি থাকে। সুতরাং এর দু' একক ধনাত্মক চার্জ্জ আছে।

আবার জানা আছে যে, আয়নিত করলে একটা পরমাণু বা পরমাণুর সমষ্টি তড়িতাদান যুক্ত হয়ে পড়ে। তাহলে তড়িতের বাহক হয়, সুতরাং কাক্ষিক ইলেকট্রোন সমূহের কথা এসে যায়। যদি কোন রকমে এই ইলেকট্রোনগুলোকে সরিয়ে ফেলা যায়, তবে পড়ে থাকে একটা ধনাত্মক আয়ন। তাহলে একটা প্রোটোন, একক ধনাত্মক আদানযুক্ত একটা হাইড্রোজেন আয়ন। একটা অ্যালফা কণা, দুই ধনাত্মক আদানযুক্ত একটা হিলিয়াম আয়ন। তেমনি যদি কোন পরমাণু বা অণুর মধ্যে কোন রকমে এক বা একাধিক ইলেকট্রোন বাইরে থেকে এসে ঢুকে পড়ে, তবে সেগুলো ঋণাত্মক আয়ন হবে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, কোন গ্যাস আয়নিত হলে এক-একটা আয়ন-যুগল সৃষ্টি হয়, যার একটা ধনাত্মক ও একটা ঋণাত্মক আয়ন। অর্থাৎ একটা ধনাত্মক আয়ন ও একটা ইলেকট্রোন। তাহলে পরমাণুর গঠনের ব্যাপারটা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রথম ধনাত্মক আদানযুক্ত কেন্দ্রস্থ নিউক্লিয়াসের কথা। এইটাই বলতে গেলে পরমাণুর সমগ্র ভর। দ্বিতীয়, অবশিষ্ট ফাঁকা স্থানে কাক্ষিক ইলেকট্রোন সমূহের অবস্থান। প্রথমটার কথা কিছুটা বলা হয়েছে। আরও যা বাকী আছে পরে বলা হবে।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জানা ছিল যে, ধনাত্মক আদানে আহিত সব চেয়ে হাল্কা কণা হল প্রোটোন। তাই ধরে নেওয়া হল যে, পরমাণুর নিউক্লিয়াসগুলো এই প্রোটোনের সমষ্টি। পরমাণবিক ভরের স্কেলে প্রোটোনের ভর প্রায় একক এবং তাতে একক ধনাত্মক চার্জ্জ থাকে। তাহলে A পরমাণবিক ভরের নিউক্লিয়াসে A সংখ্যক প্রোটোন আছে ধরা যেতে পারে। যদি তাই হয়, তবে নিউক্লিয়াসে একক ধনাত্মক আদানের সংখ্যা পরমাণবিক ভরের সমান হওয়া উচিত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, আদানের সংখ্যা পরমাণবিক সংখ্যা Zএর সমান অর্থাৎ পরমাণবিক ভরের প্রায় অর্দ্ধেক। এ কি করে সম্ভব হতে পারে? উত্তর-স্বরূপ বলা হল যে, পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটোনের সঙ্গে $A-Z$ ধনাত্মক ইলেকট্রোন আছে। যেহেতু ইলেকট্রোনের ভর অত্যন্ত কম, সুতরাং সে জন্য নিউক্লিয়াসের ভরে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হবে না। অথচ মোট ধনাত্মক আদান হয়ে যাবে $A-(A-Z)=Z$, অর্থাৎ পরমাণবিক সংখ্যার সমান। এদিকে প্রোটোনের সংখ্যা A থেকে যাবে, অর্থাৎ পরমাণবিক ভরের সমান হবে। বিটা কণা নিয়ে পরীক্ষা করে এই মতবাদ সমর্থিত হল। কিন্তু তবুও প্রোটোন এবং ইলেকট্রোনের ঘেঁসাঘেঁসি করে থাকা সম্ভব কি না তাই নিয়ে সন্দেহ জাগল। কারণ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আদান পরস্পরকে প্রশমিত করে দেবে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই প্রশ্নের একটা উত্তর পাওয়া গেল। প্রোটোন ইলেকট্রোন মিলে একটা উদাস সমষ্টি তৈরী হতে পারে, যাকে বলে নিউট্রোন। পরমাণবিক নিউক্লিয়াসে এই ধরণের নিউট্রোন থাকতে পারে। এর পর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর হাইসেনবার্গ বললেন যে, নিউক্লিয়াসে কেবল প্রোটোন আর নিউট্রোনই থাকে। তরঙ্গবাদ দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে, পরস্পরের মধ্যে যে আকর্ষণী শক্তি আছে, তাইতেই সুস্থির নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব সম্ভব। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ইতালির মাজোরানা এর আরও বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করলেন। এই হল আধুনিকতম মতবাদ। যেহেতু পরমাণবিক নিউক্লিয়াসের আসল অংশ প্রোটোন ও নিউট্রোন, সে জন্য উভয়কে সাধারণ ভাবে নিউক্লিওন নামে অভিহিত করা হয়।

প্রোটোনের মত নিউট্রোনের ভরও পরমাণবিক ভরের স্কেলে প্রায় এককের সমান। সুতরাং A পরমাণবিক ভর এবং Z পরমাণবিক সংখ্যার পরমাণবিক নিউক্লিয়াসে A নিউক্লিওন থাকে; তার মধ্যে Z সংখ্যক প্রোটোন এবং $A-Z$ সংখ্যক নিউট্রোন। A যদি অযুগ্ম হয়, তবে Z হবে Aএর অর্দ্ধাপেক্ষা অর্দ্ধ কম। উদাহরণ-স্বরূপ পরমাণবিক সংখ্যার তালিকার ক্রমিক ভাবে কয়েকটি মৌল নেওয়া যাক।

প্রথম হাইড্রোজেনে $A=1$, $Z=1$, সুতরাং $A-Z=0$; অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে একটি মাত্র প্রোটোন।

দ্বিতীয় হিলিয়ামে $A=4$, $Z=2$, সুতরাং $A-Z=2$; অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে দু'টো প্রোটোন, দু'টো নিউট্রোন।

তৃতীয় লিথিয়ামে $A=7$, $Z=3$, সুতরাং $A-Z=4$; অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে তিনটে প্রোটোন, চারটে নিউট্রোন।

চতুর্থ বেরিলিয়ামে $A=9$, $Z=4$, সুতরাং $A-Z=5$; অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে চারটে প্রোটোন, পাঁচটা নিউট্রোন।

পঞ্চম বোরোনে $A=11$, $Z=5$, সুতরাং $A-Z=6$; অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে পাঁচটা প্রোটোন, ছ'টা নিউট্রোন।

ষষ্ঠ কার্ব্বন $A=12$, $Z=6$, সুতরাং $A-Z=6$; অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে ছ'টা প্রোটোন, ছ'টা নিউট্রোন। ইত্যাদি।

[ক্রমশঃ

মানুষের কবিতা

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

এ ধরায় জন্মিলো যেদিন
নামহীন পথহীন পরিচয়হীন
দিগম্বর আদিম মানব,
সেই ক্ষণে
জন্ম নিলো তার সনে
অনন্তের বিচিত্র কামনা ···
কে বা জানে এ-কামনা ছিলো তাঁর মনে
ছিলো এ ভুবনে
হয়তো অনাদি কাল আগে
তারই-পথ-চাওয়া অনুরাগে।

সুদূর গগন-বিহারিকা
আজি যে জাগিল নীহারিকা
নব সৃজনের মহোৎসব ···
অগ্নিগর্ভ বাষ্পপুঞ্জ মেঘে
আপনার আকর্ষণ-বেগে,
অণুতে অণুতে দীপ্ত অন্ধ ক্ষিপ্ত মিলন-আবেগে
আকাশের বিক্ষুব্ধ বাসনা ···
আজি হতে লক্ষ বর্ষ পরে
তার বনারণ্যে তার পর্বতে প্রান্তরে,
কলস্বনা স্রোতস্বিনী-তীরে
জীবনের কুটীরে কুটীরে
যে আনন্দ মৃত্যু-বন্ধ দলি'
স্বতঃ-ছন্দে উঠিবে উচ্ছলি
নব নব প্রাণের স্বরূপে ;
এ নীহারিকার শিখা গলি' ···
এই আকাশের অন্ধকূপে ···
এর-ই মাঝে আজি চুপে চুপে
অনন্তের রহিল গোপন
আগামী কালের সে-স্বপন।

প্রথম যেদিন এই পৃথিবীর বুকে
জাগিল মানুষরূপে নব-নীহারিকা—
নব সম্ভাবনা ···
নিঃসীম আকাশ ছিলো চেয়ে তারি মুখে॥
অগোচরে তারি ভালে দিল জয়টীকা
অনন্তের মর্মের কামনা,
মর্মান্তিক খুশ,—
বিধাতার চেয়ে বড়ো হবে এ মানুষ।

সাগর সেদিন তারে দেয় নাই পথ,
গতি রুধি' দাঁড়ায়েছে প্রাচীন পর্বত,
পশুযূথ করেছে সন্দেহ—
ভাবিয়াছে বিধাতার প্রতিদ্বন্দ্বী-কেহ !
চারিদিকে বস্তুপিণ্ড দুস্তর বিস্তার
রচেছে বিচিত্র বাধা—যেন প্রতিবাদ ;
শ্রাবণের খর ধার—শীতের তুষার—
নিদাঘে প্রখর রবি ঢালে নাই স্নেহ।
যতো বাধা হইয়াছে জড়ো
ততো তার চিত্ত মথি জেগেছে উন্মাদ
উদ্ধত এ সাধ—
'হতে হবে, হতে হবে মোরে এ সবার—
ইহাদের বিধাতার বড়ো।'

মানুষ গাহিল যবে এই আদি সাম—
সেই ক্ষণে
জন্ম নিল তার মনে
আদিম বিধাতা।
শুনি নিজ গাথা
আপনারে আপনি সে করিল প্রণাম।
উন্মথি' চেতনা তার জাগিল উদ্দাম
নব-সৃষ্টি-কাম সুমহৎ।
যে পৃথিবী আছিল বন্ধুর
অরণ্য-প্রচুর,
রচিলো সে তারি বুকে মানুষের চলিবার পথ—
চলার দিগন্ত ভবিষ্যৎ।
বিধাতার গড়িল মন্দির, আপনার বাঁধিল সে গ্রাম।
স্বয়ম্ভুবা ধরিত্রীরে
নব-সৃষ্টি করিল সে ফিরে ···
আরো পথ, আরো পথ, রচি' আরো পথ
চলিল সে দুরন্ত দুর্বার—
অনন্তের অনন্ত বিস্ময় !
যে-বিধাতা ছিলো হিংস্র, ভয়াল, বর্বর,
তাহারে সে ভালোবেসে করিলো সুন্দর—
অংশ দিয়া আপন আত্মার,
তিলে তিলে জননীর স্নেহে ;
আপন দরদ ভরি দিয়া
তাহারে করিল দরদিয়া—
মরমিয়া মরমের প্রিয় ;
বিধাতারে সৃজিয়া মানুষ বড়ো হোলো বিধাতার চেয়ে।

বিধাতারে 'বিধাতা' বলিয়া মানুষ করিল সম্ভাষণ।
হাতে দিল রাজদণ্ড তার,
নিজে সে দাঁড়ালো যোড়করে ;
রচিল তাহার সিংহাসন
মর্মান্ত ব্যথার কূলে, আপনার মর্মের মর্মরে।
আপন সৃষ্টিরে করি' আপনার চেয়ে মহীয়ান
কে বা জানে কাহারে সে করিল সম্মান—
বিধাতারে কিম্বা আপনারে ;
কেহ জানিল না
কাহারে সে করিল বঞ্চনা
আপনারে কিম্বা বিধাতারে !
আমি দেখি আজ
বিধাতার সিংহাসনে মানুষের আপন প্রতিমা,
দীন, খর্বাকার !
অনন্ত ঐশ্বর্য নাই তার,
আছে তার সমাপ্তি ও সীমা—
তাই সে যে এত অসহায়, তাই তার এত অবিচার,
অন্ধতা ও ব্যর্থতার স্তূপ !
—মানুষেরই কামনা-দুর্বার
পূর্ণতার লাগি',
চেয়েছে ধরিতে যেন বিধাতার অপরূপ রূপ !
মানুষেরই সৃজন-মহিমা
বিধাতার অমরত্বে জাগি'
ঢাকিতে চেয়েছে যেন আপনার মরণের লাজ !

ক্ষীণ, খর্ব, দরিদ্র বিধাতা
সিংহাসন হতে আজ নামি'
তারি কাছে দাঁড়ায়েছে থামি—
পথে যার ধূলিশয্যা পাতা,
ব্যথাতুর আতুর মানুষ !
তার কানে কহিছে সে কথা—
'দূর করো গ্লানি মোর, দূর করো সর্ব অপৌরুষ,
লজ্জা মোর—সকল কলুষ,
মুছে দাও পঙ্কিলতা যুগে যুগে-জমা,—
মাগি আমি আজিকে পূর্ণতা।'

—যেথা কারাগারে
কাঁদে বন্দী শৃঙ্খলের ভারে
লৌহতন্ত্র শাসনের ডোরে,
সেথা গিয়ে কহিছে সে—'করো মোরে ক্ষমা,
মুক্তি মাগি, মুক্তি দাও মোরে।'
—শ্রমক্লান্ত শ্রমিকের দল
যেথা নিত্য-ক্ষুধায় চঞ্চল
দাঁড়ালো সে তাদের দুয়ারে—
পুঞ্জীভূত যেথা আবর্জনা ···
কহিলো সে—'করিয়ো মার্জনা
তোমাদের দীন বিধাতারে, এই শুধু চাই।
হায়,
আমি অতি অসহায়,
নবসৃজনের, বন্ধু, শক্তি মোর নাই,
কোনো কালে ছিলো না তা,
বাঁধিয়াছো মিথ্যার প্রকারে।
কহি সত্য কথা,
পুরানো জগৎ আর অথর্ব বিধাতা
মাগে মুক্তি মাগে সম্পূর্ণতা,
নবীন যৌবন মাগে তোমাদের দ্বারে।'

পূর্ণতার লাগি
অবরুদ্ধ অশ্রুজলে জাগি'
মানুষ জানে না ক্ষুব্ধ রাতে,
একই-ব্যথা বুকে বহি' বিধাতা কাঁদিছে তার সাথে
একান্তে বিরলে।
মানুষ যখন পথ চলে
তার মনে, জীবনে, সৃজনে, চিত্ততলে—
দুঃখে-সুখে, শোকে-প্রেমে, আসক্তি-আঘাতে ;
বঞ্চনা-ব্যাঘাতে,
বিধাতা দাঁড়ায়ে রহে ব্যগ্র কৌতূহলে,
প্রাণে প্রাণে কহে তার হাত রাখি হাতে—
'এই পথ-সমাপ্তি-উৎসবে
আমি পূর্ণ হবো, বন্ধু, তুমি-পূর্ণ হবে।
এই সাধ জাগে মোর সব স্বপ্ন ছেয়ে—
আমি বড়ো হই, যদি তুমি বড়ো হও মোর চেয়ে।'

-আগামী সংখ্যা থেকে-

তখ্ত্-এ-তাউস

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

জেন অস্টিনের

বাহান্ন

চিঠির দৈর্ঘ্য ও আয়তন দেখে এলিজাবেথ এই ভেবে খুসী হোল যে, মাসীমা নিশ্চয়ই তাকে সকল কথা সবিস্তারে জানিয়েছেন। নিরিবিলি গিয়ে বসে এলিজাবেথ চিঠির আদ্যন্ত পড়তে লাগল গভীর মনোযোগ সহকারে।

'কল্যাণীয়াসু—

তোমার চিঠি পেয়ে আমি অবাক হয়েছি, যেমন হয়েছেন তোমার মেসো মশায়। তোমার এ কৌতূহলের অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি। কিসের জন্যে তুমি এমন উতলা হয়েছ জানতে? সত্যি কি এই সমস্ত ঘটনায় তোমার কোন ভূমিকা ছিল? যদি আমরা ভুল করে থাকি, তবে তুমি মনে কোন দুঃখ কোরো না। যাই হোক, তোমার কাছে সবই আমি খুলে লিখছি। লংবোর্ণ থেকে বাড়ীতে ফেরার দিনই ডার্সি এসে উপস্থিত হন আমাদের বাসায়। তোমার মেসো মশায়ের সঙ্গে বেশ কয়েক ঘণ্টা তিনি রুদ্ধদ্বার কক্ষে নিভৃত আলোচনা করেন। আমি পৌঁছবার আগেই সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে যায়, সুতরাং তোমার মত আমি কৌতূহলে মরে যাইনি। তিনি এসে জানান যে, উইকহ্যাম ও লিডিয়ার সন্ধান তিনি পেয়েছেন এবং দু'জনের সঙ্গেই কথাবার্তা কয়েছেন কয়েক বার। আমরা ডার্বিসায়ার পরিত্যাগ করার পরের দিনই তিনি এখানে আসেন তাদের হদিশ বার করার শুভ বুদ্ধিতে। তিনি মনে করেন যে, উইকহ্যামের মত লোক সম্বন্ধে [illegible]

বলেই এত বড় বিপদপাত ঘটা সম্ভব হয়েছে। এর জন্য তিনি যেন নিজেই দায়ী কিছুটা, এমনি ধারণা জন্মেছিল তার। মানুষটির চরিত্র সম্বন্ধে এতেই তুমি কিছু আভাষ পাবে। বিশেষ করে তাঁর হাতে এমন কিছু খবর ছিল, যার সাহায্যে তিনি সকলের আগেই তাদের সন্ধান করতে পেরেছিলেন। ডার্সির বাড়ীতে একটি মহিলা কিছু কাল কাজ করেছিলেন, যাকে পরে ডার্সি চাকরীচ্যুত করেন। সেই মহিলাটি এখানে একটি হোটেল করেছে। উইকহ্যামের সঙ্গে মহিলাটির হৃদ্যতার কথা জানতেন ডার্সি। সুতরাং তার কাছেই প্রথম সংবাদ পান ডার্সি উইকহ্যাম সম্বন্ধে। যাই হোক, দু'-তিন দিনের মধ্যে তিনি উইকহ্যামকে ধরতে পারেন এবং তাকে বাধ্য করান লিডিয়ার সঙ্গে তাঁকে সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে। ডার্সি ভেবেছিলেন যে, লিডিয়াকে বুঝিয়ে তিনি এই পাপ-সঙ্গ পরিত্যাগ করাবেন। কিন্তু লিডিয়া সমাজ-সংসার বাপ-মা আত্মীয়-পরিজন কাউকেই ফিরে পেতে চায়নি উইকহ্যামকে ছেড়ে। সুতরাং বিবাহের দ্বারা এদের সামাজিক বন্ধনে বেঁধে ফেলা ভিন্ন তিনি আর গত্যন্তর দেখতে পাননি। উইকহ্যাম,—তুমি শুনলে অবাক হবে, প্রথমে লিডিয়াকে বিয়ে করতে সম্মত হয়নি, বরং অন্য কোনও ধনী শ্বশুরের সাহায্যে সে আপন ভাগ্য পরিবর্তন করার অভিসন্ধি নিয়ে বসেছিল। যে পরিমাণ দেনা সে করেছিল, তাতে সৈন্যবাহিনীতে ফিরে যাওয়ার কোন উপায়ই তার ছিল না। কিন্তু ডার্সি তাকে ঋণমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লিডিয়াকে বিয়ে করতে রাজী করান। অনেক আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের পর তাকে রাজী করিয়ে ডার্সি এসেছিলেন তোমার মেসো মশায়ের কাছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে। কিন্তু এ কথা তোমায় আমি বলছি এলিজাবেথ যে, মানুষটির সব-কিছুর মধ্যে তাঁর জেদই হোল সর্বাধিক। কোন কিছুই তিনি আর কাউকে দিয়ে করতে দেবেন না। সবই করবেন নিজে। তোমার মেসো মশায় কিছুতেই তাকে টলাতে পারলেন না। শুধু এইমাত্র সর্তে ডার্সি রাজী হয়েছেন যে, ডার্সি যে টাকা এই বাবদ খরচ করবেন, তার কতকাংশ ঋণ হিসাবে থাকবে যা পরে পরিশোধ করলেও চলবে। তোমার চিঠি পেয়ে তোমার মেসো মশায় যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। অন্ততঃ প্রাপ্য প্রশংসাটুকু যাতে ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছয় সে বিষয়ে জানাতে পেরে তিনি যেন হালকা হয়েছেন। ডার্সি যে এ ব্যাপারে কি করেছেন, সে সম্বন্ধে শতমুখে বললেও যেন সব বলা হয় না। ডার্সির আর সব কিছুই আছে, শুধু আর একটু সজীবতা থাকত যদি তাঁর, তবে তিনি হোতেন পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কামনার বস্তু। আমার ধারণা, স্ত্রীর কাছে তিনি তাও পাবেন; যদি তেমন কোন মেয়ে আসে তাঁর জীবনে। কিন্তু এমন চাপা চতুর মানুষ যে, তোমার কথা উল্লেখই করতে চান না। কিন্তু আর নয়। ছেলেমেয়েরা অনেকক্ষণ থেকে তাদের মায়ের জন্য অপেক্ষা করছে।'

চিঠি পড়ে এলিজাবেথের মনের অরণ্যে ঝড়ের দোলা লাগল। হর্ষ কি বিষাদ তা সঠিক যেন উপলব্ধি করতে পারলে না সে প্রথম ঝাপটে। লিডিয়ার লজ্জাজনক ব্যাপারটা নিরুপদ্রব সাবলীলভাবে মিটিয়ে ফেলার জন্য তিনি যথেষ্ট করেছেন এমনি একটা সন্দেহের দ্যোতনায় এত দিন তার মন দোদুল্যমান ছিল, এখন তার নিরসন ঘটল। তিনি স্বেচ্ছায় এত বড় কাজের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন। এই ধরণের জঘন্যতার পিছনে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন কষ্ট স্বীকার [illegible] তিক্ত, বিরক্ত,

তাকেই নানা ভাবে প্রলুব্ধ করে তিনি সুস্থ সামাজিক বোধে জাগ্রত করবার জন্য কি না করেছেন স্বচ্ছন্দে। যে মেয়ে তার অহংকারিতায় কারুরই শ্রদ্ধার পাত্রী হতে পারত না কোন দিন, তাকেই পিছল পথ থেকে টেনে তুলে এনেছেন তিনি। কি জানি কেন, এলিজাবেথের মন বললে, এ সব করেছে ডার্সি তারই জন্যে। কিন্তু সে আশা করবে কি করে সে। উইকহামের ভায়রাভাই হওয়ার মত প্রবৃত্তি কোন দিনই হবে না তার। হতে পারে না। সে ধাতু দিয়ে তিনি গঠিত নন। তিনি তাদের জন্যে অনেক করেছেন। কত তা ভেবে কূল পেল না এলিজাবেথ। কিন্তু কেন তিনি এত সব করলেন, তা বুঝতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল সে। হয়তো নিজের দায়িত্ববোধ থেকেই করেছেন এ সব। হয়তো বা মনের ঔদার্যে। তবু এ কথা না ভেবে পারলে না সে, এলিজাবেথের সেই ক্ষুব্ধ ব্যথিত পাণ্ডুর মুখছবি ডার্সিকে নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত করেছিল তার শুভ কর্মপ্রচেষ্টায়। তাঁর মনের ভার কমাতেই তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। অথচ সে তাকে কত দুঃখ দিয়েছে। কটু শ্লেষোক্তিতায় বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে কত বার দুঃখ দিয়েছে সেই মহান্ মানুষটির মনে। নিজেকে এত হীন মনে হোতে লাগল তার। ভাব সেই অহঙ্কারী মানুষটিকে এত বড়, এত মহৎ!

কার পদক্ষেপের শব্দে এলিজাবেথের তন্দ্রা ছুটে গেল। উঠে নিয়ে পথ ধরবার পূর্বেই তার সামনে যে উপস্থিত হোল সে উইকহাম।

'মাপ করবেন দিদি। আপনার নিরিবিলি বেড়ানোর বিঘ্ন ঘটালাম।'

'তা হোক। ওরা সব কোথায়?'

'মাকে নিয়ে লিডিয়া গেল মেরীটনে। হ্যাঁ দিদি, ইতিমধ্যে আপনারা না কি পেম্বার্লিতে গিয়েছিলেন?'

এলিজাবেথের ঘাড় নাড়ায় উৎসাহিত হয়ে বললে উইকহাম— 'আমার এমন হিংসা হচ্ছে। কত দিন যাইনি আমি। নিজে গিয়ে আপনাদের দেখিয়ে আনতে পারলে কত খুসী হতাম। বুড়ীটা আছে? সে আমার কথা কিছু বললে? ভারী ভালবাসত আমায় বুড়ীটা।'

'বলেছিল বৈ কি?'

'কি বলেছিল?'

'তিনি বললেন, তুমি না কি সৈন্যবাহিনীতে গিয়ে বদ্‌সঙ্গে পড়েছ। লোকে পাঁচ কথা বলে, তারই বা দোষ কি?'

'তাই নাকি'—ঠোঁট কামড়ে বললে উইকহাম। তার পর খানিক ক্ষণ নিঃশব্দে থেকে পুনরায় বললে—'সহরে কয়েক বারই ডার্সির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হল। বুঝলাম না সহরে কি করছে সে?'

'হয়তো নিজের বিয়ের ঘটকালি করছেন।'

'ওর বোনটিকে দেখেছেন? কেমন লাগল তাকে।'

'বেশ ভাল মেয়ে।'

'শুনেছি বছর দুয়েকে অনেক উন্নতি করেছে। ভারী খুসী হলাম যে, তাকে আপনাদেরও ভাল লেগেছে। আর একটু যদি এগিয়ে যেতেন কিম্পটন গ্রামে গিয়ে পৌঁছতেন। সেইখানে নিরিবিলিতে আমি গীর্জার যাজক হব, এই রকমই সব স্থির ছিল। ডার্সি কখনো কি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলেছিল?'

'শুনেছি বৈ কি। আর এ-ও শুনেছি যে, সে সময় যাজকবৃত্তি ঠিক তোমার মুখরোচক ছিল না। এখন যেমন দেখছি। তখন সে সব সম্বন্ধে কোন সর্তেই ত তুমি রাজী হওনি। যাক সে কথা।'

বাড়ীর দরজার কাছেই পৌঁছে গিয়েছিল দু'জনে। এলিজাবেথ এই নূতন মানুষটিকে এতক্ষণ সহ্য করেছিল, কিন্তু এখন তার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সে উন্মুখ হল।

'এসো ভাই। কি দরকার পুরানো কথা তুলে আর আমাদের সম্পর্ককে বিস্বাদ করে তোলার। ভবিষ্যতে সে সব কথা তুমি আর তুলো না। তা'হলেই আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে।'

উইকহাম এই পরম আত্মীয়তায় গদগদ হয়ে পড়ল। নত হয়ে এলিজাবেথের আঙুলে ঠোঁট ছুঁইয়ে সে সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখালে।

তিপ্পান্ন

এই আলাপ-আলোচনায় উইকহাম এত খুশী হোল যে, সে আর কখনো এ প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি করে নিজেকে বিব্রত বা এলিজাবেথকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করত না। এলিজাবেথও খুশী হোল এই দেখে যে, উইকহামের মুখ বন্ধ করে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট বলেছে সে।

উইকহাম ও লিডিয়ার চলে-যাওয়ার দিন আসন্ন হোল। মেয়ে-জামাইকে অন্ততঃ বছর খানেকের মত ছেড়ে থাকতে হবে এই ভাবনায় মা যেন মুশড়ে পড়লেন। সবাই মিলে নিউ ক্যাসেলে যাওয়ার পরিকল্পনায় কোন মতেই সায় দিলেন না স্বামী।

মা বললে মেয়েকে—'না জানি আবার কবে দেখা হবে তোর সঙ্গে?'

—'ভগবান জানেন। হয়তো দু'-তিন বছরের মধ্যেই আর দেখা হবে না।'

—'চিঠি দিস মাঝে মাঝে।'

—'তা দেব। কিন্তু জান তো, বিয়ে হলে চিঠি লেখবার আর বেশী অবসর পাওয়া যায় না। বোনেরা চিঠি লিখতে পারে—ওদের তো বিশেষ কাজ নেই।'

লিডিয়ার চেয়ে উইকহামের বিদায় নেওয়া বেশী আন্তরিক হোল। হাসিমুখে বিদায় নিল সে। অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বললে। অনবদ্য আচরণ উইকহামের!

মেয়ে-জামাই যাত্রা করলে স্বামী পর্যন্ত মন্তব্য করলেন—'ছেলেটি সত্যিই চমৎকার। সুন্দর ব্যবহার। সবার সাথেই প্রিয় আচরণ। ওকে জামাই করে খুবই গর্বিত আমি।'

মেয়ে চলে যাওয়ায় মায়ের কয়েকটা দিন বড়ই বিমর্ষতায় কাটল। কিন্তু এই মন-মরা অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হোল না। নানা সূত্রে প্রচারিত একটি সংবাদে আবার মন নতুন আশায় ভরে উঠল। নেদারফিল্ডে আবার ফিরে আসছে বিংলে। সকল ব্যবস্থা ঠিক রাখবার আদেশ পেয়েছে গৃহরক্ষক। দু'-এক দিনের মধ্যেই এসে পড়বে মনিব। থাকবে কয়েক সপ্তাহ। এ সংবাদ শুনে মায়ের মুখে আর হাসি ধরে না। মা ও মেয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসি বিনিময় করে।

ফিলিপস্-গিন্নীই প্রথম খবরটা আনেন।

—'যাক্, বিংলেরা তা'হলে আসছে। ভালই হোল। এ নিয়ে আমরা যে খুব মাথা ঘামাই তা নয়। জানই তো সে আমাদের কেউ

নয়—ওর মুখ আবার দেখবার জন্য আমি যে খুব উৎকণ্ঠিত ছিলাম তা নয়। তবুও সে যদি নেদারফিল্ডে আসে স্বাগতম্ জানাব তাকে। কি ঘটবে কে বলতে পারে? কিন্তু তাতে আমাদের কি এসে-যায়। আর এ সম্বন্ধে আলোচনা নয়। তুমি ঠিক জান ত ওরা আসছে?'

—'তুমি আমার উপর নির্ভর করতে পার। খুব দেরী হলে বৃহস্পতিবারে আসবে—তা না হলে সম্ভবতঃ বুধবারেই।'

বিংলের আগমন-বার্তা শুনে মায়ের মুখের রং বদলাল। মা ও মেয়ে একত্র হলে মা বললেন মেয়েকে—'বিংলে আসছে শুনে আমি খুশী বা দুঃখিত হইনি। তবে একটা কথা শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে যে, ও একা আসছে। তা'হলে ওর সঙ্গে খুব কমই দেখা-সাক্ষাৎ হবে। নিজের সম্বন্ধে আমি ভয় করি না—ভয় হয় লোকনিন্দার।'

এলিজাবেথ এ কথার যে কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। আজও সে বিশ্বাস করে, বিংলে ভালবাসে জেনকে। বন্ধুর অনুমতি নিয়েই আসছে হয়তো। হয়তো এত সাহস বেড়েছে যে বন্ধুকে আর ভয়ই করে না।'

দিদি মুখে যা-ই বলুক না কেন এবং তার মনোবাসনা যা-ই হোক না কেন, বিংলের আগমন-বার্তা তাকেও যথেষ্ট বিচলিত করে তুলেছে। সহজেই তা অনুমান করা যায়।

—'বিংলে আসা মাত্র তার সঙ্গে দেখা করো'—মা বললেন এলিজাবেথকে।

এক বছর আগে যে প্রসঙ্গ নিয়ে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে আন্তরিক আলোচনা হয়েছিল আবার তা পুনরুত্থাপিত হোল।

স্বামী বললেন—'তা হয় না। গত বছরও তুমি আমাকে তাদের ওখানে যেতে বাধ্য করেছিলে এই আশায় যে, যদি তার সঙ্গে দেখা করি সে নিশ্চয়ই আমার একটি মেয়েকে বিয়ে করবে। কিন্তু সে আশা মিথ্যায় পরিণত হয়েছে। আর আমি এ নির্বোধ ফাঁদে পা দিচ্ছি না।'

বিংলে গ্রামে ফিরলে প্রত্যেক ভদ্রলোকের উচিত তার সঙ্গে দেখা করা—এ কথাটা নানা ভাবে স্বামীর নিকট পেশ করলেন স্ত্রী।

—'এই সব গায়ে-পড়া ভদ্রতা আমি ঘৃণা করি'—উষ্মা প্রকাশ করেন স্বামী—'সে যদি আমাদের সাহচর্য চায় খুঁজে নিতে দাও তাকে। সে ভাল ভাবেই জানে কোথায় আমরা থাকি। প্রতিবেশী কেউ চলে গেলে এবং ফিরে এলে প্রতিবারই তাদের পিছন পিছন ধাওয়া করে সময় নষ্ট করতে রাজী নই আমি।'

—'তা আমি জানি। আমি বুঝি, সে এলে তার সঙ্গে দেখা না করাটা অভদ্রতা হবে। যাই হোক, তুমি দেখা না করলেও তাকে এখানে নিমন্ত্রণ করতে আমার আটকাবে না। সে সব আমি ঠিক করে ফেলেছি।'

জেন আর এলিজাবেথ একান্ত হয়।

জেন বলে এলিজাবেথকে:—'ওর আসাতে আমি দুঃখিতই। কি লাভ হবে এসে? ওর উদাসীন আচরণ আমার চোখের সামনে ভাসছে। কিন্তু সবাই সর্বক্ষণ আমার সামনে বলবে সে কথা এ একেবারে অসহ্য। মায়ের উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু তিনি জানেন না—কেউ-ই জানে না—আমি কত দুঃখ পাই যখন তিনি ঐ সব কথা বলেন। ও নেদারফিল্ড থেকে চলে গেলে আমি সুখী হই।'

বিংলে যথাসময়ে নেদারফিল্ডে এসে উপস্থিত হোল। মা চাকর বাকর মারফৎ প্রথম সুযোগেই সে সংবাদ আহরণ করলেন। নিম ন্ত্রণের আগে তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। কিন্তু তাদের আগমনের তৃতীয় দিবসে তিনি ড্রেসিং-রুমের জানলা থেকে দেখতে পেলেন, বিংলের গাড়ী তাঁর বাড়ীরই প্রাঙ্গণে প্রবেশ করছে।

মেয়েদেরকে সে-আনন্দ পরিবেশন করলেন। জেন স্থির-সংকল্প নিয়েই বসে রইল নিজের আসনে। কিন্তু এলিজাবেথ মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এগিয়ে গেল জানলার কাছে। ডার্সিও আছে বিংলের সাথে। সে এসে আবার আসন নিল দিদির পাশে।

কিটি বলল—'বিংলের সঙ্গে আর এক জন ভদ্রলোক আছেন। কে তিনি?'

—'কোন বন্ধু হবে হয়তো। আমি ঠিক জানি না।'

—বিংলের সঙ্গে আগে যে বন্ধুটি থাকত তার মতই দেখাচ্ছে। কি যেন নামটা। লম্বা আর খুব দেমাকী।'

—'ওঃ, ডার্সি। বেশ তো—বিংলের যে-কোন বন্ধুও এ-বাড়ীতে স্বাগতম্। তবুও লোকটাকে দেখলেই আমার গা রী-রী করে।'

জেন বিস্ময় ও উৎকণ্ঠায় দৃষ্টি মেলে ধরল এলিজাবেথের দিকে। ডার্বিসায়ারে ডার্সির সঙ্গে এলিজাবেথের দেখা-সাক্ষাতের কোন খবরই জানে না সে। কাজেই মাসীর কাছ থেকে ঐ অর্থপূর্ণ চিঠি পাওয়ার পর প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তে এলিজাবেথ যে খুব অপ্রতিভ বোধ করবে সন্দেহ নেই। দু'টি বোনই অসুখী বোধ করে। উভয়েরই উভয়ের জন্য সমবেদনা হয়। মা অনর্গল বকে চলেন—ডার্সিকে তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। বিংলের বন্ধু বলেই কেবল তিনি তার প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করবেন না।

কিন্তু এলিজাবেথের দুশ্চিন্তার কারণ জেনের সন্দেহের অতীত। দিদিকে সে মাসির চিঠিও দেখায়নি—ডার্সির ভাবান্তরের কথাও বলেনি। সে সাহসও হয়নি তার। জেনের কাছে ডার্সি এমন জন, যার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে এলিজাবেথ—যার গুণপনার সঠিক মর্যাদা দেয়নি সে। তবে লিডিয়ার বিয়ের ব্যাপারে সমগ্র পরিবার তার নিকট ঋণী। কিন্তু বিংলের সাথে ডার্সির নেদারফিল্ড ও লংবোর্ণে স্বেচ্ছায় আসা ডার্বিসায়ারে প্রথম বিপরীত আচরণের মতই বিস্ময়কর ঠেকল এলিজাবেথের কাছে।

তার ফ্যাকাশে মুখ আধ মিনিট যেতে না যেতেই আবার আরক্ত হয়ে উঠল—চোখে ঠিকরে পড়তে লাগল আনন্দের আলোক। বিশেষ যখন সে ভাবল তার প্রতি ডার্সির শুভেচ্ছা ও ভালবাসার বনিয়াদ একটুও চিড় খায়নি কোথাও। বললে সে মনে মনে—'আগে দেখাই যাক না, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়—আশা-নিরাশার কথা পরে ভাবা যাবে।'

সে গভীর মনঃসংযোগে কাজে তন্ময় হয়ে রইল—যেন তার মনের ভারকেন্দ্র একটুও টলেনি। চোখ তুলতে সাহস হচ্ছিল না কিন্তু শেষ পর্যন্ত উৎকণ্ঠিত, কৌতূহল-তাড়িত চোখ দু'টি তুলে ধরল দিদির দিকে। পরিচারিকা দ্রুত দ্বারবর্তিনী হচ্ছে। দিদির মুখ স্বাভাবিকের চেয়েও একটু ফ্যাকাশে। কিন্তু এলিজাবেথ যা ভেবেছিল তার চেয়ে ঢের বেশী গম্ভীর দেখাচ্ছিল জেনকে। বিংলের আগমন সংবাদে জেনের আরক্ত আননে রঙের জোয়ার।

খুব কমই কথা বলল এলিজাবেথ। একবার মাত্র সে সাহস সঞ্চয় করে তাকিয়েছিল ডার্সির দিকে। ডার্সিকে যথারীতি গম্ভীর

দেখাচ্ছিল। হয়তো মা'র সামনে স্বাভাবিক আচরণ করতে পারছিল না। বেদনাদায়ক হলেও অসম্ভব নয় এ চিন্তা।

বিংলের দিকেও তেমনি মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিপাত করল এলিজাবেথ। তাকেও খুসী ও বিব্রত দেখাচ্ছে। মা তাকে এমন সৌজন্যাতিশয্যে আপ্যায়িত করতে লাগলেন যে, বোন দু'টি লজ্জা বোধ করতে লাগল। বিশেষ করে ডার্সির প্রতি যখন শুধু রীতি-মাফিক নিরুত্তাপ সৌজন্য প্রকাশ করা হোল মাত্র।

এলিজাবেথ তো ভাল করেই জানে যে, এই মানুষটির সুবাতেই লিডিয়া দুরপনেয় কলংকের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে। কাজেই এই তুলনামূলক কুৎসিত আচরণে সে অত্যন্ত বেদনা বোধ করতে লাগল।

মেসো-মাসীর কুশল-বার্তা প্রশ্নের পর ডার্সি মুখে একেবারে চাবী বন্ধ করে বসে রইল। কিন্তু এই একটি মাত্র প্রশ্নে এলিজাবেথের চিন্তাধারায় বিপ্লব উপস্থিত হল। ডার্সি এলিজাবেথের পাশে বসে নেই—এইটাই হয়তো তার নীরবতার কারণ। কিন্তু ডার্বিসায়ারে এ রকম ঘটত না কখনো। সেখানে তার সঙ্গে কথা বলতে না পারলেও এলিজাবেথের বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করার বাধা হোত না তার। আর এখন অনেকগুলি মুহূর্ত কেটে গেলেও তার মুখ দিয়ে একটি শব্দও নিঃসৃত হল না। কিন্তু এলিজাবেথ কৌতূহল দমন করতে না পেরে যখনই তাকাচ্ছিল ডার্সির দিকে তখনই দেখতে পাচ্ছিল, ডার্সি হয়তো তার দিকে নয় তো জেনের দিকে চেয়ে আছে নীরব দৃষ্টিতে। কখনও বা শুধু মাটির দিকেই চেয়ে আছে অনন্যচিত্ত হয়ে। দুশ্চিন্তার চেয়ে গাম্ভীর্যই প্রকটিত তার মুখে। এতে যেমন হতাশ তেমনি ক্ষুব্ধ হল এলিজাবেথ।

কেন এল সে?

ডার্সি ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই কথা বলার ইচ্ছা নেই এলিজাবেথের। কিন্তু ডার্সির সঙ্গে কথা বলার সাহসও নেই তার।

ডার্সিকে সে তার বোনের কথা জিজ্ঞেসা করল কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

—'অনেক দিন পরে আবার তোমরা ফিরলে এখানে'—মা বললেন বিংলেকে।

বিংলে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

—'আমি তো ভাবতে সুরু করেছিলাম তোমরা আর ফিরবেই না। লোকেও বলাবলি করত তোমরা এ জায়গাটা চিরকালের মতই ছেড়ে দিচ্ছ। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল—তুমি ফিরবেই। তোমাদের যাওয়ার পর এখানে অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে। শার্লটির বিয়ে হয়েছে—সে আপন সংসার পেতে বসেছে। আমার নিজের একটি মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেছে। শুনেছ নিশ্চয়ই—কাগজেও দেখে থাকবে। যদিও যেমন ভাবে লেখা উচিত ছিল তেমন হয়নি। তুমি দেখেছ কি?'

বিংলে উত্তর দিল, দেখেছে সে এবং অভিনন্দন জানাল তাঁকে। এলিজাবেথ চোখ তুলে তাকাতে সাহস পেলে না—কাজেই ডার্সির মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করার সুযোগও হোল না তার।

—'মেয়ের বিয়ে দিতে পারা খুবই আনন্দের।'—মা বলে যেতে লাগলেন—'কিন্তু মেয়ে দূরে চলে যাওয়া ভারী কষ্টের। ওরা নিউ ক্যাসেলে গেছে—কত দিন থাকবে সেখানে কে জানে। উইকহ্যামের রেজিমেণ্ট এখন সেইখানে। শুনেছ তো সে স্থায়ী ভাবে বহাল হয়েছে সেনাদলে?'

এলিজাবেথ জানে এ-ও ডার্সির সৌজন্যে সম্ভবপর হয়েছে। কাজেই সে এত লজ্জা বোধ করতে লাগল যে সেখানে বসে থাকা দুরূহ হয়ে উঠল তার পক্ষে। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে কথা বলতে বাধ্য হোল সে। এলিজাবেথ জিজ্ঞাসা করল বিংলেকে, এখন সে এখানে থাকা মনস্থ করেছে কি না।

হ্যাঁ, কয়েক সপ্তাহ থাকবে বলেই স্থির করেছে।

—'তোমার ওদিকের শিকার-পর্ব শেষ হলে আমাদের এদিকে এস।' মা বললেন বিংলেকে—'উনি এতে খুসীই হবেন।'

মায়ের এই অনাবশ্যক হৃদ্যতা প্রকাশ লজ্জা দিল এলিজাবেথকে। বিংলেরা যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। মিসেস্ বেনেট তাদের খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালেন। বললেন—'তোমার কাছে একটা খাওয়া পাওনা আছে আমার। গত শীতে সহরে চলে যাওয়ার সময় ফিরে এসে সবাইকে এক দিন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে। আমি সে কথা ভুলিনি দেখলে তো। কিন্তু তুমি ফিরে এলে না বলে দুঃখ পেয়েছিলাম।'

এই মন্তব্যে বিংলে একটু অপ্রস্তুত হোল। কার্যব্যপদেশে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, বললে সে। এই বলে বিদায় নিল তারা।

তাদের থাকতে বলতে ও খেয়ে যাওয়ার অনুরোধ করতে ভারী ইচ্ছা হচ্ছিল মায়ের। কিন্তু দশ হাজারী আয়ের লোককে আপ্যায়ন করার মত আহার্যের ব্যবস্থা করা হয়তো কঠিন হবে। বিশেষ যার সম্বন্ধে তাঁর গোপন পরিকল্পনা রয়েছে মনে।

চুয়ান্ন

অতিথিরা চলে যাবার পর এলিজাবেথ নিজের মনকে নিয়ে নির্জনে বসল। আজ ডার্সির আচরণ তাকে বিস্মিত করেছিল।

—'ও কি এখানে মুখ বুঁজে বসে থাকতে এসেছে? এ সবের মানে কি?'

নানা দিক থেকে বিচার করেও এলিজাবেথ খুশী হওয়ার মত কোন সদুত্তর খুঁজে পেলো না।

—'সহরে মেসো-মাসীর প্রতি কী স্নিগ্ধ অমায়িক ব্যবহার তার! আমার প্রতিই শুধু বিরূপ? আমায় যদি ও ভয় করে তবে এলো কেন এখানে? আমাকে যদি আর না চায়, কেন এই নৈঃশব্দ? ওর সম্বন্ধে আর ভাবব না।'

এলিজাবেথের ভাবনায় ছেদ পড়ল জেনের আবির্ভাবে।

দিদির মুখ-চোখে খুশীর ঝলমলানি। স্পষ্ট বোঝা যায়, সে খুশী হয়েছে অতিথিদের আচরণে।

বললে জেন—'প্রথম সাক্ষাতের বিড়ম্বনার পালা শেষ হোল। আমি দিব্যি সহজ বোধ করছি। বিংলে এলে আর বিব্রত করতে পারবে না আমাকে। মঙ্গলবার ও যে খাবে এখানে তাতে খুশীই আমি। এবার এটা সবাই বুঝতে পারবে যে, নির্লিপ্ত মন নিয়েই সাধারণ বন্ধু হিসেবে মিলিত হচ্ছি আমরা।'

—'নির্লিপ্তই বটে'—হাসতে হাসতে বললে এলিজাবেথ—'তোকে সাবধান করে দিচ্ছি।'

—'আমাকে অত দুর্বল মনে করিস নে যে আবার বিপদে পড়ব।'

—'আমার ধারণা, আগের মতই তার প্রেমে হাবুডুবু খাবার বিপদ তোর আসন্ন।'

মঙ্গলবারের আগে আর অতিথিদের সঙ্গে দেখা হোল না। মা তাঁর সুখ-পরিকল্পনা নিয়ে মশগুল।

মঙ্গলবার লংবোর্ণে এক বিরাট পার্টির আয়োজন হোল। যে দু'জন অতিথি বহু আকাঙ্ক্ষিত, তারাও যথাসময়ে এলো। খাবার-ঘরে সমবেত হোলে বিংলে গত দিনের মত দিদির পাশে আসন নেয় কি না এলিজাবেথ তা সাগ্রহে লক্ষ্য করতে লাগল। বুদ্ধিমতী মা-ও ঐ একই চিন্তা চালিত হয়ে তাকে নিজের পাশে বসতে আহ্বান জানালেন না। ঘরে ঢুকেই বিংলে যেন একটু দ্বিধা প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু জেন তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসতেই সে নিমেষে কর্তব্য স্থির করে ফেলল। বিংলে গিয়ে বসল জেনের পাশেই। এলিজাবেথ বিজয়িনীর দৃষ্টিতে তাকাল ডার্সির দিকে—সে যেন মহান্ ঔদাসীন্যের সঙ্গেই মেনে নিয়েছে এ ব্যবস্থা।

আহারের সময় দিদির প্রতি বিংলের কিছুটা সতর্ক হোলেও বিমুগ্ধ আচরণ দেখে এলিজাবেথ এই সিদ্ধান্তই করল যে, ওদের দু'টিকে একলাটি হবার সুযোগ দিলে অচির ভবিষ্যতেই তাদের এত দিনের আশা-আকাংখার নিরসন ঘটবে। ডার্সি আর নিজের মধ্যে মাত্র টেবিলের ব্যবধান। সে বসেছে মায়ের এক পাশে। এলিজাবেথ জানে এ পরিস্থিতি দু'জনের কারুর পক্ষেই সুবিধাজনক বা প্রীতিদায়ক নয়। ডার্সি আর মায়ের মধ্যে কদাচিৎ কথার আদান-প্রদান হচ্ছে এবং যখন হচ্ছে তাও অতি নিরুত্তাপ ও আন্তরিকতাহীন ভাবেই। এলিজাবেথ এত দূরে যে, ওদের দু'জনের কথাবার্তার ছিটেফোঁটাও তার কানে যাচ্ছে না।

মায়ের এই অনুদার আচরণে এলিজাবেথ বেদনা বোধ করতে লাগল—বিশেষ যখন সে এ পরিবারের প্রতি ডার্সির ঋণের কথা ভাবছিল। তার দয়ার কথা যে অজ্ঞাত নয়—এর জন্য যে তারা সবাই কৃতজ্ঞ তার কাছে, এটা জানানোর সুযোগ পেতে তীব্র ইচ্ছা হতে লাগল তার।

আজকে সন্ধ্যায় দু'জনের মুখোমুখি হবার সুযোগ নিশ্চয়ই মিলবে—নিছক নমস্কার প্রতি-নমস্কারের প্রাণহীন অনুষ্ঠানের বদলে কথা বলার একটা ফাঁক পাবেই সে। অতিথি দু'জনের আগমনের বহু পূর্বে যে দুশ্চিন্তার মুহূর্ত অতিক্রান্ত হয়েছে তা এই ব্যাকুল প্রতীক্ষাকে এতই বিরক্তিকর করে তুলেছে যে, এলিজাবেথের ভদ্রতা বোধটুকু পর্যন্ত লোপ পাবার উপক্রম হয়েছিল। কাজেই অতিথিদের আগমন এমন একটি ব্যাপার যার উপর আজকের সন্ধ্যার আনন্দ নির্ভর করছে।

—'আজ যদি ও আমায় এড়িয়ে চলে ওর আশা আমি চিরকালের মতই বিসর্জন দেব'—বললে এলিজাবেথ।

অতিথিরা এলো শেষ পর্যন্ত। ডার্সিকে দেখে আশা পূরিত হবে মনে হোল এলিজাবেথের। কিন্তু মেয়েরা টেবিলের চারি দিকে এমন দঙ্গল বেঁধে রয়েছে যে, সেখানে একটা চেয়ার পাতবারও জায়গা হবে না।

ডার্সি ঘরে ঢুকে অপর প্রান্তে চলে গেল। এলিজাবেথের আকুল চোখ দু'টিও তাকে অনুসরণ করতে লাগল। ডার্সি যাদের সঙ্গে কথা বলল তাদের প্রত্যেকের প্রতি ঈর্ষা হতে লাগল। কাউকে কফি পরিবেশনের ধৈর্য নেই। কিন্তু নিজের এই অভদ্র আচরণের জন্য নিজের প্রতি রাগও হতে লাগল তার।

—'এই লোকটিকে একবার সে ফিরিয়ে দিয়েছিল। কেমন করে তার কাছ থেকে প্রেম-নিবেদন প্রত্যাশা করবে। একই নারীর কাছে দ্বিতীয় বার ভালবাসার প্রস্তাবের মত দুর্বলতার বিরুদ্ধে সকল পুরুষই প্রতিবাদ করবে। এর চেয়ে ঘৃণিত আত্মাবমাননা আর কি হতে পারে!'

ডার্সি নিজে নিজের কফি-পেয়ালা নিতে আসায় এলিজাবেথের মনে আশা হোল। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বললে সে—'বোনটি কোথায়? পেমবার্লিতে?'

—'ক্রিষ্টমাস পর্যন্ত থাকবে সেখানে।'

—'একা রয়েছে?'

—'না, গভর্নেস আছে। আর সবাই সপ্তাহ খানেক আগেই চলে গেছে।'

কিন্তু এর পর আর কি বলবে ভেবে পেলো না এলিজাবেথ। ডার্সি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল পাশে। শেষ পর্যন্ত মেয়েরা ফিসফিসানি সুরু করায় সে সরে গেল সেখান থেকে।

চায়ের পর্ব শেষে তাসের পাটে বসলে মেয়েরা একে একে সবাই গাত্রোত্থান করতে লাগল। এবার ডার্সির সঙ্গে মিলিত হবার আশা করল এলিজাবেথ। কিন্তু মায়ের খপ্পরে পড়ে ডার্সিকে তাসের টেবিলে বসতে দেখে এলিজাবেথের সকল আশা ধূলিসাং হয়ে গেল। মুহূর্তে সকল আনন্দ বোধও তিরোহিত হোল। আজকের সন্ধ্যার মত সকল আশা নির্মূল!

বিশেষ করে ঐ দু'টি অতিথিকে রাত্রে খেয়ে যাবার জন্য আটকে রাখার ফন্দী আঁটছিলেন মা। কিন্তু তারাই সবার আগে গাড়ী প্রস্তুত করতে আদেশ দিল। মনের কথা বলার সুযোগই পেলেন না তিনি।

আজকের বিলি-ব্যবস্থায় আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই। জেনের প্রতি বিংলের আচরণ লক্ষ্য করেছেন তিনি। তাকে যে জামাই করতে পারবেন এ বিষয়ে আর সংশয় নেই। কিন্তু পরদিন বিংলেকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসতে না দেখে নিরাশই হোলেন তিনি।

—'আজকের দিনটা বেশ আনন্দে কাটল। মাঝে মাঝে এ রকম আয়োজন করলে মন্দ হয় না'—বললে জেন।

এলিজাবেথ উত্তরে শুধু হাসল।

—'দেখ, লিজি, তোর ঐ হাসি আমি বুঝতে পারি না। আমাকে তুই সন্দেহ করিস। এতে আমি দুঃখু পাই। বিংলের সম্বন্ধে আর আদৌ আমার কোন গোপন ইচ্ছা নেই।'

—'তুই বড় নিষ্ঠুর। আমাকে হাসতেও দিবি না অথচ হাসির কারণ ঘটাচ্ছিস অনবরত।'

—'আচ্ছা, আমি যা নই তাই আমাকে স্বীকার করাতে তুই এত কোমর বেঁধেছিস্ কেন, বল্ তো।'

—'এ কথার জবাবে কি বলব জানি না। আমরা সবাই উপদেশ দিতে ভালবাসি। তুই যদি উদাসিনী হয়ে থাকতে চাস তবে তোর গোপন কথা বলিস না আমায়।'

পঞ্চান্ন

এই সাক্ষাতের কয়েক দিন পরে বিংলে আবার দেখা করতে এলো এবং এলো একলাই। তার বন্ধু সেই দিনই চলে গেছে। দশ দিন

বাদে আবার ফিরে আসার কথা। এক ঘণ্টা বিংলে বেনেট-পরিবারে কাটাল। বেশ উৎফুল্লই দেখাচ্ছিল তাকে। মা খেয়ে যেতে অনুরোধ করলেন কিন্তু বিংলে দুঃখ প্রকাশ করে জানাল যে, আগেই স্থানান্তরে কথা দিয়ে ফেলেছে সে।

মা বললেন—'এর পর তুমি আবার যেদিন আসবে ভাগ্য নিশ্চয়ই সেদিন প্রসন্না হবেন আমাদের প্রতি।'

এ বাড়ীতে যে কোন সময়ে আসতে পারলে খুশীই হবে সে। যেদিন মা বলবেন সেই দিনই আসবে—জানালে বিংলে।

—'কাল এসো না কেন।'

—'ঠিক আসব। কাল আর কোথাও যাবার নেই।'

—'সবাই ভারী খুশী হোল বিংলের এই স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে।

পরদিন বিংলে এলো এবং এলো এত সকাল সকাল যে মেয়েরা সাজগোজ করবার অবসর পর্যন্ত পেলো না। মা ছুটে গেলেন মেয়েদের সাজবার ঘরে। নিজের কেশ-প্রসাধনও অসমাপ্ত রয়েছে।

—'তাড়াতাড়ি নে মা জেন। বিংলে এসে গেছে'—পরিচারিকাকে তাড়া দিলেন মেয়েকে সাহায্য করতে।

—'আমরা এখুনি যাচ্ছি'—বললে জেন—'কিটির তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আধ ঘণ্টা হোল সে উপরে গেছে।'

—'কিটি চুলোয় যাক। কিটি কি করবে? তুই তাড়াতাড়ি কর।'

মা চলে গেলে জেন কিন্তু বোনেদের এক জন কাউকে সঙ্গে না নিয়ে কিছুতেই নীচে যেতে রাজী হোল না।

দু'টিকে কি করে একলা করে দেবেন এ দুশ্চিন্তা আবার অধীর করে মাকে। চা-পানের পর বাবা চিরদিনের স্বভাব মত নিজের পাঠাগারে আত্মমগ্ন হোলেন—মেরী উঠল দোতলায় সুর-সাধনায়। পাঁচ জনের মধ্যে দু'জনের বাধা অপসারিত হোল। মা বসে বসে ক্যাথারিন আর এলিজাবেথের দিকে চেয়ে অনেক বার চোখ টিপলেন। এলিজাবেথ মায়ের ইসারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। আর কিটি শেষ পর্যন্ত যদি বা বুঝতে পারলে, বোকার মত প্রশ্ন করে বসল।

—'আমার দিকে চেয়ে অমন চোখ টিপছ কেন, মা। আমায় কি কিছু বলছ?'

—'কিছু না বাছা—কিছু না। তোমার দিকে চেয়ে আমি চোখ টিপব কেন?'

আরো পাঁচ মিনিট তিনি চুপচাপ বসে রইলেন। কিন্তু অমূল্য মুহূর্তগুলি আর তো কোন মতেই বৃথা নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। হঠাৎ তিনি উঠে কিটিকে ডেকে বললেন—'এদিকে এসো তো মা! কথা আছে'—বলে তাকে নিয়ে ঘর থেকে চলে গেলেন। জেন তক্ষুনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল এলিজাবেথের দিকে—আসন্ন পরিণতির কথা ভেবে বেদনাতুর দৃষ্টিতে নীরব ভাষায় তাকে চলে না যাওয়ার জন্য মিনতি জানাতে লাগল।

কয়েক মিনিট পরে মা আবার দরজা খুলে এলিজাবেথকে ডাকলেন—'মা লিজি, একটা কথা শুনে যাও তো মা!'

এলিজাবেথকেও যেতে হোল শেষ পর্যন্ত।

—'ওদের দু'জনকে একটু একলা হতে দাও'—হল-ঘরে আসতেই মা বললেন মেয়েকে—'কিটি আর আমি উপরে আছি।'

এলিজাবেথ মায়ের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হোল না। মা ও কিটি যতক্ষণ না উপরে গেল বসে রইল হল-ঘরে—তার পরে আবার ফিরে এলো ড্রয়িংরুমে।

মায়ের আজকের সমস্ত পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোল। তাঁর মেয়েকে প্রেম-নিবেদন ছাড়া আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিংলের আচরণ হয়েছে অনুপম। তার সহজ প্রীতি, প্রসন্ন আচরণ আজকের সান্ধ্য পার্টিতে এনেছে আনন্দশ্রী। মায়ের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ইংগিত, মন্তব্য সব কিছুই এমন স্নিগ্ধ ঔদার্য ও হাসিমুখে গ্রহণ করেছে সে যে, জেন তার জন্য কৃতজ্ঞ।

এর পর রাত্রে খেয়ে যেতে বলার আর কোন অর্থই হয় না। তবে বিংলে যাওয়ার আগে বিশেষ করে নিজের থেকেই আগামী কাল সকালে মিঃ বেনেটের সঙ্গে পাখী শিকারের ব্যবস্থা পাকাপাকি করে গেল।

বিংলে সম্বন্ধে এলিজাবেথ আর জেনের মধ্যে একটি কথাও কানাকানি হয়নি এ পর্যন্ত। কিন্তু এলিজাবেথ শুতে গেল এ সুখ-চিন্তা নিয়ে যে, সব কিছুই দ্রুত পরিসমাপ্তি নেবে—অবশ্য ডার্সি যদি তার কথা মত নির্দিষ্ট দিনে ফিরে আসে। তবে যা যা ঘটেছে তা যে ডার্সির সম্মতিক্রমেই, এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইল না এলিজাবেথের।

নির্দিষ্ট সময়ে বিংলে আসরে এসে উপস্থিত হোল। সকালটা কাটল মিঃ বেনেটের সঙ্গে। মিঃ বেনেটের আজকের আচরণ অপ্রত্যাশিত মধুর। বিংলে ডীনার খেলে বেনেট-পরিবারের সঙ্গেই। বিকেলে পরিকল্পনা মত জেন আর তাকে একলা হবার সুযোগ দিয়ে সবাইকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোল। এলিজাবেথের একখানা চিঠি লেখার ছিল—সে চায়ের শেষে বিদায় নিল। অন্যেরা বসল তাসের পাট নিয়ে।

চিঠি শেষ করে এলিজাবেথ ড্রয়িংরুমে ফিরে এসে লক্ষ্য করল, মা তার কৌশল-জাল বিস্তার করেছেন অতি সুনিপুণ হাতে। দরজা খুলে দেখল, দিদি আর বিংলে অগ্নিকুণ্ডের ধারে গভীর আলাপে নিমগ্ন। এলিজাবেথ ঘরে ঢুকতেই ওরা কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল—সরে এল দু'জনে দু'জনের কাছ থেকে। দু'জনের কারুর মুখেই আর বাক্যস্ফূট হোল না। এলিজাবেথ চলে যাবার উপক্রম করতেই বিংলে জেনের কানে ফিসফিস করে কি বলে দ্রুত পালাল ঘর থেকে।

এলিজাবেথের কাছ থেকে জেনের গোপনীয় নেই কিছুই আর এখন গোপন কথা বলাতেই আনন্দ। গভীর আবেগে বোনকে জড়িয়ে ধরে জেন বলল—'আজকে আমার মত সুখী আর কেউ নেই পৃথিবীতে। এ আশাতীত। আমি এর যোগ্য নই।'

এলিজাবেথ আজ বোনের কাছে মনের দরজা সবটা খুলে দিলে। এলিজাবেথের প্রতিটি কথা নতুন সুখানুভূতিতে আপ্লুত করতে লাগল তাকে। কিন্তু এখন এলিজাবেথের সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকতে রাজী নয় জেন—অর্ধসমাপ্ত রাখতেও চায় না সে কোন কথা।

—'এক্ষুনি মা'র কাছে যেতে হবে'—বললে জেন—'এ সুখ-সংবাদ অন্যের মুখে শুনতে দেব না তাঁকে। বিংলে বাবার কাছে গেছে।'

জেন মায়ের কাছে গেল। মা তখন তাসের পাট তুলে ওপরে কিটির সঙ্গে গল্প করছিলেন।

এলিজাবেথ একলাটি ভাবতে বসে।

যে ঘটনা বিগত কয়েকটি দিন সবার দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল, এত তাড়াতাড়ি তার এই সুখ-পরিণতিতে এলিজাবেথের মুখে হাসির দীপ্তি দেখা দিল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ফিরে এলো বিংলে। বাবার সঙ্গে তার আলোচনা সংক্ষিপ্ত ও যথাবিহিত হয়েছে।

—'তোমার দিদিটি কোথায় ?'—দরজা খুলেই প্রশ্ন করল বিংলে।

—'ওপরে গেছে মা'র কাছে। এক্ষুনি এসে পড়বে'—

বিংলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এলিজাবেথের কাছে এসে তার প্রীতি ও শুভেচ্ছা যাচ্ঞা করল। অদূর ভবিষ্যতে আত্মীয়তার রাখিবন্ধনের শুভ সম্ভাবনায় উচ্ছ্বসিত আনন্দ প্রকাশ করল এলিজাবেথ। করমর্দনান্তে আসন নিল বিংলে। যতক্ষণ না জেন এলো ফিরে ততক্ষণ এলিজাবেথকেই তার কলকাকলি আর দিদির স্তুতিবাদ শুনতে হোল বসে বসে।

আজকের সন্ধ্যা এলো অফুরন্ত আনন্দের ডালি নিয়ে। পরিপূর্ণ সুখের তৃপ্তি জেনের মুখে এমন একটা স্নিগ্ধ-মধুর আলোয় ভরে তুলল যে, তার সৌন্দর্য যেন সহস্র দলে বিকশিত হয়ে উঠল। মিসেস্ বেনেট এত অভিভূত হয়ে পড়েছেন যে, সম্মতিদানের কথা ভুলেই গেলেন। আধ ঘণ্টা তিনি শুধু আজেবাজেই বকে গেলেন বিংলের সঙ্গে। রাত্রে আহারের সময় মিঃ বেনেটের কথায়ও মনের গভীর সুখই বিচ্ছুরিত হতে লাগল।

বিংলে বিদায় না নেওয়া অবধি তিনি অবশ্য এ সম্বন্ধে কোন ইংগিত করেননি। সে চলে গেলে তিনি বললেন মেয়েকে—'আমার অভিনন্দন, মা জেন। জীবনে তুমি সুখী হবে।' জেন তৎক্ষণাৎ বাবার কাছে গিয়ে তাঁকে চুম্বন করল।

—'তুমি খুব সুশীলা মেয়ে'—বললেন বাবা—'এই ভাবে জীবনে স্থিতি হওয়ায় আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে। তোমার দিন যে সুখে কাটবে সে-সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। তোমার মেজাজ শান্ত—ধীর-স্থির তুমি। তোমরা দু'জনেই এত সরল আর উদার যে, চাকর-বাকরেরা ঠকাবে তোমাদের—আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী করবে তোমরা।'

—'আশা করি তা হবে না। টাকা-কড়ির ব্যাপারে অপরিণামদর্শিতা অমার্জনীয় অপরাধ হবে আমার পক্ষে।'

—'কি যে বল, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী করবে ? ওদের বছরে আয় চার-পাঁচ হাজারেরও বেশী।' এর পর মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'জেন মা, আমি এত খুশী হয়েছি যে সারা রাত হয়ত চোখে ঘুমই আসবে না। আমি জানতুম কি হবে। এ হতেই হবে। তোর এত সৌন্দর্য বৃথা যেতে পারে না। গত বছরই ওকে যখন হার্টফোর্ডশায়ারে দেখি তখনই মনে হয়েছে তোদের দু'টিকে জোড়ে দেখতে পাব। বিংলের মত সুন্দর ছেলে দেখা যায় না।'

আজকের এই আনন্দ-মুহূর্তে উইকহামের কথা সবাই বিস্মৃত হোল। জেনের সঙ্গে কারুরই তুলনা হয় না।

এর পর থেকে বিংলে এ বাড়ীতে নিত্য অতিথি। আসত প্রাতরাশের আগে আর থাকত রাতের আহার পর্যন্ত। যদি না কোন বর্বর প্রতিবেশী আহারে নিমন্ত্রণ করত তাকে এবং সে-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে বাধ্য হোত সে।

দিদির সঙ্গে এলিজাবেথের স্বল্পই কথা হয়—বিংলে থাকলে আর কারুর প্রতি মনোযোগ দেবার অবসরই বা কোথায়! কিন্তু সাময়িক বিচ্ছেদের মুহূর্তে এলিজাবেথ উভয়ের পক্ষেই অপরিহার্য। জেন উপস্থিত না থাকলে বিংলে এলিজাবেথের সঙ্গেই গল্প করতে ভালবাসে আবার বিংলে চলে গেলে জেন এলিজাবেথের শরণাপন্ন হয় হৃদয়ের ভার লঘু করতে। এক দিন জেন কথায় কথায় জানাল—'গেল বসন্তে আমি যে সহরে ছিলাম বিংলে জানতই না সে কথা। বিশ্বাসই হয়নি ওর।'

—'সেই রকমই একটা কিছু ঘটেছে সন্দেহ করেছিলাম আমি। কিন্তু এর কারণ কিছু বললে সে ?'

—'এ নিশ্চয়ই ওর বোনেদের কারসাজি। তারা নিশ্চয়ই চাইত না, ও আমার সঙ্গে দেখা করুক। কিন্তু এখন ওর বোনেরা জানুক তাদের ভাই আমার সঙ্গলাভের জন্য কাঙাল। এখন আমাকে মেনে নিতে বাধ্য হবে তারা। আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে। অবশ্য আগেকার সম্পর্ক আর ফিরে আসবে না কখনো।'

—'তোর মুখ থেকে এমন ক্ষমাহীন ভাষা শুনিনি কখনো'—মন্তব্য করে এলিজাবেথ।

—'তোদের হয়ত বিশ্বাস হবে না যে গত নভেম্বরে ওরা যখন এখানকার পাট তুলে চলে গিয়েছিল, ও তখনও সত্যিকার ভালবাসত আমায়। তখন যদি আমি একটু ঔদাসীন্যের ভাব দেখাতুম, ও আর কখনই ফিরে আসত না এখন।'

—'সেটা ওর বিনয়ের পরিচয়। তবে একটু ভুল হয়েছিল ওর—' এলিজাবেথ এটা জেনে খুশীই হোল যে, বিংলে এ ব্যাপারে তার বন্ধুর হস্তক্ষেপের কথা ফাঁস করেনি। যদিও দিদির অন্তঃকরণ খুবই উদার ও ক্ষমাশীল, তবুও এ এমন একটা ব্যাপার যা জানলে ডার্সি সম্বন্ধে তার মন বিষিয়ে যেত নিশ্চয়।

লংবোর্ণের ঘটনা-পরিস্থিতি আর গোপন রইল না। মা ফিসফিস করলেন কথাটা ফিলিপস্-গৃহিণীর কানে এবং তিনিও সারা মেরীটনে কথাটা ছড়িয়ে দিতে দেরী করলেন না।

বেনেটরা যে খুবই ভাগ্যবান সে-বিষয়ে আর কারুর সন্দেহ রইল না একটুও। যদিও এই মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে লিডিয়া পালিয়ে গেলে তাদের দুর্ভাগ্য নিয়ে সবাই করুণা দেখাতে কসুর করেনি। [ক্রমশঃ।

—অনুবাদক : শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী।

ভবিষ্যদ্বাণী ?

"তোমরা দেখবে এই বাংলা দেশে আমার আনন্দমঠ জলজ্যান্ত অভিনীত হয়ে মহাবিপ্লব আনবে।"

—বঙ্কিমচন্দ্র (শোভাবাজার রাজবাটিতে লেখকবন্ধুদের কথাচ্ছলে)

সমাজতান্ত্রিক সন্ন্যাসী

বিমলচন্দ্র ঘোষ

"পরবর্তী কালে যে বিরাট আলোড়নে আর একটি যুগের সূচনা হইবে, তাহা রাশিয়া হইতে, অথবা চীন হইতে আসিবে, আমি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু উহা ঐ দুইটি দেশের একটিতেই ঘটিবে। মনুষ্য-সমাজে পর্যায়ক্রমে চারিটি শ্রেণী আধিপত্য করিয়া থাকে—পুরোহিত, ক্ষাত্রবল, বণিক এবং শ্রমিক। * * * এখন বৈশ্য-শাসন (বণিক ও শিল্পপতি)। ইহার নিঃশব্দ পেষণ এবং শোণিত শোষণ করিবার ক্ষমতা ভয়াবহ। ইহার সুবিধা এই, বণিক সকল দেশেই যায় এবং সে বাহন হইয়া পূর্বোক্ত দুই যুগের ভাবধারা সর্বত্র প্রচার করে। ইহারা ক্ষত্রিয় অপেক্ষা অধিক সামাজিক, কিন্তু এই যুগে সংস্কৃতির অধঃপতন আরম্ভ হয়। ইহার পর আসিবে শ্রমিক-শাসন। ইহার সুবিধা এই, বাহ্য সম্পদ ও দৈহিক সুখ-সুবিধা সমাজের সর্বস্তরে বিতরিত হইবে। * * * যাহা হোক, প্রথম তিনটি যুগ শেষ হইয়াছে। এখন সর্বশেষ যুগের সময় উপস্থিত। তাহারা (শ্রমিকেরা) নিশ্চয়ই ইহা পারিবে—কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। * * * আমি নিজে একজন সমাজতন্ত্রবাদী (সোশ্যালিষ্ট) —এই ব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া নহে, কিন্তু পুরা রুটি না পাওয়া অপেক্ষা অর্ধেক রুটি ভাল।"

লণ্ডন, নভেম্বর, ১৮৯৬ —স্বামী বিবেকানন্দ

উনবিংশ শতকের প্রকম্পিত গুহাগর্ত ভেদি'
তুমি এলে সূর্যসিংহ প্রমূর্ত যৌবন অভ্রভেদী
তোমায় প্রণাম
উজ্জ্বল করেছ বিশ্বে শৃঙ্খলিত বাঙালীর নাম।

ইংরাজের সর্বগ্রাসী শোষণের পঙ্কছায়াতলে
ধনতন্ত্র বিকাশের নীলাগ্নিশিখার দাবানলে
যে মশাল জ্বেলেছিল রাজা রামমোহন
তুমি তা'রি ভৈরব চারণ
তুমি তা'রি ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী
বাংলার সমাজ-মনে অগ্নিখড়্‌গধারী
হে নির্ধূম ধূমকেতু
প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মনন-সমুদ্রে তুমি সেতু।
হে সমাজতান্ত্রিক সন্ন্যাসী,
দেখেছিলে পথে পথে ঈশ্বরের শব রাশি রাশি
ক্রূর বৈশ্য-সভ্যতার রথচক্রতলে
শত শত কঙ্কালের শালগ্রাম শিবলিঙ্গ স্থলে।
বিগ্রহের রক্ত-মাংস নিষ্পেষিত তীব্র যন্ত্রণায়
আত্মার চীৎকার-ধ্বনি শূন্যে ভেসে যায়
তুমি শুনেছিলে কান পেতে
ভূগর্ভের গুরু গুরু গর্জন সংকেতে
আসে মহাপ্রলয় কম্পন
তুমি শুনেছিলে তার পদশব্দ অমিতবিক্রম।

মানুষের অপমানে উচ্চকণ্ঠ তোমার চেতনা
মানেনি মানেনি তাই গুরুবাদী মুক্তির সাধনা
অর্থহীন জপমালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
হে বিপ্লবী মহাদণ্ড উর্ধ্বে তুলে নিয়ে—
মনুষ্যত্ব উদ্বোধক শোনালে অনলগর্ভ বাণী
লৌকিক ধর্মের ঘৃণ্য অত্যাচারে তুমি দণ্ডপাণি।

অনার্য চণ্ডাল শূদ্র অস্পৃশ্যের লাঞ্ছিত সমাজে
এলে তুমি সমদর্শী বীর যোদ্ধ্ সাজে
দাসত্ব-দণ্ডকবনে ছত্রভঙ্গ-জীবন সংঘাতে
এলে তুমি আকাশ রাঙাতে
রক্তজবাকুসুমসঙ্কাশে
উনবিংশ শতাব্দীর জিজ্ঞাসা-জটিল চিদ্বিলাসে,
হে অদ্বৈত হোমানল
পতিত ভারতবর্ষে জাগালে নবীন চিত্তবল।

হিরণ্যগর্ভের ধ্যানে কিম্বা আত্মমুক্তির সাধনে
পাওনি উত্তর খুঁজে প্রজ্ঞা প্রসাধনে
হিমালয়ে সূর্যোদয়ে পাষাণে মাটিতে
প্রাচ্যে কিম্বা পাশ্চাত্যের সুরক্ষিত ধর্মের ঘাঁটিতে
লামা পোপ মোল্লা পুরুতের
বর্তমান ভবিষ্য ভূতের
পাশবিক অজ্ঞতার জৈব দীর্ঘশ্বাসে
উদ্বেলিত ঈশ্বরের পাওনি সন্ধান ইতিহাসে;
পাওনি আত্মার পরিচয়
জীবন্ত জড়ের বিশ্বে সংঘাত দেখেছ সুনিশ্চয়
শব্দে শব্দে ব্যোমে ব্যোমে অণুতে অণুতে
মৃত্তিকায় জলে কৃশানুতে
প্রচণ্ড সংঘাত
দেখেছ সৃষ্টির মূলে অপূর্ণের স্তব্ধ আর্তনাদ
দেখেছ বিপুল দ্বন্দ্ব গৈরিকের আবরণ তলে
প্রগতির জন্মতত্ত্ব অনিরুদ্ধ প্রাণের অতলে।

নিদারুণ দুঃখ তবু বিজ্ঞানের বেদান্তের ঝড়ে
সুদৃঢ় প্রত্যয় ভেঙে পড়ে
ব্রহ্মভূত রহস্যের গুহাশ্রিত গহন বিশ্বাসে
অদৃশ্য আত্মার শিখা কেঁপে বুঝি উঠেছিল ত্রাসে

মীমাংসার তমসায় হলে অবনত
বিরোধী বাসনাপুঞ্জ জ্বলে গেল জোনাকির মত।
আবার হারালে পথ
সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি, কোথা মুক্ত শাশ্বত জগত ?
কোথা পরিত্রাণ ?
কোথা সত্য ? কোথা মুক্তি ? কৈবল্যের গান ?
কৃষিতীর্থ ভারতের পবিত্র মাটির সরলতা
শ্যামলী প্রাণের ছন্দ, বিশাল গাঙ্গেয় উদারতা
নিরক্ষর তাপসের মূর্তিমন্ত রূপে
রোমাঞ্চ জাগালো দেশমাতৃকার প্রতি রোমকূপে
সারল্যের জীবন্ত শৈশব
লোকায়ত সিদ্ধবাক্ প্রাণের বৈভব।
জাগৃতির ইতিবৃত্তে তুমি এলে সম্মুখে তাঁহার
রোমাঞ্চ-কম্পিত অঙ্গ খাপ্‌খোলা দীপ্ত তলোয়ার :
ঈশ্বর দেখেছ তুমি ?
প্রসিদ্ধ সরল হাসি হা হা শব্দে মহাশূন্য ভূমি
কেঁপেছিল দুর্বোধ্য কম্পনে
দেখেছি তোমার সত্তা পূজারীর মত্ত আলিঙ্গনে।
বজ্রাহত তোমার জিজ্ঞাসা
শুনেছি বিস্ময়কর বস্তুবাদী নিরক্ষর তাপসের ভাষা :
ঈশ্বর দেখেছি সর্বভূতে সর্বকালে
রক্তে মাংসে মজ্জা মেদে আত্মার কঙ্কালে!

নবযুগ রচনার মাহেন্দ্র লগনে
সারল্যের তীর্থবারি অভিষিক্ত সাধক জীবনে
মূর্তিমন্ত প্রশ্ন তুমি জিজ্ঞাসার শাণিত কুঠার
উত্তর পেয়েছ ক্ষুরধার
সর্বধর্মে চৈতন্যের দ্রষ্টা পুরুষের
গণতন্ত্র উপাসক রামকৃষ্ণ পরমহংসের :
চিন্ময় মৃত্তিকা তৃণ কুসুম পল্লব
চিৎকণার অশান্ত বৈভব
স্থাবর জঙ্গম সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা
ঘূর্ণগতি প্রগতির ধারা
জীবে শিব, শিলে জীব, বীজে মহীরুহে
সুখ দুঃখ সমন্বিত অগ্নিচক্রব্যূহে
খৃষ্টান মুসলিম হিন্দু বৌদ্ধ সাধনার
ঊর্ধ্বে তুলি' ঐক্য-দীপাধার
আরতি জানালে তাই বিশ্বমূর্তি সর্ব মানবের
অবসান চেয়েছিলে শ্রেণী-সংঘাতের!

বিশ্বপরিক্রমা পথে হে সমাজতান্ত্রিক সন্ন্যাসী
তুমি যে দেখেছ উপবাসী
সর্বহারা জীবনের অগ্নিমুখ নিঃশব্দ মিছিল
লাঞ্ছিতের বঞ্চিতের অস্পৃশ্যের শোণিতে পিচ্ছিল
অভিশপ্ত সভ্যতার দিক্ দিগন্তরে
ধরিত্রী-ললাটে লেখা রক্তের অক্ষরে—
সংঘাতের হিংস্র ইতিহাস
তুমি যে শুনেছ রক্ত-ঝটিকার জ্বলন্ত নিঃশ্বাস।
তাই তব সিংহকণ্ঠে শুনেছি গর্জন
মানুষের মুক্তি ছাড়া অর্থহীন ঈশ্বর-দর্শন
মুক্তি মোক্ষ নিঃশ্রেয়স নির্বাণের পথে
অর্থহীন উপাসনা বঞ্চিতের আগ্নেয় পর্বতে।
তোমার ঈশ্বর
সর্বহারা কোটি কোটি আর্ত নারী-নর।

শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদল বর্ণবিদ্বেষের
নারকীয় পতাকায় বিশ্বলুণ্ঠনের
মহাদম্ভে মত্ত ছিল ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের আড়ালে
উপেক্ষিত হে সন্ন্যাসী রুদ্রতেজে তুমি তার সম্মুখে দাঁড়ালে
তাম্রবর্ণ এশিয়ার অগ্নিদগ্ধ ধ্বজা দণ্ড হাতে
স্বদেশের ঐতিহ্যের নির্মম সংঘাতে
দুর্বিনীত বিন্ধ্যগিরি সন্নিধানে অগস্ত্যের মত
বহ্নিমান ললাট উন্নত
ভারতীয় সভ্যতার দুর্ধর্ষ চারণ
শ্বেতাঙ্গ বৈশ্যের ঘৃণ্য দর্পবিনাশন!

বর্ণাশ্রমী পশ্চাচারে জর্জরিত বিশাল ভারতে
ভগ্নচক্র গতিহীন চেতনার রথে
কর্মযোগী হে মহাসারথি,
এনেছিলে ঐক্যবদ্ধ ধর্মের বন্ধন মুক্তগতি
এনেছিলে যৌবনের মুক্তিছন্দে দুরন্ত জোয়ার
অগ্নিযুগ প্রবর্তক হে ঘোড়সোয়ার
নিরন্ধ্র তিমির-পথে তব অশ্বখুরের ঘর্ষণে
উল্কা ছোটে পূর্বাশার নিরুদ্ধ তোরণে
শতদীর্ণ অন্ধকারে বাজে রুদ্র বীণ
এলো বিংশ শতাব্দীর মহা জন্মদিন
তোমার স্বপ্নের তীর্থ রূপ নিল বিশাল জগতে
রুশিয়ায় মহাচীনে ভবিষ্য ভারতে
তোমারি স্বপ্নের বিশ্ব-বিপ্লবের মহা ঐকতান
বীর্যবান হে বৈরাগী লক্ষ বার তোমায় প্রণাম।

—আগামী সংখ্যা থেকে—

মনের-ময়ূর

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

প্রতিভা বসু

তখন
দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

৭

ঠিক কোন্ ট্রেণে আমাদের তোলা হয়েছিল, আজ তা মনে না থাকলেও দিনের বেলাতেই যে উঠেছিলাম, তা স্পষ্ট মনে আছে। সঙ্গে ছ'জন সশস্ত্র গাড়োয়ালী সিপাই আর সাদা পোষাকে এক জন আই-বি'র দারোগা। তিনিও নিশ্চয়ই সশস্ত্র, তবে সিপাইদের মতো প্রকাশ্যে নয়, বস্ত্রাভ্যন্তরে, সংগোপনে। বন্দী হলেও আমরা রাজবন্দী, তাই আমাদের সঙ্গে সরকারী আচরণ কথঞ্চিৎ ভদ্রতার অপেক্ষা রাখে অন্ততঃ দৃশ্যতঃ। তাই হাতকড়া ও দড়ির মামুলী নিয়মের ব্যতিক্রম আমাদের বেলায়। কিন্তু তাই বলে যে আমরাও ভদ্রতা করে চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়ে অথবা ভাসমান ষ্টীমার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পলায়নের চেষ্টা করবো না, জোর গলায় যতই কেন না সে সম্বন্ধে আমরা বরাভয় দিই, অবিশ্বাসী সরকার তাতে বিচলিত হন না। তাই, ঢাকা থেকে সহজ ও দ্রুত পথে বহরমপুর না গিয়ে গ্রহণ করা হয় ঘোরা ও দীর্ঘ পথ এবং মহামান্য বৃটিশ গভর্ণমেন্টের অন্যতম মারাত্মক শত্রুর দল যে এই পথে চলেছে, বিজ্ঞপ্তি প্রচারে জানিয়ে দেয়া হয় আই-বি'র চ্যালা-চামুণ্ডাদের। ফলে, প্রায় ষ্টেশনেই সাদা পোষাকধারী এক জন জানালায় এসে আমরা বহাল তবিয়তে ও শরীফ মেজাজে চলেছি কি না, মূল্যবান সে তত্ত্বটুকু সংগ্রহ করে নিয়ে যান।

মধ্যম শ্রেণীর যাত্রী আমরা। তাই, এক দিকে যেমন সাধারণতঃ পরিচ্ছন্ন আরোহীদের সঙ্গে চলবার সৌভাগ্য লাভ করা যায়, তেমনি আবার কথা কইবার সুযোগ হারাতে হয়। সমাজের যে স্তরের মানুষ এঁরা, তাকে ঠিক জনতা আখ্যা দেয়া যায় না। বুদ্ধি না থাকলেও এঁদের বোদ্ধার মুখোস পরবার সখ আছে। সবাই যে একেবারে সরকারী চাকুরে এবং রাজবন্দীর সঙ্গে আলাপের কাহিনী উপর-ওয়ালার কর্ণগোচর হলেই যে এঁদের চাকরি খতম হয়ে যাবে, তা নয়। রাজবন্দীকে এঁরা সযত্নে এড়িয়ে চলেন, বোধ হয় এটাই নীতি এঁদের। ফলে, শুধু বসবার কেন, পা দু'টি সটান মেলে দিয়ে দিব্যি শোবার জায়গাও সহজেই মিলে যায়।

দারোগাটির নাম সতীশ জানা। আদি বাস মেদিনীপুরে। প্রায় বারো বছর এই বিভাগের চাকরি, একেবারে ডাইরেক্ট সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার। ঢাকা শহরে এসেছেন মাত্র বছর দেড়েক। ঢাকা তাঁর খুব ভালো লেগেছে। মাছ দুধ যেমন সস্তা, তেমনি শাক-সব্জী। পরিবারের সবার স্বাস্থ্যই ফিরে গেছে।—গায়ে পড়ে এমনি আত্মপরিচয় অনেকখানি দিলেন সতীশ জানা। অবশেষে স্বহস্তে আমার সুজনী বিছিয়ে বালিশ পেতে দিয়ে দরদী আহ্বান জানালেন: শুয়েই পড়ুন দ্বিজেন বাবু। পড়ন্ত বেলা হলেও মালপত্র গোছগাছের জন্য দুপুরে হয়তো ঘুমোতেই পারেননি আজ, তাই না?—নিন্ একটু গড়িয়ে। নামতে হবে তো সেই রাত্রে।

জিজ্ঞেস করলাম: আচ্ছা, এমনি মাথা ঘুরিয়ে গ্রাস মুখে তোলা কেন বলতে পারেন? গোয়ালন্দ হয়ে সোজা রাণাঘাট গিয়ে বহরমপুরের ট্রেণে না চেপে এমনি ঘুরপাক দিয়ে নিয়ে যাবার কারণ কি? এর পশ্চাতেও কি যোগিনী বাবুর উর্বর মস্তিষ্ক না কি?

সতীশ বাবু মৃদু হাস্য করলেন, বললেন: সেনট্রাল আই-বি'র বন্দী আপনি, যোগিনী বাবুর নাগালের বাইরে। তাই স্বয়ং গ্র্যাসবি সাহেবের নির্দেশ যে গোয়ালন্দ দিয়ে তাকে যেতেই দেবে না।

গোয়ালন্দ সম্বন্ধে পুলিশের এত আতঙ্ক কেন, বুঝতে পারলাম। বাড়ী থেকে মা'র চিঠি অবশ্য দু'দিন পূর্ব্বেও এসেছে, কিন্তু তাতে শ্রীপদর কোন কথা নেই। ষ্টীমার থেকে যে জরুরী চিঠি শ্রীপদর কাছে লিখেছিলাম, সেখানা তার হাত পর্য্যন্ত পৌঁছোল কি না কে জানে! গোয়ালন্দ থেকে যে সে আমারই সাথে গ্রামে এসেছিল, পুলিশ তা জেনেছে; সুতরাং তার নামীয় চিঠিপত্র হস্তগত করা আই-বি'র পক্ষে স্বাভাবিক। ষ্টীমারের চিঠি শেষ পর্য্যন্ত গ্র্যাসবির হাতেই গিয়ে উঠলো না কি? তাহলে তো আমার বালিশ এবার ওরা নিয়ে আসবে এবং টাটকা একটি ছ'ঘরা রিভলভার হস্তগত করবে। তাই করেছে কি?

নানা চিন্তায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। সতীশ বাবু বললেন: হ্যাঁ, একটু কষ্ট হবে বৈ কি এ পথে। তা—নতুন দেশ দেখা তো হবে, কি বলেন? কত কালের জন্য যাচ্ছেন কে জানে! তাই যত বেশীক্ষণ বাইরে থাকা যায়, ততই লাভ।—বাড়ীর চিঠি পেয়েছেন?

আবার বাড়ীর চিঠি!—চমকে উঠলাম মনে-মনে। মুখে বললাম: হ্যাঁ, তা পেয়েছি। মা খুব দুঃখ করে লিখেছেন যে, বুড়ো বয়সে আমিই তাঁকে দুঃখ দিলাম।

আপনারা ক' ভাই-বোন?

সাত ভাই, একটি বোন। সবার ছোট, সাত ভাই চম্পার বোন পারুলের মত।

মর্ম্মাহত হলেন যেন সতীশ জানা: ওঃ, দেখুন তো একেবারে সাজানো সংসার! মা তো ঠিকই লিখেছেন। আর—কেনই-বা গেলেন এই হাঙ্গামায়, আমিও তাই ভাবি। দু'টো বোমা-রিভলভার দিয়ে কি দেশ স্বাধীন হয় কখনো?

যা বলেছেন।—বলে বিরক্ত হয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। এমনি অনাহূত আদর-আপ্যায়ন ও এমনি অযাচিত উপদেশের নিগূঢ় উদ্দেশ্য যে কী, তা বোঝবার মতো কূটবুদ্ধি আমার হয়েছে। বোধ হয় একটু পর সতীশ বাবু নিজেও সেটা উপলব্ধি করলেন, তাই অন্য কথা পাড়লেন: আপনার দাদারা বোধ হয় ভালো চাকরি করেন? সরকারী চাকরি আছে কারুর?—ওঃ, আলীপুরে জজের ওখানে ট্র্যানস্লেটর? চাকরিটি ভালো।

এমনি অনেক বাজে প্রশ্ন করলেন সতীশ জানা। আমি কোনোটা নিয়েই আলোচনা না তুলে সংক্ষেপে 'হুঁ' 'হাঁ' করে কাটিয়ে দিতে লাগলাম। একটু পর যেন তাও আর ভালো লাগলো না। জানালার সার্সি তুলে দিয়ে বাইরে যত দূর পারি দৃষ্টি প্রসারিত করে রইলাম।···হ্যাঁ, গ্রাম। গ্রামের পর গ্রাম ছুটে চলেছে। গাছপালা-সমাকীর্ণ ছায়া-শীতল গ্রাম। ঢেউ-খেলানো হরিৎ ক্ষেত-ঘেরা গ্রাম। নাম-না-জানা অসংখ্য পাখীর কল-কাকলিতে মুখরিত গ্রাম। সরল, অনভিজ্ঞ জেলে, চাষী ও দিনমজুরের গ্রাম। এমনি অসংখ্য গ্রামের তুলনাহীন বিচিত্র চিত্র চোখের সামনে বন্যসে উঠে উঠে সরে যাচ্ছে। এমনি গ্রামের বুক চিরে চিরে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে আমাদের বাষ্পীয় যান।

…এমনিই একটি অখ্যাত গ্রামেরই ছেলে আমি। ভালোবেসেছিলাম আমার দেশকে, দেশের মাটিকে, দেশের অগণিত শোষিত বুভুক্ষুদের। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্বর্ণ-সোপান ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিলাম বাইরে, কঙ্করময় বন্ধুর পথে, পরদেশীকে বিতাড়িত করবার সুকঠিন ব্রত গ্রহণ করেছিলাম। দৃশ্যমান দুনিয়ায় প্রকাশ্য ভাবে চলছিল যে আপত্তি, যে অভিমান, তার ঢিমে তালের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরেই পদক্ষেপ করেছিলাম ভূগর্ভস্থ অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে, সেখান থেকেই সুরু করেছিলাম প্রতিবাদের মৃদু গুঞ্জন, লোম্যান, হডসন, সিম্পসন, পেডি ও ষ্টীভেন্সের ওপর মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়ে জানিয়েছিলাম বিক্ষোভের অভিব্যক্তি।…কিন্তু তাই কি আমার অপরাধ? দেশকে ভালোবাসা কি অন্যায়? শাঠ্য ও জোচ্চুরি সম্বল করে সাত সমুদ্র পার হয়ে এসে যারা এই দেশটা দখল করে বসলো, এখানকার টাকা নিয়ে গিয়ে যারা লণ্ডনে নির্মাণ করলো স্কাই-স্ক্রেপার, তারাই হল আমার দেশের সম্রাট, কোটি কোটি নর-নারীর ভাগ্যবিধাতা? গ্রামের শুষ্ক পুষ্করিণী, শূন্য গোলা আর ভগ্ন গোয়ালের সমাধির ওপর বসে যারা নিরোর মত বাজাবে বাঁশী, তাদেরই একচ্ছত্র অধিকার থাকবে আমার দেশের সম্পদে, দেশের ঐশ্বর্য্যে, আর সর্বহারা আমি সেই একটানা শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অঙ্গুলি হেলনের পুরস্কার লাভ করবো কারাদণ্ড, দ্বীপান্তর, ফাঁসী?……

মনুষ্যত্বের এত বড় অবমাননা নীরবে মেনে নিতে পারিনি বলেই আমার এই পুরস্কার।… এই তো চলেছে কামরা-ভর্ত্তি আরোহী, পথের এই ক্লেশ, এই ক্লান্তি গন্তব্য স্থলে পৌঁছোলে অপনোদিত হয়ে যাবে প্রিয়জনের সান্নিধ্যে, এই আশা বুকে নিয়ে। কিন্তু এদের মনের কোণে এক প্রবঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাস কি এতটুকুও আলোড়ন সৃষ্টি করছে না? এক সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কুসুমাস্তীর্ণ পথে না এগিয়ে কেন এলাম এই কণ্টকাকীর্ণ পথহীন পথে, কারুর মনে কি জাগছে না এই প্রশ্ন? ষ্টেশনে ষ্টেশনে চলছে নামা-ওঠা, যাত্রী, ফেরিওয়ালা, কুলি ও দর্শকদের গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠছে প্লাটফর্ম, কিন্তু এদেরই চোখের ওপর দিয়ে চলেছে এক জন যুবক, স্বাধীনতা যার জীবনের ব্রত—এ সংবাদ কি তারা রাখে?

কী জানি কেন, বার বার মনে হতে লাগলো আমি রিক্ত, আমি অনাথ, আমি একক, এই দুনিয়ায় আপনার বলতে আমার কেউ নেই, দক্ষিণে-বামে, সম্মুখে-পশ্চাতে যত দূর দৃষ্টি যায়, একটা ভয়াবহ শূন্যতা বুঝি খাঁ-খাঁ করছে …

অকস্মাৎ সতীশ বাবুর কথায় চমক ভাঙলো: দ্বিজেন বাবু, এই প্রথম এ্যারেষ্ট হলেন না কি?

রিভলবার চুরি সম্পর্কে গ্রেপ্তার ও মুক্তির কথা উল্লেখ করলাম। শুনে সতীশ বাবু বললেন: দাগ যখন একবার লেগেছিল, তখন আর রেহাই পাবেন কি করে? যারা একেবারে নতুন, সবে আপনাদের খাতায় নাম লিখিয়েছে, তারাও এবার একটিও বাদ যায়নি।

চুপ করে থাকলাম। পুলিশ অফিসারের সঙ্গে খুব সংযত হয়ে কথা কইতে হয়।

একটা ষ্টেশন এসে পড়লো। পানওয়ালা, বিড়িওয়ালা, পাঁউরুটিওয়ালা হেঁকে চলে যাবার পর এলো সোডা-লেমনেড আর সোডা কোথাকার? কত করে?

ফেরিওয়ালা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল: আজ্ঞে নারায়ণগঞ্জের আসল মাল। দাম চোদ্দ পয়সা।

দু' বোতল নিলাম আর নিলাম এক ডজন কমলালেবু ও এক ডজন কলা। দামের জন্য ডাক দিলাম: সতীশ বাবু!

বলুন!

মোট দাম হয়েছে পুরো এক টাকা। আর বোতল দু'টোর দাম কত দিতে হবে? আমি তো আর এখন দু' বোতলই খেয়ে ফেলছি না, নিয়ে যাবো।

সতীশ বাবু অসীম কুণ্ঠার সঙ্গে এক টাকা চার আনা বার করে দিলেন।

এ ব্যাপারে প্রচলিত বিধি ও তার ওপর চলনদার দারোগার ক্ষমতা যে কতখানি, তা আমার ভালো ভাবেই জানা ছিল। নিয়ম ছিল, আমাদের খাবার জন্য দৈনিক যে টাকা বরাদ্দ আছে, ট্রেণে বা ষ্টীমারে যাতায়াতের সময় পাওয়া যাবে তার দ্বিগুণ। তার পর বিন্দুমাত্রও অসুবিধার সৃষ্টি না করে এবং পথে কোন ক্রমেই কোনো বিতর্ক না করে রাজবন্দীকে গন্তব্য স্থানে ঠাণ্ডা মেজাজে নিয়ে যেতে হলে আরও কিছু প্রয়োজন হতে পারে বলে দারোগার হাতে ভাউচার লিখে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিয়ে দেয়া হয়। এরও পর বদমেজাজী রাজবন্দীর পাল্লায় পড়লে পথে যাতে অর্থাভাবে কোনো অসুবিধায় না পড়তে হয়, তার জন্য কিছু টাকা দারোগার হাতে বিনা ভাউচারে তুলে দেয়া হয়। তারও পর আছে: জরুরী কোনো অবস্থা দেখা দিলে দারোগার ক্ষমতা থাকে প্রয়োজন মত অর্থব্যয়ের। হেড কোয়ার্টারে ফিরে এসে বিল করলেই সে সমুদয় অর্থ ফিরে পাওয়া যায়।

আমরা এই ব্যবস্থার কথা জানি বলেই পথে বেরুলেই অকস্মাৎ আমরা এক দিকে একেবারে যেমন হয়ে উঠি পেটুক ও অমিতব্যয়ী, অপর দিকে হয়ে উঠি করুণার অবতার! যা খুশী তাই খাই, যা ভালো লাগে বা লাগে না, তাই কিনি, যাকে-তাকে যা-তা বিলিয়ে দিই আর ভিক্ষুক দেখলেই দু'-চার আনা তৎক্ষণাৎ দান করে বসি। কুলি চার আনা চাইলে আমরা আরো বখ্শিশ দিই আট আনা, যেখানে হেঁটে যাওয়া যায়, সেখানে যাই রিক্সায় আর যেখানে রিক্সা হলেই যথেষ্ট, সেখানে চেপে বসি ট্যাক্সিতে। একটি মাত্র আমাদের নীতি, সরকারী অর্থ যে ভাবে পারা যায় জনসাধারণের মাঝে বণ্টন।

পক্ষান্তরে, চলনদার দারোগা কৃপণের মত পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে নিয়ে গিয়ে রিপোর্ট দেয় এমনি দীর্ঘ এবং তাতে জরুরী অবস্থা দেখা দেবার ইতিবৃত্ত এমনি নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করে কতকগুলি অনভিপ্রেত ব্যয়ের তালিকা জুড়ে দেয় যে, বিলগুলি তার অনায়াসে পাশ হয়ে যায় আর শ্রীমান বেশ একটা মোটা মুনাফা লাভ করে। ফলে, টানা-পোড়েন চলতে থাকে রাজবন্দী আর দারোগার মধ্যে।

ট্রেণের ঘণ্টা পড়ে গেল, এমন সময় প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক এক দল মহিলা ও শিশু এবং লটবহর সহ হুড়মুড় করে এসে উঠলেন। কতক মেঝের 'পরে, কতক বাঙ্কে ও কতক বেঞ্চির নীচে ফেলে রেখে তিনি "কেতনা দে গা" বলে বিতর্কে আহ্বান করলেন কুলীর দলকে।

ভদ্রলোক গায়ের ময়লা তেল-চিটচিটে র‍্যাপারখানা কোমরে কোটের ওপর জড়িয়ে নিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে ঘোষণা করলেন : গভর্ণমেণ্ট আমলমে জুলুম ? ছেলেখেলা মিলা হায় ? আও, হাম ভি গভর্ণমেণ্ট কণ্টাগ্‌দার (কনট্রাকটর) হায়। এক টাকাকে যাস্তি হাম এক আধলা নেহি দে গা। সাত হাত মাটি খুড়লে ভি একঠো পয়সা নেহি মিলতা। আট আনা সস্তা হায় ? বলে তিনি কোটের আস্তিন গুটোতে গিয়ে বাহুর যে অংশটুকু অনাবৃত করলেন, সেটুকুতে চামড়া দিয়ে ঢাকা এক-একটা প্যাকাটি ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পেলাম না।

ট্রেণের গতি দেখা গেল এবং এই জন্যই ভদ্রলোকের সাহস আরো বেড়ে গেল। তিনি আবার একাই কুলীর দলকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন এবং আবারো উল্লেখ করতে ভুললেন না যে, তিনি গভর্ণমেণ্ট কণ্টাগ্‌দার।

গভর্ণমেণ্ট নামেই তখন ভেলকি খেলতো, তার ওপর ট্রেণ প্রায় প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে এসে গেছে, তাই অগত্যা কুলীর দল রূপোর টাকাটাই ট্যাঁকে গুঁজে লাফ দিয়ে পড়লো এবং ভদ্রলোক যুদ্ধজয়ী সেনাপতির মতো তাম্বুলরস-চর্চ্চিত বত্রিশখানা দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললেন : দেখলি রেণু, বললাম না এক টাকার একটি পয়সা বেশী আমি দোব না।

চমকে উঠলাম। রেণু! কোন্ রেণু?

দেখলাম, সে রেণু নয়। এ শহরের রেণু! শহুরে আদব-কায়দায় ও আধুনিকতম পোষাক-পরিচ্ছদে এ রেণু একেবারে মূর্ত্তিমতী অজন্তার ছবি!

স্থানের অভাব ছিল পূর্ব্বেই। তার পর একেবারে এতগুলো লোক উঠে পড়াতে বেশ মুশকিল দেখা দিল। আমার সুজনী অনেকখানি গুটিয়ে ফেলতে হল, সঙ্গীরা শিয়রের বালিশ কোলে তুলে নিলেন, উলটো দিকের বেঞ্চের শায়িত ভদ্রলোক উঠে বসলেন, কাউকে তাঁর এ্যাটাচি কেসটা বেঞ্চের নীচে নামিয়ে দিতে হল, এমনি ভাবে সমস্ত কামরায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে এখানে-ওখানে-সেখানে এক-এক করে জন বারো শিশু ও মহিলাদের বসিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক যখন স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে পকেট থেকে পানের প্রকাণ্ড ডিবেটা বার করলেন, তখন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম শহুরে রেণুর স্থান মিলেছে আমারই বিপরীত দিকের বেঞ্চে ঠিক আমার মুখোমুখি।

আধুনিকাকে এইবার ভালো ভাবে লক্ষ্য করবার সুযোগ পাওয়া গেল। ফিনফিনে পাতলা ব্লাউজ, নীচের বাসন্তী রংয়ের বক্ষোবাসের প্রান্তরেখাগুলি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, রুক্ষ চুলের দু'টো বেণীর একটি দোদুল্যমান পিঠের ওপর, অপরটি লম্বমান পুরন্ত বুকের ওপর। রক্তরাঙা সাড়ীর আঁচলখানি আলগোছে গায়ের ওপর রাখা, কেয়ারফুলি কেয়ারলেসের মতো।

বসেই ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে তিনি গালের রুজ সংস্কারে মনোনিবেশ করলেন।

এই রেণু সত্যিই সুন্দর, শরীরের গড়ন যেমন সুডৌল, তেমনি নিখুঁত। যৌবনের জোয়ারে ভরা নদীর মতো। যতই সময় কেটে যেতে লাগলো, ততই বুঝতে পারলাম ইনি কলকাতার হল্লাতে এই দলটি সমস্ত পথটাই বেশ প্রাণবন্ত ও হালকা করে রাখলো।

আমার কমলা ও কলাগুলো ছোটদের মধ্যে বন্টন করে দিলাম যখন, তখন এদের সঙ্গে আমি বেশ জমিয়ে ফেলেছি। ছোটরা হাত পেতে নিলেও বড়রা একটু সংকোচ প্রকাশ করতে ভুললেন না, বিশেষ করে রেণু দেবী। বললেন : ও কি করলেন, ওদের সব দিয়ে দিলেন যে?

বললাম : তাতে কি আর হয়েছে। আমি আবার কিনে নোব।

বাঃ, বেশ তো। কিনে-রাখা জিনিষ এমনি করে বিলিয়ে দিয়ে আবার কিনবেন?—ওঃ, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই বড়লোক!

হাসলাম ও রহস্য করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না : তা বড়লোক তো নিশ্চয়ই, অন্ততঃ যতক্ষণ ট্রেণে থাকবো ততক্ষণ তো।

রেণু প্রশ্ন করলেন : মানে?

জবাব দিলাম : মানে খুব কঠিন কিছু নয়। রাজার আতিথ্য গ্রহণ করতে চলেছি যে! তাই ব্যয়ের কোনো সীমা থাকতে পারে কি?

বলে আড়চোখে দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখলাম, দারোগা সতীশ বাবুর ঝিমোনো থেমে গেছে। তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাণাকড়ি ব্যয় সংক্ষেপ করবার জন্য যে নীতি গ্রহণ করেছেন, আবার বুঝি আমি তাতে ঘা দিই, এই দুশ্চিন্তার কালো ছাপ স্পষ্ট তাঁর মুখমণ্ডলে দেখা গেল। কিন্তু রেণু আমার রহস্য ঠিক অনুধাবন করতে না পেরে পাল্টা প্রশ্ন করলেন : রাজার আতিথ্য?

হ্যাঁ।

বুঝতে পারলাম না।

জানি, বুঝতে পারবেন না তিনি। এই হচ্ছে শহুরে রেণুর সত্যিকার রূপ! সাতরঙা প্রজাপতির মত হাল্‌কা পাখনার ঘায়ে বাতাসে গ্লামোরাস তরঙ্গ সৃষ্টি করে আলগোছে ঘুরে বেড়ান এঁরা। সকাল-সন্ধ্যা কেটে যায় নিউ মার্কেটে আর প্রেক্ষাগৃহের ব্যালকনিতে পুরুষ-বন্ধুর পাশে-পাশে। বাইরের চলিষ্ণু দুনিয়া কোনও দিন অচল হয়ে ভেঙে পড়লেও এঁদের চেতনা আসবে না। সাড়ী, বাড়ী ও গাড়ীর মধ্যেই যারা পেয়েছে জীবনের প্রেয়কে, রাজবন্দীর অর্থ তারা জানবে কোত্থেকে?...

এই যে আমার সম্মুখে এক মোহময় ভঙ্গীতে শরীর এলিয়ে দিয়ে বসে আছেন, ইঙ্গিতে, ইসারায় ও হস্ত-সঞ্চালনে সমস্ত কামরাখানির মধ্যে সৃষ্টি করে তুলেছেন বিভ্রান্তিকর আবহাওয়া, অন্তরঙ্গতায় যিনি একেবারে উচ্ছল ও উদ্বেল হয়ে উঠেছেন—নিশ্চিত জানি রাণাঘাটে আমাদের ছেড়ে ইনি যখন কলকাতাগামী ট্রেণে উঠে বসবেন, তখন থেকেই আর আমার কথা মনে পড়বে না এঁর।

তথাপি, রাজবন্দীরাও যে তাঁর আপাতমধুর সখ্যতার মোহবন্ধনে গলা বাড়িয়ে দিতে রাজী নয়, সে পরিচয়টা ভালো করে দেবার জন্যই আমার সত্যকার পরিচয় দিলাম। শুনে প্রথমটা তিনি জানালেন অসীম সহানুভূতি, সমগ্র রাজবন্দীর জন্যই যেন তাঁর কোমল হৃদয়ে দরদ একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, তার পর অকস্মাৎ যেন তাঁর উৎসাহে, স্মার্টনেসে ও অকুণ্ঠ আচরণে বিবর্ণতা দেখা গেল।

প্রদীপের মতো টিম্-টিম্ করতে লাগলেন। বক্রদৃষ্টিতে দেখলেন গাড়োয়ালী সেনাদলকে, তাদের বন্দুকগুলো ও বেয়নেটগুলোকে এবং বার বারই অনুসন্ধানী দৃষ্টি তাঁর সাদা পোষাক-পরা দারোগাটিকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

বেশ বোঝা গেল এবার রঙীন ফানুষ ফেটে গেছে, চুপসে এক খণ্ড নগণ্য কাগজ হয়ে নীচে নেমে এসে তা ধুলোয় মুখ থুবড়ে পড়েছে। পায়ের তলায় মাড়িয়ে গেলেও আর তা আকাশে ওড়বার স্বপ্ন দেখবে না।······

সন্ধ্যার পর ফুলছুরি ঘাটে এসে ষ্টীমারে চড়তে হল। ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে ওপারে তিস্তামুখ ঘাটে পৌঁছে আবার ট্রেণে চাপতে হবে।

পদ্মা নদীর ষ্টীমারের সঙ্গে এই ষ্টীমারের তুলনাই হয় না। এর আয়তন শুধু ক্ষুদ্র নয়, এর আকারও অত্যন্ত গেঁয়ো। একেবারেই আভিজাত্য নেই। এর প্রপেলর দু'টি যেমন বেমানান ভাবে বৃহৎ, তেমনি এ দু'টি আঁটা রয়েছে একেবারে পশ্চাৎ ভাগে। সেখানে যে সব কলকব্জা এ দু'টিকে চালিত করে, যেমন নেই তাদের জাঁকজমক, তেমনি নেই তাদের ফুসফুসের জোর। যক্ষা-রোগীর খুক্-খুক্ করে কাসির মতো ঝুক্-ঝুক্ শব্দ হচ্ছে সেখানে আর বিস্তর ষ্টীমের প্রশ্বাস বেরিয়ে এসে প্রমাণিত করছে যে আয়ু বোধ হয় আর বেশীক্ষণ নেই। ষ্টীমারের দৈর্ঘ প্রস্থের তিন গুণ হবে। একখানা ভারী ও অচল ফ্ল্যাটের সঙ্গে দু'খানা চাকা জুড়ে দিলে যা দাঁড়ায়, তাই।

দোতলার সম্মুখ ভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিন এবং তার পশ্চাতেই ইণ্টার ক্লাশের যাত্রীদের জন্ম খানকতক বেঞ্চ বিছানো।

এবার আর সুজনী পাতা হল না, কারণ ওপারে পৌঁছুতে অল্প সময় লাগবে। তার পরই আবার ট্রেণ। রেণু দেবী তবুই ভড়কে গিয়ে থাকুন, এবার তিনি হয় ভুল করে কিংবা কেয়ারফুলি কেয়ারলেসের মতো একেবারে আমার পাশেই বসে পড়লেন। স্তিমিত বৈদ্যুতিক আলোকে তাঁর মুখের চেহারা স্পষ্ট ঠাহর করতে পারছিলাম না। আমার সঙ্গীরা সবাই একটু লাজুক ধরণের, স্বল্পভাষী। আমার কিন্তু এই পরিবারের সঙ্গে পথের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সতীশ বাবুর কালো মুখে আরও কয়েক পোঁচ কালি লেপন করে বার তিনেক আরও কমলা, আপেল ও আঙুর কিনে ছোটদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছি এবং হাজারো আপত্তি সত্ত্বেও এবার রেণুর হাতে জোর করে খান কয়েক ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুট গুঁজে দিতে আর সংকোচ বোধ হল না।

তার পর বেলফুলের কুঁড়ির মতো দু'পাটি দাঁতের ফাঁকে কুট্-কুট্ করে বিস্কুট ভাঙতে ভাঙতে রেণুর সঙ্গে যে কথা হল হুবহু তা লিখে দিচ্ছি :—

রাণাঘাটে পৌঁছে আপনি অপেক্ষা করবেন বহরমপুরের ট্রেণের জন্ম আর আমরা তো সোজা চলে যাবো কলকাতায়। আর দেখা হবে না আপনার সঙ্গে, তাই না দ্বিজেন বাবু?

বললাম : হবে না বলতে পারি না। কিন্তু সে যে কবে, আজ থেকে কত বছর পরে, নিশ্চয় করে তা বলা যায় না ;

ফস্ করে প্রশ্ন এল : ভুলে যাবেন তো একেবারে? কিংবা মনে থাকলেও থাকবে অভদ্র মেয়ে হিসেবে—চেয়ে-চেয়ে বিস্কুট খায়, লেমনেড খায়, খাওয়ায় না একটি পয়সারও—এই তো?

হেসে জবাব দিলাম : আমিও খাওয়াইনি একটি পয়সারও। যা খেলে, প্রকৃত পক্ষে তা খাওয়ালেন মহামান্ত সরকার বাহাদুর। কিন্তু আমি ভাবছি, এমনি যেচে খাওয়াতে খাওয়াতে হঠাৎ আবার এক দিন আতিথ্য গ্রহণেরই না আমন্ত্রণ এসে যায় আমারই মত। তখন চোখের জলে বান ডাকবে তো ?

জেলে নিয়ে গিয়ে না কি খুব অত্যাচার করে ?—প্রশ্ন করলো রেণু। বললাম : আমার চেহারা কি অত্যাচারিতের চেহারা ?

রেণু আমার পানে চেয়ে মুচকি হাসলো, বললো : না, তা মনে হচ্ছে না তো। বরং—

বরং মনে হচ্ছে বাদসাহী অট্টালিকা আর নবাবী খানা ছেড়ে চলেছেন রাজার অতিথি হয়তো কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে আনন্দ-সফরে, তাই না ?—বলে হেসে উঠলাম। রেণুও হেসে উঠলো হি-হি করে।

ষ্টীমারের রেষ্টুরেণ্ট থেকে বয় এসে দু'কাপ চা দিয়ে গেল। চায়ের কাপে মুখ দিয়ে একবার সতীশ বাবুর পানে দৃষ্টিক্ষেপ করলাম। পাছে চায়ের সঙ্গে কেক বা মামলেট চেয়ে বসে আবার খরচান্ত করি তাঁকে, তাই তিনি র‍্যাপারখানা খুব ভালো করে জড়িয়ে শম্বুকের মতো একপেশে হয়ে বসেছিলেন অন্ধকার নদীর পানে চেয়ে। একুশ-বাইশ বছরের স্বাস্থ্যবান সুন্দর ছোকরার সঙ্গে আঠারো বছরের পেখম-তোলা কলেজী মেয়ের ঘনিষ্ঠ আলাপ সেই রামুলী মন দেয়া-নেয়ার পথেই তো চলবে, তাও তো মাত্র রাণাঘাট পর্য্যন্ত।—সুতরাং ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে নিজেকে রক্ষাকার্যে মনোনিবেশ করাই সতীশ বাবু যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন দেখা গেল।

রেণুর বাবা আবার চা-ওয়ালার সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিয়েছেন। জলের মতো চা, এর দাম কখনো চার পয়সা হতে পারে ? সুতরাং "গভর্ণমেণ্ট কণ্টাগদার" পুনরায় চা-ওয়ালাকেই যুদ্ধে আহ্বান করলেন। তবে এবার আর জামার আস্তিন গুটোতে পারলেন না, র‍্যাপারটাও গায়েই রাখলেন জড়িয়ে। শীত যে! নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া যে গায়ে বিঁধছে। দেখলাম, পানের ডিবে তাঁর হাতে এবং একটু পর-পরই দু'খিলি তুলে মুখে পুরছেন!

এই তো সুযোগ! বন্দীনিবাসে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্ত প্রবেশের পূর্ব্বে রেখে যাই না একটি স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে বাইরে পথের ধারে। কে বলতে পারে উত্তরকালে এই স্ফুলিঙ্গই সৃষ্টি করবে না এক সর্বনাশা হব্যবাহন ?···

চা খেতে-খেতে অনেক কথা হল। দু'জনের মাঝখানকার হালকা লঘু পরদা কখন্ যে উড়ে গিয়ে গাম্ভীর্য্যের মতো একটা থম-থমে ভাব এসে গেছে, দু'জনেই যেন তা টেরও পাইনি। রেণু জিজ্ঞেস করলো : কি করতে পারি আমি আর কেমন করে পারি ?

বলতে লাগলাম : শান্তি, সুনীতি আর বীণা তোমারই মত মেয়ে। তারা কি করতে পেরেছে ? তারা যা পেরেছে, তুমিও তা পারবে না কেন ? রাজপুত মেয়েরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ করতেন তলওয়ার চালিয়ে। আর তুমি পারবে না ভ্যানিটি ব্যাগ ছেড়ে রিভলভার তুলে নিতে ?

কোথায় পাবো ? কাকে আমি চিনি ? কে আমার চিনিয়ে দেবে ?—পর পর প্রশ্ন করলো রেণু।

হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করে নিয়ে এলাম রেলিংয়ের ধারে নিশ্চিন্ত হবার জন্ত। তার পর বললাম : আমি তোমায় চিনিয়ে দোব। তোমায় একটা নাম ও ঠিকানা দিচ্ছি। রাত দশটার পর একে বাড়ীতে পাবে। আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলবে "হলদে ফুল" তোমায় পাঠিয়েছে। তাহলেই হবে।

হলদে ফুল ?

হ্যাঁ, ওটাই আমার সাংকেতিক নাম। পার্টির লোক ছাড়া কেউ জানে না।—বলে নীচে নদীর দিকে রেণুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম : দেখছো কী অন্ধকার! এমনি অন্ধকার আমাদের ভবিষ্যৎ। কোনো উজ্জ্বল প্রভাতের প্রতিশ্রুতি দিতে পারবো না তোমায়। কাজই আমাদের জীবন। এরই চাকার নীচে নিজেকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই আমাদের আদর্শ।

রেণু কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমার কণ্ঠস্বরে তখন আবেগ এসে গেছে : কবে আমি বেরিয়ে আসবো জানি না। কিন্তু তবু বন্দীনিবাসে বসে বসে তোমার কথা ভাববো, ভাই জেলে গেলেও বোন রয়েছে বাইরে—এই হবে আমার সান্ত্বনা। পারবে না তুমি আমাদের ব্রত গ্রহণ করতে ? দেশকে স্বাধীন করবার কাজে পারবে না নিজেকে বিলিয়ে দিতে ? কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে, বন্ধুদের মধ্যে, আত্মীয় জনের মধ্যে পারবে না এই অগ্নিমন্ত্র প্রচার করতে ?

অকস্মাৎ অনুভব করলাম হাতের ওপর স্পর্শ। আমার রেলিংয়ের ওপর রাখা হাতে রেণুর তপ্ত হাত এসে ঠেকেছে! বুঝতে পারা গেল শহুরে রেণুর বুকেও জালিয়ে দিয়েছি বিপ্লবের আগুন। এবার অত্যাচারীকে পুড়িয়ে মারবে সেই আগুনের শিখা!··· উদ্দীপনায় যেন একেবারে ফেটে পড়তে লাগলাম : ক্ষুদিরাম-কানাইলাল থেকে সুরু করে বিনয়-বাদল-দীনেশ পর্য্যন্ত বাংলার অগণিত শহীদেরা যে পথের নিশানা দিয়ে গেছেন, সেই আমাদের পথ রেণু! সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতকে স্বাধীন করাই আমাদের লক্ষ্য। যে কোনো দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করলে এই সত্যটাই বার বার করে মনে ঘা দেয় যে, আবেদন-নিবেদনে করুণা পাওয়া যেতে পারে, স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। চেয়ে দেখ ফ্রান্সের দিকে, চেয়ে দেখ রাশিয়ার দিকে, আয়ারল্যাণ্ডের দিকে চেয়ে দেখ—

অকস্মাৎ বাধা পেলাম। আমার হাতখানা সস্নেহে হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে হঠাৎ রেণু বলে উঠলো : বাঃ, আপনার আংটিটি তো ভারী সুন্দর। কী বলে একে, নীলা ? ইস্, কী চকচক করছে। কতটুকু সোনা দিয়ে তৈরী দ্বিজেন বাবু ? আমিও এমনি তৈরী করাবো একটা। দিন্ না একটুখানি, বাবাকে দেখিয়ে আনি।

একেবারে চুপ করে গেলাম। নিশ্বাসও বুঝি বন্ধ হয়ে এল!······মুক্তো ছড়াচ্ছিলাম কোথায় ? কার গলায় পরাচ্ছিলাম মুক্তোর মালা ? কাকে দিচ্ছিলাম অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা ? এ যে সহুরে রেণু!······গ্রামের রেণু আমি চলে আসাতে খুশী মনে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারেনি, পত্রালাপ বন্ধ থাকলেও জানি আজও যেমন তার মনের গহনে আমার স্মৃতি ফুলের মত ফুটে রয়েছে, অপরিম্লান পারিজাতের মতই তা চিরদিন বিকীর্ণ করবে সৌন্দর্য ও সুগন্ধ!······

আর এ শহুরে রেণু। বাতাসে তুলে চলে এরা কড়া এসেন্সের হিল্লোল, এরা হিসেব করে কথা কয়, ওজন করে হাসে, এদের প্রতিটি নিমেষ সীমাহীন ভদ্রতায় নিখুঁত। এদের শালীনতা ও শোভনতার

পালিশে দাগ ধরে না। আদর্শকে পাশ কাটিয়ে এরা এসে দাঁড়ায় আদর্শবাদীর মুখোমুখি, গায়ে গা ঠেকিয়ে। আকাশের রামধনুর মতোই এদের ভালোবাসা। দীপ্তিময়, কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর। দূর থেকে দেখতে ভালো লাগে এদের, কাছে এলেই কাঠামোর নোঙরা কাঠ আর নীরস খড় বিশ্রী ভাবে চোখে ঠেকে।···

বিপ্লবীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তৈরী করে যেতে চেয়েছিলাম ভেরা ফিগনার, কিন্তু দেখলাম রেণু বেলোয়ারী কাচের পুতুল ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ওপরে চেয়ে দেখলাম মিশমিশে কালো আকাশ, তাতে অসংখ্য তারার মিটমিটে প্রদীপ। আর নীচে, ষ্টীমারের স্বল্পালোকে নদীর যেটুকু দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে, তা মৃত্যুর স্তিমিত হাসির মতই ভয়াবহ মনে হচ্ছে। তার বাইরে ঠাণ্ডা, মৃত অন্ধকার, অনেক কালের বাসি মড়ার মতোই ভারী ও স্যাঁতসেতে !···

হলদে ফুলের সাংকেতিক শব্দ ওকে বলে দিয়ে আমিই চোখে হলদে ফুল দেখতে লাগলাম।

৮

বহরমপুর বন্দীনিবাসের লৌহদ্বারে আমরা যখন এসে পৌঁছলাম, তখন বেলা দশটা হবে।

লোহার শিকওয়ালা প্রকাণ্ড গেটখানা এক পাশে সরে গিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। গেটের পর অফিস। মালপত্র এসে জমা হল অফিসে। তল্লাসী হবে। তার পর আসল বন্দীশিবিরের দ্বার খুলবে।

গোটা কয়েক সিপাই এসে সুরু করলো তল্লাসী। নামমাত্র। না করে উপায় নেই। কারণ ঐ নীরেট মগজে কী করে ঢুকবে যে, টুথ পেষ্টের টিউবের মধ্যে, সাবানের দেহাভ্যন্তরে অথবা কোটের লাইনিং-এর মধ্যে আমরা গোপনীয় পত্র বহন করে থাকি ?

তাই তল্লাসী শেষ হয়ে গেল। এবার গুরুতর বিষয়, বাসস্থান নির্বাচন। বাংলার বিপ্লবীরা তখন প্রথমতঃ মোটামুটি দু'টি দলে বিভক্ত ছিল—অনুশীলন ও যুগান্তর। তার পর ছিল ঐ এক-একটি দলের মধ্যেই বৃহৎ উপদল, হয়তো গোটা জেলা বা মহকুমা জুড়ে। আবার একটি ক্ষুদ্র শহরেই হয়তো এমনি গোটা কয়েক উপদল ছিল, পরস্পরবিরোধী। তার পর ছিল এমনি উপদলে গোটা কয়েক গ্রুপ—অমুক রায়ের গ্রুপ, তমুক দাসের গ্রুপ ইত্যাদি। এই গ্রুপ-লীডাররা অনেকটা সেনাবাহিনীর সেকশন কমাণ্ডারের মতো। হয়তো মাত্র দশ-বারো জনই তাঁর দলের সভ্য। তাহলেও তাঁর হাঁক-ডাক কম নয়। বাংলার বিপ্লব আন্দোলন যেন তাঁর দ্বারস্থ না হলে একেবারে মিইয়ে পড়ে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে, এমনি তাঁর ভাবখানা। এই গ্রুপ-বিভাগের পরও আছে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব, পছন্দ ও নির্ব্বাচন।

কর্তৃপক্ষ বন্দীদের খুশী মত সীট নির্ব্বাচনের যে অধিকার দান করেছিলেন, বন্দীরা পূর্ণ ভাবে তার সুযোগ গ্রহণ করে সমগ্র শিবিরটাই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে সংখ্যাতীত অঞ্চলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন। তাই অফিসের কেরাণীরাও জানেন যে, এঁদের দল, উপদল, গ্রুপ-লীডার, আঞ্চলিক সখ্যতা, ব্যক্তিগত পছন্দ প্রভৃতি বহু বিষয় আছে, যা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে তবে এঁরা সীট মনোনয়ন করেন। কোন্ বন্দী কোন্ দলভুক্ত কিংবা ইস্‌টার্ণ ব্যারাকের তেরো নম্বর কক্ষের বাসিন্দারা কোন্ উপদলের সভ্য, এঁরা তা বেশ জানেন ও তাই নিয়ে পরিহাস করবার সুযোগ পেলে ছাড়েন না।

প্রধান কেরাণী প্রশ্ন করলেন : আপনি কোন্ ব্যারাকে ও কোন্ ঘরে থাকতে চান ?

মানে ?—বিস্মিত হলাম : খুশী মত সীট নেয়া যেতে পারে তাহলে ?

আজ্ঞে হাঁ, বলে কেরাণী বলে যেতে লাগলেন : ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাক, ইস্‌টার্ণ ব্যারাক আর সাদার্ণ ব্যারাকে থাকেন যুগান্তর দলের বন্দীরা আর টালি শেডগুলোতে থাকেন অনুশীলনের সভ্যরা। আপনারা কি টালি-শেডে যাবেন, না—

বললাম : না, ব্যারাকে যাবো। তবে কোন্ ব্যারাকের কোন্ ঘরে সেটা ভেতরে গিয়ে দেখে আপনাদের খবর পাঠিয়ে দোব, কেমন ?

সে সময় রাজবন্দীদের মধ্যে দলীয় বা উপদলীয় চেতনা অত্যন্ত তীব্র ছিল। নতুন কেউ এলেই সাগ্রহে লক্ষ্য করা হতো তিনি কোন্ দলের, কার পরিচিত এবং কোথায় সীট নিলেন। তার পর মুহূর্ত্তের মধ্যেই সেই সংবাদ সমগ্র শিবিরে প্রচারিত হয়ে যেত মুখে মুখে যে, আজ অমুক দলের অমুক গ্রুপের এক জন এসেছে। প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই পরিচিত বন্দীরা ঝটিতি এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানান এবং যেই তাঁদের মধ্যে এক জন এসে কাঁধে হাত দিয়ে অন্যান্য সবাইকে পশ্চাতে ফেলে নবাগত কাউকে নিয়ে শিবিরের অভ্যন্তরে চলে যান, তখনই তার পরিচয় জানা যায়। পরিচিত কাউকে না পেলে তখন ভারী হাঙ্গামে পড়তে হতো, কারণ সবাই সন্দেহ সুরু করতো তাকে। সে আখ্যা পেত দিবাকর সেনগুপ্ত অর্থাৎ স্পাই রাজবন্দী নামে।

বন্দীশিবিরের ভেতরের দরজা খুলে যেতেই আমরা চার জন প্রবেশ করলাম এবং পরিচিতেরা এসে ছোঁ মেরে এক-এক জনকে নিয়ে অদৃশ্য হতে লাগলেন। আশ্চর্য্য, আমায় এসে পাকড়াও করলেন নারায়ণগঞ্জের অনুশীলনের রিভল্ট (বিদ্রোহী) গ্রুপের লীডার সুধীর চট্টোপাধ্যায়। আমার সঠিক পরিচয় তাঁর যথেষ্ট জানা ছিল আর ঢাকা জেলে একসঙ্গেই তো ছিলাম গত দু'মাস। এগিয়ে এলেন তিনি তাঁর দলীয় ঢাকা জেলের দু'টি একটি ছেলের সংবাদ সংগ্রহের জন্য। কাঁধেও একখানা হাত রাখলেন এবং সন্তর্পণে বেশ একটু এক পাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে আলাপ সুরু করলেন। ফল দাঁড়ালো এই যে, নেহাৎ ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ব্যতীত সারা শিবিরের প্রায় তিনশো বন্দী সেদিন সেই সকালে স্থির ভাবে জেনে নিলেন যে, আমি অনুশীলনের লোক, নারায়ণগঞ্জের রিভল্ট গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত।

যুগান্তর দলের নানা দল, উপদল ও গ্রুপের সদস্যেরা মুখ অন্ধকার করে যার যার কক্ষে ফিরে এলেন।

এঁদের ভুল অবশ্য ভাঙলো সেদিনই দুপুরে ভোজন-কক্ষে।

[ক্রমশঃ।

জেন অস্টেন

কেয়া দেবী

'প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস'এর রচয়িতা জেন অস্টেনের নাম সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। তাঁর জীবনী একাধারে মনোমুগ্ধকর এবং শিক্ষাপ্রদ। হ্যাম্পশায়ারে ষ্টেভেণ্টনে জর্জ অস্টেন নামে এক পাদরী থাকতেন। স্ত্রী আর অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে। সংসারে পয়সার অনটন মাঝে মাঝে হলেও সুখ-শান্তির অভাব কোন দিন হয়নি। জর্জ ও তাঁর স্ত্রীকে সবাই ভালবাসতেন। ভারী মিশুকে অমায়িক দম্পতি। স্বামী যেমন সুপণ্ডিত, স্ত্রী তেমনই সুরসিকা। তবে মিসেস্ অস্টেনের নাকের ভারী গরব ছিল। তিনি বলতেন যে, তাঁর নাক আভিজাত্যের প্রতীক। সকলের থ্যাদা, চ্যাপ্টা নাকের তিনি খুঁত ধরে বেড়াতেন। কিন্তু তাই বলে তিনি নাক উঁচু করেও থাকতেন না নাক সিঁটকাতেনও না। দু'বছর অন্তর একটি মাত্র গাউন তিনি তৈরী করাতে পারতেন। অধিকাংশ সময়ই মোটা রাইডিং ব্রীচেস পরে কাটত। পরে সেটা কেটে আবার ছেলে ফ্রান্সিসের প্যাণ্ট তৈরী হত। ফ্রান্সিস ছেলেটি ভারী চালাক ছিল। এক বার দেড় গিনী দিয়ে একটা ঘোড়া কিনে কিছু দিন পরে আড়াই গিনীতে বিক্রী করে। তখন বয়স কতই বা? বারো-তেরো। এই ছেলে পরে বৃটিশ নৌবহরের এডমিরাল হয়।

জেন তাঁর বড় বোন কাসান্ড্রাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। বড় হয়ে, যখন তাঁর সাহিত্য-ক্ষেত্রে জগৎজোড়া খ্যাতি তখনও এ ভালবাসা একটুও কমেনি। মা বলতেন যে, কাসান্ড্রার মাথা কেটে ফেললে জেনও নিজের মাথা কেটে ফেলবার জন্ত এগিয়ে দেবে। এমনই গভীর ছিল দুই বোনে ভালবাসা। মাত্র সাত বছর বয়সে জেন তাঁর বোন কাসান্ড্রার সঙ্গে অক্সফোর্ডে পড়তে যান। এক বিধবা পিসীর বাড়ী থাকতেন। সেখানে দু'জনেই ভাষণ অসুখে পড়েন। জেন প্রায় মরতে মরতে বেঁচে যান। বাড়ীতে এ খবর দেওয়া হয়নি। তাঁদের এক আত্মীয়া অস্টেন-পরিবারকে [illegible] মা তাঁদের নিতে গিয়ে দেখেন যে, মেয়েদের শুশ্রূষা করতে গিয়ে পিসী নিজে সেই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। পিসী তাতেই মারা গেলেন।

তার পর তাঁরা রীডিংএর এবে স্কুলে পড়তে যান। স্কুল পরিচালনা করতেন এক বুড়ী। ভারী স্নেহপ্রবণ, কিন্তু বুদ্ধিহীনা। এক ছাত্রী তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিল যে, ধোপার বাড়ীর কাপড়ের হিসেব রাখা ছাড়া আর কিছুই তিনি করতে পারতেন না। কিছু দিন পর পাদরী সাহেব মেয়েদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজেই বাড়ীতে শিক্ষা দিতে লাগলেন। পড়াশুনায় জেনের খুব মন ছিল। নিজেই বসে বসে সব পড়ে ফেলতেন। রিচার্ডসন, স্কট, কুপার ও ক্র্যাব তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের সুবিধা তিনি পাননি, নিজের শিক্ষার অভাব কোন দিন তিনি ভুলতে পারেননি। নিজের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে, বোধ হয় এত অজ্ঞ এবং অশিক্ষিতা কোন রমণী কখনও লেখিকা হবার দুঃসাহস প্রকাশ করেনি।

ছোট বয়স থেকেই জেন গল্প ও নাটক ইত্যাদি লিখতে আরম্ভ করেন। তখন অলীক রোমান্সের যুগ। তিনি তাই নিয়ে তাঁর লেখায় ঠাট্টা করতেন। চব্বিশ বছরের পূর্ব্বেই তিনটে উপন্যাস লিখে ফেলেছিলেন, 'প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস,' 'সেন্স এণ্ড সেন্সিবিলিটি' এবং 'নর্থাঙ্গার এবে'। তাঁর বাবা কিন্তু সে সময় এক জন প্রকাশককেও জেনের বইগুলো প্রকাশ করতে রাজী করাতে পারলেন না। মাত্র দশ পাউণ্ডে অতি কষ্টে জেন তাঁর 'নর্থাঙ্গার এবে' উপন্যাসটি বিক্রী করলেন। প্রকাশক বই কিনলেন বটে কিন্তু প্রকাশ করলেন না। লেখিকা হবার সব আশাই জেন প্রায় ত্যাগ করতে বসলেন।

কাসান্ড্রা ও জেন উভয়েই দেখতে সুন্দরী ছিলেন, তবে বড় বোনই অধিক সুন্দরী। যেন একটু রোগা আর লম্বাটে। কোঁকড়া চুল, বাদামী উজ্জ্বল নেত্র। দু'জনেরই এমন আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, সকলেই তাঁদের ভালবাসত। বহু যুবক তাঁদের বিয়ে করতে লালায়িত ছিল কিন্তু তাঁরা বিয়ে করেননি। বিবাহের চেয়ে প্রেমিকের স্মৃতিকে তাঁরা উচ্চতর স্থান দিয়েছেন। কাসান্ড্রা তাঁর পিতার এক ছাত্রকে ভালবাসতেন। উভয়ের বিয়ের কথাও হয়েছিল। কিন্তু ওয়েষ্ট ইণ্ডীজে গিয়ে ছাত্রটির পীত জ্বরে মৃত্যু হয়। জেনও এক জনকে ভালবাসতেন, কিন্তু তিনিও হঠাৎ মারা যান। দুই বোনই কুমারী থেকে গেলেন। মনের ক্ষত কারো কাছে তাঁরা প্রকাশ করেননি। ভাই-বোনের ছেলে-মেয়েদের মানুষ করেই জীবন কাটিয়ে দেন।

জেনের জীবন এদের নিয়েই। বড় ভাই এডোয়ার্ডকে এক ধনী আত্মীয় দত্তক হিসাবে গ্রহণ করেন। জেম্‌স এবং হেনরী পাদরী হন। চার্লস এবং ফ্রান্সিস নৌবিভাগে ভর্ত্তি হয়ে নেলসনের সঙ্গে নৌযুদ্ধে অংশ নেন। পরে দু'জনেই নৌবহরের এডমিরাল হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই বিয়ে করেছিলেন। ভাইপো ভাইঝিতে বাড়ী ভরে গিয়েছিল। সকলেই পিসী জেনের ন্যাওটো। খাবার সময় কাছে বসতে হবে। তাদের নিয়ে খেতে হবে। শোবার সময় আবার গল্প বলতে হবে। এমনিতে জেন অত্যন্ত অল্পভাষিণী এবং লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু বাচ্চাদের সঙ্গে সমস্ত দিন হৈ-হৈ করতে পারতেন।

গরীবদের দুঃখে তিনি ব্যথা পেতেন। নিজের হাতে তাদের জন্ত কাপড়-জামা সেলাই করতেন। অথচ আশ্চর্য্য যে, তাঁর উপন্যাস সমূহে এদের কোন উল্লেখ নেই। দরদী জেন, কলম হাতে নিলেই

রূপ রচনার রুচিরাগ
রূপের কলিকে সৌন্দর্য্যকুসুমে বিকশিত করে তোলাই এ প্রসাধনীর সাধনা। রূপ সাধকসাধিকাদের নিকট তাই চিরকাম্য এই সৌন্দর্য্যের সুরম্য সম্ভার।
মার্গো সোপ
নিম টুথ পেষ্ট
ভৃঙ্গল সুবাসিত মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল
লাবনি স্নো ও ক্রীম
কান্তা মনোমদ গন্ধসার
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা ২৯

নিষ্ঠুর সমালোচক হয়ে পড়তেন। সহানুভূতি, বেদনা রূপান্তরিত হত জ্বালায়, তীব্র প্রতিবাদে। কিন্তু তাঁর কোন উপন্যাসে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর ট্র্যাজেডি সমূহের উল্লেখ করেননি। অথচ এই নিয়ে তাঁর সমসাময়িক বহু উপন্যাস রচিত হয়েছে। এর কারণ এই যে, তিনি এ সবের উল্লেখ করতে অত্যন্ত ক্লেশ ও লজ্জা অনুভব করতেন।

জেনের এক মামাতো বোনের নাম এলিজা। ওয়ারেন হেষ্টিংসের বান্ধবী হিসেবে তিনি ইতিহাসে বিখ্যাতা। হেষ্টিংসকে লেখা এলিজার চিঠিগুলি সাহিত্যের সম্পদ-স্বরূপ। কাসান্দ্রা এলিজাকে খুব ভালবাসতেন। তাঁর বিয়ে হয় এক ফরাসী কাউন্টের সঙ্গে। ধন, রূপ গুণ, সব দিক দিয়েই যোগ্য স্বামী। কিন্তু এলিজার ভাগ্যে এ সুখ বেশী দিন সইল না। ১৭৯৪ সালে এলিজা ইংলণ্ডে বেড়াতে এসেছিলেন বাপের বাড়ী। সেই সময় ফ্রান্সে হয় বিপ্লব এবং তারই চক্রান্তে কাউন্টের শিরশ্ছেদ করা হয়। এই ঘটনা জেন ও কাসান্দ্রার মনে কতটা পীড়া দিয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়।

জেনের অধিকাংশ জীবনই কেটেছে পাড়াগাঁয়ে। দুই বিবাহিত পাদরী ভায়ের কাছে। কখনও ষ্টিভেণ্টনে, কখনও শটনে। দুই বাড়ীতেই জেন ও কাসান্দ্রা ওপর তলায় নিজেদের জন্ত একটা ছোট কুটুরী বেছে নিয়েছিলেন। যে আসবাবপত্র ড্রইং-রুমের অব্যবহার্য, তাই দিয়ে তাঁরা ঘর সাজিয়েছিলেন। শটনের ঘরের দরজায় আবার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ হত। কেউ ঘরে ঢুকতে গেলেই জেন বুঝতে পারতেন, আর তাড়াতাড়ি তাঁর রচনা কোন বইয়ের মধ্যে বা হাত-ব্যাগে লুকিয়ে ফেলতেন। ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে সেলাই আর গল্প করতে করতে হঠাৎ জেন উঠে যেতেন। ঘরে গিয়ে দু'দশ লাইন লিখে আবার ফিরে এসে সেলাই নিয়ে বসতেন। তিনি সেলাই করতেন অপূর্ব। শোনা যায় যে, তাঁর হাতের সেলাই কলের সেলাইকে হার মানিয়ে দিতে পারত।

লেখিকা হিসেবে জেনের নাম হবে, এই ছিল তাঁর বাবার মস্ত বড় আশা। সে আশা সফল হয়েছিল কিন্তু তিনি জীবিত থেকে তা দেখে যেতে পারেননি। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। জেন মনে খুবই আঘাত পান। চার বছর তিনি আর কলম ধরতে পারেননি। তার পর হঠাৎ মনে বল পেলেন। বাপের আশা পূর্ণ করতে হবে। 'সেন্স এণ্ড সেন্সিবিলিটি'র পাণ্ডুলিপি ভাল করে সংশোধন করে তিনি এগার্টন নামক এক প্রকাশককে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে বিক্রী করেন। বইটা ভালই বিক্রী হয়। জেন এই উপন্যাসের জন্ত ১৪০ পাউণ্ড পান। এতে লেখিকা হিসেবে জেনের নাম ছিল না। অর্থ পেয়ে তিনি কাসান্দ্রাকে কিছু পপলিন কিনে পাঠান। সঙ্গে এক চিঠি—"দিদি, আমি ভীষণ বড়লোক হয়ে গেছি।"

এর পর 'প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস', 'ম্যান্সফিল্ড পার্ক' এবং 'এমা' প্রকাশ করতে জেনকে কোনও বেগ পেতে হয়নি। তখন তিনি তাঁর ভাইকে সেই পুরানো প্রকাশকের কাছে পাঠান, যিনি দশ পাউণ্ডে 'নর্থাঞ্জার এবে' কিনেছিলেন কিন্তু প্রকাশ করেননি। দশ পাউণ্ড ফেরত পেয়ে প্রকাশক অতি আনন্দের সঙ্গে পাণ্ডুলিপি ফেরত দিলেন। দোকান থেকে বেরোবার সময় জেনের ভাই জানালেন যে, এই পাণ্ডুলিপি 'প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিসের' লেখিকার। প্রকাশক নিজের বেকুবিতে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

ভাই-পো ভাইঝিরা বলত, পিসীর এত নাম, কিন্তু বদলাননি তিনি একটুও। সেই আগেকার মতই আছেন। সত্যই, জেন ছিলেন প্রথমে পিসী, পরে লেখিকা। সাংসারিক স্নেহ-বন্ধনকে তিনি সাহিত্যের ওপর স্থান দিতেন।

বড়ই দুঃখের কথা যে, জেন নিজের গৌরব-সূর্য্যকে মধ্যাহ্নের উচ্চ শিখরে দেখে যেতে পারেননি। তাঁর প্রকৃত খ্যাতি হয় মৃত্যুর পর। তার কারণ সাহিত্যে দলাদলি, আর তিনি কোন দলভুক্তা ছিলেন না। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে 'পারস্যুয়েশন' লেখবার সময় তাঁর শরীর ভেঙ্গে যায়। কাসান্দ্রা তাঁকে উইনচেষ্টারে নিয়ে যান ভাল করে ডাক্তার দেখাবার জন্ত। কিন্তু সবই বৃথা হয়। শরীর আর সারে না। ১৮১৭ সালের ১৮ই জুলাই তিনি মারা যান। উইনচেষ্টার গির্জ্জায় তাঁকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে কাসান্দ্রা বলেছিলেন—"জেন ছিল আমার জীবনের সূর্য্য।" আজও জেন ইংরেজী সাহিত্য-গগনে উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে বিরাজিতা।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার মেয়ে

ছবি বসু

লোকে বলে—'বিংশ শতাব্দীর মেয়ে চালে-চলনে কথা-বার্তায় একেবারে থ' বানিয়ে দেয়।' ঠাকুমা-দিদিমারা বলেন —আমাদের কালে বাপু সাত চড়েও মুখে রা-টি অবধি ফুটত না। মা বলেন—দু'পাতা ইংরেজি পড়ে ন্যায়-অন্যায় নিয়ে অমন পুরুষালি তর্ক কেন বাছা?

আর দাদা, মামা, কাকারা? ট্রামে, বাসে ভিড় ঠেলাঠেলি করে যখন মেয়েরা ওঠেন, তখন অনেকে এঁদের সপ্রতিভতা দেখে মনে মনে তারিফ করেন আবার অনেকে বিরক্ত হন, টিটকারি দেন। কেউ বা আবার মাসিক কাগজে মেয়েদের পুরুষালি চাল-চলনের ছবি এঁকে কিংবা পয়ারের সস্তা মিলে ছড়া কেটে বেশ দু'পয়সা রোজগার করেন। কিন্তু এ হচ্ছে ১৯৫১ সালের বাংলা, যে বাংলায় খেটে-খাওয়া মেয়ের সংখ্যা বড় কম নয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগারের কথাটা এত দিন ছিল পুরুষেরই একচেটিয়া, কিন্তু আজকাল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের বেশ বড় অংশ স্কুল-কলেজে, আপিস-দপ্তরে জীবিকার্জ্জনে কাজে নিয়োজিত আছেন আর পুঁথিগত শিক্ষার সুযোগ যাঁরা পাননি এমন কত মেয়ে নানা রকম কুটীর-শিল্পে, দর্জ্জির দোকানে রেডিমেড কাজের অর্ডার জুগিয়ে বেকার স্বামী আর ছেলে-মেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে সংসার মাথায় করে আছেন,—এমন দৃষ্টান্ত বড় কম নয়।

কিন্তু একশ'-দেড়শ' বছর আগেও ছিল এই বাংলা দেশ—ছিল সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা—যখন রাস্তায় এমন সাড়ীর বন্যা চোখে পড়ত না। আমাদের মা-ঠাকুমার মা-ঠাকুমারা থাকতেন অন্দরমহলে, তার বাইরে নয়। তাঁরাও সংসার করেছেন, স্বামী-পুত্রের কল্যাণ আবার সেই সাথে পাঁচ জনের মঙ্গল চেয়েছেন, কিন্তু তাঁরা সঠিক ভাবে কি চাইতেন তা ত আমরা জানি না। তাঁদের ওপর যে সামাজিক অত্যাচার চলত তার প্রতিবাদে শুধুই কি তাঁরা গুমরে মরতেন? আজ বিংশ শতাব্দীর এই খর মধ্যাহ্নে দাঁড়িয়ে সেই ঘুমভাঙার দিনগুলোর কথা স্মরণ হয়।

ভারতবর্ষে ইংরেজ বেশ পাকাপাকি ভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে বসে বোম্বাই, মাদ্রাজ আর কলকাতা এই তিনটি সহরকে কেন্দ্র করে। তার মধ্যে কলকাতা অর্থাৎ এই বাংলা দেশেই বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল। এবার আমরা গোলাম বনলাম—শুধু বাহ্যতঃ নয়, অন্তরেও। চিন্তাধারায়, শিক্ষা-দীক্ষায় বাঙ্গালী জাত হিসাবে গর্ব করবার মত আমাদের কিছুই আর রইল না। বাঙ্গালী সমাজের তৎকালীন অবনতির অনেক বিশদ চিত্র রয়েছে বিশিষ্ট লেখকদের লেখা কেতাবে—"আলালের ঘরের দুলাল", "হুতুম প্যাঁচার নক্সা", "সংবাদপত্রের সেকালের কথা", "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" আরও অনেক পুঁথি-পত্তরে। এই অধঃপতিত বাঙ্গালী সমাজে মেয়েরা ছিলেন প্রধান বলি। তাই সতীদাহ, কৌলিন্যপ্রথা, কন্যা বিক্রয়, বিধবার প্রতি অবিচার অতি স্বাভাবিক ভাবেই সমাজে প্রচলিত ছিল। ১৮১৮ সালের সরকারী বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ১৮১৫ সাল থেকে ১৮১৮ সাল—এই তিন বছরে ২,৩৬৫ জন বিধবা সহমরণে যায়। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা ১৮৩৬ সালে এক জন কুলীনের ৬০।৬২ বা ততোধিক বিয়ের বিবরণ দিয়েছেন। সেদিনের প্রচলিত কাহিনী থেকে জানি—শ'-সওয়াশ' বিবাহের গৌরব করতে পারতেন এমন কুলীন সন্তানের অভাব ছিল না। সেকালে প্রচলিত অগণিত কদাচার, কন্যা বিক্রয়, উপপতি-উপপত্নী রাখার ব্যবস্থা, শান্তিপুর, ও চুঁচুড়ার স্ত্রীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী ও অনাচারের পরিচয়, তদানীন্তন প্রগতিপন্থী কাগজ 'সংবাদ কৌমুদী', 'জ্ঞানান্বেষণ' 'সমাচার দর্পণ', 'বেঙ্গল হরকরা', 'রিফরমার', 'সংবাদ সুধাকর' প্রভৃতির পাতায় বিশদ ভাবে মিলবে। কুলীনরা কি ভাবে স্ত্রীর অলঙ্কার চুরি করে পালাত, বিয়ের পরদিন থেকেই কি ভাবে অনেক স্ত্রী স্বামিসঙ্গ থেকে বঞ্চিত হত, কি ভাবে কুলীন ব্রাহ্মণের কাছে বিয়ে দিতে গিয়ে বাপ-মা ভিখারীর পর্যায়ে এসে পৌঁছাত তার নির্মম কাহিনী সেদিনের প্রগতিশীল কাগজগুলিতে লিখিত আছে। গরু-ছাগলের মত মেয়ে বিক্রী একটি বেশ লাভবান ব্যবসা ছিল। এ বিষয়ে একটি মজার গল্প শুনুন। কয়েক জন কন্যা-বিক্রেতা একটি বিপত্নীক ব্রাহ্মণের সঙ্গে একটি সুন্দরী মুসলমান কন্যার বিয়ে দিয়ে চারশ' টাকা আদায় করে। ব্রাহ্মণ কুটুম্বদের গৃহিণীর পাকান্ন ভোজন করিয়ে এক বছর ঐ স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-কন্না করেন। এক দিন লাউ রান্না করতে গিয়ে মেয়েটি অভ্যাস বশতঃ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—'কদ্দু ছে কেয়া ছালান হোগা'। এ কথা শুনে সবাই ঘটনাটি জানতে পারে, ব্রাহ্মণও সাথে সাথেই স্ত্রীকে ত্যাগ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে এমনি এক আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতির সন্ধান ইতিহাসে মেলে, যে ইতিহাসে শুধুই দুর্নীতি, শুধুই অগৌরব। কিন্তু এই যুগধারাকে রূপান্তরিত ক'রে এক স্বাধীন আত্মপ্রতিষ্ঠ নবযুগের সন্ধান দেন রাজা রামমোহন। এত দিন পর্য্যন্ত কোম্পানীর অনুগ্রহপুষ্ট লোভাতুর বাঙ্গালীর কাছে পাশ্চাত্য ধন-ঐশ্বর্য্যের উচ্ছিষ্টটাই ছিল লোভের। বাস্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচয়ও তাঁদের ঘটেনি। কিন্তু রামমোহনের চোখে পড়ল ইউরোপের মধ্যবিত্ত সমাজের ব্যক্তি-স্বাধীনতার রূপ, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবোধ আর এক দিকে ভারতের তৎকালীন পঙ্গু সমাজ, অসংখ্য অত্যাচার, জাতিবর্ণধর্মের নির্মম নিষ্পেষণ। প্রগতির সাধক রামমোহন হিন্দু সমাজের প্রচলিত অসংখ্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ১৮১৮ সাল হতে সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য আন্দোলন সুরু করেন।

রামমোহনের আগে সতীপ্রথার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন খৃষ্টান মিশনারীরা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার বুকানন, অধ্যাপক কোলব্রুক ও কেরী হিন্দু পণ্ডিতদের সহায়তায় সতীপ্রথা যে হিন্দুধর্মবিপরীতগামী, তা' প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন।

অবশ্য রামমোহনের বিরুদ্ধ পক্ষও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। ধর্মসভার নেতা রাজা রাধাকান্ত দেবের দল কাগজে কলমে, প্রচারে ইহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাতে থাকেন। যা হোক, সতীদাহের মত সামাজিক এই দুর্নীতিটি রামমোহন এবং প্রগতিশীল আরও অনেকের চেষ্টায় রোধ করা হয়। এই পরম কল্যাণের জন্য বাংলার সমগ্র নারী-সমাজ রামমোহনের কাছে চূড়ান্ত ভাবে ঋণগ্রস্ত।

সতীপ্রথা রোধের সাথে সাথেই স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলন সুরু হয় এবং রামমোহনও ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোধায়। অন্যান্য ব্যাপারের মত এ ব্যাপারেও বিরুদ্ধতা ছিল গোঁড়া রক্ষণশীল এক শ্রেণীর পুরুষদের থেকে। তাঁদের যুক্তি ছিল যে, একমাত্র পতিসেবাই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম, কিন্তু লেখাপড়া শেখালে সেই "বিদ্যাবতী বিবিরা" যে ইউরোপীয় "বিবিদের" মত সাত-আট বার বিবাহ না করবেন এমন কি নিশ্চয়তা আছে? ইত্যাদি।

এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে ইউরোপীয়, বিশেষ করে মিশনারীদের অবদান লক্ষ্যণীয়। উদ্দেশ্য এঁদের যাই হোক না কেন, বাংলা দেশে স্ত্রী-শিক্ষার গোড়ার কথা আলোচনা করতে গেলে এঁদের অবদানের কথা উল্লেখ করতে হবে বই কি। রেইনি সাহেবের মতে ১৭৬০ অব্দের সমকালে মিসেস্ হেজেস একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ এটাই প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। অনেকের মতে মিসেস্ পিট নামে এক জন ইউরোপীয় মহিলা এ দেশে মেয়েদের স্কুল স্থাপনে প্রথম অগ্রণী হন। কাজেই মিসেস হেজেসের স্কুল না মিসেস পিটের স্কুল কোন্‌টা প্রথম এই নিয়ে মতভেদ আছে। ১৮১৭ সালে "স্কুল সোসাইটি" স্থাপিত হওয়ার সাথে সাথে অনেক তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়েও মেয়েদের স্কুল অনেক জায়গায় স্থাপিত হয়। ১৮১৯ সালে "ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি" নামে একটি নতুন সমিতি মেয়েদের স্কুলের ভার নেয়। ক্রমশঃ বাংলা দেশের জেলায় জেলায় বেসরকারী অথবা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তার পর কলেজ এবং কলেজ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান ভাণ্ডারে বাঙ্গালী মেয়ের নব নব অভিযান বাস্তবিকই বিস্ময়কর!

১৯৫১ সালের বাঙ্গালী তরুণী আজ তাঁর মা-ঠাকুমাদের গণ্ডীবদ্ধ জীবন পেরিয়ে অনেক কদম আগে চলেছেন নিশ্চয়ই কিন্তু আজও সমাজে পুরুষের সাথে সমানাধিকার এবং যোগ্য মর্য্যাদা মিলেছে কি?

'ত্রয়ী'

অঞ্জলি দেবী

রাত্রি দ্বিপ্রহর,
কি জানি কিসের শব্দে ভেঙ্গে গেল মোর ঘুমঘোর।

সম্মুখে পিছনে চাহি,
করতলে দু'নয়ন বারম্বার ঘষি
চমকিয়া উঠিনু যে বসি।
কি দেখিনু ?
শুভ্র শয্যা 'পরে
তিনটি রমণী মূর্ত্তি অতি ধীরে ধীরে
নীরবে বসিল আসি আনত নয়নে।
চাহি প্রথমার পানে
শুধাইনু বিস্ময় ভরে
কে তুমি গুণ্ঠনবতী,
কোথা হ'তে এলে ?
কভু কি দেখেছি তোমারে ?
কুণ্ঠিত আননখানি দ্বিধা ভরে তুলি
কপোলে কুন্তলে ভালে বুলায়ে অঙ্গুলি
কমকণ্ঠে কহিলা আমারে :
'ভাল করে চাহ মোর পানে
সরাইনু গুণ্ঠনে।
স্মৃতির সাগরখানি করিয়া মন্থন
অতীতের তীরপ্রান্তে থাম কিছুক্ষণ,
তার পর দেখ দেখি
কে আমি অপরিচিতা।'
হৃদয়-রঙ্গমঞ্চে উঠিল জ্বালিকা
স্মৃতির স্নিগ্ধ দীপখানি
অতি ধীরে জ্বালাইনু আনি।
কহিনু ব্যাকুল স্বরে :
'চিনেছি গো তোমা,
তুমি মোর ফেলে আসা দিন
আধ-আলো আধ-ছায়া ভরা
তুমি মোর শৈশব-কৈশোর,
জীবন-লতার তুমি প্রথম কলিকা।
প্রথম বিরহ তুমি, তুমি মোর প্রথম মিলন,
কত স্তব্ধ ক্ষণ কত মুখর লগন
তোমা মাঝে হয়ে আছে লীন।'
মৃদু হাসি, আলিঙ্গিয়া অপর দুই জনে
মনে হ'ল সজল নয়নে
কোথা চলি গেল।
চাহিনু দ্বিতীয়া পানে,
মুখ প'রে নাহি আবরণ
অনিমিষে চাহি আছে
(মোর) দু'নয়নে রাখি দু'নয়ন।
পলকে চিনিনু ;
ইচ্ছা হ'ল হাসি
ইচ্ছা হ'ল ফেলি মোর
নাহি ফেলা যত অশ্রুরাশি।
বাড়াইয়া দুই হাত
ধরিনু তাহার হাতখানি
প্রাণপণে চাপি।

অতি পরিচিত স্পর্শ
প্রত্যহের প্রতিক্ষণ অঙ্গে অঙ্গে মোর
ছুঁয়ে যায় এ যে
এ যে মোর বর্ত্তমান ছবি।
তনু তনুলতাখানি
বৈশাখের খর রৌদ্রে বিশুষ্ক মলিন,
কুঞ্চিত কোমল কৃষ্ণ ঘন কেশভার
প্রচণ্ড বৈশাখী ঝড়ে কাঁপে বার বার
অঙ্গের শুভ্র বরণ
নিদাঘের রুদ্র তাপে হইয়াছে আতাম্রুরুচি
বিবর্ণ অধরপ্রান্তে দেখা যায় স্বল্প হাসিটুকু
অতি স্নিগ্ধ-শুচি।
শুধাইনু, 'কি বলিবে মোরে
বল করি ত্বরা,
তোমার সময় অল্প।
অদৃষ্ট শিখর হ'তে বহি আসে মহাকাল স্রোত
অতীত সমুদ্রগর্ভে হইতে বিলীন।
বিজনে বসিয়া দুটি কথা কহিবার
তোমার সময় নাহি আর।'
দৃপ্ত ভঙ্গিমায়
অকুণ্ঠিত শিরখানি নিজ মহিমায়
উচ্চে তুলি, গভীর গম্ভীর স্বরে
কহিল আমারে,
'জান তুমি
বর্ত্তমান আমি,
মধ্যাহ্ন গগন হ'তে বাস্তব তপন
ছড়াইছে দীপ্ত রশ্মি মোর মুখ 'পরে,
অতীতের মায়ার কাজল
লেপি নাই নয়নে আমার
নাহি মোর কোন সজ্জা কোন লজ্জা ভয়।
নহি আমি কুহেলিকাময়।
অদেখা অদৃষ্ট নটীর
চপল নূপুর তাল নাহি মোর পায়ে
কনক রতন আভরণ
নাহি মোর গায়ে।
আমি অচঞ্চলা,
জীবন-সংগ্রাম ক্ষেত্রে
আমারে পাইবে তব পাশে
সতত সঙ্গিনী।
তোমার বিষাদভার লই নিজ মাথে
তব হাত ধরি দুই হাতে,
তোমার সুখের স্রোতে করি যে গাহন
হাসি অকারণ।
ভবিষ্যৎ অতীতের জলধারা মাঝে
আমি যে মধ্যমা,
ফুলে ফলে শস্যভারে সাজাই পৃথীরে
করি নিরুপমা।

বক্ষে সাহস ধর
চক্ষে দীপ্ত শিখা
চাহ দেখি মোর মুখপানে
পড়, ভালে কি রয়েছে লিখা।
তার পর চল মোর পথে
দুরন্ত অশ্বরশ্মি দৃঢ় করে ধরি
সবেগে চালাইয়া দাও তব জয়-রথে।'
শেষ হ'লে বলা
ধীর শান্ত পাদক্ষেপে আসি মোর পাশে
বসিল নিশ্চুপে
আরও যা না-বলা বাণী ছিল মোর তরে
কহিল তা, নয়নের গূঢ় মূক ভাষে।
এইবার ফিরিয়া চাহিনু
তৃতীয়ার পানে।
আধ-ঘুম আধ-জাগরণে,
আধ-হাসি আধ-অশ্রু দিয়ে
যেন তার তনুখানি গড়া।
সূক্ষ্ম নীলাঞ্চলে
আনত আননখানি পরিপূর্ণ ঘেরা।
'অয়ি অদৃষ্ট সুন্দরি!
এ হেন গুণ্ঠনে
(কেন) কুণ্ঠিত করেছ তব
অপূর্ব্ব আননে?
তোমারে সাজে না এ ত,
তুমি রাজনটী,
ভাগ্যের রাজ-দরবারে নিত্য নৃত্য কর।
অথবা এ মিথ্যা ছল,
অঞ্চলে আবরিয়া মুখ
মোর সুখ দুঃখ আশা নিরাশার
বারংবার
দ্বন্দ্ব বুঝি দেখিবারে চাহ,
অলক্ষ্যে হাসিয়া কৌতুকে?'
এই বলি আগাইয়া গেনু
কিন্তু ব্যবধান
আগে-পিছে রহিল সমান।
হেলাইয়া চম্পক অঙ্গুলি
থামিতে বলিল মোরে।
তার পরে
নৃত্য হ'ল সুরু।
হাস্যময়ী, লাস্যময়ী, নৃত্যপটীয়সী
বিভোর ভাবের ভরে নাচিতে লাগিল।
মোর বক্ষ দুরু-দুরু,
অজানা শঙ্কায় আর অজ্ঞাত পুলকে।
সেই তালে তালে
পলে পলে
আপন সত্তারে গেনু ভুলি।

মনে নাই
কত দীর্ঘ সময়ের পরে
হয়ত বা যুগ-যুগান্তরে
হঠাৎ চাহিনু মোর দু'টি চক্ষু মেলি।
অন্তর কম্পিত হ'ল
সম্মুখে আমার
কি বিশাল কি গভীর
পরিখা আঁধার!
পার হ'তে হবে তারে
ঐ যে অপর পার্শ্বে, উচ্চে গিরিচূড়ে
তখনও নাচিছে সুন্দরী,
তখনও ছলনাময়ী অবিরাম গতি
অক্লান্ত চরণ।
সতত সঙ্গিনীরে করিয়া স্মরণ
ঝাঁপ দিনু আমি।
বহু ক্লেশে বহুক্ষণ পরে
উঠিনু অপর পারে।
মোরে দেখি নর্ত্তকীর নৃত্য গেল থামি।
চাহিয়া দেখিনু
অনাবৃত আননের অনিন্দ্য সে ছবি
বলিলাম, 'ওগো ভাগ্যদেবি,
তোমারে ডরি না আমি,
ভুলি না তোমার মায়ায়।
নিঃশেষে তোমারে আজি জয় করিবার
শক্তি আছে মোর।
যেথা হ'তে আস তুমি,
যেথা থাক,
যেথা চলে যাও,
সেই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ব্যাপি
থাকি আমি।'
হাসিয়া মিলাল সুন্দরী।
প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীর
ক্লান্ত ভালে মোর
ছোঁয়াইল সস্নেহ পরশ।
পূর্ব্ব দিগন্তে
তমসার বক্ষ ভেদি তরুণ অরুণ
প্রকাশিল আপন গৌরবে
ছাড়িয়া নিশার শয্যা গেনু বাতায়নে,
পড়ে মনে,
ভুলে গেছি আরও কত কি যে
আপনার মাঝে,
আপনারে দেখা মোর সাঙ্গ হ'ল না যে।
থাক থাক দূরে থাক
সব কিছু আজ,
ভূলুণ্ঠিত করি নিজ শির, রিক্ত প্রণামে
নমিলাম বিশ্বস্রষ্টে।

মেয়েদের রান্নাঘরে ফিরে যাওয়া উচিত

শ্রীপ্রীতিকণা চট্টোপাধ্যায়

মেয়েদের রান্নাঘরে ফিরে যাওয়া উচিত কি না, সে প্রশ্ন করবার আগেই মনে পড়ে যায় মেয়েদের সুস্থ রমণীয় রূপ রান্নাঘরের রসনালুব্ধ পরিবেশের মধ্যে, তাদের নিপুণ হাতের সযত্ন পারিপাট্যে যেমন পদ্ম বিনা সরোবরের শোভা, সন্তান বিনা যেমন রমণীর শোভা, বিগ্রহ বিনা যেমন মন্দিরের শোভা হয় না, তেমনি রন্ধনশালার যে একটা সুন্দর, স্বতন্ত্র মাধুর্য্য আছে, গৃহিণী বিনা সেটাও যায় নষ্ট হয়ে।

জনমুখর কর্ম্মময় এই বিরাট পৃথিবীতে নরনারীনির্বিশেষে মানুষ মাত্রেরই কর্ম্মক্ষেত্র সুবিস্তৃত। পুরুষ ও নারীর শারীরিক ও মানসিক পার্থক্য অনুসারে তাদের কর্ম্মপদ্ধতির পার্থক্যও নির্দ্ধারিত হয়ে আছে অতীতের আবহমান কাল থেকে। একে উপেক্ষা করবার সাধ্য কোন মানুষেরি নেই। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার প্রেরণায় মেয়েরা পুরুষের সমকক্ষ হওয়ার জন্য অত্যন্ত বেশী সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এই জ্ঞানলাভ করে বর্ত্তমানে মেয়েরা পুরুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। লেডী ডাক্তার, নারী পুলিশ, মেয়ে প্রফেসর, নারী সৈনিক, এমন কি মেয়ে ইঞ্জিনিয়ারও হয়েছেন কিন্তু পরিবর্ত্তে কি কোন পুরুষ এসেছেন সাংসারিক কাজে এগিয়ে? কিন্তু সেটা কি এতই অবহেলা ও উপেক্ষার বস্তু? তার মধ্যে গৌরব ও সুনাম কিছু নেই যাতে দেশের ও দশের মাঝে পরিচিতা হওয়া যায়। কিন্তু তবুও এ কথা মানতেই হবে যে, পৃথিবীর প্রয়োজন মেটাবার আগে সংসারের দৈনন্দিন নিত্য-প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটিগুলি অপরিহার্য্য সকল মানুষের জীবনে; শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় নয়, সংসারের চাহিদার তাড়নায় অনেক মেয়েকেই কেরাণী-জীবন গ্রহণ করতে হয়েছে বর্ত্তমানে। কিন্তু তার চেয়েও বড় প্রয়োজন রান্নাঘরে। যেখানে কর্ম্মক্লান্ত স্বামীর আহার্য্য প্রস্তুত করা, শিশুদের মনোমত সামান্য কিছু মিষ্টান্ন নিজ হাতে তৈরী করা—গৃহদেবতার ভোগ রান্না এবং অতিথি-নারায়ণের সেবার জন্য স্থান প্রশস্ত ও একান্ত অপরিবর্জ্জনীয়। সেখানে তো রান্নাঘর ছেড়ে মেয়েদের বাইরের কাজে সব সময় আত্মনিয়োগ করলে চলবে না? সকল সাহিত্যে ও কাব্যে নারীর স্থান রন্ধন-গৃহে। যুগে-যুগে, কালে-কালে নারী গৃহিণী, জননী, ভগিনী। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রফুল্ল, রবীন্দ্রনাথের সুচরিতা, শরৎচন্দ্রের ভারতী ও বন্দনা সকলেই উচ্চশিক্ষিতা কিন্তু সগৌরবে রন্ধনশালায় অধিষ্ঠিতা। নারী-মনের সহজ, সরল ও স্নেহময় পবিত্র মূর্ত্তি মনের মাঝে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এখানেই। নারীর রমণীয় মূর্ত্তি বিকশিত হয় রন্ধন-গৃহের সযত্ন পরিচর্য্যায়। রমণী গৃহলক্ষ্মী হয় তখনি যখন সে স্বহস্তে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনাদি পরম যত্ন সহকারে পরিবেশন করেন প্রিয়জনদের মাঝে।

সামরিক কাজে বা চাকুরীক্ষেত্রে নারীর দৈহিক ও মানসিক বলের অভাবই প্রধান অন্তরায়। রন্ধনশালার পরিশ্রম মুছে যায় দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের মাঝে। বিশ্রাম মানে এ ক্ষেত্রে শুধু ঘুমিয়ে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার কথা বলছি না। সংবাদপত্র পড়ে বা সুবিখ্যাত লেখকের বই পড়ে সময় কাটানোর নামও তো বিশ্রাম।

কিন্তু দেখুন, দশটা-পাঁচটায় অফিস করে যখন বাড়ী ফেরা যায় তখন মস্তিষ্কের বিরাম চাওয়া স্বাভাবিক। শুয়ে বা বসে রেডিও শোনা ছাড়া তখন যেন অন্য কোন কাজ করতে মন সাড়া দেয় না। যে সব অফিস-প্রত্যাগত মেয়েরা কেবল মাত্র মনের জোরে বা অভাবের তাড়নায় অন্য কাজ করতে যান—তাঁরা অল্প দিনেই শ্রান্ত হয়ে পড়েন—শুধু দেহে নয় মনেও এবং অক্ষুধা ও অজীর্ণ রোগে তাঁরা দিন দিন শীর্ণ হতে থাকেন। নারীদেহের যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য বা লালিত্য তাও যায় সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে। পাণ্ডুর কৃশতা ও একটা নীরস ভাবে ক্ষীণ দেহটি ক্রমে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। দেহের সঙ্গে মনের সংযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দেহের সঙ্গে মনও যায় ভেঙে এবং উৎসাহ হয়ে যায় ম্লান—তখন অফিসের কাজে আসে বিরক্তি এবং রান্নাঘরের কাজ করবার ইচ্ছা ও উপায় দু'টোই হয় অন্তর্হিত।

আজকাল অনেকেই স্বামি-স্ত্রী একসঙ্গে চাকরী ক'রে পাচক বা পাচিকার ব্যবস্থা করছেন—কারণ চাকরী ও রান্না দু'টো বজায় রাখা কোন মেয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়। সেই কারণেই শিশুদের পরিচর্য্যার ভারও চলে গেছে মাহিনা-করা লোকের হাতে। কিন্তু এতে অনর্থক অপব্যয় ছাড়া কি হয় বলুন তো? যাঁদের কষ্ট ক'রে অর্থ উপার্জ্জন করতে হয়—যত্নের অভাবে তাঁদেরই ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য যায় নষ্ট হয়ে। বর্ত্তমানে খাদ্য-সংকটের দিনে আপনি যদি স্বোপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা পাচক নিযুক্ত করেন, তাতে অনেক আহার্য্য দ্রব্য বাহুল্য হয় অথচ আপনারই ছেলেমেয়েরা ঠিক মত তত্ত্বাবধান ও পরিবেশনের অভাবে পেট ভরে খেতে পায় না। তাতে তাদের মানসিক অশান্তি ও দৈহিক স্বাস্থ্য যায় নষ্ট হয়ে। ছোট ছোট শিশুরা যখন প্রথম ভাত খেতে শেখে এবং যারা অপেক্ষাকৃত বড় তারা স্কুলে যাবার আগে যদি মায়ের হাতের সাজানো অন্ন-ব্যঞ্জনাদি খেতে না পায় তাহলে তাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি হয় কি? এক জন অনাত্মীয় কর্ত্তব্য-কঠিন আন্তরিকতাশূন্য পাচকের হাতে আপনার স্নেহময় ছেলেটি হয়ত রসনার অতৃপ্তিদায়ক তরকারীটি খেতে চাইল না। মায়ের মত কেউ কি আর তখন সযত্নে আদর করে অন্য কোন পছন্দ মত তরকারীটি দিয়ে খাইয়ে দেবে? তার পরিবর্ত্তে হয়ত অর্দ্ধভুক্ত শিশু চোখের জল মুছতে মুছতে উঠে যায়—মা তখন অফিসের ট্রাম ধরতে ব্যস্ত। তার পর দুপুরে মা যখন ফ্যানের তলায় অফিসের কাজে নিমগ্না, তখন বাড়ীতে ঝিয়ের হাতের পাখার হাওয়া খেতে খেতে নিদ্রা-অনিচ্ছুক শিশু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। অবশেষে দাসীর মৃদু ধমক খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন কে দেবে তার ছোট্ট কচি নরম অশ্রুসিক্ত কপোলে একটি সস্নেহ চুম্বন? কে করবে তার শিশু-মনের মাকে কাছে পাওয়ার আকুল আগ্রহের প্রতিকার? আবার রাত্রে যখন শিশু সেই পাচকেরই হাতের রান্না খেয়ে ঝিয়ের কাছে ঘুমোতে যাবে, অফিস-প্রত্যাগত মা তখন হয়ত পরিশ্রান্ত দেহভার এলিয়ে দিয়েছেন সোফায়।

মেয়েরা যদি রান্নাঘরের ভার ছেড়ে দেন অপরের হাতে, তাতে ক্ষতি আছে কিন্তু লাভ নেই। জিনিষপত্র নষ্ট, ছেলেমেয়েদের অতৃপ্তি ও স্বাস্থ্যহানি। স্বামী এবং বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ী তত্ত্বাবধানের অভাবে ক্ষুধার সময় টি ঁপছন্দ মত জিনিষটি না পেয়ে অতৃপ্তিবোধ করেন, এবং মেয়েদের নিজেদেরও তাতে মানসিক শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বাজারের ভার চাকরের হাতে, রান্নার ভার পাচকের

হাতে, এবং ছেলেমেয়েদের ভার ঝিয়ের হাতে—সমগ্র সংসারটাই চলে গেল পরের হাতে, তাতে শান্তি বজায় থাকে কি করে? এবং বর্ত্তমানের এই প্রবল অর্থসঙ্কটের দিনে ছেলেমেয়ের স্কুল-কলেজের মাহিনা, নিজেদের মনোরঞ্জনের জন্য মাঝে মাঝে সিনেমা-থিয়েটার, তার পর সংসার বজায় রাখবার জন্য ঠাকুর, ঝি-চাকর রাখা এবং সংসারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা কেমন করে সম্ভব? অথচ মেয়েরা যদি রান্নার ভার নিজেদের হাতে রাখেন তাহলে ঠাকুর, ঝি কিছুরই দরকার হয় না। এতে সংসারে শ্রী বজায় থাকে—ছেলেমেয়েদের মুখেও হাসি ফোটে—বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ী শান্তি পান—অফিস থেকে ফিরে স্ত্রীর হাতের সযত্ন-রচিত খাবার খেয়ে স্বামীও তৃপ্তি অনুভব করেন।

পুরাকালে রন্ধনশিল্পের অতীব সুখ্যাতি ছিল মহাভারতের পাঞ্চালী দ্রৌপদীর। তাঁর অভূতপূর্ব্ব রন্ধন-চাতুর্য্যের জন্যই বোধ হয় তিনি পঞ্চস্বামী এবং সখা শ্রীকৃষ্ণের মনোরঞ্জন করতে পেরেছিলেন।

পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, রন্ধনগৃহের কাজ সেখানেও কম গৌরব ও আনন্দপূর্ণ নয়। জার্ম্মাণ দেশের লেখক এরিখ মারিয়া রেমার্কের বিখ্যাত বই All Quiet on the Western Front এ পাউলের দিদিকে দেখা যায় রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত—রুগ্না জননীও বিছানা থেকে উঠে আসেন ছেলের পছন্দ মত খাবারগুলি নিজ হাতে তৈরী করে দেওয়ার জন্য—যা পাউলের সামরিক জীবনে পরম আনন্দ ও আস্বাদের পাথেয়।

স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে মেয়েরা সকলকে এই একটি মাত্র জিনিষে মুগ্ধ করতে পারে—নারী জাতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই রন্ধন-নিপুণতা। আদর্শ পুরুষ হবেন বীর ও কর্ম্মঠ এবং আদর্শ নারী হবেন নম্র, রন্ধন ও গৃহকর্ম্মনিপুণা।

কিন্তু এ কথায় এই বোঝায় না যে, সমগ্র মানব জাতির উৎকৃষ্ট সাফল্য যে বিদ্যার্চ্চনায়—তাকে আমি অস্বীকার করছি। জন্মাবধি পুরুষ থাকেন বিদ্যারই সাহচর্য্যে এবং সেই বিদ্যাশিক্ষারই প্রসাদে এবং কর্ম্মোদ্যমে তিনি উন্নতি লাভ করেন। কিন্তু নারী যে বিদ্যার্জ্জন করবে তা মনের প্রসারতা লাভ এবং সন্তানদের শিক্ষার অনেকাংশে নির্ভরতার জন্য। অবিবাহিতা মেয়েরা যখন পিত্রালয়ে থাকে তখন তারা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন থাকে এবং বিদ্যাশিক্ষার পথ অনেকটা সুগম থাকে। তখন তারা সাধারণ ভাবে বাড়ীতে বসে ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী বা সংস্কৃত কিছু কিছু শিক্ষা করতে পারে। যাদের সুযোগ ও সুবিধা আছে তারা স্কুল-কলেজেও শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে কিন্তু সে বিদ্যাশিক্ষায় মুখ্য উদ্দেশ্য যেন না হয়ে ওঠে ভবিষ্যতে চাকুরীক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করা। কারণ বর্ত্তমানে বেকার সমস্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে চাকুরীক্ষেত্র আরও সঙ্কীর্ণ না করে মেয়েদের আর ও-ক্ষেত্রে না নামাই মঙ্গলজনক। বিবাহের পর বিদ্যাশিক্ষা করা হয়ত অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ বাড়ীর কর্ত্রা অপেক্ষা বধূদের হাতে রান্নাঘরের দায়িত্ব বহুলাংশে নির্ভর করে। বিবাহের পর মেয়েদের সাধারণ ভাবে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্না হতে হয়। এবং একটা সংসারের পরিপূর্ণ গুরুভার যত দিন না সে আংশিক ভাবে বহন করবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে, তত দিন পিতামাতার সে মেয়ের বিবাহ দেওয়া উচিত নয়—কারণ রন্ধনকার্য্যকে শিল্প বলা যায়, এতে আনন্দ ও দায়িত্ব কোন অংশে কম থাকে না। অপ্রাপ্ত-বয়স্কা মেয়েদের যদি রান্নাঘরের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় সেটাও কম ক্ষতিকর নয় তাদের পক্ষে। পূর্ব্বেই বলেছি, রান্নাঘরের কাজ খুব দায়িত্বপূর্ণ, সে ভার গ্রহণে যারা অক্ষম তারা সহজেই শ্রান্ত এবং নীরস-হয়ে পড়ে। আবার যথাসময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রান্নাঘরের ভার মেয়েরা যদি নিজ হাতে না পায় এতে অনেক মেয়ের সুপ্ত ইচ্ছা সফল না হওয়ার জন্য অতি সঙ্গোপনে ক্ষীণ একটা মানসিক অতৃপ্তিতে ভরে ওঠে দিনের মুহূর্ত্তগুলি।

বিদেশ-প্রত্যাগত স্বামী বা পুত্র তাঁর স্ত্রী বা জননীর হাতের সযত্ন-রচিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি খেয়ে কত যে তৃপ্তিলাভ করেন তা বর্ণনায় প্রকাশ করা যায় না। শরৎচন্দ্রের মানসপুত্র বিপ্লবী সব্যসাচী বন্ধুর পথে, দুর্য্যোগের পথে তাঁর যাত্রা সুরু করবার আগে ভারতীর হাতের রান্না খাওয়ার লোভটুকু, আনন্দটুকু ছাড়তে পারলেন না। গৃহী, ত্যাগী, বিপ্লবী সকলের কাছেই প্রিয়জনের স্বহস্তে প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জনাদির সুন্দর স্বাদটুকু সমান উপভোগ্য। রান্নাঘরে মেয়েদের লক্ষ্মীশ্রী-মণ্ডিত রূপ পুরুষের প্রাণেও কম আনন্দের উপাদান জোগায় না।

উপেনদা কি ভণ্ড ছিলেন?

"উল্লাস ভায়ার সঙ্গে আলাপের দু'-এক দিন পরে স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক অদ্ভুত বেশে দেখা দিলেন। তাঁর শ্রীচরণ দু'খানি ছিল পাদুকাহীন। শ্রীঅঙ্গের অধোভাগে ছিল, মুক্তকচ্ছ ক'রে পরা গৈরিক বাস; তদূর্দ্ধে গৈরিক পাঞ্জাবী, আর সযত্নে মুণ্ডিত-মস্তকে ছিল টিকী। দাঁড়ী-গোঁফ যে ছিল না, সে কথা বলাই বাহুল্য। এ-হেন ভণ্ডামীর ঠাট দেখে ভক্তি উথলে না উঠলেও, (সত্য বলতে কি, বরং ভয়ঙ্কর বিটকেল ব'লে মনে হ'লেও); একটুখানি আলাপের পর মনে করতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, বাংলাদেশে গুপ্ত সমিতির সভ্য হবার মানুষ যদি কেউ থাকে ত ইনিই তাঁদের উপযুক্ততম। আলাপের পর দেখেছিলাম, অন্য বিষয়ে যেমন, ভোজনেও ওঁর taleration-এর অন্ত ছিল না। অহিন্দুর' স্পৃষ্ট, প্যাঁজ দিয়ে রাঁধা মাছ-মাংস, কিছুতেই তাঁর অরুচি বলতে শুনিনি। উপেন ১৯০৭ সালের গোড়াতে বৈপ্লবিক ব্যাপারে যোগ দিয়েছিল।"

—হেমচন্দ্র কানুনগো (বাঙলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, পৃ-২৩৬)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

৯

৬ই জুলাই রাত্রি ১২টায় আমরা ট্রেণে মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদ যাত্রা করলাম। সকাল ছয়টায় বিছানা ছেড়ে সোফায় বসলাম। বোতাম টিপতেই ট্রেণের 'ভ্যালেট' এসে চা দিয়ে গেল। নির্মল কাচের জানালা দিয়ে দেখছি, ছোট-বড় গ্রাম, সবুজ ক্ষেত, পাইন বার্চ পপলারের সমুন্নত তরুশ্রেণী পাহাড়ের গা ঘেঁষে রয়েছে; কোথাও বা বিস্তৃত হ্রদ। রেল লাইনের দু'ধারে মৌসুমী ফুলের সমারোহ, রৌদ্রে উজ্জ্বল। বেলা দশটায় লেনিনগ্রাদ ষ্টেশনে গাড়ী থামলো, আমরা পৃথিবীর অন্যতম সেরা হোটেল আস্তোরিয়ায় এসে উঠলাম। জারের আমলে ইয়োরোপ-আমেরিকার ধনীদের বিলাস ও প্রমোদ নিকেতনের বাসিন্দা বদলালেও অতীত বৈভব ম্লান হয়নি। প্রত্যেক কামরায় টেলিফোন, রেডিয়ো, বসবার ও শয়ন-গৃহ, স্নানাগারে ঠাণ্ডা ও গরম জল, ৪টা ভোজনাগার, বড় বড় বৈঠকখানা —মূল্যবান্ আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। এমন দিন ছিল, যখন এর এক সপ্তাহের বিলাসের খরচাটা জোগাতে আমাদের দেশের ছোটখাট জমিদারেরা ফতুর হয়ে যেত। এর নৃত্যশালা এক দিন বহু সম্রাজ্ঞী রাণী ও অভিজাত বিলাসিনীদের কলহাস্য ও চটুল নৃত্যে মুখরিত হত। রসিক ম্যানেজার সে সব কথা শোনালেন। গত যুদ্ধের সময় জার্মাণরা যখন নগরের বিশ মাইলের মধ্যে এসে পড়েছে তখন এক দিন তিনি খোদ হিটলারের স্বাক্ষরিত এক হুকুমনামা পেলেন, অমুক তারিখে রাত্রে লেনিনগ্রাদে তিনি বিজয়োৎসব উপলক্ষে একটি ভোজসভা করবেন। পাঁচশ' অতিথির জন্য খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা রাখবে। বলা বাহুল্য, এ হুকুম তাঁকে তামিল করতে হয়নি। তিন বৎসর এই নগরী প্রায় অবরুদ্ধ ছিল। ঝটিকাক্ষুব্ধ— জলধি-তরঙ্গের মত বারম্বার নাৎসী বাহিনী জনগণের প্রতিরোধের পাষাণ-প্রাচীরে নিষ্ফল মাথা কুটেছে। সহরের বিদ্যুৎ জল-সরবরাহ জ্বালানী ছিল না, লোকের দু'বেলা এক টুকরো রুটিও জুটতো না, তবু জনগণ ও সৈন্যদলের মৃত্যুপণ সঙ্কল্প টলেনি। এ সব কথা মনে হচ্ছিল, কিন্তু এই কয় বৎসরে নাৎসী আক্রমণের ক্ষতচিহ্ন প্রায় লুপ্ত হয়েছে।

পিটার দি গ্রেটের গড়া—সেণ্ট পিটার্সবুর্গ রূপসী নগরী। ভূমিদাসদের অস্থিমজ্জার ভিত্তির ওপর নেভা নদীর দুই তীরের জলাভূমিতে এই মহানগরী আড়াইশ' বছরে গড়ে উঠেছে। রুশ সম্রাটদের প্রতাপের খর বহ্নিতে শোষিত জনসাধারণের অর্থ রাজভাণ্ডার থেকে বর্ষার ধারার মত বর্ষিত হয়েছে। কত প্রাসাদ, গীর্জা, উপবন সেদিনের সাম্রাজ্য-মহিমার স্মৃতি বহন করছে। এখান থেকেই রুশ সাম্রাজ্য প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম তীর থেকে হিমালয় হিন্দুকুশের উত্তর ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়েছিল। স্বৈর-শাসনের এই সুদৃঢ় দুর্গের ভিতের তলায়ই বিপ্লবের বারুদও সঞ্চিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের অপেক্ষায়।

ইয়োরোপ প্রবেশের বাণ্টিক সমুদ্র-পথের পাহারাদার নৌদুর্গ ক্রোনষ্টাডের দ্বারা সুরক্ষিত লেনিনগ্রাদ সোভিয়েট রাশিয়ার দ্বিতীয় মহানগরী। হোটেল আস্তোরিয়ার সম্মুখে বাগান, দক্ষিণে বিখ্যাত গীর্জা, বামে পিটার দি গ্রেটের অশ্বারূঢ় বিরাট প্রতিমূর্তি। অপরাহ্ণ ৫টায় আমরা সহর দেখতে বেরুলাম। চওড়া রাস্তা, মাঝে মাঝে ছোট ছোট খাল, খালের ওপর সাঁকো, দু'ধারে বড় বড় প্রাসাদ (এখন শ্রমিকদের বাসভবন, নয় সামরিক দপ্তরখানা) স্কোয়ার বাগান দেখতে দেখতে আমরা জারদের বিখ্যাত 'উইনটার প্যালেসের' সম্মুখে এলাম। প্রাসাদের সম্মুখে পাথর দিয়ে বাঁধান প্রশস্ত চত্বর মাঝখানে গ্রানিট পাথরের বর্তুলাকার সু-উচ্চ জয়স্তম্ভ। এইখানেই এক দিন সাম্রাজ্যবাদের পাহারাদার কুকুর কশাক অশ্বারোহী সৈন্যের কুচকাওয়াজ হয়েছে, এইখানে সমবেত প্রজাবৃন্দকে প্রাসাদের অলিন্দ থেকে স্বর্গস্থ পিতার প্রতিভূ "লিটিল ফাদার" জার দর্শন দিয়ে ধন্য করতেন। এবং এইখানেই ১৯০৫ সালে নিরস্ত্র ক্ষুধিত জনতার আবেদনের উত্তরে জার-সৈন্যরা গুলীবর্ষণ করেছিল।

এই চত্বর রাশিয়ার জালিয়ানওয়ালাবাগ। দু'টি ঐতিহাসিক ঘটনার আশ্চর্য মিল, সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির একই খেলা। ১৯১৯এ বৃটিশ সাম্রাজ্যনীতির বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের অসন্তোষ যখন বিদ্রোহের সীমানায়, তখন জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্য কর্তৃপক্ষ ষড়যন্ত্র করলেন। লালা হংসরাজ নামে পুলিশের এক গুপ্তচর জালিয়ানওয়ালা-বাগে এক সভা আহ্বান করলো। সেদিন বৈশাখী পূর্ণিমার মেলাও ছিল। এই প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে বেরুবার পথ রোধ করে জেনারেল ডায়ার নিরস্ত্র আবালবৃদ্ধবনিতার ওপর অতর্কিতে গুলীবর্ষণ ক'রে কয়েক হাজার লোককে হতাহত করেছিল।

১৯০৫ সালে অবিকল এই ঘটনাই ঘটেছিল। ঐতিহাসিক পটভূমিকার সঙ্গেও মিল আছে। ফরাসী বিপ্লব, কালো হানড্রেডের

ভাবধারায় অনুপ্রাণিত রুশ অভিজাত মহলে জাতীয়তাবাদ এবং নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জল্পনা-কল্পনা অনেক আগেই সুরু হয়েছিল, এই আন্দোলন থেকেই গুপ্তহত্যাকারী নানা বিপ্লবী দলের সৃষ্টি হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই অসন্তোষ শ্রমিক-কৃষক-শ্রেণীতেও দেখা দিল। রুশ-জাপান যুদ্ধে জারের পরাজয় ও সামরিক শক্তির বিপর্যয়ে এই অসন্তোষ সেণ্ট পিটার্সবুর্গের কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মঘটে ব্যাপক হয়ে উঠলো। বিদ্রোহের আশঙ্কায় জারতন্ত্র বধ, বন্ধন নির্বাসনের ভীতির রাজত্ব কায়েম করলো। কিন্তু এ-ও যথেষ্ট নয়। ছোটলোকের আস্পর্দ্ধা অসহ্য। সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে! পুলিশের বড়কর্তা এবং জারের কর্ণধার ট্রিপড জাল পাতল। ফাদার গাপেন নামে এক পাদ্রী ছিল পুলিশের গুপ্তচর এবং "কারখানা শ্রমিক পরিষদের" নেতা; এই গুপ্তচর গাপেন এক দরখাস্ত রচনা ক'রে ধর্মঘটি শ্রমিকদের বললো, চল শোভাযাত্রা করে জারের কাছে যাই। তিনি আমলাতান্ত্রিক জবরদস্তীর একটা বিহিত করবেন। দেড় লাখ শ্রমিক তার অনুগামী হল। আবেদনপত্রের ভাষা দেখলেই বোঝা যায়, এ কোন বিপ্লবীর রচনা নয়। ক্ষুধিত সর্বরিক্ত শ্রমিকদের বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার চতুর পুলিশ গুপ্তচরের ছলনা।

"সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিক আমরা আপনার দুয়ারে এসেছি। আমরা দুর্ভাগা, বহুনিন্দিত ক্রীতদাস। স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারে আমরা ভেঙ্গে পড়েছি। আমরা কাজ বন্ধ করেছি, কিন্তু মালিকদের কাছে আমাদের এই ভিক্ষে, যতটুকু না হ'লে ছেলেপুলে নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না, তার বেশী আমরা চাই নে। কিন্তু এই বাঁচবার দাবীও মালিকরা মানলো না, আমরা যেন মানুষ নই, আপনার কর্মচারীরাও আমাদের দাস করে রাখবার মালিকদের জেদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। প্রভো, আপনার নিরুপায় নির্যাতিত প্রজাদের আপনি সাহায্য করুন। আপনার প্রজাদের আবেদন মঞ্জুর করুন। যদি আপনার দয়া না হয়, তা'হলে এইখানেই মরা ছাড়া আমাদের আর পথ নেই।"

'দয়ালু লিটিল ফাদার' জার দর্শন দিলেন না। কিন্তু তাদের প্রার্থনার দ্বিতীয় আবেদন মঞ্জুর করলেন। প্রাসাদের বুরুজ থেকে শিলাবৃষ্টির মত রাইফেলের গুলী বর্ষিত হ'ল। মরণাহতের আর্তনাদ-মুখরিত চত্বরে অশ্বারোহী কশাক বাহিনী ধ্বংস ও হত্যার মহোৎসবে মেতে বইয়ে দিল রক্তগঙ্গা। পরদিন পুলিশ-রিপোর্টে প্রকাশিত হ'ল, এক হাজার নিহত ও দু'হাজার আহত হয়েছে। বেসরকারী হিসেবে নিহতের সংখ্যা দু'হাজারের ওপর। রুটি বা জীবিকার বদলে বুলেট। ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারী 'রক্তাক্ত রবিবার'রূপে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এত বড় পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে সেদিনের ইয়োরোপের কূটনৈতিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়নি। কেবল প্যারীতে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা ফ্রান্সের নানা স্থানে সভা করে এর প্রতিবাদ করেছিলেন। ১৯০৫এর ৩০শে জানুয়ারী প্যারীর এক জনসভায় বিখ্যাত সাহিত্যিক ও মনীষী আনাতোল ফ্রাঁসের বজ্রস্বর মন্দ্রিত হ'ল। "জার ক্ষুধিত নরনারীকে হত্যা করেছে, তারা চেয়েছিল খাদ্য, পেয়েছে বুলেট। জার জারকেই হত্যা করেছে। যে সব নির্দোষীর রক্তে নেভা নদীর জল রাঙ্গা হ'ল, তার প্রত্যেক শোণিতবিন্দু থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ জন্মাবে, যারা এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবে। জা[র] যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালালেন, তা' তাঁরই চিতাশয্যা। নিকোলা[স] আলেকজেন্দ্রারের দিন ফুরিয়েছে, ইতিহাসে তার কলঙ্কিত স্মৃতি মা[ত্র] থাকবে। জার গভর্ণমেণ্ট শ্রমিকদের হত্যা করছে, শিক্ষিত যুবকদে[র] জেলে পুরছে, সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠাচ্ছে। আমি দেখছি, [যে] বিপ্লব বিদ্রোহ আরম্ভ হ'ল, তা থামবে না। আমার একমাত্র শঙ্কা এই রক্তাক্ত পথ যেন দীর্ঘ না হয়। এ দৃশ্য ভয়াল, অথচ গরিমাময় ছাত্র, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, মরণ-অভিসারে। একটা পীড়িত জাতির মর্ম-মথিত ক্রন্দন বিশাল সাম্রাজ্যের বিস্তার থেকে উঠে আকাশে প্রতিধ্বনি তুলছে। জারের নৃশংস পাশবিকতা আজ রুশ জাতির সত্যানুরাগ ও সততার সম্মুখীন। অত্যাচারই অত্যাচারীকে গ্রাস করবে সেদিনের বেশী বিলম্ব নেই।"

আনাতোল ফ্রাঁস রাশিয়ার সর্বহারাদের (প্রোলেটারিয়েট) যে বিজয় কামনা করেছিলেন, তা লেনিন-স্তালিন চালিত বলশেভিক পার্টি মাত্র বার বছরের মধ্যেই সফল করেছিল। সেই শুভদিন দেখবার পূর্বেই আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও বিশ্বশান্তির পুরোধা আনাতোল ফ্রাঁস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

এখান থেকে বিখ্যাত কবি পুসকিনের আবাস—সম্প্রতি ম্যুজিয়ম গত শতাব্দীর স্বচ্ছল মধ্যশ্রেণীর অভিজাতদের বাড়ী-ঘর, আসবাব পত্রের স্মৃতি। পুসকিনের ছবি, লেখার পাণ্ডুলিপি, বইএর বিভিন্ন সংস্করণ, তাঁর লাইব্রেরী, নিত্য ব্যবহারের জিনিষপত্র সাজান রয়েছে সেকালের প্রথায় শত্রুর সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে পুসকিন গুরুতর আহত হয়ে মারা যান, তাঁর শেষ শয্যা দেখলাম। সোভিয়েট রুশিয়ায় পুসকিন সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। নূতন রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবুর্গ নিয়ে একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন, নববধূর রূপযৌবন-অলঙ্কার ভূষিতা তুমি, তোমার জৌলুসে প্রৌঢ়া শাশুড়ীর মত মস্কো পরিম্লান।

নেভা নদীর ধার দিয়ে চলেছি, স্রোত মন্থর, গাঢ় নীল জল; মোটর-বোট ও ষ্টীমার চলেছে, দুই তীরে কারখানা, বাসগৃহ; এখানে এক বাগানে নেভা নদীর দিকে মুখ করে অশ্বারোহী পিটার দি গ্রেটের বৃহৎ মূর্তি, পায়ের তলায় একটা সাপ বা ড্রাগনকে বর্শায় বিদ্ধ করছেন। মূর্তিটির বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী শিল্পী জীবন্ত করে তুলেছেন। সমস্ত সহরে আর কোন জারের মূর্তি নেই। জার নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করার পর কেরেনস্কী গভর্ণমেণ্টের আমলে প্রাক্ বলশেভিক বিপ্লবীরা সেগুলি ধ্বংস করে ফেলেছিল।

ক্রমে অগ্রসর হয়ে আমরা জারের দুর্গে প্রবেশ করলাম। বড় বড় দু'-তিনটি গীর্জা। একটি গীর্জার প্রাঙ্গণে শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্মরে জার ও জারিনাদের সমাধি—দেয়ালের গায়ে বাইবেলের কাহিনীর চিত্র। এগুলিতে এখন আর প্রার্থনা করবার জন্য নরনারীর ভীড় হয় না। কৌতূহলী জনতা ম্যুজিয়ম দেখতে আসে। দুর্গের মধ্যে প্রাচীন কারাগার। এর সেলগুলি এক-একটি ভয়াবহ অন্ধকূপ,—বারান্দায় পাহারারত প্রহরীর জুতোর শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যেতো না। কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলের ৪০ ডিগ্রীর সেলগুলি এর তুলনায় আরামপ্রদ। এক-একটি সেল যেন সাম্রাজ্যনীতির প্রতি হিংসার নিষ্প্রাণ নিষ্ঠুরতা। এখানে কত বিপ্লবী পাগল হয়েছে,

কত আত্মহত্যা করেছে ; কত প্রতিভাশালী যুবকের সুগঠিত দেহ জরায় জীর্ণ হয়ে গেছে এই নিরানন্দ পুরীতে। লেনিনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ১৯ বছরের যুবক উলিয়ানভ ফাঁসীর পূর্বে যে সেলটিতে ছিলেন, সেটি এবং গর্কী ও অন্যান্য প্রাক্-বলশেভিক বিপ্লবীদের সেলগুলি চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। ১৯০৪-০৬ সালের বিদ্রোহের সময় এই জেলখানায় অতি বীভৎস নারকীয় অত্যাচার হয়েছে, তার কতকগুলি মরচে-ধরা পীড়ন-যন্ত্র দেখলাম। মন বিষাদে ভরে উঠলো। মনে পড়লো, আমাদের দেশের 'ইলিসিয়াম রো'র (অধুনা লর্ড সিংহ রোড) গোয়েন্দা ঘাঁটির কথা। পীড়ন করে পেটের কথা বার করবার ওস্তাদিতে এরাও ছিল রুশ পুলিশের সাঙ্গাৎ। যৌবনে আমি এবং আমার বন্ধুরা অনেকেই গোয়েন্দা পুলিশের মোলায়েম ব্যবহারের স্বাদ পেয়েছি। তফাৎ এই, সোভিয়েত গভর্ণমেণ্ট তাদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করেছে, আর আমাদের গভর্ণমেণ্ট সেই সব ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের প্রমোশন দিয়ে পুলিশ বিভাগের চূড়োয় বসিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বড় দুঃখেই বলেছিলেন, "যে লোক স্বার্থপর বেইমান, যে উদাসীন নিশ্চেষ্ট বর্তমানের গুপ্ত ব্যবস্থায় তারই জীবনযাত্রা সব চেয়ে নিরাপদ, তারই উন্নতি ও পুরস্কারের পথে সকলের চেয়ে বাধা অল্প।"

৮ই জুলাই রবিবার। মেঘলা প্রভাত। বৃষ্টি মাথায় করে আমরা 'স্মোলনী ইনস্টিটিউটে' গেলাম। পূর্বে অভিজাত মেয়েদের আবাসিক বিদ্যালয় ছিল। ১৯১৭র বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে বলশেভিকদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়। এই সুদর দপ্তরখানা থেকে লেনিন ও স্তালিন বিদ্রোহী সৈন্যদের সংহত ও শৃঙ্খলিত ক'রে ৭ই নভেম্বর প্রায় বিনা রক্তপাতে পেট্রোগ্রাদ দখল করেন। ৭ই নভেম্বর রাত্রি ১০টা ৪৫ মিনিটে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে সোভিয়েত সোস্যালিষ্ট গভর্ণমেণ্ট আবির্ভূত হয়েছিল।

প্রকাণ্ড বাড়ী—অধিকাংশই এখন সামরিক দপ্তরখানা, চার দিকে কড়া পাহারা। দোতলার কতকগুলো ঘর ম্যুজিয়ম, লেনিনের ছোট্ট শয়নকক্ষ, সাধারণ খাট-বিছানা, বসবার চেয়ার। যে ঘরে সামরিক বৈঠক বসতো, তাতে অনেক ঐতিহাসিক দলিল ও ছবি আছে। এখানেই প্রথম বলশেভিক কংগ্রেসে লেনিন বিপ্লবী সেনাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ৪৭ বৎসর বয়সের লেনিনের একখানি তৈলচিত্র—সুগঠিত দেহ, উজ্জ্বল মর্মভেদী দৃষ্টিতে তেজস্বী জীবনের বহ্নিজ্বালা,—কক্ষগাত্রে বিলম্বিত।

বলশেভিক বিপ্লবের ইতিবৃত্ত আলোচনা করতে করতে আমরা নগর ছাড়িয়ে অগ্রসর হ'লাম। মেঘের ঘোমটা সরিয়ে সূর্য প্রকাশ পেয়েছে, সভস্নাত গাছের পাতাগুলি চিক্-চিক্ করছে, প্রশস্ত পথের দু'ধারে অজস্র রঙ্গীন ফুল ফুটে রয়েছে। মাঠের মধ্যে নূতন বাড়ী, তার পাশেই জার্মাণ আক্রমণে বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত বাড়ীও রয়েছে। ক্রমে আমরা পুসকিন গ্রামে প্রবেশ করলাম। এটা জার্মাণরা দখল করেছিল, দু'পক্ষের গোলাগুলী বর্ষণে অধিকাংশ বাড়ীই জখম হয়েছিল। আবার এরা আরো সুন্দর করে বাড়ী, বাগান-পথ গড়ে তুলেছে। এখানকার এক বিশাল জারীয় প্রাসাদে জার্মাণ সৈন্যরা থাকতো ; পালাবার সময় ইচ্ছে করে এর ক্ষতি করে গেছে ; শিল্পকলার নিদর্শনগুলি কতক লুঠ করেছে, কতক নষ্ট করে গেছে। বাড়ীটা খাড়া আছে, তাই ধীরে ধীরে মেরামত হচ্ছে। এর একটা অংশ মেরামত করে পুসকিন ম্যুজিয়ম হয়েছে। বহু চিত্র ও পুরনো শিল্পের নিদর্শনের সংগ্রহ। এখানে নবীন রাশিয়ার অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রাচুর্য নবসৃষ্টির আনন্দে বিকশিত হচ্ছে নগর নির্মাণের সুষ্ঠু পরিকল্পনায়।

আমরা যখন সহরে ফিরে এলাম, তখন সূর্যের আলো ম্লান হয়ে এসেছে, নেভা নদীর গাঢ় নীল জলে রক্তিম আলো কাঁপছে। নদীতীরে নোঙ্গর করা ক্রুজার অরোরা বা আবরোরা।

এই রণতরীর নৌ-সৈন্যরা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং 'উইনটার প্যালেসের' সম্মুখে তাদের কামানশ্রেণী উদ্যত করে। অরোরার কামানশ্রেণীর গর্জনে কেরেনস্কীপন্থীরা পালিয়ে যায়। সেই নৌ-বিদ্রোহীদের মধ্যে জীবিত এক জন প্রৌঢ় এখন এর অধ্যক্ষ, ইনি আমাদের সব দিক ঘুরিয়ে দেখালেন এবং সেদিনের গল্প শোনালেন। এটি ১৯০০ সালে তৈরী হয়, ৬৫০০ টন, দু'পাশে ও সম্মুখে অনেকগুলি কামান। এখন এটিতে শিক্ষার্থী নৌ-সৈন্যরা থাকে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, চিত্রশালা, শিশুপ্রাসাদ, শিক্ষাগার, সংস্কৃতি-ভবন দেখি, তার পর থিয়েটার, ব্যালে নৃত্য, 'পাপেট থিয়েটার'। গ্রীষ্মকালে এখানে দিন-রাতের ব্যবধান নেই ; এখানে রাত্রি শুভ্র রৌদ্রময়ী। পাপেট বা পুতুলের থিয়েটার আমার চোখে এক অভিনব ব্যাপার। কৌতুককর একটা মিলনাত্মক প্রেম-কাহিনী ; পুতুলেরা মানুষের মত কথা বলছে, অভিনয় করছে, জীবনে এমনটি কখনো দেখিনি।

বিখ্যাত উইনটার প্যালেসে প্রবেশ করলাম। বিপুলতায়, বিশালতায়, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, চিত্রাঙ্কনে এর জুড়ি পৃথিবীতে আছে কি না জানি নে। ফরাসী সম্রাটদের ভার্সাই প্রাসাদের রূপের খ্যাতি আছে। কিন্তু দুইএর প্রকৃতি ভিন্ন। এর রূপ পুষ্পপেলব কমনীয় নয়, ঐশ্বর্য ও প্রতাপের উগ্রতায় প্রদীপ্ত। ফরাসী, ইতালীয়, ডেনিস, জার্মাণ শিল্পীদের তিন শতাব্দীর সৌন্দর্য-সৃষ্টি এই প্রাসাদের প্রতি কক্ষে, অলিন্দে, চত্বরে স্থির বিদ্যুতের মত অচপল হয়ে আছে।

এই প্রাসাদের অধিকাংশ অর্থাৎ ২৪০টি কক্ষ ম্যুজিয়ম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিত্র, পুরাতন মূর্তি, অস্ত্রশস্ত্র, বসন-ভূষণাদিতে সুসজ্জিত এই 'যাদুঘর' এখন আর্মিটাস বা হার্মিটেজ নামে পরিচিত। মোটামুটি দেখতে গেলেও ৫।৭ দিন সময় লাগে। ৩।৪ ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম। গ্রীক ও রোমক ভাস্কর্যের নিদর্শনের প্রচুর সংগ্রহ দেখে বিস্মিত হলাম।

লেনিনগ্রাদের লোক-সাধারণের জীবনযাত্রা, দোকান-পশার, কারখানা, হাসপাতাল মস্কৌর মতই, মস্কৌর মতই সহর প্রসারিত হচ্ছে, নূতন নূতন আবাসগৃহ তৈরী হচ্ছে। ১০ই জুলাই অপরাহ্ণে স্থানীয় লেখক ও সাংবাদিক-সঙ্ঘের বিদায় সম্বর্দ্ধনার পর রাত্রের ট্রেণে আমরা লেনিনগ্রাদ ত্যাগ করলাম।

১০

মস্কৌএ ফিরে অপরাহ্ণে আমরা ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে দেখা করলাম। মস্কৌএর পণ্ডিত-মহলে এঁর বিশেষ সমাদর, সোভিয়েতের মন্ত্রী ও কূটনীতিবিদ্‌রাও তাঁকে শ্রদ্ধা

করেন। এই মেলা-মেশায় তিনি খোলাখুলি ভাবে যে সব আলোচনা করেন, তার কিছু কিছু গল্প বল্লেন। আমাদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শুনে তিনি বল্তে লাগলেন, এদের শান্তি আন্দোলনটা লোক-দেখান ব্যাপার নয়, সত্যিই এরা শান্তি চায়। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম এরা দেখেছে। দেখলে তো, কি ভাবে এরা পুনর্গঠনে হাত দিয়েছে। এদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর সমাজ-জীবন নির্ভরশীল। তাই অর্থনৈতিক উন্নতি ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রূপও বদ্লাচ্ছে—লোক-ব্যবহারে কোথাও অতিনির্দিষ্টতা নেই। এরা ভুল স্বীকার করে এবং সংশোধন করে নেয়। এদের সমাজের এই সচলতা বিদেশীর দৃষ্টিতে সহসা ধরা পড়ে না।

এ দেশের মেয়েদের পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার ও অসঙ্কোচ আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা উঠতেই রাধাকৃষ্ণণ বলে উঠলেন, শিক্ষা-বিস্তার আর মেয়েদের দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়াতেই এটি সম্ভবপর হয়েছে. তোমরা লক্ষ্য করেছ, এরা প্রগলভা নয়, এদের হাবভাব সাজসজ্জা সংযত। আধুনিক রাশিয়ান তরুণীদের তিনি উচ্ছ্সিত প্রশংসা করলেন।

কেবল তরুণীরা নয়, হাল আমলের তরুণরাও, যুদ্ধের আগুনে পুড়ে ইস্পাত হয়ে উঠেছে। এদের সমাজ-চেতনা, পরস্পরের প্রতি সুবিবেচনা এদের চরিত্রের বনিয়াদ। আমি এক দিন লেনিন ম্যুজিয়মে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠছি। কয়েক ঘণ্টা ঘুরে ক্লান্ত হয়েছিলাম নিশ্চয়। হয়তো তাই দেখে দু'টি মেয়ে আমার দু'পাশে এসে আমার দুই বাহু ধরে উঠতে সাহায্য করলো। সঙ্কোচের সঙ্গে বললাম,—"নিয়েৎ নিয়েৎ"—অর্থাৎ প্রয়োজন নেই। আমার দোভাষীকে দিয়ে বলালাম, আমার বয়েস হয়েছে, তবে এত বুড়ো হইনি যে, সাহায্যের প্রয়োজন আছে। ওরা শুনে হাসতে লাগলো, কিন্তু ছাড়ল না। পরে আমি দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি বিদেশী বলেই বুঝি এতখানি সৌজন্য দেখালো। সে বললে, মোটেই নয়, আমরা ছেলেবেলা থেকেই বুড়ো-বুড়ীদের সম্মান করতে শিক্ষা পেয়েছি। বয়স্কদের অবজ্ঞা করা বা তাদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করা অভদ্রতা। আমি এই ঘটনার পর থেকে লক্ষ্য করেছি, ট্রাম, বাস বা দোকানের 'কিউ'-এ এরা প্রাচীনদের অগ্রাধিকার দেয়। ট্রামে-বাসে বুড়ো-বুড়ীদের বসবার আসন ছেড়ে দেয়। আর এক দিনের কথা মনে আছে, সাংস্কৃতিক উদ্যানে উক্রেন কুটীর-শিল্পের প্রদর্শনী দেখে, ধূমপানের জন্য বাগানের একটা বেঞ্চে বসেছি। আমার সামনের বেঞ্চে এক জন যুবক ধূমপান করছে, এমন সময় এক জন বৃদ্ধ এসে পাশে বসতেই সে সিগারেট্টা ফেলে দিল। যুবকটি যখন উঠে যাচ্ছে, তখন ইঙ্গিত করতেই আমার সম্মুখে এসে সলজ্জ ভাবে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি সিগারেট্টা ফেলে দিলে কেন?"

"ওঁর অসুবিধা হতে পারে"—

"জিজ্ঞাসা করলেই পারতে।'

"তাহলে কি আর উনি বলতেন। অনর্থক ওঁকে পীড়া দিতাম, তাই ফেলে দিলাম।"

বুঝলাম, এদের শ্রদ্ধাটা কত স্বাভাবিক। এটাও লক্ষ্য করেছি, বুড়ো-বুড়ীদের এরা শ্রমসাধ্য কাজে নিয়োগ করে না। আপিস, কারখানা, রেল-ষ্টেশন, বিমান-ঘাঁটিতে দেখেছি দরজায় পাহারা বা বিশ্রামাগারের তদারক বয়স্করাই করে। হোটেলের ছে ছোট কাজে এরাই রয়েছে। অথচ এই দেশের বিরুদ্ধে এমন র রটনা করা হয় যে, এ দেশের নরনারীকে দিয়ে ক্রীতদাসের হাড়ভা খাটুনী খাটিয়ে নেয়া হয়।

মস্কোএ একটা 'হাউস অফ রেষ্ট' বা বানপ্রস্থীদের বিশ্রামাগ দেখতে গিয়েছিলাম। ৬০০ লোকের থাকবার ব্যবস্থা আছে বি বাসিন্দা মাত্র ৫০।৬০ জন। অধ্যক্ষ বল্লেন, পেনসান পাওয় পর মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের সংসারেই বেশীর ভাগ থেকে যা যাদের কেউ নেই তারাই এখানে আসে। এরাও অলস ভাবে ব থাকে না, সাধ্য মত ছোটখাট কাজ করে। পড়াশোনা ও দ খেলা নিয়ে সময় কাটায় এমন লোকও অবশ্য আছে। বাপ- নিয়ে পারিবারিক জীবনটা অবশ্য ইয়োরোপীয় সমাজসম্মত ন হয়তো এদের সামাজিক অর্থনীতির ফলে এটা সম্ভব হয়। বিবাহি ভাই-বোনেরা একত্র থাকে এও দেখেছি, এমন কি আমাদের দে উপহাসভাজন ঘরজামাইও দেখেছি। তবে এরা শ্বশুরাশ্রিত ছ নয়, রোজগার করে।

প্রবীণ বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান আমাদের দেশেও ছি পল্লীতে এখনও কিছুটা আছে। কিন্তু কলকাতা সহরের যুদ্ধো নাগরিক সভ্যতায় ওর আর কোন চিহ্ন নেই। পথে-ঘাটে, ট্রা বাসে, ষ্টেশনে-বিপণীতে পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শনে রেওয়াজই উঠে গেছে। আমাদের সহরে ট্রামে-বাসে দুর্বলে বৃদ্ধকে বসবার আসন কেউ ছেড়ে দেয় না,—সামান্য আরাম ছে ভদ্রতার বিলাস এখানে অচল।

যে দেশে পরশ্রমজীবীর দল একেবারে বিলুপ্ত হয়েছে, যেখা সমাজের লোকসাধারণকে খাটিয়ে মুনাফার পাহাড় তৈরী ক সঞ্চিত ধন ব্যক্তিগত ভোগে অথবা অধিকতর মুনাফা সংগ্রহে প্রয়ো করার সুযোগ নেই, সেখানে মানব-প্রকৃতির পরিবর্তন অনিবা এই পরিবর্তন এসেছে সর্বমানবের সমান অধিকারবোধ থেকে এক নয়া অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর এ দেশের সমাজ-জীবন গ্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভাবীকালে কি রূপ নেবে, তা অ নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, তবে সর্বসাধারণের সম্মুখে শিক্ষার দ্ব এরা যে ভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছে, তাতে মনুষ্যত্বের মর্যাদা ও উৎক অনিবার্য। বঞ্চক ও বঞ্চিত, শোষক ও শোষিত, সুবিধাভোগী অধিকার-বঞ্চিতের লোভ ও ক্ষোভের সংঘাতে যে শ্রেণীবিদ্বেষ না আকারে সমাজদেহে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে, সে স্তর পার হ এদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে, ব্যক্তিগত মত-স্বাতন্ত্র্যকে সমা কল্যাণে সংযত করতে হয়েছে। কিন্তু আজকের সমাজের চেহার দেখলে বোঝা যায় যে, লেনিন-ষ্টালিনপন্থীরা ওপর থেকে জনগণে ওপর কিছু চাপিয়ে দেয়নি, সমাজের সমগ্র মনকে তারা উদ্ব করেছে, দেশের সৌভাগ্যসৃষ্টির কাজে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পন মধ্য দিয়ে। লক্ষ্য সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা না থাকলে নূত সমাজ গড়া যায় না। সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ব জনসাধারণের আত্মনির্ভর বিশ্বাস তাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে দিয়ে বলেই জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষই আত্মীয় হয়ে উঠে লোক-ব্যবহারে বৈষম্য নেই।

[ক্রমশঃ

থিওডর ডষ্টয়েভ্স্কি

কি, মানুষও বোধ হয় থাকবে না আর। ঘাত-অংক গণনার সূচীপত্র অনুসারে কে আর নিজের ইচ্ছে খাটাতে যাবে বলুন? সে রকম ক্ষেত্রে মানুষ আর মানুষ থাকবে না আদৌ, হয়ে যাবে পিয়ানোর হাতল বা ঐ রকমের একটা কিছু। যে মানুষের বাসনা বা ইচ্ছা জিনিষটে নেই সারংগের হাতল ছাড়া আর কি দিয়ে তার পরিচয় দেওয়া যায়? তাই নয় কি? সব সম্ভাবনার কথা ধরে নিলেও কি তেমনতরো ব্যাপার ঘটতে পারে?

আপনারা বেশ চিন্তার সংগে বলবেন, 'হুঁ', আমাদের স্বার্থ-সুবিধে সম্বন্ধে মিথ্যে ধারণা গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই আমাদের ইচ্ছাশক্তি সাধারণত ভুল করে বসে। যা একেবারে বাজে জিনিষ আমরা কখনো-কখনো তাই-ই ইচ্ছে করি; কারণটা হলো এই যে ঐ সমস্ত বাজে জিনিষের মধ্যে আমরা বোকারা কোন কিছু পরিকল্পিত সুবিধে-সুযোগ লাভের সহজ পথ খুঁজে পাই। কিন্তু, যদি সব কিছু ছক্ কেটে লিখে রেখে দেওয়া যায় (এটা করা বেশ সোজা কাজ, যেহেতু মানুষ স্বাভাবিক নিয়মের গোটা কতকও শিখতে অপারগ' এটা ধারণা করা বোকামি ও অস্বাভাবিক) তা হলে সত্যিই আমাদের তথাকথিত ইচ্ছাশক্তির শেষ হয়ে আসবে। পক্ষান্তরে যদি আমাদের ইচ্ছাশক্তি যুক্তির সংগে তাল দিয়ে চলে সব সময়, তা হলে আমরা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছের চেয়ে সেই যুক্তিটাকেই নিঃসন্দেহে কাজে লাগাবো; যেহেতু নিজের যুক্তির ক্ষমতা কাজে লাগানোটাই আবার আমাদের সেই বাজে জিনিষ কামনা করার থেকে বাঁচিয়ে দেয় অথবা নিবৃত্ত করে আমাদের নিজেদের যুক্তি খণ্ডন করার থেকে এবং যা আমাদের কাছে ক্ষতিকর সেই জিনিষের কামনা জাগিয়ে দেয়।' আচ্ছা, যদিই সমস্ত ইচ্ছা ও সংকল্পের ঠিক্-ঠিক্ হিসেব করা যায় (অবিশ্যি এখনকার কথাগুলো ধরে নিতে হবে আমারই) যেহেতু সেগুলো আমাদের তথাকথিত স্বাধীন ইচ্ছার স্ব-নিয়মে প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে আগেই, তা হলে সেগুলোকে সূচীপত্রের আকারে ছ'কে ফেলা সম্ভব এবং তখনই তার মধ্যে কী আছে দেখে-শুনে সেই অনুসারে আমাদের ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করবো; এ কথায় আমি যে আপনাদের উপহাস করছি তা ত' আমার সত্যি মনে হয় না। সেই সূচীপত্রগুলো আমাকে যদি বলে দেয়, যদি আমার হয়ে নির্দিষ্ট করে দেয় যে আমি যে-বিষয়ের দিকে (ধরুন) একবার একটা আংগুল দিয়ে নির্দিষ্ট করে নেবো সেইটেই কেবল সহজে করতেই হবে, যেহেতু বিপরীত কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না; অথবা সেই বিষয়েরই দিকে অন্য একটা আংগুল দিয়ে নির্দিষ্ট করেও করতে হবে, তা হলে সে ক্ষেত্রে আমি শিক্ষিত লোক হলেও, আমার বিজ্ঞানে কিছু পড়াশুনা থাকলেও, কতোটুকু স্বাধীনতা আমার থাকে? এক কথায়, ব্যাপারটা তেমনি দাঁড়ালে আমি আমার জীবনের (ধরুন) আগামী ত্রিশ বছরের কথা

প্রথম অধ্যায়

৮

'হাঃ, হাঃ, হাঃ!' আমি কল্পনা করে নিতে পারছি, আপনারা মনে মনে হেসে আমার কথায় বাধা দিচ্ছেন। 'তুমি পছন্দ করো আর না-ই করো, মানবীয় ইচ্ছা বলে পৃথিবীতে কোনো কিছু নেই। বিজ্ঞান মানুষকে যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে যে মানুষের ইচ্ছা বা স্বৈরতা আর কিছু—'

একটু সবুর করুন ভদ্রমহোদয়গণ! আমি নিজেও ঠিক এই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম, যদিও, স্বীকার করছি, আমি এটা নিয়ে একটু ঘাবড়ে গিছলাম। আমি বলতে যাচ্ছিলাম, একমাত্র শয়তানই জানে মানুষের ইচ্ছেটা নির্ভর করে কীসের ওপরে; এমন সময়ে হঠাৎ (ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই) মনে পড়ে গেলো আপনাদের ঐ মহামূল্য বিজ্ঞানের কথা, আর তাই থেমে গেলাম। যা হোক্, আপনারা এখন বলেছেন এটা আমার হয়ে। বাস্তবিক পক্ষে, যদি এমন সূত্র আবিষ্কার করা যায় যা দিয়ে আমাদের ইচ্ছে ও খেয়ালখুসী ভালো ভাবে প্রকাশ করা যায়; যদি এমন সূত্র আবিষ্কার করা যায়, যে সূত্র অত্যন্ত স্বচ্ছ ভাবে বুঝিয়ে দেবে কীসের ওপর সেই সব ইচ্ছে নির্ভর করে, কী-কী কানুন দ্বারা সেগুলো চালিত হয়, বিস্তার লাভের কী-কী উপায় তাদের আছে এবং কোনো নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় কোন্ দিকে তাদের গতি; যদি এমন সূত্র আবিষ্কার করা যায় যার সঠিকত্ব গণিতের অংকের মতো, তা হলে ভদ্রমহোদয়গণ, যখনই সেই রকমের সূত্র আবিষ্কৃত হবে তখন মানুষের আর নিজের ইচ্ছে বলে কিছু থাকবে না—এমন

বলে দিতে সমর্থ হবো, আমার আর কিছুই করার থাকবে না, খানিকটে বুদ্ধিবৃত্তিরও দরকার আমার হবে না। আমাকে শুধু করতে হবে এই যে, আমি কেবল স্মরণ রাখবো সব সময়ে কখনোই কোনো ক্ষেত্রেই প্রকৃতি যেনো আমায় না জিগ্‌গেস্‌ করে আমি কী করতে ইচ্ছে করি, সে যেমন আছে তেমনই তাকে গ্রহণ করবো, আমাদের চাহিদা মতো তাকে হতে হবে না। অতএব, যদি আমাদের প্রবণতা সূচীপত্র বা ক্যালেণ্ডারের দিকেই হয়—হাঁ, এমন কি যদি হয় রসায়নী বক্‌যন্ত্রের দিকেও, আমাদের তা মেনে নিতেই হবে। প্রকৃতি সব সময়ে প্রকৃতিই, তাকে গ্রহণ করতে হয় তার নিয়ম-নীতি সহ।

যা হোক্‌, আমার কাছে এ সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার। ভদ্রমহোদয়গণ, আমার এই দার্শনিকতার জন্যে ক্ষমা চাইছি, এ কিন্তু চল্লিশ বছর পাতালে বাস করার ফল; তাই আমি যদি আকাশ-কুসুম চয়ন করি তাহলে কিছু মনে করবেন না। এখন দেখুন: যুক্তি জিনিষটে অতি চমৎকার জিনিষ—আমি তা অস্বীকার করি নে; কিন্তু যুক্তি যুক্তিই, আর বেশি কিছু নয়, এ মানুষের যুক্তিবাদী বৃত্তির তৃপ্তি সাধন করে মাত্র, অথচ 'ইচ্ছেটা সকল জীবনের স্বরূপ প্রকাশ করে (অর্থাৎ যুক্তি ও অন্যান্য আনুসংগিক জিনিষ সমেত মানুষের সমগ্র জীবন প্রকাশ করে)। এ কথা সত্যি, জীবনের এই বিশেষ প্রকাশে মানবীয় জীবন সাধারণতঃ দুঃখজনক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়; তা সত্ত্বেও এই-ই জীবন, শুধু বর্গক্ষেত্র নির্ণয়ের ব্যাপারের মতোই নয়। আমার দিক থেকে বলতে পারি, আমি স্বভাবত আমার সব বৃত্তিগুলোর তৃপ্তিসাধন করতে চাই, শুধু মাত্র যুক্তিবাদী বৃত্তির তৃপ্তিসাধন করতে চাই নে (সেটা ত' আমার জীবনযাপনের সামর্থ্যের কুড়ি ভাগের এক ভাগ)। কারণ, যুক্তি কী জানে? যুক্তি ত' জানে কেবল মানুষের খানিকটে পরিমাণে ধারণ-ক্ষমতা আছে। বিশ্বাস করুন, এর বেশি আর কিছুই সে জানে না। এটা নিতান্ত সান্ত্বনা হতে পারে, তবু এই-ই বা বলতে পারবো না কেনো? বিপরীত পক্ষে, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সমগ্র ভাবেই কাজ করে, কাজ করে তার সব কিছু নিয়েই; তাই চেতন বা অবচেতন, প্রকৃতিস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ, সব কিছু নিয়েই মানুষের স্বভাব। সন্দেহ করছি, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমায় অনুকম্পার দৃষ্টি নিয়ে দেখছেন, কারণ, আপনারা আমায় এখনও বলছেন, মানুষ সত্যি সত্যিই শিক্ষিত, উন্নত হতে পারে না, হতে পারে না ভবিষ্যতের মানুষ যা হবে তাই, এই জন্যে যে, মানুষ জেনে-শুনেই তার সব চেয়ে বড়ো স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর কাজ করতে চায়। আপনারা বলবেন, এ হলো গাণিতিক সিদ্ধান্ত। তাতে আমি আপত্তি করি নে। এ-ই গাণিতিক সিদ্ধান্ত। তবু আমি আপনাদের বলছি (একশ' বারের বার বলছি), একটা সময়ে, একটা সময়েই মাত্র মানুষ ইচ্ছে করে, সচেতন ভাবে অবিবেকী ক্ষতিকর কিছু নিজের জন্যেই কামনা করে। এই-ই একটা সময় যখন সে তার নিজের পক্ষে অবিবেকী ক্ষতিকর কাজ করার কামনার অধিকার সে চায়। কোনো কিছু ভালো কামনা করে কোনো রকম দায়বদ্ধ হতে সে চায় না। এই তার সব চেয়ে বড়ো ভুল; এইখানেই আমরা দেখি তার দুরপনেয় পাগলামি। তবু এই দোষই তার পক্ষে দুনিয়ায় সব চেয়ে বড়ো জিনিষ, যদি বিপদ ঘটায় তবুও; স্বার্থ-সুবিধের ব্যাপারে আমাদের সর্বাপেক্ষা কঠিন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছে তার এই দোষটাই। এটা কারণ, যে কোনো অবস্থাতেই তার এই দোষ বাঁচিয়ে রাখে তার সকল সম্পদের সেরা, সব চেয়ে মূল্যবান্‌ সম্পদ্‌ অর্থাৎ তার ব্যক্তিত্ব তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। এই একটি শ্রেষ্ঠ অমূল্য সম্পদ্‌ মানুষ য নিয়ে গর্ব করতে পারে, এ কথা শুধু আমি একাই বলছি নে অবিশ্যি, মানুষ তার ইচ্ছেটাকে যুক্তির সংগে কদম্‌ মিলিয়ে চালাতে পারে, এবং বেশি পারে যদি না প্রথমোক্তটি শেষোক্তটি ক্ষতি করে, যদি পরিমাণ রেখে কাজ চালায়। এই ব্যবস্থা তবেই কার্যকরী হয়, এবং সময়ে-সময়ে প্রশংসনীয়ও হয়। কিং আমরা প্রায়ই দেখি ইচ্ছা আর যুক্তিতে সংঘর্ষ বাধে, আর— আর—। তবু, জানেন ভদ্রমহোদয়গণ, তবু সময়ে-সময়ে এ সংঘর্ষটাও কার্যকরী হয়, প্রশংসনীয়ও বটে। কারণও ধরু মানুষ স্বভাবতই বোকা হয় না (বাস্তব পক্ষে মানুষের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না, অবশ্য বাদ্‌ দিতে হবে যে, য মানুষই বোকা হয় তবে জগতে জ্ঞানীই বা কে?); তবে বোকা সে না হলেও অন্তত অস্বাভাবিক রকমের অকৃতজ্ঞ অসামান্য রকমের অকৃতজ্ঞ। বস্তুত, আমি বিশ্বাস করি মানুষের সব চেয়ে সুবিধেজনক সংজ্ঞা হলো, "যে-জন্তু দুই পা চলিয়া-ফিরিয়া বেড়ায় এবং যে জন্তু কৃতজ্ঞতাশূন্য।" এবং এই-সব নয়—এই-ই তার চরম ত্রুটি নয়। না; তার সব চেয়ে বড়ো দোষ হলো তার নিরবচ্ছিন্ন নীতিভ্রষ্টতা; এই নীতিভ্রষ্টতা তা সুরু হয়েছে সেই মহাপ্লাবনের কালে এবং আজকের মানুষের ইতিহাসে শ্লেইজউইগ-হোলষ্টেইনের যুগ পর্যন্ত রয়েছে। ফলত, নীতিভ্রষ্টতা তার প্রধানতম দোষ, তেমনি দোষ তার অযৌক্তিকতা, কারণ এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, নীতিভ্রষ্টতার থেকেই অযৌক্তিকতা জন্মায়। পরীক্ষা করে দেখুন তাই কি না। মানুষের ইতিহাসের দিকে চোখ মেলে তাকান, তার পরে আমায় বলুন, কী দেখলেন সেখানে। প্রচুর? বেশ, রোড্‌সের বিশাল প্রতিমূর্তি* কী অভীষ্ট সিদ্ধ করেছে শুনি? এটা যে মানুষেরই হাতের তৈরী এ কথা কোনো কোনো লোকে বিনা কারণে বলে না, আবার অনেকে বলে প্রকৃতি নিজেই না কি এটা গড়েছেন। বিভিন্নতা? বেশ, সকল যুগে সকল দেশে যখন অবিভিন্ন লোক ছিলো, কিংবা ছিলো না পণ্ডিত লোক তখন সামরিক আর বে-সামরিক লোকেদের ব্যবহৃত পোষাকের পার্থক্য নিরূপণের ব্যাপারটা কী ছিলো? অভিন্নতা? বেশ, ইতিহাসে আছে মানুষ লড়াই করে আর করে এবং এখনও করছে, সব সময়ে করেছে আবার করবে। এখানে আমি ধরে নোবো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অভিন্নতার আধিক্য! কল্পনার সব চেয়ে শৃঙ্খলাহীনতার মধ্যে তা হলে যা কিছু সহজে ঢুকে যাবে তা পৃথিবীর ইতিহাসের নজীর বলে চালানো সহজ। তবু একটা জিনি

* রোড্‌স্‌ দ্বীপের এ্যাপোলোর পিতলের মূর্তি। ঐ দ্বীপে একটি পোতাশ্রয়ের ওপর পদদ্বয় বিস্তৃত করে মূর্তিটি দাঁড়িয়েছিল এবং পদদ্বয়ের ভেতর দিয়ে বড়ো বড়ো জাহাজ চলাচল করতে এর উচ্চতা সত্তর হাত ছিলো।—অনু।

রয়ে যায় যা এর সম্বন্ধে খাটে না—এবং সেটাতে যথেষ্ট যৌক্তিকতার আদল রয়েছে। যদি কেউ তার বিরোধিতা করতে যায়, সে প্রথম কথাতেই আটকে যাবে। বিশেষত, ইতিহাসে আমরা সব সময়ে একটা আমোদজনক ব্যাপারের সম্মুখীন হই যে, ইতিহাসের পাতায় দেখি সব সময়েই অনেক অনেক সংখ্যায় নীতিবিদ্ বুদ্ধিমান্ লোক, পণ্ডিত লোক ও মানবপ্রেমিক যাঁরা জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে ধরে নিয়েছেন যতো দূর সম্ভব ধর্মসম্মতরূপে, বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে লোক-ব্যবহার করবেন—যেনো এই পৃথিবীতে সাধু ও বুদ্ধিসুলভ জীবন যাপন করার সম্ভাবনা প্রতিবেশীর কাছে প্রমাণ করে তাদের উন্নত করবেন। কিন্তু এতে লাভটা কোথায়? আমরা জানি, আগে বা পরে হোক এই সব মানব—হিতৈষীদের অনেকেই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছেন এবং অত্যন্ত অসংগত কার্যপ্রণালীর পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং আমি আপনাদের জিগগেস্ করবো—মানুষের কাছ থেকে আমরা কী আশা করতে পারি যখন দেখতে পাচ্ছি সে এমন একটা অদ্ভুত গুণসম্পন্ন জীব? আপনারা তার ওপরে চাপিয়ে দিতে পারেন পৃথিবীর যাবতীয় সুখ-শান্তি, আপনারা তাকে ডুবিয়ে দিতে পারেন সুখ-সমৃদ্ধিতে যতোক্ষণ না তার সমৃদ্ধির উপরিদেশে পুকুরের মতো বুদ্‌বুদ্ ফেটে পড়ে, আপনারা তাকে দিতে পারেন তেমন অর্থনৈতিক সাফল্য যখন ঘুমানো, ভালো-মন্দ খাওয়া আর পৃথিবীর ইতিহাসের ধারা-বাহিকতা সম্বন্ধে বুলি কপচানো ছাড়া আর কিছুই তার করার থাকবে না; হাঁ, আপনারা এ সব করতে পারেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রচণ্ড অকৃতজ্ঞতা, প্রচণ্ড শয়তানিপনায় সে আপনার সংগে নোংরা চালাকি করে শেষ করবে। সে বিপর্যস্ত করবে তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ইচ্ছে করেই কামনা করবে অনিষ্টকর বাজেতাইয়ের, কিছু অবিবেকী তুচ্ছাতিতুচ্ছের এক মাত্র উদ্দেশ্যে যে, যে মহান্ সদ্‌বুদ্ধি তাকে অর্পণ করা হয়েছে সেইটাকে কিছু পরিমাণ বাজে খামখেয়ালী জিনিষ দিয়ে সে কলংকিত করবে, আর এইটেই তার সমগ্র সত্তার একটা অংশও বটে। হাঁ, এগুলো সেই একই—খামখেয়ালী দিবাস্বপ্ন, সেই একই হীন নির্বুদ্ধিতা যা সে বজায় রাখতে চায় একটি জিনিষের নিশ্চিত অস্তিত্ব উপলব্ধি করার জন্যে, এটাকে সে পরিত্যাগ করতে পারে না,—সেটা হলো এই ধারণা যে, মানুষ এখনও মানুষ আছে, পিয়ানোর চাবির সারিতে পরিণত হয়ে যায়নি যাতে প্রকৃতি হাত চালিয়ে আপন খুসী মতো বাজিয়ে চল্‌বে, বাজিয়ে চল্‌বে যতোক্ষণ না মানুষের সব ইচ্ছা কেড়ে নেওয়ার হুমকী না দেবে, তোতা-পাখীর মুখস্থ বুলি আওড়ানোয়ও ক্যালেণ্ডারের মাধ্যমে কেড়ে নেওয়া ছাড়া। আর, যদি মানুষ পিয়ানোর চাবির সারিই হয় এবং যদি তাকে বোঝানো যায় প্রকৃতি ও গণিতের নিয়ম-কানুনই তাকে তাই-ই করেছে, তবুও সে পরিবর্তিত হতে চাইবে না। বিপরীত পক্ষে, প্রচণ্ড অকৃতজ্ঞতায় আর এক বার সে চেষ্টা করবে কোনো কিছু দুষ্কার্য করতে, এই দুষ্কার্য তাকে নিজের পক্ষ বলবৎ করার সমর্থ করবে; আর যদি তাতে ফলোদয় না হয় তাহলে সব কিছুর মধ্যে গোলমাল ঝামেলা সৃষ্টি করতে এগিয়ে যাবে, এগিয়ে যাবে সব রকমের কু-মতলব ভাঁজতে একমাত্র উদ্দেশ্যে আগের মতোই, তার ব্যক্তিত্ব জাহির করবার উদ্দেশ্যে। তার দরকার পৃথিবীর ওপর এক অভিশাপ বয়ে আনা, এবং যেহেতু মানুষই একমাত্র অভিশাপ-বাক্য উচ্চারণ করতে পারে (একমাত্র এই সুবিধের জন্যেই মানুষকে অন্যান্য জীব-জন্তুর থেকে আলাদা করা হয়), তাই এই ভয় দেখিয়ে সে তার উদ্দেশ্য সফল করতে পারে—উদ্দেশ্যটা হলো, সে যে মানুষ, পিয়ানোর চাবির সারি নয় সেইটে নিজেকে বোঝানো। কিন্তু আপনারা বলতে পারেন যদি এই সবগুলোর সূচীপত্র তৈরী করা যায়—এই সবগুলো অর্থে আমি বল্‌ছি এই ঝামেলা, গণ্ডগোল, শাপ-শাপান্ত এবং আর-আর সব—যাতে প্রত্যেকটির গণনাকে সম্ভাবনা থাকে এবং যুক্তি কাজ চালিয়ে যেতে থাকে—তা হলে, সে ক্ষেত্রে আমি বিশ্বাস করি, মানুষ ইচ্ছে করেই পাগল হয়ে যাবে যুক্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে এবং তা হলে সে নিজের পক্ষ বলবৎ করতে সমর্থ হবে। আমি এ বিশ্বাস করি এবং এর জন্যে সাক্ষী-সাবুদ্ আন্‌বার জন্যে তৈরী সোজা এই কারণে, মানুষের প্রতিটি কাজ ঘটছে একটা ব্যাপার থেকে, ব্যাপারটা হলো, মানুষ চিরকাল চেষ্টা করছে প্রমাণ করতে নিজের সন্তুষ্টির জন্যে যে সে একটা মানুষই, বাদ্যযন্ত্রের হাতলবিশেষ নয়। এবং তার পথ যতোই কেনো ভ্রান্ত হোক্, সে প্রমাণ করতে পেরেছে; তার কর্মপদ্ধতি যতোই কেনো প্যাঁচালো হোক, সে তা' প্রমাণ করতে পেরেছে। সুতরাং ভবিষ্যতে সম্ভবত তার এই বিশেষ স্বার্থকে নগণ্য বলে ঘোষণা করার থেকে বিরত থাক্‌বেন, অথবা বিরত থাকবেন এ-কথা বলা থেকে যে, তার ইচ্ছাটা কোনো কিছুর ওপর আদৌ নির্ভর করে না।

আবার, আপনারা আমাকে প্রায়ই বলেন (অথবা বলেন যখন তখন আপনারা আমায় একটিমাত্র কথার সাহায্য করেন অনুগ্রহ করে) যে, আমার স্বাধীন ইচ্ছা কেউই কেড়ে নিতে পারবে না এবং আমার এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাতে আমার স্বাধীন ইচ্ছা নিজেরই খেয়ালে আমার স্বাভাবিক স্বার্থের সংগে, প্রাকৃতিক কানুনের সংগে ও গণিতের সংগে সমতা করে চল্‌বে।

হায় ভদ্রমহোদয়গণ! আমরা যখন সূচীপত্র আর গণিত গ্রহণ করে ফেলেছি তখন আমার কতোটুকু স্বাধীন ইচ্ছা আর বাকী আছে—কতোটুকু বাকী আছে যখন দুই দু'য়ে চার হওয়ার নীতিই সর্ব-নিয়ামক হয়ে উঠেছে! যতোই কেনো দুই দু'য়ে চার হোক্ না আমার ইচ্ছেটা শেষ অবধি আমার ইচ্ছেই থাক্‌বে।

[চল্‌বে।

অনুবাদ: আনন্দ দে

চুপি চুপি বলুন

যে-কোন কথা কাকেও যদি বিশ্বাস করাতে হয় তা হ'লে
কথাটি তাকে জোরে না ব'লে, কানে কানে বলুন।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

৺মনোমোহন ঘোষ

সাক্ষী নং তিন

সরকার পক্ষের তিন নম্বর সাক্ষী ই, জে, ব্র্যাগার। অদ্য ২১শে জুলাই, ১৮৮২ তারিখে, ২৪ পরগণার অতিরিক্ত দায়রা জজ এ, সি, ব্রেট এস্কোয়ার, আমার এজলাসে হলফ পাঠ করিয়া জবানবন্দী গৃহীত হইল :—

আমার নাম ই, জে, ব্র্যাগার। আমি নদীয়ার সিভিল সার্জ্জন। এই মামলা সম্পর্কে নেটিভ ডাক্তারের রিপোর্ট আমি পড়েছি। তাঁর অভিমত ভুল, এ কথা আমি বলতে পারি না। ফুসফুসের, মগজের, চোখের congestion, জিভ বেরিয়ে আসা—কণ্ঠরোধ বা শ্বাসরোধের সঙ্গে এ সবের সামঞ্জস্য আছে। তবে এগুলো থাকলেই যে কণ্ঠরোধ বা শ্বাসরোধ হবে, এ সিদ্ধান্ত করা চলে না। কোন দমে-ভারী মানুষ যদি একটা ছোট্ট মেয়ের গলায় পা চেপে ধরে থাকে তার প্রাণ বেরিয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত, তাহলে ঐ সব লক্ষণ সম্ভবতঃ দেখা দেবে। মনে করুন, কেউ এই ভাবে মেয়েটার গলা পা দিয়ে কিছুক্ষণ চেপে ধরে রেখে তাকে শড়কী-বিদ্ধ করেছে, তাহলে আমায় বিস্মিত হয়ে দেখতে হবে যে, বাইরে কোন রক্তক্ষরণ হচ্ছে না। আংশিক শ্বাসরোধ হবার পর যদি শড়কী-বেঁধা হয়ে থাকে, তাহলে বাইরে রক্তক্ষরণের চাইতে ভিতরে ভিতরে বেশী রক্তক্ষরণ হবে, তবে বাইরে কম-বেশী রক্ত বের হবেই। জীবিত অবস্থায় কোন ক্ষতের ফলে বাইরে রক্তপাত হ'ল না, অথচ ভিতরে ভিতরে রক্তক্ষরণ হ'ল, এ আমি ভাবতেও পারি না। যে অনুমান আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, তা যদি সত্যি হয়, আর যদি কোন ধমনী কাটা গিয়ে না থাকে, তাহলে খুব সম্ভব বাইরের রক্তক্ষরণ সামান্যই হবে।

মিঃ ঘোষের জেরার উত্তরে—লিখবার তুই দিন পর, ১লা এপ্রিল রিপোর্টটি আমি পাই। বাইরে রক্তক্ষরণের কোন চিহ্ন নাই—এ কথা সে রিপোর্টে উল্লেখ ছিল। নেটিভ ডাক্তারটির রিপোর্টের সব কথা পড়ে আমার ত মনে হয় না যে, বেঁচে থাকতে বা মরবার পরে জখমি ক্ষত করা হয়েছিল। এ কথা অনুমান করবার মত পর্য্যাপ্ত তথ্য আমরা পেয়েছি। পচন ধরবার সময় যে গ্যাস জন্মেছিল, তারি চাপে পেটের ক্ষতমুখ হাঁ হয়ে থাকবে। ৪০ ঘণ্টা পরে, বিশেষ মার্চ্চে, এ গ্যাস জন্মাবে এ আশা আমি নিশ্চয়ই করব। বেঁচে থাকবার সময় কোন আঘাত-ক্ষত হয়েছে কি না পরীক্ষা করবার প্রধান test হ'ল Coagulation, কিন্তু পচন ধরতে সুরু হ'লে জমাট রক্ত তরল হয়ে যায়। ক্ষতের আকারের কথা ছেড়ে দিলে, রিপোর্টে এমন কোন লক্ষণ দেখতে পাই না, সর্পাঘাতে মৃত্যুর সঙ্গে যার সঙ্গতি নেই। জিভ বেরিয়ে আসা বা চোখ ঠিকরে পড়া—এ সব পচন থেকে হতে পারে। চোখ ত্ব'টি 'congested' ছিল কি না, এ কথা মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টা পরে বলা বড় শক্ত।

প্রশ্ন—মনে করুন, মেয়েটির পেটে সাপ কামড়েছিল, তাতেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর ঠিক পরেই কেউ ক্ষতটি বড় করে দেয়, রিপোর্টে বর্ণিত লক্ষণগুলোতে এমন কিছু আছে, যা এর সঙ্গে সঙ্গতিহীন ?

উঃ—না।

পুনঃ জবানবন্দীতে—কোন প্রশ্ন করা হয় নাই।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন—নদীয়ার দায়রা জজের আদালতে আমি বলেছিলাম—"রিপোর্টে হার্টের ventriclesএ কিছু নেই বলা হয়েছে। কাজেই নিশ্চয় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়েছিল। রক্তক্ষরণ হয়ত ভিতরে ভিতরে হয়েছিল।" এ কথায় আমি বলতে চাইনি যে, বাইরে দেখবার মত কিঞ্চিৎ রক্তক্ষরণ হবেই না। বাইরের রক্তক্ষরণ সম্বন্ধে কোন কথা আমায় জিজ্ঞেস করা হয়নি। আমার এই ধারণাই হয়েছিল যে, বিপজ্জনক এই রক্তক্ষরণ সম্ভবতঃ ভিতরে ভিতরে হয়েছিল। নেটিভ ডাক্তারটি বলেছিলেন যে, এ মৃত্যু সর্পদংশনে নয়। তাঁর এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি না। কারণ, তিনি এ ব্যাপার নজরেই আনেননি যে, দেহ কাল হয়ে গেছল, আর নখগুলো কুঁকড়ে গেছল।

স্বাঃ এ, সি ব্রেট

এইখানে পরদিন পর্য্যন্ত মামলার শুনানী মুলতুবী থাকে।

মামলার দ্বিতীয় দিন

সাক্ষী নং চার

বাদীপক্ষের ৪ নম্বরের সাক্ষী গোলকমণির জবানবন্দী। বয়স প্রায় ৬।৭। আজ ১৮৮২, ২২শে জুলাই তারিখে ২৪ পরগণার অতিরিক্ত দায়রা জজ এ, সি, ব্রেট এস্কোয়ার, আমার সামনে জবানবন্দী গৃহীত হইল—

[জজের মন্তব্য—শিশু বলছে মিথ্যে বলা "পাপ"। "পাপ" কি তা কিন্তু বলতে পারে না। তবু মেয়েটি বুদ্ধিমতী।]

আমার নাম? গোলকমণি। আসামীকে জানি। আমার বাবা। বাবার নাম—মুলুকচাঁদ। আমার এক বোন ছিল। নাম ছিল নেকজান। আমার চাইতে একটু বড়। বিকেল বেলা আমার ছোট বোন আর কচি ভাইটিকে নিয়ে মা ঘর থেকে চলে যায়। বাবা, নেকজান আর আমি গোবাটের মুখোমুখি দাওয়ায় চ্যাটাইয়ের উপর শুতে যাই। রাত্তিরে দিদির লাথিতে ঘুম ভেঙে গেল। জেগে দেখি দিদি চার দিকে পা ছুঁড়ছে। বাবা তার গলায় পা দিয়ে একটা শড়কী বিঁধিয়ে দিচ্ছে তার গায়ে। বাবাকে বললাম—দিদিকে মারছ কেন? বাবা বলল—"ফকীর কদম আলির দোষ দিবি।" এই লোকটার বৌ, সর্ব্ব, বাবার সঙ্গে থাকত। দিদি চার দিকে খালি পা ছুঁড়ছিল, কথা বলতে পারছিল না। জোছনা রাত। চাঁদ আকাশে নামুর দিকে গড়ে পড়ছিল। ভোর হব হব। দিদি আর নড়তে পারে না। বুঝলাম মরে গেছে। বাবা বাইরে চলে গেল। দিদির কাছে বসে রইলাম। প্রায় তখন ভোর। অমৃতর যে মা, আমার নানি হারু বিবি, সে এল। তাকে বললাম—'বাবা দিদিকে মেরে ফেলেছে।' খিরু খেতে ডাকল। তার কাছে গেলাম। গোবাটের উপর এক খেজুর গাছ, তারই কাছে দাঁড়িয়ে সে আমায় ডাকছিল। বাবা কি করেছে সব তাকে বললাম। বেশ যখন বেলা হ'ল, মা ঘরে এল। বাবা কি করেছে সব তাকে বললাম। মা যখন ফেরে তখন আমি শ্যাম মেথরের ঘরে। নাইতে গেছলাম। মা যখন ফিরল তখন আমি ঘরে ছিলাম সে কথাই বলতে চাচ্ছি।

প্রশ্ন—পুলিশ কখন এল জান?

উত্তর—আমি পেঁয়াজের ক্ষেতে ছিলাম। পেঁয়াজ ক্ষেত দেখা আমার অভ্যেস। নিজেই সেখানে গেছলাম। কখন দিদির লাস নিয়ে যায় দেখিনি।

প্রঃ—পেঁয়াজ ক্ষেত থেকে কখন ফিরলে?

উঃ—দুপুর হয় হয়, লাস তখন নিয়ে গেছে।

মিঃ ঘোষের জেরার উত্তরে—

'পাপ' কথা শিখিয়েছে আমায় বড় দারোগা। বড় দারোগাই ত বলল—"মিথ্যা বলিলে পাপ হয়; সত্য বলা ভাল।" বনগাঁয় এ কথা বলেছিল। সে আমায় বলেছিল—"পাপ হইলে কি হয়?" নন্দের মা আমায় বলেছিল, বাবার ফাঁসীর হুকুম হয়েছে। সেদিন আদালতের কাছে এক ধম্ম গাছের গোড়ায় সিন্নি দিয়ে সিন্নির কিছু মিষ্টি আমায় খেতে দিয়েছিল। এই মোকদ্দমার হবার সময় থেকে আমি মায়ের কাছেই আছি। জেলে আমরা বাবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিনি।

যখন আমি চোখ খুলে দেখলাম যে আমার বাবা দিদিকে মেরে ফেলছে, তখন আমি উঠে বসিনি। শুয়ে শুয়েই কি করছে দেখছিলাম।

[জজের মন্তব্য—ঠিক কি ভাবে শুয়েছিল শিশুকে দেখাতে বলা হলে, সে এক হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে দেখাল]

এই ভাবে শুয়ে থেকে বাবার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। বাবা যখন বেরিয়ে যায় তখনও এই একই ভাবে শুয়েছিলাম। আর ঘুমুইনি, কেবল শুয়েছিলাম। এ কাজের আগে বা পরে পেচ্ছাপ করবার জন্যেও উঠিনি। পেচ্ছাপ পায়ই নি।

বনগাঁর ম্যাজিষ্ট্রর সাহেবের আদালতে সাক্ষী দেবার কথা মনে আছে। সেখানে বলেছিলাম, পেচ্ছাপ পেয়েছিল তাই ঘুম ভেঙ্গে ছিল। মনে ছিল না তাই বলেছিলাম। ম্যাজিষ্ট্রকে ঠিকই বলেছিলাম যে, দিদি লাথি মারছিল তাইতেই ঘুম ভেঙ্গে যায়। বাবাকে চালা থেকে শড়কী পাড়তে দেখেছি। শড়কী যেখানে রাখা ছিল তা বিছানা থেকে হাত বাড়ালেই পাবে। আমার মায়ের মা বেঁচে আছে। গাঁয়ে তাকে কোটি বলে ডাকে। আমাদের বাড়ীর নীচের পথের ওপারেই তার ঘর।

[জজের মন্তব্য—মায়ের মা বেঁচে আছে কি না এ কথার জবাব দিতে শিশুর অদ্ভুত অনিচ্ছার ভাব দেখা গেল। প্রথমে বলে ফেলল—মাকে জিজ্ঞেস করব।]

দিদিকে মেরে ফেলছে দেখে আমি তাকে ডাকিনি। আমি একটু কাঁদলাম। যা দেখেছি তা আমার নানি কোটিকে বলিনি। কখনো তাকে বলিনি। হারু বিবি আমার ধরম নানি (সম্পর্ক নাই—নানি বলিয়া ডাকিত মাত্র) যা দেখেছিলাম তা, হারু, খিরু আর আমার মাকে ছাড়া আমার গাঁয়ের আর কাউকে বলিনি। গাঁয়ে আমার অনেক খেলার সাথী। এ ব্যাপার সম্বন্ধে তাদেরও কখন কিছু বলিনি।

ও-কাজ করবার পর বাবা সেই যে বেরিয়েছিল, ফিরে এসে দেখল, বিছানার উপর দিদির পাশে আমি জেগে বসে আছি। বাবা আমায় ডেকে বলেনি—"গোলক! ওঠ!" সে খালি কাঁদতে লাগল। চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল—"কে কোথায় আছ, দেখে যাও, আমার নেকজান কি করে মরল!" খিরু হ'ল উমেশ গাজির বৌ, আমার মাসী। বাবার ডাক শুনে প্রথমে এল হারু বিবি।

প্রঃ—পুরুষদের কে কে এল?

উঃ—এল জমির, সাজন আর শ্যাম মেথর। ওরা আমাদের আত্মীয় নয়। আমার মামু উমেশ গাজি এসে, মরার দিকে চেয়ে দেখে চলে গেল [জজের মন্তব্য—এই লোকটা যে এসেছিল তা প্রকাশ করতে মেয়েটির যেন খুবই অনিচ্ছা)। উমেশ আর আমার নানি কোটি একই বাড়ীতে থাকে। উমেশকে কোন কথা আমি বলিনি। বাবা যে ফকিরের উপর দোষ চাপাতে বলেছিল, এ কথা কাউকে বলিনি। বাবা নেকজানকে কেন মেরে ফেলল, মা আমাকে এ কথা কখন জিজ্ঞেস করেনি। [হেড কনষ্টেবল রামদাসকে ডাকা হ'ল] এই দারোগা আমাদের ঘরের মেঝে খুঁড়ে ফেলতে হুকুম দেয়, আর আমার মামু উমেশ গাজী, কোদাল দিয়ে মেঝে খুঁড়ে ফেলতে থাকে। মা সেখানে ছিল। যে সাপ না কি দিদিকে কামড়েছে সে সাপের তল্লাসীর জন্যে মেঝে

খোঁড়া হয়েছিল। সবারই এই ধারণা হয়েছিল। আমি কি দেখেছি কাউকে তা বলিনি। নেকজান কি করে মরল দারোগা তা মাকে জিজ্ঞেস করেনি। [দ্বারকা রায় কনষ্টেবলকে ডাকা হ'ল] এই কনেষ্টবল আমাকে আর আমার মাকে বনগাঁ নিয়ে গেছল। সেখানে রাত্রে গিয়ে পৌঁছি। সেখানে ইনসপেক্টারকে দেখি। [ইনসপেকটার বিপিনবিহারীকে ডাকা হলে, মেয়েটি তাকে সনাক্ত করল]। এই আদালতে হাজির হবার পর কাল সন্ধ্যায় আমায় তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাকে আর আমার মাকে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি কি জানি, ইনসপেক্টার সব তাকে বলতে বলে। এখানে যা বললাম সব কথা তাকে বলি। মা তাকে কি বলেছিল বলতে পারি না। আমাদের এক জন এক জন করে নিয়ে যাওয়া হয়। কাল যেদিন গেছে আগের হপ্তায় ঐ দিন আমার মা আর আমি বনগাঁর কাছে এক গাছতলায় বসেছিলাম। কদম আলি ফকির সঙ্গে ছিল, আমাদের জল দিচ্ছিল। কদম আলি এখানে আমাদের সঙ্গে এসেছে। সে আদালতের বাইরে আছে।

পুনঃ জবানবন্দীতে মেয়েটি বলে—কোটিকে আমি নানি বলে ডাকি। দিদিকে যখন মেরে ফেলা হয় তখন সে ঘরে ছিল। সে আসেনি। তার পা ফুলেছিল [জজের মন্তব্য—অনেক ইতস্ততঃ করে, অনেক এলোমেলো অবোধ্য কথা বলবার পর শিশু এই কৈফিয়ৎ দিল]। যখন মেঝে খুঁড়ে ফেলা হয়, তখন লাস উঠোনে ছিল।

স্বাঃ এ, সি, ব্রেট।

সাক্ষী নং পাঁচ

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ১০ আইন অনুসারে সত্য পাঠের পর সরকার পক্ষের ৫ নম্বর সাক্ষী বরাতি (বয়স প্রায় ৩৩) আজ ১৮৮২, ২২শে জুলাই তারিখে ২৪ পরগণার অতিরিক্ত দায়রা জজ এ, সি, ব্রেট এস্কোয়ার, আমার এজলাসে জবানবন্দী দেয়—

নাম আমার বরাতি। কাঠগড়ায় ঐ কয়েদীর আমি স্ত্রী। আমার এক মেয়ে ছিল। নাম নেকজান। বয়স প্রায় ৮।১০ বছর। সোয়ামীর সঙ্গে কদম আলি ফকিরের মামলা চলছিল। এ জন্যে আমার সোয়ামী গোগায় আমায় টাকা আনতে পাঠিয়েছিল। বলেছিল, ওর ভাইয়ের কাছে যেতে। ওর ভাই বললে, টাকা নেই। বিকেলে গেছলাম। পরদিন বিহানে, এই ৮।১টায়, ঘরে ফিরলাম। ঘরে ফিরে দেখি দাওয়ার এক চ্যাটাইয়ের উপর বসে আমার মেয়ে গোলক চুপি চুপি কাঁদছে, আর তার পাশে, একই চ্যাটাইয়ের উপর আমার মেয়ে নেকজান মরে পড়ে আছে। সোয়ামী ছিল না। মেয়ের কাপড় দিয়েই লাস ঢাকা ছিল। ছেঁড়া কাপড় নয়। শরীর ন্যাংটোই ছিল। রক্ত নজরে পড়েনি, তবে পেটের এমনি জায়গায় [নিজের দেহের স্থানটি দেখিয়ে দেয়] একটা জখম নজরে পড়েছিল। কিছুক্ষণ পরে সোয়ামী ঘরে এল। এসে দেখলাম এক মেয়ে মরে আছে, আর এক মেয়ে মরা ছেলের পাশে আছে বসে। জিজ্ঞেস করলাম গোলককে—ওরে তোর দিদি কি করে মল রে? সে বললে, তার বাবা তার দিদিকে মেরে ফেলেছে। বললে—গলায় পা চাপিয়ে দিয়ে শড়কী দিয়ে বিঁধেছে। সোয়ামী ঘরে ফিরলে জিজ্ঞেস করলাম—ছেলে রেখে গেলাম তোমার কাছে। গোগায় তুমি টাকা আনতে পাঠালে। এখন বল কে আমার বাছাকে মেরে ফেলেছে? বললাম—কারু সঙ্গে আমার ঝগড়া কাজিয়া নাই; ফকিরদের সঙ্গে তোমারই ত কাজিয়া। সে বললে—"কে মারল জানি নে। আমি ঘরে ছিলাম না।" সে আরও বললে, "যা হবার তা হয়েছে; এবার কি করে বাঁচা যায় তারই চেষ্টা চল করি।" এখন আমার সামনে এই যে শড়কী আর এই যে বগি—এ আমার সোয়ামীর।

মিঃ ঘোষের জেরার উত্তরে:—

সোয়ামী নেকজানকে ভারী ভালবাসত। ফিরে এসে সোয়ামীকে কাঁদতে দেখিনি। মোটেই তাকে কাঁদতে দেখিনি। "কান্না শুনেছি; আমার মেয়ে গোলক কাঁদছিল, সোয়ামীও কাঁদছিল"—নদেয় জজের কাছে এ কথা আমি বলিনি। সে কখন কাঁদেনি (জোর করে বলে)। "প্রথমে সোয়ামীর সঙ্গে কথা হ'ল, তার পর গোলককে জিজ্ঞেস করলাম তার দিদি কি করে মল"—নদেয় জজকে এ কথা আমি বলিনি। এখন যা বলছি, তাই সত্যি। প্রথমে গোলকের সঙ্গে কথা বলি। সোয়ামীর সঙ্গে যখন দেখা হ'ল, তাকে জিজ্ঞেস করলাম—"গোলক বলছে তুমি মেয়ে ফেলেছ নেকজানকে।" সে অস্বীকার করল। তার বাপ কেন নেকজানকে মেরে ফেলল, সে কথা গোলককে জিজ্ঞেস করিনি। সেও কোন কথা আমায় বলেনি। সেদিন দুপুরে আমার মা, কোটির সঙ্গে দেখা করে বললাম—"তুই ছেলে জ্যান্ত রেখে গেলাম, এসে দেখি একটি মরে গেছে।" সে বলল—"মেয়েকে ত আর ফিরে পাবে না; বোধ হয় যে জন্ম দিয়েছিল, সেই তাকে মেরে ফেলেছে।" ঘরে এসে মেয়েকে মরা দেখলাম। লাস চোখে না দেখা পর্য্যন্ত কিছু যে ঘটেছে এ ভাবতে পারিনি। মরার পাশে গোলককে একাই বসে থাকতে দেখেছি। গাঁয়ের কোন লোক, প্রতিবেশী বা আত্মীয়, সেখানে ছিল না। গোলক যা আমাকে বলেছিল, গাঁয়ের কাউকে সে কথা বলিনি। মাত্র আমার মাকে বলেছিলাম।

পরদিন জমাদার রামদাস আমাদের ঘরে এসেছিল। সে আমায় কিছু জিজ্ঞেস করেনি। আমিও তাকে কিছু বলিনি। ঐ ত সে [রামদাসকে ডাকা হলে সাক্ষী তাকে সনাক্ত করল]। যখন এই কনেষ্টবল এল তখন সোয়ামী আমায় ঘরের ভিতর যেতে বলেছিল [জজের মন্তব্য—এ কথা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে বলল]। আমাদের আর এক ঘরে আমি গেলাম। রামদাসের হুকুমে উমেশ গাজী আমাদের দাওয়ার মেঝে খুঁড়েছিল। দূর থেকে দেখেছি। শুনলাম সোয়ামী পুলিশকে বলছে যে, নেকজানকে সম্ভবতঃ সাপে কেটে মেরেছে। এক মঙ্গলবার আমি ঘরে ফিরি। পরের বৃহস্পতিবার প্রথম আমি পুলিশকে বলি যে, আমার স্বামী নেকজানকে খুন করেছে। আমার বাড়ীতে পঞ্চায়েৎ উমাচরণের সামনে কনেষ্টবল দ্বারকাকে আমি এ কথা বলি। দ্বারকা আমাকে আর গোলককে বনগাঁ নিয়ে যায়। পথে সে আমাদের সঙ্গে চলে। জমির, সাজন ও উমাচরণকেও সে সঙ্গে নেয়। গাঁয়ে দ্বারকা আমায় জিজ্ঞেস করে, কি করে আমার মেয়ে মারা গেল। আমি তাকে তখন বললাম যে, তার বাবা তাকে খুন করেছে। সন্ধ্যায় আমরা বনগাঁ পৌঁছলাম। দ্বারকা আমাদের সঙ্গেই ছিল। সে আমাদের নিয়ে গেল বড় দারোগার বাড়ীতে তার কাছে। আগে আর বড় দারোগা কেমন

দেখিনি। সে রাতে দ্বারকা আমাদের থানায় রাখল। পরদিন (শুক্রবার) প্রাতে আমার আর গোলকের জবানী লিখে নেওয়া হ'ল।

প্রশ্ন—জবানবন্দী লিখে নেবার পর তোমাদের যখন নিয়ে যাওয়া হ'ল, তখন কি দেখলে সোয়ামীকে পুলিশে গ্রেপ্তার করেছে? তখন কি তুমি তাকে ডেকে বলেছিলে—"তুমি পুলিশের কাছে একরার করেছ যে, তুমিই তোমার মেয়েকে মেরে ফেলেছ, এ কথা সত্যি?"

উত্তর—হাঁ, বলেছিলাম [জজের মন্তব্য—সাক্ষী পরে কথাটা অস্বীকার করে, তবে অস্বীকারটা সন্তোষজনক ভাবে নয়]। আমার স্বামীকে অমন কোন কথা বলিনি; এ কথা মিথ্যে—তাকে এ কথাও বলতে শুনিনি। পুলিশ আমাকে এ কথা বলেনি যে, আমার স্বামী একরার করেছে। স্বামীর ফাঁসীর হুকুম হবার পর, তার সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। আদালতে কে যেন জিজ্ঞেস করেছিল, আপীল করব কি না। আমায় বলা হয়েছিল, আপীলে আমার স্বামীর প্রাণ রক্ষা হবে না। তাই আপীলের কোন চেষ্টা আমি করিনি। আদালতের লোকেরা বলেছিল যে, আপীলের কিছু খরচা নাই। স্বামীর ফাঁসীর হুকুম হবার পর আমি পীরের কাছে সিন্নি দেইনি। গত রাতে আমায় বড় দারোগার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়নি। আমার মেয়ে গোলককেও নিয়ে যাওয়া হয়নি। সে আমার সঙ্গেই ছিল। মেয়ে যদি বলে থাকে যে কাল তাকে আর আমাকে, এক এক জন করে, বড় দারোগার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, তা হলে বলব সে ছেলে মানুষ, তাই বলেছে। যদি সে বলে থাকে, আমি সিন্নি দিয়েছি, কেন বলল বুঝতে পারছি না। গত হপ্তায় শুক্রবার আমি কদম আলি ফকিরের সঙ্গে গাছতলায় বসেছিলাম না। কেন সে এসেছে বলতে পারি না। তার বৌ-ও এসেছে।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে—যখন দেখলাম স্বামী আমার মেয়েকে খুন করেছে, তখন তার উপর খুবই রাগ হয়েছিল। বলেছিলাম, ওকে আর ভাত দেব না। সে-ও বলেছিল, আমার হাতে ও আর কখনও ভাত খাবে না। দেখলাম পুলিশ এল। দেখলাম সোয়ামী চেষ্টা করছে তাদের বুঝাতে, আমার ছেলেকে সাপে কেটে মেরেছে। আমি যে এগিয়ে গেলাম না, গিয়ে যে তাদের সত্যি ব্যাপার কি তা বলিনি, তার কারণ আমার ডাক হয়নি। ঘায়েলের ক্ষত লম্বা দেখেছি, তিন কোণা নয়। একটা আঙুল বেশ ঢুকতে পারে এমন ক্ষত। বনগাঁয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলেছিলাম, আমার সন্দেহ, কদম আলি ফকিরের বিরুদ্ধে মামলা আনবার জন্তে আমার স্বামী নেকজানকে খুন করেছে। আমার মেয়ে গোলক আমায় বলে যে যখন সে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে, কেন সে নেকজানকে মারছে, সে বলে—"কদম আলির কণ্ঠা ঘিরে দোষ পড়বে।" নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ দু'জনাকেই আমি এ কথা বলেছি।

[জজের মন্তব্য—সোপর্দ্দকারী কর্ম্মচারী বা নদীয়ার কারু নথিপত্রে এমন বিবৃতির চিহ্নও পাওয়া যায় না।]

স্বাঃ এ, সি, ব্রেট

সাক্ষী নং ছয়

সরকার পক্ষের ৬ নম্বর সাক্ষী হারু। বয়স প্রায় ৪০। জজ, ১৮৮২, ২২শে জুলাই ২৪ পরগণার অতিরিক্ত দায়রা জজ এ, সি, ব্রেট এস্কোয়ার, আমার সামনে ১৮৩৭ সালের ১০ আ[illegible] অনুসারে সত্য পাঠের পর গৃহীত জবানবন্দী—

আমার নাম হারু বিবি। আমি ফটিক সর্দ্দারের বিধ[illegible] যেদিন নেকজান মারা যায় সেদিনের কথা আমার মনে আ[illegible] আসামীকে জানি। আসামীর নাম মুলুকচাঁদ। ওর বাড়ী আ[illegible] বাড়ী থেকে এই এতটা দূর। [হাত দিয়ে দেখিয়ে বলে, এই ৩০' হাত]। ভোর বেলা। আসামীর ঘরের দিক থেকে কানে [illegible] একটা বাচ্চা কাঁদছে—"কে আমার দিদিকে মেরে ফেলল গো[illegible] সে কাঁদছিল আর এ কথা বলছিল। এর চাইতে জোরে তার গ[illegible] ওঠেনি [নিজে আওয়াজ করে যা দেখিয়ে দিল, তা বেশ নীচু গলা[illegible] এমন করে কাঁদেনি যাতে অন্তে গিয়ে সাহায্য করতে পা[illegible] ঘরে ছিলাম। আসামীর ঘরে গেলাম। গিয়ে দেখি, বারান্দায় এ[illegible] চ্যাটাইয়ের উপর পড়ে আছে নেকজান মরে, আর তার বোন গো[illegible] পাশে বসে কাঁদছে। গোলক আমায় বললে—শড়কী মেরে ব[illegible] নেকজানকে মেরে ফেলে, কচু-জঙ্গলে শড়কীটা ফেলে দিয়ে[illegible] এ কথাও বলল যে, তার বাবা নেকজানের গলায় পা দিয়েছি[illegible] আসামী তখন গোলকের কাছেই বসেছিল। গোলকের কথা [illegible] সে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ রাগ করে তার উপর হাত উঠাল। [illegible] মারেনি। লাসের গায়ে কোন ক্ষত দেখতে পাইনি। নদীয়[illegible] জজ বা বনগাঁর ম্যাজিষ্ট্রেটকে আমি এ কথা বলিনি যে আমি ক্ষ[illegible] দেখেছি।

মিঃ ঘোষের জেরার উত্তরে :—

আমার ঘরে আর লোক নাই। আসামী বা তার পরিবা[illegible] সঙ্গে আমার ভাল ভাব নাই। আমার সঙ্গে তারা কোন ধর্ম্ম-সম্ব[illegible] পাতায়নি। মেয়েটি আমায় যা বলেছিল সে কথা কাউ[illegible] বলিনি। আসামী যখন গোলককে মারবার জন্ত হাত তুলেছি[illegible] তখন মুখে কিছু বলেনি। এ কথা সে বলেনি—"তোর গলায়ও [illegible] দেব।" [জজের মন্তব্য—জজের নথীতে এ কথা পাওয়া যায় [illegible] আসামী কাঁদছিল।

পুনঃ জবানবন্দীতে—নেকজানের মরার পর আমি বি[illegible] হয়েছি।

স্বাঃ এ, সি, ব্রে[illegible]

সাক্ষী নং সাত

সরকার পক্ষের ৭ নং সাক্ষী খিরু। বয়স প্রায় ৪০। আ[illegible] ১৮৮২, ২২শে জুলাই ২৪ পরগণার অতিরিক্ত দায়রা জ[illegible] এ, সি, ব্রেট এস্কোয়ার, আমার এজলাসে ১৮৭২ সালের ১০ আই[illegible] অনুসারে সত্য পাঠান্তে জবানবন্দী দিল—

আমার নাম খিরু বিবি। সাকিন মৌজা ভুলাং। আ[illegible] উমেশ গাজির বৌ। বরাতি আমার মায়ের পেটের বোন[illegible] আসামী তার সোয়ামী। আমার বাড়ী ওদের বাড়ী থেকে অতটা [অনুমানে দেখায় ৩০০ গজ]। সকাল প্রায় ৮ট[illegible] গোলককে ডাকলাম আমার কাছে এসে খেতে। সে কাঁদছি[illegible] আমায় বললে, তার বাবা নেকজানকে মেরে ফেলেছে। [illegible] আগে ওর কান্না শুনে বাইরে নজর দিতে দেখি, বারান্দায় নেকজা[illegible] মড়া পড়ে আছে। এই না দেখে মুখ ফিরিয়ে নেই। গো[illegible]

গেলে যে, তার বাবা নেকজানের গলায় পা দিয়েছিল। শড়কীর সম্বন্ধে কোন কথা সে বলেনি।

মিঃ ঘোষের জেরার উত্তর :—

কান্নার শব্দ শুনে আমার সোয়ামী আসামীর বাড়ীতে গিয়েছিল কি না বলতে পারি না। রাতে সে আমার কাছেই শুয়েছিল। আসামীর বাড়ীর হাতার মধ্যেই আমার ঘর। হাঁ, এখন মনে পড়েছে, আমি যাবার আগে আমার স্বামী ওদের বাড়ী গেছল। সে ফিরে এলে, আমি যাই। গোলকের কাছে যা শুনেছিলাম তা কাউকে বলিনি। পরদিন রাতেও স্বামী আমার কাছে শুয়েছিল। গাঁয়ে সবাই বলাবলি করছিল যে, কোন অজানা কারণে নেকজান মরেছে। ঘটনার পর দিন আমার স্বামী একটা কোদালী নিয়ে আসামীর ঘরে মেঝে খুঁড়তে ওদের ওখানে গেছল। কেন জানি না। স্বামীর কাছে শুনেছি যে, যে সাপ নেকজানকে কামড়েছে বলে সন্দেহ করা হয়েছিল সেই সাপের খোঁজে মেঝে খোঁড়া হয়েছিল। গোলক আমায় যা বলেছিল, স্বামীকে সে কথা বলিনি। আমি ওদের ঘরে যাবার আগে আসামীকে কাঁদতে শুনেছি!

[জজের মন্তব্য—এইখানে সাক্ষী হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়লে তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। কেউ তাকে আর কোন প্রশ্ন করতে চায় না।]

স্বাঃ এ, সি, ব্রেট।

২৪শে জুলাই, সোমবার পর্য্যন্ত শুনানী মুলতুবী থাকে।

তৃতীয় দিনের শুনানী

সাক্ষী নং আট

সরকার পক্ষের আট নম্বর সাক্ষী সর্ব্ব। বয়স প্রায় ২৮। আজ ১৮৯২ সালের ২৪শে জুলাই ২৪ পরগণার অতিরিক্ত দায়রা জজ এ, সি, ব্রেট এস্কোয়ার, আমার এজলাসে, ১৮৭৩ সালের ১০ আইন অনুসারে সত্য পাঠান্তে জবানবন্দী গৃহীত হইল—

নাম আমার সর্ব্ব। সাকিন মৌজা ভুলাৎ। আসামীকে জানি। ওর নাম মুলুকচাঁদ। এক দিন রাতে আমার স্বামী ঘরে ছিল না। একা শুয়েছিলাম। ও এসেছিল আমার কাছে। আমার গায়ে বিশ্রী ভাবে হাত দিতেই আমি চেঁচিয়ে উঠি। শাউড়ী এসে ওর কাপড় চেপে ধরে। কাপড় খসিয়ে নিয়ে ও দৌড়ে পালিয়ে যায়। শাউড়ী বাতী জ্বালাল। আমরা দেখলাম, যে বারান্দায় আমি ঘুমুচ্ছিলাম, সেখানে একটা শড়কী পড়ে। শড়কী আমার স্বামীর নয়, তাই আমরা বুঝে নিলাম, আসামী ফেলে গেছে। এ জন্যে আমার স্বামী ওর বিরুদ্ধে এত্তালা করে আসে।

মিঃ ঘোষের জেরার উত্তরে :—

নেকজানের মরার কথা যখন শুনেছি, তার কত দিন আগে এ ব্যাপার ঘটেছিল মনে নেই। তা এক মাসের কম হবে। ম্যাজিষ্ট্রেটকে আমি এ কথা বলিনি যে, আমার শাউড়ী আসামীর হাত থেকে শড়কী ছিনিয়ে নেয়। যদি বলে থাকি, মনে নাই। আমার এক ভাইঝি আছে। নাম ওতিরণ—মীরুর বৌ। মীরুর সঙ্গে আসামীর এক মোকদ্দমা হয়, তাতে আসামী জেতে। জেতবার পর আমার স্বামী আমার ইজ্জৎ মারবার জন্যে আমাদের ঘরে জোর করে ঢুকবার অভিযোগ দিয়ে আসামীর নামে মামলা আনে।

পুনঃ জবানবন্দীতে কোন জিজ্ঞাসাবাদ হয় না।

স্বাঃ এ, সি, ব্রেট।

সাক্ষী নং নয়

সরকার পক্ষের নয় নম্বর সাক্ষী উমাচরণ সরকার। বয়স প্রায় ৪০। আজ ১৮৯২ সালের ২৪শে জুলাই ২৪ পরগণার অতিরিক্ত দায়রা জজ এ, সি, ব্রেট এস্কোয়ার, আমার এজলাসে, ১৮৭৩এর ১০ আইন অনুসারে সত্য পাঠের পর জবানবন্দী গৃহীত হইল—

আমার নাম—উমাচরণ সরকার। পিতা—বংশীধর। সাকিন—মৌজা ভুলাৎ। পেশা—চাষী। গাঁয়ের আমি পঞ্চায়েৎ। আসামীকে জানি। মুলুকচাঁদ, আমাদের গাঁয়ের চৌকীদার। গেল ১৫ই চৈৎ প্রাতে উমেশ গাজি আমার কাছে এসে বলল, মুলুকচাঁদের মেয়ে নেকজান মরে পড়ে আছে। জমির, সাজন, শ্যাম মেথর ও মুলুকচাঁদ ডাকছে। আমি গেলাম। গিয়ে দেখলাম, মেয়েটা বারান্দায় মরে পড়ে আছে। একখানা কাপড় ঢাকা। আসামীকে জিজ্ঞেস করলাম—কি করে মরল? সে বললে, বলতে পারি না। তাকে কাপড়টা উঠাতে বললাম, দেখলাম এখানটায় একটা ক্ষত [পাকস্থলীর সামান্য উপরের একটা স্থান দেখিয়ে দিল।]

আদালতের প্রশ্ন—ক্ষতের আকার কি রকম দেখলেন? তিন কোণা?

উত্তর—আজ্ঞে, তিন কোণা।

আসামীকে জিজ্ঞেস করলাম, ক্ষতটা কি করে হ'ল। সে বলতে পারল না। একটু পরে বলল, মেয়েকে সাপে কামড়ে মেরেছে। ক্ষতটা সাপে কাটার চিহ্ন বলে সে বলেনি। তার ঘরের গর্ত্তগুলো আমায় দেখিয়ে বলল, কোন একটা গর্ত্ত থেকে সাপ বের হয়ে থাকবে। ওর বাড়ীর কাছে এগিয়ে আসতে গো-বাটের পাশে এক কচু-জঙ্গলে একখানা শড়কী দেখতে পেলাম। একটু দূরে একখানা বগি, স্বরূপ ঘোষের ঘরের ঠিক পেছনে। আসামীকে বললাম, এগুলো যেমন আছে তেমনি থাকবে। তাকে পুলিশে খবর দিতে বললাম। হাতিয়ারগুলো ওখানে কেন পড়ে, জিজ্ঞেস করলাম তাকে। সে বলল, বলতে পারি না। যখন তাকে পুলিশে গিয়ে খবর দিতে বললাম, তাকে এ কথাও বলে দিলাম, আমার বাড়ী গিয়ে আমার কাছ থেকে একটা এত্তালা যেন নিয়ে যায়, আমি বাড়ী যাচ্ছি লিখে দিতে। ও কিন্তু আমার বাড়ী যায়নি।

মিঃ ঘোষের জেরার উত্তরে :—

পরদিন রামদাস জমাদার এসেছিল। দ্বারকা রায় আমার তার কাছে নিয়ে গেছল। সব সাক্ষীর পরে আমায় ডেকে নেওয়া হয়। একটা মাচানে লাস উঠান হয়েছে গিয়ে দেখলাম। হাতিয়ারগুলো যে দেখেছি তা রামদাসকে বলিনি। হাতিয়ারগুলো দেখে কতকটা সন্দেহ আমার হয়েছিল। সন্দেহ হয়েছিল, কেউ হয়ত নেকজানকে খুন করেছে। নদীয়ার জজের কাছে আসামীকে আমি সন্দেহ করি, এ কথা বলেছিলাম কি না স্মরণ নাই। অনেক দিনের কথা ত, এ নিয়ে এতটা দাঁড়াবে মনে হলে, যা বলেছি তা

একটু টুকে রাখতাম। [জজের মন্তব্য—কৌঁসুলী চাপ দিলে সাক্ষী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই মন্তব্য করল। আসামীকে সে সন্দেহ করেছিল কি না, এই প্রশ্ন নিয়ে সাক্ষী বড্ড কথার প্যাঁচ কষতে লাগল]। যখন আমি রামদাস জমাদারের কাছে গেলাম, তখন লক্ষ্য করিনি, যেখানে শড়কী আর বগি দেখেছিলাম, সেখানেই সে দু'টো পড়ে আছে কি না। যখন আমি বলেছিলাম যে ও দু'টো যেমন আছে তেমনি থাকবে, তখন আসামী আমায় বলেছিল, ও দু'টো আমার, যখন খুসী তুলে নেব। কোন আদালতে এ কথা বলেছি কি না মনে নাই। এই সেদিন আমি পঞ্চায়েৎ হয়েছি। খুনের রিপোর্ট দেওয়া যে আমার কাজ এ কথা আমি জানতাম না। এই জন্যে আমি যা জানি তা রামদাসকে বলিনি। দ্বারকা রায় আমায় রামদাসের কাছে নিয়ে গেছল, কিন্তু তার সঙ্গে আমার মোটেই কোন কথা হয়নি। আমায় কেন তলব দেওয়া হয়েছিল, তা'ও তাকে জিজ্ঞেস করিনি। [জজের মন্তব্য—অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর, যখন আদালত সাক্ষীর আগের কথা লিখে নিচ্ছিল, তখন আপনা-আপনিই সাক্ষী এ কথা বলে)। পরে—একটু পরে, রামদাস জিজ্ঞেস করল, মেয়েটা কি করে মরল আমি বলতে পারি কি না। বললাম—বলতে পারি না। আমার কারু উপর সন্দেহ হয় সে কথা তাকে বলিনি। যখন আমি প্রথম গিয়ে লাস দেখলাম, আসামীকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় মরা মেয়েটা আর তার বোন গোলক শুয়েছিল। গোলক সেখানে ছিল না। গোলক আর নেকজান যে একসঙ্গে ঘুমিয়েছিল এ কথা কি করে জানলাম বলতে পারি না। রামদাসের কাছে যখন আমায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখন মেঝে খুঁড়ে ফেলা দেখিনি। দেখবার জন্য যথেষ্ট কাছেও যাইনি। লাসের গায়ে বা কাপড় চোপড়ে কোন রক্ত আমি দেখিনি। আমাদের গাঁ থেকে গোগা ক্রোশ-খানিক হবে। শুনেছি আসামীর ভাই সেখানে থাকে।

পুনঃ জবানবন্দী আর হয়নি।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলে—আসামীর বাড়ী থেকে আসবার পর আমি শড়কী ও বগি দেখেছি। শড়কীখানি তার বাড়ীর উত্তরে আর বগিখানি ৩ রশি (২০ গজ) পশ্চিমে পড়েছিল। আমার বাড়ী তার বাড়ীর দক্ষিণে। জখমি ক্ষত কি করে হল এ কথা যখন আসামীকে জিজ্ঞাসা করি তখন আমার মনে সন্দেহ হয়; কিন্তু তখনও হাতিয়ারগুলো আমার নজরে পড়েনি, ক্ষত দেখেই মনে সন্দেহ হয়। বাড়ী ফিরেই আমি এতালা লিখতে বসিনি। আসামীও দেখলাম এল না, আমিও লিখলাম না। এতালা যদি লিখতাম তাহলে তাতে এই কথা থাকতো—"আমি নেকজানের লাস দেখেছি, তার বাবা বলছে সাপে কেটে মেরেছে কিন্তু একটা একটা কাটি ক্ষত দেখে মনে হচ্ছে খুন।" কাউকে বিশেষ করে সন্দেহ করছি এ কথা আমি বলি না।

স্বাঃ এ, সি, ব্রেট

[ক্রমশঃ

(মুলুকচাঁদের বিচার প্রসঙ্গে একটি চিঠি)

বনগাঁ
১০।১।১৯৫২

সসম্মান নিবেদনমিদং—

মাসিক বসুমতীতে আপনার লিখিত "মুলুকচাঁদের বিচার" পড়িয়া বড়ই প্রীত হইতেছি। আপনি যদি বাংলার সমস্ত বড় বড় বিচারগুলি এমত বঙ্গভাষায় লিখেন, তাহা হইলে উহা সকলেরই কাছে অতীব interesting হইতে পারে। মুলুকচাঁদের বিচার সম্বন্ধে আমি আমার পিতৃদেবের কাছে কিছু কিছু শুনিয়াছি। আমার পিতৃদেব প্রথমে বনগাঁয়ে থাকিতেন, তার পর ১৮৮২ খৃঃ অব্দে তিনি গোয়াড়ীতে যান—তথায় কৃষ্ণনগর কোর্টে মোক্তারী করেন।

মুলুকচাঁদ চৌকীদারের বিরুদ্ধে Murder case যখন বনগাঁ হইতে নদীয়ার সেসন কোর্টে বিচারার্থ অর্পিত হয় তখন এই বনগ্রাম সব-ডিভিসনের প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গোপাল বাবু তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে এক জন অতীব স্বাধীনচেতা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব Registrar বা Asst. Registrar ৺গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট-নিবাসী অবসর-প্রাপ্ত জজ ৺নরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বোক্ত গোপাল বাবুর অতি নিকটতম আত্মীয়—সম্ভবতঃ খুল্লতাত বা খুল্লতাত-ভ্রাতা হইবেন। কৃষ্ণনগরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট এ case এ আসামীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য গোপাল বাবুকে এক Demi Official চিঠি লিখেন—কিন্তু গোপাল বাবুর সাক্ষ্য প্রমাণে এ মোকদ্দমার আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া সাজ দেন এবং District Magistrate-এর উক্ত D. O. চিঠিখানি নথীর সামিল রাখিয়া District Magistrateএর আচর সম্বন্ধে অতি তিক্ত মন্তব্য করেন।

আমার পিতৃদেব মুলুকচাঁদের মোকদ্দমার সম্বন্ধে বিচার কারী জজ Mr. Dickensএর একগুঁয়েমির কথা গল্প করিতেন প্রথম দিন case হইয়া যাইবার পর কৃষ্ণনগরের জনৈক বিশি উকীল বাবু বাসায় যাইবার কালীন দেখেন যে, মুলুকচাঁদের স্ত্রী, পুত্র কন্যা ও আত্মীয়গণ এক পীরের দর্গায় সিন্নি দিতেছে এবং তথা বহু লোক জমায়েত হইয়াছে। উক্ত উকীল বাবুর জিজ্ঞাসায় তাহারা প্রকাশ করে যে, শাশা থানার দারোগা বাবু বলিয়াছেন যে আগামী কাল মুলুকচাঁদ খালাস হইবে। সেই আশায় তাহারা দর্গা সিন্নি দিতেছে। উকীল বাবুর তাহাতে খুব সন্দেহ হয় এবং তিনি মনে করেন যে, যে caseএ ফাঁসী বা দ্বীপান্তর অনিবার্য্য, caseএ আসামী খালাস হইবে ইহা দারোগা বাবু কি করিয়া বলিয়াছেন ? নিশ্চয়ই দারোগা বাবু ইহাদের দ্বারা মিথ্যা সাক্ষ দিয়া লইবার জন্য এই সরল-বিশ্বাসী স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণকে মিথ্যা ধাপ্পা দিয়াছেন।

বোধ হয় সে সময় undefended murder case গভর্ণমেণ্ট দ্বারা আসামীর পক্ষে উকীল দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না উক্ত উকীল বাবু বার-লাইব্রেরীতে আসিয়া এ কথা প্রকাশ করে এবং জানিতে পারেন যে, গতকাল যখন মুলুকচাঁদের স্ত্রী ও কন্যাগণের জবানবন্দী হয়, তখন মুলুকচাঁদ না কি সবিস্ময়ে Doc

হইতে মেয়েকে বলিয়াছিল, "মা, তোরা এ কথা কি ক'রে বলছিস্; পুলিশ তোদের এমন শিখানও শিখাইয়াছে!"

উকীল বাবুর এ কথা শুনিয়া নদীয়া বারের কয়েক জন বিশিষ্ট উকীল সেসন জজ Mr. Dickensএর কাছে যান এবং তাঁহাকে সমস্ত বলেন এবং বর্ত্তমান Jury discharge করিয়া নূতন Jury লইয়া case করিতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহারা মুলুকচাঁদকে Defend করিবেন ইহাও বলেন। এ কথা শুনিয়া Mr. Dickens খুব রাগিয়া উঠেন। তখন উকীল বাবুরা বলেন যে, তাঁহারা ওই মিথ্যা খুনী মোকদ্দমায় আসামীর পক্ষে মিঃ মনোমোহন ঘোষকে পর্য্যন্ত আনিতে পারেন। তাহাতেও না কি Mr. Dickens মন্তব্য করেন যে, এই serious caseএ মিঃ মনোমোহন ঘোষ আসিয়া মুলুকচাঁদের মাথা কোন মতে বাঁচাইতে পারিবেন না।

এ কথার পর বিচার চলে এবং যথারীতি মুলুকচাঁদের ফাঁসীর হুকুম হয়।

তখন নদীয়ার Bar খুব strong এবং বাংলার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ Bar ছিল। কয়েক জন উকীল কলিকাতায় মিঃ মনোমোহন ঘোষের কাছে যান এবং তাঁকে সমস্ত বলেন। মিঃ মনোমোহন ঘোষ যথারীতি হাইকোর্টে আপীল দাখিল করেন এবং জজের উক্ত আচরণ সম্বন্ধে affidavit দেয়। আপীল ও জজের reference একই সঙ্গে বিচার হয় এবং মুলুকচাঁদ হাইকোর্ট হইতে খালাস হয়। কিন্তু জজ মহোদয়েরা আলিপুর দায়রা আদালতে তাহার পুনর্বিচারের আদেশ দেন। সেই বিচারে বিনা পারিশ্রমিকে মিঃ মনোমোহন ঘোষ মুলুকচাঁদকে Defend করেন। জুরির বিচারে আলিপুরের জজ মুলুকচাঁদকে বেকসুর খালাস দিলে, কিন্তু মুলুকচাঁদ আসামীর Dock হইতে কিছুতেই নামিতে চায় না, বলে যে আবার শাশার দারোগা ও কৃষ্ণনগরের জজ তাকে ফাঁসী দিবে।

মুলুকচাঁদ শেষ জীবন পর্য্যন্ত মিঃ মনোমোহন ঘোষের আর্দ্দালী হইয়াছিল। ঐ caseএর offshoot স্বরূপ বনগাঁয়ে সেই সময়ে আর একটি ব্যাপার হয়। উদ্ধত ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণের মেজাজ কিরূপ ছিল তাহা তাহাতে দেখা যাইবে। Mr. Brander নামে এক ব্যক্তি সে সময়ে নদীয়ার Civil Surgeon ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে বাবু অধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (এক জন নেটিভ ডাক্তার) বনগাঁর হাসপাতালের chargeএ ছিলেন। এই দুই জনই মুলুকচাঁদের caseএর proscution সাক্ষী ছিলেন। অধর বাবু বহু দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া এই বনগাঁতেই পেন্সন লইয়া বাস করিতেন। আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি।

মুলুকচাঁদের caseএর সময়ে Dr. Brander এক দিন বনগাঁয়ে Inspectionএ আইসেন এবং ডাক্তার অধর বাবু তাঁর উক্ত উপর-ওয়ালাকে সম্ভ্রম দেখাইয়া receive করিবার জন্য বনগ্রামের রেল-ষ্টেশনে যান। ডাক্তার সাহেব প্রথমে ঘোড়-গাড়ীতে উঠেন এবং যেমনি অধর বাবু গাড়ীতে উঠিতে যাইবেন, অমনি Brander তাঁহাকে গাড়ীর ভিতরে উঠিতে দেন না। বলেন, "উপরে coach-manএর কাছে গিয়া ব'স।" অধর বাবু বলেন যে তিনি তাহা বসিতে পারেন না, কারণ, বনগ্রাম টাউনে তাঁহাদের যথেষ্ট মান-সম্ভ্রম আছে এবং তিনি এক জন গভর্ণমেণ্টের ডাক্তার। তাহাতে Brander আরো চটিয়া যান এবং বলেন যে তাঁহাকে coach-manএর কাছে coach-বাক্সের উপর বসিতেই হইবে। তাহাতে অধর বাবু পুনরায় আপত্তি করেন এবং বলেন, তিনি অপর গাড়ীতে যাইবেন অথবা হাঁটিয়া সবডিভিসনের dispensaryতে যাইবেন। তাহাতে সাহেব বলেন যে, "না, তা কখনও হইবে না, তোমাকে আমার হুকুম তামিল করিয়া আমারই গাড়ীতে coach বাক্সে উঠিয়া যাইতে হইবে।" এই বলিয়া সাহেব গাড়ী হইতে নামিয়া পড়েন এবং অধর বাবুকে ছড়ি দিয়া মারিতে উদ্যত হয়েন। অধর বাবু খুব তেজস্বী লোক ছিলেন, তাঁর হাতে ছাতি ছিল, তিনি ছাতি দিয়া সেই রেল-ষ্টেশনে সর্ব্বসমক্ষে Brander সাহেবকে খুব মারেন। যাহা হউক, পরে townএ আসিলে, ডাক্তার সাহেব জেল-পরিদর্শন কালে, আবার অধর বাবুর সঙ্গে ঝগড়া বাধান। সেইখানে আবার কথায় কথায় ঝগড়া সুরু হয় এবং সেখানে অধর বাবুকে সাহেব গালাগালি দিলে অধর বাবু পুনরায় ছড়ি দিয়া সাহেবকে মারেন।

শেষ বারে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে উভয়েই মোকদ্দমা করেন। কয়েকটি দিন সে মোকদ্দমা চলিবার পর Dist Magistrate, S. D. O সকলে আসিয়া উহা compromise করেন, Brander সাহেবকে অধর বাবুর কাছে apology চাহিতে হয়।

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়,
পোঃ বনগাঁও, (২৪ পরগণা)

মৃত্যু-লীলা

মৃত ব্যক্তি কখনও দংশন করে না।
মৃত জন কখনও কোন গল্প বলে না।
মৃত্যু চিকিৎসককে তাচ্ছিল্য করে।
মৃত্যু সর্ব্বাধিক সমতা এনে দেয়।
মৃত্যু কখনও কোন দিনক্ষণ মানে না।
মৃত্যু সকল ঋণ পরিশোধ ক'রে দেয়।
মৃত্যুর দিন ঘোষিত হ'লে কখনও আসে না।

—ইংরাজী প্রবাদ থেকে অনূদিত

যজ্ঞের বলি

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

অশ্বমেধ যজ্ঞ। রাজা অম্বরীষের পুণ্য এত বেশি হয়েছিল যে, এই অশ্বমেধ যজ্ঞটি সুসম্পন্ন হলে তাঁর পুণ্যের ভাগ ইন্দ্রকেও ছাপিয়ে যাবে, তিনি ইন্দ্রত্ব লাভের অধিকারী হয়ে উঠবেন। পাছে পুণ্যের আধিক্যে তিনি শেষ পর্য্যন্ত স্বর্গের সিংহাসন দাবী করে বসেন—এই ভয়েই যজ্ঞের ঘোড়াটিকে সরিয়ে ফেলার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের চৌর্য্যবৃত্তি গ্রহণ না করে উপায় ছিল না। কারণ ঘোড়াটি না পেলে তো আর অম্বরীষের যজ্ঞ পূর্ণ হবে না!

এদিকে রাজা অম্বরীষ যখন ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা পাচ্ছেন না, তখন তাঁর কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠ বললেন,—'মহারাজ, একটা উপায় আছে; কিন্তু বড়ই কঠিন!'

'কি—কি উপায় মহর্ষি!' ব্যাকুল কণ্ঠে রাজা প্রশ্ন করলেন;—আশায় তাঁর চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো,—অকূল সমুদ্রে ভাসমান কোন ব্যক্তি ঠিক যেন কূলে ওঠবার কোন আশ্রয় পেয়েছে! মহর্ষি বললেন,—'অশ্বের পরিবর্ত্তে যদি কোন ব্রাহ্মণ বালককে যজ্ঞে আহুতি দিতে পার, তবেই তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে। তাতে যজ্ঞের ফললাভ না হোক, যজ্ঞপণ্ড-জনিত পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না।'

'সে কি মহর্ষি!' রাজার কণ্ঠস্বরে যেন আতঙ্ক ফুটে উঠলো,—'ব্রাহ্মণ-বালককে যজ্ঞে আহুতি দিতে হবে? না, না, এ কি সম্ভব? তাহলে যে অশ্বমেধ না হয়ে 'নরমেধ' হয়ে যাবে! অথচ আমার মনস্কামও তাতে পূর্ণ হবে না!'

'কিন্তু উপায়ও তো আর কিছু নেই রাজা'—বিমর্ষ কণ্ঠেই উত্তর দিলেন বশিষ্ঠ—'কাজ যত দূর এগিয়েছে তাতে তো আর পিছিয়ে পড়া চলে না? যজ্ঞের অপূর্ণতা যেমন গুরুতর পাপ—তার প্রায়শ্চিত্তও কেমনি কঠোর! এ প্রায়শ্চিত্ত না করলে—শুধু তুমি নয়, যে বিশাল পবিত্র বংশে তোমার জন্ম, সেই বংশও হবে অধঃপতিত। তা ছাড়াও এর মধ্যে একটা কথা আছে।'

—রাজা অম্বরীষের কণ্ঠে তখন যেন স্বর ফুটতে চাইছিল না। রুদ্ধপ্রায় স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—'আরো কি কথা মহর্ষি?'

বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন,—'রাজশক্তির প্রভাবে যে-কোন ব্রাহ্মণ-কুমারকে ধরে আনলেও চলবে না। বাপ-মাকে প্রচুর অর্থ দিয়ে রাজী করে আনতে হবে নিখুঁত স্বাস্থ্যবান বালক। তার পর যথারীতি মন্ত্রপূত করে তাকে দিতে হবে যজ্ঞে আহুতি!

কি নিষ্ঠুর! রাজার বুক কেঁপে উঠলো! একটু চুপ করে থেকে তিনি ক্ষুণ্ণস্বরে বললেন,—'কিন্তু কে এমন বাপ-মা আছে মহর্ষি, যারা অর্থের লোভে তাদেরই রক্তে গড়া ছেলেকে জীবন্ত পুড়ে মরতে আমার হাতে তুলে দেবে?···সংসারে এমন কি কেউ থাকতে পারে?'

'হয়ত পারে'!'—মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন বশিষ্ঠ,—'জগতে কিছুই অসম্ভব নয় রাজা! তুমি খোঁজ কর। প্রচুর অর্থ দিয়ে উপযুক্ত লোক পাঠাও চারি দিকে। কি করবো রাজা, এর যে আর দ্বিতীয় পন্থা নেই!'

শেষের দিকে বশিষ্ঠের কণ্ঠে কারুণ্যের আভাস থাকলেও—দৃঢ়তাও কম ছিল না। রাজা আর কি করেন? যজ্ঞে ব্রতী হয়ে যখন বিফলষ্ট হয়েছেন, তখন গুরুর আদেশ পালন না করে আর উপায় কি? নিজের ভাগ্যে যাই হোক, পবিত্র সূর্য্যবংশকে তো তিনি কলুষিত করতে পারেন না? তিনি সেই দণ্ডেই বিপুল অর্থ দিয়ে বাছা-বাছা কয়েক জন লোককে বলির যোগ্য একটি ব্রাহ্মণকুমারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে আদেশ করলেন। অবশ্য বার বার করে সকলকে বলে দিলেন,—যেন অনিচ্ছুক কাউকে বলপ্রয়োগে বাধ্য করা না হয়।

—রাজার লোক অনেক জায়গা ঘুরে-ফিরে এক দিন ঋচীক মুনির কুটীরে এসে উপস্থিত হলো। বলা বাহুল্য, 'বলির' যোগাড় তখনও হয়নি। লোকমুখে কোথায় যেন একটু আশা-ভরসা পেয়েই তারা ঋচীকের কুটীরে এসেছে।

ঋচীক মুনি। অথচ রীতিমত সংসারী। তাঁর তিন ছেলে। রাজার লোক তাঁর কাছে এসে যেই তাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলো, অমনি ঋচীক কেমন যেন একটা আতঙ্কে আকুল হয়ে বড় ছেলেটিকে দু'হাত দিয়ে বুকে চেপে ধরলেন,—যেন রাজার লোক তাকে কোনরূপে ছিনিয়ে নিতে না পারে।···ওদিকে তখন ঋচীক মুনির স্ত্রীও ঠিক তেমনি আতঙ্কে ছোট ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরেছেন। মেজো ছেলে শুনঃশেফের দিকে কিন্তু কারুরই লক্ষ্য নেই। শুনঃশেফ কেমন যেন একটা দ্বিধায় পড়ে গিয়ে একবার বাপ-মায়ের দিকে চায়, পরক্ষণেই আবার রাজার লোকগুলির দিকে চোখ ফেরায়। হঠাৎ কি বুঝে লোকগুলির কাছে এসে সে জিজ্ঞেস করলে,—'আপনারা কোত্থেকে এসেছেন?···কি চান?'

বেশ সপ্রতিভ ভাবেই সে প্রশ্ন করলো। রাজার লোকের প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করে শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা তাকে খুলেই বললো।···শুনেই তো শুনঃশেফের মনে আনন্দ যেন আর ধরে না!—'তা বেশ তো',—ধীর কণ্ঠেই সে বলতে লাগলো,—'এতে আর চিন্তার কি আছে? আপনারা আমাকে নিয়ে চলুন। দেশের রাজা—যিনি লক্ষ লক্ষ লোকের পালনকর্ত্তা, তিনি বিপদে পড়েছেন,—আমার জীবন দিয়ে যদি তাঁর কল্যাণ করতে পারি তবে ত সে সৌভাগ্যেরই কথা! এদিকে আমাদের সংসারেও খুব অভাব যাচ্ছে; আমার বাপ-মা অভাবের তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠেছেন; আমার পরিবর্ত্তে প্রচুর অর্থ পেলে তাঁদেরও দুঃখের শেষ হবে। একসঙ্গে এমন দু'টি সংকাজ করে আমি যদি মরতে পারি, তবে ত এই বয়সেই আমার জীবন ধন্য হয়ে উঠবে। আমার জন্মও হবে সফল।'

সুশ্রী-স্বাস্থ্যবান ছেলে শুনঃশেফ! বয়স তার মাত্র বারো বছর। যেমন সুন্দর চেহারা,—কথা বলবার ভঙ্গিটিও তেমনি

চমৎকার! চোখে-মুখে কোথাও ভয় বা চিন্তার লেশমাত্রও নেই। রাজার লোক বিস্ময়ে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইলো; কিন্তু একটা কথাও ফুটলো না তাদের কারুর মুখে।

এদিকে শুনঃশেফ আর সেখানে না দাঁড়িয়ে বাপ-মায়ের কাছে এলো; তাঁদের প্রণাম করলো ভক্তিভরে। তার পর বললে,—'বাবা, মা, আপনারা দুঃখ করবেন না। আপনাদের তিন ছেলে,—জানবেন, পরের কল্যাণে এক জনকে দান করেছেন।···রাজার কল্যাণে প্রজার কল্যাণ। আমার একার বদলে যদি অনেকের মঙ্গল হয়, তবে সে তো খুব আনন্দেরই কথা। এই অল্প বয়সে আমি যে আপনাদের অভাব মোচন করবার এমন একটা সুযোগ পেলাম, এইতেই আমার জন্ম ও জীবন ধন্য মনে করছি। আমার তো আর দু'ভাই থাকলো, তাদের মধ্যেই আমি আছি মনে করবেন।' বলেই সে মা-বাপকে আর একবার প্রণাম করে রাজার লোকদের কাছে ফিরে এলো, এসেই বললে—'এখন আমার বাপ-মাকে আমার মূল্যস্বরূপ যা দেবেন, দিয়ে আমায় শীগ্‌গির নিয়ে চলুন, আর দেরি করবেন না।'

রাজার লোকদের বিস্ময় তখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ঠিক এমনি একটি ছেলেকে কোথাও দেখতে পাবে, এ যেন তারা কল্পনাও করতে পারেনি। দলের মধ্যে এক জন যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে এসে ঋচীক মুনির সম্মুখে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ একটি থলে নামিয়ে দিলে। শুনঃশেফ আর মুহূর্ত্ত দেরি না করে রাজার লোকদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো; যেন তারই গরজ বেশি!

তার বাপ-মা তখন যেন কেমন বিমূঢ় হয়ে গেছেন! দু'জনেই নীরব-নিথর! গলায় তাঁদের স্বরও ফুটছে না! শুনঃশেফের গমনের দিকে তাঁরা শুধু ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইলেন।

পথ চলতে চলতে একটা বনের ধারে সহসা সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। তার ওপর আকাশেও তখন গাঢ় মেঘ জমে উঠেছে! রাজার লোকেরা বুঝে দেখলো,—আজ আর পথ চলা সুকঠিন,—বিপজ্জনকও বটে!···অন্ধকার রাতটা কোথাও আশ্রয় নিয়ে কাল সকালেই আবার পথ চলা সুরু করলেই চলবে। কিন্তু আশ্রয় নেওয়া যায় কোথায়?'

ভাবতে ভাবতে তাদের মনে পড়লো—এই বনেই মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রম। অতিথি সৎকারে তিনি কখনোই কুণ্ঠিত হবেন না। রাত্রিটা কাটাবার পক্ষে তাঁর আশ্রমই নিরাপদ আশ্রয়।

তোমরা হয়ত জান,—বিশ্বামিত্র আগে ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজা,—পরে অসাধারণ তপস্যার বলে তিনি রাজা থেকে রাজর্ষি, রাজর্ষি থেকে ব্রহ্মর্ষি হয়ে শেষে মহর্ষি আখ্যা পেয়েছেন। তাঁর তপস্যার প্রভাবে অনেক সময় সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকেও সন্ত্রস্ত হতে হয়েছে। মানুষকে একসঙ্গে খাদ্য এবং পানীয় দেবার জন্যে তিনিই না কি নারিকেলগাছের সৃষ্টি করেন।

শুনঃশেফকে নিয়ে রাজার লোকেরা বিশ্বামিত্রের আশ্রমে আসতেই মহর্ষি পরম আদরেই সকলকে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু একটা কথা কেউ জান্‌তো না যে,—শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয়। অবশ্য শুনঃশেফ নিজে সেটা জানতো। কিন্তু সে এখন অর্থের বিনিময়ে বিক্রীত যজ্ঞের বলি,—পশুরই সমান! কাজেই ও-সব আত্মীয়তার কথা সে আর তোলা উচিত মনে করেনি। রাজার লোকদের সঙ্গে সে নীরবেই মহর্ষিকে প্রণাম করলো। আবছা অন্ধকারে—তার ওপর প্রায়ই দেখাশোনা না থাকায় বিশ্বামিত্রও তাকে চিন্‌তে পারলেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে রাজার লোকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হতেই তাঁর বুঝতে বাকী থাকলো না যে, বলির জন্য সংগৃহীত ছেলেটি কে এবং কেমন করেই বা হাসিমুখে আত্মবলি দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে।

রাত্রি তখন গভীর,—বনভূমি নিস্তব্ধ নিঝুম! গভীর অরণ্য থেকে মাঝে মাঝে দু'-একটা বন্য পশুর গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে! গাছের ডালে ঘুমন্ত পাখীর হঠাৎ জেগে উঠে পাখা নাড়ার ঝটপট্‌ শব্দ,—আর দু'-একটা রাত্রিচর পাখীর ডাকও নৈশ বাতাসে ভেসে আসছে। গাঢ় অন্ধকারে চারি দিকের কিছু যেন আর দেখা যায় না!

সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনীর পর রাজার লোকেরা সকলেই অসাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুনঃশেফের চোখে কিন্তু ঘুম নেই। আশ্রমের দরজার ফাঁক দিয়ে তিমিরাচ্ছন্ন বনানীর নৈশ রূপের দিকে সে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে।···বাপ-মা তাকে আটকায়নি,—হয়ত বড় এবং ছোটকে কোলের কাছে পেয়ে তার জন্যে তাঁদের মনও কেমন করেনি; কিন্তু বাপ-মাকে ছেড়ে এসে শুনঃশেফের প্রাণের ভেতরটা কেবলই যেন ঘেঁটে-ঘেঁটে উঠছে! সহসা ঋষি বিশ্বামিত্র তার গায়ে হাত দিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে ডাক্‌লেন,—'শুনঃশেফ, উঠে এসো।···'

মহর্ষির কণ্ঠস্বর! শুনঃশেফ চমক ভেঙ্গে উঠে পড়লো। ভয়ে, বিস্ময়ে তার বুকের স্পন্দন তখন দ্রুত হয়ে উঠেছে; তাই ত, এত রাত্রে স্বয়ং মহর্ষি ডাকেন কেন? কিন্তু কোন প্রশ্ন করবার মত সাহস তার হলো না। বিশ্বামিত্রের পিছু পিছু আশ্রমের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

মহর্ষি কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নামিয়ে বললেন,—'দেখ শুনঃশেফ, প্রথমে আমি তোমায় চিন্‌তে পারিনি। পরে অবশ্য রাজার লোকদের মুখে সব পরিচয়ই পেয়েছি। যাক, মরতে তো চলেইছ; তবু আমি তোমাকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি। যজ্ঞের আগুনে তোমাকে আহুতি দেবা মাত্রেই তুমি এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে সুরু করবে। মন্ত্রগুণে তোমার আত্মার কল্যাণ হবে। আমার বলার সঙ্গে সঙ্গে ভাল করে উচ্চারণ করে মন্ত্রটি শিখে নাও।' বলেই তিনি সুস্পষ্ট কণ্ঠে ধীরে ধীরে মন্ত্রটি আওড়াতে লাগলেন। শুনে শুনে শুনঃশেফও নির্ভুল ভাবে মন্ত্রের প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলো। কয়েক বার এই রকম করতেই মন্ত্রটি যখন শুনঃশেফের সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ হয়ে উঠলো,—তখন বিশ্বামিত্র দৃঢ়তার সহিত বললেন,—'সাবধান, যথাসময়ে মন্ত্রটি ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে ভুলো না।'

শুনঃশেফ মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিলে,—'আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।'

* * * *

—বিরাট যজ্ঞবেদীর ওপর যজ্ঞাগ্নি জ্বলছে ধূ ধূ করে! লেলিহান অগ্নিশিখা যেন সাপের মত লক্‌লক্‌ জিভ বের করে মাঝে মাঝে আকাশ স্পর্শ করছে! যজ্ঞধূমের গন্ধে চারি দিক আমোদিত। রাশি রাশি ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে উঠে যেন মেঘের সৃষ্টি করছে।

রাজা অম্বরীষ রক্তবর্ণের পাটের কাপড় পরে যজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন।

প্রশস্ত ললাট জুড়ে তাঁর রক্তচন্দনের ফোঁটা। চারি পাশে বসে রয়েছেন—কত মুনি ঋষি যোগী তপস্বী।

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা উদাত্ত কণ্ঠে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করছেন।—সাগ্নিকের সহিত কণ্ঠ মিলিয়ে রাজা গভীর নিষ্ঠায় করছেন মন্ত্রধ্বনি। কি যেন এক প্রশান্ত অথচ ভীষণ ভাবে চারি দিক্ মহান্ গাম্ভীর্য্যে ভরে উঠেছে।

রাজার বাম পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে সতস্নাত শুনঃশেফ, পরনে তার পট্টবস্ত্র—গলায় ফুলের মালা,—সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত। তাকে দেখে যূপকাষ্ঠ সন্নিহিত উৎসর্গীকৃত ছাগশাবকের কথাই মনে হচ্ছে। যথারীতি মন্ত্রপূত করে তাকেও অবশ্য উৎসর্গ করা হয়েছে বলির জন্তে। বায়ুতাড়িত অগ্নিশিখা যেন মুহুর্মুহু তাকে আহ্বান করছে নিজের দিকে। কিন্তু সে নির্ভীক—নিষ্কম্প—একটিও চিন্তার রেখা নেই তার ললাটে বরং যেন এক স্বর্গীয় দীপ্তিতে তার চোখ-মুখ ভরে উঠেছে। চতুর্দ্দিক্ লোকে লোকারণ্য—রুদ্ধ নিশ্বাসে সকলে চেয়ে আছে শুনঃশেফের দিকে—কম্পিত বুকে অপেক্ষা করছে এক মর্ম্মান্তিক পরিণতির,—এক মহা মুহূর্ত্তের।

সহসা সকলে চকিত হয়ে উঠলো। সাগ্নিকের নির্দ্দেশ মত রাজা পূর্ণাহুতির মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে শুনঃশেফকে দুই হাত দিয়ে ধরে যজ্ঞানলে নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি ঘৃত ঢেলে দেওয়া হলো যজ্ঞাগ্নির ওপর!

বিপুল আতঙ্কে সকলে তখন চোখ বুজেছে! চার দিক থেকে একটা করুণ অস্ফুট গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে! মৃদু বায়ু-আন্দোলিত বনানীর মত কেমন একটা মৌন চঞ্চলতায় সেই বিশাল লোকারণ্য যেন আন্দোলিত হয়ে উঠছে!

কৌতূহলী জনতা একটু পরেই চোখ মেলে দেখলে,—মাথার ওপরের বিস্তীর্ণ আকাশ ছেয়ে গেছে প্রগাঢ় কালো ধূম্রমণ্ডলীতে: আর তারই নীচে জ্বলছে সর্ব্বভুক্ বিরাট যজ্ঞাগ্নি শত শত লেলিহান শিখা বিস্তার করে।—আবার সেই সর্ব্বগ্রাসী অনলের মাঝে যোড় হাতে দাঁড়িয়ে আছে শুনঃশেফ: ঠোঁট দুটি তার ঘন ঘন নড়ছে,—বলা বাহুল্য যে,—সে আবৃত্তি করছে বিশ্বামিত্রের শিখিয়ে দেওয়া মন্ত্র!—অগ্নিশিখা তার দেহের কোন স্থান তো দূরের কথা,—একগাছি চুলও স্পর্শ করেনি!

দেখতে দেখতে যজ্ঞাগ্নি ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে গেল। বিপুল বিস্ময়ে সকলে দেখলো,—শুনঃশেফ সম্পূর্ণ অক্ষত—তার দেহের কোন স্থান আগুনের আঁচ লেগে একটু মলিনও হয়নি। বরং তার সর্ব্বাঙ্গ থেকে ফুটে বেরুচ্ছে যেন এক স্বর্গীয় দিব্য জ্যোতিঃ!

ঠিক এই সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠছে বিজয়ীর আনন্দ। রাজা অম্বরীষের দিকে চেয়ে তিনি বললেন,—'মহারাজ, যজ্ঞবিঘ্নের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তুমি 'নরবলি' দিয়েছ—তোমার কাজ সিদ্ধ হয়েছে; তুমি এখন পাপমুক্ত! পরম পূজ্য মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশ পালন করে তুমি তোমার কর্ত্তব্যই করেছ। এদিকে আমিও শুনঃশেফকে যে মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছিলাম, তার প্রভাবে অগ্নিদেব তাকে একেবারে স্পর্শও করেননি। এ ভাবে একটি নিষ্পাপ মহৎ অমূল্য জীবন রক্ষা করতে পেরে আমি আজ সত্যই আনন্দিত।'

পরে স্নেহোজ্জ্বল দৃষ্টিতে শুনঃশেফের দিকে চেয়ে বললেন,—'বৎস শুনঃশেফ, আজ তোমার পুনর্জ্জন্ম বা নবজন্ম হলো। তাই ... থেকে আমি তোমার নূতন নামও রাখলাম,—দেবরথ। তুমি বা... হলেও তোমার মহান্ অন্তর আমার চক্ষে এক নূতন আলোক... করেছে, তাই আমি মন্ত্রবলে তোমার জীবন রক্ষা করেছি। এ... চল আমার তপোবনে তোমার নূতন জীবনের পথে। আজ থে... তুমি আমারই পুত্র। তোমার কীর্ত্তি যুগ যুগ ধরে অক্ষয় হবে।'

ভক্তি-উদ্বেলিত হৃদয়ে সহর্ষে এগিয়ে এসে শুনঃশেফ মহ... বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করলো। বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য মুনি-ঋষি... আনন্দধ্বনি করে উঠলেন,—'মহর্ষি বিশ্বামিত্রের জয়!'—ওদি... তখন রাজা অম্বরীষের মুখেও গভীর পরিতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছে।

সার্ভান্তেস

যামিনীমোহন কর

পৃথিবীর অমর গ্রন্থরাজির মধ্যে ডন কুইক্সোট এক বিখ্যা... বই। সর্ব্বদেশে সর্ব্বসময়ে আবালবৃদ্ধবনিতা এই বই প... আনন্দ পেয়েছে। এক বার নয়, বার বার পড়েছে। পৃথি... প্রায় সকল ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। এর গল্প কে না জা... এই বই কিন্তু কেবল হাসির খোরাকই জোগায়নি, তীব্র কশাঘ... করেছে মিথ্যে রোমান্স ও শিভালরি নিয়ে উপন্যাস-প্রণেতাদে... ডন কুইক্সোট এগুলোকে সত্য মনে করে কি ভাবে বিপদগ্রস্ত... লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, এই উপন্যাসে সেই কথা বলা হয়েছে... গল্পটা সকলে বেশ ভাল ভাবে জানে, কিন্তু লেখক সম্বন্ধে অনেকে... ততটা জানে না। যে ব্যক্তি জগৎকে এত হাসিয়েছেন, তি... যে নিজের জীবনের অধিকাংশ সময়ই দুঃখে কাটিয়েছেন, সে খ... হয়ত অনেকেই রাখেন না। তিনি ছিলেন শেক্সপিয়া... সমসাময়িক। তখনকার ইংরেজের শত্রু স্পেনের সন্তান। বিখ্যা... স্পেনীয় আরমাডার জন্ত রসদ সংগ্রহকারী। তবু ইং... বিদেশী লেখকদের মধ্যে সার্ভান্তেসকেই সব চেয়ে ভালবা... শুধু ইংরেজ কেন, সব জাতিই তাঁর লেখায় মুগ্ধ।

তাঁর পুরো নাম ছিল মিগুয়েল দ্য সার্ভান্তেস সাভেদ্রা, কি... বিশ্বজগৎ তাঁকে কেবল সার্ভান্তেস নামেই জানে। যে বংশে তি... জন্মেছিলেন, তাতে খ্যাতি অর্জ্জনের কোন আশাই ছিল ন... বংশটা বনেদী বটে কিন্তু বুনিয়াদ ছিল কাঁচা। পিতামাতা অত্য... দরিদ্র ছিলেন। চাষবাস করে কোন মতে দিন গুজরান করতে... গরীবদের সাহায্যের জন্য দেওয়া সরকারী বৃত্তির অর্থে সার্ভান্তে... লেখাপড়া শেখেন। পড়াশুনায় তাঁর খুব মনোযোগ ছিল। কু... বছর বয়স পর্য্যন্ত তাঁর সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী কিছু জানা যায়নি... কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে, ভবিষ্যতে তিনি বিখ্যাত হবে... তাই কেউ তাঁকে লক্ষ্যও করেনি। ২৩ বছর বয়সে তিনি ... হাজির হলেন লোকচক্ষুর সামনে।

১৫৭০ খৃষ্টাব্দে পোপ ও ভেনিসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্পে... তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। তিনি সেই সময় স্পেনীয় সৈ... বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর ... পক্ষে সম্মুখযুদ্ধ হয় লেপান্টো সহরের কাছে, করিন্থ উপসাগরে... এই যুদ্ধে সার্ভান্তেসও অংশ গ্রহণ করেন। সে দিন তাঁর জ্ব... জ্বর। ডাক্তার জানালেন যে, তাঁর যুদ্ধ করা চলবে না। তি...

কম্যাণ্ডারকে বললেন, "আমি ঈশ্বরের ও রাজার জন্ম যুদ্ধ করতে এসেছি। নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবতে রাজী নই।" সকলে বারণ করলে কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। শেষে কর্ত্তৃপক্ষ রাজী হলেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে জাহাজের এমন অংশে স্থান দেওয়া হ'ল, যেখানে সাধারণ সৈনিক যেতে পারে না। একেবারে অফিসারদের পাশে। যুদ্ধ দেখবার যেমন সুবিধা, ঝুঁকিও সেখানে তেমনি বেশী। ভীষণ যুদ্ধ চলতে লাগল। তিনি সিংহবিক্রমে লড়তে লাগলেন। তাঁর সাহস ও রণকৌশল দেখে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বাঁ হাত একটা গোলা লেগে চূর্ণ হয়ে গেছে। দু'টো গুলী এসে বুকে লেগেছে। রক্তে সর্ব্বাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে। আর তিনি মরিয়া হয়ে লড়ে চলেছেন এক হাতে। তুর্কী নৌবহর ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের আশীটা জাহাজ ডুবে গেল, একশোটা অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ল আর প্রায় একশোটা স্পেনীয় নৌবহরের কবলিত হ'ল। যুদ্ধের পর জাহাজ থেকে শৃঙ্খল ভেঙ্গে প্রায় বারো হাজার দাসকে মুক্তি দেওয়া হ'ল।

যুদ্ধ শেষ হ'ল। সার্ভান্তেস ভগ্নহৃদয়ে দেশে ফিরছেন। বাম বাহু চিরদিনের জন্ম অকর্ম্মণ্য হয়ে গেছে। আর সৈন্যবাহিনীতে কাজ করা চলবে না। কম্যাণ্ডার স্পেনের রাজার নামে এক চিঠি দিলেন। চিঠিতে সার্ভান্তেসের সাহস ও বিক্রমের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন যে, তাঁকে যেন ক্যাপ্টেন করে দেওয়া হয়। আর এক রাজবংশীয় ব্যক্তি তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে রাজার নামে চিঠি দিয়েছেন। সার্ভান্তেসের ভাই রডরিগোও এই বাহিনীতে ছিলেন। দুই ভাই ছোট নৌকো নিয়ে দেশে ফিরছেন।

পথে তাঁরা বন্দী হলেন এলজেরীয় দস্যুদের হাতে। জাহাজে বাঁধা দিবা-রাত্রি দাঁড় টানা অবস্থা থেকে যে দাসেদের উদ্ধার করতে তিনি এসেছিলেন, নিজেই এবার তিনি সেই দাস হলেন। সৌভাগ্য বশতঃ দস্যুদলপতি তাঁর পকেট থেকে রাজাকে লেখা চিঠি দু'টো পড়ে তাঁকে বিরাট ব্যক্তি মনে করে অত্যন্ত সম্ভ্রম করতে লাগলো। আশা করলে এঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে বেশ মোটা রকমের মুক্তিপণ আদায় করা যাবে। মুক্তিপণ ঠিক হ'ল পাঁচশো স্বর্ণ ডুকাট।

তাঁদের নিয়ে যাওয়া হ'ল এলজিয়ার্সে। দাস হিসেবে তাঁর হাত বাঁধা হ'ল শেকল দিয়ে। কিন্তু কোন ভারী কাজ করতে দেওয়া হ'ত না, বা তাঁর ঘুরে বেড়ানোতেও কেউ বাধা দিত না। সেখানে তিনি দেখলেন এক দাসের উপনিবেশ। অমানুষিক খাটুনি, অত্যল্প আহার। তিনি তাঁর যৎসামান্ত সঞ্চয় থেকে তাদের উদরে আহার, হৃদয়ে উৎসাহ দিতে লাগলেন। এক দিন কয়েক জনকে নিয়ে পালাতে গেলেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হ'ল না। ধরা পড়ে গেলেন। পাছে অন্যদের শাস্তি বেশী হয় সেই জন্ম তিনি এগিয়ে গিয়ে সব দোষ নিজের মাথায় নিলেন। ফলে তাঁকে সহ্য করতে হ'ল অকথ্য অত্যাচার। কিন্তু তবুও সাহস বা উদ্যম হারাননি।

এই সময় এক জন বন্দীর মুক্তিপণ পাওয়া যায়। তার হাতে সার্ভান্তেস নিজের ও ভাইয়ের বন্দীদশার কথা বাপ-মাকে এবং বন্ধু-বান্ধবদের চিঠি লিখে জানান। দেশে প্রায় সবাই গরীব। তবু যথাসাধ্য চাঁদা তুলে তাঁরা এলজিয়ার্সে মুক্তিপণ পাঠান। কিন্তু তা দাবীর তুলনায় যৎসামান্ত। সার্ভান্তেসের মনিব অর্থটা নেন বটে কিন্তু মুক্তির কথা হেসে উড়িয়ে দেন। ঐ সামান্ত অর্থে সার্ভান্তেসের মত ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া যায় না। বাপ-মা আবার অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। জমি-জমা সম্পত্তি বিক্রী করে দেন। অবিবাহিতা বোনেরা যৌতুকের টাকা বাপকে ধরে দেন। সে অর্থ পেয়েও সার্ভান্তেসের মনিবের মন ওঠে না। অর্থ সংগ্রহের করুণ কাহিনী শুনেও মন গলে না। সার্ভান্তেস তখন মনিবকে বলেন, এই অর্থে আমার মুক্তি না হোক আমার ভাই রডরিগোর মুক্তিও কি হয় না? হ্যাঁ, রডরিগোর মুক্তি হতে পারে। রডরিগো দেশে ফিরে গেলেন। সার্ভান্তেস রয়ে গেলেন একা। অন্য উপায়ে তিনি মুক্তির পথ খুঁজতে থাকলেন। বহু বার পালাবার প্ল্যান করলেন, কিন্তু কোনটাই সফল হ'ল না। একবার ভাইয়ের কাছে খবর পাঠালেন নৌকো নিয়ে একটু দূরে অপেক্ষা করতে। তিনি সাঁতরে নৌকো চড়ে পালাবেন। বহু চেষ্টায় একটা নৌকো শেষ পর্য্যন্ত জোগাড় হ'ল। এলজিয়ার্সের উপকূলে এসে নোঙর করলে। ক'দিন আগে থেকে সার্ভান্তেস আরও পনেরো জন দাস সহ সমুদ্রের ধারে এক গুহায় লুকিয়ে ছিলেন। চারি দিকে খোঁজাখুঁজি চলছিল কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ তখনও তিনি ধরা পড়েননি। নির্দ্দিষ্ট দিনে যখন তাঁরা পালাতে যাবেন ঠিক সেই সময় এক প্রহরী নৌকো দেখতে পায়। তখনি খবর ছড়িয়ে পড়ে। দস্যুদল হৈ-হৈ করে এসে পড়তে নৌকো তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যাগ করে। দলবল সহ সার্ভান্তেস আবার ধরা পড়েন।

এইবার তাঁর ওপর চলল অমানুষিক অত্যাচার। হাতে-পায়ে পড়ল শেকল। দু'বার ফাঁসীর দড়ি গলায় উঠেও শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহতি পেলেন। জীবন বিষময় হয়ে উঠল। দস্যুরা কিন্তু তাঁকে প্রাণে মারলে না। মুক্তিপণের আশায়। সার্ভান্তেস গোপনে স্পেনের রাজাকে এক পত্র দিলেন। জানালেন এলজিয়ার্স অরক্ষিত অবস্থায় আছে। আক্রমণ করলেই দেশটা জয় করে নেওয়া যায়, সেই সঙ্গে পঁচিশ হাজার বন্দীও মুক্তি পায়। কিন্তু সে প্রার্থনা বিফল হয়। তখন তিনি এই কথা, এক স্পেনীয় উপনিবেশ ওরানের শাসনকর্ত্তাকে লেখেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই চিঠি দস্যুদলের হাতে গিয়ে পড়ে আর তার ফলে সার্ভান্তেসকে ভোগ করতে হয় অশেষ যন্ত্রণা। পাঁচ মাস তাঁকে হস্তপদ শৃঙ্খলিত করে অন্ধকার কুঠুরীতে বন্ধ করে রাখা হয়।

শেষ পর্য্যন্ত তিনি মুক্তি পেলেন। তাঁর বাপের অবস্থা তখন শোচনীয়। গ্রাসাচ্ছাদন চলছে না। তিনি দারিদ্রের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে গিয়ে সকল কথা খুলে বলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট অতি সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। চাঁদা করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে দেন। তিনশো স্বর্ণ ডুকাট পাওয়া গেল কিন্তু মুক্তিপণ পাঁচশো ডুকাট। যাই হোক, সেই অর্থ নিয়েই লোক গিয়ে হাজির হ'ল এলজিয়ার্সে। তখন সার্ভান্তেসকে গ্যালি-স্লেভ হিসেবে জাহাজে বাঁধা হয়েছে। সেই জাহাজ যাবে কনস্তান্তিনোপল। সেইখানে তুর্কীদের হাতে তাঁকে বিক্রী-করবার কথা। দস্যু-সর্দ্দার ঐ অর্থে সার্ভান্তেসকে মুক্তি দিতে রাজী হ'ল না। দূত তখন সমুদ্রের ধারে নোঙর করা জাহাজ সমূহে গিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছে সার্ভান্তেসের করুণ কাহিনী জানিয়ে ভিক্ষা করতে লাগলেন। ভগবান সহায়। টাকা উঠে এল। আর সেই অর্থে দীর্ঘ পাঁচ বছর নরক যন্ত্রণা সহ্য করার পর সার্ভান্তেস মুক্তি পেলেন। দেশে ফিরে চললেন দূতের

সঙ্গে। জন্মভূমি স্পেনে। তীরে উঠে সে কি আনন্দ! সমুদ্রের বেলাভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। বালুকারাশি চুম্বন করলেন। অসহ্য যন্ত্রণায়, যুদ্ধে এবং বন্দীদশায় যে ব্যক্তি এতটুকু কাতর হ'ননি, তাঁর চোখ দিয়ে হু-হু করে জল পড়তে লাগল।

সার্ভান্তেস বড় আশা নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন। ভেবেছিলেন এইবার সব যন্ত্রণার উপশম হবে। তাঁর বীরত্বের এবং দুঃখের কাহিনীতে নিশ্চয়ই স্পেনরাজের মন গলবে। নিশ্চয়ই সৈন্য-সামন্ত পাঠাবেন এলজিরার্স আক্রমণ করে পঁচিশ হাজার বন্দীকে মুক্তি দিতে। কিন্তু তাঁর সকল আশায় ছাই পড়ল। স্পেন-রাজ সার্ভান্তেসের কোন কথায়ই কান দিলেন না। এমন কি তাঁর শৌর্য্য-বীর্য্যেরও সম্মান দিলেন না। সার্ভান্তেস মুক্তি পেলেন কিন্তু সম্মান পেলেন না।

সার্ভান্তেস তখন জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য নাটক-উপন্যাস লিখতে লাগলেন কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধা হ'ল না। এই সময় তিনি বিয়ে করেন। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে সামান্য এক সরকারী চাকরী পান। কাজ স্পেনরাজ ফিলিপের অপরাজেয় আরমাডার জন্য রসদ সংগ্রহ করা। কিছু দিন পর বিরক্ত হয়ে তিনি কাজ ছেড়ে দেন। দিন আর চলে না। শেষে দেনার দায়ে তাঁকে জেলে যেতে হয়। জেলে বসে বসে তিনি তাঁর অমর রূপকথা ডনকুই-স্লোটের প্রথম খণ্ড লিখে ফেলেন। তার পর জেল থেকে বেরিয়ে বইটা সমাপ্ত করেন। মনে হয় তাঁর দারিদ্র্য, জেলে যাওয়া সবই ভগবানের আশীর্ব্বাদ। তা না হলে হয়ত তাঁর কলম দিয়ে এমন লেখা বার হ'ত না, যা চিরকালের জন্য তাঁকে জগৎবাসীর প্রিয় করে তুলেছে। যে ফিলিপের জন্য তিনি একটা হাত হারিয়েছেন, যে ফিলিপের কাছে তিনি কোন সম্মান বা মর্য্যাদা লাভ করেননি, সেই ফিলিপের কথা নিয়ে এক ইতিহাসের ছাত্র ছাড়া আর কে মাথা ঘামাচ্ছে? কিন্তু তাঁর স্মৃতি সমগ্র জগৎবাসীর বুকে আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

গল্প হ'লেও সত্যি

আজহারউদ্দিন খাঁন

শিল্পী হিসেবে দেশজোড়া নাম তাঁর। কত দেশ-বিদেশের লোক-জন আসে শিল্পের পাঠ নিতে। এক দিন এক জন বাঙালী ছাত্র তাঁর কাছে এসেছে নিজের একখানি ছবি দেখাতে ও ছবির দোষ-ত্রুটি জেনে নিতে। আগাগোড়া সে-ছবিখানিতে রঙ বলতে কিছু নেই, আছে শুধু ছবিখানায় গৈরিক রঙের অল্প অল্প আভাস। পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে উমা শিবের জন্যে তপস্যা করছেন, পিছনে মাথার উপরে সরু চাঁদের রেখা। শিল্পী তাকে উপদেশ দিলেন, ছবিতে একটু রং দিতে, ছবিটা কেমন যেন নিরাভরণ নিরাবরণ দেখাচ্ছে। পার্বতীকে একটু রং না দিলে কি মানায়?······

রাত্রে শিল্পীর ঘুম নেই। ঘুম কিছুতেই আসছে না। কি যেন চিন্তায় তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কারণ আর কিছু নয়—শুধু ভাবছেন ছাত্রকে সেই উপদেশ দেওয়ার কথা। আজ যা উপদেশ দিয়ে এসেছি সে-উপদেশ ছবির উপযুক্ত হল কি না? ছাত্রের দৃষ্টি নিয়ে কি উমাকে দেখেছি? সে হয়ত দেখেছে উমার সেই রূপ যে-রূপের মধ্যে ফুটে উঠেছে তাঁর তপস্যার দৃঢ়তা।···গুরুর উপদেশ মত ছাত্র যদি পার্বতীকে একটু সাজিয়ে দেয় তাহলে হয়ত সব মাটি হয়ে যাবে। উমার হয়ত সে রূপ ফুটে উঠবে না।···

ছাত্রও বসে আছে। তার চোখেও ঘুম নেই। সারা রাত সেও ভাবছে গুরুর উপদেশ মত রং দেবে কি না।···

রাত শেষ হয়ে এলো। সকাল হতে না হতেই শিল্পী চললেন ছাত্রের বাড়ীতে। গিয়ে দেখেন রং আর তুলি নিয়ে ছাত্র বসে আছে—ছবিখানিতে তখনও রং পড়েনি। শিল্পী আনন্দিত হয়ে বললেন, ওহে তোমার উমা ঠিকই আছে, তাতে রঙ আর দিও না কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলুম বল দেখি! আর একটু হলেই অত ভাল ছবিখানা নষ্ট করে দিয়েছিলুম আর কি!

এই থেকে শিল্পী খুব সাবধান হয়ে গেলেন; জীবনে মস্ত বড় শিক্ষালাভ করলেন যে, ছবি যার যার নিজের নিজের সৃষ্টি, তাতে অন্য কেউ উপদেশ দেবে কি?

এই শিল্পীটি কে জানো? ইনি হচ্ছেন আমাদের অবনীন্দ্রনাথ আর সেদিনকার ছাত্র আজকের প্রখ্যাতনামা শিল্পী নন্দলাল।

ম্যাকবেথ

১

মহা দুর্য্যোগে মেদিনী কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঝড়ের আওয়াজ বজ্রপাতের ভীষণ সুগম্ভীর শব্দ, বিদ্যুতের চোখ-ঝলসানো ছটা প্রশস্ত-প্রান্তরকে ভয়াবহ করে তুলেছে—জনমানবের লেশ নেই। এমন সময় নরওয়ে ও স্কটল্যাণ্ড যুদ্ধজয়ী দুই সেনাপতি ম্যাকবেথ ও ব্যাঙ্কো সেই প্রান্তরে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন—এই প্রকৃতির দুর্য্যোগে। তাঁরা স্কটল্যাণ্ডের রাজা ডানকানের সেনাপতি। হঠাৎ তাঁরা দেখলেন তিনটি ছায়ার মত মূর্ত্তি নাচছে আর পরস্পরকে উদ্দেশ করে গান গাইছে—

এক জন বলছে—কোথায় ও বোন্,
তুই ছিলি এতক্ষণ
অপরে বলছে—শূকর মেরে বেড়াচ্ছিলাম বোন্
শেষ জন বলছে প্রথম জনকে—তুই কোথায় ছিলি
প্রথম তার উত্তরে গাইছে—যেথা ছিলাম নিরিবিলি
সে এক মাঝির মেয়ে
বাদাম নিয়ে গোটাকতক
শেষ করে সব চিবিয়ে খেয়ে।
আমি বললুম—দে না
গোটা কতক বাদাম আমায়
আর কিছু চাই না।

তার পর সে বলে চলল, "দিলে না তবু। কিন্তু এ মেয়েকে তো সে জানে না—তার কর্ত্তা যেখানে যাবে ঠিক তার পেছু-পেছু গিয়ে হাজির হব।"

এমন সময় সেনাপতি দু'জনের উপর লক্ষ্য পড়তেই তারা থেমে গেল। ম্যাকবেথ ও ব্যাঙ্কো স্তম্ভিত—এমন দুর্য্যোগময়ী রাতে এরা আবার কে? ব্যাঙ্কো বলল, "আকার কতকটা মেয়েদের মত—মুখে দাড়ী, এরা কোন্ জীব?"

ম্যাকবেথ চীৎকার করে বলল, "কে তোমরা, যদি তোমরা কথা বলতে পার, তবে জবাব দাও—তোমরা কে?"

১ম ডাকিনী বলল,—"এসো ম্যাকবেথ—এস গ্লেমিসের রাজা।

২য় ডাকিনী বলল,—"এসো ম্যাকবেথ—কডরের নৃপতি।

৩য় ডাকিনী—তুমি এখানকার রাজা হবে কিছু দিন পরেই—তোমায় অভিনন্দিত করছি।

তাদের কথা শুনে ম্যাকবেথ চমকে উঠলেন। মনে মনে বুঝি কোন একটা ইচ্ছাকে পোষণ করছিলেন—সেটাকে হঠাৎ আজ অন্যের মুখে শুনলেন।

ব্যাঙ্কো বললেন, "এ কি স্যার, আপনি এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে চমকে উঠলেন কেন? সত্যি করে বলুন, আপনার মনে কি কোন গোপন ইচ্ছা ছিল?" তার পর ব্যাঙ্কো ডাকিনীদের উদ্দেশ ক'রে বললেন, "বন্ধুকে তোমরা ভবিষ্যতের রাজা বললে কিন্তু বন্ধু এ কথা শুনে চিন্তামগ্ন। তোমাদের যদি ভবিষ্যতের কথা বলবার ক্ষমতা থাকে—ভবিষ্যৎকে যদি স্পষ্ট দেখতে পাও—তাহ'লে আমার ভবিষ্যৎটাও বল—বল, আমাদের দু'জনের মধ্যে কে বেশী ভাগ্যবান্, কার বংশ চিরস্থায়ী হবে?"

ডাকিনী তিন জনই বলে উঠল সমস্বরে—"স্বাগত, স্বাগত, স্বাগত! তুমি ম্যাকবেথের চেয়ে সম্মানে ছোট হবে কিন্তু ভাগ্যবান্—বেশী সুখী হবে তুমি—তুমি নিজে রাজা হবে না কিন্তু তোমার বংশের অনেকে রাজা হবে। তোমাদের দু'জনকেই স্বাগত জানাচ্ছি।"

ম্যাকবেথ বললেন, "স্পষ্ট ক'রে বল এ কি ক'রে হয়? জানি বাবার মৃত্যুর পর গ্লেমিসের রাজা আমি, কিন্তু কডরের রাজা? কডরের রাজা এখনও বেঁচে—ভাগ্যবান্ ভদ্রলোক। তাহ'লে আমি কি ক'রে রাজা হব—বল তোমরা এই মাঠে বসে কি ক'রে জানলে এ কথা?"

কিন্তু উত্তর না দিয়ে ডাকিনীরা বাতাসে মিলিয়ে গেল।

ব্যাঙ্কো বললেন, "পৃথিবীতেও জলের বুদ্‌বুদের মত বুদ্‌বুদ আছে—এরাও তাই—হঠাৎ কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।"

ম্যাকবেথও দেখে-শুনে হতভম্ব, বললেন, "সত্যি যেমন আমাদের নিশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে যায়। কিন্তু শুনেছো, তোমার ছেলেরা হবে রাজা।"

ব্যাঙ্কো বললেন, "তুমি তো নিজে রাজা হবে।"

ম্যাকবেথ চিন্তিত মুখে বললেন, "কডরের থেন না কি একটা বললে?"

অশ্বপৃষ্ঠে বসে এই কথা নিয়ে আলোচনা করতে করতে তাঁরা অগ্রসর হলেন, রশ ও এ্যাঙ্গাশ আসছিল সেই পথে—এরা রাজা ডানকানের অমাত্য—পদস্থ কর্ম্মচারী। তারা তাঁদের দেখে অভিবাদন করল, বলল, "ম্যাকবেথ, আপনার যুদ্ধজয়ের সংবাদ পেয়ে রাজা আপনাকে কডরের রাজপদে নিযুক্ত করেছেন।"

ব্যাঙ্কো বললেন, "তাহ'লে ডাকিনীরা সত্যি কথাই বলেছে।"

ম্যাকবেথ বললেন, "কিন্তু কডরের থেন বেঁচে—তাহলে এটা কি ক'রে সম্ভব হল?"

এ্যাঙ্গাশ—না, রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।"

ডাকিনীদের ভবিষ্যদ্বাণী এমনি ভাবে সত্য হতে দেখে ম্যাকবেথ আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, এ্যাঙ্গাশকে বা রশকে কোন উত্তর দেবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত রইল না। তাহ'লে ত' তৃতীয় ডাকিনী যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তা সত্যি হ'তে পারে অর্থাৎ তিনি যে কিছু দিন পরে এখানকার রাজা হবেন এই আশা তাঁর মনের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ব্যাঙ্কোকে বললেন তিনি, "আমার সম্বন্ধে ডাইনীদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হতে দেখে তুমি কি ইচ্ছা কর না ব্যাঙ্কো যে, তোমার সন্তানরাও রাজা হোক্।"

ব্যাঙ্কো—"ও আশা তোমায় সিংহাসন লাভ করবার জন্যে উত্তেজিত করতে পারে। কিন্তু এরা শয়তানের দূতী—এরা মানুষকে সঙ্কটে ফেলে—তাই ওদের কথা শুনে আশা করা অন্যায়।"

২

কিন্তু ডাকিনীদের এই দুষ্ট নির্দ্দেশবাণী ম্যাকবেথের মনে গভীর ভাবে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল—ব্যাঙ্কোর উপদেশ তাঁর মনের অন্দর-মহলে প্রবেশ করতে পারে না। তখন থেকেই স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসন লাভের উপায় সন্ধানে তাঁর সমস্ত চিন্তা নিযুক্ত হয়ে রইল।

ম্যাকবেথ তাঁর স্ত্রীকে পত্র লিখলেন তাঁর বাসদুর্গ ডুন্সেনীন পাহাড়ে। সেই পত্রে ডাকিনী তিন জনের ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁর কডর রাজ্যের থেন হওয়ার সংবাদ পাঠালেন।

লেডী ম্যাকবেথ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও লোভী। ডাকিনীদের ভবিষ্যদ্বাণী যখন মিলেছেই তখন তাঁর রাণী হওয়াও অসম্ভব নয়—তাই মনে জেগে উঠল রাণী হওয়ার সাধ। আর ম্যাকবেথের ভাগ্যে যখন রাজ-সিংহাসন প্রাপ্তির কথা রয়েছে তখন সে সিংহাসন পেতেই হবে—সে পাওয়া যেমন উপায়েই হোক্। লেডী ম্যাকবেথের মনে চিন্তা-সমুদ্রের যেন বড় বড় ঢেউ উঠছে—ম্যাকবেথের দেহে রাজরক্ত ছিল—এ কথা তিনি জানতেন। তাঁর রক্তেও ছিল—তাঁর পিতামহ এক দিন স্কটলণ্ডের রাজা ছিলেন। ডানকানেরও আগেকার রাজা তাঁর একমাত্র ভাইকে গোপনে হত্যা করান আর তাঁর পিতামহকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন এ কথা লেডী ম্যাকবেথ ভোলেননি।

এমন সময় দূত এসে খবর দিল—রাজা ডানকান আসছেন তাঁর দুর্গে—সংগে দুর্গাধিপতি ম্যাকবেথও আছেন।

লেডী ম্যাকবেথের রক্তে সিংহাসনপ্রাপ্তির লোভের জোয়ার তরঙ্গিত হতে লাগল—সুযোগ এসেছে রাজা হবার—এ সুযোগ হারালে চলবে না।

ম্যাকবেথের মনেও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল—বাসনা ছিল ভবিষ্যতে বড় হওয়ার—কিন্তু সে বাসনা তাঁকে উত্তেজিত করতে পারত না—বিক্ষিপ্ত করে দিত না তাঁর মনকে।

ম্যাকবেথ এসে পৌঁছলেন। স্ত্রীকে বললেন, "রাজা রাত্রে এসে পৌঁছবেন, সঙ্গে তাঁর দুই ছেলে ম্যালকম আর ডোনালবীনও আছেন। আরও আছেন অনেকে—থেন, অমাত্য, পারিষদ।"

লেডী ম্যাকবেথ জিজ্ঞাসা করলেন, "রাজা ফিরে যাবেন কবে?"

—"কাল যাবেন এই তাঁর ইচ্ছা।"

—"কালকের সূর্য্য তাঁকে আর দেখতে হবে না। কিন্তু তুমি সেই সময়ে যেন মুখ গম্ভীর করো না—বেশ হাসি-খুশী থেকো, কেমন?"

"কিন্তু আমার একটা কথা"—শিহরিত ম্যাকবেথ কিছু একটা বলতে চেষ্টা করেন, লেডী ম্যাকবেথ তাঁর স্বামীকে বেশ ভাল ভাবেই জানতেন, তাই কোন কথা বলতে না দিয়ে বললেন, "না, না, তুমি শুধু আমার কথাটা রেখো, খুশী—খুশী থাকবে আর অন্ত সমস্ত দায় আমার।"

৩

ম্যাকবেথের দুর্গ সুন্দর সাজে সাজল। বাতাস বইতে লাগল মধুর, স্বাস্থ্যকর, দুর্গের প্রবেশদ্বার হ'তে আরম্ভ ক'রে অভ্যন্তরের সমস্ত কক্ষ মনোরম সৌন্দর্য্যে ভরে উঠল। রাজা ডানকান স্থানটি দেখে খুশী হয়ে উঠলেন। সাদরে এবং সহাস্য মুখে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন লেডী ম্যাকবেথ। তাঁর মুখে কোন কিছুরই বিকৃতি দেখা যায়নি, যাতে বোঝা যায় তাঁর মনে কি ইচ্ছা আছে। রাজা ডানকান খুশী হয়ে উঠলেন তাঁর আদর-যত্নে, সত্যি এমন স্ত্রীলোক আর হয় না! তাঁর মনে ঘুণাক্ষরেও এ চিন্তা স্থান পায়নি যে, এই হাস্যমুখী অতিথি-সেবিকার মধ্যে একটা হিংস্র সাপ বাসা বেঁধে রয়েছে—যে কোন মুহূর্ত্তে সে তার বাসস্থান থেকে বেরিয়ে ছোবল লাগাবে। রাজার উপস্থিতির জন্তে দুর্গ-মধ্যে নাচ-গান, পান-ভোজন মহা আড়ম্বরে সারা হল। রাজা ডানকান পথশ্রমে ক্লান্ত—পানাহার তাড়াতাড়ি সেরে শয়ন করলেন। তাঁর দ্বার-রক্ষক প্রহরীও পাহারা দিতে দিতে এক সময় গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল। তাদের পানিয়ে ঘুমের ওষুধ দেওয়া ছিল—সেই ওষুধই এই নিদ্রার কারণ।

মধ্য-রাত্রি। পৃথিবীর অর্দ্ধেকেরও বেশী স্থানে প্রকৃতি নিদ্রায় আচ্ছন্ন—মৃতপ্রায়। সুপ্ত মনে এই সময়েই জাগে দুঃস্বপ্ন—বোধ হয় নেকড়ে ও খুনীর মত হিংস্র জীবরাই এই সময় জেগে থাকে। লেডী ম্যাকবেথ এই রাত্রিকেই কালরাত্রি ধরে নিলেন রাজাকে হত্যা করার অভিসন্ধি নিয়ে। তাঁকে কেউ সন্দেহ করবে না—তাঁর আদর-যত্নে যেমন রাজাকে খুশী করার আগ্রহ, রাজাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করার চিহ্ন সকলেরই লক্ষ্যে পড়েছে। রাজা ডানকান খুশী হয়ে একটা হীরার আংটি উপহার দিয়ে তাঁর 'হোষ্টেস'কে বাধিত করেছেন। তাঁকে তাই কেউ সন্দেহ করবে না।

কিন্তু ম্যাকবেথকে জানেন—অন্যায় তাঁর সয় না, ভোজকক্ষেই বোঝা গেছল এটা। ম্যাকবেথ এক সময় ভোজসভা ছেড়ে চলে এলেন। মনে শঙ্কা, অনুকম্পা, ধর্ম্মজ্ঞান সবই জাগছিল। লেডী ম্যাকবেথ গতিক খারাপ দেখে প্রতিজ্ঞা করলেন, ম্যাকবেথের মনকে নিজের দখলে আনবার। তিনি ম্যাকবেথের কাছে উপস্থিত হলেন, বললেন, "খাবার-ঘর ছেড়ে চলে এলে যে?"

ম্যাকবেথ বলে উঠলেন, "না, না—এ কাজে দরকার নেই।"

তাঁর নিস্পৃহ ভাব দেখে লেডী ম্যাকবেথ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, "কে আমার মনে আশা জাগিয়েছে, তুমিই না? তোমার চঞ্চল মন; উঁচু বাসনা, প্রতিজ্ঞা করলে জীবনের সম্পদ হস্তগত করতে। আর এখন কাপুরুষের মত 'না না, পারব না।' বললে চলবে কেন? চিরটা কাল এই ভীরুতার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকবে?"

"শান্ত হও"—ম্যাকবেথ তখনও আমতা-আমতা করছেন, "বীরের কাজই পৌরুষ, কিন্তু এ কাজ অমানুষের।"

—"তবে কেন তুমি ছল ক'রে চিঠি লিখেছিলে—আজ তুমি গররাজী হয়ে পিছপা হ'তে পার কিন্তু আমি তা পারি না..."

কুণ্ঠিত হয়ে ম্যাকবেথ বললেন, "কিন্তু যদি ব্যর্থ হই?"

লেডী ম্যাকবেথ বললেন, "কেন ব্যর্থ হবেই এ দুর্ব্বলতা দূর ক'রে ফেল, তোমার পৌরুষ দিয়ে এটা সফল কর, আর তা যদি না পার তবে আমিই চললেম"—বলে দু'টো ছোরা হাতে লেডী ম্যাকবেথ ডানকানের ঘরের দিকে অগ্রসর হ'লেন। মদমত্ত আর সুপ্তিতে মগ্ন প্রহরীদের সাবধানে অতিক্রম ক'রে ডানকানের বিছানার পাশে উপস্থিত হলেন। ডানকান ভ্রমণের ক্লান্তিতে গভীর ভাবে নিদ্রামগ্ন, তাঁর সুপ্ত মুখমণ্ডল লক্ষ্য করতে লাগলেন লেডী ম্যাকবেথ—তাঁর আর হত্যা করা হল না—সেই মুখ তাঁর স্বর্গত পিতার মুখ স্মরণ করিয়ে দিল। তিনি ফিরে এলেন স্বামীর কাছে।

ম্যাকবেথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন—যাকে হত্যা করতে যাচ্ছেন তিনি সাধারণ এক জন প্রজা ত' ননই—বিরাট রাজা, তাঁর অতিথি তিনি—তাঁর ধর্ম্ম তাঁকে খুশী করা—দস্যু-তস্করের হাত হ'তে রক্ষা করা—নিজ হাতে ছুরি বওয়া ত নয়ই, আরও মনে পড়তে লাগল কত মহৎ দয়ালু রাজা এই ডানকান। রাজারই দয়ায় তাঁর এই উন্নতি। কি ক'রে হত্যার মত এক দুষ্কর্ম্ম তাঁর হাত দিয়ে সংঘটিত হবে!

কিন্তু লেডী ম্যাকবেথের অগ্নিবর্ষী কথা তখনও কানে বাজছে—তিনি ছোরা হাতে ডানকানের শয়নকক্ষে উপস্থিত হলেন। যখন তিনি যাচ্ছিলেন তখন বাতাসে যেন দেখতে পেলেন, অদৃশ্য হাতের আর একটি ছোরা—তাঁর দিকে উদ্যত আর অগ্রভাগে রক্তের ফোঁটা—তিনি যেমনি সেটাকে ধরতে গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে সেটা মিলিয়ে গেল। শুধুই বিরাট একটা শূন্যতা বিরাজ করতে লাগল সেখানে। পত্রপাত শব্দে কাঁপে পাপীর হৃদয়—ওটা কেবল তাঁর উত্তপ্ত উত্তেজিত মস্তিষ্কের ফল। এই বিভীষিকা থেকে মুক্ত হয়ে নিদ্রিত রাজার শয়নঘরে প্রবেশ করলেন তিনি। তাড়াতাড়ি শেষ হল তাঁর কাজ ছোরার একটি মাত্র আঘাতে। নিদ্রিত প্রহরীর এক জন ঘুমের মাঝখানে ঠিক সেই সময় হেসে উঠল—অন্য জন চীৎকার করে উঠল—'খুন, খুন'। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙে গেল দু'জনেরই—প্রার্থনা করল কিছুক্ষণের জন্য। এক জন বলল, "ভগবান আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন"—আর এক জন বলল "স্বস্তি—স্বস্তি"—আবার ঘুমিয়ে পড়ল তারা।

ম্যাকবেথ প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে কথা শুনছিলেন তাদের—যদিও তাঁর পক্ষে আশীর্ব্বাদের প্রয়োজন তবু "ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন" কথাটা গলায় আটকে গেল—উচ্চারণ করতে পারলেন না, তাঁর মনে হ'ল কার চীৎকার যেন তিনি শুনতে পেলেন, "আর ঘুমিও না ঘুমকে ম্যাকবেথ হত্যা করেছে, নির্দ্দোষ ঘুম, যে ঘুম জীবনকে পরিপুষ্ট করে সেই ঘুমকে হত্যা করেছে ম্যাকবেথ!" তখনও যে চীৎকার শোনা যাচ্ছে—"আর ঘুমিও না" সমস্ত কক্ষে কক্ষে যেন ধ্বনিত হ'তে লাগল, "গ্লেমিস ঘুমকে হত্যা করেছে, সে জন্যে কডর আর ঘুমাবে না—ম্যাকবেথ আর ঘুমাবে না।"

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—তরুণকুমার দত্ত

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

১১

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে কলিকাতায় অনেকগুলি গুপ্ত সমিতি পরস্পরের সন্ধান না লইয়া আপনা-আপনি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। যতীন্দ্রনাথের বরোদা হইতে আগমনের পূর্ব্বেই ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আত্মোন্নতি সমিতি নামক বিপ্লবী সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জী, ভুবনেশ্বর সেন, নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—এই কয় জনে উদ্যোগী হইয়া সমিতির পত্তন করেন। সেই সময় খেলাতচন্দ্র ইনষ্টিটুশানে সমিতির আলোচনা-সভা বসিত।

আত্মোন্নতির অন্যতম সভ্য শ্রীইন্দ্রনাথ নন্দী সমিতির উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, "তরুণেরা নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া এই সমিতি করিয়াছিলেন, সমিতির বিশ-ত্রিশ জন সভ্য প্রায় সকলেই ছাত্র ছিলেন। স্কুলের শিক্ষকেরাও আলোচনায় যোগদান করিতেন, তৎপর আমি আরও দুই জন ঐ সমিতিতে যোগদান করি। আমি boxer বলাই চাটুজ্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাখালদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছ হইতে বৈপ্লবিক motive ও method প্রাপ্ত হই। তিনি দেশের স্বাধীনতার আদর্শ আমাকে দেন। আমি যতীন্দ্রনাথ হালদারের কাছ হইতে একটি সমিতির সংবাদ পাই। তিনি বলেন, বর্দ্ধমান ও শান্তিপুরে একটি দল আছে, তাহার সংস্পর্শে ইন্দ্র বাবু আসুন। এই শান্তিপুরের দলের ভূপতি গোস্বামী ঐ আত্মোন্নতি সমিতির সংবাদ আমায় দেন। তৎপর যতীন্দ্রনাথ হালদার, রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়, আমি এই তিন জন আত্মোন্নতি সমিতিতে যোগদান করিলাম।

এই সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ফিরিঙ্গিদের সহিত সমিতির ছেলেদের প্রায়ই মারামারি হইত। এই সময় ফিরিঙ্গিদের Over-bearing attitude আমরা বড়ই অনুভব করিতাম। ইহাতে আমরা পরাধীনতার অপমান হৃদয়ে অনুভব করিতে থাকি। এই কালে হেম মল্লিক মারামারির সময়ে তাঁহার বাড়ী আশ্রয়রূপে ব্যবহার করিতে দেন। তিনি এক দল ছেলেকে উপযুক্ত নাগরিক আদর্শে গঠিত করিতে চাহিতেন। তিনি চাহিতেন যে, এক দল ছেলে civic duty, সাহস প্রভৃতির দ্বারা পুষ্ট হইয়া গঠিত হয়। স্বামীজির দেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ সোসাইটি স্থাপিত হয়। মাণিকতলা ষ্ট্রীটে সমিতির আফিসের উল্টা দিকে মাণিক দত্তের বাড়ীতে "অনুশীলন সমিতির" সভ্যেরা জমা হইতেন। এই সম্বন্ধে আমায় তাঁহাদের সহিত আলাপ হয়। তাঁহাদের নামটা আমায় আকৃষ্ট করে।

এই সময়ে হেম বাবু যখন উপরোক্ত প্রকারের দল সৃষ্টি করিতে চান তখন আমি তাঁহাকে অনুশীলনের কথা বলি। ইহাতে তিনি ছয় শত যুবককে নিমন্ত্রণ করিয়া ভূরিভোজন প্রদান করেন। এই অনুষ্ঠান তাঁহার বাড়ীতে হয়। সেই সময় অনুশীলনের একটা সমাবেশ হেম বাবুর বাড়ীতে হয় এবং অনুশীলন উৎসাহ প্রাপ্ত হয়। এই সময় হইতে হেম বাবু অনুশীলনের পৃষ্ঠপোষক সাহায্যদাতা হন।

তৎপর নিখিল মৌলিকের (ভবানন্দ স্বামী) সঙ্গে আমার আলাপ হয়। শুনিয়াছিলাম, ইনি, পরেশ লাহিড়ী (মহাদেবানন্দ স্বামী) এবং ক্ষিতিমোহন সেন (বর্ত্তমান শান্তিনিকেতনের আচার্য্য) একটি বৃহৎ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই দলের নিখিলদা'র সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়। তাঁহারই পরামর্শ অনুযায়ী আমরা ব্যবসাক্ষেত্রে নামি এবং ছাত্রভাণ্ডার স্থাপন করি।

ইহার পূর্ব্বে রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ হইতে বৈপ্লবিক সমিতির সংবাদ পাই। যখন বৈপ্লবিক সমিতির আখড়া এবং কর্ম্মীদের বাসস্থান আপার সার্কুলার রোডে অবস্থিত ছিল, তখন রঘুনাথ আমাকে লইয়া যান। এই প্রকারে আত্মোন্নতি সমিতির রঘুনাথ, আমি ও জীবন মুখোপাধ্যায় প্রথমে বৈপ্লবিক সমিতিতে যাই। পরে ক্রমে ক্রমে আত্মোন্নতি সমিতির সর্ব্ব সভ্যই বৈপ্লবিক সমিতিতে যাইতে থাকেন। এই প্রকারে আত্মোন্নতি সমিতির সহিত বৈপ্লবিক সমিতির যোগাযোগ হয়। এতৎসম্বন্ধে কোন বুঝাপড়া ছিল না। যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় উপযুক্ত লোক দেখিলেই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। এই উপায়ে আমরা বৈপ্লবিক সমিতির সভ্য হই। বাস্তব পক্ষে "আত্মোন্নতি সমিতি" বৈপ্লবিক সমিতিতে সম্পূর্ণরূপে একীভূত হইয়াছিল অথচ আত্মোন্নতি সমিতি বাহিরে নিজের অস্তিত্ব রাখিয়াছিল। জীবন, রঘুনাথ প্রভৃতি প্রতিজ্ঞাপত্রে Oath লইয়াছিলেন। বিপিন গাঙ্গুলী, প্রভাস দেব, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তখন junior সভ্য ছিলেন। প্রভাসকে আমিই আত্মোন্নতিতে প্রবেশ করাই। পবিত্র, মণি মিত্র প্রভৃতি আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। এই সম্পর্কে তাঁহারা যতীন বাবুর কাছে যান। পবিত্র বৈপ্লবিক দলে পরে প্রবেশ করিয়াছিল।

ইহার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগিনী নিবেদিতা, অধ্যাপক জগদীশ বসু, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার প্রভৃতি বুদ্ধগয়ায় যান। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে যাই। এই সময়ে আমার সহিত পাটনার পুনিত লালের আলাপ হয়। তিনি বলেন, তাঁহাদের যৌবনে তাঁহারা বিহারে একটি বৈপ্লবিক দল গঠন করিয়াছিলেন। পুনিত বাবু লাহিড়ী কোম্পানীর পাটনায় এজেন্ট ছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার সহিত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের আলাপ আমি করাইয়া দিই। এই সময় আমরা ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে স্বদেশী ভাব প্রচার করিতেছিলাম। বুদ্ধগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর "ছাত্রভাণ্ডার" স্থাপিত হয়। ছাত্রভাণ্ডার বৈপ্লবিক কর্ম্মীদের একটা আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। আমার অনুরোধে নিখিল বাবু, হরিশ শিকদার মিলিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। সুবোধ মল্লিক তাহার Lead collector ছিলেন। এই অর্থ আমরা কর্ম্মীদের ব্যয়ের জন্ম দিতাম। ছাত্রভাণ্ডার বর্ত্তমানের Seal's Mansion কলেজ ষ্ট্রীটে স্থাপিত হয়। তৎপর তাহার উল্টা J. K. Sharmaর দোকানের পার্শ্বে স্থান পরিবর্ত্তন করে। তৎপর হ্যারিসন রোডের দুই স্থানে উঠিয়া যায়। পবিত্র ও নিখিল বাবু ইহার ভার নেন। ছাত্রভাণ্ডারের প্রধান কর্ম্মী ছিলেন পবিত্র দত্ত। এই ভাণ্ডারের আচরণে বৈপ্লবিক কর্ম্ম ছিল।

ছাত্র-ভাণ্ডারের ছাতের উপর সখারাম বাবু ক্লাশ করিতেন। আলীপুর বোমার মামলার পর পবিত্র দত্তকে পুলিশ Howrah gang caseএ গ্রেপ্তার করে; এবং বলে যে, ছাত্রভাণ্ডারের যে ম্যানেজার হইবে তাহাকেই পুলিশে ধরিবে। সেই শুনিয়া রঘুনাথ ও আমি যে পরিমাণে টাকা দিয়াছিলাম তজ্জন্য সেই পরিমাণের মাল লুকাইয়া সরাইয়া ফেলিলাম। এই প্রকারে ছাত্রভাণ্ডার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। গুজব উঠিল "পুলিশ দোকান লুটাইয়াছে।"

এই সময় কালীঘাটে একটি উগ্র বৈপ্লবিক দল উদ্ভূত হয়। ইঁহারা সকলেই বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহাদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন হরিদাস হালদার। ইঁহার আত্মীয় গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কাব্যতীর্থ) কালীমন্দিরের এক জন পুরোহিত। এই পণ্ডিত মহাশয় একটি "স্বদেশী রামায়ণ" রচনা করেন। এই পুস্তকের কতকগুলি গান পরে "স্বদেশী সঙ্গীত" বলিয়া বাজারে প্রচার করা হয়; যথা: "স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি রেখ রেখ মনে এই ধ্রুব জ্ঞান", "একবার ফিরে এস ফিরে এস গো" ইত্যাদি, এই স্বদেশী রামায়ণ কথকতা দ্বারা প্রচার করা হইত। এই কথকতা বাঙ্গলায় বিশেষ জনপ্রিয় হয়। এই রামায়ণ-কথকতা হইতে প্রমাণ হয় যে, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বারীন্দ্র দ্বিতীয় বার বাংলায় আসিবার পূর্ব্বেই অস্ত্র সাহায্যে ইংরাজ বিতাড়ন চেষ্টা অনুশীলন সমিতির সদস্যগণের সঙ্কল্প ছিল। গানগুলি হইতে অনুশীলনের ভাবধারা কিছুটা বুঝা যাইবে।

১

"সিংহের দাপটে প্রাণ যায় ও মা
আন্‌লে কোথা হতে বিকট পশু দেখে ভয় পাই ও মা
পশুর রাজা সিংহ বটে তাই চরণ দিয়ে দিলি পিঠে
সে যে মহাশক্তির চরণ পেয়ে তাইতে ল্যাজ ফোলায় ও মা।
দে মা অস্ত্র দয়া ক'রে বেটাকে তাড়াই দূরে
ও তোর অশান্ত বলে আর নাহি ভয় মা
শক্তিপূজা কর্ত্তে দেখে বেটা কটমটিয়ে থাকে
সে তো নাহি মনে ভাবে আমরা তোর তনয় মা।"

২

"স্বদেশানুরাগে যেই জন জাগে অতি মহাপাপী হৌক না কেন
তবুও সেই জন অতি মহাজন সার্থক জনম তাঁহারি জেন।
দেশহিত ব্রত এ পরশমণি পরশিবে যারে যখন
রাজভয় আর কারাভয় ঘুচিবে তাহার তখনি জেন
মাতৃভূমি তরে যেই অকাতরে
নিজ প্রাণ দিতে কভু নাহি ডরে
অপঘাত ভয় খণ্ডে তার যায় গোলোকে যায় সেই জন।"

এই সময় জেলা-জজ বরদাচরণ মিত্র প্রণীত সঙ্গীত বিপ্লবী তরুণদের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠে।

৩

"শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা
অভয়া চরণে নত্র শির।
ডরি না রক্ত ঝরিতে ঝরাতে
দৃপ্ত মোরা ভক্ত বীর।
আবাহন মার যুদ্ধ স্মরণে
তৃপ্তি তপ্ত রক্ত ক্ষরণে
পশুবল আর অসুর নিধনে
মায়ের খড়্গ ব্যগ্র ধীর
মায়ের অরাতি নাশন
পদে অঞ্জলি বাঞ্ছাপূরণ
শত্রু রক্তে মায়ের তর্পণ
জবার বদলে ছিন্ন শির—"

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সরলা দেবী 'ভারতী' পত্রিকার মারফৎ "বিলাতি ঘুষি বনাম দেশী কিল" শীর্ষক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে ইউরোপীয়দিগের সহিত ভারতীয়গণ সাহস করিয়া যে সমস্ত মারামারি করিতে আরম্ভ করিয়া শ্বেত জাতির ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী সমাজ হইতে পরাজিত মনোবৃত্তি দূর করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। বীরাষ্টমী মেলা, প্রতাপাদিত্য উৎসব প্রভৃতির মারফৎ ক্ষাত্র-শক্তির উদ্বোধন প্রচেষ্টাও তিনি আরম্ভ করেন। তাঁহার সহযোগিতায় প্রমথ বাবু বিপ্লবী দল গড়িয়া তুলিবার আয়োজনে যখন রত ছিলেন, সেই সময় বরোদা হইতে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হন।

সরলা দেবীর পিতা জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয় কংগ্রেসের এক জন কর্ম্মকর্তা ছিলেন, কিন্তু জাতীয় সম্পত্তির ব্যবহার ঠিক নিয়মিত ভাবে তিনি করেন না, এরূপ একটি অপবাদ তাঁহার ছিল। সেই কারণে সরলা দেবীকেও দলের কেহ কেহ অপছন্দ করিতে থাকেন। বীরাষ্টমী উপলক্ষে সরলা দেবী চৌধুরাণী যে সমস্ত শক্তিচর্চ্চার

প্রদর্শনী করিতেন সেই শক্তিচর্চ্চা প্রসারের উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর-নিবাসী লাঠি ও তলোয়ার চালনায় সুদক্ষ তুরস্কদেশীয় ওস্তাদ প্রফেসর মার্ত্তাজাকে বহু ক্লাবের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। অনুশীলনেও ইনি শিক্ষকতা করেন। বড় লাঠি খেলা শিক্ষা দিতেন উলুবেড়িয়ার অতুল ঘোষ। প্রফেসার মার্ত্তাজাকে লইয়া সরলা দেবী চৌধুরাণী একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন।

বাংলায় যে ভাবে বিপ্লবাত্মক ভাবধারা ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল বোম্বাই অঞ্চলেও প্রায় ঠিক অনুরূপ ভাবেই বিপ্লবের প্রচেষ্টা দানা বাঁধিয়া উঠে। পৃথিবীতে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই ভাব বিকাশ লাভ করিতে বহু বার দেখা গিয়াছে। বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা একে অন্যের নিরপেক্ষ ভাবেই জমিয়া উঠে এবং বিংশ শতাব্দীতে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, চারুচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির প্রযত্নে এই দুই ধারার মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। বাঙ্গলা দেশেও যেমন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে গণতান্ত্রিক মতবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবাত্মক মনোভাব দেখা দিতে আরম্ভ করে বোম্বাই অঞ্চলে বিশেষতঃ পুণা সহরেও এই সময় হইতেই বিপ্লবাত্মক মনোভাবের বিকাশ দেখা যায়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রানাডের প্রেরণায় পুণা সার্ব্বজনিক সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলুঙ্করের যুগান্তকারী পুস্তক "নিবন্ধমালা" প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলিতে বিষ্ণু শাস্ত্রী দেশবাসীকে স্বদেশ, স্বধর্ম, স্বজাতি, জাতীয় ভাষা ও জাতীয় ঐতিহ্যকে মনে-প্রাণে ভালবাসিতে উদ্বোধিত করেন। এই সব আন্দোলনের ফলে মহারাষ্ট্র দেশে এবং বিশেষ করিয়া এই দেশের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে তাহার ফলেই মহারাষ্ট্র দেশে স্বাধীনতার অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠে।

এই অগ্নিশিখা সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে মহারাষ্ট্র বীর যুবক বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের বিদ্রোহাত্মক কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া। ফাড়কে দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য মহারাষ্ট্র বীর শিবাজীর অনুসরণে পার্ব্বত্য জাতিদের সংঘবদ্ধ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইংরাজগণ ইহাকে লুণ্ঠতরাজ ও অরাজকতার প্রচেষ্টা আখ্যা দিয়া ফাড়কের সাধনাকে খর্ব্ব করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু ফাড়কের চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও তিনি যে দীপ জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা হইতেই আগুন ছড়াইয়া পুণা প্রভৃতি অঞ্চলে চাপেকার সংঘ, সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয় প্রতিষ্ঠিত অভিনব ভারত সমিতি, শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মার বিদেশে ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য গুপ্ত আন্দোলন প্রভৃতি অগ্নিমন্ত্রের সাধনাত্মক কর্ম্মপ্রচেষ্টার উদ্ভব হয়। প্রায় দুই বৎসর এক স্থান হইতে অপর স্থানে পলাইয়া যুদ্ধ চালাইয়া ফাড়কে হীনবল হইতে থাকেন। তাহার পর ফাড়কের বিদ্রোহ অতি সহজেই দমিত হয় এবং ফাড়কে ধরা পড়িয়া এডেনে নির্ব্বাসিত হন। সেখান হইতে পলাইয়া আসিবার চেষ্টা করিয়া তিনি ব্যর্থ হন এবং নির্ব্বাসন ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফাড়কের বিদ্রোহের সহিত সহানুভূতি পুণার ব্রাহ্মণ নেতাদের বিশেষ করিয়া রানাডে ও চিপলুঙ্করের ছিল মনে করিয়া ইংরেজ সরকার ইহাদের উপর বিরূপ হন ও রানাডেকে নাসিক হইতে ধুলিয়াতে বদলী করা হয়।

ফাড়কের বিদ্রোহের পর কোনওরূপ প্রকাশ্য বিদ্রোহ কয়েক বৎসর দেখা দেয় নাই। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইংরাজ-বিদ্বেষ ধূমায়িত হইতে থাকে। বাংলা দেশে যেমন 'হিন্দু মেলা' জাতীয় মন্ত্র প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চ্চা প্রভৃতির মধ্য দিয়া ক্ষাত্রধর্ম্মের প্রতি লোকের অনুরাগ বাড়াইয়া তুলিতে সহায়তা করিয়াছিল, মহারাষ্ট্র অঞ্চলেও তেমনই সর্ব্বজনিক গণপতি উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াও সেইরূপ কাজ হইয়াছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে সর্ব্বজনিক গণপতি উৎসব প্রচলিত হয়। এই মেলার স্বেচ্ছাসেবকদিগকে অসিচালনাও শিক্ষা দেওয়া হইত। উৎসব দশ দিন ধরিয়া চলিত এবং রাস্তায় রাস্তায় যুবক দল ইংরাজ-বিরোধী সঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইতেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে শিবাজী মহারাজের মুকুট ধারণ দিবসের স্মারক হিসাবে প্রথম শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত উৎসবের প্রাণ ছিলেন দামোদর হরি চাপেকার ও তাঁহার ভ্রাতা বালকৃষ্ণ হরি চাপেকার। হিন্দুধর্ম্মের প্রতিবন্ধকনাশক সমিতি নামে এক সমিতি স্থাপন করিয়া তরুণ দলকে ইঁহারা গোপনে সামরিক কৌশল শিখাইতে থাকেন। ইঁহাদের গুপ্ত সমিতি পরে চাপেকার সংঘ নামে পরিচিত হয়।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পুণা সহরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইলে তাহা রোধ করিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে যে সমস্ত ব্যবস্থা হয় তাহার কতকগুলি বিধান অকারণে প্রজা-পীড়নের যন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে, এই ভাবিয়া জনসাধারণের মনে দারুণ অসন্তোষ জাগে। প্লেগ-কমিশনার মিষ্টার র‍্যাণ্ডকেই ইহার জন্য দায়ী করিয়া তাঁহার আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়া ৪ঠা মে তারিখে বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার 'কেশরী' পত্রিকায় এক তীব্র সমালোচনা করেন।

চাপেকার সংঘ র‍্যাণ্ডের অত্যাচার নিবারণ করিতে বদ্ধপরিকর হন। ২২শে জুন তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উৎসবের পর পুণার গণেশখণ্ডে অবস্থিত লাট-ভবন হইতে যখন মিঃ র‍্যাণ্ড প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন সেই সময় দামোদর ও বালকৃষ্ণ তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গী লেফটেনাণ্ট আয়ার্ষ্টকে হত্যা করে। হত্যাকারীদের সন্ধানপ্রদানকারীকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করাতে হত্যাকাণ্ডের সহিত চাপেকারদিগের সংশ্রবের সংবাদ দিয়া যাঁহারা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন তাঁহাদের ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে চাপেকার সংঘের সদস্যগণ হত্যা করেন। র‍্যাণ্ড হত্যার দায়ে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসী হয় এবং পুণার বিখ্যাত নাটু ও তাঁহার ভ্রাতাকে বাংলার ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ নং রেগুলেশনের ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে অজ্ঞাত স্থানে আটক রাখা হয়। চাপেকারদিগের সম্বন্ধে সংবাদদাতার হত্যাপরাধে চাপেকার সংঘের চারি জন সদস্যের ফাঁসি হয়। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনে প্রথম জীবন উৎসর্গ করেন দামোদর ও তাঁহার ভ্রাতা বালকৃষ্ণ এবং তাহার পর তাঁহাদের সংঘের এই চারি জন সদস্য।

চাপেকার সংঘের সহিত অরবিন্দ, বারীন্দ্র ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংযোগ ঘটে এবং বিষ্ণু ভাস্কর লেলেও এই দলের সমর্থক ছিলেন। চাপেকার সংঘের কার্য্যধারা বাংলায় বিস্তার করিতে আসিয়া যতীন্দ্র ও বারীন্দ্র দেখিতে পাইলেন যে, পূর্ব্ব হইতেই ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে। সেই সময় যতীন্দ্রনাথ প্রমথ মিত্রের সহায়তায় "অনুশীলন সমিতি" গড়িয়া তুলেন। [ক্রমশঃ।

বুদ্ধদেব বসু

প্রথম খণ্ড

একটি গ্রীষ্মের সকাল

১

সকালবেলাটি জ্যোতির্ময় হ'য়ে দেখা দিলো। কাল রাত্রে যে বৃষ্টি হয়েছিলো আকাশে তার চিহ্নমাত্র নেই, বাতাসে আছে তার স্মৃতি। আজ আকাশ কূলে কূলে নীল, আযোজন-উজ্জ্বল, দিগন্ত থেকে দিগন্তে অবারিত। মেঘ নেই, এক ফোঁটা শাদা মেঘও লেগে নেই কোথাও; নগ্ন বিশাল উন্মুক্ত আকাশ থেকে রৌদ্র ঝরছে অপরিমাণ আবেগে, যেন সূর্যদেব তাঁর শাশ্বত পিতৃত্ব ভুলে প্রেমিকের রূপে দেখা দিয়েছেন, তাঁর অজর তারুণ্যের তেজে প্লাবিত ক'রে দিচ্ছেন তাঁর কন্তকা এই পৃথিবীকেই। স্থিরমতি অবিচল পৃথিবীর মাতৃত্বময় হৃদয় থেকে নিশ্বাস উঠছে উত্তরে—ক্লান্তির নয়, সহিষ্ণুতারও না, বরং সুখের, তৃপ্তির, যেন বহুকাল ভুলে-থাকা কোনো বিরহের আকস্মিক অবসানের তপ্ত শ্বাস। তাপ উঠছে মাটির বুক থেকে, সূক্ষ্ম তাপ, তাতে ক্লেশ নেই, তীব্রতার সূচীমুখের প্রথম সুখকর স্পর্শটুকু মাত্র, যে-স্পর্শ হাওয়াতেও এখনো লাগেনি—সেই হাওয়া, যে ভুলতে পারেনি হ'য়ে-যাওয়া বৃষ্টিকে, অথচ আজকের উজ্জ্বলতাকেও মেনে নিয়েছে—শুধু মেনে নিয়েছে তাও নয়, তাকে স্নিগ্ধ ক'রে তুলছে কালকের স্মৃতিকণার মৃদুতা পৃথিবী ভ'রে ছড়িয়ে দিয়ে। আশ্চর্য লীলা সৌরমণ্ডলের, আশ্চর্য সকাল। আশার যদি কোনো রূপ থাকতো, উৎসাহের যদি কোনো ছবি হ'তো, এই সকালটি যেন তা-ই। গ্রীষ্মের যে-প্রাণসাধনায় পুরীষে ফুল ফোটে, জঞ্জালের স্তূপ মাটিতে মিশে উর্বরতা বাড়ায়, এবং ফুল-ঝরানো শুকনো তাপে পুড়ে-পুড়েই আমের বুকে ঘনমধুর জ'মে ওঠে, তারই উদ্দীপনা এই রৌদ্রে, তারই কল্যাণময় প্রণয় এই হাওয়ায়। এ-রকম সকাল বছরে একটি-দুটির বেশি আসে না; চৈত্র-বৈশাখের কোনো এক অপ্রত্যাশিত তিথিতে হঠাৎ সে দিনের দিগন্তে এসে দাঁড়ায়;—পৃথিবীর লোক বাজার করে, রান্না করে, আপিশে যায়; হয়তো ও-সব করতে তাদের ভালোই লাগে সেদিন, কিংবা একটু বেশি ভালো লাগে, কিংবা হঠাৎ বোঝে, বুঝে অবাক হয়, কেমন এক রকম বিনম্রবিস্ময়ে পথের ধারে ঘুঁটের গন্ধে চকিতে উপলব্ধি করে যে ও-সব কাজ—যাতে মনে হয় কষ্ট ছাড়া কিছু নেই—ও-সব কাজ প্রতিদিনই ভালো লাগে তাদের, ও-সব আছে ব'লেই বেঁচে থাকা সার্থক। হয়তো রাস্তায় বেরিয়ে জোরে নিশ্বাস নেয় কেউ, মনে হয় ফুশফুশে বেশি হাওয়া যাচ্ছে, হয়তো মনে-মনে একবার বলে, 'বাঃ, বেশ তো!'—আর রোগশয্যায় শুয়ে কেউ হয়তো ভাবে, 'আজ আমি ভালো আছি'—কেন ও-রকম হয় কেউ বোঝে না।

যে-কোনো শহরে, যে-কোনো ভিড়ে, যে-কোনো কলকারখানা বস্তিধোঁয়ার চ্যাঁচামেচি নোংরামির মধ্যে এই সকালটি সুন্দর হ'তো, কিন্তু এর আনন্দময় মদির মূর্তিটি এমন পরিপূর্ণ ক'রে অন্য কোথাও কি প্রকাশিত হ'তে পারতো, যেমন হয়েছে এই ঢাকায়, পুরানা পল্টনে? নামের মধ্যে প্রাচীনতা নিয়ে নতুন গ'ড়ে

উঠছে পাড়া—ঠিক পাড়াও হয়নি এখনো, হবে ব'লে উদ্‌যোগ মাত্র শুরু করেছে। এখনো বেশির ভাগই মাঠ, যার বুক চিরে সিঁথির মতো পথ বেঁকেছে, যার গর্ত ঘাস আগাছা খোদলের স্বচ্ছন্দ প্রচুরতার ফাঁকে-ফাঁকে এখন পর্যন্ত চারটি কি পাঁচটি যা বাড়ি উঠেছে, তা প্রান্তরের সহজ বিস্তারে বাধা না-দিয়ে ঠিক সেইটুকু যেন যোগ করেছে শুধু, যেটুকু না-হ'লে, মানুষের হাতের হালকা সেই ছোঁওয়াটুকু না-পেলে প্রকৃতি ঠিক প্রস্ফুটিত হয় না, সম্পূর্ণ হয় না। শহরের বাইরে বসতি। মাইলখানেক দক্ষিণে, রেল-লাইনের খুন্টি-গেট পেরিয়ে, তবে আরম্ভ হ'লো শহর, গন্ধে আর গোলমালে ভরা ঢাকার শহর, যার বিখ্যাত ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়ার খুরে ঐতিহাসিক ধুলো উড়ছে, হাওয়ায় যার প্রাদেশিক ভাষার লয়দার আলস্য ছড়ানো, আর তারই সঙ্গে ককনি বুলির প্রখর সুর—বণিকশ্রেণীর কড়া অথচ মিষ্টি টান, আর তার চেয়েও বিশিষ্ট, আশ্চর্য, একেবারেই স্থানীয় এবং স্বতন্ত্র, উর্দু-বাংলার তিনমিশোলি রবোল্লাস—আর যার, সেই পুরোনো এবং পরিতৃপ্ত শহরের, শাঁখা শাড়ি বাখরখানির অলি-গলি এঁকে-বেঁকে শেষ হয়েছে বিশীর্ণ বুড়িগঙ্গার ধারে নবাব-বাড়ির লাল পাথরের সূর্যাস্তচ্ছটায়। এই ঢাকা, যা লক্ষণযুক্ত, চিহ্নিত, সময়ের স্বাক্ষরে প্রামাণ্য এবং জীর্ণতাস্পৃষ্ট, তার সঙ্গে আড়ি ক'রে, রেষারেষি ক'রে, অথচ অস্তিত্বের জন্য তারই উপর নির্ভর ক'রে ফুট হয়েছে উত্তরবর্তী অভিনব রমনা, বাতিল-হওয়া বঙ্গভঙ্গের সুখস্মৃতিবহ উপনগর—কিংবা উপবন—বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন, জ্ঞানী, গুণী, ছাত্র—ছাত্রী—মহিলামুক্তির বিহারভূমি, আধুনিকতার পীঠস্থান।

এই রমনারই পূর্ব প্রান্তে, আকাশ-বাতাসে তারই সমান অংশীদার, কিন্তু গৌরবের ভারে গম্ভীর নয়, অপরিণত, সদ্য আরব্ধ, জায়মান পুরানা পল্টন। দক্ষিণে তার মাইল-ছড়ানো মাঠ, দূরের দিকে ফুটবল খেলার জনতালোভন প্রাঙ্গণ, কিন্তু কাছে এলে শুধুই প্রান্তর—হাওয়া আর আলো ছাড়া কিছুই খেলে না সেখানে;—আর প্রান্তর-পাড়ার সীমান্তরেখাও স্পষ্ট হ'তো না, যদি-না দাঁড়াতো, দাঁড়িয়ে থাকতো, মুনিসিপালিটির কাঁচা রাস্তায় শুকনো পাতার বংশাবলী ঝরিয়ে, আকাশ ভ'রে অবিরল মর্মরধ্বনি তুলে, অচল-চঞ্চলের মিলন-তোরণের মতো উন্নত প্রশস্ত বলীয়ান একটা বটগাছ। শুধু দক্ষিণে নয়, চারদিকেই তার সবুজ, উত্তর পুব গ্রাম্য উচ্ছ্বাসে ঘনশ্যামল, আর কোথাও-কোথাও সেই সব সেগুনের ভিড়ে নিবিড়, যাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী কাটা পড়েছে, পুরানা পল্টনকে বাসযোগ্য করতে। শুধু ক-টি বাড়ি ছাড়া বানানো কিছুই চোখে পড়ে না আশে-পাশে, যদি-না তথ্যের খাতিরে স্বীকার করা হয় ছোট একটা টিলাকে, বিশ-পঁচিশ ফুট উঁচু একটা টিপি, পাড়ার নামের সামরিক ইঙ্গিতটুকু যার দান, আর যার গায়ে, ঐ ইঙ্গিতটুকু কিঞ্চিন্মাত্র সার্থক ক'রে, এখনো মাঝে-মাঝে আঘাত করে সেপাইনবিশের বন্দুকচর্চার প্রতিধ্বনি। সব মিলিয়ে পুরানা পল্টনের ভাবটা ভারি ছেলেমানুষি, শুধু নতুন ব'লে নয়, এলোমেলো সবুজ ব'লে নয়, অসমাপ্ত ব'লে, সমাপ্য ব'লে;—এর সমস্তটাই যেন হ'য়ে-ওঠা, হ'য়ে-উঠতে-থাকা, কিশোর—মানে, কৈশোরের সেই লাবণ্যে জড়ানো যার নিজেকেই পূর্ণ করা ছাড়া আর-কোনো উদ্দেশ্য নেই, অথচ যে নিজেকে ঠিক জানেই না এখনো—শুধু অপরিণত নয়, পরিণতির যোগ্য, অপরিণামদর্শী। যা-কিছু বয়স্ক, আত্মচেতন, শৃঙ্খলাবদ্ধ, তার যেন স্থান নেই এখানে, যা-কিছু দায়িত্বের ভারে মন্থর এবং মূল্যবান সব যেন অবান্তর; দেয়াল এখনো গৌণ, আশ্রয় ছাড়িয়ে আকাশের অনিশ্চয়তাই বিস্তীর্ণ, মানুষ এখনো সমর্থ এবং অভ্যস্ত হ'য়ে উঠে পরিবেশের প্রভুত্বপ্রয়াসে নামেনি।

পাড়াটা মনে-প্রাণে তরুণ, এই হ'লো কথাটা। আর তাই এই অলৌকিক সকাল, উত্তরায়ণে প্রগতিশীল যুবা সূর্যের এই অমূল্য উপঢৌকন, দিনের বৃন্তের উপরে কম্পমান অচিরস্থায়ী এই সকালবেলাটি—সে যেন তার দেবশৈশব নগ্নতা, তার স্বচ্ছ স্বাধীন অপরূপ সৌন্দর্য, সমস্ত উন্মোচিত ক'রে এখানে দাঁড়িয়েছে। আলো, আনন্দ, উৎসাহ, অনুপ্রাণনা—শুধু যে বাইরে খোলা মাঠে আকাশের তলায় তরঙ্গ তুলছে তা নয়, দেয়ালের সীমার মধ্যেও নিশ্বাস ছড়ালো তার, আলোর নিশ্বাস, সূর্যের উজ্জীবনী সত্তাসার। পুরানা পল্টনে ঘর বলতে যে-ক-টি আছে তার মধ্যে এমন নেই যেখানে আজ সকালবেলার সোনার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা পায়নি। বিশেষত একটি ঘরে—ছোটো একটি একতলা বাড়ির সিঁড়ি উঠে প্রথম ঘরটিতে—সেখানে যেন ঘর আর নেই, এমন বান ডেকেছে আলোর, এমন অবিরল অথচ মৃদুমন্দ হাওয়া, আর এমন উন্মুক্ত আলিঙ্গন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আকাশের। ঘরটি ছোটো, তার উপর চার-পাঁচটা, জানলা-দরজা এমনতর বেপরদারকম খোলা যে বাইরে থেকে কেউ এলে হয়তো মনে হবে সে বাইরেই আছে এখনো—ঠিক তাও নয়, বাইরেটাকে ঠিক উপলব্ধি করবে এখানেই, কেননা ঐ একটু দেয়ালের বাধায় অসীম যেন সীমার মধ্যে গ্রাহ্য হয়েছে, অর্থ পেয়েছে, পেয়েছে স্পষ্টতা, যাথার্থ্য, সুষমা, রূপ—মনে হবে আকাশ যেন সহনীয় হ'য়ে, বিশ্বাসযোগ্য হ'য়ে নেমে এসেছে ঘরের মধ্যে, যেন এই সকালবেলার বলতে-না-পারা ব্যাকুলতা হঠাৎ এই ঘরের মধ্যে গুনগুন গান হ'য়ে উঠলো। সত্যি সে শুনবে—যদি কেউ এখন এই ঘরে আসে—শুনবে মৃদু স্বরের গুনগুনানি, মৃদু, অপরিস্ফুট, কিন্তু আবেগময়, আবেগের ছন্দে বাঁধা;—সত্যি শুনবে ছন্দ যদি মন দিয়ে শোনে, বিদেশী ভাষায় কোনো-এক আনন্দে ভরা বেদনার সুর, স্বপ্নে-পাওয়া কথা, কবিতা। কবিতা—অনির্বচনীয়কে ব্যক্ত করার এই মায়াজাল, এই হৃদয়গ্রাহী ছলনা, তাতে—ঠিক তাতেই—ধ্বনি পেয়েছে অপরূপ সকালবেলাটি, বাণী পেয়েছে নিঃশব্দ নীলিমা। ঐ সকালবেলার আলোর খেলা-ঘরে ইংরেজি কবিতা পড়ছে একলা ব'সে একজন যুবক।

যুবক? সদ্য যুবক, কিশোর, কিশোরের চেয়ে যুবক বেশি, সমবয়সির তুলনায় যুবক বেশি। শৈশবে যে তার শ্রী ছিলো না, স্বাস্থ্য ছিলো না, কৈশোরের প্রথম আঘাতেই শরীরে যে তার গচ্ছিত গোপন লাবণ্য ফুটেছিলো, বয়ঃসন্ধির সংকটকালে সে যে যন্ত্রণায় ম'রে গিয়েছিলো প্রায়, আবার সেই জন্মান্তর সাধিত হওয়া মাত্র সে যে স্বচ্ছন্দে অধিকার করেছিলো তার রাজত্ব, তার যৌবরাজ্য—এই পৃথিবী—আর এখন সে যে যৌবনের আবেগে, জীবনের আবেগে কম্পমান, অসংখ্য তীব্র অনুভূতির আকাশপাতাল উথালপাথালে অবিরাম অস্থির—এ সমস্তই লেখা আছে তার মুখে, যার দৃষ্টি আছে তার জন্য পরিষ্কার লেখা আছে। তেমন ক'রে তার দিকে তাকালে

বোঝা যাবে যে জন্ম থেকেই যৌবনের জন্ম সাধনা করেছে তার দেহমন, যে ছোটো ছেলে হ'য়ে বেঁচে থাকতে সত্যি তার ভালো লাগেনি কখনো, শৈশবস্মৃতির কিছুই এখন মূল্য নেই তার কাছে—শৈশবটা বলতে গেলে অবান্তর তার জীবনে—কখনো নিশ্বাস ফেলে না বালগোপাল ছেলেবেলার জন্ম, ঐ অপরিহার্য বছর ক-টা কাটিয়ে উঠে সে বেঁচেছে, সত্যি বেঁচেছে, বাঁচতে সত্যি শুরু করেছে ডুবতে-ডুবতে কৈশোরের ঘূর্নি পেরিয়ে যৌবনের তীরে পা দেবার পর থেকে। ঠিক যে এখনো শক্ত পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে তা নয়, কিন্তু ভঙ্গি খুব সহজ, যেন আঙুল-তোলা আদেশের ভাব, কেননা এটা বুঝেছে যে সে পৌঁচেছে, পৌঁচে গেছে, এখন এই পৃথিবী তাকে কিছুই না-দিয়ে পারবে না, শুধু সে ইচ্ছে করলেই যৌবনের বন্ধুদূত জীবনের যে-কোনো দরজা খুলে দেবে তার জন্ম; তার ঈষৎ ফোলা-ফোলা নীলচেমতো চোখের পাতায়, তার ঠোঁটের সবল অথচ সুকুমার ভোগেচ্ছু ভঙ্গিতে, এই কথাই যেন লেখা আছে যে যৌবনের আবিষ্কারে কখনোই সে ক্ষান্ত হবে না, ক্লান্ত হবে না—যেন সে সেই দুঃখে-দাগানো শান্তিহীন মানুষদেরই একজন হ'য়ে জন্মেছে যারা যৌবনের অচিরস্থায়িতায় বিশ্বাস করে না। এই যুবক, সে যে উত্তরকালে জীর্ণ দেহেও বুড়ো হ'তে চাইবে না, আপত্তি করবে, অস্বীকার করবে, তথ্যটাকে উড়িয়ে দেবে রীতিমতো, এবং খুব সম্ভব সে এত বড়োই দুর্ভাগা যে বুড়ো হ'তে সত্যি কখনো পারবেও না—হয়তো এই কথাও ধরা পড়বে যদি তেমন দ্রষ্টা কেউ লক্ষ্য কর[ে] এখন তার মুখের দিকে।

সুশ্রী মুখ। ঠিক মনোহর না হোক, প্রীতিসঞ্চারী। গাল দুটি ঈষৎ ভেঙেছে, বালোচিত পেলব স্ফীতিটুকু ঝরিয়ে দিয়েছে সময়মতো—কিংবা হয়তো ঠিক সময়ের একটুখানি আগেই—কিন্তু বালকে[র] শ্যামলিমা—দৈবাৎ যারা ধবধবে ফর্শা হ'য়ে না জন্মায় সেই সব বাঙালি বালকের তরুণ গাছপালার মতো শ্যামলিমা—কোনো যাত্রা[র] দলের বিড়ি-ফোঁকা কৃষ্ণের মুখে যার বিস্ময়কর পরম প্রকাশ হঠা[ৎ] কখনো নিশ্বাস কেড়ে নেয় আমাদের—সেই শ্যামলিমার আভ[া] মোছেনি মুখ থেকে, কেননা—একটু তাকালেই বোঝা যায়—মুখখানায় ক্ষৌরকর্মের প্রয়োজন যদিও ঘটেছে, সেটা কৈশোরে[র] চিহ্ননাশক নিত্যকর্মে পরিণত হ'তে দু-এক বছর দেরি আছে এখনো;—বয়স তার আঠারোর বেশি না, বড়ো জোর সবেমাত্র উনিশ। এখন, এই আনমনা কিংবা একমনা মুহূর্তে, যখন [সে] কবিতা ছাড়া কিছু ভাবছে না—কিংবা কিছুই ভাবছে না, শু[ধু] ছন্দের নেশায়, ধ্বনির আনন্দে ভরপুর হ'য়ে আছে—এখন তার বয়সের লক্ষণ, হয়তো তার স্বভাবেরও লক্ষণ, স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার মুখে: মুখের ভাবটি নিষ্পাপ, স্বার্থপর, কূটচক্রী; সরল, পবিত্র, অথচ স্পষ্ট, উচ্ছিষ্ট, হঠকারী, যেন অবিচারে অপ্রতিরোধ্য তা[র] প্রবণতা, যেন, এমনকি, নড়তে-থাকা ভোগেচ্ছু ঠোঁট দুটিতে কোথা[য়]

যেন, কখন যেন, নিষ্ঠুর। আত্মবিরোধী মুখ, সৌষম্যহীন, হঠাৎ বাধা পেয়েছে থুতনিতে এসে—ছোটো থুতনি, বেসুরো, ছন্দোপাতক, ছোট একটি মেয়েলি টোলের আভাসমাত্র ফুটিয়ে যেন ফাঁকি দিয়েছে তাকে, ধরিয়ে দিয়েছে তার মৌল ছেলেমানুষি, তার দুর্বলতা, অনতিক্রম্য অসহায়তা—আবার সেই সঙ্গেই এঁকে দিয়েছে যেন অনাক্রমণীয় আভিজাত্যের টীকা তার কপালের গর্বিত নীল শিরায়, এঁকে দিয়েছে উন্নত নাকের ঋজু-নেমে-আসা রেখায় ত্যাগের, দুঃখের, পরিশ্রমের, আত্মপীড়নের প্রতিজ্ঞা। সুন্দর মুখ, কিন্তু গূঢ় কোনো পোকায়-ধরা সুন্দর; অনম্য নিয়মের, অমিত স্বেচ্ছাচারিতার মুখ; সংযমের, প্রশ্রয়ের, বীরের, পলায়নপন্থীর মুখ; অর্জুনের মুখ, অন্তান্যরকম সৌভাগ্যভাগী কৃষ্ণসখার;—কবির মুখ, সত্যি বলতে—শিল্পীর মুখ।

এই যুবক, তরুণ, কবিতায় আর তরুণতায় বিহ্বল এই মানুষ—কবি, কবিকিশোর—সে যে ব'সে-ব'সে গুনগুন করছে কবিতা, এর চেয়ে স্বাভাবিক—যখন পৃথিবীতে যেন স্তব্ধতা আর উজ্জ্বলতা ছাড়া কিছু নেই, তখন এর চেয়ে সুসংগত আর কি কিছু হ'তে পারে? যে-কবিতা তার মনে পড়েছে আজ, স্বতই উঠে এসেছে মুখে, তাও ঠিক শোভন, সমঞ্জস—বলা যেতে পারে যথোচিত, মাপ্ত—তাও ঠিক মিলে গেছে আশে-পাশের সমস্ত-কিছুর সঙ্গে, যেন গ'লে যাচ্ছে—মুখ থেকে বেরোনোমাত্র গ'লে যাচ্ছে হাওয়ায়, সোনালি-সবুজ সুন্দর ভঙ্গুর এই বৈশাখের সকালবেলায়। এই বাংলায়, বাংলার মাতাল-ক'রে-দেয়া বৈশাখী উত্তাপে, কোনো-এক সম্ভবপর কবির মুখে নিঃসৃত হচ্ছে সুইনবর্ন—সুইনবর্ন, কবিদের মধ্যে সেই দানবিক ছেলেমানুষ; চিরকিশোর, চিরকুমার, কামাতুর—কৌমার্যের অক্ষম কামোন্মদনায় হিংস্র; শুধু সাহিত্যের সংরাগ ঢেলে প্রেমের জ্বালা জুড়োবার ব্যর্থতায় যে আরক্তিম, রক্তাক্ত; ধ্বনিময় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভিত্তিহীন প্রাসাদের কারুশিল্পী; প্রগল্ভ কবি, অর্থহীন, অসংবৃত; স্বতোচ্ছ্বাসিত, আত্মময়, কৃত্রিম;—মোহাচ্ছন্ন এবং মোহজাতক, শুধুই মোহজাতক—ছেলেমানুষ। টেবিলের উপর খোলা আছে এই কবির কাব্য—আর তার পাশেই, যেন এই কবিতার সমস্ত তিক্ত মাধুরীকে মূর্ত ক'রে, এই উন্নয়মান সূর্যের বন্যাকে সংহত, সুস্মিত এবং ইন্দ্রিয়লোভন ক'রে, প'ড়ে আছে শাদা পাথরের থালায় কয়েকটি রোদ্দুর রঙের চাঁপা, মাংসল, উদ্ধত, পীন, রূপে নির্লজ্জ, স্পর্শে নির্ভয়, রৌদ্রের নিবিড়চুম্বিত ঘ্রাণভাণ্ডার। কিন্তু চাঁপার গন্ধের স্বতন্ত্র কোনো চেতনা নেই যুবকটির—অন্তত তা-ই মনে হয় তার হাতের অসতর্ক ভঙ্গি দেখে, যে-হাতে একটি ফুল তুলে সে তখনই আবার ফেলে দিলো—বইয়ের দিকেও চোখ নেই তার, তাকিয়ে আছে বাইরে, চেয়ারের পিঠে মাথা ঠেকিয়ে, যে-ভাবে মানুষ শরীরটাকে নিষ্ক্রিয় রেখে ভিতরে-ভিতরে মনের তাপে জ্বলতে থাকে, সেই রকম এলিয়ে-থাকা অলস জীবন্ত ভঙ্গিতে। মাথা ভরা লম্বা ঘন চুল তার, একটু কোঁকড়া, বেসামাল, একটি গুছি এইমাত্র লুটিয়ে পড়লো কানের কাছে, সেইটি সে এক আঙুলে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে জড়াতে লাগলো, আর বলতে লাগলো গুনগুন ক'রে সেই কথা, যে-কথা বলতে চুম্বনের মতো আনন্দ ছড়ায় তার শরীরে:

"There lived a singer in France of old
By the tideless dolorous midland sea,
In a land of sand and ruin and gold
There shone one woman—and none but she."

আবার বললো থেমে-থেমে, যেন রসনার সমস্ত আস্বাদ দিয়ে প্রত্যেকটি শব্দকে আপ্লুত ক'রে-ক'রে আবার বললো, 'In a land of sand and ruin and gold'। নিশ্বাস পড়লো তার, নিশ্বাসের সুরে বললো, 'কী সুন্দর! কী সুন্দর!' কিন্তু ব'লে কী হবে, সুন্দরের কি কোনো ভাষা আছে? যে নিজেই পূর্ণপ্রকাশিত তাকে আবার প্রকাশ করবে কে? কিন্তু তবু—কত ভাগ্যে ভাষা আছে, ধ্বনি আছে, আছে বাণী—কবিতা—নয়তো এই বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য কেমন ক'রে সহ্য করতো মানুষ? কত ভাগ্যে তার জন্য সাজানো আছে—তার হাতের কাছেই, এমনকি তার মনেরই মধ্যে সাজানো আছে সুইনবর্নের স্তবকের পর স্তবক, নয়তো আজ ঘুম থেকে উঠেই চারদিক থেকে এই সুন্দরের আঘাত, এই আক্রমণ, প্রত্যক্ষ অত্যাচার—সে-ই বা সহ্য করতো কেমন ক'রে? মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলো সে, যেন প্রত্যক্ষের দখল ছাড়াতে, যেন সুখভোগের ক্ষণিক বিলাসী ক্লান্তিতে, কিন্তু হঠাৎ চাঁপার গন্ধ যেন লুকিয়ে-থাকা বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লো তার উপর, আহত হরিণের মতো কেঁপে উঠলো সে, তারপর চোখ মেলে, যেন সমস্ত দৃষ্টিকে বাইরের গভীরতায় প্লাবিত ক'রে দিয়ে, আবার মৃদুস্বরে আরম্ভ করলো:

'Wilt you yet take all, Galilean?
but these thou shalt not take,
The laurel, the palms and the paean,
the breasts of the nymphs in the brake;
Breasts more soft than a dove's—'

হঠাৎ বাধা পড়লো কবিতার আবৃত্তিতে; ব'লে উঠলো, 'আরে!' ঐ বটগাছের কাছে, ম্যানিসিপালিটির শাদা ধুলোর রাস্তা যেখানে বেঁকেছে, সেখানে একটি ঘোড়ার গাড়ি এইমাত্র মোড় নিলো।

২

পুরানা পল্টনে ঘোড়ার গাড়ির আবির্ভাব উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কালে-ভদ্রে দু-একটি আসে; আর আসে যখন, প্রায় আগে থেকেই ব'লে দেয়া যায় ঐ অল্প ক-টি বাড়ির মধ্যে কোনটি তার গন্তব্য। যদি পিচের রাস্তা ছেড়ে ডাইনে বেঁকে একটু পরেই আবার বাঁয়ে ফেরে, তাহ'লে অবশ্য বুঝতে হবে যে বকুলবাটিকায় বেড়াতে এলেন ঈশানবাবুর মোগলটুলির আত্মীয়রা। আর যদি সোজা চ'লে যায়, যদি বটগাছ পেরিয়েও এগিয়ে চলে, তাহ'লে কমলেশবাবুর বাড়ির সামনেই থামতে হবে—যদি-না—তাও হয় ক্বচিৎ কখনো—নয়নেন্দুর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন সুদূর ফরিদাবাদ থেকে তাঁর ভাগনি-জামাই। কিন্তু বটগাছ থেকে যে-গাড়ি বাঁয়ে ফেরে, সেটি—হয় সেটি যাচ্ছে ঐ যেখানে নতুন বাড়ি উঠছে সেখানে—যার ছাদ-পেটানো গানের সুর দুপুরগুলিকে উতল ক'রে দেয় আজকাল—আর নয়তো সেটি দাঁড়ায় সেই একতলাটির সামনেই, যার জানলা-খোলা ঘরে এক জন সদ্যযুবকের পড়া আওড়ানো হঠাৎ এইমাত্র থেমে গেলো।

চেয়ারে সোজা হ'য়ে বসলো সে, ভালো ক'রে গাড়িটার দিকে তাকালো। বাড়ি কদ্দূর উঠলো, তা-ই দেখতে মহিলাগণ আসছেন? কিন্তু কেন এ-সব অনর্থক প্রশ্ন, কেন আর নিজের মনে লুকোচুরি? সে তো জানে, গাড়িটায় প্রথম বার চোখ পড়ামাত্র সে তো জেনেছে, তার চোখে পড়েছে—গাড়ি যখন মোড় নিচ্ছে ঠিক তখনই চকিত নিশ্চিত একটিমাত্র মুহূর্তেই সে দেখে নিয়েছে এক টুকরো নীল, নীলের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আভা, হাঁটুর উপর শাড়ির ভাঁজের মিলিয়ে-যাওয়া নির্ভুল নীলিমা—আর তারপর তার দ্রুত-হওয়া হৃৎপিণ্ড অন্য সব কথা তাকে ব'লে দিয়েছে। নীল, আকাশ-নীল, হালকা-নীল, জ্যোছনা-নীল, স্বপ্ন-নীল। চিত্রা পরে ব'লেই ঐ রং তার ভালো লাগে? না কি তার ভালো লাগে ব'লেই চিত্রা পরে? কী জানি, এখন আর মনে পড়ে না। আর কী-বা এসে যায় তাতে—যা-ই হোক আর না-ই হোক। চিত্রা যা করে তা-ই তার ভালো লাগে; তার যা ভালো লাগে তা-ই করে চিত্রা। ও-দুয়ে তফাৎ নেই আর; মিশে গেছে, এক হ'য়ে গেছে। এখন, গাড়ি এগিয়ে আসতে, আরো স্পষ্ট হ'লো শাড়ির রং, কিন্তু আড়ালে-থাকা দর্শকের চোখ দূরে চ'লে গেলো গাড়ি ছাড়িয়ে, অথচ দৃষ্টিপথে সেটাকে রেখে, যেন এই অভ্যর্থনার তুমুল সময়ে, হৃৎপিণ্ডের উত্তরোল ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে, খুব বেশি দেখে ফেলতে সে চায় না, বড্ড বেশি দেখে ফেলতে তার ভয়। ভালোই যে এটা পালকি-গাড়ি, জানলা নেই, আরোহীদের মুখ দেখা যায় না; দরজার ফাঁক দিয়ে একটু মাত্র আভাস শুধু উন্মোচিত, শুধু একটু নির্বস্তুক নীল, হাঁটুর ভাবলেশহীন অথচ কত অর্থভরা ভঙ্গিটুকু! গাড়ি কাছে এলো, চাকা থামার শব্দ শোনা গেলো, হয়তো ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়েও তাকালো কেউ—অন্য কেউ; কিন্তু যুবকটি আর তাকালো না, উঠে গেলো না, উঠলো না চেয়ার ছেড়ে, ঠিক একই ভাবে ব'সে থাকলো প্রতীক্ষায় বাণবিদ্ধ হ'য়ে, রুদ্ধশ্বাস।

বেশিক্ষণ না, সেই স্তব্ধতার, নিঃসাড়তার, উত্তেজনার কয়েকটি মুহূর্ত। ফটক খোলার ছোট্ট আওয়াজ পাওয়া গেলো, পায়ের শব্দ সিঁড়িতে—এমনকি—তীব্রমধুর যন্ত্রণাদায়ক মুখবন্ধ!—হালকা একটু হাসি। একটু পরে অভ্যাগতরা ঘরে এলেন। প্রথমে এলেন প্রৌঢ়া একজন মহিলা, তাঁর পিছনে—দেখেই বোঝা যায়—তাঁর দুই মেয়ে, আর সবার পিছনে, অন্যদের একটু পরে, বছর পনেরোর একটি ছেলে, যে তার বয়স ছাড়িয়ে হঠাৎ অনেকটা লম্বা হ'য়ে গেছে ব'লে, এবং অন্ততপক্ষে পুরুষ ব'লে, মা-বোনের এস্কর্টের পদ অপ্রয়োজনেও পেয়ে গেছে। মেয়ে দুটির মধ্যে ছোটোটির বয়স বছর বারো, ফুটফুটে দেখতে, ফ্রক পরনে—কিন্তু শিগগিরই তার আর ফ্রক পরা চলবে না। বড়ো বোনের কুড়ি-একুশ বয়স। নীল যার পরনে এ সেই মেয়ে, ফিকে নীল শাড়ি প'রে দরজার ধারে দাঁড়িয়েছে, চোখ দুটিতে হাসির আভাস অথচ যেন হাসিও নয়, হাতের বই দুটি কোলের কাছে আলতো ক'রে ধরা। একবার সে তাকালো যুবকটির দিকে—যে অতিথি দেখে, মহিলা দেখে উঠে দাঁড়াবার সৌজন্যটুকুও রক্ষা করলো না—তারপর একটু তাড়াতাড়ি কাছে এসে বললো—বললো কোনো তুচ্ছ কথা, প্রতিদিনের সাধারণ কোনো কথা—হয়তো শুধু, 'বই দুটো রাখো', কিংবা নিজেই ও-দুটো টেবিলে রেখে চ'লে যেতে-যেতে বললো, 'মাসিমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।'—কিন্তু কী বললো তাতে কি এসে যায় না; কোনো কথাই শুনলো না যুবকটি, শুধু শুনলে গলার আওয়াজ, স্বর—সেই অশরীরী বিশুদ্ধ সত্তা, নীলিমা তরঙ্গকম্পন। মিলিয়ে গেলো শব্দের রেশ, মেয়েটি চ'লে গেলে বাড়ির ভিতরে, অন্যেরাও গেলো, আবার যুবকটি একলা।

—কিন্তু এ-রকম, এ-রকম তার আগে কখনো লাগেনি এত সে ভালোবাসে চিত্রাকে! ঘরে এলো, একটু দাঁড়ালো, এক কথা ব'লে চ'লে গেলো—আর তাতেই, শুধু এইটুকুতেই সার শরীরে এ কী আবেশ তার, চেতনার নিস্পন্দতা যেন, আবা হৃদয়ের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আনন্দের, জীবনানন্দের, বর্বর বাঁশির মত্ত নিঃস্বন! কখনো ভাবেনি এ-রকম হবে; একটু আগেও, ওদে আসতে দেখেও ভাবতে পারেনি কেমন লাগবে সত্যি যখন চো দেখবে তাকে—প্রায় প্রত্যহ যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাকে দেখে হঠাৎ তার স্নায়ুতন্ত্রে ছিলার মতো টান পড়বে কে জানতো— জানতো এমন উন্মাদের মতো স্পন্দিত হবার শক্তি রাখে তা হৃৎপিণ্ড, এমন বেগে রক্ত ছড়াতে পারে শুধু তার শরীরে ন তার জীবনে, তার ভবিষ্যতে, তার সারসত্তায়, কবিতায়—য কবিতা এখনো সে লেখেনি কিন্তু লিখবে, যা তাকে লিখতেই হবে যার ঋণে ইতিমধ্যেই তার জীবনসুদ্ধ বিকিয়ে গেছে, সেই স আশ্চর্য, চিন্তামাত্রে চমৎকারী কবিতায়। নিজের প্রণয়ের প্রতিভা

উপরওয়ালা—তুমি ধোঁওয়া বন্ধ করবে কি না?
নীচেওয়ালা—সময় নেই অসময় নেই রেডিওর চীৎকার বন্ধ করবে কি

নিজেই অবাক হ'য়ে গেলো সে, স্তম্ভিত, মুহ্যমান—যেন নিজের সম্ভবপরতার বিপুলতার সামনে নিজেই একেবারে নিঃশেষ বিনয়ে বিচূর্ণ হ'য়ে গেলো।

চাঁপার ধারালো গন্ধ আঘাত করলো তাকে, রৌদ্র-জ্বলা নীল হাওয়া ঝলমল করলো চোখের সামনে। কিন্তু স্বতন্ত্র কোনো আহ্বানে আর সাড়া দিতে পারলো না সে; অন্য কিছু ভাবতে পারলো না চিত্রাকে ছাড়া, কিংবা চিত্রাকে দেখে হঠাৎ তার অস্তিত্বের এই উন্নয়নের রহস্য ছাড়া;—কিংবা, সত্যি বলতে, কোনো কিছুই ভাবতে পারলো না, শুধু সেই রহস্যবোধের দিগন্ত-প্লাবনে মগ্ন হ'য়ে ব'সে থাকলো। আর, একটু পরে, চিত্রা যখন ফিরে এলো, তার নীল শাড়ির সমস্ত সুকোমল সৌজন্য নিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়ালো, তখন সে কিছু বললো না, কোনো কথাই বলতে পারলো না এই মেয়েকে, যে তার অত্যন্ত চেনা হ'য়েও কত দূরে স'রে গেছে এখন, সুদূরের সমুদ্রপারে দাঁড়িয়ে আছে।

চিত্রা তার দিকে তাকিয়ে থাকলো একটু; যেখানে একটি চুলের গুছি কানের কাছে কোঁকড়া হ'য়ে নেমেছে সেই দিকে তাকালো, তার ভারি, নীলচে, এখন প্রায় চোখ ঢেকে নেমে-আসা চোখের পাতার দিকে তাকালো। হাসি আরো স্পষ্ট হ'লো মেয়েটির চোখে, কিন্তু ঠোঁট পর্যন্ত ছড়ালো না, চোখ থেকেই মিলিয়ে গেলো চোখের কোণের প্রচ্ছন্ন কোনো বিষাদের ছায়ায়। ঠিক তখনই চোখ তুললো যুবকটি; চোখোচোখি হ'লো দু-জনের। চিত্রা বললো, 'কী? মৌলি?' স্নেহ ফুটলো কথাটায়, প্রায় আদর, অন্তরঙ্গতার অভ্যাসের আরাম—আবার সেই সঙ্গে যেন আহ্বান, যুদ্ধে আহ্বান, আর ঈষৎ, অতি মৃদু, সতর্ক একটু ঠাট্টার সুর। দেখা হ'লে এই কি তাদের প্রথাসিদ্ধ সম্ভাষণ? না কি চিত্রা আজই প্রথম বললো, বিশেষ কোনো অর্থ দিয়েই বললো? যা-ই হোক, কথাটা কিছু নয়, এমন কিছু নয়, এমন কোনো প্রশ্ন নয় যার উত্তর চাই। উত্তর আশাও করেনি চিত্রা, কেননা ব'লেই সে চোখ ফেরালো, চোখ ফেললো টেবিলের উপর পাতা-খোলা বইটাতে, তারপর হাত বাড়িয়ে—সরু সোনার রুলি-পরা হাত বাড়িয়ে টেবিলের পাশের আরাম-চেয়ারটা একটু বেঁকিয়ে কাছে টেনে এমন ভাবে বসলো যাতে সন্দেহ থাকলো না যে এই ঘরের পরিবেশে তার বাড়ির মতোই স্বাচ্ছন্দ্য।

'সুইনবর্ন পড়ছিলে?'

'না। ঠিক পড়ছিলাম না।' মৌলি এটুকু ব'লেই থামলো।

'একটু পড়ো না শুনি।'

সত্যি কি চিত্রা মৌলির মুখে কবিতা শুনতে চায়, না কি এটা তার ঢিল ছোড়া, বঁড়শি ফেলা শুধু—যে-কোনো একটা ছুতো ক'রে মৌলিকে ধ'রে ফেলার চেষ্টা? মৌলির এই ভাব, মুখের উপর ছেয়ে-নামা এই ভাব, যখন তার চোখের পাতা ভারি হ'য়ে চোখ দুটিকে প্রায় ঢেকে দেয়, যখন হাসি থামে, ফুর্তি থাকে না, যখন যৌবনের চলোর্মিস্রোত হঠাৎ যেন থেমে যায় দূরকালের গ্লেসিয়ারের স্পর্শ পেয়ে—মৌলির এই ভাবটির সঙ্গে ভালোই চেনা আছে চিত্রার। তখন তার একা থাকাই ভালো—কিংবা হয়তো আরো ভালো চিত্রাকে যদি কাছে পায়—কেননা চিত্রাই পারে পাখির মতো ঠুকরে-ঠুকরে তাকে উত্ত্যক্ত ক'রে সান্ত্বনা দিতে—হয়তো তখনই সবচেয়ে তার চিত্রাকে চাই—অন্তত, যতক্ষণ এই সময়টুকু আছে, সে কথা ভেবে চিত্রা যদি রোমাঞ্চ পায় তো ক্ষতি কী।

'পড়বে?'

'না।' সুইনবর্ন বন্ধ ক'রে ঠেলে রাখলো মৌলি, চিত্রার ফেরৎ-আনা বই দুটো দু-আঙুলে নাড়লো একবার।

'বই দুটো পড়লাম,' এই সুযোগটুকু ছাড়লো না চিত্রা। 'ভালো বুঝলাম না।'

'বোঝবার আর কী আছে।'

'সত্যি বলতে, এই এম. এ. পরীক্ষাটাই সমুদ্রের মতো লাগছে এখন।'

'কিছু না; ছেলেখেলা।'

'তোমার কাছে ছেলেখেলা, মৌলি, কিন্তু আমার—'

'ও-সব বোলো না। চুপ করো।'

যে-রকম ক'রে কথাটা বললো মৌলি, ঐ 'চুপ করো'-টা যে-রকম নিচু গলায় অথচ তীব্র সুরে বেরিয়ে এলো, আর বলবার সময় তার কপালের রাজদণ্ডের মতো শিরা যে-রকম ক'রে ফুলে উঠলো একটু, তাতে চিত্রা অবাক না-হ'য়ে—মৌলিকে এত ভালো চিনেও অবাক না-হ'য়ে পারলো না। একটু তাকিয়ে থেকে বললো, 'আজ কি কথা বলবে না? কী হয়েছে তোমার?'

কী হয়েছে? কী হয়েছে তা কি মৌলি বলতে পারে, না কি বলতে গেলে তার কোনো অর্থ হয়? কী হয়নি তার, কী বাকি আছে, কোথায় এতটুকু ফাঁক রেখেছে এই দিন, এই অলৌকিক সকালবেলা? বৈশাখ মাস—গ্রীষ্ম, বসন্তের অসহনীয় সম্পূর্ণতায় বৎসরের যাত্রারম্ভের সময়; যৌবন—যৌবনের অনির্বচনীয় পবিত্র ধূপে আত্মাহুতির অনির্বাণ যজ্ঞধূম; কবিতা—কবিত্ব—না, আর ভুলিয়ে রাখার, ভান ক'রে থাকার সময় নেই; আছে, পেয়েছে, জন্মেছে তা-ই নিয়ে—আর-কেউ এখনো না জানুক সে তো জানে—সে তো জানে তার মনের তলায় কী আছে, কোন খনি, মহাদেশ, সাম্রাজ্য—যা কোনোদিন, যে-কোনো দিন, বিস্ময়ের তরঙ্গ তুলে প্রকাশিত হবে শুধু তার আদেশ, তার অঙ্গুলিহেলনের ইঙ্গিতমাত্র পেলে। আর, যেন এতেও যথেষ্ট হ'লো না, যেন এই বৈশাখের সকালে যুবক হ'য়ে, কবি হ'য়ে, বেঁচে থাকাটাই যথেষ্ট হ'লো না; যেন এই শ্রী, ঋদ্ধি, শক্তি—শক্তির চেতনা—একে সংহত ক'রে, শুদ্ধ ক'রে বাঁধতে হ'লে বেদনার একটি সূত্র চাই—প্রেম এলো, চিত্রা এলো। যে-মুহূর্তে এলো, যে-মুহূর্তে ভালোবাসা তার দেহের মধ্যে আবদ্ধতার দুঃখ নিয়ে কাছে এলো, সে-মুহূর্তে ফুটে উঠলো সমস্ত জীবন, জীবনের সমস্ত সুখ, আনন্দ, সম্ভাবনা একটিমাত্র মুহূর্তের বৃন্তে আকাশ-জোড়া পদ্মের মতো ফুটে উঠলো। এখন আমি একে নিয়ে কী করবো? একে আমি সইতে পারবো কেমন ক'রে?

'অমন ক'রে তাকিয়ে আছো কেন? কী?'

চিত্রাই কথা বললো আবার, একটু ক্ষীণ স্বরে; ব'লেই মুখ নামালো। কোনো মিনারের গম্বুজের মতো উঁচু দেখালো লম্বা ক্ষীণ তনুটির উপর তার পর্যাপ্ত খোঁপা; তার ডিমের ছাঁদের মুখ—ম্লান রঙের—মৌলির ভাষায় বত্তিচেল্লি-মুখ—সেই মুখের পরিষ্কার একটি প্রোফাইল এঁকে দিলো নীল সোনার পটভূমিতে তার

ঠিক পিছনের পুবের জানলা ;—আর হঠাৎ, সে যখন একটু নড়লো—না কি কেঁপে উঠলো ?—তখন সেই রন্ধ্রের বিন্যাসে তার শরীরকেও সাজিয়ে দিলো একটি রোদের রেখা, নীল শাড়ির উপর দিয়ে ছুটে এসে একটি সোনালি তীর বিদ্ধ হ'লো তার বুকের সেই ছোট, নিচু অংশটিতে, ঠিক যার উপর থেকে মেয়েদের দুই স্তনের পৃথক যাত্রা শুরু হয়। যেন দেবতার এই প্রণয়চিহ্নে লজ্জিত হ'য়ে মাথা আরো নিচু হ'লো তার, শরীরের তুলনায় ছোটো মুখটি আরো ছোটো দেখালো, আর—আপাতত কোনো কারণ যদিও নেই—স্পষ্ট একটি লালের কোঁটা রাঙিয়ে দিলো তার পাণ্ডুবর্ণ গাল।

'না, তাকাবো না।' মৌলি মাথা ঝাঁকালো, যেন তাড়িয়ে দিলো ঐ মাথার মধ্যে যা-কিছু তার চলছে এখন। তা-ই হোক তবে—আপাতত তা-ই হোক—এই রমণীয় ছলনা, জীবনের এই সমতলের সৌভাগ্যভূমি, যেটা আছে ব'লে আসলটাকে, কোনো-রকমে সহ্য করা অন্তত সম্ভব হয়। মেনে নেয়া যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেষ্টনে তাদের প্রকাণ্ড জীবন। চেয়ারে একটু এলিয়ে বসলো সে, পা দুটোকে সামনে টান ক'রে দিয়ে বললো, 'বলো। খবর বলো। এম. এ. পরীক্ষা সমুদ্রের মতো লাগছে এখন ?'

নিশ্বাস পড়লো চিত্রার। যেন চেনা গাঙে নাইতে নেমে আঠাই জলে পড়েছিলো হঠাৎ, পায়ের তলায় মাটি পেয়ে নিশ্বাস ফেললো। আস্তে মিলিয়ে গেলো গাল থেকে লালের বিন্দুটি, ঠোঁটে যেন কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটলো। মাথা সোজা করলো সে—আর সঙ্গে-সঙ্গে সোনালি তীর ভগ্নভাবে ঝ'রে পড়লো তার পায়ের কাছে ;—হেসে তাকিয়ে বললো, 'সত্যি তা-ই। কোনোদিকেই কূল দেখতে পাচ্ছি না।'

'এ-সব সাধারণ কথা তুমি বললে আমার অপমান লাগে, চিত্রা।'

'ভুলে যাও কেন, আমিও সাধারণ ?'

'না। সাধারণ কিছুই ভালোবাসি না আমি। আর সত্যি—ভাবতে গেলে—পৃথিবীতে কিছুই তো প্রায় সাধারণ নয়। বাদ দিতে পারো অধিকাংশ লোকসংখ্যা—আর এম. এ. পরীক্ষার মতো দুটো-একটা বাজে বিষয়কে।'

'ও-রকম বলো ব'লেই তো বন্ধুমহলে তোমার বদনাম।'

'কী ব'লে বদনাম ?'

'অসহ্য অহংকারী ব'লে। তোমার অনার্সের ফল বেরোবার পর—মনে আছে ?—তারা তোমাকে প্রশংসা দিতে গিয়েছিলো, তারা তোমার মুখ থেকে ভদ্রগোছের জবাবও কিছু পায়নি।'

'ভালো লাগেনি সেই প্রশংসা। খারাপ লেগেছিলো।'

'যেটা স্বতঃসিদ্ধ সেটা নিয়ে আর কথা কেন—এই তো তোমার মনের ভাবটা ?'

'তাও নয়। কথাটা এই যে এ-সবে আমার কিছু না। এ-সবের মধ্যে আমি নেই। অন্য কাজ আছে আমার।'

'অর্থাৎ—এটা এতই তুচ্ছ যে এ নিয়ে প্রশংসা পেতেও তোমার আপত্তি ?'

'তুচ্ছ—মূল্যবান—এ-সব কথার তুলনা ছাড়া মানে নেই। আমার কাজ অন্য—অন্য কিছু।'

'"অন্য কিছু!" ঐ এক কথা তোমার মুখে। তোমার বন্ধুরা যখন পড়াশুনোর কথা বলে, ফলষ্টাফের চরিত্র নিয়ে তর্ক তোলে, তুলনা করে গ্রীকদের সঙ্গে টমাস হার্ডির, তুমি তখন মাথা ঝেঁকে হেসে বলো, "রাখো ও-সব! অন্য-কিছু বলো!"—তারপর তাদের টেনে নিয়ে যাও আদিত্যের দোকানে, চা-শিঙাড়ার ফরমাশ দাও, আর তারা যখন খেতে-খেতে আড্ডা জমায়, তুমি শুয়ে পড়ো লম্বা হ'য়ে গাছের তলায় আকাশের দিকে তাকিয়ে।—তুমি কি ভাবো এতে তাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে না ?'

'আর কী-কী আমি অন্যায় করি, বলো। শুনি তোমার মুখে।'

'তারপর—তারা কেউ যখন তোমাকে কিছু জিগেস করে, মনে করো সিম্বলিজম-এর অর্থ, কিংবা ধরো ক্লাইভ বেল-এর "ইসথেটিক ইমোশন" বিষয়ে তোমার মত জানতে চায়—কিংবা দেখতে চায় তোমার ক্রিটিসিজম-এর নোটের খাতা—তুমি তাদের বলো, "ও-সব কিছু নেই আমার। আমি কিছু জানি না।" এতে তাদের কেমন লাগে তা বোঝো ?'

'কিন্তু সত্যি যে তা-ই। সত্যি আমার নোটের খাতা কিছু নেই। সত্যি আমি কিছু জানি না।'

'কেউ বিশ্বাস করে না ও-কথা। ভাবে তোমার তুকতাক সব লুকোচ্ছো। ছোটো ভাবে তোমাকে।'

'তা মন্দ কী। কোনো বিদ্যে শিখিনি শুধু ফাঁকি দেবার বিদ্যে ছাড়া—এর কিছু-একটা শাস্তি তো আমার প্রাপ্যই।'

'ফাঁকি ?'

'বিশুদ্ধ ফাঁকি। আমার কাছে যারা পরামর্শ চায় তারা প্রত্যেকে আমার দশ গুণ অন্তত পড়েছে। তাদের কাছে আমি

দাদার ফ্যামিলি আর শালার ফ্যামিলি ধরলে বাড়ীতেই হচ্ছে একশ' তেইশটা এডাল্ট—সত্যি কথা বলতে, এই ভয়সাতেই ইলেক্‌শানে দাঁড়িয়েছিলাম।

হঠাৎ এটা-ওটা শিখে ফেলি কত সময়—খুব কাজে লেগে যায় সে-সব—তারা তা জানে না। কিংবা জানে হয়তো—সন্দেহ করে—আমাকে ধ'রে ফেলতে চায় ব'লেই পিড়াপিড়ি করে ও-রকম। আর মাঝে মাঝে কেমন ধরাও পড়ে যাই ভাখো না?'

'সেদিন বি. কে. পালের ক্লাশের কথা বলছো?'

'শুধু সেদিন কেন, ক্লাশে কোনো কথা উঠলে কোনদিন আমি ঠিক-ঠিক কিছু জবাব দিতে পারি। আমি যে কত কম জানি প্রোফেসররাও তা কি জানেন না ভেবেছো?'

'তা জেনেও তোমার খাতায় যখন দারুণরকম নম্বর তাঁরা বসিয়ে দেন, উদাহরণস্বরূপ প'ড়ে শোনান অন্ত ক্লাশে, তখন কেমন লাগে বলো তো সেই অন্ত ছেলেদের, যারা পড়াশুনো করেছে তোমার দশ গুণ?' বলতে-বলতে চিত্রার মুখে একটি আতপ্ত আভা ছড়িয়ে পড়লো, গর্বের, গৌরবের দীপ্তি, যেন এই সব অসামান্ত কৃতিত্বে তারও কোনো অংশ আছে, দায়িত্ব আছে, যেন, সত্যি বলতে, তারই অলংকার এ-সব, তারই সম্পত্তি। কোমল দেখালো ডিমের ছাঁদের মুখটি, চোখের ভাব স্নিগ্ধ, আর যখন ছোটো মাথাটি ঈষৎ হেলিয়ে মৌলির দিকে তাকালো, তখন সেই দৃষ্টি যেন প্রায় মাতার, প্রায় কোনো ইতালিয়ান ছবির কুমারী মেরী মাতার। 'আর তুমি,' একটু স্বার্থপর খুশির সুরে কথা শেষ করলো চিত্রা, 'তুমিও কিনা তাদের রাগিয়ে দাও শুধু। না, মৌলি, বন্ধুদের সঙ্গে ব্যবহার তুমি ভালো করো না।'

চিত্রার মুখের এই ভাবটি, তাকে নিয়ে চিত্রার যেন আঁচলে-বাঁধা এই গৌরববোধ, এটা মৌলির ভালো লাগে না, রীতিমতো আপত্তিকর লাগে, আবার এতেই কেমন চিত্রার উপর মমতাও তার বেড়ে যায়। একটু হেসে, যেন চিত্রার এই দুর্বলতাকে একটুখানি প্রশ্রয় দিয়ে, কিন্তু অন্ত দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, 'আমার দোষ অনেক। একটিমাত্র গুণ যে বন্ধুরা আমাকে ভালোবাসে।'

'তোমাকে ভালো না-বেসে উপায় আছে, মৌলি!' ব'লে চিত্রা একটু থামলো। দমকা হাওয়া এলো ঘরে, যেন কথাটাকে উড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলো অন্ত জানলা দিয়ে। হাত বাড়িয়ে টেবিলের কাগজে চাপা দিলো চিত্রা, তারপর যেন আগের কথাটাতেই জোর দিয়ে, অথচ তার ওজন কমিয়ে বললো, 'আর তাই তো তোমাকে সহ্য করা এত শক্ত। জানো, তোমার বন্ধুরা তোমাকে ঈর্ষা করে না—ঈর্ষা পর্যন্ত করে না? তোমাকে ঈর্ষা করারও যোগ্যতা ওদের আছে, এ-কথা ভাবতেও পারে না কেউ। আর তুমি—তাদের নিয়ে কী করো তুমি? তাদের কথাবার্তা শোনো, টুকে নাও মনে-মনে, যার কাছে যেটুকু পাবার ঠিক-ঠিক আদায় ক'রে নাও, তারপর —তারা যখন তাদের কোনো দাবী জানায়, ন্যায্য তাদের পাওনা-টুকুই চায় তোমার কাছে, তখন তাদের চায়ের দোকানে বসিয়ে দিয়ে নিজে স'রে আসো একলা হ'য়ে গাছের তলায়। তারা বোঝে—তুমি যে-অন্যায় করো তাদের উপর তা তারা বোঝে—কিন্তু—তবু—তুমি যখন লম্বা চুলে ঝাঁকানি দিয়ে হাসো, তোমার ঐ দু-চোখ ভরা আনন্দ নিয়ে তাদের দিকে তাকাও, তখন তোমাকে ভালো না-বেসেও তারা পারে না। অন্যায়—সমস্তটাই অন্যায়! এই অন্যায়ের কিছু তো প্রতিকার তুমি করতে পারো। চেষ্টা ক'রেও তাদের কিছু কাজে লাগতে কি পারো না?'

কী-কথা এ-সব? প্রণয়ের এ কী গুণ্ঠিত অথচ লজ্জাহীন উচ্ছ্বাস! অন্তদের পক্ষ নিয়ে, বন্ধুদের ছদ্মবেশ প'রে, ভক্তির এ কী কূল-খোয়ানো আত্মনিবেদন! এ-সব কথা কি বন্ধুদের, না কি চিত্রার, চিত্রারই নিজের—এ-সব বলতে, ব'লে ব'লে নিঃশেষে নিজেকে লুটিয়ে দিতে, কিংবা আজ এক নিশ্বাসেই বহুদিনের রুদ্ধ সঞ্চিত ব্যর্থ কামনায় প্রতিশোধ নিতে—এর জন্যই সে কি আজ এসেছে এই বৈশাখের সকালবেলায়? তার কথা শোনার পর একটু স্তব্ধ হ'য়ে থাকলো মৌলি, তার বাঁ হাতের তর্জনীপ্রান্তে আবার জড়ালো একটি চুলের গুছি, যেমন হয় যখনই আনমনে কিছু ভাবে সে। একটু পরে চুল ছেড়ে দিয়ে বললো, 'পারলে আমি তোমারই তো কাজে লাগতাম। পড়িয়ে দিতাম তোমাকে।'

'থাক। অনেক শিখেছি তোমার কাছে। পাঠ্য পড়াটা বাদ দাও।'

মুখ উঁচু করলো মৌলি, ঘাড়ের উপরে করোটির হাড় যেখানে আরম্ভ হয়েছে সেখানটা ঠেকিয়ে দিলো চেয়ারের কাঠে। নরম আওয়াজে হেসে উঠে বললো, ঠিক বলেছো, চিত্রা। তা কথাটা কী জানো—ঐ যে তুমি চেষ্টা করতে বললে না?—কিন্তু চেষ্টা ক'রে কিছুই পারি না আমি—চেষ্টাই করতে পারি না—যা-কিছু আমি ক'রে ফেলি সব নিজে-নিজেই হ'য়ে যায়, কেমন ক'রে হয় আমি বুঝি না। আর যা-ই করি, মাষ্টারি আমি করতে পারবো না কখনো।'

'তুমি কোন দুঃখে মাষ্টারি করবে, মৌলি? শালগ্রাম শিলা কেউ কি শিলনোড়ার কাজে লাগায়?'

'কিন্তু—তুমি ঠিক বলেছো—চেষ্টা আমার করা উচিত, চেষ্টা করতে শেখা উচিত এতদিনে। বন্ধুরা কিছু জিগেস করলে পালিয়ে বেড়াই—লজ্জার কথা বইকি। কিন্তু—কী হয় জানো?' মৌলি একটু থামলো, টেবিলের উপর সুইনবর্নের বইটা হঠাৎ খুলেই বন্ধ করলো আবার। একটু নিচু গলায়, যেন প্রায় আপন মনে বললো, 'এই কবিতা। পড়ছিলাম একটু আগে—না, পড়ছিলাম না, ভাবছিলাম। কবিতা আমি পড়তে পারি না, চিত্রা! তেমন যদি কবিতা হয়, পড়তে পারি না। গলা ধ'রে আসে, বুক ভেঙে আসে যেন, প্রায় কান্না পায়। তাহ'লে কেমন ক'রে বোঝাবো তার মানে কী।'

চিত্রার চোখের মুগ্ধতা মৌলিকে যেন স্পর্শ ক'রে গেলো। অনেক দেখেছি, মৌলি, তোমার মতো কবিতাপাগল আর দেখিনি!'

'পাগল—পাগল না-হ'য়ে উপায় আছে! শব্দে কী মোহ! ভাষায় কী জাদু! ছন্দে কী শক্তি! ধ্বনি—শুধু ধ্বনিতে কী উল্লাস!' মৌলির চোখের পাতা নীলচে হ'য়ে নেমে এলো চোখের উপর, কেমন-যেন সলজ্জ বিস্ময়ের সুরে আস্তে-আস্তে বললো, 'কবিতা যারা পড়ে না তারা কেন বেঁচে থাকে, চিত্রা, আর কেমন ক'রেই বা বেঁচে থাকে!'

ক্ষীণ হাসি ফুটলো চিত্রার ঠোঁটে, যেন বেদনার, যেন করুণার হাসি। যৌবনের, কবিত্বের, কবিকল্পনার মুখের দিকে আর যেন তাকাতে পারলো না সে, চোখ সরিয়ে নিয়ে গুনগুন নরম গলায় বললো, 'কিন্তু তোমার মতো সবাই হ'লে তুমি কেমন ক'রে বাঁচতে, মৌলি?'

পুরো খুলে গেলো মৌলির চোখ, হাসির আওয়াজ ছোট হ'য়ে বেরোলো তার গলা দিয়ে। 'ঠিক ! এখানেও তুমি ঠিক বলেছো, চিত্রা। ঠিক কথা—পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যে কবিতা পড়ে না, সে তো আমাদের ভাগ্য, সৌভাগ্য ! সবাই যদি কবিতা পড়তো তাহ'লে তুমি কি ভেবেছো এই যাকে আমরা সংসার বলি তা ছিন্নভিন্ন ধ্বংস হ'য়ে যেতো না ?'

'তোমার কী মনে হয় ?' হাসির ঝিলিক লাগলো চিত্রার চোখে।

'ঐ ছাখো—তুমি বললে কথাটা, আর এক্ষুনি আমি তোমার কাছেই নিজের ব'লে চালাচ্ছি ! চোর না-হ'য়ে কবি হবার কি উপায় নেই ?' মৌলি হাসলো, যেন শিশুদের মতো সপ্রতিভ সরল কৌতুকে। একটু পরে অন্য সুরে বললো, 'কিন্তু কিসে আমার অবাক লাগে, জানো ? অবাক লাগে তাদের দেখে, যারা কবিতা পড়ে, কিন্তু পাগল হয় না। তারা পাশ করে, তাঁরা পাশ করান, ভালোমানুষ ভদ্রলোক তারা। কবিতা প'ড়ে পাগল তারা হয় না। আঘাত পেয়ে শিউরে ওঠে না তারা—না, থরথর শিউরে ওঠে না কবিতার আঘাতে—বিস্ফোরণে। আমি কি আনতে পারি সেই আঘাত, আমি কি পারি তাদের জ্বালিয়ে দিতে নিজে আমি যেমন জ্বলছি ? এই এটা—এটা ছাড়া চেষ্টার যোগ্য আর কী আছে বলো তো ? কিন্তু পারি না—আমার মধ্যে যা আছে তা দিতে পারি না আমি। সেটা সম্ভব নয়।' শেষের কথাটায় বিষাদের সুর লাগলো, সেই বিষাদের চকিত পূর্বাভাস যেন, যা গুণী কবির গনগনে উনুনে হঠাৎ কখনো শীতের মতো নামে, নিবিয়ে দেয় ভাষা, শব্দ, সুর, বুঝিয়ে দেয় সব কথাই ব্যর্থ, কোনো কথাই বলা যায় না।

বেদনার ব্যাকুলতা ফুটলো চিত্রার মুখে, কথা বলতে গিয়ে কেঁপে উঠলো তার ঠোঁটের কোণ। 'তুমি তো দাও, মৌলি, অজস্র দাও—' তার নিজেরই আগের কথার খণ্ডন করে ব'লে উঠলো সে—'তোমারই মতো ক'রে দাও তুমি—হালকা হাওয়ায় ছড়িয়ে দাও তোমার আগুন। ওরা নিতে পারে না—আমরা নিতে পারি না—যার মধ্যে যা থাকে না সে তা নিতেও পারে না, মৌলি। তাই তো ছাখো, যদিও তোমাকে আমি পেয়েছিলাম—'

'"ছিলাম" কেন ?'

'মানে, পেয়েছি—' একটু ফ্যাকাশে মুখে ব্যাকরণের ভুল শুধরে নিলো চিত্রা,—'তবু তো ছাখো মহেন্দ্রবাবুর কাছে পড়তে যাই মাঝে-মাঝে।'

'জানি সে-কথা', মৌলি একটু বাঁকা ক'রে হাসলো। 'কিন্তু কাল তোমাকে দেখলাম না ?'

'এসোসিয়েশনের মীটিঙে ? যাইনি। ফোলিও-তত্ত্ব কত আর শোনা যায় !'

'ওখানে ভুল করলে। মহেন্দ্রবাবু শেক্সপিয়রটা জানেন। পণ্ডিত লোক।'

ও-কথা কেন বললো মৌলি ? কেন হঠাৎ নামিয়ে দিলো নিজেকে, প্রায় যেন শত্রুপক্ষে চ'লে গেলো ? মনে-মনে অবশ্য, তাদের সব ক-টি অধ্যাপকের মধ্যে, মহেন্দ্রবাবুকেই সবচেয়ে কম পছন্দ করে সে, সত্যি বলতে অবজ্ঞা করে। তথ্যকীট, কমা-জ্ঞানী মহেন্দ্র ঘোষ, অক্ষরের মূর্তিপূজক, সাহিত্যের উৎকুনভুক রসরক্তহীন পতঙ্গ। এই সব কথা, আরো একটু প্রাকৃত ভাষায়, বন্ধুদের কাছে—

চিত্রার কাছেও—কখনো যে সে প্রকাশও করেনি তা নয়। যাকে বলে পাণ্ডিত্য—গবেষণা—সেই সমস্ত ধূসর অধ্যবসায়ী জগৎটাকে সে কেমন-একরকম বিস্ময়ের চোখে ভাখে—অবোধ বিস্ময় যেন—ভাবটা যেন এ-সব আয়ায় এখানে কেন, কী হয় এ-সব দিয়ে? বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য পড়তে এসে ঐ জগতের সঙ্গে না-হ'লেই-নয় সংশ্রবটুকু কোনোরকমে সে রক্ষা ক'রে চলে অবশ্য—বলা যেতে পারে ভদ্রতাটুকু বজায় রাখে—মন যাকে দিতে পারি না তাকে অন্তত কিছু সময় দেবার শিষ্টাচার—কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর ক্লাশে তাও আর সম্ভব হয় না, নীরসতার বিরাট ওজনে মাথা তার নুয়ে আসে, চোখ জড়িয়ে আসে ক্লান্তিতে, প্রায় ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তে যন্ত্রণায় খোঁচা খেয়ে জেগে ওঠে, যখন মহেন্দ্রবাবু তার দিকে তাকিয়ে—পুরু কাচের চশমার ভিতরে বড়ো-বড়ো গোল-দেখানো চোখে ঠিক তার দিকেই তাকিয়ে তাঁর আস্তে-আস্তে চিবিয়ে-বলা কোনো-একটি নিখুঁত বাক্য শেষ করেন। যন্ত্রণা, প্রায় শরীরের যন্ত্রণা মহেন্দ্র ঘোষের মুখে শেক্সপিয়রের পদাবলী শোনা, তাঁর চেষ্টাকৃত চিবিয়ে-বলা নিখুঁত নিষ্প্রাণ উচ্চারণে লাল গরম আগুন-জ্বলা কবিতা শোনা; যন্ত্রণা—শরীরের, আত্মার যন্ত্রণা সেই দৃশ্য দেখা, যখন—হাজার মানুষের সমান জীবন্ত যে-একজন কবি, সেই কবির শব্দব্যবচ্ছেদের কৌশল যখন কৃতজ্ঞ ছাত্রদের সামনে উদ্‌ঘাটন করেন মহেন্দ্র ঘোষ! তাহ'লে এখন—চিত্রার এই অতি মৃদু পরিহাসটুকুর উত্তরে, মৌলিনাথেরই উদ্ভাবিত 'ফোলিও-তত্ত্বে'র উল্লেখের পরে, মৌলি কেন গম্ভীর হ'য়ে ও-কথা বললো, চিত্রাকে প্রায় চপলতার জন্ম শাসন করলো যেন, চ'লে গেলো তার নিজের ইচ্ছার, রুচির, এমনকি স্বভাবের বিরুদ্ধে? এ কি শুধু ছেলেমানষি খামখেয়াল, চমক লাগাবার প্রলোভন? না কি আজ আকাশময় বৈশাখের এই দিনটিকে পেয়ে, চিত্রার নীল শাড়ির উদার স্মৃতিসৌরভে প্লুত হ'য়ে, সবই আজ সহজ হ'য়ে গেছে তার কাছে, মহেন্দ্র ঘোষকে ক্ষমা করাও সহজ হয়েছে? না কি ঐ ক্ষমা তার পক্ষে স্বভাবতই সহজ;—নিকৃষ্টের প্রতি উৎকৃষ্টের যে-সহাস্য সহনশীলতায় কোনো চেষ্টারই প্রয়োজন হয় না, তারই একটা কপট ভঙ্গি শুধু প্রকাশ পেলো ঐ কথায়? না কি তার অগোপন অবজ্ঞায় একটু লুকিয়ে-রাখা চোরা চাউনির ঈর্ষারও মিশোল আছে—না কি মহেন্দ্র ঘোষকে মনে-মনে একটু ঈর্ষাও করে মৌলিনাথ, এমনকি—তাও কি সম্ভব?—অচেতন মনে তাঁরই মতো—তাঁরও মতো—হ'তে চায়, তেমনি আগ্রহ, অনস্থির, তৃপ্ত, উপায়নিপুণ, তথ্যের মজবুত মাটিতে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত? কে জানে, কে বলতে পারে কবি-মনের খবর, কে জানে কেমন ক'রে চলে সেই জটিল প্রচ্ছন্ন যন্ত্র, কত রকম স্বতোবিরোধের বাষ্পচাপে, কত বিচিত্র বিপরীতের প্রয়োজনীয় চক্রচক্রতায়! 'বাঃ, ভাখো তো এঁকে!' এ-রকম কথাও কি মৌলিনাথ কখনো ভাবেনি? মহেন্দ্র ঘোষের ক্লাশে ব'সে, তাঁর অতিযত্নবান উচ্চারণে যন্ত্রণাবিদ্ধ হ'তে-হ'তেও কখনো কি ভাবেনি—'ভাখো তো এঁকে! কেমন আরামে আছেন, কেমন পরিপাটি তৈরি হ'য়ে ক্লাশে আসেন, যে-কোনো প্রশ্নের ঠিক-ঠিক জবাবটি এঁর জিভের ডগায়, আর জুতোজোড়াটি কী চকচকে পরিষ্কার! স্পষ্ট বোঝা যায় পড়াতে এঁর ভালো লাগে, সারা জীবন পড়িয়েই কাটাবেন, ভাবনা কিছু নেই এঁর। আমি কেন এ-রকম হলাম না? আমার কেন কিছু ভালো লাগে না, নয়তো পাগলের মতো ভালো লাগে;—কী আমি বলতে চাই আমি জানি না, কী আমি লিখে ফেলি নিজে বুঝি না;—কেন আমি কাপড়জামার কথা একটুও না-ভেবে চোরকাঁটার ঘাসের উপর শুয়ে থাকি?'—হয়তো এই সবগুলি ভাবই মৌলির কথাটায় ছিলো—অনায়াসের প্রতি অবজ্ঞা, নির্দিষ্টের দিকে আকর্ষণ, অন্যকে দিয়ে নিজের কোনো অভাবের পূরণকামনা, আর সেই সঙ্গে—খুব সম্ভব—ঈর্ষাও ছিলো একটু, বাস্তবের প্রতি ভাবুকতার ঈর্ষা, সাধারণের প্রতি প্রতিভাবানের সূক্ষ্ম গোপন অনুচ্চারণীয় অনির্বাণ ঈর্ষার ঈষত্তম দংশন। তাই হয়তো একটু পরেই সে আবার বললো, 'হ্যাঁ—পণ্ডিত লোক। চোখ-কান মন-প্রাণ প্রভৃতির গোলমেলে বালাই নেই, একেবারেই পণ্ডিত।'

'সব মানুষ এক রকম হয় না, মৌলি।'

'জানি সে-কথা। আমি মহেন্দ্রবাবুর কথা ভাবছি না; আমি তোমার কথা ভাবছি।'

'এতদিনেও কি বোঝোনি যে আমার কিছুই তোমার মতো নয়?

'না, তোমার কিছুই আমার মতো নয়। তুমি মেয়ে, আমি পুরুষ। সেখানেই ব্যবধান, সেখানেই আনন্দ।'

'যে-মেয়ে তোমার যোগ্য তার দেখা কোনো-একদিন তুমি পাবে, মৌলি—হয়তো পাবে।'

'আমার ভাবনা এই যে আমি তোমার যোগ্য হবো কেমন ক'রে। কত আমার অভাব, কত আমি দুর্বল, তা কি আমি নিজের মনে জানি না?'

'কত তোমার শক্তি তা কি তুমি জানতে পেরেছো এখনো?'

'এটা তো জানলাম যে আমি তোমার কাজে লাগি না; তোমাকে মহেন্দ্রবাবুর কাছে পড়তে যেতে হয়।'

'তুমি আবার আলাদা ক'রে কোন কাজে লাগবে, মৌলি!'

'সবই আমার ইচ্ছে করে। মনে হয় সব পারবো তোমার জন্য। পারি না, তা তুমি মেনে নিয়ো না, চিত্রা। আমাকে চেষ্টা শেখাও, কষ্ট শেখাও। মহেন্দ্রবাবুর কাছে আর যেয়ো না তুমি।'

'তুমি বলো তো পরীক্ষাই না দিলাম।'

'তা বলি না। কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর কাছে আর যেয়ো না। আমি বারণ করছি তোমাকে।'

মৌলির এই কথায় কৌতুক ফুটলো না চিত্রার মুখে, বরং আরো গম্ভীর হ'লো, চোখের কোণের লুকোনো বিষাদ হঠাৎ যেন চোখ ছেড়ে নামলো তার, চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকলো—মৌলির দিকে না, খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে, যেখানে বারান্দা পেরিয়ে ঘাসের উঠোন চোখে পড়ে। আর, যেন তারই কোনো গোপন প্রার্থনার উত্তরে, সেই দরজার কাছে বিধবা একজন মহিলাকে দেখা গেলো; তাঁর পরনের থানধুতিটি যেমন ধবধবে শাদা, তেমনি শাদা কাপড়ে ঢাকা চায়ের ট্রে হাতে ক'রে আসছেন। চিত্রা তাঁকে দেখামাত্র উঠলো, এগিয়ে গিয়ে বললো, 'আমাকে দিন, মাসিমা'; ট্রে এনে টিপয়ে নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। মহিলাটি কাছে এসে ঢাকনা তুললেন। ধোঁয়া উঠলো দুধের জগ থেকে, চিকচিক করলো বড়ো দানার চিনি, নধর মোটা শবরি কলা হলদে ছায়া ফেললো উজ্জ্বল শাদা জাপানি পেয়ালায়, আর সেই পেয়ালার গায়ে তারই

সোনালি প্রান্তটুকুর মতো সরু একটি রোদের সুতো ঝিলিক দিলো হঠাৎ, গরম টোষ্ট টাটকা মাখনের সূক্ষ্ম সুস্থ সাত্ত্বিক একটি সুগন্ধ মুহূর্তের জন্য ঘ্রাণগোচর হ'য়েই পরিব্যাপ্ত গ্রীষ্মসৌরভে মিলিয়ে গেলো।

মৌলি একবার দৃষ্টিপাত ক'রে বললো, 'ডিম নেই, মা?'

'না, ডিমওলা কাল আসেনি তো—'

'সকালে আমার ডিম ছাড়া কিছু ভালো লাগে না।'

'রাখুকে পাঠিয়েছি বাজারে—'

'সে আসতে-আসতে আমার কি আর ইচ্ছে থাকবে।'

'কম মিষ্টি দিয়ে নরম সন্দেশ করেছি। খাবি তো?'

'আচ্ছা।'

'এমন অসুবিধে এখানে জিনিসপত্রের—দু-মাইল দূরে বাজার—' মৌলির মা চিত্রার দিকে তাকালেন।

'বাঃ! একদিন ডিম না-হ'লে কী হয়!' বললো চিত্রা। 'কত রকম তো আছে।'

'যার যেমন অভ্যেস তেমনি হ'লে তো ভালো লাগে।'

'না মাসিমা', চিত্রা হাসলো, 'আপনি আদর দিয়ে-দিয়ে ছেলেকে নষ্ট করছেন।'

'নষ্ট করছি বুঝি?' মহিলাটি হাসলেন। 'তা আমার সন্দেশের জন্য ভাবনা নেই চিত্রা থাকতে। বড়োটা তোর, চিত্রা, কিশমিশ দিয়েছি বেশি ক'রে। উপুড়-করা পেয়ালা দুটো সোজা করলেন তিনি, চামচে-প্লেট অদরকারেও একটু গুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'চিত্রা তাহ'লে চা তৈরি কর—আমি যাই ওদিকে।' যেতে-যেতে একটু থেমে আবার বললেন, 'তোমরা খাও, কেমন?'

তাঁর চ'লে যাওয়ার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে চিত্রা বললো, 'আশ্চর্য মা তোমার!'

'সব মা-ই আশ্চর্য।'

'কিন্তু মায়েদের মধ্যেও সব কি আর সমান!'

'না, সব সমান কোনোখানেই নেই', মৌলি ঠোঁটের কোণে হাসলো একটু। 'ওটা বানানো কথা, কম-বেশি নিয়েই বাস্তব।'

টী-পটের ঢাকনা তুলে ভিতরে একবার উঁকি দিলো চিত্রা, আস্তে একবার চা নেড়ে বললো, 'ঐ বেশিটা একটু বেশি মাত্রায় পেয়েছো তুমি।'

'আঃ! চায়ের গন্ধ!' জোরে একবার নিশ্বাস নিলো মৌলি, তারপর চিত্রার চা-তৈরি করা হাতটির মৃদু ব্যস্ততার দিকে তাকিয়ে বললো, 'সকলেই সব পায়, চিত্রা; নিতে পারে দু-চার জন।'

'থাক, ও নিয়ে আর জাঁক কোরো না। নিতে তুমি পারো তা সত্যি, নিংড়ে সবটুকু নিতে জানো, কিন্তু যারা দেয় তাদের কথা ভাবো কখনো?'

'সবটুকু? অসম্ভব, চিত্রা। মাত্র কয়েকটি কৌটোর বেশি কিছুতেই সম্ভব না। দ্যাখো ঐ বাইরের দিকে তাকিয়ে। এর কতটুকু তুমি নিতে পারো তোমার ছোট্ট জীবনে, ছোট্ট শরীরে?'

চা ঢালতে নিচু হ'লো চিত্রার মুখ, চামচে পেয়ালায় ক্ষীণ মধুর টুংটাং আওয়াজ দিলো। মুখ তুলে বললো, 'তোমার সব পাওয়া কি বাইরেই?'

'আমার মা-র কথা ভাবছো?'

'তোমার কথাই ভাবছি। আচ্ছা, তোমার মা-র কথাই ধরো। তোমার খাওয়া-পরা, তোমার সুখ-সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য, তা-ই নিয়েই তিনি ব্যস্ত সারাদিন। আর কোনোদিন তার এক চুল উনিশ-বিশ হ'লে তোমার কি তা সহ্য হয়?'

কালচেমতো ঘন-ব্রাউন চায়ের উপর প্রথম দুধ প'ড়ে কেমন ক'রে কুটিল প্যাঁচে সোনালি রং ফুটিয়ে তোলে, সেই তার প্রিয় দৃশ্যটি একমনে দেখছিলো মৌলি। চিত্রার কথা শুনে একটি যেন ক্ষমা-চাওয়া হাসি ফুটলো তার মুখে; নিচু গলায় বললো, 'ডিমের কথাটা বললাম ব'লে? তা সকালবেলা একটি ক'রে ডিম কি খুব বেশি চাওয়া?'

'কত বেশি তোমার চাওয়া তা তুমি জানো না, মৌলি।'

'কেন জানবো না। নিজের কথা সবই জানি আমি।'

'যে তোমাকে কলের মতো সব জুগিয়ে যায় তাকে তুমি ফিরেও ছাখো না তা কি তুমি জানো? তুমি কি জানো তোমার মা-র উপর অত্যাচার করো তুমি?'

'অত্যাচার করি!' লম্বা চুলে ঝাঁকানি দিয়ে মৌলি হেসে উঠলো। 'থাক, আর মন্দ বোলো না। চা খাওয়া যাক।' ছোট, অসমাপ্ত, তাপের জন্য স্পর্শমাত্রেই শেষ-হওয়া প্রথম চুমুকটি দিয়ে পেয়ালা নামিয়ে রাখলো সে, শাদা ধোঁয়া আস্তে-আস্তে পেঁচিয়ে উঠলো রোদ্দুরে, স্বচ্ছ আভা হ'য়ে মিলিয়ে গেলো।

চিত্রা জিগেস করলো, 'রুটি দেবো তো?'

'রুটি?…সকালবেলা কিছু চিবিয়ে খেতে আমার ইচ্ছে করে না। তা দাও একটু।'

'মাখনের উপর সন্দেশ মাখিয়ে দেবো?'

'কেমন সন্দেশ? এলাচ দিয়েছে?'

'খেয়ে দেখতে পারো।'

মৌলি চামচে দিয়ে এক ফালি সন্দেশ তুলে আলগোছে জিভের উপর ফেললো। নরম, কম-মিষ্টি, একটু ভেজা-ভেজা মিহিন সন্দেশ জিভের উপর গ'লে গেলো যেন সুইনবর্নের কোনো শুভ্র সিলেবল, কৈশোরের লাজুক মন্থর কামোন্মেষের মতো এলাচের গোপন গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত মুখে। চিত্রা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কেমন? ভালো না?'

'ভালো? আমি একে বলি হৃদয়নন্দন।'

'কলাটাও মন্দ লাগবে না বোধ হয়।'

'কলা?'—মৌলি ঠোঁটের ভঙ্গি করলো একটু—'নাঃ! ঠাণ্ডা—আর বড্ড সলিড। ভালো লাগে না আমার। এই সন্দেশটা বানাতে তুমি শিখে নাও।'

'এটাও শিখতে হবে আমাকে?' চিত্রা হাসলো, কেমন ভীরু, বিষণ্ণ, আবার একটু ঠাট্টা-করা, মৌলিকে প্রায় হারিয়ে-দেয়া হাসি। 'আর? মুদি গয়লা কয়লাওলার হিশেবপত্তর?'

'আবার আমার মা-র কথা?' মৌলি হাসলো না, চোখে যেন অভিযোগ নিয়ে, তিরস্কার নিয়ে চিত্রার দিকে তাকালো।

'সন্দেশ তাহ'লে এমনিই খাবে?' একটি মাখন-লাগানো ঈষদুষ্ণ টোষ্ট প্লেটে ক'রে এগিয়ে দিলো চিত্রা। নিজেরটি হাতে

তুলে বললো, 'আচ্ছা মৌলি, একটা কথা জিগেস করি তোমাকে। তোমার মা-র সুখদুঃখের কথা তুমি ভাবো কখনো?'

'"ভাবা" বলতে কী বোঝো? বাজার থেকে হাতে ক'রে চালতে নিয়ে আসা?'

'ঠিক তা-ই। সেটাই। তাতেই বোঝা যায় অন্য জনের অস্তিত্ব তুমি স্বীকার করো।'

'আলাদা ক'রে প্রমাণ দিতে হবে?'

'ঐ তো! আলাদা ক'রে কারো কথাই তুমি ভাবো না। যে তোমাকে ভালোবাসবে প্রতিদানের আশা তাকে ছাড়তে হবে।'

'প্রতিদান? ভালোবাসা কি ব্যবসাদারি?'

'বিনিময় ছাড়া ভালোবাসার অস্তিত্ব কোথায়?'

'ঠিক বলেছো। ভালোবাসাটাই বিনিময়। তার যদি অস্তিত্ব থাকে, তাহ'লে কোনো-না-কোনো রকমের বিনিময়ও আছে নিশ্চয়ই।'

একটু বিস্ময়ে, একটু বিস্মিত বেদনা ফুটলো চিত্রার মুখে, ঠোঁটের রেখায় প্রায় কেমন ভয়ের ম্লানিমা, যেন সে জানে হৃদয়ের গভীরতম অন্তঃপুরে নিজেই জানে যে এ সব কথা তার অর্থহীন, যে রাত্রে বিছানায় শুয়ে বালিশের কানে একবার কোনো কথা বললে সে-কথা আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না। একটু চুপ ক'রে থাকলো সে, একটি আঙুল আস্তে একবার বুলিয়ে গেলো কপালে, যেন মুছে দিলো কোনো অবিস্মরণীয়ের আকস্মিক ছায়াপাত, তারপর আবার বললো, চোখ-ভরা কল্যাণময় সাহস নিয়ে, চোখের কোণে বরদাত্রী ঠাট্টা নিয়ে এর পরেও তর্ক করলো—'কিন্তু তোমার বিনিময় কী-রকম? তোমার মা একে-ওকে ব'লে ডবল মজুরির দরজি আনাবেন বাড়িতে, আর তুমি দয়া ক'রে গায়ের মাপটি দিতে দাঁড়াবে—এই তো তোমার বিনিময়?'

'কী করবো বলো। আমার কাজ আছে—অন্য কাজ।'

'কিন্তু—ভাবো কখনো!—তুমি ছাড়া যার কাজ থাকবে না এমন মানুষ কোথায় পাবে তুমি চিরকাল?' ব'লে চিত্রা তার চোখ দুটি সম্পূর্ণ তুলে ধরলো মৌলির দিকে, প্রশ্নে ভরা চোখ, সাহসে ভরা, এমনকি—চোখের কোণে বিষাদ যেখানে লুকিয়ে ছিলো, সেখানে এখন স্পর্ধার মতো ঝিলিমিলি উজ্জ্বল।

আর সেই উত্তর-চাওয়া চোখের দিকে তাকিয়ে মৌলির হঠাৎ মহেন্দ্র ঘোষকে মনে পড়লো। মনে পড়লো তাঁর সুস্থির চলা, তাঁর 'wh' ব্যঞ্জনবর্ণের চেষ্টাকৃত, ত্রুটিহীন উচ্চারণ, নিজের পরিধির মধ্যে তাঁর আত্মবিশ্বাস—আত্মপ্রসাদ—যা কিছুতেই সহ্য করা যায় না অথচ যাতে দোষ ধরাও সম্ভব নয় কোনোরকমেই। সেটাই সবচেয়ে অসহ্য যে দোষ ধরার উপায় নেই, ভুল তিনি করেন না কখনো—কাঁটায়-কাঁটায় সেমিকোলনটি পর্যন্ত ঠিক আছে সব সময়। এ-কথা কি কল্পনাও করা যায় যে মহেন্দ্র ঘোষের জন্য বাড়িতে কখনো দরজি গেছে? না; নিজেই গেছেন দোকানে, পাঁচ দোকান ঘুরেছেন, দশ রকম কাপড় দেখেছেন, তখনকার পক্ষে সবচেয়ে পছন্দসই জামাটি অন্যদের চাইতে কয়েক আনা কম খরচে তৈরি করিয়েছেন যখনই তাঁর দরকার হয়েছে। কথাটা ভাবতে হাসি পেলো মৌলির, অবজ্ঞার ঢেউ উঠলো মনে—যারা নিপুণ, যারা নির্বোধ, যারা তৃপ্ত, সেই নিকৃষ্ট সাধারণ মানুষদের সমস্ত সংসারটারই উপর অবজ্ঞা—কিন্তু সেই সঙ্গে ঈর্ষাও লাগলো একটু, কোনো-এক সূক্ষ্ম গোপন উন্নিদ্র ঈর্ষার দংশন।

এ-সব কথা স্রোতের মতো ব'য়ে গেলো তার মনের উপর দিয়ে; মুহূর্তের বেশি সময় লাগলো না। 'চিরকাল?' একটুমাত্র দেরি ক'রে চিত্রার কথার সে জবাব দিলো, 'সে যে অনেক! সে যে অনেক দূর! অত দূর পর্যন্ত কিছুই এখনো ভেবে দেখিনি।' ব'লে হেসে উঠলো, যেন চিত্রা কোনো মজার কথা বলেছে, কিংবা যেমন শিশুরা হাসে যখন কোনো লজ্জা ঢাকতে চায়।

চিত্রার চোখ কোমল হ'লো, যেন করুণার ছায়া পড়লো তাতে। চোখ সরিয়ে নিলো মৌলির দিক থেকে, সামনের পেয়ালা-সাজানো টেবিলটার দিকে তাকালো, বাইরে আকাশের দিকে দেখলো একবার। 'সত্যি! চিরকাল অনেক দূর। আপাতত—' হঠাৎ থামলো, যেন অন্য কিছু বলতে গিয়ে কথা বদলে নিলো—'আপাতত বেশ লাগছে। সন্দেশ খেলে না?'

'আর খাবো না। ইচ্ছেটা জীইয়ে রাখা ভালো।'

'আরো ভালো ভালোর প্রতি সুবিচার করা,' ব'লে মৌলির সন্দেশের ভগ্নাংশটুকু নিজের প্লেটে তুলে নিলো চিত্রা। দু-আঙুলে একটু ক'রে ভেঙে নিয়ে, এক-এক চুমুক চায়ের সঙ্গে, খুব আস্তে শেষ করলো ওটুকু, তারপর একটি বিষণ্ণ গম্ভীরতা তার মুখ ছেয়ে নামলো।

'কিন্তু হাসির কথা নয়, মৌলি; ভেবে ভাখো। যে-ত্যাগ মা দিতে পারে, তা কি কোনো বন্ধুর কাছে কেউ পায় কখনো, না কি—' চিত্রা একটু থামলো, তার ম্লান গালের ঠিক মধ্যিখানে লাল ফোঁটাটি দেখা দিলো আবার—'না কি কোনো স্ত্রীর কাছেই পায়? লোকে তোমাকে ধন্য বলবে, মৌলি, জগতে তুমি আনন্দ বিলোবে অনেক, কিন্তু, মৌলিনাথ, বিয়ে করলে স্ত্রী তোমার সুখী হবে না।' শেষের কথাটা হালকা গলায় বললো, কিন্তু ধার লাগলো সুরে, ঝলসে উঠলো চোখের দূর কোণ দুটি।

এবার চিত্রাকে বিঁধলো মৌলির চোখ, উদ্ধত চোখ, ক্ষমাহীন, আর সেই সঙ্গে যেন অসহায়, হেরে-যাওয়া, প্রার্থনায় আত্মবিস্মৃত। আস্তে-আস্তে বললো, 'সুখ! সুখী!' যেন ও-সব কথার অর্থ বোঝার চেষ্টা করছে। 'তুমি কি এ-সব তুচ্ছ কথা বলবে, চিত্রা, যখন আমরা দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, মন্দিরের সামনে, বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে যখন আমরা ভয়ে কাঁপছি যেহেতু আর উপায় নেই! উপায় নেই, ডাক শুনেছি আমরা, আর উদ্ধার নেই আমাদের। ভয় কোরো না, শুধু তোমার হাতটি তুলে আস্তে একটু ছোঁও একবার, দরজা খুলে যাক।'

কী নির্লজ্জ মৌলি, কথা থামিয়েও থামলো না, চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকলো চিত্রার ডিমের ছাঁদের ম্লান রঙের ইটালিয়ান ম্যাডোনার মতো মুখের দিকে, করুণায় কোমল হ'য়ে-আসা চোখ দুটির দিকে। আর হঠাৎ সেই চোখের পাতা কেঁপে উঠলো, নিবে গেলো চোখের কোণের ঝিলিমিলি, আরো ম্লান দেখালো মুখটি, হলদেমতো ফ্যাকাশেমতো শাদা, গালের হাড় উঁচু হ'য়ে ফুটলো, গম্বুজের মতো খোঁপা যেন মনে হ'লো এলিয়ে ভেঙে ছড়িয়ে যাবে। চোখে ঝাপসা দেখলো চিত্রা, যেন অনেকখানি কুয়াশা পার হ'য়ে ঝাপসা দেখলো দরজার ধারে দাঁড়িয়ে-থাকা অন্য দু-জন মানুষকে।

৩

ঘরের নীরবতা, নিবিড়, স্পন্দমান নীরবতা, মুহূর্তের বেশি স্থায়ী হ'লো না। কুয়াশা কেটে গেলো, হাওয়া বইলো আবার, চিত্রা একটু ন'ড়ে ব'সে ডাকলো, 'গীতা! বেণু! আয়।'

সেই বারো বছরের ফুটফুটে মেয়েটি এগিয়ে এলো, পিছনে তার সদ্যগোঁফের ছায়া-পড়া হঠাৎ-লম্বা-হওয়া দাদা। সেই জানলা-খোলা ঘরে, ফুল ফল খাদ্য পানীয়ে উজ্জ্বলতর বৈশাখী হাওয়ায়, চাঁপার গন্ধে চায়ের পেয়ালায় আবিষ্ট মন্থর পরিবেশে, মুখোমুখি দু-জন মানুষের অসমাপনের তীব্রতার মধ্যিখানে, দ্বিধান্বিত লাজুক পায়ে এগিয়ে এলো ওরা, শবরি কলায় আলো-করা চায়ের টেবিলের একটুখানি দূরে এসে দাঁড়ালো। চিত্রা আড়চোখে একবার তাকালো মৌলির দিকে, দেখলো তার চোখের ছায়াচ্ছন্নতা, তার কপালের ঈষৎ ফুলে-ওঠা রাজদণ্ডের মতো শির।

'মৌলি! একবার তো বসতেও বলতে পারো ওদের। কেমন বেচারা মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।'

'বোসো, গীতা। বেণু, বোসো।'

মৌলির এই কর্তব্যপরায়ণ আমন্ত্রণে সাড়া দিলো না কেউ। বেণু তার সদ্যপ্রাপ্ত পুরুষের গলায় গমগম ক'রে বললো, 'নাঃ, বসবো না। মা জিগেস করলেন তুমি কি এখন যাবে, দিদি?'

'এই—একটু পরে। তোরা খেয়েছিস?'

'কখন!'

'আর-কিছু ইচ্ছে আছে নাকি? সন্দেশ একটু?' ব'লে চিত্রা দু-জনের দিকেই তাকালো, আর দু-জনের হ'য়ে বেণুই আবার উত্তর দিলো, 'না:। যা পেয়ারা, দিদি, ঐ গাছটায়!' ব'লেই মৌলির দিকে তাকিয়ে একটু লাল হ'লো।

'খুব পেয়ারা হয়েছে, না?' যে-চোখে একটু আগেই মেঘ ছিলো, হয়তো বিদ্যুৎ, ঝড়ের সংকেত, সেই চোখেই এখন নির্মল হ'য়ে ছড়ালো গার্হস্থ্য প্রসন্নতা; চোখে হেসে চিত্রা বললো, 'কিন্তু এতক্ষণে একটাও বোধহয় নেই?'

'যাঃ! আমি মোটে এই দুটো-একটা—তুমি খাবে, দিদি? এনে দেবো?'

'এখন না। নিয়ে চলিস কয়েকটা।'

'হ্যাঁ, তা-ই বেশ ভালো হবে। যেতে-যেতে গাড়িতে খাওয়া যাবে বেশ। তাহ'লে যেতে দেরি আছে?'

'বেশিক্ষণ না।'

'কতক্ষণ? ধরো—কুড়ি মিনিট?'

'অত ঘণ্টা-মিনিটের হিশেব দিতে পারবো না,' চিত্রা এবার প্রকাশ্যেই হাসলো, প্রায় শব্দ ক'রেই। 'খানিক পরে যাবো আরকি।'

'না, যদি দেরি থাকে তাহ'লে তারকদের বাড়ি ঘুরে আসি একবার।'

'বেশ তো; ঘুরে আয়।'

'ওদের সাইকেলটা পেলে গাড়ি আনারও সুবিধে হয়। সেই ষ্টেশনে তো যেতে হবে গাড়ির জন্য।'

'ওটাই রেখে দিলে হ'তো।'

'বা রে, খামকা বেশি ভাড়া দেবো কেন? সাইকেল না পাই হেঁটেই নিয়ে আসবো এক ছুটে। আনিনি আগে?'

'সত্যি, বেণু সঙ্গে থাকলে ভাবনা নেই!'

মুখ টিপে হাসলো ছেলেটা—চেষ্টা ক'রেও লুকোতে পারলো না। বুক টান ক'রে বললো, 'যাই তাহ'লে। আমি ঠিক সময়মতোই আসবো—' আলগোছে শার্টের আস্তিন টেনে কব্জির দিকে একটা কটাক্ষ হানলো বেণু—'এই তারকের সঙ্গে খানিকক্ষণ—তারপর—বড়ো জোর আধ ঘণ্টা লাগবে আমার।'

'আমাদের খুব তাড়া নেই তেমন।'

'না, না, সময়মতোই সব করা ভালো।' বেণু একবার ঘরের চারদিকে তাকালো, মৌলির সঙ্গে চোখে-চোখে কোনোরকমে একটা সম্ভাষণ সেরেই ঘুরে দাঁড়ালো, বেরিয়ে গেলো এখনো-ঠিক-অভ্যেস-না-হওয়া মস্ত পায়ে এঁকে-বেঁকে।

চিত্রা হেসে বললো, 'ওর ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্যে বাবা ওকে ঘড়ি কিনে দিয়েছিলেন, সেই থেকে বেণু বেজায় পাংচুয়্যাল হ'য়ে পড়েছে। কাঁটায়-কাঁটায় সব করা চাই। ওর সময়মতো নাওয়া-খাওয়ার তাড়ায় বাড়িতে সব অস্থির আছি আমরা।'

এই হালকা আদরের মতো পরিহাসের ছোঁওয়ায়, জীবনের সঙ্গে সহজ সম্বন্ধের এই ঝিরিঝিরি আরামদায়ক হাওয়াটুকুতে, মৌলি সাড়া দিলো না। সামনের পেয়ালাটা হাতে তুলেই নামিয়ে রেখে বললো, 'চা কি আছে আর?'

চিত্রা চা ঢাললো মৌলির পেয়ালায়, নিজেও নিলো আর-একটু। পেয়ালা নিতে মৌলি যখন ঝুঁকেছে, হাত বাড়িয়েছে চিত্রার দিকে, তখন তার চোখে পড়লো, যেন এই প্রথম বার চোখে পড়লো অন্য জনকে, অন্য মেয়েটিকে। জিগেস করলো, 'গীতা চা খায় না?'

এতক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলো গীতা; বাড়ি ফেরার, গাড়ি ডাকার কথায় চুপ ক'রে ছিলো; বেণুকে ঘড়ি নিয়ে ঠাট্টা করার সুযোগ নেয়নি, যোগ দেয়নি পেয়ারা পাড়ার সুখচর্চায়। বোধহয় অন্য কিছু দেখছিলো, অন্য কিছু ভাবছিলো, বোধহয় নিজেকেই এতক্ষণ ভুলে ছিলো এই বারো বছরের মেয়ে। এইবার তার অস্তিত্বের উল্লেখ শুনে—তার নাম, তারই নাম উচ্চারিত হ'তে শুনে যেন চমকে চোখ তুলে তখনই আবার নামিয়ে নিলো।

'কী, খাবি নাকি একটু?' তারপর, ঈষৎস্ফুট অসম্মতির মাথা নাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই চিত্রা আবার বললো, 'থাক, গীতা এখনো চা খায় না তেমন।'

'সেটা ভালোই। কিন্তু কবিতা কি পড়ে এখনো?'

'বাঃ! তোমার সব কবিতা ওর মুখস্থ তুমি জানো না?'

'সেরে যাবে। আর দু-তিন বছরেই সেরে যাবে। ভেবো না,' ব'লে মৌলি একটা তির্যক দৃষ্টিপাত করলো গীতার দিকে।

টুকটুকে লাল হ'য়ে উঠলো গীতার মুখ। দিদির মতো মুখ নয় তার, বরং নানা ভাবেই দিদির সে উল্টো। যা পুরোনো, যা ম্লান, যাকে মনে হয় ম্লান ব'লেই মূল্যবান, মনে হয় যেন ভঙ্গুর এবং যত্নে সাধা, কোনো ধূসর অবক্ষয়ের আভাসে যার রমণীয়তার ইন্দ্রিয়-ধার ক্ষ'য়ে যায়, যাকে হঠাৎ কখনো মনে হ'তে পারে ঝড়ের মতো তানের পরে গান থেমে আসার সর্বশেষ নিশ্বাসটুকু—এ-মেয়ের মুখে কিছুই তার নেই। গোল ছাঁদের পুষ্ট মুখ, ফুটফুটে ফর্শা রঙের, তেমনি গোলাপি

ধরনের ফর্শা যাকে মনে হয় প্রায় আপত্তিকর—বাংলায়, বিশেষত পূর্ব বাংলার মাটিতে রীতিমতো অস্বাভাবিক এবং অশোভন। হয়তো কপালটি মেয়েদের পক্ষে একটু বেশি চওড়া, কিন্তু এই খুঁতটুকু ঢেকে দিয়েছে যেন তুলি দিয়ে আঁকা পরিষ্কার দুটি কালো ভুরু, আর তারই তলায় স্বচ্ছ গভীর চোখ দুটি, যার কোণের দিকে যেন নীল ছায়া জ'মে থাকে সব সময়, আর সামনের নীলচে-ব্রাউন গোলকের মধ্যে দুফোঁটা হীরের মতো তারা দুটি ঝলমল করে। পাৎলা বিলেতি অর্গ্যাণ্ডির কুঁচি-দেয়া ফ্রক পরেছে বকের মতো শাদা, কিন্তু তার মাথার ফুল-ক'রে-বাঁধা রিবনটি ঠিক তার দিদির শাড়ির মতোই হালকা-নীল। মোটের উপর এ-মেয়ের বিধিলিপি যেন রূপসী ব'লে পরিচিত হওয়া, নিতান্তই সাধারণ অর্থে, সাংসারিক অর্থে রূপসী—এবং পরিশীলিত রসজ্ঞের মতে হয়তো তেমন পাংক্তেয় নয়, কেননা তাকে দেখে মনে হয় সেই সব মেয়েদেরই একজন, যারা ছেলেবেলায় খোলা হাওয়ায় খুব ছুটোছুটি করে, আর যা-কিছু খায় তা-ই নিখুঁত হজম ক'রে চিক্কণ মেদসঞ্চয় করে শরীরে—এবং যথাসময়ে স্বামী এবং সন্ততি নিয়ে ভরপুর সংসার ক'রে জীবন কাটায়; যাদের কখনো অসুখ করে না, ঘরে কখনো অকুলোন ঘটে না, যাদের ফর্শা কপালে সিঁদুরের টিপ একটুও কম উজ্জ্বল দেখায় না কখনো, যারা মোটা হয়, সুখী হয়, সুখী করে। এখন—এই যে সে দাঁড়িয়ে আছে তার বিসদৃশ চওড়া কপাল নিচু ক'রে, তার মাথার নীল রিবনের গুচ্ছটিকে সামনে এনে, এখন তার ইতিমধ্যেই গোল-হ'য়ে-ওঠা বাহু, আর ফ্রকের নিচে মসৃণ তরুণ জংঘার দিকে তাকিয়ে তাকে মনে হ'তে পারে এতই জীবনযোগ্য, সংসার-যোগ্য, যে তার কানের ডগাটুকু পর্যন্ত ছড়িয়ে-পড়া লজ্জার লাল আগুনের অর্থ হয়তো ঠিক কারো চোখেই তেমন ক'রে ধরা পড়বে না।

মৌলি তাকালো গীতার দিকে, গম্ভীর চোখে তাকে দেখলো একটু। জিগেস করলো, 'তোমার কোনো বন্ধু নেই পাড়ায়?'

গীতা জবাব দিলো না।

'তুমি ফুল ভালোবাসো? এই নাও—' টেবিল থেকে একটি চাঁপা তুলে হাত বাড়ালো মৌলি।

গীতা এগিয়ে এলো, মৌলির সামনে দাঁড়িয়ে একবার চোখ তুললো তার দিকে, একটি অপ্রত্যাশিত ললিত ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে ফুল নিলো তার হাত থেকে, পা টিপে-টিপে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলো।

'আশ্চর্য!' একটু পরে ব'লে উঠলো চিত্রা।

'কোনটাকে আশ্চর্য বলছো?'

'গীতার কথা বলছি। বাড়িতে ওর দুরন্তপনায় টিঁকতে পারি না আমরা, আর তোমাকে দেখলে কী অসম্ভব শান্ত হ'য়ে যায়!'

'নাকি?' তেমন কৌতূহল কি উৎসাহ প্রকাশ পেলো না মৌলির গলায়।

'আমাদের ওখানেও যাও যখন—ওর সাড়াশব্দ পাও কখনো?'

'কী যেন—লক্ষ্য করিনি।' মাথার চুল উপর দিকে ঠেলে দিয়ে মৌলি বুঝিয়ে দিলো যে প্রসঙ্গটা বদলালে এবার ভালো হয়।

'না! গীতা তখন অন্য মানুষ!' চিত্রা কিন্তু এ-প্রসঙ্গ ছাড়লো না, বরং আঁকড়ে ধরলো, যেন গীতাকে দিয়ে আরো একটুক্ষণ আড়াল করতে চাইলো নিজেকে, মৌলিকে—যেন এই ছুতোয় আরো একটু পেছিয়ে দিতে চাইলো সেই হাতুড়ির বাড়ি, এই সকালবেলার গীতিকবিতার শেষ দারুণ পংক্তিটি। 'তুমি যতক্ষণ থাকো—ও যে কোথায় থাকে কেউ দেখতেই পায় না। একদিন—তুমি হঠাৎ "পূরবী" হাতে ক'রে এলে, এসেই আওড়াতে লাগলে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে—আমি একবার উঠে গিয়ে দেখি পাশের ঘরে গীতা ব'সে আছে চুপ ক'রে; সামনে স্কুলের বই খুলে তাকিয়ে আছে দেয়ালটার দিকে, তুমি যে কবিতা বলছো তা-ই শুনছে একমনে। আমাকে দেখে চমকে উঠলো।'

এই খবরটা শুনে মৌলি কোনো মন্তব্য করলো না।

'আর এখন দেখলে তো? কী রকম ছবির মতো দাঁড়িয়ে ছিলো এসে! দু-একটা কথা অন্তত বলতে পারতে ওর সঙ্গে! ওর ইচ্ছে—আমি তো বুঝি—ওর ভীষণ ইচ্ছে তোমার একটু কাছে আসে; কিন্তু সাহস পায় না।'

'কী জানি,' মৌলি উদাস ভাবে চুল টানলো। 'বাচ্চাদের সঙ্গে ভাব জমাতে আমি একেবারেই পারি না।'

'বাচ্চা বলছো কাকে?'—চিত্রার চোখে কী রকম একটা আলো আবার ঝলক দিলো হঠাৎ, যেন কোনো বোবা রাগের ঝিলিমিলি, প্রায় কোনো হিংস্রতার স্ফুরণ—'আর দু-দিন পরে গীতা যখন শাড়ি ধরবে, তোমারই মতো কত যুবকের বুকে ঢেউ তুলবে না তখন!'

'তোমার এ-সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না', অত্যন্ত গম্ভীর মুখে মৌলি জবাব দিলো, যেন কোনো অপমানকর, অসম্মানজনক কথা শুনেছে।

'ঠাট্টা নয়—সত্যি কথা। ছেলেমানুষ ব'লে চোখেই যে ভাখো না গীতাকে, তোমার নিজেরই বা বয়সটা কী?'

'আয়ুর অঙ্কে বয়স হয় না, চিত্রা; বয়স মানুষের মনে। আমারও পনেরো-ষোলো বয়স ছিলো, কিন্তু আমি কখনো বেণুর মতো ছিলাম না। কোনো দিনই ও-রকম ছিলাম মনে করতে পারি না। গীতা তো ছোটোই; অনেক বিষয়ে তোমার চেয়েও অনেক বেশি বয়স্ক আমি।'

'যথা—কাঁচা পেয়ারা?' চিত্রা ঠোঁটের কোণে হাসলো।

'ঠিক ধরেছো। তুমি—এই তুমি—তুমি এখন গাড়িতে যেতে-যেতে পেয়ারা খাবে—অন্তত সেটা সম্ভব ব'লে মনে করো—এ-কথা ভাবতে আমার কী-রকম কষ্ট হয় জানো না?'

'কষ্ট হয়?'

'অবাক লাগে, বিশ্বাস হয় না, মেলাতে পারি না। তোমার সঙ্গে মেলাতে পারি না, চিত্রা!'

'আচ্ছা, মৌলি—সত্যি ক'রে বলো—তুমি যদি ঐ গাড়িতে থাকো, আর আমরা সবাই পেয়ারা খেতে-খেতে যাই, তুমি একটাও খাবে না?'

'আমি ঐ গাড়ি থেকেই নেমে যাবো।'

'সত্যি?'

'নিশ্চয়ই। এ সব সাধারণ সুখ অসহ্য লাগে আমার।'

'অসহ্য লাগে?' চিত্রার চোখের কোণের বিষাদের ছায়া এবার নীল হ'য়ে নামলো সমস্ত মুখে; বেদনায় ভরা, করুণায় ভরা দুটি চোখ বিস্ফারিত ক'রে মৌলির দিকে তাকিয়ে থাকলো। তার ঠোঁট দুটি ফাঁক হ'লো, কিন্তু কথা বেরোলো না, শুধু ছোটো মাথাটি আস্তে

আস্তে নড়লো একটু—যেন বলতে চাইলো 'আহা বেচারা!' বলতে চাইলো 'ভগবান তোমাকে দয়া করুন!'—কিন্তু তাও থেমে গেলো ঠোঁটের কাছে উঠে আসার আগেই—কোনো কথাই থাকলো না, শুধু মনে-মনে ডাকলো, 'মৌলি, মৌলি!'—যেন হৃদয়ের গভীরতম কোনো দয়ার স্বরে, অপরিসীম মন্ত্র কোনো নিঃশব্দে উচ্চারণে, শুধু তার নাম ধ'রে ডাকলো কয়েকবার। তারপর আস্তে-আস্তে, নিজেরই অজান্তে চোখ তার ভারি হ'য়ে বুজে এলো; চোখ বুজে থাকলো একটুক্ষণ; তারপর হঠাৎ যেন ঝাঁকানি দিয়ে জেগে উঠে বললো, 'চা খাওয়া হয়েছে তোমার? এগুলো নিয়ে যাবো?'

'থাক। বোসো। তুমি কি খুব অবাক হ'লে পেয়ারা বিষয়ে আমার কথা শুনে?'

'অবাক হবো কেন। জানি তো তোমাকে।'

'অথচ অনেক সময় এমন ব্যবহার করো, যা আমার—কী বলবো—যা আমার বাইরে, আমার জগতের বাইরে—বিরুদ্ধে বললেও দোষ হয় না।'

'কিন্তু তোমার জগতের বাইরেও মস্ত একটা বিশ্বজগৎ আছে, মৌলি। সেটা কি তোমার ইচ্ছেমতো চলবে তুমি আশা করো?'

'আমার আশা খুব ছোটো, চিত্রা। প্রকাণ্ড বিশ্বজগতের মধ্যে একজন মানুষ—শুধু একজন মানুষ—এটুকু দাবি করলেও দোষ?'

'দু-জন মানুষ কখনো এক মানুষ এক হয় না, মৌলি।'

'হয় না? তুমি আমি আজ যেখানে এসে মিলেছি সেখানে কোথায় ফাঁক আছে বলো তো? তাই বলি তোমাকে—সুর কেটে দিয়ো না, আরো কাছে এসো। ঘনিষ্ঠ হও।'

'কিন্তু—মৌলি—আমাকেই বা এত বিশ্বাস কিসের!' চিত্রা জোরে একবার নিশ্বাস নিলো কথাটা ব'লে, যেমন হয় কথার মধ্যে হাসি পেলে, কিংবা যদি দম আটকে আসে হঠাৎ।

'তাই বুঝি?' ছোট্ট হাসি ফুটলো মৌলির ঠোঁটে, দয়ালু হাসি, মা যেমন ভুরু বাঁকিয়ে অভয় দেন, কোনো অপরাধ ক'রে শিশু যখন সামনে এসে দাঁড়ায়। হাঁটু উঁচু ক'রে টেবিলে ঠেকিয়ে চেয়ারটি দোলাতে লাগলো আস্তে-আস্তে, আয়েসি গলায় বললো, 'ভারি একটা মজার গুজব রটেছে ইউনিভার্সিটিতে; জানো তো?'

'কী, শুনি?' চিত্রাও যেন আরাম ক'রে পিঠ এলিয়ে দিলো ইজি-চেয়ারে।

'তোমার নাকি বিয়ে—আর কার সঙ্গে জানো?—মহেন্দ্রবাবু, মহেন্দ্র ঘোষ প্রোফেসরের সঙ্গে!' নিচু, নরম গলায় লম্বা টানে হেসে উঠলো মৌলি—যেমন ক'রে হেসেছিলো গীতার কবিতা পড়ার কথায়—হাসির ঝোঁকে চেয়ারটা একটু বেশি উল্টিয়ে যেতেই হাত দিয়ে টেবিলটা ধ'রে ফেলে সোজা হ'লো। 'ছেলেরা সব বলাবলি করে এ নিয়ে—আর জানো, আমার কাছেই বলে!'

'তুমি কী বলো?' একটুও নড়লো না চিত্রা, একটু টেনে-টেনে কথাটা বললো, যেন তার ঘুম পেয়েছে, যেন ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রাম করছে এখন, অনেক উত্তেজিত তর্কের পর আরামে ব'সে একটু মৃদুকোমল বিশ্রম্ভালাপে নেমেছে।

'আমি আর কী বলবো—হাসি পায়—গম্ভীর হ'য়ে শুনে যাই সব। ওরা তো আর জানে না—কিন্তু জানে না কেন তাও বুঝি না—তোমাকে দেখে, আমাকে দেখে ওদের বোঝা উচিত।'

'কী বোঝা উচিত?'

'কে কবে আগুন লুকোতে পেরেছে? ওদের চোখ নেই? দেখতে পায় না?'

চিত্রা জবাব দিলো না। জবাব না দিলেও চলে এই প্রশ্নের—না কি সে এতই ক্লান্ত যে একটু কথা বলতেও তার আলস্য? কেমন দেখাচ্ছে তাকে—একটু কি ফ্যাকাশে হয়েছে মুখ?—না কি ইতিমধ্যেই তারুণ্য-হারানো সকালবেলায় জানলা থেকে রোদ স'রে গিয়ে তার মুখের স্বাভাবিক ম্লানতা আরো বেশি প্রকট হয়েছে? স্তব্ধ হ'য়ে এলিয়ে আছে সে, ইজিচেয়ারের বঙ্কিমার সঙ্গে তার শরীরের ছিপছিপে গড়নটি খাপে-খাপে মিলে গেছে যেন, হাত দুটি নেতিয়ে আছে পাশে, চোখে যেন তন্দ্রাভরা শূন্যতা;—বিরাম, পূর্ণ বিরামের ছবি তাকে দেখে মনে হবে এখন, লাফিয়ে পড়ার আগে যেমন ঝোপের পিছনে লম্বা রেশমি বাঘিনীর শরীরের আশ্চর্য বিরাম। ঠিক তেমনি ব'সেই, মৌলির দিকে—কিংবা কোনো দিকেই স্পষ্ট ক'রে না-তাকিয়ে, চিত্রা আস্তে-আস্তে বললো, 'যদি আমি বলি যে গুজবটা সত্যি?'

'সত্যি!...সত্যি!' মৌলি হাসলো, আর-কিছু বললো না।

'সত্যি, মৌলি! তুমি যা শুনেছো তা সত্যি।'

এতক্ষণে মৌলি লক্ষ্য করলো চিত্রার ফ্যাকাশে-দেখানো মুখ, তার শরীরের নেতিয়ে-পড়া অবশ নিস্পন্দ ভঙ্গি। একটু ভয়, ভয়ের অতিশয় হালকা একটু ছায়া তার মুখের উপর দিয়ে ভেসে গেলো। তারপর আশ্বাসের সুরে, বিশ্বাসের সুরে, একটি অতি কোমল সুদূরস্পর্শী স্নেহের সুরে বললো, 'তুমি কি আজ পাগল হ'লে?'

'মৌলি, আমার কথা শোনো—' হঠাৎ যেন একটা কাঁপুনির ঢেউ ব'য়ে গেলো চিত্রার পা থেকে মাথার খোঁপা পর্যন্ত—'তোমাকে একটা কথা বলতেই আজ এসেছিলাম।'

আবার একটু থমকালো মৌলি, চিত্রার দিকে সন্ত্রস্ত চোখে একবার তাকালো, কিন্তু তখনই আবার পরিষ্কার সরল হ'লো তার চোখ, খুব শান্ত একটি হাসি ফুটলো মুখে। 'কী, বাড়ির লোক জোর করছে? তা ভয় কী। তুমি—আমি—এই অফুরন্ত পৃথিবী—ভয় কী আমাদের?'

'তোমার জন্য অফুরন্ত পৃথিবী; আমার জন্য ছোটো একটি সংসার।'

'ও দুই কি মিলবে না কখনো?' হঠাৎ মৌলির মন যেন অন্য কোথাও চ'লে গেলো—উপস্থিত প্রসঙ্গ পেরিয়ে অন্য কোথাও—আবেশে আরো কালো দেখালো তার চোখ, যেমন হয়েছিলো দেখতে যখন একলা ঘরে সুইনবর্ন গুনগুন করছিলো সে; গুনগুন ক'রে, যেন আপন মনেই বলতে লাগলো, 'ও-কথাও ভেবে দেখেছি আমি। কত এমন সময় আসে যখন আমার মনে হয় আমি সব পেয়েছি, শুধু এই পৃথিবীতে জন্মেছি ব'লেই সব পেয়েছি; সকাল, বিকেল, দুপুর, রাত্রি, ঋতুর পর ঋতু—কোনো-একটি মুহূর্ত অন্য কোনো মুহূর্তের মতো নয়—; কত সময় আমার মনে হয় যদি একশো বছর বাঁচি তবু ক্লান্ত হবো না, তবু পুরোনো হবে না কিছুই, শেষ হবে না আমার বেঁচে থাকার আবেগ।'

চিত্রা নিঃসাড়ে ব'সে থাকলো, যেন মৌলির কথা শুনছেই না, কিংবা খুব একমনে শুনছে ঠিক তার নিজের মুহূর্তটিকে ধরবে ব'লে।

'কিন্তু আবার অন্য অনেক সময় আসে, যখন আমি তোমাকে চাই। তোমাকে চাই, চিত্রা। যখন মনে হয় তুমি না-হ'লে কিছুই হ'লো না; এই আলো, আকাশ, আকাশের তারা, এরা কোনো কথাই বলবে না আমাকে, যদি না তারা তোমার গলা খুঁজে পায়। তখন বুঝি কত মিথ্যা আমার দম্ভ, কত আমি অসম্পূর্ণ—তোমাকে ছাড়া। উপকরণের অন্ত নেই পৃথিবীতে, কিন্তু কে তাকে ছন্দে বাঁধবে তুমি না হ'লে? তথ্যকে কবিতা ক'রে তুলতে, বস্তুকে সুর ক'রে বাজাতে কার কাছে আমি শিখতাম তোমাকে যদি না পেতাম? সেই তুমি—চিত্রা, সেই তুমি!'

চিত্রার ছোটো মাথাটি আস্তে-আস্তে নড়লো একটু, কিন্তু আর কোনো ভঙ্গি হ'লো না শরীরে, মুখের ভাবও বদলালো না। নিশ্বাসের স্বরে বললো, 'সে আমি নই, সে আমি নই।'

'এখনো তোমার ভুল ভাঙলো না?'

'আমি কখনো ভুল করিনি, মৌলি। কখনো ভাবিনি যে ও-সব কথা যাকে তুমি বলো সে তোমারই মনের কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু।'

'তুমি আছো ব'লেই সার্থক আমার কল্পনা। নয়তো কিছুই থাকে না—সব ফাঁকা, শূন্য—নয়তো পায়ের তলায় মাটি থাকে না, চিত্রা।'

'আমি নই—সে আমি নই। তোমার বন্ধুরা ভুল বলেনি, মৌলি।'

'মানে?' মৌলির চোখের দৃষ্টি বদলে গেলো হঠাৎ, তার তন্ময় দীপ্তি নিবে গিয়ে কেমন-একটা পথ-হারানোর অনিশ্চয়তা ফুটলো। যেন ছটফট ক'রে ব'লে উঠলো, 'কী বলছো তুমি?'

আর সেই তার অস্থির, অসহায়, করুণ, সুন্দর চোখের দিকে তাকিয়ে একটা তীব্র, অক্ষম, কিন্তু একটু মধুর, প্রায় যেন উপভোগ্য আক্রোশ চিত্রার বুকের মধ্যে ঠেলে উঠলো। ছাখো, ছাখো একে! ছাখো এই লোকটার দিকে তাকিয়ে! নির্বোধ, এখনো নির্বোধ থাকবে তুমি—আমাকে বাধ্য করবে আরো বলতে, টুকরো ক'রে ফুল ছিঁড়তে—সাধারণ সুখ সইতে পারে না যে-মানুষ, তার প্রচণ্ড দুর্বলতাকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে যতক্ষণ না গিয়েছি ততক্ষণ ছাড়বে না আমাকে, আমাকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে না-গিয়ে ছাড়বে না, নিষ্ঠুর? লাল হ'য়ে উঠলো চিত্রা, গুণ-পরানো তীরের ফলা যেমন একটু-একটু কাঁপে তেমনি তার নাকের ডগাটি কাঁপলো একবার, হঠাৎ এক টানে তীরের মতো উঠে ব'সে অদ্ভুত অন্য রকম গলায় বললো, 'শোনো, মৌলি। শুনে নাও কথাটা। যা শুনেছো, সত্যি। একটুও ভুল নেই তাতে। শুনেছো? বুঝেছো?'

মৌলির উপরের ঠোঁট নিচেরটির উপর আঁটো হয়ে নামলো, এলোমেলো চুলে ভরা মাথাটা ভারি হ'য়ে নামলো তার বুকের কাছে। প্রথমে মনে হ'লো সে হেরে গেছে এবার, আর-কিছু বলবে না, কিন্তু একটু পরেই মুখ তুললো যখন, সে-মুখে দেখা গেলো একটি আশ্চর্য সরল মধুর নিষ্করুণ হাসি। ঐ হাসি দিয়ে চিত্রাকে যেন নতুন ক'রে সম্ভাষণ ক'রে সে বললো, 'শুনেছি। বুঝেছি। কিন্তু বিশ্বাস করি না।'

'শোনো। কেউ জোর করেনি আমাকে। আমারই মত নিয়ে হচ্ছে। এই দু-দিন আগেই ঠিক হ'লো সব। যা বলতে এসেছিলাম বলা হ'লো; এখন যাই।'

'না। যেয়ো না। বোসো।'

'আর-কিছু বোলো না, মৌলি। আমাকে যেতে দাও।'

'ব'লে যাও এ সব কথা মিথ্যা!'

'মিথ্যা নয়, সত্য।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'ঐ মহেন্দ্র ঘোষ—তাঁকেই?'

'হ্যাঁ। তিনি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন বাবার কাছে। আমি রাজি হয়েছি।'

'তুমি—রাজি হয়েছো?'

'যা ভালো—যাতে ভালো হবে—আমাকে তা করতেই হ'লো।'

'ভালো? এই ভালো?' মৌলি নির্বোধের মতো আওড়ালো কথাটা, যেন ঠিক বুঝতে পারছে না। দু-হাতে মুখ ঢেকে চুপ ক'রে থাকলো একটু। হাত যখন সরালো দেখা গেলো তার নাসারন্ধ্র স্ফীত, আর চোখের কোণে লাল-লাল ছিটে। 'ভালো কেন?'

'তা তুমি এখন বুঝবে না। পরে বুঝবে। দু-বছর—হয়তো এক বছর পরেই বুঝবে যে এই ভালো হ'লো।'

চিত্রার এই কথায় তার নিজের কথারই প্যারডি শুনলো মৌলি, খানিক আগে গীতাকে সে যা বলেছিলো তারই উৎকট ব্যঙ্গানুকৃতি। আর এতক্ষণ এত কথার পরে এতেই যেন মর্মস্থলে আঘাত লাগলো তার, আঘাত লাগলো মূল্যবান আত্মাভিমানে, ধারালো চোখে চিত্রার দিকে তাকালো, গর্বিত, উৎপীড়িত, বিদ্রোহময় দৃষ্টিতে। কিন্তু মৌলি কিছু বলতে পারার আগেই, তার প্রতিবাদের চীৎকার কোনো ভাষা পাবার আগেই চিত্রা আবার কথা বললো:

'তুমি যা ভেবেছো—ভেবেছিলে—জানো না সেটা অসম্ভব?

'সেই অসম্ভব তুমি কখনো ভাবোনি? সাহস থাকে তো সত্য জবাব দাও।'

একটু চুপ ক'রে থাকলো চিত্রা, তার চোখের লম্বা পলক গালের উপর ছায়া ফেললো। তারপর যেন অনিচ্ছার বাধা ঠেলে অস্ফুটে উচ্চারণ করলো, 'আমার কথা তুমি বুঝবে না, মৌলি। তুমি পুরুষ—তুমি ছেলেমানুষ।'

মৌলির চোখে ঝলক দিলো বিদ্যুৎ। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললো, 'কী?'—'ক'-টা 'খ'-য়ের মতো শোনালো—'কী বললে?'

চিত্রাও উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে-সঙ্গে। মনে হ'লো সে হাত বাড়াবে, হাত বাড়িয়ে ধ'রে ফেলবে মৌলিকে, কিংবা হঠাৎ হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়বে ঐ মেঝের উপরেই। মৌলি একটু পিছনে স'রে গর্জন ক'রে উঠলো—'আমি ছেলেমানুষ!'

'তুমি অসাধারণ, তুমি প্রতিভাবান, তুমি অনেক বিষয়ে অনেক বড়ো—সব মানি, মৌলি; কিন্তু তুমি যে ছেলেমানুষ সে কথাও তো সত্য!' বলতে-বলতে নিশ্বাস ভারি হ'লো চিত্রার, ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম ফুটলো কপালে, কখনো কল্পনা-করা-যায়-না এমন দু-একটা কুশ্রীতার রেখায় বিকৃত হ'লো সুন্দর ছোটো মুখটি; কিন্তু তবু, তার কষ্টের খরতর উজান ঠেলে তবু সে বলতে লাগলো, 'আমি

তোমাকে ভালোবাসি, মৌলি, ভক্তি করি বলতেও বাধে না; যদি তুমি কোনোদিন পৃথিবীতে কোনো মন্ত্র প্রচার করো তোমারই কাছে দীক্ষা নেবো আমি—তোমাকে গুরু ব'লে মানতে এখনো আমার আপত্তি নেই—কিন্তু সংসার—সংসার আছে, মৌলি—মেয়ে হ'য়ে জন্ম নিয়ে সংসার থেকে মুক্তি কোথায়।' মুখটা একটু উঁচু ক'রে চুপ করলো চিত্রা, তার লম্বা-দেখানো গলার উপর অনতিস্ফুট কণ্ঠাটি স্পন্দিত হ'লো দু-এক বার, তারপর শাদা-হ'য়ে-যাওয়া ঠোঁট নেড়ে আবার বললো, 'সেই সংসারে তুমি ছেলেমানুষ, মৌলি—সেখানে তোমাকে আর-কিছুই ভাবতে পারি না।'

মনে হ'লো মৌলি তার উত্তর নিয়ে তৈরি, তার পরম পাশুপত উত্তর, যা চিত্রার পরিশ্রমী প্রাকার মুহূর্তে উপড়ে দেবে ধুলোয়, ঢেলার মতো গুঁড়িয়ে দেবে সব কথা, মুচড়ে লুটিয়ে ফেলবে চিত্রাকে চিরকালের মতো তার পায়ের তলায়। নিশ্বাসের বেগে ঠোঁট খুলে গেলো তার, কিন্তু—কিছু বললো না। হঠাৎ যেন শক্তি ফুরিয়ে গেলো, ক্লান্ত হ'য়ে এলিয়ে ব'সে পড়লো আবার, নিষ্প্রভ হয়ে, নিবে গিয়ে, যেন শরীরের আয়তনেও ছোটো হ'য়ে, মাথা নিচু ক'রে ব'সে পড়লো। আর সত্যিও তাকে দেখালো যেন দুরন্ত ছেলে উপযুক্ত ধমক খেয়েছে এইমাত্র; বলবার তার কিছুই আর নেই।

আর তারপর সেই ঘরের মধ্যে সব-কিছুই থেমে গেলো যেন। বাইরে গাছের পাতা হাওয়ায় নড়লো, ডেকে চললো অধ্যবসায়ী একলা একটা পাখি, আকাশের অম্লান নীলিমা নির্বিকার তাকিয়ে থাকলো পৃথিবীর সুখ-দুঃখের দিকে। ঘরের বাইরে বেণুর গলা শোনা গেলো—'দিদি, গাড়ি এসেছে।'

'যাই!' চিত্রা স'রে এসে মৌলির চেয়ারের পিছনে দাঁড়ালো। প্রায় কোনো শব্দ না-ক'রে ডাকলো, 'মৌলি!'

মৌলি মুখ তুললো না।

'আমি যাই তবে?'

মৌলি চুপ।

চেয়ারের পিঠের উপর দিয়ে নিচু হ'লো চিত্রা, দু-হাতে হাতল দুটো ধরলো। মৌলির চুলের গন্ধ তার নিশ্বাসে লাগলো, মৌলির মাথাটা স্পর্শ করলো তার বুক। আবার ডাকলো, 'মৌলি!'

মৌলি কথা বললো না, নড়লো না।

'তুমি কিছু বলবে না আমাকে?'

মৌলি একভাবেই ব'সে থাকলো। চিত্রার ঘনিষ্ঠ বুক থেকে মাথাটি পর্যন্ত সরিয়ে নিলো না—হয়তো তাতেই বোঝাতে চাইলো তার কাছে চিত্রা এখন কত অর্থহীন।

'একবার ফিরেও তাকাবে না?'

কোনোরকম বদল হ'লো না মৌলির ভঙ্গিতে। হয়তো তাকে ভান করতে হ'লো যে ঐ শব্দটা সে শুনছে না, তার স্ফীত শিরায় দপদপ শব্দ মাথার মধ্যে—না কি চিত্রার—না কি কানের কাছে চিত্রার হৃৎপিণ্ড, তার তৃপ্তিহীন সান্ত্বনাহীন হৃদয়স্পন্দন?

'থাক। কথা বোলো না। আমার দিকে চেয়ে দেখো না। আমি যাই। যাবার আগে শেষ কথা ব'লে যাই তোমাকে। মৌলি—তোমাকে ভালোবাসি।'

আর তারপর—মৌলির পিছন থেকে আশ্রয় স'রে গেলো, তার মাথাটি শূন্যে ঝুলে থাকলো যেন—সব শূন্য—তবু সেই হৃৎস্পন্দন থামলো না, কিংবা একটু বদল হ'লো তার, একটু অন্য রকম শোনালো। এখন মৌলিকে শুনতে হ'লো—ঠিক শুনতে হ'লো তাও বলা যায় না, শরীরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অনুভব করতে হ'লো চিত্রার অতি মৃদু দিগন্তব্যাপী পায়ের শব্দ।

বেলা বাড়লো। কমলেশবাবু সাইকেলে চ'ড়ে কোর্টের দিকে রওনা হলেন। মোড়ের কল থেকে জল নিয়ে এলো ভাঁড়ি। রোদে তেতে উঠলো শাদা ধুলোর পথ। ঘরে প'ড়ে থাকলো খাওয়া-শেষের দাগ-ধরা চায়ের পেয়ালা, কলার খোশা, রুটির গুঁড়ো। একটা রৌদ্রস্নাত নীল মাছি ভোজে ব'সে গেলো সেখানে। একবার উড়ে গিয়ে হঠাৎ একটু দূরে বসলো, বসলো পাথরের থালায় চাপা ফুলের উপর। মৌলি চুপ ক'রে দেখতে লাগলো মাছিটাকে; তাড়াবার জন্য হাত তুললো না, চুপ ক'রে ব'সে থাকলো।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

সিনেমা, রেডিও ও গ্রামোফোন্

শ্রীহরিহর শেঠ

সম্প্রতি কিছু দিন হইতে সংবাদপত্রে দেখা যাইতেছে সিনেমায় দুর্নীতি, অশ্লীলতা, কুরুচি এবং অশোভন সিনেমা-পোষ্টার ও বিজ্ঞাপনের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের একটু দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহা অবশ্যই ভাল কথা, হয়ত ইহা দ্বারা ফিল্ম-প্রস্তুতকারকেরা ও সিনেমাওয়ালারা কিছুটা সংযত হইতেও পারেন। সিনেমার জন্য সেন্সর আছে, রেডিওরও বোধ হয় দেখিবার ব্যবস্থা আছে। গ্রামোফোন্ রেকর্ডের মধ্যে যে কুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়—অবশ্য রেকর্ড বলিতে কোন কোন রেকর্ডের কথাই বলিতেছি, যাহা দ্বারা পারিবারিক আবহাওয়ার শুচিতা ব্যাহত হইতে পারে, অপরিণত বয়স, বুদ্ধি ও বিবেচনাসম্পন্ন নর-নারীর মনকে কলুষিত করিতে পারে তাহার কথাই বলিতেছি। সে সব রেকর্ডের ভদ্র ও শিষ্ট সমাজের গৃহে হয়ত স্থান না হইতে পারে, কিন্তু অধুনা প্রায় যে কোন পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানে কিছু না হউক—মাইক্, লাউড-স্পীকারের সহায়তায় গ্রামোফোন্ রেকর্ডের দ্বারা পাড়া এমন কি দূরস্থিত পল্লী মাৎ করিয়া ভোর হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অবিরত ধ্বনিত হইতে দেখা যায়। যে সকল ভদ্র সজ্জন ব্যক্তিরা সাধ করিয়া সে সব রেকর্ড বাটীতে আনিতে দেন না, তাঁহাদের বাটীর ছাদেও বিবাহ-আদি উৎসবে সেই সব রেকর্ডের গান-কৌতুকাদি উচ্চ রবে বাজিতে শুনা যায়। তাহা শুধু উৎসব-বাটীর শত শত আহূতই নহেন পল্লীস্থ সকলেই তাহা শুনিতে বাধ্য হন।

জানি, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাহা যে অনুষ্ঠিত হয় গৃহস্বামীর অনুমোদনে, তাহা নহে। ছেলেমেয়েদের সখে মাইক্ আইসে, আর মাইকওয়ালার রুচি অনুসারেই রেকর্ড নির্ব্বাচিত হইয়া কখন 'বন্দে মাতরম্' 'জনগণমন' অথবা 'প্রহ্লাদচরিত্র' 'নিমাই সন্ন্যাসের' পালার পরই হয়ত মা কালীর কাছে স্বামীকে অন্ধ করিয়া দিবার জন্য মা মা বলিয়া কাতর প্রার্থনা, বা 'কোথায় গেছে পালিয়ে গেছে আমার বৌ' অথবা সেই ঠাকুরপো বৌদিদির সরস গান—'ঠাকুরপো একটুখানি রও' (Regal 1203) গীত হইতেছে। এ সব দেখিবার কি কেহ নাই, না দেখিবার আবশ্যকতা নাই, না রোধ করিবার মত আইনের বিধান নাই? যদি থাকে তবে এদিকে দৃষ্টির অভাব কেন? যদি সেরূপ কোন আইন না থাকে তবে কি উহার আবশ্যকতা নাই অর্থাৎ এ সবের দ্বারা দুর্নীতির প্রশ্রয় পায় না ইহাই বুঝিতে হইবে?

জানি না, হয়ত এক সম্প্রদায় বলিতে পারেন, গ্রামোফোন সিনেমা রেডিও এ সব ও মানুষকে আনন্দ দিবার বা শ্রবণ ও দর্শন-সুখ লাভের দ্বারা অবসর কাটাইবার জন্য। তদুত্তরে এই কথাই বলা যাইতে পারে, অবসর-বিনোদনের জন্য এ সকলের আবশ্যকতা অবশ্য স্বীকার্য। সে জন্য উৎকৃষ্ট গান, নাটক, হাস্য-কৌতুক এ সবেরও অভাব নাই। প্রেমমূলক বেশ ভাল ভাল গানও ত আছে। যাহাতে রুচি কলুষিত হইতে পারে, তরুণ-মনের মধ্যে অবাঞ্ছনীয় ভাব আসিতে পারে, তাহা বর্জ্জন করাই বিধেয়। শুধু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্যই নহে, জ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তারে, বহু বিষয় অভিজ্ঞতা জন্মাইয়া দিবার পক্ষে এ যুগের এই সব আবিষ্কার খুবই মূল্যবান। বিজ্ঞানের ইহা অপূর্ব্ব দান তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যাহা ত্যাজ্য তাহা পরিহার করা কি কর্ত্তব্য নহে? কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া যাহার দ্বারা অনর্থের ভিত্তি রচিত হইতে পারে তাহার মূল উৎপাটিত হওয়াই উচিত মনে করি।

সুন্দর অভিনীত রম্য-কাহিনী পর্দ্দায় ফেলিয়া, অথবা দেশ-বিদেশের দৃশ্যাবলী অথবা রীতি-নীতি যাহা হয়ত বহু লোকের জীবনে কখন দেখা সম্ভব হইবে না তাহা দেখাইয়া নর-নারীকে আনন্দ দান ও জ্ঞানার্জ্জনের সুযোগ দিতে বুঝি সিনেমার তুলনা নাই। ইহার দ্বারা ফিল্ম-প্রস্তুত কারখানা হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রেক্ষাগৃহের সংশ্রবে, ছাপাখানা, সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন, পোষ্টার, রেষ্টুরেণ্ট, চায়ের দোকান, গাড়ি, ট্যাক্সি, রিক্শ প্রভৃতির দ্বারা হয়ত বা কোটি কোটি লোকের অন্নসংস্থানের উপায় হইতেছে। রেডিওর দ্বারাও জগতের কত উপকার না হইতেছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংবাদ সারা জগতে পরিবেশন করিতে, দেশ-বিশ্রুত জনগণের বক্তৃতাদি শুনাইতে ইহা অদ্বিতীয়। গান, নাটক, কৌতুক-কথা অথবা নীতি-ধর্ম্মবিষয়ক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত জনহিতকর পালাদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে শুনাইতে বা বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা দিতে ইহার মত আর কি আছে? পৃথিবী হইতে বহু দিন বিদায় লইয়াছেন এমন সব মহাপুরুষ এবং প্রিয়জনের কণ্ঠস্বর এবং সুলভে শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকার গীত-বাদ্যাদি শুনাইতে গ্রামোফোনের তুলনা নাই। অন্য দিকে রেডিয়ো ও এই অনাড়ম্বর ছোট যন্ত্রটির সহযোগিতায় কতই না কাজ পাইয়া থাকে। বেতার যন্ত্রের দৈনিক অনুষ্ঠানে ইহা একটি অপরিহার্য্য উপকরণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মোট কথা, এই তিনটিই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের অমূল্য আবিষ্কার।

সিনেমা, রেডিও ও গ্রামোফোনে কি হইয়াছে কি হইতেছে তাহা মোটামুটি বলা হইল। কিন্তু কি হইতে পারে, আরও কি প্রভূত উপকার, জনকল্যাণ সাধনার্থ আনন্দ দানের সহিত বহু বিষয়ে কি শিক্ষা কি জ্ঞান দিতে পারে, এমন কি ইহাদের মাধ্যমে স্কুল-কলেজের শিক্ষা দেওয়া বিশেষ করিয়া গণশিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার কার্য্যকারিতা বিষয় কত কাজে লাগিতে পারে তাহাও ভাবিয়া দেখিবার অথবা ভাবিয়া কাজে লাগাইবার অবসর কাহারও নাই। বলা বাহুল্য দেখিবার লোক যাঁহারা তাঁহাদের কথাই বলিতেছি। সিনেমার কার্য্যকারিতার বিষয় যে তাঁহাদের অজ্ঞাত, নিশ্চয়ই তাহা নহে। আজ যাঁহারা নির্ব্বাচন প্রোপাগ্যাণ্ডার জন্য রেডিওকে কাজে লাগাইতেছেন, নির্ব্বাচন সম্পর্কীয় ব্যবস্থা ও কার্য্যপ্রণালী বুঝাইবার জন্য বহু অর্থব্যয়ে সিনেমা-ফিল্ম প্রস্তুত করাইয়া সাধারণ জনগণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে রেডিও, সিনেমাকে আরও কত মানব-কল্যাণের কাজে লাগাইতে পারেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু হায়, তাহার কথা ভুলিয়া অনেক সময় ক্ষীরটুকু ফেলিয়া নীরটুকু গ্রহণেই কি আমরা সমধিক যত্নবান নহি?

অন্যান্যের মধ্যে বিশেষ করিয়া সিনেমার মাধ্যমে আমাদের

যে অনিষ্ট হইতেছে সে বিষয় এখনও আবশ্যকানুরূপ প্রতিকার না হইলেও লোকের দৃষ্টি আছে, সরকারেরও দেখিবার ব্যবস্থা আছে। রেডিয়োও খাস সরকারের পরিচালনাধীন। যে বিষয়টির প্রতি এতাবৎ কোন লক্ষ্য দেখি নাই, কাহাকেও কোন কথা বলিতে শুনি না, যাহার তত্ত্বাবধায়ক কেহ আছেন বলিয়া জানি না—পারিবারিক তথা সামাজিক দুর্নীতি প্রশ্রয় যাহাতে না পায় মাত্র সেই উদ্দেশ্য লইয়া সে বিষয়টির দিকে যাহাতে দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এখানে তাহাই আমার প্রয়াস।

মনে পড়িতেছে, সে আজ প্রায় পঞ্চদশ বৎসর হইল চন্দননগরে বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে মূল সভাপতি পরম শ্রদ্ধেয় মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সাহিত্যে দুর্নীতির কথা প্রসঙ্গে বিজ্ঞাপনে Bustofine tabletএর কথা উল্লেখ করায় যেন কোন সাময়িক পত্রিকায় বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার এদিকেও দৃষ্টি আছে এই বলিয়া বিদ্রূপোক্তি করা হইয়াছিল। জানি না, আমাকেও গ্রামোফোন রেকর্ডের কুরুচিপূর্ণ গানগুলির কথা উল্লেখ করায় নিন্দনীয় বা বিদ্রূপের পাত্র হইতে হইবে কি না।

ষ্টুডিয়ো-পরিচিতি—অরোরা ফিল্ম

শ্রীরমেন চৌধুরী

তের নং বাস থেকে নেমে ডান ধারে নারকেলবাগান নর্থ রোড। উত্তর পথের (নর্থ রোড) দক্ষিণ দিকে সোজা এগিয়ে গেলে পৌঁছোতে সময় লাগে বড়-জোর আড়াই মিনিট। সামনেই ফটক বন্ধ অবস্থায় রয়েছে, ডান পাল্লাটির মাঝখানের খানিকটা কেটে আর একটা খুদে দরজা বানানো হয়েছে। ফটক বন্ধ থাকলে এই ক্ষুদ্র পথেই সবাই আনাগোনা করে থাকেন মাথা নিচু করেই। 'যে দেশের যে আচার'—আছাড় খাওয়া রোধ করে ভেতরে ঢুকলুম। দরোয়ান সংগে সংগে চললো। ডান দিকে ছোট বাগান, কাঁটা-পুকুর (পুকুর নয়, প্রদর্শন বিভাগীয় কার্যালয়) পেছনে ফেলে নাতিদীর্ঘ পুষ্করিণীটির সামনে হাজির হলুম। দেখলুম বাঁদিকে গাড়ি-বারান্দার তলায় কয়েক জন ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁদের প্রথমেই সৌম্যদর্শন পলিতকেশ ভদ্রলোকটি স্বাগত জানালেন। ভেতরের অফিস-ঘরে গিয়ে আসন নিলুম। অনুমানে বুঝলুম ইনিই সেই সুপরিচিত আলোকচিত্রী দেবী ঘোষ—যাঁর অক্লান্ত সাধনায় ও প্রচেষ্টায় অরোরা সিনেমার সৃষ্টি। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে অরোরা সিনেমা বাঙলা দেশে—কেবল বাঙলা বলি কেন, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও চিত্র প্রদর্শন ক'রে তখনকার দিনের জনসাধারণের আনন্দবর্ধন করেছে এবং বিভিন্ন নরনারীকে ছায়াছবির মায়ায় জড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ম্যাডান কোম্পানীর একচ্ছত্র আধিপত্যে ভাগ বসাতে যারা সে যুগে অগ্রণী হয়েছিলো তাদের অন্যতম হোলো আরোরা সিনেমা প্রতিষ্ঠান। গ্রামে গ্রামে তাঁবু খাটিয়ে, বাড়িতে ও বাগানবাড়িতে এবং হেথায়-হোথায় বায়না নিয়ে ছবি দেখিয়ে বেড়িয়ে অরোরা সিনেমা আজ বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা-মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে কতোখানি আসন-অধিকারে সমর্থ হয়েছে, তার বিষয় নতুন করে নিশ্চয় বলতে হবে না। প্রথম পূর্ণাংগ চিত্র নির্মাণের সম্মান ছাড়াও সরকারী প্রচারচিত্রের স্রষ্টা অরোরা কর্তৃপক্ষ চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্থান অধিকার করে থাকবেন নিঃসন্দেহে!

ঢং করে পেটা-ঘড়ি বাজলো—সাড়ে চারটে। নির্ধারিত সময়ের বেশ আগেই হাজির হয়েছি তাহলে। বাঙালীর চিরকালের দুর্নাম আমার হাতে বৃদ্ধি পায়নি দেখে খুশী মনে চাইলুম ফেলে-আসা-দিনের স্মৃতির গহনে তলিয়ে-যাওয়া ওই মানুষটির দিকে। কালের চিহ্ন চুলের মাঝে আত্মপ্রকাশ করলেও মনের কোণে

অবিশ্রি কাজের লোকের এই-ই তো ধরণ—যাঁরা পৃথিবীতে এসেছেন কিছু-না-কিছুর নিদর্শন রেখে যেতে, তাঁদের আক্রমণ করবে জরা, এও কি সম্ভব! এখনও প্রয়োজনে পঁয়ষট্টি বছরের উৎসাহী চিত্রশিল্পী দেবী বাবুকে ক্যামেরার হাতল ধরতে হয়, ট্রাকে বসে look through করতে হয় প্রাণোচ্ছল নব্য যুবকের মতই। মনে-মনে মাথা নত করলাম। দিনে-দিনে আমরা আজকের নবীনেরা অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলছি বটে, প্রাণশক্তি, কর্মস্পৃহা, আরো কত্তো কি!

চা দিয়ে গেল বেয়ারা। চোখ খুলে কাপে চুমুক দিয়ে শুরু করলেন শ্রদ্ধেয় ঘোষ মশাই তাঁর জীবনের কাহিনী, কারণ তাঁর জীবনের সংগে অংগাংগী ভাবে জড়িত এই অরোরা ফিল্ম। যখন ছেলেরা পুঁথির পড়া নিয়ে হাবুডুবু খায় সেই সময় কি করে তিনি ইস্কুলের পড়া শেষ করে আর্ট ইস্কুলে ছবি আঁকা ও ড্রাফটস্‌ম্যানের কাজ শিখে তখনকার সোনার দিনে যথেষ্ট মোটা মাইনের চাকরি ছেড়ে বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, ফলে পারিবারিক নানা অশান্তির মাঝে কাল কাটাতে হয়েছিলো, সে বিবরণী শুনতে পেলুম

অরোরা ফিল্মস ষ্টুডিও

ললিত-কলা ও আলোকচিত্রের ওপর সেই বয়েসে কতখানি অনুরাগ ছিলো তার পরিচয় পেলাম নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি মোটা মাইনের চাকরি প্রত্যাখ্যানের মাঝে। ফটোগ্রাফী শিক্ষায় ও বাঙলার পল্লী-মায়ের খুঁটিনাটি পরিচয় সংগ্রহে কয়েকটা বছর কাটিয়ে দিয়ে দেবী বাবু তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু চারু ঘোষের সংগে ছবি দেখিয়ে বেড়ানোর বন্দোবস্ত করলেন। প্রথম প্রথম সখের ব্যবসা হিসেবে চললো এ-বন্ধু সে-বন্ধুর বাড়িতে ছবি দেখানো। তার পর অরোরা সিনেমা নামে পেশাদার শিশু-প্রতিষ্ঠান ভূমিষ্ঠ হোলো কলকাতার বুকে ১৯১১ সালে। এই এগারো সাল বাঙলা দেশের পক্ষে নানা কারণে স্মরণীয়। এগারো সালেই ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়, এই বছরে আই, এফ, এ শীল্ড প্রথম ভারতীয় দল মোহনবাগান লাভ করে ইত্যাদি। অরোরাও এই সময়ে জন্ম নিলো।

তখনকার দিনে ছবিঘরের সংখ্যা ছিলো নাম মাত্র—অলিতে-গলিতে ব্যাঙের ছাতার মত নানা নামের ছিলো না কিছুই। বড়লোকের বাড়িতে কিংবা মেলা প্রভৃতিতে যাত্রাপার্টির ধরণে ছবি দেখানো হোতো বায়না নিয়ে। সেই কাজই শুরু করলেন দেবী বাবু ও চারু বাবু মিলে। প্রথম বায়না পেলেন মজঃফরপুরের কুখ্যাত কেনেডি সাহেবের বাগান-বাড়িতে। অল্প সময়ের মধ্যে পসার জমে এলো। নানা জায়গায় ডাক পড়তে লাগলো। এই অবসরে এঁদের সংগে হাত মেলালেন আর এক জন কর্মবীর—তিনি হচ্ছেন অনাদিনাথ বসু। নাওয়া-খাওয়া ভুলে এঁরা ছবি দেখিয়ে বেড়াতে থাকলেন। চোদ্দ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো···কাতারে কাতারে আহত সৈন্য রণাংগন থেকে ফিরিয়ে এনে নতুন সৈন্যে তাদের স্থান পূর্ণ করা হোতে লাগলো। কলকাতার সেনানিবাসগুলিতে আনীত সেই আহত যোদ্ধাদের আনন্দ দানের ব্যবস্থা করলেন তদানীন্তন বাঙলা সরকার। ম্যাডান কোম্পনী ও আর ২।১টি প্রতিষ্ঠানের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে অরোরা সিনেমা প্রথম সরকারী বরাত (order) লাভ করলো।

সাড়ে তিন বছর ধরে সৈন্যদের প্রীতি সম্পাদন করে অরোরা সিনেমা কর্তৃপক্ষ থিয়েটারের সংগে কিছু-কিছু নাটকীয় দৃশ্য চিত্রে রূপায়িত করে দেখাতে থাকেন। থিয়েটারের শিল্পীদের দিয়ে এই সব ছবির কাজ হওয়ায় জিনিসটা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ সময়ে দৃশ্যাভিনয়ের চিত্ররূপই সাধারণত দেখানো হোতো। অরোরা কর্তৃপক্ষ পূর্ণাংগ ছবি তুলে আমাদের দেশের সে অপূর্ণ প্রচেষ্টাকে সার্থক করলেন। তৈরি হোলো সাত রীলের 'রত্নাকর' ছবি। দেবী বাবু ক্যামেরার কাজ করলেন, পরিচালনা করলেন এঁদেরই বন্ধু সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়। নাট্য-জগতের তদানীন্তন বিশিষ্ট নট চুণীলাল দেব রত্নাকরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। রত্নাকর প্রথম পূর্ণ-দৈর্ঘ্য ছবি হলেও ওই সময়েই অন্যত্র ধীরেন গাঙ্গুলী মশাইও (ডি. জি.) 'বিলাত ফেরৎ' পূর্ণাংগ ছবিটি তোলেন। এই সংগে অরোরার টুকিটাকি বলে 'দাব্বুর কেলেংকারী' নামে ছোট্ট ছবিও দেখানো হয়। এর পর ২১ সালে সুরেন বাবুর পরিচালনাধীনেই ছবি উঠলো 'বিদ্যাসুন্দর'। এবারে পূরো দশ চিত্রনির্মাণ বন্ধ রেখে অরোরা সিনেমা আবার ছবি দেখানোর কাজে আত্মনিয়োগ করলো। 'কৃষ্ণ-সখা' (কৃষ্ণ সুদামা) চিত্রের দেখা পাওয়া গেল ২৩।২৪ সালে। আজকের দিনের প্রখ্যাতনামা অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীকে এই 'কৃষ্ণ-সখা'য় কেবল মাত্র পরিচালক-রূপে দেখা গেল। আর্ট থিয়েটারের নট-নটীরা বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করলেন, তার মধ্যে সুদামার চরিত্রে সন্তোষ সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। জহর গাঙ্গুলীও ছোট একটি চরিত্রে অবতীর্ণ হন।

২৫ সালে সরকার থেকে প্রচারচিত্র তোলার ব্যবস্থা হয়—অরোরার ডাক পড়লো সেখানে। ম্যালেরিয়ার বাঙলা-বিজয় অভিযান রোধকল্পে এক রীলের নির্দেশনামা উঠলো অরোরার তত্ত্বাবধানে। সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর কেটে গেছে, আজও সরকারের সংগে সে সম্পর্ক এঁদের ছিন্ন হয়নি; সরকারী সংবাদ চিত্রাদির নির্মাণকার্য সমান হারেই এঁদের তত্ত্বাবধানে এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এর পরের বছর অর্থাৎ ২৬ সালে স্বর্গত নাট্যকার ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেলোর কীর্তি'র চিত্ররূপ দিলেন অরোরা কর্তৃপক্ষ। আবার বিরতি চললো ২।৩ বছরের। অনুমান ২৯ সালে প্রখ্যাত পরিচালক নিরঞ্জন পাল মশাই ইউরোপ থেকে ফিরে এসে এখানে 'পূজারী' ছবি তুললেন। এই সময়েরই ৺যোগেশ চৌধুরীর পরিচালনায় 'নিয়তি' তোলা হোলো। ছবি দেখানোর (Touring cinema) ফাঁকে-ফাঁকে এই চিত্রনির্মাণের প্রচেষ্টা থাকায় নিয়মিত ভাবে ছবি তোলার ব্যবস্থা এঁরা তখনো করেননি। তাই আবার কয়েক বছর এঁদের নিজস্ব কোনো ছবির দেখা পাওয়া গেল না। ৺প্রমথেশ বড়ুয়া 'বড়ুয়া ষ্টুডিয়ো' খুলেছেন তখন; '১৯৮৩ সালের বাঙলা' প্রভৃতি ছবি তুলে তিনি সুবিধা করতে পারছেন না—অরোরা কর্তৃপক্ষ এগিয়ে গেলেন, বড়ুয়া-ষ্টুডিয়োর সাহায্যে প্রসারিত করলেন দক্ষিণ হস্ত। সবাক্ ছবি 'নিশির ডাক', 'মহানিশা' প্রভৃতির চিত্রগ্রহণে সক্রিয় সহযোগিতা করলেন এঁরা। 'সতী সাকুবাঈ' 'সতী অনুসূয়া' (দু'টিই মাদ্রাজী) 'টার্জন-কি-বেটি' (হিন্দি) এই ব্যবস্থায় গৃহীত হোলো।

এতো দিন ধরে অরোরা সিনেমা নামেই কাজ হচ্ছিলো, এবার হোলো তার পরিবর্তন। চিত্র-প্রযোজনার কাজ ভিন্ন-নামে অর্থাৎ অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন সংজ্ঞায় শুরু করা হোলো। যদিও ছবি দেখানোর কাজ অরোরা সিনেমা নামে এখনও হয়ে থাকে। নারকেলডাঙার বর্তমান জায়গায় ১৯৩৯ সালে আস্তানা গাড়লেন এঁরা। পরের বছর উঠলো পাকা ফ্লোর, হোলো পরিপাটী ষ্টুডিয়ো বাড়িটি। নিরঞ্জন পালের পরিচালনায় উঠলো 'আন্ধা'। পাল মশাই পরিচালিত ফিল্ম প্রোডিউসার্সের 'শুকতারা' ছবিটিরই হিন্দি সংস্করণ এবং এটিই পাল মশাই প্রথমে তুলেছিলেন। তার পর উঠলো মাদ্রাজী ভাষায় 'শংকরাচার্য'। ক্রমে 'পতিব্রতা,' 'সন্ধ্যা' "পথের সাথী" "বন্ধুর পথ' দেখা দিলো। এখানে বলা দরকার যে, নিউ থিয়েটার্সের অধিকাংশ ছবির পরিবেশনা এঁরাই যোগ্যতার সংগে করে এসেছেন এবং আজও এক নম্বর নিউ থিয়েটার্সের যাবতীয় বাঙলা ছবির পরিবেশন-স্বত্ব আইন অনুসারে এঁদেরি।

কিছু দিন আগে ছোটদের জন্যে 'খেলাঘর', 'বোধোদয়' ও 'ছুটির

বছরের প্রথম ছবি হোলো 'প্রহ্লাদ'—এখনও তার উপস্থিতির উত্তাপ জেগে আছে ধর্মপ্রাণ দর্শকের মনে। অনেক দলিল-চিত্রও (Documentary film) এরি ফাঁকে এঁরা তুলেছেন।

প্রবীন আলোকচিত্রী ননীগোপাল সান্যাল মশায়ের সংগে পরিচয় হোলো। অমায়িক ভদ্রলোক। দেবী বাবুর সংগে বহু দিন একত্রই আছেন। অবিশ্যি এঁরা অবসরপ্রাপ্তের (retired) দলে। বংকু রায় ও সরোজ মিত্র অধিকাংশ চিত্রে ক্যামেরার হাতল ঘুরিয়ে থাকেন। শব্দযন্ত্রের দায়িত্ব নিয়ে আছেন সত্যেন দাশগুপ্ত ও পরেশ দাশগুপ্ত। সত্যেন বাবুও তাঁর স্মৃতির পাতা থেকে কিছু সম্পদ দিলেন আমার লেখনী চালনার সাহায্যের জন্যে প্রকৃতপক্ষে অরোরা ষ্টুডিয়ো আজকের দিনের বহু ষ্টুডিয়োরই অগ্রজ! বেয়াল্লিশ বছর—হ্যাঁ, এই সুদীর্ঘ সময়ের বাধা-বিপত্তির বেড়াজাল ডিঙিয়ে কর্তৃপক্ষ আগেকার মতই পূর্ণোদ্যমে কাজ করে চলেছেন। আজ অনাদি বাবু নেই, ছেলে অজিত বসু আছেন, তিনিই কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। আর আছেন দেবী বাবু স্বয়ং। দেবী বাবুর সেদিনের ত্যাগস্বীকার, কৃচ্ছ্রসাধনা সার্থক হয়েছে। বোধ হয় সেই সার্থকতার স্নিগ্ধ শান্তির আলো সেদিন ওঁর চোখে দেখেছি···অবসর-দিনে এ অবলম্বন ক'জনের ভাগ্যে জোটে?

— সাহিত্য-পরিচয় —

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—(প্রথম খণ্ড) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। সিগনেট বুকশপ, ১২ নং বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

MAHATMA (Life of Mohandas Karamchand Gandhi—Vol II—D. G. Tendulkar The Times of India Press. Fort Bombay. Rs 25/-

দীনবন্ধু মিত্র—শ্রীসুশীলকুমার দে। এ, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, ২ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য এক টাকা আট আনা।

নির্জ্জন স্বাক্ষর—বুদ্ধদেব বসু। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য তিন টাকা.

নদী ও নারী—হুমায়ুন কবীর। ওরিয়েন্ট লংম্যানস্ কোং। ১৭ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

সচিত্র হস্তরেখা বিচার—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী, ১০৫ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য তিন টাকা।

জেলখানা কারাগার—নিকুঞ্জ সেন। গণদীপায়ন পাবলিশার্স, ১৭০-এ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—৪। মূল্য তিন টাকা।

প্রতিশ্রুতি—শ্রীবনবিহারী ঘোষাল। মজুমদার লাইব্রেরী, ১৮ নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

স্বপ্নাতুরা—শ্রীসুশীলচন্দ্র চাটোপাধ্যায়। ৮।৫৩ নং ফার্ণ রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

স্মৃতিকথা—শ্রীমৃণালকান্তি বসু। ৪৬ নং সাউথ এণ্ড পার্ক, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

স্বপ্ন ও সংগ্রাম—অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। সাধনা মন্দির, ৫৫ নং নারায়ণ রায় রোড, বড়িষা, কলিকাতা—৮। মূল্য দুই টাকা।

ছড়ায় ছবিতে জানোয়ার—শ্রীসুনির্ম্মল বসু। শিশু সাহিত্য সংসদ, ৩২-এ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

মহাদেশ—শ্রীমতী আভা দেবী। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

ভক্তিধারা—শ্রীরামকৃষ্ণদাস অধিকারী। শ্রীভক্তিরঞ্জন, চরভবানীপুর, পোঃ বলাগড়, জিঃ হুগলী। মূল্য ছয় আনা।

শমন-দূত—শ্রীতারাপদ ঘোষ। ১০ নং শ্রীরাম ঢ্যাং লেন, শালিখা, হাওড়া। মূল্য এক টাকা।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত লাইব্রেরী—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। সাধন-আশ্রম, ২১০।৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

সাবিত্রী—(প্রথম খণ্ড) ৮০, সপ্তকাণ্ড রামায়ণ—(দ্বিতীয় খণ্ড) ॥০, ভুখা ভারত—(তৃতীয় খণ্ড) ॥০ বিমলচন্দ্র ঘোষের কাব্যগ্রন্থমালা: কাব্যলোক: ১ যদু ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা—২৬।

তত্ত্বজিজ্ঞাসা—শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দাসগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য—২৲।

আত্মিতত্ত্ব—শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ। ১২।১ কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, মূল্য ১।০।

সাহিত্য পাঠকের ডায়েরী। (১ম পর্য্যায়)—শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র। গুপ্ত প্রকাশনী, ৮ গুপ্ত লেন, কলিকাতা। মূল্য ৪।০।

সোভিয়েট মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। এ মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা—১২। মূল্য ২।০।

গান্ধী ও ষ্টালিন: লুই ফিসার—শ্রীমতী কমলা দত্ত কর্ত্তৃক অনূদিত। রীডার্স কর্ণার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য ৪৲।

সেরা গল্প—মহাবীর দীপজ্যোতি প্রকাশনীর পক্ষে শ্রীমহাদেব ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৪৪।১ শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ॥০।

কারেণ্ট এফেয়াস—সম্পাদক শ্রী এ, আর, মুখার্জ্জী। এ মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৪৲।

HINDUSTHAN YEAR BOOK : S. C. Sarkar. M. C. Sarkar & Sons Ltd. 14 Bankim Chatterjee Street, Calcutta. Price Rs 3/12/-

সিদ্ধান্ত রত্নমালা—শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রায় বাহাদুর গঙ্গানন্দ মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট, পুরুলিয়া (মানভূম)। মূল্য ১।০।

সন্তানচর্য্যা—শ্রীসুনীতিকুমার পাল। রঞ্জন ভিলা, দেওঘর। মূল্য ১।৵০।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনী—

রোমের পর লিস্‌বন। গত নবেম্বর মাসে (১৯৫১) রোমে উত্তর-আটলাণ্টিক ট্রিটি কাউন্সিলের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনেও পশ্চিম ইউরোপীয় বাহিনী সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। অতঃপর দুই-দুই বার লিসবন সম্মেলনের তারিখ পিছাইয়া দেওয়ার পর ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) এই সম্মেলন আরম্ভ হয় এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারী এই অধিবেশন শেষ হইয়াছে। উত্তর-আটলাণ্টিক ট্রিটি কাউন্সিলের লিস্‌বন অধিবেশনের প্রকাশিত বিবরণ আলোচনা করিলেও এই সম্মেলনের প্রকৃত ফলাফল অনুমান করা বড় সহজ হয় না। এই সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির আলোচনা করিলেই অনিশ্চিত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এই অধিবেশনে ছয়-রাষ্ট্র ইউরোপীয় বাহিনী পাঁচ লক্ষের অধিক সৈন্য লইয়া গঠিত হওয়ার এবং উহার এক-চতুর্থ অংশ জার্ম্মাণ হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ছয়টি রাষ্ট্রের নাম: ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইটালী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম এবং লুক্সেমবার্গ। এই সৈন্যবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার পূর্ব্বে ইউরোপীয় রক্ষা সংহতি (European Defence Community) গঠন করিবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত সন্ধিপত্র উক্ত ছয়টি রাষ্ট্রের পার্লামেণ্ট দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে। ইউরোপীয় রক্ষা সংহতি অর্থাৎ ইউরোপীয়ান্ ডিফেন্স কমিউনিটি গঠনের প্রস্তাবও উত্তর-আটলাণ্টিক ট্রিটি কাউন্সিল কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। উক্ত ইউরোপীয় রক্ষা সংহতি উত্তর আটলাণ্টিক ট্রিটি কাউন্সিলের গঠনতন্ত্রের মধ্যেই কার্য্যকরী হইবে। এই অধিবেশনে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীতই শুধু হয় নাই, উহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্যও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সৈন্যবাহিনীর দিক দিয়া উত্তর-আটলাণ্টিক ট্রিটি কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উক্ত কাউন্সিলের সদস্য রাষ্ট্রগণ বর্ত্তমান বৎসরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ৫০ ডিভিশন সৈন্য এবং ৪ হাজার বিমান পশ্চিম ইউরোপে প্রস্তুত রাখিবে। তা ছাড়া শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরের জন্য যে সৈন্যবাহিনী নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে তাহা পশ্চিম ইউরোপের বর্ত্তমান স্থলবাহিনীর দ্বিগুণ। অথচ এ বৎসর জার্ম্মাণ সৈন্য পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। মোট সৈন্যবাহিনী ১৯৫৪ সালের মধ্যে ৮৫ ডিভিশন অথবা ১০০ ডিভিশন পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হইবে। পশ্চিম ইউরোপ রক্ষার জন্য কি পরিমাণ সৈন্য প্রস্তুত রাখা সম্ভব হইবে তাহা যে সকল অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে তন্মধ্যে সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা এবং ইউরোপীয় বাহিনীতে জার্ম্মাণ সৈন্য গৃহীত হওয়া অন্যতম। সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা অদূর ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে প্রথম অবস্থাটি। এ সম্পর্কে কাহারও পক্ষেই কিছু অনুমান করা বোধ হয় সম্ভব নয়। ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনীতে জার্ম্মাণ সৈন্য গৃহীত হওয়ার প্রশ্ন যদিও সমাধানের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তথাপি সম্মুখে এখনও কঠিন বাধা রহিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপের ছয়টি রাষ্ট্রের পার্লামেণ্টে ইউরোপীয় রক্ষা সংহতি গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইউরোপীয় বাহিনীতে জার্ম্মাণ সৈন্য গ্রহণের সমস্যা শিকায় ঝুলিতে থাকিবে। পশ্চিম ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থায় পশ্চিম জার্ম্মাণী যে একটা প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রুসাল্‌সে উত্তর-আটলাণ্টিক ট্রিটি কাউন্সিলের যে অধিবেশন হয় তাহাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, জার্ম্মাণ সৈন্য গৃহীত না হইলে পশ্চিম ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থা দৃঢ় হইবে না। জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার সম্ভাবনায় ফ্রান্স স্বাভাবিক ভাবেই শঙ্কিত না হইয়া পারে নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যেখানে পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার পক্ষপাতী, সেখানে ফ্রান্সের তাহা ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থায় জার্ম্মাণ সৈন্য গ্রহণ করিয়াও সামরিক জার্ম্মাণীর অভ্যুত্থানের বিপদ হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায়, ইহাই হইয়া উঠে ফ্রান্সের প্রধান চিন্তার বিষয়। এই চিন্তার ফল হইল ইউরোপীয় বাহিনী গঠন সম্পর্কে প্লেভাঁ পরিকল্পনা। কিন্তু ইউরোপীয় রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য কি সর্ত্তে সৈন্য, অস্ত্র-শস্ত্র এবং অর্থ পশ্চিম-জার্ম্মাণীর নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে, ইহাই প্রধান প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টার ফল হইল 'ইউরোপীয় রক্ষা সংহতি'র পরিকল্পনা। পশ্চিম-জার্ম্মাণীও বুঝিতে পারিল ইউরোপীয় রক্ষা-ব্যবস্থার তাহার গুরুত্ব সর্ব্বাধিক। কাজেই ইউরোপীয় রক্ষা-ব্যবস্থায় যোগদানের যে সর্ব্বোচ্চ মূল্যই পশ্চিম-জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেনেয়ুর দাবী করিবেন, ইহাও খুব স্বাভাবিক। তাছাড়া তাঁহার নিজের সমস্যাও বড় কম নয়। শুধু বন্ পার্লামেণ্টে বিরোধিতার কথাই নয়, পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীর চাপের কথাও তাঁহাকে ভাবিতে হইতেছে। পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীকে বিদেশ বলিয়া উপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।
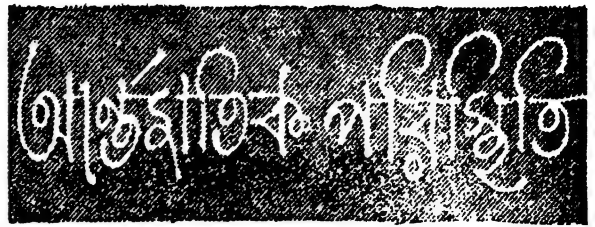
ডাঃ এডেনেয়ুর স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন যে, ইউরোপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবই শুধু বৃদ্ধি পায় নাই, তাহার স্বার্থের পরিমাণও বাড়িয়াছে। ফ্রান্স তাহার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য লইয়া কিরূপ বিব্রত তাহাও তিনি দেখিতে পাইতেছেন। ইউরোপীয় ফেডারেশন সম্পর্কে বৃটেনের ঔদাসীন্যও তাঁহার দৃষ্টিতে এড়ায় নাই। সোভিয়েট রাশিয়া পশ্চিম ইউরোপ আক্রমণ করিবে, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন বলিয়াও মনে হয় না। পশ্চিম-জার্ম্মাণীর উপর দিয়া লাল ফৌজের অভিযান চলে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর কেহই তাহা চায়ও না। যদি সত্যই এইরূপ অভিযান আরম্ভ হয়, তাহা হইলে পশ্চিমী শক্তিবর্গ বাধ্য হইয়া উহার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিবে এবং পশ্চিম-জার্ম্মাণী অস্ত্রসজ্জিত না হইলে ক্ষতির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইবে বলিয়াই তাহারা মনে করে! এই জন্যই পশ্চিম-জার্ম্মাণীর অনেকেই অস্ত্রসজ্জার বিরোধী। কিন্তু ডাঃ এডেনেয়ুর পশ্চিম ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থায় পশ্চিম-জার্ম্মাণীর যোগদান সম্পর্কে উত্তর-আটলাণ্টিক ট্রিটি কাউন্সিলের প্রস্তাব গ্রহণ

করিয়াছেন এবং ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে বন্ পার্লামেন্টে এই প্রস্তাব গৃহীতও হইয়াছে। কিন্তু ইহার মূল্যস্বরূপ দাবী করা হইয়াছে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত পশ্চিম-জার্ম্মাণীর সমমর্য্যাদা এবং পশ্চিম-জার্ম্মাণীর উপর যে সকল অর্থনৈতিক বাধা-নিষেধ আছে তাহার অপসারণ। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ পশ্চিম-জার্ম্মাণীর এই দাবী মানিতে রাজী হইবে কি না তাহা অনুমান করা কঠিন। তবে ফ্রান্স যে রাজী হইবে না, তাহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু ডাঃ এডেনেয়ুর হয়ত মনে করেন যে, পশ্চিম-জার্ম্মাণীর অর্থনীতি যদি সুদৃঢ় হয়, যদি পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সহিত পশ্চিম-জার্ম্মাণী সমমর্য্যাদা লাভ করে এবং সর্ব্বোপরি জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনী গঠনের যদি সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে অখণ্ড জার্ম্মাণী গঠন সম্পর্কে রাশিয়ার মত অধিকতর অনুকূল হইবে। তাঁহার এই ধারণা কতখানি সত্য তাহা আলোচনা করিবার স্থান এখানে আমরা পাইব না। কিন্তু লিসবন সম্মেলনের প্রাক্কালে ফরাসী জাতীয় পরিষদে ইউরোপীয় বাহিনী সম্পর্কে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক।

আলজিরিয়ার প্রাক্তন জেনারেল এবং সোশ্যালিষ্ট দলের প্রধান বক্তা Naegelen বলিয়াছেন, "আমেরিকানরা জার্ম্মাণ বাহিনী চাহে বলিয়া শোনা যায়। ইহা সত্য হইলে তাহাদিগকে জানাইয়া দিতে চাই যে, আমরা কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কি সোভিয়েট রাশিয়া কাহারও নীতিই পরিচালনা করি না, আমরা ফ্রান্সের নীতি পরিচালন করি।" কৃষক ইউনিয়নের প্রতিনিধি Loustaunan Lacan বলিয়াছেন, "ইউরোপীয় বাহিনী কি কোন মতবাদের প্রতিনিধি? কোন্ ইউরোপের? আক্রমণ করিবার অজুহাত সোভিয়েট রাশিয়াকে কেন দেওয়া হইবে? যদি আক্রমণ করিবার কোন অভিপ্রায়ই সোভিয়েট রাশিয়ার না থাকে, তাহা হইলে ঘুমন্ত ভালুকের নাকে সুড়সুড়ি দেওয়া কেন?" কম্যুনিষ্টদের পক্ষ হইতে ডেপুটী Mallert Joinville এই মন্তব্য করেন যে, ইউরোপীয় বাহিনী হইতে খাঁটি ঝটিকা বাহিনী নব জন্ম লাভ করিবে এবং মার্কিণ সামরিক অধিনায়কের অধীনে ফরাসী বাহিনী বৈদেশিক বাহিনীতে (Foreign Legion) পরিণত হইবে। আর-পি-এফ-এর পক্ষে জেনারেল Billotte বলেন, "সোভিয়েট রাশিয়ার ভয়ে ইউরোপে আমরা জার্ম্মাণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছি।" রেডিক্যাল দলের জরাগ্রস্ত ডেপুটী Henillard দুই জন পরিচারকের স্কন্ধে ভর দিয়া জাতীয় পরিষদে উপস্থিত হইয়াছিলেন শুধু জার্ম্মাণ বাহিনী গঠনের বিরুদ্ধে আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিবার জন্য। তিনি অনেক দিন জার্ম্মাণ কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দীদশায় কাটাইয়াছেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "যাহারা আমাকে শাস্তি দিয়াছে তাহাদের সহিত আমাদের সন্তান-সন্ততিরা সহযোগিতা করুক এবং যে মুষ্টিমেয় ফরাসী সৈন্যবাহিনীর উপর ফ্রান্সের কোন ক্ষমতাই থাকিবে না তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে জার্ম্মাণ বাহিনী সামর্থ্য লাভ করুক, ইহা আমি চাই না।" অবশেষে বিরোধীদের সহিত ফরাসী মন্ত্রিসভার আপোষ-মীমাংসার ফলে ইউরোপীয় বাহিনী সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা লইয়া এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। জার্ম্মাণ সৈন্য সম্পর্কে পশ্চিম-জার্ম্মাণী এবং ফ্রান্সের অভিমতকে বাদ দিয়া লিসবন সম্মেলনে গৃহীত ইউরোপীয় বাহিনী গঠনের সাফল্য সম্পর্কে আশা পোষণ করা কঠিন।

লিসবন সম্মেলনের পূর্ব্বে লণ্ডনে ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে মিঃ ইডেন, মিঃ এচিসন্, মঃ সুম্যান্ এবং ডাঃ এডেনেয়ুরের মধ্যে এক আলোচনা বৈঠক হয় এবং ইউরোপীয় রক্ষা-ব্যবস্থায় পশ্চিম-জার্ম্মাণীর অংশ গ্রহণের পথে যে সকল মতভেদ রহিয়াছে তাহার অধিকাংশেরই একটা মীমাংসা হয়। এই মীমাংসার ভিত্তিতেই যে লিসবন সম্মেলনে ইউরোপীয় বাহিনী এবং ইউরোপীয় রক্ষা সংহতি (European Defence Community) গঠন সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতেই এই দুইটি সমস্যার পূর্ণ সমাধান হইয়া যায় নাই। কারণ, ইউরোপীয় বাহিনী এবং ইউরোপীয় রক্ষা সংহতি সম্পর্কে যে পশ্চিম ইউরোপের ছয়টি দেশের পার্লামেন্টের অনুমোদন আবশ্যক হইবে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ছয়টি পার্লামেন্টে আবার যখন এ সম্পর্কে আলোচনা হইবে তখন আবার কি নূতন সর্ত্ত উক্ত মূল প্রস্তাবদ্বয়ের সহিত সংযুক্ত করা হইবে, তাহা এখনই অনুমান করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, ১৯৫২ সালের মধ্যে ৫০ ডিভিশন সৈন্য এবং ৪ হাজার এরোপ্লেন লইয়া আটলাণ্টিক সৈন্যবাহিনী গঠনের যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা কতখানি কার্য্যকরী হইবে, সে সম্বন্ধে অনেকের মনেই সন্দেহ রহিয়াছে। আটলাণ্টিক চুক্তির অন্তর্গত দেশগুলির আর্থিক অবস্থা এবং ফ্রান্সের চিরন্তন মন্ত্রিত্ব-সঙ্কট ৫০ ডিভিশন সৈন্যসংগ্রহে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করিবে। প্যারী হইতে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা Le Monde মনে করেন যে, ১৯৫২ সালের মধ্যে ৩০টি ডিভিশনের বেশী গঠন করা সম্ভব হইবে না। মার্কিণ দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ লভেটের ধারণা যে, ২৫টি ডিভিশন গঠিত হইতে পারে। ফ্রান্সের ঘরে-বাহিরে সঙ্কট ইউরোপীয় রক্ষা-ব্যবস্থার পথে বড় কম বাধার সৃষ্টি করে নাই। এই অবস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সকে বাদ দিয়া পশ্চিম-জার্ম্মাণীকেই শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করিবে কি না, তাহা অনুমান করা সহজ নয়। সুইজারল্যাণ্ডের দৈনিক পত্রিকা 'টাট্' এই মর্ম্মে এক বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন যে, প্যারীকে বাদ দিয়া লণ্ডনের সহিত বিশ্ব-রাজনীতিকে এবং প্যারীর পরিবর্ত্তে 'বনে'র সহিত সামরিক নীতিকে যুক্ত করিলে পরিস্থিতি বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিবে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমশঃ এই ধারণাই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিছুই বিচিত্র নয়। ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ প্রবল ভাবে রুশবিরোধী, এ কথা বলা যায় না। রুশিয়ার সম্প্রসারণ সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যতটা উদ্বিগ্ন, ফ্রান্স ততটা উদ্বিগ্ন নয়। মধ্য-প্রাচী এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের সমস্যা লইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের যেরূপ উৎকণ্ঠিত হওয়ার কারণ আছে, ফ্রান্সের সেরূপ নাই। সেই সঙ্গে জার্ম্মাণ সামরিক শক্তি সম্পর্কে ফ্রান্সের রহিয়াছে প্রবল বিরোধী মনোভাব। তাছাড়া রাশিয়াই যে ভাবী আক্রমণকারী, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার সত্ত্বেও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি তাহা স্বীকার করিতে পারিতেছে না। কাজেই মার্কিণ ডলার এবং চাপ সত্ত্বেও ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থা দানা বাঁধিতে পারিতেছে না। বৃটেনেও যে তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না তাহা নয়। গত ৬ই মার্চ্চ (১৯৫২) বৃটিশ কমন্স সভায় বিভানপন্থীরা অস্ত্রসজ্জা পরিকল্পনার বিরুদ্ধেই

গরমে...
বা ঠাণ্ডায়...
Erasmic
HIMALAYA BOUQUET SNOW
আপনি যেখানেই থাকুন...
হিমালয় বুকে স্নো
ব্যবহার করুন
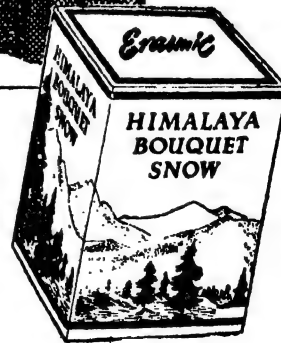
ভোট দিয়াছেন। শ্রমিক দলের এই বিদ্রোহীরা অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে ভোট দিয়া মার্কিণ নীতির বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষই শুধু জানান নাই, বিপুল সমরসজ্জা পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিকে যে কঠোর সমস্যার সম্মুখীন করিয়াছে, তাহার প্রতিই অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মালয়ে কম্যুনিষ্ট দমনের নূতন ব্যবস্থা—

বৃটিশ রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্ট গত ১৫ই জানুয়ারী (১৯৫২) জেনারেল স্যার জেরাল্ড টেম্পলারকে মালয়ের হাই-কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন। এক জন জেনারেলকে এই পদে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্য সামরিক ও অসামরিক ব্যবস্থা এক জন সমরনায়কের অধীনে আনয়ন করিয়া মালয়ের কম্যুনিষ্ট গরিলাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ তীব্রতর করিয়া তোলা। কম্যুনিষ্ট দমনের জন্য তাঁহাকে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। স্যার জেরাল্ড টেম্পলার ব্রীগস্ পরিকল্পনার কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। ব্রীগস্ পরিকল্পনার মূল কথা, কম্যুনিষ্ট গরিলাদিগকে তাহাদের সাহায্যদানকারীদের হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে নির্ম্মূল করা। জেনারেল টেম্পলার এই পরিকল্পনাকে আরও কঠোর ভাবে প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মালয় ফেডারেশনের সমর পরিষদকে মালয়ের ফেডারেল একজিকিউটিব কাউন্সিলের সহিত একীকরণ করা হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট গরিলাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ১৯৫০ সালে এই সমর পরিষদ গঠন করা হয়। মালয় ফেডারেল একজিকিউটিব কাউন্সিল মালয়ের অসামরিক শাসনকার্য্য পরিচালন করিয়া থাকেন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণের ফলে মালয়ে কার্য্যতঃ সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহাছাড়া মালয়ের সমস্ত কর্ম্মক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে জরুরী অবস্থায় নেশন্যাল সার্ভিসে যোগ দিতে বাধ্য করিবার জন্য আইন প্রণয়নেরও ব্যবস্থা হইতেছে। এই আইন পাশ হইলে ১৭ হইতে ৫৪ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক পুরুষকে তাহার নাম রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে এবং জরুরী অবস্থা উদ্ভব হইলে তাহাদিগকে কাজের জন্য আহ্বান করা হইবে।

জেনারেল টেম্পলার কঠোরতা অবলম্বন করিলেও মালয়ের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। বরং কম্যুনিষ্টরা নূতন ভাবে যে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে তাহা নিরোধ করা যেমন সহজ হইবে না, তেমনি উহা সাফল্য লাভ করিলে মালয়ে বৃটিশ শাসন কায়েম থাকা কঠিন হইবে, এইরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ আছে। এই নূতন অভিযান চলিতেছে গ্রামাঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলে সর্ব্বদা উপযুক্ত সংখ্যক পুলিশ বা সৈন্য মোতায়েন রাখা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ

নেগ্রি সেম্বিলানের বাহাউ জেলায় ১৫ জন সন্ত্রাসবাদী ১৬টি ইউরোপীয় বাগানের কাজ বন্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। জাতীয় জরুরী অবস্থা আইন কার্য্যকালে কিরূপ ফলপ্রসূ হইবে তাহা বলা কঠিন। কারণ, কম্যুনিষ্টদের প্রতি কাহার যে সহানুভূতি নাই এবং কাহার যে আছে তাহা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব।

সাড়ে তিন বৎসর ধরিয়া মালয়ে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে বৃটিশ অভিযানের ফলে ১৯৫১ সালের শেষ পর্য্যন্ত ২৬১৩ জন সন্ত্রাসবাদী নিহত হইয়াছে। ৬৫৫ জন সন্ত্রাসবাদী আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং ৮০৮ জনকে সন্দেহ করিয়া গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আহত সন্ত্রাসবাদীর সংখ্যা ১,৩৪১ জন। ইহা সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদীর সংখ্যা পাঁচ হাজারেই স্থির রহিয়াছে। ইহার কারণ, নূতন রংরুট সহজেই সংগ্রহ করা সম্ভব। বৃটিশের পক্ষে কত জন সৈন্য হতাহত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু পুলিশ নিহত হইয়াছে ১৪৭ জন এবং ১০৬৫ জন পুলিশ আহত হইয়াছে। অসামরিক লোক নিহত হইয়াছে ১৮২৮ জন। ৪১৭ জন অসামরিক লোক নিখোঁজ। মালয়ে আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য বৃটেন কি বিপুল জনক্ষয় করিতে পারে এই হিসাব হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহা সত্ত্বেও বৃটেন কম্যুনিষ্টদের দমন করিতে সমর্থ হইতেছে না। মিঃ একিসনকে মালয়ে বৃটিশ অধিকার বজায় রাখিবার জন্য স্বাধীন বিশ্বের সাহায্য যাচ্‌ঞা করিতে হইয়াছে।

জাপানে রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ—

জাপানের রাজনৈতিক সমস্যা তো আছেই, ইহার উপর আছে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ! গত ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) জাপানের কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। ইহা যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দখলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে আশঙ্কা করেন যে, কম্যুনিষ্টগণ কর্ত্তৃক ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম আরম্ভ করিবার ইহা পূর্ব্বাভাষ মাত্র। ১৯৫১ সালের আগষ্ট মাসে জাপ কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্ত্তৃক এক পরিকল্পনা গঠনের কথা জানা যায়। ইহাতে যোশিদা গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদের জন্য নেশন্যাল লিবারেশন ডেমোক্রাটিক ফ্রণ্ট গঠনের কথা আছে। গত নবেম্বর মাসে (১৯৫১) জাপ পুলিশ সশস্ত্র বিদ্রোহের এক ষড়যন্ত্রের উদ্‌ঘাটন করিয়াছে বলিয়া দাবী করে। উহার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা কিছুই জানা যায় নাই। কিন্তু ২৩শে ফেব্রুয়ারী যে বিক্ষোভ প্রদর্শন হইয়াছে তাহাকে কোন বিরাট ষড়যন্ত্রের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করার মত কি প্রমাণ আছে তাহা কিছু জানা যায় না। মার্কিণ আধিপত্য হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য কোন প্রচেষ্টা জাপানে হইয়া থাকিলে তাহা অস্বাভাবিক কিছু নয়। পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন দেশেই এইরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়া থাকে।

কম্যুনিষ্টদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের ১১ দিন পর উত্তর-জাপানে ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এক বিরাট

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ লইয়া উপস্থিত হয়। ১৯২৩ সালে ভূমিকম্পে এবং সাইক্লোনে টোকিও সহরের যে বিরাট ক্ষতি হইয়াছে, এই প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ তাহার কথাই শুধু স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ জাপ-জীবনের এক নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথাপি জাপানের এই প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ সহানুভূতি আকর্ষণ না করিয়া পারিবে না।

নেপালে সশস্ত্র বিদ্রোহ—

১৯৫০ সালের নবেম্বর মাসে রাণা-শাসনের বিরুদ্ধে নেপাল কংগ্রেস যে বিদ্রোহ করিয়াছিল, ভারত গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় তাহার একটা মীমাংসা হয় এবং ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাণা-গোষ্ঠী এবং নেপাল কংগ্রেসের এক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার দুই মাস পার না হইতেই রাণা-গোষ্ঠী দ্বারা গঠিত কুকরী দল সশস্ত্র বিদ্রোহ করিয়া নূতন গবর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলেও অস্বাভাবিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা সঙ্কটের পর সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে গত নবেম্বর মাসে (১৯৫১) উহা এক চরম সীমায় উঠে। অতঃপর রাণা-বংশকে বাদ দিয়া শুধু নেপাল কংগ্রেসের সদস্য লইয়াই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু নেপালের প্রকৃত সমস্যার সমাধান তাহাতেও হয় নাই। গত নবেম্বর মাসে যে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, উহা হইতে পূর্ব্ব মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বি, পি, কৈরলাকে বাদ দেওয়া হয় এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মাতৃকাপ্রসাদ কৈরলা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ফলে নেপাল কংগ্রেসের মধ্যে আরও বিভেদ সৃষ্টি হয়।

রাণা-গোষ্ঠীর সহিত নেপাল কংগ্রেসের যে আপোষ হয় ডাঃ কে, আই, সিংহ তাহা সমর্থন করেন নাই। তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছিল। নেপালী জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ ডি, আর, রেগমীও নেপালের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের এক জন কঠোর সমালোচক। বর্ত্তমান নেপাল মন্ত্রিসভার সকল সদস্যই নেওয়ার সম্প্রদায়ের লোক। নেপালের ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকাংশই এই সম্প্রদায়ের হাতে। অবশ্য নেপাল কম্যুনিষ্ট পার্টির কয়েক জন নেতাও এই সম্প্রদায় হইতে গৃহীত। নেপালের আর একটি প্রধান শ্রেণী উপজাতীয় লোকেরা। গুর্খা সৈন্য ইহাদের মধ্য হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। ইহারা দরিদ্র এবং অশিক্ষিত। ইহা ব্যতীত নেপালের অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, ছত্রী এবং ঠাকুরীদের কথা উল্লেখযোগ্য। নেপালের আলোচ্য বিদ্রোহের জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টিকেও দায়ী করা হইয়াছে। তাহারা না কি এই বিদ্রোহকে কার্য্যকরী ভাবে সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু নেপালের ভূমি-সমস্যাই যে প্রধান সমস্যা, সেদিকে মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে না।

নেপালে কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠিত হওয়া আধুনিক ঘটনা বলিলে খুব বেশী ভুল বলা হয় না। রাণা-শাসনের অবসান হওয়ার পরেই উহার প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এ কথাও সত্য। নেপাল কংগ্রেসের নীতিই ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। নেপাল কংগ্রেস ভূমির পুনর্ব্বণ্টনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কিছুই করে নাই, করিবার কোন চেষ্টা পর্য্যন্ত করা হয় নাই। রাণা-গোষ্ঠী এবং তাহাদের আশ্রিতদের দখলেই নেপালের অধিকাংশ ভূমি রহিয়াছে। এই সকল ভূ-সম্পত্তিকে বলা হয় 'ধীরতা।' এই সকল ভূ-সম্পত্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত 'ধীরতা' বাজেয়াপ্ত করিতে নেপালের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার অসামর্থ্য জানাইয়াছেন। এই 'ধীরতা' প্রথার জন্যই নেপালের কৃষকরা অত্যধিক শোষিত ও নিপীড়িত হইতেছে। বিদ্রোহের নেতা ডাঃ সিংহকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয় নাই। কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করা হইয়াছে। ইহাতেই দরিদ্র কৃষকদের দুঃখ দূর হইবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু যত দিন নেপালের ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন না হইতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত নেপালের কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়।

শোষকের বাজেট

"অর্থ-সচিব বাজেটকে "কেয়ার টেকার" বাজেট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাজেট আলোচনা কালে ট্যাক্স কমাইবার দাবী উঠিলে এই বাজেট "কেয়ার টেকার" বাজেট, কোন বড় পরিবর্ত্তন এখানে করা যাইবে না—এই কথা বলিয়া তাহা এড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, নূতন পার্লামেণ্ট আসিয়া যাহা করিবার করিবে। কিন্তু খাদ্যের উপর সাহায্য কমাইয়া দিয়া তিনি চাউল, আটা, গম প্রভৃতির দাম বাড়াইয়া দিয়াছেন। এটি অতি গুরুতর পরিবর্ত্তন! জনসাধারণের উপর চাপ কমাইবার দাবীর উত্তরে তিনি "কেয়ার টেকার" বাজেট এবং নূতন পার্লামেণ্ট দেখাইলেন; কিন্তু চাপটা বাড়াইবার সময় তো সে কথা মনে পড়িল না? খাদ্যে সাহায্যের ব্যবস্থা বজায় রাখিবার জন্য গত বৎসর যাহা মূল বরাদ্দ ছিল, এবারও তাহা বাজেটে ধরা হইয়াছে; তৎসত্ত্বেও বাজেটে ১৮ কোটির বেশী টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে, এই ব্যবস্থা চার মাস অনায়াসে বজায় রাখা যাইত এবং এই বাজেটকে সত্যই "কেয়ার টেকার" বাজেট বলিয়া গণ্য করিলে তাহাই করা উচিত ছিল। কিন্তু দেশমুখ সাহেব তাহা করেন নাই। একই বক্তৃতায় তিনি "কেয়ার টেকার" বাজেটের দুই রকম সংজ্ঞা দিয়াছেন। অর্থসচিব বলিতেছেন যে, চলতি বৎসরের উদ্বৃত্ত মায়া, উহা আসল বাড়তি নহে। কারণ আমদানী-শুল্ক হইতে ৫১ কোটি এবং রপ্তানী-শুল্ক হইতে ২৪ কোটি টাকা বেশী পাওয়া গিয়াছে। এই বাড়তি টাকা তাঁহার মতে উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যয় করাই সমীচীন। আমরা তাঁহার এই যুক্তিও মানিতে পারিলাম না। হঠাৎ-পাওয়া টাকার উপর কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা চলে না। ভারত সরকার যে-সব বড় বড় পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার জন্য টাকার কথাও ভাবিয়াছেন। বড় বড় পরিকল্পনার টাকা নিশ্চিত ভাবে আসিবে—এই ধারণা বজায় রাখিতে না পারিলে, ইহার মধ্যে অনিশ্চয়তা প্রবেশ করিলে পরিকল্পনার সাফল্য ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইবে। এই জন্য কোন হঠাৎ-পাওয়া টাকা বড় পরিকল্পনায় দেওয়া সমীচীন মনে হয় না। ছোট এবং যাহাকে 'এড হক' পরিকল্পনা বলা যাইতে পারে, তাহাতে হয়ত কিছু টাকা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহার আগে অন্ততঃপক্ষে তাহার সঙ্গে ট্যাক্স কমাইবার চেষ্টাতেও কিছু টাকা খরচ করা একান্ত উচিত। মোটা ও মাঝারি কাপড়, দেশলাই, তামাক প্রভৃতির উপর আবগারী-শুল্ক হ্রাস এবং খাম-পোষ্ট-কার্ডের মূল্য হ্রাস করিলে খুব বেশী টাকা লাগিত না, ইহার পরেও বহু কোটি টাকা উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য থাকিত এবং ঐ টাকায় অনেক ছোট পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা যাইত। অর্থ-সচিব এই দিক দিয়া চিন্তাই করেন নাই। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন হইতে বামপন্থী টিকিটে নির্ব্বাচিত শ্রীভেলায়ুধন দেশমুখ বাজেটকে "শোষকের বাজেট" বলিয়া অভিহিত করিয়া বেশী ভুল করেন নাই।"

—দৈনিক বসুমতী।

"দৃষ্টান্তস্থলে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছি। এখানে গম মিলিত প্রতি সের ছয় আনা এক পয়সায়। কেন্দ্রীয় অর্থ-সাহায্য বন্ধ হওয়ায় এই গমের মূল্য সম্প্রতি প্রতি সের দশ পয়সা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে নিম্নবিত্ত গৃহস্থের যে অসুবিধা ঘটিয়াছে তাহা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। অর্থ-মন্ত্রী শ্রীযুত চিন্তামন দেশমুখ অবশ্য বলিয়াছেন যে, খাদ্য সরবরাহ বাবদে কেন্দ্রীয় অর্থ-সাহায্য সম্পূর্ণ বন্ধ হইবে না, নিম্নবিত্তের খাদ্য মাইলো এবং কয়েক প্রকারের চাউল যাহাতে অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়, তার জন্য কিছুটা কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য দেওয়া হইবে। কিন্তু নিম্নবিত্তের পরিধেয় মোটা ও মাঝারী বস্ত্রের উপর ধার্য উৎপাদন-শুল্ক হ্রাস তথা এই শ্রেণীর বস্ত্রের মূল্য হ্রাস সম্পর্কে অর্থ-মন্ত্রী কোন আশার বাণীই শোনাইতে পারেন নাই।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

ব্যর্থ নির্ব্বাচন?

"এবারের নির্ব্বাচনে প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, অর্ব্বাচীনের জয় প্রায় সকল নগর কেন্দ্রে এবং অনেক গ্রাম্য অঞ্চলেও হইয়াছে। তবে সুখের বিষয়, গ্রামের লোক বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে দল অপেক্ষা ব্যক্তিত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। তাহারা টিকিট না দেখিয়া লোক চিনিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং নির্ব্বাচনের বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণে কিছু বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছে। ভুল-ভ্রান্তি তাহাদের যে হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু নগরের লোকের মত বিপরীত বুদ্ধির ব্যবহারে নিজেদের মনের জ্বালা মিটাইবার চেষ্টা তাহারা এতটা করে নাই। বোধ হয় শহুরে লোকের ন্যায় জ্ঞান-বুদ্ধি সেরূপ না থাকায় তাহাদের বুদ্ধিভ্রম এতটা হয় নাই। বাংলার নির্ব্বাচনে কোন দলই জয়যুক্ত হয় নাই, কেন না নির্ব্বাচনের ফলে যদি বাংলার ভবিষ্যতের অন্ধকার কিছু লাঘব না হয় তবে সে জয়-পরাজয়ের মূল্য কি? কেহ কি বলিতে পারেন যে, এই নির্ব্বাচনের ফলে পশ্চিম-বাংলার বিধানসভা অধিকতর কার্য্যক্ষম বা সবল হইল বা এই নির্ব্বাচনের ফলে বাংলার সমস্যাপূর্ণ ভাগ্যপথ কিছুমাত্র সুগম হইল?"

—প্রবাসী।

ভাষার শহীদ শিশু

"ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী হইয়াছে। "পাকিস্তানে উর্দ্দুকেই রাষ্ট্রভাষারূপে প্রচলিত করার যে নীতি অনুসৃত হইতেছে, পূর্ব্ব-পাকিস্তানে তাহার পরিণতি শুভকর হয় নাই দেখা যাইতেছে। বাংলাই পূর্ব্ব-পাকিস্তানের মাতৃভাষা—ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, পূর্ব্ববঙ্গবাসী সেই ভাষাকেই নিজেদের রাষ্ট্রীয় জীবনেরও মাধ্যমরূপে রক্ষা করিতে চাহিবেন। এই স্বাভাবিক প্রেরণা ও প্রবৃত্তিই পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্র-সমাজকে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করিবে, ইহাও কিছু বিচিত্র নহে—কারণ ছাত্রদের মারফতই শুধু মায়ের ভাষার পুষ্টি ও অনুশীলন নয়, পরন্তু তাহাদের মধ্য দিয়াই জাতির জীবনের উপর ভাব-ভাষার স্থায়ী প্রভাব সুবিস্তৃত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্র-সমাজ পাকিস্তানের বৃহত্তম অংশ পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ

প্রজার অন্তরের স্বাভাবিক দাবীকে সমর্থন করিয়া যে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট বিক্ষোভ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ও কঠোর হস্তে দমন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহাই গভীর দুঃখের বিষয়। আরও মর্ম্মান্তিক কথা, ইহার পরিণামে আটটি তরুণ প্রাণ গুলীর আঘাতে বলি পড়িয়াছে—তাহার মধ্যে একটি শিশুও আছে।" —নবসঙ্ঘ।

পাঁড়দের ধরো

"পুলিশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সংবাদ দিয়াছেন: কলিকাতায় অশ্লীল সাহিত্যের প্রচার হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে এবং ইহার পাঠক-গোষ্ঠী কিশোর ও তরুণগণ। এই অশ্লীলতার অতি-প্রচারের জন্ত আজ আর ক্ষোভ করিলে চলিবে না। সবুজ, অবুঝ ও কাঁচাদের পুচ্ছগুলি উচ্চে তুলিয়া নাচিবার জন্ত বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া উস্কাইয়া দিতেছি। ছেলেদের স্ফুটনোম্মুখ যৌবন-সংবেগের—বাইয়োলজিক্যাল আর্জ্জের কাছে বিনোদ বোঠান, কিরণ বোঠান ও কমলাকে ছাড়িয়া দিয়া শেষ প্রশ্নের সমাধান করিয়াছি। সহশিক্ষার সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া সিনেমা-তারকাদের লইয়া মাতামাতি করিয়া মদনযজ্ঞের শ্মশানবহ্নি জ্বালিয়াছি। অশ্লীলতা-ইতরতার পাঁড় যাহারা, তাহারা অনেকেই আমাদের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। সর্ব্বনাশের যে প্রলয়াগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা আমাদের ভস্মীভূত না করিয়া ছাড়িবে না!" —আর্য্য।

কাল্পনিক প্রদর্শনী

"কলিকাতার পরিপূরক খাদ্য-প্রদর্শনী হইয়া গেল। রাজ্যপাল হইতে মেষপালগণ সমবেত হইয়া প্রদর্শনীর মূল্য কাটকা বাজারের ন্তায় উঁচু রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন ইহা সুসংবাদ। পরিপূরক খাদ্য সম্বন্ধে রাজ্যপালের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। এ প্রদর্শনী ধনী সৌখিন পেটুকের রসনা-তৃপ্তিকর মাত্র। অনাহার অর্দ্ধাহারক্লিষ্ট লোকের পক্ষে ইহার কোন মূল্যই নাই। তবে হাঁ, যিনি এই প্রদর্শনীর কল্পনা কাজে লাগাইতে পারিয়াছেন তাঁহার কিছু সুযোগ লাভ সম্ভব হইয়াছে কি না তা আমরা জানি না। প্রচার বিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্টের এরূপ কাল্পনিক উদ্ভট প্রদর্শনী খুলিলে মধ্যে মধ্যে বুদ্ধিমানের উপার্জ্জনের সুযোগ হইবে তাহা কে না জানে? কাল্পনিক মহাপুরুষকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।" —দেশবার্ত্তা।

সিউড়ীর মেলা

"লালকুঠির প্রান্তর একদা শ্যামল বৃক্ষছায়া-সমাকীর্ণ থাকিলেও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার কল্যাণে যন্ত্রদানবের আক্রমণে পর্য্যুদস্ত শ্যামল ছায়া-ঘেরা জায়গা রুক্ষ প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। সরকারের হাতেই জায়গাটি রহিয়াছে এবং জেলা-শাসকের চেষ্টায় এই জায়গাটির ব্যবস্থা হইয়াছে। তাই সেখানেই প্রদর্শনী এবং মেলা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং সেই মতে সমস্ত রকমের বন্দোবস্ত হইয়াছে বা হইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অনেকে ভাবিতেছেন মেলা ভালই জমিবে, জাঁকজমকে পূর্ণ হইয়া উঠিবে; আবার অনেকে ভাবিতেছেন যে হয়ত বা নূতন জায়গা, সহরের মধ্যে বলিয়া ভাল জমিবে না। নূতন জায়গায় মেলাকে জমাইবার চেষ্টা চলিয়াছে অবিরাম, অবিরত। রাজাদের তথা সিউড়ীর লালকুঠির মাঠ ভরিয়া বিপণী-সজ্জা চলিয়াছে। রাজাদের দালান, তাঁদের বসিবার জায়গা ইত্যাদি সব-কিছুই মেলার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং তাহাকে সাজাইবার চেষ্টা চলিয়াছে। বিজলীর আলোয় দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া রাত্রির অন্ধকারকে ম্লান করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। লালকুঠিতে কুঠিই আছে আর আছে ফাঁকা প্রান্তর, বড়বাগানের মত প্রকৃতির শোভা সেখানে নাই তাই কৃত্রিমতা দিয়া সাজাইয়া নবীনতার ঝলকানি দিবার যে প্রয়াস চলিয়াছে, তাহা কত দূর সাফল্য লাভ করিবে তাহা মূক লালকুঠিই জানে। সিউড়ী কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর সব কয়টি নাম যাহা ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিলীন হইবার মুখে চলিয়াছে তাহা পুনরায় নবীনতর গৌরবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে কি না জানি না, তবে লালকুঠিতে নূতন ছাঁচে তাহার প্রতিষ্ঠা যে হওয়া উচিত তাহা নিশ্চয়ই সকলে বলিবে।"

—বীরভূম বার্ত্তা।

গ্রামপোষকদের অবশ্যপাঠ্য

"এক ছটাক জমি লইয়া কত দাঙ্গা-হাঙ্গামা হাইকোর্ট হইয়াছে—বড় ভাই ছোট ভাইয়ের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে—উভয় পক্ষের পক্ষপাতীদের মধ্যে খুনখারাপী পর্য্যন্ত হইয়াছে। সমাজে এ ঘটনা কিছুই নূতন নয়। কিন্তু ইহারই মধ্যে দেখিতে পাই—পথিকের পথশ্রম দূর করিতে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, তৃষ্ণা নিবারণে জলাশয় প্রতিষ্ঠার মহান্ আদর্শ। শিবোত্তর, পীরোত্তর, ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি ভূমিদান করিয়া এই সমাজেই মানুষ লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের অন্নসংস্থানে মুক্তহস্ত হইয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয়ে আকুল আগ্রহান্বিত। ধর্ম্মবুদ্ধিতে যাহা সমাজের স্বাভাবিক স্থিতিবিধানে পরম সহায় হইয়াছিল, পাপ স্বার্থবুদ্ধি ইহসর্ব্বস্ব করিয়া সমাজের সে ভারসাম্য ভাঙিয়া দিয়াছে। ভূস্বামী আজ আর তাই অন্নপ্রদাতা নাই—অন্নসংহর্ত্তারূপে ভূকর্ষকের মুখের গ্রাস নিঃস্ব করিয়া লইতেছে। গ্রামপোষক আজ গ্রামশোষকরূপে নিন্দিত ও উপহসিত। রুদ্রদেবতার রোষকষায়িত নেত্রের লক্ষ্যীভূত।" —পল্লীবাসী।

তেলের ঘানির জন্য পুরস্কার

"দেশীয় গ্রাম্য তৈলের ঘানিগুলি কাজের সেরূপযোগী ও তৈল বাহির করিবার পক্ষে প্রচুর পরিশ্রম ও সময়সাপেক্ষ এবং এই পদ্ধতিতে বেশ কিছু পরিমাণ তৈল খোলের সহিত থাকিয়া যায়। এ জন্য কোন ব্যক্তি যদি নূতন ধরণের ঘানি তৈয়ারী করিতে পারেন এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় তৈলবীজ সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত যোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকট উহা সন্তোষজনক হইলে, তাঁহাকে ৫,০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। সমিতি নির্দেশ দিয়াছেন যে, এই ঘানিতে এক-এক বারে ১০ সের করিয়া বীজ দেওয়া যাইবে ও এক-একটা ঘানি টানিতে এক ঘণ্টার বেশী সময় দেওয়া হইবে না এবং একটি বলদ দ্বারা ইহা চালিত হইবে। যন্ত্রটির দাম দুই শত টাকার অধিক হইবে না এবং খোলে শতকরা ১০ ভাগের বেশী তৈল থাকিবে না। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত ঘানির স্বত্বাধিকার কমিটিকে সমর্পণ করিবেন এবং কমিটি উহার নির্মাণ-ব্যয় (দুই শত টাকার

অনধিক) দিতে প্রস্তুত আছেন। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ব্যক্তিরা ৩১শে আগষ্ট ১৯৫২-র মধ্যে বিবৃত বিবরণ, মূল্য ইত্যাদি সহ নক্সার ছক কেন্দ্রীয় তৈলবীজ সমিতি, খাদ্য ও কৃষি-দপ্তর, রুম নং ৩৪৫, ব্লক নং ১, আক্‌বার রোড, নয়াদিল্লী এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।" —খাদ্য-উৎপাদন

ধান সীজের পালা

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার আবার গ্রামে-গ্রামে চাষীর বাড়ী-বাড়ী, মাঠে-পথে ধান সীজের পালা সুরু করেছেন। ধান আর চাল ধরার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সর্ব্বত্র চাষীদের মাঝে। শুধু চাষীরাই কেন, প্রতিটি সাধারণ মানুষ আজ চাল চুরির আসামী। সহরের আর ঘাটতি অঞ্চলের কিনে খাওয়া মানুষদের নিকট ন্যায্য দরে এবং প্রয়োজন মত চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করার ইচ্ছা ও সাধ্য এ সরকারের নাই। পূর্ণ রেশন চালু করার দাবী দিনের পর দিন উপেক্ষিত হয়েছে। তাই সাধারণ মানুষকে বাধ্য হয়ে পেটের দায়ে নিজেদের চাল সংগ্রহের জন্য ছুটতে হয়েছে,—মেয়েরা পর্য্যন্ত পথে বেরিয়েছে, পুলিশের হাতে ধরা পড়ে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে। ঘুষ দুর্নীতি লাঞ্ছনা গঞ্জনা এ তো আজ সাধারণ মানুষের ভাগ্যে নিত্য-নৈমিত্তিক দেনা-পাওনা। তাই ক্ষুধিত মানুষ আজ আসামীর কাঠগড়ায়।" —বর্দ্ধমানের ডাক।

ধোঁকাবাজি চলবে না

"এ-কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, আমরা মার্ক্সবাদের মূল নীতিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। তবে এ-ও ঠিক যে, এই মতবাদকে ভারতের উপযোগী করে কিছু অদল-বদল করে নিতে হবে। ইতিহাসও আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। কম্যুনিষ্ট পার্টি ব্যতীত মার্ক্সবাদী অন্যান্য যে দলগুলি আছে, এ ব্যাপারে তাদের ব্যর্থতা আরও গভীর। এরা ছোট-খাটো কতকগুলি বিপ্লব (বোধ হয় বৈপ্লবিক হাঙ্গামা বললেই ঠিক হবে) বাধিয়ে সমবিপ্লবকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যে গণবিপ্লবের প্রয়োজন, যে বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করার উপযুক্ত দল নেই। আমরা বিশ্বাস করি যে, বিপ্লবের পথ প্রস্তুত হলে নেতৃত্ব আপনিই আসবে। আমরা আগেও বলেছি যে কর্মীদল দল নয়, এ একটা কর্মীগোষ্ঠী মাত্র। এঁরা জানেন যে, তাঁরা গণবিপ্লবের সৈনিক মাত্র—নেতা নয়। তাই আজ এঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন দেশের প্রতিটি প্রান্তে বিপ্লবের বাণী নিয়ে। তাই কর্মীদলের প্রথম এবং প্রধান কর্ম হলো সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য পুঁজিপতি ও ভ্রান্ত সাম্যবাদীদের হরেক রকমের ধোঁকা থেকে জনসাধারণের দৃষ্টিকে মুক্ত রাখা।" —কর্মীদল।

হিন্দীর উপদ্রব

"প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু কানপুরের কোন একটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখিতে পান যে, প্রতিষ্ঠানটির সর্ব্বত্র বড় বড় হিন্দী হরফের সাইনবোর্ড টাঙানো আছে, পণ্ডিতজী বিস্মিত হইয়া বোর্ডগুলি লক্ষ্য করেন এবং জনৈক ব্যক্তিকে একটি বোর্ডের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। লোকটি হিন্দীর ইংরাজী অনুবাদ করিতে অসমর্থ হইলে পণ্ডিতজী ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী শ্রীপন্থজীকে বলেন—"কি অদ্ভুত নির্বুদ্ধিতা! আপনি কি এই হিন্দীর মানে বুঝিতে পারেন? আপনি আপনার হিন্দী ব্যবসা দ্বারা সমগ্র উত্তর প্রদেশকে উচ্ছন্নে দিয়াছেন। আপনি নিখিল ভারত নীতি অনুধাবন করিতে পারেন নাই, তাই এই সব গোলমালের সৃষ্টি।" —মুক্তি।

পারুলবালা মরে নাই

"পারুল চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ক্ষুধিত আত্মা দেশবাসীকে চিনাইয়া দিয়াছে—'এই নারীঘাতীকে চিনিয়া লও।' মাতৃহারা শিশুর ক্রন্দনে আর শোকার্ত্ত স্বামীর দীর্ঘশ্বাসে এই অপূর্ব্ব গণতন্ত্রের আমলাতান্ত্রিক কদর্য্য মূর্ত্তি আরও নগ্নরূপে আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'সংগঠন' লিখিতেছেন, 'পারুল মরেন নাই; পারুলকে হত্যা করা হইয়াছে। তাই যখন উদ্বন্ধনের রজ্জু তাঁহার কণ্ঠনালীর শ্বাসকে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, তাঁহার ঠিক্‌রাইয়া-পড়া জ্বলন্ত দৃষ্টির অভিশাপ ঘাতকদের উপর বর্ষিত হইতেছে। আমরাও তাঁহার চোখে চোখ রাখিয়া এই নারীহত্যার বিচার চাহিতেছি।' নেহরু-বিধান সাম্রাজ্যে সস্তা অপরাধ, নারীহত্যার বিচার এখানে নাই। দুই-তৃতীয়াংশের অধিক বাঙ্গালী জনমত ইহাদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে গিয়াছে। ন্যায়বিচার পাইতে হইলে দুঃশাসনের অবসান ঘটাইতে হইবে এ কথাটা আমরা যেন মুহূর্ত্তের তরেও ভুলিয়া না যাই। রাষ্ট্রবিপ্লবে, দাঙ্গায় বা গুলীর আঘাতে মৃত্যু সহনীয়, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল জ্বালা শেষ করিয়া দেয়। কিন্তু বাঙ্গলায় কংগ্রেস-মাড়োয়ারী চাপে বাঙ্গালী ভদ্র মধ্যবিত্ত সমাজ তিলে তিলে যে দৈহিক ও নৈতিক মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহা বস্তুতঃই দুঃসহ। ক্ষুধার্ত্ত স্বামিপুত্রকন্যার মুখের দিকে তাকাইতে না পারিয়া পারুলবালা উদ্বন্ধনে এ জীবন শেষ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু আরও কত পারুলবালাকে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই মর্ম্মবেদনা মুখ বুঁজিয়া সহিতে হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই গতি রোধ করিতে না পারিলে বাঙ্গালী জাতি লোপ পাইবে।"

—যুগবাণী।

গদি পেয়েছি ব'লে

"পাঁচ বৎসরের জন্য গদি পাইয়াছি অতএব স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচারের দ্বারা আত্মমঙ্গল সাধন করা আত্মীয় পোষণ দুর্নীতির সহায়তা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আর সুযোগ-সুবিধা যাহাতে না ঘটে সেদিকে উর্দ্ধতম নেতৃবৃন্দ যেন কঠোর দৃষ্টি দেন। কেন্দ্রে ও প্রদেশে বিরোধী দলগুলিকে সম্মিলিত ভাবে দেখিতে হইবে সরকার যেন গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কেবল প্রতিবাদ ও প্রতিবন্ধকতার দ্বারা রাষ্ট্রের মঙ্গল হইবে না, দেশের ও দেশবাসীর কল্যাণ সাধিত হইবে না। সরকার যেখানে গঠনমূলক কাজ স্বল্প ব্যয়ে সমাধা করিতে অগ্রসর হইবে সেখানে বিরোধী দল যেন সরকারকে সমর্থন করেন এবং যেখানে সরকার অন্যায় করিবে, বৃথা ব্যয়বাহুল্যে দেশের ক্ষতি সাধন করিবে সেখানে বিরোধী দল যেন সমবেত ভাবে সরকারকে বাধা দেন। বিরোধী দলের কর্ত্তব্য হইবে —সরকারকে ন্যায় ও সত্যের পথে, কল্যাণ ও গঠনমূলক কাজে

অনুপ্রাণিত করিয়া তোলা এবং অন্যায়, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারের উৎস রোধ করা। ইহার জন্য সকল প্রকার ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থকে গৌণ করিয়া সমষ্টিগত স্বার্থের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করার ব্রত সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বিরোধী দলগুলি যদি তাহা করিতে পারে তবেই দেশ ও দশের মঙ্গল হইবে।"

—জনসঙ্ঘ।

কলিকাতার নূতন শেরিফ

স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কলিকাতার শেরিফ নিযুক্ত হওয়ায় আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। অখণ্ড বাংলার মন্ত্রী এবং অখণ্ড বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে শেরিফ নিযুক্ত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার গুণী ব্যক্তির মর্য্যাদার সমাদর করিয়াছেন।

শোক-সংবাদ

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী নরওয়ের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ন্যুট হামসুন ৯২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ন্যুট হামসুন ১৯২০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। "গ্রোথ অফ দি সয়েল" নামক গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯৪৫ সালে তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে "খ্যালো সয়েল", "হাঙ্গার", "প্যান", "মিষ্ট্রিয়াস", "ভ্যাগাবণ্ডস" প্রভৃতি পুস্তকের নাম উল্লেখযোগ্য।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতার শেরিফ ও অবিভক্ত বঙ্গের প্রাক্তন সচিব কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী (৫৫) তাঁহার কলিকাতা আপার সার্কুলার রোডস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বিধবা পত্নী, একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীসৌমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, এক কন্যা ও বহু আত্মীয়-পরিজন রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীশচন্দ্র অল্প বয়স হইতেই জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে একাদিক্রমে তিনবার তিনি বহরমপুর পৌর-সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

তাঁহার পিতা প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর ন্যায় শ্রীশ্রীশচন্দ্রও ছিলেন প্রকৃত দানবীর। আমরা পরলোকগত মহারাজার স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

বাংলার খ্যাতনামা কাগজ ব্যবসায়ী শ্রীরঘুনাথ দত্ত গত ৪ঠা মার্চ্চ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭। তিনি ১৯০৪ সালে তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ভোলানাথ দত্তের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ আরম্ভ করেন। তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টায় অচিরেই উক্ত প্রতিষ্ঠান উন্নতি লাভ করে। শ্রীদুর্গা কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিঃ এবং রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স লিমিটেডের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আট পুত্র, তিন কন্যা, বিধবা পত্নী ও বহু পৌত্র-পৌত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা প্রার্থনা করি, স্বর্গত রঘুনাথ দত্তের আত্মা শান্তিলাভ করুক।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী মেশার্স এস, এন্‌টুল এণ্ড কোং লিমিটেডের উপদেষ্টা শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (৬২) পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৮৯ খৃঃ বাকুলিয়ার মুখোপাধ্যায়-বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি "ভারতী প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং লিঃ"-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মৃত্যুকালে ইনি তিন পুত্র—প্রফুল্লকুমার, প্রতুলকুমার ও প্রাণকুমার, তিন কন্যা, শোকার্ত্ত পরিবার ও বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন।

ভারত ফটো টাইপ ষ্টুডিয়োর স্বত্বাধিকারী শ্রীললিতমোহন গুপ্ত গত ৭ই মার্চ্চ শুক্রবার রাত্রে তাঁহার বালিগঞ্জ বাসভবনে সন্ন্যাস রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। ভারতে ফটো এনগ্রেভিং ব্যবসার অগ্রণী পরলোকগত ইউ, রায়ের প্রধান সহকারীরূপে তিনি কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন এবং পরে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান করিয়া ব্লকমেকার ও প্রিন্টাররূপে খ্যাতিলাভ করেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি।
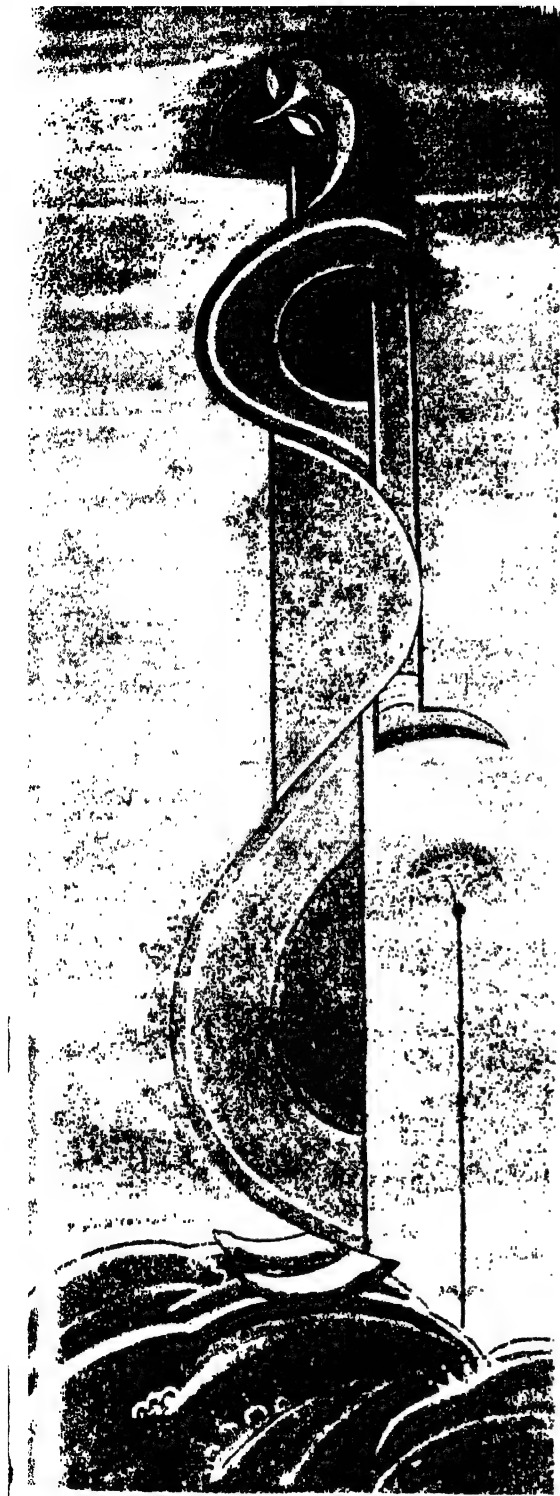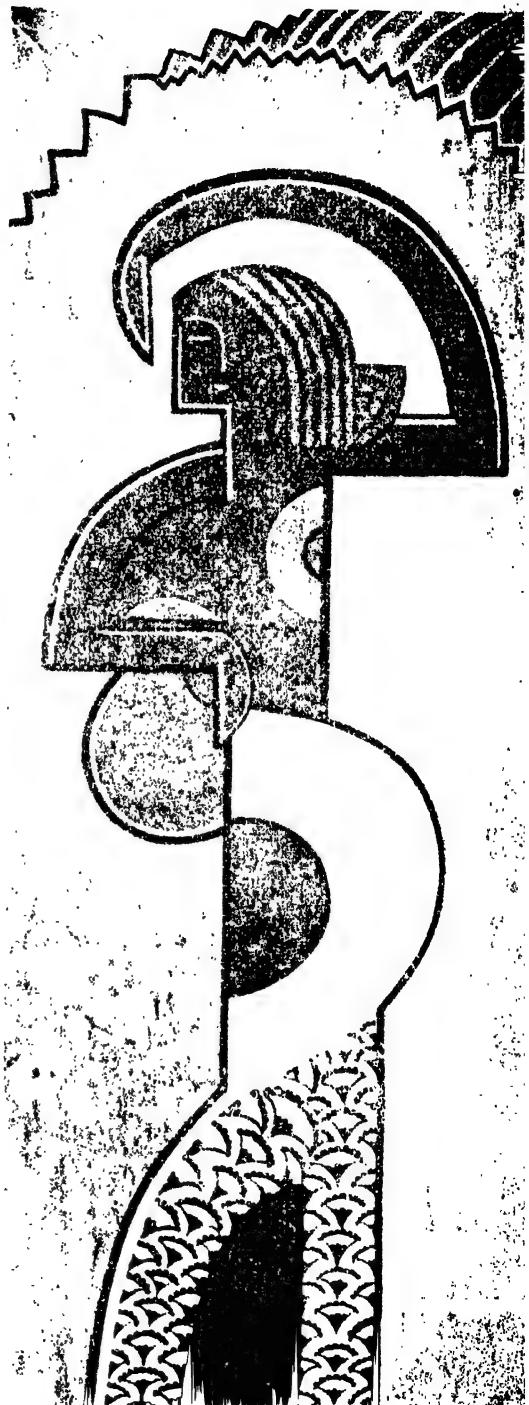
সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

নারী

—শুভো ঠাকুর অঙ্কিত

একটি স্টাডি

—শীতাংশু ভট্টাচার্য্য অঙ্কিত

কথামৃত

মথুরানাথের পুত্র দ্বারিকানাথের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি। এক দিন দ্বারিকানাথ কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদর্শনে আনিলেন। হৃদয় মাইকেলের আগমন-সংবাদ জানাইলে—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। হৃদু, তুই যা, আমি যাব না।

মাইকেল মধুসূদন। (হৃদয়কে দেখিয়া) আসতে আজ্ঞা হয়।

দ্বারিকানাথ। ইনি পরমহংস নন। ইনি তাঁর ভাগ্নে। (হৃদয়কে) আপনি তাঁকে ডেকে আনুন। ইনি (মাইকেল) তাঁহাকে দর্শন করিতে এসেছেন।

হৃদয় যাইয়া মাতুলকে সঙ্গে আনিলে মাইকেল মধুসূদন রামকৃষ্ণ-দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম পূর্ব্বক—

মাইকেল মধুসূদন। আপনি অনুগ্রহ করে আমায় কিছু ঈশ্বরীয় কথা বলুন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। বলব কি, মুখ যেন কে চেপে ধরছে।

মাইকেল মধুসূদন। আমি আপনাদের দাসকুলে জন্মেছিলুম, আমায় বলবেন না কেন?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। তা নয়। আমি বলতে চাই কিন্তু আমার বুক যেন কে চেপে ধরছে; বলতে দিচ্ছে না।

মাইকেল মধুসূদন। আমি বুঝিয়াছি আপনি আমায় কেন বলবেন না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। (হৃদয়কে) শাস্ত্রীকে ডেকে আন ত।

নারায়ণ শাস্ত্রী আসিলে শ্রীরামকৃষ্ণ মাইকেলকে কিছু উপদেশ করিতে আদেশ করিলে সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতে করিতে শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—

নারায়ণ শাস্ত্রী। আপনার ভাষা অশুদ্ধ হচ্ছে কেন?

মাইকেল মধুসূদন। অনেক দিন চর্চ্চা নাই সেই জন্য।

নারায়ণ শাস্ত্রী। আপনি হিন্দুধর্ম্ম মানেন না?

মাইকেল মধুসূদন। মানি।

নারায়ণ শাস্ত্রী। তবে কৃশ্চান হলেন কেন?

মাইকেল মধুসূদন। আমি ধর্ম্মের জন্য কৃশ্চান হইনি। দায়ে পোড়ে কৃশ্চান হয়েছিলুম। কিন্তু এখন বেশ বুঝতে পেরেছি সেটা ভুল করেছিলুম। আর এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে—হিন্দুধর্ম্মের মত আর ধর্ম্ম নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা শুনিয়া "বল দেখি ভাই কি হয় মলে" গান ধরিয়া শেষে বলিলেন—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। সকলি তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। আপনার কর্ম্ম আপনি কর মা, লোকে বলে করি আমি।

মাইকেল মধুসূদন। (গান শুনিয়া) আমাকেও তিনি এই রকম করেছেন, আমি কি করব? (শাস্ত্রী মহাশয়কে) আপনি অনুগ্রহ করে আমার বাড়ী যাবেন?

নারায়ণ শাস্ত্রী। আমি কারো বাড়ী যাইনি; আমার কোন প্রত্যাশা নাই, থাকলে যেতুম।

(অতঃপর মাইকেল বিদায় গ্রহণ করিলেন।)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আটষট্টি

দক্ষিণেশ্বরে যিনি আছেন তাঁর আরেক নাম দক্ষিণ-ঈশ্বর।

রুদ্র, যত্তে দক্ষিণমুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

উত্তরে-দক্ষিণে পূবে-পশ্চিমে ডাক পাঠাচ্ছে রামকৃষ্ণ। কখনো নহবৎখানা থেকে, কখনো বা কুঠির ছাদের উপর উঠে। আরতির সময় ঘড়ি-ঘণ্টা বাজছে আর ডাকছে রামকৃষ্ণঃ ওরে তোরা কে কোথা আছিস চলে আয়। তোদের ছাড়া দিন আর কাটে না রে—

প্রথমে এল লাটু। দ্বিতীয় এল রাখাল।

রামকৃষ্ণ দেখল গোপাল এসেছে। পায়ে নূপুর বাজছে ঝুম-ঝুম। 'আয়, আয়—' হাত বাড়িয়ে দিল রামকৃষ্ণ।

আর রাখাল দেখল স্নেহ-শান্তির সুধাসত্র বিছিয়ে মা বসে আছেন। ঝাঁপিয়ে পড়ল কোলের মধ্যে।

কখনো তার গায়ে হাত বুলোয় রামকৃষ্ণ, কখনো বা স্তন্য পান করায়। গদগদভাষে কখনো বা ডাকে, গোপাল, গোপাল; কখনো বা যদি দেখতে না পায়, গলা ছেড়ে কান্না ধরে, আমার ব্রজের রাখাল কোথায় গেলি?

যখন আসে ক্ষীর-ননী খাওয়ায়, কত খেলা দেয়, কখনো বা কাঁধে করে নাচে। আঠারো বছরের জোয়ান মরদ, বিয়ে করেছে, মনে হয় যেন অবোলা শিশু।

পড়াশোনায় মন নেই, মানে না গুরুজনদের। সব চেয়ে আশ্চর্য, নতুন বিয়ে করেছে, অথচ শ্বশুর-বাড়ি যায় না। কান্তিমতী কিশোরী স্ত্রী, এতটুকু টান নেই।

'কোথায় যাস তুই রোজ-রোজ?' বাপ হুঙ্কার করে উঠল।

ব্রাহ্মসমাজে যেত খুব আগে-আগে। সেখানকার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে এসেছে নিরাকার ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছাড়া আর কারু ভজনা করব না। এ-সবে তত আপত্তি ছিল না আনন্দমোহনের। কিন্তু তিনি তো জানেন কোথায় আজকাল ছেলের গতিবিধি। ব্রাহ্মসমাজে মিশে কেউ তো আর বিবাগী হয় না, কিন্তু যেখানে এখন সে যাওয়া-আসা সুরু করেছে সেখানে যে এক বিশ্বভোলা বাউণ্ডুলের বাসা। আজব কারখানা। ওখানে গেলে আর মানুষ হতে হবে না, রাখালিই করতে হবে সারা জীবন।

'খবরদার, আর যেতে পারবি না ওখানে!'

ছেলেকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করল আনন্দমোহন। বসিরহাটের শিকরা গাঁয়ের বলদৃপ্ত জমিদার, অগাধ পয়সার মালিক, তার ছেলে কিনা পথে-পথে ভেসে বেড়াবে। কখনোই না। থাক ঐ ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে।

এদিকে বৎসহারা গাভীর মত কাঁদছে রামকৃষ্ণ। ওরে রাখাল, কোথায় গেলি? তোকে না দেখে যে থাকতে পারছি না। মার মন্দিরে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করছেঃ মা, আমার রাখালকে এনে দাও। রাখালকে না দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে—

খাঁচায় পোরা বনের পাখির মত পাখা ঝাপটাচ্ছে রাখাল। বন্ধ ঘরে ছটফট করছে।

সেদিন কি দয়া হয়েছে, আনন্দমোহন ছেলেকে বন্ধ ঘরে না রেখে নিজের চোখের সামনে বসিয়ে রেখেছে। নজরবন্দী করে রেখেছে। নিজে নিবিষ্ট মনে দেখছে কি সব নথি-পত্র। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে জটিল মামলা, কাগজপত্রও পর্বতপ্রমাণ।

তেরছা চোখে বাপকে একবার দেখল রাখাল। দেখল, কাগজের মধ্যে ডুবে আছেন, কাগজ ছাড়া আর কিছুতে লক্ষ্য নেই। টুপ করে সরে পড়ল আলগোছে। নিজের দেহের ছায়াটিকে পর্যন্ত জানতে না দিয়ে। পথে নেমেই দে-ছুট। একেবারে দক্ষিণেশ্বর।

'রাখাল, রাখাল—' কান্নার স্বর দূর থেকে রাখাল শুনতে পাচ্ছে।

'আমি এসেছি। আমি এসেছি। এই যে আমি।' রামকৃষ্ণের প্রসারিত বাহুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাখাল।

এই মোকদ্দমায় আর জেতবার কোনো আশা নেই। নথির থেকে মুখ তুলল আনন্দমোহন। এ কি! রাখাল কোথায়? রাখাল কোথায় গেল।

আর কোথায় গেল! ছাঁদন-দড়ি খুলে দেবার পর বাছুর আবার যায় কোথায়!

এখন কোর্টের বেলা হয়ে গেছে, এখন আর ছেলের পিছু ছোটা যায় না দক্ষিণেশ্বর। সন্ধের পর ব্যবস্থা করতে হবে। এবার ফিরিয়ে এনে সত্যি-সত্যি লোহার বেড়ি পরিয়ে দেব। যৌবনের সোনার শৃঙ্খলে সে বশ মানেনি।

কিন্তু মামলায় হঠাৎ উলটো রকম ফল হয়ে গেল। ঘৃণাক্ষরেও ভাবেনি, মামলায় ডিক্রি পেল আনন্দমোহন।

ছেলের সাধুসঙ্গের জোরেই ঘটেনি তো এই ফললাভ?

কে জানে!

ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাচ্ছে বটে আনন্দমোহন, কিন্তু মনের মধ্যে আর তাড়ন-পীড়নের তাপ নেই। তার প্রথম পক্ষের সন্তান রাখাল। কত ভোগবিলাসে মানুষ। তার কিনা সইবে ও-সব অনাসৃষ্টি? ভুলিয়ে-ভালিয়ে যেমন করে হোক মনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে ঐ বিপথগামীকে।

'ওরে রাখাল, ঐ তোর বাপ আসছে বুঝি।' রামকৃষ্ণ যেন ভয় পাবার মত করে বললে। 'ছাখ দেখি তাকিয়ে—'

তা ছাড়া আবার কে। ঐ তো আনন্দমোহন। দূর থেকে ঠিক চিনেছে রামকৃষ্ণ।

বাপের আভাস পেয়ে রাখালের মুখ এতটুকু হয়ে গেল। বললে, আমি কোথাও গিয়ে লুকোই। নইলে বাবা আমাকে ঠিক ধরে নিয়ে যাবে। আর আসতে দেবে না।

'ভয় কি! আসুক না!' রামকৃষ্ণ অভয় দিলে। 'বাপ তো সাক্ষাৎ দেবতা। তাকে আবার ভয় কিসের। সামনে এলে বেশ ভক্তিভরে প্রণাম করবি। মার ইচ্ছে হলে কী না হতে পারে—'

আনন্দমোহনকে খুব সমাদর করে বসাল রামকৃষ্ণ। রাখালও দেহ-মন ঢেলে বাবাকে প্রণাম করলে।

কত গুণ আমার রাখালের! কেমন দিব্যগন্ধময় তার সত্তা। সর্ব তীর্থে তার স্নান, সর্ব যজ্ঞে তার দীক্ষা। ও হচ্ছে ব্রহ্মস্রোতা, ব্রহ্মমস্তা ছেলে। রাখালের প্রশংসা করতে লাগল রামকৃষ্ণ।

শুধু কি প্রশংসা? প্রতিটি কথার অন্তরালে সীমাহীন স্নেহ। কূলহীন ভালোবাসা।

ছেলের মুখের দিকে তাকাল আনন্দমোহন। আনন্দে জ্বলছে রাখালের চোখ দুটি। হয়তো ভালো করে খায়নি, কে জানে সারা দিন উপোস করেই আছে কিনা—তবু যেন আনন্দের প্রতিমূর্তি।

'বাবা, ক্যা ভোজন হুয়া?' এক সাধুকে জিগগেস করলে একজন।

'আজ মালিক নেহি মিলায়ে।' বললে সেই সাধু, 'আজ রামজীকি ইচ্ছাই হ্যায় ভোজন মিলনে নেহি হ্যায়। আজ আনন্দই হ্যায়—'

সর্বাবস্থায় সদানন্দ। এই আনন্দের হাট থেকে আমার তোলা বন্ধ করে দিও না।

কেমন যেন হয়ে গেল আনন্দমোহন। ছেলেকে পারল না ফিরিয়ে নিতে। শুধু রামকৃষ্ণকে বললে, "মাঝে-মাঝে এক-আধবার পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে।'

তাই সেই অনুরোধই এখন করছে রামকৃষ্ণ। ওরে, অনেক দিন হয়ে গেল, এখন একবার বাড়ি গিয়ে বাপকে দেখা দিয়ে আয়। যদি একেবারে না যাস, কেলেঙ্কারি হবে, তোকে চিরদিনের মত আটকে রাখবে, আর তোকে আসতে দেবে না।

তুইয়ে-তাইয়ে পাঠিয়ে দেয় বাড়িতে।

দু'দিন যেতে না যেতেই ফের ফিরে আসে। বাপের চোখের উপর দিয়েই ফিরে আসে। আনন্দ-মোহনের কেমন ধারণা হয়েছে এ সাধুকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। এর আস্তানায় অনেক গণ্যমান্য লোক যাতায়াত করছে। ওর এখন বিস্তর নাম-ডাক। এর কৃপাতেই মামলাতে সুফল হয়েছিল। বলা যায় না, লেগে থাকলে কোন না আবার সুবিধে হবে।

রাখালের খোঁজে নিজেও দু-এক দিন চলে আসে আনন্দমোহন।

রামকৃষ্ণ খুব খাতির-যত্ন করে। আগে আগে শুধু ছেলের প্রশংসা করত এখন বাপেরও প্রশংসা করে। বলে, 'যেমন ওল তেমন মুখীটি তো হবে। গাছটি রসালো বলেই তো ফলটি মিঠে।'

'এমনি করেই রাখালের বাবার মন খুশি রাখতেন।' বললেন একদিন শ্রীমা: 'রাখালের বাবা এলেই যত্ন করে এটি-ওটি দেখাতেন, খাওয়াতেন, কত কথা যে বলতেন তার শেষ নেই। মনে ভয়, পাছে রাখালটিকে ওখানে না রাখে, নিয়ে যায়। রাখালের সৎ-মা ছিল। সে যখন দক্ষিণেশ্বরে আসত, ঠাকুর রাখালকে বলতেন, 'ওরে, ওঁকে ভালো করে সব দ্যাখা, শোনা, যত্ন কর্—তবেই তো জানবে ছেলে আমাকে ভালোবাসে।'

একবার রামলালাকে ধরেছিল, এখন ধরল বালগোপালকে। আগে ছিল অষ্টধাতুর বিগ্রহ এখন সপ্তধাতুর মানুষ। আগে ছিল মনোমূর্তি, এখন মানস-পুত্র।

'ভারি খিদে পেয়েছে।' রাখাল বললে এসে ছেলেকে। যেমন আবদারে ছেলে মাকে এসে বলে।

খিদে পেয়েছে! কি সর্বনাশ, এখন তোকে খেতে দিই কি! ঘরে খাবার নেই, দোকানও বা কই এখানে কাছে-ভিতে! এখন করি কি, যাই কোথায়! আমার রাখালের যে খিদে পেয়েছে!

উতলা হয়ে গঙ্গার ধারে চলে এল রামকৃষ্ণ। গলা ছেড়ে কান্নার সুরে ডাকতে লাগল: 'ও গৌরদাসী, এস, আমার রাখালের খিদে পেয়েছে।'

বৃন্দাবনের সন্ন্যাসিনী এই গৌরদাসী। বলরাম বসুর কাছে শুনেছে রামকৃষ্ণের কথা। সটান চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বর। এসে দেখল রামকৃষ্ণ কোথায়, এ যে সেই গৌরহরি। সেই থেকে আছে তার পদচ্ছায়ে।

আচ্ছা, গৌরদাসী কি মেয়ে? রামকৃষ্ণ বলে, মেয়ে যদি সন্ন্যাসী হয় সে কখনো মেয়ে নয়, সে পুরুষ। গৌরদাসীও তাই পুরুষ। অদম্য কর্মশক্তি। অভঙ্গ ব্রতে অসাধ্যসাধিকা।

রামকৃষ্ণ বলে, 'আমি জল ঢালছি, তুই কাদা মাখ।'

আমি ভাব দি, তুই তাকে আকার দে। আমার রূপকে তুই রীতিতে নিয়ে যা। আমার বস্তুকে নিয়ে যা আস্বাদে।

শ্রীমা যেবার রামেশ্বর থেকে ফিরলেন, তাঁকে জিগগেস করলে মেয়েরা, 'কি দেখে এলেন বলুন—'

'আমাকে তারা লেকচার দিতে বললে।' শ্রীমা একটু হাসলেন। 'বললাম আমি লেকচার দিতে জানি না। যদি গৌরদাসী আসত তবে দিত।' একটু থেমে আবার বললেন, 'যে বড় হয় সে একটিই হয়। তার সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না। সে আমাদের গৌরদাসী।'

সেই গৌরদাসীকে লক্ষ্য করে কাঁদছে রামকৃষ্ণ। ওরে আয়, অসাধ্যসাধন করে দিয়ে যা। ঘরে এক দানা খাবার নেই। আমার রাখালকে কিছু খাবার দিয়ে যা শিগগির। তুই না হলে এ অসম্ভব কে সম্ভব করবে?

চাঁদনি ঘাটে নৌকো লাগল।

কে তোরা, কোত্থেকে আসছিস? পথে আমার গৌরদাসীকে দেখেছিস কেউ?

নৌকোর মধ্যেই তো গৌরদাসী। সঙ্গে বলরাম বোস। আরো কয়েকজন ভক্ত। সবাই এসে পড়েছে এক ডাকে।

একে-একে নামতে লাগল। গৌরদাসীও নামল। গৌরদাসীর হাতে খাবারের পুঁটলি।

'ওরে, রাখাল, আয়, ছুটে আয়, খাবার খাবি আয়। তোর জন্যে খাবার নিয়ে এসেছে গৌরদাসী।' ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগল রামকৃষ্ণ।

রাখাল কাছে এসে মুখ ভার করে রইল। বললে, 'খাব না।'

'সে কি রে? এই না বলছিলি খিদে পেয়েছে!'

'বলেছিলাম তো বলেছিলাম! তাই বলে চার দিকে ঢাক পেটাতে হবে নাকি?'

'আহাহা, তাতে কি হয়েছে।' রাখালের পিঠে হাত বুলুতে লাগল রামকৃষ্ণ: 'তোর খিদে পেয়েছে, তোর খাবার চাই, এ কথা বললে দোষ কি! খিদে পাবার মধ্যে লজ্জা কিসের! আর, খিদে যখন পেয়েছে, তখন খেতে তো হবেই। এতে আবার রাগের কথা কি! নে, এখন খা।'

রাখালকে খাইয়ে দিতে লাগল রামকৃষ্ণ।

বড় করে হাঁ কর্। ভালো করে খা।

'কি অবস্থাই গেছে। মুখ করতুম আকাশ-পাতাল জোড়া আর মা বলতুম। যেন মাকে পাকড়ে আনছি। যেন জাল ফেলে মাছ হড়-হড় করে টেনে আনা।'

সেই গানে আছে না—
'খাব খাব বলি মা গো, উদরস্থ না করিব,
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব।
যদি বল কালী খেলে কালের হাতে ঠেকা যাব,
আমার ভয় কি তাতে, কালী বলে কালেরে
কলা দেখাব॥'

উনসত্তর

কামারপুকুরের লক্ষ্মণ পানকে দিয়ে রামকৃষ্ণ খবর পাঠাল সারদাকে।

'এখানে আমার কষ্ট হচ্ছে। রামলাল মা কালীর পূজারী হয়ে বামুনের দলে মিশেছে, এখন আমাকে আর তত খোঁজ করে না। তুমি অবশ্য আসবে। ডুলি করে হোক, পালকি করে হোক, দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক, আমি দেব।'

সারদার মন কেঁদে উঠল। ভাবল যদি পারি তো পাখি হয়ে উড়ে যাই।

লক্ষ্মণ পান আরো বললে। বললে ঠাকুর ভাব-টাব হয়ে পড়ে থাকেন, সেদিকে রামলালের খোঁজ নেই। তার মনের ভাবখানা হচ্ছে, কালীঘরের থাকিয়ে পূজুরী হয়েছি, আর আমাকে পায় কে। এদিকে মা-কালীর প্রসাদ শুকনো হয়ে রয়েছে, দেখেও দেখছে না।

যেমন চালাও তেমনি চলি। যদি দূরে রাখো, দূরে থাকি; যদি কাছে ডাকো, ডাক শোনবার জন্যে কান খাড়া করে থাকি তোমার কাছে-কাছে।

ছোট তক্তপোশে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন ঠাকুর। মেঝেতে ভক্তদল। হেসে-হেসে ঠাকুর বলছেন ভক্তদের, 'হাজার বিচার করো, আর যাই কেননা বলো, তবু তাঁর অন্ডারে আমরা আছি।'

মাষ্টার মশাই বলেন, 'সেই দিন থেকে under কথাটি শিখলাম—'

'তিনি তো আর আমাদের হাতে পড়েননি, আমরাই তাঁর হাতে পড়েছি।' বললেন ঠাকুর।

তেমনি আমি পড়েছি তোমার হাতে। আমি আমার বাঁশি শূন্য করে রেখেছি, তুমি যেমন বাজাও তেমনি বাজব।

সারদা চলে এল দক্ষিণেশ্বর। ঢুকল নবতে।

ছোট্ট এই একটুখানি ঘর। ঢোকবার দরজাটিও ছোট। ঢুকতে প্রায়ই মাথা ঠুকে যায় সারদার। এক দিন তো কেটেই গেল রীতিমত। ক্রমশ অভ্যেস হয়ে এল। দরজার সামনে আপনা হতেই নুয়ে পড়ত মাথা। হে প্রবেশপথের দারুদেবতা, ভক্তিমতীর প্রণাম নাও।

সামনে একটু বারান্দা, দরমার বেড়া দেওয়া। ঐ তো ঘর, তার মধ্যেই সমস্ত সংসার। রাজ্যের জিনিসপত্র। রাঁধবার সাজ-সরঞ্জাম, হাঁড়ি-কুড়ি, বাসন-কোশন। জলের জালা, রামকৃষ্ণের জন্যে হাঁড়িতে মাছ জিয়োনো। শিকেতে ভক্তদের জন্যে খাবার-দাবার।

আবার লক্ষ্মী এসেছে সঙ্গে। সেও থাকে এই নবতের ঘরে। রাত্রে মাথার উপর মাছের হাঁড়ি কলকল করে, লক্ষ্মীর ঘুম আসে না।

শুধুই কি লক্ষ্মী? কলকাতা থেকে স্ত্রী-ভক্ত যদি কেউ আসে সেই ঘরেই রাত কাটিয়ে যায়। গৌরদাসীর তো কথাই নেই। তার আবার সেই ঘরেই ভাব হয়। থেকে-থেকে 'নিত্য কোথায়' 'নিত্য গোপাল কোথায়' বলে নৃত্য করতে থাকে।

'কে জানে তোমার নিত্য কোথায়?' সারদার কণ্ঠস্বরে হয়তো ঈষৎ ঝাঁজ ফোটে: 'দেখ গে, গঙ্গার ধারে-টারে ভাব হয়ে রয়েছে হয়তো।'

কলকাতা থেকে স্ত্রী-ভক্তরা যারা দেখতে আসে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতা লক্ষ্মী আছেন গো! যেন বনবাস গো!'

সত্যিই সীতা-লক্ষ্মী। পরনে কস্তা পেড়ে শাড়ি, সিঁথে-ভরা সিঁদুর। কালো ভরাট মাথার চুল প্রায় পা পর্যন্ত পড়েছে। গলায় সোনার কণ্ঠীহার। কানে মাকড়ি। হাতে চুড়ি যে চুড়ি রামকৃষ্ণের মধুর ভাবের সময় গড়িয়ে দিয়েছিলেন মথুর বাবু।

তার উপরে আবার নাকে নথ। নিজের নাকের কাছে আঙুল ঘুরিয়ে গোল চিহ্ন দেখিয়ে সারদাকে রামকৃষ্ণ বোঝায় ইসারায়।

নবতকে বলে খাঁচা। লক্ষ্মী আর সারদাকে শুকসারী। কালীঘরের প্রসাদ এলে রামলালকে বলে, 'ওরে খাঁচায় শুকসারী আছে, ফলমূল ছোলা-টোলা কিছু দিয়ে আয়।'

বাইরের লোক যারা শোনে, ভাবে, খাঁচায় বুঝি সত্যি-সত্যি পাখি আছে রামকৃষ্ণের।

রাত্রে তো বেশি ঘুম নেই, অন্ধকার থাকতে-থাকতেই উঠে পড়ে রামকৃষ্ণ। বেড়াতে-বেড়াতে

নবতের দিকে চলে আসে। হাঁক পাড়েঃ 'ও লক্ষ্মী, ওঠরে ওঠ। তোর খুড়িকে তোল রে। আর কত ঘুমুবি? রাত পোহাতে চলল। মার নাম কর।'

শীতের রাত। এক-এক দিন বিছানা ছাড়তে মন ওঠে না। লেপের ভিতরে কুঁকড়ি-সুকড়ি হয়ে সারদা আস্তে-আস্তে লক্ষ্মীকে বলে, 'চুপ কর, সাড়া দিস নি। নিজের চোখে তো ঘুম নেই! এখনো সময় হয়নি ওঠবার। কাক-কোকিল ডাকেনি এখনো—'

সাড়া না পেয়ে সরে যাবার লোক নয় রামকৃষ্ণ। দরজার ফাঁক দিয়ে জল ছিটোয় বিছানায়।

নইলে এমনিতে রাত চারটের সময় উঠে সারদা স্নান করে নেয় গঙ্গায়। বিকেলে নবতের সিড়িতে যেটুকু রোদ পড়ে তাইতে চুল শুকোয়। যোগেনের চুল-বাঁধাটি ভারি পছন্দ। যোগেন এলেই বলে বেঁধে দিতে।

যোগেনকে বলতে হয় না। সে নিজের থেকে বসে সেই চুলের কাঁড়ি নিয়ে। পাঁচ আঙুলে চুলের গোছা সামলাতে পারে না।

মা যে আমার আলুলায়িতকুন্তলা। থাকেন ক্ষুদ্র নবতে, কিন্তু আসলে ভুবনেশ্বরী। সর্বানন্দকরী, প্রসন্নাস্যা। ক্ষিতীশমুকুটলক্ষ্মী।

'কার ধ্যান করছিস রে লেটো?'

যার ধ্যান করছে সে তো চোখের সামনে। লাটু আসন ছেড়ে উঠে পড়ল।

'শোন, ঐ নবত-ঘরে সাক্ষাৎ ভগবতী আছেন, তাঁর রুটি বেলে দে গে।'

বিবেকানন্দের ভাষায়, জ্যান্ত দুর্গা। আমেরিকা থেকে শিবানন্দকে চিঠি লিখছেন স্বামীজীঃ 'দাদা, বিশ্বাস বড় ধন। দাদা, জ্যান্ত দুর্গা পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা-মাকে যেদিন বসিয়ে দেবে সেই দিন আমি একবার হাঁপ ছাড়ব। তার আগে আর আমি দেশে ফিরছি না।'

ফল-মিষ্টি দেদার বিলোচ্ছে সারদা। লোকদের বিলিয়ে দিতে পারলে আর তার কথা নেই। তার এই সদাব্রত দেখে রামকৃষ্ণ ঈষৎ বিরক্ত হল বোধ হয়। বললে, 'অত খরচ করলে কি চলবে?'

একটু বুঝি অভিমান হল সারদার। তার সমুখ থেকে চলে যাবার ভঙ্গিটিতে বুঝি সেই ভাবই ফুটে উঠেছে।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ। রামলালকে ডেকে পাঠাল।

'ওরে তোর খুড়িকে গিয়ে শান্ত কর।'

'কি হয়েছে?'

'বোধ হয় রেগে গেছে।' একটু থামল রামকৃষ্ণ। বললে, 'ও রাগলে আমার সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

রামকৃষ্ণ অগ্নি, সারদা দাহিকা। রামকৃষ্ণ জল, সারদা শীতলতা। রামকৃষ্ণ ব্রহ্ম, সারদা কালী।

রাখালের বালিকা-বউকে নিয়ে এসেছে মনোমোহনের মা। মনোমোহনের মা মানে রাখালের শাশুড়ি। রাখালের শ্বশুরবাড়ি রামকৃষ্ণের ভক্ত-পরিবার। কিন্তু তাই বলে রাখালের বউকে নিয়ে আসার মানে কি?

রামকৃষ্ণের বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। রাখালকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অভিসন্ধি নয় তো?

না, ব্যস্ত কি, রাখালই ফিরে-ফিরে যাবে সংসারে। তার ভোগের এখনো একটু বাকি আছে।

কিন্তু স্ত্রীর সংস্পর্শে রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হবে না তো?

আয় তো মা, আয় তো এদিকে, তোকে একবারটি দেখি।

বিশ্বেশ্বরী এগিয়ে এল রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণ তাকে দেখতে লাগল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। সুলক্ষণা, সুভূষণা মেয়ে।

সর্বঅঙ্গে দেবীশক্তি। ভয় নেই এতটুকু: স্বামীর ইষ্টপথে বিঘ্ন হবে না।

বললে, 'নবতে যাও, তোমার শাশুড়িকে প্রণাম করে এস।'

সারদাকে নবতে বলে পাঠাল রামকৃষ্ণঃ 'টাকা দিয়ে যেন পুত্রবধূর মুখ দেখো।'

সিঁতিতে বেণী পালের বাগানে রাখালকে সঙ্গে করে বেড়াতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। কথা আছে, রাতটা থাকবে সেখানে।

সন্ধ্যের পর বাগানে একা-একা বেড়াচ্ছে রামকৃষ্ণ। সেখানে কতগুলো ভূতের সঙ্গে দেখা।

'তুমি এখানে এসেছ কেন?' ভূতগুলো কাৎরাতে লাগলঃ 'তোমার হাওয়া আমাদের সহ্য হচ্ছে না। আমরা জ্বলে গেলুম, জ্বলে গেলুম। তুমি চলে যাও এখান থেকে।'

খাওয়া-দাওয়ার পরেই গাড়ি আনতে বললে রামকৃষ্ণ।

সে কি কথা, আপনি না রাত্রে এখানে থাকবেন বলেছিলেন ?

তা থাকা হল না। শুধু জীবিতের নয়, মৃতেরও আর্তি আছে।

'কিন্তু এত রাতে গাড়ি পাব কোথায় ?'

'তা পাবে, দেখ গে।'

গাড়ি পাওয়া গেল সহজেই। সেই রাতেই ফিরে এল দক্ষিণেশ্বর।

জাগ-প্রদীপটির মতই জেগে আছে সারদা। গাড়ির শব্দ পেয়ে চমকে উঠল। কান পেতে শুনল রাখালের সঙ্গে কি কথা বলছে রামকৃষ্ণ। ওমা, কি হবে, যদি না খেয়ে এসে থাকেন, কি খেতে দেব এত রাতে ? অন্য দিন কিছু না কিছু ঘরে থাকে, অন্ততঃ একটু সুজি। কখন কি খেয়ালে খেতে চেয়ে বসেন ঠিক কি। কিন্তু আজ কী হবে ? যদি বলেন, খিদে পেয়েছে ?

রাত একটা, মন্দিরের ফটক বন্ধ হয়ে গেছে কখন। কি করে কে জানে ফটক খুলিয়ে নিল রামকৃষ্ণ। হাততালি দিয়ে ঠাকুর-দেবতার নাম করতে-করতে এগুতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে তালি দিয়ে-দিয়ে রাখালও নাম করছে।

ঝি যদুর মাকে তোলাল সারদা। ও যদুর মা, কি হবে, উনি যে ফিরে এলেন ! যদি বলেন, খাইনি কিছু, খেতে দাও ?

মনের আকুলতাটি বুঝতে পেরেছে মনোহারী। নিজের ঘর থেকেই ডেকে বললে, 'তোমরা ভেবো না গো, আমরা খেয়ে এসেছি।'

পরদিন সকালে রাখালকে বললে সেই ভূতের গল্প।

'ও বাবা, ভাগ্যিস তখন বলো নি সেই রাত্তির বেলা, তাহলে আমার দাঁত-কপাটি লেগে যেত। শুনে এখুনি বুক কাঁপছে—'

স্ত্রী-ভক্তদের কাছে সেই গল্পটাই সেদিন বলছেন শ্রীমা, আর রাখালের ভয়ের কথা ভেবে হাসছেন মৃদু-মৃদু।

'ভূতগুলো তো বড় বোকা।' বললে একজন স্ত্রী-ভক্ত। 'ঠাকুরের কাছে কোথায় মুক্তি চাইবে, তা নয়, চলে যেতে বললে।'

'ঠাকুরের যখন একবার দর্শন পেলে তখন মুক্তির আর বাকি রইল কি মা!' শ্রীমার চোখ দুটি প্রসন্নতায় ভরে উঠল : 'জানো না বুঝি আমার নরেনের কাণ্ড ? সেবার মাদ্রাজে গিয়ে ভূতের পিণ্ড দিলে। পিণ্ড দিয়ে মুক্ত করে দিলে প্রেতাত্মাদের।'

কলকাতার রাস্তায় লাটুর সঙ্গে নরেনের দেখা।

'তোদের ওখানকার খবর কি ?' জিগগেস করলে নরেন।

'কাল উখানে কত উৎসব হল, আপুনি যান নাই কেন ? হামার সঙ্গে আজ উখানে চলুন—'

'আমার বয়ে গেছে। সামনে একজামিন। এখন এক পাগলা বামুনের সঙ্গে বসে আড্ডা দেবার আমার সময় নেই।'

'পাগলা বামুন!' হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল লাটু। 'পাগলা বামুন আপুনি কাকে বলছেন ?'

'আর কাকে! কোমরে কাপড় থাকে না, হাত-পা তেউরে যায়, নাম শুনলেই ধেই-ধেই করে নাচে, মান-ইজ্জত নেই, যেখানে-সেখানে খালি গায়ে যাওয়া-আসা করে! তার পর আবার ভেল্কি দেখানো আছে—'

'ভেল্কি!'

তা ছাড়া আবার কি! সেই গান আছে না ? নিতাই কি ভেল্কি জানে, নিতাই কি জাদু জানে! শুকনো কাঠে ফল ধরালো, ফুল ফোটালো পাষাণে!

'হ্যাঁ রে, রাখাল ওখানে যায় ?'

'যায় বই কি। শুধু যায় না, কখুনো দু-তিন রাত্তির থেকেও যায়। ঠাকুর তাকে ছেলে বলেন। মাকে বললেন, এই নাও গো তোমার ছেলে এসেছে।'

'রাখালকে তাঁর ছেলে বললেন ?'

'সাচ বলছি, তাই শুনেছি।'

রাখাল যদি ঠাকুরের ছেলে, নরেন শ্রীমার।

'মা, এই ১০৮ বিল্বপত্র ঠাকুরকে আহুতি দিয়ে এলুম, যাতে মঠের জমি হয়। তা কর্ম কখনো বিফলে যাবে না। ও হবেই এক দিন।' নরেনের কণ্ঠে বজ্রের ঘোষণা।

তার পর মঠের জমি কেনা হলে চতুঃসীমা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাল শ্রীমাকে। বললে, "মা, তুমি তোমার আপন জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে বেড়াও।'

একদিন খুব ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে এসেছে নরেন। বললে, 'মা আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সবই দেখছি উড়ে যায়।'

শ্রীমা হাসলেন। বললেন, 'দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না।'

নরেন বললে, 'মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়?'

কৃষ্ণ নাম বিষ্ণু নাম দু-অক্ষর হলেও কঠিন। বানানেও কঠিন উচ্চারণেও কঠিন। শিব বলতে তিনটে 'স'-এর মধ্যে একটাকে বাছতে হয়। তার চেয়ে হরি আর রাম সোজা। বর্ণপরিচয়ের সময় যখন জল-খল অজ-আম শিখেছিলি সে সময়েই শেখা যেত হরি-রাম। তেমনি সরল, শিশুবোধ্য। কিন্তু তা-ও দু-অক্ষর। তোকে একাক্ষর মন্ত্র দিচ্ছি। সব চেয়ে কম, সব চেয়ে ছোট, সব চেয়ে সোজা—সেই একাক্ষর। ওঁ নয়, হ্রীং-ক্রীং নয়। একেবারে জলের মত তরল, শিশিরের মত ঠাণ্ডা। সেই শব্দটি শিখেছিস সকলের আগে, ভুঁয়ে পড়ে মাটি পাবার সঙ্গে-সঙ্গেই। কান্নার স্বর, আনন্দের স্বর, আর্তির স্বর, আকুলতার স্বর। সেই একাক্ষর মন্ত্রটির নাম হচ্ছে মা।

মা আমার জগৎ জুড়ে। আর আমিও তো জগৎ ছাড়া নই। তাহলেই তো মা আমাকে ধরে আছেন, ঘিরে আছেন। তাহলে আর আমার ভয় কি।

মা-ই আমার অভয় মন্ত্র।

সত্তর

সুরেশ মিত্তির 'কারণ' করে জপ করে। তার পর ছাদের পাঁচিলের পাশে বসে নিচু গলায় শ্যামার গান গায়। আস্তে-আস্তে গলা চড়তে থাকে। ক্রমে-ক্রমে সে-গলা কান্নায় গলে পড়ে।

আর সে কী কান্না। আর্তনাদের মত কানে লাগে। আশে-পাশের বাড়িগুলি সচকিত হয়ে ওঠে।

'সুরেশ মিত্তির মদ খায়।' এক দিন রাম দত্ত এসে নালিশ করল রামকৃষ্ণের কাছে। 'ওকে বারণ করুন।'

'তাতে তোর কি?' রামকৃষ্ণ ঝলসে উঠল: 'ওর ধাত আলাদা, ও নিজের পথে যাবে। তাতে তোর কী মাথাব্যথা?'

'কারণ' করে কোনো দিন যদি আনন্দে পায় সুরেশকে, তখন আর কথা নেই, সর্বক্ষণ তার মুখে শুধু রামকৃষ্ণের কথা।

'তুই কত্তামো করিস নে।' রাম দত্তকে বললে এক দিন সুরেশ। 'চল্ প্রভুর কাছে যাই। তিনি যেমন আদেশ করেন তেমনি করব।'

নবতখানার পাশে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে আছে রামকৃষ্ণ। প্রণাম করে দাঁড়াল দুজনে।

মনোবাসী টের পেয়েছে মনের কথা। বললে, 'ও সুরেন্দর, মদ খাবি তো খা না। কিন্তু দেখিস পা যেন না টলে, মার পাদপদ্ম হতে মন যেন না টলে।'

এখানেও আশ্বাস, এখানেও প্রশ্রয়। মন যদি মুক্ত থাকে, পায়ের বন্ধনে কি এসে যাবে।

জানিস না সেই দুই বন্ধুর গল্প? দুই বন্ধু—এক জন গেল বেশ্যালয়ে, আরেক জন গেল ভাগবত শুনতে। প্রথম জন ভাবছে, ধিক আমাকে। বন্ধু হরিকথা শুনছে, আর আমি এ কোথায় পড়ে আছি। দ্বিতীয় জন ভাবছে, ধিক আমাকে। বন্ধু কেমন ফূর্তি করছে, আর আমি শালা কী বেকুব। দুজনেই মলো। প্রথম জনকে বিষ্ণুদূতে নিয়ে গেল—বৈকুণ্ঠে। দ্বিতীয় জনকে নিয়ে গেল যমদূতে—নরকে।

শুধু মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত। মনেতেই শুদ্ধ মনেতেই অশুদ্ধ।

মন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছাপাও লাল নীলে ছাপাও নীল। গেরুয়ায় ছাপাও গেরুয়া। যে রঙে ছোপাও সেই রঙে ছুপবে।

'ওরে মদে বিষও আছে মধুও আছে।' সুরেশ মিত্তিরকে বললে রামকৃষ্ণ। 'মদ খাস কেন? ঐ মধুর জন্যেই তো? কিন্তু ঐ বিষ তুই ধারণ করতে পারবি? না, তুই চাস তাই ধারণ করতে?'

সুরেশ মিত্তির চুপ।

'শোন, মদ খাবার আগে ঐ বিষটুকু তুই মাকে নিবেদন করে দে। বল, মা তুমি এর বিষটুকু খাও আর সুধাটুকু আমাকে দাও।'

তাই ভালো। ঝামেলা গেল। মা-ই বিষ খাক। আমার সুধাপানের কথা, সুধাই খাব পুরোপুরি।

খাবার আগে মদের গ্লাশ মাকে নিবেদন করে দেয় সুরেশ। বলে, বিষটুকু টেনে নে মা, সুধাটুকু আমার জন্যে রেখে যা। বলে গান ধরে মুক্তকণ্ঠে:

জয় কালী জয় কালী বলো,
লোকে বলে বলবে পাগল হলো;

ভালো মন্দ দুটা কথা
ভালোটা না করাই ভালো।

কিন্তু সন্তান হয়ে মাকে কত দিন সে বিষ দিতে পারবে হাতে ধরে? সুরেশের মনে খটকা লাগল। ঠাকুর তাকে ধোঁকায় ফেলেছেন। নিজে মধুটুকু খেয়ে মাকে কি ছেলে বিষ দিতে পারে? কতটুকু পারে? কত দিন পারে? মদের গ্লাশ নামিয়ে রাখল সুরেশ।

অচলানন্দ এসে রামকৃষ্ণকে বলে, একটু কারণ খাও।

সে সব কী দিনই গেছে! যে দলের সাধকই হও না কেন আমাকে দেখাও তোমার ঈশ্বরসাধন। তোমার রীত-নীত। তোমার আকার-প্রকার। আমি শুধু দেখব আর আনন্দ করব। কত রকম ভোগা, কত রকম ভজনা!

মথুর বাবুকে বললে, 'সব সাজপাট জোগাড় করে দাও।'

ভাণ্ডারী মথুর কাণ্ডারী হল। বললে, 'সব জোগাড় করে দিচ্ছি। কার কি লাগবে বলো। তোমার যাকে যা খুশি তাই দিয়ে দাও স্বচ্ছন্দে।'

সাধুদের জন্যে শুধু চাল ডাল ঘি আটা নয়—জোগাড় হল কম্বল-আসন লোটা-কমণ্ডলু—যার যা নেশার সরঞ্জাম। সিদ্ধি গাঁজা কারণ চরস। আদা পেঁয়াজ মুড়ি কড়াই-ভাজা।

তান্ত্রিক অচলানন্দের দারুণ জেদ। বলে, কারণ খেতেই হবে তোমাকে।

রামকৃষ্ণকে চক্রে নিয়ে বসে। কখনো বা চক্রেশ্বর সাজায়। বলে, 'খাও না একটু কারণ।'

রামকৃষ্ণ বলে, 'ওগো, আমার নাম করলেই নেশা হয়ে যায়।'

আমার নেশা জিভে মেশা। বাইরের কোনো পৃথক বস্তুর দরকার হয় না। যেমনি একটু নাম করব অমনি সমস্ত সত্তা পীযূষে স্নান করে উঠবে। আমার হচ্ছে নাম-সুধার নেশা।

অচলানন্দ ছেড়ে দিল। শেষকালে শুধু বললে, 'চক্রে বসলে কারণ গ্রহণ করতে হয়—নইলে সাধনার অঙ্গহানি ঘটে।'

রামকৃষ্ণ তখন কারণ নিয়ে কপালে ফোঁটা কাটে বা ঘ্রাণ নেয়। বড় জোর আঙলে করে ছিটে দেয় মুখের উপর। পাত্রে-পাত্রে ঢেলে সবাইকে পরিবেশন করে।

একেক দিন ভীষণ তর্জন করে অচলানন্দ। বলে, 'স্ত্রীলোক নিয়ে বীরভাবে সাধন তুমি কেন মানবে না? শিবের কলম মানবে না? তন্ত্র লিখে গেছেন শিব, তাতে সব ভাবের সাধন আছে। বীরভাবের সাধনও বাদ পড়েনি—'

'কে জানে বাপু,' রামকৃষ্ণের মুখে সরল সমর্থন: 'আমার শুধু সন্তানভাব।'

মধু রায়ের গলিতে গাড়ি ঢোকে না, দাঁড়ায় পূবের বা পশ্চিমের বড় রাস্তায়। সভা-শেষে হেঁটে চলেছে রামকৃষ্ণ—গলিটুকু পেরিয়েই গাড়িতে গিয়ে উঠবে। কিন্তু ঈশ্বরানন্দে এমনি মাতোয়ারা হয়ে আছে, মেপে-মেপে পা ফেলতে পারছে না। টলমল করছে, এখানকার পা ওখানে গিয়ে পড়ছে—

রাখাল বুঝি এখন সঙ্গে নেই। তার কাজই হচ্ছে ঈশ্বরবিভোর রামকৃষ্ণকে ধরে-ধরে ঠিকমতো পথ দেখানো। এইখানে সিঁড়ি, এইখানে উঁচু, এইখানে গর্ত, এমনি বলে-বলে নিজের জায়গায় টেনে নিয়ে যাওয়া। যখন রাখাল না থাকে তখন বাবুরাম আছে।

ভক্তরা দু দিক থেকে ধরে রামকৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ির দিকে। আস্তে-আস্তে নিয়ে যাচ্ছে। রামকৃষ্ণ টলছে, হেলছে-দুলছে, পা রাখতে পারছে না থির হয়ে।

গলির মোড়ে দাঁড়িয়েছিল কারা। বলে উঠল, 'কী দারুণ টেনেছে হে!'

'বাবাঃ, একেই বলে পাঁড় মাতাল! একেবারে বেহুঁস।'

লোকে তাই দেখে চর্মচক্ষে। একেই বলে দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রমাণ! দড়িকে সাপ দেখে, ছায়াকে ভূত! আবার তেমনি ঈশ্বরতন্ময়কে বলে কি না সুরাপানে জ্ঞানশূন্য!

ওরে সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে। আমার মন-মাতালে মাতাল করে মদ-মাতালে মাতাল বলে।

আহাহা, চেয়ে দ্যাখ, ঈশ্বর যেন ঊর্ণনাভ। মাকড়সা কি করে? নিজের শরীর থেকেই সূতাতন্ত্ত সৃষ্টি করে নিজের আনন্দে জাল বোনে। আবার সেই জালের আশ্রয়েই নিজের আনন্দে বাস করে। তেমনি আমাদের ঈশ্বর। সমস্ত জগতের উপাদান তিনি, তিনিই আবার সমস্ত জগতের উপলক্ষ্য।

আবার এই জগতের মধ্যেই তাঁর বাসা। এই জগৎই আবার তাঁর লীলাগৃহ।

রামকৃষ্ণ গেছে কালীঘরে ভবতারিণীকে দর্শন করতে। সারদা তার ঘরখানি ঝাঁটপাট দিয়ে রাখছে। পেতে রাখছে বিছানা। তার পর পান সাজতে বসেছে এক কোণে।

ঘরের কাজ চটপট সেরে চুপিচুপি বেরিয়ে যাবে সারদা, দরজার মুখে রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা।

কিন্তু এ তাঁর কী চেহারা! যেন পুরোদস্তুর মাতাল! চোখ দুটো লাল, এখানকার পা ওখানে পড়ছে, কথা এড়িয়ে গেছে, কী সব যেন বলছেন জড়িয়ে-জড়িয়ে!

ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে কিনা এক মুহূর্ত ভাবল সারদা।

এক মুহূর্ত।

মাতালের মত সারদার গা ঠেলে দিল রামকৃষ্ণ। বললে, 'ওগো, আমি কি মদ খেয়েছি?'

সারদা আনন্দে লহর দিয়ে উঠল। বলসে, 'না, না, মদ খাবে কেন?'

'তবে কেন এমনি টলছি? তবে কেন কথা কইতে পাচ্ছি না? আমি কি মাতাল?'

সারদা একবার দেখল বুঝি পরিপূর্ণ চোখে। বললে, 'না, না, তুমি মদ কেন খাবে? তুমি মা-কালীর ভাবামৃত খেয়েছ।' [ক্রমশঃ।

আপনি কি জানেন?

১। বাঙলা দেশ পৃথিবীর কোথায় অবস্থিত?

২। অবিভক্ত হওয়ার পূর্ব্বে বাঙলা দেশের পরিমাণ ছিল কত?

৩। ১৮২১ অব্দে রাজা রামমোহন রায় যখন ইংলণ্ড গমন করেন তখন প্রকাশ্য ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্তদিগের সংখ্যা কত ছিল?

৪। আজ থেকে ঠিক এক শত বর্ষ পূর্ব্বে ইং ১৮৫৩ সালে সমুদায় বাঙলা গ্রন্থ-সংখ্যা ছিল কত?

৫। ভারতবর্ষে কবে কোথায় প্রথম তাড়িত-বার্ত্তাবহ স্থাপিত হয়?

৬। বিলাত থেকে ভারতবর্ষ যাত্রাকালে এক জন ইংরাজ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন: ভারতবর্ষে যত টাকা রোজগার করিবেন এক পয়সাও ইংলণ্ডে আনিবেন না। কে সেই ইংরাজ?

৭। "মহম্মদের এবং বিষ্ণুর সেবকদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতে হইবে যে তাহারা যেমন পশু আমরা তাহাদিগকে পশুর ন্যায় বধ করিব।" এই উক্তি ছাপার অক্ষরে কোথায় মুদ্রিত হয়?

৮। কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রথম কবে উন্মুক্ত হয়?

(উত্তর ৮১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আকাশ-পাতাল

অ, আ, ই

কলকাতা মহানগরী তখন শান্ত হয়ে গেছে।

মানুষের সাড়া-শব্দ নেই। ঘরে ঘরে আলো নিবে গেছে। দোকান-পত্র বন্ধ। প্রায় জনহীন পথ। উতল হাওয়া বইছে থেকে থেকে। অসংখ্য নতুন নতুন মেঘ কোথা থেকে এসে জড় হচ্ছে অজস্র নক্ষত্রমণ্ডিত সোনালী আকাশে। গঙ্গার বুকে জাহাজ, হয়তো আসছে কোন দূরদেশ থেকে। যেতে যেতে বাঁশী বাজায় তীব্র, কর্কশ, গগন-বিদারক শব্দে। কলকাতা যেন কেঁপে ওঠে হঠাৎ হঠাৎ। জেগে ওঠে ঘুমন্ত নগরবাসী। শিউরে ওঠে মাতৃবক্ষের শিশু। দমকা হাওয়ায় দুলে উঠছে গাছের শিখর। এক গাছ থেকে আরেক গাছে ওড়াওড়ি করছে বাদুড়ের ঝাঁক। রাত্রি, যখন ষড়যন্ত্র ও মন্ত্রণা চালায় কুটিল মানুষ, গোপন প্রেমে তখনই তো মগ্ন হয় প্রেমিক-প্রেমিকা। হাজার চোখের অধিকারী অশেষ রাত্রি চুপিসাড়ে কান পেতে থাকে। কান পেতে শোনে ষড়যন্ত্রের মন্ত্রণা আর প্রেম-সম্ভাষণ। অলঙ্কারে সাজসজ্জা করেছে গভীর মধ্যরাত্রি। রাত্রির গলদেশে ঝুলছে হীরা-জহরৎ। দপ-দপ জলছে সৌরজগৎ।

পৃথিবীতে এখন হয়তো সকল মানুষ নিদ্রায় অচেতন। জেগে আছে শুধু রাজেশ্বরী। রাত্রি যত ঘন হয় তত বেশী জলের ধারা নামে চোখে। উষ্ণ অশ্রু পড়ছে দর-দর বেগে। কেমন যেন অসহায় মনে হয় নিজেকে। মনে হয় অবহেলিত। অনাদৃত। সত্যিই কাঁদে রাজেশ্বরী। আসতে কি ভুলে গেল সে? ভুলে গেল রাজেশ্বরীকে। একলা বসে যত ভাবে তত উষ্ণ অশ্রু বর্ষিত হয় রাজেশ্বরীর দু'চোখ বেয়ে। দুঃখ-বেদনায় যেন মথিত হতে থাকে বুকের ভিতরটা। চোখের জলে কাঁচুলীটা বুঝি বা ভিজে যায়।

ঘড়ি-ঘরের ঘণ্টায় কিছুক্ষণ আগে দু'টো বেজে গেছে ঢং-ঢং। শিয়াল ডেকে থেমে গেছে অনেক দূরে কোথায়। এখন শুধু ঝিঁঝিঁ ডাকছে। রাত্রিকে গান শোনায় ঝিল্লী সমতানে। রাজেশ্বরী কাঁদে অঝোরে।

কাছারীতেও কেউ কেউ জেগে আছে তখনও।

অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে গেছে। জুড়ী এখনও এলো না। রাত কাবার হতে চললো তবুও নয়। ফটকে জেগে আছে প্রহরী, মশা তাড়াচ্ছে আর লম্প-শিখায় পড়ছে তুলসীদাসী রামায়ণ। বয়োবৃদ্ধ নায়েবদের এক জনের এ্যাজ্‌মা আছে। ঘুম হয় না, কাশি হয়। বেশীক্ষণ শয়ন সহ্য হয় না, অধিকক্ষণ বসে থাকতে হয়। তিনি একটা লণ্ঠন হাতে শয্যা থেকে উঠে কাছারী-ঘরের বাইরে বেরিয়ে দেখেন আকাশের অবস্থা। জ্যোৎস্নালোকিত নভোমণ্ডল। একসঙ্গে এতগুলি মানুষ এলো কোথা থেকে,—দেখে যেন চমকে ওঠেন নায়েব। কাছারীর দালানে সারি-সারি শুয়েছিল কষ্টির মূর্ত্তি যেন। লণ্ঠনের আলোয় ঘর্ম্মাক্ত মুখগুলি দেখে নায়েব এতক্ষণে বুঝতে পারেন ওরা মনোহরপুর মৌজার প্রজাবৃন্দ—মফঃস্বল থেকে এসেছে সদরে। সুস্থ, সবল মানুষ—গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে আছে। কিন্তু হুজুর কি ফিরেছেন? নায়েব ইদিক-সিদিক দেখেন আর কাশির বেগ সামলাতে থাকেন বুকে হাত দিয়ে। শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী—দেখতে দেখতে বিহ্বল হয়ে পড়েন বুঝি নায়েব। একসঙ্গে এক জোড়া পাখী ডাকাডাকি করে ওঠে প্রাঙ্গণের বৃক্ষশাখায়। মিষ্ট কূজন নয়, প্যাঁচা ডাকছে বিশ্রী শ্রুতিকটু স্বরে। একটা ছুঁচোকে ধ'রেছে পেচক দু'টি। শিকার করেছে, ডাকছে আনন্দাতিশয্যে। চাঁদের আলোকে যেন বিদ্রূপ করছে।

—ঘুমোলি রাজো?

পালঙের কাছে এগিয়ে চুপিসাড়ে জিজ্ঞেস করে এলোকেশী। মুখ লুকিয়ে শুয়ে আছে রাজেশ্বরী। এলোকেশীর ডাকে সাড়া দেয় না ইচ্ছা করেই। এলোকেশী স্বগত করে, —ঘুমিয়েছিস? বেশ ক'রেছিস। আহা, আমার বাছা রে! ধ'রে-ক'রে মেয়েটাকে কি না তুলে দিলে একটা কুলাঙ্গারের হাতে? কি লজ্জার কথা! গেছে তো গেছেই, ফেরবার নাম নেই এখনও? রূপে-গুণে লক্ষ্মীর মত বৌটাকেও মনে পড়লো না?

ফিস-ফিস গুঞ্জন শেষ ক'রে এলোকেশী ঘরের সমুখে দালানে গিয়ে শুয়ে পড়লো। বিড়-বিড় করে বকতে লাগলো আরও কত কথা। বিধাতাকে দুষতে লাগলো।

এলোকেশী যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে অনুমানে বোঝে রাজেশ্বরী। চোখ মেলে তাকায়। চোখে পড়ে কুমুদিনীর ছবি। কুমুদিনীর চোখেও জল না কি! না, লণ্ঠনের শিখার কম্পমান প্রতিবিম্ব!

একটা কলসী পাওয়া যাবে না এখন কোথাও থেকে? ভাবতে ভাবতে উঠে বসলো রাজেশ্বরী। পুলিশ এসেছিল, চলে গেল কখন? বেরিয়েছেন সেই দিন থাকতে, এখনও মনে পড়লো না একটি বারও, রূপে-গুণে লক্ষ্মীর মত বৌটাকে? রাজেশ্বরী ভাবছিল, একটা কলসী থাকলে এই মাঝ-রাতেই কলসী-কাঁখে যেতো পুকুরঘাটে। কলসীটা গলায় বেঁধে একটা ডুব দিতো জলে। আর উঠতো না। ঘরে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি করতো সকলে। ভোরের আলো ফুটলে দেখা যেতো পুকুরে দেহটা ভাসছে। কিন্তু কলসী এখন

কোথায় পাওয়া যায় ? একা থাকতে থাকতে কখন আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয় কে জানে ! হয়তো একা-একা থাকার স্বাভাবিক লক্ষণ ফুটে ওঠে রাজেশ্বরীর মনে। চোখ দু'টো ঘুমে জড়িয়ে আসে। বসে বসে ঢুলতে থাকে রাজেশ্বরী। উন্মুক্ত জানলায় আকাশটা চোখে পড়ে। ফর্সা হ'তে কত দেরী এখনও, সূর্য্য উঠতে ?

হঠাৎ একটা হাওয়ার টুকরো উড়ে আসে ঘরে। শ্যামল মাটির গন্ধ-মাখানো উতল হাওয়া। জানলার পর্দাগুলো ঢেউ তুললে। চোখে-মুখে হাওয়ার স্পর্শ লাগে রাজেশ্বরীর, স্নিগ্ধ হয়ে যায় কপালটা। বুকভরা শ্বাস নিলে একটা। অন্যমনে বসে রইলো। বসে রইলো প্রভাতের প্রথম আলো দেখতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে। মাঝে-মাঝে শুধু হাওয়ার সঙ্গে চমকে ওঠে। জেগে-থাকা রাত দেখে ভয়-ভয় করে। বিনিদ্র রজনী পোয়ায়।

—বৌদি পুলিশ এসেছে !

তন্দ্রা টুটে যায় রাজেশ্বরীর। ভুল শুনছে না তো।—কি বললে, পুলিশ ? চোখ মেলে তাকায় রাজেশ্বরী। কোথায় বিনোদা, কোথায় কে ?

পুলিশ ! মহামান্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের কলিকাতা তথা বাঙলা তথা ভারতবর্ষস্থিত পুলিশ-ফোর্স চঞ্চল হয়ে উঠেছে কয়েকটা গোপন তথ্য আবিষ্কারে। ফোর্ট উইলিয়ামের সৈন্যদের তলব পড়েছে। সাহায্য করতে হবে পুলিশকে যদি প্রয়োজন হয়। ব্যারাকে ফিরেও রেহাই পায়নি জেমশ ব্র্যাডলে। হেড-কোয়ার্টার থেকে অশ্বারোহী দূত এসেছিল জেমশ ব্র্যাডলেকে ডাকতে। কমিশনার স্বয়ং লিপি পাঠিয়েছেন মধ্যরাত্রে। হুকুম দিয়েছেন পত্রপাঠ হাজির হ'তে হবে।

ডিনার শেষ ক'রে দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি মোচনের নিমিত্ত জেমশ ব্র্যাডলে তখন গড়িয়ে পড়েছিল একটা ক্যাম্প-খাটে। অকাতরে ঘুমোচ্ছিল নাক ডকিয়ে। মিসেস্ তখন টেবিলের ধারে ব'সে, পত্র লিখছিল হোমে। দিনের বেলায় শতেক কাজে পত্র লেখার সময় হয় না। হোমে ফেলে আসা পুত্র-কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে পত্রালাপে যা যতটুকু হয়। স্কটল্যাণ্ডের গমের ক্ষেত আর ছোট ছোট গ্রাম্য কুটীর—মিসেস্ যেন চোখের সামনে দেখতে পায়। পুত্র-কন্যাদের কচি কোমল কণ্ঠস্বর যেন ভেসে আসে কানে। ভেসে আসে পেতলের খাঁচায় পোষা ক্যানারী দু'টোর কিচির-মিচির। কসমস ফুলের গন্ধভরা স্কটল্যাণ্ডের হিম-শীতল হাওয়াও হয়তো ভেসে আসে।

ফটকের ভেতর অশ্বারোহী দূত প্রবেশ করতেই চিলের পালকের কলম রেখে সজাগ হয়ে ওঠে মিসেস্। ফটকের মুখ থেকে ব্যারাকের দরজা পর্য্যন্ত পথটুকু নুড়ি-পাথরের। অশ্বের পদক্ষেপে নুড়ি ছিটকে উঠেছিল। জানলার সার্শি খুলে মিসেস্ চাঁদের আলোয় দেখলে অশ্বারোহীর অফিসিয়াল পোষাক। মর্ম্মর মূর্ত্তির মত নিশ্চল হয়ে অশ্বপৃষ্ঠে বসে আছে কে এক জন। আকাশের তারার মত কি একটা দপ্-দপ্ জ্বলছে অশ্বারোহীর গম্বুজের মত টুপীতে।

জেমশ ব্র্যাডলের গায়ে হাত বুলিয়ে ডাকলে মিসেস্ কোমল কণ্ঠে। বললে,—ডিয়ার, কে যেন অপেক্ষা করছে লনে। অফিসিয়াল্ বলেই মনে হচ্ছে। তুমি কি উঠবে, না আমি আলাপ করবো ব্যক্তিটির সঙ্গে ?

ঘুম-চোখেই উঠে বসলো তৎক্ষণাৎ জেমশ ব্র্যাডলে। বললে,—Anything dangerous ?

মিসেস্ স্বামীর কপালের ঘাম মুছিয়ে দিতে দিতে বললে,—বোধ হচ্ছে তোমার একজন কলিগ, লনে অপেক্ষা করছে।

ক্যাম্প-খাট থেকে এক লাফে সটান উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো জেমশ ব্র্যাডলে। বললে,—Is it ?

মিসেস্ বললে,—Yes.

রিভলভার-আঁটা বেল্টটা দেওয়ালের হুক থেকে খুলে কোমরে জড়াতে জড়াতে ত্রস্তপদে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় জেমশ ব্র্যাডলে। বলে,—Who is there ?

অশ্বারোহী কায়দানুযায়ী সেলাম ঠুকে বললে,—I am sir, Richard. কথা বলতে-বলতে এগিয়ে আসে পত্রবাহক। হুকুমনামার লেফাফাটা এগিয়ে ধ'রে।

চিঠিটা অন্ধকারে পড়তে পারে না জেমশ ব্র্যাডলে। ঘরের ভেতর ঢুকে টেবিলের 'পরে জ্বলন্ত লণ্ঠনের কাছাকাছি গিয়ে এক নিমিষে পড়ে ফেলে। মিসেস্ দাঁড়িয়ে থাকে রুদ্ধশ্বাস হয়ে। কোন দুঃসংবাদের আশায়। জেমশ ব্র্যাডলে বললে,—ডার্লিং, আমাকে এখুনি হেড-কোয়ার্টারে যেতে হচ্ছে। মাননীয় কমিশনার ডাক পাঠিয়েছেন।

মিসেস্ শুধু বললে,—In the midst of night ?

একটু হাসলে জেমশ ব্র্যাডলে। বললে, Darling, service is service. Duty duty,

দূরে, বহু দূরে কোথায় ডাক ছাড়লো শৃগালের পাল। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে ধড়া-চূড়া চাপিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করলো জেমশ ব্র্যাডলে, তড়িৎগতিতে। সার্শি খুলে দাঁড়িয়েছিল মিসেস্। যতক্ষণ অশ্বের পদশব্দ কানে আসে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। পত্রবাহক দূতটি জেমশ ব্র্যাডলের পিছু-পিছু ঘোড়া ছোটালে। পথের বাঁকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল দু'জনে।

—Service is service ! Duty is duty !

কথা কয়েকটা উচ্চারণ করতে করতে মিসেস্ ব্র্যাডলে টেবিলের ধারে গিয়ে বসলো। গভীর রাত্রে হঠাৎ কেন ডাক পড়লো ! চিন্তাকুল হয়ে আসে মনটা—যে-মন স্কটল্যাণ্ডের চিন্তায় বিভোর ছিল। বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে অশ্ববাহী লাঙ্গল চষতে চষতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে চাষী; মেঠো পথ ধ'রে ব্যাগপাইপে গ্রাম্য-সুর বাজাতে বাজাতে একা-একা চলেছে কোন এক গ্রামীন; দখিণ বাতাসে কল্লোলিত হয়ে উঠছে সবুজ শস্যক্ষেত্র—মিসেস্ ব্র্যাডলের চোখে জেগেছিল

স্বদেশ-স্মৃতি। কিন্তু এই গভীর রজনীতে কেন ডাক পড়লো! কলম ধ'রে বসে থাকতে হয়। ভেবে কিছু স্থির করতে পারে না মিসেস্।

বাইরে রাত্রির গতি যেন অচঞ্চল হয়ে আছে। শুদ্ধ আঁধার। ক'টা বাজে কে জানে! লনের ধারে ইউকালিপটাস গাছটার সুউচ্চ শীর্ষে উড়ে এসে বসেছে কয়েকটা প্যাঁচা—ডাকছে গলা ফাটিয়ে। অমঙ্গলের ডাক ডাকছে। মিসেস্ ব্র্যাডলে অনেক কিছুই ভাবে; অসময়ে তলব পড়ার কত কি প্রয়োজন থাকতে পারে!

জেমশ ব্র্যাডলেকে দেখেই কমিশনার সোৎসাহে প্রশ্ন ক'রলেন,—What's about your search-work! How many guineapigs traced by you?

পুলিশ হেড-কোয়ার্টার যেন কেঁপে উঠলো কমিশনারের কথায়। দণ্ডায়মান প্রহরীর দল সচকিত হ'য়ে উঠলো। গিনিপিগ, গিনিপিগ এলো কোথা থেকে!

—Not a single one,—ব্র্যাডলে উত্তর দেয় হতাশ কণ্ঠে। বলে,—I have been directed to trace, when they have gone out of sight. What can I do sir?

—What!

কমিশনার ড্রাই জিনের পেগ নামালেন মুখ থেকে। কিছুক্ষণ থেমে মনে মনে কি এক অঙ্ক কষতে থাকেন যেন। পেগটা শেষ করে বললেন,—What about that chap, the Bengalee boy-zaminder?

কি উত্তর দেবে যেন ভেবেই পায় না জেমশ ব্র্যাডলে। আকাশ-পাতাল ভাবে। বলে,—He had gone to some prostitute, to pass a joyfnl night. I hope so. He was not in his residence during my visit.

রাইফেল হাতে প্রহরীর দল শুনলো শুধু একটা কথা, জমিদার। কোথা থেকে আবার জমিদার এলো!

•

জমিদার। সত্যিই জমিদার তখন গহরজানের ঘরে!

উগ্র কি এক মদের নেশায় কাতরাচ্ছে। দু'হাতে চিবুক রেখে আধা-শোয়া হয়ে হাসতে হাসতে আলাপ করছে গহরজান মদির চোখে। মুরগী-মুসল্লম আর রুটি খাওয়ার পালা চুকে গেছে। তোফা বানিয়েছে গহরজান। মাংস-রুটির সঙ্গে তৈয়ারী করেছে ভেটকী মাছের দমপোখৎ। দমপোক্তা। তোবা তোবা বলে খেয়েছে কৃষ্ণকিশোর। খেয়েছে মদের মুখে। তারিফ শুনে খুশীতে ভরে গেছে গহরজানের অন্তর।

নেশায় নিজেকে বেসামাল মনে হ'তে কৃষ্ণকিশোর বলেছিল,—এখন ফিরবো কেমন ক'রে? দাঁড়াতে পারবো না তো?

খিল-খিল ক'রে হেসে ওঠে গহরজান।

জামরুল রঙের রুমালে মুখটা চেপে-চেপে মুছে নেয়। সুর্মা-টানা চোখে মোহ-মাখানো দৃষ্টি ফুটিয়ে বলে,—মাকে বুঝি মনে আসছে? আমি তো যেতে দেবো না এখন। ডাকাতের খপ্পরে পড়বে যে!

হুজুরের দেরী দেখে কোচম্যান আবদুল প্রথমটায় ঘণ্টা বাজিয়ে হুজুরের খেয়াল যাতে হয়, সেই চেষ্টা ক'রেছিল। কিন্তু হুজুরের পাত্তা পাওয়া গেল না। তখন রাত্রি গভীর হ'তে আবদুল নিজে গিয়েই গহরজানের দরজার কড়া ধ'রে নেড়েছিল। গহরজানের দেখা পাওয়া যায়নি, দেখা দিয়েছিল সৌদামিনী। টাকা পেয়ে সৌদামিনীর মন আনন্দাতিশয্যে ডগমগ হয়েছিল। আবদুলের হাতে গোটা দুই টাকা গুঁজে দিয়ে বলেছিল ঘুম-চোখে,—যাও না বাছা, কিছু কিনে-টিনে খাও না। রাত কাবার না হ'লে তোমাদের হুজুর যাচ্ছে না। মিছে ডাকাডাকি ক'রে ঝামেলা কর'না।

কিছু খাওয়ার লোভে যায়নি আবদুল কোচম্যান। কিছু পাওয়ার লোভেও নয়।

রাত্রি ঘন হ'তে দেখে গিয়েছিল হুজুরকে ডাকতে। চোখের সামনে হুজুরকে জাহান্নমে যেতে দেখে বুকের ভেতরটায় যেন হাতুড়ির ঘা পড়েছিল আবদুলের। চোখ ফেটে দু'-এক ফোঁটা জলও বোধ করি প'ড়েছিল। কিন্তু কোন উপায় খুঁজে মেলেনি, হুজুরকে উদ্ধার করবার কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভেবেছিল, ঘোড়া দু'টো কি ভর্‌রাত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে ঐ পথের মধ্যে! কিন্তু উপায় কি? আবদুল অনন্যোপায় হয়ে গাড়ীতে ফিরে এসেছিল। আর কোন উচ্চবাচ্য করেনি। আল্লার নাম জপেছিল। হা আল্লা, হা আল্লা ক'রেছিল।

একটা এলাচ দাঁতে কাটতে কাটতে বললে কৃষ্ণকিশোর,—মা? মাকে মনে পড়ছে? না, না, মা তো সেই কাশীতে।

কাশী! মা আছেন কাশীতে?

অস্পষ্ট অতীত আবছা-আবছা মনে আছে গহরজানের। যেন শুনেছে ঐ নামটা। যেন দেখেছে ঐ দেশটা। কেমন যেন উদাসী চোখে চেয়ে থাকে গহরজান। নিশ্চুপ হয়ে থাকে। কাশী যেন কত যুগ-যুগান্তরের পরিচিত মনে হয়। গহরজান যে ঠিক জানে না গহরজানের পিতৃ-পরিচয়। কাশীর সঙ্গে ছিল কতটা যোগাযোগ। জানে সৌদামিনী, জানে সকল বৃত্তান্ত।

—মা কাশীতে কেন আছেন?

চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে শুধোয় গহরজান। আশ্চর্য্যের ভঙ্গীতে। কথা বলতে বলতে কিছুটা কাছে এগিয়ে আসে।

নেশা হ'য়ে গেছে অধিক। ঘুমের জড়তা লাগছে চোখে। কথা ব'লতে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত যেন থমকে থাকে কৃষ্ণকিশোর। বলে,—প্রথম যেদিন নেশা ক'রেছিলুম, সেদিন বাড়ী ফিরে কেলেঙ্কারী ক'রতে মা রাগ ক'রে চলে গেছে কাশীতে। প্রথম যেদিন এখানে বসির আমাকে আনলে।

বসির। বসিরুদ্দিন। কত, কত দিন হয়ে গেছে, যেন স্মৃতির অতলতায় মুছে গেছে বসিরুদ্দিন। স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে গহরজানের, বসিরুদ্দিনের কথা। বসির ব'লেছিল, যাবে কোন বাইজীর কাছে, গান শেখাতে। লক্ষ্ণৌ না লাহোরে, কোথায় যেন ব'লেছিল।

কিন্তু মায়ের কাশী যাওয়ার কারণটা শুনে কেমন যেন গুম মেরে যায় গহরজান। কেমন অন্যমনা হয় যেন। হয়তো নারীর প্রতি গহরজান নারী ব'লেই সহানুভূতি জাগে। কে সেই মা, কেমন সে মা—যে ছেলের অপকীর্ত্তি চোখে দেখবে না ব'লে ঘর-সংসার ছেড়ে চলে গেছে দূরে, বহু দূরে।

কুমুদিনী। কুমু!

কাশীর অসি-ঘাটের তীরে পাথরের এক অট্টালিকার এক প্রায়ান্ধকার ঘরে প্রদীপের আলোয় কুমুদিনী রাত্রি জেগে কাশীর মণ্ডপ-চরিত পড়ছেন। খিদিরপুরের ভূকৈলাস রাজবাড়ীর রাজা ৬জয়নারায়ণ ঘোষাল রচিত কাশী-পরিক্রমা পড়ছেন। পড়ছেন :

অগস্ত্য কহেন শুন পার্ব্বতীনন্দন
কাশীতে প্রমাদে পাপ করে যেই জন।
কিরূপে নিষ্কৃতি তার কহ বিবরণ
কার্ত্তিক কহেন, কহি শুন তুমি মুনি—

কুমুদিনী এখন আর সেই কুমুদিনী নেই। প্রথম দৃষ্টিতে দেখলে শীঘ্র চেনা যায় না তাঁকে। শরীর কৃশ হ'য়ে গেছে, শুভ্র রঙ মুছে গেছে, চক্ষু কোটরগত হ'য়েছে। মুখে ফুটেছে দুঃখভোগের রেখা-চিহ্ন। কালো পশমের মত রাশি-রাশি চুল ছিল মাথায়, কি খেয়ালে দয়াহীনের মত নিজেই কেটে ফেলেছেন। যাঁর আকৃতিতে ছিল স্নেহময় মাতৃরূপ, তাঁকে এখন সহসা দেখলে ভয় হয়। কুমুদিনীর কণ্ঠ হ'য়েছে রুক্ষ, প্রকৃতি হ'য়ে গেছে যেন সকল মোহমুক্ত, কঠিন ও কঠোর। কিন্তু কোথা থেকে যেন অসীম মনোবল সঞ্চয় করেছেন, কুমুদিনীর প্রতি পদক্ষেপে যেন দীপ্ত ভঙ্গী ফুটে ওঠে। কুমুদিনী গভীর মনোযোগ সহকারে পড়তে থাকেন নয়, কণ্ঠস্থ ক'রতে থাকেন হয়তো কাশী-মাহাত্ম্য!

পুরাণজ্ঞ কাশীতত্ত্ববেদী শুদ্ধমতি।
তোমারে কহিব কাশীমাহাত্ম্য সম্প্রতি ॥
কাশীকৃত পাপিগণে নাহি আর গতি!
প্রায়শ্চিত্ত যাহা তাহা গোপনীয় অতি ॥
জ্ঞানাগ্নি ব্যতীত পাপ-ধ্বংস অপ্রমাণ।
বিষয়-আসক্ত চিত্তে দুর্লভ সে জ্ঞান ॥

বিষয়ে আর আসক্তি নেই কুমুদিনীর যেদিন থেকে সীঁথির সিঁদুর গেছে পুড়ে। এখন হয়তো নিজের প্রতিও নেই কোন মায়া-মমতা। একটি পরম মুহূর্ত্তের জন্য এখন কেবল তাঁর আকুল প্রতীক্ষা। কিন্তু কবে যে সেই চরম ক্ষণ আসবে, যেদিন ঐ মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে দগ্ধীভূত হ'য়ে যাবেন তিনি?

গহন রাত্রি, দৃষ্টি নেই সেদিকে। প্রদীপের আলোক-শিখা দপ-দপ ক'রে ওঠে। হয়তো তেল ফুরিয়ে গেছে। কুমুদিনী একান্ত মনে সুর ক'রে-ক'রে পড়তে থাকেন। বাইরে কুলু-কুলু রবে প্রবহমানা গঙ্গা। চন্দ্রালোকে উর্ম্মিমালা ঝিলমিল করে। যেন কে মুঠো-মুঠো স্বর্ণচূর্ণ ছড়িয়ে দিয়েছে জলে।

অসি-ঘাটে কারা যেন কথা বলাবলি করছে। এই গভীর নিশীতে কারা বাক্যালাপ করছে! হাসছে হো-হো শব্দে। অট্টহাসি হাসছে। ঘাটের পৈঁঠায় জমা হয়েছে এক দল নাগা সন্ন্যাসী। পদব্রজে বিন্ধ্যাচলের পথে চলেছে সন্ন্যাসীর দল, রাত্রি অতিবাহিত ক'রে স্নানান্তে যাত্রা ক'রবে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই। জটাজুটধারী ঐ নগ্ন নাগা সন্ন্যাসীর দল বিনিদ্রায় জেগে আছে—বাক্যালাপ করছে পরস্পরে। হাস্য-বিনিময় করছে।

কয়েকটা ধুনি জ্বলছে লকলকে জিহ্বা বিস্ফারিত ক'রে। গঙ্গার জলে প্রতিবিম্ব জ্বলছে। সন্ন্যাসীদের টুকরো-টুকরো কথা আর হাসির শব্দ হাওয়ায় ভেসে যায়।

কুমুদিনী মধ্যে-মধ্যে পাঠে বিরতি দিয়ে কান পেতে থাকেন। অনুমান ক'রতে পারেন না, কোথায় কারা কথা বলে হাসতে-হাসতে।

ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে কথা বললে গহরজান।

বললে,—মা আর ফিরে আসবেন না?

প্রশ্নটা শুনে হতচকিত হ'য়ে পড়ে কৃষ্ণকিশোর। বলে,—কি জানি! কোন কথা তো জানান না।

নড়ে-চড়ে বসলো গহরজান। গলার হারটা জেল্লা তুললো। গহরজানের সুর্মা-টানা চোখ দু'টো যেন নিদ্রালু হ'য়ে উঠেছে। বললে,—কাশীতে কোথায় আছেন তিনি?

—অসিতে একটা ঘর ভাড়া ক'রেছেন।

আবছা-আবছা যেন মনে উদিত হয় কাশীর স্মৃতি। কথা বলতে-বলতে যখন-তখন গহরজান কেমন যেন বিমনা হয়ে পড়ে। একটা শূন্য পেয়ালা ছিল কাছেই। বোতল থেকে রঙীন জল ঢেলে পেয়ালাটা পরিপূর্ণ ক'রে নেয় হয়তো নেশা টুটে যাচ্ছিল, চাগিয়ে নেয় তাই নেশাটা। মদিরা পান করে। পরীক্ষা ক'রে দেখেছে গহরজান, নেশা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই সুখ। নেশা কাটলে চোখে পড়ে এই জঘন্য পরিবেশ। ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয় নিজেকে। অসহ্য মনে হয় যেন বেঁচে-থাকা। নেশা না ক'রলে যেন মেজাজ বিগড়ে থাকে। হাসতে সাধ হয় না।

এলোমেলো দমকা হাওয়ায় একটা জানলা হঠাৎ খুলে গেল খাঁ করে। চমকে উঠলো যেন দু'জনে। দেওয়ালে ছিল টাঙানো ছবি। আদম আর ঈভের। ছবিটা কেঁপে ওঠে যেন। মদির নয়ন তুলে তাকালো গহরজান। চোখের কোণ দু'টো রাঙা হয়ে উঠেছে। রক্তাভ চোখ।

কথায় হঠাৎ সোহাগের সুর ফোটায় গহরজান। ন'ড়ে-চ'ড়ে বসে। জামরুল রঙের রুমালটা আঙুলে পাকায়। বলে,—তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে এখান হ'তে ?

প্রশ্নটা আশাতীত। মণি-মাণিক্য দিয়েছে, আবার বলে কি ? কিছুক্ষণ আগেও বলেছিল বেনেটোলার কে দত্তবাবু আলমবাজারের বাগান-বাড়ীতে নিয়ে যাবে। রাখবে। ভুলে গেল গহরজান ? নেশার ঘোরে বাজে বকছে না তো। কৃষ্ণকিশোর বলে, নিয়ে যাওয়ার মিনতি শুনে কিছুটা গলে গিয়েই বলে,—কোথায় ?

—যেথায় খুশী।

বাইরে স্তব্ধ রাত্রি। অচঞ্চল। বাইরে যেন তখন নিঃঝুমের পালা চলছে। এখন কোন ঘরে বোধ হয় কেউ গীত কিংবা নৃত্য করছে না। হাওয়ায় এখন নেই কোন গজল অথবা টৌরীর রাগিণী। তবলার বোলও ভেসে আসছে না। শুধু আকাশে টুকরো-টুকরো মেঘ ভাসছে। আর হাসছে চাঁদ।

—হঠাৎ কখনও বলা যায় ? বলে কৃষ্ণকিশোর। বলে,—বেশ তো আছো এখানে।

যেন দুঃখের মৃদু হাসি ফুটে উঠলো গহরজানের তরমুজ-রঙের ঠোঁটে। বললে,—বৌ আছে তোমার, জানলে দিকদারী করবে ?

বৌ। বউ।

কচি-কচি মুখে যার কনে-চন্দন ? ডাগর চোখে যার বিশুদ্ধ দৃষ্টি ? বুকের ভেতরটায় হঠাৎ যেন কে হাতুড়ির ঘা মারলো। ভুলে গিয়েছিল যেন বৌকে। রাজেশ্বরীকে।

আকাশ পানে তাকিয়ে দেখতে-দেখতে ক্লান্ত শরীরে কখন ঘুমিয়ে প'ড়েছে রাজেশ্বরী। বালিসে মাথা নেই, বাহুতে মাথা। ঘুমোচ্ছে অকাতরে। এলোকেশী শুধু ক'বার কথা বলতে গিয়ে বকুনি শুনে পালিয়ে গেছে। শেষ বারে রাজেশ্বরী সত্যিই ধ'মকেছিল।

এলোকেশী জিজ্ঞেস ক'রতে গিয়েছিল,—রাজো, মুখে কিছু দিবি না ? দাঁতে কাটবি না কিছু ? তুই কি ঘুমোলি ?

বেশ চীৎকার ক'রেই রাজেশ্বরী বলেছে,—আঃ, তুমি বিদেয় হবে কি না ?

তখন হয়তো কলকাতা মহানগরীতে কেবল মাত্র শুধু মহামান্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের পুলিশ হেড-কোয়ার্টারে মানুষ কথা বলাবলি করছিল রাত্রির গাম্ভীর্য্যকে উপেক্ষা ক'রে। তখন শুধু বঙ্গদেশের পুলিশ কমিশনার গলা ফাটিয়ে চটাচটি করছিলেন। লালবাজারের অপারেশন ঘর তখন শুধু কেঁপে কেঁপে উঠছিল। চমকে চমকে উঠছিল প্রহরীর দল। হাতে ভারী ভারী রাইফেল, হাত থেকে খসে প'ড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। এক পেগ থেকে আরেক পেগ। হাফ নয়, অর্দ্ধেক নয়, ফুল। ড্রাই জিনের একেকটা ফুল পেগ নিমেষের মধ্যে শেষ ক'রে ফেলছেন কমিশনার। আর চেঁচাচ্ছেন। বকছেন, ইতর ভাষায় গাল পাড়ছেন।

কমিশনার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন না। লালবাজারের অপারেশন ঘর কাঁপছে কেন তবে ? কমিশনার হঠাৎ নিনাদ ক'রে ওঠেন।

বলেন,—You bitch, swine Biswas Babu !

অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়েছিল বিশ্বাস। এ, সি বিশ্বাস। অর্থাৎ এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার বিশ্বাস বাবু। তিনি সেলাম ঠুকে হাজির হ'তেই কমিশনার পুনরায় বললেন, —You bloody bastard, didn't you check your area, inspite of innumerable orders and commands ?

ষড়ানন বিশ্বাস। বাঙালী বাবু। বাঙালী চাকর। বিশ বছরের অধিক ইংরাজের পদসেবা করছেন। কথা বলতে গিয়ে কথা বলতে পারলেন না। মুখ থেকে অস্ফুট শব্দ উচ্চারিত হয়।

কি চেক করবে বিশ্বাস ?

এরিয়া চেক করবে। পল্লীর প্রতি ঘরে-ঘরে স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের লোককে পাঠিয়ে তদারক করবে। কোন্ ঘরে কে আছে আর কে নেই। কার ছেলে ভিন্‌দেশী হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস সময় মত কান দেয়নি কাজে। ডিরেকশন দিতে ভুলে গিয়েছিল সহকারীদের, কমিশনারের মেজাজ আজ বিগড়ে আছে।

কথা বলতে বলতে টেবিলে ঘুঁসি মারছেন যখন-তখন। বসে থাকতে থাকতে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। কিছুতেই যেন স্বস্তি বোধ করছেন না। কেন কে জানে, কমিশনারের শান্তি যেন ব্যাহত হয়েছে। পার্লামেণ্ট থেকে কড়া নোট এসেছে কি জন্য, অযোগ্য বিবেচিত হ'লে ইস্তফা দেওয়ায় বাধ্য করানো হবে। তদুপরি, একটা বিশেষ ঘটনা অত্যন্ত চঞ্চল ক'রে তুলেছে কমিশনারকে। ভেবে যেন কিছু কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না। টেবিলে ঘুঁষি মারছেন যখন-তখন।

জেমশ ব্র্যাডলে একটা কেদারায় বসে থাকে। ভয়ে কোন কথা বলে না।

মধ্য-কলকাতায় কোন এক আউটপোষ্টে ধরা পড়েছে এক অদ্ভুত আসামী। বামাল সমেত গ্রেপ্তার হয়েছে। কে এক জন বাঙালী যুবক, বেহালার বাক্স হাতে চলেছিল পথে। পুলিশ চ্যালেঞ্জ ক'রেছিল যুবকটিকে। শেষ পর্য্যন্ত বেহালার বাক্সে পাওয়া গেছে দস্তরমত ডবল ব্যারেল বন্দুকের খোলা যন্ত্রপাতি।

—Smuggled arms !

ঘটনা শুনে গলা ফাটিয়ে ফেলেছিলেন কমিশনার। আগ্নেয়াস্ত্র চালান হচ্ছে ! লুকোচুরি খেলা যেন, কমিশনার চোর ধরতে না পেরে মরিয়া হয়ে গেছেন। দু'-পাঁচটা চোর নয়, দলকে দল ধরতে চাইছেন। টেবিলে ঘুঁষি মারছেন

আর বলছেন—I want gangs. I want to round up the gangs.

চুনো-পুঁটিতে মন উঠছে না কমিশনারের। ধরতে চাইছেন রুই কাতলা চিতল বোয়াল। তাই ডেকে পাঠিয়েছেন জরুরী ডাকে, জেমশ ব্র্যাডলেকে। ঘুম থেকে তুলে এনেছেন।

কিন্তু যারা ধরা পড়ছে, গারদ-ঘরের অন্ধকূপে অকথ্য উৎপীড়নেও দ্বিরুক্তি করছে না। এলোমেলো কথা বলছে। আসল কথা চেপে যাচ্ছে, উৎস বলছে না।

বিশ্বাস বাবু নত-মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকেন। চেঁচাতে-চেঁচাতে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় কমিশনারের। কণ্ঠ শুকিয়ে যায়, এক-এক পেগ ড্রাই জীন খেয়ে তবে ধাতস্থ হন।

লালবাজারের অপারেশন ঘরটাই তো জগৎ নয়? বাইরে গহন রাত্রি। আকাশে চন্দ্রালোক, তবুও থমথমে রাত্রি দেখে যেন গা ছম-ছম করে। ক'টা বাজলো কে জানে!

জেমশ ব্র্যাডলে কিছুটা সাহসে বুক বেঁধে হঠাৎ ব'লে ফেললে মাতৃভাষায়। বললে,—Your honour, মিথ্যে-মিথ্যে যেখানে-সেখানে ঢুঁ মেরে কোন কাজই হবে না। রীতিমত তল্লাসী করতে হবে। খুঁজতে হবে root of evils.

কথাগুলো অন্যায় বলেনি জেমশ ব্র্যাডলে।

অন্যান্য অফিসিয়ালও ছিল কয়েক জনা। জেমশ ব্র্যাডলের কথা শুনে মাথা দোলালে। সায় দিলে কথায়। অফিসিয়ালদের এক জন বললে,—আর root থাকে চোখের আড়ালে মাটির তলায়, তাকে খুঁজে নিতে হয়।

জেমশ ব্র্যাডলে মন থেকেই হৃদয়ঙ্গম ক'রেছিল যে, বৃথা তল্লাসী করতে গিয়েছিল সে। বারাঙ্গনার গৃহে রাত্রি যাপন আর দেশসেবা একসঙ্গে কেউ কখনও করে! অহেতুক অপেক্ষা ক'রে সময়ই নষ্ট হয়েছে।

গহরজান বারাঙ্গনা?

জেমশ ব্র্যাডলে জানে না, গহরজান বারাঙ্গনা নয়। উচ্চবংশের রক্ত আছে গহরজানের দেহে। ভাগ্যদোষে গহরজান এখন রূপোপজীবিনী, কিন্তু পাপিষ্ঠা নয়। কুলটা কিন্তু কুলত্যাগিনী নয়। ঐ পোড়ামুখী সৌদামিনীর জন্যই গহরজানের এই হাল হয়েছে, নয় তো কোন নবাবের হারেমে হয়তো এত দিন খাস বেগম হয়েই থাকতো বহাল তবিয়তে।

উতল হাওয়ায় আতর-গোলাপের মিশ্রিত সুগন্ধ বয়ে যায় গহরজানের ঘর থেকে। দেয়ালগিরির আলোয় গহরজানের রূপপ্রভা চন্দ্রসূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল মনে হয়। বারাঙ্গনা মনে হয় না যেন, ভ্রম হয় কে এক দেবলোকবাসিনী অপ্সরী।

অপ্সরীর তখন ঘুম না নেশায় কে জানে চক্ষু ঢুলু-ঢুলু; মুখ রক্তবর্ণ; চিত্ত বিভ্রান্ত; হয়তো দ্রাক্ষাসুধার পূর্ণাধিকার তখন। ঘরের মানুষ মুরগী-মুসল্লম আর দমপোখতের তারিফ করায় গহরজানের মুখ খুশীতে ভরে যায় যেন। নীড়-বাঁধার আনন্দ অনুভব করে। ঘর-বাঁধার সুখ।

হঠাৎ কথা বললে গহরজান। স্তিমিত চোখ মেলে বললে,—তুমি আমার ডালিমের সাদি দিয়ে দেবে ব'লেছিলে। ভুলে গেছো? আমি যে বিস্তর আদমীকে ব'লে রেখেছি। কবে হবে?

কথা বলতে বলতে গহরজান এলিয়ে পড়লো চিৎ হয়ে। বেসামাল হয়ে গেলো বুক-পিঠের কাপড়। কিংখাবের আঁটসাঁট কাঁচুলী, আলোর স্পর্শে চাকচিক্য তুললো। দু'বাহু মাথাতে তুলে শুয়ে রইলো আচ্ছন্নের মত।

নারীর কাকুতি শুনে হয়তো বিহ্বল হয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। জড়িয়ে জড়িয়ে বলে,—বলেছি তো সাদি দিয়ে দেবো। তুমি ব্যবস্থা কর সাদির।

ঊর্দ্ধাঙ্গ নাচিয়ে মোহভরা মিষ্টি হাসি হাসে গহরজান। বলে,—সাদি হবে, খরচা লাগবে কত! তুমি খরচা দাও না, আমি বন্দোবস্ত করছি। এমন সাদি দেবো যে সাড়া লেগে যাবে পাড়ায়।

কথা বলতে-বলতে হঠাৎ উঠে পড়লো গহরজান। দেওয়ালগিরির জলন্ত শিখা ফুৎকারে নিবিয়ে দিলো।

নরম-নরম স্পর্শ লাগে গায়ে। টনক নড়ে চমকে ওঠে যেন কৃষ্ণকিশোর। গহরজান একটা হাত এগিয়ে ধ'রেছে। কোমল হাত। কৃষ্ণকিশোর চমকে ওঠে; রাজেশ্বরীর হাত দু'টোও এমনি মোমের মত নরম।

কাক-ডাকার শব্দে তখন ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেছিল রাজেশ্বরী।

ভেবেছিল ভোর হয়ে গেছে। আকাশ ফর্সা হয়েছে। কাক-জ্যোৎস্না হয়েছে। খটখটে আলো দেখে থেকে-থেকে ডেকে উঠছে কাকের দল। রাজেশ্বরী উঠে বসেছে শয্যায়। অঙ্গে-অঙ্গে যেন জ্বরের জ্বালা ধ'রেছে। রাজেশ্বরী বসে থাকে চক্ষু মুদিত ক'রে। এলোমেলো হাওয়ায় শুধু চূর্ণকুন্তল ওড়াওড়ি করে।

আলোয় আলোকময় আকাশ দেখে থেকে-থেকে ডেকে ওঠে কাক। পাখা ঝাপটায়। হিমেল হাওয়ায় গাছের শাখা দুলতে থাকে ধীরে-ধীরে।

ক'টা বাজলো কে জানে?

[ক্রমশঃ।

মায়ের মুখে শোনা কাহিনী এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের কথা বাদ দিলে ছাপার অক্ষরে প্রথম কোন্ গল্প আমার শিশু-মনকে আলোড়িত ও অস্ফুট কল্পনাবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়াছিল—দুস্তর স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করিয়া তাহারই সন্ধান করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। সেই আমার ঘটনা-বৈচিত্র্যহীন শৈশবের স্বচ্ছ নির্ঝর-ধারা আজিকার বাত্যাহত তরঙ্গক্ষুব্ধ ঘূর্ণাবর্তসঙ্কুল আবিল জলস্রোত হইতে বহু দূরে পিছনে পড়িয়া আছে। কালের বিপুল ব্যবধানে প্রায় সকল ছাপার অক্ষরই সেই নির্ঝর-ধারার স্নিগ্ধচপল নৃত্যপ্রবাহে উপলখণ্ডের মত হারাইয়া গিয়াছে। হাতড়াইতে হাতড়াইতে অকস্মাৎ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ছবি ও গল্প' আমার বিলীয়মান স্মৃতিপথে ভাসিয়া উঠিল। ভুলিয়া গিয়াছিলাম এই 'ছবি ও গল্পে'-সঙ্কলিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" কবিতাটিই আমার সাহিত্য-জীবনকে প্রথম উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল, গ্রীষ্মাবকাশের দ্বিপ্রহরে একদিন এই মহার্ঘ রত্ন-সম্বলিত বইখানি সংগ্রহ করিতে গিয়াই দাদাকে আহত করিয়া মায়ের কান্নার কারণ হইয়াছিলাম। বইখানির নাম স্মরণে উদিত হওয়া মাত্রই আমার অস্ফুট শৈশবকালকে ক্ষণকালের জন্য ফিরিয়া পাইলাম, বিচিত্র চিত্রশোভিত সেই 'ছবি ও গল্পে'র পাতায় পাতায় আবার সেই শিশুমনের অনন্ত কৌতূহল ও অসীম আগ্রহ লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলাম। মনে পড়িল—"আমাদের গোবর্দ্ধন, ওরফে গোব্‌রা"র "ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভ," সহৃদয় "কেনারামে"র অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা লাভ, বুদ্ধিমান "রামধনে"র মুক্তিলাভ এবং তাহাকে উপলক্ষ করিয়া পাড়ার বকাটে ছেলেদের সেই ছড়া—
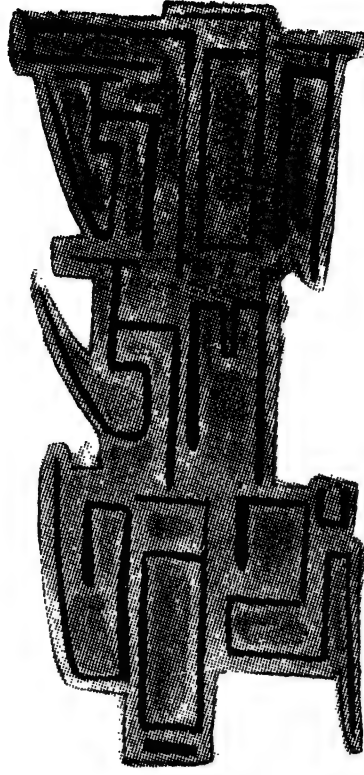
শ্রীসজনীকান্ত দাস

চতুর্থ তরঙ্গ

প্রস্তুতি (২)

"বুদ্ধিমান রামধন,
সাবধানে থেকো,
নাকে মুখে ছিপি এঁটে
বুদ্ধি ধরে রেখো।"

এবং সর্বোপরি চারি ভাগে বিভক্ত চার পরিচ্ছেদের বড় গল্প "জয়-পরাজয়ে" (আমার জীবনের প্রথম ধারাবাহিক উপন্যাস) নানা বিচিত্র ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়া গল্পের নায়ক মোহনলালের শেষ পর্যন্ত এই জ্ঞানলাভ—"দেবত্বের কাছে পশুত্ব পরাজিত।" এই চারিটি গল্পের সাহায্যেই বাংলা ছোট ও বড় গল্পের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয়। এই চারিটির মধ্যেই ভৌতিক, আধিভৌতিক, লৌকিক, পারমার্থিক, অদ্ভুত, আজগুবি, হাস্য-ব্যঙ্গাত্মক, গম্ভীর—এমন কি, আজকাল-বহুলব্যবহৃত মনস্তাত্ত্বিক রসের যথেষ্ট ইঙ্গিত পাইয়াছিলাম। শুধু অধিকাংশ বাংলা গল্পের যাহা প্রাণ—সেই নারীপুরুষ-ঘটিত প্রেম বা যৌন আবেদনের কোনও সন্ধান এইগুলিতে মিলে নাই। পূর্বে 'বর্ণপরিচয়,' 'কথামালা' প্রভৃতিতে অনেক গল্প পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সেগুলির কোনটিতেই মনে গল্প-রসের সঞ্চার হয় নাই, বানান এবং অর্থের গহনে গল্পের মাধুর্য ও আকর্ষণ হারাইয়া গিয়াছিল। এই প্রথম ছাপার অক্ষরে এমন একটি বস্তুর খোঁজ পাইলাম যাহা পাঠ্য পুস্তকে ছিল না, যাহা কাব্য না হইয়াও বাস্তব লোক হইতে কল্পনার অবাস্তব রাজ্যে আমাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিল। "জয়-পরাজয়" ছোট হইলেও আজিকার বুদ্ধিতে বিচার করিয়া দেখিতেছি, ইহাতে উপন্যাসের বাঁধন অতি চমৎকার; বাঙালী ছাত্রজীবনের দৈনন্দিন অতি সাধারণ ঘটনার সমষ্টি হইলেও ইহা সমাপ্তি পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত রাখে, ইহার উদ্দেশ্য—অন্যায়ের সহিত সংগ্রামে ন্যায়ের জয়লাভ—অতি সহজ স্বাভাবিক ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, পাঠ্য

পুস্তকের গল্পের যাহা দোষ পাঠকের চোখে আঙুল দিয়া "মরাল" প্রকট করিবার প্রয়াস ইহাতে নাই। কলিকাতা হইতে ট্রেনযোগে বাড়ি বগুলায় মায়ের কাছে যাইবার কালে নায়ক স্বপ্নে চিরশত্রু নেপালের সহিত সংঘর্ষে আহত ও মূর্ছিত হইয়া যখন "বগুলা, বগুলা" শব্দ শুনিয়া আত্মস্থ হইল, তাহার তখনকার সেই অচেতন-বিহ্বলতা আমি আজও পর্যন্ত অনুভব করিয়া থাকি; পূর্ববঙ্গ রেলপথে বগুলা ষ্টেশনটি যত বার পারাপার করিয়াছি তত বারই এক জাগ্রত জীবন্ত অনুভূতি আমাকে অভিভূত করিয়াছে। এই স্বপ্নদর্শন অধ্যায়ের প্রভাব পরবর্তী সাহিত্য-সাধনায় বহুবার অনুভব করিয়াছি। আমার প্রথম গল্পও এই স্বপ্নদর্শনমূলক—১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুর জিলা-স্কুলের হস্তলিখিত পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হয়। পরে আমার বহু গল্পে বাস্তবের সহিত স্বপ্ন জড়াইয়া গিয়াছে। 'মধু ও হুল' ও 'কলিকালে' অনেক দৃষ্টান্ত মিলিবে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নিকট আমার—তথা সেকালের ছেলেমেয়েদের ঋণের পরিমাণের কথা লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন, অক্ষয়কুমার ছানা পাকাইয়া গোল্লা প্রস্তুত করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ আসিয়া তাহা রসে ফেলিয়া রসগোল্লা করিয়া ছাড়িলেন; এই দুই জনের ক্ষেত্রে পাঠ্য পুস্তকের ক্রমপরিণতিতেই রসের সঞ্চার হইল। শিক্ষিত সমাজ তাহা গ্রহণ করিলেন। শিশুসমাজে রস-ভগীরথ হইলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। সদর-দরজা দিয়া রসের এই পরিবেশন ছাড়া জঙ্গল-ডোবা-আঁস্তাকুড়-লাঞ্ছিত খিড়কি-পথেও বহু সাহিত্যসেবী বিশুদ্ধ ও নিষিদ্ধ রসের সংমিশ্রিত ধারা প্রবাহিত করিলেন। শিক্ষিত বাঙালী তাঁহাদিগকে সরাসরি গ্রহণ করেন নাই। স্বয়ং শরৎচন্দ্রও এই শেষের দলে পড়িয়াছিলেন। ইঁহাদের কথা পরে বলিতেছি। আপাতত, যোগীন্দ্রনাথ আমাকে রসরাজ্যের যে নমুনা দিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি।

অব্যবহিত পরেই যে উপন্যাস আমাকে কল্পনা-রাজ্যের ঠিক মধ্যগগনে উড়াইয়া লইয়া গেল তাহা হইতেছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহে'র বর্ধিত সংস্করণ। *ছোট 'রাজসিংহ' পরে পড়িয়াছি*; বড়র কল্পনা-বিলাস ও বর্ণনা-নৈপুণ্য তাহাতে নাই। "চতুর্থ সংস্করণের [১৮৯৩] বিজ্ঞাপনে"র উক্তি "এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম" তখন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম কি না মনে নাই; কিন্তু 'রাজসিংহে'র কাহিনীকে সত্য বিবেচনা করিয়া হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতিগৌরব অনুভব করিয়াছিলাম স্মরণ আছে। বইখানিতে অসংখ্য চরিত্র, মহৎ চরিত্রেরও অভাব নাই কিন্তু আমার সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিল দস্যু মাণিকলালকে। মহারাণা রাজসিংহের হস্তে ধৃত হইয়া সে ভবিষ্যতে দস্যুতা পরিহারের শপথ করিয়া পূর্বপাপের শাস্তি নিজ হাতে যে ভাবে গ্রহণ করিল তাহাতে আমার বালক-চিত্ত বিমোহিত হইয়া গেল:

"এই বলিয়া দস্যু কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া, অবলীলাক্রমে আপনার তর্জ্জনী অঙ্গুলি ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ছুরিতে মাংস কাটিয়া, অস্থি কাটিল না। তখন মাণিকলাল এক শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া, ঐ অঙ্গুলির উপর ছুরিকা বসাইয়া, আর একখণ্ড প্রস্তরের দ্বারা তাহাতে ঘা মারিল। আঙ্গুল কাটিয়া মাটিতে পড়িল। দস্যু বলিল, 'মহারাজ! এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।'

রাজসিংহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দস্যু ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। বলিলেন, 'ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি?'

দস্যু বলিল, 'এ অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ। আমি রাজপুতকুলের কলঙ্ক।'

এই রাজপুতকুলকলঙ্ক অধম মাণিকলালকে শ্রদ্ধার সহিত অনুসরণ করিলাম। সে যখন রূপনগরের পানওয়ালীর সহায়তায় মোগল-সৈনিক প্রেমিক মুর মহম্মদ খাঁকে লাঞ্ছিত-অপদস্থ করিয়া তাহারই পোশাক ও হাতিয়ারে ছদ্ম বেশ ধারণ করিয়া মোগল-শিবিরে প্রবেশ করিল এবং যথাকালে রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীর শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মোগল-রক্ষীরূপে দুর্গম পর্বতের রন্ধ্রমুখে উপস্থিত হইল, তখন নিতান্ত বালক হইলেও আমিও তাহার সঙ্গে ছিলাম; রন্ধ্রমধ্যে রাজকুমারীর শিবিকা নিরাপদে রাখিয়া তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া রূপনগর-গড় হইতে কৌশলে সহস্র সুসজ্জিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেই রন্ধ্রমুখে ফিরিলাম। "পথে যাইতে যাইতে মাণিকলাল একটি ছোট রকম লাভ করিল।"—স্ত্রীলাভ। চঞ্চলকুমারী

সখী নির্মলকুমারীকে তাঁহার সঙ্গে দিল্লী লইয়া যাইতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, নির্মলকুমারী একাই দিল্লী চলিয়াছিল। মাণিকলালের সহিত তাহার এই আকস্মিক সাক্ষাতের এবং ব্লিৎজ্‌ক্রিগ-বিবাহের অনুরূপ রোমাণ্টিক ঘটনা আমি আর কখনও কোথাও পড়ি নাই। অসহায় বাঙালী-মনের অ্যাডভেঞ্চার-পিপাসা এই মাণিকলাল অনেকখানি প্রশমিত করিয়াছে।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র মোগল-আমলের খণ্ডকালের ইতিহাস ও চিরন্তন মানব-মনের ইতিহাসকে জড়াইয়া যে দ্রুততালের কাহিনী রচনা করিয়াছেন, নিয়তির অমোঘ নিয়মে আতরওয়ালী দরিয়া ও বাদশাজাদী জেব-উন্নিসা উভয়কেই এক টানে যে শোচনীয় পরিণামের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সৃষ্টিধর্মী মুন্সীয়ানা কতটুকু সে বিচার করিবার শক্তি বালকের ছিল না, তবু সে মুগ্ধ-পুলকিত হইয়াছিল এই কারণে যে, সামান্য এক রাজপুত-ভূস্বামীর সুন্দরী কন্যার অবিমৃষ্যতাপ্রসূত অভিমান বা অহঙ্কারকে সম্মান করিবার জন্য মহারাণা রাজসিংহ সর্বস্ব পণ করিয়া প্রবল প্রতাপশালী মোগল-সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধেও সমরাভিযান করিতে ইতস্তত করেন নাই, স্বজাতীয় নারীর ইজ্জৎ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত সৈন্যসামন্তপরিজন সহ সাক্ষাৎ-মৃত্যুর মুখামুখি দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহার বীরত্বের এবং স্বাজাত্য-বোধের দিকটা আমাকে মোহিত করিয়াছিল। যুগে যুগে সর্বত্র লাঞ্ছিত কলঙ্কিত ভারত-ইতিহাসের মধ্যে এই যে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একটি সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে নিঃশঙ্ক ও আত্মস্থ করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহার আবেদন অন্তত আমার কাছে বিফল হয় নাই। তাই 'রাজসিংহে'র মহিমা আজও অটল হইয়া আমার মনে বিরাজ করিতেছে। পরবর্তী জীবনে বহু গল্প-উপন্যাসে মহৎ ত্যাগের বহু আদর্শকে জয়যুক্ত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু 'রাজসিংহে'র আদর্শ তুলনায় ম্লান না হইয়া দিনে দিনে উজ্জ্বলতর হইয়াছে। ইহার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশী-আন্দোলনের পূর্বগামী হইলেও আমি উক্ত আন্দোলনের চরমতম সংঘাতের মধ্যে উপন্যাস-খানি পাঠ করিয়াছিলাম। আমার মনে মোগলে এবং ইংরেজে একাকার হইয়া গিয়াছিল, স্বদেশী-যজ্ঞের হোতারা রাজসিংহ-মাণিকলালের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

রাজধানী দিল্লীর আম-দরবারের অত্যুত্তপ্ত সামরিক এবং খাস্ অন্তঃপুরের প্রেমবিলাসের বিষাক্ত জটিল পরিবেশ হইতে সেদিনের সেই বিস্মিত উদ্‌ভ্রান্ত বালককে উদ্ধার করিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ 'রমেশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেন "প্রকাশক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বসুমতী অফিস।" এক খণ্ড কি করিয়া হস্তগত হইল আজ মনে নাই, কিন্তু সেই জীর্ণ গ্রন্থাবলীখানি আজিও আমার অধিকারে আছে। ৬৫৮ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ বই—'বঙ্গবিজেতা,' 'মাধবীকঙ্কণ,' 'জীবন-প্রভাত,' 'জীবন-সন্ধ্যা' পড়া হইয়া গেল। সেই উত্তাপ, সেই সংঘর্ষ, সেই কুটিল-জটিল চক্রান্ত—রাজধানী আর পার্বত্য সমরক্ষেত্র। বিষণ্ণ কম্পিত চিত্তে 'সংসারে' আসিয়া প্রবেশ করিলাম। সর্বাঙ্গ, শুধু সর্বাঙ্গ কেন, দেহ ও মন একসঙ্গে জুড়াইয়া গেল। এক নিমেষে প্রজ্জ্বলন্ত মার্তণ্ডলোক হইতে জ্যোৎস্নাশীতল চন্দ্রলোকে অবতীর্ণ হইলাম। কোথায় দিল্লী রাজপুতানা আরাবল্লী সিতারা আর কোথায় বর্ধমান জেলার কাটোয়াগামী রাস্তার উপর ক্ষুদ্র তালপুকুর গ্রাম! কোথায় জেব-উন্নিসা-মহাশ্বেতা আর কোথায়ই বা বিন্দুবাসিনী-সুধাহাসিনী! বাংলার গ্রামের যে চিত্র দেখিলাম, যদিও বাংলা দেশের মানচিত্র হইতে আজ একে একে তাহা নিঃশেষে মুছিয়া যাইতেছে, তথাপি তালপুকুরের স্মৃতি আমার মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। দেশ-প্রেমিক সহৃদয় কবি রমেশচন্দ্র অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন—আমি দেখিলাম :—

"তালপুকুর গ্রামে একটী সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, গ্রামের চারি দিকে মাঠ গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে চাষাগণ চারি দিকের ক্ষেত্রে চাষ দিয়াছে। গরু ও লাঙ্গল লইয়া একে একে গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে, দুই একজন বা শ্রান্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রমধ্যে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছে। তাহাদিগের গৃহিণী বা কন্যা বা ভগিনী বা মাতা তাহাদের জন্য বাড়ী হইতে ভাত লইয়া যাইতেছে। চারি দিকে রৌদ্রতপ্ত ক্ষেত্রের মধ্যে তালপুকুর গ্রাম বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং অপেক্ষাকৃত শীতল। চারি দিকে রাশি রাশি বাঁশ হইয়াছে এবং তাহার পাতাগুলি

অল্প অল্প বাতাসে সুন্দর নড়িতেছে। গৃহে গৃহে আম, কাঁঠাল, তাল, নারিকেল ও অন্যান্য ফলবৃক্ষ হইয়া ছায়া বিতরণ করিতেছে। কদলীবৃক্ষে কলা হইয়াছে, আর মাদার মনসা প্রভৃতি কাঁটাগাছ ও জঙ্গলে গ্রাম্য-পথ পূরিয়া রহিয়াছে। এক এক স্থানে বৃহৎ অশ্বত্থ বা বটগাছ ছায়া বিতরণ করিতেছে এবং কোন স্থানে বা প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষের বাগান ২০।৩০ বিঘা ব্যাপিয়া রহিয়াছে ও দিবাভাগে সেই স্থান অন্ধকারপূর্ণ করিতেছে। পত্রের ভিতর দিয়া স্থানে স্থানে সূর্য্যরশ্মি রেখাকারে ভূমিতে পড়িয়াছে, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ডালে ডালে পক্ষিগণ কুলায়ে নীরব হইয়া রহিয়াছে, কেবল কখন কখন দূর হইতে ঘুঘুর মিষ্ট স্বর সেই আম্রকাননে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর সমস্ত নিস্তব্ধ।"

বাংলার পতনোন্মুখ গ্রামাঞ্চলে এই দৃশ্য হয়তো আজিও অপ্রতুল নয়। কিন্তু ইহার পরেই রমেশচন্দ্র অতি সাধারণ দরিদ্রের যে কুটীরের ছবি আঁকিয়াছেন, কালের করাল কবলে পড়িয়া তাহা বিধ্বস্তপ্রায় হইতেছে। আমার মনে সেই আদর্শ-ছবি এখনও জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে—

"সেই তালপুকুর গ্রামে একটী সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। চারি দিকে বাঁশঝাড় ও আমকাঁঠাল প্রভৃতি দুই একটি ফলবৃক্ষ ছায়া করিয়া রহিয়াছে। বাহিরে বসিবার একখানি ঘর, সেটী ছায়ায় শীতল এবং তাহার নিকটে ৫।৬টি নারিকেল বৃক্ষে ডাব হইয়াছে। সেই ঘরের পশ্চাতে ভিতর-বাড়ীর উঠান, তথায়ও বৃক্ষের ছায়া পড়িয়াছে। উঠানের এক পার্শ্বে একটী মাচানের উপর লাউগাছে লাউ হইয়াছে, অপর দিকে কাঁটাগাছ ও জঙ্গল। একখানি বড় শুইবার ঘর আছে, তাহার উচ্চ রক সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে লেপা। পার্শ্বে একটী রান্নাঘর ও তাহার নিকট একটী গোয়ালঘরে একটী মাত্র গাভী রহিয়াছে। বাড়ীর লোকদের খাওয়াদাওয়া হইয়া গিয়াছে, উনুনে আগুন নিবিয়াছে, বেড়ায় দুই এক-খানি কাপড় শুকাইতেছে, শুইবার ঘরের রকে একটী তক্তাপোষ ও দুই একটা চরকা রহিয়াছে।..."

আমাদের একান্ত পরিচিত পরিবেশে আমাদেরই আত্মীয়-পরিজনকে অবলম্বন করিয়া যে উপন্যাস লেখা যায় সেই প্রথম অনুভব করিয়া আশ্বস্ত হইলাম। 'সংসার' ও 'সমাজে' একটা অতি মনোরম হৃদয়গ্রাহী স্নিগ্ধতা ও শান্তি যেন ব্যাপ্ত হইয়া ছিল। আমার বালক-মনও তাহাতে অবগাহন করিয়া স্নিগ্ধ হইল। সামাজিক যে গুরুতর সমস্যার অত্যন্ত সহজ সমাধান রমেশচন্দ্র করিয়া দিলেন, পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবাকে সুখী করিয়া ছাড়িলেন—সেই সব কৃতিত্ব তলাইয়া বুঝিবার বয়স তখন আমার হয় নাই, তথাপি ভাল লাগিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে'র কুন্দনন্দি-নীকে বধ করিবার জন্য চারি দিকে আটঘাট বাঁধিয়া ঘোরালো আয়োজন করিয়াছিলেন, সুধাহাসিনীকে রক্ষা করিবার জন্য রমেশচন্দ্র কোনই উত্তেজনা প্রকাশ করেন নাই, অতি নীরবে সন্দেহাতীত ভাবে কাজ সারিয়াছেন। তাঁহার এই সহৃদয় সমাধানের কৃতিত্ব পরে অনুধাবন করিয়াছি। এ যুগেও যাঁহারা রমেশচন্দ্রের 'সংসার' 'সমাজ' অনধীত রাখিয়াছেন তাঁহারা যে অত্যন্ত ঠকিয়াছেন—তাহাই বুঝাইবার জন্য বালক-আমির এই প্রিয় বই দুইখানির উল্লেখ করিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষুরধার ব্যঙ্গ এবং রমেশচন্দ্রের স্বাভাবিক নির্মল হাস্য অতি বাল্যকালেই আমাকে সাহিত্যের দুইটি বিশিষ্ট রূপ সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছিল। 'দুর্গেশনন্দিনী' তখনও পড়ি নাই, গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের সহিত পরিচয় হয় নাই। সেই নির্মল অথচ নিষ্করুণ হাসি পরে আমাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। কিন্তু 'সংসার' 'সমাজে'র শান্ত সুশীতল পরিবেশ পুনরায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিবার পূর্বেই তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' হাতে পাইলাম। বাংলার নাট্যমঞ্চ—আরও খুলিয়া বলিতে গেলে রসরাজ অমৃতলালের 'সরলা' নাটক 'স্বর্ণলতা'র প্রথমার্দ্ধের বিষয়বস্তুকে দীর্ঘকাল সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল, কিন্তু আজকাল পাঠ্যপাঠের বাধ্যতা ছাড়া 'স্বর্ণলতা' পঠিত হয় না। তবে প্রকাশের যুগে ইহা যে আলোড়ন তুলিয়াছিল তাহার জোরেই তারক গাঙ্গুলীর 'স্বর্ণলতা'র নাম বাংলার সাহিত্য-সমাজে অত্যন্ত পরিচিত হইয়া আছে। আমি যখন ইহা সাগ্রহে গলাধঃকরণ করিয়াছিলাম, তখন গদাধরচন্দ্রের "ডুচও-খাই টামাকও-খাই" ও "ঐ চরলে ডিডি" রঙ্গমঞ্চের কৃপায় প্রবাদবাক্যস্বরূপ হইয়াছে। নীলকমলের "পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে" পথের ইয়ার-ছোকরারাও গাহিয়া থাকে। সুতরাং স্বভাবত 'স্বর্ণলতা'র করুণ অশ্রুসজল দিকটি অর্থাৎ মূল কাহিনীটি আমাকে ততটা অভিভূত করে নাই যতটা করিয়াছিল নীলকমলের মস্তিষ্কবিকৃতিজনিত ও

গদাধরচন্দ্রের উচ্চারণবিকৃতিজনিত হাস্যকর পরিবেশ। বিধুভূষণ ও সরলার বিয়োগান্ত কাহিনী অথবা গোপাল-স্বর্ণলতার মিলনান্ত প্রেমকাহিনী কোনও দিনই আমার মনের উপর চাপিয়া বসে নাই, গল্পপিপাসু এবং হাস্যরসপ্রিয় আমার মনে চিরজীবী হইয়া আছে নীলকমল ও গদাধরচন্দ্র। যাঁহারা 'স্বর্ণলতা' পড়িয়াছেন তাঁহারা নীলকমলের "বাছা হনুমান" চিত্রটি নিশ্চয়ই ভুলেন নাই।—অনাবিল হাস্যরসের নিদর্শনরূপে 'স্বর্ণলতা'র এই দুইটি চরিত্র দীর্ঘ আশি বৎসর আমাদিগকে শুধু আনন্দ দেয় নাই, আমাদের সাহিত্যিক সমাজকে অনুপ্রাণিতও করিয়াছে। সামাজিক সমস্যা সমাধানের দিক দিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়াছে বলিয়াই হয়তো আমরা ইহাকে বিস্মৃতির অতল গর্ভে ঠেলিয়া দিয়াছি, কিন্তু বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম প্রথম সামাজিক উপন্যাস হিসাবে ইহার মূল্য অব্যাহত আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষে'র ইহা প্রায় সমসাময়িক। ইহার প্রথমার্ধ 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় ১২৭৯ সালের আশ্বিন হইতে ১২৮০ সালের ভাদ্র পর্যন্ত বাহির হয়; 'বিষবৃক্ষ' বাহির হয় 'বঙ্গদর্শনে' ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-ফাল্গুনে। 'স্বর্ণলতা'র পুস্তকাকারে প্রকাশের কাল ১৮৭৪ এপ্রিল, বিষবৃক্ষের ১৮৭৩ জুন। যে বড় গল্প আমাকে প্রথম উপন্যাসের আস্বাদ দেয়, 'স্বর্ণলতা' নীতির দিক দিয়া সেই "জয়-পরাজয়ে"রই বৃহৎ সংস্করণ। ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় যে পরিণামে অবশ্যম্ভাবী, স্বর্ণলতার প্রতিপাদ্যও তাহাই।

বাংলা-সাহিত্যের তৎকাল-প্রচলিত যে যে জারক রসে আমার বালক-মন জীর্ণ হইয়া সাহিত্য-ভোজে• আপনাকে নিবেদন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, নাম করিয়া করিয়া তাহার প্রধানগুলির উল্লেখ করিলাম। গল্পের বিচিত্র ও অনন্ত প্রবাহ তো বহিয়া চলিয়াছিলই। সেই প্রবাহের কোনটি স্বচ্ছ, কোনটি আবিল কর্দমাক্ত, কোনটি শান্ত, কোনটি আবর্তসঙ্কুল উত্তেজক। গ্রন্থ এবং উপহার-গ্রন্থাবলী পড়িয়াই চলিয়াছিলাম। মাসিক-পত্রিকার গহনে তখনও ঢুকি নাই, বাড়িতে তাহার আমদানিও ছিল না। বীরভূমের একজন অধিবাসী হিসাবে বাবা আমার জন্মকালে নীলরতন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বীরভূমি' নামক একটি মাসিক-পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন, অনেক পরে তাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম। যে সাময়িক-পত্র সর্বপ্রথম আমার আয়ত্তে আসে বলিয়া আমার স্মরণ আছে—তাহার নাম 'সাধনা,' সম্পাদক শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দুই খণ্ড বাঁধানো তৃতীয় বর্ষ (১৩০০ বঙ্গাব্দ)। মালদহের ইংরেজবাজার শহরের কালীতলা পল্লীর কোন্ গৃহস্থ-গৃহে আমার সাধনার বীজ লুক্কায়িত বা সংগৃহীত ছিল সে খবর হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই 'সাধনা'র বাঁধানো খণ্ড দুইটি দীর্ঘ তেতাল্লিশ বর্ষকাল সযত্নে বহন করিয়া ফিরিতেছি। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন হিতবাদীর উপহার-গ্রন্থাবলী মারফৎ আমার অতি পরিচিত। সেই বিরাট গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ দখলে না আসিলেও 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট,' 'রাজর্ষি' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' পড়িয়া ফেলিয়াছি, গল্পগুলিও চাখিয়া চাখিয়া দেখিতেছি। ১৩০০ সালের বাঁধানো 'সাধনা'র প্রথম খণ্ডে (আষাঢ়, ১৩০০) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "অসম্ভব কথা" আমার নিরঙ্কুশ গল্প-গলাধঃকরণকে চিন্তাকণ্টকিত করিয়া তুলিল। এত দিন শুনিয়া আসিতেছিলাম ও নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতেছিলাম, "এক যে ছিল রাজা।" এই নিছক গল্প শোনার সমর্থন করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ দশ বৎসরের বালকটির মনে কঠিন প্রশ্ন জাগাইয়া দিলেন, কে ছিল সে রাজা, কোথাকার রাজা, কবে তিনি ছিলেন, তিনি সত্য সত্যই ছিলেন কি না—এই সব অতি সমীচীন প্রশ্ন। এত দিন এই সব প্রশ্ন ছিল অবান্তর, বালকের মনে যুক্তির আবির্ভাব ঘটাতে বিহ্বল অসন্দিগ্ধ বালকই সচেতন তৎপর হইল, বিচারের বীজ বালক-মনে অঙ্কুরিত হইল। এই নবজাগ্রত বুদ্ধি লইয়া, বিচারের নখরদন্ত শানাইয়া মালদহ হইতে বাঁকুড়া হইয়া পাবনা পৌঁছিলাম। পূর্বেই শরৎচন্দ্রোদয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি। পাবনায় প্রথম গ্রীষ্মাবকাশে সহপাঠী বন্ধু তারাপদ লাহিড়ীর ফরাসপাতা বৈঠকখানায় সে-যুগের বিচিত্র আবিষ্কার ক্যারম-বোর্ডের সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটিল এবং পূজার অবকাশে সেইখানেই 'যমুনা' পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩২০) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চরিত্রহীন' প্রথম কিস্তি পড়িয়া ফেলিলাম। প্রথমটা অভিভূত হইলাম বটে, কিন্তু নবলব্ধ বিচারবুদ্ধির জোরে ভাসিয়া গেলাম না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য বিষয়ে পত্রাবলী

[রেভারেণ্ড জে, লং বাংলায় মুদ্রিত পুস্তক সমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করবার জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ছাত্র মাত্রেই তা অবগত আছেন। নিম্নলিখিত পত্রগুলিকে সেই তালিকার ভিত্তি বলা যেতে পারে। সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকের জন্য উপকরণ সংগ্রহের ব্যাপারে রেভারেণ্ড লংএর ধারণা খুবই নির্ভুল ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তার নিজের বিশেষ পন্থায় চালিত হচ্ছিল। ইংলণ্ড থেকে আগত তরুণ অফিসারদের শাসন ব্যাপারে দক্ষ করে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য—এ ছিল সম্পূর্ণ সরকারী ব্যাপার। কিন্তু ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটী বা বাংলা সাহিত্য সমিতিকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করতে হলেও এই সমিতি ছিল সাধারণের প্রতিষ্ঠান। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য বিষয়ে অনেক নূতন তথ্য আছে নিম্নলিখিত পত্রগুচ্ছে। —অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন।]

ক্যাপ্টেন লীজ,

সেক্রেটারী, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সমীপে :—

মহাশয়,

বাংলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে এ পর্য্যন্ত কত দূর কি করা হয়েছে, তা নির্দ্ধারণের জন্য ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটী বার মাস আগে আমাকে বাংলায় মুদ্রিত সকল পুস্তক সংগ্রহ করতে বলেছিলেন। আমি তা কতকটা করেছি, কিন্তু পুস্তক ক্রয়ের মত পর্য্যাপ্ত টাকা আমাদের নেই।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লাইব্রেরীতে যে সব বাংলা বই দু'খানা করে আছে, সেই সব বইএর এক-একখানা যদি সোসাইটীকে দেওয়া হয়, তাহলে সোসাইটীর বিশেষ উপকার করা হবে।

ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটীর লাইব্রেরী পাবলিক লাইব্রেরীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং তার ফলে সকলে সহজেই তার সদ্ব্যবহার করতে পারবে আর বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে পরিকল্পনা বিবেচনা করার সময় সরকার এখান থেকে বাংলায় মুদ্রিত বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক সমূহের সাহায্য নিতে পারবেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইংরেজী পুস্তকগুলি যে ভাবে পাবলিক লাইব্রেরীতে দেওয়া হয়েছে, ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটী সেই ভাবে তাদের পুস্তকগুলি পাবলিক লাইব্রেরীকে অর্পণ করেছে।

আপনার বিশ্বস্ত

২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৫৩ (স্বাঃ) জে, লং

এই পত্রখানি—যাতে পাবলিক লাইব্রেরীর সূচনা সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে—বাংলা সরকারের সেক্রেটারীকে ১৮৫৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে লিখিত নিম্নলিখিত পত্রের মধ্যে প্রেরণ করা হয়। এই পত্র দু'খানি ৩৭ নং ও ৩৮ নং পত্র হিসেবে ১৮৫৪ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখের জেনারেল ডিপার্টমেণ্টের সাধারণ কার্য্যবিবরণীর অংশ মধ্যে পরিগণিত হয়।

মহাশয়,

আমি এই পত্রের সঙ্গে রেভারেণ্ড জে, লংএর নিকট হতে প্রাপ্ত ২৮শে তারিখের পত্রের এক অনুলিপি বাংলার ডেপুটী গভর্ণরের নিকট পেশ করবার জন্য প্রেরণ করছি। রেভারেণ্ড লং ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটীর পক্ষ থেকে কলেজ লাইব্রেরীর যে সব বাংলা বই দু'খানা করে আছে, তার এক-একখানা দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

কলেজ লাইব্রেরীতে যে সব বাংলা বই আছে, তার একটা তালিকা এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি এবং এ বিষয়ে গভর্ণর বাহাদুরের আদেশ প্রার্থনা করছি।

আপনার বিশ্বস্ত

(স্বাঃ) ডব্লিউ, এন, লীজ

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেক্রেটারী

এই পত্রের সঙ্গে যে তালিকা দেওয়া হয়েছিল, তা নিম্নে প্রকাশ করা হল। এ থেকে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের অবস্থার একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায় :

ক্রমিক সংখ্যা	পুস্তকের নাম	লাইব্রেরীতে রক্ষিত কপির সংখ্যা
১।	হিতোপদেশ	২৪
২।	ঐ (লক্ষ্মীনারায়ণকৃত অনুবাদ)	৪
৩।	রাজা প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস	২১
৪।	রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ইতিহাস	১১

ক্রমিক সংখ্যা	পুস্তকের নাম	লাইব্রেরীতে রক্ষিত কপির সংখ্যা
৫।	তোতা ইতিহাস	১০
৬।	ডেভিডের সঙ্গীত	৫৮
৭।	মহাভারত	১০
৮।	রামায়ণ	৪৬
৯।	লিপিমালা	২১
১০।	বত্রিশ সিংহাসন	১০
১১।	পুরুষ পরীক্ষা	২৫
১২।	প্রবোধচন্দ্রিকা	১১
১৩।	সঙ্গীত-তরঙ্গ	৬
১৪।	ক্যারীর বাংলা ব্যাকরণ	১০
১৫।	ঐ ঐ কথোপকথন	৩
১৬।	ঐ ঐ অভিধান	৩৫
১৭।	শব্দসিন্ধু	৫
১৮।	সৎসাহসের কাহিনী	৪১
১৯।	ভাগবতচন্দ্র বিশারদের বাংলা ব্যাকরণ	১০
২০।	বেতালপঞ্চবিংশতি	৬৮
২১।	বাংলার ইতিহাস	৭১
২২।	অন্নদামঙ্গল	৮০
২৩।	কুসুমাবলী বা বাংলা কবিতা সংগ্রহ	৭৫
২৪।	বাস্তবস্তুবিচার	১২
২৫।	বাংলায় সেক্সপীয়ারের গল্প	২
২৬।	শিশুশিক্ষা—(৪ ভাগ)	১০
২৭।	নীতিবোধ	১০
২৮।	চারু মীমাংসা	৭
২৯।	অদ্ভুত রামায়ণ	১২
৩০।	প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক	১২
৩১।	বাংলা পত্রলেখক	৬
৩২।	পারসীক ও বাংলা শব্দমালা	১০
৩৩।	সঙ্গীত গৌরকেস্থনারা (?)	১২
৩৪।	হিন্দুস্তানের ইতিহাস	১০
৩৫।	ঈটসের বাংলা ব্যাকরণ	১৩
৩৬।	শ্যামাচরণ সরকারের বাংলা ব্যাকরণ	৭৫
৩৭।	বাক্যাবলী	৩৪
৩৮।	দিগ্‌দর্শন	১৭
৩৯।	মার্শম্যানের বাংলা অভিধান	৪১
৪০।	বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দুস্থানী অভিধান	৩
৪১।	মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের বাংলা শব্দমালা	১
৪২।	গোবিন্দচন্দ্র সেনের বাংলার ইতিহাস	২০
৪৩।	জীবনচরিত	১০
৪৪।	নরোত্তমবিলাস	২
৪৫।	ফর্ষ্টারের বাংলা শব্দমালা	৪
৪৬।	রামকমল সেনের ইংরাজী ও বাংলা অভিধান	৬০
৪৭।	সিভিল গাইড	১
৪৮।	জনসনের সংক্ষিপ্ত অভিধান (মেণ্ডিজের সংস্করণ)	৪
৪৯।	ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	৩৩
৫০।	বাংলা বাইবেল	২
৫১।	গ্ল্যাডউইনের পারসীক মুন্সীর মজার কাহিনী	৬
৫২।	রোমিও ও জুলিয়েটের ইতিহাস	১
৫৩।	করুণানিধান বিলাস	১৫
৫৪।	মহাভারত আদিপর্ব্ব	২১
৫৫।	শব্দাম্বুধি	৪

(স্বাঃ) ডব্লিউ, এন, লীজ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারী।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৫৩

এই তালিকার সব বই এখন পাওয়া যায় কি না তা আমি জানি না। তবে এ কথা ঠিক যে, এই তালিকার সমস্ত বই-ই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত হয়নি। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ যত দূর সম্ভব বাংলায় মুদ্রিত পুস্তক সমূহ সংগ্রহ করে মজুত করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

যাহা হউক, প্রস্তাবটি যে সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েছিল তা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারীকে লিখিত নিম্নলিখিত পত্র থেকে বোঝা যায় :

মহাশয়,

আপনার ৩১শে তারিখের ৫৫১ নং পত্র যার সঙ্গে কলেজ লাইব্রেরীর বাংলা বই সমূহের এক-একখানি দান করার জন্য ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটির পক্ষ থেকে রেভারেণ্ড লংএর আবেদন প্রেরণ করা হয়েছে, সেই পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করার জন্য আমি ডেপুটি গভর্ণর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়েছি এবং আমাকে এই উত্তর দেবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে সব বই দিলে কোন অসুবিধা হবে না, সেই সব বই মিঃ লংকে দেবার অধিকার গভর্ণর বাহাদুর আপনাকে দিতেছেন ; ফলাফল যেন এই অফিসে জানান হয়।

আপনার বিশ্বস্ত

ফোর্ট উইলিয়ম (স্বাঃ) ডব্লিউ, গর্ডন ইয়ং

১৬ই জানুয়ারী, ১৮৫৪। বাংলা সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারী।

এর আগে থেকেই কমিটি বাংলা সরকারের সহযোগিতা চেয়েছিলেন এবং সহযোগিতা পেয়েও আসছিলেন। কমিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত ম্যাগাজিন বিবিধার্থসংগ্রহের ৪৫খানি কপি উপহার দেবার সময় কমিটির সেক্রেটারী হেনরী উড্রো বাংলা সরকারের সেক্রেটারীকে লেখেন :

ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটি আমাকে দক্ষিণ অঞ্চলের জেলা সমূহে ব্যবহারের জন্য তাদের প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের ৪৫খানি করে কপি বাংলা সরকারকে উপহার দেবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এমন কয়েক জন ভদ্রলোক নিয়ে এই কমিটি গঠিত যাদের একমাত্র

লক্ষ্য—স্কুল বুক বা ট্রাক্ট সোসাইটী কিম্বা এশিয়াটিক সোসাইটীর আয়ত্তের বহির্ভূত জ্ঞানের প্রচার। যে ম্যাগাজিন এক্ষণে উপহার দেওয়া হল, কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে দেশীয় লোকদের মধ্যে তার প্রচার-সংখ্যা বার শ'তে পৌঁছেছে। এই অপ্রত্যাশিত সাফল্য থেকে এইরূপ সাহিত্যের অভাব বা প্রয়োজনীয়তা বেশ বুঝতে পারা যায়। এই জন্য যে সব কাছারীতে বাংলা কথ্য ভাষা সেই সব কাছারীতে ব্যবহারের জন্য এই ম্যাগাজিনের ৪৫খানি কপি গ্রহণের জন্য আপনাকে সসম্মানে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার
লামার্টিনিয়ার (স্বা:) হেনরী উড্রো, এম, এ
১২ই ডিসেম্বর, ১৮৫১ সেক্রেটারী, ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটি।

নিম্নলিখিত পত্রে উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়:

বাংলা সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারীর নিকট হইতে ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটির সেক্রেটারী সমীপে:—

ফোর্ট উইলিয়ম, ১১শে ডিসেম্বর, ১৮৫১

মহাশয়,

আপনার ১২ই তারিখের পত্র সম্পর্কে বাংলার ডেপুটী গভর্ণর আপনাকে এই অনুরোধ করতে বলেছেন যে, বাংলা সরকারকে ৪৫ কপি ম্যাগাজিন দেওয়ার জন্য আপনি যেন ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটিকে গভর্ণরের ধন্যবাদ জানিয়ে দেন।

কপিগুলি নিম্নলিখিত অফিস সমূহে বিতরণ করা হয়েছে এবং রাজস্ব বোর্ডকে কলেক্টরদের এই নির্দ্দেশ দেবার অনুরোধ জানান হয়েছে যে, তাঁরা যেন কপিগুলি এমন লোকের হাতে দেন, যারা দেশীয় লোকদের মধ্যে এর প্রচার করতে বিশেষ সক্ষম:

যশোহর, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও আসামের কমিশনারদের অফিস, বাখরগঞ্জ, বীরভূম, বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম, ঢাকা, দিনাজপুর, হুগলী, যশোহর, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, ময়মনসিং, নদীয়া, রাজসাহী, রংপুর, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও ২৪ পরগণার কলেক্টরদের অফিস, বারাসত, বাঁকুড়া, বগুড়া, ফরিদপুর, মালদহ, নোয়াখালী ও পাবনার ডেপুটী কলেক্টরদের অফিস, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দুরাং, নওগাঁ, শিবসাগর ও লখিমপুরের কলেক্টরদের অফিস এবং, মানভূমের ব্যক্তিগত সহকারীর অফিস।

আপনার বিশ্বস্ত
(স্বা:) ডব্লিউ, সিটনকার
বাংলা সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারী।

এই সকল নির্দ্দেশ সহ কমিটির সেক্রেটারী ম্যাগাজিনের কপিগুলি প্রেরণ করেন এবং নিম্নলিখিত পত্রে বাংলা সরকারের সেক্রেটারীকে সংবাদ জ্ঞাপন করেন:

ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটির সেক্রেটারীর নিকট হইতে;
তারিখ ২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৫২।

বাংলা সরকারের সেক্রেটারী সমীপে

মহাশয়,

ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমি সরকারকে বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলের জেলা সমূহে প্রধান আদালতগুলিতে ব্যবহারের জন্য ৪৫ কপি বিবিধার্থসংগ্রহ উপহার দিতেছি। এই সাময়িক পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা বর্ত্তমানে বার শত। সরকার যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই উপহার গ্রহণ করেন।

আপনার বিশ্বস্ত
(স্বা:) হেনরী উড্রো, এম, এ
লামার্টিনিয়ার স্কুলের অধ্যক্ষ ও ভার্ণাকুলার
লিটারেচার কমিটির সেক্রেটারী।

নিম্নলিখিত পত্রে উক্ত প্রস্তাব ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত হয়:

ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটির সেক্রেটারী সমীপে

মহাশয়,

২রা তারিখে এই অফিসে প্রাপ্ত আপনার বিনা তারিখের পত্র সম্পর্কে বাংলা সরকার আপনাকে এই অনুরোধ জানাবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন যে, বাংলা সরকারকে ৪৫খানা বিবিধার্থসংগ্রহ দেওয়ার জন্য আপনি যেন ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটিকে গভর্ণর বাহাদুরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রাজস্ব বোর্ডকে ১১শে ডিসেম্বর তারিখের পত্রে বর্ণিত অফিসারদের নিকট এই ম্যাগাজিন বণ্টন করে দেবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আপনার বিশ্বস্ত
ফোর্ট উইলিয়ম, (স্বা:) ডব্লিউ সীটনকার
১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫২ বাংলা সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারী।

কেশে মাখো ব্র্যাণ্ডি বীয়র

কেশ-পরিচর্চ্চায় নারী সেই আদিযুগ থেকে কত কি পদার্থ ব্যবহার করে আসছে! জলীয় নির্য্যাস, সুগন্ধী তৈল ও বৈজ্ঞানিক ঔষধের বাজারে সীমা-সংখ্যা নেই। সম্প্রতি জোহানসবার্গে নারীদের মধ্যে কেশে শ্রেফ মদ ব্যবহারের রেওয়াজ হয়েছে। জলে কেশ ধৌত ক'রে মদ মাখানো হয়। কিংবা শ্যাম্পেন অথবা বীয়র। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, বীয়র কেশের পক্ষে যথার্থই কাজে লাগছে। যদিও শ্যাম্পেন এবং ব্র্যাণ্ডি চুলে টনিকের কাজ করে। ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায়, মুখের সৌন্দর্য্য বজায় রাখতে এলিজাবেথ মদে মুখ ধৌত করতেন এবং স্কট্ল্যাণ্ডের রাণী মেরী মদে স্নান করতেন।

যাযাবর

আখ্যান

মেয়েদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বৃহৎ সজ্জাকক্ষটির পাশ দিয়ে বোধ করি বিশেষ কোন একজনের সন্ধানেই যাচ্ছিলেন নীরজা।

ব্যস্ত পদে মান্নামাসি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "নীরু, গৌরীকে দেখেছ কি এদিকে?"

নীরজা উত্তর করলেন, "কৈ, না তো!"

"হতভাগা মেয়ে গেল কোথায়? নাঃ, আমি আর পেরে উঠছিনে।" মান্নামাসির কণ্ঠে বিরক্তি ও হতাশার সংমিশ্রণ।

বিস্ময়াবিষ্ট নীরজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, ব্যাপার কি, মান্নামাসি?"

"আর বল কেন ভাই। সকাল থেকে পই পই করে মেয়েকে বললেম, ষ্টেজে নিখিলের সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁর কাজে একটু সাহায্য করতে। কে শোনে সে কথা! মেয়ে কোথায় বসে আছেন তার ঠিকানা নেই। এই মেয়ে নিয়ে আমার হয়েছে মরণ।"

"না, মান্নামাসি, গৌরীর মতো এমন ভালো মেয়েকে আপনি অমন করে বলবেন না।"

মেয়ের প্রশংসায় মা মনে মনে যথেষ্ট প্রীত হলেন। কিন্তু মুখে প্রতিবাদের ভাব ফুটিয়ে বললেন, "তোমরা তো বল, ভালো। নিজের ইষ্ট-অনিষ্ট বোধ যার নেই তার আবার ভালো কী?"

উত্তরে নীরজা কিছু বলার চেষ্টা করতেই তাঁকে বাধা দিয়ে পরিবর্ত্তিত স্বরে বললেন, "বুঝেছি, তুমি কি বলবে। সত্যি কিছু বোকা সে নয়। সে কি আর আমি জানিনে? নিজের মেয়ের কথা নিজে বলতে নেই! নইলে দেখতে, শুনতে, স্বভাবে, বুদ্ধিতে এমন মেয়ে আর কটি আছে আমাদের চেনা-জানার মধ্যে? জাঁক করছিনে। কিন্তু শিখিয়ে-পড়িয়ে মেয়েকে সবার প্রশংসার যোগ্য করে গড়ে তোলা যে কতখানি শক্ত ব্যাপার সে যে করেছে সে-ই শুধু জানে।"

নীরজা বিনা প্রতিবাদে মান্নামাসির কৃতিত্ব স্বীকার করলেন।

খুশি হয়ে মান্নামাসি বললেন, "মেয়ের সব ভালো। কিন্তু বড্ড বেশী লাজুক। আজকালকার ছেলেদের কী ধারা জানো তো? গুরুজনদের ঠিক করা সম্বন্ধে বিয়ে করবে এমন পাত্রই নয়। এরা নিজেরা দেখবে, মিশবে, পছন্দ করবে, তবে তো বিয়ে। অমনি কি আর তাঁদের চোখে পড়া যায়? এখনকার দিনে মেয়েদের কি একটু ফরোয়ার্ড না হলে চলে?"

ফরোয়ার্ড! যাক্, ইংরেজী করে কথাটাকে তবু কিছুটা ভদ্র করা হয়েছে। তা না হলে আসলে ব্যাপারটা তো গায়ে-পড়া-ভাব। চলতি বাংলায় যাকে বলে বেহায়াপনা।

নীরজা মনে মনে সঙ্কুচিত হলেন। ছিঃ ছিঃ। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলেই কি তাদের মান সম্ভ্রম বোধটুকুও থাকতে নেই?

দুঃখও বোধ করলেন। মেয়ের জন্য নয়। মেয়ের মার জন্য। হায়, মান্নামাসি! তিনি তো জানেন না, গৌরীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে কার সঙ্গে! কত শক্তিশালী তার প্রতিপক্ষ! তিনি তো জানেন না যে, একালে যুদ্ধে জয় সাহসের দ্বারা হয় না, সামর্থ্যের দ্বারা হয়। বোঝেন না যে এ যুগে আর্ম্মির চাইতে আর্ম্মামেণ্টের প্রয়োজন বেশী। বেচারা গৌরী। মায়ের তাড়নায় যতই কেননা সে ফরোয়ার্ড হোক, তার জয়ের আশা কোথায়? শট্ গান্ দিয়ে কি শার্ম্মেন ট্যাঙ্কের সঙ্গে লড়াই করা চলে?

আপন মনোভাব গোপন করে কিছুটা পরিহাসের ভঙ্গিতে নীরজা বললেন, "কিন্তু মান্নামাসি, গৌরীকে না দেখতে পেয়ে আপনি এত উতলা হচ্ছেন কেন? এই রাত্রেই তাকে দুর্গ দখলের জন্য ফরোয়ার্ড মার্চ্চ করতে হবে না কি?"

মান্নামাসি হেসে বললেন, 'এখন খুব ঠাট্টা করে নিচ্ছ। তা কর। মেয়ে বিয়ের দুর্ভাবনা তো টের পাওনি। বিয়ে-থা হোক, ঘর-সংসার কর; তখন বুঝবে বয়স্থা মেয়ে সৎপাত্রে না দিতে পারা পর্য্যন্ত মায়েদের কেন মুখে ভাত রোচে না, চোখে ঘুম আসে না।"

নীরজা সহানুভূতির সুরে বললেন, "না মান্নামাসি, আপনি মিছে অত ভাববেন না। গৌরীর মতো এমন লক্ষ্মীমেয়ের ভালো বর জুটবে না তো জুটবে কার?"

"না, মা, সে ভরসা নিয়ে তো চুপ করে বসে থাকা যায় না। একে তো ছাই পোড়া দেশে সুপাত্রের

সংখ্যাই কম, যদি বা একটি ভালো পাত্র পাওয়া গেল, তার পিছনে কী যে সাংঘাতিক শনির দৃষ্টি তা আমিই জানি। তুমি ছেলেমানুষ, এ সব বুঝবে না।"

ছেলেমানুষ মনে মনে হাসলেন। ভাবলেন, উপমাটা ঠিক হয়নি। শনি নয়,—রাহু! এ শুধু গ্রাস করতে জানে, পরিপাক করতে নয়। সে গ্রহণ করে না। গ্রহণ ঘটায়। তাতে পৃথিবীতে নামে অন্ধকার, কমল মলিন হয়, কুমুদ বিশীর্ণ।

স্বভাবতঃই অনূঢ়া কন্যার জননীরা পছন্দ করেন না স্বশ্রেণীর বিবাহযোগ্যা অন্য মেয়েদের। যেমন এক মোটর গাড়ির সেলস্‌ম্যানেরা সুচক্ষে দেখেন না অন্য কোম্পানীর গাড়িকে। বয়সের দিক দিয়ে নীরজা গৌরীর চাইতে অল্প কয়েক বছরের মাত্র বড়। সে হিসাবে তাঁকে আপন কন্যার একজন সম্ভবপর রাইভ্যাল জ্ঞান করা মান্নামাসির পক্ষে অনুচিত হতো না। কিন্তু আর্থিক স্বচ্ছলতা, সামাজিক মর্য্যাদা বা দেহসৌষ্ঠব—এ তিনের কোন দিক দিয়েই নীরজা কোন দিন মান্নামাসির উদ্বেগের হেতু হননি। তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, সম্ভবপর পাত্রদের মনোযোগ থার্ম্মোমিটারে নীরজার স্থান সাড়ে আটানব্বই ডিগ্রীরও অনেক নীচে। তাই নীরজার প্রতি তাঁর মনে কোন বিরূপতা ছিল না। এমন কি নিজের মনের সুখ-দুঃখের কথা নীরজার কাছে ব্যক্ত করতেও তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না।

সখেদে মান্নামাসি বললেন, "এ সব কি আমার করার কাজ? না আমার ভাববার কথা? এমন এক লোকের হাতে পড়েছিলেম যে সারা জীবন কেবল কষ্ট পেয়েই গেলেম। বেঁচে থাকতে কোন দিন কোন কাজ তাঁকে দিয়ে হয়নি, মরেও আমার মাথায় দিয়ে গেছেন এই কন্যাদায়ের ভার। সত্যি বলছি মা তোমাকে, বিয়ে হয়নি, তবুও আছো সুখে। মনোমতো হাতে না পড়ার চাইতে চির জীবন আইবুড়ো থাকা বরং ভালো। তাতে এমন অহর্নিশি দগ্ধে দগ্ধে মরতে হয় না।"

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রইলেন। মান্নামাসি মনে মনে পর্য্যালোচনা করলেন আপন ভগ্ন আশা, তিক্ত স্মৃতি ও ব্যর্থ জীবন। নীরজা স্মরণ করলেন আপন অপূর্ণ অতীত, অতৃপ্ত বর্ত্তমান ও অনিয়ত ভবিষ্যৎ।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মান্নামাসি বললেন, "যাই, দেখিগে মেয়েটা কোথায় গেল।"

মান্নামাসির প্রস্থান অন্তে নীরজা মিনিট কয়েক বোধ করি অন্যমনস্ক ছিলেন। পরিচিত কণ্ঠ শুনে চমকে চেয়ে দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিখিল।

ষ্টেজে আলোকসম্পাত ও সমুদ্রদৃশ্যের বৈদ্যুতিক কৌশলগুলি সম্পর্কে শেষবারের মতো সহকর্ম্মীদের নির্দ্দেশ দিয়ে তিনি অভিনয়ে নিজ বেশবিন্যাসের জন্য আপন সজ্জাকক্ষের দিকে যাচ্ছিলেন। দূর থেকে নীরজাকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার হাতের জ্বালাটা কমেছে, নীরজা? আর রক্ত বেরুচ্ছে না তো?"

নীরজা সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, "আমি আপনার খোঁজেই যাচ্ছিলেম। এই নিন।" নিজের হাতের ব্যাগটা থেকে কী একটা ক্ষুদ্র জিনিষ বের করে নিখিলের হাতে দিতে গেলেন।

"কী? স্লিভ লিঙ্কস্! একটা কেন? ওঃ, তাই তো, আমার বাঁ আস্তিনে লিঙ্কস পরিনি দেখছি। আশ্চর্য্য, আমার তো খেয়ালই হয়নি। ছিল কোথায় এটা?"

"যেখানে বরাবর থাকে। আপনি এক হাতে পরেছেন, তাড়াতাড়িতে অন্য হাতে পরতে ভুলে গেছেন।"

"ঠিক। কিন্তু তুমি তো ভোলনি। সত্যি নীরজা, তোমাকে যত দেখছি তত আমি অবাক হচ্ছি। রোগীর সেবা থেকে অসাবধানী লোকের তদারক পর্য্যন্ত সব কাজেই তুমি এক্সপার্ট। আমি যে তোমার কাছে কত কৃতজ্ঞ তা কথায় জানাতে—।"

"নার্সের কাজই তো লোকের পরিচর্য্যা করা। তা ঠিকমতো না করলে আপনি রাখবেন কেন? এর মধ্যে কৃতজ্ঞতার আছে কী, তা জানাবারই বা প্রয়োজন কোনখানে?"

রাগ হলো নীরজার। কৃতজ্ঞ! আহা, কৃতজ্ঞতা কুড়োবার জন্যে যেন তাঁর আর ঘুম হচ্ছিল না!!

"নার্সের কাজ রোগীকে অষুধ খাওয়ানো, আইসব্যাগ দেওয়া, টেম্পারেচার নেওয়া। সুস্থ লোকের জামার বোতাম বসানো, চাবি খুঁজে দেওয়া, ধোবার কাপড় মিলিয়ে রাখা নার্সের ডিউটির মধ্যে নয় নিশ্চয়ই।" বলে সহাস্যে বাঁ হাতটি এগিয়ে দিলেন, নীরজার দিকে

নীরজা লিঙ্কসটা জামার আস্তিনে পরিয়ে দিতে দিতে মনে মনে ভাবলেন, হুঁঃ, এমনি অন্ধই বটে। মুখে বললেন, "সে আর এমন বেশী কী? পিসিমার শুশ্রূষা করে হাতে অবসর যখন থাকে তখন আপনার দু একটা বই গুছিয়ে দেওয়া বা ফুলদানীটা সাজিয়ে রাখাকে কিছু কাজ বলে না। আমি না করলে, অন্য কেউ করতো। পড়ে থাকতো না।"

"ঠিক জানিনে। হয়তো করতো, কিন্তু তোমার মতো নিখুঁত করে কেউ করতে পারতো না। আমার এক এক সময়ে মনে হয়, হাসপাতালের নার্স না হয়ে বাড়ীর গিন্নী হলেই যেন তোমাকে মানাতো ভালো।"

কাণ্ডজ্ঞানহীন এঞ্জিনীয়র! কিছুমাত্র বোধ নেই, নিজের অজ্ঞাতে কার কোন সুতীব্র বেদনার তন্ত্রীতে কঠিন আঘাত করছেন তিনি!

কোন দিকে দৃকপাত মাত্র না করে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করেই চললেন, "সত্যি নীরজা, তুমি যার স্ত্রী হবে, সে ভাগ্যবান। কোনদিন তার এতটুকু অসুবিধা হবে না। কিন্তু এই যে তুমি না চাইতেই হাতের কাছে সমস্ত জিনিষটি এগিয়ে ধরছ, তাতে আমার অভ্যাস ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ভয় হয়, শেষে যেদিন তুমি চেলী পরে নিজের ঘর করতে যাবে, সেদিন না আমি একেবারে অচল হয়ে পড়ি।"

কথা সমাপ্ত করে সরলচিত্ত বক্তা হাসতে লাগলেন।

কিন্তু তাঁর শ্রোত্রীটি দুই চক্ষে অগ্নি বর্ষণ করে কঠিন স্বরে বললেন, "মিষ্টার রয়, এমন ব্যঙ্গ করার দরকার কী? আমার আর কোথাও কোন গতি নেই, আমাকেও আপনার আর পাঁচজন চাকর দাসীর মতো আপনার এখানেই খেটে খেতে হবে, সে কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে তো পরিহাসের প্রয়োজন নেই। কেন আপনি আমাকে এমন অপমান করছেন?"

বিস্মিত নিখিলের মুখের হাসি নিমেষে অন্তর্হিত হলো। তিনি ক্ষুণ্ণ স্বরে বললেন, "অপমান করেছি? বল কী, নীরজা? আমি তো কোনদিন তোমাকে চাকর দাসীদের মতো ভাবিনি।"

"ভেবেছেন। নিশ্চয় ভেবেছেন। ভাবলে দোষও নেই কিছু। চাকর নয়তো কী? আপনি মাইনে দেন, আমি কাজ করি। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছাড়া আমাদের আর অন্য সম্বন্ধ আছে কী?"

"জানো, তুমি মাইনের কথা বললে আমি কত দুঃখিত হই? তুমি যে হাসপাতালে আমাকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে রেখেছিলে সে কি আমার মাইনের লোভে? টাকা দিয়ে কি আমি আমার সে ঋণ কোন দিন শোধ করতে পারবো? ক'দিন থেকে আমি লক্ষ্য করছি তুমি যেন কেবলই বিরক্ত হচ্ছ। আমি অন্যমনস্ক লোক, কাঠখোট্টা মানুষ। কথাবার্ত্তাও সব সময়ে তোমাদের মতো তেমন গুছিয়ে বলতে পারিনে। তাই হয়তো আমার কোন আচরণ বা কথায় তোমার মনে হয়েছে যে আমি বুঝি টাকার মাপে তোমার সেবার হিসাব করছি। বিশ্বাস করো নীরজা, তোমাকে অপমান করার কথা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারিনে। তবুও না জেনে তোমার মনে যে ব্যথা দিয়েছি তার জন্যে মাপ চাইছি। আমাকে ক্ষমা করো।" বলে নিখিল ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন।

নিখিলের মলিন মুখ, কাতর চাহনি ও শ্লথ গতি নীরজাকে তাঁর আপন অকারণ রূঢ়তার তীব্রতা সম্পর্কে সচেতন করল। নিখিলের বেদনার্ত্ত কণ্ঠের সকরুণ ক্ষমাপ্রার্থনা মুহূর্ত্তে তীক্ষ্ণফলক তীরের মতো নীরজার নিজেরই বুকে বিঁধল। তাঁর দুই চোখে অশ্রু সঞ্চারিত হলো।

হায়, এমন করে ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে আপনি আর কত কাঁদাবে নীরজা, তা সে নিজেই ভেবে পায় না।

মলী সেনের সজ্জাকক্ষে একটি অপরিচিত মহিলার পদার্পণ ঘটল।

গ্রীষ্মের অপরাহ্নে সূর্য্যাস্তের পরেও যেমন অনেকক্ষণ দিনের আলো বজায় থাকে, তেমনি এই অসাধারণ মহিলার দেহলাবণ্য যৌবনান্তেও তাঁর মুখমণ্ডলে এমন একটি কমনীয় দীপ্তি রক্ষা করেছে যে, হঠাৎ দেখলে তাঁকে প্রৌঢ়া মনে করা কঠিন। বিধবার পরিধানে পরিচ্ছন্ন সাদা থান, গায়ে রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কিত বৃন্দাবনী সূতী চাদর। খালি পা। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের সরু একটি মালা। পুরুষের মতো খাটো করে ছাঁটা মাথার কালো চুলে কোথাও একটু সাদার ছাপ লাগেনি। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুগঠিত কপালের ঠিক ঠিক মাঝখানে উল্‌কিতে আঁকা একটি সরু তিলকচিহ্ন। যৌবনে

মহিলা যে যথার্থ সুন্দরী ছিলেন, সে কথা বুঝতে খুব বেশী দৃষ্টিশক্তির দরকার হয় না।

মলী সেন কিউটেক্সের শিশি থেকে তুলির সাহায্যে হাতের সুদৃশ্য অঙ্গুলির সযত্নেবর্দ্ধিত নখগুলির রঞ্জনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। চোখ তুলে তাকাতেই মহিলা বললেন, "আমি শচীনের মা।"

বলার প্রয়োজন ছিল না। মাতা পুত্রের মুখের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য কারুরই দৃষ্টি এড়'বে এমন সম্ভাবনা নেই।

মলী সেন উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করে বললেন, "আমার নাম,—মলী।"

শচীনের মা বললেন, "সে কী আর বলে দিতে হয়? তোমাকে এর আগে চোখে দেখিনি বটে, কিন্তু তোমার বর্ণনা এত শুনেছি যে, মনে মনে তোমার চেহারাটি আঁকা হয়েই ছিল। বোধ হয় হাজার লোকের ভীড়ে দেখলেও দূর থেকেই চিনতে পারতেম। আমার ছেলের মুখে তো অষ্ট প্রহরই তোমার নাম।"

মলী সেন ঈষৎ হেসে বললেন, "আমার দুর্নাম বলুন। একমাত্র নিন্দে করা ছাড়া আর কেউ যে কখনও আমার কথা বলে এমন তো মনে হয় না।"

শচীনের মাও হেসে বললেন, "তাই বৈ কি। তুমি ভালো করেই জানো, শচীন তোমাকে কতখানি পছন্দ করে। ওর ঐ এক ধারা। যাকে ভালো লাগে না, তার ছায়াও মাড়াবে না। কতদিন আত্মীয় কুটুমদের কাছে ঐ নিয়ে কথা শুনেছি। আর যার উপরে ওর টান, তার নাম করতে অজ্ঞান। তোমাকে বলব কী মা, যে বছর ম্যাট্রিক দেবে,—বেশ বড় হয়েছে—সে বছর স্কুলের কোন ছেলে নাকি বলেছিল, মনোরমা নামটা শুনতে ভালো নয়। তাই নিয়ে ঘুষোঘুষি করে সে ছেলেটির নাক দিয়ে রক্ত ঝরিয়ে এল। কেন, না, সেটা আমার নাম। ক্ষ্যাপা আর কাকে বলে!" বলে মহিলা হাসতে লাগলেন।

আপন পুত্রের তরুণ বয়সের এই হঠকারিতার কাহিনী জননীর সকৌতুক অথচ সস্নেহ ভাষণে মলী সেনের শ্রবণে একটি অপরূপ মাধুর্য্য লাভ করল। মহিলার মুখের হাসি ও চোখের দৃষ্টি থেকে ক্ষরিত বাৎসল্যগৌরবের অদৃশ্য ধারা থিয়েটারের গ্রিজ, পেইণ্ট, হীরা, জহরত, টিস্যু, ব্রোকেডে সমাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ এই সজ্জাকক্ষটিকে ঘিরে মুহূর্ত্তে যেন একটি স্নিগ্ধ কমনীয় পরিবেশ রচনা করল।

শচীনের মা একটু থেমে বললেন, "আগে ছিলেম আমি, এখন হয়েছ তুমি। প্রশংসা শুনে শুনে আমার তো রীতিমতো হিংসে হওয়ার উপক্রম।" বলে আবার হাসতে লাগলেন।

সে হাসিতে মলী সেনও যোগ দিলেন। বললেন, "সত্যি, আপনি যে এসেছেন এতে আমি কত যে খুশী হয়েছি। শুনেছি, কোথাও কোন উৎসবে আপনি যান না, তাই—।"

কপট গাম্ভীর্য্যের ভঙ্গিতে বাধা দিয়ে শচীনের মা বললেন, "তোমাদের নাটক দেখতে এসেছি, ভেবেছ বুঝি? মোটেই না। এসেছি ঝগড়া করতে। আমার কাছ থেকে আমার ছেলেকে দখল করা—এ কী রকম কথা? যাই, শক্ত করে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে আসিগে। কিন্তু এসে এখন দেখছি, ভালো করিনি। এরই মধ্যে নিজেই তোমার দখলে চলে গেছি। ছেলের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও দেখছি এখন থেকে তোমার নাম কীর্ত্তন করতে হবে।" বলে মৃদু হাস্যে মলী সেনের দিকে তাকালেন। তাঁর ভাষায় ছিল স্নেহ, দৃষ্টিতে ছিল অকপট কল্যাণকামনা।

মলী সেনকে নিরুত্তর দেখে বললেন, "সত্যি মা, আমি কোথাও কখনও যাইনে। আত্মীয় স্বজনদের বিয়ে, পৈতে, ভাতের নিমন্ত্রণেও নয়। এই নিয়ে আমাকে কথাও কম শুনতে হয় না। কিন্তু সে আমি গায়ে মাখিনে। আমার আছে ঠাকুর। তাঁকে নিয়ে সংসারের এক কোণে পড়ে আছি। আর আছে ঐ পাগলা ছেলে।"

মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "ভগবানে আপনার খুব ভক্তি বুঝি?"

শচীনের মা উত্তর দিলেন, "শোন একবার পাগলীর কথা। খুব ভক্তিই যদি থাকবে তা'হলে আর তুচ্ছ সংসারের কথা, ছেলের কথা ভেবে অস্থির হবো কেন? তবে চেষ্টা তো করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কী গতি আছে বল?"

"আচ্ছা, ভগবান যা করেন সবই ভালোর জন্যে—এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?"

"এর মধ্যে বিশ্বাস অবিশ্বাসের জায়গা নেই মা, এ যে সত্যি। আমি মুখ্যু মানুষ, তোমরা তো কত পড়াশুনা করেছ, তোমরাই বল, সূর্য্য পূব দিকে ওঠে।

সে কথা কেউ বিশ্বাস করুক না করুক, সূর্য্য তো বরাবর সেই পূব দিকেই উঠবে। এও তেমনি।"

উত্তর ও উপমাতে আর যাই থাক, ন্যায়শাস্ত্রের কণা মাত্র নেই। চরিত্রহীনের পশু বৌঠাকরুণকে মনে পড়ল মলী সেনের। অর্জ্জুন তীর ছুঁড়ে পাতাল থেকে জল এনেছে, একথা যদি মিথ্যে হয়, তবে পিতামহ ভীষ্ম তাঁর শরশয্যায় তৃষ্ণা মেটালেন কেমন করে! বুঝলেন তর্ক করা বৃথা।

কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, "কিছু যদি মনে না করেন তো বলি, শুনেছি আপনার জীবনে আপনি কিছু দুঃখ কম পাননি। আপনি তো ভগবানে এত নির্ভর করেন, আপনাকে তিনি কেন দুঃখ দিলেন?"

শচীনের মা প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, "ঠাকুর দুঃখ আমাকে অনেক দিয়েছেন সত্যি। কেন দিয়েছেন তা তিনিই জানেন। কিন্তু সে দুঃখ তুচ্ছ করার ক্ষমতা দিয়ে তিনিই তো আবার দুঃখ দূর করেছেন। তিনি যে দুঃখহরণ।"

যুক্তির দিক দিয়ে এ সকল উক্তি মলী সেনের কাছে শুধু অসার নয়, রীতিমত অশ্রদ্ধেয়। অন্য যে-কোন ব্যক্তির মুখে এ কথা শুনলে মলী সেন অবজ্ঞাভরে বলে উঠতেন—নন্‌সেন্স। কিন্তু শচীনের মার মুখে এই কথাগুলি বিশ্বাসের প্রগাঢ়তায় এমন একটি সতেজ ঋজুতা লাভ করল যে, তাকে বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করতে না পারলেও অবজ্ঞা করার রূঢ়তা প্রকাশ করলেন না তিনি।

শচীনের মা বলেন, "মা, তুমি আমার মেয়ের মতো। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই। আমার বাবা ছিলেন গরীব পূজারী বামুন। যে ঘরে বিয়ে হলো সেখানে বাবুরা পায়রার বিয়েতে দশ হাজার টাকার বাজি পুড়িয়েছেন, বউদের দাঁড়িপাল্লার ওজন করে টাকা দিয়ে মুখ দেখেছেন শাশুড়ী। নাতির জন্যে কনে দেখতে রাজাবাহাদুর যেদিন আমাদের বাড়ী এসেছিলেন, আমার তখন তের বছর বয়স। মনে আছে, বাবা বলেছিলেন, এ শুধু মদন-মোহনেরই কৃপা। নইলে তাঁর মনোরমার কী এমন কপাল! এ যে স্বপ্নেরও অতীত।'"

একটু নীরব থেকে বললেন, "স্বপ্ন ভাঙ্গতেও দেরী হলো না। বিয়ের দু'বছর যেতে না যেতেই স্বামী ঘর ছেড়ে বাইরে ছুটলেন। মোসাহেব আর মেয়ে-মানুষ নিয়ে দিনরাত ডুবে রইলেন মদে। শাশুড়ী, ননদের নির্য্যাতনের সীমা রইল না। দোষ তো আমারই। তাঁদের ছেলেকেই যদি ঘরে বেঁধে না রাখতে পারল তবে বউ-এর রূপ দিয়ে কী হবে? মনে পড়ে, নিজে সারাদিন উপোসী। তবু স্বামীর খাবার সাজিয়ে মাঝরাত অবধি জেগে বসে রয়েছি। কতদিন মত্ত অবস্থায় তিনি কাঁসি ছুঁড়ে মেরেছেন গায়ে; লক্ষ্য করলে, কপালে কাটার দাগ এখনও দু'চারটে দেখতে পাবে হয় তো।"

মলী সেন শিউরে উঠে অর্দ্ধ স্বগতের মতো মন্তব্য করলেন—"ব্রুট!"

শচীনের মা বললেন, "এ সমস্তই সয়েছিলেম। কিন্তু স্বামী যেদিন সমস্ত মান সম্ভ্রমের মাথা খেয়ে কৈবর্ত্তপাড়া থেকে এক প্রজার একটা নষ্ট মেয়েকে অন্দরমহলে এনে তুললেন সেদিন ঠিক করলেম, আর নয়। রাত্রিতে শোবার ঘরে কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়ব। খোকা তখন বছর তিনেকের। বারুণীর মেলা থেকে কে যেন তাকে খেলনা কিনে দিয়েছিল—একটি মাটির গোপাল। সেটা দু'হাতে চেপে কোথা থেকে হঠাৎ আমার কোলে উঠে বলল, 'মামু, থাকুল।' এক মুহূর্ত্তে রাস্তা দেখতে পেলেম। তাই তো, আমার ঠাকুর! তাঁকে কেন স্মরণ করিনি? আমার বাপের বাড়ীর মদনমোহন—তাঁকে কেমন করে এত দিন ভুলে ছিলেম? সেদিন থেকে ভগবানকে ডাকতে সুরু করলেম। মা, তুমি হয় তো বিশ্বাস করবে না; সেই থেকে আমার আর দুঃখ রইল না। তারপর ষোল বছর শ্বশুর বাড়ী ছিলেম। স্বামীর অত্যাচার, গুরুজনের গঞ্জনা, সরিকের ষড়যন্ত্র—কোন কিছুই আমাকে কষ্ট দিতে পারেনি।"

মলী সেন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বামীর এত অত্যাচার অপমানেও আপনি তাঁকে ছেড়ে আসেননি?"

"ছেড়ে এলেই নিস্তার কোথায়? স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক তো শুধু ইহকালেই শেষ নয়। জন্ম-জন্মান্তর ধরেই যে তা চলতে থাকবে।"

মলী সেন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, "তা বলে দুশ্চরিত্র, অত্যাচারী স্বামীর সমস্ত উপদ্রব সহ্য করেও তাঁর কাছেই পড়ে থাকতে পারবো না আমি, তা সে সম্পর্ক এক জন্মের হোক, কি এক হাজার জন্মেরই হোক।"

শচীনের মা হেসে বললেন, "বালাই, তোমাকে পারতে হবে কেন? তোমার এমন বর, এমন ঘর, এমন সুখের সংসার, তোমার মত ভাগ্যবতী আছে ক'জন?"

মলী সেনের মুখে ম্লান ছায়া পড়ল। প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের জন্য তাড়াতাড়ি বললেন, "সমস্ত সঙ্কটেই কি আপনি নিশ্চিন্তে ঈশ্বরে নির্ভর করতে পারেন?"

"পারি বলি কেমন করে? এই ছেলের ব্যাপারেই দেখ না। মাঝে তাকে নিয়ে উদ্বেগের আর সীমা ছিল না। সে গোপনে গোপনে একটা কিছু সাংঘাতিক বিপাকে জড়িয়ে পড়ছে, তা বুঝতে পারছিলেম; অথচ কী করা দরকার জানা ছিল না। শেষে একদিন মনে হলো, আমি কেন মিছে ব্যাকুল হচ্ছি। বাসুদেবের যদি এই ইচ্ছে হয় যে, ছেলে আমার জেলে পচবে বা ফাঁসিতে মরবে, তবে আমার সাধ্য কী তাকে বাঁচাই? সেই থেকে মনের অস্থিরতা কমল। কোথা থেকে গোবিন্দ জুটিয়ে দিলেন তোমাকে। না না, তুমি অমন কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? আমি সমস্তই জানি। তোমার মত এত বড় উপকার শচীনের আর কেউ করেনি।"

কৃতজ্ঞা জননীর এই অকৃত্রিম ধন্যবাদ জ্ঞাপনে মলী সেন অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলেন। মনে হল, এই ভক্তিমতী মহিলার সস্নেহ সাধুবাদে তাঁর সত্যিকার অধিকার নেই। প্রতারণার দ্বারা এই প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন এই চিন্তায় নিজের কাছেই নিজেকে তাঁর অপরাধী মনে হল। ধীরে ধীরে বললেন, "একদিন হয়তো শুনবেন, আপনার ছেলের একদিক দিয়ে যে সামান্য উপকার করেছি, অন্য দিক দিয়ে তার অনেক বেশী করেছি অপকার।"

"শুনলেও বিশ্বাস করব না। তোমাকে কতক্ষণ বা জেনেছি। তবুও এইটুকু বুঝেছি, ঠাকুর যাকে এমন লক্ষ্মীর মতো রূপ আর সরস্বতীর মতো বুদ্ধি দিয়েছেন সে ভুল করতে পারে, অন্যায় করতে পারে না।"

"কিন্তু ভুল থেকেও তো লোকের ক্ষতি হয়।"

"তা হয়। কিন্তু মা, ভুল করা না করা তো সব সময়ে মানুষের হাতে নয়। রামপ্রসাদের গান শোননি—

"সকলই যে তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি;
তোমার কর্ম্ম তুমি করাও মা, লোকে বলে করি আমি।"

শ্রদ্ধায় নম্র ও হৃদ্যতায় গভীর কণ্ঠে মলী সেন বললেন, "আপনাকে দেখে এবার কিন্তু আমার হিংসে হচ্ছে। আপনার মতো এমন সহজ সরল বিশ্বাস যদি থাকতো, তবে অনেক সঙ্কট থেকেই বোধ হয় ত্রাণ পেতেম।"

শচীনের মা সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "মা, তোমার বয়স অল্প, কিন্তু কথা শুনে মনে হয়, যেন অনেক দুঃখের সাগর পার হয়ে এসেছ। জানিনে তোমার কী কষ্ট, কীসের মনস্তাপ। কারণ যা-ই হোক, রাধামাধবকে স্মরণ করো; অশান্তি দূর হবে। বিপদ কেটে যাবে। তিনি যে বিপদভঞ্জন। দীনদয়াল।"

মলী সেন নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। শেষে অকস্মাৎ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, কী বলে আপনার ঠাকুরকে আপনি ডাকেন?"

"তাঁর নাম কি একটা, নাম যে অসংখ্য—
কুব্জা রাখিল নাম পতিতপাবন হরি।
চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহন বংশীধারী॥
অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া।
কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া॥
কণ্ব মুনি নাম রাখে……………"

এ সমস্তই মলী সেনের কাছে নতুন। অশ্রুতপূর্ব্ব কাহিনী। অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য।

কিছুক্ষণ পরে শচীনের মা বিদায় নিলেন। কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্বে গভীর স্নেহভরে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা মলী সেনের চিবুক স্পর্শ করে একটি চুম্বন গ্রহণ করলেন।

তাঁর প্রস্থান-পথে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ কেন যেন মলী সেনের মনে পড়ল তাঁর পরলোকগতা মার কথা। মলী সেন তাঁকে দেখেননি কোনদিন; প্রসবের পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তবুও বার বারই মলী সেনের মনে হতে লাগল,—তাঁর সেই অকালমৃতা জননী আজ জীবিতা থাকলে তিনি বুঝিবা এই ভগবদবিশ্বাসী পুণ্যশীলা মহিলার মতোই হতেন। ঠিক এমনই স্নেহশীলা। এমনই কল্যাণময়ী।

[ক্রমশঃ।

রত্নমালা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

বীজপুরুষ—আদিপুরুষ, পূর্ব্বপুরুষ।
বীজ্য—বীজোৎপন্ন, কুলজ, উদ্ভব।
বীণা—ত্রিতন্ত্রিবাদ্য-বিশেষ।
বীত—গত, শান্ত, ক্ষান্ত, দমিত, অতীত।
বীতরাগ—রজোগুণহীন, রাগাদিরহিত।
বীথি—পথ, শ্রেণী, বেদী।
বীভৎস—ঘৃণা, ঘৃণার্হ, ক্রূর, হিংস্রক।
বীর—শূর, যোদ্ধা, ভণ্ড, গুণী, বামাচারী।
বীরভাব—বামাচার, বিধর্ম্ম।
বীরা—গৃহিণী, পুরন্ধ্রী, পতিপুত্রবতী।
বুক্—বক্ষস্থল, উরঃ, হৃদয়, সাহস।
বুজন—মুদন, পূরণ, ভরণ, নিবন।
বুজ্‌বুজ্—বুদ্‌বুদ, জলবিম্ব, জলফোস্কা।
বুঝ—অনুমান, বুদ্ধি, জ্ঞান, অনুভব।
বুট—ছোলা, চণক, শস্যবিশেষ।
বুড়ন—ডুবন, মগ্ন হওন, আপ্লাবন।
বুদ্ধি—প্রজ্ঞা, মতি, ধী, বোধ, জ্ঞান।
বুধ—চতুর্থ গ্রহ, চতুর্থ বার, পণ্ডিত।
বুনট—বুনাট, বুনানি।
বুননিয়া—তন্তুবায়, তাঁতী, বপ্তা।
বুনা—বুনুয়া, বুনো, আরণ্যক।
বুভুক্ষা—ক্ষুধা, ভোজনেচ্ছা, ক্ষুৎ।
বুভুৎসা—জ্ঞানেচ্ছা, জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন।
বুলী—বাক্য, কথা, বাণী, শব্দ।
বৃক্ষ—দ্রুম, তরু, গাছ, পাদপ, শাখী।
বৃক্ষরুহা—লতা, পরগাছা, বল্লী।
বৃত্ত—ব্যবহার, রীতি, চরিত্র, পদ্য, মণ্ডল।
বৃত্তান্ত—বিবরণ, বিস্তারিত কথাবার্ত্তা।
বৃত্তি—বার্ষিক, জীবিকা, ব্যবসায়, বেতন।
বৃথা—ব্যর্থ, পণ্ড, অলীক।
বৃদ্ধ—প্রাচীন, বুড়া, স্থবির, বর্দ্ধিত, উন্নত।
বৃদ্ধা—প্রাচীনা, বুড়ী, স্থবিরা।
বৃন্ত—বোঁটা, ডাঁটা, পুষ্পদণ্ড, কুচাগ্র।
বৃন্দ—সমুদয়, রাশি, গণ, সমাজ, সমূহ।
বৃশ্চিক—দ্রুণকীট, বিছা, অষ্টম রাশি।
বৃষ—দ্বিতীয় রাশি, ধর্ম্ম, শ্রেষ্ঠ, ষণ্ড।
বৃষ্টি—বর্ষা, বারিপাত।
বৃহৎ—মহৎ, বড়, প্রকাণ্ড, বিপুল।
বৃহস্পতি—পঞ্চম বার, পঞ্চম গ্রহ।
বেঁক—বক্রতা, তেওড়, নদীর বাঁক।
বেগ—দ্রুততা, শীঘ্রগতি, ত্বরা, উগ্রতা।
বেগুন—হিঙ্গুলী, বার্ত্তাকী, বার্ত্তাকু।
বেগুনীয়া—অরুণবর্ণ, ধূম্রবর্ণ, কৃষ্ণরক্তবর্ণ।
বেঙ—ভেক, মণ্ডূক, দর্দ্দুর।
বেজী—নকুল, নেউট, নেউল।
বেড়—বেড়া, আড়, বৃতি, আবরণ, ঘেরা।
বেড়ী—লৌহশৃঙ্খল, নিগড়, বাউলী।
বেণী—কবরী, বিন্যস্ত কেশ, বিউনী।
বেণু—বংশী, মুরলী, বংশ, বাঁশ।
বেত—বেত্র, নলবিশেষ, ছড়ী।
বেদ—শ্রুতি, সামাদি চারি শাস্ত্র, বিদ্যা।
বেদনা—পীড়া, ব্যথা, যাতনা, দুঃখ।
বেদমাতা—গায়ত্রী, ছন্দোবিশেষ।
বেদান্ত—বেদের অগ্রভাগ, বেদের সার।
বেদি—বেদী, যাগাদি জন্য উচ্চীকৃত স্থান।
বেদী—বেত্তা, বিজ্ঞ, দক্ষ, প্রাজ্ঞ।
বেধ—ছিদ্র, বিঁধ, সুড়ঙ্গ, তল, কড়া।
বেধন—বিঁধন, ফোড়ন, ভেদন, সিঁধ কাটন।
বেপন—কম্পন, থরথরানী, কাঁপুনী।
বেল—শ্রীফল, বিল্ববৃক্ষের ফল।
বেলা—সময়, কাল, মল্লিকা, নদীর তট।
বেশ—বস্ত্র, পরিচ্ছদ, ছদ্ম, শরীরের ভূষণ।
বেশর—নাসিকাভূষণ, লোলক।
বেশ্যা—কুলটা, গণিকা, পতিতা।
বেষ্টন—ঘেরণ, বেড়ন, চতুর্দ্দিকে আবরণ।
বেহাই—বৈবাহিক, পারিণায্য।
বেহায়া—নির্লজ্জ, অপত্রপ, ব্রীড়াহীন।
বৈকাল—অপরাহ্ণ, দিনের শেষভাগ।
বৈগুণ্য—প্রাতিকূল্য, অপকার, বিগুণ।
বৈজয়ন্তী—পতাকা, ধ্বজা, মালাবিশেষ।
বৈঠক—সভা, সম্প্রদায়, হুক্কাধার।
বৈতনিক—বেতনগ্রাহী, বেতনজীবি।
বৈতালিক—স্তুতিপাঠক, বন্দী, বেতালযুক্ত।
বৈদগ্ধ—নৈপুণ্য, রসিকতা, চাতুর্য্য।
বৈদিক—বেদবেত্তা, বেদবিহিত কর্ম্ম।
বৈদুষ্য—পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, জ্ঞান।
বৈদেশিক—বিদেশী, বৈদেশী, প্রবাসী।
বৈদ্য—চিকিৎসক, আয়ুর্ব্বেদবেত্তা।
বৈধ—বিহিত, বিধিলব্ধ, যুক্তিসিদ্ধ।
বৈধর্ম্ম্য—বামাচার, নাস্তিকতা, বিরুদ্ধ ধর্ম্ম।
বৈধেয়—মূর্খ, অজ্ঞান, অনভিজ্ঞ, নিবোধ।
বৈমাত্রেয়—বিমাতার পুত্র, বিমাতৃজ।

বৈয়াকরণ—ব্যাকরণবেত্তা, ব্যাকরণজ্ঞ।
বৈরাগী—উদাসীন, দণ্ডী, বৈরাগ্যশালী।
বৈরী—শত্রু, বিপক্ষ, দ্বেষী, অরি।
বৈশিষ্ট্য—বিশিষ্টতা, উৎকর্ষ, ভব্যতা।
বৈশ্বানর—বহ্নি, অগ্নি, অনল, আগুন।
বৈষম্য—বিসদৃশ, অসাম্য, উচ্চ-নীচ।
বৈষয়িক—বিষয়ী, সাংসারিক, ঐহিক।
বৈষ্ণব—বিষ্ণুর উপাসক, বৈরাগী।
বোধ—জ্ঞান, বুদ্ধি, মতি, ধী, উপলব্ধি।
বোধক—জ্ঞাতা, জ্ঞাপক, সূচক, অনুমাপক।
বোধাতীত—জ্ঞানাতীত, বুদ্ধিবহির্ভূত।
বৌদ্ধ—জৈন, বুদ্ধমতাবলম্বী।
ব্যক্ত—স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, প্রকাশিত।
ব্যক্তি—জন, লোক, শব্দের প্রত্যয়।
ব্যগ্র—যত্নবান, সচেষ্ট, ব্যস্ত, ব্যাকুল।
ব্যঙ্গ—বিদ্রূপ, পরিহাস, মস্করা, তামাসা।
ব্যজন—পাখা, তালবৃন্ত।
ব্যঞ্জক—প্রকাশক, সূচক, বোধক, ঘাঁটক।
ব্যঞ্জন—চিহ্ন, হলবর্ণ, অন্নের উপকরণ।
ব্যতিক্রম—অন্যথা, উল্লঙ্ঘন, ব্যত্যয়।
ব্যতিরিক্ত—ভিন্ন, ছাড়া, রহিত, হীন।
ব্যতিরেক—অভাব, বিনা, ভিন্নতা।
ব্যতীত—গত, নিষিদ্ধ, ভিন্ন।
ব্যথা—বেদনা, যন্ত্রণা, মনঃপীড়া, দুঃখ।
ব্যপদেশ—ছল, ব্যাজ, প্রবঞ্চনা, সংজ্ঞা।
ব্যবচ্ছেদ—পৃথক্ করণ, কাটন, খণ্ড খণ্ড করণ।
ব্যবধান—আচ্ছাদন, আবরণ, আড়াল।
ব্যবসায়—বৃত্তি, ব্যাপার, বাণিজ্য।
ব্যবস্থা—বিধি, বিধানপত্র, শাস্ত্রাদেশ।
ব্যবহার—লৌকিক কর্ম্ম, রীতি, ধারা।
ব্যবহৃত—আচরিত, চলিত, প্রচলিত।
ব্যভিচার—অসতীত্ব, পারদার্য্য।
ব্যয়—অর্থ নিক্ষেপ, ক্ষয়, হ্রাস।
ব্যর্থ—নিরর্থক, বৃথা, নিষ্প্রয়োজন।
ব্যস্ত—ব্যাকুল, উদ্ব্যস্ত, ব্যগ্র, ব্যতিক্রান্ত।

ব্যাকরণ—বাক্যরচন শাস্ত্র, ব্যুৎপত্তিজনক।
ব্যাকুল—আকুল, উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত।
ব্যাখ্যা—বিবরণ, অর্থপ্রকাশ, প্রশংসা, ব্যাখ্যান।
ব্যাঘাত—প্রতিবন্ধক, আটক, বিঘ্ন, বাধা।
ব্যাঘ্র—শার্দূল, বাঘ।
ব্যাজ—ছল, বিলম্ব, বাট্টা, ফাও, বৃদ্ধি।
ব্যাধ—মৃগয়ু, লুব্ধক, পক্ষিমারা, মৃগজীবী।
ব্যাধি—কুষ্ঠরোগ, পীড়া, ব্যামোহ, রোগ, আময়।
ব্যাপক—ব্যাপ্তকারী, অনধীন, বাড়ন্ত।
ব্যাপার—বিষয়কর্ম্ম, ব্যবসায়, বাণিজ্য।
ব্যাপিকা—প্রগল্‌ভা স্ত্রী, কান্তি, মুখরা স্ত্রী।
ব্যাপী—অন্তর্যামী, বিভু, ব্যাপক।
ব্যাম—বাহু পরিমাণ, ধনু, বাঁউ, যুগ।
ব্যাস—বিস্তার, মুনিবিশেষ, বেদব্যাস।
ব্যাসক্ত—বিব্রত, উদ্বিগ্ন, বিমনাঃ।
ব্যাসঙ্গ—ঔদাস্য, ঘবড়াণী, আসক্তি।
ব্যাহত—মারা, মৃত, পরাভূত, বিহ্বল।
ব্যূহ—সমূহ, সৈন্যবিন্যাস, বিতর্ক।
ব্যোম—আকাশ, অন্তরীক্ষ, গগন।
ব্রণ—স্ফোটক, ফোড়া, বিস্ফোট।
ব্রহ্ম—পরমেশ্বর, পরমাত্মা, আদিকারণ।
ব্রহ্মচারী—বর্ণী, প্রথমাশ্রমী, তপস্বী।
ব্রহ্মতালু—মাথার তালু, চান্দি।
ব্রহ্মবাদী—ব্রহ্মোপাসক, নিরাকারবাদী।
ব্রহ্মযজ্ঞ—বেদাধ্যাপন, বেদপাঠনা।
ব্রহ্মা—বিধাতা, বিশ্বস্রষ্টা, বিধি, বিরিঞ্চি।
ব্রহ্মাণ্ড—জগৎ, বিশ্ব, পৃথিবী, মেদিনী।
ব্রাহ্ম—ব্রহ্মোপাসক, বিবাহবিশেষ।
ব্রাহ্মণ—প্রথম বর্ণ, বিপ্র, দ্বিজাতি।
ব্রাহ্মণ্য—বিপ্র জাতির ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের সভা।
ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত।
ব্রীড়া—লজ্জা, ত্রপা, হ্রী, হায়া।
ব্রীড়িত—সলজ্জ, ত্রপান্বিত, হ্রীযুক্ত।
ব্রীহি—শরৎপক্ব ধান্য, আশুধান্য।

[ক্রমশঃ।

সঙ্গীতজ্ঞ স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(দ্বিতীয় পর্যায়)

নরেন্দ্রনাথ তথা স্বামী বিবেকানন্দের গান চল্‌তে লাগল, গানের সুরলহরীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কখনো বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসতে লাগল, আবার কখনও বা ডুবে যাচ্ছিল মন সমাধির সমতলে। নরেন্দ্রনাথ বহুক্ষণ ধরে সে গানটি গাইতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হলেন এবং একান্ত আবদার ক'রে ও আদরের স্বরে নরেন্দ্রনাথকে বললেন: "দক্ষিণেশ্বরে যাবি? ক'দিন তো যাস্‌নি, চল্ না, আবার এখুনি ফিরে আস্‌বি।" নরেন্দ্রনাথ অপূর্ব ভগবান-পাগল মানুষটিকে তখনই প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেলেছেন, কাজেই 'না' করতে আর পারলেন না, দক্ষিণেশ্বর যেতে তিনি সম্মত হলেন। বি. এ. পড়ার কথা তখনকার মত ভুল হয়ে গেল, বইগুলি ছড়ানো রইল অনাদৃত হোয়ে ঘরের মেঝেতে। সখের তানপুরাটিকে কেবল রাখলেন তুলে। বন্ধুদের বিদায় দিয়ে নরেন্দ্রনাথ মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে চললেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে। নরেন্দ্রনাথের অপার্থিব সঙ্গীতের স্বরলহরীতে ছুটে আসেন গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ, আর শ্রীরামকৃষ্ণের সারল্য, ভালবাসা ও ঈশ্বরানুরাগের নিদর্শনে ছুটে যান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থে। সঙ্গীত এবং নিঃস্বার্থ ভালবাসার ও ভগবদ্‌প্রেমের সঙ্গম-স্থলে, দুই বাঙ্গলায় কেন, বিশ্বের মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের এই লীলামাধুর্যের নিদর্শন জগতে দুর্লভ ও সত্যই অতুলনীয়।

সঙ্গীত যে বাঙ্গলার দুই মহামানবের মিলন-সাধন করেছিল, সঙ্গীত যে অলৌকিক শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে নিবিড়তার বন্ধন সৃষ্টি করেছিল একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে কোন্ দিন ও কোথায় এই দুই মহামানবের প্রথম মিলন ঘটে এ'নিয়ে এরই মধ্যে মতভেদ বড় কম হয়নি, আর যথার্থভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের ইতিহাস লেখা না হোলে ভবিষ্যতে যে এ সম্বন্ধে আরো জটিলতার বৃদ্ধি হবে একথা সহজেই বলা যায়।

স্বর্গীয় প্রমথনাথ বসু-রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' (১ম ভাগ, পৃঃ ১০৪-১০৫) পুস্তকে উল্লিখিত হয়েছে: "১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রথম পরমহংস-দেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ঐ বৎসর তিনি (এফ, এ.) পরীক্ষা দিবার জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র নামে পরমহংসদেবের এক শিষ্য একদিন স্বকীয় সিমুলিয়ার বাসভবনে পরমহংসদেবকে আনয়ন করিয়া একটি ছোটখাট উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে একজন সুগায়কের প্রয়োজন হওয়াতে তিনি আর কাহাকেও না পাইয়া প্রতিবেশী বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র শ্রীমান নরেন্দ্রকে সাদরে নিজালয়ে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান। ঐ দিবস নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র ঠাকুর তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন।" শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় শ্রদ্ধেয় প্রমথ বাবুর বর্ণনাকেই অনুসরণ করেছেন, তবে তারিখের অসামঞ্জস্য আছে। তিনি তার 'বিবেকানন্দ-চরিত' পুস্তকে (৭ম সং, ১৩৫৬, পৃঃ ৫৩) উল্লেখ করেছেন: "কলিকাতায় শিমলাপল্লীর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় একদিন স্বালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে লইয়া আসেন এবং একটি আনন্দোৎসবের আয়োজন করেন। সুকণ্ঠ গায়কের অভাব হওয়ায় স্বীয় প্রতিবেশী নরেন্দ্রনাথকে আহ্বান করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের (?) নভেম্বর মাসে১ ঠাকুরের সহিত নরেন্দ্রনাথের এই প্রথম পরিচয়।" কিন্তু এ প্রবন্ধের প্রথম পর্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কলকাতায় রাজমোহন বসুর বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মিলন ঘটে নরেন্দ্রনাথের।২ কথামৃতকার ও লীলাপ্রসঙ্গকারের অভিমতও আমরা উল্লেখ করেছি। পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীম তাঁর কথামৃতে (৩য় ভাগ) রাজমোহন বসুর বাড়ীতে উভয়ের মিলনের কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু সেই মিলনকে তিনি বলেছেন দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। স্বামী বিবেকানন্দের সাঙ্গীতিক জীবনের আলোচনায় সাক্ষাৎকারের সন-তারিখের অবতারণা৮ সাধারণ ভাবে অবান্তর বলে মনে হয় বটে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের মতন মহামানবদের বহু মূল্যবান জীবনকাহিনীর ঐতিহাসিকতাকে যদি আমরা যথাযোগ্য মূল্য ও শ্রদ্ধা দান করি, তাহলে একথা সত্য যে, তাঁদের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তের ঘটনাকেই আমাদের সম্মান দেওয়া উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎকারের যথাযথ তারিখ-নিরূপণের ভার ভবিষ্য,৩ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাস-রচয়িতার

---

(১) আমাদের মনে হয়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবু ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী তারিখটি ভুল করেছেন, ওটা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দই হবে, কেননা পরমশ্রদ্ধেয় স্বামী সারদানন্দও তাঁর লীলাপ্রসঙ্গের পঞ্চম খণ্ডে ('ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', ১৩৫৮, পৃঃ ৫৫—৫৬) প্রমথ বসুর বিবরণকেই সমর্থন করেছেন। লীলাপ্রসঙ্গের ৫ম খণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে: "তখন ১২৮৮ সালের হেমন্তের শেষভাগ—ইং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর হইবে।" "সুকণ্ঠ গায়কের অভাব হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ ঐ দিবসে নিজ প্রতিবেশী * * শ্রীমান নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুরের নিকট ভজন গাহিবার জন্ম নিজালয়ে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। ঠাকুর ও তাঁহার প্রধান লীলাসহায়ক স্বামী বিবেকানন্দের পরস্পরকে প্রথম দর্শন করা ঐরূপে সংঘটিত হইয়াছিল।" শ্রদ্ধেয় প্রমথ বাবু ও লীলাপ্রসঙ্গকারের বর্ণনা ও ভাষা প্রায় এক রকমের। ইংরেজী—Life of the Swami Vivekananda. Vol, 1 (1914) বইয়ে এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই।

(২) এ থেকে মনে করার কোন কারণ নেই যে, বর্তমান ঘটনা পূর্বেকার রাজমোহন বসুর বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রথম মিলন ঘটনাটীর অনৈক্য বা contradiction আছে। ইতিহাসের প্রমাণপঞ্জীকে সর্বতোভাবে সম্মান করলেও আসলে আমরা ইতিহাসের অবতারণা করছি না, পরন্তু স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীত-জীবনের আলোচনা করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং তারই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জীর এখানে উল্লেখ করা মাত্র, সুতরাং পূর্বেকার কোন ঘটনার সঙ্গে পরেরকার বিবরণের অসামঞ্জস্য চিন্তা করার কোন কারণ নাই।

ওপর ছেড়ে দিয়ে ইংরেজী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে পরমশ্রদ্ধাস্পদ লীলাপ্রসঙ্গকার যা বর্ণনা করেছেন সে-সম্বন্ধেই আমরা এখানে কিছু আলোচনা করব।

লীলাপ্রসঙ্গকার উল্লেখ করেছেন সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবেকানন্দের যখন প্রথম দেখা হয় তখন স্বামিজী দু'চারটি বাঙ্গালা গান মাত্র শিখেছেন—"গান গাহিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বাঙ্গালা গান সে দুই-চারিটী মাত্র তখন শিখিয়াছে"। কিন্তু একথা ঠিক যে, বিবেকানন্দ তথা নরেন্দ্রনাথ তারও অনেক আগে থেকেই ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মসঙ্গীত অনেকগুলি শিখেছেন ও গাইতেন।৩ শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ গত ফাল্গুন (১৩৫৮, পৃঃ ৬৩১) সংখ্যা 'বসুমতী'তে উল্লেখ করেছেন: "১৮৭১ থেকেই—অর্থাৎ ১৬ বছরের নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজাদি নানা ধর্মসম্প্রদায়ে যাতায়াত শুরু করেন"। নরেন্দ্রনাথ কলকাতার তদানীন্তন বাঙ্গালী সঙ্গীতগুণী বেণী গুপ্তের কাছে ব্রাহ্মসমাজে মেলামেশা করার আগে থেকেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। প্রমথ বাবু তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ' বইয়ে (১ম খণ্ড, ১৩৫৬, পৃঃ ৭২) লিখেছেন: "বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সঙ্গীতে অনুরাগ ছিল। প্রবেশিকা শ্রেণীতে পাঠের সময় হইতেই তিনি রীতিমত গীতবাদ্যের চর্চা আরম্ভ করেন।" ব্রাহ্মসমাজে মেলামেশার জন্য শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আনন্দমোহন বসু, চিরঞ্জীব শর্মা সঙ্গীতশিল্পী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুঞ্জবিহারী দেব, উমানাথ গুপ্ত, গগনচন্দ্র হোম প্রভৃতির সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল নববিধান-ব্রাহ্মসমাজের 'গায়কাচার্য' ছিলেন, তাঁকে বলা হোত—"The Singing ; Apostle of New Dispensation Church." কুঞ্জবিহারী দেব ও উমানাথ গুপ্ত এঁরা দু'জনেও ছিলেন নববিধানের গায়ক ও গান-লেখক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠভাবে। রবীন্দ্রনাথের রচিত ও সুর-সংযোজিত গান তিনি গাইতেন, অন্তত তার ঐতিহাসিক নজির পাওয়া যায় একটি গান-সম্বন্ধে—যা নরেন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন ইংরেজী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসুর কন্যার বিবাহ-বাসরে। গানটী হোল—"দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি, বল দেব কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়"। রবীন্দ্রনাথ রচনা ক'রে গানটীতে নিজেই সুর-সংযোজন করেছিলেন এবং কিভাবে গাইতে হবে তা-ও নরেন্দ্রনাথকে তিনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন, স্বামিজী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এক বছর আট মাসের ছোট। শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্রীকালিদাস নাগ ঐ-প্রসঙ্গের উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দেখি কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর কন্যার বিবাহসভায় রবীন্দ্রনাথ-রচিত—'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি'—গানটী নরেন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন" (বসুমতী ১৩৫৮, ফাল্গুন, পৃঃ ৬৩১)। এ-ঘটনাটী পাওয়া গেছে কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সহধর্মিনী-লিখিত দিনপঞ্জী বা ডায়েরী থেকে। এ-ছাড়া তখনকার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। বাঙ্গালাদেশে বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচারকেন্দ্র ছিল তখনকার দিনে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী।৪ উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অনুকরণ ক'রে দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি গান রচনায় তখন থেকেই ব্যস্ত, আর তারই ফলে ব্রাহ্মসমাজে নূতন ধ্রুপদ-সঙ্গীতের ভাণ্ডার হয়েছিল সমৃদ্ধ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র দীপেন্দ্রনাথ ছিলেন নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী। এ-ছাড়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল সেনও ছিলেন নরেন্দ্রনাথের সতীর্থ। ঠাকুরবাড়ীতে নরেন্দ্রনাথের মেলামেশার প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইখানিতে উল্লেখ করেছেন, 'বিবেকানন্দ দীপুদাদার (দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) class-friend (সহপাঠী) ছিলেন। দু'জনেই পড়তেন তখন কলেজে। আমাদের বাড়ীতে বিবেকানন্দ এলে দীপুদাদা 'কে হে নরেন' বোলে ছুটে এসে দেখা করতেন। এতই ছিল হৃদ্যতা ও ভালবাসা।

সুতরাং উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মতন নরেন্দ্রনাথ অনেক ধ্রুপদাঙ্গ ও ভজনাত্মক বাঙ্গালা গানও শিখেছিলেন। ধর্মভাবের প্রবল উদ্দীপনা ছিল তাঁর প্রাণে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সারা বাঙ্গালাদেশে ও বিশেষ ক'রে কলকাতা মহানগরীর শিক্ষিত সমাজে নাস্তিক্য ভাবের বন্যা প্রবাহিত থাকলেও নরেন্দ্রনাথের মন ও চিন্তাধারা ছিল ভারতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ, নির্গুণ অথবা সগুণ ভগবানকে দেখার নেশা তাঁর তখন থেকেই অন্তরে ছিল লুকোনো। শ্রদ্ধেয় লীলাপ্রসঙ্গকারও উল্লেখ করেছেন: "শ্রীযুত নরেন্দ্র তখন কেবলমাত্র বিদ্যার্জনে এবং সঙ্গীত-শিক্ষায় কালযাপন করিতেছিলেন না—কিন্তু ধর্মভাবের তীব্র প্রেরণায় অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনে ও কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন" (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, ১৩৫৮, পৃঃ ৬২)। অপরাপর বিদ্যাশিক্ষার মতন সঙ্গীতশিক্ষাও নরেন্দ্রনাথের জীবনে সার্থক হয়েছিল। উচ্চাঙ্গ ক্ল্যাসিকাল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার ধর্মসঙ্গীতকেও তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেছিলেন। শুধু মানুষের দরবারেই সাজাতেন না তিনি সুরের রত্নসম্ভার, ভগবানের সিংহাসনতলেও নিবেদন করতেন তাঁর সুরের মাধুর্যময় নৈবেদ্য; পার্থিবের সঙ্গে অপার্থিব রাজ্যের যোগসূত্র রচনা করেছিলেন তাই তিনি সঙ্গীতের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই অবিশ্বাস-অন্ধকারের যুগেও।

[ক্রমশঃ।

(৩) এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যখন General Assembly's Institution-এ পড়েন, তখন সতীর্থদের অনুরোধে বিবেকানন্দকে মাঝে মাঝে বাঙ্গালা গান গাইতে হোত। এক দিনের একটী ঘটনা-সম্বন্ধে The Life of the Swami Vivekananda, Vol. 1 (1914, pp. 109—110) বইয়ে উল্লিখিত হয়েছে: "Frequently the students at the General Assembly's Institution gathered about Noren to hear him sing. There were two hundred boys in a class on a certain day. • •. The young men asked Noren to while away the time with a song. He gladly responded." এ-থেকে প্রমাণ হয়, বাঙ্গালা গানও তখন তিনি একেবারে বড় কম শিখেননি।

(৪) অধ্যাপক শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'কথা ও সুর' দ্রষ্টব্য।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিপীড়নে ও নূতন নূতন শাসন আইনে, তদুপরি অকস্মাৎ নির্ব্বাসন দণ্ডের ফলে দেশের অনেক লোক ভীত হইয়া পড়ে। ক্রমে সকল আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া যায় এবং সভা-সমিতির অধিবেশনও কমিয়া যায়। ৭ই আগষ্টের বিলাতী দ্রব্য বয়কট আন্দোলনের বাৎসরিক উৎসব ও ৩০এ আশ্বিনের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বার্ষিক সভা ব্যতীত আর কোনও বড় সভা হইত না। আমাদের বাড়ীতেও লোকজন আসা-যাওয়া একেবারে কমিয়া গেল। ভয়ে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার বহু গ্রাহক এই পত্রিকা পাঠ করা ছাড়িয়া দেয়। এমন কি, ছাপাখানায় যাঁহারা ছাপিবার কাজ দিতেন তাঁহারাও হাত গুটাইয়া লন। জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশের এই অবস্থা দেখিয়া অরবিন্দ তাঁহার বিখ্যাত উত্তরপাড়া বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"When I went to jail, the whole country was alive with the cry of Bandemataram, alive with the hope of a nation, the hope of millions of men who had newly risen out of degradation. When I came out of jail I listened for that cry but there was instead a silence. A hush had fallen on the country and men seemed bewildered—"

অরবিন্দের কনিষ্ঠা ভগিনী সরোজিনী দেবী বালিকাবস্থায়
[শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ বসুর সৌজন্যে

"আমি যখন জেলে গিয়াছিলাম তখন সারা দেশ বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দ্বারা সজীব ছিল, জাতির ভবিষ্যৎ আশায় জীবিত ছিল, লক্ষ লক্ষ লোক যাহারা অধঃপতিত অবস্থা হইতে সবে মাত্র উত্থিত হইয়াছে তাহাদের আশা লইয়া জাতি জীবিত ছিল। আমি জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই ধ্বনি শুনিতে চেষ্টা করি কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে নীরবতা দেখি। দেশে নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিয়াছিল এবং জন-সাধারণকে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।"

ইংরাজীতে যাহাকে "সমাধিক্ষেত্রের নীরবতা" বলে জনসাধারণের মধ্যে অনেকটা সেই স্তব্ধতা আসিয়াছিল। পূর্ব্বের সে উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস ছিল না। অন্তরালে চলিতেছিল অগ্নিযুগের নূতন ব্যবস্থা, নূতন গঠন, নূতন সংযোগ, বিস্ময়য় তাহার ব্যাপকতা। প্রথমে কয়েক জন মাত্র এই কার্য্যে অবতীর্ণ হন।

শ্রীঅরবিন্দ অ্যাক্রয়েড ঘোষ

শ্রীসুকুমার মিত্র

অরবিন্দ যখন জেল হইতে মুক্তি পাইয়া কলেজ স্কোয়ারে আসেন, তখন আমি আগ্রায় নির্ব্বাসিত পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া জেলের কঠোরতা সম্বন্ধে 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় এক বিবৃতি দেই। উহা পাঠে লালা লাজপত রায় লাহোরে এক সভা আহ্বান করিয়া নির্ব্বাসিতের প্রতি কঠোরতার তীব্র প্রতিবাদ করেন। আমিও গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিবাদ-পত্র পাঠাই ও তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করি।

এই সময় নানা প্রকার দুশ্চিন্তায় আমার মাতার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। এই অবস্থায় বিখ্যাত ডাক্তার স্বর্গীয় কর্ণেল ইউ, এন, মুখার্জ্জি প্রত্যহ আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমার মাতাকে দেখিয়া যাইতেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা। স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও প্রত্যহ সন্ধ্যায় আমাদের সংবাদাদি লইয়া যাইতেন। যত দিন আমার পিতা ফিরিয়া না আসিয়াছেন তত দিন তাঁহারা উভয়ে এই ভাবে যাতায়াত করিতেন। মুক্তি পাইবার পর ইঁহাদের উভয়ের সহিত অরবিন্দের নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইত।

কর্ণেল মুখার্জ্জি পরামর্শ দেন যে, স্বাস্থ্যলাভ করিতে হইলে আমার মাতার প্রত্যহ প্রবাহমান জলে স্নান করা উচিত। প্রায় প্রত্যহ অরবিন্দ তাঁহার স্নেহপরায়ণা ন'মাসীকে গঙ্গা-স্নানে লইয়া যাইতেন।

১৯০৯ সালের মে মাসে মুক্তি পাইবার কিছুকাল পরে ক্রমে অরবিন্দের বন্ধু-বান্ধব সকল আমাদের বাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিতে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে আঁট-সাঁট বস্ত্র-পরিহিত, বলিষ্ঠ অথচ কৃশ রাজপুতকে দেখিয়াছি, আবার বৃহৎ হীরকের কুণ্ডল—যাহার জ্যোতি ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে—এরূপ মাদ্রাজের ধনীকেও আসিতে দেখিয়াছি। অপর দিকে সহীদ যতীন্দ্র মুখার্জ্জি, সুরেশ দত্ত, অধ্যাপক যতীশ ঘোষ প্রভৃতি বাঙ্গালী যুবকদেরও দেখিয়াছি।

অরবিন্দের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ৺কুমুদিনী বসু

একদিন এক যুবক একটি এ্যামেরিকা প্রস্তুত রাইফেল আনিয়া আমাদের বাড়ীতে রাখিয়া যায়। তাহা অরবিন্দের নির্দ্দেশ মত লুকাইয়া রাখা হয়। পরে তাহা সরাইবার প্রয়োজন হওয়ায় এক এসরাজের বাক্সে করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্য দিয়া কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়া হাঁটিয়া যাইবার কালে পথে একজন পরিচিত ব্যক্তি হাতে এসরাজের বাক্স দেখিয়া বলিলেন 'তুমি আবার এসরাজ বাজাইতে শিখিলে কবে?' মুক্তি পাইবার পরেও অরবিন্দ তাঁহার পূর্ব্ব মতবাদ পরিবর্ত্তন করেন নাই তাহা এই সকল ও অন্যান্য ঘটনায় বুঝিতে পারিলাম।

"সুপ্রভাত"

আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্গীয়া কুমুদিনী বসু ১৯০৭ সালের শ্রাবণ মাসে 'সুপ্রভাত' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত কবিতা পাঠাইয়া দিয়া উহাকে অভিনন্দন করিলেন—

"ভৈরব তুমি কি বেশে এসেছ
ললাটে ফুঁসিছে নাগিনী
রুদ্র বীণায় এই কি বাজিল
সুপ্রভাতের রাগিণী"—

* * *

এই পত্রিকা সে সময়ে খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল। যখন ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসীর হুকুম হয় তখন আদালতের কাঠগড়ায় পুলিশ প্রহরী পরিবেষ্টিত ক্ষুদিরামের ছবি 'সুপ্রভাতে' প্রকাশিত হয়। তাহার বিপরীত পৃষ্ঠায় চট্টগ্রামের কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্তের এক কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতার নাম ছিল "আবার আসিও ফিরে"। এই কবিতা প্রকাশে গভর্ণমেণ্ট চঞ্চল হইয়া উঠেন এবং 'সুপ্রভাতে'র সম্পাদিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা করিবেন স্থির করেন। কয়েক মাস পরে শুনা গেল যে নারীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা করিলে দেশের মধ্যে অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পাইবে, এই কথা মনে করিয়া গভর্ণমেণ্ট ঐ মামলা আনিলেন না। এ সকল ঘটিয়াছিল অরবিন্দ হাজতে থাকার সময়ে।

এই পত্রিকাকে আরও জনপ্রিয় করিবার অভিপ্রায়ে আমার ভগিনী অরবিন্দকে অনুরোধ করেন যে তিনি বন্দীশালার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে "সুপ্রভাতে" যেন প্রবন্ধ লিখেন। তাঁহার অনুরোধে অরবিন্দ প্রতি মাসে আমাদের বাসায় থাকার সময়ে অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও "কারাকাহিনী" নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই প্রবন্ধেই তিনি সর্ব্বপ্রথম জেলে বাসুদেব দর্শনের কথা প্রকাশ করেন। পণ্ডিচেরী যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি এই ভাবে "সুপ্রভাতে" প্রবন্ধ লিখিয়া উহাকে সমৃদ্ধ করেন।

কর্ম্মযোগিন

সুরেন্দ্রনাথ অরবিন্দকে 'বেঙ্গলী' পত্রিকা পরিচালনা করিতে অনুরোধ করেন। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা পুনরায় প্রকাশ করার জন্য কেহ তাঁহাকে বলেন। কিন্তু তিনি নিজস্ব ম-

প্রকাশ করিবার জন্য ইচ্ছুক হন। তিনি কর্ম্মহীন না থাকিয়া কিছুদিন পরেই সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন। প্রথমে প্রকাশিত হয় ইংরাজী ভাষায় লেখা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কর্ম্মযোগিন', তাহার পরে 'ধর্ম্ম' নামক বাঙ্গলায় পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি দোতলায় বসিবার ঘরে নিবিষ্ট চিত্তে সংবাদপত্রের প্রবন্ধ লিখিতেন বা টাইপ করিতেন। তখন সেই একই ঘরে কেহ গ্রামোফোন বাজাইত অথবা উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্ত্তা বলিত এবং নানারকম গোলমাল হইত। ইহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না, তাঁহার চিন্তাধারার ব্যাঘাত হইত না, তিনি এক মনে লিখিয়া যাইতেন। এত গোলমালের মধ্যে মন স্থির করিয়া তিনি কিরূপে প্রবন্ধাদি লিখিতেন তাহা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম ও নিজেরাই লজ্জায় সংযত হইতাম।

তাঁহার 'কর্ম্মযোগিন' পত্রিকার মলাটে রথে উপবিষ্ট অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের ছবি ছিল এবং তাহার নীচে গীতা হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করা থাকিত, যাহার অর্থ ছিল, "যোগ হইল কর্ম্মে কুশলতা।"

অরবিন্দ প্রথম সংখ্যার 'কর্ম্মযোগিনে' সম্পাদকীয় স্তম্ভে পত্রিকার আদর্শ সম্বন্ধে লেখেন—

"Karmayogin will be more of a national review than a weekly newspaper. We shall notice current events only as they evidence, help, affect or resist the growth of national life and the development of the soul of the nation * * * if there is no creation, there must be disintegration; if there is no advance and victory, there must be recoil and defeat."

'কর্ম্মযোগিন' সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে সংবাদ অপেক্ষা জাতির কার্য্য-কুশলতার আলোচনাই অধিক থাকিবে। জাতির আত্মার প্রগতি এবং জাতির জীবনকে যাহা সাহায্য করে, বা বাধা দেয় অথবা প্রভাবিত করে কেবল মাত্র সেই সকল চলতি সংবাদ প্রকাশিত হইবে। "* * * যদি সৃষ্টি না থাকে তবে নিশ্চয়ই ধ্বংস আছে, যদি অগ্রগতি ও জয় না থাকে তবে অবশ্যই পশ্চাদ্‌গমন ও পরাজয় আছে।"

'কর্ম্মযোগিন' প্রকাশের প্রথম দিকে উহাতে অরবিন্দের লিখিত ঈশ, কেন ও কঠ উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ পায়। তদ্ব্যতীত বাজী প্রভু, পাপের উৎপত্তি, কে ইত্যাদি নামে তাঁহার লিখিত কবিতা প্রকাশিত হয়। পরে কালিদাসের ঋতু-সংহারের এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। আনন্দমঠের অনুবাদ শেষ হয় নাই, মাত্র ১৩ অধ্যায় অনূদিত হইয়াছিল।

ইহা ব্যতীত গঠনমূলক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যথা, জাতীয় শিক্ষার পদ্ধতি, ভারতের মস্তিষ্ক, জাতির নিকটে কলাবিদ্যার মূল্য ও কর্ম্মযোগিনের আদর্শ। কয়েক সংখ্যায় মৃতের কথোপকথন বলিয়া প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে 'প্রীতি লোকে দুইটি আত্মা'র কথোপকথন কৌতূহলপ্রদ ছিল। আত্মা বলিতেছে "পৃথিবীর দুঃখকষ্ট আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে; আমরা পৃথিবীতে ফিরিয়া যাইব; আমরা তথায় আনন্দ ও সৌন্দর্য্য এবং সদ্ভাব সঙ্গতির রাজ্য পুনঃস্থাপিত করিব।"

'কর্ম্মযোগিনে' মিণ্টো-মর্লি শাসন-সংস্কারকে বলা হয় যে উহা ফাঁকা ও অব্যবহার্য্য, উহা দেশের লোকের মধ্যে নূতন বৈরিতা আনিবে এবং এক হস্তে শাসনের কঠোরতা অপর দিকে তুষ্টি প্রদান, এক বিপজ্জনক দুমুখী শাসন-কৌশল। অরবিন্দ লেখেন যে, এই শাসনসংস্কার ভুয়া ও একটা ফাঁদ মাত্র। এরূপ অবস্থায় কি করা উচিত তাহার সম্পর্কে 'কর্ম্মযোগিনে' "আমার দেশবাসীর প্রতি খোলা চিঠি" নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি দেশের প্রধান সমস্যা সকল সম্পর্কে সাহসিকতার সহিত ও পরিষ্কার ভাবে আলোচনা করিয়া যে কার্য্যধারা প্রণয়ন করেন তাহাতে ছয়টি বিষয় ছিল। পরে তিনি বুঝিতে পারেন যে সমগ্র দেশ তাঁহার এই কার্য্যধারা গ্রহণ করিতে অক্ষম।

ভারতের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখেন তাহাতে ভারতীয় যুবকদের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রাচীন কালে যে শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল তাহা যথাসম্ভব অবলম্বন করিয়া শিক্ষা-সংস্কার করিতে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

যাহাতে দেশের লোক আপনাদিগকে গঠিত করিতে পারে এবং যখনই উপস্থিত হইবে তখনই চরম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকে তাহার জন্য 'কর্ম্মযোগিনের আদর্শ' নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কারণ, তিনি রাজনীতিক্ষেত্র ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে দশটি প্রবন্ধ লেখেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে উক্ত প্রবন্ধগুলিতে বর্ত্তমানে ভারতে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। উহা পাঠে মনে হয় যেন ১৯৫০ সালে ভারতে কি হইবে তাহা ১৯০৯ সালে তিনি জানিতেন। ভারতে দুইটি আইন-সভা, বর্ণহীন সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্ম্ম বিষয়ে পক্ষপাতশূন্যতা ও বাস্তবতা প্রভৃতি য়ুরোপীয় স্বাধীনতার ক্ষুদ্র আদর্শ স্থাপন দ্বারা ভারতের উপকার হইবে না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

১৯০৯ সালের জুলাই মাসে গোপন সংবাদ শুনা গেল যে, অরবিন্দকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিবার জন্য কলিকাতার পুলিশ জল্পনা-কল্পনা করিতেছে। ইহা জানিয়াই তিনি পূর্ব্বোক্ত 'খোলা চিঠি' লেখেন। উহাতে তিনি বলেন যে 'যদি আমাকে নির্ব্বাসিত করা হয়, যদি আমি আর না ফিরি, তাহা হইলে এই আমার শেষ রাজনৈতিক উইল (will) বা ইচ্ছা দেশবাসীর নিকট জানাইলাম।'

অরবিন্দ বাঙ্গলার নানা জেলায় মধ্যে মধ্যে বক্তৃতাদি করিতে যাইতেন। ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হুগলী সহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে তিনি যান। আমিও সেখানে গিয়াছিলাম।

৩০এ আশ্বিন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ দিবস ও রাখীবন্ধন দিবস আসিয়া পড়িল, উহা উদ্‌যাপনের জন্ম কোনও সাড়া-শব্দ নাই। অরবিন্দের নিকট এই কথা বলিলে, তখনও যে কয়েক-জন এ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্য ছিলেন ও সোসাইটির গৃহে বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে অরবিন্দ উক্ত দিবসে সভা করিয়া প্রতিবাদ জানাইবার জন্ম নির্দ্দেশ দিলেন। সোসাইটির অন্যতম কর্ম্মী বন্ধুবর শ্রীনলিনী গুপ্তকে প্রত্যেক মেস ও হোষ্টেলে যাইয়া যুবকদিগকে এই কার্য্যে যোগ দিবার জন্ম অনুরোধ করিতে বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তাঁহারা যেন কার্য্য করেন; তদনুসারে যুবকগণ রামানন্দ বাবুকে অনুরোধ করিল এবং তিনিও তাহাতে রাজী হন।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, এ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির সদস্যগণের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলেও তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন পৃথিবীর নানা স্থানে যাইয়া ভারতের মুক্তির জন্ম চেষ্টা করিয়াছেন; অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের ও বিদেশী রাজ্যের সাহায্য গ্রহণেরও চেষ্টা করিয়াছেন। নলিনী বাবু লুকাইয়া য়ুরোপ গমন করেন ও তথা হইতে রুশিয়ায় যান। কয়েক বৎসর পরে সে স্থান হইতে লুকাইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন। অপর কর্ম্মী স্বর্গীয় হেরম্ব গুপ্ত চীন, জাপান ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যাইয়া নানাভাবে ভারতের মুক্তির চেষ্টা করেন। বৃটিশের দীর্ঘ হস্ত ঐ সকল রাজ্যেও প্রসারিত হইয়া তাঁহাকে ধৃত ও নিপীড়ন করিতে চেষ্টা করে। অপর কর্ম্মী শ্রীঅবনী মুখার্জ্জিও এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এখন তিনি সোভিয়েট রাজ্যে আছেন।

১৯১০ সালের ২২শে জানুয়ারী অরবিন্দ এক বেনামী পত্র পাইলেন যে, একজন পুলিশ গুপ্তচর কয়েকজন সহকারী সহ ৬ কলেজ স্কোয়ারের বাড়ীর প্রতি নজর রাখিয়াছে এবং যে সকল চিঠিপত্র ডাকে আসে তাহার সবই খুলিয়া নকল করিয়া রাখে। পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শামসুল আলমকে হাইকোর্টে ২৪এ জানুয়ারী গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। ৫ই ফেব্রুয়ারীর 'কর্ম্মযোগিনে' অরবিন্দ এক প্রবন্ধে সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধি সম্পর্কে লেখেন যে, গভর্ণমেণ্টের পীড়ন-নীতির ফল ফলিতেছে। তখন বাঙ্গলা দেশে যে ক্রমবর্দ্ধমান সন্ত্রাসবাদ বহিয়া যাইতেছিল জাতীয়তাবাদিগণ তাহা রোধ করিতে অক্ষম।

'কর্ম্মযোগিনে'র মামলা

অরবিন্দ অন্তর্দ্ধান হইবার আট মাস পরে গভর্ণমেণ্ট অরবিন্দের 'খোলা চিঠি' রাজদ্রোহকর মনে করিয়া উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। তখন 'কর্ম্মযোগিন' বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে। মামলায় গভর্ণমেণ্ট বলেন যে গ্রেপ্তার হইবার ভয়ে অরবিন্দ পলাইয়া গিয়াছেন। 'ম্যাড্রাস টাইমস' নামক পত্রিকায় অরবিন্দ এই অভিযোগের এক উত্তর প্রকাশ করিয়া বলেন, অন্তরের প্রয়োজনে যোগ-সাধনার জন্ম তিনি পণ্ডিচেরীতে অবস্থান করিতেছেন। তথায় পৌছিবার পরে তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি বৃটিশ ভারতের আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য নহেন। নিম্ন আদালতে মুদ্রাকরের শাস্তি হয়। হাইকোর্টে আপীলে জাষ্টিস উডরফ ও জাষ্টিস ফ্লেচার উক্ত প্রবন্ধ রাজদ্রোহকর নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন এবং মুদ্রাকরকে মুক্তি দেন। এইবার লইয়া তিনবার অরবিন্দের বিরুদ্ধে মামলা বিফল হয়।

অরবিন্দ কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইবার কিছুদিন পরে একজন ইংরাজ পুলিশ কর্ম্মচারী কয়েকজন কনেষ্টবল ও বাঙ্গালী পুলিশ কর্ম্মচারী সহ ৬ কলেজ স্কোয়ারে আসিয়া আমার পিতাকে তল্লাসী ওয়ারেণ্ট দেখায়। আমি ইংরাজ পুলিশ কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করি "আপনারা কি জন্ম বাড়ী তল্লাস করিতে চাহেন"? তিনি উত্তর দেন যে 'কর্ম্মযোগিন পত্রিকাগুলি চাই।' তাহাতে আমি বলি 'সেগুলি দিলে ত' আর বাড়ী তল্লাস করিয়া তছনছ করিবেন না?' তিনি বলিলেন "না।" তখন আমি কাগজপত্র খুঁজিয়া আমার ও সরোজিনী দিদির নিকট যে সকল 'কর্ম্মযোগিনের' সংখ্যা ছিল তাহা আনিয়া উক্ত পুলিশ কর্ম্মচারীকে দেই। তাহার পরেই পুলিশ যথারীতি সমস্ত বাড়ী তল্লাস করিয়া প্রতিবারের ন্যায় তছনছ করিল। আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম 'তোমরা কথা দিয়া কথা রাখ না'। আমার পিসিমাতা নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা ছিলেন। তাঁহার ঘরে প্রতিবাদ সত্ত্বেও পুলিশ প্রবেশ করায় তিনি রন্ধন করা খাদ্যদ্রব্য সব ফেলিয়া দেন এবং অনাহারে থাকেন।

ইহারও মাসাধিক কাল পরে মধ্যরাত্রে পুলিশ আসিয়া বাড়ী তল্লাস করে। সঙ্গে আসিয়াছিলেন পুলিশের সহকারী ইন্সপেক্টর জেনারেল। তিনি আসিয়াই আমার নিকট বিদেশ হইতে প্রাপ্ত পত্র সকল দিতে বলেন। বিলাতের পার্লামেণ্টের সভ্যগণ যায় মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের পত্র সকল যেগুলি আমার পিতার নির্ব্বাসনের সময়ে তাঁহারা লিখিয়াছিলেন সেগুলি তাঁহার হস্তে দিলে, তিনি আমাকে নড়িতে বারণ করিয়া দেওয়ালের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলেন। বাড়ীর মহিলাদের পাহারা দিবার জন্ম পুলিশ এক স্ত্রীলোককে সঙ্গে আনিয়াছিল। প্যারিসের ভারত-বিপ্লবী মিসেস্ কামা, শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা কিম্বা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চিঠিরও খোঁজ হয়। একই রাত্রে ব্যারিষ্টার বি সি চাটার্জি ও স্বর্গীয়া সরোজিনী নাইডুর ভগ্নীর (যাঁহার ডাক নাম গুল্লু) গৃহও তল্লাস হয়।

এই তল্লাসের ফলে পরদিন 'ইংলিশম্যানে'র প্রতিনিধি আসিয়া তল্লাসীর খবর লন, তিনি জানিতে পারেন যে পার্লামেণ্টের সভ্যগণের পত্রাদি পুলিশ লইয়া গিয়াছে। রয়টার "সন্ত্রাসবাদীর গৃহ-তল্লাসে পার্লামেণ্টের সভ্যদের পত্র প্রাপ্তি" শীর্ষক এক খবর ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহে তাহার পরদিনই প্রকাশ করে। তাহার ফলে পার্লামেণ্টের ঐ সকল

সভ্য এই কার্য্যের জন্য ভারত-সচিবকে চাপিয়া ধরেন। কেহ কেহ সংবাদপত্রে এই তল্লাসীর প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, তাঁহারা ঐ সকল পত্রে সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করেন নাই; তথাপি তাঁহাদের পত্রগুলি কেন ভারতীয় গুপ্ত পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইল? দুই দিন পরেই পুলিশ এই সকল পত্র নিজেরাই বাড়ীতে পৌঁছিয়া দিয়া গিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে অনেকবার এই বাড়ী তল্লাসী হইয়াছে এবং ধৃত কোনও জিনিষ পুলিশ ফেরত দেয় নাই, এবারের তৎপরতার পিছনে ছিল পার্লামেণ্টের বিপক্ষ সভ্যদের হুমকী।

'কর্ম্মযোগিন' পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হইলে শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতা গিরিজা বাবুকে অরবিন্দ ডাকিয়া আনিয়া প্রেসের জন্য টাইপ, হ্যাণ্ডপ্রেস ইত্যাদি সরঞ্জাম কিনিতে দেন। শ্যামপুকুরে প্রেস স্থাপিত হইল। আমি উক্ত দুই পত্রিকার প্রুফ অনেক সময়ে দেখিয়া দিতাম। চলিয়া যাইবার কিছুকাল পরে লোক মারফৎ অরবিন্দ আমাকে প্রেসের ভার লইয়া উহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে বলেন। আমি তথায় যাইয়া শুনিলাম, প্রাপ্য টাকার জন্য পাওনাদারগণ প্রেসের মাল সকল নাকি লইয়া গিয়াছে। এই কথা অরবিন্দ প্রেরিত লোককে জানাইয়া দিয়াছিলাম।

অরবিন্দের অনুসন্ধিৎসা

অরবিন্দ আমাদের বাড়ী থাকার সময়ে আমি প্লানচেটে অশরীরী আত্মা আনিবার চেষ্টা করিতাম। নানারূপ অদ্ভুত ব্যাপারে অরবিন্দও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আমাদের সহিত সোৎসাহে প্ল্যানচেট ধরিতেন ও উত্তরে কি লেখা হইয়াছে ব্যগ্র হইয়া তাহা পাঠ করিতেন। বাল্যকাল হইতেই আমি নানা প্রকার কৌতুহলপ্রদ বিষয় লইয়া চর্চ্চা করিতে ভালবাসিতাম। কখন হঠযোগ, কখন হিপনটিজম্, প্রাণায়াম, প্রাকৃতিক চিকিৎসা, শূন্য হইতে বাক্য শ্রবণ, ইচ্ছা মত যে কোন সুগন্ধ আঘ্রাণ, প্রেতাত্মা কর্ত্তৃক জিনিষপত্র নাড়া-চাড়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান, ফ্রেনলজি, উর্দ্দু ও ফরাসী ভাষা ইত্যাদি হরেক রকম বিষয় লইয়া ঘাঁটিতাম এবং ঐ সকল বিষয়ে ভাল করিয়া বুঝিবার ও চর্চ্চা করিবার জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতাম। আমি অরবিন্দের সহিত এই সকল বিষয়ে আলোচনা করিবার সুযোগ পাই, তিনিও আমার কাছে নানা অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া ঐ সকল বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন ও আমার পুস্তকাদি পাঠ করেন। একবার ফ্রেনলজির নিয়ম অনুসারে আমি তাঁহার মাথা পরীক্ষা করি এবং তিনি কি চরিত্রের মানুষ তাহা তাঁহাকে লিখিয়া দেই। এইরূপ একবার কথা প্রসঙ্গে আমি অটোম্যাটিক রাইটিং সম্বন্ধে তাঁহাকে বলি। তিনি উৎসাহের সহিত এই সময়ে automatic writing সুরু করেন। এক দিন প্রভাতে আমাকে তিনি বলিলেন, 'কাল রাত্রে এক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে।' 'কি হইয়াছে' প্রশ্ন করিলে বলেন যে, তিনি পেন্সিল লইয়া automatic writingএর জন্য বসিয়া স্থির করিলেন যে ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে প্রমাণ হওয়া প্রয়োজন। তিনি 'প্রমাণ চাই' এই বলিয়া স্থির হইয়া পেন্সিল লইয়া বসিয়াই আছেন। তখন অধিক রাত্রি হওয়ায় আমরা নিদ্রিত হইয়াছি। অনেক রাত্রে তাঁহার হাতে পেন্সিলটি আটকাইয়া গেল, আর ছাড়ে না। বহুক্ষণ পরে লেখা শেষে মুক্ত হইল। পরে অভ্যাস হইয়া গেলে দেখিতাম তিনি অন্যমনস্ক হইয়া আছেন কিম্বা অন্যের সহিত কথা বলিতেছেন কিন্তু হাতে অনবরত লেখা চলিতেছে। 'কর্ম্মযোগিনে'র বহু প্রবন্ধ এই ভাবে লেখা।

জেল হইতে ফিরিবার পরে অরবিন্দের কাগজপত্রের মধ্য হইতে তাঁহার এক কবিতার পাণ্ডুলিপি পাইলাম (সম্ভবতঃ উর্ব্বশী)। আমি তাঁহাকে উহা ছাপাইতে বলিলাম। তিনি অর্থাভাবের কথা বলায় আমি সমস্ত পাণ্ডুলিপি স্বহস্তে টাইপ করিয়া স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে যাইয়া পুস্তকটি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া নিজ ব্যয়ে পুস্তক ছাপান এবং উহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। পরে বিক্রয়লব্ধ অর্থ অরবিন্দকে দেন।

[ক্রমশঃ।

উত্তর

১। পৃথিবীর ১১°১৮ এবং ২৮°১৫ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮২ এবং ১৭ পূর্ব্ব দ্রাঘিমাংশের অন্তর্ব্বর্ত্তী।

২। সর্ব্বপ্রথম বাঙলা দেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্ব্বে ছিল ২৫১৭৩৮ মাইল।

৩। মাত্র ছয় জন।

৪। অন্যূন ১৪০০।

৫। লর্ড ডালহৌসি ডাক্তার ওসাগনেসীর দ্বারায় কলকাতা থেকে খাজরী পর্য্যন্ত তাড়িত-বার্ত্তাবহ প্রস্তুত করিয়েছিলেন।

৬। লর্ড বেথন।

৭। সিপাই বিদ্রোহের সময় ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্রে।

৮। ৩০শে মার্চ্চ ১৮৩৬ সাল।

মুলুকচাঁদের বিচার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

৺মনোমোহন ঘোষ

সাক্ষী নম্বর দশ

সরকার পক্ষের ১০নং সাক্ষী রামদাস সরকারের জবানবন্দী, অত্ত, ১৮৮২ সালের ২৪শে জুলাই, ২৪ পরগণার এ-এস-জে, এ সি ব্রেট, আমার এজলাসে ১৮৭৩ সালের ১০ আইন অনুসারে সত্য-পাঠের পর গৃহীত হইল—

আমার নাম রামদাস সরকার। আমি হেড কনষ্টেবল। ২৭শে মার্চ্চ আমায় শর্শা থানায় মোতায়েন করা হয়। শর্শা ভুলাৎ থেকে ৯।১০ মাইল হবে। ২৮শে মার্চ্চ বেলা প্রায় ৩টায়, আসামী মুলুকচাদ আমার কাছে এসে এতালা দেয়। এতালা এই ... াগজ সনাক্ত করিয়া পাঠ করিল]। আমার তত্ত্বাবধানে এ লেখা হয়েছিল। আমি সই করেছিলাম। সাব-ইনসপেক্টারের কাছ থেকে তখন চার্জ্জ বুঝে নিচ্ছিলাম। তাই দ্বারকানাথ কনষ্টেবলকে আসামীর সঙ্গে ভুলাতে পাঠাই। দ্বারকা আর আসামী একসঙ্গেই চলে যায়। পরদিন প্রাতে ৭টা-৭।টায় আমি যাই। গিয়ে দেখি, একটা ছোট্ট মেয়ের লাস আসামীর উত্তর দাওয়ায় পড়ে। ওকে নেকজান বলে নাকি ডাকত। জিভ বেরিয়ে এসেছে। চোখ দুটো আধা বোজা। পেটে এত বড় [সাক্ষী আকার দেখাইয়া দিল] একটা ত্রিকোণ ক্ষত। [সাক্ষী এক ত্রিকোণ আঁকিয়া দেখাইয়া দিল]। কনষ্টেবল দ্বারকা রায়ের হেফাজতে লাস চালান দিলাম। খাওয়া-দাওয়ার জন্ত ভুলাতে আমি থাকলাম। তার পর বিকেল ৪টায় গাঁ ছেড়ে এলাম। লাসের গায়ে বা কাপড়-চোপড়ে রক্ত দেখিনি।

মিঃ ঘোষের জেরার উত্তরে—ভুলাতে পৌঁছে দেখি লাসের কাছে কতকগুলো গণ্যমান্ত লোক দাঁড়িয়ে। এই ভদ্রলোকও [সাক্ষী উমাচরণ সরকারকে সনাক্ত করলেন] ছিলেন। ইনি উমাচরণ পঞ্চায়েৎ। আসামীকে দিয়ে ত্রিকোণ ক্ষত ফাঁক করিয়ে বেশ করে তার ভিতরে নজর দিয়ে দেখলাম। ক্ষত গভীর নয়, দেখতে মনে হ'ল মাত্র চামড়া ভেদ করেছে। যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের জিজ্ঞেস করলাম—মৃত্যু কি করে হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন। জিজ্ঞেস করলাম, তিনিও তাই বললেন। আসামীর বৌ সেখানে ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, সে কি জানে। সে বললে—"আমি ঘরে ছিলাম না। কি করে ছেলে ম'ল বলতে পারি নে।" বেলা প্রায় ১১।০টায় সুরথাল করে লাস চালান দেই।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে—সুরথালের এই রিপোর্ট আমি লিখি [নদীয়া জজের "সি" চিহ্নিত কাগজ পাঠ করে সনাক্ত করলেন]। মুখে ফেনা ছিল, পেটটা ফুলো। গন্ধ ধরেনি। "সি" দলীলে উমাচরণ ও নেকজানের মায়ের নাম আছে। যদি নেকজানের মা, বরাতি বলে থাকে যে, সে সময় সে আমায় দেখেনি বা আমার সঙ্গে কথা বলেনি, তাহ'লে সে মিছে কথা বলেছে। শিশুটিকে সাপে কেটেছে এ আমি মানতে প্রস্তুত হয়েছিলাম, কিন্তু সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হতে পারিনি। গ্রামবাসীদের সঙ্গে আমিও মনে করেছিলাম ক্ষতটা সাপের কামড় হতে পারে। আমার আদেশে এক জন মেঝে খুঁড়ে ফেলে। আমায় বলা হয়েছিল, ওর নাম উমেশ গাজী। [এ মর্ম্মে পুলিশ ডায়রির কথা সাক্ষী বলে]। লোকটা কতকগুলো গর্ত্ত দেখতে পায়। দেখে মনে হ'ল সাপের গর্ত্ত। গর্ত্তগুলি বরাবর খোঁড়া হ'ল, সাপ পাওয়া গেল না, যত দূর মনে পড়ছে, খোঁড়বার সময় দ্বারকা রায় উপস্থিত ছিল। যে সব লোককে ডেকে পাঠান হয়েছিল, দ্বারকা রায় তাদের এনে দেবার ঠিক পরেই মেঝে খোঁড়া সুরু হয়। বর্শা বা শড়কীর কোন কথা কেউ আমায় বলেনি। আসামীকে সন্দেহ করবার মত কিছু আমি দেখিনি। ৩১শে মার্চ্চ প্রাতে এক চৌকীদা- ইনস্পেক্টারের এক হুকুম নিয়ে আমার কাছে আসে। ইনস্পেক্টারের হুকুমে বলা হয়েছিল, নিজের মেয়েকে খুন করে আসামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দিয়ে প্রথম এতালা তৈরী করতে। হুকুমে আরও বলা হয়েছিল যে, ইনস্পেক্টার নিজে এ সম্বন্ধে তদন্ত করবেন। যখন এই হুকুম এল তখন আমি শর্শায়। আ... করেছিলাম ইনস্পেক্টার ভুলাতে যাবেন, তাই আমি ভুলা... গেছলাম। সেখানে তাঁকে না পেয়ে বনগাঁ যাই। ভুলাতে ... শুনি, আসামীর বৌ আর মেয়েকে এক কনষ্টেবল বনগাঁ নিয়ে গে... ... এ কথা আমি শুনিনি। ম...

পড়ছে, আসামী তার মেয়েকে খুন করেছে, এমন কোন উল্লেখ পরোয়ানায় ছিল না ; কেবল ডাক্তারই রিপোর্ট করেন যে, ব্যাপারটা খুন। বনগাঁ গিয়ে দেখি, দ্বারকা রায় সেখানে। সে আমায় বলল, আসামীর মেয়ে বলছে, নেকজানকে খুন করেছে তার বাবা। সে বলল, বনগাঁর ইনস্‌পেক্টারের সামনে হাজির করা হলে মেয়েটা এই কথা বলে। ৩১শে আমি ইনস্‌পেক্টারের সাথে ভুলাতে চাই। যত দূর জানি, এই প্রথম ইনস্‌পেক্টার ভুলাতে যান। প্রথম যখন আমি লাস দেখতে যাই, আসামী আমায় বলেছিল যে, দুই মেয়ে নেকজান আর গোলককে নিয়ে রাত্রিতে সে ঘুমিয়েছিল। গাঁয়ের লোক-জনের সামনেই সে বলেছিল। গোলক নিতান্ত শিশু, তাই তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করিনি। বনগাঁ আর নদীয়ায় সরকার পক্ষের বক্তব্য ছিল যে, আমি যাতে কোন প্রশ্ন করতে না পারি সে জন্য আসামী গোলককে পেঁয়াজ-ক্ষেতে লুকিয়ে রেখেছিল। আমি গোলককে জিজ্ঞাসাবাদ করিনি কেন তার জন্য আমার কৈফিয়ৎ তলব করতে জিলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশ ইনস্‌পেক্টার পেয়েছিলেন বলে আমার মনে পড়ে না। আসামী মেয়েকে পিঁয়াজ-ক্ষেতে লুকিয়ে রেখেছিল, এই হেতু দিয়ে ইনস্‌পেক্টার রিপোর্ট করেছিলেন কি না বলতে পারি না। এ বিষয়ে ইনস্‌পেক্টার আমায় কোন প্রশ্ন করেছিলেন বলে মনে পড়ে না। নেকজানের বোন্‌কে আমি দেখতে পাইনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে আমি বলেছিলাম—এতে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে তার খোঁজ আমি করিনি।

[সাক্ষীর পুনঃ জবানবন্দী নেওয়া হয় না]

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে—শুনেছিলাম ডাক্তার বলেছিলেন, ক্ষত গভীর। ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজকে এ কথা আমি বলিনি যে, পরীক্ষা করে আমি দেখিছি, ক্ষত গভীর নয়। শুনেছি, ডাক্তার বলেছিলেন যে, ক্ষতটা নিশ্চয় কোন ধারাল অস্ত্র দিয়ে করা হয়েছে। শড়কী দিয়ে জখমটা হয়ে থাকতে পারে ডাক্তার এ কথা বলেছেন বলে আমি শুনিনি। আদালতে এই শড়কী আমি দেখেছি। যে অস্ত্র ব্যবহার করা হয় বলে বলা হয়েছে, এই সেই অস্ত্র বলে আমার সন্দেহ হয়নি। মেয়েটিকে শড়কী মেরে খুন করা হয়েছে এই বাদীপক্ষের যে মামলা আমি তা শুনেছি। শড়কী দিয়ে কি করে তিনকোণা ক্ষত হতে পারে এ কথা আমি চিন্তাও করিনি। নদীয়ার জজকে বলেছিলাম যে, ক্ষতের ধার খোলা হাঁ করা ছিল—এতে করে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, চামড়ার দুই ধার জুড়ে ছিল না, খোলা ছিল।

স্বাঃ এ, সি, ব্রেট।

একজিবিট ১০—প্রথম এত্তেলা

২৮ মার্চ্চ, ১৮৮২, অপরাহ্ণ ৩টা—মুলুকচাঁদ, চৌকীদার, বয়স ৪০।৪১, সাকিন ভুলাত, থানায় এসে নিম্নলিখিত জবানী দেয় :—

গেল কাল আমার বৌ ঘরে ছিল না। গেল রাতে আমি আমার ৮।৯ বছরের মেয়ে নেকজানকে নিয়ে আমার ঘরের পুব দিকের বারান্দায় ঘুমিয়েছিলাম। রাত এক প্রহর থাকতে (রাত্রি ৩টা), আমার ঘর থেকে প্রায় ২০ রশি (৮০০ গজ) উত্তরে আমার পেঁয়াজ-ক্ষেত দেখতে যাই। বারান্দায় মেয়ে তখন ঘুমিয়েছিল। ভোরবেলা বাড়ী ফিরে দেখি বিছানায় মেয়ে মরে আছে, তার মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। মেয়েকে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি তার পেটে একটা কাটা বা কামড়ের ছে দাগ। গায়ের রং নীল হয়ে গেছে। তার গায়ে আর কোন দাগ বা ক্ষত দেখতে পাইনি। মৃত্যুর কারণ কি বলতে পারি না। কাউকে সন্দেহ হয় না। এই আমার জবানবন্দী। আমি লিখতে-পড়তে পারি না।

মুলুকচাঁদ
ভুলাতের চৌকীদার

একজিবিট "সি"

নেকজান ছোকড়ীর মৃত্যুর সুরৎহাল

২৯ মার্চ, ১৮৮২, প্রাতে ৭টা—প্রহ্লাদ ঘোষ, সজন মণ্ডল সাং ভুলাত, জমির মণ্ডল, আতর গাজী, আমিরুদ্দী গাজী, কালু গাজী, উমাচরণ সরকার পঞ্চায়েৎ ও গ্রামের অন্যান্য রায়ত, মৃতার মা বরাতি এবং বাবা মুলুকচাঁদের সামনে আমি দেখেছি যে, পুব দুয়ারী ঘরের উত্তর-বারান্দায় লাস পড়ে আছে, একখানা কাপড় ঢাকা। লাস উঠানে নামাতে বলি। উপরের কাপড় সরিয়ে নিম্নলিখিত ব্যাপার দেখতে পাই—

বয়স ৮।৯ বছর। রং ময়লা। মাথায় লম্বা চুল, পেট ফোলা, দুই দাঁতের মধ্যে জিভের ডগা, নাক-মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। দেখতে শীর্ণ। বুকের নীচে এক আঙ্গুল চওড়া একটা কাটা বা কামড়ের তিনকোণা দাগ। চোখ দু'টো বোজা। দেহে অন্য কোন চিহ্ন বা আঘাত নাই।

স্বাঃ রামদাস সরকার
হেড কনষ্টেবল, শর্শা থানা।

আসামীর জবানবন্দী

মুলুকচাঁদ চৌকীদার। বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর। ১৮৮২, ৩১শে মার্চ্চ বনগাঁর প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট গোপালচন্দ্র মুখার্জ্জি, আমার এজলাসে গৃহীত জবানবন্দী :—

আমার নাম মুলুকচাঁদ চৌকীদার। পিতার নাম আশরফ সর্দ্দার। জাতি মুসলমান। পেশা চৌকীদারী। সাকিন মৌজা ভুলাৎ।

প্রঃ—তোমার মেয়ে নেকজানকে তুমি খুন করেছ ?

উঃ—না, আমি খুন করিনি।

প্রঃ—কোন তারিখে, কখন সে মারা যায় ?

উঃ—মঙ্গলবার ভোরে আমার পেঁয়াজ-ক্ষেত দেখতে গেছলাম। দুই মেয়ে ছাড়া ঘরে কেউ ছিল না। সোমবার বিকেল বেলা বৌ গেছল গোগায়। মাঠ থেকে ফিরে দেখি বড় মেয়ে নেকজান বিছানা থেকে একটু দূরে পড়ে আছে। ডাকলাম, সাড়া দিল না। নাড়া দিলাম, নড়ল না। সকাল হ'ল। দেখলাম একটা জখম। দেখলাম যে মরে গেছে। মেয়ে গোলকজান তখন ঘুমিয়ে। কাঁদতে লাগলাম। ৪।৫ দণ্ড বেলা হ'লে (প্রাতে ৮টা) থানায় রওনা হ'লাম। পথে পেয়াদা আমায় গ্রেপ্তার করলে। কদম আলি ফকীরের অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়েছিল।

প্রঃ—তার পর, কখন থানায় গেলে ?

উঃ—দুপুর গড়ে গেলে থানায় গিয়ে দারোগাকে জানালাম।

প্রঃ—তোমার বাড়ী থেকে থানা কদ্দূর ?

উঃ—৪।৫ ক্রোশ হবে।

প্রঃ—মেয়েদের রেখে কখন মাঠে গেছলে ?

উঃ—রাত এক পহর থাকতে (ভোর ৩টা)।

প্রঃ—বৌকে ঘর থেকে বাইরে পাঠিয়েছিলে কেন ?

উঃ—আমার বিরুদ্ধে যে মামলা চলছিল তার খরচার জন্ত টাকা আনতে।

প্রঃ—এই শড়কী তোমার ?

উঃ—আজ্ঞে।

প্রঃ—শড়কীটা ঘসে ফেলার মত মনে হচ্ছে কেন ?

উঃ—বলতে পারি না। আমি ঘসিনি। মাঠে যাবার সময় শড়কী নিয়ে যাইনি। লাঠি নিয়ে গেছলাম।

প্রঃ—মাঠে যখন যাও, বা রোঁদে যখন বের হও তখন সঙ্গে নাও শড়কী, না লাঠি ?

উঃ—কখনও শড়কী, কখনও লাঠি।

প্রঃ—মেয়েকে খুন করেছে বলে কাকে সন্দেহ হয় তোমার ?

উঃ—কাউকে ত খুন করতে দেখিনি হুজুর, কাজেই কাকে সন্দেহ করব ; তবে কদম আলি ফকীর ও মিরুণের সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে।

প্রঃ—শড়কী তোমার ক'গাছ আছে ?

উঃ—মাত্র এই গাছ। অন্ত যেখানি আমার বলে দেখান হয়েছে তা মিথ্যে মিথ্যি।

প্রঃ—মেয়ের গায়ে কোন গয়নাপত্র ছিল ?

উঃ—না।

পূর্ব্ব-বিচারে আসামীর জবানবন্দী

১৮৮২, ১৬ই মে নদীয়ার দায়রা জজ মিঃ ডিকেন্স ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩৪৬ ধারা অনুসারে জবানবন্দী গ্রহণ করেন—

আমার নাম মুলুকচাঁদ চৌকীদার। পিতা, আশরফ চৌকীদার। জাতি মুসলমান। সাকিন গোগা, থানা শর্শা। হাল সাকিন ভুলাৎ।

প্রঃ—তুমি দোষী ?

উঃ—আমি নির্দ্দোষ।

প্রঃ—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এই জবানবন্দী দিয়েছিলে ? জবানবন্দী সত্যি ?

[একজিবিট "ডি" পাঠ করে শোনান হয়]

উঃ—হাঁ, এই জবানবন্দী দিতেছিলাম। জবানবন্দী সত্যি।

প্রঃ—নিজে গোগায় না গিয়ে বৌকে কেন পাঠিয়েছিলে ?

উঃ—পুলিশ আমায় গাঁয়ে না দেখতে পেলে মারবে, এই ভয়ে যাইনি।

প্রঃ—দিনের বেলা গেলে না কেন ?

উঃ—ওরা (গোগায় আমার আত্মীয়রা) দিনের বেলা মাঠে কাজ-কর্ম্মে যায়, ঘরে থাকে না। তাই দিনের বেলা যাইনি।

প্রঃ—তুমি বলেছ, রাতে মাঠ থেকে ফিরে দেখলে, মেয়ে তার বিছানা থেকে একটু দূরে পড়ে আছে, আর সকাল হলে প্রতিবেশীদের ডাকলে। এসে যখন দেখলে, তখনই বাতী জ্বালালে না কেন ? চুপ করে বসে না থেকে তখনই কেন প্রতিবেশীদের ডাকলে না ?

উঃ—মাঠ থেকে ফিরে মেয়েকে অমন অবস্থায় দেখবা মাত্র আমি প্রতিবেশীদের চেঁচিয়ে ডেকেছিলাম।

প্রঃ—মেয়ে সাপের কামড়ে মরেছে, এ কথা গাঁয়ের পঞ্চায়েৎ ও থানার পুলিশকে বলেছিলে ?

উঃ—আজ্ঞে, আমি বলেছিলাম যে প্রতিবেশীরা বলছে, মেয়েকে সাপে কেটে মেরেছে।

প্রঃ—কোন সাক্ষী মানবে ?

উঃ—আজ্ঞে।

প্রঃ—সাক্ষীরা কি বলবে ?

উঃ—বলবে যে, তারা সাপে কাটার কথা বলেছিল।

স্বাঃ পি, ডিকেন্স (দায়রা জজ)

আসামীর বিবৃতির মেমো

বৌ ঘরে ছিল না। ছোট্ট দুই মেয়ে নেকজান আর গোলককে নিয়ে আমি ঘুমিয়েছিলাম। শেষ রাতে আমার পেঁয়াজ-ক্ষেত দেখতে যাই। কয়েকটা গরু-বাছুর মাঠে ঢুকেছিল তাদের খেদিয়ে দিলাম। ফিরে এসে তামাক খেলাম। মেয়েদের কাছে গিয়ে দেখি নেকজানের মাথা বালিশ থেকে নেমে গেছে, সে মাটিতে শুয়ে আছে। ওঠাতে গিয়ে দেখি মরে গেছে। চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলাম। আমার শালা, উমেশ গাজী এল, তার পর এল সজন, জমির, কয় জন মেয়েছেলে, আরও কেউ-কেউ। উমেশ গেল পঞ্চায়েৎ উমাচরণকে ডাকতে। এই এতটুকু (কাগজে এঁকে দেখাল) ক্ষত দেখলাম পেটে। উমাচরণ আর সকলে আমায় থানায় খবর দিতে বলল। থানায় যাবার সময় পথে এক পেয়াদা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখিয়ে আমায় গ্রেপ্তার করল। এক ঘণ্টা আটকে রাখল। চার আনা পয়সা দিতে যেতে দিল। বেলা প্রায় তিনটেয় থানায় পৌঁছলাম। ক্ষতটা গভীর নয়, চামড়া-কাটা। রামদাস কনষ্টেবল এসে আমায় দিয়ে যখন ফাঁক করাল, স্পষ্ট দেখলাম ক্ষত গভীর নয়, দেখে মনে হল একটু চামড়া টুকড়ে নিয়েছে। তাই সবাই বলতে লাগল সাপে-কাটা। স্বাঃ এ, সি ব্রেট (জজ)

২৪ জুলাই, ১৮৮২

আসামীর পক্ষের কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই।

২৪শে জুলাই ১৮৮২ স্বাঃ এ, সি ব্রেট (জজ)

সরকার পক্ষের বক্তব্য শেষ হ'লে জজ সরকারী উকীলকে সওয়াল করতে বললেন। সরকারী উকীল বললেন, জুরীদের কাছে তাঁর কোন বক্তব্য নাই। আদালত যা হয় করবেন। জজ বললেন, চিরাচরিত প্রথা সরকারী উকীল যে কেন মানতে চাচ্ছেন না, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তাঁর বক্তব্য তিনি আদালতকে সম্বোধন করেই না হয় বলুন।

তখন সরকারী উকীল সওয়াল প্রসঙ্গে বললেন যে, বাদী পক্ষের সাক্ষীদের বিশেষ করে আসামীর স্ত্রী ও কন্তার সাক্ষ্য জুরীরা কেন যে বিশ্বাস করবেন না তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

মিঃ মনোমোহন ঘোষের সওয়াল

জুরীদের সম্বোধন করে আসামীর পক্ষ থেকে মিঃ মনোমোহন ঘোষ কয়েকটি প্রাথমিক মন্তব্যের পর আসামীর বিরুদ্ধে যে

অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে, সে অপরাধের যে কোন মতলব নাই, সে বিষয়ে বলতে লাগলেন। তিনি বললেন—

আইন অবশ্য বলে যে, অপরাধের মতলব প্রমাণ করতে বাদী পক্ষ বাধ্য নয়, তবু এটা এমন ক্ষেত্র যেখানে জুরীদের প্রয়োজন হবে জানা, হত্যার মতলব সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ। আসামী যে তার মেয়েকে খুব ভালবাসত এ কথা ত সবাই স্বীকার করেছে, তবু নাকি সে নিজের সেই সন্তানকেই খুন করেছে। মতলব সম্বন্ধে বাদী পক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছে যে, আসামী তার শত্রুদের বিরুদ্ধে মিথ্যা খুনের মিথ্যা অভিযোগ আনতে চেয়েছিল। কিন্তু মেয়ের মরবার পরই আসামীর আচরণ এ ইঙ্গিত অহেতুক বলে প্রমাণ করে। আসামী এ ইঙ্গিতটুকুও কখনও করল না যে, কদম আলি ফকীরের কথা ত দূরে থাক, অন্য কেউও মেয়েকে খুন করেছে। সরকার পক্ষ অথবা পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে এমন কেউ, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে একটা হারান খেই ধরতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে শিশু গোলককে দিয়ে এই আদালতে সর্ব্বপ্রথম এই কথা বলাতে যে, আসামী খুন করবার সময় তাকে পরামর্শ দিচ্ছে ফকীরের ঘাড়ে দোষ চাপাতে। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, এ কথা শেখান-পড়ান। যদি আসামী পরামর্শ দিয়েই থাকত, তবে হয় বনগাঁয়ে, না হয় নদীয়ার দায়রা আদালতে নিশ্চয় সে কথা মেয়ে বলত। হাইকোর্টে আসামীর আপীল আবেদন সম্বন্ধে সওয়াল কালে আমি বলেছিলাম যে, মতলব সম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। এখন মনে হচ্ছে, এ কথা বলা ঠিক হয়নি যে এমন কি মেয়ে পর্য্যন্ত এ কথা বলেনি যে, আসামী তাকে আর কারু ঘাড়ে দোষ চাপাতে বলেছিল। এ সওয়ালের সময় কেউ জানত না যে, মামলার পুনর্ব্বিচার হবে। আজকে মেয়েটি এ আদালতে যে কথা বলেছে, তাতে মনে হচ্ছে, আসামীর অনুকূলে আমার সওয়ালের জবাব দেবার স্পষ্ট উদ্দেশ্যেই এ আদালতে মেয়েটির দিয়ে তা বলান হয়েছে। ডাক্তারী প্রমাণ, বিশেষ করে ঐ কথা যে পেটের ক্ষত থেকে এক ফোঁটা রক্তও বের হয়নি—এ থেকে জুরীরা নিশ্চয় নিঃসংশয় হবেন যে, ক্ষতের ফলে মৃত্যু হয়নি। ক্ষতটার আকার সম্বন্ধে ডাক্তার যা বলছেন, সত্যি সত্যি সেই আকারেই যদি পরিণত হয়ে থাকে, তাহ'লে জুরীরা নিশ্চয় বুঝবেন যে, কোন মতলব হাঁসিলের জন্যে মৃত্যুর পর ক্ষত করা হয়। সুরথালে হেড কনষ্টেবল রিপোর্ট করে যে, ক্ষত যখন প্রথম দেখা গেছল তখন তা ছিল ছোট্ট তিনকোণা একটু খালি। হেড কনষ্টেবলের সাক্ষ্যের সঙ্গে এর মিল আছে। পুলিশ আসবার আগে আসামীও ক্ষতটিকে সামান্য বলেছিল। এ কথা সুস্পষ্ট যে, আদালতে যে শড়কী দাখিল করা হয়েছে সম্ভবতঃ তা দিয়ে তিন কোণা ক্ষত করা যেতে পারে না। কাজেই প্রমাণ করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, ক্ষত ত্রিকোণ ছিল না। ডাক্তার হয় পরে ক্ষতের একটা অসত্য বর্ণনা দিয়েছেন, না হয় তাঁর লাস পরীক্ষা করবার পূর্ব্বে ক্ষতটা ভিন্ন আকৃতির করে ফেলা হয়। ডাক্তার দারোগার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পঞ্চায়েৎ সাক্ষীও স্বীকার করেছেন যে, যখন তিনি ক্ষতটি প্রথম দেখেন, তখন তা, হেড কনষ্টেবল তার রিপোর্টে ক্ষতের যে বিবরণ দিয়েছে, তেমনি ছিল। সাক্ষীদের সবাই স্বীকার করেছে যে, এই ক্ষত প্রথম দেখে গ্রামবাসীরা ও পুলিশ সকলেই মনে করেছিল যে, হয়ত সাপে কেটেছে। কথাটা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। ক্ষতের আকার ও লাসের ধরণে এমন কিছু ছিল না, শিশুকে সাপে কেটে মারবার অনুমানের সঙ্গে যার সামঞ্জস্য নাই। সাপ খুঁজে বের করবার জন্যে পুলিশ ও গ্রামবাসীরা কয়েক ঘণ্টা ধরে আসামীর ঘরের মেঝে খুঁড়ে ফেলেছিল। ক্ষতের আকৃতি ও আসামীর আচরণ এই দুই বিষয়ে এই ব্যাপার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যক্রমে নদীয়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের কোন বিচারই হয়নি। এই ব্যাপার আরও এক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। নদীয়ায় এই মামলার পূর্ব্ববিচার কালে পুলিশ প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, বুধবার হেড কনষ্টেবল শিশু গোলককে যে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেনি তার কারণ এই যে, হেড কনষ্টেবল যতক্ষণ গ্রামে ছিল, ততক্ষণ আসামী মেয়েকে পেঁয়াজ-ক্ষেতে লুকিয়ে রেখেছিল। বাদী পক্ষ এক কথা প্রমাণ করতে চেয়েছে নদীয়াতে এবং এখানেও। সরকারী উকীল তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় এই কথাই বলেছেন। যদি বাদী পক্ষ এই ব্যাপার প্রমাণ করতে পারত, তাহ'লে তা যে আসামীর অত্যন্ত বিরুদ্ধে দাঁড়াত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে শয়তানীর ফলে এই মিথ্যে প্রমাণ রচিত হয়েছে, সে শয়তানীর সম্পূর্ণ মুখোস খুলে দিতে পেরেছি এই আমার মনের সন্তোষ। শিশুকে শেখান হয়েছিল বলতে যে, তার বাপ তাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়েছিল। প্রধান জবানবন্দীতে শিশু শেখান কথা বলতে ভুলে গেছল। মাত্র তাই নয়, অসতর্ক সময় প্রশ্ন করায়, প্রশ্নের ধারা ধরতে না না পেরে, মেয়ে বেশ স্বীকার করে ফেলল যে, বুধবার প্রাতে মেঝে খোঁড়বার সময় সে হাজির ছিল। এই মেঝে খোঁড়া ব্যাপারটা স্বভাবতঃ তার মনে ছাপ মেরেছিল। তার উপস্থিতিতে যে মেঝে খোঁড়া হচ্ছিল, তার তত্ত্বাবধান করেছিল যে হেড কনষ্টেবল, বালিকা তাকে পর্য্যন্ত সনাক্ত করেছে। পুনঃ জবানবন্দীতে সে স্বীকার করেছে যে, সে সময় লাস ঘরেই ছিল, অথচ মূল জবানবন্দীতে সে বলে যে, লাস চালান না দেওয়া পর্য্যন্ত পেঁয়াজ-ক্ষেত থেকে সে ঘরে ফেরেনি। কাজেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, পুলিশ ইচ্ছে করেই মামলার এই অংশ বানিয়েছে। আংশিক উদ্দেশ্য, বালিকাকে যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি তা জানাবার জন্যে, আংশিক উদ্দেশ্য আসামীর বিরুদ্ধে আদালতকে বিরুদ্ধভাবাপন্ন করবার জন্যে। এই মামলা থেকে বুঝা যায় যে, আদালতের পক্ষে প্রত্যক মামলায় পুলিশের কাগজপত্র তলব করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশের কাগজপত্র তলব করে সে কাগজপত্রের সাহায্যে আদালতে প্রদত্ত প্রমাণ যাচাই করাও যে কত দরকার, তাও বুঝা যাচ্ছে এই মামলা থেকে। অপরাধের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী হ'ল শিশু মেয়েটি। এই শিশুর জবানবন্দী আদালতে যে শুনেছে, সেই বলবে সে যে শেখান সাক্ষী। একটা ছোট্ট কাহিনী বলতে তাকে শেখান-পড়ান হয়েছে। শিশু হয় সরল, সত্যবাদী। এ শিশুটি তেমন না, ওর হাব-ভাব কেমন অস্বাভাবিক। সে প্রথমে বলল, তার মায়ের মা বেঁচে নেই। খুব চাপ দিলে বলল, মাকে জিজ্ঞেস না করে উত্তর দিতে পারবে না। পঞ্চাশ জন সাক্ষী এসেও যদি প্রমাণ করত মেয়েটিকে শেখান, তাদের সাক্ষ্যের চাইতেও বড় প্রমাণ হয়েছে শিশুর এই জবাব। মাত্র এই থেকে জুরীরা বিচার করতে পারবেন যে, শিশুর বর্ণিত গল্প একেবারে বাজে। সে রাতে ওর নানী ঘরে ছিল। যদি সত্যি সত্যি আপনার বোনকে ও খুন করতে দেখে থাকে, তাহ'লে প্রথমে তার নানীকেই সে কথা গিয়ে বল

স্বাভাবিক। শিশু ত তার নানী আছে বলে প্রথমে স্বীকারই করল না, পরে ভেবে বলল নানীর সম্বন্ধে আর কোন কথার জবাব দিতে হ'লে, তার মা'র সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। যে-যে বিষয়ে ওকে শেখান হয়নি, সে-সে বিষয়ে কিন্তু শিশু, শিশুর মতই সত্যি কথা বলেছে। তার বলা গল্পের মুখ্য কথাগুলো কামড়ে থাকবার মত বুদ্ধি তার নেই।

মিঃ ঘোষ তার পর আসামীর স্ত্রীর জবানবন্দী, তার আচার-আচরণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। বাদী পক্ষের অন্যান্য সাক্ষীদের যে মিথ্যে মামলা সাজাবার জন্যে হাজির করা হয়েছে তাও বললেন। তিনি বললেন—

বেশ স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, মেয়েটিকে কখন কেউ হত্যা করেনি। হয় স্বাভাবিক কারণে, না হয় হঠাৎ, না হয় সর্পদংশনে ওর মৃত্যু হয়েছে। পেটের ক্ষত সাপে কাটার প্রাথমিক ক্ষত যদিই বা না হয়, মৃত্যুর পর নিশ্চয় তা করা হয়েছে। যদি আসামীর হয়ে কেউ তা করে থাকে তবে বোকামী হয়েছে। শরীরের কোন জায়গায় সাপে কাটার ক্ষত খুঁজে না পেয়ে সাপের কামড়ের দাগ সৃষ্টি করবার জন্য হয়ত ভয়ে এই ক্ষত করা হয়ে থাকতে পারে। যদি কোন শত্রু ক্ষত করে থাকে, তাহ'লে তা আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ সাজাবার জন্য করেছে। হয়ত শিশুর মাথায় সাপ ছোবল বসিয়েছিল। তার লম্বা লম্বা চুলগুলো সরিয়ে ক্ষতের খোঁজ কেউ করেনি। হয়ত অন্য কোন স্থানে সাপ কেটে থাকতে পারে। কি করে শিশু মরল তা নিয়ে গবেষণা করে জুরীদের কোন লাভ নাই। শিশু কি করে মরল তার ব্যাখ্যা যে আসামীকে করতেই হবে তারও কিছু মানে নাই। মৃত্যুর সম্ভাব্য হেতু সম্বন্ধে কত রকমের আন্দাজ করা যেতে পারে, কিন্তু এ সব গবেষণার কিছু দরকার নেই। আসামীর পক্ষ থেকে এ প্রমাণ করাই যথেষ্ট যে, ডাক্তারী প্রমাণ বিশ্বাস করা যায় না—এ প্রমাণ করাই যথেষ্ট যে, শিশুর বলা কাহিনী নিছক বানান—এই গল্প বলাবার জন্যে পুলিশ তাকে আর তার মাকে দাঁড় করিয়েছে। যে দারোগা সাক্ষী-সাবুদ জোগাড় করল, আদালতে সে হাজির রইলেও, জেরার সম্মুখে দাঁড়াতে বা যে-সব সাক্ষী তার সম্বন্ধে বলেছে তা অস্বীকার করতে সে এগিয়ে আসতে সাহস করল না। জুরীদের এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না যে, যে দ্বারকা রায় কনষ্টেবল মিথ্যের পর মিথ্যে কথা বলে গেছে, আর যে দারোগা সাহস করে এগিয়ে এল না, এই অসাধারণ মামলার সত্যিকার ইতিহাস ও প্রকৃত উদ্ভবের কথা সত্যি সত্যি তারাই জানে। অথচ তাদের এক জনও সে সত্য কথা প্রকাশ করা উপযুক্ত বা নিরাপদ মনে করেনি। এর আগে আসামীর পক্ষে কেউ দাঁড়াননি। ফলে অনেক সরকারী তথ্য পূর্ব্ববিচারে প্রকাশ পায়নি। এই মামলা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের সাক্ষ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করায় বেশ বিপদ আছে। আরও বিশেষ বিপদ আছে, লাসের হেলা-ফেলা পরীক্ষার পর অনভিজ্ঞ ডাক্তারদের ময়না তদন্তের রিপোর্টের বলে কোন মানুষকে দণ্ড দেওয়ায়। কোন মামলার উদ্ভব-হেতু ও প্রাথমিক অবস্থার সম্পর্কিত মুখ্য মুখ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে সাক্ষীদের যত্ন করে যে জেরা করার কত প্রয়োজন, এ মামলা থেকে তা-ও বুঝা যাচ্ছে। স্পষ্ট বুঝা গেছে যে, সাক্ষীরা আজকে যে কাহিনী ব্যক্ত করছে, প্রথম তিন দিনে কখনও তা ব্যক্ত করেনি। এ-ও জানা যাচ্ছে যে, শুক্রবার প্রাতের পূর্ব্বে দারোগা আসামীর স্ত্রী ও সন্তানকে দিয়ে আসামীকে অভিযুক্ত করাতে পেরেছে। এমন অবস্থায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, জুরীরা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে আসামীকে বেকসুর খালাস দিবেন।

[ক্রমশঃ।

পূর্ব্বপুরুষকে অমান্য ?

"উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে মধুসূদন-বঙ্কিমের যুগে যে-সাহিত্য বাঙালীর নব জাগ্রত প্রতিভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, সেই সাহিত্যের ও যুগের অন্যতম ধুরন্ধর ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। যাঁহারা রসজ্ঞ তাঁহাদের কাছে এই শক্তিশালী সাহিত্যস্রষ্টার নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রতিকূল আবহাওয়ায় আমরা বিগত যুগের অবজ্ঞাত সাহিত্যের কীর্ত্তি-কাহিনী প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি। এ-কালের আধুনিকত্ব না কি এত উন্নত হইয়াছে যে তাহাতে শুধু দীনবন্ধু কেন, তাঁহার সমসাময়িক মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রও নিতান্ত সেকেলে হইয়া গিয়াছেন। তাই বর্ত্তমান সাহিত্যচর্চ্চায় অপরিত্যাজ্য পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের খাতির থাকিলেও, তাঁহাদের রচনা প্রধানতঃ মুরুব্বিয়ানার চালে অথবা পাঠ্যপুস্তক হিসাবেই আলোচিত হয়; দীনবন্ধুর রচনা অপাঠ্য বা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ রুচিবাগীশ-মহলে ইহা না কি একেবারে অস্পৃশ্য।"

—ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে (দীনবন্ধু মিত্র—পৃ ১)

সেই মুখখানি
—ডি, কে, মিত্র
(প্রথম পুরস্কার)

যে-কথা অনেক বার বলা হয়েছে সে-কথা আবার বলতে হচ্ছে—যে কোন ছবি পাঠাবার সময় ছবির পিছনে নাম-ধাম লিখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বেনামী ছবি যে প্রচুর আসছে।

গোমড়ামুখী
—কান্তিকুমার হোড়
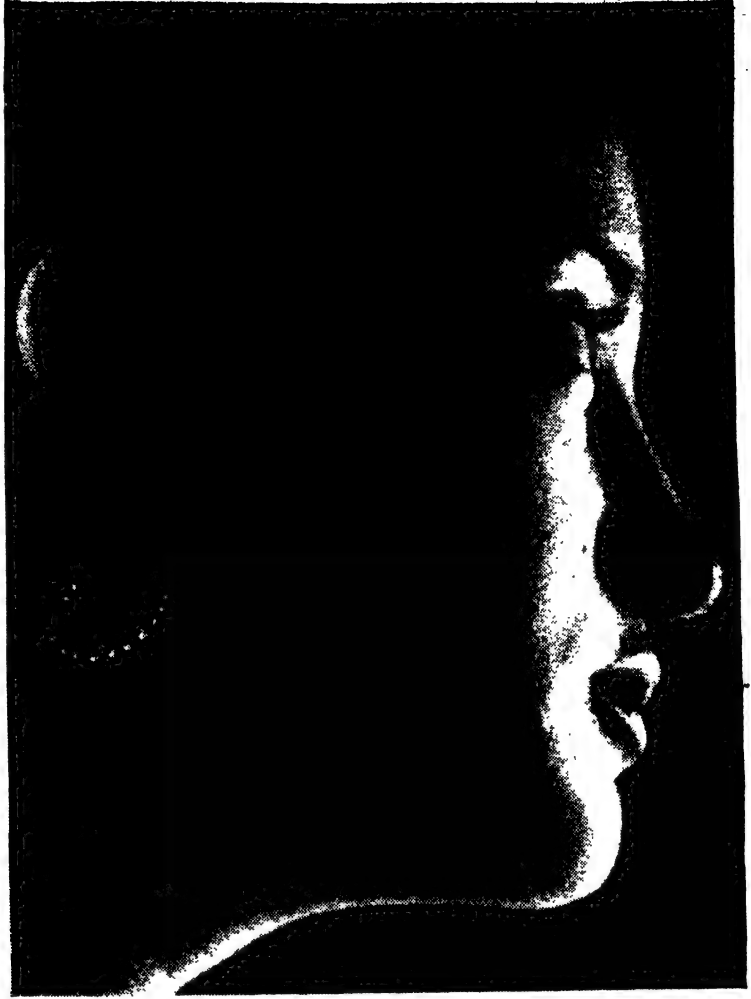
হাসি-হাসি মুখ
-মনীষিকুমার ভট্টাচার্য্য
(দ্বিতীয় পুরস্কার)

প্রতিযোগিতায় যোগদানেচ্ছুদের জানানো হচ্ছে, আগামী ২২শে বৈশাখ ছবি পাঠানো বা দেওয়ার শেষ দিন

মুখে বিস্ময়
—বিনয়ভূষণ দাস

-প্রচ্ছদপট-

এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটের চিত্রটি শ্রীরণজিত রায়চৌধুরী গৃহীত।

বইয়ে-মুখে
—কার্ত্তিক মজুমদার
(তৃতীয় পুরস্কার)

মৌন মুখ
—কুমারী কল্যাণী সরকার
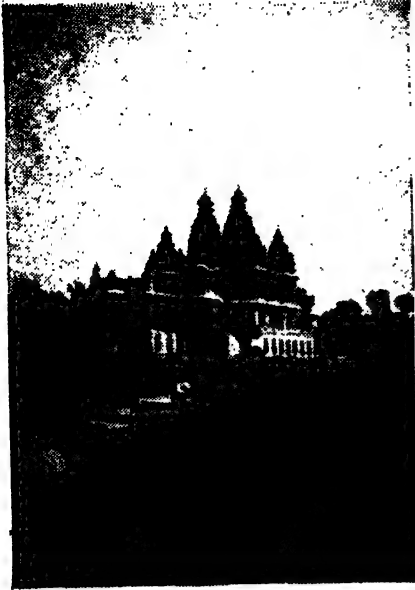
যুগল মন্দির, দেওঘর —শ্রীমানকুমার ভট্টাচার্য্য
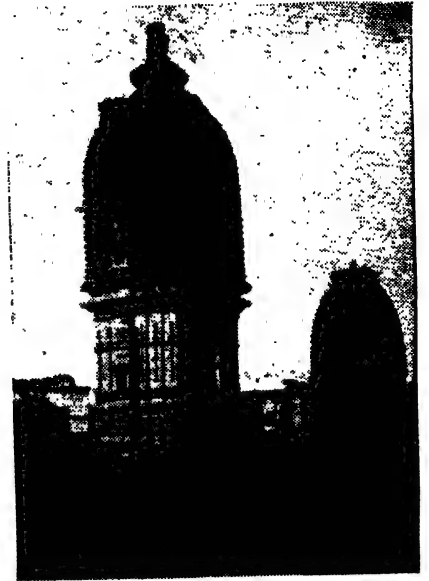
সিদ্ধেশ্বরী ও গণেশ মন্দির —ছায়ারাণী বসু

-প্রতিযোগিতা-

বিষয়

মুখ

প্রথম পুরস্কার ১৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৲

তৃতীয় পুরস্কার ৫৲

[অসংখ্য মুখের ছবি আসায় পুনরায় মুখ।]

আদ্যাপীঠের মন্দির, দক্ষিণেশ্বর —দেবেন্দ্রনাথ দাস

পরেশনাথের মন্দির —কানু ঘোষ

প্রথম খণ্ড

অনসূয়া

১

প্রতিভা বসু

আজ অনসূয়ার বিয়ে।

টিনের ঘরের সরু শিক-দেয়া এক হাত চওড়া দেড় হাত লম্বা জানালার বাইরে বকুল গাছের পাতায় চোখ পাঠিয়ে অপরিসর ঘরের একফালি মেঝের উপর চুপচাপ শুয়ে কত কথা মনে পড়লো তার। এত দিন পরে, অনেক দুঃখ-লাঞ্ছনার অলিগলি পেরিয়ে তবে কি সত্যি সত্যিই ভাগ্য তাকে দয়া করলো? ভাগ্য!

চোখের কোণে যেন এক ফোঁটা কৌতুক জমে উঠলো। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে নিজের হাতের দিকে তাকালে। সাদা শাঁখা হলদে সুতোর বন্ধনে তার হাতের বন্ধনী হয়েছে। ভাগ্যেরই তো প্রতীক! লাল পাড় কোরা শাড়ির একটা অদ্ভুত গন্ধ ঘিরে আছে তাকে। বাবা কিনে এনেছেন, অধিবাসের শাড়ি। গায়ে সিল্কের ব্লাউস। এটা ওরা পাঠিয়েছে তত্ত্ব হিসেবে। তত্ত্ব হিসেবে আরো অনেক কিছুই এসেছে। কাশ্মিরি কাজ-করা ট্রের উপর থরে-থরে সাজানো সব বহুমূল্য শাড়ি, ব্লাউস, সেমিজ, পেটিকোট, আঙুর কাঠের বাক্স ভরা সুগন্ধি রুমালের রাশি, দামী সেন্ট, প্রসাধন সামগ্রী, নানা রংয়ের রাইটিং প্যাড, একটি সোনা-বাঁধানো ছোট মেয়ে-কলম,—কলমটা অবিশ্যি কাকা তখুনি নিয়ে নিয়েছেন, তাঁর বড়ো দরকার—

আবার একটু হাসির রেখাপাত হ'লো অনসূয়ার মুখে। উঠে বসলো সে। সমস্ত শরীরে মনে কেবল ক্লান্তি। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত অফুরন্ত অনন্ত। সেই ক্লান্তি। এ কি আর কোনো দিন ফুরোবে? কাল সারা রাত একবিন্দু ঘুমুতে পারেনি, আজ থেকে জীবনের বাকী রাতগুলোও আর ঘুম হবে কি না কে জানে! নাকি এমন ঘুম আসবে দু'চোখ ভরে যে-ঘুম ভেঙে আর কখনো জেগে উঠবে না সে। আঃ! কথাটা ভাবতেও কত আরাম।

বিয়ে হচ্ছে তার চৈত্র মাসে। চৈত্র মাসে কখনো বিয়ে হয় হিন্দুশাস্ত্রে? কিন্তু তার আবার শাস্ত্র! অরক্ষণীয়া কন্যার যে-কোনো মাসেই, যে-কোনো তারিখেই, যে-কোনো দিনই বিয়ে হ'তে পারে। শাস্ত্র তো মানুষেরই সৃষ্টি। ভেঙে গ'ড়ে সুবিধে মতন বিধান তো তাঁরাই দেবেন! পাতা ঝরছে! কর্পোরেশনের লাগানো ঘূর্ণী গাছ থেকে গুঁড়ি-গুঁড়ি হলদে রেণু ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। জানালা দিয়ে এক ঝাপটা অনসূয়ার গায়ে এসেও লুটিয়ে পড়লো। ঘরের মেঝেটা হলদে হ'য়ে গেল। জোড়া তক্তপোষের পাড়ের ঢাকনী দেয়া বিছানাতে ঢাকাই বুটি হ'লো। আকাশ থেকে তারারা খসে পড়লো নাকি দিনের আলোয় টিঁকতে না পেরে তাদের অন্ধকার ঘরে?

তবু তো এ ঘরে একটা জানালা আছে পশ্চিমে, যে জানালা দিয়ে আকাশে চোখ পাঠিয়ে ঈশ্বরের মুখোমুখি হবার চেষ্টা করছে অনসূয়া, যে জানালা দিয়ে হলদে রেণুরা খুসী হ'য়ে ঝ'রে পড়ছে তার গায়ে, এক চিলতে রোদ এসে স্থির হতে পারছে তক্তপোষের পায়ার উপর। এই ঘরে এই দু'টি তক্তপোষে তার দুই ভাইকে নিয়ে মা ঘুমোন। আর এইখানে, এখন যেখানে নতুন পাটির উপর বেলা তিনটের অসময়ে এতক্ষণ ধ'রে শুয়ে-শুয়ে আলস্যে সময় কাটাচ্ছে সে, এখানে একটি মাদুর বিছিয়ে সে শোয়। আর বাবা ঐ ঘরে। উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের পাশে। সে-ঘরে জানালা নেই, আলো নেই, হাওয়া নেই, যে-ঘরে তাদের বাসন থাকে, ঘুঁটে থাকে, আবর্জনার স্তূপ থাকে সে-ঘরে।

উপায় কী! এই দুটি ঘরের দামই কুড়ি টাকা। কুড়ি-টা-কা! 'ধীরে-ধীরে, থেমে-থেমে মনে-মনে উচ্চারণ করলো অনসূয়া। প্রত্যেক মাসে এই কুড়িটা টাকা বাড়িওলার হাতে তুলে দিতে তার কী কষ্টই না-হয়। মাঝে-মাঝে বাকি পড়ে, তখন অশান্তির শেষ থাকে না। অনসূয়া অবিশ্যি অনেক দিন চেষ্টা করেছে বাবাকে এই ঘরে, একটি [illegible]

বাবা রাজী হননি। জবাবে কখনো-কখনো অশ্রাব্য ভাষায় খিঁচিয়ে উঠেছেন, কখনো বা বেদনায় ভেঙে পড়েছেন।

আজ এই ঘর সম্পূর্ণ তার। তার জন্য আজ যুগলশয্যা বিছানো হ'য়েছে ঐ তক্তপোষের উপর নতুন তোষক-বালিস পেতে। অসুস্থ মা ধুঁকে-ধুঁকে নিজের হাতে রচনা করেছেন আজ এই শয্যা। আর সেদিকে তাকিয়ে একটা অসহ্য যন্ত্রণার ঢেউ অনুভব করেছে সে বুকের মধ্যে। দৌড়ে এই পাড়ের ঢাকনা বিছিয়ে সে-দৃশ্যের উপর যবনিকা পাত করেছে।

অসহ্য। অসহ্য। কত অসহ্য তা আর কাকে বোঝাবে! কে-ই বা বুঝবে! কিন্তু কেন অসহ্য? এই বিবাহ কি তাদের দিন-রাত্রির সম্মিলিত প্রার্থনারই যৌতুক নয়? তার সতেরো বছর বয়স থেকে সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত সবাই মিলে এ ছাড়া আর অন্য কী প্রার্থনা করেছে তার জন্যে? তবে আজ তার কিসের ভয়? কিসের দুঃখ? আজ, আজ তো তার পরম ভাগ্যের দিন পরম মুহূর্ত। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই সে সংসারের আর পাঁচটা মেয়ের মতো নিষ্কলঙ্ক একটি বিবাহিত মেয়ে, এক ভদ্রলোকের বিবাহিতা স্ত্রী। সত্যিই কি কোনো একটি পুরুষ নামধারী জীবের স্ত্রী হ'তে যাচ্ছে সে? স্ত্রী!

গরিব হোক্, অন্ধ হোক্, খঞ্জ, মূর্খ, কুৎসিত, যার সঙ্গেই হোক্ না কেবল একটা বিয়ে হোক্ শুধু মাত্র এই চেষ্টাতেই কত গলদঘর্ম হয়েছেন অবিনাশ বাবু। কাকা সাহস জুগিয়েছেন পেছনে দাঁড়িয়ে, কিন্তু কেউ বিয়ে করতে রাজী হয়নি তাকে। এগিয়েছে অনেকে, কিন্তু পেছিয়েছে শেষ পর্যন্ত সবাই। যারা নেবে, তারা জেনে-শুনে ফুটো হাঁড়ি কিনবে কেন? ফুটোটা অবিশ্যি কাকা আগাগোড়াই গোপন করতে চেয়েছিলেন, তিনি যে তার সব চেয়ে বড়ো হিতাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু মা রাজী হননি। ভাঙা-ভাঙা গলায় কেবলি বলেছেন, 'না না, তা হয় না, ঠাকুরপো। শেষে কি মারধোর খেয়ে মরবে মেয়েটা?'

'মরুক! ওর মরাই উচিত।'

তবু মা জলভরা চোখে মাথা নেড়েছেন সজোরে। বাবা মাটিতে চোখ রেখে চুপ।

শেষের দিকে বাবাও সে-চেষ্টাই করেছেন, মাও সায় দিয়েছেন তাতে, কাকা ইন্ধন জুগিয়েছেন সেই সদিচ্ছায়। কিন্তু ভেঙে দিয়েছে সে নিজে। অসম্ভব! সব গোপন ক'রে নিজেকে গছানো, কিছুতেই, কোনো রকমেই সম্ভব নয় তার পক্ষে। আর এ নিয়ে কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা, কত নিগ্রহই ভোগ করতে হয়েছে তাদের কাছে। এমন কি দশ বছরের ছোট বোনটাও টিটকিরি দিতে ছাড়েনি। যাকে বলতে গেলে সে-ই মানুষ করেছে—মায়ের উত্তাপ দিয়ে, শীতের রাত্রিতে নিজে আঁচল জড়িয়ে যাকে পুরোনো লেপ দু'ভাঁজ করে গায়ে দিয়ে শীত নিবারণ করেছে। দিক্। এখানে অনসূয়া আপন বুদ্ধিতে অটল।

কাকা এক দিন সুখবর আনলেন একটা। সব কথা জেনেও কোন্ এক দয়ালু ভদ্রলোক নাকি বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন তাকে। আশ্চর্য্যের কথা! বাবা চোখ তুলে তাকালেন, একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কারা?' কোনো বিষয়ে আগ্রহ দেখাবার মতো উৎসাহও আর তাঁর নেই।

'আমার এক মক্কেল।'

সাগ্রহে এগিয়ে এলেন মা। রোগে ভুগে-ভুগে তিনি ছোট হ'য়ে গেছেন, দারিদ্র্যের ছাপ পড়েছে সারা শরীরে। বড়ো-বড়ো দু'টি চোখের পাতা যেন সব সময়েই বুজে আসতে চায়! তবু এই একটা খবরেই তাঁর সমস্ত প্রাণশক্তি উদ্দীপিত হয়ে উঠলো।

কাকা উদাস গলায় আবার বললেন, 'আমার এক মক্কেল।'

বাবা বললেন, 'বেশ।'

'তা হ'লে আপনার অমত নেই?'

'না, অমত কিসের।'

'কথা দিতে পারি?'

'দাও।'

'ছেলেটি কী করে ঠাকুরপো?' এটা মা'র প্রশ্ন।

'কী করে?' কাকা ছোটো ক'রে হাসলেন 'কী করে না? কলকাতা শহরের আদ্দেক ব্যবসাই তো তার।'

'তা হ'লে খুব ধনীলোক বল?'

'নিশ্চয়ই।'

'কী জাত?'

'জাত দিয়ে আপনার দরকার কী? আপনার মেয়েরই কি কোনো জাত আছে?'

'না, না, জাত-ফাৎ আমি মানবো না, মানবো না', চেঁচিয়ে উঠলেন বাবা। 'নিজের যার জাতের ঠিক নেই তার জন্যে আবার জাতের দোহাই! আমি তোমাকে বলছি, বিকাশ, তেলি, মুচি, হাড়ি, ডোম, শুঁড়ি, বেণে যাই হোক, যা-ই হোক—একটা বিয়ে ঠিক ক'রে দাও তুমি, আমি আপদ বিদেয় করি।'

কাকা মাথা নাড়লেন। গলার আওয়াজ ঈষৎ নিচু ক'রে বললেন, 'তবে আর দেরি ক'রে লাভ কী?'

'কিছু না।'

'ওরা এ জন্যে টাকাও দেবে কিছু, কত চাইবো বলুন তো?'

'টাকা! 'কথাটা বুঝতে পারলেন না বাবা। 'টাকা দেবে কেন?'

'এই আর কি, বিয়ের খরচ-টরচ'—

'বিয়ের খরচও ওরা দেবে?'

'সব। সব। আমি বলছি কী আপনাকে।'

অবিনাশ বাবুর চোখে খুসীর বদলে কেমন একটা উদ্বেগ নেমে এলো। নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন চুপ ক'রে। বিকাশ হাসলো। 'ভয় পাবার কিছু নেই, চাপ দিলে দু-পাঁচ হাজার টাকাও আমি বার ক'রে আনতে পারি আপনাদের জন্য।'

দু'-পাঁ-চ হা-জা-র!' মা চোখ কপালে তুললেন, 'ওরা কারা?'

'এ সব বিষয়ে মেয়েদের মাথা না গলানোই ভালো। তা হ'লে আমি আজই ওদের মেয়ে দেখাতে নিয়ে আসি। কী বলেন?' কাকা বাবার দিকেই চোখ পাতলেন।

মুখ নামিয়ে নিলেন অবিনাশ বাবু। 'তোমার কথা আমি ভালো বুঝতে পারছি না বিকাশ! আমার মেয়েকেই কেউ নিতে চায় না, তার উপরে অত টাকা দিয়ে'—

'আপনার বোঝা উচিত।'

'না, আমি বুঝতে পারছি না।'

'বৌদি, তুমি কি এখান থেকে একটু যাবে?'

'উনি থাকুন না, ওঁর সামনেই বল না।'

বাবার রকম-সকম দেখে হঠাৎ একটু বোধ হয় দ্বিধান্বিত হ'য়ে পড়লেন কাকা। ডান হাতের আঙুল বাঁ হাতে খুঁটতে-খুঁটতে বললেন, 'এ তো আজ-কাল হামেশাই হচ্ছে। এ সব মেয়েদের জন্য কত আশ্রম, কত প্রতিষ্ঠান—দেখতে একটু ভালো-টালো'—কানের কাছে মুখ নিয়ে কী ফিশ-ফিশ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে গরম তেলে জলের ছিটে পড়লো। বিড়-বিড় ক'রে উঠলেন বাবা, 'এ্যাঁ, তুই মেয়ে বিক্রীর কথা বলছিস্ না কি আমাকে? এ্যাঁ! টাকা দিয়ে কিনে নেবে ওরা? এ্যাঁ!' কাটা কইয়ের মতো ছ টুফট্ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন, 'তুই না ওর কাকা! এ কথা বললি তুই? বলতে পারলি? এমন একটা অসৎ প্রস্তাব তুই—মুখে আনতে পারলি ওর সম্বন্ধে?'

বাবার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে কাকা চমকালেন প্রথমটায়, শেষে মুখ হাঁড়ি ক'রে বললেন, 'ওর বিয়ে এ উপায়ে ছাড়া হবে না। কেউ নেবে না আপনার মেয়েকে।'

'না-হয় না-ই হলো। তবু আমি বাপ হ'য়ে এত বড় সর্বনাশ ওর করতে পারবো না, বিকাশ!' একটু থামলেন, ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, 'ওর অনেক ভালোই তো আমি তোর পরামর্শে—এ পর্যন্ত ক'রে এসেছি, আর থাক্। তুই যা, আর কোনো হিতাকাঙ্ক্ষা করিস নে ওর জন্যে।' তার পর জোরে-জোরে উঠোনময় পাইচারি করতে লাগলেন তিনি। সারা জীবনে ভাইয়ের মুখের উপর এই প্রথম বোধ হয় এত কথা বললেন, বলতে পারলেন।

মুখ কালো ক'রে উঠে যেতে-যেতে কাকা বললেন, 'বেশ!'

২

তার পর সেই যে তিনি গেলেন আর এলেন না। হয়তো খুশীই হ'লেন না-আসবার এই অছিলাটুকু গ্রহণ করতে পেরে। যত কমই আসুন তবু তো সংশ্রব থাকলে বিপদের সময় অবিনাশ বাবু হাত পাততে চান তাঁরই কাছে? তাছাড়া তিনি পাঁচটি মেয়ের বাপ, সেটাও তো দেখতে হবে? কর্তব্য তো তিনি সবই করেছেন, আর কত? স্নেহান্ধ পিতার সরল ভ্রাতা হিসেবে শাসন করেছেন ভাইঝিকে, জাতরক্ষার অত বড় দায়িত্ব বীরত্বের সঙ্গে সম্পাদন করেছেন, চুলের মুঠি ধরে হিড়-হিড় ক'রে টেনে এনেছেন ঘরে, তবু আরো?

বেলা তিনটের পড়ন্ত রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে চোখ জ্বালা করলো অনসূয়ার। বকুলপাতারা ঝির-ঝির ক'রে কাঁপলো, তার চোখের পল্লবও কেঁপে উঠলো থর-থর ক'রে।

কাল সারা রাত ধরে কেঁদেছেন মা, কত কাল পরে মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কেঁপে উঠেছেন বারে বারে, যত নিষ্ঠুরতা করেছেন বছরের পর বছর সব তার চোখের জলের ধারা হ'য়ে গড়িয়ে পড়েছে গাল বেয়ে। বালিশ ভিজে গেছে। কেন? এই তো তাঁর আকাঙ্ক্ষিত দিন, কত প্রার্থনার ফল তাঁর, তাঁর তেত্রিশ বছরের গালের হাড়-ওঠা মেয়ের আজ বিয়ে! তবু, তবু তাঁর কেন এই কান্না? 'কত তো বিপত্নীক আছে, কত হৃদয়বান আছে সংসারে, কেউ কি এই হতভাগিনীকে একটু জায়গা দিতে পারে না?' এ কথা তো কত সহস্র বার উচ্চারণ করেছেন তিনি। তবে? তবে কিসের এই শোক? মাদুর পেতে চুপচাপ কত রাত পর্য্যন্ত বাবা বসেছিলেন বারান্দায়। তাঁর চোখেও কি কাল জল ছিলো না?

কেন? এমন সুখের দিন আর কবে এসেছে তাঁদের জীবনে? অনসূয়া। নগণ্য, অপাংক্তেয়, অনাদৃত, যাকে দেখলে আত্মীয়-পরিজন মুখ ফেরায়, বন্ধুরা হাসে, আঙুল দেখায় লোকেরা এমন কি নিজের মা-বাপ পর্য্যন্ত যার মুখের দিকে তাকাতে ঘৃণা বোধ করে সেই অনসূয়ার বিয়ে। বিয়ে।

অনসূয়ার নিজেরই কি কম আশ্চর্য্য লাগছে? এই যে অবেলায় জানালা দিয়ে বকুলপাতায় চোখ রেখে অলস ভঙ্গীতে শুয়ে আছে সে, লাল পাড় শাড়ির কোরা গন্ধ ঠেলে কাঁচা হলুদের গন্ধ ভাসছে গা থেকে, লম্বা লম্বা দুটি হাতের মণিবন্ধে চিক্-চিক্ করছে চারগাছা সোনার চুড়ি, কানের ফুটো টন্-টন্ করছে দুলের ভারে, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী হ'তে পারে তার জীবনে? এ সময় রোজ সে কী করে? স্কুল থেকেও ফেরে না। যদি বা শনিবার ফেরে তক্ষুনি আঁচ দেয় উনুনে, খাবার যোগাড় করে ভাইয়েদের, অবিশ্রান্ত নিষ্ঠুর মেজাজ নিয়ে কাজ থেকে ফিরে বাবার যাতে এতটুকু ত্রুটিও চোখে না পড়ে তার চেষ্টায় ব্যাকুল হ'য়ে থাকে। মা বোবা অসহায় চোখে চুপচাপ তাকিয়ে থাকেন তক্তপোষে শুয়ে, অনসূয়া নিঃশব্দে কলের মতো সংসারের অনুকোটি দাবী মেটায়। ভাই দু'টি ভালোবাসে তাকে, তারা দিদি-অন্ত প্রাণ, কিন্তু ভালোবাসা গ্রহণ করবার শক্তি কি আছে অনসূয়ার? বোনটিকে চোদ্দ বছর বয়সেই বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন মা, কিন্তু বোন নিশ্চিন্ত হ'তে পারেনি, দিদির জন্যে তাকে কথা শুনতে হয় শাশুড়ির কাছে।

আজ সব অশান্তির অবসান। আপদ বিদায় হবে আজ। আজ তাদের আনন্দের দিন, মুক্তির দিন, আজ অনসূয়ার বিয়ে। কাল এই বেলা তিনটের পড়ন্ত রোদ্দুরে সে কোথায়? কত দূরে? সেই দয়ালু ভদ্রলোকটি, একটি সামান্য বিজ্ঞাপন দেখেই যিনি আজ গ্রহণ করছেন তাকে, সব জেনেও যিনি তাকে বিবাহের মর্য্যাদা দিচ্ছেন, কাল তিনি তাকে কোথায় নিয়ে যাবেন? কত দূরে? কে! কে তিনি! দেবতা! শয়তান! কাকার মক্কেল! কে! কোথা থেকে এসে হঠাৎ ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছেন তাকে, কে সেই মানুষ! মা জানেন? বাবা জানেন? কেউ কি জানে সেই কথা? তাই কি এই কান্না? তাই? হঠাৎ অনসূয়ার বুক বেয়ে ভয়ের শিরশিরানি নামলো। সভয়ে চোখ বুজলো সে।

৩

শোনা গেছে ভদ্রলোক বোম্বাইয়ের অধিবাসী। শোনা গেছে তিনি মস্ত ধনী। মস্ত তাঁর ইস্কুরুপ, বল্টুর কারখানা, আর সেই কারখানার একচ্ছত্র অধিপতি তিনি। তাঁর ব্যবসার শাখা-প্রশাখা দেশে-বিদেশে ছড়ানো। নামতই বাঙালী, বাংলা দেশের সঙ্গে হয়তো কেবল মাত্র বিবাহ দ্বারাই আজ সম্বন্ধ স্থাপিত হবে তাঁর। দীর্ঘকাল আমেরিকা-প্রবাসী ছিলেন, মাথার চুল পাকিয়ে ফিরে এসেছেন ভারতবর্ষে।

সবই শোনা গেছে, এখন পর্য্যন্ত দেখা যায়নি কিছুই। অবিশ্যি আর্থিক পরিচয় কিঞ্চিৎ দিয়েছেন বই কি ভদ্রলোক। সকাল-বেলাকার দৃশ্যটি মনে-মনে কল্পনা করলো অনসূয়া। তাদের বাড়িতে ঢোকবার নিচু সরু টিনের দরজাটি দিয়ে কেবল আসছেই, আসছেই। দশ-দশটা লোক ব'য়ে নিয়ে এসেছে তার অধিবাসের সামগ্রী। শুধু কি থরে-থরে প্রসাধন দ্রব্য আর শাড়ি-ব্লাউসের স্তূপ? মাছ, মাংস, দই, মিষ্টি, শাক-সব্জি, ফল-মূল, তেল-ঘি, পেস্তা-বাদাম-কিসমিস—কী না? কী তিনি পাঠাননি তাঁর রাজ ঐশ্বর্য্যের স্বাক্ষরস্বরূপ? বাবা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর ঘরের দরজায়, মা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর ঘরের দরজায়, অনসূয়া দাঁড়িয়ে আছে রান্না-ঘরের দরজায়। ভাই দু'টির একটি কোথায় বেরিয়েছে, আর একটি পড়া ছেড়ে উঠে এসে চুপ!

পাঁচটি ঝি, পাঁচটি ভৃত্য। প্রত্যেকে নতুন কাপড় পরেছে, নতুন জামা গায়ে দিয়েছে, মেয়েদের হাতে মোটা-মোটা সোনার বালা, গলায় পাথরের মালা, কোমরে রূপোর গোট। পুরুষদের কোমরে রূপোর পটি।

ছোট্ট উঠোন ভ'রে গেল। পাঁচ মিনিট-পর্য্যন্ত সবাই স্থির। একটু পরে সম্বিৎ পেয়ে এগিয়ে এলেন মা, শাঁখ বাজালেন দুর্ব্বল বুকে, জিনিশপত্র ঘরে তুললেন, খেতে দিলেন লোকজনদের, তার পর প্রত্যেককে দু'টি দু'টি টাকা বকসিস দিয়ে বিদায় দিলেন মিষ্টিমুখে। কুড়িটি টাকা বেরিয়ে গেল এক লহমায়, অনসূয়া নিশ্বাস ছাড়লো। তার আর তার বাবার কত পরিশ্রমের উপার্জ্জন এই কুড়ি টাকা! কুড়ি টাকা তাদের বাড়িভাড়া।

এই টাকার জন্য সপ্তাহে তিনটে টিউশনি করতে হয় তাকে, দশটার সময় হাতে-কাচা মোটা শাড়ী প'রে গালে পার্ল পাউডর বুলিয়ে কর্পোরেশন স্কুলে মাষ্টারি করতে যেতে হয়। আর প্রেসের অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালিয়ে বাষট্টি বছরের বুড়ো বাপকে সকাল-সন্ধ্যে প্রুফ দেখে-দেখে চোখ ক্ষয় করতে হয়। সেই টাকা কি না এ ভাবে বেরিয়ে গেল! বুকটা করকর করছিল কিন্তু মনে পড়লো চার দিন আগে ভদ্রলোক পাঁচখানা একশো টাকার নোট পাঠিয়েছিলেন তার পাকা দেখার যৌতুক হিসেবে। সেই পাঁচখানার তিনখানা খরচ হ'য়ে দু'খানা এখনো তার মা'র হাত-বাক্সে স্থির হ'য়ে আছে।

হাসলো অনসূয়া। কাকা হ'লে পাঁচখানা নোটে পাঁচ হাজার টাকা আদায় ক'রে ছাড়তেন, বাবা কিছু পারলেন না।

না, না, ছি! তক্ষুনি মনকে ধিক্কার দিল সে। এ সব কেন ভাবছে? কী অন্যায়! হয়তো মানুষটি সত্যিই দয়ালু। হয়তো ঈশ্বর সত্যিই এত দিনে দয়া করেছেন অনসূয়াকে, অনসূয়ার লাঞ্ছিত নিপীড়িত মা-বাবাকে। অনসূয়াকে যাঁরা দেখতে এসেছিলেন তাঁদের কাছে তো ভয়ের কিছু শোনেনি। তারাও তো আর পাঁচ জন ভদ্রলোকের মতোই ভদ্র, বরং বেশী বিনীত, বেশী সদালাপী। দু'জন পাত্রের বন্ধু, এক জন কর্ম্মচারী।

বাবা একবার বলেছিলেন, 'ছেলেটিকে কি একবার দেখতে পারি?'

তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়লেন বন্ধু—'অসম্ভব।'

বাবা আর কোনো কথা বললেন না। সাহস নেই তাঁর। কে জানে চাপ দিলে যদি বা ভেঙে যায়।

তাঁরা বললেন, পাত্র বিয়ের দিন সময় মতো এসে পৌঁছবেন প্লেনে ক'রে, আর বিয়ে ক'রেই পরের দিন সকাল আটটায় উড়ে যাবেন অনসূয়াকে নিয়ে। সামান্য একটা বিয়ের জন্য এর বেশী সময় দেয়া অসম্ভব তাঁর পক্ষে। বাবা বললেন, 'তা তো ঠিকই, তা তো ঠিকই।' হাত পেতে পাকা দেখার নোট ক'খানা কোমরে গুঁজলেন। অনসূয়া বাবার দিকে তাকিয়ে তখন কী ভেবেছিলো?

কিন্তু মুখ মলিন করলেন মা। রাত্রিতে খেতে ব'সে বললেন, 'আমার ভয় করছে।'

'ভয়! কেন?'

'একবার দেখলে না, শুনলে না, খোঁজ-খবর নিলে না কিছু—'

'এর চেয়ে আবার কত ভালো ক'রে খোঁজ-খবর নেবো।' বাবা দ্রুত হাত চালালেন ভাতের থালায়।

'একটু যদি চোখের দেখাও দেখতাম মানুষটাকে—'

'যত সব—!'

'ওরা যা বললো তা যে সব সত্যি, কে জানে!'

'তবে যাও না, এরোপ্লেনে চড়ে বম্বেতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসো!'

পরিবেশন করতে-করতে অনসূয়া বুঝতে পারলো আস্তে-আস্তে রাগ চড়ছে বাবার। ভাই দু'টি চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। মা দুর্ব্বল গলায় আবার বললেন, "সাত দিনের মধ্যে সব ঠিক ক'রে ফেললো, ওদেরই বা এত গরজ কেন? আর কটা দিন সময় নাও তুমি, কোথায় দেশ, কোথাকার মানুষ, কী জাত—'

বোমা ফাটলো—'সময় নেবো কেন, চিরজীবন গলায় ঝুলিয়ে গুষ্টিশুদ্ধ ডুবে মরবো না? টাকা খরচ করে তো এই জন্যেই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম।' ভাত ছড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। মা ঢোঁক চেপে উদ্গত কান্নাকে বুকের ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন। আজ-কাল বাবার রাগ চণ্ডাল।

যখন রাত বাড়লো, পাড়া নিস্তব্ধ হ'লো, টিপি-টিপি পায়ে অন্ধকার রান্নাঘরে বেড়ালগুলো ঘুরে বেড়াতে লাগলো নিঃশব্দে, অনসূয়া এই জানালাটি দিয়ে তাকিয়ে রইলো আকাশে। মনে মনে বললো একটু ঘুম দাও ঈশ্বর! শুধু একটু ঘুম। ভুলে থাকার সামান্যতম অবকাশ। চোখের উপর হাত চাপলো জোরে।

[ক্রমশঃ।

হে বন্ধু বিদায়!

আগামী একশো বছরের মধ্যে গরিলা জাতি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, যদি না মানুষ গরিলার এই ভাগ্যকে যে-কোন চেষ্টায় পরিবর্ত্তিত করতে সক্ষম হয়।

—ডাঃ রবার্ট এম. ইয়েরকেশ (ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়)

প্রথম অঙ্কঃ প্রথম দৃশ্য

(দিল্লীর একটি পথ। পথের ধারে গাছের নিচে একটি দরগা।
দরগার কাছে জনকয়েক লোক দাঁড়িয়ে কথা বলছে।)

প্রথম ব্যক্তি। একেবারে উন্মত্ত বললেই হয়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। বাপ্‌ রে! কাঁচা-খেগো দেবতা। এক মাসের মধ্যে সহরটাকে একেবারে ছারেখারে দিলে হে!

তৃতীয় ব্যক্তি। হ্যাঁ বাবা, বাদশা বটে! সহরের গাছগুলো পর্যন্ত সব মুড়িয়ে দিলে!

চতুর্থ ব্যক্তি। কাক-চিলগুলো পর্যন্ত টের পাচ্ছে যে, বাদশা এসেছে!

প্রথম ব্যক্তি। আমি ভাবি, আর ভাবি, কিছু কুল-কিনারা পাইনে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। যা বলেছিস ভাই, আমিও ভাবি কিন্তু ঐ তোরই মত—কুলকিনারা কিছু পাইনে।

তৃতীয় ব্যক্তি। কি এত ভাবিস্ বল দিকিন্?

প্রথম ব্যক্তি। কি ভাবি জানিস্? ভাবি যে ঐ লোকটা কি ক'রে যুদ্ধ জয় ক'রে সিংহাসন অধিকার করলে!

তৃতীয় ব্যক্তি। তোবা তোবা! যুদ্ধ জয় করেছিল মানে! হেরে ভূত হ'য়ে লম্বা দিচ্ছিলেন এমন সময়—কাউকে বলিসনি ভাই—আল্লা কসম—তাহ'লে আমার গর্দানা যাবে! এমন সময় ঐ যে, লালকুঁয়ার—কি যে ফুক্‌ মন্তর ঝাড়লে—আজিম্-উস্-শান্-এর জেতা লড়াই ফেঁসে গেল!

চতুর্থ ব্যক্তি। বাপ্‌ রে! শুনলেও চমকে উঠতে হয়। কি বলিস?

প্রথম ব্যক্তি। তা আর বলতে!

তৃতীয় ব্যক্তি। ওহে আর নয়, চল স'রে পড়া যাক্‌। আজকাল এই রাস্তা তো বাদশার মক্কা-মদিনা হয়েছে কিনা! সামনে পড়লে আর জাহান্নম দেখতে দেরি হবে না। আজ আবার ইতোয়ার—

দ্বিতীয় ব্যক্তি। চল ভাই চল, কোন শালা আর সখ ক'রে এ রাস্তায় আসে বল। গিন্নীর হয়েছে ছেলের সখ—তাই মাঝে মাঝে এই জাফর আলি পীরের দরগায় সিন্নি চড়াতে আসি। সে তো আর জানে না যে বাদশার সামনে প'ড়ে গেলে ছেলে বেটা আর বাপ ডাকবার অবসর পাবে না।

প্রথম ব্যক্তি। আচ্ছা—বাদশা প্রতি রবিবারে কোথায় যায় হে?

চতুর্থ ব্যক্তি। আর সে কথা বল কেন? লালকুঁয়ারের হ'য়েছে ছেলের সখ। তাই দু'জনে মিলে প্রতি রবিবারে চিরাগ্-ই-দিলের তালাওয়ে নাইতে যাওয়া হয়। শুনেছি যে সেখানে দু'টোতে মিলে সারাদিন যা বেল্লোগিরি করে—আরে ছি ছি ছি ছি—সে আর মুখে আনা যায় না।

তৃতীয় ব্যক্তি। একটা কথা বলি—তা তোরা যা-ই মনে করিস।

প্রথম ব্যক্তি। কি বল্ তো!

তৃতীয় ব্যক্তি। বলছি যে ঐ ডাইনির পেটে, ঐ পাগলটার যে ছেলে জন্মাবে—সে বেটা তক্তে বসলে কি ব্যাপারটা হবে একবার ভেবে দেখেছিস!

চতুর্থ ব্যক্তি। বাপ্‌ রে, ভাবলে গা শিউরে ওঠে।

তৃতীয় ব্যক্তি। তবে একবার ব্যাপারখানি বোঝো!

(নেপথ্যে আওয়াজ শোনা গেল)—

—হট্ যাও হট্ যাও, এই কোন হায়—গাজি ময়জুদ্দিন জাহান্দার শাহ্‌ পাদশাহ্‌,—)

সকলে। ঐ রে আসছে—চল্ চল্, পালাই চল্।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী—দেওয়ানি খাস।

দু'পাশে দু'-সারি প্রহরী। তাছাড়া আলি মুরাদ কোকলতাস খাঁ, ইকলাস খাঁ, রাজা সভাচাঁদ, সাদুল্লা খাঁ প্রভৃতি কর্মচারী।)

আলি মুরাদ। সম্রাটকে এখনো দেখা যাচ্ছে না কেন?

সাদুল্লা। এখনো ঘুম থেকে ওঠেননি বোধ হয়। তা উজির সাহেবই বা গেলেন কোথায়?

ইকলাস খাঁ। উজিরের দক্ষিণ হস্ত রাজা সভাচাঁদ নিশ্চয়ই তার সংবাদ রাখেন।

রাজা সভাচাঁদ। উজির সাহেব এই এলেন ব'লে—ব্যস্ত হবেন না।

কোকলতাস্ খাঁ। তিনি হচ্ছেন রাজ্যের প্রধান কর্মচারী, মন্ত্রণা-গৃহে তাঁরই সর্বাগ্রে আসার প্রয়োজন।

সভাচাঁদ। রাজ্যের সর্বপ্রধান কর্মচারীর কাজের বিচার সম্রাট নিজে করবেন. আপনাদের সে অধিকার নেই। অনধিকারচর্চা করবেন না খাঁ-সাহেব, তাতে বিপদ আছে।

সাদুল্লা খাঁ। অনধিকারচর্চা না করলে যে আরো বেশি বিপদের সম্ভাবনা আছে রাজা। ওদিকে পাটনায় যে ফরুখশায়ার নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছে, সে সংবাদটি কি পেয়েছেন আপনারা—

(অকস্মাৎ এক পাশ দিয়ে সম্রাটের আবির্ভাব। সম্রাটের মাথায় পাগড়ি নেই, হাতে চাবুক। সম্রাট প্রবেশ করতেই কর্মচারীরা যে যার নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়াল। সম্রাট কয়েক মুহূর্ত রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সকলের দিকে একেক বার এগিয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইতে লাগলেন। তার পরে এক রকম ছুটে গিয়ে তক্তের ওপর ব'সে পড়লেন!)

কোকলতাস্ খাঁ। জাঁহাপনা, লোকপরম্পরায় শোনা যাচ্ছে যে, আপনার ভাই আজিম-উস্-শান্-এর পুত্র ফরুখশায়ার পাটনায় বিদ্রোহী হয়েছে।

সভাচাঁদ। জাঁহাপনা, এও শোনা যাচ্ছে যে, এলাহাবাদের সুবেদার আবদুল্লা খাঁ ফরুখশায়ারের পক্ষ নেবে। অবিলম্বে আমাদের একটা বিহিত করা প্রয়োজন মনে হচ্ছে।

সম্রাট। (তক্ত থেকে নেমে এগিয়ে এসে)—কোকলতাস্ খাঁ, তুমি এখুনি এই মুহূর্তে পাটনা যাও। শয়তান্ ফরুখশায়ারকে বল গিয়ে সে যদি জাহান্নমে যেতে না চায় তাহ'লে যেন এই মতলব পরিত্যাগ করে। আর সেখান থেকে আসবার সময় পাটনার শ্রেষ্ঠ গায়িকা ও পাঁচ জন সুন্দরীকে নিয়ে আসবে।

কোকলতাস্ খাঁ। জাঁহাপনা, আবদুল্লা খাঁর ছোট ভাই সৈয়দ হুসেন আলি খাঁও ফরুখশায়ারের দলে যোগ দিয়েছে ব'লে শোনা যাচ্ছে।

সম্রাট। জুলফিকার খাঁ—জুলফিকার খাঁ কোথায় গেল! জুলফিকার খাঁ—জুলফিকার খাঁ—দরবারে উজির নেই কেন? আজ এলে তাকে কুত্তাকে দিয়ে খাওয়াবো।

(সম্রাট মেজেতে সপাং-সপাং ক'রে চাবুক মারতে লাগলেন।)

আজ আসুক সে—তার খাল ছাড়িয়ে নেওয়া হবে। জল্লাদ—জল্লাদকে ডাকো। সে মনে করেছে কি—জুলফিকার খাঁ—নসৃরৎ খাঁ—

(সম্রাট ছুটোছুটি করতে করতে প্রথম প্রহরীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে তাকে একবার প্রদক্ষিণ করে চাবুক দিয়ে মারতে আরম্ভ করলেন। প্রহরী নিস্পন্দ হ'য়ে আঘাত সহ্য করতে লাগল।)

(জুলফিকার খাঁ প্রবেশ)

(সম্রাট প্রহার থামিয়ে দিয়ে জুলফিকারের কাছে এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত দিয়ে বলতে লাগলেন—)

সম্রাট। এতক্ষণ কোথায় ছিলে বন্ধু? দরবারে কত মজা হ'য়ে গেল। আসতে এত দেরি হল যে!

(জুলফিকার সম্রাটের কথার কোনো জবাব না দিয়ে আভূমি নত হ'য়ে কুর্নিশ করলে মাত্র।)

সম্রাট। এর মধ্যে কোনো মেয়েমানুষ আছে ব'লে মনে হচ্ছে। ঠিক ধরেছি কিনা বল তো?

(জুলফিকার মৃদু হেসে আবার কুর্নিশ করলে)

সম্রাট। কি রকম দেখতে?—এই যাও সব, আজকের মত দরবার বন্ধ হ'ল। চল বন্ধু, যাওয়া যাক সেখানে—

(সভাসদ্ সকলে নির্বাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রৈল দেখে সম্রাট চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে চীৎকার করতে লাগলেন।)

সম্রাট। নিকলো—নিকলো—চল বন্ধু এই বেলা বেরিয়ে যাওয়া যাক্।

(সম্রাট জুলফিকারকে টেনে নিয়ে এক দিক দিয়ে বেরুতে যাবেন এমন সময় সেই দিক দিয়ে লালকুঁয়ারের প্রবেশ।)

সম্রাট। কে? ইম্‌তিয়াজ? আমাদের বোধ হয় শীগগির পাটনায় যেতে হবে। সে সম্বন্ধে উজিরের সঙ্গে আমার বিশেষ পরামর্শ আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ফিরে আসছি। আজকের মতন তাহ'লে সভাভঙ্গ হ'ল। চল জুলফিকার খাঁ।

ইম্‌তিয়াজ। কোথায় যাবে? তোমার পিসি জিন্নৎ-উন্নিসা বেগমের কাছ থেকে চিঠি এসেছে—এই নাও।

(সম্রাট তাড়াতাড়ি চিঠি খুলে পড়তে লাগলেন! পড়া শেষ হ'য়ে গেলে—)

সম্রাট। চল জুলফিকার, তাড়াতাড়ি আমাদের কাজটা শেষ ক'রে আসি। আজ আবার পিসির বাড়ী নেমন্তন্ন আছে। ঐখান থেকে একেবারে নেমন্তন্ন সেরে প্রাসাদে ফিরব।

ইম্‌তিয়াজ। কী—তুমি ঐ নেমন্তন্নে যাবে? পত্রখানা ভালো ক'রে পড়ে দেখেছ?

সম্রাট। পত্রে তো নেমন্তন্নই করা হয়েছে ইম্‌তিয়াজ!

ইম্‌তিয়াজ। আর কিছু করা হয়নি! ভালো ক'রে পড় দিকিন।

সম্রাট। (পত্রপাঠ) "তোমার সহিত আমার বিশেষ কোনো পরামর্শ আছে। রাত্রে এইখানেই আহার করিবে। কিন্তু দোহাই আল্লার, তুমি যে বাজারের স্ত্রীলোকটিকে লইয়া দিনরাত্রি উন্মত্ত লইয়া আছ তাহাকে সঙ্গে আনিও না।"

ইম্‌তিয়াজ। কোন সাহসে সে বাঁদী দিল্লীশ্বরের প্রধানা মহিষীকে

অপমান করতে সাহস করে! নিশ্চয় তোমার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে—

সম্রাট। আল্লা সাক্ষী ইমতিয়াজ, আমি তাকে কখনো এমন প্রশ্রয় দিইনি। ইমতিয়াজ—ইমতিয়াজ—তুমি কি বুঝতে পারছ না, আমাদের ভালোবাসা দেখে লোকে বুক ফেটে ম'রে যাচ্ছে। ঐ—ঐ—ঐ তক্তে যে বসে তার নাকি স্নেহ ভালোবাসা দয়া মমতা কর্তব্য সব বিসর্জন দিতে হয়। আমি তো সবই বিসর্জন দিয়েছি। আমার একমাত্র অপরাধ আমি তোমায় ভালোবাসি। আমার অপরাধ যে আমি জানি ঐ তক্তের মূল্য এক কানাকড়িও নয়; ঐ তক্তের চার পাশ ঘিরে যে ষড়যন্ত্রের ধোঁয়া ঘনিয়ে আছে তা কি আমি জানি না, খুব জানি। যত বেশি জানছি ততই আমি তোমার প্রেমে ডুবে যাচ্ছি। কিন্তু লোকের তো তা সহ্য হয় না। শেষ কালে তারা মুখের ওপরে আমার অপমান করতে সাহস করছে! আশ্চর্য, এখনো আমি বন্দী হইনি—এখনো আমার পুত্রেরা আমার বুকে ছুরি বসায়নি। জুল্‌ফিকার খাঁ—আমি এ অপমান সহ্য করব না। দিল্লীশ্বর যার প্রসাদভিখারী, কে সে বাঁদী তাকে এমন করে অপমান করতে সাহস করে? সাদুল্লা খাঁ—সাদুল্লা খাঁ কোথায় গেল?

(সাদুল্লা খাঁ অগ্রসর হইলেন)

সাদুল্লা খাঁ—তুমি এখুনি গিয়ে জিন্নত-উন্নিসা বেগমের বাড়ী ঘেরাও কর। কাল সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাকে জিন্দা মাটিতে গেড়ে দেবে। হা-হা-হা—জিন্দা গেড়ে দেবে। দিল্লীশ্বরের প্রধানা বেগমকে যে অপমান করতে সাহস করে তার স্থান ধরণীর ওপরে নয়—ধরণীর মধ্যে।

জুল্‌ফিকার খাঁ। জাঁহাপনা, একবার ভালো করে ভেবে দেখবেন কি করছেন। নারীহত্যা করবেন না।

সম্রাট। কেন করব না?—আলবাৎ করব। কারারুদ্ধ ক'রে তিলে তিলে মেরে ফেলার চাইতে কি একেবারে মেরে ফেলা ভালো নয়?

সাদুল্লা খাঁ। সম্রাট তাঁকে মার্জনা করুন। তিনি আপনার পিসি; তিনি বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আলমগীরের কন্যা।

সম্রাট। হা হা হা—ঠিক সময়ে কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছ সাদুল্লা খাঁ। সম্রাট আলমগীর—যে পিতাকে হত্যা করেছিল, ভাইকে হত্যা করেছিল, নিজের ছেলে মেয়ে ভাই বোন কাউকে রেয়াৎ করেনি—ক্ষমার সময়ে তার নাম উল্লেখ করে বড় উপকার করলে। সাদুল্লা খাঁ, আমিও বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আলমগীরের পৌত্র। আলমগীরকে লোকে জিন্দা পীর ব'লত, কিন্তু আমি আত্মীয়-রক্তস্রোতে ধরণীতে এমন বন্যা নিয়ে আসব যে লোকে আমার নাম দেবে জিন্দা—

কোকলতাস খাঁ। কিন্তু সম্রাট এ সময়ে রাজ্যের যে অবস্থা তাতে এই রকম একটা হত্যাকাণ্ড হ'লে—

সম্রাট। আমার সিংহাসনের মেয়াদ কিছু কমে যাবার সম্ভাবনা আছে। সে আমি জানি, কিন্তু সেই কয়েক দিনের মেয়াদ বাড়াবার জন্যে আমি আমার প্রেমের অমর্যাদা করতে পারব না। কোনো কথায় কিছু ফল হবে না কোকলতাস খাঁ, জিন্নৎ-উন্নিসাকে তার দণ্ডভোগ থেকে একমাত্র বাঁচাতে পারে সে—যাকে সে অপমান করেছে।

সাদুল্লা খাঁ। (ইমতিয়াজকে) জাঁহাপনা, জিন্নৎ-উন্নিসা বেগমকে ক্ষমা করুন। তাঁকে হত্যা করলে সহরে একটা হাঙ্গামা হ'তে পারে।

ইমতিয়াজ। এ কথা আপনার মুখে শোভা পায় না খাঁ সাহেব। হাঙ্গামা হয়, আপনারা হাঙ্গামা নিবারণ করবেন। হাঙ্গামার ভয়ে অপরাধীকে অব্যাহতি দিয়ে আপনারা কি ক'রে রাজত্ব চালাবেন?

জুল্‌ফিকার খাঁ। মহামান্যা বেগম সাহেবা, জিন্নৎ-উন্নিসা বেগমকে অব্যাহতি দিন। তাঁকে হত্যা করলে সম্রাটের অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে।

ইমতিয়াজ। সম্রাট, জিন্নৎ-উন্নিসা বাঁদীকে অব্যাহতি দিন। জুল্‌ফিকার খাঁ আপনার বন্ধু।

সম্রাট। দেখলে জুল্‌ফিকার খাঁ, দেখলে ওঁর মহানুভবতা!

জুল্‌ফিকার, সাদুল্লা, কোকলতাস, হেদায়েৎ উল্লা প্রভৃতি সকলে। জয় বেগম ইমতিয়াজ মহলের জয়—জয় বেগম ইমতিয়াজ মহলের জয়।

সম্রাট। ইমতিয়াজ, আজ আর এদের কারুকে বাড়ী যেতে দিও না—বড় খুসি হয়েছি। আজ এইখানেই সুরা ও সৌন্দর্যের পূজা করা যাক। ডাকো তোমার বাঁদীর দল, গাইয়ে-বাজিয়ের দল—সারা রাত্রি আমোদ হবে।

ইমতিয়াজ। বাঁদী—

(বাঁদীর প্রবেশ)

ইমতিয়াজ। শরাব—(বাঁদী প্রস্থানোদ্যত) গাইয়ে-বাজিয়েদের খবর দাও।

[বাঁদীর প্রস্থান।

জুল্‌ফিকার খাঁ। সম্রাট আমাকে অনুগ্রহ ক'রে যদি বিদায় দেন, একটা বিশেষ কাজ আছে।

সম্রাট। আচ্ছা, তুমি তোমার কাজ সেরে এখুনি এসো।

[জুল্‌ফিকার খাঁর প্রস্থান।

(এক দল গাইয়ে-বাজিয়ের প্রবেশ)

সম্রাট। এই—তোমরা নাচো গাও—নিয়ামৎ, সবাইকে শরাব দাও।

(সাদুল্লা, হেদায়েৎ, কোকলতাস ও সভাচাঁদ ব্যতিরেকে প্রহরী পর্যন্ত সকলের শরাব পান। ইমতিয়াজ গিয়ে তক্তের ওপর বসল)

ইমতিয়াজ। নিয়ামৎ, গান-বাজনা সুরু হোক।

(নাচ ও গান আরম্ভ হল)

(সম্রাট বাইজীদের সঙ্গে নাচতে আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে জনৈক সভাসদ সম্রাটের গলা ধ'রে নৃত্য আরম্ভ করতেই—সাদুল্লা, কোকলতাস, হেদায়েৎ ও সভাচাঁদ আসর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।)

সম্রাট। (নাচতে নাচতে)—বাহবা—কেয়া ফূর্তি! (হঠাৎ) —এই আমার চাবুক—আমার চাবুক কোথায় গেল! (তিন-চার জনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন, দু-তিন জনকে ঘুঁসো

মারলেন। গান-বাজনা সব থেমে গেল। ইম্‌তিয়াজ তক্ত থেকে উঠে এসে সম্রাটের হাতে চাবুক দিয়ে—)

ইম্‌তিয়াজ। এই নাও চাবুক। তুমি বড় রসভঙ্গ কর।

সম্রাট। কোনো চিন্তা নেই প্রিয়তম, যে জিনিষের জন্ত রসভঙ্গ হয়েছে আবার তাই দিয়েই রসের উৎস ফুটিয়ে তুলছি। (*চতুর্দিকে চাবুক চালাতে চালাতে*)—এই সব থামলে কেন? চালাও—গান-বাজনা চালাও—

(আবার গান, নাচ-গান সুরু হল। মধ্যভাগে সম্রাট নাচতে আরম্ভ করলেন ও নাচতে নাচতে পড়ে গেলেন। ইম্‌তিয়াজ ছুটে এসে সম্রাটের মাথাটা কোলের ওপর নিলেন।)

ইম্‌তিয়াজ। জল—জল নিয়ে এস শীগ্‌গির—

(বাঁদী জল নিয়ে এল। ইমতিয়াজ জলের ছিটে দিতে দিতে সম্রাটের জ্ঞান ফিরে এল।)

সম্রাট। (উঠে ব'সে)—সাদুল্লা খাঁ গেল কোথায়? (দাঁড়িয়ে উঠে চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে) সাদুল্লা গেল কোথায়?

প্রহরী। সাদুল্লা খাঁ প্রাসাদেই আছেন জাঁহাপনা। ডেকে নিয়ে আসব তাকে?

সম্রাট। এখুনি—এখুনি—কেন সে আমায় না ব'লে দরবার ছেড়ে চ'লে গেল।

[প্রহরীর প্রস্থান।

সম্রাট। এই তোমরা থামলে কেন? চালাও চালাও গান-বাজনা চালাও—

(আবার গান-বাজনা সুরু হ'ল। কিছুক্ষণ গান-বাজনা চলবার পর সাদুল্লার প্রবেশ।)

সম্রাট। এই সব চুপ।

(গান-বাজনা থামল।)

সম্রাট। সাদুল্লা খাঁ, এলাহাবাদের সুবেদারের নাম কি?

সাদুল্লা। সম্রাট, তাঁর নাম হচ্ছে আবদুল্লা খাঁ।

সম্রাট। এ লোকটা হুশেন আলি খাঁর কে হয়?

সাদুল্লা। ভাই হয়।

সম্রাট। সাদুল্লা খাঁ, তুমি নাচতে পার?

সাদুল্লা। না হুজুর, ও বিদ্যেটা কখনো প্রয়োজন হবে ব'লে মনে করিনি।

সম্রাট। তবে কি বিদ্যে তোমার জানা আছে শুনি? রাজ-সরকারে তুমি কি কাজ কর?

সাদুল্লা। আজ্ঞে হুজুর, আমি সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী।

সম্রাট। আচ্ছা আজই যদি যুদ্ধ বাধে তাহ'লে সে খরচের টাকা তোমার মজুদ আছে?

সাদুল্লা। আজ্ঞে, নগদ টাকা রাজকোষে নেই বললেই চলে।

সম্রাট। কেন নেই? তুমি তাহ'লে এত দিন করছিলে কি?

সাদুল্লা খাঁ। আজ্ঞে, জাঁহাপনা সিংহাসন পাবার পর থেকে জমিদারেরা কেউ খাজনা দেয়নি। তারা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না যে, আপনি সিংহাসন অধিকার করেছেন।

সম্রাট। সে বিশ্বাস এত দিন করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল সাদুল্লা খাঁ, কারণ তুমি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী। এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে, তুমি নাচতে তো জানোই না, সামান্ত মন্ত্রীর কাজ তাও জানো না। সাদুল্লা খাঁ, দিল্লীর সম্রাটের মন্ত্রী হ'তে হ'লে নাচতে আগে জানতে হবে। আজ থেকে তোমার মন্ত্রীর কাজ গেল। এই কওন্ হ্যায়?

(বান্দার প্রবেশ)

রাজা সভাচাঁদ—সভাচাঁদকে ডেকে নিয়ে এসো। হা—হা—নাচতে জানো না তুমি সাদুল্লা খাঁ।—যাক, তোমাকে আমি অন্ত কাজ দিচ্ছি, কোনো ভয় নেই। (সম্রাট কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে—)

কি কাজ তোমাকে দিই! আমার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগেই তো উপযুক্ত কর্মচারী রয়েছে। (চিন্তা) ও—মনে পড়েছে। ইমতিয়াজ—ইমতিয়াজ—

ইমতিয়াজ। কি সম্রাট—

সম্রাট। ইমতিয়াজ, তোমার মনে আছে তুমি এক দিন বলেছিলে মানুষ জলে ডোববার সময় কি রকম আঁকুপাকু করে তা কখনো দেখনি। সাদুল্লা খাঁ, তোমার ওপর আদেশ এই যে, কাল সকালে তুমি তিনটি নৌকো বোঝাই লোক নিয়ে যমুনায় ডোবাবে—সাম্রাজ্ঞী প্রাসাদের কক্ষ থেকে তাই দেখবেন। তিনটি নৌকো—বুঝতে পারলে। একটি নৌকোর পুরোভাগে থাকবে—

(সভাচাঁদের প্রবেশ)

—এই যে রাজা সভাচাঁদ—আমাদের এইমাত্র একটা পরামর্শ হচ্ছিল, আপনি এসে পড়েছেন ভালোই হয়েছে। প্রধানা বেগম এক দিন—জলমগ্ন মানুষ কি ক'রে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করে—তাই দেখবার বাসনা জানিয়েছিলেন। আমি সাদুল্লা খাঁকে আদেশ দিয়েছি যে, কাল সকালে তিনটি নৌকো বোঝাই লোক যোগাড় ক'রে যমুনাতে নিয়ে নৌকাগুলির তলা ফাঁসিয়ে দেবেন। পাছে লোকেরা আগেই পালিয়ে যায় সেই জন্ত একটি নৌকোর পুরোভাগে থাকবে সাদুল্লা খাঁ, একটির পুরোভাগে থাকবেন আপনি, আরেকটির পুরোভাগে থাকবো আমি।

সাদুল্লা ও সভাচাঁদ। কি সর্বনাশ!

ইমতিয়াজ। কিন্তু সম্রাট আমার কাছে না থাকলে আমার আনন্দের অনেকখানি কমে যাবে।

সম্রাট। বেশ, তাহ'লে চল, আমরা এখন থেকেই প্রাসাদের কক্ষে গিয়ে অপেক্ষা করি। চল ইমতিয়াজ।

[সম্রাট ও ইমতিয়াজের প্রস্থান।

[ক্রমশঃ।

ছাপ্পান্ন

এক দিন সকালে খাওয়ার ঘরে বসে সবাই বিংলেকে মধ্যমণি করে গল্প জুড়েছে, এমন সময় দরজায় গাড়ী থামার আওয়াজে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হ'ল। জানলা দিয়ে দেখা গেল একখানি গাড়ী এদের বাগানে প্রবেশ করছে। এত সকালে দূর থেকে অতিথি আসার সময় নয়। তা ছাড়া গাড়ীখানি দেখে এ গাঁয়ের বলে মনে হ'ল না। সকাল বেলার জমাট গল্পের আসরে এই ভাবে ভাঁটা পড়তে দিতে রাজী ছিল না বিংলে। সে জেনকে নিয়ে বাগানের দিকে পা বাড়ালে একটু নির্জনতা খুঁজতে। বাকী তিন জন এই অপ্রত্যাশিত অতিথির প্রতি বিরাগ পোষণ করে বসে রইল অপেক্ষা করে। দরজা খুলে যখন অতিথি প্রবেশ করলেন, সবাই বিস্মিত হ'ল। লেডী ক্যাথারিন এই অসময়ে অতিথি হয়েছেন।

এলিজাবেথ ছাড়া বাকী দু'জন, মা ও কিটি কেউই ইতিপূর্বে লেডী ক্যাথারিনকে দেখেনি। সুতরাং তাদের বিস্ময়ের কারণ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু এলিজাবেথই যেন বেশী বিস্মিত হ'ল এই পরিস্থিতিতে।

যেন কত অবহেলা-ভরে এসে ঘরে ঢুকলেন। এলিজাবেথের স্বাগত অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে শুষ্ক সাড়া দিয়ে তিনি নিঃশব্দে আসন নিলেন। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই এলিজাবেথ মায়ের কাছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে দিয়েছিল।

এমন মহীয়সী মহিলার আতিথ্যে গদগদ হয়ে উঠলেও মা নিঃশব্দ সৌজন্যের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন তাঁকে। লেডী ক্যাথারিন কয়েকটি মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে যেন কিছু রুক্ষতার সঙ্গেই এলিজাবেথকে উদ্দেশ করে বললেন—'ভাল আছ ত? উটি কি তোমার মা?'

ছোট্ট সায় দিল এলিজাবেথ। তখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হল—'আর ঐটি তোমার ভগ্নী?'

এতক্ষণে মা নিজে আলাপের সূত্র ধরলেন। পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—'হাঁ, ঐ আমার কোলের আগেরটি। কোলের মেয়েটির সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। সে স্বামীঘর করছে। আর আমার বড় মেয়ে বাগানে বেড়াচ্ছে। তারও শীগ্‌গির বিয়ের ব্যবস্থা করেছি।'

'আপনাদের বাগানটি বড়ো ছোট।'

'আপনার বাড়ীর তুলনায় এ কিছুই নয়। তবে এখানে এমন বাগান অনেকেরই নেই।'

'এই গরম কালে কি করে আপনারা এ ঘরে বসে গল্প করেন? সব জানলাই ত দেখছি পশ্চিমমুখো।'

এলিজাবেথের মা আত্মীয়তার সুরে বললেন—'ওদের খবর সব ভাল ত? আমার শার্লটি আর তার বর?'

'ভালই আছে। পরশু সন্ধ্যায় এসেছিল তারা আমার ওখানে। ভালই আছে।'

এলিজাবেথ ভাবছিল হয়ত বা সখী শার্লট কোন চিঠি পাঠিয়েছে এঁর মারফৎ। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন তেমন কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন এলিজাবেথ মনে মনে ক্ষুণ্ণ হ'ল। উতলাও হ'ল বেশ। লেডী ক্যাথারিনের এই হঠাৎ আবির্ভাবের কোন সঙ্গত কারণ সে খুঁজে পেলে না।

সামান্য জলযোগের কথা তুললেন মা, কিন্তু লেডী ক্যাথারিন তা গ্রহণে অসম্মতি জানালেন। তার পর চেয়ার ছেড়ে উঠে এলিজাবেথকে লক্ষ্য করে বললেন—'তোমাদের বাগানের ঐ

জেন অস্টিনের

পাশটায় বেশ যেন বন ঘন হয়ে উঠেছে দেখে এলাম। ওদিকটা ঘুরে দেখতে ইচ্ছা করছে। তুমি যদি আমায় পথ দেখাও, ভারী খুশী হব আমি।'

'যা মা, নিয়ে যা ওঁকে। ওদিকটা বেড়ালে খুবই ভাল লাগবে আপনার। গাছপালাগুলো দেখে উনি খুবই খুসী হবেন।'

অতিথিকে খুশী করার জন্য এলিজাবেথ মায়ের নির্দেশ পালন করতে গেল। সিঁড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় লেডী ক্যাথারিন পাশের ভেজান দরজাগুলি খুলে ঘরের ভিতরগুলি লক্ষ্য করে করে দেখলেন। ঘরগুলির ছিমছাম চেহারায় খুশীই হয়েছেন জানালেন।

বাইরে লনে তাঁর গাড়ী অপেক্ষা করছে। নিঃশব্দে দু'জনে পায়ে পায়ে এগোলেন। আজ প্রতিজ্ঞা করেছিল এলিজাবেথ যে, এই দাম্ভিক মহিলার সঙ্গে সে যেচে আলাপ করবে না।

অল্প দূর অগ্রসর হবার পর লেডী ক্যাথারিন নৈঃশব্দ ভঙ্গ করে বললেন—'আজ সকাল বেলা সম্পূর্ণ আচম্বিতে তোমাদের গৃহে কেন আতিথ্য নিয়েছি তার কারণ নিশ্চয়ই তুমি অনুমান করতে পেরেছ? তোমার হৃদয়-মন সে কথা জানাতে ভুল করেনি তোমায়।'

এলিজাবেথের বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। অবাক চাহনি তুলে ধরে সে জিজ্ঞাসা করল তাঁর আসার কারণ। সে ত কিছুই অনুমান করতে পারেনি।

উত্তেজিত কণ্ঠে লেডী ক্যাথারিন এই মেয়েটির চাপা উত্তরকে শাসন করলেন—'তুমি জান এলিজাবেথ, আমি অবহেলা সহ্য করতে পারি না। যতই কথা চাপা দেওয়ার চেষ্টা কর আমার

কাছে কিছুই গোপন করতে পারবে না। আমি চিরকাল সরল খোলাখুলি মনের মানুষ। বিশেষ করে এই ধরণের ব্যাপারে রাখা-ঢাকা আমি মোটেই সহ্য করব না। দু'দিন আগে আমি একটি বিশেষ সাঙ্ঘাতিক খবর পেয়েছি। শুনলাম যে, তোমার দিদির শুধু যে সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তা নয়, তোমারও না কি শীগ্‌গিরির বিয়ে হবে আমারই নিজের ভাইপোর সঙ্গে। কার কথা বলছি তোমার বুঝতে অসুবিধা হবে না। ডার্সির সঙ্গে তোমার বিয়ের গুজব চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি জানি এর চেয়ে গর্হিত জঘন্য মিথ্যা আর কিছু নেই। কিন্তু এই মিথ্যা প্রচার এখুনি নিবারণ করা দরকার মনে করেই আমি এত দূর ছুটে এসেছি এই অসময়ে। আমার মতামত তোমাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার মনে হ'ল আমার।'

রাগে অপমানে এলিজাবেথের সারা মুখ রাঙা হয়ে উঠল। 'যদি মিথ্যা বলেই জানেন, তবে এত দূর কষ্ট করে আসবার কি প্রয়োজন ঘটল তা বুঝলাম না আমি। আপনি কি চান, সেই কথাটাই দয়া করে প্রকাশ করে বললে বাধিত হব।'

'এ মিথ্যা গুজবের রটনা এখুনি বন্ধ করতে হবে।'

এতক্ষণে এলিজাবেথের উষ্ণতা কমে এল। ঠাণ্ডা-গলায় সে বললে—'কিন্তু এত দূর থেকে ছুটে এসে আমাদের বাড়ীতে অতিথি হওয়ার খবর যখন রটবে তখন লোকে কি গুজবটাকেই বেশী করে বিশ্বাস করতে চাইবে না মনে করেন। অবশ্য আপনার অনুমান যদি সত্য হয়।'

'ওঃ। তাহ'লে গুজবটা সম্বন্ধে তোমরা কিছুই জান না, মনে করে নেব। নিজেরাই ত এই মিথ্যা কথা চারি দিকে ছড়িয়েছ। আর এখন বলছ আমরা কিছুই জানি না।'

'আমরা এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না।'

'তাহ'লে গুজবটাও মিথ্যা, এই কথা বলতে চাও ত?'

'আপনার সব প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই লেডী ক্যাথারিন। আপনার যা জিজ্ঞাস্য, তা জানতে চাইতে পারেন। উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা।'

'এ আমি সহ্য করব না। কিছুতেই বরদাস্ত করব না। আমি পরিষ্কার জানতে চাই ডার্সি তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে কি না?'

'আপনিই ত বললেন যে তা কখনো হতে পারে না।'

'হতে ত পারেই না। ওর বুদ্ধি-বিবেচনা যতক্ষণ বজায় থাকবে, এমন সর্বনাশের পথে ও কিছুতেই পা বাড়াবে না। কিন্তু তোমরা যাদু জান। কত রকম করে লোভ দেখিয়ে, ভুলিয়ে হয়ত বা কোন দুর্বল মুহূর্তে ওর কাছে কথা আদায় করে নিয়ে থাকবে। তোমাদের ছল-চাতুরীর অভাব নাই।'

'করেই যদি থাকি' বললে এলিজাবেথ নির্বিরোধী গলায়— 'তার কৈফিয়ৎ দেবো না আপনার কাছে।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ মুখরা মেয়ে আমি কে? এ ধরণের উত্তরে আমি অভ্যস্ত নই কোন কালে। তা ছাড়া পৃথিবীতে ডার্সির আমিই একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষিণী। তার ভাল-মন্দ সম্বন্ধে আমার সব-কিছু জানার প্রয়োজন আছে।'

'ওর ভাল-মন্দর দায়িত্ব আপনার। কিন্তু আমার ভাল-মন্দর নয়।'

'তুমি আমার কথা ভাল করে শুনে রাখ। যে ঘরে-বরে পড়বার আশায় তুমি আছ, তা জীবনে হবে না তোমার। ডার্সির সঙ্গে আমার নিজের মেয়ে বাগ্‌দত্তা হয়ে আছে। তার আশা তুমি ত্যাগ কর।'

'তাই নাকি! তা যদি সত্যি হয়, তিনি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করবেন কেন?'

লেডী ক্যাথারিন কয়েকটি মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলেন। তার পর দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন—'ওদের দু'টির কথা তোমায় খুলে বলি। ছেলেবেলা থেকেই ওদের পরস্পরের জন্যে তৈরী করা হয়েছে। ডার্সির মা আর আমি দুই বন্ধু ছিলাম। দু'টিতে যখন দোলনায় শুয়ে থাকত তখনই আমরা দুই সইতে এই কথা ভেবে রেখেছিলাম। আর এই এত দিন পরে যখন দু'জনেই পূর্ণ যৌবনে এসে পা দিয়েছে তখন কোথাকার কে একটা নীচু সমাজের মেয়ে এসে তাদের মিলনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, আর আমায় তাই দাঁড়িয়ে দেখতে হবে নিঃশব্দে! তোমার শরীরে কি মেয়েমানুষের স্নেহ মমতা কর্তব্য-বোধ কিছুই নেই? তোমায় ত বলছি যে ছেলেবেলা থেকেই ওরা দু'টিতে এক জোড়া পাখীর মত বড়ো হয়ে উঠেছে। তবে কেন তুমি জেনে-শুনে ওদের পথে কাঁটা হচ্ছ?'

এলিজাবেথের কণ্ঠে কোন ঝাঁঝ ছিল না যখন সে জবাব দেবার জন্য মুখ তুললে। বললে—'আমি জানি। শুনেছি সে কথা এর আগেও। কিন্তু তাতে আমার কি আসে-যায় বলুন। ওঁর মায়ের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি নিকটতমা একটি বোনকে বিয়ে করে সংসারী হন। কিন্তু তাঁকে বিয়ে করে আমার সংসারী হওয়ার পথে কি বাধা। আমি তাঁর অযোগ্যা নই। আপনারা তাঁকে সংসারী করার জন্য নানা পরিকল্পনা করে রেখেছেন, কিন্তু তাঁর সংসারী হওয়ার ব্যাপারে বাইরের লোকেরও কিছু-কিছু হস্তক্ষেপ এসে পড়বেই। যদি তিনি এমন কোন কারণে আর একটি মেয়ের কাছে বাঁধা না পড়ে থাকেন, যা তার সম্মান বা পরিবারের সম্মানের পক্ষে হানিকর, তবে তিনি স্বেচ্ছায় যে-কোন মেয়েকেই পছন্দ করে নিতে পারেন। আমার প্রতি যদি তাঁর অনুরাগ সঞ্জাত হয়েই থাকে, তাঁকে বঞ্চিত করার কি অধিকার আছে আমার?'

'তোমায় আমি সতর্ক করে দিচ্ছি জেদী মেয়ে, ডার্সির আত্মীয়-স্বজনের কারুর কোন স্নেহ-ভালবাসা তুমি পাবে না, যদি তুমি এমন শত্রুতা কর আমাদের সঙ্গে। সবাই তোমায় ঘৃণা করবে। কেউ তোমার নামোচ্চারণ করবে না। সমাজে তোমার নামে নিন্দার ধিক্কার পড়ে যাবে। তোমায় আমরা সমাজে একঘরে করে রাখব।'

'এত ক্ষতি সহ্য করে কোন মেয়েই সংসার পাততে চায় না।' বললে এলিজাবেথ—'কিন্তু ওঁর ঘর, ওঁর সংসার, ওঁর প্রতিষ্ঠার কাছে সে-সব তুচ্ছ মনে হবে আমার কাছে। অন্ততঃ ডার্সিদের ঘরে বৌ হয়ে গেলে আমি ও-সব ফালতু নিন্দা-সুখ্যাতির জন্যে অনুতাপ করব না।'

লেডী ক্যাথারিন আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। জীবনে কোন মেয়ের কাছে এমন ভাবে পরাজিত হননি তিনি। তাঁর আভিজাত্য ও উন্নাসিকতায় এমন ভাবে কেউ ধাক্কা দেয়নি এর আগে। কঠিন কণ্ঠে তিনি এলিজাবেথকে ভর্ৎসনা করলেন। তাকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য যত প্রকার যুক্তি-তর্কের অবতারণা

করলেন। নীচু সমাজের মেয়ে বলে অপমান করে তাকে পিছিয়ে দিতে চাইলেন। তার বিয়ে যে সুখের হবে না, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার মন ভেঙে দিতে চাইলেন নানা কৌশলে। কিন্তু এলিজাবেথ তাঁর কথায় সায় দিল না। সে বললে—'আপনার ভাইপোর সহধর্মিণী হয়ে আমি কিছুই হারাব না। বরং সবই পাব আমি। আমি কিছুতেই তাঁর অযোগ্যা মনে করতে পারছি না নিজেকে। তিনি এক জন সদ্‌বংশজাত পুরুষ, আমি সদ্‌বংশের মেয়ে। আমি তার যোগ্যা নই কিসে?'

লেডী ক্যাথারিন জিদ ধরে বললেন—'এই কথাটাই শুধু আমায় স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বল, সত্যিই কি ডার্সি তোমায় কথা দিয়েছে?'

এলিজাবেথ মিথ্যা বলতে পারলে না। লেডী ক্যাথারিনের দাম্ভিকতাকে প্রতারিত করার জন্যও সে অসত্যের আশ্রয় নিতে পারলে না। বললে, 'তিনি আমায় কথা দেননি কোন দিনই।'

এ কথায় গোপন উল্লাসে ভরে গেল লেডী ক্যাথারিনের মুখ।

'তুমি আমায় কথা দাও মা, তাকে তুমি বাঁধবে না।'

'সে প্রতিজ্ঞা কি করে করব আমি?'

'কিন্তু আমি খালি হাতে ফিরে যাব না মা! আমি জানি তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। আমাকেও তুমি জান। কাজে নেমে আমি কখনো পিছিয়ে যাব, এ আত্মপ্রবঞ্চনা মনেও ঠাঁই দিও না। তোমার কথা না নিয়ে আমি এ-বাড়ী থেকে এক পাও নড়ব না।'

'কেন আপনি আমায় এমন অযৌক্তিক প্রস্তাবে সম্মত করাতে চাইছেন? ও কথা আমি কিছুতেই দিতে পারব না। আপনার অভিলাষ তিনি আপনার মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হন, কিন্তু আমার মুখের কথাতেই কি তা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে? যদি সত্যিই এমন হয় যে আমার প্রতি তাঁর কোন মমতা থাকে মনের মণিকোঠায় গোপনে, তবে তাঁকে আমি প্রত্যাখ্যান করলেই যে তিনি আপনার মেয়ের উপর সেই ভালবাসা ন্যস্ত করবেন, তার কি কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে? আমায় আপনি এত দিনে যা চিনেছেন তাতে এটুকু আপনার অনুমান করা উচিত যে, কৌশলে আপনি আমার কাছ থেকে এমন কোন অসঙ্গত প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিতে পারবেন না। আপনার ভাইপোর ব্যক্তিগত জীবনে আপনার হস্তক্ষেপ কতখানি তিনি সহ্য করবেন আমি জানি না, কিন্তু আমার মিনতি, আমার ব্যক্তিগত জীবনে আপনি আর নিজেকে জড়িত করবেন না। 'এই আমার শেষ অনুরোধ।'

লেডী ক্যাথারিন শেষ বারের মত বললেন—'তা'হলে ডার্সিকে তুমি আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবেই?'

'অমন কথা আমি একবারও উচ্চারণও করিনি। কিন্তু এ কথা ঠিকই যে, নিজের সুখের দিকে চেয়ে আমি যা করব তা অন্য কারুরই ইচ্ছায় বা প্ররোচনায় বদল করব না। আমার মঙ্গল-অমঙ্গল আমি নিজেই বেছে নিতে পারব।'

'তবে এই তোমার শেষ কথা' বললেন লেডী ক্যাথারিন—'এই যদি তোমার শেষ কথা হয়, তবে আমিও বলে যাচ্ছি শুনে রাখ, আমি বেঁচে থাকতে তোমার ইচ্ছা কিছুতেই পূর্ণ হবে না। তোমায় আমি সুবুদ্ধি দিতে এসেছিলাম, কিন্তু তোমার মত জেদী অবুঝ মেয়ে কোন সুবুদ্ধিরই ধার ধারে না। ঠিক আছে। দেখা যাক কি হয়।'

দু'জনে উত্তেজিত পদক্ষেপে ফিরে এল বাগানে যেখানে লেডী ক্যাথারিনের গাড়ী অপেক্ষা করছিল। এলিজাবেথের দিকে ঝাঁঝালো কণ্ঠে শ্লেষ মিশিয়ে কথা ক'টি ছুঁড়ে মারলেন তিনি—'আমি আর তোমাদের বাড়ীতে পা দিতে চাই না। তোমাদের সম্বন্ধে ভাল ধারণাও নিয়ে যাচ্ছি না। এই আমার শেষ কথা।'

তাঁকে বিশ্রাম নিয়ে যাবার কথা বলতে পারলে না এলিজাবেথ। যখন সে বাড়ীর দরজার কাছে পৌঁছল ততক্ষণে লেডী ক্যাথারিনের গাড়ী সদর রাস্তায় গিয়ে পড়েছে।

সাতান্ন

এলিজাবেথের স্থির নিষ্কম্প চিত্ত-সরসীতে এই অপ্রত্যাশিত আঘাত যে আলোড়নের সৃষ্টি করল, তার বিক্ষোভ সহজে যেতে চাইল না তার মন থেকে। বেশ অনেকক্ষণ ধরে সেই কথা ভিন্ন অন্য কিছু ভাবতেও পারলে না সে। এইটুকু অন্ততঃ স্পষ্ট ধরা পড়ল যে, লেডী ক্যাথারিন তাঁর বাড়ী থেকে এতখানি পথ কষ্ট করে এসেছেন কেবল মাত্র একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। ডার্সির সঙ্গে এলিজাবেথের সম্ভাব্য পরিণয়-সূত্রটি আর অধিক দৃঢ় হবার পূর্বেই সেটিকে সযত্নে ছিন্ন করাই তাঁর অভিসন্ধি। উদ্দেশ্যটি মহৎ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এলিজাবেথ ভেবে কূল-কিনারা পেল না এই সংবাদ রটনার মূল উৎসটি কি? ডার্সি বিংলের পরম বন্ধু। বিংলের সঙ্গে তার দিদির শুভ বিবাহের সংবাদ ইতিমধ্যেই চতুর্দিকে সাড়া জাগিয়ে দিয়েছে। সুতরাং উৎসাহী শুভাকাঙ্ক্ষীরা যে ডার্সির সঙ্গে জেনের বোনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনা নিয়ে জল্পনা করতে পারে এটা মন্দ যুক্তি মনে হ'ল না এলিজাবেথের কাছে। এ কথা ত সত্যি যে, বিংলের সঙ্গে তার দিদির বিয়ে হলে, ডার্সিও এ বাড়ীর এক জন প্রিয়জন হয়ে উঠবে। নানা কারণে তাদের সংসারে ডার্সি আগের চেয়ে বেশী আনাগোনা করবেই। এলিজাবেথের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তাতে বাড়বে বই কমবে না। সুতরাং প্রতিবেশী লুকাসরা যে তাদের মেয়ে শার্লটকে এ খবর পাঠাতে ভুল করেনি তা সত্যি। সুতরাং শার্লটির মুখ থেকে লেডী ক্যাথারিন শুনেছেন এবং এই অপ্রিয় সম্ভাবনাকে সমূলে উৎপাটিত করার বাসনা নিয়েই তিনি এত দূর ছুটে এসেছিলেন।

লেডী ক্যাথারিনের কথাবার্তা নিজের মনে নাড়া-চাড়া করে গভীর অস্বস্তি ভোগ করতে লাগল এলিজাবেথ। যে রকম জেদী মহিলা তিনি, ডার্সির সঙ্গে এলিজাবেথের বিয়ে রোধ করার জন্য তিনি যে ডার্সির উপর প্রবল চাপ দেবেন, সে কথা না ভেবে পারলে না সে। এলিজাবেথের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন যে সামাজিকতার দিক থেকে কতখানি হানিকর হবে, সে সম্বন্ধে লেডী ক্যাথারিনের যুক্তি কতখানি গ্রহণ করতে পারে ডার্সি, সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করতে পারলে না এলিজাবেথ। ঐ মহিলাটির উপর ডার্সির শ্রদ্ধা কতখানি, তাঁর যুক্তির প্রাবল্যে কতখানি বিচলিত হতে পারে ডার্সি, সে কথা ঠিক স্পষ্ট না বুঝলেও এটুকু সম্বন্ধে এলিজাবেথের সন্দেহ রইল না যে, ডার্সির চোখে সেই মহিলা মহীয়সী। তিনি যখন এই অসম বিবাহের কথা আলোচনা করবেন, স্বভাবতঃই ডার্সির অহংকার ও সম্ভ্রম বোধের স্পর্শ-কাতর জায়গায় তিনি ঘা

দেবেন। ডার্সি যে সে সকল যুক্তি যথেষ্ট সঙ্গত মনে করবে না, সে সম্বন্ধে এলিজাবেথ যেন কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারলে না।

ইতিপূর্বে যেটুকু দুর্বলতা ও বিচ্যুতি ঘটে গেছে সে সব এবার ভেসে যাবে এক জনপ্রিয় শুভাকাঙ্ক্ষিণীর স্নেহ-বন্যায়। আর একবার মনের মোহ-জাল কেটে গেলে ডার্সি আর কোনো দিন ফিরবে না এলিজাবেথের জগতে। আর কোনো দিন হয়ত দেখাও হবে না তাদের। বিংলের সঙ্গে এখানে এসে দেখা করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে ডার্সি, তার পথে কাঁটা হবেনই লেডী ক্যাথারিন।

'যদি এখানে না-আসার কোন খবর পাঠান তিনি' মনে মনে ভাবলে এলিজাবেথ 'তা'হলে বুঝতে আমার কিছুই বাকী থাকবে না। জানব, আমার সব প্রত্যাশা মৃগতৃষ্ণিকায় পর্যবসিত হল। জানব যে তাঁর একনিষ্ঠতা একটা সাময়িক হৃদয়দৌর্বল্য। যদি তাই হয়, আমিও মুছে ফেলব তাঁকে মন থেকে। কোন ক্ষোভ রাখব না যে, এক দিন তিনি আমার পরম প্রিয় হতে চেয়েছিলেন।'

পরদিন সকালে সিঁড়ি দিয়ে নামবার মুখে বাবার সঙ্গে দেখা হ'ল এলিজাবেথের।

হাতে একখানি চিঠি নিয়ে তিনি লাইব্রেরী-ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। মেয়েকে দেখেই বললেন—'তোমারই খোঁজে যাচ্ছিলাম মা। আমার ঘরে এসো।'

বাবার হাতে ঐ চিঠি দেখে এলিজাবেথের মন উতলা হয়ে উঠল আগ্রহে। কি জানি, হয়ত বা লেডী ক্যাথারিন পত্রে সব কিছু জানিয়েছেন বাবাকে। সে ক্ষেত্রে তাকে কি কি কৈফিয়ৎ দিতে হবে সে কথা ভেবে এলিজাবেথের নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

আগুনের ধারে বসে বাবা বললেন তাকে—'সকালেই এই চিঠি পেয়ে ভারী অবাক হয়েছি মা! তোমাকে নিয়েই লেখা চিঠি, সুতরাং তোমার জানার অধিকার আছে বৈ কি কি লেখা আছে এতে। আমি ত কখনো ভাবতেই পারিনি যে, আমার দু'টি মেয়েই একসঙ্গে পাত্রস্থ হতে যাচ্ছে। যাই হোক, তোমায় আমি আশীর্বাদ করছি।'

অন্ততঃ লেডী ক্যাথারিনের কাছ থেকে যে এ চিঠি আসেনি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হল এলিজাবেথ। হয়ত বা ডার্সির কাছ থেকে এসেছে, ভাবতেই তার দু'টি গালে যেন রক্তের জোয়ার নামল আচম্বিতে।

'তোমায় দেখে মনে হচ্ছে যে তুমি ব্যাপারটা জান। আমি দেখেছি কি না, এ-সব ব্যাপারে অল্পবয়সী মেয়েরা ভারী বুদ্ধিমতী হয়। তবে এটা ঠিক, চিঠি যে লিখেছে তার নাম তোমার বুদ্ধির অগম্য। বলতে পার কে? পারবে না বলতে? তবে শোন, চিঠি লিখেছে কলিন্স।'

'কলিন্স? সে কি লিখেছে?'

'অপেক্ষা কর মা। প্রথমেই জেনের বিয়ের সংবাদে সে পরম প্রীত হয়ে তার অভিনন্দন জানিয়েছে। সম্ভবতঃ সে তার শ্বশুর-বাড়ীর তরফ থেকেই খবরটা পেয়েছে। কিন্তু জেনের বিয়ের সম্বন্ধে সে কি কি লিখেছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করে তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না:

কলিন্স লিখেছে, "আপনার কন্যা এলিজাবেথ আর অধিকক্ষণ পিতৃ-গৃহে বেনেট নামে পরিচিতা থাকবে না। আপনার কন্যা পরমা ভাগ্যবতী, কেন না যে লোকটির সহিত তাহার চিরজীবনের সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে, শুনিতেছি সে এ দেশে এক পরম কৃতী পুরুষরূপে ইতিমধ্যেই খ্যাত। সেই লোকটি কেবল যে প্রকৃত ঐশ্বর্যের অধিকারী তাহা নয় পরন্তু আভিজাত্যের গৌরবসম্পন্ন যাহা ঈর্ষ্যার সামগ্রী। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও আমি আপনাকে এই বিবাহের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছি। আমার এই সতর্ক করার মূল কারণ এই জন্য যে, তাঁহার পরমাত্মীয়া লেডী ক্যাথারিন এই বিবাহ ব্যাপারটি সুদৃষ্টিতে দেখিতেছেন না।"

'কী আশ্চর্য দেখ মা, লুকাসরা এত বড়ো মিথ্যেটা কি করে রটাতে পারলে? যে লোক খুঁত না বের করে কোন মেয়ের কথা ভাবতে পারে না, যে বোধ হয় এতাবৎ তোমার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখেনি, তার সম্বন্ধে এমন গুজব যারা রটাতে পারে, তাদের উদ্ভাবনী শক্তির তারিফ না করে থাকতে পারা যায় না।'

বাবার এই স্নিগ্ধ সরলতায় আন্তরিকতার সঙ্গে যোগ দিতে পারলে এলিজাবেথের খুবই খুশী হ'ত, কিন্তু তা না পেরে সে শুধু ম্লান একটু হাসলে মাত্র।

এর পর কলিন্স আরো বহু উপদেশ ও শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করে লিখেছে, লিডিয়ার কুশ্রী ব্যাপারটা যে আরো অধিক দূর কেলেঙ্কারীতে গড়ায়নি, এ পরম কারুণিক পরমেশ্বরের আশীর্বাদ! অবশ্য সে যদি জন্তবর্ণের পুরোহিত হ'ত, তবে এ রকম অন্যায় ও অসামাজিকতা সে কিছুতেই বরদাস্ত করত না। অবশ্য যথার্থ খ্রীশ্চান হিসাবে মিঃ বেনেটের উচিত তাদের মার্জনা করা। কিন্তু তাদের মুখ দেখা বা তাদের নামোচ্চারণ করা ধর্মবিরুদ্ধই হবে। তার পর শার্লটির আসন্ন সন্তান-সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছে কলিন্স।

বাবা বললেন—'তোমায় দেখে মনে হচ্ছে মা, তুমি যেন কৌতুকটা প্রাণ ভরে উপভোগ করতে পারলে না ঠিক। এতে আমাদের ভাবনার কিছু নেই।'

কিন্তু এ কথাতেও এলিজাবেথ মলিন হাসি হাসলে মাত্র। নিজের মনের ভাব নিয়ে এমন লুকোচুরি খেলা আগে কখনো খেলেনি বলে সে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগল বাবার সামনে। বাবার সামনে হাসলেও, সে হাসি তার কান্নার বুক-নিঙড়ানো হাসি। ডার্সির ঔদাসীন্য নিয়ে কৌতুক করে বাবা তার মনে গভীর ব্যথা দিয়েছেন নিজের অগোচরে। মুহূর্তে মনে হল, বাবা যা এত সামান্য বলে মনে করেছেন, তাকেই প্রকাণ্ড করে ধরে চরম ভুল করল না ত এলিজাবেথ?

আটান্ন

এলিজাবেথের প্রত্যাশাকে মিথ্যা করে দিয়ে বিংলে প্রি[illegible] বন্ধুকে সঙ্গে করেই নিয়ে এল লংবোর্নে। সে ত ভেবেছিল বিং[illegible] এসে বলবে যে, ডার্সি নানা কারণে আসতে পারল না বলে ক্ষমা[illegible] ভিক্ষা করে পত্র দিয়েছে। মা যে বিংলের কাছে লেডী ক্যাথারি[illegible] এ বাড়ীতে পদধূলি দেওয়ার কথাটা তুলে সব বেফাঁস করে দে[illegible] এই আশঙ্কায় উদ্গ্রীব হয়েছিল এলিজাবেথ। কিন্তু সে রক[illegible] সম্ভাবনা ঘটবার পূর্বেই বিংলে জেনের সঙ্গে নিরিবিলি হবার কো[illegible]

সকলকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব করলে। জেন আর বিংলে কিছু দূর অগ্রসর হবার পরই এদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বাকী রইল তিন জন কিটি, এলিজাবেথ ও ডার্সি। এরা তিন জনে যথাসম্ভব সামান্য বাক্যালাপেই পথ অতিক্রম করতে লাগল।

কিছু দূর এগিয়ে কিটি গেল তার বন্ধু মারিয়া লুকাসকে ডাকতে। সুতরাং এলিজাবেথ ডার্সির সঙ্গে নিভৃত হ'ল। এলিজাবেথ এ সুবর্ণ-সুযোগের অপব্যবহার করতে চাইলে না। দুরু-দুরু বুকে সাহস সঞ্চয় করে সে বললে—'জানেন, আমি ভারী স্বার্থপর মেয়ে। নিজের আরামের জন্য অন্যের মনে ব্যথা দিতে আমার একটুও বাধে না। কিন্তু আমার বোন লিডিয়ার জন্যে আপনি যা করেছেন তার জন্য সহস্র ধন্যবাদ আপনাকে। যেদিন থেকে আমি আপনার মহানুভবতার কথা জেনেছি, আমি এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করেছি, যখন আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আপনাকে জানাতে পারব, এ আমার পরম সৌভাগ্য।'

ডার্সি কিছুটা বিচলিত বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'ভারী লজ্জিত বোধ করলাম। আমি কোন দিন ভাবতে পারিনি যে আপনার মেসো মশায় এমন ভাবে গোপন কথা ফাঁস করে দেবেন। কী আশ্চর্য, আমি ত ভাবতেই পারি না।'

'সে যাই হোক, শুধু নিজের তরফ থেকেই নয়, আমাদের পরিবারের সকলের পক্ষ থেকেই আমি আপনাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আপনি না থাকলে আমাদের পরিবারের সুনামের যে কী দুর্দশা হত, ভেবেই পাই না। লিডিয়ারই বা কি যে হোত?'

'যদি সত্যি ধন্যবাদই দেবেন' বললে ডার্সি, 'তবে নিজের তরফ থেকেই দিন। আমি যা করেছি, তা আপনাকে সুখী করার জন্যই করেছি। আপনার পরিবারের পক্ষে আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকার কোন অর্থই হয় না। তাঁদের প্রতি আমার যত শ্রদ্ধাই থাক, আপনিই আমার সকল কর্মের মূল প্রেরণা তা অস্বীকার করব না।'

ডার্সির কথার ভঙ্গিমায় নিজেকে হারিয়ে ফেললে এলিজাবেথ। ডার্সি পুনর্বার বললে—'আমার মন নিয়ে আপনি যে ভাবে ছিনিমিনি খেলেছেন তা আর আমার সহ্য হয় না। আমি আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, গত এপ্রিল মাসে আমার মনোভাব যা ছিল তার বিন্দু মাত্র পরিবর্তন আজো ঘটেনি। আপনার মুখের একটি মাত্র কথায় আমি চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে যাব।'

পুরুষের এই আত্মসমর্পণে নারী ধৈর্যহারা হয়ে গেল। কতক্ষণ ধরে সে কথা কইতে পারলে না। তার পর এক সময় তার চিত্ত-সমুদ্রে জোয়ার এল। কল-কল ধ্বনিতে হৃদয় হয়ে উঠল মুখর। এপ্রিল মাসে একদিন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এলিজাবেথ নির্মম হয়ে। কিন্তু দিনে দিনে সেই প্রত্যাখ্যানের ব্যথা তার নিজের হৃদয়কেই দুঃখ দিয়েছে। তার পর ঘটে গেছে অনেক বিবর্তন তার মনের জগতে। এখন ভালবাসাই হয়েছে তার ধ্যান-জ্ঞান-জপ। ডার্সিই তার ধ্যেয়। তার পরম আরাধ্য। তার প্রেমের প্রতীক।

এ কথায় ডার্সিও নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারলে না। এলিজাবেথকে সে পরম আগ্রহে কাছে টেনে নিলে।

এক সময় ডার্সি তাকে বললে—'লেডী ক্যাথারিনের মুখে তোমার কথা শুনে অবধি আমার মনে নূতন আশার সঞ্চার হল। আমার বিরুদ্ধে সত্যি যদি মনে তোমার বিরাগ থাকত, তবে অমন আগ্রহের সঙ্গে তুমি তাঁর প্রত্যেকটি কথার জবাব দিতে না।'

তার পর দুই জনে অনেক গল্প হল। অবিরাম অবিশ্রান্ত গল্পের প্রবাহে কত সুখ-দুঃখময় স্মৃতির পুনরুদ্ঘাটন। মান-অভিমানের পালা চলল। পরস্পর ভুল-বোঝাবুঝির ফলে কে কত দুঃখ-অশান্তি ভোগ করেছে তার সবিস্তার বর্ণনায় কেউই কার্পণ্য করলে না।

'তোমার কাছে আমার যে কত ঋণ এলিজা, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না প্রিয়তমা! তুমি নিষ্ঠুরের মত আমায় দুঃখ দিয়েছিলে, দিয়েছিলে আঘাত আমার মনের নিভৃত চেতনায়। যা দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিলে আমায়। দাম্ভিক, আত্মচেতন, আত্মকেন্দ্রিক ছিলাম আমি। নিজের মধ্যে একটা প্রচণ্ড অহংবোধ ছিল যা নিজেকে সর্বজয়ী মনে করত। কিন্তু তুমি যেদিন এলে আমার পথে, দেখলাম কত দুর্বল আমি। সত্যিকারের বিশ্ববিজয়িনী নারীকে জয় করার কোন ঐশ্বর্যই আমার ছিল না। সেদিন আমি নিজেকে নূতন করে আবিষ্কার করলাম। তুমিই আমায় মানুষ করে তুললে এলিজা।'

এক সময় দু'জনেরই খেয়াল হল যে, গল্পে গল্পে তারা বাড়ী থেকে বহু দূর চলে এসেছে। ফেরার সময় প্রায় পার হয়ে যায়।

দ্রুত-পায়ে দু'জনে বাড়ীর দিকে রওনা হল। বিংলে ও জেনের কথা নিয়ে তারা দু'জনেই পরম আহ্লাদ করলে। এ তাদের ভালই হল। দুই বন্ধু এমন এক অচ্ছেদ্য পারিবারিক বন্ধনে জড়িয়ে গেল যে, তাদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হয়ে উঠল। জেন ও এলিজাবেথের মধ্যে যে-গভীর অন্তরঙ্গতা তা এই দুই বন্ধুর মধ্যেও সঞ্জাত হয়ে উঠবে, তাতে কারুরই সন্দেহ রইল না।

বাড়ীর হল-ঘরের কাছে এসে দু'জনে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার পর যেন নূতন মানুষের মত খাওয়ার টেবিলে যেখানে পরিবারের সকলে সমবেত হয়ে তাদের প্রতীক্ষা করছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল।

এই দু'টি প্রাণীর গভীর মনের কথা বোঝবার কোন সূত্র রইল না বাইরে। তারা যেন চিরদিনের অপরিচিত দু'টি নারী-পুরুষ।

[ক্রমশঃ।

—অনুবাদক : শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

গল্প হলেও সত্যি

ভাই গম্ভীর হয়ে চিলেকোটায় ব'সে আছে দেখে বোন বললে,—হ্যাঁ দাদা, তুই এখানে এমন ব'সে আছিস্ কেন?

ভাই বললে,—বেশী কথা বলেছি, সেই জন্যে মা বকেছে। বলেছে, গম্ভীর হয়ে থাকা অভ্যাস করতে, নয় তো ভবিষ্যতে বেগ পেতে হবে।

বোন ক্ষোভের সঙ্গে বললে,—মা-ও যেমন! প্রথমে আমাদের কথা বলতে শিখিয়ে এখন চুপ করতে বললে কখনও চলে? যখন আমরা কথা বলতাম না, সেই ছেলেবেলায় কথা বলতে কে শিখিয়েছিল?

বাস্তুহারা

পরিমল গোস্বামী

একটি শহর এই কাহিনীর রঙ্গস্থল, কিন্তু কোন্ শহর তার পরিচয় নেই, চেনাও যাবে না গল্প পড়ে। তদুপরি এর নায়ক-নায়িকা কোন্ সমাজের তাও লেখককে বার বার বলে দিতে হয়েছে, চেনা যাবে না ভয়ে। সে জন্যে পাঠকের মনে হতে পারে কাহিনীটি আমি সিনেমার জন্য রচনা করছি, কিন্তু আমার নিজের তা উদ্দেশ্য নয়। তবে আমার সন্দেহ নেই যে অনেক সিনেমাকার এটি পড়ে প্রলুব্ধ হতে পারেন। এ গল্পের এইটুকুই মাত্র ভূমিকা। আসল গল্পটি এই :

মস্ত বড় বাড়ি। সে এক বিরাট ব্যাপার। ধারণা করা শক্ত। আগাগোড়া মার্বেলের কাজ। কিন্তু এ বাড়ির সব চেয়ে আকর্ষণীয় এর সিঁড়ি। অতি প্রকাণ্ড, চারখানা ফোর-সীটার পাশাপাশি চলতে পারে অবশ্য যদি সে রকম ব্যবস্থা করা যায়। সিঁড়ি মূল্যবান কার্পেটে মোড়া। দোতলায় উঠতে সিঁড়ির মাঝখানে বিশ্রামের জায়গা। সেখান থেকে ডান ধারে বেঁকে আটটি মাত্র ধাপ পার হলেই দোতলা। নিচে, সিঁড়ি যেখানে শুরু হল, সেখানটা হচ্ছে অভ্যাগতদের অপেক্ষা করবার জায়গা। বহু আসন চক্রাকারে সাজানো, মাঝখানে বড় গোল টেবিল। দূরে দূরে আরও সব বিচিত্র আসবাবপত্র। এক কোণে প্রকাণ্ড এক পিয়ানো—গ্র্যাণ্ড আপরাইট।

এত বড় বাড়ি, এত পরিপাটি, কিন্তু মানুষ মাত্র একটি—ত্রিশ বছরের একটি মাত্র যুবক, নাম রাজেন্দ্রকুমার। গায়ে সর্বদা ড্রেসিং গাউন।

রাজেন্দ্র স্বভাবতই বেকার। কাজ পায়নি বলে নয়, কাজ তার দরকার নেই। কি যে সে চায় তা সে জানে না, অথচ কিছু যে চায় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কখনো একখানা বই খুলে বসে (দশটি আলমারি বইতে বোঝাই), কখনো আয়নার সামনে (মানুষ-সমান কত যে আয়না যেখানে-সেখানে) চুল ব্রাশ করে, কখনো ছবি আঁকতে বসে, কিন্তু কোনোটাতেই তার মন বসে না। চেকবই পকেটে নিয়ে ঘোরে, যখন-তখন চেক লেখে, সই করে, কিন্তু তখনই সেটা ছিঁড়ে ফেলে। কাকে দেবে চেক? বই সামনে নিয়ে গান গায়, আয়নার সামনে দাড়ি কামাতে-কামাতে নাচে, পিয়ানো বাজাতে-বাজাতে সিগারেট খায়। কখনো ডাকে ভজাকে। ভজা পরিচারক। বুড়ো মানুষ, ফতুয়া গায়ে, খাটো ধুতি পরা, কাঁধে গামছা, সর্বদা একটা গার্জিয়ান-গার্জিয়ান ভাব।

আর একটি দৃশ্য। রাজেন্দ্র-ভবন থেকে কিছু দূরে একটি দোকানে নতুন সাইনবোর্ড টাঙানো হচ্ছে—তাতে ইংরেজীতে লেখা "ওয়াইনস অ্যাণ্ড ফুড।" পথচারী কেউ কেউ সে দিকে চেয়ে দেখছে, কিন্তু এ জন্যে কারো কোনো ভাবনা নেই মনে হচ্ছে। কিন্তু দোকানের ভিতরে এক কক্ষে দোকানের ইহুদি মালিক জুডা সম্পূর্ণ ভাবনাশূন্য নয়। এ পাড়ায় মদ খাবার লোক আছে কি না সে জানে না, মাত্র সহজাত সংস্কার ও সাম্প্রতিক কিছু অভিজ্ঞতা তার ভরসা। বাপ-মা-হারা এলিজা জুডার সহকারিণী। জুডার বড় ভাইয়ের মেয়ে। সে বলছে, "এখানে দোকান খোলা এক বিরাট গ্যাম্‌ব্লিং হল, হয় তো দু'দিনেই বন্ধ করে পালাতে হবে।"

জুডা বলছে, "এ বুড়োর মন কিন্তু তা বলে না। আমার গণৎকারি যদি ঠিক হয় তা হলে দেখবি দোকান ভাল ভাবেই চলবে।"

মুখে বলছে বটে কিন্তু তবু জুডার মনে কিছু সন্দেহ আছে, সে খুব নিশ্চিত নয়। তবে পরীক্ষা করতে বাধা কি এটাই তার মনের ভাব। এখন এলিজা যদি একটু উৎসাহ দেয় তবেই বৃদ্ধ জুডার মনে ভরসা জাগে। এলিজা উৎসাহ দেবে কি না সে কথা এখন থাক। এখন আমরা আবার ফিরে যাই রাজেন্দ্র-ভবনে।

দুদিন পার হয়ে গেছে এর মধ্যে। যথারীতি ড্রেসিং গাউন সজ্জিত রাজেন্দ্র দোতলার ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো মাঝপথে, সেখান থেকে সিঁড়ির দ্বিতীয় পর্যায়। মনে যখন একটু স্ফূর্তির উদয় হয় তখন সে আর এই দ্বিতীয় পর্যায়ে সিঁড়ির ধাপে পা দেয় না, ঝকঝকে পালিশ রেলিংএর উপর ঘোড়ার মতো চেপে সড়াৎ করে নিচে নেমে আসে। আজ অকারণ একটা আনন্দে নেমে আসছিল সেই ভাবে—কিন্তু নিচে পৌঁছেই এমন এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হল যে লজ্জায়, সঙ্কোচে, বিস্ময়ে এবং সম্ভবত

কিছু পরিমাণ ভয়ে একেবারে কেঁচোর মতো হয়ে গেল। একটি ভদ্র যুবক সিঁড়ির রেলিংএ শ্লিপ করে একটি ছোট বালকের মতো নিচে নেমে আসছে এ দৃশ্য আর যাকেই হোক, এক জন অপরিচিত যুবতীকে দেখাতে হবে তা সে কল্পনাই করতে পারেনি। তার মুখখানা হঠাৎ লজ্জায় বোকার মতো দেখাতে লাগল। কিন্তু এ কোন্ রাজকন্যার আবির্ভাব ঘটল তার সম্মুখে? সবুজ রঙের সিল্কের শাড়ীর পর্ণপুটে শিশিরভেজা লাবণ্য নিয়ে এ কোন্ বসরার গোলাপ ফুটে উঠল তার আঙিনায়?

রাজকন্যার মুখে মৃদু হাসি। মধুর ভঙ্গীতে নমস্কার জানিয়ে বলল, "আমি বাস্তহারা, আমার নাম হানা, হাসন্থ হানা।"

রাজেন্দ্র ঢোঁক গিলে বলল, "আপনি বা—বা-স্ত—"

হানা হেসে বলল, "বিশ্বাস হয় না বুঝি? অবশ্য আপনার দোষ নেই, সবাই বাস্তহারার মাত্র একটি চেহারাই জানে, অর্থাৎ বাইরের দিক দিয়ে যে সর্বহারা। কিন্তু সে কথা যাক, কেন না হঠাৎ এখন সব বুঝিয়ে বলা শক্ত, হয়তো আপনি এখন কাজে বেরিয়ে যাচ্ছেন।"

রাজেন্দ্র এতক্ষণে কিছু প্রকৃতিস্থ হয়েছে, সে সে-কথার ঘোর প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, "না আপনি বসুন। বাস্তহারা কথাটার যে দু'মুখো অর্থ থাকতে পারে তা আমি আগে ভাবিনি।"

রাজেন্দ্রের এই অনভিজ্ঞতার পথে হানা সহজেই তার অন্তরে প্রবেশ করে গেল। তার মনের অন্ধকার কক্ষে-কক্ষে হানা যেন আলো জ্বালাতে লাগল তার মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত কথার ঝলকে। রাজেন্দ্র যত বিস্মিত হতে লাগল তত তার চেহারা ক্রমে বোকার মতো দেখাতে লাগল। আলাপ শেষে রাজেন্দ্র বুঝতে পারল মনের ভিতরে একটা বাস্ত আছে এবং সেই বাস্ত থেকে চ্যুত হলেও বাস্তহারা হওয়া যায়। এই সংজ্ঞা অনুসারেই হানা বাস্তহারা, এবং রাজেন্দ্রেরও মনের দিক দিয়ে কোথাও কোনো আশ্রয় না থাকাতে সেও বাস্তহারা। রাজেন্দ্র খুব খুশি হয়ে পকেট থেকে চেকবই নিয়ে লিখতে শুরু করল—বলল, "আপাতত কত পেলে আপনি খুশি হবেন?"

হানা বলল," টাকা চাই কে বলেছে? টাকা চাই না, মানুষ চাই। টাকা দেওয়ার লোক যথেষ্ট আছে, আমি এসেছি মানুষ খুঁজতে। সংসারে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাস্তহারা নামক এক বিরাট সম্প্রদায় আছে, তাদের তো টাকা দিয়ে কিছু করা যায় না। ধরুন আপনার তো যথেষ্ট টাকা আছে, কিন্তু তবু আপনি বাস্তহারা। তাই বলছিলাম আসুন আমরা এমন একটা প্ল্যান করি যাতে সত্যই এদের জন্যে কিছু করা যায়। লক্ষ্মীটি, আমার কথাটা ভাবতে থাকুন, আমি আবার কাল আসব। কেমন?"

হানা বিদায় নিয়ে গেছে কখন রাজেন্দ্রের খেয়াল নেই। সমস্ত আবহাওয়া যেন একটা মধুর মাদক গন্ধে ভরে উঠেছে। রাজেন্দ্র স্বপ্ন দেখছে, তার মন দেহ থেকে মুক্ত হয়ে গেছে, সে তার দিকে চেয়ে আছে। মনের মাথায় বোঝা, পিঠে বোঝা, ঘরছাড়া আশ্রয়প্রার্থীর মতো সে প্রান্তর-পথ পার হয়ে চলেছে। আশ্রয় চাই, কিন্তু কে দেবে?

ভজা দূর থেকে এতক্ষণ সব লক্ষ্য করছিল, এবারে ধীরে-ধীরে কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, "বাস্তহারা কে খোকাবাবু? কথাটা কানে এলো।

রাজেন্দ্র চমকিত হল ভজার গলা শুনে। বলল, "আমি রে, আমি।"

"তিন-পুরুষের বাস্ত থাকতে বাস্তহারা? ও মেয়ে তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে বলে দিচ্ছি। সাবধানে থেকো; আর কখনো ওকে এখানে ঢুকতে দেব না।"

রাজেন্দ্র বলল, "না রে না—ভয় নেই। আমি বাস্তহারা, হানা বাস্তহারা, তুই বাস্তহারা—দুনিয়ায় যে যেখানে আছে সবাই বাস্তহারা—আজ কি আনন্দ, কি যে ঘটে গেল রে ভজা, তুই নিতান্তই ভজা, তাই বুঝতে পারছিস না, বুঝতে চেষ্টাও করিস না।"—বলতে বলতে রাজেন্দ্র ছুটে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল এবং রেলিং-এর উপর দিয়ে সড়াৎ করে নিচে নেমে এসে পাগলের মতো পিয়ানো বাজাতে লাগল।

পরদিন আবার ওদের দেখা হল। এখন ওরা কথা বলার চেয়ে গান গাওয়াই বেশি পছন্দ করে। যখন-তখন গান গায়। ফুল গাছের ডাল ধরে গান গায়। সিঁড়ি ও আসবাবপত্রের আড়ালে-আড়ালে লুকোচুরি খেলার ভঙ্গীতে গান গায়, তার পর যখন হানা বিদায় নেয় তখন সিঁড়ির রেলিংএ যথারীতি স্লিপ খেতে থাকে।

দিন সাতেকের মধ্যে রাজেন্দ্রের জীবনে এবং মনোজগতে কি যে বিপর্যয় ঘটে গেল! হানা টাকা চায় না (যদিও এখন মাঝে-মাঝে নেয়), চেক লিখতে গেলেই থামিয়ে দেয় (সর্বদা ক্যাশ নেয়)—হানা মানুষ চায়। রাজেন্দ্রই কি সেই মানুষ? আগে ছিল না, এখন অবশ্যই হয়েছে। তার বাস্তহারা সত্তাটি আবিষ্কার হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মানুষ হয়েছে।

রাজেন্দ্র যথাসম্ভব শক্তি সংগ্রহ করতে লাগল, আত্মসমর্পণের প্রস্তাব সে আজই করবে। একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, কিন্তু উপায় কি? তা ভিন্ন সময়ের কৃত্রিম বিস্তার একটা সংস্কার মাত্র, অন্তরের রাজ্যে এক মুহূর্তে এক বছর পার হওয়া যায়, সে কথা কি মিথ্যা? কোনো অপরিচিত ছেলে ও মেয়ের দেখা হল। ছেলে বলল, 'তোমাকে আমার ভাল লাগছে', মেয়ে বলল, 'আমারও লাগছে'--ছেলে তৎক্ষণাৎ বলল, 'তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই', মেয়ে বলল, 'চল।' এতে অন্যায় কিছু নেই। এক জনের পছন্দ হলে অন্য জন যদি রাজি না হয় সংসারে মারাত্মক বিষ, দড়ি-কলসী অথবা চলন্ত গাড়ির চাকা যথেষ্ট আছে। অতএব আজই সন্ধ্যায়।

সন্ধ্যায় যথারীতি ড্রেসিং গাউনে সজ্জিত রাজেন্দ্র হানার অপেক্ষায় স্লিপ খেয়ে নিচে নেমে এলো। প্রতিদিন সে ঘড়ি ধরে ঠিক ছটায় আসে। রাজেন্দ্রও ঠিক ছটার সময় নিচে নেমেছে, কিন্তু হানা কোথায়? ভজা একখানা খামে বন্ধ চিঠি এনে দিল রাজেন্দ্রের হাতে। রাজেন্দ্রের মুখে একটা ভয় ফুটে উঠল। সে তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়ে যা পড়ল তাতে তৎক্ষণাৎ তার হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হল না, কারণ কাহিনী এখানে শেষ হতে পারে না। চিঠিতে লেখা ছিল, "ক্ষমা চাই; কারণ, অসম্ভব। আমি চিরবিদায় নিচ্ছি। প্রিয়তম, আবার ক্ষমা চাই।"

রাজেন্দ্রকে উন্মাদ করার পক্ষে ঠিক এতখানি নিষ্ঠুরতার কোনো দরকার ছিল না। তবে মাত্রা কম হলেও প্রতিক্রিয়াটা একই হত সে কথা বলা বাহুল্য। মাত্রাধিক্যটা আমাদের চোখেই বেশি লাগছে।

রাজেন্দ চিঠি পড়ে ক্ষণকাল স্তম্ভিতবৎ দাঁড়িয়ে রইল, তার হাত-পা কাঁপতে লাগল, তার পর টলতে-টলতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডটা যেন ছিঁড়ে গেছে। এমনি অবস্থায় পথে পথে পাগলের মতো ঘুরল কিছুক্ষণ। তার পর হঠাৎ তার চোখে পড়ল মদের দোকানের সাইনবোর্ড। সে এর মধ্যে যেন একটা ইঙ্গিত পেয়ে গেল, যেন তার জন্যেই এ দোকান এখানে অপেক্ষা করছে।

রাজেন্দ্রকে যখন কয়েক জন লোক ধরাধরি করে এনে বাড়িতে পৌছে দিল তখন রাত বারোটা। ভজা ভয় পেয়ে গেল। রাজেন্দ্র জ্ঞানহারা মাতাল। এইবার ভজার জ্ঞান হারাবার পালা।

পরদিন সন্ধ্যায় তার জ্ঞান হল বহু চেষ্টার পর। সে বুঝতে পারল তার নিজের ঘরেই শুয়ে আছে সে। সব যেন স্বপ্ন, সব মরীচিকা। মদের তো আশ্চর্য শক্তি! সব ভুলিয়ে দেয়! তবে এসো সুরা দেবী, তুমিই আমাকে আশ্রয় দাও।

মদের দোকানের এই ইঙ্গিত পাঠক গোড়াতেই পেয়েছেন, রাজেন্দ্র পেল একটু দেরিতে। এক মরীচিকা-মরু পার হয়ে সে আর এক মরীচিকা-মরুতে প্রবেশ করল। এখন সে সর্বদা মদ খায়, নাচে, গায়। পিয়ানো বাজায়—যেমন সে আগে করত, কিন্তু তবু কত তফাৎ! এখন সে মৃত্যুপথযাত্রী। ডজন-ডজন বোতল আসে তার বাড়িতে। বন্ধুরা যারা খাব-খাব করছিল, এখন নিয়মিত এসে খায়, যারা গোপনে খেত কেউ জানত না, তারা সবাই এসে জোটে রাজেন্দ্রের কাছে। তবু তারা কত তফাৎ! তারা কেউ ব্যর্থ প্রেমিক নয়। রাজেন্দ্র কখনো দোকানে ঢোকে, বন্ধুরাও যায় তার সঙ্গে, কিন্তু বন্ধুরা অকম্পিত পায়ে যথাসময়ে সরে পড়ে, রাজেন্দ্রকে চ্যাংদোলায় ঘরে ফিরতে হয়। বন্ধুত্বের অকৃত্রিম দলিল স্বাক্ষরিত হয় সুরাদেবীর সঙ্গে। দোকানের চেহারা ফিরে যায় ক'দিনের মধ্যে।

সেদিন সন্ধ্যায় দোকানেই বসেছে রাজেন্দ্র বন্ধুদের সঙ্গে। বন্ধুরা একে একে উঠে গেছে, এখন সে একা। তার এখনও অনেক বাকী। সম্পূর্ণ পড়ে যাওয়া না পর্যন্ত সে মদ খাবে। মাঝে-মাঝে জড়িত স্বরে হানা—হানা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। হঠাৎ তার কানে এলো তার পাশের কেবিনে তারই দীর্ঘশ্বাসের প্রতিধ্বনি। কে যেন সেখানেও হানা—হানা করে কাঁদছে। শেষে চার দিকের সকল কেবিন থেকে ঐ একই কান্না শোনা যেতে লাগল। নিজ নিজ কক্ষ থেকে সবাই বেরিয়ে এলো টলতে-টলতে। সমবেদনায় বিগলিত হয়ে সবাই পরস্পর গলাগলি করে বসে পড়ল মেঝের উপর, এবং হানাকে ওরা প্রত্যেকেই কেন চায় কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা না করে (করার ক্ষমতা ছিল না) সবাই সমস্বরে কাঁদতে লাগল। তার পর সবাই একই দুঃখে দুঃখী, এটা অন্তর থেকে বুঝতে পেরে সবাই একসঙ্গে মদ খেতে লাগল।

প্রতিদিনের পৌনঃপুনিক এই ইতিহাস রাজেন্দ্রের একই, এর আর বর্ণনা করে লাভ নেই, কিন্তু এর পর আর একটি দৃশ্য এখানে উন্মোচন করা আবশ্যক।

মদের দোকানের মালিক জুডার কক্ষ। রাত একটা। জুডা ও এলিজার মধ্যে আলাপ চলছে।

জুডা। "কেমন, বলেছিলাম না আমার মন্ত্র খাটবে? তুই আমাকে বোকা ভেবেছিলি, বলেছিলি এখানে দোকান চলবে না। তবে এতে তোর বাহাদুরিও কম নয়। যে দশ জনকে এনেছিস তারা ও তাদের বন্ধু-বান্ধব মিলিয়ে দিন প্রায় দু'হাজার টাকা বিক্রি হচ্ছে। তোর বাংলা শেখা সার্থক, অভিনয় সার্থক।"

এলিজা। "কিন্তু কি করে বুঝেছিলে যে এই সব বাঙালী যুবক প্রেমে ব্যর্থ হলেই মদ খাবে?"

জুডা। "আমি অনেক বাংলা সিনেমা দেখেছি কি না, ভাল ভাল সব শিক্ষিত ছেলেদের যদি একবার প্রেমে ব্যর্থ করানো যায় তা হলে মদ তারা খাবেই।"

এলিজা। "তা এক রকম সত্যিই। তুমি আরও খুশি হবে দেখে যে, আমি তোমার দোকানের মূলধনও অনেকখানি সংগ্রহ করে ফেলেছি এর মধ্যে।"

এলিজা দশ হাজার টাকার নোট জুডার হাতে তুলে দিল।

জুডা আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল। বলল, "তোর হানা নামটিও বেশ সার্থক হয়েছে বলতে হবে।"

এলিজা বলল, "কেন? বহু জায়গায় হানা দিয়েছি বলে?"

জুডা হাসতে-হাসতে বলল, "তা এক রকম বটে। এইবার তুই সিনেমায় নামতে পারিস, আর আমার আপত্তি নেই। তোর বোম্বাই যাত্রা আজই ভোরের প্লেনে—টিকিট কেনা হয়ে গেছে।"

এর পর আরও একটি দৃশ্য বাকী আছে। এ দৃশ্যটি রাজেন্দ্র-ভবনে। রাজেন্দ্রের মৃতদেহের পাশে ডক্টর ভার্টিব্রেট এক্স-রে সরঞ্জাম নিয়ে বসে আছেন। তিনি ফিজিও-সাইকোলজি এবং সাইকো-ফিজিওলজি বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন বহু কাল! বর্ত্তমানে তিনি বাঙালী যুবকদের অকালমৃত্যুর কথা শুনলেই সেখানে এসে তাঁর পরীক্ষা চালান। সঙ্গে বহনযোগ্য এক্স-রে সেট থাকে। এক্স-রে ফোটো তোলা হয়ে গেছে, এবারে তিনি অদৃশ্য আলোয় স্ক্রীন ধরে উপস্থিত ডাক্তারদের সামনে রাজেন্দ্রের মেরুদণ্ডের ছবি দেখাচ্ছেন। বলছেন, "এই দেখুন এর মেরুদণ্ড নেই, সম্পূর্ণ গলে গেছে। অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু সত্য। কারণ জন্ম থেকেই এর মেরুদণ্ড শক্ত ছিল না, হাড়ের উপাদানগুলো জেলির মতো নরম ছিল, তার উপরে সামান্য শক্ত একটি আবরণ ছিল মাত্র। কিছু দিন ধরে আমি এক জাতীয় বাঙালী ছেলেকে লক্ষ্য করছি তাদের মেরুদণ্ড জন্মাবধি ঠিক এমনি নরম। বাংলা সিনেমার নায়ক হবার ঝোঁক তাদের অত্যন্ত বেশি। সিনেমার নায়করূপে যদি সে প্রেমে ব্যর্থ হয় এবং মদ খায় (সবাই বলে উঠলেন "যদি" নেই, খাবেই) তা হলে আর তাকে বাঁচানো যাবে না, কেন না বেশি মাত্রায় অ্যালকহলে এই জাতীয় মেরুদণ্ড ধীরে-ধীরে গলে যেতে থাকে ঠিক যেমন উগ্র অ্যাসিডে শক্ত ধাতু গলতে থাকে। অবশ্য এ ছেলেটি সিনেমায় যায়নি, তবে যাবার সম্ভাবনা ছিল ষোল আনা, দেখবেন অন্তত এর জীবন-কাহিনীটি সিনেমার হাত থেকে বাঁচানো শক্ত হবে।"

কথাটি মিথ্যা বলেননি তিনি। কারণ ডক্টর ভার্টিব্রেট ডাক্তারদের সঙ্গে বেরিয়ে আসতেই দেখেন সিঁড়ির গোড়ায় ডজন খানেক সিনেমা ডাইরেক্টর রাজেন্দ্রের জীবন-কাহিনীর কপিরাইট কিনবেন বলে এসে জড়ো হয়েছেন।

নারীনক্ষত্র

নারী দশে পরী, পনেরোয় সন্ন্যাসিনী, চল্লিশে দানবী এবং আশীতে রাক্ষসী।

নারীর মন এবং শীতের হাওয়া পরিবর্ত্তনশীল।

নারী যত কিছু শক্তি ধারণ করে জিহ্বায়।

নারীর কাজকর্ম্ম শেষ হতে চায় না।

নারীর উপদেশ যতই মূল্যহীন হোক, গ্রহণ না করা একান্তই মূর্খামি।

নারীর যে-বিষয়ে জ্ঞান থাকে না সে-বিষয়ে কথা বলে না।

নারী, কুকুর (অথবা গাধা) এবং বাদাম গাছকে যত বেশী মারাধরা করবে তত বেশী ভাল হয়ে যাবে।

নারীই পুরুষের যত দুঃখের মূল।

নারী এবং কুকুর কর্ণের মারফৎ পুরুষকে জাগিয়ে রাখে।

নারী এবং মুরগীকে অতিরিক্ত আলস্যে রাখলে শীঘ্র হারাতে হয়।

নারী এবং সঙ্গীতের বয়স ধার্য্য করা কখনও উচিত নয়।

নারী এবং নারীর খেয়ালখুশী বিপদজনক।

নারী সুরা, খেলা এবং বঞ্চনা সম্পত্তি নষ্ট করে, অভাব বর্দ্ধিত করে।

নারী সদাই যা করে পূর্ণমাত্রায়।

নারী হুইলশায়ারে জন্মায়, কাম্বারল্যাণ্ডে প্রতিপালিত হয়, বেডফোর্ডশায়ারে কালাতিপাত করে, স্বামীদের বাকিংহামে নিয়ে যায় এবং শ্রিউস্‌বেরীতে ইহলোক ত্যাগ করে।

নারী প্রয়োজনীয় অমঙ্গল।

নারী চার্চ্চে সন্ন্যাসিনী, পথে অপ্সরী, উনুনের ধারে দানবী এবং শয্যায় গরিলা।

নারী রাজনীতিতে নামলে কাচের দোকানে বানরীর অবস্থা হয়।

নারী যদিচ্ছা হাসতে এবং যদিচ্ছা কাঁদতে জানে।

—ইংরেজী প্রবাদ থেকে অনূদিত।

বুদ্ধদেব বসু

দ্বিতীয় খণ্ড

একটি বর্ষার সন্ধ্যা

পাঁচ বছর পরে আষাঢ়ের এক অপরাহ্ণ নিবিড় হ'য়ে নেমেছে সেই পুরানা পল্টনে। সেই—? না কি অন্য এক, অন্য কোনো—যা ছিলো তার স্মৃতি দিয়ে ভরা, যা হ'য়ে গেছে তার চিহ্ন মুছে-ফেলা, শুধু সেই একই নামের সূত্রে বাঁধা অন্য এক পুরানা পল্টন? আরো অনেক বাড়ি উঠেছে পাড়ায়: দোতলা বাড়ি, জাঁকালো বাড়ি, বাগানওলা, পরদা-ঘেরা, মার্বেল পিতলের নামের ফলকে চকচকে আত্মসচেতন। পাড়ার এই চকচকে ভাবটাই বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে এখন—যখন 'শহর' থেকে, শাঁখারিবাজার, তাঁতিবাজার ইসলামপুরের মিষ্টি স্যাঁৎসেঁতে পচা-পচা নেশা-ধরানো গন্ধে-ভরা পুরোনো দিনের ঢাকা থেকে কেউ আসে সেখানে—টাটকা চুনকাম-করা দেয়াল—কেননা, অধিকাংশ বাড়ি নতুন, আর তেমন পুরোনো কোনোটিই এখনো নয়—সদ্যসবুজ খড়খড়ি, ক্রেটোন কাপড়ের পরদার ফাঁকে ধূসর শীতল মসৃণ মেঝের পরিচ্ছন্ন আভাস;—সব মিলিয়ে নতুন; কিন্তু কৈশোরের, তারুণ্যের, অসমাপ্ত, সমাপ্য, নিজে-নিজে হ'তে থাকা এবং হ'য়ে ওঠা কোনো পদার্থের বেপথুমান অস্থির নতুনত্ব আর নয়—সদ্য-বানানো পণ্যের মতো নিশ্চিন্ত নতুন, সস্তকেনা জিনিশের মতো গম্ভীর চকচকে—পালিশ-করা, শেষ-করা, তৈরি। তৈরি হ'য়ে উঠেছে এতদিনে; শাদা ধুলোর রাস্তা এখন শান-বাঁধানো, পিচের প্রলেপে নির্ভরযোগ্য, মোড়ে-মোড়ে বিজলি-বাতির স্তব্ধতা, আর ঘরে—কোনো-কোনো ঘরে—এই সেদিনমাত্র গুজব যার শোনা গেলো, আর ইতিমধ্যেই সগৌরবে যে সমাগত, সেই রেডিওযন্ত্রে কলকাতার কলতান। না—এখন আর দৃষ্য কিছু নেই; জংলি প্রকৃতি পোষ মেনেছে মানুষের হাতে; এই পাড়া এখন স্থিত, সুস্থির, আরামদায়ক, সম্ভ্রান্ত, তার উপর রমনার মহিমা-ছোঁওয়ায় গরীয়ান; হাল আমলের, আধুনিক, ফ্যাশনযোগ্য; বদলি-হ'য়ে-আসা ডেপুটিবাবুর আকাঙ্ক্ষিত পীঠস্থান।

এই ইস্ত্রি-করা টেরি-কাটা পাড়ায়, ডেপুটি-মুন্সেফ-প্রোফেসর এবং পেন্সন-পাওয়াদের প্রতিবেশিতার মধ্যে, মৌলিনাথের ছোটো একতলাটি তেমন ভালো আর দেখায় না—একটু বেখাপ লাগে, যেন দলছাড়া, গোত্র-হারানো। এর মালিকের—দেখেই বোঝা যায়—তেমন যত্ন নেই বাড়ির উপর—কিংবা সামর্থ্য নেই; বৃষ্টি স'য়ে-স'য়ে কালশিরে পড়েছে দেয়ালে, কোথাও আবার কালোর গায়ে শ্যাওলা ধরেছে—আর সেই শ্যাওলার বুকে বেগনি রঙের যে-ছোট্ট ফুল হঠাৎ উঁকি দেয় এক-একদিন, পাশের বাড়ির ডালিয়া-ফোটা বাগানের সামনে কোন লজ্জায় সে মুখ তুলবে! এই পাশের বাড়িটা—শৌখিন, অর্বাচীন, দর্পিত দোতলা, সে তার বড়ো-বড়ো ঘর আর বারান্দা ছড়িয়ে মৌলির পুব দিকটাকে প্রায় পূর্ণগ্রাস করেছে; সেদিকে তাকালে মৌলিনাথ আজকাল দেখতে পায়,—দূর গাছপালার আবছা-সবুজ কালচেমতো পুঞ্জ আর দেখতে পায় না, ঐ বাড়িটার হালকা চটুল গোলাপি রংটাই দৃষ্টিসীমা জুড়ে থাকে।

কিন্তু দক্ষিণ—অন্তত দক্ষিণটা তার অবাধ আছে এখনো ; প্রান্তর পেরিয়ে ফুটবলের মাঠ, তারপর রেল-লাইন—তারও ওপারে লম্বা সরু বারান্দাওলা শহুরে বাড়ির চিলকোঠা পর্যন্ত চোখ ছুঁয়ে যাবার বাধা নেই ; আর এদিকে, চোখের সামনে, প্রান্তর থেমে পাড়া যেখানে আরম্ভ, সেখানে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে হাজার পাতায় অফুরন্ত অস্থির সেই স্থবির বলীয়ান বটগাছ। এখন, এই ছায়াচ্ছন্ন থমথমে বিকেলে, মৌলি ব'সে আছে দক্ষিণের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে—সেই ইজি-চেয়ারে, চিত্রা যেটাতে বসেছিলো। চেয়ারটি একটু মলিন হয়েছে এ-কয় বছরে, ঘরের অন্যান্য আসবাবও তা-ই ; দেয়াল একটু বিবর্ণ ; পুবের জানলায় পরদা দিতে হয়েছে, আর মেঝের যেখানটা খুব রোদ্দুর পায় গ্রীষ্মকালে—যেখানে নীল শাড়ি-পরা চিত্রা তার পা দুটি রেখেছিলো—সেখানে চুলের মতো অতি সূক্ষ্ম ফাটল নকশা এঁকে দিয়েছে সিমেন্টে। এ ছাড়া আর ঘরটির বিশেষ বদল হয়নি ; শুধু বইয়ের সংখ্যা বেড়েছে, মৌলির পুরোনো বেঁটে আলমারির পাশে আর-একটা এখন উঁচু এবং বেঢপ হ'য়ে দাঁড়িয়ে, তাছাড়া ছোটো শেলফ গোটা তিনেক—তাদেরও আকৃতিগত সামঞ্জস্য নেই ব'লে, এবং মোটের উপর বড্ড বেশি বই আছে ব'লে, ঘরটি আগের চাইতে ছোটো দেখায় এখন—হয়তো, অন্যদের কাছে, একটু গম্ভীরও লাগে।

চুপ ক'রে ব'সে আছে মৌলি। তার পায়ের কাছে মেঝের উপর প'ড়ে আছে দু-ঘণ্টা আগে পৌঁছনো কিন্তু মাত্রই একটু আগে উল্টিয়ে-দেখা এলোমেলো খবর-কাগজ। পাশে, বেতের ছোটো গোল টেবিলে দু-একটা বই, বাংলা মাসিকপত্র। তাকিয়ে-তাকিয়ে মৌলি দেখছিলো, কেমন বিশাল, কেমন সীমান্তহীন বিস্ফারিত হ'য়ে নেমে আসছে আষাঢ়ের সন্ধ্যা। মেঘের উপর মেঘ জমেছে আকাশে, রঙের উপর রং লেগেছে ; পরতে-পরতে, ভাঁজে-ভাঁজে, একই রঙের ক্রমশ-গাঢ়-হওয়া স্বরগ্রামের কী আশ্চর্য সংগতিসাধন এই আকাশ-ময় বিস্তীর্ণ অর্কেস্ট্রায়! শাদা মেঘের উপর ধোঁয়া মেঘ, ধোঁয়ার উপর নীল, নীলের উপর কালো। আশ্চর্য, অপরূপ, অলৌকিক—শূন্য দিয়ে গড়া এই রঙ্গমঞ্চ, আকাশ নামক কল্পনা দিয়ে বানানো এই নাটমন্দির—অলীক, ভিত্তিহীন, কিছুই না—অথচ বাস্তব, বিশ্বাস্য, দৃশ্যমান। ঐ দূরে, রেল-লাইনের ওপারে শহুরে চিলকোঠার উপর আকাশ যেখানে ঢালু হ'য়ে নেমেছে—কিংবা যেখানে তার উত্থানের আরম্ভ—সেখানে আকাশ নির্মেঘ নিরঞ্জন, কিংবা—যেহেতু কোনো নাম আমাদের দিতেই হবে—কিংবা শুভ্র, যাকে ঠিক শাদা বলে তাও নয়—ডিমের খোলার মতো নির্বিকার রঙের—কোমল, স্বচ্ছ, স্পর্শাতীত, পবিত্র—অস্পৃষ্ট ঋষ্যশৃঙ্গের চোখে বারাঙ্গনার উদ্‌ঘাটিত উরুর মতো অপাপবিদ্ধ। তারপর ধাপে-ধাপে উঠেছে মিশ্র স্বর, শ্রুতি, সুরসম্ভার, অতি কোমল রেখাব থেকে তীব্র নিখাদ পর্যন্ত ; বেঁকে-বেঁকে উঠেছে ছাই রং, ছায়া রং, ধূসর ; ধূসর একটি হৃদয়হরণ মীড় দিয়ে মিশে গেছে নীলের মধ্যে : নীল, হালকা-নীল, স্বপ্ন-নীল, গাঢ়-নীল—কোথাও একটু সবুজে ছোঁয়া—অরণ্য-পথে চুঁইয়ে-পড়া ভোরের মতো সবুজ ; আবার কোথাও, দুপুরবেলার বনচ্ছায়ার মতো মখমল-গভীর বেগনিতে ডোবানো ; তারপর সেই বেগনি থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে কালো, নিথর কালো, পুঞ্জীভূত—মৌলির চোখ যেখানে আর পৌঁছয় না, আকাশের সেই সব তুঙ্গ স্তূপে শিখরে-শিখরে পরিকীর্ণ—যাকে নষ্ট মেয়ে সুরঙ্গমা চেনে কিন্তু প্রিয়তমা মহিষী যাকে চেনে না, সেই প্রেমিক, ভয়াল, প্রেমাতুর, প্রার্থনীয় রাজার মতো ভাবনা-বাসনা-সব-ডোবানো অকূল অতল অপরিমাণ কালো। আর সেই কালোর বুকে—তিন লাইন ছেড়ে-দেয়া কোনো স্বপ্নে-পাওয়া অচিন্তনীয় মিলের মতো, কিংবা কবিতার ফিরে-আসা কিন্তু সমস্তটির অর্থ-বদলে-দেয়া ধুয়োর মতো, কিংবা—সুর যখন ব্যাকুল হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে নিজেকে প্রায় অসীমে হারায়, তখন শমের মুখে হঠাৎ-পড়া ফিরিয়ে-আনা মৃদঙ্গ-বোলের মতো—সেই ঘনকালোর বুকে আবার ভেসে আছে হালকা রং, ধোঁয়াটে শাদা অনিশ্চিত স্বচ্ছ মেঘ, যেন গগন ঠাকুরের মায়াবী কোনো জানলায় দেখা আলো—ঐ কালোকে আরো উজ্জ্বল ক'রে তুলে আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে তারই মধ্যে। দেখা যাচ্ছিলো মেঘেদের নড়াচড়া—মন্থর ধ্রুপদী তালে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে পরস্পরে মিশে যাওয়া, কোনো-এক অস্থির, অধৈর্যহীন, পরিবর্তমান স্থাপত্য-বিলাস—মিনার, খিলান, সোপান, গম্বুজ, বারান্দার পর অফুরন্ত বারান্দার ভাঙা-গড়া ;—তারপর, তাকিয়ে থাকতেই-থাকতেই, সব ভেঙে গেলো, মুছে গেলো, একাকার হ'লো কালোয় ; স্তব্ধ হ'লো গতি, হাওয়া বন্ধ ;—কম আলোয় আরো-বিস্তীর্ণ-দেখানো প্রান্তরের উপর, ছবির মতো নিস্পন্দ-হওয়া বটগাছটার উপর, সমস্ত রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষমাণ পৃথিবীর উপর, মেঘ তার জটায়ু-পাখা আদিগন্ত ছড়িয়ে দিয়ে প'ড়ে থাকলো। এখন আর কিছু নেই, আর-কিছু হবার নেই : শুধু বৃষ্টি।

—বৃষ্টি নামুক। মেঘ ফেটে যাক, দিগন্তকে ছিঁড়ে দিক হাওয়া, আকাশটাকে ফাটিয়ে দিয়ে বজ্র বেজে উঠুক। আ—মৌলি মনে-মনে ভাবলো—কী আনন্দ এইরকম সন্ধ্যায়, কী আনন্দ ঝড়বৃষ্টির সহচর বিরুদ্ধতাকে বুকে ক'রে বেরিয়ে পড়তে, ঘুরে বেড়াতে, এগিয়ে যেতে! কত দিন, কত রাত্রে এই বৃষ্টি তাকে ধ'রে ফেলেছে মাঠের মধ্যে ; একটু থামেনি সে, আশ্রয় খোঁজেনি, দ্রুত করেনি গতি ; কোনো-একটি ক্ষুদ্রতম অনিচ্ছায়, এমনকি কোনো বিস্ময়ের ভঙ্গিতেও সেই নির্জন মিলনের গৌরবহানি করেনি ; শুধু, যখন তার চুল বেয়ে জলের ধারা ঠোঁটে নেমেছে আর গায়ের জামাটা লেপটে গেছে পিঠের চামড়ায়, তখন শুধু ভিতরে-ভিতরে কেঁপেছে, বৃষ্টির প্রণয়প্লাবনের আনন্দে কেঁপেছে, অন্ধকারে হাওয়ায় শীৎকারে শিউরে উঠেছে সমস্ত শরীরে। সেই শিহরণ—যদিও বৃষ্টির আগে সব এখন স্তব্ধ, আর মৌলি ব'সে আছে ঘরের মধ্যে আরামচেয়ারে—সেই তীক্ষ্ণ হাওয়ার ঠাণ্ডা অথচ বুকের মধ্যে উষ্ণ ক'রে তোলা শিহরণ ক্ষণিকের জন্য অনুভব করলো মৌলি, যেন কোনো পাগল অভিসার বিদ্যুতের মতো চমকে দিলো তার শরীরে—তারপরেই মিলিয়ে গেলো, ফুরিয়ে গেলো। আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে আনলো সে, একবার তাকালো ঘরের চারদিকে, যেখানে সবই আরামদায়ক, সুব্যবস্থিত, তারই সুবিধের খাপে-খাপে সব বসানো—যেখানে কিছুই তাকে বাধা দেয় না, কোথাও কিছু প্রতিকূল নেই।

ডাকের চিঠি হাতে ক'রে তার মা ঘরে এলেন। এ-কয় বছরে

একটু রোগা হয়েছেন ভদ্রমহিলা, বয়সের ছাপ পড়েছে মুখে, চোখের তলাকার চামড়ায় সূক্ষ্ম রেখা পড়েছে যা আগে ছিলো না। মৌলি তাঁর দিকে না-তাকিয়েই চিঠিগুলি হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলো একবার—তার পাব্লিশার দাস লাইব্রেরির খাম, তার সাহিত্যিক বন্ধু বিদ্যুত সেনের ছাপার মতো হাতের লেখা, আরো দু-একটা বার প্রেরকের নাম আন্দাজ করা যায় না—না-খুলেই বেতের টেবিলে রেখে দিলো।

মা জিগেস করলেন, 'চিঠি পড়লি না?'

'পড়বো।'

মা একটু অবাক হ'য়ে ছেলের দিকে তাকালেন। আর সত্যিও, এই উদাসীনতা, টাটকা-পাওয়া বার্তা বিষয়ে এই নিঃস্পৃহ ভঙ্গি—এটা মৌলির পক্ষে অ-সাধারণ, ঠিক স্বাভাবিক নয়, যে তাকে একটুও চেনে তার চোখেই লক্ষ্যণীয়। অভ্যাস তার একেবারেই উল্টো। সারাদিনের মধ্যে এই সময়টাই তার সবচেয়ে ভালো লাগে আজকাল, এই বিকেলবেলাটা, যখন সে ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরেছে, যে-কাজের কোনো অর্থ নেই তার কাছে সেই কাজ সেদিনের মতো চুকিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরেছে, আর তার খানিক পরেই হাতে পেয়েছে সেদিনের ডাক—কলকাতার চিঠি, অন্য কত নাম-শোনা কি নাম-না-শোনা শহরের, যে-পৃথিবী অনেক বড়ো সেই পৃথিবীর স্পর্শ পেয়েছে, যখন সে মুক্তি পেয়েছে অন্য এক বৃহত্তর জগতে। সেটাই তার পক্ষে প্রথাগত, স্বভাবসিদ্ধ—অধীর হাতে খাম খোলা, প্রথম বার চোখটাকে শুধু দৌড়িয়ে এনে পরের বারে মন দিয়ে পড়া, তারপর সেদিনই সন্ধ্যায়, কিংবা শোবার আগে রাত্রে ব'সে জবাব লেখা—যাতে পরের দিনের ডাক ধরতে পারে, কেননা এই পদ্মা-পেরোনো শহরে সভ্য জগতের নিয়ম উল্টিয়ে চিঠিপত্র পৌঁছয় বিকেলে এবং যাত্রা করে পূর্বাহ্ণে। প্রায় সব চিঠিরই জবাব দেয় সে, অপরিচিত পাঠকেরও—অনেকেই তারা পাঠিকা—ইতিমধ্যেই খ্যাতির উপজাতক এ-সব চিঠিপত্র সে পাচ্ছে কিছু-কিছু—যে-চিঠিতে অমুক লেখা ভালো লেগেছে এ ছাড়া আর কথা নেই, তারও কোনো উত্তর না-দিলে তার শান্তি হয় না। যে-কোনো, যে-কোনো কিছু, যা সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা জড়িত তার সত্যিকার কাজের, তার সত্যিকার জীবনের সঙ্গে। সেদিকে মন তাকে দিতেই হবে—কিছুই সেখানে তুচ্ছ নয়, ভানেরও মূল্য আছে সেখানে—সেখানে তার চরম মন তাকে দিতেই হবে, নয়তো তার অস্তিত্বটা আছে কেন।

সাধারণত এই রকমই মনে হয় তার—অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্তও, এই রকমই মনে হ'তো। কিন্তু সম্প্রতি মাঝে-মাঝে এমন হচ্ছে যে এই উৎসাহ, এই তাকে অন্ধ বেগে টেনে-নিয়ে-চলা প্রেরণা, তাতে হঠাৎ যেন গুমোট ক'রে আসে, আজকের এই মেঘে ঢাকা বেলার মতোই থমথমে, আলো নেই, হাওয়া নেই, কিন্তু বাঁধন-ছেঁড়া বর্ষণেরও যেন আশা নেই। এই তার অভ্যাসের আরাম, মা'র হাতের যত্নে রাখা দৈনন্দিন জীবন, রীতিমতোই উল্লেখ্য এবং বহির্জগতে আলোচিত তার কৃতিত্ব—এ-সবের অন্তরালে, যেন পূর্ণস্বাস্থ্যে প্রচ্ছন্ন কোনো বীজাণু, সুস্থতার কান্তি নকল ক'রে লুকিয়ে-থাকা কোনো সূক্ষ্ম রোগ, এই তার সুখী এবং আত্মস্থ জীবনের অন্তরালে মৌলিকে কামড়ে আছে, তাকে কুঁড়ে খাচ্ছে—কী তার নাম দেবে সে জানে না—অতৃপ্তি? অশান্তি? ব্যর্থতাবোধ? সেটা যা-ই হোক সেটা আছে, কাজ ক'রে যাচ্ছে ভিতরে-ভিতরে; সেটা কখনো দেখা দেয় মিষ্টি-মিষ্টি কবিত্বময় মনখারাপের চেহারা নিয়ে; তখন সে এমন কোনো বিষাদে-ভরা ব্যাকুল কবিতা লিখে ফেলে যার ফলে কলকাতার কোনো সম্পাদকের কিংবা এলাহাবাদের কোনো সিকতাকণার চিঠি চ'লে আসে তার কাছে;—আবার কখনো এ-সব অপরিচিতের অভিবাদনের ফলেই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে মনে, আহত আত্মাভিমানের জ্বালা, যা চায় তা অত্যন্ত বেশি সহজে পেয়েই সে ঠ'কে গেলো, এই সন্দেহ ছোবল মারে তার মনের মধ্যে—তখন সে অবশ হ'য়ে যায়, অক্ষম, যেমন আজকের এই ঘনায়মান মেঘলা বিকেলে—একখানা চিঠি খুলতেও তার হাত ওঠে না তখন, শুধু শোনে, মনে-মনে, কানে-কানে শোনে, কোন এক শব্দহীন অট্টহাসির উপহাস চুরমার ক'রে দিচ্ছে তার সাতাশ বছরের জীবনটাকে।

সাতাশ বছর! এক-এক সময় শুধু এই চিন্তাই পাথর হ'য়ে চেপে ব'সে তার বুকের উপর, যে বয়স তার সাতাশ হ'লো। মাত্র সাতাশ, ইতিমধ্যেই সাতাশ, কী দারুণ বার্ধক্যের মতো, এই সাতাশ! জীবনের পূর্ণকাল কি ইতিমধ্যেই কাটায়নি সে? সমাপ্তির প্রান্তে এসে কি পৌঁছয়নি? অভিজ্ঞতার দীর্ঘ পথ পার হ'য়ে কি আসেনি—মানুষের মহিমা, মানুষের ইন্দ্রিয়-বন্দী অসহায় তুচ্ছতা, সব কি উপলব্ধি করেনি নিজের মধ্যে, জানেনি আনন্দ, হৃদয়প্লাবী আহ্লাদ—জানেনি তৃষ্ণা, বুক-ফাটা তৃষ্ণায় জলের দিকে ছুটে-ছুটে বালুর মধ্যে মুখ থুবড়ে জ্ব'লে মরা, তাও কি সে জানেনি? আরো যত বছর সামনে প'ড়ে আছে, আরো যত দীর্ঘ দিন তাকে বাঁচতে হবে এখনো—কী তারা দিতে পারে, কী নতুন আনতে পারে তারা, যা-কিছু হবে সবই কি আগে হ'য়ে যায়নি, যা-কিছু নতুন সবই কি পুরোনোর পুনরাবৃত্তি নয়? যখন ষোলো ছিলো, সতেরো ছিলো, উথালপাথাল উনিশ-কুড়ি ছিলো, তখন এই পঁচিশ-পেরোনো বছরগুলির দিকে কত আশার দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছে, কত উজ্জ্বল রঙে এঁকেছে তাদের—পরিণত, প্রজ্ঞান, যে-কোনো দিকের যে-কোনো হাওয়ায় ছিন্নভিন্ন, নয় আর, কোনো এক অচঞ্চল-আলো-জ্বলা রুদ্ধ ঘরে নিবিষ্ট—আরম্ভের জন্য, এতদিনে আরম্ভের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু কী হ'লো? কয়েকখানা বই লিখেছে সে, সে-সব বই ভালো বলছে লোকে; সে যা-কিছু লেখে তা-ই ছাপা হচ্ছে; নিন্দার দ্বারা, নিয়মিত, ক্রুদ্ধ, সুপরিচালিত নিন্দার দ্বারা তাকে সম্মান করছে কেউ-কেউ;—হঠাৎ তার কোনো-একটা লেখা, যা সে লিখেছিলো তার বিগত যৌবনে কখনো শুধু মন খারাপের ভার নামাতে, কিংবা হঠাৎ খেলাচ্ছলে শুধুমাত্র ইচ্ছে করেছে ব'লেই—তা-ই নিয়ে কী দুশ্চিন্তা সেই সব প্রৌঢ়বয়স্ক সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞজনের, মাসিকপত্রের গল্প পড়ার চাইতে আরো কিছু ভদ্রগোছের কাজেই যাঁদের ব্যস্ত থাকা উচিত। এই সব হয়েছে তার এর মধ্যে: এতদিনেও কিছুই তার হয়নি।

'দেখিস, কোনোটা হারিয়ে না যায়।' মৌলির মা চিঠিগুলোর উপর বই চাপা দিলেন।

যেন ভালো দেখাবে ব'লেই, কিংবা মা'র কাছে মুখরক্ষার জন্য, মৌলি হাত বাড়িয়ে বিদ্যুৎ সেনের চিঠিটা তুলে নিলো, খাম খুলে

প্রথম যেখানে চোখ পড়লো সেখানেই শুরু করলো পড়তে।···
'মুশকিলে পড়েছি। উপন্যাসটা আরম্ভ করেছিলুম শীতকালে জসিডি থেকে ফিরে। পৌষ মাসের সাঁওতাল পরগণায় গল্পটা সাজিয়েছিলুম। মাঝে ক-মাস ফেলে রাখার পর এখন আবার লিখতে গিয়ে দেখি—কিছুতেই তো সুর মিলছে না। ঘোর বর্ষা এখন—রোজই কিছু বৃষ্টি হচ্ছে—আমাদের গলি সেদিন জল দাঁড়িয়ে খাল হ'য়ে গেলো। এর মধ্যে মাঠজোড়া কুয়াশা, ঘাসের পথে শিশির, আর রোদের দুপুরে কমলালেবু আর ফুলবাগানে প্রজাপতির ঝাঁক—এ-সব যেন খুঁজেই পাচ্ছি না মনের মধ্যে। তাই ভাবছি···'
মৌলি আর পড়লো না, খামে ভ'রে পকেটে রাখলো; পরে ভালো ক'রে পড়বে। আ—লেখা, লেখা! কী ক'রে লেখে মানুষে, জন্ম দেয়, সৃষ্টি করে! স্রষ্টা, ধাতা, বিধাতার প্রতিদ্বন্দ্বী, ঐশ্বরিক আদিশক্তির অপহারক! কী ক'রে পারে? শিল্পীরা তীব্র ক'রে বাঁচেন, চরম ক'রে বাঁচেন—এ-কথাই মৌলি ভেবেছে এতদিন—বাঁচার পেয়ালা পূর্ণ হ'য়ে যা উপচে পড়ে সে-ই তাঁদের সৃষ্টি, শুধু বেঁচে থেকে বাঁচার ধার মেটে না তাঁদের—হাজার মানুষের সমান জীবন্ত কোনো শেক্সপিয়র, বিশাল কোনো বীণার মতো দুরন্ত কোনো রবীন্দ্রনাথের। অর্থাৎ—মৌলি ভেবেছে এতদিন—অন্যান্য মানুষের চাইতে শিল্পীর প্রাণশক্তি, কামশক্তি অনেক বেশি প্রবল; বাঁচার কোনো পরদা-চড়ানো বৃহত্তর রূপেরই নাম শিল্পরচনা। কিন্তু তা-ই কি? শীতঋতুর কাব্যটি যে শুরু হ'য়েই ঠেকে গেলো, সে কি এই জন্যই নয় যে বিদ্যুৎ সেন যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পী এখনো হ'তে পারেনি? ঋতুর চপলতার ঊর্ধ্বে, আকাশ-বাতাসের মনোহরণ ছেলেখেলার ঊর্ধ্বে, স্থান, কাল, শরীর, শরীরের মধ্যে সীমিত এই জীবনেরও ঊর্ধ্বে কি উঠতে হবে না শিল্পীকে? বেঁচে থাকা, আর শিল্পী হওয়া, এ দুই কি একই সঙ্গে সম্ভব?

আর তুমি, মৌলিনাথ? মৌলি আবার বাইরে তাকালো, মৃদু একটু নিশ্বাস পড়লো তার। একটু আগে সব স্তব্ধ ছিলো, আর এখনই—জটিল কোন এঞ্জিনের রওনা হবার স্পন্দনের মতো—বটের পাতা একটু-একটু কাঁপছে।—না, না, তার কিছু হবে না: সে ভালোবাসে, সে লোভী, সে ভোগী। আকাশে মেঘ করলে তার মন-কেমন করে, আকাশে মেঘ জমলে সে কাজ ফেলে তাকিয়ে থাকে।

চোখ ফিরিয়ে এনে সে তার মা-কে একটা কথা বললো।

'শুনেছো, মা, বটগাছটা নাকি কাটিয়ে ফেলা হচ্ছে?'

মা ইতিমধ্যে তার টেবিল গোছাতে ব্যস্ত হয়েছিলেন, কাজ না-থামিয়ে বললেন, 'শুনছি তো!'

'পাড়ার কর্তারা লেখালেখি করছেন ম্যুনিসিপালিটিতে। বড্ড পাখি বসে, নোংরা করে।'

'সেদিন রাসবিহারীবাবুর বাড়ির ছাতে একটা শকুন—'

'শুনেছি। ভারি আস্পর্ধা শকুনটার—কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিষ্ট্যান্ট রাসবিহারী বাঁড়ুয্যে, তাঁর এই সেদিনমাত্র-শেষ-হওয়া মস্ত বড়ো বাড়ি—সেই বাড়ির ছাতে গিয়ে বসা! শাস্তি হওয়া উচিত।'

'শকুন বসলে অকল্যাণ হয় গৃহস্থের।'

'তা হ'লেও কিছু-একটা হয় তো!' বাঁকা হাসলো মৌলি, যেন আরো কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলো।

মা-র চোখ—একটু ভর্ৎসনা, একটু আশঙ্কা-মেশানো দৃষ্টি—চকিতে একবার ছুঁয়ে গেলো তাকে। মৌলি ফিরে তাকালো যেন লজ্জা-পাওয়া ছেলেমানুষি সরল চোখে, কিন্তু বাঁকা হাসির রেখাটুকু তার ঠোঁট থেকে মুছে গেলো না। একটু পরে বললো, 'তোমার মনে আছে, মা, সেই রাত ক'রে বাচ্চা শকুনের কান্না?'

'মনে নেই! নয়নেন্দুর মা-র নাকি ঘুম হ'তো না প্রথম-প্রথম!'

'কিন্তু ওরা তো আর নেই আজকাল। সেই ডাক কতদিন আর শুনি না। আমি ভাবি, ঐ শকুনটা এলো কোত্থেকে। কিংবা ফিরে এলো কেন। এর কি কোনো অর্থ নেই?'

'যত অদ্ভুত ভাবনা তোর! আর এত বই টেবিলে কেন জড়ো করিস বল তো?'

'ঐ বটগাছেই বাসা বেঁধেছে আবার? ঠিক জানো?'

'তা-ই তো শুনছি। এই প্রুফগুলো পুরোনো নাকি ছাখ। ফেলে দেবো?'

গুমরে নিচু গলায় আকাশ ভ'রে ডেকে উঠলো মেঘ, যেন আহত কোনো বিশাল বাঘের দূর-থেকে-শোনা গর্জন। মৌলির মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, যেন হঠাৎ খুঁজে পেয়েছে কোনো আনন্দ, কোনো সুন্দর সমাধান। আস্তে-আস্তে বললো, 'খুব ভালো হয় মা, খুব ভালো হয়, যদি আজই, এখনই, হঠাৎ বাজ প'ড়ে বটগাছটা ম'রে যায়! এক মুহূর্তে ঝলসে পুড়ে ম'রে যাক গাছটা, তারপর আমি, আমিও—' হঠাৎ থেমে গেলো মৌলি, যেন ভিতর থেকে বাধা পেলো কথায়, তার মুখের আলো মিলিয়ে গিয়ে কেমন করুণ দেখালো, কেমন কান্না-পাওয়া আধুটে গলায় কথা শেষ করলো সে—'এখানে আর এক মুহূর্ত আমার থাকতে ইচ্ছে করে না।'

'তোর লেখার খাতা বাঁ দিকে থাকলো, আর চিঠির প্যাড সব ডান দিকে। খামগুলো দেরাজে রাখলাম।' টেবিল গোছানো শেষ ক'রে মা একটু কাছে এসে দাঁড়ালেন, প্রায় একই সুরে বললেন, 'তা আমি তো কবে থেকেই বলছি কলকাতায় চল। তুই চেষ্টা করলে ওখানে কি আর সুবিধে না হবে।'

'সুবিধে?' মৌলির ঠোঁটের কোণ আবার একটু বেঁকে গেলো।

'হ্যাঁ, সুবিধে হবে। চাকরি হবে।'

'কিন্তু প্রোফেসরি তো ভালোই। কত সম্মান, কত ছুটি।'

'ভালো! ভালো!' কথার তালে-তালে মৌলি টোকা দিলো চেয়ারের হাতলে, আর-কিছু বললো না। তার বাঁ-দিকে-সিঁথি-করা ঘন-চুলে-ভরা মাথাটি নিচু হ'লো, যেন নুয়ে পড়লো কোনো লুকিয়ে-রাখা ভুলতে-না-পারা লজ্জায়। না, কখনো ভুলতে পারে না সে ঠ'কে গেছে—না কি ঠকিয়েছে?—কথা দিয়ে কথা রাখেনি, প্রতারক সে, জোচ্চোর! যা কখনো ভাবেনি তা-ই হ'লো: সেই মাষ্টারি করছে। প্রবঞ্চনা তার নিজের সঙ্গে, প্রবঞ্চনা তার অন্তরের সঙ্গে; ছাত্ররা যা চায় তা পায় না তার কাছে; আর ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ, তারই সুবান্ধব অধ্যাপকেরা, এই কয়েক বছর আগেও তার গুণপনায় যাঁরা মুগ্ধ ছিলেন, তাঁরাও—যদিও বাইরে তাঁরা উৎসাহী এবং সহৃদয় তবু মৌলি তো বোঝে, এও বোঝে এতে তাঁদের অন্যায় কিছু নেই—তাঁরাও আজকাল আড়চোখে দেখছেন তাকে, মনে-মনে কিংবা নিজেদের মধ্যে বলছেন যে মৌলিনাথের কাছে এর বেশি কি প্রত্যাশা আমাদের ছিলো না? সে ছিলো অদ্বিতীয় ছাত্র, সর্বত্র

অবাধ যার অধিকার ; হয়েছে কনিষ্ঠতম শিক্ষক, সহনীয়, লক্ষ্যণীয়, স্নেহভাজন—মাত্র একজন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট লেকচারার ! এই পতন কেমন ক'রে সে সহ্য করছে !

'কেন, তোর ভালো লাগে না ?'

মা-র এই কথায় মৌলি মুখ তুললো। 'এই মাষ্টারি ?' ব'লে নিচু গলায় হাসলো একটু, আরাম ক'রে হেলান দিলো চেয়ারে। 'ও-সব ছেড়ে দাও, মা ; আমার কিছু হ'লো না এটা জেনে নাও।'

'কিছু হ'লো না বুঝি ?' একটি মোলায়েম হাসি ছড়িয়ে পড়লো মা-র মুখে, মোড়া টেনে মুখোমুখি তিনি বসলেন, যেন বিষয়টা বুঝিয়ে না-দিয়ে ছাড়বেন না। 'তাই বুঝি পাশ করার সঙ্গে-সঙ্গেই ডেকে নিয়ে চাকরি দিয়েছে ? আর তাই বুঝি এটুকু বয়সেই সারা দেশে তোর নাম ?'

এটুকু বয়স ! সারা দেশে নাম ! কত বেশি আমার বয়স, আর কত তুচ্ছ এই নাম তা তুমি কখনো জানবে না, মা ! মৌলির মনে পড়লো সেই সব স্বপ্নে-চালানো দিনের কথা, যখন সত্যি তার বয়স ছিলো অল্প, সত্যি সে ছেলেমানুষ ছিলো। সুখ ছিলো তখন, সেই নিজেকে দিয়েই ঘেরাও-করা গণ্ডির মধ্যে সুখ ছিলো—কী দুর্ভাগ্য মানুষের যে কূপমণ্ডুকের আত্মপ্রসাদ ছাড়া সুখ নেই তার জীবনে ! সুখ ছিলো, যখন দশ বছর বয়সে অ্যালাষ্টর তর্জমা করেছিলো, যখন ম্যাট্রিকুলেশনে এমন খাতা লিখেছিলো যে পাদ্রি পরীক্ষক ভেবে পাননি ছেলেটি জিনিয়স না বদ্ধ পাগল, যখন তার সতেরো বছর বয়সের কোনো-এক আলস্যময় দুপুর-কাটানো কবিতায় বাংলা কবিতার মোড় ফিরেছিলো, যখন সে ছিলো সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র, তার তুল্য আর-কেউ ছিলো না, যখন লোকেরা প্রায় ভেবেই পেতো না শেষ পর্যন্ত কোনখানে সে পৌঁছবে। সেই বদ্ধতায়, সেই অন্ধতায়—তাতেই শুধু সুখ ছিলো। আর এখন ?··· নাম ? খ্যাতি ? কী তুচ্ছ, কী গ্লানিকর সেই খ্যাতি, যা অন্য পাঁচজনের সঙ্গে সমান ভাগ ক'রে নিতে হয় ; কী লজ্জার সেই প্রশংসা শোনা যাতে লোকে ভালোই বলে কিন্তু এ-কথা কেউ বলে না যে এমন আর হয় না ! এর উপরে ওঠা, তুলনার উপরে ওঠা, অনন্য হওয়া ! শুধু আপন মনে প্রত্যয় নয়, জগতের সামনে প্রমাণ করতে পারা যে কেউ তার সমকক্ষ নয়, সন্নিকটও নয়, সকল প্রতিযোগিতার সে পরপারে ! গ্যেটে ! রবীন্দ্রনাথ ! কপট কৃষ্ণের অন্যায় সাহায্যে স্বভাবজয়ী অর্জুন !···না, না, সে নয়, সে তা নয় ; মহাপ্রস্থানের পথে বিশ্বজয়ী মুখ থুবড়ে সে পড়বে না, সে মরবে তার আপন মনের প্রত্যয়ের পাঁকে, তার ইচ্ছায়, তার শক্তিহীন, দুর্বার ইচ্ছায় কর্ণের মতো রথের চাকা ডুবে-ডুবে।···এই তো—এখনই—অতীতের কথা ভাবছে সে, যাত্রা শুরু হ'তে-না-হ'তেই পিছন ফিরে তাকাচ্ছে—বুড়ো হয়েছে, অকালেই বুড়ো হয়েছে।··· তাহ'লে ইচ্ছাটাকেই ছেঁটে দিলে কেমন হয় ? ভদ্রলোক হ'য়ে জীবন কাটাবার যে-প্রলোভন নিত্য উপস্থিত, তারই কাছে হার মানলে কেমন হয় ?

'হ্যাঁ, খুব হয়েছে আমার। আর ক-দিন পরেই পুরানা পল্টনের একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক হ'য়ে বসতে পারবো।'

ছেলের দিকে চুপ ক'রে একটু তাকিয়ে থাকলেন মা। তারপর বললেন, 'তোর যা ভালো লাগে না তা তুই করিস কেন, মৌলি। চাকরি ছেড়ে দে, চল কলকাতায়।'

'চাকরি ছাড়তে পারি, কিন্তু তোমাকে ছাড়বো কেমন ক'রে ? তুমি না-থাকলে এতদিনে আমি এ-দেশেই থাকতাম না।'

ছোট্ট নিশ্বাস পড়লো মা-র। এই বিধবা ভদ্রমহিলা, একটির বেশি সন্তান যিনি ধারণ করেননি, এই ছেলে যাঁর জীবনের লক্ষ্য, জীবনের অর্থ, সর্বস্ব, তার সব ইচ্ছা মেটাতে গিয়ে নিজের সব সম্বল যিনি খুইয়েছেন, কত রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনে-মনে শুধু এ-ই বলেছেন যে মৌলি যেন বেঁচে থাকে, আর কখনো-কখনো ভয়ে যাঁর বুক শুকিয়ে গেছে পাছে মৌলির এই অসামান্যতাই তাঁর অদৃষ্টে সহ্য না হয়—ছেলের এই কথায় তাঁর নিশ্বাস পড়লো। কিন্তু তার দোষ কী ? কোন কথায় ব্যথা লাগে সে তো জানে না, জানলে কি বলতো ? না, মৌলির কিছু দোষ নয় ; দোষ তাঁরই, মা-র—এ তো সত্যি কথাই যে মৌলি তাঁকে ছাড়িয়ে বেড়ে উঠেছে এতদূর পর্যন্ত যেখানে তাঁর অস্তিত্বটাই এখন—এখন অবান্তর, শুধু অবান্তর নয়, অন্তরায়—হ্যাঁ, অন্তরায় বইকি, তার আরো বেড়ে ওঠার প্রতিবন্ধক। এই অদ্ভুত, এই-যে আশ্চর্য মানুষটিকে তিনি পৃথিবীতে এনেছিলেন, আজ এর কতটুকু বোঝেন তিনি, কতটুকু জানেন এর কথা ? তার এ-সব ভাবভঙ্গি, এই এক-এক সময় মন-গুমরে ব'সে থাকা, যখন সে কথা বলে না ; কিংবা শুধু দুঃখ-পাওয়া—কখনো বা দুঃখ-দেয়া—বাঁকা সুরে কথা বলে—এ-সব অবশ্য খুবই ভালো চেনা আছে তাঁর, এর চেহারাটা তিনি ভালোই চেনেন, বাইরে থেকে অনেক দেখেছেন, কিন্তু সত্যি এর অর্থ তো কিছুই বোঝেন না, কিছুই জানেন না কী ভাবছে সে আপন মনে, কোনো কাজেই লাগতে পারেন না তার, তার হতাশ হ'য়ে ব'সে থাকার দিকে কোনো রকমেই হাত বাড়াতে পারেন না। এখন তার প্রয়োজন—অনেক দিন ধ'রেই তিনি ভাবছেন কথাটা, ছেলের সঙ্গে কথা বলার সুযোগও খুঁজছেন—মা-র প্রয়োজন তার নেই আর—এখন অন্য কাউকে চাই যে সত্যি তার জীবনের অংশ নিতে পারবে, সঙ্গিনী, সহানুভাবিনী, স্ত্রী। যোগ্য মেয়ে ? কত দয়া ভগবানের যে ঠিক যোগ্য মেয়েটি তৈরি হয়েছে তারই জন্য, দিনে-দিনে তৈরি ক'রে তুলেছে নিজেকে, উৎসর্গ করেছে এখনই তাকে নিজের জীবন ! কেন ওরা দেরি করছে আর ? মিলুক ওরা, দু-জনে মিলে বিলেত চ'লে যাক, দু-জনে দু-জনের জোরে বড়ো হ'য়ে উঠুক—আমি, শুধুমাত্র মা, শুধুমাত্র শৈশবের অধিকারিণী, এর বেশি অন্য কোনো স্বর্গসুখ আমি চাই না।

'তা ভাবনা কী,' মনের কথার অর্ধেক শুধু প্রকাশ করলেন তিনি। 'আমি তোকে বিলেত পাঠাতে পারলাম না, কিন্তু তুই নিজেই যেতে পারবি একদিন। এখানকার ইউনিভার্সিটি থেকেই পাঠাবে তোকে।'

মৌলি জবাব দিলো না কথার। আ, এও কি কপালে আছে তার ? কোনোদিন তাদেরও একজন কি হ'তে হবে তাকে, যারা ঋণের কৃপণ অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে, লণ্ডন শহরে চোখ-কান বুজে দু-বছর কাটিয়ে, কোনোরকমে একটা ডিগ্রি কুড়িয়ে দেশে ফেরে—তারপর একশো মুদ্রা বেশি মূল্যের চাকরির চেষ্টায় মরীয়া হ'য়ে রক্ত তোলে মুখে ? বিলেতের বুড়ি ছুঁয়ে এসে সাংসারিক

উন্নতি! অন্তত এটুকু কোরো, ভগবান, সেখানে আমাকে নামিয়ো না। সে যদি যায়—সে যে অনেক দিনের, অনেক দূরের যাত্রা! তাকে-যে সব দেখতে হবে—ইটালির রেনেসাঁস-নীলিমা, এল গ্রেকোর আলো-আঁধারি-স্বপ্ন-জড়ানো স্প্যানিশ রাত্রি, ঐতিহাসিক স্বপ্নভারাতুর জর্মন নগর, ইস্পাত-নীল ধারালো পরিচ্ছন্ন উত্তরাপথ—স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, পুরাণভূমি আইসল্যাণ্ড—আর রাশিয়া, ধ্যানে এবং তুষারে ধবল টলষ্টয়ের রাশিয়া—সব যে চাই তার, সব যে চায় তাকে, কোনোটাই ছেড়ে গেলে তার চলবে না।—কেন সে লক্ষপতি হ'লো না? কিন্তু তাহ'লেই বা কী হ'তো? এই ইওরোপ, এই তার বইয়ে-পড়া মনের মধ্যে পাওয়া ইওরোপ, একে ভ্রমণ ক'রে এর বেশি কি পাবে কখনো;—তাতে কি শুধু ভিড় দেখবে না, নেহাৎই শুধু মানুষের মুখ—হোটেল, বাজার, গির্জে, গ্যালারি নয়তো শুধু দৃশ্য, জল-মাটি-আকাশ-মেশানো আপাতনতুন কিন্তু আসলে সেই একই চেনা রমণীয়তা—শুধু অবয়ব, শুধু অনুষ্ঠান;—একে এর বেশি পেতে হ'লে, প্রাণ দিয়ে পেতে হ'লে, সেখানেই কি জন্মাতে হয় না—আর নয়তো, নয়তো সেই মনের মধ্যেই যতটা তার পাওয়া যায়, চিন্তার মানচিত্রে যতটা তার ধরা যায়, নিজের বাড়িতে নিশ্চল ব'সে-ব'সে, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, যখন—আর দেরি নেই, ঐ বুঝি উড়াল দিলো আষাঢ়, ঝাঁপ দিলো বৃষ্টি, সারা আকাশ বাংলা ভাষায় কথা ক'য়ে উঠলো!

২

বাইরের দিকে চোখ রেখেই মৌলি বললো, 'না, মা, এই বাংলা দেশই সবচেয়ে ভালো আমার। এমন বর্ষা তো আর কোথাও নেই।'

কিন্তু তার কথা শোনা গেলো না, শোনা গেলো তারই কথার যথাযোগ্য উত্তর, যার সামনে, যার বিশাল বাঁশির মতো নিঃস্বনে, তুচ্ছ হ'য়ে মিলিয়ে গেলো মৌলিনাথের বিক্ষোভে ভরা স্বগতোক্তি। মেঘের নিগড়ে বন্দী হ'য়ে যে ছিলো এতক্ষণ, সে হঠাৎ মুক্তি পেয়ে ছুটে এলো, বেরিয়ে এলো স্তব্ধতার বুক ফেটে হাওয়া—ঠাণ্ডা, উদ্দাম—চকিত কাকের কর্কশ ডাক শাঁখের মতো বেজে উঠলো, বটগাছের জটিল দেহটি দুলে উঠলো যেন নটুমুদ্রির মতো নাচের ভঙ্গিতে—কিন্তু তার পরেই গাছটি আর দেখা গেলো না, ধুলোর ঝড়ে আঁধার হ'লো প্রান্তর, ধুলো-কুটো-কাঁকর-ওড়ানো দামাল হাওয়া খেপিয়ে দিলো এইমাত্র গোছানো টেবিলের কাগজপত্র।

মৌলির মা তাড়াতাড়ি উঠলেন জানলার শার্সি লাগাতে। অনেকগুলো জানলা; একে-একে বন্ধ করতে-করতেও কিছু কাগজ উড়ে পড়লো মেঝেতে, ধুলো লাগলো জিনিশপত্রে, মৌলির চুলে। মৌলি নড়লো না, মা-কে সাহায্য করতেও উঠলো না; আর মা যখন শেষ জানলাটির শার্সি লাগিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছেন, ঠিক তখনই মুহূর্তের জন্ম আলো হ'য়ে উঠলো প্রান্তর; ভুতুড়ে, অদ্ভুত, গা-ছমছম-করা সান্ধ্য বিদ্যুতের নীল-সবুজ-সোনালি-শাদা পাগল আলোয় অস্থির বটগাছটা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো আবার, তারপর ভীষণ শব্দে বাজ পড়লো যেন আকাশটাকে চুরমার ক'রে ফাটিয়ে দিয়ে। আর মেঘের দূর গহ্বরে-গহ্বরে তার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই রিমঝিম মধুর শব্দে বৃষ্টি যেই ঝাঁপিয়ে নামলো, অমনি দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে ঘরে এলো একটি মেয়ে, ঘন-নীল পরদাটাকে পিছনে রেখে দরজার ধারে দাঁড়ালো।

—'উঃ, খুব বেঁচে গেছি!'

কথাটা হালকা হ'য়ে খ'সে পড়লো মেয়েটির মুখ থেকে, যেমন ডাল থেকে ফুল ঝ'রে পড়ে, শার্সি-বন্ধ-করা ঘরের হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়লো তার—তার সৌরভ, অনুরণন; এই ঘরে, যেখানে এতক্ষণ ধ'রে সব ছিলো গম্ভীর, চিন্তায় এবং আষাঢ়ে ভারাতুর, সাতাশ বছরের বার্ধক্যবোধে আচ্ছন্ন, আত্মচেতনার কুয়োর মধ্যে খুঁড়ে-খুঁড়ে তন্ন তন্ন তল্লাসের শ্রমে প্রপীড়িত—সেখানে হঠাৎ যেন আলোর জগতের ডাক এলো এই কথায়—এই প্রায় অশরীরী কথায়—কেননা মেঘের ছায়ায় কালো-হ'য়ে-আসা ঘরের মধ্যে মেয়েটিকে ভালো দেখা যাচ্ছিলো না—এলো বাস্তবের, স্বাস্থ্যের ডাক, জীবনের, যৌবনের লজ্জাহীন চপল আহ্বান।

এই ডাকে প্রথম সাড়া দিলেন মা। 'গীতা!' স্পষ্ট শোনা গেলো আনন্দের কাঁপন তাঁর গলায়, যেন এই নামটুকু ধ'রে ডাকতেও তাঁর সুখ। দেয়ালে হাত রেখে আলো জ্বাললেন তিনি। বাইরে বৃষ্টি-ভরা সন্ধ্যার পটভূমিতে ঘরের মধ্যে ইলেকট্রিক আলো অত্যন্ত বেশি উজ্জ্বল দেখালো, কেমন কড়া, কাঁচা, নিজেকে-যেন-জাহির-করা হলদে;—মৌলি হাত তুলে চোখ আড়াল করলো, এতক্ষণ নম্র ছায়ায় মিশে থাকার পর হঠাৎ এই আলোর ঔদ্ধত্য তার ভালো লাগলো না। তবু সে একবার না-তাকিয়েও পারলো না, দরজার ধারে দাঁড়িয়ে-থাকা অতিথির দিকে একটুখানি তাকিয়েও তাকে থাকতে হ'লো—ব'সে-ব'সে দেখতে হ'লো মেয়েটিকে—আলোয় উদ্ভাসিত, যেন বিকশিত—ঘন-নীল পরদাটি পিছনে থাকায় যার ধবধবে রং প্রায় অন্যায়রকম ফর্শা দেখাচ্ছে, যার চুলে, কপালে, যেন-তুলি-দিয়ে-আঁকা পরিষ্কার দুটি ভুরুর উপর একটু বিসদৃশরকম চওড়া কপালে মুক্তোর মতো চিকচিক করছে জলের ফোঁটা, আর যার বুকের কাছে শাড়ির আঁচলে কয়েকটি বৃষ্টিফোঁটা এঁকে দিয়েছে তাদের ক্ষণকালীন কালো-কালো প্রণয়স্বাক্ষর। মেয়েটি অনুভব করলো সেই দৃষ্টি—অনুভব করলো তার রক্তের ঈষদুষ্ণ চঞ্চলতায়, যা ছড়িয়ে পড়ে তার শরীরের মধ্যে গোপনে-গোপনে, যখন ইউনিভার্সিটির ক্লাশে, ব্রাউনিঙের সঙ্গে এজরা পাউণ্ড এবং আধুনিক কবিতার সম্বন্ধ বোঝাতে গিয়ে, কিংবা কবিতায়—সাহিত্যে—উপমাপ্রয়োগের অপরিহার্য উপকারিতার বিষয়ে বলতে-বলতে, মৌলিনাথের চোখ হঠাৎ পড়ে তার মুখের উপর, আর তারপর—অন্তেরা যতক্ষণে অধ্যাপকের বক্তব্যের পিছনে ছুটেছে, কিংবা কেউ হয়তো নিঃস্পৃহভাবে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে—সে শুধু শোনে, মনে-মনে, ভয়ে-ভয়ে শোনে, তার হৃৎপিণ্ডের ঈষৎ-দ্রুত-হওয়া স্পন্দন। এই সব—হ্যাঁ, এতটাই তার ভিতরে-ভিতরে ঘ'টে যায়—যদিও গীতা জানে—জেনে মনে-মনে কোথায় যেন শান্তিও পায়—যে মৌলিনাথের ঐ দৃষ্টির লক্ষ্য সে নয়, কোনো-এক দিকে তাকাতে হবে ব'লেই সে তাকিয়েছে তার দিকে;—আর এখনো—যদিও মৌলিনাথেরই দরজায় সে দাঁড়িয়েছে—তবু সে জানে যে ঐ চোখ

তাকে ঠিক দেখছে না, যে-কোনো একটা বস্তুকেই, হয়তো—কী লজ্জা!—চোখের পক্ষে প্রীতিকর কোনো বস্তুকেই শুধু দেখছে। তাই গীতা সেই দৃষ্টির কোনো জবাব দিলো না, ঘুরে দাঁড়ালো মৌলির মা-র মুখোমুখি, যিনি মাতৃত্বময় হাসিমুখে তাকেই দেখছিলেন, বিশেষ একটু মন দিয়েই দেখছিলেন যেন।

এগিয়ে এসে তার মাথায় তিনি হাত রাখলেন। 'ভিজিসনি তো?'

'না, মাসিমা, আমিও ঢুকছি আর বৃষ্টিও নামলো।' বাঁ হাতে কপালের জল মুছে ফেলে গীতা একটু হাসলো, তার পুষ্ট, পূর্ণ ঠোঁটের ফাঁকে সুন্দর শাদা দাঁতের সারি ঝিলিক দিলো ইলেকট্রিক আলোয়। 'মেয়েদের হস্টেলে পার্টি ছিলো, সেখান থেকে বেরিয়ে ভাবলাম—'

'বেশ করেছিস। বোস।' বিধবা মহিলা আর-কিছু বললেন না, কিন্তু চোখ দিয়ে যেন আরো কিছু বললেন, যেন প্রায় ব'লেই দিলেন যে একটু আগে তারই কথা ভাবছিলেন তিনি, যে তাঁর আজকাল-কার সব ভাবনার মধ্যে গীতার কথাই ফিরে-ফিরে আসে বার-বার।

গীতা কি বুঝলো সে-কথা? তার মাসিমার মনের কথা সে কি বুঝেছে? এও কি বোঝেনি যে তার কথাও মাসিমার কাছে লুকোনো নেই, যে সে ধরা প'ড়ে গেছে সমস্ত রকম ছদ্মবেশের অতীত হ'য়ে? কিন্তু ধরে না-প'ড়ে পালাবে কোথায়? না-বুঝে কি উপায় আছে? কে না বুঝবে, কে না দেখতে পাবে তার ভিতরটাকে—নিজের বুকের শব্দ শুনতে-শুনতে গীতার এক-এক সময় মনে হয়—ক্লাশের অন্যান্য ছাত্রছাত্রী, ইউনিভার্সিটির অন্যান্য অধ্যাপকেরা, সারা রমনা, সারা শহর, যে-পথ দিয়ে সে হেঁটে যায় সেই পথের অন্য সব অচেনা মানুষ—কখনো তার এমনও মনে হয় যেন সকলেই তাকে বুঝে ফেলছে, দেখে ফেলছে—যেন সে স্বচ্ছ হ'য়ে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে রৌদ্রময় চৌরাস্তায়—আর এখানে তো মা! চোখ নামিয়ে নিক, দ্রুত পথ চলুক, আঁচল আরো ঘন ক'রে গায়ে জড়াক—না, সে-রকম চঞ্চল-হওয়া সময়ে কারো কাছেই নিস্তার নেই তার—শুধু ঐ একজন ছাড়া, ঐ অন্ধ, অবোধ, করুণাময়, হৃদয়হীন মৌলিনাথ ছাড়া! কথাটা ভাবতে মুচড়ে ওঠে তার বুকের মধ্যে, আবার কোথায় যেন আশ্বাসও পায়।

প্রৌঢ়া মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে গীতা অস্ফুট নিশ্বাস ফেললো। আমরা দু'জন ষড়যন্ত্রী, চোখে-চোখে চক্রান্তকারী আমরা। আমি তা হ'তে চাই না, কিন্তু না-হ'য়ে আমার উপায় নেই। আমি এখানে আসতে চাই-না, এসে টিঁকতে পারি না—কিন্তু না-এসেও টিঁকতে পারি না। মাসিমা কি এতটাও জানেন? গীতা একটু চোখ সরিয়ে নিলো, যেন কোনো ছল ক'রে তার এই প্রশ্নেরই উত্তরের আশায় জিগেস করলো, 'কেমন আছেন, মাসিমা?'

'আমি? আমি আবার কেমন থাকবো? ভালো আছি।'

'আপনার হাঁপানি?'

'ও কিছু না।'

'ভালো একজন ডাক্তার দেখান না কেন, মাসিমা?'

'বলতে চাস যে-ডাক্তার দেখিয়েছি সে ভালো নয়?'

'হোমিওপ্যাথিতে আপনার মতো বিশ্বাস তো থাকে না সকলের। দাদা এবার ছুটিতে এসে বলছিলো—'

'ও, বেণু! মস্ত ডাক্তার হয়েছে সে!'

'এই রকমই হয় মাসিমা। যারা ছোটো ছিলো তারা বড়ো হয়—তা আপনারা মানুন আর না-ই মানুন।'

'বাসরে! না-মেনে উপায় আছে! বিজ্ঞের মতো কত কথা আমাকে শুনিয়ে গেলো একদিন।'

'দাদা বলছিলো নতুন কী-একটা ইনজেকশন বেরিয়েছে—'

'সে-সব আমার জানতে বাকি নেই! তা আমি বলি, আমাদের নতুন ডাক্তারটিও পাশ ক'রে বেরোক, তখনই হবে সব।' ব'লে, একটু হেসে, ভদ্রমহিলা দরজার দিকে স'রে এলেন, কিন্তু গীতা তখনই আবার কথা পাড়লো, মাসিমার ঐ অনতি-আলোচ্য অসুস্থতার প্রসঙ্গটাকেই অবলম্বন ক'রে আরো একটু ধ'রে রাখলো তাঁকে—'আপনার হাঁপানির কথা আগে তো শুনিনি কখনো?'

'আমিও প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম রে। কিন্তু এই ছাখ না, আমার ছেলেবেলার সঙ্গীটি ঠিক সময়ে দেখা দিয়েছে আবার।'

'ঠিক সময়ে কেন?'

'ঝাঁটপাট দিয়ে রাস্তাটি তো পরিষ্কার ক'রে রাখতে হবে।'

'ওঃ, খুব বুড়োদের মতো কথা বলছেন আজকাল!' ঠাট্টার সুরে, কিন্তু বেদনা-ছোঁয়া নরম গলায় গীতা একটু হাসলো। 'তাহ'লে কি মিটফোর্ডের নরেন গাঙুলিকেই নিয়ে আসবো একদিন?'

'বলিস কী গীতা, বেণুর প্রথম রোগী হাতছাড়া হ'তে দিবি তুই? অমন কথা মুখেও আনিসনে। ও তাহ'লে মনে করবে কী বল তো! এমনিই এবার ইনজেকশন দিতে না-পেরে মনের দুঃখে ছুটি থাকতেই চ'লে গেলো। তারপর—কেমন আছে? চিঠিপত্র পাস?'

'মা-কে লেখে মাঝে-মাঝে। খুব কম।'

'তা এটা কি আর মা-মাসিকে মনে পড়ার বয়স! তুই-ই বা ক'দিন আসিস বল তো?' ব'লেই, গীতার মুখের একটুখানি রং-বদল লক্ষ্য ক'রেই, তার জবাবের জন্য অপেক্ষা না-ক'রে—কিংবা তাকে জবাব দেবার কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে—ভদ্রমহিলা আবার বললেন, 'এ-বিষয়ে চিত্রা কিন্তু খুব ভালো!'

'দিদি?' হঠাৎ গীতা একটু লাল হ'লো, একটু নিচু গলায়, কেমন-যেন বিষণ্ণভাবে বললো, 'তার সঙ্গে কার তুলনা? এমন সপ্তাহ যায় না যে দিদির চিঠি না আসে।'

'প্রথম-প্রথম আমাকেও লিখতো খুব। কিন্তু আমি কি পারি চিঠি লেখায় ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে?'

বিষাদের ছায়া ঘন হ'লো গীতার মুখে, তার চোখের কোণ দুটি, যেখানে নীল ছায়া জ'মে থাকে সব সময়, সেখানে যেন কালো ক'রে এলো মুহূর্তের জন্য। সে-সব চিঠি—গীতা দেখেছে, মাসিমা একদিন দেখিয়েছিলেন তাকে—সকলের সব চিঠি তোলা থাকে তাঁর হাতবাক্সে—সে-সব স্মৃতিভরা, হৃদয়-ঢালা, কখনো প্রায় কান্না-পাওয়া উচ্ছ্বাস—সে-সব কি এই প্রৌঢ়া মহিলারই উদ্দেশে লেখা, আসলে কি অন্য একজনকেই লেখা নয়? সে কি দেখেছে সে-সব? পড়েছে কখনো? আর সে—সেই অন্য একজন—সে নিজেও কোনো চিঠিপত্র কি পায়নি কোনোদিন, চিঠি লেখায় হারিয়ে দেয়নি সেই দিদিকে, যে কাশ্মির থেকে বারো পৃষ্ঠা বর্ণনা লিখে পাঠিয়েছিলো?

'জানেন, মাসিমা,' হঠাৎ একটু উৎসাহিত গলায় গীতা বললো, 'দিদি এবার কাশ্মির বেড়াতে গিয়েছিলো, গুলমার্গ থেকে আঠারো পৃষ্ঠা চিঠি লিখেছিলো আমাকে!'

'বারো'টা 'আঠারো' হ'য়ে গেলো তার মুখে—নিজের অজান্তে

নয়—তথ্যের এই অপলাপটুকু তার বিবেকে সহ্য হ'লো সহজেই, কথার শেষে বিস্ময়-চিহ্নটিও স্পষ্ট আওয়াজ দিলো গলায়। কিন্তু মাসিমার হাসিমুখে স্নেহপ্রসূত প্রশংসার প্রশ্রয় ছাড়া কিছুই ফুটলো না।

'তাই তো বলি আমি, যে পারে সে সবই পারে। সংসার চালানো, ছেলেপুলে মানুষ করা, তার উপর আবার মেয়েদের কলেজে প্রোফেসরিও করছে না?'

'শুধু কি তা-ই? সেবারে দিল্লিতে দিদির বাড়িতে এক মাস থেকে এলুম তো—দিদি একেবারে দশভুজা! মহেন্দ্রবাবুর পরীক্ষার খাতা দেখে দেয় দিদি, ক্লাশে ছাত্রদের তিনি যে-নোট দেন তাও তৈরি ক'রে দেয় মাঝে-মাঝে—এদিকে রোজ রাত্রে মহেন্দ্রবাবু একটা স্যুপ খান, সেটা দিদি নিজের হাতে না-রাঁধলে নাকি চলে না!' যেন বলতে বেশ লাগছে, বলতে পেরে তৃপ্ত হচ্ছে নিজের মনে, যেন মনের মধ্যে কোথায় কোন অজ্ঞাত সুখের স্বাদ নিচ্ছে, এমনি ক'রে কথাগুলি বললো গীতা, তারপর পুষ্ট ঠোঁটে সুন্দর কিন্তু কুটিল একটু হেসে বললো, 'একেবারে লক্ষ্মী মেয়ে, কী বলেন?'

প্রৌঢ়া মহিলা সকৌতুকে এই বর্ণনা শুনছিলেন, গীতা থামামাত্র জবাব দিলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, অত জাঁক করতে হবে না দিদিকে নিয়ে। আমাদের এখানেও লক্ষ্মী মেয়ে আছেন একজন—সরস্বতীও বলতে পারিস। আপাতত একটু বসুন তিনি—আমি দেখে আসি রাধু ওদিকে কী করছে,' ব'লেই নীল পরদায় ঠেলা দিয়ে তিনি চ'লে গেলেন—গীতাকে আর কথা বলার, বাধা দেবার সময় দিলেন না।

মুহূর্তের জন্য গীতা দাঁড়িয়ে থাকলো সেখানেই, কাঁপতে-থাকা পরদাটার উপর চোখ রেখে। মুহূর্তের জন্য তাকে দেখালো যেন সেও চ'লে যাবে ঘর থেকে, মাসিমার পিছু-পিছু গিয়ে হয়তো বসবে জলখাইয়ের আচার চাখতে, কিংবা হয়তো রান্নাঘরে তাঁর পাশে ব'সে হাত পাকাবে নিমকি ভাজায়। কিন্তু না—আর হয় না। যে-মুহূর্তে মাসিমা চ'লে গেলেন, যে-মুহূর্তে তার আঁকড়ে-থাকা ক্ষীণ ছুতোটুকু ছিঁড়ে গেলো, সে-মুহূর্তে আর-কিছুই গীতার চেতনায় থাকলো না, ওপাশের ঐ জানলার ধারে ইজিচেয়ারে ব'সে-থাকা মানুষটির অস্তিত্বই আবার তার সমস্ত মন জুড়ে বসলো। আর, মাসিমার সঙ্গে তার এই কথাবার্তা, তার এই নিজেকে লুকোতে সচেষ্ট কিন্তু অকৃতকার্য কথাবার্তা শেষ হওয়ামাত্র ঘরের আবহাওয়াও বদলে গেলো একেবারে; কাচের শার্সিতে প্রতিহত হ'য়ে বাইরের অঝোর বৃষ্টি কানে লাগলো—মনে লাগলো—অতি মৃদু স্পর্শকোমল বিরহব্যাকুল কোনো অফুরন্ত দীর্ঘশ্বাসের মতো। মিথ্যা, মিথ্যা সব—বৃষ্টির শব্দ এই কথা যেন ব'লে যাচ্ছে—যা নিয়ে তোমরা কথা বলো, যা নিয়ে তোমরা কাজ করো, যা নিয়ে দিনের পর দিন তোমরা কাটিয়ে দেও—সব, সব মিথ্যা।

গীতা ফিরে দাঁড়ালো, আস্তে-আস্তে মেঝে পার হ'য়ে মৌলির সামনে এসে বসলো সেই মোড়াটিতে, যেটাতে একটু আগে তার মা বসেছিলেন। খুব চেনা, একই পরিবারভুক্ত অন্তরঙ্গ নয় অথচ খুব অভ্যস্ত এবং এবং আপন কারো কাছে—যেখানে কথা বলার বিষয়ের কোনো অভাব হয় না অথচ কথা বলার বাধ্যতাও থাকে না কোনো, সেখানে মানুষ যেমন ক'রে আসে এবং বসে, গীতার বসবার ধরনে, দু-হাতে হাঁটু জড়িয়ে মৌলির দিকে ঠিক মুখোমুখি না-তাকাবার ভঙ্গিতে, সেই স্বাচ্ছন্দ্যই বোঝা গেলো—অন্তত, সে বুঝিয়ে দিলো তা-ই, তার অতি গভীর অচিকিৎস্য অস্বস্তি একটুও ফুটতে দিলো না বাইরে। কোনটা খাঁটি আর কোনটা মেকি, কোনটা স্বতস্ফূর্ত আর কোনটা ভান, তা কি কখনোই কেউ নিশ্চিত ক'রে বলতে পারে—মেয়েদের বেলায়? মেয়েরা—সেই আশ্চর্য জীব, আত্মস্থ, চতুর, সংযত, সাবলীল, যে-কোনো অবস্থায় অবিদ্রোহী, যে-কোনো পরিবেশে নমনীয়, যারা বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে না-গিয়েই তাকে হারিয়ে দেয় শেষ পর্যন্ত, যারা তাদের ইচ্ছাটাকেই দৈবাৎ যেন ঘটিয়ে দেয় এবং দৈবাৎ যেটা ঘ'টে যায় সেটাকেই মিলিয়ে নেয় ইচ্ছার সঙ্গে, অর্থাৎ যারা অসম্ভবের পাথরে মাথা কাটিয়ে মরে না কখনো, অতএব স্বাভাবিকের আশ্রয় থেকেও কিছুতেই চ্যুত হয় না—সেই কপট, সহজ, সহজেই চক্রান্তকারী, জীবনযোগ্য, জীবনশিল্পী মেয়েদের বেলায় কেউ কি কখনো বলতে পারে কোনটা স্বতঃস্ফূর্ত আর কোনটা ভান? না কি এটা শুধু জীবনশিল্পেরই কথা নয়, শিল্পকলার, সৃষ্টিকলারও কথা—না কি স্বতঃস্ফূর্ত ব'লে স্বত্যি কিছু নেই, কিংবা স্বতঃস্ফূর্ত সুন্দর হয় না কখনো—কেননা শুদ্ধতায় সৌন্দর্য নেই? যা সুন্দর, রূপে, শব্দে, ভাষায় কিংবা চিন্তায় সুন্দর—ছবি, গান, কবিতা—তা-ই কি কোনো-এক অর্থে বানানো নয়, পারকল্পিত, সংঘটিত—কোনো-এক স্রষ্টার গঠনশক্তিরই কি প্রকাশ নয় সে, বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল আণবিক রাশিকে সংঘবদ্ধ ক'রে তোলার শক্তির—এবং সংঘ মানেই কি অস্বাভাবিকতা নয়, কৃত্রিমতা নয়? হয়তো তাই—যা প্রত্যেক কবি মনে-মনে জানেন যদিও হাবেভাবে অনেক সময় অন্যরকম দেখান—যাকে মনে হয় অপ্রতিরোধ্য প্রেরণার ফল, সৃষ্টির তেজোস্ফূর্তির স্বতঃপ্রভ বিকিরণ—তাও চেষ্টিত, আদিষ্ট, অভিনীত, নিজেকে কোনো-এক অভিনয়ের মধ্যে অবিকল মিশিয়ে দিতে যিনি পারেন, তাঁকেই না শিল্পী বলি আমরা! কে এমন শিল্পী আছেন যিনি নারীর ছলনা শেখেননি, যিনি স্বভাবতই অংশত নারী নন—কোথায় সেই ভগবান যাঁকে অর্ধনারীশ্বর হ'তে হ'লো না?

গীতা চুপ ক'রে ব'সে থাকলো একটুক্ষণ; বাইরের উতল সন্ধ্যার শব্দ শুনলো। তারপর বললো, 'খুব বৃষ্টি হচ্ছে।'

মন্তব্যটা বাহুল্য সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্য জনের মৌনভঙ্গের পক্ষে যথেষ্ট হ'লো এটি। মৌলি বললো, 'এ-রকম বৃষ্টি হ'লেই কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে আমার।'

'আমি এসে বাধা দিলাম বোধহয়?'

'না, গীতা, তুমি ছাড়াও বাধা আছে। ইচ্ছে! এই ইচ্ছে জিনিশটা কী? শুধু আমাদের দুঃখের মূল।'

'ওটা ধর্মযাজকের কথা হ'লো; তোমার মুখে মানায় না।'

'কিন্তু ভেবে ভাখো—যেখানে ইচ্ছা থাকে, কিন্তু ইচ্ছার অনুপাতে শক্তি থাকে না?'

'ইচ্ছে করতে পারাটাকেই একটা শক্তি বলবে না তুমি?'

'সেটা কী-রকম শক্তি? সে বলে, আমাকে প্রকাশ করো। সেখানে তার যোগ্য হ'তে পারে ক'জন?'

'অনেকেই পারে না। কেউ-কেউ পারে।'

'যারা পারে বলছো তাদের মুখেও কী-কথা শুনি? "যত সাধ ছিলো সাধ্য ছিলো না"! এই আক্ষেপ থামলো না কখনো। পৃথিবীর এই ইচ্ছুক মানুষগুলি নিজের তাপে জ্ব'লে গেলো চিরকাল।'

'জ্বলতেই হবে, নয়তো আলো হবে কেমন ক'রে। শক্তি নেই—এই আক্ষেপ ছাড়া শক্তি হবে কেমন ক'রে?'

'মানি তোমার কথা। ইচ্ছার অনুপাতে শক্তি থাকে না ব'লেই শক্তির সীমা বেড়ে চলে মানুষের! কিন্তু তারপর? ইচ্ছা যখন আরো দূরের দিগন্তে স'রে যায়?'

'সেই দিগন্তের পিছনে ছুটেই তো বাঁচে মানুষ। আর যা-ই করো, ইচ্ছাটাকে দোষ দিয়ো না তুমি। আমি বলি—'

'কী বলো তুমি, শুনি?'

গীতা ন'ড়ে বসলো মোড়ায়। একটু বাঁকা হেসে, যেন না বলাটা আরো বেশি লজ্জার হবে ব'লেই লজ্জা-কাটানো ঠাট্টার সুরে বললো, 'মনে করো যা চাই তা আমি পাবো না। মনে করো তা জেনেই নিয়েছি। তাই ব'লে কি চাওয়াটাকেই বাদ দিতে বলবে তুমি? না! আমি বলি, তবু ঐ ইচ্ছেটুকু থাক। তাতেই বুঝবো যে বেঁচে আছি।'

মৌলি ভয়া চোখে গীতার দিকে তাকালো। গীতা চোখ নামিয়ে নিলো না, ফিরিয়ে দিলো সেই দৃষ্টি, উজ্জ্বল কালো ভুরু দুটি একটু কুঁচকে, যেন স্পর্ধিত চোখে, ভিতরে-ভিতরে যে দুর্বল তার চেষ্টাকৃত স্পর্ধিত চোখে মৌলির দিকে ফিরে তাকালো। মৌলি বললো, 'সত্যি! সত্যি কথা বলেছো! তোমার কথা শুনে আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছি, গীতা!'

'অবাক কেন?'

'এই আমাদের সেদিনের গীতা—সে আজ এত কথাও বলতে শিখেছে!'

'তুমি আমাকে ছোটো দেখেছো, সে তো আমার অপরাধ নয়।'

'বোধ হয় সেটা আমারই অপরাধ?' মৌলি হাসলো।

ঠিক কথা, তোমারই অপরাধ। তুমি আমাকে ছোটো দেখেছো, এমন একটা সময় থেকে আমাকে দেখছো যখন আমি প্রায় শিশুদের দলে, আর তুমি—অকালপক!—বয়স ছাড়িয়েও যুবক হ'য়ে উঠেছো, তোমার এই অপরাধ কি আমিই ক্ষমা করতে পারবো কোনোদিন, না কি তুমিই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবে? সেই বয়সে, সেই সবচেয়ে কাঁচা এবং আগ্রহে ভরা বয়স থেকে তোমাকে যদি না-দেখতাম—তুমি, এমন আশ্চর্য সজীব এবং উদাসীন!—তাহ'লে তোমার প্রতি এই অন্যায় ভক্তির নিগড়ে কি আমি এমন ক'রে বন্দী হতাম আজ? তোমার ঐ চুল দুলিয়ে হেসে ওঠা দেখবো ব'লে কতবার কত ছুতোয় ঘুরে বেড়িয়েছে একটি ছোটো মেয়ে—তুমি কি তা জানো? তোমার আবোলতাবোল ঝোড়ো গলার কথা শুনতে, কবিতা শুনতে, কত সময় দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থেকেছে ছোটো একটি মেয়ে—তুমি কি তা জানো?—কিন্তু এমনই বা ছোটো কী? তবু—ঐ ছোটো থাকার বদনাম তার ছিলো ব'লেই তুমি তাকে এমন করলে—করতে পারলে—যে সে আজ তোমারই মতো চলে, বলে, ভাবতে চায়, তোমার মুদ্রাদোষ পর্যন্ত নকল করে, আর তোমার কাছে শেখা কথা আবার তোমারই কাছে আওড়ায় যখন, তখন তোমার প্রশংসা শোনার লজ্জাও তাকে সইতে হয়!

'তাছাড়া, এতে অবাক হবার কী আছে তোমার? এ-সব তো আমার কথা নয়, তোমারই কথা।'

'কথার কোনো কপিরাইট আমি মানি না। যে যেটা নিজের ক'রে নিতে পারে সেটাই তার নিজের। সেই নিতে পারার শক্তি তোমার আছে গীতা।'

'মনে হচ্ছে সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছো ছাত্রীকে?'

'যথোচিত ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। মাষ্টারি করলে এই রকমই সব অধঃপতন হয়।'

'আমি বলতে চেয়েছিলাম যে সার্টিফিকেটের যোগ্য আমি নই। সেদিন ক্লাশে তুমি মেটাফিজিকাল কবিদের বিষয়ে যা বললে, তা বোঝার মতো বুদ্ধিও আমার জুটলো না।'

হঠাৎ একটু লাল হ'লো মৌলি। যে-কর্ম সে নিয়েছে সে-কর্ম তাকে সাজে না, এ-কথা সে কি কখনো ভুলতে পারে যে আবার তাকে মনে করিয়ে দিতে হবে? না, পারে না সে—কিংবা হয়তো এখানে তার মনই নেই—তার একদা-গুণমুগ্ধ অধ্যাপকেরা নিরাশ হচ্ছেন মনে-মনে, আর ছাত্ররা—সেই সতেজ, উৎসাহী, জিজ্ঞাসু যুবকদের বিষয়ে মর্মঘাতী কথাটা এই যে তাদের চোখে এখনো তার খ্যাতির ঘোর লেগে আছে—ছাত্রহিশেবে তার প্রবচনরূপ খ্যাতির, তার উপর বাংলা সাহিত্যে তার ক্রিয়াকর্মের বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়ার। আ, খ্যাতি—গ্লানিকর, দুঃসহ পদার্থ—সবচেয়ে গ্লানিকর তখন, যখন তা ছড়িয়ে পড়ে কোনো অক্ষমতার অক্ষম্য আচ্ছাদনের মতো, যখন তা ঢেকে রাখে, লুকিয়ে রাখে, ঘটতে দেয়, নিজের সঙ্গে এবং পরের সঙ্গে কোনো প্রবঞ্চনা! তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ এই মাষ্টারি, কিন্তু যে-কোনো কাজ, তুচ্ছতম যে-কোনো কাজ হাতে নিয়ে তাতে অকৃতকার্য হওয়া—এটা কেমন ক'রে মেনে নিতে পারে সে, একদা যার কথা ছিলো বিশ্বজয়ী গাণ্ডীব হাতে বেরিয়ে পড়ার? কবে এই মাষ্টারি সে ছাড়তে পারবে? কবে আর তাকে সইতে হবে না বাছা-বাছা ছাত্রদের শ্রদ্ধা—মর্মস্পর্শী, অপমানকর উপহার—সেই উজ্জ্বল সম্ভ্রমের ব্যঙ্গ বিমলেন্দু সেনের মতো ছাত্রের চোখে, নিজের চরকায় তেল দেবার ক্ষমতা সত্যি বলতে তার চেয়ে যার অনেক বেশি।

মৌলি হাতের মুঠো শক্ত ক'রে ছেড়ে দিলো একবার—যেন তার উদ্গত অভিমানটাকে পিষে দিলো আঙুলের চাপে। 'বুদ্ধি জুটলো না বুঝি?' ব'লে হাসলো। 'কিন্তু সে-দোষ তোমার বুদ্ধির নয়, গীতা। মেটাফিজিকাল কবিতা অন্য কাউকে পড়াতে দেবার জন্য আন্দোলন করা উচিত তোমাদের!'

'আমি ভাবছিলাম তোমার কাছে এসে একদিন—কিন্তু তোমার কি সময় হবে?'

'সময়? আমাকে এতদিন ধ'রে দেখার পর তুমি কি এই ভাবলে, গীতা, যে আমি "ব্যস্ত" মানুষ?'

'আমি জানি যে সময়ের অভাব কখনোই কারো হয় না। শুধু ইচ্ছারই অভাব হয়। তাই জিগেস করলাম।'

'শুধু ইচ্ছার নয়, শক্তিরও অভাব হয় মনে রেখো। যারা বলে যে সময় পেলে তারা এই করতো ঐ করতো, তারা করুণারও যোগ্য নয় ভুলো না।'

'তাহ'লে দেবে একদিন বুঝিয়ে?'

'আমি পারি না বুঝিয়ে বলতে!' মৌলি সরল গলায় হেসে উঠলো, তার কপালের উপর নেচে উঠলো একটি চুলের গুচ্ছি। 'আর তাছাড়া—' হাসির সুর হঠাৎ মিলিয়ে গেলো তার গলা থেকে—'আমি কি নিজেই কিছু বুঝেছি যে অন্যকে বোঝাবো? কোনো বিষয়েই মনস্থির করতে আমি কি পেরেছি এখনো? আমি বড়ো উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ—কত সময় কত রকম মনে হয় নিজেই তার দিশে পাই না।'

—উদ্‌ভ্রান্ত! তা-ই তো, তা-ই তো তোমাকে হ'তে হবে। তার মানেই জীবন্ত, তার মানেই মনের তার বার-বার হাজার সুরে বেজে ওঠে। তুমি কি কখনো তাদের একজন হ'তে পারো, যারা পায়ে পা তুলে নিশ্চিন্ত, যারা সব বিষয়ে "ঠিক জানে", যারা কয়েকটি "প্রিন্সিপল" মেনে জীবন কাটায়? শিখবে তুমি চিরকাল, নতুন হবে বার-বার, বেড়ে উঠবে তুমি চিরকাল! তোমার মতো উদ্‌ভ্রান্ত হ'তে পারা কারো-কারো উচ্চাশার আকাশ, তা কি তুমি জানো?

'বোঝা গেলো।' আবার একটু হাসি ফুটলো গীতার ঠোঁটে, তার ছবির মতো ভ্রূকুটি একটু বেঁকলো। 'আবেদন মঞ্জুর হ'লো না। এদিকে ক্লাশের সবাই ভাবে কী, জানো? ভাবে, "গীতার আর ভাবনা কী! স্বয়ং মৌলিনাথবাবু তার সহায়!"'

'স্বয়ং মৌলিনাথবাবু যার সহায় সেই ছাত্রকে ভগবান যেন দয়া করেন! পাশ-করানো বিদ্যে আমি কিছুই জানি না, তা তো বুঝেছো?'

'বড্ড তোমার দেমাক! আমি তো পাশ করার জন্যই জীবন পণ করেছি!'

'ঠিক অতটা পণ না-করলেও তোমার চ'লে যাবে, মনে হচ্ছে। প্রোফেসরদের সকলেরই ধারণা যে এ-বছর দুটি ফার্স্ট ক্লাস হবে: একটি তুমি, আর একটি বিমলেন্দু। এর মধ্যে ফার্স্ট কে হয় সেটা একটা দ্রষ্টব্য বিষয়।'

'কী এসে যায়, বলো তো, ফার্স্ট হ'লে? প্রত্যেক বছর, প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিতে, কতই তো ফার্স্ট হ'য়ে বেরোচ্ছে। কী এসে যায়?'

'পারলে, যে-কোনো কাজ হাতে নিয়ে করতে পারলে, এইটুকুই এসে যায়। না-পারা কি ভালো?'

'কিন্তু আমি ভাবি অন্য কথা। তখন কিছুই ভালো লাগে না।'

'কী ভাবো বলো তো?'

'সাধারণের মধ্যে একটু অসাধারণ না-হ'য়ে নেহাৎই সাধারণ হওয়া কি ভালো নয়?'

মৌলি একটু তাকিয়ে থাকলো গীতার দিকে। নিচু গলায়, যেন কোনো গোপন কথা বলছে এমনি সুরে বললো, 'গীতা! এইটে আমার মনের মতো কথা বলেছো!'

'আমার খারাপ লাগে, কেমন রাগ হয়, যখন ইউনিভার্সিটিতে তোমার কথা বলাবলি করে ওরা। কথায়-কথায় বলে—"সবাই কি আর মৌলিনাথ হয়!" তোমাকে ওরা প্রতিযোগিতার বাইরে রেখেছে।—কিন্তু কেন?'

মৌলি একটু হাসলো, স্পষ্ট বোঝা গেলো সে খুশি হ'লো কথাটা শুনে। গীতা আবার বললো, 'আমি ভাবি যে তুমি যেখানে আছো সেখানে কখনো পৌঁছনো যাবে না, এই যদি স্বতঃসিদ্ধ কথা, তাহ'লে এ-সব চেষ্টার প্রহসন ক'রে লাভ কী।'

সেই তৃপ্তির হাসিটুকু—যে-প্রশংসা নিজেকে সে দিতে চায় তা

অন্তের মুখ থেকে শোনার ক্ষণিক আত্মপ্রসাদ—মৌলির মুখ থেকে মিলিয়ে গেলো। 'গরম হচ্ছে ঘরটা,' ব'লে উঠে গিয়ে একটা জানলা খুলে দিলো, গীতার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো একটুক্ষণ। হাওয়ার জোর আর নেই, বৃষ্টি পড়ছে অবিরল ঋজু রেখায়, যেন কোনো একই কথা অফুরন্ত বার মনে করিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর বিস্মৃতিপ্রবণ মানুষদের। পাড়ার ঝাপসা-দেখানো ইলেকট্রিক আলোর সারি পেরিয়ে তার চোখ চ'লে গেলো প্রান্তরের অন্ধকারে, ফিরে এলো যেখানে অন্ধকার আরো ঘন ব'লে বটগাছটা দাঁড়িয়ে আছে বোঝা যায়। বাইরের সোঁদাগন্ধ হাওয়ায় নিশ্বাস নিলো, মুখে লাগালো স্পর্শময় বর্ষণের নির্যাস। তারপর ফিরে এলো চেয়ারের কাছে, কিন্তু বসলো না, গীতার সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো: 'আমি? আমি কি কোনোখানে পৌঁচেছি? না, গীতা। আমার দুঃখের কথা বলি তোমাকে; এতদিনেও মনের কোনো আশ্রয় আমি খুঁজে পাইনি। তাই তো অন্তদের কোনো কাজে আমি লাগি না: তুমি, গীতা—তোমারও কোনো কাজে লাগতে পারি না আমি। সাহিত্যের পথে বেরিয়েছো তুমি আজ: কী দেখছো এখানে? এখানেও পাণ্ডা আছেন, পুরুৎ আছেন, নানা মতের মোহান্ত—সমালোচক তাঁরা, পণ্ডিত, ধর্মযাজক, তাঁরা তোমাকে হাতে ধ'রে নিয়ে যাবেন পর-পর সুশৃঙ্খল পা ফেলে, তাঁদের কাছে পদ্ধতি শিখবে তুমি, নির্দেশ পাবে, নির্দিষ্টের আশ্রয় পাবে তাঁদেরই কাছে, গীতা। আর আমি এই এঁদেরই এড়িয়ে গেছি বরাবর, দূর থেকে গড় ক'রে পালিয়ে গেছি, পৈতে নিইনি, তিলক কাটিনি—এঁদের কারোরই কোনো ইশকুলে আমি ভর্তি হলাম না কখনো—স্বর্গরাজ্যের যে-চাবির গোছা বাঁধা আছে এঁদের কোমরে, তার ঝুমঝুম আওয়াজের আহ্বানে আমার মন সাড়া দিলো না; আমি চ'লে এলাম মন্দির গির্জে পাশ কাটিয়ে; আমি চাইলাম স্বাধীনভাবে স্বর্গে পৌঁছতে, আঁকাবাঁকা ধুলোর পথে ঘুরে-ঘুরে সোজাসুজি স্বর্গে পৌঁছতে চাইলাম: আমাকে ব'লতে পারো সাহিত্যের পথে বাউল, আপন উপলব্ধি ছাড়া আর-কিছুই যে মানে না সেই মিষ্টিক বলতে পারো আমাকে। এই পর্যন্ত বেশ ভালো।' ব'লে মৌলি থামলো, গীতার মুখে চোখ রাখলো একবার, গীতার চোখের তারা দুটি ছোট্ট দু-ফোঁটা হিরের মতো জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো। তারপর নিশ্বাস ফেলে আবার বললো, 'হ্যাঁ, এই পর্যন্ত শুনতে বেশ ভালো। কিন্তু যেখানে আমি তাঁবু বাঁধতে চেয়েছিলাম, সেই উপলব্ধি আমার কোথায়? এতদিনে কিছুই আমি সম্বল কুড়োতে পারিনি—শুধু অভিজ্ঞতা ছাড়া। কিন্তু সেই আমার দিনে-দিনে পলে-পলে পাওয়া অসংখ্য অবাক-করা আঘাত—আমার সাহিত্যের অভিজ্ঞতা, বলতে পারো জীবনেরও অভিজ্ঞতা—তার উতরোল অস্থিরতাকে উপলব্ধির সূত্রে কি আমি বাঁধতে পারলাম এখনো? না, গীতা, তা আমি পারিনি—তার মানে কিছুই পারিনি। অভিজ্ঞতা ঢেউয়ের মতো আসে আর যায়—উচ্ছৃঙ্খল তারা, নিয়ম মানে না, পরস্পরের প্রতিকূলে চলে কত সময়—ফেলে রেখে যায় কিছু পলিমাটি, দিনে-দিনে জ'মে ওঠে ভূমি—কিন্তু সেই মাটির স্তরে-স্তরে ফসল ফলাতে হ'লে শিক্ষা চাই, শাসন চাই, হয়তো—হয়তো কোথাও আত্মসমর্পণেরও শক্তি চাই, গীতা। কিন্তু আমি—আমি আমার অহমিকাকেই সিংহাসনে বসিয়েছি, কবিতার ক্রিমিন্যাল আমি—বিদ্রোহী—স্বপ্নের স্বৈরাচার আমার পেশা। এখানে স্বাধীনতা আছে, কিন্তু নিঃসঙ্গতাও আছে, গীতা; একরকম বলতে-না-পারা তীব্রতার আস্বাদ আছে, কিন্তু শান্তি নেই—শান্তি নেই।'

'মনে করো আমি শান্তি চাই না?' যে-মুহূর্তে মৌলি থামলো সে-মুহূর্তেই গীতা ব'লে উঠলো, 'মনে করো আমিও যদি উদ্‌ভ্রান্ত হ'তে চাই?'

ছোট্ট আওয়াজ ক'রে হাসলো মৌলি। তার বসবার ইজিচেয়ারটায় এক পা তুলে দাঁড়িয়ে গীতাকে একটু দেখলো যেন মন দিয়ে। 'মনে হচ্ছে ইতিমধ্যেই একটু উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছো?' তারপর হঠাৎ অন্য রকম গলায় বললো, 'তোমার পড়াশুনোয় কখনো কোনো অসুবিধে ঘটলে বিমলেন্দুকে জিগেস করতে পারো।'

'উদ্‌ভ্রান্ত হবার ওষুধ বুঝি বিমলেন্দু সেন?'

'ও অমন সুস্থির ব'লেই ওকে আমার ভালো লাগে।'

'সত্যি?' হাসির আভাস ঝিলিক দিলো গীতার চোখে।

না, সত্যি নয় কথাটা। সুস্থির মানুষ মৌলিনাথের ভালো লাগে না। ভালো লাগে না, কিন্তু তারিফ করে মনে-মনে। বিমলেন্দুর নিচু গলার কথা, তার অপ্রগল্‌ভ, অনুচ্ছ্বসিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ কথাবার্তা, তার চোখের স্মিতশীতল দৃষ্টি, তার বইয়ের পাতা ওল্টাবার অতিশয় মৃদু এবং সশ্রদ্ধ ধরনটি—এমন কখনো হয় না যে এ-সব মৌলিনাথের মনের কোনো-এক অংশের প্রশংসা কেড়ে না নেয়। ক্লাশে যখন বিমলেন্দুর দিকে তার চোখ পড়ে—মন দিয়ে শোনার ফলে একটু লম্বাটে দেখায় মুখটি, কিন্তু চোখে চোখ পড়লেই বোঝা যায় যে শুনতে-শুনতেই বাহুল্য অংশ ছেঁটে দিচ্ছে সে—কিংবা যখন ছাত্রদের কোনো অনুষ্ঠানের সন্ধ্যায় সে ন্যূনতম ব্যস্ততা দেখিয়ে অধিকতম সুচারুতা সম্পাদন করে—কিংবা কোনোদিন যখন মৌলিনাথের বাড়িতে এসে—সেদিন হয়তো রবীন্দ্রনাথের হাল আমলের গল্প নিয়ে কথা উঠলো—অধ্যাপকের অনেক কথার ফাঁকে-ফাঁকে গল্পকবিতার অলীকতার বিষয়ে অল্প কয়েকটি সারবান মন্তব্য ক'রে কৃতজ্ঞ মুখে উঠে চ'লে যায়—তখন মৌলিনাথ মনে-মনে বলে, 'ছেলেটির সবই ভালো, কিন্তু এমন—পরিমিত!' আর সঙ্গে-সঙ্গে তখনই আবার বলে, 'ভাগ্যবান যুবক! ভাগ্যবান!'

'বিমলেন্দুকে সত্যি খুব ভালো লাগে আমার,' যেন একটু ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলে মৌলি বললো। 'সত্যি খুব ভালো ছেলে।'

'"ভালো ছেলে"দের ভক্ত হ'লে কবে থেকে?'

'সে-অর্থে নয়,' মৌলি চোখ দিয়ে প্রায় তিরস্কার করলো গীতাকে। 'ও পড়েছে বিস্তর, বুঝেছে অনেকটা, যা বুঝেছে তা গুছিয়ে বেশ বলতেও পারে।—কিন্তু আমার চাইতে তুমি তো ওকে বেশি জানো।'

'হ্যাঁ, জানি। জানি ওর মস্ত গুণ এই যে ও যা বোঝে না তা নিয়ে কথা বলে না। হয়তো,' একটু থেমে গীতা জুড়ে দিলো, 'হয়তো তা বুঝতেও চায় না।'

'যা বোঝা যায় না,' গীতার কথাটা ভুল শুনলো মৌলি, কিংবা হয়তো ইচ্ছে ক'রেই বদলে নিলো, 'তা বুঝতে না-চাওয়াই তো

ভালো! যা বোঝা যায় না তা বোঝার চেষ্টা, যা বলা যায় না তা বলার চেষ্টা—' হঠাৎ থেমে গেলো মৌলি।

'বলো!' যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এলো গীতার এই নিচু গলার ডাক, আবেদনে ভরা আহ্বান, নিশ্বাসের সুরে মনে-মনে বলা প্রায় কোনো প্রার্থনার মতো। কিন্তু মৌলি জবাব দিলো না, স'রে গিয়ে পাইচারি করতে লাগলো ঘরের মধ্যে। আ, এ-সব কথা গীতাকে কেন বলছে সে, কেন সে তার মনের ভাবনা গীতার সামনে মেলে ধরে যখনই গীতাকে সে কাছে পায়? এটা অভ্যেস হ'য়ে গেছে তার, ওরও তা-ই হয়েছে হয়তো; গীতা এলেই এই রকম কথা চলে খানিকক্ষণ, ও কেমন একরকম পারে তার কথাকে ঠিক সে-সব দিকেই বইয়ে দিতে যেখানে বলতে গেলে কথা আর ফুরোয় না। ভালো না—ভালো হয়নি এটা। কথা বলার তার হয়তো প্রয়োজন আছে, কিন্তু অন্যের তো শোনার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই শুধু নয়, রীতিমতো অপ্রয়োজন আছে; ক্ষতি হয় ওতে, নষ্ট হ'য়ে যায় জীবন। এক দিকে এই কবিতা, সাহিত্য—যা-কিছু বানানো, রচিত, কল্পিত, অর্থ-দিতে-চাওয়া; অন্য দিকে বিনা জবাবদিহির জীবন। সুখ শুধু তারাই জানে, শুধু বাঁচা, শুধু বাঁচতে পারাই যাদের যথেষ্ট। বাস্তবে ছাড়া আর কোথায় স্বাস্থ্য আছে মানুষের? সংসারে ছাড়া আর কোথায় আশ্রয় আছে? নিজে যারা সুন্দর হ'তে জানে, সুন্দর ক'রে বাঁচতে পারে, কোন দুঃখে সুন্দরের পিছনে ছুটবে তারা—সেই উন্মাদ অভিশপ্ত মৃগয়া, যার শেষে বিজেতাই একদিন মুখ থবড়ে মাটিতে প'ড়ে থাকে কিরাতের বর্বর তীরের লক্ষ্য হ'য়ে! আগে সে ভাবতো যে জীবন আর সাহিত্য পরস্পরের পরিপূরক: জীবনে যে-সব প্রশ্ন জাগে তারই উত্তর মানুষ খুঁজে পায় সাহিত্যে।—কিন্তু না! কিছু জানবার জন্য আমরা লাইব্রেরিতে যাই, সেটা সাহিত্য পড়া নয়; শোকের দিনে আমরা গীতা খুলে বসি, সেটা কবিতা পড়া নয়। জীবনসমস্যার মেটিরিয়া মেডিকা নয় সাহিত্য, তার সম্বন্ধে সবচেয়ে ভয়ংকর কথাই তো এই যে সে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, এই বিশ্বে স্বাধীন সত্তা আছে তার। তাই তো খুঁজে-খুঁজে তার অন্ত কেউ পায় না; তাই তো সব ব্যর্থ—অর্থহীন—যত কথাই কবিতা নিয়ে আমরা বলি না, যত-না আমরা সুন্দরের সুতো ছিঁড়ি ব'সে-ব'সে। কবিরা কবিতা লেখেন—সব সময় বলবার কিছু আছে ব'লেই কি লিখতে বসেন? তা তো নয়। এর আরম্ভ কোথায়? সেই প্রথম চালিয়ে-দেয়া ধাক্কা আসে কোথা থেকে? খেলাচ্ছলে আরম্ভ হয় কত সময়—হয়তো কোনো ছন্দের পোকা মগজ থেকে তাড়াবার জন্য, কিংবা যখন হঠাৎ কোনো তৈরি লাইন পথের ধারে নর্দমার জলে উপহার পায়, কিংবা কোনো চমকে-দেয়া আদরের মতো মিল—শুধু একটি মিলেরই জন্য কি কবিতা লেখা শুরু হয় না কখনো? কিন্তু সেই তুচ্ছ আরম্ভ থেকেও মহৎ পরিণাম সম্ভব হয় কোন জাদুবলে? কেমন ক'রে তাতে বেরিয়ে আসে পরতে-পরতে অভিজ্ঞতা, ধরা পড়ে স্তরে-স্তরে অর্থ, আসে ব্যাপ্তি, ঘনতা, সংগতি;—শুধু তা-ই নয়, তার উপরেও এমন কিছু এসে মিশে যায় কবি নিজে যা ইচ্ছে করেননি, ইচ্ছে করলেও দিতে পারতেন না কখনো—যার ফলে কবিতা হ'য়ে ওঠে মনুষ্যজাতির সংহত ইতিহাস? খেলা আর খেলা থাকে না যখন, তখনকার তাপ, হিম, পরিশ্রম, ত্যাগ—নিজেকে নিংড়ে বের করার দম-বন্ধ-করা কষ্ট—সব বুঝে নিয়েও, সেখানে পূর্ণ মূল্য মিটিয়ে দিয়েও—তবু তো কিছু বাকি থাকে যা বোঝা যায় না—সেই সর্বশেষ স্পর্শটুকু, যা না-হ'লে কিছুই হ'তো না, যেটুকু না-ঘটলে কথার সারি তাসের বাড়ির মতো ভেঙে পড়ে! সেই অনির্বচনীয়ে উঁকি দেবে কে? সৃষ্টির রহস্য যেখানে সহনীয় দৃশ্য দিয়ে ঘিরে রেখেছে—সেই আশ্চর্য দ্রৌপদীর শাড়ি!—কার এত স্পর্ধা যে পরদা সরিয়ে উঁকি দিতে যাবে সেখানে? না, না! এই গীতা, আজকের এই উনিশ বছরের গীতা আমাদের, যার সামনে আস্ত একটা ভরপুর জীবন প'ড়ে আছে—তাকে কেন লুব্ধ করা, ব্যর্থতার পথে, আবেগের ব্যভিচারের পথে, তাকে কেন টেনে আনা?

'তুমি কী ভাবছো জানতে পারি?'

'তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছিলাম।' মৌলি পাইচারি থামিয়ে আবার এসে ইজিচেয়ারে বসলো।

'আমাকে কোনো কথা বলতে এতক্ষণ ভাবতে হয় তোমার?'

'তোমার জন্য আমার ভাবনা হয়, গীতা, যেহেতু তুমি কবিতা ভালোবাসো।'

কবিতা ভালোবাসি? হায় মূঢ় মানুষ! পৃথিবীর সমস্ত কবিতা আমি কি মহানন্দে বানের জলে ভাসিয়ে দিতাম না, আমার চাওয়ার এক বিন্দু তাতে মিটতো যদি! কী পড়ি আমি কবিতায়, কেন পড়ি, কোন মূল্য সেখানে আমার জমা আছে তা তুমি বোঝো না—বুঝো না—কোনোদিন না-বুঝে আমায় বাঁচিয়ে দিয়ো তুমি, আমার এই ফাঁকির বেসাতি ধ'রে ফেলো না।

'হ্যাঁ, ভাবনা হয়,' আস্তে, সস্নেহ সুরে মৌলি বললো, 'কখনো-কখনো ভয় করে তোমার জন্য। না, গীতা না; এ-সব নিয়ে কেন এত ভাবছো তুমি?'

'কী নিয়ে ভাবছি বলো তো?'

'ভালো না এ-সব। ঐ-যে তুমি বললে যে তবু ঐ ইচ্ছেটুকু থাক, ও-রকম কথা ভালো না, গীতা। তাতে বুঝবে বেঁচে আছো? না, না! আমি বলছি তোমাকে, ওতে মানুষ বাঁচে না। আমি তো জানি, আমি তো একটা ইচ্ছার পিণ্ড হ'য়ে ব'সে আছি; আমি তো জানি যে চীৎকার ক'রে বুক ফাটালেও সাড়া দেবে না সেই বধির। এই পাপ, হৃদয়ের এই ব্যাধি যদি উপড়ে ফেলতে না পারো, গীতা, তাহ'লে জীবন তার প্রতিশোধ নেবে তোমার উপর, তুমি বুড়ো হবে অকালে, জিভে স্বাদ থাকবে না, বন্ধুরা তোমাকে ছেড়ে যাবে—তাহ'লে তোমার দু-চোখে দুটি হিরের কৌটো আর জলজল করবে না, গীতা! ঐ পরিণামের দিকেই রঙিন পথ মেলে দিয়েছে এই—এই সব—কবিতা ইত্যাদি ব্যাপার। বুঝেছো আমার কথা?'

'বুঝেছি। কিন্তু রাধুকে একটু সাহায্য করলে বোধহয় ভালো হয়, ব'লে গীতা উঠে দাঁড়ালো।

৩

দু-হাতে ধরে চায়ের ট্রে নিয়ে আসতে-আসতে রাধু ঠেকে গিয়েছিলো দরজার পরদায়, গীতা গিয়ে পরদাটা তুলে ধরলো। ঘরে এসে বেতের টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাধু একটু দাঁড়ালো। আধবুড়ো মানুষ, মাথায়

কাঁচা-পাকা চুল, চওড়া মুখের ভাবটি যেন জজিয়তি ধরনের গম্ভীর। একটু ঢিলে, দীর্ঘসূত্রী, কিন্তু মোটের উপর বিশ্বাসী কাজের লোক, আর অবশ্য অনেক দিনের পুরোনো—তবে বড্ড যেন রাশভারি, এই বিশ্বসংসারে অনুমোদনের অযোগ্য কিছু আবিষ্কার করতে সর্বদাই যেন প্রস্তুত। মৌলি তাকে সমীহ করে, প্রায় একটু ভয় করে বললেও ভুল হয় না; তার মনে হয় রাখু যেন কঠিন সমালোচনার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়—এই ঘরের মধ্যে বইপত্র নিয়ে ব'সে যা-কিছু সে করে কিংবা করে না, তার সমস্তটাই রাখুর বিচক্ষণ আনুকূল্যহীন বিচারের অধীন ব'লে মৌলি সন্দেহ করে মনে-মনে।

বেতের টেবিলের বই চিঠিপত্র লেখার টেবিলে তুলে রাখলো রাখু। ঠিক দরকার ছিলো না, তবু ট্রে-সুদ্ধ টেবিলটি মৌলির আরো হাতের কাছে এগিয়ে দিলো। ঈষৎ শ্লেষ্মাজড়িত গলায় জিগেস করলো, 'আর-কিছু লাগবে?'

'না,' রাখুর দিকে না-তাকিয়ে মৌলি জবাব দিলো।

'চিনির শিরেয় চিনেবাদাম পশিয়ে ভাজা হয়েছে; মা খেতে বললেন।'

'আচ্ছা।'

মাপা-মাপা পা ফেলে রাখু চ'লে গেলো ঘর থেকে। তার ফতুয়া-পরা জোরালো পিঠটা—মৌলির মনে হ'লো—যেন নিঃশব্দে তাকে বিদ্রূপ ক'রে গেলো। হঠাৎ কেমন নিস্তেজ লাগলো তার, অবসন্ন; যেন একটা হিম কাঁপুনি নামলো তার মেরুদণ্ড বেয়ে; মুহূর্তের জন্য মনে হ'লো তার এই সাহিত্যচর্চা—জীবনের সর্বস্ব তার —তা কিছু না, কিছুই না, কিছুই এতে এসে যায় না। মনে হ'লো যৌবন তার ফুরিয়ে গেছে; আর সেই অভাবের ক্ষতিপূরণ হয় এমন কোন সম্পদ আছে পৃথিবীতে?

বাইরের কালো রাত্রির দিক থেকে চোখ সরিয়ে আনলো মৌলি, আপাতত এ-কথা ভেবেই সুখী হবার চেষ্টা করলো যে ঠিক সময়ে চা পাঠিয়ে দিয়েছেন মা। সুখঃ কথা ব'লে ক্লান্ত হ'য়ে গরম চায়ে গলা ভিজোবার সুখ, কোনো বৃষ্টি-নামা শেষরাত্রের ভাঙা ঘুমে পায়ের তলায় পুরোনো কাঁথার উষ্ণনরম শীতলতার স্পর্শসুখ—সুখের এ-সব উঞ্ছবৃত্তি নিয়েই সারা জীবন কেটে যায় মানুষের। ভালো—কিন্তু তাও কি ভালো নয়, এটুকুই কি বাঁচোয়া নয়, সত্যি বলতে? কোনো-না-কোনো রকমের সুখ যদি না থাকে তাহ'লে আত্মসম্মানও থাকে না, আর আত্মসম্মান না-থাকলে আর থাকলো কী জীবনে? হ্যাঁ, ভালোই তো; ভালোই তো দেখাচ্ছে এই সাজানো ট্রে, সবুজ-হলুদে ডোরা-কাটা কাপড়ের উপর গোয়ালিয়রের গাঢ়-নীল পেয়ালা—সেবার নিয়ে এসেছিলো কলকাতা থেকে—গন্ধ উঠছে গরম নিমকির, চিনিতে পশানো চিনেবাদামটাও দেখতে কিছু মন্দ লাগছে না। মৌলির মনে হ'লো যে এই সব দৈনন্দিন জিনিশ—জীবনের সাধারণ সব উপকরণ, যা সে ব্যবহার করে, ভোগ করে, নির্ভর ক'রে থাকে যাদের উপর—এদেরও কিছু পাওনা আছে তার কাছে, কিন্তু এদের সেই মূল্যটুকু মিটিয়ে দিতে সে-যে ভুলে যাচ্ছে আজকাল, এতেই বোঝা যায়—এটাই কি তার ব্যর্থতার পরিমাপ নয়?

গীতা আবার সেই মোড়াটিতে এসে চুপ ক'রে ব'সে ছিলো, মৌলির চোখ স'রে গেলো তার দিকে। একটু পরে বললো, 'তোমার শাড়ির রংটি বেশ।'

'হেলিওট্রোপ রং তোমার ভালো লাগে?'

'হেলিওট্রোপ—সুন্দর কথা! আসল মানে "সূর্যমুখী"। অবশ্য আমাদের ভাষায় সূর্যমুখী আলাদা। হেলিওট্রোপ ফুল তুমি দেখেছো?'

'না, দেখিনি।'

'আমিও দেখিনি। তবে কচুরিপানার ফুল দেখেছি। তাও সুন্দর। আর ঠিক এই রকমই তার রং।' একটু চুপ ক'রে থেকে মৌলি আবার বললো, 'বেশ রংটি।'

'বেশ বলছো? না, রংটা বাজে।'

'বাজে?'

'নয়তো আমাকে ছাড়িয়ে শাড়ির রংই তোমার চোখে পড়লো!'

'আসলে এই রংটিতে তোমাকে মানিয়েছে বেশ।'

'কিন্তু আর কি মেয়ে নেই যাকে এ-রঙে মানায়?'

'একচ্ছত্র আধিপত্য চাও?' মৌলি হাসলো।

'তোমার চা বোধ হয় কড়া হ'য়ে যাচ্ছে,' গীতা মনে করিয়ে দিলো মৌলিকে, কিন্তু চা ঢেলে দেবার মেয়েলি কর্তব্যটুকু সম্পাদন করতে অগ্রসর হ'লো না।

'চা—বেশ, বেশ। আমাদের পূর্বপুরুষদের আমি ক্ষমা করতে পারি না, গীতা—এই ভারতবর্ষীয় চা পাতা তাঁরা পাঁচ হাজার বছরে আবিষ্কার করতে পারলেন না। কাজটা বাকি রাখলেন ইংরেজের জন্য।'

'আমি কিন্তু এখন চা না।'

'খাবে না?'

'এইমাত্র খেয়ে আসছি।'

'তাহ'লে নিমকি একটা?' মৌলি নিচু হ'য়ে টী-পটের ঢাকনা তুললো।

'আচ্ছা, দাও। মৌলির হাত থেকে আধখানা নিমকি ভেঙে নিলো গীতা, বাঁ হাতের দু-আঙুলে ধ'রে থাকলো।

'তোমাকে প্লেট দিইনি বুঝি?'—মৌলি ভ্রম সংশোধন করলো তাড়াতাড়ি—'একটু মিষ্টি চিনেবাদাম? রাখু বিশেষভাবে রেকমেণ্ড করলো এটা।'

গীতা দুটি-তিনটি চিনেবাদামের দানা তুলে নিলো। 'আচ্ছা, একটু চা-ও দাও। আধ পেয়ালারও কম কিন্তু।' তারপর মৌলির হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিয়ে তার উপর মুখ নামিয়ে গভীরভাবে নিশ্বাস নিলো একবার। চোখ বুজে এলো তার, সেই গন্ধে, সেই দুর্বার, ক্ষণকালীন আঘ্রাণে, যাকে কিছুতেই ধ'রে রাখা যায় না কিন্তু মুহূর্তেই যে অনেক কিছু কাজ ক'রে চ'লে যায়, যে-গন্ধ প্রথম তাকে আঘাত করেছিলো যখন চা নাড়তে টী-পটের ঢাকনা তুলেছিলো মৌলি। সে কি চায়ের গন্ধ? না চাঁপা ফুলের? না কোনো বৈশাখের সোনার মতো সকালবেলার? এ তো সেই আবার—বৃষ্টি, অন্ধকার, বছর, সময়, সমস্ত পার হ'য়ে সেই আবার, সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল সকালবেলাটি, যখন সে পা টিপে-টিপে এই ঘরে এসেছিলো, ওদের দু-জনের কত কী বলাবলির মধ্যে হঠাৎ এসে মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়েছিলো! আ—ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষ গীতা। কিন্তু তার মন, তার হৃদয়, তার বারো বছরের কাঁপন-লাগা শরীরের

অণু-পরমাণু দিয়ে তখনই কি সমস্ত ইতিহাস সে প'ড়ে নেয়নি—ইতিহাসের পাত্রীও কি হ'য়ে পড়েনি সঙ্গে-সঙ্গে?—ওদের দু-জনের—কথাটা কি উচ্চারণ করা যায়? কিন্তু এখন আর বাধাই বা কী—ওদের দু-জনের কিশোরপ্রণয়ের তাপ সেও কি আভাসে কিছু পায়নি, ঢেউ তুলে ছড়িয়ে যায়নি তার আবহাওয়ায়—যেমন ফাল্গুন মাসে দুপুরবেলায় হঠাৎ দক্ষিণে হাওয়া দেয়, আর আমের ডাল শিউরে উঠে মুঠো-মুঠো মুকুল তোলে ফুটিয়ে?—সেইখানেই আরম্ভ! অনেক দিন, অনেক মুহূর্ত, বার-বার কত সোনালি ঝলক ব'য়ে গেছে তার উপর দিয়ে—কিন্তু সেদিনের সেই সকালবেলাটির মতো, চাঁপার গন্ধে চায়ের গন্ধে নেশা ধরানো সেই মুহূর্তটির মতো, কিছুই আর ঘটেনি এই ইতিহাসে। কী তীব্র ভালো লাগা ছিলো তাতে, সেই শুধু কাছে এসে একটু দাঁড়ানোয়, তার হাত থেকে চাঁপা ফুল নিয়ে মাথা নিচু ক'রে আস্তে-আস্তে ফিরে যাওয়ায়—যাতে কিনা এই জীবনের যা-কিছু ভালো, যা-কিছু সুন্দর, সমস্তই ঐ গন্ধ হ'য়ে জড়িয়ে আছে তার মনের মধ্যে। আর এখন? এখনই কি তোমার ভালো লাগার অবসান হয়েছে, গীতা? এই তো তুমি ব'সে আছো—যে-চায়ে সত্যি তোমার ইচ্ছে নেই সেই চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে, যে-কবিতায় সত্যি তোমার মন নেই তারই স্বচ্ছ জালের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে—শুধু কাছে থাকতে, ব'সে থাকতে, তাকিয়ে থাকতে!

'চা খাচ্ছো না? ভালো হয়নি?'

'খাচ্ছি।' গীতা মুখ নিচু করলো পেয়ালায়, কিন্তু চুমুক না-দিয়ে তখনই আবার বললো, তোমার মনে পড়ে, একদিনের কথা? একদিন—অনেকদিন আগে—সকালবেলা তোমার এখানে এসেছিলাম। সবাই এসেছিলাম আমরা। মা, দাদা—দিদিও। তোমার টেবিলে সেদিন পাথরের থালায় চাঁপা ফুল ছিলো।' এটুকু ব'লে চুপ করলো গীতা, যেন আরো কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো।

একটু কি ছায়া পড়লো মৌলির মুখে? চোখের পাতা মুহূর্তের জন্য নেমে এলো চোখের উপর? কিন্তু তখনই হাসি ফুটলো ঠোঁটে, পরিষ্কার চোখে হেসে তাকিয়ে বললো, 'মনে আছে তোমার? তোমাকে সেদিন একটা ফুল দিয়েছিলাম, কিন্তু সব ক'টাই দেয়া উচিত ছিলো। যা সুন্দর তুমি ছিলে তখন!'

'ছিলাম!'

নিশ্বাস পড়লো মৌলির। সবচেয়ে নিষ্ঠুর কথা—ঐ ছিলো, ছিলাম! কিন্তু ঐ তো হয়, গীতা, ঐ তো হয়। তোমার ঐ বয়সে—তোমার রূপের যেন তুলনা ছিলো না! আর এখন—আরো দশজন রূপসীর ভিড়ে মিশে গেছো তুমি। এক দশা তোমার আর আমার।

'কেউ-কেউ হয়তো বলবে যে এখন তুমি আরো সুন্দর।'

'কিন্তু তুমি তা বলবে না—এই তো? তা তোমার মতো বছর-বছর আরো সুন্দর তো সবাই হয় না।'

মৌলি হাসলো, যেন বেশ খুশি হ'য়েই হাসলো। 'আমার অনেক

প্রশংসা শুনেছি, গীতা, কিন্তু আমি দেখতে ভালো এ-কথা এই প্রথম শুনলাম।'

এই প্রথম? কেন এ-সব মিথ্যা ব'লে আমাকে আরো মনে করিয়ে দাও আমার হার? আমি কি জানি না যে আমি হেরে গেছি, প্রথম থেকেই হেরে ব'সে আছি, ঠিক শুরু করতেই আমি কখনো পারলাম না!

'দিদি কী বলতো, জানো?' একটু সাবধানে, কিন্তু আপাতত খুব সহজ ক'রে গীতা বললো 'বলতো—মৌলির মতো চোখ, মৌলির মতো হাসি, কোনো মানুষের হয় না।'

'হ্যাঁ, তোমার দিদি যদি ও-রকম বলতেন,' ব'লে মৌলি একটু আয়াস ক'রে হেলান দিলো চেয়ারে। 'কিন্তু তোমার উপর দিদির প্রভাব স্বাস্থ্যকর হয়নি।'

দিদির প্রভাব? কে জানে কার প্রভাব। দিদিকে সে ভালোবাসতো—সেই তার শিউরে-ওঠা সবুজ বয়সে দিদিকে সে ভালোবাসতো খুব, মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকতো দিদির দিকে—সবচেয়ে ভালোবাসতো মৌলির সঙ্গে যা-কিছু তখন ছিলো চিত্রার। আ—ঈর্ষার পর্যন্ত স্থান ছিলো না তখন, এত সে অস্ফুট, অব্যক্ত, দুর্বল। দিদির যখন বিয়ে ঠিক হ'লো, বিয়ে হ'লো, তারপরেই মহেন্দ্রবাবু দিল্লিতে চাকরি নিয়ে চ'লে গেলেন—সেই সমস্তটা সময় সে কেঁদেছিলো খুব—থেকে-থেকেই তার কান্না পেতো তখন—কিন্তু সে-কান্না কিসের? কার জন্য? দিদির বিয়ের খবর সে প্রথম যখন শুনলো—সেই চাঁপাফুলের সকালবেলার দু-একদিন পরেই—তখনই কি লাফিয়ে ওঠেনি তার হৃৎপিণ্ড, মনে-মনে হায়-হায় ক'রে ব'লে ওঠেনি যে আর তো সে আমাদের বাড়ি আসবে না! কিন্তু তারপর, সেই বসন্ত ঋতুর প্রথম ঝড়ঝাপট কেটে যাবার পর, যখন সে প্রামাণ্যরূপে বড়ো হ'য়ে শাড়ি ধরলো, স্কুল ডিঙিয়ে কলেজে এলো—কপালগুণে পড়াশুনোর জোরে লক্ষ্যণীয়ও হ'তে পারলো একটুখানি—আর সর্বশেষে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে এসে নতুন একটা অধিকার পেলো যখন—এই এতগুলি বছর ভ'রে গীতার মনে এই কথারই ঢেউ দিয়েছে থেকে-থেকে যে ভাগ্যে এখন দিদি কাছে নেই। ভাগ্যে সুমতি হ'লো দিদির, মানুষটাকে আস্ত জুড়ে দখল করার স্পর্ধা হ'লো না, ভাগ্যে দিদি স্থিত হ'লো হাজার মাইলের নিশ্চিন্ত পরপারে—যখন—যখন আর অন্য কারো পিছন-পিছন পা টিপে-টিপে ঘরে আসতে তাকে হয় না, যখন সে নিজেরই পায়ে দাঁড়াতে পারছে!—নিজের পায়ে, কিন্তু অন্যের জমিতে বোধহয়? অন্তত, অন্য কেউ এই পথেই এগিয়েছিলো তার আগে—পৌঁছতে না পারুক, এই পথেরই দূর্বাঘাস মাড়িয়েছিলো? এমনি ক'রে এই ঘরে এসেছিলো অন্য কেউ, এমনি ক'রে কথা শুনেছিলো, দু-চোখ ভ'রে দেখেছিলো। জানি, মেনে নিয়েছি সব, তবু অসহ্য লাগে এক-এক সময়। তুমি, মহেন্দ্র ঘোষের স্ত্রী, তোমাকে কি আসতেই হয়েছিলো এই দেশে দু-দিনের জন্য বেড়াতে? আমার এই স্বর্গে, এই অলীক, ভিত্তিহীন, অনুপার্জিত স্বর্গে, এই একটু ছায়া কি তোমাকে ফেলতেই হ'লো, দরিয়াগঞ্জের দোতলা বাড়ির গৃহলক্ষ্মী? এ-কথা যখন ভাবে, তখন যেন দিদিকে আর ক্ষমা করতে পারে না গীতা, দিদির কারণে যত পুলক সে পেয়েছিলো তার জন্য কৃতজ্ঞ হ'তে ভুলে যায়—তখন তার মনে হয় যে দিদির সবই ফাঁকা, ফেনিয়ে-তোলা, ভেজাল, ঐ তার লম্বা-চওড়া সাহিত্যিক ভাবের চিঠিপত্রেরই মতো, যাতে মৌলিনাথের আগেকার গল্পের অসাধু অনুকরণ লক্ষ্য ক'রে গীতার যন্ত্রণাবিদ্ধ মন কিছুতেই আর সান্ত্বনা মানে না।

'বোধ হয় কারো উপরেই অন্য কারো প্রভাব স্বাস্থ্যকর হয় না,' ব'লে গীতা যেন সন্ধানী চোখে চকিতে একবার মৌলির দিকে তাকালো। তারপরেই বললো, যেন তার প্রথম কথাটারই দ্বিতীয়টা কোনো উদাহরণ, 'দিদি আমাকে এখনো খুব চিঠি লেখে, অনেক সব উপদেশের কথা থাকে তাতে।'

'ভালো, ভালো।' পিঠ-চাপড়ানো মোলায়েম গলায় মৌলিনাথ জবাব দিলো। 'ও-বিষয়টায় বরাবরই তিনি পারদর্শী। তারপর—কেমন আছে সে?'

'ভালো আছে।' গীতা লক্ষ্য করলো 'তিনি'র বদলে 'সে' কথাটা, আর সেই সঙ্গে বলার স্বর কেমন একটু বদলে গেলো। একটু নিমকি ভেঙে মুখে দিলো, সঙ্গে একটি মিষ্টি বাদাম, চুমুক দিলো স্মৃতি ভরা চায়ের পেয়ালায়। কিন্তু ততক্ষণেও মৌলি যখন আর-কিছু বললো না, তখন চোখ তুলে হালকা ক'রে জিগেস করলো, 'দিদির সঙ্গে শিগগির তোমার দেখা হয়নি বোধহয়?'

'শিগগির?' ঐটুকু ব'লেই মৌলি থামলো। তাকে মনে হ'লো অন্যমনস্ক, যেন বিষয়টাতে ঠিক মন দিচ্ছে না।

'দিদি তো ছুটিতে আসেন, আর তুমি তো তখন প্রায়ই আবার থাকো না।'

গীতা কি ভাবছে তার দিদিকে এড়াবার জন্যই ছুটিতে আমি বাইরে চ'লে যাই? কত বাষ্প ঢুকছে ওর মগজে, ওর সুন্দর মুখটি ম্লান ক'রে দেবার জন্য কত কল্পনার ষড়যন্ত্র ওকে ঘিরেছে? টুক-টুক টোকা দিচ্ছে দরজায়—শুনতে চায় ও, জানতে চায়, আসতে চায় ও যাকে ভাবছে 'ভিতরে', অতীতটাকে সৃষ্টি ক'রে নিতে চায় আবার, তারই মধ্যে বাঁচতে চায়। বেচারা! তার দিদির জন্য ছুটিতে আমি থাকি না? আ—যদি তা-ই, যদি তা-ই হ'তো! কাউকে এড়াতে চাই, কারো সঙ্গে পাছে দেখা হয় তাই পালিয়ে যাই—সে-রকম কোনো আশ্চর্য সম্ভাবনা দিগন্তে কোথাও জেগে থাকতো যদি! দেখা হয়নি? তাও হয়েছে। প্রমাণ পেয়েছি উত্তরভারতীয় জলবায়ুর স্বাস্থ্যকরতার, প্রমাণ পেয়েছি সে ভুল বলেনি, তার কথাই ঠিক—তোমার কথাই সত্য হ'লো, চিত্রা। ছেলেমানুষ—ছেলেমানুষি! কিন্তু আমি কি তার মুখের দিকে তাকিয়ে—তার প্রিয়্যাফেলাইট-পাণ্ডুতাজয়ী এখনকার মেদচিক্কণ মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কি মনে-মনে বলতে পেরেছি, 'কী বোকাই আমি ছিলাম তখন!' ভগবান না করুন! ভগবান করুন এত বিজ্ঞ যেন কখনো আমি না হই যে রঙ্গমঞ্চে নায়ক আর নই ব'লেই দর্শকের আসনে ব'সেও একাত্ম হ'তে পারি না! সবই আমরা ভুলে যাই—কিছুই আমরা ভুলি না। অতীত—কী আশ্চর্য এই যাকে আমরা অতীত বলি, প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে বর্তমানের স্রোতের মধ্যে—কোনো-একটি মুহূর্ত সেই মুহূর্তকালের বেশি দাঁড়িয়ে থাকবে না—অথচ কোথাও সব হ'য়ে-যাওয়ার একটা নিজস্ব সত্তাও আছে যেন, সেখান থেকে কিছুতেই তাকে নড়ানো যাবে না। যা ছিলো তাকে এখন দেখলে চিনতেই পারবো না, কিন্তু যা কোনো-একদিন ছিলো

তা যেন চিরকাল ধ'রেই আছে। চিরকাল, চিত্রা, চিরকাল। আমি কি ভুলতে পারি—সেই তুমি যখন আমার চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়েছিলে, সেই তোমার শরীরের স্পর্শ, বুকের উত্তাপ, তোমার সমস্ত শরীরের সৌরভে ভরা নিশ্বাসের উন্মাদনা! আমি কি ভুলতে পারি তোমার কথা—'তোমাকে ভালোবাসি, মৌলি!' আকাশ ভ'রে বাঁশি বেজে উঠলো, সে-বাঁশি আর থামলো না। 'ভালোবাসি!' কিন্তু সে তুমি নও, চিত্রা, সে তুমি নও—এ-কথাও তুমি ঠিক বলেছিলে। তোমার সঙ্গে দেখা না-হ'লে আর এসে যায় না আমার—তোমার সঙ্গে দেখা হ'লেও আর এসে যায় না, চিত্রা! তুমি—আমি—ও-সব কিছু না, খেলা, ছেলেমানুষি। কিন্তু এর পরেও আরো একটু কথা আছে যা তুমি বলোনি, বলতে পারোনি। আর তাই—যদিও অনেক তুমি দিয়েছো আমাকে, অনেক করেছো আমার জন্য, তবু এই ছেলেমানুষির চিকিৎসা আমার তোমার হাতে হ'লো না। সংসার ডাকলো তোমাকে, বাঁচলে তুমি সেখানে গিয়ে, জীবনের মৃন্ময় তাপ মুঠোর মধ্যে পেলে সেখানে—সেই একমুঠো জীবন, চিত্রা, যার অভ্যাসে, প্রথায়, দুটি-চারটি বিশ্বাস্ত প্রতীকের আশ্চর্য বলশালিতায় আমাদের হাজার উতরোল ইচ্ছা যেন মায়ের বুকে শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়ে। এদিকে আমি—আমার মনে কোনো একটি ইচ্ছা আজও বেঁচে থাকে যদি, সে-ইচ্ছা শুধু ছেলেমানুষির, শুধু অফুরন্ত বার বোকা হবার, পাগল হবার! আর তাই তো আমাকে জীবন ভ'রে খুঁজে বেড়াতে হবে কে আমাকে আবার বলবে 'ভালোবাসি', যে আমাকে ভালোবাসে তাকে পাবো না জেনেও খুঁজে-খুঁজে পাগল হ'তে হবে চিরকাল।

মৌলির মনে পড়লো তার চায়ের পেয়ালা—তার প্রিয় পানীয়—এটা ভালোই যে এ-সব সহজলভ্য জড়বস্তুতেও কিছু ভালোবাসা ছড়িয়ে থাকে মানুষের। পেয়ালা হাতে তুলে বললো, 'বৃষ্টি থামলো, মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, ধ'রে এলো বোধ হয়।'

'তোমাকে গাড়ি আনিয়ে দিতে হবে?'

'আমার যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছো, মনে হয়?'

'না,' মৌলি হাসলো। 'আমি বরং তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম যে এখনই যেয়ো না। আর-একটু বোসো। আরো দু-একটা কথা বলি তোমাকে।'

গীতা চোখ তুলে তাকালো, প্রায় ছাত্রীর মতোই একান্ত দৃষ্টিতে; তার মসৃণ শাদা কপালটির উপরে কুমারী সিঁথি সুন্দর দেখালো।

'কথাটা এই যে আমাদের, এই মানুষদের মাপে জগৎটা ঠিক তৈরি হয়নি। এই পৃথিবী—জগৎ—এটা বড্ড বড়ো, আমাদের পক্ষে বড্ড বেশি বড়ো এটা। ভেবে ভাখো এই জগৎ জুড়ে কত কিছু ব্যাপার চলছে অনুক্ষণ—তার কতটুকু আমরা নিতে পারি, পেতে পারি? একটা সহজ উদাহরণ নাও: পৃথিবীতে প্রতিদিন ঘটছে হচ্ছে—আশ্চর্য, হৃদয়প্লাবী ঘটনা। কিন্তু কোনো মানুষ তার সমস্ত আয়ুষ্কালে ক'টা সূর্যাস্ত চোখে ভাখে, বলো তো? আর দেখলেও বা তার কতটুকু দেখতে পায়? কতক্ষণ দেখতে পারে? গ্যেটে বলেছিলেন, পনেরো মিনিটের বেশি না। হয়তো বাড়িয়েই বলেছিলেন। হয়তো পাঁচ মিনিটেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে অধিকাংশ মানুষ। যা প্রিয়, যা সুন্দর, যা পরম, তার দিকে বেশিক্ষণ মন দিতে পারি না আমরা, তার দিকে নিবিষ্ট হওয়া প্রায় অসম্ভব। ছোটো-ছোটো ইন্দ্রিয়ের দূত ছোট-ছোটো অভিজ্ঞতা এনে দেয় আমাদের—কতটুকু তাদের দৌড়, কত অল্প গিয়েই হাঁপিয়ে পড়ে তারা, তা কি সবচেয়ে দুঃসাহসী মানুষও উপলব্ধি করে না তারা-ভরা আকাশের দিকে অন্ধকারে তাকিয়ে? মন দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে, অনেকটা তুমি জানতে পারো তা সত্যি; কিন্তু তাও তোমার নিজেরই মাপে অনেক, জগতের মাপে কিছুই না। যে-কোনো একটা বিষয় সম্পূর্ণ ক'রে জানতে হ'লে—শুধু তা-ই বা কেন, কোনো একটিমাত্র অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে হ'লে মানুষের সমস্ত জীবন যথেষ্ট নয়, গীতা। আর তাছাড়া, ঐ বুদ্ধি ব্যাপারটা অবান্তর, বলতে পারো বাইরেকার কথা ওটা। আসল কথাটা—সেটা কী আমি জানি না; শুনেছি ঋষিরা জানেন—মেয়েরাও জানে আমার মনে হয়।'

পেয়ালার অবশিষ্ট চা আস্তে-আস্তে শেষ করলো মৌলি, তারপর বললো:

'আর তাই আমরা এই পৃথিবীটাকে—জীবনটাকে—ছোটো-ছোটো টুকরো ক'রে ভাগ ক'রে নিই—নিতেই হয়, গীতা, না নিয়ে কোনো উপায় নেই শেষ পর্যন্ত। কিংবা থাকলেও সে-উপায় ভালো না, তাতে ভালো হয় না, হয়তো শুধু সর্বনাশের লাল বাতি জ্ব'লে ওঠে। হ্যাঁ গীতা, তা-ই ভালো—যার ভাগ্যে যেটুকু পড়লো সেই চিলতেটুকু নিয়ে খুশি হওয়া, তার বেশি সাহস না-করা—শুধু তা-ই নয়, তার বেশি কিছু হ'য়ে উঠতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া, ঠেকিয়ে রাখা, এড়িয়ে যাওয়া। কথাটা তোমার ভালো লাগছে না বুঝতে পারছি—এখন লাগবেও না—কিন্তু কোনো-একদিন—সে-দিন খুব দূরেও হয়তো নয়—তুমি ঠিক বুঝবে যে সম্মোহন ভাঙে না শুধু তথ্যের, প্রথার, পরিমিতির, তখন ঐ টুকরোটিকেই সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলার শক্তিও তুমি পাবে নিজের মধ্যে। যে-সুন্দর সত্যি পর্যাপ্ত, তৃপ্তিকর—যা শুধু তৃষ্ণা বাড়িয়ে চ'লে যায় না—তাও শুধু ওখানেই আছে। একটু আগে তোমার দিদির কথা জিগেস করছিলে না? না, শিগগির দেখা হয়নি তার সঙ্গে, কিন্তু দেখা হয়েছে। আর তাকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম—বুঝেছি—যা-কিছু ব'লে-ব'লে এতক্ষণে তোমার ধৈর্যের পুঁজি উজাড় ক'রে এনেছি প্রায়। আমি তাকে সুন্দর দেখেছিলাম; নিজের ছোটো গণ্ডির মধ্যে একান্তে বাঁচতে পারা যে কী-রকম সুন্দর, তা তোমার দিদিকে দেখেই বুঝেছিলাম, গীতা।

'কিন্তু এটা পরের কথা। এর আগে অন্য একটা সময়—অন্য একটা অবস্থা যায় মানুষের। তখন তার মনে হয় যে সমস্ত পৃথিবীটাই তার, কোথাও তার বাধা নেই, একটিমাত্র ক্ষুদ্র জীবনে মহান জীবন বাঁচবার তার স্পর্ধা হয় তখন। সেটাকে বলতে পারো মনের ছেলেবেলা—ছেলেমানুষি—কিছুতেই যখন তৃপ্তি হয় না, শান্তি হয় না—যা-কিছুই হোক মনে হয় আরো কিছু—অন্য কিছু কেন হ'লো না—আর সেই অন্য কিছু ঘটিয়ে তুলতে তার ইচ্ছাই শুধু যথেষ্ট মনে হয়। মধুর বলতে পারো সেই সময়টাকে—সেই প্রথম-ঘুমভাঙা ভোরবেলা, যখন আমরা স্বপ্নও দেখছি আবার রাস্তার আওয়াজও কানে আসছে, যখন আমরা স্বপ্নও দেখছি আবার স্বপ্নটাকেই ইচ্ছেমতো চালিয়ে নিচ্ছি যেন হঠাৎ-পাওয়া অদ্ভুত কোনো

দৈব বলে। হ্যাঁ—মধুর হয়তো, কিন্তু সুখের না—অন্তত আমি তাকে সুখের বলবো না—আর তথ্য তাতে কম থাকে ব'লে তার জ্বালাযন্ত্রণার মজুরিও মেলে না সব সময়। সুখ এসে পৌঁছয় পরে—যখন বেলা বাড়ে, সোনালি আভা মুছে যায়, স্বপ্নের অলস বিছানা ছেড়ে স্বাস্থ্যকর ঠাণ্ডা জলে নাইতে হয় যখন, যখন রান্না চড়ে, আপিশের ঘণ্টা বাজে ঘড়িতে—বেলা বাড়ে। তখন আমরা চিনতে পেরে সুখী হই, প্রামাণ্যকে বুঝতে শিখি—তখন থেকে পলে-পলে সুখী হ'তে শিখি আমরা, যার উপরে জীবনে আর শিক্ষা নেই। কেউ-কেউ থাকে কুঁড়ে, তারা দেরি না-ক'রে উঠতে পারে না; কেউ-কেউ তাদের দুপুর-আলোতেও ভোরের স্বপ্ন ব'য়ে বেড়ায়—লোকে তাদের পাগল বলে। কিন্তু তুমি, গীতা—তোমার ঐ সুন্দর ক'টি আঙুলের ফাঁক দিয়ে দিনের ভরপুর অঞ্জলি গ'লে-গ'লে ঝ'রে যাবে—এমন ভয় কল্পনাতেও তুমি স্থান দিয়ো না। তুমিও শিখবে একদিন, মেনে নিয়েই হারিয়ে দিতে পারবে; আর তখন—এই আজকের দিনে যা-কিছু নিয়ে তুমি জড়িয়ে আছো, সব ঠিক উচিত মূল্যই পাবে তখন, এই তোমার কবিতা নিয়ে মধুর খেলা, এই এখানে আমার কাছে ব'সে-ব'সে কত রকম ভাবনা নিয়ে ছেলেখেলা—'

'কী বললে? খেলা? ছেলেখেলা?'

'হ্যাঁ, গীতা, খেলা। কিন্তু তাই ব'লে অনর্থক নয়; জীবনেরই জন্য তৈরি হওয়ার উপায় এটা—কিন্তু উপায় মাত্র, অস্থায়ীরূপে প্রয়োজনীয়, সে-কথা ভুললে চলবে না। শিশু খেলতে-খেলতেই অভিজ্ঞ হয়, কিন্তু তাই ব'লে এমন সময় কি আসে না যখন তার অভিজ্ঞতার সে প্রমাণ চায় জগতের কাছে? তোমার মনের এখনকার ভাব আমি বেশ বুঝতে পারি। তোমার শাড়ির রং কারো চোখে ভালো লাগলে তোমার মনে হয় তোমাকে ছাপিয়ে শাড়িটাই তার চোখে পড়লো। তোমার কথা শুনে কেউ ভালো বললে তুমি সন্দেহ করো সে-কথা তোমার নিজের নয়। মনে-মনে নিজেকে যে-মূল্য দাও তুমি, বাইরের কাছে তা পাচ্ছো না ভেবে দুঃখ পাও। কিংবা হয়তো ভাবো—"এই শাড়ি, কথা—যা আভরণ, বিশেষণ, গুণ—তার বাইরে এমন কিছু কি নেই আমার মধ্যে, যাতে কোনো আয়োজনের কথাই ওঠে না—যা শুধু আছে ব'লেই মূল্যবান?" কিন্তু আমাদের মধ্যে যে-অংশটা সহজ,—বিনা-সাফাই, বিনা-জবাবদিহির অন্তরঙ্গ,—যেটা গ'ড়ে-তোলা, ঘটিয়ে-তোলা নয়,—সেটা কখনোই কোনো মূল্য পায় না যতক্ষণ-না কেউ এসে তার মূল্য দেয়। সে-মূল্য আমরা সকলের কাছে, অনেকের কাছে চাই না, কোনো-একজন বিশেষের কাছেই চাই। তোমাকে যে তোমার পূর্ণ মূল্য দেবে, সে-ও একদিন আসবে, গীতা।'

'হয়েছে তোমার? শেষ করেছো?' মৌলি চমকে উঠলো আওয়াজ শুনে—ঐ রকম ন্যাকড়া ছেঁড়ার মতো চাপা অথচ কর্কশ আওয়াজ গীতার গলা থেকে বেরোতে পারে সে ভাবেনি কখনো—আর এ কী আগুন রং কখন তার মুখে জ্ব'লে উঠলো! 'গীতা!'—তার দিকে হাত বাড়ালো মৌলি—'কী হয়েছে তোমার?' কিন্তু গীতা মাথা নেড়ে উড়িয়ে দিলো ঐ উদ্বিগ্ন প্রশ্ন, তার সামনের শূন্যটাকেই ঠেলে দিলো হাত দিয়ে। 'শেষ করেছো তুমি? আর-কিছু তো বলবার নেই তোমার? তাহ'লে শোনো—আমার দু-একটা শোনো এবার। তুমি তো অনেক বললে—জীবনের তত্ত্ব বোঝালে, মেয়েদের বিষয়ে মন্তব্য শোনালে, আমার বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণীও করলে দু-একটা। পণ্ডিত তুমি—চিন্তাশীল সুধীজন—কথা বলার অধিকার আছে তোমার। হ্যাঁ, কথা বলা—তোমার নিজের মনটাকে বাইরে বেশ মনোরম ক'রে ফুটিয়ে তোলা—তা পারো তুমি, সেটাই পেশা তোমার, সেটা তোমার "আসে", বেশ ভালোই আসে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐটুকুই! শুধু কথা! বোঝো না তুমি কিছুই, জানো না তুমি কিছুই; নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত আছো তুমি সারাক্ষণ, নিজেরই মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছো, তার বাইরে কিছুই তোমার চোখে পড়ে না।' কথাগুলি ঝেঁকে-ঝেঁকে বের করলো গীতা, যেন তার গলার উপর তার বশ নেই আর—কখনো হঠাৎ চড়া পরদায় আবার কখনো এত নিচুতে যে প্রায় শোনাই যায় না; আর এই অসম স্বরেরই দৃশ্যমান ছবির মতো তার মুখের রঙেরও বদল হ'লো থেকে-থেকে—আগুন থেকে ছাই, পাংশু, পাংশু দুটি ঠোঁট কখনো নড়তে গিয়ে কেঁপে উঠলো, আবার সেই ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে থেকেই গনগনে তেতে উঠলো কখনো। 'না, কিছুই না! আমি নিজের মনে কী ভাবি আর না ভাবি তাও জানো তুমি? না, কিছুই জানো না! একটিমাত্র মানুষকে তুমি চেনো—অন্তত, চিনতে চাও—একটিমাত্র মানুষে তোমার মন আছে: সে তুমি নিজে। নিজের মনেই অন্যদের তুমি ভাঙো গড়ো—কল্পনার কারিগরি তোমার—তা-ই নিয়ে বিলাস করো ব'সে-ব'সে, অন্যদের কিছুই তাতে এসে যায় না। অন্যকে দেখতে পাওয়া—মনে-মনে বানানো কেউ নয়, উপন্যাসের চরিত্র কেউ নয়,—জ্যান্ত কোনো মানুষকে ঠিক দেখতে পাওয়া—সেই দৃষ্টি তোমার থাকতো যদি—'এখানে হঠাৎ গলা ভেঙে গেলো গীতার—'তাহ'লে আমাকে আজ পরিপাটি যে-সার্মনটি তুমি শোনালে তা নিজের উপরেই প্রয়োগ করার বুদ্ধি কি তোমার হ'তো না? বুদ্ধি—তোমার মতে বাজে জিনিশ—তোমার মধ্যে তার অভাব আছে ব'লে গর্ব করো তুমি—আর তাই বোধ হয় তুমি যা বলো নিজেই তার মানে বোঝো না, বলতে ভালো লাগে ব'লেই বলো—মুখে তোমার কথা জোগায় তাই শুধু ব'লে যাও। কিন্তু এই একটা কথা আজ শুনে রাখো আমার মুখে—' গীতার চোখের হিরের দুটি কৌটো থেকে হঠাৎ যেন লাল ফুলকি ঠিকরে বেরোলো—'যে তোমার ঐ মনোহরণ মাকড়শার জালে কাউকে তুমি বাঁধতে পারবে না শেষ পর্যন্ত, কাউকে তুমি কাছে পাবে না কোনোদিন। অনেক কীর্তি রাখবে তুমি, লোকের মুখে নাম থাকবে তোমার, সভাস্থলে আসন পাবে উঁচুতে—কিন্তু নিজের ঘরে ফিরে এসে বুক শুকিয়ে তিলে-তিলে মরবে তুমি;—তোমার সব আশা, ইচ্ছা, তোমার শরীরের রক্ত মাংস মজ্জা—সব ঐ কথাতেই পর্যবসিত হবে, ঐ তোমার কথার ছায়ালোকে—যার গোলকধাঁধার অলিতে-গলিতে নিজেকেই তুমি হারিয়ে ফেলবে একদিন।'

ব'লে গীতা উঠে দাঁড়ালো; কোনোদিকে না-তাকিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

৪

মৌলি উঠে জানলার ধারে দাঁড়ালো। বৃষ্টি আর নেই; মেঘ চুঁইয়ে জ্যোছনা পড়েছে ভিজে মাঠে। এরই মধ্যে ছাতা হাতে

বেরিয়ে পড়েছেন সুবোধবাবু—মোটা মানুষটির দুলে-দুলে চলা দেখে মৌলি চিনলো—রোজ সন্ধ্যায় প্রসন্ন সিংহের তাসের আড্ডায় তাঁর যাওয়া চাই। পাশের পুব-দিক-ঢাকা দোতলা বাড়ির রেডিওর গান কানে এলো, একটু শুনলো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে; তারপর জানলা থেকে স'রে এসে বসলো—আরামচেয়ারে তার নয়, লেখার টেবিলেই সোজা হ'য়ে বসলো। টেবিলের উপর না-খোলা দুটো খামের দিকে তাকালো একবার; পকেট থেকে বের করলো বিদ্যুৎ সেনের চিঠিটা। বেশ লিখেছে কিন্তু—পড়তে-পড়তেই তার জবাবেরও কয়েকটা লাইন—কয়েকটি ছিপছিপে শ্রবণসুভগ বাক্য—তার মনের উপরে ভেসে উঠলো। পড়া শেষ ক'রে ফিরে তাকিয়ে দেখলো মা কেমন উদ্‌ভ্রান্ত মুখে তার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখে অবাক হ'লো না—মা-কে সে আশাই করছিলো মনে-মনে।

মা বললেন, 'গীতার কী হয়েছে রে?'

'কিছু হয়েছে নাকি?'

'তুই ওকে কী বলেছিস।'

'অনেক কথাই বলেছি;'

'বারান্দা দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ আমার চোখে পড়লো। অন্ধকারে ব'সে আছে আমার ঘরে। আলো জেলে দেখি—'

'কাঁদছিলো?' জিগেস করলো মৌলি।

'তুই কেমন মানুষ বল তো!' মা আর-কিছু বললেন না।

'তুমি ওর সঙ্গে কথা বললে?'

'বলবো আর কী—সবই তো বুঝি। এ-রকম ক'রে আর চলতে পারে না, মৌলি।'

'আমিও তা-ই ভাবছিলাম। আমার সংসর্গ থেকে ওকে দূরে সরানো দরকার।'

'মানে?'

'যা বললাম তা-ই। আমার প্রভাব ভালো হচ্ছে না ওর উপর। ওর সুখের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছি আমি।'

'বলছিস কী তুই?' মা চোখ বড়ো ক'রে ছেলের দিকে তাকালেন। 'ওর সুখের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিস—তুই!'

'দেখছি তো তা-ই। এ-রকম কিছু-একটা হবে, অনেকদিন থেকেই ভয় করছিলাম মনে-মনে।'

'তুই কী বলছিস আমি বুঝতে পারছি না, মৌলি। যেটা সবচেয়ে সুখের, যার চাইতে সুখের কিছু আর হ'তে পারে না—ওর মা, বাবা, আমি নিজে—আমরা সবাই এতদিন ধ'রে যা আশা করছি—'

'তোমরা আশা করছো? কিন্তু—'

"এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই, মৌলি। যা পাঁচজনে ছাখে—রূপ, গুণ, বিদ্যেবুদ্ধি—ও-সব ছেড়েই দে, ওর মনের নৌকো কোন হাওয়াতে ও ভাসিয়েছে তা তো তুই জানিস। এর পরেও কি অন্য কোনো কথা থাকে?'

'অসম্ভব, মা!' মৌলি একটু বিষণ্ণ ক'রে হাসলো।

'কোনটাকে অসম্ভব বলছিস?'

'তোমরা যা ভাবছো তা হবার নয়।'

মা এক পা পিছনে সরলেন, যেন ছেলের মুখ ভালো ক'রে দেখবেন ব'লে। একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ভালো ক'রে ভেবে কথা বল। মানুষের জীবন নিয়ে খেলা চলে না, মৌলি।'

'আমি কোনো খেলা করিনি, মা,' মৌলি মিনতির সুরে বললো। 'আমাকে কেন বলছো?'

'কা'কে বলবো তবে? সত্যি ক'রে বল, তুই কি ওকে ভালোবাসিস না?'

'ভালোবাসি না? ঐটুকু থেকে দেখছি ওকে—আমাদের গীতা—ওকে ভালোবাসি না?'

'ঐটুকু', 'আমাদের গীতা'—এই কথাগুলি বেসুরো লাগলো মায়ের কানে। মুখে বললেন, 'ওকে প্রথম যখন দেখেছিলি তুইও তখন "ঐটুকু"ই ছিলি। আজ তোমরা দু-জনেই যথেষ্ট বড়ো হয়েছো।' একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, 'এটাই ঠিক সময়; আর দেরি করা তোমাদের উচিত না।'

'না, মা, আর দেরি করবো না। আমি চ'লে যাবো এখান থেকে।'

'নিশ্চয়ই—যেখানে তোর ভালো লাগে—যা তোদের ভালো লাগে! বিয়েটা হ'য়ে যাক, তারপর বিলেত যেতে চাস তাই যাবি তোরা। আমি যেমন ক'রে পারি পাঠাবো।'

'থাক, মা,' ক্লান্ত সুরে জবাব দিলো মৌলি, 'এ-সব কথা থাক।'

'বিয়ে যে তুই করবি না তা তো নয়?'

'আমি কি সে-কথা বলেছি?'

'তবে? তুই আর গীতা—এর সঙ্গে তুলনা হয় নাকি অন্য কিছুর? এ-রকম বন্ধু, স্বজন, সর্ববিষয়ে ওর মতো সহায়—সারা জীবনে আর কি তুই পাবি ভেবেছিস?'

'কতটা পেলাম, সেই লাভের হিশেব ওঠে কিসে। বিয়েটা কি ব্যবসা?'

'দেয়া-নেয়া নিয়েই মানুষের জীবন তা জানিস না? তুই বল, আমাকে বুঝিয়ে বল, এতে তোর আপত্তি কোথায়।'

'বলতে পারবো না, মা। বোঝাতে পারবো না। ঠিক—ঠিক ও-রকম ক'রে ওকে আমার লাগেনি কোনোদিন। ওকে আমার ছেলেমানুষ লাগে। ওকে আমার—বোনের মতো লাগে, মা।'

'বোন!' মার শীর্ণ ঠোঁটে বিদ্রূপের ছটা ঝিলিক দিলো। 'ও-সব বাজে কথা মুখে আনিস না, মৌলি!' তারপর কাছে এসে, মৌলির চেয়ারের হাতলে এক হাত রেখে বেদনা-ভরা নরম গলায় বললেন, 'আমার কথা শোন। আমার এই একটা কথা রাখ। বাজে কথা ব'লে—বাজে কথা ভেবে—ওর জীবনটা তুই ব্যর্থ ক'রে দিস না।'

'তুমি জানো না, মা, ওকে বাঁচিয়ে দিলাম। ওর জীবন প্রায় ব্যর্থ হ'তেই চলেছিলো—কিন্তু আর ভয় থাকলো না।'

মা নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলেন ছেলের দিকে। তাঁর নিষ্প্রভ চোখের উপরে-নিচে বয়সের রেখা গভীর দেখালো। একটু পরে বললেন, 'কিন্তু তোর জীবন? তোর নিজের কথা একবার ভাবিস? আমি আর ক-দিন। আর এখনই আমি কতটুকু করতে পারি তোকে। গীতাকে তোর পাশে দেখলে আমি নিশ্চিন্ত হতাম।'

মৌলির একটু অপমান লাগলো কথাটায়। মা তাকে উত্তরাধিকারসূত্রে রেখে যেতে চান গীতার হাতে। তার 'দেখাশুনো করা'র কেউ একজন চাই, অভিভাবক চাই—নয়তো সে কি বাঁচতে পারে, বেচারা! একটু হেসে বললো, 'আমার জন্য ভেবো না, মা। আমি ঠিক আছি। ঠিক আছে সব।'

'শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকলেই হ'লো,' ব'লে মা নিশ্বাস ফেললেন। 'একবার আসবি নাকি ও-ঘরে?'

'থাক। আমি আর গিয়ে কী করবো।'

'গাড়ি আনতে পাঠিয়েছি। তুই যাবি ওর সঙ্গে?'

'রাখুই যাক,' ব'লে মৌলি হাতে তুলে নিলো তার সেদিনের ডাকের অজস্র চিঠিপত্র।

মা নিঃশব্দে চ'লে গেলেন। মৌলি তার পাব্লিশারের খাম খুললো। তার শেষ বইটা বিক্রি হচ্ছে না তেমন—ছোটো গল্পের চাহিদা নেই—তবে সে যদি কোনো উপন্যাসে হাত দিয়ে থাকে, কিংবা যদি শিগগির দেয়...মৌলি রেখে দিলো চিঠি, ওটা যেন তার নিজেরই অজান্তে খ'সে পড়লো তার হাত থেকে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বাইরে তাকালো, নতুন-জেগে-ওঠা রাত্রির দিকে পাঠিয়ে দিলো চোখ। এতক্ষণে আরো একটু হালকা হয়েছে মেঘ—মৌলি ব'সে-ব'সেই জানলা দিয়ে দেখতে পেলো—একটি তারা, যেন স্বর্গের কোনো বৃষ্টিবিন্দু, জ্বলজ্বল করছে তার চোখের সামনে। চাপা চাঁদের ক্যাকাশে আলোয় নীল দেখাচ্ছে রাত্রিটাকে, সবুজের আমেজ-লাগা ভিজে-ভিজে নীলচে মতো; মাঠের মধ্যে তাকালে—যদিও খানিক পরেই রেল-লাইন, রেল-ষ্টেশন, চিলকোঠার ত্রিভুজ-তোলা শহর—তবু কেমন শান্তিভরা মস্ত একটা ঝাঁ-ঝাঁ দূরের স্পর্শের মতো মনে হয়। আশ্চর্য বিস্মৃতিপ্রবণ প্রকৃতি, আশ্চর্য তার অম্লান চপলতা। একটু আগেকার হুলুস্থুল—সেই উত্তাল আকাশ—কোথায় গেলো সব? মৌলি তাকিয়ে দেখলো—দেখলো, লাল দুটো চোখ জ্বেলে এগিয়ে আসছে একটা ঘোড়ার গাড়ি। গাড়োয়ানদের দাঁতে-জিভ-চেপে-বের-করা গাড়ি থামাবার চেনা শব্দে হঠাৎ কেমন মুচড়ে উঠলো তার বুকের মধ্যে। 'এর মানে কি এই হ'লো যে ও আর আসবে না?' আর তারপর শুনলো রওনা হবার চাবুকের শিষ—রাখু ব'সে আছে উপরে—টক-টক ঘোড়ার খুর বটগাছের মোড়ের কাছে মিলিয়ে গেলো। না, ঝড়বৃষ্টি সবই হয়ে গেলো, কিন্তু বটগাছটা মরতে পারেনি বাজ প'ড়ে—ঐ তো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে আবছা জ্যোছনায়, তার লক্ষ পাতা থেকে লক্ষ-লক্ষ জলের ফোঁটা টপটপ ক'রে ঝ'রে পড়ছে—সারা রাত্ত ধ'রে ঝরবে—মৌলি কানে না-শুনেও মনে-মনে সেই শব্দ শুনলো। এই গাছ কেটে ফেলবে ওরা; বোবা হবে মাঠ, বিধবা হবে দৃষ্টি, বর্ষার তানপুরোর তার ছিঁড়ে যাবে। একটা নিশ্বাস উঠে এলো মৌলির বুকের ভিতর থেকে। 'আমি—আমিও আর এখানে থাকবো না।'

সমাপ্ত

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারতবর্ষ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

পূর্বের প্রবন্ধে ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনের বর্তমান আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, মালয় ও থাইল্যাণ্ডের কথা বলা হয় নাই। মালয় ও থাইল্যাণ্ডের অবস্থা, পণ্ডিত নেহেরুর উদ্যোগে দিল্লীতে এশিয়ান রিলেশনস কনফারেন্সের অধিবেশন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভবিষ্যৎ ও ভারতবর্ষের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্পর্কের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই সিরিজ শেষ করা হইবে।

মালয়

ইন্দোচীনের মত মালয়েও জাপানী আত্মসমর্পণের সময় হইতে সঙ্কটজনক অবস্থা চলিতেছে, কবে মালয়ে শান্তি স্থাপিত হইবে বুঝা যাইতেছে না। ৫৩ হাজার বর্গ-মাইল আয়তন ও অনুমান ৬০ লক্ষ অধিবাসীর এই ক্ষুদ্র দেশটিকে লইয়া ব্রিটিশ সরকার রীতিমত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন।

মালয়ের বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে খাঁটি মালয়ীর সংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪২ হইতে ৪৩ অংশ মাত্র। মালয়ের চীনা অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৪৫ জন এবং ভারতীয় ও সিংহলী অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ১২ হইতে ১৩। ইহারা ছাড়া ইন্দোনেশিয়ান, য়ুরোপীয়ান, য়ুরেশিয়ান ও অন্যান্য মিশ্র জাতিও কিছু আছে। দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সম্পদ মুষ্টিমেয় য়ুরোপীয়ান, আমেরিকান এবং চীনাদের হাতে, কিছু অংশ ভারতীয় ও সিংহলীদের হাতে। দেশের শ্রমশক্তি চীনা ও ভারতীয়দের লইয়া গঠিত। লক্ষ লক্ষ চীনা ও ভারতীয় শ্রমিক টিন খনিগুলির এলাকায় ও রবারের বাগানে বাস করে। ইহাদের অনেকে তিন-চার পুরুষ ধরিয়া স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রীতদাসের অবস্থায় মালয়ে বাস করিতেছে।

মালয়ের এই মিশ্র জনসমষ্টি, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর বিদেশীর কর্তৃত্ব ও জনসাধারণের দারিদ্র্য মিলিয়া আজ এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে যে, যুদ্ধোত্তর মালয়ে শাসন ও শোষণের পুনরধিকার স্থাপনের পথে ইংরাজের কাজ বিশেষ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে চারি বৎসর মালয় জাপানীদের দখলে ছিল সে চারি বৎসর তাহারা দেশে শ্বেতজাতিদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছিল। জাপানের আত্মসমর্পণের পরে মিত্রশক্তি বা ইংরাজবাহিনী মালয়ে ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে দেশময় ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন আরম্ভ হইল। মালয়ী, চীনা, ভারতীয় ও য়ুরেশিয়ান সমবেত ভাবে এই ধর্মঘটে ও বিক্ষোভ প্রদর্শনে যোগ দিল। ইংরাজবাহিনী মালয়ে প্রবেশ করিলে জাপানী কারেন্সী অচল বলিয়া ঘোষিত হইল। খাদ্যাভাব ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্যের উপর এই ব্যবস্থার ফলে নিঃস্ব জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। দেশময় লুঠতরাজ, নরহত্যা ও অরাজকতা আরম্ভ হইল। বাহিরে প্রচারিত হইল ব্যাণ্ডিট বা দস্যুদল এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। এই ব্যাণ্ডিটরা প্রচারকদের হাতে ক্রমে কম্যুনিষ্ট পার্টিজানে (partisans) রূপান্তরিত হইয়াছে।

মালয়ী ব্যাণ্ডিট বা ডাকাতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইল। হংকং হইতে আরও ব্রিটিশ সৈন্য আসিল, ভারতবর্ষ ও নেপালের সঙ্গে বন্দোবস্তের ফলে ৩০ ব্যাটালিয়ন গুর্খা সৈন্য পাওয়া গেল, পুলিশ ও সৈন্যদলে নূতন লোক ভর্তি করা হইতে লাগিল, প্যালেষ্টাইন হইতে সুদক্ষ ব্রিটিশ পুলিশের কর্তাকে মালয়ী পুলিশের কর্তৃত্বভার দিয়া মালয়ে আনা হইল, নূতন নূতন স্পিটফায়ার ও বোমারু বিমান আসিল। এত আয়োজন করিতে হইল মালয়ের দস্যু বা গেরিলাদের বিরুদ্ধে।

মালয়ের এই গেরিলা কাহারা? জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-বাহিনীর (Malayan Peoples Anti-Japanese Army) সৈন্যরা আজ ব্যাণ্ডিট নামে প্রখ্যাত। ইংরাজেরা মালয় হইতে পলাইবার সময়ে তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়াছিল। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা শিক্ষা দিবার জন্য মিত্রশক্তির বিমান প্যারাসুটে করিয়া শিক্ষাদাতা তাহাদের মধ্যে নামাইয়া দিয়াছিল, অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিয়াছিল। জাপানের আত্মসমর্পণ ও মিত্রশক্তি কর্তৃক মালয় পুনরধিকারের মধ্যবর্তী কালে এই প্রতিরোধবাহিনী প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের গভর্ণমেণ্টের কাজ করিয়াছিল। প্রতিরোধ-বাহিনীর কয়েক জন নেতাকে লণ্ডনে Victory Paradeএ যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। অর্ডার অব দি এম্পায়ার উপাধি দানে পুরস্কৃত করা হইয়াছিল।

এই ভাবে অনুগৃহীত প্রতিরোধবাহিনীর সৈন্যরা ডাকাত নামে পরিচিত হইল কেন? ব্রহ্মের জেনারেল আউন স্যাংয়ের প্রতিরোধ-বাহিনীকে ত ব্যাণ্ডিট বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই? ইহার কারণ অবস্থা গতিকে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্ম পরিত্যাগে বাধ্য হইলেও ইংরাজ হয়ত ভাবিয়াছিল, মালয়ের অবস্থা এমন প্রতিকূল হয় নাই যে, সেখান হইতেও তাহাকে সরিয়া পড়িতে হইবে। অথবা ভাবিয়াছিল মালয়ের অবস্থা যত প্রতিকূল হউক তাহা আয়ত্তে আনা তাহার পক্ষে সহজ হইবে। কিন্তু তাহা সহজ হয় নাই। কয়েক বৎসর ধরিয়া আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা সত্ত্বেও অবস্থা এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, ফেডারেল রাজধানী কুয়ালালামপুর সহরের সীমানার বাহিরে ব্যাণ্ডিট দলের সান্ধ্য আইন বলবৎ। সন্ধ্যার পরে কেহ রাস্তায় বাহির হইতে সাহস পায় না। ইংরাজ সকলকে বুঝাইয়াছে যে, মালয়ে সে কম্যুনিজম ঠেকাইবার যুদ্ধ চালাইতেছে। ইন্দোচীনেও ফরাসীরা তাহাই করিতেছে।

মালয়ে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কম্যুনিষ্ট দল গঠিত হইয়াছিল। রবার বাগান ও টিন খনির লক্ষ লক্ষ চীনা ও ভারতীয় শ্রমিকের মধ্যে কম্যুনিষ্ট প্রচারকগণ অনুকূল প্রচারক্ষেত্র পাইয়াছিল। জাপানী দখলের সময়ে অত্যাচারের ভয়ে সহস্র সহস্র চীনা শ্রমিক জঙ্গলে পলাইয়া গিয়া ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে ও বেওয়ারিশ জমি চাষ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যেও প্রচারক্ষেত্র পাওয়া গিয়াছিল। মালয়ের কম্যুনিষ্ট দলের অধিকাংশ চীনা কম্যুনিষ্ট লইয়া গঠিত। প্রথম দিকে তাহাদের মধ্যে আনামী ও ইন্দোনেশিয়ান কম্যুনিষ্টও ছিল। কোন কোন পর্যবেক্ষকের মতে খাঁটি মালয়ীরা অনেকে

কম্যুনিষ্ট দলের পক্ষে নহে, তাহাদের মধ্যে পৃথক্ জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে; ট্রেড য়ুনিয়নের ভিত্তিতে পৃথক্ শ্রমিক আন্দোলনও দেশে গড়িয়া উঠিতেছে। তাঁহারা বলেন, কম্যুনিষ্ট আন্দোলন যত দিন পর্যন্ত চীনাদের দ্বারা প্রচলিত হইবে মালয়ীরা তাহাতে যোগ দিবে না, কিন্তু কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধেও তাহারা কিছু করিবে না। এক জন ভারতীয় সরকারী পর্যবেক্ষকের মতে মালয়ের বিদ্রোহ জাতীয় অভ্যুত্থান নহে, কারণ বিদ্রোহীদের কোন "পোলিটিকাল ইডিওলজি" অর্থাৎ রাজনৈতিক মতবাদ নাই। তাঁহার মতে যাহা ঘটিতেছে তাহা "ব্যাণ্ডিট্রি" বা দস্যুদলের সৃষ্ট অরাজকতা ছাড়া আর কিছু নহে। এই ভদ্রলোকের পর্যবেক্ষণ প্রসঙ্গে এ সন্দেহটুকু পর্যন্ত হয় নাই যে, মালয়ের বিদ্রোহ প্রকৃত প্রস্তাবে দস্যু দলের সৃষ্ট অরাজকতা কি না সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ রহিয়াছে। একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মালয়ের কম্যুনিষ্ট দলের সেক্রেটারী জেনারেলের নাম চ্যাং পেং, অন্য আরও কয়েকটি নামে ইনি পরিচিত। এই ৩০ বৎসর বয়স্ক মিশ্র মালয়-চীনা বংশোদ্ভব নেতাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ব্রিটিশ পুলিশ ও সৈন্যদল সমগ্র মালয় উপদ্বীপ চষিয়া ফেলিতেছে। তাঁহাকে মালয়ের এক নম্বর শত্রু বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। মালয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহার মস্তকের জন্য ৭ হাজার পাউণ্ড ও জীবিত অবস্থায় গ্রেপ্তারের জন্য ১ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। এই এক নম্বর শত্রু যুদ্ধের সময় সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসী এণ্টি-জাপানীজ গেরিলা বাহিনীর নায়করূপে মিত্রশক্তির নিকট পরিচিত ছিলেন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনের বিজয় উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন এবং অর্ডার অব দি এম্পায়ার খেতাব পাইয়াছিলেন। এরূপ বিশ্বস্ত ব্যক্তি কেন মালয়ের এক নম্বর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন তাহা অনুসন্ধানের বিষয় নহে কি?

ব্রহ্মের এণ্টি-জাপানীজ প্রতিরোধবাহিনীর নেতা ও ভারতবর্ষের কংগ্রেসের সঙ্গে যিনি সন্ধি করিয়াছিলেন সেই ভূতপূর্ব শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী মালয় সম্পর্কে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"The British Government have no intention of relinquishing their responsibilities until their task is completed.—We have no intention of jeopardising the security, well-being and liberty of the people for whom Britain is responsible, by a premature withdrawl." এই দায়িত্বজ্ঞানের বড়াই, এই "উপযুক্ত সময়ের পূর্বে" ক্ষমতা ত্যাগ করিবার অনিচ্ছার সঙ্কল্প ভারতবর্ষ অনেকবার শুনিয়াছে। এই মনোভাবই যে একদা বিশ্বস্ত ও অনুগৃহীত এণ্টি-জাপানীজ প্রতিরোধ-বাহিনীকে এণ্টি-ব্রিটিশ গেরিলা বাহিনীতে রূপান্তরিত করিয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

ক্ষমতাচ্যুত হইয়া বিলাতী শ্রমিক দলের দৃষ্টি অধিকতর স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে মনে হয়। মালয়ের ব্রিটিশ হাই কমিশনার স্যর হেনরী গুরণের হত্যা ও জবরদস্ত শাসক বলিয়া খ্যাত স্যর জিরাল্ড টেম্পলারের নিয়োগ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া একখানি বিলাতী পত্রিকা লিখিতেছে,—স্যার জিরাল্ড টেম্পলারের কাজ সহজ হইবে মনে হয় না। মালয়ের বিপ্লবের পিছনে যে সকল মস্তিষ্ক কাজ করিতেছে তাহার অধিকারীরা অতিশয় শক্ত মানুষ ও ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে তাহারা লড়াইতে হাত পাকাইতেছে। মালয়ের পার্টিজানদের সন্ন্যাসীর মত কঠোর জীবন তাহাদিগকে আরও কঠোর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে। মালয়ে জবরদস্ত শাসক অপেক্ষা রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজন অধিক।

মালয়ে এক দিকে গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে লড়াই চলিতেছে। অন্য দিকে আপোষকামী মালয়ী রাজনীতিক দলগুলি মিলিয়া ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই দলের নেতা দাতো আওং। এই দলের লক্ষ্য ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস লাভ। ব্রিটেনের কলোনিয়াল অফিস এই দলের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। গত বৎসর মালয়ের মালয়ী, চীনা ও ভারতীয় অধিবাসীদের প্রধান দলগুলি মিলিয়া আই. এম. পি. (Independence of Malaya Party) নামে একটি নূতন পার্টি গঠন করিয়াছেন। এই দলগুলির মধ্যে য়ুনাইটেড মালয় নেশনাল অরগানাইজেশন, মালয় চাইনীজ এসোসিয়েশন ও ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান অরগানাইজেশনস আছে। নূতন পার্টির লক্ষ্য স্বাধীন, সার্বভৌম মালয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

মালয়ের চীনা, ভারতীয় ও মালয়ী অধিবাসীদিগকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলাইয়া নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের গতি আর অগ্রসর হইবার পথ রুদ্ধ করিবার জন্য মালয় গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

থাইল্যাণ্ড

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে একমাত্র থাইল্যাণ্ডে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের কথা বাহিরে শোনা যায় না। এংলো-আমেরিকান ব্লকের দৃষ্টিতে থাইল্যাণ্ড দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এণ্টি-কম্যুনিষ্ট ঘাঁটি।

যুদ্ধের সময় মার্শাল পিলবুল সোনগ্রাম জাপানের সহযোগিতা করিয়া নিজের দেশকে উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। জাপানের আত্মসমর্পণের পরে মিত্রশক্তি থাইল্যাণ্ডে প্রবেশ করিল এবং মার্শালকে গ্রেপ্তার করা হইল। ক্ষমতাচ্যুত হইয়া কয়েক বৎসর নজরবন্দী অবস্থায় থাকিবার পরে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে এক বিপ্লব ঘটাইয়া তিনি পুনরায় প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন। প্রধান মন্ত্রীর পদে বসিয়াই তিনি আপনাকে কম্যুনিজমের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিলেন। থাইল্যাণ্ড আমেরিকার পক্ষাশ্রয় পাইল। বর্তমানে আমেরিকার ডলার ও আমেরিকার মাল থাইল্যাণ্ডে বন্যার মত প্রবেশ করিতেছে এবং মার্শাল পিলবুল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার অতি বিশ্বস্ত মিত্র বলিয়া সম্মানিত। মার্শালের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব থাইল্যাণ্ডের অধিবাসী ৩০ লক্ষ চীনাকে এখনও মাও-সে-তুঙ্গের বিরোধী ও মার্শাল চিয়াং কাইশেকের পক্ষভুক্ত রাখা।

ইন্দোচীনের যুদ্ধে এংলো-আমেরিকান শক্তির সাক্ষাৎভাবে যোগদানের সময় আসিলে থাইল্যাণ্ড যে আক্রমণের ঘাঁটি হইবে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভবিষ্যৎ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, এক

থাইল্যাণ্ড বাদে প্রত্যেকটি দেশে অশান্তির অগ্নি ধূমায়িত হইতেছে। দুইটি দেশে, ইন্দোচীনে ও মালয়ে, প্রত্যাবর্তনকারী বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত সংঘর্ষ চলিতেছে। ইন্দোচীনে ও মালয়ে এই প্রকাশ্য সংঘর্ষ না ঘটিলে ব্রহ্ম ও ইন্দোনেশিয়ায় যে দলের হাতে দেশের শাসন-ক্ষমতা রহিয়াছে তাঁহাদের পক্ষে দেশে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার ও গঠনমূলক কার্যের দ্বারা দেশবাসীর বৈষয়িক উন্নতিসাধন করিবার কর্তব্য পালন করা হয়ত অপেক্ষাকৃত সহজ হইত। যে কারণেই হউক, এ বিষয়ে তাঁহাদের অকৃতকার্যতা অবস্থা আরও অনিশ্চিত ও বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিতেছে। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের লোভ ও জিদের ফলে যে বিপদের আশঙ্কা ঘনীভূত হইতেছে সেই আশঙ্কা দূর করিবার জন্ম পশ্চিম-য়ুরোপীয় ব্লকের ত্রাণকর্তা আমেরিকার নিকট সাহায্যের জন্ম আবেদন যাইতেছে। নর্থ আটলাণ্টিক রক্ষা-চুক্তির অনুসরণে প্যাসিফিক এলায়েন্স ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া রক্ষা-চুক্তির কথা আলোচিত হইতেছে। প্যাসিফিক এলায়েন্সের মধ্যে এ-পর্যন্ত ফিলিপাইন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড আছে, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও সিংহলকে এই গোষ্ঠীর মধ্যে আনিবার কল্পনা হইতেছে; কিন্তু ভারতবর্ষের মতি-গতির জন্ম উদ্যোক্তাদের মনে সাফল্য সম্বন্ধে একটু ইতস্ততঃ ভাব রহিয়াছে। এই এলায়েন্সের প্রধান উৎসাহী ফ্রান্স। সে আমেরিকাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে যে, ইন্দোচীনের যুদ্ধ আগেকার আমলের মামুলী কলোনিয়াল যুদ্ধ নহে, ইহা কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে ফ্রি ওয়ার্ল্ডের যুদ্ধ, ফ্রান্স সমগ্র পশ্চিম-জগতের হইয়া লড়িতেছে।

সংবাদে প্রকাশ, আমেরিকার এই ধরণের এলায়েন্স গঠনে তেমন আপত্তি নাই, কিন্তু আপাততঃ ইন্দোচীনে যুদ্ধের সরঞ্জাম পাঠাইয়া সে ফ্রান্সকে যে সাহায্য করিতেছে, তাহার অধিক অগ্রসর হইতে সে ইচ্ছুক নহে। অর্থাৎ, কোরিয়ার মত ইন্দোচীনে সৈন্ম-সাহায্য পাঠাইতে সে রাজি নহে। কিন্তু গত এক পক্ষ কালের মধ্যে টুকরা-টুকরা যে সকল সংবাদ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, একটা বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। আমেরিকান সাহায্য-পুষ্ট কে. এম. টি সৈন্যদল ব্রহ্মের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিয়াছে। কি উদ্দেশ্যে তাহারা এই কার্য করিয়াছে তাহা বাহিরে এখনও ভাল করিয়া প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু ব্রিটেন যে এই ব্যবস্থা বিশেষ পছন্দ করিতেছে না তাহা মিঃ এডেনের অনুসন্ধানের প্রস্তাব ও আমেরিকার আপত্তি হইতে বুঝিতে অসুবিধা হয় না। এই ভাবে ইন্দোচীনে চিয়াং কাইশেকের সৈন্যদল বা জাপানী সৈন্য ভবিষ্যতে প্রবেশ করিলে তাহা বিস্ময়ের কারণ হইবে না।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে সকল দেশে এখনও নূতন দেশীয় শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা পরিচালনা করিতেছেন, তিনটি ধ্বংসাত্মক শক্তি সে সকল দেশে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলার উপর আঘাত হানিতেছে। এই তিনটি শক্তি হইতেছে কম্যুনিজম, সাম্প্রদায়িকতা ও স্বাতন্ত্র্যবাদ। ইন্দোনেশিয়ায় এই তিনটি শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়, ব্রহ্মেও তাহাই দেখা যায়। বর্তমান গভর্ণমেণ্ট এই তিনটি শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে গিয়া বিপর্যস্ত হইবার মত। বৈষয়িক উন্নতির জন্ম গঠনমূলক কার্যক্রম আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও অর্থাভাবে ব্যাহত হইতেছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, যে-দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি-সংঘ মরিয়া হইয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে সমরায়োজন করিতেছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি একে একে এই দুইটি শক্তিসংঘের কোন কোনটির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। আত্মরক্ষার যে একমাত্র উপায় আছে, আভ্যন্তরীণ অবস্থার চাপে বা বাহিরের চাপে সে উপায় অবলম্বন করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ। এই উপায়টি হইতেছে "নেশনাল সলিডারিটি"র ভিত্তিতে দেশের মধ্যে নূতন শক্তিশালী পার্টির উদ্ভব। বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থায় এইরূপ পার্টির অভ্যুদয় সম্ভব কি না তাহা লইয়া অনেক তর্ক উঠিতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, উহা সম্ভব না হইলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দুইটি ব্লকের শক্তি-পরীক্ষার ক্ষেত্র হইবে, যেমন হইয়াছে কোরিয়ায়।

ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পরে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত জহরলালের উদ্যোগে দিল্লীতে এশিয়ান রিলেশনস কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল—

"The members of the delegates from the Asian countries, assembled in the first Asian Relations Conference in New Delhi, firmly believing that the peace of the world to be real and enduring, must be linked up with the freedom and well-being of the people out of Asia, are unanimously of the opinion that the contacts forged at this conference must be maintained and strengthened, and the good work begun here must be continued, efficiently organised and actively developed."

এই অভিপ্রায়ে কনফারেন্স "এশিয়ান রিলেশন্স অরগানাইজেশন" নামে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য:

1. To promote the study and understanding of Asian problems and relations in their Asian and world aspects;

2. To foster friendly relations and co-operation among the peoples of Asia and between them and the rest of the world, and

3. To further the progress and well-being of the peoples of the world.

এই সকল উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য একটি প্রভিশনাল জেনারেল কাউন্সিল গঠিত হইয়াছিল। প্রস্তাব হইয়াছিল, পরের বৎসর চীনে এই কনফারেন্সের অধিবেশন হইবে।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর পণ্ডিত নেহেরু যে সকল সুন্দর ও উদার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এই কনফারেন্সও তাহার মধ্যে একটি স্বপ্ন। "এশিয়া এক", "য়ুনাইটেড নেশনস প্রতিষ্ঠানে এশিয়ার সকল দেশ মিলিয়া একটি প্রাচ্য ব্লক গঠন করিতে হইবে", "ভারতবর্ষ এশিয়ার নেতা" ইত্যাদি অনেক কথা অধিবেশনের সময়ে আলোচিত হইয়াছিল।

দ্বিধা-বিভক্ত, খাদ্যাভাবে ক্লিষ্ট, বৈষয়িক উন্নতিতে অনগ্রসর ভারতবর্ষের পক্ষে নেতৃত্ব করা দূরের কথা, কাউন্সিলের উদ্দেশ্য সাধনে কার্যকরী অংশ গ্রহণ করা কতখানি কঠিন, ১৯৪৮এর পরে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা বুঝিবার অবকাশ পাওয়া গিয়াছে। গোটা এশিয়ার কথা ছাড়িয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার জাতিগুলির প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনে ভারতবর্ষের সম্মুখে কত রকমের অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান আলোচনা হইতে কিছু বুঝিতে পারা যাইবে। মালয়ে ও ইন্দোচীনে কলোনিয়ালিজমের সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠে কোন কথা বলা কি ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব ?

আরও কথা আছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, কোন একটা শক্তিশালী প্রতিকূল শক্তির ইঙ্গিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন দেশে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর প্রতি একটা প্রতিকূল ভাব জাগিতেছে। স্মরণাতীত কাল হইতে যে সিংহল ভারতবাসীর অঙ্গ মাত্র সেই সিংহলে ভারতবর্ষের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব আজ আর অস্পষ্ট নহে! ২৫ হাজার বর্গ-মাইল আয়তনের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ভারতবর্ষের মত বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতি এই প্রতিকূল ভাব পোষণ ও প্রকাশ করিবার মত উৎসাহ কোথায় হইতে পাইতেছে? পাকিস্তানী প্রচারকগণ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়ে ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের ধুয়া তুলিয়া ভারত-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করিতেছে। ইহার উদ্দেশ্য কি? এই কাজে পাকিস্তানকে উৎসাহ যোগাইতেছে কে? সাম্প্রদায়িকতা ভারতবর্ষে নিন্দিত; কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্প্রদায়িকতা ক্রমে মাথা তুলিতেছে। ইন্দোনেশিয়ায় দার-উল-ইসলাম দলের পাকিস্তানের জেহাদী ও মোজাহেদ দলের সঙ্গে মিল আছে, মিশরের মুস্লিম ব্রাদারহুড পার্টি ও ইরাণের ফেদায়ান ইসলাম দলের সঙ্গে মিল আছে। ধর্মান্ধতা ছাড়িয়া বর্ণান্ধতার কথা তুলিলে দেখা যায়, এই দলগুলি আমেরিকার ক্লু-কুক্স্-ক্লানের সমগোত্রীয়।

এই সকল বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজের স্বার্থরক্ষার দায়ে ভারতবর্ষকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে সদ্ভাব বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পুরাতন আত্মীয়তার বন্ধনের স্মরণ আজকাল বৈষয়িক ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কাজে লাগে না, হয়ত ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও নির্ম্মল বুদ্ধির অভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা তিক্ততার সৃষ্টি করে। তবু সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের একটা আবেদন আছে দেশের শিক্ষিত, অ-রাজনৈতিক জনসাধারণের কাছে। থাইল্যাণ্ডে থাই-ভারত লজের ভারতীয় উদ্যোক্তাগণ একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া এই দিকে কাজ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশেও রাজনৈতিক সম্পর্ক-বর্জ্জিত স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এ বিষয়ে ভারত সরকারের অর্থ ও অন্য প্রকার প্রয়োজনীয় সাহায্য করা আবশ্যক। অস্থায়ী কালচারাল মিশন বা গুডউইল মিশনের দ্বারা এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে দূতাবাসের কর্ম্মচারীদের মাধ্যমেও এই কাজ চালাইবার চেষ্টা করা যথেষ্ট নহে।

খাদ্যাভাবের জন্য ভারতকে বাহিরে হাত পাতিতে হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব দেশগুলিতে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। এই খাদ্যশস্য ভারতের প্রয়োজনীয় ধান্য। ইন্দোচীনে গোলযোগ চলিতেছে। ব্রহ্মেও তাহাই। থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশিয়া চাউল রপ্তানী করিতে পারে। এই চাউল যাহাতে অন্য হাতে না পড়ে ভারতবর্ষকে তাহা দেখিতে হইবে।

ভবিষ্যতে কোন দিন ভারতবর্ষের পক্ষে শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করিয়া ভারত মহাসাগরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইলে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাহার প্রভাব হইবে শান্তি, স্বাস্থ্য ও স্থায়িত্বের অনুকূল। বর্ত্তমানে একদিকে ভারতের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন বিরোধীদের অনিষ্টকর প্রচারকার্যের প্রতিকার ও অন্য দিকে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা করা ছাড়া আর কিছু করিবার সুযোগ ও সামর্থ্য ভারতবর্ষের নাই বলিয়া মনে হয়।

[ক্রমশঃ।

চুমু দেওয়া-নেওয়ার ইতিবৃত্ত

নিমক বা নুণ খাওয়ার বাসনা থেকে নাকি চুমু দেওয়া-নেওয়ার উদ্ভব হয়েছে—দাবী করছেন ক্যানাডার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডগলাশ ওয়ালকিংটন। চুমুর ইতিহাস প্রসঙ্গে তিনি আরও বলছেন: মানুষ যখন গুহায় বসবাস করতো সেই সময় জনৈক গুহাবাসী দেখলে যে দারুণ গ্রীষ্মমধ্যে অসহ্য উষ্ণ আবহাওয়ায় লবণাস্বাদে শরীর শীতল ও স্নিগ্ধ হয়। গুহাবাসী ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করলে যে, কোন প্রতিবেশীর কপোল বা গাল লেহন করলে নোনতা আস্বাদ পাওয়া যায়।

গুহাবাসীকে নিমক জোগায় কে? প্রতিবেশীর কপোল ব্যতীত অন্য কিছুতে লবণাস্বাদ না পেয়ে গুহাবাসীদের একে অন্যের গাল চাটাচাটি ছাড়া গত্যন্তর রইলো না।

দিন যায়। ক্রমে ক্রমে গুহাবাসী হৃদয়ঙ্গম করলে যে, গালই যদি চাটতে হয় তখন প্রতিবেশী পুরুষাপেক্ষা নারী হলে যেন মন্দ হয় না। এবং ঠিক তখন থেকেই মনুষ্য জাতি নুণ এবং উষ্ণ আবহাওয়াকে ভুলে গিয়ে পুরুষ নারীকে এবং নারী পুরুষকে······

জ্যাকুস তিসো

শ্রীযামিনীমোহন কর

নাগরিক তিসো ফরাসী গণতন্ত্রের এক জন পরম ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি সেই যুগের নররক্ত-পিপাসুদের দলের মধ্যে কোন অংশ গ্রহণ করেননি। তিনি এক থিয়েটারে সীন আঁকতেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি ছিলেন অগ্রণী, কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অথবা কোন ধনীকে বধ্যমঞ্চে তোলবার সময় অশ্লীল ব্যঙ্গ ও গালি-গালাজ করার মধ্যে তিনি থাকতেন না। ফরাসী বিপ্লবের মত রক্তক্ষয়ী ব্যাপারের মধ্যে থেকেও তিনি ছিলেন ঠাণ্ডা-মাথার লোক। সামান্য রোজগার, তাইতেই সন্তুষ্ট। লোভও নেই, হিংসাও নেই। একটি মাত্র ঘরে বাস, সপ্তাহে একবার ভূরিভোজন, বছরে একটা কোট। এই ছিল তাঁর জীবনযাত্রা-প্রণালী। কেবল নাগরিক-সৈনিক হিসেবে তাঁকে উপরন্তু প্রহরীর কাজও করতে হত।

এক শীতকালের রাত্রে তিনি ধড়া-চূড়া পরে বন্দুক নিয়ে প্রহরীর কাজে বেরোতে যাচ্ছেন, সেই সময় তাঁর দরজায় কে যেন মৃদু করাঘাত করল। দরজা খুলে দেখেন এক যুবতী দাঁড়িয়ে। আপাদমস্তক এক ওভারকোটে আবৃত। যুবতী বললে,—"নাগরিক তিসো, আমি ভীষণ বিপদে পড়ে আপনার সাহায্য ভিক্ষা করতে এসেছি।"

হাতের মোমবাতিটা তিসো তুলে ধরলেন আগন্তুকার মুখের কাছে। যদিও অবগুণ্ঠনে আবৃতা তবুও দেখে মনে হল মেয়েটি সুন্দরী এবং ভয়ার্তা। তিসো উত্তর দিলেন,—"কিছু মনে করবেন না। আমার তো এখন সময় নেই। হোটেল ড ভিয়েতে এখনই আমায় প্রহরীর কাজে যেতে হচ্ছে। বড়ই দুঃখিত।"

অপরিচিতা বললে,—"তা জানি। সেখান থেকে দলবল নিয়ে আপনাকে সেণ্ট ডেনিস রোডে এক বাড়ীতে যেতে হবে এক বন্দীকে আনতে।"

বিস্মিত হয়ে তিসো প্রশ্ন করলেন,—"এ কথা আপনি জানলেন কি করে?"

মেয়েটি উত্তর দিলে,—"সে অনেক ব্যাপার। এখন সব কথা বলবার সময় নেই। আপনি কি আমাকে সেই বাড়ীতে ঢুকতে সাহায্য করবেন?"—এই বলে টাকার থলি সামনে ধরল।

তিসো রেগে উঠলেন—"কি! আপনার স্পর্দ্ধা তো বড় কম নয়? আমাকে অর্থের লোভ দেখাচ্ছেন! আমি ঘুষ নেব ভেবেছেন? না আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছেন?"

মেয়েটি তিসোর পায়ের কাছে টাকার থলি ফেলে দিয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল। বললে,—"আমি আমার মনিবঝীর কাছে শেষ বিদায় নিতে যাচ্ছিলুম। কতই বা বয়স তাঁর। একেবারে ছেলেমানুষ। বন্দিনী হয়ে কারাগারে ঢুকলে আর তিনি মুক্তি পাবেন না। যদি কখনও বার করা হয় তবে বধ্যমঞ্চে নিয়ে যাবার জন্য। অথচ তিনি কোন দোষে দোষী নন। অমন সহৃদয় মহিলা খুব কমই আছেন। ওরা তাঁর স্বামীকে হত্যা করেছে। তাতেও কি সন্তুষ্ট নয়? আবার তাঁকে হত্যা করতে চাইছে?"

তিসোর মনে দয়ার উদ্রেক হল। বললেন,—"আচ্ছা, দেখি আমি কি করতে পারি।"

মেয়েটি তিসোর হস্ত চুম্বন করে নমস্কার জানিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল।

তখনই তিসো হোটেল ড ভিয়ের অভিমুখে রওয়ানা হলেন। গিয়েই শুনলেন যে, তাঁকে প্রহরী দলের সঙ্গে রাত বারোটায় সেণ্ট ডেনিস রোডের এক বাড়ীতে যেতে হবে এক বন্দিনীকে আনতে। বুঝলেন, মেয়েটি ঠিক খবরই জোগাড় করেছিল। তিসো শুধু ভাবতে লাগলেন, কি উপায়ে এই গোপন খবর মেয়েটি জানতে পারল! নিশ্চয়ই দলেরই কোন লোক ঘুষ খেয়েছে। নিজের দলের প্রতি তাঁর একটা অবিশ্বাসের ভাব জেগে উঠল। মৃত্যুপথ-যাত্রিনীর জন্য তিনি ব্যাকুল হলেন।

মাঝ রাত্রে এক বন্ধ গাড়ী নিয়ে তাঁরা গন্তব্য পথে অগ্রসর হলেন। যেমন ঠাণ্ডা, তেমনই অন্ধকার। তার ওপর আবার ভীষণ বৃষ্টি। অনেক কষ্টে সেই বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলেন। নীচের তলার এক কাচের জানলা দিয়ে দেখা গেল, ঘরে প্রচুর আলো আর এক দল সৈনিক সেখানে বসে মদ গিলছে আর হল্লা করছে। বুঝলেন যে, নিজাবাসে কাউণ্টেসকে নজরবন্দী করে রাখার জন্য এই ব্যবস্থা, যত দিন না রোবেস্পিয়ে তাঁর ভাগ্য সম্বন্ধে কোন আদেশ দেন।

পুরাতন প্রহরীরা নতুনদের বেশ অভ্যর্থনা করল। কাউণ্টেসের ভাঁড়ার থেকে খাবার মদ সব বার করে খেতে দিল। ভারপ্রাপ্ত কর্পোরাল বললে যে, এইবার গেটের প্রহরী বদল করা প্রয়োজন। নতুন দল থেকে কারো যাওয়া উচিত। পুরানো প্রহরী, বেচারা ভিজে গেছে, শীতে কাঁপছে। কে যাবে? একটু ইতস্ততঃ করে তিসো এগিয়ে গেলেন ডিউটির জন্য। বন্ধুরা ভারী খুশী। তাদের ঠাণ্ডায় বৃষ্টিতে বেরোতে হল না। সবাই তাকে বাহবা দিলে।

কিছুক্ষণ গেটে দাঁড়িয়ে থাকবার পর সেই ওভারকোটে আবৃতা রমণী এসে হাজির হল। মৃদু স্বরে তিসোকে আবেদন জানাল,—"হে নাগরিক, ভগবানের দোহাই আমাকে সাহায্য কর। আমার কর্ত্রী ছেলেমানুষ, অত্যন্ত ছেলেমানুষ। তাঁকে বাঁচতে দাও। কিছু বোলো না, চুপ করে থেক। আমি তাঁর পালাবার ব্যবস্থা করব।"

একটু চিন্তা করে তিসো বললেন,—"বেশ, তাই হোক।"

আগন্তুকা একটু সরে গিয়ে বাড়ীর সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিন বার হাতের লণ্ঠন নাড়লে। সঙ্গে সঙ্গে দোতলা থেকে একটা দড়ির মই নেমে এল। তিসো নীচেটা শক্ত করে চেপে ধরলেন। ওপর থেকে মই বেয়ে একটি মহিলা নেমে এলেন। ভীতা, কম্পিতা সুন্দরী কাউণ্টেস এসে দাঁড়ালেন তিসোর সামনে।

তিসোর মনে হতে লাগল তিনিও ষড়যন্ত্রের এক জন। চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—"এইবার?"

একটা গাড়ীর অদূরে অপেক্ষা করার কথা ছিল। তাতে চড়ে কাউণ্টেস ফ্রান্সের সীমান্ত অতিক্রম করবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ গাড়ী আসেনি। তাঁরা কিছুক্ষণ দুরু-দুরু বক্ষে অপেক্ষা করে শেষে নিরাশ হয়ে পড়লেন। গাড়ী এল না কেন? হয় গাড়োয়ান পুলিশের হাতে পড়েছে কিম্বা শেষ পর্য্যন্ত ভয়ে পেছিয়ে গেছে। ওদিকে প্রহরী বদলাবার সময় হয়ে গেল। এখন কি করা যায়?

চিন্তা করে কোন উপায় বার করবার পূর্ব্বেই এক জন প্রহরী সহ কর্পোরাল লণ্ঠন হাতে বাইরে এল। প্রহরী বদলাতে হবে। এসে দেখেন তিসোর কাছে দু'জন মহিলা দাঁড়িয়ে। তাঁরা লুকোবার অবসর পাননি। রেগে চীৎকার করে উঠল,—"এ সব মেয়েদের নিয়ে এখানে কি হচ্ছে?"

সৌভাগ্য বশতঃ কাউণ্টেস এক গরীব রমণীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। তিসোর মাথায় চট করে বুদ্ধি এসে গেল। ব্যাজার ভাব দেখিয়ে বললেন,—"আর বলেন কেন কর্পোরাল সাহেব, এই স্ত্রী নিয়ে ভারী মুস্কিলে পড়েছি। আমার পিছু-পিছু এখানেও ধাওয়া করেছে। ভয়ানক সন্দেহ করে আমাকে। এ ভাবে কি বাঁচা যায়?"

সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। কর্পোরাল সকলকে ঘরের মধ্যে গরমে গিয়ে বসতে অনুরোধ করল। ভীষণ অবস্থা! আপত্তি জানালে ধরা পড়বার সম্ভাবনা। ওদের সন্দেহ হতে পারে। গেলে চিনে ফেলতে পারে। কিন্তু উপায় কি? অন্য প্রহরী মোতায়েন করা হল। কর্পোরালের সঙ্গে সবাই ঘরে গেলেন। সৌভাগ্য বশতঃ প্রহরীরা সবাই পাঁড় মাতাল হয়ে গিছল। তা ছাড়া কাউণ্টেসের ছদ্মবেশও নিখুঁত হয়েছিল। কেউ সন্দেহ করলে না। সবাই ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে আর মদ গিলতে থাকল। শেষে কর্পোরাল বললে,—"আর না, এইবার বন্দিনীকে নিয়ে পারী যাত্রা করতে হবে।"

কাউণ্টেস ভয়ে পাথর হয়ে গেছেন। প্রহরী ওপরে কাউণ্টেসের ঘর খুঁজে চীৎকার করতে করতে নেমে এল,—"ঘর খালি। পাখী উড়ে গেছে।" খোঁজ খোঁজ। কিন্তু কোথায় কাউণ্টেস? তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে কাউণ্টেস তাদের সামনে বসে। শেষে তারা ঠিক করল নিশ্চয়ই তিনি পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করেছেন। মাতাল প্রহরী দল তখন পারী ফিরে চলল।

কর্পোরাল দরাজ মেজাজে বললে—"ওহে তিসো, তোমার স্ত্রী আর তার সঙ্গিনী আমাদের গাড়ীতে যেতে পারে।"

যে গাড়ীতে কাউণ্টেসের প্রহরী-বেষ্টিতা হয়ে বন্দিনী অবস্থায় যাবার কথা, সেই গাড়ীতেই তিনি চললেন। গাড়ীতে প্রহরী দল আছে বটে, কিন্তু তিনি বন্দিনী ন'ন। পারী পৌঁছে কর্পোরাল বললে,—"তিসো, এইবার মেয়েদের নিয়ে তুমি বাড়ী যাও। আজকের মত কাজ শেষ।"

কিন্তু এখন কি করা যায়? অন্য কোন উপায়ও নেই। অগত্যা তিনি কাউণ্টেস ও তাঁর পরিচারিকাকে নিয়ে নিজের ঘরেই এনে তুললেন। আর তাদের ঘর ছেড়ে দিয়ে নিজে অন্য বাড়ীর বাইরের বারান্দায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে তিসোর এক বন্ধু তাঁকে বললেন,—"ওহে কাল রাত্রে তুমি নাকি বাড়ী ছিলে না। দলের লোকেরা তোমায় সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে। লোকে কথায় বলে সাবধানের মার নেই। মনে রেখ, পৃথিবীতে টিকটিকির অভাব নেই।"

তিসো বাড়ী ফিরে কাউণ্টেসকে সব কথা জানালেন। বললেন যে, বাড়ী খানাতল্লাসী করলে তাঁরা ধরা পড়ে যাবেন। ফলে মৃত্যু অনিবার্য্য। সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শেষে তিসো বললেন,—"এক উপায় আছে। আপনি যদি এখানে খোলাখুলি ভাবে থাকবার অধিকার অর্জ্জন করে নেন, তা হলে আর কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। অবশ্য এ কথা বলতে আমি নিজেই সংকোচ বোধ করছি। আমি আপনার নেহাৎ অযোগ্য। কিন্তু এ ছাড়া অন্য উপায় দেখছি না।"

পরিচারিকাও তিসোর কথা অনুমোদন করলে। শেষে তাই করতে হল। কাউণ্টেসই যে মাদাম তিসো এ কথা কেউ ভাবতেও পারল না। কাউণ্টেস এ বিবাহে সুখীই হয়েছিলেন। ফরাসী বিপ্লব শেষ হয়ে গেল, ভয়ের রাজ্য অন্তর্হিত হল, কিন্তু এঁদের ভালবাসা অক্ষুণ্ণ হয়ে রইল।

ম্যাকবেথ

৪

লেডী ম্যাকবেথ ভাবছিলেন—স্বামী বুঝি তাঁর অকৃতকার্য্য হ'লেন, এমন সময় রক্তমাখা হাতে বিভ্রান্ত-মস্তিষ্ক ম্যাকবেথ হাজির হ'লেন—চোখে তাঁর ভয়ের ছায়ার ঘন বিস্তার, দূর থেকে স্ত্রীকে দেখে চীৎকার করে উঠলেন—"কে, কে; ওখানে।"—

লেডী-ম্যাকবেথ ভীত হয়ে উঠলেন—এই বুঝি ঘুম ভেঙে যায় সকলের। বললেন, "কাজের উদ্যোগেই এত ভয় পেয়ো না—এখনও কাজ বাকী মনে রেখ—যদি না বাবার মুখের ছবি দেখতাম রাজার মুখে—তবে আমি নিজেই কাজ সারতাম।"

"আমি সে কাজ সেরে ফেলেছি" বলতে বলতে ম্যাকবেথের স্বরের হঠাৎ পরিবর্ত্তন হ'ল। ফিস্-ফিস্ ক'রে বললেন, "আচ্ছা, তুমি কোন শব্দ শুনতে পাওনি?"

—"না, শুধু পেঁচার চীৎকার—ঝিল্লীর ঝিঁ ঝিঁ শব্দ।"

রক্তমাখা হাতের দিকে চেয়ে ম্যাকবেথ বলে উঠলেন—"ওঃ, কি ভীষণ দৃশ্য!"

লেডী ম্যাকবেথ—"এমন কথা অবোধের মুখেই শোভা পায়।"

ম্যাকবেথ বিড়-বিড় ক'রে বলতে লাগলেন, "জান, এক জন প্রহরী ঘুমের ঘোরে হেসে উঠল—ঠিক সেই সময় এক জন চেঁচিয়ে উঠল, 'খুন—খুন' ক'রে।"

"ও কিছু নয়, তুমি হাত ধুয়ে ফেল"—লেডী ম্যাকবেথ বললেন।

এমন সময় দ্বারে করাঘাত হ'ল। লেডী ম্যাকবেথ বললেন, "নাও, নাও—ভোর হ'য়ে গেল—রাত্তিরের পোষাক পর, এ রকম বেশে দু'জনকে জেগে থাকতে দেখলে সন্দেহ করবে লোকে!"

প্রভাত হ'য়েছে সবে মাত্র। ম্যাকডফ এসে উপস্থিত হ'লেন ম্যাকবেথের কাছে। তিনি রাজা ডানকানের এক জন অমাত্য। জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ কি বিছানা ছেড়ে উঠেছেন?"

"না", ম্যাকবেথ বললেন, "এখনও ঘুম ভাঙে নি।"

—"তিনি বলেছিলেন ভোর বেলা আসতে কিন্তু সময় ত' বয়ে গেল, আমাকে তাহ'লে ত' একবার মহারাজের শোবার ঘরে যেতে হচ্ছে—হ্যাঁ সাহস ক'রে যেতেই হবে"—বলে ম্যাকডফ রাজার ঘরে ঢুকলেন—সঙ্গে সঙ্গেই চীৎকার করতে করতে বেরিয়ে এলেন—"খুন খুন—মহারাজ খুন হয়েছেন।"

সম্ভ দুর্ঘটনার খবর শোনার মত ম্যাকবেথ চম্‌কে উঠে বললেন, "সে কি—চলো, চলো দেখি।"

"ও-হো-হো আমি আর যাব না—তুমি নিজের চোখে দেখে এস"—শোক-কাতর ম্যাকডফ বললেন।

ম্যাকবেথ ও অপর এক জন অমাত্য লেনক্স ছুটে গেলেন দেখতে।

ম্যাকডফ পাগলের মত ঘণ্টাধ্বনি করতে লাগলেন। ছুটে এলেন লেডী ম্যাকবেথ—"কি হ'ল, এ ঘণ্টা কেন?"

"আপনার শোনার মত কথা নয় দেবি! আপনি কোমলা—অনর্থক কষ্ট পাবেন।"

ব্যাঙ্কো ছুটে এলেন।

ম্যাকডফ হায় হায় ক'রে উঠলেন,—"ব্যাঙ্কো, ব্যাঙ্কো, আমাদের রাজা খুন!"

লেডী ম্যাকবেথ বলে উঠলেন—"এ্যাঁ—আমার বাড়ীতে, এ মহাপাপ করল কে?"

ম্যাকবেথ প্রবেশ করলেন। হঠাৎ শোকের আঘাতে মুহ্যমান তিনি—বললেন, "ওঃ! এ কথা শোনার আগে যদি মৃত্যু হ'ত।"

সমস্ত দুর্গময় এ কথা প্রচার হ'য়ে গেলো। রাজপুত্র ম্যালকম ও ডোনালবীন ছুটতে ছুটতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে করেছে এ কাজ?"

লেনক্স বললেন, "আমার মনে হয় প্রহরী দু'জনেরই কাজ—সমস্ত শরীর তাদের রক্তমাখা।"

ম্যাকবেথ বললেন, "আমার মন অনুশোচনায় বিদ্ধ; ক্রোধে-ক্ষোভে আমি তাদের দু'জনকে হত্যা করেছি।"

যদিও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্যে ম্যাকবেথ এ কাজ করেছিলেন—সমস্ত দোষটা প্রহরীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেই কিন্তু ম্যালকম ও ডোনালবীনের মন সন্দেহের ছায়ায় কাল হ'য়ে উঠল। মনে-প্রাণে বুঝতে পারলেন তাঁরা কোন একটা গভীর ষড়যন্ত্র যেন তাঁদের লক্ষ্য ক'রে গড়ে উঠছে। নির্জ্জনে তাঁরা স্থির করলেন আর এমন অবস্থায় এখানে থাকা চলে না। তাই স্থির হ'ল ম্যালকম আশ্রয় নেবেন বৃটেনের রাজদ্বারে—ডোনালবীন যাবেন আয়ার্ল'ণ্ডে সকলের অজ্ঞাতে।

৫

ম্যাকডফের মনেও এই একই সন্দেহ উঁকি দিতে লাগল। রসকে বললেন, "আমার মনে হয় এ ম্যাকবেথের কাজ—রাজপুত্র দু'জনে অন্তর্হিত হয়েছে—ম্যাকবেথও তাই রাষ্ট্র করে বেড়াচ্ছে পলাতকেরাই অপরাধী।"

"তাতে তার লাভ"—রস সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

"কেন, ম্যাকবেথের রাজ-অভিষেকের কথা শোননি?"

ঠিক তাই। রাজা ডানকানের মৃত্যুতে রাজপুত্রেরাই উত্তরাধিকারী, কিন্তু দু'জনেই তাঁরা অজ্ঞাতবাসে, তাই ম্যাকবেথ হ'লেন স্কটল্যাণ্ডের রাজা। তৃতীয় ডাকিনীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হ'ল।

কিন্তু ম্যাকবেথ বা তাঁর স্ত্রী ডাকিনীদের ভবিষ্যদ্বাণী ভুলতে পারেননি। ব্যাঙ্কোর ছেলে হবে রাজা—এ চিন্তাও তাঁদের কাছে অসহ্য হ'য়ে উঠল। পরের রক্তে একবার হাত যখন রঞ্জিত হ'য়েছেই—তখন এখন তাঁদের পেছনের দিকে তাকালে চলবে না। এই চিন্তাই ম্যাকবেথ-দম্পতীর রক্তের অণু-পরমাণুতে দোল খেতে লাগল। স্থির হ'ল, ব্যাঙ্কো বা তাঁর ছেলে ফ্লিয়ান্স দু'জনকেই মরতে হবে—মরা তাঁদের চাই-ই।

দু'জন গুপ্তঘাতক নিযুক্ত হ'ল ব্যাঙ্কো ও তাঁর ছেলেকে হত্যা করবার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাজ্যাভিষেকের সূত্রে নিয়ে এক বিরাট ভোজসভায় ম্যাকবেথ রাজ্যের প্রধানদের নিমন্ত্রণ করলেন—ব্যাঙ্কো ও ফ্লিয়ান্সও বাদ গেলেন না। তাঁদের আগমন-পথেই লুকিয়ে রইল ঘাতক দু'জন। ভোজ-সভার রাত্রিতেই নিহত হ'লেন ব্যাঙ্কো—কিন্তু ফ্লিয়ান্সকে ধরা গেলো না।

এদিকে নৈশ ভোজ-সভায় ম্যাকবেথ-দম্পতী তখন সম্ভ্রান্ত নিমন্ত্রিতদের সাদরে স্বাগত জানাচ্ছেন।

সময় বয়ে যায়। সেনাপতি ব্যাঙ্কো এখনও অনুপস্থিত। ব্যাঙ্কোর অনুপস্থিতিতে সকলেই দুঃখিত হ'লেন।

সমস্ত আসন নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্তদের দ্বারা পূর্ণ—মাত্র একটি আসন খালি। সেই আসনে স্বয়ং ম্যাকবেথকে বসবার জন্যে উপস্থিত নিমন্ত্রিতরা অনুরোধ করতে লাগলেন—রাজসঙ্গ তাঁদের তৃপ্তি দেবে। ম্যাকবেথ এগিয়ে গেলেন—কিন্তু চেয়ারে বসতে গিয়ে চম্‌কে উঠলেন। ব্যাঙ্কোর রক্তাক্ত ছায়ামূর্ত্তি সেই আসনে আসীন।

ম্যাকবেথ বিড়-বিড় ক'রে বলতে লাগলেন—"না, না—এ আমার কাজ নয়—তুমি রক্তাক্ত মাথাভরা চুল নিয়ে আমার দিকে অমন করে তাকিয়ো না"—ভয়ে তাঁর দেহ থর-থর ক'রে কাঁপছে। সেই দেখে উপস্থিত সকলে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন।

"কি হ'ল, কি হ'ল"—সবিস্ময়ে তাঁরা বলে উঠলেন।

"মহারাজকে আজ অসুস্থ মনে হচ্ছে"—লেডী ম্যাকবেথ বললেন, তার পর ম্যাকবেথকে সচেতন করবার জন্যে বললেন, "তোমার অতিথিরা তোমার জন্যে বসে রয়েছেন ভোজে তোমার সঙ্গ লাভের আশায়।"

ততক্ষণে ব্যাঙ্কোর প্রেতমূর্ত্তি মিলিয়ে গেছে। প্রকৃতিস্থ হ'য়ে ভোজে বসলেন। এমন সময় আবার ভূত দেখার মত তিনি চমকে উঠলেন। তাঁর সামনে ব্যাঙ্কোর প্রেতছায়া দাঁড়িয়ে আছে। আর কেউ-ই এটা দেখতে পেলেন না, শুধু ম্যাকবেথই সে দৃশ্য দেখছেন—দেখছেন ব্যাঙ্কো একদৃষ্টে যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন—"যাও, যাও—যদি আবার আস—ও মূর্ত্তিতে আর এসো না—না—না এই ভয়ঙ্কর ছায়ামূর্ত্তিতে নয়।"

সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাকে যেতে বলছেন আপনি, কে আপনার সামনে রয়েছে?"

বেগতিক দেখে লেডী ম্যাকবেথ সভা ভেঙ্গে দেওয়াই

যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন; বললেন, "রাজা ডানকানের মৃত্যুর পর থেকে মহারাজ এমনই অসুস্থ হ'য়ে পড়েন মাঝে মাঝে। এ সময়ে এঁকে কথা বলতে দেওয়া উচিত নয়।"

সভা ভেঙে গেল। সভাগৃহ খালি হ'লে ম্যাকবেথ বললেন, "দেখেছ—ম্যাকডফ আজকের ভোজে আসেনি। কেন বল ত' সে এমনি ক'রে রাজ-নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করল?"

ম্যাকডফের না আসার কারণ জানা ছিল না। লেডী ম্যাকবেথ সংশয়াকুল চিত্তে জিজ্ঞাসা করলেন—"কোন ক্রটি হয়নি ত' নিমন্ত্রণে?"

"না, তা নয়, গুপ্তচর খবর দিয়েছে ম্যাকডফ বাড়ী নেই, পাপ যখন একবার করেছি, বার বার পাপ কাজই মনে সাহস জোগাবে, আবার একবার ডাকিনীদের কাছে যাব, দেখি তারা কি বলে—" ম্যাকবেথ বললেন।

৬

আবার সেই দুর্য্যোগময়ী রাত্রি, আবার ম্যাকবেথ ডাকিনীদের সাক্ষাৎ পেলেন সেই প্রান্তরের একটা গুহায়। অবিদ্যার অধিকারী তারা। তাঁকে পাপকর্ম্মে অগ্রসর হবার সাহস দিল—কিন্তু একটি মূর্ত্তি যে কথাটি বলল তা ম্যাকবেথের সারা মন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। সে বলল, "ম্যাকবেথের তত দিন পতন হবে না, যত দিন না বারনামের অরণ্য ডুন্সেনীন পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আসবে।"

ম্যাকবেথ চিন্তা করতে লাগলেন, "এ-ও কখনো হয়! একটা গাছপালা সমেত বন কখন সজীব হয়ে চলা-ফেরা করতে পারে মানুষের মত? কিন্তু—"

ঐ কিন্তুর প্রশ্নই মাথায় ঘুরতে লাগল একটা বেদনাদায়ক কীটের মত, আরও জেনেছিলেন, ম্যাকডফ আর ফাইকের অধিপতি দু'জনে গোপনে তাঁর বিরুদ্ধে জাল বিস্তার করছে।

"সাবধান, সাবধান!"—প্রেত-প্রেতিনীদের সাবধানসূচক বাণী আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হ'তে লাগল।

*   *   *   *

ম্যাকডফকে না পেয়ে ম্যাকবেথ তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে হত্যা করালেন নিষ্ঠুর ভাবে। ঠিক সেই সময় ডানকানের পুত্র ম্যালকম ও ম্যাকডফ পরামর্শ করছিলেন ম্যাকবেথকে দমন করবার জন্ম। ম্যাকবেথের সমস্ত সামন্ত রাজা, পদস্থ কর্ম্মচারীই ম্যাকবেথের অত্যাচারে তখন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। সকলেই গোপনে যোগ দিয়েছে চক্রান্তকারীদের দলে। রশের মুখে শুনলেন ম্যাকডফ—ম্যাকবেথের বর্ব্বরতার কথা। রশ কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে পরে বলল, "আপনার স্ত্রী-পুত্র আর নেই, ম্যাকবেথের নিষ্ঠুর হাতে তারা আজ পরলোকে।"

রাজার রহস্যজনক-মৃত্যুতে ম্যাকডফের মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল, এখন প্রতিহিংসার আগুন আগেকার আগুনকে লেলিহান ক'রে দিল। প্রতিজ্ঞা করলেন ম্যাকবেথকে ধ্বংস করবেনই তিনি।

লেডী ম্যাকবেথ ক্রমশঃ অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। যে পাপ কাজ তিনি করেছিলেন—তার কথা ভোলাবার চেষ্টা করলেও ভুলতে পারলেন না। কার এক ফোঁটা রক্ত যেন তার হৃদয়ের গভীর তলদেশে চিরদিনের জন্মে লেগে আছে। চিরটা কাল থাকবেও সেটা—এই চিন্তাই তাঁকে ঘুমের মাঝখানে জাগিয়ে দিত। যে রক্তে তিনি হাত রঞ্জিত করেছিলেন সে রক্তটাকে ধুয়ে ফেলবার জন্তে, একেবারে নিশ্চিহ্ন করবার জন্তে উন্মাদের মত তাঁর হাত পীড়ন করেন—ঘুমের মাঝখানে সেই হাত কচলাতে থাকেন যেন সেটাকে ধুয়ে ফেলতে চান, কিন্তু সে দাগ যেন ওঠে না—এখনও সেই রক্তের গন্ধ পান তিনি—"হায় রে পোড়া দাগ—যা, যাঃ, উঠে যাঃ, এখনও যে গন্ধ রয়েছে এখানটায়—হায়, হায়, আরবের সমস্ত আতর ঢাললেও বুঝি সে গন্ধ আর দূর হবে না"—প্রলাপ বকেন তিনি। ডাক্তারেরা কোন আশাই দেন না, বলেন—"এ রোগ যে দেহে নয়, মনে, এ রোগ সারাতে পারে এমন ডাক্তার আর নেই।" ম্যাকবেথ বিচলিত হয়ে পড়েন।

ওদিকে শুনলেন ম্যাকডফ ইংরেজ সৈন্তদের নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে স্কটলণ্ডে তাঁর প্রাসাদের দিকে। আর এদিকে রাণীর উন্মাদ অবস্থা! ঘোর সংকট। এমনি ঘোর সংকটেই তাঁকে একা ফেলে সকলের মূল লেডী ম্যাকবেথ আগেই যাত্রা করলেন নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রে। তাঁর স্থান কোথায় হবে কে-ই বা বলবে?

কাতর হ'লেও ম্যাকবেথের মনে একটা সাহসের বাণী ভাসছিল। ডাকিনীরা তাঁকে বলেছে, যতক্ষণ বারনামের অরণ্য না উঠে আসে তাঁর দুর্গ ডুন্সেনীন পাহাড়ের চূড়ায় ততক্ষণ তাঁর পতন নেই—তিনি ততক্ষণ অমর—কারও শক্তি নেই তার আগে তাঁকে পরাজিত করে। কিন্তু সময় কি এগিয়ে এল তাঁর? দূত-মুখে শুনলেন, বারনামের গোটা জঙ্গলটা আশ্চর্য্যজনক ভাবে ডুন্সেনীন পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আসছে। বিশ্বাস করতে পারলেন না—এখনও তিনি পৃথিবীতে বাস করছেন—এ অলৌকিক ঘটনা কি ক'রে সম্ভব হয়! কিন্তু গবাক্ষ-পথে দেখলেন দূতের কথা মিথ্যা নয়—সত্যই উঠে আসছে তাঁর যমদূত, তাঁর শমন বারনামের জঙ্গল—বড় বড় গাছগুলোর যেন চলবার ক্ষমতা এসেছে—উঠে আসছে তাঁর প্রাসাদের দিকে।

ম্যাকডফের নেতৃত্বে বৃটিশ সেনা বারনাম অরণ্যের এক একটা ডালকে ছদ্মবেশস্বরূপ করে এগিয়ে আসছিল।

ম্যাকবেথ বুঝলেন—তাঁর মৃত্যু সন্নিকট। তবুও তিনি শেষ চেষ্টা করতে লাগলেন, তাঁর অনুচরেরা প্রাণপণ যুদ্ধ করতে লাগল। কিন্তু পাপের সরা তখন সম্পূর্ণরূপেই ভরা। তাই ম্যাকবেথের সকল চেষ্টা মরণের আগে রোগীর মাটি আঁকড়ে ধরার মত। ম্যাকডফের সৈন্ত প্রাসাদে প্রবেশ করল। ম্যাকবেথ যুদ্ধসাজে সেজে প্রাণপণ যুদ্ধ করছিলেন; এমন সময় ম্যাকডফের সঙ্গে দেখা। তাঁকে দেখেই চীৎকার করে উঠলেন ম্যাকবেথ,—"ফিরে যাও ম্যাকডফ, ফিরে যাও, তোমার মুখ দেখতে চাই না, তোর বংশের অনেক রক্তে আমার এ তরবারি লাল হ'য়ে উঠেছে—আর বেশী রক্ত ঝরাতে চাই না।"

কিন্তু হায়! ডাকিনীদের শেষ কথাও ফলল। যে বারনামের অরণ্য উঠে এলেই ম্যাকবেথের মৃত্যু সে জঙ্গল উঠে এসেছে। ম্যাকডফের তরবারির আঘাতে ম্যাকবেথের মুণ্ডহীন দেহটা মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল।   অনুবাদক—তরুণকুমার দত্ত।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১১

'মেরা ঝাঁসী দেঙ্গী নেহি!' এই বহ্নিগর্ভ বাণীতে প্রতিবাদ জানালেন রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রবলপ্রতাপ ইংরেজ সরকারের সেই জবরদস্ত ঘোষণার বিরুদ্ধে। এর পর ক্ষোভে অভিমানে উদ্বেলিত

চিত্তে রাণী প্রাসাদের কক্ষে ফিরে এলেন। দূরদর্শিনী রাণী দিব্য-দৃষ্টিতে তাকালেন ভারতের দিকে দিকে—চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি একটি করে অতীতের পরাক্রান্ত রাজবংশগুলির শোচনীয় অধঃপতন, দুর্ভাগ্য উত্তরাধিকারীদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী স্পর্দ্ধিত ইংরেজ সরকারের হৃদয়হীন অত্যাচার এবং অত্যাচারিতদের একান্ত অসহায় অবস্থা। অন্যায় অনুচিত অবৈধ জেনেও ইংরেজের এই অত্যাচার প্রত্যেকেই নীরবে সহ্য করছে। আর, তাছাড়া উপায়ই বা কোথায়? আত্মকলহে ভারতের রাজ্যগুলি আত্মশক্তি হারিয়ে অতীত গৌরবের অবদান আঁকড়ে পড়ে আছে—আত্মরক্ষার সামর্থও তাদের নেই।

মনে পড়লো—নাগপুরের ভোঁসলা রাজবংশের কথা। সেই মহাবীর প্রথম রঘুজী ভোঁসলা—দুর্দ্ধর্ষ অশ্ববাহিনী নিয়ে একদা যিনি সারা ভারতে হানা দিয়েছিলেন; দিল্লীর বাদশাহ পর্যন্ত 'থরহরিকম্প' হতেন যাঁর দুর্বার দাপটে। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় রঘুজীও বড় 'কেউ-কেটা' ছিলেন না; এঁরই সেনানী ভাস্কর পণ্ডিত মারাঠা শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'চৌথ' দাবী করে সুবে বাঙলার নবাব আলিবর্দীকে ব্যতিব্যস্ত করায় নিরুপায় হয়ে নবাব কৌশলে বিশ্বাসঘাতকতায় ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করে ভীমরুলের চাকে লোষ্ট্রনিক্ষেপের মত এক দারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন এবং অবশেষে উড়িষ্যা প্রদেশের সঙ্গে বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা 'চৌথ স্বরূপ' দেবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে রঘুজী ভোঁসলার রোষানল থেকে রক্ষা পান ও মারাঠা-বিপ্লব থেকে তাঁর স্নেহের দৌহিত্র সিরাজকে নিষ্কণ্টক করে যান। মহীশূরের মহাবীর হায়দর আলির মত নাগপুরের বীরকেশরী রঘুজীও যে ইংরেজদিগকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাদের রাজ্যবিস্তারে প্রবল অন্তরায়-স্বরূপ ছিলেন—সেই দুর্দ্ধর্ষ রঘুজীর বংশধর কালক্রমে অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করলেন। কিন্তু চাকা তখন ঘুরে গেছে, ইংরেজের তখন অপ্রতিহত ক্ষমতা, পক্ষান্তরে আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধের শোচনীয় পরিণতির সাক্ষিস্বরূপ হয়ে সেদিনের পরাক্রান্ত রঘুজীর সাম্রাজ্য ভেঙে গেছে, নাগপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির অধিকারীরূপে গলিত-নখরদ্রংষ্ট্রা ব্যাঘ্রের মত রঘুজী ভোঁসলার বংশধর কোনরূপে রাজগী বজায় রেখেছিলেন। তৃতীয় রঘুজীর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের শ্যেন দৃষ্টি তীব্রতর হয়ে উঠল। ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কলগুলো তখন ভারতবাসীর লজ্জা নিবারণের জন্যে অবিশ্রান্তগতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং ভারতবর্ষের তাঁত ও তাঁতীদের বস্ত্রবয়ন শক্তি প্রতিরোধ করা হয়েছে নানা ভাবে। বিলাতের যন্ত্র-দানবদের দারুণ ক্ষুধা মেটাবার জন্যে চাই প্রচুর পরিমাণে কার্পাস তুলা—সেই তুলার জন্মস্থান হোচ্ছে নাগপুর ও তার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল; সুতরাং নাগপুর খাসে আনা ইংরেজের একান্ত প্রয়োজন। তাই শ্যেন দৃষ্টিতে এই স্বাধীন রাজ্যটির জীর্ণ সিংহাসনের পানে তাকিয়ে উপযুক্ত ক্ষণটির প্রতীক্ষা করছিল ইংরেজ।

তৃতীয় রঘুজীর বিধবা রাণী বঙ্কবাঈ এই বংশেরই এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বালককে দত্তক পুত্র গ্রহণ করলেন। প্রাসঙ্গিক অনুষ্ঠানের পর সেই বালক জানোজী ভোঁসলা নামে অভিহিত হয়ে নাগপুরের গদীতে বসলেন। ঝাঁসীর মত নাগপুরের অনুষ্ঠানেও বৃটিশ রেসিডেন্ট ম্যানসন সাহেব উপস্থিত থাকেন বন্ধুভাবে। কিন্তু এর পরেই লর্ড ডালহৌসীর গবর্ণমেণ্ট রাণীর দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ এই অজুহাতে এক ঘোষণা দ্বারা নাগপুর রাজ্য খাস করে নিলেন। কিন্তু এখানেই রাণী ও রাজবংশের পরিজনদের দুর্গতির সমাপ্তি হলো না। ইংরেজ দেখলেন, ভোঁসলা রাজবংশের পরিজন-সংখ্যা এত বেশী, তাঁদের বৃত্তির জন্যে একটা মোটা রকমের তহবিল তৈরী না করলে শেষে অসুবিধায় পড়তে হবে। রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। যে রাজ্য তাঁরা খাস করে নিলেন, তার রাজস্ব থেকে পরিজনদের বৃত্তিদানের ব্যাপারটা ভবিষ্যতের গর্ভে রেখে, তাঁরা তাড়াতাড়ি মৃত রাজার রাজকীয় ঐশ্বর্য এবং সঞ্চিত মূল্যবান জহরত প্রভৃতি বিক্রয় করে ঐ তহবিল গড়বার জন্যে যে সব নিষ্ঠুর কাণ্ড করলেন, তার প্রত্যেকটি যে-কোন সভ্য জাতির পক্ষে অনন্তকালব্যাপী কলঙ্কময় দুষ্কৃতির মত বেদনাদায়ক স্মৃতি! ভারতের ভাগ্যবিধাতারূপে ভারতের হৃদয়হীন বড়লাট লর্ড ডালহৌসী সদম্ভে ফতোয়া দিলেন—রাণী ও রাজ-পরিজনদের যখন রাজ্যই রইল না, সে অবস্থায় আগেকার মত রাজকীয় আড়ম্বরও নিরর্থক। সুতরাং রাণীদের ব্যক্তিগত বসন-ভূষণ ও আসবাব-পত্রের অতিরিক্ত সব কিছুই নিলামে বিক্রয় করে সেই অর্থ তাঁদের জন্যই বৃত্তিদানের তহবিলে দেওয়া হবে। এই ফতোয়ার ফলও হলো মর্মান্তিক। ইংরেজ রেসিডেণ্ট সদলবলে নাগপুর প্রাসাদে হানা দিলেন ঠিক এক দল হানাদার দস্যুর মত। বিশাল প্রাসাদের বাহির ও ভিতর মহল থেকে দামী দামী যাবতীয় দুর্লভ আসবাব-পত্র তুলে এনে নাগপুরের বাজারে প্রকাশ্য ভাবে নিলাম ডেকে বিক্রীর ব্যবস্থা করা হলো। মণিমুক্তা-খচিত আস্তরণ দেওয়া রাজকীয় শিবিকা, শকট, হাতীশালার যাবতীয় হাতী, ঘোড়াশালার ঘোড়া—সব-কিছু উজাড় করে নিয়ে চললো সরকারী কর্ম্মচারীরা। সব চেয়ে মর্মান্তিক হলো—রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করে ঘৃণ্য লুণ্ঠনকারীর মতনই যখন ইংরেজের তাঁবেদারগণ রাণীদের সঞ্চিত রত্নালঙ্কারের সঙ্গে স্ত্রী-ধন পর্যন্ত—তাঁদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল। রাজপুরীর মধ্যে যখন এই কাণ্ড চলতে থাকে, সেই সময় বৃদ্ধা রাজমাতা টলতে টলতে অন্দর মহলের অলিন্দের উপরে এসে দু'হাতে রেলিং ধরে ক্রোধে অপমানে কাঁপতে কাঁপতে চীৎকার করে বলতে থাকেন: "ওরে, তোরা কি মরে গেছিস্... ভোঁসলা-বংশের এই লাঞ্ছনা দেখার চেয়ে ঘরে-ঘরে আগুন লাগিয়ে দে—সব পুড়ে ছাই হয়ে যাক।"

এর পর রাণীদের সেই সব দুর্মূল্য মণি-মুক্তা-জহরত প্রভৃতির ক্রেতা নাগপুরে মেলেনি বলে, সেগুলি কলকাতায় পাঠানো হয় বড়লাটের হুকুমে; ফলে, রাজ-পরিবারের ব্যবহৃত সেই সব মণিরত্ন কলকাতায় হ্যামিল্টন কোম্পানীর বিপণীর শোভাবর্দ্ধন করে।

মনে পড়লো সাতারার কথা। ছত্রপতি শিবাজীর বংশধর—সাতারার শেষ নৃপতি প্রতাপজীর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠা মহিষী সগুণাবাঈ দত্তক পুত্র গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তা অগ্রাহ্য করে বাহুবলে ইংরাজ সরকার তাঁদের সেই মিত্ররাজ্যটিকে, অধীন রাজ্য ভেবে স্বরাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিলেন। রাণী সগুণাবাঈ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে কোর্ট অব ডিরেক্টর্সদের দরবারে অভিযোগ করেছিলেন; কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষ কোন প্রতিকারই করেননি।

সাতারার পরে সম্বলপুর, কেরৌলী ও আকর্টের অদৃষ্টেও একই দুর্ভোগ দেখা দিল। রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক রাজ্য—যেখানেই অপুত্রক অবস্থায় রাজা পরলোকগমন করেছেন, সেই রাজ্য একই নজীরে ইংরেজ সরকার খাস করে নিলেন। এমন কি, চব্বিশ হাজার বর্গ-মাইল পরিমিত সুবিস্তীর্ণ অযোধ্যা রাজ্য কু-শাসনের অজুহাত দেখিয়ে নবাব ওয়াজিদ আলি শা'কে রাজ্যচ্যুত করে কলকাতার উপকণ্ঠে মেটিয়াবুরুজে নজরবন্দী করে রাখা হলো: তার পর সেখানেও নাগপুরের মতই নবাব-প্রাসাদের গৃহসজ্জা, মূল্যবান বসন-ভূষণ, যান-বাহন, হস্তলিখিত দুষ্প্রাপ্য অমূল্য গ্রন্থ-সম্পদ প্রভৃতি আমিনাবাদের বাজারে নিলামে বিক্রয় হলো কোম্পানীর কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে। এখানেও নবাব ও নবাবের বহু বেগম ও পোষ্যদের বৃত্তির অনুকূলে এক ধনভাণ্ডার খোলা হয় এবং ধনসংগ্রহের অভিপ্রায়ে কোম্পানীর কর্মচারীরা নবাব-হারেমের অসূর্যম্পশ্যা মহিলাদের হারেমের বাইরে এনে তাঁদের নিজস্ব ধনসম্পত্তিও লুণ্ঠন করতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হননি।

এই ভাবে এক-একটি স্বাধীন বা মিত্ররাজ্য আত্মসাৎ করে রাণী ও রাজপরিজনদের উপরে যে সব অসম্মানজনক আচরণ অনুষ্ঠিত হয় কোম্পানীর পক্ষ থেকে, তার মূলে শুধু যে রাজান্তঃপুরিকাদের মনে বেদনার জ্বালা ধরে তা নয়—নিখিল ভারতের প্রত্যেক অধিবাসীই এর জন্তে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হয়ে অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকেন ইংরেজ কোম্পানীর উদ্দেশে।

উল্লিখিত রাজ্যগুলির ভাগ্য-বিপর্যয় কোন কোন ক্ষেত্রে ঝাঁসীর দুর্যোগের অনেক আগেই, আবার বা কোন কোন ক্ষেত্রে ঝাঁসীর বিপদের প্রাক্কালে বা কিছু পরেই ঘটেছিল। কিন্তু তাহলেও সাতারা, নাগপুর, সম্বলপুর প্রভৃতির বিপর্যয় মহারাজ গঙ্গাধরের জীবিতকালেই অনুষ্ঠিত হয় এবং সে সময় রাণী লক্ষ্মীবাঈ নাগপুরের বৃদ্ধা রাজমাতার মর্মবাণী শুনে স্বামীকে বলেছিলেন—ইংরেজ যাদুকরের মত ভারতের মানুষগুলোকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলেই রঘুজী ভোঁসলার পরিজনদের এ অপমান নীরবে তারা দেখেছিল—রাজমাতার কান্না শুনেও মানুষগুলোর গায়ের রক্ত তেতে ওঠেনি! কিন্তু রাণী বোধ হয় সেদিন স্বপ্নেও ভাবেননি, ঝাঁসীর পরিণামও এক দিন এমনি হবে, আর সেদিন তাঁর কণ্ঠের জ্বালাময়ী স্বর ঝাঁসীর সন্তানদের দেহের রক্ত উত্তপ্ত করে তুললেও ইংরেজের যাদুদণ্ডের অলৌকিক প্রভাব তাদের প্রত্যেককে স্তব্ধ, স্তম্ভিত ও নির্বাক্ করে রাখবে।

রাণী বুঝলেন, মুখে যতই প্রতিবাদ করুন—ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যতই যুক্তি দেখান, তাতে কোন ফল হবে না; এর একমাত্র উপায় হচ্ছে মুখের কথা রক্ষা করবার জন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম। কিন্তু ক্ষুদ্র ঝাঁসীর মুষ্টিমেয় সেনাদল নিয়ে প্রবলপ্রতাপ ইংরেজের অজেয় রণবাহিনীর প্রতিরোধ করতে যাওয়া—দিগন্তবিস্তারী অগ্নিতরঙ্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মতই উন্মত্ততার পরিচায়ক। কিন্তু তথাপি, ইংরেজের এত বড় অন্যায় ও মিথ্যাচার সহ্য করে বেঁচে থাকাও তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র গৌরবের কথা নয়। এই অবস্থায় সহসা তাঁর মনে পড়ল—মহারাষ্ট্র রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজীর উপদেষ্টা গুরু মহাত্মা রামদাস স্বামীর একটি পরম উপদেশ। তিনি বলেছিলেন—এক-মনে এক-প্রাণে এক-সত্তা হোয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করলেই কাম্য লাভ হয়—সর্ব ফল পাওয়া যায়।...স্বামীজীর ঋণী রাণীর মনে শান্তি দিল; তিনি বুঝলেন—পৃথিবীর সকল শক্তির উপরে যাঁর শক্তি, যে শক্তি সীমাহীন, অনন্ত, অপরিমিত, সেই পরম শক্তিমানের উপরেই নির্ভর করে রাণী মনের জ্বালা নিবৃত্ত করতে সচেষ্ট হলেন। তাঁর মনোবীণায় নূতন সুর ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—'আরাধনা-বলে সর্বফল মিলে।' স্বরু রাজ্যের শোক ভুলে তিনি তাঁর কুলদেবী পমমেশ্বরী মহালক্ষ্মীর আরাধনায় মগ্ন হলেন।

'৮৫৪ অব্দের ১৫ই মার্চ তারিখে লর্ড ডালহৌসীর নির্দ্ধারণ অনুসারে ঝাঁসী ইংরেজ শাসনাধীন রাজ্য বলে বিঘোষিত হলো। রাণী তাঁর সেনাদল এবং রাজ্যের কর্মচারীদিগকে ছয় মাসের বেতন পুরস্কার-স্বরূপ প্রদান করে সাশ্রুলোচনে সকলকে বিদায় দিলেন। বিবাহের পর বধূরূপে রাণী ঝাঁসী দুর্গসংলগ্ন রাজপ্রাসাদে স্বামীর সঙ্গে বরাবর বাস করেছেন, স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুর-বংশের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত সেই প্রাসাদেই তিনি এ পর্যন্ত সগৌরবে বসবাস করছিলেন। ইংরেজ সরকারের নির্দেশে সেই দুর্গ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করে দুর্ভাগ্য দত্তক পুত্র দামোদরের হাত ধরে নগর-মধ্যবর্তী রাজ-প্রাসাদে বাস করতে বাধ্য হলেন রাণী। পিতা মোরপন্থ, দেওয়ান লক্ষ্মণরাও এবং কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর রাণীর সঙ্গে নগর-প্রাসাদে চললেন। উপরন্তু ঝাঁসীর দুর্গপ্রাসাদে যে সব আশ্রিত এবং রাণীর সহচরীবৃন্দ এত কাল বাস করতেন—যাঁদের অন্ত কোন অবলম্বনই ছিল না, রাজ্যহারা হয়েও রাণী তাঁদের কাউকে ত্যাগ করতে পারলেন না, তাঁরাও ভাগ্যহীনা রাণীকেই তাদের সৌভাগ্যরূপিণী জেনে সাশ্রুলোচনে তাঁর অনুগমন করল। একদা যিনি জাঁকজমকে মিছিল করে প্রত্যহ নগর ভ্রমণ করতেন, এখন তাঁকে অনাড়ম্বরে আশ্রিত পরিজনবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে দুর্গপ্রাসাদ ত্যাগ করে নগরের পরিত্যক্ত উদ্যান-বাটিকায় গমন করতে দেখে ঝাঁসীর অধিবাসীরা আর্তস্বরে রোদন করতে লাগল।

ইংরেজ সরকার রাণীর প্রতি এই মর্মে এক আদেশ জারী করেছিলেন যে, রাণী তাঁর সৈন্তদল ভেঙে দেবেন, রাজকোষে গচ্ছিত ধন-রত্ন এবং কেল্লার অস্ত্র-শস্ত্রাদির উপর হস্তক্ষেপ করবেন না। রাণী বুঝেছিলেন, যে কোন কারণেই হোক, ইংরেজ সরকার তাঁর আত্মমর্য্যাদায় এখনো আঘাত করেননি—সম্ভবতঃ তাঁরা রাণীর গতিবিধি সন্তর্পণে লক্ষ্য করছিলেন। রাণীর আচরণে কোনরূপ ছিদ্রের সন্ধান পেলেই তাঁরা বাহ্যিক এই ভদ্রতার মুখোস খুলে ফেলে অন্তান্ত রাজ্যের রাজ্যচ্যুতা রাণীদের প্রতি যে অশিষ্ট ব্যবহার করেছেন, এখানেও তার অনুসরণে কুণ্ঠিত হবেন না। বুদ্ধিমতী রাণী অবস্থাটি উপলব্ধি করে, মনের ক্রোধ ও ক্ষোভ মনের মধ্যেই চেপে রেখে বর্ণে বর্ণে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের আদেশ মেনেই চললেন।

নগরমধ্যবর্তী প্রাসাদে প্রবেশ করেই রাণী তাঁর সঙ্গিনীদের সাহায্যে সংগোপনে এমন একটি কাজ সম্পন্ন করে ফেললেন, যাতে তাঁর দূরদৃষ্টির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রাসাদের বিস্তীর্ণ উদ্যানে ঝাঁসী রাজ্যের চারিটি বিখ্যাত কামান অনেক দিন থেকেই স্থাপিত ছিল। প্রাসাদে প্রবেশ করেই রাণীর প্রথম কাজ হলো সেই কামানগুলি যাতে ইংরেজের হাতে না পড়ে তার ব্যবস্থা করা। যেমন রাণীর সঙ্কল্প, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কাজ। বাগানের মধ্যে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে কামানগুলিকে লুকিয়ে ফেলা হলো। কামান ছাড়াও

এই প্রাসাদে বহু অস্ত্র-শস্ত্র ছিল। বিশ্বস্ত অনুচর ও সঙ্গিনীদের সাহায্যে রাণী সেগুলিও এমন ভাবে সুকৌশলে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখলেন, যাতে নষ্ট না হয়ে যায় কিম্বা কারুর নজরেও না পড়ে। প্রাসাদের মধ্যে সুড়ঙ্গপথে অন্যের অগম্য বহু ভয়খানা ছিল—সেইখানেই অস্ত্র-শস্ত্র সব সংগোপনে সুরক্ষিত হলো।

ঝাঁসী অধিকার করে ইংরেজ সরকার জনৈক কমিশনারের উপর তার শাসনভার অর্পণ করলেন। দেশীয় রাজ্য খাস করে অধিকৃত রাজ্যের রাজস্ব কি ভাবে সেই রাজ্যের উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে জন সলিভান্ নামে জনৈক নিরপেক্ষ ইংরেজ সুধী 'এ প্লী ফর দি প্রিনসেস অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে লর্ড ডালহৌসীর দেশীয় রাজ্য আত্মসাৎ-নীতির এক নির্ভীক সমালোচনা করেন। ঐ সকল রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির ধুয়া ধরেই রাজ্যগুলি ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে লর্ড ডালহৌসীর আমলে তথাকথিত দেশীয় রাজ্যগুলির কি অবস্থা ঘটে, সেই কথাই সলিভান্ সাহেব এই ভাবে বিবৃত করেন:

কোন দেশীয় রাজ্য খাস করবার সঙ্গে সঙ্গেই এক জন পদস্থ ইংরেজ কমিশনারের হাতে সেই রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করা হয়। তাঁর অধীনে কতিপয় কর্মচারী নিযুক্ত থাকে। প্রকারান্তরে সেই কমিশনারই রাজ্যের রাজার পদে বসে রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব করেন। রাজ্যের দরবারের অস্তিত্ব লোপ হয়; রাজ-কর্ম্মচারিবর্গ এবং রাজার কয়েক সহস্র সৈন্যকে বরখাস্ত করার ফলে তারা বেকার অবস্থায় পতিত হয়। রাজধানীর পূর্ব গৌরব আর থাকে না—ক্রমশঃ শ্রীভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের অবনতি ও বিনাশ ঘটে। রাজ্যের প্রজাদের ধনসম্পত্তি লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে, ইংরেজদের সব দিক দিয়েই উন্নতি হতে থাকে; তারা স্পঞ্জের মত ভারতের গঙ্গার উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি থেকে ধনসম্পদ শোষণ করে টেমস্ নদীর তীরবর্তী বিলাত নগরে নিঃসৃত করে তারই ঐশ্বর্য বাড়াতে থাকে।

ঝাঁসী রাজ্য ইংরেজ-শাসনভুক্ত হওয়ায় তার অবস্থাও এমনি শোচনীয় হতে থাকে। ঝাঁসীর প্রজারা অল্প দিনের মধ্যেই উপলব্ধি করতে পারে, রাণীর আমলে তারা কত সুখে ছিল, আর এখন তারা কি ভাবে ধনে-মানে-প্রাণে মরতে বসেছে।

ঝাঁসীর শাসনভার গ্রহণ করবার প্রাক্কালে পলিটিক্যাল এজেন্ট ঝাঁসীর রাজকোষ পরিদর্শন করে দেখলেন, সেখানে নগদ ছয় লক্ষ টাকা এবং বহু লক্ষ টাকার দুর্লভ রত্নালঙ্কার ও জহরত প্রভৃতি আছে। পলিটিক্যাল অফিসার প্রস্তাব করলেন—এ সমস্তই রাণীকে প্রদান করা হোক। কিন্তু বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর এ প্রস্তাব পছন্দ হলো না। তিনি বললেন যে, ঐ সম্পত্তি আইন অনুসারে মৃত মহারাজের দত্তক পুত্রেরই প্রাপ্য। তাঁর মতে, ভূতপূর্ব রাজার দত্তক পুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকার পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত না হলেও, রাজার নিজস্ব ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃত হতে পারেন। এ অবস্থায় ঐ সম্পত্তি সরকারী ধনাগারে গচ্ছিত থাকবে এবং দামোদর রাও প্রাপ্তবয়স্ক হলে সুদসমেত তাঁকে প্রত্যার্পণ করা হবে। বড়লাটের নির্দেশ মত পলিটিক্যাল এজেন্ট রাণীকে এ কথা জানালেন এবং তাঁকে মাসিক যে হারে বৃত্তি দেওয়া হবে, তারও উল্লেখ করলেন।

রাণী ঐ গচ্ছিত টাকা সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না; তবে তাঁর জন্য মাসিক যে পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন ইংরেজ সরকার, তিনি ঘৃণার সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। রাণীর এই কঠোর মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে ইংরেজ অফিসারগণ স্তব্ধ হলেন।

কিন্তু ঝাঁসী রাজকোষের ঐ ছয় লক্ষ নগদ টাকা এবং বহু লক্ষ টাকার মণি-মুক্তা-জহরত প্রভৃতি ইংরেজ-সরকারের ধনাগারে চিরদিনের মতই গচ্ছিত থেকে যায়। তার কারণ, দামোদর রাও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে—যদিও রাণীর তখন ভাগ্য-বিপর্যয় হয়েছিল—সে টাকা বা সম্পত্তির এক কপর্দকও পাননি। কেবল মাত্র—ঝাঁসী রাজ্য খাস হবার দু'বছর পরে রাজকুমার দামোদর সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করলে, তাঁর উপনয়নের সময় একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে রাণী ঐ গচ্ছিত সম্পত্তি থেকে এক লক্ষ টাকা প্রার্থনা করেন। প্রথমে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট রাণীর প্রস্তাবে সম্মত হননি, শেষে অনেক বিবেচনার পর জানালেন যে, রাজ্যের চার জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ টাকার জন্য জামিনস্বরূপ দায়ী থাকতে সম্মত হলে এ টাকা দেওয়া যেতে পারে। এ প্রস্তাব অত্যন্ত অবমাননাকর ভেবে প্রথমে রাণী সম্মত হননি, শেষে তাঁর পিতার অনুরোধে তুচ্ছ এই ব্যাপার নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে মনোমালিন্য না করে প্রস্তাব মত রাজ্যের চার জন বিশিষ্ট ব্যক্তির জামানতের অনুকূলেই রাণী এক লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন—যে টাকা তাঁর স্বামীর তহবিলজাত। ফলে, গচ্ছিত বহু লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র এই এক লক্ষ টাকাই এ পক্ষের হস্তগত হয়েছিল এবং সেই টাকায় রাণী দামোদরের যজ্ঞোপবীত ধারণ অনুষ্ঠানটি সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন করতে সমর্থ হলেন।

ঝাঁসী রাজ্য খাস হবার পর রাণীর মনের অবস্থা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ম্যালিসন যে বর্ণনা করে গেছেন, তার মর্ম এইরূপ: ঝাঁসী খাস হবার পর তিন বছরের মধ্যে রাণীর অন্তর শান্ত ভাব অবলম্বন করেনি। তাঁর মনে সর্বদাই এই ধারণা জাগরূক ছিল যে, ইংরেজরা তাঁর স্বামীর বংশের অবমাননা এবং তাঁর প্রতি অতি গর্হিত ব্যবহার করেছেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর এই মনোবেদনা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হয় এবং তিনি বৈরনির্য্যাতনের আকাঙ্ক্ষায় অতি কষ্টে কালাতিপাত করছিলেন।

প্রকৃত পক্ষে এই ইংরেজ জাতিকে রাণী তাঁর পরম বৈরি জেনেই পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে দেবতার দ্বারে ধর্ণা দিয়ে মনে মনে উপযুক্ত ক্ষণ গণনা করছিলেন। কায়মনোপ্রাণে মহালক্ষ্মীর অর্চনা করতে করতে রাণী তাঁর অন্তরের প্রার্থনা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নিবেদন করেন—ইংরেজ কোম্পানীর অহমিকা চূর্ণ হোক, ভারতের সুদিন আবার ফিরে আসুক, ভারতবাসীর অন্তর থেকে বৈদেশিক মোহ বিলুপ্ত হোক্।

[ক্রমশঃ।

১১০৬ খৃষ্টাব্দ। পাশ্চাত্য চিত্রকলায় এল এক বিশেষ বিদ্রোহের যুগ। অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, চিত্রজগতে তার আগেও যুগে যুগে শিল্পীরা কি বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি? নিশ্চয়ই করেছেন। সর্বশ্রেণীর ললিতকলাতেই বারে বারে বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই শিল্পীরা করেছেন নব নব যুগের উদ্বোধন। এখানে সে ইতিহাস দিতে গেলে আমার কথা আর ফুরোবে না।

কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য চিত্র (এবং ভাস্কর্য্য) কলায় যে বিদ্রোহ জাগ্রত হয়েছে, তার সঙ্গে আগেকার বিদ্রোহের তুলনাই হয় না। সাধারণ রাষ্ট্রবিপ্লবের কথা ধরুন। আঠারো শতাব্দীর ফরাসী বিদ্রোহের ফলে অনেক কিছুই উল্টে-পাল্টে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ফ্রান্সের জনসাধারণ অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের যোগসূত্র ছিন্ন করতে চায়নি। রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু প্রজাতন্ত্র কিছু একটা নূতন ব্যাপার নয়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব যুগেও পৃথিবীতে প্রজাতন্ত্রের অভাব ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীতে রুশিয়ায় যে বিদ্রোহ দেখা গেছে, কমিউনিষ্টরা সেখানে অতীতের অধিকাংশ ঐতিহ্যকে অস্বীকার ক'রে গ'ড়ে তুলতে চেয়েছে এক অভিনব রাষ্ট্র ও সমাজ।

চিত্র ও ভাস্কর্য্য কলার আধুনিক বিদ্রোহও হচ্ছে সোভিয়েট রুশিয়ার ঐ বিদ্রোহের মত। শিল্পীরা আর গ্রাহ্য করতে চান না অতীতের ঐতিহ্যকে। আগে আমরা ছবি ও মূর্ত্তি বললে যা বুঝতুম, এখনকার অসংখ্য পাশ্চাত্য শিল্পীর হাতের কাজের মধ্যে তার কোন লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যায় না। আগে চিত্রকে বলা হ'ত, সার্ব্বজনীন ভাষা; কিন্তু আধুনিক চিত্র হয়ে উঠতে চায় একেবারেই ছবিকারের
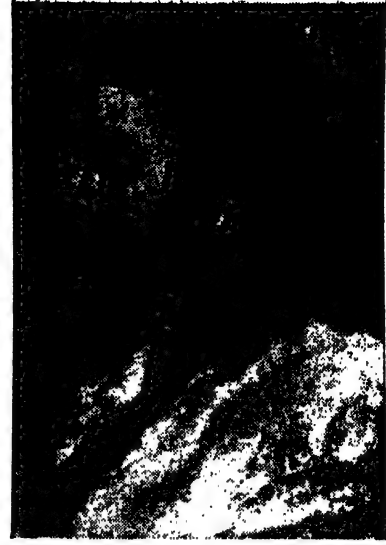
সে —চিত্ত দাস

ব্যক্তিগত ভাষা—তা বুঝতে পারে কিংবা বুঝতে পারে ব'লে ভান করে মাত্র জনকয়েক লোক।

অতি-আধুনিক ভাস্কর্য্যের সমালোচক অতীতের ভাস্কর্য্যকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ক'রে তাদের নাম দিয়েছেন গ্রীক কুসংস্কার, মধ্য-যুগের (বা রেনেসাঁসের) কুসংস্কার ও রোমান্টিক কুসংস্কার। অর্থাৎ গ্রীক-যুগের প্রাক্সিতেলেশ। মধ্য যুগের মিকেলাঞ্জেলো ও উনবিংশ শতাব্দীর রোদাঁ প্রমুখ ভাস্করকে তিনি আমল দিতে প্রস্তুত নন (The Meaning of Modern Sculpture: By R. H. Wilenski)।

ছবির মেলার ভূমিকা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মূর্ত্তি —সরসী রায়চৌধুরী

আমি আধুনিক আর্টের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বলতে চাই না। কিন্তু উক্ত আধুনিক সমালোচকের মনোবৃত্তি প্রশংসনীয় নয়। অতীতের যা কিছু সব মন্দ এবং আধুনিক যা কিছু সব ভালো, এই একচোখো সংকীর্ণতার মধ্যেই কি নেই অধিকতর অসহনীয় কুসংস্কার?

আগে য়ুরোপের নানা দেশের শিল্প-শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্যে ইতালীতে

পাহাড়িয়া —সুনীলকুমার সেনগুপ্ত

ফেরীঘাট —শ্যামল বসু

যাওয়া দরকার মনে করতেন। কিন্তু এখন তাঁদের কাছে ফ্রান্স হয়ে উঠেছে তীর্থক্ষেত্রের মত। কারণ, আধুনিক চিত্রকলার প্রায় প্রত্যেকটি নূতন পদ্ধতির জন্ম হয়েছে ঐখানেই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ফরাসী দেশে পরে পরে আত্মপ্রকাশ করে Fauvism, Naturalism, Futurism, Eclecticism, Idealism, Purism, "Dada" and Scepticism ও Hyper-Realism প্রভৃতি আরো হরেক রকম "ইজম্"। ওদেরই মধ্যে আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল কিউবিজ্‌ম্। তার মধ্য থেকে জন্ম লাভ করে Neo-Plasticism, Constructivism ও Orphism প্রভৃতি। তারও উপরে আছে Sur Realism এবং আরো অনেক ছোট-বড় ইজ্‌মেরও অভাব নেই, সব ইজ্‌মের নাড়ীনক্ষত্রের পরিচয় দিলে পাঠকদের মাথা ঘুরে যেতে পারে। আগে অধিকাংশ আধুনিক চিত্রকরের উপরে ছিল মাতিস ও পিকাসোর অল্প-বিস্তর প্রভাব। কিন্তু সে প্রভাব নষ্ট ক'রে দিয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। হিসাব করলে দেখা যাবে, মধ্য-যুগ থেকে উনবিংশ

দশাশ্বমেধ ঘাট —সুভাষরঞ্জন সিংহ-রায়

শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় চারি শত বৎসরের মধ্যে য়ুরোপীয় চিত্রকলায় যে কয়েকটি নূতন পদ্ধতি জন্মলাভ করেছে, গত অর্দ্ধ-শতাব্দীর মধ্যে ভেকছত্রের মত গজিয়ে-ওঠা ইজ্‌মের ভিড়ে সেগুলি অনায়াসেই চাপা প'ড়ে যেতে পারে।

কোন কোন ইজ্‌ম্ একেবারে ব্যর্থ হয়নি, সাধারণ চিত্রকলার ভিতরে আংশিক ভাবে আশ্রয় পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পাবে ব'লে মনে করি। দৃষ্টান্তস্বরূপ "কিউবিজ্‌মে"র কথা বলা যায়। আবার কোন কোন ইজ্‌ম্ মারা পড়েছে আঁতুড়-ঘরেই। অনেকের পরমায়ু হয়েছে বড় জোর মরসুমী ফুলের মত। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। অধিকাংশ ইজ্‌মই হচ্ছে শিল্পীদের ব্যক্তিগত খেয়ালখেলা মাত্র, খেয়াল মিটলেই আর তার সার্থকতা থাকে না। কিউবিজ্‌মের স্রষ্টা পিকাসো পর্য্যন্ত এখন ভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে নাড়াচাড়া করেন।

বিখ্যাত লেখক সিসলে হাড্‌লষ্টন লিখেছেন: "Painters too were vain. They had to persuade themselves that they were better than their predecessors. Otherwise why should they paint at all ? That is the feeling behind much modern art. If one cannot beat Rembrandt on his own ground, then choose another. Rembrandt was good, in his way ; but we have become tired of that way. We will invent something new. Better to reign in Cubisn than serve in Classicism." (Paris Salons, Cafes, Studios)

ওদেশে কোন না কোন একটা ইজ্‌মের শিল্পী আত্মপ্রকাশ করতে চান, তাঁদের স্বপক্ষে একটা বলবার কথা থাকে। বিশেষ চিন্তার পর নিজের বিশেষ পরিকল্পনার ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাঁরা অবলম্বন করেন কোন নূতন পদ্ধতি। তাঁদের ধারণা যত নূতন বা অদ্ভুত হোক্, তা স্বদেশের মাটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে ভোলে না।

কিন্তু কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য ক'রে আসছি, ভারতের অতি-আধুনিক চিত্রশিল্পীদের মধ্যে একটা রোগ ক্রমেই সংক্রামক হয়ে উঠছে। নূতন উপায়ে ভাবপ্রকাশ করবার জন্যে স্বকীয় কোন পদ্ধতির আশ্রয় না নিয়ে তাঁরা অবলম্বন করতে চান হাল-ফ্যাসানের য়ুরোপীয় চিত্রপদ্ধতি। এই সব নয়া নয়া ইজ্‌মের আসল কথা কি, তাঁরা তা জানেন না কিংবা জানলেও পরিপাক করতে পারেন না, তাই তাঁদের আঁকা ছবিগুলি হয়ে দাঁড়ায় বিজাতীয় শিল্পের অক্ষম ও অর্থহীন অনুকরণ মাত্র। এ বৎসরেও অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীতে বোম্বাইয়ের দুই চিত্রকর (গেড ও হুসেন) ঐ শ্রেণীর ব্যর্থ চিত্ররচনা ক'রে হাস্যাস্পদ হয়েছেন। সেগুলি আর্টও নয়, ছবিও নয়, চোখের বালি!

আরো কয়েক জন শিল্পীর কাজে দেখলুম, উদ্ভটতার দিকে অল্পবিস্তর অশোভন ঝোঁক। তাঁরাও বাংলা দেশে গঙ্গার ধারে ব'সে কালাপানির ওপারে নজর রেখে ছবি আঁকতে চেয়েছেন। শিল্পী রূপের পুরোধা হয়েও যদি কুরূপ ও কুৎসিতের প্রেমে প'ড়ে রুচিবিকারের পরিচয় দিতে চান, তা হ'লে তাঁদের হাত থেকে জোর ক'রে তুলি কেড়ে নেওয়াই উচিত। কোন কোন অতি-আধুনিক

পাশ্চাত্য চিত্রকর এমন ভাবে নর-নারীর মূর্ত্তি আঁকেন যে দেখলেই মনে হয়, তারা যেন পচা মড়ার মত ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে বা elephantiasis রোগে ভুগছে। অগ্রপশ্চাৎ কিছুই না ভেবে-চিন্তে ভারতীয় পটুয়া অমনি সেই কিম্ভুতকিমাকারের নকল করতে বসে যাচ্ছে। এই অনুকৃতিকৌতুক মোটেই কৌতুককর নয়, এ হচ্ছে মনীষায় অপমান।

অবনীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী হয়ে ভারতশিল্পে এনেছিলেন নবজীবনের ধারা। কিসের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর সেই বিদ্রোহ? তিনি চেয়েছিলেন, ভারতের শিল্পী যেন নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখে, নকলিয়া হয়ে বিলাতী শিল্পীর মোসাহেবি না করে। প্রাচ্য কলাপদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার আগে ভারতীয় শিল্পীদের নিজস্ব বলতে কিছুই ছিল না, পদে পদে করত তারা পাশ্চাত্য আর্টের দাসত্ব। রাফাএল ও রেমব্রাণ্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, এই ছিল তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু গিয়ে পৌছত তারা চেরাগের তলাকার অন্ধকারে। হ'তে পারত না তৃতীয় শ্রেণীর পাশ্চাত্য শিল্পীরও সমকক্ষ। অবনীন্দ্রনাথ সেই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘরমুখো করতে পেরেছিলেন ব'লেই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি উচ্চশ্রেণীর এক শিল্পীগোষ্ঠিকে।

দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু এখনো আমরা বর্জ্জন করতে পারিনি দাসমনোভাব। তাই অবনীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই এদেশী তরুণ শিল্পীদের মন আবার ছুটে যেতে চেয়েছে ঘরের বাইরে। আমি নিজে শিল্পাচার্য্যকে দুঃখিত ভাবে বলতে শুনেছি, "আমাদের সময়ে শিল্প যে পথ ধ'রে চলেছিল, এখন তা ছেড়ে সে অন্য পথের পথিক হ'তে চায়।" দাসমনোভাব এমনি বিপদজনক। স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েও সে খুঁজে বেড়ায় শৃঙ্খলকেই। যেমন পিঞ্জরে অভ্যস্ত বিহঙ্গকে মুক্তি দিলেও আবার ফিরে আসে পিঞ্জরের ভিতরেই।

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "আমি তোমাদের কোন দেশ-বিদেশের আর্টের জয়পতাকার নীচে দাঁড়াতে বলিনি, বলবও না। রসের দেবতা যে চন্দ্রাতপের নীচে সভা ক'রে ব'সে আছেন, সেই সভায় প্রবেশ করবার অধিকারী হও, এই আমার তোমাকে এবং তোমার ছাত্রদের উপদেশ এবং আশীর্ব্বাদ।"

এক এক দেশের আলো-বাতাস ও জল-মাটির বিশেষত্ব নিয়েই মানুষের দেহ ও প্রকৃতি হয় এক এক রকম এবং সেই বিভিন্নতারও ছাপ পড়ে দেশ-বিদেশের আর্টের উপরে। প্রাচীন ভারত, মিশর, বাবিলন, গ্রীস, পারস্য ও চীন প্রভৃতি দেশের আর্ট নিয়ে বিচার করলেই ধরা পড়ে এই সত্য কথাটা! রোমীয় যুগের বা মধ্য-যুগের য়ুরোপও মিশর বা অন্য কোন দেশের আর্টের দিকে আকৃষ্ট হয়নি, সে গ্রহণ করেছে গ্রীসের ঐতিহ্যকেই। আবার আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের দিগ্বিজয়ের ফলে ভারতীয় ও গ্রীসীয় ললিতকলা যখন পরস্পরের নিকটস্থ হ'ল, তখন বিজিত ভারত-সীমান্তের গান্ধার প্রদেশে জন্মলাভ করে এমন এক বর্ণসঙ্কর আর্ট, যার উপরে ছিল বিজেতা গ্রীসেরই প্রভূত প্রভাব। কিন্তু এখানকার তাল গাছকে জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে শ্বেতদ্বীপের মাটিতে পুঁতলে যেমন সে বাঁচতে পারে না, তেমনি সেই বর্ণসঙ্কর আর্টেরও পরমায়ু হ'ল না সুদীর্ঘ। প্রত্নতত্ত্ববিদরা আজ মাটি খুঁড়ে তার কঙ্কাল তুলে গুণবিচারে নিযুক্ত আছেন বটে, কিন্তু ভারত-শিল্পী গ্রীসের কাছে আত্মবিক্রয় করেনি, ভুলে গিয়েছিল সে গান্ধার-শিল্পকে খৃষ্টপূর্ব্ব যুগেই।
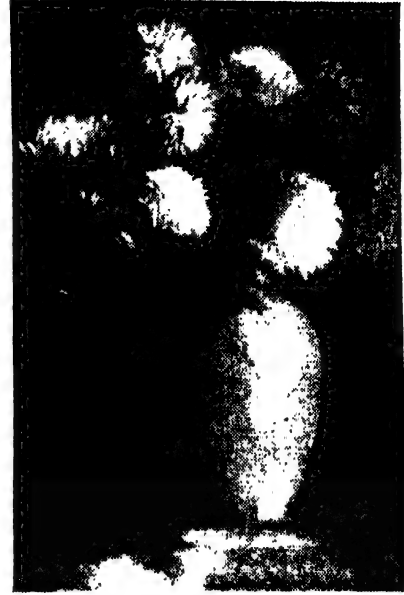
চন্দ্রমল্লিকা —মনতোষ কুমারী

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ একাধিপতি বা ডিক্টেটর ছিলেন না, তিনি যে পদ্ধতি আবিষ্কার ও অবলম্বন করেছিলেন, তাঁর শিষ্যদেরও সেই পদ্ধতি আঁকড়ে থাকবার আদেশ দেননি। তিনি জানতেন নদনদীর মত শিল্পও হচ্ছে চলমান। অতীতের ঐতিহ্যকে স্মরণে রেখে যুগধর্ম্ম অনুসারে এগিয়ে চলে আর্ট, এগিয়ে চলে। যোগ্য গুরুর মত শিষ্যদের সঙ্গে তিনি রসের দেবতার পরিচয় সাধন ক'রে দিতেন। তার পর তাঁর উপদেশবাণী শ্রবণ ক'রে তাঁরা যথেচ্ছক্রমে স্বাধীন ভাবে নানা দিকে নানা পথে যাত্রা করতে পারতেন—অবনীন্দ্রনাথের নির্দ্দিষ্ট

গাঁ —সেবিকা নাগ

গাঁ —শঙ্কর বসু

বিশেষ পদ্ধতি অনুসারেই যে কাজ করতে হবে এমন কোন কথা ছিল না। তবে যিনিই যে পথে যান, সে পথ যেন হয় ভারতেরই পথ—সে পথ যেন না হয় লণ্ডনের বা প্যারিসের রাজপথ। স্বদেশেরই পথে পথে ভ্রমণ করলে যথার্থ চক্ষুমান্ শিল্পীরা খুঁজে পেতে পারেন কত সোনাদানা, কত হীরামাণিক। অবনীন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্য শ্রীনন্দলাল বসু নব নব পদ্ধতিতে করেছেন কত না সফল পরীক্ষা! তাঁর আর এক শিষ্য শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীও এদেশে থেকেই নিজের বিশেষ পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন। এবং বিজাতীয় আর্টের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিনিক্ষেপ না ক'রে ও অবনীন্দ্রনাথের অনুসরণ না ক'রেও সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায়, তার সমুজ্জল দৃষ্টান্ত দিয়েছেন শ্রীযামিনী রায়। এমন কি তিনি ম্যাডোনা ও খৃষ্ট প্রভৃতিকে নিয়েও ছবি আঁকতে পেরেছেন আমাদেরই দেশীয় পদ্ধতিতে! কিন্তু এ দেশের অতি-আধুনিক বালখিল্য শিল্পীরা চোখ থাকতেও কাণা, এত দৃষ্টান্ত সামনে পেয়েও এবং য়ুরোপে না গিয়েও তাঁরা কল্পনায় য়ুরোপীয় শিল্পের অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে মরছেন দিশেহারার মত।

এবারের ছবির মেলায় অবনীন্দ্রনাথ, শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনন্দলাল বসু ও শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত চিত্রাবলীও স্থানলাভ করেছে। কিন্তু তাঁদের ছবির কথা নিয়ে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। তা ছাড়াও প্রদর্শিত হয়েছে শত শত ছবি। তাদের কথা নিয়েও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করবার জায়গা আমার হাতে নেই এবং আলোচনা ক'রেও বিশেষ লাভ আছে ব'লে মনে হয় না। কারণ বেশীর ভাগ ছবিই হয়েছে চলনসই এবং শিল্পীরা চলতে চেয়েছেন চলা পথেই। কোথাও কোথাও কাঁচা হাত বা মনের পরিচয়ও আছে। একজন শিল্পী still life-এর ছবি এঁকেছেন—বোধ করি বহু বিখ্যাত চিত্রকরের দেখাদেখি। কিন্তু পাকা পটুয়ারা এ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ নিজের বিষয়বস্তুর উপকরণগুলি যে অযত্নবিন্যস্ত ক'রেই দেখাতে চান, সেটুকু তিনি লক্ষ্য করেননি। ফলে মনে হয়, তাঁর উপকরণগুলিকে ছবি আঁকবার জন্যে সাবধানে যথাস্থানে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছে। এ হচ্ছে স্বাভাবিকতার মধ্যে অস্বাভাবিকতা।

আরো দু'টি ব্যাপার লক্ষ্য করলুম। এ দেশে মহিলা শিল্পীরা ক্রমেই দলে ভারি হয়ে উঠছেন। এটা আনন্দের কথা। আগেকার দিনে কলকাতার চিত্র-প্রদর্শনীতে আসর প্রায় দখল ক'রে থাকত জলীয় রঙে আঁকা পটগুলিই। কিন্তু আজকাল তৈলবর্ণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে চান, এমন শিল্পীর সংখ্যা অল্প নয়।

শ্রীগোপাল ঘোষ এখন আর উদীয়মান শিল্পী নন, সম্যকরূপে সমুদিত। সম্পূর্ণ নূতন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিশ্চিত তাঁর তুলির টান। বর্ণের আল্পিম্পনে তিনি যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দেন, আবার দরকার হ'লে বর্ণের বিচিত্র সমারোহে আমাদের দৃষ্টিকে ক'রে তোলেন উৎসবময়। তাঁর আঁকা আটখানি ছবি দেখলুম, প্রত্যেকখানি পরিচয় দেয় তাঁর নিজস্ব ভঙ্গির। সব চেয়ে ভালো লাগল চলোর্ম্মিচঞ্চলা বেগবতী নদীর বুকে ভাসমান তরণীর ছবিখানি (২৩৬ নং)। কয়েকটি পরিমিত রেখাপাত ক'রে ফুটিয়ে তোলা একটি দ্রুত গতিভঙ্গির সুন্দর কবিতা।

নিজের পথ খুঁজে পেয়েছেন এমন আর একজন পাকা শিল্পী হচ্ছেন শ্রীরথীন মৈত্র। আজ কয়েক বৎসর ধ'রে তাঁর ক্রমোন্নতি লক্ষ্য ক'রে আসছি। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে প্রদর্শিত তাঁর আঁকা "প্রাতরাশ" নামে ছবিখানি আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। যে কোন আর্টে যাঁরা দুর্বোধ হ'তে চান, আমি তাঁর প্রশস্তিরচনা করতে রাজি নই। দুর্বোধ হওয়া কত সহজ, কিন্তু সরল হওয়া কত কঠিন! শ্রীরথীন মৈত্রের কাজে পাই এই মিষ্ট সরলতাটুকু। এবারে তিনি দেখিয়েছেন চারখানি ছবি। খুব ভালো লাগল "বৈকালী ঘুম" শীর্ষক পটখানি।

ভালো ভালো ছবি দেখলুম তো আরো কয়েকখানি, কিন্তু ভালো ক'রে বলবার স্থানাভাব। মাদ্রাজী পটুয়া শ্রী J. Gnanayutham (বাংলায় তাঁর নামের কি উচ্চারণ হ'তে পারে জানি না) এঁকেছেন "খেয়াঘাটে"র একখানি চমৎকার ছবি। শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব-বর্ম্মণেরও কয়েকখানি পট দৃষ্টি আকর্ষণ করে—

গণেশের শিক্ষা —শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

তালপাতার পুঁথি

শ্রীকালিদাস রায়

তালপাতা চিরে চিরে তাই গাঁথি রচেছিলে পুঁথি,
যাহা শুধু ছিল স্মৃতি, শুধু ছিল শ্রুতি।
তাহাই শলাকা দিয়ে সে পুঁথিতে রেখেছিলে ক্ষুদি'
হে সাধক, হে তাপস সুধী।

অমৃতস্য পুত্রগণে তব চিন্তা তব অনুভূতি,
রসভরা প্রাণের আকুতি
জানাইতে কতই না ছিল আকিঞ্চন!
রাখিতে চাহিয়াছিলে অমর করিয়া জ্ঞানধন।
কত কথা হ'ল নাক' বলা
চিরায়ু-বাহন-হারা কত বাণী হইল বিফলা।
সংক্ষেপে বিবৃত হ'তে তব চিন্তা হ'ল সূত্রাকারা,
ব্যাখ্যার অভাবে তার লুপ্ত হ'ল ধারা।
নশ্বরের পটে তুমি ক্ষুদে গেলে যে শাশ্বতী বাণী,
বিকৃত করিল তারে কীট দন্ত হানি'
ভুলাইয়া দিল মুছে মহাকাল বুলাইয়া পাণি।

আজি গ্রন্থারণ্যে বসি কি পড়িব ভাবিয়া না পাই,
পাঠ্যের অভাব আজ নাই।
তবু মহাসারস্বত, স্মরি তব কথা
মনে পাই ব্যথা।
বিশ্বের করিতে তুমি চেয়েছিলে নিজস্ব সাধনা,
তার তরে, নিঃস্ব তুমি, সয়েছিলে কতই বেদনা!

কুটীরের চাল চিরে হ'তো বৃষ্টিপাত,
জাগি সারা বরষার রাত,
পুঁথিখানি বুকে ধরি সারা গৃহময়,
খুঁজিয়াছ নির্জ্জল আশ্রয়।
কুটীরে জ্বলিলে বহ্নি শুধু তব পুঁথিখানি বুকে,
বাহিরে ছুটিয়া আসি' হেসেছিলে নিশ্চিন্ত কৌতুকে।
মরণ-শয্যায় তুমি আর সব ভুলি'
কম্প্র হস্তে পুঁথিখানি পৌত্র হস্তে দিয়াছিলে তুলি'।

কত তত্ত্ব, কত তথ্য অধিগম্য আজিকে আমার,
তবু মনে হয় তুমি সর্ব্বতত্ত্বসার
জানাইতে চেয়েছিলে তালের পাতায়,
হয়ত চরম তত্ত্ব ছিল লেখা তায়,
যা জানিলে থাকে নাক' জানিবার আর কিছু বাকি।
উন্মীলিত ক'রে দিত হয়ত বা আমার এ আঁখি
অজ্ঞান-তিমির-জালে ঢাকা
জ্ঞানাঞ্জনশলাকার রূপ ধরি তোমার শলাকা।

যত ভাববিলাসীর অসার ফেনিল কথামালা
ভরিয়াছে আজি গ্রন্থশালা।
মহাজ্ঞান তাপসের সুধাময়ী সনাতনী ভাষা,
মিটাল কীটের ক্ষুধা আর মহাকালের পিপাসা।
জ্ঞানের প্রবাহে হেরি' শত পথ আজি বিশ্ব ভরি'
অশ্রু প্রবাহ বয় মম নেত্রে তব কথা স্মরি'।

বিশেষ ভাবে "হলদে ফুল"। শ্রীরাধাচরণ বাগচীর চারখানি ছবির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজ উপভোগ্য, কিন্তু চারুদর্শন মূর্ত্তি দেখাবার জন্যে বেশী চেষ্টা না ক'রে তিনি যদি ভাবাভিব্যক্তির দিকে অধিকতর অবহিত হন, তা হ'লে অধিকতর আনন্দলাভ করব। শ্রীইন্দ্র দুগারের আরণ্য ও গ্রাম্য চিত্রগুলি ভালো লাগল। শ্রীসতীশ সিংহ তাঁর একখানি ছবির ব্যর্থতাব্যঞ্জক নাম দিয়েছেন—"স্বাধীন ভারতের নাগরিক"। স্বাধীন ভারতের জন্যে আমরা গৌরব অনুভব করি, কিন্তু "পরো দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে"ই। লক্ষ লক্ষ নিরাশ্রয় দরিদ্র এখানে কুকুর-বিড়ালের জীবনযাপন করছে পথে পথে। কেবল কল্পনাবিলাস নয়, রং আর রেখার কাব্যরচনা নয়, আধুনিক শিল্পীদের উচিত স্বপ্নলোক থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তব জগতে পদার্পণ করা এবং এই শ্রেণীর ট্র্যাজেডিকে ফুটিয়ে তোলা। সতীশচন্দ্র কেবল একখানি উৎকৃষ্ট ছবি আঁকেননি, সেই সঙ্গে চিন্তাশীলতারও পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে এই রকম আরো ছবির প্রত্যাশা করি।

শ্রীজি, ডি. পাউলরাজের কয়েকখানি ছবি মনকে খুশী করে। শ্রীকে. সি. এস পানিকরের "করাতী", "খেয়া নৌকা" দ্রষ্টব্য চিত্র। শ্রীকিশোরী রায় এঁকেছেন ওস্তাদ-শিল্পী শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের একখানি প্রতিকৃতি। তার মধ্যে তথাকথিত অতি-আধুনিকতার উপদ্রব নেই, রামের ছবিকে শ্যামের ব'লে ভ্রম হয় না। তাঁর "রহস্যময় পথের পথিক" ছবিখানিও উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামকিঙ্করের "কৃষ্ণের জন্ম", স্বর্গীয় হীরাচাঁদ দুগারের "উদয়পুর", শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "নৃত্য", শ্রীএ. এস. সেনের "ধান কোটা", শ্রীসোলগায়োঙ্কারের "পথের দৃশ্য" ও শ্রীগোপেন রায়ের "শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন সংবাদ" এবং আরো কয়েকখানি দেখবার মত ছবি আছে, স্থানাভাবে সেগুলির নামোল্লেখ করা সম্ভবপর হ'ল না। শ্রীরথীন্দ্র-নাথ ঠাকুর পাঠিয়েছেন কয়েকখানি ফুলের ছবি। বেশ হয়েছে। তাঁর এ বিদ্যার কথা জানা ছিল না।

লিথোগ্রাফ, এচিং ও উড-কাট প্রভৃতি গ্রাফিক আর্টের বিভাগটিও সমৃদ্ধ হয়েছে। শ্রীহরেন দাস এবং আরো কয়েক জনের কাজ প্রশংসনীয়।

ভাস্কর্য্য বিভাগে পাথরের কোন মূর্ত্তি নেই। শ্রীএস. এম. সেনের দু'টি এবং মিসেস্ শীলা ভেটের একটি কাঠের মূর্ত্তিকে সুখ্যাতি করতে পারি। শ্রীমতী ইন্দুমতী লাগহেটের প্লাষ্টারে গড়া নিগ্রোর মাথা এবং শ্রীসতীশ চক্রবর্ত্তীর সিমেণ্টে তৈরি আন্দামানের আদি-বাসীর মূর্ত্তিও উল্লেখনীয়।

মানুষের কবিতা

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

যারা পথ কাটে, গাড়ি টানে, তাড়ি খায়, গায় সারিগান,
তাহাদের সবার সমান—

অরণ্যেরে করে যারা জয়—
সহর বসায় তার বুকে ;
রেল্ পাতে, খনি খোঁড়ে, ঠ্যালে বয়লার,—
বাস করে কারখানা ঘিরে
ছাই-ধূমে পোড়া কয়লার,—
অবশেষে মানি' পরাজয়
নগরের বঞ্চনা-কৌতুকে,
দীনহীন নিঃস্ব নিরাশ্রয়
বেঁচে থাকে মরণের মুখে—
ব্যর্থ যাহাদের দিগ্বিজয়-অভিযান,
তাহাদের সবার সমান—

পথ ভাঙে যারা বোঝা বয়ে সোজা হয়ে জনতার ভিড়ে,
ঘর্মার্ত্ত শরীরে ;
চাষ করি' শ্রাবণে-শিশিরে
লাঙলের ফালে যারা ভরি' তোলে এই ধরণীর
সোনার সঞ্চয়,
মৃত্যুরে ঠেকায়ে রাখে—বীর যারা এই পৃথিবীর।
আপনারে নিত্য করি' ক্ষয়
মানুষের নিত্য-পরিত্রাতা,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা
যারা
জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দানে,
তবু সর্বহারা
বসি' নিত্য-দুর্ভিক্ষের তীরে ;
আলোকের উৎস হয়ে রহিলো তিমিরে,
বঞ্চিত মহান্ ;
তাহাদের সবার সমান—

যারা যেতে যেতে থেমে গেল, নেমে গেল নিচে,
রয়ে গেল পিছে ;
যাহাদেরে কেহ নাহি জানে,
নাহি মানে,
কবি নাহি রচে কভু কবিতা বা গানে ;
নাহি চেনে কেহ ;
নাহি আশা, নাহি ভাষা, ভালোবাসা, স্নেহ ;
পশুত্বেও নাহিক বিকার,—
আছে-কিম্বা-নাই-যারা নাহিক প্রমাণ,
তাহাদের সবার সমান—

চাহি জীবনের অধিকার
তাহাদেরি জগতের কোণে
একান্তে গোপনে।

চলিবো তাদেরি মতো ভিড় ঠেলি উড়াইয়া ধূলি—
কেহ না চাহিবে আঁখি তুলি
কেহ নাহি ঠারিবে অঙ্গুলি—
দীর্ঘ মরু চরণ-বিক্ষত।
তাহাদেরি মত—
তৃষ্ণাতুর তপ্ত দীর্ঘ দিন
বাঁচিবার ব্যর্থ প্রাণপণে
তুচ্ছতায় করিব বিলীন—
ধ্রুবতারা জাগে যে-লগনে
গোধূলি-গগনে,
শ্রান্ত ক্লান্ত দেহভার বহি অশরণ অচেতন মনে,
সহিয়া অবহেলা আঘাত অপমান—
তাহাদের সবার সমান।

প্রভাত যাদের কাছে নাহি আনে আলোর অঞ্জলি,
ফুলগন্ধ, পাখির কাকলি—
নিয়ে আসে কলে কলে বিকল চীৎকার-
বিক্ষুব্ধ আহ্বান,
প্রতিহিংস্র লৌহ-পুঞ্জে বাষ্প-ধূম-অগ্নি ওঠে জ্বলি'—
নিরালোক রুদ্ধ দিনমান ;
নিয়ে আসে যাহাদের ঘরে ঘরে নতুন অভাব,
বাঁচিবার তিক্ত আয়োজন ;
ঢুকিতে যাদের ঘরে সকালের আলো অন্ধ হোলো,
বাতাসের দম বন্ধ হোলো,
আকাশের হারালো স্বভাব—
তাহাদের সবার মতন,
এ প্রভাতে এ আলোকে আমারো না রোক্ প্রয়োজন।

যাহাদের সন্ধ্যার গগন
দেখিবার নাহি শুভক্ষণ—
দিনান্তের ঘর্ম ঝরে প্রাণান্ত-কঠোর পরিশ্রমে,
আকাশ কী লিপি আনে প্রতি-সাঁঝে নাহি জানে ভ্রমে ;
দখিনের বায়ু হায় যাহাদের না পায় সন্ধান ;
চির-ভাগ্যহত
তাহাদেরি মতো
রবো চির-অভাগ্যের ভাগী ;
প্রভাত ও সন্ধ্যা নিতি রঙে রঙে আপনা সাজায়
কার প্রীতি মাগি

নিত্য-নব আয়োজনে—
কেন বা কাহার লাগি
চাঁদ আসে যায়
নাহি বুঝি মনে,
কখন কে কোন্ পাখি গায় কি না গায়,
ফুল ফোটে কি না ফোটে বনে-উপবনে,
পূর্ণিমার রাত আসে কাহাদের খোঁজে,
বসন্ত বিবাগী—কেন ফিরিতেছে ও যে
দ্বারে দ্বারে কর হানি কার আবাহনে—
তাহাদেরি মত
ইহাদের প্রতি রবো বিমুখ বিরত।
না থাক্ এদের স্থান আমার জীবনে।
ভালোবাসা কেন এ হৃদয়ে ?
সুন্দরের হাতছানি কেন হয় আমার ভুবনে !
কে চায় বরণমালা ? প্রণয়ের পালা ?
বঁধুর মধুর-বাণী যেন বিষঢালা—
ভালোবাসা চিত্তে আনে জ্বালা—
ফুল যতো ওঠে শূল হয়ে।

আমার স্বাচ্ছন্দ্য মোরে হানিছে বিকার,
এই-আলো এ-বাতাস
যেন পরিহাস ;
স্নেহ-প্রেম দেহমন দহে।
আমার সম্মান মোরে করে অপমান ;
তাহাদের সবার সমান
করিবারে চাহি সর্ব-বন্ধন-স্বীকার—
হবো দীন, রবো ক্রীতদাস,
চিরবন্দী দুঃখ-কারাগারে ;
মাগি আপনার সর্বনাশ।
ঘুমাতেও নাহি সুখ, চুমাতেও নাহি অধিকার,
অমৃত আমার তরে নহে।
কে সহিবে আত্মার ধিক্কার ?
বড়ো মার আনন্দের মারে।

যেই-সুখ যেই-শান্তি যে-আনন্দ সকলের নয়
মর্মে মর্মে করে তা জর্জর—
জনেকের অভ্যুদয়ে সর্ব মানবের পরাজয় !
তার জয়ধ্বনি
তার সব চেয়ে পরাভব গণি।
সুখ নাই পূর্ণতায়, তিক্ত প্রেয়সীর ওষ্ঠাধর,
সভ্যতায় সুখ নাই শতকোটি নর যার পর—
এ-ভুবন এতো সুখহীন—মনোদুঃখও হেথায় বিলাস।

সুখ যদি থাকে তবে সুখ আছে একমুষ্টি গ্রাসে
সকলের সাথে ভাগ করি' পথধূলিমলিন আবাসে ;
সুখ আছে হইয়া বর্বর—
সুখদুঃখবোধহীন কয়েকটি সংক্ষিপ্ত নিশ্বাস
সকলের সাথে ভোগ করি' সম-শ্রমে সম-বেদনায় ;
সুখ আছে অতি অল্পে, অতি রিক্ততায় ;—
যে-মুহূর্তে মরণ ঘনায়—
সবাই মরিব শেষে, সুখ আনে শুধু এ বিশ্বাস।

মৃত্যু যাহাদের দিলো এক ভাগ্য, এক অবসান,—
নাহি শোক, নাহি সভা, নাহি স্তবগান,
নাহি ঘন করতালি খর বক্তৃতার,—
খবরকাগজে নাহি ঠাঁই,—
যার লাগি নাহি ক্ষোভ, না জাগে অভাব,
নাহি কারো ক্ষতি, কারো লাভ,
নাহি শ্রুতি, নাহি স্মৃতি, নাহি ইতিহাস,
কারো মনে কোনো প্রীতি নাই,
কারো চোখে নাহি অশ্রুধার—
রহিলো-কি-রহিলো-না নাহিক প্রমাণ—
তাহাদের সবার সমান
চাহি মরণের অধিকার
তাহাদেরি ভুবনের কোণে—
একান্তে—গোপনে।

চতুর্দশপদী

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

মন যেথা শূন্য, বায়ু হাহাকারে একটি গুঞ্জন
গুঞ্জরিত যে জীবনে—ব্যর্থতায় সকল প্রয়াস ;
প্রেম সেথা শুধু স্বপ্ন, মরীচিকা, তোমাকে স্মরণ
আনে শুধু আত্মঘাতী নিরালম্ব নির্জন বিবাস।

তোমাকে ডেকেছি তবু বার বার জীবনে আমার ;
ক্লান্তিহীন তপস্যায় দৃষ্টি তব ক্ষণিক প্রসাদে
চেয়েছি. পেয়েছি কিবা, পেয়েছি চেয়েছি আর বার,
চির-প্রতীক্ষায় প্রেম তাই বুঝি কেটেছে প্রমাদে।

অসম্ভব প্রিয়তম, অসম্ভব মোদের মিলন
অসম্ভব আরো বুঝি স্বাধিকার-প্রমত্ত প্রণয়—
এ কথা ভেবেছি কত তবু আমি করেছি স্মরণ,
প্রস্তুত হয়েছি কিবা সাধিতে কি ক্ষণিক প্রলয়।

এখনি এখানে এই কালাতীত তীব্র মুহূর্তেই
নিশ্চল আমার কর্ম, নিরাসক্তি আনে সহজেই।

তোমায় চাই

বিমলচন্দ্র ঘোষ

বাতাস নেই নিঝুম রাত নীরব নীল আর্তনাদ
স্তব্ধ চাঁদ দিগন্তর মন রাঙা।
গুমোট মেঘ পথ বিজন
ক্ষুব্ধ মন অগ্নিশোণ
বিদ্যুতের চকমকি দিগ্বলয় চমকানো।
বটগাছের শুকনো ডাল কাল পেঁচার ক্রেঙ্কারে
নির্জন পথ রুক্ষ স্বর হঠাৎ বুক চমকানো॥

তোমায় চাই তোমায় চাই ঘুম পাহাড় লঙ্ঘনে
তোমায় চাই রক্তমেঘ থমথমে!
নীল জমাট অন্ধকার
ভাঙবো আজ দুর্গদ্বার
তোমার প্রেম আসুক ঝড় বিপুল ঝড় গর্জনে
তোমায় চাই আকাশ তাই অগ্নিমুখ দূর বিথার
তন্দ্রাহীন শতাব্দীর সংখ্যাহীন বন্দনার॥

আবার পথ দূর বিথার গুমোট মেঘ স্তব্ধ চাঁদ
আঁচল কার ঝাউ বনের ঝিলমিলি
আবছা কার হাতছানি
নিথর মন সন্ধানী
শূন্য মাঠ ঝিঁঝির ডাক যায় শোনা:
অনির্বাণ জ্বলছে গান জ্বলছে সুর শতাব্দীর
তোমায় চাই তোমার প্রেম তোমার সুর ঘুম ভাঙা॥

কান্না কার রুদ্ধদ্বার তমিস্রার বুক চেরা
মন শ্মশান কম্পমান চুল্লীতে
দিন-রাতের নীল চিতার
স্বপ্নহীন দূর বিথার
শব্দহীন রক্তঝড় তোমার প্রেম থমথমে!
চন্দ্রমার লাসকাটা জ্বলছে হাড় ঘুম-পাহাড়
তোমায় চাই তোমার প্রেম শতাব্দীর বুক জ্বলে॥

অন্তহীন পথ খোঁজার ক্লান্তিহীন অঙ্গীকার
হে বিপ্লব, তোমার স্তব কী গম্ভীর!

মিলায় রাত আর্তনাদ
তোমার প্রেম শঙ্খনাদ
ছুটছে রথ কী ঘর্ঘর চাকায় বাজ মূর্ছিত।
তোমার প্রেম তোমার সুখ বিদ্যুতের বন্যাতে
আমার মন উধাও আজ কী উদ্দাম ঝঞ্ঝাতে॥

আওয়াজ কার বুক কাঁপায় নীল মাটির নামলো ধ্বস্
সংখ্যাহীন হোমশিখার লকলকে
রক্তজিভ মৃত্তিকার
চাটছে নীল অন্ধকার
চাটছে হাড় তমিস্রার বিদ্যুতের চকমকি,
চন্দ্রমার ঘুম পাহাড় হিমশীতল যন্ত্রণার
শূন্যে লীন অগ্নিময় রক্তজিভ মৃত্তিকার॥

তোমায় চাই তোমায় চাই আকাশ তাই ঘুমহারা
তোমায় চাই ভোরবেলার শুকতারা!
ভাঙলো আজ দুর্গদ্বার
শূন্যে লীন অন্ধকার
উতল আজ সাত সাগর সপ্ত রঙ, সপ্ত সুর।
চন্দ্রমার মুক্তিস্নান নীল আকাশ নির্নিমেষ—
তোমায় চাই সফল তাই শতাব্দীর বন্দনা॥

আমার মন তোমার পথ তোমার মন আমার পথ
বিশ্বদীপ হে বিপ্লব ঘুমভাঙা!
আমার সুর তোমার গান
তোমার সুর কম্পমান
সংখ্যাহীন বহ্নিমান চিতার বুক চমকানো।
তমিস্রার জ্বালায় বুক জীবন পথ রক্তমুখ
তোমার প্রেম তোমার সুখ ঘুমভাঙার অগ্নিঝড়॥

আকাশময় ঝড়ের গান কী উদ্দাম উল্লাসে
চন্দ্রমার ঘুম পাহাড় উন্মনা।
আমার পথ তোমার মন
সংখ্যাহীন মুক্তিপণ
উধাও আজ তোমার রথ তমিস্রার বুক ভাঙা।
আমার বুক ভরায় আজ তোমার প্রেম তোমার সুখ
রাঙলো তাই সংখ্যাহীন রক্তমুখ চুম্বনে॥

১লা মে, ১৯৫১

॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবায় নমঃ ॥

পাঠক-পাঠিকা গ্রাহক-গ্রাহিকা অনুগ্রাহক-গ্রাহিকাদের অবগতির জন্যে

সবিনয় নিবেদন,

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কৃপায় আপনাদের অতি প্রিয় মাসিক বসুমতী বাঙলা ১৩৫৯ সালে ৩১তম বর্ষে পদার্পণ ক'রল। আপনাদের আন্তরিক পোষকতা, প্রীতি ও অনুগ্রহ মাসিক বসুমতীর অগ্রগতির পথে সবিশেষ সাহায্য করেছে—যেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। কথাটি হয়তো এখন আর কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, মাসিক বসুমতী আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাসিক পত্র, অর্থাৎ সাময়িক কাগজের বাজারে যার অন্য কোন জুড়ী নেই। অনুমান করি, কথাটি হয়তো বিস্তারিত ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হবে না, কেন না সকলেই দেখছেন, মাসিক বসুমতীতে যে ধরণের অদৃষ্টপূর্ব্ব, কৌতূহলোদ্দীপক, আকর্ষণীয়, তথ্যবহুল লেখা এবং রেখা থাকে তেমন কি অন্য কোন দেশীয় ও ভারতীয় মাসিক পত্রে খুঁজে পাওয়া যায়? বাঙলা সাহিত্যের খ্যাতিমান সমালোচক শ্রীঅতুল গুপ্ত মশায়ও কথাটি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং আত্মশ্লাঘার অধিক প্রয়োজন নেই।

আপনি গ্রাহক, লেখক, শিল্পী কিংবা সমালোচক যেই হোন না কেন, আপনি মাসিক বসুমতীর শুভাকাঙ্ক্ষী। জানেন তো, মাসিক বসুমতী এখনও পর্য্যন্ত কোন রাজনৈতিক কিংবা সাহিত্যিক দলের নয়, অর্থাৎ মাসিক বসুমতী সকল দলের? সোজা কথায় আসছি এখন। আমাদের অনেক দিনের গ্রাহক-গ্রাহিকা কিংবা অনুগ্রাহক-অনুগ্রাহিকাদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, চৈত্র মাসে মাসিক বসুমতীর বর্ষ শেষ হয় এবং বৈশাখে হয় বর্ষারম্ভ। সেই সময়টি ঠিক এসে পড়লো। এক্ষণে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে, আগামী বর্ষের প্রাপ্য চাঁদাটা বৈশাখের আগেই পাঠিয়ে দেওয়া। ডাকঘরের নিয়ম হয়েছে, গ্রহীতা লিখিত পত্র না দিলে ভিঃ পিঃ ডাকে কাগজ পাঠানো চলবে না। গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লিখিত নির্দ্দেশ ব্যতীত মাসিক বসুমতীও পাঠানো যাবে না। আমাদের অনুরোধ, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনে ব্রতী হোন। আমরা শুধু বলতে পারি, সম্পাদকীয় বৈশিষ্ট্যে ১৩৫৮ সালের মাসিক বসুমতী দেখে আপনি যত খুশী হয়েছেন, পড়ে যত আনন্দ ও তৃপ্তি পেয়েছেন, ১৩৫৯ সালের মাসিক বসুমতী পড়ে তদপেক্ষা অনেক অনেক বেশী আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন। আপনাদের সুবিধার জন্য মাত্র কয়েকটি জ্ঞাতব্য নিম্নে জ্ঞাত করান হচ্ছে। নমস্কারান্তে ইতি ১৩৫৮, চৈত্র

বিনীত

কর্ম্মাধ্যক্ষ

বসুমতী সাহিত্য মন্দির

কলিকাতা—১২

॥ যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায় ॥

ভারতে (ভারতীয় মুদ্রায়) বার্ষিক সডাক	১২৲
ষাণ্মাসিক সডাক ৬৲ : প্রতি সংখ্যা (ভারতীয় মুদ্রায়) সডাক	১।৶০
পাকিস্তানে (পাক মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক রেজিঃ খরচ সহ	১৫৲
ষাণ্মাসিক " " ৭॥০ : প্রতি সংখ্যা সডাক (ভারতীয় ও পাক মুদ্রায়)	১।৶০
ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)	
বার্ষিক রেজিঃ ডাকে ৩০৲ : ষাণ্মাসিক রেজিঃ ডাকে	১৫৲
ভারতের বাহিরে প্রতি সংখ্যা সডাক (ভারতীয় মুদ্রায়)	২॥০

॥ টাকা পাঠাবার সময় গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করতে যেন ভুলবেন না ॥

তিন বোন

কেয়া দেবী

প্যাট্রিক ব্রন্‌টির নাম আসলে শুধু প্যাট্রিক। বাপের পদবী ছিল প্যাট্রিক। নেলসনকে যখন ব্রন্‌টির ডিউক করে দেওয়া হল, তখন নেলসনের ভক্ত প্যাট্রিক নামধারণ করলেন প্যাট্রিক ব্রন্‌টি। গরীবের ছেলে। এক জন পাদ্রীর সুপারিশে গ্রামে এক মাষ্টারীর পদ লাভ করেন। পরে কেমব্রিজের গ্র্যাজুয়েট হন। হঠাৎ এক দিন তিনি দেখলেন মারিয়া ব্র্যানওয়েলকে। প্রথম দর্শনেই প্রেম। সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ। আট বছর পরে মারিয়া মারা যান, ছয়টি সন্তান রেখে। স্বাস্থ্য কারোরই ভাল ছিল না। স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে বাস করে কারই বা স্বাস্থ্য ভাল থাকে? তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বোন এলিজাবেথ আসেন ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা করতে।

ছোট একটা ঘরে বাচ্চারা থাকে। ভাল খেতে পরতে পায় না। খেলবার জন্য খেলনা পর্য্যন্ত নেই। গ্রামে লোকের বসবাস অত্যন্ত কম। খেলার সঙ্গী বলতে তারাই নিজেরা। পড়াশোনাও চলে খুব এলোমেলো ভাবে। বাপের লেখাপড়ার সখ ছিল। নিজে কিছু লিখেও ছিলেন। তারাও বাপের ধাত পেয়েছিল। আপন মনেই পড়াশোনা করত আর হাতের কাছে কাগজ-কলম পেলেই কিছু-না-কিছু লিখত। বড় মেয়ে মারিয়া জন্মেছিল ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে, এলিজাবেথ ১৮১৫, শার্লটি ১৮১৬, ব্র্যানওয়েল ১৮১৭, এমিলি ১৮১৮, আর ছোট মেয়ে এ্যান ১৮২০ খৃষ্টাব্দে। কেউ চল্লিশ বছরের বেশী বাঁচেনি। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে সাহিত্য-জগতে তিন বোন যা দান করে গেছে, তা আজও তাদের অমর করে রেখেছে।

ব্রন্‌টিরা ছেলেবেলায় বুঝতেও পারত না যে, তারা যে ভাবে জীবন যাপন করে অন্য ছেলে-মেয়েরা তা করে না। বুঝল বড় হয়ে যখন প্রথম চার বোন স্কুলে গেল। 'জেন আয়ার' উপন্যাসে এই স্কুলের কথা আছে। গরীব ধর্ম্মযাজকদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল। [illegible] [illegible]। [illegible] ব্যবস্থাও তথৈবচ। শীতকালে হাঁটতে হাঁটতে ছাত্রীদের যেতে হল গির্জ্জায়। গ্যালারীতে বসে ঠাণ্ডা খাবার খেত শীতে কাঁপতে কাঁপতে। শীঘ্রই তাদের শরীর ভেঙ্গে গেল। তার ওপর আবার এক মাষ্টারণী বড় বোন মারিয়াকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। তাকে অযথা বকাবকি করতেন, কষ্ট দিতেন। ছোট বোনেরা ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে চেয়ে থাকত। কিছু করার ছিল না। কিছু দিনের মধ্যেই মারিয়ার অবস্থা এমন হল যে, দজ্জাল মাষ্টারণী পর্য্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। মারিয়ার বাঁচবার আশা খুবই কম। বাপকে খবর পাঠান হল মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্য। বাড়ী আসবার কয়েক দিন পরেই মারিয়ার জীবন-প্রদীপ নিবে গেল। সেই বছরই ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য এলিজাবেথকেও বাড়ী পাঠান হল। সে-ও মারা গেল বাড়ী ফিরে। মৃত্যুকালে তাদের বয়স এগারো আর দশ বছর। আরও কিছু দিন পরে এমিলি ও শার্লটিকেও বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হল শরীর খারাপ হওয়ার অজুহাতে। কিছু দিন বাড়ীতে থাকবার পর তাদের রো হেড স্কুলে পাঠান হল। শার্লটির স্কুল বেশ ভালই লেগেছিল, কিন্তু এমিলির বাড়ীর জন্য ভয়ানক মন কেমন করতে লাগল। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে দেখে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হল। শার্লটি আর এ্যান খুব লাজুক ছিল। দেখতে ছোটখাটো। এমিলি বেশ লম্বা, মোটেই লাজুক নয়, তবে ভয়ানক গম্ভীর। বোনেদের মধ্যে এ্যানকে সব চেয়ে ভাল দেখতে ছিল। শার্লটিও মন্দ নয়। দু'জনের অনেক বার বিয়ের কথাবার্ত্তা হয়, কিন্তু তারা বিয়ে করতে রাজী হ'য় না। এ্যানের কোন প্রেমিক ছিল কি না জানা যায়নি; কারণ সে একেই গম্ভীর, তার ওপর প্রেম সম্বন্ধে তো একেবারে নীরব। তার বন্ধু বলতে ছিল তার বোনেরা আর এক কুকুর। যখন মারা যায়, শবাধারের সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা কাঁদতে কাঁদতে যায় আর সেই কবরের ধারেই বসে থাকে। জোর করে তাকে বাড়ী ফিরিয়ে আনতে হয়। প্রতিদিনই সে কবরের ধারে গিয়ে বসে থাকত। আর সেইখানেই বেচারা মারা যায়। শার্লটির এক উপন্যাসে এই কুকুরের কথা আছে; নাম দিয়েছে তাতার।

এ্যানের মৃত্যুর পর তার লেখবার টেবিলের দেরাজ থেকে এক কবিতার খাতা বার হয়। অপূর্ব্ব সে কবিতাগুলো। যেমন গম্ভীর তেমনি উদার ও উচ্চভাবাপন্ন। সাহিত্য-জগতে তার দ্যুতি আজও নিষ্প্রভ হয়নি।

বাড়ীতে এক ছেলে, বোনেদের একমাত্র ভাই। তাঁদের ইচ্ছা ভাই খুব উঁচু দরের চিত্রশিল্পী হোক। শিক্ষানবিশীর খরচ জোগাবার জন্য তাঁরা গভর্ণেসের চাকরী নেন। সে এক দুঃসহ জীবন। পড়াতে গিয়ে শার্লটি দেখেন ছেলেমেয়েগুলো ভয়ানক অসভ্য। বড়লোকের সন্তান। আদরে আদরে তাদের মাথা খেয়ে দিয়েছে। একটি ছেলে তাঁকে ঢিল ছুঁড়ে মারে। ফলে তাঁর কপাল কেটে যায়। পরদিন তাদের মা প্রশ্ন করেন,—"কপাল কাটল কি করে?" শার্লটি বলেন,—"হঠাৎ পড়ে গিয়ে।" অসভ্য ছেলে-মেয়েগুলো এই ব্যাপারের পর থেকে তাঁর অত্যন্ত ভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তাতেও মুস্কিল। বাচ্চা ছেলে। এক দিন বলে উঠল,—"মিস্‌ ব্রন্‌টিকে আমি খুব ভালবাসি!" মা তো মহা খাপ্পা। ছিঃ ছিঃ, বড়লোকের ছেলের মুখে এ কি কথা! গভর্ণেস ঝি-চাকরের সামিল। অনুকম্পা হতে পারে। তার বেশী অসম্ভব। যখন ছেলে-মেয়েরা মা কি বাপের সঙ্গে বেড়াতে বেরোত, শার্লটিকেটু এক দূরে পেছনে থাকতে হত। ঝি তো, একসঙ্গে গেলে মর্য্যাদার

হানি হবে। এর ওপর আবার বাড়ীর সমস্ত সেলাই-এর কাজ করতে হত।

এমিলিকে কাজ করতে হত ভোর ছ'টা থেকে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত। মধ্যে মাত্র আধ ঘণ্টার ছুটি। ব্যবহার তথৈব চ।

তখন শার্লটির মাথায় এক বুদ্ধি এল। মেয়েদের একটা স্কুল করলে মন্দ হয় না। তাহলে তিন বোন একসঙ্গে থাকতে পারে। পরের দোরে চাকরী করতে যেতে হয় না। কিন্তু সে জন্ম বিদেশী ভাষা জানা দরকার। মাসীর কাছ থেকে টাকা ধার করে এমিলি আর শার্লটি ব্রুসেলসে পেনসনাত হেগেরে বিদেশী ভাষা শিখতে গেলেন। কিছু দিন পরেই মাসী মারা গেলেন। এ্যান গভর্ণেসের চাকরী করছেন। বাড়ীর জন্ম মন খারাপ হওয়াতে এমিলি ফিরে এলেন। শার্লটি একাই পাঠ সমাপ্ত করে মাষ্টারণীগিরির উপযুক্তা হয়ে দেশে ফিরলেন। কিন্তু দেখেন যে, তাঁদের ছোট্ট বাড়ীতে স্কুল করা অসম্ভব। একে জায়গার অকুলান, তার ওপর ভাই ব্র্যানওয়েলকে নিয়ে মুস্কিল। শিল্পী না হয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন দুর্দ্দান্ত মাতাল। বাপ অন্ধ হয়ে পড়েছেন। ভাই কোন রকম কাজ করতে নারাজ। মদের সঙ্গে আফিমও ধরেছেন। তার মাথাও ক্রমে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। চার ধারে ধার-দেনা করে বসে আছেন। বোনেরা মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন।

আবার শার্লটির মাথায় এক বুদ্ধি এল। তাঁরা বই লিখে ছাপাবেন। তিন বোনে মিলে এক খাতায় কবিতা লিখলেন। "কুরার, এলিস ও এক্টন বেল" রচিত কবিতার বই বার হল। খরচ পড়ল প্রায় চার শ' টাকা, বিক্রী হল মাত্র ছ'খানা। কিন্তু এতেও তাঁরা দমলেন না। কবিতার বই বিক্রী হল না। বেশ, তাঁরা উপন্যাস লিখবেন। কুরার বেল কর্ত্তৃক প্রফেসার, এলিস বেল কর্ত্তৃক ওয়াদারিং হাইটস এবং এক্টন বেল কর্ত্তৃক এগনেস গ্রে, প্রকাশকদের ঘরে পাঠান হল। 'প্রফেসার' নামক উপন্যাস কোন প্রকাশকই নিতে রাজী হলেন না। তখন শার্লটি 'জেন আয়ার' নামক উপন্যাস লিখলেন। সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ও খ্যাতি তাঁকে বরণ করল। এই উপন্যাসের জন্ম প্রকাশক তাঁকে প্রায় আট হাজার টাকা দেন। তখন শার্লটির বয়স একত্রিশ বছর। পাড়াগেঁয়ে গরীব মেয়ে। অমর উপন্যাসের লেখিকা তিনি, এ কথা যেন বিশ্বাস হতে চায় না। সেই সময় অন্য দুই বোনের উপন্যাস দু'টোও প্রকাশিত হল এবং তাঁরাও যশস্বিনী হয়ে উঠলেন। ঠিক এর পরেই এ্যান "ওয়াইল্ডফেল হলের ভাড়াটে" নামক এক উপন্যাস পাঠান। অবশ্য তখনও তিন বোনই ছদ্মনামে লিখছেন, ডাক মারফৎ যোগাযোগ। তাঁদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশকরা পর্য্যন্ত জানেন না। এ্যানের প্রকাশক তাঁর উপন্যাসকে "জেন আয়ারের" রচয়িতার নামে চালাবার চেষ্টা করলেন। শার্লটি ও এ্যান লণ্ডনে গেলেন প্রকৃত ব্যাপারটা প্রকাশককে জানাতে। তখন প্রকাশক প্রথম জানতে পারলেন কুরার বেল পুরুষ নয় নারী, এবং তাঁর প্রকৃত নাম শার্লটি ব্রন্টি।

'জেন আয়ার' উপন্যাসের জনপ্রিয়তায় বাপ যেমন আনন্দিত তেমনই বিস্মিত হলেন। কিন্তু ভাই ব্র্যানওয়েল কিছুই জানলেন না। তাঁর মাথা তখন খারাপ হয়ে গেছে। ১৮৪৮ সালে তিনি মারা গেলেন দাঁড়িয়ে। বয়স হয়েছিল মাত্র ৩১ বছর। তার ছ'মাস পরে ত্রিশ বছর বয়সে মারা গেলেন এমিলি। এ্যানের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হল পনের বছরে। তখন তার বয়স মাত্র উনত্রিশ বছর। ছয় সন্তানের মধ্যে কেবল শার্লটি বেঁচে রইলেন।

এমিলির দেরাজ থেকে শার্লটি পেলেন বিখ্যাত কবিতার পাণ্ডুলিপি—"শেষ কয়েক ছত্র।" ম্যাথিউ আর্ণল্ড কবিতা পড়ে বলেন যে, বায়রণের পর এত জোরালো কবিতা আর কেউ লেখেননি।

তার পর শার্লটির "শার্লে", "ভিলেৎ" ইত্যাদি উপন্যাস প্রকাশিত হল। প্রভূত যশ ও অর্থ লাভ করলেন। থ্যাকারে, ডিকেন্স, আর্ণল্ড, মার্টিনো, মিসেস্ গাস্কেল ইত্যাদির সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। সমসাময়িক প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মধ্যে তখন তিনি এক জন।

সেই সময় আর্থার নিকল্‌স নামক এক পাদ্রী শার্লটির পাণি-প্রার্থী হন। বাপ বলেই ছিলেন—"আশা নেই।" কিন্তু আশ্চর্য্য, শার্লটি তাঁকে বিয়ে করতে রাজী হলেন এক সর্ত্তে। বাড়ী ছেড়ে বাপকে ছেড়ে তিনি যাবেন না। স্বামীও যেতে পারবেন না। ভাই-বোনের স্মৃতি-জড়িত পুরানো বাড়ী। নিকল্‌স তাতেই রাজী হ'ন। বিয়ে করে তিনি বেশ সুখী হয়েছিলেন, কিন্তু অতি অল্প দিনের জন্যই। মৃত্যু এসে অকালে তাঁকে গ্রাস করল। তখনও বুড়ো বাপ বেঁচে।

বৃদ্ধ ব্রন্টি তার পর আরও ছ'বছর বেঁচে ছিলেন। শেষ দিন পর্য্যন্ত নিজের প্রতিজ্ঞা মত নিকলস্ বৃদ্ধকে ছেড়ে যাননি। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তিনি আয়ারল্যাণ্ডে চলে যান। ব্রন্টি-পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

বাঙলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিকদের সুযোগ

হাসিরাশি দেবী

বাঙলা সাহিত্যে বহু দিন আগে থেকেই মেয়েরা নিজেদের সুখ-দুঃখ, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে—দেশজ-গান, কবিতা-ছড়া, ব্রতকথা, রূপকথা ও প্রবাদ-বচনের মধ্যে রূপায়িত ক'রে পাঠক-সমাজে বা শ্রোতৃ-মহলে পরিবেশন ক'রে এসেছেন। অবশ্য, সাহিত্য হিসাবে না হ'লেও এগুলিকে লোক-সাহিত্যের অঙ্গ ব'লে ধরা হয়। সাহিত্য হিসাবে এইগুলি গণ্য ক'রতে হ'লে লেখাপড়ার দ্বারায় রুচি ও সাধারণ জ্ঞানকে যতখানি উজ্জ্বল ও আকৃষ্টমান ক'রে তোলা সম্ভব, উনবিংশ শতাব্দী বা তারও আগের সময়ে মেয়েদের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। তার কারণ বহু এবং সেই জন্যই যে-সব মেয়েদের রচিত লোক-সাহিত্য এত দিন শিক্ষিত ও সুসভ্য সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করতে অনুমতি লাভ করেনি, আজকের মানুষ তাকেই সমাদর ক'রতে চায় তার দাম বুঝে।

বিংশ শতাব্দীর সমঝদার মানুষ যেমন চারি দিকেই তার সন্ধানী দৃষ্টি প্রেরণ ক'রেছে, তেমনি ফিরে তাকিয়েছে তাদের পল্লীবাংলার অঙ্গনে আবদ্ধ, মুখে-মুখে প্রচলিত ছড়া, গান, এবং প্রবাদ-বচনের দিকেও। লোক-সাহিত্য এগুলি, এবং এইগুলির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে সুসভ্য শহরবাসীর অন্তরের ইতিহাস। বাঙ্গালী মেয়েদের সহজ-সরল জীবন-যাত্রার কাহিনী নিয়ে রূপ দান করা হ'য়েছে

বাউল, বারোমাসী, জাগ-গান, সারিগান, দেহতত্ত্ব, মনসার গান ইত্যাদিতে।

এই সব রচনায় রচয়িতার নাম বা রচনা-কালের কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ও ধরা পড়ে না। লোক-সাহিত্যে বাংলার ইতর-ভদ্র আদি ক'রে সকল শ্রেণী ও সমাজের মেয়েদেরই রচনা স্থান পেয়েছে। মুখে মুখে এই সব ছড়া, গান বা প্রবাদ-বচনগুলির জায়গায় জায়গায় ভাষার একটু অদল-বদল হ'লেও মূল বিষয়টি দেখা যায় একই ধরণের। বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচিত হয় পারিবারিক ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে দিয়েই বেশীর ভাগ। স্থান, কাল, পাত্র এবং বিষয়-বস্তু প্রায় এক থাকার জন্য রচনাগুলি বিভিন্ন মুখে ঘুরলেও অসঙ্গত এবং অশোভন শোনায় না। এই রকম ভাবেই, এখনও আমাদের রসানুভূতির সঙ্গে সাহিত্যের প্রথম যে পরিচয় ঘটে—তার মূলে থাকেন দিদিমা-ঠাকুরমার দল। হয়তো বর্ষার সন্ধ্যায় কি বিনিদ্র শীতের শেষ রাত্রে তারাই তাঁদের ঝুলি-ঝোলা উজাড় ক'রে শোনান—ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কি রাজপুত্র-রাজকন্যার গল্প

নিরবচ্ছিন্ন মধুর রসের মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে তাঁরাও করেন রাক্ষস-রাক্ষসীর আবির্ভাব। তাতে শিশু-চিত্ত আকৃষ্ট হয় আবার নূতন উৎসাহে। সাহিত্য-সৃষ্টি করতে এমনি বৈচিত্র্যের দরকার শ্রোতা বা পাঠক-মনের যুক্তিতর্কের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে; এবং সেই কথাই বলতে চাই।

লোক-সাহিত্যের এই পর্য্যায়ে, কথা-সাহিত্যের মধ্যে থেকে আমাদের মনে প্রথম যে রসানুভূতির সন্ধান পাই, তার মূল শিকড় ছড়িয়ে থাকে সুজলা-সুফলা বাংলা দেশের অঙ্গনে ও প্রাঙ্গণে। সাধারণ নারী-প্রকৃতি সেখানকার প্রতিদিনের জীবনযাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটির ঘটনাগুলো যেন আলপনার মত কথায় কথায় এঁকে গেছেন আমাদের স্মৃতির ফলকে।

বিংশ শতাব্দীর আলোকোজ্জ্বল রাজপথে যার বিজ্ঞাপন দেবার দরকার হয় না—সেই লোক-সাহিত্য আমাদের গ্রামীণ পরিবেশের কৃষকদের কুটীর থেকে—আজও চলতে দেখি শহরের নাগরিক জীবনেও। হয়তো তার মধ্যে কিছু-কিছু বদল হ'য়েছে, কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়নি।

কিন্তু লিখিত ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টির পরিচয় মেলে তার অনেক পরে, অর্থাৎ বিগত শতাব্দীর নারী আন্দোলনের সময় থেকে। রুচি ও রসবোধ প্রায় এই সময় থেকে মেয়েদের গতানুগতিক জীবনযাত্রার মোড় অনেকটা ঘুরিয়ে নিয়ে এলো বিচারশীলতা ও প্রগতির দিকে। অবশ্য এই প্রগতিপন্থী মনের স্পর্শ সমাজের সর্বস্তরের সব মেয়েদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হ'লো না; যে কয় জন মেয়ের মনে এর সম্ভাবনা জাগলো সংখ্যায় তাঁরা অল্প হ'লেও, এই প্রগতিবাদিদের পরিচয় ফুটে উঠলো তাঁদেরই লেখনীর মুখে-মুখে।

আজকের তুলনায় ও প্রয়োজনে যদিও সে পরিচয় সামান্যই কিন্তু সেদিন তাকে সামান্য ব'লে কেউই ভাবতে পারেননি। সমাজের সর্বস্তর ও সব মেয়েদের মধ্যে যে এই বিচারশীল মনের বা ইচ্ছা জাগবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, তার কারণ ছিল। এই অভাব তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গের মত ঘিরে রেখেছিল ব্যক্তিগত জীবন-যাপন প্রণালীর সীমারেখায়। সামাজিক যে বিধি-ব্যবস্থা 'নয় বৎসরের মেয়েকে বিপত্নীক বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করতো, ভোগ-বিলাসের ছড়াছড়ির মধ্যে তরুণী বাল-বিধবাকে নিরম্বু একাদশীর উপবাস করার বিধান দিত, কিম্বা 'স্বামি-পরিত্যক্তাকে বাপ-ভাইয়ের, শ্বশুর-ভাসুরের ঘরে প্রতিবাদহীন পরিচারিকায় পরিণত' করতো, তাদের মনে এই সমাজনীতির বিরুদ্ধবাদী শক্তি জাগবে কোথা থেকে? কাজেই, তাঁরা নিজেদের দুরদৃষ্টের জন্য দোষারোপ করতেন কেবল দৈবেরই ওপর; নিজেদের যুক্তি দিয়ে, শক্তি দিয়ে নিজেদেরই শক্তিহীনতার সৃষ্টি এই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করতে রাজী হননি। তাই, লক্ষ লক্ষ নিরক্ষরা পল্লীবাসিনীর মত শহরের স্বল্প-শিক্ষিতা বা অর্দ্ধ-শিক্ষিতারাও নিজেদের চিন্তাধারাকে মুক্তি দিলেন না গতানুগতিকতার সীমানা অতিক্রম করতে। কিন্তু তাহ'লেও এদের মধ্যে থেকেও নিজের নিজের স্বাধীন ও যুক্তিবাদী মতামত কিছুও লিখিত ভাবে প্রকাশ করলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী প্রভৃতি।

তবু মানুষের সমাজ চিরদিনই প্রগতিশীল; চিরদিনই পুরাতন থেকে নূতন পথের খোঁজ করে চলেছে সে, মেনে চলেছে নূতন প্রয়োজন-বোধ। আজকের দিনও এই প্রয়োজন-বোধে নিত্য-নূতন সমস্যার সম্মুখে এনে হাজির করেছে মানুষের জীবনকে।

সাহিত্য-সৃষ্টি যখন মানুষকে নিয়েই তখন মানুষের প্রয়োজন-বোধকে অস্বীকার সে করতে পারে না। আজকের মানুষের যে দুঃখ কষ্ট আশা ও আকাঙ্ক্ষাময় জীবন বন্ধুর পথে চলতে সুরু করেছে —সে পথে মানুষের কল্পনা-ক্ষেত্রের আরও বিস্তৃতির প্রয়োজন। কারণ, এত দিন সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে অর্থনীতি বা রাজনীতির স্থান ছিল না, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে সেই অর্থ ও রাজনীতি বিভিন্ন রূপে রূপায়িত হ'য়ে সমস্ত বাঙ্গালীর সাহিত্য-জীবনটাকে ভেঙ্গে-চুরে নতুন রূপে বিশ্বের সাহিত্য-সভায় পৌঁছে দিতে উৎসুক।

এটা বাংলার সাহিত্যিক মেয়েদের পক্ষে গৌরবের কি অগৌরবের বিষয়-বস্তু হবে, তা বলতে পারি না; কিন্তু মেয়েদের যে সংরক্ষণশীল মন এত দিন ধর্ম্মনীতির কারাকক্ষে বন্দী অবস্থায় নিজের নিষ্ঠাকে, আচার ও অনুষ্ঠানকে অন্ধত্বের একাগ্রতায় আঁকড়ে ধ'রে ছিলেন, সেই আঁকড়ে-ধরা মুষ্টি যে তাঁদের আপনি খুলে যাবে, এ কথা নিশ্চয়। অন্তঃসারহীন যে ধর্ম্মানুষ্ঠানকে চিরদিন বাঁচানো যায় না, এখনকার বিচারশক্তিতে ঠেকে তারই খণ্ড খণ্ড হবার সময় এসেছে। এই ভাবে সে যাবেই এবং তখনই চারি দিকে ছড়িয়ে পড়বে কুণ্ঠাহীন স্বাধীন মতবাদ।

কিন্তু, তাই ব'লে লোক-সাহিত্যে, মেয়েদের কল্পনার যে বিকাশ দেখা গেছে এত দিন, এবং এত দিন যা কেবল আমাদের আনন্দই দিয়ে এসেছে সে আনন্দকে অস্বীকার করা চলে না। যুগের প্রয়োজনে হয় নূতন নূতন ভাবধারার সৃষ্টি। এই ভাবধারাই যখন কল্পনা-কুশলী শিল্পীর শিল্পে আত্মচেতনায়, যুগানুগত চিন্তা ও নিবিড় রসানুভূতিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠবে, তখনই তাঁর রচনা হবে সার্থক ও মানুষের সমাজে প্রয়োজনীয়।

রূপ চর্চ্চার
আধুনিক প্রণালী
সকল দেশে ও সকল সময়ে রমণীরা নানা উপায়ে নিজেদের দেহশ্রী ও লাবণ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যচর্চ্চার বিভিন্ন অভিনব প্রণালীর সৃষ্টি হয়েছে। ক্যালকেমিকোর প্রসাধন সামগ্রী আজ রূপচর্চ্চার অন্যতম আধুনিক প্রণালী বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত।
মলয় চন্দন সাবান
রেণুকা পাউডার
লাবণি স্নো ও ক্রীম
তুহিনা সৌন্দর্য্য ক্ষীর
ক্যাষ্টরল সুবাসিত ক্যাষ্টর তৈল
CASTOROL
La-bonny
কিনিবার সময় আসল জিনিষ দেখিয়া লইবেন
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

চাকুরী ক্ষেত্রে মেয়েদের সুযোগ

কল্যাণী বসু

মেয়েদের চাকুরী করার দু'টো দিক আছে। কেউ বা চাকুরী করে নিজের সখের ওপর। তারা নিজেদের গৃহের কাজ বড় একটা পছন্দ করে না। প্রয়োজন মত গৃহের কাজ শেষ করে বাইরে বেরিয়ে যায় চাকুরী করতে। কিন্তু তারা যে কত বড় ভুল করে সে জ্ঞান বোধ হয় তাদের নেই। বাড়ীতেও যে তাদের কত প্রয়োজন সে চিন্তা তারা করে না। বাড়ীতে থেকে বিনা মাইনের চাকুরীতে তাদের মন বসে না। বাইরের কাজটাই ভাল ব'লে মেনে নেয়। এতে যে তাদের নিজেদেরই কত অনিষ্ট হয় সে তারা বোঝে না।

আবার অনেক মেয়ে আছে যারা স্বামীর বা পিতার সংসারের দারিদ্র্য ঘোচাবার জন্তে আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়ে চাকুরী করতে বাধ্য হয়। সখ করে যারা চাকুরী করে তাদের অপেক্ষা এদের সংখ্যা অনেক বেশী। আমাদের ঘরের অধিকাংশ পিতা বা স্বামী চান না যে, তাঁদের কন্যা বা স্ত্রী সংসারের দারিদ্র্য ঘোচাবার জন্তে চাকুরী করে অর্থোপার্জ্জন করুক। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের অন্য কোন উপায় না দেখে ভদ্রঘরের মেয়েরা চাকুরী করে বৃদ্ধ পিতা-মাতা, নাবালক ভাই-বোন, অক্ষম স্বামী ও অসহায় ছেলে-মেয়ের ভরণ-পোষণ যোগায়।

আগেকার দিনে চাকুরী তো দূরের কথা, মেয়েদের লেখাপড়া শেখাই যেন চরম অপরাধ ব'লে মনে হ'ত। তার কিছু কাল পরে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসার লাভ করল বটে, কিন্তু মেয়েদের চাকুরী করাটা ছিল খুবই নিন্দনীয়। সেই কারণে পিতার বা স্বামীর সংসারের দারিদ্র্য ঘোচাবার কোন উপায়ই মেয়েদের ছিল না। কেবল মাত্র পুরুষের উপার্জ্জনের ওপরেই তারা নির্ভর করত। মেয়েমানুষ ঘরে আবদ্ধ থাকবে এই ছিল রীতি। তখনকার দিনে মেয়েরাও নিজেদের আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্তে সর্ব্বদা চেষ্টা করত। কাজেই তখন চাকুরী ক্ষেত্রে মেয়েদের এত সুযোগ দেওয়া হ'ত না।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগের মেয়েরা ঠিক বিপরীত। শিক্ষায়-দীক্ষায় তারা পুরুষের সমকক্ষ হ'য়ে সমান তালে পা ফেলে চ'লতে চায়। এই কারণে বর্ত্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে ও চাকুরি-ক্ষেত্রে মেয়েদের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়। আজ-কাল মেয়েদের অর্থোপার্জ্জনের জন্য নানান্ পথ খোলা হ'য়েছে। চাকুরী বলতে শুধু বড় বড় অফিসের চাকুরীই বোঝায় না। ডাক্তারী, মাষ্টারী, নার্সিং, অভিনেত্রী, সৈন্তবাহিনী, এবং সম্প্রতি (রাস্তায় ভীড় বাড়াবার জন্তে) পুলিশ বাহিনীতেও মেয়েদের নিয়োগ করা হচ্ছে। অসহায় মেয়েদের জন্তে দেশে দেশে গ'ড়ে উঠেছে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। এই সমিতির মেয়েরা সরকারের সাহায্য নিয়ে সেলাই, বোনা, হাতের কাজ, খেলনা তৈরী, ধূপ, পাঁপড়, বড়ি, আচার ইত্যাদি তৈরী করে বেশ উপার্জ্জন করছে।

এখন এসেছে নারী-জাগরণের দিন। সত্যিকার মানুষ হ'য়ে বাঁচতে হ'লে যাদের বিশেষ প্রয়োজন সেই ডাক্তার ও মাষ্টার আজ-কাল মেয়েরা হচ্ছে। মেয়েরা চিকিৎসা করছে, মেয়েরা শিক্ষা দিচ্ছে, মেয়েরা সেবা করছে, মেয়েরা বড় বড় অফিসে চাকুরী করে সংসারের দারিদ্র্য ঘোচাচ্ছে এটা খুবই প্রশংসনীয়।

কিন্তু আমার মনে হয়, মেয়েরাও পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চল্‌বার চেষ্টা করছে ব'লেই আমাদের দেশের নারী জাতি আজ অধঃপাতে যেতে ব'সেছে। যদি সত্যিকার চাকুরী করার উদ্দেশ্যই কোন মেয়ের থাকে তাহ'লে যার আর্থিক ও শারীরিক বল আছে সে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে ডাক্তারী ও মাষ্টারীর মধ্যে দিয়ে নারীর যা পরমধর্ম্ম সেবা ও সন্তানপালন সেই ধর্ম্ম পালন করুক। নার্সিংএর কাজ শিখে সেবিকার কাজ করুক। অশিক্ষিতা ও অসহায় মেয়েদের জন্তে তো রয়েছে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। যেখানে এই সমিতির ব্যবস্থা নেই সেখানকার মেয়েরা স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্য নিয়ে এই সমিতি গড়ে তুলুক। হাইহিল পায়ে দিয়ে, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে, রুজ-লিপষ্টিক মেখে অফিসে চাকুরী করতে যাওয়ার চেয়ে এই উপায়ে অর্থোপার্জ্জনই আমার শ্রেয়ঃ ব'লে মনে হয়। তাছাড়া যেখানে পুরুষদের বেকার সমস্যা মেটানো কঠিন হয়ে উঠেছে, সেখানে যদি আবার মেয়েরা চাকুরী করতে যায়, তাহ'লে পুরুষদের বেকার সমস্যা মেটানো আরও কঠিন হ'য়ে উঠবে।

তোমরা ও আমরা

(বীরবলের তোমরা ও আমরার অনুকরণে)

অঞ্জলি বসু

তোমরা ও আমরা বিভিন্ন ; কারণ, তোমরা তোমরা এবং আমরা আমরা। তা যদি না হ'ত তাহ'লে তোমরা ও আমরা উভয়ে মিলে শুধু 'তারা' হ'ত। তোমরা ও আমরার ভেদাভেদ থাকতো না।

প্রথম কথাই হ'ল, তোমরা বিত্তবান আর আমরা বিত্তহীন। তোমাদের অন্নাভাব হয় না কোন দিন, তাই তোমাদের ঘরে ঘরে ফি-বছর হয় 'নবান্ন' ; আর তোমাদের ঘরে অন্ন পর্য্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও আমাদের অন্নাভাব চিরদিন। তাই আমরা আমরণ "নিরন্ন।" তোমাদের দেহযন্ত্র বিকল হয় অত্যধিক আহারে, আর আমাদের দেহযন্ত্র অচল হয় অনাহারে। তোমাদের সম্মান নিজ নিজ ভূঁড়ি বর্দ্ধনে, আর আমাদের নির্ব্বাণ তোমাদের পেষণে।

তোমরা সর্ব্বত্রই পূজ্য। কারণ, তোমাদের পরিচয় তোমাদের 'ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সে।' আমরা কিন্তু সর্ব্বত্রই পরিত্যাজ্য। কারণ, প্রপিতামহের কাল থেকেই আমরা 'ব্যাংক্রাপ্ট' (Bankrupt)। তাই আমরা মরলে লোকে বলে লোকটা পটল তুলেছে। আর, তোমরা মরলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে বলে, তিনি দেবধামে যাত্রা করেছেন।

তোমরা নির্গুণ হ'লেও তোমাদের গুণের কদর করে সবাই। আমরা শতগুণী হ'লেও আমাদের গুণের আদর নেই কোথাও।

জীবন তোমাদের কাছে মধুর স্বপ্নাবিশেষ। তাই তোমরা সপরিবারে হাওয়া বদলাতে যাও দার্জ্জিলিঙ, সিমলা, ওয়াল্টেয়ার কিংবা পুরীতে। আমরা কিন্তু হাওয়া বদলাবার প্রয়োজনই বোধ

করি নে, কারণ জীবনের পূর্ব্বাহ্ণেই আমরা একেবারে হাওয়ার মিশে যাই শ্মশান-ভূমিতে গিয়ে।

সুখ তোমাদের ideal. তাই বর্ষার রূপ তোমরা উপভোগ কর কাচের শার্সির ভেতর দিয়ে। তোমাদের মন ভেসে যায় জলধারার কলরোলের সঙ্গে। দুঃখ আমাদের real. আমাদের জীবন 'nothing but a walking shadow.' বর্ষার কলরোলের সঙ্গে আমাদের মন ভেসে যেতে চায় না। ফুটো ছাদের মহিমায় বর্ষা নিজেই আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় একেবারে নিউমোনিয়ার কূলে।

আমাদের মেয়েরা সহজাত লজ্জাটুকু ঢাকবার মত পরিধেয় বস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না ; তাই তারা থাকে ঘরের কোণে। তোমাদের মেয়েরা শ্রী-অঙ্গে বিচিত্র সিল্ক, ভয়েলের বিজ্ঞাপন এঁটে প্রচার করে নিজেদের, তাই ঘরের কোণ তাদের ত্যাজ্য।

তোমাদের প্রচুর আছে, তবুও তোমরা আমাদের ভাত মেরে পেট পূজো কর। আমাদের কিছুই নেই, তবুও আমরা তোমাদের ভেট দিয়ে তোমাদের পূজো করি।

তোমরা কর শাসন আর আমরা করি অনশন। মোদ্দা কথা, তোমরা উপরে আছ আমাদের শোষণ করে, আর আমরা নীচে আছি তোমাদের তোষণ করে।

তোমাদের আছে ঘরের টান। চলার পথে থাকে আমাদের প্রাণ এবং মান। অবস্থাটা দুঃসহ না হ'লে শ্রীরাধিকার মত বিরহ-কাতর সুরে আক্ষেপ করতে পারতাম—'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর'।

তোমরাও ভালো, আমরাও ভালো। শুধু তোমাদের কাছে আমরা মন্দ, আর আমাদের কাছে তোমরা নৃশংস। সে আর এমন কী। তবে, তোমাদের মন্দ আমাদের ভালো আর আমাদের ভালো তোমাদের মন্দ।

সুতরাং এই দুয়ে মিলে অদূর ভবিষ্যতে যে 'তারা' হবে তা একেবারেই অসম্ভব। যেমন অসম্ভব 'সোনার পাথর বাটি।'

রামকৃষ্ণ

আভা দেবী

ভগবান তুমি দেহরূপ নিয়ে এসেছিলে বারে বারে
মানুষের সংসারে।
বিপুল বিশ্বে তাই অনিবার ধুয়ে মুছে গেছে বেদনারই ভার
তব পদ-রজঃ করুণা-কণার—
প্রেম-মধু উৎসারে
বিধৌত হ'লো গ্লানি পঙ্কিল পবিত্র হ'লো গঙ্গা-সলিল ;
অজ্ঞান আর অজ্ঞতা-ভরা অন্ধকারে
তুমি জ্বেলেছিলে জ্ঞানের আলোক
মহামুক্তিকা-দ্বারে।

ভগবান তুমি মহাভাব দিয়ে শিখায়েছ ভালবাসা,
সহজ সরল মধুর ক'রেছ অনন্ত জিজ্ঞাসা ;
পথ আর মত ভগবান নয় এরা শুধু পথচারী
অনুরাগ ভরে যে ডাকিবে তাঁরে প্রেম-মধু সঞ্চারি
চিরবসন্ত মধুপানানন্দে সেই হবে অধিকারী ;
যাগ যজ্ঞ বিচার বিরোধ—তাঁর কাছে কিছু নয়,
ভক্তের কাছে মহাসমুদ্র হিমরূপে প্রেমময়।

ভগবান তুমি এসেছিলে তাই মায়াময় পৃথিবীর
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারাদল এখনো র'য়েছে স্থির,
সাগর-শঙ্খে জলদমন্দ্রে এখনো মা ভৈঃ রব
এখনো রয়েছে জীবের জীবনে সত্যের গৌরব।
রামকৃষ্ণ এই মহানাম পাবক-শিখার মত
জগতের মাটি হয়তো করিবে তীর্থেতে
পরিণত।

জীবের জীবনে শিখায়েছ তুমি জীব-জননীর নাম,
যোগীরে দিয়েছ শুদ্ধ সত্য গভীরের আহ্বান।
কৃতিত্ব নিল গৌড়ীয় মাটি বিপুল পৃথ্বীধামে
রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ নামে ;
প্রসন্ন তব প্রসাদ-দৃষ্টি চিরপ্রার্থনা করি
হোক মধুময় চির-সুন্দর এই মহা-শর্ব্বরী।
কর হে পুণ্য কর হে ধন্য ওগো তুমি প্রেমময়,
তোমার মহিমা নাম-কীর্ত্তনে অজ্ঞায় হোক ক্ষয়।

ভক্ত কবীর

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

উপেন্দ্রকুমার দাস (শান্তিনিকেতন)

কবীরদাসের সময়ে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মমত প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে প্রধান দু'টি—হিন্দু ও মুসলমান। এই দুই মতের সঙ্গেই কবীরদাসের অল্পাধিক পরিচয় ছিল। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের উপর এই দুই মতেরই প্রভাব দেখা যায়।

এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন। আজকাল যেমন হিন্দুধর্ম বলতে ভারতবর্ষে উৎপন্ন ধর্মমাত্রকেই বুঝায় কবীরদাসের সময় কিন্তু সে রকম ছিল না। সেই সময়ে হিন্দুধর্ম কথাটা আরও সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হ'ত। বেদ, ব্রাহ্মণ আর পৌরাণিক মত এই তিনটিকে যে মানে, কবীরদাস ত তাকেই হিন্দু বলে মনে করতেন। অবশ্যি, মুসলমান কথাটা তখন যে অর্থে ব্যবহৃত হ'ত আজও সেই অর্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে। কবীরদাসের উপর হিন্দু প্রভাবের কথা আমরা আগেই খানিকটা আলোচনা করেছি। কবীরদাসের প্রেমভক্তির সাধনাকে যদি কোনো মতের অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তা'হলে সে মত অবশ্যই হিন্দুমত। তাঁর পরমার্থতত্ত্বও হিন্দুচিন্তার ধারা ওতপ্রোত ছিল সে কথাও আমরা লক্ষ্য করেছি।

কবীরদাস মূর্ত্তিপূজা, বহু দেব-দেবীর পূজা, অবতারবাদ প্রভৃতির নিন্দা করেছেন। অনেকে বলেন, তার কারণ মুসলমান-প্রভাব। অনেকে আবার এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, এই রকম মূর্ত্তিপূজা, অবতারবাদ প্রভৃতির খণ্ডন যোগমত প্রভৃতিতে মুসলমান এদেশে আসবার বহু আগে থেকেই হয়ে আসছিল। এই ধরণের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য ছিল। কবীরদাস সেই ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছিলেন। তবে তাঁর উপর ইসলামের প্রভাবও অবশ্যই ছিল। সেই প্রভাবের ফলে তাঁর মধ্যে একটি বিশেষ রকমের সাহস এসে গিয়েছিল যার জন্য তিনি তাঁর পূর্ববর্ত্তী সিদ্ধ ও যোগীদের মত তত্ত্বজালে জড়িয়ে পড়েননি। তিনি প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য যুক্তির কথা না ভেবেই সহজ ঢঙে সহজ কথা বলতে পেরেছেন।

কবীরদাস হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের তত্ত্বহীন যুক্তিহীন বাহ্যাচার এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব ভণ্ডামি দেখা দিয়েছিল তাদের তীব্র ভাবে আঘাত করেছেন, এ কথা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কাজ কবীরদাস করেছেন। তিনি বাহ্যতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন এই দু'টি ধর্মমতের লক্ষ্যও যে এক তা দেখিয়েছেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় মতই একই ভগবানের কথা বলছে, উভয় মতেই হয়েছে ভগবানেরই প্রকাশ। তাই, কবীরদাস সন্তকে ডাক দিয়ে বললেন, 'সন্ত, আমি দু'টি পথই দেখেছি। হিন্দু-তুরুক আমি আলাদা মনে করি না। সব মতেরই স্বাদ মিঠা।' বললেন, 'হিন্দু আর তুরুকের একই রাস্তা। এইটেই সদ্‌গুরুর নির্দেশ।' কবীর বলছেন, 'ওহে সন্ত, শোন, রাম না বলে খোদা বললে কিছু এসে যায় না।' ভগবান একই। তাঁর নানা নাম। কেউ তাঁকে এক নামে ডাকে কেউ অন্য নামে। কিন্তু তাই বলে ত আর আলাদা আলাদা ভগবানের কথা হয় না। হিন্দু বলে রাম, কৃষ্ণ; মুসলমান বলে আল্লা, করীম। আর তার জন্য উভয়ে উভয়কে পৃথক ভেবে লড়াই করে মরে। কবীরদাসের কাছে এ বড় অদ্ভুত ঠেকে। তিনি বলেন, 'একই জমির উপর বাস করছে, অথচ কাউকে বলা হচ্ছে হিন্দু, কাউকে তুরুক।' আর এদের মধ্যে কত ভেদ!

এর সব হ'ল পথের কথা। মানুষ যতক্ষণ ভগবানকে পায় না ততক্ষণ তার ভেদবুদ্ধি থাকে। কিন্তু যেই পথের শেষে পৌঁছায়, ভগবানকে পায়, তখন দেখে ভেদ কোথাও নেই। তখন সে বুঝতে পারে 'আল্লা রাম করীম কৃষ্ণ এ সব ত হজরতেরই নাম।' মতের বিভেদ, পথের বিভেদ তখন ঘুচে যায়।

কবীরদাসও এই কথাটাই বার বার বলেছেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানের যে মিলনের কথা বলেছেন তার মূল এইখানে। তিনি ভগবানকে পেয়েছিলেন। সেই জন্য স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন হিন্দু আর মুসলমান একই ভগবানের আরাধনা করছে। হিন্দু যাঁকে বলছে রাম, মুসলমান তাঁকেই বলছে আল্লা। এদের মত ও পথের পার্থক্য যা-ই থাক না কেন লক্ষ্য একই। তাই, কবীরদাসের কাছে হিন্দুও যা মুসলমানও ছিল তাই। এদের তিনি একই মনে করতেন। আলাদা আলাদা নামে ভগবানকে ডাকে বলেই ত তারা সত্যিকারের আলাদা নয়? হিন্দুও মানুষ, মুসলমানও মানুষ। তাদের উপাস্যও এক। 'একই মাটির ভাঁড়, ভিন্ন ভিন্ন তার নাম'।

তাই সিদ্ধভক্ত কবীরদাস কোনো রকম সাম্প্রদায়িক ভেদ স্বীকার করেননি। তিনি মনে করতেন সত্যিকারের ভগবদ্‌ভক্ত যাঁরা, যাঁরা সত্যিকারের ভগবদ্‌প্রেমী, তাঁদের যিনি যে-নামেই যে-ভাবেই ভগবানকে ডাকুন না কেন, আসলে সবাই তাঁরা এক। কেন না, সবাই তাঁরা একই ভগবানের উপাসক। শুধু তাই নয়, তিনি মানুষ মাত্রকেই ভগবানের রূপ বলে মনে করতেন। তিনি বলছেন, 'হে রাম, যত নরনারী জন্মেছে তারা সব তোমারই রূপ।' কাজেই তাঁর কাছে মানুষে মানুষে কোনো ভেদ ছিল না।

ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র উপনিষদের যুগ থেকে পরম একের কথা বলে আসছে। বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যকে নিয়ে তিনি বিরাজমান। সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই পরম একেরই প্রকাশ। কবীরদাস যে এক ঈশ্বরের কথা বলেছেন তাতে করে তিনি এই ঐতিহ্যেরই অনুসরণ করেছেন। অনেকে বলেন, এই একেশ্বরের কথা তিনি ইসলামের কাছ থেকে পেয়েছেন। একথা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। কারণ, কবীরদাসের উপর ইসলামের সত্যিকারের কোনো প্রভাব পড়ে থাকলে তা এসেছে সূফী সাধকদের কাছ থেকে। আর এই সূফী মতের উপর অদ্বৈত বেদান্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। কাজেই অনুমান করা যায়, যে পরম একের সাধনা কবীরদাস গুরু রামানন্দের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তাই মুসলিম সূফী সাধকদের সংস্পর্শে এসে সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল।

আর তিনি প্রচারও করে গেছেন প্রেমভক্তিরই কথা। সে প্রেমভক্তিতে কোনো সাম্প্রদায়িক চিহ্ন নেই। সেই জন্য, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই কবীরদাসের শিষ্য হয়েছিল। ভক্ত কবীর তাঁর প্রভু রামের কথাই বলে গেছেন। এই ছিল তাঁর প্রধান বক্তব্য। এই রামই পরম এক। তা বুঝাবার জন্যই যেন তিনি রামের নানা নাম ব্যবহার করেছেন। রামই আল্লা, রামই রহিম, তিনিই হরি, তিনিই কৃষ্ণ। আবার কবীরদাস পরমাত্মাকে নামাতীত মনে করতেন। তিনি যেমন রূপাতীত তেমনি নামাতীত। আল্লা আর রাম দুইয়েরই অগম্য তিনি।

কিন্তু কবীরদাসের আসল পরিচয় তিনি ভক্ত কবীর। এইটি জানা হয়ে গেলে আর তাঁর কথা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। ভক্ত কবীর ভগবানের কথাই বলেছেন আর সব কিছু তারই আনুসঙ্গিক। এইটিই হ'ল কবীরদাসের সকল মতামতের মূল রহস্য।

বিশ্ব সম্বন্ধে বিশ্ববিধাতার আছে সুষ্ঠু পরিকল্পনা। সব কিছুই সেই পরিকল্পনার অন্তর্গত। মানুষও সেই পরিকল্পনার অন্তর্গত সৃষ্টির উপাদান মাত্র। মানুষের জীবনযাত্রার ইতিহাসে সেই পরিকল্পনাই প্রকাশিত হচ্ছে। জগতের বিভিন্ন অংশে বিধাতার ইচ্ছা বিভিন্ন ভাবে ক্রিয়াশীল। ভারতবর্ষেও বিধাতার একটা বিশেষ ইচ্ছা কাজ করছে। তিনি যেন এখানে মানুষের অধ্যাত্ম-জীবনের বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন এবং সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে যে পরম ঐক্যতত্ত্বটি রয়েছে তাকেও উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের আগাগোড়া এই ইচ্ছা বিস্তৃত হয়ে আছে। বিভিন্নতার মধ্য দিয়ে, বিরোধের মধ্য দিয়ে এ আপনাকে প্রকাশ করছে। বিধাতার এই ইচ্ছাকেই বহন করে যুগে-যুগে কত মহাপুরুষেরই না এখানে আবির্ভাব হ'ল। জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির বিভিন্ন পথে মানুষের অধ্যাত্ম-জীবনের কি বিপুল বৈচিত্র্যকেই না তাঁরা প্রকাশ করলেন! কবীরদাসও বিধাতার এই ইচ্ছাকে বহন করেই আবির্ভূত হ'লেন। স্রষ্টার পরিকল্পনা অনুযায়ী জগতে যখন যার প্রয়োজন হয় তখনই তার উদ্ভব হয়। আর সেই উদ্ভবের অনুকূল পরিবেশেরও তখন সৃষ্টি হয়। কবীরদাস যখন এলেন তখন তাঁর আসার প্রয়োজন হয়েছিল এবং তাঁর আবির্ভাবের অনুকূল পরিবেশেরও সৃষ্টি হয়েছিল।

ভারতীয় সাধনা তখন এক বিরাট সঙ্ঘর্ষের সম্মুখীন হয়েছে। এক অভিনব পরিণতির মুখে দাঁড়িয়েছে। ভারতের ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে এসে প্রবেশ করেছে ইসলাম ধর্ম। এ যাবৎ ভারতের ধর্ম-সাধনার বিভিন্ন মত ও পথের উদ্ভব হয়েছিল সত্য এবং তাদের মধ্যে কোথাও বা অল্প পরিমাণে কোথাও বা অধিক পরিমাণে পার্থক্য এমন কি বিরোধও ছিল সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের তলে তলে একটা ঐক্যের অন্তধারা বয়ে চলেছিল। বৈচিত্র্যের মধ্যে এমন কি বিরোধের মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি এইটিই ভারতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য। তাই মত ও পথের বিভিন্নতাকে ভারত সহজেই স্বীকার করে নিয়েছিল। পরমতসহিষ্ণুতা ভারতের অপর বিশিষ্টতা। ভারতের ধর্ম-সাধনা ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই জন্য বেদ-গ্রাহ্য ও বেদ-বাহ্য সংস্কারযুক্ত ও সংস্কার-মুক্ত নানা ধর্মমত এখানে পাশাপাশি স্থান পেয়েছে।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল থেকেই মনুষ্যত্বকে শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষ হিসাবেই এখানে মানুষের সম্মান, তার আদর। মানুষের ধর্মমত তার সে সম্মান ও আদর লাভে বাধা সৃষ্টি করে না। মানুষের শ্রেষ্ঠতার এই চারিত্রিক আদর্শের জন্য ভারতে যে-কোনো ধর্মের মানুষ অন্য যে-কোনো ধর্মের মানুষের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়ে এসেছে। তাই, ভারতীয় সমাজে জাতি-বর্ণ-ধর্মের ভেদ থাকা সত্ত্বেও মনুষ্যত্বের এক উদার আদর্শে সবাই মিলতে পারত।

ভারতীয় সমাজ অতি প্রাচীন কাল থেকে মোটের উপর ব্রাহ্মণ্য-পুষ্ট আর সেই জন্য আচারনিষ্ঠ। যারা আচার মানত না তারা জাতিচ্যুত হ'ত, কিন্তু সমাজ-শাসন মেনে চললে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হ'ত না, নূতন একটা জাতির সৃষ্টি করে সমাজেই থেকে যেত। এমনি করে বহু জাতি ও উপজাতির সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তবু বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বজায় ছিল।

নানা বিরোধী মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সমাজের প্রধান কীর্ত্তি সত্য, কিন্তু এই কীর্ত্তি দোষহীন ছিল না। এটি সমাজদেহকে দুর্বল করে দিয়েছিল। ভারতীয় সমাজে সামঞ্জস্য ছিল কিন্তু সংহতি ছিল না।

ইসলামের সংঘাতে এই দুর্ব্বলতা বিশেষ ভাবে প্রকট হয়ে পড়ল। মুসলিম সমাজ ভারতীয় সমাজের ঠিক উল্টো ছাঁচে গড়া। মুসলমান সমাজ আচার মানে না, অন্য ধর্মমতকে স্বীকার করে না, বিধর্মীকে আপন ধর্মে ধর্মান্তরিত করা পুণ্য কর্ম মনে করে, স্বীয় ধর্মের মাপকাঠি দিয়ে সব মানুষকে বিচার করে বলে অমুসলমানদের হীন বলে মনে করে। বিধর্মীদের জন্য তার নরকের ব্যবস্থা। আপন গণ্ডীর বাইরে মুসলমান সমাজ অত্যন্ত অনুদার। ইসলাম যখন এল তখন ভারতীয় সমাজের বাইরে যাবার সব ক'টি দুয়ারই খোলা ছিল কিন্তু ভিতরে আসার পথ ছিল না একটিও। মুসলমান সমাজের ভিতরে আসার সব দুয়ারই ছিল খোলা, বাইরে যাওয়ার সব দুয়ার বন্ধ।

গণতান্ত্রিক সাম্যমূলক যুযুৎসু ইসলাম ধর্ম ভারতীয় সমাজকে প্রচণ্ড আঘাত হান্‌ল। তার বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বানচাল হবার যোগাড় হ'ল। আচারনিষ্ঠ সমাজ যাদের জাতিচ্যুত করছিল তারা অপমানিত হয়ে আর পুরোনো সমাজে থাকতে চাইল না। মুসলমান সমাজ তাদের সাদরে গ্রহণ করতে লাগল। তবে, আত্মরক্ষার শক্তি যেমন ব্যক্তিমানুষের সহজাত তেমনি সমাজেরও। আঘাত পেলেই এ শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠে। তাই, ইসলামের আঘাতে ভারতীয় সমাজে সংহতি-চেতনা দেখা দিল। "ভারতীয় জনসাধারণের সাধারণ নাম হ'ল হিন্দু। এই হিন্দু মানে অমুসলমান। ভারতে উদ্ভূত সকল ধর্ম বহু কালাবধি প্রচলিত বিবিধ আচার অনুষ্ঠান ঐতিহ্য প্রভৃতি সবই এই একটা কথা দ্বারা সূচিত হ'ল।"

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। এর বিভিন্ন অংশে যেখানে ধর্মের মূলতত্ত্ব এক সেখানেও ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানের ও বিবিধ সামাজিক প্রথা প্রভৃতির পার্থক্য ছিল প্রভূত।

নব উদ্‌বুদ্ধ সংহতি-চেতনাকে কার্য্যকরী রূপ দেবার প্রয়াস সুরু হ'ল। কিন্তু এ প্রয়াস ব্রাহ্মণ্য-শাসিত সমাজের প্রয়াস! স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা শাস্ত্রকে ভিত্তি করে সারা ভারতে একই রকম আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তনের জন্য বিধি প্রণয়ন করতে প্রবৃত্ত হ'লেন। বলা বাহুল্য, এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। যে রোগ ভিতরের, বাইরে ওষুধ লাগিয়ে তা দূর করা যায় না। বাহ্যানুষ্ঠান স্থানীয় বস্তু, মানুষের স্বভাবের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই, বিভিন্ন স্থানে তা বিভিন্ন হবেই। জোর করে সব এক রকম করতে গেলে সে-চেষ্টা সফল হয় না, হয়ওনি।

ভারতীয় ধর্মমতগুলি এই সময়ে শুষ্ক জ্ঞানময় দার্শনিক কূটতর্কের জটিলতা এবং বাহ্যানুষ্ঠানের স্থানীয় ও শাস্ত্র-শাসিত বিবিধ বৈচিত্র্যের বেড়াজালে পড়ে সক্রিয়তা, গতিশীলতা হারিয়ে

ফেলেছিল। মতের বিভিন্নতা ও পথের পার্থক্য ধর্মের উপলক্ষ না হয়ে লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জাতিভেদমূলক সামাজিক ব্যবস্থা। ফলে জনসাধারণের মধ্যে সংহতি ও ঐক্যবোধের স্থলে সাম্প্রদায়িকতাবোধ প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় উত্তর-ভারতে এসে লাগল বৈয়ক্তিক ঈশ্বরে বিশ্বাসী দার্শনিকতার কূটতর্কমুক্ত সংহতিমূলক ইসলাম ধর্মের সংঘাত। ইসলাম ধর্ম সমূহগত, ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে না। বাহ্যাচারের বাঁধন তার তেমন শক্ত নয়। প্রবল বিজিগীষু এই ধর্মবন্যার বেগে ছড়িয়ে পড়তে চায়।

ধর্মের গ্লানি যখন দেখা দেয় তখন বিধির বিধানে নূতন করে ধর্ম সংস্থাপিত হয়। ধর্ম জীবনেরই ধর্ম। জীবন জীর্ণতাকে বরদাস্ত করতে পারে না ; জীর্ণতাকে ঘুচিয়ে বারে বারে সে নূতন হয়ে দেখা দেয়। ভারতবর্ষেও মুসলমান আসার তিন-চারশ' বছর আগে থেকেই ধর্মের গ্লানি দেখা দিয়েছিল এবং তখনই ভক্তিধর্ম নূতন করে রূপ নিয়েছিল দক্ষিণ-ভারতে।

ভক্তিধর্ম প্রেমের ধর্ম। কাজেই এ সংহতিমূলক সাম্যের ধর্ম। কিন্তু ভারতবর্ষের মাটির গুণে একেও সামাজিক ভেদমূলক ব্যবস্থার সঙ্গে আপোষ করে চলতে হ'ল। ফলে ভক্তিধর্মে দেখা দিল দু'টো ধারা। একটি শাস্ত্রের শাসন মেনে উপাসনার বাহ্যানুষ্ঠান মেনে, সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রভৃতি স্বীকার করে নিয়ে সগুণ উপাসনার পথ নিল। অপরটি নিল এই সব অগ্রাহ্য করে হৃদয়ের সহজ অনুভূতির সহায়তায় নির্গুণ উপাসনার পথ। অবশ্য, সগুণ উপাসকদের মধ্যেও অনেক সাধক শাস্ত্র না মেনে হৃদয়ের সহজ অনুভূতির পথে প্রেমভক্তির সাধনা করেছেন। এঁদের মধ্যেও অনেকে ছিলেন "বেভুরী।"

ধর্মের ক্ষেত্রে ভক্তিধর্ম ভারতীয় জীবনের মূলগত ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করল। শাস্ত্রানুগ ভক্তিধারাও ভক্তির ক্ষেত্রে সকল মানুষের সমান অধিকার স্বীকার করে। এ ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই। তবে এই ঐক্যতত্ত্ব বিশেষ করে শাস্ত্র-না-মানা 'বেভুরী' ভক্তদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল।

ইসলামের আঘাতে যে পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল তাতে করে এই ধারা বিশেষ ভাবে প্রবল হয়ে সমগ্র উত্তর-ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। এর প্রধান নিমিত্ত হ'লেন কবীরদাস। ধর্ম তখন প্রধানত সাম্প্রদায়িক, শাস্ত্র-শাসিত এবং আচারনিষ্ঠ। শুধু হিন্দুধর্ম নয়, ইসলামধর্মও।

সম্প্রদায় বিভেদ সৃষ্টি করে। ধর্ম যে নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্প্রদায় তা স্বীকার করে না। তার কাছে মানুষের পরিচয় সাম্প্রদায়িক মানুষ হিসাবে, এমন কি ভগবানেরও পরিচয় সাম্প্রদায়িক ভগবান হিসাবে। যথার্থ ভক্তি কিন্তু সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। ভক্তি চিনে শুধু ভগবানকে, চিনে শুধু ভক্তকে। জীবের সঙ্গে ভগবানের যে অবিরত প্রেমলীলা চলছে ভক্তি-সাধনার এই ভিত্তি। ভগবান জীব মাত্রেরই অন্তর থেকে লীলা করছেন। কাজেই ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তি জীবের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। এই প্রেমভক্তিই তার ধর্ম। এতে জীবমাত্রেরই সমান অধিকার। এ ক্ষেত্রে কোনো বিভেদ, কোনো বিরোধ, কোন সংঘর্ষের স্থান নেই। ভক্তের কাছে ভক্তিই একমাত্র লক্ষ্য। শাস্ত্র সংস্কার, বাহ্যানুষ্ঠান প্রভৃতি তাঁর কাছে অর্থহীন। অবশ্য, এক শ্রেণীর ভক্ত শাস্ত্র সংস্কার বাহ্যানুষ্ঠান প্রভৃতিকে মেনে চলেন। তবে এইগুলিকে তাঁরা ভক্তির সহায়ক হিসাবেই মানেন।

কবীরদাস ছিলেন প্রথমোক্ত শ্রেণীর ভক্ত। তাঁর কাছে সকলের উপর প্রেমভক্তি। এই তাঁর সর্বস্ব। এর বাড়া কিছু তিনি মানতেন না। কবীরদাস ধর্ম বলতে বুঝতেন এই প্রেমভক্তির ধর্ম, কোনো সম্প্রদায়ের ধর্ম নয়। আর জাতি, সম্প্রদায়, শাস্ত্র, লোকাচার, দেশাচার প্রভৃতি যা-কিছু এই প্রেমভক্তির প্রতিকূল তিনি তাকেই অস্বীকার করেছেন, তারই বিরোধিতা করেছেন। ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তি মানুষের অন্তরে স্বত: উৎসারিত হয়। মানুষ মাত্রেরই এতে সহজ অধিকার। আর এই ভক্তির ক্ষেত্রে সবাই এক। ভক্তের কোনো জাতি নেই, ভক্তিধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম নেই। ভক্ত কবীরদাস এমনি ভক্তির কথাই বলেছেন। তিনি সব রকমের গণ্ডি, সব রকমের বন্ধনের বাইরে যে মিলনভূমি সেখানে সবাইকে আহ্বান করেছেন। ভারতের সংহতি-চেতনা এমনি ভাবে নূতন করে তাঁর মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করেছে।

তদানীন্তন ভারতের বিভিন্ন ধর্মমতের সঙ্গে কবীরদাসের পরিচয় ছিল। তাঁর জীবনে একাধিক মতের প্রভাবও পড়েছিল। কিন্তু তিনি কোনো বিশেষ মতবাদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েননি, বিশেষ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হননি। তাই সকল মতেরই দোষগুণ তিনি নির্লিপ্ত ভাবে বিচার করতে পারতেন। আর সবার বাইরে ছিলেন বলে' পরস্পর-বিরোধীদেরও মিলন-ক্ষেত্রের কথা বলতে পারতেন।

এ সম্পর্কে দ্বিবেদীজী লিখেছেন—"তিনি যেন দাঁড়িয়েছিলেন নানা বিরুদ্ধ মতবাদের সমন্বয়-স্থলে, নানা অসম্ভব পরিস্থিতির মিলন-বিন্দুর উপর। তিনি এমনি একটি জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন যেখানে থেকে একদিকে বেরিয়ে গেছে হিন্দুত্ব আর একদিকে মুসলমানত্ব ; একদিকে জ্ঞান আর একদিকে অশিক্ষা ; একদিকে যোগমার্গ আর একদিকে ভক্তিমার্গ, একদিকে নির্গুণ ভাবনা আর একদিকে সগুণ সাধনা। নানা পথের এমনি সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে কবীরদাস প্রত্যেক পথের দোষ-গুণ দেখিয়ে দিতে পারতেন।"

ভক্ত কবীরদাস ছিলেন বীর সাধক। অসাধারণ ছিল তাঁর সাহস। এক ভগবদ্‌প্রেমভক্তি ছাড়া আর কিছুই তিনি মানতেন না, আর যা এই প্রেমভক্তির বিরোধী যত শক্তিশালীই হোক না কেন প্রচণ্ড ভাবে তাকে আঘাত করতেন। তাঁর সাধনার পথে কত বাধা-বিঘ্ন, কত প্রলোভন দেখা দিয়েছে, তিনি সে সমস্তই অপূর্ব সাহসের সঙ্গে অতিক্রম করে গেছেন। প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে তিনি জয়ী হয়েছেন। অন্য ভক্তদের বিশেষ করে শাস্ত্র-মানা সগুণ উপাসকদের সঙ্গে তাঁর একটা মস্ত পার্থক্য এই ছিল যে, তাঁরা শাস্ত্র-সংস্কার প্রভৃতি মানতেন কিন্তু কবীরদাস এ সব কিছুই মানতেন না। একদিক দিয়ে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী ভক্ত। সে যুগে ধর্মের ক্ষেত্রে পুরাতনের প্রভাব এড়িয়ে যাঁরা নূতন পথে চলেছেন কবীরদাস ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, "কবীরের পর ভারতে সংস্কারমুক্ত যে কোনো ধর্মমত মধ্যযুগে হইয়াছে' তাহার প্রত্যেকটার উপর প্রত্যক্ষতঃ অপ্রত্যক্ষতঃ কবীরের প্রভাব অসামান্য।"

কবীরদাস আপন অন্তর্যামীর প্রেরণায় স্বীয় হৃদয়ের সহজ ভক্তির পথে চলেছিলেন। তিনি সত্যের সঙ্গে মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন, ভগবদ্‌কৃপা লাভ করেছিলেন। সেই জন্য কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বিশেষ মতবাদের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখতে পারেননি। তিনি হিন্দুও ছিলেন না, মুসলমানও ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক ধরণের সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের উর্দ্ধে। কেন না, তিনি দেখেছিলেন ভগবানের প্রতি যথার্থ প্রেমভক্তির ক্ষেত্রে কোনো রকম সাম্প্রদায়িকতা, কোনো রকম দ্বন্দ্বের স্থান নেই। এখানে হিন্দুও নেই, মুসলমানও নেই। আছে শুধু ভক্ত, শুধু সন্ত। তাই কবীরদাসের মতে সন্তের কোনো জাতি নেই। এই দিক দিয়েই কবীরদাস বিভিন্ন ধর্মমতের মিলন-ক্ষেত্রটি দেখিয়ে দিয়েছেন। কবীরদাসের মতে ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়। মানুষ তাঁকে যে ভাবে যে নামেই ডাকুক না কেন তিনি একই। কাজেই, ঈশ্বরের প্রতি যাদের বিশ্বাস আছে, প্রেমভক্তি আছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকতে পারে না, যত বিরোধ বাহ্যাচার নিয়ে। এই জন্য, কবীরদাস সকল রকম বাহ্যাচারের বিরোধী ছিলেন। তিনি সকল ধর্মের মূলগত ঐক্য—ভগবদ্‌বিশ্বাস ও প্রেমভক্তির কথা বলেছেন।

আল্লা-রাম যে এক এ কথা কবীরদাসই প্রথম জোর-গলায় প্রচার করলেন। হিন্দু ও মুসলমান এই দু'টি পরস্পর-বিরোধী ধর্মের এই ভাবে তিনি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। এই ছিল তাঁর ভগবদ্‌নির্দিষ্ট কাজ। তবে এই কাজটি ছিল কবীরদাসের ভক্তিসাধনার গৌণ ফল। কবীরদাসের প্রধান পরিচয় তিনি ভক্ত। সংস্কারমুক্ত, সহজ, উদার, সর্বজনীন ভক্তি প্রচারই ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে কবীরদাসের প্রধান দান। ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী বলেন, "কবীরদাসের অধিকাংশ মত ভারতের এক অতি প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুগত। পূর্ব্ববর্তী সহজপন্থী সিদ্ধ ও যোগীদের সঙ্গে তাঁর অনেক বিষয়ে মিল আছে। কিন্তু একটি জিনিষ তাঁদের কারুর ছিল না। সে ভক্তি। রামের প্রতি ভক্তি। এই রাম পরাৎপরং ব্রহ্ম। কবীর প্রচার করলেন এই ভক্তি। এই তাঁর দান।"

কবীরদাসের বাণী থেকে তবু নানা মুনি নানা মতের সমর্থন খুঁজে পান। সমাজ-সংস্কার, সর্বধর্মসমন্বয়, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা, ধর্মসম্প্রদায় স্থাপন, সাহিত্যরস ইত্যাদি কত বস্তুই না এতে পাওয়া যায়। এটা কিছু আশ্চর্য্যও নয়। যাঁরা সত্যদ্রষ্টা সাধক তাঁদের বাণীতে জীবনের নানা রহস্যের সন্ধানই মেলে। কেন না, তাঁরা যে গভীরের কথা বলেন বাইরের থেকে তাকে নানা ভাবেই দেখা যায়। আর তা ছাড়া কবীরদাস ছিলেন সাধারণ মানুষ। যদিও তিনি সিদ্ধভক্ত ছিলেন এবং সর্বদা ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে থাকতেন এবং যদিও তিনি নিজেকে এমন এক আনন্দ-লোকের অধিবাসী মনে করতেন যেখানে সাধারণ মানুষ পৌঁছাতে পারে না, তথাপি সাধারণ মানুষেরই সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর যোগ। সাধারণ মানুষের সুখে-দুঃখে-ভরা দৈনন্দিন জীবনের সকল তুচ্ছতা সকল মহত্ত্বের সঙ্গে তিনি যোগ রেখে চলতেন। "এই ধরিত্রীর মাটিতেই তিনি দৃঢ় করে পা রাখতেন, গভীর তত্ত্বকথাও তিনি সহজ বুদ্ধি আর সজীব মনের সাহায্যে প্রকাশ করতেন।"

কবীরদাস ছিলেন নিরক্ষর মানুষ। গ্রন্থগত-পাণ্ডিত্য বা শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁর যা ছিল তা পাণ্ডিত্যের দ্বারা পাওয়া যায় না। তিনি ভগবানকে পেয়েছিলেন। এই জন্য তাঁর প্রেমভক্তির বাণী অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে আর তা হয়েছে জনসাধারণেরই ভাষায়। গভীর তত্ত্বকথাও তিনি সহজ করে বলেছেন। সাধারণ লোকের অতি পরিচিত বিষয় যেমন কৃষি, তাঁতবোনা, এ সব থেকে উপমা প্রভৃতির ব্যবহার করেছেন। এই জন্য কবীরদাসের বাণী সাধারণ নিরক্ষর লোকেও অনায়াসে বুঝতে পারে। যে সব গভীর তত্ত্বকথা দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য তাও কবীরদাসের বলার গুণে তাদের কাছে সহজ হয়ে গেছে। এই জন্য জনসাধারণের উপর কবীরদাসের এমন অসাধারণ প্রভাব। ডাঃ দ্বিবেদীজী বলেন, "শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কবীরদাস জনসাধারণের সাথী ও গুরু। তাঁকে যে তারা শুধু শ্রদ্ধাভক্তি করে তা নয়, তার চেয়েও বেশী তাঁকে আপন জন বলে ভালবাসে। বরং শ্রদ্ধা করার চেয়ে ভালবাসেই বেশী। এই জন্য কবীরদাসের সন্ত-রূপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবি-রূপও বরাবর লোকের কাছে আদর পেয়ে আসছে। তিনি শুধু নেতা ও গুরু নন, সাথী ও বন্ধু।"

কবীরদাসের সময়ে জনসাধারণের ধর্মজীবনে নানা মিথ্যাচার নানা যুক্তিহীন সংস্কার প্রবল হয়ে উঠেছিল। এইগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ছিল যথার্থ প্রেমভক্তির প্রতিবন্ধক। এই কারণে কবীরদাস এইগুলিকে তীব্র ভাবে আঘাত করেছেন। ফলে, তাঁর রচনায় সমাজ-সংস্কারমূলক অনেক বাণী পাওয়া যায়। এই জন্যই

অনেকে কবীরদাসকে সমাজ-সংস্কারক মনে করেন। কিন্তু তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। কেন না, তাঁর সেরূপ কোনো মতলবই ছিল না। তাঁর আসল কাজ ছিল প্রেমভক্তির প্রচার। সেই কাজ করতে গিয়ে তাঁকে এমন সব কথা বলতে হয়েছে যা সমাজ-সংস্কারের প্রভূত সহায়তা করেছে।

কবীরদাস ছিলেন যথার্থ মুক্তপুরুষ। বাঁধন ছেঁড়ার কাজ ছিল তাঁর সহজাত। তাই তাঁর কণ্ঠে মুক্তির বাণী এমন প্রবল হয়ে উঠেছে। সে বাণী শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকেনি, মানুষের সমাজ-জীবনেও তার প্রভাব পড়েছে যথেষ্ট, মানুষের বুদ্ধিকে মুক্ত করার কাজেও তা অনেক সহায়তা করেছে।

বীর ভক্ত ছিলেন কবীরদাস, তিনি যা মিথ্যা বলে মনে করতেন তার সঙ্গে কখনো আপোষ করে চলতে জানতেন না, তাকে আঘাত করতেন প্রচণ্ড ভাবে। নিজে যা সত্য বলে মনে করতেন সারা দুনিয়া বিরুদ্ধে গেলেও তা প্রচার করতেন জোর-গলায়। এই জন্য অনেকে তাঁকে অহংকারী মনে করেন। হ্যাঁ, কবীরদাস অহংকারী ছিলেন বৈ কি। কিন্তু তাঁর অহংকার সাধারণ মানুষের অহংকার থেকে পৃথক্‌। তাঁর অহংকার ভক্তের অহংকার। কবীরদাস অহংকার করেই ত বলেছেন, জোলা রামনাম নিয়ে জগৎ জয় করে যাবে। কিন্তু লোকে ভক্তের এই অহংকারটি যে কি তা বুঝতে পারে না। ডাঃ দ্বিবেদীজী বলেন, "সমাজে যা অহংকার ভগবদ্‌ভক্তির ক্ষেত্রে তাই আপনার প্রতি ও আপনার প্রিয়তমের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাসের পরিচায়ক।"

কবীরদাসের পদে অনেক পরস্পর-বিরোধী কথা পাওয়া যায়। এর কারণ কবীরদাস ছিলেন ভক্ত। অনন্ত রহস্যময় ভগবান ভক্তের কাছে যখন যে ভাবে ধরা দেন ভক্ত তখন সেই ভাবেই তাঁর কথা বলেন। "ভগবানের যে অনির্বচনীয় রূপের পরিচয় ভক্ত পান তাকে ত ঠিক ঠিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না। কেন না, যে রূপ অসীম অনন্ত তা মানুষের সীমিত ভাষার মধ্যে ধরা দেয় না, তাই সেই রূপের কথা বলতে গেলে নানা ভাবে তা বলবার চেষ্টা করতে হয়। এই জন্য অনেক সময় ভক্তের কথা পরস্পর-বিরোধী হয়। এই রকম পরস্পর-বিরোধী কথার সাহায্যে ভক্ত ভগবদ্‌সত্তার অনির্বচনীয়তাই লক্ষ্য করেন।"

কবীরদাস ছিলেন যথার্থ গুরু। ধর্মের ক্ষেত্রে গুরুতর সঙ্কট সময়ে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। ধর্মের নানা গ্লানিতে অভিভূত ভারতের জনসাধারণকে তিনি দেখালেন যথার্থ ধর্মের পথ, তাদের চিত্তকে বন্ধনমুক্ত করবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক লোকেরা তাঁর অনেক কথাই বুঝতে পারেনি। তিনি অনেক ব্যাপারেই তাঁর সময়ের অনেক অগ্রবর্তী ছিলেন। এমন অনেক ব্যাপার তাঁর কাছে জলের মত পরিষ্কার ছিল যা তাঁর সমকালবর্তীদের ধারণা করতেই হয়ত শত শত বৎসর লেগে যেত।

এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। জগতের অনেক মহাপুরুষ সম্বন্ধেই এ কথা বলা চলে। তাঁদের সমকালবর্ত্তীরা তাঁদের খুব কম কথাই বুঝতে পেরেছে। তার কারণ, তাঁদের কাল তাঁদের সমকালকে অতিক্রম করে দূর-ভবিষ্যতের দিকে বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে। তাই, তাঁদের সব কথা বুঝতে হ'লে কয়েক শতাব্দী কেটে যায়।

কবীরদাসের বেলাও তাই হয়েছে। ভারতীয় সাধনার ধারা তাঁকে অবলম্বন করে যে সঙ্কট অতিক্রম করে এল, অন্য কথায়, ভারতের সাধনার ধারাকে তিনি যে সঙ্কটের মধ্য দিয়ে বহন করে নিয়ে এলেন তার পূরো অর্থ সেদিনকার মানুষ বুঝতে পারেনি। তা বুঝবার জন্য কয়েক শতাব্দী লেগেছে আর সেই কয়েক শতাব্দী ধরে তাঁর সাধনাই ভিতরে ভিতরে কাজ করে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে।

আজকের দিনের মানুষ কবীরদাসের বাণী মানুক আর নাই মানুক, তাঁর মাহাত্ম্য বুঝতে পারে। ভাবের ক্ষেত্রে ভারতীয় চিত্তের চিরাগত উদারতাকে কবীরদাসের সাধনা যে বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করে দিয়েছে এ কথা নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রই স্বীকার করবেন।

শেষ

লুভ্‌র গ্যালারীর মোনালিসাকে

শ্রীদুর্গাদাস সরকার

বহু রাজ্য যদি ভাঙে, বহু গ্রাম নগর নগরী
বিস্মৃতির অন্ধকারে যদি ডোবে, এবং কখনো
মুছে যায় আকাশের নীল রঙ কলের ধোঁয়ায়—
মোনালিসা, তোমাকে তো ভুলবো না তবু একজনো।

অরণ্যের অন্ধকারে আমাদের ক্ষুধায় কান্নাতে
আর যদি কেউ আজ এখন তোমাকে ভুলে যাই
ক্ষতি নেই, ক্ষোভ নেই। ভাঙন তো তোমাকে চেয়েই;
শুধু ক্ষুব্ধ জীবনের মাঝখানে তোমাকেই চাই।

লেওনার্দো দা'ভিঞ্চির মোনালিসা—তুমি আমাদের
চোখে-মুখে হাসি তব। রহস্যের মাধুর্যে মধুর
রেখাঙ্কিত অঙ্গ তব জীবনকে দেয় কী স্নিগ্ধতা,
তব দু'টি চোখে আছে সব পরিপূর্ণতার সুর!

পৃথিবীর মাঠ-ঘাট হয় যদি কখনো চঞ্চল
দা'ভিঞ্চির মোনালিসা থেকো তুমি লাবণ্যে কোমল।

৯

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

বন্দীশিবিরে চেনা ও জানা লোকের যে খুব অভাব ছিল, তা নয়। তবুও, সেকালে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির কর্ম্মীরা সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা গ্রহণ করতো গোপনতার এবং প্রতি ক্ষেত্রে সে শিক্ষা সাধ্যমত কার্য্যে প্রয়োগ করতে ভুলতো না। তাই, প্রথম দিনেই একেবারে কোন্ নির্দ্দিষ্ট ব্যারাকের কোন্ বিশেষ সীটটি পেলে আমি বাধিত হই, অফিসে সে কথা প্রকাশ না করে শুধু বলেছিলাম টালির ব্যারাকগুলি বাদ দিতে। দেখা গেল, আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে ইসটার্ণ ব্যারাকের চার নম্বর ঘরে।

সুধীর বাবুকে ছেড়ে দিয়ে আমার ঘরে এসে বসতেই অনুশীলনের যাঁরা দলবৃদ্ধির পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিলেন, তাঁদের মুখাবয়বের ঔজ্জ্বল্য চকিতে মিলিয়ে গেল শরতের হালকা মেঘের মতো। তার পরই 'লবি' আলোচনা ও গবেষণা সুরু হয়ে গেল যুগান্তর দলের সংখ্যাতীত উপদল ও গ্রুপের মধ্যে: লোকটি কোন্ গ্রুপের হে?

বারান্দায় এঁদের অনেককেই আনাগোনা করতে দেখলাম। আমার দিকে একটা অদ্ভুত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁরা সরে যেতে লাগলেন এবং ঘুরে এলেন আবার। কী যে এঁদের নীরব প্রশ্ন, স্পষ্ট তা বুঝতে পারলেও চুপ করে থেকে একটা সাসপেন্স সৃষ্টি করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

এঁদের মধ্যে দু'-এক জন হয়তো সাহসে ভর করে ঘরে ঢুকে পড়লেন এবং এগিয়ে এলেন পাশের সীটের বাসিন্দার কাছে, একটু ইতস্ততঃ করে, টেবিলের ওপরকার এটা-ওটা-সেটা বৃথাই নাড়াচাড়া করে নিরর্থক কয়েকটা মিনিট নষ্ট করে আবার আমার প্রতি একটা আলাময়ী জিজ্ঞাসু দৃষ্টি হেনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন গুটি-গুটি করে। এরই মধ্যে দুঃসাহসী এক জন হয়তো একেবারে প্রাণ হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন আমার কাছেই! কিন্তু সোজা-সুজি প্রশ্ন করতে পারলেন না: আপনি ঢাকা জেল থেকে আসছেন?

জবাব দিলাম।

নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তীকে চিনতেন না?

পাল্টা প্রশ্নে উত্তর দিলাম: বরিশাল শঙ্কর মঠের তো? নিশ্চয়ই চিনতাম। আর কাকেই বা না চিনতাম! মাত্র তো শ' দেড়েক বন্দী। কারুর কাছে কি কেউ অচেনা বা অপরিচিত থাকতে পারেন?

তা তো বটেই, তা তো বটেই।—বলে প্রশ্নকারী সন্দেহ নিরসনের জন্য আবার প্রশ্ন করলেন: ধীরেন সোমকে?

হেসে বললাম: সবাইকেই চিনি। অনুশীলনের চারু রায়কেও চিনি, আবার মাদারীপুরের পুষ্প চাটার্জ্জীকেও চিনি। বিশেষ করে,, ঢাকা জেলের ভক্ষণ সমিতি দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে।

ভক্ষণ সমিতির প্রসঙ্গ আসতেই স্বভাবতঃই তার বিবরণ খানিকটে দিতে হলো এবং কিচেন ম্যানেজারের সঙ্গে জীবনব্যাপী মহা সংগ্রামে সর্ব্বত্র জয়লাভ করে কোন্ ওয়াটারলু রণক্ষেত্রে আমাদের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটে, তাও বিবৃত করলাম। অবশেষে করলাম পাল্টা প্রশ্ন: কমেট মানে শশাঙ্ক দাশগুপ্ত কোন্ ঘরে আছেন

ও—শশাঙ্ক বাবু! হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব পারি! চলুন না, নিয়ে যাই আপনাকে ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের চোদ্দ নম্বরে।—আসুন।

আহ্লাদে ভদ্রলোক অকস্মাৎ ডগমগ হয়ে উঠলেন এবং উৎসাহের আতিশয্যে আমায় সাহায্য করবার জন্য একেবারে উন্মুখ হয়ে পড়লেন! কিন্তু তাঁর অত্যুগ্র আগ্রহের আগুনে জল ঢেলে দিয়ে আমি বলে ফেললাম: থাক্, পরে তো দেখা হবেই।

কিন্তু তিনি শেষ চেষ্টা করলেন: তাঁকে ডেকে আনবো?

না, থাক্।—বলে আমি এই প্রসঙ্গের ওপর যবনিকা টেনে দিলাম। মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়িয়ে থেকে ভদ্রলোক চোখে-মুখে খুশীর মশাল জেলে নিয়ে হন-হন করে বেরিয়ে চলে গেলেন। মনে হলো যেন বাইরে গিয়ে সমগ্র বিশ্বকে আহ্বান করে উদাত্ত কণ্ঠে এই মহাবাণীই ছড়িয়ে দেবেন যে, অনুশীলন অথবা যুগান্তরের রিভোল্ট দল নয়, রংপুর বা দিনাজপুরের ভ্যাবাগঙ্গারাম গ্রুপের নয়, সতীশ রায়ের সাড়ে তিন জনের পাকানো দল, এমন কি, মুখচোরা কমিউনিষ্টও নয়, একেবারে খোদ বি-ভি···

ঘণ্টা খানেক পর খাবার ঘণ্টা বেজে উঠলো এবং যতীশ গুহ, কমেট, মনোরঞ্জন, নীতিশ প্রভৃতির পাশেই বসলাম আসনে। ব্যস্, এবার ললাটে টীকা লাগানো হয়ে গেল এবং সর্ব্বপ্রকার গবেষণা ও আলোচনার ঘটলো পরিসমাপ্তি।

রাত দশটা পনেরো মিনিটে ঘর বন্ধ হয়ে গেলে আমার পাশের ছেলেটির পানে দৃষ্টিক্ষেপের অবসর পেলাম। ওর দাদার বয়সী তো আমি নিশ্চয়ই, কারণ অমরের বয়েস পনেরো-ষোলোর বেশী হবে কি না সন্দেহ। চেহারায় বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছুই নেই, তথাপি হঠাৎ একবার চাইলে আবার চাইতে ইচ্ছে করে। মুখাবয়বের কোথায় যেন কী-একটা আছে লেপটে, চোখের মণিতে তার প্রতিবিম্ব হঠাৎ ঝক্-ঝক্ করে ওঠে!

গ্যাটাপারচারের ফ্রেমে-আঁটা পুরু কাচের চশমা, তার পশ্চাতে এক জোড়া রহস্যময় চক্ষু। অন্যমনস্কতার ছাপ তাতে লেগে রয়েছে মনে করলে ভুল করা হবে। সে চোখকে ফাঁকি দেয়া সহজ নয়, অথচ তাতে বুদ্ধির চোখ-ঝলসানো প্রখরতা নেই, অনেকটা উদাসীন দার্শনিকের মতো। এ্যাটম বা মলিকিউলের প্রতি দৃষ্টি যার সীমাহীন সজাগ অন্ধকার রাতে পাহারাওয়ালার লণ্ঠনের মতো, অথচ ব্যবহারিক জীবনের এলোপাথাড়ি পাগলা হাওয়ায় যার শিখা অনুক্ষণ কেঁপে-কেঁপে ওঠে আত্মরক্ষার দাপাদাপিতে। সব্যসাচীর মতো সে পাখীর চক্ষুটিকেই শুধু দেখতে পায়, পারিপার্শ্বিক তার কাছে বিবর্ণ ও মূল্যহীন।

আলাপে জানা গেল, উড়িষ্যার কেন্দ্রাপাড়ায় তার আদি বাড়ী। মেদিনীপুরে আই-এ ক্লাশে ভর্ত্তি হয়েছিল। কর্ণেল পেডি নিহত হবার পর আরও অনেকের সঙ্গে তাকেও গ্রেপ্তার করে. কয়েক মাস হাজতে রাখা হয় ও পরে ছেড়ে দেয়া হয়। মিছিমিছি আবার রাজবন্দী করে পাঠিয়ে দিয়েছে বহরমপুরে।···এমনি আকুতিভরা কণ্ঠে নিরীহ বেচারা মন্তব্য করলো যে, আশঙ্কা হলো অমরের চোখের পাতা বুঝি সিক্ত হয়ে উঠেছে!

সমরেন্দ্র পাল আমার অন্যতম রুম-মেট। সদালাপী, মিষ্টভাষী

ও অত্যন্ত স্মার্ট! বিশ্ববিদ্যালয় সামরিক শিক্ষা বাহিনীর তিনি ছিলেন অন্যতম সেকসন কমাণ্ডার। রাইফেলের নিশানায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে রৌপ্যপদক পুরস্কার পান। কলকাতার মার্জ্জিত ভাষায় কথা বলবার শত চেষ্টা করলেও জিহ্বার প্রহরা ব্যর্থ করে দিয়ে বেরিয়ে আসে মাঝে মাঝে খাস কুমিল্লার সুর। শ্রোতা হেসে উঠলে তিনিও হাসেন। ভারী সরল।

কুমিল্লার হিমাংশু ভট্টাচার্য্যও আছেন। সেখানকার জনৈক গপ-লীডার। কার্ত্তিকের মতো অত্যন্ত ঘন চুল, চওড়া অথচ অত্যন্ত বেঁটে প্রায় হিটলারের মত এক জোড়া গোঁফ। পাতলা শুক তেজপাতার মতো দেহ আর তেমনি ক্ষুরধার বুদ্ধি! যুক্তি প্রদর্শনে তাঁর জুড়ি মেলা ভার বলে একাধিক বার প্রমাণিত হয়েছে সংবাদ পাওয়া গেল।

প্রথম রাত্রির কথা আজো মনে পড়ে। হরিমোহন এসে মশারি গুঁজে দিয়ে গেলে আমি লেপখানা মাথার ওপর টেনে দিলাম। কিন্তু ঘুম কোথায়? দূরে কোথায় ঘণ্টা বেজে চললো: বারোটা, একটা, দু'টো।···পরিচিতদের সঙ্গে আবার নতুন করে আলাপে এবং অপরিচিতদের সঙ্গে নতুন করে পরিচয়ে অনেকখানি সময়ক্ষেপ হলেও সে তো দিনের বেলা। রাত্রে এসে তো বন্ধুরা তেমন ভিড় কিছু করেনি? এমনি স্তিমিত অন্ধকারে চোখ মেলে চেয়ে থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা না-কাটিয়ে বাড়ীতে মার কাছে চিঠি লিখলেও তো চলতো?

কিন্তু লিখবার সরঞ্জাম থাকলেই তো লেখা হয় না, লিখবার জন্ম চাই মন। আমার একেবারেই মন ছিল না। বহরমপুরে এসেই যেন সে-মন হারিয়ে ফেলেছি। ঢাকা জেলে থাকতে অত্যন্ত যুক্তিহীন হলেও তবুও একটা ক্ষীণ আশার আলো-রেখা মাঝে মাঝে মনের কোণে ঝিলিক মেরে যেত: হয়তো অকস্মাৎ এক প্রভাতে আসবে আমার মুক্তির সংবাদ। প্রতিদিনের প্রভাত ব্যর্থ প্রত্যাশায় পাণ্ডুর হয়ে উঠলেও আগামী দিনের অনিশ্চয়তা আবার খানিকটে সতেজ করে তুলতো। কনফারমড্ হয়ে যাবার পরও মনে হয়েছে, তবু তো রয়েছি ঢাকা জেলে, আমার গ্রামের আট মাইলের মধ্যেই। দেয়ালের ওপর দিয়ে যে লাইট-পোষ্টগুলো দেখা যাচ্ছে, ওরই নীচেকার রাস্তা দিয়ে কত বার যাতায়াত করেছি নিঝুম রাতে শহরের খোয়া-ঢালা রাস্তায় পাড়া কাঁপিয়ে যে ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ী ছুটে চলে, তার বিশ্রী শব্দ এসে কানে কত পরিচিতের গুনগুনানি গুনিয়ে গেছে, শহরের সোরগোলে যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে আমারই কণ্ঠ। ঢাকা শহরকে মনে হয়েছে যেন আমাদের গ্রামেরই বৈঠকখানা। অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার হারালেও বৈঠকখানার ফরাসে তো গা এলিয়ে পড়ে থাকবার অধিকার ছিল।···

কিন্তু বহরমপুর বন্দীশিবিরে প্রবেশের পর অকস্মাৎ মনে হলো যেন কত দূরে আমায় টেনে আনা হয়েছে। কত পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে, কত সাগর পাড়ি দিয়ে, কত মরু-প্রান্তর অতিক্রম করে কোন্ পাতালপুরীর লৌহ-কুঠরীতে আমায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। এ থেকে যেন আর নিষ্কৃতি নেই আমার! চক্রব্যূহে প্রবেশের পথ আছে খোলা, কিন্তু বেরিয়ে যাবার? ভাবতে গেলে সারা গায়ে কাঁটা দেয়, শরীরটা ছমছম করে ওঠে—মনে হয়, জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই ইসটার্ণ ব্যারাকের চার নম্বর ঘরেই আমায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হবে।···

তথাপি নিরাশায় ভেঙে পড়বার মতো ঠুনকো মন সে-যুগের বিপ্লবীদের মধ্যে এক জনেরও ছিল কি না সন্দেহ। কী করে বিপ্লব আসবে, কোথা থেকে আসবে আমাদের অস্ত্র, সশস্ত্র অভ্যুত্থানে কে করবেন আমাদের পরিচালনা, কোথায় সেই জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং, এই সব তীক্ষ্ণ প্রশ্নের খুব পরিষ্কার জবাব আমরা দিতে পারতাম না সত্য। সংগঠনের পরবর্ত্তী অধ্যায় কি, কি আমাদের কর্ম্মসূচী, কোন্ ইন্দ্রজাল স্পর্শে অকস্মাৎ এক দিন বৃটিশসিংহ ল্যাজ গুটিয়ে তার বিলিতি বিবরে অদৃশ্য হয়ে যাবে, কোন্ কর্ণধারের হাতে স্বাধীন দেশের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালিত হবে, ঠিক কোন্ পথে দূর হবে দেশের নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতা, দুঃখ ও দারিদ্র্য, এ সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা ধারণা থাকলেও উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল আমাদের একেবারে সীমাহীন। সে-যুগের বিপ্লবীদের মন ষ্টীমারের বয়লারের সঙ্গে তুলনীয়। বাইরেটা অন্ধকার, শান্ত ও স্বাভাবিক, কিন্তু ভেতরে অনির্ব্বাণ বৈশ্বানর, লকলকে তার সর্ব্বগ্রাসী শিখা! আস্তরণের কোমলতা দেখে অন্দরের ভয়াবহতার পরিমাপ করা কঠিন। ত্বকের মসৃণতায় অস্থির কঠোরতার প্রতিবিম্ব পড়ে না।···

চলার পথে পদে-পদে পেয়েছে তারা বাধা, কানে শুনেছে আসন্ন বিপদের ক্রুদ্ধ গর্জ্জন, বিশ্বাসঘাতকতার কুশাঙ্কুরে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তাদের দেহ, একে-একে বিদায় নিয়েছে শুভানুধ্যায়ী ও সহযোগীর দল, তথাপি মুষড়ে পড়েনি, দুমড়ে যায়নি তারা, সূচিভেদ্য অন্ধকারে মাথা খুঁড়ে-খুঁড়ে প্রতীক্ষা করেছে তারা এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতের!···

আলীপুর সেন্‌ট্রাল জেল থেকে ফাঁসীর আসামী দীনেশ গুপ্ত তাঁর দিদিকে লিখেছিলেন, "···মৃত্যুকে আমরা ভয় করি বলিয়াই সে আমাদের জুজুর ভয় দেখাইবার সাহস পায়।···" সত্যিই বিপ্লবীরা মৃত্যুকে ভয় করে না। তাকে তারা জানায় আহ্বান পরিচিতের মতো, অন্তরঙ্গের মতো কাছে ডেকে নেয়, বন্ধুর মতো করে আলিঙ্গন!

তাই জানি, এ অমানিশা কেটে যাবে, এ রাত্রি প্রভাত হবে, বহরমপুর বন্দীশিবিরের লৌহ-দ্বার দু'পাশে সরে গিয়ে সসম্মানে আবার এক দিন আমায় বেরিয়ে যাবার পথ উন্মুক্ত করে দেবে।···

যে রেণুর মনে আগুন জ্বালাতে গিয়ে ব্যর্থকাম হয়েছি, আমার আবেগের গাম্ভীর্য্যে হয়তো সে মনে-মনে হেসেছে। হাসুক, ক্ষতি নেই। কিন্তু আমার সাংকেতিক নামটি সে শুনেছে। যদি প্রকাশ করে দেয়?···তার পূর্ব্বেই পাঠাতে হবে সংবাদ যথাস্থানে ও যত সত্বর সম্ভব।

১০

ক্রমে ক্রমে যা হয় তাই হলো, বন্দীশিবিরের সঙ্গে আমার মিতালী ঘটে গেল। এখানকার জীবনযাপনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলাম নিজকে।

বিরাট বন্দীশিবির। আয়তন এক বর্গ-মাইলের কাছাকাছি। অতি দীর্ঘ ব্যারাক দু'টি, ইস্টার্ণ ও ওয়েষ্টার্ণ। এ ছাড়া ক্ষুদ্রাকার

ব্যারাক দু'টি, সাদার্ণ এ এবং সাদার্ণ বি। বড় ব্যারাক দু'টির প্রত্যেক কক্ষের আয়তন অনুযায়ী হয় চার জন বা ছয় জন বন্দী থাকেন। সাদার্ণ ব্যারাক দু'টির প্রত্যেক কক্ষে থাকেন চার জন করে। যুগান্তর দলের বিভিন্ন উপদল, গ্রুপ ও স্বতন্ত্র সদস্য মিলে এই ব্যারাক চারটি দখল করে রেখেছেন।

এ ছাড়া গোটা চারেক টালীর ছাউনি-দেয়া মাঝারি সাইজের ব্যারাক আছে। তাতে থাকেন অনুশীলন, রিভোল্ট দলের সদস্যেরা এবং জন কতক কম্যুনিষ্ট ও গুটি কয় কংগ্রেসী।

বাসিন্দার সংখ্যা তিনশো'র ওপর। কাজে-কাজেই তাদের স্নানের জায়গা, খাবার ঘর, রান্নাঘর, জ্বালানী রাখবার ঘর, অসংখ্য কয়েদী চাকর, রাঁধুনী, ধোপা, নাপিত, জমাদার, বাগানের মালী—সব মিলিয়ে একটা আস্ত দুনিয়া বলা চলে। একটি ডিসপেনসারী আছে ও আছে ত্রিশটি বেডের একটি হাসপাতাল।

তার পর এরই মাঝে-মাঝে খেলার মাঠ। সেখানে ফুটবল, টেনিস, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, হকি, ক্রিকেট ও বাসকেট বল খেলা হয়। যাঁরা ব্যায়ামের অভিলাষী, তাঁদের জন্য গোটা দুই নানাবিধ সরঞ্জামপূর্ণ ব্যায়ামাগার আছে, কুস্তির আখড়াও আছে।

খোলা জায়গায় স্নানের জন্য বিরাট চৌবাচ্চা আছে, আবার আবরু রক্ষা করে যাঁরা স্নান করতে চান, তাদের জন্য আছে প্রায় পঞ্চাশটা বাথরুম। এক ধরণের জলের আধার থাকে জেলের মধ্যে, যাকে জেলীয় ভাষায় বলা হয় মূড়ী। আঠারো ইঞ্চি চওড়া এবং হয়তো ত্রিশ ফুট দীর্ঘ ড্রেনের মতো। ট্যাপ দিয়ে জল এসে ভর্ত্তি হয়ে যায়, আবার ছিপি খুলে দিলে সব জল বেরিয়ে যেতে পারে। এই দীর্ঘ গোটা চারেক মূড়ীর ওপর চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে ঘেরা ঝাঁপের দরজাওয়ালা সারি সারি স্নানের ঘর।

রাজবন্দীদের মধ্যে অনেকের ফুলের বাগানের সখ। তাঁরা হয় নিজেদের ঘরের বাইরেই অথবা অন্যত্রও সুদৃশ্য ফুলের বাগান তৈরী করে নিয়েছেন। তাতে দেশী ও বিলিতি নানাজাতীয় ফুলের জঙ্গল। কেউ সখ করে পোষেন মুরগী, কেউ হাঁস, কেউ কবুতর। কারুর আবার পোষা কাঠবিড়ালীও আছে। পকেটে করে বা কাঁধে নিয়ে বেড়াতে যান, রাত্রে বালিশের পাশেই সে চুপটি করে ঘুমিয়ে থাকে। খাবার-ঘরে কাঁধ থেকে নেমে এসে কুট-কুট করে হয়তো একটা আলু ভক্ষণ করে আবার কাঁধের ওপর উঠে বসে থাকে। অনেক সময় সারাটা দিন বাইরের গাছে-গাছে জাত-ভাইবোনদের সঙ্গে খেলা করে সন্ধ্যে হতেই ফিরে আসে আমাদের ব্যারাকে, যার পোষা, ঠিক তার কাছে। আশ্চর্য্য পোষ মানে এই কাঠবিড়ালী। সবার চাইতে উদ্ভট সখ নোয়াখালীর বীরেন কুণ্ডুর। তার পোষা ছিল বেজী, সাদা বক, একটা হনুমান এবং একটা পাতি শেয়াল। কোন্ ড্রেন দিয়ে কী করে এই শেয়ালটা বন্দীশিবিরে ঢুকে পড়ে। বীরেন তাড়া করে তাকে এনে আটকে ফেলে ব্যায়ামাগারে। তার পর তার গলায় দড়ি বেঁধে একেবারে ছাগলের মতো নিয়ে এল নিজের ঘরে। কি করে যে হনুমান বা বক সে বন্দী করেছে, সেই জানে! তার ঘরটি একেবারে চিড়িয়াখানা, দুর্গন্ধে ভরপুর। তথাপি তার সখ উদ্ভট।

'সত্যি, একটা পৃথক্ জগৎ। এখানকার হাসি-কান্না, এখানকার মান-অভিমান, এখানকার প্রত্যেকটি তরঙ্গ চারখানা দেয়ালের মধ্যেই উত্তাল ও দুর্নিবার হয়ে উঠে, আবার এক সময় এই চারখানা দেওয়ালের মধ্যেই সমাধি লাভ করে আর তার ওপর জমতে থাকে বিস্মৃতির মাটির চাপ। বাইরের জগতের কোনো উচ্ছ্বাসেরই প্রতিধ্বনি এখানে মেলে না। পরিবর্ত্তনশীল সমাজের যেন একটি টুকরো নির্ম্মম হাতে এনে এই বন্দীশালায় রাখা হয়েছে বন্দী করে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য। স্নেহ, মায়া ও মমতায় এবং দরদী পরিবেশে বাইরে যে সুখ-নীড়টি গড়ে উঠতে পারতো, এখানে ঊষর ক্ষেত্রে পড়ে গিয়ে হয়তো তার আর্দ্রতা যাচ্ছে উবে।······

সমগ্র বাংলা দেশের লোক এখানে জড়ো হয়েছে। পশ্চিম-বঙ্গের লোক সাধারণতঃ কম, উত্তর-বঙ্গের কিছু আছে, অবশিষ্ট অর্থাৎ অর্দ্ধেকের অনেক বেশী এসেছে পূর্ব্ব-বঙ্গ থেকে—ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ থেকে। কুমিল্লারও কিছু আছে। বন্দীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে এসে দাঁড়িয়েছে তিনশো পঁচিশে। আর স্থান নেই।

আহারের বাবদ বরাদ্দ জন-প্রতি দৈনিক এক টাকা দশ আনা। অর্থাৎ বিরাট রসুই ঘরের গোটা দশেক চুল্লীতে প্রতিদিন পাঁচ শতাধিক টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করা হয়। এত টাকা ব্যয়ের পরও মাসের শেষ দিকে দৈনন্দিন উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ বেশ মোটা হয়ে ওঠে। কিন্তু এক মাসের উদ্বৃত্ত পরবর্ত্তী মাসে টেনে নিয়ে যাওয়া সরকারী নিয়মে নিষিদ্ধ বলে প্রত্যেক মাসেরই শেষ দিকে ঘন-ঘন কয়েকটা Feast বা বিশেষ ভোজনের ব্যবস্থা থাকে।

বিশেষ ভোজনের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে কিচেন-ম্যানেজারের মৌলিকত্ব, রুচি-পছন্দ ও কর্ম্মদক্ষতার ওপর। এক জন ম্যানেজার যেভাবে করলেন, অপর ম্যানেজার চেষ্টা করেন সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে করতে। এবং বলাই বাহুল্য যে, বৈচিত্র্য সৃষ্টির উন্মাদনায় অনেক সময় তা খানিকটে উদ্ভট হয়ে ওঠে। ফলে হয়তো কিছু অপব্যয় হয়; কিন্তু সে জন্য দুঃখ করবার কারণ নেই। এটা সরকারী পয়সা, বরাদ্দ অর্থে যে আমাদের অতি কষ্টে সংকুলান হচ্ছে, সেটাই প্রমাণ করতে হবে সর্ব্বদা, নইলে ভাতা কমিয়ে দেবার আশঙ্কা আছে।

মার্চ্চ মাসের শেষাশেষি এমনি একটা বিশেষ ভোজনের দিন পড়লো। কিচেন-ম্যানেজার সত্য বাবু অফিসে গিয়ে ব্যবস্থা করে এলেন যে, দু'-রকম পোলাউ হবে—ঝাল ও মিঠে। আর হবে দু'-রকম-মাংস—ঝোল ও কোর্ম্মা। রান্না করবে স্বয়ং নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাবুর্চ্চি। ঠিক সিরাজের নয়, তবে মুর্শিদাবাদ নবাব-বাড়ীর খাস বাবুর্চ্চিই আসবে জানা গেল। কিন্তু বাইরের লোকের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আই-বি বিভাগের অনুমতি ও উপস্থিতি ব্যতীত বে-আইনী। সুতরাং বাবুর্চ্চিরা এসে অফিসের ওখানে রান্না করে রেখে যাবে। তারা চলে যাবার পর আমাদের সত্য বাবু সেগুলো নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবেন। খাসী গোটা চারেক কিনে আনা হলো বটে, কিন্তু তা বলি দিয়ে কাটবার অধিকার আমাদের নেই। কারণ ঐ বিরাট খড়্গ নিয়ে খাসীর মুণ্ডচ্ছেদের নাম দিয়ে শিবিরের কমাণ্ডাণ্ট টবিন সাহেব যা

তাঁর সহকারী গিরিজা দত্তকেই যদি আমরা তাড়া করে বসি! তাদের দিয়ে তো আর খাসীর কাজ চলতে পারে না!...

সুতরাং বাবুর্চিরাই খাসী জবাই করে নিয়ে অফিসে রান্না সুরু করলো। আর এদিকে খাবার হল্-এ সত্য বাবু ও জনকতক স্বেচ্ছাসেবক অন্যান্য ব্যবস্থায় মেতে উঠলেন।

হল্-এর মাঝখানে গোটা কয়েক তক্তপোষ জড়ো করে শুভ্র চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। সেই মঞ্চের ওপর অর্কেষ্ট্রা দল নানা যন্ত্র বাজাচ্ছেন। দেয়ালে মাঝে-মাঝে ফুলের রিং, প্রত্যেকটি খুঁটি সাদা কাপড়ে মুড়ে তার ওপর দিয়ে জড়ানো ফুলের মালা। ফরাসের ওপর অনেকগুলো ফুলদানী, তাতে বেশ বড়-বড় গোলাপ ও রজনীগন্ধা। সারা হলময় সুশৃঙ্খল ভাবে নয়, ইতস্তত: ছড়ানো অনেকগুলো ছোট টেবিল, তার চারি দিকে চারখানা চেয়ার। টেবিলের মাঝখানে একটি ফুলদানীর মধ্যে থেকে রজনীগন্ধার ঝাড় গলা উঁচু করে আছে।

নিমন্ত্রিতেরা যেই একে-একে এসে হল্-ঘরে প্রবেশ করছেন, অমনি দরজায় তাঁদের বুকে গুঁজে দেয়া হচ্ছে একটি ছোট ফুলের তোড়া আর ঝারি থেকে ছিটিয়ে দেয়া হচ্ছে গোলাপ-জল।

রাত ঠিক আটটার সময় খাবার দেবার ঘণ্টা পড়লো। এসে অবধি ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের চোদ্দ নম্বর ঘরে আমার আড্ডা জমে গিয়েছিল। প্রত্যেক দিনই খাবার ঘণ্টা পড়লে আমরা যাই স্নান করতে এবং খাবার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘণ্টা বেজে যাবার পর যাই দল বেঁধে খেতে। তখন বিরাট হোটেলের খাদ্যাবশেষ নিয়ে আমরা বসি কেউ বারকোষ নিয়ে, কেউ বা গামলা নিয়ে, আবার কেউ কড়াইতেই। মেনু'র অনেকগুলোই হয়তো তখন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে দমে যাবার পাত্র আমরা নই। শুধু নুণ-ভাত হলেও আধপেটা আমরা কোন দিন খাইনে। খাওয়া সম্বন্ধে চোদ্দ নম্বরের ঔদাসীন্য সর্ব্বজনবিদিত।

হল্-ঘরে প্রবেশ করতেই যথারীতি পেলাম ফুলের তোড়া ও গোলাপ-জল। খান তিনেক টেবিল জুড়ে আমরা বসলাম। যতীশ বাবু, নীতিশ, কমেট, মনোরঞ্জন, ভোলা বসাক, ননী চৌধুরী, চারু জোয়ারদার, অমর চাটার্জ্জী, নরেন দাস, পরিমল রায়, জ্যোতির্জীবন ঘোষ ও আমি। নবাবী খানা মিলবে বলে আজই প্রথম এলাম যথাসময়ে। ওদিকে আবার দশটা বেজে পোনেরো মিনিটে লকআপ। এর মধ্যেই সব সেরে যার-যার ঘরে পৌঁছুতে হবে।

কমেট ও ননী খাবার ব্যাপারে একেবারে সদাশিব। যা যখন পাওয়া যায়, তাতেই তারা খুশী, শুধু 'যতটুকুটা' একটু বিবেচনা করতে হবে।

কমেট বললো: এ কি, নবাবী খানার উপক্রমণিকা নাকি?

গোটা কয়েক আঙুরের দানা মুখে ফেলে জবাব দিল ননী: আঙুর ফল যখন টক নয়, তখন নবাবী খানাতেও বোধ হয় সিরাজউদ্দৌলার খোসবাই পাওয়া যাবে। সবুরে মেওয়া ফলে, এ কথা ভুলছো কেন?

ভোলা বলে উঠলো: তার পর শাস্ত্রবাক্য রয়েছে প্রাপ্তিমাত্রেন ভক্ষয়েৎ। অতএব—

খাওয়া সুরু হলো। এক প্লেট করে ফল—আপেল, আঙুর, বেদানার দানা, ন্যাসপাতি, আখরোট, কিসমিস, মনাক্কা, কিছু বাদাম-পেস্তা, কমলা, শশা, ও এক ফালি পেঁপে আর কয়েকটা বড় সাইজের কুল। সঙ্গে জল নয়, এক গ্লাস করে ঘোলের সরবৎ।

অর্কেষ্ট্রা দল বাজাচ্ছে ইংরেজী কোনো গৎ আর আমরা টেবিলে বসে খাচ্ছি সাত্ত্বিক আহার। অর্থাৎ পরবর্ত্তী রাজসিক ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য পাকযন্ত্রগুলিতে তালিম দিয়ে নিচ্ছি। পিটপিটে চারু বাবু বলে উঠলেন: কিসমিসগুলো ভালো করে ধোয়া হয়নি, দেখছেন বোঁটাগুলো রয়ে গেছে আর পেঁপেটা যেন বড্ড বেশী পাকা, গলে যাচ্ছে।

পেটরোগা চারু বাবু চিরকালই অতি সাবধানী। কিন্তু তাই বলে নীতিশ তো নয়, মনোরঞ্জনও নয়। তারা তৎক্ষণাৎ চারু বাবুর প্লেট ভারমুক্ত করে দিল। নীতিশ বললো: চারুদা, নবাবী খানা এলে আপনি এসে আমার টেবিলে বসবেন কিন্তু।

ননী বাধা দিল: যা, যা। আমার রুম-মেট ভাগাতে আসিস নে। পাশাপাশি রাত্রে শুতে হবে। তোকে দান করলে চারু বাবুকে আর ঘরে ফিরে যেতে হবে না।

কুস্তিগীর ভোলা জবাব দিল: তাহলে বদলী যাবো আমি। কায়েৎটুলীতে তোকে আমিও চিৎ করেছি বহু বার, তা ভুলিসনি তো ননী?

পরিমল বললো: তা এখানেই হয়ে যাক না একবার। নবাবী খানার জন্য পাকস্থলীর জায়গা বেড়ে যাবে'খন।

সত্য বাবু ঘুরে-ঘুরে সবার টেবিলে তদারক করে বেড়াচ্ছিলেন। বোধ হয় পরিমলের কথাটা কানে গেছে। প্রায় বক্তৃতা দেবার ভঙ্গীতে আশ্বাস-বাণী উচ্চারণ করলেন: সত্যিই নবাবী খানা! যে বাবুর্চি রাঁধছে, তার ঠাকুরদাদার বাবা কিংবা তার বাবা ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার খাস বাবুর্চি। অফিসের কাছাকাছি আমি ঘুরে এসেছি। একেবারে মুর্শিদাবাদী খোসবাই। এই এসে পড়লো বলে। আপনারা আর-একটু ধৈর্য্য ধরুন।—ওহে, একখানা নতুন গৎ ধরো না—দীনেশ।—বলে অর্কেষ্ট্রা দলের নেতা দীনেশ দাসকে উস্কে দেবার চেষ্টা করলেন।

একখানা কেন, নতুন ও পুরাতন অনেকগুলো গৎ বাজানো হলো এবং ঘড়ির কাঁটাও এসে ঠেকলো পুরোপুরি নটায়। কোথায় নবাবী খানা! সবাই অধীর ছিলেন, এবার অতিষ্ঠ হয়ে ওঠবার উপক্রম দেখা গেল। মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল এ-টেবিলে ও-টেবিলে। দু'-একটা টেবিল খালি করে নিমন্ত্রিতেরা উঠে গেলেন। বাদক দলের ফরাসও খানিকটে খালি বোধ হলো। বেগতিক দেখে একটা কোণের টেবিল থেকে পুরো ছ'ফিট দীর্ঘ কয়ালী বিশ্বাস দণ্ডায়মান হয়ে বক্তৃতা সুরু করলেন: বন্ধুগণ, ম্যানেজার আমায় কিছু বলবার অনুরোধ না জানালেও কর্ত্তব্য পালনের তাগিদে আমি দাঁড়িয়েছি। আপনারা যে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন, তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এবং তার যে যথেষ্ট যুক্তিও আছে, তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। আর ঘণ্টা-খানেক পরই টবিনের বিউগল বেজে উঠবে আমাদের বুকে হাতুড়ী মেরে। নবাব সিরাজ কেন, তার ঠাকুর্দা আলীবর্দি কবর থেকে উঠে এসে অনুরোধ জানালেও বৃটিশসিংহের পালিত পুত্র টবিন সাহেবের হুকুম টলবে না, তাও আমরা মর্ম্মে-মর্ম্মে জানি। কিন্তু বন্ধুগণ, এই ব্যাপারের জন্য ম্যানেজার কি করতে পারেন, তাই বলুন আপনারা? আফিসের গেটের কাছাকাছি

তিনি চীৎকার করতে পারেন মাত্র, কিন্তু বাবুর্চির দাড়ী ধরে টেনে দেবার সুযোগ তাঁর কোথায়? সেই পাকশালায় তাঁর প্রবেশাধিকার আছে কি? অতএব, বন্ধুগণ—

অকস্মাৎ একটি কণ্ঠ শোনা গেল: কিন্তু ম্যানেজারের ক্যানভাস করে কি মাংসের মাত্রা কিছু বেশী পাওয়া যাবে করালী বাবু?

করালী বাবু জবাব দিলেন: নিঃস্বার্থ ভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেয়াই আমার কাজ। তা থেকে আপনারা নিজেদের খুশীমত উপসংহার রচনা করে নিতে পারেন। নবাবী খানা এসে পৌঁছোবার এই যে অযৌক্তিক বিলম্ব, এই যে আমাদের সীমাহীন প্রতীক্ষা—

কিন্তু অকস্মাৎ মিছিল করে চাকর ও রাঁধুনীর দল এসে প্রবেশ করলো। সবার হাতেই হয় পোলাউয়ের ডেকচি কিংবা মাংসের বালতি। নবাবী খানা এসে গেছে! নিমন্ত্রিতেরা কলস্বরে এমনি ভাবে অভ্যর্থনা জানালেন যে, করালী বিশ্বাস বক্তৃতার মধ্যপথেই আসন গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। মিছিলের শেষে প্রবেশ করলেন স্বয়ং কিচেন-ম্যানেজার সত্য বাবু, চোখে-মুখে বিজয়ীর আত্মপ্রসাদ ঝক্‌-ঝক্‌ করছে!

দশখানা হাত বার করে তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে দু'-রকম পোলাউ প্লেটে সাজিয়ে দিলেন টেবিলে-টেবিলে। সুবাসে পাগল হয়ে অর্কেষ্ট্রা দল একযোগে করাস ত্যাগ করে টেবিল দখল করে বসে গেছেন। সবে নামানো হয়েছে, অত্যন্ত গরম। ওদিকে ঘড়ির কাঁটা সাড়ে ন'টায় এসে ঠেকেছে।

বোধ হয় মনোরঞ্জনই সবার আগে জিভে ঠেকিয়েই চীৎকার করে উঠলো: ও বাবা, এ কি নবাবী খানা রে! এ যে দেখছি মিষ্টি একেবারে সীতাভোগের মতো। আর এই-বা কি রকম ঝাল পোলাউ? নুণ নেই, মসলা নেই, ঝাল নেই, একেবারে হাইড্রোজেনের মতো tasteless, odourless—

রবি লাহিড়ীর কণ্ঠ শোনা গেল: আর খাসীর মাংস? এ কি রে ভাই, এ যে গন্ধে একেবারে ভুস্ হয়ে গেছে। আর এ কি ঝোল, না ঘি আর তেলের সুরুয়া?

অপর টেবিল থেকে, মতি সিং একখানা ঠ্যাং হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল: আর এখানা? এই হাত খানেক লম্বা হাড়খানা খাসীর, না কোনো কচি বাছুরের, যে বাছুর এখনো ঘাস খেতে শেখেনি, একেবারে ফুলের মতো পবিত্র—

শিবদাস লাহিড়ী বাধা দিল: থাম্ মতি, থাম্, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না।

বিমল চক্রবর্তী বললো: কেন, এতে তো দোষ নেই? শাস্ত্রে আছে, হরিণ, কাছিম আর একুশ দিন যার বয়স হয়নি, এমনি কচি বাছুর বিধবারাও খেতে পারেন।

একেবারে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল।

ভোলা বসাক প্লেট ঠেলে রেখে বলে উঠলো: না দ্বিজেন বাবু, এ নবাবী খানা আমার পোষাবে না। ও সত্য বাবু, সত্য বাবু কোথায়? আরে মশাই, ও-বেলার খয়রোলা মাছের ঝোল আর হাঁড়ীর তলায় এক মুঠো ভাত আছে কি?

কিন্তু কোথায় সত্য বাবু? প্রায় পাঁচশো টাকা ব্যয় করে যে নবাবী খানার ব্যবস্থা করা হলো, তা যে এমনি হবে, কি করে জানবেন তিনি? তাই বুদ্ধিমানের মতো চাকরদের ওপর ভার দিয়ে তিনি পলায়ন করেছেন।

সত্যিই, পোলাউ আর মাংসের অদ্ভুত স্বাদ। পূর্ব্বেই বলেছি, বন্দীদের মধ্যে প্রায় সবাই পূর্ব্ব অথবা উত্তর-বঙ্গের। উত্তর-বঙ্গের কোথাও কোথাও মিষ্টি দিয়ে রাঁধবার রীতি প্রচলিত থাকলেও পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রধান মসলা হলো ঝাল—শুকনো লঙ্কা হোক্, কাঁচা লঙ্কা হোক্, গোলমরিচ হোক্, আদা হোক্, নইলে নিদেন পক্ষে সরষে হোক—ঝাল তাদের চাই-ই এবং প্রচুর পরিমাণে চাই। কিন্তু এ কি খাদ্য? মিষ্টি পোলাউ আর মাংসের কোর্ম্মার কথা ছেড়ে দিলেও ঝাল পোলাউ আর মাংসের ঝোলে আর যা-ই থাক, এতটুকুও ঝাল নেই।

একে একে সবাই উঠে পড়লেন। ননী মন্তব্য করলো: শালা বাবুর্চ্চি এখনো বোধ হয় অফিসে আছে। যাবেন চারু বাবু ব্যাটার দাড়িটা ছিঁড়ে দিয়ে আসতে?

চারু বাবু এই সব দুষ্পাচ্য খাদ্য একেবারে স্পর্শ করেননি। ঘ্রাণেই নাকি তাঁর বমি-বমি করছে। বললেন: কম যা খেয়েছি, তাতেই আমার হয়ে গেছে। ও-সব অখাদ্য আমি খাইওনি, তাই বাবুর্চির দাড়ী ছেঁড়বার উৎসাহও আমার নেই।

দেখতে-দেখতে সবগুলো টেবিল খালি হয়ে গেল। টেবিল ভর্ত্তি পড়ে রইলো সিরাজী খানা,—মিষ্টি পোলাউ, ঝাল পোলাউ, মিষ্টি-মাংস আর ঝাল-মাংস। বাবুর্চ্চিদের উদ্দেশ্যে চোখা-চোখা গালি বর্ষণ করে সবাই গায়ের ঝাল মেটাতে লাগলেন।

সবার শেষে হল্ থেকে বেরিয়ে আসবার সময় দেখলাম, বাগ্মী করালী বিশ্বাস খালি টেবিল-চেয়ারের উদ্দেশ্যে অথবা স্তূপীকৃত খাদ্যের উদ্দেশ্যে তপনো ওজস্বিনী ভাষায় এক্সটেম্পোর চালাচ্ছেন: নবাবী খানা আপনাদের মনোরঞ্জন করতে পারলো না। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হলো যে, নবাবী আমল শেষ হয়ে গেছে। পলাশীর রণক্ষেত্রে স্বাধীনতা-সূর্য্য ডুবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নবাবী সভ্যতা ও আচার-ব্যবহারও বাংলা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আপনাদের আত্মত্যাগ, আপনাদের সর্ব্বাত্মক সংগ্রাম ও আপনাদের রক্তদানের ফলে সেই স্বাধীনতা-সূর্য্য ভারতের গগনে আবার উদিত হলেও সেই নবাবী আমল আর ফিরে আসবে না। কারণ আপনাদের সে প্রকৃতি কোথায়? এই যে মিঠে-পোলাউ, এই যে খাসীর লম্বা ঠ্যাং দাদু আলীবর্দ্দি বা নাতি সিরাজকে হাতে করে খাইয়ে দিতেন—

এমন সময় শিবির প্রতিধ্বনিত করে বেজে উঠলো বিউগল। দশটা বেজে গেছে। পনেরো মিনিট সময় আছে নিজেদের ঘরে ফিরে যাবার। কাজেই করালী বিশ্বাসের বক্তৃতা মধ্যপথে থেমে গেল। খালি টেবিল-চেয়ারগুলোকেই বোধ হয় অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে করালী বাবু বেরিয়ে এলেন। বাইরে এসে বললেন: চারু জোয়ারদারের বোধ হয় দিনাজপুরের কাটারীভোগের চিঁড়ে আছে। যাই এক মুঠ নিয়ে যাই। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে দ্বিজেন বাবু!

১১

রাজবন্দীদের খাদ্যের জন্য গভর্ণমেন্টের গৌরী সেনী ব্যবস্থার পশ্চাতে আছে তাঁদের সুস্পষ্ট একটি কূটনীতি, বাইরের লোক তার

সংবাদ রাখেন কি না জানি নে। সরকারী বরাদ্দ অর্থে আমাদের কায়ক্লেশে সংকুলান হয়, এটা প্রমাণিত করবার জন্ত কিচেন-ম্যানেজার সর্ব্বদাই চেষ্টা করতেন দৈনন্দিন বরাদ্দ অর্থের সবটাই ব্যয়ের। কিন্তু তা হতো না। তাই মাসের শেষ দিকে Feast হতো। ফলে অপব্যয় হতো প্রচুর আর সেই অপব্যয়ের সংবাদ যে যথাস্থানে যথাসময়ে পৌঁছোত, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ঢাকা জেলেই যে শুধু দিবাকর সেনগুপ্ত আছে, তা কি করে বলা যায়? এই বিরাট বন্দীশিবিরের বিশে অমনি ক'জন দিবাকর যে আত্মগোপন করে রয়েছে এবং ইঁদুরের মতো কি ভাবে যে তারা মাটির নীচে দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে মেঝের ওপর চোরাবালির সৃষ্টি করছে, কে তার সঠিক সংবাদ রাখে? গভর্ণমেণ্ট এখানকার মেঝেতে সূচ পড়বার শব্দও শুনতে পান।...

কিন্তু এর পরও আমাদের বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ হ্রাস করা হয় না কেন? প্রয়োজনাতীত অর্থ ব্যয় করে গভর্ণমেণ্ট তাঁদের মারাত্মক শত্রুদের পোষেন কেন? কারণ, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য আমাদের আরামপ্রিয় ও ভোজনপ্রিয় করে তোলা। থালাপূর্ণ দামী খাদ্য না হলে যদি আমাদের মন খারাপ হয়, তাহলে কাজে আমাদের উৎসাহ ও আগ্রহ কমে আসবে, গভর্ণমেণ্টের তাই বিশ্বাস। এই সহজ লজিকের ওপর নির্ভর করেই আমাদের রাজসিক খাদ্য ও নবাবী খানার সুযোগ দেয়া হয়। সরকারী অভীষ্ট খানিকটে সিদ্ধ হয় বৈ কি?...

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গভর্ণমেণ্টের এই নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অর্থ ব্যয় না করলে বরাদ্দ হ্রাস পাবে, আবার ব্যয় করলেও অলস হয়ে পড়বার আশঙ্কা আছে, এই উভয় সংকটকে অপরে ভয় করে চললেও আমরা করিনি। ডায়লেমার দু'টি তীক্ষ্ণ ও উদ্মুখ হর্ণ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে আমরা সাহসী বুলফাইটারের মতো দু'-হাতে ধরে ফেলেছি তার দু'টি শিং এবং মোচড় দিয়ে দিয়েছি ভেঙে বৃষপুঙ্গবের স্কন্ধ।...যেমন পেটুকের মতো খেতাম আমরা, তেমনি ব্যায়ামও করতাম কয়েক ঘণ্টা নিয়মিত ভাবে। ঢাকার ছেলেরা ছিল কুস্তিতে ওস্তাদ, বরিশালের ছেলেরা ছিল প্যারালাল বারে আর কুমিল্লার ছেলেরা ছিল ভারোত্তোলনে। কোনোটাতেই প্রথম স্থান অধিকার না করলেও সবটাতেই ছিলাম আমি।

ঢাকা জেলের পুরানো বন্ধুরা এসে পড়বার পর কুস্তির আখড়া বেশ ভালো ভাবে সরগরম হয়ে উঠলো। ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের পশ্চাৎ-ভাগে তৈরী হলো মাটি, তাতে ঢালা হলো আধ মণ সরষের তেল। সবার দেখাদেখি ল্যাঙট এঁটে আমিও নেমে গেলাম। কামাখ্যাদা'র সঙ্গে প্রথম দিনের লড়াইতেই এতখানি শ্রান্ত হয়ে পড়লাম যে, সাত রাউণ্ড কুস্তির পর আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলাম।

প্রথম দিনের টেনিস খেলার কথাও মনে পড়ে। প্রথমতঃ র‍্যাকেটখানা বেশী বড় ও ভারী মনে হচ্ছিল ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেটের তুলনায়। রবারের বলটাও বড্ড জোরে ছুটে আসে জালের ওপর দিয়ে। শাটল ককের মতো হাওয়ায় আদৌ আটকায় না। ফিরিয়ে দিতে হলেও প্রয়োজন প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত, ব্যাডমিণ্টনের মতো ইকুস-ঠাকুস্ অচল।

অতএব, প্রথম বলটাই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এত জোরে হাঁকিয়ে দিলাম যে, ক্রিকেট খেলার নিয়ম অনুযায়ী সেটা ওভার বাউণ্ডারী আউট হয়ে গেল আর র‍্যাকেটখানা খটাস্‌ করে এসে ঘা মারলো আমারই কপালে। চশমার ব্রিজ গেল দু'টুকরো হয়ে ভেঙে আর কপাল থেঁতলে রক্ত দেখা দিল। তার পর ডাক্তার··· বেনজিন লীল!

প্যারালাল বার ব্যায়ামের ওস্তাদ অজিত দাস, মধুসূদন দত্ত, সুধীর দাস প্রভৃতি। সবাই বরিশালের। সেখানে আমি যোগদান করলাম। রাইজিং থেকে সুরু করে অনেকখানিই ফেললাম শিখে, শুধু পিকক্‌ কিছুতেই হতে পারলাম না।

কিন্তু ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন আর ক্যারম খেলায় আমি প্রায় অদ্বিতীয় হয়ে উঠলাম। ফুটবলে আমার কৃতিত্ব আমি যে কোনো পজিশনে চমৎকার খেলতে পারি। দু'টো পা যেমন চলে, তেমনি চলে আমার মাথাও। চশমাতে আমার পাওয়ার বেশ। তাই খুলে নিয়ে খেলি। তথাপি গোলকিপার কোন্‌ দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে চকিতে দেখে নিয়ে ঠুক্‌ করে মাথা দিয়ে বলটি আস্তে অপর দিক দিয়ে গোলে ঢুকিয়ে দেবার ব্যাপারে আমার দোসর নেই। আর সাংঘাতিক বেগমান আমার শট্‌। পেনাল্টি হলে কোনো কৌশলের আশ্রয় না নিয়েই সোজা শট্‌ মারি আমি, গোলকিপার তা প্রতিহত করবার জন্য আদৌ চেষ্টাই করে না। ভেটারেন গোলকিপার কুশা বাবু তো একবার স্পষ্টই বললেন: দ্বিজেন বাবুর কিক্‌ থামাতে গিয়ে কি হাতখানা খোয়াবো?

ভলিবলে আমার যোগ্যতম স্থান নেটে নয়, দ্বিতীয় সারির মধ্যস্থানটি। ফুটবলের সেণ্টার-হাফের মতো। একেবারে কেন্দ্রস্থল। দায়িত্ব সীমাহীন। বল শুধু ফিরিয়ে দিলেই হবে না, নিয়ন্ত্রিত আঘাতে ওটি জালের ঠিক ওপরে এমনি ভাবে তুলে দিতে হবে যাতে সেণ্টার খেলোয়াড় অনায়াসে তা হয় রসগোল্লাটির মতো টুক্‌ করে প্রতিপক্ষের দিকের ফাঁকা জায়গাটি দেখে ছেড়ে দেবে কিংবা চাপ মেরে একেবারে রাইফেলের বুলেটের মতো উড়িয়ে দেবে। আরো মজার ব্যাপার এই যে, আমি বল মারি দু'হাত জড়ো করে নয়, প্রায়ই এক হাতে। ফলে, আমার ক্ষিপ্রতা সবার চাইতে বেশী।

ব্যাডমিন্টনে আমার স্ক্রু মারা বা প্লেসিং ছিল অনমুকরণীয়। গায়ের জোরে চাপ মারার চাইতে স্ক্রু ও প্লেসিংএর দ্বারা যে কত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে খেলা যায় হৈ-হৈ ও ছুটোছুটি না করে, আমি তা দেখিয়ে দিলাম।

ক্যারম এতই ভালো খেলতাম যে, সারা শিবিরে আমরা ছিলাম চার জন, যাদের খেলা দেখবার জন্ম ভিড় পড়ে যেত। শিবদাস লাহিড়ী, নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, দেবেশপ্রসাদ চৌধুরী ও আমি। বিজ্ঞানের চরম প্রমাণিত হতো আমাদের প্রত্যেকটি মারে। শুধু ঝড়ের মতো আঘাত দেয়া নয় এবং তার ফলে কোথায় একটি ঘুঁটি অপ্রত্যাশিত ভাবে পকেট হয়ে যাওয়া নিয়ে আত্মপ্রশংসা নয়, প্রত্যেকটি মারের পূর্ব্বে তার ফলাফল কি নিশ্চয়ই হবে আর কি-কি হবার প্রচুর সম্ভাবনা আর কি হয়তো হতে পারে, দর্শকদের সমক্ষে তা বিবৃত করে আমরা ষ্ট্রাইকার ছেড়ে দিই।

শুধু ব্যায়াম আর খেলাধুলা নয়। শিবিরে আসবার পরেই জানি নে কি করে জানাজানি হয়ে গেছে যে, ১১২৮ সালের ভারতীয় জাতীয় মহাসভার কলকাতা অধিবেশনে যে বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে, তারই 'বি' কোম্পানীর অন্যতম সার্জেণ্ট ছিলাম আমি। অবশ্য 'বি' কোম্পানীর দু'-চার জন সেনা যে রাজবন্দী হয়ে আসেনি, তা নয়। কিন্তু গল্প করে বেড়াবার মতো ছেলে তারা নয়।

আসল কথা, শিবিরের নেতৃস্থানীয় যাঁরা, সামরিক শিক্ষার কথা তাঁরা কিছু দিন ধরেই বিশেষ ভাবে চিন্তা করছিলেন। সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স বাইরে জেলায় জেলায় যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, শিবিরে আসবার পর সে শিক্ষাদান স্থগিত থাকবে কেন? সমগ্র বাংলা দেশের বিপ্লবী কর্ম্মীরা এখানে এসে জমায়েৎ হয়েছেন। থিওরী যতখানিই জানা থাক না কেন, প্যারেড ও ব্যায়ামের মাধ্যমে হাতে-কলমে সামরিক নিয়মানুবর্ত্তিতা ও কুচকাওয়াজ আদ্যোপান্ত শিক্ষালাভ করে স্ব স্ব কর্ম্ম-এলাকায় ফিরে গিয়ে তাঁরা এমনি স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তোলবার সুযোগ পাবেন। এতে সামরিক মনোবৃত্তি গঠন করা সহজ হবে। হিংসায় বিশ্বাসী বিপ্লবীদের সৈনিকের হিম্মৎ থাকা আবশ্যক।

অনুশীলনের সদস্যেরা সংখ্যায় আমাদের এক-তৃতীয়াংশ হলেও এবং তাদের পৃথক্‌ কিচেন ও পৃথক্‌ ব্যারাক হলেও স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন ব্যাপারে তারা যুগান্তরের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিতে দ্বিধা করলেন না।

অতএব, ১১৩২ সালের এপ্রিল মাসের এক শান্ত সকালবেলায় অকস্মাৎ শিবির কম্পিত করে বেজে উঠলো স্নানের ঘণ্টা নয়, খাবার ঘণ্টা নয়, ঢাকা জেলের সেই পাগলা ঘণ্টিও নয়, বহরমপুর ডিটেনশন ক্যাম্প ইনফ্যান্ট্রির কুচকাওয়াজের ঘণ্টা আর হুড়-হুড় করে বেরিয়ে এসে সবাই ফল্‌-ইন্‌ করলো ইস্টার্ণ ব্যারাকের পূর্ব-দক্ষিণ কোণের মাঠটিতে। সংখ্যায় তারা প্রায় আড়াইশো। অনুশীলন আছে, যুগান্তর আছে, দল আছে, উপদল আছে, গ্রুপ আছে, স্বতন্ত্রেরা আছে, পরিচয়হীনেরা আছে, রিভোল্ট আছে, এমন কি কমিউনিষ্টেরাও আছে; আর, সবার সম্মুখে উন্নত বক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে ইনফ্যান্ট্রির জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং, সর্ব্বাধিনায়ক দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়।

আমার প্রধান অভায়লি সেই রহস্যময় চক্ষু উদাসীন দার্শনিক অমর চাটার্জ্জী।

কিন্তু বিভ্রাট বেধে গেল প্রথম দিনেই।

ঠিক সাতটাতে ঘণ্টা বাজাবার কথা ছিল। কিচেন-ম্যানেজারের ঘণ্টা। যখন পাঁচ মিনিট বাকি, তখন অমরকে আসতে না দেখে কামাখ্যাদা' পাছে দেরী হয়ে যায়, এ জন্ম নিজেই ঘণ্টা বাজিয়ে দেন। কিন্তু তখনো তিন মিনিট বাকি ছিল। যথাসময়ে অমর সেখানে এসে তাঁকে ঘড়ি দেখিয়ে দেয়।

সামরিক নিয়মানুবর্ত্তিতা অত্যন্ত কঠোর। সেখানে তিন মিনিট হেলায়-ফেলায় উড়িয়ে দেবার মতো নয়, প্রতিটি সেকেণ্ড মূল্যবান।

সুতরাং—

সুতরাং জিওসি-র হুকুম এলো: কমরেড্‌স্‌, এ্যাটেন—শন্‌।

পাথরের মতো সবাই দাঁড়িয়ে গেল। একেবারে নিশ্চল, নিশ্বাস পড়ছে কি না সন্দেহ।

জিওসি খট্‌ করে বুটের আওয়াজ করে প্রত্যেকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার পোষাক-পরিচ্ছদ, বেল্ট প্রভৃতির সামান্য ত্রুটিগুলি শুধরে দিতে লাগলেন। কিছু সৈন্য প্রথম দিনেই সামরিক খাঁকি পোষাক সংগ্রহ করে উঠতে পারেনি, জনকতক বয়স্ক লোক সংকোচবশে সংগ্রহ করেও পরিধান করেননি।

Number : জিওসির আদেশ এল। ওয়ান, টু, থ্রি, করে সংখ্যা উচ্চারিত হতে-হতে এসে ঠেকলো ছশো আঠারোয়।

তার পর মুহূর্ত্ত মাত্র নীরব থেকে হুকুম এলো : Orderley, fall out !

লাইন থেকে এক পা এগিয়ে এসে অমর বুটের আওয়াজ তুললো খট্‌।

—Who rang the bell earlier ?

অমর ঘটনা যথাযথ ভাবে বিবৃত করলো এবং আদেশ পেয়ে আবার লাইনে ফিরে গেল।

এবার কামাখ্যাদা'র পালা। দলীয় নিয়মানুবর্ত্তিতার কামাখ্যাচরণ রায় আমার দাদা—শ্রদ্ধেয় ও সম্মানার্হ। সেখানে সর্ব্বদাই তাঁকে সমীহ করে চলাই আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু প্যারেড গ্রাউণ্ডে আমি জিওসি, বি-ডি-সি-আইয়ের সর্ব্বাধিনায়ক আর কামাখ্যাচরণ রায় সেই ইনফ্যান্‌ট্রির সামান্য প্রাইভেট। কামাখ্যাদা' আর ষিজেন নয়, এখানে মেজর জেনারেল গ্যাংগুলী আর প্রাইভেট রয়। সামরিক সংবিধানে দাদা-ভাই নেই। অতএব—

Private Roy, fall out.

কামাখ্যাদা' সামরিক কায়দায় লাইন থেকে বেরিয়ে এলেন। সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম উন্নতবক্ষে প্রস্তর-কঠিন মুখ নিয়ে। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম তাঁর চোখের পানে।

—Why did you ring the bell ?

কামাখ্যাদা' বললেন যে, পাছে দেরী হয়ে যায়, সে জন্য তিনি নিজেই ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য তাঁর সঙ্গে ঘড়ি ছিল না, তাই সময় দেখতে পারেননি।

—The bell was rung three minutes earlier. Did you not commit an offence ?

—Yes, Sir, it was an offence.

—Was it not a breach of military discipline ?

—Yes, Sir.

—Are you not liable to punishment ?

—Certainly, Sir.

চরম মুহূর্ত্ত এসে গেছে! বেশ বুঝতে পারলাম সেই ছশো আঠারো জন বন্দী রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করছে আমার পরবর্ত্তী আদেশের। জলদগম্ভীর স্বরে কোন্ কঠিন শাস্তির আদেশ-বাণী আমি উচ্চারণ করি আমারই দলীয় দাদার প্রতি, সমবেত বন্দীরা যে তারই প্রতীক্ষা করছে, তা স্পষ্ট অনুভব করলাম।

কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বললাম : This is the birthday of the Infantry and this is your first offence. Hence, you are let off with a very grave warning. Don't you follow ?

—Yes, Sir.

—To your lines !

দাবানলের মতো এই সংবাদ সমগ্র বন্দীশিবিরে রাষ্ট্র হয়ে গেল মুহূর্ত্তের মধ্যে।

দুপুরে খাবার হল্‌-এ এসে প্রবেশ করতেই কামাখ্যাদা' সবার সমক্ষেই একেবারে দু'-হাতে জড়িয়ে ধরলেন আমায়। সবলে আলিঙ্গন করে বলে উঠলেন : That's like a real G. O. C. ভারী খুশী হয়েছি তোমার দৃঢ়তায়। এই তো চাই। আমায় শাস্তি দিলেও অবনত-মস্তকে মেনে নিতাম তা।

লজ্জিত মুখে নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করতে যেতে কামাখ্যাদা' আবার আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বরিশাল শঙ্কর মঠের ধীরেনদা'ও পেছনে আসছিলেন কিচেন-ম্যানেজারের কাছে। তিনি বলে উঠলেন : হবে না কেন ? কার হাতের তৈরী দেখতে হবে তো!

সঙ্গী রমেশ দাস প্রশ্ন করলো : কার ?

কেন্দ্রর সত্য গুপ্ত। সেই "চ্যালেঞ্জ ফিপ্‌টি!" একাই হকি-ষ্টীক নিয়ে যিনি পঞ্চাশ জনের মহড়া নেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। জানিস্ নে বুঝি সে কাহিনী ? শোন্ তবে— [ক্রমশঃ।

—আগামী সংখ্যা থেকে—

(রোমাঞ্চমূলক উপন্যাস)

অন্ধকারের দেশে

পঞ্চানন ঘোষাল

['রক্তনদীর ধারা' রচনা ক'রে যে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন লেখক, সেই সুনাম অব্যাহত থাকবে অন্ধকারের দেশেও।]

সা হি ত্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

নুর মুহম্মদ—লাচারীকার। গ্রন্থ—মদনকুমার ও মধুমালার বিরহ-লাচারী (কাব্য)।

নৃত্যগোপাল কবিরত্ন—চিকিৎসক ও নাট্যকার। প্রতিষ্ঠা—বাণীবিলাস নাট্যসম্প্রদায় (টোলের ছাত্রদল লইয়া গঠিত)। গ্রন্থ—রামাবদানম্ (কাব্য। ইহা জর্মানে স্কুলপাঠ্য হইয়াছিল)।

নৃত্যগোর চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রত্নাবলী (১৮৭১)।

নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—Origin & Growth of Castes in India, ১ম (১৯৩১)।

নৃপেন্দ্রকুমার বসু—যৌনতত্ত্ববিদ্। যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। গ্রন্থ—প্রেম ও কামবিজ্ঞান, নরনারীর যৌনবোধ, মালসা-ভোগ, দুর্নীতির ইতিহাস ২ খণ্ড। ফ্রয়েডের ভালবাসা, ফ্রয়েডের নারী-চরিত্র, History of prostitution. সম্পাদক—জীবনের আলো (১৩৩৫), যৌনবিশ্বকোষ (১৩৪৫)।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্যিক এবং গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মহীয়সী মহিলা, শেলী, বিজ্ঞানের জন্মকথা, আবিষ্কারের কথা, সান ইয়াৎ সেন, পণ্ডিত মতিলাল, শতাব্দীর সূর্য (১৩৩৫), ডি ভ্যালেরা (১৩২১), মা (ম্যাক্সিম গোর্কীর অনুবাদ), কীর্তি-কাহিনী, বিজ্ঞানের আবিষ্কার, সেক্সপীয়ারের কমেডী, সেক্সপীয়ারের ট্রাজেডী, বিজ্ঞান বুড়োর গল্প, বাছু মার্কনী, কৃষ্ণ জাতির কর্মবীর, নূতন যুগের নূতন মানুষ, পঞ্চপ্রদীপ, দুঃখজয়ীর দল, আমার বাংলা, উনিশ শ' পাঁচ, রাষ্ট্রনেতা জহরলাল, কুলী (অনুবাদ), থ্রি মাস্কেটিয়ারস (অনুবাদ), দু'টা পাতা একটা কুঁড়ি (অনুবাদ), এইচ, জি, ওয়েলসের গল্প, পূজোর বাজার। সম্পাদক—গল্পভারতী।

নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—যাঙালী কোন্ পথে, ম্যাদেম বোভারি।

নৃপেন্দ্র বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভাগ্য-নিরূপিতা, হিমানী, পরিণয়-সার, বিকাশ ও ব্যথা।

নৃসিংহ—টীকাকার। গ্রন্থ—দীপিকা।

নৃসিংহকুমার দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রূপের লক্ষ্মী।

নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। শিক্ষা—এম এ। গ্রন্থ—জমিদারী, মহাজনী ও বাজার একাউন্টস (১৮৬৮), পত্রপ্রকাশ (১৮৭২), কুমারসম্ভব (অনুবাদ, ১৮৭৩)। সম্পাদক—সাহিত্য-সংহিতা, (মাসিক, ১৩০৭—১০, ১৩১২—১৪, ১৩১৯—২০)।

নৃসিংহ দৈবজ্ঞ—ভাষ্যকার। পিতা কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ। গ্রন্থ—বাসনাবার্ত্তিকম্ (সিদ্ধান্ত-শিরোমণি কৃত বাসনাবার্ত্তিকের টীকা), সূর্যসিদ্ধান্ত (১৩৭৫ শক)

নৃসিংহদেব রায় মহাশয়, রাজা—কবি। জন্ম—১৭৪০ খৃঃ বাঁশবেড়িয়ার রাজবংশে। পিতা—গোবিন্দদেব রায় মহাশয়। কাশী গমন (১৭৯৭)। গ্রন্থ—কাশীখণ্ডের পদ্যানুবাদ, উড্ডীশতন্ত্র (বঙ্গানুবাদ)।

নৃসিংহপঞ্চানন ভট্টাচার্য—টীকাকার। ১৬৭৫ খৃঃ বর্তমান ছিলেন। টীকাগ্রন্থ—ন্যায়সিদ্ধান্ত-মঞ্জরীভূষণ।

নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায়—শিক্ষাব্রতী সাহিত্যিক। জন্ম—১২৮৮ খৃঃ ৮ই কার্তিক বর্ধমান জেলার অন্তর্গত পাটলি গ্রামের গঙ্গাপুর নামক স্থানে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৩৫০ বঙ্গ ২৭এ কার্ত্তিক ভদ্রকালী (হুগলী) নিজবাটীতে। পিতা—কালীনাথ মুখোপাধ্যায়। কাশী হইতে 'কাব্যসিন্ধু' উপাধি লাভ। গ্রন্থ—সাহিত্য-প্রসূন (১৯০১), সাহিত্য-দর্পণ (১৮৯২), বর্ণজ্ঞান (১৮৯৫), আশুতোষ সরল ব্যাকরণ, আর্যনারীর গৃহধর্ম (১৯১২), সংক্ষিপ্ত বাংলা ব্যাকরণ, জ্ঞানমুকুল, সাহিত্য-রত্নাকর, পূজোপহার, কবিতা-প্রসূন, (৩ খণ্ড), নীতিপ্রসূন, সংস্কৃত ব্যাকরণসার, সংস্কৃত ব্যাকরণসার সোপান (১৮৯২), Moral readings : A garland of poems (১৮৯২), Boys first word-book (১৮৯৫), Readings in English Literature, Hints in the study of Sanskrit, মহাজনী হিসাব, The code of civil procedure, 1882—1889. সম্পাদক—ধর্মপ্রচারক। সহ-সম্পাদক—বসুমতী।

নৃসিংহ সরস্বতী আচার্য—গ্রন্থকার। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে কাশীধামে। গ্রন্থ—ভেদধিক্কার (১৫১৬ খৃ), সুবোধিনী টীকা (১৫১৬ খৃঃ), বেদান্ত-ডিণ্ডিম (১৮১০ খৃঃ মুদ্রিত)।

নৃহরি—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—জাতকসার-দীপিকা।

পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্যসেবী। নিবাস—২৪-পরগনার অন্তর্গত নীলা গ্রামে। সম্পাদক—প্রভা (মাসিক, ১৩০১)।

পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়—কবি। কাব্যগ্রন্থ—অশ্রু ও আকাশ, অন্ধকার, সুরা ও শোণিত, রাত্রির যাত্রী (উপন্যাস, ১৩৫৩)।

পঞ্চানন তর্করত্ন—পণ্ডিত। জন্ম—১২৭৩ বঙ্গ ভট্টপল্লীতে। পিতা—নন্দলাল বিদ্যারত্ন। কর্ম—বঙ্গবাসী কার্যালয়, অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ। গ্রন্থ—সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী পূর্ণিমায় টীকা, অমরমঙ্গল, ধর্মসিদ্ধান্ত, বৈশেষিকদর্শনম্ (ব্যাখ্যা), যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (বঙ্গানুবাদ, ১৩১১), সর্বমঙ্গলোদয়ম্ (কাব্য, ১৯৫৩ শক)।

পঞ্চানন নিয়োগী—শিক্ষাব্রতী ও রসায়নশাস্ত্রবিদ্। এম, এ। গ্রীফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কার (১৯০৬), ডক্টরেট উপাধি লাভ। বঙ্গীয় সরকারের গবেষক (১৯০৪-৬), অধ্যাপক, গভর্ণমেন্ট কলেজ, রাজশাহী, অধ্যক্ষ, মহারাজা মণীন্দ্র কলেজ। গ্রন্থ—আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন (১৩২২), তুফান, বৈজ্ঞানিক জীবনী (১৩২২), Iron in Ancient India.

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি ও সংবাদপত্রসেবী। গ্রন্থ—প্রেমনাটক, রমণীনাটক (কাব্য, ১২৫৪); গল্প—রসিকতরঙ্গিণী, (ছন্দাকারে) রসতরঙ্গিণী। সম্পাদক—অরুণোদয় (সাপ্তাহিক, ১৮৪৮)।

পঞ্চানন ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। নিবাস—দেওঘর। প্রতিষ্ঠাতা—আর্যমিশন ইনস্টিটিউসন, কলিকাতা। গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ধর্ম ও পূজাদি মীমাংসা, স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, যোগ-সংগীত।

পঞ্চানন মজুমদার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আলো-আঁধার, মরীচিকা।

পঞ্চানন মিত্র, ডক্টর—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—কলিকাতার উপকণ্ঠে সুঁড়ো নামক স্থানে। ডি এস সি। অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থ—Pre-Historic India.

পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। এম-এ। নিবাস—কলিকাতা। The co-operative credit movement in India, Indian constitutional documents, 1773-1915। সম্পাদক—Indian Citizen Series.

পঞ্চানন রায়-চৌধুরী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কাপ্তেন গোবিন্দরামের দপ্তর, কাঞ্চনমালা (১৮৯১), নবীন সন্ন্যাসীর গুপ্তকথা (১৩০৩)।

পতঞ্জলি—দার্শনিক পণ্ডিত। খৃঃপূঃ ১৫০ বর্তমান ছিলেন। গ্রন্থ—পাতঞ্জল-দর্শন, পাতঞ্জল-মহাভাষ্যম্ (ব্যাকরণ, ১৮৭৮ খৃঃ মুদ্রিত)। পাতঞ্জলযোগসূত্রম্ (১৮৮৩ খৃঃ মুদ্রিত)।

পদ্মগুপ্ত—গ্রন্থকার। ১১শ শতাব্দী। গ্রন্থ—নবসাহসাঙ্কচরিত।

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য—পণ্ডিত। জন্ম—শ্রীহট্ট। এম-এ, বিদ্যাবিনোদ, মহামহোপাধ্যায় উপাধিলাভ। কিছুকাল শিলং সেক্রেটারিয়েটে কর্মের পর অধ্যাপক, কটন কলেজ, গৌহাটী। গ্রন্থ—বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তিনিরাশ, হিন্দুবিবাহ-সংস্কার, কামরূপশাসনাবলী (১৩৩৮), পরশুরাম কুণ্ড ও বদরিকাশ্রম ভ্রমণ।

পদ্মনাভ—জ্যোতির্বিদ্। ১২শ শতাব্দী। পিতা—যমুনাপুরনিবাসী কৃষ্ণদাস (১১৫০খৃঃ)। গ্রন্থ—ব্যবহারপ্রদীপ।

পদ্মনাভ মিশ্র—দার্শনিক পণ্ডিত। গৌড়দেশীয় 'গঢ়' নামক রাজ্যের রাণী দুর্গাবতীর (১৫৪৮-১৫৬৪ খৃঃ) সভাপণ্ডিত। পিতা—জগদ্গুরু বলভদ্র মিশ্র। গ্রন্থ—দুর্গাবতী-প্রকাশ, ৭ খণ্ড, বীরভদ্রচম্পূ, অলঙ্কার, স্মৃতিদুর্গাবতীপ্রকাশ ও প্রায়শ্চিত্ত-প্রকাশ, বেদান্ত, ন্যায়বৈশেষিক।

পদ্মপ্রভ সূরি—গ্রন্থকার। পিতা—কৃষ্ণদেব। গ্রন্থ—ভুবনদীপক বা গ্রহভাবপ্রকাশ (জাতকগ্রন্থ—১৫৮৭ খৃঃ)।

পদ্মসুন্দর গণি—জৈন পণ্ডিত। গ্রন্থ—পার্শ্বনাথচরিত (সংস্কৃত ভাষায়—১০৮৩ খৃঃ)।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—সাহিত্যিক ও সংবাদপত্রসেবী। জন্ম—১৩০০ বঙ্গ ১১ই ভাদ্র ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের মধ্যপাড়া নামক গ্রামে (মাতুলালয়ে)। পিতা—কামিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (শিক্ষক, মৈমনসিং স্কুল)। ছাত্রাবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়া সিঙ্গাপুর, জাভা, সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ এবং বৈদেশিক ভাষা—জর্মান এবং ফরাসী শিক্ষা। কর্ম—সবুজপত্র (মাসিক), দৈনিক স্বরাজ, বিজলী, কল্লোল, আনন্দবাজার, দেশ, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, অঙ্কো প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে। অসংখ্য একাঙ্কিকা নাটিকা রচনা। গ্রন্থ—নীলপাখী (অনুবাদ), সোনার দেশ, বীরত্বের কাহিনী, লে মিজারেবল্ (অনুবাদ), বুবুক্ষা (অনুবাদ), এক দিন যারা মানুষ ছিল, খেলোয়াড়, রামধনু, বিদুষী (নাটক)।

পরম মিশ্র—জ্যোতির্বিদ্। পিতা—রত্নমণি। গ্রন্থ—মুকুন্দবিজয় (ফলিত জ্যোতিষ, ১৫৩৪ খৃঃ)।

পরম সুখ—গ্রন্থকার। পিতা—সীতারাম। গ্রন্থ—রমলনবরত্ন (কাশী, ১৮১০ খৃঃ)।

পরমানন্দ কাব (পণ্ডিত)—অনুবাদক। পিতা—কবিরাজ ব্রজচন্দ্র। গ্রন্থ—শৃঙ্গারসপ্তশতী—(বিহারী দাসের হিন্দী সতসঈ-এর সংস্কৃত অনুবাদ। ১৯২৫ সংবত)।

পরমানন্দ গুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গৌরাঙ্গবিজয়।

পরমানন্দ গোস্বামী—গ্রন্থকার। জন্ম—বসন্তপুর। গ্রন্থ—জামাতৃর।

পরমানন্দ দাস, কবিকর্ণপূর—[কবিকর্ণপূর দ্রষ্টব্য]।

পরমানন্দ ন্যায়রত্ন—অনুবাদক। গ্রন্থ—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (বঙ্গানুবাদ)।

পরমানন্দ পাঠক—জ্যোতির্বিদ্। নিবাস—কাশীধাম। গ্রন্থ—প্রশ্নমাণিকমালা (১৭৪৮)।

পরমানন্দ পুরী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গোবিন্দবিজয়।

পরমানন্দ মৈত্রেয়—সংগ্রহকার। গ্রন্থ—প্রত্যক্ষ জ্ঞানদীপিকা (১৭৫১ শক)।

পরমানন্দ সরস্বতী, স্বামী—কবি ও সন্ন্যাসী। পূর্বনাম—পুলিনবিহারী মুখোপাধ্যায়। জন্ম—১২৮৩ বঙ্গ ৩রা আশ্বিন সাতক্ষীরা মহকুমার রাটিপাড়া কুমিরা গ্রামে। পিতা—মথুরানাথ মুখোপাধ্যায় (জমীদার)। ১২ বৎসর বয়সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা। কয়েকজন মহাত্মার সঙ্গলাভ করিয়া সংসার ত্যাগ। পরে হাওড়া রামরাজাতলা শঙ্করমঠ প্রতিষ্ঠা ও উহার মঠাধীশ। গ্রন্থ—কবিতাহার, ৩ খণ্ড (কাব্য), ব্রহ্মদত্তের রাজসূয়যজ্ঞ (নাটক), গোবর্ধনলীলা (নাটক), হয়ে পাগলা (প্রহসন), আনন্দ-প্রদীপ। আনন্দসাগর।

পরমানন্দ সেন—বৈষ্ণব কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৫২৭ খৃঃ নদীয়া জেলায় কাঞ্চনপল্লীতে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৫৭৬ (আনু)। পিতা—শিবানন্দ সেন। নিবাস—বর্ধমান কুলীন গ্রাম। বৈষ্ণবাচার্য দর্পণ মতে ইনি কলিকাতা নিবাসী। মহাপ্রভুর শিষ্য। মহাপ্রভু ইহাকে 'কবিকর্ণপূর' বলিয়া ডাকিতেন এবং পুরীদাস নামে অভিহিত করেন। গ্রন্থ—চৈতন্যচরিত কাব্য, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ, কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা, অলঙ্কারকৌস্তুভ, চৈতন্যশতক, স্তবাবলী, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা।

পরমেশপ্রসন্ন রায়—গ্রন্থকার। নিবাস—আসানসোল। বি, এ,। গ্রন্থ—মেয়েলী ব্রতকথা।

পরমেশ্বর কবীন্দ্র—বঙ্গীয় কবি। জন্ম—১৬শ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম। গ্রন্থ—পরাগলী মহাভারত (আদি—অভিষেক) [বাংলার শাসনকর্তা হোসেন সাহেব (১৪৯৪—১৫২৫ খৃঃ) সেনাপতি পরাগল খাঁ-এর আদেশে]।

পরশুরাম চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কালিয়দমন, সুদামাচরিত্র, গুরুদক্ষিণা, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কৃষ্ণগুণ-কথন ; জন্মাষ্টমী ব্রতকথা।

পরশুরাম মিত্র—প্রাচীন কবি। জন্ম—পশ্চিমবঙ্গের চম্পক নগরের (আনু) ১০০০ বঙ্গাব্দের শেষভাগে। গ্রন্থ—কৃষ্ণমঙ্গল, মাধব-সঙ্গীত (১১১০ খৃঃ)।

পরাশর—জ্যোতির্বিদ্। জন্ম—খৃঃ পূঃ ১৩০০ অব্দ। গ্রন্থ—পরাশরতন্ত্র পরাশর লঘু বা উড়ুদায়।

পরিতোষ দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পরিণয়-রহস্য।

পরিমল গোস্বামী—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৯৭ খৃঃ ফরিদপুর জেলার রতনদিয়া গ্রামে (মাতুলালয়ে)। পিতা—কবি বিহারীলাল গোস্বামী। নিবাস—পাবনা। শিক্ষা—প্রবেশিকা (১৯১৫), বি, এ (বিদ্যাসাগর কলেজ), কিছুদিন বিশ্বভারতীর কলাভবনে, এম, এ (প্রাইভেট, ১৯২৩)। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্য সাধনা। রস-রচনা ইঁহার বৈশিষ্ট্য। ফটোগ্রাফীতেও ইনি

বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। বর্তমানে যুগান্তর পত্রিকার ম্যাগাজিন বিভাগে কর্ম। গ্রন্থ—বুদ্বুদ (১১৩৬), ট্রামের সেই লোকটা, দুমুখের বিচার, ঘুষ, ব্ল্যাকমার্কেট, মারকে লেঙ্গে, ক্যামেরার ছবি, আধুনিক আলোকচিত্রণ, আষাঢ়ে দেশে, ডিটেকটিভ শিবনাথ। সম্পাদক—শনিবারের চিঠি (মাসিক, ১১৩২—৩৬), সচিত্র ভারত (সাপ্তাহিক, ১১৩৭), অলকা (মাসিক, প্রমথ চৌধুরী সহ, ১১৩৮)।

পরিমলকুমার রায়—গ্রন্থকার ও অর্থশাস্ত্রবিদ্। জন্ম—মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি শহরে। মৃত্যু—১১৫১ খৃঃ ১৪ই অক্টোবর নিউইয়র্কে (ছদ্মনাম—সুবাস।) পিতা—বরেন্দ্রকুমার রায়। শিক্ষা—এম, এ, বি-এল, পি, আর, এস (১১৪৬), পি, এইচ, ডি (অক্সফোর্ড, ১১৫১)। ছাত্রাবস্থা হইতেই ইনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। কারাবরণ (১১৩১—৩৮, ১১৪০—৪৪)। কারারুদ্ধ অবস্থায় বি, এ, এম, এ, বি-এল ও পি, আর, এস হন। কর্ম—অধ্যাপক, বঙ্গবাসী, সিটি, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়। Indian Administrative service, U. N. O. (Social & Economical Commission for Europe ১১৫১)—রোম, নিউ ইয়র্কে গমন (১১৫১)। গ্রন্থ—The Agricultural Economics of Bengal (১১৪৬), The Theory & Practice of Agricultural Insurance (১১৫১), ইদানিং (সুবাস ছদ্মনামে)।

পরেশচন্দ্র নন্দী—চিকিৎসক। জন্ম—১৩১৩ বঙ্গ ত্রিপুরা জেলায় নাছিরাবাদ গ্রামে। মৃত্যু—১৩৪০ বঙ্গ, বৈশাখ। শিক্ষা—প্রবেশিকা (ত্রিপুরা বঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয়), বি, এস্, সি, এম, বি (মেডিক্যাল কলেজ, ১১৩২)। কর্ম—মেডিক্যাল কলেজ রেসিডেণ্ট হাউস সার্জেন। সম্পাদক—শতদল (মাসিক)।

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—১১০৪ খৃঃ ডিসেম্বর ঢাকা জেলার সুলতান সাহাদি গ্রামে। পিতা—গোপীমোহন সেনগুপ্ত। শিক্ষা—প্রবেশিকা (রূপতারা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়—১১২২); আই, এস্ সি (জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ, ১১২৪), বি, এস্ সি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১১২৮)। কর্ম—শিক্ষকতা (১১২৮—৩০), সাংবাদিকতা (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১৩২—৪০), বর্তমানে কাশিমবাজার মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী। গ্রন্থ—বিজ্ঞানের মায়াপুরী (১৩৪৬), কর্মবীর রাজেন্দ্রনাথ (১৩৪৭), রবীন্দ্রনাথ (১৩৪৮), অদৃশ্য গোয়েন্দা (১৩৫২), নূতন আলো (১৩৫৪), মানুষের বন্ধু (১৩৫৭), হেনরী ফোর্ড, দানবীর কার্ণেগী, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, শিলাদিত্য, মহারাজা গুহ বাপ্পাদিত্য, সমর সিংহ, লক্ষ্মণ সিংহ, হাম্বির, চণ্ড, রাণাকুম্ভ, রাণা সঙ্গ, বনবীর।

পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—চিকিৎসক। জন্ম—১২১৮ বঙ্গ মেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুর গ্রামে। পিতা—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা)। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, মিহিজাম। সর্পদংশনের বিখ্যাত ঔষধ Lexin-এর আবিষ্কারক। গ্রন্থ—Hand-book of Snake-bite.

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়—গীতিনাট্যকার। গীতিনাট্য—অকাল-বোধন, তাপসকুমারী, ধ্রুব বা শৈশব আরাধনা, পঞ্চবটী।

পশুপতি চৌধুরী—গীতিনাট্যকার। গীতিনাট্য—কল্যাণী, দশরথ, শ্মশান, সুযজ্ঞ।

পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়—সাংবাদিক। প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক—প্রভাবতী (দৈনিক, ১৮৭১)।

পশুপতি ভট্টাচার্য—চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২১৮ বঙ্গ, ৪ঠা পৌষ। গ্রন্থ—যুক্তধারা, ঘূর্ণাবর্ত, পদব্রজা, কৃষ্ণদ্বীপের রাণী।

পশুপতি মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—উন্মাদিনী (উপ, ১২১৭)।

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। ইনি বহু গীতিনাট্য ও গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ—পরদেশী, মানিনী সত্যভামা, সম্বরাসুর, জয়মাল্য, নজরে নাকাল, রাখীবন্ধন, আরবী হুর, লয়লা-মজনু, ধর্মপথ, মীনা, মা, ভাস্কর পণ্ডিত, সংযমা, সতী, দেবাসুর, দধীচি বা বজ্রসৃষ্টি, চাঁদ সদাগর।

পাঁচকড়ি দে—গ্রন্থকার। জন্ম—কলিকাতা। বহু রহস্যোপন্যাসের লেখক। গ্রন্থ—মায়াবী, মনোরমা, মায়াবিনী, পরিমল, জীবন্মৃত-রহস্য, হত্যাকারী কে? নীলবসনাসুন্দরী (১১০৪), গোবিন্দরাম (১১০৫), রহস্য-বিপ্লব, মৃত্যু বিভীষিকা, প্রতিজ্ঞা-পালন (১১০৭), বিষম-বৈসূচন, জয়-পরাজয় (১১০৭), হত্যারহস্য, সহধর্মিণী, ছদ্মবেশী, লক্ষ টাকা (১১০৮), নরাধম, কালফণী, বাঙ্গালীর বীরত্ব। সম্পাদিত গ্রন্থ—ভীষণ প্রতিশোধ, ভীষণ প্রতিহিংসা, শোণিততর্পণ, রঘু ডাকাত, মৃত্যুরঙ্গিণী, হরতনের নওলা, সতী সীমন্তিনী, সুহাসিনী (১১০৮), কৃষ্ণযাত্রা (সংকলিত, গোবিন্দ অধিকারী কৃত, ১৩৪৪)।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—সাংবাদিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৭৪ বঙ্গ ভাগলপুরে। মৃত্যু—১৩৩০ বঙ্গ কার্ত্তিক। পৈতৃক নিবাস—২৪-পরগনার অন্তর্গত হালিশহর গ্রামে। শিক্ষা—বি-এ (ভাগলপুর তেজনারায়ণ কলেজ), কাশীতে সংস্কৃত, সাহিত্য ও সাংখ্য বিষয়ে পরীক্ষা। কর্ম—সরকারী চাকুরী, পরে অধ্যাপনা ও সংবাদপত্র সেবা। গ্রন্থ—উমা (১১০১), রূপলহরী, ভিক্টোরিয়া-চরিত, সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব (১৩২৫), বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয় (১৩২২), আইন-ই-অকবরী (বঙ্গানুবাদ), চৈতন্যচরিতামৃত (সংস্কৃত)। সম্পাদক—বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বসুমতী, দৈনিক নায়ক, রঙ্গালয় (সাপ্তাহিক, ১৩০৮—১১), সাহিত্য (১৩২৭), হিন্দুস্থান, প্রবাহিনী (সাপ্তাহিক, ১৩২০—২২)।

পাঁচুলাল ঘোষ—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৮৩ খৃঃ মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথিতে। পিতা—প্রসন্নকুমার ঘোষ (কবি)। গ্রন্থ—আঙুর (১৩১৮), আপেল (১৩২৩), শীতল জীবনী (১৩৪৮)।

পার্থসারথি মিশ্র—মীমাংসাকার। ১৩শ শতাব্দী। পিতা—যজ্ঞাত্ম মিশ্র। টীকাগ্রন্থ—শাস্ত্রদীপিকা, ন্যায়রত্নাকর, ন্যায়রত্নমালা (বেনারস, ১১০০ খৃঃ মুদ্রিত), শ্লোকবার্তিক (টীকা, মুদ্রিত ১৮১৮ খৃঃ), তন্ত্ররত্ন।

পার্বতীকান্ত বাচস্পতি—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ১১শ শতাব্দী। পঞ্চকোটের রাজসভায় সভাপণ্ডিত। গ্রন্থ—নব্য ন্যায়।

পার্বতীচরণ দাস—সংবাদপত্রসেবী। সম্পাদক—সংবাদ-মৃত্যুঞ্জয়ী (১৮৩৭ খৃঃ। এই পত্রিকার সম্পাদকীয়, সংবাদ এবং বিজ্ঞাপন কবিতায় রচিত)।

পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—লাবণ্যবতী (১৮৭৫)।

পার্শ্বনাথ গণি—জৈন নৈয়ায়িক ও গ্রন্থকার। ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। টীকাগ্রন্থ—ন্যায়প্রবেশ-পঞ্জিকা।

পিয়ার্স, জে, রেভা—পাদরী। গ্রন্থ—ইংরেজি ভাষায় অভিধান (১৮২০), ভূগোল ও জ্যোতিষ (১৮২৪), বাক্যাবলী, নীতিকথা।

পীতাম্বর—জ্যোতির্বিদ্। গ্রন্থ—বিবাহপটল (১৫২৪ খৃঃ), নির্ণয়ামৃত (টীকা)।

পীতাম্বর দাস-চৌধুরী—বৈষ্ণব পদকর্তা। পিতা—রামগোপাল চৌধুরী। গ্রন্থ—রসমঞ্জরী।

পীতাম্বর দে—সঙ্গীতকার। জন্ম—১৮৩৮ খৃঃ বীরভূম জেলার অন্তর্গত জয়বাজার। মৃত্যু—১৯০৪ খৃঃ। শিক্ষকতা, বীরভূম, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে। অবসর গ্রহণ (১৮৯৭), এবং বহু গান রচনা। গ্রন্থ—গীতাবলী।

পীতাম্বর ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রতিবিলাপ (কুমারসম্ভব কাব্যের আংশিক অনুবাদ)।

পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়—বঙ্গীয় আভিধানিক। নিবাস—উত্তরপাড়া। গ্রন্থ—শব্দসিন্ধু (অভিধান ১২২৪ বঙ্গ), ক্রিয়াযোগসার (১২৩১)।

পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ—কামরূপ-রাজের সভাপণ্ডিত। (আনু) ১৭শ শতাব্দী। গ্রন্থ—শ্রাদ্ধকৌমুদী, তিথিকৌমুদী, দায়কৌমুদী, বিবাদকৌমুদী (১৫২৬ শক)।

পীতাম্বর সেন—কবি। নিবাস—শিবাদহ। গ্রন্থ—উষাহরণ (কাব্য)।

পীযূষকান্তি ঘোষ—সাংবাদিক। জন্ম—১৮৭৫ খৃঃ। মৃত্যু—১৩৩৫ বঙ্গ, কার্ত্তিক। পিতা—মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ। শিক্ষা—প্রেসিডেন্সী কলেজ। অন্যতম পরিচালক—অমৃতবাজার পত্রিকা। সম্পাদক—The Hindu Spiritual Magazine.

পুরন্দর খাঁ—গোপীনাথ বসু দ্রষ্টব্য।

পুরন্দর মণ্ডল—সঙ্গীত-রচয়িতা ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৪৩ বঙ্গ ৩০এ অগ্রহায়ণ। খেজুরী থানার অন্তর্গত কশাড়িয়া গ্রাম, মেদিনীপুর। মৃত্যু—১৩০৬ বঙ্গ, ২১এ শ্রাবণ। পিতা—রসিকচন্দ্র মণ্ডল। গ্রন্থ—সঙ্গীত-সুধাকর, কলিমাহাত্ম্য, মনঃশিক্ষা।

পুরুষোত্তম গোস্বামী—টীকাকার। ১৮শ শতাব্দী। পিতা—পীতাম্বর গোস্বামী। টীকাগ্রন্থ—ভাষাপ্রকাশ, সুবর্ণসূত্র, প্রস্থানরত্নাকর।

পুরুষোত্তম তর্কালঙ্কার—বৃত্তিকার। জন্ম—রাজসাহী জেলার বুড়ীর ভাগ গ্রামে। গ্রন্থ—ভাষাবৃত্তি (পাণিনি ব্যাকরণের বৃত্তি)।

পুরুষোত্তম দেব—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ত্রিকাণ্ডশেষ (১১শ শতক। অমরকোষের পরিশিষ্ট), বর্ণদেশনা, দ্বিরূপকোষ, একাক্ষরকোষ, হারাবলী (অভিধান), জ্ঞাপকসমুচ্চয়, উণাদিবৃত্তি।

পুরুষোত্তম দেব গজপতি—অসমীয়া গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দীপিকাচন্দ (১১শ শতাব্দী)।

পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ—কামরূপীয় পণ্ডিত। পিতা—শুকদেব রায়-চৌধুরী। রাজা নরনারায়ণের সমসাময়িক। ইনি কলিকাতা প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশের পূর্বপুরুষ। গ্রন্থ—প্রয়োগ-রত্নমালা, মুক্তিচিন্তামণি।

পুরুষোত্তম মিত্র (বিদ্যাবাগীশ)—বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবি। জন্ম—নবদ্বীপ জেলার ফুলিয়া গ্রামে। পিতা—গঙ্গাদাস মিত্র। বৃন্দাবনে গমন ও 'প্রেমদাস' আখ্যা লাভ। গ্রন্থ—চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী বা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (১৭১২ খৃঃ), বংশীশিক্ষা (১৭১৬ খৃঃ), আনন্দভৈরব, মনঃশিক্ষা।

পুষ্প বসু—গ্রন্থকর্ত্রী। জন্ম—১৯০৫ খৃঃ ২৭এ নভেম্বর কলিকাতা। স্বামী—ব্যারিষ্টার ডি, কে, বসু। বাল্যজীবন কাটে সিমলা পাহাড়ে। ইনি বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যসাধনা করেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখিকা। গ্রন্থ—অলকা (উপন্যাস, ১৩৪৫), বিধির বিধান, জীবন-প্রদীপ, নূতন চাকরের কীর্তি, গল্প-সংগ্রহ, প্রদীপ-পতঙ্গ, ভুতুড়ে।

পুষ্পলতা দেবী—মহিলা গ্রন্থ রচয়িত্রী। গ্রন্থ—পুষ্পচয়ন (উপ), বিনিময় (উপ)।

পূরণচাঁদ নাহার—সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক। জন্ম—১৮৭৫ মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জে। মৃত্যু—১৯৩৬ খৃঃ ৩১শে মে। শিক্ষা—বি এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ), এম, এ, (১৮৯৮), বি, এল। গ্রন্থ—জৈন অনুশাসন লিপি, ৩ খণ্ড।

পূরণচাঁদ শ্যামসুখা—জৈন গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জৈন দর্শনের রূপরেখা, জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীর, জৈনধর্মের পরিচয়।

পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চিরসঙ্গিনী (১২৯১), ছায়াপথ, ১২ খণ্ড (১৩০৫), ৩য় ৪র্থ (১৩০৮), রাধানাথের কন্যাদায় (১৩০৭)।

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্যিক ও রাজকর্মচারী। জন্ম—১৮৪৮ খৃঃ। মৃত্যু—১৯২২ খৃঃ। পিতা—যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কর্ম—স্পেশাল সব-রেজিষ্ট্রার (১৮৭২), ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। অবসর গ্রহণ (১৮৯৭)। গ্রন্থ—শৈশব-সহচরী, মধুমতী।

পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কায়স্থতত্ত্বতরঙ্গিণী, গুপ্ত সংহিতা।

পূর্ণচন্দ্র দাস—কবি। জন্ম—মেদিনীপুরের অন্তর্গত মহিষাদল। গ্রন্থ—গাথা (১৩০১), উচ্ছ্বাস (১৩১৮)।

পূর্ণচন্দ্র দাস, ডাক্তার—চিকিৎসক। সম্পাদক—বারুইপুর চিকিৎসা-তত্ত্ব (পাক্ষিক, ১২৮০, বারুইপুর)।

পূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভটসাগর—শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৫৭ খৃঃ, ১০ই আগষ্ট। মৃত্যু—১৯৪৬ খৃঃ, ১৮ই অক্টোবর কলিকাতা বাগবাজার। শিক্ষা—বি, এ, (প্রেসিডেন্সী কলেজ)। কর্ম—শিক্ষকতা, বিভিন্ন স্কুল, অধ্যাপক, আশুতোষ কলেজ। উদ্ভটসাগর উপাধিলাভ (কাশী)। গ্রন্থ—উদ্ভটশ্লোকমালা, উদ্ভটসমুদ্র, স্তবসমুদ্র, প্রশ্নোত্তর-মণিরত্নমালা, মোহমুদ্গর ও মোহকুঠার। সম্পাদিত গ্রন্থ—মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পাণ্ডবগীতা, উপক্রমণিকা (ব্যাকরণ,)।

পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। জন্ম—হুগলী জেলায় চুঁচুড়ায়। গ্রন্থ—(ভূতনাথ চৌধুরী সহ) পরিমিতি প্রাকৃত (Process of mensuration, ১৮৭৪), পরিমিতি প্রাকৃত (Treatise on mensuration, ১৮৭৩)।

পূর্ণচন্দ্র মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পদার্থবিদ্যাসার।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

১১

১২ই জুলাই প্রভাত ৭টায় মস্কো বিমান-ঘাঁটি থেকে স্তালিনগ্রাদ যাত্রা করা গেল। বেলা ৯টার সময় ভরোনেৎসে বিমান থামলো, আমরা চা-পান করতে করতে দোতলার জানালা দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত নগর দেখলাম, বহু শুভ্র সমুন্নত বাড়ী আবার আকাশে মাথা তুলেছে। বিমান নীচু দিয়ে চলেছে: ডন নদীর দু'পাশে সমবায় কৃষিক্ষেত্রের বিশাল বিস্তার, অরণ্যখণ্ড, স্তেপভূমি ও ছোট-বড় গ্রাম। দেখতে দেখতে বেলা সাড়ে এগারটায় স্তালিনগ্রাদে অবতরণ করা গেল। প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন-রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে। মোটরে সহরের দিকে অগ্রসর হলাম, দুই দিকে ধ্বংসস্তূপ, কাঁটাতারের বেড়া, পরিত্যক্ত পরিখার খাদ, তারই মধ্যে নূতন জনপদ গড়ে উঠছে। পথের দু'ধারে সহরতলীর চেহারা সুশ্রী নয়। ক্রমে প্রশস্ত মসৃণ পথে নগরীর কেন্দ্রস্থলে এসে পড়লাম। একটা মাঝারী গোছের হোটেলে আস্তানা পেলাম। বাঙ্গলা দেশের মত গরম। ফেরিজী পোষাক ছেড়ে স্নান করে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে বাঁচি। লেনিনগ্রাদ থেকে স্তালিনগ্রাদ, এ যেন দার্জিলিং থেকে গ্রীষ্মকালের কলকাতা।

হোটেলের জানালা দিয়ে দেখছি দূরে ভল্‌গা নদী, সম্মুখে প্রকাণ্ড একটা ছ'তালা বাড়ী, সমবায় সমিতির বিপণী। দূরে দূরে বড় বড় বাড়ীর ধ্বংসস্তূপ, আর তার পাশেই উঠছে, নূতন সৌধমালা। মহাসর্বনাশের বুকে নবসৃষ্টি রূপায়িত হয়ে উঠছে। প্রলয় ও সৃষ্টির মহা রহস্য রৌদ্রতপ্ত নগরীর বুকে এক বিভ্রান্তিকর মরীচিকার মত মনে হ'ল।. প্রণাম করে বললাম, স্তালিনগ্রাদ, তুমি আজ মস্কো বা লেনিনগ্রাদের মত রূপসী নও, তুমি বীর্যবতী। নাৎসী-দানব দলনে তোমার ভীমা ভৈরবী মূর্তি আজ সংযত। লক্ষ নরমুণ্ডের ওপর

১৯১৮ সালের কথা। জারের আমলে জারিৎসিন নামে খ্যাত নগরী; বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রতিবিপ্লবী সেনাপতিদের দ্বারা অবরুদ্ধ। অবস্থা সঙ্গীন। লাল পল্টনের ব্যূহ বিচ্ছিন্ন। উত্তর-ককেশিয়া থেকে মস্কোএ গম পাঠাবার পথ প্রতিবিপ্লবী কশাক সৈন্য অধিকার করেছে। এমন সঙ্কটের দিনে, লেনিনের নির্দেশে স্তালিন জারিৎসিন অবরোধ মুক্ত করবার ভার গ্রহণ করলেন। রাজনীতিক বিপ্লবী নেতা স্তালিন সামরিক নেতৃত্বেও তাঁর প্রতিভা ও কর্মশক্তির পরিচয় দিলেন। জারিৎসিন বন্দর অবরোধ-মুক্ত হল, তাঁর উৎসাহে অনুপ্রাণিত লাল পল্টন জেনারেল ক্রাসনফের সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। এই বিপুল সাফল্যের স্মৃতিরক্ষায় সোবিয়েৎ গভর্ণমেণ্ট বন্দরের নূতন নাম দিলেন স্তালিনগ্রাদ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসীবাহিনী পরিবেষ্টিত স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের ইতিহাস অনেকেরই জানা। ১৯৪১এর সেপ্টেম্বর মাসে হিটলারের ঝটিকাবাহিনী সহরে প্রবেশ করেছে—নির্মম নিষ্ঠুর সংগ্রাম! ৩০শে সেপ্টেম্বর হিটলার ঘোষণা করলেন, "আমাদের জয় সম্পূর্ণ হয়ে এলো। আমরা স্তালিনগ্রাদ আক্রমণ করেছি, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, স্তালিনগ্রাদ আমরা দখল করবোই।" পৃথিবীর ইতিহাসে এমন যুদ্ধ হয়নি। ধ্বংসের মহাশ্মশানে পরিণত নগরীর প্রতি গৃহে প্রতি পথে আধুনিক মারণাস্ত্রের সংঘাত—চারদিকে ভগ্ন কামান, বিমান শেলের আবরণী, রাইফেল এবং অগণিত মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে। জয়াশাহীন জার্মানরা হত্যা ও ধ্বংসের উৎসবে মেতেছে, এমন সময় ৮ই জানুয়ারী সোবিয়েৎ সেনাপতি চরমপত্র দিলেন, তোমাদের জয় বা পলায়নের কোন ভরসা নেই, অনর্থক রক্তপাত থেকে নিবৃত্ত হয়ে আত্মসমর্পণ কর। এই উদার প্রস্তাব জার্মাণ সেনাপতি অগ্রাহ্য করলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ আহত সিংহের মত লাল পল্টনের আক্রমণের সম্মুখে নাৎসীবাহিনী দাঁড়াতে পারলো না। সাত মাস অবরোধের পর ৬০ ডিভিসন শত্রু-সৈন্যকে উৎসাদিত করে, মার্শাল জুকভ স্তালিনগ্রাদ অধিকার করলেন, এবং মার্শাল ফন পাউলুস ২৪ জন জেনারেল, ২৫০০ হাজার অফিসার এবং ২০ হাজার সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করলেন। ১৯৪৩এর ৫ই ফেব্রুয়ারী, বিধ্বস্ত মহানগরী স্তালিনগ্রাদে নাৎসী বিজয়-অভিযানের সমাধি রচিত হ'ল।

জারিৎসিন ও স্তালিনগ্রাদের দুই-দুই বার অকুতোভয় সৌ- শত্রু-পরাভবের নিদর্শনগুলি একটি ম্যুজিয়মে সযত্নে সুরক্ষিত হয়েছে শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে-নেয়া কামান বন্দুক তরবারি, লেনিনে লেখা চিঠি, স্তালিনের উত্তর অনেক দলিল, ছবি দেখতে দেখতে আমরা একটি কক্ষে উপস্থিত হলাম। এখানে নাৎসী-বিজয়ী স্তালিনগ্রাদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যে সব অভিনন্দন ও উপহার পেয়েছে, তা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বৃটিশরাজ ষষ্ঠ জর্জের তরবারি

২১ নিজেদের নয়, পৃথিবীকে মুক্ত করল যারা, তারা দেশ-দেশান্তর থেকে কত উপহার কত অভিনন্দন পেয়েছে। আমার মাতৃভূমি ভারত কোথায়? দেখলাম, ভারতের উপহার, এক মাত্র ছাত্র ফেডারেশনের দিল্লী শাখা থেকে দেওয়া একখানি বেনারসী সাড়ী ও নেকলেস্। আমার ভাগ্য ভাল, বাঙ্গলা ছাত্র ফেডারেশনের উপহার নয়, আমরা সাড়ী, চুড়ী বা হার কাপুরুষদেরই উপহার দিয়ে থাকি।

ম্যুজিয়ম থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সম্মুখে শহীদ-চত্বর। পূব দিকে মাইল তিনেক দীর্ঘ 'শান্তি সড়ক'—দু'পাশে ৫।৭ তলা বাড়ী, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের আবাস-ভবন। চত্বরের পশ্চিমে বিশাল নাট্যশালা গড়ে উঠেছে, উত্তরে বাগান। আমরা চলেছি, ভল্‌গা নদীর দিকে। এই রাস্তার দু'পাশে যেমন নূতন ইমারত, তেমনি ভাঙ্গা বাড়ীগুলোও মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। প্রতিদিন চারদিক ঘুরে দেখেছি, প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা! এক-একটা বাড়ী বহু ভাবে বিদীর্ণ হয়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবের কঙ্কালের মত পড়ে আছে; আবার ৫।৭ তলা বাড়ী ঠিক খাড়া আছে, কিন্তু সর্বাঙ্গে বুলেটের ক্ষতচিহ্ন। এ বাড়ীগুলির ওপর বোমা পড়েনি। এর প্রত্যেক তলায়, প্রত্যেক কক্ষে, সিঁড়িতে হাতাহাতি যুদ্ধ হয়েছে।

বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। পথে স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-মেয়ে চলেছে নদীর ধারে। ধুতিচাদর-পরা বাঙ্গালী আমি কৌতূহল নিয়ে চলেছি। এই ভল্‌গা নদী। সহরের পূর্ব পার ঢালু হয়ে নেমে গেছে, পশ্চিম পার খাড়া উঁচু। স্রোত মন্থর—কাস্পিয়ান সাগর-সঙ্গম বেশী দূরে নয়। ভল্‌গার তীরে দাঁড়িয়ে প্রথমেই মনে হ'ল, এক খণ্ড পূর্ববঙ্গ যেন রাশিয়ায় ছিটকে এসে পড়েছে। এ নারায়ণগঞ্জ না চাঁদপুর? সেই ষ্টীমারঘাট, গাধাবোট টেনে চলেছে, ছোট্ট ষ্টীমলঞ্চ, যাত্রীবাহী ষ্টীমার নোঙ্গর করে আছে ঘাটে, পালতোলা নৌকো চলেছে বুক ফুলিয়ে, গাঙ-চিলের দল আকাশে পাখা মেলে উড়ছে। আমার দেশ আমার জন্মভূমির স্মৃতি বড় বেশী করে মনে পড়তে লাগল, উন্মনা হয়ে গেলাম। পদ্মা যমুনা ধলেশ্বরী মেঘনা কোথায়, আর কোথায় ভল্‌গা! ওপারের তরুশ্রেণী-ঢাকা গ্রামের নিস্তব্ধ নিকেতনে সারা দিনের কর্মশ্রান্ত মানুষ; আমার দেশের মতই স্নেহ-মমতা-ভালবাসার একান্ত নির্ভরতার শান্তির নীড়ে ফিরে চলেছে, কল্পনা-নেত্রে যেন প্রত্যক্ষ করলাম। অনেক দিন আগের কথা, এমনি ভাবে একদিন মালাবারে পূর্ববঙ্গের শ্যামল শ্রী মনকে অভিভূত করেছিল। স্তালিনগ্রাদ, তুমি কেবল বীর্যবতী নও, তুমি রূপসীও। পূর্ববঙ্গের সজল-কোমল শ্যামল শ্রী, অস্তরবির রক্তিম আলোয় কি অপরূপ হয়ে দিগ্‌বলয় পর্যন্ত উদ্ভাসিত!

১২

স্তালিনগ্রাদে দু'টো কারখানা দেখলাম। একটি "রেড অক্টোবর ফ্যাক্টরী" ইস্পাতের কারখানা; আর একটি "ঝের্ঝিনস্কী ট্রাকটর ফ্যাক্টরী।"—এ দু'টোই ধ্বংস হয়েছিল, আবার নূতন করে কলকব্জা বসান হয়েছে। ইস্পাতের কারখানাটি খুব বড় নয়, সম্মুখে বাগান, রাস্তা, শ্রমিকদের আবাসভবন দেখে, ভল্‌গার তীরে এদের 'প্যালেস অফ টেকনিক' দেখলাম। এক কোটি রুবল ব্যয় হয়েছে এটি তৈরী করতে। এর নাচঘর, ভোজনশালা, লাইব্রেরী, কারিগরী বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র এবং ৬০০ আসন সমন্বিত

ভল্‌গা নদীতে নৌকায় ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ

নাট্যশালা দেখলাম। শ্রমিকদের সংস্কৃতিক উন্নতি ও চিত্তবিনোদনের সব রকম ব্যবস্থা। এ-ছাড়া কিণ্ডারগার্টেন, হাসপাতাল শিশু-পালনাগার রয়েছে।

সহরের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে 'ট্রাক্টর ফ্যাক্টরী'। এটিকে কেন্দ্র করে একটা নূতন সহর গড়ে উঠেছে। পথের দু'ধারে গাছের সার ও বাগান। স্কুল-গৃহ আবাস-ভবন ক্লাব বিপণী ছাড়িয়ে আমরা কারখানার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। আপিস-বাড়ীর দোতলার হল-ঘরে ডিরেক্টর ও ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। জানালা দিয়ে দেখলাম পুরনো কারখানার ধ্বংসাবশেষ। কতকটা অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। নূতন কারখানা ২।৩ বছর হ'ল চালু হয়েছে। ত্রিশ হাজার নরনারী এই কারখানায় কাজ করে। প্রতি পাঁচ মিনিটে এক-একখানি নূতন ট্রাক্টর বা মোটর-চালিত অতিকায় কলের লাঙ্গল কারখানা থেকে বেরিয়ে আসছে। দেখলাম, হাজার খানেক নূতন ট্রাক্টর দেশের বিভিন্ন কৃষিকেন্দ্রে চালান হবার জন্য প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করছে। রেলের খোলা মালগাড়ীতে এগুলি ক্রেণে করে তোলা হচ্ছে।

কারখানার ভেতরে প্রবেশ করলাম। এ যেন বিশ্বকর্মার কর্মশালা। বিভিন্ন বিভাগে ঘূর্ণিত বৈদ্যুতিক যন্ত্রে বিভিন্ন অংশ তৈরি হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে জোড়া দেওয়ার কাজও চলেছে, যন্ত্রচালিত ট্রলীতে এগুলি এক বিভাগ থেকে আর এক বিভাগে চলে যাচ্ছে, অবশেষে পূর্ণাঙ্গ ট্রাক্টর হয়ে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসছে। একটি কলের সামনে এসে আমরা দাঁড়ালাম। ডিরেক্টর বললেন, পূর্বে এটি চালাতে ২৪ জন শ্রমিকের দরকার হ'ত। সোবিয়েৎ ইঞ্জিনিয়াররা এর এত উন্নতি করেছেন যে, এখন দু'জন শ্রমিকই এটা চালাতে পারে। এই দু'জনের এক জন নারী শ্রমিক, তার বুকে দু'টো সোনার মেডেল। ইনি সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক হিরোইন। এঁকে প্রশ্ন করলাম, যন্ত্রের উন্নতির ফলে ২২ জন শ্রমিক ছাঁটাই হ'ল, তাহ'লে যন্ত্রের উন্নতি কি শ্রমিকদের স্বার্থের বিরোধী নয়? উনি বললেন, তা কেন হবে? কায়িক শ্রম লাঘব করা এবং খাটবার সময় কমিয়ে আনাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা ২২ জন কমরেডকে নূতন গঠন-কাজে যোগ দেবার জন্য মুক্তি দিয়েছি। আমাদের এখানে কাউকে বেকার বসে থাকতে হয় না।

এখানে শ্রমিক নরনারীরা হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, হাড়ভাঙা খাটুনীর কোন লক্ষণ নেই। প্রত্যহ ৮ ঘণ্টার বেশী খাটা আইনতঃ নিষিদ্ধ। এখানে রবিবার নেই। শ্রমিকেরা পালা করে প্রতি ৫ দিন পর এক দিন ছুটি পায়। সপ্তাহে এক বার করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়, বিশ্রাম ও চিকিৎসার দরকার হ'লে হাসপাতালে পাঠান হয়। বছরে এক মাস থেকে পনর দিন ছুটি—তখন এরা স্বাস্থ্যনিবাসে চলে যায়, খরচ বহন করে কারখানা। ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার সতর্ক প্রহরী।

এই কারখানা-সংলগ্ন ভল্গা নদীর তীরে, "প্যালেস অফ কালচার" এক বৃহৎ ব্যাপার। এর ২৬টি বিভাগ। শ্রমিক এবং তাদের ছেলেমেয়েদের সাহিত্য বিজ্ঞান যন্ত্রশিল্প সঙ্গীত নৃত্য-বাদ্য চিত্রকলা ভাস্কর্য শিক্ষা দেবার বিভিন্ন বিভাগগুলি আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কিশোর-কিশোরীরা আমাদের ব্যাণ্ড বাজিয়ে শোনাল। এর অনতিদূরে শিশু-পালনাগার। মায়েরা কাজে যাবার সময় ছেলে-মেয়েদের রেখে গেছে। ছ'মাস থেকে তিন বছর বয়সের হাজার খানেক শিশু; কেউ ঘুমুচ্ছে, কেউ খেলছে, কেউ একাই পুতুল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। সেবিকারা সকলের ওপর নজর রাখছেন। এরা তাদেরই ঘরের ছেলেমেয়ে, যাদের না ছিল ধন, না ছিল মর্যাদা। আমাদের দেশের স্বচ্ছল ভদ্রশ্রেণীর ছেলেমেয়েরাও এত আদর-যত্নে মানুষ হয় না। নবযুগের মানুষ তৈরীর কাজ এরা গোড়া থেকেই সুরু করেছে। স্বামী বিবেকানন্দের "Man-making Religion"এর বাস্তব রূপ দেখলাম। এরা সকলের মধ্যে একই ব্রহ্মের প্রকাশ বাস্তব ক্ষেত্রে উপলব্ধি করেছে।

যুদ্ধে অনাথ শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ভবনে গিয়ে দেখলাম, দয়ার দানে প্রতিপালিত অনাথ আশ্রমের ভীরু বাসিন্দা এরা নয়। এরা অনাথাশ্রম বলে না, বলে শিশুদের প্রাসাদ। আমাদের দেশের দু'-চোরটি অনাথ আশ্রম দেখেছি; যেখানে অভাগারা ধনীর উচ্ছিষ্টে প্রতিপালিত হয়, কড়া শাসনে পঙ্গু মন নিয়ে নিরানন্দে থাকে। তাই বা কয়টি? পথে পথে ভিক্ষে করা, নয় অচিকিৎসায় মরা এই তো সনাতন নিয়ম। এখানে দেখলাম ঠিক উল্টো। বলিষ্ঠদেহ হাস্যোজ্জ্বল মুখ বালক-বালিকারা আমাদের তাদের পড়ার ঘর শোবার ঘর দেখালো, ক্ষুদে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় নাচগান করে খুশী প্রকাশ করলো। এরা পারিবারিক জীবনের ভাগ্য-বিপর্যয়ে পরিত্যক্ত আবর্জনা নয়, এরা সমাজের সম্পদ।

অপরাহ্নে ভল্গায় মোটর-বোটে উঠেছি। কিছু দূর যাবার পর সহরের ওপারে থামলো। সকলে নেমে পড়লাম। খাড়া পাড়, বালি ঠেলে ওপরে উঠলাম, এক জন বুড়ী নাতি-নাতনী নিয়ে এসেছেন, স্নান করবেন। অনেকেই নেমে পড়লেন জলে। আমিও নেমে পড়লাম। আমার সাঁতার কাটা দেখে তো সকলে অবাক। কমরেড আকসানা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, বেশী দূরে যেয়ো না। কে শোনে কথা! আমি অজ বাঙ্গাল, জল দেখে ভয় পাবো! অনেক দিন পর সাঁতার আর অবগাহন হ'ল। বোট ফিরে চলেছে, আকাশে চাঁদ উঠলো! আমার স্বদেশের সঙ্গে এর কি কোন তফাৎ আছে?

তফাৎ আছে বৈ কি! এখানে কেবল নদীতে নয়, মানুষের মনের মরা-গাঙ্গেও জোয়ার এসেছে। আরো বড় স্তালিনগ্রাদ গড়ার কাজ অক্লান্ত উদ্যমে চলেছে। এরা যে ভাবে চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করে স্তালিনগ্রাদকে শত্রু-কবল থেকে উদ্ধার করেছে, সেই ভাবেই নবসৃষ্টির কঠিন দায়িত্ব নিয়েছে। আর আমরা স্বদেশ কর্মনির্দেশ-হীন বাণীর বন্যাস্রোতে তৃণখণ্ডের মত ভেসে চলেছে—তুলনা করতে গেলে চিত্ত বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

ত্রিশ বর্গ-মাইল জুড়ে নূতন স্তালিনগ্রাদ তৈরী হচ্ছে, 'সিটি আর্কিটেক্টের' আপিসে গিয়ে তার পরিচয় পেলাম। তিনি নূতন নগর তৈরীর পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিলেন। সহরের কেন্দ্রস্থলে তিন বর্গ মাইলের মধ্যে টাউন হল, থিয়েটার, স্কুল-কলেজ, হোটেল, বাগান রাস্তার নক্সা দেখলাম; ১৯৫৩ সালের মধ্যেই নির্মাণকার্য শেষ হবে। ভল্গা নদীর উজানে যে বৃহৎ জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র তৈরী হচ্ছে, ১৯৫২ সাল থেকে তার কাজ আরম্ভ হবে। সেই বিদ্যুত-শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য শিল্পকেন্দ্র ও কারখানাগুলি প্রস্তুত হচ্ছে। সোবিয়েতের জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছায় চালিত সৃজনীশক্তির দুঃসাহস স্তালিনগ্রাদে মূর্ত হয়ে উঠছে।

শহীদ-চত্বরে দাঁড়িয়ে দেখছি, বীরের শোণিত-সিক্ত ভূমির ওপর শ্যামল তরুশ্রেণী অজস্র ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে। তারই স্নিগ্ধ ছায়ায় হাস্যমুখর শিশুরা খেলায় মেতেছে। এমন সময় বার বছরের একটি ছেলের হাত ধরে একটি বৃদ্ধা চলতে চলতে, আমাদের দেখে দাঁড়ালেন। আমরা ভারতীয় জেনে, তাঁর বহু-রেখায়-কুঞ্চিত ললাটের নীচে নিষ্প্রভ চোখ দু'টিতে প্রীতির প্রসন্নতা ফুটে উঠলো। বললেন, তোমাদের দেশের কথা কিছু কিছু শুনেছি—তোমরাও তো শান্তি আন্দোলন করছো।

বললাম—আমরা শান্তিবাদী। এখানে এসে যা দেখলাম, তাতে তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি ঠেকান না যায়, তাহ'লে মানুষ সভ্যতার সব সম্পদ খুইয়ে দেউলে হয়ে যাবে।

বৃদ্ধা হাত তুলে আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, ঐখানে একটা ভাঙ্গা ট্যাঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে আমার পুত্র, পুত্রবধূ ও কনিষ্ঠ পুত্র মেসিনগান দিয়ে শত্রুকে ঠেকিয়েছে। পিতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে ওরা তিন জন ঐখানেই একসঙ্গে প্রাণ দিয়েছে। সেই দারুণ দুর্দিনের স্মৃতি এবং সেই শিশুটিকে বুকে করে আমি বেঁচে আছি। স্তালিনগ্রাদের ছেলেমেয়েরা আবার শান্তির নীড় রচনা করছে সে কি শত্রুর বোমায় ধ্বংস হবার জন্য? তোমরা দেশে ফিরে গিয়ে এই কথাই বলো, আমরা যুদ্ধ চাই নে, কারো সম্পদে আমাদের লোভ নেই ঈর্ষা নেই। আমাদের সন্তানরা মানুষ হবে, বধ্যভূমির বলির পশু হবে না।

মধ্যযুগের ইতিহাসের পাতা থেকে যেন কোন বীর পুত্রের আত্মোৎসর্গের গৌরব-গর্বিতা রাজপুত নারী আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। অপরিচিত বিদেশীদের সম্মুখে তাঁর অবরুদ্ধ ভাবাবেগ সামলে নিয়ে বললেন, আশীর্বাদ করি, ভারত-সন্তানেরা যেন নরঘাতক না হয়। নতমস্তকে বললাম, মা, আজকের দিনে এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর নেই।

কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে শতপুত্রবিয়োগবিধুরা গান্ধারীর বিলাপ, আজও শত শত পতিপুত্রহীনার কণ্ঠে শোকাবেগে উদ্বেলিত। সেদিন গান্ধারীর সম্মুখে পার্থসারথি নারায়ণ হতবাক্ হয়ে অধোমুখ হয়েছিলেন। আজও কোরিয়া ভিয়েৎনাম মালয়ে শত-সহস্র অশ্রুমুখী নারীর আর্তবিলাপ মানবতার বিচারশালার পাষাণবেদীতে নিষ্ফল মাথা কুটছে!

১৩

১২ই জুলাই বেলা এগারটায় স্তালিনগ্রাদ থেকে বিদায়। অনায়াস-নৈপুণ্যে বিমান ঊর্দ্ধলোকে উঠে গেল, বায়ুমণ্ডল নিথর, পৃথিবী মেঘে ঢাকা। আমরা শীতার্ত হয়ে উঠলাম। ধুতি-পিরানের ওপর কম্বল চাপিয়ে বসে রইলাম। চার ঘণ্টার মধ্যে মস্কো এসে গেলাম। এখানে এসে দেখি বেজায় গরম পড়েছে। অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে আজ উষ্ণতম দিন। এক জন হেসে বললে, তোমরা ভারতীয় গরম নিয়ে এসেছো।

বেতার-কেন্দ্রে গিয়ে স্তালিনগ্রাদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটি বাঙ্গলা বক্তৃতা দিয়ে হোটেলে ফিরেই শুনলাম, টাস এজেন্সীর কয়েক জন সাংবাদিক আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে আমরা স্ব স্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলাম। এই প্রসঙ্গে আমি বললাম,—সবই দেখলাম, কেবল বহুল-প্রচারিত "লৌহ-যবনিকা"র সাক্ষাৎ মিললো না। মনে হয় ও-বস্তুটি রাশিয়ায় নেই, আছে রুশ-বিদ্বেষীদের মগজে। পরদিন প্রাভদায় ঐ বিবরণ প্রকাশিত হয়। 'রয়টার' এটা লণ্ডন থেকে ভারতেও প্রচার করেন। দেশে ফিরে শুনলাম, এ নিয়ে কোন কোন সংবাদপত্রে আমাকে বিদ্রূপ ও আক্রমণ করা হয়েছে। একটু রং চড়িয়ে কেউ লিখেছেন, মস্কোএ পৌছেই আমি নাকি ঐ বিবৃতি দিয়েছি। সত্যের প্রতি কিছুটা নিষ্ঠা থাকলে তাঁরা দেখতেন আমাদের মস্কো আসার অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পরে আমি ঐ মন্তব্য করি এবং দেশে ফিরে বহু জনসভায় এ কথা বলেছি।

'লৌহ-যবনিকা' কথাটি নানা উদ্দেশে এবং নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রথম অভিযোগ—ওরা কতকগুলি পূর্বনির্দিষ্ট স্থান ও প্রতিষ্ঠান দেখায়। স্বাধীন ভাবে কিছুই দেখবার উপায় নেই। আমন্ত্রিত প্রতিনিধিদের 'কনডাক্টেড টুর' ব্যবস্থায় সত্যিকার রাশিয়ার জন-জীবন আড়ালেই থেকে যায়।

উত্তর—অল্প সময়ের মধ্যে দল বেঁধে বেশী দেখতে হ'লে, সর্বত্রই এমনি ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হয়। এক নিশ্বাসে যারা ইউরোপ বা ভারত ভ্রমণ করেন, তাঁরাও টমাস কুক বা ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বাঁধা-ধরা স্থানগুলি দেখেন। রোমে আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু এখানে ব্যবস্থা স্বতন্ত্র—পূর্বদিন রাত্রে আমরা

আলোচনা করে দ্রষ্টব্য স্থান বা প্রতিষ্ঠান ঠিক করে নিতাম। সেই অনুযায়ী এঁরা যান-বাহনের ব্যবস্থা করতেন, সঙ্গে দোভাষী দিতেন। চোখ-কান খোলা থাকলে সহর ও পল্লীর জন-জীবন বোঝা বিশেষ কিছু শক্ত নয়। রূপকথার গল্পের মত এরা চোখ বেঁধে আমাদের রহস্যময় পুরী দেখাতে নিয়ে যায়নি। সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার নব সৃষ্টিকে এরা গর্বের সঙ্গে বিদেশী অতিথিদের দেখাবার জন্যই আমাদের আমন্ত্রণ করেছিল। এরা রেখে-ঢেকে দেখাচ্ছে বা সাজিয়ে-গুছিয়ে দেখাচ্ছে, এমন সন্দেহ করবার কোন কারণ আমি খুঁজে পাইনি। আলাপ করে দেখেছি, বৃটিশ কোয়েকার, নরউইজীয়ান ও আমেরিকান শ্রমিক প্রতিনিধিরাও এ বিষয়ে একমত। তাঁরাও দেশে ফিরে 'লৌহ-যবনিকার' অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন।

দ্বিতীয় অভিযোগ—বিদেশীদের রাশিয়ায় প্রবেশ সম্বন্ধে ওদের কড়াকড়ি ও সন্দেহ অত্যন্ত প্রবল।

উত্তর—এ অভিযোগটা ওরাও অস্বীকার করে না। মনে রাখতে হবে, ধনতান্ত্রিক জগতের বৈরতা ও বয়কট সোবিয়েৎ ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত সমান প্রবল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মাণীর শক্ত পাল্লায় পড়ে ততোধিক শক্তিমান সোবিয়েৎ রাশিয়ার প্রেমে যাঁরা ডগমগ হয়ে উঠেছিলেন, ফাঁড়া কেটে যাবার পর তাঁরাই সুর ঘুরিয়ে ফেলেছেন। সমগ্র ইয়োরোপ 'লাল' হয়ে গেল বলে ধনতন্ত্রীদের আর্তনাদ ও সোবিয়েৎ-বিদ্বেষ ১৯৪৭ থেকেই সুরু হয়েছে। এতে রুশদের চিত্ত প্রীতি-প্রসন্ন ঔদার্যে ভরে উঠবার কথা নয়। ধনতন্ত্রীদের গুপ্তচর ও স্পাই, ইনফরমার সম্বন্ধে এরা সজাগ এবং ধ্বংসাত্মক কাজ সম্বন্ধে সতর্ক। সাংবাদিকের ছদ্মবেশে গুপ্তচরবৃত্তির অনেক প্রমাণ এরা পেয়েছে। আন্তর্জাতিক হৃদ্যতার আদান-প্রদান পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে জানবার ও বোঝবার ওপর নির্ভর করে। বর্তমান জগতে তা' দুর্লভ।

তৃতীয় অভিযোগ—'লৌহ-যবনিকা'র অন্তরালে এরা কোটি কোটি লোককে বন্দীশিবিরে রেখে ক্রীতদাসের মত খাটায়; উরাল অঞ্চলে বা সাইবেরিয়ার জঙ্গলে এমন অমানুষিক ব্যবস্থা আছে।

উত্তর—রাশিয়ার শ্রমিক সাধারণের স্বচ্ছলতা, সম্মান ও মর্যাদা যা চোখে দেখেছি, তাতে এমন ব্যাপার অসম্ভব। যা মিথ্যা নিন্দা, যুক্তি দিয়ে তা খণ্ডন করা যায় না।

চতুর্থ অভিযোগ—ওরা 'লৌহ-যবনিকা'র আড়ালে বিশ্বজয়ের দুরাশা নিয়ে বিপুল সামরিক বল গড়ে তুলছে।

উত্তর—এটা ঈসপের গল্পের মেষশাবককে হত্যা করার নেকড়ে বাঘের যুক্তি। শতবর্ষ পূর্বে কবি হেমচন্দ্র লিখেছেন,—"হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়, পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়।" তার প্রকট মূর্তি আজ তো প্রত্যক্ষ। নবীন ইয়োরোপ, পুরাতন ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকারী হবার আশায় ইয়োরোপ-এশিয়াময় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছেন, তার একটা যুক্তি আবিষ্কার করবার জন্য 'লৌহ-যবনিকা'টা পাকাপোক্ত করা দরকার। আপাদ-মস্তক অস্ত্রসজ্জিত হয়ে এরা সব দেশেই ঢুকছেন। প্রশ্ন করলে ডান হাতের রাইফেল উঁচু করে, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা পিঠের পেছনে উঁচিয়ে ধরে বলেন, ঐ যে! ঐ যে কি? বোঝ না, লাল জুজু আসছে। তোমাকে তো বাঁচাতে হবে! আমি নিজেই বাঁচবো, তুমি সরে পড়! বললেই হ'ল, যেখানে স্বাধীন জগৎ বিপন্ন, সেখানে তুমি একা কি করবে? নিজেও মরবে আমাদেরও মারবে। 'লৌহ-যবনিকা'র খাঁচায় লাল জুজুকে আটকে রাখতে হ'লে, 'প্যাক্ট-যবনিকা' দরকার।

আমার স্বদেশে এ সব বালাই ছিল না, আমাদের সদর দরজা হাজার বছর ধরে উন্মুক্ত। গ্রীক যবন শক হুন তুর্কী পাঠান মুঘল ইংরাজ ফরাসী পর্তুগীজ দিনেমার ওলান্দাজ সকলেই এসেছে। স্বাধীন হবার পরও পশ্চিমাদের প্রবেশদ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত। আমাদের পক্ষেও 'স্বাধীন' ইয়োরোপ আমেরিকায় যেতে বিশেষ কোন হাঙ্গামা নেই। কিন্তু চীন ও রাশিয়া যেতে চাইলেই "খাদি যবনিকা"র ধাক্কা খেতে হয়। আমেরিকা-ইংলণ্ডেও সেই দশা। বিশেষ শ্রেণীর লোকের ছাড়পত্র নিয়ে প্রবেশ ও নির্গমন দুই-ই দুরূহ। সম্প্রতি বের্লিন যুব-উৎসবে যোগদানে তরুণ-তরুণীদের ছাড়পত্র না দেওয়ার কড়াকড়ি ভারতে, বৃটেনে, আমেরিকায় আমরা দেখলাম। কাজেই কাচের ঘরে বাস করে অপরের প্রতি ঢিল ছোঁড়া খুব নিরাপদ খেলা নয়। আন্তর্জাতিক রেষারেষিতে নিরপেক্ষ ভারত; কোন শক্তি-শিবিরে যোগ দেবে না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জওহরলালের ভারতে আসবার জন্য রাশিয়ান প্রতিনিধি দল অনুমতি পায়নি, ভারতীয়দের অনেকেই রাশিয়ায় যাবার অনুমতি পায় না, কিন্তু আমেরিকার বেলায় এমনটি হয় না। যবনিকার পর যবনিকা আছে, তা' লোহারই হোক আর যাই হোক। [ক্রমশঃ।

আগামী সংখ্যা থেকে

ভল্গা থেকে গঙ্গা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

অনুবাদ করছেন বক্সা কারাগারের বর্তমান এক রাজবন্দী
শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়

ন্যুট হামস্থন

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

ন্যুট হামস্থনের মৃত্যু হয়েছে।

খবরের কাগজের অবহেলিত এক কোণে অত্যন্ত নিরুৎসাহে ছাপা হ'ল হাম্‌স্থনের মৃত্যু-সংবাদ। সংবাদের উপর বড় শিরোনামা নেই, তলায় নেই বিগতের জন্য চিরাচরিত কয়েক ছত্র প্রশস্তি। আমাদের দেশ বলে নয়, শিল্পীদের নিয়ে যাদের উৎকট হৈ-চৈ, সেই ইওরোপ আমেরিকা বা সভ্য জগতের কোনোখানেই—এমন কি হাম্‌স্থনের দেশ নরওয়েতেও এ সংবাদে কোথাও উল্লেখযোগ্য প্রিয়-বিয়োগের কোনো উচ্ছাস দূরে থাক, নিছক শালীনতাবোধের শুক দুঃখ-প্রকাশও করল না কেউ।

হাম্‌স্থনের জীবনাবসান সত্ত ঘটনা হলেও সমস্ত জগতের কাছে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে অনেক দিন। বিগ্রহহীন মন্দির যেমন ভরে যায় আগাছায়, হয়ে ওঠে মানুষের অগম্য হিংস্র শ্বাপদ-সরীসৃপের বাসভূমি, চরিত্রভ্রষ্ট হলে পরম প্রতিভাধর মানুষেরও বুঝি সেই অবস্থা হয়। তাঁকে আর কেউ তখন মাথা নোয়ায় না, উৎসর্গ করে না মনের উদ্গত শ্রদ্ধা, যাঁকে এক দিন পরম আত্মীয় পরম প্রিয়জন ভেবেছিল তাকে চেষ্টা ক'রে ভুলে থাকে, শত প্রয়োজনেও পরিহার করে, যতখানি ভালবেসেছিল তার দ্বিগুণ অবজ্ঞা দিয়ে আঘাত করতে চায়, উপেক্ষা দিয়ে অতীতের উৎসাহকে উপহাস ক'রে ওঠে।

জীবনের সায়াহ্নে সাহিত্য ছেড়ে হাম্‌স্থন যোগ দিয়েছিলেন রাজনীতিতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাঁর দেশ যখন শত্রু-কবলিত, নাৎসী-অধিকারে তখন ভারতবর্ষের মিরজাফরের মত কলঙ্কিত-নাম কুইসলিং সেই শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল আর হাম্‌স্থন ছিলেন তার দলে—শত্রুদের সঙ্গে সে সহযোগিতা সমর্থন করেছিলেন তিনি।

নাৎসীরা যখন সমস্ত জগতের সামনে হামস্থনকে তুলে ধরল তাদের কার্যের অকুণ্ঠ সমর্থক বলে, তখন দেশ-বিদেশ থেকে প্রত্যহ তাঁর হাজার হাজার বই ডাকে ফেরৎ পেতে লাগলেন তিনি। দেশের দুর্দিনের, জাতির সঙ্কটের অসাড় নৈরাশ্যের মধ্যে যাঁদের প্রেরণায় মানুষ আবার বুক বাঁধে সেই কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা যখন বিশ্বাসঘাতকতা করেন তখন তাঁদের অপরাধ বুঝি জগতের সামনে সমস্ত জাতিকেই অপরাধী করে তোলে। হামস্থনের অপরাধ তাই বুঝি মৃত্যুতেও তাঁর দেশের লোক ক্ষমা করতে পারল না। সারা জগৎ ক্ষমা করল না দেশদ্রোহীকে। অথচ এক দিন সমস্ত দেশের, সারা জগতের কি শ্রদ্ধা, কি সম্মান, কি ভালবাসা তিনি আকর্ষণ করেছিলেন। কোথায় নরওয়ে, কোথায় বাংলা দেশ, তবু অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত-কৃত তাঁর রচনার অনুবাদ পড়ে হয়েছে ধন্য বাঙালী পাঠক। ৺শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত', ৺বিভূতিভূষণের 'অপূর্ব'-র মত তাঁর উপন্যাসের মূল চরিত্র * 'অগাষ্টস'এর সঙ্গে অন্তরঙ্গ না হয়ে বুঝি পারা যায় না, থাকা যায় না মরমী শিল্পীকে প্রণাম না ক'রে।

আজন্ম কি দুঃসহ দারিদ্র্যের সঙ্গে দুরবস্থার সঙ্গে তাঁকে লড়াই করে বাঁচতে হয়েছে, দাঁড়াতে হয়েছে, রচনা করতে হয়েছে সাহিত্য সহায়সম্বলহীন অতি দরিদ্র ঘরে জন্মে ১১ বছর বয়সে যখন তাঁর সাহিত্যে হাতেখড়ি হয় তখন অন্নসংস্থানের জন্য অন্য হাতে জুতো সেলাই করতে হ'ত তাঁকে। তার পর কখনো কয়লা-গুদামে মজুর খাটতে হয়েছে, কখনো বা জুটেছে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। ভাগ্যান্বেষণে আমেরিকায় উপস্থিত হয়ে কখনো ট্রাম-কণ্ডাক্টরি, কখনো বা খামারে-আবাদে জনমজুরী। ২১ বছর বয়সে এক ডেনীয় পত্রিকায় তাঁর "সুলট" উপন্যাসের কয়েকটি পরিচ্ছেদ ছাপা হয় এবং তার অব্যবহিত পরেই তার ইংরাজী অনুবাদ "হাঙ্গার" (বুভুক্ষা) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই হাম্‌স্থন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। রচনার ভঙ্গী, বিষয়বস্তু ও তার বিন্যাসের মৌলিকতায় বুভুক্ষা ইংরাজী-ভাষী জগতে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং তার পর আরো উপন্যাস বেরিয়ে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়ে উত্তরোত্তর হাম্‌স্থনের খ্যাতি সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ে। রুশীয় ও মার্কিণ সাহিত্যের প্রভাব ও ভাবধারা আশ্চর্য মিশ খেয়েছিল তাঁর রচনায়—রুশীয় ঔপন্যাসিকদের ধারায় মর্বিড চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যেমন তাঁর উপন্যাস ভর্তি, তেমনি মার্কিণী লেখকদের চমক-দেওয়া উপমায় সেগুলির প্রকাশ অতি সাবলীল স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে। হাম্‌স্থনের রচনায় আরো আশ্চর্য করল সকলকে তাঁর নৈসর্গিক অনুভূতি—রূপ-গন্ধ-ভরা প্রাকৃতিক পরিবেশ। "বুভুক্ষা" (Hungur) এবং তার পর "ভূমিজ" (Growth of the Soil), "ইন্দ্রাগারে নারী" (The woman at the Well), "প্যান" (Pan), "ভিক্টোরিয়া" (Victoria) ও "ভবঘুরে" (Vagabonds) পড়ে সারা জগৎ তাঁকে সাহিত্যগুরু বলে মেনে নিল, নিবেদন করল ভক্তি-শ্রদ্ধা। ইবসেন্, বিয়র্ণসন্, সিবেলিয়াস্, ষ্ট্রিণ্ডবের্গ এর রচনা-সমৃদ্ধ স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের মর্যাদা পেলেন তিনি, বিশ্বসাহিত্যে অক্ষয় হ'ল তাঁর নাম। তাঁর সাহিত্যে সৃষ্ট ভাবধারায় পুষ্ট হ'ল নবীনেরা, দেশ ও বিদেশের চোখে গড়ে উঠল নূতন নরওয়ে।

সে নরওয়ে হাম্‌স্থনের মৃত্যুতে মোচন করল না এক ফোঁটা অশ্রু।

ভাবতে অবাক হতে হয়। আবার মনে হয়— সাহিত্যিক হাম্‌স্থন ও রাজনৈতিক হাম্‌স্থন বুঝি এক ব্যক্তি নন। ১৩ বছর বয়সের কাঠামোয় পুরে দেওয়া আধাবয়সী দু'টি স্বতন্ত্র মানুষ। এক জনের জন্ম হীন বংশে, অর্থে দারিদ্র্যে অসহায় উপবাসের মধ্যে সে রচনা করেছে "বুভুক্ষা" (Hunger), "ভূমিজ" (Growth of the Soil); কখনো হন্যে কুকুরের মত পথে পথে ঘুরে, কখনো বা বনে বা পাহাড়ে নদীতে বা ঝর্ণায় প্রাকৃতিক আবেষ্টনীতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে সে রচনা করেছে "ভবঘুরে" (Vagabonds); এক হাতে জুতো সেলাই করে অন্য হাতে সে রচনা করেছে বরাভয় সাহিত্য। অন্য জনের জন্ম ঐশ্বর্যে, প্রাচুর্যে, নোবেল পুরস্কার ও জগৎজোড়া খ্যাতির প্লাবনে; কর্ম ও সেই জন্ম পরিবেশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। রাজনৈতিক হাম্‌স্থনকে তার দেশবাসী কখনো ক্ষমা করবে না—তারা যে সাহিত্যিক হাম্‌স্থনের জীবনভোর রচনা। অনাদরে অপমানে, নিঃসঙ্গ ভাবে তাই যার মৃত্যু হয়েছে সে পথভ্রান্ত রাজনৈতিক হাম্‌স্থন। রাত্রের দুঃস্বপ্নের মত তাকে দেশ ভুলে যাবে অল্প দিনেই। ভুলতে পারবে না সাহিত্যিক হামস্থনকে। তাঁকে ভুলতে হলে ভুলতে হবে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে—আর সেই সাহিত্যের সৃষ্ট নিজেদের। তাই সাহিত্যিক হামস্থনের মৃত্যু নেই—আর্ত মানবাত্মারূপে সাহিত্যে তিনি চিরন্তন হয়ে রইলেন!

---

* হামস্থনের জন্ম ১৮৫৯ সালে ৪ঠা অগষ্ট। 'অগষ্ট' মাস থেকে

এ্যাটম

শ্রীযামিনীমোহন কর

এ্যাটমের গঠন

নিম্ন পরমাণবিক ওজনের মৌল-সমূহের পরমাণবিক সংখ্যা Z, পরমাণবিক ওজন A-এর প্রায় অর্দ্ধ, তার মানে যে তাদের নিউক্লিয়াসে নিউট্রোন ও প্রোটোনের সংখ্যা প্রায় সমান। যতই ওজন বাড়তে থাকে, ততই A এর অর্দ্ধাপেক্ষা Z কম হয়, ফলে Z অপেক্ষা A—Z বড় হয়, অর্থাৎ তাদের স্থায়ী নিউক্লিয়াসে নিউট্রোনের সংখ্যা প্রোটোনের সংখ্যাপেক্ষা অধিক হয়। ইউরেনিয়ামের কথা ধরা যাক। এর পরমাণবিক ওজন 238 এবং পরমাণবিক সংখ্যা 92, তাহলে এর নিউক্লিয়াসে আছে 92 সংখ্যক প্রোটোন এবং 46টা নিউট্রোন। এই সংখ্যাগুলোর ওপর নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

এইখানে আর একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদি নিউক্লিয়াসে কেবল নিউট্রোন ও প্রোটোন থাকে, তবে যেহেতু উভয়ের ভর প্রায় এককের সমান, সুতরাং প্রত্যেক মৌলের পরমাণবিক ওজন প্রায় অখণ্ডাংশ হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে আছেও তাই। অধিকাংশ মৌলের পরমাণবিক ওজন অখণ্ড সংখ্যা থেকে 0·1 অপেক্ষা কম-বেশী নয়। আপাত দৃষ্টিতে যা পার্থক্য রয়েছে তার কারণ অনেক মৌলের মধ্যে বিভিন্ন পরমাণবিক ওজনের পরমাণুসমূহ মেশান আছে। যেমন ক্লোরিনের মধ্যে পরমাণুসমূহের ওজন ও 35 থেকে ও 37এর মধ্যে, ফলে তার পরমাণবিক ওজন গড়ে দাঁড়ায় 35·46. এর থেকেই আইসোটোপের কথা এসে পড়ে।

নিউক্লিয়াসের চার ধারে ইলেকট্রোনসমূহ কি ভাবে সাজান থাকে, তা জানা যায় পরমাণবিক বর্ণালি (spectra) থেকে। কোন বস্তুকে খুব বেশী গরম করলে, অথবা কোন গ্যাসের মধ্যে তড়িৎ মোক্ষণ করলে বিকিরণের উৎপত্তি হয়। কিছুটা দৃশ্য আর কিছুটা অদৃশ্য অতিবেগুনির প্রান্তে। স্পেক্ট্রোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করলে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণ বিভিন্ন রঙে ভেঙ্গে গিয়ে এক বিশেষ প্যাটার্ণ সৃষ্টি করবে। হাইড্রোজেন বা হিলিয়ামের মত অণুসমূহের বর্ণালি বেশ সরল এবং তার মধ্যে রেখার সংখ্যাও কম, কিন্তু ভারী অণুসমূহের বর্ণালির প্যাটার্ণ রীতিমত জটিল এবং তার মধ্যে থাকে শত শত রেখা। অনেক পরিশ্রমের পর এদের প্রকৃত অর্থ নির্দ্দেশ করা সম্ভব হয়েছে। যখন নাগাওকা পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন শনিগ্রহের মত বলেছিলেন তখন তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, পরমাণবিক বর্ণালির প্যাটার্ণের কারণ বৃত্তীয়-কক্ষে ধাবমান ইলেকট্রোন সমূহের দোলন। এ কথাটা ঠিক নয়। ইলেকট্রোন সমূহ ঋণাত্মক আধানে আহিত, সুতরাং ধনাত্মক নিউক্লিয়াসের মধ্যে গিয়ে পড়া উচিত। রাদারফোর্ড বলেন যে, এই আকর্ষণকে গতীয় কেন্দ্রাতিগ বল প্রশমিত করে। অনেকটা সূর্য্যের চার ধারে গ্রহের অবস্থানের মত। কিন্তু এটার মধ্যেও গলদ রয়েছে। তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্বানুসারে ঘূর্ণনের জন্য গতীয় শক্তি বিকিরণ রূপে নির্গত হবে ফলে কক্ষের বক্রীয় ব্যাসার্দ্ধ (radius of curvature) ক্রমশঃ কমতে থাকবে। তাহলে ইলেকট্রোনের গতিপথ ঘোরানো প্যাঁচের (Spiral) মত হবে এবং শেষ অবধি ইলেকট্রোন নিউক্লিয়াসের মধ্যে গিয়ে পড়বে। সেই সঙ্গে বর্ণালিতে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্রমিক পর্য্যায় থাকবে, স্পষ্ট ভাবে বিভিন্ন রেখা পাওয়া যাবে না। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, এই মতবাদ ঠিক নয়।
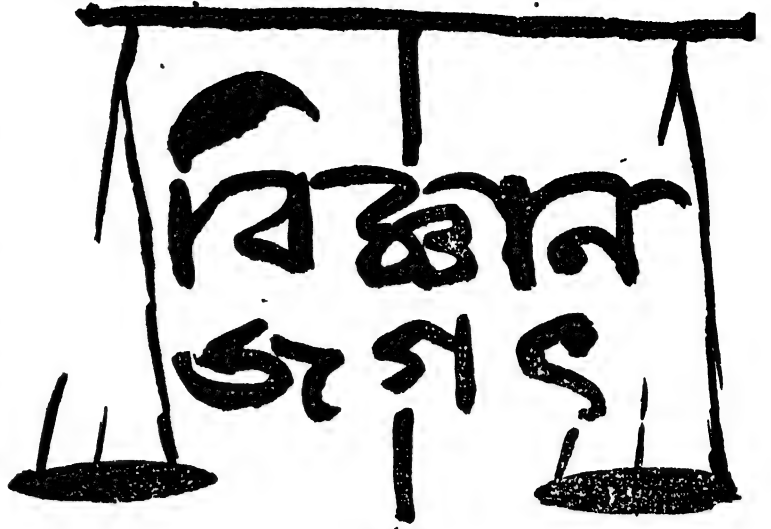
এই হাঙ্গামার নিষ্পত্তির জন্য ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে দিনেমার বৈজ্ঞানিক নিলস বর এক অদ্ভুত মতবাদ প্রকাশ করলেন, যা তড়িচ্চুম্বকীয় মতবাদের বিরুদ্ধ। তিনি বললেন যে, বদ্ধ কক্ষে ঘোরবার সময় ইলেকট্রোন থেকে কোন শক্তি বিকিরণ হয় না। তাহলে এই কক্ষ সুস্থির। এর নাম দিলেন পরমাণুর সুস্থির অবস্থা। প্রত্যেক পরমাণুর অনেকগুলো সুস্থিরাবস্থা থাকে। যে কোন একটা সুস্থিরাবস্থায় শক্তির পরিমাণ ধ্রুব, কিন্তু বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন। উচ্চতর শক্তির অবস্থা থেকে নিম্নতর শক্তির অবস্থায় ইলেকট্রোন লাফিয়ে চলে যায়, ফলে বর্ণালির রেখাসমূহ সুস্পষ্ট থাকে। লাফাবার অর্থাৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তনের নিয়ম কোয়াণ্টাম তত্ত্বাদের সমীকরণের ওপর নির্ভর করে। যদি প্রাথমিক উচ্চতর শক্তির অবস্থায় পরমাণুর শক্তি E_2 হয়, এবং অন্তিম নিম্নতর শক্তির অবস্থায় পরমাণুর শক্তি E_1 হয়, তবে ইলেকট্রোনের উল্লম্ফনের জন্য শক্তি নির্গত হয়েছে E_2-E_1. এখন প্ল্যাঙ্কের কোয়াণ্টাম মতবাদের সমীকরণে আছে যে,

$$\lambda = \frac{c}{n} = \frac{hc}{E_2 - E_1}.$$

যেখানে λ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, n আবৃত্তি, c আলোর বেগ এবং h প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক। তাহলেই বর্ণালিতে বিভিন্ন রেখা দেখা যাবে। যদি ইলেকট্রোনের ভর m, বেগ v এবং বৃত্তীয় কক্ষের ব্যাসার্দ্ধ r হয়, তবে তার কৌণিক ভরবেগ m v r হবে। ব্যাসার্দ্ধের মান 1, 2, 3,… n ইত্যাদি অখণ্ড সংখ্যা ধরতে হবে। বর দেখালেন যে, হাইড্রোজেন অণুর জন্য

$$r_n = 0{\cdot}53 \times 10^{-8} \times n^2 \text{ সেণ্টিমিটার।}$$

সব চেয়ে ভেতরকার কক্ষের জন্য $n=1$, সুতরাং $r_1 = 0{\cdot}53 \times 10^{-8}$

সেণ্টিমিটার। অঙ্ক পদ্ধতিতে কষা হাইড্রোজেন অণুর স্বাভাবিক ব্যাসার্দ্ধের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। ক্রমিক উচ্চতর শক্তির অবস্থায় বিভিন্ন অনুরূপ কক্ষের জন্য n=2, 3, 4. ইত্যাদি বসাতে হবে। এখন আরও অনেক রকম কোয়াণ্টাম সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। এই সম্পর্কে সবচেয়ে আধুনিক মতবাদ পরে আলোচিত হবে।

এইখানে আর একটা কথা এসে পড়ছে। বরের মতানুসারে ইলেকট্রোনের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে অবস্থান ও তার ভরবেগ জানা যায় ধরা হয়েছে। কিন্তু অনিশ্চয়তা সূত্রানুসারে একই সঙ্গে দু'টো জিনিষ জানা সম্ভব নয়। তাহলে হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রোনের কক্ষের যে ব্যাসার্দ্ধ নির্ণয় করা হ'ল তা সন্দেহজনক। এই মুস্কিল দূর করা হ'ল তরঙ্গ-বলবিদ্যার সাহায্যে।

নিউক্লিয়াস ভঙ্গ

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পরমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে কারো কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। নিউক্লিয়াসকে পূর্ব্বে অখণ্ড মনে করা হ'ত। যখন নিউক্লিয়াস যে ভাঙ্গা যায় এই তথ্য আবিষ্কৃত হ'ল তখনই প্রথম জানা গেল যে এই ভঙ্গের ফলে প্রচুর পরিমাণ শক্তি ছাড়া পায়। তখনই বৈজ্ঞানিকরা চিন্তা করা শুরু করলেন কি করে এই ছাড়া-পাওয়া প্রচণ্ড শক্তিকে মানুষের কাজে লাগান যায়। এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নিউক্লিয়াস ভঙ্গের মধ্যে যতই বৈজ্ঞানিক কৌতূহল থাক না কেন, কেবল এই ভাঙ্গার ব্যাপার থেকে শক্তিকে মুক্তি দেওয়ার সমস্যার সমাধান হয় না। নিউট্রোনই এই ভাঙ্গার ব্যাপারের প্রধান এবং ভঙ্গের সঙ্গে নিউট্রোন নির্গত হয়। ব্যাপারটা সহজ ভাবে বললে দাঁড়ায় যে, ইন্ধন জোগান দিতে পারলে আগুন আপনা থেকেই জ্বলতে থাকে, কারণ ক্রমাগত শক্তি উৎপাদিত হবে। ইন্ধনের অন্তর্নিহিত শক্তিই আগুনকে জ্বালিয়ে রাখতে সাহায্য করবে।

মনে কর, এক ফোঁটা জল আছে। গোলকের মত আকৃতি। প্রথমে চ্যাপ্টা হয়ে ডিমের আকৃতি ধারণ করল। পরে মধ্যেটা আরও চেপে গেল আর দুই প্রান্ত ফুলে উঠে ডাম্বেলের মত দেখতে হ'ল। তার পর দু'ফোঁটা জল হয়ে গেল। উভয়েরই গোলকের মত আকৃতি। এক ফোঁটাকে দু'ফোঁটা করতে শক্তির প্রয়োজন হ'ল। কারণ পরস্পরকে বেঁধে রাখার (cohesion) বিরুদ্ধে কাজ করতে হ'ল। ঠিক এই রকম ব্যাপার ঘটে নিউক্লিয়াসকে ভাঙ্গবার সময়। নিজে থেকে হয় না। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিশিয়ে একটা বোতলে পূরে রাখলে কোন দিনই বিস্ফোরণ হবে না আর জলও তৈরী হবে না। বিস্ফোরক পদার্থসমূহ বহু দিন নিরাপদ ভাবে রাখা চলে না। বোমার কারখানায় কত বোমাই তৈরী হয়, গুদামে ভরা থাকে। আপনা হতে বিস্ফোরণ হয় না। সেজন্য একটা বিশেষ পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়। একে বলা হয় তৎপরতা শক্তি (energy of activation)। তেমনি নিউক্লিয়াসকে ভাঙ্গবার জন্যও একটা নির্দ্দিষ্ট তৎপরতা শক্তির প্রয়োজন হয়। দু'টো ভগ্ন নিউক্লিয়াস ধনাত্মক আদানযুক্ত, সুতরাং পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে। এই ভাঙ্গবার কাজে সাহায্য করে। আবার ভাঙ্গবার পূর্ব্বে অংশ দুটোর মধ্যে যোগাকর্ষণ আছে, যা ভাঙ্গবার কাজের বিরোধী। নিউক্লিওনের সংখ্যা অর্থাৎ ভরের সংখ্যা Aএর ওপর যোগাকর্ষণ নির্ভর করে আর যেহেতু ধনাত্মক আদান Z সুতরাং বিকর্ষণ Z^2এর ওপর নির্ভর করে। তাহলে ভঙ্গের সুবিধা নির্ভর করছে Z^2/Aএর মানের ওপর; অর্থাৎ এই মান যত বেশী হবে, ততই নিউক্লিয়াস ভাঙ্গবার সুবিধা হবে।

তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই বৈজ্ঞানিকদের মনে পরমাণুকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহারের কথা উদয় হয়েছিল। কোন কোন পরমাণু থেকে আপনা থেকেই তড়িতাদানে আহিত কণাসমূহ নির্গত হয়। সেগুলো ফটোগ্রাফ প্লেটের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, সুতরাং নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে শক্তি আছে। প্রশ্ন জাগল, এই শক্তির উৎস কোথায়? ১৯০২ খৃষ্টাব্দে পিয়ারী ও মাদাম কুরি লিখলেন যে, তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহের প্রতিটি পরমাণু এই শক্তির উৎসস্বরূপ। এর অর্থ দু'রকম হতে পারে। প্রথম এই যে, প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে স্থিতীয় শক্তি অন্তর্নিহিত আছে, সেই শক্তিই মুক্তি পায়। দ্বিতীয় এই যে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু এমন এক যন্ত্রবিশেষ, যা বাইরে থেকে শক্তি টেনে নিয়ে সুবিধা মত আবার তা মুক্ত করে দিতে পারে। ক্রুকস, কেলভিন ইত্যাদি দ্বিতীয় মতকে পোষণ করলেন যদিও তা তাপ-গতিবিদ্যার বিরোধী। আর বেকেরেল, রাদারফোর্ড, সডি ইত্যাদি প্রথম মতের পোষকতা করলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে শেষোক্ত দুই জন লিখলেন যে, কেবল তেজস্ক্রিয় পরমাণু কেন, সকল পরমাণুর মধ্যে প্রচুর স্থিতীয় শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে নিউক্লিয়াস ভঙ্গের আবিষ্কারের পরে শক্তির প্রকৃত উৎসের সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু ভাঙ্গাটাই আসল কথা নয়। আসল ব্যাপার এই যে, ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে আরও নিউট্রোন মুক্তি পায়, আবার তারাই ভাঙ্গার কাজে সাহায্য করে। অনেকটা মাছের তেলে মাছ ভাজার মত। একবার কাজ আরম্ভ হয়ে গেলে আপনা-আপনিই প্রচণ্ড বেগে ভাঙ্গা চলতে থাকবে। মনে কর, একটা নিউক্লিয়াস ভঙ্গের ফলে দু'টো নিউট্রোন মুক্তি পেল। এরা আবার প্রত্যেকে কাজে লেগে দু'টো করে নিউট্রোনকে মুক্তি দিল। ফলে চারটে নিউট্রোন হয়ে গেল। আবার চারটে থেকে হয়ে গেল আটটা। এই ভাবে দেখতে দেখতে অসংখ্য নিউট্রোন ভাঙ্গার কাজে নেমে পড়ল। একটা নিউট্রোন থেকে বেড়ে চলেছে, 1, 2, 4, 8, 16, 32... গুণোত্তর শ্রেণীতে। আশীটা পদ নিলে 10^{24} নিউট্রোন মুক্ত হয়ে যাবে। এক গ্রাম পরমাণু অর্থাৎ 240 গ্রাম ইউরেনিয়ামকে দেখতে দেখতে ভেঙ্গে ফেলবে। একটা নিউট্রোনের সামান্য একটু-খানি শক্তি থেকে উদ্ভূত হবে ঘণ্টায় 50 লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ প্রচণ্ড শক্তি। আর এই শক্তি উৎপন্ন হতে সময় লাগবে এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষতম অংশ। এত কম সময়ের মধ্যে এত অধিক শক্তি সৃষ্টি হলে যা অবশ্যম্ভাবী ফল তাই হবে, অর্থাৎ প্রচণ্ড প্রলয়-কারী বিস্ফোরণ হবে। এইখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ছাড়া পাওয়া সব নিউট্রোন এই ভাঙ্গবার কাজে লাগে না। কিছুটা একেবারেই ভেজে যায়, কিছুটা যে অংশ ভাজছে না সেইখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। যদি খুব বেশী নিউট্রোন এই ভাবে অন্যত্র না যায়, তবে চেইনের মত প্রক্রিয়া এবং বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে।

[ক্রমশঃ।

থিওডর ডষ্টয়েভ্‌স্কি

প্রথম অধ্যায়

১

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বলার দরকার করে না যে, এতোক্ষণ আমি তামাসা করছিলাম। তবে যতোই কেনো আমার ঠাট্টা-তামাসা দুর্বল শোনাক্, আমি যা-যা বলেছি তাব সবগুলো কথাই কিন্তু তামাসা করে বলা নয়। কারণ, কতকগুলো ঠাট্টা-তামাসা আমার বেশ যুক্তি দিয়ে বলা। কিছু-কিছু প্রশ্ন আমার আত্মাকে পীড়িত করছে, এবং আমি আপনাদের অনুরোধ করছি সেগুলোর সমাধান করে দেওয়ার জন্যে। উদাহরণত, আপনারা বলেন যে আপনারা চান্ মানুষ কতকগুলো পুরোনো রীতি-নিয়ম ভুলে যাক্ এবং বিজ্ঞান ও সুস্থ চিন্তার নির্দেশ অনুসারে তার ইচ্ছেটাকে নিয়ন্ত্রিত করুক্। কিন্তু কেমন করে আপনারা জান্‌লেন মানুষ কেবল মাত্র পরিবর্তন করতে পারে নয়, উপরন্তু করেই? কী করে আপনারা ধারণা করলেন মানুষের ইচ্ছেটা নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার? অর্থাৎ, কেমন করে আপনারা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করে ফেললেন, মানুষের ইচ্ছের অমন নিয়ন্ত্রণ তার পক্ষে সুবিধেরই হবে, কিংবা যদি মানুষ তার খাঁটি স্বাভাবিক স্বার্থ-সুবিধের (যা যুক্তি গাণিতিক সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত) দিকে ছুটে চলা থেকে নিবৃত্ত থাকে তাহলে সেই পথটাই তার পক্ষে সত্যিই সংগঠনকর হবে? এ ত' আপনাদেরই গড়া প্রস্তাবনা মাত্র—এ মাত্র একটা কানুন (আমরা নিশ্চয়ই ধারণা করবো) যে কানুন সমগ্র ভাবে মনুষ্য জাতি করেনি, করেছেন তার্কিকরা। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা সম্ভবত আমায় পাগল ঠাওরাচ্ছেন। বেশ, তাই যদি হয় তাহলে আমি দোষী স্বীকার করছি; আমি আপনাদের সংগে একেবারে একমত। মানুষ মুখ্যত একটা গঠনক্ষম জীব—এমন একটা জীব যে, লক্ষ্যে পৌঁছাবার চিরন্তন সংগ্রামে,° উদ্ভাবনী কাজে নিজেকে নিয়োগ করার ব্যাপারে একেবারে ভাগ্যনির্দিষ্ট, নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় সে এমন একটা পথ তৈরী করতে চায় যে-পথ তাকে নিয়ে যাবে অজানা গন্তব্য স্থানে। তাই এটা ঠিকই, কেনো মানুষ সে-পথ থেকে বার বার সরে আসে। সে সরে আসে, কারণ, সে যে-পথে চলার চেষ্টা করছে সেটা ত' জোর করেই করছে। সে সরে আসে, কারণ, একাধারে বোকা আর স্বাধীনচেতা হয়ে সে কখনও-কখনও ভাবে, যদিও এই পথ তাকে শেষ পর্যন্ত কোনো একটা লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে, তবু সে লক্ষ্য চিরকালই দূরবর্তী থেকে যাবে। ফলে দায়িত্বজ্ঞানহীন শিশুর মতো কখনও-কখনও সে উদ্ভাবক হিসেবে তার নিজের যে কার্যকলাপ সেটাকে অস্বীকার করে এবং মারাত্মক শ্রমবিমুখতার প্রশ্রয় দেয় যে শ্রমবিমুখতাকে আমরা জানি সকল দুষ্কর্মের প্রসূতি হিসেবে। মানুষ যে গঠন করতে, পথ তৈরী করতে ভালোবাসে তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু তাই বলে মানুষ অতো আবেগ নিয়ে সাধারণ ভাবে ক্ষয়-ক্ষতি, গণ্ডগোল সৃষ্টি করতেই বা ভালোবাসে কেনো? তার উত্তর দিন্। আমার প্রথমত এই সম্বন্ধে দু'-চারটে কথা বলবার আছে। সাধারণ একটা বিশৃঙ্খলা ঘটাবার প্রতি তার এই যে আগ্রহ (স্বীকার করতেই হবে তার এই আগ্রহ কোনো বিবাদের সৃষ্টি করে না) সে আগ্রহ জন্মলাভ করে একান্ত ভাবে তার লক্ষ্য পূরণের জন্যে সহজাত ভয় থেকে এবং সেই হিসেবে গঠন নির্মাণের উপাদানগুলোর শেষ হয়ে যাওয়ার সহজাত ভয় থেকে, তাই নয় কি? এটাও কি সত্যি নয় যে, হাতের কাছ থেকে নয়, দূর থেকেই সে ভালোবাসে তার সেই অট্টালিকাকে যেটাকে সে গড়ে তুলছে? তার মানে, সে সৃষ্টি করতেই ভালোবাসে, তার সৃষ্ট জিনিষ ভোগ করতে নয়—যখন নির্মাণকার্য শেষ হয়ে যায় তখন সেটাকে হস্তান্তর করতে ভালোবাসে পিঁপড়ে, ছাগল-ভেড়া প্রভৃতি জাতীয় নিচু স্তরের সামাজিক জীবদের হাতে, তাই নয়

পিপীলিকারা সম্পূর্ণ ভিন্ন রুচির জীব। তারা প্রতিনিয়ত সুন্দর সুন্দর ঘর-বাড়ী তৈরী করছে, একবার তৈরী হলে সেগুলো প্রায় অনশ্বর হয়ে যায়, উইঢিবির থেকে যতো সব ভালো-ভালো পিপীলিকার জন্ম হয় এবং সেখানেই (সম্ভবত) তারা মারা যায়। এই ভাবে তাদের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, তাদের অধ্যবসায়ও। পক্ষান্তরে, মানুষ হলো নির্বোধ, বাইরে চটকদার সে, এবং দাবা খেলুড়ের মতো লক্ষ্যে পৌঁছানোর পদ্ধতি যতো প্রয়োজন মনে করে, লক্ষ্যটাকে ততো মনে করে না। তাছাড়া, কে জানে (কারণ খুব নিশ্চিত করেই বলা হয় না) যে পৃথিবীতে মানুষ যে লক্ষ্যের জন্যে দৌড়-ঝাঁপ করে সেই লক্ষ্যটা বিরামহীন সাধনার প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত থাকে?

নিহিত থাকে বরং সেই লক্ষ্যটারই মধ্যে (অর্থাৎ জীবন যাপনের প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে না), এই লক্ষ্যটা সেই সূত্র নির্দেশে চলে যে সূত্রের কথা হলো, দুই আর দুই মিলে চার হয়। তবে, ভদ্র-মহোদয়গণ, এই সূত্রটাই ত' জীবন নয় ; বরং সেটা মৃত্যুর পূর্বাভাস! সব ক্ষেত্রেই মানুষ দুয়ে-আর-দুয়ে চার হওয়ার সূত্র চিন্তা করতে ভয় পায়, আমি নিজেও পাই। যদিও মানুষ আপ্রাণ খেটে চলেছে এই সূত্র লাভের জন্যে, যদিও সে এই সূত্র-সন্ধানে আকাশ-পাতাল তোলপাড় করছে, এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে জীবনটাকে বরবাদ করছে, তাহলেও এটা কী হতে পারে যে সে সত্যিই সংগ্রামে জয়ী হতে ভয় পায়, এই কারণে যে যদি সে হঠাৎ সেই সূত্রটাকে ধরে ফেলে তাহলে তার মনে হবে আর কিছু অন্বেষণ করার থাক্‌লো না? মজুররা তাদের সপ্তাহান্তিক মাইনে পায় তাদের কাজ শেষ করার পরে এবং শৌণ্ডিকালয়ে গিয়ে স্ফূর্তি করে। এই তাদের সপ্তাহান্তিক চিত্তবিনোদনের উপায়। কিন্তু জনসাধারণ কোথায় যেতে পারে? এটা ত' সোজা কথা, মানুষ যদি সত্যিই তার পরিশ্রমের শেষ স্তরে পৌঁছয়, তবে তার শয্যাকণ্টক উপস্থিত হবে। অর্থাৎ, মানুষ ভালোবাসে কোনো কিছু আয়ত্ত করতে, কিন্তু তাই বলে একেবারে মুঠোর মধ্যে আনতে চায় না ; অবিশ্যি এই স্বভাবটাই তার চরিত্রের নিতান্ত হাস্যকর দিক এবং এইটেকে দৃশ্যত অযৌক্তিক মনে হবে। সে যাই হোক্, দুয়ে-আর-দুয়ে চার হওয়ার যে সূত্র মানুষ সব চেয়ে সেইটেকেই সহ্য করতে পারে না; আমিও এটাকে অত্যন্ত ঘৃণার্হ বস্তু হিসেবে ছাড়া অন্য কোনো ভাবে দেখি নে, কারণ এই সূত্রটার এমন একটা অসভ্যপনা আছে যেনো রাস্তায় আপনাদের সঙ্গে দেখা হলেই কোমরে হাত দিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে মুখের ওপর থু-থুঃ করে দেয়। এই সূত্র তার নিজের দিক থেকে যথেষ্ট ঠিক, এ-কথা আমি স্বীকার করি সত্যি ; তবে এ-কথাও বিনয়ের সংগে বলি (যদি আমায় সমান ভাবে সবায়ের প্রশংসা করতে হয়ই), দুইয়ে-আর-দুইয়ে পাঁচ হওয়ার সূত্রের প্রতি আকর্ষণ যে নেই এমন নয়।

তাহলে কেনো আপনারা অতো দৃঢ় ভাবে, অতো অদ্ভুত ভাবে নিশ্চিত হয়েছেন যে, একটা জিনিস, একটা জিনিসই কেবল স্বাভাবিক আর বাস্তব—অর্থাৎ মংগলকর—মানব জাতির পক্ষে? সুবিধে-সুযোগের পরিমাপ করতে গিয়ে কি যুক্তি কখনও ভুল করে না? মানুষ কখনও কখনও কি তার সমৃদ্ধির বাইরে কোনো-কিছুকে ভালোবাসতে পারে না? দুঃখ-দুর্দশাকেও কি মানুষ ভালোবাসতে পারে না? এবং সুখ-শান্তির মতো দুঃখ-দুর্দশাটাও কি তার কাছে মংগলকর হতে পারে না? নিশ্চয়ই মানুষ কখনও কখনও ভালোবাসে তার দুঃখ-দুর্দশাকে এবং ভালোবাসে গভীর আবেগে ; সুতরাং সত্য-নির্ধারণের জন্যে ইতিহাসের খোঁজ করবেন না, বরং যদি আপনারা মানুষই হন্, যদি জীবন সম্বন্ধে আপনাদের অভিজ্ঞতা থেকে থাকে তাহলে নিজেদেরকেই প্রশ্নটা করুন। আমার দিক থেকে বলতে পারি, সুখ-সমৃদ্ধির প্রতি অখণ্ড আসক্তিকে আমি একটা অসভ্যতা বলে মনে করি; কারণ মাঝে-মাঝে যদি বিপদাপদ আসে, আসে দুঃখ-যন্ত্রণা, তাহলে সেটা আমার কাছে আরামদায়ক মনে হয়। তবে আমি যে একেবারেই দুঃখ-দুর্দশার পক্ষে তা নয়, এবং পুরোপুরি সুখ-সমৃদ্ধির পক্ষেও নয় ; আমার সাধারণত ভালো লাগে আমার ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছেটাকে এবং যখন খুশী আমি সেটাকে সেই ভাবে ব্যবহার করতে। পারি। জানি, রংগাভিনয়ের ক্ষেত্রে দুঃখ-দুর্দশাকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা হয় না ; জানি, পৃথিবীতে খৃষ্টের সহস্র বর্ষব্যাপী রাজত্ব-কালের সময়ে দুঃখ-দুর্দশাকে একেবারেই অকল্পনীয় চিন্তা করা হবে, তার কারণ হলো, যেহেতু দুঃখ-দুর্দশা প্রকাশ করে কিছু নেতিবাচক আর সন্দেহবাচক, তাই এমন কোনো কিছু খাড়া করা যায় না যেখানে একটা সন্দেহ ভিৎ গাড়তে পারে। তৎসত্বেও আমি নিশ্চিত জানি, মানুষ পুরোপুরি দুঃখ-দুর্দশাকে অস্বীকার করতে পারে না (মানুষের পরিকল্পনার মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও সংপ্লব ঘটে বলেই); কারণ দুঃখ-দুর্দশাই আত্ম-উপলব্ধির প্রধান উপায়। এই চিঠির গোড়াতেই বলে নিয়েছি যে, আমার মতে মানুষের পক্ষে আত্ম-উপলব্ধিটাই প্রচণ্ড দুর্ভাগ্য ; তবু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস মানুষ এটাকে ভীষণ ভালোবাসে, এবং অন্য কোনো প্রকার আনন্দের বিনিময়ে এটাকে ছাড়তে রাজী হবে না। উদাহরণত, দুয়ে-আর-দুয়ে চার হওয়ার সূত্রের চেয়ে দুঃখ-দুর্দশা অপরিমেয় শ্রেষ্ঠ ; কারণ, যদি দুয়ে-আর-দুয়ে চার হওয়ার সূত্রটাকে অধিগত করা যায় তাহলে মানুষের পক্ষে কিছু করার বা অনুভব করার আর কী থাকে? তখন আমাদের করবার থাকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মুখ বন্ধ করে রেখে অনন্ত ধ্যান-অনুধ্যানের অবস্থায় উপনীত হওয়া। এই একই ফল (অর্থাৎ যখন আমাদের আর কিছু করার থাকবে না) হতে পারে আত্ম-উপলব্ধির বেলায় ; তবে সে-সব ক্ষেত্রে মাঝে-মাঝে মুখ বদলে নিয়ে নিজেকে চাংগা করে তোলা যেতে পারে। অবশ্য এটা একটা পশ্চাদপসরণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু কিছু না হওয়ার থেকে ত' ভালোই।

১০

আপনারা কি বিশ্বাস করেন না অনন্তকাল ধরে অ-ভংগুর থাকবে যে 'স্ফটিক প্রাসাদ'* সেই সংস্থায় কেউ মুখ খুলতে পারবে না, বা কেউ ঠাট্টা-তামাসা করতে পারবে না? এখন, যেহেতু এটা স্ফটিক নির্মিত হবে এবং অনন্ত কাল ধরে অ-ধংগুর থাকবে এবং যেহেতু সেখানে কেউ মুখ খুলতে পারবে না, আমি সে-রকম জায়গায় যেতে লজ্জা বোধ করি। কারণ আপনারা বুঝতে পারছেন না, যদি সেটা প্রাসাদ না হয়ে মুরগীর খাঁচা হতো, তবে বৃষ্টি পড়তে সুরু করলে আমি সেখানেই আশ্রয় নিতাম, অবশ্য সেটা ঘটার সম্ভাবনা কম ; তবে নিতাম নিতান্ত আশ্রয় পাওয়ার কৃতজ্ঞতাতেই এবং রাজ-ভবন বলে ভুল করতাম। কথাটা শুনে আপনারা হেসে উঠবেন বা এ-ও পর্যন্ত বলে ফেলতে পারেন যে, ঐ সব ক্ষেত্রে মুরগীর খাঁচার মতোই কাজে লাগতে পারে খুব জমকালো ধর্মমন্দিরগুলো। তাহলে আমি জবাব দেবো, হাঁ তা লাগতে পারে, যদি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য জলে-ভেজার হাত থেকে রেহাই পাওয়াই হয়।

---

* ইংরেজী মিলেনিয়াম শব্দের অর্থ হলো, পৃথিবীতে খৃষ্টের সহস্র বর্ষব্যাপী রাজত্বকাল ; রুশ ভাষায় তাকে 'স্ফটিক-প্রাসাদ' বলা হয়।—অনু।

কিন্তু কেমন করে হবে তা, যদি আমায় বুঝে নিতেই হয় যে, শুধু মাত্র ঐ রকমের উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ থাকতে পারবে না বেঁচে, বা যদি কাউকে বাঁচতেই হয়, তবে ঐ প্রাসাদেই তার পোষাবে ভালো? এটা আমার ইচ্ছে-অভীপ্সা বলে অনুমান করে নিচ্ছি। এই রকম ক্ষেত্রে আপনারা কিছুতেই আমার কাছ থেকে আমার ইচ্ছেটাকে সরিয়ে নিতে পারেন না যদি না আমার ইচ্ছেশক্তিটাকে উচ্ছেদ করে দেন। এবং যদি ধরে নেওয়া যায়, ইচ্ছেশক্তিটাকে নির্মূল করে দিতে পারা আপনাদের পক্ষে সম্ভব, কিংবা আমার সামনে বিপরীত প্রকারের কোনো আকর্ষণীয় বিষয় ধরতে পারা সম্ভব এবং আমাকে একটা নতুনতরো আদর্শ যুগিয়ে দিলেন, তাহলেও আমি ঐ প্রাসাদকে মুরগীর খাঁচা বলে ভুল করতে নারাজ হতে পারি! আর যদি ঐ স্ফটিক-প্রাসাদ স্বপ্নের বস্তু হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মে অসম্ভব মনে হয়, কিংবা আমার ব্যক্তিগত অজ্ঞতা যদি আমার যুগের কিছু-কিছু প্রাচীন সংস্কার, যুক্তি-বিরুদ্ধ প্রথার সংগে যুক্ত হয়ে আমায় অমন জিনিষ কল্পনা করতে বলে, তাহলে অসম্ভব হলেও কি আমায় তা পরোয়া করে চলতে হবে? তার অস্তিত্ব আছে বা নেই, এ-দু'টো কি আমার কাছে একই রকম মনে হবে না? কিংবা তার অস্তিত্ব আছে বা নেই, এ দু'টো কি আমার কাছে একই রকম মনে হবে না যদি তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার ইচ্ছে-অভীপ্সা থেমে যায়?··· আবার দেখ্‌ছি আপনারা হাস্‌ছেন। তা. হেসে উড়িয়ে দিন্‌। আপনাদের হাসির কী দাম তা আমি জানি, কারণ, যখন আমি ক্ষুধার্ত তখন অতিভোজনজনিত অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা বলার মতো তেমন স্বভাব আমার নয়, বা বলার মতো তেমন স্বভাব আমার নয় যে, সামান্য আপোষ-মীমাংসার ওপর ছাড়া অন্য কোনো মহত্তর যা-কিছুর ওপর আমার আশা-ভরসা নির্ভর করছে তা আমার জানা নেই; এই আশা-ভরসা দশমিকের অসংখ্য পৌনঃপুনিক বিন্দুর মতো, এবং প্রাকৃতিক নিয়ম সে আশা-ভরসাকে বেঁচে থাকার অনুমতি দিতে পারে (এবং দেয়ও)। আমার ইচ্ছা সমূহের প্রধানতমটি কতোকগুলো ফ্ল্যাটের একটা ব্লক্‌ নয়, যে ব্লকে দাঁত-ব্যবসায়ীদের ভাড়াটে রাখা হয়েছে বা গরীব বাসিন্দাদের ঘরের জন্যে হাজার বছরের লীজ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু যদি আপনারা আমার ইচ্ছেটাকে ছাঁটাই করে দিতে পারেন, যদি আমার আদর্শগুলোকে মুছে ফেলে দিয়ে নতুনতরো উৎকৃষ্ট কিছু আমাকে দেখাতে পারেন, তাহলে হয়ত বা আপনাদের মতে মত দিয়ে দিতে পারি। এর উত্তরে আপনারা বলতে পারেন আমাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজী করাব মতো সময় আপনাদের নেই; তার উত্তরে আমারও সমান জবাব আছে: তার পরে আমরা বিষয়টাকে নিয়ে যথোচিত মর্যাদার সংগে আরও আলোচনা করবো, আলোচনা করবো যতোক্ষণ না আপনারা সিদ্ধান্ত করেন, আমি আপনাদের আকর্ষণের যোগ্য ব্যক্তি নই। আমি খুব ভীষণ রকম পরোয়া করবো না। আমার জন্য সব সময়েই থাকবে খোলা নিচু-তলার দুনিয়া।

এদিকে আমি ত' জীবন যাপন করতে থাকি, প্রয়োগ করতে থাকি আমার স্ব-ইচ্ছাশক্তি; এবং কোনো বাড়ীর ব্লকের গায়ে নতুন একখানা ইট লাগানোর মতো আমার সেই ইচ্ছাশক্তির ওপর নতুন কিছু প্রয়োগ করার আগেই যেনো আমার শক্তি পংগু হয়ে যায়। মাত্র অল্প দিনই আগে মাত্র আমি ঐ স্ফটিক প্রাসাদের ব্যাপারটা বাতিল করে দিয়েছি, শুধু এইমাত্র কারণে যে, আমি ওটার বিরুদ্ধে মুখ না খুলে থাকতে পারবো না। তখন আমি যা বলেছিলাম তা এই জন্যেই বলিনি যে, আমি সব কিছুর বিরুদ্ধে কথা বলতে ভালোবাসি, বলেছিলাম বরং এই কারণে, যে, এতো সব প্রাসাদ-অট্টালিকার মধ্যে সেই রকম একখানা প্রাসাদের অস্তিত্ব এখনও ঘটেনি যেখানে যার সম্বন্ধে লোকে ঠাট্টা-তামাসা করতে পারবে। পক্ষান্তরে, একান্ত কৃতজ্ঞতায় আমি আমার জিভ কেটেই ফেলে দেবো যদি এমন ব্যবস্থা করা হয়, যাতে কোনো সময়েই সেইটের বিরুদ্ধে কিছু উদ্গীরণ করার মতো মনের অবস্থা আমার না হয়। সেই রকমের একটা প্রাসাদ অসম্ভব ব্যাপার হলেই বা কি, আর আমার বর্তমান অবস্থায় আমি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারলেই বা আমি কিসের পরোয়া করি? ওই ধরণের ইচ্ছে-অভীপ্সাই বা আমার আদৌ হবে কেনো? শুধু এইমাত্র কারণে হতে পারে যে, শেষকালে হয়ত আমার এই রকম একটা সিদ্ধান্ত করতে হতে পারে আমার সমস্ত মানসিক গঠনটাই ভুয়ো? সেইটেই সব-কিছুর কি মূল? আমি তা বিশ্বাস করি নে।

তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত—যথা, নীচু-তলার দুনিয়ার বাসিন্দার সব সময়ে উচিত মুখের লাগাম খুলে রাখা; যদিও সে গত চল্লিশ বছর ধরে মুখ বুজিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে তার গহ্বরে, তবু আজ সে বাইরের আলোয় আত্মপ্রকাশ করুক, মুখের লাগাম খুলে ফেলুক টেনে, এবং অনবরত একটানা করতে থাকুক বক্‌-বক্‌-বক্‌···

[চলবে

অনুবাদ: আনন্দ দে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাব্য-কমল-পথে যেই জন যাত্রী
ছন্দের মাঝারেতে জাগে অহোরাত্রি।
পিয়ানো ও চরকার সুরে মেলে সুর যার
সে-কবির কীর্তি যে জাগিছে বারম্বার।

অকাল প্রয়াণ তবু কীর্তি তো নয় মৃত
বাঙালীর হিয়া মাঝে দীপ্ত যা অবিরত।
কবি সত্যেন্দ্র সে স্মরণীয় বাঙলার
তারি উদ্দেশে হিয়া জানায় নমস্কার।

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

১২

অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হওয়ার পর ভগিনী নিবেদিতা বাংলার এই বিপ্লব-কেন্দ্রটিতে তাঁহার লাইব্রেরীর জাতীয়তা বিষয়ক প্রায় দুই শত পুস্তক দান করেন। তাঁর পুস্তক-সংগ্রহের মধ্যে ছিল আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, ডাচ রিপাবলিক, গ্যারিবল্ডী ও ম্যাটসিনির জীবনী, সিপাহী যুদ্ধের ও আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস, টডের রাজস্থান, উইলিয়াম ডিগবীর ব্রিটিশ অর্থনীতির বই, ভারত, ইউরোপ ও ইংলণ্ডের ইতিহাস, War Made Impossible নামক একখানি আধুনিক ব্যাপক ধ্বংসমূলক বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের বিবরণ সম্বলিত বই, ব্যারণ ওকাকুরার বই।

ভগিনী নিবেদিতার প্রদত্ত লাইব্রেরীই ১০৮ নং আপার সার্কুলার রোডের চক্রের ছিল প্রাণ ও প্রেরণার উৎস-মূল। নিবেদিতার সহিত যতীন্দ্রনাথের কথা ছিল, এই পুস্তকসমূহ অবলম্বনে রাজনীতি শিক্ষা দিবার ও কর্ম্মী গড়িবার বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। সেই স্কুলে বা study circle-এ বিভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস, জীবনী, অর্থনীতি, ধর্ম্ম, সমাজ, জাতির উত্থান-পতনের নিগূঢ় তত্ত্ব লইয়া আলোচনা ও শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রচারকরূপে ভারতের নব জাগরণের চারণরূপে নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে বিপ্লবের বীজ বপন করিয়া সমগ্র দেশে অসংখ্য বিপ্লবী-কেন্দ্র স্থাপন করিবে।

সার্কুলার রোডের এই রাজনীতির স্কুলে বারীন্দ্র, দেবব্রত বসু, নলিন মিত্র, জ্যোতিষ সমাজপতি, ভূপেন দত্ত, ইন্দ্রনাথ নন্দী প্রভৃতি ছিলেন প্রথম ছাত্রদল। বারীন্দ্রকুমার এক বিবৃতিতে বলেন, "আমি এসে সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়কে এই বিপ্লব-কেন্দ্রটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের পরম ভক্ত এই মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ ছিলেন পূর্ব্বে দেওঘর স্কুলের শিক্ষক, আমাদের ছাত্রজীবনের মন্ত্রগুরু। এঁর নেতৃত্বে সেই তরুণ বয়সে আমরা দেওঘরে দাড়োয়া নদীর ধারে শিখতাম লাঠিখেলা, নন্দন পাহাড়ে দুই দলে মোগল ও মাওয়ালী সেনায় বিভক্ত হ'য়ে করতাম যুদ্ধের অভিনয়। দেওঘরের অত্যাচারী সাব ডিভিশন্যাল অফিসারের বিরুদ্ধে 'হিতবাদী' কাগজে পত্রপ্রেরকের পত্র প্রকাশ করার সন্দেহে সখারাম বাবুর স্কুলের চাকুরী যায়। পরে তিনি 'হিতবাদী'র সম্পাদক বিভাগের উচ্চতর বেতনে কাজ পেয়েছিলেন, এস্-ডি-ওর ক্রোধ হয়েছিল তাঁর পক্ষে শাপে বর। স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিতে বদ্ধপরিকর এমন একটি দল দেশে গজিয়ে উঠেছে—এই সুসংবাদ আমার মুখে শুনে শিবাজীভক্ত তেজস্বী এই মহারাষ্ট্রী আলাপ-পরিচয় ক'রে গেলেন এবং এই স্কুলের অর্থনীতির ক্লাসটির শিক্ষার ভার নিলেন।"

সার্কুলার রোডের কেন্দ্রে পলিটিকাল মিশনারী গঠনের কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। ব্যারিষ্টার পি মিত্র মহাশয় ইতিহাস পড়াইবার ভার গ্রহণ করেন—বিশেষ করিয়া সিপাহী যুদ্ধের, শিখ অভ্যুত্থানের ও ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস। সখারাম গণেশ দেউস্কর বৃটিশ-ভারতে আর্থিক শোষণের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করিতেন। উইলিয়াম ডিগবীর 'Prosperous British India' পুস্তককে ভিত্তি করিয়া তিনি 'দেশের কথা' রচনা করেন। পরে 'রণনীতি', 'মুক্তি কোন পথে' প্রভৃতি পুস্তকের সঙ্গে এই পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত হয়।

যতীন্দ্রনাথ পড়াইতেন রণনীতি এবং ছাত্রদের নিকট অগ্নিদীপ্ত ভাষায় ভাবী বিপ্লবের কথা বলিতেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নানা জাতির উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত—ইটালীর জাগরণের কাহিনী, মার্কিণের স্বাধীনতা-যুদ্ধের কথা, আইরিশ মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কিত পুস্তক পড়াইতেন।

বারীন্দ্রকুমার তাঁর বিবৃতিতে বলেন, "বিপ্লবী ভাব প্রচার করার জন্য আমি প্রচারকরূপে প্রথম বের হই বর্দ্ধমানে। সেখানে তখন আমার ঢাকা কলেজের লজিকের তরুণ প্রফেসার বদলী হ'য়ে এসেছেন; তাঁকে কেন্দ্র ক'রে আমরা বর্দ্ধমানে একটি গুপ্ত সমিতির উপশাখা গ'ড়ে তুললাম। শ্রীঅরবিন্দ সহ আমার দ্বিতীয় অভিযান মেদিনীপুরে। আমার দুই মামা যোগেন্দ্র বসু ও সত্যেন বসু ইতিমধ্যেই সেখানে তরুণ দলকে দিয়ে একটি গুপ্তচক্র গ'ড়ে ফেলেছেন; এইখানে প্রথম পরিচিত হলাম সত্যেন বসু, নিরাপদ রায়, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রভৃতি বহু প্রৌঢ় ও তরুণ কর্ম্মীর সঙ্গে। মেদিনীপুরের "আনন্দমঠ" ছিল একটি একতলা ছোট এঁদোপড়া শ্রীহীন বাড়ীতে। দেখলাম, ছেঁড়া মাদুরের উপর ছেলেরা শোয়; তারই পাশে একটি তিন হাত উঁচু ধুলামাখা মৃন্ময়ী কালী প্রতিমা অযত্ন-প্রদত্ত গুটিকয়েক আধ-শুকনো জবার নৈবেদ্য সামনে ক'রে রক্তজিহ্বা বের ক'রে ক্ষেপাটে কর্ম্মীগুলির আদর্শেই যেন খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে রাঙতার খাঁড়া, পদতলে নিদ্রিত অসাড় হতচৈতন্য শিব ঠাকুরটি। এই মৃন্ময়ীকে কেন্দ্র ক'রে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার মত ইংরাজের সাম্রাজ্য উল্টে ফেলার শুভ কাজ চলেছে।

"নিরাপদ রায় ছিল খর্ব্বকায়, গৌরকান্তি শান্ত মৌনপ্রায় মানুষটি; সে ছিল শান্তিপুরের ছেলে, তার কটা চোখে ও নির্ব্বাক্ ওষ্ঠে হাসি থাকতো লেগে। একটা ময়লা ধুতি ও চাদর গায়ে খালি পায়ে সে দরকার হ'লে দশ-বিশ ক্রোশ পথ অক্লেশে যেত হেঁটে, যখন আর কোন অসাধ্য সাধনের কাজ না পেতো খুঁজে—তখন গম্ভীর মৌনতা ভরে হুঁকাটি হাতে বসেই থাকতো অসীম ধৈর্য্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে—চোখে তার গোপন কৌতুকের হাসিটুকু নিয়ে।

"সত্যেন ছিল শীর্ণকায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছেলে, দুরন্ত হাঁপানী রোগে রুগ্ন, মুখে বুদ্ধির সতেজ দীপ্তি, রোগা শরীরে অফুরন্ত কর্ম্ম-চাঞ্চল্য; এই ছোট্ট দলের দলপতি হ'য়ে চরকীর পাকের মত সে

বেড়াত। অদূর ভবিষ্যতে এই সত্যেন বসুই আলিপুর বোমার মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে কানাই দত্তের সাহায্যে হত্যা ক'রেছিল।

"এই যাত্রা মেদিনীপুরে শ্রীঅরবিন্দ হেমচন্দ্রকে স্বহস্তে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দেন। হেমচন্দ্র কানুনগো ছিলেন বয়সে প্রৌঢ় হ'য়েও এই দলেরই এক জন। তখন তিনি ছিলেন মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনে পাউণ্ড ইনস্পেক্টর—গরু-ছাগলের খোঁয়াড়গুলির তত্ত্বাবধায়ক অফিসার। হাসি, রঙ্গরস, সরস রসিকতা তাঁর ছিল স্বভাবজাত, মুখে থাকতো অমায়িক হাসিটি লেগেই। এমন মিশুক সদাপ্রসন্ন মজলিসী মানুষ খুব কম দেখা যায়। অভিনয়ে দক্ষ, সুগায়ক, উত্তম শিকারী ও সাইক্লিষ্ট, পাশ্চাত্য চিত্রাঙ্কনে ও ফটোগ্রাফিতে অতি উচ্চ অঙ্গের আর্টিষ্ট, খুঁটিনাটি মেশিন মেরামতিতে নিপুণ, রসায়ন-বিদ্যায়ও পারদর্শী—এই সব কর্ম্মে হেমদা'র গুণের আর অবধি ছিল না।

"এই দলেরই অন্তর্গত ছিল ক্ষুদিরাম বসু। ক্ষুদিরাম তখন নিতান্ত লাজুক, স্বল্পভাষী রোগা ছেলেটি, আমাদের সামনে সঙ্কোচে এগোতো না। আমার মাতামহ রাজনারায়ণ বসু ছিলেন মেদিনীপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডমাষ্টার। তিনি অবসর নিয়ে দেওঘরে বাস করার পর তাঁর ভাই দুর্গানারায়ণ বসু হন এই হেডমাষ্টারীতে বহাল। জ্ঞান বসু ও সত্যেন বসু তাঁরই ভাই অভয়চরণ বসুর পুত্র, কর্ণেলগোলাতে তাঁর বসতবাটি এখনও আছে। এই বাড়ীর কাছেই একতলা বাড়ী—মেদিনীপুরের মা—কালী-মার্কা আনন্দমঠ।

আমার অস্পষ্ট মনে আছে, সখারাম বাবুকে নিয়ে ছেলে-ধরার কাজে যাত্রার কথা এবং চাঁদের আলো-করা গঙ্গাতীরে বাঁধানো ঘাটের উপর এক দল তরুণকে নিয়ে আমাদের সেই প্রাণ-মাতানো আলোচনা। সেটি বোধ হয় খড়দহের গঙ্গাতীরের ঘটনা।

"তাছাড়া কলিকাতার পার্কে পার্কে সন্ধ্যা ও সকালে বসে রাজনৈতিক আলোচনা করতাম, তার আকর্ষণে ছেলেরা এসে পরিচিত হ'য়ে পড়তো এবং ধরা দিতো। হেদুয়া, কলেজ স্কোয়ার প্রভৃতি পার্কগুলি আমাদের ছেলে-ধরার ফাঁদ ছিল। এখানে কবিরাজ সি কে সেনদের চন্দরদা' নিত্য বসে ছেলে ক্ষেপাতেন।"

কিন্তু শীঘ্রই সার্কুলার রোডের বিপ্লব-কেন্দ্রে ফাটল ধরিল, এবং দলাদলি দেখা দিল। যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অপবাদ দিয়া তাঁহাকে এই বিপ্লব-কেন্দ্র হইতে বিদায় লইতে বাধ্য করা হয়। উক্ত বিপ্লবী আড্ডা তুলিয়া মদন মিত্র লেনের এক বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই বাড়ীতে ২।৩ মাস থাকা হয়। ঐ সময় সর্ব্বক্ষণের কর্ম্মীর মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ও অবিনাশ। একটি চাকরের জন্য ঐ বাড়ী ছাড়িয়া দিতে হয়। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সাহায্যে তখন আমরা গুটিকয়েক রিভলভার সংগ্রহ করিয়াছি। এক দিন একটি রিভলভার ঘরে টেবিলের উপর রাখা ছিল, চাকরটি সেই রিভলভারটি হাতে লইয়া সামনের বাড়ীর দেওয়াল লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করে। গুলী লাগিয়া দেওয়ালের কিছু প্ল্যাষ্টার খসিয়া পড়ে, চাকরটির চাল-চলন সন্দেহজনক মনে করিয়া তাহাকে বরখাস্ত করা হয়। বাড়ীটিও গুলী চলার গণ্ডগোলে ছাড়িয়া দেওয়া স্থির হয়।

সেই সময় বিপ্লব-কেন্দ্রের অন্যতম কর্ম্মী নলিন মিত্রের বাড়ী ছিল ১৭০ নং অপার সার্কুলার রোডে। নলিন এই বাড়ীর নিকটে একটি দোতলা ছোট বাড়ী কেন্দ্রের জন্য ভাড়া করে। এই সময় সর্ব্বক্ষণের কর্ম্মী হিসাবে পূর্ণ রক্ষিত বিপ্লব-কেন্দ্রে যোগদান করে।

যতীন্দ্রনাথ সার্কুলার রোডের বাসা ছাড়িয়া দিয়া সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে এক মেসে আশ্রয় নেন। তিনি গুজরাট-কেন্দ্রের সভাপতি অরবিন্দকে পত্র লিখিয়া বাংলার এই বিপ্লব-কেন্দ্রের গৃহ-কলহ মীমাংসার জন্য আমন্ত্রণ করেন। যতীন্দ্রনাথের আহ্বানে অরবিন্দ ১৯০৪ সালে পূজাবকাশের সময় আসেন এবং দলাদলির অবসান ঘটান। বারীন্দ্র ও অবিনাশ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায় চলিয়া আসেন এবং পূর্ব্বের আড্ডা তুলিয়া দেওয়া হয়। নূতন উৎসাহে আবার দুই দল একত্রিত হইয়া কাজ করার সঙ্কল্প হয়, কিন্তু এই সদিচ্ছা অধিক কাল স্থায়ী হয় না। অল্প দিনের মধ্যেই আবার ভাঙ্গন ধরিল।

অনুশীলন সমিতির কর্ম্মক্ষেত্র পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশঃই বিস্তৃত হইতে লাগিল। পি, মিত্রের নির্দ্দেশে সতীশ বসু পশ্চিমবঙ্গের এবং পুলিন দাস পূর্ব্ববঙ্গের ভার গ্রহণ করেন; কিন্তু বারীন্দ্রকুমার তাঁর বিবৃতিতে বলেন, "আমরা সার্কুলার রোডের দল রইলাম আলগোছে পৃথক্ কর্ম্মধারা নিয়ে।"

পুলিন বাবুর অসাধারণ সংগঠন-শক্তির বলে ঢাকার কেন্দ্রই সমগ্র বাংলা বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব ও উত্তর-বাংলায় বিস্তার লাভ করে। অনুশীলন সমিতির উপর দিয়া নানা আঘাত-প্রত্যাঘাত সত্ত্বেও ভারত ও ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র সমিতির কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

পুলিন বাবু ঢাকাতে থাকিতেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি মহারাষ্ট্র-দেশীয় এক ব্যক্তির নিকট হইতে অসি ও ছোরা-খেলা এবং দেশীয় পাইকদের নিকট হইতে লাঠি খেলা শিক্ষা করেন। পুলিন বাবু ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য দেশে ক্ষাত্রশক্তি জাগাইতে প্রয়াসী হইলেন এবং সমিতির মধ্যে অসি খেলা, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ও ড্রিল শিক্ষা প্রভৃতি প্রচলন করিলেন।

সমিতির প্রধান কেন্দ্র ঢাকায় একটি বোর্ডিং স্থাপিত হয়। সেই বোর্ডিংএ প্রায় দুই শত ছাত্র থাকিত। তাহারা সকলেই বাড়ী-ঘর ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। এই যুবকদের ব্যয়ভার সমিতি হইতেই নির্ব্বাহ হইত। তাহারা সেখানে থাকিয়া লাঠি খেলা ছোরা খেলা প্রভৃতি শিক্ষা করিত এবং সহরে-সহরে গ্রামে-গ্রামে গিয়া তাহার শাখা স্থাপন করিয়া সেখানকার নূতন সভ্যদের ঐ সমস্ত খেলা শিখাইত। এই ভাবে অনুশীলন সমিতির শাখা বাংলা দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। স্বদেশী আন্দোলন দেশের মধ্যে নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করিলে জনসাধারণের মধ্যে একটা বীরত্বের ভাব সঞ্চারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি পড় অসি খেলা ও ড্রিল শিক্ষার উপর। এই সময় কোন কোন স্থানে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হইলে সমিতির সভ্যগণ বীরত্বের সহিত তাহার সম্মুখীন হইত। ফলে, সমিতির উপর সকলে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল এবং দলে দলে লোক অনুশীলন সমিতির সভ্য হইয়া আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা করিতে থাকে।

প্রতি বৎসর সমিতির কৃত্রিম যুদ্ধ হইত এবং সময়-সময় খেলারও প্রতিযোগিতা হইত। এই কৃত্রিম যুদ্ধের খেলা একটা দেখিবার জিনিষ ছিল। সহরের বহু লোক, এমন কি জেলার হাকিম, পুলিশ সাহেবরাও উহা দেখিতে যাইতেন। তাঁহারা তামাসা দেখিতে যাইতেন কি আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি দেখিতে যাইতেন, তাহা বলা কঠিন। কৃত্রিম যুদ্ধে উভয় পক্ষে সমিতির পাঁচ-সাত হাজার সভ্য সমবেত হইয়া ছোট লাঠি, বড় লাঠি, ছোরা প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধ করিত। দুই দিকে দুই প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপর বড় বাঁশ বাঁধিয়া তাহাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হইত। যে-দল যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষ দলের ঐ জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লইতে পারিত ও প্রধান সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করিতে পারিত সেই দলই জয়লাভ করিত। বহু লোক এই যুদ্ধে আহত হইত। এ জন্য পূর্ব্ব হইতেই হাসপাতাল ও ডাক্তারের ব্যবস্থা থাকিত, প্রত্যেক লাঠির মধ্যে রং মাখান থাকিত এবং কাহারও কাপড়-জামায় ঐ রং লাগিলে সে আহত বলিয়া গণ্য হইত ও তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইত। কেহ তাহাকে প্রহার করিতে পারিত না এবং অ্যাম্বুলেন্স আসিয়া তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাইত।

এই যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন, "এই কৃত্রিম যুদ্ধে আমি আহত হই াছি, অর্থাৎ বিপক্ষের লাঠির আঘাতে আমার জামায় রংএর দাগ লাগিয়াছে। আমার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। আমি মাঝামাঝি করিয়া যাইতেছি—এমন সময় এক জন পরিদর্শক সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি আমার ঘাড় ধরিয়া আমাকে বসাইয়া দিলেন। এদিকে অপর রাস্তা দিয়া বিপক্ষের একটি দল আসিয়া আমাদের দলের উপর সঙ্গীন চালনা করিল। একখানা বড় লাঠি লইয়া আমি বিপক্ষ দলটিকে বাধা দিলাম। পরে দূর হইতে তাহারা আমাদের দলের উপর বড় লাঠি নিক্ষেপ করিতে লাগিল—আমরাও পাল্টা জবাব দিতে লাগিলাম। হঠাৎ বিপক্ষের একটি বড় লাঠি আসিয়া আমার কপালে পড়িল। তাহা ফিরাইতে না পারায় আমার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এমন সময় অ্যাম্বুলেন্স আসিয়া আমাকে উঠাইয়া লইয়া গেল এবং একখানা গাড়ীতে করিয়া হাসপাতালে রাখিয়া আসিল। সেই রাত্রেই হাসপাতালে থাকিয়া খবর পাইলাম আমাদের অর্থাৎ মফঃস্বলের জয় হইয়াছে।"

"নেতা হওয়া তখন বড় শক্ত ব্যাপার ছিল। নেতৃত্ব তখন মোটেই লোভনীয় ব্যবসা ছিল না। নেতাদের বিপদই ছিল তখন বেশী—ফাঁসী, দ্বীপান্তর, গুলীর আঘাতে মৃত্যু। অনুশীলনের নেতা প্রত্যেকেই ছোট হইতে বড় হইয়াছে। প্রথমে প্রত্যেককে বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া গ্রামে গিয়া বসিতে হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, হয়তো সেখানে কোন ভদ্রলোকের বাস নাই, সেখানে প্রথমে তাহাকে একটা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া থাকিতে হইয়াছে, গ্রামের লোকের মুষ্টিভিক্ষার উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে। সেখানে যে সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়াছে, যে অসম সাহসের পরিচয় দিয়াছে, যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ ও ত্যাগের পরিচয় দিতে পারিয়াছে সে-ই ধীরে ধীরে প্রধান কেন্দ্রে আসিয়াছে। দলের লোক তাহাকেই নেতা বলিয়া মানিয়াছে। তখন কোন 'ইলেকসন' ছিল না, তখন ছিল যোগ্যতা।"

সমিতির ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইত। কিন্তু এই অর্থের অভাব কোন দিন হয় নাই—নানা ভাবে অর্থ-সমস্যার সমাধান হইত। মুষ্টিভিক্ষা করিয়া যে চাউল জমা হইত তাহা বিক্রয় করিয়া সমিতির তহবিলে জমা পড়িত। কিছু দিন পর আয়ের আর একটি পথ আবিষ্কৃত হইল। ঢাকা জেলার অন্তর্গত সাটিরপাড়া গ্রামের বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সমিতির সভ্যদের ডাকিয়া বলেন—"শ্রাদ্ধের বৃষ ও বৎসতরী শাস্ত্রানুসারে অধার্মিক। বর্ত্তমানে গোয়ালারা ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা লইয়া যায়, তোমরা দেশের কাজের জন্য তাহা গ্রহণ করিতে পার।" ইহার পর যেখানেই শ্রাদ্ধ হইত সেখানে গিয়া বৃষ ও বৎসতরী লইয়া আসা হইত। উহা বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত টাকা সমিতির তহবিলে জমা দেওয়া হইত। একবার গোতাঁসিয়া গ্রামে বীরেন ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর শ্রাদ্ধে এই 'গোধন' লইয়া গোয়ালা ও ব্রাহ্মণগণের সহিত সমিতির সভ্যদের খণ্ডযুদ্ধ হয়। সমিতির সভ্যগণ জয়ী হইয়া গোধন লইয়া চলিয়া যান। পরে ব্রাহ্মণ ও গোয়ালাদের প্রতিনিধিগণ ঢাকায় গিয়া নেতাদের অভিযোগ করেন এবং এই সর্ত্তে মীমাংসা হয় যে, গোধনের পরিবর্ত্তে তাঁহারা তাঁহাদের ছেলেদের সমিতির সভ্য করিয়া দিবেন, শ্রাদ্ধ ও বিবাহ উপলক্ষ্যে সমিতিকে চাঁদা দিবেন।

কলিকাতা কেন্দ্রের খরচ সাধারণতঃ ধনী লোকদের চাঁদার উপরেই নির্ভর করিতে হইত। ইহা ছাড়া অরবিন্দ মাসে ১০০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন। কিন্তু যখন দলাদলি দেখা দেয় তখন তিনি উক্ত মাসিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দেন।

[ক্রমশঃ।

ভারতীয় দর্শনে নাচ

শ্রীবিমলেন্দু বসু

দ্বৈতশক্তি যে মনুষ্য-জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তি এ সত্য জগতে বিশ্ব-জনগণ সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছে "ভারতীয় দর্শন"। মনুষ্য-জীবনের এ চিরন্তন দ্বন্দ্ব আমাদের শাস্ত্রসমূহে পুরুষ ও প্রকৃতি, কার্য্য ও কারণ, জড়াংশ ও প্রাণাংশ, শাক্ত ও শক্তি, অন্ন ও অন্নাদ প্রভৃতি নামে কত ভাবেই না ব্যক্ত হইয়াছে। এই পুরুষ ও প্রকৃতি, শাক্ত ও শক্তি, কার্য্য ও কারণাদি বলিতে কি বুঝায় এবং উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধই বা কি ইহা আর্থার এভেলন্, (সার জন্ উড্‌রফ) তাঁহার অমর লেখনীতে অতি প্রাঞ্জলরূপে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

পদার্থ, শক্তি, প্রকৃতি ও কার্য্য নিয়তই প্রাণাংশ, পুরুষ, কারণ বা জীবাত্মাই উর্দ্ধে উঠিবার প্রয়াস করিতেছেন। পরন্তু পরিণামে জীবাত্মাই জয়যুক্ত হইয়া থাকেন। বস্তুহীন প্রাণ বা প্রাণহীন বস্তু উভয়ই অচিন্তনীয় এমন কি ধারণাতীত, সুতরাং উভয়েই উভয়ের একত্রে বিরাজিত এই দ্বৈততার আলোড়নকে দ্বন্দ্ব বলা হয়। এই কার্য্য-কারণ-গত দ্বন্দ্বের নানা প্রকার বিন্যাসকেই প্রাচীন ভারতীয় বুধগণ জনসাধারণকে এই দ্বন্দ্বাবস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞাত করাইতে নানা রূপ-রস-শব্দাদির দ্বারা এই দ্বন্দ্বের কর্ম্ম-পদ্ধতির বিকশিত অবস্থার প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহাই ভারতীয় মূল তত্ত্ব বা মূল কলা বলিয়া খ্যাত।

এই দ্বৈততা হইতেই বিশ্বে রূপ-রস-শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রের বিকাশ। এই দ্বৈততাই "আধিদৈবিক", "আধ্যাত্মিক", "আধিভৌতিক" জগতের সৃজন, পালন ও ক্ষারণকারী, ইহাই ভারতীয় তত্ত্বের মূলাধার। প্রাচীন ভারতীয়গণ এই দ্বৈততাকে নামরূপে পর্য্যবেশিত করিয়া বিশ্ব-জনগণকে জ্ঞাত করাইতে সে রূপগুলির সৃজন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি নামে খ্যাত। এইরূপে পঞ্চতন্মাত্রের সহায়তায় এই বিশাল ও বিস্তৃত প্রচারের কর্ম্ম-পদ্ধতির প্রয়াসই ভারতীয় কলার উৎপত্তি হেতু। এই অপূর্ব্ব ধারণা আমাদের স্থূল বস্তুর উপর আপন প্রভাব বিস্তার করতঃ পারমার্থিক সত্তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই ধারণার প্রচার করিবার মানসে প্রাচীন ভারতীয় বুধগণ তাঁহাদের কল্পিত কার্য্য-কারণকে সপ্ত শক্তিতে বিভক্ত করিয়া, এই সপ্ত শক্তির বিভিন্ন স্থান, কাল, পাত্রানুযায়ী অবস্থানই যে এই বিশ্ব-সৃজনের মূলতত্ত্ব তাহার উদ্ভব করিয়াছেন। এই সপ্ত মাতৃকার কর্ম্ম-পদ্ধতিকে লাস্য ও এই সপ্ত মাতৃকার সপ্ত শক্তি যে স্তরে যাইয়া সমাবর্ত্তিত হইতেছে, সেই স্তরকে পুরুষ বা মহাপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই মহাপুরুষের কর্ম্ম-পদ্ধতিকে তাণ্ডব নামে অভিহিত করিয়া লাস্য ও তাণ্ডবের বিভিন্ন সার্থকতার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

আমাদের আত্মা তৃপ্ত হয় তাণ্ডবে ও স্থূলেন্দ্রিয় চরিতার্থ হয় লাস্যে। তাণ্ডব—শ্রেয়ঃ, লাস্য—প্রেয়, ইহার উজ্জ্বল রূপ পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে অর্দ্ধনারীশ্বর কল্পনায়। জীবাত্মা ও জড়েতে মিলিত হইয়া সৃষ্ট হয় এক পরমাত্মা। বিজ্ঞানের ভাষায় এই দুই শক্তিকে বলা হয় নেগেটিভ্ ও পজিটিভ্। এতদুভয়ের সংমিশ্রণই প্রাণশক্তির উৎপত্তি-হেতু। ভারতীয় দর্শনের এই উচ্চ ভাবধারা যত প্রকার কলাবিদ্যা আছে তদ্দ্বারা প্রচারিত হইত এবং রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শাদি পঞ্চতন্মাত্রের নানা স্তরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া প্রচারিত হইত। শব্দ দ্বারা এই কলার প্রচারকে ভারতীয় সঙ্গীত নামে রূপ দ্বারা প্রচারকে ভারতীয় চিত্র, ভাস্কর্য্য ও নানা দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তির নামে অভিহিত করিয়াছেন, বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিতে যাইলে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয়গণ তাঁহাদের এই অন্তরীক্ষ সম্বন্ধীয় নানা স্তরের গূঢ় ধারণাকে জন-গণ সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিতে এক-একটি পৃথক্ পৃথক্ নাম দিয়া, পৃথক্ পৃথক্ নামানুযায়ী রূপ পরিগ্রহণ করাইয়া এই নাম-রূপের সমাবিষ্টাকৃতিকে দেবতার নামে কথিত করিয়াছেন। পুনরায় এই কল্পিত দেবতামূর্ত্তি সমূহের কর্ম্ম-পদ্ধতির বিন্যাস-মানসে এই মূর্ত্তিগুলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বিভিন্ন প্রকারের বহুল ভঙ্গিমা দ্বারা অন্তরীক্ষের স্তরে স্তরে কর্ম্ম-পদ্ধতির বিশিষ্টরূপে বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় প্রাচীন মন্দির ও গুহাগাত্রস্থিত ভাস্কর্য্যে দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে এতাবৎও ইহার নিদর্শন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবলোকন করিতে পাই।

বাঙলা ছবি অধঃপাতের পথে গেলেও বাঙলার 'মেক-আপ' শিল্প এখনও অনন্যসাধারণ। রাণী ভবানী চিত্রে রামকান্তরূপে পাহাড়ী সান্যাল। মেক-আপম্যান শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়।

কাপালিকের কবলে ক্যাবলা চিত্রে ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

জন-সাধারণ সম্মুখে এই কল্পিত দেব-দেবীর বিস্তারিত ধারাবাহিক কর্ম্ম-পদ্ধতির নিদর্শন-সমূহ প্রদর্শন করাইতে এই দেবমূর্ত্তিগুলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গিমার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার সহিত ভারতীয় সঙ্গীতের তাল, মান, লয়াদি সংযোগ করিয়াছেন। এই তাল, মান, সুর-সম্বলিত দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গিমাকে ভারতীয় নৃত্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। যেহেতু, প্রস্তর দারু ধাতু আদি দ্বারা নির্ম্মিত এই প্রতিমূর্ত্তিগুলি স্পন্দনহীন নিশ্চল, ইহাদের দ্বারা ধারাবাহিক গতির বিশ্লেষণ অসম্ভব, এক-একটি স্তরের এক-একটি 'নির্দ্দিষ্ট স্থানের বর্ণনা সুপরিস্ফুট হয়, কিন্তু একটি স্তর হইতে অন্য একটি স্তরে কিরূপে কোন্ কোন্ শব্দের অনুপ্রেরণায়, কি রসের অভ্যুদয়ের দ্বারা কোন্ ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া চালিত হইতেছে, কি ভাব প্রকাশ করিতে প্রয়াসী,, পুনরায় কি ভাবে, কোন্ শব্দ সংযোগে, কোন্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করিতে করিতে, কোন ভাবের বিকাশ করিতে করিতে অন্য অন্য কোন স্তরে যাইলে রসের ধারাবাহিক প্রকাশ হইয়া জন-সাধারণের মন উদ্ভাসিত করিবে, এতদসমূহ পরিদর্শন করান অসম্ভব। অতএব প্রাচীন বুধগণ এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার মানসে তাঁহাদের এই বর্ণিত, সৃজিত, গঠিত আকৃতি-সমূহের সহিত যথাসম্ভব সৌসাদৃশ্য প্রকাশ করিতেছে এইরূপ সুগঠিত, বলিষ্ঠ, রূপবান নরনারীগণকে নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাদিগকে ভারতীয় তত্ত্বসমূহ জ্ঞাত করাইতেন. ভারতীয় সঙ্গীতের তাল, মান, লয় প্রচারের পন্থা বিষয়ে পারদর্শী করিয়া এক-একটি পূর্ণ আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন, রূপ-রস-শব্দাদি বিষয় বিশেষ অভিজ্ঞ মহারসিক-রসিকা করিয়া তুলিতেন। এই আত্মজ্ঞানসম্পন্ন রসিক-রসিকাগণ দ্বারা দেব-দেবীর রূপ পরিগ্রহণ করাইয়া, তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গিমা দ্বারা জনগণ সমক্ষে নিত্যানন্দের স্বরূপ বর্ণনা মানসে এই গূঢ় তত্ত্বের দ্বারোদ্‌ঘাটন প্রয়াসী হইয়া, শব্দ-সম্বলিত করিয়া এই রসিক-রসিকা-গণকে চালনা করত জনগণকে পঞ্চতন্মাত্রে আপ্লুত করিয়া গিয়াছেন। ইহাই ভারতীয় নৃত্য নামে আখ্যাত। যিনি পঞ্চতন্মাত্রাভিজ্ঞ হইয়া এই শাস্ত্র পরিচালনা করিতেন, তাঁহাকে ধারণা ও বাস্তবে একান্ত সমপারদর্শিতাপূর্ণ মহামহোপাধ্যায় হইতে হইত, ইঁহারাই সূত্রধর বা সূত্রধারিণী নামে খ্যাত হইতেন। যাঁহারা ইঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিষয়টি পরিস্ফুট করিতেন, তাঁহাদিগকে "পাত্র" বা "পাত্রী" বলা হইত। অতএব ভারতীয় নৃত্য-বিলাসপ্রিয়তার লালসা-বহ্নির ইন্ধন নহে, ইহা প্রাচীন বুধগণের বহু সাধ্য-সাধনাপ্রসূত নিত্যানন্দ বিষয় বর্ণনার পৌরোহিত্য। বাস্তবরূপে নৃত্য বলিতে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহার সুস্পষ্টতা প্রতীয়মান হয় স্বচ্ছ বস্তু মধ্যে অণু-পরমাণুর পরস্পরবিরুদ্ধ গতিতে।

উপরি-উল্লিখিত সপ্ত-মাতৃকার সম-সমাবেশপ্রসূত ধারণাকে প্রাচীনগণ শিব-তাণ্ডব নাম দিয়াছেন। যেহেতু ইহা সম্পূর্ণ পৌরুষ-ভাবাপন্ন, মনুষ্য-জীবন যে স্থায়ী নয় বরং গতিশীল, এই নৃত্যে এই ধারণাই প্রকটিত হয়। হীরক-মধ্যস্থিত অণু-পরমাণু যেরূপ বিভিন্ন দিকে ঘূর্ণায়মান হয়, নটরাজ বা শিব-তাণ্ডব নৃত্যেও তদ্রূপ অর্থ প্রকাশিত হয় এই নটরাজের সুন্দর, ললিত রূপই মনুষ্য-জীবনের পরমারাধ্য বস্তু, পরম প্রাণ, জীবনদাতা, সচ্চিদানন্দ শিবরূপে তাঁহারই স্মৃতিতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সন্তানগণকে অবগত করাইতেছেন যে "জীবন সদা স্পন্দনময়, নিত্য ও সত্য, নটরাজের প্রতিমূর্ত্তিতে এই তথ্যই প্রকৃষ্টরূপে বিরাজিত, নিদর্শন-স্বরূপ গবাদি পশুগণ ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র তাহাদের আপনাপন ভঙ্গিতে নৃত্য করে, ইহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আদ্যাশক্তির ছন্দময় গতি হীরকখণ্ড-মধ্যস্থিত কার্ব্বন্ বা অ্যাটম্‌সমূহ আভ্যন্তরিক পরস্পর-বিরুদ্ধ গতি প্রকাশিত, এই তথ্য শিবের নটরাজ বা তাণ্ডব-নৃত্যে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিগণ কর্ত্তৃক এই নটরাজের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম-সমাবেশপূর্ণ আকৃতির ধারণা এক আদর্শময় জীবন্ত বিরাট পুরুষের 'বিষয় অবগত করাইয়া দেয় 'যে, 'আমরা কি হিন্দু, কি মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ যে-কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ইউরোপ, আমেরিকা, এসিয়ার কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, সোসালিষ্ট প্রভৃতি যে কোন দেশের, 'যে কোন জাতীয়, যাহা কিছু সম্প্রদায়ভুক্ত হই না কেন, তাঁহার দ্বারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সৃজিত, স্থিত হইয়া, তাঁহারই দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত

ষ্টুডিয়ো-পরিচিতি

কালী ফিল্মস্

শ্রীরমেন চৌধুরী

ষ্টুডিয়োর ইতিবৃত্ত-সংগ্রহের পথ কুসুমাস্তীর্ণ যে নয় এটা হয়তো বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজের মানুষেরা কাজ করেই তৃপ্তি পেয়ে থাকেন, সে কাজ কি ভাবে সাধিত হোলো, কখন এবং কেন হোলো তার ধারা-বিবরণী টুকে রাখতে অবকাশ পান না। তাঁরা যে তা চান না—এটাও বলা চলতে পারে। 'কাজই তো করলুম, হ্যাঃ, আবার তাকে ফলাও করে খাতা-পত্তরে লিখে রাখবো কি?'—এই রকমের কতোকটা মনোভাব হয় তাঁদের। আগেকার দিনের লোকেদের সম্পর্কে এটা তো বিশেষ ভাবে খাটে; বর্তমান যুগের মানুষ বোধ হয় অতোটা ঢিলে-ঢালা প্রকৃতির নয়; এরা বুঝতে শিখেছে কি না সব-কিছুর প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু আমার কাজ আগেকার মানুষদের কার্য-কারণের লোপ-পাওয়া ইতিহাস নিয়ে। দু'-এক জায়গায় হয়তো অসুবিধা হয়নি বা হচ্ছে না কিন্তু বেশির ভাগই তার বিপরীত। যাঁদের নিয়ে এবং যাঁদের কৃচ্ছ্রসাধনায় ও আত্মত্যাগে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে, আজ তাঁদের অনেকেই হয় ইহধামে নেই, নয় তো বয়েসের ভারে আর আজ তাঁদের হাতে-গড়া মানুষের (আজ ভাগ্যের প্রসাদে তাদের অনেকেই নানা রকম দায়িত্বপূর্ণ আসনে আসীন) অবাঞ্ছিত প্রতিদানে মুয়ে পড়েছেন অনিচ্ছা ও উৎসাহহীনতার মাঝে। বহু তদ্বিরে তাঁদের ধ'রে-ক'রে অতীত দিনের রোমন্থনে রাজী করানো গেলেও হুবহু হিসেব মেলে না। এতে তাঁদের অপরাধ নেই নিশ্চয়ই! স্মৃতির পাতায় লেখা দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে ম্লান হয়ে যাওয়া সহজ, স্বাভাবিকও। তবু এঁদের ধন্যবাদ দিই—কী বলিষ্ঠ মন, অতীত আর তার রঙের মেলা, কাজের খেলা করেই তো অবসান হয়েছে কিন্তু এঁরা তার অনেকখানিই বন্দী করে রেখেছেন স্মরণের পিঞ্জরে!

এই যে বললুম, হুবহু হিসেব না মেলার কথা—সেই কারণে লিপিকার আমার বর্ণনায় অল্প-বিস্তর অদল-বদল হওয়া আশ্চর্য নয়। সে-ত্রুটি যদি কখনো দৃষ্ট হয় তাহোলেও আমার বলবার আছে—আমার এ পর্যালোচনায় দিন-ক্ষণটাই গুরুত্বপূর্ণ নয়; সামান্য দিন ক্ষণ বা কার্যক্রম আগে-পরে হ'য়ে যাওয়ার বিচ্যুতিতে কোনোই ক্ষতি হবে না। এ আমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ক'লকাতার ষ্টুডিয়োগুলির সৃষ্টির অসংবদ্ধ ইতিকথার সংযোগ-সাধনে। সব-কিছুই যেন তার কাল-সমুদ্রে হারা হ'য়ে না যায়। অপর একটি উদ্দেশ্যও আছে, সেটি হোলো উৎসাহী সাধারণের সামনে এক নজরে, এক কলমে ঘটনাগুলি ধরে দেয়া।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীজ। নামটা বোধ হয় সাধারণের মন থেকে আজ সরে এসেছে বিস্মৃতির অন্তরালে। একটু গভীর ভাবে ভাবলে হয়তো উদ্দেশ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার দরকার হবে না, ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীজ হোলো বর্তমান কালী ফিল্মসেরই প্রথম দিনের সংজ্ঞা। আজ কয়েক বছর কালী ফিল্মসের নিজস্ব ছবি সাধারণ্যে মুক্তি পায়নি বটে, কিন্তু কালী ফিল্মসেরও এক দিন ছিলো যখন তার ষ্টুডিয়োর ভিতরে-বাইরে কর্ম-ব্যস্ততার বিরাম ছিলো
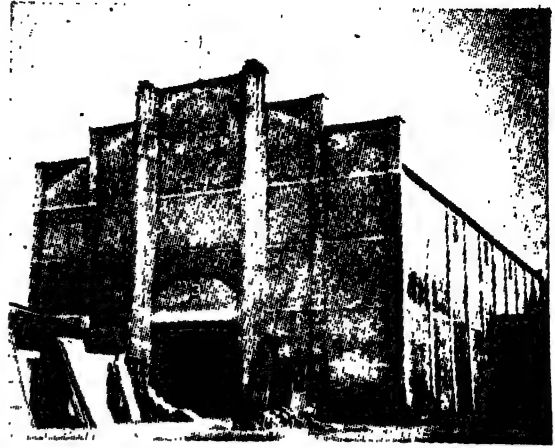
কালী ফিল্মস ষ্টুডিও

রাণী ভবানীতে বেণীমামারূপে ধীরাজ

—মেক-আপম্যান শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়

না। আর তারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ নামের সুরভি বাঙলা থেকে ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশেই ব্যাপ্ত হয়েছিলো। 'তরুণী', 'স্বর্ণকাঞ্চন', 'টকি অব টকিজ' প্রভৃতি সার্থকনামা ছবির কথা বাঙলা দেশের মানুষ আজও ভুলতে পারেনি বলেই মনে করি। প্রকৃতই কালী ফিল্মসের দান অকিঞ্চিৎকর নয়, কালের বুকে তার স্বাক্ষর র'য়ে গেছে আজও অম্লান!

এই ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীজ গ'ড়ে ওঠে উনিশ শো পঁয়ত্রিশ সালের মাঝামাঝি। বাঙলা দেশের প্রথম বাঙালী পরিচালক—আ সেই নির্বাক্ যুগ থেকে—স্বনামধন্য প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী মশাই ম্যাডান কোম্পানী ছাড়ার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম করিয়েও মনের শান্তি না পাওয়ায় পরিপূর্ণ স্বাধীনতায় শুরু করলেন যাত্রা—মাধ্যম হোলো তাঁর উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান। একনিষ্ঠ সাধক, স্বাধীনচেতা গাঙ্গুলী মশায়ের নাম বাঙলা তথা ভারতের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। এই নীরব কর্মীটি অন্তরের আবেগে শুধু কাজই করে গেছেন, তার জন্যে স্বনিয়োজিত চাটুকারদের গগন-বিদারী ঢক্কা-নিনাদের ব্যবস্থা রাখেননি আজকের দিনের সহস্রমারী রথী-মহারথীদের মত। তাই ইনি উপেক্ষিত, অপাংক্তেয়। এ যেন অবিকল বাঙলা দেশের অবস্থা স্বাধীন ভারতের ক্ষমতাশালীদের সভায়। যে-বাঙলা প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশকে পথ দেখালো, দেশমাতাকে চেনালো জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করে, আজ সে দীনতম দীন। বিরাট ভোজসভায় তার ভাগ্যে এক টুকরো হাড় পর্যন্ত জুটছে না! ঠিক সেই রকমই হাওয়া বইছে আজকের ছায়াছবির রাজ্যেও। ভরা বর্ষায় ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে-ওঠা সুবিধাবাদীর দল নিজের কোলেই ঝোল টানতে শশব্যস্ত; যাঁরা প্রকৃত গুণী-জ্ঞানী, যাঁরা পথ-প্রদর্শক তাঁদের ঠেলে দিয়েছে লোক-চক্ষুর একেবারে আড়ালে! আমরা অপরের কাছ থেকে সম্মান পেতে চাই, কিন্তু অন্যকে সমাদর করতে জানি না। ভেবে দেখি না, ভবিষ্যতে 'গলিত নখদন্ত' হোলে আমরাও যে ভেসে যাবো উপেক্ষার হিমানী-ধারায়! কত দূর বুদ্ধিহীনতা বলুন তো?···

সে কথা যাক্। প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী মশায়ের সম্বন্ধে সবিশেষ জানাতে পারবো আপনাদের ম্যাডান ষ্টুডিয়োর প্রসংগে। তবে সংক্ষেপে খানিক না বলে উপায় নেই। ১৯০৪ সালে গাঙ্গুলী মশাই ম্যাডান কোম্পানীতে যোগ দেন। ভেবে দেখুন কথাটা—আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগের ঘটনা। তখন গোটা ভারতবর্ষের চেহারাই ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। ছায়াছবি তৈরি হওয়া তো দূরের কথা, চারশো ফিটের বিলিতি ছবি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যেত না এদেশে। এই চারশো ফিটেই তখনকার full length হোতো। এখানে এ-সব ছবি দেখানো হোতো কলকাতায় গড়ের মাঠে তাঁবু খাটিয়ে। তারই কী উত্তেজনা, কতো উদ্দীপনা!

এই ছবি দেখানোর পালার সংগে ছবি-তোলার ব্যবস্থা করলেন ম্যাডান কোম্পানী; গাঙ্গুলী মশাই হেথা-সেথায় ঘুরে যোগাড়-যন্ত্র করা, বন্দোবস্ত করা প্রভৃতিতে আত্মনিয়োগ করলেন। তার পর নির্বাক্ কাহিনী তোলার সময় এসে পড়লো। পর-পর [illegible]

একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন জে, এফ, ম্যাডান আর সে-সাম্রাজ্যের ভিত্তি-নির্মাতা গাঙ্গুলী মশাই। 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'কপালকুণ্ডলা', 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি অবিস্মরণীয় সংখ্যাতীত ছবি পরিচালনা করেছেন ইনি। সে সময় আর কেউ ছিলো না, এ-কথা আজ ক'জন মনে রেখেছে? চোখের আড়াল হোলেই মনের আসন স'রে যায়!

বহু বছর পর অনুমান চব্বিশ সালে ম্যাডান কোম্পানী যখন হাত-বদল করলো সেই সময় নতুন ব্যবস্থা মনঃপূত না হওয়ায় প্রিয়নাথ বাবু ওই ষ্টুডিয়োর সংস্পর্শ ত্যাগ করলেন। পরে মতিলাল চামেরিয়াকে নিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম খোলেন কিন্তু সেখানেও মন বসলো না। এরই ফলে সৃষ্টি হোলো ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীজ!

টালীগঞ্জ ট্রাম-ডিপো পেছনে ফেলে যে পথ সোজা চলে গেছে রেস কোর্সকে সামান্য আলিংগন করে, সেই রাস্তায় খানিক এগুলেই ডান দিকে পাওয়া যাবে এই ষ্টুডিয়ো-বাড়িটি। এইখানেই এক রকম ছাউনী ফেলা হোলো যেন। পূর্ণাংগ ষ্টুডিয়ো করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার কিছুই ছিলো না প্রতিষ্ঠাতার আয়ত্তে। কিন্তু তাহোলে কি হয়—পুরুষকারের তো অভাব নেই। মা লক্ষ্মী প্রসন্না না হয়ে কি পারেন? জোড়াতালি দিয়ে ছবির কাজ শুরু হয়ে গেল। 'ঋণমুক্তি' অসম্ভব ত্বরিতে মুক্তিপথে এগিয়ে চললো। এর পরিচালনা গাঙ্গুলী মশাই নিজে করলেন না, সে যুগের বিশেষ শক্তিমান নট তিনকড়ি চক্রবর্তীকে দিলেন এই দুরূহ কাজটি। 'ঋণমুক্তি'র পর 'বিল্বমংগল'—এটিরও পরিচালনা করলেন চক্রবর্তী মশাই। এমনি ভাবে সাতাশখানা ছোটো-বড়ো মিলিয়ে ছবি উঠলো কালী ফিল্মে। ছবিগুলি বেশির ভাগই গাঙ্গুলী মশায়ের পরিচালনায় হয়েছে, আবার ৺জ্যোতিষ মুখার্জি, সুশীল মজুমদার, সুকুমার দাশগুপ্ত প্রভৃতিও পরিচালক হিসাবে আছেন এর মধ্যে।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীজ কি করে কালী ফিল্মে পরিবর্তিত হোলো জানতে চাইছেন? বিষয়টি কিন্তু বিশেষ দুঃখের—কারণ যাঁর নামের স্মৃতি এ ষ্টুডিয়ো আজো বহন করছে, তিনি ছিলেন প্রিয়নাথ বাবুর সুযোগ্য পুত্র। সুখ-দুঃখ পাশাপাশি হাত ধরে চলে বলে কথা আছে—সেই কথা মর্মান্তিক সত্য হয়ে দেখা দিলো গাঙ্গুলী মশায়ের জীবনে। ষ্টুডিয়ো যখন ঝড়-ঝাপ্টা কাটিয়ে ক্রমশঃ সাফল্যের স্বর্ণ-তোরণ অভিমুখে অগ্রসরমান, সেই সার্থক মুহূর্তে নেমে এলো নির্মেঘ আকাশ হ'তে ব্যথার বজ্র! পুত্র কালীধন সম্পূর্ণ অভাবিত ভাবে অজ্ঞাত-লোকে যাত্রা করলেন অথচ তাঁর বিলেত যাওয়ার আয়োজন পাকা করা ছিলো। মানুষের জল্পনা-কল্পনা কতো অলীক! নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস! শোক-সন্তপ্ত পিতা সন্তানকে অবিস্মরণীয় করতে আপ্রাণ প্রয়াস পেলেন—তারি স্মারক ষ্টুডিয়োটি। অবিলম্বে কালী ফিল্ম নাম ধারণ করলো ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীজ। এ হোলো সাঁইত্রিশ সালের ঘটনা।

এর পর উনচল্লিশ সালে কাজের সুবিধার জন্যে ষ্টুডিয়োকে লিমিটেড করে নেয়া হয়। কালী ফিল্মসের তোলা ছবির একটা তালিকা দিলুম:—'সাবিত্রী' (বাংলা ও তামিল), 'ঋণমুক্তি', 'বিল্বমংগল', 'তরুণী', 'টকি অভ টকিজ', 'বিদ্যাসুন্দর', 'বিরহ',

'পাতালপুরী', 'কাল-পরিণয়,' 'তুলসীদাস', 'মণিকাঞ্চন', 'বড়বাবু', 'সার্বজনীন বিবাহোৎসব', 'মুক্তিস্নান', 'হারানিধি', 'মডার্ণ লেডি' (হিন্দী), 'আশীয়ানা' (হিন্দি), 'প্রফুল্ল', 'সীতার বিবাহ' (উড়িয়া) 'আমীনা' (উর্দ্দু), 'রেশমী রুমাল', 'কচি সংসদ', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'রাস পূর্ণিমা', 'গুলবকাওয়ালী' (তামিল), 'ভোট-ভণ্ডুল', 'বাঙলার মেয়ে', 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি।

জাত-অভিনেতা ফণি রায়কে এখানকার 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে' প্রথম আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গেছে ; তেমনি ধারা ৺রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'বিল্বমংগল' ছবিতেই চিত্রাভিনেতারূপে দর্শক-সাধারণকে অভিবাদন জানিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। স্বর্গত পরিচালক জ্যোতিষ মুখার্জির পরিচালনার হাতে-খড়ি এখানেই।

কোম্পানী লিমিটেড হওয়ার পর অর্থাৎ চল্লিশ সালে গাঙ্গুলী মশাই ষ্টুডিয়োর দায়িত্বের বোঝা নামিয়ে রেখে স্বাস্থ্যহানির জন্যে কলকাতার বাইরে চলে যান! ভাড়া খেটে এবং সামান্য দু'-একখানা ছবি তুলে কালী ফিল্ম এর পরেও তার অগ্রগমন অব্যাহত রাখে ; কিন্তু সে-কাহিনীর তেমন জৌলুস নেই। বেশ কিছু দিন হোলো ফটকে চাবি পড়ে গেছে ষ্টুডিয়োর, কিন্তু তার বন্ধনদশার মুক্তিও আসন্ন হ'য়ে উঠেছে। যে-বাড়ির চারি দিকে কর্মব্যস্ততার রাগিণী বেজেছে দিনের পর দিন, আজ মাসের পর মাস সে ষ্টুডিয়োর ফ্লোরে, অফিসে, পথে জমেছে প্রাণহীনতার ধূলিকালি! তবে ইতিহাস পুনরাবর্ত্তন করে থাকে—সেই জন্যেই বোধ হয় আবার ষ্টুডিয়োর ভার (রিসিভার হিসাবে) গাঙ্গুলী মশায়ের হাতে ফিরে আসছে। বয়সে বৃদ্ধ প্রিয়নাথ বাবু যুবজনোচিত প্রাণ প্রাচুর্যে ও উৎসাহে বাধার সহস্র গ্রন্থি একটি-একটি করে খুলে চলেছেন, অতি অল্প দিনের মধ্যেই সব কিছু জটিলতা দূর হয়ে ষ্টুডিয়ো তার অতীতের পরিবেশ ফিরে পাবে। বাঙলা দেশের এই ছবির সংকট-সময়ে কালী ফিল্মসের পুনরাবির্ভাব হয়তো বিশেষ কল্যাণকরই হবে—আর তা হোলেই মংগল!

১৩৫৮

১। সংকেত—২০শে বৈশাখ—অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় * * * * *

২। শংখবাণী—২৭শে বৈশাখ—জ্যোতির্ম্ময় রায় * * *

৩। দুর্গেশনন্দিনী—২৩শে জ্যৈষ্ঠ—অমর মল্লিক * * *

৪। রাজমোহনের বৌ—৩০শে জ্যৈষ্ঠ—হিরণ্ময় সেন * * * *

৫। কালসাপ—৩১শে জ্যৈষ্ঠ—খগেন রায় * * * * *

৬। খেলাঘর—১৪ই আষাঢ়—সৌমেন মুখোপাধ্যায় * * *

৭। প্রত্যাবর্ত্তন—১৫ই আষাঢ়—সুকুমার দাশগুপ্ত * * *

৮। সেতু—২১শে আষাঢ়—প্রেমেন্দ্র মিত্র * *

৯। '৪২—২৩শে শ্রাবণ—হেমেন গুপ্ত * *

১০। স্পর্শমণি—৭ই ভাদ্র—সুধীন মজুমদার *

১১। অনুরাগ—৭ই ভাদ্র—দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় * * * * *

১২। নষ্টনীড়—৭ই ভাদ্র—পশুপতি চট্টোপাধ্যায় * * *

১৩। আনন্দমঠ—২৭শে ভাদ্র—সতীশ দাশগুপ্ত * * *

১৪। প্রতিধ্বনি—৪ঠা আশ্বিন—কালীপদ দাস * * * *

১৫। দত্তা—১৮ই আশ্বিন—সৌমেন মুখোপাধ্যায় * * *

১৬। চীনের পুতুল—১৮ই আশ্বিন—পার্থসারথি * * * * *

১৭। বাবলা—১৮ই আশ্বিন—অগ্রদূত *

১৮। সম্পদ—৮ই কার্ত্তিক—অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় * * * * *

১৯। মিনতি—২২শে কার্ত্তিক—বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় * * * * *

২০। সুনন্দার বিয়ে—৭ই অগ্রহায়ণ—সুধীর সরকার * * * *

২১। ক্ষুদিরাম—১৪ই অগ্রহায়ণ—হিরণ্ময় সেন * *

২২। পণ্ডিত মশাই—২১শে অগ্রহায়ণ—নরেশ মিত্র *

২৩। জবানবন্দী—১১শে পৌষ—অমর দত্ত * * * *

২৪। বাগদাদ—১১শে পৌষ—শ্যাম চক্রবর্ত্তী * * * *

২৫। রঘু ডাকাত—২৬শে পৌষ—গিরীন চৌধুরী * * * * *

২৬। প্রহ্লাদ—৪ঠা মাঘ—ফণী বর্ম্মা * * *

২৭। ভিন দেশের মেয়ে—১১ই মাঘ—ইন্দু ভট্টাচার্য্য * * * *

২৮। মেঘমুক্তি—১৮ই মাঘ—চিত্ত বসু * * * *

২৯। সঞ্জীবনী—২৫শে মাঘ—সুকুমার দাশগুপ্ত * *

৩০। কুহেলিকা—২৫শে মাঘ—রমেশ বসু * * * * *

৩১। পাত্রী চাই—২রা ফাল্গুন—সুনীল মজুমদার * * * *

৩২। আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপ—৯ই ফাল্গুন—বিজন সেন * * * *

৩৩। পাশের বাড়ী—২৩শে ফাল্গুন—সুধীর মুখোপাধ্যায় * *

৩৪। নিরক্ষর—১লা চৈত্র—গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় * *

৩৫। কৃষ্ণকান্তের উইল—১লা চৈত্র—খগেন রায় * * *

৩৬। সিরাজদ্দৌলা—২৩শে চৈত্র—অমর দত্ত * * *

৩৭। বসু-পরিবার—২৯শে চৈত্র—নির্ম্মল দে * * *

[১৩৫৮ সালের বাঙলা ছায়াছবির জাতি-বিচার করা হইয়াছে। যথা * তারকা চিহ্নিত প্রথম শ্রেণী, * * দ্বিতীয় শ্রেণী, * * * তৃতীয় শ্রেণী, * * * * চতুর্থ শ্রেণী এবং * * * * * নিকৃষ্ট শ্রেণী।]

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

কোরিয়া যুদ্ধে রোগ-বীজাণু—

কোরিয়া যুদ্ধে তথাকথিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর মার্কিণ অধিনায়কগণ উত্তর-কোরিয়ায় এবং চীনের কতকগুলি অঞ্চলে বিমান হইতে রোগ-বীজাণু-দুষ্ট পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গাদি বর্ষণ করিয়া প্লেগ, কলেরা, টাইফাস প্রভৃতি ভয়ঙ্কর স্পর্শ-সংক্রামক রোগ ছড়াইতেছে বলিয়া কম্যুনিষ্টদের পক্ষ হইতে যে অভিযোগ করা হইতেছে তাহা প্রকৃতপক্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বীজাণু-যুদ্ধ চালাইবার অভিযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লক যে-ভাবে এই গুরুতর অভিযোগকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাও খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। অভিযোগ সত্য হইলেই যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভাল ছেলেটির মত এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিবে, ইহা আশা করার মত দুরাশা আর কিছুই হইতে পারে না। অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলির যাঁহারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির কর্ণধার তাঁহারা এই বিশ্বাসই বিশেষ ভাবে প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে, কম্যুনিষ্টরা যে-কোন অভিযোগই উপস্থিত করুক না কেন, তাহাই মিথ্যা। এই প্রচার যে বিফলে যায় নাই, তাহা কম্যুনিষ্টদের বীজাণু-যুদ্ধের অভিযোগ সম্পর্কে মার্কিণ ও বৃটিশ সংবাদপত্রগুলির মন্তব্য হইতেই বুঝিতে পারা যায়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মুখপাত্রগণ এবং বৃটিশ এবং মার্কিণ সংবাদপত্রগুলি অভিযোগ শুনিয়াই বলিতে সুরু করিয়াছেন যে, অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কোনরূপ তদন্তের পূর্ব্বেই বলিতেছেন, অভিযোগের কোন প্রমাণ নাই। প্রথম বীজাণু-যুদ্ধের অভিযোগকে কোন আমলই দেওয়া হয় নাই এবং অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সংবাদপত্রসমূহও প্রথমে এ সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্বশান্তি পরিষদ (World Peace Council) যখন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিল এবং নিরস্ত্রীকরণ কমিশনে (Disarmament Commission) মঃ মালিক যখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিরুদ্ধে বীজাণু-যুদ্ধের অভিযোগ উপস্থিত করিলেন, তখন এ সম্পর্কে নীরব থাকা আর সম্ভব হয় নাই।

উত্তর-কোরিয়ায় এবং চীনের কতকগুলি অঞ্চলে রোগ-বীজাণু ছড়াইবার অভিযোগের বিবরণ-সম্বলিত যে সর্ব্বশেষ বুলেটিন বিশ্বশান্তি পরিষদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বিভিন্ন তদন্তকার্য্য এবং সাক্ষীদের প্রত্যক্ষ বর্ণনা এবং অনেক নূতন তথ্য বিবৃত হইয়াছে। বিশ্বশান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্ট মঃ জুলী কুরী গত ৮ই মার্চ্চ (১৯৫২) বিশ্ববাসীর কাছে এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। বীজাণু-অস্ত্র প্রয়োগ সম্পর্কে চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মঃ কুয়ো মো-জো বিশ্বশান্তি পরিষদের নিকট যে-বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, মঃ জুলী কুরী তাঁহার আবেদনে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিবরণে বলা হইয়াছে যে, ২৮শে জানুয়ারী এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে মার্কিণ সামরিক বিমান কোরিয়ায় কম্যুনিষ্টদের ব্যূহের উপর এবং ব্যূহের পশ্চাদ্‌ভাগে প্লেগ, কলেরা, টাইফাস এবং অন্যান্য ভয়ানক স্পর্শ-সংক্রামক রোগের বীজাণু ছড়াইয়াছে। বীজাণু-অস্ত্র প্রয়োগের ইহাই একমাত্র অভিযোগ নহে। পিকিং রেডিও বহু বার রোগ-বীজাণু ছড়াইবার অভিযোগ করিয়াছে। গত ৭ই মার্চ্চ (১৯৫২) পিকিং রেডিও এই অভিযোগ করে যে, ২৯শে ফেব্রুয়ারী এবং ৫ই মার্চ্চের (১৯৫২) মধ্যে ৪৪৮টি মার্কিণ বিমান প্রত্যেক দিন মাঞ্চুরিয়ার সহরগুলির উপর রোগ-বীজাণু-দুষ্ট কীট-পতঙ্গাদি বর্ষণ করিয়াছে। ৮ই মার্চ্চ (১৯৫২) উত্তর-কোরিয়া এই অভিযোগ করে যে, ৭ই মার্চ্চ রাত্রে রাজধানী পিয়ং গিয়াং-এর তিনটি সহর অঞ্চলে মার্কিণ বিমান বীজাণু-বোমা বর্ষণ করিয়াছে। এই বীজাণু-বোমার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, খুব পাৎলা ধাতুর পাত দ্বারা এই বোমা নির্ম্মিত এবং উহাতে চারিটি প্রকোষ্ঠ আছে। মাটিতে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বোমার মুখ খুলিয়া যায় এবং রোগ-বীজাণু-দুষ্ট কীট-পতঙ্গাদি উড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে। ঐ ৮ই মার্চ্চ তারিখে চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের নিকট সরকারী ভাবে মার্কিণ বিমান হইতে রোগ-বীজাণু-বোমা বর্ষণের অভিযোগ করেন। মিঃ একিসন এবং জেনারেল রীজওয়ে উভয়েই অত্যন্ত তীব্র ভাষায় এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন। মার্কিণ এবং বৃটিশ সংবাদপত্র-সমূহও এই অভিযোগকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা এই অভিযোগকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিবার জন্য জাপানের বিরুদ্ধে চীনের ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরের অনুরূপ অভিযোগের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছেন। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে তদানীন্তন চীন গবর্ণমেণ্ট জাপানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, চীনের অন্ততঃ তিনটি সহরে জাপান বিউবোনিক প্লেগ ছড়াইয়াছে। জাপ গবর্ণমেণ্ট এই অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণ জাপ গবর্ণমেণ্টের এই অস্বীকৃতি মানিয়া লইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা বোধ হয় এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিবার সময় উহা যে পার্লহারবারের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা এবং তখন যে জাপানকে তোষণ করিতেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন ব্যগ্র ছিল, সে কথা বিস্মৃত হওয়াই সুবিবেচনার কার্য্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। উক্ত পত্রিকা অতীতের এই নজীর উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। উক্ত পত্রিকা বলিয়াছেন যে, চীন ও কোরিয়ার গ্রাম ও সহরগুলিতে রোগ-বীজাণুবাহী কীট-পতঙ্গ, ইঁদুর প্রভৃতি এত বেশী আছে যে, ৪৪৮টি বিমান পুনঃ পুনঃ রোগ-বীজাণু বর্ষণ করিলেও রোগ খুব বেশী ছড়াইবে না। বিলাতের 'টাইমস্' পত্রিকা ২০শে মার্চ্চ (১৯৫২) তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বীজাণু-যুদ্ধের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণের জন্য দুইটি যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। উক্ত পত্রিকা বলিয়াছেন যে, উত্তর-কোরিয়ায় ও চীনে টাইফাস, প্লেগ প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপ যে দেখা দিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে এবং যে-সকল দেশে মানুষ আদিম অবস্থার মধ্যে বাস করিতেছে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা নাই, সেখানে এই সকল রোগের প্রকোপ

দেখা দেয়ই। 'টাইমস্' পত্রিকা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই সুযোগে চীন গবর্ণমেণ্ট চীনাদের মধ্যে আমেরিকাবাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতেছেন। 'টাইমস্' পত্রিকার দ্বিতীয় যুক্তিটি অত্যন্ত হাস্যকররূপে অকাট্য। উক্ত পত্রিকা বলিয়াছেন যে, ইচ্ছা করিয়া রোগ ছড়ানো পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের দৃষ্টিতে এত ঘৃণিত ব্যাপার যে আমেরিকানরা কিম্বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত অন্য কোন দেশ যুদ্ধের এই ঘৃণিত পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে, পাশ্চাত্য দেশের কোন লোকই তাহা বিশ্বাস করিবে না। একেবারে অকাট্য যুক্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বার্থরক্ষার জন্য পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা যে কি করিতে পারে আর না পারে, এশিয়াবাসীরা তাহা মর্ম্মান্তিক ভাবেই অনুভব করিয়া আসিতেছে। 'ডেইলী মেল' পত্রিকা ২৫শে মার্চ্চ তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, রোগের সংক্রমণের হাত হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করার সমস্ত চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ায় তাহাদের এই পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা যত তীব্র ভাষাতেই বীজাণু-যুদ্ধের অভিযোগ অস্বীকার করুন না কেন, এশিয়াবাসীর পক্ষে তাহাকে বেদবাক্য বলিয়া স্বীকার করা অসম্ভব। পরমাণু-বোমার আস্বাদ এশিয়াবাসীই পাইয়াছে।

মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন যে, রোগ-বীজাণু ছড়াইবার অভিযোগ শুধু অস্বীকার করিয়া এশিয়াবাসীকে ধোকা দেওয়া চলিবে না। এই জন্যই এই অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য তাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক রেডক্রসকে অনুরোধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। রেডক্রশের আন্তর্জ্জাতিক কমিটিও তদন্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। চীনা কম্যুনিষ্টগণ অবশ্য এই তদন্তে রাজী হন নাই। মঃ মালিক এই অস্বীকৃতির সমর্থনে নিরস্ত্রীকরণ কমিশনে বলিয়াছেন যে, রেডক্রশের আন্তর্জ্জাতিক কমিটি নিরপেক্ষ নয়। এইরূপ আশঙ্কা অমূলক বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। চীনে ও উত্তর-কোরিয়ায় মহামারী নিরোধে সাহায্য করিতে আন্তর্জ্জাতিক স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানও (World Health Organization) রাজী হইয়াছিলেন। চীন ও উত্তর-কোরিয়া এই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটিকেও নিরপেক্ষ মনে না করিয়া যদি উহার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করা হইয়া থাকে তাহা হইলেও বিস্ময়ের বিষয় হয় না। কারণ, এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর জেনারেল Dr. Chisholm গত ৩রা এপ্রিল (১৯৫২) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হেড-কোয়ার্টারে এক সাংবাদিক-সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, কোরিয়ায় বীজাণু-যুদ্ধ চালান হইতেছে বলিয়া কম্যুনিষ্টরা যে অভিযোগ করিয়াছে তাহার কোন প্রমাণ নাই এবং মহামারী অস্বাভাবিকরূপে দেখা দিয়াছে বলিয়াও জানা যায় না। বিনা তদন্তে যাঁহারা অভিযোগকে মিথ্যা বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের নিরপেক্ষতার উপর আস্থা স্থাপন করা কঠিন।

এই অভিযোগের বিরুদ্ধে একটা যুক্তি অবশ্যই দেওয়া যাইতে পারে যে, এইরূপ রোগ-বীজাণু ছড়ান আমেরিকানদের পক্ষেও আত্মঘাতী নীতি। কারণ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্যরাও এই বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। কিন্তু রোগ-বীজাণু ছড়াইবার পূর্ব্বে সম্মিলিত সৈন্যদিগকে যদি টীকা দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের আক্রান্ত হইবার কোন আশঙ্কা আছে, ইহা মনে

করার কোন কারণ দেখা যায় না। বিশেষতঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যূহ হইতে বহু দূরে যদি রোগ-বীজাণু ছড়ান হয়, তাহা হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্যদের আক্রান্ত হওয়ার কোন আশঙ্কা থাকে না। বস্তুতঃ, কম্যুনিষ্টদের পক্ষ হইতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, রোগ-বীজাণু ছড়াইবার পূর্ব্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্যদিগকে টীকা দেওয়া হইয়াছে।

হংকং হইতে ২৫শে মার্চ্চ (১৯৫২) তারিখের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, চীনা ও উত্তর-কোরীয় ব্যূহের পশ্চাদ্‌ভাগে কয়েক জন গুপ্তচরকে ধৃত করা হইয়াছে বলিয়া 'নিউ চায়না নিউজ এজেন্সী' দাবী করিয়াছে। বীজাণু ছড়াইবার ফল কিরূপ হইয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এই সকল গুপ্তচর মার্কিণ বিমান হইতে প্যারাসুট যোগে অবতরণ করিয়াছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন যে ইহাকেও মিথ্যা সংবাদ বলিয়া অভিহিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। চীনে এবং কোরিয়ায় ব্যাপক বীজাণু-যুদ্ধ চালাইবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র নিন্দা করিয়া গত ১১শে মার্চ্চ (১৯৫২) সোভিয়েট রাশিয়া নিরস্ত্রীকরণ কমিশনে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। আন্তর্জ্জাতিক গণতন্ত্রী ব্যবহার-জীবী সমিতি কম্যুনিষ্টদের অভিযোগ তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিশন প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই কমিশন উত্তর-কোরিয়া এবং উত্তর-পূর্ব্ব চীনে তদন্ত করিয়া জানাইয়াছেন যে, উত্তর কোরিয়া এবং উত্তর-পূর্ব্ব চীনের অবস্থা একই রকম। তাঁহারা রোগ-বীজাণু-দুষ্ট বহু কীটপতঙ্গাদি দেখিতে পাইয়াছেন। এই কমিশনের তদন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন স্বীকার করিবে ইহাও আশা করা অসম্ভব। কম্যুনিষ্টদের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়, এইরূপ তদন্তের ব্যবস্থা ছাড়া আর কোনরূপ তদন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নিরপেক্ষ তদন্ত বলিয়া মনে হইবে কি ?

যুদ্ধে রোগ-বীজাণু ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা নূতন নয়। অতীত কালে রোগজনক স্বাভাবিক কারণে সৈন্যদলে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সেনাসেরিব যখন মিশর আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার সৈন্যদলে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। জেরুজালেম আক্রমণের সময় আসেরীয় সৈন্যদলে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হওয়ায় আসন্ন ধ্বংস হইতে জেরুজালেম রক্ষা পাইয়াছিল। বর্ত্তমানে মানুষ এই রোগ-বীজাণুকে যুদ্ধের মারণাস্ত্রে পরিণত করিয়াছে। ১৯২৪ সালে আমরা সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধে রোগ-বীজাণু ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা শুনিতে পাই। ঐ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ (League of Nations) যুদ্ধে রোগ-বীজাণু ব্যবহার নিষিদ্ধ করিবার জন্য পৃথিবীর সমস্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। ১৯২৫ সালে জেনেভায় ৪১টি রাষ্ট্র বীজাণু-যুদ্ধ নিষিদ্ধ করিয়া এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান এই চুক্তিতে যোগদান করে নাই। কিন্তু ইহার পর ১৯৩২ সালে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বীজাণু-যুদ্ধ নিবারণ করা কার্য্যতঃ অসম্ভব বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। নাৎসী-নায়কগণই সর্ব্বপ্রথম বীজাণু অস্ত্র ব্যবহার করিবেন, দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের পূর্ব্বে এই আশঙ্কা জাগিয়াছিল। জার্ম্মাণীতে ও জাপানে বীজাণু অস্ত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হইয়াছিল। গত যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণী ও জাপান বীজাণু-যুদ্ধ চালায় নাই বটে, কিন্তু ঐ সময় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও প্রায় চারি হাজার বীজাণুবিদ্ এ-সম্পর্কে গবেষণা চালাইয়াছিলেন। মের্ক রিপোর্টে (Merck Roport) এই গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। পশ্চিমী শক্তিবর্গের পুনরস্ত্রসজ্জা পরিকল্পনায় রোগ-বীজাণু সম্বন্ধে গবেষণা একটা প্রধান স্থান পাইয়াছে এবং ভাবী যুদ্ধে রোগ-বীজাণু ব্যবহারের কথাও বিবেচনা করা হইতেছে। সম্প্রতি ফ্রান্সের 'লিমো' পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, বৃটেনে রোগ-বীজাণু ব্যবহার সম্পর্কে পরীক্ষা করিবার আয়োজন চলিতেছে। কমন্স সভায় বীজাণু-যুদ্ধ সম্পর্কে গবেষণার ব্যয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে পার্লামেণ্টারী দেশরক্ষা-সচিব জন-স্বার্থের খাতিরে এ সম্পর্কে কোন বিবরণ প্রকাশ করিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু রোগ-বীজাণু সম্পর্কে গবেষণার কথা অস্বীকার করেন নাই। ১৯৪৮ সালে কমন্স সভায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, ভবিষ্যৎ যুদ্ধে রোগ-বীজাণু ব্যবহারের বিষয় উপেক্ষা করা হয় নাই।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রোগ-বীজাণু সম্পর্কে গবেষণার বিষয় চীনের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মঃ কুয়ো মো-জো কর্ত্তৃক বিশ্বশান্তি পরিষদের নিকট প্রেরিত বার্ত্তায় বলা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হইতে জাপানের বহু বীজাণুবিদ্ যুদ্ধাপরাধীকে মার্কিণ সেনা বিভাগ অনেক রকম বীজাণু-অস্ত্র নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছে। কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর চীনা ও উত্তর কোরীয় যুদ্ধবন্দী এবং কোরীয় অসামরিক লোকদের উপর উহার পরীক্ষাও করা হইয়াছে। ভবিষ্যৎ যুদ্ধে যে রোগ-বীজাণু অস্ত্র ব্যবহৃত হইবে, এ-সম্বন্ধে সকলেই আশঙ্কা করেন। কেবল বর্ত্তমান কোরিয়া যুদ্ধে রোগ-বীজাণু ব্যবহৃত হইতেছে, এ কথা অ-কম্যুনিষ্টগণ বিশ্বাস করিতে রাজী নহেন। রোগ-বীজাণু সম্বন্ধে গবেষণা যদি পশ্চিমী শক্তিবর্গের অস্ত্রসজ্জার অঙ্গীয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই গবেষণার ফল পরীক্ষা করাও প্রয়োজন। পরমাণু-বোমার পরীক্ষা নেবাদা মরুভূমিতে কিম্বা বিকিনি বলয়ে চলিতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যৎ যুদ্ধে শত্রুদেশে যে বীজাণু বোমা বা বীজাণুবাহী কীট-পতঙ্গাদি-ভরা বাক্স বা ঐরূপ কিছু বর্ষণ করা হইবে, তাহার শক্তি পরীক্ষা করা কোথায় এবং কিরূপে সম্ভব ? যদি বীজাণু-অস্ত্র প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোরিয়া যুদ্ধই কি তাহার শক্তি-পরীক্ষা করিবার শ্রেষ্ঠ সুযোগ নয় ?

মঃ ষ্ট্যালিনের উত্তর—

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ১৯ জন সংবাদপত্র ও রেডিও-সম্পাদক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এক মাসের জন্য ইউরোপ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। গত ২৪শে মার্চ্চ (১৯৫২) তাঁহারা রোম হইতে তার-যোগে চারিটি প্রশ্ন মঃ ষ্ট্যালিনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। গত ১লা এপ্রিল মঃ ষ্ট্যালিন প্রশ্ন চারিটির যে-উত্তর লোক মারফৎ তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার ফল ভীমরুলের চাকে লোষ্ট্রনিক্ষেপের মতই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মঃ ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন যে, দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বের তুলনায় তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম বর্ত্তমানে অধিকতর নিকটবর্ত্তী হয় নাই। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, বৃহৎ রাষ্ট্রনায়কদের সম্মেলনের ফল

সুতরাং ভালই হইবে। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাইয়াছেন যে, অখণ্ড জার্ম্মাণী গঠনের পক্ষে বর্ত্তমান সময়কে তিনি উপযুক্ত বলিয়াই মনে করেন। চতুর্থ প্রশ্নটি ছিল, "কোন্ ভিত্তিতে ধনতন্ত্র ও কম্যুনিজমের পাশাপাশি অবস্থান সম্ভব?" ইহার উত্তরে মঃ ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন, "সহযোগিতার জন্ত যদি পারস্পরিক ইচ্ছা থাকে, প্রতিশ্রুত দায়িত্ব যদি প্রতিপালন করিবার আগ্রহ থাকে এবং সাম্যের (equality) নীতি এবং অন্ত রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি যদি প্রতিপালন করা হয়, তাহা হইলে ধনতন্ত্র এবং কম্যুনিজমের শান্তিপূর্ণ ভাবে পাশাপাশি অবস্থান সম্পূর্ণরূপেই সম্ভব।"

ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন সময়ে মঃ ষ্ট্যালিনের শান্তি-প্রস্তাব যেরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছে, মার্কিণ সংবাদপত্র ও রেডিও-সম্পাদকদের উল্লিখিত চারিটির প্রশ্নের উত্তরের বেলাতেও তাহার অন্তথা হয় নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডীন একিসন বলিয়াছেন, মঃ ষ্ট্যালিন নূতন কথা কিছুই বলেন নাই। মিঃ চার্চ্চিল (৭ই এপ্রিল ১৯৫২) বলিয়াছেন যে, অবস্থা অনুকূল হইলে মার্শাল ষ্ট্যালিন এবং মিঃ ট্রুম্যানের সহিত তিনি সানন্দে সাক্ষাৎ করিবেন। প্রথম প্রশ্ন এই যে, শান্তির জন্ত মঃ ষ্ট্যালিনের নূতন কথা বলিবার সত্যই কিছু আছে কি না? দ্বিতীয়তঃ, কিরূপ অবস্থা হইলে তাহাকে মিঃ চার্চ্চিল অনুকূল অবস্থা বলিয়া মনে করিবেন? মঃ ষ্ট্যালিন অবশ্য মনে করেন যে, ধনতন্ত্র এবং কম্যুনিজমের পাশাপাশি অবস্থান সম্ভবপর। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, কম্যুনিজমের ধ্বংস না হইলে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র নিরাপদ হইবে না। ইহাই যেখানে মার্কিণ-মনোভাব সেখানে বৃহৎ রাষ্ট্র-নায়কদের সম্মেলন হওয়ার অনুকূল অবস্থা হইয়াছে বলিয়া মিঃ চার্চ্চিলের স্বীকার করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি ছাড়া তাঁহার পক্ষে মঃ ষ্ট্যালিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়াও সম্ভব নয়। এই বৎসর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন হইবে। কাজেই প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের পক্ষে মঃ ষ্ট্যালিনের সহিত আলোচনা সম্পর্কে গতানুগতিক নীতির পরিবর্ত্তন করারও কোন সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ, আগামী নির্ব্বাচনে মিঃ ট্রুম্যান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না। রিপাবলিকান দলের পক্ষে জেনারেল আইসেনহাওয়ারেরই প্রেসিডেণ্ট পদের জন্ত মনোনীত হওয়ার সম্ভাবনা এবং তিনিই যে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবেন, ইহাতেও সন্দেহ নাই বলিয়াই মনে হয়। জেনারেল আইসেনহাওয়ার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হইলেও রাশিয়া ও কম্যুনিজম সম্পর্কে মার্কিণ নীতির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না, আর পরিবর্ত্তন হইলেও কম্যুনিজম নিরোধের নীতি অধিকতর তীব্র আকার ধারণ করিবে মাত্র। তাই বলিয়া তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম, নিকটবর্ত্তী হইবে, এ কথা স্বীকার করা যায় না।

পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনায়কগণ মনে করেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু বোমার জন্তই এ পর্য্যন্ত বিশ্বশান্তি বিনষ্ট হয় নাই। কিন্তু যুদ্ধোত্তর গত ছয় বৎসরে অন্ততঃ তিন-চার বার এমন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যখন রাশিয়া ইচ্ছা করিলে উপযুক্ত প্রতিবিধানের জন্ত চেষ্টা করিতে পারিত এবং এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, পশ্চিম ইউরোপের সামরিক অবস্থা এরূপ যে, রাশিয়া ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সমগ্র ইউরোপ দখল করিতে পারিত। সুবিবেচনা ও ধৈর্য্যের জন্তই রাশিয়া এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। এখন মনে করা হইতেছে যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু বোমা এবং ইউরোপীয় বাহিনীর ৫০ ডিভিশন সৈন্য ইউরোপে শান্তি রক্ষা করিবে। কিন্তু পরমাণু বোমা এখন রাশিয়ারও আছে। ১৯৫২ সালের মধ্যে ইউরোপীয় বাহিনীতে ৫০ ডিভিশন সৈন্ত হওয়ার কতটুকু সম্ভাবনা? এই বৎসর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন এক ডিভিশন সৈন্তও দিবে না। জার্ম্মাণ সৈন্তও এ বৎসর পাওয়া সম্ভব নয়। ফ্রান্সের দেয় সৈন্তের পরিমাণ ১৪ ডিভিশন হইতে কমাইয়া ১২ ডিভিশন করা হইয়াছে। যত দিন ইন্দোচীনে যুদ্ধ চলিবে তত দিন এই ১২ ডিভিশন সৈন্ত কাগজে-কলমে থাকিবে। সুতরাং এ কথা নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায় যে, উত্তর আটলাণ্টিক-গোষ্ঠীর সামরিক শক্তির জন্ত নয়, রাশিয়ার ধৈর্য্য ও সুবিবেচনার জন্তই ইউরোপে শান্তিভঙ্গ হইবে না।

অখণ্ড জার্ম্মাণী গঠনের পক্ষে বর্ত্তমান সময়কে শুধু মঃ ষ্ট্যালিনই উপযুক্ত মনে করেন না, গত ১০ই মার্চ্চ (১৯৫২) ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের জন্ত রাশিয়া যে নূতন প্রস্তাব করিয়াছে, জার্ম্মাণদের কাছেও তাহা সত্যই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে না হইয়া পারে না। রাশিয়ার প্রস্তাবের মূল কথা এই যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম জার্ম্মাণী মিলিত করিয়া অখণ্ড জার্ম্মাণী গঠন করা হইবে এবং এই অখণ্ড জার্ম্মাণীর স্থলসৈন্ত, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী সবই থাকিবে। জার্ম্মাণ বাহিনীকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার জন্ত জার্ম্মাণ অস্ত্রশিল্পের পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং আগেকার জার্ম্মাণ জেনারেল ও অফিসারগণই জার্ম্মাণ বাহিনী পরিচালনা করিবেন। শান্তি চুক্তির জন্ত যে সম্মেলন আহ্বান করা হইবে, তাহাতে যোগদানের জন্ত জার্ম্মাণীকেও আমন্ত্রণ করিতে হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স সরাসরি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে। রাশিয়ার এই নূতন প্রস্তাবকে রুশ-প্রচারকার্য্য বলিয়া উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কারণ, পটস্‌ডাম চুক্তিতে জার্ম্মাণীকে পুনরায় অস্ত্রসজ্জিত করার ব্যাপারে রাশিয়ার জন্ত যে রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা আছে, এই প্রস্তাবে রাশিয়া তাহা ত্যাগ করিয়াছে। অবশ্য অখণ্ড জার্ম্মাণী যদি পশ্চিম ইউরোপীয় গোষ্ঠীতে যোগদান করে, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় বিষয় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু ইহা একরূপ নিশ্চিত যে, জার্ম্মাণীতে স্বাধীন ভাবে সাধারণ নির্ব্বাচন হইলে এডেনেয়ুয়ের দলের ক্ষমতা পাইবার সম্ভাবনা নাই। ক্ষমতা পাইবে সোস্তালিষ্টরা ও জাতীয়তাবাদীরা। এই দুইটি দল শুধু কম্যুনিজম-বিরোধীই নয়, ভয়ানক রকমে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরও বিরোধী। সুতরাং অখণ্ড জার্ম্মাণী হইবে নিরপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ, শান্তি চুক্তির পরে জার্ম্মাণী হইতে মার্কিণ ও বৃটিশ সৈন্ত সরাইয়া লইতে হইবে। ইহাতে রাশিয়ারই সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। এই আশঙ্কাই অখণ্ড জার্ম্মাণী গঠন সম্পর্কে রাশিয়ার নূতন প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিবার প্রধান কারণ।

টিউনিশিয়ায় ফ্রান্সের মরণ কামড়—

ইন্দোচীনে প্রবল আঘাতে বিক্ষুব্ধ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের আহত গর্ব্ব ও ঔদ্ধত্য তীব্র আক্রোশে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে টিউনিশিয়ার উপর। গত ২৫শে মার্চ্চ (১৯৫২) ফরাসী কর্তৃপক্ষ টিউনিশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ চেনিক এবং তাঁহার মন্ত্রিসভার আরও তিন জন মন্ত্রীকে গ্রেফতার করিয়া অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন, সমগ্র টিউনিশিয়ায় জারী করা হইয়াছে সামরিক আইন, স্বাধীনতাকামীদিগকে ধর-পাকড় করা হইয়াছে। সমগ্র টিউনিশিয়ায় অবরোধ অবস্থা সৃষ্টি করিয়া ফরাসী কর্তৃপক্ষ টিউনিশিয়ার জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে শুরু করিয়াছে সর্ব্বগ্রাসী সংগ্রাম। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্ম ফরাসী গবর্ণমেন্টের যে ইহা মরণ কামড়, তাহাতে সন্দেহ নাই। নয়াদস্তুর পার্টির স্বায়ত্ত-শাসনের অতি সামান্ত দাবীর মধ্যেও ফরাসী কর্তৃপক্ষ সাম্রাজ্য হারাইবার আশঙ্কা দেখিয়া ভীত ও চমকিত হইয়া উঠিয়াছেন।

নয়াদস্তুর পার্টির দাবী সত্যই খুব বেশী ছিল না। আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্ত-শাসনের পরিবর্ত্তে পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপার ফরাসী কর্তৃপক্ষের হাতে ছাড়িয়া দিতে নয়াদস্তুর পার্টি রাজী ছিল। তাঁহাদের দাবী ছিল শুধু এই যে, টিউনিশিয়ার আইন-সভা এবং মন্ত্রিসভা শুধু টিউনিশিয়াবাসীদের লইয়াই গঠিত হইবে। যে সকল ফরাসী টিউনিশিয়ায় বাস করিতেছে, তাহারাও এই দাবী পূরণের পথে যথেষ্ট অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৫১) প্যারীতে ফরাসী গবর্ণমেন্টের সহিত টিউনিশিয়ার আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর গত ১৮ই জানুয়ারী (১৯৫২) নয়াদস্তুর পার্টির নেতা ডাঃ হাবিব বোরগুইবা এবং বহু সংখ্যক জাতীয়তাবাদীকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু ফরাসী গবর্ণমেন্ট ইহাতেও টিউনিশিয়ায় সাম্রাজ্য রক্ষা সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই। টিউনিশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করিয়া সাম্রাজ্য নিরাপদ করিবার জন্ম মহম্মদ চেনিক অপেক্ষাও অধিকতর নরমপন্থীকে প্রধান মন্ত্রী করাই তাঁহারা জরুরী প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়াছেন।

মাসাধিক কাল পূর্ব্বে টিউনিশিয়ার রেসিডেণ্ট জেনারেল Count Houteclogue প্যারীতে এই অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, টিউনিশিয়া মন্ত্রিসভায় নয়াদস্তুর পার্টির যে সকল সদস্য আছেন, তাঁহারা এই দলের আন্দোলন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে টিউনিশিয়া সম্পর্কে অভিযোগ উপস্থিত করিবার দাবীর সমর্থক। এই অবস্থায় উক্ত মন্ত্রিসভার সহিত রাজনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে কোন আলোচনা চালান অত্যন্ত কঠিন। অতঃপর ফরাসী মন্ত্রিসভা চেনিক মন্ত্রিসভাকে অপসারিত করিবার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার সহযোগীদিগকে গ্রেফতার করা ছাড়া অবশ্য আর কোন উপায়ে মহম্মদ চেনিককে অপসারিত করিবার উপায় ছিল না। তাঁহাদিগকে গ্রেফতার করিয়া অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণ করিয়া ফরাসী কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে টিউনিশিয়ার বে শালাহেদ্দিন বাক্কোচিকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং ফরাসী গবর্ণমেণ্টও টিউনিশিয়ার জন্ম এক নূতন শাসন-সংস্কার ঘোষণা করেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদীরা এই শাসন-সংস্কারকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। বস্তুতঃ এক ইস্তাহার জারী করিয়া এই শাসন-সংস্কারকে তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। নূতন প্রধান মন্ত্রী শালাহেদ্দিন বাক্কোচির পক্ষে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্ম মন্ত্রী পাওয়াই প্রথমে কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। পরে অবশ্য তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু টিউনিশিয়ার স্বাধীনতা-সমস্তার কোন সমাধান হয় নাই। সমগ্র উত্তর-আফ্রিকায় পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার জন্ম যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে, টিউনিশিয়ার অশান্তি তাহার একটি অংশ মাত্র। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সত্যই এই সমস্তার মীমাংসা করিতে পারিবে কি না, তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মিশরের আর এক অধ্যায়—

কায়রোস্থিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্তার র‍্যালফ ষ্টিভেনশনের সর্দ্দি লাগার ফলে মিশরের আলী মাহের পাশার মন্ত্রিসভার পতন হওয়া প্রথম দৃষ্টিতে অনেকের কাছেই বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবিত মধ্য-প্রাচ্যে কিছুই অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইঙ্গ-মিশর সমস্তা সমাধানের জন্ম গত ১লা মার্চ্চ (১৯৫২) কায়রোতে ইঙ্গ-মিশর বৈঠক আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল।

আলী মাহের পাশা কেন পদত্যাগ করিলেন বা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তাহার কারণ এখন পর্য্যন্তও দুর্জ্ঞেয় হইয়াই রহিয়াছে। নির্ভরযোগ্য মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত রাখা সম্পর্কে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট দেখা দেওয়ায় আলী মাহের পাশা পদত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটটা কি তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। মিশরের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রধান মন্ত্রী ৩০ দিনের জন্ম পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত রাখিবার জন্ম রাজাকে অনুরোধ করিতে অধিকারী। পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত রাখিবার কাল আরও ৩০ দিন বর্দ্ধিত করিবার জন্ম অনুরোধ করিবার অধিকারও তাঁহার আছে। সুতরাং পার্লামেণ্টের অধিবেশন ৬০ দিন অর্থাৎ দুই মাস কাল স্থগিত রাখার পক্ষে কোন অসুবিধাই নাই। এই ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর হয় তাঁহাকে পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে, না হয় পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া ৬০ দিনের মধ্যে নূতন নির্ব্বাচনের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, যদিও মিশর পার্লামেণ্টে আলী মাহের পাশার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই, তাহা হইলেও চারি মাস কাল প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকা তাঁহার পক্ষে কোন অসুবিধাই ছিল না। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের জন্ম আলী মাহের পাশা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, ইহা স্বীকার করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যখন রাজা ফারুকের নির্দ্দেশ মত প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন তখন তিনি জানিতেন যে, মিশর পার্লামেণ্টে ওয়াফদ দলেরই প্রাধান্ত এবং ইহা জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আলী মাহের পাশা রাজা ফারুকের নিকট যে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়াছেন, তাহা হইতেও তাঁহার পদত্যাগের কারণ বুঝিতে পারা যায় না। পদত্যাগ-পত্রে পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলা হইয়াছে যে, "আমার মিশনের পথে বাধা

সৃষ্টি করা হইয়াছে।" কিরূপ বাধা, কে বা কাহারা বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা কিছুই বলা হয় নাই।

প্রধান মন্ত্রী হইয়া আলী মাহের পাশা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সুয়েজ খাল এবং সুদান সম্পর্কে তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ওয়াফদ গবর্ণমেণ্টের নীতিই অনুসরণ করিবেন। কিন্তু যিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুসারে সুয়েজ খাল ও সুদান সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মীমাংসা করিবার জন্তই মিশরের প্রধান মন্ত্রী হইলেন, তাঁহার পক্ষে উক্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। গত জানুয়ারী মাসের বিভিন্ন হাঙ্গামায় যে সকল ব্যবসায়ীদের ব্যবসা-কেন্দ্রের ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে ৫০ লক্ষ (মিশরীয়) পাউণ্ড সাহায্য দিবার জন্ত যখন তাঁহার গবর্ণমেণ্ট বিল উত্থাপন করিলেন, তখন ওয়াফদ দল এই নীতির বিরোধিতা করিলেন। কারণ, এই সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা প্রায় সকলেই বৃটিশ। পার্লামেণ্টে ওয়াফদ দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলিয়া এই বিল পাশ করা সম্ভব ছিল না। এই জন্ত আলী মাহের পাশা পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত রাখার জন্ত রাজাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পরে ওয়াফদ দলের সহিত একটা মীমাংসা হওয়ায় পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত রাখার আর প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু বৃটেনের সহিত আলোচনার সময় যখন আসিল, তখন আবার তিনি পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করিয়া পারেন নাই। বৃটিশের পছন্দ মত সর্ত্তে মীমাংসা করিতে হইলে পার্লামেণ্টের ওয়াফদ দলের সদস্যদের বাধা সর্ব্বাগ্রে দূর করা প্রয়োজন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত রাখার পক্ষপাতীই শুধু নয়, এ জন্ত তাঁহারা যে রাজা ফারুকের উপর যথেষ্ট চাপ দিয়াছেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব এবং মর্য্যাদা রক্ষার জন্তই যে ইঙ্গ-মিশর আলোচনার সময় পার্লামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ থাকা প্রয়োজন তাহাতে আর সন্দেহ কি? পৃথিবীতে যদি ইঙ্গ-মার্কিণ শিবিরের স্বার্থই রক্ষিত না হইল, তবে গণতন্ত্রের অস্তিত্বই বা থাকিবে কিরূপে?

কায়রোর এক সংবাদে প্রকাশ যে, রাজা ফারুক পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত রাখার জন্ত স্বতন্ত্র ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় এবং এ ব্যাপারে মন্ত্রিসভাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করায় আলী মাহের পাশার মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। ইহার অর্থ কি ইহাই যে, মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্ট স্থগিত রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাজী নহেন বলিয়াই তাঁহারা পদত্যাগ করিয়াছেন? সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্ত অপসারণ সম্পর্কে এবং সুদান সম্পর্কে আলী মাহের পাশার নিজস্ব একটি পরিকল্পনা ছিল। যদিও মধ্য-প্রাচী রক্ষা-ব্যবস্থায় যোগদান করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না, তথাপি তাঁহার পরিকল্পনায় এক বৎসরের মধ্যে সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্ত অপসারণের দাবী ছিল বলিয়া প্রকাশ। বৃটেন যে উহাতেও রাজী ছিল না, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। বৃটেন সুয়েজ খাল সম্পর্কে স্থিতাবস্থা বজায় রাখিয়াই মীমাংসা করিতে চায়। আলী মাহেরের পরিকল্পনা অনুসারে তাহা সম্ভব হইত না। খুব সম্ভব রাজা ফারুক বৃটিশের দাবীতে রাজী হইয়াছিলেন এবং কায়রোস্থিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার র‍্যাল্ফেল ষ্টিভেনশনকে তাহা জানাইয়াও ছিলেন। বোধ হয় এই জন্তই আলোচনা আরম্ভ হওয়ার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে স্যার র‍্যাফেল ষ্টিভেনশন সর্দ্দি লাগাইয়া বসিলেন। তাঁহার এই সর্দ্দি যে কূটনৈতিক সর্দ্দি, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার সাধারণ সর্দ্দি লাগিলে মিশর মন্ত্রিসভা বানচাল হওয়ার কারণ দেখা যায় না। এই অনুমান সত্য হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, রাজা ফারুকের চাপেই আলী মাহের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং যিনি বৃটিশের অভিপ্রায় বিনা আপত্তিতে সিদ্ধ করিতে প্রস্তুত এইরূপ লোককেই মিশরের প্রধান মন্ত্রী করা হইয়াছে। আহমদ নাগিব হিলালী পাশা প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াই রাজা ফারুককে লিখিয়াছেন, সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্ত অপসারণ এবং নীল নদের উপত্যকার ঐক্যসাধন শান্তি, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি দূর হওয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। ইহার একমাত্র অর্থ যে, ওয়াফদ দলের শক্তিকে ধ্বংস করা, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে না।

হিলালী পাশাও পূর্ব্বে ওয়াফদ দলে ছিলেন। গত নবেম্বর মাসে (১৯৫২) তাঁহাকে দল হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। সুতরাং ওয়াফদ দলের শক্তি ধ্বংস করা সম্পর্কে বৃটেন, রাজা ফারুক এবং হিলালী পাশার মধ্যে একটা স্বাভাবিক ঐক্য রহিয়াছে। ইহার প্রথম পর্য্যায় হিসাবে বিশৃঙ্খলা, রাজদ্রোহ এবং এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর এক সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করার অভিযোগে সেরাগ এল দীন পাশা এবং আবদুল ফতে হাসান পাশাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেরাগ এল দীন পাশা ওয়াফদ দলের জেনারেল সেক্রেটারী এবং নাহাশ পাশা গবর্ণমেণ্টে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ওয়াফদ দলে strong man বলিয়া অভিহিত। ইঙ্গ-মিশর আলোচনা যাহাতে নির্বিঘ্নে চলিতে পারে তাহার জন্ত দ্বিতীয় কার্য্য করা হইয়াছে মিশর পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া। আগামী ১৮ই মে (১৯৫২)' নির্ব্বাচন হওয়ার দিন ধার্য্য হইয়াছে। কিন্তু উহার মধ্যে আলোচনা শেষ হইয়া মীমাংসা সম্ভাবনা খুব কম। নির্ব্বাচন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ।

গত ২২শে মার্চ্চ (১৯৫২) খাল অঞ্চল ও সুদান সম্পর্কে মীমাংসা করিবার জন্ত আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রও মীমাংসার ব্যাপারে সহযোগিতা করিতেছে। ইতিমধ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সুদানে নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত ২রা এপ্রিল (১৯৫২) সুদানকে স্বায়ত্ত-শাসন দিবার জন্ত সুদান আইন সভায় একটি বিল উপস্থিত করাও হইয়াছে। ইহাতে সুদান সম্পর্কে মীমাংসা সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ গত ৮ই এপ্রিল তারিখের আলোচনায় সুদানের ব্যাপার লইয়া মিশরের প্রধান মন্ত্রী এবং বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের মধ্যে বেশ একটু গরম-গরম কথা-কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। সুয়েজ খাল সম্পর্কে যদি ধীরে-ধীরে বৃটিশ সৈন্ত অপসারণের নীতি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে ১৯৫৬ সালে ইঙ্গ-মিশর চুক্তি শেষ হওয়ার পরেও খাল অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্ত থাকিবার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে। সুদান লইয়া ইঙ্গ-মিশর আলোচনায় অচল অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ—

এশিয়ার বিপ্লবের পথ যে আফ্রিকাও অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহা উত্তর-আফ্রিকা, মধ্য-আফ্রিকা এবং পূর্ব্ব, পশ্চিম এবং

দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলী হইতেই বুঝা যাইতেছে। গত ৬ই এপ্রিল (১৯৫২) দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতকায়দের প্রভুত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্ত আরম্ভ হইয়াছে অ-শ্বেতকায়দের অহিংস সত্যাগ্রহ সংগ্রাম। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই দিনটিতে অর্থাৎ ১৬৫২ সালের ৬ই এপ্রিল হল্যাণ্ডের অধিবাসী জ্যোন ভান রিয়েবিক সদল বলে দক্ষিণ আফ্রিকায় অবতরণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেণ্ট এই দিনটিকে শ্বেতকায়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দিন হিসাবে প্রতিপালন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই জন্তই অ-শ্বেতকায়রা এই দিনটিকে শ্বেতকায়দের প্রভুত্ব হইতে মুক্ত হওয়ার আন্দোলন আরম্ভ করিবার সময়রূপে ধার্য্য করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বপ্রথম দক্ষিণ আফ্রিকাতেই অহিংস সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছিলেন। অ-শ্বেতকায়রা মহাত্মাজীর তৈয়ারী অস্ত্রই গ্রহণ করিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতকায়দের সংখ্যা ২৫ লক্ষ। তাহারাই ১৩ লক্ষ অ-শ্বেতকায়দের উপর আধিপত্য করিতেছে। এই ১৩ লক্ষ অ-শ্বেতকায়দের মধ্যে আফ্রিকানদের সংখ্যা ৮০ লক্ষ, এশিয়াবাসীর সংখ্যা ৩ লক্ষ এবং ১০ লক্ষ বর্ণসঙ্কর (colourd people)। সমস্ত অ-শ্বেতকায়গণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেণ্টের বর্ণানুযায়ী অঞ্চল বিভাগ আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন। গত আড়াই বৎসরের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেণ্ট অ-শ্বেতকায়দের সমস্ত অধিকার বিলোপ করিবার জন্ত যে-কয়েকটি আইন প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমেই মিশ্র বিবাহ আইনের কথা বলা প্রয়োজন। এই আইন দ্বারা ইউরোপীয় ও অ-ইউরোপীয়দের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, জনসংখ্যা রেজেষ্ট্রীকরণ আইন। এই আইন অনুসারে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে তাহার জাতিগত জন্মের ভিত্তিতে নাম রেজেষ্ট্রী করিতে হয়। ইহার পর রচিত হইয়াছে বর্ণানুযায়ী অঞ্চল বিভাগ বা The Group Areas Act. অতঃপর বর্ণ বৈষম্য নীতি বর্ণসঙ্করদের প্রতি প্রয়োগ করিবার জন্ত রচিত হইয়াছে অ-ইউরোপীয় প্রতিনিধিত্ব আইন। দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বোচ্চ আদালত এই আইনকে অবৈধ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু মালান গবর্ণমেণ্ট সহজে নিরস্ত হইবেন বলিয়া মনে হয় না।

গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৫১) আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস মালান গবর্ণমেণ্টের বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত করেন এবং তাঁহারা এই সংগ্রামকে সমস্ত অ-ইউরোপীয়, এশীয় এবং বর্ণসঙ্করদের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনে পরিণত করিতে সাব্যস্ত করেন। গত মার্চ্চ মাসে (১৯৫২) The Franchise Action Council ও এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। দেড় বৎসর পূর্ব্বে মালান গবর্ণমেণ্ট যখন অ-ইউরোপীয় প্রতিনিধিত্ব আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। গত ৬ই এপ্রিল হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা স্বাধীনতার সংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

— সাহিত্য পরিচয় —

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় ভাগ)—বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বৈষ্ণব সাহিত্য প্রবেশিকা—শ্রীহিমাংশুচন্দ্র চৌধুরী। জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ, ১১৯ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

সেনী গীতিমালা (দ্বিতীয় ভাগ)—শওকত আলি খান। সেনী সঙ্গীত সমাজ, ৬৭ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

THE FUNDAMENTALS OF HINDUISM —Satischandra Chatterjee M. A., PH. D. Das Gupta & Co Ltd. 54/3, College St. Calcutta. Rs. 3/8-

এগিয়ে যাবো—অমূল্যকুমার বসু। প্রকাশিকা—অনুপমা দেবী, অণ্ডাল, বর্দ্ধমান। মূল্য আড়াই টাকা।

পূর্ব্বরঙ্গ—অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। সাধনা মন্দির, ৫৫ নং নারায়ণ রায় রোড, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

যৌবনশ্রী—শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ। কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী, ১০৫ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

ছোটদের রামায়ণ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ওরিয়েণ্ট লংম্যানস লিঃ, ১৭ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

মনের কথা—ডাঃ হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

তুমি আর আমি—শ্রীরমেন চৌধুরী। বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস, ৮ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দু' টাকা চার আনা।

কথা ও কাকলি—শ্রীকাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিকা—শ্রীআরতি বন্দ্যোপাধ্যায়, আন্দুল, রায়পাড়া, হাওড়া। মূল্য বারো আনা।

পদক্ষেপ—নেপাল মুখোপাধ্যায়। লেখনী প্রকাশনী, ৪৫।এ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চার আনা।

INDIAN HISTORICAL RECORDS COMMISSION, Vol I and II. Government of India Press. New Delhi.

বিপ্রামে বিভ্রাট, অভিশপ্ত হার (১ম ও ২য় খণ্ড)—গুরুদাস হালদার। হালদার প্রেস, ২২ নং থর্ণহিল রোড, এলাহাবাদ। প্রতি খণ্ডের মূল্য দেড় টাকা।

বাঙ্গালী জাগো

"বাঙ্গালাকে শেষ আঘাত হানিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে ফাইনান্স কমিশন। আয়কর ও পাট-শুল্কের ভাগ বাঙ্গালাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কমানো হইয়াছিল। বাঙ্গালা সরকার বা বাঙ্গালী জনসাধারণ তাহার প্রতিবাদ করেন নাই। ফাইনান্স কমিশনের বাঙ্গালী চেয়ারম্যান দুর্ব্বলচিত্ত লোক, তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া নিয়োগী এওয়ার্ডের দ্বারা বাঙ্গালার আরও বড় এবং স্থায়ী অনিষ্ট করা হইতে পারে—এ আশঙ্কা আমরা আদৌ অমূলক মনে করি না। বাঙ্গালার কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট দিল্লীর নির্দ্দেশের বাহিরে যাইতে পারিবেন না, দিল্লীর সহিত নানাবিধ স্বার্থ-সূত্রে তাঁহারা জড়িত। বাঙ্গালার সমস্ত আন্দোলন যেন কেবল বন্দীমুক্তির দাবী এবং ছাঁটাই প্রভৃতির প্রতিবাদেই নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। ইহাদের প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমাদের আরও একটু বাহিরে তাকাইতে হইবে। বাঙ্গালার উপর যে-সব আঘাত আসিতেছে তাহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। বাঙ্গালী জাতি আজ এক মহা সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজিকার নিশ্চেষ্টতা অথবা দুর্ব্বলতা আমাদের বিনাশের কারণ হইতে পারে—এই বোধ যদি আজও আমাদের সকলের মনে জাগ্রত না হয়, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও দলাদলি ভুলিয়া আজও যদি আমরা মিলিত ভাবে বাহুতে বাহু বাঁধিয়া দাঁড়াইতে না পারি, আত্মরক্ষা এবং জাতির অস্তিত্ব রক্ষাকে আজও যদি আমরা প্রাদেশিকতা বলিয়া ভুল করি, তবে বোধ হয় স্বয়ং বিধাতাও আমাদের রক্ষা করিতে পারিবেন না।"

—দৈনিক বসুমতী।

আমাদের বাঙলা ভাষা

"আইন-মন্ত্রী পীরজাদা আবদুস সাত্তারের সংশোধনী প্রস্তাবের মর্ম: রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই বলিয়া মিঃ নূর আমেদের প্রস্তাব অপ্রয়োজনীয়। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকা সফরে আসিয়া উর্দুই পাকিস্থানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন কেমন করিয়া? পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর কি ইহা অজ্ঞাত ছিল যে, "রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই?" ঢাকা সফরে আসিয়া খাজা নাজিমুদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেন—তাহাই পূর্ববঙ্গে নূতন ভাবে ভাষা আন্দোলনের সৃষ্টি করে এবং উহা ব্যাপক আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের মনে এই সন্দেহই দেখা দেয় যে, তাহাদের মাতৃভাষা পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে যাহাতে স্থান না পায়, পাকিস্থানের শক্তিশালী পরিচালকগণের তাহাই মনোগত বাসনা। পূর্ববঙ্গের ৪ কোটি অধিবাসীর রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে এই যে সংশয় ও সন্দেহ তাহা দূর করিবার জন্যও মিঃ নূর আমেদের প্রস্তাব স্বীকার করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা আদৌ স্বীকার করা হইবে না ইহাই যদি করাচী কর্তৃপক্ষের মনোগত বাসনা থাকে—তাহা হইলে আইন-মন্ত্রীর প্রস্তাব দেখা দিবে এবং গৃহীত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। আর বাংলাভাষাভাষী নহেন যাঁহারা, সংখ্যায় তাঁহারা, যাহাই হউন, প্রভাবশালী তাঁহাদের সুরে সুর মিলাইয়া বলাই যাঁহাদের কর্মনীতি ও নিয়তি, পূর্ববঙ্গের সেই সকল লীগ-নায়ক আইন-মন্ত্রীর সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করিবেন, তাহাও অপ্রত্যাশিত নহে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

যাদের সুপারিশ আছে

"উদ্বাস্তদের সম্পর্কে একটা মর্মান্তিক সত্য এই যে, যাহাদের তদ্বিরের জোর আছে, ধরিবার লোক আছে, কিম্বা সুপারিশ করিবার মতো মুরুব্বি আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের সরকারী সাহায্য লাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। কিন্তু যাহাদের সকলের আগে সাহায্য পাওয়া উচিত, তাহারা পাইতেছে না এবং কবে পাইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা দেখা যাইতেছে না। এই সকল নিঃস্ব, রিক্ত কলিকাতা মহানগরীতে একান্ত অপরিচিত বহু আশ্রয়প্রার্থীর শোচনীয় অবস্থা আমাদিগকেও প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতে হয়। আশ্রয়চ্যুত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র শরণার্থীর শোচনীয় অবস্থা অবর্ণনীয়। সরকারী ধারা কিম্বা কর্মমাফিক অগ্রসর হইবার তাহাদের পথ জানা নাই, সুপারিশ আদায় করিবার মতো আত্মীয়-স্বজনও নাই। উদ্বাস্তদের মধ্যেও এই শ্রেণীর লোকই সর্বাপেক্ষা অধিক দুর্গত। সুতরাং সরকারী ক্যাম্পে যাহারা আছে তাহারা ছাড়াও যাহারা বাহিরে পড়িয়া আছে, নীরবে অনশনে দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে, দিনে মুখ দেখাইতে লজ্জাবোধ করিয়া রাত্রির অন্ধকারে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া স্ত্রী-পুত্র সহ পথচারীদের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে, তাহাদের দিকেও অবিলম্বে দৃষ্টিপাতের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমরা যেন শিবিরের কিম্বা শিবিরের বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের কাহাকেও না ভুলি।"

—যুগান্তর।

মৃত্যুর কবলে রামপুরহাট

"মার্কিণ শ্বেতাঙ্গ মহিলা মাদাম রুজভেণ্টকে লইয়া আমাদের শাসকগোষ্ঠী যেদিন মহানন্দে মশগুল, সেদিন হতভাগ্য রামপুরহাটের উপেক্ষিত মানুষের দল "হরিবোল" ধ্বনি দিয়া গণ্ডা-গণ্ডা শবদেহের সৎকার করিল। মন্ত্রিত্বের টুকরা লাভের আশায় জেলার খ্যাতনামা স্বদেশসেবিগণ যেদিন ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে আনন্দের বান ডাকাইতে-ছিলেন, সেদিন এই ক্ষুদ্র সহরের বুক হইতে অবহেলিত জনতার ১৩ জনকে মাতা বসুমতী তাঁর শান্ত ক্রোড়ে আশ্রয় দিলেন। ১৫ হাজার জনতার এই ক্ষুদ্র সহরে অদ্যাবধি শতাধিক অমূল্য জীবন অনন্তে শয়ন লাভ করিল। মহা শ্মশানের মহাযাত্রার যাত্রী দল এখনও পরিশ্রান্ত হয় নাই। প্রতি প্রাতে শুভ মৃত্যুর সুসংবাদ বহন করিয়া যে বাতাস বহিয়া যায় তাহার ম্লান স্মৃতি বেদনাহত হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া সহরবাসী রাত্রি অতিবাহিত করে। আগামী কাল কাহার ডাক আসে তাহারই প্রতীক্ষায় উদ্বেলিত সহরের লোক দিন গোণে। স্বাধীনতা-দিবসের আনন্দোৎসবে যাহারা জনগণের দুঃখে কাঁদিয়া বিহ্বল হন তাঁহাদের আজ দেখা মিলে না। মহামারী শেষ হইয়া সহরে শান্তির বাতাস বহিলে তাঁহাদের আবার দেখা মিলিবে। বাণী ও বক্তৃতা দিয়া দেশবাসীকে উপদেশামৃত পরিবেশন করিবেন।

অতীতের ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়া সরলপ্রাণ দেশবাসী চরিতার্থ হইবে। স্বামিহীনা স্ত্রী, পুত্রহীন পিতা, মাতাহীন সন্তান কিন্তু সেদিনের আলোকমালার বন্যায় ভাসিতে পারিবে না। শুধু নিরালায় বসিয়া শিহরিয়া উঠিবে। নরহন্তা সরকারের জল্লাদী দৃষ্টি হইতে পরিমিত ব্যবধানে থাকিয়া প্রশ্ন করিবে, কেন জানুয়ারী মাসে বসন্তের টীকা দেওয়া হয় নাই? মহামারীর সূচনায় কেন স্বাস্থ্য বিভাগের সর্ব্বাধিনায়ক মহাশয় এক সপ্তাহের জন্ম বাহিরে আসিয়া ঔষধের অভাব মিটাইলেন না? টেলিগ্রাম, রেডিওগ্রাম পাওয়া সত্ত্বেও কেন উপযুক্ত পরিমাণে "লিম্প" সরবরাহ করা হইল না? রোগ প্রারম্ভে ব্যাপক ভাবে টীকা দিলে হয়তো বহু প্রাণ রক্ষা পাইত। জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি সেবা করিতে আসিয়া লিম্পের অভাবে কেন ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল? পৃথিবীর অন্ত কোন স্বাধীন দেশে সরকারের ত্রুটির জন্ম একটি প্রাণ বিনষ্ট হইলে কর্তৃপক্ষকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া শাস্তি গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু আমরা শুধু কাঁদি আর অদৃষ্টের দোহাই দি। দীর্ঘশ্বাস ফেলি।...এর কি শেষ নাই?" —বীরভূমের ডাক।

মিসেস অথবা মিস

"শুধু হরি নয়, গৌরহরি। কেবল ইন্দ্রাণী নহে, রহমান ইন্দ্রাণী। —এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে: যজ্ঞ ও কোর্ব্বাণী, সারকামসিশুন এবং চূড়াকরণের মহামিলন হইল। মিসেস্ অথবা মিস্, আইবুড়ি অথচ এক ছেলের মাকে রূপের ডালি বলিয়া মুকুট পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যিনি দিয়াছেন, তিনি গান্ধীপন্থী কংগ্রেসের অন্যতম পাণ্ডা-পুরুষ মিঃ পাতিল। এক দিন অধ্যাত্মকবি কন্যাকুমারীকে বিষ্ণুপত্নী নমস্তভ্যং বলিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ভারত-জননীকে শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী মন্ত্রে আরতি করিয়াছিলেন। ঋষি ও দেবতাবৃন্দ নতি নিবেদন করিয়াছিলেন এই মন্ত্রে: ইন্দ্রাণী পাত্ত সন্তাব সংস্ততে পরমেশ্বরী। আর, শ্রীনেহরুর অপ্রগতিশীল ইণ্ডিয়া নটার পূজা করিয়া কৃতার্থমন্য হইল। এত দিনে ভারত-বিভাগ যজ্ঞের হইল অবভৃথ স্নান! এই 'মিস্ ইণ্ডিয়া'র অধঃপাতী অনুষ্ঠানে আমাদের সতী-লক্ষ্মীর, শঙ্খ-সিন্দুর-শোভিতা ভামাঙ্গিনী-সীমন্তিনীর, আমার দরিদ্রের ঘরণী-ভগিনী, লক্ষ সহস্র অনূঢ়ার যে অমর্য্যাদা অবমাননা হইল, তাহা আলাউদ্দীন খিলিজীকেও হার মানাইল। অধঃপাত আর কাহাকে বলে?" —আর্য্য।

* * * *

"বাংলার জনৈক মহিলা সৌন্দর্য্য-প্রতিযোগিতায় "মিস্-ইণ্ডিয়া" অর্থাৎ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলিয়া ঘোষিতা হইলেন। এই ভাবে রূপের প্রতিযোগিতা একেবারেই পাশ্চাত্য চঙ; ইহাকে ভারতীয় কৃষ্টি-বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। পুরুষের নিকট নারীর রূপ এবং নারীর নিকট পুরুষের রূপ প্রধানত যৌন-আবেদনধর্ম্মী, ইহাকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। তাই ভারতীয় সভ্যতা নারীর রূপকে কল্যাণের সহিত জড়িত করিয়া দেখিতে চাহিয়াছে, যদি অন্তরের পশু তাহাতে খানিকটা দমিত থাকে। এই জন্ম নারীর রূপের উপমা দিতে গিয়া আমরা বলিয়াছি লক্ষ্মীর মত রূপবতী, মা দুর্গার মত গড়ন ইত্যাদি। কখনও বলি নাই উর্ব্বশীর মত, রম্ভার মত সুন্দরী। কেন না উর্ব্বশীর যে রূপ, নর্ত্তকীর যে রূপ তাহার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। তাহা মানুষকে দাহ করে, শান্ত করে না; তাহা আমাদিগকে গৃহছাড়া করে, শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় দেয় না। আজ ভারতীয় সুন্দরীদিগকে আমরা বলি "তোমরা মিস্-ইণ্ডিয়া হইও না। রূপবতী হও কিন্তু মা লক্ষ্মীর মত রূপবতী হও। তোমাদের মধ্যে যেন আমরা কল্যাণ খুঁজিয়া পাই।" —বঙ্গবাণী।

গণসংযোগ

"জনগণের সমষ্টিগত কল্যাণই গণতন্ত্রের সত্যিকার উদ্দেশ্য এবং ইহার একমাত্র লক্ষ্যই হইতেছে তাই। আজ সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্র প্রভৃতি যে কোন অবস্থাতে স্বেচ্ছাচারের নিদর্শন খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না। এই ইচ্ছাকৃত স্বেচ্ছাচারের ফলে মানুষ বিক্ষুব্ধ ও বিভ্রান্ত হইতেছে। জনগণের এই বিক্ষোভ ও বিভ্রান্তি গণসংযোগ দূর করিতে পারে এবং ব্যক্তিবিশেষের, এমন কি সমষ্টিগত স্বেচ্ছাচারও দূর করিতে পারে। অজ্ঞতা প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রতিবন্ধক। মানুষের অজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। মানুষ যদি আপনার সত্তা, সমাজ-জীবনে আপনার অবস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হইবার মত চেতনা না পায় তবে গণতন্ত্র বৃথা ও ব্যর্থ হইয়া যাইতে দেরী হয় না। গণতন্ত্রকে প্রকৃত কল্যাণকর ও জনহিতকর করিয়া তুলিতে হইলে গণসংযোগ অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য।" —ত্রিস্রোতা।

মাহিনায় পার্থক্য

"করাচীতে কংগ্রেস এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, ভারতবর্ষে কোন সরকারী কর্মচারীর বেতন ৫০০ টাকার বেশি হোতে পারবে না। কংগ্রেসের হাতে শাসন-ভার আসার পর এখন দেখা যাচ্ছে, ৪ হাজার টাকাতেও থৈ পাচ্ছে না। যে দেশের জনসাধারণের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, রোগে ঔষধ জোটে না, সে দেশের এক জন লাট সাহেবের পেছনে বছরে খরচ হয় প্রায় ৬ লক্ষ টাকা এবং এমন কি, অতি অযোগ্য সেক্রেটারীদেরও বেতন দেয়া হয় মাসে ২,৭৫০ টাকা। অথচ এই দেশেরই এক জন প্রাথমিক শিক্ষক মাইনে পায় মাসে মাত্র ৩০ টাকা; ফলে অনেক সময়ে অভাবের তাড়নায় তাকে গলায় দড়ি দিতে হয়।" —সাধারণতন্ত্রী।

অমৃত না গরল?

"আজ সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, দেশবাসী মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে কি, হিন্দু জাতির মহত্ত্বপূর্ণ দেব-দেবী পূজা, গাজন, মহোৎসব রথোৎসব প্রভৃতিতে প্রায় অধিকাংশ কর্ম্মকর্ত্তা ও তৎ আনু-সঙ্গিক কার্য্য নির্ব্বাহকগণও মাদক দ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া পারেন না। শবদাহাদি ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, যাত্রা পার্ব্বণ, কীর্ত্তনাদিতে মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা একটা চিরচলিত প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজকাল এইরূপ দৃষ্টিগোচর হইতেছে মাদক দ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ বা ব্যবহার ব্যতিরেকে কোনও শুভাশুভ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে না। আমাদের বক্তব্য এই যে দেশের চিন্তানায়কগণ, দেশবাসিগণ কি এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন না? স্বাধীন দেশের অধিবাসিগণ

স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট নাগরিকতার পরিবর্ত্তে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিবে? সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া দেশ হইতে মাদকতা রূপ বিষের উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হউক।" —গ্রামসেবা।

জেলা কর্ত্তৃপক্ষ তৎপর হোন

"কাঁথি হইতে পেটুয়াঘাটে যাতায়াতের একমাত্র প্রধান ও প্রয়োজনীয় পথ রসুলপুর শ্যামচক ও শ্যামচক হইতে পেটুয়াঘাট পর্য্যন্ত রাস্তাটির উন্নয়ন জন্য আমরা কয়েক বার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে যখন সরকারী প্রচেষ্টায় দেশের চারি দিকে রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধিত হইতেছে, তখন এই অত্যাবশ্যকীয় পথটির উন্নতির জন্য আমরা জেলাবোর্ড কর্ত্তৃপক্ষকে তৎপর হইতে অনুরোধ জানাইতেছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কাঁথি মহকুমায় এ বৎসর সরকার হইতে রাস্তাঘাট আদির সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্য্যের মাধ্যমে Test Relief দ্বারা দেশবাসীর খাদ্য ঘাটতির দিনে সাহায্য দান করা হইবে, প্রস্তাবিত হইয়াছে। জানা গিয়াছে ইহাতে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে। আমরা পূর্ব্ব হইতেই কাঁথি রসুলপুর ও শ্যামচক পেটুয়াঘাট রাস্তাটির সংস্কার ও উন্নয়ন কার্য্যের জন্য যাহাতে এই অর্থ ব্যয়িত হয়, তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। বলা বাহুল্য যে, ইহাতে একটি বিশেষ অভাব পূরণের সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষ দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইবেন।" —নীহার।

অযৌক্তিক রিকুইজিশন

"করিমগঞ্জে বাসা রিকুইজিশন ব্যাপার নিয়া প্রায়ই নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, কোন ব্যক্তিবিশেষ সংশ্লিষ্ট অফিসের সঙ্গে অন্যায় যোগসূত্র স্থাপন করিয়া কোন বাসায় স্থায়ী ভাবে লোক থাকা সত্ত্বেও তাহা হুকুম-দখল করাইয়া থাকেন। সম্প্রতি সহরে এইরূপ এক ব্যাপারে রিকুইজিশনের ভারপ্রাপ্ত সাবডেপুটী মিঃ জামানের হঠকারিতার চূড়ান্ত পরিচয় পাইয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। এক জন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন অফিসার বা শিক্ষিত ভদ্রলোকের পক্ষে এরূপ কার্য্য সম্ভবপর বলিয়া ভাবিতেও লজ্জা হয়। এই শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারীর কার্য্যের ফলে স্বাধীন দেশের সরকারের সুনাম হানি হইয়া থাকে। উক্ত অফিসারের বিরুদ্ধে পূর্ব্বে আরো বহু গুরুতর অভিযোগ আমাদের কাছে আসিয়াছে। সরকার এরূপ কর্ম্মচারীকে সংযত করার ব্যবস্থা অবিলম্বে করিবেন—এরূপ আশা অবশ্যই করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমরা বাড়ী রিকুইজিশন সম্পর্কে অযৌক্তিক নীতি পরিবর্ত্তনের দাবীও জানাইতেছি।" —যুগশক্তি।

কৃষিজীবিগণ বিবেচনা করুন

"সরকারী খাদ্য-সংগ্রহ এ বৎসর বর্দ্ধমান জেলায় মোটেই আশাপ্রদ নহে। সত্য কথা, প্রতি বৎসরের তুলনায় এ বৎসর উৎপন্ন খাদ্য-শস্যের পরিমাণ অনেক কম। উৎপাদনের অনুপাতে সংগ্রহ-কার্য্য অগ্রসর হইতে থাকিলে বিশেষ উদ্বেগের কারণ ছিল না। ধান্যের মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনায় অনেকেই সরকারকে ধান্য বিক্রয় করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন বলিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি। দ্রব্যমূল্যের হ্রাস হওয়ায় বিশেষতঃ কৃষিজীবিগণের নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যমূল্য (বস্ত্র ব্যতীত) অত্যধিক হ্রাস হওয়ায় নূতন করিয়া ধান্যের মূল্য বৃদ্ধির কথা চিন্তা করা যাইতেছে না। সুতরাং ধান্যের মূল্য বৃদ্ধির আশায় ধান্য বিক্রয়ের ইতস্ততঃ করিলে সংগ্রহ ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। আমরা জেলার কৃষিজীবিগণকে প্রদেশের খাদ্যাবস্থার কথা বিবেচনা করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছি।" —বর্দ্ধমান।

মাসতুতো ভাই

"সরকারের ধান্য-সংগ্রহ নীতি কার্য্যকরী করার অধিকারী কর্ম্মচারীদের কল্যাণে পল্লীগ্রাম অঞ্চলে ইহা "বর্গীর হাঙ্গামার" মতই আতঙ্ক ও অসন্তোষের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কৃষিজীবিদের উদ্বৃত্ত ধান্য স্বেচ্ছায় সরকারকে দিবার মত সহানুভূতিপূর্ণ মনোবৃত্তি গঠন করিতে সরকারের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের অবহেলাই ক্রমশঃ সারা দেশে অসন্তোষের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। স্বীয় শ্রম-জাত সোনার ফসল এই সকল "বর্গীদের" হাতে তুলিয়া দিয়া "আপন-ভাতে বেগুন-পোড়া" অবস্থার সৃষ্টি করিতে কাহারই বা ইচ্ছা হয়? শিল্পাঞ্চল তথা কলিকাতা সহরে অবস্থিত আমাদেরই আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়াইবার জন্য এই ধান্য সংগ্রহ করা হইতেছে—উহাদের খাওয়াইবার পবিত্র দায়িত্ব বহন করার অধিকার লাভ করিয়া পল্লীগ্রামের কৃষিজীবির ধন্য হওয়া উচিত—এই সকল ঔচিত্য-বোধ জাগ্রত করার মত অবস্থার সৃষ্টি করিতে সরকারের এই বিভাগ সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছে। সর্ব্বোপরি এই বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র ব্যবস্থাই বানচাল করিয়া দিতেছে। কর্ডনিং উপবিভাগের সম্পর্কে ত নিন্দায় আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ বাঙ্গলা দেশের গ্রাম্য বৃদ্ধার আশীর্ব্বাণী—"দারোগা হও বাবা"—না হইয়া "পেট্রোল গার্ড বা লীডার হও" এই বাণীই স্বতঃ উচ্চারিত হওয়ার মত অবস্থা হইয়াছে। আজিকার বৃদ্ধা হয়ত সন্ধান রাখেন না যে, এই বিভাগের সংশ্লিষ্ট সাধারণ অথবা শাখা-বিভাগগুলির কর্ত্তা, উপকর্ত্তাগণ ইহাদেরই "মাসতুতোভাই" ব্যতীত আর কিছুই নহেন, তাই তাঁহার আশীষের বাণী-ভাণ্ডার এখনও এত দীন হইয়া আছে।" —রাঢ়দীপিকা।

ছাড়িবেন তো ছাড়ুন

"তমলুকের কতকগুলি ধানকলকে সরকার ফি লইয়াও নূতন করিয়া আর লাইসেন্স দিতেছেন না। শুনা যাইতেছে, লাইসেন্স-ফি বাৎসরিক ৫০৲ টাকা হইতে নাকি বাড়াইয়া ২৫০৲ টাকার ধার্য্য ও আদায় করিবার উদ্দেশ্যেই এই তুষ্ণীভাব। পারমিট সম্বন্ধে ঐ এক অবস্থা অথচ লোককে ধান কুটাইতেই হইতেছে। ফলে নূতন-পুরাতন কোন ধানকল বসিয়া নাই আর তাহাদের কাজ যে অবৈধ তাহা বলিবার বা দেখিবার কেহ আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহাতে জনসাধারণের সঙ্গে সঙ্গে ধানকল মালিকদের

[illegible] অনেক সুবিধা হইতেছে কিন্তু আইন থাকা সত্ত্বেও যদি তাহা [illegible] না হয় তবে অবৈধ কার্য্যে লোকের সাহস বাড়িয়া যায়। [illegible] ইহা কি সরকার কি শান্তিপ্রিয় দেশবাসী কাহারও পক্ষে [illegible] হয় না। সুতরাং এ আর সি পি'র এই ন যযৌ ন তস্থৌ [illegible] কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। ছাড়িবেন ত সবকে বলিয়া কহিয়াই ছাড়িয়া দেন, আর না ছাড়িবেন ত তাড়াতাড়ি তাহারও একটা ব্যবস্থা করুন।"

—প্রদীপ।

গঙ্গা-বাঁধ ও ভাগীরথী

মেজর জেনারেল রেনেল অঙ্কিত কাশিমবাজার দ্বীপের মানচিত্রে দেখা যায়, সুতীর নিকট হইতে নির্গত হইয়া ভাগীরথী নদী গরেশপুর পর্য্যন্ত বাঁকে বাঁকে আসিয়াছে এবং পদ্মা হইতে নির্গত আরও কয়েকটি শাখার সহায়তা পাইয়াছে। বর্ত্তমানে ভাগীরথী মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর ভাগে আর কোনও শাখার সহিত সংযুক্ত নয়। ১১১৩ সালে ভাগীরথী নুরপুরের নিকটে পদ্মানদী হইতে বাহির হওয়ার কথা ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লেখা আছে। জঙ্গীপুরের কিছু উপরে বাশলই ও পাগলা নদী এবং শক্তিপুরের কাছে চোয়া ডেকরা নদী আসিয়া ভাগীরথীতে পড়িত। সেই উপনদীগুলিও বর্ত্তমানে তেমন জল সরবরাহ করে না। মিঃ ওয়্যালী ভাগীরথীর স্রোতের গতি উত্তর হইতে দক্ষিণ না হইয়া উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে হওয়ার জন্ম নদীতে পলীমাটি অধিক পরিমাণে জমা হওয়ার কথাও লিখিয়াছেন। মোটের উপর বর্ত্তমানে ভাগীরথী নদীকে জলপূর্ণ ও স্রোতস্বিনী রাখার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। অবিলম্বে গঙ্গা-বাঁধ পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার সেই কারণেই প্রয়োজন। Feeder channels খনন করিয়া পূর্ব্বে যেমন গঙ্গানদীর জল নানা খাতে ভাগীরথীতে প্রবেশ করিত, তাহার ব্যবস্থা না করিলে ভাগীরথী শুকাইয়া যাইবে। তাহাতে মুর্শিদাবাদবাসীর যেমন ক্ষতি হইবে, কলিকাতা প্রভৃতি দক্ষিণ দেশেরও তেমনি লাভ হইবে না। কথায় বলে সময়ের একটি কোঁড় অন্ত সময়ের নয়টি কোঁড়ের সমান। আমরা ভরসা করি, ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ফরাক্কায় গঙ্গা-বাঁধ রচনার ব্যবস্থার সহিত ভাগীরথী নদীর সংস্কার কার্য্যেও অবিলম্বে ব্রতী হইবেন। অপরাপর পরিকল্পনা অপেক্ষা এই পরিকল্পনা কম জরুরী নয় বলিয়াই আমরা মনে করি।"

—মুর্শিদাবাদ সমাচার।

পেঁয়াজ-পয়জার

সরকারী ধান্ত-সংগ্রহ ব্যাপারে নানা প্রকার জুলুম প্রভৃতি অনাচারের বহু সংবাদই প্রকাশ পায়, কিন্তু গত ১২ই চৈত্রের সহযোগী "মুর্শিদাবাদ সমাচারে" হরিহরপাড়া থানার হরিশপুর হইতে পরেশ সেখ যে অভিযোগ করিয়াছে, তাহা খুবই গুরুতর। প্রোকিওরমেন্ট অফিসার তাহার যে পরিমাণ ধান সীজ করেন, অজ্ঞ চাষী ভয়ে সই করিয়া দেয়। তাহার যে ধান আছে তাহাতে তাহার বছর কাটিবে না। ইতিমধ্যে ইউঃ বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বাবুর মধ্যস্থতায় ১০০৲ টাকা জোগাড় করিয়া দিয়া সে-যাত্রা সে অব্যাহতি পায়। কিন্তু এইখানেই তাহার শাস্তি শেষ হইল না। হঠাৎ পুনরায় প্রোকিওরমেন্ট চীফ ইনস্পেক্টর পরেশ সেখের উপর চার্জ্জ করেন এবং কেন ধান দাও নাই বলিয়া ভয় দেখান। বেচারী সমস্ত বিবরণই তাঁহাকে জানাইলে তিনি যথারীতি তাহাকে হাঁকাইয়া দেন, আবার প্রেসিডেন্ট বাবুও টাকা ফেরৎ দিতে অস্বীকার করিতেছেন। গরীব চাষীরা কি ভাবে হয়রাণ হইতেছে—ইহা হইতেই তাহা বুঝা যায়। অনেকেই আমাদের কাছে এইরূপ অভিযোগ করে, লিখিয়া দিতে সাহস করে না। পরেশ সেখের সাহস দেখিয়া অপরেও এইরূপ ঘটনা লিখিয়া জানাইলে প্রতীকারের ব্যবস্থা হইতে পারে।"

—পল্লীবাসী।

এ্যাসেসমেণ্টেও গলতি

"পুরুলিয়া সহরের মিউনিসিপ্যাল এ্যাসেসমেণ্ট প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর হয়। বর্ত্তমান বৎসর এ্যাসেসমেণ্টের বৎসর পড়িয়াছিল। পুরাতন এ্যাসেসমেণ্টগুলিতে নানাবিধ বৈষম্য থাকে বলিয়া নূতন যথাযোগ্য এ্যাসেসমেণ্ট লোকে কামনা ও অভিনন্দিত করে। এ বৎসর মনোনীত এ্যাসেসারের উপরে পুরুলিয়া সহরের এ্যাসেসমেণ্টের ভার পড়ে। বিগত মার্চ্চ মাসে এ্যাসেসমেণ্ট দাখিলের শেষ তারিখ নির্দ্ধারিত ছিল। শেষ তারিখে দাখিল না হইলে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আরো এক বছর পিছাইয়া যায়—ইহাই নিয়ম। আমরা শুনিলাম, নূতন এ্যাসেসমেণ্ট ঐ তারিখ মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে নাই। সুতরাং এ্যাসেসমেণ্ট এক বছরের জন্ম পিছাইয়া গেল। ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় হয় নাই। শুনিতেছি, এ্যাসেসমেণ্ট গৃহীত হইতে না পারার পিছনে কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে ব্যাপার কি, সঠিক ভাবে জানিবার জন্ম আমরা আগ্রহান্বিত। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

—মুক্তি।

উৎসাহী হইতে দেখিলে

"সেচ ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তনের দ্বারা উৎপাদনে আগ্রহশীল সরকারকে আমরা এক্ষণে ইহাই সুপারিশ করিব যে, ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত তাহারা উপকৃত। জমির মালিকদের লইয়া নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার জন্ত বাঁধ নির্ম্মাণ ও জল সরবরাহ সমবায় সমিতি গঠন করিয়া তাঁহাদের উপর এই কাজের ভারার্পণ করুন। ইহার দ্বারা জমির মালিকগণ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হইয়া ইহা কার্য্যকরী করার জন্ত আগ্রহান্বিত হইবেন এবং স্থায়ী ভাবে সেচ ব্যবস্থা রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা থাকিবে। ইহা ছাড়া জমির মালিকগণ ইহার দ্বারা উপকৃত হইতে থাকিলে ভবিষ্যতে সমবায়ে চাষে আকৃষ্ট হইয়া অধিক উৎপাদনে তাঁহারা যথেষ্ট উৎসাহ পাইবেন। অধিক উৎপাদনে আগ্রহশীল জাতীয় সরকারকে এই কাজে উৎসাহী হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।"

—বর্দ্ধমানের কথা।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক